















# প্রবাসী

বৈশাখ—১৩৭৯

# প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৭৯

## সূচীপত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ—	...
একোত্তর-সপ্ততিবর্ষোত্তীর্ণ প্রবাসী—	...
পুরাতন বিবিধ প্রসঙ্গ সঙ্কলন—	...
চটির পাটি—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়	...
বাংলা ভাষার সংস্কার—বিজয়চন্দ্র মজুমদার	...
পিতৃদেব স্মরণে আমার জীবনস্মৃতি—জ্যোতির্নাথ ঠাকুর	...
অপমান ( কবিতা )—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
স্বপ্ন ( কবিতা )—বিজয়লাল রায়	...
মণি (কবিতা)—দেবেন্দ্রনাথ সেন	...
মেঘের (কবিতা)—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...
গাগর পারে—সীতা দেবী	...
অভাবহীন পথ ( উপভাস )—যমুনা নাগ	...
নীলাচলে—কানাইলাল দত্ত	...
মাতৃভাষার অর্থশাস্ত্র—অধিমল সিংহ	...
সহজ শোভন এবং কষ্টকরিত জাতীয় ভাব—বিজয়লাল ঠাকুর	...
হকার জন্ম—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...
অভয় ( উপভাস )—শ্রীমুখীচন্দ্র রাহা	...
কংগ্রেস স্মৃতি—শ্রীগিরিজামোহন সান্নাল	...
পুণা আশ্রমে—দিলীপকুমার রায়	...
জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক—অমল সেন	...
করুণার আধার মাদার চেরেজা—কমলা দাশগুপ্ত	...
ক্রমক্রমেবৈহ ন প্রার্থয়ন্তে (কবিতা)—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	...
ছায়াময়ী (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ সান্নাল	...
পশ্চিমবঙ্গের নাম রাখা হোক “বঙ্গভূমি”—অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়	...
ঐতিহাসিক ঘোড়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
এটম্ বম্ (কবিতা)—যোগানন্দ দাস	...
মিটে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...
প্রবাসীর সন্তর বৎসর—জ্যোতির্নাথ দেবী	...
হেলেনের পাততাড়ি—লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়	...
রসময়ীর রণিকতা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	...
বাঙালীত্ব ধ্বংসের নানা আয়োজন—পরিমল গোস্বামী	...
প্রকল্প-স্বপ্নায়ণে বিতস্ত বাংলার বর্তমান চিত্র—চিন্তরঞ্জন দাস	...
আমার ইউরোপ ভ্রমণ—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	...
পঞ্চদশ্য—	...
সাময়িকী—	...
দেশ বিদেশের কথা—	...
শোক সংবাদ—	...
নেতৃত্ববাদ—বিমুখুবর্ণ জানা	...



**પ્રતાપી**

# প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩৭৯

## সূচীপত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ—	...	১
একোত্তর-সপ্ততিবর্ষোত্তীর্ণ প্রবাসী—	...	৯
পুরাতন বিবিধ প্রসঙ্গ সম্বলন—	...	১৪
চটির পাটি—চাক বন্দোপাধ্যায়	...	২৫
বাংলা ভাষার সংস্কার—বিজয়চন্দ্র মজুমদার	...	৩১
পিড়ভেব সন্দেশে আমার জীবনস্মৃতি—জ্যোতির্ময়নাথ ঠাকুর	...	৩৪
অপমান ( কবিতা )—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩৮
স্বপ্ন ( কবিতা )—বিজয়লাল রায়	...	৩৮
মণি (কবিতা)—দেবেন্দ্রনাথ সেন	...	৩৯
মেঘর (কবিতা)—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৪০
সাগর পারে—সীতা দেবী	...	৪১
অভাবহীন পথ ( উপভাস )—বহুনা নাগ	...	৫০
নীলাচলে—কানাইলাল দত্ত	...	৫৮
মাতৃভাষায় অর্থশাস্ত্র—সুবিমল সিংহ	...	৬৩
সহজ শোভন এবং কষ্টকল্পিত জাতীয় ভাব—বিজয়লাল ঠাকুর	...	৭১
হকার জগৎ—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	৭৩
অভয় ( উপভাস )—শ্রীমুখীচন্দ্র রাহা	...	৮১
কংগ্রেস স্মৃতি—শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল	...	৮৯
পুণা আশ্রমে—দিলীপকুমার রায়	...	৯৫
জোনাকি থেকে জ্যোতির্জ—অমল সেন	...	১০২
কল্পনার আধার মাদার চেরেজ—কমলা দাশগুপ্ত	...	১১১
ক্রমক্রমেবোধ ন প্রার্থন্যে (কবিতা)—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	...	১১৬
ছায়াময়ী (কবিতা)—শ্রীআন্তোব সান্যাল	...	১১৬
পশ্চিমবঙ্গের নাম রাখা হোক “বঙ্গভূমি”—সুজিতকুমার ব্রূখোপাধ্যায়	...	১১৭
ঐতিহাসিক ঘোড়—রবীন্দ্রনাথ ভট্ট	...	১১৮
এটম্ বম্ (কবিতা)—যোগানন্দ দাস	...	১২০
মিতে—সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১২১
প্রবাসীর সস্তর বৎসর—জ্যোতির্ময়ী দেবী	...	১২৫
হেলেনের পাভভাড়ি—লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়	...	১২৮
রসময়ীর ঝগড়া—প্রভাতকুমার ব্রূখোপাধ্যায়	...	১৩১
বাঙালীত্ব ধ্বংসের নানা আরোহণ—পরিমল গোস্বামী	...	১৪০
প্রকল্প-রূপায়ণে বিভক্ত বাংলার বর্তমান চিত্র—চিত্তরঞ্জন দাস	...	১৫১
আমার ইউরোপ ভ্রমণ—জৈলোক্যনাথ ব্রূখোপাধ্যায়	...	১৬২
পঞ্চশস্য—	...	১৬৮
সাময়িকী—	...	১৭০
দেশ বিদেশের কথা—	...	১৭২
শোক সংবাদ—	...	১৭৬
নেতৃত্ববাদ—বিধুভূষণ জানা	...	১৭৭
চিত্রাশিল্পে প্রবাসীর অবদান—দেবীপ্রসাদ দ্বারচৌধুরী	...	১৭৯
সঙ্গীতজিজ্ঞাসা—	...	১৮০



জ্যৈষ্ঠ-১৩৭৯

প্রবাসী



## প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯

বিবিধ প্রসঙ্গ—	...	১৮৫
রামমোহন রায়—বতীজনাথ ঠাকুর	...	১৯০
রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে সামান্ত হ—একটি কথা—ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	...	১৯৬
১১ই মাঘ—বতীজনাথ ঠাকুর	...	২০০
শায়ত প্রতিষ্ঠা—কিৰ্ত্তিমোহন সেন শাস্ত্রী	...	২০২
ভারতবর্ষের ধর্ম—বতীজনাথ ঠাকুর	...	২০৮
রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ	...	২১১
ব্রাহ্মসমাজের সাধকতা—বতীজনাথ ঠাকুর	...	২১৩
ভক্তিধর্ম ও জাতিভেদ—শিবনাথ শাস্ত্রী	...	২১৯
প্রবাসী—কুসুমবল্লভ মল্লিক	...	২২৬
পিতৃহৃতি—সৌদামিনী দেবী	...	২২৭
রাজা রামমোহন রায়—অশোক চট্টোপাধ্যায়	...	২৩৫
নেতা রামমোহন রায়—কাজী আবদুল ওহুদ	...	২৪৪
রাজা রামমোহন রায়—জ্যোতির্ধরী দেবী	...	২৪৮
রামমোহন রায় ও বাংলা গদ্য—মনোমোহন ঘোষ	...	২৫১
সাগর পারে—সীতা দেবী	...	২৫০
জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক—অমল সেন	...	২৬৫
অভয় (উপভাস)—ঐন্দ্রধীরচন্দ্র রাহা	...	২৭৪
কংগ্রেস দৃষ্টি—ঐগিরিকামোহন সান্যাল	...	২৭৯
আমার ইউরোপ ভ্রমণ—বৈলোক্যনাথ বুধোপাধ্যায়	...	২৮৪
অভাববহীন পথ (উপভাস)—বসুনা নাগ	...	২৯০
পুণী আশ্রমে—দিলীপকুমার রায়	...	২৯৬
মাতৃভাষার হৃদয়শাস্ত্র—অধিবল সিংহ	...	৩০১
বৃন্দাবন রামমোহন—কিৰ্ত্তিমোহন ঘোষ	...	৩০৬
স্বর্ণ—বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায়	...	৩২০
কলঙ্ক—বতীজনাথ ঠাকুর	...	৩২১
কাল রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে—মনোমোহন সিংহরায়	...	৩২১
সবটুকু ঘোছে নাকি—করুণাময় বসু	...	৩২২
ব্রেন্সেলের বাড়িকর—সম্মতি চট্টোপাধ্যায়	...	৩২৩
“বঙ্গভূমি” নাম হবে কেন ?—অজিতকুমার বুধোপাধ্যায়	...	৩২৬
আমেরিকার উপর ভারতের প্রভাব	...	৩২৭
রাজা রামমোহন রায়ের রচনার উদ্ধৃতি	...	৩৩১
রামমোহন সম্বন্ধে দেশী বিদেশী লোকদের মত	...	৩৪২
পঞ্চশত—	...	৩৪৭
দেশ-বিদেশের কথা—	...	৩৫১
সাময়িকী—	...	৩৫৭
পুস্তক পরিচয়—	...	৩৬০



## প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩৭৯

### সূচীপত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ—	...	৩৬১
আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রামমোহন রায়—যোগানন্দ দাস	...	৩৬২
কোনাকি থেকে জ্যোতিষ—অমল সেন	...	৩৬৭
পিতা ও পুত্র—স্বধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩৮২
আমার ইউরোপ ভ্রমণ—জৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	...	৩৯৩
পুণী আশ্রমে—দিলীপকুমার রায়	...	৩৯
ইসলামী বৈশিষ্ট্য ও বাঙালী মনীষা—জ্যোতির্ষ্ময়ী দেবী	...	৪০
অভিবিহীন পথ (উপভাস)—বহুলা নাগ	...	৪০
কংগ্রেস স্থিতি—শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল	...	৪১৬
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাধনা প্রসঙ্গে রামমোহন রায়—বিজ্ঞেননাথ ঠাকুর	...	৪১৭
সাগর পারে—সীতা দেবী	...	৪২৭
অবনীন্দ্র-স্থিতি রক্ষা প্রসঙ্গে—শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় ও জিহববরুণ মিত্র	...	৪২
অভয় (উপভাস)—শ্রীস্বধীরচন্দ্র বাহা	...	৪৩০
সঙ্গীত সঙ্কলন—রাজা রামমোহন রায়	...	৪৩৮
বোম্বেশচন্দ্র স্মরণে—কানাইলাল দত্ত	...	৪৫৭
বিশ্বতপ্রায় কবি—রুবিকা কব	...	৪৭
ভারতের, বিপ্লব আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের ভূমিকা—সন্তোষকুমার অধিকারী	...	৫০
ক্রীড়া জগতে ভার প্রশিক্ষনের অবদান—স্বধীন্দ্রনাথ ভট্ট	...	৫৫
বর্ষ মর্মর—ডাঃ নন্দলাল গাল	...	৫৬
হেলেনের পাততাড়ি—সম্মী চট্টোপাধ্যায়	...	৪৭
পঞ্চশত—	...	৪৭৮
সামরিকী—	...	৪৭
দেশ বিদেশের কথা—	...	৪৮১

## কুষ্ঠ ও ধবল

## দি বেঙ্গল আর্ট প্রিন্টার

৭০ বৎসরের চিকিৎসাক্ষেত্রে হাওড়া কুষ্ঠ-কুষ্ঠীর হইতে  
নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা দুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও  
অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা হাড়া  
একজিবা, সোরাইনিস, ছটকতাদিসহ কঠিন কঠিন চর্ম-  
রোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসার আরোগ্য হয়।  
বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের অল্প লিখুন।

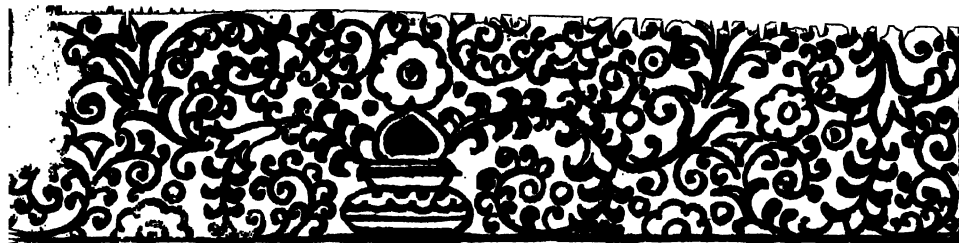
পণ্ডিত রামপ্রসাদ শর্মা কবিরাজ, সি, বি, নং ৭, হাওড়া।

পাখা :—৩৬নং হারিসন রোড, কলিকাতা-৯



৭, ইণ্ডিয়ান মিটার স্ট্রিট,

কলিকাতা-১৩



ଆବଣ

୧୦୭୯



# প্রবাসী—শ্রাবণ ১৩৭৯

## সূচীপত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ—	...	৪৮৫
ভারতীয় দর্শনে বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা—সলিল বিশ্বাস	...	৪৯০
আমার ইউরোপ ভ্রমণ—ঐক্যলোকনাথ মুখোপাধ্যায়	...	৫০৭
শ্রীঅরবিন্দের 'দ্বিত্ব-জীবন'-এর আলোচনা—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	...	৫১০
জোনাকি থেকে জ্যোতিষ—অমল সেন	...	৫২১
মাতৃভাষার অর্থশাস্ত্র—সুবিমল সিংহ	...	৫২৫
অভয় ( উপভাস )—শ্রীস্বধীরচন্দ্র রাহা	...	৫২৯
ভোট—শ্রীভাগবত দাস বরাট	...	৫৩৭
কংগ্রেস স্থিতি—শ্রীগিরিজামোহন সাক্সাল	...	৫৩৭
অভাবহীন পথ ( উপভাস )—যমুনা নাগ	...	৫৪৪
প্রকল্প-রূপায়ণে বিভক্ত বাংলার বর্তমান চিত্র—চন্দ্ররঞ্জন দাস	...	৫৫০
পুণা আশ্রমে—শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	৫৫৮
বকিতা ( গল্প )—আরতি বসু	...	৫৬৫
রাজমাফা ( কবিতা )—জ্যোতিষ্ময়ী দেবী	...	৫৭২
রামমোহন বিশ্ববৈষ্ণব মূল অন্তঃসন্ধান—অশোক চট্টোপাধ্যায়	...	৫৭
রামমোহন জিজ্ঞাসার পথিকৃত রাখালদাস হালদার—কিতান রায়	...	৫৭৭
আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রামমোহন রায়—যোগীনন্দ দাস	...	৫৮৫
ছেলেদের পাতভাঙি—লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়	...	৫৮৯
পঞ্চশত—	...	৫৯২
সাময়িকী—	...	৫৯৬
দেশ বিদেশের কথা—	...	
পুস্তক পরিচয়—	...	৬০১

## কুষ্ঠ ধবল

## দি বেঙ্গল আর্ট প্রিন্টার

৭০ বৎসরের চিকিৎসাক্ষেত্রে হাঁওড়া কুষ্ঠ-কুষ্ঠীর হইতে  
নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা দুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও  
অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা হাঁড়া  
একজিবা, লোরাইসিল, স্ট্রিক্তাদিসিহ কঠিন কঠিন চর্ম-  
রোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসার আরোগ্য হয়।  
বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের ভ্রম লিখুন।

পণ্ডিত রামপ্রসাদ শর্মা কবিরাজ, পি, বি, নং ৭, হাঁওড়া

পাখা :- ৩৬নং হারিসন রোড, কলিকাতা-৯



৭, ইন্ডিয়ান মিটার স্ট্রিট,

কলিকাতা-১৩



ভাঙ্গ

১৩৭৯



# প্রবাসী—ভাদ্র, ১৩৭৯

## সূচীপত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ—	৬০৫
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবণতা—অধ্যাপক শ্রীমল কুমার চট্টোপাধ্যায়	৬১০
জোনাকি থেকে জ্যোতিষ—অমল সেন	৬১৯
রামায়ণে আৰ্য সমাজ—রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী	৬২৬
আমার ইউরোপ ভ্রমণ—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	৬৩১
বৃত্ত—অর্ধেন্দু চক্রবর্তী	৬৩৭
কংগ্রেস স্থিতি—শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল	৬৪১
ঐক্যবোধনাথ ১৩৭৯ ভ্রমণ স্মরণে—সংগ্রাম সিংহ ভালুকদার	৬৪৭
অভয় ( উপভাস )—ঐক্যবোধনাথ	৬৪৮
অবীক্ষিত ও বৈশালিনী—শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায়	৬৫০
জৈব—ঐক্যবোধনাথ রঞ্জন সেনগুপ্ত	৬৬৪
সেকাল আর একাল কলিযুগ—সত্যযুগ—যতীন্দ্র মোহন গাঙ্গুলী	৬৬৮
অভাবহীন পথ ( উপভাস )—যমুনা নাগ	৬৭১
পণ—ঐক্যবোধনাথ দাস	৬৭৭
এককল্প-রূপায়ণে বিভক্ত বাংলার বর্তমান চিত্র—চন্দ্ররঞ্জন দাস	৬৮১
মাতৃভাষার অর্থশাস্ত্র—স্বর্নমল সিংহ	৬৮৭
রামমোহন ( কবিতা )—শান্তশীল দাস	৬৯১
সনেট ( কবিতা )—শ্রীঅণুভোষ সান্যাল	৬৯১
ডাক ও সাড়া ( কবিতা )—শ্রীদিলীপকুমার রায়	৬৯২
অকাল কান্তন ( কবিতা )—ঐক্যবোধনাথ মুখোপাধ্যায়	৬৯২
একশ শতকের পৃথিবী—শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার দে	৬৯৩
সাবিত্রীর কবি কবি শ্রীঅরবিন্দ ( কবিতা )—শ্রীদিলীপ কুমার রায়	৭১০
হলেদের পাততর্জি—লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়	৭১২
সাময়িকী—	৭১৬
পঞ্চলত—	৭১৯
দেশ বিদেশের কথা—	৭২১
পুস্তক পরিচয়—	৭২৪

## কুষ্ঠ ও ধবল

দি বেঙ্গল আর্ট প্রিন্টার



৭০ বৎসরের চিকিৎসাক্ষেত্রে হাড্ডা কুষ্ঠ-কুষ্ঠীর হইতে  
নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা স্বাস্থ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগের  
অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা হাড্ডা  
একজিয়া, সোরাইসিস, হুটকডািসহ কঠিন কঠিন চর্ম-  
রোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসার আয়োগ্য হয়।  
বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের অল্প নিধন।  
পণ্ডিত রামচরণ শর্মা কবিরাজ, পি, বি, নং ৭, হাড্ডা ॥

৭, ইন্ডিয়ান মিটার স্ট্রিট,

আশ্বিন

১৩৭৯





# প্রবাসী—আশ্বিন ১৩৭৯

## সূচীপত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ—	...	৭২৫
বাংলায় বিপ্লব সংগঠন ও যতীন্দ্রনাথ দাস—সন্তোষকুমার অধিকারী	...	৭৩৩
রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে তাঁর সৈন্যের বাংলার কথা—গৌরীদাস মল্লিক	...	৭৭২
অভয় (উপভাস)—শ্রীমুখীচন্দ্র রাই	...	৭৫৩
গল্প বলছি (গল্প)—হর্গোপদ দাস	...	৭৫৭
সংগ্রামী যোগেশদাস : একটি প্রকাজলি—বিশ্বপ্রাণ ভট্ট	...	৭৬০
আদর্শবাদ ও ধর্মমত—	...	৭৬৩
ভালো জাত—নিত্যানন্দ	...	৭৬৫
আমার ইউরোপ ভ্রমণ—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	...	৭৬৮
বাংলা দেশের নৃকের তিন রূপ—শ্রী যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৭৭৪
মাহ কুটলে মুড়ো দোব—জ্যোতির্ষধী দেবী	...	৭৭৭
পূর্ণা অশ্রমে—শ্রীদিলীপকুমার রায়	...	৭৭৯
অগ্নিগর্ভ পশ্চিমবঙ্গ (৭)—শ্রীমুখীশীল দত্ত	...	৭৮৭
কংগ্রেস স্থিতি—শ্রীগিরিজামোহন সাক্তাল	...	৭৯৭
নাট্যরীতি—ধীরেন্দ্রনাথ রায়	...	৮০৩
রজনীকান্তের কল্যানী—শৈলেনকুমার দত্ত	...	৮০৮
অজবিহীন পথ (উপভাস)—যমুনা নাগ	...	৮১২
রামমোহন ও নবজাগরণ—	...	৮১৯
শ্রী শ্রবিন্দ : শতাব্দী অর্থ (কবিতা)—শান্তশীল দাস	...	৮২৬
একহরমূপস্তম্ভ : (কবিতা)—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	...	৮২৭
হলেদের পাভর্জাড—সম্মী চট্টোপাধ্যায়	...	৮২৯
দীন দরিন গীতিকার অহল যদা—শ্রী ভাগবতলাল বরট	...	৮২৮
দেশ বিদেশের কথা—	...	৮৩০
সাময়িকী—	...	৮৩৩
পঞ্চশত—	...	৮৩৭
পুস্তক পরিচয়—	...	৮৪৪

## কুষ্ঠ ও ধবল

## দি বেঙ্গল আর্ট প্রিন্টার

৭০ বৎসরের চিকিৎসাক্ষেত্রে হাওড়া কুষ্ঠ-কুষ্ঠীর হইতে নব আবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা হুঃসাধ্য কুষ্ঠ ও ধবল রোগীও অল্প দিনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতেছেন। উহা ছাড়া একজিয়া, সোরাইসিস, স্ফটিকতাদিসহ কঠিন কঠিন চর্ম-রোগও এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসার আরোগ্য হয়। বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-পুস্তকের ভত্ত লিখুন।  
পণ্ডিত রামপ্রসাদ শর্মা কবিরাজ, পি, বি, নং ৭, হাওড়া



৭, ইণ্ডিয়ান মিটার স্ট্রীট,



ବର୍ଷକଳାକ୍ରମ କଥନ

ଶ୍ରୀନନ୍ଦନାଥ ବନ୍ଧୁ



# প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নারায়ণা বলহীনেন লভ্যঃ”

৭২তম ভাগ  
প্রথম খণ্ড

}

বৈশাখ, ১৩৭৯

}

১ম সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

কম্যুনিষ্ট, ফ্যাশিষ্ট ও স্বাধীন-মানবীয় সংস্থা

একটা সময় ছিল যখন গরীব শ্রমজীবী অথবা কৃষকগণ যদি নিজেকে আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনার্থে আন্দোলন করিত তাহা হইলে তাহাদের উপরওয়াল মালিকগণ তাহাদিগকে বিপ্লবী, বিদ্রোহী অথবা কম্যুনিষ্ট বলিয়া অপবাদ করিয়া তাহাদের অধিক পাওনার দাবি যে সকল দিক দিয়াই নিষ্পত্তি ও গর্হিত এই কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেন। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রভী যে সময় গঠিত হয় নাই তখন তাহারা বিদ্রোহী বা বিপ্লবী বলিয়াই অখ্যাতির অধিকারী হইত। পরে কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে তাহারা শোষণ কার্য নিরত মালিক গোষ্ঠীর ভাষায় কম্যুনিষ্ট বলিয়া অখ্যাতিত হইতে আরম্ভ করিল। ইহার সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্ৰ-পীড়িত প্রজাদিগের “সিডি-শন” হুলনীয়। লুণ্ঠন, অত্যাচার ও সর্বপ্রকার বর্বরতা নিষ্পেষিত প্রজাদিগের পক্ষে রাজা বা সম্রাটের বিরুদ্ধে কোন প্রকার আন্দোলন পরিচালনাই চূড়ান্ত অপরাধ বলিয়া উৎপীড়কগণ ধরিয়া লইতেন ও সেই অর্যোক্তিক ধারণা অনুসরণে তাহাদিগের উপর অত্যাচার আরও অবলম্বনে চালাইতে থাকিতেন। অর্থনীতি ক্ষেত্রের

শোষণও এই একইভাবে জোরাল হইয়া উঠিত এবং প্রাপ্য না দিয়া গুণ প্রার্থীর বদনাম করিয়াই নীতি-সংস্কারকার্য শেষ করা হইত। কোনও ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসংঘকে বিদ্রোহী, বিপ্লবী অথবা কম্যুনিষ্ট বলিলেই প্রমাণ হয় না যে সেই ব্যক্তি অথবা সংঘক ব্যক্তিগণ কোনও রাজ্যের প্রাণহানি করিয়াছে অথবা রাজকোষাগার লুণ্ঠন করিয়াছে। দাবি রাখা কি না বিচার করিবার পক্ষেই দাবিদারের চরিত্র খারাপ বলিয়া বিষয়টার নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া গুণ যে অজ্ঞায় তাহা নহে, ঐকগ কার্য স্তত্বেই সকল নিয়মবিরুদ্ধ ও অনীতি-নাশক।

আধুনিক কালে সকল দেশের সকল রাষ্ট্রীয় বিলম্বব্যবস্থাকেই মানব স্বাধীনতার পূর্ণতম অভিব্যক্তি বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। মুক্তি ও স্বাধীনতা যে বিশ্বের সকল মানুষের কাম্য এবং প্রাপ্য একথা বর্তমান কালে মানুষমাত্রই একটা স্বয়ংসিদ্ধ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। স্তবরাং যদি দেখা যায় যে, কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতার আদর্শ ধর্ম করা হইতেছে তাহা হইলে সেই প্রতিষ্ঠান মানবতার শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় ব্যবহার নিদর্শন নহে প্রমাণ করিতে কোনও

অসুবিধা হয় না। এই কারণে যেখানেই মানুষকে নিজের শুভ ইচ্ছা অনুসরণে জীবন নির্মাণ করিতে দেওয়া হয় না সেখানেই মিথ্যা প্রচারের দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হয় যে, সেই স্থানে মানুষের সকল স্বাধীনতাই পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। অর্থাৎ সকল রাষ্ট্রেই, তাহা কম্যুনিষ্ট হউক, ক্যাশিষ্ট হউক অথবা সাধারণতন্ত্রই হউক, কোথাও কেহ স্বীকার করে না যে, মানব স্বাধীনতা কোথাও কিছু মাত্র ধ্বংস করা হইয়াছে। কিন্তু পরম্পরের নিন্দাবাদের কোনও অভাব কোনও রাষ্ট্রেই লক্ষিত হয় না। সাধারণতন্ত্রের জনসাধারণ যে-সকল দেশে একনায়কত্ব অথবা একটিমাত্র রাষ্ট্রীয় দলের আধিপত্য আছে সে-সকল দেশে যে মানব স্বাধীনতা ধ্বংস করা হইয়া থাকে তাহা প্রচার করিতে ঘিষা করেন না। কম্যুনিষ্ট জনসাধারণ বলেন যে সাধারণতন্ত্রীদিগের স্বাধীনতা শুধু কাগজে লিপিত স্বাধীনতা। বস্তুতঃ সাধারণতন্ত্রের নির্মাচন, প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা রাষ্ট্রশাসন প্রভৃতি বাহিরের লোক দেখান মুক্ত ও স্বাধীন জীবন-যাত্রার মিথ্যা অভিনয় মাত্র। সাধারণতন্ত্রে প্রায় সর্বত্রই জনসাধারণ পুঁজিবাদীদিগের দাস ও তাহাদিগের দ্বারা শোষিত ও উৎপীড়িত। সাধারণতন্ত্রীদিগের ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্মাচনও একটা বিরাট মিথ্যার অভিনয়। ভোট ক্রয় বিক্রয়, ভীতি প্রদর্শন করিয়া ভোট দিতে বাধ্য করা, যাহার ভোট তাহার ভোটের বৃদ্ধি আগমনের পূর্বেই অল্প ব্যক্তির দ্বারা ভোট দেওয়ান, এবং মিথ্যা নাম তালিকাভুক্ত করাইয়া, যে মানুষের অস্তিত্ব নাই তাহার নামে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা, ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্রীয় দলগুলি সাধারণতন্ত্রকে একটা প্রহসনে দাঁড় করাইয়াছে। রাষ্ট্রীয় দলগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই সকল চক্রান্ত করিয়া থাকে এবং যাহারা অর্থ ও অস্ত্রাস্ত্র উপকরণ সরবরাহ করিয়া রাষ্ট্রীয় দলগুলিকে নির্মাচনে জয়লাভ করিতে সাহায্য করে তাহারা বিভিন্নভাবে নিজের নানা প্রকার অর্থকর সুবিধা করাইয়া লইয়া যাহা খরচ হয় তাহা স্তূপে আসলে আদায় করিয়া লইয়া থাকে। কম্যুনিষ্ট দিগের নিজের বিচ্ছিন্ন দলের আর একটা

সমালোচনার উদাহরণ হইল, কোনও সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রীয় দল কম্যুনিষ্টদিগকে পরাজিত করিয়া জয় লাভ করিলেই সেই দলকে ক্যাশিষ্ট বলিয়া অভিহিত করা। ক্যাশিষ্ট নামধের রাষ্ট্রীয় সংগঠন কি তাহা বুঝিতে হইলে কিছুটা ইতিহাসের কথা আলোচনা আবশ্যিক। প্রথমতঃ ক্যাশিজম প্রবর্তন করেন ইতালীয় নেতা বেনিতো মুসোলিনি। ইনি রোমান যুগের মুক্ত-কুঠারের গুহবদ্ধ সন্ন্যাসীরাতির হাতলকে একতার প্রতীক বলিয়া নিজ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় দলের জন্তে ব্যবহার করেন ও দলের নাম দেন *fasci di combattimento*। এই দলের লোকেরা একান্ত ভাবে জাতীয়তাবাদী ছিলেন ও এক নায়কের অনুসরণে প্রাণপণ করিয়া সকল ক্ষেত্রে সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইহারা অতি সরলভাবে রক্ষণশীল ছিলেন এবং রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেন। এই ভাবে ক্যাশিষ্টগণ শ্রমজীবীদিগের আন্দোলনের চেষ্টা দমন করিতেন এবং বিদেশীদিগের বিরুদ্ধাচরণেও অগ্রসর হইতেন। যথা ইহুদি বা নিগ্রো বিরুদ্ধত। ক্যাশিষ্টগণ নারীজাতির অগ্রগমনে বিশ্বাস করিতেন না, ব্যক্তির সকল অধিকার জাতির উন্নতির জন্ত রালদান দিতে চাহিতেন, দেশের সকল সম্পদ যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্ত ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিতেন ও যাহাকে নেতা বলিয়া মানিতেন তাঁহার একাধিপত্যের বিরুদ্ধত। কোন ভাবেই মানিতেন না। ইতালীতে ক্যাশিজম ১৯১৯ খৃঃাব্দে প্রবর্তিত হয় ও ১৯৪৩ খৃঃাব্দে মুসোলিনির পতন হইবার সঙ্গে শেষ হয়। ক্যাশিজম জার্মানীতে নাৎসি দলের নেতা হিটলারের নায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ও পোলাণ্ডে পিলসুডস্কি, অষ্ট্রিয়ায় ডলফুস, স্পেনে ফ্রানকো, পর্তুগালে সালাজার ও আর্জেন্টাইনে পেরন-এর নেতৃত্বে কোরাল হইয়া উঠে। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, নরওয়ে ও রুটেনেও ক্যাশিজম কিছু কিছু বর্জিত হয় কিন্তু পূর্ণপাতি আহরণ করিতে পারে নাই। ক্যাশিষ্টদিগের শ্রমজীবী আন্দোলন দমন চেষ্টা ছিল একটা প্রধান রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য। সেই কারণে ভারতবর্ষে ক্যাশিজম কখনও জন্মগ্রহণ হইতে পারে নাই। ইহা ব্যতীত এই দেশের

রাষ্ট্রক্ষেত্রে বামপন্থা দক্ষিণের আদর্শবাদেও ঘনভাবে ছায়া ফেলিয়াছে বলিয়া ক্যাশিভমের মত উৎকট রক্ষণশীলতা কোনও মতেই রাষ্ট্রীয় মতবাদে শিকড় গড়াইতে পারে নাই। সুতরাং যখন ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণ কংগ্রেসীদিগকে ক্যাশিভ বলিয়া জনচক্ষে হেয় করিবার চেষ্টা করেন তখন তাঁহারা এই কথাই বলিবার চেষ্টা করেন যে, কংগ্রেস একনায়কত্বে বিশ্বাসী অথবা কংগ্রেস পুরাতনের বস্তাপচা মনোভাবের পুনর্জাগরণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যে ক্যাশিভম ইতিহাসে কম্যুনিজমের চরম শত্রুরূপে একদা আবির্ভূত হইয়াছিল তাহার পুনরাবির্ভাব ভারতে কদাপি সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কম্যুনিষ্টগণ রাজ্যাধিকার আহরণ চেষ্টায় বিপ্লবের পথে চলিতে পারেন ও কোন কোন অবস্থা হইলে তাঁহাদিগের কার্যকলাপ সকল সময়ে জায় স্নানীতি ও অসম্ভাব্য-ব্যবহারের উচ্চাদর্শের নিখরচ্যূত হইয়া অধোগমনশীল হইতেও পারে। কংগ্রেসও সামাজিক প্রগতিশীলতার আদর্শ-রক্ষা করিতে পূর্বেও অনেক সময় সক্ষম হন নাই, এখনও ভবিষ্যতের কোনও নূতন পরিস্থিতিতে আদর্শের পথভ্রষ্ট হইতে যে না পারেন তাহাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না। তবে যাহাই ঘটিবে তাহা কোন পুরান নব্বা অল্পসরণে ঘটবে এমন ভাবিবার কোন কারণ দেখা যায় না। জায়, অজায়, পাণ, পুণ্য, সুবুদ্ধি ও বুদ্ধিহীনতা, সকল কিছুই পুরাতন বাধা বিপাক্তিকে উত্তমরূপে দেখিয়া বুঝিয়া পথ চলে। থাকা থাকিলে অজানা পথেই মানুষ থাকা খায়। কৃতবুদ্ধিও সর্বদাই তাহাকে নূতন উপায়ে অভিপ্রায় সিদ্ধির চেষ্টা করিতে উদ্বুদ্ধ করে।

ঐমতী ইন্দ্রিয়া গায়ীর নিন্দাবাদ চেষ্টা বাঁহারা করেন তাঁহারা কেহ কেহ তাঁহাকে ক্যাশিভ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। ঐমতী ইন্দ্রিয়ার মধ্যে ক্যাশিভের কোনও লক্ষণই আমরা কখনো দেখিতে পাই নাই। নিন্দা করিতে হইলে সত্য মিথ্যা জ্ঞান হারাইয়া নিন্দা করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। ঐমতী ইন্দ্রিয়ার মধ্যে প্রগতিশীলতাই দেখা যায়; উৎকট রক্ষণশীলতা কোথাও

দেখা যায় না। তিনি মুক্ত করিবার জন্য চির উৎসুক বলিয়াও কেহ মনে করেন না। এক কথায় তাঁহার মধ্যে ক্যাশিভ ভাব কোথাও দেখা যায় না। অপর পক্ষে বাঁহারা বিপ্লবে বিশ্বাস করেন তাঁহারা সর্বদা মুক্ত বাধাইতে ইচ্ছুক। পার্টির প্রাধিকার নিকট ব্যক্তির অধিকার বলি দিতেও সর্বদা তাঁহারা প্রস্তুত। বিদেশীর নিকট আত্মসমর্পণেও তাঁহাদের লজ্জা নাই। জনসাধারণের স্বত্ব আরোহণ করিয়া প্রবল হস্তে তাহাদের দমন ও শোষণ করিয়া তাহাদিগকে “মুক্তি ও স্বাধীনতা” দান করিতে বাঁহারা সদা সচেষ্ট তাঁহাদিগের সহিত ক্যাশিভদিগের সাদৃশ্য অধিকভাবে বর্তমান থাকিতে দেখা যায়। জনসাধারণের মুখ বন্ধ, পার্টির হুকুমে যে কোন ব্যক্তি যে কোন কার্য করিতে বাধ্য, জীবনযাত্রা পদ্ধতি, শিক্ষা, সংস্কার পার্টির উচ্ছাহুসারে চালিত; এইরূপ যে অবস্থা তাহা যে-সকল দেশে দেখা যায় সে দেশগুলিতে সাধারণতঃ কোনওভাবেই প্রতিষ্ঠিত আছে বলা যায় না। এ কথা সত্য যে, সাধারণতঃই মুখোঁস পরিয়া নেতাদিগের দৈবাচার জনগণের উপর অত্যাচার চালাইতে পারে; কিন্তু মুখোঁসটিকে যথার্থ ভাবে রচিত ও ব্যবহৃত করিতে হইলে সাধারণতঃই বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনেকাংশে রাষ্ট্রদেহে সংযুক্ত রাখিতে হয় ও তাহাতে নেতাদিগের আত্মপ্রতিষ্ঠা ততটা উৎকট রূপ ধারণে সক্ষম হয় না। ইহা ব্যতীত জনমনের উপর খোলাখুলিভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা-বিরুদ্ধ রীতিনীতির মাতাঘোঁষা বিশ্বাস জাগরণের উদ্দেশ্যে মনোবৈজ্ঞানিক অস্ত্রোপচারও সহজ হয় না। অর্থাৎ সাধারণতঃই মুখোঁস পরিহিত রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি পূর্ণ ও সহজ সরল ভাবে জনসাধারণের রাজত্ব না হইলেও তাহা নগ্নগাত্র কম্যুনিজম অপেক্ষা সাধারণের আত্মসম্মান-রক্ষক।

### অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত মালিকানা

যে সকল কারবারের মূলধন রাষ্ট্রের তহবিল হইতে লওয়া হয় সেগুলির পরিচালনার ভারও রাষ্ট্রীয় কর্মচারী-দিগের হস্তে স্তূত হইয়া থাকে। যে সকল কারবারের মূলধন জনসাধারণের ভিতর হইতে অংশীদার ব্যক্তিগণ

দিয়া থাকেন সেগুলি ব্যক্তিগত অধিকারের প্রতিষ্ঠান ও সেই কারবারগুলির পরিচালনাও থাকে অংশীদারদিগের হস্তে; অর্থাৎ সেগুলির পরিচালকগণ অংশীদারদিগের প্রতিনিধি হিসাবেই কারবারগুলির উপর প্রভুত্ব করেন। কখন কখন কার্যের সুবিধার জন্য অথবা সামাজিক পরিহিতির কারণে রাষ্ট্রীয় কারবারে জনসাধারণের প্রতিনিধি লওয়া হয় এবং ঋণ গ্রহণ করার জন্য অনেক ব্যক্তিগত ভাবে চালিত কারবারে সরকারী কর্মচারী বা প্রতিভূর উপস্থিতিও হইয়া থাকে। এইগুলি কিন্তু শুধু পরিচালনার সুবিধার ব্যবস্থা মাত্র, ইহার সহিত প্রভুত্ব, মালিকানা বা অংশীদারীর কথা জড়িত থাকে না। মূলধন একতরফা হইলেও পরিচালনা ক্ষেত্রে দুই তরফের লোক থাকিতে পারে।

রুশিয়ায় কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে সকল কাজ কারবার জাতীয় হইয়া যায় এবং পরিচালনার বিষয়েও সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত হইতে আবশ্য করে। কিন্তু কেন্দ্রীভূত পরিচালনা পরে উঠাইয়া দেওয়া হয়, যেহেতু রাষ্ট্রীয় কর্মচারীগণ, বাস্তব অবস্থা যাহাই হউক, সকল সমস্তার সমাধান আইনের বিধান অনুসারে করিতে গিয়া বহু কাজকারবার অচল করিয়া দেন। রুশিয়ায় ক্রমে ক্রমে কেন্দ্রগত ভাবে পরিচালনার কার্য বন্ধ হইয়া যায় এবং স্থানীয় অভিজ্ঞতার সাহায্য গ্রহণ করাই নিয়ম হয়। বর্তমানে রুশিয়ায় বহু কারবার ব্যক্তিগতভাবে চালিত হইতেছে। পরিচালকগণ শুধু রাষ্ট্রকে কারখানার মালিক বলিয়া স্বীকার করেন ও তৎক্ষণাত্ একটা নির্দিষ্ট হারে টাকা দিতে বাধ্য থাকেন। ঐ টাকা দিবার পর যাহা লাভ হইতে পারে তাহা পরিচালকগণ নানাভাবে খটন করেন।

ভারতবর্ষে এখনও রাষ্ট্রীয় কারবার রাষ্ট্রই চালাইয়া থাকেন এবং তাহাতে পরিচালনার কার্য কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইজন্য এখন চিন্তা করা হইতেছে যে কি ভাবে ব্যক্তিগত মালিকানা ও পরিচালনার সহিত সরকারী প্রভুত্ব ও হকুমদারীর সমন্বয় স্থাপন করা সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ মূলধনের বিষয়েও ব্যক্তির অংশীদারী মানিয়া লইবার কথা বিচার করা হইতেছে।

এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ও পরিচালনার উৎস দুই ধায়ায় বহমান হইবে। রাষ্ট্র পরিচালনার রীতিনীতির ভ্রাতৃধর্মের দিক বাহাতে সুরক্ষিত থাকে তাহা দোঁষবেন এবং ব্যক্তিগত পরিচালকগণ উপযুক্ত ভাবে উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া লাভের দিক সামলাইবেন। মূলধন দুই তরফ হইতেই আগিবে। কাজকারবার দুই চক্রের উপর চলিলে সামাজিক কল্যাণের ব্যবস্থা এক চক্রে চলার তুলনায় উন্নততর হইবে বলিয়া সকলের বিশ্বাস। রাষ্ট্র জনসাধারণের সহায়তা লাভ করিলে মূলধন সংগ্রহ কার্যও সহজ করিতে পারিবেন।

“হিপি”রা কি ভক্তজ্ঞানাকন্ডকী?

কিছুদিন পূর্বে কোন সূত্রে “হিপি”রা কি মনোভাব প্রণোদিত হইয়া ভারতে আসিয়া আলুথালু বস্ত্র পরিহিত ভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় সেই আলোচনা উচ্চস্তরের রাজনৈতিক আসরে উপাধিত হইয়াছিল। তাহাতে কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বলেন যে অনেক “হিপি” ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান আহরণ ইচ্ছায় এই দেশে আগমন করেন ও তাঁহাদিগের কেহ কেহ ভক্ত জ্ঞান লাভে সক্ষমও হইয়া থাকেন। কথাটা সত্য হইতে পারে অর্থাৎ এক হাজার “হিপি”-র মধ্যে হয়ত তিনজন সাংখ্য বেদান্ত চর্চা করিয়া নিজেদের মনের ঐশ্বর্য্যাত্মক করিয়াছেন, অথবা অপর একজন “হিপি” সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া সর্বশাস্ত্রবিদ্যারূপ হইবার পথে পদস্থাপনক্রম হইয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও বাকি ৯৯৬ জন সঞ্ছদ্র ভ্রমণ নিরত “হিপি” যে গঞ্জিকা সেবন প্রভৃতি দ্রব্যে প্রবৃত্ত নছেন এবং সুবিধা অনুসারে বিদেশী রাষ্ট্রের দিক হইতে ভারতের নানান খবর সংগ্রহ করিয়া বেড়ান না সে কথা প্রমাণ হয় না। বিদেশী গুপ্তচরগণ নানান ছদ্মবেশ ও ভেক ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় ও তাহার মধ্যে সন্ন্যাসী, শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক, সঙ্গীতবাদের ওস্তাদ প্রভৃতি নানা প্রকার মানুষই দেখা যায়। কোথাও কোথাও “হিপি” অপেক্ষা বহুগুণ শাস্তিভঙ্গকারী ককতত বিদেশী বৈকবদিগের প্রাহুর্ভাব দেখা যাইতেছে। ইহার

নিজেদের উৎকট-শব্দ-বহুল ধর্মীচার লইয়াই থাকে অথবা অল্প কিছু ভারত-বিরুদ্ধ কার্যও করে কি না, কে বলিতে পারে? প্রাচীনকালে যে সকল জ্ঞানী গুণী বিদেশীগণ ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার আশাদ লাভেচ্ছায় এদেশে আসিতেন “হিপি” অথবা “হরেকৃষ্ণ” দলের বিদেশীগণ সেইরূপ উচ্চস্তরের মানুষ নহে। ইহাদিগের কোন গভীর আধ্যাত্মিক আগ্রহ আছে অথবা ইহারা জ্ঞান মার্গের পথিক বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। যে স্তুতিচা ও মাদ্ধিত ক্রটি মানুষকে কৃষ্টি ও সভ্যতার উচ্চস্তরে স্থাপন করে সে মানসিক আভিজাত্য “হিপি” বা “হরেকৃষ্ণ” দলের মধ্যে লক্ষিত হয় না। ইহারা যে জাতীয় মানুষ বলিয়া সকলের মনে হয় তাহাতে ইহাদিগের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি থাকিতে পারে যাহাদের দ্বারা আমাদিগের সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ হইতে পারে। সুতরাং ইহাদিগের কোন কোন ব্যক্তি যথার্থ পাণ্ডিত্য ও অপর গুণের আকর হইলেও ইহাদিগের ভারত পর্যটন সীমাবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয়। যাহারা ভারতে আসিয়া ভারতীয় আচার ব্যবহারের অহুকরণ করে এবং উৎকট ভঙ্গী ও সিংহনাদ সহকারে বৈকব বা অপরাধী সাজিয়া সকলের নিদ্রাভঙ্গ করে; তাহাদের ভারতে উপস্থিতি আন্তর্জাতিক সম্মত মণুর করিয়া তুলিতেও সাহায্য করে না।

#### মধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থা

অপর দেশের মতই ভারতবর্ষেও মধ্যবিত্ত জনগণকে একটা বিশেষ শ্রেণী বলিয়া বিবেচনা করা হয়। এই শ্রেণীর মানুষের নাম যদিও মধ্যবিত্ত কিন্তু তাহাদিগের বিশেষত্ব তাহাদের উপার্জনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। উপার্জনের পরিমাণ অধিকও নহে এবং অভ্যন্তরও নহে; তাহার পরিমাণ মাঝারি; অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ধনীও নহেন, দরিদ্রও নহেন, আর্থিক অবস্থায় তাঁহারা একটা মাঝামাঝি স্থান অধিকার করিয়া আছেন। যাহাদের আয় বার্ষিক ২০০০ টাকা বা ততোধিক তাঁহারা যদি ধনী বলিয়া পরিচিত হন এবং যাহাদের আয় বাৎসরিক ৩০০০ টাকা বা তাহা হইতেও অল্প তাঁহারা যদি দরিদ্র বলিয়া অভিহিত হন; তাহা

হইলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনসাধারণের বাৎসরিক আয় ৩০০০ টাকা হইতে অধিক এবং ২০০০০ টাকা হইতে কম ধরা যাইতে পারে। কিন্তু বস্তুত বহু কারিগর বা দোকানদার আছেন যাহাদের উপার্জন ঐ দুই সীমার মধ্যেই পড়ে কিন্তু তাঁহারা ঠিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ বলিয়া গণ্য হ'ন না। ইহার কারণ এই যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ বলিতে আমরা বহুকাল হইতেই কেরাণী, নিয়ন্ত্রকের রাজকর্মচারী, শিক্ষক, সাধারণ স্তরের ডাক্তার কবিরাজ উকিল যন্ত্রাবিদ, সামরিক কর্মচারী, লেখক, পত্রিকা সম্পাদনা কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি, হিসাব লেখক, খাজাঞ্চি, দালাল, জীবনবীমার এজেন্ট প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকেই বুঝিয়া থাকি। এই সকল ব্যক্তির বিশেষত্ব তাহাদের উপার্জনের পরিমাণের মাঝারি আকারের ভিতর নিহিত নহে। বিশেষত্ব তাহাদের মানসিক গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতরেই নিবিষ্ট। এই কারণে অনেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শিক্ষিত সমাজ বলিতে একই সম্প্রদায়ের মানুষ বুঝিয়া থাকেন। জাতির শিক্ষা ও মানসিক ঐশ্বর্য এই সম্প্রদায়ের ভিতরেই রক্ষিত থাকে এবং এই সম্প্রদায়ের মানুষ যদি অভাবে নিম্নশ্রেণী অবস্থায় থাকে তাহা হইলে জাতির অবস্থাও ক্রমশঃ নিম্নস্তর ও প্রতিভাহীন হইয়া দাঁড়ায়। বাক্সালীর বর্তমান কর্মশক্তি ও প্রতিভার নিম্নস্তর অবস্থার কারণ অহুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ব্রিটিশ যুগের শেষ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজকে ব্রিটিশ যে ভাবে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল ও পরে স্বাধীনতা প্রাপ্তি হইলেও যে পেষণ রীতির কোনও বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ করা যায় নাই; সেই মধ্যবিত্ত তথা শিক্ষিত বাক্সালী সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরের মধ্যেই বাক্সালী জাতির বর্তমান অর্থনৈতিক, চারিত্রিক ও সামাজিক অবস্থার কারণ পূর্ণরূপে নিহিত আছে।

স্বাধীনতা লাভের পরে যে সকল পরিবর্তন অহুসায়ে ভারত গঠন কার্য চালিত হইয়াছে সেই সকল পরিবর্তনের শিক্ষিত সমাজের উন্নতি হয় নাই। কিছু কিছু ব্যতিক্রম কৌশল শিক্ষা হইয়াছে; হয় নাই বুঝি



পূর্ণবিকাশ ও জ্ঞানের উন্মেষ। যে প্রেরণা ও যে প্রতিভা উর্নাবংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজের ভিতর জাগ্রতভাবে দেখা দিয়াছিল; বিংশ শতাব্দীর আরম্ভের কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহা উপনুক্ত রসের ধোঁরাক না পাইয়া জীর্ণশীর্ণ শুষ্ক অবস্থায় মরণোন্মুখ হইল। বাহারা ধনবান্ ছিল তাহারা নানা ভাবে সাহায্য পাইয়া আরও ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠিল। যাহারা কারিগর ও নানা-ক্ষেত্রের পেশাদার ছিল তাহারাও কিছু কিছু উন্নতি করিল। শুণু কষ্টক্লেশ অভাব জর্জরিত হইয়া রহিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ। রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে দল পাকাইয়া যদিও কেহ কেহ সুবিধা করিয়া লইল, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। এখন কথা হইতেছে, দেশের ভবিষ্যৎ যেখানে এই সম্রাজ্যের উন্নতির উপরই বিশেষ ভাবে নির্ভর করে সে ক্ষেত্রে এ সম্রাজ্যকে সর্বল ও প্রাণবান্ করিবার ব্যবস্থা না করিলে জাতির উন্নতি অসম্ভব। ইহার কি ব্যবস্থা হইবে? শিক্ষা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আদর্শবাদ প্রভৃতি যে সকল গুণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে উর্নাবংশ শতাব্দীর মধ্যকাল হইতে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভের কিছুকাল অবধি দেখা যাইত ও যে গুণাবলী বৃটিশের মধ্যবিত্ত-বিনাশ নীতি ও স্বাধীন ভারতের শিক্ষিত সমাজকে অবহেলা করিয়া চলিবার কারণে প্রায় উঠিয়া যাইতে বাসিয়াছিল, সেই চরিত্রগত সর্বল সত্ত্ব প্রাণবন্ততার এখন অবধি পুনরাবির্ভাব সম্ভব হয় নাই। এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি না দিলে জাতি গঠন একটা মিথ্যা কল্পনার কথাই রহিয়া যাইবে। মধ্যবিত্ত তথা শিক্ষিত সমাজকে শাস্ত্রশালী ও অগ্রগমন সক্ষম করিতে হইলে শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সুচিন্তিত ও কার্যকর পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা অবিলম্বে আবশ্যক। এই দিকে দৃষ্টি না দিয়া শুণু সোশিয়ালিজম বা সমাজবাদের নামকীর্ণন করিলেই সমাজ সুগঠিত ও উন্নতরূপ ধারণ করিবে না।

পশ্চিমবঙ্গ, বঙ্গভূমি না বঙ্গপ্রদেশ ?

পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করা আবশ্যক ও নূতন নাম বঙ্গভূমি হইলে উত্তম হয়, একথা আমরা পূর্বেও

বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি। বঙ্গপ্রদেশ নামটি কোম কোম ব্যক্তি সমর্থন করিয়াছেন; কিন্তু উহা যে ঐতিকটু এবং বাংলা ও বাঙালীর বিশেষত্ব জ্ঞাপক না হইয়া বাংলার প্রাদেশিকতাই জোর করিয়া জ্ঞাপন করে তাহাতে সন্দেহ নাই। বঙ্গভূমি বলিলে বুঝা যায় যে এই ভূমিতে বঙ্গীয় মানবদিগের বাস। বঙ্গপ্রদেশ বলিলে প্রথমেই বঙ্গ যে (ভারতের) একটা প্রদেশ মাত্র অর্থাৎ একটা বৃহত্তর দেহের অঙ্গ মাত্র, সেই কথাই শ্রোতাকে মনে করাইয়া দেয়। এই কারণে বঙ্গপ্রদেশ নামটি বাঙালীর মনে কোন সজ্জি সৃজন করে না।

ঐশ্বর্য উৎপাদন ও বন্টন

অর্থনীতিতে ঐশ্বর্য উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ একই নিষয়ের বিভিন্ন অভিব্যক্তি বলিয়া আলোচিত হয়। অর্থাৎ বস্তু বা অবাস্তব মূল্যবান্ সেবা বা সহায়তা প্রথমত উৎপন্ন হয় ও তৎপরে তাহা নিরায়িত ভাবে বিভিন্ন ভোক্তার অংশে পৌঁছায় এবং শেষে তাহা মাহুষের ভোগে লাগে। অবাস্তব সেবার যে মূল্য আছে তাহা সহজেই বোধগম্য। যথা চিকিৎসা, শিক্ষা অথবা আদালতে উকিলের সহায়তা। এইগুলি মূল্যবান্ সেবা অথবা সাহায্যের, কথা কিন্তু বাস্তবরূপ ধারণ করে না। বাস্তব উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহজেই বুঝা যায় যে, কেহ কিছু নিষ্কাশ, গঠন, বহন অথবা পরিবর্তিতরূপ দান করিল কি না; কিন্তু অবাস্তব সেবা, সহায়তা বা সাহায্যের সম্বন্ধে কোনও মাপ, ওজন অথবা প্রকৃষ্টভাবে উপস্থিতি বিচার করিতে পারা সহজ নহে। সুতরাং যাহারা অবাস্তব কার্য করিতে নিযুক্ত হইয়া থাকেন তাহারা সর্বক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে যাহা করিবার তাহা না করিয়াও বেতন আহরণ করিয়া চলিতে পারেন। কিম্বা যে পরিমাণ কার্য করা উচিত তাহা না করিয়া সমাজকে প্রবিকৃত করিতে পারেন। সুতরাং যখন বেকার সমস্ত সমাধানার্থে কার্যের সৃজন করা হয় তখন উচিত যথাসম্ভব বাস্তব দ্রব্য উৎপাদন করিবার জন্ত মাহুষকে নিযুক্ত করা। তাহা না হইলে বহুলোক কর্তে নিযুক্ত

হইয়া কোনও কার্য না করিয়া বেতন পাইতে থাকার সম্ভাবনা উপস্থিত হইবে ও কলে সেই বেতন সমাজের উৎপাদন কর্ণে নিযুক্ত উৎপাদনকারী কর্মীদিগের ভাগ হইতে কাটিয়া লইয়া নিরক্ষরদিগকে দেওয়া হইবে। এই কাটিয়া লওয়া কি ভাবে সম্পন্ন হইবে তাহা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, যদি সরকারী চাকুরী স্থাপিত করিয়া বহু লোককে বেতনভোগী করা হয় এবং যদি সেই সকল ব্যক্তির কোন মূল্যগ্রন্থ কার্য না থাকে, তাহা হইলে ঐ বেতন দিবার টাকা রাজকর বৃদ্ধি করিয়া সংগৃহীত হইবে ও সেই বর্দ্ধিত হারে রাজকর খাহার দিবে তাহাদের ভোগে অথবা সঙ্কে আঘাত লাগিবে। সুতরাং অবাস্তব কার্য করিবার ওজুহাত দেখাইয়া চাকুরী স্থাপিত সরকারীভাবে করা উচিত নহে। তাহা অপেক্ষা অর্থনৈতিক দিক হইতে অনেক নিরাপদ ও ক্রান্তির সম্ভাবনা যুক্ত উপায় হইল বাস্তব উৎপাদনের দিকে সচেষ্ট হওয়া। অবাস্তব সেবার জন্যই যদি অর্থব্যয় করিতে হয় তাহা হইলে নতুন নতুন পাঠশালা খুলিয়া দেশের সকল বালকবালিকার যাহাতে অক্ষরজ্ঞান হয় ও যাহাতে তাহারা অধিক করিয়া কর্মক্ষম হইতে পারে সেই চেষ্টা করিলে দেশের মঙ্গল হইবে। উহার জন্য যদি রাজকর বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহা দেওয়া জায্য হইবে। কিন্তু অকারণে চাকুরী স্থাপিত করিয়া রাষ্ট্রীয় দলের পাণ্ডাদিগের পেটোয়া লোকের সংস্থান করিবার ব্যবস্থা জাতীয় অর্থনীতির দিক হইতে প্রথমতঃ বাঞ্ছনীয় নহে এবং তাহা জনসাধারণের প্রতি ভ্রাম্যপন্যাসিতও নহে।

সন ১৩৭১

বঙ্গাব্দ ১৩৭৮ বৎসর আতিক্রম করিয়া ১৩৭৯ বৎসরে পদার্পণ করিল। প্রবাসীও এই সঙ্গে নিজ জীবনের ৭১ বৎসর সম্পূর্ণ করিয়া বাংলা মাসিক পত্রিকা জগতে অদ্বৈতকাল নির্যামিত ও অজ্ঞেয় প্রকাশনের একটা নতুন অনতিক্রান্ত বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করিল। বাঙালী পাঠক ও লেখক সমাজের সহায়তা ব্যতীত এই কঠিন কার্য কখনও সাধিত হইতে পারিত না ও প্রবাসী এইক

পাঠক ও লেখকদিগের নিকট সবিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। প্রবাসীর জীবনে দুইটি বিষয় মহাব্যুৎপাদিত হইয়াছে ও সেই কারণে নানা বিপত্তির আবির্ভাব হওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রকাশ কার্য অব্যাহত থাকিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ৪২ বৎসর কালের মধ্যে বহুবার সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদিগের ক্রোধান্বিত প্রবাসীর দিকে অস্ত্র শ্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে; কিন্তু প্রবাসী অত্যাচারী শোষকদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া নিজ স্বাধীন মতামতের আদর্শ সকল সময়েই পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। সেই যুগের সাহিত্যক্ষেত্রের প্রায় সকল মহারথীই প্রবাসীর সহায়তা করিতেন ও অনেক অলেখকের রচনা প্রবাসীর পৃষ্ঠাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহা প্রবাসীর প্রগতিশীলতার একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল এবং অজ্ঞাবধি প্রবাসী স্তনন লেখকদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াই চলিতে দিখা করেন না। আমরা এই সংখ্যাতে পুরাতন প্রবাসী হইতে কিছু কিছু লেখা পুনর্মুদ্রিত করিতেছি। আজকার পাঠকগণ এই সকল রচনা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। পূর্বকালের লেখকদিগের রচনা পাঠ করিলে আজকালকার লেখকদিগেরও লেখার রীতি পদ্ধতি ও আদর্শ বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সাহায্য হইতে পারে। সে যুগের চিত্রকলারও একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই সংখ্যায় পুনঃপ্রকাশিত করা হইল।

অন্যায় ও অধর্মের ছুই তরুণ স্বরূপ

প্রাচীনকালে রুটেনে রাষ্ট্র সংক্রান্ত অজ্ঞানের তাযাতা প্রমাণ করিবার জন্য একটা কথা প্রচলন করা হইয়াছিল, তাহার অর্থ এই যে, রাজা যাহাই করেন তাহাই ন্যায়। The king can do no wrong, কথাটার এখন আর রুটেনে অথবা অপরাণের দেশে কোনও মূল্য নাই; কারণ, রাজার রাষ্ট্রক্ষেত্রে কিছু করা না-করার ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ পাইয়াছে ও রাজা এখন রাষ্ট্রশক্তির একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতীক মাত্র। এখন সাধারণতঃ অথবা অপরাণের প্রচলিত রাষ্ট্রনীতি অনুসারে রাজশক্তি

জনসাধারণ অথবা রাষ্ট্রীয়দলের হস্তেই পূর্ণরূপে বর্তমান থাকে এবং কোনও ন্যায় অন্যায় করার দায়িত্বও আজকাল প্রতিনিধি নির্বাচক জনসাধারণ অথবা রাজ-শক্তিধারী রাষ্ট্রীয়দলের সভ্যদের উপরেই ন্যস্ত হয়। এখন এইরূপ পরিস্থিতিতে আমাদিগের দৃষ্টান্তই মনে হয় যে, জনসাধারণ, রাষ্ট্রীয়দল অথবা রাষ্ট্র-পরিচালক পাল্লিমেন্ট বা বিধানসভাগুলি সকল অনায়াসের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। রাজশক্তি যেখানে যেভাবেই ব্যক্তি বা প্রকাশিত হয় তাহার সংক্ষেপে ন্যায়-অন্যায়ের কথা উঠিতে পারে না, এইরূপ নীতি প্রবর্তন করিলে সেই নীতি মানিয়া চলিতে সকলকে বাধ্য করা হইলেও তাহার সত্যতাতে কোনও বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারে না। ব্যক্তি যেকোন অন্যায় করিতে পারে, পাপ কায়ে লিপ্ত হইতে পারে, ব্যক্তিসংঘ, রাষ্ট্রীয়দল অথবা সমগ্র-জাতিও সেইভাবেই অধ্যর্থের কবলে পড়িয়া অন্যায় এমন কি অমানুষিকভাবেও নিযুক্ত হইতে পারে। ইতিহাসে বহু বিরাট বিরাট রাষ্ট্র, দল অথবা আইনসভা ব্যৱসার প্রকটভাবে অন্যায় করিয়াছে দেখা গিয়াছে এবং তাহার প্রমাণ হইয়াছে যে, দলবদ্ধ ভাবে অন্যায় করিলে সে অন্যায় মানব সমাজ কখনও সমর্থনের চক্ষে দেখিতে পারে না। সুতরাং “আইনে আছে”, “সরকারবাহাদুরের হুকুম” অথবা “ইহাই প্রচলিত রীতি” ইত্যাদি কথার উপর নির্ভর করিয়া কোনও কিছুই যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করা চলিতে পারে না। ইহার ভিতর আর একটি কথাও আছে। জনসাধারণের অভিমত গ্রহণ করিয়া কাজ হইতেছে বলিলেই যে সে অভিমত লওয়া হইতেছে একথা প্রমাণ হয় না। বহুক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের আমলাগণ একরূপ ভুল ধারণার আড়ালে নিজেদের যথেষ্টাচারের অলম্বনীয় প্রকার নির্মাণ করিয়া জনসাধারণকে নিজেদের মানবীয় অধিকার উপভোগ হইতে ব্যক্তি করিয়া থাকে। সাধারণতঃ অনেক ক্ষেত্রেই আমলাতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। রাষ্ট্রীয়দলের শক্তি বলিয়া যাহা প্রাচ্য হয়, বহুক্ষেত্রেই

তাহা এক বা অল্প সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির দৈর্ঘ্যচায় ব্যতীত আর কিছু নহে।

আমাদিগের দেশে যেকোন দেখা যায় যে, জনসাধারণ রাজকর দিবার সময় মিথ্যা ও অন্যায় আশ্রয় করিয়া রাজকর না দিবার চেষ্টা করে, সেই সঙ্গেই দেখা যায় যে, যাহারা রাজকর আদায় করে তাহারাও অন্যায় ও মিথ্যা ওজুহাত দেখাইয়া যাহার নিকট যাহা প্রাপ্য নহে তাহার নিকট হইতে জুলুম করিয়া তাহা আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই ক্ষেত্রে অন্যায় ও অধ্যর্থের বিবিধ স্বরূপ। একটি ব্যক্তির অন্যায়ের ছবি ও অপরাধেই দেখা যায় রাষ্ট্রের দ্বারা নিযুক্ত আমলাদিগের মিথ্যা জনউৎপীড়ন নীতির প্রকট অভিব্যক্তি। উপার্জনের প্রকৃত পরিমাণ, গনসংপদের মূল্য বিচার, বায় ও ক্ষতির প্রকৃত আকার প্রভৃতি সকল বিষয়েই আমলাগণ যথেষ্টাচার করিতে সदा উদ্বৃত থাকে। সুবিধামত পরিস্থিতি সৃষ্ট হইলে আবার তাহারাই উপায়ে সুর গাহিয়া মিথ্যাটাকে বিপরীত পথে চালিত করিতে যত্ন করেন না। রীতি নীতি ও আইন অনুসারে যাহা হয় তাহার বিপরীত সর্বত্রই সর্ব সময়ে হইয়া থাকে এবং তাহাতে যাহারা আহত অথবা উপকৃত হয় তাহারা প্রায় সকল সময়েই রাষ্ট্র বা জাতির অন্যায় ও অধ্যর্থের পথ-গামী নেতা ও আমলাদিগের বিকৃত কর্তব্য পদ্ধতির জন্য একরূপ ভাবে লাভবান অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ভারতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষিত ও শাসনরীতির পূর্ণ বিচার ও মূল্যায়ন আবশ্যক। ইহা না করিলে শুধু কথার আড়ালে নূতন নূতন অন্যায়, মিথ্যা, পক্ষপাতিত্ব ও শোষণের আয়োজন অতি দ্রুত বর্ধিত হইয়া সকল ন্যায় প্রচেষ্টা বিফল করিয়া দিবে। যে অন্যায় ও পাপ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে সর্ব প্রথমে তাহার সংস্কার প্রয়োজন। নূতন ন্যায়ধর্মের অভিনয় করিয়া পুরাতন রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসা হয় না। সে চিকিৎসা কঠিন হস্তে না করিলে চলিবে না।

# একোত্তর-সপ্ততিবর্ষোত্তীর্ণ প্রবাসী

বাংলা ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে (১৯০১, এপ্রিল), এলাহাবাদের ২১১ সাউথ বোডের বাসাবাড়ী থেকে প্রবাসীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তখন থেকে এই সত্তর বৎসরের বেশী প্রতি মাসে এর নিয়মিত প্রকাশ অব্যাহত আছে।

## প্রবাসী প্রসঙ্গে

প্রথম সংখ্যাতেই লেখকরূপে দেখা দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক বোগেশচন্দ্র রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, প্রভৃতি। প্রথম সংখ্যা এমনই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে প্রকাশিত হইবামাত্র নিঃশেষিত হইয়া গেল, সেই সংখ্যাটি দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিতে হইল।

শ্রীমতী শান্তা দেবী, রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা।

বঙ্গদর্শন প্রকাশের সমকালীন একটি পত্রিকা এলাহাবাদ থেকে ‘প্রবাসী’ নামে বের হয়; ‘কারু পাঠশালা’ নামক কলেজের অধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে এই পত্রিকাটি বের করেন। রবীন্দ্রনাথ এই নতুন পত্রিকার জন্ত লিখে পাঠান—‘সব ঠাই য়র ঘর আছে, আমি সেই ঘর মির খুঁজিয়া’ কবিতাটি। এই হ’ল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ‘প্রবাসী’র প্রথম সাক্ষাৎ। ১৩১৩ সাল পর্যন্ত প্রতীয় যোগ ছাপিত হয়নি—কবি ‘বঙ্গদর্শন’ নিয়ে তখন ব্যস্ত; তা ছাড়া শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেছেন।

১৩১৪ সাল, ভাদ্র মাস থেকে ‘প্রবাসী’তে কবির ‘গোরা’ উপন্যাস শুরু হ’ল (১৯০৭, আগষ্ট); তার পূর্বে বের হয় ছোট গল্প ‘মাষ্টার মশায়’। রামানন্দবাবু কবিকে এক সময়ে তিন শ’ টাকা দিয়ে বলেন, তাঁর সুবিধা হলে যেন একটা গল্প লিখে দেন। কবির মনে হ’ল যে, তিন শ’ টাকার মত বড় একটা কিছু দেওয়া উচিত। তাই শুরু করলেন ‘গোরা’। ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাস থেকে ১৩১৬ সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত ব্রজ মাস চলেছিল ধারাবাহিক এই উপন্যাস। ইতিপূর্বে এতবড় উপন্যাস কোন বাংলা পত্রিকায় বোধহয় বের হয় নি। ‘জীবন-মুখিত’র খসড়া নতুন ক’রে লিখে দিলেন প্রবাসীর জন্ত; এ বইখানি ১৩১৮, ভাদ্র থেকে ১৩১৯, শ্রাবণ পর্যন্ত এক বৎসর চলে। ‘অচলায়তন’ পুরো নাটকটি ১৯১৮ সালের আশ্বিন সংখ্যায় ছাপা হয়।

এখন থেকে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনা—কবিতা, গান, ধর্মবিশ্বাস, সাহিত্য বিবয়ক প্রবন্ধ, রাজনৈতিক প্রবন্ধ ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত হতে থাকল। ‘প্রবাসী’র মধ্যে ১৩১৪ সাল থেকে ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের রচনারাজি, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা, তাঁর পত্রাবলী, সম্পাদকীয় বিবিধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী সম্বন্ধে যে অজস্র আলোচনা আছে—তার তালিকা যদি প্রস্তুত হয় তবে দেখা যাবে সাময়িক পত্রিকা কি পরিমাণে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণের কাছে পরিচয় ক’রে দেবার সহায়তা করেছিল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়  
প্রবাসী বহুবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ

৩১ চৈত্র, ১৩৬৭

বর্তমান শতাব্দীর ভালো গল্প-লিখিয়েরা অধিকাংশই প্রবাসীর নিয়মিত লেখক ছিলেন। সেইজন্মে যদি কোনো একখানি পত্রিকাকে আধুনিক বাংলা গল্পের বাহক বলতে হয় তাহলে সে প্রবাসী।

শ্রীমুকুমার সেন

প্রবাসী ষষ্ঠ বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ।

রামানন্দ প্রসঙ্গে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৯৬ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে রামানন্দ দাসী পত্রিকা সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। তার আগে রবীন্দ্রনাথের সাধনা উঠে গেছে। ১৮৯৭ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে (১৩০৪ পৌষ) রামানন্দের সম্পাদনায় ‘প্রদীপ’ প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : “প্রথম যখন রামানন্দ-বারু প্রদীপ ও পরে ‘প্রবাসী’ বের করলেন তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিশ্বাস লাগল। আকারে বড়ো, ছবিতে অলঙ্কৃত, রচনায় বিচিত্র এমন দামী জার্নাল যে বাংলা দেশে চলতে পারে তা বিশ্বাস হয় নি।”

প্রদীপের প্রথম বৎসরে শিবনাথ শাস্ত্রী বিভাগাগর সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। তা পড়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদককে জানান : “আমি ইতিপূর্বেই প্রদীপের সত্যসম্পূর্ণতা লইয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন পূর্বক আপনাকে পত্র লিখিব হ্রির করিয়াছিলাম। উহার প্রত্যেক গল্প প্রবন্ধই সুপাঠ্য কইয়াছে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের (ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগর) প্রবন্ধটি স্নগভীর চিন্তাপূর্ণ — পাঠ করিয়া যথার্থ উপকার পাইলাম বলিয়া ধারণা হয়। নগেন্দ্র (গুপ্ত) বাবুর গল্পটি অত্যন্ত মনোরম হইয়াছে। ইহার মধ্যে তাঁহার অসামান্য ভাষা-নৈপুণ্য এবং প্রতিভা স্ফূর্তি পাইয়াছে। সর্বশুদ্ধ বলিতে পারি ... প্রদীপের মত এমন একখণ্ড বাংলা সাময়িকপত্র ইতিপূর্বে আশার হস্তগত হয় নাই।”

প্রবাসীর সম্পর্কে অল্প লিখেছেন :

“পরম দুঃখের দিনে তিনি আমার প্রবন্ধকে অর্থমূল্য দিবেছেন—এমন সময়ে দিবেছেন, যখন দাবি করলে

বিনামূল্যেই পেতেন। সেকথা আজ মনে আছে। তখন আমার বিজ্ঞানিকেতনের কুখ্য মেটাবার জন্য হিতবাদীর তৎকালীন ধনশালী কর্তৃপক্ষের কাছে আমার চার-পাঁচটি বইয়ের দ্বয় বন্ধক রেখে সামান্য কিছু টাকা সংগ্রহ করেছিলাম। প্রায় পনেরো বৎসরেও তা শোধ হয়নি। আমার অল্প বইয়ের আয়ও তখন বাধাগ্রস্ত ছিল। অর্থাৎ সেদিন দান পাওয়ার পথে দয়া ছিল না। উপার্জনের পথে বুজির অভাব, সম্প্রদায়ের উপর শনির দাঁষ্ট। অথচ শাস্ত্রানিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সুরক্ষিত দাবি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এমন সময় প্রবাসী-সম্পাদক সত্যপ্রসন্ন হয়ে আমার প্রবন্ধের মূল্য দিয়েছিলেন। মাসিক পত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার।

“...অর্থই তো একমাত্র আনুকূল্যের উপায় নয়। প্রবাসী-সম্পাদক সদা তাঁর লেখা দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, মমত্বের বর্জ্য পত্রিকার দ্বারা বিশ্ব-ভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নির্দোষ জ্ঞান সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভার-সীড়িত আয়ুকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। দুঃসাহ্য কর্তব্যভারে অর্থদানের চেয়েও সজ্ঞান, প্রীতিমান অনেক সময় বেনী মূল্যবান। সুদীর্ঘকাল আমার ব্রতধাপনে আমি কেবল যে অর্থহীন ছিলাম তা নয় সঙ্গীহীন ছিলেন ভিতরে বাহিরে বিরুদ্ধতা ও অভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা সংগ্রাম করে এসেছি। এমন অবস্থায় যারা আমার দুর্গম পথে ক্রমে ক্রমে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা আমার বক্তৃৎসর্গগত আত্মীয়ের চেয়ে কম আত্মীয় নন, বরঞ্চ বেশি। বস্তুত আমার জীবনের লক্ষ্যকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৈনন্দিক জীবনকেও সেই পরিমাণে আশ্রয় দান করেছেন। সেই স্বল্পসংখ্যক কর্মসুহৃদদের মধ্যে প্রবাসী-সম্পাদক অল্পতম। আজ আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।”

রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে ১৯২৭ খ্রীঃ ২ জুলাই একটি চিঠিতে লেখেন :

“জানি না কি কারণে সংসারে আমার বন্ধুদের

দীর্ঘ অভ্যস্ত সঙ্গী। আমার মধ্যে একটা কোনো গুরুতর অভাব নিশ্চয়ই আছে। আমার বিশ্বাস সেই অভাবটা হচ্ছে আমার হস্ততা প্রকাশের প্রাচুর্যের অভাব। শিশুকাল থেকে অভ্যস্ত একলা ছিলুম, লোকসঙ্গ না পাওয়াতে লোকব্যবহারের শক্তি সম্ভবত আমার আড়ট হয়ে গেছে।.....

“যখন বয়স হয়েছে, পরিচিত লোকদের মধ্যে যাদের আমি কোনো না কোনো কারণে শ্রদ্ধা করতে পেরেছি তাদেরই আমি মনে মনে বন্ধু বলে গণ্য করেছি। তাদেরও সকলকে আমি রক্ষা করতে পারি নি। এদের সংখ্যা অভ্যস্ত অল্প। জগদীশ, আপনি, যত্নবাবু ও রামেন্দ্রসুন্দর জিবেদী এই চারজনকেই নাম মনে পড়চে।...

“প্রবাসীতে অগ্রগামী হয়ে আপনি যে পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন অল্প সকল কাগজ যখন তারই অনুবর্তন করে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়েছিল তখন আমি সেজন্য অভ্যস্ত বিরক্ত বোধ করেছি।”

### জগদীশচন্দ্র বসু

...তুমি প্রকৃত মনুষ্য লাভ করিয়াছ, তরকে জয় করিয়াছ, তেজস্বী হইয়াছ, সত্যব্রত পালন করিতেছ। শিশুর জন্ত ইহা অপেক্ষা আমার বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা আর কিছুই নাই। তোমার গৌরবে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।.....

যে-শিক্ষা দ্বারা এই জাতি ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিয়া বৃহত্তর অন্তর্জ্ঞান করিত, বাহ্য দ্বারা মনুষ্য ভয়ের অতীত হইত, যে-বীরধর্মের অনুষ্ঠানে শক্তিশীলতার দ্বর্ভা তার শক্তিশালী স্বেচ্ছায় বহন করিত—সেই শিক্ষা ও দীক্ষা এখনও এদেশ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। এই শিক্ষা যেন তোমার লেখা দ্বারা সর্বত্র প্রচারিত হয়।

### অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হেলেনদের জন্তে বই লিখি, কিন্তু সে বই ছবি দিয়ে সাজিয়ে দেবার ভারও নিজে নিতে হয়। শুধু এই নয়, ব্রহ্ম তৈরি করতে ছুটেতে হয় কিরীড়ার কাছে। হাক্টোন এবং গ্লু-কলার বলে, ছোটো জিনিসই তখন

ছাপাখানা থেকে অনেক দূরে অজ্ঞাতবাস করছে। সেই সময়ে রামানন্দবাবুর মাধ্যমে খেয়াল উঠল সচিব প্রবাসী প্রকাশ করার। আমি তখন আছি এলাহাবাদ চার্চ রোডে জজসাহেবের বাংলায়, আর রামানন্দবাবু থাকেন শ্রবণাজ আশ্রমের কাছাকাছি আর-একটা বাসায়—দুজনেই প্রবাসী আমরা। ইণ্ডিয়ান প্রেসের চিত্তামণিবাবু তখন নতুন ছাপাখানা শুরু করেছেন। একজন হিন্দুস্থানী চিত্রকর, সে ছবি আঁকে বই সাজাতে। বাংলার চিত্রকর সবাই ভবিষ্যৎ অবস্থায় তখন, কেবল সকাল হচ্ছে মাত্র। রামানন্দবাবুর হুঃসাহসে ভর করে প্রবাসীর প্রথম সংখ্যায় লেখা দেবার আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। সচিব মাসিক পত্রিকা বাবু করার স্বপ্ন অনেকদিন এসেছিল আমাদের অনেকের মনে, কিন্তু সে পত্রিকা নিয়মিত ভাবে প্রকাশের বিষয়ে সন্দেহ নিয়েই আসত ভাবনাটা। তাই রামানন্দবাবু যখন নিঃসংশয়ে ছবি ছাপানোর প্রস্তাবটা আমার কাছে পাড়লেন, তখন হোট হোট হেলেমেয়েতে পরিপূর্ণ তাঁর সংসারটির দিকে চেয়ে আমি বলেছিলাম, কাগজটা ঢালাতে গিয়ে শেষে না বিপদে পড়েন। সেই প্রবাসী আর আজকের প্রবাসী সমানভাবে চলে এসে, নতুন নতুন আর্টিস্ট এল ছবি দিতে প্রবাসীতে। এ যে হল তার জন্তে দায়ী আমি নয়, রামানন্দবাবু। নতুন বাংলার আর্টিস্টদের ছবি প্রবাসীতে এবং তাঁর আলবমে, তাঁর রামায়ণে ছাপিয়ে পরে পরে সমালোচকের হাতে তাঁকে তিরস্কৃত হতে হয়েছে; আর আমরা আর্টিস্টরা শুধু যে তাঁর দৌলতে বিনি পরসায় দেশজোড়া বিজ্ঞাপন পেয়ে গেছি তা নয়, নিয়মিত দক্ষিণা কাননমূল্য ৬০ পাঁছি এখনো। কে ছাপুত ঘরের কাড়ি দিয়ে আমাদের হেলেমেয়েদের হাতের হেলেখেলার ছবি সমস্ত, যদি না প্রবাসী বাবু করতেন রামানন্দবাবু।...তাদের সবার হয়ে আজ আমি প্রবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর আমার নিজের দিক থেকে বলছি শোভন কীর্ত্তি তোমার হউক।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩০। প্রবাসীর ২৫ বৎসর বয়ঃপূর্তি উপলক্ষে।

### নন্দলাল বসু

শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ কবে হ'ল আমার ঠিক স্মরণ নেই, তবে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে। আমার ছাত্রাবস্থায় গভর্ণমেন্ট আর্ট স্কুলে অধ্যয়ন করি। সেই সময় থেকেই তিনি আমার বিশেষ স্নেহ করতেন। বাংলা ১৩২৭ সালে কিছুদিনের জন্যে তাঁর কস্তা শ্রীমতী শান্তা দেবীর চিত্রশিল্পকার ব্যবস্থা করেছিলেন : সেই বোধের আমি প্রথম শিক্ষকতা আরম্ভ করি। তারপর তাঁর সম্পাদিত রামায়ণের জন্যে প্রায় ২০২২খানি ছবি আমাকে দিয়ে আঁকিয়েছিলেন, যা করে আমি বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেছিলাম।

আমাদের বর্তমান ভারতীয় চিত্রকলায় নবজাগরণের বুলে তাঁর উৎসাহ ও সাহায্য যে কতখানি শক্তিসংকার করেছিল, তা আজকে বিশেষ করে উপলব্ধি করতে পারি। মডার্ন রিভিউ, প্রবাসী ও চ্যাটার্জির পিকচার এ্যালুমিন্স-এর মাধ্যমে সেই যুগে আমাদের চিত্রকলায় সর্বাপেক্ষা প্রচার সম্ভব হয়েছিল।

আজকের এই ভারতীয় চিত্রকলায় উচ্চমান ও প্রতিষ্ঠার বুলে শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু একজন প্রধান দরদী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

প্রবাসী বাটবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ।

### মনীষী রামানন্দ ও প্রবাসী প্রসঙ্গে

...আমার মতো অনেকেরই স্কুল-কলেজের শিক্ষার অল্পপূরকতা করেছে তাঁর প্রবাসী। প্রবাসীর পাঠশালাতেই কবিগুরুর অজয় রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এই পাঠশালাতেই আচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, মহেশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজদাস দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বিধুশেখর শাস্ত্রী, অবনীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ক্রিষ্ণমোহন সেন, হরিহর শেঠ, অগদীনন্দ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, জগদীশচন্দ্র ইত্যাদি বহু জ্ঞানগুরুগণের বহু জ্ঞানগর্ভ রচনা পাঠ করে

উপকৃত হয়েছি। সর্বোপরি প্রতিমাসে রামানন্দবাবুর লিখিত বিবিধ প্রসঙ্গগুলি পাঠ করে প্রবন্ধ রচনার অনুশীলনে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করেছি।

আজকালকার অনেক পাণ্ডিত ব্যক্তির রচিত প্রবন্ধাদি পড়তে গেলে উদ্ঘাতি পথে অনারাসে আগাতে পারি না—তখন রামানন্দবাবুর গভ্রভাষাশৈলীর কথা মনে পড়ে। সেরূপ অথপাঠ্য গভ্রভাষা এ যুগে বিরল।

রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধসাহিত্য রচনা করেছেন—তাঁর অনন্তকরণীয় ভাষাসাহিত্যেরই নিজস্ব ভাষা। সাহিত্যেতর বিষয়ের জন্য যে গভ্রভাষা লিখতেন রামানন্দবাবু, তাই ছিল আমাদের অল্পকরণীয়। এ ভাষা ছিল নিরাসবেগ, অনলংকৃত, বক্তব্যবিক্রিত, যুক্তিপূর্ণস্বরূপ প্রবাহিত স্বচ্ছ সাবলীল ও রূপদ্রব্যাকী। নিরাসরণ সত্যকে স্পষ্ট করে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে ঘোষণা করার জন্য প্রয়োজন ছিল এ ভাষার। এ ভাষার পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য সাহিত্যেতর বিষয়ের আলোচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রবাসীর ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ কেবল ভাষার দিক থেকে নয়, চিন্তাশীলতা ও তথ্যবিশেষের বিচার বিশ্লেষণের দিক হতেও স্বতন্ত্র একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। প্রবাসী তাই বহুদিন ধরে দেশের গভ্রাহর্গতিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষা-পরিবেশনে পরিপূরকতার কাজ করেছে।...

প্রবাসী দেশসেবা ও জনগণের সেবা করেছে,—পাঠকদের চিন্তে দেশাস্থবোধের উদ্দীপন করে, জনমত গঠন করে অবিচার, অত্যাচার ও অসত্যের সাহিত সংগ্রাম করে, সরকারী দরবারে লায়িত্ত বক্তৃত জনগণের ন্যায্য দাবি ও অভাব অভিযোগ পেশ করে।

দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব প্রচার করে প্রবাসী বহুদেশের ঐতি জনগণের প্রচার উদ্বোধন করেছে।

কেবল বিবিধ জ্ঞান শাখার দিকে নয়, বহুদেশের প্রাচীন ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা ইত্যাদি শিল্পকৃষ্টির গৌরবের দিকে প্রবাসী দেশের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

দেশের শিক্ষা-বিভাগে, সাহিত্য-সেবার, সমাজ-সংস্কারে, কুসংস্কার-দমনে, ক্রীচ-সংস্কারে প্রবাসীর অবদান অসামান্য।

(প্রায় ৪০ বৎসর ধরে জনগণের পরিচয় ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনার সঙ্গে প্রবাসীর মারফৎ। রবীন্দ্রনাথের সর্গশ্রেষ্ঠ উপভাস গোরা আড়াই বছর ধরে প্রবাসীর পৃষ্ঠা অলংকৃত করেছে। ষাট বছর ধরে শত শত সাহিত্যপ্রভী প্রবাসীকে আশ্রয় করে সারস্বত সাধনা করেছে। বাংলা সাহিত্যের ত্রিগুণি সাধনে প্রবাসীর দান অসাধারণ।)

প্রবাসী কখনও আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য জনসাধারণের ক্রীচর দাসত্ব করেনি, তাদের ক্রীচকে মার্জিত, পরিচ্ছন্ন ও গুণিত্যের সমুদ্রত করবারই চেষ্টা করেছে। স্বার্থের প্রয়োজনে কখনও তার স্বকীয় মর্যাদা ও আদর্শ ক্ষুণ্ণ করেনি। মনসী রামানন্দ ছিলেন আদর্শ সম্পাদক। লেখকদের প্রেরিত রচনাবলীর ভূপ থেকে কয়েকটি নির্গাচন করে ছাপতে দেওয়ার নাম সম্পাদনা নয়, সম্পাদনাও একটা আর্ট, সম্পাদনাও একটা নতুন সৃষ্টি। সম্পাদকের কর্তব্য ও দায়িত্ব যে কত গুরুত্বপূর্ণ, প্রম-সাপেক্ষ, জ্ঞাননিভর তা আদর্শ সম্পাদনার রামানন্দবাবু দেখিয়ে গিয়েছেন। পুরাতন প্রবাসী থেকে তরুণ সম্পাদকদের অনেক কিছু শেখবার আছে।...

রামানন্দবাবু ছিলেন সত্যের নির্ভীক পূজারী, অসত্যের সঙ্গে তিনি সন্ধি করে চলতে পারতেন না। সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ, সর্ব সমস্তার সমাধানে তিনি ছিলেন পথি প্রদর্শক, তিনি ছিলেন

গতানুগতিকতার বিরোধী, স্বাধীন চিন্তার প্রবর্তক, ভেজবী ও স্পষ্টবক্তা। শৃঙ্খলানিষ্ঠতা ও নিয়মাহুতি-তার তিনি ছিলেন আচার্য যোগেশচন্দ্র ও রাজশেখর বসুর সগোত্র।

অধ্যাপকদের চেয়ে তাঁর কাছেই আমার চেয়ে বেশি শিক্ষা লাভ হয়েছে। তাঁর নাম উচ্চারিত হলে আজও তাঁর উদ্দেশ্যে মন্তক নতাই অবনত হয়ে পড়ে।...

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর  
(কথাসাহিত্য, ১৩১২)

...ভূপ লেখক নয়, পাঠকও সৃষ্টি করেছেন রামানন্দ।

—আজকাল যেমন তিন পাঠকবা নাকি সিনেমা স্টারদের ছবিছাড়া পত্রিকা কেনে না,—উত্তম ও অন্নাল গল্প পড়তে চায় তবেই বই বেশী প্রচার হয়। তাই সেগুলির চাষের ফলাও কারবার ছাড়া পত্রিকার উপায় নেই। নিজের দেশের শিক্ষিত সমুদায়ের প্রতি এমন অজ্ঞতা ও এমন দায়িত্বহীনতা সে যুগে কোনো সম্পাদকই হয়ত করতেন না। বিশেষকরে ‘প্রবাসী’র পাঠকগোষ্ঠী দ্বারা ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ পড়বার ভুলে তেমনি আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতেন যেমন আগ্রহে হয়ত আজকের পাঠক ইন্ট্রুমার্ক। উপভাসের জন্ত বসে থাকেন। সত্য বলতে কি ‘প্রবাসী’র পাঠকদের নিয়ে একটি সংবেদনশীল, উচ্চ সংস্কৃতি সম্পন্ন, অহংক্রান্ত ও রবীন্দ্রসাহিত্যাহুতরাপী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের জীবনে এত স্বাধীন ধরে অসংস্কৃত পাঠক মন গড়ে তোলার কাজ আর কোনো সম্পাদক করেছেন কি না সন্দেহ।

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী  
জাতীয় আদরণে রামানন্দের দান।





# পুরাতন বিবিধ প্রসঙ্গ সকলন

## ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় আদর্শ

নানা জনের রাষ্ট্রীয় আদর্শ নানাবিধ। স্বাধীনতার অর্থও সকলে এক রকম বুঝেন না। আমরা যখন বালক ছিলাম তখন আমাদের একজন সঙ্গী বলিয়াছিল, “দেশটা স্বাধীন হইলে বেশ হয়, তাহা হইলে আমার যাহা দরকার সবই পাই, কাহাকেও টেন্স দিতে হয় না।” স্বাধীন দেশের লোককে ট্যান্স দিতে হয় না, এরূপ ধারণা কোন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের আছে কি না, জানি না; কিন্তু স্বাধীনতার মানে যে অনেকে নিজের ইচ্ছামত ও সুবিধা মত আচরণ বুঝে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবিক যাহারা স্বাধীন তাহাদিগকেও নানা রকমের নিয়মের বাধাবাধির মধ্যে বাস করিতে হয়। অনেক সময় পরাধীন লোকদের চেয়ে স্বাধীন লোকদের অর্থব্যয় এবং যুদ্ধে প্রাণসংশয় ও প্রাণহানি বেশী হয়। বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে ভারতবর্ষকে কেবলমাত্র দেড় কোটি টাকা দিতে হইয়াছে। কিন্তু একজন বিশেষজ্ঞ সুইসের মতে ইংলণ্ডকে প্রত্যহ দেড় কোটি, জার্মানী ও রাশিয়ার প্রত্যেককে প্রত্যহ ৪০ কোটি, ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার প্রত্যেককে প্রত্যহ তিন কোটি টাকা করিয়া খরচ কাঁপতে হইতেছে। অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে যত সৈন্ত পাঠাইতে হইয়াছে, ভারতবর্ষকে তত পাঠাইতে হয় নাই। অবশ্য যাহারা স্বাধীনতার স্বপ্ন ও অধিকার ভোগ করে, যুদ্ধের সময় তাহারা উৎসাহের সহিত তাহার মূল্য দিতেও প্রস্তুত থাকে।

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় অবস্থা কিরূপ হইবে, উহার মধ্যে স্বাধীনতা কতদূর থাকিবে, কেহ বলিতে

পারে না। স্বদেশী রাজার অধীন হইলেই যে দেশের লোক বাস্তবিক স্বাধীনতা ভোগ করিবেই, তাহা বলা যায় না। স্বদেশী রাজা খুব প্রজাপীড়ক হইতে পারে। আবার এমনও হয় যে, বিদেশী রাজার অধীন কোন কোন দেশের লোকের এরূপ কিছু অধিকার থাকিতে পারে যাহা স্বদেশী রাজার অধীন, কোন কোন দেশের লোকদের নাই। অতএব “স্বাধীন” বা “পরাধীন” কথা-দুটির দ্বারা বিচার না করিয়া রাষ্ট্রীয় অধিকারের দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যিক। তজ্জন্ত আমরা “স্বাধীন” বা “পরাধীন” কোন কথাই ব্যবহার না করিয়া ভবিষ্যৎ ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা খুব সংক্ষেপে বলিতে চাই।

মানুষের প্রত্যেকের শক্তির বিকাশ, আনন্দ, সুবিধা ও উন্নতির জন্য যেরূপ সুযোগ পাওয়া দরকার এবং যাহা কিছু করা দরকার, তৎসম্বন্ধে কোন কোন দেশের লোকের নিজের যতটা হাত আছে ততটা কোন কোন দেশের লোকদের ততটা নাই। আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই যে, ভারতের ভবিষ্যৎ অধিবাসীরা যে কোন দেশের লোকের সমান সুখ এবং দৈহিক ও আত্মিক শক্তিশালী হইবে, তাহাদের জীবন যে কোন দেশের লোকের জীবনের স্তায় আনন্দপূর্ণ হইবে, তাহাদের নিজের উন্নতির জন্য তাহারা যাহা আবশ্যিক মনে করিবে তাহা করিবার অধিকার ও যোগ্যতা তাহাদের থাকিবে, এবং মানুষের পক্ষে নিজের ভাগ্যবিধাতা যতটা হওয়া সম্ভব তাহা তাহারা হইবে। ভারতের অধিবাসী বলিতে আমরা জাতি, বংশ ও ধর্ম নির্বিশেষে ভারতজাত

ও ভারতের হারী বাসিন্দা সমুদয় নারী ও পুরুষকে বুঝি। ভবিষ্যৎ ভারতে আমরা কোন একটি শ্রেণীর পুরুষ বা নারীর প্রভুত্ব দেখিতে চাই না, কিংবা নারীর উপর পুরুষের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব দেখিতে চাই না।

ইহাই আমাদের ভবিষ্যৎ ভারতের আদর্শ। ইহা অপেক্ষা খাট কোন অবস্থাকে আমরা আদর্শ বলিতে পারি না, ইহা অপেক্ষা খাট কোন জিনিসের চিন্তায় আমাদের আত্মা আনন্দ পায় না।

ইহা ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু ভবিষ্যৎ ধীরে ধীরে আসে। এবং আমরা এই যে মুহূর্তে লিখিতেছি, তাহার পর মুহূর্তই ভবিষ্যৎ, এবং অল্পকণ পরেই তাড়াতাড়ি আবার অতীতে মিলাইয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতের আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইবে কি না, এবং কখন হইবে, তাহা কেবল ভবিষ্যৎদংশীয়দিগের উপর নির্ভর করিতেছে না। এখন বাহারা বাঁচিয়া আছেন, বিশেষ করিয়া এখনও বাহাদের সম্মুখে দীর্ঘ জীবনপথ পড়িয়া গিয়াছে, তাহাদের উপরও ইহা নির্ভর করে এবং তাহারাও ইহার জন্ত দায়ী। স্বপ্ন দেখার নিন্দা আমরা করি না। স্বপ্ন দেখার আবশ্যক আছে। কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তববৃত্তি দিতে হইলে প্রজ্ঞা, একাগ্রতা, ত্যাগ ও কঠোর শ্রমের প্রয়োজন। ভাগ্যবান্ তাহারা বাহারা এই প্রয়োজন স্বীকার করে, এবং তদনুসারে আচরণ করে।

প্রবাসী, মাঘ, ১৩২১।

### শিক্ষার একটি প্রধান কথা

আমাদের দেশে পুস্তক পাঠ ও মুখস্থ করা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু তাহা উচিত নয়। পুস্তকে যে পূর্ণলব্ধ জ্ঞান সঞ্চিত আছে তাহা অল্প আয়ালে স্বাভিজ্ঞতির সাহায্যে আয়ত্ত করিয়া লইলেই শিক্ষা হয় না। তাহার কারণ অনেক। প্রথমতঃ পুস্তকে বাহা লেখা আছে, তাহা নিভুল নহে। বিজ্ঞান প্রত্যেক শাখায় নূতন সত্যের ও তথ্যের আবিষ্কারে দেখা যাইতেছে, পুস্তকে লিখিত অনেক কথাই বহুদিনের কথা। অতএব পুস্তকে বাহা আছে,

তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। পরীক্ষা যে উপায়ে করিতে হইবে, তাহার দ্বারা প্রকৃত শিক্ষা অর্জন হইবে।

জ্ঞান চরকমের, বহির্জগতের জ্ঞান এবং মানুষের অন্তর্জগতের জ্ঞান। বহির্জগৎ সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে, তাহাকে বহির্জগতের সমুদয় ঘটনা ও ব্যাপারের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে। পর্যবেক্ষণ (observation) এবং পরীক্ষণ (experiment) দ্বারা ইহা করিতে হইবে। যদি পুস্তকে লেখা থাকে, যে, এই এই যন্ত্রের সাহায্যে এই এই কাজ করিলে বিনা তারে সংবাদ পাঠান যায়, তাহা হইলে উহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে প্রকৃত জ্ঞান হইবে না। বস্তুর প্রকৃত কার্য, অন্ততঃ পক্ষে তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া, এবং সমস্ত প্রক্রিয়া পুস্তক লিখিত বর্ণনার অনুযায়ী করিয়া, দেখিতে হইবে যে, সত্য-সত্যই বিনা তারে সংবাদ পাঠান গেল কি না। যদি এইরূপ পরীক্ষণ (experiment) সফল হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, যে, পুস্তকে বাহা লেখা আছে তাহা ঠিক। যদি সংবাদ না যায়, তাহা হইলে পরীক্ষণ সফল হইল না কেন, তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে। পুস্তকে যদি লেখা থাকে যে, ৩রা শ্রাবণ মধ্যাহ্ন ১টা ১২ মিনিটের সময় সূর্য্যোদয় হইবে, তাহা হইলে তাহা মানিয়া লইয়া মুখস্থ করিয়া রাখিলে প্রকৃত জ্ঞান হইবে না। নিভুল ঘড়ির সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে হইবে যে পুস্তকে উল্লিখিত সময়ে সূর্য্যোদয় হইল কি না। হইলে পুস্তক নিভুল বুঝিতে হইবে। না হইলে ভ্রম কোথায়, এবং কিরূপে হইল বুঝিয়া বাহির করিতে হইবে। ইতিহাসে যদি লেখা থাকে যে, কোন এক স্থানের প্রস্তরস্তম্ভে সম্রাট্ অশোক কতকগুলি অনুশাসন উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে সেইগুলি মুখস্থ করিলেই ঠিক ঐতিহাসিক জ্ঞান হইবে না। কতকটা জ্ঞান হইবে যদি সেই অনুশাসন-গুলির প্রতিলিপি সম্মুখে রাখিয়া যে প্রাচীন লিপিতে উহা লিখিত তাহা পড়িতে পারি। এবং যে প্রাচীন ভাষায় উহা রচিত তাহা বুঝিতে পারি। সম্পূর্ণ জ্ঞান

হইবে যদি স্বয়ং সেই স্তরের নিকট গিয়া অনুশাসনের প্রতিশ্রুতি লইয়া তাহা পড়িতে ও বুঝিতে পারি। সকল বিষয়েই জ্ঞানের মূল উপাধান ও উৎসের নিকট পৌঁছিলে তবে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। মানুষের অন্তর্জগৎ সৰ্ব্বদে নানা দর্শনশাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ ও কাব্যাদি হইতে আমরা বাহ্য জানিতে পারি, তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলে প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া যায় না। যিনি নিজের আত্মার মধ্যে, নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে, অন্তর্জগৎ সৰ্ব্বদে পুস্তকনিবন্ধ জ্ঞানের সাক্ষ্য পান, পুস্তকে যাহা আছে, নিজের মনে তাহার প্রতিরূপ দেখিতে পান, তাঁহার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। যদি কেহ দেখেন যে, পুস্তকের কথার তাঁহার আত্মা সার্ব দিতেছে না, তাহা হইলে তাঁহাকে শুদ্ধাঙ্গকরণে চিন্তা দ্বারা, অপরের সহিত আলোচনা দ্বারা প্রকৃত সত্য উপনীত হইতে চেষ্টা করিতে হইবে।

কি বিহর্জগৎ, কি অন্তর্জগৎ, উভয় সৰ্ব্বদেই জ্ঞান যথাসম্ভব সাক্ষাৎভাবে পরীক্ষিত ও লব্ধ হইলে তবে তাহা প্রকৃত জ্ঞান হয়।

পুস্তকই পুরাতন সাক্ষিত জ্ঞান পরীক্ষা করিবার উপায় যাহা, নূতন জ্ঞান লাভের পথও তাহাই। বিহর্জগৎ সৰ্ব্বদে নিত্য নূতন নূতন আবিষ্কার হইতেছে; অন্তর্জগৎ সৰ্ব্বদে দার্শনিক, ধর্মীচাৰ্য্য ও কবিরা নূতন কথা বলিতেছেন। বাস্তবিক উভয় জগৎ সৰ্ব্বদে যাহা জানা বাইতে পারে তাহার অতি অল্প অংশই এ পর্যন্ত জানা গিয়াছে। জ্ঞানের প্রস্রবণ অক্ষুরন্ত। পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, চিন্তা, ধ্যান ও আলোচনা আদি দ্বারা নূতন জ্ঞান লাভের শক্তি জন্মান, শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। যে শিক্ষাপ্রণালী মানুষকে চিন্তা, ধ্যান ও আলোচনা করিতে, পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করিতে উত্তেজিত করিবে, অধিক পরিমাণে সমর্থ না করিয়া বরং অসমর্থই করিয়া ফেলে তাহা শিক্ষা নামের অযোগ্য।

যে ব্যক্তি কার্য্যভ্যাস মানিয়া লইয়াছে যে, যাহা কিছু জানিবার তাহা জানা হইয়া গিয়াছে এবং তাহা পুস্তকে লেখা আছে, তাহার কোনপ্রকার

প্রকৃত শিক্ষা হইতে পারে না; সে কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট ভোতাপাখী হইতে পারে। যে অন্তর্জগৎকে ও বিহর্জগৎকে বিনয় ও কোতূহলের চক্রে দেখে, তাহারই শিক্ষা হইতে পারে।

শিশু অক্ষুরন্ত কোতূহল লইয়া জন্মগ্রহণ করে; জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতে তাহার বিনয় ও কোতূহলের আর অবধি থাকে না। এইজন্যই ত সে সব জিনিসই ছুঁইতে, ভাঙিতে, চাঙািতে, নাড়িতে চায়। এইজন্যই ত সে কথা বলিতে শিখিবার পর বাপমাকে ও অপর সকলকে প্রশ্ন করিয়া হারহান করিয়া ছলে। শিশুর এই কোতূহল যে-মানুষের আমরণ থাকে, সে-ই প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি। যে তথাকথিত শিক্ষা কোতূহল বিনষ্ট করিয়া দেয়, তাহা শিক্ষা নামের অযোগ্য। তাহা অতি অনিষ্টকর।

বিনয় ও কোতূহল শিক্ষার গোড়া। সেই কোতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য মানুষকে চোখ, কান, নাক, স্বক ও জিহ্বার প্রয়োগ করিতে হয়। হাত নিপুণভাবে চালাইতে হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের মধ্যস্থ বুদ্ধির প্রয়োগ করিতে হয়।

কিন্তু শুধু হাতের নৈপুণ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের স্তম্ভপ্রয়োগ, বুদ্ধির চালনা, ইহা হইলেই শিক্ষা হয় না। কারণ, মানুষকে অস্ত্রে শিক্ষা দেয় এবং সে নিজে নিজেই শিক্ষিত হয় এইজন্য, যে, সে অস্ত্র মানুষের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এরূপভাবে জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবে, যাহাতে তাহার নিজের মঙ্গল ও আনন্দ হয় এবং অস্ত্র সব মানুষেরও মঙ্গল ও আনন্দ হয়। এরূপ জীবন যাপন শুধু জ্ঞান, বুদ্ধির উৎকর্ষ, এবং কর্মোদ্রিগ ও পর্য্যবেক্ষণোদ্রিগের দক্ষতা ও কার্য্যকারিতার উপর নির্ভর করে না। মানুষ যদি সংযত, প্রেমিক, অন্তের হিতৈষী, সহিষ্ণু, স্বার্থভাগী ও বিবেচক না হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা নিজের এবং অপরদের কল্যাণ সাধিত হতে পারে না। জন্মভের আনন্দ বর্জনও তাহার দ্বারা হয় না। এইজন্য বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনও

অবস্ত-প্রয়োজনীয়। যেমন জ্ঞান চাই, নৈপুণ্য চাই, তেমনি অথবা তার চেয়েও বেশী চাই চরিত্র। বাস্তবিক, জ্ঞান ও নৈপুণ্য লাভ চরিত্রের উপর বহু পরিমাণে নির্ভর করে। কারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিভালাভ প্রমসাপেক্ষ ও তপতাসাপেক্ষ; কিন্তু সংবত, একাধ্র, অধ্যবসায়ী ও নিষ্ঠাবান্ না হইলে প্রম ও তপস্যা সম্ভব নহে; এবং সংবম, একাধ্রতা, অধ্যবসায়, ও নিষ্ঠা সাধু চরিত্রের অঙ্গ।

এইসব কারণে আগে যখন ইংরেজীতে বলা হইত যে তিনটি “আর” (The three Rs) হইলেই প্রাথমিক শিক্ষা হয়, যথা রাইডিং, রাইটিং, ও রিথম্যাটিক (reading, writing, and [A] rithmetic) তেমনি কেহ কেহ বলিতেছেন, যে, তিনটি “এইচে” (The three H's) শিক্ষা হয়,—যথা, হ্যাণ্ড, হেড্ ও হার্ট (Hand Head and Heart), অর্থাৎ হাতের সুপ্রয়োগ, বুদ্ধির সুপরিচালনা, এবং হৃদয়ের উৎকর্ষ, এই তিনে মানুষের প্রশিক্ষা হয়। তিনটি “আরে” শিক্ষা হয়, বলা অপেক্ষা, “এইচে” শিক্ষা হয়, বলা অধিকতর সত্য, — যৌদ ও ইহাতেও সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশ পায় না। শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য পূর্ণতর ভাবে বলিতে উপরে চেষ্টা করিয়াছি।

আমাদের দেশে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার নানা দোষ ও ক্রটি আছে। আগের আলোচনা হইতে তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে। হাতের নৈপুণ্য আমাদের গুর কমই হয়। নানা বকম জিনিস গড়িতে, নানা বকমের প্রতিষ্ঠিত নক্সা ও ছবি আঁকিতে এবং সুন্দররূপে লিখিতে আমাদের শিখা উচিত। কিন্তু পুরোক্ত হুঁরকম শিক্ষাও অল্প লোকেরই হয়। অধিকন্তু আগে বালকবালিকাদের হাতের লেখা বেক্রপ ভাল করিবার জন্য চেষ্টা করা হইত, এখন তাহা হয় না বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধির ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টাও হয় না। কেবল মাত্র স্মৃতিশক্তির চালনা যথেষ্ট অপেক্ষা বেশী পরিমাণে হয়।

প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৭৬।

## জাতীয় উন্নতি ও ব্যক্তিগত চরিত্র

জাতির মানে যখন ব্যক্তির সমষ্টি, তখন জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদের চরিত্র বিত্ত ও উন্নত না হইলে যে জাতীয় চরিত্র বিত্ত ও উন্নত হইতে পারে না, সুতরাং জাতীয় উন্নতিও হইতে পারে না,—ইহা এক সহজ কথা যে, বেশী বুদ্ধিবর্ত্ত দ্বারা ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন বোধ হয় না। অথচ এই কথাটা আমরা অনেকে অনেক সময় ভুলিয়া থাকি। এইজন্য চরিত্রবান্ গান্ধী যে বারবার বলিতেছেন, যে, আমাদের আত্মশুদ্ধি (self purification) দরকার, এই উক্তির গুরুত্ব ও পূর্ণ অর্থ অনেকের হৃদয়ঙ্গম হয় না। মানুষকে অহামকা ছাড়িয়া নড়া হইতে হইবে, বাক্যে আচরণে চিন্তায় অসংযম ত্যাগ করিয়া সংযত হইতে হইবে, ক্রোধের পরিবর্ত্তে অক্রোধ ও মৈত্রীকে, প্রতিভাংশসার পরিবর্ত্তে প্রীতিক্রমে প্রীতিষ্ঠিত করিতে হইবে, প্রগতিশীলচরিত্রকে বশে রাখিয়া তৎসমুদয়কে নিয়ন্ত্রণ বা বিধাতানির্দিষ্ট কার্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। মিথ্যার পরিবর্ত্তে সত্যকে অবলম্বন করিতে হইবে এবং নিজের স্বার্থ ও প্রেয়ের পরিবর্ত্তে নিজের ও অন্তঃকলের কল্যাণের জন্য প্রেয়কেই লভ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে—নানা দেশের জাতির ও যুগের ধর্মোপদেশেই ইহা বলিয়াছেন। আত্মশুদ্ধির ইহাই পথ।

শিবমোহ শাস্ত্রী মহাশয় যখন লিখিয়াছিলেন, “ইঞ্জিরের দাস যে-বা বারমাস, স্বদেশ-উদ্ধার তার কার্য নয়,” তখন তিনি যুগাপেক্ষ, আমরা তখন শিশু। অতীত যুগের সাধুদের মত আধুনিক সময়ের অস্ত্র ধর্মাস্ত্রারাও চরিত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। আত্মবল্যাণ্ডের দেশভক্ত ম্যাকজুইনী কার্যকর হইয়া প্রায়োপবেশন করেন, হয় স্মৃতি নয় উপবাস এই প্রতিজ্ঞা করেন। চুম্বান্ডর দিন উপবাসের পর তাঁহার নির্মল আত্মা দেহ কায়াগার ও ইংরেজের কায়াগার উভয়ই ত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করে। এই পুণ্যাস্ত্রার ‘স্বাধীনতার মূলমন্ত্র’ (Principles of Freedom) নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে :—

One cannot be an honest man in one—sphere and a rascal in another and since a citizen to fulfil his duty to his country must be honourable and zealous he must develop the underlying virtues in private life. He must strengthen the individual character, and to do this he must deal with many things seemingly remote and inconsequential from a national point of view.

অর্থাৎ, কেহ এক ক্ষেত্রে সাধু ও অসঙ্গত ক্ষেত্রে দুষ্কৃত হইতে পারে না ; এবং দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্ত দেশবাসীকে যখন সাধু ও আগ্রহী হইতে হয়, তখন তার আত্মবৃত্তিক সমস্ত গুণ ও ধর্ম তার ব্যক্তিগত জীবনেও অর্জন করিয়া পরিষ্কৃত করিয়া তুলিতে হয়। তাকে তার ব্যক্তিগত চরিত্র বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইবে, এবং এর জন্ত দেশের কাজের দিক হইতে দূরগত ও অসংলগ্ন বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান অনেক জিনিসের সাধনা তাহাকে করিতে হইবে।

জাতীয় কোন অহুষ্ঠানে, কার্খো, প্রচেষ্টায় গাঁহারা প্রধান বা অপ্রধান নেতৃত্ব করেন বা অল্পকে কোন কার্য্য করিবার জন্ত মনোনীত করেন, তাঁহাদের এইসব কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। পৃথিবীর সর্বত্র, আমাদের দেশেও, আজকাল নারীরা পূর্ণাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সার্বজনিক কার্য্যক্ষেত্রে (in the field of public activities) অবতীর্ণ হইতেছেন। সার্বজনিক কর্মীদের (public workerদের) চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ইহা একটি অতিবিস্তৃত কারণ ;—বিশেষতঃ সেই সকল অহুষ্ঠানে যাহা নারীর কল্যাণের জন্ত অভিপ্রোক্ত।

পানেলের মত, ডিক্লেয়ার, মত আদালতে দোষ প্রমাণ হইয়া গেলে তবে দোষটা ধর্মব্য, নতুবা নয়, ইহা মনে করা উচিত নয়। কাহারো নিন্দা কুৎসা প্রচার করা অকর্তব্য কিন্তু যেখানেই মনোনয়ন বা নির্বাচন প্রয়োজন হইবে, সেখানেই প্রত্যেক চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিলেই যথেষ্ট ফল পাওয়া যাইতে পারে।

চরিত্রদোষ এক রকম নয়। পানদোষ বা অস্ত্রবিধ নেশার অধীনতাও চরিত্রদোষ। আর্থিক দায়িত্ব সম্বন্ধে বাহাদুরের কর্তব্যবোধ কম বলিয়া আদালতে প্রমাণ হইয়াছে সার্বজনিক অহুষ্ঠানে এরূপ কর্মীরও কোনপ্রকার প্রাধান্ত অব্যাহতীয়।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৯২৮।

### আমেরিকার প্রাচ্যের অপমান

কানাডা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত। ঐ দেশের ভ্যাঙ্কুবর শহর ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ ও কানাডার সীমান্তে অবস্থিত। কানাডা হইতে আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্‌সে প্রবেশ করিতে হইলে ভ্যাঙ্কুবর একটি প্রবেশ দ্বার। সেখানে সব প্রবেশাধীদের পরীক্ষা হয়। এশিয়ার কোন জাতির লোককে ইউনাইটেড স্টেট্‌সে পৌরঅধিকার-বিশিষ্ট স্থায়ী বাসিন্দা হইবার জন্ত ঢুকিতে দেওয়া হয় না। ইউরোপীয় জাতি সকলের লোকদের ঢুকিবার ও পৌর অধিকার পাইবার বাধা নাই। কিন্তু কোন ইউরোপীয় দেশের কত জন মানুষকে প্রতি বৎসর ঢুকিতে দেওয়া হইবে, তাহার সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে।

আমেরিকায় ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ আমেরিকা মহাদেশের সকলের চেয়ে শিক্ষাশালী ও ধনী দেশ বলিয়া তাহাকেই সংক্ষেপে আমেরিকা বলা হয়।

রবীন্দ্রনাথ কানাডায় বক্তৃতা করিবার জন্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেখানেও এশিয়াবাসীদের প্রবেশের ও পৌর অধিকার লাভের বাধা আছে। কিন্তু কবিসেখানে কোন ক্ষুদ্র ব্যবহার পান নাই। কানাডার কাজ সাধিয়া ভ্যাঙ্কুবরের পথে তিনি যখন আমেরিকা প্রবেশ করিতে যান, তখন সেই শহরের রাজ্যী পরীক্ষা-গৃহ-ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তাঁহার প্রতি অশিষ্ট ও ক্ষুদ্র ব্যবহার করে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে।

কবি ইতাকে প্রাচ্যের প্রতি আমেরিকার দুর্ব্যবহার মনে করিয়াছেন। ইহা যে এশিয়ার অপমান তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই উপলক্ষ্যে কোন কোন ধরনের কাগজ কবিকে নানা উপদেশ দিয়াছেন। কোন কোন উপদেশ হইতে মনে হয়, কাহারও এইরূপ ধারণা আছে, যে, ভারতবর্ষ পরাধীন বলিয়াই ভারতবর্ষের লোককে এইরূপ অপমান সহ্য করিতে হয়। এই ধারণা একেবারে মিথ্যা নয়, সম্পূর্ণ সত্যও নয়। সম্পূর্ণ সত্য নহে বলিতোহ এইজন্য, যে, স্বাধীন ও শক্তিশালী জাপানের লোকদিগকেও হায়ী, বাসিন্দা হইয়া পৌর অধিকার লাভের জন্য আমেরিকায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না। স্বাধীন, পরাধীন, এশিয়ার সব দেশের লোকের সম্বন্ধেই এক নিয়ম। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথকে যে-প্রকার অপমান করা হইয়াছে, জাপানের কোন বিখ্যাত লোককে ত সেরূপ অপমান করা হয় না? কখনও হইয়াছে কি না মনে পড়িতেছে না। কিন্তু ভারতবর্ষেরও সব বিখ্যাত লোক আমেরিকান যাত্রী পরীক্ষক কর্তৃকারীর দ্বারা অপমানিত হন নাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও পূর্বে যখন যখন আমেরিকা গিয়াছিলেন তখন অপমানিত হন নাই; সম্রাতি শ্রীমতী সরোজনী নাইডু আমেরিকা প্রবেশের সময় অপমানিত হন নাই।

প্রকৃত কথা এই, যে, এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে যে আইনটা আছে, তাহাই চূড়ান্ত অপমানকর; ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও প্রতি রূঢ় ব্যবহার হইলে তাহাতে অপমান বিশেষ কিছু বাড়ে না। শিষ্ট ব্যবহার হইলেও বিশেষ কিছু কমে না। এই অপমান সমুদয় এশিয়ার, শুধু ভারতবর্ষের নহে।

অনেকে বলিতেছেন, আমেরিকা আমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, আমেরিকানদের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিবার অধিকার আমাদের আছে এবং তাহা করা উচিত। অপমানের প্রতিশোধ-রূপ অপমান করা ক্রুদ্ধ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বটে, কিন্তু তাহা কর্তব্য কি না এবং সুবিবেচনার কাজ হইবে কি না, তাবিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু আপাততঃ এ বিষয়ে কিছু পৌকরের আভিনয় না করা ভাল। কারণ কর্তব্য বাহাই হউক, তাহা করিবার ক্ষমতা এখন

আমাদের নাই, স্বরাজ লব্ধ হইলে ক্ষমতা জন্মবে। তখন তাবিয়া দেখিতে হইবে, স্বাধীন ও শক্তিশালী জাপানের ক্ষমতা থাকা সম্বন্ধে সে কেন প্রাচ্যের সম্বন্ধে আমেরিকার অপমানকর ব্যবহার প্রতিশোধ রূপ আমেরিকার সম্বন্ধে নিজের দেশে সেইরূপ ব্যবস্থা করে নাই। এখন স্বরাজ লাভের চেষ্টাই রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের প্রধান চেষ্টা হওয়া উচিত। স্বরাজ পাইবার পরেও প্রতিশোধ নীতি অবলম্বন অপেক্ষা চরিত্রে, জানে ও কণ্ঠে স্মরণ হওয়া দ্বারা প্রাচ্য অধিক ফল পাইবেন।

রাগের মাধ্যম সমগ্র আমেরিকান জাতিকে গালাগালি দেওয়াও ত ঠিক নহে। স্বাধীন দেশেও তথাকার গভর্নমেন্ট ও তথাকার অধিবাসীবর্গ সমার্থক নহে। অনেক স্থলেই দেখা যায়, গণতান্ত্রিক দেশে সকলের চেয়ে স্বার্থপর, এবং দুঃস্বপ্ন বিদেশী জাতিদিগকে সকলের চেয়ে শোষণেচ্ছু ও লুণ্ঠনেচ্ছু লোকেরাই রাষ্ট্রীয় শক্তির অধিকারী ও পরিচালক হয়। আমেরিকার লোকদের মধ্যে যাহারা প্রাচ্যের অপমানের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহারা সংখ্যায় বেশী হইতে পারে; কিন্তু তাহারা আমেরিকার সব অধিবাসী নয়, শ্রেষ্ঠ অধিবাসীও নহে। আমেরিকার এমন লোক বিস্তর আছেন, যাহারা সকল দেশের সকল জাতির প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহারের পক্ষপাতী। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষের পক্ষে অপমানকর আইন রদ করিতে চেষ্টা আছেন।

আমেরিকার লোকদের এই শ্রেষ্ঠ অংশের অনেকে রবীন্দ্রনাথের বাগী শুনিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কোন কোন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। সেইজন্য তিনি আমেরিকা গিয়াছিলেন, খ্যাতি বা সম্মানের জন্য নহে। তাঁহার খ্যাতি ও সম্মান ইউরোপের নানা দেশে এবং চীন, জাপান, শ্রাম প্রভৃতি স্বাধীন প্রাচ্য দেশে যথেষ্ট অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে।

বে-দেশের গবর্নমেন্ট কর্তৃক প্রাচ্য অপমানিত সে দেশেরও কতক লোক প্রাচ্য কোন কোন মনীষীর কথা

তিনিতে আশ্রয় প্রকাশ করিলে তাঁহাদের মনোবাহা পূর্ণ করা অকর্তব্য নহে। কিন্তু যে সব আমেরিকান প্রাচ্যের উপদেষ্টাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন, তাঁহাদের আগে হইতে এমন ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে উপদেষ্টাদিগের কোন প্রকার অসুবিধা ও অপমান না হয়। ববীজন্যকে এবার যাহারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এরূপ ব্যবস্থা না করার অপরাধী হইয়াছেন।

প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৬।

### হিজলী জেলের খবর

হিজলী জেলে রাজনৈতিক কয়েদীরা কিরূপ ব্যবহার পায় সম্ভ্রান্তি সে-বিষয়ে খবরের কাগজে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। সেদিনকার অ্যালবার্ট হলের সভাতেও অনেক কথা বলা হইয়াছে। এগুলি সমস্ত ভুলভোগী প্রত্যক্ষদর্শীর কথা। তাই বলিয়া আমরা গভর্ণমেন্টকে এগুলি বিনা তদন্তে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে বলিতেছি না। কয়েদীদের থাকিবার সাধারণ ঘর, নির্জন কারাকক্ষ, পরিষেব, স্নানের ব্যবস্থা, খাদ্য, রোগে চিকিৎসা ও ঔষধ, হাসপাতালগৃহ প্রভৃতি সকল বন্দবস্তেরই দোষ দেখান হইয়াছে ও বলা হইয়াছে, যে, বন্দবস্তগুলি জেল-বিধির বিপরীত—জেল-বিধি অনেক ভাল। গভর্ণমেন্ট বলিতে পারেন, যাহা লেখা ও বলা হইয়াছে তাহা মিথ্যা। কিন্তু গভর্ণমেন্ট যাহা বলিবেন, তাহা তো হানীর কর্মচারীদের প্রভুত্ব বিবরণ অহুসারে বলিবেন। তাহাতে লোকের বিশ্বাস জন্মিবে না। কেননা আগে এই হিজলীতেই রাজনৈতিক বন্দীদের উপর গুলি চালান উপলক্ষ্যে যে সরকারী তদন্ত হয় তাহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছিল, যে, উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে অপ্রকৃত কথা বলিয়াছিলেন। সেইজন্য আমরা বলি, নিজেদের সুখ্যাতি ও সন্মান প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্তই প্রকাশ্য তদন্ত করান গভর্ণমেন্টের উচিত। এরূপ প্রকাশ্য তদন্তে যদি সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত এবং উক্ত সভার বিবৃত সব বৃত্তান্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়, ভালই।

তবে এমনও হইতে পারে যে, এই সব বৃত্তান্ত সত্য, এবং কয়েদীদের জন্ত জেল-বিধিতে যেরূপ ব্যবস্থা আছে তার চেয়ে কঠোর ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা গভর্ণমেন্টে দাব্যত্ব ও বাহনীর মনে করেন। ইহা আমরা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতেছি না, কেবল আলোচনার জন্তে অহুমান করিতেছি। কারণ, গভর্ণমেন্ট কোন কোন বিষয়ে কখন কখন অবস্থা বুঝিয়া কঠোরতর বা নুহতর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাই বলিতেছি, যে, গভর্ণমেন্ট যদি মনে করিয়া থাকেন, যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় জেল কোডের ব্যবস্থায় আরামে কয়েদীদিগকে না রাখিয়া অধিকতর কঠোর ব্যবস্থায় রাখা দরকার তাহা হইলে সরকার প্রকাশ্যভাবে কোডের পরিবর্তন করুন, সংশোধিত নূতন কোড প্রকাশিত হউক, দেশে ও বিদেশে লোকে জাহ্নক ভারতবর্ষের কারাগারে বন্দীদিগকে কিরূপ অবস্থায় রাখা হয়। নতুবা যদি ইহা সত্য হয়, যে, কোডে আছে অপেক্ষাকৃত মানবিক ও আশামদায়ক ব্যবস্থা কিন্তু হিজলীর জেল-কর্মচারীরা রাজনৈতিক বন্দীদিগকে রাখে অসুবিধা ব্যবস্থায়, তাহা হইলে গভর্ণমেন্টকে এই বৈদ্যুতিক ও বৈপরীত্যের জল্প দারী হইতে হয়। তাহা বাহনীর নহে।

হিজলী জেল সম্বন্ধে আর একটি আভ্যোগ এই, যে, তথ্য রাজনৈতিক বন্দীদিগকে বলপূর্বক হাত তুলিয়া ও মাথায় ঠেকাইয়া “সরকার সেলাম” বলান হয় এবং তাহাতে আপত্তি করিলেই আপত্তিকারীকে ডাঙাবেড়ী সাজা দেওয়া হয়। এবিষয়েও যথাবোধ্য প্রকাশ্য অহুসন্ধান হওয়া কর্তব্য। আমাদের ধারণা মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া কোন রাজনৈতিক বন্দীকে জেল কর্মচারীদিগকে তদ্রূপমতে প্রচলিত সন্ধান দেখাইতে অনিচ্ছুক নহেন। মহাত্মা গান্ধী এরূপ সন্ধান দেখাইয়া থাকেন। তাহার একটি কারণ, তিনি বন্দী হইলেও মানুষের মত ব্যবহার, তদ্রূপলোকের মত ব্যবহার, জেলে পান। সব রাজনৈতিক বন্দী মহাত্মা গান্ধী নহেন কিন্তু মানুষ তাঁহারা সকলেই এবং তদ্রূপ প্রেমীর মানুষও বটে। সুতরাং তাঁহারাও তদ্রূপ মানবিক ব্যবহার পাইবার যোগ্য।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, “The law is no respecter of persons,” আইন মানুষের মানুষের প্রভেদ করে না, সকলের ওপর সমান ভাবে খাটে। আমরাও তাহাই চাই। মহাত্মা গান্ধী ও বড় বড় নেতারা জেলে ভাল ব্যবহার পান, এবং ইহা যদি সত্য হয় যে অন্তেরা পান না, তাহা হইলে অসঙ্গতি ঘোষ ঘটে। সরকার বলিতে বাংলা ভাষায় সাধারণতঃ গভর্ণমেন্ট এবং কচিং প্রভৃতি বা মালিক বুঝায়। জেলের উচ্চতম কর্মচারীও গভর্ণমেন্ট নহেন, বা কয়েদীদের মালিক, ও প্রভৃতি নহেন। সুতরাং তাঁহাকে সরকার বলিলে গভর্ণমেন্টের অসম্মান করা হয়। ইংলণ্ডে কোন জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টকে কয়েদীরা “গুড মর্নিং, গভর্ণমেন্ট” বা “গুড মর্নিং, মাই লর্ড এণ্ড মাস্টার” বলে বলিয়া আমরা কখনও শুনি নাই। বাংলাদেশে কেহ কাহাকেও “সরকার সেলাম” বলিয়া অভিনন্দন করে না। সেলাম শব্দটি আরবী। বাংলাদেশে মুসলমানেরা যখন উহা অভিবাদনার্থ ব্যবহার করেন, তখন তাঁহারাও “সরকার সেলাম” বলেন না। উহা বাংলাদেশের কোন সম্প্রদায়ের লোকেরই অভিবাদন নহে। “সেলাম আলেকুম” বা “আলেকুম সেলাম”—এর মানে “আপনি শান্তিতে থাকুন।” যদি ইহা সত্য হয় যে, হিজলী জেলের কয়েদীদেরকে জোর করিয়া “সরকার, সেলাম” বলা হয়, তাহা হইলে কার্যতঃ তাহার মানে দাঁড়ায় “হে প্রভু, বা, হে গভর্ণমেন্ট, আপনি শান্তিতে থাকুন এবং আমরা অশান্তিতে থাকি।” রাষ্ট্রীয় সব ব্যাপারই গভীর। তাহাতে হাতরসের আবির্ভাব অবাহুনিয়—অনভিপ্রোক্ত আবির্ভাবও অবাহুনিয়।

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।

### “বুর্জোয়া”

আমরা উত্তম, অন্তেরা অধম—এই ভাবটা সর্বত্র প্রাচীন কাল থেকে বিদ্যমান আছে। অস্ত্রের অধমতা বুঝাইবার নিমিত্ত নানা দেশে নানা ভাষায় নানা শব্দের

ব্যবহার হুটু হয়। গ্রীক ভাষায় বাহারি কথা বলিত না, গ্রীকরা তাহাদিগকে বাবেরিয়ান বলিত, ইহুদীরা অস্ত্র জাতির লোকদিগকে জেটাইল বলিত, বৈদিক আর্যেরা অনার্যদের প্রতি দাস, দম্ভ্য, রেজ্জ আদি শব্দ প্রয়োগ করিত, আচার্যগণ হিন্দুর চক্ষে অহিন্দু বা রেজ্জ, খ্রীষ্টিয়ানরা হিন্দুদিগকে জীহেন বা পেগ্যান বলে, মুসলমানেরা হিন্দুকে কাকের বলে। অন্তের প্রতি এইরূপ কোন-না-কোন শব্দ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে অবজ্ঞাও সূচিত হয়।

পূর্বকাল হইতে আগত এইসব অবজ্ঞামিশ্রিত শব্দ প্রায়ই কোন-না-কোন ধর্মসম্প্রদায়ের লোক ব্যবহার করে। তাহাড়া রাজনৈতিক দলাদলি প্রসূত এই রকম শব্দও আছে। যেমন ইংরেজদের মধ্যে প্রগতিশীল, উদারনৈতিক বা মৌলিসম্মতাদিগের দলের লোকেরা রক্ষণশীল দলের লোকদিগকে টোরা বলে। আমাদের দেশে এক দলের লোক অন্য দলের লোককে চরমপন্থী, মডারেট ইত্যাদি অভিধা দিয়া থাকে। আজকাল ইউরোপ হইতে আমদানী “বুর্জোয়া (Bourgeois)” কথাটা ভারতীয় একদল লোক প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার মানে করে তাহার ক্রমীয় কম্যুনিস্টদের মতাবলম্বী এবং নিজেরা বুর্জোয়া নহে। ইহা একটি ক্লেঞ্চ কথা, মানে দোকানদার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক অর্থাৎ অভিজাতও নয়, দৈহিক শ্রমজীবী, কারিগর, চাষী ইত্যাদিও নয়। আমাদের দেশে কিন্তু বাহারি অপরের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশার্থ এই শব্দটি ব্যবহার করে তাহার অনেক বা অধিকাংশ নিজের খাত নিজে উৎপাদন করে না, নিজের কাপড় নিজে বোনে না, দৈহিক শ্রমের কোন কাজ করে না। পরগাহার মত পরাবলম্বী পরশ্রমজীবী হওয়াটা যদি বুর্জোয়ার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে ইহাদের অনেকেই বুর্জোয়া, এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকও বটেই। অনেকে মহাত্মা গান্ধীকে পর্য্যন্ত, শুধু বুর্জোয়া নহে, বুর্জোয়াদের কর্মচারী বলে। হাজরা পর্য্যন্ত অন্তের প্রতি বুর্জোয়া শব্দ প্রয়োগ করিতেছে। ধর্মভেদ, বৃত্তি



ভেদ, ভাষাভেদ, সামাজিক শ্রেণীভেদ প্রভৃতি কোন কারণেই অবজ্ঞানুচক কোন শব্দ অস্ত্রের প্রতি প্রয়োগ করা কাহারও উচিত নয়। নির্মূলত মানুষ কেহ নাই, কোন নির্মূলত মানবসমষ্টিও নাই। যেমন কোন মানুষই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে অস্ত্র কোন মানুষের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবনধারণ করিতে পারে না, তেমনি কোন শ্রেণীর মানুষও অস্ত্রশ্রেণীনিরপেক্ষ অথচ সত্য উন্নত কৃষ্টিশীল জীবন ধারণ করিতে পারে না। কৃশিয়াতে কারখানার শ্রমিক এবং চাষীদের প্রাধান্য নামভঃ স্থাপিত হইয়াছে। অভিজাতদের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে। কৃশীয় মধ্যবিত্ত পুৰোঁআদিগকে নিশ্চিহ্ন বা বিতাড়িত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক কি কারখানার শ্রমিক ও ক্ষেতের চাষীরা প্রভু হইয়াছে? তাহা হয় নাই। তাহার কতকগুলি নেতার বা একজন নেতার অধীন হইয়াছে—অর্থাৎ একপ্রকার মুখ্যতন্ত্র (oligarchy) বা একনায়কত্ব (dictatorship) স্থাপিত হইয়াছে। তা ছাড়া, কৃশিয়ার কারখানার শ্রমিক ও ক্ষেতের কৃষকেরা অস্ত্রশ্রেণীনিরপেক্ষ হইতে পারে নাই। সেই দেশের নেতারা আমেরিকা হইতে অনেক হাাজার শিল্পী এবং কার্মানী হইতে অনেক ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞ আমদানী করিতে বাধ্য হন। কার্মান ইঞ্জিনিয়ার ও বিশেষজ্ঞদিগকে তাড়াইয়া দিবার পর ঐ ঐ শ্রেণীর ফরাসী লইতে হইয়াছে।

প্রবাসী, পৌষ, ১৩৪০.

### মিঃ জিন্নার আশ্পর্দা

নানা অজুহাতে মিঃ জিন্না তাঁহার দলের কামটি হইতে বক্তের মুসলমানদের অস্ত্রতম নেতা মৌলবী কজুল হকের নাম কাটিয়া দিয়াছেন। বাঙালী মুসলমানেরা অস্ত্র যে কোন প্রদেশের মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত মুক্তিজনী লোকও অনেক আছেন। অথচ তাঁহারা অস্ত্র প্রদেশের মুসলমানদের মুকামিয়ানা চান ও সহ করেন। তাহাতেই শেখোভদের ঔকত্য ও আশ্পর্দা বাড়ে।

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩।

### বিপ্লব

“বৈঁচে থাক বিপ্লব” “ইনকিলাব জিন্দাবাদ—” তানিতে বেশ খুব হুজুক হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে কত নরহত্যা, কত রক্তপাত, কত অস্ত্র হুকার্ধ্য জড়িত থাকে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। আজকাল ধর্মের দোহাই বেশী লোকে মানিতে চায় না। কিন্তু ভায় ও অস্ত্রায়ের মধ্যে প্রভেদ লুপ্ত হয় নাই। যাহা ভায়সম্মত নহে তাহা করিলে শীঘ্র বা বিলম্বে তাহার প্রতিক্রিয়া হইবেই। নরহত্যা ও রক্তপাত এক পক্ষ করিলে অস্ত্র পক্ষও সুযোগ পাইলে তাহা করিবে।

বিপ্লবও দু-রকমের হয়। ক্রালে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, বর্তমান শতাব্দীতে রাশিয়ার যে বিপ্লব হইয়াছে, তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ লোকদের বিপ্লব। অনেক নরহত্যা করিয়া তাহা ঘটাইতে হইয়াছে। রাশিয়ার হত্যার জের এখনও মিটে নাই। যে বিপ্লব রক্তপাত করিয়া ঘটান হইয়াছিল তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আরও রক্তপাত চলিতেছে।

অস্ত্রবিধ বিপ্লব সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রভু স্থাপনের জন্য বিপ্লব নহে, সংখ্যালঘু কতকগুলি লোকের প্রভু স্থাপন ও রক্ষার জন্য ইহা ঘটনা থাকে বা ঘটান হইয়া থাকে; যেমন ইটালীতে ফাসিষ্ট বিপ্লব, জার্মেনীতে নাৎসী বিপ্লব। স্পেনে সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রভু স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন যুদ্ধ চলিতেছে ইটালীর ফাসিষ্ট ও জার্মেনীর নাৎসী প্রভুদের মত সংখ্যালঘু এক শ্রেণীর প্রভু স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং সেইজন্য স্পেনের বিদ্রোহীরা ইটালীর ও জার্মেনীর সাহায্য পাইয়া আসিতেছে।

গুণ কারখানার শ্রমিকেরা ও তাহাদের মত লোকেরা রাষ্ট্রের নিরস্তা হইবে, কিংবা কারখানার শ্রমিক ও মাঠের চাষীরাই রাষ্ট্রে সর্বসর্বা হইবে, আর কোন শ্রেণীর লোক থাকিবে না, এ রকম রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা রাশিয়াতে বা অস্ত্র কোন দেশে এখনও কার্যে হয় নাই, আবার ইটালীর ফাসিষ্ট প্রভু বা জার্মেনীর

নাৎশী প্রভৃৎও নিয়োগ হইয়াছে মনে হয় না। রাশিয়ার বিপ্লবীদের ও কাল বার্কস্ প্রভৃতি বাহাদুরদের মতের অনুসরণ তাহারা করিয়াছে, তাহাদের আদর্শ শ্রেণী, বিহীন সমাজ (classless society)। সে আদর্শ রাশিয়াতেও বাস্তবে পরিণত হয় নাই।

বস্তুতঃ কোন শ্রেণীর লোককে বিনষ্ট বা দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া নিষ্কর করিয়া ফেলা বা এক শ্রেণীর লোককে প্রভু করিয়া অল্প সকলকে শাস্ত্রহীন ও পদানত করা ও রাখা, বাহারা সংখ্যায় বেশী তাহাদের মত ও কাজকেই বিনা বিচারে স্রাস্য বলিয়া মানিয়া লওয়া—এবিধ কোন পন্থা, আদর্শ বা মত গ্রহণীয় ও অনুসরণীয় নহে। কেমন করিয়া যে সামাজিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সমাজকে সুস্থ, জীবন্ত ও প্রগতিশীল রাখা যায়, তাহা বলা বড় কঠিন। যাহার প্রাণ আছে তাহা বরাবর ঠিক এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। জীবন্ত সমাজে পরিবর্তন অবশ্যতাবী। জীবন্ত রাষ্ট্রেও পরিবর্তন অবশ্যতাবী। রক্তপ্লুত বিপ্লবের পথে না গিয়া কেমন করিয়া একপ পরিবর্তন করা যাইতে পারে, তাহা নির্দেশ করা কঠিন—যদিও আদর্শ তাহাই হওয়া উচিত। ইউরোপে, কাজ, রাশিয়া, ইটালী, জার্মেনী...সমস্ত বলপ্রয়োগ দ্বারা পরিবর্তন সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, পরিবর্তন করিয়াছেও। কিন্তু কোথাও এখনও রক্তপাতের ঘের মিটে নাই। অল্প কয়েকটি দেশ প্রধানতঃ রক্তপাত ব্যতিরেকেই আধুনিক যুগে পরিবর্তন করিয়াছে—যেমন ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, বেলজিয়াম, ইংলও...—যদিও এমন কোন দেশ নাই যাহার ইতিহাসে কোন-না-কোন যুগে রক্তপাত সহকারে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। কিন্তু মাহুঘের ইতিহাসের গোড়ার দিকে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাকে আদর্শ মনে করা যাইতে পারে না। মাহুঘের ক্রমোন্নতি বাহনীর।

ইতিহাসের অনেক ভীষণ বিপ্লবের সহিত জড়াক্ষে বড় ভূমিকম্প প্রভৃৎপাত জলপ্রাবনের সাদৃশ্য আছে। জড়াক্ষে এই সকল উৎপাত বিনাশ করে অনেক কিছু। কিন্তু তাহারা বাহা বিনাশ করে তাহার মধ্যে আবর্জনা

ক্রেত যোগবীজ...অনেক থাকে। এবং বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সৃষ্টিও কিছু কিছু হয়। বহু বিপ্লব সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলা যায়।

প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৪।

### আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সংক্ষিপ্ত

সম্রাতি মেরিনীপুরে তথাকার সাহিত্য-পরিষদের উৎসব উপলক্ষ্যে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু ‘ঐতিহাসিক’ আলোচনা হইয়াছিল, দৈনিক কাগজে একরূপ দেখিয়াছি। বস্তুতঃ এই আধুনিক চিত্রকলার সূত্রপাত সম্বন্ধে লিখিতে বা বক্তৃতা করিতে গিয়া কেহই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে বাদ দিতে পারেন না। অতএব, তিনি ইহার উদ্ভব সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা আধুনিক ইণ্ডিয়ান আর্টের কোন তথ্যপ্রিয় ঐতিহাসিক কিংবা অ-বিশেষজ্ঞ বক্তা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। তিনি সন ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ‘শান্তিনিকেতন পত্রে’ লিখিয়াছিলেন, “বাংগলার কবি (রবীন্দ্রনাথ) আর্টের সূত্রপাত করেন, বাংলার আর্টিষ্ট (অবনীন্দ্রনাথ) সেই সূত্র ধরে একলা একলা কাজ করে চলো কতদিন—”। অবনীন্দ্রনাথের এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের সর্গাতিপুষ্টি উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ‘গোল্ডেন বুক অর টাগোর, নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় উদ্ধৃত হইয়া আছে।

‘প্রবাসী’ আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার কিঞ্চিৎ সেবা করিয়াছে। নূতন কিছু কেহ করিলে কাহাকেও না কাহাকেও তন্ময় কই উক্তি সহ করিতে হয়। ‘প্রবাসী’র সেবা অন্ততঃ এইটুকু, যে, সে তাহা সহ করিয়া অপর সকলকে সেই অপ্রিয় কর্তব্য পালনের দায় হইতে মুক্তি দিয়াছে। এই ব্যাপারটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবনি বর্ণিত হওয়া ভাল।

(এই সংখ্যার ১১ পৃষ্ঠার রামানন্দ প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্রষ্টব্য)

আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার উৎসাহদাতা বলিয়া বাহারা ভগিনী নিবেদিতার নাম করেন তাহারা ঠিকই করেন। তিনি শুধু ভারতবর্ষের নহে, অন্তান্ত দেশেরও

ললিতকলার মর্মজ ছিলেন। ভারতীয় চিত্রকলার নূতন পর্যায়ের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে ও মর্মজ হইতে সাহায্য করিবার নিমিত্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “মুর্খু শাহজাহান” প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ চিত্রের ব্যাখ্যা তিনি মডার্ন রিভিউতেই করিতেন। কারণ, এই সকল চিত্রের বহুবর্ণ প্রতিলিপি ইংরেজী মাসিক কাগজের মধ্যে একমাত্র উহাতেই ছাপা হইত (এবং এখনও উহাতেই হয়)। অতএব ভারতীয় চিত্রকলার সেবক বলিয়া এই ইংরেজী মাসিকেরও নাম করিলে সত্যের অপলাপ হয় না। ভগিনী নিবেদিতা মডার্ন রিভিউতে অজন্টা ওহাবলীর স্থাপত্য ও সম্বন্ধেও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৪৭।

### দেশভক্তি

দেশভক্তি। যিনি যে স্থানটিকে পবিত্র মনে করেন বা যেখানে ভগবানের পূজা করেন, সেই স্থানটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। হিন্দুর দেবমন্দির ও তপোবন, বৌদ্ধের চৈতর্য ও বিহার; খৃষ্টিয়ানদের গির্জা ও সমাধিস্থান, মুসলমানদের মসজিদ ও কবর, প্রভৃতি স্থান পরিষ্কার রাখা হয় অধিকন্তু ভগবতের স্মরণভরে নিকেতন-সমূহের মধ্যে অনেকগুলি এই জাতীয়।

আমরা আপনাদিগকে দেশভক্ত বলিয়া মনে করি। কিন্তু বজ্রের থানা, ডোবা, রাস্তা ঘাট, পচা পুকুর, পুতিগন্ধময় নর্দমা, আগাছা ও জঙ্গলপূর্ণ পতিত ভূমি দেখিলে কি মনে হয় যে আমরা দেশকে পবিত্র স্থান মনে করি? অরণ্যের গভীরতা ও সৌন্দর্য্য বিধান করিবার জন্য মানুষকে কোন চেষ্টা করিতে হয় না। পর্বতের ভীমকান্দশোভা মানুষের চোটার কোনও অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মানুষের বাস ও মানুষের হাত যেখানে আছে, সেখানকার চেহারা দেখিলেই বুঝা যায় যে, মানুষ নিজের জীবনকে ভগবানের লীলাক্ষেত্র মনে করিতেছে কি না।

দেশকে আমরা যে ভক্তি করি, পবিত্র মনে করি, তাহা এইজন্য যে, উহার তিত্তর দ্বারা ভগবানের দেহ,

দ্বারা আমাদেরকে পুষ্টি করে উহার প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে তিনি বিরাজিত। তবে উহাকে এমন হতভাগী করিয়া কেন রাখি?

মূলবাগানটির মতন স্মরণ সাধন পত্রী, নগর, দেশ যে পৃথিবীতে নাই, তাহা ত নয়।

যদিও অনেক লোককে অপরিষ্কার স্মৃতি থাকিতে এবং নিজ-গৃহ ও তৎপার্বত্য স্থানসমূহকে এরূপ অবস্থায় রাখিতে বাধ্য করে, দেখিয়াই ও শুনিয়াই। কিন্তু অনেকের সম্বল অবস্থা সত্ত্বেও এরূপ দশা দেখা যায়, আবার অনেক দরিদ্র ব্যক্তিও অপরিচ্ছন্নতা ও অস্বচ্ছন্দতা সহ করিতে পারে না। ইহা কিন্তু সত্য যে, দ্বিভুক্ত অপেক্ষা ধনীরা পক্ষে নিজ দেহের ও বাসভূমির পরিচ্ছন্নতা সাধন সহজসাধ্য।

আমরা গরীব কেন? ভারতবর্ষ বিদেশীর অতুল ঐর্ষ্যের কারণ, অথচ ভারতবাসী গরীব। ইহা কাহার দোষ?

আমরা দেশকে “জনকজননী-জননী”, “দেশমাতা” প্রভৃতি নামে আভিহিত করি; “বলেশমাতারম্” গান গাই; দেশবাসীকে ভাই বলিয়া রাখিবন্ধন করি; “ভাই ভাই এক ঠাই, ভেদ নাই, ভেদ নাই,” প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করি। তাহা হইলে কার্যভ্যন্তর: দেখান কর্তব্য। যে যাহারা চিরজীবন অর্দ্ধাশনে কাটায়, যাহারা অর্দ্ধনগ্ন ও চীর-পরিহিত, যাহাদের চালে খড় নাই, যাহাদের হুঁড়েঘরও নাই, যাহারা নিরক্ষর, যাহারা পাইক গোমস্তা পিঠাদা কনটেবল হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতরপদস্থ নানা জনের উৎপীড়ন সহ করে, যাহারা পীড়িত হইলে বিনা চিকিৎসায় বিনা যত্নে মারা পড়ে, যাহারা দুর্নীতি-প্রসূ হইয়া পুণ্ডর অধম জীবন যাপন করে, তাহারাও আমাদেরই দেশমাতার সন্তান।

কিন্তু সে ভাই কেমন ভাই যে কেবল আপনাদিগকে লইয়াই ব্যস্ত, মাতার অন্ত সন্তানদের কোন ধরন রাখে না।

প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২১।

# চাটর পাটি

চাক বন্দোপাধ্যায়

আমি পশ্চিমে চাকরি করি। বড়দিনের ছুটির আগে কয়েকদিনের ছুটি লইয়া আমি বাড়ী আসিতে-ছিলাম। ট্রেনে দেখিলাম বিষম ভিড়। দিল্লীর দরবার তখন সন্ত সমাপ্ত হইয়াছে, এবং কলিকাতার রাজসমাগম, কংগ্রেস, কনফারেন্স প্রভৃতি আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; শীতকালে কলিকাতায় আমোদ আহ্লাদ রঙ্গ ভাষাগারও আয়োজন থাকে প্রচুর—এবারে বিশেষভাবে গুণা দেড়েক সার্কাস, দুইদল সেন্সপীরর অভিনেতা, চার-চারটে বায়োফোন প্রভৃতি, দীপদীপের ধারে পতঙ্গের মতো, দর্শক আকর্ষণ করিতেছিল বিস্তর। অধিকন্তু এই সময়ে রেল কোম্পানী একবারের পার্যাণি কড়ি লইয়া ডবল থেরা পার করে বলিয়া দরকার না থাকিলেও অনেকে এক পাক ছুরিয়া আসার প্রলোভন সামলাইতে পারে না। স্ততঃ ভিড়েরও অবধি থাকে না। ট্রেনে বগি গাড়ী দিয়া কুলাইতে না পারিয়া রেল কোম্পানীর সেকেন্দ্রে বকেরা স্প্যান্ডি স্ক্র স্ক্র কামরা ভাগ-করা গাড়ী ছাড়িয়াও লোকের হান করা হুস হইয়া উঠিয়াছিল।

আমি অনেক কষ্টে একখানি শিক ঘেরা স্ক্র কামরার মধ্যে উঠিয়া কোনো মতে একটু হান করিয়া লইয়া-ছিলাম। সে কামরায় একজন পাঞ্জাবী বড় বড় বিহানার মোট ও বাস ভোরক বুড়ি প্রভৃতিতে উপরের বাস-ছটি বোকাই করিয়া বসিয়া ছিল—তাহার যেমন দেখ, তেমন দাড়ি এবং তেমন কি পাহাড়ীর আরতন। নীচের বোকেতে পাঁচজন পেশোয়ারী তাহাদের বিপুলারতন শরীর, চিলেচালা পোষাক ও শীতবস্ত্রের মোট লইয়া বিরাজমান। অপর সাতজনদের মধ্যে তিনজন বাঙালী, চারজন হিন্দুস্থানী। এই তেরজনের উপর আমি হইলাম চতুর্দশ। স্ততঃ আমি-বধন এই কামরার প্রবেশের হুন্ডেই করিতেছিলাম। তখন পাঞ্জাবীর গর্জন,

পেশোয়ারীর আশ্ফালন, হিন্দুস্থানীর বকবকানি ও বাঙালীর দাঁতখিঁচুনি যে কিরূপ ভীষণ প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিয়াছিল তাহা বলিয়া বুঝানো শক্ত।

আমি কাহাকেও কিছুমাত্র গ্রাহ না করিয়া বধন গাড়ীতে চড়িতে আসিলাম তখন দুইজন পেশোয়ারী দুই দিক হইতে গাড়ীর কপাট টানিয়া ধরিয়া গভীর হইয়া বসিয়া রহিল। আমি তৎক্ষণাৎ রণে ভঙ্গ দিবার ভান করিয়া সেখান হইতে একটু সারিয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, লক্ষ্যটা যেন আশেপাশের কামরার প্রতিই। তখন আমার সবক্ষে নিশ্চিন্ত হইয়া পেশোয়ারীরা সারিয়া বসিল। আর আমিও দরকার হাতল ঘুরাইয়া একেবারে গাড়ীর ভিতরে উঠিয়া গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

আমার আকস্মিক আবির্ভাবে আরোহীরা একবার কোলাহল করিয়া উঠিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল। স্ততঃ নীচই সজ্জি হইয়া গেল। আমি গাড়ীর দরজার কাছেই এক পেশোয়ারীর পাশে হান পাইলাম।

এতক্ষণ যে গাড়ীর দরজা ধরিয়া উত্তরপক্ষে গজ-কচ্ছপের মুকু চলিতেছিল তাহা যেন মিথ্যা, স্বপ্ন মাত্র—বাস্তবিক পক্ষে আমরা পূর্বম মিত্র, এমনি ভাবে সকলের সঙ্গে আলাপ ক্রিয়া উঠিল। আমাদের বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রায় সকলেই কলিকাতায় বাইবে; কেবল হিন্দুস্থানীরা নামিবে পাটনাও এবং পাঞ্জাবী নামিবে আসানসোলে।

গাড়ী নির্বিবাদে মোগলসরাই টেননে আসিয়া পৌঁছিল। একটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ধরনের লোক চাহরের উপর একখানি লাল বনাত গায়ে দিয়া, একটি ভারি পুঁটলি বগলে লইয়া প্রাটকর্মে ছুটাছুটি করিতেছিল। ব্রাহ্মণ যেখানে যার সেখান হইতেই বিতাড়িত হইয়া গিয়াছিল। সবর-বতই যার ব্রাহ্মণও ততই ব্যত

হইয়া কলের তাঁতের মাকুর মতন, দক্ষ খেলোয়াড়ের ব্যাটের মুখে লন্টেনিসের বলের মতন কেবলই এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে থাকে, কোথাও বেচারী একটু স্থিতি পাইতেছে না। অবশেষে ব্রাহ্মণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাদের কামরার সম্মুখে আসিয়া অতি মিনতির স্বরে বলিল—বাবা, একটু দরজাটা খুলে দাও বাবা।

আমি বললাম—ঠাকুরমশায়, দেখছেন আমরা চোদ্দ জন আছি; আর দেখছেন ত চোদ্দ জন নয়, চোদ্দ জোয়ান। আপনি অন্ত্র চেষ্টা দেখুন।

ব্রাহ্মণ বেড়া মাথায় টিকি নাড়িয়া বলিল—সব শালায় খোসামোদ করে এসেছি বাবা, কোনো বেটার যদি ব্রাহ্মণ বলে একটু ভক্তিপ্রদা হল। ঘোর কলি। ঘোর কলি। খুলে দাও বাবা।

আমি হাসিয়া বললাম—ঠাকুর মশায়, এ কামরার আরোহীদেরও যে ব্রাহ্মণের প্রতি খুব বেশী রকম ভক্তি-প্রদা আছে এরূপ সন্দেহ আপনি কেন করছেন? এই যে পেশোয়ারী কটি, এরা গোব্রাহ্মণহিতায় চ মোটেই নয়।

—তোমরা ত বাবা বাঙালী হিঁচু, ব্রাহ্মণপাণ্ডিতের উপকারটি কর বাবা।

একজন পেশোয়ারী ব্রাহ্মণের বোচকার খাফা দিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে বলিল—ভাগো ভাগো, ইঁহা পর জাগা কাঁহা?

ব্রাহ্মণ বোচকার ভাৱে টালিয়া পড়িয়া গেল। এবং ট্রেন ছাড়বার ঘন্টা পড়িল।

আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া নামিয়া একহাতে ব্রাহ্মণের বোচকা ও অপর হাতে ব্রাহ্মণকে ধরিয়া টানিয়া গাড়ীতে ছুলিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পেশোয়ারীরা কষ্ট হইয়া আমাকে ভৎসনা করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণ আমার মাথার টেড়িটিকে নাতানাবুদ করিয়া আমার আলীকর্দার করিতে লাগিল। আমি হাসিমুখে উভয় পক্ষেরই অত্যাচার গ্রহণ করিলাম।

আমার জায়গাটিতে আমি ব্রাহ্মণকে বসাইয়া নিজে

দাঁড়াইয়া রহিলাম। পেশোয়ারীরা কি জামি কেন আমার উপর ভারি খুসি হইয়া গিয়াছিল—তাহারা আমাকে তাহাদের কাপড়ের মোটের উপর বসিতে বলিল।

ইহার পর হইতে আমাদের কাছাকেও আর লোক তাড়াইবার কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। সে ভার লইয়াছিল সেই ঠাকুর মশায়। পশ্চিমে ভীর্ণ করিতে আসিয়া তাহার মেজাজটা এমনি রাখালা হইয়া গিয়াছিল যে হিন্দু ছাড়া সে আরকিছু বলিতে পারিতেন-ছিল না; তাহার হিন্দু নাগরী প্রচারিণী সভাকে বৃদ্ধাকূট দেখাইয়া নির্ভীক নিরঙ্কুশভাবেই নির্গত হইতেন। কেহ গাড়ীর নিকটবর্তী হইলেই ঠাকুর চিৎকার করিতেন, জায়গা নেই হায়! জায়গা নেই হায়! দেখতা নেই পনর আদমী হায়? আর কাঁহা বৈঠেগা? গা পর বৈঠেগা না মাথা পর বৈঠেগা?

আমি হাসিয়া বললাম, ঠাকুর মশায়, আপনি ত এই মাত্র গাড়ীতে ওঠবার জন্যে আকুল বিকুল করছিলেন। এখন গাড়ীতে উঠে সে কথাটা ভুলে গেলে চলবে কেন যে সকল যাত্রীরই গরজ সমান।

ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া নাকে খুব বড় এক টিপ্ নস্ত ভরিয়া বলিল—গরজ সমান হলে কি হয়। বসবে কোথা, জায়গা কৈ?

আমি হাসিয়া বললাম—আপনি যখন উঠছিলেন তখনও ত জায়গা ছিল না।

—আরে তার চেয়ে ত এখন আরো কমে গেছে।

—হ্যাঁ, কিন্তু সে বিচার আপনাদের আমার করা শোভা পায় না, কারণ আমরা ভরা গাড়ীতে উঠেছি। বিচারের ভার থাকা উচিত আগন্তুক আরোহীর ওপর। তারা যদি এত লোক দেখেও ওঠেন তবে বুঝতে হবে অন্ত্রও এই রকম অবস্থা।

ঠাকুর টিকি নাড়িয়া বলিল—হাঁঃ। তুমি হ্র বললে এই রকম অবস্থা। কিন্তু এর ওপর লোক বৃদ্ধি হলে আমাদের অবস্থাটা কি রকম হবে?

আমি নীরব হইয়া হাসিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণ খুব

বন বন নত লইতে লাগিল। শেষে বলিল—কাপীর নত আঁত উত্তম। নেবে ?

—আজ্ঞে না।—বলিয়া আমি ব্রাহ্মণের রকম দোঁধতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া গাড়ীওদ্ধ সকলেই স্নিগ্ধ-মুখে কৌতুক অহুতব করিতেছিল।

গাড়ী বজায়ে পৌঁছিলে একজন বাঙালী ভদ্রলোক একটা তোরণ ও একমোট বিহানা লইয়া আমাদের গাড়ী আক্রমণ করিলেন। ব্রাহ্মণ তটিকি নাড়িয়া একেবারে মারমুখো! আমি আগন্তুককে বলিলাম—আমরা এখানে পনেরজন আছি। অস্ত্র গাড়ীতে আপনি চেঁচা দেখলে ভালো হত।

—সব গাড়ীতেই এই রকম মশায়। আমি বেশী দূর যাব না, আমি মোকামাতে নেমে যাব।

—আজ্ঞা আছেন।—বলিয়া আমি দরজা খুলিয়া ধরিলাম।

ব্রাহ্মণ দরজা ধরিয়া বন্ধ করিবার জন্ত টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি জোর করিয়া খুলিয়া রাখিয়া হাসিতে হাসিতে ব্রাহ্মণকে বলিলাম—ঠাকুর মশায়, মোগলসরাইয়ে নিজের অবস্থাটা স্বরণ করুন।

ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি ত বড় পাজি লোক হে! আমার গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়েছ ত একেবারে মাথা কিনেছ আর কি? এ গাড়ী কি তোমার কেনা? কোম্পানীর গাড়ী। আমি পরসাদ দিয়ে চড়েছি। তবে অত কথা কও কেন হ্যাঁ?

আমি হাসিয়া বলিলাম—এ ভদ্রলোকও কোম্পানীকে পরসাদ দিয়ে এসেছেন, অমনি আসেননি আপনার দয়্য ভিড়ে করতে।

ব্রাহ্মণ অধিকতর জুঁক হইয়া বলিল—তুমি ত বড় বোলক হে। বত লোক পরসাদ দিয়েছে সব লোক এক গাড়ীতে আসবে নাকি?

আমি পূর্ববৎ হাসিয়াই বলিলাম—আজ্ঞে, সেটা আমার একটু ভুল হয়ে গেছে। এক গাড়ীতে যে সকলের ঠাই হয় না সে বোধটা মোগলসরাইয়ে হলেই ঠিক হত।

ব্রাহ্মণ পরাস্ত হইয়া বাগিয়া গনগন করিতে লাগিল।

আমার উপর ব্রাহ্মণের ক্রোধ দেখিয়া আর কেহই আমাকে কিছু বলিল না। কেবল একজন পেশোয়ারী হাসিয়া বলিল—বাবু, তুমি সবাইকেই যে নিমন্ত্রণ করে এই কামরাতে ভরছ।

আমি হাসিয়া বলিলাম—কি করি বল মিঞা সাহেব, সকলের যেতে হবে ত? আর পাটনায় এই ক'জন নেবে যাবে; এ ভদ্রলোকও মোকামায় নাওবেন; তখন পুর জারগী হয়ে যাবে। তখন আমাদেরই রাজ্য হবে।

ব্রাহ্মণ বলিল—হাঁ, তুমি সেই ধাতের লোক কিনা; বিষ বাংলার সকল লোককে ডেকে এই গাড়ীতে ভুলবে তখন।

চরম লোক বোঝাই হওয়াতে আর কোনো টেশনে কেহ আমাদের কামরার প্রতি দৃকপাতও করিল না। এখন নামিবার পালা।

পাটনাতে হিন্দুহানীরা নামিবার জন্ত উঠিল। ব্রাহ্মণ হুকার করিয়া বলিল—এই, আঁত নামতা কাহে, আঁত কেঙা লোক উঠেগা। বৈঠো বৈঠো।

আমি হাসিয়া বলিলাম—ঠাকুরমশায়, আপনার অহুরোধে কি ওরা গন্তব্যস্থান ছেড়ে আপনার বাড়ী পর্যন্ত নির্দিষ্টপথে পৌঁছে দেবার জন্তে হির হয়ে বলে থাকবে?

ব্রাহ্মণ বলিল—তুমি ত বড় ব্যস্তবাগীশ হে। লোককে ভোলবার জন্তেও যেমন তাড়াতাড়ি নামিবার জন্তেও তেমনি।

আমি হাসিয়া বলিলাম—একটু ব্যস্তবাগীশ না হলে যে ঠাকুরমশায়কে এখনো মোগলসরাই টেশনের কাকরের ওপর গড়াগড়ি দিতে হত।

হিন্দুহানীরা তাহাদের পোটলা পুটলি, লেপ, লোটা, লাঠি পোটো, নাগরী জুতা প্রভৃতি ঘাড়ে পিঠে হাতে বুলাইয়া লইয়া একে একে নামিতে লাগিল; কাহারো লোটা ভটাচার্যের নেড়া মাথায় ঠক ঠক করিয়া ঠুকিয়া গেল, কাহারো নাগরী জুতার নাল ব্রাহ্মণের দীর্ঘ নাসিকায় ঘসিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বলিয়া বলিয়া—উকরুক। ছাড়ুখোর কাহাকা। এই, সামালকে নামো।—ইত্যাদি বলিয়া গর্জন করিতে লাগিল।

মোকামার শেরাগত বাঙালীটি ভাঁহার বাস বিহানা লইয়া নামিয়া গেলেন। বাসর কোণ লাগিয়া ভট্টাচার্য্যের পুঁটুলিটিকে বেকি হইতে নীচে গড়াইয়া পড়িল এবং বোচকা বাঁধা কাপড়খানা একটু ছিড়িয়া গেল। আর যার কোথায়। ব্রাহ্মণ সপ্তমে চড়িয়া গালাগালি আরম্ভ করিল। রাগের শেষ ভালটা আসিয়া পড়িল আমার ঘাড়ে।—তোমার জন্তেই ত আমার এই কাপড় ছিড়িল। এর ভেতরে বাবা বিবেশ্বরের মূল বেলপাত আছে, এতে যে পাঠে কল তাতে কি তোমার ভাল হবে? উচ্ছন্ন যাবে, উচ্ছন্ন যাবে।—বলিয়া ব্রাহ্মণ ঘন ঘন হাত ও টিকি আন্দোলন করিতে লাগিল।

আমি হাসিয়া বলিলাম—ঠাকুরমশায়, কোনটুকলবে, গাড়ীতে গুঠার আশীর্বাদটা না এই অভিসম্পাতটা?

একজন বাঙালী সহযাত্রী দূরের কোণ হইতে বলিল—কোনটাই ফলবে না; হুটোতে কাটাকাটি হয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণ আন্দোলন করিয়া বলিতে লাগিল—ফলবে না? ফলবে না? সাক্ষাৎ বাবা বিবেশ্বরের টাটকা মূল বেলপাতের অপমান। উচ্ছন্ন যাবে। উচ্ছন্ন যাবে।

আমি গভীরভাবে জোড়হাত করিয়া বলিলাম—ঠাকুরমশায়, আপনার ঠিকানাটা দিবে যাবেন; আমি উচ্ছন্ন থেলে শ্রাকের নিমন্ত্রণটা আপনার কেন ফড়াবে; আপনানি অহুগ্রহ করে আমার শ্রাকের দিন পারের খুলো দিলে আমি পরলোকে গিয়ে কৃতার্থ হব।

গাড়ীর সকল বাঙালী আরোহীরা উচ্ছন্ন হইতে লাগিল। তাহাদের হাসি দেখিয়া পাঞ্জাবী পেশোয়ারী সকলেই হাসিল। হাসির সংক্রামিতা ক্রমশ শিকের কঁকে কঁকে কামরা হইতে কামরান্তরে হড়াইয়া পড়িল। তখন সকল কামরার আরোহীর নজর পড়িল সেই ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের দিকে।

ব্রাহ্মণ আমাকে রাগাইতে না পারিয়া এবং সকলের কোঁহুকপাজ হইয়া পোঁজ হইয়া বলিয়া নম্র লইতে মনঃসংযোগ করিল।

এখন হইতে সেই গাড়ী ঐশনে ধামে আর তথানি

ব্রাহ্মণ সুপ্র বিহৃত করিয়া আমার বলে, ডাক ডাক, সবাইকে ডাক, অনেক কায়গা রয়েছে, ডাক।

অভ্যন্তর কামরাও প্রায় খালি হইয়া আসিয়াছিল হুতরাং আমাদের কামরার মধ্যে মধ্যে অন্নদূরের যাত্রী দু-একজন ছাড়া আর বড় বেশী কেহ উঠিল না।

এইবার পাঞ্জাবীপ্রবরের নামিবার পালা। তাহার সেই বিপুলায়তন দেহ ও পাগড়ী লইয়া সে ক্রমে ক্রমে তাহার অতিকার বাস পেটরা মোটমার্টির নামাইতে লাগিল। মোটা মোটা বাসগুলি কি সহজে দরজা দিয়া কীশে? অনেক টানাটানি, অনেক ঠেলাঠেলি করিয়া এক-একটি পার হইতে লাগিল। আমি দরজার মুখের কাছে ছিলাম হুতরাং আমিই ধরিয়া মোটগুলি বাতির করিয়া দিওঁছিলাম। ব্রাহ্মণও দরজার কাছেই ছিল। কিন্তু সে হাত-পা গুটাইয়া বেকির উপর জগন্নাথের মতন বসিয়া অনবরত বকিয়া যাইতেছিল—যত সব লক্ষ্মীছাড়া এসে ছুটেছে। একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসবার জো নেই। আর এই এক ককরদালাল ছুটেছে, সকল তাতেই আছে। কার মোট নামল না-নামল তোর অত মাথা ব্যথা কেন রে বাপ।

পাঞ্জাবীর সমস্ত মোট নামাইবার পূর্বেই গাড়ী ছাড়িবার ঘন্টা দিল। তাড়াহড়া করিয়া সব মোট নামাইয়া পাঞ্জাবী যখন গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল তখন গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

এতক্ষণে ব্রাহ্মণ পা নামাইয়া সোজা হইয়া বসিল। পা নামাইয়া বেকির তলে পা চালাইয়া কিছুক্ষণ সে ইতস্ততঃ পদচালনা করিল। তারপর বুকিয়া সে কি খুঁজিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ঠাকুরমশায় কি খুঁজছেন?

ব্রাহ্মণ এক পায়ে চটি পরিয়া অপর নয়পদ উল্লে উঠাইয়া ব্যগ্রভাবে বলিল—আমার আর একপাটি চটি?

বেকির তল, মোটের নীচে, আশ পাশ সবত্র খুঁজিলাম, কোথাও চটির পাটি মিলিল না। বুঝিলাম, পাঞ্জাবীর মাল টানাটানি করিবার সময় চটির পাটি পড়িয়া চলে গিয়াছে।

আমি বিজ্ঞানী করলাম—ঠাকুর মশায়, আপনার চটির হুপাটিই ছিল ত ?

ব্রাহ্মণ ত ভেলে বেগনে জলিয়া আমার উপরে ধারা হইয়া মুখখিঁচাইয়া বলিল—না, হুপাটি থাকবে কেন ? আমি এক পায়ে চটি পরে বেড়াই। আমি কি একদানড়ে ডুত ? বৈদিক আহাঙ্গক কোথাকার।

আমি হাসিয়া বলিলাম—না না, আমি সে কথা বলিহিনে যে আপনি এক পায়ে চটি দ্বিগুণ বেড়ান। তবে এমনও হতে পারে যে তীর্থে লোকে এক-একটা বস্ত্র ত্যাগ করে আসে; আপনি একপাটি চটি ইচ্ছে বা অনিচ্ছে পাওয়া গুণ্ডার-পীড়াসীড়িতে ত্যাগ করে এসেছেন।

ব্রাহ্মণ টিকি উৎকিণ্ড করিয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিল—কী ! বৃত্তান, অব্যাহিক, বৈদিক ! তীর্থে অপমান !...আমি যদি ব্রাহ্মণ হই, যদি আমি জিগক্ষ্য করি...

আমি তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলাম—তবে ছুটি গোজায় যাও। কিন্তু ঠাকুরমশায় গোজায় যাওয়াটা কেমন তা জানা নেই। গোজা খেতে কিন্তু তাঁর মুখরোচক। আর কলিকালে ব্রাহ্মণের শাপে কেউ মরে না, ব্রাহ্মণের লাঠিতে সাপ থেকে মাহুদ পর্যন্ত মরে বটে।

ব্রাহ্মণ আমার সঙ্গে না পারিয়া গন গন করিতে করিতে পা হইতে চটির পাটি খুলিয়া লইয়া একদৃষ্টে দৌঁধিতে লাগিল, দৌঁধিতে দৌঁধিতে ক্রোধ তিরোহিত হইয়া দৃষ্টি হইতে বাৎসল্য করিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ হই হাতে চটির পাটিটিকে মুখের সামনে উঁচু করিয়া ধরিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল—আমার নতুন চটি। এই সব কপী আসবার আগে ঠনঠনে থেকে বেড় টাকার কিনেছি। আমার নতুন চটি।—

ব্রাহ্মণের ঘরে বেধনা মেশানো।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমার যেমন হাসি পাইতেন তেমনই দুঃখও হইতেন। আমি চারি-দিকের হাসির হাবুদার মধ্যে অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া

মুখভাব বদলন্তব রক্তাধ ও বিমর্ষ করিয়া বলিলাম—তাই ও ঠাকুরমশায়, আপনার নতুন চটির এক পাটি পড়ে গেল...

—পড়ে গেল। বলতে লজ্জা করে না, মিথ্যাবাদী পাবও। ছুই-ই ত ইচ্ছে করে, বদমায়েসী করে আমার চটির পাটি কেলে দিয়েছিল। নইলে আমার পয়সা দিয়ে কেনা, হকের ধন, অমান ধামধা পড়ে গেলেই হল।...আমার একেবারে আনকোরা নতুন চটি।—

ব্রাহ্মণের ঘর তিরকারের তীব্রতা হইতে চটির মেহে করুণাত্মক হইয়া আসিল এবং দৃষ্টি তাহার জালা জ্বলিয়া শীতল হইয়া গেল। সে হুই হাতে অবশিষ্ট পাটিটিকে জ্বলিয়া ধরিয়া একবার আশ্বালন করিয়া আমাকে বলে—ছুই ইচ্ছে করে বদমায়েসী করে কেলে দিয়েছিল। আমার চটির শোকে করুণাত্মক হইয়া বারংবার বলিতে থাকে—আমার নতুন চটি ! আমার নতুন চটি।

আমি অতি মিনতির ঘরে বলিলাম—ঠাকুর মশায়, আপনি যদি কিছু মনে না করেন ত আমি দাম দিচ্ছি, আপনি কলকাতা গিয়ে আর এক কোড়া নতুন চটি কিনে নেবেন। আপনার মত ব্রাহ্মণকে জুতো দান করলে আমার অক্ষয় পুণ্য হবে।

ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া নাসারক্ত হুলাইয়া টিকি নাড়িয়া বলিল—আ্যা, বেটা পাঁজি নছার হতভাষা বৈদিক অকালকুমাও। আমি তীর্থ করে কিবে যাবার পথে তাঁর দান প্রতিগ্রহ করে পতিত হই আর কি ? তেমন তোম মতলব বটে। নইলে আর ইচ্ছে করে আমার নতুন চটির পাটিতে কেলে দিস। আমার নতুন চটি।

ব্রাহ্মণকে আর অধিক বাঁচানো নির্দয়ের কার্য হইবে বলিয়া আমি চুপ করিয়া বলিয়া রহিলাম। ব্রাহ্মণ কিছু কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেন না। সে একবার এক পায়ে চটি পরিয়া বলে; আর একবার বা চটিপরা পা জ্বলিয়া দেখে; এক একবার বা পয়স আঁগ্রে হুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া চটির পাটি চোখের



সামনে জুলিয়া ককণ নেন্দ্রে দেখে; দেখিয়া দেখিয়া  
আবার নামাইয়া রাখে। থাকিয়া থাকিয়া এক-একবার  
আমার দিকে সজোব দৃষ্টিতে চাহে। কলিকাল বলিয়া  
রফা। নতুবা ব্রাহ্মণের যোবানলে আমি ভস্ম হইয়া  
যাইতাম; এক-একবার ব্রাহ্মণ অক্ষুট ক্রোধমিশ্র ককণ  
ঘরে বলে—আমার নতুন চটি। আমার আনকোরা  
চটি।

খানিকক্ষণ এইরূপ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ চটির  
পাটিটি চোখের সম্মুখে করিয়া দেখিতে দেখিতে বলিয়া  
উঠিল—বাক, এ একপাটি থেকেই বা কি হবে, এ পাটিও  
বাক!—

এই বলিয়াই শাড়ীর জানালা দিয়া চটির পাটিটি  
টান মাথিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। কিন্তু ফেলিয়া  
দিয়াই জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সতৃক নয়নে সেই  
চটির পাটিটিকে দেখিতে লাগিল। যখন আর দেখা গেল  
না তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ব্রাহ্মণ হুঃখ ও ক্রোধমিশ্র  
বিকৃত ঘরে আমাকে বলিল—কেমন? মনস্কামনা পূর্ণ  
হল ত?

আমি হাসিয়া বলিলাম—এ পাটি কেলে দ্বিঘে  
আপনি আর এমন বেশি কি করলেন। সঙ্গীহারা  
হয়েই ত বেচারী একেবারে নিরক্ষর হয়ে পড়েছিল;  
কারণ আপনি ত বলেইছেন এই একটু আগে যে, আপনি  
একানড়ে নন যে একপায়ে জুতো পরবেন।

ব্রাহ্মণ মুখ বিচাইয়া বলিল—হী হী, তাঁর আনন্দ  
ওয়েছে! বাক্যবাগীশ। কথার মুহূর্ত! বদমায়েস।  
পাজি! হতভাগা!—

ব্রাহ্মণের গালির ‘ট্রেন’ শেষ হইবার পূর্বে ট্রেন  
আগিয়া রাণীগঞ্জে থামিল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া  
প্রাটিকর্মে পারচারি করিতে করিতে দেখিলাম,  
ভট্টাচার্য্যের প্রথম পাটি চটি পাঞ্জাবীর মোটের টানে  
সরিয়া পড়িয়া গাড়ীর পাদানের নীচেরধাপে আটকাইয়া

আছে। আমি ইহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম—  
ঠাকুর মশায়, এই যে আপনার চটি এখানে আটকে  
আছে!—

এবং তারপর সেই চটির পাটিটিকে উদ্ধার করিয়া  
ভট্টাচার্য্যের হাতে দিলাম।

ভট্টাচার্য্য হাবাণো পুত্র ফিরিয়া পাওয়ার মতো  
বাঞ্ছা আছে সেই চটির পাটিটিকে হুই হাতে চাপিয়া  
ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল—দেখেছ  
একবার নষ্টামটে। চটির পাটিটে লুকিয়ে রেখে এতক্ষণ  
আমার সঙ্গে তামাসা করা। আমি তোমার বাপের বয়সী,  
আমার সঙ্গে তামাসা? ওয়ে হতভাগা পাজি। তামাসাই  
বদি করাইছিল তবে যখন আমি ও পাটিটে কেলে দিলাম,  
তখন আমার বারণ করিলেন কেন? আমি কেলে  
টেলে দিলাম, এখন এসে বলছেন, ঠাকুর মশায়,  
আপনার চটি। আমার একেবারে নেহাল করে দিলেন  
আর কি।

ভট্টাচার্য্যের চোখ হলহল করিতেছিল। তাকায়  
ভাব দেখিয়া আমার সঙ্গেই হইতেছিল, লোকলজ্জা  
অভয়ায় না হইলে ব্রাহ্মণ হয়ত হাবাধন চটির পাটিটিকে  
চুষন করিয়া অক্ষকলে নান করাইত।

ব্রাহ্মণ চটির পাটিটিকে দেখিয়া দেখিয়া আপনার  
পাশে বোঁকর উপর রাখিল। তারপর পোটলাটি  
কোলের উপর জুলিয়া আন্তে আন্তে খুলিয়া চটির  
পাটিটিকে পোটলায় বাঁধিয়া রাখিল। হয়ত তাকার  
মনের মধ্যে একটু আশা জাগিতেছিল যে, ফেলিয়া-  
দেওয়া পাটিটিও হয়ত এমনি করিয়া কোনো আশ্চর্য্য  
উপায়ে আমি কিংাইয়া দিতে পারিব। কিংবা পণ্ডিত  
লোকে এক রকম ভুল হবার করে না বলিয়াই হয়ত  
এ পাটিটিকে ব্রাহ্মণ আর ফেলিয়া দিতে পারিল না।

# বাংলা ভাষার সংস্কার

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

সময়টা যখন আমাদের ইংরেজী-বিদদের হাতে  
উপর ভাষি হইয়া বোলে (১) অর্থাৎ ভাষা কথায় যখন  
কোন কাজকর্ম না থাকে, তখনই ইংহারা কেহ কেহ  
বাঙ্গলা ভাষায় একটু সখের চর্চা করিয়া থাকেন। অবশ্য  
বড় বালাই। অবসরের ছিদ্ৰ পথেই যত শয়তান  
মাফুকের ঘাড়ে চাপে। কাজ না থাকিলে উপযুক্ত  
তাইপো খুড়ার গল্যাভার আয়োজন করেন; এবং কাজ  
নাই বলিয়াই অনেক সখের সাহিত্যিক ভাষার সংস্কারক  
সাহিত্য দাঁড়াইয়াছেন। কেহ বা বলিতেছেন বাংলা  
অক্ষরগুলির চেহারা বড় খারাপ; হয় উহাদিগকে রোমান  
হাচে ঢাল, নাহয় নাগরাই পেটা কর। কেহ বা  
বলিতেছেন হে অক্ষরের ঘাড় অক্ষর চড়িলে ছেলে-  
খেলার মত দেখায়; উহারা গভীর ভাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র  
দাঁড়াইয়া থাকুক। কেহ বা বাবান সংস্কার করিতে গিয়া  
অ-ভালির গাল টিপিয়া ও করিয়া দিতেছেন এবং বর্গীয়  
অনুনাঙ্গিককে আত্ম একটি বর্ণরূপে খাড়া করিতেছেন।  
ইহাতে ভাষা শিখিবার বা লিখিবার কোন প্রকার  
সাহায্য হইতেছে কি না লেখা ভাবিবার ইংহাদের  
অবকাশ নাই। যে খাতুর গুণে সংস্কারকেরা আপনায়  
ছাড়া পেরে কথা বিচার করিতে পারেন না এবং যে পথে  
দেবতায়াও বাইতে সাহস করেন না, সে পথে অগ্রসর  
হয়েন, সেই খাতুর ইংরেজি নাম brass। ১। বাসিয়া

বাদ দিলে বাদ বাকি ইংইরোপটা যতখানি, আমাদের  
ভারতবর্ষটা প্রায় তত বড়। এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন  
প্রাদেশিক ভাষা থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই  
নাই। কোন কোন সংস্কারক মনে করেন যে যদি আমরা  
সকলে মিলিয়া একরকম অক্ষর লিখি, তবে হয় ভাষাগুলি  
এক হইয়া যাইবে, না হয় ত নিদান পক্ষে আমরা  
পরস্পরে পরস্পরের ভাষা শিখিয়া ফেলিব। বাঙ্গলা এবং  
আসাম দেশের অক্ষর একইরূপ অথচ বাঙ্গালীরা  
আসামের ভাষা শিখিয়া ফেলে না কেন? ইংলণ্ডে কালে  
ইটালিতে এবং আরও অন্ত্র অন্ত্র দেশে একই রকমের  
অক্ষর প্রচলিত আছে বলিয়া কি ইংরেজেরা ফরাসী বা  
ইটালিয়ান শিখিয়া থাকে? দায়ে পড়িয়া না শিখিলে  
কিছা প্রাণের টানে না শিখিলে কেহই পেরে ভাষা  
শিখিতে পারে না; তাই ইংলণ্ডে অল্পসংখ্যক কয়েকজন  
শিক্ষিত লোক ভিন্ন ফরাসীভাষানিং লোক পাওয়া যায়  
না। ফরাসীদেশে অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া ইংরেজী  
জানা লোক বাহির করিতে হয়। অক্ষরের সামুদ্রিক  
ছাড়াও স্পেন পর্তুগালের ভাষা ইটালিয়ানের বড়  
কাছাকাছি; তথাও ত উহারা পরস্পরের ভাষা শিক্ষা করেন  
না। গাছারা প্রকৃতত্বের জন্ত বা অধিক বিভালাভের  
জন্ত অন্ত্র দেশের ভাষা শিক্ষা করিতে চান, অক্ষরের  
বাধা তাঁহাদের কাছে অতি দুচ্ছ। ভারতে যত প্রেক্ষীর  
অক্ষর প্রচলিত আছে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে একজন  
শিক্ষিত ব্যক্তি সেগুলি চিনিয়া ফেলিতে পারেন।  
ইইকারুদ্যাণ্ডে জার্মান ভাষা চলে, ফরাসী ভাষা চলে,

(১) এইরূপ অপূর্ণ বাঙ্গলা লিখিয়া আমিও ভাষা-  
সংস্কারক হইতে ইচ্ছা করি।

তবুও কিন্তু একতার বাধা নাই। মিলনের বাহা বর্ষা বাধা, অমরা তাহা ছর করিতে শিখি নাই; কেবল অবাস্তব কথা লইয়া সময় নষ্ট করিতে শিখিয়াছি।

বাহার্য অক্ষরের একতা সাধন করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের ঐতিহাসিক বিভা দেখিয়া ভিত্ত হইতে হয়। নাগারি নাকি আমাদের পূর্বকালের অক্ষর ছিল এবং সংস্কৃত ভাষার নাকি ঐগুলি লিখিবার অক্ষর ছিল। এই সকল কথা কহিতে বাহারা লজ্জাবোধ করেন না তাঁহাদের হুঁতলা অসীম। একদিকে দীনেশচন্দ্র সেনের মত পণ্ডিতেরা যুদ্ধদেবকে বাঙ্গলা অক্ষর শিখাইয়া দিতেছেন, অতীতকে আবার অপূর্ণ ঐতিহাসিকেরা বাঙ্গলা অক্ষরকে নাগারির বাজা বলিয়া এচার করিতেছেন। এই গেল এক শ্রেণীর সংস্কারকের কথা।

২। বর্ণপরিচয় করিয়া ফেলিতে পারিলেই যে একটি ভাষার সকল শব্দ উচ্চারণ করা যাইতে পারিবে একথা কোন তাকাত ভাষার সম্বন্ধে কদাচ খাটিতে পারে না। যেমন অক্ষর, তেমনি বানান আর তেমনি উচ্চারণ, এ ত্র্যাহসর্পগুণ ঘটাইয়া তোলা হুঁসাধ্য। সংস্কৃত নামে পরিচিত ভাষায় বর্ণগুলির বাঁধা উচ্চারণ দেখিতে পাই। এ-কার ও-কারের হ্রস্ব উচ্চারণ নাই, কুত্রাপি accent নাই, এ অসাড়তা কোন কথা কহিবার ভাষায় থাকিতে পারে না। ছান্দস বা বেদের ভাষায় ঐগুলি ছিল না; accent যোগে এ-কার ও-কারও অনেক স্থানে হ্রস্ব উচ্চারণ হইত। এবং তাব অল্পসারে কথায় accent পড়িত। আদ্র এবং তামিল ভাষায় প্রাচীনকালের স্বরবর্ণগুলি হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের ভিত্তি অধিক হইয়া পড়িয়াছে। হ্রস্ব এ, হ্রস্ব ও উচ্চারণের ব্যবহা করা হইয়াছে। যে ছান্দস জ্বাঝাড প্রাকৃত ভাষাকে বলিয়া থাকিয়া ‘সংস্কৃত’ নাম দেওয়া হইয়াছিল সে প্রাকৃত ভাষায় প্রাকৃত উচ্চারণই ছিল। লোকের সাধারণ ব্যবহারের ভাষা ছিল না বলিয়া অর্কাচীন যুগের সংস্কৃতে যে নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা কোন জীবন্ত ভাষায় চলিতে পারে না।

ঠিক উচ্চারণের মত করিয়া বানান করিব, এ কাজ কেবল হ্রস্ব তাই নয়। উহার কপহারী স্থিতি আর দিনেই হুঁতলাইয়া যায়। শব্দ যত ছোট হউক, যত সোজা

হউক, সাধারণে উচ্চারণে সর্বদাই উহার বিকৃতি হইতেই থাকিবে। এরূপ হলে যদি উচ্চারণের কোন একটা প্রাকৃতিক নিয়ম ধারিতে পারা যায়, তবে সেই নিয়মটি বলিয়া দিয়া শব্দ উচ্চারণের পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন শব্দ-তত্ত্ব লিখিয়াছিলেন, তখন আশা করিয়াছিলাম যে বিকৃত ভাবে বাঙ্গলা শব্দের উচ্চারণের নিয়মগুলি কেহ লিখিয়া ফেলিবেন। প্রবাসী পত্রে যখন এ প্রেষণার সমালোচনা করিয়াছিলাম, তখন ঐ বিষয়ে দু-চারটি কথা লিখিয়াছিলাম। ক-এ ও-কার দিয়া না লিখিলেও যখন প্রায় ও-কারান্ত করিয়া কলু পড়ি, বিশেষ্য হইলে মত কথাটি হসন্ত করিয়া উচ্চারণ করি এবং সদৃশ অর্থে ব্যবহার করিলে অক্ষর হুঁটিকে যত্ন যত্ন উচ্চারণ করিয়া প্রথম অক্ষরে অর্ধ ও-কার এবং শেষ অক্ষরে পূর্ণ ও-কার যোগ করি, তিফা লিখিলেও তিফে পড়ি, চুলা লিখিলেও চুলো পড়ি, তখন উচ্চারণের নিয়ম নির্দেশ করাই প্রয়োজন। উচ্চারণের মত করিয়া বানান করিলে কিছু কল হইবে না। আমাদের একাধের যে উচ্চারণ ইংরেজী at শব্দে আছে, ঐ উচ্চারণটি বাঙ্গলা দেশের বিশেষ উচ্চারণ। উচ্চারণের নিয়ম নির্দেশ না করিলে এক এবং এতদৃশ শব্দের ভিত্তি যত্ন যত্ন অক্ষর চাই। “কাল একটি কাল হলে বলিলা—পাত পাত ভাঙ খাইব” এ হলে একটি অক্ষরকে হসন্ত দিয়া এবং অল্প অক্ষরটিতে ও-কার যোগ করিয়া না লিখিলেও এক বানান দেখিয়া শব্দ উচ্চারণ করিতে গোলে পড়িতে হয় না; এবং যে নিয়মে উচ্চারণ যত্ন হইয়া যায় তাহাও ধারিতে পারা যায়। হুঁতলা হলে বাঙ্গলা বর্ণমালায় উচ্চারণ সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলিতেছি।—

অ—বাঙ্গলায় এই অক্ষরটির উচ্চারণ কতকটা ও বেশী। প্রাচীন পালিতে এবং মগধ দেশের প্রাকৃতে অনেকস্থলে ঠিক এবরূপ উচ্চারণ ছিল। আমরাই কেবল এখন সেই উচ্চারণের উত্তরাধিকারী আছি। সংস্কৃত ভাষা পড়িবার সময়ে উহাকে যে ভাবে উচ্চারণ

করিতে হয়, সে উচ্চারণ, আ স্বরের রূপ উচ্চারণ মাত্র। যদ্বারাষ্ট্র এবং ত্রাবিড় ভাষায় যে ভাবে উচ্চারিত হয় তাহাতে উহাকে আমাদের আ বলিলেই চলে। তেলুগু আমাদের আ দীর্ঘ না হইয়া বহু রূপ উচ্চারিত হইয়া থাকে। বৈদিক বা ছান্দস ভাষায় অনেকস্থলে অ-কারটির কিকিৎ ও-বোঁসা উচ্চারণ হইত, এবং সেই ঐতিহ্যই পালিতে উহার উচ্চারণ সংক্রমিত হইয়াছে। বৈদিক প্রাতিশাখ্যে (অথর্ব প্রাতিশাখ্য, ১—৩৬; বাজসনৈয় প্রাতিশাখ্য, ১—৭২) এবং পাণিনির শেষ সূত্রে অ-কারের ঐরূপ উচ্চারণের কথা আছে। উহার নাম “সংবৃত” বা চাপা উচ্চারণ।

আমরা দেখিতে পাই যে যেগুলি খাটি বাঙ্গলা শব্দ অথবা যেগুলি বহুকাল ধেকে বাঙ্গলায় ব্যবহৃত সে-সকল শব্দে অ-কারের সর্বত্রই সংবৃত উচ্চারণ। সংবৃত কথা হইলেও লক্ষ্য, কল্যা, অতি, গণ্য, হস্ত প্রভৃতি শব্দে সংবৃত বা বাঙ্গলা অ উচ্চারণ করিয়া থাকি। কিন্তু যেখানে কথাগুলি খাটি সংবৃত, কেবল কদাচিৎ মাহুষের নামকরণে বা অন্তরকম পোষাকি ব্যবহারে কথাগুলি ব্যবহার করি সেখানে পূর্ণ অ-কার উচ্চারণ করি। যথা—কমল, অক্ষর, অপূর্ণ প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছিলেন যে, র-কলা-বিশিষ্ট বর্ণের সহিত “অ” লিপ্ত থাকিলে তাহা “ও” হইয়া যায়। যথা ব্রজ, ভ্রম প্রভাপ ইত্যাদি। কিন্তু “অ” পরে থাকিলে হয় না। যথা—ক্রয়, এর ইত্যাদি। পাঠকেরা দেখিতে পাইতেছেন যে, এখানেও আমার পূর্বনির্দিষ্ট নিয়মই খাটিতেছে, নূতন সূত্রের প্রয়োজন হইতেছে না। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ব্যতিক্রম সূত্রটিও গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাহার প্রদর্শিত দৃষ্টান্তগুলি আমার সাধারণ সূত্রের মধ্যেই পড়িতেছে। কোন ব্যতিক্রম সূত্র না করিয়াই বুঝিতে পারি যে অক্ষর, অকুতোভয়, অখ্যাতি, অবৃত, প্রভৃতির অ-কার বাঙ্গলার বৃত উচ্চারিত হইবে না।

অনেকগুলি শব্দ আছে সেগুলি বিশেষ্য হইলে বৃত উচ্চারিত হয়। কিন্তু ক্রিয়াপদ বা বিশেষণ হইলে

যদ্বাত উচ্চারিত হইয়া থাকে, এবং কাজেই বাঙ্গলা অকারের-উচ্চারণ প্রবল হইয়া উঠে। প্রায়শঃই এইগুলি দুই অক্ষরের শব্দ। যেমন বল (শক্তি) এবং বল (যথা কণ্ঠ), মত (অভিপ্রায়) এবং মত (সদৃশ)। দুই অক্ষরের নিম্নলিখিত বিশেষণ শব্দগুলিতে অক্ষর বৃত্তর বৃত্তর উচ্চারিত হয়। যথা—ভাল, কাল ইত্যাদি। আলো শব্দটি লএ ও-কার দ্বারা লিপিত হয় বলিয়া কেহ কেহ ভাল বলিতেও ও-কার দ্বিতে চান। আলো কথাটি আলোক শব্দ হইতে। কাজেই উহাতে ও-কার আছে। কিন্তু অন্তগুলিতে ও-কার না দিলেও বাঙ্গলা নিয়মে ও-কার যোগ করিবার মত উচ্চারণ করিতে হইবে।

আ—আ-কার উচ্চারণ যে যে স্থলে এ-কার এবং যে যে স্থলে ও-কার হইয়া আসে রবীন্দ্র ঠাকুর শব্দতত্ত্বে তাহার স্পষ্ট দুইটি নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা লিখি পিঠা, চিড়া, কড়া, ভিড়া; কিন্তু উচ্চারণ করি পিঠে, চিঁড়ে, কত্রে এবং ভিঞ্চে। এবং লিখি চুলা, চুলা, চুমা, মুঠা, কিন্তু উচ্চারণ করি চুলো, চুলো, চুমো ও মুঠো। এরূপ স্থলে নিয়মটি ধরাই উচিত। উচ্চারণের মতন করিয়া বানান পরিবর্তন করা উচিত নয়।

বাঙ্গলার বৃত্ত অক্ষরগুলি যদি কৈবল্যলাভ করিয়া বৃত্ত হয়, হউক। কিন্তু কি প্রয়োজনে উহাদিগকে যুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইবে একবার জিজ্ঞাসা করিতে চাই। এখনও বৃত্ত অক্ষরগুলি তাহাদের প্রাচীনরূপে একটা ইতিহাস লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। লিখিতে পড়িতে কেহকোন ক্রেশ অসুভব করিতেছেন। তবে কি অন্ত উহার সঙ্গীনতা সুখ অসুভব করিবে? কেহ বলিতে পারেন যে, ছাপাখানায় কোন অসুবিধা ঘটে নাই বটে, কিন্তু যখন বাঙ্গলার অন্ত টাইপ লেখা বলের সৃষ্টি হইবে, তখন এই জটিল বানান রাখিলে কল গড়ার সুবিধা হইবে না। কল গড়ার যখন দরকার জন্মিবে, তখন যে কলটি গড়িবে সে ব্যবসায়ীদেরের অন্ত নূতন চেহারার অক্ষর সৃষ্টি করিতে পারে। প্রয়োজনের তাড়ায় অনেক পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন হয়। তখন যদি ক্রত লিখিবার নিয়মের অন্তরঙ্গ বানান গ্রহণ

কবিবার পক্ষে দশজনের প্রয়োজন হয়, তবে ধীরে ধীরে অক্ষরের চেহারা বদলাইয়া যাউক্বেই। ইচ্ছা কবি যে এমন দিন আসুক যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্ত বহু পরিমাণে বাজলা ভাষায় অনেক কথা লিখিতে হইবে। সে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কতাকৈও কোন প্রস্তাব করিতে হইবে না। আপনা আপনি সুবিধার খাতিরে অক্ষরগুলির চেহারা বদলাইয়া কেলিতে হইবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বাহা চলিবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার বাড়িলে তাহা আপনিই আদৃত হইবে। তখন কল গাড়িবার সময় দোখিয়া লইবে যে, উ-কার ঞ-কার প্রভৃতিও অক্ষরের নাচে না দিয়া পাশে দিলে অধিক সুবিধা হইবে কি না? আমরা যখন কল গাড়িতেছি না, তখন একটা বৃথা নুতন খাড়া করিয়া কল কি? শাহায়া

নুতনের প্রস্তাব করিতেছেন, তাঁহারা কোন কথা না বলিয়া যদি টাইপ লিখিবার কল কুটি করিয়া ফেলেন এবং সেই কলে যে অক্ষরের যে চেহারা দিলে লিখিবার সুবিধা হয় এবং খরচ সস্তা পড়ে, অক্ষর-গুলির সেই চেহারা দিয়া দেন, তাহা হইলে বাহ্যিক কল কিনিয়া লিখিবার প্রয়োজন, তাহারা নিচ্চরই সে কল কিনিবেন এবং নুতন চেহারার অক্ষরে কথা লিখিবেন। পরিবর্তনের যে সময়ে প্রয়োজন নাই, তখন অথবা কথা লইয়া সময়ক্ষেপ করিবার কিছু সুবিধা দেখিতে পাইতেছি না। মিছাই একটা নুতন কিছু কর বলিয়া সংস্কারক সাজিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩১৮।

## পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি

জ্যোতির্বিদ্যা ঠাকুর

১। কোন সময়ে পিতৃদেব সাহেবগণের গঙ্গাবক্ষে স্বর্গরায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। কোন বিষয়কর্ম উপলক্ষে সেই সময় তাঁহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। বজ্রার মধ্যে গিয়া দেখি, টেবিলের উপর দুই চারিখানা বঁাখান ফরাসী গ্রন্থ, আর একখানি ফরাসী-ইংরাজি অভিধান রহিয়াছে। ঐ গ্রন্থগুলি Victor Cousin-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “Le Vrai, le beau, le bien”—অর্থাৎ “সত্য, সুন্দর, মঙ্গল।” উহার ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহার এতই ভাল লাগিয়াছিল যে ফরাসী মূল-গ্রন্থ পড়িবার জন্ত তিনি উৎসুক হইয়াছিলেন। তাই তিনি কয়েক কপি বিলাত হইতে

আনাইয়াছিলেন। আমি যখন গেলাম, তখন তিনি ইংরাজি অনুবাদের সহিত মিলাইয়া অভিধানের সাহায্যে ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে যে অংশ বুঝিতে পারিতেছিলেন না, আমাকে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন, আমি অল্পবয়সে ফরাসী জানি। তাঁহার বার্ত্তক্যে এই অধ্যবসায় দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্ত আমার উৎসুক্য হইলেও সে সময়ে আমি পাঠ করিবার অবসর পাই নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, ঐ কীটকট গ্রন্থ বোলপুরের লাইব্রেরী হইতে আনাইয়া পাঠ করি ও অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। ..

২। একদিন আমাদের বাড়ীর পাঠশালার গুরু মহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া ভালপাতার ক, খ প্রভৃতি অক্ষরে দাগ বুলাইতেছিলাম। বোধ হয় আমার বয়স তখন ৫ বৎসর—সেই সময় পিতৃদেব আমাদের পাশ দিয়া যাইতে-ছিলেন। গুরুমহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমি দাঁড়াইলাম না। তিনি কিরিয়া আসিয়া, আমাকে দাঁড়াইতে বলিলেন। আদব-কায়দার প্রতি এমন তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

৩। তিনি সাহিত্যাহুরাগী ছিলেন।

আমার প্রণীত পুস্তকক্রম, সরোজিনী, অশ্রমভাটী নাটক প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যেকেরই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়া আমাকে পত্র লেখেন, সেই পত্রগুলি সম্বন্ধে রক্ষা করি নাই বলিয়া এখন হুঃখ হয়।

৪। তিনি প্রায়ই বাহিরে বাহিরে থাকিতেন। যখনই বাড়ী আসিতেন, তিনি আমাদেরকে নানা বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন। তাঁহার ভেতালার বাসবার ঘরে, দিন কতক তিনি আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদেরকে ধারাবাহিকরূপে মৌখিক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের সঙ্গে তাঁহার দুই-একজন বাহিরের শিল্পও উপস্থিত থাকিতেন। আমার সেবদাদা গণেশ ঠাকুরের কাজ করিতেন। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার সমস্ত কথা টুকিয়া লইতেন। তিনি এবিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেবদাদা কাগজ পেন্সিল লইয়া সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। কি ব্রাহ্মসমাজে, কি পারিবারিক উপাসনামণ্ডপে, যেখানেই পিতৃদেব বস্তুতা করিতেন বা উপদেশ দিতেন, তিনি বস্তুসমূহ সমস্ত তাহা অবিকল টুকিয়া লইতেন। পরে পরিষ্কার করিয়া লিখিতেন। এমন কি, পিতৃদেব ঘরে বসিয়া সহজ ভাবে বাক্যালাপ করিতেছেন, তাহাও তিনি টুকিতে ছাড়িতেন না। আমরা এখন পিতৃদেবের যে-সকল ব্যাখ্যান দেখিতে পাই, তাঁহার অধিকাংশ তাঁহারই পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল। সেবদাদার পূর্বে সেবদাদাও (১) এইরূপ পিতৃদেবের

বস্তুতা সকল টুকিয়া লইতেন। পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইলে, তিনি কোন কোন অংশ সংশোধন করিয়া দিতেন।

৫। আমাদের বাহ্য ও দৈহিক উন্নতির প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। কুস্তি শিখাইবার ভল্ল হীরা সিং নামক একজন শিখ পালোয়ানকে তিনি নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন। এই হীরা সিংহের নিকট এসিদ্ধ পালোয়ান অল্প গুরু শিখা করিতেন। আমাদের বাড়ীতে কুস্তির একটা আধড়া ছিল। আমি তখন শিশু ছিলাম। আমি ইহাতে যোগ দিই নাই। ভাইদের মধ্যে আমার সেবদাদা (৩হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ব্যায়াম চর্চায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রীতিমত পালোয়ান হইয়া উঠিয়াছিলেন। হীরা সিংহের নিকট তলোয়ার, গুণ্ডা, লাঠি সব রকমই শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাজালীর মধ্যে আমার সেবদাদা ও অল্প গুরু সেই সময়ে এই বিষয়ে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

পিতৃদেব যখন বাড়ী আসিতেন, তিনি আমাদের সকলকে লইয়া আহারে বসিতেন। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়, অন্ন ব্যঞ্জনের পর, শেষে চাপাটি ও সন্দেশ আসিত। বোধহয় পিতৃদেব মনে করিতেন, ভাতে যথেষ্ট দৈহিক পুষ্টি হয় না। আবার দিনকতক, কালী হইতে একজন হালুইকর আনাইয়াছিলেন, সেই হালুইকর রাজে নানাবিধ উৎকৃষ্ট নিম্নক ও মিষ্টায় প্রস্তুত করিত।

৬। পিতৃদেব যখন দেহাদুর্বে ছিলেন, আমি কোন বিষয়কর উপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি ৩সীতানাথ ঘোষের পত্র বাহির করিয়া বলিলেন, “বেচারি বড় কটে পড়েছে।” এই বলিয়া, সীতানাথকে ১০০ টাকা দিতে আমাকে অমুমাতি করিলেন। গুলিলাম সীতানাথবাবু এত টাকা পাইবেন বলিয়া আদৌ প্রত্যাশা করেন নাই। এইরূপ আরও দুই-একটি দৃষ্টান্ত আছে। পিতৃদেব যখন দান করিতেন, এইরূপেই সুতহস্তে দান করিতেন। এই প্রসঙ্গে ৩সীতানাথবাবুর কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি তাড়িৎ চিকিৎসার

জন্ত এক প্রকার নুতন বস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি কিছুদিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। হিন্দুর তাড়িৎজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ অনেকগুলি প্রবন্ধ তিনি পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

৭। কলিকাতার আমার বড়দিদিমার একখানা বাড়ী ছিল। দিদিমার এক পালিত কণ্ঠামাত্র ছিল। পিতৃদেব হাড়া তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী আর কেহই ছিল না। দিদিমার মৃত্যু হইলে সেই বাড়ীর বস আমার পিতৃদেবে আসিয়া বসিল। সেই বাড়ী দখল করিবার কথা উঠিল। আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সেই বাড়ীর উপর লোলুপ দৃষ্টি ছিল। বাড়ীটি বেশ বড়। মূল্য ২০।৩০ হাজারের কম হইবে না। কিন্তু পিতৃদেব ঐ বাড়ী দিদিমার পালিত কণ্ঠাকেই দান করিলেন। এইরূপ তাঁহার দয়া ও উদারতা ছিল।

৮। বিগত সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার অসুযোগ ছিল। আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ৮বিজু চক্রবর্তী আমাদের বাড়ীর বেতনভুক্ গায়ক ছিলেন। মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যার পর তিনি বিজুর গান শুনিতেন। মাসিক বেতন পাইলেও, গান শুনিবার পর প্রত্যেক বারে ২ টাকা করিয়া বিজুকে পারিতোষিক দিতেন। তিনি ভাল ভাল গায়ককে আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিতেন। তদ্ব্যতীত শ্রীমদ্রামাণ্ড্য বন্দ্যোপাধ্যায়, যহু ভট্ট, শান্তিপূরের প্রসিদ্ধ জমিদার মতি বাবুর ভ্রাতা রাজচন্দ্র বাবু—ইহাদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল ওস্তাদের হিন্দী গান ভাঙ্গিয়া আমরা অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছি। সর্বপ্রথমে মেঘদাশ বড়দাদা বিজুর গান ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। কিছুকাল পরে বড়দাদা মেঘদাশ ও আমি—আমরা নানা ওস্তাদের হিন্দী গান ভাঙ্গিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। বাহার বোদিন রচনা হইত, পিতৃদেব সেই রচিত গান সন্ধ্যার পর শুনিতেন। তাঁহার ভাল লাগিলে আমরা উৎসাহিত হইতাম। যখন আমি সঙ্গীতসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করি, সেখানে বিগত সঙ্গীতের চর্চা হইবে শুনিয়া তিনি ১০০০ টাকা ব্যয় করিতে আমাকে অনুরোধ করেন।

৯। প্রায়ই হুই-একজন বেডিক্যাল কলেজের ছাত্রকে আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিই। তাঁহার শিক্ষার ব্যয়ভার তিনি বহন করিতেন। তদ্ব্যতীত একজন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র...এখন ডাক্তার—আমাদের সাহিত্য কখন সাক্ষাৎ হইলেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। হুই-একজন বন্ধুর পুত্রকেও, কলিকাতার থাকিয়া বিভাগ্যে শিক্ষা করিবার জন্ত আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহারো জন্ত উত্তম বস্ত্র ও উত্তম আহাৰাদি ব্যবস্থা করিতেন।

১০। তিনি অত্যন্ত সময়নিষ্ঠ ছিলেন। তিনি যেখানে বসিতেন তাঁহার সমুখস্থ টিপারে একটা জেব-ঘড়ি খোলা থাকিত। তিনি ঘড়ি দেখিয়া ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে স্নান আহাৰাদি করিতেন। কখন তাহার ব্যতিক্রম হইত না। কেবল যখন কাহারও সঙ্গে ঈশ্বর প্রসঙ্গে কথা-বার্তা হইত, তখন সময়ের জ্ঞান থাকিত না। তাঁহার জীবনের ঘটনার ঈশ্বরের করুণার কত নিদর্শন পাইয়াছেন এক-একদিন আমাদের নিকট বর্ণনা করিতেন; বর্ণনা করিতে করিতে তিনি যেন একেবারে মাতিয়া উঠিতেন—তাঁহার মুখে উৎসাহ ও আনন্দের একটা স্বর্ণীয় প্রভা ফুটিয়া উঠিত। তখন আর কিছুই হ'ল থাকিত না। যখন হ'ল হইত, তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রস্থান করিতেন।

১১। তাঁহার 'রাশ-ভারী' ছিল। তিনি যখন বাড়ী থাকিতেন, তখন যেন বাড়ী 'প্রমগম' করিত। পাছে কোন কর্তব্যের ক্রটি হয়, চাকর-বাকর সকলেই সর্বদা সশঙ্ক থাকিত। সব কাজ ঠিক নিয়মে চলিত। তিনি কাহাকেও শাসন করিতেন না, অথচ সমস্ত কাজ সুশৃঙ্খল রূপে নির্বাহ হইত। তিনি যখন বাড়ী হইতে চলিয়া বাইতেন তখন চাকর-বাকরদিগের মন হইতে যেন একটা পাৰাণ-ভার নামিয়া যাইত। ইতিগান দিবারের লেখক কখনো পামার কখন কখন আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। পিতৃদেব বিদ্রোশে চলিয়া গেলে, পামার সাহেব বাড়ীর তাবান্ডর সূচ্য করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন :—“When the cat is away the mice will play.”

১২। আমাদের কাহারও কোন দোষক্রটি তাঁহার কর্মসৌচ্য হইলে তিনি পারিবারিক উপাসনার সময় উপাসনা মণ্ডপে সার্বজন উপদেশদ্বারা এমন ভাবে বলিতেন যে দোষী ব্যক্তি তাঁহার মর্ম উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হইত।

১৩। আমি যখন শিশু হিলাম, পিতৃদেব তাঁহার এক বহু বেদী-বাড়ির সহিত কখন কখন দাবা খেলিতেন। কিন্তু তাস খেলিতে কখন তাঁহাকে দোখ নাই।

১৪। পিতৃদেব জ্ঞানিকার পক্ষপাতী ছিলেন। আমার শৈশবকালে দোখিতাম, একজন তিলক কাটা বৈকণ্ঠী ঠাকুর আমাদেব অন্তঃপুরে শিক্ষা দিতে আসিতেন। তারপর মিস্ গোমিস্ প্রভৃতি বৃষ্টান মেয়েরা বাজালা শিখাইতে আসিতেন। “এইরূপে আমরা মুখ ঘুই মুখ ঘুই, তা দেখাইবার পূর্বে” (অর্থঃ মুখ দেখাইবার পূর্বে)—“একবার নাহি পার পুনর্বার লাগো, সাধ্যমত চেষ্টা কর পুনর্বার লাগো”—এই সকল বাক্য অভ্যাস করান হইত আমার মনে পড়ে। তার পর পণ্ডিত অমোঘানাথ পাকড়াশি আমাদেব অন্তঃপুরে শিক্ষা দিতেন। ইহাই বিত্ত শিক্ষা। যখন বেধন হুল প্রথম স্থাপিত হয়, তখন পিতৃদেব আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে ঐ হুলে ভর্তি করিয়া দেন।

১৫। পিতৃদেব আমাদেব সকলকেই একে একে ব্রাহ্মধর্মের শ্লোক পাঠ করিতে অভ্যাস করাইয়াছিলেন। হুয় দীর্ঘ রক্ষা করিয়া, বিত্ত উচ্চারণ সহকারে টানা-স্বরে আশাদিগকে শ্লোক পাঠ করাইতেন। এত অল্প বয়সে উপনিষদের গভীর তত্ত্ব-সকল বুঝিতে পারিব না বলিয়াই বোধ হয় তিনি শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা করিতেন না। তবে তখন হইতে ঐ সকল শ্লোক আমাদের মনিকট গরিষ্ঠ হইয়া থাকিলে, ভবিষ্যতে আমরা উহা হইতে উপকার লাভ করিতে পারিব, ইহাই বোধ হয় তাঁহার নোদুস্ত অভিপ্রায় ছিল। আমাদেব সমস্ত আমি ও আমার গুড়ুতত্ত্বজ্ঞাতা ৬ জনের নাম ঠাকুর—আমরা দুইজনে

প্রতিদিন প্রাতে তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম পাঠ করিতাম। কিছুকাল পরে, ৬৭মাদ্রাসার দায়ের পুস্তক তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম পাঠ শিক্ষা করিতে আসিতেন। পরে, ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষার জন্য আমাদেব বাড়ীর পুজার দালানে একটি ছোটখাট পাঠশালাও খোলা হয়। এই পাঠশালার বাহিরের চারি-পাঁচ জন বিদ্যালয়ের ছাত্রও ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা করিতে আসিত। পণ্ডিত অমোঘানাথ পাকড়াশি ব্রাহ্মধর্ম পাঠ করাইতেন, শ্লোকের ব্যাখ্যাও করিতেন। বীতিমত পরীক্ষাও হইত। আমার বাল্যবন্ধু, ৬ অক্ষরচন্দ্রে চৌধুরী (পরে হাইকোর্টের অ্যাটর্নী, “ভারতী”র সাহিত্য-সমালোচক, সুলেখক, মুকবি) পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব অধিকার করার পিতৃদেব একদা বাঁধান ব্রাহ্মধর্ম এর তাঁহাকে দ্বহস্তে পুরস্কার দেন। আমার দীক্ষার কিছুদিন পূর্বে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্ম শিক্ষা করিবার জন্য পিতৃদেব প্রতিদিন তাঁহার নিকট আমাকে পাঠাইয়া দিতেন। আমার উপনয়নের সময় পিতৃদেব বাড়ী ছিলেন না। আমার উপনয়ন প্রচলিত প্রথা-অনুসারেই হইয়াছিল। আমার দীক্ষা ব্রাহ্মধর্মের অমুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। আমার বোধ হয়, অমুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে ইহাই প্রথম অমুষ্ঠান।

১৬। একবার উত্তর-পশ্চিমাকালে খুব হুতিক হয়। সেই হুতিক উপলক্ষে আমি ব্রাহ্মসমাজে একটা সভা হয়। সেই সভায় পিতৃদেব বেদী হইতে বক্তৃতা করেন তাঁহা আমি কখন ভুলিব না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া লোকেরা এমন মুগ্ধ ও উত্তেজিত হইয়াছিল যে, বাহার কাছে বাহা কিছু ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই হুতিকের সাহায্যার্থে দান করিল। কেহ আতুল হইতে আট খুলিয়া দিল, কেহ ষড়্ ও ষড়্ চেন খুলিয়া দিল। আমার স্মরণ হয়, ৬ কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহুল্য উত্তরীয় বস্ত্র (বোধহয় শাল) তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন।



# অপমান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর হৃদয়গা দেশ, বাদ্যের করেছ অপমান,  
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ।

মানুষের অধিকারে  
বঞ্চিত করেছ যারে,

বাদ্যের সম্মুখে বেধে তবু কোলে দাও নাই স্থান,  
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে  
স্থণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে ।

বিধাতার ক্রুরহাথে  
হৃদয়কের দ্বারে বসে

ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান ।  
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥

তোমার আসন হতে খেদায় তাদের দিলে তৈলে  
সেখায় শক্তিরে তব নির্দাসন দিলে অবহেলে ।

চরণে দলিত হয়ে  
খুলায় সে যায় বয়ে,

সেই নিয়ে নেমে এস, নহিলে নাহি রে পরিজ্ঞাপ ।  
অপমানে হতে হবে আজ তোরে সবার সমান ॥

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধবে যে নীচে,  
পশ্চাতে বেধেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে ।

অজ্ঞানের অঙ্ককারে  
আড়ালে ঢাকিত যারে

তোমার মজল ঢাকি গাঁড়িছে সে ঘোর ব্যবধান ।  
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥

শতক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভঙ্গর,—  
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার ।

তবু নত করি আঁখি  
দেখিবারে পাও না কি

নেমেছে খুলার তলে হীন পতিতের গগনান ;  
অপমানে হতে হবে সেখা তোরে সবার সমান ॥

দেখিতে পাও না তুমি বৃত্ত্যবৃত্ত দাঁড়িয়েছে ঘরে,  
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহকারে ।

সবারে না যদি ডাঁক,  
এখনো সিরিয়া থাক,

আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ারে অভিমান—  
বৃত্ত্যমারের হবে তবে চিত্তান্তরে সবার সমান ॥

২০শে আষাঢ়, ১৩১৭ । প্রবাসী—শ্রাবণ, ১৩১৭

## স্বপ্ন

জিজ্ঞেসলাল রায়

সে গেছে আমার মর্দপটে  
হারার মত ভেসে ।

সে গেছে আমার হৃদয়ভটে  
চেউয়ের মত এসে ;

তারে নয়নভরে দেখেছিলাম,  
বুকের ভিতর বেধেছিলাম,

রক্ত দিয়ে ঘিরে ;

সুন্দের সিংহাসনে বসিয়েছিলাম  
সোনার স্বপ্নটিরে ।

সে এখন সেদিন এসেছিল  
আমার কুঁড়িগথে,

সে হৃদয়ের মত ভেসেছিল

আঁখির বিনোদিত :  
 তাকে বঁহাঝাঝি, বঁতন করে  
 আঁখির কঁঠর বতন করে,  
 নিরোহিলাম তবে ;  
 সেদিন ভরেছিল জীবন আমার  
 বসন্তকোঃসবে ।  
 সেদিন পুষ্পে পুষ্পে কুজতবন  
 উঠল আমার লেজ ;  
 সেদিন বোম্বাকিত করে পবন  
 উঠল বীণা বেজে ;  
 সুখে ক্ষয় আমার ভরে গেল  
 ভূবে গেল, মরে গেল  
 সন্ধ্যাসম মেঘে ;  
 যেন উঠলাম আমি জন্ম হতে  
 কন্যাস্তরে জেগে ।  
 যখন ময় আছি সুখের নীড়ে  
 যশ গেল টুটে ;  
 হটাৎ বীণার তারটি গেল ছিঁড়ে  
 আর্দ্রমানে উঠে ;  
 এখন বহি সন্ধ্যার গভীর তানে  
 বীণার সবে কবির পাশে  
 চেয়ে নিরবধি ;  
 সেই বসন্ত আমার সুগের ধূমে  
 একবার আসে যদি ।  
 'প্রবাসী'—বৈশাখ, ১৩১৫ ।

## মণি

(একটি শিশুর প্রতি)

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১

হে স্নানর ! বসন্ত, কোন্ বসন্ত-লোকে,  
 নাগিনী-অলকে,  
 হাণিয়া উজ্জল হাসি, হৃদয়ে চন্দ্রিকা-রাশি,  
 ছিল তোর নিখোঁষ স্বপ্নকে ?

কোন্ নীল অধরেতে, নীহারিকা-বালবেরেতে,  
 ছিল তুই লয় ?  
 উজলিয়া দ্বিতাবরী, সারা বিশ্ব আলো করি,  
 আগুন আনলে আহা আগুন নিময় ।  
 কোন্ নব অলকাতে বাসন্তী উবাতে,  
 ফুটেছিল তারার ? তখন তুলাতে ?  
 ২  
 তোরে হোরি, এ কি হোরি ? রজনী পার্শ্বতী,  
 বসন্তচুম্বণা ।  
 অঙ্গে অঙ্গে ফুল কোটে, অলি স্বকারিরা হোটে,  
 লীলাময়ী, লালিতগমনা ।  
 জিনি রক্ত পদ্মরাগ, তহুতে অশোক-রাগ,  
 যায় গিরিকস্তা,—  
 স্নানর পাশ-স্পর্শে, কাঁপিয়া রাতিয়া হর্ষে,  
 গিরি-অশোকের শাখা হইল সুখতা ?  
 জিনি সেই পদ্মরাগ, জিনি সে অশোক,  
 রে স্নানর ! তোর ঐ রজনী আলোক ।  
 ৩  
 হোরি ও চিকণ হাসি, অনিন্দ্য বদন  
 ও রে মনোহর ।  
 তেজি এ পাষাণ প্রাণ স্বকারি ললিত তান,  
 ছুটে মোর কবিতা-নিখর ।  
 দিবা নেজে হোরি আমি মোহিতে দিগ্গিরি কামী,  
 সাঁজিছে স্নানরী ।  
 টুকুরে হোরিয়া মুখ, পাইল অপূর্ণ সুখ ;  
 হল হল কোহিহুরে ভূবিল কবরী  
 সুরঙ্গাহানের সেই কোহিহুর মণি  
 জিনি তুই, ওরে মণি । লাবণ্যের খনি ।  
 ৪  
 তোরে হোরি রে স্নানর ! আমার এ প্রাণে  
 বাহিল মলয় ।  
 হিম ঋতু অবসান, কোঁকিল ধরিল গান ;  
 আকালিক বসন্ত উদয় ।  
 হোরিতেছি হুঃখী বক্ষ, পেয়েছে প্রিয়ার বক্ষ,  
 কিরিয়া হরবে

জায়াপতি কুতুহলে, হের দেখে গলে, গলে।  
চক্ৰকান্তমাণি গলে চক্ৰকা-পরশে।

অলকার অলঙ্কল চক্ৰকান্তমাণি  
জিনি ছুই, ওরে মাণি, লাংগেয়র ধনি।

কি বাহু জানিস কাহা? রে পরশমাণি,  
ও তোমার পরশে,  
হীনকাণ্ড লৌহনিভা, ধীরল কাকন-বিভা,  
ভাবপর মানস-সরসে।  
কোন অজানিত টানে টানিল আমার প্রাণে,  
অরকান্ত মাণি ?  
খুঁচিল কলুবজর, ব্যাধিহীন এ অন্তর,  
স্পর্শে তোমার, ওরে মোর চাক চিত্তমাণি।  
মুখ, কবিতা ছিল নয়ন মুদিয়া ;  
স্পর্শে তোমার হর্ষে ধনী উঠিল বসিয়া।

কোন সে বৈকুণ্ঠে ছিল, বিকুর উরসে  
কৌতুভ রতন ?  
তোমারে পেয়ে, ওরে মাণি পাইল নয়নমাণি  
আমার এ আঁখার নয়ন।  
এ কি আলোকের বজ্রা। চারিধারে ছুনি, পালা  
হীরক মোহন।  
খুঁচিল খুঁচিল জাস, টুটিল যারার কঁপ,  
এ কি। এ কি। এ কি হোঁচ অগুরু দর্শন !

এণ্ডি ব্রহ্মবনে আঁকা বাসিহে হলান,  
নীলকান্ত মাণি যোয়।—ব্রহ্মীচোরা ল্যাক।  
হলজায়াহ। এবাসী—মাঘ, ১৩.১।

## মেথর

সত্যোজ্ঞনাথ দত্ত।

কে বলে তোমায়ে, বহু, অস্পৃক্ত অর্চাচ ?  
অর্চিতা কিরিহে সধা তোমার পিহনে ;  
ভূমি আহ, গৃহবাসে তাই আছে ক্রটি,  
নাহিলে মাহুয বুঝি কিরে যেত বনে।  
শিশু-জ্ঞানে সেবা ভূমি করিতেহ সবে,  
খুঁচাইছ রাজিধিন সর্ব স্কন্ধ গ্রানি ;  
স্বপার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে,—  
হে বহু। ভূমিই একা মেনেছ সে বাণী।  
নির্ধিকারে আবর্জনা বহ অহর্নিশ,  
নির্ধিকার সধা ওচি ভূমি গজাজল।  
নীলকণ্ঠ করেহেন পৃথু ধীরে নির্ধিক ;  
আর ভূমি ? ভূমি তারে করেছ নির্ধল।  
এস বহু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—  
কল্যাণের কর্ম করি' লাহুনা সাহিতে।

এবাসী—আবণ, ১৩১৩।



# সাগর পারে

গীতা দেবী

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আমার বিবাহ হয় ২০শে সেপ্টেম্বর। আমার স্বামী তখন ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে বইয়ের ব্যবসা করতেন। ঐ দূরদেশে গিয়ে থর করতে হবে। সেইভাবেই সব জিনিষপত্র গোছগাছ করা হতে লাগল। কতক বস্ত্রালঙ্কার, বাসনপত্র এসব দেওয়া হল, আসবাব কিছু দেওয়া হল না কারণ রেঙ্গুন তখন কাঠের জিনিষের জন্য বিখ্যাত, সেখানে গিয়েই ওসব কেনা হবে ঠিক হল।

আমার মা তখন অত্যন্তই অসুস্থ। কাজেই মুমখাম করবার উপায় ছিল না। নিজেকে বড়ীতেই বিয়ে হল, লোকজন খাওয়ার না ডাকলে নয় তাঁদেরই ডাকা হল। বরের বাড়ী পূর্ববঙ্গে, কলকাতায় তাঁর আত্মীয়-স্বজন তখন বেশী ছিলেন না, কাজেই বরযাত্রীও তেমন কেউ আসবেন না মনে হয়েছিল। তবে আমার শশুর মশায় বিয়ের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। বরের বড়ুবাড়ব হু-চারজন এসেছিলেন।

বিবাহের আসরে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। তখন বিশেষ কোনো কাজে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। কর্তব্যান্ততার মধ্যেও বিয়ে এবং বউভাত হুদিনই এসেছিলেন তিনি। বিয়েতে গাম করেছিলেন আমার পরলোকগতা ভ্রাতৃজায়া শ্রীমতী অরুন্ধতী। রবীন্দ্রনাথ গানের প্রশংসা করেছিলেন।

বিবাহের পরদিন শশুরবাড়ী যাবার কথা। কলকাতায় তখন শশুরবাড়ী বলতে কিছু ছিল না। এক কুটুম্বের বাড়ীতেই গিয়ে উঠেছিলাম, ল্যান্সডাউন বোডে। এই বাড়ীতেই বউভাত হয় এবং এখান থেকেই আমার বাপের বাড়ী ফিরে যাই। সেখান থেকে রেঙ্গুন যাত্রা।

অত দূর দেশে মেরেকে পাঠিয়ে দিতে আমার বাবা

মনে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। সেখানে কেউ আত্মীয়-স্বজন ছিলেন না আমাদের। আমাদের মা অতি অসুস্থ হয়ে পড়ায়, বাবাই এককাল একাধারে মা আর বাবার কর্তব্য পালন করে যাচ্ছিলেন। অত্যন্ত সন্তানবৎসল ছিলেন তিনি। হেলেনবেলায় আমরা দুই বোন যখন স্কুলে ভর্তি হই, তখন আমাদের স্কুলে রেখে এসে বাবা সারা দিন মন খারাপ করে ছিলেন। এবার ত মেরেকে কত দূরে পাঠিয়ে দিতে হল, কখন আবার দেখতে পাবেন তার কোনো স্থিরতাও রইল না। আমি চলে যাবার পর বাবা একেবারে শয্যাগত হয়ে পড়েন। অনেকদিন ভুগে ছিলেন heart-এর অসুখে।

B. I. S. N.-এর জাহাজে করে বর্ষা যাওয়া হত তখন। প্রথম যে জাহাজটা করে যাই, সেটার নাম Aronda বোধ হয়। সে ত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগের কথা। এখনও ঐ জাহাজের লাইনটাই চালু আছে কি না জানি না। জিনিষপত্র নিয়ে আত্মীয়-স্বজন ও কিছু বন্ধু-বাড়ব সহকারে সকাল সকাল ত Outram Ghat-এ এসে উপস্থিত হলাম। তখনও জাহাজ হাড়তে কিছু দেরি ছিল। ঘাটের উপর-তলার বারান্দায় বসে গল্পসল্প করতে লাগলাম। আমার খুড়তুতো ভাই হেমন্ত কয়েকখানা হবিও তুলল। যাত্রী প্রচুর, সমস্ত জায়গাটা একে-বারে ছেয়ে গেছে স্ত্রী, পুরুষ, কাক্সা বাচ্চার। গোলমালে কান পাতা যায় না। অধিকাংশই খার্ড ক্লাসে ডেকের যাত্রী। তাদের সব দায়সারা গোছ বাহ্যপরীক্ষাও হচ্ছে মনে হল।

টীমারের শিঙা হঠাৎ ঘোরভাবে বেজে উঠল। খার্ড ক্লাসের যাত্রীর দলে মহা তাড়াহড়ো বেধে গেল। পুলিশের গুঁতো, থালাসীদের বাধা সব অগ্রাহ্য করে তারা জাহাজের সিঁড়ির দিকে ছুটল। বা বাঁকাখাকি,

পড়ে গিয়ে যে কেউ সলিল-সমাধি লাভ করল না সেই চের। পোর্টলা-পুর্টলি হুচারজনের খোওয়া গেল, কিন্তু সেদিকে কারো নজর আছে বলে মনে হল না।

খাড়াখাকিটা খানিকটা কমলে আমরা জিনিষপত্র নিয়ে উঠলাম। সিঁড়িটা মোটেই সুবিধার নয়, উঠতে একটু কষ্ট হল। এর আগে কখনও বড় ষ্টীমারে করে দূরে কোথাও যাইনি, তাই ভয় না করলেও একটু অসোয়াস্তি লাগছিল। সবাই মিলে sea sickness সম্বন্ধে এত সারধান করেছিল, যে, সে আনন্ডাটাও একেবারে যে ছিল না তা নয়। উপরের ডেক তখন একেবারে যাত্রীতে ঠাশা হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে দিয়েই এগোতে হল। যাত্রীরা সকলে ঠেলাঠেলি মারামারি করে নিজেকেই জন্তে একটু ভাল জায়গা দখল করতে ব্যস্ত। একটা মাহুর বা শতরঞ্জি কেলতে পারলেই নিশ্চিন্ত। যে পারবে তার সেখানে অথও রাজত্ব। হিন্দুস্থানী মহিলারা এ বিষয়ে খুব মজবুত। ঠেলাঠেলি এবং মারামারি করে তারা মোটা মোটা ভোজনপুত্রী ও পাজাবীকে হঠিয়ে দিয়ে ভাল জায়গা দখল করে বসছে। “ইয়ে হামারা এলাকা” বলে তারা বেরকম জোরের সঙ্গে চেপে বসছে, ততখানি জোর ঝাঁপালীরা রাগী লম্বীবাইও প্রকাশ করেছিলেন কি না সন্দেহ।

শামলা মাঝার, চোগা চাপকান পরা জাহাজের ‘বয়’-গুলি প্রবেশপথের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কেবিনের নম্বর দেখে নিয়ে তারা যাত্রীদের নিজের নিজের কোর্টরে পৌঁছে দিচ্ছে।

কেবিন দেখে তা আমার প্রায় চক্কর। এগুলি যে এত ছোট তা আমার ধারণা ছিল না। এর মধ্যে এত জিনিষপত্র নিয়ে তিন-চার দিন হুটো মাহুর থাকব কি করে? যেমন করেই হোক থাকতে ত হবে। তবে কোর্টরে ছোট হলেও বেশ তকতকে পরিষ্কার। বিহীনার চাদর, বালিশের ওয়াড়, তোয়ালে সবই ধোপার বাড়ীতে কাচা পাট-ভাঙা। জিনিষপত্র সব গুছিয়ে গাঁহিয়ে বেধে, bunk-এর ওপর গুঁজে দিয়ে দরতাকে

একটু কাঁকা করা গেল, মনে হল এখন নিঃশ্বাস নেওয়া যাবে। একটা port hole দিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখলাম। জাহাজের শিঙা তখনও ভৈরব নিনাদে বেজে চলেছে, এখনি ছাড়বে বোধ হয়। ডেকের উপর মহা ভিড়, সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁরর মাহুরদের সঙ্গে চীৎকার করে কথা বলছে। বেশীর ভাগেরই চোখ হলহল করছে। আবার কেউ বা হাসি-তামাসা দিয়ে আশ্রয় বিচ্ছেদের বেদনাকে চাপা দিচ্ছে। খালাসীরা চীৎকার করে সিঁড়ি তুলতে আরম্ভ করল। তাদের চীৎকার শোনবামাত্র যাত্রী ছাড়া আর যারা জাহাজে উঠেছিল, সবাই নেমে গেল। ষ্টীমারের লোহার দেহ হলে উঠল, বিরাট স্পন্দনের মত তার ভিতরে স্পন্দন হতে লাগল। ষ্টীমার ধীরে ধীরে তাঁর থেকে সরে যেতে লাগল। কেটির দোতলা থেকে আত্মীয়-বন্ধুর আর ডেকের উপর থেকে যাত্রীরা ক্রমশ উড়িয়ে বিদায় নিতে লাগলেন। বাচ্চাকাচ্চা অনেক কাঁদা জুড়ে দিল। জাহাজের স্পন্দন ক্রমশ থেকে ক্রমশ হতে লাগল, দেখতে দেখতে ষ্টীমার বেশ খানিকটা দূরে চলে গেল। তাঁরর লোকজন আর দেখা গেল না।

আমার ঘামী এর আগে কয়েক বার রেজুন থেকে যাওয়া আসা করেছেন, কাজেই এখানকার নিয়ম কানুন তাঁর খানিক জানা ছিল। এখানে কেবিনের যাত্রীরা অনেকে জাহাজের খানা খান, তবে তাতে গরু ও গুরোরের মাংসও থাকে বলে গাঁরা জাত রাখতে বেশী ব্যস্ত, তাঁরা এক বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সঙ্গে করে চাল ভাল ঘি তেল তাঁর ভরকারি সব নিয়ে যান, রান্নার বাসনও নিয়ে যান। জাহাজে ভাণ্ডারী নামক এক হিন্দু দোকানী থাকে। সে হিন্দু খালাসীদের জন্তও রাঁধে বোধহয়। তার হাতে যদি মেগে জুখে এই-সব চাল ভাল ভরকারি প্রভৃতি ডেকচিতে করে দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে খানিক বাদে রান্না করে এনে দেয়। ভালই রাঁধে তবে দারুণ ঝাল। আমরা সেই ব্যবস্থাই করলাম। এই রকম জাহাজের কেবিনে বলে আমাদের প্রথম লংসার আকর্ষণ হল।

জলযাত্রা আবার এই প্রথম। হান করা প্রভৃতি ব্যাপারে খানিকটা হবিবা পাবার জন্য জাহাজের বেতনকে (তার নাম “টোপাজ”) ডেকে আনা হল। তাকে বর্ণনা করল করে ব্যবস্থা করা হল যে, অল্প ব্যক্তিগত গিয়ে ব্যবসায় নোংরা করার আগে সে আমার হানের ব্যবস্থা করে দেবে। কাপড়চোপড় কাচার দরকার হলে সে-ই চালিয়ে দেবে।

হান সেবে এসে আবার port hole দিয়ে উঁকি মারলাম। এচও চেউ উঠছে, যেন লাক দিয়ে কোবনের মধ্যে এসে চুকতে চায়। জলের রংও অনেক গাঢ়তর নীল, প্রায় কালির মত। দূরে অতিদূরে তীরের অল্পট আভাস, তরুশ্রেণীর নীলাভ ছায়াবুড়ি। জাহাজের ‘প্রেশেলর’-এর শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

রাত্রি হয়ে এল খানিক পরে। চেহারা আর গন্ধ ভালই তবে বুধে নিয়ে প্রায় চোখের জল বোঁরিয়ে এল। একটা গোটা পাতিলেবু খরচ করে কিছুটা ষাওয়া গেল। জাহাজ-বাসের সময় আর যে সুখই হোক ষাওয়ার সুখ হবে না, সেটা বুধতেই পারলাম। চায়ের সঙ্গে কুচি মাখন প্রভৃতি যা এল, তাতেও বেশ জাপখালীনের গন্ধ।

চা খাবার পর কোবনের ‘বয়’ বাসন নিয়ে যেতে এল। বাসন ভুলে নিয়ে সে কোবন কাঁট দেওয়া, বিছানা ঠিক করা প্রভৃতি কাজ সারতে লাগল। আমি বসে বসে তার কাজ দেখতে লাগলাম। লোকটি হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “বাবু আপনার বাড়ী কোথায়?”

আমি ত অস্বাভূ। বাবু আমার কোথা থেকে কে এসে? যবে ত একমাত্র আমিই রয়েছি? আমারই দিকে সে হাঁ করে চেয়ে আছে দেখে, কোনোক্রমে হাসি চেপে বললাম, “কলকাতায়।”

‘বয়’ বলল, “আমি হামাস কলকাতার ছিলাম। খালা মুলুক। এ জাহাজে কাজ করে দেশের কথা ত এক রকম ভুলেই গৌছি। কথা কইবার লোকই মেলে না।”

আমি প্রশ্ন করলাম, “তোমার দেশ কোথায়?”

সে বলল, “চাটগাঁয়ে। কিন্তু বিশ বছর দেশে বাইরিন।”

কাজকর্ম সেবে ত দে চলে গেল। কোবনের সহযাত্রী কিংবে এলে দিচ্ছাসা করলাম, “ব্যাপার কি বলত? লোকটা আমাকে ‘বাবু’ বলে সম্বোধন করল কেন?”

উত্তরে শুনলাম যে, কোবনে যে-সব বঙ্গ ললনা গচ-রাচর যান, আমি ঠিক সে রকম নয়। তাই বেশী সম্মান দেখাবার জন্তেই হয়ত ‘বাবু’ বলেছে। অথবা মহিলাদের কি ভাবে সম্বোধন করা যায় সেটা বোধ হয় ভেবে পায় নি।

সারাটা দিন ঐ কয়েক ফিট লম্বা খুঁপীর মধ্যে বসে থাকা যায় না। বিকালের দিকে কাপড়চোপড় বদলে ডেক-এ বেড়াতে চললাম। কিন্তু ডেক-এ যা ভিড়, তার মধ্যে ঘুরে বেড়ান সহজ নয়। রেলিংএর ধারটা খানিকটা কাঁকা, কারণ ওখানে জলের ঝাপটা এসে লাগে, কাজেই যাত্রীরা ভিজে ঘাবার ভয়ে যতটা পারে সরে বসে। সেই খানটাতেই খানিকটা ঘোরা করা গেল। যাত্রীগুলিকে বেশ ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম, তারা ও আমাকে দেখতে কনুই করল না। পাজাবী কাবুলী, মারাঠী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, সব প্রদেশের মানুষ আছে। বাঙালী যাত্রীও অনেক রয়েছে। স্ত্রী পুরুষ আত্মবাক্সা সব গাদাগাদি করে কি রকম ভাবে যে রয়েছে, তা দেখলে ত্রুটারই অস্বস্তি লাগে, কিন্তু ওরা নিজেরা যে কিছু সেরকম অহুত্ব করছে তা মনে হল না। মেয়েরাও দিবিখা খাচ্ছে দাচ্ছে, গল্প করছে এবং ঐ সহস্র কোঁড়হালী দৃষ্টি সামনে শুয়ে পড়ে দিবিখা খুঁম লাগাচ্ছে। নিজেদের সব রকম জিনিষপত্র তাদের সঙ্গেই। মানুষ বা শতরঞ্জি বিছিয়ে তার চারদিকে সব প্যাটরা, বোঁচকা প্রভৃতি দিয়ে দেওয়াল বানিয়ে যে যার নিজের হুর্পের মধ্যে অচল হয়ে বসে আছে। হিন্দুহানীদের ভিতর কেউ বা স্নান করে তুলসীদাসের-সামান্য পড়ছে; কয়েকজন জাত ভাই বসে বসে জা শুনছে। কোথাও বা উড়ন্তাবাসী প্রকাণ্ড চিত্র বিচিত্র ‘বটুয়’ খুলে পান সাজতে ব্যস্ত। পান খাবার

উমেদারও আশে পাশে অনেক হাজির। মেয়েরা বেশীর ভাগই ছেলোপিলে সামলাচ্ছে, সাময়িক সংসারের তদারকি করছে। অল্প প্রদেশের মেয়েদের চেয়ে বাঙালীর মেয়েগুলি একটু বেশী জড়গড়, তবে সবাই নয়। এক বঙ্গমহিলা মশারি খাটিয়ে নিজের এলাকা সুচিহ্নিত ও সুরক্ষিত করেছেন, তবে তারই মধ্যে বসে বসে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান ধরেছেন, এতে স্তম্ভ যাত্রীরা খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন।

ডেকের এক কোণে ভাণ্ডারীর দোকান। এখানে পুরী ঝাল, ভরকারি, আটার হালুয়া খুব চড়া দরে বিক্রী হচ্ছে, ফলটলও কিছু আছে। হিন্দুস্থানী প্যাড়া ও বুটের মিঠাইও বর্তমান। তবে ভেদের কোলীয়া অবিসংবাদী হলেও তাদের বয়স সন্ধ্যাে সন্ধ্যাহান হয়ে বেশীর ভাগ যাত্রীই তাদের দিকে ঘেঁষছে না। কাবুলীরা সঙ্গে করে বিরাট কলের ও মেওয়ার কাঁকা নিয়ে এসেছে, বসে বসে সেগুলি সাজাচ্ছে। তামিল ক্রোরপতি চোটি হাঁটু অবধি ময়লা কাপড় এবং কাঁধে পাড় ওড়াল। গামছা নিয়ে নিজের দেশের লোকের সঙ্গে আলাপ করছে হাত মুখ নেড়ে। ইচ্ছা করলে এমন একখানা জাহাজ, হয়ত সে যত্নেই কিনতে পারে, কিন্তু চলেছে পনেরো টাকা ভাড়ায় ডেক প্যাসেঞ্জার হয়ে।

চট্ করেই যেন সন্ধ্যা হয়ে গেল, সূর্য অস্ত যাবার উপক্রম। মসীকক জলের উপর যেন ছোলিখেলা আরম্ভ হল। রংএ রংএ জলধির কালো বুক রঙীন করে দিয়ে সূর্য অস্তকর্ণের মধ্যেই টপ্ করে ডুবে গেল। হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এল, তার প্রভাবতা আর গর্জনও কিছু বাড়াল। দিক্ চক্রবালের এক দিকে সোনার খড়্গের মত তাঁদের দীপ্তি দেখা গেল। জাহাজের সব ক'টা আলো এক সঙ্গে জলে উঠল।

যাত্রীরা সব যথাসাধ্য চেঁলাঠেলি করে ডেকের বারখানটার তাল পাকাচ্ছে, বোলিংএর ধারে বড় বেশী হাওয়া। আপাদমস্তক কমল মুড়ি দিয়ে কেউ কেউ শুয়েও পড়ছে। এই সময় চং চং করে ডিনারের বট্টা

পড়ায় আমরা ডেক থেকে নেমে নিজেশ্বের কেবিনে চলে গেলাম। আটটার মধ্যে জাহাজের সব কাজকর্ম চুকিয়ে ফেলা নিয়ম, কাজেই খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে ফেলার দিকে মন দিলাম। দেখতে দেখতে জাহাজের সব কর্মব্যস্ততা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। চারদিক্ একেবারে চুপচাপ।

আমি চিরদিনই খুব ভোরে উঠি। ষ্টীমারেও তার ব্যতিক্রম হল না। মুখ হাত ধুয়ে আর খুপরীর মধ্যে বসে থাকতে ভাল লাগল না। আবার ডেকের উপরেই বেড়াতে চললাম। সেখানকার জগৎ তখন সুপ্তিমগ্ন। দু-একটি খালাসী এবার ওখার ঘোরাফেরা করছে, দু-একটি হিন্দুস্থানী যাত্রী উঠে বসে হাই তুলছে। ডেকের একটা কোণে যাত্রীর ভিড় কিছু কম, সেই-খান দিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীদের জল সংরক্ষিত ডেকে যাবার রাস্তা। সেখানটাতেই বেড়াবার সুবিধা।

যাত্রীরা ক্রমে ক্রমে জেগে উঠতে শুরু করল। বেহুয়া ভজন গাওয়া ও 'লোটা' মাজার ধুম পড়ে গেল। সকালেই আবার খালাসীরা একবার ডেক ধুয়ে দিয়ে যায়, কাজেই মেয়ে যাত্রীর দল বাচ্চাকাচ্চা সামলাচ্ছিল এবং যেসব জিনিষপত্র জল লেগে ভিজে যেতে পারে সেসব গুটিয়ে নিয়ে বাস প্যাটারের উপরে রাখছিল। খালাসীর হাতের ঝাঁটার জল খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, তাই তাড়াতাড়ি ডেকের উপর থেকে সরে পড়া গেল।

এ দিনটাও ঠিক আগের দিনের মত একই ভাবে একই ভালে কেটে গেল। মাঝে একবার একটু diversion ঘটল। একটা বট্টা বিকট রবে বাজতে লাগল। খালাসী, 'বয়' ও অফিসাররাও দোঁড়াদোঁড়ি করতে আরম্ভ করল। যাত্রীরা ত হতবুদ্ধি। তাদের সবাইকে যে যেমন অবস্থায় ছিল, কেবিন থেকে বার করে দিয়ে কেবিনে তাল দিয়ে দেওয়া হল। আবার অস্ত কর্ণের মধ্যেই ব্যাপারটা চুকে গেল। অফিসাররা life belt খুলে ফেলে নিজের নিজের কাজে চলে গেল। 'বয়'রা এসে কেবিনের তাল খুলে দিল, যাত্রীরা বার বার ঘরে চুকে বাঁচল। শুনলাম এই বকম alarm bell বাজিয়ে শুণ্ড শুণ্ড rehearsal অনেক সময়ই দেওয়া হয়।

তৃতীয় দিনটাও ঐ ভাবেই কাটল। এর পরদিন সকালে জাহাজ ব্রহ্মদেশের তীরে ভিড়বে। যাত্রীদের মধ্যে আজ একটু উৎসাহ দেখা গেল। তিনদিন খালি জল দেখে দেখে তারা হয়রান হয়ে পড়েছিল। তীর অবশ্য এখনও অনেক দূরে, তবু ডাডায় পা রাখার আশাতেই তারা খানিকটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সব দিকেই জিনিষপত্র গুছিয়ে ফেলার ব্যস্ততা দেখা যেতে লাগল।

জলের রং তমে বদলাতে লাগল। ঝকঝকে গাঢ় নীল কেমন শ্রাওলাগোলা সবুজ হয়ে এল। গুনলাম আমরা এখন Gulf of Martaban দিয়ে যাচ্ছি। এ নামটি হোটবেলায় ভূগোল পড়ার সময় প্রাণপণে মুখস্থ করেছি বটে, তবে সেটা সাপ কি ব্যাঙ তা তখন ভেবে দেখিনি।

আজ ষাওয়া দাওয়া সকলেই তাড়াতাড়ি চুকিয়ে বসল। পোর্টলা পু'টলি বেঁধে যাত্রীরাও তৈরি, এখন জাহাজটা তীরে ভিড়লেই হয়। সমুদ্র ছেড়ে সে এখন ইরাবতী নদীর ভিতর চুকে পড়েছে। 'বয়' 'টোপাজ' প্রভৃতি সবাই ধারে কাছে ঘোরাঘুরি আরম্ভ করল, প্রত্যেক যাত্রীর কাছ থেকে তারা বর্ণাশিশ নেবে। সে এক মহাপর্ল। যাই দাও, কিছুতেই তাদের খুশী করতে পারবে না। অনেক কষ্টে ও তাদের কাছ থেকে নিষ্ফাতি পাওয়া গেল।

কমে ব্রহ্মদেশের রাজধানী চোখের সীমানায় ধরা দিল। আমি নুতন বোঁ, প্রথম যাচ্ছি দামীর চাকরি হানে, কাজেই বেশ সেজেগুজে নামতে হল, কারণ নিশ্চয়ই জাহাজ ঘাটে আত্মীয়-বন্ধুরা আসবেন স্বাগত জানাতে। অতএব দামী রঙীন বেনারসী, ও গহনাগাটি পরেই জাহাজ থেকে নামতে হল।

জাহাজ ঘাট থেকেই রেজুনের বিখ্যাত শোরেডাগন প্যাপোডা দেখা যায়। চেয়ে দেখলাম গাছের সারের উপর দিয়ে সোনালী চূড়াটা ঝকঝক করে জলছে, ঠিক যেন শ্যামাক্ত নৃপতির মাথার সোনার মুকুট। রেজুন বন্দর দেখে কিন্তু বড়ই নিরাশ হতে হল। অতি কদর্য আর পঁঙ্কল চেহারা। এই নাকি বিলাসের লীলাভূমি,

নবীন ব্রহ্মদেশের প্রবেশদ্বার? ভাঙা কাঠের ঘর, টিনের ছাউনির সার, সরু লম্বা মুখোঁ 'শাম্পান' নৌকা, আর তার ময়লা কাপড় পরা চট্টগ্রামবাসী মাঝি, এই ত শুধু চোখে পড়ে। আশপাশের ঘরগুলির স্থাপত্য অভিনব, এইটুকুই বা। ইরাবতী নামটি যতই সুন্দর হোক জল ত কাঁদামাখা ঘোলা।

জাহাজ তীরে ভিড়তেই ছুতুল শব্দে সিঁড়ি নেমে পড়ল। এক দল কুলি জেটির থেকে এক দৌড়ে জাহাজে উঠে এল। তারপর সে যেন ডাকাত পড়ল কেবিনগুলির উপর। যাত্রীদের মোটামুটি নিয়ে সে কি কাড়াকাড়ি মারামারি। কুলিগুলি সবই মাত্রাজী, তাদের ভাষার এক অক্ষরও বোঝা গেল না। আশংকা যেন ঝড় বয়ে গেল, তারপর নিজেদের জিনিষপত্র নিয়ে কোনোমতে নেমে পড়া গেল।

ষ্টামারঘাটে অনেকগুলি মানুষই এসেছিলেন আমাদের অভ্যর্থনা করতে, কেউ আত্মীয়, কেউ কুটুম্ব, কেউ বা বন্ধু।

ঠিকাগাড়ী ডেকে, জিনিষপত্র নিয়ে আমি ও আমার নুতন সংসারে পদার্পণ করলাম। রেজুনের বাড়ী ঘর ঠিক আমাদের ভারতীয় ধরণের নয়। এরা কাঠ এবং কাঁচ খুব বেশী ব্যবহার করে, ইটপাথর ততটা নয়। আমি কিনেই একটা বড় চৌকোণা ঘর বানিয়ে ফেলে, তারপর ভিড়ের কাঠের পাটি'শন দিয়ে দিয়ে কামরা তৈরি করে। সামনে একটা বড় ঘর তারপরের জায়গাটা হুতাপে বিভক্ত, তাকে দুটো বেডরুম বলতে পার, বা একটা বেডরুম, একটা পিছনের রান্নাঘর ও বাথরুমে যাবার প্যাসেজ বলতে পারা যায়। সব পিছনের অংশ-টুকুও দুইভাগে বিভক্ত, একটি রান্নাঘর ও অল্পট বাথরুম। সব আধা পাটি'শন, একমাত্র বাথরুমটার পুরো পাটি'শন। আমাদের ভারতবর্ষীয় সংসারে এ হেন গৃহ-ব্যবস্থা খানিকটা বেআক ও নোংরা মনে হয়, এখানে কিন্তু ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে অনেকেই এই রকম বাড়ীতে থাকে। এক সার করে বাড়ীর পিছনে একটি করে 'কাঁচড়া গিল'(নোংরা ফেলার গিল) এই রকম ব্যবহার



সাধারণ, তবে অল্প প্যাটার্নের বাড়ীও কিছু কিছু আছে, সেগুলির মধ্যে হয়ত বিশেষ অল্পমাত্রা নিতে হয়।

সম্মতি দেখলাম যে, বাড়ীতে আমরা দুজনই শুধু এবং এক ভায়ে ও একজন ভৃত্য। ভৃত্যটির নাম গুনলাম 'ঐশ্বর্য'। অত বড় নাম ধরে ডাকা সুবিধার নয়, কাজেই আমরা ঠিক করলাম তাকে 'সূর্য্য' বলে ডাকা হবে। এই বাড়ীতেই আমার ভাণ্ডার এবং জা তাঁদের নবজাত পুত্রকে নিয়ে এসে থাকবেন গুনলাম, তবে তাঁদের আসতে তখনও কিছু দেরি ছিল। পাড়াটা চূপচাপ, বেশী গোলমাল নেই, তবে পাশেই একটা সিনেমা হাউস, তাতে রাজনা বাদে আর শব্দ কিছু আছে। অল্প দূরেই একটা বিশাল সরকারী বাড়ী আর তার চারদিকে বহু বিস্তৃত বাগান আর 'লন্'। ওটা বোধহয় Burma Secretariat-এর অফিস বাড়ী ছিল। এখানের রাস্তাগুলির অনেক নামই দেখলাম ইংরেজী, যেমন Spark Street, Merchant Phayre Street, ইত্যাদি। পথঘাট দিয়ে যারা চলেছে, তার ভিতর ভারতবর্ষীয় এত বেশী যে ব্রহ্মদেশে এটিকে ভারতীয় শহর বলে ভুল করা যায়। ব্রহ্মদেশীয় মানুষ আছে অবশ্য ধানিক ধানিক। বাড়ীঘরগুলির স্থাপত্য ও ঠিক ভারতবর্ষের মত নয়। একটা জিনিষ চোখে খুব স্পষ্ট লাগল, সেটা এখানকার মেয়েদের রঙীন সাজ। রেশম ছাড়া সূতি বেন তারা পরতেই জানে না, আর কি স্পষ্ট সব রং। রাস্তায় বেন ইলুভ খেলে যাচ্ছে। গহনাও সকলে হুচারটে পরেছে। নতুন ঘাঁচের সব খোপা, মেয়েগুলি সব যেন পাশী টুপী পরেছে। তাতে অনেকে আবার ফুলের কাপড়টা লাগিয়েছে। মুখে কি একটা শাদা পাউডারের মত মাখান, সেটার নাম গুনলাম 'তানাকা'। কি একটা কাঠ খসে চন্দন পঙ্কের মত করে মাখতে হয়। দেখে খালি রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ছিল। তিনি মেয়েদের রঙীন সাজের বড় পক্ষপাতী। শান্তিনিকেতনে যা চলেত আমাদের প্রায়ই বকতেন, শাদা কাপড় পরার জন্ত। ব্রহ্মদেশের এই মেয়েগুলিকে দেখে তিনি নিস্তর খুব খুশী হয়েছিলেন।

সেদিন খাওয়া দাওয়া ও দুমনো ছাড়া আর কিছু করা গেল না। চারদিক জাহাজের খুপখীতে কাটবে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। পরদিন থেকে নতুন দেশ দেখা শোনার ব্যাপার শুরু করব ঠিক করলাম।

একালে উঠে সামনের সড় কাঠের বাগানের দাঁড়িয়ে দেখলাম ফুলওয়ালী চ্যান্টা ফুলের ডালার করে নানা-রকম ফুল বেচতে বেরিয়েছে। নিজেও সেজেছে প্রায় ফুলের মত। ডেকে চলেছে "পা, পা" ফেরিওয়ালার কাজ সব প্রায় মেয়েরাই করে। দোকান বাজার টাকার অনেকটাই এদের হাতে। প্রমাকলে চারবাসের কাজেও এরা খুব খাটে। এদের সাধারণ শ্রেণীর পুরুষের দল কিছু প্রমিষমুখ। অনেকে বলে শুয়ে, আমোদ প্রমোদ করে দিন কাটাতেই বেশী ভালবাসে। কথায় কথায় মারামারি করতে, হোরা ছুরি মারতে খুব ওস্তাদ। এটাকে তারা খুব একটা গর্বের বিষয় মনে করে। এই শ্রেণীর একজন ব্রহ্মদেশীয় যুবককে গর্ভ করে করে বলতে শোনা গেল, "হাম্ চাটগাঁওওয়াল নাহি হয়। তিন দকে জেলমে গিয়া"। বাস্তবিক এখান প্রমাণ্য কাজকর্ম করতে যেসব পুরুষমানুষকে দেখলাম তারা প্রায় সবাই হয় ভারতীয়, নয় চীনা। রাস্তায় ঘাটে যানবাহনের মধ্যে সব চেয়ে চোখে বেশী পড়ে রিকশা, রেজুনে তাকে বলে 'লাকা'। বাহক সবই ভারতীয়। অভ্যস্ত সত্তায় এখান থেকে ওখানে নিয়ে যায় বলে সবাই সাধারণ লাক্ষ্য চড়ছে, পায়ে হাঁটতেই চায় না। চীনারা বাকি করে ছাড়ে কাঠের বাজার ফুলেরে খাবার বিক্রী করে বেড়াচ্ছে। কাঠের বাজার ভিতর টোড বসান, তার উপর গরম গরম খাবার। চীনা মুখে কিছুই বলছে না, হুটকরো বাঁশ নিয়ে খালি খট্ খট্ শব্দ করছে। এতেই সবাই বুঝবে কি খাবার। খাবারের বর্ণনা শুনে, আর তার জ্ঞান পেয়ে ভু আমাদের দেশের লোকের নাক কান চমকে যাবে, কিং ওখানের লোকের কাছে এসব খাবারের বেশ আদর। অতি স্নানকৃত সব মেয়ে পুরুষ রাস্তায় এই সব খাবার কিনছে, এবং সেখানে বলেই খেয়ে নিচ্ছে। মোংরা ফেলার কাঁচড়া গলিতেও দাঁড়িয়ে

বসে চৌত-বা জোলা উল্লু নিনে রাগা করে দেখতাম। এদিকে পরশে হয়ত সিক্কা সাটিনের সুড়ি, হাতে গলায় কানে সোনা ও রবীর গহনা। আমাদের দেশের পাচ্চিকারা পরবেন হয়ত ময়লা দাগধরা ছেঁড়া শাড়ী, তবে রান্নার জায়গায় গোবরজল ছড়াবেন বার দশেক। কোনটা করা উচিত সে বিষয়ে ত দ্বারক মতভেদ।

বেঙ্গুনের বাড়ীতে ত প্রথম সওয়া করলাম এক গোছা নীল ফুল। কয়েক পরশা দাম, দেখতে অতি সুন্দর, তবে গন্ধ কিছুই নেই। অনেকদিন টিকে থাকে, সহজে শুকায় না। এখানে আর-এক জাতের ফুলও দেখতাম, তাকে সবাই বলত “মেমিও ক্রাউয়ার।” একেবারে অমর পুষ্প, কিছুতেই শুকায় না। দেখতে কাগজের ফুলের মত, কিছু গন্ধও নেই, কিন্তু পরমায়ু একেবারে অসুরস্র। ব্রহ্মদেশে ফুলের ত খুবই আদর, কিন্তু ভাল জাতের অভিজাত ফুল যেগুলি, তা বিশেষ দেখতে পেতাম না। সবই বুনো ধরনের ফুল, রংএর ঘটা বেশ আছে।

পাশেই একটি সিনেমা হল। গাড়ীভাড়া করে যেতে হবে না, অতএব বিকালে চা টা খেয়ে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হওয়া গেল। কি ছবি যে দেখেছিলাম তা কিছু মনে নেই, তবে আট আনার বেশ ভদ্র গোছের ‘সেট’ পাওয়া গিয়েছিল, সেটা বেশ মনে আছে। এরপর থেকে যখনই আর কিছু করার থাকত না, তখনই গিয়ে সিনেমা হলে হাজির হতাম। সন্তাপ্তার দিন ছিল তখন।

এরপর বেঙ্গুনের দ্রষ্টব্য হানগুলি দেখবার পালা। সর্বশ্রেষ্ঠ তার মধ্যে ‘শোয়ে ডাগোন প্যাগোডা।’ এর চূড়া দেখা গিয়েছিল জাহাজে থাকতে থাকতেই। ব্রহ্মদেশ প্যাগোডারই দেশ, তার মধ্যে সব চেয়ে বড় আর সব চেয়ে বিখ্যাত এই প্যাগোডাটিই। এটা বেঙ্গুন নদর থেকে একটি দূরে অবস্থিত। বিরাট, ব্যাপার, দেখতে বেশ খানিক সময় লাগবে। সেই ভাবেই প্রস্তুত হয়ে বেরোন গেল। হু-চারজন সঙ্গে চললেন।

গাড়ীতে চলল। শুনেছিলাম বড় প্যাগোডা শহর বড়-খানিকটা দূরে, তবে কতদূরে তখন তা বুঝিনি।

চলেছি ত চলেছি। ক্রমে শহর ছাড়িয়ে গেল, নানা রকম বস্ত্র ছাড়িয়ে গেল, এখন শুধু খোলা মাঠ আর মধ্যে মধ্যে হুচারটে ঘর। শেষে ভয় হতে লাগল যে প্যাগোডার পথ ভুল করেছে কি না। তার কাছে সে কথাটা প্রকাশ করাতে সে এমন ভাবে ঠোট বাঁকাল যেন এমন অকৃত কথা সে জীবনেও শোনেনি।

গাড়ীটা এবার একটু উপর দিকে উঠছে বলে মনে হল। কাছে কোথাও গোরা পটনের ছাউনি আছে বোঝা গেল, কারণ খানিক রংএর পোশাক পরা হুচারটি মুর্ত্তি দেখলাম এদিক্ ওদিকে। চারিদিকে যন-সন্নিবিষ্ট গাছের সার, তাদের শ্রামলতা অতিক্রম করে এতক্ষণে প্যাগোডার চূড়াটা আমাদের দৃষ্টিপথে ফুটে উঠল। প্রকাণ্ড এক সিঁড়ির শ্রেণীর নীচে এসে আমাদের গাড়ী থামল। চারিদিকে গাড়ী ঘোড়া আর মানুষের মহাভিড়। নীচে সিঁড়িগুলির উপরে গৈরিক পোশাক পরা কয়েক জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী দাঁড়িয়ে আছেন। জুতো পায়ে দিয়ে মন্দিরের ভিতর কারো যাওয়া নিষেধ। চামড়ার কোনো জিনিসই নিয়ে যাওয়ার নিয়ম কেই। যাতে কোনো যাত্রী এই নিয়ম ভঙ্গ না করে, সেদিকে ঐরা দৃষ্টি রেখেছেন।

আমরা জুতো ইত্যাদি খুলে গাড়ীর ভিতর রেখে উপরে উঠতে আরম্ভ করলাম। প্রথম বড় বড় কয়েকটা সিঁড়ি অতিক্রম করে একটা ছোট চত্বরের মত। তারপর আবার সিঁড়ি। এ সিঁড়ির যেন আর শেষ নেই, উঠতে উঠতে পা ছিঁড়ে যাবার জোগাড়। আমার দিল্লীর কুতব মিনারের সিঁড়ির কথা মনে পড়ে গেল। এই সিঁড়ি গুলির উপরে ছাদ, হু পাশে ছোট ছোট থুণির ঘর, সেখানে হরেক রকমের দোকান সাজিয়ে বসেছে ব্রহ্মদেশীয়া রমণীর দল। জায়গাটা কিছু অস্বস্তিকর, তবে দোকানগুলিতে বাতিল আছে, ভক্তগণের বিভিন্ন রঙের পাখরের কাজ রুক্মকু করছে। বিকটমুণ্ডা বাঘ, সিংহ, মকর সব এদিক্ ওদিক্ খাবা পেতে বসে আছে। কত যুগ ধরেই এখানে তাদের বাস তবু এখনও রং অলো নষ্ট হয়নি, বা হাত পা কি লেজ ধসে যায়নি।

নানারকম জিনিষই এখানে বিক্রী হচ্ছে। মনি-হারীর দোকান অনেক, তার চেয়ে বেশী ফুল আর বাতির দোকান। বেচছেন ঝাড়া তাঁরা বেশীর ভাগই তরুণী, এবং খুবই অসম্মিত। যত রকম ভাষা তারা জানে সবের সাহায্যেই তারা যাত্রীদের ডাকাডাকি করছে, “এস ফুল, বাতি, কেনো, জুতো বেখে দাও, বসে বিশ্রাম কর।” ঝাড়া বৌদ্ধ তারা সকলেই ফুল ও মোমবাতি কিনছে, ঝাড়া বৌদ্ধ নয়, তারাও অনেকে কিনছে।

কত দেশের কত রকম পোশাক পরা মানুষ সিঁড়ি বেয়ে পাশাপাশি উঠছে, কত ভাষায় কিস্ কিস্ করে কথা বলছে, এর ভিতর বুদ্ধ-রক্ষা আছে, বুদ্ধ-সুবতী আছে, বালক বালিকা আছে। কিন্তু গোলমাল নেই, বাকবিতণ্ডা নেই। তীর্থের মর্যাদা রাখতে এরা জানে। হুয়ত হুয়য়ের ভক্তির অর্থ্যে তারা দীন, কিন্তু বাইরের ব্যবহারে প্রকার দৈন্ত নেই; ক্ষুদ্র শিশু, প্রগল্ভ বালক-বালিকা পর্যন্ত নীরবে চলেছে। সচল রামধনুর মত উজ্জ্বল নয়নাভিরাম রঙের স্রোত সিঁড়ি বেয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে সংসারভ্যাগীর গৈরিকও তার সঙ্গে মিশছে। কোথাও অপরিচ্ছন্নতা নেই। আমাদের তীর্থগুলি ত নোংরামীতে, চীৎকারে, কুৎসিত রোগপ্রসূ ভিখারীর উৎপাতে প্রায় নরকের চেহারা ধরে। প্যাগোডাতে এসে চোখ কান দুইই যেন জুড়িয়ে গেল।

সিঁড়িগুলি অবশেষে শেষ হল। আমরা প্রকাণ্ড একটা বীথান আঙিনার মত জায়গায় এসে হাজির হলাম। তার মাঝখানে প্রধান প্যাগোডাটি উন্নত বর্ণমাণ্ডিত চূড়া নিয়ে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। তার চার দিক্ ঘিরে ছোট ছোট মন্দির। এই মন্দিরগুলির ভিতর সবই প্রায় বুদ্ধমূর্তি। খেতপ্রস্তর-নির্মিত, সর্গোদ্রে বর্ণাভরণ, অপরোষ্ঠ তাম্বুলবিভূত, মাথায় বর্ণমুকুট। সংসার-ভ্যাগী সম্রাসী সিকার্কের মূর্তি এ নয়, এ রাজপুত্রেরই মূর্তি। চারিদিকের চাকচিক্য চোখকে তৃপ্ত করে বটে, তবে প্রকৃতভাৱে হৃদয় পূর্ণ হয় না, মাথা লুটিয়ে পড়ে না। কেবল রূপের হটা, রংএর ঘট। যাত্রীদল

নীরবে চলেছে, ফুল ও বাতির অর্থ্য বেখে নিন্দের নিভের পূজা শেষ করছে তারপর উঠে গিয়ে অস্ত্র এক মূর্তির সামনে অবনত হচ্ছে। সব চেয়ে বড় মূর্তিটির সামনে মাহুয়ের ভিড় লেগেই আছে, ফুলে ফুলে ভিড়-তল ঢেকে গিয়েছে। নানা রং বেরংএর কয়েক সার ছোট ছোট মোমবাতি মূর্তিটির সামনে নিরন্তর জলছে। অল্প বয়স্ক যাত্রীরা ছুতিন মিনিট দাঁড়িয়েই চলে যাচ্ছে, বুদ্ধবুদ্ধারা ঘটীর পর ঘটী স্তব্ব হয়ে বসেই আছে। একদিকে প্রকাণ্ড একটা ঘটী, কোনও কোনও যাত্রী সেখানে দাঁড়িয়ে সেটাকে হু-একবার বাজিয়েও যাচ্ছে। এদের ধারণা, যে মাহুয় যতবার এ ঘটী বাজাবে তাকে ততবার এই মন্দিরে আসতে হবে।

আঙিনাটি ঘিরেও হয় বৌদ্ধ মন্দির, নয় চিত্রশালা, নয় প্রাচীন ব্রহ্মদেশীয় মণিরত্ন তৈজস প্রভৃতির সংগ্রহ-শালা। ভক্তবৃন্দের প্রদত্ত বহুমূল্য সব উপহার এক জায়গায় রক্ষিত।

এত ঘোরাঘুরি করে বড়ই ক্লান্ত লাগছিল। ঠিক করলাম আজকের মত ফেরা যাক, আর-এক দিন এসে ভাল করে দেখা যাবে। বোরিয়ে গিয়ে ট্যাগ্লি গাড়ীর এক বিরাট্ ভিড়ের মধ্যে পড়লাম। সেগুলি সরে না গেলে ঘোড়ার গাড়ীর কাছ অবধি যাওয়াই যাবে না। কাকেই ধানিক অপেক্ষা করতে হল, তারপর বাড়ী ফিরলাম।

এরপর ঘরঘোর গোছান এবং দরকারি আসবাব ও জিনিষপত্র কেনাকাটার হুচারদিন গেল। কলকাতা থেকে আসার সময় কাঠের আসবাব কিছু আনিনি, ওনোহিলাম এখানে সস্তায় খুব ভাল জিনিষ পাওয়া যায়। কিছু কেনা গেল। জিনিষগুলো ভালই ছিল, বেশ সুন্দর দেখতে, তবে যখন ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে দেখে ফিরলাম তখন আর এগুলির কিছু সন্ধে করে আনতে পারি নি, সবই ওখানে কেলে বেখে এসেছিলাম। আর একদিন একটি tea set কিনেছিলাম যেন আছে, Whiteway Laidlaw-র দোকানে গিয়ে। সে ত প্রায় ৫০. রংসর আগের কথা, এখনও সেটার হু-

চারটে স্ট্রেট পড়ে আছে। ঠিক ঐ ধরনের জিনিষ আজকাল আর পাওয়া যায় না।

ভায়গা খুবই সীমাবদ্ধ, তবু পার্টিশনগুলি নেড়েচেড়ে সেগুলোকেই যথাসাধ্য সুবিভক্ত করা গেল। কারণ এই বাড়ীতেই আমার ভাণ্ডারও থাকবে। শুভলাল, তাঁর স্ত্রী শিশুপুত্রকে নিয়ে। বাচ্চার দেখাশোনা করার জন্য আর-একজন চাকরও থাকবে।

হুচারজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপও হল। আমার আগের পরিচিত মানুষও এখানে কয়েকজন ছিলেন। সমাজ পাড়ার আমাদের পাশের বাড়ীতেই থাকতেন পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। তাঁর মেজ মেয়ে জ্যোতির্ষরী বিয়ে করেছিলেন মহিভকুমার মুখোপাধ্যায়কে। ইনি তখন ছিলেন রেজুনের Bengal Academy-র অধ্যক্ষ। জ্যোতির্ষরীও ঐ স্কুলের মেয়েদের বিভাগের অধ্যক্ষা ছিলেন। তাঁদের নিমন্ত্রণে একদিন তাঁদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলাম। এতদিনে চেনা লোকের মুখ দেখে খুব ভাল লাগল। জ্যোতির্ষরী সাক্ষাৎ বরদোর, তাঁর স্কুলের মত, স্নানর হেলেমেয়ে হটিকে দেখেও খুব ভাল লাগল। অনেকক্ষণ বসে গল্পগাছা করে, খেয়ে দেয়ে বাড়ী ফিরলাম। ওঁরা তখন ঐ স্কুল বাড়ীটির উপর তলাতেই থাকতেন। আর-একজন কলকাতার চেনা মানুষও এখানে সংসার পেতেছিলেন। তাঁর সঙ্গেও কিছুদিন পরে দেখা হয়েছিল। তিনিও সমাজপাড়ার মেয়ে ঐতিলতা বসাক। ঐঁর বাবা কাশীচন্দ্র বোহাল ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক। ঐঁরও সমাজপাড়ার সাধন আশ্রমের বাড়ীতে থাকতেন। ঐতিলতা আমার চেয়ে কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন, ঐঁকে আমরা ডিলিদি বলে ডাকতাম। এর স্বামী বিজয়কুমার বসাক তখন রেজুনে এক কলেজে প্রিন্সিপালের কাজ নিয়ে এসেছিলেন। ঐঁরও তখন হেলেমেয়ে হয়েছে। ঐঁর বিভিন্ন বাড়ীতে অনেকবারই গিয়েছি, নানা উপলক্ষে।

আর-একজন চেনা মানুষ ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ঘোঁহিলী পারুল, আমাদের হেম মাসীয়ার ঘরে। ঐঁর স্বামী ছিলেন সুরেশ ঘোহন বন্দ্য,

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ভাগিনের। ইনি একদিন আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছিলেন। ওঁর স্বামী যদিও রেজুনে কোটেই practice করতেন (তিনি ব্যারিষ্টার ছিলেন) কিন্তু তাঁরা থাকতেন 'ইন্সলিন'-নামক রেজুনের নিকবর্তী একটি ছোট শহরে। আমিও একদিন গিয়ে-ছিলাম তাঁর বাড়ী 'ইন্সলিন'-এ। ব্রহ্মদেশে আমি যে সাত বছর ছিলাম, তাঁর ভিতর ঐ একদিনই আমি ট্রেনে চড়ে বেরিয়েছিলাম। কয়েক বছর থাকার পর সুরেশবাবু অসুস্থ হয়ে পড়ার তাঁরা ব্রহ্মদেশ ছেড়ে চলে যান।

আগে বাদের চিনতাম না, তাঁদের হুচারজনের সঙ্গেও তাঁদের পরিবারবর্গের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। তবে রেজুনে থাকাকালীন আমার সামাজিক জীবন বলে বেশী কিছু ছিল না। নিজে রোগ ভোগ করতাম এবং হেলেমেয়েরা রোগ ভোগ করত, এই নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হত যে মেলামেশা করা বা যাওয়া-আসা করা কার বাড়ীতে হয়েই উঠত না। আমার স্বামী একটা বইয়ের ব্যবসা চালাতেন, সেই সঙ্গে সংগ্রহীত হুচারজন ভদ্রলোক ও তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ঐঁদের নাম সরোজকুমার সেন, আশুতোষ মিত্র প্রভৃতি। খণ্ডরবাড়ীর আশ্রয় কুঠি কয়েকজনের সঙ্গে এখানে এসে আলাপ হয়েছিল। এর মধ্যে আমার বড় নন্দাই জিতেন্দ্রকুমার নাগ ও আশার স্বামীর মাসভুতো ভাই নীহারব্রজ পাল ছিলেন। আর একজন ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রীকে আমি এখনও গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। ঐঁর নাম জানব্রজ চৌধুরী। আমার গভীর হৃৎকের দিনে ঐঁরা যেরকম আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছিলেন, এমন অল্প লোকেই করে। ইনি পরলোক গমন করেছেন শুনেছি। তাঁর পরিবারবর্গ আছেন। একবার এক সভাতে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তবে তখন কথাবার্তা বেশী বলতে পারিনি। তারপর সংযোগ হারিয়ে ফেলি। যোগসূত্র রাখতে পারলে খুবই সুখী হতাম।

এছাড়া স্বামীর বন্ধুবান্ধব কিছু কিছু ছিল। ভায়গা নান্দ্রপ্রদেশের, নানা জাতিভাষী, নানা ধর্মাবলম্বী।

# অন্তবিহীন পথ

(উপভাস)

যমুনা নাগ

(পূর্ণপ্রকাশিতের পর)

এদিকে জয়তী কাকডালে অবিনাশের জন্য একটি উপহার নিয়ে এসেছে। তার হাতে বইখানা তুলে দিল—

‘একটা বই দিই তোমায়? আজকের দিনের জন্য আমার বিশেষ শুভেচ্ছা—এই লিখে দিলাম।

‘কিন্তু তুমি এখনই যেতে পারবে না’ অবিনাশ জোর দিয়ে লাগল।

‘মুঠু আজ খুবই ক্লান্ত, সাড়ে মটার গাড়ী আসলে করে যাবো।’ কথা শেষ করতে না করতেই টেলিফোন বজে উঠল। অবিনাশ উঠে গিয়ে ধরল। জয়তীকে ডেকে বলল, মুঠু একটু অসুস্থ বোধ করছে বলে ‘দগুস্ত’ থেকে টেলিফোন এসেছে—তাকে নীর ফিরে বসে হবে।

জয়তী এক মুহূর্ত না বলে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি নেমে গাড়ীতে গিয়ে উঠল—অবিনাশ বাধা দিল না। গাড়ী ব জোরে চালাতে আদেশ দিল।

বাড়ী এসে পৌঁছেই সে গাড়ী থেকে প্রায় লাক দিয়ে নেমে গেল, ভেতরে ঢুকে দেখে মুঠুর ঘরে খিল দওয়া। খুব ধাকা দিল বেশ কয়েকবার। দরজা লেতেই জয়তী দেখল মুঠু একেবারে মাতাল অবস্থায় লিচ্ছে—প্রায় উন্মাদের মত চেহারা। জয়তীর বুকের ভেতর প্রচণ্ড ধাকা লাগল। মুঠুর ঘরে ঢুকেই স দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মুঠুকে বুকের একটা ওয়ুথ দিয়ে দিল আর বলল—

‘ঘুমিয়ে পড়, তোমার শরীর অসুস্থ।’

মুঠু অবিনাশের বাড়ীর বিষয় কি একটা বলতে

চেষ্টা করছিল, কথা তার জড়িয়ে গেল, বোকা গেল না কিছু।

জয়তী বলল—‘অবিনাশের বাড়ী বন্ধুদের নেমস্তর আছে, তাই চলে এলাম।’ মুঠুর কাছে বসে জয়তী ধীরে ধীরে বলল—

‘এখন ভাল লাগছে তো?’ মুঠু ঘুমিয়ে পড়ল।

জয়তী বার বার বলা সত্বেও মুঠু একেবারেই তাকে অগ্রাহ করেছে, নিয়মিত মস্তপান শুরু করেছে আবার। অতিথিকে মদ খেতে দেওয়া ওজর মাত্র, সে নিজেই তার পুরাতন বদঅভ্যাস ডেকে আনছিল, কিন্তু জয়তীর মানা সে শুনতে রাজী নয়। জয়তীর মনে তাই একই প্রশ্ন ফিরে আসছিল—

‘আবার কেন মুঠু মদ ধরল?’

আজ আবার এই পুরাতন সমস্যা জয়তীর মন উতলা করে তুলেছে। এক অজানা ভয় তার মনকে পিষে পিষে ফেলাছিল। জয়তী মুঠুর এই হুগলভার কথা ভাল করেই জানত, পূর্বে বহুবার তাকে মাতাল অবস্থায় দেখেছে—কিন্তু তার স্বামী মাতাল বলে নিশ্চিত হবে? জয়তী কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। অসহ্য লাগল আজ তার। মুঠুকে স্তম্ভী করতেই চেয়েছিল—তাকে যথাযথ্য সবদিক দিয়ে সাহায্য করেছে, তবু কেন মুঠু মদ ছাড়তে পারে না?

মনে মনে বলতে লাগল—

‘আজ যেন পশুর মত দেখাচ্ছে মুঠুকে—আমি তো তাকে প্রভা করছি, আপন করতেই চেয়েছি—চিন্তায় মোত জয়তীকে উত্তোষিত করে তুলল, এক পলক ঘুম

এল না চোখে, হাত চারটে, তবু ঘুম নেই। মুকুট সজা হীন পুত্র মত পাশে পড়ে আছে—হুঃখে কষ্টে জর্জরিত হয়ে জরজী নিস্তেজ হয়ে পড়ল, আর জেগে থাকতে পারল না।

ঘণ্টা-হরেকের মধ্যেই উষার কিরণ চারিদিক আলোকিত করে তুলল—ছটা বাজাতেই পাখীর ডাক, গরুর ঘটা ও ঠেলাগাড়ীর ঘড়ঘড়ান শোনা গেল, বৃহু সমীরণ বইতে লাগল, প্রভাতের সৌন্দর্য চারিদিকে যেন আনন্দ এনে দিল—জয়তীর হুঃখপ্র ভরা হাত কোন রকমে কেটে গেল। কে তার হাত ধরল? জয়তী চীৎকার করে উঠল—কিসের বিভীষিকা?

‘কেমন আছে তুমি?’ মুকুট প্রশ্ন করল।

জয়তী চমকে উঠে বসল—মুকুটের হাতখানা সারিয়ে দিয়ে বলল ‘তুমি কেমন আছ?’ এ বিভীষিকা যে মিথ্যা নয় তাও জয়তী বুঝতে পারল, মুকুটের নেশার ঘোর তখনও কাটেনি, অসহ্য পরীক্ষার মধ্যে পড়ল জয়তী। মুকুটের উদ্ভাদ হৃতি জয়তীর মনে যে ছাপ রেখেছে সে কি ভোলা এতই সহজ? আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে জয়তী বুঝিয়ে দিল।

‘এখন ভোর হয়েছে—সকাল হয়েছে, চল বারান্দায় বসে চা খাই।’ মুকুট জয়তীর সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় চেয়ারে বসল। টেলিফোন ডীক্‌সরে বেজে উঠল।

টেলিফোন শুনে মুকুটের মাথা যেন বুদ্ধির মধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেল—অরতীকে সে বলল—‘বলে দাও হুপূরে খেতে আসতে—ওদের সঙ্গে কথা আছে। পাতিয়ালায় লোক ওরা—আসতে চায় দেখা করতে।’

‘একদিন ছেড়ে দাও না ওদের, বিশ্রাম কর মুকুট। আজ একটিও লোককে আসতে দেব না,—জয়তী জোর করতে লাগল।

মুকুট প্রায় চীৎকার করে উঠল, দৌড়ে এসে টেলিফোন কেড়ে নিয়ে বলল—‘আমার সঙ্গে হুপূরে থাকবেন আপনি’ বলেই টেলিফোন রেখে দিল।

‘কিছু বোঝ না তুমি জয়তী!’ বলে মুকুট আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

‘কাল রাতে উদ্ভাদ মাতাল হয়ে পড়েছিলে—এসে দেখি কি ভীষণ হৃতি, কি হুবহু—আত্মসন্ধান জানি কি কিছু আছে তোমার? আমারও মাথা নীচু।’ জয়তী লম্ট করে রাগ প্রকাশ করল। মুকুট উত্তর দিল—

‘মদ খাচ্ছি আবার, সাতা, কিন্তু ভাল তো লাগে না—বিশ্রাম করতেও ভুলে গেছি।’

‘কতদিন কাজ করতে পারবে এভাবে? রোজ মাতাল হলে আর কাজে মন দিতে পারবে না—বুঝতে চেষ্টা কর।’—জয়তী যতই বোকাবার চেষ্টা করছিল ততই নিজেকে বুঝতে পারছিল মুকুটের স্বভাব ক্রমশ বদলিয়ে যাচ্ছে, আর স্থিরতা নেই তার কিছুতেই। ছবি আঁকার মোহ কেটে গেছে, কিসের গিহনে সে ছুটছে?

‘কাল সাড়ে সাতটা থেকে কাজ শুরু করোই ন’টার সময় অসুস্থ লাগল তাই গাড়ী পাঠালাম তোমার নিয়ে আসতে। শরীর মোটেই ভাল লাগছে না জয়তী!’ মুকুট স্বীকার করল।

‘শরীরের দোষ কি? আজ খুলে তোমার কতগুলি কথা বলব—অপ্রিয় সত্য হলেও তোমার স্তন্যে হবে। তোমার চেহারা দেখে বোকা বায় যশের মোহ তোমার ভিলে ভিলে খেয়ে ফেলছে—তার সঙ্গে আমার জীবনের...’

মুকুট গলা চাড়িয়ে বলল—‘তোমার জীবন একটা বিশেষ নাট্যে পরিণত হয়েছে? একেবারেই নয়। তোমার জীবন অতি সত্য—এইভাবেই পৃষ্ঠপোষকদের পরণাপন্ন হতে হবে, তাদের সাহায্য ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। যে আতিথীদের আমি বাড়ীতে আদর করে নিয়ে আসি, বহুভাবে ব্যবহার করি, তাদের ওপরই আমার নির্ভর করতে হয়—শিল্পজগতের পরীক্ষা বা বল খেলা—এর মধ্যে তুমিও জড়িয়ে পড়েছ—নিজায় নেই তোমারও। তোমার জীবনই বা কিভাবে গড়ে উঠছে বল তো? শিল্পী বলে পরিচয় দিতে বেশ গর্ব বোধ কর তুমি। কাদের সহায়তার দ্বারা আজ

‘তুমি এইটুকু নাম করেছ ভেবে দেখো।’ শিল্পীর জীবনে নানা প্রেক্ষার লোকের আবির্ভাব হয়, সকলের সঙ্গে হস্ততা রাখতে পারলেই মঙ্গল। আমার তাই এতটা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। কাউকে তামিল্য করলে চলে না। আমি বিশ্বাস রাখি এদের ওপর। শিল্পের প্রগতির জন্য কাদের ওপর নির্ভর করতে হয়? যারা হাবি ভালবাসে, সৃষ্টি কাদের সমর্থকার। মূল্যবান হাবি ক্রয় করে অনেকে তা আবার বিদেশে বিক্রী করে দেয়, তাতেও খানিক নাম হয়। প্রদর্শনী দেখতে যায় এরাই।—এরাই তো আমার শিল্প হিতৈষী। এরা আলোচনা করে, সমালোচনা করে, প্রশংসা করে, নিন্দা করে কিন্তু, এরা উদাসীন নয়—এদের দরদ আছে শিল্পীদের প্রতি। তাদের সঙ্গে শক্ততা করার চাইতে বন্ধুত্ব রাখাই শ্রেয়। যদিও তারা বলে যে, আমার কাছে তারা মুগ্ধ, তবু আমিই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সর্গদা, উৎসাহী। তারা আমার চিত্রের উপাসক হতে পারে কিন্তু আমার উপাসক নাও হতে পারে। তোমার প্রদর্শনী এত সফল হয়েছিল কি করে? এই মুহূর্তেই শিল্পভক্ত হিতকর দর্শক তোমায় প্রেরণা দিয়েছিল, আজ তুমি তাদের ভুলতে চাও, তাদের কাছ থেকে পালাতে চাও, আমি একা আর কতদিক রক্ষা করব? তোমার সুনাম হওয়া মাত্র তুমি এদের ত্যাগ করেছ, আমিই বন্ধুত্ব রক্ষা করছি। তাদের মঙ্গলকামনা ও শুভেচ্ছাকে অগ্রাহ্য করতে চাই না। তুমি কর্তব্য করছ স্বীকার করি কিন্তু তোমার আন্তরিকতার কোন পরিচয় পাই না। তোমার মন লাড়া দেয় না বুঝতে পারি।’

জয়ন্তী মুকুটের স্পষ্ট কথাগুলি নীরবেই শুনে গেল যতবার সে কথা বলবার চেষ্টা করেছে ততবার মুকুট তাকে বাধা দিয়েছে—আজ মুকুট অনেক সভ্য কথা খুলে বলল—কিন্তু জয়ন্তী সব মেনে নিতে রাজী নয়। মুকুট থামল না—

‘এদের তোমায় আর ভাল লাগে না—এই ভিড় তোমার অসহ। তুমি এদের সঙ্গে পারবে না তাই আমি

একাই বুকু করি—অতি কঠিন মন এদের তবু প্রীতির বন্ধনে বেঁধে রাখি।’

‘আমায় যদি তোমার সুখহৃৎখের ভাগী করতে তাহলে সবই পারতাম—দিলে কোথায় সে অধিকার, পে দারিদ্র? আমার শক্তিকে শুধু দমন করে রেখেছ। তোমায় আশ্ব প্রসাদ বেড়ে উলছে—এই ভেবে যে তুমি আমার গড়ে তুলছ।’ জয়ন্তী আর চুপ থাকতে পারল না।

‘পারতে না তুমি এদের সঙ্গে জয়ন্তী! এরা কেউ সরল মাহুষ নয়—কুটিল জটিল প্রবন্ধকণ্ড আছে এদের মধ্যে, তুমি চিনবে না তাদের।’

‘আমি ঠিক পারতাম এদের সঙ্গে লড়তে। তুমি যদি উগ্রভ মাজাল হয়ে এদের সামলাতে পার, আমি পারব না কেন? আমি তো নেশাখোর নই।’

‘তুমি ভাবো তাই, তোমার নেশা নেই? তোমার ঐ রসিক উচ্ছ্বল দলটির সঙ্গে দেখা না হলে দিন কাটে না—ওরাই তোমার সঙ্গী—তোমার মনের খোরাক জোগায়। আমি গেল্লাসের আশায় থাকি আর তুমি ঐ নবীন দলের মুখ চেয়ে থাকো। শিল্পী নেশা খোজে—সে তার জীবনের বাস্তব সংগ্রাম থেকে প্রায়ই মুক্তি পেতে চায়—কর্ণকালের জন্য সে সত্যকে ভুলে যেতে চায় জয়ন্তী। আমি যাদের মধ্যে থাকি তুমি তাদের ভাল করে জান না, আমি তোমায় আমার ডানার আড়ালে রেখেছি—ঐ সমালোচক-সমাজের কাছ থেকে দূরিয়ে রেখেছি, রক্ষা করেছি, তাই তুমি অনেক কিছু জানতে পারনি। প্রত্যেকটি প্রদর্শনীর পছাতে, সুনাম সুখ্যাতির অন্তরালে, প্রতিযোগিতা ও সাক্ষ্যের মাঝখানে কত যে ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শৈশাচিক প্রলোভন সিন্ধ্যা মাহুষের মনকে কণ্ঠন করেছে সে কি দেখেছ? তুমি এই দলের মন কা কিছু, তার উত্তরে রয়ে গেলে, আমি সব বোঝা বহন করে দাঁড়ি—তোমায় সব কিছু জানতে দেব না তাই। যুগের ভীষণতা, শক্তির নির্ভরতা কিছু তোমায় বেন স্পর্শ না করে তাই চেয়েছি। কিন্তু তুমি তিরকালই অব্যব হয়ে বেঁধে।

এই বিশাল শিল্পজগতের সোজা পথ যেনিকে সেই দিকে তোমার ঘরে রাখতে চেষ্টা করোঁহি, আমি ভাল মনে হই গ্রহণ করোঁহি, সন্দেহ নেই কিন্তু অবিনাশের ঐ যে দলটি দায়িত্বহীন, আকাঙ্ক্ষাহীন জীবনকোলাসে জ্বলছে, সেই দলই তোমার আকর্ষণ করে। তুমি নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছ গতের কঠোরতা থেকে, তাই বুঝ-বুঝতাদের দলে ভিড়ে গিয়েই আনন্দ খুঁজে নিয়েছ। ওরা তোমার উন্নতির পথে অগ্রসর করে নিতে পারবে না কোনদিন। আমি তোমার রক্ষাকর্তা হয়ে আছি, তাই বেঁচে গেছ। আমি যেদিন পছন্দ, ক্রান্ত হব, একা বুদ্ধ করতে পারব না তখন হয়ত বুঝবে কতটা তুমি লাভ করেছ। আমার শক্তি এখনও অনেক আছে, আমিই তোমার রক্ষাটা থেকে সরিয়ে রাখতে পারি।' মুকুটকে আজ প্রকৃত শক্তিশালী কন্যা বলে মনে হল। জয়ন্তী বৃদ্ধ কণ্ঠে বলল—

‘তাই যদি হয়, এতই যদি তোমার শক্তি থাকে তবে ঐ নেশাটুকু থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছ না কেন? এভাবে তোমার সুনাম বেশীদিন থাকবে না।’

শিল্পীর সুনাম কিভাবে প্রকাশ পায় লেখাও আশ্চর্য। তার চরিত্র বা স্বভাবের ওপর কিছুই নির্ভর করে না। দক্ষতা তার সম্বল। শিল্পীর সারাদিনে এক ঘুরোঁ ভাত ঘুটেছে কি না তাও কেউ জানতে চায় না—সে বিবাহবিখ্যাত হলেও তার স্ত্রীস্বর্গের জন্ত কারুর প্রাণ কাঁদে না। তার সমস্ত জীবনটাই চিরন্তন বর্ণভূমি—খ্যাতি থাক বা না থাক। তাকে লোকের মতামত স্তন্যভেদী হবে। সে গ্রহণ করুক আর না করুক।’

মুকুটের কথাগুলি জয়ন্তীর মনে বিধল কিন্তু এই একতরফা তত্ত্ব সে স্তন্যভেদী বাকী নয়—সে জানে সে শিশুর মত অবুধ নয়।

সে বলল, ‘তুমি নিজের হৃদয়তাকে প্রেমের দেবার জন্তই বোধ হয় সব আত্মরক্ষিত করে তোল, আমার তুমি নিরাপন্ন করতে পারবে না।’ জয়ন্তীর কেমন যেন

উদ্ভ্রান্ত মনোভাব, মুকুটের কথা সে বিশ্বাস করতে চায় না—তাই স্পষ্ট কথা না বলেও পারল না—

যেদিন তোমার ঐ ভীষণ দুর্ভিতে দেখি সেদিন আর বিশ্বাস হয় না এই সংসারের প্রতি বা আমাদের পারিবারিক জীবনের প্রতি তোমার একান্তল প্রীতি বা একটুও আকর্ষণ আছে। ভাগ্য নিত্যই আমার বিরুদ্ধে। কাল বাবার চিঠি পেরোঁহি—লিখেছেন মা বিশেষ অম্বহ। হাটের দুর্দলতার জন্য তিনি শয্যাশায়ী। যেতে আমার খুবই ইচ্ছা করছে কিন্তু তোমার এই সুগতিত রোগ দেখলে তোমার ওপর ভরসা আর থাকে না—ছেড়ে যেতে সাহসও হয় না। যদি যশোলাভ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহলে অন্তরের অনেক কিছুই বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হতে হয়। সে প্রতিটি আমার হয়নি তা স্বীকার করছি, কিন্তু এই বিষয়ে মতামত আমার ভিন্ন তাও বালি। এখন আর সে-সব কথা থাক।’ জয়ন্তী গালে হাত দিয়ে অন্তমনস্ক হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর একটা চিঠি লিখতে গেল।

বাইরের জীবনের সঙ্গে তার অন্তরের জগতের যে দ্বন্দ্ব চলছিল মুকুট যদিও তা গ্রহণ করে নিয়েছিল তবু স্বাভাবিকভাবে তা মানিয়ে নিতে পারেনি তাই নেশার সাহায্য নিয়েছিল। ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে সে জয়ন্তীর সঙ্গে ব্যবহারে সামঞ্জস্য রাখতে পারেনি না—কখনও উদ্বাসীনতাও প্রকাশ পাচ্ছিল। মুকুটের প্রতি তাই জয়ন্তীর সমাহৃদ্যুত খানিক ক্রমে গিয়েছিল। চিত্তকরের জীবনে যে এমন হতে পারে জয়ন্তী তা বুঝতে পেরেও মুকুটকে সতর্ক করা করতে পারেনি না—জয়ন্তীকে সে খুলে কোন কথা বলেনি এতদিন তাই সে নিত্যই মর্জাহত। তাকে এইভাবে নূর সরিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন ছিল না জয়ন্তী বুদ্ধিমতী ও স্পষ্ট বক্তা, তাকে এতটা ছুঁছ করে অবুধ বলে ঘোষণারোপ করা নিত্যই অজ্ঞতার আবিচার। মুকুট জয়ন্তীকে চিত্তকররূপে গড়ে তুলেছে বলে কেমন যেন একটা অর্ধহীন অহংকার তাকে গ্রাস করে কেলোঁছিল। জয়ন্তীকে তাই লক্ষ্যমণী-



সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি সে। জয়তীকে সে অসংখ্য অযোগ্য করে দিয়েছিল কিন্তু বনিষ্ঠ বন্ধুর মত নিজের সমস্যা ক্ষেত্রে কোনদিনই ডেকে নেয়নি। জয়তীর জীবন তাই দিনে দিনে বিরাটিকর হয়ে উঠছিল। তর্কাতর্কির পর মুকুট ও জয়তী—সুদূরমানে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। প্রায় রাতেই এইভাবে কথা কাটাকাটি করে হুকনে উঠে যায়—কারুরই মনে শান্তি নেই। কতবার ঘুম ভেঙ্গে যায় জয়তীর তার অন্ত নেই।

ভোরের আলো তখনও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না—সূর্য উঠবার অনেক আগেই জয়তী উঠেছে—বাগানের দিকে সে এগিয়ে গেল। এই নিঃশব্দতা তার মনে কণিকের দস্ত শান্তি এনেছিল। প্রকোমল ঘাসের ওপর পা-ছুটি রেখে শীতল শিশিরবিন্দুর স্পর্শ পেল। কিন্তু মন তার অশান্ত। ছুটারবার হাঁটাইটি করতে করতে দেখতে পেল সাইকেলে করে কে যেন আসছে। লোকটি গেট খুলে ঢুকল। ডাক পিওন দেখে জয়তী ছুটে গিয়ে গেট ভাল করে খুলে দিল। হাত থেকে খামখানা নিয়ে খুলল ‘তার’ এসেছে।

‘শান্তা কাল রাতে দেহভ্যাগ করেছেন। বাবা’

ছুরি দিয়ে কে যেন জয়তীর বুকখানা ক্ষত করে দিল।

‘নেই, নেই...মা কি সত্যিই নেই?’ সিঁড়ির এক কোণায় গিয়ে জয়তী বসে পড়ল—

‘শেষ নাহি যে, শেষ নাহি যে’ একথাই বারবার মনে আসতে লাগল। কৈশোরে বাবা তাকে কত তত্ত্বের কথা সহজ ভাষায় গল্পের ছলে বোঝাতেন, আজ সেই শাস্ত্রের কথাগুলি স্পষ্ট বাজতে লাগল।

‘বৃহ্ম মাহুযকে বিনাশ করে না’—আহা, সত্যিই তো তার মা ধরা ছোঁওয়ার বাইরে চলে গেলেন কিন্তু সারা জীবন কত কল্পনা, স্নেহ-মমতার কোমল স্পর্শ দিয়ে নিত্য নিয়ত জীবনকে ভরে দিয়েছিলেন আজ তিনি অতি নিকটেই আছেন মনে হল। মায়ের স্নেহভরা মুখমণ্ডল চোখের সামনে যেভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল এমন কোনদিন হয়নি। মনে হ’ল বহুদূর থেকে বৃহ্ম হেসে

ভরসা দিচ্ছেন, তিনি কাছেই আছেন। বৃহ্মার মত সত্যও যেমন আর কিছু নেই, মাতৃপ্রেমের মত চিরস্থায়ী আর কি আছে? বিশ্বজননীরই যে প্রকাশ। নানান কথা ভাবতে ভাবতে জয়তী নিজেকেই শান্ত করছিল। ‘তার’ খানা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল—মুকুট তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। মুকুটের ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে জয়তীর মায়া হল, সে যেন বলতে চাইল সে মুকুটের কাছে রক্তজ। কিন্তু এখন মুহূর্ত আসে তার জীবনে যখন সে মুকুটকে আর শ্রদ্ধা করতে পারে না। বাইরের জগতের কাছেই সে একমাত্র প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, তাদের জীবনে একতার অভাব নেই। মুকুট অনেক বেলাতেও উঠল না দেখে জয়তী তার কাছে গিয়ে একটু ধাক্কা দিল—মুকুট তখনি জেগে তাকাল। বিছানায় শোওয়া অবস্থায় সে বলতে লাগল—

‘কাল একটা ভারী স্নানর স্বপ্ন দেখেছি—জয়তী। তোমার মা লালপেড়ে গরদখানা পরে বোরিয়ারে আসছেন ঘর থেকে—তোমার বাবা একখানা বেল ফুলের মালা তার হাতে জড়িয়ে দিচ্ছেন।’

জয়তীর হুই চোখ বেয়ে অশ্রুধারা বয়ে গেল—‘তার’টি মুকুটের হাতে দিল। মুকুট চমকে উঠে বসল—

‘আশ্চর্য, এত পরিষ্কারভাবে দেখলাম তাঁকে, কি হ’ল?’ একেবারে নির্গত হয়ে রইল। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল—ধীরে ধীরে পাশের ঘরে গিয়ে তৈরি হয়ে নিল। জয়তীর দেহমনে আজ শুধু অবসাদ—সে একাই যেন হঃখ বহন করতে পারে এই মনে মনে প্রার্থনা করল। মুকুট জয়তীর কাছে এসে বসল কিন্তু জয়তী তার কাছে প্রাণের কথা বলতে সঙ্কোচ করে, আর সহানুভূতি তো কিছুতেই চাইতে পারবে না।

‘হুমি বাবার কাছে যেতে চাও?’ মুকুট প্রশ্ন করল।

‘এখনই না—তার চিঠির অপেক্ষা করব’—সে উত্তর দিল। মায়ের বৃহ্মসংবাদ পেয়ে জয়তী নিভাত একাকী বোধ করল, মুকুটের সঙ্গে সে আর নিজের মনের কথা

বলতে পারল না। প্রচণ্ড শোকেরও মুখখালা অস্তরে জমাট বেঁধে গেল।

গমত হয়ে প্রত্যহ যেমন সংসারের কর্তব্য করে সেইভাবে জয়তী কাজ করতে লাগল। মুকুট তাকে বলল, ঘটা-খানেকের মধ্যে একটি আর্ট ডিলার তার কাছে আসবে। জয়তী টেলিফোন করে অবিনাশকে খবর দিল, সে কয়েকদিন আর বেরুতে চায় না—মনের অবস্থা তার নিতান্তই মন্দ। অবিনাশ কয়েক মিনিটের মধ্যেই রওনা দিল এবং সে দ্বিগুণে পৌঁছেতেই মুকুট তাকে গেষ্টের কাছ থেকে ভিতরে ডেকে নিয়ে বসাল। মুকুট আর অবিনাশ বেশ খানিকটা গল্প করল। অল্প সময়ের মধ্যে আর্ট ডিলারের দল এসে পৌঁছেতে অবিনাশ বাড়ী করে গেল। পরের দিন সকালে অবিনাশ আবার মুকুট ও জয়তীর সঙ্গে দেখা করতে এল। মুকুট অবিনাশকে নিয়ে তক্তগোশের ওপর আরাম করে বসেছে। আজ মুকুট অবিনাশকে পুরাতন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত কাছে ডেকে নানান সমস্যা আলোচনা করতে চায়। বেশিকাজের উদ্দেশ্যে এতদিন মুকুট অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে সৌবর্য অবিনাশকে বিদ্রুতভাবে সবই বলল। অবিনাশের পরামর্শ মুকুট আগ্রহভরে শুনল এবং অধিকাংশই গ্রহণ করল। জয়তীর সঙ্গে কোনদিন মুকুট কোন কিছুই খুলে আলোচনা করেনি, শিল্পজগতের জটিল কার্যবৃত্তি ও বিভিন্ন সভাসমিতির উল্লেখমাত্র শুনেছে সে—সব-কিছু থেকে সে বাদ পড়ে যেতো। ক্রমশঃ তাই তার মন বিকল্প হয়ে উঠছিল। মুকুট তাকে জানায়নি কিছুই, মতামতও চায়নি কোনদিন। যে জনতা প্রতিদিন মুকুটকে ডেকে নিয়ে যায় জয়তী যেন তাদের প্রতি বিরুদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে, বন্ধুদের ভালমন্দ সে কিছুই লক্ষ্য করে না। মুকুটের সামিথ্য পায়নি বলে তাদের বিবয় জয়তী উদাসীন হয়েছিল সন্দেহ নেই। অবিনাশও মুকুটের দল বলের কাছ থেকে সৎসাহায্য দূরে থাকতো, সে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে এদের সঙ্গে মিশতে পারবে না জানত। মুকুটকেও তাই সে খুলে বলল যে, তার মতামত একেবারেই অল্পকম। বেশী কিছু সাহায্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

‘বড় কিছু প্রায়ন করলেই ভূমি সরে যেতে চাও অবিনাশ, তোমার সভাবই তাই।’ মুকুট অভিযোগ করল।

‘আমি সত্যিই বড় কিছুর মধ্যে থাকতে ভালবাসি না—যে সব গণ্যমান্য বন্ধুরা ও পদস্থ ব্যক্তিরা এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে আমার উৎসাহ হয় না। শিল্পী যখন আর্ট ডিলারদের সঙ্গে অতিরিক্ত মিশে যায় তখন তার অনেকখানি স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যায়, তাছাড়া তার জীবনে উচ্চ আদর্শ আর বিশেষ থাকে না। অবশ্য ছবির মূল্য হয়ত বাড়তে পারে।’

‘হেলেমানুষ ভূমি, কোন আকাজকা কি নেই তোমার?’

‘তা হয়ত সত্যি’—অবিনাশ স্পষ্ট উত্তর দিল।

‘শিল্পজগতে সকল হবে, সুখ্যাতি লাভ করবে এ আকাজকা জয়তীর মনে আঁত প্রবলভাবেই জেগেছিল, আপনি তাকে সে সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন, তার সৌভাগ্য। আপনারা দুজনেই শিল্পের উন্নতির জন্য অনেক করতে পেয়েছেন—আপনারা প্রশংসা সকল হান্নেই শোনা যায়।’

মুকুট অবিনাশের কথাগুলি সন্তুষ্ট মনে শুনে গেল তারপর বলল—অবিনাশ ভূমি বিয়ে করনি কেন? স্বামীস্বী দুজনে একত্রে কাজ করার উৎসাহ পাবে, ছাড়িয়ে বসবার প্রেরণা পাবে—দুটোও কত সাহায্য করতে পারবে।’

‘আমি যে শিল্পীই বিয়ে করব—চিহ্নকর যে তাকে হতেই হবে এ আপনাকে তা কে বলল? আমি একটি সাধারণ মেয়েকে গৃহলক্ষ্মী করে নিয়ে আসব, সে আমাকেই শিল্পী বলে মানবে—আমার দেখাশোনা করবে কিন্তু ছবি আঁকবে না। আমি আপনার মত এত সব তাকে দিতে পারব না—যত্নকে সত্যি করার শক্তি আমার নেই। বাস্তব যা কিছু, সহজভাবে তাই গ্রহণ করবে সে। গৃহের মধ্যে শিল্প-প্রতিবোধিতা শুরু হয়ে গেলে নানান অসুবিধা।’

মুহূর্ত অবিনাশের কথাগুলি শুনিছিল আর হাসিছিল সে খানিক আনন্দ পাচ্ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু সব অর্থহীন বোকবার সে চেঁচা করল না।

‘যাই হোক, তুমি আমাদের সাহায্য করবে অবিনাশ’ মুহূর্ত স্নেহভরে অবিনাশকে অহরোহর করল।

‘একদিন তোমার বন্ধুদের এখানে নিয়ে এস, তাদের সঙ্গে আলাপ করব। কবে আনবে বল?’

অবিনাশ একটু আশ্চর্য হয়ে ডাকল—‘যেদিন বলবেন সেদিনই ওদের নিয়ে আসব। আপত্তি কি?’

অবিনাশ তার স্ক্যাটে কিরে বাবার জন্ত ব্যস্ত হচ্ছিল, করেকটি বন্ধু হুপুরে তার সঙ্গে একত্রে খাবে কথা ছিল। অবিনাশ সোজা হয়ে দাঁড়াল। জয়তী এতক্ষণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, এসে বসে গল্প করতে পারেনি—অবিনাশকে যেতে দেখে এগিয়ে এল—

‘গৃহলক্ষী আসছে কবে?’ বলতেই অবিনাশ উত্তর দিল—

‘লক্ষী মাত্রই ঢকলা—ঘরে নিয়ে আসা ও বসানো কি এতই সহজ?’ তাড়াতাড়ি বণনা দিল।

জয়তীর মন বিবাদের পরিপূর্ণ, সে অবিনাশকে সহজেই ছেড়ে দিল। ঘুরে কিরে মার কথা মনে পড়ে। কত বাল্যস্মৃতি তার মনকে উত্তলা করেছে—সে বেন আর হির থাকতে পারছে না। একাই হুঃখকে জয় করার চেষ্টা করছে। বাবাকে মেথবার জন্য মন তার ব্যাকুল। তার মা বাবার গভীর প্রেমের বন্ধন কখনও শিথিল হয়নি। দেবাশিস যখনই বিদেশে গেছে, ছোট ছোট স্তম্ভ কাজ করা আসবাবপত্র, খেলনা, সাড়ী, বই, লেস, ছবি নানান হান থেকে নিয়ে এসেছে, কোন বিশেষ দিন উপলক্ষ্য করে সেগুলি বাজ থেকে বার করে শাত্তাকে উপহার দিয়েছে। শাত্তা জিনিসগুলি পেয়ে আনন্দ করে বলেছে—

‘এ তো ঘেরেরের অভ্যাস—তুমি আবার এসব স্তম্ভর জিনিসগুলি কোথায় পেলেন?’

‘কেন?’ দেবাশিস আপত্তি করে উঠেছে—

‘পুরুষ যখন সাতাই ভালবাসে তখনই সে দিতে চায়।

আমার বন্ধুদের মধ্যে এমন ব্রীজপ্রাণ ক’জনের বল তো? তাদের এসব কথা মনে হবে কি করে?’

দেবাশিস ও শাত্তা। হুজুমেই সন্তানদের প্রতি মেহান্ত ছিল, ছেলেকে পুত্রবধূ নাভনী সকলকেই গভীর প্রেমের বন্ধনে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু ছেলেরা অতটা চায়নি, তারা স্বাধীন হবার পর একটু দূরেই সরে গিয়েছিল। জয়তী যেদিন বাড়ী ছেড়ে দুর্দীর্ঘ পাঁচ বছরের জন্ত বিদেশে চলে গেল, সেদিনের হুঃখ শাত্তার কোনদিন ঘোচেনি, সে গভীর মনঃকষ্ট সহ করেছিল, এক দেবাশিসই তাকে মধ্যে মধ্যে সান্না দিতে পারত। মুহূর্তকে বিয়ে করে জয়তী সুখী হোক এই কামনাই করেছিল হুজুমে—জয়তীর চিঠি পেয়ে তারা নিশ্চিন্ত হয়। ‘দিগন্ত’ দেখে শাত্তা বড়ই তৃপ্তি পেয়েছিল। জয়তীর স্বপ্ন সকল হয়েছে, সে কেনে গেছে। কিন্তু দেবাশিস মন্তব্য কিছুই প্রকাশ করেনি তখন। জয়তীর বিবাহিত জীবনের সমস্ত কেই বা জানত? মুহূর্ত কোনদিন চায়নি জয়তী মাতৃস্বের কর্তব্যভারে জড়িয়ে পড়ে, তাই উভয়েই এ বিষয় উদাসীন হয়ে পড়েছিল। জয়তীর সর্গশ্রেষ্ঠ বাসনা ছিল চিত্রকর হয়ে সুখ্যাতি লাভ করবে, স্বাধীন হবে। বিখ্যাত শিল্পীর সহধর্মিণী হয়েছিল বলে তার তাই গর্ভও ছিল। মানব জীবন ও শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবেই মুহূর্ত বিশ্বাস করত; কিন্তু শিল্প তাব চেয়েও বেশী কিছু প্রকাশ করবে যাতে জীবনের সঙ্গে সর্গদা মিল না থাকতেও পারে। সকলেরই ধারণা মুহূর্তের ও জয়তীর জীবন একই স্রুজেই বাঁধা। বন্ধুদের কাছে জয়তী বলেছে—

‘আমাদের একই আদর্শ, একই উদ্দেশ্য, একই প্রেরণা।’ বাইরের জগৎ জয়তীর অন্তরের ঘন্থের কথা কোনদিন অবগত হয়নি।

শিল্পক্ষেত্রের ঘন্থ মুহূর্তকে কেমন যেম একটা স্বার্থপর জীবনের দিকে নিয়ে চলেছিল। শিল্পায়তনের জটিল সমস্যাগুলির জম্ম সমাধান হ’ল। অভিজ্ঞ শিল্পীদের জন্ত বিশেষ করে এই শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হ’ল। সকল রকম লালিতকারী স্বপ্নক ছাত্রছাত্রী স্বর্ণ স্বরণ

লাভ করল। বিদেশ থেকে বিখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে এসে কিছুদিন রাখা হবে তাহাড়া তারতন্যের ধাঁসে শিল্প-শুক্রাও তার নেবেন। মুকুট নিশ্চিত বোধ করছিল—এতদিনের স্বপ্ন বুঝি সত্যি হল—রীতিমত আশায়িত হয়ে উঠল। কিন্তু জরতীকে সে কিছুই বলে না—এই শিকারজনের সঙ্গে জরতীর যেন কিছুই সম্পর্ক নেই, জরতীর অসহ অভিমান, সে বিবরণ হয়ে উঠল। তার মনে শুধু নৈরাশ্র, গভীর হুঃখ। সে এই ভিড়কে আর এক দণ্ডও সহ করতে পারছিল না। সকলেই যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। ক্রমাগত যারা মুকুটের সঙ্গে নির্জনে কথা বলে, নিভতে আলোচনা করে সে তাদের পরিচয়ও জানে না। মুকুটের শিল্প রাজ্য তার কাছে কি সম্পূর্ণ অচেনা, অপরিচিত হয়ে গেল? সকলের সঙ্গে জরতী হাসিমুখে কথা বলে, আপ্যায়িত করে, কিন্তু মুকুট নিষ্ঠুরের মত তাকে অবজ্ঞা করে চলেছে। সে কি কিছুতেই বোঝে না জরতীকে সে কতখানি আঘাত করেছে? চিত্রকরের জীবন যে শুধু কল্পনার স্বপ্নরাজ্য নয়, তা কি জরতী বোঝেনি? তার অপরাধ কোথায় সে জানতে চায়, এ ক্ষেত্রে তার যে ক্রটি কিছুই নেই জরতী এ বিষয় বিধানশূন্য। মুকুটকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে সে

কিন্তু পেয়েছে শুধু অবহেলা, উদাসীনতা ও তিরস্কার। কোথায় চলেছে সে কতদূর? আর কতদিন এভাবে চলবে তাই ভাবতে লাগল। মুকুটের ক্রান্তি নেই, বিয়াম নেই, বিবেচনা নেই, প্রীতি নেই, কেবল নেশা—আকাঙ্ক্ষার মত্ততা। জরতী বৈধ মানল—সে নীরবে সব দিক বজায় রাখবে পণ করল। বিপুল অভিমানের যে কুৎসিত ক্ষত তিলে তিলে তাকে গ্রাস করছিল, একটি বিশাল কর্ণজাল দিয়ে সে তা ঢেকে দিল। কাজের মেশার ও উজ্জ্বল অকস্মাৎ সে যেন মেতে উঠেছে। মুকুট অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পেল না। জরতী যে মুখোশ পরল বলেই এই জীবননাট্যে দক্ষতার সহিত অভিনয় করে যেতে পারল, মুকুটের মূল চোখে তা ধরা পড়ল না। এই অলীক রঙ্গমঞ্চের আলোছায়ায় বৃত্য, যবনিকার অন্তঃকালের বীণার অসঙ্গতিপূর্ণ ঝংকার কিছুই জরতীকে টলাতে পারছিল না—নিজের ইচ্ছাকে বাসনাকে সে অলৌকিকভাবে জয় করে নিতে পারবে আশা করল। একমাত্র এইভাবেই সে মুকুটের নির্ভয় শিল্পতত্ত্ব মেনে নিতে পারল। হার মানবে না এই তার সংকল্প।

ক্রমশঃ



# নীলাচলে

কানাইলাল দত্ত

কাশীতাই প্রসাদের চূর্ণশা শুনে একদিন মালপোয়া প্রসাদ এনে হাজির করলেন। এটি খুবই উপাদেয় ছিল। বাড়ীতে আসার দিন এই কাশীতাইই—গজা ও অভ্যন্তর প্রসাদ, ফুল বেলপাতা খুবই সুদৃষ্ট আধারে প্যাক করে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেজন্য কোন পৃথক মূল্য দেবার প্রয়োজন হয়নি। ওটা নাকি ভোগের জন্য প্রস্তুত অর্ধমূল্যের মধ্যেই আমাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল। আমরা যখন শ্রীজগন্নাথদেব মর্শনোগিয়েছিলাম, তখন কি একটা বিশেষ যোগ চলছিল। বিধবা স্ত্রীলোক বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের নারী ভক্তের সমাগম ছিল প্রচুর। আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর পরের একাদশী থেকে কার্তিক মাসের উষান একাদশী পর্যন্ত একমাস কাল জগন্নাথ দেবের রাধা-দামোদর বেশ হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়া ও মেদিনীপুরে রাধা-দামোদর মন্দির আছে। পূজা নিবেদনের ধরণ-ধারণ খুবই অনাড়ম্বর। সকলেই স্বতঃপ্রসঙ্গ জালিয়ে দিচ্ছেন দেখা গেল। রাধা-দামোদর মন্দির সমুখে বিধবাগণকে বৃত্তাঙ্গীত সহযোগে ভক্তি নিবেদন করতেও দেখেছি। এই সকল ভক্তের অনেকেই সমুদ্রতীরেও একপ্রকার পূজা করতে দেখা যায়। বালির মধ্যে একটি তুলসী গাছ বসিয়ে তারই সামনে মন্ত্র পাঠ করেন। গুরোহিত সাহায্য করেন। নারকেল এবং চালতা অল্প অর্ঘ্য বলে বিবোধিত। পূজা শেষে পঞ্চরত্ন সহ উক্ত ফলবর্ষ সাগরে বিসর্জিত হয়।

কালীপূজার রাত্রে এখানে একটি মনোরম পিতৃ-পুত্র স্মরণোৎসব হয়। একে পিতৃলোক-পূজাও বলা হয়। লৌকিক ব্যাপারটা খুবই সাদাসিধা। লম্বা লম্বা পাট কাটি জালিয়ে আকাশে তুলে ধরে পিতৃ-পুত্রের পথ দেখতে সাহায্য করা হয়। আত্মান ময়

হানীর ভাষায় হড়ার আকারে সজ্জিত। কে বা কারা রচনা করেছিলেন তা জানা যায় না; বাদ্যও যার তবে তা সহজলভ্য নয়। আমাদের কাশীতাই কয়েকটি হড়া তমিয়েছিলেন। হড়াগুলি যে অর্ধবহ ও মাধুর্যমণ্ডিত তা স্বীকার করতেই হবে। একটি হড়া যেমন শুনেছি এখানে তুলে দিলাম।

বড়বাড়িয়ে সড়সড়িয়ে

আঁধার আসে বাতশ সীঁড়িতে

প্রসাদ পেয়ে

খেত গজায় হাত পা গুয়ে

আলোয় যাও

পিতৃলোকে অমৃত দৃষ্টিতে তাকাও।

আমাদের আকাশপ্রদীপের সঙ্গে এর সাদৃশ্য সামান্য মনেও হুনিরীক্ষা নয়। দীপারিতার দীপ জলতে দেখলাম প্রায় সব বাড়িতেই।

ঐ দিন শ্রীমন্দিরের সামনে অরুণ স্তম্ভের পাদদেশে প্রাঙ্গণেরা বেশ কয়েকটি হোমসূও প্রজ্জ্বলিত করে বসে থাকেন। সাধারণ মানুষ যে যেমন দক্ষিণা দেন তেমন আকারে তার জন্য হোম করে দেন।

শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে যেমন প্রচুর দেবদেবী ও পৌরাণিক মূর্তি আছেন তেমনি এ স্থানটি নিত্য নানা উৎসবে মুখরিত থাকে। মানুষ নিজ নিজ ক্রটি ও অভীলা অঙ্গুসারে এই সব উৎসব থেকে আনন্দ আহরণ করে থাকেন। সকলের সব প্রার্থনা পূর্ণ হবার উপাদান এর মধ্যে সহজেই মিলে যায়। প্রত্যাহক যেমন প্রত্যাহার সহজ সুযোগ পায়, তেমনি তত্ত্ব দেখা পান তগবানের। কথাটা নিয়ে তর্ক তোলা যায়। কিন্তু সব কিছুকে তর্ক দিয়ে বা সূক্তি দিয়ে যে ব্যাখ্যা করা যায় না, বোঝানও যায় না এই সহজ সত্যটি স্মরণীয়।

ধীরে ধীরেছিলেন একটি ছোট্ট স্তম্ভের উপমায়। জানি উপমা ব্যক্তি নয়। তথাপি এ হলে উপমাই হলো একমাত্র অবলম্বন যা সফল করে আমরা মনের ভাব কতকটা বোধগম্যরূপে ব্যক্ত করতে পারি। তিনি বলেছিলেন এই যে, আমরা পিতামাতাকে ভক্তি করি, স্ত্রীকে ভালবাসি অথবা পুত্রকন্যাকে স্নেহ করি; এর কোনটারই কি মাপকোঁক করা যায় না ছাঁই এঁকে দেখানো যায়? এই সামান্য পার্থক্যই জিনিস যখন একমাত্র অসুভূতিলক তখন অপার্থক্য ঐশ্বরিক আশীর্বাদকে আমরা কেউ কেউ ধরা ছোঁয়ার মধ্যে যদি না-ই পাই তবে মিথ্যা বলব কোন্‌ ব্যক্তিতে? বিনোবাজির একটা লেখায় পড়ে-  
ছিলেন:

যা যখন সন্মুখে আমাদের পিঠে তাঁর হাতটা রাখেন তখন আমাদের মনে অপূর্ণ আনন্দ ও আবেগের সঞ্চার হয়। অল্পরূপ ওজনের আর একখানা হাত রাখলে নিশ্চয়ই এমন আনন্দ আমরা অল্পভব করব না। মায়ের হাত আর আমার পিঠের মধ্যে একটা অদৃশ্য বন্ধ থাকে— তা হলো মায়ের স্নেহ। সব সম্ভানই মাতৃস্নেহের অধিকারী। কিন্তু তাই বলে সকলে কি সমান মর্যাদার এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সেই স্নেহে নির্ভর করে? করে না। তেমনই সকল মানুষই ভগবদ্-প্রেমের অধিকারী হলেও নিজ নিজ কর্মকর্তিত্বের দোষগুণে কেউ আমরা সেই অপূর্ণ প্রেম আবাদন করতে পারি, কেউ নিজেকে বঞ্চিত করি। আরও সহজ করে বলি দাঁড়ায়, বুদ্ধি ও ভালবাসা ইত্যাদি যেমন দেখানো যায় না কিন্তু কর্মে প্রকটিত হয়, ভগবান তখন আমাদের চৈতন্তে উদ্ভাসিত হন, আচার আচরণে প্রকটিত হন।

পাঠক দয়া করে মনে রাখবেন, ঐক্যে ভৌ বটেই ঐশ্বরিক সম্পর্কেও আমি পূর্ণ কোন আলোচনা করছি না। অল্প সময়ের মধ্যে হঠাৎ বার এক-আধ বস্তু করে দর্শনের কালে আমার মনে যে প্রতিভা হরেছিল তাই মাত্র এখানে বলবার চেষ্টা করছি। ঐশ্বরিক প্রাক্কণের একটি পাথরের কাক মূর্তি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমার ভীর্ণকর ভেদন কোন লেখাপড়া

নেই। লোকমুখে তিনি যা শোনে, তাই গুহিরে বলার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, এটি হলো ভূবাণ্ড কাক। কাক অমর। স্বাভাবিকভাবে কাকের বৃদ্ধা নেই। কাকের স্বাভাবিক বৃদ্ধা আমার চোখে পড়ে নি যদিও প্রতিদিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ওরা আমাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। অপর দিকে কোন কারণে একটি কাক যদি মারা পড়ে হুনিয়ার কাক জড়ো হয়ে হলুদুল বাধিয়ে দেয় ভূবাণ্ড। কাক যুগযুগান্তর ধরে নাকি নামনাম কীর্তন করেন। এই ভূবাণ্ড কাকের মূর্তি ঐশ্বরিক প্রাক্কণে বঞ্চিত আছে। জনশ্রুতি হলো—ঐশ্বরিক নির্মাণ করে ইজ্রাহার মহারাজা ব্রহ্মার নিকট গেলেন তাঁকে দিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করানো যায় কি না তার তদারক করতে। ব্রহ্মার জন্ত অপেক্ষা করতে বহু বর্ষ কেটে গেল ইতিমধ্যে ইজ্রাহারের মন্দির জবর-দখল হয়ে যায়। রাজা কিরে এসে মন্দির দাবি করলে প্রতিপক্ষ গালমাথব তা ছেড়ে দিতে অস্বীকার তো করলেনই পরন্তু সে মন্দির নিজের বলে দাবি করে বসলেন। এই ভূবাণ্ড কাক মন্দিরপ্রাক্কণহীন কল্লবট গাছে থেকে সব দেখেছেন। তিনি ইজ্রাহার রাজার দাবি সত্য বলে সমর্থন করেন।

ঐশ্বরিক সম্পর্কে আরও একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। মন্দিরচূড়ায় সে চক্র স্থাপিত রয়েছে সেটি বিষ্ণু চক্র বলে আকৃষ্ট। আর ঐ যে ধ্বজা দেখা যায় সেটা ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং বৈধে দিয়েছিলেন। ধ্বজা চড়ানো বিশেষ সফলদায়ক বলে ভক্তেরা বিশ্বাস করেন। এই কার্বে পারদর্শী এক শ্রেণীর লোক ঐক্যে আছেন। তাঁরা অবলীলাক্রমে ১২ ফুট উঁচু মন্দিরশীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। ধ্বজার কথাটা বিশেষ করে মনে হবার কারণ হচ্ছে আমার ঐক্যে অবহান কালে একদিন (১৫-১০-১১) দুর্গা পূর্ণিমা ঐশ্বরিক ধ্বজা খসে পড়ে। এটা লৌকিক বিচারে অতিশয় দুর্লভ বলে বিবেচিত হয়। সেবকেরা যথাবিধি শাস্ত্রীয় প্রতিকারে প্রতী হরেছিলেন। তৎসঙ্গেও অচিরেই ওড়িশার এক দাক্ষণ হর্ষগণ বটে। বস্তুতঃ এক পক্ষকালের মধ্যে ওড়িশার

বিত্তীর্ণ অকল বড় ও জলগ্রাসনে বিধ্বস্ত হয়ে ৪০ লক্ষাধিক লোক বিপন্ন হয়ে পড়েন এবং কোন কোন হিসাবে ২৫ হাজার লোক নিহত হন। ব্যাপারটা কাকতালীয় কি না জানি না। তবে যারা ঈশ্বরের ধ্বজা ধরে পড়ার সঙ্গে এর সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী তাদের সঙ্গে তর্ক করিনি। জনশ্রুতি হলো, ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং এই ধ্বজা বেঁধে দিয়ে যোষণা করেছিলেন—দূর থেকে এই ধ্বজা দর্শন করে প্রণাম করলেই মানুষ মুক্তি লাভ করবে।

জগন্নাথের রথ তো প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে—জগন্নাথের রথ আগনিই চলে। রথযাত্রার দিন নবান্নিমিত্ত তিনটি পৃথক্ রথে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা দেবী ঈশ্বরের থেকে গুণ্ডা গমন করেন।

এই রথে দীর্ঘ রজ্জু যোজিত থাকে। সেটা ধরে শত শত সহস্র সহস্র ভক্ত রথ টেনে নিয়ে চলে। রথের এই রজ্জু ধরে টানার সুযোগ পাওয়া এক মহা সৌভাগ্য বলে ভক্তগণ মনে করেন। তজ্জেরা এই ভাবে টানতে টানতে রথত্রয়কে এক মাইল উত্তরে গুণ্ডা বাড়ি বা প্রভুর বাগান বাড়ি নিয়ে যায়। এইটুকু পথ যেতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে।

গুণ্ডা বাড়ি সম্পর্কে নানা প্রকার কথা প্রচলিত আছে। আমার কাছে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক যেটি মনে হয়েছে সেটাই এখানে যেমন তর্নোই বিবৃত করছি। সত্যাসত্য বিচার এখানে অপ্রয়োজনীয়। কিংবদন্তী মাজেই মানুষ আপন মনের মাহুরা মিশিয়ে তৈরী করে থাকে। গল্পটা বলেছিলেন আমার কাশীতাই।

গুণ্ডা মহারাণী ছিলেন জগন্নাথদেবের মেধরাণী। গুণ্ডার মেধরাণীকে মহারাণী বলে। ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত হবার পর অস্ত্র অশুভদের প্রবেশাধিকার লোপ পায়। তখন গুণ্ডা মহারাণী অস্ত্রযোগ করেন : আমি তোমার মলব্রূ সাক করে এতদিন বাধা এত দেবা করলাম, তা ঠাকুর তুমি রাজভোগের লোভে একদম ভুলে গেলে? তুমি কেমন প্রভু? গুণ্ডা মহারাণীর আকুলতা মিশ্রিত অভিমান প্রভুর হৃদয় স্পর্শ করেছিল।

তিনিই নিয়ম প্রচার করে দিলেন—রথযাত্রার সাত দিন তাঁকে সকলেই স্পর্শ করতে পারবে এবং বৎসরে ঐ সময়টা তিনি গুণ্ডা মহারাণীর বাড়িতে অবস্থান করবেন। এটিকে মাসীর বাড়িও বলা হয়। আমরাও তো অনেক সেবিকাকে মা মাসী প্রভৃতি সম্বোধন করে থাকি। প্রেমের ঠাকুরের আচার ব্যবহার মানুষ থেকে ভিন্নতর হয় না—সত্য হোক মিথ্যা হোক আখ্যানটি আশার ভাল লেগেছে। লোকবিশ্বাস রথের দিন কম বেশি বর্ষা হবেই এবং তা নাকি হয়েও থাকে।

জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধানের জন্য বেশ কয়েকজন ছাড়িয়ার সেবক থাকেন। এঁরা হুটী বেত এমন কায়দায় আন্দোলিত করেন যে বেশ জোরে কটাকট শব্দ হয়। এই কাজের দ্বারাই তাঁরা যাত্রীদের কাছ থেকে বেশ দুপুরসা উপার্জনও করতে সমর্থ হন। যাত্রীদের মাথার গুটা ঠেঁকিয়েই পয়সার জন্য হাত বাড়ান। পেয়েও যান। জগন্নাথের ছাড়ির স্পর্শে যে ধস্ত করল তাকে কোন্ ভক্তজন দশটা পয়সা দিতে কার্পণ্য করবেন? কাশীতাই বলেছিলেন, দশহরার দিন এই ছাড়ির বিশেষ পূজা হয়। আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ দিনে অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, বই দোয়াত কলম ইত্যাদি পূজা করা হয়ে থাকে। ছাড়ি পূজার অন্ত কোন তাৎপর্য আছে কি না জানাতে পারিনি।

চৈত্র মাসে গাজনের সময়ে বাংলা দেশের ছাড়ি পূজার সঙ্গে এর সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায়।

মন্দিরের শত শত কাহিনী ছাড়িয়ে আছে নানা বই পত্রে আর এখানকার মানুষের মুখে মুখে। সে কাহিনীর আদি বা অন্ত কোনটাই স্পর্শ করা যায় না। তাই ঈশ্বরের সকল দেবদেবী এবং মূল বিশেষত্বকে প্রণাম করে আমরা উঠে পড়লাম। কাশীতাই বলেন, বাড়লা থেকে এসেছেন, চৈতন্ত গঙ্গারী দেখবেন না? দেখবেন না সিন্ধু বকুল? ফেরার পথেই পড়বে। চলুন একবার দেখে যাবেন। কাশীতাই বুঝতে পারেনি যে, বাংলার মানুষ, সে শাক্ত হোক আর শৈব হোক কিংবা হোক বৈক্য—চৈতন্ত মহাপ্রভুকে নিয়ে গর্ব ও গৌরব করে

সবাই। অঃরাং তাঁকে পাশ কাটিয়ে যাবার কথা উঠতেই পারে না।

গভীরা শব্দের অর্থ হলো মন্দির মধ্যকার ক্ষুদ্র কক্ষ। শ্রীমন্দিরের অনতিদূরে চৈতন্ত গভীরা। একটি সাধারণ বাড়ি। ভিতরে নিত্য কীর্তন ও চৈতন্তচরিতাবৃত ভাগবতাদি গ্রন্থ নিত্য পাঠের ব্যবস্থা আছে। অপরাহ্নে আমরা যখন গেলাম তখন এক স্থলে কনাকয়েক ভক্ত নিয়ে জনৈক কথক ওড়িয়া ভাবায় শ্রীচৈতন্ত ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। পাঠক ওড়িয়া কি বাঙালী বুঝা গেল না। অপর একটি দালানে তিনজন বাঙালী বৃদ্ধ ও করতাল সহ নাম সংকীর্তন করছেন খুবই বৃহৎ স্বরে। কোথেকে মনে হলো নিয়ম রক্ষা হচ্ছে। আরও ভেতরে অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর খড়ম কমণ্ডলু কাচের আধারে রক্ষিত দেখলাম। সেই আধারের মধ্যেই আর একটি ছোট্ট পেটিকায় মহাপ্রভু ব্যবহৃত একখানি কাঁথা ভাঁজ করে রাখা হয়েছে। তাঁর পেছনে মুণ্ডিত মস্তক ও হাঁটু বুড়ে বসা গৌরাজ সুল্লরের একটি ভাবি সুল্লর ছবি রয়েছে। বাড়িটি পুরাতন কিন্তু যত্নে রক্ষিত। কালীতাই জানালেন, রথযাত্রার সময় প্রচুর চৈতন্ত-ভক্ত এখানে সমবেত হন।

চৈতন্ত গভীরার অদূরে সিদ্ধ বকুল। হরিদাস ঠাকুর ছিলেন মহাপ্রভুর মুসলমান ভক্ত-শিষ্যোদ্যোগ। তিনিও মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে আসেন। এখন যেখানে সিদ্ধ বকুল সেখানেই হরিদাস অবস্থান করতেন। জগন্নাথ দেবের দত্তাবান কাঠি পাওয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিতরণ করেন। মহাপ্রভু একদিন এইরূপ একটি কাঠি প্রসাদী পান। শ্রীচৈতন্তদেব ঐ কাঠিটি হরিদাস ঠাকুরের ভজন স্থানে প্রোথিত করে দেন। সেই কাঠি থেকে গাছ। পুরাতন গাছের জীর্ণ কাণ্ড বেদী করে ঘিরে রাখা হয়েছে, তারই একটা ডাল অলৌকিক উপায়ে এখনো জীবন্ত দেখা যায়। সে তো প্রায় ৫০০ বছর হলো হরিদাস ঠাকুর শ্রীক্ষেত্রে ধামে বিরাজ করেছিলেন।

এইখানে একটি মন্দিরে হরিদাস ঠাকুরের ছবি

আছে। মনে হয় ঠাকুর ছোট খাট কৃশ মানুষ ছিলেন। ধর্ম্ম মুসলমান বলে মহাপ্রভুর সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের একত্রে থাকা বোধহয় হয়নি।

মহাপ্রভুর ওড়িশা লীলার সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংযুক্ত হলেন চৌটা গোপীনাথ। হরিচণ্ডীসাহিত্যে একটি স্মৃতি মন্দিরে চৌটা গোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত। এটা আমাদের দেখা হয়নি। তেমন দেখা হয়নি সোনার গৌরাজ। মহাপ্রভুর নাকি বার হাজার ভক্ত ছিল ওড়িশায়। বাঙলার এক হুর্দোগের দিনে তাঁর আবির্ভাব কিন্তু জীবনের প্রেত অংশ কাটান এখানে এবং এইখানেই তাঁর মানব দেহ ভগবতী তত্ত্বতে লীন হয়ে যায়।

আমার পুরী অবস্থানকাল শেষ হয়ে এসেছে। এবার ঘরে ফেরার পাল। বাড়িতে আপনজনদের জন্ত রন্ধ-প্রীতির কিছু উপহার কিনতে বেরিয়েছি। খুব সামান্ত সব খুচরো খাচরা সৌখীন ভিনিস। যেমন, শব্দের মালা, শিংএর শিল্পকর্ম, চন্দন কাঠের কোঁটা—এই সব। খোঁজ খবর করতে করতে মনে হলো শ্রীমন্দিরের জন্তই তো অধিকাংশ মানুষ আসেন আর তাঁরাই এই সব কেনা-কাটা করে ওড়িশার অর্থনীতিকে সজীব রাখতে বিপুল সাহায্য করেন। এটা পরোক্ষ প্রভাব। জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদে প্রত্যক্ষভাবে কয়েক সহস্র ব্যক্তির রক্ষা রোজগার হয়। দুই হাজারের মত পাণ্ডাঠাকুর আছেন। রজনশালার একটু বিবরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। সেখানে মোট কর্মচারী এক হাজারের মত হবেন। কথিত হয়, জগন্নাথদেবের ৬ প্রকার সেবক আছেন। দিনরাতের পূজা, ভোগরাগ, বেশবাস পরিবর্তন করানো, স্নান চন্দন মালায় যোগান দেওয়া ইত্যাদি কাজে বহু ব্যক্তির প্রয়োজন। প্রসাদ রান্নার হাঁড়ি, সেজন্ত প্রয়োজনীয় চাল, তরিতরকারী, মসলাপাতি যোগানোর কাজেও বহুমানুষ লিপ্ত থাকেন।

মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত কাড়ুদার, জমাদার, পাইক বরকন্দাজ যেমন দরকার তেমন প্রয়োজন রাজমিস্ত্রী, বিজাল মিস্ত্রী প্রভৃতি। এত বিশাল ও



বিপুলসংখ্যক মন্দিরের কাজকর্ম ঠিকমত করা এক-  
আধজননের কর্ম নয়। হিসাবপত্র রক্ষণাবেক্ষণের ও  
অভ্যন্তরীণ পরিচালনার জন্য কেমনা, হিসাব  
রক্ষক, তহবিলদার। পরিদর্শক ও কর্তা বা ম্যানেজার  
জাতীয় কর্মীর সংখ্যাও নেহাৎ কম হবার কথা নয়।  
এমন কি নৃত্যশিল্পী, গায়ক পাঠক ও কথকদের জন্য নিত্য  
কর্ম নির্দিষ্ট আছে। মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি  
আছে। সেসব দেখা শুনার জন্য নায়ের গোমস্তা  
পাইক বরকন্দাজ দরকার। মন্দির কমিটির বাস  
আছে, অন্য কোন কোন ব্যংসায় আছে কি না  
জানি না। এ জন্যও তো লোকজনের দরকার।  
জগন্নাথ মন্দিরের বার্ষিক আয় প্রায় চার-পাঁচ লক্ষ টাকার  
কিছু বেশি বলে শুনেছি। পূর্ণোক্ত শ্রীক্ষেত্র পুস্তকে  
উল্লেখ আছে, “১১২৫সাল হইতে ১১২৮ সাল পর্যন্ত গড়-  
পড়তা বাৎসরিক আয় ও ব্যয় মোট ৬০, ০০ টাকা  
হইয়াছিল।” ইহা এখন বহুগুণে বেড়েছে তা  
নিঃসংশয়ে বলা যায়। নিজ নিজ অকলে প্রতিটি  
মন্দির সেই অকলের অর্থনীতিও বিপুলভাবে নিয়ন্ত্রণ  
করার শক্তি রাখে। জগন্নাথ মন্দিরের এই দিকটি নিয়ে  
বিশদ আলোচনার অবকাশ আছে।—এ সব ভাবনা  
চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামাবার যোগ্যতা আমার নেই।  
তবে অস্বস্তি করোঁহ, মন্দির-কেন্দ্রিক অর্থনীতিতে,  
টলস্টয় যাকে বলেছেন economics of justice তার  
অভিব্যক্তি ঘটে।

বাড়ি কেয়ার জাগ্রত এসেছে। এখনও অনেক কাজ  
বাঁকি। ঘাঘের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, একটু খনিষ্টাও  
ইতিমধ্যে জমেছে বাবার আগে তাদের সঙ্গে দেখা  
সাক্ষাৎ করতে হবে। সাত সাতটা দিন পুরীতে  
আনন্দে কেটেছে। অপূরণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমুদ্র,  
অবিস্মরণীয় পুরাকীর্তি, দুধর হাপত্য, শ্রীজগন্নাথদেব

সবই দেখবার দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকার পেয়েও পূর্ণ  
পরিভূতি পাচ্ছি না। আমি একলা এসেছি। বার্ষিক  
শিকার হলান না তো? সকলে মিলে যা ভোগ করা  
যায় না তা তো গ্রহণীয় হতে পারে না। জগন্নাথ  
ক্ষেত্রের শিকারও বোধ করি এই : এখানে মিলিত  
ভোগের ব্যবহার দ্বারা এই কথাই ঘোষণা করা হচ্ছে  
না কি? আবার যেন সকলে মিলে আসতে পারি  
জগন্নাথদেবের নিকট এই আকুল প্রার্থনা জানিয়ে  
গৃহান্তিরূপে রওনা হলাম।

পুরী থেকে কলকাতা মাত্র ৩১০ মাইল—এক রাতের  
রেল ভ্রমণ। রেল কর্তৃপক্ষের সুব্যবস্থায় তৃতীয় শ্রেণীর  
যাত্রীরা সামান্য অতিরিক্ত মাণ্ডলে সুশোবার আরগী  
সংরক্ষণ করতে পারেন। সুমোতে যাবেন এবং সুম  
ভাঙলে দেখবেন আপনি কলকাতা পৌঁছে গেছেন।  
কলকাতায় সুম ভাঙলেও আপনার চোখের সামনে  
ভাসতে থাকে শ্রীক্ষেত্র, শ্রীমন্দির আর সমুদ্রের সীমাহীন  
অনন্ত বিস্তৃত উদ্ভাল ফেনিল জলরাশি—দিক্‌চক্রবালের  
শেষে কি আছে তা আপনি অনুমান করতে পারেন—  
কিন্তু নিশ্চয় করে কিছুই বোধ করি জানেন না।  
সেই জানা জানা চেনা চেনা অথচ অজানা অচেনা বা  
আধো জানা আধো চেনা বস্তুর অনির্গচনীয় ও অব্যক্ত  
অক্ষুট আনন্দের দ্বারাই হৃদির প্রথম প্রভাত থেকে  
মাস্থর সজীবিত হয়ে আসছে। আমরাও কোন  
ব্যতিক্রম নই। আমার অস্বস্তি আনন্দের আর এক  
অভিব্যক্তিই তো এই রচনা। আশা করব অনাদিকালে  
সেই আনন্দ পাঠক মনেও পরিব্যাপ্ত হবে। জগন্নাথের  
রথ আপনিই চলে, চলবার জ্ঞান থাক আর নাই থাক,  
কোথায় চলেছে তা জাহুক আর নাই জাহুক, কোনমতে  
যদি একবার মহাকালের সেই ইথে চড়ে বসতে পারি  
তবেই আনন্দলোকে দিক্‌চক্র পৌঁছে যাব আমরা।

# মাতৃভাষায় অর্থশাস্ত্র

দ্বারিদ্র্য লিংহ

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের ধারাবাহিকতার সূত্র স্বরূপ একই পূর্বসূত্রবৃত্তি প্রয়োজন।

সাধারণ পণ্যদ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণে চাহিদা এবং যোগানের ভূমিকা এবং কোন দেশীয় মুদ্রার বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য নির্ধারণে চাহিদা এবং যোগানের ভূমিকা, এই দুই-এর ভুলনা এমনকি সাধারণ পণ্যদ্রব্যাদির অবাধ প্রতিযোগিতা মূলক বাজার (Free Competition) এবং বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রার অবাধ বিনিময়ের বাজার (Free Foreign Exchange Market) এই দুই-এর সামূহ্যের আলোচনা চলিতেছিল। বৈয়াকিক ব্যক্তি-ত্বত্ব) (Economic Individualism) এবং অবাধ উদ্যোগ (Freedom of Enterprise) নীতি স্বীকৃত হইলে কোন পণ্যদ্রব্য অথবা উপকৃতির (service) মূল্য নির্ধারিত হয় “বাজারে” অর্থাৎ একদিকে ক্রেতা অথবা ব্যবহৃত্তা (consumer) এবং অপরদিকে বিক্রেতা অথবা উৎপাদক (producer), এই দুই পক্ষের অবাধ যোগাযোগে এবং পারস্পরিক সম্মতিতে। এইরূপে কোন একটা পণ্যদ্রব্যের অথবা উপকৃতির (service) বাজারের, অর্থাৎ ক্রেতা এবং বিক্রেতার অবাধ যোগাযোগের, একটা আদর্শ অবস্থাকে অর্থশাস্ত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা অথবা পূর্ণ-প্রতিযোগিতা (Free Competition অথবা Perfect Competition) আখ্যা দেওয়া হয়। কোন পণ্যদ্রব্যের বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে ইহার অসংখ্য ক্রেতা এবং অসংখ্য বিক্রেতা থাকিবেন, ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের পরস্পরের মধ্যে অবাধ যোগাযোগ থাকিবে অথচ কোন পক্ষপাতের থাকিবে না, ক্রেতা অথবা বিক্রেতাদের মধ্যে কোন কোটী অথবা মূল্যাদি সম্পর্কে কোন বুঝাপড়া থাকিবে না, বিভিন্ন বিক্রেতার নিজস্ব স্বত্বের মধ্যে বাস্তবিক অথবা কাল্পনিক কোনও

পার্থক্য থাকিবে না, এবং নৈকট্য, আচরণ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে প্রভাবিত হইয়া কোন বিশেষ ক্রেতা কোন বিশেষ বিক্রেতা অথবা তাঁহার পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট অথবা আসক্ত হইবেন না।

এইরূপ একটা ‘আদর্শ অবাধ-প্রতিযোগিতা-মূলক বাজারে কোন পণ্যদ্রব্য অথবা উপকৃতির একটা মাত্র মূল্য থাকিবে। সেই মূল্য স্থির হইবে বাজারে ইহার মোট চাহিদা এবং মোট যোগানের ভিত্তিতে। কোন বিশেষ ক্রেতা অথবা বিক্রেতার পক্ষে তাহা কমানিবার অথবা বাড়াইবার শক্তি নাই। প্রত্যেক ক্রেতা অথবা বিক্রেতা চলিত বাজার-দরটাকে মানিয়া লইয়া নিজের চাহিদা (ক্রয়) অথবা যোগান (বিক্রয়) কমানিতে বাড়াইতে পারেন, এই মাত্র। অর্থাৎ ক্রেতা অথবা বিক্রেতার কেহই মূল্য-নির্ধারক (price maker) নহেন তাঁহারা মূল্যগ্রহণকারক (price taker) মাত্র।

বাস্তব জগতে এইরূপ আদর্শপূর্ণ প্রতিযোগিতা বড় একটা দেখা যায় না। বরং ইহার ব্যতিক্রমই সচরাচর চোখে পড়ে। তবে অর্থশাস্ত্রের তত্ত্বের খাতিরে বাস্তবের কতকগুলি মৌল চারিত্রিক বিশেষত্বকে বাস্তব হইতে বিদ্রষ্ট অথবা বিমূর্ত্ত (abstract) করিয়া একটা কাল্পনিক আদর্শ অথবা “মডেল” (model) তৈরী করা হয়। অবাধ অথবা পূর্ণ প্রতিযোগিতার অর্থশাস্ত্রীয় মডেলটা জানা থাকিলে বাস্তবে কোথায়, কখন, কি কারণে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে এবং ইহার ফল কি দাঁড়ায় তাহা অনুধাবন করা সহজ হয়।

কোন পণ্যদ্রব্য অথবা উপকৃতির বাজারে আদর্শ অবাধ প্রতিযোগিতার যে কোন একটা শর্তের ব্যতিক্রম ঘটিলেই অর্থশাস্ত্রে ইহাকে আখ্যা দেওয়া হয় “অপূর্ণ” অথবা “অসম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা” (Imperfect Compe-

tion)। ইহাকে “ব্যাহত” প্রতিযোগিতাও বলা যায়। যেমন ধরা যাক পণ্যদ্রব্যটির অসংখ্য ক্রেতা এবং অসংখ্য বিক্রেতা আছেন, ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের পরস্পরের মধ্যে অবাধ যোগাযোগ আছে অথচ কোন পক্ষপাতিত্ব নাই, বিভিন্ন বিক্রেতার বিক্রয় পণ্য সম্পূর্ণ অভিন্ন অথবা পরিবর্ত সাপেক্ষ (perfect substitute); এ অবস্থায়ও যদি ক্রেতারা অথবা বিক্রেতারা অথবা উভয় পক্ষ একজোট হন কিংবা ক্রেতাদের অথবা বিক্রেতাদের পরস্পরের মধ্যে মূল্য সম্পর্কে কোন বুঝাপড়া থাকে তবে একচেটিয়া অথবা একায়ত্ত বাজারের (Monopoly) উদ্ভব হইল (অবশ্য এ অবস্থায় ক্রেতাদের সঙ্গে বিক্রেতাদের সমষ্টিগত ভাবে “অবাধ যোগাযোগ” থাকিলেও স্বতন্ত্রভাবে তাহা থাকিতে পারে না)। ক্রেতারা একজোট হইলে হয় “একক্রেতায়ত্ত বাজার” Monopsony; বিক্রেতারা একজোট হইলে হয় “একবিক্রেতায়ত্ত বাজার” (Monopoly); এবং উভয় পক্ষ একজোট হইলে তাহা হয় “উভয়পাক্ষিক অথবা দ্বিপাক্ষিক অথবা দুই তরফা একায়ত্ত বাজার” (Bilateral Monopoly)। বাস্তব জগতে প্রমের বাজারে একদিকে প্রমের নিষেধাজ্ঞা অর্থাৎ ক্রেতা তথা শিল্পপতি, অথবা ক্ষেত্র বিশেষে কোন সরকারী সংস্থা, এবং অপর দিকে প্রমের বিক্রেতা সংঘ-বদ্ধ শ্রমিক (Traded Union), এই দুই পক্ষ প্রায়শঃ এইরূপ উভয়দুখী একায়ত্ত বাজারের সৃষ্টি করেন। একেত্রে “সংঘবদ্ধ শ্রমিক” বলিতে শুধু সাধারণ শ্রমজীবী অথবা “মজুর”দের শ্রমিকসংঘই (Trade Union) বুঝায় না। করণিক, শিক্ষক, অধ্যাপক, অধিকারিক (Officer), বৈমানিক (pilot) চাকুরীরত চিকিৎসক ইত্যাদি বাহ্যিক নিষেধের প্রমের মূল্য অর্থাৎ মাহিনা অথবা মালোহারা নির্দিষ্ট করনের জন্ত একজোট হন তাঁহারা সকলেই এই শ্রেণীতে পড়েন, কারণ অর্থশাস্ত্রে “শ্রম” (Labour, বলিতে শুধু কায়িক শ্রমই বুঝায় না, মূল্য অথবা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বিক্রয় অথবা বিক্রীত মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা মস্তিষ্কের শ্রমও ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়ে “ধন-তান্ত্রিক” অর্থবিজ্ঞানী এবং “সমাজবাদী” অর্থবিজ্ঞানী

উভয়েই একমত বলিয়া মনে হয়। যেমন কাল' মার্কস-এর ভাষায়, “বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজন সাধক শ্রম অথবা উৎপাদন মূলক কার্যাবলীর মধ্যে যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, ইহা একটা শারীর-বিজ্ঞান-সম্মত সত্য (Physiological fact) যে এই সবই মানুষের দেহবৃত্তের ক্রিয়া (functions of human organism) এবং ইহাদের প্রকৃতি অথবা বহিঃপ্রকাশ (nature and form) ঐক্যপূর্ণ হোক না কেন, এরূপ প্রত্যেকটি ক্রিয়াই মানুষের মস্তিষ্ক, স্নায়ু, মাংসপেশী ইত্যাদির প্রয়োগ (expenditure of human brain, nerves, muscles etc.)”। যাহাই হউক, আমাদের আলোচ্য এবং বিবেচ্য এই যে, কোন বিশেষ শ্রেণীর শ্রমের বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলে ইহার অসংখ্য ক্রেতা (অর্থাৎ প্রমের নিষেধাজ্ঞা তথা “মালিক”) এবং অসংখ্য বিক্রেতা (অর্থাৎ “শ্রমিক”) থাকিবেন এবং প্রমের মূল্যের (অর্থাৎ “মজুরী”র) উপর বিশেষ ক্রেতার (মালিকের) অথবা বিশেষ বিক্রেতার (শ্রমিকের) কোন হাত থাকিবে না। সেই মজুরীর হার নির্ধারিত হইবে বাজারে সেই প্রমের মোট যোগান এবং মোট চাহিদার ভিত্তিতে। আবার কোন বিশেষ শ্রেণীর শ্রমের চাহিদা আসিবে বাজারে সেই বিশেষ শ্রম হইতে জাত পণ্য-দ্রব্যের চাহিদা হইতে, তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন পণ্যদ্রব্যের মূল্যের উপরও কোন উৎপাদকের হাত নাই। অতএব প্রমের ক্রেতা অথবা “মালিক” প্রমের বাজার দরের সহিত অর্থাৎ চলতি মজুরীর হারের সহিত (অন্তান্ত আনুমানিক উৎপাদন ব্যয় মিলাইয়া) সেই প্রমজাত দ্রব্যের চলতি বাজার দরের তুলনা করিবেন। যতক্ষণ পণ্যদ্রব্য শ্রমিকের মজুরী (এবং দ্রব্যটির অন্তান্ত আনুমানিক উৎপাদন ব্যয়) সেই প্রমজাত দ্রব্যের চলতি বাজার দরের নীচে থাকিবে ততক্ষণ তাঁহার মুনাফা হইবে। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতায় সেই মুনাফাও বেশী দিন থাকে না। হয় দ্রব্যটির উৎপাদন শিল্প (অর্থাৎ সমষ্টিগত ভাবে উৎপাদক গোষ্ঠী) প্রসারিত হইয়া বাজারে দ্রব্যটির মোট যোগান বাড়িবে এবং মূল্য নামিবে, আর না হয় মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার

দ্বারা প্রমিকদের নিয়োগ প্রণয়িত হইয়া (প্রমের নহিবা বাড়িয়া) মজুরী তথা উৎপাদন ব্যয় বাড়িবে। ফলে শেরপর্ষাদ অভিযুক্ত মুনাফা অর্জিত হইয়া উৎপাদকেরা মোটামুটি ভাবে একটা “স্বাভাবিক মুনাফা” (normal profit) মাত্র পাইবেন, বাহা না পাইলে ব্যবসায় গুটাইয়া কোলিতে হয় এবং যাহাকে উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়।

কিন্তু বাস্তব জগতে মালিকেরা নিজেদের মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতাও করেন তেমনই আবার জোটও বাঁধেন। প্রমিকেরাও তদ্রূপই। এই বিষয়ে আজ হইতে ঠিক দুই শতাব্দী আগে, এবং কাল’ মার্কস-এরও প্রায় এক শতাব্দী আগে, আধুনিক ধর্মবিজ্ঞানের আদি জনক বলিয়া স্বীকৃত অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িতে আজও মল লাগে না। “প্রমিকেরা চাহেন যথাসাধ্য আদায় করিতে, মালিকেরা চাহেন যথাসাধ্য কম দিতে। এক পক্ষ মজুরী বৃদ্ধির জন্য, অল্প পক্ষ মজুরী হ্রাসের জন্য, জোট বাঁধিতে প্রবণ (The workmen desire to get as much, the masters to give as little as possible. The former are disposed to combine in order to raise, the latter in order to lower the wages of labour)। তার পর তিনি বলেন যে মালিকেরা সংখ্যার অল্প বলিয়া অনেক সহজে জোট বাঁধিতে পারেন এবং তাহা ছাড়া (অ্যাডাম স্মিথ-এর আমলে যেদ্রুপ ছিল) আইন মালিকদের এইরূপ জোট বাঁধার স্বীকৃতি দেয়, অন্ততঃ বাধা দেয় না, কিন্তু প্রমিকদের বেলায় বাধা দেয় (The masters, being fewer in number, can combine much more easily; and the law besides, authorises, or at least does not prohibit their combinations, while it prohibits those of the workmen)। অ্যাডাম স্মিথ-এর অভিযোগ এই যে (তাহার সময়ে যেদ্রুপ ছিল) “মজুরী হ্রাসের উদ্দেশ্যে মালিকদের সম্মিলিত হওয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোন বিধান নাই, অথচ

ইহা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হওয়ার বিরুদ্ধে একাধিক আইন আছে (We have no acts of parliament against combining to lower the price of work ; but many against combining to raise it)। অ্যাডাম স্মিথ আরও বলেন যে, মালিক এবং প্রমিকের মধ্যে যদি মজুরী সংক্রান্ত বিসংবাদ উপস্থিত হয় তাহা হইলে কোন পক্ষ যে অপর পক্ষকে সহজে কাবু করিতে পারিবেন তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কারণ “এইরূপ বিবাদে মালিকেরা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কাল চালাইয়া যাইতে পারেন। একজন প্রমিকও নিয়োগ না করিয়া তাঁহারী তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ পুঁজি ধারা হ্রাস বৎসর চালাইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু কাজ না থাকিলে অনেক প্রমিকের এক সপ্তাহও চলে না, এক মাস অথবা এক বৎসরও চলে না”।

তারপর অ্যাডাম স্মিথ বলেন যে, প্রমিকদের জোট বাঁধার কথা খুব ফলাও করিয়া বলা হয় কিন্তু মালিকদের জোটবাঁধার বিষয়ে কেহ বড় একটা উচ্চবাচ্য করেন না। কারণ ইহা এত স্বাভাবিক অথবা নৈমিত্তিক ব্যাপার যে এ বিষয়ে কেহ আলোচনা করে না (because it is the usual, and one may say the natural state of things which nobody ever hears of)।” মালিকেরা সর্বদা এবং সর্বদা প্রমিককে তাঁহার মজুরীর “প্রকৃত হার” অপেক্ষা বেশী না দিবার একটা চিরকালীন অঘোষিত অথবা অপ্রকাশিত শর্তে তলে-তলে জোটবদ্ধ থাকেন (Masters are always and everywhere in a sort of tacit but constant and uniform combination not to raise the wages of labour above their actual rate)। ইহার লক্ষণ প্রতিবেশী এবং সমশ্রেণীরদের নিকট আভিশয় নিলানয়। এমন কি সময় সময় মালিকেরা মজুরীর “প্রকৃত হার” অপেক্ষা তাহা আরও নীচে নামাইয়া দিতেও বিশেষ সূত্রে জোটবদ্ধ হন। এবং তাহা আভিশয় গোপনে। তবে এই ধরনের জোটের বিরুদ্ধে প্রায়ই প্রমিকেরাও আন্দোলন করিয়া পান্টা জোট বাঁধেন (Such combinations,

however, are frequently resisted by a contrary defensive combination of the workmen)। আবার অনেক সময় মালিকেরা তাঁহাদিগকে এভাবে (মজুরী হ্রাসের চক্রান্ত ধারা না) চটাইলেও শ্রমিকেরা নিজে হইতেই তাঁহাদের মজুরী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জোট বাঁধেন (who sometimes too, without any provocation of this kind, combine of their own accord to raise the price of their labour)। সাধারণতঃ তাঁহাদের দাবীর সমর্থনে খুঁজি থাকে কখনও বা খাদ্য দ্রব্যাদির উচ্চ মূল্য, আবার কখনও বা তাঁহাদিগকে খাটাইয়া মালিকের উচ্চ মুনাফাপ্রাপ্তি (their usual pretences are sometimes the high price of provisions, sometimes the great profit which their masters make by their work)। কিন্তু তাঁহাদের জোট আন্দোলনগুলিকে হোক আর আক্রমণগুলিকে হোক ইহার কথা খুবই শোনা যায়। এবং তাঁহাদের দাবীর আশু নিষ্পত্তির জন্য তাঁহারা সর্বদাই অতিশয় সোরগোল (loudest clamour) করেন এবং সায় সময় মর্মস্পর্ষ হিংসারও আশ্রয় নেন (most shocking violence and outrage)। তাঁহারা একরূপ মরিয়ার মত নিরক্ষা এবং মাজাতিরিত ব্যবহার করেন, যেন অবিলম্বে সম্রাসের মুখে মালিককে তাঁহাদের দাবী না মানাইতে পারিলে তাঁহাদিগকে অনাহারে মারিতে হইবে। একরূপ অবস্থায় মালিকেরাও অপরাধকে ভেমনি সোরগোল তুলেন, তারম্বরে শাসকদের সাহায্যের দাবী করেন, আর দাবী করেন কঠিনভাবে সেই সব আইনের প্রয়োগের যে সব আইন পরিচর (servants), শ্রমিক এবং দিন-মজুর কারিগরদের (journeymen) জোট বাঁধার বিরুদ্ধে অতিশয় কঠোরতার সহিত বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। পরিণামে শ্রমিকেরা তাঁহাদের হিংসাত্মক উচ্ছ্বাসসম্বলিত হইতে বিশেষ স্তব্ধ লাভ করেন না। একদিকে বিচারকের হস্তক্ষেপ, এবং মালিকদের অধিকতর টিকিয়া থাকার শক্তি, আর অপরাধকে অধিকাংশ শ্রমিকের পেটের দায়ে আত্মসমর্পণ করার ভাগিদ, এইসব মিলিয়া

শ্রমিকদের জোট হইতে শেষ পর্যন্ত কিছুই ফল হয় না, পালের গোদাদের (ringleaders) শাস্তি এবং নিপাত ছাড়া।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে অ্যাডাম স্মিথ যখন তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থ “বিভিন্ন দেশের জাতীয় সম্পদের মূলাংশ এবং তাহার উৎসাহসম্পাদন” (An Inquiry into the Nature and Causes of the 'Wealth of Nations') এইসব লিখিতেছিলেন তখনও আধুনিক যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব হয় নাই। তখন ইংলণ্ডে আমাদের দেশে যাহাকে বলা হয় কুটির-শিল্প (Cottage Industry) সেইরূপ গৃহস্থ শিল্প ব্যবহার (domestic system) যুগ চলিতেছিল। অর্থাৎ আধুনিক কালে যেমন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই শতাধিক অথবা সহস্রাধিক শ্রমিক নির্যাক্ত কর্মশালা দেখিতে পাওয়া যায়, তখনও ইংলণ্ডে অথবা পৃথিবীর অন্ত কোণায়ও সেসকল কর্মশালা আবির্ভাব ঘটে নাই। পরবর্তী কালে অর্থাৎ অ্যাডাম স্মিথের পঁচাত্তর অথবা একশত বৎসর পরে যখন কার্ল মার্কস শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করিয়া মানব সমাজে ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী-সংঘাত-জনিত বিপ্লব-এর অনিবার্যতা এবং তাহার অবশ্যস্বাভাবী পরিণতি মূলাংশে শ্রেণীহীন সমাজের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পটভূমিকায়। কারণ অ্যাডাম স্মিথ-এর সময় হইতেই অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক হইতে শিল্পের ক্ষেত্রে কতকগুলি যুগান্তকর আবিষ্কার এবং তাহার প্রয়োগের ফলে শিল্প জগতে একটা আমূল পরিবর্তন আসে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অবসান এবং উনবিংশ শতাব্দীর নুতনা হইতে প্রথমে ইংলণ্ডে, এবং তারপর ক্রমে ফ্রান্স, জার্মানী, রুশিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি পাক্ষাত্য দেশে, এবং মূদুর প্রাচ্যের জাপানে সংঘটিত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও সংঘটিত শিল্পজগতের এই আমূল পরিবর্তনকে অর্থ-নৈতিক ইতিহাসে “শিল্প-বিপ্লব” (Industrial Revolution) আখ্যা দেওয়া হয়। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের প্রথম

দরম্মে, দ্বীপ জমজুতি জার্মানী হইতে নির্কাসিত, প্রতিবেশী রাষ্ট্র করাসী হইতে আশ্রয়চ্যুত, অক্লান্তকর্মী মহামনীষী কার্ল মার্কস ইংলণ্ডের মাটিতে আশ্রয় লইয়া, চরম অনটনের মধ্যে চির সহকর্মী অক্লান্ত বন্ধু ফ্রেডরিক এঙ্গেলস (Frederick Engels)-এর সাহায্যে মাত্র সঞ্চল করিয়া, একদিকে তথাকার নবোদ্ভূত শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান স্বতন্ত্রমোক্ষণ ও হুঃখহর্ষণা, অপরদিকে নবোদ্ভূত মালিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান ক্ষীতি এবং সমৃদ্ধির নিদান বিশ্লেষণে ব্রিটিশ মিউজিয়াম (British Museum)-এর প্রদর্শনীর আলোচনা উদ্যোগ অধ্যয়ন এবং গবেষণা পূর্বক অ্যাডাম স্মিথের ঠিক এক শতাব্দী পর আরেক-খানি যুগান্তকারী অর্থশাস্ত্র গ্রন্থ (ক্যাপিটেল) প্রণয়ন করেন। তারপর আর একশত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে শিল্পবিপ্লবের গতি অব্যাহত রহিয়াছে অথবা ত্বরিততর হইয়াছে। কার্ল মার্কসের স্বত্বকে হাতিয়ার করিয়া, এবং তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীকে অংশতঃ ব্যর্থ এবং অংশতঃ সার্থক করিয়া অপেক্ষাকৃত ক্রটিগ্রস্ত সমাজতন্ত্রিতে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটয়া শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এবং তথায় অত্যন্তকালের মধ্যে এমন সব বিশ্বয়কর শিল্প-বিপ্লব ঘটিতেছে যাহা সম্ভবতঃ কার্ল মার্কস-এরও কল্পনাতীত ছিল। অপরদিকে এই মার্কস-বাদেই ক্রমবর্ধমান এবং সর্বপ্রাসী প্রভাবে বিচলিত ধনতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রিতেও রাষ্ট্রের প্রত্যেক হস্তক্ষেপে শ্রমিক শ্রেণীর বৈষয়িক ক্রমোন্নতি ঘটিতেছে, সেই মার্কসবাদকেই বানচাল করিতে। তবে শিল্পবিপ্লবের প্রথমযুগে কার্ল মার্কস শ্রমিক মালিক সম্পর্কের পারিপ্ৰেক্ষিতে যে শ্রেণী-সংঘাতের তত্ত্ব প্রচার করিয়া-ছিলেন, এবং আধুনিককালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের চরম শিল্পোন্নতির যুগে “সমৃদ্ধিশীল সমাজ”-এর (Affluent Society) শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের পর্যালোচনা করিয়া তথাকার অর্থনীতিবিদ জন গলব্রেথ (John Galbraith) মালিক-শ্রমিক জোটের (monopoly) ঐক্যকে শ্রমিকশ্রেণী জোটকে যে একটা “প্রতিরোধ শক্তি” (“countervailing power”) আখ্যা দিবে একটা

নূতন তত্ত্ব (Theory of Countervailing Power) দিয়াছেন, এই উত্তরের মধ্যেই আমরা “বুদ্ধোদয়” অর্থশাস্ত্রের আদি জনক অ্যাডাম স্মিথ-এর উপরি উদ্ধৃত উক্তিগুলির হুবহু প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। অভ্যর্থ দেখা যায় যে শ্রমিক এবং মালিকের, তথা শ্রম এবং মূলধনের পারস্পরিক সম্পর্ক—ইহাদের সহযোগিতা অথবা সংঘাত, মিলন অথবা বিচ্ছেদ, সন্ধি অথবা বিগ্রহ—অর্থশাস্ত্রকারদের নিকট নেহাতই একটা আধুনিক যুগের অভিনব সমস্যা নয়; বরী না হোক অস্বতঃ দুইশত বছরের সমস্যা (মার্কসের মতে শ্রেণী সংঘাতই মানব ইতিহাসের সনাতন এবং চিরন্তন সত্য)। তবে আধুনিক জগতে এই সমস্যাটা হয়ত একটু বেশী প্রকট হইয়াছে মার্কস-বাদেই প্রভাবে। বাহাই হউক, এই সমস্যাটি সম্যক না বুঝিতে পারিলে বৈষয়িক সমাজ সংগঠনের প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যায় না: “ধনতান্ত্রিক” “সমাজতান্ত্রিক” অথবা “সঙ্কর” অর্থাৎ “মিশ্র” (mixed) কোন “অর্থনীতি” (economic policy) সম্পর্কেই কোন মন্তব্য করা যায় না। ফলে অর্থশাস্ত্রও অর্থহীন, বন্ধ্য এবং নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়। অথচ ইহা বুঝিতে যাওয়ার পথও খুব অগম্য নয়। কারণ আমরা স্থূল-কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অর্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করি তাহা মূলতঃ ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের “ধনতান্ত্রিক” সমাজ তান্ত্রিক অর্থশাস্ত্র, এবং তথাকার স্থূল-কলেজেরই পাঠ্য। আবার আমরা রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে “সমাজতান্ত্রিক” নীতি অনুসরণ করিতে চাই সেই “সমাজতান্ত্রিক অর্থশাস্ত্রও” আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার সুযোগ নাই। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আমরা নামজুর করিয়া দিয়াছি, আবার প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রসব বেদনাও আমরা সহ করিতে নারাজ। এই প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ কবির লেখা হইতে একটা উদ্ধৃতি মনে পড়ে। কোন্ প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছিলেন, তাহা সাক্ষ্য-বাস্তবিকেরই বলিতে পারিবেন। তবে আক্ষরিক অর্থে আমাদের অবস্থার সঙ্গে বেশ মিলিয়া যায়। আমরা যেন দুইটা জগতের মাঝখানে বিচরণ করিতেছি, একটা বিগত,

আরেকটি অনাগত এবং হরত বা অসত্যাব্য (‘Wandering between two worlds, one dead, the other powerless to be born.’)।

বাহাই হোক, আমরা আমাদের সীমিত জ্ঞানের আলোকে অন্ততঃ অর্থশাস্ত্রের মূল তত্ত্বগুলিকে মার্কসীয় সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে যথাসাধ্য দেখিতে চেষ্টা করিব। একথা মনে রাখা দরকার যে পাশ্চাত্য “ধনতাত্ত্বিক” সমাজে অনুসৃত অর্থশাস্ত্রকে মার্কস-এঙ্গেলস প্রবর্তিত “বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী” অর্থশাস্ত্রে “বুদ্ধেরা অর্থশাস্ত্র” আখ্যা দেওয়া হইলেও এবং শেষোক্ত অর্থশাস্ত্রটি প্রথমোক্ত অর্থশাস্ত্রের নিষ্ঠুর কশাঘাত মূলক সমালোচনা হইতে উদ্ধৃত হইলেও মূলতঃ উহার উদ্দেশ্যেই একই “সনাতন” অথবা “আদি” অর্থশাস্ত্রের (Classical Economics) ঐতিহ্যবাহী। এবং অ্যাডাম স্মিথই ইহার আদি প্রবক্তা। তবে মার্কস-এর দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব এই যে, তিনি মানুষের বৈষয়িক এবং যাবতীয় সামাজিক সমাজকে ঐতিহাসিক সমাজ বিবর্তন-এর (historical evolution) পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করিতে প্রয়াসী। আমাদের পক্ষেও “শ্রম” “মূলধন” ইত্যাদি শব্দের প্রকৃত অর্থশাস্ত্রীয় তাৎপর্য বুঝিতে হইলে ইহাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার পর্যালোচনা অপরিহার্য।

অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) এর আমলে চার্লস ডার্কইন (১৮০৯-১৮৮২)-এর জৈববিবর্তন বাদ (Theory of Organic Evolution) তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে নাই। কারণ ডার্কইন আসিয়ারাডিলেন অ্যাডাম স্মিথ-এর পরে। কিন্তু তিনি ছিলেন কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮০)-এর সমসাময়িক। মার্কস এবং এঙ্গেলস যখন তাঁহাদের রচিত বিবর্তনশাস্ত্র এবং যুগান্তকারী “কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টোতে” (১৮৪৮) ঐতিহাসিক সমাজবিবর্তনে শ্রেণী সংগ্রামের ভূমিকার কথা প্রচার করিতেছিলেন, ঠিক ঐ সময়েই (১৮৫৯) চার্লস ডার্কইন (Charles Darwin) জীবজগতের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে তাঁহার তথ্যবহুল প্রামাণ্য গ্রন্থ “প্রকৃতির নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন

শ্রেণীর প্রাণীর উদ্ভব” (The Origin of Species by means of Natural Selection) অথবা “জীবন সংগ্রামে নির্বাচিতের অথবা যোগ্যত্বের উত্তরণ” (Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life) প্রকাশিত করেন। উক্ত গ্রন্থে মানব সমাজের উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের অলৌকিক কাহিনীর স্থলে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত একটা বৃত্তিভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রচারিত হওয়ার মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁহাদের কল্পনা-ভিত্তিক ভাববাদ (Idealism)-বিরোধী এবং বিজ্ঞান-সম্মত বাস্তববাদ (materialism)-এর একটা চমৎকার সমর্থন পাইয়া তাহা সাদরে গ্রহণ করেন। এবং যতাবতঃই মার্কস-এঙ্গেলস গ্রন্থ “বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী”র ডার্কইনের জৈব বিবর্তনবাদ তত্ত্বকে আরও আগাইয়া লইয়া মানুষের সমাজবিবর্তন-এর সহিত যুক্ত করিয়া একটা ধারাবাহিক বিবর্তনের চিত্র আঁকিতে সক্ষম হন। আমরাও যদি এই দৃষ্টিকোণ হইতেই দেখিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে “শ্রম” (labour) “মূলধন” (capital), “প্রাকৃতিক সম্পদ” (যাহাকে অর্থশাস্ত্রে “land” আখ্যা দেওয়া হয়) ইত্যাদি মৌলিক অর্থশাস্ত্রীয় শব্দগুলির প্রকৃত সংজ্ঞা এবং তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, এবং বৈষয়িক সমাজ সংগঠনে ইহাদের প্রকৃত ভূমিকা, ইত্যাদি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে পারি।

বিজ্ঞান-ভিত্তিক অল্পমান অল্পসারে পৃথিবীতে সর্ব প্রথম জীবের আবির্ভাব ঘটে ছই শত কোটি বৎসর আগে অথচ প্রমাণ অল্পসারে ছই লক্ষ বৎসর আগেও “মানুষ”-এর আবির্ভাব ঘটে নাই। প্রথমে আবির্ভূত আদি মূত্র আনুবীক্ষণিক অথবা আনুবীক্ষণাতীত প্রাণীগুলি শতাধিক কোটি বৎসরে পৃথিবীর আবহাওয়ার বিচিত্র পরিবর্তন এবং য য প্রাণিপার্বিক অবস্থার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া বাঁচিয়া থাকার স্বাভাবিক জৈব প্রবণতাজাত সংগ্রামের মধ্য দিয়া বিভিন্ন শাখার রূপান্তরিত তথা বিবর্তিত হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ বিচিত্র উদ্ভিদ এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ জলচর উভচর জু-চর খে-চর ইত্যাদি

বিচিত্র প্রাণিতে পরিণত হইয়াছে এবং হইতেছে। আবার অনেক বিশৃঙ্খল হইয়াছে। তদ্ব্যতীত এক প্রাণীর চতুর্দশ প্রাণী হয় সাত কোটি বৎসর আগে বৃক্ষোপরি আশ্রয় লাভ করেন এবং ক্রমে শাখাযুগে পরিণত হন। বৃক্ষশাখা অবলম্বনে চলাফেরা এবং গাছের ডালপালাদি আঁকড়াইয়া ধরিয়া ভারসাম্য রক্ষা, অথবা সময় সময় লম্বমান তাবে ঝুলা, ইত্যাদিতে অভ্যস্ত হওয়ার সমুদয় পদবুগল বাহ্যতে পরিণত হয়, মণিবন্ধ সবল হয়, খাবার অঙ্গুলীভাল সূক্ষ্ম এবং পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। কলে তাঁহারা হস্তধারা আহার্যাদি আহরণ করিয়া মুখে দিতে, গাছের ডাল অথবা প্রস্তরাদি ধরিতে, ভুলিতে, সকালন করিতে, এমন কি দূরে নিক্ষেপ করিতেও সমর্থ হন। এইরূপ শাখাযুগের একটি বিলাসুল শাখা (apes) সম্ভবতঃ দুই কোটি বৎসর আগে বৃক্ষোপরি পরিত্যাগপূর্বক ভূমিতে অবতরণ করেন, অথবা বৃক্ষোপরে থাকিয়াও প্রায়শঃ ভূমিতে অবতরণ করিতে বাধ্য হন। যেমন, মনে করা যাক যে, জলবায়ুর পরিবর্তনে অরণ্য বিরল হইয়া আসায় বৃক্ষোপরি থাকিয়াই বৃক্ষশাখা অবলম্বনে রক্ষা হইতে বৃক্ষোপরে গমনাগমন অসম্ভব হইল। এই অবস্থায় আহার্যাদির সন্ধানে বাধ্য হইয়াই ভূমিতে অবতরণ করিতে হয়। এই সব শাখাযুগের সম্ভাব্যতাই ভূপৃষ্ঠের উপরও সমুদয় দুইটি-বাহ এবং পেছনের দুইটি পা এই চারটি অঙ্গের সাহায্যেই গমনাগমন করিতে থাকেন। তাঁহাদের উত্তর-পূর্বদিকের অনেক আঁকড়া সেরূপ ভাবেই চলাফেরা করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু প্রায় বিশ লক্ষ বৎসর আগে ইহাদেরই একটা শাখা সমুদয় দুইটি বাহকে প্রধানতঃ আহার্য আহরণ, শত্রু হনন, আশ্রয়কা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত রাখেন আর পেছনের দুই পটকে প্রধানতঃ দেহভার বহনের কাজে নিয়োজিত রাখেন। চারিটা অঙ্গের হলে দুইটা অঙ্গের উপর দেহভার ধারণের দায়িত্ব পড়ায়, অর্থাৎ ইহাদের দায়িত্ব বিগলিত হওয়ার সম্ভাব্যতাই ইহাদের আকৃতিও তদনুরূপ বারিভূতে থাকে। পক্ষান্তরে দেহভার বহনের দায়িত্ব মুক্ত হইয়া বাহবয়ের দক্ষতা এবং ক্রিপ্রভা বারিভূতা ইহারা জীবন সংগ্রামে বিশেষ সহায়ক হইল। কাঁঠখণ্ড অথবা প্রস্তরাদি ছলিয়া লইয়া

তাঁহা আঘাতে একদিকে যেমন অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রাণী শিকার সহজ হইল, অপরদিকে তেমনি নিরাপদ দূরত্ব হইতে নিক্ষেপ আঘাতে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী জীবেরও হমন সম্ভব হইল। তা ছাড়া বিপদে বৃক্ষোপরি ত আছেই। ক্রমে তাঁহারা লক্ষ লক্ষ বৎসরের অভ্যাসের কলে ভূপৃষ্ঠের উপর শুধুমাত্র পশ্চাতের দুইটি পায়ের উপর ভর করিয়া থাঙ্গু ভাবে দাঁড়াইতে, হাঁটিতে এবং দৌড়াইতেও সমর্থ হইলেন।

এইরূপে বিপদে পরিণত চতুর্দশ জীবেরা সম্ভবতঃ বেশ কয়েক লক্ষ বৎসর কাঁঠখণ্ড প্রস্তরাদি দলবদ্ধ দেহাতিবিকৃত প্রত্যঙ্গের (extracorporeal limbs) সাহায্যে আশ্রয়কা এবং আত্মরক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত রহিলেন। জীবন সংগ্রামে সচেতন ভাবে হস্তের এবং অঙ্গের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভাব্যতাই মস্তিষ্কের তথা বুদ্ধিবৃত্তিরও প্রসার ঘটিতে লাগিল। প্রকৃতিজাত কল হুলের সহিত মস্তিষ্ক মাংস সর্বাঙ্গাদি প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের সমাবেশও মস্তিষ্কের পুষ্টিসাধনে বিশেষ সহায়ক হইয়া থাকিবে। বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত অস্ত্রাদি নির্মাচন, এমন কি প্রকৃতিতে দাতাবিক ভাবে লভ্য কাঁঠখণ্ড প্রস্তরাদির হলে সচেতন ভাবে প্রস্তরাদি ভাঙ্গিয়া প্রয়োজনানুরূপ আকৃতি দিয়া উপযুক্ত অস্ত্র প্রস্তুত করা যায়। সম্ভাব্যতাই ফলমূল্যাহারী শাখাযুগের তীক্ষ্ণ নখদন্ত থাকে না। অতএব তাঁহাদেরও ছিল না। কিন্তু এই অভাবের পরিপূরক স্বরূপ খণ্ডিত প্রস্তরের তীক্ষ্ণ অস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া তাঁহারা সিংহ-ব্যাঘ্রাদি তীক্ষ্ণ-দন্ত-নখবাহু জীবের সহিতও সংগ্রাম করিয়া উত্তরোত্তর অস্ত্রাস্ত্র প্রাণীর উপর প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হন।

শিকার অথবা আশ্রয়কার প্রয়োজনে দলবদ্ধ ভাবে বাস করিতে হয়। এ অবস্থায় একের অস্ত্রের সহিত তাবের বিনিময় অপরিহার্য। অস্ত্রাস্ত্র পশুপক্ষীও বন্যজীবের সহিত একত্র থাকিলে ভীতি হইয়াই বাগ অস্ত্রধারণ বেদনা ঘোষণা প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ ধ্বনি অথবা অজ্ঞতঙ্গী দ্বারা তাহা ব্যক্ত করে। তবে



তাহাদের কণ্ঠস্বরে খুব বেশী একটা বৈচিত্র্য থাকে না। অতএব তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিবার শক্তি সীমাবদ্ধ এবং তাহাদের প্রয়োজনও সীমিত। কিন্তু সচেতন ভাবে অল্প ব্যবহারকারী বিশদ প্রাণীদের বাঁচিয়া থাকার কলাকৌশল যতই বাড়িতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিরও বিকাশ হইতে লাগিল, তাহা বিনিময়ের প্রয়োজনও ততই বাড়িতে লাগিল। বিভিন্ন পরিচিত বস্তুর নামকরণ করিতে হইবে, নাম শুনিলেই নামীয় বস্তুটির একটা চিত্র মনস্কক্ষে উদ্ভিত হইবে; ইহাতে চক্ষু, কণ্ঠ এবং মন অর্থাৎ যান্ত্রিক অথবা দ্বিতীয়ার্থ, এই তিনের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কোন অল্প প্রস্তুত করিবার অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাসলব্ধ পদ্ধতি অপরকে শিখাইতে হইবে, অপরের নিকট শিখিতে হইবে, এবং পুরুষপরিম্পরায় সেই শিক্ষা সফলিত করিতে হইবে; এই সব অপরিহার্য্য প্রয়োজনে তাহা বিনিময়স্বার্থে ক্রমে অর্থাৎ সহস্র সহস্র বৎসরের অভ্যাস-এর ফলে কণ্ঠস্থ স-তার নরময় (larynx), জিহ্বা, মুখ-গহ্বরাদির প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তন সাধিত হইয়া তাহা প্রকাশের চেষ্টা অজ্ঞাত প্রাণীর মত একটানা অথবা বৈচিত্র্যহীন ধ্বনিমাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া, প্রশস্ত মুখগহ্বরে সফরক্ষম জিহ্বা, অধঃগোষ্ঠ, দন্ত, মুখ, তালু ইহাদের পারস্পরিক সংস্পর্শে বিচিত্র খণ্ডিত ধ্বনিময় ভাষার (articulate speech) উদ্ভব হইল।

যে কোন প্রত্যঙ্গ (limb) ক্রমাগত একই কাজে সার্থক-ভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকিলে পুরুষপরিম্পরায় ইহার প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তন সাধিত হয়। পক্ষান্তরে কোন প্রত্যঙ্গের সার্থক ব্যবহার না থাকিলে ইহা ক্রমে ক্ষয়িমাণ হইয়া একেবারে বেমাণ্য বিলুপ্তও হইয়া বাইতে

পারে। বৃক্ষাশ্রয়ী শাখাশূন্যদের গাছের ডালশালা আঁকড়াইয়া ধরিতে, হাত এবং পা এই উভয় প্রত্যঙ্গই ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া এই উভয়েরই অঙ্গুলীগুলি দীর্ঘ হয় কিন্তু ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল বিশদ প্রাণীদের সেসকল প্রয়োজন না থাকায় পদস্বরের অঙ্গুলীগুলি ক্রমে ক্ষুদ্র অর্থাৎ ছোট হইয়া গেল। পক্ষান্তরে অস্ত্রাদি ব্যবহার অথবা নির্মাণ-এ হাত দুইটি ক্রমে সূক্ষ্মতর এবং জটিলতর কার্য্যে নিয়োজিত থাকায় হস্তাঙ্গুলীগুলি উত্তরোত্তর অধিকতর সকালনক্ষম হইল। আর সর্দাপেক্ষা উত্তরোত্তরোপায় পরিবর্তন হইল এই যে অঙ্গুষ্ঠ অর্থাৎ বৃক্ষাঙ্গুলীটি অজ্ঞাত অঙ্গুলী হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহাদের বিপরীত দিকে অপসারিত হইল। ফলে একদিকে বৃক্ষাঙ্গুলী এবং অপরদিকে অজ্ঞাত অঙ্গুলী বিশেষতঃ তর্জনী এই দুই-এর সাহায্যে কোন সূক্ষ্ম বস্তুকে চিমটার ভাৱ ধরা যায়। শোনা যায় যে ইংরেজ বণিকরা এদেশের তাঁতশিল্প নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তত্ত্বাবধায়কের অঙ্গুষ্ঠটি কাটিয়া দিতেন। জৈব (অথবা “মানবীয়”) বিবর্তনে বুড়ো আঙ্গুলটির এই গুরুত্ব যে-ভাঙির বণিক সম্প্রদায় এমন চমৎকার ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন সেই জাতির বৈবয়িক সন্মুখি কে কল্পিতে পারে?

\* এখানে স্মরণীয় যে শ্রমের বাজারে মালিক শ্রেণীর জোটকে “monopsony” (এক ক্রেতারত্ব বাজার) এবং শ্রমিক শ্রেণীর জোটকে “monopoly” (এক বিক্রেতারত্ব বাজার) বলাই, ঠিক এবং এই দুই-এর মিশ্রণ অথবা “সহাবস্থান”কে বালিতে হয় bilateral monopoly (উভয় তরফা একায়ত্ব বাজার)।

# সহজ শোভন এবং কষ্টকল্পিত জাতীয় ভাব

দিকেননাথ ঠাকুর

হায়! “জাতীয় ভাব” আমাদের দেশে মত একটা সাধনার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজ হইবার জন্ত কোনো ইংরাজকে সাধ্যসাধনা করিতে হয় না; ফরাসী হইবার জন্ত কোনো ফরাসীকে সাধ্যসাধনা করিতে হয় না; জৰ্মান হইবার জন্ত কোনো জৰ্মানকে সাধ্যসাধনা করিতে হয় না; অথচ ইংরাজ না হওয়া ইংরাজের পক্ষে মুহূর্ত্তলা; ফরাসী না হওয়া ফরাসীসের পক্ষে তথৈব। ইংরাজ যেমন জানে “আমি আমি” তেঁরি জানি “আমি ইংরাজ”; ফরাসী যেমন জানে “আমি আমি” তেঁরি জানে “আমি ফরাসী”; জৰ্মান যেমন জানে “আমি আমি” তেঁমনি জানে “আমি জৰ্মান”। গর্গের সহিত জানে—লক্ষ্যের সহিত নহে। ইহাদের জাতীয় ভাব সাধনার কোনো অপেক্ষা রাখে না। সত্য জাতি যাদেরই প্রধানতম সাধনার বিষয়—সত্য, জ্ঞান, ধর্ম, এই সকল উচ্চ সামগ্রী। স্বজাতি স্বসত্যজাতি যাদেরই অমরমূল্য ধরাও সামগ্রী। কিন্তু আমরা তাহা বুঝি না, বুঝিবার মধ্যে আমরা বুঝি অকেন্দ্র তর্কবিতর্ক।

## তর্কের নমুনা

ইংরাজেরা চীনদেশীয় চিকণ সুগন্ধ্য ব্যবহার করে, ইহা কাহারো আবিষ্কৃত নাই; অতএব প্রমাণ হইল যে, তাহাদের জাতীয় ভাব কেবল একটা কথাই কথা।

রামমোহন রায় চেয়ারে বসিতেন, টেবিলে লিখন-পঠনাদি করিতেন;—আবার তাহাজে চীড়িয়া

বিলতি গিয়াছিলেন; অতএব প্রমাণ হইল যে, তাঁহার জাতীয় ভাবের গোড়ায় গলদ।

এইরূপ খাঁচার স্তায়শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্ক নব্ব্বীপের তর্কালঙ্কারদিগকেই পোতা পায়। বলিতে কি—উহার বেষ্মরো এবং বেতলা চীৎকার-ধ্বনিতে আমার গায়ে জর আসে। জাতীয় ভাব ভাল জিনিস খুবই; কিন্তু তাহা সত্বেও—যে জাতীয়ভাব চীন-দেশীয় সুগন্ধ্য ব্যবহার করিলেই চীনকে আক্রান্ত হইয়া পড়ে; এবং চেয়ারে বসিলেই বা টেবিলে ভোজন করিলেই ইংরাজকে আক্রান্ত হইয়া পড়ে সেরূপ মূল-কুমার জাতীয় ভাব যাত্রার সড়্, বই আর কিছুই নয়। ইংরাজেরা চীন পাত্রই ব্যবহার করুন, আর ইংরাজ মহিলারা কাশ্মীর শালই পরিধান করুন—বাহাই করুন না কেন—ইংরাজ ইংরাজই। ইংরাজেরা চীন দেশীয় চিকণ সুগন্ধ্য ব্যবহার করে সত্য; কিন্তু কি ভাবে ব্যবহার করে? আমাদের এই গরম দেশে নব্য চতুর শ্রোতে গা ঢালিয়া আমরা বেতাবে আঁটসাঁটি ইংরাজি পাবল্ছ পরিয়া ইংরাজ সাজি সেই ভাবে কি? অথবা, যে দেশেরই ভাল জিনিস হউক না, যদেশে তাহার উচিত মত ব্যবহার চালানো ভাল বই মন্দ নহে—এই ভাবে? মনের ভাবই আসল জিনিস। রামমোহন রায় তো বাইবেল না পাঁড়িয়াছিলেন এমন নহে; কোরাণ তো তাঁহার কর্তব্য ছিল। তবে কেন তিনি বেদোপনিষদকে দেশের সর্বোচ্চ প্রধান আসনে বসাইবার জন্ত পীরজম বতদূর করিতে হয় করিয়াছিলেন?

ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, জাতীয় ভাব  
তাঁহার প্রাণের সামিল ছিল।

বিভাসাগর মহাশয় চেম্বারে বসিতেন। টেবিলের  
উপরে ভর হাপন করিয়া চিঠিপত্র লিখিতেন এবং ইংরাজি  
পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন বলিয়া কিছু আর তাঁহার জ্ঞাত  
যায় নাই; অবশ্য, টোলীয় জ্ঞানশাস্ত্রের বিধান মতে তাঁর  
ঐক্যপূর্ণ কার্য বিজাতীয় বিজাতীয় ভাবের পরিচায়ক।  
কিন্তু অর্কপকাননেরা যিনি যাহা বলুন না কেন, তেজস্বী  
ব্রাহ্মণ মহাশয়টির ভট্টাচার্য্যধরনের বেশ দেখিলে—এবং  
নির্ভীক সোকা ভাবের কথাবার্তা শুনিলে—বজাতীয়  
ভাব যে কিরূপ তাঁহার প্রাণগত অন্তরের সামগ্রী ছিল  
তাহা কাহারো জানিতে বিলম্ব হইত না। প্রকৃত কথা  
এই যে, জাতীয় ভাব অলৌকিক বাক্যাড়ম্বরের সামগ্রীও  
নহে—কঠোর সাধনার সামগ্রীও নহে; তাহা সহস্র  
অন্তঃকরণের একটি সহজ শোভন ভাব। তাহা গাঁহার  
আছে তাঁহার আছে; গাঁহার নাই তাঁহার অন্তঃ-

করণের মরুভূমি হইতে তাহা কোর করিয়া কলাইয়া  
তোলা অসম্ভব। আমি তাই বলি যে, “জাতীয় ভাব”  
কথাটা বড় একটা গোলমালে কথা—ও কথাটা তুলিয়া  
যাওয়াই আমাদের পক্ষে প্রেরণকর। অন্ততঃ কিছু দিনের  
জন্ত জাতীয় ভাবের ধবলা ওড়ানো কার্য হ্রাসিত রাখা  
হউক, তাহার পরিবর্তে আমাদের স্বজাতির বাহা প্রকৃত  
গৌরবের বিষয় তাহার যতদূর পারা যায় নটোকার  
করিয়া তাহার সারাংশ কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা  
করা হউক—কেন না তাহার মধ্যে সত্য আছে, জ্ঞান  
আছে, ধর্ম আছে, মহাব্যব আছে—আর এই সকল পরম  
ধনই সাধনার বিষয়; এইগুলিকে আগাইয়া তুলিলেই  
সেই সঙ্গে জাতীয় ভাব আপনা আপনিই জাগিয়া  
উঠিবে—বুহুং বুহুং একেজো বাক্যাড়ম্বরে পুঁথি পুঁথি  
হইবে না।

প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩১৬।



# স্বকার জন্ম

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মৰ্ত্য হইতে পকাশকোটি যোজন উর্ধ্বে ধূম্রলোক :-  
সেখানকার সবই বাষ্পময়, - বায়ু, বাষ্পপূর্ণ, সাগর সারিৎ  
সরোবর বাষ্পে ভরা, পৰ্ব্বত কেবল বাষ্পতুপ মাত্র, পশু  
পক্ষী কীটপতঙ্গ সকলে বাষ্পাকারে বিরাজ করিতেছে।  
সেই ধূম্রলোকে একদিন মহা কোলাহল শোনা গেল।

তখন বর্গের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বকর্মার সাহায্যে  
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন এক রকম শেষ হইয়াছে—মাথার  
ভিতর বা' বা' প্রান ছিল, জল, মাটি, ইট, কাঠ, চূণ, স্তম্ভ,  
পাথর প্রভৃতির সমষ্টিতে তা' সবই মুক্তিমান হইয়া  
উঠিয়াছে। এইবার ব্রহ্মা নাকে সর্ষপ তৈল দিয়া বহু  
অনিষ্ট রজনীর শোধ তুলিবেন মনে করিতেছেন, কিন্তু  
তা'হা ঘটয়া উঠিল না।

ধূম্রলোকবাসী ধূমপায়ীগণ সেদিন ধূমধামের সহিত  
এক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন;—সর্বত্র তাম্রকটপজে  
ছাপা বিজ্ঞাপন বিলি করিয়া ধূমপায়ীর দল একত্র করা  
হইয়াছে;—নানা তাম্রকটাপার সমন্বিত, দুমকেতু-  
ধ্বজমাণ্ডল সভাঙ্গল জনসমাগমে গম্গম্ করিতেছে,  
গঞ্জিকা-ধূপে ও চরস-রসে সভাগৃহ আয়োজিত। সেদিন  
সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—“ধূমপায়ীর কষ্ট নিবারণ।”

যথানিয়মে হাততালির চটপট পটাপট শব্দে  
মনোনীত হইয়া সভাপতি আসন গ্রহণ করিলেন।  
সভার সম্পাদক প্রোক্তাদিগের হাতে হাতে তাম্রকটপজে  
ছাপা রেজোল্যুশনের অহুলাপি বাঁটিয়া, দিলেন,—  
হাততালির শব্দ মিলাইতে না মিলাইতে চতুর্দিকে  
তাম্রকটপজ নাড়ার একটা ধ্বংস শব্দ উঠিল।

প্রথম বক্তা দাঁড়াইয়া উঠিয়া যুগের সমুখে  
রেজোল্যুশন পত্রখানি ধরিয়া ছাপার হরকে লেখা সভার  
প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন:—“ধূমপানের নিষিদ্ধ কোন নয়

সৃষ্টি না হওয়ার সমস্ত ধূমসেবীগণ বহুবিধ অসুবিধা ভোগ  
করিতেছেন, এবং এই অসুবিধা দূরীভূত না হইলে  
ধূমপায়ীর সংখ্যা দ্রুতর হইয়া শীঘ্রই একেবারে নির্লিপ  
প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। তজ্জন্ত আমরা সমস্ত  
ধূমগ্রাহী একত্র হইয়া এককণ্ঠে ব্রহ্মার সদনে আবেদন  
করিতেছি যে, তিনি ইহার কোন উপায় বিধান করুন;  
এই সঙ্গে তাঁহাকে জানান হউক যে, পূর্বেও কারণে  
ইতিমধ্যে ১১১ জন ধূম্রলোক ত্যাগ করিয়াছেন।”

প্রস্তাবপাঠ শেষহইলোঁতিম ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা  
আরম্ভ করিলেন,—“ধূম্রলোচন সভাপতি মহাশয় ও  
ধূম্রলোকবাসী ভাইসকল। কেহই অপরিজ্ঞাত মহেন যে  
ইন্দ্রাদি দেব যেমন জ্যোতিতে পরিপুষ্ট, মানবজাতি যেমন  
অগ্নে পরিবর্জিত, তেমনি ধূম্রলোকবাসী যে আমরা,  
আমাদের এই বাষ্পদেহ প্রচুর ধূম-ধূমায়িত না হইলে  
একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। হবিষানল যেমন  
দেবজাদিগের, শাকার যেমন মানবজাদিগের, তেমনি বর্গ ও  
মর্ত্যের মধ্যবর্তী ধূম্রলোকবাসী আমাদের এই যে না-  
মানব-না-দেব দেহ, ইহার সংগঠনে ধূম যে নিত্যক  
আবশ্যক এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না।  
কালিদাস তাঁহার মেঘদূতে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে,  
ধূমজ্যোতি সম্মিশ্রণে আমাদের এই বিপুল দেহ গঠিত  
হইয়াছে; এই বাষ্পময় দেহ লইয়া একদিন আমরা  
রামগিরি হইতে অলকা, অলকা হইতে রামগিরি, চক্রে  
নিমেষে গতায়ত করিয়াছি, সে কিসের বলে? একমাত্র  
ধূমপানই কি তাহার কারণ নয়?”

“ভাই সব। ধূমপানের কষ্টের কথা আপনারা  
সকলেই জানেন। প্রথমত ধূমপত্র যে পরিমাণে ধ্বংস  
করা হয় সে পরিমাণে নেশা হয় না। সুপীড়িত পরে

অবিসংযোগ করিয়া তাহার চারিপাশে ঘিরিয়া বসিয়া ধূম গ্রহণ করিতে হইলে, ধূমের অধিকাংশ কেন, সবই প্রায় নষ্ট হইয়া যায়,—অতি অল্প পরিমাণ নাক ও মুখের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। তরপুর দেশার পরিপূর্ণ ধূমকুণ্ডলী মেঘাকাশে, আমাধিককে বৃদ্ধাকৃষ্ট প্রদর্শন পূর্বক হেলিতে ছলিতে বাতাসে ভর দিয়া স্বর্গলোকে চম্পট প্রদান করে, আর আমরা হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকি, না পারি ধরিয়া মুখে পুঁতে, না পারি আর কিছু করিতে। হায় হায়, এ কি কম আপশোষ, কম ক্রান্তির কথা? (করতালির ধ্বনি।) শুধু কি তাই? হাঁ করিয়া ধূমগ্রহণ করিতে করিতে মুখের চোয়াল ধরিয়া আসে, কবিরাজ ডাকিয়া ঔষধ মালিশ করিতে হয়, তবে সে বেদনা যায়। (হাত্তধ্বনি।) তাহাতে একেশারীক কষ্ট আবার অর্থব্যয়। আবার গুহুন, একেলা বসিয়া আরামে যখন থুসী তখন ধূমপান করিতে পাই না; একেলার জন্ত এত করিয়া ধূমপত্র কখন পোড়ান যায়?—যে ধূমে পঁচিশজন খুজলোচন হইতে পারেন, তাহা কি একটি প্রাণীর জন্ত খরচ করা যায়? ধোঁয়ার আড়ার সকলকে একত্র করিবার জন্ত প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হয়। তাহাতে যে কত সময় নষ্ট হয় তাহা কহ্তব্য নয়। অনেকে হয়ত যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারেন না, বেচারাদের আর সেদিন ধূমগ্রহণ করা হয় না; তাহাদের সে কষ্ট দেখিলে চক্ষু ফাটিয়া জল আসে,—মনে প্রফুল্লতা নাই, শরীরে বল নাই, কাজে মন নাই, আহাৰে অরুচি, কেবল অবসাদ, জড়তা, অসুস্থতা—সেদিনটা তাহাদের কাছে যেন বিধাতার অভিসম্পাত। (করতালি।) হায় হায়! ক্রান্ত স্বীকার করিয়াও রীতিমত নেশা জন্মে কই। ইহার উপায় বিধান করিতে না পারিলে আর চলে না। ভ্রাতৃগণ, আপনারা একত্র হউন, উঠিয়া পড়িয়া লাগুন, শীঘ্রই যদি কোন ধূমপান যন্ত্র আবিষ্কৃত না হয় তবে জানিবেন ধূমপানের ব্যাপার ধূমেই শেষ হইবে।”

বক্তা তাক্কুট পত্র দ্বারা মুখের দাম মুহিতে মুহিতে বসিয়া পড়িলেন। প্রস্তাবটি যথাক্রমে অস্বস্ত সত্যের

দ্বারা সমর্থিত ও পরিপোষিত হইয়া শেষে সমগ্র সভার অনুমোদিত হইল।

ঠায় বসিয়া বক্তৃতা শুনিতে শ্রোতৃগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন, সকলেরই শরীরে অবসাদ পরিলক্ষিত হইতেছিল। কেহ কেহ গাত্র প্রসারণ, হস্তোত্তলন ও মুখব্যাদান পূর্বক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে অবসাদ ঘুচাইবার নিম্নলি চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্রমে তাহা সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে সভাস্থল হাই-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল,—সেই হাইয়ের অক্ষুট শব্দ ও তৎসংলগ্ন ভূড়ির ভূড়, ভূড়, ধ্বনি মিলিয়া এক অপক্লপ কলরবের সৃষ্টি হইল।

কক্ষান্তরে ধূমপত্র সাক্ষ্যত ছিল, তাহাতে আর সংযোগ করা হইল, বর্ধার মেঘের মত পূর্ণ পূর্ণ ধোঁয়া উল্লসি হইয়া গৃহ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তাহার মধ্যে আসন পাতিয়া সভ্যমণ্ডলী উপবেশন করিলেন। তৎক্ষণাৎ মুখের হাই মুখে মিলাইয়া গেল, হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল; শরীরের অবসাদ ঘুচিয়া গেল, উৎসাহ আসিল, মন প্রফুল্ল হইল। ধূমগ্রহণ শেষ করিয়া যে যেখানকার সেখানে চলিয়া গেলেন।

২

ধূমপায়িসভার বেকোজুশন সকল সভ্যের স্বাক্ষরিত হইয়া যথাসময়ে ব্রহ্মার নিকট প্রেরিত হইল। ব্রহ্মা তাহা পাঠ করিয়া মাথার হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এতদিনে তাহার বুদ্ধিতে প্রবেশ করে নাই যে, ধূমসেবন যন্ত্রের কোন আবশ্যকতা আছে। স্বজন কার্য শেষ হইয়াছে মনে করিয়া এবং অনেকটা খরচ বাঁচাইবার জন্ত তিনি বিশ্বকর্মার ডিপার্টমেন্টে ছলিয়া দিবার সংকল্প করিতেছিলেন; এই মর্মে একটা খসড়াও প্রস্তুত হইয়াছিল। দেবসভার আগামী অধিবেশনে তাহা পেশ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন; এমন সময় এই কাণ্ড। ব্রহ্মার ভাবনার আরো একটু কারণ ছিল। এবারকার বাজেটে তিনি বিশ্বকর্মার ডিপার্টমেন্টের খরচা ধরেন নাই; মনে করিয়াছিলেন সেটা ত উঠিয়াই বাইবে। এখন তাহা

বজার বাণিজ্যে গেলে অর্থ বোগাইবেন কেমন করিয়া ?  
এইরূপ নানা চিন্তার ব্রহ্মা মুহমান হইয়া পড়িলেন।

হুণ্ডিকার্য্য, পূর্জকার্য্য ও যজ্ঞনির্মাণ সংক্রান্ত দরখাস্ত  
সমূহের সর্বপ্রথম বিবেচনা করিবার ভার বিশ্বকর্মার  
দপ্তরে চালান করিয়া দিয়া ব্রহ্মা তখনকার মত কতকটা  
নিশ্চিন্ত হইলেন।

অনেকদিন হইতে বিশ্বকর্মার হাতে কোন কাজকর্ম  
নাই; কি করেন, কি করেন ভাবিতেছেন এমন সময়ে  
সেই দরখাস্তখানা তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি  
আনন্দে লাফাইয়া উঠিলেন। কিন্তু কি রকম একটা যদ  
আবস্ত্র তাহা চট করিয়া তাঁহার মাথায় আসিল না।  
তিনি নিজে ধূমপান করিতেন না, কয়েক একটা পরিষ্কার  
ধারণা তাঁহার কিছুতেই হইতেনি না। তখন তিনি  
হির করিলেন যে ধূমপায়িসভার সম্পাদকের সহিত এ  
বিষয়ে বাচনিক পরামর্শ করিয়া ব্যাপারটা খোলসা  
করিয়া লইবেন।

যথাসময়ে বিশ্বকর্মা আপিসের শিলমোহরাক্রান্ত  
একখানা সরকারি চিঠি সম্পাদকের নিকট পৌঁছিল।  
সম্পাদক আপিসে উপস্থিত হইলে বিশ্বকর্মা তাঁহার সহিত  
দীর্ঘকালব্যাপী তর্ক বিতর্ক করিলেন। তর্কে তাঁহার  
কথাটা বেশ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল;—সহসা তাঁহার  
কথায় একটা ‘আইডিয়া’ প্রবেশ করিল। তিনি সম্পাদক-  
কে লক্ষ্য করিয়া খুব দস্তের সহিত কহিলেন,—“যদি  
আমি স্বজন করিবই। কিন্তু এ বিষয়ে আপনাদের একটু  
সাহায্য চাই।”

সম্পাদক আগ্রহসহকারে কানটা খাড়া করিয়া  
বলিলেন—“নিশ্চয়ই; আরহা আপনারই আজ্ঞানুযায়ী  
আছি; কি করিতে হইবে বলুন।”

বিশ্বকর্মা কহিলেন—“আরাকহ না, কেবল বর্ণের তিন  
প্রধান দেবতা স্ত্রী-ঈশ্বতি-এলয়-কর্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্ব-  
রের নিকট হইতে যজ্ঞ নির্মাণের উপকরণ আপনাদিগকে  
সংগ্রহ করিতে হইবে, উপকরণ আমার সন্ধানে নাই।”

“বে আজ্ঞা” বলিয়া সম্পাদক উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং  
চাদরখানা ফেলে কোলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন।

৩

ধূমপায়িসভার জনকতক বাহা বাহা লোক মিলিয়া  
একটা প্রতিনিধিদল গঠিত হইল। তাঁহারা এক শুভদিনে  
বাণ্যখানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোক যাত্রা করিলেন।  
সহস্র যোজন দূর হইতে এক বহুবিন্দুর্গ সমুজ্জল জ্যোতি-  
মণ্ডল তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল। যেন লক্ষ লক্ষ  
চন্দ্র একত্রে সমুদ্রিত হইয়া অত্যাশ্চর্য্য প্রভার ব্রহ্মলোক  
মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। সেখানে উপস্থিত হইয়া  
দোঁখলেন, অব্ ওস্ত নামক দুইটি সুখা-রূপ ব্রহ্মলোককে  
চক্রাকারে বেটন করিয়া চলিয়াছে, তাহার তীরে দাঁড়া-  
ইয়া ব্রহ্মলোকবাসীগণ আকর্ষিত মুখাপান করিতেছেন।  
সেখানকার ভূমি বিচিত্র রহস্যময়ী; স্থানে স্থানে হেম অট্টা-  
লিকা ও অপূর্ণ রহস্য দিব্য মন্দির শোভা পাইতেছে;  
সেই শঙ্খচকো-কাংস্যা-নির্নাদিত মন্দির মধ্য হইতে ব্রহ্মার্চি-  
দিগের সমকর্ষে গীত নাম-গান উথিত হইয়া জলহল  
আকাশ মুখরিত করিতেছে, সেই গানের সহিত একতানে  
এমরণ গুঞ্জন করিয়া গান গাহিতেছে; ধূপ ধূনা চন্দন  
কস্তুরী কুঙ্কম ও পুষ্পের সৌরভে দিক্ আমোদিত। বেদ  
বেদান্ত পারদশী মহাত্ম্যব্রত ব্রাহ্মণগণ যথাপদ ও যথাক্রম  
অবেদ অধ্যয়ন করিতেছেন। বিজ্ঞানী যজ্ঞকার্য্য আরম্ভ  
হইয়াছে, চতুর্দিকে হোমানল প্রজ্জ্বলিত, তাহাতে বারবার  
আহুতি প্রদত্ত হইতেছে—আজ্ঞাধুমে দিগ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ।  
ব্রহ্মার্চিদিগের স্তব্ধ সংযোগে বেদাধ্যয়ন শব্দে ব্রহ্মলোক  
শব্দায়মান। ধূমপায়ীগণ সেই সকল স্তব্ধ ধ্বনি শ্রবণ  
করিয়া শরীর পবিত্র বলিয়া বোধ করিলেন, তাঁহাদের  
আনন্দের সীমা রহিল না।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন একস্থানে মহা  
জনতা—দেবাদিনাগণ অন্ততর্কী অশ্বখতলে দাঁড়াইয়া  
কলসে কলসে অমৃত আরোহণ করিতেছেন; অন্নময় ও  
মদকর সরোবর তীরে দক্ষ প্রমুখ প্রজাপতিগণ দ্বারা  
অভিধারণ সংকৃত হইতেছেন।

দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার সদনে আসিয়া পৌঁছিলেন।  
প্রকাণ্ড রহস্য হেম অট্টালিকা। পদ্মরাগ, নীলকান্ত,  
অরুণাকান্ত, বৈষ্ণবর্ষ্মাণ ও হীরক, প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতি

নানা বয়স্কচিত অট্টালিকা-প্রাচীরের ঐচ্ছল্য তাঁহাদের চক্ষু বলসাইয়া দিল, যারে অসংখ্য চতুর্ভুজ প্রহরী পাহারা দিতেছে, তাহাদের চারি হতে চারি প্রকার অস্ত্রশস্ত্র বিস্রাজ করিতেছে।

ব্রহ্মা তখন পূজায় বসিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহা-  
দ্বিগুণে অপেক্ষা করিতে হইল;—একজন প্রহরী তাঁহা-  
দ্বিগুণে বিশ্রামঘর দেখাইয়া দিয়া গেল।

নামাবলী গায় কমণ্ডলু হাতে চার কপালে চারিটি  
কোটা ষাট্টিয়া ব্রহ্মা বৈঠকখানায় দেখা দিলেন। সকলে  
সম্মুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।  
ব্রহ্মা চতুর্ভুজ নীরবে ভুলিয়া সকলকে বলিতে ইচ্ছিত  
করিলেন। তাঁহার সভাপ্রশাস্ত চতুর্ভুজ আজ কেমন  
বিবাদ-ভারাক্রান্ত, বিবর্তিত চিহ্নবিজড়িত। তিনি  
আসন গ্রহণ করিলে পর সকলে উপবেশন করিলেন।

তখন ব্রহ্মার বাক্যক্ষুরণ হইল, তাঁহার চারি কর্ণের  
গভীর স্বর একত্রে বাহির হইয়া সকলকার ভীতি উৎ-  
পাদন করিল। দলের মধ্যে একজন ছোকরা ছিল, ব্রহ্মার  
চার জোড়া ওষ্ঠ এক সঙ্গে কম্পিত হইয়া যে একটা  
হাস্যোদ্দীপক শব্দ করিতোঁছিল তাহাতে সে হাসি  
চাপিতে পারিতোঁছিল না, তাহার আকর্ষণ গুণে কণ্ঠে  
লাল হইয়া উঠিতোঁছিল।

ব্রহ্মা বিবর্তিতবিজড়িত কণ্ঠে কহিলেন,—“আমার সময়  
বড় অল্প, হাতে বিস্তর কাজ, যাঁহা বলিবার আছে চট্-  
পট্ সারিয়া লও।”

প্রতিনিধিদলের প্রধান ব্যক্তি তখন তাড়াতাড়ি  
দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—“আমরা আপনার অধিক  
সময় নষ্ট করিব না; কেবল ধূমপানযন্ত্র সংক্রান্ত হই-চারিটা  
কথা বলিব। আপনি আমাদের দরখাস্ত—”

ব্রহ্মা বাধা দিয়া বলিলেন—“অত বিশদ বর্ণনার  
আবশ্যক নাই, মোট কথাটা বল।”

যিনি কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন, বাধা পাইয়া তিনি  
ধতমত থাইয়া গেলেন, কি বলিবেন গোলমাল হইয়া  
গেল, কিন্তু তাহা সামলাইয়া লইয়া পুনরায় কহিলেন,—  
“একদিন বিশ্বকর্মা আমাদের সভার সম্পাদক—”

ব্রহ্মা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—“সমস্ত কথা শুনিবার  
আমার সময় নাই, এখুনি আনানাহার শেষ করিয়া আমাকে  
দেবসভায় যাইতে হইবে, সেখানে অনেক কাজ আছে।  
তোমাদের আসল কথাটা কি শীঘ্র বল, নয়ত সময়ান্তরে  
আসিও।”

প্রধান ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—“না, না,  
আমি এখুনি সারিয়া লইতোঁছি। শুধুন না, এ—ই  
বিশ্বকর্মা অ-খা-স দিয়াছেন ধূমপানযন্ত্র তিনি নির্মাণ  
করিবেন, কিন্তু—”

ব্রহ্মা আরো চট্টিয়া উঠিয়া বলিলেন—“বিশ্বকর্মা  
আবাস দিয়াছেন তা আমার কি?”

সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন “না, না, তা  
নয় কিন্তু—”

“কিন্তু কিন্তু করিয়াই তুমি আমাকে বিরক্ত করিলে,  
এত চেষ্টা করিয়াও আসল কথাটা এখনও শুনিতে  
পাইলাম না, আমি এমন করিয়া আর সময় নষ্ট করিতে  
পারি না।” এই বলিয়া ব্রহ্মা গাত্ৰোত্থান করিলেন।

সেই প্রধান ব্যক্তি অল্পে ছাড়িবার পাত্র নহেন।  
তিনি জোড় করে ব্রহ্মার স্তবগান করিয়া কহিলেন—“হে  
দেবশ্রেষ্ঠ! হে সৃষ্টিকর্তা! হে পন্নয়োনি! আপনার অমু-  
গ্ৰহে আমরা দেহে প্রাণ, নয়নে আলোক, নাসিকায়  
বাতাস পাইতোঁছি, আপনারই প্রসাদে জীবন ধারণ  
করিতোঁছি, আপনার কৃপায় সর্ববিষয়ে স্বচ্ছন্দতা লাভ  
করিতোঁছি, আপনি আমাদের রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা,  
সর্বেসর্গা, আমরা আপনার ঐচরণের দাস মাত্র; আপনি  
আমাদের প্রতি বিশ্বাস হইবেন না। হে দেব! অধম-  
দিগের প্রতি করুণা কটাক্ষ করুন।”

ব্রহ্মা তবে থলিয়া গেলেন, নিজের উপর একটু গর্ব  
বোধ করিয়া কহিলেন—“অবশ্য অবশ্য, তোমাদের হৃৎ  
আমার কাছে নয় তাহার কাছে জানাইবে?  
আমি তোমাদের সমস্ত অভাব দূর করিব।” এই বলিয়া  
তিনি পুনরায় উপবেশন করিলেন।

তখন ধূমপানযন্ত্রের বৃত্তান্ত আভ্যুপাখ্য তাঁহার সম্মুখে  
বিস্তৃত করা হইল; কথার মত হইয়া তিনি দেব-সভা

কথা তুলিয়া গেলেন। বক্তা মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রশংসা গান করিয়া তাঁহার শ্রবণের আশ্রয় রক্ষা করিতে লাগিলেন। সমস্ত শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন,—“আমার বাপু যা সৰল ছিল, তা ব্রহ্মাও স্বক্ৰমে সব গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে এই কমণ্ডলুটি। তাহা তোমাদিগকে দিতে পারি, যদি কোনো কাজে লাগে,—কিন্তু বিশ্বকৰ্ম্মাকে বলিও, যদি উহা ব্যবহারে না লাগে ত আমায় যেন ফিরাইয়া দেন; ওটা আমার বড় সখের, বড় দরকারের।”

৩

ধুমপানিসভার বাস্পয়ান একদিন কৈলাস অভিমুখে উড়িয়া চলিল। অসংখ্য জনপদ, নদ-নদী, অরণ্য অতিক্রম করিয়া প্রতিনিধিগণ দূর হইতে দেখিতে পাইলেন এক রক্ততণ্ডুল পক্ষী, দূর হইতে তাকাকে মেঘ বলিয়া ভ্রম হয়; মন্দোদ নামক সমুদ্রতীরে শীতলবারিপুর সুরোবর তাহার পদচুম্বন করিতেছে, তাহারই তীরে নানা বিচিত্র সুগন্ধ পুষ্প-ভারাবনত বৃক্ষাবলি শোভিত এক পবিত্র মনোরম নন্দন-কানন, তাহার মধ্যে যক্ষ এক কিন্নর পক্ষী ও অঙ্গরাগণ নৃত্যগীতবাজে ও ক্রীড়াকলাপে মত্ত রহিয়াছে।

কৈলাস মধ্যে প্রথম শান্তি মূর্তিমান হইয়া বিবাক করিতেছেন,—কোথাও চাকল্য বা উত্তেজনার লেশমাত্র নাই; বিশ্বেশ্বর-সিদ্ধগণ সংযত হইয়া তপস্করণ করিতেছেন, সকলেই যেন ধ্যানমগ্ন, গভীর, সংযত। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু হিংসাঘেবান্ন তুলিয়া বৃগস্থের সহিত একত্রে ক্রীড়া করিতেছে। ধলাকামালায় নভহুল যেমন সুশোভিত হয়, অতিশুদ্ধ কামধেনু সকল প্রেয়ী-মিবন্ধ থাকায় ঐহান সেইরূপ সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। যক্ষাৰ্প, বিরপাক, দীর্ঘরোমা, শতগ্রীব, উরুবজ্র, প্রভৃতি সহস্র সহস্র ভূতগণ চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে ত্রাসের উদয় হয়।

কলাকামালাশোভিতকর্তৃ কটাতারাকান্ত দেবাদিদেব মহাদেব বসিয়া বসিয়া তিমিরতনেত্রে নভমন্তকে ঝিমাইতেছেন, সত্যীদেবী সমুখে বসিয়া পদসেবা

করিতেছেন। ঘরের চারিদিকে অনেক জিনিস হুড়ান; গোষ্ঠাকতক শুক বিঘণত ও ধূত্বাসুল বাতাসে ইতস্তত উড়িতেছে, একদিকে একহুড়া হেঁড়া মালা ও একখানা বাঘহাল পাড়িয়া আছে; তাহারই পাশে মহাদেবের ডমরুটা বর্তমান। এককোণে তুপীকৃত হাই, মধ্যে মধ্যে পবনভাড়িত হইয়া সতী ও মহাদেবের অঙ্গে আশিয়া লাগিতেছে। অদূরে ভৃঙ্গী একটা প্রকাণ্ড নিমকঠী লইয়া সিঁচি ছুটিতেছে এবং শুন্ শুন্ ঘরে গান গাহিতেছে। মহাদেবের বাহন বলদটা গোয়ালে শুইয়া রোমহ করিতেছে, সাপগুলি একটা গর্ভের মধ্যে কুণ্ডলী পাকাইয়া নিশ্চিন্ত মনে বিগ্রাম করিতেছে। নন্দী লগড় হস্তে বাহিষ্যার রক্ষা করিতেছে, গজকাসেবনে তাহার চতুর্হস্তী জবাগুলের মত রক্তবর্ণ।

প্রত্যহ বৈকালে সিদ্ধিসেবন করা মহাদেবের অভ্যাস। এখনও সিঁচি না পাইয়া তাঁহার ক্রমাগত হাই উঠিতেছে, মনটা কেমন কস্ কস্ করিতেছে,—তিনি একবার ভৃঙ্গীকে হাঁক দিলেন। এমন সময় নন্দী বাহিষ্যার ছাড়িয়া মহাদেবের সমুখে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিল যে, দর্শন আকাজক্ষায় শুভবৃন্দ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। মহাদেব তাঁহাদিগকে ভিতরে আনিবার হুকুম দিলেন। সত্যীদেবী স্বামীর পা ছাড়িয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

অগ্নিকণ মধ্যে ধুমসেবিসভার প্রতিনিধিদল সেখানে দেখা দিলেন। ভৃঙ্গীসিঁচিখোটা কেলিয়া তাঁহাদের বসিবার জন্ত ক্ষিপ্ৰহস্তে বাঘহালখানা পাতিয়া দিল। মহাদেব তত্তগণকে দেখিয়া পরম স্নীত হইলেন, কুশলাদি প্রদ্বের পর জিজ্ঞাসা করিলেন—“হে ধূত্বলোকবাসীগণ! ধুমসেবনে তোমাদের কোন ব্যাঘাত ঘটিতেছে না ত, মর্জের যজ্ঞধুম তোমাদের দিকে নিয়ত পৌহিতেছে ত, কেহ কোন প্রকার উপদ্রব ঘটায় না ত?”

দলের প্রধান ব্যক্তি উত্তর করিলেন—“হে দেবাদিদেব! কলিকালে জম্বুদ্বীপে যজ্ঞকার্য বন্ধ বটে কিন্তু কল-কারখানা, কলের গাড়ী প্রভৃতি হইতে যে ধূমোদগরণ হয় তাহা বড় কম নয়। উক্ত দ্বীপে বৈদ্যাতক



ব্যাপারের প্রকার ভূক্তির সঙ্গে মনোমধ্যে আশঙ্কার উদয় হইতেছে বটে, কিন্তু আপনাব্যবস্থাপনাদিগকে আত্মপর্যন্ত ধুমসেবনে কেহ কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই; কেবল মধ্যে মধ্যে উন্নতি-বিধায়িনী পত্রিকাখানা আমাদের প্রতি কটুবাণী বর্ষণ করে। আমরা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করি না, প্রতিবাদ করি না; আমরা ব্যাক্যের দ্বারা নয়, কার্যের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চাই যে, ধুমসেবন ও ধুমপায়ী সভা হইতে ত্রিলোকের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।”

মহাদেব সাধু সাধু শব্দে এই উক্তি সমর্থন করিলেন।

তখন সেই দলের প্রধান ব্যক্তি কহিলেন—“কিন্তু ধুমসেবনের জন্য কোন যন্ত্র না থাকায় আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে।” এই বলিয়া তিনি আত্মপূর্ণিক সমস্ত বর্ণনা করিলেন। মহাদেব তিনরা পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহাদের উদ্ভবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন—“তোমাদের চেষ্টায় যদি একটা যন্ত্র সৃষ্টি হয় তাহা হইলে আমিও বাঁচি, পত্রিকা সেবনে আমারও তেমন দুঃখ নাই হইতেছে না,— ইচ্ছা হয় সমস্ত ধুমটাই গলাধঃকরণ করি, কিন্তু তাহা পারি না।”

দলের প্রধান, ব্যক্তি তখন বলিলেন—“হে দেবোত্তম! যন্ত্র-নিৰ্মাণ অসাধ্য বলিয়া অনুমান হইতেছে না, বিবৰ্দ্ধন। আমাদের পক্ষে ভরসা দিয়াছেন। প্রকার কাহ হইতে কমগুলি পাইয়াছি। এখন আপনি কোন উপকরণ দিলেই হয়।”

মহাদেব উত্তর করিলেন—“দেখ ভক্তগণ, প্রায়ই আমার মনে হয় যে, আমার ডমরুটীর দ্বারা জগতের অশেষ উপকার সাধিত হইবে; যখন বাজাই তখন তাহার গভীর রব হইতে যেন অক্ষুট আভাস পাই—যেন সে আপনি গুমরি গুমরি বলে—‘হে দেব, আমার কার্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া দাও, শুধু শব্দ স্বজন আমার চরম লক্ষ্য নয়; আমার অন্ত যা গুণ আছে তাহা প্রকাশিত হইতে দাও, কেবল তালমানলয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখিও না। তাই বলিতেছি, হে ধুমপায়িনী! দেখ দেখি পরীক্ষা করিয়া আমার অনুমান সত্য কি না। আমার বিশ্বাস ডমরুটী ধুমসেবন যন্ত্রের একটা অভ্যাবস্তক

উপাদান হইতে পারিবে।” এই বলিয়া তিনি ভক্তিকে ডমরু আনিতে আদেশ করিলেন। ভক্তি তাহা উঠাইয়া আনিল। কাঁধ হইতে গামছাখানা লইয়া তাহার ধূলি কাড়িয়া মহাদেবের হাতে দিল। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া নিজের পাশে রাখিয়া দিলেন।

তারপর অন্ত কথাবার্তা আরম্ভ হইল; ইতিমধ্যে ভক্তি সিঁচি আনিয়া হাজির করিল, মহাদেব পানিকটা পান করিয়া ভক্তদিগকে প্রসাদ দিলেন। ধুমপান যন্ত্রের কথাটা আর উঠিল না। ধুমপায়ীর দল প্রস্থান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু ডমরুটী হস্তগত না হইলে যাইতে পারেন না, মহাদেবের কোলের কাছে সেটা পাড়িয়া আছে, তিনি তাহা দিবার নামও করেন না। সকলে প্রমাদ গণিলেন। অনেকক্ষণের পর একজন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—“হে দেব! তাহা হইলে ডমরুটী লইবার জন্য কবে আসিব?”

মহাদেব একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—“না, না, ওটা আজই নিয়ে যাও। আমি ওটার কথা একদম ভুলেই গিয়াছিলাম।” তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন—“এইজন্মেই ত নূতন উপাধি পেরেছি—ভোলানাথ।”

বিকু ধুমপায়ীদের উপর বড় চটা ছিলেন। ধুমপায়ী সভা উঠাইয়া দিবার জন্য মর্গের কৌশলী সভায় অনেকবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবা-বিদেব মহাদেবের জন্য তাহা পারেন নাই, তিনি বরাবর বিকুর প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন। বিকু তথাপি ছাড়েন নাই; উন্নতিবিধায়িনী পত্রিকায় ধুমপানের বিরুদ্ধে লম্বা লম্বা প্রবন্ধ লিখিয়া বিবরণটাকে সজীব রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই বিশেষ কোন ফল হয় নাই; এ সমস্ত বাধা সত্ত্বেও ধুমপায়ী সভা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছিল।

সেদিন প্রতিনিধিহীন উপকরণ আহরণের চেষ্টায় তাহার প্রাসাদে আসিল, তিনি আশ্চর্য হইয়া উঠিলেন, প্রহরীকে ডাকিয়া বলিলেন—“বা, বল্গে, আমার সঙ্গে দেখা হইবে না।”

এহরীৰ মুখে এ কথা শুনিয়া ধুমপায়ীৰ দল পক্ষাৎ-  
পদ হইল না, “তোমাৰ মনিষকে বলগে যে, আমাৰা  
আজ অন্ন সময়ের জন্যেই তাঁহাৰ সহিত সাক্ষাৎ কৰিতে  
চাই।”

এহরী এহুৰ অগ্নিসূৰ্তি দেখিয়া আসিয়াছিল।  
সে অবস্থায় তাঁহাৰ কাহে আৰ যাইতে সাহস কৰিল না,  
বলিল—“বুধা চেটা, দেখা হবে না।”

অমনি কৰিয়া তিন তিন দিন ধুমপায়ী সভাৰ  
প্রতিনিধিদল বিজুৰ বাহিৰাৰ হাতে কৰিয়া  
আসিলেন। তখন তাঁহাৰা এক মতলব আটিলেন।

মৰ্ত্য সৃজন হইবাৰ পৰ হাতে সেখানে লীলা খেলা  
কৰিবাৰ ক্ষমতা বৰ্গেৰ অনেক দেবতা আদিষ্ট হইয়াছিলেন।  
বিজুৰ উপৰ ভাৱ পড়িয়াছিল যে, তাঁহাকে মৰ্ত্যবাসে  
বংশীবাদন কৰিয়া গোপিনীকুলেৰ মনোৰঞ্জন কৰিতে  
হইবে। বাণী বাজান তাঁহাৰ কখন অভ্যাস ছিল না।  
সেইজন আত্মকাল প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা একটা কল্যাণেৰ  
আড্ডায় বাণী বাজান দিখিতে যান। ধুমপায়ীৰা সে  
সন্ধান পাতিয়াছিলেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ধুমপায়ীদলেৰ একটা হোকৰা  
ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া বিজুৰ বাড়ীৰ সম্মুখে পাৰচাৰ  
কৰিতেছিল। সেদিন বিজু বাণীটা হাতে কৰিয়া যেমনি  
বাহিৰ হইয়াছেন, অমনি সেই হোকৰা চিলেৰ মত হোঁ  
মাৰিয়া বিজুৰ হাত হাতে বাণীটা কাড়িয়া লইয়া হুট  
দিল। তাহাৰ বাপসময় সন্মুখেই নিমেষেৰ মধ্যে সন্ধ্যাৰ  
অন্ধকাৰে কোথায় গিয়াইয়া গেল তাহা বিজু দেখিতে  
পাইলেন না; বিৰণ বদনে বাটীতে কৰিয়া  
গেলেন। সেই অবধি তাঁহাৰ কল্যাণেৰ আড্ডায় যাওয়া  
বন্ধ হইল।

বিজু অন্নদিনেৰ মধ্যেই জানিতে পাৰিলেন যে,  
ধুমপায়ীদিগেৰ চাহুৰীতে তাঁহাৰ বাণীটা গিয়াছে।  
বাণীটা যে কেহ কাড়িয়া লইয়াছে সেখা লজ্জায় দেহ  
সভাৰ প্রকাশ কৰিতে পাৰিলেন না; ধুমপায়ীৰাও কি  
উপায়ে তাহা সংগ্ৰহ কৰিয়াছেন অপ্রকাশ রাখিলেন।  
আসল ব্যাপাৰটা কেহ জানিল না; সকলে বুঝিল, ব্রহ্মা  
এক মহেশ্বৰেৰ জায় তিনিও দান কৰিয়াছেন। কিন্তু

বাণীটা হস্তান্তৰ হওয়াৰ বিজুৰ মৰ্ত্যে আসিবাৰ দিন  
পিছাইয়া গেল।

ব্রহ্মাৰ কন্যাসু, বিজুৰ বাণী ও মহেশ্বৰেৰ ডমক  
পাইয়া বিশ্বকৰ্মা যত নিৰ্মাণে লাগিয়া গেলেন। এই  
তিনটি সামগ্ৰী দৰ্শন মাথোঁৰে তাঁহাৰ উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন  
মস্তিষ্কে ধুমপান যন্ত্ৰেৰ একটি ছায়া পড়িল। তাহাৰই  
অনুকৰণ কৰিয়া তিনি একটি কায়া রচনা কৰিলেন।  
কন্যাসুৰ মুখেৰ কাঁদ কমাইয়া কেলিলেন। বাণীৰ  
হিত্তভাল বুজাইয়া দিলেন। ডমকৰ দুই মুখেৰ চৰ্চ  
কাটিয়া গেল। তখন কন্যাসুৰ উপৰ বাণী, বাণীৰ  
উপৰ চৰ্চবিহীন ডমকটি স্থাপন কৰিয়া দেখিলেন,  
ঠিক হইয়াছে।

স-কলিকা হকাৰ সৃষ্টি হইল। বিজু জুজু হইলেন,  
ব্রহ্মা নিশ্চিন্ত হইলেন। মহেশ্বৰ মহা গুণী। তাঁহাৰ  
ডমকটীকে তিনি বে বাজলগ্ন হাতে মুক্তি দিতে  
পাৰিয়াছেন সেইজন তাঁহাৰ বেশী আনন্দ। প্ৰিয়  
ডমকটীকে তিনি এক ভাবে দান কৰিয়া আৰ-এক ভাবে  
গ্ৰহণ কৰিলেন। গজিকা সেবনেৰ ক্ষমতা কেবলমাত্ৰ  
কলিকাটি লইয়া তাহাকে শ্ৰেষ্ঠ ও অধৰত্ব দান  
কৰিলেন। সেই অবধি গজিকা সেবনে কলিকাই  
প্রশস্ত।

হকা সৃষ্টি হওয়াৰ কথা ইন্ত্ৰেৰ কানে পৌছিল।  
তিনি চুটিয়া আসিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন—“কৰিয়াছেন  
কি দেব? সৃষ্টি বন্ধা হইবে কি কৰিয়া?”

ব্রহ্মা ব্যাঘ্ৰেৰে বলিয়া উঠিলেন—“কেন, কেন?”

ইন্ত্ৰ—“মৰ্ত্যালোকবাসীৰা ত বজ্জকাৰ্য্য বন্ধ কৰিয়াছে।  
তাঁহাৰ উপৰ আমাৰ বজ্জটা চুৰি কৰিয়া লওয়া অবধি  
তাঁহাকে তাঁহাৰা সকল কাৰ্য্যে লাগাইতেছে। অগ্নি-  
দেবকে আৰ বড় কৈয়াৰ কৰে না; ধুম অতাবে বন্ধ  
কোখাও বীজমত জল বৰ্ষণ কৰিতে পাৰিতেছেন না।  
তামাকু ব্যবহাৰেৰ সৰ্বজন বহল প্রচাৰ হওয়াৰ একটু  
আশাৰ উদয় হইতেছিল। তাঁহাৰ ধুমও যদি বন্ধ  
সাহায্যে টানিয়া লইবাৰ ব্যবহা কৰিয়া দেন তবে আৰ  
উপায় কি? বাৰি অতাবে পৃথিবী আগ্নিশূন্য হইয়া  
পাড়বে—আপনাৰ সৃষ্টি বসাতলে বাটবে।”

ইজের কথা শুনিয়া ব্রহ্মার চতুর্ভুজ ভয়ে একেবারে  
বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—“তাই  
ত, তাই ত, ধূলোলকবাসীরা ত আমার একথা বলে নাই,  
তাহারা আমাকে ভয়কর ঠকাইয়াছে।”

ইজ বলিলেন,—“ইহার উপায় বিধান করুন।”

ব্রহ্মা বলিলেন—“নিশ্চয়ই, ধূমপায়ীরা আমার সঙ্গে  
যেমন জুয়াচুরি করিয়াছে, আমি তাহাদের তেমন  
অভিসম্পাত দিব। ইজ, তুমি জল আন।”

জলগত্বে লইয়া ব্রহ্মা তখন শাপ দিলেন—“কোন  
ধূমসেবী আজ হইতে ধূমপানঘ্ননিঃসৃত সমস্ত ধূম গলাধঃ-  
করণ করিতে পারিবে না,—ধূমের অধিকাংশ ভাগ  
তাহাকে নু দিয়া মুখের ভিতর হইতে বাহির করিয়া  
দিতে হইবে। যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবে সে  
ধূমপানে কোন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে না।  
তাহাকে যন্ত্রাকাশে অকালে দেহত্যাগ করিতে  
হইবে।”

তাহার পর একদিন ধূমপায়িসভায় হকার প্রতিষ্ঠা  
হইল। চলনচর্চিত পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিয়া হকার  
সম্মুখে নতকায় হইয়া বসিয়া হকা-শাস্ত্র শুলিয়া সকল  
সভ্য হকা-স্তোত্র পাঠ করিলেন,—“হে হকে। হে  
ধূমপায়িসভাসভ্যজনহঃস্বহারিণী। হে কুণ্ডলীকৃত  
ধূমপায়িসমুদায়িণী। তোমাকে বারবার নমস্কার করি,  
তুমি আমাদের প্রতি সদা প্রসন্ন থাক। হে বিশ্বরমে।  
তুমি বিশ্বজনপ্রমহারিণী অলসজন-প্রতিপালিনী,  
ভাৰ্য্যাতৎসি-চিন্তাবিকার-বিনাশিনী। হু আমরা  
তোমার মহিমা কেমনে বর্ণিব? তুমি শোকপ্রাপ্ত জনকে  
প্রবোধ দাও ভয়প্রাপ্ত জনকে ভরসা দাও, বুদ্ধিভট জনকে  
বুদ্ধি দাও, কোপবৃত্ত জনকে শান্তি প্রদান কর। হে  
বরদে। হে সর্গস্বপ্রদায়িনী। তুমি আমাদের ঘরে  
অক্ষয় হইয়া বিরাজ কর। তোমার যশঃসৌরভ সূৰ্ব-  
কিরণের জায় হড়াইয়া পড়ুক। তোমার গর্ভ হু জলকমল  
মেঘগর্জনবৎ ধ্বনিত হইতে থাকুক, তোমার মুখহিমে

সহিত আমাদের অধরৌষ্ঠের যেন তিলেক বিচ্ছেদ না  
হয়। ষ্টি ষ্টি ষ্টি।

ইতি হকার জয়কথা সমাপ্ত। ২

### ফল-কথা

এই হকার জয়কথা যিনি নিত্য আগ্রহে ও অবহিত-  
চিন্তে শ্রবণ করেন তাঁহার অক্ষয় ধূলোলকবাস হয়।  
যিনি একবার মাত্র শ্রবণ করেন তাঁহার পুণ্যের ইয়ত্তা  
থাকে না।

যিনি ধূমপান করেন দেবী ধূমাবতী ও অম্বরশ্রেষ্ঠ  
ধূলোলচন সকল বিপদে তাঁহার সহায় হন; তাঁহার  
বুদ্ধির জড়তা থাকে না, মাথা বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠে।  
কল্পনা অতীব প্রতিভাশালী হয়, তিনি সমস্ত অসম্ভব  
গুলিধোরোচিত নানা গল্পগুজবের সৃষ্টি করিতে পারেন।  
দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার প্রতি সদা প্রসন্ন থাকেন,  
যেহেতু তাঁহার কৈলাসবাস হয়। যিনি হকার নিম্পা  
করেন তাঁহাকে জন্মান্তরে শৃগালদেহধারণ করিয়া কেবল  
‘হকা হয়’ রব করিতে হয়।

১। গাহারা তামাক সেবন করেন তাঁহারা জানেন যে,  
যেঁয়া টানিয়া মুখ হইতে বাহির করিয়া দিয়া  
তাঁহা চোখের সামনে ল্পষ্ট দেখিতে না পাইলে  
তামাকু খাইয়া কোন তৃপ্তি হয় না। তাহার কারণ  
আমার মনে হয় ব্রহ্মার এই অভিশাপ।

### —লেখক

২। হকার সৃষ্টি হওয়ার ধূলোলকে ধূমপান অত্যন্ত বুদ্ধি  
পাইয়াছে এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেই  
জন্য তামাক সাজিবার নিমিত্ত একদল ভৃত্যের  
প্রয়োজন হওয়ার ধূলোলকবাসীরা মর্ডলোকে  
সিগারেট ও বিড়ি পাঠাইয়াছেন;—বালকেরা  
সিগারেট ও বিড়ি খাইয়া অকালে মর্ডাদেহ ত্যাগ  
করিয়া ধূলোলকে গিয়া তামাক সাজিবে, এই  
উদ্দেশ্য।

এবাসী, আশ্বিন, ১৩৮৫।

# অভয়

(উপভাস)

ঐশ্বরীচন্দ্র রাহা

(পূর্ণপ্রকাশিতের পর)

অভয় অঁধাক হয়ে যায়। কখন যে পাটুলি এল আর কখন যে স্টেশন ছেড়ে চলে গেল, সে কিছুই লক্ষ্য করেনি। কি অশ্রুমনস্ক হয়েই ছিল। ভাবল এমন করেই লোক নিজের স্টেশন ছেড়ে অন্য স্টেশনে নেমে পড়ে। কপালের দুর্গতি আর কি। অভয় ভাড়াভাড়ি নিজের জিনিষপত্র গুঁছিয়ে নেয়। বাস্‌জটা বোঁকর তলা থেকে টেনে আনে—বিহানা নামিয়ে বাস্‌জের ওপর রাখে। ষাবাবের হাঁড়িটা সমস্ত বাস্‌জের পাশে রাখে। গাড়ী থামতেই নেমে পড়ে অভয়। বিহানা নামিয়ে হাঁড়িটা নামিয়ে আনে। বাস্‌জটা টেনে ধারের কাছে আনে। হারানই এসেছে। সে ছুটতে ছুটতে আসে। দুধনে ধরাধারি করে বাস্‌জটা নামায়। কৌঁচার খুঁট দিয়ে কপালের ঘাম মুছে অভয় বলে—হারান, সব ভাল তো? বাবা আসেব নি? না?

—না, বাড়ীতেই—আছেন।

—কেন? বাবার শরীর ভাল তো?

—হাঁ, ভাল।

—মা, গীতা খোকন—

হাঁ, লবাই ভাল। হারাধন বলে, খুব রন্ধুর। এবার হাঁট।

অভয় হাতাটা হাতে নিল। হারাধনের মাথার

বাক্স আর বিহানা চাপিয়ে হাঁটতে লাগল। যেতে হবে দু মাইলের কিছু ওপর। রেল লাইনের ধার দিয়ে রাত্তা। গাড়ীটা হ হ করে চলে গেল। স্টেশন আন্তে আন্তে কাঁকা হয়ে যাচ্ছে। অভয় চারদিকে চার। দূরে দেখা যাচ্ছে থানা, আর ঐ দেখা যাচ্ছে, শেতলা ডালার মাঠ আর মন্দির। তার পাশে জমিদারদের কাছারী বাড়ী। লাইনের কিছু দূরে গঙ্গা। গঙ্গা এখন খুব শীর্ণকার। ওপারে, বালুচর, ধু-ধু করছে। নিঃসঙ্গ বাবলা গাছগুলো এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাইনের দু পাশে আম বাগান। আম, কাঁঠাল আর বাঁশ গাছের ঝাড়। বাবলা, শিমূল, তাল, খেজুর গাছও অনেক। হুপুবেব নিস্তকতার মাঝে, দু একটা গরু চরে বেড়াচ্ছে। একটানা ভাবে ঘুরু পাখী ডেকে যাচ্ছে। এখন বোদটা বড় বেশী। কৌঁচার খুঁটে মুখ বুলল অভয়। লাইনের পাশের পাখর, গুলো বোদে পুড়ে যেন আগুন হয়েছে। একটা গরম বাতাস চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। পথ চলতে চলতে, দু-একটা কথা বলছে অভয়। হারাধন মাঝে মাঝে জবাব দিচ্ছে শুধু।

এবার এসে গেছে তাদের গাঁ। দূরে দেখা যাচ্ছে রেলের গুমটা ঘর। তার পাশ দিয়ে রাত্তা। খুলোভরা রাত্তা, বোদের তেজে, তেজে উঠেছে। রাত্তার চপাশে

আম বাগান আর বাবলা বন। রাত্তায় লোকজন নেই, সব নিশেধ আর নিষেধ।

একটা বাঁক নিল রাত্তাটা। এবপন কুমোরপাড়া। চু-চুর ঘর কুমোর এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। ওদের বাড়ীর উঠানে কাঁচা হাঁড়ী, মাটির নাদা, দগা, মুচি সব শুকোচ্ছে। মাথায় গামছা বেঁধে ছিফ পাল কাঠ কুড়িয়ে আনছিল। মাথা থেকে বোকাটা ঝুৎ ঝুলে বলল, কি রত্নর নাকি?—তা—তা—বাড়ী যাও—। অভয়র মনটা ছলাৎ করে উঠল। কি যেন বলতে যাচ্ছিল ছিফ পাল। বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। দূরে দেখা যাচ্ছে সেই বগিচলা, মস্ত বড় অশখ গাছটা নিবিড় ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশ দিয়ে, কিছুটা গেলেই অভয়দের বাড়ী। সেই সন্ধ্যা রাত্তায় এসে অভয় উৎফুল্ল হয়ে তাকিয়ে থাকে এই তো তাদের বাড়ীতে ঢুকবার রাত্তা দেখা যাচ্ছে। সেই বাঁশের গেট, পাশে পেয়ারা গাছ আর বাঁশের বেড়া দেওয়া বাগান। কিন্তু দরজার পাশে, মায়ের সেই প্রতীক্ষাময় উৎফুল্ল মুখ কোথায়? অভয় হন্ হন্ করে এগিয়ে যায়—

দরজা ঠেলে ডাকে—মা—মা—। কিন্তু আসেন গোপেশ্বর, কিন্তু এ কি চেহারা? মাথার চুল এলোমেলো রুম্ম, এক মুখ দাঁড়ি গোঁপ। অভয় প্রণাম করে, তার বাবার দিকে তাকিয়ে হতচকিত হয়। বাবার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

অভয় ডাকে—মা—মা—। অভয়ের গলায় শব্দ পেয়ে, ছুটে আসে গীতা, খোকন। একসঙ্গে ওরা কেঁদে ওঠে।

—দাদা গো—মা আমাদের নেই—

—মা নেই—মা নেই? শব্দ করে কেঁদে ওঠে অভয়। একটা দারুণ ব্যথা হঠাৎ কোমর থেকে ওপরে ওঠে আর নামে। অভয় সেই জায়গায় বসে পড়ে। মনে হয়, পৃথিবীতে আলো নেই, বাতাস নেই, সমস্ত পৃথিবী আজ শূন্য। মা নেই—মা নেই—পৃথিবীর সমস্ত বাতাস যেন কেঁদে বলতে থাকে—না—নেই—নেই—নেই—

হাওয়ায় মোট নামিয়ে বলে, এ কি, হিঃ—হিঃ ছোটবারু। ছেলেটা এই খাড়া রোদে হেঁটে এল। আগে বস্ত্রক, জিক্কক, তায়গর না ময় খবরটা দিতে হয়। হাবান মাথায় গামছা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বলে, আর কি করবে দাদা? সবই ভগ্নমানের হাত। কপালের লিখন। এখন ওঠ ঘরে যাও, একটু ঠাণ্ডা হও গো। কাঁদবার তো অনেক সময় রয়েছে দাদা—

অভয় আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল—এসে দাঁড়াল উঠোনে। মার হাতের চিহ্ন যে সবখানে। তুলসী মন্দিরে সেই প্রদীপ রয়েছে। উঠানে এখনও মার হাতের গোবর দেওয়া নিকানোর দাগ। সমস্ত ঘর বাড়ীতে যে তাঁরই হাতের চিহ্ন, সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে! অভয় ঘরের রোয়াকে উঠে সামনের দাওয়ায় বসল। দিনের আলো যেন অন্ধকার হয়ে গেছে। উপরের আকাশে তীব্র সূর্য্য—এ আকাশ ঘর বাড়ী গাছপালা আজ যেন যেন সবই নিরর্থক। অভয়ের মনে হতে লাগল, এই জগৎ সংসার, যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু, সবই কণভঙ্গুর, সব মায়্যা, সব মিথ্যা, সকলই মরীচিকার মত মায়্যা আর স্বপ্ন। সব মিথ্যা, সব মিথ্যা—মিথ্যা—জগৎ মিথ্যা—

অভয়ের মনে পড়তে লাগল, তার মালদহ বাবার দিনটা। তার মা যে কত ভোরে উঠে,—কত রান্না করেছিলেন। তারপর তাকে ডেকেছেন—বাবা অভয়, আর বাবা—

মায়ের সেই শীর্ণ মুখখানি—দারিদ্র্যমাথা চেহারা—খানা, হেঁড়া শাড়ী, হাতে শুধু একটি লোহা আর শীখা পরা মূর্তিখানা—চোখের ওপর ভালতে থাকে। মার যে কত আশা ছিল। কিন্তু হায়, এই এক মাসের মধ্যে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত আশা চিরকালের মত নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কিরে এসে সে আর দেখতে পেল না তার মাকে। সে যে কত আশা করে মায়ের জন্ত শাড়ী এনেছে, মা তা পরতে পেলেন না। নুতন কাপড় দেবার আনন্দ আজ সব শেষ। অভয় বলে—মা, মায়ো,



বলতে না পারে, মা বাবা কিছুই শেখাননি। বাবা, এখন শ্রম শান্তি তো করতে হবে। দাদাকে লিখছি যদি কিছু টাকা পাঠান, তবেই সব রকে। নইলে খুব দুশকিলে পড়তে হবে। পুরুত্ব মশাই কর্তৃক দিয়েছেন। তার ওপর কেঁদো কজন, আর হুচারজন আছে। দাদা যদি গোটা পঞ্চাশ টাকা পাঠান, তবে আর দুপাঁচ টাকা-চেষ্টা চরিত্তির করে কোন রকমে যোগাড় করব।

চোখ মুছে গোপেশ্বর বললেন, রাত যখন ছুটো হবে, হঠাৎ উনি বললেন, শরীরটা খুব খারাপ করছে। তার পর ভোরের দিকে জ্ঞান হারাবার সময় বললেন, আমি আর বাঁচব না, ওদের দেখো। শুধু খোকাকে দেখতে পেলাম না এই আক্ষেপ থাকল। মরার আগেও ডেকেছেন—অভয়, খোকা আমার। গোপেশ্বর আর কথা বলতে পারেন না। দুই চোখ ভরে যায় জলে গলা ভেঙ্গে যায়।

অভয় বলল, এখন চুপ করুন বাবা। এখন ওরা শুক কাঁদতে শুরু করবে। খোকন খেলা করছে, এখনি তবে মা মা বলে কেঁদে উঠবে। বাই হোক, কাল পরও দেখুন কোন চিঠিপত্র আসে কিনা। অভয় চারদিকে চায়। তার মায়ের চিহ্ন সব জায়গায়। একা মা যে, সমস্ত সংসার ভরে ছিলেন। তাঁর কল্যাণ হাতের ছাপ, আজ সব জায়গাতেই রয়েছে। যেখানে যা যেখানে গেলেন, সব যে তেমনি সাক্ষান রয়েছে। সরষের তেল, একটা আলাদা শিশিতে একটু একটু করে জমিয়ে রেখেছেন। রান্নার চাল থেকে এক মুঠো চাল উঠিয়ে আলাদা হাঁড়ীতে জমাড়েন, তাও রয়েছে। এখনি সব পুঁটিনাটি কত জিনিস। একটুকরো কাগজ, দাড়ি, কাগজের তোলা, ভাঙ্গা হাঁড়ী কিছুই তিনি ত্রু কেলতেন না। বলতেন, যাকে রাখো সেই রাখে, ছাইটুকু রাখলে এক সময় ছাইটুকুও কাজ দেবে।

বুড়ি ভিঁমিত আলোর অভয় দেখল, বাবার চেহারার কত পরিবর্তন হয়েছে এই কয় দিনে। একে তো তিনি চিরকাল রোগী আর দুর্বল, গায়ে মাংসের ভাগ খুব কম। এখন যেন আরও বুড়ো হয়ে গেছেন। মাখার চুলগুলো

এই কদিনেই সাদা হয়ে গেছে। মুখে পাকা গোপ দাড়িতে আরও বৃদ্ধ দেখাচ্ছে। মনে হয়, চোখে আর ভাল দেখতে পাচ্ছেন না। তারপর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। অভয় একটা নিঃশ্বাস ফেলে। অভয় ভাবে কি করে এই সব ফেলে সে মালমল যাবে। কিন্তু না গিয়েও তো উপায় নেই। কোন রকমে ম্যাট্রিকটা তাঁকে যে পাস করতে হবে। তাকে মাহুত হতে হবে—গীতা খোকনের সব দায়িত্ব যে তার ওপর।

রাত বাড়তে থাকে। বাইরে একটানা ঝিঁঝিঁ পোকের শব্দ। চারদিক এখন অন্ধকার। জমাট অন্ধকার রাজ্যে অন্ধকারের বুকে অজস্র জ্যোৎস্না পোকের ঝাঁক উড়ে উড়ে গাছে বসছে। আধারের মাঝে যেন শত সহস্র রত্নখণ্ড ঝক্ ঝক্ করছে। যেন কোন এক রূপবতীর মন্থরকণ্ঠী শাড়ীর আঁচল ধরায় নেমে এসেছে আর সেই অন্ধকারের মাঝে, সহস্র সহস্র মণি ঝক্ ঝক্ করছে। বহুদূর আকাশে অগণিত তারকা, নোবিউলী, গ্রহের দল বিরামহীনভাবে ঘুরে ঘুরে চলছে। কক্ষের বন্ধনীতে তারকারা যেন কাঁদছে—তাদের বেদনা-নিঃশ্বাসে মহা ব্যোম নিরন্তর চকল। অভয় ভাবে, এই সীমাহীন অনন্ত অন্ধকার সমুদ্রের পারে কি আছে? এই অজস্র কোটি কোটি গ্রহের মাঝে নক্ষত্রের মাঝে না আরও ওপারে সেই স্বর্গরাজ্য? তার ছাঁড়নী মা এখন কোথায়? অভয় নিরিয়ম নয়নে তাকিয়ে থাকে।

—বাবা—অভয় সচকিত হয়ে ওঠে।

গোপেশ্বর বললেন, চুপ করে থাকিসনে বাবা। ভোর মুখ দেখে যে আমার বুক কেটে যাচ্ছে। কি করাব বল? এই নির্যাত। নে, মুখ চোখ ঘুঁর্বে, যা হয় ছুটো কল মল মুখে দে। গরুটা মুখ কম দিচ্ছে। গরু, ছাগলের রক্ত সবই তিনি নিজের হাতে করতেন। এই কদিন আর ওদের দিকে মন দিতে পারিনি। দেখছি খোল, ছবি সব ছুরিয়ে গেছে। এসব কোনদিনই আমি দেখিনি, সব তিনি দেখতেন। মা গীতা, দাদার জায়গাটা করে দে। আমি গোরালঘরটা দেখে আনি।

খুম আসে না। রাত বেড়ে ওঠে। পাশে গীতা খোকন ঘুসুচ্ছে। গোপেশ্বরের শোবার ঘরে, এক আধঘার পাশ কেয়ার শব্দ আসে। কখনও বা ধীরে ধীরে, কখনও বা টেনে টেনে, বলেন, ঠাকুর, ঠাকুর, নাক্সাইশ! আবার নিশব্দ, আবার নিশব্দ। ঘরের একপাশে লঠনটা শুধু টিপ্ টিপ্ করে জলতে থাকে। দেয়ালে পড়ে তার ছায়া—। অভয় চুপচাপ শুয়ে থাকে। চোখে আর খুম আসে না। একসঙ্গে শত সহস্র চিন্তা ভিড় করে আসে। একটা হাত খোকনের গায়ে দিয়ে, অভয় শুধু মায়ের কথাই ভাবতে থাকে। ভাবে,—কী আশ্চর্য্য এই মানুষের জীবন। কত ক্ষণহায়ী আর কত ভয়ুর। তার তরুণ মনে প্রশ্ন জাগে সেই চিরন্তন পুরাতন প্রশ্ন মানুষ মরে কোথায় যায়? না—এই শেষ। তাদের মাটির টবে গোলাপ ফুল ফুটতে দেখেছে অভয়। কী মনোলোভা রং, কী অদ্ভুত সুন্দর গন্ধ। কিন্তু হায়—ঐ রূপ, সৌন্দর্য্য কত ক্ষণহায়ী। রূপ সৌন্দর্য্য ও গন্ধের জন্তু সৃষ্টিকর্তার কেন এত আয়োজন। এই কথা অনেকবার ভেবেছে অভয়। এর সার্থকতাই বা কোথায়? সেই ফুলের রং বিবর্ণ হয়ে যাবে— শুকিয়ে যাবে—গন্ধ উবে যাবে, শেষে ফুল ঝরে পড়বে মাটিতে। কিন্তু কেন? কেন, চিরকালের মত ঐ রূপ, ঐ সৌন্দর্য্য, অমন সুন্দর সুগন্ধ নিয়ে ঐ গোলাপ কি বেঁচে থাকতে পারে না? মানুষের জীবনও তো ঐ। এই জীবনের পেছনে কত আয়োজন, এই দেহবিজ্ঞাসে কত খুঁটিনাটি কৌশল। কিন্তু এই মানুষ তো চিরকাল বাঁচে না। কেন বাঁচে না? জানালা দিয়ে, বাইরে তাকায় অভয়। আকাশে অগস্ত নক্ষত্র মিট্ মিট্ করে জলছে। অভয় ভাবে, মানুষ কি মরে ঐ তারকাদের কাছে যায়? ঐ অনেক দূরে? কিন্তু তার মা কোথায়? কোন্ তারকার মধ্যে গিয়েছেন তার মা। ওখান থেকে কি তিনি আমার দেখতে পাচ্ছেন? এই বয়সসার, গীতা খোকন, এদের কি দেখছেন তার মা? আর ভাবতে পারে না—হুই চোখে জল আসে, একটা অব্যক্ত বেদনায় সমস্ত বুক টনটন করতে থাকে। অভয় ভাবে, না,

তারের মা আর আসবেন না। সেই চেহারা নিয়ে, আর মাকে দেখা যাবে না। না—কোনদিনই—কোনও সময়েই দেখা যাবে না।

যোগেশ্বরের কাছ থেকে চিঠি এল। আর এল পঞ্চাশটি টাকা। হুঃখ করে, অনেক কথা লিখেছেন। অভয়কে লিখেছেন—সংসার এই রকমই। প্রত্যেকেই ঠিক এমনই অবস্থায় পড়বে। কিন্তু সংসারে সমস্ত হুঃখ-শোককে আমাদের যে ভুলে থাকতেই হবে। আর সময়ই যাবতীয় শোকহুঃখকে ভুলিয়ে দেয়। এ সংসারে জয়গ্রহণ অর্থই হুঃখ ভোগ। এখন এই হুঃখের মাঝে আমাদের বড় হতে হবে, হুঃখকে সাধী করেই সব সময়ে সংগ্রাম করে চলতে হবে। মাথা নত করলে চলবে না। এমন অনেক কথা। ভেঠাবাবুর পত্রখানা খুব ভাল লাগল অভয়ের। মিনতি লিখেছে চিঠি। এত হুঃখের মধ্যেও অভয়ের দুকটা একটা অনাবিল আনন্দে ভরে গেল। আশ্চর্য্য এই অহুভূতি। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে, বাঙালী ছেলেমেয়েরা, সচরাচর অনায়াসে জীপুক্রম বন্ধুকে পায় না। চিন্তের এই এক অদ্ভুত অহুভূতি, তাই অতি নিকটতম আত্মীয়ের ভেতরই তা সঞ্চারিত হতে থাকে। এটা ভাল না মন্দ, এই অহুভূতির মধ্যে, কামনা বাসনার কোন গন্ধ আছে কি নাই, তা বিচার্য্য বিষয় নয়। কিন্তু এই বিচিত্র আনন্দ-মগ্ন অহুভূতি প্রত্যেক কিশোর কিশোরীর বয়ঃ-সন্ধি কালেই দেখা যায়। মাদকতাভরা এই বিচিত্র মগ্ন অহুভূতিতে হুটি অতি নবীন ফুলের মত পবিজ হৃদয়, শুধু মাত্র ভাল লাগার টানে নিকটে আসে। একে অপরকে ভালবাসে, সজ কামনা করে, শুধু চোখে দেখে, শুধু মাত্র হুটি কথা শুনেই আনন্দিত হয়, জীবন যন্ত মনে করে।

সেই বিচিত্র অহুভূতির ছাদ, মিনতি আর অভয়ের জীবনে এসে লেগেছে। তাই শত হুঃখের মধ্যে, মিনতির কয় ছত্র লেখা পত্রখানি, যেন তার আর্ন্ত হৃদয়কে চন্দন প্রলেপে শান্ত ও স্নিগ্ধ করে দিল। বাড়প্রাকের আর



বেনী দেবী নেই। শ্রাকের জিনবর্ণিত যোগাড় একরূপ শেষ। হু-টারজনকে নিমন্ত্রণ করে এল অভয়। তাঁরা দাঁড়িয়ে থেকে দেখবেন বাতে মাড়বার উদ্ধার হয় তারই অহুর্বোধ বার বার করল অভয়।

মুগলকাকার বাড়ীর দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল অভয়। ঠিক সেই রকমই সব। বাড়ীর সদর দরজার একপাশে বাশীকৃত ছাই। সেই নেড়ী কুকুরটী— ছাইগাছার ওরে। দরজার এক পাট ভেঙ্গে গেছে। মাত্র আর একটি কপাট কোন রকমে লেগে আছে। বাড়ী যেন আরো শ্রীহীন হয়েছে। উঠানে একগলা জল। একপাশে পড়ে রয়েছে শুভ্র গোলা। গোলার চালে খড় নেই—গোলাও কাৎ হয়ে কোনরকমে খাড়া হয়ে আছে। গোরাল ঘরও তাই। চালে খড় নেই। গোরাল শুভ্র—গরু নেই। চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল অভয়। জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। উঠানের একপাশে একটা ডালিম গাছ—তার পাশে পঞ্চ-মুখী জবা গাছ। কিন্তু কি আশ্চর্য, জবাগাছটার ফুল ফুটে আলো হয়ে রয়েছে। একধারে কুরো, কুরোর পাশে সুরু সুরু হুটী পেঁপে গাছ। ওদেরও চেহারা শীর্ণশীর্ণ। গাছে ছোট ছোট হু-একটি পেঁপে ঝুলছে। সমস্ত বাড়ীটা যেন বিবাদ মাথা—জীবনের লেশ মাত্র নেই। অভয় ভয়ে ভয়েই ডাকল মুগলকাকা—ও মুগলকাকা—। ঘরের ভেতর থেকে লাড়া এল—কে? কে ডাকে—

—আমি অভয়। একবার বাইরে আসুন—

—ওঃ। অভয়, মানে গোপেনের ছেলে—তা বেশ —আচ্ছা আচ্ছা। লাঠির শব্দ করতে করতে বোরিয়ে এলেন মুগলকাকা। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে মুগলকাকার?

অভয় আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল। মুগলবাবুর মাথার চুল সব সাদা। আরও বৃদ্ধো হয়ে গেছেন—যেন আরও অধিক হয়ে পড়েছেন। লাঠির ওপর ভর দিয়ে, চোখের ওপর হাত দিয়ে, মুগলবাবু বললেন, ওঃ, ছুঁমি অভয়। আর বাবা ভাল দেখতে পাইনে, শরীর ভেঙ্গে গেছে। চিন্তা, ওহু চিন্তা, আর হুচিন্তা। দিনরাত

রাবণের চিন্তার মত ঝিকি ঝিকি জলছে। এখন বাতে সর্গ শরীর অকর্ষণ্য—

অভয় বলল, আমি এসেছি—আমার মাড়বার উদ্ধারের জন্য। কাল বাট, পরশু শ্রাক। তাই দাঁড়িয়ে থেকে বাতে মাড়-বার হতে উদ্ধার হই, সেই ব্যবস্থা করবেন। হুপুরে বৎসামাত্র আরোজন, হুপুরে নিমন্ত্রণ— তা কাকীমা কোথায়?

—কাকীমা? আর বাঁসনে বাবা। কেউ নেই, কেউ নেই। মনাটা তো স্বদেশী করে ছেলে পচছে। তোর কাকীমা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, আজ ছমাস হ'ল তাইয়ের বাড়ীতে চলে গিয়েছে। ছেলেমেয়ে হুটী, তাগাও গেছে ওদের মায়ের সঙ্গে। ভাখু, পৌখ কী কাণ্ড। আমি বৃদ্ধো মানুষ, বাতে অকর্ষণ্য হয়ে গেছি। এক গেলাস জল ঢেলে খাওয়ার শক্তি নেই। কি করে যে দিনরাত যাচ্ছে তা ভগবানই একমাত্র জানেন। আমার কেউ নেই বাবা—মুগলবাবু হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন।

অভয় অবাক হয়ে গেল। মুগলকাকার কী পরিবর্তন। মনে মনে ভাবল অভয়, বোধকরি মুগলকাকার কপালে রোজ ভাতও জোটে না। হয়ত, কোনদিন হোঁচট খেয়ে ঘরের মধ্যেই মরে থাকবেন। কী আশ্চর্য পরিবর্তন। মুগলকাকার সেই মূর্তি আর আজকের চেহারা কত না বিরাট পরিবর্তন। অভয়ের মনে খুব হুঃখ হ'ল। এ কি করুণ চেহারা, আর সত্যের কী অকৃত পরিবর্তন।

মন্মথর খবর কেনেছে অভয়। আলিপুর জেলে নাকি আছে। ওর বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযোগ। মনাকা, কোন চিঠিপত্র দেয় না। মন্মথর সেই দোকানদারটার অবস্থা অভয় পোচনীর। ঘরের জানালা দরজা সব গেছে। মাত্র মাটির দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপর চালে খড় পর্য্যন্ত নেই। এখন বেওয়ারিশ কুকুর গরু ছাগলের এটা আত্মনা। ঘরের চারিদিক জললাকীর্ণ, পায়ে চলা হাতাইহু পর্য্যন্ত ঘাসে আর জললে ঢেকে গেছে। অভয় চুপ করে দাঁড়াল।

একবাৰ যথেষ্ট মেলাৰ সময়, মনাদা—সখ কৰে, ফুলগাহ  
কিনে ফুলেৰ বাগান কল্লিছিল। হাঁ—সেই বাগান তো  
এইখানেই ছিল। জলপেৰ জন্ত আৰ কিছু দেখা যায়  
না। গোলাপ গাহ ছিল, আৰ ছিল রজনীগন্ধা আৰ  
বেলফুলেৰ গাহ। না—এখন আৰ কিছুই নেই।  
হয় কেউ ভুলে নিৰে গৈছে, নহ'বা অৰ্থে সৰ মৰে গৈছে।  
এই ফুলবাগানটোৰ ওপৰ মনাদাৰ কী অসম্ভব সমতাই  
না ছিল। কত ফুল ফুটত—একটা দীৰ্ঘ নিশ্বাস বোঁৱে  
এল অভয়েৰ বুক খেকে। কতদিন কেটে গেল, আশ্চৰ্য্য,  
এই পৃথিবী কত ক্রত সৰে য়াছে আৰ কত তাড়াতাড়ি  
না এৰ পৰিবৰ্তন হৈছে। অভয় চুপ কৰে তাৰঙে থাকে।  
এই কিছুদিন আগেও তাৰ মা ছিল। যেখানেই সে  
থাক না, তাৰ মনপ্রাণ পড়ে থাকত বাড়ীৰ দিকে আৰ  
মায়ের কাছে। সে বুৰ্তত, তাৰ মায় মনও পড়ে থাকত,  
তাৰ দিকে। একসূত্রে বাঁধা ছিল মা আৰ হেলৈৰ  
প্রাণ। কিন্তু সেই সুতোগাহটি ছিঁড়ে গৈছে। এখন  
মায়ের মত আৰ কে তাৰ পথ চেয়ে থাকবে, তেমন কৰে  
কে আৰ ডাকবে। খোকা—খোকা—। বাবা অভয়  
এলি—। সে গৰীবের হৈলে, আৰ তাৰ মা গৰীবের  
ত্নী; গৰীবের মা। দাৱিত্ব যে কি জিনিষ;  
সব সে দেখেছে। অভয় নিঃশ্বাস ফেলে হাঁটিতে শুক  
কৰে।

নিভক ঘৰ। চাৰিদিকে শ্রদ্ধেৰ উপকরণ।  
সৰোজিনীৰ শ্রদ্ধ, যিনি এখন সমস্ত মায় সমতা, বন্ধন  
ত্যাগ কৰেছেন, চিত্তাৰ অগ্নিতে বাৰ মৰদেহ তন্ত্ৰীভূত—  
আৰ বাৰ আত্মা আক মহাকাশে বিলীন। সেই দেহ-  
হীন কায়াহীন সৰোজিনীৰ স্বৰ্গত আত্মাৰ উদ্দেশ্যে  
পুত্ৰেৰ অক্ষসজল প্রার্থনা তাঁৰ আত্মা শান্তি পাক,—  
তাঁৰ অমৰ আত্মা যেন ঈশ্বৰেৰ দয়া লাভ কৰে।  
পুৰোহিতের গভীৰ কঠেৰ ময় সাৰা গৃহকে যেন প্রাণ-  
বন্ত কৰে ফুলেছে। মনে হৈছে, অলক্ষিতে সৰোজিনী  
এসে দাঁড়িয়ে, যেন বহুতে পুত্ৰেৰ দেওৱা পিতৃ গ্ৰহণ  
কৰেছেন। যেন তিনি ভুণ্ড, যেন আনিষ্ঠিত।  
গোপেশ্বৰেৰ পাশে, গীতা খোকন চুপ কৰে বসে আছে।

মাতাৰ উদ্দেশ্যে তৰ্পণ কৰতে কৰতে বাৰ বাৰ কঁকহে  
অভয়।

প্ৰতিবেশিনীৱা বলল, কেঁদ না বাবা। এখন চোখেৰ  
জল কেললে এতে তোমাৰ মায়েরই কষ্ট হবে—

তিনি ঠিক এসেছেন। তিনি সব দেখেছেন—সব  
গুনছেন। তিনি তোমাৰ আশীৰ্বাদ কৰেছেন—

পুৰোহিতের কাজ শেষ হ'ল। নিজের পাওনাগতী  
গোছাতে গোছাতে বললেন, বাবা, ভগবানের এই  
লীলা। জগৎ সংসাৰ চিৰকাল এমনি ভাবেই চলেছে।  
নদীৰ জল ছুটে চলেছে, কোথায় যে য়াছে কে জানে।  
এই দৃশ্যৰ জগতেৰ ওপৰ সেই দৃশ্ব জগৎ। ওঁহা  
আছেন বে কি বাবা। সবই সত্য, সবই সত্য।  
অভয়েৰ সমস্ত শৰীৰ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তাৰ মনে  
হতে লাগল: তাৰ মা যেন ঠিক তেমনি ভাবে এসে  
দাঁড়িয়েছেন। মাথায় ঘোমটা—হাতে লোহা আৰ  
শাখা। মাথায় সিঁহৰ। কিন্তু মুখ যেন বড় বিষৰ—  
তিনি অগলকনেজে শুণ তাকিয়ে আছেন।

—মা—মা—। অভয় কেঁদে উঠতেই, গোপেশ্বৰ  
বললেন, বাবা, অত উতলা হ'লে চলবে না। তুমি বড়  
হয়েছ, তুমি যদি উতলা হও, তবে এই ছোট ভাইবোন,  
ওঁহা যে কেঁদে হাট বসাবে। এখনও যে অনেক কাজ  
বাকী। পুৰোহিত মশাই উঠে দাঁড়ালেন। নিজের  
পেটীলা পুটলী হুহাতে নিৰে বললেন, হাঁ উতলা হলে  
চলবে না। এই তো সংসাৰ—আৰ এই নিয়ম। বৃহা  
অবস্ত্তাবী কেনেও আমবা বৃহাকে ভুলে থাকি। অবস্ত্ত  
তিনিই ফুলিয়ে বেখেছেন। সংসাৰে নিজেকে অমৰ  
ভেবে, কৰ্ত্তব্যাকৰ্ষ কৰে যেতে হবে। ফলাফল কি  
তা তাঁৰ ওপৰ নিৰ্ভৰ কৰতে হবে। আত্মা, এখন আঁসি  
বাবা—হাঁ, এখন অভয়কে জলটল খেতে দাও। তাৰপৰ  
—হাঁ কাল বধাসময়েই আসব আমি। কোন একাৰে  
দায় উদ্ধাৰ কৰতে হবে, বুৰলে গোপেশ। ভাল কথা  
তোমাৰ দাদা বোৰ হয় আসেছেন না—

গোপেশ্বৰ বললেন, দাদা টাকা পাঠিয়েছেন।  
লিখেছেন, এখন যাওয়া অসম্ভব—খুব কাজেৰ চাপ—

—তাই ত গোপেশ। তোমার অভয়েরও তো ছুটি ছুরিয়ে এল। এখন এই হুটীর ছুটি একাধারে মা-বাবা। কি-আর করবে বল। নারায়ণ—নারায়ণ—সবই বিধাতা পুরুষের খেলা—

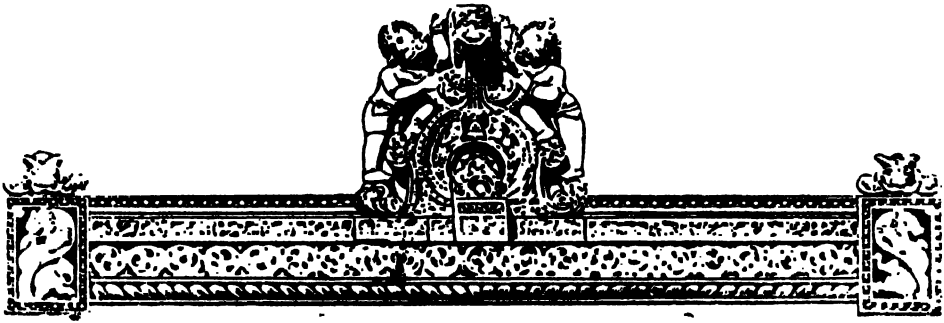
তার খেলাই বটে। কিন্তু এই খেলার খেল যেন কত কঠিন, কত হঃসহ কাজ, তা একমাত্র ভক্তভোগীই জানে। সংসারের প্রাত্যহিক জীবনযরণার মাঝে, নৃতন করে আর একটা বিপদ দাঁড়াল গোপেশ্বরের সম্মুখে। এতদিন সংসারের, সব কিছু দেখাশোনার মালিক ছিল। সরোজিনী। এখন একজন লোকের অবর্তমানে আজ গোপেশ্বর চারিদিক্ অন্ধকার দেখতে লাগলেন।

রান্না করা, বাটনা বাটা, জল তোলা, গরুবাছুরের যত্ন এ সমস্তই করতেন সরোজিনী। গোপেশ্বর বাইরে বাইরে ছুরতেন সামান্ত জমিজমা, আওলাতি গাছ, বাঁশ প্রভৃতির দেখাশোনা এসব করতেন। নিজের একখানি ছোট্ট দোকান আছে, তার কেনাবেচা, হিগাবপত্র রাখা,

শহর থেকে মালপত্র আনা এসব নিজেরই করতেন। কিন্তু এখন উপায় কি? গীতাকেই এখন সংসারের ভার নিতে হবে। শুধু ভর রান্না করার ব্যাপারে। এই অতটুকু মেয়ে, হয়ত উন্নত ধরতে গিয়ে, বা রান্না করতে গিয়ে কোন দূর্ঘটনা না করে বসে। দীনহঃখীর কপাল এমনই খারাপ। কথায় আছে না, তুমি যাও বন্ধে কপাল যাবে সঙ্গে। অদৃষ্ট যদি ভাল হ'ত, তবে এমন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হত না। কিন্তু এখন আর হা-হতাশ করে কোনও লাভ নেই। মানুষ অবস্থার দাস, সেই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারলেই বিপদ।

পায়ে পায়ে সময় চলে যায়। সময় তো কাকুর জন্মে বসে থাকবে না। মহাকালের কালো বুকে এমন কত শত সহস্র যুহু কোথায় হারিয়ে গেছে কে তার সন্ধান জানে? চোখের জল, বুকের জ্বালা, সবই একদিন ঝাঁকিয়ে যাবে। প্রকৃতির নিয়মে মানুষ আবার হাসবে, আবার সব ভুলে যাবে।

ক্রমশঃ



# কংগ্রেস স্মৃতি

( সপ্তবিংশ অধিবেশন—ময়া—১৯২২ )

শ্রীগিরিজামোহন সান্যাল

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

॥ ৭ ॥

২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে বিষয়-নির্গাচনী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হল।

কংগ্রেসে বিবেচনা করে গ্রহণ করার জন্য বার্লিন থেকে প্রসিদ্ধ বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য) একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, ইংলণ্ডের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করতে হবে। এই দাবি কার্য্যে পরিণত করার জন্য একটি কর্মসূচীর খসড়াও তিনি পাঠিয়েছিলেন। কেউ তাঁর প্রস্তাবের উপর গুরুত্ব দিলেন না।

অস্তান্তবাদের মত এবারও কোন সংবাদিককে বিষয়-নির্গাচনীর অধিবেশনে প্রবেশপত্র দেওয়া হয়নি। কেবলমাত্র ১২ জন দর্শককে এই সভায় উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

স্বরাষ্ট্রপুত্রীর সম্মুখে বিষয়-নির্গাচনী সভার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্যাণ্ডেল নির্মিত হয়েছিল।

বিষয়-নির্গাচনী সভার কার্য্য আরম্ভ হলে—প্রথমেই কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্নে উভয় দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা বিভিন্ন নেতা করতে লাগলেন কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল না।

এদিন কোন বিতর্কমূলক প্রস্তাব উপস্থিত করা হল না। কেবলমাত্র রাজী কামাল পাশা ও চুর্কী প্রভৃতিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন, দেশের জন্য ধীরা সৈন্য প্রেরণের প্রস্তাব প্রকাশ করা কর্তব্য।

দুঃখ বরণ করেছেন তাঁদের এবং অহিংসা ও নির্ভীকতার জন্য আকালীদেব অভিনন্দন জ্ঞাপন সম্বন্ধে প্রস্তাবগুলি আলোচনা করে কংগ্রেসে উপস্থিত করার জন্য গৃহীত হল।

সৌদিদকার মত বিষয়-নির্গাচনী সভা শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন নেতারা উভয় দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। উভয় দলের নেতারাও পৃথক পৃথক স্থানে মিলিত হয়ে এদিকের আলোচনা করতে লাগলেন। দেশবন্ধুর বাসগৃহে কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষপাতীরা এক বৈঠক মিলিত হয়ে প্রায় তিন ঘণ্টা আলোচনা করেন। কংগ্রেসে তাঁরা যদি হেরে যান তাহলে তাঁদের কর্মপদ্ধতি কি হবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করে স্থির করা হল যে সে-ক্ষেত্রে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অনুকূলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্যকর পদ ত্যাগ করবেন।

কাউন্সিল প্রবেশের বিরোধী দলও পৃথক ভাবে মিলিত হয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করতে লাগলেন।

২৪শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে পুনরায় বিষয়-নির্গাচনী সভার অধিবেশন আরম্ভ হল। রাজাগোপালাচাৰী মশায় প্রস্তাব করলেন যে—কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্নটি প্রথমে আলোচনা করা হোক। সভাপতি এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বললেন যে, গুরুতর প্রস্নগুলির আলোচনার পূর্বে তাঁকে প্রকৃত অধিবেশনে সভাপতির অতিভাষণ পাঠ করার জন্য সৌজন্য প্রকাশ করা কর্তব্য। সুতরাং আর কোন গুরুতর প্রস্তাব এদিন আলোচনা

হল না। মাত্র ব্রিটিশ পণ্য বয়কট সম্বন্ধে প্রত্যাবের উপর আলোচনা হল। রাত্রি অধিক হওয়ার সৌদনের মত সভা বন্ধ করে পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অধিবেশন স্থগিত রাখা হল।

পরদিন প্রাতঃকাল ৯টা নাগাদ পুনরায় বিষয়-নির্গাচনী সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হল। পূর্ণদিনের ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের আলোচনা আরম্ভ হল। আলোচনার পর প্রস্তাবটি গৃহীত হল। তার পর সৌদনের মত সভা কার্য শেষ হল। স্থির হল ২৬শে তারিখ প্রথম দিনের কংগ্রেসের প্রকৃত অধিবেশনের পর পুনরায় বিষয়-নির্গাচনী সমিতির সভা হবে।

॥ ৮ ॥

কংগ্রেসের প্রথম দিনের অধিবেশনের দিন স্থির হয়েছিল ২৬শে ডিসেম্বর। নির্দিষ্ট সময় দুটোর বহু পূর্ব থেকেই প্রতিনিধি ও দর্শক দ্বারা প্যাণ্ডেল পরিপূর্ণ হয়েছিল। আমরা যখন প্রায় ১০টার সময় প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করি তখন দেখলাম যে, দর্শকের স্থান সম্পূর্ণ ভরে গিয়েছে, গ্যালারির মধ্যবর্তী খালি জায়গাগুলিও দর্শক দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল।

কংগ্রেসে মহিলাদের উপস্থিতির সংখ্যা ক্রমে বাড়িছিল। এবার প্রায় ১০০ পর্দানশীন মহিলা ১৫০০ মহিলা কংগ্রেসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

খন্ডের সামিয়ানা যুক্ত স্তরহৎ প্যাণ্ডেল নির্মিত হয়েছিল। প্যাণ্ডেলের প্রবেশদ্বার বৌদ্ধ স্থাপত্য-রীতি অনুসারে নির্মিত হয়ে অগ্নি শোভা ধারণ করেছিল। তোরণ দ্বারে মহাত্মা গান্ধীর স্তরহৎ আলংকার্য চিত্র রাখা হয়েছিল।

প্রবেশদ্বার থেকে প্যাণ্ডেল পর্য্যন্ত রাস্তার ধারে ধারে পুষ্পোদ্ভান শোভিত স্থানে চারটি কোয়ার্টার সজ্জা করা হয়েছিল। প্যাণ্ডেলের অভ্যন্তরে “দেশের জন্মই সুনামের জীবন”, “হিন্দু-মুসলমান ঐক্য মহাত্মার মানস সন্তান”, “জালিয়ানওয়ালা বাগ হরণ কর”, “গভর্নমেন্টের প্রদত্ত উপাধি দাসত্বের প্রতীক চিহ্ন”। ওঠে, জাগো এবং উদ্বেগ সফল না

হওয়া পর্য্যন্ত গতিবোধ করো না”, “দেশের ভবিষ্যৎ মহিলাদের হাতে”, “স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার” প্রভৃতি স্লোগান বড় বড় বোর্ডে লিখে প্যাণ্ডেলের ভিতর টাঙ্গানো হয়েছিল।

বেলা ২টার অনেকটা আগেই পুরোতাপে আমেজাবাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও বয় কাউন্টদের ব্যাণ্ড পাটি এবং পশ্চাতে সি রাজাগোপালাচারী, বল্লভ ভাই প্যাটেল, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, সি বিজয়রামচাচারিয়ার, এন সি কেলকার ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সহ শোভাযাত্রা সহকারে বিপুল অভ্যর্থনা ও “দেশবন্ধু দাঁপ কি জয়” ধ্বনির মধ্যে সভাপতি মশায় প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে ডায়ালো তাঁর জন্ম রক্ষিত আসনে উপবেশন করলেন।

ক্রমে অমৃত্যু নেতারা এসে ডায়ালো আসন গ্রহণ করলেন। যখন শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ গান্ধী (পরবর্তী কালে তিনি কস্তুরবা গান্ধী নামে উল্লিখিত হতেন) প্রবেশ করলেন তখন তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা জানানো হল।

ডায়ালো দ্বারা আসন গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন—পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, চাকিম আজমল খাঁ, সি বিজয় রামচাচারিয়ার, ডাক্তার এম্ এ আনসারী, ডঃ ময়ূর, এন্স সি কেলকার, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, সি রাজাগোপালাচারী, মহম্মদ উল হক্, শেঠ, যমুনালাল বাকজ, লালু হুসী-চাঁদ, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, অখিল চন্দ্র দত্ত, এ রঙ্গধামী আয়েজার, অভয়কর, এন্স সত্য-নৃতি, এফ্ আকাস ভায়েবজী, কে শান্তনর, সি এন্স রজ আয়ার, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, এন্স আর জয়কর, প্রফেসর ডেজা সিং, কে, নটরাজনু। এস শ্রীনিবাস আয়েজার, শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ গান্ধী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, বেগম হুমায়ত মোহানী, শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, শ্রীমতী বরপরাণী নেহেরু, চন্দ্র কংশী সহায়, অম্বায়ে নারায়ণ সিং, সর্দার গুরুবর সিং, বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি। ডারবান হতে আগত

কয়েকজন দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন।

বেলা ২টার সময় স্বদেশী যুগের প্রসিদ্ধ গায়ক ব্রজেনলাল গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে কয়েক জন বাঙালী, মহিলা বন্ধে মাতরম্ গাইলেন। বন্ধেমাতরম্ গাওয়ার সময় সকলে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর গান্ধী মহাবিশ্বালায়ের বিখ্যাত গায়ক বিষ্ণু দিগম্বর উদাস্ত কণ্ঠে একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন। তার পর শ্রীমতী তায়েরজী দ্বারা মর্মস্পর্শী সঙ্গীত গীত হওয়ার পর সভার কর্তব্য আরম্ভ হল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বাবু ব্রিজ কিশোর প্রসাদ হিন্দীতে তাঁর অভিব্যক্তি পাঠ করলেন।

সভাপতি মশায়কে যথারীতি অভ্যর্থনা করার পরে তিনি বললেন যে, অভিজ্ঞতার অভাবে কংগ্রেসের অয়োজনে তাঁদের অনেক ত্রুটি হয়েছে। তজ্জন্ম তিনি অভ্যর্থনা সমিতিঃ পক্ষ থেকে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

তারপর তিনি পাবনা গয়া নগরের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে বললেন যে, এই নগরেই বুদ্ধদেব তাঁর প্রথম আত্মোপলব্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি জানালেন যে, এই বিহার প্রদেশেই দক্ষিণ আফ্রিকা হতে প্রত্যাগত মহাত্মা গান্ধী তাঁর নীতি ও কর্মপদ্ধতি অতুল্যারে কাজ শুরু করেছিলেন।

তিনি আন্তিমত প্রকাশ করলেন যে, ১৯২০ সালের পূর্ণ পর্যন্ত কংগ্রেসের কাজ প্রস্তাব পাশ, গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন নিবেদন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে আলোচনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কংগ্রেসের এই কার্যক্রমকেই তার আগুতোষ চৌধুরী স্বাধীনতা দিচ্চা আখ্যা দিয়েছিলেন। মহাত্মাই নতুন পথ দেখিয়ে আমাদের ঈঙ্গিত উদ্বেগ সকল করার উপায় স্বরূপ অসহযোগ নীতি গ্রহণ করতে কংগ্রেসকে সঙ্গত করেছিলেন। তারপর তিনি বিস্তারিত ভাবে অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে বললেন।

তারপর তিনি প্রায়শ্চলিকে সংঘবদ্ধ করার কথা

বলে জানালেন, এই কাজ বিশেষ ভাবে আবশ্যক, কারণ, দেশের জনসাধারণকে সঙ্গে না পেলে স্বরাজ অর্জন করা যাবে না।

ব্যক্তিগত আইন অমান্তের তিন বিধি সমালোচনা করে বললেন, স্বরাজ পিকেটিং বা আইন অমান্ত দ্বারা অর্জন করা যাবে না। কাজটি এত সোজা নয়। স্বরাজ অর্জনের জন্য চাই ভীষ্মের মত অনমনীয় প্রতিজ্ঞা এবং ভগীরথের মত অদম্য মনোবল।

তারপর তিনি কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকাশ করলেন। তিনি অত্যন্ত হৃৎকষের সহিত লক্ষ্য করলেন, যে অসহযোগ আন্দোলনের পরিচালকরা প্রস্তাব আমাদের কতক বন্ধুকে স্পর্শ করতে পারেন। তাঁরা মহাত্মার বাণী গ্রহণ করতে অপারগ হয়েছেন। জয়াকর মশায়ের মত গারা মনে করেন যে জনগণের প্রতিভা স্বরূপ দেশবন্ধু দাশ ও পাণ্ডিত্য মাতলাল নেওকের মত নেতারা কাউন্সিলে প্রবেশ করলে তাঁরা গভর্ণমেণ্টকে তাঁদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে বাধ্য করবেন তাঁদের এই দ্রাস্ত মত তিনি অনেকগুলি শ্রুতিঃ দ্বারা খণ্ডন করলেন।

তিনি দৃঢ়তার সহিত বললেন, যদি তাঁরা সগনিয় প্রেণী থেকে সর্বোচ্চ প্রেণীর সকলকে নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলতে পারেন বা জনসাধারণকে তাঁদের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন তা হলে কাউন্সিল প্রবেশের কোন প্রশ্নই উঠবে না।

অবশেষে তিনি জানালেন যে, কংগ্রেসের দ্বায় যাই হোক না কেন, তাতে যেন তাঁদের উল্লসিত বা ভগ্নমনো-রখ না করে। যদি কংগ্রেস কাউন্সিল প্রবেশের দপক্ষে ভোট দেয় তা হলে তাঁদের মধ্যে গারা গঠন-মূলক কর্মসূচীর সাফল্যে বিশ্বাসী, এবং তাই স্বরাজের প্রকৃত পন্থা মনে করেন, তাঁরা কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে তাঁদের কাজ ভাগ করে নেবেন এবং সেই কর্মসূচী কার্যে পরিণত করতে তাঁরা মনোনিবেশ করবেন এবং গারা কাউন্সিলে প্রবেশের পক্ষে তাঁরা নিশ্চিনপ্রার্থী হবেন এবং কাউন্সিলের ভিতরে তাঁদের কর্মসূচী ব পরীক্ষা দেবেন।

উপলংঘ্যে তিনি আবেদন করলেন, যাতে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশমত কংগ্রেসের কাজ হিন্দীতে পরিচালিত হয়। অতঃপর তিনি সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর অভিভাষণ শেষ করলেন।

অভিভাষণের পর ব্রজ কিশোর বাণু সভাপতি মশায়ের থলার ফুলের মালা পরিবেশ দিলেন এবং তাঁর কামার বুকে সভাপতির ব্যাজ, একটি সুন্দর কারুকার্য, শোভিত তারকা এঁটে দিলেন। তারপর তিনি বোষণা করলেন যে, সভাপতি মশায় তাঁর ভাষণ এখন দেবেন।

মুহুমুহু কর্ণবিহারক ‘মহাত্মা গান্ধী কি জয়’ ও ‘দেশবন্ধু কি জয়’ ধ্বনির মধ্যে সভাপতি মশায় বক্তৃতা মঞ্চে উঠলেন।

তিনি হিংরোজি ভাষায় লিখিত তাঁর সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করতে আরম্ভ করলেন।

প্রথমেই তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রেস্তাবের কথা উল্লেখ করলেন। তিনি জানালেন যে, আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে অবিস্মরণীয় সংগ্রামের পর মহাত্মা গুহ ও কারাগারে নিষ্কপ্ত হয়েছেন। এই বৎসর কংগ্রেসের কার্য চালনার সময় তাঁরা গান্ধীজীর নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হবেন।

এই রকম মর্মস্পর্শী, উচ্চমনা, মহিমাময় অল্পরূপ কাহিনীর জন্ত তাঁদের হৃদয় হাজার বৎসরের পূর্বে যেতে হবে, যখন নাজারেথের যিশু জনগণকে বিপদগামী করার অভিযোগে বিদেশী আদালতে বিচারের জন্ত আনীত হয়েছিলেন। যখন যিশু গভর্ণরের সম্মুখে দাঁড়ালেন তখন গভর্ণর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি ইহুদীদের রাজা?” যিশু উত্তর দিলেন, “তুমি বলহ।” যখন প্রধান প্রধান পুরোহিত ও মাজকরেরা তাঁর উপর দোষারোপ করল তখন গভর্ণর পট্রিয়াস পাইলট বললেন, “তুমি কি শোন নি তোমার বিরুদ্ধে কত কথা সাক্ষীরা বলল?” তখন তিনি কোন উত্তর দিলেন না। এতে গভর্ণর বিষয়ে অবাক হয়েছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর পথ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি তাঁর দোষ স্বীকার করেছিলেন কিন্তু বলেছিলেন

যে যদি তিনি ব্যুরোক্রেসিস আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে থাকেন তাহলে সেই বিরুদ্ধাচরণ করতে তিনি ইব্রের আইনই যেনে নিরেছেন। সভাপতি দেশবন্ধুর অহুমান যে, যে-কাজ তাঁর (মহাত্মার) বিচার করেছেন এবং কারাবন্দের আদেশ দিয়েছেন তিনিও পাইলটের মতই বিস্মিত হয়েছিলেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহান্ এবং তা কার্যকর করতে মহান্ মহাত্মা গান্ধী দেশের জন্ত যে শেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তাতে তাঁর অতুলনীয় মহত্বই প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীতে কত মহাপুরুষ জন্মেছেন, তাঁদের সর্গাপেক্ষা শ্রেষ্ঠদের মধ্যে অবিস্মরণীয়ভাবে তিনি তাঁদের অন্ততম পৃথিবীতে তাঁর দরকার আছে। যে জাতিকে তিনি জয়ের পর জয়ে নিয়ে যেতে নেতৃত্ব করেছেন সে জাতি তাঁকে বর্তমানে এবং সর্গকালে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করবে।

তারপর তিনি বিস্তারিত ভাবে আইন ও শৃঙ্খলার কথা আলোচনা করে এই আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ত ব্যুরোক্রেসিসকে সমর্থনের জন্ত মডারেটদের সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন, যেখানে স্বাধীনতা এসেছে সেখানে, সে সকল আইন আইন ও শৃঙ্খলার জন্ত তৈরি হয়েছিল সেই সকল আইন ভেঙেই এসেছে। যখন গভর্ণমেন্ট ঘেঁষাচারী ও অনাচারী এবং যখন জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হচ্ছে না তখন আইন ও শৃঙ্খলার কথা বলা বৃথা। তাঁর এই মতের পৌরকতার জন্ত বহু দেশের ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতি দিলেন। তিনি বললেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ও প্রত্যেক জাতির যে-আইনী আইন প্রবর্তনে বাধা দেওয়ার অধিকার আছে। আসল কথা হচ্ছে—মাতৃমের জন্তই আইন ও শৃঙ্খলা—আইন ও শৃঙ্খলার জন্ত মাতৃ নয়।

তার পর তিনি জাতীয়তার আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, পূর্বপর ভারতের ইতিহাসে তিনি একটি উদ্দেশ্যই প্রকাশিত হতে দেখেছেন। দেশের উপর দিয়ে বড়ের পর বড় করে নিয়েছে। আপাততঃ যদে হচ্ছে তেবে, এতে পরম্পর-

বিরোধী শক্তির সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয়ে জনগনকে একটি বৃহৎ জাতিতে পরিণত করেছে। আর্য ও অনার্যের সংঘর্ষের ফলও তাদের এক জাতিতে পরিণত করা। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তার স্রমহং কৃষ্টি দ্বারা সমস্ত ভারতকে এক স্রজে বঁধতে পেরেছে এবং প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাই একটি বড় রকমের জাতীয়করণের শক্তি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদী বৌদ্ধ ধর্মও সেই ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সফল করেছে। বৌদ্ধধর্মের ফলে মগধ থেকে তক্ষশীলা পর্যন্ত একটি বৌদ্ধ সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। এতে কেবল মাত্র ভারতের ঐক্য সৃষ্ট করেনি। হিমালয় লঙ্ঘন করে এশিয়ায় এবং সমুদ্রের পরপারে বৃহত্তর ভারত সৃষ্টি করেছে। এর ফলে আমরা যে পুণ্য নগরে মিলিত হয়েছি সেই নগর এশিয়ার বিভিন্ন জাতির লক্ষ লক্ষ মানবের তর্কবিহানে পরিণত হয়েছে। তার পর একই কৃষ্টি সম্পন্ন বিভিন্ন জাতির মুসলমানরা ভারতবর্ষে এসে এখানকারই বাসিন্দা হলেন। তাঁরা ভারতের জনজীবনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, আশ্চর্য্য সজীবতা এনে দিলেন। কিন্তু যেখানে আসিল ভারতবর্ষ, সেই গ্রামগুলির জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়নি। তারপর এল ইংরেজ। তারা তাদের বৈদেশিক সভ্যতা ও প্রথা প্রচলন করে দেশের জাতীয়তার মূলে রক্ত আঘাত করল, কিন্তু সেই আঘাতের ফলে—ভারতের ঐক্যকরণ সম্পূর্ণ হল। ইতিহাসের উদ্দেশ্য প্রায় সিদ্ধ হয়েছে। মহান ভারতীয় জাতীয়তা—আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এই জাতীয়তার প্রসঙ্গ বা, স্বরাজ্যলাভের প্রসঙ্গ তাই।

তারপর তিনি অহিংস অসহযোগের পন্থা সমর্থন করে বললেন যে, স্বরাজ্যলাভের পক্ষে এই হল পথ।

তারপর তিনি কনাসী দেশ, ইংলণ্ড, ইটালী ও রাশিয়ার বিপ্লবের ইতিহাস আলোচনা করে বললেন যে, তিনি বিপ্লবে বিশ্বাস করেন কিন্তু হিংসামূলক কাজ স্বাধীনতা দই করে। অহিংসার পথে বিপ্লবের গতি মধুর কিন্তু সুনিশ্চিত।

পিতামাতা গুরুজনদের বাক্য অমাত্র কথার ভিত্ত

মুখকদের যে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ হয়েছে তা তিনি স্বীকার করেন। এই কার্যের অন্তর্কূলে প্রত্যেক ধর্মালোকনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার সম্বন্ধে তিনি বললেন, স্বরাজ গভর্ণমেন্টের অধীনে তাদের সকল সম্প্রদায়ের অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ঘোষণার দ্বারা কাজ আরম্ভ করতে হবে। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে, লক্ষ্যে প্যাঁট (হুতি) আরও স্পষ্ট ও জোরের সঙ্গে পুনঃ স্বীকার করা প্রয়োজন। হিন্দু ও মুসলমানকে তাদের পরস্পরের অধিকার স্বীকার করে নিতে হবে। এর জন্য তাদের যদি কিছু ভাণ্ড স্বীকার করতে হয় তাও করতে হবে। হিন্দু ও মুসলমান ভারতের জনগণের স্রমহং অংশ স্রমভোগ তাদের সংখ্যা-লব্ধ শিখ, বৃটান পার্শী প্রভৃতি সম্প্রদায়কে স্বরাজ গভর্ণমেন্টের আমলে তাদের সংখ্যার অনুপাতিক প্রাপ্য অংশ থেকে বেনী দ্বিষ্টে হবে। তিনি বৃটান সম্প্রদায় বলতে যে পাঁচ ভারতীয় বৃটান মনে করেন তা নয়। এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ইঙ্গ-ভারতীয় এবং দ্বারা ভারতবর্ষকে নিজের দেশ মেনে নিয়েছেন তাঁরাও অন্তর্গত।

তারপর তিনি বিদেশভ্রমণে প্রচার কার্য চালানোর আবশ্যিকতার কথা বললেন এবং নির্দীরমাণ গ্রেট এশিয়ান ফেডারেশনে যোগ দেওয়ার জন্য কোর দিলেন।

তিনি পাকিস্তানে ও খিলাফতের সমস্যার প্রতিকার দাবি করলেন।

তিনি ভারতীয় ভারত গভর্ণমেন্টের একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা কংগ্রেসের সামনে উপস্থিত করলেন।

সভাপতি দশায় তারপর এবারকার কংগ্রেসের প্রধান আলোচ্য বিষয় কাউন্সিলে প্রবেশ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, এই প্রসঙ্গ উপলক্ষে কংগ্রেসের ভিতর ‘প্রো-চেজার’ ও ‘নো-চেজার’ নামে দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছে। দেশময় তর্ক-বিতর্ক চলছে যে কাউন্সিলে প্রবেশ অহিংস



অসহযোগ নীতির অন্তর্গত কি না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে এ অসহযোগ নীতির পরিপন্থী নয়। এ সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত ভাবে বললেন। সংশোধিত বিধানসভাপ্রতিষ্ঠাতে অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের পথে বাধা না দেওয়ার নীতি সম্বন্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করলেন। চ্যাম্বের গুরুভার আরও বাড়বে। তিনি আশঙ্কা করেন যে, এর ফলে যে জনগণ এখন তাঁদের সঙ্গে আছে তাদের সমর্থন তাঁরা হারাবেন।

তিনি কংগ্রেসের নিকট আবেদন জানালেন যে, যদি ব্যুরোক্রেসী দেশের জীবন না মানে তাহলে কাউন্সিল-প্রবেশ-পন্থীদের কাউন্সিলে প্রবেশ করে সেগুলি ধ্বংস করার অসুমতি দিন।

তারপর তিনি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে বললেন।

স্কুল ও কলেজের বয়কট ও আইনজীবীদের আদালত বয়কট চালিয়ে যাওয়ার তিনি পক্ষপাতী। তিনি খন্দর সম্বন্ধে বললেন, যেন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খন্দর টংপারনের ব্যবস্থা না করা হয়।

উপসংহারে তিনি বললেন যে, যদিও বর্তমান

আন্দোলনের বিশেষ জুস্টি সাফল্য দেখানো যাবে না তাহলেও এর সফলতা নিশ্চিত।

তার পর তিনি সমবেত প্রতিনির্ধারণকে সম্বোধন করে বললেন যে, সত্য ও জ্ঞানের জন্য আপনারা নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করুন যাতে আপনাদের সম্মান-সম্মতি-গণ ও তাদের সম্মান-সম্মতিগণ আপনাদের দুঃখভোগের ফল লাভে করতে পারে। আপনারা ভায়দ্যবাহুসারে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম করুন, যাতে যখন জয়লাভ হবে তখন যেন তা আপনাদের কল্যাণের না করে অথবা গুণগুণের ক্ষমতা নিজ হাতে রাখার জন্য প্রলুব্ধ না করে। আপনাদের সংগ্রাম যদি আধ্যাত্মিক হয় তাহলে আপনাদের অস্তিত্ব হবে আধ্যাত্মিক সৈন্তদের উপযোগী। আপনাদের জন্য ক্রোধ নয়, দুশা নয়, ক্ষুদ্রতা নয়- নীচতা নয় অথবা মিথ্যাচার নয়। আপনাদের জন্য উষা-সমাগমের আশা ও রাজি-অবসানের বিশ্বাস।

তিনি 'বন্দে মাতরম্' উচ্চারণে করে তাঁর অভিনয় শেষ করলেন।

একটি জাতীয় সঙ্গীতের পর সেদিনের মত সভা শেষ হল।

ক্রমশঃ



# পুণা আশ্রমে

দিলীপকুমার দাস

এই অলৌকিক অভিজ্ঞতার ফলে কালীদাসকে আমরা  
বরণ ক'রে নিলাম নিটোল আনন্দে। আমার সর্গপ্রথম  
—অনেকের মতে আমার সর্গশ্রেষ্ঠ—সমগ্রাস 'অষ্টটন  
আজো ঘটে' কালীদাসকে উৎসর্গ করেছি এই বরমাল্যে :

সাধনায় কেউ পায় জ্ঞান, কেউ প্রতিজ্ঞা, কেউ ভাস্কর্য,  
আমরা কত কি—যা অপরে পারে না জানতে।

আমরা কিন্তু ভেবেছি যে, তুমি পেয়েছ প্রেমের শক্তি—  
পরকে আপন ক'রে নিয়ে কাছে টানতে।

দিয়েছ শাস্তি কে গুপ্তযোগী, কত অশান্ত পাথে  
মুক্তির দিশা দেখিয়ে তোমার জীবনের দৃষ্টান্তে :

সমাজে সত্য মেলানোয় আড়ায় কালীদাস সত্যই  
গুপ্তযোগীর মতন আচরণ করতেন—মানসে, সাধারণের  
সামনে। তবে গানের ভালোবেসে কাছে টানতেন  
তাঁদের অনেকেই অনুভব করেছেন তাঁর অসামান্য প্রেমের  
টান। 'আমাদের কালীদাস' বলে তাঁকে ডাকত সবাই।  
নানা দেশ থেকে নানা যোগী তপস্বী তথা জ্ঞানার্থী  
তাঁর কাছে আসত। এসে যে অনেক কিছু পেত  
এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু সব আগে পেত তাঁর স্নেহ  
স্পর্শ। স্নেহ দানে কালীদাস বাহ্যবিচার ছিল না। তাঁর  
ব্যক্তিক্রমে সত্যিই জলত প্রেমের অমলিন রংমশাল।  
তিনি এক বিদেহী মহাযোগীর সংস্পর্শে এসে যোগী  
ব'নে গিয়েছিলেন শুনেছি। তাঁর দেহান্তের পরে তাঁর  
এক প্রিয় শিষ্য কবি বিড়পদ তাঁর কীর্তি যোগীজীবনের  
ঈশ্বর আভাষ দেন। এ ছাড়া তাঁর অন্তর সাধনার কোনো  
ইতিহাসই কেউ লেখেনি—জানত না লিখবে কোথেকে ?  
মনে হয় শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ  
কীকিৎ জানল, কারণ এঁদের সঙ্গে কালীদাস নিরলার  
যতীর পর যতী কথাবার্তা হ'ত। কিন্তু তাঁরা কেউই  
আজ পর্যন্ত কিছু লেখেননি। এক্ষেত্রে আমি হৃৎসবোধ

করেছি—তবে মনে হয়—কালীদাস ধরা দিতে চাইতেন  
না ব'লেই তাঁর 'বন্ধু'-র কথা নিজেও লেখেননি বা  
(বিড়পদবাবু ছাড়া) কাউকে দিয়ে লেখান নি শেষ  
পর্যন্ত। তিনি সম্ভবতঃ চেয়েছিলেন যে, তাঁর দেহান্তের  
পর 'বন্ধু'-কাহিনীর রোমান্স প্রকাশ হবে কেবলমাত্র  
বিড়পদবাবুর মাধ্যমে। কিন্তু এসব জরুরীকল্পনা  
অবাস্তব না, হলেও নীচল। আনন্দের কথা এই যে,  
বিড়পদবাবুর 'আমাদের কালীদাস' আত্মপ্রকাশ  
করেছে ১৯৬১ সালে, প্রকাশক—গ্রন্থপ্রকাশ, হুত্রত কীর্তি,  
১৯ শ্রামচরণ দে স্ট্রীট, কালকাতা—মূল্য ৫ টাকা। এবং  
এতে অনেক মূল্যবান তথ্য আছে—কালীদাস সাধনা  
সম্বন্ধে—'বিশেষ ক'রে তাঁর কাছে আবির্ভূত হতেন যে-  
মহাযোগী তাঁর বাণী, যার নামকরণ করেছেন কালীদাস  
—'বন্ধু'। কে এ-বন্ধু কেউ জানে না, কিন্তু বইটিতে  
বিড়পদবাবু কিছু সংবাদ দিয়েছেন যা পড়লে মন ভরসা  
পায় ভাবতে যে, এরকম দৈবী আবির্ভাব সম্ভব—এ-  
কালীগুণেও যার উপাত্ত নাস্তিক বস্তুভাবিকতা। ইন্দ্রিয়ার  
কাছে যেমন আসেন শ্রীমীরা, কালীদাস কাছে তেমন  
আসতেন শ্রী'বন্ধু'—গার স্বীকার্য কালীদাস যোগব্রতী  
হয়েছিলেন। এ সংবাদটিও আমরা প্রথম পাই  
বিড়পদবাবুরই স্মৃতিচারণে, ওঁর কালীদাস ভাবধের  
অভিলিপিতে।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এ বিদেহী 'বন্ধু'  
কালীদাস কাগে এসেছিলেন ভাগবতী করুণায় তাঁকে  
সিঁদুর পথে আগ্নেয় দিতে। একদা বিড়পদবাবু  
কালীদাসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : "বন্ধুর সঙ্গে  
আপনার বাতীদানের অনেকখানি সময় কাটে। তখন  
আপনার কি করেন কি বলেন জানতে ইচ্ছা করে,"  
কালীদাস হেসে উত্তর দিয়েছিলেন ( ২২ পৃষ্ঠা ) : "স্বর্ষকথা

বা তত্ত্বকথা বলতে বা বোঝার সে-সবের কিছুই হয় না। বহু বলেন আকাশের কথা, আলোর কথা, যৌক্তিক-মেঘের লুকোচুরি খেলার কথা, মাঠ ঘাট নদী স্বর্ণী পাহাড় পর্বতের কথা, দিব্যিরাত্রির অতিসারের কথা—আরই তারই কাকে কাকে বলেন মানুষের আনন্দ-বেদনার অনুরক্ত কাহিনী, জীবনের আদি-অন্তহীন কার্যকথা। গানের পর গান গ্রেয়ে যান [মনে করিয়ে দেয় ইন্দ্রিয়ার কাছে মীরার গানের পর গান গাওয়ার কথা] ‘আর আমি তগ্ন হয়ে তানি। আশ্চর্য্য, তাঁর ভাষার ইন্দ্রজালে আমি গ্রহের পর গ্রহ ধরে নিজে কতলে থাকি। অনুপম সেই কঠোর বক্তারে আমি মন্ত্র-বুদ্ধের মত সন্মোহিত হয়ে যাই। আমার সাধনার ধন যে বাংলাভাষা, তাকে যেন নতুন করে পলে পলে আবিষ্কার করছি তাঁর মুখের কথায়, তাঁর অপকল্প লক্ষ্যবিন্দুতে। সন্দেহ আগে, একি সেই পরিচিত বাংলা ভাষা না দেবভাষা? আমার মাতৃভাষার যে এত ঐশ্বর্য্য, এত মাহুর্ষ থাকতে পারে, বহুর মুখে না ওনলে তা কোনোদিন আমি অনুভব করতে পারতাম না। সহজ সরল ছোট ছোট কথাগুলি যেন প্রাণের গভীর থেকে এসে সারা প্রাণকে মাতিয়ে দিয়ে যায় : সত্যের আলোকে ঝলমল করে ওঠে। ইচ্ছা করে তাঁর সেই অনুপম কথাগুলি সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাই। কিন্তু তা তো আর হবার নয়।”

আমি বললাম, “কালীদাস, যদি বাধা না থাকে আপনি আমাদের সেই সব কথার কিছু শোনাতে পারেন?” [২০ পৃষ্ঠা।]

কালীদাস বললেন, “তা কি আর বলা যায়? কার ভাগ্যে কি আছে কে বলতে পারে? আমারই কথা ভেবে দেখুন। আমি সাধু সন্ন্যাসী কিছুই তো নই। কোনো বর্ষশাস্ত্রের পাতা উটে দেখি নি। বংশলী করোঁছি, রীতিমত সংসার করোঁছি, সাহিত্য করোঁছি, আসর জরিদের আড্ডা দিইোঁছি, কোনো বকম ধর্মকর্মের দায় দিইোঁ কখনো যাইনি, ঠাকুর দেবতাদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখিনি। তবু তো আমার ভাগ্যে বহুর আবির্ভাবের বাধা হয় নি। বহু তো সেই কথাই

বলেন : ‘আমাকে ঝুঁজে বেড়াতে হবে কেন? আমিই তো সবাইকে ঝুঁজে ঝুঁজে বেড়াই। যখন তখন ঘরে ঘরে করাঘাত করি আর হতাশ হয়ে কিরে আসি। যে যার দরজা আগলে বসে থাকে বলে কোনোখানে প্রবেশের পথ পাই না, তবুও তো আশা ছাড়তে পারি না। হুঃখের দিনে সমবেদনার পাশে গিয়ে দাঁড়াই, কিন্তু সাড়া পাই না। আনন্দের দিনে আবার তার কাছে ছুটে যাই, তখনো দেখি আমার দিকে কিরে তাকাবার তার অবসর নেই। আসে জগৎ, আসে মৃত্যু—প্রভাতের পর আসে সন্ধ্যা। আলোক-স্নাত বংশীর বৃকে আনন্দ-সমারোহে যারা মেতে থাকে, তারাও আমার দিকে তাকায় না; তমসাবৃত বন্যার হুঃখ-পারাবারে যারা হাবুড়ু বার, তারাও আমার দিকে কিরে চায় না।” [২০ পৃষ্ঠা।]

পড়তে পড়তে গিয়ে কাঁটা ছেঁয় : এ তো জীবন-দেবতার কথা, যিনি নিরন্তরই চান আমাদের হৃদয়ে ঠাই পেতে কিন্তু দ্বার খোলা না পেয়ে কিরে যান। জীবনদেবতা বা তাঁর প্রতিনিধি—একই কথা, কেননা ‘ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম হন’ এ সাক্ষাৎ উপনিষদের ঘোষণা। যেমন I and my Father are one—বুড়ীদেবের আত্ম-পরিচিতি। যে ঠাকুরকে পায় সে তাঁর সিদ্ধ চেতনার নিজের বিন্দু অহংতা বিসর্জন দিয়ে তাঁর হাতের যত্ন হয় জীবনযুক্ত পদবী পেয়ে। রবীন্দ্রনাথ এই জীবনদেবতার কথা বলেছেন তাঁর কত গানে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কত কবিতায়—বিশেষ করে সাবিজীতে। গীতারও পাই অথবা নিম্পাপ হয়ে ব্রহ্মনির্গণ লাভ করে কিরে এসে ‘সংস্কারভিত্তিক রত’ হন—যে-প্রেক্ষাটী একই আগে উদ্ভূত করোঁছি। এই ব্রহ্মনির্গণের আভাস দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বক্তৃতা তাঁর ভাষায় সাবিজী-তে :

The landmarks of the little person fell :

The island ego joined the continent.

অর্থাৎ কি না, আমাদের বিভূতিবিহীন আমি জীবনে হুঃখ পায় ভূমার অসীমার স্রাব্যাদ না পেয়ে। সাধনার যেমনি এ-আমি-র আড়াল লুপ্ত হয় অহং আমি-র স্বীপাবক বৃত্ত হুঃখী জীবন। অনন্ত পরমাত্মার সাংস্কার

লাভ করে (ভগবানের ভাষায়) “প্রায়শ্চিত্ত আনন্দ-সমুদ্রময়ঃ”। কালীদাস ‘বন্ধু’ এই বিভূতাসুখ্য পাবার পর বিভূত প্রতিভূ হয়ে বন্ধুজীবের কাছে কীরে আসতেন তাদেরকে অসীমার, ভূমার ঐশ্বর্যবাদ দিয়ে ধন্ত করতে। স্ববীজনাথের এটি গানে আছে :

সে যে কাছে এসে বসেছিল, তবু জাগি নি,

কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনি!

তিনি কাছে এসে বসেন তো বারবারই, কিন্তু আমরা যে মোহবুমে আচ্ছন্ন তাই জানতে পারি না তাঁর সারিণ্য। দাঁড়র একটি গানে আছে, দ্বাপ্রত প্রেমিকের সঙ্গে ঘুমন্ত প্রেমিকার প্রেমলীলা হবে কেনন করে? ইন্দ্রিয়ার একটি প্রাণলক্ষী মীরাভক্তনে আছে (উবাঞ্জলি):

হৈ কোন সহ পরদেশি আরা মেরে দার কে?

‘তু খোল দে, তু খোল দে’,—রায়ে পুকারকে?

সহ কোন স্নেহে ঘরমে ফির দীপক জ্বায়ে হৈ?

সহ কোন আয়ে হৈ সখী, সহ কোন আয়ে হৈ?

আসে) পরদেশী কে অভিধ রে আজ হুয়ারে আমার?

“খোল) খোল দার ওরে”—তারঘরে ডাকে আনিবার।

আবার) শূন্ত ঘরে এলো কে দীপ জ্বালতে অচকল?

বল) কে এলো ঐ, বল না না সখী আজ এলো কে বল?

কালীদাস বলছেন—‘বন্ধু’ তাঁর অন্তর-মান্নরে দীপ জ্বালতেই এগেছিলেন তাঁর ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তুলে। যেমন ইন্দ্রিয়ার মনও মীরাতে অজীকার করেছিল বলেই মীরা ইন্দ্রিয়ার কাছে এসে তাঁর গানের ডালি উজাড় করে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি বন্ধুর তাকেও কালীদাস অসীমার (ভূমার) ডাক ওনেছিলেন বলেই ঘরে থেকেও হয়েছিলেন ঘরছাড়া, অনিকেত—ভনতে পেয়েছিলেন ‘বন্ধু’-র বাণী তাঁর বুকের তাতে—যে মহাপ্রেমিক স্রষ্টা হয়েই কালীদাস কাছে এসে যেতে ধরা দিয়েছিলেন প্রেমের ঠাকুরকে চাইতে শেখাতে, ভালোবেসেছিলেন ভালোবাসাতে। বলছেন বন্ধু : “সুখি আমার দিকে মুখ না করালে আমি যে নিকেই

ব্যর্থ হয়ে বাই, তাই তোমার কাছে আসার পথ নিরন্তর আমাকেই ধুঞ্জে বেড়াতে হয়েছে.....তোমার কাছে ধরা দিতে হয়েছে।” (২৫ ও ২৬ পৃ :।)

এর ফল কী হ’ল? কালীদাস সব দ্বন্দ্ব থেকে চিরমুক্ত পেয়ে হলেন ‘নিশ্চিন্ত’ (২৬ পৃ:)—বলছেন বিভূতপদ কীর্তিকে যে, বন্ধুর কাছে আত্মসমর্পণ করার পরে তাঁর “আয় করণীয় কী থাকতে পারে? অতএব এবার আমার কথা বাদ দিয়ে বন্ধুর মুখের কথাই বলি :

‘তিনি [বন্ধু] সবাইকার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; সবাইকার পিছনে পিছনে ছায়ার মত জড়িয়ে আছেন। যে, যেখানে, যে-অবস্থায় আছে তাঁর সঙ্গেই আছেন।’ (২৭ পৃ:)।

এই বাণীই তো সঙ্গুরু—যিনি জীবনদেবতার প্রতিনিধি ওরকে ইটেরই একটি বাহ্য রূপ। তাই শ্রীগুরুর মধ্যে যে-ধনুসাধক ইটকে সত্যি চাকুর করেছে তার বুকে শ্রীগুরুর দীক্ষায় বেজে উঠেই গুরু-গুরু দেবাত্মার ধরা-দেওয়ার সুর। এ-সুরের হাজারাে ব্যঞ্জনা বিচার মুহূর্ত, কিন্তু বাদী সুর—প্রেমের ধরজ। কালীদাস এই বাণীটি বড় স্নানর করে খুটিয়েছেন—বন্ধুর আদেশে বলেছেন কালীদাস :

‘স্বক্কের যা ধর্ম, মাহুসেরও তো ঠিক তাই। ধরিত্রীর কোলে ভূমিষ্ঠ হ’ল যে-শিশুটি, তার পাওয়ার হিসাব সে আর কতটুকু জানে? তবু তো একথা মিথ্যা নয় যে সে তার পারিপার্শ্বিক জগতের কাছে অজস্রভাবে খণী। দিনে দিনে সে পরিপুষ্ট হয়েছে স্নেহমমতার অকুপণ দাক্ষিণ্যে, সবাইকার কাছ থেকে সব কিছু আহরণ করে সে তিলে তিলে শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত হয়েছে। অনেক পাওয়ার পরিশেষে তারও ভেদ-দেওয়ার পালা আসা চাই, নৈলে যে প্রকৃতির পূর্ণতা চক্রে হেদ প’ড়ে যায়। এই অতি সহজ স্বাভাবিক কথাটাই তো বিশ্বপ্রকৃতির একমাত্র মর্মকথা। এইটুকু বুঝলেই তো তত্ত্বজ্ঞানের কিছু বাকি থাকে না, এইটুকু আচরণ করলেই তো সব হয়।”

“তাই তিনি [বন্ধু] বলেন—‘দাঁও, যা কিছু তোমার আছে সবাকু দাঁও। সবাইকার যা প্রাপ্য, নিছক

দেওয়ার প্রয়োজন, মুক্তহস্তে দিয়ে ছুঁমি সার্থক হও।  
 পরিপূর্ণভাবে দাও যা কিছু তোমার আছে। দ্বিভেদে  
 কার্পণ্য কোরো না প্রাণ, নিভেও কার্পণ্য  
 কোরো না। ত'রে দাও, নাও; নিভেও ভুলে  
 গিয়ে ভালোবাসো, সবাইকার ভালোবাসায় অবগাহন  
 করো। বসন্তযুগ পৃথিবীতে উপবাসী অতন্ত খেঁকো না।  
 চোখ মেলে চেয়ে দেখ—চারণিকে কত আনন্দের পসরা  
 আমি সাজিয়ে রেখেছি। এত আয়োজন, এত সমারোহ  
 সৃষ্টি ক'রে রেখেছি কেবল তোমার জন্যে। ছুঁমি নেবে  
 না, ভোগ করবে না তো মৃগ মৃগ ধ'রে এত সুন্দর ক'রে  
 আমার সৃষ্টির অর্থ্য আমি সাজিয়ে রেখেছি কেন?  
 সবাইকার কাছ থেকে যেমন নিয়েছ, তেমনি আবার  
 সবাইকে সব দাও; সব স্নেহে, প্রেমে, মমতায়,  
 ভালোবাসায় পরিপূর্ণভাবে সাড়া দাও।" (২৭ পৃ: ১)

কিন্তু ভালোবাসব বললেই কি ভালোবাসা যায়,  
 না, দিতে চাইলেই দেওয়া যায়? প্রেমের দীক্ষা না  
 পেয়ে কে কবে প্রেমাসিক লাভ করেছে? "প্রেমের  
 ঠাকুর" উপাধিটি বড় সুন্দর। ইন্দ্রা জীৱামক্কদেবের  
 উদ্দেশে একটি গান বেঁধেছিল গত বৎসর দক্ষিণেশ্বর  
 থেকে ফিরে:

ফির প্রেমকে ঠাকুর, আও।

হে রামকৃষ্ণ সিরি রামকৃষ্ণ! ফির মা মা মা মা গাও।...

দেখো হুণিয়া' দৈ জগবাসী,

কালী মন্দির ছাই উদাসী,

পাপী ভাপী দীনকে ঠাকুর ফির আ শরণ লগাও।

এসো প্রেমের ঠাকুর, এসো গো ফিরে আবার।

এসো, জীৱামক্ক! এসো গেয়ে গান মা মা মা বন্দনার।

দেখ, কাঁধে এ জগৎ ধুঁখে ব্যাখায়,

কালীমন্দিরে সে-বেদনা ছায়,

পাপী ভাপীদের হে দীনদয়াল, সাধাও শরণ মা-র।

সবাই জানে—সাধনার তিনটি প্রধান মার্গ আছে:

কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি। ভক্তিমার্গের যাত্রীরাই প্রেমকে  
 আবাহন করেন। ভগবানের সঙ্গে মিলনানন্দ লাভ  
 ক'রে তাঁর পরে সে-প্রেম সবাইকে মিলিয়ে প্রেমের

দেওয়া-নেওয়া যুগ সম্পূর্ণ করতে। কালীদা ইন্দ্রার  
 সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। সে ভগবৎ প্রেমের  
 মূর্ত প্রতীক হয়ে বহু আর্ত ও অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসুকে কাছে  
 টানতে পারত ব'লে, তাকে a being of love and light  
 উপাধি দিয়েছিলেন, এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে ইন্দ্রার সম্ভাব  
 তথা দৃষ্টিভঙ্গীর গভীর মিল ছিল ব'লে। মনে পড়ে—  
 প্রায়ই ভিন্ন ইন্দ্রার মীরাজ্ঞানের একটি লাইন উদ্ধৃত  
 করতেন:

"জাকে কমল নয়ন মধুর বয়ন চপল চরণ আওয়ে"

ইন্দ্রার আর একটি সুন্দর ভজন তিনি অত্যন্ত  
 ভালোবাসতেন যেটি সুখাভিলে চাপা হয়েছে:

"কৈশী লগন লগী রী মাউ কৈশী লগন লগাউ।"

গানটি আমি একবার কালীদার ঠাকুরি স্মৃতিতে  
 গেয়েছিলাম—তাঁর শিষ্যদের শোনাতে। কালীদা  
 ছিলেন সভাপতি তথা স্ক্রু। গানটির শেষে তিনি  
 জলভরা চোখে আমাকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তাই  
 গানটির দুটি স্তবকের অনুবাদ দিই—বিচিত্র গান, মীরা  
 ও ঠাকুরের উত্তর প্রত্যুত্তর:—

মীরা:

এ কেমন প্রেমে বাঁধিলে আমারে—বাঁধিলে প্রেমে  
 আমারে?

নই রাণী আর—হয়ে প্রেমদাসী এসেছি তব হুয়ারে!

বাজায়ে কেমন মুরলী মোহন

নজালে মীরার তরু প্রাণ মন,

তব তরে হিয়া অধীর এখন—দাও দরশন তারে।

নই রাণী আর—হয়ে প্রেমদাসী এসেছি তব হুয়ারে।

কক:

এ কেমন প্রেমে সাধিলে আমারে—সাধিলে প্রেমে  
 আমারে?

প্রেমে তব করি' অধীর বাঁধিয়া আনিলে তব হুয়ারে।

গেয়ে মধু হরিনাম বন্ধার

আনিলে টানিয়া আঙনে তোমার,

গোলোকে রহিতে না পারিয়া আর এল শ্রান  
 অভিসারে—

ধারে করি' প্রেমে অধীর বাঁধিয়া আনিলে তব  
 হুয়ারে।

কালীদাস দেহরক্ষার পরে বিড়বাবুর 'আমাদের কালীদাস' পড়তে পড়তে চম্কে উঠেছিলাম 'বন্ধু'-র ভাষণে—এই-ই যে ছিল তাঁর পরমা বাণী—মেসেক : অর্থাৎ, ভক্তই যে শুধু ভগবানকে চান তাই নয়, ভগবানও ভক্তকে চান। না, এ-বাণী পূর্ণ বাণী নয়, সত্যের সত্য হ'ল ভক্তের-ভগবানকে-চাওয়া ভগবানের-ভক্তকে-চাওয়ারই প্রতিফলন—রিফ্লেকশন। রবীন্দ্রনাথের একটি গানেও এই মহাবাহীর আভাস আছে, ভক্ত বলছেন প্রেমের অভিযানে :

“একলা তুমি একলা আমি হ'লে।”

‘বন্ধু’ ভগবত করুণার মূর্তি বিগ্রহ হয়ে কালীদাসকে এই কথাই বলেছিলেন অপকল্প চতে :

“জীবনে ঢলপ্রান্তি সবাই করে। ইচ্ছায় হোক আনিচ্ছায় হোক ধূলোকাদা সবাই মাখে।.....সেকজে আমার কাছে আসার বাধা হবে কেন?.....রখা সজোচে যদি আমাকে এঁড়িয়ে এঁড়িয়ে চলো আর পদে পদে অঙ্গীকার করো, তাতে আমি যে ব্যথা পাই।.....আমার মত গরজ আমার মত দরদ আর কার? ...জন্মজন্মান্তর ধরে আমি-তোমাদের পিছনে আকুল হয়ে কিরিছি... আমাকে ছাড়া তোমাদের যদি বা চলে, তোমাদের ছাড়া আমার যে চলে না।.....তাই তো আমি ছায়ার মত তোমাদের অনুসরণ করি।” (২৮ ও ২৯ পৃঃ)

একথা বলতে পারে এমন স্তরে একমাত্র বিশ্বপ্রোমক জগদ্বন্ধু—যে কালীদাসকে বরণ করেছিল নিজেরই “গরজে”, অনুসরণ করেছিল “ছায়ার মত”। কালীদাস সংসারী থেকেও যে অসংসারী ছিলেন তার জগৎ দায়িক এই করুণাময় ‘বন্ধু’—যে এসেছিল প্রেমের ঠাকুরের মূর্তি মাত্রী হয়ে তাঁকে প্রেমমত্তে দীক্ষা দিয়ে সাধারণ মানবের স্তর থেকে প্রেমিক মহাসাধকের স্তরে উত্তীর্ণ করতে। তাইতো প্রেমজ্বলন্ত কালীদাস বস্ত্রভাঙ করার পর শুধু প্রেমের হরিমলুট বিলিয়েই থগ্ন হয়েছিলেন, নিজে প্রেমের ঠাকুরের চরণে চিরাশ্রয় পেয়ে।

আমরা যখন আমাদের পুণ্য আশ্রমে আঁত সজ্ঞর্পণে সাধনা করছি ‘কাউন্টিং এন্ড্রি পোর্ন’ যাকে বলে, আমি বই লিখছি আর কিছু বাড়িতে (অন

বেড়েও ছিল—নৈলে পুণ্য থেকে কলকাতা মাস্তাজ কালী প্রয়াগ প্রয়াগ করতাম কী করে?) তখন কালীদাস অনাবিল অকুণ্ঠ স্নেহ আমাদের কাছে খানিকটা পথের পাথর মতন হয়েই এসেছিল। তাঁর সঙ্গে আমার একটি ছবি—কালীদাস-দিলীপ আলিঙ্গনবদ্ধ হাসিমুখা ফটো, আমার কাছে এখন মহার্ঘ ও পুণ্য স্মারক হয়ে আছে।

১৯৫৯ সালে হরিকৃষ্ণ মন্দির গড়ে ওঠার পরে কালীদাস সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—যখন তিনি কালীবাসী। তাঁকে অনেকবার বলেছিলাম তাঁর সাধনার কথা বলতে, কিন্তু প্রতিবারই তিনি তেঁসে টাঁড়িয়ে দিতেন। একবার বলেছিলেন আমাকে যে, বলবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলেননি। তাঁর স্নেহাশ্রিত মহাপ্রাণ ডোরাহামীরও হয়েছিল অকল্পিত আভিজাত্য—কালীদাস তাঁকেও নিজের সাধনার কথা বলবেন বলে ডেকে শেষ পর্যন্ত নাক দিয়োগলেন, বলেছিলেন মাথা নেড়ে : “উই” you must find out for yourself”। আশ্চর্যপ্রাপ্ত ও মগ্নপ্রাপ্ত ছিল তাঁর সাধনার কবচকুণ্ডল। তাঁর কাছে এলে কারুর মনেই সন্দেহ থাকত না যে, তিনি শক্তিম্যানু পুরুষ ও প্রেমিক যোগী। যা-ই বলতেন সজোরেই বলতেন—কে কী মনে করবে এ-হৃদাবনা তাঁর কোনোদিনই ছিল না ‘বন্ধু’-র কাছে প্রেমদীক্ষা নিয়ে তিনি যেন আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন। কেবল আমাকে একদিন টুকোছিলেন : “আপনি চান সবাইকেই খোলাখুলি আপনাদের নানা অলৌকিক অমুচুঁতি-উপলব্ধির কথা বলতে। এ-ও আমি জানি : এসব আপনি প্রকাশ করতে চান শুধু এইজন্তেই যে, আপনি চান—অধিকারী হবার সাধনা না করেও সবাই আনন্দী হোক—সকলে এমন এমন জানুক যে, ভগবানের করুণা এখনো একান্ত সাধকদের বল ও আলো দিয়ে পথের পাথর জোগায়। কিন্তু দিলীপদা, কেউ দিতে চাইলেই কি অণের নিতে পারে? অকুণ্ঠ দেওয়া যেমন কঠিন অকুণ্ঠ নেওয়াও কি ঠিক তেমন কঠিন নয়?”

আমার অনেকবারই মনে হয়েছে—কালীদাস আমাকে সাবধান করতে চেয়েছিলেন আমাকে নানা বেদধর্মী খৃষ্টিয়ানীর ব্যঙ্গবিজ্ঞপের তীরন্দাজি থেকে বাঁচাতেই। কিন্তু আমি বারবার পণ নিয়েও পারতাম না, যা দেখেছি তা না ব'লে গভীর মেঘলা মুখে চুপ ক'রে ব'লে থাকতে। মহাভারতে বলেছে “যতাবো হুরতিক্রমঃ”—যতাব যায় না ম'লে। নিরুপায়।

কিন্তু এ-মতানৈক্য অবাস্তব। আসলে অন্তরে কালীদাস সঙ্গ আমাদের গভীর মিল ছিল—প্রেমের স্রীক্রেতে তথা পৃথিবীবাদে যার গোড়াভাব কথা—এ-জগৎ যায় না। সার্বিকী ভগবানকে বলেছিল যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মা যদি সত্য হয় তবে জগৎও সত্য—

If thou and I are true, the world is true

যুক্তির-যুক্তি নির্মাণেও নয় পরিনির্মাণেও নয়, তার একমাত্র পথ এ-পৃথিবীতে এসে ভগবানের হাতের যন্ত্র হয়ে তাঁর ইচ্ছাকে বরণ ক'রে ঘেঁছাচারকে বিদায় দিয়ে স্বতন্ত্রতা হওয়া :

A huge extinction is not God's last word...

Here to fulfil himself was God's desire.

বিরাক্তি নির্মাণ নয় মহত্তম মন্ত্র ঐশ্বরের.....

এ-ধরার প্রাণ লীলালোকে চান পূর্ণ সিক্তি তিনি।

‘আমাদের কালীদাস’ স্বাতিচারণে দুটি ভাব আছে। প্রথমার্ধে “বহু”-র কথা; শেষার্ধে বিড়পদ কীতি এক মহর্ষির জবানিতে কালীদাস অক্ষর বাণী পরিবেশন করেছেন—যা তিনি কালীদাস মুখেই শুনেছিলেন। এরই নাম পৃথিবীবাদ) :

—শুরুদেব, আমরা জানি আমরা তাঁকে চাই। কিন্তু তিনি কী চান তা তো আমরা জানি না।

—এখনো জানো না, কিন্তু একদিন তো জানতে হবে। তার জন্তে প্রস্তুতি তো এখন থেকেই থাকা চাই। তিনি কি চান সেটা যদি জানতেই না চাও, তবে তোমরা তাঁকে ভালোবাসবে কি করে? যার মধ্যে ভালো ক'রে বাসা বাঁধা যায় তাকেই তো বলে ভালোবাসা।

—কি তিনি চান, শুরুদেব?

—তিনি চান—পৃথিবীর মত কঠিন হও, পৃথিবীর মত সহজ সরল সর্গংসহা হও। পৃথিবীকে বর্জন কোরো না, অর্জন করো।

—পৃথিবীর মত কঠিন—সে কেমন শুরুদেব?

—বুঝলে না? পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে চেয়ে দেখ। তবে বুক জুড়ে চলেছে ধ্বংস সৃষ্টির খেলা অনন্ত কাল ধ'রে। কত মানুষ, কত পশুপক্ষী, কত বৃক্ষলতা, কত কীট পতঙ্গ নিরন্ত জন্মাচ্ছে, নিরন্ত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। যে-বুকে আগছে জীবন, সেই বুকেই তার সমাপ্তি হচ্ছে মরণে। এমনি ক'রে জীবন-মরণকে সহন করছে যে, বহন করছে যে, তার চেয়ে কঠিন আর কি আছে বৎস? তিনি চান—এমনি ক'রে তোমরাও কঠিন হও, কিন্তু সঙ্গ সঙ্গ পৃথিবীর মত সহজ সরলও থাকো। লক্ষ্য ক'রে দেখ—ক্রান্তি নেই, কৃষ্ঠা নেই তার তার সহজ সরলতায়। বীজটুকু হাওয়ার ভেসে এসে উড়ে পড়ল, আর অমনি আগল জীবন। সবুজে সবুজে মাঠ ভ'রে গেল।.....কার্পণ্য তার কোনোখানে নেই। তিনি চান তোমরা এই পৃথিবীকে ধ'রে পৃথিবীর ম'তই সর্গংসহ হয়ে থাকো। পৃথিবীকে বাদ দিয়ে আপনাকে নিয়ে ভগ্ন হয়ে সৃষ্টি সংসার ভুলে থাকো—এ তিনি কখনোই চান না, বৎস!

বলাই বোশ—এই পৃথিবীবাদ রবীন্দ্রনাথেরও একটি বাণী। তাঁর ‘উৎসর্গ’তে বড় অক্ষর ক'রে কবি বলেছেন এই কথাটিই :

“যন্ত্র যে আমি অনন্তকাল, যন্ত্র আমার ধরণী,

যন্ত্র এ-মাটি, যন্ত্র অদূর তারকা হিরণ্যবরণী,

যা ভয়োহ আমি যন্ত্র হয়েছি যন্ত্র এ মোর ধরণী।”

কিন্তু কালীদাস নানা স্তরে ছন্দে এই পৃথিবীবাদের গান গাইলেও তাঁর নিজের স্বরূপ কাউকে জানতে দেন নি। স্রীরামকৃষ্ণ কথায়তো এক কারাগার আছে ঠাকুর বলেছেন মণিকে : “অচিনে গাহ শুনেই?—সে একরকম গাহ আছে, তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না।”

বিড়পদ কীতি তাই ঠিকই লিখেছেন কালীদাস উদ্দেশে (১৯১ পৃঃ) :

“সোঁদনো তোমাকে কেহ চেনে নাই, আজও কি  
চেনে কেহ ?

প্রাণের নাগাল কেহ পায় নাই, ইয়েছে কেবল দেহ ।”

কিছু হঃখ কেন ? প্রেমকের আত্মা তো অমর (ঐ) :

‘কোথায় কী তব পথের নিশানা—কী হবে সেকথা

ভেবে ?

যেখানেই থাকো সেখান হইতে আবার টানিয়া

নেবে.....

এখানে যেমন পেরোছি তোমায়ে,

ভেমনি করিয়া পাইব ওপারে,

তোমার হইয়া তোমায়ে লইয়া বাঁধিব নুতন বাসা ।

মরণের ঘরে, মরণের পরে মরে না তো ভালোবাসা ।”

কালীদাস এই প্রার্থনারই উত্তর দিয়েছেন তাঁর একটি

প্রাণস্পর্শী কবিতায় ( ১৫৫ পৃঃ—২৪১১১।১১৬০ ) :

‘আমায় ঘোরি’ এই-যে এদের এত আনাগোনা,

এতদিনের এতকণের এই-যে জানাশোনা,

কী বা পেল কী পেল না—কিছুই নাহি জানি,

তবু ওদের ভালোবাসায় অবাধু আমি মানি ।

দেহ যখন শেষ হয়ে যায়, থাকে শুধু নাম,

মহাকালের মহাশ্রোতে কী-ই বা তাহার দাম ?

কামনা সব শেষ করোঁছি, কী বা আমার চাওয়া ?—

ওপার হতে গারে লাগে বিদায় বেলার হাওয়া ।

কামনা কি শেষ করেছি ? হয়তো কিছু বাকি :

তাই তো ওদের ভালোবাসা দেহমনে মাঁখি ।

একটি তুকা থাকুক আমার, ছাড়তে নাহি চাই—

মুগে মুগে কিরে কিরে ওদের যেন পাই ।

আমায় ঘোরি’ আমায় ধরি’ পেল যারা হুখ

পরম কণে পরম ধনে ভরবে তাদের বুক ।

জগতে আমরা কেবল তারই কাছে ছুটে যাই যে দিতে

পারে একটুখানি স্নেহের পরশ । জানার কাছেও যাই,

কিন্তু যে-জ্ঞানের বাণী পাই তাতে মন খুশী হলেও

প্রাণ ভরে কই ? প্রায় তার সব আগে প্রাণের পরশ ।

কালীদাস কাছে মাতুর পেশ এই স্পর্শ । এ-স্পর্শ

দেওয়া সহজ কথা নয়, এ একটা প্রতিভা—যে পারে সে

আপনি পারে । একটি গানে আমি লিখেছিলাম :

“ভালোবাসি” বলা সহজ কঠিন শুধু ভালোবাসা :

একটু রঙিন উজ্জ্বল হায় কার মেটে গভীর পিপাসা ?

কালীদাস কাছে থেকে আত্মরদের দল কেবল অপলক

রঙিন উজ্জ্বলের সান্না নিরে কিরত না—কিরত হৃদয়ে

পেয়ে প্রেমের স্পর্শ—তাঁর এক টুকরো হাসিতে, এক

টুকরো সজাষণে, এক টুকরো চাহনিতে ঝরিয়ে দিভেন

তিনি তাঁর হৃদয়ের স্নেহমধুর তাপ—যার সঙ্গে জড়িয়ে

থাকত তাঁর সহজ প্রেমের নরম আলো বৃহল হাসি ।

তাই অচিন থেকেও তিনি আত্মপরিচয় কীশ করতেন

তাঁর প্রেমের বাণীতে, স্নেহের হাওয়ায় জ্বড়িয়ে দিভেন

কত হঃখীর সঞ্চিত ক্ষোভ ব্যথা । ইন্দ্রিয়া ও আমি

তাই তো তাঁর সান্নিধ্যে এত গভীর ভ্রূণ পেতাম ।

তাঁর এই কবিতায় ( মনে হয় ) তিনি একেছেন নিজেরই

এই গুঢ় ছবিটি ( ১৫৪ পৃঃ ) :

“জানী গুণী অনেক আছেন, থাকুন তাঁরা ভালো :

তোমার কাছে যাচে সবাই একটু প্রেমের আলো ।

এইটি পারো, তুমিই পারো, তুমিই পারো দিতে :

সারাজীবন দিয়েছ তো কতজনার চিতে ।

টানো সবার বুকের কাছে, হাসো অভয় হাসি,

বিনা বিধায় বলা বলা : ‘ভালোবাসি, বাসি ।’

তুমি বিরাট, তুমি প্রেমিক, তুমি মহৎ প্রাণ :

মর্মরিত তোমার বুক বিরাট, আত্মনা ।”

ক্রমশঃ



# জানাকি থেকে জ্যোতিষ

[ নিগ্রো মনোবী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য ]

অমল সেন

( পুনঃপ্রকাশিতের পর )

১৪

জর্জ কার্ভার টাক্সেগি শিক্ষায়তনের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে আসার পরে ক্রমাগত কয়েক বছর পর্যন্ত অ্যালবামা প্রদেশে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হল, এমন অপরিপুষ্ট ফলন এর আগে আর কখনো উৎপন্ন হয়নি। সেইজন্মে এই বছরগুলোকে সেয়া ফলনের বছর বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

জর্জ কার্ভার এখন সারাক্ষণই ব্যস্ত, তাঁর প্রান্তটি যুহুর্ড এখন মূল্যবান, অপচয় করার মতো একটি যুহুর্ডও তাঁর হাতে নেই। যেসব কাজ অজ্ঞাত বিভাগের করণীয় বলে স্পষ্টতঃ নির্দিষ্ট করে রাখা না হলেও জর্জ কার্ভারের কর্মতালিকার তা অন্তর্ভুক্ত লিখ্যই নয়, কিন্তু তথাপি ধীরে ধীরে এক-একটা করে সেই সবগুলি কাজই করতে দেওয়া হল জর্জ কার্ভারকে, সেইসব কাজের দায়িত্ব তাঁর উপরে এসে পড়ল। তিনি বাড়ী তৈরি করার জন্য গ্লান আঁকেন, যন্ত্রপাতির নক্সা তৈরি করেন, কূপের জল নিয়ে গবেষণা করেন, আবহাওয়ার হিসেব রাখেন, বৃষ্টিপাতের পরিমাপ স্থির করেন এবং নিয়মিতভাবে সেগুলি সরকারী আবহাওয়া দপ্তরে সরবরাহ করেন।

এগুলি ছাড়াও তাঁর আরো অনেক কাজ। নবনির্মিত

কৃষিক্ষেত্রের পশ্চাৎপটের দৃষ্ট অঙ্কন করা, তার সোপান-শ্রেণী ও প্রাঙ্গণ নির্মাণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ, উদ্ভান রচনা ও নব নব তৃণভোজ্য রূপসজ্জায় তা সজ্জিত করা, উদ্ভান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও ঘাসের চাপড়া ইত্যাদি লাগানো ইত্যাদি সব রকম কাজই তাঁকে করতে হয় এবং একটা কাজও তিনি বিমূমাত্র অপ্রকার সজে করেন না। সব কাজে জর্জ কার্ভারের সমান আন্তরিক আগ্রহ, সমান যত্ন। এক সময়ের সর্গরক্ত বন্ধা এই কংকরময় কঠিন মৃত্তিকা কার্ভারের যাহ্ন-দণ্ডের স্পর্শে আজ এক অপূর্ণ শক্তিশালী প্রাকৃতিক উদ্ভানে পরিণত হয়েছে—জর্জ কার্ভার ব্যতীত এ কাজ আর কারুর দ্বারাও বোধহয় সম্ভবপর ছিল না।

এত অসুখ কাজ জর্জ কার্ভারের কিন্তু তথাপি তিনি তাঁর গবেষণা চালিয়ে নেবার সময় ঠিক বের করে নেন ওরই মধ্য দিয়ে এবং উৎসাহের সঙ্গে গবেষণার কাজ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী উদ্যোগে কৃষি বিভাগের মাধ্যমে উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করে রাখার জন্য যে সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে জর্জ কার্ভারও সেখানে তাঁর নিজের সংগৃহীত গাঁহপাছালির কিছু নমুনা পাঠিয়ে দিলেন।

টাক্সেগি শিক্ষায়তনের নতুন কৃষিক্ষেত্র নির্মাণের

কাজ ১৮৯৮ সালে সমাপ্ত হল। অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার তাঁর পুরোন দিনের বন্ধু এবং বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সচিব অধ্যাপক উইলসনকে কৃষিক্ষেত্রের যাবোদ্যটন করে তা জাতির সেবায় উৎসর্গ করার জন্য কৃষিক্ষেত্রের উদ্বোধন উৎসবে পৌরোহিত্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। অধ্যাপক উইলসন সানন্দে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে জর্জ কার্ভারকে চিঠি লিখে তা জানিয়ে দিলেন।

১৫

জর্জ কার্ভার জন্মস্থানেই একজন শিক্ষাদাতা শিক্ষক থাকে এককথায় বলতে পারি একজন লোকশিক্ষক। শিক্ষাদানই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। কিন্তু তাঁর শিক্ষাদান শুধু তাঁর ক্লাসঘরের ক্ষুদ্র গর্তাটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার বাপি বৃদ্ধর অবাধ ছাড়িয়ে পড়েছে। তিনি টাঙ্কোগিতে চলে গিয়েছিলেন তাঁর বক্তৃতা কোন রকম সার্থিসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, যে মত ও বিরাট আদর্শ তাঁকে টাঙ্কোগিতে চলে যাওয়ার প্রেরণা দিয়েছিল তা হল জনগণকে, বিশেষত আশঙ্কায় অন্ধকারে ডুবে থাকা নিগ্রো জনগণকে, জ্ঞানের আলো দেখিয়ে অগ্রগতির পথে পরিচালনা করা এবং শুধু নিজেকে সেই মহৎ ব্রতে উৎসর্গ করেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, তিনি তাঁর ছাত্রদেরও উদ্বুদ্ধ করে তুললেন। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলেন, “তোমরা যেমন বহুল্য পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করো অথবা ব্যাংকে যে টাকার পাণ্ডা জমিয়ে তোলা সংসারিক জীবনে তার গুরুত্ব যে খুব বেশী তা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও আমি জোর দিয়েই বলব, মহৎ জীবনে অধিকার অর্জন করার জন্য মহৎ ত্যাগ প্রয়োজন। সেবার আদর্শ—দেশের সেবা, জাতির সেবা, মানবের সেবার আদর্শ যদি নিজেকে চিন্তকে উদ্বোধিত করতে না পারে তবে মহৎ জীবনে উত্তরণ করতে তোমরা বার্ষ্য হবে, মহত্ত্বের অধিকার লাভ করার পৌরব থেকে তোমরা চিরকাল বঞ্চিত থাকবে।” তিনি বারংবার বিশেষ জোরে

সঙ্গে ছাত্রদের ডাক দিয়ে বলেন “যে জিনিস আতি দুচ্ছ, অতি নগণ্য, অকিঞ্চয় সাধারণ তাকে আমি যদি অসাধারণের রঙ মাখিয়ে দেখতে দেখো, দেখবে, সব জিনিস তোমার ভালো লাগবে, সব জিনিস তোমার কাছে সুন্দর মনে হবে, তখন আর কোন জিনিসকে দুচ্ছ বলে অবহেলা করার প্ররতি তোমার মধ্যে জন্মাবে না।”

জর্জ কার্ভার তাঁর ছয়হাড়া যাযাবর জীবনে এক সময়ে পিয়ানো বাজনা অভ্যাস করেছিলেন। শুধু অভ্যাস নয়, পিয়ানো বাজানোর তিনি দস্তরমতো দক্ষতা লাভ করেছিলেন। এখন প্রতি রবিবার অ্যালবামা হলে বাজে সংগীতের আসরে তিনি তাঁর পুরানো পিয়ানো নিয়ে বাজাতে বসেন এবং শিক্ষক ও ছাত্ররা সবাই উন্মুখ আগ্রহে মনমুগ্ধর মতো বসে বসে তাঁর পিয়ানো বাজনা শোনেন। জর্জ কার্ভার তখন হয়ে বসে বাজান নিগ্রোদের ভক্তিমূলক গান—“হুলে হুলে হুগো নীচু মগর বথ”, ছাওলের “লার্গো” সংগীত এবং রক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষে রচিত বিভিন্ন গান।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই গানের আসরে বসে টাঙ্কোগি শিক্ষায়তনের কোষাধ্যক্ষ মিঃ ওয়াটসন লোগান একটা প্রস্তাব করে বসলেন। প্রস্তাবে অধ্যাপক জর্জ কার্ভারকে একদল সংগীতশিল্পী নিয়ে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে আসার অনুরোধ জানানো হল এবং সেই আসরে গারা উপস্থিত ছিলেন সবাই একবাক্যে আনন্দের সঙ্গে সেই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। কিন্তু জর্জ কার্ভার হেসে কণি প্রতিবাদের সুরে জবাব দিলেন, “আমি অতি নগণ্য একজন পিয়ানো-বাদক মাত্র, সঙ্গীত-শিল্পী আমি কোনক্রমেই নই। তা ছাড়াও, আমি সাধারণ একজন অধ্যাপক।”

মিঃ লোগানও সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, “ডাঃ বুকর টি ওয়াশিংটনও একজন কলেজ অধ্যাপক, বক্তা নন কিন্তু তথাপি টাঙ্কোগি শিক্ষায়তন গড়া ও তার উন্নতি বিধানের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি দেশে বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে বোড়িয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র তিনি এইভাবে পরিভ্রমণ করেছেন।”

জর্জ কার্ডারের আপত্তি আর খাটলো না। বরং মিঃ লোগানের প্রস্তাব ভিত্তর থেকে তাঁর মনটাকে তীব্রভাবে নাড়া দিল। বহুদিন আগে থেকে অর্থসংগ্রহের উপায় নিয়ে চিন্তা করে আসছিলেন, কিভাবে আরো কিছু বেশী অর্থ সংগ্রহ করে আরো ১৫ একর জমি কিনে টাক্সেস শিকারতনের খামারের সঙ্গে যুক্ত করে সেটাকে বাড়ানো যায়,—কিন্তু অনেক চিন্তা করেও কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মিঃ লোগানের প্রস্তাব শুনে জর্জ কার্ডারের মাথার সেই চিন্তার জট খুলে দিল। তিনি উপায় খুঁজে পেলেন।

জর্জ কার্ডার সংগীত-শিল্পীর দল গঠন করে দেশভ্রমণে বেরোনোই ঠিক করলেন। চারদিকে প্রচারপত্র ছড়ানো হল, তাতে লেখা হল, ‘জর্জ ওয়াশিংটন কার্ডার তাঁর পিয়ানো-বাদক ও যন্ত্রশিল্পীর দল নিয়ে অ্যালবামা, জর্জিয়া, লুসিয়ানা এবং টেক্সাস প্রভৃতি শহর ও পল্লী অঞ্চল পরিভ্রমণ করবেন।’ কিন্তু দেশভ্রমণে বের হতে হলে ভালো একটা পোশাক অন্তত চাই, জর্জ কার্ডারের একটাও ভালো পোশাক নেই। তাঁর জন্ম একটা স্ট্রট ক্রয় করার উদ্দেশ্যে বহুরা সবাই মিলে টাকার জোগাড় করল।

১৮১১ সালের ৬ই জুলাই জর্জ কার্ডার তাঁর পিয়ানো-বাদকদল নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে পরিভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন।

স্বরের অলৌকিক ইঞ্জল রচনা করে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ডার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তিনি যে এত বড়ো একজন সংগীত-শিল্পী, পিয়ানো বাদনে তাঁর যে এমন অসুভূত দক্ষতা রয়েছে, তাঁর প্রতিশ্রুতির পরিচয় পাবার আগে পর্যন্ত সে কথা কেউ চিন্তাই করতে পারেনি। তাঁর অপূর্ণ পিয়ানো বাজনা দেশের লোককে মুগ্ধ বিস্মিত করল। জর্জ কার্ডার তাঁর দলবল নিয়ে যেখানে বান সেখানেই শত শত লোক ভিড় করে তাঁর বাজনা শুনে আসে। যতক্ষণ জর্জ কার্ডার পিয়ানো বাজান ততক্ষণ শ্রোতারা বিশ্ববাহত চিন্তে মনঃসংগমে বসে বসে

শোনে। অনেকে তাঁকে বহু সমাদর করে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যায় আরো ভালোভাবে তাঁর বাজনা শুনবার আশ্রয়ে।

জর্জ কার্ডার তাঁর পরিভ্রমণকালে সদর ব্যবহার ও সাধর অভ্যর্থনা যেমন লাভ করেছেন, তেমনি লাহুনা এবং অপমানও তাঁকে বহু সহ করতে হয়েছে। একবার পূর্ণ টেক্সাসে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটল। জর্জ কার্ডার তত্ক্ষণাত্ নিম্নো—এই অপরাধে সেখানকার নাগরিকরা তাঁকে সাধারণ রক্ষক থেকে নামিয়ে দিয়েই ফাস্ত হল না, সেই মুহূর্ত থেকে পর্যন্ত তারা তাঁকে বের করে দিল।

আবার এর বিপরীত ঘটনাও ঘটেছে। জর্জিয়া শহরের এক বিজ্ঞানসম্মত প্রাঙ্গণে জর্জ কার্ডারের গানের আসর বসেছে। এক বেঁতাক ডহলোক সঙ্গীত এসেছিলেন তাঁর বাজনা শুনে। জর্জ কার্ডারের পিয়ানো বাজনা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা অকস্মিক কণ্ঠে বলেছিলেন, “সংগীতের সুরের মধ্যে যে এতখানি মধু, এত সৌন্দর্য লুকায়িত থাকতে পারে তা আমাদের জানা ছিল না এবং জর্জ কার্ডারের বাজনা না শুনে কোনো দিনই তা আমাদের জানবার সুযোগ হত না। আজই প্রথম আমরা এই আশ্চর্য্যবর জানতে পারলাম।”

সংগীতের আসর সমাপ্ত হবার পরে লোকজন সব চলে গেলে হোটেলের কক্ষে গিয়ে যে কাজটা জর্জ কার্ডার অন্তসব কাজ ফেলে রেখে সবার আগে করেন সেটা হল তাঁর সোদিনের উপার্জিত অর্থের পরিমাণ কত হল তা শুনে হিসাব কার মিলিয়ে রাখা। একটুও দেরীতে তাঁর এ কাজ করলে চলে না। পাঁচ সপ্তাহ পরে পরিভ্রমণ শেষ করে তিনি যখন টেক্সাসে ফিরে এলেন সেদিন তাঁর কাছে কমা হয়েছিল কয়েক শত ডলার।

জর্জ কার্ডার দেশভ্রমণে বের হবার সময়ে তাঁর বহুরা যে পোশাক তাঁর জন্ম দিনে দিয়েছিলেন পরে আর কোনদিন কেউ তাঁকে তাকে তা পরিধান করতে দেখেনি। ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এসে সেই যে তিনি পোশাক গা থেকে খুলে আলমারিতে টাঙিয়ে রেখে-

হিলেন, বছরের পর বছর তা সেখানেই ঝুলানো অবস্থায় ছিল। দিনের পর দিন খুলো জমে তা ময়লা এবং শতাহর হয়ে অবশেষে একদিন কোথায় যে নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে গেল কেউ তা জানতেও পারল না। পরে কেউ কখনো কোনো কথা এসঙ্গে পোশাকটার কথা জিজ্ঞাসা করলে ভর্জ কার্তার হেসে বলতেন, “ওহো, তোমরা সেই পোশাকটার কথা বলছ?” এর বেশী আর কিছু তাঁর মুখে থেকে কেউ কোনোদিন শোনেনি।

১৬

জর্জ কার্তার যখন তাঁর সদীত শিল্পীর দল নিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন একটা অতিশয় কল্প ও মর্মভর দৃশ্য তাঁর চোখে পড়েছে। তিনি দেখেছেন মাহুঘের স্থাণা, ঘেঘ, অবহেলা এবং নিপীড়ন কত ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে; দেখেছেন, যেতকার মালিকশ্রেণীর লোকেরা কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের কিভাবে নরকের অন্ধকারে ফেলে রেখেছে। মনুষ্য-বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য নোংরা অন্ধকার স্যাৎসেতে রূপরি রূপার কতগুলি ঘর আর সেই অন্ধকার ঘরের অধিবাসী দারিদ্র্যপীড়িত, লাঞ্চিত মাহুঘগুলোকে দেখে তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছেন সেদিন—কী হুঃসহ অপমানকর জীবন নিগ্রো ক্রীতদাসদের। এক-একখানা আলোবাতিসহীন জীর্ণ কুঁড়েঘরে একসঙ্গে অনেকগুলি লোক বাস করে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে। দরজার সামনে শূয়োরের খোঁয়াড় আর আবজনা ও জঞ্জালের স্তুপ, তার হুর্গন্ধে নিঃবাস বন্ধ হয়ে আসে।

দক্ষিণাঞ্চলের রিক্ত ধীন রুদ্ধ, পাথরের তো কঠিন জমি, যার মধ্য দিয়ে লাকলি চালনা করা হুঃশাধ্য, সেই জমি জর্জ কার্তার নিজের চোখে দেখা অবাধ তা নিয়ে অনেক ভেবেছেন। নিঃস্ব রিক্ত বন্ধা বহুতরা—যাটি বার-বারে কেটে চোঁচির হয়ে আছে, সেই মাটিকে কি করে উর্বর শস্তাশ্রমল ও সমৃদ্ধ করে তোলা যার সেইটেই ছিল তাঁর চিন্তার বিষয়। এখানকার সবগুলি ক্ষেতে শুষ্ক তুলোরই চাষ হয়। অন্য কোন

কসল ফলাবার এখানে কেউ কখনো চেষ্টাও করে না, হয়ও না। কিন্তু এই মাটিকেও বসসিক্ত উর্বর এবং শস্তাশ্রমল করে তোলা সম্ভব হতে পারে যদি তুলো উৎপাদনের একচেয়েমি থেকে মুক্ত করে এই জমিতে অন্য কোন কসল ফলানো হয়। তাতে শুষ্ক জমির উর্বরা শক্তিই রক্ষি পাবে না, এখানকার নিঃস্ব সর্গীরক্ত দারিদ্র্য মাহুঘগুলির মুখেও অন্ন ভোগানো যাবে, তাদের নৈরাশ্রভরা জীবনে আলো নিয়ে আসা সম্ভব হবে। তাদের ক্লম ক্লম সন্তানগুলিকে বাঁচিয়ে তোলা যাবে, তাদের জগৎ জীবনধারণের নতুন সুযোগ এবং উজ্জল ভবিষ্যৎও গড়ে তোলা সম্ভব হবে। হাঁ, নিশ্চয়ই তা সম্ভব হবে। কার্তার কথাগুলি নিজের মনে মনে আঙড়ান আর একা একা পথ চলেন।

যদি তাদের কানে আমি নতুন মন্ত্র দিতে পারি, জীবনের নবতর ব্যাখ্যা নিয়ে তাদের কাছে আমি উপহিত হতে পারি, যদি তাদের বোঝাতে পারি তারাও যেতাদদের মতোই মাহুঘ, মনুষ্যহে এবং মানবজীবনে তাদেরও পরিপূর্ণ অধিকার আছে। তারাও দাধীন, অহ, আনন্দনয় জীবনের অধিকারী হতে পারে, তবে আমি তাদের জীবনে এক বিঘটে পরিবর্তন ঘটতে পারবো। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ, জর্জ কার্তার তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ তাবে মেলোমেশা করে অর্জাননের মধ্যেই তাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করলেন যে, তিনি তাদের সুহৃৎ এবং একান্ত শুভাম্ম্যায়ী। তিনি তাদের মধ্যে গিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। অসীম ধৈর্য, প্রগাঢ় সহানুভূতি ও প্রাণভরা দ্রব্দ নিয়ে তিনি তাদের মধ্যস্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন, তাদের নিয়ে “কৃষক পরিষদ” নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন। প্রতি মঙ্গলবারে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে দলে দলে কৃষক এসে কৃষক পরিষদের বৈঠকে মিলিত হয়। গোড়ার দিকে অবশ্য তাদের সংখ্যা তেমন বেশী ছিল না, কিন্তু লোকের মুখে মুখে যখন জর্জ কার্তার এবং পরিষদের খ্যাতি অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল তখন ক্রমাগত সভার উপহিত সভ্যের সংখ্যাও বাড়তে লাগল এবং

বহুদূরবর্তী গ্রাম থেকেও কৃষকরা আসতে শুরু করল। কৃষক পরিষদের ক্ষুদ্র অপরিষর কিন্তু ছবির মতো সুন্দর করে সাজানো ঘরের মধ্যে গায়ে গা লাগিয়ে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে পতীর মনোযোগের সঙ্গে তারা জজ' কার্ভারের সব কথা শুনত। সব কথাই অর্থ পাটভাবে না বুঝলেও কথাগুলি তাদের খুবই ভালো লাগত। ছুশকী, তিনশকী, এমনকি তার চেয়েও বেশী সময়, অর্থাৎ কার্ভার যতক্ষণ তাদের মন আকর্ষণ করে রাখতে পারতেন ততক্ষণ তারা একটুও না নড়াচড়া করে অথচ মনোযোগের সঙ্গে গুরু হয়ে বসে তাঁর কথা শুনত। তিনি তাদের বুঝিয়ে বলতেন কৃষিকাজের উন্নতির সঙ্গে তাদের নিজেদের জীবনের উন্নতির কেমন করে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ঐকান্তিক উদ্ভম ও আগ্রহ থাকলে তবেই তা হওয়া সম্ভব, তাদের জ্ঞান সেকথা বলতেও ভুলতেন না। ডাঃ কার্ভার সেইসব গ্রামা কৃষকদের সঙ্গে জমির উপরশাস্তি এবং অল্পসব জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, তাদের ঘরের চতুর্দিকের সংলগ্ন জমিতে শাক-সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করার পরামর্শ দিতেন। নিজেদের প্রয়োজন মতো শাকসবজি উৎপাদন করতে পারলে তাদের বেশী দাম দিয়ে মাছ মাংস ইত্যাদি না কিনলেও খুব বেশী অসুবিধা হবে না। শুড়ের দাম বোজাই যে রকম বেড়ে যাচ্ছে তাতে দরিদ্র সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে তা আর কিনে খাওয়া সম্ভব হবে না। সাধারণ লোকদের বিশেষত নিম্নোক্তদের মনে তখন একটা কুসংস্কার বসুন্স ছিল টম্যাটো সম্বন্ধে, তারা মনে করত টম্যাটো হচ্ছে একজাতীয় বিষফল, খাওয়া তো হরের কথা, কেউ তা খুঁত না পর্যন্ত, কিন্তু জজ' কার্ভার যখন তাদের সামনেই মস্ত বড় একটা লাল রঙের টম্যাটো হাতে নিয়ে ছুরি দিয়ে তা টুকরো টুকরো করে কেটে মুখের মধ্যে কেলো অন্যায়সে বেশ রসিয়ে রসিয়ে খেতে আরম্ভ করলেন লোকগুলি তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে তো তখন বিস্ময়ে অবাক। জজ' কার্ভার করছেন কী? বিষফল খাচ্ছেন? তাদের সকলের মুখ ভয়ে আতঙ্কে শুকিয়ে গেল। তারা

নিশাকৃ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু, কই, বিষফল খেয়ে জজ' কার্ভারের তো কোন কীড়ই হল না।

“দেখলে তো তোমরা, টম্যাটো খেয়ে আমি কেমন বহাল ভাবিতে বেঁচে রয়েছি,” ডাঃ কার্ভার বললেন তাদের। তারপর তিনি টম্যাটোর উপকারিতা তাদের বুঝিয়ে দিলেন, জার্ডি রোগের আক্রমণ থেকে যেহাি পাবার জন্য টম্যাটো খাওয়া একান্ত দরকার, বাঁচতে হলে টম্যাটো না খেলে উদ্ধার নেই। কারণ টম্যাটোর মতো এত বড় প্রাতিষেধক সে রোগের আর কিছু নেই।

কিছুদিনের মধ্যেই এমন একটা সময় দেখা দিল যখন জজ' কার্ভারের সঙ্গে দেখা করার জন্য কৃষি পরিষদ ভবনে বহু লোক এসে ভিড় জমাতে শুরু করল।

টাক্সিগ শিক্ষায়তন থেকে বের হয়ে যে বড় রাস্তাটা সোজা অনেকদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে সেই রাস্তার শেষ প্রান্তে অল্প ও জলাভূমির ধার ঘেঁষে সারি সারি ঘর বেঁধে যে হাজার হাজার নিম্নো ক্রীতদাসদের বাস তারা কিন্তু জজ' কার্ভারের নামও শোনেনি। ডাঃ কার্ভার তাদের কাছে যাবেন স্থির করলেন, গিয়ে বন্ধুর মতো, আত্মীয়ের মতো তাদের জীবনের সব সুখঃখের অংশীদার হবেন।

১৭

জজ' কার্ভার যে কোন লতাশুল্ম, ফুল অথবা গাছের চারা একবার মাত্র দেখেই বলে দিতে পারেন তা কোন জাতের, কোন দেশে তার প্রথম জন্ম এবং গাছপালা সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ই তিনি জানেন। একবার হঠাৎ কি, ডাঃ কার্ভারের জনকয়েক ছাত্র তাঁকে নিয়ে একটু তামাসা করার উদ্দেশ্যে তাঁর সামনে একটা ছারপোকা (Bug) হাজির করে বলল, সেটা তারা বনের মধ্য থেকে সংগ্রহ করে এনেছে। আসলে সেটা ছারপোকা ছিল না, অদ্ভুত আকৃতির একটা পোকা ছিল সেটা, তার দেহ ছিল বিহা, ডানা ছিল প্রকাণ্ডিতর, পা দুটো ছিল কড়ি-

এর আর মাথাটা ছিল শুব্বরে পোকার;—সবগুলিকে মৃত্যু দিয়ে গেঁথে একটা কিছু-কিমাকার পোকার রূপ দেওয়া হয়েছিল। একখানা কার্ডবোর্ডের গায়ে সেটাকে আঠা। দিয়ে লাগিয়ে এমন চমৎকারভাবে সাজানো হয়েছিল যে, সেটা যে কৃত্রিম, একজন আনাড়ি লোক তা বুঝতেই পারবে না, অভিজ্ঞ লোকের পক্ষেও সহজে ধরা মুশকিল। টেবিলের উপর সেই পদার্থটাকে রেখে, যারা জজ' কার্ডারের সঙ্গে নিষ্ঠুর কৌতুক করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল সেই ছাত্রদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞাসা করল, “ভায়, আমরা বুঝতে পারছি না এটা কি পোকা, আপান দয়া করে বলে দেবেন এটা কোন জাতীয় কীট সেই উদ্দেশ্যে আমরা আপনার কাছে এটা নিয়ে এসেছি।”

ডাঃ কার্ডার এক নজরে পোকাটা দেখে নিয়ে ছাত্রদের মুখের দিকে তাকালেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, “এটা কি হাম (Hum) করে?”

ছাত্ররা জবাব দিল, “হ্যাঁ, তা করে ভায়।”

জজ' কার্ডার বললেন “তাই যদি হয় তবে এটা হচ্ছে Humbug.”

অধ্যাপকের কাছ থেকে এরকম মুখের মতো জবাব পেয়ে ছাত্ররা আর একটি কথাও বলতে পারল না কিন্তু তারা জজ' কার্ডারের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় পেয়ে একটা জিনিষ নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল, আত্মভোলা এই বৈজ্ঞানিককে জ্ঞানের রাজ্যে পরাজিত করা একেবারেই অসম্ভব।

জজ' কার্ডার বিস্তারিত রা জ্ঞানের অহংকার করেন না। তিনি বলেন, “যদি তুমি সত্যি কিছু জান তবে বিনীতভাবে তা স্বীকার কর। আর যদি কিছুই না জান তবে সে কথাও কবুল করার সাহস রাখ।”

আর একটা কথাও তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত : “আমি জানি না, কিন্তু আমি জানবার চেষ্টা করি এবং আরুহ্য আমি সেই চেষ্টা চালিয়ে যাব।” বস্তুত জজ' ওয়াশিংটন কার্ডার জীবনভোর নিজেই যেমন শুধু একজন জানপিপাসু ছাত্র ব্যতীত আর কিছুই

ভাবেননি এবং জানতপত্রের চেয়ে অল্প কোন বড় ভগ্নতা তাঁর জীবনে ছিল না, ছাত্রদের কাছ থেকেও তিনি তাই আশা করতেন, তেমনই জ্ঞানলাভের জন্য মহৎ প্রয়াস ও উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। তাদের অন্তরে জ্ঞানের দীপ জ্বালাবার উদ্দেশ্যে এবং জানবার প্রচণ্ড আগ্রহ সঞ্চার করার জন্য তিনি সদা বলতেন, “জ্ঞান, জ্ঞান, নিজেকে জান বিশ্বকে জান।”

টাক্সেগ শিক্ষায়তনে জজ' কার্ডারের কাছে বিজ্ঞানভেদে উদ্দেশ্যে যেসব ছাত্ররা এসেছে তাদের অধিকাংশই এসেছে আশঙ্কা ও কুসংস্কারের পরিবেশের মধ্যে বাস করার অভ্যস্ত জীবনধারা নিয়ে এবং তাদের মেধাশক্তিও সাধারণ অনেক ছাত্রের তুলনায় খুবই কম, কিন্তু তথাপি তাদের মধ্যে বড় হবার যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সম্ভাবনা অস্তরের মতো লুক্কায়িত ছিল অধ্যাপক জজ' ওয়াশিংটন কার্ডার অপারিসমীম অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা সেই সামান্য সম্ভাবনাকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিতরূপে বাস্তবে রূপায়িত করলেন। উত্তরকালে তাঁর ছাত্ররা অনেকেই জীবনে কৃতী এবং গণ্যমান্য হতে পেরেছিলেন, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বলিত বিশ্বকে জানতে পেরেছিলেন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও জজ' কার্ডার তাঁর ছাত্রদের নিরহংকার হবার সদৃশ উপদেশ দিতেন, জ্ঞানের অহংকার, বিস্তারিত অহংকার কিংবা ঐশ্বর্যের অহংকার করতে নিষেধ করতেন। অহংকার ভালো নয়, অহংকার পতনের মূল। তা ছাড়া অজ্ঞের কাছ থেকে শেখা বা ধার করা জ্ঞান ও বিস্তারিত নিজে বড়াই করা তো কোন মতেই উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি ময়ূরপুচ্ছ ও চড়াই পাখীর একটি গল্প তাদের কাছে বলতেন।

অধ্যাপক কার্ডার সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলতেন, “তা হলেও আমরা জানি ময়ূরপুচ্ছ নিয়ে নিজের দেহ সজ্জিত করার চেষ্টা করা চড়াই পাখীর উচিত হয়নি কারণ তার আসল রূপ তাতে ঢাকা পড়েনি, ময়ূরপুচ্ছের তলায় তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাদামী রঙের পালক আর তার নিজের ক্ষুদ্র শরীরটা তো রয়েই গেল।”

একজন ছাত্র বলল, “কিন্তু তার, চড়ুই পাখী তো গান গাইতে পারে।”

অধ্যাপক কার্তার উত্তর দিলেন, “আমিও তো সেই কথাই বলতে চাই। ভগবান্ চড়ুই পাখীকে সৃষ্টি করার সময়ে তার শরীরে সুন্দর পালকের জায়া পরিবে দিগেছেন কিন্তু তার চাইতে আরো একটা বড় জিনিস তিনি তাকে দান করেছেন, তার গান গাইবার ক্ষমতা। কাজেই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, ভগবান্ আমাদের বাক্যে যা নিজস্ব জিনিস দিয়েছেন সর্গশ্রেষ্ঠে তার অনুশীলন এবং যত্ন করা। অস্ত্রের অনুকরণ করে তার মতো হবার চেষ্টা করা উচিত নয়।”

এমনিভাবে অধ্যাপক কার্তার তাঁর ছাত্রদের দানভর্যতা ও স্বাধীন মনোভাব অবলম্বন করতে শিক্ষা দিতেন, নিন্দেদের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকাশিত করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ এবং প্রেরণা দিতেন। তিনি তাদের কাছ থেকে উদ্ভাসিত ও মহৎ আকাঙ্ক্ষা আশা করতেন। “প্রায় মহৎ আকাঙ্ক্ষা” নয়, কারণ তাঁর মতে ‘প্রায়’ কথাটা অর্থহীন। “একটা জিনিস হয় ঠিক হবে, নচেৎ ভুল হবে—এই ছয়ের মাঝামাঝি কিছু হতে পারে না।”

মানবজীবন হুঃখের নয়, তা আনন্দের, জজ কার্তার এই শিক্ষাই সর্বদা তাঁর ছাত্রদের দিয়ে এসেছেন। তিনি বলতেন, দিলখোলা হাসিখুশি মেজাজ নিয়ে জীবনটা আনন্দে ভরিয়ে রাখতে চেষ্টা কর, দেখবে তার হুল্য অনেক। হুঃখে আছি মনে করে সব সবয়ে যদি তোমার কাজা পায়, দুঃখভার করে থাক তুমি, তবে তোমার হুঃখ কোনকালে ঘুচেবে না। হুঃখ হুঃখ করে কাঁদলে কিছু হবে না, হুঃখকে জয় করার জন্য আপন পুরুষকারের সাধনা কর, আর তা যদি না পার অন্ততঃ হুঃখকে ভুলে থাকার চেষ্টা কর।

কিন্তু কেবল টাকেরিগেতে কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ না রেখে জজ কার্তার তার বাইরেও তা ছড়িয়ে দিলেন এবং যেতাক কতক নিবিশেষে সব কৃষকদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন, হাসিমুখে

কিতাবে কাজ করতে হয় এবং হাসিমুখে কাজ করলে কেমন করে তা পরিপ্রমের না হয়ে আনন্দময় হয়ে উঠতে পারে। এমনিভাবে তাদের চিন্তার দৈন্ত দূর করে তিনি তাদের মহৎ প্রেরণার উদ্বুদ্ধ করে তুলতে লাগলেন।

১৮

হাজার কাজের মধ্যে ডুবে থাকলেও জজ কার্তার তাঁর দক্ষিণাগুলোর দরিদ্র ও অসহায় নিগ্রো ভাইবোনদের কথা ভুলে থাকতে পারেন না। তাদের সেই পুত্র মতো জীবনধারণের ছাঁচ চোখ বুজেও স্পষ্ট দেখতে পান তিনি। একটা বড় কাঠের বাক্সের মতো খুপার একখানা ঘরে, যার দরজা নেই জানালা নেই আলো হাওয়া প্রবেশ করার কোন পথ নেই, সেই স্যাংসেতে অন্ধকার ঘরে ছেলে-বয়ে-বোঁ সব মিলিয়ে দশ-বারো জনের এক-একটা পরিবার খালি মেঝের উপরে শুয়ে ঘুমায়। চারিদিকে হজাল আবজনার জুপ জমে পাহাড় হয়ে আছে। চূর্ণকে হাওয়া বিবাক্ত। রোগ আর মহামারীর সঙ্গে আপোষ করে তারা বাস করে এবং এইভাবে বাস করার নামই তাদের বেঁচে থাকা।

এই শোচনীয় হুঃখময় জীবন থেকে তাদের কিতাবে উদ্ধার করবেন জজ কার্তার ভেবে পান না। কিছুদিন থেকে একটা চিন্তা তাঁর মন অধিকার করে আছে। দক্ষিণ অঞ্চলের এই অসহায় লোকগুলিকে যখন টাকেরিগেতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তখন টাকেরিগে কেন না ওদের কাছে নিয়ে যাই!

অধ্যাপক জজ কার্তার ডাঃ বুকার টি ওয়াশিংটনের কাছে নিজের পরিকল্পনা ব্যক্ত করলেন, বললেন, সেই হুঃখদৈন্তাক্রান্ত লোকগুলি যখন এখানে আসতেই পারবে না তখন আমরাই কেন নিয়ে যাই না তাদের কাছে ভালো বাসগৃহ তৈরি করার সাজসজ্জা, আধুনিক স্বাস্থ্যসুবিধা এবং সুন্দর স্বাধীন জীবন বাপনের আদর্শ ও প্রেরণা?

ডাঃ বুকার টি ওয়াশিংটন শুধু যে তাঁর আন্তরিক সমর্থন জানালেন জজ কার্তারের এভাবে তাই নয়, তিনি

প্রেরণা দিয়ে উৎসাহ দিয়ে কার্তারকে উদ্বীণ ক'রে ছুলালেন

জজ' কার্তার পরিকল্পনা অসুযায়ী কাজ শুরু ক'রে দিলেন। হাড়িড়ি বাটালি নিয়ে নিজেই একটা কাঠের গাড়ি তৈরি করলেন। তাতে চারটে চাকা লাগালেন, বসবার আসন এবং জিনিষপত্র রাখবার জন্ত আয়গা বানালেন। সবশেষে সেই গাড়ি টেনে নিয়ে যাবার জন্ত তার সঙ্গে একটা খচ্চর ছুড়ে দিলেন।

এইভাবে সৃষ্টি হ'ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম জামামান্ ক্রয়-বিভাগলয়।

জজ' কার্তার নিজের তৈরি গাড়িতে উঠে বসলেন। তিনিই তার প্রথম সওয়ারী। সঙ্গে নিলেন কয়েকটা জরুরী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যথা, ননী-মাখন তৈরি করার যন্ত্র, পানির পরীক্ষার যন্ত্র, মাখন তোলার মছন দণ্ড, কয়েক খানা মই, একটা ইম্পাতের তৈরি লাঙ্গল, উচ্চাশ পবিচরার জন্ত বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতি ছাড়াও একটা গাভীও সঙ্গে নিলেন। গাভী সঙ্গে নেবার উদ্দেশ্য হ'ল কৈমন ক'রে দুধ হুইতে হয় তা গ্রামের কৃষকদের সেখানো। এ ছাড়া কার্তার তাঁর দু'পকেট ভর্তি ক'রে নিলেন মার্কিন ক্রয় বিভাগের সচিব মিঃ উইলসনের পাঠানো কয়েক জাতীয় শস্তাবীজের প্যাকেট এবং প্যাকিং বাজে কয়ানো কয়েক রকম ফলের কলমেখ চারা।

জজ' কার্তার প্রত্যই টাক্ষৌণি কলেজে ক্লাসের পড়ানো শেষ ক'রেই তাঁর খচ্চরে চান্না জামামান্ ক্রয় বিভাগলয় নিয়ে ঘুরতে শেষ হয়। এ ছাড়াও প্রত্যেক সপ্তাহান্তিক ছুটির দিনে তো বটেই, অজান্ত ছুটির দিন-গুলিও তাঁর বাদ যায় না। অবসর পেলেই তিনি কৃষকদের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হবার উদ্দেশ্যে বের হন।

তিনি কেবল খুঁজে বেড়ান কোথায় কে নিষ ও অসহায় নিগ্রো কৃষক আছে, হাটে বাজারে গড়ে সেখানেই তাদের কয়েকজনকে একসঙ্গে জটলা করতে

দেখেন সেখানেই গিয়ে তিনি কাজ করতেন। কোন গাছের তলার বা কুড়ে ঘরে বসে তাদের সঙ্গে আপনজনের মতো আন্তরিকতার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তিনি একা একা পল্লীগ্রামে ঘুরে বেড়ান, অজান্ত অধ্যাত অপরিচিত যারা তিনি বিশেষ ক'রে তাদের কাছে বান, তাদের সঙ্গে তাদের দুখ-হুঃখ নিয়ে আলোচনা করেন, তাদের সমস্তার সমাধান বাংলা দেয়। তাদের বিপদ-আপদের খবর নেন। এমনি ভাবে জজ' কার্তার অগণিত দীন-হুঃখী ও অধঃপতিত মানুষের বন্ধু হলেন, তাদের মধ্যে নিজেকে উদার সূর্যালোকের মতো অবাধে ছাড়িয়ে দিয়ে তাদের হুঃখ-বেদনার অংশীদার হয়ে, তাদের চোখের জল মোছাবার ভার নিলেন, তাদের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

যাদের সেবায় তিনি নিজেকে এমন ভাবে গঁপে দিলেন তাদের সকলেই যে এক রকম সভাবের লোক ছিল অথবা সকলেই যে তাঁকে খুব পছন্দ করত তা কি নয়? তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল দ্বাণ্ডক ও অককারী, অনেকের মন ছিল সন্দেহের বিবে কালো, পরলীকাতর ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ! তারা কার্তারকে সহজচিত্তে গ্রহণ করতে পারল না। এমনি ঈর্ষ্যাপরায়ণ নিগ্রোদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বলত, 'তুমি আমাদের চাইতে বড় হ'লে কিসে? তুমিও তো আমাদেরই মতো একজন কালো নিগ্রো, আমাদেরই মতো জন্ম-ক্রীতদাস।' কিন্তু এরকম লোকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। অধিকাংশ লোকই কার্তারকে পছন্দ করত। তাঁর সব কথা গভীর আগ্রহের সঙ্গে শুনত এবং যে কথাগুলি বুঝতে পারত না তারা তাঁর কাছে প্রশ্ন ক'রে ভালোভাবে জেনে নিত।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে জজ' কার্তার অন্তরে অন্তরে বিশেষ ব্যথিত হলেন। নিগ্রো কৃষিকারীরা উদ্যান্ত কর্মের পরিপ্রশ্ন ক'রেও পেট ভরে খেতে পার না হবেলা, যারাও বা একটু সচ্ছল অবস্থার গ্রামাঞ্চলের জন্ত মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় করার দরুণ উপার্জিত অর্থই বেশীর ভাগই ব্যয় হয়ে যায়। তারা কিছুই সঞ্চয়



করতে পারে না। রোগ বা অন্ত কোন ছুঁপিপাক দেখা দিলে তারা অকূল পাথারে পড়ে।

জর্জ কার্ভার দরিদ্র নিম্নোদের কাছে অর্থ সঞ্চয়ের পরিচয়না নিয়ে উপস্থিত হলেন, অর্থ সঞ্চয়ের উপকারিতা তাদের বুঝিয়ে দিতে প্রয়াসী হলেন। তারা প্রত্যহ যাতে অন্তত পাঁচ সেন্ট করে জমাবার অভ্যাস আরম্ভ করতে পারে তার উপরে তিনি বিশেষ জোর দিলেন। তিনি বললেন, “দেখবে, বছরের শেষে তোমাদের এক একজনের তহবিলে অনেক সেন্ট জমা হয়ে টাকার অঙ্ক বেশ বেড়ে যাবে এবং তখন তোমরা খার দেনা থেকে মুক্ত হ’তে তো পারবেই; দেনার দায়ের আর কখনো তোমাদের জড়িয়ে পড়তে হবে না। দরকার হলে তখন তোমরা অন্তদেরও বিপদে আপদে সাহায্য করতে পারবে। এসব ছাড়াও তোমরা আরও অনেক জমি কিনে, লাঙ্গল কিনে কসল উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে পারবে এবং ছাঁচিষ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে

শান্তিতে ও আরামে দিন কাটাতে পারবে। এছাড়া জোতদারদের কেবল থেকে রেহাই পাবার তোমাদের আর কোন উপায় আমি দেখতে পাচ্ছি না।”

কার্ভারের এসব উপদেশ ও পরামর্শ নিমূল হল না। অতি অল্পদিনের মধ্যেই লোকে কার্ভারের কথাব সারবত্তা উপলব্ধি করতে পারল এবং অনেকের কাছে স্বল্পসংখ্য রীতিমত একটা নেশার মতো হয়ে দাঁড়াল।

যে যেমন করে পারে যেখানে পারে কেবল পয়সা জমায়—হাঁড়ি-কলসী, টিনের কোটো, এমন কি ঘরের মেঝেতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে পর্যন্ত লুকিয়ে রেখে পয়সা জমায়। অনেকে ঘরের বাইরে বাগানের কোন বড় গাছের কাঁপা কোটরে সকলের অজান্তে পয়সা লুকিয়ে রেখে দেয়। অর্থ সঞ্চয় করার উৎসাহ দেখা দিল সকলের মধ্যে।

ক্রমশঃ



# করণার আধার মাদার টেরেজা

কমলা দাশগুপ্ত

শিশু ভবনের দোতলার বিরাট হল ঘরখানাতে ছোট ছোট খাটে শুয়ে আছে শিশুর দল। ঠিক যেন এক বিখ্যাত প্রকাণ্ড হাসপাতালে চুকলাম। পরিচারক স্বকৃৎস্বকৃৎ করছে। কোথাও এতটুকু ময়লা নেই, আছে বাজে জিনিস নেই, পরিচ্ছন্ন এবং আলোবাতাস পরিপূর্ণ। একটি নানু তার নিয়ে রয়েছে। কয়েকটি সিস্টার এবং সেরিকাও নীরবে সম্মুখে কাজ করে চলেছেন। স্নিগ্ধ পরিবেশ, মোহময় মাহুর্ষ। এটি মাদার টেরেজার শিশুভবন। ১৯৫৫ সালে ৭৮ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে তিনটি স্থাপন করেন।

১৯৫৫ সালে একটা কাচের ইনকিউবেটর (Incubator)-এর মধ্যে ৩টা খোপ। তার কাচের বড় ঢাকনাটা হেলান দিয়ে খুলে রাখা হয়েছে। আরো ২টা ইনকিউবেটর-এর খোপ পাশেই রয়েছে। ১১টা খোপে ১১টি শিশু অকাতরে ঘুমচ্ছে। —কেউ মোদিনই ভূমিষ্ঠ, কেউ তার আগের দিনে, কেউ বা ২১ দিন আগে। শীতের দিন। সবাইকে চমৎকার নরম পুরু বিহানায় শুইয়ে গরম রাখা হয়েছে। তাদের গায়ে স্পর্শ করে আছে ছোট ছোট গরমজলের বোতল—ভাণ্ড গরম কাপড়ে ঢাকা। শুষ্ক উষ্ণতা ঘিরে রয়েছে শিশুর নরম ঘুমন্ত দেহকে। মায়ের দেহের স্পর্শের মতো উষ্ণ নরম বিহানা। সিস্টার ও কর্মীদের হাতের ও ছুঁয়ের স্পর্শ পাচ্ছে শিশুরা। তারা কি জানে তাদের মা নেই?

তারা কেউ জন্মেছে অসময়ে, কেউ বা অতিশয় রক্ত, কেউ অন্ধ, কেউ পঙ্গু। কেউ এসেছে ডায়েবিস থেকে, কেউ পুলিশের কাছ থেকে, কেউ সমাজসেবীর হাত থেকে, কেউবা ছিল গাভীর অবাঞ্ছিত, কেউ বা পরিত্যক্ত।

১৯৫৫ সালে আছে আরো ৩০টা ছোট ছোট খাটে ৩০টি

শিশু। ৭৮ মাস বয়স পর্যন্ত তারা থাকে এই সব খাটে। সিস্টার এবং কর্মীরা অবিগম তাদের দেখাশোনা করে চলেছেন। নরম শিশুগুলিকে স্নেহভরে হৃদয়ে তুলে নিয়ে তাঁরা মাদার করছেন, খাওয়াচ্ছেন, পরিচার করে দিচ্ছেন, ওষুধ খাওয়াচ্ছেন, প্রাস্টিকের পাজামার নীচের ডেজা ময়লা কাপড় বদলে দিচ্ছেন। কোথাও একটু মূলো ময়লাও নেই। অল্প অল্প কবলের টুকরো দিয়ে ঢাকা কিছু ছটফট করে চলেছে শিশুরা। কেউ বা উপড় হয়ে শুয়ে জলজল চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে চুক করছে, কেউ আবার হাতে তুলে নিজেই হাঁ হাঁ করে খেতে চাইছে। চাইলে কি হবে, তাদের কিছু ঘড়ির কাটা ঘরে খাওয়ানো হবে ফিফিং বোতল দিয়ে। পাঁচ মিনিট বাকী থাকলেও খেতে পারবে না।

একটু আগে ইনকিউবেটর-এর একটি শিশুকে দেখোছি, তারের মতো খুব সুরু একটি প্রাস্টিকের তৈরী নল দিয়ে তাকে খাওয়ানো হচ্ছে। অসময়ে জন্মেছে বলে নিকে খেতে পারেনা। ৫৬ মাসের বাচ্চাদের খাটের ওপরে প্রাস্টিকের-রড্‌বের্ডের তার লাগিয়ে চমৎকার সব পুতুল গুলিয়ে রেখেছেন—বাচ্চারা অবাক হয়ে দেখছে আর হাত পা ছুঁড়ছে।

যে সব বাচ্চা ১৯৫৫ সালে বাতাবিক ও স্নেহভাবে ৭৮ মাস পর্যন্ত বড় হয় তাদের তারপর সেখান থেকে সরিয়ে পাশের একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। যখন তারা হাঁটতে শিখবে এবং পাঁচ বছরের হবে তখন এই দ্বিতীয় ঘর থেকে নীচের ঘরে যাবে। দ্বিতীয় ঘরে আছে চোদ্দটি শিশু।

এখানে এসে ঘোঁষ কাঠিতে তুলো জড়িয়ে কার নাক পরিচার করা হচ্ছে, কারও খুব পরিচার করা হচ্ছে, কাউকে ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে। একটি

বাক্সার পেটটা যত বড় এবং চামড়ার উপর যা। সে অপেক্ষা করছে সিস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে। কারো বা শরীরে যা ও একাক্ষণ। তাকে পরিচয় করে ওরূপ লাগানো হচ্ছে। সিস্টার ও সেবিকাদের এত স্নেহময় সেবা, যে, দেখে অস্বাভাবিক হয়ে যেতে হয়। তাঁরা যেন যুগ্ম জিনিসটাকে মনের ভিতর থেকে তুলে নিয়ে অন্ধ জায়গায় ছুঁড়ে কেলে দিয়েছেন।

এই ঘরে ছুটি বাক্সার পা পঙ্কু কিন্তু শরীরের উপরের ভাগ জায়গায় স্থল। হয়তো ভবিষ্যতে হালপাতালে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করানো হবে—হাঁটা স্বাভাবিক করার জন্য।

যখন সমস্ত ভবনটি শিশুতে ভর্তি হয়ে যায় তখন নতুন বাক্সা এলে দমদম, বম্ব, দিল্লী, মাদ্রাজ, কানপুর, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে মাদার টেরেজার যে সব শিশুভবন আছে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বেশী হলেও এখানে যাদের না রাখলেই নয় তাদের কত এখানেই অল্প ঘরে নতুন ব্যবস্থা করে রেখে দেওয়া হয়। কাউকেই কিরিয়ে দেওয়া হয় না।

পাঁচ বছর বয়স হলে অনেক ছেলেদের দমদমের “বয়েস টাউন স্কুলে” পাঠানো হয়—তাঁরা বোর্ডিংএ থাকে। সেখানে বাইরের ছেলেরা পড়তে আসে।

মেয়েরা পাঁচ বছরের হলে অনেকে এন্টলীতে স্কুলে অথবা ক্যাথলিক স্কুলে অথবা কনভেন্টে পড়তে যায়। তাঁরাও বোর্ডিংএ থাকে। ছুটিতে এখানে শিশুভবনে আসে।

দেখলাম ২৬শে ও ২৭শে জাহ্নমারী হৃদিনের প্রজাতন্ত্র দিবস ও ইন্-এর ছুটিতে প্রায় ১৮টি মেয়ে বোর্ডিং থেকে এসেছিল, আবার চলে যাবে। শিশুভবনে এসে আনন্দে দিন কাটিয়ে গেল—এটাই তো তাদের বাড়ী।

তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা বাজে। হাদে উঠে দেখি, সেখানেও চার থেকে ছয় বছরের বাক্সারা ভাবী সিস্টারদের সঙ্গে খেলা করছে। তাঁরা এদের চুলে তেল মাখিয়ে জল দিয়ে মুছে নিয়ে চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন—অথবা কাঁচ বেগী বেঁধে দিচ্ছেন। মুখ মুছিয়ে পরিচয়

করে দিচ্ছেন। বাক্সারা দৌড়ছে, খেলছে, হাসছে। দেখলাম, বাঁচী ও কোলা থেকে দশজন শিক্ষার্থী মেয়ে এসেছেন। তাঁরা সিস্টার হবার ট্রেনিং নিচ্ছেন। একেবারে ছেলেমানুষ, বয়স মাত্র ১৪—১৬। এখানকার ছয় মাস ট্রেনিং-এর পরে আরো তিন বছর সিস্টার ট্রেনিং নিয়ে সিস্টার হবেন।

এদের ট্রেনিং-এর মোটামুটি নিয়ম এই ধরনের—(১) প্রথম অবস্থার postulant, ছয় মাসের প্রাথমিক ট্রেনিং। (২) দ্বিতীয় অবস্থাকে বলে novice, তখন তিন বছরের, কিন্তু সিস্টার ট্রেনিং নেবেন। শাড়া শাড়ী, পাড়বিহীন এবং কাঁধে ছোট জুপ। (৩) তিন বছর ট্রেনিং-এর পরে নীলপাড় শাড়ী তাঁদের পোশাক এবং কোমরে বড় জুপ। তখন এঁরা professed sisters। কেউ যদি এখানকার অসন্তব পরিপ্রম সঙ্গ করতে না পারেন তবে তাঁরা কিরে চলে যান।

গেলাম একতলার নীচের ঘরগুলি দেখতে। ওপরে যেসব মেয়েরা বড় হয়েছে এবং বোর্ডিংএ না গিয়ে এখানেই রয়েছে, তাঁরা থাকে। আঠারোটি মেয়ে এখনে আছে। তাদের ১৮টা টিনের স্টুটকেন্স ও বিছানা কাছেই গোছানো রয়েছে। সবাই স্কুলে পড়ে এবং ক্রি। ছুটি মেয়ে ক্লাস টুতে পড়ছে।

একতলার দ্বিতীয় ঘরে থাকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মেয়েরা, বয়স বার, চোদ্দ, সংখ্যায় আট জন। কিন্তু সুস্থ-মানসিক একটি জম্মাছ মেয়ে এদের সঙ্গে গল্প করছিল। জম্মাছ মেয়েটি অজ্ঞাত জন্মের পর থেকে এখানেই আছে। মাতৃঘের সমান বর্ষাধার আনন্দের সঙ্গেই বড় হয়ে উঠছে সে, বয়স বোধ হয় ১৫।১৬।

হৃদপোষ্য শিশুরা এবং বোগীরা ছাড়া এখানে অল্পদের সাধারণতঃ খেতে দেওয়া হয়—দিনে ভাল, ভাত, তরকারী এবং রাতে ভাল, কুটি, তরকারী। মাঝে মাঝে মাছ মাংসও হয়। টীকিন দেওয়া হয় কুটি, চা, এবং কখনো কখনো কলা।

গেটের কাছে এসে দেখি, সন্ট লেকের জয়বাংলার বৌকউজদের বাজার জন্ত মশলা বাটা হচ্ছে। ভোর

এটার উত্থান ধরিয়ে রাখা শুরু হবে, সকাল সাড়ে সাতটার খাবার নিয়ে গাড়ী চলে যাবে। গাড়ী ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে। আগে যেত প্রত্যহ পাঁচ মন চালের ভাত ও সেই পরিমাণে তরকারী। এখন যায় আড়াই মণ চালের ভাত ও তরকারী। বৃহস্পতি বারে মাছ এবং রবিবারে মাংস যায়। মাঝে মাঝে ডিমও।

আবার আসি শিশুদের কথায়। অনেক শিশু এখান থেকে দত্তক রূপে চলে যায়। নতুন গৃহে গিয়ে নতুন পিতা-মাতার আদর ভালবাসার মধ্যে তারা আশীশব মাস্ক হয়। দত্তক সন্তান সংসারে গিয়ে একেবারে মিশে যায়। আমরা জানি, পোস্ত নেন যে পিতামাতা তাঁরা নিজেকে ত্রিষিত পিতৃমাতৃস্নেহই ঢেলে দেন অজস্র ধারায়। অনেকে হয়তো জানেও না তাদের অভীত কি। সোসাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সঙ্গে এবিষয়ে এঁদের যোগাযোগ আছে।

অনেক শিশু দত্তক নয়, এখানেই প্রতিপালিত হয়। কিন্তু দূর থেকে প্রতিপালক পিতামাতারূপে (foster parents) এক একটি শিশুর ভার গ্রহণ করেন অর্থ ও জিনিস দিয়ে। মানবদরদী প্রতিপালক পিতামাতা তাঁরা।

শিশুরা যখন একটু বড় হয়, তাদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। যারা লেখাপড়ায় তেমন অবিধা করতে পারে না তাদের হাতের কাজ বা সেলাই শেখানো হয়। তখন প্রতিপালক পিতামাতার টাকা কাজে লাগে। এই সব ছেলেমেয়েরা বড় হলে মাদার টেরেজা বিয়ের ব্যবস্থাও করেন। প্রতিপালক পিতামাতার দেওয়া অর্থ যা বাঁচে তা বিয়ের সময় তাদের দিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিপালক পিতামাতারা ইরোরোপ আমেরিকার মতো দূর দেশ-দেশান্তরেও থাকেন, আবার এ দেশেও আছেন।

যদিও অনেক শিশু এখানে বিভিন্ন হুঃ মা-বাবার কাছ থেকে আসে, কিন্তু অনেকেই তারা আর কোনো দিন বাড়িতে ফিরে যায় না।

কোনো কুমারী মা অসহায় ভাবে মাদার টেরেজার

কাছে এলে তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় হাসপাতালে সপন্নানে। এখানে মাদারের কাছে সন্তানটিকে চিরদিনের জন্য রেখে সে চলে যায় শিশুর বাকী জীবনের ভার নেন মাদার।

কোনো দরিদ্র স্বামীর ঘরের বৌ দারিদ্র্যের পেয়ণে সন্তান প্রতিপালনে অপারগ হলে সেও তার বাচ্চাকে মাদারের কাছে ভার দিয়ে রেখে চলে যেতে পারে। মাদার সর্বদায়িত্ব নিয়ে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন। পরে ইচ্ছে করলে মা এসে নিয়েও যেতে পারে। অসহায় পক্ষ, অল্প সন্তানরাও এখানে স্থান পায়।

একটি আঠারো বছরের মেয়েকে দেখলাম অন্তঃসত্ত্বা। কোনো বাড়ীতে রান্না করে ও বাচ্চাদের দেখাশোনা করে। এখানে এসে রয়েছে। বাচ্চা হয়ে গেলে কয়েকদিন পরে আবার কাজে যোগ দিতে চলে যাবে। স্বামী পার্গল হয়ে ছাড়িয়ে গেছে। এই মেয়েটিও কিন্তু এখানকার শিশুদের সেবাকাজে সাহায্য করছে।

আর একটি সত্তেরো বছরের মেয়ের বিয়ে হয়েছিল যার সঙ্গে সে স্বীকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গিয়েছে। এখানে বাচ্চা হয়ে গেলে পরে আবার সে মা-বাবার কাছে চলে যাবে।

ত্রিপুরা থেকে একটি রৌকুটাজি মহিলা প্রেনে এসে এখানে রয়েছেন, হাসপাতালে চোখের অপারেশন করিয়েছেন, চিকিৎসা হচ্ছে।

জয়বাংলার বড়ার থেকে যারা এসেছেন তাঁদেরও বিপন্ন শিশুকে এখানে, রাখা ও লালন পালন করা হচ্ছে। ইচ্ছে করলে মা এখানে থেকে নিজেও দেখাশোনা করতে পারেন।

পাকিস্তানের সঙ্গে জয়বাংলার মুক্তের কাহিনী কল্পণ। জয়বাংলা থেকে ক্রীন্দান ও হিন্দু মেয়েরা অনেকে চলে এসেছেন—তাঁদেরও বাচ্চা হবে। পনেরো বছরের মেয়েটির স্বামী মুক্তি বাহিনীর সেনা ছিলেন—তিনি যখন পলাতক ছিলেন মেয়েটি পালিয়ে আসে।

সত্তেরো বছরের মেয়েটি নদীয়া থেকে এসেছে—

স্বামী পাণ্ডিত্যানী মিলিটারীর আতঙ্কে টিকতে না পেরে স্ত্রীকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে ফাদারের সাহায্যে।

চীকশ বছরের মেয়েটির স্বামীকে পাক-মিলিটারীরা কেটে ফেলেছে। দমদমে এসেছে হেঁটে। সেখান থেকে সিস্টাররা নিয়ে এসেছেন—বাচ্চা হতে বেশী দেবী নেই।

শিশু ভবনে এবং বাইরেও মাদার টেরেজা অনেক-গুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। কতগুলি বাস্তবশূলও আছে। সেগুলি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত নয়।

সেখানে বাস্তব বাচ্চারাও পড়তে আসে, এখানকার বাচ্চারাও যায়। কোথাও বাস্তব গাছের তলায়, কোথাও ছোট চক্রে, কোথাও মাসিক কয়েক টাকা ভাড়ায় মাটির ঘরে স্কুলগুলি চলে। কোথাও তিনি কুঠরোগাক্রান্ত, বাচ্চাদের জন্ম নাসার্গির ও প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করেন।

মাদার টেরেজার সেবাসংঘের কর্মীরা এদের পড়ান। অনেক সময় রাজার ফুটপাথ এদের গ্র্যাকরোডের কাজ করে, আবার গনী পুলের পারিত্যক্ত জিনিসও এঁরা ব্যবহার করেন। স্কুলে বাচ্চারা হুপুরে খাবার এবং দুধ পায়।

তৃত্ব ভারতবর্ষ থেকে নয়, ইয়োরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসে অর্থ, দুধ, ওষুধ, বস্ত্র ও অজ্ঞাত জিনিসের অকাভর দান ও সাহায্য। অর্থের অনটন তাঁর হয় না। অকপণ দানের অদ্বৈত ধারায় উৎসাহিত মাদার টেরেজা গুলেছেন বহু ঋণ বিতরণ ও কোঅপারেটিভ কেন্দ্র। শত সহস্র মানুষ এখানে এসব জিনিস পেয়ে বেঁচে যায়।

এক কালীন অর্থ দিয়েও তাঁর গরীবকে সাহায্য করেন জরুরী প্রয়োজনে। দুঃস্থরা হয়তো কখনো পেলেন বাড়ীভাড়া, কখনো পুলের বেতন, বই, বিয়ের সাহায্য, ওষুধ ও রক্ত পাবার অর্থ, অস্ত্রোপচারের সাহায্য। বাক্য কাকে বলে? ব্যসনে, হুঁতিকে,

রাষ্ট্রবিপ্লবে, শ্মশানে সশ্রুই, মাদার দুঃখীর বহু। পাশে দাঁড়িয়ে বহুর মতো হাত বাড়িয়ে রয়েছেন।

বাস্তি এলাকায় তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়, মাতৃসন, কুমারী মায়েরদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর সহকর্মীসংঘের ডাক্তার ও নাসার্গি অকাভর সেবা করে চলেছেন।

বর্তমানে মাদার কয়েকজন ডাক্তার সিস্টারদের নিয়ে ঢাকা গেছেন একই আদর্শ মাথায় নিয়ে। সেখানেও তাঁর পরিকল্পনা আছে, বাংলাদেশে পাণ্ডিত্যানী ফৌজদের জঘন্য বশতায় প্রায় দুই তিন হাজার মেয়ে, যাদের বাচ্চা হবে, সেই মেয়ে ও শিশুদের জন্য আশ্রয়স্থল খুলবেন। মরণাপন্ন দুঃস্থদের জন্য শেষ আরাধনের স্থান খুলবেন, অসহায়দের জন্য সাপাষ্যকেন্দ্র, ওষুধ ও চিকিৎসাকেন্দ্র খুলবেন। তিনি বাংলাদেশের পুনর্গঠনে ও পুনর্গঠনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবেন।

নির্মল হৃদয়

অথবা

অন্তিম সেবাধর

প্রতি মানুষ জন্মগ্রহণ থেকে ধীরে ধীরে মধ্যাহ্ন গগন পার হয়ে আঁগয়ে চলেছে দিনান্তের যাত্রাপথে। জন্মের সময়ও যেমন অনেক শিশু অবাঞ্ছিত ও হতভাগ্য থাকতে পারে, মৃত্যুর ঘরে এসেও তেমনি অনেক মানুষ পারিত্যক্ত, লালিত, নিকপায় হয়ে ফুটপাথে পড়ে থাকতে পারে। মাদার টেরেজা তাদেরও মনে রেখেছেন।

কলকাতার কালীঘাটের বিখ্যাত কালীমন্দিরের কাছে ছিল একটি ধর্মশালা। আগে সেখানে দরিদ্র তীর্থযাত্রীরা আশ্রয় নিতেন। মাদার এই ধর্মশালার বাড়ীটিকে পরিণত করেছেন দরিদ্র মৃত্যুপথযাত্রীদের অন্তিম সেবাধরে। নাম দিয়েছেন নির্মল হৃদয়। ২৫১ নং কালীঘাট রোডে এটি অবস্থিত। বাড়ীটি কম্পোরেশন থেকে পাওয়া।

কলকাতার রাজার ও অলিগলির নিরাশ্রয় দুর্ভিক্ষ রোগীরা এখানে আশ্রয় পায়। ডাক্তার সিস্টার গার্ট্রুড (Dr. Sister Gertrude) এদের চিকিৎসা করেন।

আরো একটি ডাক্তার রবিবারে আসেন। সিস্টাররা এবং সেবিকারা মনে করেন যেন ভগবান্ রোগীর রূপ ধারণ করে আর্ত হয়ে সেবা চাইছেন। এমনই নিষ্ঠায় এঁরা সেবা করে চলেছেন।

এখানে অস্ত্রমকালের রোগযন্ত্রণায় কাতর মাতৃস্ব কতরকমের ভেদ বাস ক্রেদ চলে চলেছেন। তবু কিন্তু অকাতরে দরদের সঙ্গে, ভালবাসার সঙ্গে সিস্টার ও সেবিকারা তাদের সেবা করে চলেছেন। পরিষ্কার রাখবার অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

খাবার রয়েছে। চার বারই খেতে দেওয়া হয়। শোহার ক্রেমের উপর বিছানান্তলিও নরম, কিন্তু মাটি থেকে বোধহয় এক বিঘ্ন উঁচু পাছে অচৈতন্য থাকলে মাটিতে পড়ে যায়, এই আশঙ্কা।

সকলেই যে মায়া যায় তা নয়। অনেক যন্ত্রণাকাতর মাতৃস্ব কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা ও খাদ্য পেয়ে ভালও হয়ে ওঠে, অবশ্য যদি তাদের জীবনীশক্তি থাকে। একটি সুস্থ, বালককে আনি হয়েছিল রাস্তা থেকে। সে তো দেখলাম হুন্দর বাছা ফিরে পেয়ে সেরে উঠেছে এবং ওখানকার কাজই করছে। আনন্দে ভরে আছে মুখখানা।

আবার অনেকে স্বল্পে যত্ন সেবা পেয়েও মাতৃস্বের যোগাভাবেই মৃত্যু বরণ করে।

কাছেই অবস্থিত কেওড়াডালা শাশান। মৃত্যু হলে হিন্দুদের তিন্মু সংকার সমিতি, মুসলমান হলে অজুমান এবং জীশান হলে লবেরল কোম্পানী থেকে গাড়ী এসে লবদেহ নিয়ে যায়।

### কুষ্ঠরোগী

পৃথিবীতে কুষ্ঠরোগীদের বোধহয় সর্বাধিক সংখ্যা নেই। এ দেশেও হাজার হাজার কুষ্ঠরোগী গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে আশ্রয় এবং খাদ্যের জন্য। তাদের চিকিৎসাও হয় না। এরা অনেক সময় বস্তিতে আশ্রয় নেয়। মাদার টেবেরকা হুংখীর হুংখ আপন হৃদয় দিয়ে অহুত্ব করেন। তাঁর ডাক্তার নাস ও সেবক-সেবিকাদল জাম্যমাণ চিকিৎসাকেজ নিয়ে এই সকল ব্যক্তি এলাকায়

প্রতিদিন যান। কুষ্ঠরোগীরা রাস্তার অথবা গলিতে তাঁদের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে। তাদের যেমন চিকিৎসা করা হয় তেমনই বাধ্য করা হয় বিনা খুলে ওশু ও খাদ্যের। যদি তারা সম্পূর্ণ সুস্থ নাও হয় তবু তাদের পরিবারে অথবা সমাজে এই রোগের সংক্রমণের আশঙ্কা কমে যায়।

অসংখ্য রোগীর পরিচর্যার জন্য অনেক চিকিৎসা কেন্দ্রই মাদার খুলেছেন। এইসব ছিন্নমূলদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চিকিৎসকের কাছে শান্তনগর নামে একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সেখানে তাদের হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়। ২০০০.০০ রোগী হাসপাতালে আছে। সংক্রমণমুক্ত হলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। সেখানে কলোনী আছে তাদের। কেউ কেউ কলোনীতে সপরিবারে থাকে।

এই কলোনীতে মূলও আছে। বিভিন্ন কাজের কিছুকিছু শিক্ষাও দেওয়া হয়, যাতে তারা ভিক্ষা করতেই বাধ্য না হয়। যাতে তারা শান্তিতে থাকতে পারে এবং জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা গৃহে পায়।

ভারতবর্ষে অন্ততঃ ৩৪টি শহরে মাদারের এরূপ কেন্দ্র আছে।

পৃথিবীতে ৮ম হুংখ যা কিছু আছে তা বোধহয় সবই মাদার টেবেরকা হৃদয় ছেয়ে আছে। তাকে তিনি গ্রহণ করেছেন মা হৃদয়ের আত্মলতা দিয়ে। বিশ্বমানবতা ও দরদবোধ তাঁকে এদের একেবারে কাছে নিয়ে গেছে। তিনি যেন করুণার আধার।

তাঁকে জিজ্ঞেস করি, কোন প্রেরণায় আপনি এ কাজে নামলেন? নম্র হৃদয়ে তিনি বাংলার উত্তর দেন— “ভগবান্ আমাকে আহ্বান করেছেন, আমি তাই এ কাজ না করে পারি নাই।” তারপর বাইবেলের ভাষায় ইংরিজিতে বলেন -

“I was hungry and you gave me to eat  
I was sick and you visited me  
I was naked and you clothed me  
I was thirsty and you gave me to drink  
I was homeless and you took me in.”

এই কথাগুলি যেমন মাদার টেরেজাকে প্রেরণা দেয় তেমনি মাদার টেরেজাও এই কথা দিয়েই অন্তরের প্রেরণা দেন। তাঁর Missionaries of Charity নামক সংঘে স্ত্রী, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র, অধ্যবিত্ত সব রকমের ব্যয় থেকেই সেবারতীরা এসে যোগ দেন, তাঁদের নিঃস্বার্থ কাজ করবার প্রেরণা আসে। তাঁদের যেমন কাজের শিক্ষাও দেওয়া হয় তেমনি প্যারিসচূরাল ট্রেনিংও দেওয়া হয়। মাদার তাঁর Missionaries of Charity পরি-পূর্ণভাবে সংগঠন করেন ১৯৬০ সালে।

১৯১০ সালে আলবানিয়াতে মাদার টেরেজা জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি লয়েটোর সিস্টার

রূপে কলকাতায় আসেন। কুড়ি বছর সেখানে শিক্ষায়তী ছিলেন। ১৯৫০ সালে চার্চের অনুমতি নিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন Missionaries of Charity নামে সেবাসংঘ।

তাঁর কাজ আজ পৃথিবীর বহু ভাগায় বিস্তৃত। ভেনিজুয়েলা, সিংহল, টানজেনিয়া, পূর্ণ আফ্রিকা, ইটালী, অস্ট্রেলিয়া, কেনিয়া, প্রভৃতি বহু স্থানে তাঁর বিশ্বমানবতার কাজ ছড়িয়ে আছে।

করুণাময়ী মাদার টেরেজাকে দেখে সাদিন যখন ফিরে এলাম, প্রাণটা আমার ভূগুণ্ডে ভরে গেল।

৪. ২. ৭২.

## ধ্রুবমধুববেষ্টিত ন প্রার্থয়ন্তে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমার অন্তরলোকে গিয়েছে যে পথ—  
সে পথে হস্তবাসিছু, হৃৎকণ্ঠা পর্যন্ত,  
অরণ্য হৃৎকৃতক্রম্য, সঙ্কট চরম।  
ওঠো, জাগো; সেই পথ করো আতিক্রম  
কৃষ্ঠাশূন্য পদক্ষেপে! তুমি অনন্তের।  
তুমার চরণপ্রান্তে চির বদন্তের  
পুষ্কিত আনন্দলোকে তব ভদ্রাসন।  
অন্তে কবে কে পেরেছে তৃপ্তি চিরন্তন?  
জনতার করতাল থসা যে আবুল  
মধ্যাহ্নের গগন যত গোখুলিতে ধূলি।  
কামনার মৃত্যুজালে বুক শিওদল  
মর্মে ছায় নৈরাশ্রের শিলা জগদল  
ওঠে হাসি, চলনায় কখনো তুলো না  
অক্রমে ক্রমেরে কড় করো না প্রার্থনা।

## ছায়াময়ী

ঈশাণ্ডতায় সান্তাল

কোনু স্বাতীনকত্রের সালিল-সম্পাতে  
উঠেছিলে কুটে তুমি এবক্ষ-সম্পূটে  
হৃৎক্রেত মুক্তাসম অলগে কখন  
নাহি জানি! কবে এলো যৌবন-জোয়ার  
তব বহু-যযুনায় জাগাইয়া তুলি'  
কাণকের উত্তরোল আকুল হিমোল  
ভটপ্রাবী। শুধু একখানি ক্রীণ রেখা  
রেখেছে সে এ জীবন বেলা-বালুকার  
লীয়মান। মুহূর্তের আনন্দ-কুজন,—  
তারপর কোথা গিক—কোথা উপবন—  
কোথা মত্ত কান্তনের প্রগলভ প্রলাপ।  
কবে দ্বিরে নিমেষের অকল-আভাস  
মিশে গেলে কোনু শূন্তে তার ছায়াময়ী,  
বরাবর আঁখি-কোণে নিশিত কারুক।

# পশ্চিমবঙ্গের নাম রাখা হোক “বঙ্গভূমি”

( দ্বিতীয় পর্বাংশ )

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন আবশ্যিক। “পশ্চিম” পরিভাষ্য করলে থাকে—“বঙ্গ”। “বঙ্গ” নামটি ঐতিহ্য পরিপূর্ণ। আড়াই হাজার বছর যাবৎ এই নামটি আমাদের সংস্কৃত ও পার্শ্ব সাহিত্যের নানা গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে।

আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে “বঙ্গ” নামই আছে।

এখন প্রশ্ন উঠবে—কেবল “বঙ্গ” নাম রাখা যাবে, না ওর সঙ্গে আর কিছু যোগ করা হবে? আর কিছু যোগ করার প্রস্তাবে “বঙ্গভূমি” ও “বঙ্গ প্রদেশ”—এর কথাই মনে আসে।

“বঙ্গ প্রদেশ” নাম ঋতিকটু। তার চেয়ে “বঙ্গভূমি” অনেক ঋতিমধুর। জাতীয় সঙ্গীতের চরিত্রা রবীন্দ্রনাথও একাধিকবার তাঁর কাব্যে বঙ্গভূমি নাম ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে তাঁর দুটি প্রসিদ্ধ কবিতার কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

“নমোনম নমঃ স্তব্ধা যম জননী বঙ্গভূমি।

গঙ্গার তীর, সিন্ধু সমীর, জীবন জুড়ালে ভূমি।

অবারিত মাঠ গগনললাট চূমে তব পদধূলি,

ছায়াছনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।

পল্লবঘন আজকানন রাখালের খেলা গেহ,

তরু অতল দ্বিধি কালোজল—নিশীথ শীতল মেহ।

‘হুই বিদ্যা জমি’ রবীন্দ্রচন্দাবলী ১ম, পৃ-৬১২।

এই কবিতার পশ্চিমবঙ্গের রূপ সূটে উঠেছে।

বঙ্গমাতা

পুণ্যে পাশে হুঃখে সুখে পতনে উথানে

মাতৃর হইতে দাও তোমার সন্তানে

হে স্নেহাৰ্ছ বঙ্গভূমি, তব গৃহে জোড়ে

চিরশান্ত করে আর রাখিয়ে না ধরে।”

ঐ প্রথম খণ্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা।

আমাদের ভাষায় “ভূমি” শব্দের একটি স্তম্ভুর, অন্তরঙ্গ ব্যবহার-জাত অর্থ আছে—যা দেশ (বা প্রদেশ) শব্দের মধ্যে পাই না। তাই আমরা বলি—বঙ্গভূমি, মাতৃভূমি।

মানভূম, ধলভূম, সিংভূম, বীরভূম মল্লভূম, (মল্লভূমি) প্রভৃতি, স্থান, দেশ রাষ্ট্রবাচক ভূমি শব্দের ব্যবহার আমাদের ভাষায় যথেষ্ট আছে।

পৃথিবীর অল্প ভাষাতেও দেশ শব্দের বদলে অনেক জায়গায় “ভূমি” শব্দের প্রয়োগ দেখি।

যথা—ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, থাইল্যান্ড, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ইত্যাদি।

তারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে, যথা অথন বেদে (১২।১।১২) ভূমিকে মা (মাতা ভূমিঃ) বলা হয়েছে।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকও ভূমিকে মা বলেন। গ্রামে গ্রামে একটা কথা ছেলেবেলা হতে শুনে আসি—“মাটি—মাটি।” অর্থাৎ মাটি (বা ভূমি) আমাদের “মা”।

“ভূমি” যে মাতা, এবং মাতারও মাতা—তাও রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়া যায়।

“ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।”

“ও গো মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ

তোমার বুকে।”

“ভূমি যে সকল সহ্য, সকলবহা, মাতার মাতা ॥”

“ওমা, অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি

মা—”

রবীন্দ্রচন্দাবলী ১র্থ, ১৮২-২০ পৃষ্ঠা।

১। প্রথম পর্বাংশ, প্রবাসী, চৈত্র, ১০১১।



২। প্রাচীনতম গ্রন্থ—ঐতরেয় আরণ্যক, ২।১।১ ;  
বোধয়ন ধর্মসূত্র, ১।১।১৪ ; অথর্ববেদ পরিশিষ্ট,  
১।৭।৭।

৩। পশ্চিমবঙ্গের “বাংলা” নাম রাখার প্রস্তাবও  
উঠেছে। “বাংলা” ও “বাংলাদেশ”—দুই

নামের এমন মিল যে ভবিষ্যতে নানা  
অসুবিধার পড়তে হবে।

“বঙ্গদেশ” নাম রাখা সম্ভব নয়—কারণ এক দেশের এক  
রাষ্ট্রের (ভারতের) অন্তর্গত ভূখণ্ডকে “দেশ” বলা যায় না।

“বাংলাদেশ” একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, সুতরাং  
সেখানে “দেশ” শব্দের প্রয়োগ সম্ভব।

## ঐতিহাসিক দৌড়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মেলবোর্ণ অলিম্পিকের এক ঐতিহাসিক দৌড়।  
ইতিহাসের পাতায় এ দৌড় দর্শকদের লেখা থাকবে। এ  
দৌড় কখনও বিস্মৃত হবার নয়।

লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে টেডিয়াম তখন গমগম  
করছে। এবার আটশত মিটার দৌড়ের ফাইনাল  
অনুষ্ঠিত হবে। চূড়ান্ত পর্ষায়েই মনোনিবেশ আটজন  
প্রতিযোগীর মধ্যে পাঁচজন ইতিমধ্যেই জগদ্বিখ্যাত।  
এদের মধ্যে কেউ করেছেন বিশ্ব-রেকর্ড, কেউ বিশ্ব  
রেকর্ডের সমান সময় আর কেউ বা করেছেন বিশ্ব-  
রেকর্ডের অতি নিকটবর্তী সময়।

আটজন প্রতিযোগীকে তাদের নিজ নিজ ট্র্যাকে  
দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। যথাসাধ্য নিয়োজিত  
করায় জন্ত প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আটজন  
দৌড়বীর।

পিস্তল গর্জনে দৌড় শুরু হল। ঝড়ের গতিতে  
সমান তালে ছুটে চলেছেন আটটি দুর্গারগতি দৃঢ়চিহ্ন  
যুবক।

পঞ্চাশ গজ দৌড়ের পর Annie Sowellকে একটু  
এগিয়ে থাকতে দেখা গেল। চূড়ান্ত গতিতে ছুটে চলেছে  
Pittsburgএর এই দৌড়বীর। হারাতেই হবে সকলকে।

দৌড়চক্রের বাকের মুখে বিরুদ্ধ বায়ু দেখা দেয় প্রতি-  
দ্বন্দ্বকে ধরে। কিন্তু এ সম্বন্ধে তার গতি সীমিত হয় না।  
সাধ্য-শক্তির শেষ কণাইকু পর্য্যন্তও নিয়োজিত করে  
গতির সমতা বজায় রাখে।

লক্ষ কণ্ঠে Sowellএর নামে জয়-ধ্বনি শোনা গেল।  
কিন্তু উত্তেজনার এই মুহূর্তে মাত্রাতিরিক্ত পরিগ্রহ করে  
সে বোধহয় একটু হুল করে। কিন্তু পরাজিত হওয়ার  
জ্ঞান এই একটু হুলই যথেষ্ট।

Annie Sowellএর ঠিক পেছনেই দেখা গেল Fontana  
Universityর Tom Courtneyকে, আর তাকে অগ্র-  
সরণরত তখন এক ছাত্রের মিটারের বিশ্ব-রেকর্ড  
অধিকারী নরওয়ের Boysen।

এদের পেছনেই ছুটে আসছেন তখন ব্রিটেনের ডিউং  
গতি সম্পন্ন Johnson, আর তার পেছনে Californiar  
Louie Surrierকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়। তীব্রগতিতে  
ভেড়ে আসতে দেখা গেল। চলল পাঁচজন বিশ্ববিখ্যাত  
দৌড়বীরের এই অমাহারিক প্রতিযোগিতা।

এক অভাবনীয় অসম্ভব দৃশ্য। দর্শকগণ ব্যকস্মিত-  
হীন। উত্তেজনামুখর টেডিয়াম, কিন্তু ভিত্তি ও নিভর।

উত্তেজিত হতবাক জনতাকে পরবর্তী বিন্ময়ের জঙ্গ অধীরভাবে প্রতীক্ষারত দেখা যায়।

বাকের মুখ এলো, Sowellএর পা-দুটি যেন কাঁপছে। হৃপায়েছ দরতের ব্যবধান যেন একটু কমে গেছে। ইয়া এইটুকুই যথেষ্ট। Tom Courtneyকে দেখা গেল দোড় চক্রের ঠিক মধ্যখানে Sowellকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। এর ঠিক পর যুদ্ধভেঁই অপর তিন দোড়বীর রবারের মতন পেছন থেকে বেরিয়ে এসে Sowellকে ঘিরে ফেলে উদ্ভাস গতিতে ছুটে চলল।

চক্রপথের শেষ বাকের নিকট তাদের দোড়তে দেখা গেল এবার। শ্রান্ত ক্রান্ত Courtney সম্পূর্ণ হতবাস অবস্থায় ছুটে চলেছেন। মাঝায় যন্ত্রণা এবং অবশ দুটি পায়ের সঙ্গে অসুস্থত্ব করছেন এক অতীব পীড়াদায়ক ক্রান্তি। কানের মধ্যে ভেসে আসছে দর্শকগণের উদ্ভাস-ধ্বনির একটা কীণ বেশ।

Tom Courtney চিন্তা করতে করতে ছুটে চলেছেন—সকলেই তো কখন সমান পরিশ্রান্ত, অতএব এই ভাবেনই চলুক।

সহসা দেখা গেল Johnson বেরিয়ে আসছেন। তিনি Courtneyকে ফেলে প্রায় হ'গজ এগিয়ে গেলেন। এইবার আরম্ভ হয় শেষ পর্যায়ের চরম দোড়।

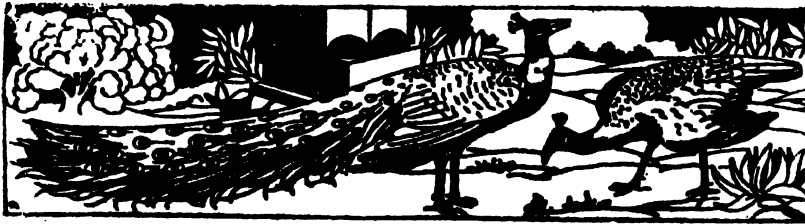
পরিশ্রান্ত Courtney Johnsonকে এগিয়ে যেতে দেখলেন। হঠাৎ এই সময় আলোড়িত হয়ে উঠল তার মন—“জিততে তাকে হবেই।” সমস্ত চিন্তা ক্রেশ সরিয়ে দিয়ে ঐ একটি কথাই তখন তার মনে জেগে বইল—“জিততে তাকে হবেই।”

দোড়ের শেষ দশ গজ থাকতে দেখা গেল হ'জনেই সমান যাচ্ছেন। অতঃপর দোড়ের পরিসমাপ্তি। শোনা গেল দোড় শেষ করে Tom Courtney অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

মাটিকে শোনা গেল “বিজয়ী Tom Courtney ফিতা স্পর্শ করেই মাঠের মধ্যে জ্ঞানহারী হয়ে পড়িয়ে পড়েছেন। সুতরাং পুরস্কার বিতরণ উৎসব একটু দেরীতে হবে।

তারপর সেই বিজয়োৎসব পালিত হয়েছিল সেই সময়ের আরও একদফা পরে—যখন Courtney একটা হুহু হয়ে উঠেছিলেন।

এ এক স্মরণীয় কৃতিত্ব যা দেখে টেডিয়ারামের একলক লোক বিন্ময়ে অভিভূত হয়ে নিবাক ও নিম্পল হয়ে উঠেছিল। তাই বলছিলাম সত্যিই এ এক ঐতিহাসিক দোড়।”



# এটম্ বম্

যোগামন্দ দাস

এলো বুঝি ঐ এটম্ বম্ ।  
তাইথে তাইথে নাচে ভৈরব  
গগনে গগনে বাজে ঐ বব—  
ববম্ বম্ ।  
ঐ এলো বুঝি এটম্ বম্ ।

আনু ঘড়া ঘটি কলসী আনু ।  
ভূত প্রেত দানো পিশাচ কুল  
নাচে উল্লাসে হ'য়ে আকুল,  
বহিবে এবার ছাপি' হুকুল  
রক্ত-বান ।

পূরিবে যে আশা  
মিটিবে পিপাসা  
মুক্তরক্ত করিয়া পান,  
ছুই কশ বেয়ে সে শোণিতধারা ব'বে উজান ।  
আনু ঘড়া ঘটি কলসী আনু ।

লালে লাল হ'ল আকাশ-কোল ।  
ঘরে ঘরে জলে বহি' চিতায়,  
কিবা হৃৎ শোক ভাবনা কি ভায়,  
আজি লেগে গেছে শক্র-মিতায়  
গুণগোল ।

সবি যে আহবে  
পুড়ে ছাই হবে,  
কেটে কুটি-কুটি চিতায় ভোল ।  
বাজা রে কাঁসর বাজা রে ঘটা ঢকা ঢোল  
লালে লাল হ'ল আকাশ-কোল ।

ঐ শোনা যায় অটহাসির হটরোল ।  
আসিছে মড়ক, আসে মহামারী ।  
ককাল দল হাসে সারি সারি ।

কাতারে কাতারে ভিখারী ভুখারী  
ভোলে পটোল ।  
লাখে লাখে টাকা,—  
ফের ঘোরে চাকা,  
বাজার যেন না বে-কন্ট্রোল,  
যরিবে মরুক বগল বাজারে দে হরিবোল ।  
ঐ শোনা যায় অটহাসির হটরোল ।

নাচ, সবে মিলে নাচ, দেয়ার ।  
ছনিয়াটা পুড়ে হ'বে ছারখার,  
ম'স-পোড়া বাস পাই যে তাহার ।  
অশানে অশানে শিবা-চিৎকার  
চমৎকার !

এবার জুটিব,  
ছুটিব নুটিব

যত ধন আছে যত মড়ার ।  
পারি না এমন জোর মরুম পারি না আর ।  
নাচ, সবে মিলে নাচ, দেয়ার ।

আকাশের পাশে ঐ বুঝি আসে  
ও কে উঁকি মাঝে, বৃহ বৃহ হাসে,—  
হিসাবের মাঝে লাগিল গোল ?  
দে দোল দোল ।

(২৭ জুন, ১৯৫০ কোরিয়ার যুদ্ধে জেনারেল ম্যাক-  
আর্থার যখন এটম্ বোমা প্রয়োগের আদ্যাস দেন, সেই  
সময়ে লেখা । ম্যাকআর্থারের দিন কি আজ গত  
হয়েছে ?)

# মিতে

অখীঅনাথ ঠাকুর

## প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামপুরের জমিদারপুত্র সুবোধকুমার ভৈরব নদের জলে কাগজের নৌকা ভাসাইতেছিল। নৌকা যখন খানিক দূর ভাসিয়া যাইতেছিল তখন সে একটি ককি দিয়া নৌকাখানি টানিয়া ভীরের কাছে আনিতেছিল। এমন করিয়া সে ও তাহার নৌকা গ্রাম ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গেল।

গ্রামের বাহিরে আসিয়া বালকের চমক ভাঙিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, পাখীরা কলরব করিতে করিতে কুলায়ে ফিরিতেছে, কৃষকেরা মাঠের কাজ সারিয়া লাজল কাঁধে বাড়ির দিকে চলিয়াছে। অপরিচিত স্থানে রাত্রি আসিল দেখিয়া সুবোধকুমারের প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল। তাহার মা তাহার কাছে নাই, - সে মা মা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

সুবোধকুমারের সমবয়স্ক একটি বালক একগোছা হোলায় শাক হাতে করিয়া সেইদিকে আসিতেছিল। সে সুবোধকুমারকে দেখিয়া জাড়াডাড়ি তাহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কোথেকে এসেচ তাই? কোথায় বাবে?”

সুবোধ বলিল, “আমি পথ ভুলে গেছি—আমি বাড়ি যাব।”

বালক জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার বাড়ি কোথায়?”

সুবোধ বলিল “ইসলামপুর জমিদারদের বাড়ি।”

বালক বলিল, “তুমি ভয় কোরোনা, আমি তোমার বাড়ি পৌঁছে দেব। এখন আমাদের বাড়ি আমার মার কাছে চল।”

অপরিচিত স্থানে বন্ধু লাভ করিয়া সুবোধ চক্কর জল মুছিল। বালক সুবোধকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার নাম কি তাই?”

সে বলিল, “আমার নাম সুবোধকুমার।”

বালক বলিল, “আমারও তাই তাই নাম। ভারি মজা, না? আজ থেকে তুমি আমার মিতে। সুবোধকুমারের মুখে হাসি ফুটিল।

সুবোধ তাহার মিতের হাত ধরিয়া তাহাদের বাড়িতে আসিল। ছোট একতলা বাড়ি। বাড়ির বাহিরে খানিকটা জমি পরিষ্কার করিয়া বেগুনের ক্ষেত করা হইয়াছে, বাড়ির দেয়াল বাহিয়া কুমড়োর গাছ উঠিয়াছে। বাড়ির ভিতর উঠানের এক পাশে তুলসী মঞ্চ একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। আর এক পাশে মাচার উপর শসা সুলিতেছে। ভিতরে দুইটি মাত্র ঘর—একটি ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে আর একটি ঘর অন্ধকার।

বালকদের গৃহপ্রবেশ-শব্দে একটি শ্রীলোক তত্তপদে যে ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, “আরে হাবলা এসেছি। আমি সন্ধ্যা থেকে ঘর আর বার করছি। দেবী করল কেন। আমি ভেবে ভেবে মরছিলাম। সঙ্গে একে?”

হাবলা বলিল, “মা, সেই কথাটাই আগে জিজ্ঞাসা করতে হয়। বল দেখি কে?”

মা বলিল, “আমি যদি তাই জানব তবে কিজান্সা করব কেন।”

হাব্‌লা বলিল, “একটা আশ্বাস করবে বল না।”

হাব্‌লার মা বলিল, “ক্ষাপা হেলে, এতে কি আশ্বাস করব—তুই বলনা কে?”

“বলব, তবে বলব, এ আমার মিতে” এই বলিয়া হাব্‌লা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাব্‌লার মা হাব্‌লার মুখে সব শুনিয়া স্তবোধকে আদর করিয়া ঘরে লইয়া গেল। তাহার মাখার হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, “কোন ভয় নেই বাছা আমরা তোমাকে বাড়ি দিয়ে আসব।”

হাব্‌লা বলিল, “মা, মিতে মা মা বলে কাঁদছিল।”

“বাছা আমার, বাবা আমার বলিয়া হাব্‌লার মা স্তবোধকে কোলের ভিতর টানিয়া লইল এবং যত্নে তাহাকে খাওয়াইল—খানকতক শসা, একটু ছানা, একটু মোহনভোগ—বিধবার ঘরে আর কিছু ছিল না। খাওয়া হইলে হাব্‌লার মা পুত্রের হাত ধরিয়া এবং স্তবোধকুমারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে কোলে করিয়া জমীদার-বাড়ি চলিল।

জমীদার বাড়িতে হলদুল পাড়িয়া গিয়াছে। স্বরওয়ান, চাকর-বাকর ইকডাকে গ্রামখানি সন্ধ্যায় করিয়া তুলিয়াছে। গালপাটাধারী আকালী সিং দীর্ঘ যটি হস্তে “খোকাবাবু কিধার গিয়া”, “খোকাবাবু কিধার গিয়া” বলিতে বলিতে একদিক দিয়া চলিয়াছে। চাকর-বাকর লণ্ডন হাতে আর একদিক দিয়া ছুটিয়াছে।

এমন সময় হাব্‌লার মা স্তবোধকে কোলে করিয়া বাড়ির ভিতর হাজির। গৃহিণী এতক্ষণ সপ্তমে স্তব চড়াইয়া কাঁদিতোছিলেন, স্তবোধকে দেখিয়া স্তব নামাইয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া প্রপ্নের পর প্রপ্নে হাব্‌লার মাকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। সমস্ত শুনিয়া গৃহিণী উঠিলেন। চাবির গোছা বন্ম বন্ম করিতে করিতে উপরে গেলেন এবং খানিকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া হাব্‌লার মা'র হাতে দুইটি টাকা দিতে গিয়া বলিলেন—“ওগো ভালমাহুষের মেয়ে, এই দু'টাকা দিয়ে তোমার ছেলেকে নতুন কাপড় কিনে দিও।”

হাব্‌লার মা অপমানিত বোধ করিয়া “আমরা ভিখিরি নই গো আমরা গেরস্ত ঘরের মেয়ে”—এই বলিয়া হাব্‌লার হাত ধরিয়া চলিয়া বাইতোরিল। স্তবোধ ছুটিয়া আসিয়া হাব্‌লার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “মা, এ আমার মিতে। একে আজ আমাদের বাড়ি থাকতে বল।”

গৃহিণী হাব্‌লার মার উত্তর শুনিয়া রাগে গস্‌ গস্‌ করিতেছিলেন, ঠাস করিয়া স্তবোধের গালে চড় মারিয়া বলিলেন, “লক্ষ্মীছাড়া হেলে, মিতে পাতবার আর লোক পাওনি? চল ওপরে চল।” স্তবোধ হাব্‌লার গলা ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিল। হাব্‌লার চোখ হলু করিতেছিল। সে আস্তে আস্তে মার সঙ্গে বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

তারপর হাব্‌লার সঙ্গে স্তবোধকুমারের অনেকবার দেখা হইয়াছে। মাঠে, ঘাটে স্তবোধ হাব্‌লার হাত ধরিয়া সমস্ত সন্ধ্যা, সমস্ত সকাল বেড়াইয়া বেড়াইয়াছে। চাবাদের ক্ষেতে চাবাদের সঙ্গে আলু তুলিয়াছে, বাগানে ফুল তুলিয়াছে, নদীতে নৌকা ভাসাইয়াছে, পুকুরে মাছ ধরিয়াছে,—স্তবোধের মা অনেক মারিয়া ধরিয়াও স্তবোধকে পারিয়া ওঠেন নাই। স্তবোধ জলখাবারের বাছা পরসা পাইত খাবার কিনিয়া মিতেকে খাওয়াইত—তাহার মিতেও তাহাকে বাড়ি লইয়া গিয়া মাকে দিয়া লুচি ভাজাইয়া মোহনভোগ তৈয়ারি করাইয়া খাওয়াইত। বিধবার এই হাব্‌লা ব্যতীত সংসারে আর কেহ ছিল, না। তাহার কিছু ভূসম্পত্তি ও নগদ টাকা ছিল, তাহাতেই সংসার চলিয়া বাইত।

এইরূপে যখন স্তবোধের সঙ্গে হাব্‌লার বন্ধুত্ব গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে চলিয়াছে, তখন একদিন স্তবোধ সন্ধ্যার সময় হাব্‌লাদের বাড়ি আসিয়া বৃষ্টির জন্ত সকাল সকাল বাড়ি ফিরিতে পারিল না। সেদিন হাব্‌লা জেদ ধরিল, “মা, আজ মিতে আমাদের বাড়ি থাক। তুমি আত্মবিশ্বাস কর।” মা কিন্তু জমীদারগৃহিণীর স্বভাব জানিত, সেই জন্ত একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। হাব্‌লাও কিছুতে ছাড়িতে না। তার মা বলিল, “আমরা

পৃথিবী লোক, সুবোধ যদি আজ বাড়িতে আমাদের বাড়ি থাকে, তাহলে সুবোধকে ওর বাপমা হুকমেনেই খুব বকবেন। সেটা কি ভাল ?”

হাব্‌লা তাই শুনিয়া সুবোধের মুখের দিকে চাহিল। সুবোধ মারের ভয় করিলেও মিত্রের বাড়ি একদিন থাকিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না।

দুপুর রাতে হাব্‌লাদের বাড়িতে ডাকাত পড়ার মত গুপ্তগোল আরম্ভ হইল। কেহ দরজা ভাঙে, কেহ পাঁচিল টপকাইয়া ওঠে। হাব্‌লার মা বাহির হইয়া দেখিল, সকলেই জমিদার-বাড়ির লোক। তাহার হাব্‌লার মাকে দেখিয়া গালি দিয়া বলিল, “খোকাবাবু কোথায় আছেন শীগগীর বল।” সুবোধ বাহির হইয়া তাহাদিগকে অনেক বাকল, কিন্তু তাহার সুবোধের কথা মোটেই শ্রদ্ধা না করিয়া বলিল, “মাঠাকুরুণ হুকুম দিইছেন মাগীর চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যেতে।” হাব্‌লার মা তাই শুনিয়া বলিল, “চল, আমি যাচ্ছি।”

সেই রাতে সুবোধ তাহার পিতার নিকট এমন মার খাইল যাহা তাহার জীবনে আর কখনও ঘটে নাই। সে মার খাইয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল। গৃহিণী হাব্‌লার মাকে বলিলেন, “ছোটলোক মাগী, তুই আঁতাকুড়ে পড়ে থাকিস্—তোর এত বড় আশ্পদা তুই জমিদারের ছেলেকে বাড়িতে রাখিস।”

হাব্‌লার মা বলিল, “দ্বিদি, আমরা ছোটলোক নই; আমরা গেরস্ত।”

জমিদারগৃহিণী নথ নাড়িয়া বলিলেন, “ও মা, কি হবে। ছোটলোক নজ্জার মাগী আমাকে বলে দ্বিদি। আশ্পদা কম নয়। তুই নাকি আমার ছেলেকে খিচুড়ি খাইয়েচিস। ওমা কি যেজ্ঞার কথা।”

হাব্‌লার মা বলিল, “দ্বিদি, আমরাও ভাল জাতের মেয়ে—আমাদের বাড়ি খেতে দোষ কি।”

কথা শুনিয়া গিন্নি ভেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “কের যদি আমার ছেলেকে তোরা ডেকে নিয়ে বাস্‌ ত তোদের ভিটেমাটি উজ্জর করব।”

সুবোধ চোরের মত তাহার বিছানার গিয়া শুইয়া

পড়িল। সে রাতে তাহার খুব হইল না—সমস্ত রাত সুঁপিয়া সুঁপিয়া কাঁদিল।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাব্‌লা আর সুবোধের দেখা পায় না। সে সুবোধদের বাড়ির আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, নদীর ধারে গিয়া বসে, বাগানে গিয়া চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে,—কিন্তু সুবোধ আর আসে না সে তাহার মিত্রের জন্য চারিখানি ঘুড়ি তৈয়ারি করিয়াছে, দুইখানি ভেলা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কাকি কাটিয়া ভাল হিপ্‌ তৈয়ারি করিয়াছে। নদীতে ছিপ্‌ ফেলিয়া তবে, সুবোধ এখানি পিছন হইতে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিবে;—সে কিন্তু প্রথমেই বলিবে না যে, মিত্রে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিয়াছে। সে প্রথমে হরিদাস, গৌরসুন্দর, নিতাইচাঁদ, আরও কত কি নাম করিবে। তাহার পর বলিবে মিত্রে। তখন উভয়ের মধ্যে মত হাসাখাসি পড়িয়া যাইবে। ছিপে বড় মাহ উঠিলে হাব্‌লা ভাবে, এ মাহটা মিত্রেকে দেখাইতে হইবে। তিন-চার দিন বাড়িতে রাখিয়া মাহটা যখন পাঁচিয়া যায়, দুর্গন্ধ ছোটে, তখন সে মাহটাকে ফেলিয়া দিয়া আসে। বাগানে গিয়া রাশি রাশি ফুল তোলে, টগর, বেলা, মালিকা, জুই—বড় একটা মালা গাঁখে, ভাবে মিত্রের গলায় দেব। যখন ফুলগুলি শুকাইয়া যায় তখন হতশ হইয়া মালাটি ফেলিয়া দেয়। আবার সন্ধ্যার সময় সুবোধের বাড়ির কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, যদি একবার দেখা পায় তবে ডাকিবে।

একদিন যখন হাব্‌লা লুকাইয়া সুবোধদের বাড়ির কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দেখিল, সুবোধদের বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে। কেহ ডাক্তার আনিতে ছুটিয়াছে, কেহ ঔষধ আনিতে চলিয়াছে, কেহ “বরফ আন” বলিয়া চীৎকার করিতেছে—লোকজন ব্যস্ত হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। হাব্‌লা শুনি, সুবোধের কলেরা হইয়াছে। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল,—সে উদ্বেগে তাহার মার নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিল, “মা মিত্রের কলেরা হয়েছে। চল মা দেখে আসি চল।”

সৌন্দর্য না ও হেলের কাহারও খাওয়া হইল না। হজনে জমীদার-বাড়ি গিয়া জমীদার-গৃহিণীর পায়ে ধরিল। বলিল, “আমরা স্রবোধের শুশ্রূষা করব।” জমীদার-গৃহিণী আজ তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। হাব্‌লা ও তাহার মা স্রবোধের কাছে বসিয়া সমস্ত আশ্রয় দিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। তাহাদের শুশ্রূষার শুণেই স্রবোধ যে এ যাত্রায় রক্ষা পাইল, সকলেই তাহা একবাক্যে বলিতে লাগিল। হাব্‌লা এক মুহূর্তের জন্যও স্রবোধে কাহাড়া হয় নাই।

স্রবোধ যখন আরোগ্য লাভ করিল, তখন ডাক্তারকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইল, এক শত টাকা আশ্রয়দায়ককে বিতরণ করা হইল, এবং প্রায় চারিশত টাকা ধরত করিয়া সর্বমঙ্গলার পূজা দেওয়া হইল। তখন গৃহিণী ভাবিলেন, হাব্‌লার মাকে কিছু দেওয়া হইল না। এই মনে করিয়া পাঁচটি টাকা হাব্‌লার মাকে দিতে গেলেন। হাব্‌লার মা বলিল, “দিদি, আমরা ওজলে আসি নি।”

আবার সেই দিদি। গৃহিণী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, “আমরা বাহা, ওর বেশী দিতে পারব না।” হাব্‌লা ও হাব্‌লার মা কোন কথা না কহিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

এবার হাব্‌লার পালা। সে এই সাত-আট দিন নিজের শরীরের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করে নাই। সে স্থান করে নাই, পেট ভরিয়া খায় নাই, রাতে ঘুমায় নাই। কলেরা স্রবোধকে অব্যাহতি দিল কিন্তু তাহাকে চাপিরা

ধরিল। হাব্‌লার মা হাব্‌লার অন্ত সর্বস্ব ব্যয় করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না।

হাব্‌লা ঔষধ খাইতে চাহিত না, কেবল বলিত “আমার মিতেকে একবার এনে দাও, আমি তাকে দেখব।”

হাব্‌লার মা তিন-চার বার জমীদার বাড়ি গিয়া স্রবোধের মার নিকট অন্তর্য বিনয় করিল, তাহার পায়ে ধরিল, কিন্তু কোন কিছুই খাটিল না। স্রবোধের মা বলিলেন, “আমার স্রবোধ তোমাদের বাড়ি যেতে পারবে না বাহা, কেন বিরক্ত করছ, আমি বলছি? সে যেতে পারবে না।” হাব্‌লার মা কর্তাকে গিয়া ধরিল, বলিল, “আমার ছেলে একটবার স্রবোধকে দেখতে চায়। সে একবার আমার সঙ্গে আসুক।”

কর্তা বলিলেন, স্রবোধের শরীর ধারণ, যেতে পারবে না।” হাব্‌লার মা হতাশ মনে ফিরিয়া চলিল।

স্রবোধ ঘরে বসিয়া হাব্‌লার মার সকল কথা শুনিয়া ছিল। সে খিড়িকির দরজা দিয়া উদ্ভব্বাসে হাব্‌লার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। হাব্‌লার মা তখন অর্ধেক পথে।

হাব্‌লা স্রবোধকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে বিহ্বানায় উঠিয়া বসিল। স্রবোধ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল “মিতে।” হাব্‌লা ক্রীণকণ্ঠে উত্তর দিল “মিতে।”

হাব্‌লার মা যখন বাড়ি পৌঁছিল, তখন স্রবোধ হাব্‌লার বৃত্তদেহ বৃকে করিয়া বসিয়া আছে।

প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩১৮



# প্রবাসীর সত্তর বৎসর

জ্যোতির্ষ্ময়ী দেবী

মাসুকের ভালবাসা শ্রদ্ধা প্রীতির স্থান কাল পাড়  
আছে নিশ্চয় কিন্তু সব সময়ে তার 'ভাব' বা রূপ বোঝাও  
যায় না বোঝানোও যায় না।

সে ভালবাসে মাসুকে স্বপ্ন বহুতক। জীবজন্তুকে-  
গাছপালাকে, আবার যুগ্ময়ী দেশকে।—সবচেয়ে আশ্চর্য্য  
সে তার অতীত বর্তমানকালকেও ভালবাসে। যার না  
আছে আধার না আছে রূপ, শুধু এক ভাবময় শ্রদ্ধা  
প্রীতি ভরা মোহময়ী সে ভালবাসা।

আরো নানা স্বপ্ন ভালবাসা প্রীতি আছে সে  
ভালবাসা হল অবশ্য কিছুকি প্রীতি। কোনো আদর্শকে  
ভালবাসা—সামাজিক সংস্কারকে, ধর্মীয় আদর্শ ও  
সংস্কারকে—সত্য সত্যতা নীতিকে ভালবাসা—যার জল  
যুগে যুগে মাসুকের সর্ব ত্যাগ সর্ব স্ব ত্যাগ করেছে।

কিন্তু এত বড় বড় কিছু নয়—ছোট ছোট প্রীতিও  
কম গভীর হয় না, বড় কম মগুর হয় না; তেমনও  
অবাস্তব অর্থাৎ বস্তুহীন বিষয় আছে, কিংবা বস্তুদেহী  
বস্তুময়ও; যেমন বই।

অর্থাৎ আমরা প্রবাসী বাঙালীর সম্ভাবনা  
ভালবেসেছিলাম 'প্রবাসী'কে। 'প্রবাসী' নামের  
একটি মাসিক পত্রকে। যার প্রকাশভবন জম্মুভূমি বা  
'বাসগৃহ' কোথায় তার সম্পাদকের "মনো-ভূমিতে"  
অথবা ইন্ট কাঠ মাটির ঘরে; আমাদের বোঝবার বয়স  
নয়। কে সম্পাদক তাও জানা নেই। লেখকরা বা  
কারা কিবা লেখেন তাও সেই ৭৮ বছরের বয়সের  
বোঝবার বয়স নয়। ছবি অবশ্য ছিল সে প্রবাসীতে  
এবং গল্পও। কিন্তু সে ছবি বা গল্প তো রূপকথা  
বা 'হাসিখুসী' বইয়ের ছবি নয়; তবু কিন্তু প্রবাসী  
আমাদের মনোহরণ করেছিল। নিত্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ  
যার কথামালা পড়া বিভ্রান্তে কি পড়েছিলাম বা ছবিতে  
কি দেখেছিলাম আমার নিজেরই জানা নেই।

তবে মনে হয় সেকালের শিশুরা—অনেক, মাসুকের  
মধ্যে গুরুজনের মধ্যে থাকত। তাঁদের কথাবার্তা  
আলোচনা শুনে পেত বুঝুক বা না বুঝুক। তাই  
থেকেই এই শ্রদ্ধা সংক্রমণ হয়েছিল। বোধ হয় বইয়ের  
পড়ার ঘরে বসে গুরুজনের কেউ প্রথম সংখ্যা প্রবাসীতে  
জয়পুর মহারাজার যে বাঘ শিকারের ছবি বেবোয় সেটা  
নিয়ে কথাবার্তা বলেছিলেন। ছবিটা দেখিয়েছিলেন  
নিজের ঘরে। আমরাও দেখেছিলাম। কৌতূহলও  
হয়েছিল, আমাদেরই জয়পুরের রাজার ছবি। দ্বিতীয়  
কৌতূহলেরও কারণ ছিল, আমাদেরই সেখানকার তখন  
প্রধানমন্ত্রী কান্টিলাল মুখোপাধ্যায়ের জীবনকথা  
বেরিয়েছে সেই প্রবাসীতে। ছবি বা গল্প নয়,  
পরিচয়ের পরিচয়ই হল মূল কৌতূহল। তারপর কবে  
কে জানে পিতা বই-এর আলমারীর তাক ঝাড়তে  
গোছাতে বাহতে দিলেন। —এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে  
দিলেন শিখিয়েও দিলেন মাসিক পত্রিকার, 'প্রবাসী'  
'উদ্বোধন' 'ভারতী' 'জম্মুভূমি' 'বালকবন্ধু', আরো অল্প  
বইয়েরও বিজ্ঞাপনের পাতা ছেঁড়া, সূচীপত্র সাজানো;  
—মাস মত সাক্ষরে বাঁধাতে দেবার জন্ত। তখনকার  
পত্রিকার বর্ষ মাস আরম্ভ যে-কোনো মাসে হত না।  
সোজামুজি—বৈশাখ থেকেই প্রায় হওয়ার প্রথা ছিল।  
অবশ্য ব্যতিক্রমও ছিল (উদ্বোধন)।

যাই হোক, বই খাটা মানেই বইয়ের পরিচয়  
পাওয়া।

কি পেলাম কি শিখিয়েছিলাম বই বাঁধাতে দিতে বসে  
তা বোঝার বয়স নয়। তবে পেলাম যে কিছু তাতে  
সন্দেহ নেই।

তার নাম হল বইয়ের সাহিত্যের দাঁড়। একটা  
অন্তরকম আনন্দের আবাদ। কিন্তু কথানিই বা বই



সেই সেকালে। প্রথমকার মত বাইরের রূপশোভাও তার ছিল না। ভিতরের ছবি কথাও ঠিক শিশু-মনোহর ছিল না।

তবু সেই মাত্র কৃত্তিবাস, কাম্বীরাম দাস, শিশুবোধক পাঠ্য বাইরের সঙ্গে ওরূপে তাগাই এনে দিয়েছিল অল্পতরসের ছাদ। যা কখনো ফুরায় না।

রবীন্দ্রনাথ “বঙ্গদর্শনের” কথাই বলোছিলেন, যেন “রাজার মত আবির্ভাব।” (“রাজবহুত ধনির”) বঙ্গদর্শনের আয়ু দীর্ঘ হয়নি। তার সম্পাদক ও লেখক বঙ্কিমচন্দ্রও দীর্ঘ পরমায়ু পাননি।

কিন্তু ‘বঙ্গদর্শনের’ ঐতিহ্য থেকেই বাংলা সাহিত্য ‘ভারতী’ পেরোইল। প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে ‘প্রবাসী’ আবির্ভাব ১৯০৮ সালে।

আবির্ভাবই নিশ্চয়। বুঝতে শিখি বা পড়তে পারি বা না পারি আমাদের বয়সের পাঠ্যও তখন তাতে ছিল না। কিন্তু অতি অনিয়মিত তার প্রকাশ। মাসের ২০ তারিখের মধ্যেই ‘প্রবাসী’ অল্প মলাটে অল্প ছবি আর বড়দের পাঠ্য গল্প নিয়ে বাড়ীতে ও হাতে এসে পৌঁছত। যদিও সেকালে আবার বই পড়ার বিধি-নিষেধও ছিল। প্রবাসী সে বিধির বাইরে ছিল। সে থাক ‘প্রবাসীতে’ রবীন্দ্রনাথের কবিতা “সব ঠাই মোর ঘর আছে” প্রথম সংখ্যাতেই ছিল। ‘স্বদেশের বাহিরে বাঙ্গালী’ও (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস রচিত) ছিল। গল্পও ছিল, মনে নেই কি।

কিন্তু তখনও তাতে মেয়েদের লেখা ছিল না। কত কাল! তা আমার মনে পড়ে না। হাতের কাছে নেই সবগুলো। আর মেয়ে লেখিকারাও তখন জন্মান নি অনেক।

নবপরিচয় বঙ্গদর্শন ছাড়ার পরে ১৩১৪ সালের পরে রবীন্দ্রনাথকে ‘প্রবাসী’ পুরো করে পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের লেখার তখন থেকেই ‘মাটিরমশাই’, পরে ‘গোরা’ ‘জীবনস্মৃতি’, প্রবন্ধ কবিতা গানে বরাবর প্রবাসী সবুজ ছিল ১৩৪৮ অবধি। এক কথায় ‘প্রবাসী’ যেমন রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথও তেমনি

করেই ‘প্রবাসী’ ও তার সম্পাদককে পেয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ ১৩১৬ সালের পর ‘প্রবাসী’ সেই ৩১/অর্ধাৎ ১০ চার আনাতে তার আকার আর উপাদান বড় ও সমৃদ্ধও করল। শিশু বিভাগ, পঞ্চমত, গল্পন ও সমালোচন, বেতালের বৈঠক, দেশ বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান, চিত্রকলা বিবিধ প্রসঙ্গ দেশের কথা ছিলই তো আগে থেকেই,—সব নিয়ে ‘প্রবাসী’ বাংলা পত্রিকা জগতে অভুলনীর মাসিক পত্র হয়ে উঠল—প্রবাসে-বিদেশে-বদেশে।

এখন বলি শুধু প্রবাসী ও প্রবাসিনী জগতে বিশেষভাবে প্রবাসীর কত সমাদর ও প্রভাব ছিল, তা আমার মত বর্ষীয়সী পাঠিকা গরা বেঁচে আছেন তাঁরা জানেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশী এবং পরসগল্প, প্রিয়দর্শনা দেবীর ছোট বড় কবিতা, নানা দেশের নানা প্রসঙ্গ ও তথ্যও তো তাদের আরেক জগতে নিয়ে যেত সেটা সেকালের অন্তঃপুরে একেবারে নুতন।

এক জয়পুর শহরেই ১৮ খানি প্রবাসী যেত। অধ্যাপক সমাজের ঘরে ঘরে। এবং পুরোনো অধিবাসী হরিমোহন সেন, কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সংসারচন্দ্র সেনের বাড়ীতে। পরে দেখোঁছি দিল্লী ও পাটনার (বাঁকিপুর) চেনা জানা আত্মীয় সমাজেও প্রবাসী সকলের ঘরের সমাদরের ধন। এরপর সহসা দেখা গেল ‘প্রবাসী’র পাতার নিরুপমা দেবীর ‘দ্বিধিক’, শৈলবালা ঘোষের লেখা ‘শেখ আব্দু’। উল্লেখ্য হল, এই সব সেকালের লেখিকারা সবাই ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সেকালে হিন্দু সমাজের অন্তঃপুরিকা মেয়ে।

এরপর পেলাম আমরা সংযুক্তা দেবীকে। সীতা ও শান্তা দেবীর সংযুক্ত রচনা “উত্তানলতা”। এই উপজাতির উপাদান আর আমাদের সেকালের মেয়েদের মত ঘরোয়া বিয়ে প্রেম শান্তভী বা ঝগড়া নিয়ে নয়। এ এক স্থল কলেজের ছাত্রী বোর্ডিং জীবন জগৎ। আবার ঘরোয়া সংস্কার নিয়েও নতুন জিনিস এনোইল। আগে বা ছিল না।

নারী লেখিকা সম্পর্কে প্রিয়তম অন্নদাচরণ বারকে লেখা প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়ের চিঠিতে পাই, প্রবাসী সম্পাদকের নির্দেশ ছিল নারী সাহিত্যিকের ছোট বড় কাঁচা ভালো কোনো রচনাই যেন সহসা কিরিয়ে দেওয়া না হয়।

সম্পাদক নিজেকে নিকপমা দেবার লেখা সংশোধন করে দিয়েছেন কয়েকবার। (“পরিচয়” ১৩৭২।৩)

নারী সাহিত্যিক সম্পর্কে তাঁর উক্তি আর বিশ্লেষণ যেমন শ্রদ্ধাভেদে নূতন। বলেছেন, “কেবল পুরুষেরা লিখিলে বাহা হইত নারীরা লেখনী ধারণ করার পর নূতন কিছু পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাদের আত্মশক্তি স্বাধীনভাবে বাড়িতে থাকিলে—সাহিত্যে নূতন শক্তি ও সম্পদ সঞ্চিত হইবে।”

সাহিত্যের প্রসঙ্গে। “সাহিত্যে বাঙালী আপনাকে প্রকাশ করেছে বলেই সে আর নিজের কাছে আপনি অগোচর নাই। যেখানে যাক্ তার আত্ম-ভূতির গভীর আনন্দ বৎসরে বৎসরে নানা সন্দেহলনীতে উজ্জ্বলিত হচ্ছে।” (১৩৪২ প্রবাসী কান্তন)

রামানন্দ-সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্র তখন ভিয়েনাতে। যাকে যাকে মডার্ন রিভিউতে লেখেন। রামানন্দবাবু কিছু বেশী টাকার চেক তাঁর জন্ত খামে তরলেন। বলেছিলেন, আপনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশী টাকা ঠেকে দিচ্ছেন। তিনি বললেন, তিনি বিদেশে। অনেক ধরচ। আরো বেশী দেওয়া উচিত।”

(যমদত্ত বর্ষিকাবার্ষিকী) ১৯৬৮

বিভাগী প্রসঙ্গ। “বিভাগীদের সম্বন্ধে আমরা সকলে মত পোষণ করি, তার প্রধান কথা, যিনি হাজি নামে পরিচিত হবেন তাঁর প্রথম কাজ হইবে বিভাগী, রানলাভ, ভবিষ্যতের স্বর্নসাধনার চিন্তা।.....তাঁদের কোনো বিষয়ে নেড়ফের ইচ্ছা হইতে নূরে থাকিতে ইবে..... বিভাগী বা হাজি নামটি রাখিব। বিভাগীকে অর্থে প্রাপ্যপালিত হইব কিন্তু অভিভাবক। শিকড়ের বদলে জন্মান্যকের নির্দেশে ও উপদেশ উচলিব—ইহা আমরা অসম্মত মনে করি।”.....

(প্রবাসী ১৩৩৮)

লেখা ও লেখক। এটি খুব মজা ও কৌতুকজনক মনে হয়েছিল। কোনো সময়ে একবার লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গরা থেকে এসে প্রবাসী অফিসে দেখা করতে আসেন। সম্পাদক মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কে। তাতে চাক্ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাম ও পরিচয় দেন।

বুঝি সম্পাদক মহাশয় তখন হেসে বলেন, ‘আমি লেখা চিনি। লেখক চিনি না’। (প্রবাসী ফুটনোট কোনো সংখ্যায়)

অর্থাৎ আগে লেখকের নাম দেখে পরে লেখার গুণাগুণ দেখা হত না। এবং লেখা নির্গাচমে ‘প্রবাসী’ মনে হয় আজও সেট রকমই নির্দলীয় নিরপেক্ষ হয়ে আছে।

কোন সুদূর প্রবাস থেকে ১৯৩৫-৩৬ সালে আমিও দু-একটি লেখা পাঠিয়েছি। সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে প্রাপ্ত স্বীকার ও মনোনীত হওয়া না হওয়ার চিঠি এসেছে। এমনি তাঁর লক্ষ্য ছিল সব তরয়ের নতুন কোনো লেখক ও লেখিকার লেখার ওপর।

ছোট থেকেই আমাদের কাছে ‘প্রবাসী’ ও প্রবাসী সম্পাদক ছিলেন এক আদর্শ শ্রদ্ধের বিষয় ও মাহুয়।

আমি তাঁকে একবার মাত্র দেখেছি। ১৩১৪ সাল সেবারে কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে। টাউন হলে সভায় তিনি কর্ণব্যক্ত থাকতেন। এক সময়ে তিনি বেরিয়েছেন অফিস থেকে। আমি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। ১৩০৮ থেকে, আমারও আট বছর বয়স থেকে জমা প্রদান-ভিত্তিক সে প্রণাম। স্বল্পভাষী সম্পাদক মহাশয় জিজ্ঞাসাতাবে আমার দিকে চাইলেন। আমি কেমন সঙ্কোচ বসে কিছু নিজের পরিচয় নিজের নাম বলতে পারলাম না। কেন—তা আকো ভাবি। নাম বললে তিনি চিনতেন বোধ হয় প্রবাসী বাঙালীর কত্তা হিসাবে। এবং প্রবাসীতে লেখাও তো বেরিয়েছিল।

এই হল আমার আত্মপরিচয় দিতে সঙ্কোচ ও প্রজ্ঞার প্রণাম—সেকলে পাঠিকা সমাজের প্রবাসীর স্বর্গীয় সম্পাদক মহাশয়কে। এবং শ্রদ্ধা নিবেদন সত্তর বছরের প্রবাসীকে।

# ছেলের মাতা

## ইন্ড্রজাল

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

অনেকদিন আগের কথা—ভরত দেশের কোন একটি গ্রামে এক বিধবা তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে বাস করত। সে অতি গরিব ছিল। একদিন তাদের এমন অবস্থা হলো যে বাড়িতে একটি পয়সা বাকি রইল না আর তাদের হৃৎকেন্দ্রে শেষে অনাহারে দিন কাটল। রাত্রে এক মুঠো জলি কল ও জল খেয়ে তারা ঠিক করল যে পরদিন ছেলের কিছু একটা কাজের ব্যবস্থা করতেই হবে।

মা আগনের ধারে বসে ছেলে আবু হোসেনকে খুব হুঃখ করে বলল— “বাবা, এখানে তোমার কোন উন্নতি হবার আশা নেই। চল, আমরা কাল সকালে ওই বড় শহরে যাই; সেখানে তোমাকে কোন কারিগরের কাছে রেখে আসব যাতে কিছুদিন কাজ দেখবার পর নিজে কিছু করে খেতে পারবে।”

আবু তাতেই রাজি হলো।

পরদিন সকালে তারা পাহাড়ের ওপাশের বড় রাজধানীর দিকে রওনা হলো।—চারিদিকে ফিঁৎ ডাকার আওয়াজে, আর ফুলের স্রমিষ্ট ও গুল্লের গন্ধে রাতা ভরা।—মাথার উপরে বড় বড় গাছগুলির ছায়ার ছায়ায় হৃৎকেন্দ্রে ঢলেছে কিন্তু বেচারি যারের এই সব কিনিস দেখবার সময় নেই; তার মন হুঃখে ভরা, আর সে কেবলই ভাবছে যে তার একমাত্র সন্তানকে সে আর

হয়ত দেখতে পাবে না। কিছু দূর গিয়ে তারা নদীর ধার দিয়ে যেতে লাগল ও পরে ঠাঁতায় বসে বিশ্রাম করতে লাগল।

“হায়-রে হায়,” মা বিগাপ করতে শুরু করল, “আমার কি কপাল যে আমার একমাত্র সন্তানকে আর দেখতে পাব কি না জানি না—হায়-রে হায়।”

হঠাৎ একটা বিরাট ঢেউ নদীর ভিতর থেকে উঠে এসে আবু ও তার মায়ের কাছে ঝড়ি হয়ে দাঁড়াল। তারা হৃৎকেন্দ্রে ভয়ের চোটে নদীতীরের বড় বড় পাথরের পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিল। কিছুক্ষণ পর কে গভীর স্বরে বলল— “আমাকে ডাকলে কেন? কি চাও তোমরা? আমার নাম হায়-রে-হায় ও আমি নদীর প্রধান বাহকর। আমার নাম ধরে কেন ডাকলে?”

আবুর মা কিছুপরে গাছল করে উত্তর দিল— “হুজুর, আমি কান্নাকাটি করছি কারণ আমার একমাত্র সন্তানকে শহরে কাজ করতে হবে আর আমি হয়ত তাকে আর দেখতে পাব না।”

বাহকর হায়-রে-হায় ধাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে আবুকে দেখতে লাগল। অল্পক্ষণ পর সে গরিব বিধবাকে বলল— “তোমার ছেলেকে শহরে নিয়ে যেও না—তাকে আমার সঙ্গে নদীর তলার জলের রাজ্যে আসতে দাঁও, সেখানে আমি তাকে বহরকমের বাহুবিন্দা

শেখাব। তিন বছর পর এই জায়গার ভূমি আবার এসো, আর আমার নাম ধরে ডাকলেই তোমার হেলেকে কিরিয়ে দিয়ে যাব।”

এই সব কথা শুনে আবু হোসেন খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল, কাজেই তার মা কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হেলেকে বাহুকরের কাছে রেখে যেতে রাজি হলো।—নিমেষের মধ্যে একটা নীল চাদরে আবুকে জড়িয়ে নিয়ে বাহুকর নদীর কলে ডুব দিল।

কলরাজ্যে পৌঁছে আবু হোসেন আশ্চর্য হয়ে সব দেখতে লাগল।—চারিদিকে নানারকমের মাছ, অদ্ভুত ফুলে ও ফলে পরিপূর্ণ। বাহুকরের প্রকাণ্ড প্রাসাদ, ও সেখানে যেতেই তার অতি স্নেহের কন্ডাকে দেখে আবু মোহিত। নানা প্রকার দামি পাখর বসান আগবাবে প্রাসাদ ভরা ও মাছগুলি আর্দালির পোশাক পরে কুর্নিশ করছে সব সময়। আবু এই সব দেখে শুনে তাক্স হয়ে গেল।

কিছুদিন পর বাহুকর-কন্ডা আবুকে ডেকে বল—“ভূমি আমার বাপকে বিশ্বাস করো না।—সে তোমাকে কোন বাহুবিন্দা শেখাবে না, এখানে চাকরের মত রাখবে আর তার যদি কোন প্রকারে সন্দেহ হয় যে তুমি কিছু বাহু শিখেছ তো সে তুমি তোমাকে পাখর বানিয়ে দেবে। ওই যে দেখছ বড় বড় পাখরগুলি, ওই সব তোমারই মত মাহুস ছিল। কাজেই সাবধান। সব সময় বোকার মত ঘুরবে, যেন কিছুই বোকা না এই ভান করবে।

আবু হোসেন তার কথা মত তিন বছর কলরাজ্যে বাস করল। আসলে সে অতি বুদ্ধিমান ছিল ও চুপি চুপি নানারকম বাহুবিন্দা সে শিখে নিল, যদিও বাহুকর কিছুই টের পেল না। “সত্যি, এই হেলেটা একেবারেই বোকা,” সে বার বার তার মেয়েকে বলত, “ওকে তিন বছর পর ওর মায়ের কাছে নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব।” মেয়েটি চুপ করে সব শুনত।

এইভাবে বছরের পর বছর ঘুরে গিয়ে তিন বছর শেষ হলো। আবুর মা কথামত নদীর ধারে এসে

একদিন বাহুকরের নাম ধরে ডাকতে লাগল—“ওগো বাহুকর, হায়-রে-হায়। আমার আবুকে দিয়ে যাও; তিন বছর হয়ে গেছে। আমি ডাকে বাড়ি নিয়ে যাব।”

অল্পক্ষণ পরে একটা প্রকাণ্ড চেউ এগিয়ে এলো ও তারই মধ্যে থেকে বাহুকর ও আবু হোসেন নীল চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে বোঁরয়ে এলো। হুঃখিনী মা হেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

কিছুদূর যাবার পর আবু তার মাকে বলতে শুরু করল, “জানি মা, আমি অনেক বাহুবিন্দা শিখেছি। আমার শহরে পৌঁছলেই সেগুলি দেখিয়ে পরমা রাজ্যের করা যাবে। কেবল তোমাকে যা বলব তাই কর, তাহলেই বাহুটা পুরোপুরি সফল হবে।”

যেতে যেতে তারা একটি অতি স্নেহের বাগানে পৌঁছল। এটি ঠিক শহরের বাইরে। আবু তার মাকে বল,—“এই বাগানের ভিতর আমি খুব স্নেহের প্রাসাদের রূপ ধরে দাঁড়াব। তুমি এই প্রাসাদটি মত লাতে পার বিক্রি করে দেবে। কিন্তু সাবধান—সদর দরজার চাবিটি কিছুতেই যেন বেহাড না হয়, তা হলে আমি আর কোনদিন মাহুসের রূপ ফিরে পাব না।”

তার মা এতে সহজেই রাজি হলো।

কয়েক ঘণ্টা পর আবু হঠাৎ উধাও হয়ে গেল আর সেই বাগানে একটি অপূর্ণ প্রাসাদ দেখা গেল; তার দরজা জানালা সব খোলা ও সামনের দরজায় একটি সোনার চাবি তালায় ঝুলছে। আবুর মা তুম্বুণি সেই চাবিটি কোঁচড়ে পুরল।

কিছুক্ষণ পরেই এক ধনী বণিক রাজা দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে প্রাসাদটি দেখেই বল—“বাবা, কি চমৎকার প্রাসাদ! এটি কি বিক্রি হবে?”

আবুর মা উত্তর দিল যে—“হ্যাঁ বাড়ি বিক্রি হবে; এর দাম হচ্ছে কুড়ি হাজার টাকা।”

বণিক এই দাম দিতে রাজি হলো ও বিধবার হাতে কুড়িটি টাকার থলে ধরিয়ে দিল।

“দরজার চাবি কই?” বণিক জিজ্ঞেস করল।

“আবুর মা বল—“চাবি হারিয়ে গেছে।”

“ঠিক আছে, আমি আর-একটি চাঁদ কাটিয়ে নেব” বলে বাণক খুঁসি মনে প্রাসাদে চুকে পড়ল আর সব চেয়ে ভাল বিছানাটি বেছে নিয়ে সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।—

যাত্রী ক্রমশঃ গভীর হতে লাগল।—শেষে মাঝরাতে আবু হোসেন নিজস্ব শ্রুতি ধরল ও মাকে সঙ্গে করে সেখানে থেকে পালিয়ে গেল।

পরদিন সকালে বাণকের ঘুম ভাঙতে সে উঠে বসে দেখল যে, বেশের চাদরে মোড়া নরম বিছানাটি কোথায় উধাও হয়ে গেছে ও তার বদলে বাগানের শক্ত মাটির উপরে সে শুয়ে আছে। কোথায় সেই মনোরম প্রাসাদ অদৃশ্য হয়েছে। হতভম্ব হয়ে বাণক রাত্তির রাত্তির ঘুমেতে গুঁক করেছে এমন সময় তার দেখা হলো নদীর বাহুরকের সঙ্গে।

“হায়-রে হায়”, বাণক বিলাপ করতে করতে চলেছে, “হায় রে হায়। আমার কি ভাগ্য।”

“কেমন হে? ভাগ্য কি দোষ করল, আর আমাকেই বা ডাকছে কেন?” বাহুরক জিজ্ঞেস করল।

বাণক বলল—“কালকে আমি কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে একটি অপূর্ণ স্তম্ভ প্রাসাদ কিনলাম। তার কত চমৎকার জানালা ও চারিদিক বেত পাথরে মোড়া। কেবল দরজার চাবিটি হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আজ দেখ কোথাও কিছুই নেই। প্রাসাদটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।”

বাণকের বিলাপ শুনেই বাহুরক সব ব্যাপার বুঝতে পারল। “ওহো আবু হোসেন।” সে রেগে চিৎকার করে উঠল, “ভূমি তো খুব চতুর দেখছি। তিন বছর ধরে ভূমি আমার সব বাহুবিন্দা শিখে ফেলেছ। কিন্তু আমি তোমাকে দেখে নেব, দাঁড়াও”—বলে সে বড়ের মত বোঁরয়ে গেল আবুর খোঁজে।

ইতিমধ্যে আবু তার মাকে একটি অল্প বাহু শেখাচ্ছিল—“দেখ, এবার আমি একটা কালো ঘোড়ার রূপ ধরিছি আর ভূমি আমাকে খুব লাভে বিক্রি করবার চেষ্টা করবে। কিন্তু সাবধান, ঘোড়ার সোনার লাগামটি যেন

বিক্রি না হয়, তা হলে আমি আর কোমলিন বাহুবরণে ফিরতে পারব না।”

পর মুহূর্তে সে কাল ঘোড়ার রূপ ধরে ফেলল। মাথার তার ধবধবে সাদা বঁুটি, আর গলায় সোনার লাগাম, প্রায়ের রং ঠিক আবলুস কাঠের মত চক্চকে কালো। কিছুক্ষণ পরেই নদীর বাহুরক পাশের রাতা দ্বিধে সেইখানে এসে উপস্থিত হলো, কিন্তু তাকে চেনা মুশকিল, “কারণ সে ছদ্মবেশে মেঘপালকের মত হাতে হাড়ি নিয়ে এসে দাঁড়াল। আবুর মাকে বল বাহুরক—“বাঃ, বেশ, স্তম্ভ ঘোড়া তোমার। কত দামে বিক্রি করবে?”

বড়ি বলল—“তিন হাজার টাকার এক পরসী কম নয়।”

“বেশ তাই দের, কিন্তু এই সোনার লাগামটিও আমি চাই”—বলেই বাহুরক লাফিয়ে গিয়ে সেটা ধরতে গেল।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই আবু হোসেন বুঝতে পারল যে এই লোকটি আসলে বাহুরক। কঠোর কালো ঘোড়াটা উদ্ভব্বাসে ছুটে পালিয়ে যেতে লাগল আর তার পিছন পিছন বাহুরক দ্রুতবেগে ছুটেতে লাগল। অল্পক্ষণ পরেই বাহুরক ঘোড়ার বঁুটি হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলে আর কি, এমন সময় আবু হোসেন ঘোড়ার রূপ ত্যাগ করে পাখি হয়ে আকাশে উড়ে পালিয়ে গেল।

“ওহো, তোমার বড় সাহস বেড়েছে দেখছি,” বলে বাহুরক ঈর্ষ্যের বেশ ধরে আবুরকে তাড়া করল। কিন্তু সেও তখন একটি ছোট্ট ফুলের রূপে পাহাড়ের বড় বড় পাথরের কাটলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বাহুরক আবার মেঘ পালকের বেশে ফুলটি ফুলে নিল, কিন্তু আবু এবার গমের শিসের আকারে তার আঙ্গুলের ঠাকের মধ্যে দ্বিধে গলে পড়ে গেল।

ভীষণ রেগে বাহুরক মোরগের বেশ ধরে শিশটি বেই চৌটে ধরেছে অমনি আবু শেরালের বেশে মোরগকে ধরে গিলে খেয়ে ফেলল।

তারপর আবু হোসেনকে আর পায় কে।—সে বাহুরকের ঘেরেকে বিয়ে করে ফেলল। তাদের বিয়ের ভোজ চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি ধরে চলল।—ইহার পরে নিত্য নতুন বাহুবিন্দা দেখিয়ে আবু হোসেন সকলকে অবাক করতে লাগল।

# রসময়ীর রসিকতা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

## প্রথম পরিচ্ছেদ

কেজমোহন বাবুর অষ্টাদশবর্ষব্যাপী দাম্পত্যজীবন জীব সাহিত্য মুকুটগ্রন্থ ও সঙ্গীত কার্যতে করিতেই কাটিয়াছে। এমন রণরাজিনী স্ত্রী বঙ্গদেশে প্রায়ই দেখা যায় না।

কেজমোহনের বয়স এখন চল্লিশ বৎসর। স্ত্রী রসময়ীর বয়স ত্রিশ। ‘রসময়ী’—এ নাম যে রাখিয়াছিল বলিহারি তাহার প্রতিভা, তবে রসও ত অনেকগুলি আছে কিনা—এ কেজমোহন জানেন না।

কেজমোহন একজন বাঙালানবীশ মোস্তাফিজ—হুগলীতে থাকিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জন করেন। বাড়ী তাঁহার হুগলীতে নহে—ভেলার মধ্যে কোনও এক পল্লী গ্রামে। তবে কয়েক বৎসর হইল হুগলীতে নিজ বাড়ী নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

হুগলের বিষয় এ পর্য্যন্ত কেজমোহনের সন্তানাদি কিছুই হয় নাই—স্ত্রীর যেসকল বয়স, আর হইবার ভরসাও নাই। অনেকদিন হইতে তাহার মাসী পিসী প্রভৃতি পুনরায় বিবাহ করবার জন্য তাঁহাকে অত্যাশঙ্কিত করিতেছেন। কেজমোহনের আন্তরিক বাসনাও তাহাই কিন্তু রসময়ীর ভয়ে এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোনরূপ চেষ্টা-চরিত্র করিতে সাহস করেন নাই।

ইতিমধ্যে সামান্য একটা ঘটনা উপলক্ষ্যে রসময়ী ভয়ানক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া কেজমোহনকে দুই দিন গৃহহাড়া করিল। অবশেষে মিলে তাহার পিতৃভ্রাতা হালিসহরে চলিয়া গেল। কেজমোহন তখন সাহসে ভর্য করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন রসময়ীর আর দুঃখদর্শন করিবেন না—অজ্ঞাত বিবাহ করিবেন। এ বাড়ীতে রসময়ীকে আর চুকিতে দিবেন না—এই শেষ।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হালিসহর গ্রামটি হুগলীরই অপর পারে—মধ্যে গঙ্গা প্রবাহিত। চৌধুরীপাড়ায় রসময়ীর পিতৃভ্রাতা। অনেক দিন হইল তাহার পিতৃভ্রাতার কাল হইয়াছে। এখন সে বাড়ীতে রসময়ীর বিধবা দ্বিবি বিনোদিনী এবং তাহার দুইটি ছোট ভাই নবীন ও সুবোধ বাস করে। নবীন কাঁচড়াপাড়ার কারখানায় কর্ম করে—সুবোধ ইন্ডুল জাড়িয়া এখন বাড়ীতেই বাসিয়া আছে—কর্মকাজ এখনও কিছু জুটে নাই।

মাসাধিক কাল রসময়ী হালিসহরে বাস করিতেছে। পূর্বে পূর্বে একরূপ হলে দস্তে তপ করিয়া কেজমোহন আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং কত সাধ্যসাধনা করিয়া স্ত্রীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেন। কিন্তু এবার সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া রসময়ী কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

পাড়ার একজন বালক প্রভাহ নোকা যোগে গঙ্গা পার হইয়া হুগলী ত্রাক স্থলে পড়িতে বাইত। সে ছেলেকে গ্রামে প্রচার করিয়া দিল, কেজমোহন বাবুর বিবাহ—দিন হির হইয়া গিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া রসময়ীর দ্বিবি বিনোদিনী একদিন বৈকালে ছেলেকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিলেন। তাহাকে সন্দেশ ও রসগোল্লা খাইতে দিয়া বলিলেন—“বাবা, তুমিলায় নাকি আমাদের কেজমোহন বাবুর বিয়ে করছে? এ কথা কি সত্যি?”

বালক বলিল—“হ্যাঁ সত্যি বৈ কি। আমাদের ক্লাসে সুবোধ বলে একজন ছেলে পড়ে। চুঁচড়ায় তার মামার বাড়ী। তাইই মাঝাতো বোনের সঙ্গে বিয়ে।”

“ঠিক জান।”

“জানি বৈ কি। অরেশই ত আমাকে বলেছে। দিন  
হির পর্যন্ত হয়ে গেছে।”

“তার মামার নাম কি?”

“নাম হরিশ্চন্দ্র চাটুয্যে। জজ আদালতে কর্ত্ত  
করেন।”

“তাদের বাড়ীটি ভূমি চেন বাবা?”

“হ্যাঁ, চিনি বৈ কি। অরেশের সঙ্গে কতবার  
গিয়েছি।”

“কত বড় মেয়ে?”

“এই—আমাদের বয়সীই হবে।”—বালকটির বয়স  
ত্রয়োদশ বৎসর।

“কেমন দেখতে?”

“তা—বেশ সুন্দর।”

বিনোদিনী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে  
বলিলেন—“আচ্ছা, কাল একবার আমাদের হ বোনকে  
সে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পার বাবা?”

“কেন?”

“তাদের একবার মিনতি করে বলে করে দেখি—  
বিয়ে হলে আমার বোনটিরও সুখ হবে না—তাদের  
মেয়েও জলে পড়বে। কাল একবার আমাদের নিয়ে  
চল।”

“কখন?”

“এই—খাওয়া দাওয়ার পরে।”

“আমার ইস্কুল কামাই হবে যে?”

“একদিনের জন্তে মাষ্টারের কাছে ছুটি নিও এখন।  
আমি বরং তোমার একটি টাকা দেব—দুড়ী নাটাই এই  
সব কিনে।”

বালকটি ব্যগ্রভাবে নিজ সন্মতি জানাইল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা এগারোটার সময় দুই ভগ্নীকে সঙ্গে  
লইয়া বালকটি চুঁচুড়া বাজা করিল। গঙ্গাপার হইয়া,  
ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া মাধনীতলায় হরিশবাবুর  
গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। খিড়কী দরজার সম্মুখে  
বাড়ী দাঁড়াইল।

রসমতী বলিল—“এই বাড়ী?”

“হ্যাঁ।”

“আচ্ছা, ভূমি গাড়ীর ভিতর বসে থাক। আমরা  
চট করে ওঁদের সঙ্গে দেখাটা করে আসি।” বলিয়া  
দুইজনে অবতরণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

সে বাড়ীর মেয়েয়া কেহ তখন দ্বান করিতেছে,  
কেহ খাইতে বসিয়াছে, কেহ বা আহাৰান্তে উঠানে  
বসিয়া চুল শুকাইতেছে। হঠাৎ দুইজন ভদ্রমহরের  
অপরিচিতা স্ত্রীলোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া  
একজন সন্মুখে বলিল—“তোমরা কারা গা?”

বিনোদিনী বলিল—“আমরা হালিসহর থেকে  
তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।”

স্ত্রীলোকটি সন্মুখভাবে বলিল—“এস—বস।”

দুইজনে বারান্দায় উঠিয়া উপবেশন করিয়া বলিল—  
“বাড়ীর গিন্নী কোনটি?”

একজন প্রোচাকে দেখাইয়া সকলে বলিল—“ইনি  
গিন্নী।”

গৃহিণী বলিলেন—“তোমারা কি মনে করে এসেছ  
বাহা?”

বিনোদিনী বলিল—“তোমাদের মেয়ের নাকি  
বিয়ে?”

গৃহিণী বলিলেন—“হ্যাঁ—আমার ছোট মেয়েটির  
বিয়ে।”

“কবে?”

“এই বিশে মাঘ দিন হির হয়েছে।”

“পাত্রটি কে?”

“কেজমোহন চক্রবর্তী—হরলীতে মোক্তারি  
করেন।”

“সতীনের ওপর মেয়ে দিচ্ছ বাহা?”

গৃহিণীর বিষয় প্রতি কথায় বাড়িয়া বলিয়াছিল।  
জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমরা চেন নাকি?”

বিনোদিনী বলিল—“চিনিনে আবার—খুব চিনি।  
আমাদের প্রামেই ত বিয়ে করেছে।”

গ্রহণী বলিলেন—“হ্যাঁ—সতীন আছে বটে—কিন্তু সে স্ত্রীকে পরিভ্যাগ করেছে।”

রসময়ী এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল; তাহার মনের রাগ ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। এই কথা শুনিয়া হস্তপদ ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল—চন্দ্র দুইটি লাল হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল—“কেন পরিভ্যাগ করেছে কিছু শুনেছ গা?”

“শুনেছি সে মাগী নাকি বড় দুষ্টাল।”

শ্রবণমাত্র রসময়ী তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। বাগান্ধার কোণে ছিল একগাছা বাঁটা। নিমেষ মধ্যে সেইটা দুই হস্তে ধরিয়া গ্রহণীর উপর সপাসপ্ ধরিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল—“কেন?—কেন?—আর কি মরবার জায়গা পেলো না?—জায়গা পেলো না?—আমার সোয়ামি ছাড়া কি তোমার মেয়ের মত পাস্তর জুটলো না?—জুটলো না?”

এই অভাবনীয় ঘটনায় বাড়ীর লোকে ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার পর মহা গুণ্ডগোল আরম্ভ হইল। অল্পবয়স্কা বালিকারা কাঁদিয়া ছুটিয়া কেহ খাটের নীচে, কেহ সিন্দূকের আড়ালে লুকাইল। বড়ীর কি বসিয়া বাসন মাজিতেছিল। সে বাসন ফেলিয়া—“ও রে খুন করছে রে—খুন করছে রে—সেপাই—এ সেপাই—এ পাহারাওয়ালার”—বলিয়া উদ্ধবাসে ছুটিয়া বাতায় বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ীর অপর মেয়েরা আসিয়া রসময়ীকে ধরিয়া ফেলিল। রসময়ী তখন গ্রহণীকে ছাড়িয়া তাহাদের উপর কিল চড় ও নিষ্ঠবন বৃষ্টি করিতে লাগিল। কাহারও কাপড় ছিঁড়িয়া দিল, কাহারও চুল ছিঁড়িয়া দিল, কাহাকেও খামচাইয়া দিল, কাহাকেও কামড়াইয়া দিল। হাঁকিতে হাঁকিতে বলিতে লাগিল—“কনেটি গেল কোথা? তাকে একবার বের কর না। চোখ দুটো গেলে দিবে বাই। নাকটা কেটে দিবে বাই। দাঁতগুলো তেজে দিবে বাই।”

বিনোদিনী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

ক্রমে সদর দরজার লোক জমিয়া হৈ হৈ করিতে লাগিল। তখন সে বলিল—“রসময়ী—ধাম্ ধাম্—ক্যামা দে বোনু—খুব হয়েছে। চল বাড়ী চল।”

কি ছুটিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বলিল—“ওগো, যেতে দিওনি—যেতে দিওনি—ধানায় খবর দিবে এসেছি, দাখোগা আসছে।”

পালিসের নাম শুনিয়া রসময়ী বলিল—“চল দিদি, চল।”

“যাবে কোথা—দাখোগা আসুক তবে যেও।” বলিয়া দুই তিনটি স্ত্রীলোক রসময়ীকে ধরিতে অগ্রসর হইল।

রসময়ী একলক্ষ্যে উঠানের কোণ হইতে আরম্ভি খানা সংগ্রহ করিয়া মাথার উপর সবেগে ঘুরাইয়া বলিল—“খুন চেপেছে—আমার খুন চেপেছে—সবাকো খুন করে ধাঁস যাব।”

ইহা দাঁড়িয়া সমস্ত স্ত্রীলোক “আ গোঃ” বলিয়া ছুটিয়া যের চুকিয়া হুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। “পাহারা ওয়ালা—এ পাহারাওয়ালার—আসামা পালার”—বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে কি পুনশ্চ বাতায় বাহির হইয়া পড়িল।

রসময়ী তখন দাঁড়ির সহিত খিড়কী দরজা দিয়া বাহির হইয়া বাড়ীতে উঠিয়া বলিল—“পারঘাটে চল।”

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বলা বাহুল্য হরিশ্চন্দ্রবাবু ক্ষেত্রমোহনকে কস্তাদান করলেন না। তাহার গ্রহণী বলিলেন—“সে খুনে মেরেমাছুব, বিয়ে দিলে আমার মেরেকে খুন করে ফেলবে। ভূমি অস্ত্র চেষ্টা দেখ।”

পরদিন কাহারিতে গিয়া হরিশ্চন্দ্রবাবুর মুখে ক্ষেত্রমোহন সকল কথাই শ্রবণ করিলেন। রাগে তাহার সঙ্গরসীর জলিতে লাগিল।

কাহারি হইতে বাড়ী কিরিয়া হাতমুখ ধুইয়া অন্তঃপুরে বসিয়া ক্ষেত্রবাবু তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ বাড়ের মত রসময়ী আসিয়া প্রবেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ঝাক হইয়া ক্ষেত্রমোহনের পানে



দৃষ্টিপাত করিল—সেই প্রকার দৃষ্টিপাত, যে দৃষ্টিতে পূর্বে সুনির্ভর লোককে ভ্রম করিয়া কোলভেন।

ক্ষেত্রাবু বলিলেন—“কি মনে করে?”

রসময়ী অসম্ভব সংযমের সহিত উত্তর করিল—  
“একটা প্রাচীর যোগাড় করতে।”—তাহার গুঠমুগল  
কোণে কম্পিত হইতে লাগিল।

তামাক টানিতে টানিতে ক্ষেত্রমোহনবাবু বলিলেন  
—“প্রাচীণ কার?”

“হরিশ চাটুয্যের মেয়ের—আর মেয়ের মার।”

“তা হলে হুটো প্রাচী বল। সঙ্গে সঙ্গে অর্মান  
নিজেরটাও সেবে নিলে হয় না?”

“সেইটি হবে না এখন। বুড়ো বয়সে বিয়ে করছ  
না কি শুনলাম?”

হঁকা নামাইয়া, একটু উত্তোষিত ভাবে ক্ষেত্রমোহন  
বলিলেন—“করাইছে ত। করব না কেন? তোমার ভয়ে  
না কি?”

রসময়ী চাঁৎকার করিয়া, কাত নাড়িয়া বলিল—  
“কর না, করে একবার মজাটাই দেল না।”

“কি করবে তুমি?”

“এই এমন কিছু না। আঁধারটি দ্বিজে সে মেয়ের  
নাবটী কেটে দেয়—আর বুকে একখানা দশনুনে পাথর  
চাপিয়ে দেব।”

“আর তোমার নাকটা কানটা কেউ যদি কেটে  
দেয়?”

“এসনা। কাটনা। তুমি কাট না হয়।”—বালিয়া  
রসময়ী নিজ কোমরে হুই হাত দিয়া, ঝুঁকিয়া নিজের  
মুখ ক্ষেত্রমোহনের আঁত নিকটে সরাইয়া দিল।

স্ত্রীর এতাদৃশ বিনয় দেখিয়া, ক্ষেত্রমোহন আবার  
হঁকা উঠাইয়া লইয়া আপন মনে টানিতে লাগিলেন।  
ঝুঁকিয়া থাকিয়া থাকিয়া যখন ক্রান্তিবোধ হইল, রসময়ী  
তখন নিজের মুখ সরাইয়া লইয়া আবার লোকা হইয়া  
দাঁড়াইল। বলিল—“তা হলে আঁধারটিতে শান দিয়ে  
রাখিগে। সবুজ পাকা হলে ধবধটা দিও—চুপি চুপি  
যেন শুভকর্ষী সেবে কেলো না।”

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—“তুমি না মরলে আর বিয়ে  
করাইনে। মরবে কবে?”

এই কথা শুনিয়া রসময়ী বিজ্ঞপদের হাঁঃ হাঁঃ করিয়া  
হাসিয়া উঠিল। বলিল—“আমি মরব কবে জিজ্ঞাসা  
করছ? রসি বামনি এমনি মরছে না। তার এখনও  
অনেক দেবী—বিস্তর বিলম্ব। তোমার বিয়ে করার  
বয়স যাবে,—বুড়ো খুড়খুড়ো হবে—ভূঁয়ে বুয়ে হয়ে  
যাবে—যখন আর কেউ তোমায় মেয়ে দিতে রাজী হবে  
না—তখন আমি মরব।”

দাম্পত্য রসলাপ এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে বাঁহিরে  
একখানি গাড়ী থামিবার শব্দ হইল। ‘রসময়ী বলিল  
—“তবে সেই কথাই বইল। এখন তবে আসি।  
দিদি ওপাড়ায় তার যাত্রের বাড়ী গিরোঁছিল—ভাবলাম  
তার সঙ্গে এসে তোমার সঙ্গে হুটো মনের কথা করে  
যাই।” বালিয়া রসময়ী প্রস্থান করিল।

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উক্ত কথোৎপত্তনের পর ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে।  
রসময়ীর গর্ভ সফল হইল না। সে এখন বৃত্তান্তযায়  
শায়িত।

সংবাদ পাইয়া ক্ষেত্রমোহনবাবু হালিসহরে গেলেন।  
চিকিৎসাদির কিছুই ক্রটি হইল না। কিন্তু রসময়ী  
বাঁচিল না।

গঙ্গাভীরে লইয়া গিয়া ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর সুখাশ্রয়  
করিলেন। আশ্চর্য্য সংসারের মায়া—এত যে কষ্ট  
দিয়াছে, তাহার অন্তঃ ক্ষেত্রমোহন বঁচু বঁচু করিয়া  
অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

আরও মাস ছয় কাটিল। ক্ষেত্রমোহনের পার্শ্বচর  
বহুবান্ধবগণ নানা স্থানে পাজী অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন।  
অবশেষে হরলীর নিকটবর্তী একটি গ্রামে সুযোগ্য  
পাজীর সন্ধান পাওয়া গেল। ক্ষেত্রমোহন স্বয়ং গিয়া  
কড়া দেখিয়া আসিলেন। যেহেতু ভাগ্য—দেখিতেও  
ভাল। বিশেষ মেয়ের পিতা একটি বড় জমিদারের  
নায়েব—ওদিককার মাঝলা-মোকদ্দমাতলিও এই সূত্রে  
ক্ষেত্রমোহনবাবুর করারত হইবে। কড়ার পিতা  
রজনীকান্ত ঘোষাল ইয়াহি লেখাপাড়া জানা ব্যক্তি।

বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইল। বরের খুড়া মহাশয় গ্রাম হইতে আসিয়াছেন—কল্যাণীন্দ্র। এভাবে আকিসককে বলিয়া ছুই চারিজন মকেলের সঙ্গে মোক্তারবাবু কথাবার্তা করিতেছিলেন—খুড়া মহাশয় একখানি “বঙ্গবাসী” হস্তে বরের কোশে বলিয়া তামাক সেবন করিতেছিলেন। এমন সময় ডাকপত্ৰ আসিল। ক্ষেত্রমোহনবাবুর হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল।

ধামের উপর হস্তাক্ষরের প্রান্ত দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষেত্রমোহনের মাথা ঘুরিয়া গেল। ছুই-চারিবার চক্ষু বগড়াইয়া বারবার ধামখানির শিরোনামা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাঁচে আনিয়া, দূরে সরাইয়া নানাপ্রকারে দেখিলেন।

অবশেষে কম্পিত হস্তে পত্রখানি খুলিলেন। পাঁড়িয়া, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মকেলগণকে বলিলেন—“আচ্ছা, এখন তোমরা যাও—আজ সকালে সকালেই কাহারি যাব—সেইখানেই বাকী কথাবার্তা হবে এখন।”

মকেলগণ চলিয়া গেলে খুড়া মহাশয় বলিলেন—“চাঁচা এল কেন?”

ভাড়তরুর ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

“কোথাকার চিঠি?”

“তাই ত ভাবছি।”

ক্ষেত্রমোহনের মুখভাব এবং কণ্ঠস্বরের বিকৃতি লক্ষ্য করিয়া খুড়া মহাশয় উঠিয়া নিকটে আসিলেন। তখন ক্ষেত্রমোহন পত্রখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিতেছেন। তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, চক্ষু কপালে উঠিয়াছে।

খুড়া মহাশয় ক্রতভাবে বলিলেন—“কি? ব্যাপার কি? কোনও হুঃসংবাদ নয় ত?”

ক্ষেত্রমোহনবাবু নীরবে পত্রখানি খুড়া মহাশয়ের হাতে দিলেন। তিনি পত্র লইয়া, চশমা অঙ্গসজ্জান করিয়া চক্ষে পরিলেন। জানালায় কাছে দাঁড়াইয়া খুড়া মহাশয় পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। সাধারণ পাতলা চিঠির কাগজে বেঙুনী রঙের ম্যাগজেন্টা কালী দিয়া লেখা—  
উপরে হানের নাম নাই, তারিখ নাই—নিম্ন প্রকার মত লিখিত :—

শ্রীশ্রী হর্গা

বহায়

প্রণাম পূর্বক নীচেরদিক বিসেস

তোমার মোতিফুর খরিজাছে। মোনে করি-  
আছ রসময়ী খরিজাছে আপোদ গিয়াছে এইবার বিবাহ  
করি। আমি খরিজাছে বটে কিন্তু তাই বলিয়া তুমি  
নিষ্কান্ধি পাইয়াছ তাহা মোনেও করিওনা। বাড়ির  
সম্মুখে জে বড় বটগাছ আছে তাইতে আমি আজকাল  
বাস করিতেছি। তুমি কি কর কোতায় যাও সম্মুখে  
আমি সেখানে বলিয়া দেখিতেছি। রাত্বে গাছ হইতে  
নামিয়া মাঝে মাঝে তোমার স্বপ্ন ঘবে বাই। তোমার  
খাটের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াই। এক একবার ইচ্ছা  
করে গলাটা টাপিয়া দিয়া তোমাকেও আমার স্নিহ  
কার। আমার একানে বড়ডো একলা বোধ হয়।  
আমার চেহারা একন ভীতশয় খারাপ হই গিয়াছে।  
আমার গাএর মাংসো চামড়া আর কিছুই নাই। খালি  
হাড় আছে ভাও সাদা নয়। গংগাতিরে আমাকে জে  
পোডাইআছিলে তাতেই হাড়গুলো কালো কালো হইয়া  
গিয়াছে। যাক তটিক নিজের রূপ বয়না নিজের মুখে  
শোভা পায় না। বিবাহ করিও না কারণে তোমার  
নলাটে অসেস হুগগতি নেকা আছে।

রসমই।

পত্র পাঁড়িয়া খুড়া মহাশয়েরও মুখ কালিমাময় হইয়া  
গেল। ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ হাতের লেখা  
কার চিন্তে পারছ?”

“খুব চিনি। তারই হাতের লেখা।”

“অল্প কেউ জাল করেনি ত?”

“ভগবান জানেন।”

খুড়া মহাশয় নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।  
কিয়ৎক্ষণ ছাদের কড়িকাঠের পানে চাহিয়া বলিয়া  
উঠিলেন—“জয়রাম—সীতারাম—রাম রাঘব—রাবণারি  
—রাম—রাম—রাম।”

খুড়ামহাশয়কে এতদবস্থায় দেখিয়া ক্ষেত্রমোহনের

আরও ভয় হইল। বলিলেন—“আচ্ছা খুড়ো মহাশয়—  
ভূতে কখনও চিঠি লেখে?”

খুড়া মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—“ভূত বলতে নেই—  
ভূত বলতে নেই—উপবেদতা বল। জয় বাঘব  
রাংচন্দ্র।”

হুইজনেই নির্দীক। অবশেষে খুড়া মহাশয়  
বলিলেন—“দেখ—কাকের বদমাইসি নয়ত? এমনটাই  
কি হতে পারে? অনেক রকম ভৌতিক উপদ্রবের কথা  
গুনাই বটে—কিন্তু—এরকমটা—কখনও ত শোনা যায়  
নি। আচ্ছা—বউমার হাতের লেখা আগেকার চিঠিপত্র  
কিছু আছে কি? লেখাটা মিলিয়ে দেখলে হয়।”

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—“পুরণো চিঠি আছে বৈ  
কি।”—বলিয়া বাটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারি-  
পাঁচখানা বাহির করিয়া আনিলেন।

খুড়া মহাশয় চশমার কাঁচ হুইখানি কোঁচার কাপড়ে  
ভাল করিয়া মার্জনা করিয়া লইলেন। পরে পত্রগুলি  
লইয়া অভ্যন্ত সাবধানে হস্তাক্ষর মিলাইতে লাগিলেন।  
অবশেষে সেগুলি টেবিলের উপর ফেলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস  
পরিভ্রাণ করিয়া বলিলেন—“একই হাতের লেখা ত  
দেখিচি।”—খামখানা উন্টিয়া পাণ্ডিয়া দেখিতে  
লাগিলেন। এক পরসর ছয়খানাওয়ালা সাধারণ সাদা  
খাম। তাহাতে একখানি হুই পরসর টিকিট অঁটা  
আছে। ক্ষেত্রমোহনের হাতে খামখানি দিয়া বলিলেন  
—“কোথাকার ছাপ আছে দেখ ত?”

ক্ষেত্রবাবু বাস্তলানবীশ মোক্তার হইলেও ইংরাজি  
ছাপার অক্ষর পড়িতে পারিতেন। ছাপ পরীক্ষা  
করিয়া বলিলেন—“হুগলীর ছাপ। কালকের তারিখ।”

খুড়ামহাশয় চূপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাঝে  
মাঝে কেবল অফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন—“জয় বাঘ  
—জয়—সীতারাম।”

কাহারীর বেলা হয় দোঁখিয়া মোক্তারবাবু স্থান  
করিয়া আহায়ে বসিলেন—কিন্তু কিছুই খাইতে  
পারিলেন না। রাত্র্যবরের বারান্দায় বেখানে বসিয়া  
তিনি আহা করিতেছিলেন, সেখান হইতে বটগাহটার

অপ্রভাব দেখা যায়। ধান আর মাঝে মাঝে সেই  
গাহটার পানে চাহেন। একসময় গাহের একটা ডাল  
খড় খড় করিয়া নড়িয়া উঠিল। কাহার যেন হাসিরও  
শব্দ শুনা গেল। ক্ষেত্রমোহনবাবুর আর খাওয়া হইল  
না। উঠিয়া পড়িলেন। যুথ প্রকালন করিয়া বাহিরে  
আসিয়া বটগাহটার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন।  
হুই-তিনটি কাঠবিড়ালী ডালে ডালে পরস্পরকে ভাড়া  
করিয়া ফিরিতেছে। গোটাকতক কাক উচ্চ শাখায়  
বসিয়া জাতীয়সঙ্গীত গাহিতেছে। ইহা ভিন্ন আর  
কিছুই দোঁখিতে পাইলেন না।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় ক্ষেত্রমোহনের শয়নকক্ষে খুড়া  
ভাইপো বাসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।  
দিবসে খুড়া মহাশয় কপাটের বাহিরে এবং ভিতরে  
দেওয়ালময় রামনাম লিখিয়া দিয়াছেন। অতঃ হুইজনেই  
এক শয্যায় শয়ন করিবেন। বালিসের তলায় একখানি  
কুন্তিবাসী রামায়ণ রক্ষিত কইবে এবং ঘরে সমস্ত রাজি  
আলো জ্বলবে বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—“তা হলে খুড়ো মহাশয়,  
কি করা যায়? বিবাহটা বন্ধ কবে দেওয়া যাবে?”

খুড়া মহাশয় বলিলেন—“আমি ত তার দরকার  
দেখিছিনে।”

“যদি কোনও উপদ্রব অভ্যুত্থার হয়?”

খুড়া মহাশয় কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। শেষে  
বলিলেন—“ভয়ের কোন কারণ দেখি না।”

“এ যে বলেছে ইচ্ছা করে তোমার গলাটা টিপে  
দিই?”

“নাঃ—তা পারবে না। হাজার হোক স্বামী ত  
বটে।”

“আর যে বলেছে বিয়ে কোনো না, এরূপে তোমার  
অশেষ দুর্গতি হবে?”

“অশেষ দুর্গতি হবে, তার মানে এ নাও হতে পারে  
যে আমি তোমার অশেষ দুর্গতি করব। ওর মানে  
বোধহয় এই যে অধিক বয়সে বিবাহ করলে যে সমস্ত

গাংসারিক অশান্তি উপস্থিত হই তাই তোমারও অদৃষ্টে ঘটবে।”

ক্ষেত্রমোহন বাবু দুপ করিয়া রহিলেন। মনে ভয়ও যথেষ্ট আছে—অথচ বিবাহ করিবার লোভটিও সঞ্চার করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য।

পরদিন আশীর্বাদ হইয়া গেল কিন্তু ক্ষেত্রমোহন যে ভৌতিক পত্র লইয়াছেন সে কথাও রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। নায়েব রজনী বাবুরও কানে ক্রমে এ কথা পৌঁছিল। বলিয়াছি তিনি ইংরাজ জানা ব্যক্তি,—শুনিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—“ভূত! এই বিংশ শতাব্দীতেও ভূত বিশ্বাস করতে হবে?”

বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে চই ফাল্গুন। আর পাঁচ দিন মাত্র বাকী আছে। উভয় পক্ষ হইতে সমস্ত আয়োজনাদি হইতেছে। বৈকালে বৈষ্ণবানায় ক্ষেত্র বাবু জনকয়েক বন্ধুবান্ধব সহ বসিয়াছিলেন।—ইহাদের মধ্যে একজন সরকারী উকীল—নাম মনোহর বাবু। লোকটির বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। চোখে সোনার চশমা। মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া দুপ—মুগমুগল প্রচুর গোসল দাঁড়িতে আবৃত—হাতে বড় বড় নখ—এক কথায়—লোকটি থিয়জফিষ্ট। ক্ষেত্র বাবুর ভৌতিক পত্র প্রাপ্তির সমাচার অবগত হইয়া অবাধ মনোহর বাবু তাঁহার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া লইয়াছেন।—অপর একজন নব্য যুবক—নাম সুরেন্দ্রনাথ। তিনি এল. এ. ফেল করা শিক্ষিত মোস্তাফা। বিশ্বর ইংরাজ উপক্লাস পাঠ করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—“ক্ষেত্রবাবু—একটা কথা আমার মনে হাঁচ্ছিল, অনেক উপক্লাসে পড়া গেছে, একটা দৃষ্টিনা ঘটে গেল, যেমন রেল কমিশন বা নৌকাডুবি বা আর কিছু—সকলেই মনে করেছে অযুক্ত লোকটা মরে গেছে—মৃত্যুর চাকুর সাক্ষীরও অভাব নেই কিন্তু বইয়ের শেষ দিকটার দেখা গেল সে বেঁচে আছে। তাই আমার মনে হয়, হয় আপনার স্ত্রী এখনও বেঁচে আছেন, নয় এ চিঠি জাল। কিন্তু আপনার দৃঢ় বিশ্বাস এ চিঠি

তাঁরই হাতের লেখা—জাল নয়। সুতরাং আপনার স্ত্রী বেঁচে আছেন বিশ্বাস করা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই। কারণ, এ বিংশ শতাব্দীতে,—ভূতের অস্তিত্ব কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারা যায় না।”

থিয়জফিষ্ট উকীল বাবুটি ইলা শুনিয়া বলিলেন—“কেন মশায়—বিংশ শতাব্দীতে ভূতের অস্তিত্ব কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারেন না কেন?”

নবীন মোস্তাফাবাবু বলিলেন—“কারণ, আমি কখনও দেখিনি।”

শুনিয়া মনোহর বাবু বিজ্ঞভাবে কান্স করিয়া বলিলেন—“সম্রাট্, সপ্তম এডওয়ার্ডকে কখনও দেখেছেন?”

“না, দোঁর্থনি।”

“তিনি আছেন বলে বিশ্বাস করেন?”

“কার। তার কারণ, আমি না দেখলেও রাজার রাজার লোক তাঁকে দেখেছে। তাঁর দশ-বিশখানা ছাঁবও দেখেছি। কিন্তু ভূত আমি নিজে দেখেছি, এমন কথা আজ পর্যন্ত কাউকে বলেও শুনলাম না। সবাই বলে খুব বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনেছে যে তারা স্বয়ং ভূত দেখেছে।”

মনোহর বাবু তাঁহার স্তূথন দাঁড়ির মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস অঙ্গুলীগুলি চালনা করিতে করিতে বলিলেন—“আপনি বলেন, রাজার রাজার লোক সম্রাটকে দেখেছে। তেমন রাজার রাজার লোক অশরীরী আত্মাকেও প্রত্যক্ষ করেছে। আপনি বলেন যে সম্রাটের দশবিশখানা ছাঁব দেখেছেন। তেমন দশ-বিশখানা ভূতেরও ছাঁব আপনাকে আমি দেখাতে পারি। যদি দেখতে যান, একদিন আমার বাড়ীতে যাবেন। আমার একখানা বইয়ে কেটি কিং-এর ছাঁব আছে। প্রথম চালসের সময় কেটি কিং নামে একটি মেয়ে জীবিত ছিলেন। বোল বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকা ও ইউরোপের নানা স্থানে অনেক সের্গাসে, কেটি কিং মূলশরীর ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর নাড়ী পরীক্ষা করা

হয়েছে। তাঁর শরীরে ছুরি কুটিয়ে দেখা হয়েছে, ঠিক মানুষের মত রক্তপাত হয়। তাঁর ফোটোগ্রাফ পর্য্যন্ত তোলা হয়েছে। ফোটোগ্রাফ থেকে তাঁর ছবি আমার বইতে আছে—আসবেন দেখাব।”

হুজুর বাবু মুহু মুহু হাত্ত করিয়া বালিলেন—  
“আপনারাও যেমন ভালমানুষ। এই সব বিশ্বাস করেন! ভূতবাদীদের কত জোচ্ছুরি ধরা পড়েছে তার সংখ্যা নেই। কেটি কি—এর দেখে ছুরি কুটিয়ে দিয়ে রক্তপাত হয়েছে। এটে আপানি বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ বলে উল্লেখ করলেন। আমার ত ঠিক উল্টো মনে হয়। ছুরি কুটালে রক্ত না পড়ত—অথচ শরীরী মানুষ একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখছি—তাহলে বরং বিশ্বাস হত এটা বাস্তবিক মানুষ নয়। এ ক্ষেত্রে দেখুন, ভূত, তিনি বড়ীর সামনেই বটগাছে থাকেন। চিঠি যখন লিখতে পারেন, তখন অনায়াসেই খুঁটিগ্রহণ করে নিজের বক্তব্য বলে যেতে পারতেন। কিন্তু তা না করে খাম, কাগজ, কালী, কলম সংগ্রহ করবার কষ্ট স্বীকার করলেন। এইটুকু থেকে এইটুকু—চিঠি বানি টেবিলের উপর রেখে গেলেন হত, তা না করে এক মাইল দূরে পোটআপিসে গেলেন তাকে পোষ্ট করতে আবার দুটা পয়সা খরচ করে টিকিট কিনতে হল। মশায়, ভৌতিক জগতে পয়সা যদি বাস্তবিকই এত সস্তা হয় তা হলে না হয় সেইখানে গিয়েই প্র্যাকটিস শুরু করি।”

মনোহর বাবু একটু বিবাক্তর সাক্ষিত বালিলেন—  
“মশায়! জিনিষটা হাঁসি ভামিসার নয়। এসব গভীর বিষয়। অনেক চেষ্টা, অনেক আলোচনা না করে আঁধারে মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়। ভৌতিক জগৎ থেকে ডাকে চিঠি আসা এই প্রথম নয়। হিমালয় থেকে মহাত্মা গান্ধী মাঝে মাঝে ডাকে চিঠিপত্র লিখে থাকেন। কুণ্ডলীলাল নামক এক মহাত্মা এরকম অনেক চিঠি আমাদের মাদাম ব্রাভাটস্কিকে লিখেছিলেন। তাঁরাও মনে করলে সাক্ষ্য আবির্ভাব হয়ে বক্তব্য বলে যেতে পারতেন—কিন্তু চিঠি উড়িয়ে টেবিলের ওপর ফেলে যেতে পারতেন—কিন্তু ডাকেই তাঁরা চিঠিপত্র পাঠাতেন।”

ইহা শুনিয়া শিক্ষিত মোক্তারবাবু মুহু হাত্ত করিতে লাগিলেন। বালিলেন—“কুণ্ডলীলালের চিঠিও কোন কালে জাল বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। ডাক্তার হক্সন বলে একজন বৈজ্ঞানিক নিজে ভারতবর্ষে এসে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মাদাম ব্রাভাটস্কি আর দামোদর বলে এক ব্যক্তি মিলে এসব জাল করেছিলেন।”

একথা শুনিয়া ষিয়জিকিট বাবুটি ক্রকুকিত করিয়া বিবাক্তির স্বরে বালিলেন—“ও সব ঈর্ষাপরায়ণ লেখকের বই পড়বেন না। আমার কাছে আসবেন, ভাল ভাল সব বই আপনাকে পড়তে দেব। তা পড়লে আপনার সমস্ত অবিশ্বাস দূর হয়ে যাবে। মাদাম ব্রাভাটস্কি যে কত বড় লোক তা তাঁর অর্টিসিস্ আনভেল্ড বইতে পড়লেই বুঝতে পারবেন।”

হুজুরবাবু মুচাকিয়া হাঁসিয়া বালিলেন—“সে বইতে পাড়িনি বটে তবে এডমন্ড গ্যারেট প্রণীত ‘আইসিস্ ভোর মচ আনভেল্ড—অর দি টোয়ি অন্ দি গ্রেট মক্কাংমা কোন্স’ বইতে পড়িছি। লাইব্রেরিতে আছে। দেখতে চান ত এনে দিতে পারি।”

এ কথা শুনি মনোহরবাবু রাগিয়া আঙন হইয়া উঠিলেন। বালিলেন—“এ আপনারা এক কথা শিখে রেখেছেন। প্রাল দেওয়া যায় না এমন ভাল জিনিসই নেই। যত সব কুচক্রী বদমায়েস লোক ইম্বাছাখি মাদামের অপবাদ রটনা করেছে।”

এমন সময় বাঁহরের শব্দ উদ্ভিত হইল—“বাবু চিঠি আছো।” পরমুহুর্তে ডাকপত্ৰও প্রবেশ করিয়া ফেজ বাবুর হাতে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি হাতে লইয়া ক্ষেত্রমোহনবাবুর চক্ষুহির হইয়া গেল। বালিলেন—  
“মশাই আবার সেট।”

পত্র খুলিয়া পাঠ করিয়া সেখানে সকলের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। ষিয়জিকিট বাবুটি অতি আগ্রহের সহিত সেখানি কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিলেন। শেষে নবীন মোক্তারবাবুর হাতে সেখানি দিলেন।

পত্রখানি এইরূপ—

## শ্রীশ্রী হুর্গা

স্বহাস

প্রণাম পূর্বক নীবেদনক বিসেস

এত সাহস তোমার। আসিসবাদ পজন্ত হইয়া গিয়াছে। তুমি যোনে কারআহ আমি তোমাকে ছে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা ফাঁকা আওয়াজ। রাস বাহান ভেমন মেয়ে নয়। আমি মানা করা সতোও বিবাত কাঁধবে। একনও সাবধান ৩৩। এ হুরমোত পরিভ্যাগ কর। নইলে একদিন গাঁভর রাতিগরে তুমি যকন ঘুমাইয়া থাকিবে বটগাচ হইতে নামিয়া তোমার বুকে একখানা দসমুনে পাতর চাপাইয়া দিব। ঘুম আর ভাগিবে না। রসমই।

একে একে সকলে পজখানি পাড়িলেন। পাড়িয়া আসিত হইয়া বাসিয়া রহিলেন। শিক্ষিত মোক্তার বাবুও মুখ শুকাইয়া গেল। অখাপ তিনি যন হইতে সংশয় দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—“আচ্ছা ক্ষেত্রবাবু—আর একবার বেশ করে লেখাটা পরীক্ষা করে দেখুন দেখি। আপনার জীর হাতের লেখাই বটে ? না কোন জায়গায় কোন সন্দেহজনক তফাৎ আছে ?”

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—“কোন সন্দেহ নেই। ভাল নয়। শুধু হাতের লেখার মিল হলেও বা সন্দেহ করতাম। তার যেখানে যেখানে যে যে বানান ‘হুল’ চিরকাল হত এ চিঠিতেও তাই। সে চিরকালই শ্রীশ্রী এজারগার হুর্গা একটু তফাৎ—এ লিখিত—এ দ্ব্যনান চিঠিতেও তাই। তা ছাড়া চিঠিতে এমন সব কথাবার্তা রয়েছে যা সে জীবিত কালেও মুখে সর্বদা ব্যবহার করত।”

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বাসিয়া রহিলেন। কিয়ৎপরে হুরেজবাবু গলা বাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“তার বহুর সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন ?”

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—“হিলাম বৈ কি।”

“সঙ্গে সঙ্গে যাটে গিয়েছিলেন ?”

“গিয়েছিলাম।”

“গিঁড়তার উপর তাঁর দেহ রাখবার পর তাঁর মৃত আপনি আর দেখেছিলেন ?”

“দেখিনি আবার ? আমি নিজেই ত মুখাঙ্গ করছি। ওকে তুমি যা ভাবছ তা নয়। কোনও দল হয়নি।”

নবা মোক্তারবাবু তখন খাড়া ঠেট করিয়া বাসিয়া রহিলেন।

একজন বলিল—

“There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.” হে হোরেশিও—স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাটার বিষয় তোমার দর্শনাবিজ্ঞান স্বপ্নেও অবগত নহে।”

অপর একজন বলিলেন—“তা ত বটেই। তা ও বটেই। ধরুন আমাদের দেশে—“শুধু আমাদের দেশেই বা বল কেন—সকল দেশেই আদি কাল থেকে যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে ‘তার কী কিছুই ভিত্তি নেই ?’”

সবকারী উকীল বাবুটি বলিলেন—শুধু অর্দ্ধা বিশ্বাসের কথা নয়। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপে ও আমেরিকায় ভূতের আন্তর নিঃসংশায়িতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে। একসময় হুর্গার পর্যন্ত ভূতকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখন আর শিক্ষিত সমাজে সে ভাব নেই। ইংল্যান্ড লেখক টেড সাহেব তার এক গ্রন্থে লিখেছেন—

“Of all the vulgar superstitions of the half-educated, none dies harder than the absurd delusion that there are no such things as ghosts (অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনে যতগুলি ইতরজনোচিত কুসংস্কার আছে, তাহার মধ্যে ‘ভূত নাই’ এই অদৃষ্ট ভ্রমটিই সর্বাপেক্ষা প্রবল—বলিয়া বিজয়ী বীরের মত তিনি হুরেজবাবুর প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল—সেদিনকার মত সত্যভঙ্গ হইল। সেই বটগাছের তলা দিয়া যাইতে যাইতে হুরেজবাবুরও গা-টা ছুঁ ছুঁ করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খুড়া মহাশয় কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর বাড়ী কিরিয়া আসিয়া, দ্বিতীয় পত্রের কথা

তিনিরা বলিলেন—“দেখ ক্ষেত্র, ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। বিবাহটা এখন না হয় বন্ধই রাখা যাক। আমার মতে, বৎসর পূর্ণ হলেই, গরায় গিয়ে একটা পিণ্ড দিয়ে এস, উদ্ধার হয়ে যাবেন। বৎসর পূর্ণ হতে ত আর বেশী দেরী নেই—আর মাসখানেক হলেই হয়। তখন নির্দিষ্টে শুভকর্ম শেষ করা যাবে।”

ক্ষেত্রাবু বলিলেন—“তা বেশ—সেই ভাল কথা।”

কস্তার পিতাকে বলিয়া কহিয়া বিবাহের দিন পিছাইয়া দেওয়া হইল। নিমন্ত্রণ পত্র সমস্ত প্রত্যাশ্রুত হইল। গয়া-শ্রাদ্ধ সারিয়া আসিয়া ক্ষেত্রাবু বিবাহ করিবেন ইহা সকলেই জানিতে পারিল।

ক্ষেত্রাবুর হস্তে একটা বড় জালিয়াতির মোকদ্দমার ভাষ্যের ভার রহিয়াছে। মোকদ্দমাটা দায়রা সোপর্দ হইয়াছে। সেটা শেষ না হইলে ক্ষেত্রাবু গয়া যাইতে পারিতেছেন না। করিয়ারদি পক্ষের সাক্ষীদ্বিগকে সমস্ত দিন ধরিয়া তালিম দিতে কহিতেছে।

মোকদ্দমার পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলা কাছারী হইতে করিয়ার সময় “রসময়ী”র তৃতীয় পত্র ক্ষেত্রাবুর হস্তগত হইল। তাহাতে অস্ত্রাণ কথার সঙ্গে লেখা আছে—

“হুনিলাম নাকি গয়ায় আমার পিণ্ড দিতে যাইতেছ। ভাবিআছ বুঁকি পিণ্ড দিলে আমি উদ্ধার হইয়া যাইব ত কন সচলে বিবাহ করিবে। গয়ায় যদি যাও তবে চোরের বেস ধরিয়া রেলগাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তোমার বুকে ছোরা বসাইয়া দিব।”

ক্ষেত্রাবুর আর বাড়ী যাওয়া হইল না। কাছারীর পোষাকেই মনোহর বাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহাকে পত্র দেখাইলেন।

মনোহর বাবু পত্র পাড়িয়া বলিলেন—“এ যে বড়ই বিপদ দেখছি। বিবাহ করবার কল্পনা আপনাকে পারিত্যাগ করতে হল।”

ক্ষেত্রাবু বলিলেন—“আচ্ছা মহাশয়, অশরীরী আত্মা যাহুবেৎ বুকে ছুরি বাসিয়ে দিতে পারে? আপনাদের ধর্ম্যজ্ঞান শাস্ত্রে কি বলে?”

মনোহরবাবু একখানি মোটা বাঁহ আলমারি হইতে

পাড়িয়া একখান খুলিয়া বলিলেন—“এ সবকিছু ধর্ম্যজ্ঞান শাস্ত্রের মত এই। সুক্তাঙ্ঘাণ সাধারণতঃ অশরীরী। কিন্তু কখন কখনও তাঁরা নিজেকে যেটিরিয়েলাইজ অর্থাৎ জড়দেহ-সম্পন্ন করে থাকেন। তাঁদের এমন ক্ষমতা আছে যে বায়ু থেকে, গ্রাহপালা থেকে, ভূমি থেকে,— এমন কি কাছাকাছি মানুষের দেহ থেকে, আবশ্যকীয় পদার্থগুলি সংগ্রহ করে নিজদেহ ধারণ করেন। সুতরাং সে অবস্থায় বুকে ছুরি বাসিয়ে দিতে পারা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। আর এও বিবেচনা করুন না, যে হস্ত কলম ধরে চিঠি লিখতে সক্ষম, সে হস্ত ছুরি ধরতে পারবে না কেন?”

ক্ষেত্রমোহনবাবু কিয়ৎকণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—“দেখুন, এ পত্রগুলো জাল কি না সেটা একবার ভাল করে তদন্ত করতে হচ্ছে। আমি বলি কি, এই যে কলকাতা থেকে হস্তলিপি-বৈজ্ঞানিক আমাদের দায়রার মোকদ্দমায় সাক্ষ্য সিতে আসছেন, তাঁকে দিয়ে এ চিঠিগুলো একবার পরীক্ষা করালে হয় না?”

ধর্ম্যজ্ঞানবট বাবুটি ক্ষেত্রমোহনের এ সন্দেহবাদে মনে মনে বিরক্ত, হইলেন। প্রকাশে বলিলেন—“তা—বীদ আপনার ইচ্ছা হয়, পরীক্ষা করতে পারেন।”

পরদিন দায়রায় জালের মোকদ্দমাটির বিচার আরম্ভ হইল। হস্তলিপি-বৈজ্ঞানিক সফটমোর সাহেব সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। দিন শেষে কাছারির পর, ক্ষেত্রমোহন ডাকবাংলায় গিয়া সফটমোর সাহেবকে ভোঁতিৎ পত্র তিনখানি দিলেন। তুলনার জন্য রসময়ীর কয়েকখানি পুরাতন আসল পত্রও দিয়া আসিলেন। সাহেব বলিলেন—“কল্যা প্রাতে পরীক্ষার ফলাফল জানাইব।”

পরদিন প্রাতঃকালে সরকারী উকীল মনোহরবাবুকে সঙ্গে লইয়া ক্ষেত্রমোহন আবার ডাকবাংলায় উপস্থিত হইলেন। সাহেব বলিলেন—“পরীক্ষাধীন পত্র তিনখানি এবং আসল পত্রগুলি সমস্তই এক হস্তের লেখা।”

ইহা শুনিয়া ক্ষেত্রাবুর মুখখানি ছোট হইয়া গেল।

মনোহরবাবু বলিলেন—“সাহেব অল্পেই করিয়া একখানি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতে পারেন?”

সাহেব মনে করিলেন—নিশ্চয়ই এ পজ লইয়া একটা মামলা-মোকদ্দমা হইবে। আবার সাক্ষী দিতে আসিয়া কী পাওয়া যাইবে অত্যাং আল্লাদের সহিত তিনি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন।

বাসায় যাইতে যাইতে মনোহরবাবু ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন—“এই চিঠিগুলির নকল আর সাহেবের সার্টিফিকেট যদি আমাদের বিয়র্কফিক্যাল রিভিউ নামক মাসিকপত্রে ছাপতে পাঠাই, তাহে আপনার কোনও আপত্তি আছে কি? আমরা যাকে স্পিরিট-রাইটিং বলি তার অল্পের অকাটা প্রমাণ হবে।”

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—“তাহে আমার আপত্তি নেই।”

পরবর্তী সংখ্যা বিয়র্কফিক্যাল রিভিউ পত্রে সার্টিফিকেটসহ চিঠিগুলি ছাপা হইয়া গেল। নানা স্থান হইতে বড় বড় বিওর্কফিক্টরস ক্ষেত্রমোহনবাবুকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ চগলীতে আসিয়া পত্রগুলি সচক্ষে দেখিয়া বিষয়ে অভিভূত হইতে লাগিলেন।

### অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিয়র্কফিক্ট মহলে ক্ষেত্রবাবুর পুত্রের আর সীমা নাই—কিন্তু ইহাতে তিনি কিছুমাত্র সাধনলাভ করিলেন না। পত্রগুলি জাল প্রমাণ হইলে তিনি বিবাহ করিয়া অধী হইতে পারিতেন। ভয়ে গয়ায় গিয়া পিণ্ডমান করিতেও পারিলেন না। তাঁহার অষ্টে দুই বিবাহ আর নাই।

চৈত্রমাস আসিল—বসন্তের বাতাস বহিতেছে। দোল উপলক্ষে কাছারী বন্ধ। ক্ষেত্রমোহন বাড়ীতে বসিয়া নিজ হৃদয়ের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল, হালিসহরে তাঁহার বন্ধুবান্ধবীতে মহাবিপদ উপস্থিত। দোল উপলক্ষে বাকি পোড়াইতে গিয়া, একটা বোম্ব ফুটিয়া তাঁহার ছোট সাক্ষী স্তবোধ বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাকে হগলীর হাসপাতালে আনা হইয়াছে।

গুনিয়া ক্ষেত্রবাবু থাকিতে পারিলেন না—গাড়ী ভাড়া করিয়া হাসপাতাল অভিমুখে ছুটিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, ছেলেটির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন—বিছানার নীচে মেঝের উপর বসিয়া বিবহা বিনোদিনী রোদন করিতেছেন। ক্ষেত্রমোহনকে দেখিয়া তিনি আরও রোদন করিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন ঔষধ-প্রয়োগ ও শুশ্রূষা চলিল। সন্ধ্যার দিকে ডাক্তারেরা বলিল আর প্রাণের আশঙ্কা নাই।

ক্ষেত্রমোহন শ্রান্তিকে বলিলেন—“ঠাকুরাণ, সন্ধ্যা চল—এইবার বাড়ী চল।”

বিনোদিনী বলিলেন—“আমি স্তবোধকে ছেড়ে বাড়ী যেতে পারব না।”

“সমস্ত দিন অনাহারে আছি—স্নানকার পর্য্যন্ত হল না।”

“তা না হোক! আমি যেতে পারব না।”

অবস্থা দুঃখের হাসপাতালের ডাক্তারেরা বলিলেন—“আপনাকে বাড়ী যেতে হবে। এখানে ত রাতে থাকতে পাবেন না। কাল সকালে আবার আসবেন এখন। আর কোনও ভয় নেই। বিপদ যা তা কেটে গেছে। আমরা সেবা শুশ্রূষা করব—আপনার কোনও চিন্তা নেই—আপনি বাড়ী যান।”

অনেক বুঝাইতে; বিনোদিনী সম্মত হইলেন। ক্ষেত্রমোহনকে বলিলেন—“তুমি তবে আমায় হালিসহরে নিয়ে চল। রাতে সেখানে থাকবে। কাল ভোরে আবার এখানে আমায় পৌঁছে দিতে হবে।”

ক্ষেত্রমোহন তাহাই করিলেন। হালিসহরে গাড়ী কালি।

ভোরে উঠিয়া যহুতে একাছালম তামাক সাজিয়া ক্ষেত্রমোহন ধূমপান আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময় বাড়ীর বাহিরে মহা গুণগোল উপস্থিত হইল। তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া বাহিরে গিয়া দেখিলেন, লালপাখড়ীতে বাড়ী ঘেঁষাও করিয়া ফেলিয়াছে। স্বয়ং পুলিশের হুপারিকেণ্ডেণ্ট সাহেব অধপৃষ্ঠে দ্বারা দাঁড়াইয়া। সঙ্গে কয়েকজন দারোগা ও হেডকনেটবলও আছে।



পুলিশ ও সাহেবের সঙ্গে ক্ষেত্রবাবুর পরিচয় ছিল।  
নত হইয়া সাহেবকে সেলাম করিলেন।

—“হেলো বুথটিয়ার, ট্রাম হেখানে থি থাউটেছে?”

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন “হজুর, এই আমার বুথর  
বাড়ী।”

“ইহা তোমার বুথরবাড়ী আছে? উটম্, হামি  
তোমাড় বুথরবাড়ী সার্চ থাউবে।”

“কেন হজুর?”

“হেখানে বোমা টেয়াড় হয় থিনা ডোঁথবে। ইহা  
সার্চওয়ারেন্ট আছে।”—বলিয়া সাহেব সার্চওয়ারেন্ট-  
খানি ক্ষেত্রবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন।

ক্ষেত্রবাবু সেখানি উল্টিয়া পাণ্ডিয়া দোঁথয়া সাহেবের  
হাতে ফিরাইয়া দিলেন। বলিলেন,—“হজুর মালেক—  
যা ইচ্ছা করতে পারেন।”

সাহেব বলিলেন—“থ্রীলোকখন্কে লুকাইয়া রাখ।”

পুলিশ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। থ্রীলোকপণের  
নথো বিনোদিনী। তিনি পুলিশের ভয়ে কোথাও  
লুকাইবার প্রয়োজন দোঁথলেন না। বীরনামের মালাটি  
হাতে করিয়া উঠানে ভুলসীতলায় বসিয়া বহিলেন।

খানাতলাসী আরম্ভ হইল। বন্দুক, বাক্স,  
ডিনামাইট, বোমা, বর্ষমান বর্ণনাতি, সূর্যাস্তর, গীতা,  
দেশের কথা, রিভলভি অন্ রিভলভি, প্রভৃতি কিছুই  
বাহির হইল না। বাহির হইল হিন্দু সংকল্পমালা, গুপ্ত  
প্রেস পঞ্জিকা, কাশীদাসী মহাভারত এবং একখানি  
বটতলার ছেঁড়া উপজাস। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনও দেশ-  
নায়কের কোনও ছবি বাহির হইল না,—বাহির হইল  
কেবল খানকতক কালাঁঘাটের পট এবং একখানা  
আর্ট টুডিঙের রশেণ মূর্তি। জমিদারের খানকতক  
পূজার্ন দাখিলা এবং একটা মূলিমালিন চিঠির ফাইল  
বাহিরে হইল। বিনোদিনীর বাক্স হইতে বাহির হইল

একবাঁগুল চিঠি এবং খানকতক ঠিকানা লেখা শাফা  
খাম।

সমস্ত জিনিস উঠানে আনিয়া জমা করা হইল।  
একজন দারোগা কাগজপত্রগুলির কিংবদন্তি প্রস্তুত করিতে  
লাগিলেন। ক্ষেত্রমোহনও সেইখানে বসিয়া ছিলেন।  
তিনি দোঁথলেন, শাফা খামগুলির প্রত্যেক খানিতে  
ভাঁহারই শিরোনামা লেখা, এবং রসময়ীর হস্তাকর।  
পুলিশ সাহেবের অহুমতি হইয়া খাম ও চিঠিগুলি  
ক্ষেত্রবাবু পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। খান-কুড়ি চিঠি  
রাখিয়াছে—সমস্তই বেগুনী রঙের ম্যাগেটো কালাঁতে,  
রসময়ীর হস্তাকরে লিখিত। কয়েকখানি চিঠি খুলিয়া  
ক্ষেত্রবাবু পাঠও করিলেন। নানা অবস্থা কল্পনা করিয়া  
অল্পমানে পত্রগুলি লিখিত। কোন কোনটাতে  
বটগাছের বাসহানেরও উল্লেখ আছে। একখানাতে  
আছে—“গয়ার পিণ্ডদান করিয়া আঁসআছ বলিয়া মনে  
করিও না আমি আর তোমার অনিষ্ট করিতে পারি না।  
এখনও রাস বামনী তোমার পাড় মটকাইতে পারে।”  
একখানাতে রাখিয়াছে—“শুনলাম বিবাহের দিন ইহা  
হইয়াছে, এখনও সাবধান।”—একখানাতে আছে—  
“কলা তোমার বিবাহ। এত মানা করলাম কিছুতেই  
খানিলে না। আচ্ছা বাসরঘরে আগুন লাগাইয়া  
তোমাকে ও তোমার বধূকে পোড়ইয়া মারিব।”  
ইত্যাদি।

সমস্ত ব্যাপারটা দিনের আলোর মত ক্ষেত্রমোহনের  
নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল।

বিনোদিনী ভুলসীতলায় বসিয়া সমস্তই দোঁথতে  
হিলেন।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—“ঠাকুরাঁক, এসব কি?”

ঠাকুরাঁক আপনমনে মালাজপ করিয়া বাইতে  
লাগিলেন।

প্রবাসী—গৌর, ১৩১৬।

# বাঙালীত্ব ধ্বংসের নানা আয়োজন

পরিমল গোস্বামী

অস্বাস্থ্য মাসিক ও প্রবাসীর উদ্ভাবন ও দীর্ঘকালীন সম্পাদন কাজের ভিতর দিয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দেশসেবা করেছেন, যে প্রকার নির্ভীকতার সঙ্গে সত্যকে আয়ত্নকাল পর্যন্ত সবার উপরে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন, বাঙালীর স্বার্থরক্ষায় তিনি যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন, সেই দ্বারা তাঁর পুত্র, বর্তমান সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় আন্তর্য্য সার্থকতার সঙ্গে অঙ্গসংগ কবে চলেছেন।—প্রবাসীর প্রতি আমার বিগত প্রায় পাঁচ বৎসরের আবিষ্কৃত অনুরাগ এই কারণেই।

অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদকীয়তে এবং বাঁধন পত্রায় যে বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিচ্ছেন, তার জন্য আমি আনন্দিত।

সম্রাতি বাঙালীর বাঙালীত্ব হালধে দেবার যে সময় আয়োজন আরম্ভ হয়েছে, তার ধারণা উদ্ঘাটন কর্তব্য বোধ হওয়াতে এবং তা সম্পাদকের দেশের বক্তৃতা সার্থকতার সঙ্গে কিছু মিলবে এই আশায়, প্রবাসীর বিশেষ সংখ্যার জন্যে এই প্রবন্ধটি পাঠাইছি।

যখন এ রচনাটি লিখতে শুরু করছি তখন কাগজে পড়লাম, পশ্চিমবঙ্গের নাম বদল করে শুধু বাংলা করার প্রস্তাব উঠেছে। এ-লেখা যখন ছাপা হবে তখন হস্ত-তো আর-একটা নাম হবে; কিন্তু সে প্রসঙ্গ আমার বক্তব্যের পক্ষে খুব জরুরি নয়। আপাততঃ পশ্চিমবঙ্গ আছে এবং সেই নামকে স্মরণে বেবেই পরবর্তী প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশ দুই পৃথক রাজ্য এবং আমরা সবাই বাংলাদেশের মানুষ এবং সবাই মৃত্যুশীল। কিন্তু শুধু বাঙালী পরিচয় যদি পূর্ববঙ্গের (বা বাংলাদেশের) লোকের পরিচয় হয় তবে আমাদের

পৃথক পরিচয় কি হবে? আমরা পশ্চিমা বাঙালী? অথবা শুধু পশ্চিমা?

পশ্চিমা বলতে আমরা ছেলেবেলায় হিন্দুভাষীদের বুঝতাম, তা সে মানুষ বিহারের হোক বা উত্তর প্রদেশের হোক। কিন্তু সেই 'পশ্চিমা' আমরা এখন নিজেরাই হতে চলেছি, এ-রাজ্যের নাম যার হোক। কারণ আমাদের ভাষা যদি বদলে যায়, এবং তাকে ধ্বংস করি, তাহলে আমাদের বাঙালী পরিচয় আর দরকার হবে না। পরিচয়ে বা জাতিতে পশ্চিমা এবং ভাষায় হিন্দী। অথবা পরিচয়ে হিন্দী (হিন্দী-বাংলার মিশ্রণ), কারণ আমরা হিন্দীভাষী। বোধ হয় ভালই হবে। অবশ্য ভাল হওয়া না-হওয়া আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে না। ব্যাপারটা অনিবার্যরূপেই ঘটবে মনে হচ্ছে। কারণ বাংলা ভাষাকে আমরা ক্রমে ব্যাবল টাওয়ারের ভাষায় পরিণত করতে চলেছি, অর্থাৎ হুদোষা ভাষায়। এতে বাঙালীত্ব (অবশ্য যদি বাঙালীত্ব একটি গৌরবজনক শব্দ হয়) অনেকখানি ধ্বংস হবে। বাকি বর্তবে যেটুকু, তার ক্ষয় অল্প বাবস্থা আছে।

বাংলাভাষা ধ্বংসের জন্য আমাদের আকাশবাণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তারপরে আছে গবর্নর কাগজ। তবে প্রধান ভূমিকা প্রথমোক্তের। কারণ আকাশবাণীর ভাষা ধ্বনিত বাণী, সন্তোগামী, এবং ক্রত-সফরী। এই আকাশবাণীকেই প্রথমে উল্লেখ করতে হ'ল কারণ এটি আমাদের টাকায় চলে, কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এবং এর সমালোচনায় আমাদের অধিকার আছে, যদিও তাতে কোনো কাজ হয় না, অন্তত অস্বাধিক হয়নি। আকাশবাণীর বাংলাভাষা বিকৃত করার আয়োজন নানা দিক থেকে। উচ্চারণ,

ব্যাকরণ এবং বিদেশী শব্দের স্বীকৃত লিপ্যন্তর (ধ্বনির দিক থেকে) বিকৃত রূপে প্রচার।

### আকাশবাণীর ভূমিকা

যেমন এঁরা কোনো গানের আগে ঘোষণা করেন এবারে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুুন, গেয়েছেন শ্রীঅমুক। এই ‘গেয়েছেন’ কথাটা গোড়ায়, মাঝখানে অথবা শেষকালে একবার উচ্চারণ করা হয়। ‘শুুন’ অথচ ‘গেয়েছেন’—ব্যাকরণের কালের পরিচয় কি? বর্তমান কাল, অতীত ও পুরাণটি বর্তমান একই সঙ্গে। ভেলিকিবাক্স! কাল স্পর্কে শ্রোতা-বিস্ময়কারী। ‘গানটি শুুন’ বলেই ‘গেয়েছেন’! শোনার আগেই গেয়েছেন! আবার ঠিক ঠিক ঘোষণাও শোনা যায় কদাচিত্। যেমন রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুুন, শিল্পী অমুক। বা অমুকের কণ্ঠে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুুন। কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত এই ভাষায় ঘোষণা শুনিনি। একবার নাকি এ-রকম হয়েছিল; অর্থাৎ গোড়ায়, মাঝখানে এবং শেষে—এই তিনবারই বলা হয়েছিল “শিল্পী অমুক”। শোনা যায় তাতে আকাশবাণীর বাঁড়টা সেট মুহূর্তে কাঁচ হয়ে পড়েছিল কিন্তু পরবর্তী ঘোষণায় অল্পের গানের আগে যখন ঘোষণা করা হ’ল “আধুনিক গান শুুন, গেয়েছেন অমুক”—তখনই বাঁড়টি আবার বাঁড়া হয়ে উঠেছিল।

ঘোষণা আরো মজার আছে। তিনপান্না ডিস্ক রেকর্ড বাজানো হবে; ঘোষণা শোনা গেল, “রেকর্ডে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুুন, প্রথমে গেয়েছেন অমুক শিল্পী।” গান শেষ হলে পরবর্তী ঘোষণা “পরে গেয়েছেন অমুক শিল্পী”। এ-ক্ষেত্রে আগে-পরে পাওয়ার দায়িত্ব গায়কের উপর ছাড়া হ’ল। কিন্তু ঘোষক বা ঘোষিকা জানলেন কি করে কে আগে গেয়েছেন এবং কে পরে গেয়েছেন? এই অপূর্ণ সব ঘোষণা কেউ যদি টেপে ধরে রাখেন তবে বাংলা ভাষার ভিত্তিটা কিভাবে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়েছে, তার ইতিহাস খেঁচে থাকবে, মিসিং লিংক কিছু আর থাকবে না। ব্যাপারটা আরো বিস্তারিতভাবে বলা যাক।

গানের শিল্পী রেকর্ডের আড়ালে থাকেন, ডিস্ক

অথবা টেপ রেকর্ডের আড়ালে। তার জন্যই কি ‘গেয়েছেন’ বলা হয়? কোনো সভায় কোনো গায়ক বা গায়িকা যদি পর্দার আড়াল থেকে গান, তাহলেও কি ঘোষণা করা চলে অমুকের রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুুন, ইনি প্রথমে গেয়েছেন অমুক গান? গাইবার আগেই গেয়েছেন? আর যদি রেকর্ডের জন্যই এমন বলা হয়, তবে কিজান্না দরকার কি? শিল্পীর কণ্ঠে অমুক গান শুুন অথবা শু শু বলা হোক যে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুুন, শিল্পী অমুক। এ-রকম যখন মাঝে মাঝে বলাও হয় এবং তাতে ক্ষতি হয় না, তবে ব্যাকরণ বিকৃত করার দরকার কি? তা ছাড়া কথিকা বা আলোচনাও তো রেকর্ড করা হয় আগে এবং পরে তাই বাজানো হয়, তবে সে ক্ষেত্রে কোনোদিনও বলা হয় না কেন: “এখন এঁদের আলোচনা শুুন, এঁরা আলোচনা করেছেন অমুক বিষয়”? বাঙালী ধ্বংসে ব্যাকরণ ধ্বংস একটা বড় অস্ত্র—আসল কথা এটাই।

### ফলশ্রুতি মানে কি?

আকাশবাণীর অনেকেই ফল অর্থে ফলশ্রুতি বলে থাকেন। খবরের কাগজেও চলেছে। সাক্ষাৎকথাও অনেকে লিখছেন, এবং ফলশ্রুতি বাংলাদেশেও অধিকার বিস্তার করেছে। কেফিয়ৎ হয়তো এই যে, ফল কথাটা মেড়া-নেড়া শোনায়, কিন্তু ফলশ্রুতি শুনকে বেশ লাগে। তা যদি হয় তবে শ্রুতিমণ্ডর করার জন্য কুস্রুশ্রুতি, শেয়ালশ্রুতি, বাঘশ্রুতি চলবে না কেন? জন ও জনশ্রুতি যদি এক হত তা হলে “জনশ্রুতি অধিনায়ক জয় হে” লিখলে বাধা ছিল কি? কিংবা জন-জাগরণের স্থলে জনশ্রুতি জাগরণ? শ্রুতি শব্দটি কি সংস্কৃত চর্চৈভূমির মতো? কিংবা তরকারীর আলুর মতো? গ্রাহ্যে কি এমন চিঠি লেখা চলবে:

“তোমার চিঠিশ্রুতি পেলাম। গৃহিণীশ্রুতি ও পুত্রাধিশ্রুতিসহ আমি কলকাতাশ্রুতির বাইরে যাক্ষি কয়েকদিনের জন্য। দাদাশ্রুতি ও বৌদিশ্রুতি বাড়িতেই থাকবেন। আমাদের ভৃত্যশ্রুতি ঠ্যাংশ্রুতি মচুকে একমাস বিদ্রোহশ্রুতিতে গুয়েছিল, এখন ভাল আছে।

চিকিৎসার ফলশ্রুতি হতে কয়েক সপ্তাহ দেরি হল। তবে বেদনাশ্রুতি এখনো সামান্য একটু আছে। দাঁদা-শ্রুতির পূত্রশ্রুতি অসুস্থ বলেই তাঁদের যাওয়া হল না। এখন অনেকটা সুস্থ। ফলশ্রুতির রস খাচ্ছে এবং ব্যবস্থা অসুস্থায়ী মৎস্যশ্রুতি ও মাংসশ্রুতি সম্পূর্ণ নিষেধ হয়েছে। তবে হৃৎশ্রুতি ও বালিশ্রুতি খেতে বাধা নেই।”

এই তো গত ২৩।৩।৭২ তারিখে ‘বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা’ নামক আঁতি প্রয়োজনীয় আলোচনা, বেতার কণ্ঠে ঐ কথাটি ছাড়া যার আর কোনো পরিচয় ছিল না, সেটি শেষ হবার পথে নিউক্লিয়ার পাওয়ার বিষয়ে অল্প একজন একটি কথিকা আরম্ভ করলেন, কিন্তু বলতে বলতে যখনই বললেন “এটি ভারিই ফলশ্রুতি” (বা ঐ একম কোনো বাক্য যাতে ফল অর্থে ফলশ্রুতি ব্যবহৃত হল) শোনামাত্র রেডিও বন্ধ করে দিলাম।

### বাঙালীর হননে বাংলা উচ্চারণ বর্জন

উচ্চারণ শব্দের বাংলা উচ্চারণ উচ্চোগ। সং উচ্চোগ, প্রাকৃত উচ্চোগ, বাংলাও তাই। উদ্‌যোগও বলা হয় কিন্তু বলতে গেলে উচ্চোগই শোনাবে। (কিঞ্চ উদ্‌য়ম-এর ক্ষেত্রে উদ্‌য়ম হ'ল না। উচ্চমও না।) তাহঁ বাংলা উচ্চারণে উচ্চোগ, উদ্‌যোগ অথবা উচ্চোগ। উচ্চান উচ্চান নয়, শুধু উচ্চোগ উচ্চোগ। যোগ করা বা যুক্ত ধাতুর সঙ্গে সম্পর্ক বলে উৎ+যোগ। কিন্তু বাংলায় কেউ কেউ উদ্‌যোগ উচ্চারণ করছেন এবং আকাশবাণীতেও বেশী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘উদ্‌যোগ’ ব্যবহার করেছেন ‘উদ্‌দোগ’ করেননি। যথা—

“দেশীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগে প্রথম চাইতেই আশাতকর আশির্ষের লক্ষণ দেখা যাইতেছে ইহাটি আমাদের আশঙ্কার বিষয়।.....এখন যদি আমাদের আরোজন পণ্ডিত হয় তবে যথাকালে ভবিষ্যৎ উদ্‌যোগের সময় এই প্রয়াসের ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ হইবে।” (শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা।)

বাংলা উচ্চারণ বর্জনের আর কোনো কারণ দেখা যায় না, একমাত্র তার স্থলে হিন্দি উচ্চারণ বসানো ছাড়া। যেমন যুথ—বাংলা উচ্চারণ যুগ্ম। কিন্তু

আকাশবাণীতে আরম্ভ হয়েছে যুগ্ম। পদ্মার বাংলা উচ্চারণ পদ্মা অথবা পদ্দা। পদ্মের বাংলা উচ্চারণ পদ্ম বা পদ্দ। কিন্তু এখন শুনাছি পদ্মা, পদম। আত্মার বাংলা উচ্চারণ আত্মা। কিন্তু অনেকেই, বিশেষ করে আকাশবাণী বলছেন আত্মা। এবং এতদিন পরে হঠাৎ আত্মার এবং আধ্যাত্মিক শুনে স্তম্ভিত। গত ১৪।২।৭২ তারিখে মহিলামহলে ‘আধ্যাত্মিক’ শুনে মনে হল এবারে যারা আধ্যাত্মিক বা আত্মিক ভ্রমতে বাস করেন, এখন তা বর্জন করার সময় এসে গেছে। স্মিত-কে স্মিত উচ্চারণ করা হয় বাংলায়। কিন্তু রেডিওর এক ঘোষকের মুখে শ্রুতি শুনে আর সন্দেহ রইল না যে আমাদের পাশ্চিমা হতে আর গুব দেবী নেই। স্মিতাও স্মৃতিভা হয়েছেন শুনেই কয়েকবার। জরমান Schmi-এর উচ্চারণ কি করে বাংলা উচ্চারণকে উৎখাত করল বোঝা যায় না। ইংরেজী smi হলেও বোঝা যেত। কিন্তু আকাশবাণীতে ঐ জরমান Schmi হয়েছে! এই উচ্চারণ সংস্কৃতির দিকে বোকার ব্যাপার নয়। কারণ স্মৃতিভাৎ যদি Shush-nūta উচ্চারণ করে তাহলে তা সংস্কৃতও হল না, বাংলাও হল না। একটা স্টাইল হল মাত্র, এবং তা যে অজ্ঞতাগ্রস্ত তাকে সন্দেহ কি? দিল্লীর একজন ইংরেজী সংবাদ পাঠিকা নিজের নাম বলেন স্মৃমা, আগেই বলেছি। আর একজন নিজের নাম বলেন হারিশ, আর একজন বলেন নারিনী। হরীশকে বলেন হারীশ। বাংলাতেও তার অন্তর্করণ হচ্ছে একটু একটু করে। যেমন মলটা (খাঁপ) মালটা হয়েছে, পদ্মার পাড়ার হয়েছে কলকাতার আকাশ-বাণীতে, জিওলটার জিওলটার হয়েছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শব্দের উচ্চারণে অ একটুখানি আ-এর দিকে ঝুঁকছে। একদিন শুনেছি (গায়িকার নাম মনে নেই) “প্রভু, বালো বালো কবে/তোমার পথের গুলার রঙে রঙে আঁচল রঙীন হবে।”

হারি এখনো বাংলায় হারি হয় নি, তবে হিন্দীর দিকে আর একটু বেশি ঝুঁকলেই হারি হারি হবে। বল হারি হারিবোল। কি মজাই না হবে তখন।

### লিপ্যন্তর জনিত বানান ও উচ্চারণবিধি অমাত্য

প্রধানতঃ ইংরেজী শব্দই আমাদের লিপ্যন্তর করে বাংলায় লিখতে হয়। যে-সব ইংরেজী বা অন্যান্য বিদেশী শব্দ বহুদিনের ব্যবহারে বাংলা হয়ে গেছে সে-সব শব্দের কথা বাদ দিয়ে বলাই আবশ্যিক।

ইংরেজী Ess উচ্চারণ কলকাতার অধিবাসীরা অনেকেই করতে পারেন না। স্কুল থেকে Ess উচ্চারণ শেখানো হয়নি তাঁদের। তাঁরা S অক্ষরের Sh উচ্চারণ করেন। যেমন Soviet তাঁদের জিভের জড়তার জন্য Shoviet হয়ে পড়ে। গাংরা আকাশবাণীর বাংলা সংবাদ শুনেছেন তাঁরা জানেন অনেকের মুখে S অক্ষরটি Sh হয়। কিংবা Ess-এর ভুল উচ্চারণ। যেমন Officer, তাঁরা বলেন Offisher। Greeceকে বলেন Grish। এই শেষ উচ্চারণটি স্তম্ভিত হয়ে শুনেছি গত ১৯৭২ তারিখে সকাল ৭।১০টার প্রোগ্রাম ঘোষণায়। বলা হল “২১০০টার বিজ্ঞানীদের জন্য Grish দেশ সম্বন্ধে বলবেন ডক্টর অয়ুক”। কোতুল হল। শুনলাম প্রোগ্রাম। সেই ডক্টর উপাধিধারী পরিষ্কার বলতে লাগলেন (Grish, এবং বার বার।) গুঁড়ির জড়ত্ব যেমন জগৎ, জিহ্বার জড়ত্বও তেমন জগৎ। গুঁড়ির জড়ত্ব নিয়ে শিক্ষক হওয়া যায় না, কিন্তু জিহ্বার জড়ত্ব নিয়ে শিক্ষক হওয়ায় বাধা হয় না বিজ্ঞান আলোচনাতেও কোনো কেনো ডক্টরের মুখে isotope শুনেছি। তারপর গত ১৯৭২ তারিখে বিজ্ঞানীদের জন্য একটি ঘোষণায় বলা হয়েছিল Shar রমেশচন্দ্র মিত্র গার্লস স্কুলের ছাত্রীসহ ইত্যাদি। আমি অবশ্য এ-প্রোগ্রাম শুনিনি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কি শিক্ষাই পাচ্ছে উচ্চারণের! শারেরা কি বলেন?

বাংলা উচ্চারণে আমরা স ও শ উচ্চারণে অধিকাংশ স্থলেই পার্থক্য রাখিনি, যেমন গেলাস, পাস করা—উচ্চারণ করি গেলান, পান করা। পুলিশকেও পুলিশ বাল। কিন্তু লেখার সময় মূল Ess উচ্চারণের লিপ্যন্তরে স লেখা উচিত, শ নয়। তাতে বোঝা যায় আমরা বাই বাল, মূল Ess উচ্চারণ ছিল। কিন্তু যে-সব

বিদেশী শব্দ বাংলা হয়ে গেছে কেবল তাদের ক্ষেত্রেই s-কর sh উচ্চারণ। বিদেশী শব্দ বা নামের ক্ষেত্রে নয়। সেখানে মূল উচ্চারণ Ess থাকলে বাংলায় স এবং উচ্চারণেও তাই। যেমন Alice in Wonderlandকে যদি কেউ Alish in... বলে তবে এমন উচ্চারণে হাসির উদ্রেক করবে। বাংলায় লিখতে হবে অ্যালিস, অ্যালিশ নয়। তের্মান নোটিস, নোটিশ নয়। গেলাস, গেলান নয়। নোটিস গেলাস্ ক্রাস ইত্যাদি লিখলে চোখে দেখে বোঝা যায় মূল উচ্চারণ ও বানানে Ess অক্ষর বা অক্ষরপ ধ্বনি ছিল। পাস করা কথাটি যেমন। পান করা লিখলে বুঝতে হবে মূল ইংরেজী pash ছিল। কিন্তু পাস লিখলে এই ভুল হবে না। ইংরেজরা মাতাল হলে s-কে sh বলে। এক মাতাল ট্যাক্সির দরজা খুলে ভিতরে গিয়েই অল্প দরজা খুলে বেরিয়ে (তার ধারণা রক্তবো পৌছে গেছে) চালককে জিজ্ঞাসা করেছিল How much? অর্থাৎ কত ডাড়া দিতে হবে। স্টেটসম্যানে বহু বৎসর আগে issuc শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ নিয়ে চিঠিতে তর্ক হাচ্ছিল। একজন পত্রলেখক মীমাংসা করেছিলেন এইভাবে—ডিনারের আগে issuc, কিন্তু ডিনারের পরে ishu, অতএব তর্ক মিটিয়ে ফেলাই ভাল। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা, আজও ভুলিনি। তাই খাংরা প্রকৃত উচ্চারণ জানেন এবং লিপ্যন্তরের নিয়ম জানেন, তাঁরা গেলাস, ক্রাস, পুলিশ, নোটিস প্রভৃতি স দিয়ে লেখেন, শ দিয়ে লেখেন না।

ইংরেজী বানানের সঙ্গে উচ্চারণ সব জায়গায় মেলে না। সেজন্য সহজেই ভুল হয়। উচ্চারণে কোতুল থাকলে ভুল হবার সম্ভাবনা কম। Bronze-এর উচ্চারণ ব্রোন্জ নয়। ওটা ব্রনz, Cantonment দেখেই ওটাকে আকাশবাণীর সংবাদ পাঠকেরা ক্যান্টনমেন্ট বলেন। সৈন্যদের হাউসকে ইংরেজরা ক্যান্টনমেন্ট বলে। অভিযানেও তাই আছে। আবার বাংলা নামে যেখানে বি দিয়ে আরম্ভ, সেখানে প্যারীচরণ সরকারের ‘ফার্স্ট বুক অফ রাইজিং’ নামক পুস্তকে ছালা বি-ই (Be বি) এই ছুর

অনুযায়ী বাঙালীরা নিজের নাম ইংরেজীতে লেখেন Bejoy, Benoy। Bejoya Greetingsও দেখেছি। বিদেশীরা এগুলিকে বেজয়, বেনয়-রূপে পড়বে। নানাতাবে অবাঙালীরূপে নিজেকে প্রচার করার উগ্র ইচ্ছা ইংরেজদের আমল থেকে। ইংরেজরা বাঙালীকে ইংরেজ ভাবুক এমন ইচ্ছাও বানানোর মধ্যে দেখা যায়। এখন বৌঁটটা হিন্দির দিকে। যেমন পৈতৃক পদবী অনেকে বাদ দিচ্ছেন। উদয়শঙ্কর, রাবিশঙ্কর, ভীমবরবরণ, প্রভৃতি মিস্টার শঙ্কর, মিস্টার বরণ হয়েছেন। মূল উদ্দেশ্য যাই হোক, বর্তমানে হিন্দিওয়ালারা এ-নাম দেখে ঐরা বাঙালী নন বলে বুঝতে পারলে বাঙালীর লোপের আনন্দটা পাওয়া যায়। চৌধুরী, অধিকারী, গোস্বামী প্রভৃতি ইংরেজীতে লেখার সময় শেষে y-অক্ষর ব্যবহার করা লিপ্যন্তরের বিধিতে সমর্থিত নয়। শেষে i ব্যবহার্য। এবং অন্ত শব্দে হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ই হুইয়েতেই i ব্যবহার্য। আগে বিধবিশ্রাণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর নাম বা পদবী নিজেরা ইংরেজীতে যে বানানেই লিপ্যন্তর, ছাপা হত কিন্তু শুধু আকারে, লিপ্যন্তরের বিধি মাত্র করে। এখন ওসব উঠে গেছে। লিপ্যন্তর বা বানানু অমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার একটি ধাপ। হিন্দিতে আকার বোঝাতে একসঙ্গে গুটি A (যেমন RAAT) ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এর অগ্র-করণ দেখেছি।

বাংলা উচ্চারণে প্রাদেশিকতার অস্ত্রান্ত্র নমুন।

ইংরেজী Ess উচ্চারণে sh উচ্চারণের কথা বলাইছে। উল্টোটোও আছে। অনেকে দীনেশকে Diness, সুরেশকে Surcess বলেন। একদিন আকাশবাণীর বিজ্ঞান আলোচনাতেও ঠিক এই রকম উচ্চারণ শুনেছি একজন আলোচনাকারীর মুখে। অনেকে শালা উচ্চারণ করে sla। কলকাতার প্রাদেশিকতা, অল্প কথায় যাকে বলা যেতে পারে cockney বা আসলে slang, সেই উচ্চারণ রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও প্রবেশ করেছে।

“প্রাণ চার চক্ষু না চার মরি এ কী ভোর হৃদয় লক্ষ্য

হৃদয় এসে কিরে যায় তবে কার লাগি বিধ্যা এ সজ্জা”

এই গানের ‘সজ্জা’ শব্দটি রেকর্ডের গানে শুর্নোচ সজ্জা বা সইজ্জা রূপে। মহিলা-মহলে স্কুল-সজ্জাকে ‘স্কুল-শয্যা’ উচ্চারণে বলা হল শুর্নোচ। ২০৩৭২ তারিখে বিভাখাঁদের জল্প প্রোগ্রামে একটি কথকায় বলা হল রূপসজ্জা। সজ্জা প্রাদেশিক উচ্চারণে ‘সইজ্জা’।

রবীন্দ্রনাথের গানের যে দুটি ছত্র উদ্ধৃত করেছি, এই গান যারা রেকর্ডে নতুন শুনেছেন তাঁরা বুঝেছেন গানের উদ্ভিষ্টা তার দ্বয়ভেদে জল্প বুঝাই বিহানা পেতে রেখেছে। অথচ ওটা বিহানা নয়, সজ্জা—আভরণ। অর্থাৎ সাজসজ্জা তার বুঝা হল। (রবীন্দ্রনাথের লেখাও বুঝা হল।) আবার শালা ‘সইজ্জা’ মানে সাজ বুঝলেন, তাঁরা ঐ গানের আর একটি কথায় (‘শয্যা যে কটক শয্যা’) বুঝবেন জামা বা শাড়ীতে কাটা বিধছে। কটকশয্যাকে কটক-সজ্জা বুঝবেন। সজ্জার সইজ্জা উচ্চারণ রেকর্ডে ছাড়া পেল কি করে? এ-বিষয়ে যদি কোনো বাহ্যবিচার না থাকে তবে ভবিষ্যতে আরো কি হবে ভেবে ভয় পাচ্ছি। কেউ রেকর্ড করবে “শ্যামের কোলে রোদ তেসেছে”, কেউ রেকর্ড করবে “ছ্যালো যে পরাণের অঙ্গকারে” অথবা “তার হাতে ছ্যালো হাসির ফুলের তার”। কোন্‌ ছলে এমন উচ্চারণ বন্ধ করা যাবে যখন সজ্জার সইজ্জা উচ্চারণ পাস হল? দ্বিতীয় একজন আকাশবাণীর সংবাদ-পাঠক টানশকে ট্রান্স বলেন, তাই বা আদর্শ হবে না কেন?

শিক্ষা কংস একেবারে মূল থেকে শুরু

যাতে প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই বাঙালীকে বুঝ বানানো যায় সে ব্যবস্থা পাকা আমাদের দেশে। বইতে ছোটরা যখন পড়ে চাঁদ বরফে ঢাকা, কুইনিন সিংকোনা গাছের পাড়া থেকে ভৈরবী, সাপ দ্বিভু দ্বিভু নিয়ে নিবাস নেয়, মাছ চোখ দিয়ে নিবাস নেয়, জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন, উদ্ভবিকাশে বাতাস অত্যন্ত ঘন, সেজল পাখীরা ডানা না নেড়েও ভেসে থাকতে পারে, মাউন্ট এভারেস্ট আবিষ্কার করেছিলেন তেনজিং ও হিলারি, রূপ বিপ্লব নেতা ‘লোলিন’, আকির্মাডিসের ইউরেকা তত্ত্ব আবিষ্কারেই বিজ্ঞানের প্রথম যাত্রা আরম্ভ

হয়, আর্থনিক ও পারমাণবিক শক্তি একই জিনিস, একসের লোহা একসের ভুলো থেকে ভারী ইত্যাদি।

সবই ছাপা পাঠ্য-পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করা হল। তালিকা এত দীর্ঘ করা যায় যে শুধু তাইতেই ‘প্রবাসী’র একটি বিশেষ সংখ্যা তৈরী হতে পারে। এই শিক্ষা অনেকদিন ধরে চলছে। ২১ বা ২২-টি সংস্করণ পর্যন্ত হয়েছে এরকম বইয়ের। শিক্ষাকে ‘সাবোটাজ’ করার অপারিকল্পিত একটি অজ্ঞ এটি বলেই সম্বোধন হয়। বাঙালী মুক্তিযুদ্ধে চিন্তা করতে অক্ষম হয় এই জন্য, গোড়া থেকেই। কিন্তু যেখানে উদ্দেশ্যই তাই সেখানে প্রতিবাদ বুঝা।

### মুক্তিহীন চিন্তার দৈন্য অপরিমেয়

আকাশবাণীর কণ্ঠ সন্ন্যাসিনী, এবং এই প্রতিষ্ঠান আমাদের সবার টাকায় চলে। সেজন্য এর কার্যক্রম অনেক বেশি। কিন্তু কার্যতঃ কি হচ্ছে? যদি কেউ নিয়মিত বি-বি-সি ওভারসীজ সার্ভিস শোনে তাহলে বুঝতে পারবেন, আকাশবাণীর স্থান কোথায়। ভুল মাহুয মাজেরই হয়, কিন্তু ভুল দোঁষেই দিলে তা প্রোত্বেই করা হয় না, এমন ঘটনা শুধু এখানেই ঘটে। “গান শুভন, গেয়েছেন অমুক”—এই অপভ্রামার বিরুদ্ধে অনেকবার কাগজে বলা হয়েছে, কিন্তু তারা নিজেদের ডিক্টেটর মনে করেন, তাঁরা তা শুনেও গরজ করবেন কেন? মার্কিনী মানে অ্যামেরিকানী একথা বহুবার স্বরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে খবরের কাগজের মাধ্যমে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? ২৪।৩।৭২ তারিখে সকাল ৯টার বাংলা সংবাদেও অ্যামেরিকান বা মার্কিন না বলে তার স্থলে মার্কিনী বলা হল। মুক্তিহীন চিন্তার নমুনা। মুক্তিহীন কেন, বলছি। এশিয়ার বিশেষণ এশিয়ান, অ্যামেরিকার বিশেষণ অ্যামেরিকান (মেরিকান ককুই উচ্চারণ, তা থেকে মার্কিন, মানে অ্যামেরিকান), আফ্রিকার বিশেষণ আফ্রিকান, অস্ট্রেলিয়ার বিশেষণ অস্ট্রেলিয়ান, ইউরোপের বিশেষণ ইউরোপীয়ান, তেমনি ইরানিয়ান, ইণ্ডিয়ান ইত্যাদি। কিন্তু এই সব বিশেষণ ব্যবহার না করে কেউ কি বলবেন এশিয়ানী,

অ্যাক্রিকানী, অস্ট্রেলিয়ানী, ইউরোপীয়ানী, বা অ্যামেরিকানী, বা ইণ্ডিয়ানী, ইরানিয়ানী? তিনজন অ্যাক্রিকানী ভদ্রলোক এসেছিলেন কেউ বলে? কিন্তু আকাশবাণীতে মার্কিনকে মার্কিনী বলা হয়। মার্কিনী মানে অ্যামেরিকানী এ বোধের অভাব। কেন বলা হচ্ছে সে প্রশ্ন জাগে না মনে। (খবরের কাগজেও ‘মার্কিনী’ আরম্ভ হয়েছে!)

আকাশবাণীতে নানা কথিকা শুনেছি, কিন্তু কারো মুখে দুই ফুট বা তিন ফুট শুনিনি। শুনেছি দুই ফুট বা তিন ফুট, যারা পরতারোহণ করেছেন, তাঁরাও ১৫ হাজার ফুট বা দুই হাজার ফুট বলেছেন। এটা শুধুই স্থূল জীবনে দুটের বহুবচন ফুট এই নতুন ধরণের প্রুয়াল শেখার ক্রান্তি জাহির করার প্রয়াস থেকে জাত। ম্যান থেকে মেনও তাই, কিন্তু ফুট-এর ব্যবহার জীবনে বার বার দরকার হচ্ছে। মাপ-জোক নিয়ে যাদের কারবার তারা ৩ ফুট ৪ ফুট বলে। ‘তাঁরা কি অজ্ঞ? বাংলায় যে ইংরেজী শব্দের বহুবচন ব্যবহার হয় না, এটা কি অভ্যাসবশত তারা জানে, কিন্তু কিছু বেশি লেখাপড়া শিখলে আর জানা যায় না। তাঁরা এই কিছু বেশি লেখাপড়া শিখেও তাঁকি বা মাইলের বেলায় বা অজ্ঞ ইংরেজী শব্দের বহুবচন ব্যবহার করেন না, তাঁরাও সেই স্থূল জীবনের আশ্রয় আবিষ্কার ফুট বহুবচনে দুটস না হয়ে ফুট হয়, এই জ্ঞান জাহির করতে ভালেন না। তাঁরা হু’থানা চেয়ার্স বা হু মাইলস বলেন না। ৫০০ মাইলস ঘুরে এলাম, বা হু’থানা ট্রেনস স্টেশনে এসে থেমেছে বলেন না। কিন্তু তিন ফুট কেন বলেন, কেন দুটের বেলায় অমানবদমে প্রুয়াল বলেন তা কেন ভাববার মতো মনের শিক্ষার অভাব।

দ্বিতীয়া (বা চতুর্থী) বিভক্তিতে বহুবচনে ‘কে’

ভুল নয়; কিন্তু অচল

আমাদেরকে, তাদেরকে এককালে ঢালাবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু চলেনি। “এ কথা তাদের বলব” অচল। “এ কথা তাদের বলব” এটাই প্রচলিত। তোমাদেরকে দেব অচল, তোমাদের দেব প্রচলিত।

পূর্ববঙ্গে এই “কে” বড় বেশি ব্যবহৃত হতে শুনেছি।  
বাঙালী বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারের পর থেকে।  
“কে” যদি চলত তা হলে চলতি ভাষার ভগ্নীরূপ  
এমন চৌধুরীর ভাষাতেও তা থাকত। তাঁর একটি  
বাক্য উদ্ধৃত করছি :

“পরের হুঃখ যখন তাদের নিজের দোষে, তখন  
তাদের গুণ ভাল হতে শেখাও...” “নিখিলেশ ও সন্দীপ  
যদি বিলাকে নিজের নিজের কাজে লাগাবার চেষ্টা না  
ক’রে নিজেকেই বিমলার কাজে লাগাতে.....”

তাদেরকে ভাল হতে শেখাও অথবা নিজেকেই  
বিমলার কাজে বলা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : “এমন অগ্রে হৃৎভাগাদের  
কাতকড়া দিয়ে বেঁধে ক্রমে ক্রমে চাপকের ব্যবস্থা করে  
স্বষ্টিকর্তার এক নিষ্ঠুর খেলা।”

অথবা “ডাকব তাদের কাঁ দিয়ে, খোরাক দেব  
কোথা থেকে?”

দুটি হানি “হৃৎভাগাদেরকে” অথবা “তাদেরকে”  
বলা হয়নি। অথবা—

ইহাদের করো আশীর্বাদ।

দরায় উঠেছে ফুটে গুন প্রাণভাল,

নন্দনের এনেছে সংবাদ,

ইহাদের করো আশীর্বাদ।

“ইহাদেরকে করো আশীর্বাদ” বলা হয়নি।

বনিতবের পরেই ‘আওয়াজতত্ত্ব’

বাঙালীকে আশীর্কিত করে তুলতে নানা আয়োজনের  
কথা বলা হল, এবার ছাত্রগুলোর সনদার্থের জল পাড়ায়  
পাড়ায় ব্যবস্থা আছে লাউড স্পীকারের। কোনো-না-  
কোনো উপলক্ষে লেগেই আছে। কঠিন ইট-পাথরের  
বাড়ি-ঘেরা বন্ধ স্থানে অল্পল অসভ্য এবং আশালীন-  
ভাবে এই লাউড স্পীকারের বিকট আওয়াজ স্রষ্টিতে  
এক রকম আনন্দ অবশ্যই পাওয়া যায়। সবাইকে  
জব্ব করে আনন্দ উপভোগ আমাদের দেশের প্রাচীন  
ঐতিহ্য। মাঝখানে ব্রাহ্ম আন্দোলনে ও বিরাট  
ঐতিহ্যের হিন্দুদের সংস্কারমূলক মনোভাবের ফলে গত

শতকে বেশ একটা বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে উঠছিল।  
কিন্তু এখন আর তা নেই। একটা ভুল পরিবেশ গড়ে  
উঠতে না উঠতে ইতর আবিহাওয়ার বাঙালীর জীবন  
কলুষিত হয়ে উঠেছে। কাণ্ডজ্ঞান বিসর্জন হয়ে গেছে,  
নইলে অপাঠ্য বইয়ের সাহায্যে যেমন শিক্ষার সূলে  
কুঠারাঘাত করা হচ্ছে তেমনি লাউড স্পীকারের সাহায্যে  
সুলের ছেলেমেয়েদের মনে যেটুকু ছন্দ ও সৌন্দর্য বোধ  
সহজে গড়ে উঠতে পারত তা একেবারে চূর্ণ করে দেওয়া  
হচ্ছে। অল্পল গান, কান ফাটানো উচ্চ প্রায়ের অতি  
অস্বাভাবিক আওয়াজের সাহায্যে তাদের মর্মভেদ  
করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ জিনিসের ছাড়পত্র কি করে  
দেওয়া হয় তা বুঝির অগম্য। অল্পল গান লাউড  
স্পীকারে বাজানো আমাদের ধর্মের আবিচ্ছেদ অঙ্গ  
এমন কথা কেউ বলবেন না। পূজার চাঁদা আদায়  
এবং সে সময় নানা জুলুম ও প্রয়োজন বলে ছুরির  
ব্যবহার অবশ্যই ধর্মের আবিচ্ছেদ অঙ্গ নয়। অথচ  
এ দুটি জিনিসই এ দেশে অনায়াসে চলছে। সভ্য  
দেশ সমূহে নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত নানা  
আয়োজন, তার মধ্যে বিমানের আওয়াজ, কল-  
কারখানার আওয়াজ, মোটরের আওয়াজ প্রভৃতি কি  
করে কমানো যায় তার জন্ত নানা আলোচনা চলছে।  
কিন্তু আমাদের দেশের মানুষগুলো সভ্য মানুষের কোঠায়  
পড়ে না বলে তাদের জন্ত শাসকদেরও দায়িত্ব বা ভাবনা  
নেই। আশ্চর্য্য কাণ্ড। চোখের সামনে দেশটাকে  
নানা দিক দিয়ে অসভ্য বানানো হচ্ছে, অথচ প্রতিকার  
চিন্তা দূরের কথা, উদ্বাসীনতার দ্বারা তার সমর্থনই  
আছে।

আকাশবাণীর কলকাতার ঘোষণাকারীরা বলেন  
“সংবাদ আজকের মতো,” বা “এখনকার মতো  
এইখানেই শেষ হল।” এরমধ্যে কুসংস্কার-আচ্ছন্ন বাঙালী  
চরিত্রের এমন একটা ভীকৃত্যের পরিচয় আছে বা তাবলে  
অবাক হতে হয়। “এখনকার মতো” বা “আজকের  
মতো” না বলে যদি শুধু বলা যায় “এখানেই শেষ হল”?  
সর্বনাশ! তা যদি ঋষিবাক্য হয়ে পড়ে, অর্থাৎ সত্যিই



যদি শেষ হয়, অর্থাৎ ঘোষণাকারীকে আর যদি সংবাদ পাঠ না করতে হয়, সেই ভয় লুকিয়ে আছে ঐ ঘোষণার মধ্যে। জঘন্ডতম ভীকৃতার দৃষ্টান্ত, কারণ ওটা যদি প্রোত্যার সুবিধার জন্যই বলা হত তা হলে ওর পরে, আবার কখন বলা হবে সে সময়টারও উল্লেখ থাকত। নইলে “এখনকার মতো শেষ হল” শুধু শোনা গেল, কিন্তু আবার কখন বা কবে আরম্ভ হবে তা জানা গেল না। তা ছাড়া ঐ রোডও আছে, তিনিই জানেন, সংবাদ যখন শেষ হল সেটা চিরদিনের জন্য শেষ নয়। তিনি নিশ্চয় জানেন আবার বলা হবে। এবং কখন বলা হবো তাও জানেন। বেতার জগৎ আছে, খবরের কাগজ আছে, পোগ্রাম ঘোষণা আছে। রোডও প্রোত্যার এসব কিছুই জানেন না বিশ্বাস হয় না। তা ছাড়া “এখনকার মতো” কথাটা এমন প্রবল গর্বের সঙ্গে : এমন জোরেয় সঙ্গে ; বলা হয় যেন রোডওর যাবতীয় প্রোগ্রামের মধ্যে ওটাই একমাত্র মূল্যবান কথা। অল্প কোন দেশে অথবা এ দেশের অন্ত কোনো রাজ্যে এমন বলা হয় না। হিন্দিতে “সমাচার ‘এইখানেই’ সমাপ্ত হয়ে বলা বলা হয় না। উর্দুতেও খবরে ‘এইখানেই’ বতম বলা হয় না, ইংরেজীতে এখনকার মতো that is the end of the news বলা হয় না।

বাঙালীর চরিত্র, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ধ্বংসের চারিদিকের বিপুল আয়োজনের কথা সামান্য বলা গেল। এ ছাড়া সৌন্দর্যবোধ নষ্ট করার আয়োজন, যথা :

শহরকে স্লোগান আর ইলেকশনের পোটার অথবা নির্বাচনপ্রার্থীর নাম অন্ত বাড়িতে পেট করে অল্প বয়সের ছাত্রছাত্রীদের মাতে একটা কুৎসিত ভাব চোখ মুললেই মনে প্রবেশ করতে পারে তারও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইলেকশনের পরে তা যে সুখে দেওয়াও দরকার এ গরজ নেই নির্বাচন প্রার্থীর। অর্থাৎ তাঁদের ভাল ভাল বাড়ির অথবা কে-কোনো বাড়ি বা প্রাচীরের সৌন্দর্য পাইকারীভাবে নষ্ট করতে অধিকার আছে সৌন্দর্য বাড়ার এমন কি যা আছে তা রক্ষা করাও যে দরকার, এ শিক্ষা তাঁদের আছে মনে হয় না। অন্ত বাড়ির সৌন্দর্য রভাবে নষ্ট করা কি আইনসঙ্গত ? জয়লাভের পরে কোনো কোনো নির্বাচনপ্রার্থী লাউড স্পীকারের সাহায্যে ভোটদাতাদের জল্প করেছেন এমন দৃষ্টান্ত আছে। সভ্য দেশের সঙ্গে এইখানেই এদেশের পার্থক্য। এমনি অবস্থা চলতে থাকলে গাঁরা বাঙালী ধ্বংসে পুঁশি হবেন, তাঁরা এর বিপরীতটা হতে দেবেন কি ? নতুন সরকার গঠিত হবার পর থেকেই দেখছি যেখানে সাত দিনেও আবর্জনা সরানো হত না, সেখানে প্রাতিদিন সরানো হচ্ছে। কিন্তু অল্পের বাড়ির সৌন্দর্য নষ্ট, পথের সৌন্দর্য নষ্ট, এবং লাউড স্পীকার রূপ আবর্জনাও কি এই সঙ্গে সরানো হবে ? সাধারণ মানুষ একটু ভদ্র পরিবেশে বাস করতে চায়, সেটুকু যদি কোনো শাসক নতুন করে গড়ে তুলতে পারেন তাহলে বাঙালীর যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা বেঁচে যেতেও পারে।



# প্রকল্প-রূপায়ণে বিভক্ত বাংলার বর্তমান চিত্র

চিত্তরঞ্জন দাস

বাহুসুত রবি

পূর্ণ দিগন্তে উদীয়মান ভেঙ্কোদীপ্ত রাব অকস্মাৎ  
বাহুপ্রাসে পতিত-হ'য়ে স্নদীর্ঘ ন'মাস কাল অন্ত্যমিত্ত  
থাকার পর, পুনর্বার উদিত হয়েছে সন্ত-মুক্ত পূর্ণাকলে !  
বাহু-মুক্ত রবির অলোকোজ্জ্বল ত্রিধি কিরণে সমুদ্ভাসিত  
হয়েছে সমগ্র মুক্তাকল। জন-মনে জেগেছে আজ নব  
জাগরণের অভূতপূর্ণ সাড়া। অস্তিত্বিত ৯'য়েছে সব  
পুঞ্জীভূত ভীতি, সন্ত্রাস, বিবাদের ধন-কুস-ছায়া।  
জাতীয় জীবনে এসেছে আজ হৃদনের বাস্তব নিশানা।  
মুক্ত মানুষের কণ্ঠে শুধুঃ—জয় বাংলা, জয় তিম্; জয়  
ইন্দিরা, জয় মুজিব।

একবছর মুজিবুর রহমান পূর্ণ বাংলার আবাসবাদী  
হুমহান নেতা। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর আশা  
তবলা ভবিষ্যের অধিতীয় প্রতীক। মুক্তিযুদ্ধের সর্গশ্রেষ্ঠ  
বীর। প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট কুখ্যাত ইয়াহিয়া খাঁর  
পূর্ববক্ত ও বাঙ্গালী ধ্বংসের প্রকল্প রূপায়ণের বৃশংস  
কার্যক্রম শুরু হয় ২৫শে মার্চ, ১৯৭১। উক্ত দিবস  
গতীর রাত্রে ঢাকার বানমাস্তুর বাড়ী থেকে সকলের  
অজান্তাসারে বঙ্গবন্ধু মুজিবকে গ্রেপ্তার করে সঙ্গে সঙ্গে  
প্রেরণ করা হয়; পশ্চিম পাকিস্তানের এক নির্জন  
কারাগারে। মুজিবের গ্রেপ্তার ও গণহত্যার কঠোর  
নির্দেশ জারি করে এই রাত্রেই ইয়াহিয়া পালিয়ে যায়  
পিণ্ডিতো। তদবধি শুরু হয় পাক-দানবগণ কর্তৃক পূর্ববঙ্গে  
বাঙ্গালী নিধন পাপাণ্ড যজ্ঞাহুষ্ঠান শাড়ঘরে এবং উহার  
সমাপ্তি ঘটে স্নদীর্ঘ ন'মাস পরে। বলা বাহুল্য পাক  
ভারত মুক্ত না হ'লে কিবা ভারতীয় জওয়ানদের সক্রিয়  
সাহায্য না পেলে, একক নিরস্ত্র মুক্তি-বাহিনীর পক্ষে  
কখনও সম্ভব হত না পূর্ববঙ্গে গণহত্যাকারী শসস্ত্র পাক  
দস্যদের পর্য্যুদ্রহ করে সম্পূর্ণ ধ্বংসের কবল থেকে বাংলা

ও বাঙ্গালী জাতিকে উদ্ধার করা। বাংলা দেশের  
ঐতিহাস হ'ত অল্পরূপ।

২৫শে মার্চ রাতি থেকে পূর্ববাংলার সাড়ে সাত  
কোটি বাঙ্গালীর মুকুট-মান শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘদিন  
নির্পোজ। সত্যবতই সেখানে সৃষ্টি হ'ল এক অভূতপূর্ণ  
গণচাকলা, সঠিক সম্মান কেউ জানে না বা বলতে পারে  
না। দেশ বিদেশে দাক্ষণ উৎকর্ষ। সমস্ত নানা জল্পনা  
কল্পনা। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন ধারণা। কেউ বলে তিনি  
আত্মগোপন করেছেন, আবার কেউ বলে সম্ভবত তিনি  
পাক কারাগারে বন্দী হ'য়ে আছেন। তবে অধিকাংশ  
লোকেরই ধারণা হ'য়েছিল, পাক দানবদের হস্তে শেখ  
নিহত। জুলাই মাসে হঠাৎ একাদিন জনৈক পাকিস্তানী  
যুধপাতি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিবের  
গ্রেপ্তার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বিচারাধীন কারাবন্দীর  
গবর ব্যক্ত করেন। কিন্তু কোথায়? কোন জেলে?  
কেউ বলেন লায়ালপুরে, আবার কেউ বা বলেন  
রাওয়ালপিণ্ডিতে। তাই নিয়ে আবার শুরু হ'ল তখন  
নানা জল্পনা কল্পনা।

অতঃপর বি বি সি থেকে প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারের  
থবরে বলা হয়, সামরিক আদালতে গোপনে শেখ  
মুজিবের বিচার হবে। শেখ একজন উকিলের সাহায্য  
নিতে পারেন, কিন্তু কোন বিদেশী উকিলের সাহায্য  
নেওয়া চলবে না।

এর পরেই এল মুজিবকে হত্যার হুমকি। পাকিস্তান  
জাতীয় পরিষদের অধিবেশন যখন বসবে সে সময়ে শেখ  
মুজিবুর রহমান জীবিত না থাকতে পারেন, এই মর্মে  
সংবাদপত্রের প্রকাশিত পাক-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁর  
উক্তিভে ভারতের লোকসভা ও বিধের মুক্তিযোদ্ধাদের  
বিশেষ আলোড়ন দেখা দিল।

মুজিবের মুক্তির জন্য ব্রিটিশ এম পি-রা আবেদন জানান। ১১ই আগস্ট সামরিক আদালতে মুজিবের বিচার শুরু হলো। লায়ালপুর জেলে। মিঃ এ কে ব্রোহী মুজিবের পক্ষ সমর্থন করেন। কয়েকদিন বিবর্তিত পর আবার বিচার শুরু হলো ২১শে আগস্ট। ওই দিনই আইরিশ বাবের সদস্য ও আন্তর্জাতিক অ্যামনেস্টি (ক্ষমা) বিষয়ক চেয়ারম্যান সিন ম্যাক্‌ব্রাইড সামরিক আদালত ভেঙে দিয়ে অসামরিক আদালতে বিচারের আদেশ দেওয়ার জন্য ক্রেঃ ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানান।

ইয়াহিয়া খানের চাই আগস্টের ১৭তার পর বিশ্বজনমত মুজিবের ভাগ্যে কি পড়েছে, বা কি ঘটতে পারে তাই নিয়ে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়ে, প্রশ্ন উঠল শেখ মুজিব কার ভাগ্য বরণ করেছেন—পৃথুখা না বেনু বেঞ্জার ?

২২শে সেপ্টেম্বর এপির সংবাদে জানা গেল বঙ্গবন্ধুর বিচার শেষ হয়ে গেছে। ১লা অক্টোবর রুশ শান্তি কমিটি বঙ্গবন্ধু ও অপরাপর নেতাদের প্রতি পাকিস্তানী উৎপীড়ন বন্ধ করার জন্য আবেদন জানান। সোভিয়েত সাংবাদিক ইউনিয়নও শেখ মুজিবের বিচার বন্ধ করবার দাবী জানান। ২৩শে নভেম্বর তারিখে আন্তর্জাতিক ক্রুরিট কমিশন শেখ মুজিবের রহমানের বিচার সম্পর্কে পাক সরকার সম্পূর্ণ গোপনীয়তা অবলম্বন করার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেন।

২রা ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, মুজিব জীবিত এবং সুস্থ। ১৮ই ডিসেম্বর এক সরকারী মুখপাত্র জানান যে, দেশছোড়ের অভিযোগে শেখ মুজিবুর রহমানের যে বিচার চলছিল তা শেষ হয়েছিল, তবে রায় এখনও দেওয়া হয়নি। ওই দিনই লণ্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকা এক সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

২১শে ডিসেম্বর রাজ্জে নব পাক-প্রেসিডেন্ট মিঃ জুলফিকার আলি ভট্টো জানান যে, শেখ মুজিবুর

রহমানকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং গৃহবন্দী করে রাখা হবে। ২৩শে ডিসেম্বর তথ্যাত্তজ মহল থেকে জানা যায় যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে গভকল্যা কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে রাওয়ালপিন্ডিতে এনে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। ২৭শে ডিসেম্বর পাকিস্তান বেতারে বলা হয় যে, প্রেঃ ভট্টো শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং ওই সাক্ষাৎকারটি ছিল দ্বিতীয়বারের।

২রা জানুয়ারী ১৯৭২ সালের সংবাদে প্রকাশ যে, পাক প্রেসিডেন্ট মিঃ ভট্টো মার্কিন সামরিক পত্র টাইম-এর প্রতিনিধির কাছে বলেছেন, তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমানকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। ৩রা জানুয়ারী এক জন-সভায় ভট্টোর ঘোষণা:—বিশ্বজনমতের সম্মান রাখতে তিনি মুজিবকে বিনাশর্তে মুক্তি দেবেন।

৮ই জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু মুজিবের বন্দীপন হল শেষ। ওই দিন লণ্ডনের থবরে প্রকাশ, পাক প্রেসিডেন্ট মিঃ ভট্টো বিনা শর্তে মুজিবকে মুক্তি দিয়ে লণ্ডনে প্রেরণ করেছেন। সেখানে ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ ব্যক্তিগতভাবে বাংলা দেশের রাষ্ট্রপতিকে সাদর স্বাগত সন্মিলন জানান করে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করেন।

৯ই জানুয়ারী ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান-বাহিনীর বিশেষ কমেট বিমানে স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৫০ মিঃএ লণ্ডন থেকে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করেন রাহ-মুক্ত রাব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১০ই জানুয়ারী দিল্লির পালাম বিমান-বন্দরে বঙ্গবন্ধুকে অভ্যুত্পন্ন স্বাগত সন্মিলন জানান করেন এক সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীভি ভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে কোন বিদেশী রাষ্ট্রনায়ককে স্বাগত জানাতে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী উভয়কে একসঙ্গে বিমান-বন্দরে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়নি। মুজিব-বাহী উক্ত ব্রিটিশ বিমানটি সকাল ৮টা ২মিঃএ পালাম বিমান-বন্দরের মাটি স্পর্শ

করা মাত্র একুশ বার ভোপধ্বনি করে স্বাগত জানান হয়। বিমান থেকে অবতরণ করে শেখ মুজিবুর রহমান একটি মঞ্চে এসে দাঁড়াবার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীজয়ের গার্ড অব অনারের অধিনায়ক তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়ান। অতঃপর তিনি উক্ত অধিনায়কের সঙ্গে গার্ড অব অনার পরিদর্শন করেন। শেখ সাহেব এই প্রথম কোনও দেশের গার্ড অব অনার পরিদর্শন করলেন।

পরিদর্শন-মঞ্চ থেকে নেমে তিনি ভারতীয় মন্ত্রীবর্গ, রাজনীতিক ও এম পিদের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ভারতের প্রটোকোল-প্রধান। বিমান-বন্দরের অস্থানীয় পর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি প্যারেডে আউটে যান। সেখানে আয়োজিত বিরাট জন-সভায় ভাষণ দান করেন বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান। প্রথমে তিনি হুঁসেঁকীতেই তাঁর ভাষণ দান শুরু করেছিলেন, যাতে ধবাকালী শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষে তাঁর বক্তৃতা সহজে বোঝগয়া হয়। কিন্তু জনতা তাঁকে বাংলায় বক্তৃতা করার দাবি জানান। সঙ্গে সঙ্গে শেখ তখন সানন্দে বাংলায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সাংক্ষমতা :- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অতুলনীয় অবদানের কথা উল্লেখ করে সম্বাস্তঃ-করণে ভারতকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধন অটুট রাখবার পূর্ণ প্রীতিজ্ঞাপিত প্রদান। অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন বঙ্গবন্ধু ভারতীয় জওয়ান ও জনগণকে, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে। ভাষণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শেখ মুজিব উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি দেন—জয় বাংলা। জয় হিন্দ। জয় ইন্দিরা গান্ধী। সবুজ বর্ণের শাড়ি পরিহিতা শ্রীমতী গান্ধী তখন মাইকের সামনে এসে বলেন, “আমার সঙ্গে আপনাবাও বলে উঠুন :-শেখ মুজিবুর রহমান জিন্দাবাদ।” আকাশ বাতাস মুখারিত হয়ে ওঠে তখন বিরাট জনতার গগনভেদী জয়ধ্বনিতে :-শেখ মুজিবুর রহমান জিন্দাবাদ।”

সভাশেষে প্যারেডে আউটে থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি ভবনে যাবার সময় স্বাগত হুঁসেঁকী হাজার হাজার হর্ষোৎসুক নাগরিক তাঁদের

উচ্ছ্বসিত আনন্দ প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রীয় আভিষেকের জন্ত ভারত সরকার নতুন যে মার্শাল্ডজ বেনজ মোটর গাড়িটি ক্রয় করেছেন, নয়া দিল্লিতে শেখ সাহেবই তা সর্ব প্রথম ব্যবহার করলেন।

দিল্লির গ্যারিসন এন্ডেও আহূত বিরাট জনসভায় ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু বলেন :-“আমার মুক্তি ও বাংলাদেশের বিপন্ন জনসমাজের হুঁসেঁকী নিরসনের জন্ত শ্রীমতী গান্ধী পৃথিবীর প্রীতি রাষ্ট্রের হুঁসেঁকী হুঁসেঁকী দিয়েছেন—আমাদের সরকার তাঁর প্রীতি ও ভারতের জনগণের প্রীতি চির কৃতজ্ঞ। এ কথা আমরা কোনদিন ভুলব না।”

রাষ্ট্রপতি ভবনের মোগল উদ্যানে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গান্ধীর এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে নিরালায় আলাপ আলোচনা করেছেন বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান। অতঃপর তিনি বিপ্রহরের পূর্বেই পালায় বিমান বন্দর থেকে ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান-বহরের বিশেষ জেট বিমানে রওনা হন স্বাধীন বাংলার রাজধানী ঢাকা পহরের উদ্দেশে। বেলা ১টা ৩৩ মিঃ-এ উক্ত বিমানটি ঢাকা তেজগাঁও বিমান-বন্দরের আকাশে দৃষ্ট হওয়া মাত্র, বিমান-বন্দরে অপেক্ষমান লক্ষ লক্ষ জনতার কণ্ঠে উথিত হলো : জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী জিন্দাবাদ। অকুরন্ত হর্ষধ্বনি। কিন্তু বিমান নামবে কোথায়? লোকে লোকারণ। রানওয়ের উপরেও। অর্গণিত জনতার মাথার উপরে দুরহে তখন বিমানটি। বহুকণ্ঠে লোক সরান হলো। বিমান নামলো। থামলো। খোলা হলো দরজা। বেরিয়ে এলেন স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর ভালোবাসার সোনার বাংলায় আবার ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু সুদীর্ঘ সাড়েন’মাস পরে। বেলা তখন একটা আটচালিশ মিনিট। তৎপূর্বে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে ভোপধ্বনি করা হয় একাধিশবার, একটা আঠারো মিনিটে। একটা বাহায় মিঃ-এ কর্ণেল ওসমানি নিয়ে এলেন বঙ্গবন্ধুকে বিশেষভাবে নির্মিত মঞ্চে। তিন

বাহিনীর গার্ড অব অনার গ্রহণ করলেন বঙ্গবন্ধু। অতঃপর শ্রীভাষুদ্দিন পরিচয় করিয়ে দিলেন বঙ্গবন্ধুকে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে। এবার বিমান-বন্দর ঘুরে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করতে একটি খোলা ট্রাকে গিয়ে উঠলেন বঙ্গবন্ধু। সঙ্গে মন্ত্রীসভার সদস্যগণ ও আওয়ামী-লীগনেতৃবৃন্দ। উপরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপটার পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে শুরু করে খোলা ট্রাকটিকে।

অতঃপর ট্রাকটি ক্রমশঃ রমনা ময়দানের পথে অগ্রসর হয়। জনশ্রোত পৌরিয়ে ট্রাকটি যখন রমনার রেসকোর্স ময়দানে পৌঁছল তখন বিকেল ৪-৩৫ মিঃ। ট্রাক থেকে বঙ্গবন্ধু নামলেন, কিন্তু চার-পাশে জনতার প্রচণ্ড ভিড়ের জন্ত মকের দিকে আর এগোতে পারছেন না। প্রধান সেনাপাতি ওলমানি তাঁর আগে আগে পথ করে দেবার চেষ্টা করছেন। জনসমুহ পৌরিয়ে বঙ্গবন্ধু যখন মকে গিয়ে বসলেন তখন বিকেল ৪-৪১ মিঃ। জনতা তখন শান্ত। ময়দানের সব দিক থেকেই তাঁরা তাঁদের প্রিয় নেতাকে দেখতে পাচ্ছেন। শেষ সাহেব ৪-৫১ মিঃ-এ মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এক মিনিট জনতার দিকে তাকিয়ে রইলেন, কোন কথাই বলতে পারলেন না। কঁদে ফেললেন। আঁত কষ্টে অশ্রু সঞ্চার করে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন এবং মাত্র ২০ মিঃ-এ তাঁনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

১৭ মিনিটে বঙ্গবন্ধু অনেক কথাই বলছেন, যা সম্ভবত পূর্বে তাঁর স্বদীর্ঘ বক্তৃতায়ও কখনও বলেন নি, তাঁর বক্তৃতার কতকংশ নিয়ে উদ্ধৃত করছিঃ—

“আমি প্রথমে স্বরণ করি বাংলাদেশের যে অর্গণ্ড হিন্দু-মুসলমানের উপর অত্যাচার হয়েছে তাঁদের। তাঁদের স্থিতির জন্য প্রার্থনা করি, তাঁদের আত্মার মঙ্গল কামনা করি। আজ আমার বাংলা স্বাধীন। আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। আমি আজ বক্তৃতা করতে পারব না। বাংলার মেয়েরা, মায়েরা, ছাত্র, কৃষক সবাই আমরা দেশের মুক্তির জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছে ও করেছে, তার তুলনা নাই। আমি কারাগারে

বন্দী ছিলাম। আপনারা দেশকে মুক্ত করেছেন। আমি জানতাম বাংলাকে কেউ দ্বাভাবে রাখতে পারবে না। কত লোক শহীদ হ’য়েছেন, জান দিয়েছেন ও গিছু হটেন নাই। ৩০ লক্ষ লোককে মেয়ে ফেলেছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাসুদ্ধেও এত লোক, এত নাগরিক বৃত্ত্যবরণ করেন নাই, শহীদ হন নাই।

“আমি জানতাম না আবার আপনাদের মধ্যে কিবে আসতে পারব। আমি ওদের বলেছিলাম, তোমরা আমাকে মারতে চাও, মেয়ে ফেল। শুধু আমার লাশটা বাংলাদেশে আমার বাঙালীদের কিরিয়ে দিও। আমি আজ মোবারকবাদ জানাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারতের জনগণকে। মোবারকবাদ জানাই ভারতের সেনাবাহিনীকে। মোবারকবাদ জানাই রাশিয়া, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি এবং আমেরিকার জনসাধারণকে। এক কোটি লোক বংবাড়ী ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধীর ভারত তাঁদের খাবার দাবার দিয়েছিল, আশ্রয় দিয়েছিল। এত বড় মাননতা ভোলা যায় না। আজ বাংলাদেশ এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, বাংলাকে কেউ দ্বাভাবে রাখতে পারবে না। বড়যন্ত্র করে লাভ নাই। বাংলাদেশ স্বাধীন থাকবেই।

“আমার সোনার বাংলা আমি তোমাঝ বড় ভালবাসি। হুঁনিয়ার সব রাষ্ট্রের কাছে আমার আবেদন, আমার বাংলায় রাস্তা নাই, ঘাট নাই, খাবার নাই, আমার মানুষ গৃহহারা, পথের ভিখারী—তোমাদের সাহায্য চাই। আবার বালি, বাংলাদেশকে মেনে নাও। রেকর্গনাইজ কর। এ স্বীকৃতি দিতেই হবে। না দিয়ে উপায় নাই। আমরা হারব না।

“কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলে গিয়েছেন “সাত কোটি সম্মানে রে হে বঙ্গ জননী, রেখেছো বাঙালী করে, মানুষ কর নি।” কিন্তু বাঙালী দেখিয়ে দিল কবিগুরুর সে বাণী ভুল, স্বাধীনতার সংগ্রামে এত লোক আত্মত্যাগ দিয়েছে, ত্যাগ স্বীকার করেছে, এমন নাকির বাংলা ছাড়া হুনিয়ার ইতিহাসে আর কোথায়? এত লোক আর

কোথাও প্রাণ দেয় নাই। তাই আমি বলি, দাবায়ে রাখতে পারব না।

“আজ থেকে আমার হুকুম—প্রোসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয়, ভাই হিসাবে। তোমরা আমার ভাই, আমি তোমাদের ভাই। আমাদের এ স্বাধীনতা পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না পায়, সুবকরা কাজ না পায়। মুক্তিবাঞ্ছিনী, ছাত্রসমাজ তোমাদের সকলকে আমার সুবারকবাদ। তোমরা লড়েছো। গেরিলা হুঁয়েছো। বক্তৃতা দিয়েছো, বক্তৃদান খুঁচা যায় না। দেশকে স্বাধীন করেছে। আজ থেকে বাংলায় যেন চাঁর ডাকাতি আর না হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের লোক বাংলায় কথা বলে না। আমি বলি তোমরা বাঙালী হুঁয়ে যাও। কেউ তোমাদের গায়ে হাত ভুলবে না। কিন্তু যারা দালালী করেছে, লোকের ঘরে ঢুকে হত্যা করেছে, তাদের বিচার হবে। একজনকেও ক্ষমা করা হবে না। আমি চাই স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিকের মত বিচার হয়ে শাস্তি চোক।

“আপনারা আমাকে চেয়েছেন, আমি এসেছি। আমার কান্নার হুকুম হয়েছিল। কবর খোঁড়া হয়েছিল। জীবন দেবার ভক্ত প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। বলেছিলাম আমি মানুষ, আমি বাঙালী, আমি মুসলমান, মানুষ একবারই মরে, হবার নয়। হাসতে হাসতে মরব, তবু ওদের কাছে ক্ষমা চাইব না। মরার আগেও বলে যাব আমি বাঙালী, বাংলা আমার ভাষা, জন্ম বাংলা। বলব বাংলার মাটি আমার মা। আমি মাথা নত করব না। প্রেক্তারের পর তিন মাস ওরা আমাকে ডঃ কামাল হোসেনকে দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কিন্তু মাথা নামাই নাই। ধরা পড়ার আগে তাজউদ্দিনকে বলেছিলাম, আমি চললাম, কাজ করে যেও। তখন জানতাম আর কিরে আসব না। তাজউদ্দিন এবং অল্প সব সহকর্মীকে আশীর্বাদ করি। তোমরা ঠিকমত কাজ করেছে।

“আজ আমি বক্তৃতা করতে পারছি না, নমো নমো নমঃ শ্রদ্ধা নম জননী জন্মভূমি। সেই জন্মভূমির

নাটিতে পা দিয়ে আমি চোখের পানি রাখতে পারি নাই। কামতাম না এই মাটিকে, এই জাতিতে এত ভালবাসি। ভাবতেই পারছিলাম না আবার আমি বাংলার মাটিতে কিরে এসেছি, বাংলার মানুষ আজ স্বাধীন। সামনে আমাদের অনেক কাজ বাকী। যেখানে রাস্তা ভেঙেছে, নিজেরাই তা তৈরী কর। একজনও ঘুর খাবা না, মনে রেখো, আমি ক্ষমা করব না। পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের বলি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন যুগা নেই। তোমরা আমাদের মা বোনদের ‘রেপ’ করেছে, ত্রিশ লক্ষ লোককে মেরেছে। তবু বলি তোমরা মৃত্যু খাও। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে সব শেষ তোমাদের সঙ্গে আর না। তোমরা স্বাধীন থাকো, আমরাও স্বাধীন থাকি। দুই স্বাধীন দেশের সঙ্গে পৃথিবীর অল্প দেশের সঙ্গে যে সম্পর্ক থাকে তাই থাকবে। তবে যারা অলস করেছে—তাদের ক্ষমা নাই। তোমরা প্রায়ের পর আমি পোড়িয়ে দিয়েছি। এমন কোন গ্রাম নাই, এমন কোন ক্যাম্প নাই, আমার লোককে হত্যা কর নাই। সেই মুজিবর বর্তমান আর নাই। আমি অসুস্থ। কিছুদিন পরে আবার বক্তৃতা দেব। কাপুরুষ, তোমরা বল মুসলমান। মনে রেখো ইন্ডোনেশিয়ার পর বাংলাদেশ দ্বিতীয় মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্র। ভারত তৃতীয়। পশ্চিম পাকিস্তান মুসলমানের সংখ্যা চতুর্থ। (বাক্সের সঙ্গে) তোমরা মুসলমান, মুসলমান মা-বোনদের ‘রেপ’ করে? কেনে রাখ বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ। গনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রই আমাদের আদর্শ।

“দাঁড়িতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। যেদিন আমি বলব সেদিনই তিনি বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতের সৈন্ত সরিয়ে নেবেন। কিছু কিছু সরিয়েও নিতে আরম্ভ করেছেন। লাড়ে সাত কোটি বাঙালীর পক্ষ থেকে আমি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে এবং তাঁর সরকারকে সুবারকবাদ জানাই। পৃথিবীর এমন কোন রাষ্ট্রপ্রধান নাই যার কাছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে বলেন নি, ‘আপনারা ইয়াহিরাকে বলুন মুজিবকে ছেড়ে

দিতে।' এক কোটি লোক মাড়ুডুমি ছেড়ে ভারতে হান নিয়েছিল। কত অল্পহ পরার্থী যারা গিয়েছে। কমা কর, আমার ভাইয়েরা কমা কর। পৃথিবীর বহুদেশ তাহে যার মোট জনসংখ্যাই দশ বা পনেরো লক্ষ। আর এক কোটি মানুষ এই বাংলা থেকে শুধু গ্রহহারা হ'য়েছিলেন। তবু বলি ভাইয়েরা, আইন শৃঙ্খলা তোমাদের হাতে নিও না। মুক্তি বাহিনীর সুবক্তেরা, তোমরা আমার প্রণাম নাও।

“ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, কর্মচারী, হিন্দু, মুসলমান, ভারতীয় জওয়ান তোমাদের সকলকে ধন্তবাদ। যে সব পুলিশ, ই পী আর, যারা মা বোন গৃহ সব ত্যাগ করে সংগ্রামে সামিল হ'য়েছিলেন, যাদের অনেকের মা বোনকে ওরা ধরে নিয়ে ক্যান্টুনমেন্টে বন্দী করে রেখেছিল, তাদের সকলকে ধন্তবাদ। বাংলার মানুষ মুক্ত হাওয়ার বাস করবে, ভাত খাবে, সুখে থাকবে এই আমার জীবনের সাধ। এই আশীর্বাদ আমাকে করবেন। আপনারা প্রাণ দিয়েছেন। বলেছেন, মুজিব ভাই বলে গিয়েছে দেশকে স্বাধীন কর, জান দাও। আপনারা জান দিয়েছেন। আল্লা আছেন তাই আমি আপনাদের কাছে ফিরে এসেছি। আমি জানি, আমার সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে কী কষ্ট আপনারা করেছেন। নয় মাস কোন কাগজ পাই নাই। কারাগারে আমাকে জানতে দেওয়া হয়নি—এখানে কী কষ্ট, কত লাহুনা। আসার আগে তুট্টো সাহেব আমাকে বলেছিলেন, দেখুন হুই অংশে কোন বাঁধন রাখা যদি সম্ভব হয়। আমি বললাম, তুট্টো সাহেব, তোমরা সুখে থাকো, কিন্তু বাঁধন টুটে গ্যাছে। আর না। তোমাদের সঙ্গে সব শেষ।

“ভায়েরা আমার, চার লক্ষ বাঙালী এখনও পশ্চিম পাকিস্তানে। আপনাদের অহুম্মাত নিয়ে একটি দাবি আমি রাখতে চাই—রাষ্ট্রসংঘ অথবা আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা থেকে ‘ইনকোয়ারী’ করতে হবে কীভাবে পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের হত্যা করেছে। আমি রাষ্ট্রসংঘের কাছে এই দাবি রাখতে চাই। ভায়েরা আমার, জানি বড়বড় শেষ হয় নাই। সাবধান করে

দিচ্ছি কেউ সে চেষ্টা ক'রো না। সেদিন এই ময়দানের সভায় বলেছিলাম, এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। বলি নাই? বলেছিলাম ধরে ধরে দুর্গ তৈরী কর। আজ বলি—ঠিক থাকো। এক থাকো। স্বাধীন স্বাধীন হ'য়েছি স্বাধীনই থাকব, ইনশা আল্লা।

“আজ আমি আর বক্তৃতা করতে পারছি না। আপনারা আমাকে দোয়া করুন। সবাই মিলে মোনাহাত করুন।

‘ভারত বাংলাদেশ ভাই ভাই। শহীদের স্মৃতি অমর হোক। জয় বাংলা।’

রমনা ময়দানের সভায় উক্ত ভাষণদান কালে অধিকাংশ সময়ই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। জনগণের ভালোবাসা দেখে তিনি শিশুর মতো কেঁদেছেন। মাঝে মাঝেই তাঁর বক্তব্যে সমর্থন জ্ঞানিয়ে বিশাল জনতা সমুদ্রের মত গর্জে উঠেছে—তাঁকেও তখন খেমে যেতে হয়েছিল, রমনা ময়দানের সভায় বঙ্গবন্ধু ৪টা ৫২ থেকে ৪টা ১২ মিনিট বক্তৃতা করেন। অতঃপর তিনি স্বগৃহে গমন করেন।

### স্বগৃহে মুজিব

তখন প্রায় সন্ধ্যা। শেখ মুজিবুর রহমান এসে পৌছলেন তাঁর ধানমণ্ডীর বাড়ীতে। এলেন অনেক হুংখ আর বেদনার স্মৃতির বোঝা বুকে নিয়ে। বিরাট খোলা মোটর গাড়িটি বাড়ির দরজার গোড়ায় এসে থামতেই সেখানে দেখা গেল এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য। বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক বাড়ি পৌছনোর অনেক আগেই সেখানে লোকে লোকারণ্য। মানুষের মেলা। অধীর আগ্রহে তাঁরা প্রিয় নেতার আগমনের প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুণাইলেন। আর সেই সঙ্গে চাকের ডালে ডালে তাঁরা নাচছিলেন, গাইছিলেন, রেস্ কোরস ময়দান থেকে শেষের গাড়ি ধানমণ্ডীর বাড়িতে পৌছতেই চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল—জয় বাংলা।

গাড়ি থেকে মুজিব নামা যাত্রা ছেলে শেখ কামাল এগিয়ে গিয়ে আঁকাকে জড়িয়ে ধরলেন। বেশ কয়েক মিনিট কাটল এইভাবে। হৃদয়ের চোখ দিয়েই তখন

বীৰভাঙ্গা বন্যার মত জল গড়িয়ে পড়ছে। তারপর মেয়ে এসে হাজির। সেও কাঁদছে। তিন জনের কান্নার মুখে কথা নেই। তারপর তাঁরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন বাড়ির বসবার ঘরের দিকে। ডানদিকে একটি দরজা। সোজা চলে গিয়েছে বেগম মুজিবের শোবার ঘরের দিকে। সেখানে অপেক্ষা করাছিলেন বেগম মুজিব এবং বজবজুর মা ও বাবা। শোবার ঘরের দরজার পাশে পাহারা দিচ্ছেলেন ভারতীয় সাক্ষীরা, যাতে সেখানে কোন অব্যাহত ব্যক্তি ঢুকে না পড়ে।

বেগম মুজিব গভীর উৎকর্ষা ও উদ্বেগ নিয়ে বেতারের ধারাবিবরণী শুনেছেন সারাক্ষণ। শুনেছেন তাঁর স্বামীর আগমন বার্তা, রেস কোরস ময়দানে তাঁর জয়। মুজিব ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই সবাই আবার কেঁদে উঠলেন। মুজিব প্রথমে বাবাকে আলিঙ্গন করলেন, তারপর জড়িয়ে ধরলেন মাকে। এর পর এসে দাঁড়ালেন স্ত্রীর সামনে। স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে গভীর পরিভ্রান্তিতে মাথা রাখলেন স্বামীর বুকে। কেঁদে উঠলেন চীৎকার করে, তারপর নিজেকে খানিকটা সামালিয়ে নিয়ে বলতে গেলেন, তাঁর এই নয় মাসের হৃৎপিণ্ডের কথা। কিন্তু বলতে শুরু করেই জ্ঞান হারালেন, খানিক বাদেই অবশ্য তাঁর জ্ঞান ফিরল। তারপর আত্মীয়স্বজন একে একে মুজিবকে আগত জানালেন।

প্রিয়জনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের পর মুজিব কিছু খেতে চাইলেন। তাঁকে দেওয়া হল এক কাপ হরালিকসু। তিনি খেলেন। বাইরে তখনও লোকের ভিড়। তাঁদের সকলের সঙ্গে দেখা করতে তিনি চলে গেলেন নিজের বসার ঘরে। তখন তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গি। অপেক্ষমান ব্যক্তিদের সঙ্গে যথাসম্ভব সংক্ষেপে কথাবার্তা শেষ করে তিনি আবার কিরে এলেন ভিতরের ঘরে। জনতার ভিড়ও কমে গেল।

“খোকা, তুই আমাকে একবার আদ্রা বলে ডাক। কতদিন তোর ডাক শুনি নি।” —ছেলেকে কোলে টেনে ওই কথা বলেন বজবজুর মা। মায়ের কোলে মাথা

রেখে কান্নার ভেঙে পড়েন শেখ সাহেব। ১৫ বছরের বৃদ্ধ পিতা শেখ লুৎফর রহমান সাহান্না দ্বিবে বলেন, “তুই আজ কাঁদাও না। তুই চেয়েছিল দেশ স্বাধীন করবি। তোর দেশ আজ স্বাধীন।” পাশে দাঁড়িয়ে বড় মেয়ে হাসিনা ও জামাই ডাঃ ওয়াজেদ। হাসিনার মন্তব্য,— “আন্দা, তুমি কত শুকিয়ে গেছ।”

অন্তঃপর শেখ মুজিব স্ত্রীর সঙ্গে এক সঙ্গে বসে ডাল, ভাত ও মাছের ঝোল খান। খেতে ঘেঁষে হুই মেয়ে— হাসিনা আর রেহানা। খাওয়া দাওয়া শেষ করে মুজিব কুর্ভা ও লুঙ্গি পরে বাড়ী থেকে বোরিয়ে আসেন। তখন অনেক রাত। ইউ এন আই-এর একজন সংবাদদাতা তখন এসেছেন বজবজুর বাড়ীতে, বজবজু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আমার রেস কোরসের বক্তৃতা কি আপনি শুনেছেন—যেখানে আমি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি?” জবাবে সংবাদদাতাটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। মুজিব তখন বলেন, “সত্যিই তিনি ওই শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য।” বেগম মুজিবকে সঙ্গে নিয়ে বজবজু হেঁটে রাস্তার ওপারে একটি বাড়িতে যান এবং সেখানেই তাঁরা রাত্রিবাস করেন।

### নতুন কর্মজীবন শুরু

পরদিন ১১ই জাহুয়ারী প্রাতে গোটা বাড়ীতেই জনতার ভিড়। সকলেই চান শেখ সাহেবকে দেখতে, তাঁর কাছে যেতে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু তা কি ক’রে সম্ভব? ন’টা নাগাদ বাড়ীতে লোকেরা অস্বরোধ জানাতে বাধ্য হলেন, বললেন: “আপনারা শুঁকে একটু সময় দিন। দাঁড়ি কামিয়ে গোসল সেয়ে নাত্তা করে নিন। তারপর নিচেই যাবেন। সকলের সঙ্গেই কথা বলবেন।” কিন্তু ক’জনে লোকটা শুনে রাকী? ইতিমধ্যে গোসল সেয়ে দরজা খুলে শেখ সাহেব বেরুতেই ওপর ভলার যারা ছিল সবাই হড়বুড় ক’রে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করল। শেখ সাহেব তখন হুহাত ছুলে বললেন:—“প্রিয় প্রিয়। আমাকে একটু তৈরী হ’য়ে নিতে দিন। তার পরেই



আমি নিচে আসছি।” ভিড় একই হালকা হলো। এগারটা নাগাদ তিনি তৈরী হলেন। ক্যাবিনেট মিটিং-এ যাবেন। জনাব তাজউদ্দিনকে সঙ্গে নিয়ে শেখ সাহেব নিচে নামলেন। প্রচণ্ড ভিড়। ভিড়ের চাপ ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে। শেখ সাহেব তখন নিজের বললেন, “আপনারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। আমাকে এক্ষণি ক্যাবিনেট মিটিং-এ যেতে হবে। আমাকে এখনই কাজ শুরু করতে হবে।” গেটের মাধ্যমে একখানা গাড়ী ছিল। শেখ সাহেব স্লোগান দিলেন, “জয় বাংলা।” সমবেত জনতাও তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ধ্বনি দিল “জয় বাংলা।” শেখ সাহেব তখন গাড়ীতে উঠে বসলেন। ডাকলেন “তাজউদ্দিন এসো।” এলেন, গাড়ীতে উঠলেন, গাড়ী ছেড়ে দিল। জনতা ধ্বনি দিল “জয় মুজিব।” শুরু হল স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রপতি মুজিবুর রহমানের নতুন কর্মজীবন।

#### প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ

বঙ্গবন্ধু অসাধারণ কর্মবীর। তাই তিনি প্রথমেই ক্যাবিনেট মিটিং-এ অস্বীকার করলেন স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে। তিনি চেয়েছিলেন সাংগঠনিক কার্যে তাঁর সর্গশক্তি নিয়োগ করতে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে সরকার চলবে কি করে? স্বাধীন রাষ্ট্র চালাবে কে? মুত্তরাং শেষ পর্যন্ত সহকর্মীদের বিশেষ অনুরোধে শেখ সাহেব প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করতে সন্মত হলেন এবং রাষ্ট্রপতি নির্গাচিত হলেন আবু সয়ীদ চৌধুরী।

#### মুজিব মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক ও সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশের অস্থায়ী মন্ত্রিসভার প্রয়োজনীয় রদ

বদলের পর, মুজিব মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক বসে ১৩ই জাম্মারী ১৩৭২। উক্ত বৈঠকে আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে প্রথমেই ছিল জাতীয় সঙ্গীত সম্পর্কিত বিষয়টি। একবাক্যে সকলেই মত দিলেন, রবীন্দ্রনাথের ‘আমার সোনার বাংলা’ হবে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। সিদ্ধান্ত হল : গানটির প্রথম দশ লাইন অর্থাৎ ‘মা তোর বদনখানি মলিন হ’লে, আমি নয়ন জলে ভাসি’ পর্যন্ত গাওয়া হবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম একজন কবির গচনা হু’টি গান হু’টি স্বাধীন দেশের জাতীয় সঙ্গীত।

এপসঙ্গীত হিসাবে নির্বাচন করা হ’য়েছে কাজী নজরুল ইসলামের ‘চল চল চল’ গানটি।

পূর্বে জাতীয় পতাকার যে রূপ ছিল আজ তার সামান্য সংশোধনের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। আগে পতাকা ছিল সবুজ রঙের। মাঝখানে রক্তবর্ণ বৃত্ত। বৃত্তের মাঝখানে বাংলাদেশের মানচিত্র সোনালী রঙের। এখন মানচিত্রটি তুলে দেওয়া হবে। এর প্রধান কারণ পতাকার মানচিত্র ব্যবহার করা সাধারণ লোকের পক্ষে অস্বাভাবিক। ব্যবহার করলেও তা প্রায়ই সঠিক হয় না।

আজকের বৈঠকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হ’য়েছে। আগাধী ১৬ই জাম্মারী রবিবার বাংলাদেশ জাতীয় শোক দিবস পালন করা হবে। ওই দিন সরকারী, বেসরকারী অফিসভবনে, বাড়িতে বাড়িতে জাতীয় পতাকা অর্ধনামিত করা হবে, জনগণ শোকাচ্ছ কালো ব্যাজ পরবেন। বিশেষ প্রার্থনা করা হবে মন্দিরে, মসজিদে, গীরজায়, সর্বত্র।

#### বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস। আমার প্রাণে বাজার বাঁশ।

ও মা, কাণ্ডনে তোর আমের বনে ভ্রাণে পাগল করে,

(মরি হায়, হায় রে) —

ও মা অজ্ঞানে তোর ভরা কেতে কী দেখেছি মধুর হাসি।

কী শোভা কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো,

কী অঁচল বিছায়েছ বটেদ মূলে, নদীর কূলে কূলে,

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে অধীর মতো

(মরি হায়, হায় রে) —

মা, তোর বদনখানি মলিন হ’লে, আমি নয়নজলে ভাসি।

এই গান প্রথম প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত “বঙ্গদর্শন”

পত্রিকার ১৩১২ সালের আশ্বিন মাসে।

## বাংলাদেশের রূপ সঙ্গীত

চল চল চল

উষা' গগনে বাজে মাদল, নিয়ে উভলা ধরনী-তল,

অরুণ প্রান্তের তরুণ দল, চল রে চল রে চল ।

চল চল চল ।

উষার হুয়ারে হানি আঘাত, আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,

আমরা টুটার তিমির রাত, বাধার বিক্ষাচল ।

নব নবীনের গাহিরা গান, সজীব কারিব মহা-শব্দান,

আমরা দানিব নতুন প্রাণ, বাহতে নবীন বল ।

চল রে নও-জোয়ান, শোন্ রে পাতিয়া কান—

বুহা-জোরণ হুয়ারে হুয়ারে, জীবনের আহ্বান ।

ভাত্রে ভাত, আগল, চল রে চল রে চল ।

চল চল চল ।

বাংলাদেশের মুজিব মন্ত্রী-সভার সদস্যবৃন্দ

১) প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান : দফতর :—  
মন্ত্রীসভা বিবরণ, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও  
বেতাব ।

২) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (প্রাক্তন অহায়া  
রাষ্ট্রপতি)—শিল্প ও বাণিজ্য ।

৩) তাজউদ্দিন আমেদ (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী)—অর্থ,  
ভূমিস্বত্ব ও পরিবহন ।

৪) ক্যাপ্টেন মনুহর আলি—যোগাযোগ ।

৫) খোন্দকার মুত্তাক আমেদ—সেচ, বিদ্যুৎ ও বস্তা  
নিয়ন্ত্রণ ।

৬) আবদুস সামাদ আজাদ—পররাষ্ট্র ।

৭) আবদুল হেনা কামারুজ্জামান—জাণ ও পুনরাসন ।

৮) শেখ আবদুল আজিজ—কৃষি, হানীয় স্বায়ত্তশাসন,  
প্রাথমিক উন্নয়ন ও সমবায় ।

৯) প্রফেসর ইউনুস আলি—শিক্ষা ও সংস্কৃতি ।

১০) জহর আহমেদ চৌধুরী—স্বাস্থ্য, শ্রম, সমাজকল্যাণ  
ও পরিবার-পরিবহন ।

১১) কণী মজুমদার—বাড় ও অসামরিক সরবরাহ ।

১২) ডাঃ কামাল হোসেন—আইন ও সংবাদ বিবরণ,  
সংবিধান-প্রণয়ন, পূর্ভ ও গৃহ নির্মাণ ।

যে-সমস্ত দফতর বটন হয়নি, সে গুলির দ্বায়ে  
আপাতত প্রধানমন্ত্রীর হাতেই থাকবে । এক

সপ্তাহের মধ্যেই মুজিব মন্ত্রীসভা সম্মুখীন হবেন ।

মন্ত্রীসভায় আরও তিনজন পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী ও কয়েকজন

উপমন্ত্রী নেওয়া হবে । প্রায় ঠিক হয়েই আছে যে,

টাকাইলের শ্রী আবদুল মানান, যশোহরের শ্রী সোহাব

হোসেন ও শ্রী সিদ্দিকীকে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করা

হবে । শ্রীসিদ্দিকী বর্তমানে জাতীয় পরিষদের  
নির্বাচিত সদস্য ।

স্বাধীন বাংলাদেশ : কয়েকটি তথ্য

নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ । জনসংখ্যার দিক থেকে

বিশ্বে এর স্থান অষ্টম । কেবলমাত্র, চীন, ভারত,

সোভিয়েট ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া ও

ব্রাজিলের জনসংখ্যা এই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের

চেয়ে বেশি ।

সীমা : উত্তরে ভারত পশ্চিমে ভারত, পূর্বে ভারত,

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ।

জনসংখ্যা : সাড়ে সাত কোটি ।

আয়তন : ৫৫১২৬ বর্গমাইল ।

জেলার সংখ্যা : ১১ ।

মহকুমা : ৫৭ ।

ধান : ৪১৭।

গ্রাম : ৩০ হাজার।

এখান নদী : পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা, ইছামতী  
ইত্যাদি।

নদীপথ : শ্রীতকালে—৩৫০০ মাইল; বর্ষাকালে—  
৪৫০০ মাইল।

ব্যবহারোপযোগী সড়ক : ২৫০০ মাইল।

রেল লাইন : ১৪০০ মাইল।

নোবন্দর : চট্টগ্রাম, ঢালনা।

নগর : ঢাকা চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ইত্যাদি।

ছোট শহর : ৮০টি।

শহরবাসী : শতকরা ১২-৫, গ্রামে বসবাসকারীর  
সংখ্যা শতকরা ৮৭.৫ ভাগ।

পশুপাল্যোগ্য দ্রব্যাদি : কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্যাদি  
এবং চামড়া।

পাটকলের সংখ্যা : ৪২, এছাড়া ২০টি নতুন পাটকল  
নির্মিত হচ্ছে।

সাক্ষর ব্যক্তিদের সংখ্যা : শতকরা ২০ ভাগ।

মাতৃভাষা বাংলা। স্বাধীনবাংলাকে এ স্বাধীন  
বিয়াল্লিশটি দেশ স্বীকৃত দান করেছে।

### বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাস্তব সত্য

বাংলাদেশের স্বাধীনতা কোন দেশী অথবা বিদেশী  
শাসকের অসুস্থকার দান কিবা। ভিক্ষা-লব্ধ বস্তু নয়, বহু  
লক্ষ বাঙালীর অমূল্য জীবনের বিনিময়ে অর্পিত বাস্তব  
স্বাধীনতা। বিপ্লবী বাংলার মূলমন্ত্র : “রাজনৈতিক  
স্বাধীনতার পথ পুণ্যবিকারিত নয়, ক্রোধের কর্তৃত্ব।”  
তাই উক্ত মহামন্ত্রে দীক্ষিত ও অসুপ্রাণিত অসংখ্য  
মুক্তিকামী বাঙালীর শোণিত সিদ্ধ স্মৃতদেহের উপর  
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন বাংলার যে পরিচয় সিংহাসন  
তা কখনও অবাস্তব বা অস্বাভাবিক হতে পারে না।  
নিঃসন্দেহে উহা হবে দীর্ঘস্থায়ী ও নিরঙ্কর, এবং  
তহুদেই আজ সমগ্র বাঙালী জাতিতে অতীতের  
সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ বিবাদ বিলম্বিত বিষ্মত  
ও একাত্ম হ’য়ে দেশ এবং জাতি পুনর্জন্মের নিমিত্ত

সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, স্বাধীন বাংলায়  
সামগ্রিক উন্নয়ন-প্রকল্প রূপায়ণে। পাক দানবগোষ্ঠীর  
বৃশস অত্যাচারের ফলে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত  
বাংলাকে পুনরায় হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং  
কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা গড়ে তুলতে হবে  
অতীতের ঐতিহ্যবাহী সেই সোনার বাংলা রূপে।  
অধিকার করতে হবে পুনরায় সকল দেশের শীর্ষস্থান  
বিশ্বের দরবারে প্রমাণ করতে হবে বাঙালী জাতি সম্পূর্ণ  
নিশ্চিন্ত হয়নি। জাতীয় ঐক্য ও মুসহাতির আদর্শ  
দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। তবেই হবে লক্ষ লক্ষ  
বাঙালীর অমূল্য জীবনের বিনিময়ে অর্জিত বাস্তব  
স্বাধীনতার পূর্ণ ও প্রকৃত সার্থকতা।

### বঙ্গবন্ধুর কলিকাতা সফর ঐতিহাসিক

ভারত সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে স্বাধীন বাংলার  
প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গত ৬ই ফেব্রুয়ারী  
কলিকাতা সফরে এসেছিলেন। দমদম বিমানবন্দরে  
তাকে সাদর স্বাগত সন্মিলন প্রদান করেছিলেন দয়ং  
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। প্রসঙ্গত  
উল্লেখ্য ইতিপূর্বে কোন রাষ্ট্রপ্রধানকে কলিকাতায় আগমন  
উপলক্ষে এরূপ সাড়ম্বর সন্মিলন প্রদান করা হয় নি।  
বঙ্গবন্ধুর সন্মিলন সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক বা  
রাজকীয়। ওই দিন সকাল সোয়া দশটায় ভারতীয়  
বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর  
রহমান ঢাকা থেকে দমদম বিমান বন্দরে এসে পৌঁছলে  
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে  
স্বাগতম জানান। শ্রীমতী গান্ধী দিল্লী থেকে যে  
বিমানে এসেছিলেন, সে বিমানটি শেষের বিমান  
পৌঁছবার পনের মিনিট পূর্বে অর্থাৎ দশটায় দমদম বিমান  
বন্দরে অবতরণ করে সুতরাং শ্রীমতী গান্ধী যথাসময়ে  
সন্মিলন প্রদানের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। বিপুল  
সন্মিলন প্রদানের পর বঙ্গবন্ধুর প্রতি প্রদর্শিত হ’ল  
সামগ্রিক অভিবাদন। গীত হ’ল বাংলাদেশের জাতীয়  
সঙ্গীত এখনে এবং পরে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত।  
পরিচিতি হ’লেন বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দরে উপস্থিত সরকারী

বেসরকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে এবং বৈদেশিক রাষ্ট্র প্রতিনিধি বর্গের সঙ্গে। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে একই হেলিকপ্টারে গিয়ে মোহন-বাগান মাঠে অবতরণ করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। সেখান থেকে মোটর গাড়ীতে রাজভবনে যাবার পথে দুই প্রধানমন্ত্রী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তখন বেলা ঠিক এগারোট। অগণিত লোকের জয়ধ্বনি: বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ, ইন্দিরাজী জিন্দাবাদ। তারপর দুই প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে মিছিল গিয়ে ঢুকল রাজভবনে দক্ষিণ ফটক দিয়ে। বাইরে জনতার বিপুল জয়ধ্বনি।

রাজভবনে পৌঁছেই দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে শুরু হল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। দুপুরে আহার ও বিশ্রামের পর প্রধানমন্ত্রীর রাজভবন থেকে মোটরে গিয়ে বিকাল ৩-১০ মিঃএ পৌঁছলেন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের জন-সভায়। উন্মোচিত জনতার প্রচণ্ড ভিড়। কত লক্ষ মানুষ সেখানে সমবেত হ'য়েছিল, তার সংখ্যা নিকরণ করা একেবারেই অসম্ভব ছিল। ৩-১৫ মিঃএ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বক্তৃতা শুরু করেন এবং বিশ মিনিটে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। অতঃপর বঙ্গবন্ধুও বিশ মিনিটে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন। দুই প্রধানমন্ত্রীর

বক্তৃতার সারাংশ, সর্বাঙ্গী, ধ্রুববাদ ও কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন এবং ভারত-বাংলাদেশ চির-মৈত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রদান ইত্যাদী।

সভা শেষে তাঁরা রাজভবনে ফিরে যান। সন্ধ্যার কর্মসূচি শেষ ক'রে, রাতের ভোজসভায়ও উভয় প্রধানমন্ত্রী যথায়থ ভাষণ দান করেন, ময়দানের সওয়া এবং রাজভবনে যে সমস্ত সঙ্গীত পাঁরবেশিত হ'য়েছিল, তার অধিকাংশই ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা বৃত্ত্যনাট্যও অহুঁঠিত হ'য়েছিল। রাত এগারোটায় প্রধানমন্ত্রীর বাবশ্রাম গ্রহণ করেন।

পরদিন প্রাতেও দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। যুক্তিবদ্ধত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের ব্যাপারে ভারত বাংলাদেশকে ঢালাও সাহায্য দেবে বলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু বলেছেন: ভারতের ঋণ বাংলাদেশ কোনদিন শোধ করতে পারবে না। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উদ্ভাবনস কয়েক কোটি টাকার জীপ, ট্রাক, এম্বুলেন্স প্রভৃতি বাংলাদেশকে দান করেন এবং তিনি দুপুরেই কলিকাতা ত্যাগ করে দিল্লি ফিরে যান। বঙ্গবন্ধু বিকাল ৩টার পর পৌরসভা কর্তৃক সম্বাদিত হন। পরদিন সকালে তিনি কলিকাতা ত্যাগ ক'রে দ্বাদশ বিমান-বন্দর থেকে ভারতীয় বিমানে ঢাকা চ'লে যান।



# আমার ইউরোপ ভ্রমণ

( ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী )

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

প্রিন্স অফ ওয়েলস, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নাগরিকভাষণে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, ব্রিটেনের লোকেরা যেন প্রদর্শনীতে আগত বিবিধ উপনিবেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেন, যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের দেশের একটি স্নেহপূর্ণ স্মৃতি বহন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন। এই প্রস্তাবটি প্রাজ্ঞজনোচিত এবং সহায়ত্বভাজক। কিন্তু ইহার নিজস্ব মূল্য যাহাই হউক, যে স্থান হইতে প্রস্তাবটি আসিল তাহার জন্যই বিশেষ করিয়া সকলে ইহাকে সর্হ্ব অভ্যর্থনা জানাইল, কারণ প্রিন্স অফ ওয়েলস—আমাদের ভাবী সম্রাট—ইংল্যান্ডের সকল শ্রেণীর লোকেরই খুব প্রিয়। তিনি খুব উদার এবং সরল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট। তাঁহাকে সবাই মনে মনে পূজা করে। আমাদের কাছে ইংল্যান্ডের সকল দিক হইতে নিমন্ত্রণ পত্র আসিতে লাগিল। সকল শ্রেণীর নিকট হইতে। সম্রাজ্ঞী ডিকটোরিয়ার নিকট হইতেও আসিল। নিমন্ত্রণের সংখ্যা এত হইল যে ইহার জন্য একটি স্বতন্ত্র রিসেপশন কমিটি গঠন করিতে হইল। পরে জানিতে পারিলাম এই নিমন্ত্রণের জন্য নিমন্ত্রিতদের মধ্যেও কিছু কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। ইহা ঘটয়াছিল ব্রিটিশ-জাত ঔপনিবেশিক লোকদের মধ্যে, এবং যাহাদের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে প্রদর্শনী অথবা উপনিবেশের লেশমাত্র সংশ্রব আছে তাহাদের মধ্যে। আমাদের অপেক্ষা ইহারা এই নিমন্ত্রণের মূল্য বেশি বুঝিতে পারিয়াছিল। পিপিউ দ্বীপপুঞ্জের প্রিন্স ল'বুর মত আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিলাম, এই সামান্য ব্যাপার লইয়া এত উত্তেজনা কেন। ক্রমশঃ আমাদের জ্ঞানচকু উদ্বীলিত হইল।

বেথিলাম আমাদের দেশের অপেক্ষা ইংল্যান্ডের লোকদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত কঠোর। আসিলে ইহা শ্রেণীভেদ।

ইংরেজ জাতিতে মূলতঃ দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। উচ্চ শ্রেণীতে জনসংখ্যা দশ হাজার, এবং এই দশ হাজার ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত শ্রেণীকে বলা হয় “সোসাইটি”, ইহাদের নিয়ম আর সবাই যাহারা সোসাইটিভুক্ত নহে, অথবা অল্প কথায় যাহারা জেনটলম্যান নহে, তাহারা নিম্ন শ্রেণীর। কিন্তু এই মূল বিভাগের মধ্যবর্তী অঞ্চলটি স্তর আছে, এবং ইহাদের মধ্যে যাহারা একটু উচ্চ পর্যায়ের তাহারা তাহাদের নিম্ন পর্যায়ের লোকদের দৃষ্টির চোখে দেখে। এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সর্বদা চেটী করিতেছে তাহাদের অব্যবহিত উপরের শ্রেণীতে স্থান পাইতে। এ বিষয়ে কিছু যোগ্যতা লাভ কারবামাত্র সে সোসাইটিভুক্ত হইতে প্রাপণ চেটী করিয়া থাকে। অর্থাৎ তাহারা ঐ সর্বোচ্চ দশ হাজারের মধ্যে নিমন্ত্রিত অতিথি হইবার দৌভাগ্য লাভ করিতে চাহে। যদি নেহাৎ দীন হীন হয় তবে সে তাহার ঠিক উপরের স্তরে উঠিতে চেটী করে। এই উদ্দেশ্য মনে মনে পোষণ করে বলিয়া ইহারা কেহই নিজেকে উপাধ'নের পরিমাণ কাহাকেও জানায় না, এবং সে যাহা নহে, তাহাই দেখাইতে সব সময় চেটী করে। অনেক দোকানদার ও দরিদ্র ব্যক্তি স্বাক্ষরিতক মতবাদে রক্ষণশীল; উদ্দেশ্য এই যে, কেহ তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিলে ভাবিবে ইহারা সম্মাননীয় এবং ধনী লোক। কারণ অভিজাত শ্রেণী সকলেই রক্ষণশীল ও ধনী, এবং ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত অপরিচ্ছন্ন লোকেরা উদার এবং সংস্কারপন্থী।

ইংরেজদের এই জাতিভেদ এই ভাবে প্রকাশ করা যায়—(১) রাজপরিবার ও প্রাচীন উচ্চ অভিজাতদের সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ, (২) প্রাচীন অভিজাতদের নিম্ন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ, (৩) অভিজাত বর্গের উপাধিহীন আত্মনির্ভর আত্মীয় স্বজন, এবং যাহারা অধুনা উপাধি লাভ করিয়াছে এবং ধনী বণিকগণ যাহারা অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে, (৪) অভিজাত শ্রেণীর নিকট-আত্মীয়গণ যাহাদের নিজস্ব কোনও উপার্জন নাই, এবং যাহারা উত্তরাধিকার লাভ করিবার অপেক্ষা রাখে অথবা যাহারা লাভজনক বিবাহের অপেক্ষা করিতেছে। ইহারাই সপোষ দশ হাজারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি। যে সব ব্যক্তি রাজপরিবারে জন্মায় নাই, যাহারা রেস কোর্সে, থিয়েটারে, চিত্রশিল্পে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, অথবা সরকারি চাকরিতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে তাহাদিগকে ইহার প্রথম শ্রেণী পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা, আপ্যায়ন করিয়া থাকে। সোসাইটি বহির্ভূত লোকেরা অগণিত জাতিতে বিভক্ত, প্রধানতঃ অর্থের পরিমাণ বিচারে। জন্মসূত্রেও কিছু পরিমাণ নিচায় হইয়া থাকে। হিন্দুদের মতই ইংরেজরা নিম্ন জাতির সঙ্গে একত্র পানাহার করে না, বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় না। এবং আমাদের পবিত্র ব্রাহ্মণরা যেমন করে, তেমন নিষ্ঠাবান্ অভিজাত ইংরেজরাও কোনও উপলক্ষে নিম্ন শ্রেণীর ইংরেজের সংস্পর্শে আসিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। অপবিত্রতা দূর করিবার জন্ত অনেক সময় তাহারা স্নগন্ধ মিশ্রিত ভলেও স্নান করে। একবার এক ভদ্র লোককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। জিবাহুরের ব্রাহ্মণ যে কারণে একজন অশ্লীল পুলিস্যাকে হেঁয় না, তিনিও সেই একই কারণের কথা উল্লেখ করিলেন। পানাহার বিষয়ে অবশ্য উহাদের আমাদের মত ছুঁৎমার্গ নাই, কারণ ও দেশে ধর্ম এ রকম বিধান দেয় নাই। হোটেলের ইংরেজ ব্রাহ্মণ ইংরেজ ব্রাহ্মণেতরের সঙ্গে খাইতে পারে, জাহাজে অথবা অভ্রমণে—মোট কথা যেখানে না পারিয়া উপায় নাই। তবু এ সব হলেও সে বখাওত্ব দূর করিয়া চলিবে। যাত্রী জাহাজে

সে অল্পকালের মধ্যেই নিজেকে দলের লোক খুঁজিয়া লয় এবং তাহারা পৃথক দল গঠন করে। নিম্ন শ্রেণীর ইংরেজের সঙ্গে এরূপ ক্ষেত্রে মিশিলে ইংরেজ ব্রাহ্মণ জাতিভেদ হয় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সে তাহাদের দলে খুব স্বাধীনভাবে মেশে না। মিশিলে তাহার স্তরের লোকেরা তাহাকে নিচু নজরে দেখিবে। দাঁতব্য উদ্দেশ্যে উচ্চস্তরের মহিলা অথবা ধর্মজীবীদের নিঃসম্মল লোকদের বাড়িতে যাওয়া অবশ্য নিষিদ্ধ নহে।

আন্তঃশ্রেণিক বিবাহ আচলনীয়, কিন্তু ব্যতিক্রম আছে। যদি কোনও নূতন ধনী হওয়া বণিক সোসাইটিতে উত্তীর্ণ হইতে চাহে, এবং কোন দরিদ্র ইংরেজব্রাহ্মণ বিবাহসূত্রে অর্থ লাভ করিতে চাহে, তাহা হইলে আন্তঃশ্রেণিক বিবাহ ঘটয়া থাকে। কল্যাণ ও তাহার আত্মীয়গণ তখন সোসাইটিতে গৃহীত হয়, যদিও সম্পূর্ণ বিনা আপত্তিতে নহে। অবশ্য পরবর্তী বংশের লোকেরা স্বতঃই সোসাইটি-ভুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর মেয়েকে বিবাহ করিল, অথচ তাহার টাকা নাই, এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহভেদ বড়ই দৃষ্টান্ত। তাহার ঘাড়ে জাতিচূড়তির খড়্গটি নামিয়া আসিতে বিলম্ব হয় না। আমাদের দেশে ধর্মীয় প্রতিভুলতা আছে থাকিয়া ও বিবাহের ক্ষেত্রে, কিন্তু ভ্রাতৃত্ব বোধে নাই। এ ক্ষেত্রে উচ্চ নীচ ভেদ নাই। ইংল্যান্ডে সেরূপ নহে। সেখানে দুই জাতির মধ্যে ভালবাসাও নাই, স্বগাও নাই। উচ্চ সেখানে নীচকে সোজা হুজি অগ্রাহ্য করিয়া চলে। সে তাহার কথা চিন্তাও করে না, তাহার অভিমতকে স্বীকারও করে না, শুধু ভোট ভিক্ষার সময় তাহাকে স্মরণ করিতে হয়। যাহাদের পূর্বপুরুষ উইলিয়াম দি কংকরাব-এর সঙ্গে ব্রিটেনে আসিয়াছিল, এবং সে সময় সেখানকার জমির পূর্ব মালিকের নিকট হইতে জমির স্বত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহারাই ইংরেজ সোসাইটিতে প্রথম শ্রেণীর লোক। পরে যে সব লোক নানা দিক হইতে বড় হইয়াছে, তাহারও ক্রমে সোসাইটিভুক্ত হইয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। শিক্ষার প্রসার, সমস্ত শ্রেণীর লোকের তত্ত্ব অর্থ হুড়াইয়া পড়া, উদার আইনের

দক্ষ সকলের পক্ষে অধিক ধনলাভ সহজ হওয়ায় অভিজাতদের ক্ষমতা ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে, এবং তাহাদের স্বাতন্ত্র্যও ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

তৃপ্তির নিয়ম শ্রেণীর সঙ্গে সম্মতি অভিজাতদের স্বতন্ত্র মিশ্রণ পুনঃ পুনঃ ঘটতে এখন এমন হইয়াছে যে, সাধারণ শ্রেণীর মানুষ এখন লর্ড সভার সভ্য হওয়ার ব্যাপারটা খুব সম্মানজনক কি না এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করিতেছে। পুরাতন জাতিভেদ প্রথা ভারতেও যেমন ইংল্যান্ডেও তেমনি ভাঙিয়া পড়িতেছে—কারণ উভয়ই এক, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার। অবশ্য হুটি দেশেই উচ্চ জাতিকে সম্মান করার রীতিটি এখনও প্রবল আছে। অতএব প্রাসাদ হইতে যে নিমন্ত্রণ আসিল, তাহাতে ঐগনিবোধিকগণ ও ভারতীয়গণ রাজপরিবারের এই অবনমনে তাহাদের আতিথেয়তা লাভে ব্যগ্র হইয়াছিল স্বভাবতঃই। আমরা অন্ততঃ এই আতিথেয়তা না পাইলে ইংরেজ জীবনের সঙ্গে এতটা পরিচিত হইতে পারিতাম না।

১৮৮৬ সনের জুলাইয়ের প্রথম দিকে আমাদিগকে উইন্ডসর কাস্টলে লাক্ষের নিমন্ত্রণ হইল। পত্রটি এই ভাবে লিখিত ছিল—

“The Lord Steward has received Her Majesty's command to invite,—’ to luncheon at Windsor Castle on Monday, the 5th of July at 2 o'clock.”

কার্ডের বিপরীত দিকে কি পোষাকে আসিতে হইবে তাহার নির্দেশ দেওয়া ছিল। যথা, মহিলাগণ মনিং ড্রেস পরিবেন, শুভ্রমহোদয়গণ ঈভনিং কোট, মনিং ট্রাউজার্স, তৎসহ শ্রেণী-পরিচায়ক চিহ্ন ও সম্মান-চিহ্নাদি। আরও ছিল “the Court will be in mourning.” (রাজপরিবার ও পদস্থ কর্মীগণের শোক-চিহ্ন ধারণ করা থাকিবে।)

এই জুলাই সকাল দুইটা জিশ মিনিটের সময় উবার আলো ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আরও পরে পূর্বাকাশে সোনার রং দেখা দিল। সুপ্র লণ্ডন শহরের উচ্চ চিমনিগুলি প্রথম রং গ্রহণ করিল।

জান্নালা দরজা বন্ধ, রাজপথ জনশূন্য, শুধু জাগ্রত পুলিশের লোক বাটে কিরিতেছে, কিংবা কোনও গৃহহীন কাহারও দরজার ধাপ হইতে জাগিয়া হাই তুলিতেছে ও হাত টান করিয়া আড়মোড়া ভাঙিতেছে। ক্রমে সেই স্বর্ণাভা সর্বত্র নিজেকে বিস্তার করিয়া সমস্ত অন্ধকার দূর করিল। শুধু পাখীর ডাক শোনা যাইতেছে, লণ্ডন তখনও সুপ্র। লণ্ডনে তখনও রাত্রি। সাড়ে চারিটা বাজিল। ক্রমে পথে বুটের আওয়াজ শোনা যাইতে লাগিল, একটি দুইটি করিয়া পরে রাজপথ পদশব্দে মুখারিত হইল। মধুর সন্ধানে এই সব মোমাহিদের যাইতে হইবে ত। ফুলের পাপাড়ি খুলিয়াছে, হাওয়ায় সুগন্ধ, অতএব কাজ আরম্ভ কর।

মধু মক্ষিকার সঙ্গে তুলনা (যদি আদৌ তুলনা চলে) ওদেশে করিয়া থাকে, ওদেশের পক্ষে যোগ্য তুলনা সন্দেহ নাই। সব ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে সময়ের একটি সুক্লান্ত উহার বাজে নষ্ট করে না। প্রয়োজনের চাপে বিশ্বাসেরও অনেকখানি অংশ উহারে কাজের হাত সমর্পণ করতে হয়। ওখানকার প্রত্যেকটি নবনারী মক্ষিকার মতই কর্মবাস্ত। কয়েকটি ড্রোন (অলস পুরুষমাককা, অল্পের প্রেমের ফলভোগী) কর্মহীন অলস প্রকৃতির লোকদের ক্ষতি অল্পদের পরিপ্রামের কলে পূরণ হইয়া যায়। কিছু সংখ্যক লোর্ড ও জেনটলম্যান ব্যতীত প্রত্যেকই কাজ করে, এবং কাজ করে সাধারণতঃ সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত এবং আমরা যেভাবে কাজ করি তাহা হইতে ইহা পৃথক। এখানে আমরা ধীরে স্নেহে মধুর গতিতে কাজ করি, উহার ওদেশে সময়ের পিঠে যেন চাবুক মারিয়া চালায়। সেখানে বহলক্ষ যন্ত্রের হাতের সঙ্গে চারি কোটি মানুষের হাত যুক্ত হইয়া জমি চাষ করে, হাতুড়ি চালায়, শেলাই করে, বয়নের কাজ করে—দিনে রাতে অবিরাম। যাহা উৎপন্ন হয় তাহা যে জমিটুকুর উপর বনীভূত করা হইয়াছে, সেই জমিটুকুর নাম দেওয়া হইয়াছে ব্রিটেন। আর আমাদের দেশে, আবহাওয়া এবং দৈহিক সামর্থ্যগত অসুবিধার কথা ধরিলেও শুধু

কি করিয়া শ্রমকে লাভবান করা যায় সে জ্ঞানের অভাব এবং বয়স্কদের কর্মবিমুখতায় খুব কমিয়া হিসাব করিলেও প্রতিদিন ১৬ কোটি শ্রম-ঘণ্টা নষ্ট হয়। ঘণ্টায় এক পয়সার শ্রম নষ্ট হইলেও প্রতিদিন পঁচিশ লাখ টাকা আর কম হইতেছে। অল্প কথায় এই অলস হাতগুলিকে যদি কর্মভংগুর হইতে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহারা আশি দিনের কাজে ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের মত একটি রেলপথ গাড়িয়া তুলিতে পারে। স্বর্ণমন্ডের জাগরণকারী ভাবগুরুভারী এখন কোথায় গিয়াছেন? বর্তমানে তাঁহাদের কেহ কি আমাদের ভিতর আবির্ভূত হইয়া সভ্য মানবের মত জীবন কাটাইবার উপায় বলিয়া দিতে পারেন না? আমাদের কি শিক্ষাইতে পারেন না যে, অলসতা পাপ, এবং কাজ করা পুণ্য এবং ইহাই পার্থিব বহু ধর্ম ফুলাইয়া দিতে পারে এবং স্বর্গে যাইবার অন্তিমাত্র-পত্র দিতে পারে? অথবা বিত্তহীন লোকদের নিকট হইতে অর্থ উপায়ের নূতন নূতন বুদ্ধি না খাটাইয়া ইহাদের নিকট তাহার বিনিময়ে শ্রম লইলে তাহা হয়? এই শ্রম তাহারা অব্যবহারে নষ্ট করে। ইহা ঘরা শড়ক, রেলপথ, কুপ, পুষ্করিণী, খাল করািয়া লওয়া যায়, এমন সমাজে, যেখানে জনসাধারণ ঠিক পথে চিন্তা করিতে জানে না, সেখানে পিটার দি গ্রেটের মত একজন শাসক দরকার, যাহার হুকুম আইনের কাজ করবে এবং যাহাতে পাল্লিমেন্টের নিকট হইতে কোনও বাধা আসিবে না, খবরের কাগজের অর্থহীন চিৎকার থাকিবে না। তাহা হইলে নিয়মতান্ত্রিক সরকার যাহা করিতে একশত বৎসর লাগায় তাহা করিতে দশ বৎসর লাগিবে। জাপানের কথা ভাবিয়া দেখুন না?

একটি এঞ্জিন ভূগর্ভস্থ রেলস্টেশনের শেড হইতে খুব ঘেন আনিচ্চার সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল, এবং শানটিং করিয়া শ্রমিকদের জন্য গাড়ি জুড়িয়া ফেলিল। প্রাটকরমের উপর বুকস্টলের লোকেরা আসিয়া হাজির হইল, শ্রমিকেরা পেনি খরচ করিয়া সকালের সংবাদপত্র কিনিতে লাগিল। বাহিরে চাকার ঠেলা ককি-স্টল আসিল। তাহাতে পাশাপাশি দুইটি বড় গায়ে জল ফুটিতেছে। একটি কাঠের বোডে শতা

দ্বামের অনেক কাপ ও সসারের ঠুন ঠুন শব্দ হইতেছে। ব্যস্ত-সমস্ত লোকেরা স্টল ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ককি গিলিতে লাগিল, এবং শেষ হইলে একটি করিয়া পেনি রাখিয়া যে যাহার মত চলিয়া গেল। ছেলেরা খবরের কাগজ হাঁকিয়া যাইতেছে পথে পথে, দুধওয়ালী কড়া সুরে চিৎকার করিতেছে, ভৃত্যেরা দরজা পরিষ্কার করিতেছে, পিতলের কবজাগুলি ঘিরিয়া বকবক করিতেছে, ধাপগুলি সাবান জলে ধুইয়া ঘিরিয়া পরিষ্কার করিতেছে। দোকানীরা দোকান খুলিয়া ধূলা কাড়িয়া বিক্রয় দ্রবদি সাজাইয়া রাখিতেছে। সাতটার মধ্যে শ্রমিক লগুন জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা গত রাত্রির ডিনার এবং বলনাচের ক্লাস্তিবশত এখনও ঘুমাইয়া আছে। তাহারা দশটার আগে বড় একটা বিছানা ছাড়ে না। ঐপনিবেশিক আগন্তকেরাও নিমন্ত্রণে যোগ দিয়া ক্লাস্তি তাহারও শুইয়া আছে।

সম্রাজ্ঞী কর্তৃক ব্যবহৃত স্পেশাল ট্রেন আমাদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই ট্রেন প্যাডিংটন স্টেশন হইতে অপরাহ্ন একটার সময় যাত্রা করিল। উইন্ডসরে রাজকীয় বাহন প্রস্তুত ছিল, আমাদের সঙ্গে লইয়া সেন্টাল ক্যাসল-এর দিকে রওনা হইল। সার বাড'উড তাঁহার স্বভাবাসঙ্গ সঙ্গদয়তা বশতঃ ইণ্ডিয়া অফিসের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে মিষ্টার ফিটজেরাল্ড নামক এক পলিটিক্যাল অফিসারের তত্ত্বাবধানে রাখিলেন। তিনি সার সেমুর ফিটজেরাল্ডের ভাই। আমাদের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। উইন্ডসরের পথগুলিতে নানাদেশের অতিথি-দিগকে দেখিবার জন্য লোকের ভিড় হইয়াছিল খুব, কিন্তু তাহারা স্তব্ধ ছিল। ক্যাসলের দিকে যত অগ্রসর হইতোঁছি, ততই একের পর এক হর্ষধ্বনিতে আমাদের সঙ্গে অত্যাধিক জ্ঞান হইতেছে। আমরা ভারতীয়রা সর্বাপেক্ষা অধিক হর্ষধ্বনি লাভ করিয়া-ছিলাম। প্রদর্শনীয় সংগ্রহের বাইরে যাহারা রাজ-নিমন্ত্রণ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা—নরসিংগড়ের রাজা, গণ্ডালের ঠাকুর সাহিব, গাইকোয়াড়-



রাক্ষসের ভ্রাতা সম্পত্তি বাও এবং দুইটি অকলের এক মুসলমান নরপতি। আমাদের গাড়ি হাই স্ট্রীট হইয়া, সপ্তম হেনরি গ্রেট দ্বিরা স্টেট অ্যাপার্টমেন্টে উপস্থিত হইল। উপস্থিত অভ্যাগত-গণকে “জম্মাদিন বহি” বা বার্থ ডে বুক-এ স্বাক্ষর করিতে বলা হইল। বইখানি সুন্দর ভাবে বাঁধাই করা, প্রতি পৃষ্ঠায় তারিখ ছাপা। প্রত্যেকে যিনি যে তারিখে জম্মিয়াছেন সেই তারিখের পাতায় নাম স্বাক্ষর করিলেন। স্বাক্ষর গ্রহণের ‘বহি’ হইতেই ইহার জন্ম, এবং এরকম বই অনেক গৃহেই আছে। জানি, কাংগ অনেকের বাড়িতেই এরকম স্বাক্ষর করিতে হইয়াছে। এবং শুধু ইংরেজীতে নহে, স্বদেশী ভাষাতেও করিতে হইয়াছে। ইহার পর লোভনীয় সব খাদ্য পরিবেশন করা হইল। লান্চে পরে পরিচয়, অভ্যর্থনা ইত্যাদির পালা আরম্ভ হইল। প্রিন্স অভ ওয়েলস সবাইকে একে একে সম্রাজ্ঞীর কাছে পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রিন্স অভ ওয়েলস দণ্ডায়মানা সম্রাজ্ঞীর দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইলেন, প্রিন্সেস অভ ওয়েলস বাম দিকে দাঁড়াইলেন, পরিবারের অন্তর্গত সকলে পিছন দিকে দাঁড়াইলেন। যোষক এক-একটি নাম উচ্চারণ করে, সে ঐ কক্ষ প্রবেশ করিয়া সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়ায়। সুব্রাহ্মণ্য তখন ঐ আতিথ্যের পরিচয় সম্রাজ্ঞীকে শুনাইয়া দেন। তৎক্ষণাৎ আতিথ্য মাধানত করিয়া আভিবাदन জানায়। এবং ইহার পরেই রীতি অনুযায়ী সেখান হইতে সরিয়া যায়, তখন সেখানে আর একজন আসিয়া দাঁড়ায়। ভারতীয়দের প্রতি সম্রাজ্ঞীর সদয়ভাব লক্ষ্য করিলাম। ইহার পরে অল্প সময়েও ইহা লক্ষ্য করিয়াছি। অস্থান শেষ হইলে আমরা ক্যাসল-এর সমস্ত অংশ দেখিবার সুযোগ পাইলাম। সোদিম ভবাকার সমস্ত কক্ষ আমাদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

স্টেট অ্যাপার্টমেন্টগুলি সম্রাজ্ঞী উইন্ডসর ক্যাসল-এ না থাকিলে সপ্তাহে চারিদিন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বৎসরের অধিকাংশ সময়ে তিনি

স্কটল্যান্ডের ব্যালমোরাল ক্যাসল অথবা (ওয়াইট হাউসের) অস্বোন্ হাউসে বাস করেন। উইন্ডসর ক্যাসল-এর অ্যাপার্টমেন্টগুলিতে কক্ষ আছে দশটি। ইহার নাম কুইনস অডিয়েন্স চেম্বার, কুইনস প্রেজেন্স চেম্বার, গার্ড চেম্বার, সেক্রেটারি হোল, গ্র্যান্ড রিসেপশন রুম, ওয়াটারলু চেম্বার, গ্র্যান্ড ডেস্টিনেউল, স্টেট অ্যান্ডি রুম, জুকারোল রুম, এবং ড্যানডাইক রুম। কক্ষগুলির সিলিং-এ শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা কাহিনী-চিত্র, প্রাচীর-সমূহে মূল্যবান পর্দা ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের চিত্র রহিয়াছে। অডিয়েন্স চেম্বারের সিলিং-এ ক্যাথারিন অভ ব্রাগানজা, দ্বিতীয় চার্লস-এর রাণী (ব্রিটানিয়া রূপে চিত্রিত): তিনি একটি শকটে বসিয়া আছেন, রাজহাসেরা সেটিকে ভাঙুর মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সঙ্গে চলিতেছেন প্রাচীন দেবতাপ্রণ—সিরিস, ফ্লোরা, পোমোনা ইত্যাদি। প্রাচীরে তিনটি পোবেলিন (বা পোবল্যা) পরদা, তাহাতে ওলড টেম্‌স্টোমেন্ট বর্ণিত এসথারের ইতিহাস চিত্রিত রহিয়াছে। দরজার উপরে মেরি, কুইন অভ স্কটস-এর পূর্ণাবয়ব চিত্র টাঙানো আছে, চিত্রের পটভূমিতে মেরির হত্যা দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে। এই হত্যা দৃশ্যের নিচে যে ল্যাটিন লিখনটি আছে তাহার অর্থ—“রাজ্ঞী—যিনি নৃপতিদের কন্যা, সহধর্মিণী এবং মাতা, তাঁহাকে জল্পাদের কুঠাখাঘাতে হত্যা করা হইয়াছে। প্রথমে দুটি আঘাতে তাঁহাকে নিষ্ঠুর ভাবে আহত করা হয়, তৃতীয় আঘাতে তাঁহার শির দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই হত্যা দৃশ্যে কুইন এলিজাবেথের কমিশনার ও অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।” চিত্রের উপরের কোণে আরও একটি লিখনে বলা হইয়াছে—“মেরি কুইন অভ স্কটল্যান্ড—স্মারক: ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী, গ্রেট ব্রিটেনের নৃপতি জেমস-এর মাতা, নিজের লোকদের ধর্মবিশ্বাস-বিশ্ববোধিতার ফলে উন্মুক্ত এবং বিদ্রোহীদের দ্বারা পরাভূত হইয়া ১৫৬৮ সনে ইংল্যান্ডে আসিয়াছিলেন আশ্রয় লাভের আশায়। তাঁহার আত্মীয়া কুইন এলিজাবেথের কথার বিশ্বাস করার ফলে,

তাহাকে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা ১১ বৎসর কারাগারে কাটাতে হয়, হাজার অপবাদে তাহার নাম কলঙ্কিত করা হয়, তাহার পর ধর্মমত-বিরোধিতার অজুহাতে ও বিরোধীদের উদ্ভানিতে ইংলিশ পার্লামেন্টের নির্মম বিচারে তাহার চরম দণ্ড বিধান হয়, এবং তিনি হত্যাকাশীদের নিকট প্রেরিত হন। ১৫৮৭ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারি একটি সাধারণ জজ্ঞাদের হাতে ৪৫ বৎসর বয়সে তাহার শিরহিয় করা হয়।” ইহার ইতিহাস পড়িলে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

কুইন'স প্রেজেন্স চেম্বারের সিলিং-এও রূপক চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। আর্কিয়াদেন নেপলস-এর চিত্রকর আর্কোনিও ভেরিও। দ্বিতীয় চার্লস তাহাতে ইংল্যাণ্ডে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন। এ চিত্রেও কাথারিন প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। একটি চম্পাতপ তাহার মাথার উপরে, জেফির বা পশ্চিমবাহিত মধুর বাতাস তাহা শূভে ধরিয়া রাখিয়াছে, মহাকাল সেটিকে ওখানে বিছাইয়া দিয়াছে। ইহার নিচের চিত্রে জায়-বিচার রাজদ্রোহিতা ও অশান্ত অন্তঃ প্রেতদেহকে বিভাঙিত করিতেছে। প্রাচীরের গোবল'য়া পর্দায় এসম্বারের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা আচ্ছন্ন হইয়াছে। গার্ড চেম্বারে খুন্দের স্বারকল্পে বহু চিত্তাকর্ষক অশ্রুশ্রু সাজিত রহিয়াছে। ট্রাকালগার নৌ-খুন্দের ভিকটোর নামক যে কাহাজিট গোলাবদ্ধ হইয়াছিল তাহার শাস্তলের (কোরমাস্টার) একটি অংশ এখানে রাখিয়াছে। এ নৌ-খুন্দের আর একটি দৃষ্টি একটি 'বারশট', ইহা এ কাহাজেরই আটজন লোককে নিহত করিয়াছিল। শিখদের নিকট হইতে প্রাপ্ত দুইটি কামানও সেখানে রাখিয়াছে। লেক জর্জের হলটি বেশ বড়, ২ • ফুট দীর্ঘ এবং ৭৪ ফুট প্রস্থ। ইহার সিলিং প্রথম অর্ডার অফ দি গার্টার প্রচলনের সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ শিভালার সময় হইতে বত বকম অল্প ব্যবহৃত হইতেছে

তাহা চিত্রিত রহিয়াছে। এই 'অর্ডার' ভূক্ত বাবতীর 'নাইট'দের নামও জানালাগুলির প্যানেলে লিখিত আছে। তৃতীয় এডওয়ার্ড ও ব্ল্যাক প্রিন্স (তৃতীয় এডওয়ার্ডের এক পুত্র) হইতে আরম্ভ করিয়া আর্ল অফ বিকনসকিল্ড ও মার্কুইস অফ স্যালিসবারি পর্যন্ত সবার নাম। প্রাচীরগুলিতে রাজাদের নাম—প্রথম জেমস হইতে চতুর্থ জর্জ পর্যন্ত। এ্যাণ্ড রিসেপশন রুমটি বিশেষ ভাবে অলঙ্কৃত। প্রাচীরগুলিতে বে গোবল'য়া পর্দা আছে, তাহাতে জেমস ও মিডবার কাহিনী চিত্রিত রাখিয়াছে। ওয়াটারলু চেম্বারে রাখিয়াছে ওয়াটারলু যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত বাবতীয় রাজা যোজা ও রাজনীতিক ব্যক্তিদের কর্মফলে এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল তাহাদের সকলের প্রতিকৃতি। নেপোলিয়নের প্রতিকৃতি এখানে নাই, কিংবা তাহার অধীন যে সব ফরাসী জেনারেল খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতিকৃতিও অল্পপরিমিত। এ্যাণ্ড ভেস্টিবিউলে সামরিক বিজয় গৌরবের বহু চিত্র, বর্ষ প্রভৃতি রাখিয়াছে। একদিকে বোয়েহ্ন নামক ভাস্করের নির্মিত সম্রাজ্ঞীর 'শার্প' নামক কুকুরসহ প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত রাখিয়াছে। স্টেট অ্যাশ্টি রুমের সিলিং-এ পূর্বে উল্লিখিত ভেরিও নামক নেপলসের শিল্পী অঙ্কিত খুব ক্ষুণ্ণযুক্ত দেবতাদের চিত্র রাখিয়াছে। দেবতাদের এটি রাজকীয় ডিনার, খুব জাঁকপূর্ণ। সিলিং ও প্রাচীরের সংযোগস্থলের খিলানে মাহ ও বুর্গার চিত্র। ফ্রোবেরগের শিল্পী জুকারেলির নামে যে কক্ষটি, তাহাতে এই শিল্পীর অঙ্কিত চিত্র রাখিয়াছে। উল্লেখযোগ্য দুই-খানি ছবি—“দি মীটিং অফ আইজাং অ্যাণ্ড বেবেকা” ও “দি ফাইনিং অফ মোজেস”। আর এক বিখ্যাত শিল্পীর নামের কক্ষে ২২ খানি প্রতিকৃতি রাখিয়াছে। এটি শেষ কক্ষ—শিল্পী ভ্যানডাইক।

ক্রমশঃ



পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত

“ত্রিপুরা” সাপ্তাহিকে প্রকাশ :

স্বাধীনতা লাভের সময় যে ত্রিপুরা রাজ্য ছিল একটি ছোট সামন্ত রাজ্য, কালক্রমে প্রগতির পথে পদযাত্রা করিয়া বিবর্তনের মাধ্যমে হইল “গ” শ্রেণীর রাজ্য ; পরে টেরীটরী, আজ উন্নীত হইয়াছে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে। পূর্ণ ক্ষমতাবান্ তার বিধান সভা ও মন্ত্রিপরিষদ। সেই মন্ত্রিপরিষদের মুখ্যমন্ত্রী হইলেন ত্রিপুরা রাজ্যের ধ্যান্ডিমান্ অকৃতদার রাজনৈতিক ধুরন্ধর শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত। বর্তমান বয়স তাঁহার ৫১ বৎসর। রাজনৈতিক জীবনের সূত্র হয় ছাত্র জীবনে ১৯০৮ সালে মাত্র বিশ বছর বয়সে। প্রথমে ছিলেন বিপ্লবী দলে, পরে গান্ধীবাদী অহিংস কংগ্রেসী। আজ নব কংগ্রেসী তথা ইন্দিরা পক্ষী কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হইয়া ত্রিপুরার—পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত।

গত ২০শে মার্চ অপরাহ্ন বেলা সাড়ে চারি খটিকায় ত্রিপুরার সুব্রম্য রাজত্ববনে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীসেনগুপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর পদে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ বাক্য পাঠ্য করান রাজ্যপাল শ্রীবি কে নেহেরু। ত্রিপুরার সরকারী ভাষা যেহেতু বাংলা, উক্ত সরকারীভাবে চালু না হইলেও শ্রীসেনগুপ্ত এই দিন শপথবাক্য বাংলাতেই পাঠ করেন। এই দিন আর একজন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন, তিনি হইলেন আদিবাসী সদস্য শ্রীহারিচরণ চৌধুরী। বিধান সভার সভ্য হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করেন প্রাক্তন বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক।

### ইতিহাসের বিকৃতি

তৎকালীন পত্রিকায় রাজা রামমোহন রায় সৰ্বদে কোন ইতিহাসবিদের সাম্প্রতিক অপপ্রচার সৰ্বদে লিপিত হইয়াছে :

রামমোহন জন্মদিশতবার্ষিকীর প্রাকালে রামমোহনের সর্বতোমুখী মানবমুক্তির আদর্শের অম্লরাগীগণকে যে একটি নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। রামমোহন তাঁহার জন্মদিশাহীন বলিষ্ঠ আদর্শবাদ দ্বারা সমাজের সকল প্রকার জড়তা ও কায়েরী স্বার্থের মূলে কুঠারাবাত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম মনীষা ও বিশাল কর্মকাণ্ডকে সমগ্রভাবে দেখিবার প্রচেষ্টা না করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে—তাঁহাকে কখনও সমাজ-সংস্কারক, কখনও উদার ধর্মপ্রবক্তা, কখনও প্রতিভাশালী সুপণ্ডিত গবেষক, আবার কখনও বা কৃটবুদ্ধি রাজনীতি-বিদ মনে হওয়া নিচিত নহে। ইহাকে দৃষ্টিবিভ্রম না বলিয়া দৃষ্টির সংকীর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা বলা যাইতে পারে। বহু-কোণ-বিশিষ্ট হীরকখণ্ডের স্তায় তাঁহার প্রতিভাও বহুমুখী ছিল এবং ইহার সকল দিক হইতেই বিভিন্ন সময়ে আলোক বিচ্ছুরিত হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এই বিশিষ্টাংশ একটি মূল জ্যোতিঃকেন্দ্র হইতে জাত। তাঁহার সকল চিন্তা ও কর্মের মূলে একটিই প্রেরণা ছিল, —তাহা তাঁহার আঁচল ব্রহ্মহুত। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাক্তন ব্রহ্মবদ্গণের ভুলনায় তাঁহার বৈশিষ্ট্য এইখানেই যে, ব্রহ্মজ্ঞান তাঁহাকে পৌকিক জগতের প্রতি বিমুগ্ধ করে নাই। সমাজের অভ্যাস, অভ্যাসের, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামে ইহা তাঁহাকে উদ্ধ করিয়াছে। সেই জন্যই তাঁহার চিন্তা নিহক বাহু সমাজসংস্কারকে অতিক্রম করিয়া নানা সমস্তার মূলে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল এবং তিনি বালিতে পারিয়া ছিলেন : “The struggles are not merely between the reformers and anti-reformers, but between liberty and oppression throughout the world ; between justice and injustice ; between right and wrong.” এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীই রামমোহনের প্রতিভার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং এইখানেই তাঁহার সমসাময়িকগণের সহিত তাঁহার

প্রভেদ। গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য, ব্রহ্মাঙ্গর বিদ্যালকার, রামরাম বহু, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির ভুলনা তাঁহার সাহিত্য হহতেই পারে না। তাঁহার অম্লরাগীমণ্ডলীতেও অথবা ডিরোজিওর শিল্পদলে প্রতিভার ও কল্যাণবুদ্ধিতে তাঁহার সমকক্ষ দূরে থাকুক তাঁহার নিকটবর্তীও কেহ ছিলেন না। এমন কি তদানীন্তন পাশ্চাত্য জগতও তাঁহার প্রতিভার বিস্মিত হইয়াছিল—এবং ইংলণ্ডে তাঁহার উপস্থিতিতে সম-সাময়িক ইংরেজী বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কগণ সোক্রাটিস প্রেটো বা আরিসটটলের উপস্থিতির স্তায় অতুলনীয় ঘটনা মনে করিয়াছিলেন।

বাঁহার মূল আদর্শ ব্রহ্মভূতির ভিত্তিতে সর্বজীবে ব্রহ্মের প্রকাশ অম্লভব-পূর্ণক মানব-কল্যাণের নিমিত্ত অবিরত সংগ্রাম—প্রতিক্রিয়া ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিগণ যে তাঁহাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিবেন ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় অজ্ঞতা ও ভগ্নামী, অর্থনৈতিক শোষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁহার বজ্রনির্ধোষ প্রাচীনপন্থী সমাজের ভিত্তিমূল কাঁপাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং বিবেকানন্দের ভাষায় বাঁহার 'অতীতের বঙ্গালিনচর্য' তাঁহারই যে হিংস্র আক্রোশে প্রত্যাঘাত হানিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? রামমোহনের জীবদ্দশায় একাধিক বার তাঁহার প্রাণ ন্যাসের চেষ্টা হইয়াছিল; অজ্ঞাত আততায়ীর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সন্দেহ সতর্ক থাকিতে হইত; তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিবার প্রয়াসও কম হয় নাই। আজ কালান্তরে রামমোহনের সেই প্রতিপক্ষগণ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সময়ের সাহিত্য ক্রমশঃ দীপ্ততর রূপে লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তথাপি রক্ষণশীলগণের পক্ষ হইতে আক্রমণের বিষয় নাই। আমরা জানি ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দে যখন রামমোহনের ব্রহ্মশতবার্ষিকী মহাসমারোহে সমগ্র বিশ্বে অস্থিষ্ঠিত হয়—সেই সময়ের কিছু বিরুদ্ধ কণ্ঠ শোনা গিয়াছিল। তখন রামমোহনকে প্রত্যক্ষ আঘাত করিবার উপায় ছিল না—তাই আরম্ভ হইয়াছিল—ঐতিহাসিক গবেষণার নামে

তথ্যবিকৃতি এবং মিথ্যা ও অর্ধসত্যের প্রচার। কিন্তু মিথ্যা ও অর্ধ সত্যের অস্ববিধা এই তাহা সাময়িকভাবে চটক সৃষ্টি করিলেও স্থায়ী হয় না। ঐ সময়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইল নূতন, তথ্য আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইল—এবং ক্রমশঃ উহার প্রভাব প্রশমিত হইল।

বর্তমান দ্বিশতবার্ষিকী বৎসরেও ইহার ব্যতিক্রম প্রত্যাশা করিলে ভুল হইবে। ঐতিহাসিক গবেষণার নামে আবার রামমোহন-দ্বিশতবার্ষিকী অম্লভানে বাধা সৃষ্টির অপপ্রয়াস আরম্ভ হইয়াছে। নানা তর্কবিতর্কের পর উভয় পক্ষের মতামত গুনিয়া ভারত-সরকার যখন অবশেষে ১১৭২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত একবৎসর কালকে রামমোহন জন্মদ্বিশত-বার্ষিকী-বৎসর বলিয়া গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন—তখনই আরম্ভ হইল আবার ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দকে রামমোহনের জন্মবৎসর বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার নূতন প্রচেষ্টা ইহার পুরেই—একজন প্রবীণ ঐতিহাসিক রামমোহনের প্রতিভা ও কীর্তির বিশ্লেষণ কার্বে অবতীর্ণ হইলেন। গত এই ফেব্রুয়ারী ইনি এগিস্টিয়াক সোসাইটি ভবনে যে বক্তৃতা করিয়াছেন—তাহার মধ্যে রামমোহন প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁহার শোচনীয় অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মূলে পৌঁছিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি রামমোহনের কীর্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন—এবং দেখা যাইতেছে—সেখানেও সকল তথ্য তাঁহার আয়ত্তাধীন নহে। প্রকৃত কথা, তিনি এখানে ঐতিহাসিক রূপে আলোচনা করেন নাই—বাঁহাকে বিভিন্ন সনাতন হিন্দুধর্ম বলিয়া মনে করেন তাহারই পক্ষাবলম্বন করিয়া সমুখ সমরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। রামমোহনের তীব্র আঘাতে তাঁহার সমকালীন বিরোধীপক্ষের মর্যাদা হইয়াছিল। দুই শতাব্দী পার হইয়া তাহাদেও আর্ডনারের কণি বেশ যদি আজিও ভাসিয়া আসে তাহা হইলে বর্তমানে রামমোহনের প্রতিভার বিপ্লবী চরিত্রকে উপলব্ধি করিবার স্বেচ্ছা বই অস্বচ্ছা হইবে না।

# সাময়িকী

## ওয়াক্স অসুসদ্ধান কমিটির রিপোর্ট

সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীওয়াক্স অধিনায়ক যে অসুসদ্ধান কমিটি বসিয়াছিল তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই কমিটি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং তাঁহারা গর্ভগমেন্টকে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন তাহা সকল ভারতবাসীরই প্রাণধানের বিষয়। তাঁহারা যে সকল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন সে সকল কথা পূর্ন হইতেই ভারতের বহুলোকেই বলিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু ভারত সরকার জন-সাধারণের কথায় কখনও টলেন না ও এই ক্ষেত্রেও তাঁহারা কাহারও কোনও কথায় কখনও কর্ণপাত করেন নাহ। তৎকাল দেশের বহু ক্ষতি হইয়াছে কিন্তু সে কারণে কোনও আমলা অথবা মন্ত্রী কোনও অস্বাভাব্য হইবার সম্ভাবনা নাই। কমিটি বলিয়াছেন যে, ভারতের মানুষ যে রাজকর দিতে চাহেন না তাহার কারণ ভারতের রাজকরের হার অন্তরাভাবে অতি বার্দ্ধত। যে ক্ষেত্রে অপর দেশে কেহ কোন রাজকর দেয় না, ভারতে সেইক্ষেত্রে উচ্চ হারে ট্যাক্স আদায় করা হয়। যাহাদের আয় অধিক তাহাদিগের আয়ের পরিমাণ একটা সীমার উর্ধ্বের যে আয় তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই আয়কর হিসাবে সরকারের কর্ণালিত হয়। (আমেরিকায় বাৎসরিক ২২৫০০ টাকা আয় না হইলে কাহাকেও আয়কর দিতে হয় না। যুরোপের বহু ধনবান্ দেশে কোনও ব্যক্তির কোনও আয়ের শতকরা ৬৫ ভাগের অধিক কখনও রাজকর হিসাবে আদায় করা হয় না।) ভারতবর্ষে সকলপ্রকার রাজস্ব একত্র করিয়া দেখিলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে ব্যক্তির বাৎসরিক আয় ১ লক্ষ টাকা তাহাকে আড়াই লক্ষ টাকা ট্যাক্স দিতে হয়। ঐ আয় কোন ঈংরেজ বা আমেরিকানের

হইলে তাহাকে হয়ত এক লক্ষ টাকার কিছু অধিক ট্যাক্স দিতে হইত। যাহাদের আরও অধিক আয় ভারতবর্ষে তাহাদিগকে তিন লক্ষের অধিক আয়ের শতকরা প্রায় একশত টাকাই কর হিসাবে দিতে হয়। যদি তিন লক্ষের অধিক আয় করা বে-আইনী হইত তাহা হইলে কেহ কিছু বলিত না; কিন্তু আয় করা আইনে সমর্থিত অথচ আয়ের উচ্চতম অংশ প্রায় সবটাই রাজকর হিসাবে দিয়া দিতে হইবে এ-নিয়ম আইনত অর্জিত যোগ্যতার টাকা কাড়িয়া লওয়ার মতই। ওয়াক্স কমিটি বলিয়াছেন যে, আয়করের হার পরিবর্তন করিয়া এইরূপ করা হউক যাহাতে ১০০০ টাকা বার্ষিক আয় হইলে তাহার আয়কর হইবে ২৬২৫০ টাকা এবং তাহার অধিক যাহা আয় হইবে তাহার উপর শতকরা ৬৫ টাকা আয়কর ধার্য হইবে। এ নিয়মে যাহার ৩০০০০ টাকা আয় হইবে তাহাকে ২৬২৫০+১৪২৫০০ = ১৭৫১৫০ আয়কর দিতে হইবে। এ-রূপ নিয়ম হইলে আপাতদৃষ্টিতে রাজস্ব কমিয়া যাইবে মনে হইলেও ট্যাক্স ফাঁকি দিবার চেষ্টা হ্রাস পাওয়ার ফলে মোট আদায় বাড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে করা হয়। বাৎসরিক ১০০০ টাকা আয় হইলে বর্তমানে তাহার উপর ৩০০০ টাকা আয়কর দিতে হয়। ওয়াক্স কমিটির দ্বারা স্থিরীকৃত হারে তাহা হইবে ২৬৫০ টাকা। কমিটির অধিকাংশ সভ্যের মতে ট্যাক্স ফাঁকির পরিমাণ বাৎসরিক ৪৫০ কোটি টাকার অধিক। এই টাকার যদি অর্ধেকও নুতন নিয়ম হইলে আদায় হয় তাহা হইলে মোটের উপর রাজকর বৃদ্ধি হইবে।

কালোবাজারের কারবার সম্বন্ধে কমিটি বলিয়াছেন যে ১৯৬৮-৬৯ খৃঃ অব্দে ১০০০ কোটি কালোটাকার কারবার হইয়াছিল। এই সকল কারবার যে ভাবে হয়

তাহার সহিত উৎকোচ দান, বেয়াইনী ভাবে বর্ষ ও বিদেশী দ্রব্যাদি দেশে আনিবার ব্যবস্থা ইত্যাদির ঘনিষ্ট সংযোগ আছে বলিয়া অনুমান করা যায়। সুতরাং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুনীতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কালোবাজার যাহাতে আরও প্রসারিত না হয় সেই চেষ্টা অত্যাবশ্যক বলা যাইতে পারে। রাজকর কাঁকি দিবার সহিত কালো বাজারের একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে এবং রাজকর কাঁকি দিবার আগ্রহের মূলে যদি আঘাত করা যায় তাহা হইলে তাহা দ্বারা কালো বাজারও আহত হইবে। ভারতের সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা বিশেষ করিয়া বেকারী ও অল্প উপার্জন দোষদুষ্ট তত্ত্বগত যে অল্প সংখ্যক ভারতীয় অধিক উপার্জন করেন; আমলাদিগের রাজস্ব আহরণ চেষ্টা শুধু তাহাদিগের উপরই অধিক করিয়া নিবৃত্ত হয়। সর্বসাধারণের আর্থিক অবস্থা যাহাতে উন্নত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলে ভারতীয় অর্থনীতি ব্যাধিমুক্ত ভাবে অগ্রগমণে সক্ষম হইতে পারে।

উত্তর ভিয়েতনামের দক্ষিণ ভিয়েতনাম অভিযান

উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্তবাহিনী সম্প্রতি দক্ষিণ ভিয়েতনামের উপর একটা প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে এবং সেই আক্রমণের ফলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের অনেক সামরিক কেন্দ্র উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্তদিগের হস্তগত হইয়াছে। এই আক্রমণ কি কারণে অকস্মাৎ আরম্ভ হইল তাহার গূঢ় অর্থ সহজবোধ্য নহে; তবে ইহার সহিত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রপতি নিক্সনের চীন গমন ও চীনের রাষ্ট্রনেতাদিগের সহিত আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নীতির প্রকৃষ্ট আলোচনার সম্বন্ধ আছে

বলিয়া অনুমান করা যায়। চীন সম্ভবতঃ যে নীতি অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক, ক্রিশিয়া তাহার বিপরীত কোন পথে চলিতে চায় এবং চীনকে নিজ পথে না চলিতে দিবার জন্য ক্রিশিয়া হয়ত হানয়কে প্রতাবাদিত করিয়া বর্তমান পরিস্থিতি সৃজন করিয়াছে। ইহাও হইতে পারে যে, চীন আমেরিকাকে যাহা বুঝিতে দিয়াছে গোপনে তাহার বিপরীত পন্থা অনুসরণ করিয়া আমেরিকাকে নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদিগের পক্ষে ভিতরের কথা জানা সম্ভব নহে এবং যে ক্ষেত্রে আমেরিকা, চীন ও ক্রিশিয়া আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির ক্রীড়ামণ্ডলে পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিতে নিরন্তর সেখানে সেই ক্রীড়ার কোন কায়দা-কৌশলই অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে না। এই পরিবর্তনশীল ক্রিশিয়ার আসরে খেলোয়াড়দিগের আত্মপ্রতিষ্ঠাই একমাত্র স্থির নিশ্চয় সংকল্পের কথা। অতঃপর আমেরিকান সৈন্তবাহিনীও নূতন করিয়া ব্যাপকভাবে যুদ্ধে নামিতে বাধ্য হইবে। সে যুদ্ধ কিভাবে চালিত হইবে অথবা তাহার ফলে উত্তর ভিয়েতনামের কতটা ক্ষতি হইবে তাহা এখনও অনুমানের বিষয়। উত্তর ভিয়েতনাম তাহার অভিযানে বহু সৈন্ত লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামেরও বহু সৈন্ত আছে ও সে সকল সৈন্ত এখনও যুদ্ধে নামে নাই। কাহারও কাহারও মতে উত্তর ভিয়েতনাম শীঘ্রই সাইগন দখল করিয়া লইবে। অপরদিকে একথাও সত্য যে আমেরিকা তাহার বিমানশক্তি ব্যবহারে হানয়কে বিচলিত করিবে এবং তাহাতে উত্তর ভিয়েতনামের যুদ্ধ পরিচালনা কঠিন হইবে।



# দেশ-বিদেশের কথা

## সমুদ্র পরিষ্কার রণা

সম্প্রতি নরওয়েতে একটি আন্তর্জাতিক বৈঠকে সমুদ্রের জল পরিষ্কার রাখার জন্য উত্তর সাগরের উপকূলস্থ বেশগুলি একটি নিয়ন্ত্রণ নীতি স্বাক্ষর করিয়া তাহা সকল জাহাজ ও বিমানের উপর জারি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। জাহাজ ও বিমান হইতে যে সকল বস্তু সমুদ্রের জলে ফেলা হয় তাহার মধ্যে অনেক কিছুই জল বিবাক্ত করিয়া নানাপথে মনুষ্যজাতির স্বাস্থ্যবস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া মানবজীবন বিপন্ন করিবার কারণ হয়। বীজাণু ও কীট-কীটাপু নাকশক রাসায়নিক বস্তু, পারদ, ক্যাডামিয়াম ও নানা প্রকারের প্রাণিক দ্রব্য, সমুদ্রের জলে বাহাতে নিক্ষেপ না হইতে পারে, মানব জাতির ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের জন্য সেই ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। ফলশ্রুতিতে সকলেই আবর্জনা ফেলা বন্ধ করিবার চেষ্টা করে বলিয়া জনসাধারণ জলে আবর্জনা ফেলিবার অভ্যাস করিগেছে। এখন নূতন নীতি অনুসরণে মানুষ প্রথমে সকল অপকারী বস্তু ভিত্তিভূত করিয়া ভৎপরে সেই ভস্ম ফলে বা জলে আবর্জনা হিসাবে ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবে। অনেক প্রকারের আবর্জনা আছে যাহা কঠিনকর নহে। সেইসকল বস্তু ফেলিয়া দেওয়া সম্বন্ধে কোন নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হইবে না। বহু বিবাক্ত বস্তু আছে যাহা কিছুকাল জলে বা ফলে পড়িয়া থাকিলে নিজ বিবাক্তভাবে হারাইয়া অল্প রূপ ধারণ করে। এই সকল বস্তুও বর্তমান নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। বর্তমানে বহু বিজ্ঞানাগারে আবর্জনা কি ভাবে কঠিনকর না হইয়া

দূর করিয়া দেওয়া যায় তাহা লইয়া গবেষণা হইতেছে। এই গবেষণার ফলে অদূর ভবিষ্যতে মানবসমাজে আবর্জনা দূর করিবার সমস্তার সমাধান হইবে বলিয়া জ্ঞানীজন বিশ্বাস করেন।

কৃশিয়া ও চীনের মধ্যে যুদ্ধ লাগিলে কি হইবে

একথা কৃশিয়ার ও চীনের সর্জন পূর্ণ প্রচলিত যে ঐ দুই দেশের ভিতর একটা যুদ্ধ লাগিবেই, এবং শীঘ্রই লাগিবে। এই যুদ্ধ লাগিলে কৃশিয়ার পক্ষে তাহার পূর্ক এশিয়ার এলাকায় স্থিত সহস্র বছর রেলকেন্দ্র প্রভৃতি রক্ষা করা বিশেষ কঠিন হইবে, কেননা কৃশিয়ার সামরিক শক্তি ও তাহার অস্ত্রশস্ত্রাদি উৎপাদন কেন্দ্র যুরোপেই প্রাতিষ্ঠিত এবং যুরোপ হইতে সৈন্যসামন্ত ও রসদ মাল-মশলা সাইবেরিয়ার অপর প্রান্তে লইয়া যাইতে হইলে তাহার জন্য হয় সমুদ্রপথে বহু সহস্র মাইল যাইতে হয়, নয়ত সাইবেরিয়ার রেল ধরিয়া কয়েক সহস্র মাইল যাইতে হয়। সুয়েজ খাল যদি খোলা থাকে তাহা হইলে সমুদ্রপথে কিছুটা কমিয়া যাইতে পারে, নতুবা আফ্রিকা বেটন করিয়া যাইতে আরও কয়েক হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। এই যুদ্ধ সম্ভাবনা হইবার পূর্কে সাইবেরিয়ার রেলপথ সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রাদি পাঠাইবার পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা বলিয়া ধার্য হইত। কিন্তু ঐ রেলপথ বহুফলে চীন দেশের এলাকার গা ঘেঁষিয়া স্থাপিত আছে বলিয়া বর্তমানে সমরকৌশলীগণ উহার উপযুক্ততা সম্বন্ধে সন্দেহান হইতেছেন। কোন কোন ফলে চীনাগণের ভোণের গোলা সহজেই সাইবেরিয়ার রেলপথ ধ্বংস করিতে পারে এবং প্রায়

সর্বত্রই ঐ রেলপথ রকেট দিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে। রাশিয়ান দিগের চেষ্টা আরও ৫০০ শত মাইল উত্তরে সরাইয়া ঐ রেলপথ বসাইয়া তাহাকে চীন আক্রমণের সম্ভাবনা মুক্ত করার ব্যবস্থা করিবার এবং তাহারা ঐরূপ আয়োজন চালাইতেছে বলিয়া শুনা যায়। বন্টিক ও কৃকসাগর হইতে সুরক্ষা খাল দিয়া ভারত মহাদাগরে আসিতে পারিলে কৃশিয়ার খুবই সুবিধা হয় এবং কৃশিয়া সেই চেষ্টা সকল করিবার জন্য আরবদিগের সহিত ব্যবস্থা করিতে সর্ব্বদা তৎপরতা দেখাইয়া থাকে। ভারত মহাসাগরে যাহাতে জাহাজ লইয়া যাইতে অসুবিধা না হয় সেইজন্যও কৃশিয়া ভারতের সহিত ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছুক বলিয়া মনে হয়। সে ব্যবস্থা ঠিক কি ভাবে করা হইবে তাহা প্রকৃষ্ট রূপে বর্ণনা করা যায় না। লেনিনগ্রাড, মারমান্স্ক ও ওডেশা হইতে মাল ও মানুষ জাহাজে পাঠাইতে হইলে পথ খোলা থাকা আবশ্যিক এবং পথে স্থানে স্থানে জাহাজের আশ্রয়ক্ষেত্র ও তেল কয়লা ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থারও প্রয়োজন। কৃশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ স্থাপন রীতিনীতি এই প্রয়োজন বুঝিয়া চালিত হয় সন্দেহ নাই। চীনের সহিত সংঘর্ষ হইতোহুও ঐ একই কারণে, যদিও একেজ্রে কথাটা স্থলপথ খোলা ও নিরাপদ রাখার। সাইবেরিয়ার রেলপথ রক্ষা করা কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। তবে চীনা কমান্ডারগণ যতদূর ঐ রেলপথ নষ্ট করিবার জন্য সাগর পাড়িলে তাহাদিগকে বাধা দেওয়ার কার্য্য কষ্টকর কঠিন ও বহুবায়সাধ্য হইবে মনে হয়। সুতরাং যুদ্ধ লাগাইয়া চীনাগণকে ঐ রেলপথ হইতে বহুদূরে সরাইয়া দেওয়ার কথাটাও কার্য্যাসিদ্ধির সহজ পন্থা বলিয়া কৃশিয়ার সামরিক বিশেষজ্ঞরা যে চিন্তা করিতেছেন না গহা নহে। কৃশ-চীন যুদ্ধের সম্ভাবনা এই সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে দৃড়িত।

### বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

সোভিয়েট কনগাল জেনেরাল কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদে আচার্য্য কিঙডর ডি কনস্টানটিন

লিখিত একটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সারাংশ প্রচার করা হইয়াছে। উহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

জাতিসংঘ ১৯১১ সালকে জাতিষেবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বৎসর বলে ঘোষণা করেছিলেন। সমস্ত মুক্তিকামী জাতির কাছে বর্ণবিদ্বেষ একটা বিরাট সমস্যা। ১৯৬০ সালের ২০শে মার্চ দক্ষিণ আফ্রিকার শারপেভিলেতে জাতিষেবীরা আফ্রিকানদের এক শান্তিপূর্ণ বিকোভ-মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করে। নিরস্ত্র বান্ধু শ্রমিকদের মিছিলে বর্ণষেবীদের এই গুলিবর্ষণের ফলে ৬১ জন নিহত ও ১৮০ জন আহত হয়। আফ্রিকানদের মালিকের ক্রীতদাসে পরিণত করে যে বৈষম্যমূলক হাড়পাঞ্জ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে তাই প্রত্যবাদে এই বিকোভ-মিছিল বেরিয়েছিল। এই ঘটনার ফলেই জাতিসংঘে এই সমস্যাটি উত্থাপিত হয়।

কিন্তু শারপেভিলের হত্যাকাণ্ড মানুষের বিরুদ্ধে জাতিষেবীদের অপরাধের রক্তাক্ত ইতিহাসে একটি ঘটনামাত্র এবং কোনক্রমেই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘটনা নয়। বর্ণবিদ্বেষ, বিশেষ বর্ণ বা জাতির মানুষদের একঘরে করে রাখা এবং বৈষম্য—এগুলি হল পুঁজিবাদের করেফটি ভয়াবহ পাপ। এই সব পাপ এখনও আমাদের পৃথিবীতে বর্তমান। কোন কোন দেশে এগুলি আবার প্রধান মতাদর্শ ও কর্মনীতিরূপে পর্ব্বস্ত বর্তমান।

সকলেরই জানা আছে যে, জাতিষেবের তাত্ত্বিকরা বলে থাকেন যে, মানবজাতি “শ্রেষ্ঠ” ও “হীন” এই দুইভাগে বিভক্ত। “শ্রেষ্ঠ” জাতিগুলি সংস্কৃতি ও সভ্যতার দ্বারা উঠতে সক্ষম এবং “হীন” জাতিগুলি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে অক্ষম। জাতিষেব ঔপনিবেশিক বিজয় অভিযানের তৎপরত ভিত্তি বুগিয়েছে এবং যোগাচ্ছে। জাতিষেবের কৃক পতাকার তলে জাতিসমূহের বিরুদ্ধে, মানবজাতির বিরুদ্ধে অতি ভয়াবহ অপরাধ অর্হীত হয়েছে। সমগ্র জাতির নিমূলীকরণ, দাস ব্যবসার এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশীয় অধিবাসীদের উপর নির্ধন



ঔপনিবেশিক শোষণ—এ-সব এবং অস্তান্ত বহু নিষ্ঠুর অত্যাচারকে (বা বুর্জোয়াদের বিবেক অস্বীকার করতে পারে না) নানা রকম জাতিষেবী তত্ত্বের দ্বারা শুদ্ধ করা হয়েছে, সমর্থন করা হয়েছে।

অধুনাকালের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, আমাদের কালের প্রতিক্রিয়াশীল ও যুদ্ধবাদী শক্তিগুলির হাতিয়াররূপেই জাতিষেব বর্তমান রয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল তাত্ত্বিকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে “ঐশ্বর্যশালী সমাজ” বলে বর্ণনা করেন। সে দেশে যে “স্বাধীনতা ও প্রায়ের” আধিপত্য বর্তমান তার প্রশংসায় তাঁরা পক্ষযুগ।

দাসত্ব লোপের পর একশত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু এর ফলে আড়াই কোটি মার্কিন নিগ্রো না পেয়েছেন সমানাধিকার, না পেয়েছেন সত্যিকারের স্বাধীনতা। আজ পর্যন্ত জাতিষেব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র সামাজিক কাঠামোর অচ্ছেদ্য অঙ্গ। গাজচর্মের বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মার্কিন নাগরিকের জন্ত মার্কিন সংবিধানে বুর্জোয়া স্বাধীনতার গ্যারান্টি দেওয়া সত্ত্বেও এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্রতি বৎসর সমগ্র জগৎ নিগ্রো জনগণের বিরুদ্ধে পুলিশ সন্ত্রাসের নতুন নতুন নিদর্শন, নিগ্রো রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা, নিগ্রোদের নাগরিক অধিকারের জন্ত ধারা সংগ্রাম করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন প্রত্যক্ষ করেছে।

বর্তমানে এক সাজানো অভিযোগের ভিত্তিতে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি জাতিষেবী আদালত নিগ্রো স্বাধীনতার সাহসী বোদ্ধা, নির্ভীক-দেশপ্রেমিক ও কমিউনিষ্ট এনজেলো ডেভিলকে শাস্তি দেওয়ার মতলব তৈরি করেছে। অনেক দিন থেকেই এই রকম সব ঘটনা “মার্কিন জীবনযাত্রা”র একটি রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাত্যাভিমান শুধু স্বরাষ্ট্র নীতি নির্ধারকদের নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারকদেরও প্রধান মতাদর্শগত মতবাদ। এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সর্বত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্ত চেষ্টা করছে, অস্তান্ত জাতির

ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে, অন্যান্য জাতির জগৎগত অধিকার ও সার্বভৌমত্ব খুসীমত লঙ্ঘন করছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র ও পৃথিবীর সমগ্র এক একটি অঞ্চলের উপর তার ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় বলপ্রয়োগ করছে, ঘুর দিচ্ছে ও অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ করছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে তিরেং নাম, কাষোডিয়া ও লাওসে তার নিলম্ব সশস্ত্র হস্তক্ষেপ একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

হিটলারী নাৎসীদের পদাঙ্কানুসরণ করে মার্কিন কোজ তিরেংনামের সংমাই গ্রাম জালিয়ে দিয়েছে, নারী, শিশু ও বৃদ্ধসহ বহু অ-সামরিক মানুষকে হত্যা করেছে। বিমান, ট্যাঙ্ক, নাগাম, বিবরপ্প-যুদ্ধের আধুনিক প্রযুক্তি বিস্তার সব কিছুই ইন্দোচীনের ছোট ছোট জাতিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়ে মার্কিন হস্তক্ষেপকারী ও তার দালালরা যা করছে মানবতাবাদী কোন মানুষের বিবেক কখনও তা’মেনে নিতে পারবে না।

আগের মতই দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে জাতিষেবী সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে সবচেয়ে বন্ধ্যাহীন আকারে। সেখানে জাতি বৈষম্যকে আইনসিদ্ধ করা হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার মূল অধিবাসীদের ঔপনিবেশিক বন্ধনে বেঁধে রাখার জন্য এবং ৩৭ লক্ষ সংখ্যালঘু বৈতাল্য যাতে ১ কোটি ৬০ লক্ষ অ-বৈতাল্য অধিবাসীকে নির্যমভাবে শোষণ করতে পারে তার উপযোগী অবস্থা বজায় রাখার জন্য জাতিবিষেব হল দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকশ্রেণীর একটি হাতিয়ার।

দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিষেবীদের অনুসৃত কর্মনীতির ভিত্তি হল জাতি ও বর্ণ স্বাতন্ত্র্যের মতবাদ। এই মতবাদে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারি বিভিন্ন জাতি ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে স্বতন্ত্র জীবন বাপনের বিধান দেওয়া হয়েছে। ও মতবাদের সাহায্যে জাতিষেবীরা নির্যমিতভাবে দেশের ইরোরোপীয় অধিবাসীদের মগজ বোলাই করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিসমূহদের অহুসরণ করছে দক্ষিণ রোডেশিয়ার তাদের “সমমনোভাবাপন্ন” ছোট অংশীদারেরা। কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিবেশী এই দেশের ঘটনাবলী বিশ্বজনমত্তের উত্তেজিত ও ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্ভ্রান্ত দক্ষিণ রোডেশিয়ার ক্যাসিস্ট সরকারের সঙ্গে ব্রিটিশ রক্ষণশীল সরকারের একটি লক্ষ্যজনক কারবার হয়েছে। আয়ান স্মিথের জাতিসমূহ সরকারের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ আরোপিত নিষেধাজ্ঞা অমান্ত করে এই কারবার করা হয়েছে।

ক্যাসিস্ট পর্ভুগালের আংগোলা ও অঙ্গোলা উপনিবেশে জাতিবিষে বৈশ জাঁকিয়ে উঠেছে। পর্ভুগাল তার এই সব উপনিবেশকে তার “সাগর পারের ভূখণ্ড” বলে ঘোষণা করেছে।

পৃথিবী ভারতীয় উপমহাদেশের শোচনীয় ঘটনাবলী এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করেছে। এই দুঃখজনক ঘটনাবলীর মূল কারণগুলি কি? সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের মধ্যেই মূল কারণগুলি নিহিত। “বিত্তেদ সৃষ্টি করে শাসন করা”র জঘন্য কর্মনীতি অহুসরণ করে ব্রিটেন

ধর্মীয় সংস্কারকে কাজে লাগায় এবং হিন্দু ও মুসলমানদের বিরোধ বাধানোর চেষ্টা করে।

সামরিক সংঘর্ষের আশু কারণ হল পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কর্মনীতি এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী অধিবাসীদের উপর নির্ভর হামলা। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক কর্তৃপক্ষের জাতিভিত্তিক হিংসার ফলস্বরূপ প্রায় দশলক্ষ বাঙ্গালী নিহত হই এবং এককোটি মানুষ জীবন বাঁচানোর জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

আজকের দিনের অবস্থায় জাতিবিষে ও জাতিভিত্তিক শত্রুতা জাতিসমূহের মধ্যে বিরোধ ও ঘৃণা সৃষ্টি করে না, অতঃসম্মার প্রতিযোগিতা ও জল্পাবাদের প্রসারের মতাদর্শগত ভিত্তিও যোগায় এবং পারমাণবিক বিশ্ব-যুদ্ধের বিপদ সৃষ্টি করে।

জাতিসমূহের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য হল আন্তর্জাতিক উদ্বেজনা হ্রাসের মতাদর্শগত ভিত্তি। বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণের একটি ধাপ হিসাবে পরমাণু-অস্ত্র ও অন্যান্য বিধ্বংসী অস্ত্র নির্বিক ও নিমূল করার বাস্তব অবস্থা গ্রহণ করার শান্তিনীতির আন্তর্জাতিক ভিত্তিও হল এই ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য।



## শোক-সংবাদ

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ বৃহস্পতিবার ভোররাতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গণিতজ্ঞ মোহিত মোহন দাশগুপ্ত সন্ধ্যানে পরলোক গমন করেন। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে “জুলফিকার” ছদ্মনামেই সুপরিচিত ছিলেন। গত কয়েক বাস তিনি হৃদযন্ত্রের পীড়ার শয্যাশায়ী ছিলেন।

বিভিন্ন ভাষার সুপরিচিত শ্রীদাশগুপ্ত বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যের আগ্রহী পাঠক ছিলেন। বাংলাদেশের যশোহর জেলার নড়াইলে তাঁহার জন্ম। চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও কলিকাতায় শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি ফলিত গণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন ও দেবানন্দ ‘সার্ভে অব ইণ্ডিয়া’র যোগ দেন। কয়েক বৎসর পর তিনি FORWARD ইংরাজী দৈনিকের সহসম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অবশেষে সরকারী কাজে যোগ দেন। ‘সার্ভে অব ইণ্ডিয়া’র অবস্থান কালীন ভূ-গণিতের উপর কিছু মূল্যবান মৌলিক গবেষণা করেন।

কলেজ জীবনেই তিনি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তদানীন্তন ‘প্রবাসী গল্প প্রতিযোগিতায়’ পুরস্কার লাভ করেন। তখন হইতে বৃহৎ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রবাসীর সহিত আন্তরিক যোগ ছিল। তিনি প্রবাসীর নিয়মিত পাঠক ছিলেন এবং ‘Modern Review’ ও প্রবাসীতে তাঁহার বহু রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হইত। গল্প, রম্যরচনা ছাড়াও তিনি বিভিন্ন ইংরাজী ও বাংলা পত্রিকায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদির নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি রচনা ইংরাজী, হিন্দী ও গুজরাতী ভাষায় অনূদিত হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত সরল, নিরহংকারী ও সদালাপী ছিলেন। বৃহৎকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৪ বৎসর। তিনি স্ত্রী, তিনপুত্র, তিনকন্যা ও গুণবৃদ্ধ বহু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব রাধিয়া গিয়াছেন।

# নেতৃত্ববাদ

বিমুক্তবণ কান

বর্তমান কালে যে প্রেক্ষণীয় নেতৃত্ববাদ দেখা দিচ্ছে, ইলাতে অশাসন প্রায় অবলুপ্ত হইয়াছে, সাম, দান, দণ্ড, ভেদ এই চারিটি বহু পরীক্ষিত ও চিরন্তন নীতি হইতে বর্তমান কালের রাজনীতি আজ নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছে। এখন রাজধর্ম ও রাজনীতির নামে এবং শাসনভঙ্গের নামে কেবলমাত্র একটা ঠাট ও একটা পতাকা থাকিলেই চলে। আধুনিক রাজনীতি কেজে যোগ্য ও অযোগ্য, হুট-শিটে নির্দিশেষে 'শ্রী-পুরুষের সমানাদিকার এবং দল গঠন' এই দুইটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দল সমর্থন ও ভোটের প্রতিযোগিতায় (গণতন্ত্র) জয়ী হওয়ার জন্য সরকারের অর্থনৈতিক সজ্জিতর দিকে লক্ষ না রাখিয়া অসংখ্য সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু কর্মচারীদের কাহার কি দায়িত্ব ও কর্তব্য তাহা সম্ভবত তাঁহাদের অজ্ঞাত। কে কি কাজ করিতেছে, অথবা কিছুই না করিয়া সর্বসাধারণের অর্থ শোষণ করিতেছে; কিংবা তাঁহাদের কাজের উপযুক্ত মান কিসয়। স্নায়ুসজ্জিত ভাবে অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে কি না তাহার কোন উপযুক্ত তদারক নাই। কিন্তু ইহাদের পরিশোধের জন্য সাধারণ ব্যক্তিও নানাভাবে ট্যাগ দিয়া দারিদ্র্যপীড়িত হইতেছে, সম্ভাব্যতাই ইহারা ক্ষয়ভাষণ দলের নেতাদের পোষ, সমর্থক ও অহুগত এবং ইহাদের পোষ ও অহুগতজনের সংখ্যাও এই সঙ্গে বৃদ্ধ হইয়াছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এই সকল নেতার নিকট অর্থগ্রহণ করিয়া থাকে— এমন কি সম্পূর্ণ বিরোধী দল বলিয়া পরিচিত কোন কান হুদে ও বড় দলের পরিচালকেরাও এই প্রকারে অর্থ পাইয়া থাকে। শিক্ষা ও শিল্প সম্ভারনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উচ্চতর যে সহস্র অহস্র নবীন শিক্ষক

নিযুক্ত হইতেছেন, তাঁহাদের বোগ্যতার বিচার প্রধানতঃ দলের সমর্থনের উপর নির্ভর করে এবং এই সকল বোগ্য অযোগ্য শিক্ষক প্রেক্ষণী শিক্ষাক্ষেত্রে কি পরিবেশ সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহারা যথার্থভাবে কর্তব্য কিছু করেন কিনা, তাহার তদারকের কোন ব্যবস্থা নাই; থাকিলেও তাহা দলের সমর্থনে চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই প্রকার সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষক প্রতিপালনের ব্যয় নির্বাহ করিতেই সরকারের নিজস্ব আয়ে আর সম্মান হইতেছে না। গঠনমূলক পরিকল্পনাগুলি অস্ত্রের সাহায্য অথবা অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল হইয়াছে।

একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে কোন দ্বিধা নাই যে, বিগত ২৫ বৎসরে সরকার লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা নিছক ব্যক্তিগত ও দলগত মনজ্জিষ্ট পর্যায়ে ব্যয় বরাদ্দ ও বরদাস্ত করিয়াছেন। ইহার ফলে কাহারও হাতে পক্ষত প্রমাণ অর্থ জমা হইয়াছে, কেহ কেহ ভোগ বিলাসে ও পানাহারে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। দেশের ৪০ কোটি সাধারণ মানুষের গড় দৈনিক আয় মাত্র ৩৫ নয়া পরসায় সীমাবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা উপযুক্ত খাদ্যভাবে পুষ্টির অভাবে যুগ্মর পথের পথিক। অবাঞ্ছিত ব্যক্তির মধ্যে কিছু সংখ্যক নিজস্ব সজ্জিত ও সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাহারা কৃষিকারী মধ্যবিত্ত। ইহারা যেহেতু স্বাবলম্বী সেজন্য ইহারা বর্তমানকালের ভারতীয় নেতাদের চক্ষুশূল এবং অবাস্থিত। তাহারা দারিদ্র্য সমভাবে বণ্টন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কেবলমাত্র তাঁহারা এবং তাঁহাদের সহযোগী ব্যতীত আর সকলকে দারিদ্র্য বরণ করিতে হইবে একজন সংবিধানের যে সকল ধারা ও উপধারা পরিবর্তন ও পরিবর্তন আবশ্যক তাহাও করিতে ইহারা নিলক্ষ্যভাবে প্রস্তুত এবং তাহার প্রণালীও স্থির হইয়া প্রয়োগ করা হইতেছে।

ইহা বলিলে অস্বাভাবিক হইবে না যে, ব্যক্তিগত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এই সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে নিঃসঙ্কোচে অর্থায়ন যাবৎ প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার ব্যয় করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু যদি সংসদ ও সততার সহিত এই সমুদয় অর্থ যথাযথভাবে দেশের উৎপাদন ও সাধারণের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রায়ে

এখানে কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন কুটির শিল্পে ও কৃষিকার্যে বিনিয়োগ করা হইত, অথবা আইন অনুযায়ী ভাবে যথা সময়ে জমির ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়া প্রাপকদের দ্বারা এই সকল কার্য্য করান হইত, তাহা হইলে যথার্থই দারিদ্রের অবসান হইত এবং এই নেতৃত্ববাদ প্রকার সহিত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। অধিকন্তু ভারতের এই প্রকার অপারিসীম ঋণ বৃদ্ধি হইত না এবং তাহার সমাধানের জন্য এক প্রণালী সকল সম্পদ হিন্তাই করিয়া আর এক প্রণালীকে দেওয়ার আবশ্যক হইত না। কিন্তু দারিদ্র মোচনের এই নিরুদ্ভূত পদ্ধতিতে “গরিবী” চিরস্থায়ী হইবে মাত্র। ইহা যথার্থ অর্থ নৈতিক সমস্তার সমাধান বলিয়া স্বীকৃত নয়। ইহা নিহক দল গঠন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বস্ত্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও পরিচালনা প্রণয়নে বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব, মার্ক্জিত চরিত্রের ও যথার্থ দেশপ্রেমের অভাব হইতেই এইসকল অনর্থের উৎপত্তি ঘটিতেছে। সুতরাং ইহাকে আদৌ স্মরণাসন বলিয়া আভিহিত করা যায় না।

বর্তমান যুগের এই প্রণালী “রাজনীতি” রাজধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থকে এবং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করিয়াছে। ইহার ভয়াবহ পরিণতিও দেখা দিয়াছে। ব্যক্তির এই নেতৃত্বের বিনিয়াদ রচনার ব্যয়ভার (ঋণ) দেশবাসীকেই পরিশোধ করিতে হইতেছে। নূতন কর ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশ হয়ত ভবিষ্যতে ঋণ বিধও হইয়া বিদেশীর শাসনাধীন হইবে। “গরিবী হটাও” ধ্বনিটি বিকৃত পথে চরম পর্যায়ে দারিদ্র বৃদ্ধি করিবে এবং তথাকথিত “আর্থিক স্বরাজ” চরম অর্থনৈতিক সৃষ্টি সঙ্কট করিবে।

সুপ্রসঙ্গ বৎসরের পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরাট দায়িত্ব ও সম্মান লাভ করিয়া নেহেরুজী আপন রাজনৈতিক প্রতিভা প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য সুদীর্ঘ ২০ বৎসর যে অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন এবং যে অমূল্য সময়, সুযোগ, সম্পদ এবং বাহ্যিকোপকারের বিপুল অর্থ ও কারিগরি সাহায্য ব্যবহার করিবার নিরুপস্থল অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাহার দায়িত্ব অনুযায়ী রাজধর্ম প্রাপ্যপালনে নিয়োজিত হইলে ভারতবর্ষ আজ অনায়াসে পশ্চিম জার্মানীর স্তায় দারিদ্রশূন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ এক মহানার্দ্রশালী রাষ্ট্ররূপে বিবেচ্য লাভ করিতে সক্ষম হইত এবং ঐ সঙ্গে নেহেরুজীও যথার্থ গৌরবের অধিকারী হইতেন।

এখন শুধু একটা প্রশ্ন—আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন প্রকারে তথাকথিত সোশিয়ালিষ্টিক প্যাটার্নে ভারতবর্ষ রূপান্তরিত হইলে এবং শ্রমজী গান্ধী সমগ্র

এশিয়া মহাদেশের অন্ততম বিরাট নেতৃ বলিয়া রাশিয়ার একান্ত প্রকার পাত্রী হইলে তাহাতে ভারতবাসীর অথবা ভারতবর্ষের কোন হুঃখের লাঘব হইবে? ভারতবর্ষের কেবল “মানচিত্র” ব্যতীত তাহার অপর বৈশিষ্ট্যের কতটা অবশিষ্ট থাকিবে? এই অপূর্ণ “প্যাটার্ন” সৃষ্টি করিতে বর্তমান কাল পর্যন্ত দেশবাসীকে যে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং আগামীদিনের জন্য আরও যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে, তাহা পরিপূরণ করিতেও ইহার চতুঃপাশ সময়ের প্রয়োজন হইবে; অথবা এই প্রকারের ভারতবর্ষে তথাকথিত নেহেরুজীর “প্যাটার্ন” রূপায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি হইবে অনাহার ক্লিষ্ট অন্তিম হাহাকার। এই হাহাকারময় ভারতবাসীর রাজ্য তখন কে রক্ষা করিবে? স্বাভাবিক ভাবেই তাহার একান্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন-রাশিয়া অনায়াসেই ইহার উপর আপন আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবে।

সুন্দের হার্মাদিগকে অতীত ভারতের যে ইতিহাস ও জীবনী পড়ান হইতেছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটি জীবনীতে মহানু আদর্শের বহু বর্ণনা আছে, কিন্তু সেই হার্মাদের প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছে তাহাদের বর্তমান নেতাদের বিপরীত জীবনীচিত্র ও চরিত্র। পুরান ও নূতন জগতের প্রখ্যাত নেতৃবর্গের এক-একটা আদর্শগত ভাবমূর্ত্তি ছিল। তাহারা এক-একটি ভাবমূর্ত্তি লইয়াই আবির্ভূত ও বিগত হইয়াছেন, কিন্তু জনমানসে সেই ভাবমূর্ত্তি মূর্ত্ত হইয়া রহিয়াছে। সেই উজ্জল মানাদিকতার উপর আজ নেতৃবর্গের এক একজনে অসংখ্য চিত্র চরিত্র, ভাব-ভঙ্গি-না সাজ সজ্জা ভোগবিলাসের যে দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হইতেছে, তাহার কোন ভাবময় আদর্শকে তরুণেরা অনুসরণ করিবে তাহা নিশ্চয়ই বিভ্রান্তিকর। এই বিভ্রান্তিকর পরিবেশ সামাজিক জীবনকে—জাতীয়তাবোধকেও কলঙ্কিত করিয়াছে। জনজীবনে চরিত্রগত ও আদর্শগত বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের ইহা একটি বিশেষ কারণ। ভারতের ভাবি নাগরিক এই হার্মাসমাজের নিকট রাষ্ট্রীয় পটভূমিকায় প্রত্যক্ষ আদর্শের আজ এমনই অভাব যে, তাহারা ভবিষ্যতে উন্নত-চরিত্র ও কর্মী ব্যক্তি হইবার প্রয়াস পাইবে না এবং পাঠিতেছে না।

ভারতের এমন হুর্দীন ও দুর্লক্ষণ সহস্র বৎসরের ইতিহাসে আর কখনও এমনভাবে দেখা দিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। বাংলার শিক্ষিত সমাজের ও গণজিত-সম্পন্ন ব্যক্তিদের এবিষয়ে এখনই চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে।

# চিত্রশিল্পে প্রবাসীর অবদান

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

বহু বৎসরের সম্বন্ধ নিয়ে স্থানিকথা বলার জন্য আজ প্রবাসীর পৃষ্ঠায় একটু স্থান পাবার আশা থাকার পুরাতন কয়েকটি কথা বলার সুযোগ নিই।

প্রবাসীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে। ছবি নিয়ে গিয়েছিলাম প্রবাসীতে ছাপাবার জন্য, কিন্তু সাহসের অভাবে অফিস ঘরে ঢুকতে পারিনি। দরজার সামনেই দাঁড়ি, এক দিব্যাকান্তি কিশোর,—কিশোর বলছি, কিন্তু যৌবনকে আহ্বানের জন্য বয়স তখন প্রস্তুত হয়ে আছে। গুনলাম এই নাম অশোক চ্যাটার্জি। ইনি তখন বাইসাইকেল দাঁড় করিয়ে কি একটা সার্কাসী প্যাচ খেলার চেষ্টা করছিলেন। আমি এদিক দ্বিধে একেবারে অপটু হিলাম না। মিঃ চ্যাটার্জির সমস্তার রন্ধার চেষ্টায় ধরা পড়ল, গাড়ীটাকে ঝাড়া খাকতে বারবার হুকুম করা সত্ত্বেও হুকুম মানার দিক দিয়ে চাকা দুটো ভেঁদে যায় দাঁড়ানো না। আমিও প্রায় তাঁর সমবয়সী, বয়সোচিত দৃষ্টি যেন আমাকে ঠেলা মেরে এগিয়ে দিল নিজের গুণ জাহির করবার জন্যে। ছবির বাঁ ওল দেয়ালে ঠেস দিয়ে বেঞ্চে এগিয়ে গেলাম মিঃ চ্যাটার্জির কাছে এবং বললাম, “আপনার কোথায় অসুবিধা হচ্ছে তা আমি বুঝেছি। আমাকে যদি গাড়ীটা একটু দেন তাহলে দেখিয়ে দিই কি করে বেসামাল চাকাকে শায়েস্তা করতে হয়।” একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে এইরূপ অশোভনীয় অসুযোগ গুনলে নিজের অপারগতা স্বীকৃতির জন্য সচরাচর মানুষ এগিয়ে আসে না। একেবারে ঘটল ভিন্নরূপ। তদ্রূপে সহাস্য বদনে সাইকেলটা এগিয়ে ত দিলেনই, তারপর আমাকে সাইকেল চড়তে দেখেই গুণগ্রাহী নিঃসঙ্কোচে বললেন,

“বাঃ, আপনিত বেশ সাইকেল চালান।” কিন্তু প্রতিযোগিতার উপলক্ষ্য চালানো ছিল না, ছিল থামানো। আমার উচিত ছিল একটু নম্রভাবে বলা, “এ আর কি এমন শক্ত কাজ?” কিন্তু বললাম উল্টো। বেশ বিজয়ের মতই বুঝিয়ে দিলাম, এটা সাধনা-সাপেক্ষ ব্যাপার। যদি ভেবে দেখতাম তাহলে বুঝতাম, আমি তখন সার্কাসে যে সাইকেল চালানো দেখাতাম সেটা ছিল সার্কাসের serious একটা খেলা। আর মিঃ চ্যাটার্জি বা নিয়ে কসরৎ করছিলেন, তা ছিল আসলে ওস্তাদ ক্লাউনের খেলা, যাকে বলে, সব জানি তবু বোকা সাজ।

সাধনার কথায় কি হবে আসি। যে সাধনার পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রবাসী অফিসের দ্বারে ধরনা দিইয়াছিলাম, সেই বিষয়ে কোন কথা সাহসের অভাবে বলার অবকাশ পেলাম না। ইতিমধ্যে কখন যে মিঃ চ্যাটার্জির নজর ছবির বাঁ ওলটার দিকে চলে গিয়েছিল জানতে পারিনি। সাইকেলের খেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়ি জরীর মতন যখন সীট থেকে নামলাম, তখন তিনি বললেন, “ওর ভিতর বুঝি ছবি আছে?” এতবড় প্যারিকং-এর ভিতর যে লেখার খসড়া থাকতে পারে না তা বোঝা তাঁর পক্ষে শক্ত ছিল না, কারণ তখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার অনেকগুলি ধাপ উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন, এ খবর পরে জানলাম, আরো জানলাম, তিনি প্রবাসী-সম্পাদক প্রক্টর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র।

মিঃ চ্যাটার্জি ছবি দেখলেন। বেশ খুঁটিয়ে দেখলেন। আমার ছবিকে ত অমন করে সচরাচর কেউ দেখে না। মনে হল, উনি ছবি বোঝেন। দার্শনিক আর কাকে বলে? আমি যেন এমনই ছবি আঁকি যে

একজন বোকার দরকার সে ছবির শুশ্রূষা বিচারের জন্য। কিতরের যেমাক যেভাবেই তেড়ে উঠুক, প্রতিভুল মতামত যে স্তনতে হবে না এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত ছিলাম না। মিঃ চ্যাটার্জি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “এই ছবি ছাপানো উচিত।” উৎসাহবানী শোনার সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলটা কোন প্রকারে কোথাও ঠেস দিয়ে রেখে ছবির বাঁওল তুলে নিলাম কাঁধে, তারপর বেপরোয়ায় মত চুকে গেলাম অফিস ঘরে। তখন প্রবাসী অফিসের বাহ্যিক আকৃতিতে জাঁদরেল ভাব কিছু ছিল না, সাহেবী ভাষায় বলতে হলে বিবরণ দাঁড়ায় modest office accommodation। কপালগুণে শ্রদ্ধের রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে এমনই একটা শক্তি ছিল, যে আমার মত একজন সাধারণকে মাথা নত করিয়ে কাছে টেনে নেয়। এই টানের তাগিদেই তাঁর ঐচ্ছিক স্পর্শ করে ধস্ত হলাম। ভক্তি নিবেদনের পিছনে স্বার্থ বেটু ছিল তা হল মহানের কাছে নিজেকে নত করতে পারার মধ্যেই যে আনন্দ তা লাভ করা। রামানন্দ বাবু আমার ছবি দেখলেন, তাঁর মুখভঙ্গিতে এমন কোন ভাবের প্রকাশ হল না, যাঁর মধ্যে হতাশ করার কোনো ইচ্ছিত থাকতে পারে। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। সম্পাদক মহাশয় বললেন, “আপনি আকেন ভাল, কিন্তু এই ছবিগুলি ছাপার অসুবিধা আছে।” দারুণ একটা আঘাত পেলাম। সোজা কথায় যদি বলতেন, “ছবি ছবি আকতে জান না,” কিংবা কোন্ রকমের ছবি হলে প্রবাসীতে ছাপা চলে তার আভাস দিতেন, তাহলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারতাম। ক্রমে গিরোহিলাম, ভবিষ্যতের কথা ভেবে বাড়ী ফিরলাম।

কোন্ ধরনের উল্লেখ যে কোনো বৈশিষ্ট্যের প্রতি সম্পাদক মহাশয়ের পক্ষপাতিত্ব ছিল তা জানতে সময় লাগল না। এইখানেই বলতে হয় যে, পক্ষপাতিত্ব যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে, প্রবাসী তার অপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

ছবিকে স্তব্ধ করেই প্রবাসী, প্রবাসীর সম্পাদক এবং ঐক্যশোক চ্যাটার্জির সঙ্গে যে পরিচয় ঘটেছিল, সেই পরিচয়ের সঙ্গে আমার সারাজীবনের যোগ আছে। সে যোগ শুধু ছবি প্রকাশের দ্বার্ষিক জড়িয়ে ছিল না, ক্রমে তা ঘরোয়া সম্বন্ধও গড়ে তুলেছিল। ঐক্যশোক চ্যাটার্জিকে তখন স্তব্ধ বলে সম্বোধন করি, ডাকের গোড়ায় সমীহের পাহারা উঠে গিয়েছে। ঘরোয়া সম্পর্কের দাবী এই কারণেই পেশ করলাম।

ছবি উপলক্ষেই যখন প্রবাসীর সঙ্গে আমার যোগ ঘটেছিল, তখন ছবি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করি। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা, তখন ছবি যে কৃষ্টির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে পারে তা শিক্ষিত লোকদের মধ্যে অনেকেরই জানতেন না। শিক্ষিত লোক বলতে আমাদের সেরা বিজ্ঞাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শে যারা জ্ঞানীর ছাড়পত্র পেয়েছিলেন তাঁদেরকেও এদিক দিয়ে অশিক্ষিতদের দলের মধ্যে নিশ্চিত মনে ফেলা যায়। এই বিশেষ অশিক্ষিত দলে এমন অনেকে ছিলেন, কিংবা হয়ত এখনও আছেন যারা ছবি বুঝি না বলতে বেশ একটা গরম বোধ করেন। অর্থাৎ তাঁরা বোধহয় জানাতেন চান, ছবি অঁকা যেখানে সময়ের অপব্যয় এবং দুর্ভরও বটে, সেখানে ছবি বোঝাকে দুষ্কৃতির উৎসাহ দান বলে মানতে হয়। এটি ছিল তখন প্রথম সত্য। মিথ্যার আবরণে অবুর্ভদের মেনে নেওয়ার সঙ্গে যখন আমাদের সমাজে, শিক্ষাক্ষেত্রে নানাভাবে অর্থহীন বিশ্বাসের প্রচার শুরু হয়েছিল, সেই সময় শ্রদ্ধের রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউয়ের মাধ্যমে আমাদের দেশী শিক্ষার্থীদের কাজ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে লাগলেন। চিত্রশিল্প এবং ভাষ্যকে তিনি যে কৃষ্টির একটি বৃহৎ এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ধরেছিলেন তার কারণ, ছবি বা সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পী তাঁর মানসিক উচ্ছ্বাসকে যেভাবে রূপান্তরিত করার প্রকাশ করেন তাকে কোনো সাহিত্যিক বা কবির সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করলে নগণ্য করা যায় না। সন্দেহকেও এই উচ্ছ্বাসের প্রসঙ্গে আনা

থায়, কিন্তু সঙ্গীতের সঙ্গে ছুলনা উপস্থিত ক্ষেত্রে সমীচীন হবে না, কারণ, সঙ্গীত যে উজ্জ্বলই প্রকাশ করুক সেখানে রূপের পরিকল্পনা অল্পের কেন্দ্রে থেকে। সংক্ষেপে বাক্য abstract form of interpretation of expression বলা যেতে পারে।

হৃদয় সাহস এবং নিজের বিচারে একান্ত বিশ্বাস থাকায় রামানন্দবাবু বৈরসিকদের চতুর্দিক থেকে আক্রমণকে সহনীয় করে আনলেন। ‘দেশী শিল্পী’ কথাটা ইচ্ছা করেই ব্যবহার কল্যাণ, কারণ তখনকার দিনে খারাপ ছবি আঁকতেন তাঁরা বিদেশী প্রথার আঁকা বর্ণনায় ছবির অগ্রহণ করতেন। তাঁদের ছবির mythological বিষয়বস্তুতে দেবদেবীরা যে রূপ নিয়ে আবির্ভূত হতেন তাতে তাঁদের পাংলুন ও স্মার্ট বর্জিত যাহুই বলা যেতে পারে। শিবঠাকুরকে দেখেছি, গঙ্গাদেবীকে ধারণ করার জন্তে যেন কুহ পরোয়া নৌকি বলে মল্লযোদ্ধার মত কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়েছেন। এ ক্ষেত্রে যেমন তিনি মল্লযোদ্ধার রূপ নিলেন অন্তর্গত যেখানে তিনি বিরাট ধ্যানী, যেরকম ধ্যানযুক্ত হতে হলে পরমাসনে বসতে হয়, যে আসনে শিরদাঁড়া সোজা রাখা নিয়ম, তাঁরই দেখেছি ক্ষীণ উদর, তিনি একাদিকে জটাধারী, অপরাধকে বেগুন-ময়ূর তাঁর গাল। হিমালয় পাহাড়ে নিশ্চয় মাইনে কথা পরামানিক ছিল এবং হাল ফ্যাশনেই বোধ হয় সে ক্ষুর চালাত। এইখানেই কি দেবদেবীর রূপ-পরিকল্পনার শেষ? কার্তিকের, যিনি দেবসেনাপতি, তাঁর বাহন ময়ূরই হোক বা উটপাখীই হোক যায় আদে না, তাঁর যোদ্ধা বেশে বনিয়াদী চালের চণ্ডা কালপেড়ে কৌচানো কাপড়, আর তাঁর শ্রীচরণ সেবার লাগত অতীত যুগের পাশাপাশি ছুতো, ‘বল’ বুতোই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেকোনো পাছকার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এই ধারার বাহক হয়েই আরও আধুনিক কালে এসেছেন মা লক্ষ্মী ও মা সরস্বতী ডাকশাইটে চলচ্চিত্র তারকাধার রূপ নিয়ে। এইরূপ নিতুল প্রতিষ্ঠিত যার্তেঘাটে অরণীয় লোকদের স্মৃতিতেও দেখা যায় না। সাধারণের সমর্থন না থাকলে এই ধরনের কচি গড়ে

উঠতে পারে না। প্রকৃত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বহাণের সেই সময় দাঁড়ালেন কৃষ্টির বাস্তবাহক হিসাবে কৃষ্টির পরিবর্তন ঘটাবার জন্তে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সূচক বিশ্বাস যদি তাঁর সহায় না হত তবে আজকের দিনে হাবিকে ভ্রমসমাজ, শিক্ষিত সমাজ কৃষ্টির অঙ্গ বলে স্বীকার করত না। তখন যেসব শিল্পীর কাজ ‘প্রবাসী’র পৃষ্ঠায় স্থান পেত, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিতানী মজুমদার, অসিত হালদার, সমর গুপ্ত, সুরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন কর, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, চুখতাই, বেঙ্কটাম্বা, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, বরদাচরণ উকীল, শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রভৃতি। আমাদের কাজ ছাপা হতে শুরু হল অনেক পরে। আমাদের বলতে থাকে নাম মনে পড়ছে তাঁরা হলেন, বাইরের সেন, চারু রায়, হর্ষাধার বঙ্গোপাধ্যায়, চিত্তামণি কর, মনীষী দে প্রভৃতি। আমাদেরও এই শেষোক্ত দলের মধ্যে নিতে হয়।

আমরা যে-ধরনের ছবি আঁকতাম সেই অঙ্কন পদ্ধতিকে ওরিয়েন্টাল আর্ট বলা হত। ওরিয়েন্টাল আর্ট কথাটাকে ব্যাপক অর্থে ধরতে হলে সেটা সমগ্র এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এশিয়াতেই বিভিন্ন দেশে এত বিভিন্ন প্রথায় অঙ্কনপদ্ধতি গড়ে উঠেছিল এবং tradition হিসাবে চলছে যাতে তাদের কোনোটির বৈশিষ্ট্যকেই অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমন পারসীক, চৈনিক, জাপানী, যবদ্বীপীয় অঙ্কন-রীতি। আমার বিবেচনায়, আমরা যে-ধরনের ছবি আঁকতাম, তাতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছেই ছিল, কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হয় যে, অবনীন্দ্রনাথের কাজও বাইরের প্রভাবকে এড়িয়ে চলতে পারেনি। তাঁর কাজে যেমন দেশী মোগল, রাজপুত, পাহাড়ী স্থল ইত্যাদির ছাপ পড়েছিল, তেমনি ছবির পরিবেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্তে ইউরোপীয় composition-এর রীতি কম আধিপত্য স্থাপন করেনি। সুতরাং অবনীন্দ্রনাথের ছবিকে কেবল ওরিয়েন্টাল আর্ট বললে তাঁর সব গুণের পূর্ণ বিশ্লেষণ হয় না। তাছাড়া তাঁর



শিল্পকর্মে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অবদানকেও যানতে হয়। শেষোক্ত কারণে আমার মতে তাঁর এক-তঁর শিল্প-প্রশিক্ষণবর্গের অনুল্লভ অফনরীতিকে অবনীন্দ্রনাথ তুল অব পোন্টিং বললেই অধিক সমীচীন হয়।

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকেই যখন এতটা প্রাধান্য দিচ্ছি, তখন তাঁর ছবিতে ঘরোয়া মাটির সাড়া কিভাবে ধরা পড়ল তাও বলা উচিত।

এই বিশেষ ধরনের সাড়ার পিছনে ছিল, অফন-পদ্ধতিতে রঙ, রেখা ও রূপের সমাবেশ। যে সমাবেশের সংস্পর্শে এসে বিনা বিধায় অনুভব করা যেত যে, তাঁর ছবিতে যেসব উচ্ছ্বাস রূপায়িত হয়েছে তার মধ্যে আছে ঘরোয়া মাটির টানে তার সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ। এই যোগসূত্রই তাঁর ছবিকে বিদেশীর অশোভনীয় আকর্ষণ থেকে হিঁচিয়ে এনে আমাদের স্বাভাবিক ভাব-প্রবণতার সঙ্গে যোগ ঘটিয়ে দিয়েছিল। আমাদের দেশের স্বাভাবিক ভাবোচ্ছ্বাস ও তার প্রকাশভঙ্গীকে অন্য দেশের সঙ্গে প্রভেদ করে বললাম এই কারণে যে, প্রত্যেক দেশেই উচ্ছ্বাসের প্রকাশ ঘটে তার স্বকীয় প্রধার, প্রচলিত অভ্যাস থেকে।

ছবির গুণাগুণ ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণের আড়ম্বর আর বাড়িয়ে তুললে আমার বক্তব্য আটের প্রবন্ধের তরে উঠে যেতে পারে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে উপস্থিত 'চিত্রশিল্পে প্রবাসীর অবদান' সম্পর্কে লিখতে বসিনি। অতএব ছবির ব্যাখ্যা ছেড়ে মূল বক্তব্যে ফিরে আসি।

ছবিকে কৃষ্টির অঙ্গরূপে স্বীকৃতি দেবার অক্লান্ত চেষ্টার জন্তে রামানন্দবাবুর নাম এদেশের যে-কোনো শিল্পীর কাছে শুণ্ড স্বরণীয় হয়ে থাকবে না, শিল্পী-সমাজে তার একটি হান হওয়ার কৃতজ্ঞ থাকারও কথা। কৃতজ্ঞতার কথা বলতে কেবল ঝাঝ অবনীন্দ্রনাথের

অনুসরণ করেছেন তাঁদের কথাই বলিনি, ঝাঝ ইউরোপীয় প্রধার ছবি আঁকতেন তাঁদেরও মনে রেখে কথাটা বলছি। কারণ, যে প্রথাতেই ছবি আঁকা হোক, ছবি সব সময়েই তার ব্যক্তি জ্ঞাপন করে নক্শার সাহায্যে। নক্শা যেভাবেই প্রকাশ করা হোক, আসলে সে ছবির কথাই বলে। ভাষা আলাদা হলেও ভাবের অন্তর্নিহিত সত্যের পরিবর্তন হয় না। রামানন্দবাবুর পক্ষপাতিত্বের চাপ দেশী ধরণে আঁকা ছবির ব্যাপক প্রচার সম্বন্ধে তাঁকে সদা জাগ্রত রাখলেও, যেসব শিল্পী বিদেশী প্রধার ছবি আঁকতেন তাঁরা যদি তাঁদের কাজকে ছবির কোঠায় তুলতে পারতেন, তাঁদের কাজও প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউয়ে সমাদরে হান পেয়েছে। দেশীয় ধরণে আঁকা ছবির প্রচারে আরও ঝাঝ সহায়তা করে-ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ই বি ছাভেল, আনন্দ কুমারদাসী, ও সি গান্ধুলী, টেলা ক্রাফার্ড ও সিস্টার নিবেদিতারও নাম না করলে শিল্পীদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার পূর্ণ প্রকাশ হবে না।

বক্তব্যের শেষে মণ পরিশোধের কথা ওঠে। শিল্পী হিসাবে আমি যে স্বীকৃতি পেয়েছি তার মূলে অনেক-খানিই প্রবাসীর কাছ থেকে পাওয়া উৎসাহবাণী, বা স্বস্তির মধ্যে এগিদে চলার পথ বোঝার সুবিধা ও সাহস দিয়েছিল। অত বড় সহায় নাগালে না থাকলে তরুণ পথ খুঁজতে গিয়ে দিশাহারা হয়ে যেতাম।

প্রসঙ্গক্রমে কেদারদ্বার (৬কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, স্কুহর বড় ভাই) কথা মনে পড়ছে। দিনের পর দিন আমার ঠুঁড়িওতে স্কুহর মতই ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে-ছেন। প্রবাসীর জন্য আমাকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নেবার প্রয়োজন হলে তিনি বসে থেকে কাজ করিয়ে নিতেন, পাছে শিল্পীর temperament কাজের দাবিকে ফাঁকি দিয়ে বসে।

# যষ্টিপুঁতিতে

সুশীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

...প্রায় তিন পুরুষ ধরিয়া আমাদের দেশের উন্নতি, প্রগতি এবং কচিং অবনতি, আমাদের সুখঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, আমাদের জয়-পরাজয়, আমাদের হর্ষবিবাদ, এ সমস্তর সাক্ষী হইয়া প্রবাসী মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। এই ষাট বৎসরের সাতশো কুড়িখানি প্রবাসী পত্রিকার মধ্যে বাঙ্গালীর এযুগের ইতিহাস ও সাহিত্য নিহিত আছে।—বালি বাঙ্গালা দেশের কেন, ভারতবর্ষের এবং সমগ্র বিশ্বেরও ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি দিগ্‌দর্শন এই ষাট বৎসর ধরিয়া প্রবাসীর মধ্যে পাওয়া যাইবে।...

...প্রকাশনের পারিপাট্যে, প্রবন্ধ-গৌরবে, চিত্রসজ্জার প্রবাসী প্রথম হইতে বাংলাভাষার সর্বাঙ্গের পত্রিকাগুলি অঙ্গন অধিকার করিতে সমর্থ হয়। প্রবাসীতে প্রবন্ধ বাহির হওয়া বহুবৎসর ধরিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে একটি সম্মান ও গৌরবের কথা বলিয়া বিবোচিত হইবে।.....

...প্রবাসী পত্রিকার এই একটি প্রথম সার্থকতা ইহাই হইয়াছিল যে, বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর মনে ভারতীয় শিল্প ও চিত্রকলা সম্বন্ধে জ্ঞান, মর্যাদাবোধ এবং রসাত্মকুতি প্রতিষ্ঠা করা। প্রবাসীর এই আশ্রয় চেষ্টার ফলে অন্ততঃ আংশিক ভাবে বাঙ্গালী অবনীজনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার, সুরেন্দ্র গাঙ্গুলি, ক্রীতীজনাথ, যামিনী রায় প্রমুখ শিল্পীকে নিজের হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে ইহা একটি কম কথা নয়। .....

...বাঙ্গালীর সাহিত্য-চেতনার উদ্বোধনে এবং তাহাকে পুষ্ট ও রসসিক্ত করিবার কার্যে এইভাবে অবদানকারী অধিক কাল ধরিয়া প্রবাসীর কীর্তি অমূল্য হইয়া আছে।

...প্রবাসীর দেশসেবা এই পত্রিকাকে বিশেষ গৌরবান্বিত করিয়াছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বলিষ্ঠ ও নিষ্ঠুর স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার জন্ত সাধনা, প্রবাসীতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত তাঁহার 'বাঁবিধ প্রসঙ্গ' শীর্ষক অংশে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সব শ্রেণীর পাঠককেই বিশেষভাবে জাগ্রিত করিয়া রাখিতে সহায়তা করিয়াছিল।.....

...যুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, এইভাবে প্রবাসী বাঙ্গালীর জনগণের মধ্যে উচ্চভাব, আদর্শ শিক্ষা, দেশাস্ববোধ প্রভৃতি সদৃশ বর্ধনে সার্থকতা অর্জন করিয়াছে। প্রবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত শুদ্ধ ও শুদ্ধ জ্যোতির্ময় দৃষ্টিভঙ্গি। ইন্টেলেক্চুয়ালিজম্ অর্থাৎ আধমানবিকতা, ও ইউনিভার্সালি হিউম্যানিজম্ অর্থাৎ বিশ্বমানবিকতার অন্ততম প্রচারক রূপে প্রবাসী কার্য করিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালীর চিত্তে এখন যে একটি যুক্তি ও জ্ঞানের দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়, প্রবাসী পত্রিকা তাহার অভিবর্ধনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে।.....

...যষ্টিপুঁতির এই শুভ অবসরে আমি আমার নিজের পক্ষ হইতে এবং দেশবাসীর পক্ষ হইতে প্রবাসী পত্রিকার সর্গাকীন উন্নতি ও দীর্ঘজীবন কামনা করি—এবং প্রার্থনা করি যেন বাঙ্গালীর জীবনে বহু বৎসর ধরিয়া, এমন কি পূর্ণ শতাব্দী ও তাহার অধিক কাল ধরিয়া প্রবাসী সত্য শিব সুন্দর এবং জ্ঞান ও রসাত্মকুতির দ্বারা অব্যাহত রাখিয়া যাইতে পারে।

হুমায়ুন কবির

...কলেজে ভর্তি হবার পরে একদিকে যেমন স্বাধীনতার স্বপ্ন আঘাত দিবিড়ভাবে ভালবাসতে এবং

বুঝতে শিখলাম, সঙ্গে সঙ্গে বদেলী এবং বিদেশী সাহিত্যের বিচিত্র বিকাশের সঙ্গে পরিচয়ও বাড়তে লাগল। সেইসময় থেকেই প্রবাসীর অভ্যন্তর রচনাও ছবর এবং মনকে নাড়া দিতে শুরু করে। পরে ধীরে ধীরে বাঙলা সাহিত্যের সেবা করেছেন, বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই প্রথম প্রবাসীর পাঠ্য পরিচয় হয়। নতুন নতুন লেখক আবিষ্কার এবং বাঙালার জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের রচনা ছড়িয়ে দেবার কাজে সে যুগে প্রবাসীর যে ভূমিকা, বাঙলা সাহিত্যের অম্লরাণী কোনদিনই তা ভুলবে না।

আমরা তখন ভাবতাম যে প্রবাসীতে রচনা প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত সাহিত্যিক হিসাবে পুরোপুরি স্বীকৃতি লাভ হয় নি। প্রথম যেবার প্রবাসীতে আমার লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, সেদিনকার আনন্দের কথা আজো স্বপ্ন আছে।...

### শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

...প্রবাসী মাসিকের কাছে 'প্রবাসী'র সমাধির কথা অবধি রইল না। প্রবাসের শিক্ষিত প্রবাসী বাঙালীদের কাছে 'প্রবাসী' যেন গৃহপালিকা মত অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠল—অবশ্যপাঠ্য ত বটেই। তাঁদের মনেও জীবনে সাহিত্যের একটি শুদ্ধ পরিচ্ছন্ন আনন্দময় পরিবেশ 'প্রবাসী' সৃষ্টি করেছিল।

১৯০৮ সাল থেকে পরের কয়েক বছর প্রবাসী সাহিত্য ও সমাজচিত্রের আদর্শ নিয়েই যেন একমন ছিল। হেসকান্দে সহসা ১৯১১ সালে প্রথম বঙ্গব্যবচ্ছেদ হ'ল। এর পরে 'প্রবাসী' আর শুধু সাহিত্য-সমাজ-শিল্পকলার ভাবনা নিয়ে ব্যাপৃত রইল না। 'প্রবাসী' যেন দেশের

বেদনা-ভাবনা, অপমান-সাহসের গানির কথা নিয়ে আকুল হয়ে উঠল। সাহিত্য, সমাজচিত্র, চিত্র, শিল্পকলার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক মহাশয় রাজনীতিকে সমান ক'রে—এক ক'রে নিলেন প্রবাসীর বিবিধ এগঙ্গে—প্রবাসীর বিখ্যাত লেখকদের নাম রচনার ও প্রবন্ধে। দেশকে যেন এই চতুর্দিক বাহিনী নিয়ে 'প্রবাসী' চালনা করতে লাগল।.....

### কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

...তাঁর প্রকৃতির জন্ত প্রবাসীর লেখার বিচার হ'ত লেখককে দেখে নয়, লেখার গুণ দেখে। একবার এক ভদ্রলোক প্রবাসীর অফিসে গিয়ে বললেন,—'চিন্তন দেখি মশাই, আমায় কে?' রামানন্দবাবু অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন, কোন জবাব দিতে পারলেন না। ভদ্রলোক তখন নিজের পরিচয় দিলেন—'তাঁর নাম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ছোট গল্প রচনার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরেই নাম ছিল প্রভাতবাবুর। 'বলবানু জামাতা,' 'আজতত্ত্ব,' 'শরীলে আর পদধ নাই'—তাঁর রচনায় এই রকম বাক্যগুলি তখনকার দিনে রহস্যআলাপে লোকের মুখে শোনা যেত। উপভাসের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বাংলা দেশের একজন প্রধান লেখক। তাঁর রচনার মধ্যে হাস্যকৌতুকের প্রাধান্য ছিল। তাঁর গল্প, উপভাস উভয়ই প্রবাসীতে বেকৃত। অথচ সম্পাদকের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি কখনও। রামানন্দবাবু প্রভাতবাবুর পরিচয় পেয়ে বললেন—'মনে মনে আমিও আশ্চর্য করেছিলুম আপনাকেই নাম।' প্রভাতবাবু হেসে জবাব দিলেন—'মনের আশ্চর্য্য কথাটা মুখ ফুটে বলতে না পারতেই ত আমার সঙ্গে বাকীতে হেরে গেলেন।'...



রাজা রামমোহন রায়



ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

# প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নারায়ণা বলহীনেন লভ্যঃ”

৭২তম ভাগ  
প্রথম খণ্ড

}

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯

}

২য় সংখ্যা



## বিবি

## প্রসঙ্গ



### দারিদ্র্য দূর কর

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই কয়টি কথার একটি বিরাট সর্বগ্রাসী সমস্যার আলোচনা ও প্রতিবিধান চেষ্টা করিয়া দেশবাসীকে ঐ মহাসমস্যার সমাধান সম্বন্ধে সজাগ করিয়াছেন। দারিদ্র্য দূর হয় নাই এবং কিভাবে কখন কতটা সেই দারিদ্র্য-ভারের লাঘব হইবে তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু দেশবাসী সকলেরই মনে একটা বিশ্বাস জাগ্রত হইয়াছে যে দেশশাসকদিগের সকল চেষ্টা এখন বিশেষ করিয়া দারিদ্র্য দূর করার কার্যে প্রযুক্ত হইবে। এবং তাহা হইলে সেই চেষ্টা অন্ততঃ কিছুটা সফল হইবে। অর্থাৎ নানা ক্ষেত্রে দেশের মানুষ নতুন নতুন অর্থকর কার্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে; ভোগের বস্তু সামগ্রী ও আবাস্য ব্যবস্থা (বথা শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি) বর্ধিত হারে উৎপন্ন ও প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিবে এবং কলে দেশের মানুষ পূর্বের ভার আর অসহায়, বেকার ও নিঃসম্বল

অবস্থায় অনাহারে অর্দ্ধাহারে অজ্ঞতার অন্ধকারে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে না। এ কথা ঠিক যে চেষ্টা থাকিলে যে দেশে ভোগ সামগ্রী যথেষ্ট পাওয়া যায় না সে দেশের মানুষের কাজের অভাব থাকি উচিত হয় না। বহুসংখ্যক বেকার মানুষ কর্মে নিযুক্ত হইয়া বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করিলে এবং শিক্ষা চিকিৎসা ও অপর আবাস্য সেবাকর্মে আত্মনিয়োগ করিলে সেই সকল বস্তু ও সেবা উৎপাদকদিগেরই ভোগে ও উপকারে লাগিয়া উৎপাদন কার্য সফল করিতে পারে। ঐ সকলের মূল্য অর্থেণ্য করা করিয়া কর্ম্মদিগের উপার্জন অর্থে মিটাইবার ব্যবস্থা করিলে সেইরূপ ব্যবস্থাই যথায় বলিয়া বিবর্তিত হইবে এবং প্রচলিত অর্থনীতির কাঠামোর ভিতরে ঐ সকল নতুন উৎপাদন কার্য বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় ও প্রস্তুতকারকদিগের বেতনাদির হানি নির্দিষ্ট হইয়া লেন দেন হইয়া যাওয়া সহজ হইবে। অর্থাৎ যদি কয়েক কোটি বেকার মানুষ কর্ম্মরূপে নিযুক্ত হইয়া যে সকল

বস্ত্র ক্রয় করিতেন অথবা শিক্ষা বা চিকিৎসার মূল্য দান করিতেন, তাঁহারা নিজেরাই যদি সেই সকল প্রস্তুত ও শিক্ষা চিকিৎসার কার্য করিতেন তাহা হইলে ডানহাতের কার্যের মূল্য বাম হস্তে প্রাপ্ত হইয়া এবং বাম হস্তের অর্থ দিয়া ডান হস্তস্থিত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য দিয়া অর্থনৈতিক কার্যব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইয়া যাইত। ইহা যদি না করিয়া অসংলগ্ন ভাবে নানাক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন কার্য ব্যবস্থা করিয়া ক্রমে ক্রমে দেশের সকল বেকারকে কার্যে নিযুক্ত করা এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে বিষয়টা ঋণাচ্ছাড়া ভাবে করা হইবে এবং তাহার ফল সর্বক্ষেত্রে উত্তম হইবে না। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঋণাচ্ছাড়া ভাবে করার ফলে বহু ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অধিক উৎপাদন হইয়া যাইবে এবং অনেক স্থলে প্রয়োজন থাকিলেও উৎপাদন যথেষ্ট হইবে না। যদি সারা দেশের মানুষের সকল প্রয়োজনীয় বস্তুর একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া সকল কিছুই মোট পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এবং যে সকল বস্তুর বা অবাস্তব সেবার উৎপাদন যথেষ্ট না থাকায় লোকের চাহিদা অপূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে দেখা যাইবে, সেই সকলের উৎপাদন ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে নূতন কর্মীদের নূতন উৎপাদন কার্য সঙ্গে সঙ্গে জাতির জনগণের জীবন-যাত্রার ব্যবহৃত হইয়া যাইতে পারে, উদ্ভূত কিছুই অব্যবহৃতভাবে পড়িয়া থাকিবে না। অর্থাৎ যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রস্তুত তালিকা ও শহরের এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের তালিকা দেখিয়া বেকার জনগণের তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং ফুড ডিপার্টমেন্ট ও অন্যান্য রাজস্ব সংক্রান্ত শাসন বিভাগের সাহায্যে উৎপন্ন দ্রব্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ অনায়াসেই কোথায় কোথায় কার্য ও কার্যোৎপন্ন বস্ত্র প্রভৃতির পরিমাণ বৃদ্ধি সম্ভব সে কথা ঠিক করিতে পারিবেন।

উপরে বর্ণিত ভাবে বেকার ও ভোগ্য বস্ত্র প্রভৃতির অভাব এই বিবিধ সমস্যার সমাধান চেষ্টা না করিয়া যদি শুধু সরকারী চাকুরী সৃষ্টি করিয়া কিছু কিছু

বেকার মানুষকে চাকুরী হিসাবে নানা দপ্তরে বসাইবার ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে সেই সকল চাকুরী শুধু উৎপাদন-কার্য-বর্জিতভাবে মাহিনা দিয়া পেটোরা মানুষজনকে টাকা পাওয়াইবার ব্যবস্থা মাত্র হইবে। এই সকল চাকুরীদিগের কোনও মূল্য ধার্য করা যায় এরূপ কার্য থাকিবে না এবং তাহারা শুধু বেতনই পাইবে। জনসাধারণের উপর ইহা একটা রাজকর বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়াইবে এবং অল্প কিছু মানুষেরই ইহাতে উপার্জন হইতে পারিবে। একথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে এই চাকুরী সৃষ্টির পছন্দ সর্বোপেক্ষা সহজসাধ্য পছন্দ ও ইহা দ্বারা দেশের লোকদের সংস্থান করা শীঘ্র শীঘ্র সম্ভব হয়। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক পরিণতির কোনও দ্বারী উন্নতি ইহাতে হয় না। যাহাকে বলে দায়সারী লোক-দেখান পছন্দ অসুসরণ—ইহা তাহাই।

### রামমোহনের-সমাজ সংস্কার-ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও জাতি গঠন পরিকল্পনা

রাজা রামমোহন রায়ের কার্যকলাপ, চিন্তার ধারা, তর্ক-বিতর্ক, শাসক গোষ্ঠীর সহিত পত্রাদি বিনিময় প্রভৃতির চর্চা করিলে দেখা যায় যে, তিনি যেসকল সংস্কার ও গঠনমূলক পরিবর্তন ও প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়া-হিলেন তাহা ভারতের সভ্যতা বৃষ্টি রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় অঙ্গের সকল অবয়বেই উপলব্ধির ক্ষেত্র সন্ধান করিয়াছিল। আজ হইতে প্রায় দুইশত বর্ষের পূর্বের সেই আধ্যাত্মিক, মানসিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও প্রাচীন জ্ঞানচর্চা ক্ষেত্রের জাগরণের কথার পর্যালোচনা করিলে রামমোহন রায়ের সর্বমুখী প্রতিষ্ঠার অত্যন্তব্য বিরাটত্বও ব্যাপ্তি সকলের মনেই মহাবিশ্বের সৃষ্টি করে। পুরুষের সহিত নারীর সমান অধিকারের কথা তিনি প্রায় একশত আশি বৎসর হইল বলিয়া গিয়াছেন : কিন্তু তাহা আইনতঃ গ্রাহ্য হইয়াছে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে। কার্যতঃ কতটা কি হইয়াছে তাহা কেহ সঠিক বলিতে পারে না। শিক্ষার পথ প্রদর্শক রামমোহন রায় বাহা বলিয়া গিয়াছেন সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা সকল ভারত

বাসীর ভক্ত আজিও করা হয় নাই এবং কখন করা হইবে তাহা কে জানে? নারীজাতির সম্মান রক্ষার আদর্শ এখনও বিশ্ববাসী কার্য্যভঃ মানিয়া লয় নাই। ইহার প্রমাণ, সম্ভ্রান্তি বাংলাদেশে যাহা ঘটিয়াছে ও যে স্বপ্ন্য কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে আমেরিকা ও চীন যুধ বন্ধ করিয়া অপরাধীদিগের শাস্তির কথা উল্লেখ মাত্র করে নাই, তাহাতেই পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। অথচ ভারতের বহু “আধুনিক”-মতবাদ-প্রচারক ও সমর্থক নরনারী এই চীন অথবা আমেরিকার সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। সকল মানবের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের স্বজন ও সাম্য প্রতিষ্ঠা, যাহার ভক্ত রাজা রামমোহন রায় আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন, সে আদর্শ আজও বিশ্বের বহুক্ষেত্রে অহুপলব্ধ থাকিয়া গিয়াছে। ইহার সহিত ছিল সকলের নিজ নিজ মত প্রকাশের অধিকার কিন্তু বর্তমান যুগে সাম্যের অধিকার বহু দেশে শুধু শ্বেতকায় নাগরিক-দিগের ভুক্তই বিশেষভাবে সংরক্ষিত আছে। কৃষ্ণকায়-গণ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ আফ্রিকায় ও বোডেশিয়ায় সাম্য উপভোগে সক্ষম নহেন। অল্প অনেক শ্বেতকায়-প্রধান দেশেও কৃষ্ণকায়গণ সমান অধিকার প্রাপ্ত হয়েন না।

স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করাতেও নানাভাবে বাধা দিবার চেষ্টা নানাক্ষেত্রে করা হইয়া থাকে। মতবৈধ-জাত কলহ ও রক্তপাত বহু দেশেই একটা রাষ্ট্রনীতির অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রাচীন জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তাহার দ্বারা সর্বমানবের আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতি সাধন চেষ্টা বর্তমানে বিশেষ হইতেছে কি না তাহা গণ্ডিতজনের অহুস্কানের বিষয়। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভক্তিরূপের আসরে কোন কোন মহাপুরুষ কখন কখন রামমোহনের পরে ভারতের সমাজে আবির্ভূত হইয়া থাকিলেও তাহাতে জনমানসে পরমেশ্বরের সহিত মানবের সম্বন্ধ বিচার চেষ্টা বর্ধিত হইয়াছে বলিয়া মনে করে করা যায় কি না তাহাও বিচার্য্য। পাশ্চাত্যে বর্তমানকালে বিজ্ঞান ও দর্শনের যে সমস্ত সাধন চেষ্টা

বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক করিতেছেন ও যাহার ফলে ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা ও চর্চা উচ্চশিক্ষিত মানুষের মধ্যে পুনঃ প্রচলিত হইতেছে; সেই মনোভাব ভারতবর্ষে বিশেষ দেখা যায় না। পরন্তু আধুনিকতার সহিত ভারতবর্ষে নিরীশ্বরবাদ যেন একটা বিশেষ সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। ইহার কারণ ভারতবাসী শিক্ষিতসমাজ কোনও অন্তর্নিহিত শক্তি যে সৃষ্টির মূলে থাকিয়া তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতেছে এইরূপ বিশ্বাস সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকে। সৃষ্টি কিভাবে কেন হইল, সৃষ্টিতে মানবজাতির স্থান, সৃষ্টির ভিতরে কোনও প্রাণশক্তি আছে কি না এবং থাকিলে তাহার সহিত মানবের কোন বিশেষ সম্বন্ধের সম্ভাবনা আছে কি না ইত্যাদি বহু কথা কোনও আলোচনা বর্তমান যুগের আধুনিক বিজ্ঞানগোষ্ঠীদিগের মধ্যে আর প্রচলিত থাকিতেছে না। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞার নিকট বলিদান দিবার কোনও চেষ্টার সমর্থন ত করিতে পারিতেনই না; তাহার নিকট বিজ্ঞা ও বিজ্ঞান ঈশ্বর উপলব্ধিরই প্রশস্ততর পথ বলিয়া স্বীকৃত হইত। আজিও তাহার প্রদর্শিত পথে বাহারা চলেন তাহারা আধ্যাত্মিকতা বর্ধিত বিজ্ঞাকে আশ্রয় করিয়া কখনও জীবন পথে অগ্রগমন চেষ্টা করেন না। আধ্যাত্মিকতা উন্নত বিজ্ঞা মানুষকে জ্ঞানের পথে যে ঈশ্বর উপলব্ধিতে লইয়া যায় তাহার সহিত ভক্তির পথে পরমাত্মার সহিত যে সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন চেষ্টা হইতে পারে না; কিন্তু কোন পথে চলিলে ফল প্রাপ্তিতে কি পার্থক্য দেখা যাইতে পারে তাহার বিচার সহজ নহে। রাজা রামমোহন রায় জ্ঞান ও ভক্তি উভয় পথেই চলিতে সক্ষম ছিলেন। জ্ঞান উপলব্ধি ভক্তিকে দুর্বল করে না; পরন্তু আরও জোরাল করিয়া দেয় বলিয়াই তিনি সম্ভবত বিশ্বাস করিতেন। অপর সাধকদিগের মধ্যেও এই বিশ্বাস দেখা গিয়াছে।

ব্রহ্মসমাজ প্রচারের দ্বারা সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করে না তাহার কারণ প্রধানতঃ এই যে ব্রাহ্মসমাজের



অধিকাংশ সভাই উচ্চশিক্ষিত এবং আধ্যাত্মিকতার বিধাসী। প্রচারের কলে বাহারা কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ে যোগদান করেন তাঁহারা নিজ হইতে মত পরিবর্তন না করিলে প্রচারকগণ তাঁহাদের মত পরিবর্তনার্থে যে আলোচনা-সমালোচনা ইত্যাদি করেন তাহা অনেক ক্ষেত্রেই আপত্তিকরক ভুলনার উত্থাপন করে। রাজা রামমোহন রায় কোনও সম্প্রদায়ের নিষ্প্রবাহ করা অমার্জনীয় মনে করিতেন এবং সেই চিন্তা ধারা অহুত্ব করিয়াই অধ্যাবিধি ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত হইতেছে। অপর কোনও ধর্মমত বা ধর্মসংক্রান্ত রীতিনীতির সমালোচনা করা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সমীচীন মনে করা হয় না। সুতরাং উচ্চাঙ্গের দার্শনিক আলোচনা ব্যতীত অপর ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। প্রচার কার্য এই কারণেই বিশেষ করা হয় না। রাজা রামমোহন রায় লিখিত ব্রাহ্মসমাজ ভবনের দানপত্র পাঠ করিলে অপর ধর্মের সমালোচনা ও নিষ্প্রবাহ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হইবে।

একথা ঠিকই যে কেয়লা, মহারাষ্ট্র, বঙ্গভূমি প্রভৃতি দেশে বর্তমানে খ্রীশিক্ষা ও খ্রীলোকদিগের মানবীয় অধিকার লইয়া আর পুরাকালের জায় অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের প্রাহুর্ভাব লক্ষিত হয় না। কিন্তু যে সকল অকলে অজ্ঞানতার অন্ধকার প্রগাঢ়রূপে বিরাজমান সেই সকল স্থলে এখনও শতকরা নব্বইজন খ্রীলোক নিরক্ষর। আইনে মানা থাকিলেও এখনও বাল্যবিবাহ কোন কোন দেশে প্রবলভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। বঙ্গভূমিতেও পণপ্রথা এখনও সচল ও ইহা নারীজাতির অবমাননার কথা স্বীকার করিতেই হয়। সুতরাং রাজা রামমোহন রায়ের মানবীয় রাষ্ট্রীয় আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সকল আদর্শই বর্তমানে উপলব্ধ হইয়া গিয়াছে ও ভারতে এখন আর কাহাকেও রামমোহন রায়ের নিকট কিছু শিখিতে হইবে না; সকলেই প্রগতির উচ্চতম শিখরে উঠিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবে আধুনিক মূল্যে মাহুত্ব হইয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি কথা কতটা মূল্য আছে তাহা সেই মহা-

পুরুষের এই বিশতবার্ষিকী অহুতান বৎসরে চিন্তাশীল ভারতীয় জাতিরই ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। দেখা যাইবে যে, তিনি ভারতীয় মাহুত্বকে বাহা হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন ভারতীয়েরা সর্বক্ষেত্রে ঠিক সেইরূপ হইয়া উঠিতে এখনও সক্ষম হয়েন নাই। রাজা রামমোহন রায় যে সকল ব্যক্তিগত, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও মানবীয় আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন সেই সকল আদর্শ ভারতে তথা বিধে এখনও প্রচার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পূর্ণরূপে বর্তমান রহিয়াছে। এই কথা মনে রাখিয়া ভারতবাসী যদি সমাজ ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রগতিশীল হইবার চেষ্টা করেন তাহা হইলেই জাতির ও ব্যক্তির উন্নতির সম্ভাবনা জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারিবে।

বঙ্গপ্রদেশ, বঙ্গভূমি, বঙ্গদেশ না শুধু বঙ্গ ?

পশ্চিমবঙ্গের নাম বঙ্গলাইয়া নাম রাখা হইবে বঙ্গ প্রদেশ বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছিল। ইহাতে অনেকে আপত্তি করেন ও বলেন যে নামটা বঙ্গভূমি হওয়া উচিত। আমরাও এই বঙ্গভূমি নামেরই সমর্থক। অপর যে সকল নাম দেওয়ার কথা উঠিয়াছে তাহার মধ্যে বঙ্গ দেশ অথবা শুধু বঙ্গ নাম দিবার কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ বখন দেশের নাম হিসাবে প্রচলিত ছিল তখন শুধু বঙ্গ বলিলেই বাংলা ভাষাভাষী বাঙ্গালী জাতির দেশ বুঝাইত। কেহ কেহ বঙ্গদেশ কথাটিও ব্যবহার করিয়াছেন। বঙ্গদেশের সহিত বাংলাদেশ নামটির সাদৃশ্য থাকিলেও দুইটি নাম এক নহে; কিছু পার্থক্য আছে। যাহাই হউক, বঙ্গপ্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গ, বঙ্গদেশ বা বঙ্গভূমি নামই অধিক ক্রটি যম্বর। এবং অর্থের দিক দিয়াও দেশের জাপক। আমাদের দেশটি যে শুধু মাত্র ভারতের একটি প্রদেশ এই কথাটা প্রকটভাবে বলিবার কোনও অর্থ হয় না। বাঙ্গালা ভাষার, বাঙ্গালী জাতির ও বাংলার সভ্যতা ও কৃষ্টির নাম রক্ষা করিবার জন্ত প্রদেশ কথাটা ব্যবহার না করাই সমীচীন। ভারতের যে সকল রাষ্ট্রীয় অঙ্গের নামের সহিত প্রদেশ শব্দটি সংযুক্ত আছে সেই সকল দেশের সৃজন হইয়াছিল রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে; তাহাদের

কোনও বিশেষ কুটি বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য ছিল না। বখা উত্তর প্রদেশে ভোজপুরী, কানোজী, কৌশলী, মথুরাবাসী, উর্দুভাষাভাষী প্রভৃতি বহু জাতির মানুষের বাস। পূর্বে যখন ইহার নাম ছিল আগ্রা ও আউধ সংযুক্ত প্রদেশ তখন হইতেই এই প্রদেশের জাতি ধর্ম ভাষা আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও ঐক্যবদ্ধতা ছিল না। অল্প প্রদেশেও ঐরূপ তেলেলানা, তেলেলুভাষী, পুরাতন অন্ধ্রদেশবাসী প্রভৃতি, মিশ্রিত জাতির বাস। সত্যতা ভাষা বা ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য থাকিতে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিল নাড়ু, কেরালা, মহীশূর প্রভৃতির নামের সহিত প্রদেশ কথটি সংযুক্ত হয় নাই। বঙ্গভূমিরও কৃত্রিম উপায়ে জোড়াভাড়া দেওয়া কোন বৈশিষ্ট্য রচিত হয় নাই। বরঞ্চ বলা যায় যে বঙ্গভূমির অনেকাংশ কাটিয়া লইয়া বিহারে সংযুক্ত করা হইয়াছে এবং সেই সকল অংশ পুনরায় বঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত করা ভ্রান্তঃ উচিত। তাহা করিলে বিহারের অঙ্গহানি হইবে বলিয়া অনেক বিহারবাসী হিন্দীভাষাভাষী ব্যক্তি আলোড়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা গায়ের জোরে বঙ্গভূমির অঙ্গহানি করিয়া বিহারের শোভা বা ঐশ্বর্য বৃদ্ধি না করিয়া উত্তর প্রদেশের ভোজপুরী অংশ বিহারে সংযুক্ত করিয়া লইলেই কাজটা উচিত ও বিবাদ নিরাস্তক হইতে পারে। ধানবাদকে ধনুন্দ বাঁলয়া চিৎকার করিলেই মানভূম জেলাটি বিহারের স্বাভাবিক অঙ্গ হইয়া যায় না। কালিমাটি, খাটশিলা, ধলভূম প্রভৃতিও বাংলার ইতিহাসের সহিত সহস্র বৎসর ধরিয়া জড়িত আছে। উৎপাত করিয়া বাঙ্গালীকে হিন্দী বলাইবার চেষ্টাও কখনও সুসাধ্য হইবে না। উত্তর প্রদেশ বিরাট আকার ও তাহার বিহারী অঙ্গ সকল বিহারে বাইলেই উদ্ভব হয়। এ সকল কথা অল্প প্রসঙ্গ; শুধু বঙ্গভূমির গঠন লইয়া উল্লেখ করা আবশ্যিক বলিয়াই এই স্থলে কথার উত্থাপনা হইল।

### বঙ্গে জল কষ্ট

বঙ্গদেশে জলের প্রাচুর্য থাকায় বঙ্গবাসী সাধারণ বধেই জল ব্যবহার করার অভ্যস্ত। অল্প জল ব্যবহারে

জীবনযাত্রা নির্বাহে বাঙালীর পক্ষে কষ্টকর। এই বৎসর বহুকাল ধরিয়া বড় ঝাপটা বৃষ্টিপাত না হওয়ায় নদা হলে জল কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। অগভীর নলকূপগুলিও শুকাইয়া বাইতেছে। যে সকল স্থানে কূপ হইতে বাসি করিয়া জল তুলিয়া ব্যবহার করা হইত সেই সকল স্থানে বহু কূপ শুকাইয়া গিয়াছে অথবা অতি অল্প জল উঠাইলেই আর জল পাওয়া যাইতেছে না। কলিকাতার গঙ্গাতেও ফরাকা হইতে জল বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইবার যে কথা ছিল তাহা এখনও করা হয় নাই। মন্ত্রী হুম্মতুয়াইয়া সম্ভবত ফরাকার উদ্দেশ্যে কথটা ইচ্ছাপূর্বকই তুলিয়া বসিয়া আছেন; কারণ তিনি ফরাকাতে লোকজন ডাকিয়া মহাসমারোহে একটা উন্মোচন বা উদ্বাটন কার্য করিয়া নাম কিনিবার চেষ্টা করিয়াছেন; যদিও আসল কাজটা এখনও করা হয় নাই। একটা প্রবাদে মতই কথা আছে—অব্যবহার বর্ণনা করিয়া—মাহাতে লোকজন আয়োজন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, লেবু, ছন, তেল সবই সংগ্রহ করা হইয়াছে, শুধু চালটা সংগ্রহ হইলেই হয়। শ্রীহুম্মতুয়াইয়া ফরাকা বাঁধা বাঁধিয়া তাহার উপর দিয়া রেলগাড়ী মোটর গাড়ী চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, শুধু বাঁধবাঁধিবার মূল উদ্দেশ্য যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা সেইটাই এখনও হইয়া উঠে নাই। তিনি নানা বিচিত্র কার্য করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন কিন্তু দেশের উন্নতি ও মঙ্গলকর কার্যগুলি করিতে পারিতেছেন না। এ অবস্থায় তাঁহাকে দিয়া কিছু করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। দেশের জলকষ্ট নিবারণ অবশ্য কেন্দ্রীয় শাসকদিগের কার্য নহে। ইহার ব্যবস্থা কি হইবে তাহা এই দেশের মুখ্য মন্ত্রী বলিতে পারিবেন। কিন্তু তিনিও বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনা লইয়া ব্যাকুল; জল-কষ্ট লইয়া অতি শীঘ্র কিছু করিতে পারিবেন কি?

### ভিয়েতনামের যুদ্ধ

ভিয়েতনামের উত্তর অঙ্গলের উপর আমেরিকার বোমা বর্ষণ প্রবল ভাবে চলিতেছে এবং আমেরিকা সমুদ্রপথে উত্তর ভিয়েতনাম গমন সকল দেশের

জাহাজাদির পক্ষে বিপদজনক বা অসম্ভব করিয়া দিবার জন্য উত্তর ভিয়েতনামের বন্দরগুলির আশেপাশে জলময় “মাইন” ছাড়িয়া দিয়া ঐ দেশের অবরোধ আরও সম্পূর্ণ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। রুশিয়া বলিয়াছে যে তাহার জাহাজ উত্তর ভিয়েতনামে যাইবে এবং তৎক্ষণ “মাইন” ছুলিয়া দিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক হইলে তাহা করা হইবে। “মাইন” ছাড়িয়া অপর দেশের জাহাজ চলাচল যদি আমেরিকা বন্ধ করিতে পারে তাহা হইলে রুশিয়া তাহার জাহাব দিবার ব্যবস্থা করিতে সহজেই পারিবে। ইহার অর্থ দক্ষিণ ভিয়েতনামের বন্দরগুলি অবরোধ করিয়া “মাইন” স্থাপন অথবা আরও ব্যাপক কোন ব্যবস্থা তাহা বলা যায় না। তবে এ কথা বুঝায় যে রুশিয়াকে যদি উত্তর ভিয়েতনামে অস্ত্র সরবরাহে বাধা দেওয়া হয় তাহা হইলে রুশিয়া প্রত্যুত্তরে আমেরিকাকেও ভিয়েতনামে অস্ত্র সৈন্তাদি প্রেরণে বাধা দিবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে রুশিয়ার সহিত আমেরিকার সংঘর্ষের সম্ভাবনা বৃদ্ধি হইবে বলিয়া মনে হয় এবং সেই সংঘর্ষ যে শুধু ভিয়েতনাম অঞ্চলেই হইবে; আরও দূরে, জলে হলে আকাশে হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? আমেরিকার সৈন্ত বাহিনী বহুকাল হইতেই ভিয়েতনামের রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধ করিতেছে। চীনা অথবা রুশ দেশীয় সৈন্ত ঐ যুদ্ধক্ষেত্রে অত্যাধিক সাক্ষাৎভাবে বুদ্ধে নামে নাই। কিন্তু সে অবস্থার পরিবর্তন হইতে কোনও বাধা আছে কি? যদি রুশিয়া ও চীন সৈন্ত পাঠাইয়া উত্তর ভিয়েতনামকে সাহায্য করে তাহা হইলে আমেরিকা অথবা বিশ্ববাসী তাহা ততটাই অস্ত্রায় বলিতে পারেন যতটা অস্ত্রায় আমেরিকা বহুকালাবধি করিয়া আসিতেছে। ভারের বিচারে আমেরিকার জন্য কোন নুতন বিধান নির্দিষ্ট হইতে পারে না। অর্থাৎ আমেরিকা বাহ্য করিতে পারিবে রুশিয়া ও চীনও তাহাই করিবার অধিকার ভারতঃ দাবি করিতে পারে।

#### দ্বিতীয়ে বর্ণবিষয়

দ্বিতীয়ে কোন কোন বিদেশী রাজ্যের রাজদূতনিবাসের বা দফতরের ভারতবাণী কর্মীদের সম্বন্ধে রাজদূত

দফতরের নিয়মকানুন বর্ণবিষয়বোধেই বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। যথা কোনও একটি বিদেশী রাজদূত আত্মনার একটি কৃত্রিম সরোবর নির্মাণ করিয়া স্থানের অধিকার শুধু ঐ বিদেশবাসীদেরই জন্যই বিশেষ করিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ রাজদূত দফতরের যে সকল ভারতীয় কর্মচারী আছেন তাহারা ঐ সরোবরে অবগাহন করিতে পারেন না। ইহার কারণ শুনা যায় এইরূপ দেখান হইয়াছে যে, ভারতবাসীদের সহিত একত্র এক সরোবরে স্নান করিলে বিদেশীদের স্বাস্থ্য-হানির সম্ভাবনা হয়। বস্তত কথাটা ঠিক ইহার বিপরীত। বিদেশীদেরই নানা প্রকার ব্যাধি থাকে যথা পোলিওমাইয়েলাইটিস প্রভৃতি রোগ, যাহা ভারতীয়গণ বিদেশীদের সহিত এক স্থানকূণ্ডে অবগাহন করিলে ভারতীয়দেরই হইতে পারে। এই কথাটা উল্লেখ করিয়া বলিয়া ভারতীয়দের প্রতি অসম্মান দেখান হইয়াছে এবং তাহা লইয়া দিল্লির দরবারে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে বিদেশীদের সংক্রামক ব্যাধিভাতি অধিক থাকিলে তাহাদের পক্ষে ভারতে না আসাই উচিত। কারণ বহু ব্যাধি এক হাওয়ার নিশ্বাস গ্রহণ গ্রহণ নিশ্বাস হইতে সংক্রামিত হইতে পারে এবং বিদেশীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বায়ুমণ্ডল রচনা অতি কঠিন কার্য; সুতরাং ঐ জাতীয় সংক্রামক ব্যাধিভর হইতে বিদেশীদেরকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় তাহাদেরকে এ দেশে না আসিতে দেওয়া। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে বহু বিদেশী “হিপি” “হেরকুক” প্রভৃতি এদেশে আসিয়া যত্নভর যেমন তেমন করিয়া ঘুরিয়া কিরিয়া বেড়াইতেছে। ইহার আশা করিতে নানা ভাবে নানা ব্যাধিতে সংক্রামিত করিতে পারে। সুতরাং ইহাদেরকে এদেশে না আসিতে দেওয়াই উচিত। কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা কেহ কেন করিতেছেন না? এই সকল ব্যক্তিকে দেখিলে মনে হয় না যে ইহার পূর্ণরূপে সকল ব্যাধি হুত এবং স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার প্রতীক। আশা করিয়া দেশে অবশ্য ব্যাধি সম্বন্ধে অজানতা ও ঔদাসীন্য প্রভৃতি

সর্বত্রই বিভিন্ন বোঝাকাত ব্যক্তিসকলের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সেই দিক দিয়া দেখিলে আমাদের বিদেশীদিগের সম্বন্ধে কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু বিদেশীগণ যদি আমাদের সম্বন্ধে অসম্মান সূচক নিয়মাদি প্রবর্তন করে, তাহা আমাদের কখনও সহ করা উচিত হইবে না।

### কার্য্যে অবহেলা

ভারতবর্ষের মানুষ অতি দারিদ্র্য। ইহার মূল কারণ অসুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, ভারতের যে সকল মানুষ কোন কর্ম্মভার পাউয়াছে তাহারা কর্ম্মে অবহেলা ও বিলম্ব করিতে সতত সচেষ্ট বলিয়া প্রথমতঃ তাহাদের সকল কার্য্যেই অপর দেশের তুলনায় অধিক সংখ্যক লোক লাগিয়া থাকে এবং দ্বিতীয়তঃ সকল কার্য্যেই এক ঘটীর স্থলে তিন ঘটী সময় লাগিয়া যায়। ভারতীয় মানুষ যে কর্ম্মশক্তিহীন একথা কেহ বলে না। যথা সাময়িক ক্ষেত্রে অপর দেশের তুলনায় ভারতীয়গণের একই সংখ্যক ব্যক্তি একই প্রকার কার্য্য একই সময়ে করিয়া থাকে, এবং অপর জাতি অপেক্ষা উত্তমরূপেই করে। সাময়িক কার্য্য কারখানা অথবা দফতরের কার্য্য অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম সাধ্য, কষ্টকর ও বিপদজনক। সেই কার্য্য যে জাতির মানুষ শীঘ্র ও যথার্থভাবে করিতে পারে সেই জাতি সকল কার্য্যই উত্তমরূপে করিতে সক্ষম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অথচ কারখানায়, দফতরে অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে সকল শ্রমসাধ্য কার্য্যেই ভারতীয়েরা অপারগ বলিয়া মনে হয় কেন? ইহার কারণ অবহেলা। করিয়া গা ঢিলা দিয়া বেগার-ঠেলাভাবে কাজ করার অভ্যাস। যদি ভারতের সকল মানুষ নিজ নিজ শক্তি অসুযায়ী ভাবে কর্ম্ম আত্মনিয়োগ করিত তাহা হইলে ভারতের ঐশ্বর্য্য অনায়াসে বিগুণ চতুগুণ হইতে পারিত। ইহা যে হয় নাই তাহার কারণ অবহেলা ও পূর্ণ কর্ম্মশক্তি নিয়োগ না করা। এই গা ঢিলা দিয়া কাজ করার আর একটা কঠিন দিক আছে। যে যত বহু মূলধন লাগাইয়া ক্রয় করা হয় সেই যত্নকে পূর্ণ গতিতে না চালাইয়া ঢিলা ভালে চালাইলে মূলধনের পূর্ণ ব্যবহার হয় না। অর্থাৎ ভারতে যদি ৬০০০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার

হইয়া থাকে তাহা হইলে উৎপাদন যথেষ্ট না হইলে সেই মূলধন অংশতঃ পড়িয়া পড়িয়া নষ্ট হইতেছে বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ অর্ধগতিতে চলিলে ঐ মূলধনের অর্ধেক বা ৩০০০ কোটি টাকা জমান মূলধন জলে পড়িয়াছে বলা যাইতে পারে।

সুতরাং যদি এই জাতি পূর্ণ উত্তমে কার্য্যে লাগিয়া যায় তাহা হইলে জাতির কার্য্যকর মূলধন বিনা ধরতে বিগুণ হইয়া যাইবে বলিয়া ধরা যাইবে। সেই অল্পপাতে জাতির মোট বার্ষিক আয়ও বিগুণ হইয়া যাইবে এবং দারিদ্র্য দূর করার কার্য্য বিনা ব্যয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়া যাইবে। “পরিবী হটাও” বলিয়া যে একটা আশ্রয় ভোলা হইয়াছে তাহা কার্য্যতঃ ফলশ্রুতি করিতে হইলে, পরিবীর বিভিন্ন কারণগুলিকে সর্বাঙ্গ্রে দূর করিতে হইবে। এই সকল কারণের মধ্যে দেখা যায় সর্বাঙ্গেকা প্রবল কারণ হইল কার্য্যহলে হাত গুটাইয়া নিষ্কর্ম্ম হইয়া বসিয়া থাকা। ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষ কোন কাজ না করিয়া অথবা অতি অল্প সময় কাজ করিয়া বসিয়া থাকে। এই সকল মানুষ যদি পুরা কাজ করে তাহা হইলে জাতির যে পরিমাণ অধিক ঐশ্বর্য্য উৎপাদিত হইতে পারে তাহাতে জাতীয় দারিদ্র্য প্রায় দূর হইয়া যাইতে পারে। যাহারা কর্ম্মে পূর্ণকালের জন্ত বেতন ভোগী কর্ম্মীরূপে নিযুক্ত আছে তাহারাও যে সকলে পূর্ণ উত্তমে কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহা নহে। অনেকেই কাজে ঈর্ষা দিয়া বসিয়া বেতন গ্রহণ করে। অনেকে যে স্থলে একজনের কাজ আছে সেই স্থলে তিনজন কাজ করিবার আভিনয় করিয়া দিন গুজরান করে। বেকারী ঈর্ষাবাদি ইত্যাদি দূর না করিলে পরিবী হটান কখনও সফল হইতে পারে না। আর একটা দোষ আছে তাহা হইল ঢিলা ভালে বিলম্ব করিয়া কাজ করা। যে কাজ এক ঘটীর করা যায় তাহা যদি তিন ঘটীর করা হয় তাহাও পরিবী বুদ্ধির একটা জোয়াল উপায়। আমাদের দেশে ধীরে ধীরে গতিতে কাজ করা একটা চির বর্তমান দারিদ্র্য-বর্ধক-ব্যাধি। সকল কর্ম্মী যদি যথাসম্ভব শীঘ্র শীঘ্র নিজ

নিজ কার্য শেষ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে ঐশ্বর্য বৃদ্ধি আপনা হইতেই সাধিত হইতে পারে।

### পাকিস্তানের সমর আগ্রহ

বাংলাদেশে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহার মূলে ছিল পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক লক্ষ লক্ষ নবনারীশিশুকে ভারতে তাড়িয়া প্রবেশ করিতে বাধ্য করা এবং বহুসংখ্যক পাক সেনাদিগের দ্বারা ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদিগের উপর আক্রমণ। পশ্চিম সমগ্রদলে যে যুদ্ধ হয় তাহাও পাকিস্তানই আরম্ভ করে। পাক বিমানবাহিনী অকস্মাৎ অনেকগুলি ভারতীয় বিমান কেন্দ্রের উপর বোমাবর্ষণ আরম্ভ করে ও ভারতও আত্ম রক্ষার্থে পাক বিমানগুলির উপর প্রত্যাক্রমণ করিতে বাধ্য হয়। পাক সৈন্তগণও ভারতের এলাকার অগ্রপ্রবেশ চেষ্টা করে ও ভারতীয় সৈন্তবাহিনীও প্রত্যুত্তরে তাহার পালটা জবাব দিয়া পাকিস্তানের উপর আক্রমণ করে। পাকফৌজ যখন বাংলাদেশে আত্ম-সমর্পণ করে ও পূর্বে পশ্চিম হুই দিকেই গুলি চালনা বন্ধ হয় তখন মুক্তিযুদ্ধের ব্যবস্থা হয়। যে রেখার উপরে হুই দলের সৈন্তগণ শান্তিরক্ষা করিয়া অবস্থিত তাহাকে মুক্তিযুদ্ধের রেখা বলা হইয়া থাকে। সম্মুখিত কাম্বীরে মুক্তিযুদ্ধের রেখার উপরে হুই হলে পাক সৈন্তগণ প্রবল আক্রমণ করিয়া এ হুইটি হলের খাঁটি হুইটি দখল করিয়া লয়। এই কার্যে তাহাদের অনেক সৈন্ত হতাহত হয়। ভারতীয় সেনাপতিগণ এ হুইটি খাঁটি নিজেদের করায়ত্ত রাখিবার জন্য বহু সৈন্তের প্রাণহানি হইতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কারণ এ খাঁটি হুইটি সামরিক ভাবে তত কিছু মূল্যবান ছিল না। পাকিস্তান লোক দেখাইবার জন্য এ কার্যে অনেক সৈন্ত বিনাশ

সহ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে লোকের অল্পপাতে তেমন কোনও লাভ হয় নাই। অবস্থা যাহা ছিল প্রায় তাহাই আছে। উপরন্তু মুক্তিযুদ্ধের মানিরা লইয়া হঠাৎ সেই মুক্তিযুদ্ধের তত্ত্ব করার অধ্যাতিতত্ত্ব পাকিস্তানের কপালে লাগিয়াছে।

### আসাম প্রদেশের সংবিধান-বিরুদ্ধতা

আসামের অধিনীতা জাতির লোকেরা বহুকাল হইতেই ভারতের সংবিধান-বিরুদ্ধতা করিয়া আসিতেছেন ও তাহার ফলে এ প্রদেশে ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। এই সংবিধান-বিরুদ্ধতার প্রকটতম লক্ষণ হইল, এ প্রদেশের যাহারা আসামী ভাষাভাষী নহেন তাঁহাদিগের উপর জোরজুলুম করিয়া তাঁহাদের মাতৃভাষা অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্বাহের পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা। যথা বাঙ্গালী জাতির মানুষ আসামে বহু সংখ্যায় বাস করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা আসামী জাতির মানুষের তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু আসামের প্রাদেশিক ভাষা আসামী বলিয়া বাঙ্গালীদিগের শিক্ষা ক্ষেত্রে ও অপরাপর কাজে কর্তব্য বাংলা ভাষা ব্যবহার করিবার অধিকার আসাম সরকার স্বীকার করেন না। কোন কোন আসামী শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা জোর করিয়া অচল করা হইয়াছে। পূর্বে আসামের বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানগণ নিজেদের মাতৃভাষা আসামী বলিয়া লিখাইতেন। এখন সম্ভবতঃ তাঁহারা নিজেদের যথার্থ মাতৃভাষা যাহা তাহাই লিখাইবেন মনে হয়। তাহা হইলে সম্ভবত আসামের অধিকাংশ নাগরিকের মাতৃভাষা হইবে বাংলা। তখন কি ভারত সরকার তাহা মানিরা লইয়া আসামের ভাষা বাংলাকেই স্থির করিবেন? অথবা আসাম পুনর্নির্মাণ বিধিও করিয়া একখণ্ডের ভাষা বাংলা ও অপর খণ্ডের ভাষা আসামী ঘোষণা করিবেন?

# রামমোহন রায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের প্রাণ বিস্ত্রোহী। চারিদিকে জড়মানব তার একান্ত শক্তি ও অসংখ্য বাহু বিস্তার করে বসে আছে। ক্ষুদ্র প্রাণ প্রতি বহুদূর্ভে নানাদিক্ থেকে তাকে নিরস্ত করে তবে আত্মপ্রকাশ করে। এই জড় তার চারিদিকে ক্রান্তির প্রাচীর তুলে তুলে তার প্রয়াসের পরিধিকে কেবলি সঙ্কীর্ণ করে আনতে চায়। বারম্বার এই প্রাচীরকে ভেঙে ভেঙে তবে প্রাণ আপন অধিকার রক্ষা করতে পারে। তাই আমাদের হৃৎপিণ্ড দিনে রাতে এক বহুদূর্ভ ছুটি নিতে পারে না, গুরুভার বস্তৃপুঞ্জের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তার আক্রমণ ক্ষান্ত হলেই মুহূর্ত।

প্রাণের এই নিত্য সচেতনতাই যেমন প্রাণের আত্ম-প্রকাশ, মনেরও তাই। তার অনন্ত জিজ্ঞাসা। চারিদিকে সত্যের রহস্য নূক হয়ে আছে। আপন শক্তিতে উত্তর আদায় করতে হয়। অল্প অনবধান হলেই ভুল উত্তর পাই। সেই ভুল উত্তরগুলিকে নিশ্চেষ্টে নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নিলেই মনের সাংঘাতিক পরাভব। জিজ্ঞাসার শৈথিল্যেই মনের জড়তা। যেমন জীবনী শক্তির নিরুদ্যমেই অস্বাভাব্য, তাতেই যত যোগের উৎপত্তি, বিনাশের আয়োজন, ভেমনি মননশক্তির অবসাদ ঘটলেই মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে যত বকমের বিকার প্রবেশ করে। সত্য-মিথ্যা ভালমন্দ সমস্ত কিছুকেই বিনাপ্রায়ে অলস ভীক মন যখন মেনে নিতে থাকে তখনই মনুষ্যের সকল প্রকার হুর্গতি। জড়ের মধ্যে যে অচল বৃত্ততা, মানুষের মন যখনই তার সঙ্গে আপোষে সন্ধি করে তখন থেকে জগতে মানুষ মনমরা হয়ে থাকে, জড় রাজ্যে, খাদ্যনা ছুঁগিয়ে নিঃশ্ব হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে একদিন মনের স্বরাজ গিয়েছে ধ্বংস হয়ে। পক্ষ মনের ছিল না আত্মকর্ষন, এর করবার শক্তি

ও ভরসা সে হারিয়েছিল। সে বা মনেছে তাই মেনেছে, যে বুলি তার কানে দেওয়া হয়েছে সেই বুলিই সে আউড়িয়েছে। যখন কোন উৎপাত এসে পড়েছে তখন তাকে বিবিলিপি বলে নিয়েছে মেনে। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নূতন প্রণালীতে বর্তমানকালীন সংসার-সমস্যার সমাধান করা তার অধিকার-বাহিত্ব তুলে স্বীকার করার দ্বারা আত্মাবমাননার তার সঙ্কোচ ছিল না। মনের আত্মপ্রকাশের দ্বারা সৌন্দর্য এদেশে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেশ তখন সামনের কালের দিকে চলেনি, পিছনের কালকেই ক্রমাগত প্রদর্শন করেছে—চিন্তাশক্তি যেহুঁকু বাকি ছিল সে অহুসদ্ধান করতে নয়, অহুসরণ করবার ক্ষমতাই।

হুঁপ্ত যখন আবিষ্ট করে তখনই চুঁচি বাবার সময়। অন্তরের মধ্যে যখন অসাড়তা, বাইরের বিবাদ তখনই প্রবল। চিন্তের মধ্যে যার স্বাধীনতা নেই, বাইরের দিক্ থেকে সে কখনই স্বাধীন হতে পারে না। অন্তরের দিকে সব-কিছুকে যে আঁবিস্বাদে মেনে নেয়, বাইরে অভ্যর্থ প্রভুকেও না-মানবার শক্তি তার থাকে না,—যে-বুদ্ধি অসত্যকে ঠেকায় মনে, সেই বুদ্ধিই অমজলকে ঠেকায় বাহঃসংসারে—নির্জীব মন অন্তরে বাহিরে কোনো আক্রমণকেই ঠেকাতে পারে না। তাই সৌন্দর্য্যের তারতের ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেল, ভারতবর্ষ তার মর্মান্তিক পরাভবকে মেনে নিলে আর সেই সঙ্গে মেনে নিলে যা না-মানবার এমন হাজার হাজার জীবন। এই যে তার বাইরের হুর্দিশার বোঝা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল, এ তার অন্তরের অবিচ্ছিন্ন বোঝাই সাদিল।

যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি কীপতন, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত্ত, স্মৃতিশক্তি অগুণ্ট, বর্তমান মুগ্ধের কোনো প্রাণের নূতন উত্তর দেবার

মতো বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিন্তামৈত্র  
সম্বন্ধে লক্ষ্য করবার মতো চেতনাও যখন হ্রাস, সেই  
হ্রাসের দিনেই রামমোহন রায়ের এদেশে আবির্ভাব।  
এবল শক্তিতে তিনি আঘাত করেছিলেন সেই হ্রস্বহার  
বুলে, বা হ্রস্বের পরম সম্পদ স্বাধীন বুদ্ধিকে অবিবাস  
করেছে। কিন্তু তখন আমরা সেই হ্রস্বহার কারণকেই  
পূজা করতে অভ্যস্ত, তাই, সেদিন আমরাও তাঁকে শত্রু  
বলে দণ্ড উদ্যত করেছি। ডাক্তার বলেন, রাগ  
জ্বিন্ধটা দেহের অধিকার সম্বন্ধে দীর্ঘকালের দলিল  
দাঁখিল করলেও সে বাহিরের আগন্তুক, স্বাভাবিকই  
দেহের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য। রামমোহন রায় তেমন  
করেই বলেছিলেন, আমাদের অজ্ঞানকে, আমাদের  
অন্ধতাকে কালের গণনার সনাতন বলি, কিন্তু সত্যের  
দিক্‌ থেকে তাই আমাদের অনাস্থ্যের আগন্তুক। তিনি  
দেখিয়েছিলেন, আমাদের দেশের অন্তরাত্মার মধ্যেই  
কোথার আছে বিস্তৃত জ্ঞানের চির পুরাতন চিরনূতন  
প্রতিষ্ঠা; মনের স্বাধীনকে আত্মার শক্তিতে প্রবল করবার  
জন্তে, উজ্জল করবার জন্তে ভারতের একান্ত আপন যে  
সাধন-সম্পদের ভাণ্ডার তারই দ্বার তিনি খুলে  
দিয়েছিলেন। সৌন্দর্য্যের জনতা তাঁকে শত্রু বলে  
ঘোষণা করেছিল।

আজও কি রামমোহনকে আমরা শত্রু বলে অসম্মান  
করতে পারি? দ্বার গৌরবে দেশ বিশ্বের কাছে আপন  
গৌরবের পরিচয় দিতে পারে, এমন লোক কি আমাদের  
অনেক আছে? দেশের বর্ষা মহাপুরুষের নামে  
গৌরব করার অর্থই দেশের ভবিষ্যতের জন্মে আশা  
করা। সে গৌরব প্রাদেশিক হলে, সাময়িক হলে তার  
উপরে নির্ভর করা চলে না। সে গৌরব এমন হওয়া চাই  
সমস্ত পৃথিবী বাক্যে সমর্থন করে। রামমোহনের চিন্তা,  
তাঁর হৃদয় স্থানিক ও কণিক পরিধিতে বদ্ধ ছিল না।  
বহিঃ প্রাকৃত তবে দেশের সাধারণ লোকে অনায়াসে  
তাঁকে সমাদর করতে পারত। কারণ, যে মানবও  
আমাদের নিজস্ব ব্যবহারের দ্বারা সুপরিচিত বা বিশেষ  
দেশবাসীর, তা সর্বদেশ ও চিরন্তন কালের নয়। কিন্তু

সেই পরিমাপের দ্বারা পরিমিত গৌরবের দ্বারা দেশ  
বাধা ছলতে পারবে না, সর্বদেশকালের সর্বলোকের  
কাছে তাকে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না। তার  
মহত্বকে নীরতুমিবন্তী জনতার আদর্শকে অনেক উপরে  
হাড়িয়ে উঠতে হবে। তাতে করে বর্তমানকালের  
সাম্প্রতিক রূচিবিশ্বাস ও আচার তাকে নিষ্ঠুর ভাবে  
আঘাত করতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বড় আঘাত  
চিরন্তন আদর্শের আঘাত। দিগ্নাগাচারের ছলহস্তের  
আঘাত উপাহতের আঘাত, সেই উপাহত মুহূর্ত নিজেই  
সদ্য ধ্বংসোদ্ভূত, কিন্তু ভারতীয় সূত্র ইঙ্গিতের আঘাত  
শরত কালের। সে আঘাতে বারা বিলুপ্ত হয়েচে  
তাদের সমসাময়িক জয়ধ্বনির তারস্বর মহাকালের  
মহাকাশে কীপ্তম স্পন্দনও রাধেনি।

কণিক আনন্দের ছুকানে যাদের নাম ডালিয়ে দ্বার  
রামমোহন রায় তো সেই শ্রেণীর লোক নন। বিস্মৃতি  
বা উপেক্ষার কুহেলিকা তাঁর স্মৃতিতে কিছুকালের জন্য  
আচ্ছন্ন রাখেও সে আবরণ কেটে যাবেই। দেশে  
আজ নবজাগরণের হাওয়া যখন দিয়েছে, সব ঠাচ্ছে  
বাল্লের অস্ত্রাল, তখন সর্বপ্রথমেই দেখা যাবে  
রামমোহনের মহোচ্চ বৃত্তি। নবযুগের উদ্বোধনের বাগী  
দেশের মধ্যে তিনিই তো প্রথম এনেছিলেন, সেই বাগী  
এই দেশেরই পুরাতন মন্ত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল; সেই মন্ত্রে  
তিনি বলেছিলেন, “অপারিগু”, হে সত্য, তোমার আবরণ  
অদ্বারিত করো। ভারতের এই বাণী কেবল বদেশের জন্য  
নয়, সকল দেশের সকল কালের জন্য। এই কারণেই  
ভারতবর্ষের সত্য বিনি প্রকাশ করবেন তাঁর প্রকাশের  
কেন্দ্র সর্বজনীন। রামমোহন সেই সর্বকালের মানব।  
আমরা গর্ব করতে পারি স্থানিক ও সাময়িক ক্ষুদ্র মাপের  
বড়লোককে নিয়ে, কিন্তু বাঁদের নিয়ে গৌরব করতে  
পারি তাঁরা “পূর্বাপরো ভোরানধীষাৎ হিতঃ পৃথিব্যা  
ইব মানবঃ।” তাঁদের বাঁহা পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রকে  
স্পর্শ করে আছে।

ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের দ্বারা পূর্ববর্তী ছিলেন  
তাঁদের মধ্যে অজ্ঞান কবীর নিজেকে বলেছিলেন ভারত

পাখিক। ভারতকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন মহাপথ  
রূপে। এই পথে ইতিহাসের আদিকাল থেকে চলমান  
মানবের ধারা প্রবাহিত। এই পথে স্রব্ধাভীত কালে  
এসেছিল যারা তাদের চিহ্ন ভুগর্ভে। এই পথে এসেছিল  
হোমারি বহন করে আধ্যাত্মিক। এই পথে একদা  
এসেছিল মুক্তিভঙ্গের আশায় চীন দেশ থেকে তীর্থযাত্রী।  
আবার কেউ এসেছে সাম্রাজ্যের লোভে, কেউ এল অর্থ  
কামনার। সবাই পেরেছে আতিথ্য। এ ভারতে পথের  
সাধনা পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যোগা-আসার নেওয়া-  
দেওয়ার সম্বন্ধ, এখানে সকলের সঙ্গে মেলবার সমস্ত  
সমাধান করতে হবে। এই সমস্ত সমাধান স্বতন্ত্র না  
হয়েছে তত্ত্বকণ আমাদের হৃৎকের অন্তর্ভুক্ত। এই  
মিলনের সত্য সমস্ত মানবের চরম সত্য, এই সত্যকে  
আমাদের ইতিহাসের অঙ্গীভূত করতে হবে। রামমোহন  
রায় ভারতের এই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন  
ভারতের বা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল  
ভারতের হৃদয়ের প্রতীক—সেখানে হিন্দু মুসলমান বৃষ্টান  
সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সত্যায়,—সেই মেলবার  
আসন ছিল ভারতের মহা ঐক্যাত্ত্ব একমেবাধিতীয়।  
আধুনিক যুগে মানবের ঐক্যবাণী যিনি বহন করে  
এনেছেন, তাঁরই প্রেরণায় উৎসাহ হয়ে ভারতের আধুনিক  
কবি ভারতপথের বে গান গেয়েছে তাই উদ্ধৃত করে  
রামমোহনের প্রশস্তি শেষ করি :—

হে নোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে আগো যে ধীরে  
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

• • • • •

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওজস্বানি  
হৃদয়তন্ত্রে একের মত্রে উঠেছিল রণরণ।  
তপস্তা বলে একের অনলে বহরে আহুতি দিয়া  
বিভেদ ভুলিল, জাগারে ছুলিল একটি বিরাট হিয়া।

সেই সাধনার সে আরাধনার  
যজ্ঞশালার খোলো আজি দ্বার।

হেথার সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে,  
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

এসো হে আর্ধ্য, এসো অনাৰ্য্য, তিনু মুসলমান,  
এসো এসো আজ ছুঁই ইংরাজ, এসো এসো বৃষ্টান।  
এসো ব্রাহ্মণ, গুচি করি মন ধরো হাত সবাকার,  
এসো হে পণ্ডিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।

মার আতিবেকে এসো এসো ঘরা,

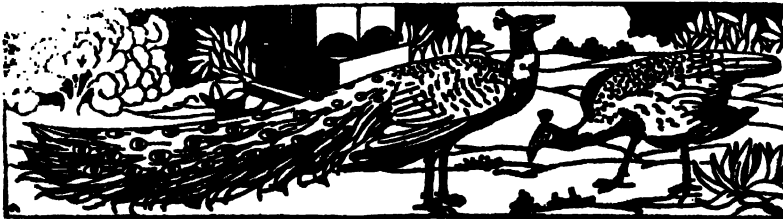
মল্লযট হয়নি যে ভরা।

সবার পরশে পণিব্রজ করা তীর্থনীরে,

আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

\* রামমোহন-শতবাহিনীর শেষ বক্তৃতা।

প্রবাসী, কান্তন, ১৩৪০।





# রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে সামান্য দু-একটি কথা

ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

এই আধুনিকালে প্রবাসীদের গুরু রামমোহন মুইল নগরে তহু বন্ধা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুদিনে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সর্বত্র সভাসমিতির আয়োজন হইয়া থাকে; ইহা একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, কিন্তু রাজার মহত্বের সম্বন্ধে অনেকেই ধারণা হ্রস্পট নহে। এসম্বন্ধে সাধারণ ভাবে এই কথা বলা যাইতে পারে, যে, সকল মহাপুরুষের জায় রাজা রামমোহন রায়ের মহত্বও ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার ত্যাগ লোকচকুর সম্মুখে প্রকাশিত ছিল না, লোকচকুর অন্তরালে নীরবে সাধিত হইত। উহা সাধারণ ত্যাগ নহে—আত্মত্যাগ। সংসারের কোন বস্তুর ত্যাগ অতি সহজ কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি কার্য্যে যে আত্মত্যাগ, যে মানসিক কষ্ট-ত্যাগ তাহা সহজ নহে—জীবনব্যাপী সাধনার বস্তু। রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রযত্নে এই সাধনাতেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সকলেই অবগত আছেন এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের জন্য রাজা কি কঠোর সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শিক্ষাকর্ম্মটি প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তিনি ক্রটি হইতে আপনার নাম প্রত্যাহার করিলেন। কেননা, তাঁহার নাম ক্রটিতে থাকিলে আত্মকলহে কার্য্য পণ্ড হইবার সম্ভাবনা ছিল। আমরা কত সামান্ত কার্য্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া বেড়াই। কিন্তু রাজা বলিলেন, কাজ হইলেই হইল। পশ্চাত্য হইতে যতদূর সাধ্য আমি করিব, ক্রটিতে নাম থাকিবে কি না তাহাতে কি আসিয়া যায়। যিনি লোকপ্রেমের জন্য মানবজাতির সেবার আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য কলহ করিবার অবসর কোথায়? সকল বিবাদের মূলীভূত কারণ যে “আমি” তাহা তিনি মাঝে প্রবেশগরে বিসর্জন দিয়াছিলেন। কাজ

হইলেই হইল, দেশের সেবা হইলেই হইল, মানব জাতির কল্যাণ হইলেই হইল, আর কিছু চাহিবার নাই।

কর্ম্মক্ষেত্রে বা শকটারোহণে চলিতে চলিতে রাজা চকু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেন। ইংলণ্ডে অবস্থিতকালে শকটারোহণে যাইবার সময় এইরূপ মুদ্রিতনেত্র রাজাকে একজন ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “রাজা, আপনি থাকিয়া থাকিয়া এরূপে চকু মুদ্রিত করেন কেন?” তখন রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, “পাপ চিন্তা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ভগবানে মনোনিবেশ করি।” মহিলাটি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—“রাজা, আপনার মনেও কি পাপ চিন্তার উদয় হয়?” তখন রাজা অতি বিনয়ের সঙ্গে বলিলেন, “আমি সামান্ত মানুষ, মানুষ মাঝেরই পাপচিন্তা আসিতে পারে।” রাজা এখানে যে পাপচিন্তার কথা বলিয়াছেন তাহা কি? এ সম্বন্ধে সর্ব-সাধারণের ধারণা অতি ভ্রান্ত। রাজা আপনার সম্বন্ধে যে পাপচিন্তার কথা বলিয়াছিলেন তাহা সাধারণ পাপ নহে—তাহা কার্য্যগত বা অতিপ্রায়গত পাপ নহে। রাজা যে পাপের প্রেক্ষাবিভাগ করিয়াছেন তাহাতে জ্ঞানমার্গাবলম্বীর পক্ষে ব্রহ্মবিচ্যুতিই পাপ। কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাকে কষ্টা বলিয়া মনে করাই পাপচিন্তা। রাজা আপনাকে জ্ঞানপন্থী বলিয়া মনে করিতেন, যদিও জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম তাঁহাতে সমভাবে নিকষিত হইয়াছিল। তাঁহার মত কর্ম্মী কে? এই বিষয়ে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রের সকল বিভাগেই তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাই যখন কর্ম্মের ঘোড়ে তাঁহার ব্রাহ্মী হিতের ব্যাঘাত উৎপন্ন হইত তখন তিনি কালকাল হানাহানির বিচার না করিয়া নৈরাস্ত্রিত করতঃ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে যত্নবান্

হইতেন। কর্মক্ষেত্রে প্রয়োচনার “আমি কর্তা” এই পাণ্ডিত্য তাঁহার ক্ষমতা প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলেই তিনি জ্ঞানপন্থীর এই মহাপাতক হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য ধ্যানহ হইয়া আত্মাকে পরমাত্মায় সমাহিত করিতেন। সেইজন্যই ক্রমে ক্রমে বুদ্ধিতলেজ হইয়া তাঁহাকে ধ্যানহ হইতে দেখা যাইত। রাজার ধ্যান গিরিগঙ্ধারবাসী কর্মত্যাগীর সমাধি নহে। কিন্তু মহা কর্মযোগীর জীবিতা ওপরমাত্মার বোণসাধন। যিনি বাহিরের কর্মক্ষেত্রে মহা কর্তারূপে লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকাশিত, তিনি অন্তরে কিন্তু সকল কর্তৃত্বজ্ঞান পরিহার করিয়া আত্মত্যাগসাধনে নিযুক্ত। এই ত্যাগের দীক্ষার দীক্ষিত ছিলেন বলিয়াই বাহিরে সকল প্রকার বিক্ষেপের কারণ বর্তমান সত্ত্বেও তিনি নির্ভিকার চিত্তে যার কর্তব্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কখন কখন কালের জন্তও তাঁহাকে বহান হইতে বিচ্যুত করিতে সমর্থ হয় নাই। এই যে আমিরের ত্যাগ ইহাই রামমোহনকে প্রাচীন ব্রহ্মধ্যাননিবৃত্ত ঋষিদিগের সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত করিয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায় যদি কেবল একজন আত্মত্যাগী ঋষি হইতেন তাহা হইলেও তিনি আমাদিগের শ্রদ্ধার পাত্র থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী ছিল। তাঁহার কর্মক্ষেত্র মানবজাতির কর্মক্ষেত্র ছিল। তিনি যে নব ভারতের পিতা ও গুরু, প্রতিষ্ঠাতা ও ভবিষ্যৎভা তাহা কেবল এজ্ঞ নহে যে, তিনি নানা বিভাগে কার্য করিয়াছেন। কিন্তু জাতীয় জীবনের যে যে বিভাগে আজ আমরা কার্য করিতেছি, সে-সকল কার্যের পূর্ততা হাড়া আমরা জাতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব না, সে-সকলের দ্বার তিনিই উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি একাধারে দার্শনিক ও রাজনীতিক, ব্যবস্থাপক ও আইনজ্ঞ, সেবক ও শিক্ষক ছিলেন। মানবজাতি তাঁহার মতন সেবক আর কখন লাভ করিয়াছে? তিনি একাধারে ধর্ম, রাজনীতিক, রাজনীতিক ও শিক্ষার সংস্কারক ছিলেন। ইহার এক এক বিষয়েই তিনি প্রাচ্য ও পশ্চাত্য, প্রাচীন

ও নবীন, যে কোন সংস্কারকের সঙ্গে তুলিত হইতে পারেন। এই বহুবৈ আবার রাজার একমাত্র বিশেষত্ব নহে। যে যে ক্ষেত্রে তিনি কার্য করিয়াছেন সে-সকল ক্ষেত্রেই প্রায় তিনি তাঁহার সমসাময়িকদের বহু পূর্ববর্তী ছিলেন। শিক্ষার বিষয় যখন তিনি তখন দেখিতে পাই যে, রাজা তাঁহার সময়ের কত অগ্রবর্তী ছিলেন। রাজা বুঝিয়াছিলেন, পশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান হাড়া জাতীয় উন্নতি সম্ভব হইবে না। তাই তিনি পশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন। এই প্রভাবে দেশের লোক তাঁহার উপর এমন ঋণগ্রস্ত হইয়া উঠিল, যেন তিনি সমস্ত দেশটাকে তুলিয়া ভারত মহাসাগরে ফেলিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। দেশের লোকের চিন্তা তাঁহার চিন্তা হইতে তখন কত পশ্চাত্তী ছিল। আজ একশত বৎসর পরে তাঁহার কথা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। এখন যদি কেহ শিক্ষার সঙ্কোচের প্রস্তাব করে তবে আমরা তাহার উপর ঋণগ্রস্ত হইয়া উঠি। এই তো সেদিন কলকাতার কলেজ তুলিয়া দিবার প্রস্তাব হইলে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ সমবেত সভায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই নবদ্বীপ কিন্তু গোড়া হিন্দুমান্যের এক প্রধান কেন্দ্র। এবং পণ্ডিতগণ হিন্দু গোড়ামির প্রধান রক্ষক। একথা ঠিক, পুরাতন নবীনকে রাজা দিয়া সরিয়া পড়ে কিন্তু তিনিই বাস্তবিক prophet যিনি পূর্ন হইতে এই পরিবর্তন দেখিতে পাইয়া তাহার মত ব্যবস্থা করেন। এখন অনেকে পশ্চাত্য শিক্ষার যে কিছু কিছু ত্রুটি উৎপন্ন করিয়াছে তাহা দেখিয়া ইহার উপর বীভৎস হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু ভবিষ্যৎটাই রামমোহন এই ত্রুটির প্রতিবেদ পূর্ন হইতেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি এক হস্তে এই পশ্চাত্য শিক্ষা—এই পশ্চাত্য সাহিত্য-বিজ্ঞানের অপরা বিদ্যা এবং অপর হস্তে আধ্যাত্মিক সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনসম্পদ উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরাবিত্তা এ দেশকে বিভরণ করিয়া গিয়াছেন—একটি বেন অপরাটর অপূর্ণতা দূর করিতে পারে। কিন্তু রাজার সাহায্য ও দেশের লোকের সহায়তাই পাইয়া শিক্ষা ক্রতপদে অগ্রসর

হইয়াছে কিন্তু এতদ্বয়ের অভাবে ব্রহ্মজ্ঞান পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং যদি পশ্চাত্তাত্ত্ব শিক্ষা কিছু আনিষ্ট করিয়া থাকে তবে তাহার দ্বারা আমাদের অদৃষ্টকেই ধর্মবাদ দিতে পারি, রামমোহনকে দোষী করিতে পারি না। তাঁহার দুরদৃষ্টি কিছুই অপূর্ণ রাখিয়া যায় নাই।

ধর্মের ইতিহাস হইতে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক। রাজা তাঁহার স্ত্রী দৃষ্টিতে বেশ সুখিরাছিলেন যে, যদি বৃষ্টধর্ম মানবের জ্ঞানবিজ্ঞানালোকিত মনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তবে বীণ্ডর মনোহর নৈতিক উপদেশের দ্বারাই করিতে পারিবে, জিহ্বাবাদ, নির্দোষীর রক্তে পাপীর পরিজ্ঞাপ প্রভৃতি হৃর্গোষ্য মতের দ্বারা নহে; কেননা, এই-সব কোন কোন মত বিজ্ঞান-স্বাক্ষিত বুদ্ধির নিকটে পরিভ্যাজ্য। নির্দোষীর রক্তে পরিজ্ঞাপ পাওয়া অপেক্ষা অনন্তকাল নরকে বাস করা বিস্তৃত নৈতিক বুদ্ধির নিকট অধিকতর বাহনীর বলিয়া মনে হয়। এই দৃষ্টই বীণ্ডর উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া রাজা রামমোহন রায় Precepts of Jesus প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি ফল হইল? বৃষ্টান মিশনারীরা এ কার্যে শরতানের প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা রাজাকে গালাগালির চূড়ান্ত করিলেন। পরিশেষে বৃষ্টানুগণের ক্ষমাশীলতা এতদূর অগ্রসর হইল যে, বৃষ্টের উপদেশাবলী লোকের হস্তে ছুলিয়া দেওয়ার বহা অপরাধে রাজাকে antichrist বা শরতান নামে অভিহিত হইতে হইল। কিন্তু কালের কি বিচিত্র পরিবর্তন! কিছুদিন পূর্বে বৃষ্টধর্মের হৃর্গোষ্য মতগুলি লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে একজন বৃষ্টীয় মিশনারী রাজা রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক অহুলরণ করিয়া এদেশে বৃষ্টের উপদেশ প্রচার করিবার জন্য আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। অথচ এই মিশনারীরই একজন পূর্ববর্তী ঐ কার্যের দৃষ্টই রামমোহন রায়কে শরতানের অবতার বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কেবল ইহাই নহে। আপনারা হয়তো অবগত আছেন যে, এখন বৃষ্টান মিশনারীরা লর্ড মর্লক প্রকাশিত Teachings of Jesus in His own

Words নামক এক পুস্তিকা বিতরণ করিতেছেন। ইহার সঙ্গে রাজার Precepts of Jesus-এর মূলত: কোনই পার্থক্য নাই। লর্ড মর্লক ভূমিকার একটা স্বীকার করিয়াছেন। রাজা এক শতাব্দী পূর্ব হইতে বৃষ্টীয় ধর্মের এই পরিবর্তন গৃহীত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জগতের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল। সে উন্নতি আবার বৃষ্টীয়জগতেই প্রধানতঃ আবদ্ধ। সেই বৃষ্টীয়জগতের একটা পরিবর্তন ভবিষ্যৎদৃষ্টিবলে এক শতাব্দী পূর্ব হইতে ধরিয়া লওয়া কি অমানুষিক প্রতিভার পরিচায়ক, তাহা সহজেই অহুমের।

দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন এখন বিশেষভাবে চলিতেছে। দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি তাহা ভাবিয়া সকলেই শঙ্কায়িত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় রাজনীতি সম্বন্ধে বাহা বলিয়া গিয়াছেন, পঁচিশ বৎসরের কংগ্রেসের আন্দোলনের পরও সমস্ত দেশের রাজনীতিজগৎ একত্রিত হইয়া রাজার কথার উপরে একটাও নূতন কথা বসাইতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। কংগ্রেসের কার্যাবলীর নথী খুঁজিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, রাজা রামমোহন রায় পার্লামেন্টের নিকট আপনার সাক্ষ্য ভারতের শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে গভর্মেন্টকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমরা এক শতাব্দী পরে তাহা অপেক্ষা কোনওরূপ উচ্চতর উপদেশ দিতে সমর্থ হইতেছি না। এমন কি, লর্ড মর্লক নব-প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারে ভারত-শাসন সম্বন্ধে যে নূতন প্রণালী ঘোষিত হইয়াছে, তাহাও রাজা রামমোহন রায়ের পক্ষে নূতন নহে। রাজা অতি দৃঢ়তার সহিত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, “মনে কর আজ হইতে একশত বৎসরের মধ্যে দেশীয়দিগের চিন্তা যখন পশ্চাত্তাত্ত্ব জ্ঞানবিজ্ঞানে আলোকিত হইয়া উঠিবে, তখন কি তাহারা অজ্ঞানের প্রতিরোধ করিতে বন্ধপরিবর্তন হইবে না? তেমনটা যদি আইরিশ প্রণালীতে ভারত শাসন কর তবে আরও অপেক্ষা এক চতুর্থাংশ শিক্ষা লাভ করিয়াও ভারতবাসী তাহাদিগের দুরবর্তিতার সুযোগ ও অভ্যন্তরীণ ধনবল ও জনবলের সাহায্যে ভারত-শাসন

অসম্ভব করিয়া তুলিবে। \* সুতরাং ভারতবাসীকে শিক্ষিত করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের উপবৃত্ত করিয়া তোলা। তাহা হইলে যদি কোন দুরবর্তী সময়ে কোন দুর্গত্যা হুত্রে ইংলণ্ড হইতে ভারত বিচ্ছিন্নও হয়, তবুও উভয় দেশের বন্ধুতা বিনষ্ট হইবে না।” কেননা—ইংলণ্ড ভারতকে স্বায়ত্ত শাসনে শিক্ষিত করিয়া তুলিলে ভারতের যে উপকার হইবে সে উপকার ভারত কখনও তুলিতে পারিবে না। মল্লীর শাসনসংস্কারের কি ইহাই উদ্দেশ্য নহে? কিন্তু হায়। রাজার ব্রহ্মার পঁচাত্তর বৎসর পরে আমাদের শাসন-কর্ত্তাগণ উহা বুঝিলেন। যদি তাঁহারা ইতিপূর্বে রাজার উপদেশ গ্রহণ করিতেন তবে আর বিগত তিন বৎসরের জঞ্জাল ইংরাজরাজত্বের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিতে পারিত না। একদিকে পরীক্ষিত হইয়াছে বমা (bomb), দেখা গেল তাহা নিফল। অত্রদিকে পরীক্ষিত হইল নিপেষণ (repression), দেখিয়াছি তাহাও নিফল। বাকী আছে রাজা রামমোহন রায়ের পন্থা,—রাজার প্রজার মিলিয়া দেশের কল্যাণ সাধন। লর্ড মল্লীর শাসনসংস্কার প্রস্তাব সেই উদ্দেশ্য লইয়া জয়প্রহণ করিয়াছে। ইহা আরম্ভ মাত্র। উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইলে বিগত কর বৎসরের ইতিহাস স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার স্তায় মনে বিলীন হইয়া যাইবে। শাস্ত বলে প্রকৃত জ্ঞান হইলে বাহু জগৎ স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। “রাজা রামমোহন রায়ের পন্থা ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার পক্ষে সেই প্রকৃত জ্ঞান। সেই পথে চালিলেই কেবল আমরা লক্ষ্য হানে বাইরা পৌঁছিতে পারিব। এবং রাজা রামমোহন রায়ের স্বপ্ন

সকল হইবে। সে স্বপ্ন কি? ভবিষ্যৎ ভারত স্বাধীন! এশিয়ার আলোকভূমি, ইংলণ্ডের বন্ধু। ভবিষ্যৎ ভারত সম্বন্ধে কথা কহিবার অধিকার কেবল রাজা রামমোহন রায়েরই। ভবিষ্যৎ ভারত একা হিন্দুর হইবে না, মুসলমান ও খৃষ্টান সভ্যতাও সেখানে থাকিবে। এই তিন সভ্যতাকে যিনি স্ব স্ব মার্গে এক বিশ্বজনীন আদর্শে উপনীত হইবার পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ভবিষ্যৎ ভারতের নেতৃত্ব কেবল তাঁহারই। এ নেতা কেবল হিন্দু পাণ্ডিত নহেন, মুসলমান মৌলবী নহেন বা খৃষ্টান পাদ্রী নহেন। একাধারে যিনি হিন্দু পাণ্ডিত, জ্বরদন্ত মৌলবী এবং খৃষ্টীয়ান পাদ্রী তিনিই ভবিষ্যৎ ভারতের পিতা, নেতা ও গুরু। যেদিন ভবিষ্যৎ ভারত সগর্বে মস্তক তুলিয়া বিশ্বমানবের মহাসভায় আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিবে সেদিন তাহার মস্তকমুহূর্ত্তে স্মৃতিকরে লেখা থাকিবে “ঐরামমোহন”। সেদিন জগতের লোক বিশ্বয়-বিস্ফারিত লোচনে এই হিন্দু পাণ্ডিত, এই জ্বরদন্ত মৌলবী, এই খৃষ্টীয়ান পাদ্রী, ভবিষ্যৎ ভারতের এই পিতা নেতা ও গুরুর দিকে তাকোইবে—আমরা সেদিন গৌরবোন্নত বক্ষে উচ্চকণ্ঠে বল্লেখ্যাতরন্থ ধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিব, “এই নব ভারতের আমাদের রামমোহন। আমাদেরই বাঙ্গালী রামমোহন।”

প্রবাসী, কার্তিক, ১৩১৬।

\* বাহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা এই উক্তি হইতে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে রাজা একজন প্রকৃত ভবিষ্যৎস্রষ্টার স্তায়—বিগত তিন-চার বৎসরের ঘটনাবলী যেন মানস-চক্ষে দর্শন করিয়া এইরূপ বলিতেছেন।

# ১১ই মাঘ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক প্রতিকূল যত্নসহ প্রায়ই অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দেয়—ব্যক্তিগত কট্ট-ভাবপের সঙ্গে যুক্ত হওয়াতে সেই তীব্রতার সামনে ঈর্ষিক্রমে আপন মত প্রকাশ করা সংকোচের বিষয় হয়ে ওঠে। আজ আমার পক্ষে সেই সংকোচের দিনের অবসান হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে আমি ব্রহ্মার গহনে অবতরণ করেছিলাম, এখনও তার বহুর ভটভাগে স্থলিত পড়ে চলছি। আজ আমার পক্ষে লোকমতের প্রভাব আর প্রবল নয়—এখন নিরবধি কাল আমার সমুখে বর্তমান।

১১ই মাঘের উৎসব যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাকে আমাদের দেশের জনসাধারণ স্বীকার করেন। যা তারা স্বীকার করে না তাকে তারা কলঙ্কিত করে। যিনি পরম শ্রদ্ধের, যেমন মহাত্মা রামমোহন রায়, তাঁর সম্বন্ধে বিরোধের উত্তাপ আজও প্রশমিত হয়নি। এটা স্বাভাবিক হুতরাং অনিবার্য, অতএব তাই নিয়ে পরস্পরকে লাঞ্ছিত করা নিরর্থক। এ-সকল ধর্ম কোলাহল ভুলে গিয়ে অন্ধকার উৎসবের মূলে ঐ মহানু চারিত্রশক্তি প্রতিষ্ঠিত, শান্তমনে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের ভক্তি নিবেদন করব। যতদূর সম্ভব এই প্রকার কারণকে সত্য বলে স্বীকার করবেন একথা আমাদের দেশের সকলের কাছেই প্রত্যাশা করতে পারি। কারণ এই সম্মানে যদেশের প্রতিই সম্মান।

পরজাতীয়কে যখন আমরা আচার ধর্ম নিয়ে বিচার করি তখন যত্নসহ অত্যাতি করে থাকি। বিশেষত যেখানে তাদের সঙ্গে এমন সম্বন্ধ বা হৃৎ দেয় এবং অপমান করে। কিন্তু তাদের ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মহত্ব প্রকাশ করে থাকে তাতে সন্দেহ নেই।

আমাদের দেশের সামাজিক শত বাধা ভেদ করে মহাপুরুষের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু সংস্কারের আবিলতার আনরা তাঁদের ক্ষুদ্র করেছে, তাঁদের সত্য স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারিনি। জাতীয় চিন্তাধর্মের এই বিকৃতি দুশ্পট হয়ে উঠছে প্রত্যহ আমাদের ইতিহাসে।

খ্রীষ্টধর্ম মানুষকে শ্রদ্ধা করেছে কেননা তাঁদের যিনি পূজনীয় তিনি মানবের রূপে মানবের ভাগ্য স্বীকার করেছিলেন। এই কারণে ঐরা যথার্থ খ্রীষ্টান তাঁদের মানবজীতি অক্লান্ত ভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে দেশে বিদেশে, আমরা তার পরিচয় পেরেছি। যদি তাঁদের ধর্মমতে কোনো অসম্পূর্ণতা থাকে বলে আমরা মনে করি, তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে, অন্তত এক জারগায় এই ধর্ম মানবজাতির সঙ্গে আত্মনিবেদনের যোগে তাঁদের সম্বন্ধযুক্ত করতে পেরেছে, সেটা ধর্মবুদ্ধির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁদের সাহিত্য এবং ব্যবহারে যেখানে মহাত্ম্য দেখেছি মানবতা সেখানে সমুজ্জ্বল। সেখানে দৈন্য নেই, সেখানে স্বার্থের সংঘাতের উদ্বেগ—একটি উপার সভ্যতার নিকশ ঘটছে। আমাদের দেশে ধর্ম মানুষের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধকে হিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে; আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বাহন না হয়ে আধুনিক ভারতীয় ধর্মাসুষ্ঠান দেশব্যাপী ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করেছে।

আচার যেখানে সাম্প্রদায়িক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয়, সেখানে মানুষের তাই নিয়ে পরস্পর অনৈক্য ঘটে না। যেমন চীনদেশে। চীন সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিরোধ নেই এই মতের পার্থক্য সম্বন্ধে। আচারে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধর্মের নামে সমাজকে তারা নিশীড়িত করেন। যখন একসময়ে খ্রীষ্টধর্ম ঈশ্বরের ক্রোধের দোহাই দিয়ে বাহবলে নিজের প্রভু বিস্তারের

চেষ্টা করেছিল তখনই সে ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্বাচন করেছে, কেননা তখনও তাদের ধর্ম শুভবুদ্ধিকে অমাত্র করে সংস্কারকেই স্বীকার করেছিল। জনসাধারণের বিশ্বাসের কোনো বুদ্ধিসম্মত ভূমিকা তাতে দেখা দেয়নি শাস্ত্র-অনুশাসন ছাড়া। আজকের দিনে যুরোপীয় সভ্যতার বহু ক্রটি সত্ত্বেও সমাজে ধর্মের অল্প আক্রমণ নেই, তাদের মধ্যে কেউ বৌদ্ধ বা মুসলমান হলে তাকে ধর্মের নাম নিয়ে অত্যাচার করা হয় না। আচার এবং ধর্মের মিশ্রণে তাদের সমাজ কলুষিত হয়নি,—তাদের শক্তির একটি কারণ সেইখানে। আমাদের দেশে শক্তিকন্দের প্রধান একটি হেতু, ধর্মের নাম নিয়ে প্রাত্যহিক জীবনে বহু নিরর্থক সংস্কারের আধিপত্য। এতে ধর্মের ভ্রষ্টতা এবং আচারের অত্যাচারপন্যায় অভ্যাস রূপ প্রকাশ পায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে দক্ষিণ মালাবারের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্রাহ্মণের জাতীয় ডাক্তারকে ব্রাহ্মণ গৃহস্থ আপন বাড়িতে নিয়োগ দিচ্ছিলেন চিকিৎসার জন্য। যে পথ দিয়ে গিয়েছিল সেটা কোনো পুষ্করিণীর তীরস্থ। তাতে মকদ্দমা উঠেছিল আদালত পর্যন্ত, যে, সমস্ত পুষ্করিণীর জল দূষিত হয়েছে, অতএব তাকে শোধন করবার আইন জারি হোক, অপরাধী গৃহস্থের উপর। এখানে দেখি হওদাতা আইন এবং আচারের সমবেত মূঢ় আক্রমণ, এর মধ্যে শাস্ত্র ধর্মের পরিচয় নেই। অথচ ধর্মের নামে এই রকম অমানবিকতা আমাদের দেশে প্রচলিত পোষে আসছে। মহাপুরুষ দৈবে আমাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে এই অধার্মিক ধর্মবিশ্বাস এবং বুদ্ধি-বিরোধী আচারের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তথাপি দেশের জনসাধারণের মধ্যে নিরর্থক অজ্ঞানের পুনরাবৃত্তিই ধর্মের মর্যাদা নিয়েছে এবং আজও ধর্মবোধহীন অমানবিকতার চাপে সমাজ মানুষকে অপমানিত করেছে।

এই প্রকার মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের অভিঘাতে সমাজ শতধণ্ডে ভেঙে পড়ল। তার নাম নিয়ে বেশীর ভাগ দেশবাসীকে অবজ্ঞাজনন করা হ'ল, বলা হ'ল অশুচি এবং অপাণ্ডিত্যের। আচারের যেটা গৌণ সে বহুসংখ্যক

মানুষকে দূরে সরিয়েছি তাদের দুর্বলতা এবং মূঢ়তা, তাদের আত্মবিশ্বাসনা সমগ্র দেশের উপর চেপে তাকে অকৃতার্থ করে রেখেছে দুর্ভাগ্যকাল। অথচ আমাদের বা বিগত, আমাদের সনাতন আধ্যাত্মিক সম্পদ তাতে মানুষের এবং সর্বজীবের মূল্য ভূমির পরিমাণ স্বীকার করেছে। আত্মবৎ সর্বভূতেষু পশুতঃ পশুতঃ—এত বড়ো কথা বোধহয় কোনো শাস্ত্রে নেই। সকলের মধ্যে আত্মার এই সম্বন্ধস্বীকার এবং এই সমগ্রের দৃষ্টিকে আমরা হারিয়েছি। আত্মতানিক মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যবে যবে আচারের এবং অনৈক্যের ব্যর্থতা বিস্তার করেছি। জাতীয় সভ্য শতধা বিখণ্ডিত হয়ে আজ আমাদের চরম দুর্বলতা উপস্থিত। এই দুর্গতিগ্রস্ত সমাজে একদিন একটি ব্রাহ্মণ-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, রামমোহন রায়। সমাজের সমস্ত অন্ধতাকে তিনি প্রতিপক্ষে অস্বীকার করেছেন, নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছেন মূঢ় সংস্কারের বিরুদ্ধে। সেজন্য তিনি নিন্দাজনন হয়েছেন এবং সেই নিন্দার আক্রমণ এখনো শান্ত হয়নি। এই দুর্গতির দিনেই আজ আমাদের পুনর্বার তাঁর বাণী শ্রবণ করবার সময় এসে। তাঁর মহাজীবনের মূল সাধনা কোন্‌খানে নিহিত তা আমাদের বুঝতে হবে।

উপনিষদের একটি মন্ত্র আছে—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। বিশ্ববিধাতার একটা রূপ আছে যা কেবলমাত্র সত্য, অর্থাৎ আছে ছাড়া তার অন্ত বাণী সেই। তার পরবর্তী কথা হচ্ছে জ্ঞানং—সে কেবল মাত্র হওয়া নয়, সত্য বোধের উপরে জ্ঞানের উপলব্ধিতে মহত্ত্বের বড়ো পদবী লাভ হল। সেই জ্ঞানকে যেখানে অবজ্ঞা করা হয়েছে, বুদ্ধির মোহমুগ্ধ বহু শক্তিকে প্রয়োগ না করে মানবকে যেখানে অস্বীকার করেছি সেইখানে আমাদের অকৃতার্থতা। জ্ঞানের সোপান দিয়ে উপনীত বই পরমাত্মার, কৃত্রিম কর্মের পথে নয়। তাঁর সাব্যপ্যে সর্বমানবের মিলন। ব্রহ্মকে উপনিষদ-কাষিত বাণীতে উপলব্ধি করতে হলে বিশ্বসত্যকে স্বীকার করে জ্ঞানের ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিক সত্যে পৌঁছতে হবে।

সংপ্রাপ্ত্যনন্ কথয়ো জানতুস্তাঃ  
কৃত্যদ্বানো বীতরাগাঃ প্রপাত্তাঃ ।  
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা  
বুভুক্ষ্বানঃ সর্বমেবাশিশিত ॥

পূর্বব্যাপী আশ্রয় সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সকলের মধ্যে জানতুস্তা কথিয়া প্রবেশ করেন। আমাদের শাস্ত্রমতে এই হচ্ছে মানুষের চরম সার্থকতা। এই বাপী কিরিয়ে আনলেন মহাত্মা রামমোহন রায়। অহুষ্ঠানিক কৃত্যের বন্ধনে বন্দী সমাজকে ধর্মভ্রষ্টতা হতে আত্মোপলব্ধির সাধনায় প্রবৃত্ত করলেন তিনি; ভারতকে শোনাগেলন এক্যমন্ত্র বাতে চরম মানব-সত্যের উপলব্ধি দ্বারা মানুষের

মধ্যে সত্য এবং জ্ঞানের বোনে কল্যাণবর সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। ধর্মের বিকার ভয়াবহ, বৈষায়িক ঈর্ষা-বিরোধে যে ক্ষতি করে তারও চেয়ে সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে ধার্মিকতা। আত্মর্ষ ধীশক্তি নিয়ে রামমোহন দাঁড়ালেন জাতীয় ধর্মবিবাসের কুহেলিকার অভীতে; সত্যের অকুণ্ঠিত প্রকাশে নিরোগ করলেন তাঁর অতুলনীয় চারিত্র-শক্তি। এই অব্যবসারে তিনি ছিলেন একক, তিনি ছিলেন নিশ্চিন্ত। তাঁর সাধনাকে আজকের এই উৎসবে অন্তরে গ্রহণ করে নিজেকে এবং নিজের দেশকে যেন ধৃত্ত করি।

এবাসী, কান্দন, ১৩৪৭।

## শাস্ত্রত প্রতিষ্ঠা

ক্ষিতমোহন সেন শাস্ত্রী

জগৎ জুড়ে চারিদিকে আজ চলছে ভীষণ মারামারি, হানাহানি। হুঃখ-হুর্গীতির আর অন্ত নেই। এখানে বসে সেইসব হুঃখ-হুর্গীতির কথা কল্পনারও আনতে পারি না। এমন সময়ে জগতে ধর্মের কথা কে শুনেবে?

তবু সেইজন্তই আজ ধর্মকে বেশী করে আঁকড়ে ধরতে হবে, ধর্ম ছাড়া এই হুর্গীতির জন্ত মানুষের আশ্রয় আর কি হতে পারে?

প্রশ্ন হতে পারে বটে ধর্মই বা বাঁচাবে কেমন করে? তবে যুরোপের মাজ এমন দশা কেন? সেখানে কি তবে এতদিন ধর্ম ছিল না? বড় বড় মন্দির, বড় বড় প্রতিষ্ঠানে ঠাসা ছিল সেই দেশ সেখানে কত কত মনীষী ও মহামনা লোকের বাস, সেই দেশের তবে কেন এমন হুর্গীত?

তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তিগতভাবে

সেই দেশে জ্ঞানী ও ভীতমান ধার্মিক মহৎ মানুষ থাকলেও সারাবেশে ধর্মের নামে যে বিরাট ঐশ্বর্যময় আয়োজন ছিল তার মধ্যে ধর্মের চেয়ে সংস্কার, অহুশাসন ও সম্ভ্রমচারটাই ছিল বেশী। তাই সেখানে ধর্মের নেতার দল যুদ্ধে জয়ের জন্ত, বিপক্ষকে পরাজিত করবার জন্ত, বুদ্ধোত্তমকে আশীর্বাদ করেছেন, বুদ্ধোত্তমকে আশিস বর্ষণ করেছেন।

সংস্কার ও সম্ভ্রমচার যেখানে ধর্মকে অতিক্রম করে সেখানেই ধর্মের নানা হুর্গীত ও বিকার দেখা দেয়। তখন সংস্কার, অহুশাসন ও আচারের বাহ্য-বিচারই সত্য ও ধর্মজীবনের হানটি জুড়ে বসে। ধর্ম যেখানে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সেখানে এরূপ ঘটনা অসম্ভব নয়। অথচ ধর্ম ও জীবনকে পরস্পরে বিযুক্ত করে রাখলেও কিছুতেই চলতে পারে না।

তবে দেখতে হবে যে, ধর্মই যেন জীবনকে চালিত করে, ধর্ম যেন সাম্প্রদায়িক লাভক্ষতি প্রভৃতি হিসাবের দ্বারা চালিত না হয়। আমাদের লাভলোকসানের হিসাব বা সাম্প্রদায়িক সংস্কার যদি ধর্মকে চালিত করে তবে তার চেয়ে দুর্গতি কি হতে পারে?

কেউ কেউ বলেন, আমাদের যেসব মনোভাব নীচ ধরনের তার সঙ্গেও যদি ধর্ম যুক্ত থাকে তবে তাতেও কতক পরিমাণে সংশয় আসে। তাই তাঁরা বলেন, জীবহিংসা যদি করতেই হয়, তবে নাহয় তা কম ধর্মের নামে। কিন্তু তাতে কি জীবহিংসা কখনও কমেছে? না যারা সাধারণত হিংসা-বিশুদ্ধ তারাত বাধ্য হয়ে ধর্মের নামে করেছে হিংসা? ডাকাতরা যে কালী পূজা করত তাতে তাদের ডাকাতি কি আরও ভীষণ হয়নি? ঠগীরা ধর্মের নামে মানুষের প্রাণহরণ করত। সেই ক্ষত্রেই মানুষের এই প্রাণ-হরণের প্রবৃত্তি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটুও কমল না, বরং ধর্মের নামে এই জিঘাংসা আরও উগ্র হয়ে সারা ভারতকে এমন করে পেয়ে বসল যে, কর্পেল স্ট্রীম্যানকে অতি কঠোর হস্তে তা দমন করতে হয়েছিল।

ইয়োপে Inquisition-এ যে নিষ্ঠুরতার পাঁচচর পাওয়া গিয়েছে সেরূপ নিষ্ঠুরতা তাদের সাধারণ সামাজিক জীবনে কখনও দেখা যায়নি। ধর্মের কোরেই অনেক রকমের অমানুষিকতা ভীষণ প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল। চরিত্রগত ঘেচ্ছাচার যখন ধর্মের সার পায় তখন যে তা আরও কত ব্যাপক ও বীভৎস হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তার প্রমাণ Bacchanalia, Saturnalia প্রভৃতি উৎসব। দেখা গেছে হোলি প্রভৃতি উৎসবে সহস্র মানুষও এমন কুৎসিত গালাগালিতে মেতে ওঠে যে তারতের অনেক স্থানে তখন মেয়েরা রাতার ঘের হতে পায়নি না।

কাজেই ধর্মকেই জীবনের চালক করতে হবে। দিনগত প্রয়োজনময় জীবনকে ধর্মের চালক করলেই বিশদ। অথচ সব বেশেই দেখা গিয়েছে যে, একদল লোক লান্দাতাবে ধর্মের নামে নিজেরের স্বার্থই সিদ্ধ

করে নিয়েছেন। লোকে তাঁদের সেই সব আচরণকেই ধর্ম বলে ভুল করেছে। তাই এক-এক সময় ধর্মের এই রকম দুর্গতি দেখে মানুষ রাগ করে ধর্মকেই বর্জন করেছে। কিন্তু বুঝা রাগ করলে চলবে কেন? সেই দোষ কি ধর্মের? ধর্মকে নিজেরাই বিকৃত করে তার সেই বিকৃত রূপ দেখে যদি নিজেরাই রাগ করি তবে কি সেটা দুর্ভাগ্যজনক হবে? মানুষের বেহু ত পচলে দুর্ভাগ্য হয়, তা বলে কে কবে জ্যান্ত মানুষের সজ বর্জন করার কথা বলতে পেরেছে?

ধর্ম হল জীবনের জীবন, এই রকম মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে ছাড়ব এও কি কখনো হয়? আমাদের দেশে একটি কথা আছে,

ভূমিতে পড়িলে লোক ভূমিই আশ্রয়।

ধর্মের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার থেকে যদি পতন ঘটেই থাকে, তবে উঠতে হলেও ধর্মকে আশ্রয় করেই উঠতে হবে, তাছাড়া আর ত গতি নেই।

স্বার্থকামনা ও বাসনা দ্বারা মানুষ বদ্ধ। সেই বন্ধনের মধ্যে ধর্মই দেয় মুক্তি। যখন দেখি ধর্মই মানুষকে বাঁধছে তখন বুঝতে হবে ধর্মের নাম করে সাম্প্রদায়িক ও সাম্প্রদায়িকতাই এই বাঁধনের ছেঁচু। চতুর বিবরী লোকের হল ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা আমদানি করে লোকের সর্বনাশ করেছে। এমন অবস্থায়ও যথার্থ ধর্ম ছাড়া আর কেউ সেই দুর্গতি হতে মানুষকে রক্ষা করতে পারে না। এই দুর্গতি হতে মানবসমাজকে বাঁচা রক্ষা করেছেন তাঁরাই সব মহাপুরুষ।

মহাপুরুষদের একত্রে এই জগতে কম হুঃখ সহিতে হয়নি। মহাত্মা বিজয়ী এইজন্ত কচকের মুকুট মাথায় ধারণ করে হুই চোবের মাঝখানে বসেছিলেন প্রাণ দিলেন।

চতুর পাণ্ডা ও পুরোহিতের হল চিরকাল ঈশ্বরকে মানবের মধ্যে বদ্ধ করে সরল সাধারণ লোকের কাছে দ্বিবিদ্য ব্যবসা জীবনে বসেছিল। খ্রীষ্ট য়েই বললেন, "তাকে দেবতা করে মানবের বদ্ধ করে রাখা কেন? তিনি আমাদের পিতা, আমাদের ঘরের লোক।"



“পিডা”—এই কথা বলতেই মন্দিরের সব বাঁধন গেল  
খুঁচে, ভগবান্ বের হয়ে এলেন মানবের গৃহ-পরিবারে।  
তাকে নিয়ে বাঁবা ব্যবসা চালাতেন তাঁরাই বা মহাত্মা  
ঈটকে ছাড়বেন কেন? তাই ঈটকে প্রাণ দিতে হল।

শাস্ত্রে আচারে বাগে যজ্ঞে যখন এই দেশের মানুষের  
চিত্ত প্রীতিভিত্ত, তখন বুদ্ধদের বজ্রকণ্ঠে বোষণা করলেন,  
—এইসব জাল জমাল ছাড়,—প্রত্যেকে আপন আপন  
চিত্তকে দীপ্ত করে সেই আলোতে নিজের নিজের পথ  
দেখ—“আত্মদীপো ভব,” তখন তাঁকেও যে কি  
পরিমাণ হুঃখ সইতে হয়েছিল তা সহজেই বুঝি।

যখনই মহাপুরুষের বড় বড় বাণীতে এই দেশ সাড়া  
দিয়েছে তখনই তার জ্ঞান বিজ্ঞান ও আনন্দের সবগুলি  
ধার খুলে গেছে। আর যখন তার দৃষ্টি ক্ষুদ্র আচারে  
সংস্কারে কলুষিত হয়েছিল তখন ভারতের হুঃখহর্গতির আর  
সীমা নেই।

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ভারতের বিরাট, আদর্শ  
যখন সত্য ও সাধনা হতে পরিভ্রষ্ট, যখন ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
অসংখ্য আচার-বিচার-মাত্র-সম্বল সম্ভ্রদ্বারে হিন্ন বিচ্ছিন্ন,  
তখন মনীষী রামমোহনের মহানুভব সেই হুর্গতি দেখে  
ব্যথিত হ'ল। রামমোহন দেখলেন, ভারতকে এক  
বিরাট, আদর্শে একপ্রাণ করতে না পারলে আর তার  
কল্যাণ নেই। কোনো বিশেষ সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রে,  
দেবতার বা আচার-অনুষ্ঠানে এই একেবারে সত্যবনা  
কোনো মতেই সম্ভব নয়। কারণ, এক সম্ভ্রদ্বারের  
দেবতাকে অস্ত সম্ভ্রদ্বারের লোকেরা দারুণ বিষেবের  
দৃষ্টিতে দেখেন। একের লিঙ্গ, দেবতা, প্রতিমা, শাস্ত্র ও  
আচার অন্যের পক্ষে অপূজ্য, অগ্রাহ ও অপ্রত্যাখ্য।  
আজও ভারতের সকল হিন্দুকে এক করতে গেলে কোনো  
বিশেষ সম্ভ্রদ্বারের দেবতা শাস্ত্র বা আচার আশ্রয় করলে  
চলে না। অথচ দেবতা বা শাস্ত্র-আচার ছাড়াই যেমন  
কোনো বিশেষ সম্ভ্রদ্বারের উপাদেয়, তেমন অজ্ঞাত সব  
সম্ভ্রদ্বারের অপাদেয়। এই বিপদ হতে মুক্ত হবার  
কোনো উপায়ই দেখা যায় না। অথচ তাই বলে  
ভারতের বাইরের শাস্ত্র বা আচারকে আনাও ত চলবে

না। তখনকার সেই হুঃখ অসামান্য মনীষী রামমোহন  
বুঝলেন যে, এই বিপদে একমাত্র পতি ভারতের আত্ম  
পূরাতন ধর্মের মূল উপনিষদকে আশ্রয় করে শাস্ত্র ধর্ম-  
ভিত্তিক উপর দাঁড়ানো। তা ছাড়া আর কোনো পথ  
নেই।

কিছুদিন পূর্বে বাংলাদেশের শিক্ষাবিভাগ  
মুসলমানদের জন্য ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করে হিন্দুদেরও  
বলেন, তাঁরা যেন তাঁদের সম্ভ্রদ্বারের হেলেমেয়েদের  
ধর্মশিক্ষার উপযোগী কোনো পাঠ্যপুস্তক রচনা ও  
তদুপযোগী কিছু সাধনেরও ব্যবস্থা করেন। হিন্দু  
হেলেমেয়েদের ধর্মশিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে যে  
কমিটি হল তাতে নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব,  
প্রাচীনপন্থী ও বর্তমান কালের উদার ভাবের লোকও  
ছিলেন। কমিটির পর কমিটি বসল কিন্তু সর্ব সম্ভ্রদ্বারের  
প্রত্যেকের কোন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হল না।  
এক সম্ভ্রদ্বারের তবস্ততি পূজা-পদ্ধতি আনলেই অস্ত  
সম্ভ্রদ্বার তৎক্ষণাৎ ছেড়ে চলে যাবেন, কিছুতেই এই  
বিপদের সমাধান করা গেল না। তখনই বোঝা গেল  
কি কারণে রামমোহন একেবারে এইসব সাম্প্রদায়িক  
শাখাগুলোকে পরিহার করে একেবারে এই দেশের  
ধর্মের নিত্য ভিত্তিতে ও শাস্ত্র সত্যে গিয়ে আশ্রয়  
নিলেন। তারপর থেকেই দেখা গেল যে, হিন্দুর সর্ব  
সম্ভ্রদ্বারের জন্য কোনো ব্যবস্থা ঠাড়া করতে গেলেই  
রামমোহনের ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সম্বলিত সব বাণীর  
বাইরে আর যাবার ঘো নেই।

পশ্চিম জগৎ যখন তার শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম রাজনীতি  
নিয়ে এই দেশে এসে উপস্থিত হল, তখন হুঃখহর্গত  
রামমোহন বুঝেছিলেন, এখন ভারতের ধর্মকে  
আর নামা শাখার বহু হিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে  
চলবে না। ভারতের নামা সাধনা একটি মহানুভব  
মধ্যে সংহত না হলে আর উপায় নেই। কত বড় মনীষী  
থাকলে তখনকার দিনে এই কথাটা বোঝা যায় তা  
ভাবে আজও বিস্তৃত হতে হয়। অথচ তার জন্য  
রামমোহন কদাপরই পেরে গেছেন সিন্দা লাঙ্গনা ও  
অপমান। সেই হুর্গতির এখনও কি শেষ হয়েছে?

হয়ত প্রাচীন কালেও এই দেশে যুগে যুগে সকল ধর্মগুরুরাই এই সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই এমন অবস্থায় উপনিষৎ গীতা ও ব্রহ্মসূত্রকেই আশ্রয় গ্রহণ বলে ধরেছেন, এবং এই তিনটি আশ্রয়কে নাম দিয়েছেন প্রহ্নানত্রয়। তাই দেখতে পাই, ভারতের প্রত্যেকটি ধর্মগুরু আপন সম্ভ্রমার হাপনের জন্য প্রহ্নানত্রয়কে আশ্রয় না করে পারেননি। রামমোহনও ভারতকে শাখত ধর্ম-ভিত্তির উপরে হাপন করতে গিয়ে এই প্রহ্নানত্রয়েরই আশ্রয় নিলেন। রামমোহনকে ধারা অ-হিন্দু বলে গাল দিতে চান, তাঁরা মনে রাখবেন, রামমোহন যে পথে গিয়েছেন, তাঁর পূর্ববর্তী সব ধর্মগুরুরাও সেই পথেই গিয়েছেন।

তবে রামমোহনের বিশেষত্ব কোথায়? তাঁর বিশেষত্ব তাঁর শাখত ধর্মকে তিনি বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগের সঙ্গে একান্ত সঙ্গত করে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর সময় সমস্ত প্রতীচ্য তার সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য নিয়ে এদেশে হাজির হল, তিনি তার সঙ্গে ভারতের সাধনাকে অপূর্ণ ভাবে মিলিয়ে দিলেন। ভারতের ধর্মসাধনা অর্থাৎ ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মজ্ঞান, প্রহ্নানত্ব ছিল সম্যাসীদের। তিনি সেই সাধনা প্রতিষ্ঠিত করলেন ভারতের গৃহস্থ জীবনে। তা হাড়া সমাজ রাজনীতি শিক্ষা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে রামমোহনের যে-সব অতুলনীয় দান আছে তার কথা আমরা এখন উল্লেখ না-ই করলাম।

কেউ যদি বলেন, ভারতের প্রাচীন সাধনাতে আমরা যদি এখন ফিরে বাই তবে আমরা কি করে উত্তমী কর্মশীল প্রতীচ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারব? ভারত তো চিরদিন কর্মবিশুদ্ধ। তার উত্তরে বলতে হবে এই, যে, আজকের দিনে কর্মবিশুদ্ধ অলসতাকেই আমরা ভারতের আধ্যাত্মিকতা বলে মনে করছি, আসলে তা হল ভারতের পরবর্তী তামাসিক যুগের কথা। ভারতের গৌরবোজ্জ্বল যুগে পদে পদে দেখা যায় জীবনের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও কর্ম ও সাধনার উত্তমের সহিত গভীর যোগ। তামাসিকতার অবসাদে যদি আপনাকে আমরা ছেড়ে দিই তবে তাতে আমাদের পৌরুষের যে

অপমান তার মত অবশ্য আর আমাদের কিছু নেই। এইখানে ভারতের মনীষীদের হাবিতে কর্মময় উত্তমময় মানবের যে মাহাত্ম্য আমরা কীর্তিত দেখি, প্রতীচ্য দেশের পৌরুষ-সাধনার কাছে তার কৃত্তি হবার কোনো হেতু নেই।

আমাদের দেশের ঋষিদের অমর বাণীর মধ্যে সেই বীৰ্য্যময় সাধনার মন্ত্র ছিল বলেই রামমোহন বেদ উপনিষদের দিকে হুকলেন। মানবাত্মার জয় ঘোষণা, নিত্য ঐগিরে চলবার জন্য মহতী আকাঙ্ক্ষা, উত্তমের মধ্যে মহা সার্থকতা, সবই দেখতে পাই সেই সব অমৃত মন্ত্রের মধ্যে। উপনিষৎ বাণীগুলির মধ্যে দেখা যায় আচার-অহুতান সম্ভ্রমার বিধিনিষেধ—সকলের উপরে মাহু ও তার মাহাত্ম্য।

উপনিষৎ বলেন, ইচ্ছা হ'তে মন বড়, মন হ'তে আত্মা বড়, আত্মা হ'তেও পুরুষ বড়, পুরুষ হ'তে আর শ্রেষ্ঠ কিছু নেই, তাহাই চরম ও পরম।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।

পুরুষায় পরং কিঞ্চিৎ সা কাঠা সা পরা গতিঃ।

কঠোপনিষৎ, ১. ৩. ১১.

এই পুরুষ আপনার জ্যোতিতে আপনি দীপ্ত, বুকের ভাবায় বলা যায়, সে আত্মদীপ্ত।

তাই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বললেন,

অয়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি।

বৃহদারণ্যক. ৪. ৩. ১.

বুদ্ধি, কর্মশক্তি, উত্তম, সঙ্গ, কর্মসাধনা, সব কিছু নিয়ে প্রাচীন শব্দ “ক্রতু”। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলেন, এই মানবই ক্রতুময়।

এব ধনু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ। ৩. ১৪. ১.

ছান্দোগ্য আরও বলেন, এই মাহুই হল বজ্র। মাহুবকে বাদ দিয়ে যোগবজ্র প্রভৃতি অহুতানের কোনই অর্থ নেই।

পুরুষো বাব বজ্রঃ। ছান্দোগ্য. ৩. ১৬. ১.

যুগক উপনিষৎ বলেন, কর্ম, তপস্কা, ব্রহ্ম, পরমাত্ম সবই এই পুরুষ। নানাবিধ বিখ্যার আবরণে

মাহর আছে চাপা পড়ে। যে সেই-সমস্ত মিথ্যার  
মাশিতে আচ্ছন্ন অন্তরনিহিত রহস্যবৃত্ত পুরুষকে চিনতে  
পারে সেই আবিষ্কার সকল বন্ধনকে পারে মুক্ত  
করতে।

পুরুষ এবেরং বিধং কৰ্ম তপো ব্রহ্ম পরাবৃত্তম্।  
এতৎ বো বেদ নিহিতং গুহ্যম্  
সোঽবিজ্ঞাতাঃ সৰ্বাঃ সৰ্বিকবতীহ সৌম্য ॥

বুতক. ২. ১. ১০.

প্রলোপনিবৎ বলেন, সৰ্বভাবে পরিপূর্ণ সেই পুরুষের  
ধরূপ বুঝতে হবে।

বোড়শকলং পুরুষং বেদ। এতৎ উপ ৬. ১.

এই পরিপূর্ণ পুরুষকে না জানলে ব্রহ্মকে অতিক্রম  
করে অবৃত্ত লাভের আর কোনো উপায় নেই। তাই  
প্রলোপনিবৎ বলেন, সেই বেদ পুরুষকে জান, যেন ব্রহ্ম  
জোমাদের আর না ব্যাধিত করতে পারে।

তৎ বেদং পুরুষং বেদ যথা মা বো ব্রহ্মঃ পরিব্যথা।

এতৎ উপ ৬. ৬.

আর প্রাচীন সব বেদসংহিতাতে দেখি, ধর্মের নামে  
যে উত্তমহীনতা তাকে ধরিয়া কঠোর ভাবে আঘাত  
করেছেন। তখনকার দিনেও আচার-পরায়ণ পুরোহিতের  
দল যে কর্মোত্তম হতে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলেন তা  
বুঝতে পারি সেই আঘাতের ভাষায়—“নিরুত্তম  
পুরোহিতের মত মিত্রালু হোরো না—”

বোহু ব্রহ্মেব তদ্বর্ভব।—সামবেদ সংহিতা, ২.১.১৮.

তাই সব বেদে ধর্মের প্রার্থনা—হে দেবতা, পিতা  
বেদন পূজগণকে কর্মোত্তম শেখান তেমনি আমাদেরকে  
কর্মোত্তমে কল্পিতে ছুমি শিক্ষিত কর।

ইত্র ক্রতুশাত্তর পিতাপুত্রোভ্যো যথা

শিক্ষাপো অশ্বিন্ ॥ সামবেদ. ৬. ৩. ৬.

সামবেদ আরও বলেন,—কর্মপরায়ণেরাই দেবতার  
প্রিয়, মিত্রালু অবলাদপ্রভরা নয়। অতঃ উদ্যমীরাই  
আনন্দলোক অধিকার করতে পারেন।

ইচ্ছতি দেবা ব্রহ্মতম যস্যার স্পৃহয়তি।

যদি প্রবাসদত্তাঃ ॥ ১. ১. ৬.

মানব-সাহায্যের ও মানবীয় দৃষ্টি ও কল্যাণ-উদ্যমের  
এই যে জর-বোঝা তাতেই বুঝা যায় ভারতের প্রাচীন  
মহর্ষিদের মনীষার মহত্ব। সেইসব মহা সত্য যখন  
আমরা বিস্তৃত হয়েছিলাম তখন এই ব্রহ্মের যে মহর্ষি  
আমাদের কাছে আবার নুতন করে তা এনে উপস্থিত  
করলেন, সেই ব্রহ্মগুরু রামমোহনকে যদি আমরা যোগ্য  
সন্মান না দিতে পারি তবে আমাদের চেয়ে আর  
অভ্যাজন কে?

হরত কেউ বলতে পারেন, আমাদের শাস্ত্রশাসিত  
বিনীত দেশে রামমোহন বুঝা একটা বিরোধ এনে  
হাজির করলেন। কেউ বা আবার বলবেন, স্বাধীন যে  
নববুধ আসছে তার প্রারম্ভে তিনি বেদ-উপনিষদের  
বোহাই দিয়ে আমাদের চিন্তকে বেঁধে কেনে পুরাতন  
অর্থহীন ধর্মবিশ্বাসের অলুপাসনের কাছে দাসত্ব লিপে  
দিলেন। আসল কথা রামমোহনই দেখালেন, সেই পরম  
সত্য, নিত্য সত্যে স্বাধীন ও পরাধীন বলে কোনো  
বিরোধ নেই। শাস্ত্র সত্যময় ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে  
স্বাধীন বিচারের কোনো বিরোধ নেই। বরং সেই সব  
সাধকবাণী ভিতরের বাইরের সব বুঝা দাসত্ব হতে  
আমাদের চিন্তকে মুক্ত করে দেয়। ধর্মবিশ্বাসই  
বললেন, “যদি ধর্মের জেনে থাক তবে বড় জোর  
দেবতাদের রহস্য জেনেছ, যদি যজুর্বেদ জেনে থাক  
তবে নারায়ণ জোর যজ্ঞের রহস্যটাই আরক্ত করেছ,  
যদি সামবেদ জেনে থাক তবে নারায়ণ আর সব কথাই  
জেনেছ, কিন্তু তোমার অন্তরের মধ্যে যে বেদ আছে  
সেই অনন্ত জীবনবেদকে যদি জেনে থাক তবেই তুমি  
জানতে পেরেছ ব্রহ্মকে; এই বেদ না জানলে আর  
কোনো বেদের সাহায্যেই তুমি ব্রহ্মবিৎ হতে পার  
না।”

অচোহ বো বেদ স বেদ বেদান্  
বজ্রং বি বো বেদ স বেদ বজ্রম্।  
সামানি বো বেদ স বেদ সর্গং  
বো মানসং বেদ স বেদ ব্রহ্ম ॥

ইতিহাসোপনিষৎ,

(Unpublished Upanishads,  
Adyar Library, p. 11)

কাজেই রামমোহনই আমাদের দেশে নৃতন ও পুরাতনের বিরোধ দিলেন ছুটিরে, শাস্ত্র ও বিচারবুদ্ধির বিরোধ দিলেন দূর করে। আজ জগতের এই হুগীতির দিনে বারবার সেই হুগুগুর কাছেই প্রত্যানত হয়ে বসি, হে আচার্য্য, সময় এসেছে, জগতে বত ভাই ভাই আজ পরস্পরকে না কেনেই কর্ণাজুনের মত বুঝা হানাহানি মারামারি করে মরছে, তোমার উচ্চারিত ভারতের অতি প্রাচীন ঐক্যমন্ত্র “পিতা নোহসি” আজ আবার আমাদের কাছে দীপমান হোক।

হে পরম দেবতা, তুমি আমাদের সকলেরই পিতা, সবাই আমরা তোমার সন্তান। “পিতা নোহসি” এই কথা আমরা বুধে প্রতিদিন আওড়ালে বা ভজন করলেও সমস্ত জীবন দিয়ে জানিনে। “পিতা নো বোধি”—

তুমি সমস্ত জীবনকে এই সত্য দিয়ে বোধিত কর। তবেই তোমার প্রতি আমাদের সব নমস্কার সত্য হবে। নইলে আমাদের এত পূজা অর্চনা ক্রিয়াকর্ম সবই ব্যর্থ। “নমস্তেহত”—পৃথিবীতে যে যেখানে যেভাবে তোমাকে নমস্কার করছে, মৈত্রী ও প্রেমে সব আজ সত্য হোক। নইলে পৃথিবীতে হিংসারের হানাহানির মারামারির অন্ত কিছুতেই হবে না। “তুমিই আমাদের সকলের অন্তর্নিহিত পরম ধর্ম, তোমার প্রেরিত কল্যাণ-বুদ্ধি ও উদ্যমই আমাদের অন্তর্নিহিত পরম রক্ষাকবচ।”

ব্রহ্ম বর্ম মমাস্তবম্

শর্ম বর্ম মমাস্তবম্।

সামবেদ সংহিতা।

উত্তরাচিক, ১. ৩. ৮.

প্রবাসী, কান্তন, ১৩৪৭।



# ভারতবর্ষের ধর্ম

বসীন্দাথ ঠাকুর

পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাচীন ধর্ম দেখা যায় না যার মূলে দেবতার ভয়ের স্থান নেই। শাসনেই তাদের সকলের মূল প্রেরণা। প্রায় সকল রকম ধর্মই জোর করে মানুষকে কতকগুলি আচার ও নিয়ম পালনের জাড়া দিয়েছে—পাশের ভয়, নরকের ভয়, উৎকট শাস্তির ভয়, শত সহস্র ভয়ের শাসনে কঠোর গ্রহি দিয়ে বাঁধা হয়েছে ধর্মজীবনকে। এই সমস্ত ধর্মের মূলে ছিল আদিম মানুষের অন্ধশক্তিকে পূজা। একজন সর্গশক্তিমান দেবতা সৃষ্টিকে বাইরে থেকে চালনা করছেন। তাঁর অঙ্গশাসন তিলমাত্র অমান্য করলে গুরুতর শাস্তি অপেক্ষা করে আছে—সকল ধর্মেরই এই হ'ল মূল কথা।

এর বিশেষ একটি কারণ আছে। প্রথম যুগে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল নিত্যমুহূর্তে অনিশ্চিত। আহা-বিহার প্রভৃতি সকল প্রয়োজনের ব্যবহাই ছিল একান্ত দুর্লভ, পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল অত্যন্ত ক্রুর, নিষ্ঠুর। পণ্ডচারণ থেকে কুট বণিকবৃত্তি পর্যন্ত মানব ইতিহাসের সকল অবস্থাতেই দেখি, কাড়াকাড়ির চেষ্টা ছিল প্রবল। এই দম্ভ্যবৃত্তি নির্ভর হয়েছিল মানব-সমাজে। এরই জড়নায় সোদিম মানুষ শক্তিকে প্রজ্ঞা করেছে, শাস্তির প্রচণ্ড বিরুদ্ধতাকে দূর করে, শাস্ত করে প্রাণপণে তাকে আপনার পক্ষে টানবার চেষ্টা করেছে। জীবনকে এই ভাবে দেখার ফলে তাদের ধর্মে শাসন-নীতি হয়েছে প্রবল; এরই ফলে সে-যুগে যার হাতে ছিল শাসনদণ্ড সে জোর করে সকলকে এনেছে নিজের মতে। নিজের বাহুবলের দ্বারা এবং দেবতাকে বশ করে টেনে সে নির্গন্ধের মত পীড়িত করেছে অন্তকে।

একমাত্র উপনিষদের ধর্মই দেখতে পাই, ঋষিরা দূর করতে পেরেছেন শাস্তির ভয়কে এই ভয়কে। তাঁরা

বলেছেন, “আনন্দাত্মেয় ঋষিমানি কুতানি জায়ন্তে”—এমন দৃঢ়ভাবে এত বড়ো কথা কোনো ধর্মে কোথাও বলা হয়নি। এই আনন্দের দিকেই চলেছে সৃষ্টি, ভয়ের দিকে নয়। এ-কথা ধারা বলেছেন তাঁদেরও জীবন তখন ছিল বিভীষিকার দ্বারা হিংস্রতার দ্বারা বেধা। এই আদিম যুগের মানুষই অন্তর পূজা করেছে অন্ধ শক্তিকে, সেই যুগেরই আর-এক মানুষের অন্তরে প্রথম এল উপনিষদের মত্রে আনন্দের অমোঘ বাগ্নি, সে-বাগ্নি এল আমাদেরই এই ভারতবর্ষে।

আনন্দের এ বাগ্নি সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিলিত হবার বাগ্নি। মূঢ়তা বা ভয়ের চিহ্ন লেশমাত্র এর মধ্যে নেই। এই সাধনার সঙ্গীতপ্রভ চেষ্টার স্থানান্তিত নির্দেশ আছে। আপনাকে নির্মল, শুচি করতে হবে, সৃষ্টির মূলে নিহিত রয়েছে যে ঐক্য তাকে মৈত্রী ভাবের চর্চায় বুঝতে চেষ্টা করতে হবে, পরমদেবতার সঙ্গে নিগূঢ়তম আত্মীয়তা স্থাপন করতে হবে। ইহজীবনের সকল প্রিয়সম্পর্কের অপেক্ষা তিনি প্রিয়তর এই কথাই তাঁরা বার বার ঘোষণা করেছেন বিধাহীন উদাত্ত কণ্ঠে—“তদেত্তৎ প্রেরঃ পুরাণ প্রেরো বিস্তাণ প্রেরোহস্তম্যং সর্বম্যং অন্তরতরং বদয়মাস্মা”, তিনিই অন্তরের অন্তরতর আত্মা যিনি এই বিশ্বের অন্তরে নিরন্তর বাস করছেন। তিনি সকল প্রিয়ের প্রিয়। সকলের চেয়ে ভয়ংকর তিনি নন। এই উপলব্ধির মধ্যে মূঢ়তার তিলমাত্র চিহ্ন নেই, মত্তত্বের নিষ্ঠুর বাক্যধ্বনি কোথাও তাঁকে শাস্ত করার ভীক চেষ্টা নেই, বিকৃতির কথাবার্তা স্থান নেই।

ঋষিরা বলেছেন, সকলকে সমান দেখতে হবে, সাধনাকে সকলের মধ্যে সার্বিক করে ছুলতে হবে। সকলের মধ্যে আপনাকে যে দেখেছে আবিষ্কৃত বিবল

দৃষ্টিতে, ভারই সাধনা সার্থক। এই যে সাম্য-বোধ, অভ্যেদে রাষ্ট্রক্ষেত্রে একেই বলা হয়েছে ডেমক্রাসি। এ-দেশের সাধনার একে যে মানা হয়নি তা তো নয়। উচ্চ নীচে ভেদ দূর করবার চেষ্টা এদেশেও হয়েছে। সাম্যের সাধনা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বত্রই যে দূর হয়ে যাচ্ছে এর কারণ, কেন্দ্রগত বিশ্বাসে কোথাও এর সংকল্পের অভাব রয়েছে। আজ তাই সে এমন নিঃশেষে উন্মূল হয়ে অসাম্প্রদায়িক বিপ্লবের মধ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল।

ডেমক্রাসির ইতিহাসের আরম্ভে দাস-ব্যবসা যখন দেশে দেশে মানবতাকে কলুষিত করেছিল, সে-যুগে দাস্যবৃত্তির নিপীড়ন ছিল বিস্তৃত। ধর্মপ্রচারের উন্নত স্বাক্ষর সঙ্গে ডেমক্রাসির ভক্তরাই একদিন সর্বত্র নিষ্ঠুর অসাম্য বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। শাস্ত্রম্ শিবম্ অশেষতম্, ধর্মের যা মূল কথা তা প্রবেশ করেনি তাদের অন্তরে। বিশ্বের যাকার শাস্তিকে মেনে নিজের সংকীর্ণ স্বার্থেরই সন্ধি করব—এই ছিল একমাত্র বোধ।

তাই বলি, নির্মল মৃত্যুতরঙ্গিত উপনিষদের যে ধর্ম তা শুধু আদিম কালেই নয়, পরবর্তী কালেও অস্ত কোথাও দেখা যায়নি,—ভয়ংকরকে ভয়ংকর আচারের দ্বারা শাস্ত করার চেষ্টা কোথাও নেই প্রাচীন এই ঋষিদের ধর্মে।

পরবর্তী যুগে হুংখকে একদিন মানা হয়েছে এই ভারতবর্ষেই। বৌদ্ধযুগের সূচনার একটা অবসাদ এল; এই বোধ এল যে, জীবনযাত্রা স্তব্ধের নয় শাস্তির নয়, যাকে পাই তাকে একদিন অকস্মৎ হারায়ে—মৃত্যু জীবনকে আক্রমণ করে, জরা পীড়িত করে দেহকে। ঐশ্বর্যপ্রধান দেশের পক্ষে অসম্ভব নয় এ-ধরণের চিন্তা এবং অস্বচ্ছন্দ। বেদে কিন্তু কোথাও দেখি না এ-ধরণের অবসাদ। তাঁরা বারংবার চেয়েছেন সৃষ্টির এই আনন্দ-যজ্ঞে মুক্ত আলোকে। বাতাসে হান পেতে।

অভ্যেদের সম্বন্ধে হুংসহত্যাবোধ এবং জীবনকে এড়াবার হ্রস্বলতা সেই দেশেই একদিন এল, কিন্তু তার মধ্যে দিয়েই এল একটি মহান বাণী। হুংখকে স্বীকারের

সঙ্গে বুদ্ধ তার নিরুত্তর কথাই বলেছেন। সেও কিছু কম বড়ো কথা নয়। মানব-জীবনের যে হুংখ তা ব্যক্তিগত হুংখ, বুদ্ধ এই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, আপন প্রযুক্তি, আপন কামনার চরিতার্থতা থেকে বঞ্চিত হওয়াতেই মানুষের হুংখের মূল আছে মিহিত। এই তত্ত্বের সঙ্গেই তিনি তাই বললেন মৈত্রীর বাণী। সকলকে সমান করে, এক করে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখলে তবেই সকল হুংখের নিরুত্তি। যাতা যেমন করে আপন একমাত্র পুত্রকে ভালোবাসেন, সর্বমানবকে সেই ভাবে ভালোবাসলে তবেই হুংখের নির্মমতার হাত থেকে মুক্তি, তবেই সীমাবদ্ধ এই সংসারে অসীমের উপলব্ধি হবে সম্পূর্ণ। প্রেমের এই উদার উপলব্ধিতেই জীবনের মুক্তি। এখানেও কোনো দণ্ডধারী ভয়ংকরের কল্পনা দেখি না। অকৃতার্থতার হুংখ জীবনে আছে সে-কথা স্বীকার করা হয়নি কিন্তু গৃহ প্রত্যয়ের সঙ্গে এ-কথাও বলা হয়েছে যে অকৃতার্থতার এই হুংখ আত্মপ্রভাবের লক্ষ্যর, কোনো অদৃষ্ট শাসকের হ্রস্বল্য নিয়মপালনের ক্রটি এর কারণ নয়।

অতএব দেখতে পাই, উপনিষদের মত্রে “ঐশাবাস্তমিদং সর্বং” সর্বব্যাপী সত্যের কথা কল্পনা করা হয়েছে, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয়ের মত্রে বৌদ্ধযুগেও সেই একই সত্যের কল্পনা করা হয়েছে। এই মত্রে কোথাও কোনো অংশে ভিলমাত্র নালিশ নেই। উপনিষদের ঋষি বলেছেন শাস্তির দিক থেকে, বলেছেন পূর্ণতার দিক থেকে; বুদ্ধ বলেছেন অপনাকে ভালোবাসার দ্বারা, পরিপূর্ণ আত্মত্যাগের দ্বারা জীবনসাধনার বাণী। লোভ-ক্রোধ জয়ের তাঁর যে বাণী সে-ও সেই “ভেদ ত্যক্তম্” এই বাণী। মূলত হুইই সম্পূর্ণ একই বাণী।

জগতের বীভৎস ব্যভিচারের মধ্যে আজ এই সত্যটি বিশেষ করে স্মরণ করবার দিন এসেছে। লোভ-ক্রোধে কোরো না—এ বাণী আজ সংগ্রামের বিক্ষুব্ধ আবর্তে মানুষ মনে রাখতে পারছে না। এর হান বৃষ্টি আজ রাষ্ট্রনীতি থেকে একেবারেই মুছে গেল; সমাজ-

দীপ্তির ক্ষেত্রে তো বহু পূর্বেই মানুষ এ-বাণী বিশ্বত হয়েছিল। অত্যন্ত লজ্জার কথা। উপনিষদের মন্ত্রের এই দেশেও মানুষকে অপমানিত আমরা কম করিনি। লোভের তাড়নায় মানুষ আজ মানুষের সম্মিলিত শক্তিকে দিকে দিকে বলহীন করছে, মারছে। যুগান্তরের সাধনায় পাওয়া সকল বিশ্বাসকে সে আজ নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করছে, চূর্ণ করছে। এতে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সে নিজেকেই আঘাত করছে তা নিজের জানে না।

এই ভেদবুদ্ধি যে আমাদের দেশের অন্তরের জিনিস নয় তা আমরা ভুলতে বসেছি। এর পীড়নে কী পরিমাণে পঙ্গু আমরা হয়েছি এবং আজও হচ্ছি, জীবনের ক্ষেত্রে ক্রমশই কি ভাবে শতধা বিছিন্ন হয়ে পড়াছি তা আমরা এতদিন বুঝিনি, আজও বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয়, এই মনোবৃত্তির জন্তে দায়ী আমাদের অনার্য রক্ত যা পরবর্তী যুগে অলঙ্কিতে আমাদের দেহের মধ্যে এসে মিশেছে। ইতিহাস ভাল করে আমার জানা নেই, কিন্তু আমার মনে হয়, এই কারণেই হয়ত মানবতার বা সাম্যের যে ধর্ম তা যুগে গিয়েছে। অনার্যরক্তের সংমিশ্রণের বিকৃতিকে অস্বীকার কেমন করে করি যখন চারিদিকে দেখি এই বিকৃত মনোবৃত্তি শক্তির নামে, বলের নামে সমগ্র মানবসমাজকে জীর্ণ করছে। দুটি তাদের এতদূর অন্ধ যে তারা দেখতেও পায় না এতে নিজেরই নৌকায় হিঙ্গ করা হচ্ছে।

আমাদের দেশেও আজ তাই ভাববার সময় এসেছে। ভাবনা জাগছে, ভারত আজ তার এই চরম বিপদের সময় আপনাকে গুঁজে পাচ্ছে না কেন? এর মূল কারণ নির্দেশ করা একেবারেই কঠিন নয়। ধীরে ধীরে অতি স্থানিষ্ঠ এবং স্থানিষ্ঠ দক্ষতার সঙ্গে এ-দেশে মানুষের কল্পগত শক্তির মূল ছেদ করা হয়েছে, তাকে অপহরণ

করা হয়েছে কুট রাষ্ট্রনীতির সাহায্যে। আজ সাহায্য করবার ডাক এসেছে কিন্তু সে শক্তি এখন কোথায়? ভারত সত্যায়তা করতে পারবে না বিশ্বমানবকে কোনো ক্ষেত্রেই। আমরা দাস্তবৃত্তিতে দীক্ষিত হয়েছি যত্নহীন হারিয়ে; আজ তাদের সাহায্যে এই যুগান্তরগত পরাভবের গ্লানি দূর করব? মানুষকেই যে আমরা তিলে তিলে নিঃশেষে হারিয়েছি। যে ধর্ম একদিন মানুষকে কাছে টেনেছিল সাম্যের আকর্ষণে, প্রেমের আকর্ষণে, তাতে এত বড়ো কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হয়েছে যে, দেবতাকে যারা ভয়ের তাড়নায় পূজা করে তারা দেবতার পণ্ড, তারা নিজেকেই তুচ্ছ আচার বিচারের যুগে আবদ্ধ হয়ে আছে। পূজারীর গৌরব তাদের জন্ত নয়, সৃষ্টির বজ্রালায় কোনো শুভকার্যে তাদের অধিকার নেই। দেখতে পাচ্ছি সেই হিংস্র পশুরাই আজ দলে দলে ধ্বনধ্বনিত বিস্তার করে দিকে দিকে উদ্ধার হয়ে ছেগে উঠেছে। কে আজ তাদের শাস্ত করবে, নিয়ন্ত্রণ করবে জানি নে।

এই নিদাক্ষণ বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও তবু গৌরবের সঙ্গে আমাদের স্মরণ করবার দিন এসেছে যে- আমরা জগৎগ্রহণ করেছি সেই ভারতবর্ষে যে-দেশে পরম আনন্দরূপের চরমতম উপলব্ধি একদিন সার্থক হয়েছিল, এই দেশেই একদিন মানুষকে ভয়ের কঠোর বন্ধন থেকে উদ্ধার করে আনন্দের উদ্ধার লোকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। প্রাচীন সেই ঋষিদের আজ এগাম নিবেদন করি।

(শান্তিনিকেতন মন্দিরে আচার্য্যের উপদেশ। ১৯৩৭। জীবনমল্ল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত।)

এবাসী, আশ্বিন, ১৩৭১।

## রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ

...শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংশ্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল, হিন্দু-কলেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অহুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটি হেডমাস্টার পুষ্করিণীর ধারে অবস্থিত। আমি প্রায় প্রতি শনিবার দুইটার সময় ছুটি হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানে বাইতাম। অল্প দিনও দেখা করিয়া আসিতাম। কোন কোন দিন আমি তথায় গিয়া বড়ই উপদ্রব করিতাম। বাগানের গাছের নিচু ছিঁড়িয়া, কড়াইগুলি ভাঙ্গিয়া মনের সুখে খাইতাম। রামমোহন রায় একদিন কহিলেন, “বেবাদর!” রোদ্ধে হটাৎপাটি করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে বোসো। যত নিচু খেতে পার, এইখানে বসিয়া খাও।” মালীকে বলিলেন, “যা, গাছ থেকে নিচু পেড়ে নিয়ে আর।” সে তৎক্ষণাৎ এক থালা তরিয়া নিচু আনিয়া দিল। তখন রামমোহন রায় বলিলেন, “যত ইচ্ছা নিচু খাও।”

তাঁহার বৃত্তি প্রশান্ত ও গভীর। আমি বড় প্রজ্ঞা ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে দেখিতাম। বাগানে একটা কাঠের দোলা ছিল। রামমোহন রায় অল্পচালনার জন্য তাহাতে দোল খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলো তিনি আমাকে সেই দোলায় বসাইয়া আপনি টানিতেন, কণেক পরে আপনি তাহাতে বসিয়া বলিতেন, “বেবাদর। এখন ছুটি টান।”

...আমি মাসের দুর্গোৎসব। আমি এই উপলক্ষে রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিতে বাই। গিয়া বলিলাম, “রামমণি ঠাকুরের নিবেদন, তিন দিন আপনার প্রতিমা দর্শনের নিমন্ত্রণ।” তিনিই তিনি

বলিলেন, “বেবাদর। আমাকে কেন, রাখাপ্রসাদকেও বল।”

...এই অবধি আমি মনে মনে সন্মত করিলাম, যে, রামমোহন রায় যেমন কোনো প্রতিমা পূজায় ও পৌত্তলিকতার যোগ দিতেন না, তেমনি আমিও আর তাহাতে যোগ দিব না।... (বিষভারতীর প্রহসনের প্রকাশিত মহাবির আত্মজীবনী।)

আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ নিজ বাল্যজীবনে তাঁহার উপরে যে রামমোহন রায়ের নিগূঢ় প্রভাব পতিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে বিশেষ কিছুই লিখেন নাই। একসময়ে তিনি কয়েকজন কুহুংলী মিজান্নর প্রশ্নের উত্তরে এবিষয়ে বাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রচিত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে বিবৃত আছে।

(সম্পাদকীয় পরিশিষ্ট, মহাবির আত্মজীবনী।)

দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “আমার উপরে তাঁহার এক নিগূঢ় প্রভাব ছিল। আমি তখন বালক ছিলাম, স্তম্ভভাৱে তাঁহার সহিত কথোপকথনের সুযোগ ছিল না। কিন্তু আমার উপরে তাহার সুখের এমন এক আকর্ষণ ছিল যে আমি আর কাহারও সুখ দেখিয়া কখনও সেইরূপ আকৃষ্ট হই নাই।...

...আমি প্রায়ই রাজার বাড়ীতে রাজার সহিত বাইতাম। তখন রাজার সহিত আমার প্রায়ই কোনও কথাবার্তা হইত না। আমি তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাঁহার স্নান সুখ দর্শন করিতাম। তাঁহার সুখের প্রতি আমি অতিশয় আকৃষ্ট হইতাম। রাজার সহিত বাড়ীতে বেড়াইবার সময় আমি প্রায়ই রাজার বিষয়ে চিন্তাতে মগ্ন থাকিতাম। রাজার কি হইতেছে, সে বিষয়ে কিছু জানিতে পারিতাম না। আমি পুত্তলিকার ভাৱ দ্বিষ্ট



হইয়া বলিয়া থাকিতাম। কেবলই রাজাকে দেখিতাম। আমার হৃদয় একপ্রকার গভীর ও অবর্ণনীয়ভাবে পরিপ্লুত হইত। স্পষ্টই বুঝা যায় যে রাজার সহিত আমার কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল।...যে কার্যের জন্ত তিনি পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, সেই কার্যের জন্ত পরিশ্রম করিবার উৎসাহ আমি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি।...

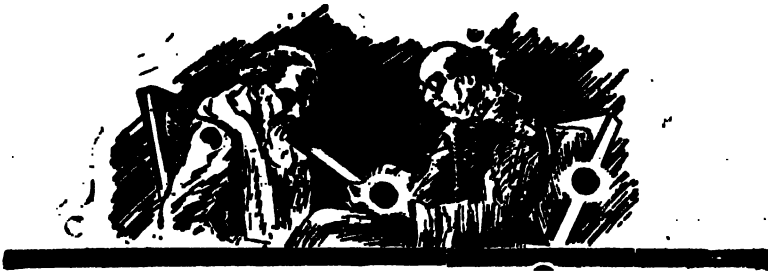
“ইংলণ্ডে গমন করিবার সময়ে রাজা আমার পিতার নিকট বিদায় লইতে আসিলেন। আমাদের বাড়ীর সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশী, রাজাকে দেখিবার জন্ত আমাদের স্ত্রীশিশু প্রাঙ্গণে একত্র হইয়াছিলেন। আমি তখন, সেখানে ছিলাম না। তখন আমি সামান্য বালক। তথাচ, রাজা আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার হস্তমর্দন না করিয়া তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমার পিতা আমাকে ডাকিয়া আনিলেন। তখন রাজা আমার হস্তমর্দন করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। রাজা যে সময়ে আমার হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। বয়স অধিক হইলে উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।

...যখন রাজার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল তখন আমার পিতা প্রতিদিন প্রাতঃকালে পুষ্পাদি উপকরণ লইয়া দ্বৈতারা, পূজা করিতেন। তিনি

প্রকৃত ভক্তির সহিত পূজা করিতেন, কিন্তু পূজা অপেক্ষাও রাজার প্রতি তাঁহার ভক্তি অধিক হইয়াছিল। কখনও কখনও এমন হইত যে, তিনি পূজার বলিয়াছেন, এমন সময়ে রাজা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। রাজা আমাদের গলিতে প্রবেশ করিবা মাত্র আমার পিতার নিকট সংবাদ যাইত যে তিনি আসিতেছেন। আমার পিতা তৎক্ষণাৎ পূজা হইতে উঠিয়া রাজাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেন। রাজার বহুদিগের উপর তাঁহার এই প্রকার প্রভাব ছিল।

“যখন রাজা রামমোহন বাবুর মৃত্যু-সংবাদ আসিল, তখন আমি আমার পিতার নিকটে ছিলাম। আমার পিতা বালকের স্তর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমারও অতিশয় শোক হইয়াছিল। যদিও রাজার সহিত আমার বিশেষ বনিষ্টতা ছিল না, যদিও তিনি আমাকে কোন উপদেশ দেন নাই, তথাচ তাঁহার সুখী এবং চরিত্র আমার হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। তাঁহার দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম।”

- (১) পরে মহর্ষি বলিয়াছিলেন, “তখন আমার বয়স আট কিম্বা নয় বৎসর হইবে।”
- (২) দ্বারকানাথ রামলোচন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র ও রামবাণী ঠাকুরের উরসপুত্র ছিলেন। রামলোচন তখন পরলোকগত।
- (৩) রামমোহনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র।



# ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একটি গান যখনই ধরা যায় তখনই তার রূপ প্রকাশ হয় না—তার একটা অংশ সম্পূর্ণ হয়ে যখন সম্মুখে আসে তখন সমস্তটার রাগিণী কি এবং তার অন্তরাটা কোন্‌দিকে গতি নেবে সে কথা চিন্তা করবার সময় আসে।

আমাদের দেশের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজেরও ভূমিকা একটা সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে; তার আরম্ভের দিকের কাজ একটা সমাপ্তির মধ্যে পৌঁছেছে। যে সমস্ত প্রাণহীন অভ্যস্ত লোকাচারের জড় আবরণের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে হিন্দুসমাজ আপনার চিরন্তন সত্য সন্ধান চেষ্টা করিয়ে বসেছিল—ব্রাহ্মসমাজ তার সেই আবরণকে ছিন্ন করবার জন্তে তাকে আঘাত করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে এই যে আঘাত দেবার কাজ, এ একটা সম্মুখে উত্তীর্ণ হয়েছে। হিন্দুসমাজ নানা দিক দিয়ে নিজের ভিতরকার নিত্যতম এবং মহত্তম সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্তে চেষ্টা করতে প্রস্তুত হয়েছে।

এই চেষ্টা একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না, এই চেষ্টা নানান বাত-প্রতিবাদ ও সত্য-বিপর্যায় ভিতর দিয়ে দিয়ে যাবে নানা শাখা-প্রশাখার পথ খুঁজতে-খুঁজতে আপন সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে। এই চেষ্টার অনেক রূপ দেখা যাবে যার মধ্যে সত্যের সূক্তি বিগুহভাবে প্রকাশ পাবে না কিন্তু তবু যেটি প্রধান কাজ সেটি সম্পন্ন হয়েছে,—হিন্দুসমাজের চিন্তা ক্ষেত্রে উঠেছে। এই চিন্তা যখন ক্ষেত্রে তখন হিন্দুসমাজ আরও অস্বস্তিতে কালের

স্রোতে ভেসে যেতে পারে না—তাকে এখন থেকে দিকনির্ণয় করে চলতেই হবে, নিজের হালটা কোথায় তা তাকে খুঁজে নিতেই হবে। ডুল অনেক করবে কিন্তু ডুল করবার শক্তি যার হয়েছে, ডুল সংশোধন করবারও শক্তি তার জেগেছে।

তাই বলছিলাম ব্রাহ্ম সমাজের আরম্ভের কাজটা সম্মুখে এসে সমাপ্ত হয়েছে। সে নিদ্রিত সমাজকে জাগিয়েছে। কিন্তু এইখানেই কি ব্রাহ্মসমাজের কাজ সুরিয়েছে? যে পণ্ডিতরা পাছশালার ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদের ঘাবে আঘাত করেই কি সে চলে যাবে—কিবা আগরশের পরেও কি সেই ঘাবে আঘাত করার বিবর্তিতকর অভ্যাস সে পরিত্যাগ করতে পারবে না? এবার কি পথে চলবার কাজে তাকে অগ্রসর হতে হবে না?

নিকট উৎসের বাধা দূর করবার জন্তে বতকণ পর্যন্ত মাটি খোঁড়া যার ততকণ পর্যন্ত সে কাজটা বিশেষভাবে আমারই। সেই ধননকরা কুপটাকে আমার বলে অভিমান করতে পারি—কিন্তু যখন খুঁড়তে খুঁড়তে উৎস বোরিয়ে পড়ে, তখন কোন্‌দিক কেলে দিয়ে সেই গর্ত ছেড়ে বাইরে উঠে পড়তে হয়। তখন যে স্বরণাটী দেখা দেয় সে যে বিশ্বের জিনিষ—তার উপরে আমারই শিলমোহরের ছাপ দিয়ে তাকে আর সর্পিণ অধিকারের মধ্যে ধরে রেখে দিতে পারি না। তখন সেই উৎস নিজের পথ নিজে প্রস্তুত করে নিয়ে বাইরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে—তখন আমরাই তার অহসরণ করতে প্রস্তুত হই।

আমাদের সাম্প্রদায়িক ইতিহাসেরও এইরকম দুই অধ্যায় আছে। যতদিন বাধা দূর করবার পালা, ততদিন আমাদের চেষ্টা, আমাদের কৃতিত্ব; ততদিন আমাদের কাজ চারিদিক্ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন, এমন কি, চারিদিকের বিরুদ্ধ, ততদিন সম্ভাব্যের সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত ভীত।

অবশেষে গভীর থেকে গভীরতরে যেতে যেতে এমন একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছন যায় যেখানে বিশ্বের মঙ্গলগত চিরন্তন সত্য-উৎস আর প্রবাহ থাকে না। সে জিনিস সকলেরই জিনিষ—সে যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তখন খন্ডা কোদাল কেলে দিয়ে আঘাতের কাজ বন্ধ রেখে নিজেকে তারই অসুস্থতা করে বিশ্বের ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে মিলনের পথে বেরিয়ে পড়তে হয়। সম্ভাব্য তখন কুপের কাজ ছেড়ে বাহিরের কাজে আপনি ছাড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন তার লক্ষ্য-পরিবর্তন হয়, তখন তার বোধশক্তি নিখিলের বৃহৎ প্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় করে, পদে পদে আপনাকেই ভীতভাবে অসুস্থ করে না।

ব্রাহ্মসমাজ কি আজ আপনার সেই সার্থকতার সম্মুখে এসে পৌঁছে নিজের এতদিনকার সমস্ত ভাঙাগড়া চেষ্টাকে সাম্প্রদায়িকতার বাইরে মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে দেখবার অবকাশ পায় নি?

অবশ্য ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত দিক্ থেকে আমাদের একটা আশ্রয় দিয়েছে সেটা অবহেলা করবার নয়। পূর্বে আমাদের ভক্তিগুণ্ডি জ্ঞানগুণ্ডি বহুদিনব্যাপী হুর্গতপ্রাপ্ত দেশের নানা খণ্ডতা ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে যথার্থ পরিভূতি লাভ করতে পারিছিল না। পৃথিবী যখন তার বৃহৎ ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের সম্মুখে এগে আবির্ভূত হল, তখন ঠাণ্ডা বিশ্বপৃথিবীব্যাপী আদর্শের সঙ্গে আমাদের বিশ্বাস ও আচারকে মিলিয়ে দেখবার একটা সময় এসে পড়। সেই সন্ধ্যার সময়ে অনেকেই নিজের দেশের প্রতি এবং প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সম্পূর্ণ প্রসিদ্ধিহীন হয়ে পড়েছিল। সেই বিপদের দিন থেকে আজ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ আমাদের মুক্তিকে ও

ভক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে, আমাদের ভেঙ্গে যেতে দেয়নি।

সাম্প্রদায়িক দিক্ থেকে দেখা যেতে পারে ব্রাহ্মসমাজ আঘাতের দ্বারা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাজের বহুতর কুরীতি ও কুসংস্কার দূর করেছে এবং বিশেষ ভাবে আমাদের দেশের শ্রীলোকদের শিক্ষা ও অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে তাদের মনুষ্যত্বের অধিকারকে প্রশস্ত করে দিয়েছে।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে আশ্রয় করে, আমরা উপাসনা করে আনন্দ পাচ্ছি এবং সামাজিক কর্তব্য সাধন করে উপকার পাচ্ছি, এইটুকু মাত্র স্বীকার করেই থামতে পারিনে। ব্রাহ্মসমাজের উপলব্ধিকে এর চেয়ে অনেক বড় করে পেতে হবে।

এ কথা সত্য নয় যে, ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র আধুনিক কালের হিন্দুসমাজকে সংস্কার করবার একটা চেষ্টা, অথবা ঈশ্বরোপাসকের মনে জ্ঞান ও ভক্তির একটা সমন্বয় সাধনের বর্তমানকালীন প্রয়াস। ব্রাহ্মসমাজ চিরন্তন ভারতবর্ষের একটি আধুনিক আত্মপ্রকাশ।

ইতিহাসে দেখা গিয়েছে ভারতবর্ষ বাহ্যিক নব নব ধর্মমতের প্রবল আঘাত সহ করেছে। কিন্তু চন্দনচক্র যেমন আঘাত পেলে আপনার গন্ধকেই আরো অধিক করে প্রকাশ করে তেমনি ভারতবর্ষও যখন প্রবল আঘাত পেয়েছে তখনই আপনার সকলের চেয়ে সত্য সাধনাকেই, ব্রহ্মসাধনাকেই, নুতন করে উন্মুখ করে দিয়েছে। তা যদি না, করত তাহলে সে আত্মরক্ষা করতেই পারত না।

মুসলমানধর্ম প্রবল ধর্ম, এবং তা নিশ্চেষ্ট ধর্ম নয়। এই ধর্ম যেখানে গেছে সেখানেই আপনার বিরুদ্ধ ধর্মকে আঘাত করে ভূমিসাৎ করে তবে ক্ষান্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের উপরেও এই প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়েছিল এবং বহুশতাব্দী ধরে এই আঘাত নিরন্তর কাজ করেছে।

এই আঘাতবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল তখনকার ধর্ম-ইতিহাস আমরা দেখতে পাইনে। কারণ, সে ইতিহাস সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হয়নি। কিন্তু সেই

মুসলমান অভিযোগের মুখে ভারতবর্ষে যে-সকল সাধক জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের বাগী আলোচনা করে দেখলে পাঁচ দেখা যায়, ভারতবর্ষ আপন অন্তরতম সত্যকে উন্মোচিত করে দিয়ে এই মুসলমানধর্মের আঘাতবেগকে সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিল।

সত্যের আঘাত কেবল সত্যই গ্রহণ করতে পারে। এইজন্য প্রবল আঘাতের মুখে প্রত্যেক জাতি, হয় আপনবেগে ঐষ্ট সত্যকে সমুদ্রলব্ধ করে প্রকাশ করে, নয়, আপনার মিথ্যা স্বলকে উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে যায়। ভারতবর্ষেরও যখন আত্মরক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছিল তখন সাধকের পর সাধক এসে ভারতবর্ষের চিরসত্যকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন। সেই যুগের নানক, রবিদাস, কবীর, দাদু প্রভৃতি সাধুদের জীবন ও রচনা ধারা আলোচনা করচেন তাঁরা সেই সময়কার ধর্ম-ইতিহাসের যবনিকা অপসারিত করে যখন দেখাবেন তখন দেখতে পাব, ভারতবর্ষ তখন আত্মসম্পাদ্ স্বত্বকে কি রকম সবলে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষ তখন দেখিয়েছিল, মুসলমান ধর্মের যেটি সত্য সেটি ভারতবর্ষের সত্যের বিরোধী নয়। দেখিয়েছিল, ভারতবর্ষের মর্মহলে সত্যের এমন একটি বিপুল সাধনা সঞ্চিত হয়ে আছে যা সকল সত্যকেই আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারে। এইজন্যই সত্যের আঘাত তার বাইরে এসে যতই ঠেঁকুক, তার মর্মে গিয়ে কখনো বাজে না, তাকে বিনাশ করে না।

আজ আবার পাকিস্তানগণের সত্য আপনার জয়যোষণা করে ভারতবর্ষের দুর্গাধারে আঘাত করেছে। এই আঘাত কি আত্মীয়ের আঘাত হবে, না শত্রুর আঘাত হবে? প্রথম যৌদিন সে শূন্যস্থান করে এসেছিল সেদিন ত মনে করেছিলুম সে বুঝি বুদ্ধ্যাবাণ হানবে। আমাদের মধ্যে যারা ভীকু তারা মনে করেছিল, ভারতবর্ষের সত্যস্বল নেই অতএব এইবার তাকে জয় হীন আশ্রয় পরিত্যাগ করতে হল বুঝি।

কিন্তু তা হয়নি। পৃথিবীর সব আগন্তকের সাড়া পেয়ে ভারতবর্ষের নবীন সাধকেরা নির্ভয়ে তার বহাদরনের

অবরুদ্ধ দুর্গের দ্বার খুলে দিলেন। ভারতবর্ষের সাধন ভাণ্ডারে এবার পাকিস্তান্য আতিথিকে সমাধারে আহ্বান করা হয়েছে—ভয় নেই, কোনো অভাব নেই—এইবার যেতোক হবে সেই আনন্দতোকে পূর্ণ পশ্চিম এক পংক্তিতে বসে যাবে।

ভারতবর্ষের সেই চিরস্থান সাধনার দ্বার উন্মোচিতই ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক তাৎপর্য। অনেক দিন দ্বার রুদ্ধ ছিল, ভালার মরচে পড়েছিল, চাবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এইজন্যে গোড়ার খোলবার সময় কঠিন শ্রম দিতে হয়েছে, সেটাকে যেন বিরোধের মত বোধ হয়েছিল।

কিন্তু বিরোধ নয়। বর্তমানকালের সংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজে ভারতবর্ষ আপনার সত্যরূপ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। চিরকালের ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মসমাজ নবীনকালের বিশ্বপৃথিবীর সভায় আহ্বান করেছে। বিশ্বপৃথিবীর পক্ষে এখনো এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে। বিশ্বমানবের উত্তরোত্তর উদ্ভিদ্যমান সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের সাধনাই সকল সমস্তার সকল কটিলতার বর্ষা সমাধান করে দেবে, এই একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্রকণ্ঠে আজ ফুটে উঠেছে।

ব্রাহ্মসমাজকে, তার সাম্প্রদায়িকতার আবরণ খুঁচিয়ে দিয়ে, মানব-ইতিহাসের এই বিরাট ক্ষেত্রে যুগ্ম করে উপলব্ধি করার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে।

আমরা ব্রহ্মকে স্বীকার করেছি এই কথাটি যদি সত্য হয় তবে আমরা ভারতবর্ষকে স্বীকার করেছি এবং ভারতবর্ষের সাধনকেই সমুদ্র পৃথিবীর সত্যসাধনাকে গ্রহণ করার মহাযজ্ঞ আমরা আরম্ভ করেছি।

ব্রহ্মের উপলব্ধি বলতে যে কি বোঝায়, উপনিষদের একটি মন্ত্রে তার আভাস আছে।

যো দেবোহমৌ ধোহপুত্র

যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,—

য ওষধিষু যো বনশ্চিভু

ভম্বে দেবার নমোনমঃ।

যে দেবতা অরিভে, যিনি জলে, যিনি নিখিল ভূবনে  
প্রবেশ করে আছেন, যিনি ওষাধিতে, যিনি বনস্পতিতে,  
সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্বব্যাপী, এই মোটা কথাটা বলে নিষ্কণ্ঠ  
পাওয়া নয়। এটি কেবল জ্ঞানের কথামাত্র নয়—এ একটি  
পরিপূর্ণ বোধের কথা। অরি, জল, তরুলতাকে  
আমরা ব্যবহারের সামগ্রী বলেই জানি, এইজন্য  
আমাদের চিত্ত তাদের নিত্য আংশিক ভাবেই গ্রহণ  
করে—আমাদের চৈতন্য সেখানে পরম চৈতন্যকে অহুত  
করে না। উপনিষদের উল্লিখিত মন্ত্রে আমাদের সমস্ত  
চৈতন্যকে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের মধ্যে আব্ধান  
করছে। জড়ে কীবে নিখিলভূবনে ব্রহ্মকে এই যে  
উপলব্ধি করা এ কেবলমাত্র জ্ঞানের উপলব্ধি নয়, এ  
ভক্তির উপলব্ধি। ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ জানা নয়; সর্বজ্ঞ নমস্কার  
করা, বোধের সঙ্গে সঙ্গে নমস্কারকে বিশ্বভূবনে প্রসারিত  
করে দেওয়া। ভূমাকে যেখানে আমরা বোধ করি সেই  
বোধের রসই হচ্ছে ভক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এই  
রসের বিচ্ছেদ না রাখা, সমস্তকেই ভক্তির দ্বারা  
চৈতন্যের মধ্যে উপলব্ধি করা, জীবনের এমন পরিপূর্ণতা,  
জগৎধারণের এমন সার্থকতা আর কি হতে পারে।

কালের বহুতর আবর্তনের মধ্যে এই ব্রহ্মসাধনা  
একদিন আমাদের দেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু  
সে জ্বিলিখত একেবারে হারিয়ে বাবার নয়। তাকে  
আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। কেননা এই ব্রহ্মসাধনা  
থেকে বাদ দিয়ে দেখলে মহাব্যতের কোনো একটা চরম  
তাৎপর্য থাকে না—সে একটা পুনঃ পুনঃ আবর্তমান  
অন্তরীক্ষ ঘুরার মত প্রতিভাত হয়।

ভারতবর্ষ যে সত্যসম্পদ পেয়েছিল, মাঝে তাকে  
হারিয়ে দিয়েছে। কারণ, পুনরীকৃত তাকে বৃহত্তর করে  
পাবার প্রয়োজন আছে। হারাবার কারণের মধ্যে  
নিশ্চয়ই একটা অপূর্ণতা ছিল—সেইটিকে শোধন করে  
পূর্ণতর করে নেবার জন্তেই তাকে হারাতে হয়েছে।  
একবার তার কাছ থেকে দূরে না গেলে তাকে বিগুহ  
করে সত্য করে দেখবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

হারিয়েছিলাম কেন? আমাদের সাধনার মধ্যে  
একটা অসামঞ্জস্য ঘটেছিল। আমাদের সাধনার মধ্যে  
অন্তর ও বাহির, আত্মার দিক ও বিষয়ের দিক সমান  
ওজন রেখে চলতে পারিনি। আমরা ব্রহ্মসাধনার  
যখন জ্ঞানের দিকে বোঁক দিয়েছিলাম—তখন জ্ঞানকেই  
এচ্ছান্ত করে ছুলেছিলাম—তখন জ্ঞান যেন জ্ঞানের সমস্ত  
বিষয়কে পর্য্যন্ত একেবারে পরিহার করে কেবল আপনায়  
মগ্নেই আপনাকে পর্য্যাপ্ত করে ছুলতে চেয়েছিল।  
আমাদের সাধনা যখন ভক্তির পথ অবলম্বন করেছিল,  
ভক্তি তখন বিচিত্র কর্ণে ও সেবার আপনাকে প্রবাহিত  
করে না দিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে ক্রমাগত উজ্জ্বলিত  
হয়ে একটা কেনিল ভাবোন্নততার আবর্ত সৃষ্টি করেছে।

যে জিনিষ জড় নয় সে কেবলমাত্র আপনাকে নিয়ে  
চিকিতে পারে না, আপনার বাইরে তাকে আপনার খাদ্য  
খুঁজতে হয়। জীব যখন খাদ্যভাবে নিজের চর্চা ও  
শারীর উপকরণকে নিজে ভিতরে ভিতরে খেতে থাকে  
তখন সে কিছুদিন বেঁচে থাকে কিন্তু ক্রমশই নীরস ও  
নির্জীব হয়ে মারা পড়ে।

আমাদের জ্ঞানবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তি কেবল আপনাকে  
আপনি খেয়ে বাঁচতে পারে না—আপনাকে পোষণ  
করবার জন্তে, রক্ষা করবার জন্তে আপনার বাইরে তাকে  
যেতেই হবে। কিন্তু ভারতবর্ষে একদিন জ্ঞান অত্যন্ত  
বিগুহ অবস্থা পাবার প্রলোভনে সমস্তকে বর্জন করে  
নিজের কেন্দ্রের মধ্যে নিজের পরিধিকে বিলুপ্ত করবার  
চেষ্টা করেছিল—এবং হৃদয় আপনার হৃদয়বৃত্তিকে  
নিজের মধ্যেই নিজের লক্ষ্য স্থাপন করে আপনাকে ব্যর্থ  
করে ছুলেছিল।

পৃথিবীর পশ্চিম প্রদেশ তখন এর উল্টো দিকে  
চলছিল। সে বিষয়বস্তুটির বৈচিত্র্যের মধ্যে অহরহ  
দূরে দূরে বহুতর তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে ভূপাকার  
করে ছুলেছিল—তার কোনো অন্ত ছিল না, কোনো  
ঐক্য ছিল না। তার ছিল কেবল সংগ্রহের লোভেই  
সংগ্রহ, কাজের উদ্দেশ্যনাতেই কাজ, ভোগের মত্ততাতেই  
ভোগ।

কিন্তু এই বিষয়ের বৈচিত্র্যবাহ্যে যুরোপ গভীরতম চরম একটি পার্যিন বটে, তবু তার সর্বব্যাপী একটি বাহ্য শৃঙ্খলা সে দেখেছিল। সে দেখেছে, সমস্তই অমোঘ নিয়মের শৃঙ্খলে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন বাঁধা, কোথায় বাঁধা, কার হাতে বাঁধা—এই সমস্ত বন্ধন কোন্‌খানে একটি মুক্তিতে একটি আনন্দে পর্যাবসিত যুরোপ তা দেখেন।

এমন সময়েই রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্ঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে, জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ করে বিশ্বব্যাপী করে প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা, সকল চেষ্টা মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল মাত্র ধ্যানের বস্তু, জ্ঞানের বস্তু করে নিভতে নির্গাসিত করে রাখেননি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্বইতিহাসে বিশ্বধর্ম্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে, সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নতুন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।

রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্যবাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভারতবর্ষকে দীক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল, এই বাঙ্গী তখন উচ্চারিত হয়েছে।

অথচ আন্দর্ভোয় বিষয় এই যে, ঘরে বাইরে তখন এই ব্রহ্মসাধনার কথা চাপা ছিল। আমাদের দেশে তখন ব্রহ্মকে পরমজ্ঞানীরা অতি দূর গ্রহন জ্ঞানহর্ষের মধ্যে কারাক্ষ করে রেখেছিল; চারিদিকে রাজত্ব করছিল আচার-বিচার—বাহু অহুষ্ঠান এবং ভক্তি-রস-মাদকতার বিচিত্র আয়োজন। সোদন রামমোহন রায় যখন ব্রহ্মসাধনাকে পৃথিবীর অন্ধকার সমাধি থেকে মুক্ত করে জীবনের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করালেন তখন দেশের লোক সবাই ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল, এ আমাদের আপন নয়, এ আমাদের বাপ-পিতামহের সামগ্রী নয়, বলে

উঠল এ গুটানি, একে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। শক্তি যখন বিলুপ্ত হয়, জীবন যখন সতীর্ণ হয়ে আসে, জ্ঞান যখন প্রাণ্য গভীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কাল্পনিকতাকে নিয়ে যথেষ্ট বিশ্বাসের অন্ধকার ঘরে যত্ন দেখে আপনাকে বিকল করতে চায়, তখনই ব্রহ্ম সকলের চেয়ে সুদূর, এমন কি, সকলের চেয়ে বিরুদ্ধ হয়ে প্রতিভাত হন। এদিকে যুরোপে মানবশক্তি তখন প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে বৃহৎভাবে আপনাকে প্রকাশ করচে। কিন্তু সে তখন আপনাকেই প্রকাশ করতে চাচ্ছে, আপনার চেয়ে বড়কে নয়, সকলের চেয়ে শ্রেয়কে নয়। তার জ্ঞানের ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী, তার কর্মের ক্ষেত্র পৃথিবী জোড়া, এবং সেই উপলক্ষে মানুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সুদূরবিস্তৃত। কিন্তু তার ধ্বংসপ্রবণ লেখা ছিল “আমি”, তার মন্ত্র ছিল জোর বার মূলুক তার। সে যে অত্যাশ্রিত রক্তবসনা শক্তি দেবতাকে জগতে প্রচার করতে চলেছিল তার বাহন ছিল পশ্যসক্তার, অন্তহীন উপকরণরাশি।

কিন্তু এই বৃহৎ ব্যাপারকে কিসে ঐক্যদান করতে পারে? এই বিরাট যজ্ঞের যজ্ঞগতি কে? কেউ বা বলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, কেউ বা বলে অধিকাংশের সুখসাধন, কেউ বা বলে মানবদেবতা, কিন্তু কিছুতেই বিরোধ মেটে না, কিছুতেই ঐক্যদান করতে পারে না, প্রতিকূলতা পরস্পরের প্রতি ক্রকুটি করে পরস্পরকে শাস্ত রাখতে চেষ্টা করে এবং যাকে গ্রহণ করতে দলবদ্ধ স্বার্থের কোনখানে বাধে তাকে একেবারে ধ্বংস করবার কল্পে সে উদ্ভত হয়ে ওঠে। কেবল বিপ্লবের পর বিপ্লব আসচে, কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলচে—কিন্তু একথা একদিন জানতেই হবে, বাহিরে যেখানে বৃহৎ অহুষ্ঠান অন্তরে সেখানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি না করলে কিছুতেই কিছু সময় হয়তে পারবে না;—প্রয়োজন বোধকে যত বড় নাম দাও, বার্ষাসিককে যত বড় সিংহাসনে বসাত, নিয়মকে যত পাকা করে তোলো এবং শক্তিকে যত প্রবল করে দাঁড় করাত, সত্যপ্রতিষ্ঠা কিছুতেই নেই, শেষ পর্যন্ত কিছুই টিকতে এবং টেকতে পারবে না। যা প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর,

আত্ম-সমাহিত অথচ বিশ্বাত্মপ্রবীষ্ট সেই আধ্যাত্মিক জীবনমুদ্রের দ্বারা না বেঁধে ছুঁতে পারলে অল্প কোনো কৃত্রিম জোড়াভাড়ার দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, কর্মের সঙ্গে কর্ম, জাতির সঙ্গে জাতি যথার্থভাবে সন্নিবিষ্ট হতে পারবে না। সেই সন্নিবিষ্ট যদি না ঘটে তবে আয়োজন যতই বিপুল হবে তার সংঘাত-বেদনা ততই হৃৎসহ হরে উঠতে থাকবে।

যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে ছুঁতে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্বগ্রোহী সমগ্রের মধ্যে সর্বসত্তাভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করচে, এই হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। ভারতবর্ষে এই ইতিহাসের আরম্ভ হয়েছে কোম সুদূর দুর্গম শুষ্কতার মধ্যে। এই ইতিহাসের দ্বারা কখনও দুই কূল ভাসিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, কখনো বালুকাস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে কিন্তু কখনই শুষ্ক হয়নি। আজ আমরা ভারতবর্ষের মর্মোচ্ছ্বাসিত সেই অমৃতধারাকে

বিধাতার সেই চিরপ্রবাহিত মঙ্গল ইচ্ছার স্রোতধিনীকে আমাদের ঘরের সম্মুখে দেখতে পেয়েছি কিন্তু তাই বলে যেন তাকে আমরা ছোট করে আমাদের সাম্প্রদায়িক গৃহস্থালির সামগ্রী করে না জানি; যেন বুঝতে পারি, নিরুপলব্ধ ভূষার-স্রুত এই পুণ্য স্রোত কোন্ গঙ্গোত্রীর নিভৃত কন্দর থেকে বিগলিত হয়ে পড়চে এবং ভবিষ্যতের দিকপ্রান্তে কোন্ মহাসমুদ্র তাকে অভ্যর্থনা করে জলদ-মস্ত্রে মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করচে। ভাস্করাশির মধ্যে যে প্রাণ নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে সেই প্রাণকে সজীবিত করবার এই দ্বারা, অতীতের সঙ্গে অনাগতকে আবিষ্কার কল্যাণের সূত্রে এক করে দেবার এই দ্বারা, এবং বিশ্বজগতে জ্ঞান ও ভক্তির দুই ভীরকে অগভীর অপরিত্র জীবনযোগে সন্নিবিষ্ট করে দিয়ে কর্মের ক্ষেত্রকে বিচিত্র শস্তপর্ধ্যায়ে পরিপূর্ণরূপে সফল করে তোলাবার ক্ষেত্রেই ভারতের অমৃত-কলময়-কল্লোলিত এই উদার স্রোতধনী।

প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩১৮।..



# ভক্তিধর্ম ও জাতিভেদ

শিবনাথ শাস্ত্রী

ইহা একটা গভীর রূপে চিন্তা করিবার উপযুক্ত বিষয়। যে, এই জাতিভেদ-প্রপীড়িত এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের আলম-স্বরূপ দেশে যে-কোনও স্থানে ভক্তিধর্মের প্রসার দৃষ্ট হইয়াছে, সেইখানেই তৎসঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদের প্রকোপের হ্রাস দৃষ্ট হইয়াছে—যেন ভক্তিধর্ম ও জাতিভেদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বিরোধ আছে।

এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে শূদ্র প্রভৃতি হীন জাতীয়গণ ধর্মের যত্ন যাজন প্রভৃতি উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত। এদেশের একটা বহুকাল-প্রসিদ্ধ প্রচলিত বচন এই :—

শ্রী-শূদ্র-বিজবন্ধুনাং ঐশী ন শ্রীতিগোচরা।

অর্থ—শ্রী শূদ্র ও দৈবজ্ঞ ভাট প্রভৃতি অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণের ত্রিবেদ শ্রবণীয় নহে।

আমাদের লৌকিক প্রথাও চিরদিন ইহার অনুরূপ হইয়া আসিয়াছে। এখনও শূদ্রাদির সমক্ষে গায়ত্রী মন্ত্র বা অপর কোনও বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণ নিষিদ্ধ। এমন কি রাজা রামমোহন স্বয়ং যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠা করিলেন; তখন দেশ-প্রচলিত লৌকিক সংস্কারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত রাজাকে এই নিয়ম করিতে হইল যে, একটা পার্শ্বের ঘরে ব্রাহ্মণ আচার্যগণ যখন উপনিষদাদি বেদমন্ত্র পাঠ করিবেন, তখন শূদ্রেরা সেখানে বাইতে পারিবেন না। কয়েক বৎসরের পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা ঐ নিয়ম রহিত হয়।

কেবল যে শূদ্রগণ বেদমন্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করিতে

পারিবেন না, এরূপ কঠিন শাসন ছিল তাহা নহে। যাহা একস্থলে অতি পরিহাররূপেই বলিয়াছেন :—

নাত্তাধিকারো ধর্মোত্ত ন ধর্মাৎ প্রতিবেদনং।

অর্থাৎ—ইহার (শূদ্রের) ধর্মে অধিকার নাই সুতরাং ধর্ম হইতে বর্জনও নাই।

অভিপ্রায় এই যে, যে কার্যে ব্রাহ্মণের পাতিত্ব জন্মে ও ধর্মের অধিকার বিলুপ্ত হয়, তাহাতে শূদ্রের পাতিত্ব নাই।

যে দেশে চিরদিন শূদ্রাদি হীন জাতীয়দিগের প্রতি এরূপ কঠিন শাসন রহিয়াছে, সে দেশে ভক্তিধর্ম কি আশ্চর্য পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভক্তিধর্ম যে কেবল শূদ্রাদি হীন জাতীয়দিগকে ধর্মসাধনে অধিকার দিয়াছে তাহা নহে, অনেক স্থলে তাহাদিগকে গুরু ও আচার্যের পদেও অভিষিক্ত করিয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশে যদি কেহ পদ্যপণ করেন এবং কোন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীর দোষিতে যান তাহা হইলে হয়ত দোষিতে পাইবেন যে, মাল্লিক মধ্যবর্তী বিজ্ঞানীর নিকট অগ্রসর হইবার দ্বারে অপরূপ অনেক মূর্তি রহিয়াছে। অহুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন যে, সেগুলি আলোয়াড়-শ্রেণীগণ্য সাধুদিগের মূর্তি। অর্থাৎ ভক্তিদিগের মূর্তির চরণে প্রণত হইয়া তবে ভগবানের নিকট হইতে হয়। অহুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, এই আলোয়াড় বা ভক্তিদিগের অনেকে পরেরা প্রভৃতি হীনজাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইহা কি অতীব বিস্ময়জনক



ব্যাপার নহে যে, যে-দেশে এখনও একজন পরেরা ব্রাহ্মণের দশহাতের মধ্যে আসিতে পারে না, যে-দেশে হীন জাতীয়গণ সর্ববিধ সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অধিকার হইতে আজিও বঞ্চিত, সে-দেশে পরেরা শ্রেণী হইতে সমুৎপন্ন ভক্তগণ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। দাক্ষিণাত্যের দৃষ্টান্ত অত্রোদিতোঁহ, কারণ, সেখানে জাতিভেদের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক। আৰ্য্যাবর্ষে মহম্মদীয় শাসনপ্রণালী বহু শতাব্দী প্রচলিত থাকিতে জাতিভেদের প্রভাব বহুল পরিমাণে শিথিল হইয়াছে,—অতরাং এখানে শূদ্রাদি হীনজাতীয়দিগের প্রাহর্য্যের সম্ভবপর।

আৰ্য্যাবর্ষেও জাতিভেদের উপরে ভক্তিধর্মের প্রভাব আশ্চর্য্যরূপে হ্রাসিত দেখা যায়। সবিস্তর উল্লেখ প্রবৃত্ত না হইয়া এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রামানন্দী বা রামাং নারক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রবর্তক রামানন্দের দ্বাদশ জন শিষ্য—আশানন্দ, কবীর, রয়দাস বা রুইদাস, পীপা, হুসহরানন্দ, গুখানন্দ, ভাবানন্দ, ধমা, সেন, মহানন্দ, পরমানন্দ ও প্রিয়ানন্দ। ইহাদের অনেকেই স্বতন্ত্র সম্প্রদায়কর্ত্তা গুরুরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এই দ্বাদশ জনের মধ্যে কবীর জোলা-তীতি, রয়দাস চামার, পীপা রাজপুত, ধমা জাট এবং সেন নাপিত। ভক্তিধর্ম কি আশ্চর্য্য রূপেই জাতিভেদকে দলন করিয়াছে। অপর দুই ভারত-প্রসিদ্ধ ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাজনের উল্লেখও এই সঙ্গে করা ভাল। প্রথম বাবা নানক, দ্বিতীয় ডুকারাম। ইহারা উভয়েই বণিক-কুল-সমুৎপন্ন অথচ উভয়েই চিরদিন উচ্চজাতীয়দিগের দ্বারা পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বাবা নানক যে জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন, তাহার ঘোষণা স্বরূপ বালা ও মর্দানা নামক দুইজন শিশুসহ সর্বত্র ভ্রমণ করিতেন; তাহারা তাঁহার সংগীতের দ্বারা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ইত্যাদি সকল বর্ণের লোককে শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন।

ডুকারামও অবিশেষে ব্রাহ্মণ ও নিম্নজাতীয় দ্বারা সমানভাবে পূজিত করিতেন। তাঁহার অনুগত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

হীনজাতীয়দিগকে ধর্ম্মাধিকার দেওয়া সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্যে ও আৰ্য্যাবর্ষে কিঞ্চিৎ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। দাক্ষিণাত্যে ভক্তিধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান প্রচারক রামানন্দ। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি ব্রাহ্মণের জাতিধর্ম্মকে স্বীকারান্বিত অধিকার দেন নাই, কিন্তু শূদ্রাদি হীন জাতীয়দিগকে বিষ্ণুর ভক্ত্যনুষ্ঠান ও ভক্তির সাধনে সম্পূর্ণ অধিকার দিয়াছেন। বলিতে গেলে তাঁহার প্রচারিত উদ্ধার মতই ভক্তিধর্ম্ম হইতে জাতিভেদকে নিরস্ত করিয়াছে।

বঙ্গদেশে আসিয়া চৈতন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখি, উক্ত সম্প্রদায়ের প্রভুগুরু চৈতন্য, অর্থাৎ ও নিত্যানন্দ যদিও ব্রাহ্মণ ছিলেন, তথাপি তাঁহারা যে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন তাহা হইতে জাতিভেদ দ্বারা নিরস্ত হইল। হরিদাস একজন যবন। উক্ত গুরুগুরু অবাধে তাঁহাকে কোল দিয়াছিলেন। ইহাদের ইতিবৃত্তে দেখিতে পাই যে গোষ্ঠামিগণের অর্থাৎ চৈতন্যের পারিষদগণের শিষ্য শিষ্যাগণের অনেকে নীচজাতীয় ছিলেন, অথচ তাঁহারা গুরু-পরম্পরাক্রমে শিষ্যবর্গের দ্বারা পূজিত হইয়া আসিতেছেন। যবন-সংসর্গী রূপ সনাতন, বসুনাথ দাস, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণবসমাজে সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজনপূজিত অনেক গুরু জাত্যাংশে হীন ছিলেন। এ দেশীয় বৈষ্ণবগণের মুখে একটি প্রাচীন সংস্কৃতবচন সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায় :—

চণ্ডালোহপি বিজ্ঞশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।

হরিভক্তি-বিহীনস্ত বিজ্ঞোহপি স্বপচাধমঃ॥

অর্থ—চণ্ডালও যদি হরিভক্তি-পরায়ণ হয়, তবে সে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, আর ব্রাহ্মণ যদি হরিভক্তি-বিহীন হয় তবে সে চণ্ডালের অধম। আর একটা চলিত বাক্য এই :—

“নিজাই আচণ্ডালে দেয় কোল,

কোল দিয়ে বলে হরিবোল”

এই সকল উক্তিভেদে ভক্তিধর্মের চক্ষে জাতিভেদের হীনতাই প্রকাশ করিতেছে। কেবল যে বৈকব গুরু-দ্বৈপের উপদেশবাক্যেই জাতিভেদের হীনতা লক্ষিত হইয়াছে তাহা নহে, নেড়া, বাউল, বিহঙ্গ, দরবেশ প্রভৃতি চৈতন্ত সম্প্রদায়ের যত শাখা দেখা গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই কার্য্যতঃ জাতিভেদ বর্জন করিয়াছে। চৈতন্তের পারিষদগণ ও তাঁহাদের বংশধরগণ যেমন ‘গোস্বামী’ নামে উক্ত হইয়াছেন তেমন সম্প্রদায়ের অন্ততম শাখা যে কর্তাভজা সম্প্রদায় তাহার গুরুগণ ‘মহাশয়’ নামে উক্ত হইয়াছেন। এরূপ ক্ষত হওয়া যায় যে, মহাশয়দিগের মধ্যে মুসলমানও আছেন, এবং হিন্দু শিষ্টেরা তাঁহাদের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থাকেন। এদেশের সাধারণ লোকে নেড়া, বাউল প্রভৃতি চৈতন্ত সম্প্রদায়কে ‘অনন্ত কুল’ বলিয়া থাকে। কেহ ইহার কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে লোকে বলে যে ‘অনন্ত কুলে দাঁড়িয়েছে’ অর্থাৎ জাতিভেদ পরিভ্যাগ করিয়া নেড়া-নেড়ীর দলে প্রবেশ করিয়াছে। সর্ব বর্ষের লোক এই অনন্ত কুলে প্রবেশ করিয়াছে ও প্রতিদিন করিতেছে। বঙ্গদেশের কোন কোনও বিভাগে হিন্দু গ্রহহরণ, বিশেষতঃ যাহাদের ভবনে অন্নবরক্ক বিধবা আছে, এরূপ গ্রহহরণ এই নেড়া বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়-সকলের ভয়ে বিব্রত। ইহার ভিক্ষা করিবার হলে গ্রহহরণ গ্রহে আসে ও বালবিধাদিগকে ভুলাইয়া কুলের বাহির করিয়া লইয়া যায় এবং অনন্ত কুলে দণ্ডায়মান করে। তৎপরে তাহার নেড়াদের সঙ্গে নেড়া হইয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন আরম্ভ করে ও ‘প্রকৃতি সাধনে’ সহায়তা করিতে থাকে।

অধিক কি, যেখানেই ভক্তিধর্মের অভ্যাস সেইখানেই জাতিভেদের দলন—একথা এমন সত্য যে, আসামে প্রচলিত মহাপুরুষীয় ধর্মেও ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আসাম প্রদেশে মহাপুরুষীয় ধর্ম নামে এক ধর্ম প্রচলিত আছে। “শঙ্কর দেউ” বা শঙ্করদেব তাহার প্রতিষ্ঠাকর্তা। ১৩৭০ শকে, আলিগুর্খার নামক গ্রামে এক কারহকুলে শঙ্করদেবের জন্ম হয়। এরূপ জনশ্রুতি

আছে যে, শঙ্করদেব দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া নবদ্বীপে পুরীতে চৈতন্তদেবের সাহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এই জনশ্রুতি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক, শঙ্করদেব যে চৈতন্তদেবের প্রচারিত ভক্তিধর্মের অনেক ভাব আসামে প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এক বিষয়ে চৈতন্তের সাহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। চৈতন্ত বাধাকুলের স্তম্ভের সম্মুখে প্রণত হইতেন কিন্তু শঙ্করদেব স্তম্ভপূজার অতিশয় বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁহার উপদেশে একস্থানে বলিয়াছেন :—

“অন্ত দেবীদেব না করিবা সেবা,  
না খাইবা প্রসাদ তার।  
গৃহে না পশিবা স্তম্ভিকো না চাহিবা,  
ভক্তি হবে ব্যাভিচার।”

দেবস্তুতি দেখিবে না, দেব-প্রসাদ খাইবে না, দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিবে না, তাহা হইলে ভক্তির ব্যাভিচার হইবে, এরূপ উপদেশ এদেশীয় আর কোনও ভক্তিপন্থাবলম্বী সাধুর মুখে ক্ষত হয় নাই একথা বলিলে অত্যাুক্তি হয় না। জাতিভেদ সবক্ষেপে শঙ্করদেবের উপদেশেই প্রকার কঠোর ছিল। ব্রাহ্মণেরাও শূদ্র মণ্ডলের নিকট উপদেশ লইবে, তিনি এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এরূপ শোনা যায়, তিনি নিজেকে একজন মুসলমানকে শিষ্ট করিয়া তাহাকে “হারিনাম” মন্ত্র দিয়াছিলেন। স্তম্ভপূজা বিষয়ে চৈতন্তের সাহিত কিঞ্চিৎ প্রভেদ থাকিলেও এক বিষয়ে তাঁহার সাহিত সোসাদৃশ্য ছিল। চৈতন্তের ধর্ম-প্রচারের প্রধান লক্ষণ ছিল, নাম সংকীর্ণন। জপ তপঃ ক্রিয়াকাণ্ডের পারিষদে তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন নাম-সংকীর্ণন। তাঁহার উক্তি বলিয়া নিম্নলিখিত উক্তিটা প্রচলিত আছে :—

হরেনাম, হরেনাম, হরেনামেব কেবলং।

কলৌ নাভ্যেব, নাভ্যেব, নাভ্যেব গতিবত্তথা।

অর্থ—হারিনাম, হরিনাম, কেবল হরিনাম, ভক্তি কালিতে অন্ত গতি নাই, নাই, নাই।

আমাম দেশে শহরদেবের উক্তি বলিয়া ইহার অল্পরূপ একটা উক্তি প্রচলিত আছে :—

ভাঙ্কিনং হুঙ্কিনং মন্ত্রে মেঘাচ্ছন্নং ন হুঙ্কিনং

বাঙ্কিনং হরি-সংলাপ-কথা-সীমুখ-বাঙ্কিতং ॥

অর্থ—যেদিন আকাশ ঘনঘটাস্থর সেদিন হুঙ্কিন নয়, কিন্তু সেই দিনকেই প্রকৃত হুঙ্কিন মনে করি, যেদিন হরিকথা-সীমুখ-বিবাক্কিত হইয়া গত হয়।

শহরদেবের শিষ্যগণের মধ্যে ইষ্টদেবতার নাম করিবার জন্য এক প্রকার সাধনগৃহ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাকে “নাম-ঘর” বলে। সেই সকল ঘরে এই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ মধ্যে মধ্যে সমবেত হইয়া নাম-কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন। যে নাম-কীৰ্ত্তনকে চৈতন্ত ও শহরদেব উভয়েই ধর্মসাধনের প্রধান উপায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সেই নাম-কীৰ্ত্তনে জাতি-বর্ণনির্ভেদে সকলকেই অধিকার দিয়াছেন।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, যে-কোনও স্থানে ভক্তিধর্ম প্রচারিত হইয়াছে সেইখানেই ইহা জাতিভেদকে দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, জাতিভেদের সহিত ভক্তিধর্মের এই বিরোধের কারণ কি? প্রথম উত্তর, জ্ঞান-প্রধান ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিবাদ করিয়াই ভক্তিধর্মের অভ্যুদয়; জাতিভেদ এথা ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তি ধরুণ, স্তুতবাং ভক্তিধর্ম জাতিভেদের প্রতিবাদ করিয়া অভ্যুদিত হইয়াছে। এ দেশে প্রচলিত বৈষ্ণবধর্মেই ভক্তিধর্ম প্রধান রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহানীতনুকালে রামানুজের প্রতিষ্ঠিত ‘ঈ’ সম্প্রদায় হইতেই বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয় গণনা করা হয়। তৎপরে দাক্ষিণাত্যে ও আর্ধ্যাবর্তে বৈষ্ণবধর্মের অনেক শাখা প্রশাখা দেখা দিয়াছে এবং বৈষ্ণব ধর্ম দেশভেদে নানারূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে এরূপ অনুমান করিতে হইবে না যে, রামানুজ হইতেই ভক্তি ধর্মের প্রকৃত অভ্যুদয়। ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ১১২৭ অব্দে রামানুজ বিদ্যমান ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য তাহার তিনশত বৎসর

পূর্বে অভ্যুদিত হন। “আর্ধ্য-বিভাঙ্গধাকর” নামক গ্রন্থের নির্দেশানুসারে তিনি ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ৮২০ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া দ্বারা যে, শহরদেব সমকালেও কোন কোনও ভক্তি-সম্প্রদায় দেশে বিদ্যমান ছিল। আর তাহা থাকিবারই কথা। কারণ শাণ্ডিল্য সূত্র, নারদ পঞ্চরাত্র, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন ভক্তিগ্রন্থসকল আজিও রহিয়াছে, তাহাতে ভক্তিধর্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অধিক কি, গীতাতেই ‘যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ’ ইত্যাদি বচনদ্বারা ভক্তিমার্গের বহুপ্রাচীনতা প্রতিপাদন করিতেছে। তবে রামানুজ হইতে যে বৈষ্ণব বা ভক্তিধর্মের অভ্যুদয় গণনা করা হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, শহরদেব দ্বিগিজয়ের পর কি আর্ধ্যাবর্ত কি দাক্ষিণাত্যে সর্বত্রই শৈব ধর্মের মহাপ্রাচুর্য্য হইয়াছিল, এবং ভক্তিধর্ম প্রায় এক প্রকার নিরূপণ প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন কি সেই সময় হইতে অনেক বৈষ্ণবতীর্থ লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। বর্তমান বৃন্দাবনে যেসকল তীর্থস্থান দেখা যাইতেছে তাহার অনেক চৈতন্তের শিষ্যগণের দ্বারা ও অপরাপর বৈষ্ণব সাধুদিগের দ্বারা পুনরুদ্ধৃত লুপ্ত তীর্থ মাত্র।

বলিতে কি, রামানুজের অভ্যুদয়ান শহরদেব প্রচারিত অষ্টভদ্রবাদ ও শৈব ধর্মের আতিশয্য ও অনিষ্ট ফল হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য। লুণ্ঠার জাধানিতে যে কথা ঘোষণা করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন, রামানুজ তৎসদৃশ কথা বলিবার জন্যই ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রোমান কাথলিক ধর্মসমাজ শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন যে, ধর্মসমাজের নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ-সকলের অনুসরণের দ্বারা ইহাও নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান দ্বারা ইহা হইতে (salvation is by works)। লুণ্ঠার সেক্টগণের অনুসরণ করিয়া বলিলেন : “না, ভক্তির দ্বারা ইহা হইতে (salvation is by faith)।” রামানুজ এবং তাহার শিষ্যগণও বৈষ্ণব ভক্তির প্রেততা প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

মুক্তি অর্থাৎ বৈধী মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ, ইহা প্রচলিত ভক্তি-পথাবলম্বীদের প্রগাঢ় সংস্কার ও সর্বপ্রধান উপদেশ। চৈতন্তের শিষ্যগণের একটি প্রসিদ্ধ ভক্তি এই :—

জগতের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।

চৈতন্ত সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্তেও দেখিতে পাই যে, চৈতন্তদেব নীলাচলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সংবাদ পাইলেন, তাঁহার অহুগৃহীতকালে অবৈত বঙ্গদেশে আবার মুক্তি প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। চৈতন্ত এই সংবাদে হৃগ্ধিত হইয়া, নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে ভক্তি প্রচারের ভার দিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। সংক্ষেপে বলি। বিধির ধর্ম ও ভক্তির ধর্ম এই উভয়ের বিরোধ এদেশে চিরপ্রসিদ্ধ। বিধির ধর্ম বলিতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বুঝিতে হইবে। কারণ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বেদ, স্মৃতি প্রভৃতির আদেশ উপদেশের উপরে স্মৃতি-প্রতিষ্ঠিত এবং জাতিভেদ ইহার চূর্ণস্বরূপ। সুতরাং বিধির ধর্মের প্রতিবাদ করিয়া বখন ভক্তিধর্মের অভ্যুদয় হইল, তখন ইহার আক্রমণ অনিবার্যরূপে জাতিভেদের উপরেও গিয়া পড়িল।

এখানে ইহাও উল্লেখের যোগ্য যে, কেবল ভক্তি ধর্ম নহে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদ করিয়া যখন যে সম্প্রদায় অভিযুক্ত হইয়াছে, তাহার অগ্নাধিক পরিমাণে জাতিভেদের দলন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম ব্রাহ্মণ্যদিগের আচারিত বৈদিক ধর্মের প্রতিবাদ করিয়া অগ্রগ্রহণ করে! সুতরাং ইহা জাতিভেদকেও দলন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। ইহার প্রথম-প্রয়োগদিগের মধ্যে অনেক হীন জাতীয় লোক প্রবিষ্ট হইয়াছিল। অধিক কি, অধুনাতন সময়েও বেদবাহু, কে-কোনও ধর্মমত প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই জাতিভেদকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে। বখা তাম্রিক সম্প্রদায়। তন্ত্র শাস্ত্র বেদবাহু বলিয়া পরিগণিত। তাম্রিকগণ খাঁর সাধকদলের মধ্যে জাতি-

ভেদকে স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের একটি সুপ্রসিদ্ধ বচন এই :—

প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্কে বর্ণাঃ বিজ্যোত্তমাঃ।

অর্থ—ভৈরবীচক্র আরম্ভ হইলে সকল বর্ণকে বিজ্যোত্তম বলিয়া গণনা করিতে হইবে। অর্থাৎ তখন আর জাতিবিচার থাকিবে না! অতএব প্রথম কথা এই, ভক্তিধর্ম যে জাতিভেদকে দলন করিতে চাহিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, ইহা বেদবাহু এবং ইহা বৈধীধর্মের প্রতিবাদ করিয়া অভিযুক্ত হইয়াছে।

ভক্তিধর্ম বৈদিক ও বৈধীধর্মের বিরোধী তাহা প্রসিদ্ধ ভক্তিগ্রন্থকারদিগের গ্রন্থেও প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীমৎভাগবত প্রসিদ্ধ ভক্তিগ্রন্থ। ভাগবতের রচনা সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে এইরূপ আছে যে, ব্যাসদেব মহাত্মারতাদি রচনাস্তে ক্লান্ত ও বিযত্ব হইয়া সর্বস্বতীতীরে নির্জনস্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে, তিনি নিজে সর্ব ধর্মোচরণ করিয়াছেন তবু কেন তাঁহার চিন্তা প্রসন্ন হইতেছে না। এ সকল কেন তাঁহাকে শান্তি দিতে পারিতেছে না। তাঁহার চিন্তার এতদবস্থাতে দেবর্ষি নারদ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি ব্যাসকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভক্তিভেদের প্রতি, হরিগুণাত্মকীর্তনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া ব্যাস যে বৈধীধর্মের উপদেশ করিয়াছেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। তদনন্তর ব্যাস আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভক্তিভেদের ব্যাখ্যাতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং ক্রিয়াবহুল বৈধীধর্মের প্রতিবাদ করিয়া যে ভক্তিধর্মের অভিযুক্ত তাহা ভাগবতেও দৃষ্ট হইতেছে।

কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, ইহার ভিতরে আরও কিছু গূঢ় কারণ আছে কি না? বোধ হয় কিছু গূঢ় কারণও আছে। ভক্তি ধর্মের প্রাণ প্রেম। ভক্তির প্রাচীন লক্ষণ এই :—

সী পরাহরতিবীর্যধরে।

অর্থ—ঈশ্বরে যে পরম অহুরাগ তাহাই ভক্তি।

এখন মনে রাখিতে হইবে যে, প্রেম বা অহুরাগের স্বভাব এই যে ইহা কোনও বন্ধন জানে না। যে বন্ধুত্বে

মাহুব প্রেমিক হয় সেই মুহূর্তেই সে সর্গ-বন্ধন-মুক্ত, তাহার আত্মা স্বাধীন। যাহার আত্মা স্বাধীন, বাহিরের বন্ধনে তাহার কি করে? বাহিরের বন্ধন তাহার পক্ষে থাকিয়াও নাই। এই জন্যই সেট পল আদিম খৃষ্টীয় যুগলীকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, যীশুর প্রতি একবার প্রতিটি স্থাপিত হইলে, তৎপরে সে ব্যক্তি দাসত্ব-পাশে বন্ধই থাকুক, আর স্বাধীন থাকুক, সে সমান কথা। — কারণ যীশুর প্রেমপাশে যে বন্ধ সে তাহার যীশু-প্রেম-বিহীন প্রভু অপেক্ষাও স্বাধীন। এই জন্য দেখিতে পাই আদিম খৃষ্টীয়যুগ দাসত্ব প্রথার সহিত বিরোধ উৎপন্ন করে নাই। মানবকে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্থাৎ প্রেমের স্বাধীনতা দিয়া নিরস্ত হইয়াছে। ভারতের ভক্তি ধর্মের প্রচারকগণও প্রকারান্তরে সেই সত্য প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা হীন জাতীয়দিগকে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ থাকুক, সে ত তুচ্ছ, তুমি যখন হারিতে প্রেম স্থাপন করিয়াছ, তখন তুমি ব্রাহ্মণের উপরে উঠিয়াছ। তোমার আত্মার সকল বন্ধন খসিয়া গিয়াছে। তুমি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন। এইরূপে প্রেম মানবাত্মাকে সকল বন্ধন ছুটাইয়া প্রকৃত স্বাধীনতা দিয়াছে।

স্বাধীনতা যেমন প্রেমের মূলমন্ত্র, সাম্যও তেমনি প্রেমের মূলমন্ত্র। প্রেমে উচ্চ নীচ নাই, ধনী দরিদ্র নাই। সকলেই প্রেমের অধিকারী। মানবীয় প্রেমেরও অদ্বিতীয় সাম্যাবধানশক্তি। এ প্রেমও বাধা বিহীন মানে না, উচ্চ নীচ গণনা করে না। এই কারণে ভক্তিমর্শ্বাবলম্বিগণ যখন ভগবৎ-প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে উচ্চজাতি হীনজাতির প্রভেদ অদ্বিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা আর মনে করিতে পারেন নাই যে, ব্রাহ্মণ শ্রীমন্ত যে-প্রেমের অধিকারী, যখন হরিদাস স্ত্রী-প্রেমের অধিকারী নহেন। সুতরাং জাতিভেদ তাঁহাদের চিত্ত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের উপদেশ সহজেই জাতিভেদের বিরুদ্ধে গিয়াছে।

তবে অধিকাংশ ভক্তি-সম্প্রদায় জাতিভেদের বিরুদ্ধে

অস্ত্রধারণ করেন নাই। যেমন তাঁহারা অনেক সামাজিক প্রথা, বা লৌকিক সংস্কারের উপরে হস্তার্পণ করেন নাই, তেমনি জাতিভেদরূপ সামাজিক প্রথার উপরেও হস্ত দেন নাই। অনেক সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ গোপনে আপনাদের মধ্যে জাতিভেদের শাসন লঙ্ঘন করিয়াছেন, কিন্তু প্রকাশে সামাজিক ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের কার্যনীতি তাঁহাদের একটি উদ্ভিঙে প্রকাশ পাইতেছে :—

“লোকের মধ্যে লোকাচার, সদগুরুর কাছে সঙ্গাচার।” অর্থ—বাহিরে লৌকিক আচার রাখ, গুরু-সমীপে সাধকগণ যখন বসেন তখন তাঁহাদের অবলম্বিত আচার অবলম্বন কর।

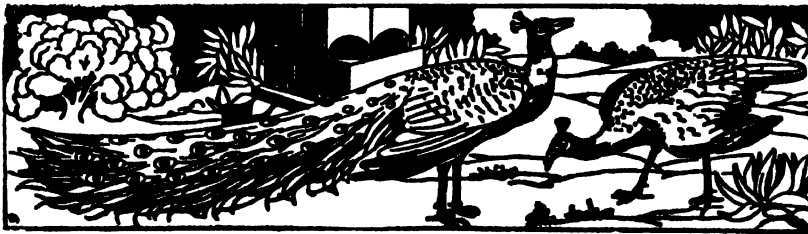
এইরূপে অনেক সম্প্রদায়ের সাধন-প্রক্রিয়া একটা গুপ্ত সাধনপ্রণালীতে দাঁড়াইয়াছে। লোকচক্ষের অভাবশে তাঁহারা এমন অনেক কাজ করেন, যাহা লোকে ধ্রুপদ জানে না। সকলেই অনুভব করিতে পারেন যে, এরূপ গুপ্তসাধন চলিতে আরম্ভ হইলে, তাহার পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন হয়। এই কারণে এরূপ গুপ্ত সাধকদলে অনেক কদাচার প্রবেশ করিয়াছে, পরে জানিতে পারা গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলভাচার্য্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সম্প্রদায়ের গুরুগণ শিষ্যবর্গের নারীগণকে লইয়া যাহা করিতেন, তাহা অকথ্য, অশ্রাব্য, অনালোচ্য। তাহাও স্বর্গীয় কর্ণদাস মূলজী ইহার কোন কোনও কথা লোকালয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহাতে লোকনিন্দার স্রোত এই সম্প্রদায়ের গুরুগণের আচরণের প্রতি প্রবাহিত হইয়া সে অত্যাচারকে কিয়ৎ পরিমাণে দমন করিয়াছে। এ বিষয়ে অধিক বাহারা জানিত চান, তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ মিঃ ম্যালেবারির লিখিত “Gujrat, and the Gujratis” নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে এবং বোম্বাই হাইকোর্টের Maharajah vs Libel Case-এর বিবরণ পাঠ করিলে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

তবে একথাও সত্য যে, এই সকল গুপ্ত সাধকদলের যে লোকনিন্দা তাহার কারণ তাঁহাদের গুপ্ত সাধনও

বাহিরের লোকের নানা প্রকার করুনা। লোকে যখন দেখে, একদল লোক আপনাদের কাজকর্ম লোকচক্ষের অন্তরালে রাখিবার জন্য ব্যগ্র, তখন যতাবতঃ মনে করে, ইহারা কোনও প্রকার অপকর্ম নিশ্চয় করে যাহা লোকচক্ষে ধরিতে প্রস্তুত নয়। এই কারণে আদিম খৃষ্টীয়মণ্ডলীর নামে লোকে নানা কথা কহিত। আদিম খৃষ্টীয়গণ নির্ধ্যাতনের ও রাজসভ্যাচারের ভয়ে অতি গোপনে মিলিত হইতেন। অনেক সময় রাত্রিকালে সমাধিস্থানের স্থানসমূহ প্রেতগৃহে সমবেত হইয়া উপাসনাদি করিতেন; রাজকর্মচারীরা জানিতেও পারিত না। এই কারণে লোকে বলিত, তাহারা নরমাংস খায় ও অপরাধের বহু প্রকার বীভৎস কাণ্ড করে। এমন কি তাঁহাদের প্রতি সমকালীন যাহুরের এত কুসংস্কার ছিল যে, সে-সময়কার যে কোমণ্ড রোমীয় ঐচ্ছিক তাঁহাদের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই লিখিয়াছেন, “সেই স্থণিত সজ্জায় যাহারা যীশুর আশ্রিত” ইত্যাদি। সেইরূপ ভারতবর্ষের গুপ্ত সাধকদিগের যে অধ্যাত্তি তাহারও মূলে

অনেক পরিমাণে লোকের ভ্রান্ত সংস্কার আছে। তাহা হইলেও “লোকের মধ্যে লোকাচার, সঙ্গতের কাছে সঙ্গাচার”—এই মত, ভারতীয় নীতির দুর্বলতাকেই প্রকাশ করিতেছে। অপরাধকে এই দুর্বিত নীতি অবলম্বন করিতে অধিকাংশ ভাবুকধর্ম জাতীয় চরিত্রের উন্নতি বিষয়ে কিছুই সাহায্য করিতে পারে নাই। তাহাদের সাধন-প্রণালী কেবল ভাবুকতাতে পর্যাবসিত হইয়াছে। ভাবুকের স্বর্গ ভগ্নমতা-নিমগ্ন কাপুরুষের স্বর্গ; তাহাতে না ব্যক্তিগত চরিত্রকে দৃঢ় করে, না জাতীয় চরিত্রকে উন্নত করে। ইহার অকৃতকার্যতার প্রমাণ ভারতের সামাজিক ইতিবৃত্ত। অধিক আর বলিবার প্রয়োজন নাই। বর্তমান প্রবন্ধের ফলস্বরূপ এইটুকু মনে থাকিলেই যথেষ্ট যে, প্রকৃত ভগ্নবক্তিত্ব হৃদয়ে থাকিলেই জাতিভেদ আর মনে থাকে না। ভক্তিবর্ষ বাস্তবিক জাতিভেদের বিরোধী।

প্রবাসী, কলকাতা, ১৩১১।



# প্রবাসী

কুহুদবজন মল্লিক

নিজ ভূমে যবে প্রবাসী ভারতবাসী,  
সে নামেই ছুমি দেখা দিলে হেথা আসি' ।  
দেবতার তেজ করিয়া লক্ষ্যোপন  
এলে যেন এক দরিত্র ব্রাহ্মণ ।  
মধ্য আকাশে তখন যদিও রবি,  
মান ও মলিন দেশ, দীনতার ছবি ।  
শব-সাধনার তখনো হয়নি শেষ—  
করে হুর্গীত, হুর্নীতি, হুঃখ ক্লেশ ।  
কাঁচৎ কোথাও গোপনে জ্বলিছে গুণী,  
মুক্তির লাগি' আহতি দিতেছে গুণী ।  
ছুমি গ'ড়ে দিলে অভিনব গঠছুমি,  
জাতির দৃষ্টিভঙ্গী ফিরালে ছুমি ।  
স্থূল পঙ্কিল ছিল যা জাতির কচি,  
ছুমি ক'রে দিলে স্নেহ এবং তচি ।  
ধ্বংস করিতে বাহা কিছু শিবেরতর,  
এলে দীন বেশে বিপুল শক্তির ।  
লেখনী করিলে তীক্ষ্ণ ও সংযত,—  
সব্যসাচীর নিশিত শরের মত ।  
তারাই তোমার পাশপত অস্ত্র,  
পশুবল তাতে ভরে হ'ল ত্ত ।  
রবির বীণার মহাগজীত সুর—  
নিকট করিল যা ছিল দূর স্নদূর ।  
দেখিলে, দেখালে, পুলকে বিশ্বয়েতে,—  
বজ্রের রবি—বিপ্লবের রবি হতে ।  
অভিনন্দিত করিলে বারংবার,  
পুষ্পোদয় সে গান্ধী মহাত্মার ।  
ঘটালো ভারতে বাহার আবির্ভাব,  
গোটা দেশ আর জাতির মুক্তিলাভ ।  
কেশর লুটীয়ে বাহার চরণ-তলে  
পশুবাণ হ'ল মাহুদ ভূমতলে ।

লোকোত্তর যে প্রতিভার ধনী দেশ,  
দেখাইলে তার নব নব উদ্বেগ ।  
রঙে ও রেখায় যে ভাব লুকানো আছে,  
ছুমিই প্রকাশ করিলে সবার কাছে ।  
বহুর মত আনন্দে হাত ধরি'  
দেখাইয়া দিলে সে মাদুরী—মরি। মরি ।  
রসিক শিল্পী কত করি মহাজন,  
মুশোভিত তব করিয়াছে অঙ্গন ।  
কতই ভ্রমর এল গেল গুঞ্জরি'—  
সজল নয়নে আজিকে তাদিকে স্মরি ।  
তোমার সঙ্গে কাজিকত পরিচয়,  
আজ ভেবে দেখি—অন্ন দিনের নয় ।  
রবি-পারিজাত পরিমণ্ডলে সবে,  
পাত পাতিয়াছি অমৃতের উৎসবে ।  
রবিরে দেখেছি কত আপনার করি',  
এখনো যে মোরা সেই গৌরবে মরি ।  
আজিও তোমাকে দে'খে আনন্দ পাই  
কৈশোরের সে উজ্জ্বল কমে নাই ।  
তব জয়যথে কুহুম চড়াই কের,  
হে প্রবাসী ছুমি আত্মীয় আমাদের ।  
বিরাট লাধনা একটি তপস্বীর  
তোমাকে করেছে সেবাত্রী পৃথিবীর ।  
জন্মদিন যে আজিকে বসন্তম,  
স্নেহ সবল রহিয়াহ মনোরম ।  
ধন্য হয়েছ সাধকের কৃপা লাভে ।  
কত শতাব্দী তোমারে প্রণামি' বাবে ।  
সহায় হউন স্বয়ং যোগেশ্বর,  
সঙ্গে রহুন পার্শ্ব ধনুর্ধর,  
যেন অশুভ জীবন কর্মময়  
চির-দিবসের কীড়ি হইয়া যায় ।

প্রবাসী ব্রিটিশাধিকারী স্মারকগ্রন্থ ।

# পিতৃস্মৃতি

সৌদামিনী দেবী

পিতা শিলাইদহ জমিদারীতে পদ্মানদীতে তাঁহার তিন-চারটি হেলেকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে গেলেন। সেখানে থাকিতেই তিনি সংকল্প করিলেন, দূরে কোথাও নির্জনে গিয়া ঈশ্বর সাধনা করিবেন। সেখান হইতেই হেলেকের বাড়ি পাঠাইয়া তিনি সিমলায় চলিয়া গেলেন। ইহাদ্বয়কে বাড়ি পাঠাইবার সময় তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তখনো সোম, রবি ও তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা জন্মগ্রহণ করে নাই। পিতা মনে করিয়াছিলেন, হয়ত তাঁহার বাড়ি ফেরা আর ঘটিয়া উঠিবে না।

তিনি সিমলায় যাইবার দিনকয়েক পরেই সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। অনেকদিন তাঁহার চিঠিপত্র পাওয়া গেল না। একটি গুজব উঠিল, সিপাহীরা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। একে অনেকদিন চিঠিপত্র লেখেন নাই, তাহার উপর এই গুজব,—বাড়ীর সকলে ভাবনার অভিভূত হইল। মা ত আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কান্নাকাতি করিতে লাগিলেন। সে এক ভয়ানক দিন গিয়াছে।

কিছুদিন পরে তাঁহার চিঠি পাওয়া গেল; তখন সকলে মুহূর্তে হইলেন। এদিকে, তাঁহার সিমলা থাকিবার সময়েই পুণ্যেজ বসিয়া আমার একটি ভাইয়ের মৃত্যু হইল। পিতার কাছে শুনিয়াছি, পুণ্যেজ মারা যাইবার সংবাদ তিনি পান নাই কিন্তু একদিন সেই প্রবাসেই তিনি শব্দই দেখিতে পাইলেন পুণ্যেজ কোনো কথা না কহিয়া তাঁহার কাছে আগিয়া দাঁড়াইল। তাহা যাত্রার যন্ত্র নহে, দিনের বেলা জাগ্রৎ অবস্থায় তিনি তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। তিনি সেই সিমলায় থাকিতেই ছোট কাকার মৃত্যু হইয়াছিল—তখনো তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি।

রবির অগ্নের পর হইতে আমাদের পরিবারে জাত-কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল অস্থগান অগৌড়লিক প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্বে যে সকল ভট্টাচার্য্যেরা পৌরোহিত্য প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, রবির জাত-কর্ম উপলক্ষ্যে তাহাদের সহিত পিতার অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল আমার অল্প অল্প মনে পড়ে। রবির অন্নপ্রাশনের যে পিঁড়ার উপরে আলপনার সঙ্গে তাহার নাম লেখা হইয়াছিল সেই পিঁড়ির চারিধারে পিতার আদেশে ছোট ছোট গর্ভ করানো হয়। সেই গর্ভের মধ্যে সারি সারি মোমবাতি বসাইয়া তিনি আমাদের তাহা জালিয়া দিতে বলিলেন। নামকরণের দিন তাহার নামের চারিধিকে বাতি জলিতে লাগিল। রবির নামের উপরে সেই মহাত্মার আশীর্বাদ এইরূপেই ব্যক্ত হইয়াছিল।

মা আমার সতীশাস্ত্রী পতিপরায়ণা ছিলেন। পিতা সর্বদাই বিদেশে কাটাইতেন, এই কারণে সর্বদাই তিনি চিন্তিত হইয়া থাকিতেন। পূজার সময় কোনোমতেই পিতা বাড়িতে থাকিতেন না—এইজন্য পূজার উৎসবে বাজা গান আমোদ যত কিছু হইত তাহাতে আর সকলেই মাতিয়া থাকিতেন কিন্তু মা তাহার মধ্যে কিছুতে যোগ দিতে পারিতেন না। তখন নির্জন ঘরে তিনি একলা বসিয়া থাকিতেন। কাকীমারা আসিয়া তাঁহাকে কত সাধ্য সাধনা করিতেন, তিনি বাহির হইতেন না। গ্রহাচার্য্যেরা যজ্ঞরন্ধাদির দ্বারা পিতার সর্বপ্রকার আপদ দূর করিবার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার কাছ হইতে সর্বদাই যে কত অর্থ লইয়া বাইত তাহার সীমা নাই।

যে ব্রাহ্মব্রহ্মে মাতার মৃত্যু হইয়াছিল পিতা তাহার পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় হিমালয় হইতে বাড়ী



কিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে মা কপে কপে চেতনা হারাইতেছিলেন। পিতা আসিয়াছেন শুনিয়া বলিলেন, “বসুতে চোঁকি দাও।” পিতা সমুখে আসিয়া বসিলেন। মা বলিলেন, “আমি তবে চলেম।” আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমাদের মনে হইল, স্বামীর নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য এতদূর তিনি আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। মার মৃত্যুর পরে মৃতদেহ স্নান লইয়া বাইবার সময় পিতা দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফুল চন্দন অত্র দিয়া শয্যা লাফাইয়া দিয়া বলিলেন—“হয় বৎসরের সময় এনেছিলেন, আজ বিদায় দিলেম।”

আমার হেলেবেরান আমাদের বাড়িতে যে পূজার উৎসব ছিল তাহার মধ্যে সাংস্কৃতিকভাবে কিছুই দেখা যাইত না। এই পূজা-অনুষ্ঠান আমোদে উন্নত হইবার একটা উপলক্ষ্যমাত্র ছিল। আমরা ছোট বেলার শিবপূজা ইছুপূজা প্রভৃতি যাহা দেখিতাম তাহারই অনুকরণ করিতাম। দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমার নিকট অঞ্জলি দিয়া তবে জলপ্রশংসা করিতে পাইতাম। আমার ঘরে কুকের ছবি ছিল, আমি গোপনে ফুল জল লইয়া ভক্তির সহিত সেই ছবির পূজা করিতাম।

একবার পিতা যখন সিমলা পাহাড় হইতে হঠাৎ বাড়ি ফিরিলেন, তখন বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজা। সেদিন বিসর্জন। তিনি বাড়িতে প্রবেশ না করিয়া ব্রাহ্মসমাজে গিয়া বসিয়া রহিলেন—বাড়ির সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কোন প্রকারে ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হইলে তিনি ঘরে আসিলেন। তাহার পর হইতে আমাদের বাড়িতে প্রতিমা পূজা উঠিয়া যাইতে লাগিল। একদিন প্রাতঃকালে সত্যকে কোলে করিয়া লইয়া বসিয়া আছি; এমন সময় সেজদাদা একখানি ছোট ছাপানো কাগজ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এই কবিতাটি মুখস্থ করিয়া লইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। সে কবিতাটি বোধকার সকলেই জানেন—

একে একে দিব্যরাস্তা করিতেছে গভীরাত,  
তাহার শাসনে চলে সকল সংসার হে।

সেজদাদা, মেজকাকীমা ও তাঁর মেয়েদের ব্রাহ্ম ধর্ম সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলিতেন। মেজকাকীমা খুব প্রকার সাহিত্য শুনিতেন কিন্তু তাঁহার মেয়েরা তাহাতে কান দিতেন না। অবশেষে তাঁহারা শালগ্রাম শিলাটিকে লইয়া আমাদের সমুখের বাড়িতে উঠিয়া গেলেন—আমরা একলা পড়িলাম। আমার মা বহু-সন্তানবতী ছিলেন, এই জন্য তিনি আমাদের সকলকে তেমন করিয়া দেখিতে পারিতেন না—মেজকাকীমার ঘরেই আমাদের সকলের আশ্রয় ছিল। তিনি আমাদের বড় ভালবাসিতেন, তাঁহার পরেই আমাদের বড় আবদার ছিল। তিনি যেদিন ভোরের বেলা গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন আমাকে তাঁহার সঙ্গে লইতেন। তিনি অল্পকালের জন্যও দূরে গেলে আমাদের বড় কষ্ট বোধ হইত।

এক সময় ছিল যখন আমাদের বাড়ি আত্মীয়স্বজন পূর্ণ ছিল। অবশেষে একদিন দেখিলাম প্রায় সকল আত্মীয়ই আমাদের দিগকে একে একে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। পিতামহ তাঁহার উইলে বাহাদিগকে কিছু কিছু দান করিয়া গিয়াছিলেন, দেখিলাম তাঁহারা আদালতে মকদ্দমা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল করাতে আমাদের বৈবাহিক দুর্গতির দিন উপস্থিত হইয়াছিল—তথাপি উইল অনুসারে যাহার যাহা প্রাপ্য ছিল তাহা পরিশোধ করিয়া দিয়া পিতৃদেব নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। তাঁহার উপর যে অভ্যাচার গিয়াছে তিনি ধীরভাবে সমস্ত বহন করিয়াছেন, কখনও ভ্রাতৃ পথ হইতে এঁট হন নাই। বাহারা তাঁহার প্রতি অভ্যস্ত অনাচার ব্যবহার করিয়াছে, দৈন্তবশত পড়িয়া যখন তাহার তাঁহার পরণাপন্ন হইয়াছে তখন তিনি তাহাদের চির-জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

আমাদের বাল্যকালে মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা বড় একটা ছিল না। বৈক্য মেয়েরা কেহ কেহ বাংলা, এমন কি সংস্কৃত শিক্ষা করিত—তাহাদেরই নিকট অল্প একটু শিখরা রাখার বহাজ্যবত এক

সেকলে হুই-একখানা গল্পের বই পড়িতে পারিলেই যথেষ্ট মনে করা হইত। আমাদের মা কাকীমারাও সেইরূপ শিখাই পাইয়াছিলেন।

আমাদেরও প্রথম শিক্ষা একজন বৈকুণ্ঠ নিকট হইত। তাহার কাছে শিশুপাঠ পড়িতাম, এবং কলাপাতে চিঠি লেখা অভ্যাস করিতাম। ক্রমে তাহার কাছে রামায়ণ পড়া পর্যন্ত আমাদের অগ্রসর হইয়াছিল। এমন সময় পিতৃদেব গিমলাপাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে মন দিলেন। কেশববাবুদের অন্তঃপুরে মিশনারি মেয়েরা পড়াইতে আসিত। আমাদের শিক্ষার জন্য পিতা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। বাঙালী স্ত্রীজন শিক্ষয়িত্রী প্রতিদিন আমাদের পড়াইতেন এবং হঠাৎ একদিন মেম আসিয়া আমাদের পড়াইতে পড়াইয়া যাইতেন। মাস কয়েক এই ভাবে চলিয়াছিল। অবশেষে একবার পিতৃদেব আমাদের পড়াশুনা কেমন-ভাবে চলিতেছে দেখিতে আসিলেন। একখানা স্নেটে শিক্ষয়িত্রী আমাদের পাঠ লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন— তাহারই অনুসরণ করিয়া কপি করিবার জন্য আমাদের প্রতি ভার ছিল। স্নেটে লিখিত সেই পাঠের বানান ও ভাষা দেখিয়া পিতা আমাদের এই নিয়মের শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলেন।

কালকাতায় মেয়েদের জন্য যখন বেধুন স্কুল প্রথম স্থাপিত হয় তখন ছাত্রী পাওয়া কঠিন হইল। তখন পিতৃদেব আমাকে এবং আমার খুড়তুত ভগিনীকে সেখানে পাঠাইয়া দেন। হরদেব চাটুয্যে মশায় আমার পিতার বড় অনুরক্ত ছিলেন, তিনিও তাঁহার দুই মেয়েকে সেখানে নিযুক্ত করিলেন। ইহা ছাড়া মদন মোহন ভট্টাচার্য মহাশয়ও তাঁহার কয়েকটি মেয়েকে বেধুন স্কুলে পড়িতে পাঠাইয়া দেন। এইরূপে অতি অল্প কয়টি মাত্র ছাত্রী লইয়া বেধুন স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়।

মেয়েদের কেবল লেখপড়া দেখানো নয়, শিল্প দেখানোর প্রতিও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

আমাদের পরিবারে যখন বিবাহ প্রতীত অনুষ্ঠান হইতে পৌত্তলিক অংশ উঠিয়া গেল তখনো জানাইবরণ স্ত্রীআচার প্রভৃতি বিবাহের আনুষ্ঠানিক প্রথাগুলিকে পিতা একা করিয়াছিলেন। সেই-সকল উপলক্ষ্যে পিতাকে আল্পনা দিবার তার আমাদের উপর ছিল। ভাল করিয়া ফুল কাটিয়া আল্পনা দিতে না পারিলে তিনি কিছুতেই পছন্দ করিতেন না। কোথাও নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে আমার ছোট বোনদের চুল বাঁধার তার আমার উপর ছিল। কেমন চুল বাঁধা হইল এক-একদিন তিনি তাহা নিজে দেখিতেন। তাঁহার পছন্দ মত না হইলে পুনরায় খুলিয়া ভাল করিয়া বাঁধিতে হইত।

মানসিক বিষয়ে পিতৃদেবের যেমন একটি সূক্ষ্মতা ছিল, ইন্দ্রিয়বোধ সম্বন্ধেও সেইরূপ দেখা বাইত। কোনো প্রকার ক্রীড়ানীতি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সঙ্গীত বিশেষরূপ ভাল না হইলে তিনি গুনিতে ভালবাসিতেন না। প্রতিভার পিয়ানো বাজানো এবং রবির গান গুনিতে তিনি ভালবাসিতেন। বলিতেন, রবি আমাদের বাঙ্গালা দেশের বুলবুল। মন্দ গন্ধ তাঁহার কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল—সুগন্ধ দ্রব্য সর্বদা তাঁহার কাছে থাকিত। ফুল তিনি বড় ভালবাসিতেন। পার্ক স্ট্রীটে যখন তাঁহার কাছে ছিলাম তখন প্রত্যহ তাঁহাকে একটি করিয়া তোড়া বাঁধিয়া দিতাম। মাঝে মাঝে তাহাই ত্রাণ করিতে করিতে তিনি হাকেজের কবিতা আবৃত্তি করিতেন, বলিতেন, ফুলের গন্ধ আমি তাঁহারই গন্ধ পাই। একদিন এইরূপে যখন হাকেজের কাব্যরসে তিনি মগ্ন ছিলেন আমাকে বলিলেন, পৌলিল লইয়া এস। তাহা লইয়া গেলে তিনি হাকেজের কবিতা ভজ'মা করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি তাহা লিখিয়া লইলাম। সেগুলি তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হইয়াছিল। স্কুলের পরিপাটি করিয়া কোনো কাজ নিশ্চয় না হইলে তিনি কোনোদিন খুলি হইতেন না। আমাদের রন্ধন শিক্ষার জন্য তিনি নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন প্রতিদিন একটা করিয়া তরকারী বাঁধিতে

হইবে। যোজ একটা করিয়া টাকা পাইতাম। সেই টাকার বাহ তরকারী কিনিয়া আমাদিগকে বাঁধিতে হইত। আমাদের কোনো এক সম্পর্কের দ্বিধিয়া ভাল বাঁধিতে পারিতেন, তিনিই আমাদের শিক্ষক ছিলেন।

বাড়ির মধ্যে আমাদের প্রাত্যহিক উপাসনার একটি ঘর ছিল। পিতার আদেশ অনুসারে আমরা সাক কাপড় পরিয়া সেই ঘর প্রতিদিন বাড়িয়া সুস্থিয়া পরিবাদ করিতাম। মহোৎসবের দিনে সেই ঘর স্নান পাঠা দিয়া সাজাইতে হইত। আমরা পরমানন্দে সমস্ত রাত জাগিয়া ঘর সাজাইতাম। পিতা সকালে আসিয়া প্রথমে আমাদিগকে লইয়া সেই ঘরে উপাসনা করিয়া পরে ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। সেই উপাসনার ঘরে তিনি প্রতিদিন উপাসনা করিয়া আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম পড়াইতেন;—কোনো কোনো দিন আমাদিগকে লইয়া গ্রন্থকল্পের বিষয় আলোচনা করিতেন। এইরূপে যে-সকল উপদেশ দিতেন, আমাদিগকে তাহা লিখিতে হইত। লেখা ভাল হইলে তাহার পাশে তিনি উৎসাহ-বাক্য লিখিয়া দিতেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে বলপ্রয়োগের কোনো স্থান ছিল না; তিনি বাহা আদেশ করিতেন তাহাই আমরা সর্দীচিতে পালন করিতাম—তাঁহার আদেশ আমাদের পক্ষে দেববাক্য ছিল।

বাহিরের দালানে বেদীন লোকসমাগম হইত, উপাসনা-সভা বলিত; যেকদা দাঁ নিজে গান রচনা করিয়া একটি ছোট হার্মোনিয়ম লইয়া মনের সঙ্গে যখন সেই গান গাইতেন তখন সকলেই মুগ্ধ হইত, এবং আমাদের যে কি ভাল লাগিত তাহা বলিতে পারি না। ধর্মের উৎসাহে যেকদা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। শ্রী-স্বাধীনতা বলিয়া একখানি চিঠি বই তাঁহার অল্প বয়সেই তিনি লিখিয়াছিলেন। তখন মেয়েদের বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে ঢাকা দেওয়া পাখীতে বাঁধাই দীতি ছিল—মেয়েদের পক্ষে গাড়ি চড়া বিষয় লজ্জার কথা বলিয়া গণ্য হইত। একখানি পাতলা গাড়ি মাজই তখন মেয়েদের পরিবেশ ছিল। আমাদের বাড়িতে

যেকদা দাঁ এসমস্ত উল্টাইয়া দিলেন। আমরা যখন শেমিজ জামা জুতা মোজা পরিয়া গাড়ি চাড়া বাহির হইতে লাগিলাম তখন চারিদিক হইতে যে কিরণ বিকির উঠিয়াছিল তাহা এখনকার দিনে কল্পনা করা সহজ নয়। পিতৃদেব নিবেদন করিলে তাহা লঙ্ঘন করা আমাদের অসাধ্য হইত কিন্তু তিনি ইহাতে কোনো বাধা দেন নাই। তিনি যখন দেখিতেন ছেলেমেয়েরা কোনো মনের দিকে যাইতেছে না, তখন কোনো আচারের পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি নিবেদন করিতেন না।

আমার পিতার পিসুভুতভাই চন্দ্রবাবু আমাদের সমুখের বাড়িতেই বাস করিতেন। একদিন তিনি আসিয়া পিতাকে বলিলেন—“দেখ, দেবেজ। তোমার বাড়ির মেয়েরা বাহিরের খোলা ছাতে বেড়ায়, আমরা দেখিতে পাই; আমাদের লজ্জা করে। তুমি শাসন করিয়া দাও না কেন?” পিতা বলিলেন, “কালের পরিবর্তন হইয়াছে। নবাবের আমলে যে নিয়ম খাটিত এখন আর সে নিয়ম খাটিবে না। আমি আর কিসের বাধা দিব, বাঁহার রাজ্য তিনিই সমস্ত ঠিক করিয়া লইবেন।” ছোট মেয়েরা ভাল করিয়া কাপড় সামলাইতে পারিত না তাই তাহাদের সাড়ি পরা তিনি পছন্দ করিতেন না। বাড়িতে দাঁ ছিল—পিতা নিজের কল্পনা হইতে নানা প্রকার পোষাক তৈরি করাইবার চেষ্টা করিতেন। অবশেষে আমাদের পোষাক অনেকটা পেশোয়ারাজের ধরণের হইয়া উঠিয়াছিল। আমার সেজ এবং ন বোন অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত ছিল বলিয়া আত্মীয়েরা চারিদিক হইতেই মাকে এবং পিতাকে ত্যাগ করিতেন। যা বিচলিত হইয়া উঠিতেন কিন্তু পিতা কাহারও কোনো কথা কানেই লইতেন না। ব্রাহ্ম অত্রাঙ্গণে একজনে আহাবের প্রথা পিতার সম্মতিতে আমাদের বাড়িতেই আরম্ভ হয় কিন্তু অসর্ব বিবাহ সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্তই তাঁহার আপত্তি দূর হয় নাই। ব্রাহ্মণদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহে তাঁহার উৎসাহ ছিল।

একদিকে প্রাচীন প্রথা সম্বন্ধে আর একদিকে

তাহার রক্ষণ এই দুইই তাঁহার চরিত্রে দৃঢ় ছিল। এইজন্য সমাজের আচার সম্বন্ধে তিনি যে-কোনো পারবর্তন তাঁহার পরিবারে প্রবর্তিত করিয়াছেন, সমাজের প্রতি নির্ভরমতা বশতঃ তাহা করেন নাই। দেশের সমাজকে তিনি আপনার জিনিষ বলিয়াই জানিতেন। সামাজিক প্রথার মধ্যে যেখানে যেটুকু সৌন্দর্য আছে তাহার প্রতি তাঁহার সমতা ছিল। এইজন্য জামাই-বস্ত্রী ভাই-কোটা প্রভৃতি লৌকিক প্রথা আমাদের বাড়িতে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। অনেকে এ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিল, তিনি শোনেন নাই। আমি যখন তাঁহাকে খবর দিতাম, আজ ভাই-কোটা, তিনি শুনিয়া হাসিতেন, বলিতেন, “তুমি কোটা দিয়াছ—আমরা যম রাজার দুয়ারে কাটা দিতে যাই না, যিনি যমরাজের রাজা তাঁহার কাছে ভাইয়ের মজল কামনা করি।”

একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে;—এখনকার দিনে নিতান্ত দুর্বল লোকও যে পথে অনায়াসে চলিতে পারে তখনকার কালের বিশেষ শক্তিমান লোকের পক্ষেও তাহা দুর্গম ছিল। তাছাড়া একথাও মনে রাখা চাই, একবার পথে বাহির হইলে সেপথে চলা তেমন কঠিন নহে, কিন্তু পথ দেখানই শক্ত। সামাজিক উন্নতির পথে এখনকার কালের ক্রতগামীরা পিতৃদেবের বৃহৎপিত্তকে মনে মনে নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, তখন যে রাস্তা ছিল তাহা পায়ে হাঁটিবার মত; প্রত্যেক পদক্ষেপেই নিজের শক্তি প্রয়োগ করিতে হইত; এখন সেখানেই অবাধে গাড়ি চলিতেছে, তাই বলিয়া রথারোহীরা যে পদাতিকের চেয়ে অধিক শক্তিশালী এমন কথা যেন তাঁহারা কল্পনা না করেন—এবং একথাও বোধহয় চিন্তা করিবার যোগ্য যে তখনকার রাস্তার অন্ধবেগে গাড়ি হাঁকাইলে আরোহীদের পক্ষে তাহা কল্যাণকর না হইতে পারিত।

একদিন কেশববাবু যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া পিতার সঙ্গে যোগদান করিলেন তখন চারিদিকে বর্ণোৎসাহে কল্পিত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা

মনে পড়ে। পিতা তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম বলিয়া ডাকিতেন ও পুত্রের অধিক ঘেহ করিতেন। বৃদ্ধবয়ে সমাজে উপাসনার পর কিরিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ির দালানে যখন সকলে মিলিয়া গান গায়িতেন—

“সবে মিলে মিলে গাঁও বে,—

তাঁর পবিত্র নাম লয়ে জীবন কর সকল,  
কেহ থেকে না নীরব”—

তখন কি উৎসাহের আনন্দে আমাদের মন উত্তোষিত হইয়া উঠিত। সমাজবাড়ি মেঘামত হওয়ার উপলক্ষে আমাদের বাড়ির দালানে বাড়িতে উপাসনাসভা বলিত—তখন আমরা ছেলেমানুষ—কিন্তু উপদেশে, গানে, বক্তৃতার ঈশ্বরের প্রেমরসে মাহুকের মন যে কেমন করিয়া অভিযুক্ত হইত তহো আজও ভুলিতে পারি না।

একবার মাঘোৎসবের আগের দিনে মামা আসিয়া আমাকে বলিয়া গেলেন—“কর্তা বলিয়া দিলেন, কাল কেশববাবুর স্ত্রী ও আর দুইজন ঘরে আসিবেন—তোমরা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া খাওয়ানো ও দেখাশোনা করিবে—কোনো ক্রটি না হয়।” তাহার পরদিন কেশববাবু প্রতাপবাবু ও অক্ষয় মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী আমাদের বাড়িতে আসিলেন।

কেশববাবুর স্ত্রী তিনচার মাস আমাদের কাছে ছিলেন। তখন আত্মীয়স্বজনরা আমাদের পক্ষে ত্যাগ করিয়াছেন, কেহ আমাদের বাড়িতে আসিতেন না। সেই সময়ে কেশববাবুর স্ত্রীকে আমাদের আত্মীয়রূপে পাইয়া আমরা বড় আনন্দে ছিলাম। প্রথমটা তাঁহার মন বিমর্ষ ছিল—বিশেষত তাঁর একটি ছোট ভাইয়ের জন্ত তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হইত। সেই সময় সোম রবি ও সত্য শিশু ছিল—তাঁহাদিগকে তিনি সর্বদা কোলে করিয়া থাকিতেন—বলিতেন, রবিকে তাঁহার সেই ছোট ভাইটির মত মনে হয়। সত্য তাঁহাকে মালী বলিতে পারিত না, “মাকি” বলিত, তাহাতে তিনি আনন্দে বোধ করিতেন। তাঁহাকে আমাদের ভাগিনীর মতই মনে হইত।—তিনি বাইবার সময় আমরা বড় বেদনা পাইয়া ছিলাম।

আমরা যখন কিছুদিন মৈনানের বাগানে হিলাম তখন সেখানে কেশববাবু বড় ছেলে করুণার অন্নপ্রাশন হইয়াছিল। তখনকার সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশেষ সমারোহে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। দশ-পনোন্মো দিন আগে হইতে আমরা গিঁড়িতে আগ্ননা দিতে নিযুক্ত হিলাম। এই কাজে আমরা প্রশংসা পাইয়া-হিলাম।

চুঁচুড়ার বাড়িতে পিতার যখন কঠিন পীড়া হয় তখন আমি আর আমার ন বোন স্বর্ণ তাঁহার সেবার জন্য গিয়াছিলাম। কিন্তু পাছে আমাদের কোন অসুবিধা হয় সেজন্য তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। সেই অবস্থাতেই আমার শোবার খাবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তবে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার কাছে থাকিয়া কেহ কোনো বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করিবে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না ;—এমন কি ভৃত্যদেরও কোনো অসুবিধা তাঁহার ভাল লাগিত না।

চুঁচুড়ার থাকিতে তাঁহার একদিন অর প্রবল হইয়া উঠিল, বিকাল হইতে জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিলেন। ইংরাজ ডাক্তার আসিয়া বলিল, এই অর ভ্যাগের সময় বিপদের আশঙ্কা আছে, সেই সময়েই নাড়ি ছাড়িয়া যাইতে পারে—অতএব সাবধান থাকা আবশ্যিক। রাজনারায়ণ বাবু সেই রাতে আসিয়াছিলেন। ডাক্তার বেদানার রসে আর্সেনিক মিশাইয়া দিয়াছিলেন, আমি তাহাই কাপড়ে ভিজাইয়া তাঁহার জিভে দিতেছিলাম এবং ডাক্তার কেবলি নাড়ি পরীক্ষা করিতেছিলেন। নাড়ি হুঁকল ; ভোয়ের বেলাটাতে ভয়ের কথা। কিন্তু সকালবেলায় জ্ঞান হইবামাত্রই তিনি উঠিয়া বসিয়া শাস্ত্রীকে বলিলেন, রাজনারায়ণবাবু আসিয়াছেন, তাঁহাকে ডাক। শাস্ত্রী ভয় পাইলেন, পাছে এই অবহার কথা কহিবার চেষ্টা করিয়া হুঁকলতা বাড়িয়া যায়। রাজনারায়ণবাবু কাছে আসিয়া বসিলেন। পিতা বলিলেন, “দেখ, আমি ঈশ্বরের আদেশ পাইলাম, যে এ রাজার দুই বন্ধু পাইলে। তোমার এখনো কাজ বাকি আছে ; আমার বিকে আরো দুই-একদিন হও।”

সকল কর্ণই তিনি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া ও ভায়পথে থাকিয়া নির্বাহ করিয়াছেন। যখন পার্ক স্ট্রীটে তাঁহার কাছে হিলাম, দোষিতাম সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি একই চৌকিতে সমানভাবে বসিয়া ঈশ্বর চিন্তায় দিন কাটাইয়াছেন—স্নানাহার ছাড়া আর সমস্ত কর্ণই তাঁহার মন ঈশ্বরে নির্বাহিত থাকিত। কোনো দিন যখন কোনো প্রয়োজনীয় কথা বলিতে বাইতাম, তিনি ধলিতেন, আমি কোথায় হিলাম, আমাকে কোথায় আনিলে,—তখন মনে অনুভূতি হইত।

বয়সের শেষভাগে যখন পিতৃদেব পার্ক স্ট্রীটে ৭ জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া ছিলেন তখন তাঁহার কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া-হিলাম। ইহার পূর্বে প্রায়ই তিনি বিদেশে নির্জনবাসে দিনযাপন করিয়াছেন। যখন চাঁঠিতে তাঁহার বাড়ি আসিবার খবর আসিত, তখন আমাদের এত আনন্দ হইত যে, যে লোক সংবাদ দিত তাহাকে পুরস্কার দিতাম। সকালে তিনি আমাদের সকলকে একত্র করিয়া দালানে উপাসনা করিতেন। উপাসনা হইতে কিরিয়া আসিবার পূর্বে তিনি একবার আমাদের দোষিয়া লইতেন। বাহিরে গিয়া মামাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, অনুককে আজ ভাল দেখিলাম না কেন, অনুককে বেন বিষম বোধ হইল। কর্ণকালের দৃষ্টিতে তিনি আমাদের মনের অবস্থা বুঝিয়া লইতেন। তাঁহার মতের বিকল্পে কত কাজ করিয়াছি কিন্তু কখনো তিনি আমাদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন নাই। তিনি যখন মিষ্টমুখে বা বলিয়া থাকিতেন তখন সে যে কি মধুর লাগিত তাহা কীবনে কখনো ভুলিতে পারিব না। তেমন মধুর বাণী আর কাহারো মুখে ত ভুলিতে পাই না। এত বড় বৃহৎ পরিবারকে তিনি তাঁহার স্নেহপূর্ণ মঙ্গলকামনায় আশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং সর্বপ্রকার সাংসারিক সুখ-দুঃখ ও বিরোধ-বিপ্লবের মধ্যে আঁচলিত থাকিয়া নীরবে নিরন্তর সকলের কল্যাণ বিধান করিয়াছেন।

ভাঁহার কাছে গুনিয়াছিলাম, শিশু অবহার দার কোলে  
 ওইয়া তিনি কিছুকৈ করিয়া হৃদ খাইতেছেন সেকথাও  
 তাঁর অন্ন অন্ন মনে পড়ে। ভাঁহার বালককালের একটি  
 ঘটনা তিনি একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন,  
 —“তখন আমার বয়স পাঁচ কি ছয় বৎসর হইবে।  
 ঠাকুরঘরে গিয়া দেখি, ঘরে কেহই নাই, সিংহাসনের  
 উপর শালগ্রাম ঠাকুর। আমি সেই শিলাটিকে আন্তে  
 আন্তে তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া মাটিতে গড়াইয়া  
 মনের আনন্দে খেলা করিতেছি—ওদিকে পূজারি ব্রাহ্মণ  
 আসিয়া দেখে যে সিংহাসনে ঠাকুর নাই। ঠাকুর কে  
 লইল বলিয়া মহা হলহুল বাধিয়া গেছে; চাঞ্চিদিকে  
 খোজ খোজ করিতে করিতে একজন আসিয়া দেখে যে  
 আমি তাহা লইয়া নিশ্চিন্তমনে খেলা করিতেছি। বাড়ির  
 মেয়েরা সব ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, দেবেজ, এ কি  
 সর্বনাশ—ঠাকুরকে লইয়া খেলা। কি মহা বিপদই না  
 জানি ঘটবে। পুনর্বার অভিব্যেক করিয়া ঠাকুরকে  
 সিংহাসনে স্থাপিত করা হইল। তাহার পরে যাহাতে  
 আমার কোনো অনিষ্ট না হয় সেকন্ত শাস্তি  
 বস্ত্রবনের ধুম পড়িয়া গেল।”

পিতামহের আমলে দুর্গোৎসব যেমন আমাদের  
 বাড়ির সামাজিক আনন্দোৎসব ছিল এবং এই উৎসব  
 যেমন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত, পিতার ইচ্ছা ছিল  
 যোৎসবকে তিনি দেইরূপ আমাদের বাড়ির আনন্দ  
 সম্বলনের মত করিয়া তুলিবেন। যখন ভাঁহার হাতে  
 এই উৎসবের ভার ছিল তখন মাঘমাসের প্রথমদিন  
 হইতেই কাজকর্ম আরম্ভ হইত; ভৃত্যেরা কাপড় পাইত,  
 পরিবারস্থ আত্মীয়জনদিগকে কাপড় দেওয়া হইত;  
 কান্দালী বিদায়েরও বিশেষ আয়োজন হইত। পূর্বে  
 পূজার সময়ে যেসকল বৃহদাকারের মেঠাই তৈরী হইত,  
 এরাই মাঘেও সেইরূপ মেঠাইয়ের ব্যবহা ছিল। সেই  
 বড় বড় মেঠাইয়ের ভূগুপ সকালবেলা হতে বাইরের ঘরে  
 টেবিলের উপর সাজানো থাকিত; বাহার যখন ইচ্ছা  
 খাইতেন—কোনো বাধা ছিল না। একবার উৎসবের  
 দিন ব্রাহ্মসমাজগৃহে প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ করিয়া

আসিয়া ভাঁহার এক কামাতা এই মিঠায়রাশির সম্মুখে  
 দাঁড়াইয়া “বাঃ, কেয়া বাৎ ছায়” বলিয়া মনের উচ্ছ্বাস  
 যেমন প্রবল কর্তে ব্যক্ত করিয়াছেন অমনি দেখিলেন,  
 সম্মুখে পিতা আসিয়া ভাঁহার সেই আনন্দ আবেগে  
 হাত করিতেছেন। তিনি ত লজ্জার মাটি হইয়া  
 ধেলেন। উৎসবের রাজিতেও আহ্বারের আয়োজন  
 অব্যাহত ছিল—যে যখনই আসিত আহ্বার করিতে  
 বসিয়া যাইত।

পয়লা বৈশাখে বর্ষারস্তের উপাসনার পর আমরা  
 ভাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি আমাদের প্রত্যেককে  
 একটি করিয়া গিনি দিয়া আশীর্বাদ করিতেন। সেদিন  
 দুপুর বেলায় বাদামের কুলপির বরফ তৈরী করাইয়া  
 আমাদের জন্য পাঠাইয়া দিতেন। আমরা তাহা সকলে  
 আনন্দে ভাগ করিয়া খাইতাম। ১লা বৈশাখে প্রথম  
 অকণোদরে প্রত্যাষের নির্মল স্নিগ্ধতার মধ্যে মধুর গানে  
 ও পিতৃদেবের হৃদয়গ্রাহী উপদেশে আমাদের সকলের  
 মন আরাধনার ভক্তিরসে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া  
 উঠিত। আজ মনে হয় যেন সেই এক পবিত্র সত্যবৃন্দ  
 চলিয়া গিয়াছে।

যখন পিতা বজ্রোটার ছিলেন, তখন মনে আছে  
 তিনি মাকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—দেখ,  
 ছোটকাকা আমাকে পত্র দিয়াছেন, তুমি আর বেশ  
 ছাড়িয়া কতদিন পাছাড়ে পক্ষতে ঘুরিয়া বেড়াইবে—  
 বাড়িতে আসিয়া বড়লোকের ছেলেদের মত দশ-পাঁচটি  
 মোসাহেব রাখিয়া পাঁচজনকে লইয়া আমোদ আশ্বাদে  
 দিনযাপন কর—আত্মীয়বন্ধু ছাড়িয়া তুমি একলাটি কি  
 করিয়া জীবন কাটাইতেছ।—ভাঁহার ছোটকাকা মনেও  
 করিতে পারিতেন না, নিজের মন ভোলাইবার ও দিন  
 কাটাইবার জন্য ভাঁহাকে একমুহূর্তকালও পাঁচজনের  
 সুখাপেক্ষা করিতে হইত না।

পাঁড়ার সময় যখন ভাঁহাকে ডাক্তার দেখিতে  
 আসিয়াছিল তখন একদিন তিনি আমাকে  
 বলিয়াছিলেন, “এ ডাক্তার আমার কি করিবে, আমার  
 যিনি ডাক্তার তিনি সর্বদা আমার কাছে কাছেই

ধাকেন। আমি যখন একবার কাশ্মীরে পাহাড়-ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলাম তখন আমার শরীর ভাল ছিল না। আমাদের প্রবাসের বহুদি আমায় সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া বলিয়া গেলেন, এখন আপনার বাহির হওয়া উচিত হইবে না—আগে শরীর সুস্থ হউক, তাহার পরে যেমন ইচ্ছা করিবেন। আমি তাঁহাদের কাহারও বারণ শুনিতাম না। ঝাঁপানে করিয়া পাহাড়ে উঠিতোঁহ। কোথায় যাইব এবং কোথায় থাকিব তাহার কোনো ঠিকানা নাই। চাকরদের বলিয়া দিলাম তোর যেখানে পাস একটা কোনো আশ্রয় ঠিক করিয়া রাখ। তাহারা একটা ভালাবাড়ী খালি পাইয়াছিল। সেখানে একটা খাটিয়া পড়িয়াছিল তাহারই উপরে তাহারা আমার বিহানা করিয়া রাখিয়াছিল। সেইখানে গিয়া আমি ত শুইয়া পড়িলাম। একে শরীর অসুস্থ, পথে কিছুই আহাৰ করি নাই। তাহার পরে ঝাঁকানি, ক্লাস্তি ও দুর্বলতার আমাকে যেন একেবারে আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। আমি খাটিয়ার শুইয়া চোখ বুজিলাম, আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন কাহার কোলের উপর শুইয়া আছি—আমার বড়ই আশ্রয়। সকালে উঠিয়া চাকরদের বলিলাম, চেষ্টা করিয়া দেখ, যদি কোথাও দুধ পাওয়া যায়। তাহারা দুইজনে ঘটা লইয়া দুধের সন্ধানে বাহির হইল। কিছুদূর যাইতেই দেখে একটা গাভী আসিতেছে। সেই গাভীটাকে একজন ধরিল ও আর-একজন তাহার দুধ দুইয়া লইল। সেই দুধটুকু খাইয়া মনে হইল যেন আমার জীবন কিরিয়া আগিল।

তাহার পর ধীরে ধীরে আমি সারিয়া উঠিলাম এবং শরীরে বল পাইলাম। নিজের ঘরে গোক পুখিলাম—সেই গোক রোজ দশলের দুধ দিত। সেই দুধ ও তাহার ঘি মাখন খাইয়া এবং খুব করিয়া বেড়াইয়া আমি একেবারে সুস্থ হইয়া উঠিলাম। সেখানে আমার ভাতার কবিরাজ কে ছিল, কে বা আমার এই দুধের পথ্য জোগাইয়াছিল?”

পার্ক স্ট্রীটে বসিবার আমরা সকল ভাইবোনে মিলিয়া পিতার জন্মোৎসব করিতাম সেদিন আমাদের বড়ই আনন্দের দিন ছিল। সেদিন পরিবারের সকলেই একত্র হইতেন। তিনি মাঝখানে চৌকিতে বসিতেন, আমরা সকলে তাঁহাকে বেতন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতাম।—বড়দাদা' সম্বোধিত কিছু একটা লিখিয়া পাঠ করিতেন। রবি গান করিত। তিনি ফুল বড় ভালবাসিতেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ফুলের তোড়া, ফুলের সাজ আনিয়া উপহার দিত।—আমরা ফুল দিয়া তাঁহার সমস্ত ঘরটি সাজাইয়া দিতাম। ছেলেমেয়ে জামাতা বধু দৌহিত্র পৌত্র সকলে মিলিয়া তাঁহার কল্যাণ কামনা করিতেছে, এত বড় মঙ্গলের সাজিতরা আনন্দ-উপহার সুদীর্ঘ জীবনের সন্ধ্যাকালে কয়জন লোকের ভাগ্যে ঘটে? আমাদের সেই আনন্দের দিন আর কিরিয়া আসিবে না, সেই পবিত্র সোম্যস্মৃতি আর দেখিতে পাইব না।

(মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাকল্পা কর্তৃক লিখিত।)

প্রবাসী, চৈত্র, ১৩১৮।



# রাজা রামমোহন রায়

অশোক চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এইটি বাঙ্গালা সাহিত্যের সকল যুগের সকল অঙ্গের যে নিখুঁত পরিচয় পাঠকদিগকে দিরাছে তাহা শিক্ষক, ছাত্র ও সাধারণ পাঠক সমাজে সঙ্গত স্বীকৃত হইয়াছে। এই কারণেই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যেহেতু ডাঃ সুকুমার সেন জ্ঞানানুসন্ধানের একান্ত ভাবে সত্য পথের পথিক এবং বিস্তার ক্ষেত্রে সত্যের প্রতিষ্ঠার যে মহানু দায়িত্ব সে সম্বন্ধে সঙ্গী জ্ঞাত। বাংলা ভাষার উন্নত ও সুগঠিত রূপ ধারণের মূলে যে সকল মনীষীর অক্লান্ত চেষ্টা ও হৃদয়বাবগ-উদ্ভূত কর্মশক্তি প্রায় দেড়শতাধিক বৎসরেরও পূর্বে নিযুক্ত থাকিতে লক্ষ্য করা গিয়াছে, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নাম তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বোপরে উল্লেখ করিতে হয়। তিনি বঙ্গিও সঙ্গীতাদি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তাঁহার নিজ কর্মধারার বিভিন্ন শ্রোতের গতি নানা ভাষায় গত রচনার উপরেই বিশেষ করিয়া নির্ভর করিত। তিনি ফারসী, আরবী, সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, ইংরেজী, বাংলা ও অপরাপর ভাষা ব্যবহারে বহু পুণ্ডিকা, বিচার-বিভর্কাদি লিপিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত হইতে ভাষান্তর করিয়া ইংরেজীও বাংলাতে বহু শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার সমালোচনা তৎকালে খৃষ্টান ধর্মব্রাজক সমাজে একটা আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। ডাঃ সুকুমার সেন বলেন : “রামমোহন রায়ই প্রথম

ভারতীয় ব্যক্তি যিনি খৃষ্টধর্মের প্রসার ও প্রচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। সেকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বধর্মনিষ্ঠ অন্ত ব্যক্তিরা খৃষ্টধর্মকে হেয় জ্ঞান করিলেও শাসকদের ধর্মকে প্রকাশে নিন্দা করিতে নামেন নাই। তাঁহারা জাত বাঁচাইয়া খৃষ্টীয় ব্রাজকদের সঙ্গে যতদূর সম্ভব সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই। রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধাচরণ শক্তিশালী ও সমকক্ষ প্রতিনিবন্ধীর বিরোধ বলিয়া গাঢ়রিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অগ্রসর ছিলেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গে এই পণ্ডিত বিরোধ যাহা ব্রুড্যান (বিভালকার) শুরু করিলেন তাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। রামমোহনের ব্রুড্যান বিশ-পাঁচ বহর পরেও এমন অনেক নকশা নাটক ও গান লেখা হইয়াছিল যাহাতে রামমোহন কাল অবতার বলিয়া মসীলোপিত।” ব্রুড্যান বিভালকার ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কোরি সাহেব কর্তৃক নিযুক্ত প্রধান সহকারী পণ্ডিত। তিনি যে পাণ্ডিত্যের শত্রু রামমোহন রায়কে আক্রমণ করিয়া লেখনী চালনা করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। রামমোহন বিরোধ বাঁহারা করিতেন তাঁহারা অনেকেই পাণ্ডিত্যের প্রয়োচনাতেই ঐ কার্যে আত্মনিয়োগ করিতেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য অনেক পণ্ডিত ছিলেন যাহারা রামমোহনের সমাজ-সংস্কার-চেষ্টা ধর্ম-বিরুদ্ধ মনে করিতেন বলিয়াই তাঁহার বিরুদ্ধে বুদ্ধ ঘোষণা করিতেন। এ কথা নিশ্চয়ই বলিতে হয় যে, সনাতন-



পহী বহু ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়ের নিম্নাবাদে যে নামিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল পাণ্ডুরিদিগের রামমোহন-বিবেচনাজ্ঞাপন প্রয়োচনা। বহু বৃষ্টি জাতির কর্মচারী ব্যবসাদারও যে রামমোহনের সমাজ-সংস্কারে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেন তাহার মূলেও ছিল পাণ্ডুরি-মত উদ্ধৃত প্রেরণ।

সেই যুগের যে রামমোহন-বিবেচনের ধারা তাহা অত্যাধিক বাংলার কোন কোন আত্মনিয়োজিত পণ্ডিতের মনের গভীরে অঙ্কসলিল প্রবাহে গতিমান থাকিয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের অকারণ-আগ্রহ-প্রসূত মসীলপেন চেষ্টা সর্বভাবেই নিফল হইলেও তাঁহারা নিজেদের সমাজজ্ঞান রাহিত্য ত্যাগ করিতে অক্ষম। সূর্য-কিরণের মতই বাহার মাহাত্ম্য ও দীপ্যমান প্রতিভা মানব মনের অন্ধকার বিনাশ করিয়া জ্যোতির্ময় বিশ্বজাল বিস্তার করিয়া প্রগতির পথ আলোকিত করিয়া গিয়াছে; সেই মহামানবের পুরুষকার খর্ব করিয়া লোকমানসে বিভ্রান্তি সঞ্জন চেষ্টা কখন সক্ষম হইতে পারে না। যে মহাপুরুষকে স্পেন দেশের সংবিধান প্রদান হইলে পরে তৎদেশের রাষ্ট্রনেতাপণ ১৮১২ খৃঃ অব্দে তাহার প্রথম সংস্কার উৎসর্গ করিয়া সেই সংবিধান মুদ্রিত করিয়াছিলেন; বাঁহাকে ইরোরোপের খ্যাতিমান ব্যক্তি-গণ, (যেহা রবার্ট ওয়েন, জেরোম বেনথাম প্রভৃতি) ইরাসমাস, এমন কি সোক্রাটিস, প্লেটো ও অ্যারিসটটল-এর সহিত তুলনা করিয়াছিলেন, এবং বাঁহাকে ক্রান্তান্তর রাজা লুই ফিলিপ নিজ প্রাসাদে ভোজন করিতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; সেই বৃষ্টি সাম্রাজ্যবাসী অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশের প্রথম ইংরেজীনিবাস, বহু ভাষা ভাষী, বিশিষ্ট জ্ঞান ও গুণাবলীর আধার, দ্বিতীয়বার প্রতিভাধি, হিন্দু শাস্ত্রসকলের পুনরুদ্বোধকর্তা রাজা রামমোহন রায়ের জ্ঞান গুণ ও কর্মশক্তি অস্বীকৃত উচ্চাঙ্গ হইতে বাঁহারা তাঁহাকে নিয়ন্তরে নামাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন তাঁহাদের বিকৃত মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া জাতির বা কোন ব্যক্তির কোনও অতীষ্টানি

হইতে পারে না। সুতরাং সে কথাই উল্লেখ মাত্র করিয়াই এই প্রসঙ্গের বিচার শেষ করা যাইতেছে।

রাজা রামমোহন রায় নানা ক্ষেত্রে নিজ কর্তব্য কার্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য বহু বিবরে বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি বাংলা গল্পকে অনেক স্থলে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সাধিত করিয়াছিলেন। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেন :

“গীর্জা ও পাঠশালার বাহিরে আনিয়া বিচার বিশ্লেষণে উচ্চতর চিন্তার বাহন হিসাবে প্রথম ব্যবহারে লাগাইয়া, বাজালা গল্পকে জাতে তুলিলেন আধুনিক কালের পুরোভূমিকার সবচেয়ে শক্তিশালী ও মনোহী ব্যক্তি রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩০), বাঁহার কর্ম ও চিন্তা, উদ্ভাস ও মনীষা ভারতবর্ষের ইতিহাসে আধুনিক যুগের দরজা খুলিয়া দিয়াছে। কোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের মত রামমোহন সংস্কৃত ব্যবসায়ী অথবা কারসানবীশ ছিলেন না। তিনি সংস্কৃত জানিতেন, ফারসী (এবং আরবী সম্ভবত) আরও ভালো করিয়া জানিতেন, তিনি ভারতবর্ষের ইংরেজী শিক্ষিতদের অগ্রণী। বহুভাষী রামমোহন টাইলার দিকে নজর না দিয়া বক্তব্যের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাই তাঁহার হাতে বাজালা গল্পের যে রূপ গঠিত হইল তাহাতে মাদুর্ণ না থাক স্পষ্টতা ছিল, কার্যোপযোগিতা ছিল। এখনকার দিনে, হেদচিহ্নবিহীন রামমোহনের বাক্যাবলী উদ্ভট ঠেকিতে পারে কিন্তু সে সময়ের কলেজ রচনার সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে বোঝা যাইবে কেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত প্রাচীনতার ভক্তও বলিয়াছিলেন, ‘দেওয়ানজী জলের মত বাজালা লিখিতেন।’ এ সত্য রামমোহনের প্রবল প্রতিপক্ষ লেখক ব্রহ্মাঙ্কুরও তাঁহাকে গালি দিতে গিয়া স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার মতে রামমোহন সংস্কৃত ছাড়িয়া এবং ‘সান্ত্য ভাষার’ কাহ না খোঁবিয়া সাধারণের বোধ্য ভাষার বেদান্তসিদ্ধান্ত বিস্তার করিয়া অসং আচরণ করিয়াছেন।”

ব্রহ্মাঙ্কুরের মতে তাঁহার ভায় ‘সান্ত্যভাষার দ্ব্যর্থ-

বোদ্ধা সংপূর্ণবের" পক্ষে "নরা উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ" করাও মহা কষ্টকর বিবেচনা করা বাইতে পারে। সুতরাং রামমোহন লৌকিক ভাষা ব্যবহার করিয়া মহা অজ্ঞায় করিয়াছিলেন। ডাঃ সেন তৎপরে রামমোহনের হস্তে বাঙ্গালা গদ্য ভাষার পূর্ণতার গঠনের বর্ণনা করিয়া বলেন :

“ঐরামপুরের পাদরিদের ও খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধতা করিয়া রামমোহন উপনিষদ-বেদান্ত-আশ্রিত একেশ্বর ব্রহ্ম উপাসনার প্রচারে ও প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দিলেন। তিনি ঈশা কেন মুক্ত মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষদের অম্ববাদ করিলেন, কয়েকটি পরমার্থতত্ত্ব গান লিখিলেন, গীতার পদ্য অম্ববাদ করিলেন (বা করাইলেন) এবং সর্বপ্রথম বাহির করিলেন ‘বেদান্ত প্রহ’ ও ‘বেদান্তসার’ (১৮১৫)। এই প্রহ দুইটিও অম্ববাদাত্মক। রামমোহনের বিরুদ্ধে পাদরিরা ষাড়া করিলেন বৃত্তান্ত বিজ্ঞানকারকে। রামমোহনের বেদান্তব্যাখ্যা ও বেদান্তব্যাখ্যার প্রচেষ্টা দুইয়েরই নিন্দা করিয়া বৃত্তান্ত লিখিলেন ‘বেদান্তচক্রিকা’ প্রথম খণ্ড (১৮১৭)। তাহার উত্তরে রামমোহন একটি ৬৪ পৃষ্ঠার পুস্তিকা লিখিলেন। ইহাতে কোন নাম দেওয়া ছিল না। পরে ইহা ‘ভট্টাচার্যের সহিত বিচার’ নাম পাইয়াছে। বৃত্তান্তের অভিযোগ হৃৎক্যাপূর্ণ, কিন্তু প্রত্যুত্তরে রামমোহন হৃৎক্যাপূর্ণ হইতে সম্ভরণে দূরে রাহিয়াছিলেন। ছুঁমিকার ভট্টাচার্যের বেদান্ত আলোচনাকে স্বাগত করিয়া রামমোহন বলিতেছেন যে তিনি বেদান্তচক্রিকার প্রস্তাবিত দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতীকার আছেন।

কিন্তু তিন প্রকারে অন্তঃকরণে খেদ জন্মে প্রথম এই যে সংস্কৃত ভাষা করিয়া ভাষাকে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার ভাৎপর্ষ এই যে সর্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ় ২ সংস্কৃত শব্দ সকল ইচ্ছা পূর্বক দিয়া প্রহকে হৃৎক্য করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং ভাৎপর্ষের অভাব করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্তচক্রিকাকে প্রথম

বেদান্তচক্রিকা হইতে স্তম্ভ ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য লিখেন বাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়। দ্বিতীয়।...অতএব নিবেদন দ্বিতীয় বেদান্তচক্রিকাতে যে স্তম্ভ এবং প্রীতি আর স্তুতিাদির প্রমাণ ভট্টাচার্য লিখিবেন তাহার বিশেষরূপে নিদর্শন যেন লিখেন। তৃতীয়। বেদান্তচক্রিকার প্রথমে লিখেন যে এ প্রহ কাহার ভাষা বিবরণের উত্তর দিবার দ্রষ্ট লেখা বাইতেছে এমন নহে অথচ প্রথম অবধি শেষ পর্যন্ত যে প্রহা-নামরূপ অম্বকেরা ইত্যাদি উক্তির দ্বারা কেবল আমাদিগেই শ্লেশ করিয়াছেন এবং হানে ২ বাহা আমরা কদাপি কোনো প্রহে লিখি নাই এবং স্বীকার করি নাই তাহা আমাদের মত হয় এমন জানাইয়াছেন অতএব তৃতীয় এই যে শাস্ত্রার্থের অম্বশীলনে সত্যকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় বেদান্তচক্রিকাতে যদি আমাদের লিখিত মতকে ভট্টাচার্য হৃৎক্যে ইচ্ছা করেন তবে তাহার পৃষ্ঠা এবং পংক্তির নির্দেশ পূর্বক লিখিয়া যেন দোষ দেন তাহা হইলে বিজ্ঞানলোক দোষাদোষ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। ভট্টাচার্য শাস্ত্রালাপে হৃৎক্য না কহেন এ প্রার্থনা বুঝা করি যেহেতু অভ্যাসের অভাব প্রায় হয় না যদি ভট্টাচার্য কৃপা পূর্বক দ্বিতীয় বেদান্তচক্রিকাকে পূনের জায় হৃৎক্য পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেষ্ট দ্বন্দ্বা করিয়া মানিব ইতি।’

“এই প্রার্থনা করিয়া রামমোহন পুস্তিকা শেষ করিয়াছেন।

“৫ সর্বব্যাপী পরমেশ্বর ছুঁমি আমাদিগে হিংসা মৎসরতা মিথ্যাপ্রবাদে প্রবর্ত করাইবে না ও তৎসং।’

“বলা বাহুল্য ভট্টাচার্য আর লেখনী ছুঁটান নাই।

“রামমোহনের বিচার-বিশ্লেষণের সরল দ্বিতীয় পরিচয় হিসাবে পুস্তিকাটি হইতে আরও একটু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

“ঐ ৬০ পৃষ্ঠের ১৫ পংক্তিতে ভট্টাচার্য প্রস্তাব করেন, “হে অপ্রোক্ষনামরূপ অম্বকেরা আমরা তোমাদিগে দ্বিজ্ঞানসি তোমরা কি” ইত্যাদি। উত্তর। আমাদিগে

সোপাধি ভীষ করিয়া বেধে কহেন ইহা দৌধভেদি  
বসন্তত্ব বিধিত না হইলে উপাধির নাশ হয় না এ কারণ  
তাহার জিজ্ঞাস্য হইতহাং তাঁহার প্রতিপাদক শাস্ত্রের  
এবং আচার্যোপদেশের প্রবণের নিমিত্ত বস করিয়া  
ধার্মিক অভাব আমরা বিশ্বকর্ম ও সিন্ধুকর্ম ইত্যাদি  
গুরু রাখি না এবং ভট্টাচার্যের উপকৃতি স্বীকার করি  
যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনি অতি প্রিয় হয়  
এ নিমিত্তে স্বকীয় দোষসকল দেখিতে পাইতেনিহাম  
না ভট্টাচার্য তাহা জ্ঞাত করাইতেছেন উভয় লোকের  
কোথও বরতুল্য হয়।...

“ভট্টাচার্য” নিবৃত্ত হইলেন। তাহার পর আসিলেন  
‘গোদামী’। তাঁহার আপত্তির জবাবে রামমোহন  
বিভিন্ন পুস্তিকাখানি লিখিলেন, বাহা ‘গোদামীর  
সহিত বিচার’ নামে প্রসিদ্ধ। বিষয় ঐশ্বরের সাকারত্ব-  
নিরাকারত্ব। পুস্তিকাটির আরম্ভ এইরূপ।

‘অবিত্যীয় ইন্দ্রিয়ের অগোচর সর্বব্যাপি যে পরব্রহ্ম  
তাঁহার তত্ত্ব হইতে লোক সকলকে বিরুদ্ধ করিবার  
নিমিত্ত ও পরিমিত এবং সুখ নাসিকাদি অবয়ব বিশিষ্টের  
ভজনে প্রবর্ত করাইবার জন্তে ভগবদ্গৌরাক্ষপরায়ণ  
গোদামিকী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া  
পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর প্রত্যেকে দেওয়া যাইতেছে  
বিজ্ঞ সকলে বিবেচনা করিবেন।’

“ভট্টাচার্যের অভিযোগ হৃৎক্যাপূর্ণ ছিল, গোদামীর  
অভিযোগে কোন হৃৎক্য ছিল না। ‘গোদামী’র পরে  
তিনি প্রতিবাদ তুলিলেন তিনি কহাতির পথ ধরিলেন।  
ইহাকে জবাব দিতে গিয়া রামমোহন যে পুস্তিকা  
লিখিলেন তাহা ‘কবিতাকারের সহিত বিচার’ নামে  
প্রসিদ্ধ। ভূমিকার গোড়ার অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।  
‘ওঁ তৎ সৎ। ঐশোপনিষৎ প্রভৃতির ভূমিকার আমরা  
বাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহার উল্লেখ মাত্র না করিয়া  
কবিতাকার উত্তর দিবার হলে নানা প্রকার কহুতি ও  
ব্যঙ্গ আমাদের প্রতি করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন  
তাহার দ্বারা এই উপলব্ধি হয় যে অতিশয় যের প্রবৃত্ত  
কেবল আমাদের প্রতি হৃৎক্য কহিতে কবিতাকারের

সম্পূর্ণ বাসনা ছিল কিন্তু শিষ্ট লোকসকল হঠাৎ নিন্দা  
করিবেন এই আশঙ্কায় শুদ্ধ গালি না দিয়া গালি ও  
তাহার মধ্যে ২ দেবতা বিষয়ের শ্লোক এই হইকে একত্র  
করিয়া ঐ পুস্তককে প্রভ্রান্তর শব্দে বিখ্যাত করিয়াছেন  
বর্তাপিও আমাদের কোন ২ আত্মীয়ের আপাতত বাসনা  
ছিল যে ঐ সকল ব্যাক্যের অন্তরূপ উত্তর দেন কিন্তু  
অপ্রিয় কথা সত্য হইলেও তাহার কখন লোকত ও ধর্মত  
বিরুদ্ধ জানিয়া মহাত্মারতীর এই শ্লোকের স্মরণ করিয়া  
কান্দ রহিলেন...’

“রামমোহনের পঞ্চম প্রতিবাদ-পুস্তিকা ‘পঞ্চ্য প্রদান’  
(১৮২৩) কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের ‘পাণ্ডুপীড়ন’-এর  
প্রভ্রান্তর।

“রামমোহন সংবাদপত্র পরিচালনাতেও অগ্রণী  
ছিলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রথম  
বাক্সালা সাময়িক ও সংবাদ পত্র ‘সমাচারদর্পণ’ প্রকাশিত  
হয়। বাক্সালা ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাসে এই  
ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাহার পর রামমোহন  
Brahmunical Magazine ও ‘ব্রাহ্মণ সেবধি’ নামে  
ইংরেজী ও বাক্সালায় (১৮২১) এবং ‘মৌরতুল আখবার’  
নামে ফারসীতে (১৮২২) পত্রিকা বাহির করেন।

“রামমোহন, ইংরাজীতে বাক্সালা ব্যাকরণ  
লিখিয়াছিলেন (১৮২৩)। এই বইটি লেখক কর্তৃক  
‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ নামে বাক্সালায় ভাষান্তরিত হয় এবং  
রামমোহনের বৃত্ত্য হইবার পরেই (১৮৩০) ইহা ফুল  
বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বইটির আকার  
ছোট কিন্তু ইহার আপে প্রকাশিত কোরি প্রভৃতির  
ব্যাকরণের তুলনার অনেক ভালো। ব্যাকরণখানি  
দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দু কলেজে নীচের শ্রেণীতে পাঠ্য  
ছিল। এখনকার বাক্সালা ব্যাকরণের পরিভাষা অনেক  
পরিমাণে রামমোহনের গৌড়ীয় ব্যাকরণ হইতে  
নেওয়া। (তবে রামমোহন আমাদের অপেক্ষাও  
‘প্রগতিশীল’ ছিলেন, কেননা তিনি সম্রদান কারক  
পরিভাষা করিয়াছিলেন এবং সম্বন্ধ পদকে কারক

বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।) ব্যাকরণের মধ্যে রামমোহন সিনট্যাকসও ধরিয়াছিলেন। রামমোহনের ব্যাকরণ সূত্র যে কেমন সহজ ছিল তাহার একটু পরিচয় দিচ্ছি।

‘কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ, সম্বন্ধ এই ষট্ কারক, ভাষাতে ব্যবহৃত হয়, সম্ভাব্যানের উদ্যোগক কোন শব্দ বা বিশেষ রূপ না থাকিতে তাহার ব্যবহার নাই। সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ, কারক না হইলেও ভাষাতে কারক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।.....

‘কর্ম দুই প্রকার মুখ্য ও গৌণ। যাহাতে সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ব্যাপ্তি হয় তাহার নাম মুখ্য, এবং যাহাতে পরম্পরায় ক্রিয়া ব্যাপ্ত হয় তাহার নাম গৌণ।’

“রামমোহন রায়ের এই ভালো ব্যাকরণখানি ছিল বলিয়াই বোধ করি বিভাগ্যগর শিশুপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ লিখেন নাই।”

রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গলা গদ্য ভাষা ব্যবহারের গোড়ার কারণ ছিল শাস্ত্রগ্রন্থ অহুবাদে আগ্রহ; সমাজ-সংস্কার-বিরোধী পণ্ডিতদিগের সমালোচনার প্রচেষ্টার দানের প্রয়োজনে পুস্তিকা রচনা; নিজ আদর্শ প্রচার ও বিস্তার চেষ্টা এবং ইংরেজী ধরণের সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার আবশ্যিকতা। তাঁহার ষট্ গদ্য রচনা প্রণালী অহুসরণে পরে তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যগণ গদ্য প্রণয়ন কার্যে আরও আগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাঁহারা এই কার্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রমুখ হান অধিকার করিয়া আছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহর্ষির সম্ভানগণ বিশেষ করিয়া বিজ্ঞাননাথ ও রবীন্দ্রনাথ এই কার্যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। মহর্ষির সমসাময়িকদিগের মধ্যে বাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির কার্যে মহাক্ষমতাবান্ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে রাখিয়াছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আরও বাঁহারা মহাক্ষমী বলিয়া বিখ্যাত তাঁহারা হইলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ

মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব হুগোপাধ্যায় ও পদ্ম-নাটকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

রাজা রামমোহন রায় যে প্রগতি প্রবাহের ধারা বহমান করিয়া দিয়া বাঙ্গলা গদ্যের নূতন রূপের সৃষ্টি করিয়া দিলেন; তাহারই অহুসরণে একের পর এক করিয়া বহু লেখক সেই ভাষা প্রবাহকে আকারে প্রকারে বহুধা বিস্তৃত ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে লাগিলেন। পাদ্রিদের অহুচর, সমাজসংস্কার নিবর্তক, রামমোহন বিরুদ্ধতা নির্বীণ, প্রতিক্রিয়াশীল পণ্ডিতগোষ্ঠী কিছুকাল বেতনভোগী বোদ্ধার বেশে জাতির সংস্কার রণাঙ্গনে লক্ষ্য রূপে করিয়া ও পাঠ্য পুস্তকাদি রচনায় কিছু কিছু শক্তি প্রদর্শন করিয়া ভাষা গঠন ক্ষেত্রে হইতে ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সংবাদপত্র প্রকাশেও নূতন প্রতিভার সমাবেশ হইতে লাগিল এবং জাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তিও নানাতাবে নানারূপে আকৃতি লাভ করিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ভাষা গঠন কার্যে ক্রমবিকাশিতভাবে শেষাবধি আধুনিক বাঙ্গলা ভাষার আবির্ভাব হইল। এই পরিণতির মূলে আছেন রাজা রামমোহন রায়।

রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কার আগ্রহের কারণ অহুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে তাঁহার বাল্যে ও যৌবনে সমাজের অবস্থা যেদ্রুপ কুসংস্কার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল তাহাতে উন্নতচরিত্র মানুষ মাত্রেই আত্মসম্মানবোধ আহত হইতে পারিত। যে সকল বর্ষের রীতি নীতি ও সামাজিক প্রথা সে যুগে ভারতীয় মানবকে অজ্ঞানতার পক্ষে নিষ্পত্ত করিয়া জাতিতে পর-দাসত্বের শৃংখলাবদ্ধ রাখিয়া ভারতের প্রাচীন উচ্চ সভ্যতা ও জ্ঞানের ঐতিহ্যকে একটা অবিদ্যাত উপকণ্ঠ আকার দিয়াছিল; সেই সকল সামাজিক ব্যাধির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল সতীদাহ প্রথা, বাল্য-বিবাহ, বহিবিবাহ (কৌলীভ প্রথা জাত), স্ত্রীশিকার অভাব, স্ত্রীলোকদিগের উত্তরাধিকারে বাধা, জাতিভেদ, অসৎ বিবাহে বাধা, বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবহার অভাব,

সভাকাত শিশুদিগকে জল গর্ভে নিক্ষেপ করা, অবরোধ প্রথা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকলের সহিত দেখা বাইত, হিন্দু-মুসলমানদিগের ভুলনার খ্রীষ্টানদিগের (বেত-কৃক উভয় জাতীয়) প্রেষ্টতার অধিকার (আদালতে জুরি ইত্যাদিতে), হিন্দু-মুসলমানদিগের নানা প্রকার অধিকারের অভাব; ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার অভাব, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রামমোহন রায় অতি অল্প বয়সেই পাটনার কারসী ও আরবী শিক্ষার্থে গমন করেন ও তৎপরে বেনারসে সংস্কৃত পাঠ করিতে যান। তিনি যে এই সকল ভাষা ১৬ বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহার বহু প্রমাণ আছে। তিনি ১৬ বৎসর বয়সের পূর্বেই পৌত্তলিকতা-বিরুদ্ধ একটি পুস্তিকা রচনা করিয়া পিতার সহিত মনান্তরে লিপ্ত হইয়া পড়েন ও পরে ঐরূপ অপর একটি পুস্তিকা রচনা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া উত্তর ভারতে ভ্রমণে চলিয়া যান। ১৭৮২-৯০ বৎসরে তিনি তিব্বত গমন করেন ও সেই দেশের রাজধানী লাসায় থাকিয়া প্রায় দুইবৎসর মহাবান বৌদ্ধধর্ম চর্চার আত্মনিয়োগ করেন। এইখানে লামাদিগের সহিত তর্কবিতর্কের কালে তাঁহার প্রাণনাশ সভাবনা হয়; কিন্তু তিব্বতী মহিলাদিগের সাহায্যে তিনি দেশে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হন। নারীদিগের সাহায্যে প্রাণরক্ষা হওয়াতে তিনি আজীবন নারী জাতির প্রতি একটা প্রজ্ঞা ও কৃতজ্ঞতার ভাব পোষণ করেন ও তাঁহাদিগের সুখ দুঃখা স্বাধীনতা ও সর্বদায়ী মঙ্গলের জন্য সর্বদা সচেত থাকেন। সমাজ সংস্কার ও ধর্মমত লইয়া জাতা ও পিতার সহিত কলহের কালে তিনি ১৭৯৭ খৃঃ অব্দে গৃহত্যাগ করিয়া পৃথকভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। নিজের ব্যবসা পৃথকভাবে আরম্ভ করিয়া রামমোহন ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে হুইট ডালুক(রামেশ্বরপুর ও গোবিন্দপুর) ক্রয় করিয়া নিজ বহু রাজীবলোচনের হস্তে তাহার পরিচালনা ও বাজনা আদায় প্রভৃতির ভার্য্যাপন করেন। রাজীবলোচন আদায়ের টাকা তাঁহাকে নিয়মিত পাঠাইতে থাকেন।

১৮০১ খৃঃ অব্দে রামমোহন জন ডিগ্গবিব সহিত পরিচিত হ'ন। এই সময় তিনি অল্প অল্প ইংরেজী বলিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহার ইংরেজীর জ্ঞান অধিক ছিল না। তিনি ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ছুকাছুল-মুয়াহিদ্দিন পুস্তিকা কারসী ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করেন। ইহা একেশ্বর-বাদের সমর্থনে লিখিত হয় ও ইহার ভূমিকা লিখিত হয় আরবী ভাষায়।

রামমোহন রায় অতঃপর জন ডিগ্গবিব ও টমাস উডকোর্ড এই দুই রাজকর্মচারীর সহিত নানা কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রায় ১৮১৪ বৎসর কাটাইয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে ডিগ্গবিব তাঁহাকে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করার বোর্ড অফ রেজিট্রি তাঁহার সে নিয়োগ খারিজ করেন। ডিগ্গবিব তাঁহাদের এই কার্যের বিরুদ্ধে সতেন্দ্র প্রতিবাদ করেন। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে ডিগ্গবিব কার্যে ইস্তফা দিয়া ১৮১৬ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে চলিয়া যান। রামমোহন অতঃপর পাকাপাকি কলিকাতার বাস করিতে থাকেন। ১৮১৫ খৃঃ অব্দে তিনি “আত্মীয় সভার” প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইহার পরে যে সকল রচনা প্রকাশ করেন তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম নীচে দেওয়া হইল।

১৮১৫ বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্তসার, বাংলা অম্ববাদ। ১৮১৬ ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (বাংলা)। ১৮১৬ কেনোপনিষদ বাংলা ও ইংরেজী অম্ববাদ। ১৮১৬ ঐশোপনিষদ বাংলা ও ইংরেজী অম্ববাদ। বেদান্তের সারাংশ ইংরেজীতে অম্ববাদ। ১৮১৬ সংস্কৃতে উৎসবানন্দ বিভাবাগীশের সহিত বিচার। ১৮১৭ বাংলার বর্তমান যুগের হিন্দু পূজা পদ্ধতির দোষ ক্রটির আলোচনা। ১৮১৭ বদরায়ণের বেদান্তসূত্রের বাংলা অম্ববাদ। বাংলার বেদান্তসার। ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত বেদান্ত। ১৮১৭ কঠোপনিষদের বাংলা অম্ববাদ। ১৭১৭ মণ্ডুক্যোপনিষদের বাংলা অম্ববাদ। ১৮১৭ ইংরেজীতে কেনোপনিষদ। ইংরেজীতে হিন্দু-দিগের অভিব্যক্তি। বেদে একেশ্বরবাদ লইয়া ইংরেজীতে আলোচনা।

১৮১৭-২০ হর বংসর ধর্ম্মিরা বহু পাণ্ডিত্যবিশিষ্টের সহিত রামমোহনের পৌত্তলিকতা লইয়া সুদীর্ঘ তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৮১৮তে বাংলায় গায়ত্রীর অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হয়। গোবামীর সহিত বিচার, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ (ষষ্ঠীয় সম্বাদ) ও ইংরেজীতে কঠোপনিষদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮১৯ স্ত্রীক্ষণ্য শাস্ত্রীর সহিত তর্কবিতর্ক। ১৮১৯ সতীদাহ বিষয়ে পুস্তিকা। সপক্ষে বিপক্ষে মতামত বিচার। আত্মনাস্ত্যবিবেক প্রকাশ। বাংলায় মুক্তকোপনিষদ অনুবাদ। উহার ইংরেজী অনুবাদ। ১৮২০ বাংলায় কাবতাকারের সহিত বিচার। ১৮২০ সতীদাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে মতামত বিষয়ে ষষ্ঠীয় আলোচনার বর্ণনা। ১৮২০ যিশুর নীতিবাদ, সুখ ও শান্তির পথপ্রদর্শন (ইংরেজীতে) ও তাহার বাংলা ও সংস্কৃত অনুবাদ। এই পুস্তিকা লইয়া খ্রীষ্টান পাণ্ডিত্যবিশিষ্টের সহিত বহু বাদানুবাদ হয়। ডাঃ মার্ম্যান ও মিঃ স্মিট রামমোহনের সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করেন। রামমোহন তাঁহাদের প্রত্যুত্তরে অপরূপ পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের মতবাদ খণ্ডন করেন। ১৮২১ খ্রীঃমসীহের ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রকাশিত সমাচার দর্শন সাপ্তাহিকে হিন্দুশাস্ত্রসকলের মূল্যহীনতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হয়। রামমোহন রায় ঐ সকল সমালোচনার বিরুদ্ধে শিবপ্রসাদ শর্মা নামে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করেন। ১৮২১ ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি স্থাপন করা হয়। ব্রাহ্মণ সেবাধি প্রকাশ। ১৮২২ ঋঃ অশ্বে রাজা রামমোহন রায় একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। ডেভিড হেয়ার ও ডাঃ ডাককে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য দান। ১৮২২ হিন্দু নারীদ্বিগের উত্তরাধিকার বিষয়ে বর্তমান রীতির শাস্ত্র-বিরুদ্ধতা লইয়া ইংরেজীতে আলোচনা প্রকাশ। ডাঃ মার্ম্যানের বহুগুণ লওনে রাজা রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করেন। ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস রামমোহনের চিঠিপত্রাদি প্রকাশ না করার রামমোহন ধর্ম্মভাষ্যর একটি মুদ্রাবল্ল স্থাপন করেন। ইহার নাম হইল ইউনিটেরিয়ান

প্রেস। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মবিলাসিগণের নিকট আবেদন— বহু হিত্র ও ঐক্য উদ্ধৃতি সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। বড়লাট জন অ্যাডাম কর্তৃক মুদ্রাবল্লের নিয়ন্ত্রণ নীতি নির্ধারণ (প্রেস অ্যাক্ট)। রামমোহন রায় এই নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম পরিচালনা করেন। কিন্তু ভারত হইতে ইংলণ্ড অবধি সংগ্রাম চালাইয়া কোনও ফল হয় নাই। ১৮২৩ শিক্ষা বিষয়ে লর্ড অ্যাংলার্টকে লিখিত পত্র প্রকাশ। ১৮২৬ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (বাংলায়)। ইংরেজীতে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা। ১৮২৭ গায়ত্রীর ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্ (সংস্কৃত)। বঙ্গমুচী (বাংলা ও সংস্কৃত)। ১৮২৮ ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মসঙ্গীত। ১৮২৯ সতীদাহ প্রথা আইন-বিরুদ্ধ করা হইল। ১৮৩০ ব্রাহ্মসমাজের দানপত্রের নিয়মাবলী প্রকাশ। ১৮৩০ তিন মাসে আটখানি পত্র হিন্দু উত্তরাধিকার বিষয়ে আলোচনা প্রকাশ। ১৮৩০ ইংল্যান্ডে অবস্থান কালে গোড়ীয় ব্যাকরণ প্রকাশ করা হয়।

তথু ভাষাজ্ঞান দিয়াই যদি মানুষের গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিচার করা সম্ভব হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে রাজা রামমোহন রায় অসাধারণ বহুগুণ-বিশিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন। কারণ তিনি বহু ভাষাবিদ ছিলেন। সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, ফারসী, পালি, তিব্বতী, বাংলা, হিন্দী, উর্দু, তিনি উত্তমরূপেই জানিতেন। ইহা ব্যতীত তিনি আর কয়েকটি ভারতীয় ভাষাও অল্পবিস্তর জানিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে তিনি ১৪১৫টি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সে বাহা হউক, তথু ভাষাজ্ঞান দিয়া রাজা রামমোহনকে বিচার করিবার কোনও আবশ্রুকতা দেখা যায় না, কারণ তিনি প্রথমতঃ বহুগুণী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ও তত্বগণিত তাঁহার অত্যন্ত আধ্যাত্মিকতা, জাতীয়তাবোধ, দেশভক্তি, ভারতের প্রাচীন গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশ্রয়, নারীজাতির জীবন সম্পদ ও সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা প্রত্যাভি তাঁহাকে মানব সমাজের মহত্তম মানুষের একজন বলিয়া প্রমাণ করে। তিনি যে ১৮

বংসর বয়সে একাকী হিমালয়ের দুর্গম প্রাকার ও বিপদা-  
কীর্ণ ও ভূবারাচ্ছন্ন পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া লাসা  
গমন করিয়াছিলেন, শুধু সেই অসাধ্য সাধনের জন্যই  
তিনি ঔসাহসিক মাহুবিদগণের মধ্যে চিরস্মরণীয় হইয়া  
থাকিবেন। উক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মিয়া তিনিই প্রথমে  
ইংরেজী শিক্ষা করিয়া সমুদ্রপারে বিদেশী সম্রাটের  
মিকট নিজ দেশের বিভিন্ন অভিযোগ শুনাইতে  
গিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতবাসী বাহাকে  
দেখিয়া বিদেশী গুণীজন তাঁহাকে ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ  
মানবদর্শকের সহিত তুলনা করিয়া নিজেদের বিষয়  
প্রকাশ করিয়াছিলেন। মানব স্বাধীনতা, সাম্য ও  
মানবতার সকল অধিকারের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য রামমোহন  
রায় জীবনপণ করিয়া সংগ্রাম করিয়াছিলেন। সতীদাহ  
নিবারণ চেষ্টার জন্য তাঁহার জীবন একাধিকবার বিপন্ন  
হইয়াছে। পৌত্তলিকতা দূর করিয়া একেশ্বরবাদের  
প্রতিষ্ঠা চেষ্টার জন্যও তিনি সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া  
অগ্রসর হইতে বিধা করেন নাই। রাজশক্তি সমর্পিত  
বেতকার ধর্মযাজকদিগের হিন্দু শাস্ত্রের নিন্দাবাদ অপ্রমাণ  
করিবার চেষ্টায় এবং খ্রীষ্টিয় ধর্মের প্রচলিত আচার  
ব্যবহারের সমালোচনার আত্মনিয়োগ করিয়াও  
রামমোহন রায় নিজের নির্ভীকতা প্রমাণ করিয়া  
গিয়াছেন। এক দেশ কর্তৃক অপর দেশের উপর  
প্রভুত্ব স্থাপন অথবা এক ব্যক্তির অপর কোন  
ব্যক্তির উপর অন্তায় শাসন অধিকার দেখিলে  
রামমোহন রায়ের মনে নিদারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হইত।  
তিনি সেই কারণে কোন জাতি বা ব্যক্তি মুক্তলাভ  
করিলে মহানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। সেনের  
জনসাধারণের সংবিধানিক অধিকার লাভ, দক্ষিণ  
আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা প্রাপ্তি, দাসত্ব  
প্রথার উচ্ছেদ কিম্বা ব্রুটেনের রাষ্ট্রীয় সংস্কার (Reform  
Bill) আইন বলবৎ হওয়া, সকল কিছুই রাজা রামমোহন  
রায়কে বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছিল। এশিয়ার  
মাহুবিদ যে একদিন অদূর ভবিষ্যতে নিজ মানবীয়  
অধিকার পূর্ণ উপভোগে সক্ষম হইবে সে কথাও তিনি

বলিয়াছিলেন। এক জাতি অপর জাতির অধিকার  
স্বীকার করিয়া যদি প্রভুত্ব চেষ্টা সংঘত করিয়া সাম্যের  
আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে দুই  
জাতির মধ্যে বিবাদ না হইয়া বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়;  
শক্তিশালীর বিরুদ্ধে দুর্বলের বিজ্রোহের আবশ্যিকতা আর  
থাকে না, শক্ততা বিদূরিত হইয়া তৎহলে বন্ধুত্ব ও একতা  
বোধ জাগ্রত হয়। ব্রুটেনের সাম্রাজ্যবাদী পরদেশ-  
শাসকদিগকে এই সত্য উপলব্ধি করাইতে রাজা রামমোহন  
রায় নানাভাবে চেষ্টা করিতেন। ভারতের মাহুবিদ যে  
ইংরেজী ভাষা শিখিয়া বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া  
একদিন সর্বক্ষেত্রে ইংরেজের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে,  
এ কথাও তিনি বলিতেন। ভবিষ্যতের সেই  
পরিহীতিতে ইংরেজ বাহাতে ভারতের সহিত মৈত্রীর  
সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া চলিতে পারে তাহার জন্য ইংরেজের  
পূর্ব হইতেই ভারতীয় মানবকে আত্মোন্নতির কার্যে  
সাহায্য করা উচিত, এ কথাও রামমোহনের।

সমাজ সংস্কার, রাষ্ট্রীয় বিলব্যবহার ভিতরে ভিতরে জ্বল ও  
প্রগতিশীলতার প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার বিস্তার, নানা বিষয়ে  
বাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন, সংবাদপত্র প্রকাশ, সর্বধর্ম  
সমন্বয় সাধন করিয়া বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্বের ও এক ধর্ম  
অবলম্বনের আদর্শকে কার্যকর রূপ গ্রহণ করাইবার  
চেষ্টা, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতিকে নিজ নিজ ধর্মের  
সত্যরূপ উপলব্ধি করিতে শিক্ষা দান, রাজকার্য ও শাসন  
ক্ষেত্রে জ্ঞান ও সুনীতির প্রসার, প্রভৃতি বহু বিষয় রাজা  
রামমোহন রায়ের অন্তরে চিরজাগ্রত থাকিত। যে-  
খানে যাহা উচিত ও উত্তম সেইখানেই তাহাকে গঠন  
করিয়া উন্নততর রূপ দান করিবার চেষ্টা তাঁহার জীবনের  
মূলমন্ত্র ছিল। একাধারে বহু গুণ তাঁহার মধ্যে সঞ্চিত  
হইয়াছিল, সে যুগের নানাক্ষেত্রের অভাব, রিক্ততা ও  
বিকৃত রাষ্ট্রনীতির উপাধিতির কারণে। ধর্ম সংস্কার,  
রাষ্ট্রনীতি গঠন, সামাজিক রাষ্ট্রনীতির যথাযথ  
পরিবর্তিত আকার প্রবর্তন, ভাষার উন্নয়ন, শিক্ষা ও  
অপরূপ জনমঙ্গল প্রতিষ্ঠান সকল গড়িয়া তোলা  
ইত্যাদি বহু কার্য ও আদর্শ এই একই মহামানবের

যত্ন-প্রসূত হইয়া সেই যুগে আধ্যাত্মিকতা, কৃষ্টি, সভ্যতা, জাতীয়তা ও বিশ্বমানবতাবোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাস্তবরূপ গ্রহণে সক্ষম হইয়াছিল। রাজা রামমোহন রায়ের অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভা ভারতীয় মানবকে প্রাচীনতার আড়ষ্ট মনোভাবের অর্দ্ধমৃত অবস্থা হইতে টানিয়া তুলিয়া প্রগতির পথে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল, এবং কৃষ্ণাভি পরিভ্যাগ করিয়া ভারতবাসীজনকে উন্নত আদর্শে সভ্য জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার পরবর্তী বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল মহানুষ্ঠেতা নেতৃগণ ভারতকে নূতন আদর্শে অগ্রগমনে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারা কদাপি সে কার্য্যে সক্ষম হইতেন না যদি না রাজা রামমোহন নানাভাবে জাতিকে স্বাভিনীতি ও জীবন নিদাহ পহার উন্নত আদর্শ অনুসরণ করিতে

শিক্ষাদান করিতেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, রাজা রামমোহন, ভারতে যুগে যুগে যে সকল মহামানব জাতিকে উন্নতির সোপানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আবির্ভূত হন, তাঁহাদেরই অন্ততম। তিনি না আসিলে ভারতে আধুনিক কাল কখনও স্বার্থ রূপ ধারণ করিয়া প্রবহমান হইত না। স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন যে, রাজা রামমোহনের নিকট হইতে তিনি দেশভক্তি, বেদান্ত ও সর্ব্বধর্ম্মসম্বন্ধ এই তিন শিক্ষা লাভ করিয়া ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি পরবর্তী কালের জাতি-প্রগঠনকারী মহাজন সকলেই রাজা রামমোহন রায়ের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তিনিই ছিলেন নব জাগরণের দীপ্ত আলোকবাহী পথদর্শক।





# নেতা রামমোহন

কাজী আবদুল ওহুদ

বাংলার পুরুষকারের সূৰ্ত্ত-বিগ্রহে মুক্তিযুদ্ধের মহা উল্লাসাতা রামমোহনের প্রতি আমি হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা বহন করি কথায় তা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারব কি না বলতে পারি না ; কিন্তু রামমোহনকে ও তাঁর প্রবর্তিত ব্রাহ্ম আন্দোলনকে সমস্ত অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতে পেরেছি বলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করি।

যুদ্ধ ফলেন পরিচীরতে ; রামমোহনের মহুত্বের ও মুক্তিসাধনার মাহাত্ম্য কত তাও চীৎকার করে বলবার দরকার করে না। তাঁর প্রচারের পর শতবৎসর গত হয়েছে, এই একশত বৎসরের বাংলার ইতিহাসের উপর চোখ বুলিয়ে গেলে বিষ্ময়ে শ্রদ্ধায় আপনি সে মাহাত্ম্যের পরিমাপ হয়। এই শত বৎসরে বাংলার হ্রস্ব সর্গস্থপণে সত্যের সাধনা করেছে, জীবনের প্রকৃত আশা লাভের জন্য ; প্রকৃত রূপ দেখে নয়ন সার্থক করার জন্য, অতি নির্মম হয়ে প্রাচীন সংস্কারকে আক্রমণ করেছে ; মানবাত্মার সেই সংগ্রামের সামনে মৃত্যু আপনি নত হয়ে আসে। সত্য-সাধনার এই কি স্বরূপ নয় ? কোনো এক যুগে মানুষ সত্য-সাধনা করেছে ; তারপর সেই অতীত সাধনার রোমহন করেছে মানুষের চলে বা চলতে পারে, মানুষের স্থণিত অধঃপতন ও শেচনীয় আধ্যাত্মিক আত্মহত্যার পক্ষে বার বার কি একথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় নাই ? পণ্ডিতবোঁর মতো সত্য কোথাও কিনতে পাওয়া যায় না —না শাস্ত্রের কাছ থেকে, না গুরুর কাছ থেকে,—যুদ্ধে পুণ্যোদ্রগের মতো পরম বেদনার মানবজীবনের ভিতর থেকে তার জন্ম হয়, মানুষের জীবনে এই মহা-স্ফটিক

প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য এই শত বৎসরের বাংলার ইতিহাসে আমাদের ঘটেছে। আর কে না আজ জানে সেই সৌভাগ্যের জন্য কোন্ পরম ভাগ্যবানের কাছে আমরা ঋণী।

কিন্তু রামমোহনের যে গভীর ভপত্ৰা, কালের পটে মানবতার যে নব চিত্রাঙ্কন প্রয়াস, এই শত বৎসরের বাংলার ইতিহাসেও তার আংশিক পরিচয়ই আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে, পূর্ণ পরিচয়ের উদ্ঘাটনের তার স্তম্ভ রয়েছে ভবিষ্যতের উপর। প্রধানতঃ দুটি কথা ভেবে এ কথা বলছি। প্রথমতঃ, রামমোহনের যে মুক্তিযুদ্ধ, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-অভিমানী বাঙালীর কণ্ঠে আজ তা আর উদাত্ত সুরে বিধোবিত হচ্ছে না, দ্বিতীয়তঃ, রামমোহনের আত্মীয়-গোষ্ঠীর এক বড়ো শাখা, অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়, তাঁর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজও সচেতন হয়ে ওঠে নাই। রামমোহনের বিরাট চিন্তা হিন্দু-মুসলমান এই দুই প্রবল ভাবধারার সঙ্গমস্থল ছিল। হিন্দু সেই মহাতীর্থে স্নান করে কিছু শক্তি ও শ্রী অর্জন করেছে। এতীর্থে যে মুসলমানেরও শক্তি ও শ্রী লাভের জন্য অমোদ্য, শ্রীই হোক আর বিলম্বই হোক মুসলমানকেও একথা স্বীকার করতে হবে।

কেন একথা বলছি তা একই বিষয়-ভাবে বললে. অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পরিবর্তন জগতের নিয়ম। সে পরিবর্তন যে মানুষের কথায়-বার্তায়, সাজসজ্জায় ও জীবনযাত্রার প্রণালীতেই সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, মানুষের

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৬, রামমোহন স্মৃতিবাসরে পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ দপ্তরে পঠিত।

বড়-বিবাস, সাহিত্য-ধর্ম এ সমস্তেও তা বর্তে। কিন্তু জীবনে পরিবর্তনের শাসন স্বীকার করলেও বুধে তা স্বীকার করতে মানুষের ঘোর হয়; এ স্বাভাবিক; মানুষের জীবন তার কথার আগে চলে। কিন্তু ঘোর হলেও যে-সমাজ সভ্যতার দাবি করে, অস্তিত্ব সভ্য সমাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বেঁচে থাকতে চায়, তার পূর্ণভাবেই পরিবর্তনের শাসন স্বীকার করে নেওয়া ভিন্ন গভীর নাই। তাই আধুনিককালের সঙ্গে মুসলমানের যখন সম্যক পরিচয় হবে এবং সেই পরিচয়ের প্রভাবে এক নূতন দৃষ্টিতে সে তার প্রাচীন শাস্ত্র ও সভ্যতার প্রতি চাইতে বাধ্য হবে, তখন বিশ্বয়ে প্রত্যয় সে দেখবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশের এই মহাপুরুষ ইসলাম ও মুসলমানের অনেক কিছু উপাদানরূপে ব্যবহার করে আধুনিক জীবনের প্রয়োজনে কি এক পৌরবসয় নবসৃষ্টির ভিত্তি পত্তন করেছেন—এবং সেই দিক দিয়ে আধুনিক মুসলমানদের তিনি কিরূপ একজন অগ্রবর্তী নেতা। ভিন্ন সমাজের লোক হয়েও রামমোহন যে এই অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিলেন তার আংশিক কারণ আত্মপ্রকৃতির ধর্মে হৃদয়ত মোহনদের চরিত্রের প্রতি তিনি আকৃষ্ট ছিলেন; আর ইসলামের ইতিহাসে যা কিছু মূল্যবান, যা কিছু স্মরণীয়, যেমন কোরআন, হৃদয়ত মোহনদের জীবনী ও বাণী, মোতাজ্জেলা দর্শন, হাফ সাহিত্য, এ সমস্তের সঙ্গে তাঁর অতি গভীর পরিচয় ছিল—এমন গভীর যে তার সাহায্যে যে কোনো কিছুকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নেওয়া যায়। তাই হিন্দু যেমন রামমোহনকে ব্রহ্মবাদী ঋষির উত্তরপুরুষ বলে গণ্য করেছেন, মুসলমানও তেমন একদিন তাঁকে ‘তোহাদ’-মন্ত্রী সাম্যবাদী হৃদয়ত মোহনদের একালের একজন শক্তিশালী শিল্পরূপে জানবেন এবং তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করে তাঁর স্তুতিমন্ত্রে নিজেদের হারিয়ে-কেলা-স্তুতি ও মহত্ত্ববোধের অন্তত্বাদ পুনরায় লাভ করবেন।

বাস্তবিক, হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের চিন্তাধারার প্রতি প্রত্যয়িত হয়ে উভয়ের শাস্ত্রকে আখ্যাত করে, হিন্দু ও

মুসলমান সমস্তার জটিলতম অংশের সমাধান রামমোহন নিজের জীবনে ও সৃষ্টিতে করেছেন। আজ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই চিন্তে শুভবুদ্ধি শোচনীয় ভাবে আচ্ছন্ন। এই আত্মঘাতী মোহের অবসানে, আধুনিক ভারতের সভ্যতার নেতা রামমোহনের উপর উভয়ের দৃষ্টি পড়লে, হয়তো স্নকল ফলবে।

আর শুধু হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কেন, প্রাচীন শাস্ত্রকে একেবারে বাছ না দিয়ে, কিন্তু সেই শাস্ত্রের উপর বিচারবুদ্ধি ও লোক-শ্রেয়ের আদর্শের প্রাধান্য দিয়ে নব্য ভারতের এগিয়ে চলার জন্য যে পথ নির্দেশ তিনি করেছেন, মনে হয়, ভারতের জন্য আজও সেই-ই শ্রেষ্ঠতম পথনির্দেশ। রামমোহনের পরে অস্তিত্ব সাধকের আর্গিভাব ভারতভূমিতে ঘটেছে; তাঁদের প্রচারের ফলে গুরু ও শাস্ত্রের নব প্রয়োজনীয়তা মানুষ উপলব্ধি করেছে, মানুষের জ্ঞানের পরিধিও কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে ভেবে দেখবার কথা এই, ভারতের কোন্ সমস্যা বড়ো, “হৃদয়ারণের গহন” ঘুরপাক খাওয়ার সমস্যা, না, বৃহৎ জগতের সঙ্গে কি ভাবে যোগবৃত্ত হওয়া যায় সেই সমস্যা। মনে হয়, বৃহৎ জগতের সঙ্গে কি ভাবে যোগবৃত্ত হওয়া যায় সে-বিষয়ে ভারত বহুকাল ধরে অনেক পরিমাণে উদাসীন রয়েছে বলে ‘সোহং’ ‘সকং’ ‘খিদিং ব্রহ্ম’ ‘নরনারায়ণের পূজা’ ইত্যাদি মহাসম্বৎসারী সঙ্কেত কোন্ অতীত কাল থেকে তার বুকের উপর দিয়ে হাত ধরাধরি করে চলে আসছে হীনতম অস্পৃশ্যতা, উৎকট বর্ণবিভাগ সমস্যা। এই সংকটে হয়তো রামমোহনের ‘শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা লোকশ্রেয়ঃ আর বিচারবুদ্ধি’র আদর্শেরই এই ক্রমতা আছে যাতে ভারতের জড়তাগ্রস্ত সাধারণ জীবনে বীর্ষ সঞ্চারিত হতে পারে।

এমন হতে পারে, লোকশ্রেয়ঃ আর বিচারবুদ্ধিকে যখন শাস্ত্রের উপর প্রাধান্য দেওয়া হল, তখন শাস্ত্রের কথা একেবারে না তোলাই হয়তো সমীচীন ছিল। এর সাধারণ উত্তর—লোকসিহঁতির জন্য এর প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের আর একটি কথা মনে হয়।

শাস্ত্র বাঁদের চিত্ত থেকে উৎসারিত হয়েছিল তাঁরাও গভীরভাবে সত্য ও প্রেরণ: অন্বেষণী ছিলেন, সত্যের অপরাধ পুলক-বেদনা নিজেদের চিত্ত দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই চিরবহস্যমণ্ডিত সত্যের অন্বেষণ বন্ধন কারো ভিতরে প্রবল হয়ে জাগে তখন কোনো কোনো শাস্ত্র তাঁর পক্ষে অমূল্য অবলম্বনেরই কার্য করতে পারে। রামমোহনের আঁত গভীর প্রকৃতি মানুষের এ প্রয়োজনকে উপেক্ষার চক্রে দেখতে পারে নাই। কিন্তু কারো কারো পক্ষে কোনো বিশেষ অবস্থায় শাস্ত্রের এবংবিধ প্রয়োজন অহুত্ব হলেও সর্গসাধারণের স্বাভাবিক অবস্থায় লোকপ্রেরণ: আর বিচারবুদ্ধির আদর্শই যে মানুষের পক্ষে অশেষ কল্যাণের নিদান আঁত পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতেই তিনি সে সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাস্তবিক যত গভীর করে আমরা ভাবতে যাব ততই স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারব, রামমোহনের এই যে আদর্শ, প্রাচীন শাস্ত্রে প্রজ্ঞা কিন্তু তারও উপর লোকপ্রেরণ: ও বিচারবুদ্ধির প্রাধান্য, মানুষের সমাজকে দবল ও হুম্মর রাখবার ক্ষেত্রে এ কত অবাধ।

এই সম্পর্কে আর একটি কথা আমাদের মনে পড়ছে—পরে পরে উদ্ভাবিত উপশাস্ত্রগুলির প্রতি কতকটা উপেক্ষা প্রদর্শন করে রামমোহন মানুষকে চোখ দিতে বলেছেন সব ধর্মের মূল শাস্ত্রের উপর। পৌরাণিক যুগকে উপেক্ষা করে হিন্দুকে তিনি অবলম্বন করতে বলেছেন বেদ ও উপনিষৎ; ‘মোহান্দেস’দের ইসলাম ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে মুসলমানকে অবলম্বন করতে বলেছেন মূল কোরআন, আর পরে পরে উদ্ভাবিত ত্রিষবাদ প্রভৃতি উপেক্ষা করে খ্রীষ্টানকে গ্রহণ করতে বলেছেন মূল বাইবেল।। অথচ তিনি নিজে প্রাচীন বৈদিক ঋষির মতো জটা বহনও পরিধান করেন নাই, কলমূল খেয়ে জীবন অতিবাহিত করার প্রয়োজন তেমন অহুত্ব করেন নাই, আর শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষকে বিশেষ করে অহুশীলন করতে বলেছেন আধুনিকতম বিজ্ঞান। তাঁর এই মনোভাবের অর্থ মিলবে তাঁর এই উক্তি়র ভিতরে, “ধর্ম যদি ঈশ্বরের, রাজনীতি তবে কি শরতানের!”

অথবা সে অর্থ আরও ভালো করে মিলবে গুরু কামালের এই বাণীতে :—“বিশ্বজগৎ চলেছে ভগবানের উৎসব যাত্রায়, নিত্যই চলেছে তাঁর ‘বরিত্রাত’ (বরযাত্রা)। প্রতি মানব নিজ নিজ মশাল জালিয়ে চলেছে। গ্রহ চক্রে তারার মশালশ্রেণী চলেছে অসীম আকাশে, মানব সাধনার দীপাবলী চলেছে কালের আকাশে। সাধক মাঝে মাঝে ভুলে যায়, ধ্যান নিজীব হয়ে আসে, নিত্যকালের উৎসব-পথে হুম্মান মশাল নিয়ে মানব ঘুমিয়ে পড়ে। এমন সময়ে মহাপুরুষ আসেন বহুগভীর উদ্‌বোধন মন্ত্রে তাদের জাগিয়ে দিতে। সাধন যখন যেখানে প্রাণহীন হ্রগিত হয়ে আসে, অগ্নিময়ী দীপা নিয়ে সেখানেই মানবের মহাগুরুরা আসেন। তাঁরা চলে গেলে বিবরী কুপণ সাম্রাজ্যিক ভাণ্ডারীরা সেই মশালগুলিও চায় সক্ষয় করে রেখে বৈবরিকতা চালাতে। জলন্ত মশাল ভাণ্ডারে জমানো অসম্ভব, তাই তারা নিজীব আগুনটুকুও নিবিয়ে সংগ্রহ করে কেবল মশালের স্মৃতি দণ্ড এ দক্ষাংশে নেকড়া।”\* বাস্তবিক সমস্ত রকমের সত্য অহুসন্ধান, সমস্ত শুভ চেষ্টা (রাজনীতিও) যে আমাদের জীবনে ভগবানের উৎসব—ঈশ্বরে সমর্পিত-প্রাণ মতাকর্মী রামমোহন তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই যেখানে মানুষ অহুহীন প্রয়াসে নিজেদের ভগবানের উৎসব আয়োজন করেছে, যেমন প্রত্যেক ধর্মের মূল শাস্ত্রগুলির ভিতরে অথবা আধুনিক বিজ্ঞানে, সেখানে তিনি সপ্রক্স নেত্রপাত করেছেন। কিন্তু যেখানে সেই উৎসবে রচনার চাইতে হীন অহুকরণের আয়োজন, উহুহুস্তির আয়োজন বেশি হয়েছে, মানুষের অনন্ত শুভ চেষ্টার নিরামক চিরজাগ্রত ভগবানের সঙ্গে যোগগুক্ত হওয়ায় যে স্মৃতির অপরিণামী আনন্দ, তা ক্ষুন্ন হয়েছে, যেমন পরে পরে উদ্ভাবিত উপশাস্ত্রগুলির ভিতরে, সেখান থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন। রামমোহনের এই যে চিরজাগ্রত ভগবানকে

\* শ্রীযুক্ত কিতামোহন সেন মহাশয়ের অপ্রকাশিত সংগ্রহ থেকে গৃহীত।—লেখক।

মানুষের অন্তরীণ ও ভ্রান্ত প্রয়াসের ভিতর দিয়ে উপলব্ধি করার সাধনা, সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের সাহিত্যে তা অনেকখানি রূপ লাভ করেছে। তাই আশা হয়, হয়তো বাঙালী তার গোঁব-সামগ্ৰী রামমোহনের মাহাত্ম্য একদিন পূর্ণভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে, এবং তাতে করে ইতিহাসে তার জন্ত এক বড়ো জাঁতির আসন রচিত হবে।

জ্ঞানই মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়, রামমোহনের এই মত সৰ্ব্বদে ছুটি একটি কথা বলে আমার এই সামান্ত আলোচনার উপসংহার করব। মুক্তি অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি কি সে-সবদে স্পষ্ট কথা হয়তো কেউই কাউকে বলে দিতে পারেন না। যিনি সে মুক্তি পান, তিনি নিজেরই তা অনুভব করেন, কিন্তু কেমন করে তাঁর সেই অনুভূতির অধিকারী অন্তেও হতে পারে, সে সবদে যে সব উপদেশ আদেশ তিনি অপরকে দেন তা তার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, পর্যাপ্ত হলে মানুষের ধর্ম কি, পথ কি, তার মীমাংসা জগতে সহজ হয়ে আসত। তার উপর, মুক্তিপ্রাপ্ত বলে মানুষের নিকট খারাপ পরিচিত সেই সকল অবতার, পয়গম্বর, ঋষি, সাধক, কবি প্রভৃতির যে সমস্ত জীবনকাহিনী ও বাণী আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি তা মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখলে মনে হয়, হয়তো এঁদের সকলের কাছে মুক্তির একই রূপ, একই আশ্বাদ ছিল না। কিন্তু এ বিচারের চাইতে এই সম্পর্কে অন্য একটি কথা আমাদের কাছে বেশি মূল্যবান, সেটি এই যে, এই মুক্তিপ্রাপ্তের ভিতরে যাঁরা জ্ঞানের উপর বেশি জোর দিয়েছেন

তাঁরাই মানুষের বেশি নির্ভরযোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন— তাঁদের নেতৃত্বে মানুষের আত্মপ্রকাশের অবসর বেশি ঘটেছে। তাই, জ্ঞানই মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায় কি না সে বিচারের ভার মুক্তির অধিকারীদের উপর স্তম্ভ রেখে একথা আমরা সহজভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, জ্ঞান-সাধনার ভিতরে মানুষের অনন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

এর উপর আধুনিক ভারতবাসীদের জন্মে তাদের নেতার এই কথার অল্প অর্থও আছে? ভারতে শান্তি ও মৈত্রীর সমস্তা প্রায় তুল্য রূপে কুঞ্চিত। এ অবস্থার জ্ঞানের অনির্ণাণ সাধনাকে উপেক্ষা করে কোনো সম্ভাব্যবিশেষের বা শাস্ত্রবিশেষের বিশ্বাস-কটিকে প্রাধান্য দিলে সত্যকার কল্যাণের পথ থেকে দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বাস্তবিকই, জ্ঞানের সাধনাকে দৃঢ়মুঠিতে অবলম্বন করা ভিন্ন ভারতের যে প্রকৃত কল্যাণ নাই, যে কোনো চক্ৰযান ব্যক্তি তা স্বীকার করবেন।

ভারত এক নব সময়ই কামনা করছে। নব মানবতার উদ্‌বোধন মানবজীবনের সব সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস, ভারতের সত্যকার মঙ্গলের জন্ত চাই। রামমোহনের মুক্তিমন্ত্রে বিরাট জ্ঞান-সময়, সেই নব সময়ের ভিত্তি হয়েছে, পশ্চিম আত্ম তাঁর স্বাভাব্যসরে এই কথাটি সসম্মানে স্বরণ করছি।

প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩০।



# রাজা রামমোহন রায়

জ্যোতির্ষদী দেবী

রাজার জন্মসন নিয়ে মতভেদ আছে। আলোচনাও চলছে দেখছি পত্র-পত্রিকায়। (আমরা তাঁকে রাজাই বলব। পূর্বেও অনেকে তাঁকে রাজাই বলেছেন। বিপিন পাল-মহর্ষি প্রমুখ।)

জন্ম বর্ষ মতভেদে সাধারণের কিছু যায় আসে না। সেটা ঐতিহাসিকের এলাকা। তিনি ঐতিহাসিকে নির্ণয় করতে পারেন করুন।

মেয়েরা আমরা সন্তানদের জন্মতিথি পালন করি। কিন্তু এখনকার ছেলেরা তারা জন্মদিন পালন করে। অনেক সময়ে দুটোর ব্যবধান ২০-২৫ দিন মাস খানেক হয়ে যায় “ম’লমাস” হলে।

দেখা যাবে কুক জন্মষ্টমী, রামনবমী, বুদ্ধপূর্ণিমা পৌরপূর্ণিমা নানক পূর্ণিমা (এটি জন্মদিন বা তিথি নয়, শিশুদের নিজেদের মতে জন্মদিন করা) ইত্যাদি সব আবির্ভাব-তিথিগুলি তারিখের সঙ্গে মেলে না। কুক জন্মষ্টমী শ্রাবণ ভাদ্র হু’মাসেই পড়ে। রামনবমীও তাই, কান্তনু চৈত্র বৈশাখেও পড়ে। এবং তাঁদের জন্ম সালের কথাই বা কে জানে। রাম, কুক, বুদ্ধদেবের। চৈত্রভদ্রেবেরও তাই। তবু আবির্ভাবের আনন্দ, তিরোধানের বেদনা মানুষের হৃদয়ে বহন করতে বাধা হয় না।

ব্যাস বাঙ্গালী কালিদাসেরই বা জন্মতিথি সাল মাস বছরের সন্ধান কার জানা আছে, কিন্তু তাঁদের অমরত্ব লাভে কিছু বাধা হয়েছে বলে জানা নেই। দেশকালাতীত হয়ে সারা ভারতের হৃদয়ে তাঁরা বেঁচে আছেন।

আমরা আমাদের মেয়েলী প্রথায় ১১১২/১১১৪ খোঁচি তাঁর জন্ম সাল হোক না—১১১২/১১১৪কেও বিশতবার্ষিকী স্মরণ উৎসব মনে করে সমান আনন্দ প্রকাশ

ও প্রণাম জানাব। হু-এক বৎসর এগিয়ে বা পিছিয়ে গেলেও তাঁর কর্মের জীবনের মহত্ব ও মহিমার কম বেশী হবে না।

এখন আমরা রাজার সম্বন্ধে কতকগুলি উক্তি পাঠকের কাছে তুলে দিচ্ছি। রাজার কীর্তির আলো, কর্মের প্রভাব, আদর্শের ভাবদীপ কতভাবে সমসাময়িক ও পরবর্তীদের ওপর পড়েছিল দেখতে পাওয়া যাবে।

কিন্তু তার আগে বলি ঐ লোকোত্তর পুরুষটির নিজের সুখে বলা নিজের জীবনের একটুখানি কথা। তাঁর কলিকাতায় বহু গর্ভন সাহেবকে লেখা।—“যোলো বছর বয়সে আমি দেবদেবী-বাদী ধর্মের বিরুদ্ধে একখানি বই লিখিয়া আত্মীয়স্বজনদের একান্ত বিরূপ ভাজন হই। তখনই আমি গৃহত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্গত নানা প্রদেশে ভ্রমণ করি। পরিশেষে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অভ্যন্ত বিরাগবশতঃ ভারতের বিহীনুত কয়েকটি দেশও ভ্রমণ করিয়াছিলাম। তারপর আমার বিংশতি বৎসর বয়স হইলে আমার পিতা আমাকে পুনরায় আহ্বান করেন। এবং তাঁর স্নেহ লাভ করি।

“ইহার পর হইতেই আমি যুরোপীয়গণের সংসর্গে আসিতে আরম্ভ করি। তাঁহাদের সাধারণতঃ অধিকতর বুদ্ধিমান, দৃঢ়চরিত্র, ও মিতাচারী দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি যে আমার কুসংস্কার ছিল তাহা ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম।

কিন্তু পৌত্তলিকতা ও অস্ত্রাস্ত্র বিবরে বিবেচনাকার ব্রাহ্মণদের সহিত সহমরণ ও অস্ত্রাস্ত্র নানা অনাটিকর প্রথা নিবারণের জন্য হস্তক্ষেপ করা ও ক্রমাগত তর্কবিতর্ক হওয়াতে আমার প্রতি তাঁহাদের বিবেচ পুনরুদ্ধারিত হইল। এবং পরিবারে তাঁহাদের ক্ষমতা ও প্রভাব থাকাতে পিতা পুনরায় বিরূপ হইলেন। কিন্তু কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করা হইত।

‘এই তর্ক বিতর্কে আমি কখনো হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত ধর্মের নামে যে বিকৃত ধর্ম প্রচলিত তাহাই আমার বিতর্কের বিষয় ছিল। কিন্তু দেশবাসী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কতিপয় কটল্যাওবাসী বহু ছাড়া আর সকলেই আমাকে ত্যাগ করিল। তাঁহাদের ও তাঁহাদের জাতির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

‘কিন্তু কিছু সম্রাস্ত ব্যক্তি বিরোধ সত্ত্বেও আমার মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

‘এই সময়ে আমার য়রোপ যাওয়ার ইচ্ছা হইল। পরিশেষে সে আশা পূর্ণ হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতের ভাবী রাজ্য শাসন নূতন সনন্দ দ্বারা স্থিতিস্থাপক হইবে। এবং সতীদাহ নিবারণের বিক্রমে প্রিন্সি কাউন্সিলনে আপীল গুনানি হইবে বলিয়া আমি ১৮৩৩ নবম্বরে বিলাতি যাত্রা করিলাম’..... (নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রাজা রামমোহনের জীবনী থেকে।)

যত সংক্ষেপে রাজা তাঁর জীবনকথা বলেছেন, তত সংক্ষেপে ও সহজে তাঁর জীবনের মহৎ কর্মগুলি সম্পন্ন হয়নি, সকলেই সেকথা জানেন। এবং সেইখানেই হুঁশো বছরের নানা মাত্রের দৃষ্টির প্রদীপে তাঁকে আঞ্জো সমান উজ্জল মূর্তিতে দেখতে পাওয়া যাবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।—‘সকল মহাপুরুষের মতই রাজা অত্যন্ত বিনীতস্বভাব ছিলেন। অসংখ্য লোক তাঁর নিকট আসতেন। তর্কও করতেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তর্ক করার মত উপযুক্ত কেহ আসতেন না। প্রায়ই অসংলগ্ন বিশৃঙ্খল কথা বলতেন। রাজা কিন্তু সকলের কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কাউকে চলে যেতে বলতেও পারতেন না। যখন প্রতিপক্ষ অত্যন্ত নিবোধের মত কথা বলতেন, তখন তিনি বলতেন, ‘এখন একটু বাগানে গেলো কেমন হয়’। আমি প্রায়ই রাজার বাড়ী যেতাম। কিন্তু কোন কথাবাড়াই হত না। আমি বসে তাঁর সুন্দর মুখ দেখতাম। তাঁর প্রতি আমার অত্যন্ত আকর্ষণ ছিল। আমার পিতার তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। পিতা সকালে কুল

আদি নিয়ে প্রকৃত ভক্তির সঙ্গে পূজা করতেন। এমন সময়ে রাজা এলেই তিনি উঠে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করতেন.....।

‘ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হবার পর আমি মাঝে মাঝে লুকিয়ে সেখানে যেতাম। তখনও কিছু গান করতেন। রাজার সমাজেও তিনি ও তাঁর ভাই কৃষ্ণ একত্রে গান করতেন। গোলাম আকাস নামে একজন পাখোয়াজ বাজাতেন। ‘বিগত বিশেষ’ গানটি রাজার অত্যন্ত প্রিয় ছিল।’

(নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রামমোহন চরিত থেকে।)

বঙ্কিমচন্দ্র।—‘মহাত্মা রামমোহনের পূর্বে বহু পণ্ডিতাগ্রগণ্য মাত্রের থাকিলেও বাংলা ভাষা বঙ্গ জলাশয়ের মত শ্রোতহীন প্রবাহহীন ছিল। তাঁহার হাতেই তাহা সহজ শ্রোত পায়। রামমোহন রায় এখনকার হারিসন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ মহাশয়দের পূর্বগামী,—তাঁহাকে দেশবাংসল্যের পূর্বগামী প্রধান নেতা বলা যায়।’ (প্রবন্ধাবলী থেকে।)

বিপিনচন্দ্র পাল।—‘রাজা রামমোহন ধর্ম ব্যাখ্যাভা। ধর্ম প্রবর্তক নহেন। ঈশ্বর তত্ত্ব ও ধর্ম তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেই তাঁর শাস্ত্র প্রচার বেদান্ত সূত্র এক—পাঁচটি উপনিষদ ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক ও মাতৃক্য আদি উপনিষদের প্রচার সঙ্গাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তাঁহার কাছে মনে হইয়াছিল।...

‘রাজা জীবনকে সত্যের, কর্মের সার্থক এবং ধর্ম ও ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের সাহিত যুক্ত সত্য ও বস্তুগত পরিবার জগৎই একদিকে বেদান্তের প্রচার অভ্যাসকে পাকাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষার বিস্তারের জন্য যুগপৎ চেষ্টা করিয় ছিলেন।.....এইজন্যই তিনি লন্ড্র আমহাঠ’কে এদেশে পাকাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন.....।’

(চরিত্র চিত্র থেকে।)

রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ রাজাকে ‘ভারত পথিক’ বলেছেন। বলেছেন, ‘আমরা ভুলিয়া যাই রামমোহন রায় আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণ কর্তা।—

“কি রাজনীতি, কি সমাজ, কি বঙ্গাশিকা, কি ভাষা, এমন কি প্রাচীন শাস্ত্রালোচনায় যে এক নতুন উৎসাহ দেখা যাইতেছে তাহারও তিনিই পথ প্রদর্শক। তিনি বঙ্গদেশকে প্র্যান্টি-ত্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন.....”

(‘বঙ্গিচন্দ্র’ প্রবন্ধ থেকে।)

বিবেকানন্দ।—“এই নৈনিতালেই স্বামীজী রাজা রামমোহন রায় সবক্ষে অনেক কথা বলেন। তাহাতে তিনি তিনটি প্রধান বিষয় এই আচার্য্যের শিক্ষার মূলমন্ত্র বলিয়া নির্দেশ করেন। তাঁহার বেদান্ত গ্রন্থ, স্বদেশপ্রেম প্রচার, হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে প্রীতি—এই সকল বিষয়ে রাজার উদারতা ও ভবিষ্যদর্শিতা যে কার্য্যপ্রণালীর সূচনা করিয়াছিল, তিনি নিজেও তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন, বলিতেন.....” (নিবেদিতা। “স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে” ৫ পৃঃ।)

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।.....“তিনি বাঙালীর, ভারতীয়দের, সকল মানবজাতির যে সর্বাঙ্গীন আদর্শ মনে রাখিয়া চিন্তা অর্থব্যয় স্বার্থভ্যাগ করিয়াছিলেন, এক লোকনিন্দা উৎপীড়ন সহ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের প্রতিজ্ঞা ও চিন্তা প্রসূত। তাঁহার সকল চেষ্টার মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল, কল্যাণের আদর্শ অথবা মানবপ্রীতি ও মানবজাতির মঙ্গলসাধনের চেষ্টাই ভগবৎ ভক্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন—এবং শ্রেষ্ঠ সেবার উপায়”.....। (প্রবাসী থেকে।)

কাজী আবদুল ওহুদ সাহেব।—“তিনি ছিলেন সহজভাবে সত্যবিজ্ঞান। জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হইত এই সহজ পরিচয়েরই পরিচিতি। এই সহজ সত্য বিজ্ঞানার প্রেরণায় মানুষ ধর্ম-সমাজ-সংস্কারক, বিজ্ঞানী,

দার্শনিক, বহুবিধ হতে পারেন। বলা বাহুল্য জীবন একটা অর্থও ব্যাপার। রামমোহনের ঐশ্বর্য্যভাগ ব্রহ্মজ্ঞান লোকপ্রেমের সহিত নিত্যবৃত্ত। তাঁর সাধনা অভিন্নত কল্যাণ সাধনা”.....।

(“শাস্ত্রত বঙ্গ” রামমোহন রায়।)

কিন্তু এই হুশো বহরের মানুষের নানা উক্তি ও ভাবনের মধ্যে আমরা যেসেদের লেখার বা বলায় রাজার প্রশান্ত বা কর্মকাণ্ডের ভালোমন্দ নিয়ে কোনো একটি কথাও কোনোখানে ঝুঁজে পাইনি। ধর্ম কর্ম জ্ঞান দর্শন সাহিত্য ও সমাজ বিচার গুরুগম্ভীর আলোচনা বিষয়ে তাঁদের বিস্তারিত জ্ঞান সেকালে না থাকাই স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু মানুষের জীবন, মরণের যে স্বাভাবিক অধিকার তাঁদের সে সময়ে ছিল না এবং তখন এল,— সে কথা তাঁদের লেখার বা কথার কোথাও পাওয়া যায় না।

এই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সহনশূন্য বা সহমরণ প্রথা-সম্পর্কে তার সপক্ষে বা বিপক্ষে ভারতের কোটি কোটি নারীর কোনো কথাই পাওয়া যায় না। তখনো নয়, এখনো নয়। কোনো প্রদেশেই নয়।

যদিও মর্মান্তিক শোকে বিরোগবোধনার মানুষের বৃত্ত্য ইচ্ছা চিরকালই ছিল, এখনো আছে, কিন্তু শোকে অস্বাভাবিক বৃত্ত্য তো বিরলই চিরকাল।

প্রথম সমাজভয়, সত্যধর্মচ্যুতি নিন্দার ইঙ্গিতের ভয়, লোকলজ্জার আতঙ্ক, শিক্ষা-হীনতা,—সত্য অসত্য বিচারের সাহসের অভাব, সামাজিক ষিকারের ভয় অথবা কি মনোভাব সেকালের তাঁদের ছিল, সেই সময়ের মনের কথা আমরা একালের নারী বলতে পারব না। হয়ত যেসেদের মনের কথার ইতিহাসই নেই। তাই তাঁরা নীরব।

# রামমোহন রায় ও বাংলা গদ্য

মনোমোহন খোষ

খুব বেশী দিন হয়নি যে বাংলা গল্পসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস তেমন অস্পষ্ট নয় এবং এহেন অস্পষ্টতার ফলে এই সাহিত্য সৃষ্টির গৌরব আরোপিত হয়েছে একাধিক ব্যক্তির উপর। কেউ কেউ বলেন যে উইলিয়ম কেরীই এই সাহিত্যের জনক। আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের নামও কেউ কেউ এই সঙ্গে জুড়ে দেন; কেউ বা বলেন, রামমোহন রায়ই এই সাহিত্যের শৈশবে পিতার কাজ করেছেন; আর অন্যদের মত হচ্ছে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই বাংলা গল্প-সাহিত্যের সত্যিকারের পিতা। এ প্রসঙ্গে বারা টেকচাঁদ ঠাকুর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নাম করেন তাঁদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। এই সকল দাবীর প্রাতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য নিতান্ত অসহায়ভাবে আশ্রয়গোপন করে আছে। উপস্থিত প্রবন্ধে তাকে আবিষ্কার করার আংশিক চেষ্টা করা যাবে। বাংলা গল্প-সাহিত্য-সৃষ্টির ব্যাপারে রামমোহন রায়ের প্রভাব কতখানি তাই হবে আমাদের আলোচ্য।

১৮০১ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়াবার জন্যে উইলিয়ম কেরী ও তাঁর সহকারী গণ চৌদ্ধখানি বাংলা পুস্তক রচনা করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে এ-সকলকে ‘ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালা’ নামে উল্লেখ করা হবে। এদেশের আধুনিক সাহিত্য গড়ে ওঠার ব্যাপারে উক্ত গ্রন্থমালার প্রভাব সন্দেহ যে, ধারণা চলে আসছে তা সর্বত্রই বৃত্তিসঙ্গত বলে মনে হয়

না। বর্তমান যুগে, এ-সকল বইতেই সর্বপ্রথমে সাহিত্য রচনার কাজে গল্পের ব্যবহার হয়েছে সত্য বটে; কিন্তু এদের সন্ধানে এ কথাই একমাত্র কথা নয়। এই বইগুলি পাঠকসমাজে কতখানি প্রচার লাভ করেছিল এবং তাদের সমাদর হয়েছিল কি পরিমাণে, তা না জানে বাংলা সাহিত্যের ওপর কেরী ও তাঁর ফোর্ট উইলিয়মী দলের প্রভাব আন্দাজ করতে যাওয়া পণ্ডিত্য হবে।

ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার প্রচার ও জনপ্রিয়তা সন্দেহে জানলাভ করতে হলে এই পুস্তকসমূহের বিষয়-বস্তুর দিকে আগে তাকাতে হবে। এদের মধ্যে পাঁচখানি সংস্কৃত (‘হিতোপদেশ’ ১ ‘সংহাসনদ্ব্যর্থীশিকা’ ও ‘পুস্তক পরীক্ষা’), একখানি পারসী (‘তুহাতিনামা ২’) আর একখানি ইংরেজী গল্প-গ্রন্থের (‘ইসপ্‌স কেবলস’) অনুবাদ; অবশিষ্ট সাতখানির মধ্যে একখানি (‘ইতিহাসমালা’), গল্পের সংকলন, দুইখানি (‘লিপিমাল্য ও প্রবোধচক্রিকা’) প্রবন্ধ পুস্তক, একখানি (‘কথোপকথন’) কথাবার্তার নমুনা এবং তিনখানি (‘প্রতাপাদিত্যের চরিত্র’, ‘রাজাবলী’ ও ‘ককচন্দ্র রায়ের চরিত্র’) ইতিহাসপুস্তক রচনা। এই শেষোক্ত সাতখানি পুস্তকের মধ্যে ‘প্রবোধ-চক্রিকা’র কিছু কিছু গল্প আছে, আর তিনখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থকেও গল্প-পুস্তক বলে গণ্য করা যায়। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, ফোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার অধিকাংশই ছিল গল্প-পুস্তক। দেশ-কাল-নির্দেশে জনসাধারণের গল্পপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত, কাজেই মনে হতে পারে যে ঐ গ্রন্থমালা তখনকার দিনে বেশ প্রচলিত



ও জনপ্রিয় হয়েছিল এবং তার কলে বাংলার নুতন গল্প-সাহিত্যে বহু গতিবেগ লাভ করেছিল। কিন্তু ফলত ব্যাপারটা যে এরূপ হয়নি তা অস্বাভাবিক করবার যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে হয়।

গল্প শুনতে যে লোকে আকৃষ্ট হয় তার প্রধান কারণ আখ্যানের অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব; আর পুরানো গল্প এবং অনেক বার শোনা গল্পও যে লোকে শোনে তার কারণ অন্তর্নিহিত আদর্শের মহিমা। যেমন এদেশের রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির গল্প; হাজারবার শুনেও সেগুলি সবক্কে শ্রোতাদের আকর্ষণ শিথিল হয় না। কিন্তু কোর্ট উইলিয়ম প্রহমালার গল্পে এই দুইয়ের কোন গুণই বড় একটা ছিল না। সংস্কৃত গ্রন্থের আখ্যানসমূহ লোকমুখে খুবই প্রচলিত ছিল। তাই যে-ভাষার অপরিচিত বা অল্পপরিচিত আরবী, পারস্যী ও সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য এবং পদবিভাজন-প্রণালী (syntax) ঝোলমালে, সে-ভাষার ঐ পরিচিত গল্প শুনতে লোকের তেমন আগ্রহ হয়ত দেখা যায়নি। প্রতাপাদিত্য বা কৃষ্ণচন্দ্রাদির চরিত্র সবক্কেও সেই একই কথা বলতে পারা যায়।

গল্প ও গল্পমূলক পুস্তকগুলি ছেড়ে দিলে কোর্ট উইলিয়ম প্রহমালার যে বই বাকী থাকে তা হচ্ছে বুদ্ধিজীবী বিদ্যালয়কার রচিত 'প্রবোধচর্চিকা'। এই বইখানিকে প্রহমালার মৌলিক রচনা বলে ধরা হলেও এর বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব খুবই অল্প। সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও পুরাণাদি থেকে সংকলন করে এই পুস্তক তৈরি হয়েছিল। একত্রে এখানে পাঠকদের আকৃষ্ট করবার মত বই হয়নি। রচনারীতির দিক দিয়েও এই বই বরং কিরলংশে তাঁদের বিমুগ্ধ করবার মত। এর আরম্ভে হুর্কোষ্য সমাসের বাহুল্য পাঠকবর্গের মনে বীতিমত ভয় জন্মায়। যার বিষয়বস্তু বা রচনারীতির আকর্ষণ কম, এমন বইও শুধু গদ্যের অভিনবত্বের দ্বারা জনসাধারণের কৌতূহলের বন্ধ হতে পারত কিন্তু কোর্ট উইলিয়ম প্রহমালার ফুল্যভার ভেত্রে তা হওয়া সম্ভবপর ছিল না। ঐ পুস্তকসকলের প্রতি খণ্ডের দাম

কখনও কখনও আট টাকা পর্যন্ত ছিল। যে সময়ে লোকে আট-দশ টাকা মালিক বেতনে ছোটখাট সংসার চালাত সেই সময়ের পক্ষে এই দাম সংগ্রহ করা যে কষ্টসাধ্য ছিল তা বলাই বাহুল্য।

এই সব কারণে মনে হয় যে, কোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাংলা গভের প্রেট প্রবর্তক হলেও উক্ত কলেজের প্রহমালা তৎকালীন জনসাধারণের খুব অগ্রাংশের হাতেই পৌঁছতে পেরেছিল। ঐ বইগুলি হয়ত কেবল কোম্পানীর কন্সপ্রার্থী বিলাতী সাহেব ও মুষ্টিমেয় কৌতূহলী ধনী ব্যক্তিরাই ক্রয় করতে পারতেন। এরূপ স্বল্পপ্রচারিত পুস্তকের প্রভাব খুব সীমাবদ্ধ থাকবারই কথা। উপস্থিত ক্ষেত্রে যে অন্তরূপ ব্যাপার ঘটেছিল তা ভাববার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। সে বাই হোক, বাংলা সাহিত্যের এই অলোভনীয় অবস্থা খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এই সাহিত্যের কৃত্তী প্রবর্তক রামমোহন রায় বর্ধন ১১৫ সালে বাংলা গভে রচিত তাঁর দুখানি একেশ্বরবাদ-প্রতিপাদক পুস্তক, ('বেদান্তগ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার') প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণ করলেন তখন থেকে বাংলা গল্প-সাহিত্য এগিয়ে চলার মত গতিবেগ সংগ্রহ করল।

রামমোহনের পুস্তক ছিল লোকসাধারণের অস্বাভাবিক হৃদয়প্রসাদমূলক ঈশ্বরোপাসনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমালোচনার পূর্ণ। কাজেই এই বই প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশময় ভূমূল আন্দোলন স্রব্ধ হ'ল। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যে অল্পসংখ্যক লোকের মনঃপুত হল তাঁরা রামমোহনের মতাহুর্ভাগী হলেন, আর বীরা একেশ্বরবাদ প্রচারের মধ্যে ধর্মবিপ্লবের বিভীষিকা দেখলেন তাঁরা তাঁর উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠলেন। রামমোহনের বাংলা গল্প সমসাময়িক লোকদের মধ্যে কতখানি প্রচার লাভ করেছিল এই ব্যাপার তার বেশ স্পষ্ট সাক্ষী। এদিক দিয়ে তাঁর কৃতিত্ব কেহী প্রমুখ কোর্ট উইলিয়ম প্রহমালার লেখকগণের কৃতিত্বের বহু উর্ধ্বে।

রামমোহনের গল্প-রচনার বহুল প্রচার যে কেবল

ধর্মবিষয়ক বাদানুবাদের আশ্রয়েই ঘটেছিল তা মনে করবার কারণ নেই। ধর্মতত্ত্বের আন্দোলন তাঁর লেখা প্রচারের সাহায্য করেছে বটে, কিন্তু তাঁর গভ-রচনার প্রাঞ্জলতাও তাঁকে এ-বিষয়ে কম সাহায্য করেনি। তাঁর প্রচারিত গ্রন্থেই তিনি যদি বেদান্তের মত দুরূহ বিষয়কে নিতান্ত সহজরূপে পাঠকের বোধগম্য করতে না পারতেন তবে তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের ভেতর বিচলিত হবার কথা ছিল না। কারণ, যে সব শাস্ত্রীয় প্রমাণ তিনি নিজের পুস্তকমধ্যে উল্লেখ করেছিলেন সেগুলি যত দিন চূর্ণোন্মোচন সংস্কৃতিতে নিবদ্ধ ছিল তত দিন গোড়া সমাজ-নায়কদের মানসিক শাস্তি নষ্ট হয়নি। কিন্তু প্রাঞ্জল বাংলা-গদ্যে সে-সকলের অল্পবাদ ও ব্যাখ্যা করে তিনি যখন সংখ্যাবহুল সংস্কৃতানিভজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করলেন তখন গোড়ার দল বিচলিত না হয়ে থাকতে পারলেন না। একেশ্বরবাদের ব্যর্থ প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদিগণ বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করাকেও অপরাধজনক বলে প্রচার করলেন (এ ২-১০)।<sup>১০</sup> রামমোহনের বাংলা গদ্যের প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে এ হ'ল পরোক্ষ প্রমাণ। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণপ্রার্থীকে রামমোহনের রচনার সহিত ফোর্ট উইলিয়মের পাণ্ডিত্যবৃত্তান্তের ও অন্তান্ত সমসাময়িক লেখকের রচনার তুলনা করতে হবে। বৃত্তান্তের তাঁর 'বেদান্তচর্চিকা' ৪ নামক গ্রন্থের আরম্ভে লিখছেন :—

“ব্রহ্ম সর্বত্র বিদিত্ত্বাতি সমায়াতে কলৌ যুগে।  
নাস্তিভিত্তি কোন্তের শিল্পোদয়পরায়ণাঃ॥ ইত্যাদি  
শাস্ত্রের দৃষ্টান্তহলানিভিত্ত তত্ত্বজ্ঞানিমানিরদের স্বকপোল-  
কল্পিত স্বপ্রয়োজনসিদ্ধিতাৎপর্যক বাক্যপ্রবন্ধ  
কল্পনার খণ্ডনার্থ ইহা লেখা যাইতেছে এমত কেহ মনে  
করিও না। যেহেতুক বিশিষ্টাংশিষ্ট শিষ্টেরদের সে  
কথা লক্ষ্যই নহে তবে যে এ গ্রন্থ রচিত হইতেছে  
বিত্ত্বদ্ব্যভিপ্রায়িত্বক অবিশীলিত শিষ্টেরদের স্বর্গীয় স্ব  
জ্ঞান ও কুল ও আশ্রয়বিহিত বর্ষাহুষ্ঠানের কারণ-  
শতভেদেও অন্তর্থা কখন হইতে পারে না এ নিশ্চয়ই আছে  
অতীতি একত্বকো বেদান্তশাস্ত্রের অপ্রাচ্যুত্ব প্রবৃত্ত জনরাজ

হুহুহুহুহুহুহু হুহুহুহুহু হি বালমংজানাং এতৎশাস্ত্রার্থ জ্ঞায়  
বকধুর্ভেদদের বচনে পরমার্থপ্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্রের  
অনান্য না হয় কেবল এই তাৎপর্যেতে বেদান্তশাস্ত্রের  
সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে ॥”

আর ১৮২০ সালে প্রকাশিত ‘পারগুণীড়ন’ এ গ্রন্থের  
আরম্ভে আছে :—

“অবিবর্তন মনজ্ঞাপতাপিত ভক্ততত্ত্বজ্ঞানী পাণ্ডিত্য-  
মানী ব্যক্তিবিশেষদিগের এবং প্রভাবক-প্রভাবপাথরপ  
মহাধূমাককারে জন্মান্তরের জ্ঞায় অক্ষ তৎসংসর্গী জীব-  
বিশেষদিগের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম দিবসে প্রেরিত,  
চিরচিহ্নিত, স্বকপোলকল্পিত নানা বাগাড়ম্বরিত,  
স্বাধিবিচনতাৎপর্যার্থবিহীন, স্বাধিবিচনতাৎপর্যার্থ-  
সম্বোধার্থ রচিত অন্তঃসারবিহিত অল্পবুদ্ধিজনগণের  
আপাততঃ শ্রবণমধুর নয়নধূলিপ্রক্ষেপসদৃশ উত্তারাতাল  
প্রাপ্ত হইবামাত্র হুটীচিহ্নিত কৃতকৃত্য হইলাম ॥”

উদ্ধৃত রচনাংশ দুটির সঙ্গে তুলনার জন্য  
রামমোহনের রচনা থেকেও দুটি অংশ নীচে দেওয়া  
যাচ্ছে। ‘বেদান্তচর্চিকা’র উত্তরে রামমোহন যে  
বই (‘ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার’) লিখেছিলেন তার  
গোড়াতে আছে :—

“ভট্টাচার্য্য আপনার গ্রন্থের প্রথম পত্রে লিখেন যে  
এ গ্রন্থ কোন ব্যক্তির কাল্পনিক ব্যাক্যের খণ্ডনের জন্যে  
লেখা যাইতেছে এমত কেহ মনে না করেন কিন্তু  
বেদান্তশাস্ত্রের লোকের অনান্য না হয় কেবল এই  
নিমিত্তে বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে লেখা গেল  
এবং ভট্টাচার্য্য এ গ্রন্থের সমাপ্তিতে তাহার নাম বেদান্ত-  
চর্চিকা রাখিয়াছেন। ইহাতে এই সূত্র আপনকার  
আমারদিগের হইতেছে যে যে কোনো ব্যক্তি বেদান্ত-  
শাস্ত্রের মত পূর্ণ হইতে না জানেন এবং ভট্টাচার্য্যের  
পাণ্ডিত্যে বিশ্বাস রাখেন তেঁহ বেদান্তের মত জানিবার  
নিমিত্ত এ গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন তখন হুতরাং  
ধেঁধিবেন যে বেদান্তচর্চিকার প্রথম শ্লোকে কলিকালীর  
তাবৎ ব্রহ্মবাদীর উপহাসের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন

সবদা উদয় হইয়া তাহাকে ক্লেস দেয়। মাংসভোজন শাস্ত্রে আবিহিত ইহা যদি না করিতে পারে অন্ততঃ লোকনিন্দা কারিবার উদ্দেশে কাঁহবেক যে নিবেদন কারিয়া যায় না কিম্বা আচমনে অধিক কি অল্প জল লইয়াছিল কিন্তু মংসের তুষ্টির নিমিত্তে কে আপন শাস্ত্রবিহিত আহার ও প্রারক নিম্নিত ভোগ পারিত্যাগ করে ইচ্ছাতে মংসের অদৃষ্টে যে হুঃখ তাকা কে নিবারণ করিতে পারিবেক ইতি ॥ (গ্র ২৩২)

চারি প্রস্তর উত্তর পেয়ে প্রসকর্ভা যে খুব খুশী হন নি তা বলাই বলাই। আচর্য্য তিনি পোষপুণ্ডীড়ন নামে তার এক প্রত্যস্তর প্রকাশ করলেন। এ বইয়ের ভাষার নমুনা আমরা দেখোঁছি। রামমোহন নিজের প্রতি নিন্দা, বাঙ্গাবিজপ ও কট্টীকিতে পূর্ণ এই বইয়ের উত্তরে ‘পথা প্রদান’ নামে যে রত্ন পুস্তক রচনা করেছিলেন তার ভূমিকায় কৈফিয়ৎ দিয়েছেন কেন যে তিনি কট্টীকির উত্তর কট্টীকি দ্বারা দেন নি। তার দেওয়া একটি কারণ তাঁরই ভাষায় দেওয়া যাচ্ছে।

বালক ও পশাদির হিতকরণে ও চিকিৎসা সময়ে তাহার আক্ষালন ও চীৎকার এবং বিরুদ্ধ কারিবার চেষ্টা যদি করে ও হিংসাতে প্রবৃত্ত হয় তাহাতে ই অর্থাৎ প্রাণীর চীৎকারাদির পরিবর্ত্ত না কারিয়া দয়ালু মনুষ্যেরা তাহাদের হিতৈচ্ছা কট্টে ক্ষান্ত হয়েন না, সেওরূপ আমাদের হিতৈষণার বিনিময়ে ধর্মসংহারকের বিরুদ্ধ চেষ্টায় ও দেব প্রকাশে আমরা রাগাপন্ন না হইয়া ঐ প্রত্যস্তরের উত্তরে শাস্ত্রীর উপদেশের দ্বারা ততোধিক স্নেহ প্রকাশ করিভোঁছি। (গ্র ২৪৭)

‘বেদান্তচর্চিকা’র লেখক যুক্তাশ্রয় ভট্টাচার্য্য তাঁর গ্রন্থে রামমোহনের উদ্দেশে যথেষ্ট বাঙ্গাবিজপ ও হুঙ্কার্য্য প্রয়োগ করেছিলেন। তার উত্তরে রামমোহন ‘ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার’ নামে পুস্তক রচনা করেন। এই বইয়ের গোড়ায়ও তিনি পাণ্ডা হুঙ্কার্য্য ব্যবহার না করার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :—

“আমাদিগের সম্বন্ধে যে বাঙ্গাবিজপ হুঙ্কার্য্য ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন তাহার উত্তর না দিবার কারণ আদৌ এই যে

পরমার্থ বিষয়ক বিচারে অসামু ভাষা এবং হুঙ্কার্য্য কখন সৎথা অসুজ হয়, দ্বিতীয়তঃ আমাদিগের এমনত রীতিও নহে যে হুঙ্কার্য্য কখন বলের দ্বারা লোকেতে জয়ী হই। অতএব ভট্টাচার্য্যের হুঙ্কার্য্যের উত্তর প্রদানে আমরা অপরাধী রাহলাম। (গ্র ৬৮০)

উল্লিখিত দুইটুকু তিনটি থেকে রামমোহনের যে বচন-চাঞ্চল্য ও সূক্ষ্ম হান্তরস সৃষ্টির পাঁচয় পাওয়া যাচ্ছে তা কেবল উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যগ্রন্থের রচনাতেই স্পষ্ট। কোর্ট উইলিয়ম গ্রন্থমালার লেখকবর্গের বা রামমোহনের সমসাময়িক অন্যান্য লেখকের রচনায় এত শ্রেণীর সাহিত্যিক ক্ষমতার নিদর্শন দেখা যায় বলে মনে হয় না। আর তা হয়ত দেখাও যেতে পারে না; কারণ রামমোহনের সঙ্গে তাঁদের এক বিষয়ে বিষম প্রভেদ ছিল। এই প্রভেদ হচ্ছে প্রেরণা সম্পর্কিত। যুক্তাশ্রয় বা পাষপুণ্ডীড়নাদির লেখকরা লিখোঁছিলেন অর্থপ্রাপ্তির আশায়। তাই উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক গুণ তাঁদের রচনায় দেখা দেয় নি, যুক্তাত সংস্কৃত পারশী বা ইংরেজী পুস্তক বা সে সকলের বিষয়বস্তুর সাহায্য নিয়ে তাঁরা যে সব রচনা করেছিলেন সেগুলো কোনও রকমে কাজ চালাবার মতো ছিল। এই তাঁদের সম্বন্ধে সন্দোহ প্রশংসা।

রামমোহন রায় যে গল্প রচনা করেছিলেন তার পশ্চাতে ছিল মননশক্তি এবং হৃদয়গ্রন্থির সেই প্রবল প্রেরণা যার তাড়নায় মাত্রম ব্যক্তিগত সুখস্বচ্ছন্দ্য অনায়াসে বিসর্জন দিয়ে সমসাময়িক ব্যক্তিগত ও ভাবগত পুরুষদের মঙ্গল চিন্তা করে। এই আন্তরিক প্রেরণার ফলেই তাঁর প্রকাশভঙ্গী যথাসম্ভব সরল, সরস ও ক্রান্তিমাত্রাবর্জিত হতে পেরেছিল। কিন্তু উক্ত প্রেরণা কেবল তাঁকে এ কাজে সিদ্ধি দান করে নি। রামমোহনের বহুভাষাজ্ঞান এবং ভাষা-বিশ্লেষণের ক্ষমতাও তাঁকে বাংলা গল্পের কৃতি প্রবর্তক করে তোলাবার যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাঁর লেখা ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ পড়লেই বোঝা যায়, বাংলা ভাষার অনন্ত-শেষাংশ ৩০৫ পৃষ্ঠার দৃষ্টব্য

# সাগর পারে

সীতা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এষণর বাড়ীতে লোক কিছু বেড়ে গেল। আমার ভাসুর তাঁর স্বামী এবং নবজাত প্রভুকে নিয়ে এসে পৌঁছিলেন। বাচ্চাকে বহন করবার একটি অন্নবয়স্ক চাকরও জুটে গেল। বাড়ীতে ছোট্ট, তবু ওরই মধ্যে ডাঁহিয়ে গাঁহিয়ে হান-সঙ্কলান করে নিতে হল।

আমার জা সম্পর্কে বড় ভ্রমে পড়লে অনেক ছোট। একে আগেই কলকাতায় একবার দেখেছিলেন। ময়মনসিংহের এক গ্রামের মেয়ে এখনও শতকের দশক ধারণে খুব অভ্যস্ত করে বসে নানা। বেশ কয়েকজন মস্তক নাখান। তবে প্রথম সন্তানটিকে নিয়ে সারাক্ষণই বাতবাত। আমার বড় নন্দিত এক সময় এসে পৌঁছিলেন। তাঁর প্রতিদিন দেশে গেলেন। রেশুনে এঁরা নিজেদের বাড়ী করেছিলেন কালাবাতবত। এটি বেসুনের একটি শতরতাল। প্রধানতঃ ভারতীয়দের বাস এখানে। একদেশবাসীরা ভারতীয়দের বলে --কালী। এঁরা স্বামী জিতেন্দ্রসুন্দের নাম এখানে বাঙালীদের মধ্যে সুপরিচিত লোক ছিলেন। কান দ্যান ও পেরোপকারের জন্ত বিখ্যাত ছিলেন বেশ। বাড়ী তাঁর ভিত্তি ছিল পরিবার-পারজন। হুঁ-এন তাঁর একসঙ্গে থাকতেন সকলেরই সন্তানসন্ততির সংখ্যা বেশ ভালই ছিল। জিতেন্দ্রসুন্দের মা ও বোনও মধ্যমধ্যে এখানে আসতেন। সেকালের একজনবর্তী পরিবারের চিত্র একেবারে। এঁদের বাড়ী নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ প্রায়ই লেগে থাকত। বাড়ী এমনিতেই ভর্তি, আত্মিক-অভ্যাগত এলে আর ভিলধারণের জায়গা থাকত না। খাওয়া-পান একেবারে বোড়শোপচারে। বোদের রান্নার হাতেই খুব সুনাম ছিল। চাকর-বাকরকে বেশ শিখিয়েও নিয়েছিলেন।

যা হোক, আমাদেরও বোধ সংসারমাত্রা চলতে

আবস্ত করল একরকম করে। খুব যে স্তম্ভন তাই চলল তা বলা যায় না, কারণ সংসারের মাত্রমাত্র বড়ই বিভিন্ন মতাবের এবং বিভিন্ন ধরণের ছিল। তবে যতটা গোলমাল হতে পারত তা হল না। ঠিক করলাম যে সংসারের ভার যেটুকু আমার উপরে পড়েছে সেগুলো সেগেও গ্রহণ সময় যখন আমার দৈতে থাকবে, তখন আমার লেখা পড়ার কাজগুলো আবার আরম্ভ করা উচিত। লেখার কাজে আবার মন দিলাম। একদেশে যতাদন ছিলাম লেখা কখনও বন্ধ করিনি। অনেক ছোট গল্প লিখেছি, “সরভীতকা” উপন্যাসটি লিখেছি। একদেশের পটভূমিকায় আরো দুটি উপন্যাস লিখেছিলাম “মোহামায়া” আর “ক্ষান্তিকের আত্মিক”। কিন্তু এ দুটিই কলকাতায় ফিরে আসবার পর লেখা।

স্বতন্ত্রভাবে আত্মীয়-স্বজনদের জন্য পরিচিত লোক এখানে অনেক ছিলেন, তবে বেশির ভাগই বাঙালী। ভারতীয় একদেশের লোক ও Anglo-Indian ও Anglo-Burmanও কিছু কিছু ছিলেন তবে একদেশী বহুবাক্য কাকর ত দেখলাম না। সামাজিকভাবে তাদের সঙ্গে ভারতীয়দের কোনো মেলামেশা আছে বলে মনে হত না। ওরা ভারতীয়দের বিশেষ পছন্দ করে না মনে হত। ভারতীয়রাও কাজকর্মের খাতরে এঁদের সঙ্গে যতটুকু না মিশলে নয়, তার বেশী আর কেউ এগোতেন না। আমি নিজেকে ওখানে সাত বৎসর ছিলাম, তার মধ্যে কথা বলেছি মোটা তিনেক একদেশীয়া নাস ও একজন বিলাত ফেরৎ মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে। ওদের ভাষা এক অক্ষরও বুঝতাম না। শিখবার কোনো চেষ্টাও করিনি। ওদের সাহিত্য বলে কিছু আছে কি না তার খোঁজও কখনও করিনি। শির

কার্যে এদের তাত্বেশ খেলে তার নিদর্শন অবশ্য চারিদিকেই দেখতাম। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম যে, এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের খুব আদর। বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেই সবাই স্বতঃপ্রস্তুত হয়ে ভিক্ষা দেয়, তাঁদের চাইতেও হয় না। শুনতাম, এর পার্যবর্ত্তে এরা জাতির প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারটা সবটাই চালিয়ে দেন। ব্যবস্থাটা আমার খুবই ভাল লাগত। এতে ভিক্ষারতির মধ্যে যে হীনতা আছে সেটা একেবারেই থাকে না। ভারতীয়দের মধ্যে এখানে সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ত মাত্রাজ ও অন্ধপ্রদেশের লোকদের। বাড়ীর চাকরবাকরের কাজ এরাই বেশীকরত। এদের ভিতর খ্রীষ্টান সংখ্যায় অনেক। দিব্য ইংরেজী বলতে পারে অথচ অক্ষর-পরিচয় নেই। বাঙালীও অনেক দেখতাম পুস্তকদের নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের লোক বেশী। এদের ভাষা এমন যে অল্প জায়গার বাঙালীদের পক্ষে বোঝা প্রায় অসম্ভব। আমার একটি নোয়াখালীবাসী চাকর জুটে ছিল, আমি বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে শেষে হিন্দিতে কথা বলতাম। একজন বাঙালী আর-একজনের সঙ্গে কথা বলতে পারে না নিজের ভাষায়, এ বিষয়ে একদিন বিষয় প্রকাশ করাতে আমার মাত্রাজী আয়া বলল; “ও লোক বাঙালী নোঁহ আন্দা ও লোক চাট্‌গাঁওওয়াল। হয়।” তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে চট্টগ্রামবাসীও বাঙালীই, আর কিছু নয়।

ওখানে থাকা কালে ভারতীয় বলতে বাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তার মধ্যে তত্ত্বলোক বারা তাঁরা সবই প্রায় বাঙালী। ওখানে তখন একটি ব্রাহ্মসমাজও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বেশ কয়েকজন ব্রাহ্ম ওখানে বাস করতেন। রবিবারের নিয়মিত উপাসনা হত, মাঘোৎসব হত। কলকাতায় বাঁদের আগে থেকে চিনতাম, তা ছাড়াও ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার, কুলচাঁপ্রসাদ নিরোগী ও তাঁদের পরিবারবর্গের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। রেজুনে নানা ব্যবসায়গৃহে অনেক বাঙালী বেশ কিছুকাল ধরে বসবাস করছিলেন, এদের মধ্যে খুব নামজাদা ও কেউ

কেউ ছিলেন। তাদের কাছ থেকে সাদর আমন্ত্রণও হত। একবার পেয়েছিলাম তবে সে-সব নিমন্ত্রণ রক্ষা আর কোনদিন হয়ে ওঠেন।

কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে বাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তারা বেশীর ভাগই মাত্রাজী, তামিলভাষী, ও তেলেগু-ভাষী। বেশীর ভাগই রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান। তামিলভাষীরা, তেলেগুভাষীদের কেমন যেন একটু অবজার চোখে দেখত, এর কারণটা আমি কোনদিনই বুঝতে পারিনি। সাতের-মেমদের এরা মহা ভক্ত ছিল। মেমসাহেবের বাড়ী কাজ করতে গেলে তারা আর কিছু চাইত না। ভারতীয় মনিবদের তারা একটু অপকৃষ্ট জীবন মনে করত মেমদের ভুলনায়। তাদের মুখে একটা কথা প্রায়ই শুনতাম, “একজন শাড়ী পরা মহিলা, আর একজন শাড়ী পরা মহিলাবের জুতো কেন বইবে?” গাউন পরা মহিলাবের জুতো বহন করাটা এরা গর্বের বিষয়ই মনে করত। মেমদের বাড়ী কাজ করে অবশ্য এদের কিছু কিছু উপকার হয়েছিল। এরা পোশাক-আশাকে অভব্য বা নোংরা ছিল না, বাচ্চাকাচ্চা কাজ খানিকটা জানত, সকলেই প্রায় হিন্দি এবং ইংরেজি চলনসই রকম বলতে পারত। গির্জায় যাওয়া ও নিজেদের ধর্মীয় আচার আদি পালনে বেশ নিষ্ঠা দেখাত। ধূমপান ও মদ্যপান এদের মধ্যে বেশ চলতি ছিল, সেগুলোও মেমদের কাছে শেখা কি না জানি না। আর একটা ভাল জিনিস এদের মধ্যে দেখতাম, ধনী-দারিদ্রের ভেদটা এদের তত ছিল না। একই পরিবারে কেউ বা আয়া বাবুঁটির কাজ করছে, আবার তারই মাসজুতো ভাই হয়ত বড় ব্যারিটার বা রেলওয়ের বড় কর্মচারী। তাদের মধ্যে মেলামেশা, যাওয়া-আসা বেশ আছে। ব্রহ্মদেশের ভাষা কিছু না শিখলেও, শুনে শুনে তামিল ভাষাটা মাঝার মধ্যে বেশ চুকে গিয়েছিল। ওদের ভাষা বুঝতে প্রায় সবই পারতাম, বলবার চেষ্টা করলে হয়ত তাও পারতাম তবে সে চেষ্টা কোনদিন করিনি। আমার দ্বিতীয়া কভা হুঁশিয়া রেজুনেই হয়েছিল, এখানেই তার প্রথম কথা বলতে শেখা। সে প্রথম যে ভাষার কথা বলতে শিখল,

সেটা তার নিছকই তাঁর, হিন্দি তামিল এবং বাংলার এক অপূর্ণ সংমিশ্রণ। বেশ বহর হুই-ভিন অবাধ সে এই ভাবার কথা বলত। বেচারীর দোষ নেই, কানের কাছে তার নিরন্তর বাজতে থাকত, কলকাতার বাংলা ভাষা, পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষা, হিন্দি ও তামিল। কোন্টা সে বলে তা হলে? তার আয়া ও তার ভিন-চারটে ছেলেমেয়ে সারাক্ষণ তার সঙ্গে থাকত। তাদের ভাষাটাই অগত্যা সে সর্বাঙ্গে আয়ত্ত করে নিল।

চাকর আয়াদের বাদ দিলে সমশ্রেণীর মাস্তাজীদের সঙ্গে তেমন আলাপ পরিচয় হয়নি। একজন তামিল খ্রীষ্টান হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। অল্পবে বিহুবে আমাদের দেখা-শোনা করতেন। তিনি তাঁর বড়াদিদির সঙ্গে থাকতেন। তাঁদের বাড়ীতে একাধিন চারের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। তাঁর দিদিটি আতি উচ্চাশিক্ষিত এবং খুব অমায়িক। ঐরই ছোট বোনের বিয়েতে আর-একবার গিয়েছিলাম। আর এক Anglo-Indian পরিবারে একবার পথ ভুলেই প্রায় গিয়ে পড়েছিলাম, তাঁদের বাড়ীর এইটুকুই মাত্র মনে আছে যে, গৃহিণীকে দেখে আমি কর্তার স্ত্রী বলে মনেই করতে পারিনি। তিনি একেবারে রুক্ষা, কর্তাটি বেশ বুধাপুরুষ। ওখানে সাত বৎসর বাসের মধ্যে আতি অল্প লোকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছিল। নানা কারণে সর্পক্ষণই প্রায় ব্যাধব্যস্ত হয়ে থাকতে হত, এর ওর বাড়ী যাবার সময়ই পেতাম না।

এখন পূর্ণ কথার ফিরে আসা যাক। গোহগাহ করে সংসার একরকম আয়ত্ত করা গিয়েছিল, চলেও বাচ্ছিল মোটামুটি ভাল ভাবে। কলকাতা থেকে দিদি ও বাবার চিঠিপত্র প্রায়ই পেতাম। এমন সময় নিজে বেশ বেশী রকম অস্থির হয়ে পড়লাম। ছেলেবেলার পর এত বেশী ভোগা এই প্রথম। নিজেকে বড় বেশী বিপন্ন মনে হত। কাজকর্ম কলে রেখে আমার স্বামীকে বেশীর ভাগ সময় আমার সেবা করেই কাটাতে হত।

কলকাতায় থবর দেওয়া হল। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হল যে এখন কিছুদিন আমি কলকাতার গিরে

থাকব। দাদা আসবেন এখানে আমাকে নিয়ে বাবার জন্তে, কারণ আমার স্বামীর পক্ষে এখন কাজকর্ম কলে যাওয়া সম্ভব নয়।

দাদা এলেন। এই ছোট বাড়ীর মধ্যেই কোনমতে তাঁর আরগা করে দেওয়া হল। রেজুন ঘুরে ফিরে দেখলেন। বিভিন্ন দেশের চিত্র, তাকুর্বা, হাপত্য, এসব বিষয়ে তাঁর দারুণ বৌক, সমস্ত বাজার বেঁটিয়ে অনেক জিনিষ কিনে কেললেন। বড় বড় হুটি নর্তকের হুটি এখনও তাঁদের বাড়ীর দরজার হুবারে দাঁড়িয়ে আছে দেখা যায়। যিনি তাদের আদর করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি আজ কোথায়?

একাধিন কালাবাস্ততে আমার বড় ননদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়ে এলেন। ভুল করে সোনার একটা হাত বাড়ি পকেটে রেখেছিলেন, সেই ওক সেটা এক ঘোপাকে দিয়ে দেওয়া হল। তারপর সেটা উদ্ধার করতে কি হাজার। যাক্ষরাজে কালাবাস্ততে সেটা ঘোপার বাড়ী চড়াও হয়ে ধস্তাধস্ত করে তবে সে বাড়ি উদ্ধার হল।

বাহোক এরপর অল্পকাল জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে ত আবার দাদার সঙ্গে ফিরে চললাম কলকাতায়। তখনও শরীর ভাল করে সারোনি, কেবিনে শুয়ে পড়ে থেকেই প্রায় তিনটা দিন কেটে গেল।

কলকাতায় ত ফিরে এলাম। বাড়ী প্রায় তেমনই আছে। দাদার মেয়ে রমা একটু বড় হয়েছে। আমার খুড়তুতো ভাই হেমন্ত একাধিন আমাদের বাড়ীতে ছিল। বিয়ে করবার পরেও কিছুদিন ছিল। এখন শুনলাম, সে অল্প জায়গায় উঠে গেছে। তার বচ আমাকে দেওয়া হল থাকবার জন্ত।

আত্মীয়-পরিজন চেনা পরিচিত সকলের সঙ্গে আবার দেখা-সাক্ষাৎ হল। বাবা বেশ ভুগেছিলেন আমার বিয়ের পর, একটু রোগা হয়ে গিয়েছেন দেখলাম। অস্ত্রা যে যেমন ছিলেন, সেই রকমই আছেন।

বহু-বাকব, আত্মীয়-বন্ধন সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হতে লাগল। শান্তিনিকেতন থেকে এই সময় সন্তোষ

মজুমদার এসেছিলেন কলকাতায়। একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। এর কিছুদিন পরেই গুনলাম যে তিনি মারা গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ এ সময় চীন যাত্রার জোপাড় করছিলেন। এরই সব ব্যবস্থা করতে তখন কলকাতায় এসেছিলেন। জোড়াসাঁকোর একদিন গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে তখন দারুণ ভিড়। তবু তারই মধ্যে এসে হুচারটে কথা বলে গেলেন। আমার ভ্রাতৃকারা আমার সঙ্গে ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “সীতাকে কি রেজুনে ছুরিয়ান (একরকম হুর্গদ্ধ ফল) আর নাল্লি (মাছের তৈরী একরকম ব্রহ্মদেশীয় হুর্গদ্ধ খাদ্য) ছাড়া আর কিছু খেতে দেওয়া হত না? ওর চেহারা এরকম হয়ে গেল কেন?” সীতাই চেহারাটা তখন খুবই খারাপ হয়েছিল। এর কয়েক দিনের মধ্যেই বেশ কিছু অল্পচর পার্শ্বচর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চীন ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি ভ্রমণে চলে গেলেন। দলের মধ্যে ক্ষিতিমোহন বাবু, নন্দলাল বাবু, কালিদাস নাগ প্রভৃতি ছিলেন বলে মনে পড়ে। রেজুনে ঐদের বিপুলভাবে সর্ষর্না করেন ওখানের প্রবাসী বাঙালীরা। আমি কলকাতায় বসে বসেই তার গল্প শুনলাম চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাদের বাড়ী গিয়ে খেয়েও এসেছিলেন। আমার স্বস্তরবাড়ীর সবাই তখন এক পাচতলা বাড়ীর সন্মোচ্চ flat এ গিয়ে বাসা বেঁধেছেন। সেখানে উঠতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন “এ যে সীতাই পঞ্চ পাবার জোপাড়।” অনেক রকম মাছের ব্যঞ্জন সাজিয়ে খেতে দেওয়াতে ক্ষিতিমোহনবাবু বলেছিলেন, “এ কি রে? কিছু খারাপ খবর দিবি নাকি?” আমার স্বামীর এক মাসতুতো ভাই নীহাররঞ্জন পাল, বাল্যকালে শান্তি-নিকেতনে পড়তেন, তাঁকেই একথা বলেছিলেন।

এইসময় কলকাতায় আমার প্রথমা কন্ঠাটি জন্মগ্রহণ করে। ডাক্তার, নার্স, ঔষধ পণ্য, সেবা শুশ্রূষা কিছুই ক্রটি করেনি। যেসকল দেখতেও বেশ বড় সড় আর হুন্দর হয়েছিল। সাধ করে তার নাম রেখেছিলাম সুবর্ণিকা।

কিন্তু তার যাত্রার জীবন খালি যোগযন্ত্রণা ভোগ করেই শেষ হয়ে গেল। মাত্র এখানো বৎসর সে বেঁচে ছিল। এর ভিতর নিক্কেও শান্তি পায়নি, আমাকেও শান্তি দেয়নি। আমি চেষ্টা করেও তার যথাযথ সেবা করতে পারিনি, অস্ত্রায় ব্যবহার করেছি অনেক সময়, এটা আমার জীবনের একটা মন্ত বড় অপরাধ। প্রথম মাস তিনেক সে ভালই ছিল।

এই সময় চীন ভ্রমণ সেয়ে রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন। একদিন আমাকে দেখতে এসে খুকীকে কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। কি নাম রেখোঁহ জিজ্ঞাসা করলেন। নাম শুনে প্রশংসাও করলেন। তারপর যুমন্ত শিশুর দিকে চেয়ে বললেন, “এর উপর আমার হিংসা হচ্ছে। কেমন নিশ্চিন্ত মনে যুমছে, একে ত বিখ্যাতরতীর ভাবনা ভাবতে হয় না?” খুকীকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে এরপর তিনি চলে গেলেন।

এবারে মাস তিনেক পরে আবার রেজুনে ফিরে গেলাম। Weatherটা খুব ভাল ছিল না। জাহাজ বেশ হুলাছিল, মন্ত বড় বড় ঢেউ। হুচারটে ঝপ্ ঝপ্ করে port hole-এর গায়ে আঘাত করছিল। জল ও চুকে পড়ল এক-আধবার। মেয়ে নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে sea sick হবার অবসরও পাইনি। ঝাড়া হাত-পায়ে থাকলে নিশ্চয়ই কিছু একটা হত। এবারে যে জাহাজটায় গিয়েছিলাম, সেটার নাম Arankola। এখানে আমাদের একজন বন্ধু লাভ হল। তিনি জাহাজেরই একজন কর্মচারী, নাম Mr. Bose। তদ্রলোক সত্যিই তদ্রলোক ছিলেন, এত সৌজন্য বাঙালীর মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায় নিক্কেই আলাপ করেছিলেন, একদিন আমাদের তাঁর cabin-এ নিয়ে গিয়ে খুব বোড়শোপচারে নিমন্ত্রণও খাইয়ে দিয়েছিলেন। B.I.S.N. কোম্পানীর জাহাজ তখন নানাদেশে ঘুরত, এবং বাঙালপথে বারবার রেজুনে থামত। তিনি সর্বদাই এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতেন এবং খুব দাবী দাবী উপহার নিয়ে আসতেন। একবার বোধহয় Australia থেকেই এমন প্রকাণ্ড এক বোতল ডর্জি হুগন্ধী নিয়ে

এসেছিলেন, যে আমি ত দেখেছি। সেটা শেষ করতে আমার অনেক বৎসর লেগেছিল। আর একবার নিয়ে এলেন gram fed muttonএর বিরাট এক ঠ্যাং। সেও খেয়ে শেষ করা হুড়ক। রেজুন থেকে চলে আসার পর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি।

যাক, এবারে রেজুনে গিয়ে Phayre Streetএ যে বাড়ীটাতে উঠলাম, সেটা একটা বেশ বড় পাঁচতলা বাড়ী। পাঁচতলায় হুটো ক্র্যাট, তার একটায় আমরা থাকতাম, আর একটায় এক মুলমান পারিবার থাকতেন। সে তদ্রলোকের নামটা ঠিক কি ছিল মনে নেই, চাকর-বাকররা তাঁর উল্লেখ করত সালাম সাহেব বলে। তাঁরা গোড়া মুলমানহ, মেয়েদের মধ্যে ঝাঁরা অল্পবয়স্ক। তাঁদের কোনোদিনই চোখে দোখানি, তবে কর্তার রক্তা শাদুড়ী মধ্যে মধ্যে এসে আমাদের ক্র্যাটে ঝাঁজির হতেন। তিনি বুড়ীমাসুহ বলেই বোধহয় পর্দার বিশেষ ধার ধারতেননা। ভাঙা ভাঙা বাংলায় গল্প করতেন। আমার মেয়ে এবং আমার জায়ের ছেলে দেখে মজা খুশী হয়ে বললেন, “এ বেশ ভাল, ঘরে ঘরেই থাকবে।” আমরা তাঁকে অনেক করে বোকাতে চেষ্টা করতাম যে আমাদের বাড়ালী হিন্দুদের ঘরে ওরকম ঘরে ঘরে বিবাহের ব্যবস্থা হয় না।

বাড়ীটা আগের বাড়ীর চেয়ে কিছু বড়ও ছিল। উপরের ছাদটাও আমরা ব্যবহার করতে পারতাম। ওখানেই গোড়ার দিকে একটা বড় পাট দিগেছিলাম। অনেক লোককে বলেছিলাম। ঐ বোধহয় আমার ওখানের একমাত্র বড় social অস্থান। সবাই এসেছিলেন, আনন্দও করা গিয়েছিল। তারপর অবশ্য ক্রমে রোগে শোকে সাংসারিক উৎপাতে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে উৎসব অস্থান করার কোনো অবসরই আর রইল না। বড় জায়ের আর একটি গুল হল এখানে। পরিবারটি এখন বড়ই দাঁড়াল বেশ। দাসী-চাকরের সংখ্যাও বাড়ল, তাদের স্বগড়ার্বাটিও বাড়ল। ঐ বাড়ীরই সর্বমির তলায় আমার দামীর কর্মস্থল বইয়ের দোকান ও ছাপাখানা ছিল। এইটা একটা স্থিতি ছিল যে তাঁকে বেশী ছোট্টাট করতে হত না।

এই সময় আমার মেয়েটির দারুণ অসুখ আরম্ভ হল। ঘন ঘন গি হতে লাগল। সে দিনগুলোর কথা মনে করলে এখনও মনে হয় হৃৎস্পন্দ বেধেছি। ওখানের ডাক্তাররা ত প্রথমে কিছু বুঝতেই পারলেন না। ইংরেজ সিভিল সার্জেনকেও ডেকে দেখান হল। কিন্তু তিনিও বিশেষ কিছু সাহায্য করতে পারলেন না। ওখানেও বহুবাকবরা তখন খুব সাহায্য করেছিলেন। রোগ কিন্তু একভাবেই চলতে লাগল। শেষে ওখানের একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি পাশ করা ডাক্তার নন, কিন্তু নিজের বহুবাকবদের ওষুধ দেন এবং সকলেই উপকৃত হন। নাম ছিল তাঁর বিজুতি, দাস বা গুপ্ত, এত দিন পরে ঠিক মনে নেই। তিনি কারো কাছেই পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু নিতেন না। পোস্টমাস্টারের কাছ করতেন বোধহয়। তাঁকেই ডেকে আনা হল। শ্রামবর্ষ রোগামাসুহ, চলমাপরা। অনেককণ বসে বসে একদৃষ্টে শিশু রোগিনীকে দেখলেন। তারপর ওষুধ দিয়ে গেলেন।

এরপর থেকেই রোগের প্রকোপ কমতে আরম্ভ হল, এবং কয়েকদিন পরে গি হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। তবে শুনলাম, যে শিশু যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিল তা সম্ভবতঃ কোনদিনই সম্পূর্ণরূপে সারবে না, মধ্যে মধ্যে রোগের আক্রমণ হবেই। শিশুর মানসিক বিকাশও এতে বিশেষ ভাবে ব্যাহত হতে পারে। বুঝলাম, সামনে এখন বিষম সংগ্রামের দিন। নূতন দেশে নূতন সংসার। এই পীড়িত শিশুর আংশিক ভারও নিতে পারে শেষকণ কেউই তখন সে পরিবারে ছিল না। স্বি-চাকর সবই নূতন, বিবাসের উপযোগী কেউ নয়। আমাকে এখন অনেকাংশে গৃহবন্দীর জীবন যাপন করতে হবে, তা বুঝতেই পারলাম। আমি সাত বছর ছিলাম ব্রহ্মদেশে, তার ভিতর অর্ধেক দিন সত্য সত্যই প্রায় বন্দী ছিলাম। হ-এক বছর জন্তু কখনও কখনও বেবোতাম, তাও শিশুটিকে সঙ্গে নিয়েই বেশী ভাগ। শেষের দিকে আতি একটি কার্ণিটা ও কর্ণব্যানিট আনা ছোট্টাটে কিছু



ছটি আহার মাঝে মাঝে মিলত। বড়দিন রেজুনে হিলাম ভতর্দিন এই যেয়েটি টিএর অল্প এবং অল্প নানা যোগে তুপেছিল। বিড়তিবাবুই তার দেখাশোনা করতেন, তাতেই সে বায়ে বায়ে সামলে উঠত। বিড়তিবাবু হয় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বা তার কিছুদিন আগেই কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে দেশে চলে আসেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ আহার অসীম। কলকাতায় এসে তাঁর ধৌক পেয়েছিলাম কিন্তু বোগস্নান আর কোনদিনই জোড়া লাগেনি।

এদিকে দিন একভাবেই কাটতে লাগল। লেখাপড়ার কাজে বেশী করে ডুবে থাকার চেষ্টা করতাম, তাও সব সময় হয়ে উঠত না। বন্ধুভাবে মিশতে পারি এমন কোনো লোক সেখানে পাইনি, একলা একলাই দিন কাটত। মেয়ে কখনও ভাল থাকত, কখনও থাকত না। কলকাতার থেকে নিয়মমত চিঠিপত্র আসত, দ্বিদি লিখতেন, বাবাও লিখতেন। দ্বিদির বিবাহ আসন্ন এরকম একটা আভাস মাঝে মাঝে পাচ্ছিলাম, তবে একেবারে সঠিক করে জানতাম না। এবারে জানলাম যে, কালিদাস নাগ মহাপুরের সঙ্গে বিয়ে তাঁর ঠিক হয়ে গিয়েছে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই তাঁর বিয়ে হবে। শুনে খুব আনন্দিত হলাম। কালিদাসবাবুর সঙ্গে আমাদের বহুদিনের আলাপ ছিল। বোধহয় ১৯১১-১৩ বর্ষ আমরা শান্তিনিকেতন যাওয়া শুরু করি, তখন থেকেই তিনিও এই নব তীর্থযাত্রীদের দলে জুটে যান। আঁত ভ্রমর্শন, মুকর্ষ, সন্ধ্যাপী লোক ছিলেন, কাজেই তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি পরিচিত ব্রাহ্মবাড়ীর ছেলে, কাজেকাজেই তাঁকে আমরা অনেক জায়গায়ই দেখতাম। শান্তিনিকেতনে বর্ষনই গানের আড্ডা বসত, কালিদাসবাবু সেখানে অগ্রণীকপে উপস্থিত হতেন। নিজে গাইতেনও বেশ ভাল, এবং গান শিখতেনও খুব চট্ করে। গাইতে বললে কিছু সহজে রাজী হতেন না কিছুতেই। অল্পবয়সেই অধ্যাপক হয়ে বসেছিলেন, কিন্তু গুরুগভীর কোনোদিনও হতে পারেননি। স্কুলের রায়দের

বাড়ীর সব কোঠুক জুড়েই তাঁর সব সময়ে স্নাত উৎসাহে বোগ দিতেন। মাঝে কিছুদিন নানাভাবে ঘুরেছিলেন। প্যারিসে গিয়ে পড়াশোনাও করেছিলেন। সিংহলে একটি কলেজের তার নিয়োগ কিছুদিন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সর্বদাই কোঠুক করে “ঐতিহাসিক” বলে সম্বোধন করতেন। আলিপুর চিড়িয়াখানার তদানীন্তন অধ্যক্ষ বিজয়ক বহু ছিলেন তাঁর বড়মাঝ। এইখানেই বাস করতেন কালিদাসবাবুর মেজতাই গৌকুলচন্দ্র নাগ। ইনি ভবানীপুরের Four Arts Club এর সংগঠক সভ্যদের মধ্যে প্রধান একজন ছিলেন। চারটে Arts-এর সব কটাতেই তাঁর অধিকার ছিল প্রশস্ত। বিজয়বাবুর বাড়ী আর বাগান এই সভ্যটির খুবই কাজে লাগত, এবং প্রায়ই এখানে সভার আবেশন বসত। কলকাতায় থাকলে কালিদাসবাবু এসব উৎসবে নিয়মিত হাজির হতেন। তবে ভবপুরে রোগ তাঁর চিরদিনই ছিল, থেকে থেকে কিছুদিনের জঙ্গ কোথায় যে অদৃষ্ট হয়ে যেতেন তার ঠিক নেই। এবারে শুনলাম, তিনি পাকাপাকি কলকাতায় এসে বসেছেন, এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ নিয়েছেন। এতদিনে বোধহয় গৃহী হওয়ার দিকে যন গিয়েছে এবং বিবাহও স্থির করে কলেছেন। এত দিনের বন্ধু আমাদের ঘরের জামাই হবেন শুনে খুবই খুশী হলাম।

বেশাখ মাসে বিয়ের তারিখ পড়েছিল, ঠিক করলাম একটু আগে আগেই যাব। গোহগাহ করে নিয়ে ত যাত্রা করা গেল। বাড়ীতে পৌঁছেই একটা জিনিস প্রথম নজরে পড়ল। মা যেন বেশ স্বাভাবিক ভাবেই চলছেন, কথাবার্তা বলছেন। মুলুনারা যাবার পর থেকেই তিনি যেন সংসারের সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, জগৎ সংসারের কিছুই সঙ্গেই তাঁর সম্বন্ধ ছিল না। এখন তিনি হঠাৎ আগেকার দিনের মধ্যে ফিরে গেছেন যেন। বোধহয় বড়ময়ের বিয়েতে খুশী হয়েছেন খুব, তাতেই এই পরিবর্তন আপনার লাকুল্যার বোডে এবাসী কার্যালয়ের বাড়ীটি

তখন ছিল বিরাট, চারদিকে জমিও ছিল অনেক। সেই বাড়ীতে বিয়ে হবে ঠিক হয়েছিল। আমি যখন পৌঁছলাম, তখনও বিয়েতে কে আচার্য্য হবেন ঠিক হয়নি। আমার বিয়ে ব্রাহ্ম সমাজে প্রচলিত প্রথায় Act III অনুযায়ী রোজিষ্টি করে হয়েছিল, এই বিয়েতে ওনলাম বরের অসম্মতি থাকায় রোজিষ্টি হবে না। আচার্য্য হলেন শেখ অবধি ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার।

রবীন্দ্রনাথ তখন পর্য্যন্ত কলকাতাতেই ছিলেন। কিন্তু ওনলাম তিনি কয়েক দিন পরে কলকাতা থেকে চলে যাবেন, বিয়ের দিন পর্য্যন্ত থাকবেন না। উনি তখন আলিপুরে প্রশান্ত মহলানবিশের বাড়ীতে ছিলেন। সেখানে একদিন আমাদের নিমন্ত্রণ হল। রবীন্দ্রনাথ বর-কনেকে সাজিয়ে গুঁড়িয়ে পাশাপাশি বসিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং উপদেশ দিলেন। পাওয়া দাওয়া গান প্রভৃতিও হল। বিয়েতে যে রইলেন না, আমাদের সেই অভাবটা যেন খানিকটা পূর্ণ করে দিয়ে গেলেন।

বাড়ীতে তখন বেশ পুরোদমে হৈ চৈ চলছে, স্যাকরা আসছে, বেনারসী-ওয়ালা আসছে। কার্য্যতঃ বাড়ীর মিস্ত্রী যে, সে-ই কনে, বেশ মজার ব্যাপার হচ্ছিল। মা ত বহুকাল গৃহিনীর পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন, রোগে পড়বার সময় থেকে। দাঁড়িই গৃহকত্রীর পদে ছিলেন। দাঁদার নবাববাহিতা স্ত্রী তখনও গৃহিণীর স্থান নেননি, বেশী ভাগই বাপের বাড়ী থাকতেন। প্রায় বিয়ের দিন অবধি দাঁদি মিস্ত্রীপনা করলেন। বিয়ের আগের দিন বাবা চাঁদিটা চেয়ে নিলেন। বললেন, “দেখি মা, ওটা এখন আমার দাঁও।”

দাঁদির বিয়ে খুব ঘটী করেই হুয়োছিল। বরকে নিয়ে তার বন্ধুর দল খুব হুল্লোড় করেছিলেন। একটা দৃষ্ট এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। বর আগেরে আসছেন, বন্ধুগণ তাঁর চারদিক্ ঘিরে, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাণপণে বরকে একটা টোপর পরাবার চেষ্টা করছেন, এবং বর প্রাণপণে তাতে বাধা দিচ্ছেন।

বিয়ে ত হয়ে গেল, তার পরদিন বেশ বুড়ির মধ্যে বর-কনে বিদায় হয়ে গেল। তার পরদিন গেল

ফুলশয্যার তত্ত্ব। আমরাও বরের মামার বাড়ী আলিপুরে গিয়ে নেমস্তন্ন খেয়ে এলাম।

বিয়ের পরেই রামমোহন রায় বোডের এই পুরনো বাড়ী ছেড়ে, এই রাস্তার উপরেই নূতন একটা বাড়ীতে উঠে গেলাম। সেইখানে দুতিন দিন থেকে আমি আবার সুস্থপথে পাড়ি দিলাম।

আমাদের দুই বোনের বিয়ে হয়ে যাওয়ার বাবা বড় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন। স্ত্রী ত তাঁর থেকেও ছিলেন না, মেয়েরাও দুজনই খর ছাড়ল।

এর পর থেকে অনেক সময় তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে থাকতেন। বিশ্বভারতীর কাজে মথো মথো ঘোগণও দিতেন। আমার ছোট ভাই অশোকও এই সময় ওখানে কিছুদিন অধ্যাপকের কাজ করেছিলেন বলে শুনেছিলাম। তাঁর বিয়ের কথাও এ সময় কিছু কিছু শুনে এসেছিলাম। ডাঃ নীলরতন সরকারের সব-ছোট মেয়ে কমলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হির হয়েছিল, তবে কখন বিয়ে হবে সেটা পাকাপাকি হির হয়নি।

কলকাতার থেকে চলে আসবার আগে একবার আমার মেজ ননদের স্বামী অধিনীকুমার রায় মশায়ের সঙ্গে দেখা হল। একে আগে আমি কখনও দেখিনি। তাঁর তৃতীয় কন্যা কল্যাণীর জন্মের সংবাদও তখনই পাওয়া গেল। এর সঙ্গে পরে বোধকর আর একবার মাত্র দেখা হয়। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনটি কন্যা ও একটি পুত্র বেখে বান, সব ক’টিই তখন আঁত অল্পবয়স্ক। আমার মেজ নন্দ সুপ্রভা এত ক’টি অপোগণ্ড সন্তান নিয়ে বহুবৎসর কঠোর সংগ্রাম করেন। আশনীবাধুর ইচ্ছা ছিল বেয়েদেবও উচ্চ শিক্ষা দেন। সুপ্রভা অনেক কষ্ট সহ করে মেয়ে তিনটিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত কলেজে পাড়িয়েছিলেন, এবং সব ক’টিরই বেশ সুপ্রভা বিয়ে দিয়েছিলেন, ছেলে এম-এ পাশ করে কিছুদিন মৌলিক গবেষণার কাজও করেছিলেন। সুপ্রভার আঁত অল্প বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়, কাজেই পড়াশুনা তাঁর কিছুই হয়নি বললেই হয়, কিন্তু উচ্চ শিক্ষার মূল্য তিনি অনেক উচ্চ শিক্ষকের চেয়ে বেশী বুঝতেন। তাঁর স্বামী মরনসিংহের আঠার-

বাড়ী টেটের দেওয়ান ছিলেন। এই জবদার বংশ তাঁদের আত্মীয়ও ছিলেন। সুপ্রভা বিধবা হবার পর এঁদের কাছ থেকে একটি মাসিক পেনশন পেতেন এবং অক্লান্ত ভাবে উদ্বাস্ত পরিচর্যা করতেন। সাধারণ বাহ্য তাঁর ভালই ছিল গোড়ার দিকে। কিন্তু সংসারের সমস্ত কাজ প্রায় নিজে করে এবং চারটি ছেলেমেয়েকে লালন পালন করে তাঁর বিলাস বলে কিছু ছিল না। নিজের কোনো স্বত্ত্ব তিনি করতেন না, করবার উপায়ও ছিল না। তাঁর তীক্ষ্ণ আত্মসম্মত জ্ঞান ছিল। যাতে নিজের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়, এতেন কাজ তিনি কিছুতেই করতে চাইতেন না। এ জন্ত একটু আলাদা আলাদা থাকা পছন্দ করতেন। হাতমুখী ও প্রকৃতিচিন্ত মাহুষ ছিলেন, মুক্টি-বোধও বেশ জাগ্রত ছিল। অকাল বৈধব্যে, অভভুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি কিছুই বুঝে পড়েননি, যেখানে যেতেন হাসি গলে বেশ জমিয়ে রাখতেন। তাঁর সব কাজকর্ম, রান্না-বাছা, শেলাই, সবই অতি পরিপাটি ছিল, এলোথেলো কাজকর্ম তিনি দেখতে পারতেন না। প্রথর হিসাব জ্ঞান ছিল, একটি পরলা তিনি অপব্যয় করতেন না। দরকার পড়লে নিজের সীমিত আয়ের মধ্য থেকেও আত্মীয়-বন্ধনকে অর্থসাহায্য করতেন। স্বামী অল্প কিছু বা রেখে গিয়েছিলেন, এবং পেনশন হিসাবে যা পেতেন, তারই মধ্যে গৃহিণীর গাছিরে মেয়েদের বেশ ভাল ভাবেই বিয়ে দিয়েছিলেন। যতদিন ময়মনসিংহ শহরে নিজের সংসার নিয়ে আলাদা বাড়ীতে ছিলেন, তাঁর বেশ সুশৃঙ্খল সংসারই ছিল। তবে দেশ-বিভাগের সময় দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্ত তাঁকে বাড়ীঘর ছেড়ে কলকাতার চলে আসতে হল। এতে তিনি বড়ই আশঙ্কিত বোধ করতেন কিন্তু তখন আর কিই বা করবার ছিল? মেয়ে তিনটিরই তখন বিয়ে হয়ে গেছে তবে ছেলের পড়াশুনা তখনও শেষ হয়নি। কাজেই কলকাতার আত্মীয় বাড়ীতে তাঁকে থেকে যেতে হয়েছিল। শেষ জীবনে তিনি ধানিক দৈহিক ও মানসিক কষ্ট ভোগ করে গেলেন, এতে বড় অবাক লাগে। তাঁর মত কর্তব্যনিষ্ঠ, অক্লান্তকর্মী বাহুষ এ শান্তি ভোগ করলেন কেন? ইহজীবনের কর্মকালের মধ্যে তাঁর এসব কিছু পাওনা ছিল না, তা প্রায় নিশ্চয় করে বলা যায়। কোনোদিন কারো ভালো ছাড়া মন্য করতে তাঁকে দেখা যায়নি। এই জেদেই হরত পূর্ণজন্মের কর্মকাল এ জন্মেও কলে বলে

মাহুষের একটা ধারণা গড়ে উঠেছে। এটা নিজের জীবনেও যেন দেখতে পাই। বা পেয়েছি এ জগতে এসে, আনন্দের দিক দিয়ে, সৌভাগ্যের দিক দিয়ে, তা পাবার যেমন কোন যোগ্যতা আমার ছিল না, তেমনি শান্তিও বা পেয়েছি, তা পাবার মত হৃদয়ই বা আমি কিছু কি করেছিলাম?

দ্বিদিব বিয়ের পর আবার যখন ব্রহ্মদেশে গিয়ে গেলাম, তখন পরিবারের উপর হঠাৎ যেন শনির দুটি পড়ল। বাড়ীতে তিনটি শিশু সন্তান ছিল, আমার বড় কাকের দুটি ছেলে ও আমার একটি মেয়ে, তিনটিই এক সঙ্গে দারুণ রক্ত আমাশা রোগে আক্রান্ত হল। সে এক নিদারুণ কাল। মনে করলে এখনও অবিস্ম্য লাগে। যেহুঁন একটা বড় শহর, মোটামুটি সব রকম চিকিৎসার ব্যবস্থাই সেখানে ছিল। ছেলেহুঁটির এলোপ্যাথী চিকিৎসা চলতে লাগল, সেবা যাতে ভাল মতে হয় তার জন্ত নার্সও রাখা হল। আমি মেয়ের চিকিৎসা বিভূতি বাবুর উপরেই কেলে রাখলাম, কারণ আগের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলাম যে, এ মেয়ের জাকারী চিকিৎসার কোনো ফল হবে না। সে ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে লাগল।

ছেলেহুঁটিকে বাঁচান গেল না। কয়েক দিনের ব্যবধানে তারা দুজনেই মারা গেল। তার পিতামাতার বা অবস্থা হল, তা একেবারে অবর্ণনীয়। এরই মধ্যে আবার কি কারণে জানি না, Phayre Street-এর পাঁচতলা বাড়ী ছেড়ে, কালাবস্তির একটা বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। সেখানে হুঁর্ণিত বাড়ল বই কমল না। ঐখানেই আমার জায়ের বড় ছেলেটি মারা গেল। আবার কিরে এলাম Phayre Street-এর বাড়ীতে। দ্বিতীয় ছেলেটি এই বাড়ীতে গেল।

সে সময়টা পরিষ্কার করে যেন এখন মনে পড়ে না অথচ সে সময়ের অন্তান্ত কথা তবু অনেকটা মনে আছে।

আবার বাড়ী খোঁজা আরম্ভ হল, এবাড়ীতে আর কেউ থাকতে চাইল না। বুঁজে পেতে আর-একটি বাড়ীতে উঠে গেলাম। এটা এক মহারাষ্ট্রীয় উকীলের বাড়ী, নাম তাঁর হালকার। ভারতীয় লোক, কাজেই বাড়ীটা একটু ভারতীয় ভাবে তৈরি, ঘরের সংখ্যাও বেশী। পেটার দরকারও ছিল, কারণ এই সময়ে আমার যন্ত্রণা এখানে এলেন, এবং অবিস্ম্যতা ছোট ননদটিও এসে এখানে মাঝে মাঝে থাকতে লাগলেন। বাড়ীর সামনে একটা কাঁকা মাঠের মত ছিল, বাড়ীতে আলো বাতাস খুব। অন্তান্ত ব্রহ্মদেশীয় বাড়ীর চেয়ে এটাতে ব্যবহারিক একটু ভাল ছিল।

ক্রমশঃ

# জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

## [ নিগ্রো মনোষী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনালেখ্য ]

অমল সেন

(পূর্ণপ্রকাশিতের পর)

জর্জ কার্ভার আন্তে আন্তে খুব সতর্কতার সঙ্গে দক্ষিণাফ্রিকার অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের দিকে মন দিয়ে তা কার্যকর করে তুলতে লাগলেন। এচও গ্রীষ্মের অগ্নিকরী ক্রম দিনগুলিতে ওয়োরের মাংসে যাতে পচন ধরতে না পারে তার জন্য অল্প কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কি উপায়ে তা সংরক্ষিত করে রাখা যায় জর্জ কার্ভার তাও অধিবাসীদের শিখিয়ে দিলেন।

পুষ্টিহীনতা রোগের প্রকৃত কারণ সেসবের অনেক বড় বড় ডাক্তারেরও জানা ছিল না, তারা শুধু আশ্রয় উপর নির্ভর করে চিকিৎসা করত। পুষ্টিহীনতা রোগের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক হলো কাঁচা ফল। খেয়ে সহজে এই রোগের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। বিজ্ঞ অভিভক্তালব্ধ বহু বিখ্যাত চিকিৎসক এই রহস্য জানতে পারার আগেই ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার তা আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু শুধু আবিষ্কার করলে অথবা নিজেকে জানলেই তো হবে না, সকলের কাছে, বিশেষ করে তাঁর নিগ্রো ভাইবোনদের কাছে এই খবরটি পৌঁছে দিতে হবেই এবং এই উদ্দেশ্য নিয়ে ডাঃ কার্ভার তাঁর আবিষ্কারের কথা জনে জনে বলে বেড়াতে লাগলেন। নিজের কৃতিত্ব জাহির করার জন্য নয়, লোকদের মধ্যে কাঁচা ফল খাবার অভ্যাস গড়ে তুলবার সংকল্প নিয়ে। তিনি যাকে কাছে পান তাকেই বলেন, “তাই, রোজকার খাওয়ার সঙ্গে একটুখানি ফল খেয়ো, বতটুকু পারো, বা তোমার মাথো কুলোর, সামান্য হলেও ক্ষতি নেই। দামী ফল খেতে না পারো সাধারণ ফল,

এই যেমন ধরো—বুনো খেজুর, ডাঁসা পেয়ারা, লশা, আপেল যে খেতে যে ফল পাওয়া যায়, তাই খেয়ো।” সম্মতিক্রমে তিনি বলতেন, “ফল খাও, ফল খাওয়া ভালো, ফল খাওয়া দরকার।”

জর্জ কার্ভার প্যাকেট ভরে ভরে নানা রকমের ফসলের বীজ নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে তা সাধারণ লোকদের মধ্যে বিতরণ করে বেড়াতে লাগলেন। শাকসব্জি উৎপাদনের পদ্ধতি পুঙ্খ নুয়কদের শেখাতে তাঁর বিশেষ বেগ পেতে হল না, কিন্তু মুশকিল হল মালিদের নিয়ে, তারা ক্ষেত থেকে ফসল তুলে ঘরে আনতে পারে, তা দিয়ে খাবার তৈরি করতেও যে পারা যায়, কি করে সেটা সম্ভব তা তাদের বুদ্ধিতে কিছুতেই কুলিয়ে ওঠে না। তাই জর্জ কার্ভারকেই এগিয়ে যেতে হল তাদের হাতে কসমে খাবার তৈরি করার নিয়ম শিখিয়ে দেবার জন্য। জামার হাতা কনুই অর্থাৎ গুটিয়ে নিয়ে তিনি নিজেকে গিয়ে রান্না করার সাক্ষরজ্ঞান নিয়ে উন্নতের কাছে বসলেন এবং শাকসব্জি বিট, পালাং গাজর কড়াইগুটি এবং আলু দিয়ে কিতাবে চমৎকার ও সুখরোচক খাদ্য তৈরি করতে হয় তা তাদের শিখিয়ে দিলেন। এমন এক বাড়ীতে শুধু নয়, বাড়ী বাড়ী গিয়ে তিনি মেয়েদের রান্না শেখাতে লাগলেন।

বাগানে এবং বাড়ীর চারদ্বারের পড়ো জমিতে অনেকদিন ধরে জমা হয়ে জঙ্গাল ও কত আবর্জনার যে পাহাড় গড়ে ওঠে এবং এক সময়ে তা পচতে আরম্ভ করে কিন্তু মাহুষের কোন কাজেই লাগে না, অধ্যাপক জর্জ

ওয়ারিংটন কার্ভার তাঁর বিশ্বয়কর উদ্ভাবনী প্রতিভার সাহায্যে সেই জঞ্জালের জুপ থেকে মানুষের উপকারে লাগবার মতো কতকগুলি জিনিস সংগ্রহ করে এনে তা দিয়ে অনেক রকম আশ্চর্য বস্তু তৈরি করলেন। প্রচুর পরিমাণ শূন্যের চর্বি আগে লোকে ফেলে দিত, তা যে কোনকালে মানুষের কোন কাজে আসতে পারে সে ধারণাই তাদের ছিল না। ডাঃ কার্ভার সেই আবর্জনার জুপে ফেলে দেওয়া চর্বি এনে তা থেকে চমৎকার কাপড় কাচার সাবান তৈরি করে গৃহস্থদের ব্যবহার করতে দিলেন। সারা বছরে তাদের আর সাবান কেনার দরকারই হল না। আশ্চর্য্য মিষ্টি আলু খেতে লোক ভেমন পচন্দ করত না, তিনি তা থেকে তৈরি করলেন উৎকৃষ্ট খেতসার। এমন আরো অনেকগুলি জিনিস তিনি তৈরি করলেন।

নিগ্রো গমণীদের হাতে কয়েক রকমের ফুলের চারা ও বীজ দিয়ে জর্জ কার্ভার বললেন, “যরের আশেপাশে দরজার কাছে আঙিনায় এইসব ফুলের চারা ও বীজগুলি লাগিয়ে দিলে যখন গাছ হবে ও ফুল হবে, দেখবে কী চমৎকার লাগবে। ফুলের গন্ধে সারা বাড়ী ভরে যাবে। জানো তো কুল হচ্ছে ভগবানের নীরব দূত।” এই কথা বলে তিনি গাড়ীতে উঠে বলে গাড়ী চালিয়ে দিলেন।

জর্জ কার্ভারের তৈরি গাড়ীর খবর সব লোকে জানিল, তারা তার নাম রাখল টাঙ্কেগি গাড়ী। দলে দলে লোক আসতে শুরু করলো অধ্যাপক কার্ভারের কাছে। যারা আগে বুধা কাজে ও গল্পগুজবে সময় নষ্ট করত, শনিবারের বিকেলবেলাটা আলস্যে কাটিয়ে দিত, তারা এখন সবাই দল বেঁধে শহরে আসতে লাগল কার্ভারের তৈরি মনোরম ফুল ও ফলের বাগান দেখবার জন্য, কিন্তু এতে বেতাজরা মোটেই খুশি হতে পারে না। তারা জর্জ কার্ভারের জনপ্রিয়তা এভাবে বর্ধিত হতে দেখে দারুণ অস্বস্তি বোধ করে এবং কার্ভারের এইসব সভাসমিতি, কিভাবে পণ্ড করে দেওয়া যায় তার স্রবোধ খোঁজে। তারা বলতে আরম্ভ করে দিল, কোন কৃষকার নিগ্রোতে আমরা আমাদের জমির

জিসীমানার খেঁবতে দেব না। এই কথা বলে তারা এইটেই বোঝাতে চেয়েছিল যে, কোন কৃষকার নিগ্রো যে অত্যধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদন করে বেতাজ মালিক বা কৃষিজীবীকে হারিয়ে দেবে তারা তা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।

নিগ্রোজাতির কর্মবীর ডাঃ বুকার টি ওয়ারিংটন এবং ডাঃ জর্জ ওয়ারিংটন কার্ভারের মতো নিগ্রো জাতির কল্যাণকামী বহু ও শ্রেষ্ঠ মনীষী সমগ্র অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন, “কোনো মানুষকেই চিরকাল অন্ধকারের মধ্যে আটকে রেখে দেওয়া যায় না বা গর্ভের মধ্যে ফেলে দাবিয়ে রাখা যায় না, যদি সেই মানুষ নিজে ইচ্ছে করে গর্ভে না নামে।”

তাঁদের এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হতে খুব বেশী দিন দেবী হল না। অল্পদিনের মধ্যেই বেতাজদের সম্প্রদায় বন্ধ হয়ে এল, তারা স্রব পাণ্টে অল্প ভাষার কথা বলতে শুরু করল এবং কালো নিগ্রার অধ্যাপকটী কী বলে তা শুনবার জন্য তাই কাছে যাওয়া-আসা আরম্ভ করল। উদাহরণ্য জর্জ কার্ভার সাংগে তাদের গ্রহণ করলেন। তিনি তাদের পেয়ে খুশিই হলেন।

দক্ষিণাফলের নিগ্রো কৃষকদের যে সমস্তা, বেতাজ কৃষকদের সমস্তা তা থেকে আলাদা নয়। মোটামুটি ভাবে দক্ষিণাফলের সব কৃষকদের একই সমস্তা, শাদা ও কালোর প্রয়োজন একই ধরণের এবং একই জিনিসের। জর্জ ওয়ারিংটন কার্ভার অন্ধকার সমুদ্রে একটা বড় রকমের চিল নিক্ষেপ করেছিলেন এবং শাদা-কালো নির্বিশেষে যত বেশী সংখ্যক লোককে তিনি উন্নততর ও সুখশান্তি-সমৃদ্ধ জীবনের সন্ধান দিতে পেরেছিলেন ততই বেশী করে সেই চিলের আঘাত লেগে সমুদ্রে চেউ জেগেছিল এবং তার পরিণতি ক্রমশঃ দূর থেকে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজো ঠাণ্ডা ছড়িয়ে পড়া ধামেনি, কারণ আজো আমেরিকার বর্ণবিষেব সোদনকার মতোই প্রবল, আজো নিগ্রোজাতি পছন্দলিত, বাক্ত, সম্পূর্ণ মানবিক অধিকার লাভের জন্য তাদের সংগ্রাম আজও শেষ হয়নি।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার এই দৃঢ় প্রত্যয় মনে মনে পোষণ করতেন যে তিনি যেদিন ইহলোক ত্যাগ করবেন সেদিন তিনি তাঁর অন্তরে অন্তত এ বিশ্বাস নিয়ে যেতে পারবেন, ভ্রাম্যমাণ কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর অন্তসব কাজের কথা লোক যদি মনে নাও রাখে, টাক্সেগির ভ্রাম্যমাণ কৃষি বিদ্যালয় বৈচে থাকার সঙ্গে তাঁর নাম নিশ্চয় জড়িয়ে থাকবে। জর্জ কার্ভারের গাড়ীর উপরে প্রতিষ্ঠিত কৃষিবিদ্যালয় সোদন দরিদ্র ও অনশনাক্রান্ত কৃষকদের দারিদ্র্যের অভিলাষ থেকে মুক্ত করে যে বিপ্লব এনেছিল—ইয়া বিপ্লবই বলব কারণ জর্জ কার্ভারের এই কাজের ফলে কৃষকদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল—তারই ফলে টাক্সেগি কৃষি বিদ্যালয় আজ শ্রেষ্ঠ কৃষি মহাবিদ্যালয় রূপে সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এই কৃষি মহাবিদ্যালয়ের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, “এই কলেজের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষিকাজে স্নান করবে তোলা, মূল্যহীনকে মূল্যবান করা এবং দুচ্ছ ও অকিঞ্চন্যকে মর্যাদাভূষিত করা। ভগবানের সৃষ্ট সামান্য ও দরিদ্রতম ব্যক্তিও যাতে স্থান পায়, মান পায়, স্বাস্থ্য এবং সম্পদ লাভ করতে পারে, তার গৃহ শান্তি ও সুখের আগার হয় এবং সর্বোপরি তার জীবনের যাতে মূল্য বাড়ে, এই কলেজে সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়।”

কার্ভারের ভ্রাম্যমাণ কৃষি কলেজের নাম হীতিমধ্যে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে এবং বীতিমতো লাড়া জাগিয়ে তুলেছে। বহু জায়গা থেকে তাঁর কাছে ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয় সংস্থাপনের নিয়মকানুন জানতে চেরে ও এ বিষয়ে তাঁর উপদেশ এবং পরামর্শ প্রার্থনা করে বহু চিঠিপত্র এসে। ভারত, রাশিয়া, চীন, জাপান, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার অনেক লোক অসীম আগ্রহ, কৌতূহল ও অসুস্থান্দ্রিয়া নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হল। তারা এল কার্ভারের অভ্যাসার্চ ভ্রাম্যমাণ কৃষি মহাবিদ্যালয় দর্শন করে প্রত্যেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা

সকর করতে। তারা কৃষি মহাবিদ্যালয়ের উদ্ভাবক সেই যোগা চোহারার চ্যাভা, কালো ও কুৎসিত দর্শন অধ্যাপককে দেখে বিশ্বাসে অভিভূত হয়ে পড়ল, ইনি ঐ এই কৃষি কর দেহের মধ্যে সৃষ্টিধর্মী এতবড় প্রতিভা সূকিয়ে রেখেছিলেন এতদিন! কিন্তু এর জন্য মানুষটির এতটুকুও অহংকার নেই, নিজেকে জাহির করার চেষ্টা নেই, বরং ঐর গুণের কথা বলে কেউ ঐর প্রশংসা করলে ইনি যারপরনাই লজ্জা পান, অতিশয় বিরত বোধ করেন।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের এই স্থিতিগুলি সাক্ষ্য এবং বিশ্বজোড়া খ্যাতিতে যিনি সবার চাইতে বেশী আনন্দ ও গর্ব অনুভব করেন সেই মানুষটি হলেন ডাঃ বুকার টি ওয়াশিংটন। তিনি জর্জ কার্ভারকে কাছে ডেকে আহ্বান করে বাসিয়ে তাঁর বেতন বৃদ্ধি করে দিতে চাইলেন, কিন্তু কার্ভার রাজি হলেন না, মাথা নেড়ে বললেন, না, না, বেশী মাইনে আমি চাই না। অত টাকা নিয়ে আমি কী করব? আমি একা মানুষ, তিনবেলা তিন মুঠো আহ্বার এবং একটা মাঝ পোশাক হলেই আমার চলে যায়। আর ক্যাপন অথবা সৌধনতার কথা যদি বলেন, আমার সেসব কিছুই নেই বললেই চলে, শুধু আমার কোটের ভাঁজে বুকপকেটের কাছে একটা স্নানর ফুল পেলেই আমি খুশি। আর, তার জন্য আমার কোনো ভাবনা নেই। আমার বাগানে অল্প এবং রকমারি ফুল ফোটে।

জর্জ কার্ভারের বিশ্বজোড়া খ্যাতিতে পৃথিবীর অনেক বড় বড় লোক আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম ম্যাকিনলি এবং খিওডোর রুজভেল্ট, জর্জ কার্ভারের প্রাক্তন শিক্ষক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান কৃষি-সচিব মিঃ জেমস জি উইলসন।

করেক বছর ধরে পল্লী অঞ্চলগুলিতে ঘুরে বেড়ালেন জর্জ কার্ভার, কৃষকদের মধ্যে গিয়ে তাদের বিভিন্ন জাতের কল ও ফুল-ফলের চাষ করবার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে

বললেন, যেমন কলাই ও মিষ্টি আলুর চাষ। কিন্তু তাঁর উপদেশ এবং পরামর্শে বিশেষ কোন কল হল না। কৃষকরা তেমন আগ্রহ দেখাল না। তখন জর্জ কার্ভার নিজের সন্মতান নিয়ে পরীক্ষা—নিরীক্ষা করে তা থেকে এক ধরনের ময়দা আবিষ্কার করলেন। এ ছাড়াও সন্মতান থেকে তিনি এক রকমের শস্ত্রচূর্ণ এবং দুধ তৈরি করলেন। তাঁর গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত এই সন্মতানের দুধ এবং ময়দা একদিন সারা দক্ষিণাঞ্চলের আধিবাসীদের প্রধান খাদ্য হিসাবে পরিগণিত হল। যেসব জমিতে এককাল তুলোর চাষ হত সে জমিতে এইসব ফসল যে উৎপন্ন করার এখনো সময় হয়নি এবং জমি সেসব ফসল উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত হয়নি, জর্জ কার্ভার জমির গুণাগুণ পরীক্ষা করে সেটা বুঝতে পারলেন।

হঠাৎ ভয়ংকর মূর্তি নিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে ফসলের মহামারী দেখা দিল। অজন্মা নর, ধসা রোগে আক্রান্ত হয়ে তারা তাজা গাছগুলি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, তাদের আর মাথা ভোলার শক্তি রইল না।

এই মহামারীর মোকাবিলা করতে না পেরে দলে দলে অসহায় কৃষক প্রতিকারের আশায় জর্জ কার্ভারের কাছে ছুটে এল। কার্ভার বহাদুর আগে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন তাদের, কলাইর সংক্রামক ব্যাধি একবার বিস্তারলাভ করতে পারিলে তা বোধ করা প্রায় হুঃসাধ্য, ক্ষুদ্র জীবাণুগুলি খুবই সাজাতিক, শুধু কেবল তুলো খেয়েই বেঁচে থাকতে পারে। এরা সংখ্যায় বেশী হলে তখন আর কিছুতেই এদের আক্রমণ প্রতিরোধ কিংবা ধসা রোগের হাত থেকে ফসল রক্ষা করা যায় না।

১৯৫ সালে এই উইন্ডল কীটের ধ্বংসাত্মক আক্রমণের ফলে লুইসিয়ানা, মিসিসিপি, অ্যালাবামা প্রভৃতি করেকটা অঞ্চলের সব তুলোর ক্ষেত সম্পূর্ণ হারবার হয়ে গেল। হাজার হাজার কৃষক একেবারে সর্বস্বারা ও নিঃস্ব হল, বিশেষ করে তুলোর চাষই যাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। তাদের ফসল গেল, জমি

গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের সব আশা ভরসাও নির্মূল হল।

মহামারীর একটা চেষ্টা ভালো করে মিলিয়ে যেতে না যেতেই নতুন আর একটা চেষ্টা আসবাব সম্ভাবনা দেখা দিল, কারণ উইন্ডল কীটের মাটিতে যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ডিম পেড়ে রেখে গিয়েছিল তা থেকে আরো যে কোটি কোটি কীট জন্মগ্রহণ করেছে, তাই থেকেই নতুন মহামারীর আবির্ভাবের পথ সূত্রমূল হল। এই ডিমগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে না পারলে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হবে না। ডিম ধ্বংস করার একমাত্র উপায় হল তীব্র বিষ ব্যবহার করা, কিন্তু তার একটা মারাত্মক পরিণতিও আছে, তীব্র বিষের ক্রিয়ায় তুলোর বীজ-গুলিও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হবে।

ডাঃ জর্জ কার্ভার কিছুদিনের জন্ত বাইরে গিয়েছিলেন সম্প্রতি টাক্সেগিতে ফিরে এসেছেন। এসে চাষীদের এই দুর্দৈব অবস্থা দেখলেন। তুলো-চাষীদের বুককাটা কান্না তাঁকে বিচলিত করে তুলল। তাঁর নিজের জমিতে তখন তিনি তুলোর চাষ না করে কলাই বুন দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর গাছের চারাগুলির দিকে চেয়ে থাকেন, সেগুলি তাজা আর বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে, উইন্ডল কীট সেগুলির কোন ক্ষতি করতে পারেনি। কলাইয়ের গাছগুলি উইন্ডল কীটের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, শুধু তাই নয়, তিনি দেখলেন, কলাই উইন্ডল কীটের আক্রমণের একমাত্র প্রতিবেদক।

কলাইয়ের এই আশ্চর্য প্রতিবেদক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের মাথার চমৎকার একটা আইডিয়া এল—তুলোর বদলে কলাইয়ের চাষ করলে কেমন হয়। তিনি একটা বিজ্ঞাপন লিখে তার অনেকগুলি নকল করে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করার জন্ত পাঠিয়ে দিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল—লাউলের সাহায্যে তুলোগাছগুলি গোড়া থেকে উপড়ে কেলে জমিতে বেশ ভালো করে বিষমাখানো জলের হিটে হাড়িয়ে দিন, দেখবেন, তা হলেই উইন্ডল কীটের বংশ সমূলে ধ্বংস হবে। তারপর সেই জমি একমাস কিংবা দেড়মাস চাষ না করে পরিত্যক্ত অবস্থায়

কেলে রেখে দিল। পরে যখন বিষের ক্রিয়া সম্পূর্ণ লুপ্ত হবে তখন সেই জমিতে কলাই বুনো দিল।

জর্জ কার্ভারের এই বিজ্ঞাপন পাঠ করে স্থানে স্থানে অনেকের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল, প্রতিবাদও কম হল না। অনেকে তাঁর কাছে নালিশ জানাতে এল, ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তারা প্রশ্ন করল,—“তুলোর বদলে কলাইয়ের চাষ করতে বলছেন আপনি আমাদের, আপনার মতলবটা কী? আপনি কি আমাদের মেয়ে কেলতে চান?”

কার্ভার তাদের সব নালিশ, সব আপত্তি বৈধ ধরে শুনলেন। তারপর বললেন, “না, আমি আপনাদের যাতে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পান তাই করতে চাই। আমি আপনাদের আবার আগের মতো সুখী এবং সম্পদশীল করে তুলতে চাই। কলাই মোটেই তুচ্ছ জিনিষ নয়, এর খাদ্যমূল্য যেমন যথেষ্ট, খাদ্য হিসাবেও এ অতি উপাদেয় এবং পুষ্টিবর। আপনাদের এতকাল পশু খাদ্যরূপেই শুধু কলাই ব্যবহার করে এসেছেন, তার বাইরেও যে এ অল্প কোন রক্ষণ ব্যবহার আছে তা আপনাদের জানা নেই। কলাই মানুষেরও খাদ্য এবং উপযোগী খাদ্য। কলাই দিয়ে খাবার তৈরি করে খেলে মানুষের উপকার হবে। তা ছাড়া, কলাই যে জমিতে উৎপাদন করা হবে সেই জমির উর্বরশাস্ত্রও অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে। কলাই থেকে অনেক সুস্বাদু এবং পুষ্টিবর খাবার যেমন তৈরি করা যায়, তেমনি কলাইতে মানুষের মাংসপেশী গঠন ও লুপ্ত করার উপযোগী প্রচুর প্রোটিন রয়েছে। এ দিয়ে তৈরি এক পাউণ্ড খাবারের খাদ্যমূল্য এক পাউণ্ড গোমাংসের তুলনায় অনেক বেশী। সবচেয়ে বড় কথা, কলাই উৎপাদন করা মোটেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, বরং খুবই সহজ এবং পরিশ্রমও কম হয়।”

কলাই চাষ করার পরামর্শ দেবার সঙ্গে সঙ্গে জর্জ কার্ভার কৃষকদের হাতে একখানা কাগজে কলাই চাষের রীতিমুঠা এবং কলাই দিয়ে তৈরি করা যায় এরকম একশো রকম খাবারের তালিকা লিখে দিলেন।

জর্জ কার্ভার চাকরি শিকারতনের শিককদের কাছে

কলাইয়ের গুণ প্রমাণ করে দেখাবার উদ্দেশ্যে তা থেকে পাঁচ রকমের বিভিন্ন খাবার তৈরি করে তাদের খাওয়ালেন। খাবারগুলি হল দুগ্ধ, কৃত্রিম দুগ্ধগায় মাংস, স্যালাড, আইসক্রিম এবং কাকি। এই পাঁচ রকমের খাবার ছাড়া আরো কয়েক রকম সুখরোচক খাদ্য তিনি তাদের পাতে পরিবেশন করলেন এবং সেগুলিও সবই কলাই থেকে তৈরি করা। শিককরা আনন্দের সঙ্গে এবং মুক্তকণ্ঠে একথা ঘোষণা না করে পারলেন না যে, এমন সুস্বাদু ও ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের খাবার, তাও আবার শুধু এক কলাই থেকে তৈরি, আর কখনো তাঁরা আশ্চর্য করেননি।

এসব সত্ত্বেও কিন্তু অধিকাংশ কৃষক কলাই চাষ করার ব্যাপারে ততটা উৎসাহ বোধ করল না বা তেমন আগ্রহ দেখাল না। তাদের মনে তখন পর্বস্ত ও যথেষ্ট বিধা এবং সংশয়। সম্পূর্ণ অজানা নতুন কোন জিনিষ চট করে তারা সহজে গ্রহণ করতে চায় না। আর চিন্তার দিক থেকে জর্জ কার্ভারের এই পরিবর্তন ছিল বাস্তবিকই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই পরিবর্তন গ্রহণ করার অর্থই কৃষকদের এতদিনকার অত্যন্ত জীবনযাত্রার আদর্শ পরিবর্তন। সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলের গোটা ব্যবসাই ছিল আসলে তুলোর ব্যবসা এবং দক্ষিণাঞ্চলে তুলোর কারবারীদের তুলোর বাজার সারা পৃথিবীতে ছড়ানো ছিল। কিন্তু কলাই চাষ করলে তার বাজার কোথায় পাওয়া যাবে? সার্কাসে এবং খেলাধুলার ব্যবহৃত লম্বা-হ্যান্ডারগুলির জন্যই শুধু তখন খাদ্য হিসাবে কলাইর চাহিদা ছিল এবং সেই চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে দুই প্রোচ্যের দেশগুলি থেকে হাজার হাজার বস্তা কলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমদানী করা হত।

ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের উৎসাহ উদ্দীপনার অল্পপ্রাণিত হয়ে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকরা ক্রমে একটু একটু করে তাদের জমিতে তুলোচাষের বদলে কলাইয়ের চাষ করতে, আরম্ভ করে দিল। আগে হয়তো কোথাও কদাচিত্ হু-একখানী কলাইয়ের ক্ষেত চোখে পড়ত, এখন সে জায়গায় বেশীরভাগই কলাইয়ের ক্ষেত দেখা



যার—তুলোর চাষ প্রায় উঠে গেছে বললেই হয়। প্রথম সে কৃষক মাত্র বিপ একর জমিতে কলাইয়ের চাষ শুরু করেছিল, শেষ পর্যন্ত সে চারশ একর জমির সবটাকেই কলাই বুনতে লাগল।

মধ্যমলের মতো কোমল গাঢ় সবুজ কলাইয়ের ক্ষেতে শাধা শাধা অজস্র ফুলে ফুটে নয়নভোলানা এক অপূর্ণ শোভার সৃষ্টি হয়েছে, মনে হয় দিগদিগন্ত ছেয়ে কে বেন শাধা ফুলের আভরণ বিছিয়ে রেখেছে।

শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময় এল যখন আর কেউই তুলোর চাষ করে না। সবাই তুলোর চাষ করা ছেড়ে দিল। মটগোমারি ও অ্যালাবামা থেকে শুরু করে ফ্লোরিডার সীমান্ত অবধি বত কৃষিযোগ্য জমি আছে তার অধিকাংশ জমিতেই কলাই সংপ্রধান উৎপন্ন হয় হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু অকস্মাৎ একটা বিপদ দেখা দিল, একে দ্বিধাবিপাকও বলা যেতে পারে। প্রথমে যেসব কৃষকরা ডাঃ জর্জ কার্ভারের প্রেরণার উত্থু হরে কলাইয়ের ফসল উৎপন্ন করতে আরম্ভ করেছিল তাদের মধ্যে এক বুকা ষিধবা মহিলাও ছিলেন। তিনি তাঁর তুলোর ক্ষেতে কলাইয়ের চাষ করিয়েছিলেন, শত শত বুশেল ফসল তিনি ক্ষেত থেকে আনিয়ে ঘর বোকাই করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ষ্দের নেই। এই বিপদের আভাস সর্বপ্রথম পাওয়া গেল মহিলার কাছ থেকে, অক্টোবর মাসের এক অপরাহ্ন বেলায় তিনি চলে এলেন লোকা ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের কাছে। কড়া নাড়ায় শব্দ পেয়ে কার্ভার দরজা খুলেই মহিলাকে সামনে দেখতে গেলেন।

বুকা মহিলা জর্জ কার্ভারকে আগে কখনো দেখেননি তাই চিনতে পারলেন না, জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি কি ডাঃ জর্জ কার্ভারের সঙ্গে কথা বলছি?”

“কেন বলুন তো।”

“আমি তাঁকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম। আপনাই যদি ডাঃ কার্ভার হন তো আপনার কাছেই জানতে চাই, আপনি আমাদের কলাই

চাষ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আপনার কথা শুনে কলাইয়ের চাষ করে এখন আমাদের কি হাল হয়েছে জানেন? একজনও ষ্দের জুটছে না, কলাই বিক্রী করতে না পেরে ষ্দের জমিরে রেখেছি। কলাই ভালের পাহাড় হয়ে আছে আমার ষ্দের। আমি একজন অনাধিনী ষিধবা, কলাই যদি বিক্রী করতে না পারি, সব যদি পচে নষ্ট হয়, তবে আমার কি উপায় হবে বলতে পারেন?”

বুকা মহিলা এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বললেন, কিন্তু জর্জ কার্ভার একটা কথারও জবাব দিতে পারলেন না, তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু এ প্রশ্ন কি একা বুকা মহিলার? না, এ প্রশ্ন আজ এখানকার শত শত কৃষিক্রীবার। দলে দলে কৃষক এসে তাঁকে এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল, সকলের আজ এক সমস্যা। কিন্তু জর্জ কার্ভার কারুরই কোন প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। তাঁর মুখে ভাষা জোগাল না। কিন্তু এটা তো তিনি জানেন, এ অবস্থার জন্য একা তিনিই সম্পূর্ণ দায়ী, তিনিই এই বিপদ ডেকে এনেছেন। কাজেই বিপদ থেকে মুক্তিলাভের উপায়ও তাঁকেই খুঁজে বার করতে হবে। এবং সেই কাজেই তিনি আত্মনিয়োগ করলেন।

এর আগে দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিক্রীবার সমস্যা একটা দিকই মাত্র তাঁর চোখে পড়েছিল, অল্প আর একটা দিকও যে থাকতে পারে, সে কথা একবারও তাঁর মনে হয়নি। অনিচ্ছাকৃত হলেও সেই অপরাধের জন্যই ভগবান তাঁকে আজ এই শাস্ত দিচ্ছেন।

কলাই চাষ করার অল্পকালে জর্জ কার্ভার যে সকল জোয়ালো মুক্তি দেখিয়েছিলেন তার সার্থকতা প্রমাণিত হতে আরম্ভ করেছে এতদিনে, কিন্তু সে সার্থকতার একটা বিপরীত দিকও যে আছে, সে কথা তিনি তখন একবারও ভাবেন নি। সেই সার্থকতাই আজ প্রকট দৈত্যের মতো ভয়ংকর মুক্তি ধরে সবকিছু ধ্বংস করে কলে তার সৃষ্টিকর্তাকে ব্যঙ্গ করছে। ভয় দেখাচ্ছে। এ দৈত্য তাঁর নিজের সৃষ্টি, অবিকল ক্রাংকেনটাইনের মতো।

জর্জ কার্ভার ঘর ছেড়ে বাতায় বের হলেন। সেখানে ঘাস সেখানেই দেখতে পান তাঁর আপন অপরিণাম-দর্শিতা রক্তচক্ষু মেলে তাঁকেই শাসাচ্ছে। সব বাড়ীর আধিনার গোলাভর্তি কসল। যে সকল কাটা হয়নি তা এখনো মাঠেই পড়ে আছে। বিক্রী হয় না তো কসল ছুঁলে কী হবে, সকলের মনের এখন এই একই ভাব। পরিভ্রান্ত কসল মাঠে পড়ে নষ্ট হচ্ছে।

জর্জ কার্ভার ঘুরে ঘুরে এই একই দৃশ্য দেখতে পেলেন, একই অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। সর্বত্র কৃষকদের একই হৃদশা। তারা দল বেঁধে তাঁর কাছে ছুটে আসে, ব্যাঙুল কর্তে প্রশ্ন করে, “বলুন জর্জ কার্ভার, আমরা এখন কী করব? আমাদের এতবড় সর্বনাশ হল তো শুণ্ড আপনাই জগ্ন, আপনি যদি অমন করে না বলতেন তবে আমরা নিশ্চয়ই কল্যাণের চাবি করতাম না। কল্যাণের চাবি নিয়েই থাকতাম।”

সামাজিক নিয়মে কল্যাণের বাজার যদি না পাওয়া যায় তবে জর্জ কার্ভারকেই যেমন করে হোক সেই বাজার সৃষ্টি করতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি কাজ আরম্ভ করলেন।

বহু বছর পরে এক সময় জর্জ কার্ভার তাঁর জীবনের সবচেয়ে সংকটময় এই দিনগুলির কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, “আমি সেই সংকটের দিনে কায়মনো-বাক্যে শুণ্ড ভগবানকে ডেকেছি আর বিপদ থেকে পরিভ্রাণের উপায় খুঁজোঁছি, কিন্তু কখনো সাহস হারাইনি।”

তখনো ভালো করে তাঁর হয়নি, গাছের ছায়ার তখনো বাতের অন্ধকার লুকিয়ে ছিল। সেই আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে জর্জ কার্ভার চলে গেলেন তাঁর একান্ত প্রিয় পরিচিত এবং সান্দ্রনার হল নিবিড় অরণ্যের এক নিভৃত পরিবেশে। সেখানে নবপ্রভাতের নতুন স্নিগ্ধের সন্ধান করতে গিয়ে বলে উঠলেন, “হে সৃষ্টিকর্তা বিধাতা, কেন তুমি এই বিধবৃষ্টি সৃষ্টি করেছ?”

তিনি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলেন যে একজন তাঁকে

বলছে, “অতি ক্ষুদ্র মানুষ তুমি জর্জ কার্ভার, এ যক্ষ্ম বিরাট প্রশ্ন তুমি করে না। তুমি যেমন ক্ষুদ্র তেমনি ক্ষুদ্র প্রশ্ন কর।” কার্ভারের মনে হল যক্ষ্ম ঈশ্বর তাঁকে একথাগুলি বলছেন। তিনিও সেইভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রিয় সৃষ্টিকর্তা, মানুষকে তুমি কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি করেছ?”

আবার ঈশ্বর তাঁকে বললেন, “হে ক্ষুদ্র মানব, এমন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না যা তোমার অধিকারের বাইরে। তোমার কৌতূহল তুমি সংযত কর।”

জর্জ কার্ভার তখন বললেন, “আমি আমার সর্বশেষ প্রশ্ন তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, দয়া করে বল, তুমি কল্যাণে সৃষ্টি করেছ কেন?”

ঈশ্বর সম্মত হয়ে বললেন, “সেই ভালো” এবং জর্জ কার্ভারের হাতের মুঠোর খানিকটা পরিমাণ কল্যাণের দানা গুঁজে দিয়ে বললেন, “চল তোমার গবেষণাগারে যাই।” তিনি জর্জ কার্ভারকে যেন তাঁর নিজের গবেষণাগারে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

মোহম্বের মতো জর্জ কার্ভার অনেকটা পথ হেঁটে কখন যে গবেষণাগারে এসে পৌঁছে গিয়েছেন তা তিনি নিজেও বুঝতে পারেননি, কিন্তু একসময়ে সন্ধ্যা ঘুম থেকে জেগে ওঠা মানুষের মতো হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, তিনি গবেষণাগারের মধ্যে বসে আছেন। এ যে কেমন করে সম্ভব তিনি নিজে বলতে পারেন না এবং বুদ্ধিতেও তার ব্যাখ্যা খেলে না।

জর্জ কার্ভারের জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হল।

যোগী যোগাসনে বসলেন।

গবেষণাগারের কবার্ট বন্ধ করে বৈজ্ঞানিক ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার বসলেন তাঁর নতুন তপস্যার, নব-যুগের নবীন তপঃ ঋষির তপ-সাধনা শুরু হল।

একমুঠো কল্যাণের দানা নিয়ে জর্জ কার্ভার যত্ন করে সেগুলোর খোসা ছাড়ালেন, তারপর সারাদিন ও সারারাত বলে তিনি সেই দানাগুলোকে একটা একটা করে আলাদা করে নিয়ে সেগুলোর ভিতকার দেহ পর্বার্ণ ও এক বকবের আঠার মতো নির্দ্বন্দ্ব বের করলেন,

পরে আবার সেই সেই পদার্থ ও আঠালো নির্বাস থেকে লাক্ষা জাতীয় এককর্মজিনা এবং শর্করা ও খেঁতসার আবিষ্কার করলেন। তাঁর সামনে এলোমেলো ছড়ানো রয়েছে কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ এবং আরো নানা স্বকর্মের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। তিনি বিচিত্র তাপাঙ্ক ও চাপ সৃষ্টি করে সেই তাপাঙ্ক ও চাপের সাহায্যে সব জিনিস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

এমনিভাবে নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সাধনার কয়েক রাত কয়েকটা দিন কেটে গেল, পরের দরজা বন্ধ, ভিতরে জ্বল্ জ্বল্ কার্ভারিক করছেন কেউ জানতে পারে না। কিন্তু তিনি যে মস্তবড় একটা কিছু আবিষ্কার করার উদ্দেশ্য নিয়ে নিবলমভাবে গবেষণা করছেন, এটা সমস্ত বুঝতে পারলেন।

বৈজ্ঞানিক ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের কঠোর সাধনা অস্বস্ত হল। গবেষণাগারের অভ্যন্তরে থেকে তিনি প্রস্তুত করে চললেন রাসায়নিক প্রাকৃতিক সাহায্যে নানা জাতীয় কৃত্রিম অথচ মাতৃবেশ জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য, যেমন, কৃত্রিম দুগ্ধ, লেখার কাল, রঙ ও বানিশ, জুতোয় পালিশ, ফ্রিওলোটে, মলম, দাড়ি কামাবায় ক্রিম, এবং কৃত্রিম মাখন। এসব জিনিসের কার্ভার প্রস্তুত করলেন একমাত্র একটি পদার্থ থেকে সে পদার্থটি হচ্ছে কলাই। কলাইয়ের খোসা থেকে এ ছাড়াও তিনি তৈরি করলেন ভূমি-নিষ্করক যন্ত্র, বিদ্যুৎশক্তি পরিবাহী যন্ত্র ও কয়লার জ্বালানী দ্রব্য।

২০

ভাষ্যবোধ আরো অনেক দিন গেল, রাত গেল, কিন্তু জর্জ কার্ভার তাঁর ঘরের দরজা খুললেন না, কিংবা বাইরেও বৌরখে এলেন না একটাবারের জন্ত। কতলোক যে তাঁকে ডাকতে এসে তাঁর গবেষণাগারের দরজা বন্ধ দেখে ফিরে গেল, কিন্তু সেই যে কয়েকদিন আগে তাঁর গবেষণাগারে প্রবেশ করেছেন তিনি এই করদিনের মধ্যে তা আর খোলে নাই।

এমনিভাবে একটানা কেটে গেল তাঁর আরো দুই রাত দুইদিন, অন্যভাবে অনিচ্ছায় অবিশ্রান্তভাবে অনন্তমনা হয়ে

তিনি তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর প্রিয় শিষ্যরা, টাক্সোগণিকায়তনের ছাত্ররা, কয়েকবার তাঁকে ডাকতে এসে হুঁপ, দরজা কড়াঘাত করে জিজ্ঞাসা করেছিল তারা, “মাস্টার হুহ শরীরে আছেন তো মাস্টার?” তিনি দরজা না খুলেই ভিতর থেকে এই বলে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। তোমরা এবার যাও, দয়া করে আমাকে বিরক্ত করো না। অন্যকে ভালো থাকতে দাও। আমি কাজ করছি।”

যখন হাতের জর্জ কার্ভার এই কথাগুলি বললেন তখন র্ত্ত্বের একটু বিন্দু স্বকর্মের রক্ত ও কর্কশ শোনাল, যা তাঁর সভ্যদের ব্যতিক্রম। যতাবত তিনি উদ্বৃত্তা মেনে চলেন, অসৌজন্যমূলক ব্যবহার তিনি কখনো কারুর সঙ্গেই করেন না। তিনি একান্তভাবে বিশ্বাস করেন যে, তিনি ভগবানের কোলের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন। কোনো দিক থেকে কারুর কাছ থেকেই ভয় পাবার তাঁর কিছু নেই। তিনি নিজেকে ভগবানের হাতের যন্ত্র বলে ভাবেন, তিনি যা কিছু করছেন ভগবানই তা তাঁকে দিয়ে কারয়ে নিচ্ছেন। তিনিই জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর বিশ্বকর্মের রক্ষণ উদ্ঘাটন করার ভার দিয়ে।

এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার পরে একসময়ে বলেছিলেন—“সেই মহান্ শ্রুতি তিনটি সাক্ষ্য দান করেছেন, সেত তিনটি সাক্ষ্য হচ্ছে জীবজগৎ উদ্ভিদ জগৎ এবং আকরিক পদার্থ জগৎ। এখন তিনি তার সঙ্গে চতুর্থ আরও একটি জগৎ যুক্ত করেছেন—রাসায়ন জগৎ। রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম বস্ত আবিষ্কার ও তার উৎপাদন হচ্ছে এই চতুর্থ জগতের কাজ।”

এর কয়েক বছর পরে যখন নব আবিষ্কৃত কেমাজি বিজ্ঞান তথা ক্রিষ্-রসায়ন বিজ্ঞাকে মাটি, বাতাস এবং সূর্যালোকের অন্তর্নিহিত অবচেতন শক্তি থেকে ঐশ্বর্য সৃষ্টির প্রয়াস বলে লোকে জানল তখন অ্যালাবামার ক্রিষ্কীরী সাধারণ মানুষেরা বলতে লাগল, এ তো

আমাদের জানা জিনিষ। ‘কেমার্কি’ কথাটা সৃষ্টি হবার বহুদিন আগেই জর্জ কার্ভার আমাদের এ জিনিষের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছিলেন, কাজেই অনেকদিন আগে থেকেই তিনি একজন কেমার্কিষ্ট।

একদিন ভোরবেলায় জর্জ কার্ভার তাঁর গবেষণাগারের ছবিখানা ঘুরে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ছবিখানার ডাক দিয়ে, “এসো তোমরা সবাই, আজ আমি তোমাদের একটা আশ্চর্য জিনিষ দেখাব”, এই বলে তিন জন তাঁদের গবেষণাগারের ভিতরে নিয়ে গেলেন।

গবেষণাগারের দেয়াল ঘেঁষে তাকে তাকে অনেকগুলি শিশু-বয়স্ক ধরে ধরে সাজানো। আর প্রত্যেক শিশু-বয়স্কের গায়ে লেবেল খোঁটা রয়েছে— হাতে লেখা ‘কলাই’। ছবিখানার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল। আবার প্রত্যেকটা শিশু-বয়স্কের গায়ে কাগজ লাগিয়ে ভাতে আলাদা আলাদা সব জিনিষের নামও লিখে রাখা হয়েছে। একমাত্র কলাই থেকে কত রকমের নতুন নতুন জিনিষ অধ্যাপক জর্জ কার্ভার আবিষ্কার করেছেন তাঁর সব নমুনা এখানে রেখে দেওয়া হয়েছে, এগুলির মধ্যে রয়েছে কয়েকরকম সুগন্ধ পানীয় দ্রব্য, আচার, মোরসা, চাটনি, কফি, পাউডার, ষাণ্ডবহর্য পালন করার জন্য এক জাতের পালিশ কাগজ, ঘষে ঘষে লাগিয়ে দেবার জন্য এক রকম তেল, দাড়ি কামাবার ক্রিম, কাগজ, লিখবার কালি, মেঝে ঢাকবার চক্ক মোজেক জাতীয় এক রকম আস্তরণ, প্রাণীষ্টক, প্যাম্প, কৃত্রিম রবার এবং এমন আরো কত যে জিনিষ, সবগুলির নাম এখানে বলা সম্ভব নয়। কলাইয়ের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটিয়ে জর্জ ওয়ারিংটন কার্ভার স্বীয় প্রতিভাবলে এত সব জিনিষ সৃষ্টি করেছেন—সৃষ্টি না বলে আমরা বরং বলতে পারি আবিষ্কার করেছেন।

কিন্তু এ তো সব শুধু।

আবিষ্কারের প্রথম পণ্ডেই জর্জ কার্ভার কলাইয়ের রস

থেকে এমন এক রকম দুধ তৈরি করলেন যা স্বাদে গন্ধে এবং রঙে অবিকল খাঁটি দুধের মতো, কোন তফাৎ নেই। কলাইয়ের খোসায় তৈরি আঠার মতো একটা জিনিষ থেকে একগুচ্ছ ফিতা বের করে তাতে মুহূ চাপ দিতেই তা থেকে উজ্জ্বল পীতাম্ব রশ্মি বিচ্ছুরিত হল, খেতপাথরের মতো কঠিন ও শাদা চারকোণ বিশিষ্ট একটা আধারের মধ্যে তা রেখে দিলেন—আবিষ্কৃত হল লণ্ঠনের মতো চমৎকার একটা দীপাধার, বড়ঝড়ায় যা নিভে যাবার ভয় নেই।

ছবিখানা দেখে অবাক হল। অধ্যাপক কার্ভারের নব-আবিষ্কৃত বিচিত্র ধরণের সৃষ্টিশীল জিনিষ তাদের মনে পরমাধ্বয়ের সৃষ্টি করল।

জর্জ ওয়ারিংটন কার্ভারের এই বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফল হল স্মরণপ্রসারী এবং বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি সারা দেশে ছাড়িয়ে পড়ল। তাঁর আবিষ্কৃত কৃত্রিম দুধ বেলজিয়াম দেশের অল্পগত কক্সো প্রদেশের লিন্ড প্রদেদের জন্য বিশেষভাবে জীবনরক্ষার সত্যিকার বলে সন্মতিক্রান্তরূপে প্রমাণিত হল। তখন কক্সো প্রদেশের গভীর অরণ্যে বসবাসকারীদের গরু মোষ প্রতি পালন করা এক হুমসাহা ব্যাপার ছিল। একদিকে বিস্ময় নাছির হাশন এবং অপরদিকে ছিল বাঘের আক্রমণ—এই দুই কারণে গুরুপালিত জীবজন্তুর রক্ষা করা এক কঠিন সমস্যা ছিল। তাই সেখানে দুধের অভাব দেখা দিত। কোন শিশু মাতৃহীন হলে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই তাঁর মৃত্যু ডেকে নিয়ে আনত। কিন্তু তা; কার্ভারের এই অদ্ভুত আবিষ্কারের ফলে সে দেশে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হল। কলাই থেকে তৈরি দুধ পান করে শিশুরা মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসতে লাগল। যে পরিমার্জিত এক বিষাক্তময় পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছিল জর্জ কার্ভারের আবিষ্কার সেই পরিণতি থেকে কক্সোকে রক্ষা করল।

ক্রমশঃ

# অভয়

( উপভাস )

ঐশ্বরীচন্দ্র রাহা

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

অভয় বলে—বাবা, আর একটা বছর। কোন বকমে পাশটা করলে, যেমন করেই হোক একটা কিছু জুটিয়ে নেব। গীতা থেকেও ওদের তো মান্ত্য করতে হবে। গোপেশ্বর ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, তাই আমি ভাবছি বাবা। তোমার মা যাওয়ার পর, খালি যেন মনে হচ্ছে আমারও ডাক এসেছে। হয়ত, কোন্‌দিন, তোদের মায়ের মত, তোদের ছেড়ে চলে যাব। আমার আর কোন ভয় নেই বাবা। শুধু পিছুটান রয়েছে, মেয়েটা আর ছেলেটার জন্যে। আমি জানি, আমার অবর্তমানে সব ভারই তোমার ঘাড়ে পড়বে। তখন যেকোনো কবে, কী করাব, ওদের যে কী গতি হবে, তা আর ভাবিনে। সব ভাবনা চিন্তা আমি ছেড়ে দিয়েছি ভগবানের ওপর। তাঁর যা ইচ্ছে, তাই করবেন।

—বাবা, অভয় বলে, ওসব কথা ভেবে মন ধারাপ করবেন না। যা হবার তাই হবে। কাল যদি কারুর পূর্ণ হবে, তবে কোনও ভক্তির তো রদ করতে পারে না। মা যে আকাশ থেকে সব দেখছেন। আমি বলছি মা সমস্তই দেখছেন। আপনি শক্ত হোন। তাঁর জগৎ চোখ সব সময় মেলে রয়েছেন আমাদের দিকে—

অভয়ের প্রদীপ মুখের দিকে বাঁস্বতভাবে চেয়ে থাকেন গোপেশ্বর। বাইরে উঠানে সরোজিনীর নিজ হাতে পোতা পেয়ারা গাছ, শিউলি ফুলের গাছ, সেই

তুলসী নাকে তুলসী পাছটি রয়েছে। ঘরের ভেতর, ঘরের বাইরে, সন্ধ্যার সরোজিনীর নিজ হাতেই ছাপ, তাঁরই স্বাভাবিক যে বাড়ীর চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এ যে ভুলবার নয়—

গোপেশ্বরের মনে হ'ল, অলীকভে এসে দাঁড়িয়েছেন সরোজিনী। চোখে মগ্ন শাস্ত্র দৃষ্টি, দৃষ্টিতে রয়ে পড়ছে শাস্ত্রের সুধা। যেন ঈনি সকৌতুকে তাকিয়ে রয়েছেন। মৌন দৃষ্টি যেন মুখের হয়ে বলছে, কেন, এই তো আমি। কেন দেখতে পাচ্ছি না আমার। মাত্র একটা পরদা ঝুলছে এঘর আর ঐ ঘরের মাঝে। আমার কী দেখতে পাচ্ছি না? এটা তো আমি। আমার বন্ধন তো ছিন্ন হয়নি। মরণ কী শ্রেয় ভালবাসার বন্ধনকে কাটতে পারে? গোপেশ্বর সম্মোহিতের মত সম্মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

অভয় অশ্রুচর্চা হয়ে গেল। তার নামে চিঠি এসেছে তা সাধারণ পোস্টকার্ড নয়, রীতিমত সবুজ রংএর একখানি দামি খাম। অভয় নিজেকে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। কে এই পত্র পাঠাল। শুভময় কী? তা তো হতেই পারে না। দিন দুই আগে, পোস্টকার্ডে শুভময় খুব হুংস করে পত্র দিয়েছে। তার মায়ের মৃত্যুর জন্য, খুব হুংস জানিয়ে সমবেদনা জানিয়েছে। শুভময় লিখেছে, অল্প বয়সে মাকে হারান যে কী কষ্ট, তা কি বুঝিয়ে তাই?

মার মতন এ পৃথিবীতে আর কে আছে? এমন স্নেহ, ভালবাসা, এই পৃথিবীতে আর কার কাছে পাব আমরা? পৃথিবীতে বুঝি এমন ভালবাসার আর তুলনাই হয় না। এমনি আরও কত কি। শুভময়ের চিঠিখানা পড়ে অভয়ের হৃদে চোখে জল এসেছিল। তার অন্তরের রক্তাক্ত বেদনার স্থানে আবার যেন কে নতুন করে খা দ্বিয়ে রক্তাক্ত করে দিল। অভয় মনে মনে আশ্চর্য হয়ে যায়। অভয় খামখানা নেড়ে চেড়ে দেখতে থাকে। উপরের ঠিকানা গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। হাতের লেখা কী মন্দর।

এই বহুসাময় খামখানায় দিকে তাঁকিয়ে তাকিয়ে তার মনে এক অদ্ভুত ভাব দেখা যায়। এ যেন কোন এক হারানো রতন। এর অন্তরে কী আছে, তাই ভাবতেই ভাল লাগে। যতক্ষণ এটা বন্ধ আছে ততক্ষণ এ রক্তময় কোন এক বস্তু। এক চরম কোষ্ঠিলে গুর সারা অন্তর ভরে যায়। কে এই পত্রদাতা? কে লিখল এই চিঠি, এমন স্নেহের অশ্রী খামে। এ তো ডাকঘরের সাধারণ খাম নয়। এতো কোন সজ্জা সামগ্রী নয়। হাতে মাঠে বাজারের জাঁকিমও নয়। এ নগ্নমূল্য কোন মার্গ, কোন গুপ্তদান এতদিন কোথায় লুক্কায়িত ছিল।

অবশেষে জয় হয় কোষ্ঠিলের। খুব আন্তে হাত সন্তপণে চিড়ল খামখানাকে। সূর্যোর আলোয় পত্রখানা দেখা যাচ্ছে। অভয় আন্তে আন্তে পত্রটি খামের গুপ্ত কক্ষ থেকে বের করল।

চমকে ওঠে অভয়। এ যে, মিনার্ভার লেখা পত্র। এ যে স্বপ্নাতীত, আশাতীত। পত্র যে এত মধুর এত মন্দর, হয়, তা কোনদিনই ভাবতে পারেনি অভয়। এর প্রান্ত লাইন, প্রান্ত অক্ষরে কত মধু, কত সুখ। জীবনের প্রথম দিকেই পেয়েছে কঠিন শোক। আবার সেই শোকের মাঝে, আর এক মমতাময়ীর সুধামাখা স্পর্শ। একদিকে ব্যথা অন্যদিকে অসহ্য আনন্দ বোধ। যাকে হারানোর চিরকালের অসহ্য দুঃখবোধের মধ্যে দেখা দিয়েছে অন্য এক করুণা ভালবাসার আহ্বান। এক অপূর্ণ আনন্দ স্থানে অভয়ের সারা মন ভরে যায়।

এক সময় ছুটি ফুরিয়ে যায়। এখন অভয়কে রওনা হতে হবে। অভয় ভাবে, সেই একদিনের সঙ্গে আজকের দিনের কত তফাৎ। হাঁতপুষের কথা মনে পড়ে যায়। তার মালদহ রওনা করার আগের দিনের কথা মনে পড়ে যায়। সমস্তাদিন না তাকে চোখের আড়াল করেননি। নিঃশ্রান্তে সেই টিনের বাক্সটি গাঁহিয়ে দিয়েছিলেন। জামা, কাপড়, চাদরে সাবান দিয়ে, আবার নিজহাতে ঝুঁকি করে দিয়েছিলেন। অভয় যে সব জাঁকিম খেতে ভালবাসত, মা তাঁই বড় কষ্টে তৈরী করে সম্মুখে বসে খাইয়েছিলেন। বিদেশে বিভূয়ে, অপরিচিত জায়গায়, অল্প অল্প খাবাড়ীতে কী ভাবে বাস করতে হয়, কী ভাবে চলাক্ষেপ করতে হয়, এমনি বড় উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আত্ম কোথায় না। গীতা, শোকন, অভয়ের কাছে কাছে, স্নান মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার কতদিন পর তাদের দাদী বাড়ী আসবে, তাই ওরা ভাবছে। অন্য গীতাকে, শোকনকে কাছে টেনে বলে, আবার আঁখি পুজোর ছুটিতে আসব। কত খেলনা নিয়ে আসব। এখন মন দিয়ে, লেখাপড়া করবে—কিন্তু একা একা পুকুরে যেন চান করতে যাবে না, আর দাঁড়ির সঙ্গে ঝগড়া করবে না। ঝগড়া করলে, মা যে দুঃখ পাচ্ছেন। মা—আম্মা হয়ে শোকন তাকায় —।

স্নান হেসে, আকাশের দিকে আঁতুল দিয়ে দোঁখয়ে অভয় বলে, মা যে এ—ঐখানে আছেন। ওপান থেকে মা সব দেখছেন। মা আবার আসবেন, আবার শোকনকে কোলে নেবেন। শোকন অভয়ের কোলে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একসময় সজ্জা হয়ে আসে। তুলসীতলায় মূপ গুনো দেয় গীতা। শোকন গজাঙ্গল ছিটিয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করে বলে, হাঁরবোল, হাঁরবোল। গীতা শীঘ্র বাজায়। শব্দের শব্দ কাপতে কাপতে দূরে হারিয়ে যায়। অজান্তে বাড়ী হ'তে শীঘ্রের শব্দ আসে। সজ্জার আকাশ পবিত্র শম্মধ্বনিতে ভরে যায়। গীতা বাবার অহিকের জায়গা করে দেয়। লক্ষ্মীর ঘরের মাঝখানে

একটু গজাজল ছিটিয়ে কুশাসন পেতে দেয়। গজাজলের ঘটটি কাছে রাখে, রেড়ীর তেলের প্রদীপটার তেল দ্বিগুণ, সলতে উসকে দেয়।

গোপেশ্বরবাবু আঁচলি শেষে এক পেয়ালা চা, সামান্য ছুটি মুড়ি মুড়িকি খান, এই তাঁর অভ্যাস।

অভয় খোকনকে কাছে টেনে নেয়। অভয়ের সারামন হ হ করে ওঠে। আজ তার মা নেই, সমস্ত ঘর শূন্য। মা যে কতখানি ছিলেন তা অল্পে কি বুঝবে। সরোজিনী এই সংসার মাখায় করে রেখেছিলেন। সমস্ত বিষয়ে খুঁটিনাটি দৃষ্টি দিয়ে, কত হিসেব করে সংসার চালাতেন। চিরকাল অতি দারিদ্র্যের মাঝে, অনশন অর্জাশন, চরম দুঃস্বপ্নের মাঝে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল। তবুও সরোজিনী, কোনদিনই আক্ষেপ করেননি।

আঁচলি শেষ হয়ে গেল, গোপেশ্বর এসে বসলেন রান্নাঘরে। গীতা গুর চা আর মুড়ি এনে দিল। গোপেশ্বর বললেন, খোকা কিছু খেয়েছিস রে? অভয় বলল, মুড়ি খেয়েছি। বাবা, তুমি গীতার দিকে বিশেষ লক্ষ রেখো। ছেলেমানুষ এই রান্না বাছা করতে গিয়ে, শেষে দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে ফেলে। তারপর গুর লেখা পড়া রয়েছে—

—যতটুকু পারি, সব সময় নজর রাখ। রান্নার কাজ ও না করলে আর কে করছে। সবই কপাল। সাবধান হয়েই কাজকর্ম করে। কিছু দৈবকে কে ঠেকাবে বাবা। আমি সব তাঁরই ওপর ছেড়ে দিয়েছি। তিনি যদি রক্ষা করেন, তবেই সব রক্ষা হবে। নইলে নয়—

একটু চুপ করে থেকে, গোপেশ্বর বললেন, এখানকার জন্তে ভাবনা করিসনে বাবা। ভাল করে, লেখাপড়া কর। কোন প্রকারে পাশটা যাতে করতে পারি, এখন শুধু তাই দেখ বাবা।

দাদার কোলেই খোকনের চোখ জড়িয়ে আসে। গোপেশ্বর বললেন, এই দেখো। সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমিয়ে পড়বে। ওকে নিয়েই আমার মুশকিল। সমস্ত

দিন হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়াবে আর সন্ধ্যা হলেই ঘুমিয়ে পড়বে। দিনরাত্তে বার বার বলবে—দাদি, মা কোথায়? বার বার এ ঘর ও ঘরে ঢুকবে আর ডাকবে—মা—মা—বলে। ওকে নিয়েই আমার ভাবনা।

অভয় বলল, আস্তে আস্তে সবই ঠিক হয়ে যাবে। এখন অভ্যাস মত ঐ সব করছে, বড় হলে তখন বুঝতে শিখবে, তখন আর এমন করবে না। এখন থেকে একটু একটু করে পড়াশোনার দিকে নজর দিতে হবে—। তাতে অনেকটা ভুলে থাকবে।

—দশটার পর গীতার সঙ্গে স্থল যায়। মাটার মশাইকে বলে দিয়েছি, একটু নজর রাখতে। সেখানে অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে ভুলে থাকে। যাহোক, দশটা থেকে তিনটে পর্যন্ত যা হয় শোনে, পাচজনের সঙ্গে মিশে অনেক কিছু ভুলে থাকে। উনি চলে যাওয়ার পর আমার দিন রাত্ত সব একাকার হয়ে গিয়েছে বাবা। ক্রমশঃ রাত্ত বাড়তে থাকে। একটা দুঃস্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভয়ের মন ভরে যায়। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র, ঠিক আগের মতই ঐক্যমিত্ কচ্ছে। সরোজিনীর ইচ্ছা-লাক হতে প্রস্থানের পর, ফেলে রাখা সব স্মৃতিচিহ্নগুলি আজও অগ্নি। তাঁর হাতের রাক্ষর এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। তাও কয়তো বেশীদিন থাকবে না। কালপ্রবাহে একদিন সরোজিনীর সব স্মৃতিচিহ্ন হাতের রাক্ষর, মলকালের হাতের প্রলেপে সবই অবলুপ্ত হয়ে যাবে। জীবনের নতুন বর্ণমালায়, স্টেটের পুরাতন লেখাগুলি নিশ্চয় হয়ে যাবে। বংশাতির ছায়ায়, সরোজিনীর সমস্ত চিহ্ন, স্মৃতি, চিরকালের মত কোথায় নিশ্চয় হয়ে যাবে।

ভারাক্রান্ত মনে, অভয় ফিরে গেল শালদকে। মায়ের সঙ্গে তার দেখা হয়নি। যুতাকালে মা তাকে বহবার দেখতে চেয়েছিলেন। বহবার নাম ধরে ডেকেছিলেন। অক্ষুট কঠে বারবার ডেকেছিলেন—খোকা—খোকা। বহবার ছেলেকে দেখবার জন্তে এ পাশে ও পাশে তাকিয়েছিলেন। তাঁর শীর্ণ হুই চোখ দিয়ে তবু অক্ষ নেমে এসেছিল। সেই শেষ যাত্রার পূর্বে, এই পৃথিবীর

সমস্ত মায়ী, মমতা, স্নেহ, ভালবাসার শক্ত বঁধন ছিন্ন করবার পূর্বে, বোধ করি আপ্রাণ চেষ্টায় আর একবার অভয়কে ডেকেছিলেন। কিন্তু আশা পূর্ণ হয়নি। এমনি অপূর্ণ আশা আকাজকা নিয়ে, অবিরত দুঃখ, বেদনা সয়ে সয়ে কত বাসনা, কামনা, কত কুখ্যা নিয়ে তিনি ইতলোক ছেড়েছেন। এমনি কতবার, কত জন্ম, কত দিন, এই অচ্ছেদ্য মায়ী মমতার জালে, কত পুত্র কত কন্যা, কত ভাই ভগিনী, স্বামী পিতা মাতাকে কাঁদিয়ে আবার এমনিভাবে, হৃৎকালের বন্ধন কেটে, সেই অদৃশ্য আঁচস্তমীয় পথে গমন করছে। কিন্তু কেন যায়, কেন আবার আসে, এই পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের কি কারণ, তা কে বলতে পারে ?

সরোজিনীর এত পরবাড়ী, তাঁর নিজ হাতে পোতা আম গাছ পেঁপে গাছ, তাঁর গাঠি বাছুর, তাঁর স্বামী ছেলেমেয়ে এসব কি ভুলে যাবেন ? দেহের মত সেই অদৃশ্য মনটার কি এত মাটির জগতের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখবেনা ? দেহের সঙ্গে কি মনটাও চাই হয়ে যাবে দু'র মনের ওপর আর কোনও আধিপত্য এত জড় জগতের সঙ্গে থাকে না, অথবা দু'র অত্র কোন শক্তির অধীনে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। দু'র বা প্রকৃতির এত নিঃসম। প্রাকৃতিক নিয়মে কোটি কোটি বছর আগেও কত জীবন সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তাদের আর কোনও অস্তিত্বই নেই। দু'র তাই। বোধ করি এই জীবনপ্রবাহ এমনি চলবে—আপন গতিতে। এর পেছনে কোনও অদৃশ্য শক্তি নেই, একথা ভাবতেও কষ্ট হয়। তবে বিশ্বজগৎ কি কোনও খামখেয়ালীর খেয়ালীপনার সৃষ্টি ? অভয় আপনমনে তাই ভাবতে থাকে। তার মনের সেই প্রকৃষ্টতা সেই আনন্দ, সব বেন নষ্ট হয়ে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে অভয় নিঃশ্বাস ফেলে। বইয়ের পাতা খোলা থাকে—চোখও থাকে খোলা। মন চলে যায়, দূরে—বহুদূরে।

এর মধ্যে একটা ব্যতিক্রম দেখা গেল, আশালতা'র ব্যবহারে। যে দূরত্বের ব্যবধান সৃষ্টি করে এতদিন আশালতা চলে আসছিলেন, সেই ব্যবধান যেন কিছুটা

সরেগেছে মনে হ'ল। সরোজিনীর মৃত্যুর পর, যার্নাসক চিন্তাধারা যৎসামান্য বদলে গেছে মনে হয়। হয়তো এটাও কণিক। গ্রন্থান-বৈরাগ্যের যৌক কিছুদিন পর কাটিয়ে উঠবেন আশালতা। সরোজিনীকে তিনি জীবনে দেখেননি, অভয়দের সঙ্গে তাঁর স্বামীর একতর সম্বন্ধ আছে, এই তিনি জানতেন। কিন্তু সেই সম্পর্কটা খুব বড় করে কখনও দেখেননি, এবং দেখার কোন দরকারও হয়নি। নিজের মূলশাস্ত্র ও অচেল অর্থ ও প্রাচুর্যের মধ্যে অধে জীবন কাটছে, সেখানে নিজ অধেই তিনি আশ্রয়। অপরের দুঃখ বেদনা দারিদ্র্য সম্বন্ধে কোনদিনই কোন দুঃখের সামান্য রেখাপাত মনের ওপর হয়নি—ও সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। লোকের ওপর মাঝে মাঝে যে কৃপাদৃষ্টি করেন, তাতে নিজ ধনসম্পদের মাতিমা ও ঐশ্বর্য্য জানানই হয়ে থাকে। কিন্তু আজ যেন কিছুটা পারিবর্তন দেখা দিয়েছে। মনোভর সঙ্গে অভয়ের মেলামেশা কোনদিনই ভালচক্ষে দেখেননি। তাই নিজ মেয়ের ওপর অস্পষ্ট নিষেধও ছিল। এখন সরোজিনীর আকান্মক মৃত্যুতে যেন কিছুটা পারিবর্তন দেখা দিয়েছে। অভয় কিছু ঠিক তাই আছে, অকারণে বাড়ীর মধ্যে যায় না এবং দ্বিতলে তৈরী ওঠেই না।

দু'লে শুভময়ের সঙ্গে দেখা হতেই শুভময় বলল, ইস্, এঁক চেতারা হয়েছে অভয়দা। অভয়ের এঁ শোক, মায়ের মৃত্যু, এ সমস্তই জানে শুভময়। তাই বলল, এখন পড়াশোনার দিকে মন দিতে হবে। আজ বিকেলে আমাদের বাড়ী এস অভয়দা। বাবা আরও নূতন নূতন বই কিনে এনেছেন। ছুটির পর একসঙ্গে যাব।

ছুটির পর ওরা এল দোতলার লাইব্রেরী ঘরে। ঘর খানাকে আরও নূতন নূতন আসবাবপত্র সাজান হয়েছে। ঘরের মেঝের ওপর যে গালচেখানা পাতা রয়েছে তাও নূতন কারুকারণো ভরা। এত নরম যে পায়ের চাপে পায়ের গোড়ালি ঢুবে যায়। একটা নূতন বাহারে ঘাড়, আর বইয়ের আলনারীতে ইংরেজী বাংলা নূতন বইয়ে ভর্তি। শুভ বলল, বাবা নূতন একটা প্রায়োফোন কিনেছেন এই দেখুন।



অবাক হয়ে অভয় বলল, বাঃ, বেশ মজার তো।  
এটা দেখতে ছোট্ট একটা আলমারীর মত—

শুভ বলল, এটা টেবিল গ্রামোফোন বলতে পারেন।  
এই দেখুন, গান চলার সময় সামনের দুই পাঞ্জা খুলে  
দিলাম। উপরের ঢাকনাটা বন্ধ করে দিলাম। শুধু  
কি সুন্দর গান। একটা কানা কেউর গান—

অভয় অবাক হয়ে যায়। মাহুকের গানের গলা কি  
এত সুন্দর হয়? অভয় তখন হয়ে গান শুনেতে থাকে।  
এক আশ্চর্য্য অসুভূতিতে ওর সারা মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়।  
এমন সুন্দর গান এর আগে আর কোনদিন শোনেনি।  
অভয় বলল, এর গান আর আছে? আচ্ছা যে গাইছে  
তাকে কানা কেউ বলছ কেন?

—বাঃ। উনি যে অন্ধ। তাই—

—অন্ধ? আচ্ছা—এমন যে গান গায় সে অন্ধ।  
একটা দুঃখের বেদনায় অভয়ের সারা মন ভরে যায়।  
কিন্তু অভয় ভাবে, উঃঃ, এঁকে অন্ধ বলা যায় না। এঁর  
বাইয়ের চোখ না থাকলেও অন্তরের যে চোখ তাতে  
সবই দেখছেন। অন্তরের চোখ আঁত পানকার আর  
তীক্ষ্ণ। গান চলতে থাকে। এর আগে অভয় কিছু কিছু  
গান শুনেছে, কিন্তু এমন সুন্দর গান আগে শোনেনি।  
কণেকের জর মন অল্প জগতে চলে যায়। সমস্ত চিন্তা  
ভাবনা দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে, ওর মন যেন লঘুপক্ষ পাখী-  
মত পাখানা মেলে অনাবিল আনন্দ শ্রোতে ভেসে চলে  
যায়। পেছনের দিকে আর তাকায় না। মায়াহীন  
বেদনাশূন্য বোধহীন এক মন। এ যেন মুক্ত বিহঙ্গমের  
মত দুখানি অতি লঘু পক্ষ পাখী মেলে অনন্ত গগনে  
পাড়ি দিচ্ছে। গানের সুরের মাঝে অভয়ের সমস্ত  
চিন্তা ভুবে যায়।

একসময় শুভ বলে—আচ্ছা অভয়দা, আপনি অত  
কি ভাবছেন। কিন্তু ভেবে কি কিছু দুঃখ লাগবে হয়?  
মার থেকে নিজের পড়াশোনা নষ্ট হয় শুধু—

অভয় বলল, সব কথাই ঠিক। কিন্তু চেষ্টা করেও  
চিন্তাকে তাড়াতে পারিনে। মা যে এত শিষ্ট্রী  
আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন, তা ভাবতেও পারিনি।

ছোট ভাই বোন রয়েছে, আর বাবার যা শরীরের অবস্থা,  
তাতে মনে হয়, বাবাও কোনদিন এমনি হট করে চলে  
যাবেন। হয়তো আমার সঙ্গে দেখাও হবে না। যদি  
একা হতাম, কোন চিন্তা ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে  
ভাবনা ছোট ভাই বোন দুটির জন্ত।

শুভময় বলে, দেখুন, কে যে দেখবে আর কি যে  
হবে, তা আগে থাকতে কেউই বলতে পারে না। যদি  
পাশত, তবে সংসারের চেহারা অল্প রকমই হয়ে যেত।  
দেখবার মালিক তো ভগবান। আমার মা বলেন, যার  
কেউ নেই, তার ভগবান আছেন। তিনিই দেখবেন।  
তিনিই ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

ভগবানের ওপর শুভময়ের এতটা বিশ্বাস দেখে অভয়  
অতি আশ্চর্য্য হয়ে যায়। সে নিজেও ঠিক বোঝে না।  
লোকমুখে শুনেছে-ঈশ্বরই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা কিন্তু  
কেন করেছেন আর কি তাঁর উদ্দেশ্য—এ সম্বন্ধে তার  
নিজের কোন ধারণাই নেই। অবশ্য এরকম বড় প্রশ্ন  
মনে আসে, কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জর কাউকে  
কিছু প্রশ্ন করতে লজ্জা পায়। ভাবে, ছোট ছেলের মুখে  
এক বড় বড় কথা, বোধ করি লোকে হাসবে। বলবে  
হয়ত, ফাজিল ছোকরা কোথাকার।

অভয়ের মনে হয়, হয়ত মোনাদা এসব কথা  
উত্তর দিতে পারুক। কিন্তু মোনাদা যে কোথায় তা কে  
বলবে?

গভীর রাত। চারদিক নিস্তব্ধ। বাড়ীর সকলেই  
এখন ঘুমে অচেতন। শুধু ঘুম নেই অভয়ের চোখে।  
অভয় নিবিষ্টমনে বই পড়ে যাচ্ছে। এটা রহস্য  
সিরিজের বই নয়—কোন উপক্লাস, গল্প, বা ডিটেকটিভ  
বইও নয়। স্বামীজীর লেখা একপালা বই জোগাড় করে  
এনেছে অভয়। তাই পড়ছে। নিবিষ্টমনে পড়ছে,  
পূর্ণরূপে সম্বন্ধে, স্বামীজীর কথা।

“আপনারা অনেকেই জানেন না যে, পুনর্জন্ম প্রাচীন  
ধর্ম সমূহের একটি অতি পুরাতন বিশ্বাস। ক্যারিসী,  
ইহুদী, এবং খ্রীষ্টান ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্তকগণের  
মধ্যে ইহা সু-পরিচিত ছিল। আরবাবদের ইহা একটি

প্রচলিত বিশ্বাস ছিল। হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মধ্যে এখনও ইহা টিকিয়া আছে। বিজ্ঞানের অঙ্কাদয় কাল পর্যন্ত এই ধারা চলিয়া আসিয়াছিল। বিজ্ঞান তো বিভিন্ন জড় শক্তিকে বুঝিবার প্রয়াসমাত্র। পাশ্চাত্য দেশের আপনারা মনে করেন যে, পুনর্জন্মবাদ নৈতিক আদর্শকে ব্যাহত করে। পুনর্জন্মবাদের বিচার ধারা এবং যৌক্তিক ও তাত্ত্বিক দিকগুলির পুরোপুরি আলোচনার জন্য আমাদেরকে গোড়া হইতে সর্ব বিষয় পরীক্ষা করিতে হইবে।”

অভয় বক্তৃতা শুনে মুখে ভুলে তাকিয়ে থাকে। মায়ের মুখ। তাকে গভীরভাবে নড়া দিচ্ছে। তার চিন্তাধারা ওলট পালট করে দিচ্ছে। সাধারণতঃ তার মত বয়সের ছেলে সে চিন্তাতাবনা করে তার সঙ্গে অভয়ের চিন্তাধারা বিভিন্ন। অভয় অল্প কোন সমবয়সী ছেলে হতে পথক। সংসারের অপরাধ

পাঁচজনের মত গভীরগতিক পথে চলতে ওর মন চায় না। একে শিশু বৈশিষ্ট্য কষ্ট, দারিদ্র্য ওকে শক্ত করে তুলেছে। সংসার যে কি জিনিষ—আর এই সমাজের মানুষেরা যে কি চরিত্রের লোক—এখন সে সবই বুঝতে শিখেছে। প্রায় সকলের কাছে কোথাও ঘৃণা, কোথাও ত্যাগ, অবহেলা এসবই পেয়েছে। নিজের দারিদ্র্য, অভাব, দিনের পর দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে ক্ষুধার যাতনা সহ্য করা—ক্ষুধার কাতর ভাইবোনদের কান্না, পিতা-মাতার নীরব অশ্রু বষণ এসবই দেখেছে অভয়। মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রগুলি তাই গ্রীষ্ম ভৌম আর মোটা। আশাতে অধ্যাত্তে সমস্ত মন রয়েছে ঈশ্বরের মত কাঠিন। তাই হরল চামি, আনন্দ আর গভীর ভাবে মনকে আনিচ্ছিল বলে না।

ক্রমশঃ

## কংগ্রেস স্মৃতি

(সম্পূর্ণ অধিবেশন—গয়া—১৯২২)

ঐগিরিজামোহন সাগুাল

১

পর্যটন বেলা ২টার সময় কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। পূর্ণাদিনের মত সভাপতি প্রতিনিধি ও দর্শক দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছিল।

এদিনের সভা উদ্বোধন করলেন কয়েকজন পাণ্ডিত সমবেত কর্তৃক বেদমন্ত্র গান করে। তারপর কোরাণ থেকে একজন প্রার্থনা করলেন। তারপর কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীতের পর সভার কার্য আরম্ভ হল।

এদিনকার অধিবেশন খুব সংক্ষিপ্ত হয়েছিল। সভাপতি মশায় প্রথমেই তিনটি প্রস্তাব দ্বয় উত্থাপন করলেন। সেগুলি নিয়ে দেওয়া হল।

এই কংগ্রেস সভা দ্বারা গান্ধীর শান্ত ও সত্যের বাণী দ্বারা ভারতবর্ষে মানবতার সেবা সক্রিয় ভাবে উপলব্ধি করছে এবং ভারতের জনগণের দ্বারা প্রণেয় জল তাঁর প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ নীতিতে পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন করছে।

এই কংগ্রেস যে সকল বীর নাগরিকগণ যেচ্ছায় হৃৎকবরগণের কর্মসূচী অনুসারে হৃৎকবর করেছেন এবং দ্বারা কংগ্রেসের উপদেশানুসারে কোন প্রকার আত্ম পক্ষ সমর্থন না করে বা জামিন না নিয়ে কারাবরণ করেছেন এবং দ্বারা বর্তমানে বিভিন্ন মেয়াদে কারাগারে আবদ্ধ আছেন, দেশের সেবার জন্য তাঁদের এই অবদান

গভীর ভাবে উপলব্ধি করছে এবং এই ত্যাগের মনোভাব সজীব রাখতে এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম অক্ষুর রাখতে দেশের জনগণকে আহ্বান করছে।

এই কংগ্রেস আকালী শতীদর। যে অতুলনীয় বীরত্ব দেখিয়েছেন এবং সমগ্র জাতির উন্নয়নের জন্য তাঁরা যে আহ্বাসের মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা গণ ও প্রশংসার সচিত্র উপলব্ধি করছে।

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ উপরোক্ত প্রস্তাব তিনটি দিক দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার পর ভোটে গৃহীত হল।

তার পরের প্রস্তাব উপস্থিত করলেন—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, এই কংগ্রেস গান্ধী কামাল পাশা ও তুর্কী জাতিকে তাদের সাম্প্রতিক সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছে এবং যতদিন পর্যন্ত—ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট তার সদা শক্তি প্রয়োগ করে তুর্কী জাতির মুক্ত ও স্বাধীন সত্তার বাধা সারিয়ে না দিচ্ছে এবং এবং নিবিঘ্নে জাতীয় জীবন যাপনের এবং ইসলামের কার্যকর অভিভাবকত্বের ও অনুসন্ধানীদের কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীনতা-উল্-আরবের মুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না হলে ততদিন পর্যন্ত ভারতের জনগণের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ়তা জ্ঞাপন করছে।

শ্রীমতী নাইডু তাঁর অপূর্ণ ভাষণে এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে বললেন।

প্রস্তাব সমর্থন করলেন পাজাবের দান সিং ও অজয় হরি সনোত্তম রাও।

বারাণসীর শিবপ্রসাদ ভূপ্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করে ‘অনুসন্ধান’ শব্দের পরিবর্তে ‘বিদেশী’ শব্দ বসাতে বললেন।

বারাণসীর প্রখ্যাত পণ্ডিত বাবু ভগবান দাস সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

হাকিম আজমল খাঁ সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সংশোধনী প্রস্তাব ভোটে দিলেন, প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

তারপর মূল প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

সেদিনের মত সভার কাজ শেষ হল।

১০.

২৭শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের আধিবেশনের পর সন্ধ্যায় সময় বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভার আধিবেশন আরম্ভ হল।

১৯২০ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ আধিবেশনকে যেমন মালবায় কংগ্রেস আখ্যা দিয়েছিলেন তেমনি এবারকার কংগ্রেসকে রাজা গোপালাচাৰী কংগ্রেস আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বিষয়নির্বাচনী সভায় আলোচনার সময় দেখা গেল, রাজাগোপালাচাৰীই সবে সদা। তিনি যে প্রস্তাব উপস্থিত বা সমর্থন করলেন তাই গৃহীত হল। তাঁর বিরোধিতায় কোন প্রস্তাবই পাশ করা যেতে পারে নি। মহাত্মা গান্ধীর কারাবরণের পর তিনিই ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন।

বিষয়নির্বাচনী সমিতির দর্শকদের মধ্যে অনেকগুলি জামিনা নাড়ুর যুবক উপস্থিত ছিলেন রাজাগোপালাচাৰী বক্তৃতা আরম্ভ করলেই তারা জোড় হস্তে ছোট গান্ধী ছোট গান্ধী বলে ব্যাঙ্গোক্তি করতে লাগল।

কাউন্সিলে প্রবেশের প্রশ্ন নিয়েই সভার আধিক্য সময় কাটল। কাউন্সিল প্রবেশের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষের প্রায় সকলেই নিজ নিজ মত সমর্থনের জন্য ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’ থেকে মতামত উদ্ধৃত করতে লাগলেন। দেখে মনে হল যেন উকিলরা তাঁদের পক্ষ সমর্থনের জন্য ‘ল’ রিপোর্ট থেকে নাজির দেখাচ্ছেন।

আইন অমাত্য তদন্ত কমিটির অর্ধেক সদস্যের সুপারিশ অনুসারে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কাউন্সিলে প্রবেশের অনুরোধে এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ঐ প্রস্তাবের সার মর্ম ছিল এই যে, বিলাফ ও পাজাবের অভ্যাসের প্রতিকার এবং অনতিবিলম্বে স্বরাজ অর্জনের জন্য অহিংস অসহযোগের নীতি অনুসারে অসহযোগীরা কাউন্সিল প্রবেশের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হবেন এবং

যেহেতু নতুন কাউন্সিলের সময় নির্দিষ্ট হয়েছে ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে অতএব—১৯২০ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের পরিবর্তে প্রথম সপ্তাহে করতে হবে এবং অবস্থা বিবেচনায় প্রয়োজন হলে চূড়ান্ত মত প্রকাশের জন্য পুনরায় কংগ্রেসের নিকট উপস্থিত হতে হবে।

এই প্রস্তাবের ১১টি সংশোধনী প্রস্তাব বিভিন্ন সদস্যগণ উপস্থাপন করলেন।

একটি প্রস্তাবে নির্দিষ্ট কালের জন্য কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাব মূলতঃই রাখার কথা ছিল। কোন প্রস্তাবে তিন মাসের জন্য, কোন প্রস্তাবে কয়েক মাসের জন্য প্রস্তাবটি মূলতঃই রাখার কথা ছিল।

একটি সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছিল যার উদ্দেশ্য ছিল তিন মাসের জন্য প্রস্তাবটি মূলতঃই রেখে পরে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আয়োজন করে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা হোক এবং ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত আইন অমান্য করার জন্য সংপ্রকাশ উপায় উদ্ভাবন করা হোক।

বাবু ভগবান্দাস একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন, তাতে বলা হল যে, কংগ্রেস-সংস্থাগুলির ও তাদের অর্থের কোন সাহায্য না নেওয়ার শর্তে কাউন্সিল প্রবেশের অস্বীকার দেওয়া হোক।

শ্রীনিবাস আয়েজার (মাদ্রাজ হাটিকোটের ভূতপূর্ণ এডভোকেট জেনারেল এবং পরবর্তী কালে কংগ্রেসের সভাপতি) একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন, তাতে বলা হল যে, কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে অটোনমি দেওয়া হোক এই শর্তে যে কোন কংগ্রেসপ্রার্থী জয়লাভের পর শপথ গ্রহণ করবেন না বা কাউন্সিলের কোন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন না।

২৮শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের কোন প্রস্তাব অধিবেশন হল না। সেদিনও দুই বেলায় বিবর্তনগাঁচনী সীমিত অধিবেশন হল।

রাজাগোপালাচাৰী সমস্ত প্রস্তাবেরই বিরোধিতা

করলেন এবং রাজাজীর প্রবর্তিত গঠনমূলক কর্মসূচীর উপর জোর দিলেন।

তিনি একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপন করলেন, তাতে বলা হয়েছে যে, যেহেতু ১৯২০ সময় নির্গাচন বয়কট করায় যে প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে গভর্ণমেন্ট তার ক্রমতা নষ্ট হতে পারছিল সেগুলির নৈতিক শক্তি ধ্বংস হয়েছে এবং যেহেতু আগামী বৎসরের নির্গাচনে ভারতের জনগণের অংশগ্রহণ না করা একান্ত প্রয়োজন অতএব এই কংগ্রেস উপদেশ দিচ্ছে যে, কোন কংগ্রেস সদস্য যেন কোন কাউন্সিলের পদপ্রার্থী না হন এবং সমস্ত ভোট-দাতাগণ ভোটদানে বিরত থাকেন এবং তাদের বিরত থাকার সংবাদ অল্প ইতিমধ্যে কংগ্রেস কমিটির নির্দেশানুসারে উক্ত কমিটিকে জানান।

বল্লভভাই প্যাটেল এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

স্বদেশ মিত্রের এ রক্তাক্ত আয়েজার কয়েক মাসের জন্য প্রস্তাবটি মূলতঃই রাখার জন্য প্রস্তাব করলেন।

এস এফ আয়ার উভয়পক্ষের মধ্যে আপোসের জন্য সভা মূলতঃই রাখার প্রস্তাব করলেন।

যমুনাদাস মেহতা প্রস্তাব করলেন যে ১৯২৩ সালের কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যন্ত এই প্রশ্ন মূলতঃই রাখা হোক এবং ইতিমধ্যে কংগ্রেসের সদস্যগণ নির্গাচনপ্রার্থী হন।

এস সত্যমূর্তি এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

পাঁওত মদনমোহন মালবীর পাঁওত মাতলাল নেহেরুর মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

সংশোধনী প্রস্তাবগুলি সহ মূল প্রস্তাব সংখ্যাধিক্য ভোটে অগ্রাহ্য হল। রাজাজীর প্রস্তাব বিপুল সংখ্যাধিক্যের ভোটে গৃহীত হল।

পাঁওত মাতলাল নেহেরু নোটস দিলেন যে, তিনি ২৯শে তারিখের প্রস্তাব অধিবেশনে তাঁর প্রস্তাব রাজাগোপালাচাৰীর সংশোধনী প্রস্তাব হিসাবে উপস্থাপন করবেন।

(১১)

২২শে ডিসেম্বর কংগ্রেস অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল বেলা ২টার সময়। পূর্ণ পূর্ণ দিনের মত এদিনও সভাগৃহ পার্শ্বপূর্ণ হয়েছিল।

সভাপতি মশায় যথারীতি শোভাযাত্রা সহ প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে ডায়ালে আসন গ্রহণ করার পর কলকাতার পণ্ডিত মাদোলাল মুকুল একটি গান গাইলেন তারপর কয়েকজন বাঙালী মহিলা সমবেত করে একটি জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন।

সঙ্গীত সমাপনান্তে সভার কার্য আরম্ভ হল।

সভাপতি মশায় এস সভাপত্যটিকে প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য আহ্বান করলেন।

সভাপতি বক্তৃতা মঞ্চে উঠে প্রথমে তাঁর প্রস্তাব পড়ে শোনালেন।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস আইন অমান্ত তদন্ত কমিটির বিশিষ্ট পণ্যদ্রব্যের বয়কটের সুপারিশ গ্রহণ করছে এবং সিদ্ধান্ত করেছে যে কোন্ কোন্ ব্রিটিশ পণ্য সাফল্যের সঠিক বয়কট করা যেতে পারে এবং তৎপরিবর্তে কোন্ কোন্ স্থান থেকে ঐ সকল দ্রব্য সহজে পাওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে বিষয় রিপোর্ট দুই মাসের মধ্যে অল হাওয়া কংগ্রেস কমিটির নিকট দাখিল করার জন্য একটি কমিটির উপর ভার দেওয়া হোক।

আরও বলা হয়েছে, বন্ধর ও সমুদয় বৈদেশিক বস্তু বয়কট সম্বন্ধে কংগ্রেসের কর্মসূচী এই প্রস্তাব দ্বারা বিধিত হবে না।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত কমিটির সদস্য হবেন : এন্ সি লেন, জে কে মেহতা, এন্ সি কেলকার, উমর শোভানী এবং অধ্যাপক ক্রীচরাম সাহানী।

প্রস্তাব বিবেচনা করে সভাপতি ইংরেজিতে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন, যুক্ত প্রদেশের স্বামী ভক্ততীর্থ হিন্দীতে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

সি বিজয় রামবাচারিয়া এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বলতে যকের উপর দাঁড়ালে তাঁকে সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শক মণ্ডলী সোজাসে অভ্যর্থনা জানাল কিন্তু কি এক অজাত

কারণে মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের ব্লক থেকে 'স্ট্রেম' 'স্ট্রেম' ধ্বনি উঠল। প্রবীণ দেশপ্রোমক ভূতপূর্ণ কংগ্রেস সভাপতির প্রতি এই আচরণ অত্যন্ত নিম্ননীয়।

মাই হোক বিজয় রামবাচারিয়া মশায় এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন যে, ব্রিটিশ পণ্য বর্জন অকার্যকর ও অনির্ভরপ্রত।

পণ্ডিত হুন্দলাল হিন্দীতে পূর্ববর্তী বক্তাকে সমর্থন করলেন।

রক্তস্বামী আয়েজার ও শিবপ্রসাদ গুপ্ত মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এরপর সি রাজাগোপালাচারী উঠে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বললেন যে তিনি স্বীকার করছেন যে, তাঁদের মনে ক্রোধের ভাব জাগ্রত হয়েছে এবং একমাত্র ব্যক্তি যিনি সাফল্যের সঠিক এটা দমন করেন সেই মহাত্মা গান্ধী তাঁদের মধ্যে উপস্থিত নেই। তিনি সকলকে ক্রোধের ভাব সম্বরণ করতে অনুরোধ করে বললেন যে, এই প্রস্তাবে এমন পরিবর্তনের উদ্ভব হতে পারে যার ফল পরে অনুভূত করতে হতে পারে, কারণ এই প্রস্তাব বৈদেশীর সাহায্য না করে হস্তান্তর ব্যতীত অস্ত্র বিদেশী রাজ্যগুলির নিকট ভারতের অর্থ নৈতিক অধীনতা ক্রিয়েম করবে। খাদি ও অস্ত্র গঠনমূলক কর্মসূচীর উপর জোর না দিয়ে তাঁদের উদ্যম নিয়োজিত হবে ব্রিটিশ বাণিজ্যের স্থানে কোন্ কোন্ বিদেশী দেশগুলি গ্রহণ করবে তা খুঁজে বের করতে। তিনি সকলের নিকট গান্ধীজীর নামে আবেদন জানালেন যেন গান্ধীজী তাঁদের নিকট থেকে সরে যাওয়ার এত অল্প সময়ের মাধ্যমে তাঁরা তাঁকে (গান্ধীজীকে) ফলে না যান এবং এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন কারণ, এই প্রস্তাব কংগ্রেসকে একটি নতুন নীতি অবলম্বন করতে বলছে তা বিদেশী দ্রব্য বর্জন প্রস্তাবের অঙ্গীভূত নয়।

পদ্মরাজ জৈন হিন্দীতে মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

তারপর বি এন্ শাস্ত্রী মূল প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে জোরালো ভাষায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন। তখন কয়েকজন প্রতিনিধি—তর্ক-বিবর্তের (closure) দাবী জানালেন, সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রী মশায় বসে পড়লেন।

তারপর সভাপতি মশায় বিতর্কের প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য সভামুখিকে আহ্বান করলেন। সভামুখি মশায় ওজস্বিনী ভাষায় বিপক্ষ দলের মত শ্রবণ করলেন।

সভামুখি মশায় আসন গ্রহণ করার পর সভাপতি মশায়ের নির্দেশে শ্রীমতী সরোজিনী নাট্টঙ্ক মল্লোপাধিকারী উঠে প্রস্তাবের উপর ভোট নিলেন।

প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিকারী “মহাত্মাগান্ধী কি জয়” মর্মে অগ্রাহ্য হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন রাজা-গোপালচন্দ্রী—

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, যে হেতু ১৯২০ সালের নির্বাচনে কাউন্সিল বয়কট করার যে প্রাতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে গভর্ণমেন্ট তাদের ক্ষমতা দৃঢ়ীভূত করাছিল এবং দায়িত্বশীল শাসন চালানছিল সেগুলির নৈতিকশক্তি নষ্ট হয়েছে এবং আন্তঃসমসংযোগের একান্ত প্রয়োজনীয় কর্মসূচী তিসাবে আগামী বৎসরের নির্বাচনেও জনগণের সেরে থাকা প্রয়োজন, সেইহেতু এই কংগ্রেস সকল ভোটারদের কোন কাউন্সিলের সদস্যপদ প্রার্থীরূপে দাঁড়ানো থেকে বিরত হওয়ার উপদেশ দিচ্ছে এবং এই উপদেশ অমান্য করে যদি কেউ নির্বাচন-প্রার্থী হন তাঁর পক্ষে ভোটদানে বিরত থাকা এবং অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস

কমিটির নির্দেশানুসারে ওদের বিরত থাকার সংবাদ জানানোর জন্য উপদেশ দিচ্ছে।

এই প্রস্তাব উপস্থিত করে অজ্ঞাত কথার পর রাজাগোপালাচন্দ্রী মশায় বললেন যে, পক্ষটি নিয়ে বিরোধ থাকলেও কাউন্সিল বয়কট কার্যকর করা সম্বন্ধে সকলেই একমত। তিনি মনে করেন যে কাউন্সিল বয়কট করার একমাত্র ফলপ্রসূ উপায় হচ্ছে কাউন্সিলের জন্য নির্বাচন বয়কট করা।

পাঞ্জাবের পাণ্ডিত নৌকরাম এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

ডাক্তার অনিসারী প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বললেন যে, কলকাতায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং যা নাগপুর ও আমেদাবাদে স্বীকৃত হয়েছে তা পরিবর্তন করার কোন সুাত্তসম্ভব কারণই কেউ দেখাতে পারেন না।

বেগম হসরত মোতাম্মী প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠে বললেন যে, তিনি ভাবতে পারেন না যে, দারা পূর্ণ স্বাধীনতা চান তাঁরা অসহযোগ আন্দোলন পরিত্যাগের কল্পনা করতে পারেন।

প্রস্তাবের উপর আলোচনা শেষে হওয়ার পূর্বেই সৌদনের মত আবেশনের কাণ্ড শেষ হল।

ক্রমশঃ



# আমার ইউরোপ ভ্রমণ

( ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী )

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

উইগসর ক্যাসল-এ অ্যালবার্ট মেমোরিয়াল চ্যাপেলটি উল্লেখযোগ্য। সম্রাজ্ঞী ভিকটোরিয়া তাঁহার স্বামীর স্মৃতিতে এটি নির্মাণ করিয়াছেন। ইহার মহিমা তাককে অরণ্য করাইয়া দেয়। নির্মাণে পৃথিবীখ্যাত বহু জাতীয় মূল্যবান প্রস্তর ব্যবহার করা হইয়াছে।

প্রিন্স অ্যালবার্টকে সমাহিত করা হইয়াছে নিকটস্থ ক্রগমোর নামক স্থানে, সেইখানে সম্রাজ্ঞীর একটি নিজস্ব ভূসম্পত্তি আছে। সম্রাজ্ঞীর অন্ত্যস্ত লইয়া সেই সমাধি আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। সমাধি গুপ্ততি শ্বেত মাসল পাথরে নির্মিত। দোঁধিতে স্নন্দর।

লং ওয়াক নামক শড়কটি দেখিলাম। এটি দৈর্ঘ্যে তিন মাইল। জানা গেল এটি শ্রেষ্ঠ অর্থাভিনউ বা বাঁধ। দুই পাশে সুদৃশ্য এণ্ডম বৃক্ষশ্রেণী—সংখ্যায় ১৬০০। অতঃপর শ' পশুপালন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। এটি অ্যালবার্টের তিনটি কৃষিক্ষেত্রে অঙ্গতম। সম্রাজ্ঞীর নির্দেশে আমাদিগকে স্ট্রবেরি ও ক্রান খাইতে দেওয়া হইল। স্ট্রবেরি এই জমিরই ফসল, ইংল্যাণ্ডে ইহা অপেক্ষা অস্বাদু স্ট্রবেরি আর দোঁধ নাই। উইগসরের নিকটেই ইটন কলেজ, এদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় বলিয়া খ্যাত। এইভাবে আমরা মিকটহ নানা স্থান দেখিলাম, এবং ইংরেজ জাতিদের সদায় ব্যবহারের সুখস্বাস্থি বহন করিয়া ফিরিলাম।

১০ত জুলাই মাল'বরো হাউসে প্রিন্স ও প্রিন্সেস অ' ওয়েলস আমাদের জন্য একটি গার্ডেন পার্টির ব্যবস্থা করিলেন। অন্ত্যস্ত শেষ হইল সাড়ে চারিটা হইতে সাতটার ভিতরে। ইংরেজদের পোশাক কিভাবে

বর্ণনা করিব জানি না। কোনও লোডি যদি আমার এই লেখা পড়েন, তিনি অবশ্যই ইহার মধ্যে আমার বর্ণনা শুদ্ধিবে। কিন্তু তিনি নিরাশ হইবেন। কোনও লোডির সঙ্গে দেখা হইলে তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিবেন, “রাণীকে দেখিয়াছেন?” অথবা “প্রিন্সেসকে দেখিয়াছেন?”—তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেই অনুমান করা যাইবে তিনি ব্যাভাষে পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, “তাঁহার সজ্জা কেমন ছিল?” এ প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে আমার বর্ণনাত প্রকট হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই, কারণ আমি বলিব, “সটি ত লক্ষ্য করি নাই।” অথবা তিনি কালো পোশাক পরিয়াছিলেন।” অন্ত্যস্ত শেষে অর্থাধারা স্বাধীনভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন, ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, একপ উপলক্ষে আপ্যায়নকারী জাতিদের এই স্বাধীনতায় আর কোনও বাধা-নিষেধ আরোপ করেন না, কারণ ইহাঃ দম্বর। আমাদের দেশের সত্ত্ব নিয়ন্ত্রণকারী অর্থাধাদের ব্যক্তিগতভাবে বলেন না যে এটা খান, ওটা খান, আরও খান ইত্যাদি। প্রচুর খাদ্য ও পানীয় এক স্থানে জমা করা থাকে, তাহার বক্ষকের নিকটে গিয়া যথা প্রয়োজন চাহিয়া লইলেই হইল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাপ দিয়া ষাওয়াইবার রীতি সেখানে নাই। এই জাতীয় পার্টিতে পরস্পর পরিচিত হইবার সুযোগ পাওয়া যায়। উদ্যানে রাশিয়ান ব্যাণ্ড বাজিতেছিল, এই দলে কয়েকজন বিখ্যাত ক্রশ গায়িকা ছিলেন। প্রাচ্য পোশাক ছিল তাঁহাদের পরিধানে, চোগা ও কোমর-বন্ধ। সম্রাজ্ঞী ভিকটোরিয়াও অর্থাধাদের ভিতর দিয়া একসময়ে হাঁটিয়া গেলেন ও কিছুক্ষণ রাশিয়ান

পারিকারের গান গুনিলেন। সঙ্গীত শেষে তিনি দলের প্রধানকে নিজে ধন্যবাদ জানাইলেন।

সকাল ক্ষেত্রে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নহে। একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতীয়রা নডেল পড়িয়া, উচ্চ ইংরেজ জীবনকে বেটন করিয়া যে অসংস্কৃত ক্রটি সম্পন্ন ঐশ্বর্য রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অল্পমান করিতে পারিবেন না। আমি নিজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে একথা বলিতেছি। আসামের রক্ত দফলা ভাণ্ডার পাঠাড়ে অর্থাৎ গুহ ভাগ করিয়া কলিকাতা প্রদর্শনীতে সেই গৃহের মডেল নির্মাণের জন্য আসিবার সময় বলিয়াছিল, “আমি দেবতাদের আবাস-স্থলে চালালাম।” আমাদের পুরাণ ইত্যাদিতে যদি দেবতাদের বর্ণনা ষথায়ক হইয়া থাকে, তাহাদের রীতি-নীতি আচার-আচরণ বিলাসিতা শক্তি-সামর্থ্য যদি নির্ভরযোগ্যভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে কোনও হিন্দু ক্রান্ত, ইংল্যান্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের উপর একবার চোখ বুলাইলেও বলিবেন, “এই ‘ত’ স্বর্গ।” সমস্তটা দেশ, মাঠ-ঘাট, অরণ্য, প্রাসাদ, পণ্ডিত জমি, জলাভূমি—সমস্ত খাসিয়া মাজিয়া কাটিয়া, সমান করিয়া চাঁবর মত করিয়া রাখা হইয়াছে। মানুষের যত এবং নৈপুণ্যে যতটা সম্ভব তাকা করা হইয়াছে। জমিতে চড়াই উৎরাই থাকিতে সৌন্দর্য আরও বাড়িয়াছে। নয়ন লোভন সজ্জা মঠ, তাহার ভিতর দিয়া রূপার সূতার মত ছোটখাটো যোতাসনী ছুটিতেছে, জল কানায় কানায় পূর্ণ। শতক্ষেত্রগুলি জ্যামিতিক নির্ভুল নক্সার জায় সাজান। ফলের বাগান ফলে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে চিরসজ্জা অরণ্য, তাহাতে ফেঁকাই পাখীদের বাস। প্রাসাদভূমি হর্ম্যরাজি দীর্ঘ বীথিকায় শোভিত। পার্কে হরিণ নির্দোষমনে চরিতেছে। হুদে বস্ত্র হাঁস সঁতার কাটিতেছে। গ্রীণ হাউস, পাম হাউস রহিয়াছে। ছোট ছোট গ্রাম, আমাদের দেশের ছোট শহরভুল্য। শহরগুলির প্রশস্ত পথগুলি পরিচ্ছন্ন, একই চেহারার বাড়িগুলি চমৎকার সাজান। দীর্ঘ চিমানি, কারখানা সমূহ প্রাণ

চকল—এ সমস্ত ভরাতিত ভূমিকে অল্পমতাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। রেল যাইবার সময় চোখের সমুখ দিয়া এসব দৃশ্য দ্রুত পার হইয়া যায়। প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন চলে ৫০ হইতে ৬০ মাইল বেগে। এদেশের ইহাই রেল-গাড়ির সাধারণ গতি। সজ্জা ক্ষেত্রে যেগুলি বিন্দুবৎ মনে হয়, গোকুলের দলকে মাঠে চরিতে ও ঘোমছান করিতে দেখা যায়, ওদিকে মেঘশাবকেরা লাফালাফি ছুটাছুটি করিতেছে, চাবের ঘোড়া দাঁড়াইয়া সোঁদকে চাহিয়া আছে। সম্ভ্রান্ত চাবকরা উন্টান মাটির মধ্য হইতে কাক ও চড়ুই পাখীর দল পোকা ঝুটিয়া খাইতেছে। খুবই বিশ্বাসের ব্যাপার যে, ওদেশে কাকেরা মানুষের বসতিব কাছে খুব যায় না। আগেই বলিয়াছি, একজন ভারতীয়ের বিটেন, ক্রান্ত, কিংবা বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া চালিবার সময় এসব স্থানের নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা প্রবলভাবে চোখে না পড়িয়া পারে না। আগাছা নাই, উদ্ভিজ্জের পচা গাছা নাই, দুর্গন্ধ নোংরা খাল নাই। যে দিকে তাকান যায়, সর্বত্র সমস্ত হস্তাবলম্ব ও সূক্ষ্মচরিত্র দেখা যায়।

উহার দেশটিকে যেভাবে গাড়িয়াছে, বাড়িগুলিও তেমনই সমস্ত গাড়িয়াছে। ইংরেজদের ম্যানশন বা বড় বড় কর্ম্মাগুলির সঙ্গে যে সব দীর্ঘ গাছের সারি রহিয়াছে তাহা দেখিবার মত। কাছাকাছি স্থান দিয়া কুলুকুলু শব্দে ভুলিয়া যায় কোনও পোতাঁশনী ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া এইসব কর্ম্মের পরিবেশ আরও সুন্দর হইয়া উঠে। পথ এবং ফুলের জমি সবই নানা রঙের ভাঙা পাথর বিছানো। ইহার পাশেই ফুলের জমি, নানা আকারের, যাহা কেবল এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত জানাবিশেষ মালির দ্বারাই সম্ভব। কোনও কোনও স্থানে ঘন গুল্ম স্বাধীনভাবে বাড়িতে দেওয়া হইয়াছে, তাহার পাশে পাশে সাজানো বাগান আরও মনোহর দেখাইতেছে। পাহাড়ের ক্রমান্বয় গায়ে বড় বড় গাছকেও স্বাধীনভাবে বাড়িতে দেওয়া হইয়াছে। এই সব গাছের পাতার আড়ালে কোকিল ও ধ্রুপ পাখী (ছাতাবে) ডাকে। ওদেশে আমি একটিও কোকিল



দেখি নাই, কিন্তু আমি অনেকবার তাকার কুহুম্বরিন  
 গনিয়াছি। এ ডাক আমাদের দেশের কোকিলের মত  
 নহে। আমাদের কোকিল কুউ—কুউ—কুউ ক্রমাগত  
 ডাকিয়া চলে। ইংল্যান্ডের কোকিলের ডাক একটু  
 বেশি গম্ভীর এবং মোটা, এবং তাহার কুহুম্বরিন অনেকক্ষণ  
 পর পর শোনা যায়। পার্থক্য এতই স্পষ্ট যে, আমি যখন  
 ইহা প্রথম শুনি, তখন এক বজ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া  
 ছিলাম, “এ কোন্ পাখীর ডাক?” অবশ্য গান গাওয়া  
 পাখীরা ইংল্যান্ডে প্রায়কালে দেখা দেয়। হ্রদের ধারের  
 জলে, ঘন শরবন সেখানে নুনোহাঁস বাসা বাঁধে। লাল  
 ফুলের প্রশস্ত চক্রাকার পাতাগুলি জলের বুকে শান্তভাবে  
 ভাসিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে এক-একটি  
 ফুল তাহাদের লম্বা ডাঁটার উপর নিচের দিকে ঝুলন্ত  
 ভাবে মাথা নোয়াইয়া আছে। গৃহের নিকটে রহিয়াছে  
 টেনিস খেলবার ভায়গা, এবং অস্ত্রাঙ্গ খণ্ড খণ্ড সবুজ  
 জমি, তাহার উপর ছোটরা খেলাধুলা করে, নিকটেই  
 ফুলের ক্ষেতের ররপা ধারা হইতে যে সজীব ধ্বনিভ  
 হইতেছে বড়রা আর একস্থানে তাহার পাশে বৌকিতে  
 বসিয়া তাহা শুনিতেছে। সমস্ত স্থানটিতে নানা মর্মর  
 শ্রুতি স্থাপিত হইয়াছে—নতুন পুরাতন সব রকমই আছে।  
 সেগুলি ইটালিয়ান অথবা গ্রীক। এখানকার গরম  
 উদ্যান-গৃহে প্রায়মণ্ডলের গাছ পালিত হয়। গরম গৃহে  
 মাস্কাটেল ও অস্ত্রাঙ্গ জাতীয় আড়ুর প্রচুর উৎপাদিত হয়।  
 বৎসরের সব সময়েই ফলন হয়। হর্ম্য-সংলগ্ন কাঁচের  
 ছাদবিশিষ্ট কনজার-ভেটীরিতে বাসিয়া বিশ্রাম সুখ  
 উপভোগ করা চলে। পাশে বিলিয়াড খেলবার ঘর।  
 অস্ত্র ঘরে এক তরুণী সাক্ষিপোশাকে বসিয়া পিয়ানো  
 বাজাইতেছে। তাহাকে দ্বৈবকস্তার মত দেখাইতেছে,  
 সে যেন স্বর্গীয় সজীব পৃথিবীতে নামাইয়া আনিতেছে।  
 বসিবার ঘরে সন্ধ্যাপেক্ষা সৌন্দর্য ও শিল্পশ্রীতির পরিচয়  
 পাওয়া যাইবে। বসিবার আসনগুলি যেমন সুন্দর  
 তেমন আরাম দায়ক। ঘরের কোণায়, তাকে,  
 কুলুঙ্গিতে পৃথিবীর নানান হইতে সংগৃহীত হস্তাণ্য  
 প্রাচীন কালের সুন্দর সব দ্রব্য সূক্ষ্মচন্দ্রভাবে স্থাপিত

রহিয়াছে। জানালায় পরদাগুলি অল্পত সুন্দর।  
 সিলিং-এ নানা চিত্র। পায়ের নিচের কাপেটিও সুন্দর  
 কাজের এক আশ্চর্য নিদর্শন। যে পিয়ানোটি বাজিতে-  
 ছিল, তাহাও কাঠ ও আইজারের সহযোগে সুন্দর চেহারা  
 পাইয়াছে। ভাসু সমুহ নানারঙের ফুলের ব্যাকে বা  
 তোড়ায় সজ্জিত। ঘর অগ্রে ভরিয়া ভুলিয়াছে। মাহের  
 খাদ্যও আছে প্রচুর বংশ বংশ ধরিয়া গৃহ-লাইব্রেরীটি  
 হাজার হাজার গ্রন্থে ভরিয়া উঠিয়াছে। অতুলনীয়  
 বহিরাবরণ সেগুলির। পারিবারিক প্রতিষ্ঠিত চিত্র কত  
 না! বহু শতাব্দীর পূর্বপুরুষদের চিত্র সেগুলি। কিন্তু  
 প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জাতীয় সৌন্দর্যশ্রীতির পরিচয় বহন  
 করিতেছে। ডাইনিং টেবলটি যে কাপড়ে ঢাকা তাহা  
 সম্পূর্ণ নিম্নলঙ্ক, তাহার শুভ্রতায় কোথাও একটি ক্ষুদ্র চিহ্নও  
 নাই। তাহার উপর ফুল, পাতা, ইত্যাদি সূক্ষ্মচন্দ্রত  
 ভাবে সাজান, রূপার ডিশগুলি বকমক করিতেছে, তাহা  
 অলঙ্করণ পূর্ণ, তাহা ভিন্ন চার্টিন-পাত্র, পানপাত্র,  
 ডিক্যাণ্ডার ও অস্ত্রাঙ্গ নানা আশ্চর্য দ্রব্য। ইহার সঙ্গে  
 আমাদের ভোজনশ্রীতির কোনও তুলনা একমাত্র উদ্ভাস  
 ভিন্ন অল্প কেহ করিবে না। ছোটখাটো ব্যাপারেও  
 আমাদের কত ক্রটি। হুন বাঁধিবার পাত্রটি কি সুন্দর,  
 ছোট রূপার চামচ এই পাছ হইতে হুন তুলিবার জন্য  
 ব্যবহৃত হয়। আর যে হুন তোলা হয় তাহার বিস্তৃতি  
 ও শুভ্রতা, তুলনা করিতে গেলে হল্যান্ড-এর শীতলত্বের  
 তুষারের কথা মনে পড়ে। আর আমাদের দেশের হুন  
 আর হুনের পাত্রের কথা ভাবুন। কিভাবে সে হুন তুলিয়া  
 লই তাহাও ভাবুন। ইউরোপের লোকেরা কোনও  
 খাদ্যদ্রব্য হাতে তুলিয়া ধায় না, হাতে পরিবেশনও করে  
 না। হাতে তুলিয়া একটি সিগারও কাহাকেও দেওয়া হয়  
 না, উহা অশিষ্টতা। খাদ্যদ্রব্যের বেলায় দাঁকণ ভারতে  
 এই রীতি কিছু পরিমাণ মাত্র করা হয়। কিন্তু বাংলা  
 দেশে ভোজের সময় কিভাবে নিমন্ত্রিতদিগের পাতে  
 খাদ্য তুলিয়া দেওয়া হয় তাহা দেখিলে অবশ্য বোধ  
 হয়। মিষ্টর দোকানে অথবা কলিকাতার হোটেলের  
 খাদ্য পরিবেশনও রীতিবিরহিত। ইংল্যান্ডে যে সব

বিভিন্ন পাঠে বিভিন্ন খাদ্য পরিবেশন করা হয় সে পাঠ-গুলিতে কত রকম ছবি। খাদ্যদ্রব্যগুলিও নানা শিল্প-সজ্জত চেহারা। আমাদের দেশে এদিক দিয়া কিছু খুল ধরনের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ইউরোপে এ বিদ্যা শিল্পকৃষ্টির চরমে পৌঁছিয়াছে। আমি এষ্ট সুরকৃষ্টির কথা এতটা আলোচনা করিলাম না যদি ইহা কেবলমাত্র ধনীদিগের সমাজেই আবদ্ধ থাকিত। পক্ষান্তরে এই কৃষ্টি উদ্ভাবনের সমাজের সমস্তের বিস্তৃত। তাহাদের সকলেই, অবস্থা যাই হউক, তাহাদের স্বধাসাধ্য চেষ্টা নিজের এবং তাহাদের পরিবেশে যাঁহা কিছু আছে ক্রটিসম্পন্ন করিতে। এই বিষয়ে ইউরোপীয়দের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এই যে, তাহারা ইহা আন্তরিকভাবে ইচ্ছা করে, এবং ইহার জন্য সখর পরিশ্রম করে। আর আমরা এ জিনিস ইচ্ছাও করি না, ইহার জন্য চেষ্টাও করি না। আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ইহাদের আরও পার্থক্য আছে। এখানে কোনও ব্যক্তির যদি ধোলা খরচ না জোটে তাহা হইলে সে নোংরা কাপড় পরিয়া দিন কাটায়। ইংলণ্ডে এরূপ লোক নিজ হাতে পোশাক কাটিয়া পরিষ্কার করে। আমাদের দেশে সম্মান বোধ এখনও নিচু স্তরের। আমার মতে ইউরোপীয় সভ্যতার সর্গাশেকা বড় ক্রান্তি এই যে, ইহা নানা উপভোগ্য বস্তু, সকল সভ্যনিষ্ঠ কর্মীর ক্রয় সীমার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে এবং শুণু তাহা ইউরোপের মাত্রের নহে, পৃথিবীর সকল মাত্রের।

ইংল্যান্ডের জীবনযাত্রার মান আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। ইংরেজদের মনে আরাম ও সৌন্দর্য সূক্ত-ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কঁক করিয়া ভাল ভাবে বাঁচিতে হয় তাহা তাহারা জানে, এবং ইহার জন্য যে উপকরণ দরকার তাহা আয়ত্ত করিবার উপায়ও তাহারা জানে। তাহারা উপভোগ্য উপকরণ সমূহকে মানব জাতিতে ভুলাইয়া ফাঁদে কোঁলিবার উপায় স্বরূপ মনে করে না, বরং তাহাকে উহার কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করে, এবং তাহা আরও কঁক করিয়া উন্নত ও উপভোগ্য করা যায় তাহার জন্য পরিশ্রম করে। তাহারা জলের

ডুবাইবার স্বভাবকে, আগুনের পুড়াইবার স্বভাবকে এবং গোলাপ গাছের কাঁটাকে ভয় করিয়া চলে নাই, তাহারা উহা অগ্রাহ্য করিয়া উহাদিগকে নিজের কাজের জন্য বখাযোগ্য ব্যবহার করিয়াছে। বহুদিন পূর্ব হইতেই তাহারা বৃষ্টিতে পারিয়াছে, বৈরাগ্য বা কৃচ্ছ সাধন এক জাতীয় ধর্মোন্মাদনা, মাতৃ-বিকার এবং ধর্মোন্মাদনা অর্থাৎ ইনস্যানিটি। তাহাদের জীবনের দাবি—সৌন্দর্য ও আরাম উপভোগ। এবং এই সন্মজ্ঞান দাবি মীটাইতে উহাদের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা। সেইজন্যই উহার উপকরণ সহজলভ্য হইয়াছে, এবং নিম্নস্তরের লোকেরও আয়ত্তাধীন হইয়াছে। আমাদের দেশে ইহার চাহিদা বহু দূরে অস্পষ্টভাবে মাত্র দেখা দিয়াছে। আমাদের দৃষ্টিতে ইংরেজ জীবনের শিল্পকৃষ্টি সজ্জত পরিবেশ মনে হয় যেন অতিমাত্রায় পরিকল্পনা ও পদ্ধতি মানিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, এবং সেজন্য তাহা অত্যন্ত কঠোর এবং ক্রান্তিকর বোধ হয়। যেন সব কিছুই ইংরেজদের দৃঢ় চরিত্র ও সবল দেহের ছাপ পাইয়াছে। উহাদের শিল্প-সৌন্দর্য পূর্ণ প্রস্তুতি গোলাপের স্নায়ু চোখে বাঁধা লাগায়, সবুজ পর্ণ-পুটের ভিত্তর হইতে লাজুক কুঁড়িটির মত কোমল দৃষ্টিতে বাহিরে ডাকায় না। উহা আমাদের শিল্প। কিন্তু সদেশবাসীগণ, ভোমরা ইহার জন্য গবিত হইও না। আমরা যে এখনও এমন শিল্প রচনা করি ইহা আমাদের হৃদ্যাগ! কারণ ইহা সবটাই কাব্য, ইহা অল্প জগতের স্বপ্ন মাথা মধুর ভাব। এই কঠিন রূঢ় কুখ্যাত জগতে ইহা যেমাননি, যে কুখ্যাত জগৎ কুমুদখুলকে মন্দ হাওয়ায় জলে থেলা করিতে দেয় না, জল হইতে উপড়াইয়া লয়, নিরীহ মেঘাবককে তত্যা করে, কোমল-চাহনি-বৃক্ষ গেজেল হাঁরণকে গুলি করিয়া মায়ে, পক্ষতের নিকটই জঙ্গলে মেঘের মত মধুর গাঁততে চলাফেরা করা হস্তীযুগের গলায় কাল পরায়, সে জগতে কোমলকাব্য চলে কি? এ জগতে গদ্যময় আগরণই একমাত্র টিকিয়া থাকিবার যোগ্যতা দিতে পারে, কাব্যেরভাবে ভুবিয়া থাকা চলবে না। বাপ ও যত্নের আকারে গদ্য কোটি কোটি লোকের

প্রভু, তাহার মধ্যে কাষের বাটালি দ্বারা ক্ষুধা মিটাইবার জন্য মাসে পাঁচ টাকা আর একমুঠি অন্ন, আর শীতে শুইবার জন্য দু'আনা দামের খেজুর পাড়ার পাটি ভিন্ন আর কিছু উপার্জন করা যাইবে না। আমাদের শিল্পের আরু ফুয়াইয়া আসিয়াছে, এবং তাহার মৃত্যুই এখন প্রয়োজন যদি সে মাসে দশ আনার বেশি উপার্জন করিতে না পারে। প্রেমের মূল্য বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কারু শিল্পের ধ্বংস অনিবার্য। অন্ততঃ পক্ষে ব্যবসা হিসাবে ভারতীয় কারু শিল্পের সার্থকতা এদেশে খুব বেশি নাই। আধুনিক যন্ত্র আসিয়া ইহাকে ধ্বংস করিবে। সুন্দর মসলিন, অতি সুন্দর কারুখুস্ত পইসাল কাশ্মীরী শালকে ল্যাঙ্কাশায়ার উৎপাদ করিয়াছে, বামিংহাম এখন ধাতুশিল্পকে ধ্বংস করিবার উদ্যোগে করিয়াছে। আসল নকল সবই শেষ পর্যন্ত নিকট হইবে।

ইংরেজ জাতির জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিতে শিল্প বোধ কিরূপ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তরূপে আমি একখানা কার্ডের কথা উল্লেখ করিতোঁছি। উপনিবেশিকদের ও ভারতীয়দের সম্মানে লর্ড মেয়ার আমাদের একটা একটি বল-বৃত্তের অস্থানে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। হান গিল্ডহল, কাল, ২৫শে জুন ১৮৮৯, শুক্রবার। কার্ডখানি একটি উৎকৃষ্ট চিত্র, অত্যন্ত আমি স্থিতিচিত্র স্বরূপ ইহা বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। নম্রার ভাঙ্গিটি প্রাচ্যদেশীয়। কার্ডের চারিটি ধারে এমন সুন্দর পাড় আঁকা, মনে হয় তাহা যেন হারুন-অল-রশিদের প্রাসাদের কার্ণিশ হইতে নকল করা। তাহার পরেই যে পাড়টি আঁকা হইয়াছে তাহাতে উপনিবেশসমূহ ও ভারতবর্ষের ২২টি ফুলের ছবি, এবং প্রত্যেকটি ফুলের যেমন বর্ণ, ঠিক সেই সব বর্ণে রঞ্জিত। ইহাদের মধ্যে *Acmena elliptica* (সিডনির লিলিপালি), *Swainsona greyana* (ডারলিং নদীর পয়জন পী), *Coplis trifolia* (কানাডার গোল্ড বেড), *Cissampelos* (ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভেলভেট লীফ), *Citrus limonum* (পশ্চিম আফ্রিকার লেমন গাছ), *Vitis*

*vinifera* (কেপটাউনের ব্র্যাক প্রেপ) এবং *Viola adorata* (উত্তর ভারতের বনফশা)। এই ফুলগুলি কার্ডের চারিদিকে ক্রমের মত দেখাইতেছে, এবং সেই ক্রমের মধ্যে প্রত্যেক দেশের মুদ্রাস্ব ও নাম চিত্রিত আছে। বামে প্রথমে সাইপ্রাস, তাহার পর কানাডা, মল্টা, উত্তরমাশা অন্তরীপ ও জাটাল। আরও নিচে একটি বন্দর—দেখানে বড় একটি জাহাজ ও মাছধরা নৌকা, তাঁরভূমি পাহাড়ী, দূরের আকাশে মেঘ—কেপ টাউনের ছবি। ইহার নিচে পর পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ব্রিটিশ গিয়ানা, পশ্চিম আফ্রিকা, নিউক্যাম্ব্রিয়া, ককল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ, এবং নিউ গিনি। কার্ডের বাম পার্শ্ব শেষ হইল। ডান পার্শ্বে, সামরাসিনিক স্থাপত্যে যাহাকে বলে “জবাব” বা রিপ্লাই—সেই ভিত্তিতে চিত্রিত হইয়াছে সাইপ্রাসের জবাবে মারিশয়াস। ইহার পর নিউ জীল্যাণ্ড, ইহার সামরিক চিহ্নের নিচে দুইটি লোকের ছবি, একজনের হাতে তুলাদণ্ড, অপরজনের হাতে একটি দণ্ড। ইহার পর হংকং, নিউ সাউথ ওয়েলস, এবং গুইনসল্যাণ্ড। কেপ টাউনের জবাবে দক্ষিণ পার্শ্বে সিডনি বন্দর, বন্দরে বড় একটি বাষ্পীয় জাহাজ, এবং বহু রক্ত পরিপূর্ণ ভীষ্মভূমিতে গম্বুজ যুক্ত একটি হর্য্য, গাঁজা ও অস্ত্রাস্ত্র অট্টালিকা। সিডনির পরে আসিয়াছে স্ট্রেট সেটেলমেন্টস, উত্তর বোরনিও, সিংহল, ভিকটোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং ফিজি। এইখানেই দক্ষিণ পার্শ্ব শেষ। উপরের প্রান্তে দক্ষিণ দিকে লণ্ডন ও বাম দিকে গিল্ডহল। এই দুইয়ের মাঝখানে লণ্ডনের সামরিক চিহ্ন, তাহার এক দিকে একজন লণ্ডন রাইফল ভোলান্টিয়ার ও অস্ট্রেলিয়ান ভোলান্টিয়ার, অপরদিকে ইংলিশ গার্ডস্‌ম্যান ও নেটিভ ইণ্ডিয়ান সৈনিক প্রহরী স্বরূপ দণ্ডায়মান। জাতীয় এবং রাজকীয় পতাকাগুলি কার্ডের বিপরীত দিকে, এবং ইহার নিচে কানাডার সামরিক চিহ্নের একটি অংশ, যথা গোলাপ, ত্রিপত্র ও কাঁটা, নিচে মুদ্রিত *Domine Dirige Nos*, (প্রভু, আমাদের পথ দেখাও)। নিচের পাড়ে অটাওয়া শহরের ছবি। এটি বাম পার্শ্বে অবস্থিত। দক্ষিণ পার্শ্বে কলিকাতা, ও তৎসহ গভর্নমেন্ট হাউস,

ময়নান, ও অকটারলোনি মনুমেন্ট। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে শেরিফদের ও লর্ড মেয়ারের প্রতীক চিহ্ন। কেন্দ্রের পটভূমিতে একটি ভারতীয় খিলান, দুইটি স্তম্ভের উপর চিত্রিত হইয়াছে। ইহার এক পার্শ্বে আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান নামক এক আদিবাসী, তাহার পাশে এক বৃদ্ধি আনারস সহ একজন নিগ্রো। আরও কিছু দূরে দীর্ঘকায় এক ফার্শ গাছের নিচে পিছনের দৃষ্টি পাসে ভর করিয়া একটি ক্যাডাক, একটি মেমশাবক ও একটি গরু পাখী। অল্প দিকে এক অস্ট্রেলিয়ান অধারোকার কাছে একজন ভারতীয় সচিব দণ্ডায়মান। আরও পশ্চাতে একটি বাঘাশকারের দৃষ্ট ইচ্ছাতে একটি গাভী ও দুটি বাঘ রহিয়াছে। কাডের কেন্দ্রে নিমন্ত্রণ লিপ। কাডখানি ক্রোমোলিপো পদ্ধতিতে মুদ্রিত।

বলুনতোর অগুস্তান ১৮৮৬ সনের ২৫শ জুন তারিখে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অগুস্তানটি খুবই আকর্ষণকর। ইচ্ছাতে প্রায় ছয় হাজার লোক যোগদান করিয়াছিলেন। তাহার সর্বশেষ লগুন সেমিটটির সেবা ব্যক্তি। আর্থাধিদগকে যথার্থ লর্ড মেয়ার দি রাইট অনবেরল জন স্টেপলস এফ-এস-এ'র সাক্ষত পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল। নতুন আরম্ভ হইল নয়টার সময়। নাচ সম্পর্কে আমার কিছু বাঁলবার নাই, কারণ আমি ইহা জানি না, বুঝি না। আমি শুধু নাচের দিকে চাহিয়া ছিলাম, এবং মাঝে মাঝে, তাহার আমার মত নাচে যোগ দেন নাই। তাহাদের সঙ্গে পরিচিত হইতাম। সময় বাঁচি নাচ চলিয়াছিল।

চ্যালো চ্যাণ্ডলার্স হল-এ একটি শৌখীন সম্প্রদায়ের নাটক দেখিতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। আমাদের দেশে এরূপ অভিনয় অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু লগুনে যাহা দেখিলাম, তাহার সহিত সেখানের তুলনা চলে না। প্রতিগত বিশেষ শিক্ষা না পাইয়াও শ্রীপুরুষ যেরূপ সুন্দর অভিনয় করিলেন তাহা না দেখিলে বিশ্বাস হইত না। এমন কি লগুনবাসীরাও, তাহার উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখায় অভিভূত, তাহারও এই শৌখিনদের অভিনয়ে স্যাত্তয়, ছুরি লেন, অ্যাডেলফি, গ্রেব, গেইটি, প্রিন্সেস,

কমোড, হে-মারকেট, স্ট্র্যাণ্ড, কন্ডেট গার্ডেন, অ্যান্ডিনউ, এবং অজান্তে থিয়েটার। প্রত্যেকটির জন্যই আমরা ক্রীটিকেট পাঠিয়াছিলাম। এই সব থিয়েটার বিষয়ে আমার বাঁলবার উপযুক্ত ভাষা নাই। ইহাদের সাহিত্যতুলনায় আমাদের বীডন স্ট্রিটের থিয়েটারগুলি ছেলেখেলা বোধ হইবে: এইটুকু মাত্র বাঁলতে পারি।

দুই দেশের থিয়েটারের মাঝে যে ব্যবধান, তাহা হইতেই ইউরোপীয়দের এবং ভারতীয়দের কত ব্যবধান অনুমান করা যাইবে। ব্যবধান বিরাট। কিন্তু হায়, আমি আমার দেশবাসীর একটি সম্প্রদায়কে একথা বুঝাইতে পারি না। সীমার প্রজ্ঞার অব্যর্থতা সম্পর্কে অনমনীয় বিশ্বাসই অজ্ঞতা। আশ্রয়শেষের বিষয় এই যে, মাত্র একশত বৎসর পূর্বে ইউরোপীয় এবং ভারতবাসীগণ সামাজিক অগ্রগতিতে প্রায় সমস্তেরে ছিল, এবং এই সময়ের মধ্যে, বলা উচিত গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে উভারা অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, আর আমরা উভাদের অপেক্ষা বহু দূর পিছাইয়া পড়িয়াছি। আমরাও অগ্রসর হইতাম, কিন্তু শব্দক গীততে। উহার দুটিতেই রেলগাড়ির গতিতে! অবশ্য ইহা সম্ভব এই কারণে যে, পৃথিবীর সকল দিক হইতে প্রথম উভাদের কাছে আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু প্রথম এই যে-কোন ভাগিয়া পড়িয়াছে; দ্বিতীয় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের পার্যারিসের হুডেন থিয়েটারের মত একটি অনন্য উপভোগের প্রতিষ্ঠান পালন করা সম্ভব হয় কি কারণ? অস্ট্রিয়া বিদেশ হইতে কেনিও সম্পদ আকর্ষণ করিতে পারে না, তবু কেনিও করিয়া ভিয়েনাত পুং থিয়েটারের মত প্রতিষ্ঠান পালন করে? এমন কি নিঃস্ব ইটালও ভেনিস, ফ্লোরেন্স এবং রোমে উচ্চতর অপেরা হাউসগুলি বাঁচাইয়া রাখে? আমাদের দেশ ইহাদের অপেক্ষা অধিক উৎপাদনকারী দেশ। ফ্রান্সের দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া, বোর্হোমায়ার পাইন অরণ্যের দিকে চাহিয়া, জার্মানির রাই ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া, দক্ষিণ ইটালির অলিভ উদ্ভিদগুলির দিকে চাহিয়া আমার মনে হইয়াছে তবে কেন আমরা এত দরিদ্র?

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীগণ স্বর্ণযুগের কাল হইতে গাছের সমস্ত কাটা ভাল দিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘর তৈয়ারি করিয়া তাহাতে বাস করিতে অভ্যস্ত, শীতের দিনে কাঠাকুর চামড়া ভিন্ন গায়ে দিবার তাহাদের অস্ত্র কিছু নাই, সুধার যন্ত্রণায় তাহারা কীট পতঙ্গ এবং অস্বাস্থ্য কুখ্যাদ্য খাটিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, এবং তাহাদের আধিকাংশ এখনও এই তাবুই জীবন কাটিতেছে। অথচ ইউরোপীয়দের হাতে পড়িয়া এ

একই দেশ এখন কত ফসল ফলাইতেছে। আমার মনে প্রশ্ন জাগে, এই সব পলিনেশীয়দের মধ্যে কি এখনও কোনও অর্থনীতিবিদ জন্মায় নাই, যে ব্যক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সুশীলিত ভাষায় এমন কথা প্রচার করিতে পারে যে, তাহাদের দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ ইংরেজরা তাহাদের দেশের ঐশ্বর্য লুণ্ঠ করিতেছে বালিয়া? আমাদের দেশে এরূপ অর্থনীতিবিদ আমরা সকলেই।  
ক্রমশঃ

## অন্তর্বিহীন পথ

( উপভাস )

যশুনা নাগ

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

আবিনাশ দু-একদিন পর পর মুকুট ও জয়তীর সঙ্গে দেখা করিতে যায়। মুকুট অনেক ঘণ্টার জন্যই বাটরের কাছে ব্যস্ত থাকে। জয়তীকে আবিনাশ বলে গেল সময় হলে তার স্ক্যাটে আবির যেতে, সেখানেই জয়তী স্থির হয়ে বসে কথা বলে। কিন্তু জয়তীও ক্রমশঃ মুকুটের মত উপদেশের সুরে কথা বলতে চায়—

‘আবিনাশ, তুমি বড় একটা বাড়ী নিয়ে কাজটা ভাল করে কর না কেন? কত উন্নতি করতে পারবে তাই ভাব। শিল্পাভিযাগী দলের সঙ্গে আলাপও তো কর না?’ আবিনাশ চুপ করে থাকতে পারল না—

‘জয়তী, জীবনের আনন্দ তাকে বলে তোমরা কিছু বোঝ না—দীর্ঘকালের মত একটা উদ্ভাদ আবহাওয়ায় আমি কখনই থাকতে পারতুম না—রাজীও নই। নিজের একটা আস্তর আছে আমি বিশ্বাস করি। আমার জীবনের আদর্শ একেবারেই অল্প রকম। তোমরা স্বাধীনতাকে দেখায় হারিয়েছে, এখন পরাধীনতার সঙ্গে

এমন জড়িয়ে গেছে, সঙ্কট করতে পারছে না—আবার একই করতেও পারছে না। আমি যখন বিয়ে করব—যদি বাধব, তখন দেখো বাটরের বাক্সটি আমার শাস্তি নষ্ট করবে না।

জয়তী বুঝল তাহদের বাড়ীর কোলাহলের মধ্যে আবিনাশ ভাল কিছুই দেখে না—সে যেন অবিরামের কথা স্মৃতি করে বুঝল না এমনই ভান করে বলল—

‘আমাদের বাড়ীর আবহাওয়া তোমার পছন্দ নয় বুঝি? ভাল না লাগার কোন কারণ নেই। কত রকম লোকের আনাগোনা—কখনও আমোদ-প্রমোদও হয় না কি?’ নিজের সম্মান রাখার জন্যই, নিজের সংসারের মর্যাদা রাখার উদ্দেশ্যেই কথাগুলি বলল কিন্তু সে যে অন্তর থেকে বেরুল না তা আবিনাশের বুঝতে বাকী রইল না। জয়তী তার সংসার রক্ষার্থে অতিরিক্ত বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে সে কথা ভেবে অবিরামের মধ্যে মধ্যে সহানুভূতি হয় কিন্তু জয়তী তার বিবাহিত জীবনের সংগ্রাম বুঝে

খালোচনা কৰে নও, তাই অবিনাশ বেশী কিছু বলতে চায় না। অবিনাশ দাঁড়িয়েছিল, চলে যাবে বলেই সিগারেটটা ছাইদানীৰ মध्ये নিৰ্ভয়ে দিল— দেখতে পেল একটা মোটাৰ গেটৰ ভিতৰ চুকছে— গাড়ীৰ মध्ये অনেক লোক। জয়তীও ব্যস্ত হয়ে উঠল। চুল বাঁধা ছিল না, ভাড়াভাড়া গোঁপা জড়িয়ে নিল, চটি জোড়া পায়ে পড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, অবিনাশের দিকে তাকিয়ে অনুরোধ কৰল—

‘এখনি যেও না—একটু বোসো অবিনাশ।’

মুকুট তখনও ফেৰেনি অবিনাশ নিভাস্ত আঁচলি সতেও একটু অপেক্ষা কৰল। অপরিচিত ভাড়াৰ মध्ये পড়ে যাওয়া তাঁৰ নিভাস্ত অসচ্ছন্দ কিছু সে জয়তীৰ অনুরোধ গড়াত্তে পারল না।

মুকুটের মध्ये একটি ভদ্রমহিলা বসে চুকে এলেন এবং বেশ জদাভাৰ সাঁহত জয়তীকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁৰ বয়স পঞ্চাশের কম নয় মনে হল। পরণে একটি ঘি বহুৰ বেশনের শাড়ী জাকে পাড় বা বুটা কিছুই নেই। গাউজটি গাৰ জাম বহুৰ—খানের দাগ দুটে উঠেছে চাৰাঁদকে—লম্বায় গাউজটি নিভাস্তই পাটো বলে দেহের শিথিল। সহজেই চোখে পড়েছে। মহিলা জামাৰ বহুৰ সঙ্গে মিলিয়ে কাল্পাৰ্শ্টিক লাগিয়েছেন। চোখে কাজল রেখা আৰ ভুৰু হুটি পন কৰে টানা। পাউডাৰ একটু অতিৰিক্তই দেখাছিল। সাজসজ্জায় কটি বিশেষ ছিল না তবু তাঁৰ বয়স পঞ্চাশের চেয়ে বেশীও হতে পারে মনে হল। হঠাৎ প্রসাধনের সাহায্যে কয়েক বছৰ বয়স চাকতে পেরেছেন। গোঁপায় চুল শুঁজতে শুঁজতে বললেন—

‘মুকুট কোথায়? আমার নিভাস্তই প্রয়োজন তাকে’ বলেই শিশুর মত খিলাখিল কৰে হাসলেন, একটু চোখ টিপলেন আৰ অকারণে বুদ্ধ হাসলেন। উত্তরের আশা না কৰেই বললেন—

‘জয়পুৰে একটি চিত্ৰপ্ৰদৰ্শনীর জন্ত মুকুটের সাহায্য নিতে এসোঁছি, কাল সন্ধ্যায় সে দেখা কৰবে বলেছিল। কোন খবৰ দেয় নি তাই আজ চলে এলাম। সঙ্গে

গাড়ীতে জয়পুৰেই বহু কয়েকজন বসে আছেন। তুমিই তো মিসেস শুভ? তুমিই তুমিও আমাদের সাহায্য কৰতে ইচ্ছুক? ভদ্রমহিলা কাকৰ উত্তরের প্রতীক্ষা না কৰেই নানা ইচ্ছা আঁচলি প্ৰকাশ কৰে গেলেন। অবশেষে জয়তী উত্তৰ দিল—

‘মুকুট এখনই না ফিৰতে পারে, দেবী কবে মনে হয়।’

কিন্তু আপনি কি অপেক্ষা কৰবেন?’

‘নিশ্চয়ই! বাঁস থানিকক্ষণ, ইতিমধ্যে ছাঁব দেখাও—

মুকুটের নতুন কাজ আছে নাকি কিছু?’ অবিনাশ এঁগিয়ে এসে ভদ্রমহিলাকে বলল—

‘একটু চা এনে দিও সাপনাতে?’ ভদ্রমহিলা অবিনাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—

‘এই সে নমস্কাৰ ইয়ংমান, আপনাৰ পাঁচৰ ভো পেলাম না? মুকুটের আশ্বাস বা বহু বলেই অন্তমান কৰাচি।’

‘না, আমি আশ্বাস নহ, তবে মুকুটের সঙ্গে পাঁচৰ অনেকদিন। জয়তী ও আমি দুজনেই মুকুটের ছান ও ছালী ছিলাম, একত্রেই কাজ শিখোঁছি কিছুদিন। জয়তীৰ স্টুডিও দেখেছেন? সে সন্ধ্যা আৰ্টিষ্ট জানেন তো?’

জয়তী কপাল হুঁচকিয়ে অবিনাশের দিকে চাহত কৰল চা নিয়ে আসতে। ‘ভদ্রমহিলা হাতে পেয়ালা নিয়ে বেশ আৰাম কৰে জামিয়ে বসে গল্প আৰম্ভ কৰলেন।

‘জয়পুৰে একটা আৰ্টিষ্ট আৰম্ভ কৰতে চাই—মুকুট বলেছিল সে বিষয় পরামৰ্শ দিতে পারে। তোমরা সকলেই এসো আমার সঙ্গে খুঁজি খুঁজি হব।’ ভদ্রমহিলা ধীতমঃ আন্তৰিকতার সাঁহত কথা বললেন, সকলকে আপন কৰে নিতেই তিনি উৎসুক।

‘বাজবাড়ীৰ সঙ্গে আমার আশ্বাসতা আছে। অনেকদিন বিধবা হয়েছি, বয়সসংসারেৰ বন্ধন কিছুই নেই—বাইরের কাজ-কৰ্ম নিয়েই থাক। নিজের সন্তান ছিল না কোনদিন, গভীৰদেব ছেলেমেয়েদের বড় কৰে দিওঁছি—এখন একেবারেই একা।’

অবিনাশ কোঁড়ালের সঙ্গে আঁতখর কথাগুলি শুনে যাচ্ছিল—চায়ের ট্রে নিয়ে এসে জয়তীর লামনে রাখল। জয়তী কতগুলি চাঁক টোস্ট এঁগিয়ে দিল—চা ঢালতে ঢালতে গেষ্টের দিকে তাকিয়ে দেখল—মুকুটের গাড়ী এচণ্ড বেগে বাগানের ভিতর ঢুকছে, ঘরের সামনে এসে সশব্দে থামল। গাড়ী থেকে নেমে এসে মুকুট বলল—

‘মিসেস সিং, এত দেরী হয়ে গেল, বড়ই দুঃখিত, তবু যাক আপনি একা পড়েন নি, এঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে নিশ্চয়।’

মিসেস সিং অবিনাশ ও জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললেন—‘এঁরাও সব আসবেন জয়পুরে!—এইমাত্র চা খাওয়ালেন যত্ন করে। আলাপ হ’ল এতক্ষণ।’

মুকুট গম্ভীর মুখে বলল—‘জয়তীর মা অল্পদিন হ’ল হঠাৎ মারা গেলেন, তাঁর বাবার কাছে যাবেন শীঘ্র—আনি একলাই আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি।’

অবিনাশের দিকে তাকিয়ে মুকুট বলল—‘যাবে নাকি অবিনাশ?’

‘না মুকুটদা, আমার এখানে অনেক কাজ। নেমন্তরের জন্ম অশেষ ধন্যবাদ—অন্ত কোন সুযোগে একবার নিশ্চয় যাব।’ অবিনাশ কিছুতেই মুকুট ও তার বন্ধুদের সঙ্গে কাজের ব্যাপারে জড়াতে রাজী নয়। নতুন কথায় নিজেকে চুটি করিয়ে নিল।

পরের দিন ভোরে মুকুট, মিসেস সিং ও তাঁর দলের সঙ্গে জয়পুর রওনা হল। রাজবাড়ীর একটি বৃহৎ মহলে একখানা বড় আর একখানা ছোট ঘর মুকুটের জন্ম ঠিক করা ছিল। চারিদিকে সবই ফিটফাট, প্রাতিষ্ঠানের আহাঙ্গারির বাহুল্য দেখে মুকুট সন্তোষিত হয়ে উঠছিল, প্রত্যহই যেন এক বিবরণি আয়োজন।

কয়েকজন শিল্পীকে একত্র করে মুকুট স্কুলের কাজ আরম্ভ করল এবং কিভাবে কাজ চালাতে হবে তার একটি কার্যসূচি করে দিল। প্রদর্শনী সংক্রান্ত কতগুলি সমস্তার সমাধান হবে আশায় বিশেষ আলোচনা সভা এসবে, বহুলোক একত্র হয়েছে। জয়তীর ও তার নিজের কয়েকখানা বড় ছবি মিসেস সিং-এর সঙ্গে ছিল, অল্প-

দিনের মধ্যে সেগুলি বিক্রী হয়ে গেল। জয়পুরের বিশিষ্ট খরিদাররা মুকুট ও জয়তীর ছবির বিশিষ্ট্য ও নতুনত্ব লক্ষ্য করল এবং জয়পুরে উভয়ের ছবির বিশেষ একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা উচিত বলে পরামর্শ দিল। তৎক্ষণাৎ শিল্পীদের প্রদর্শনীর ঘায়েদাটন হবে—তারই উদ্দেশ্যে মিসেস সিং মুকুটকে জয়পুর নিয়ে গিয়েছিলেন। কয়েকজন প্রবীণ চিত্রকর সেই প্রদর্শনীর ভার নিয়েছিলেন। মুকুটের সাহায্য পেয়ে তাঁরা খুবই খুশী হলেন। রাজস্থানের ও অজান্ত স্থানের শিল্পীদের যোগ দেবার জন্ম নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে, তাঁদের ছবি সব জড় করা হ’ল। সারাদিন খুঁটিনাটি নানা কাজ করে এসে মুকুট কান্ত ও পার্শ্বাঙ্গ। সন্ধ্যা হতেই মাতা ডুংরি ও লহমন ডুংরি আলো দেখা যায়। এখানে এখানে প্রাসাদগুলিতে আলো জ্বলে উঠতে—মনোরম দৃশ্য মুকুটের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পাহাড়ের ওপর যেন দেয়ালের আলো।

মিসেস সিং তাঁর কয়েকটি বাক্সটিকে নিয়ে এসে মুকুটের সঙ্গে আর্ট স্কুলের বিষয় আলোচনা করলেন। মিটিং শেষ হতে মুকুট বেশ কয়েক গেলাস মগ্পান করল। একাই বসেছিল তাই কতটা যে পান করেছে আন্দাজ করতে পারে নি। মাতাল অবস্থায় কেমন যেন অদ্ভুত চেহারা মুকুট ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মহিলারা মুকুটকে ঐভাবে দেখে সকলেই মুখ টিপে একটু হাসলেন আর ধীরে ধীরে সরে পড়লেন। রাজস্থানে রাজ-পরিবারের মহিলারা পানোপ্যন্ত পুরুষদের দেখে বিচলিত হন না বরং তাদের বিষয় গদ্য করেই গল্প করেন। একজন বললেন, তাঁর স্বপ্নের মহাশয়কে রোজ ঘরে কাঁধে চাড়িয়ে নিয়ে আসতে হয়। আর একজন বললেন, এ তো কিছুই নয়—তাঁর খুঁড়স্বপ্নকে সর্বদাই খাটে শুইয়ে ঘরে আনতে হত, তিনি নিতান্তই বীর পুরুষ ছিলেন, আঁতখর মত খেয়ে বা অজ্ঞান হয়ে পড়তে তিনি ভয় পেতেন না। মুকুটের অবস্থা দেখে তাঁরা কিছুই অস্বাভাবিক মনে করলেন না—বরং মুকুটও যে বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তি তাই

প্রমাণ হল। যুহু কেসে তাঁরা বিদায় নিলেন। যুহুট সে রাত রীতিমত নির্বিঘ্নে ঘুসুলো।

পরদিন প্রভাতের আলো তাকে নতুন প্রেরণা এনে দিল। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত খুব ঘুসুল—তারপর সারা সন্ধ্যা কয়েকটি বছর সঙ্গে বসে বিশেষ ভাবে মনোপান করল। জয়তী সঙ্গে না থাকায় যুহুটের ভোজন ও পান করা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল এবং সে কখনও কখনও অসুস্থ বোধ করছিল বলে একটু যেন চিন্তিত হয়ে পড়ল। আর্ট কুলের কাজগুলি হ্রস্পন্ন করে সে খানিক নিশ্চিন্ত হ'ল। যুহুটের প্রশংসা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল—মিসেস সিং অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। যুহুট দিল্লী ফেরার জন্য ব্যস্ত, হল।

\* \* \*

এদিকে দেবশিশু দিন গুনাচ্ছিল। জয়তীকে কাছে পাবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছে। বহুদিন পর জয়তী পিলালয় যাবে। নিজের সংসারে তার দায়িত্বের অভাব ছিল না। 'দিগন্ত'তে এসে অবধি সে আর দিল্লী ছাড়বার সুযোগ পায় নি। জয়তীর ট্রেন চিক সময় এসে পৌঁছল। শীলা তাকে বাড়ী নিয়ে এল। দেবশিশু পড়ার ঘরে বসেছিল, জয়তী এসে পৌঁছতেই সে বাবার ঢুকের ওপর মাথা রেখে শিশুর মত কেঁদে উঠল। এইভাবে সে কাটেনি কখনও। যেন বাধ ভেঙে পড়ল—হুজনে একটিও কথা বলতে পারল না। খানিকক্ষণ হুজনে নিদাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—তারপর দেবশিশু জয়তীর মাথায় হাত রেখে বলল—

‘জয়মা, তুমি জান করে এস—কাপড় বদলে এস—মায় কথা সব তোমার কাছেই বলব।’ অল্লিদিনের মধ্যে দেবশিশুর যেন বাধ'কো ধরেছে, তার চোখে আর তেমন দীপ্তি নেই—জান মুখ, শুক কপোল, চাপা হুখের ঘনহারা তাকে ঘিরে কেলেছে। জয়তীকে সে নিজের শোকের কথা বলতে চায় নি—শাস্তার পাণ্ডিত্য অবস্থার কথা সে উল্লেখ করবে না মনস্থ করল। শুধু এই কণ্ঠি কথাই বলল—

‘যুহু জীবনেরই একটি অংশমাত্র—জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুদীর্ঘ পথ মাত্র, একটি জীবনে কাজ ফুরালে আবার অন্য একটি জীবনের কর্তব্য এনে পড়ে, এইভাবে কেবল দেহেরই পরিবর্তন হতে থাকে মানুষ তাই ক্রমাগত আসছে আর যাচ্ছে, কিছুই ফুরা না। আমরা মায়া দিয়ে নিজেদের ভুলাই, যুহুতে জীবনের সমাপ্তি বসে ভাবি, তাই নৈরাশ্র, হুঃখ, শোণ ও ক্লেশ শাস্তি কেড়ে নেয়। পুণ্যস্থান তৌ কোনভাবেই পুণ্য হতে পারে না, তবে যুহুকে ভয় করি কেন, যুহুর মধ্যে দিয়ে মানবজীবনের পরিণাম অতি সত্য হয়ে ওঠে না কি?’

শীলা দেবশিশুর পাশেই বসে কথাগুলি গুনাচ্ছিল চোখ দুটি নীরবে মুছে নিয়ে বলল—

‘পিতামাতার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না, তাঁরা স্মৃতি ভিতর দিয়ে অমর হন। তাঁদের হারিয়েছি—এ কথা ভাবতেই পারি না। কত শত্রু শৈশবের স্মৃতির মধ্যে দিয়ে কিরে আসেন, নিঃস্বর্ণ প্রেমের বন্ধনে জড়িয়ে আছেন, দূরত্ব কোথাও দৌঁধ না। আমার মায় সেই পু' মন্দর কল্যাণী স্মৃতি শুকতারার মত জেগে আছে।’

শোকান্তি দেবশিশু বড় শাস্তি পেল, সে বলল—

‘শীলামা, তুমি জয়তীকে সাধনা দিতে পারবে আমি বিশ্বাস করি—কথাগুলি বড় অন্তর থেকে বলেছে তোমার কাছে কাছেই যেন থাকে জয়তী!’ কিন্তু সে নিজেকে হির থাকতে পারল না। চেয়ার থেকে উঠে ঘরেই পায়চারী করতে লাগল। জান সেরে নিজে জয়তী নিঃশব্দে বাবার কাছে এসে বলল।

মাথা নিচু করে বলতে লাগল ‘বাবা, মা কি কি বলে যেতে পেরেছিলেন?’

‘একখানা মস্ত হাঁসি রেখে গেছেন, তোমার খুব ছোট বেলাকার এই ছবিখানা কতবার দেখতেন আর বলতে—দেখ, জয়তী যেন একটি ছোট্ট পরী। তোমার ম' বার বার অজ্ঞান হয়ে পড়াছিলেন বলে বড় চিন্তিত হয়েছিলাম। ডাক্তার দেখেই বললেন, হাটের দুর্গলত বিহানার শুইয়ে দিলেন। কথা কমই বলতেন কিন্তু ম'



তার অশান্তি কিছু ছিল না। বোদিন শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন সোদিনও কোন কষ্ট ছিল না শরীরে। সাজিয়ে তুলে দিলাম গার জিনিস তাঁকে, কি স্বপ্নের দোখেরোহল যখন সেই লাল পেড়ে গরদের শাড়ীখানা পরিয়ে দিল সকলে। তাঁর হাতে একটি মালা জড়িয়ে দিলাম নিজের হাতে। কোন্‌ তাঁর সেরে একা যেতে পারবে জানি না—তবু তার ইচ্ছা পূর্ণ হোক এই প্রার্থনা করি। আমার বলেছিল তাঁর সেরে যেতে ইচ্ছা করে।’

দেবালিশের চোখেও জল এল, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চোখ মুছে আবার সংযত হয়ে জয়তীর দিকে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে নিজের শৈশবের কাহিনী বলতে লাগল। বহুকাল পর আবার কৈশোরের হৃদয় দিনের কথা জার মনে পড়ে। তার পিতামাতার সঙ্গে কত দেশ-বিদেশে পাহাড়ে সমুদ্রতীরে সে ঘুরেছে—চোখের সামনে সেই সকল দৃশ্য ও ঘটনা যেন সত্য হয়ে দৃষ্টি ওঠে। জয়তী বড় শান্তিতে বাবার কথা শুনাছিল—মনের এই সহজ যোগাযোগ তাকে পুনরায় সুস্থ করে তুলবে, সে আশা করল। পিতৃত্বের প্রকৃত আকর্ষণ আঁত গভীরভাবে আজ অনুভব করতে পারল, বাবার কাছে বসে সে অনেক দুঃখও তুলতে পারল। জয়তী অস্বাভাবিক বলল—

‘বাবা, তুমি আমার সঙ্গে দিল্লী চল। মুকুট শীঘ্র জয়পুর থেকে ফিরবে, সে ফেরার আগেই আমি ফিরতে চাই—তোমারও ভাল লাগবে, চল। মুকুটের শরীর প্রায় অসুস্থ হয় আত্মকাল।’

‘কি হয়েছে তার?’ দেবালিশ ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করতে জয়তী বলল—

‘তুমি তো জান বাবা, তার দুর্বলতার কথা—দেবালিশ মুহুর্তের মধ্যেই মুকুটের অসুস্থতার কারণ অনুমান করতে পারল—জয়তীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। কন্যার জীবনের সংগ্রামের কথা তার কাছে নতুন নয়—তার কষ্ট দেখতে যেতে দেবালিশের আগ্রহ হয় না—

‘জয়তী, এ বাড়ীর প্রত্যেকটি ইটের সঙ্গে আমার শত স্মৃতি জড়িয়ে আছে—এখানেই আরও কিছুদিন

থাকি—বাদল ও মাদল খুব জমিয়ে রেখেছে, ওরা দাবা পাশা খেলতে শিখেছে—প্রায়ই আমার হারিয়ে দেয়। বরং মুকুট ও তুমি কিছুদিন এইখানে এসে থাকো—বিশ্রাম পাবে দুজনেই। তাছাড়া এই বাড়ীতেই তুমি মানুষ হয়েছ, মুকুট তো এ বাড়ী ভাল করে দেখেনি। আমরা তিনপুরুষ এ বাড়ীতে একত্রে আছি।’

কলকাতায় থাকতে থাকতেই জয়তী আঁবনাশের কাছ থেকে একটি লম্বা চিঠি পেল। দিল্লীর খবর বিস্তৃতভাবে দিয়েছে সে। চিঠিখানার সুখ যেন ঠিক অল্প চিঠিগুলির মত নয়। তার নিজের বিষয় অনেক লিখেছে—

‘জয়তী, তোমাদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছি যে তোমাদের অনুপস্থিতিতে তোমাদের অভাব বোধ করতে আরম্ভ করছি। এবার দিল্লীতে এসে দেখবে, আমি ambition অর্থাৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষা কথাটির অর্থ বুঝতে পেরেছি। এবার ভাবছি সংসার পেতে বসব মুকুট ঠিকই বলেছে, নইলে কাজে প্রেরণা আসে না। তোমাদের নিকটে পেরেছিলাম আমার সৌভাগ্য, এবং চিরকাল এদিনগুলির স্মৃতি আমার আনন্দ দেবে। আমি অধিক বিষয়েই উদাসীন এ কথা হয়ত সত্য, খুব একটা জোর দিয়ে কিছু করার চেষ্টা করিনি কোনদিন। বন্ধুদের সঙ্গেও মিশেছি স্বাভাবিক সহজ ভাবে—মজামত খুব জাহির করিনি কোন বিষয়। জাতিভেদ, পদমর্যাদা, বয়স, চাকরী, এ কোন কিছুই বিচার করিনি—বন্ধুত্ব মাপকাঠি আমার নেই বললেই হয়। তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বও সেইভাবেই হয়েছে। কিন্তু আমার অনেক বন্ধুদের নিয়ে তুমি কঠিন সমালোচনা করেছ—রাগ করেছ। অনিত্যকে নিয়ে আমার বীতিমত গালাগালি দিয়েছ। অনিত্যের বাবা ভারতীয় কিন্তু তার মা ফরাসী মহিলা। তিনি অনিত্যের বাবাকে ছেড়ে চলে যান এবং অনিত্যের বাবা বিদেশে বাস করতে শুরু করেন। মেয়েটিকে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিলেন তার ভাগ্য খুঁজে নেবার জন্য। আমোদবাদের হঠাৎ এক জায়গায় আলাপ হল। একটি শিল্প-ক্ষেত্রে দুজনেই কাজ করছিলাম।

সেই থেকে সে আমার খোঁজ রাখে—পেছু পেছু ঘোরে। তার জীবনের কোনদিকেই ছিব্রতা নেই—না আছে ঘর, না পেয়েছে স্নেহ ভালবাসা, না আছে আত্মসম্মান বোধ। এ রকম মেয়েদের দেখলে স্বাগতের চেয়ে ককণা হওয়াই স্বাভাবিক—কিজন সে অস্বাভাবিক ব্যবহার করে আমি বেশ খুঁসি—এবং ভূমিও এখন জানলে। এ রকম গৃহহীন, ভবঘুরে, ছন্নছাড়া মেয়ে ও পুরুষের সঙ্গে কখন কখন আলাপ হয়ে যায়—তাদের গুণ ও অনেক আছে আর মানুষও মন্দ নয়। ভাগ্য তাদের মন্দ বলে তাদের অবজ্ঞা করতে পারি না। যখন সাথে ফুলায় সাহায্য করি। ভূমি যে-সব সুযোগ পেয়েছে জীবনে, অনেকেই সে-সকল সুযোগ পায়নি, ভূমিহীণতা সহ্যভূতি বোধ করবে, সেই তো স্বাভাবিক। যাহোক, তোমরা শীঘ্র ফিরে আসবে আশা করি, আমার চল বিচার করবে না এই বিশ্বাস রাখি।

জয়ন্তী চিঠিখানা বেশ কয়েকবার পড়ল—এবং নানান অর্থ খুঁজতে লাগল। অনিভার সঙ্গে বন্ধুত্বের কৈফিয়ত দেওয়ার জন্যই এ চিঠি লেখা। অধিনাশের লক্ষ্য '৩০য়া উচিত।' মনে মনে এই কথাগুলি বলতে লাগল। চিঠিখানা জবতী

দ্বিতীয়বার পড়ল এবং ঝামেল ভেতর ঢুকিয়ে ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল। বালিশের নিচে ব্যাগ রেখে শুতে গেল। পরের দিন বাবাকে ছেড়ে যেতে হবে, তার মনে শান্তি নেই কিন্তু ফিরে তার যেতেই হবে। দেবাশিস মনকে হুঁল হতে দিল না—কন্যাকে ফেরার পথে একটুও বাধা দিল না।

উষার আলো অতি কণ্ঠভাবে উঁকি দিচ্ছে। দু-একটি পাখীর ডাক দূর থেকে শোনা গেল। দেবাশিস উঠে ঘরের বাইরে পায়চারি করতে লাগল। জয়ন্তী পায়ের খুলো নিতেই দেবাশিস আর হুঁর থাকতে পারল না। বাবার এত বিমর্ষ মুখ জয়ন্তী কোনদিন দেখেনি—নিজেও সে কাদতে কাদতে দিগন্ত রওনা দিল। শীলা খুব মশায়কো নিয়ে ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর এসে বসল। দায়িত্বপূর্ণ জীবনের মুকুটিন পরাঙালি পার হতে হতে শীলা অসীম বৈষ্য লাভ করেছে। অন্তরের গভীর প্রেমমত্তা দিয়ে আশপাশের সকলকে সে ঘিরে রাখতে চায়। অপূর্ণ এক নিঃসার্থ প্রেম তাকে নিজের জীবনের গুরুত্বের কথা সম্পূর্ণ হালিয়ে দিয়েছে। সে আর এখন ঝিষ্ট নয়, মানসিক দুঃখকষ্ট তাকে বিশেষ হুঁল করতে পারে না। রক্ত দেবাশিস ক্রমশঃ শীলার ওপরই নির্ভর করতে লাগল, শীলাও সাধুনা গেল। ক্রমশঃ



# পুণা আশ্রমে

ঐদিলীপকুমার দাস

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ডানলাভিল কটেক-এ যখন অভাব-অনটনের মধ্যে ছিলাম তখন তিনচারবার কলকাতায় কালীদাস সঙ্গে আলাপ করেছিলাম তাঁর ওখানে গিয়ে, তিনিও আসতেন এলগিন রোডে মিলন সেন-এর ওখানে আমার গান শুনতে। এতে আমি বিশেষ উৎসাহ পেতাম, কারণ, সেসময়ে আমার আর্থিক অবস্থা ঠিক শোচনীয় না হ'লেও আমার শুভাৰ্থীরা বলাবলি করতেন, আমি খুব ভুল করছি পণ্ডিচেরি আশ্রম-গুরুহীন-ছেড়ে এসে। কেবল কালীদাসই রুই হয়েছিলেন, আমাকে সঘনে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন : “মা ভৈঃ, আপনাকে কোনো সাধু বা গুরুই বাধতে পারবেন না—আপনি নিজের পথ নিজের কৈটে নিয়ে চলবেন।” কেন একথা বলেছিলেন সে-সময়ে তা বুঝতে পারিনি। কারণ, আমার (সে-সময়ে) মনে হ'ত যে, আমার জীবনের বিকাশ আর হবে না, গুরুহীন নিঃসহায় দিলীপকুমারের শেষ জীবনটা হয়ত ঠিক অনশনে না কাটতেও পারে, কিন্তু পণ্ডিচেরিতে যেমন রাজার হাশে ছিলাম সে-রকম বিশ্বাস-বলীয়ান্ ও কাব্যাসমুদ্র জীবন আর ফিরে আসবে না। কিন্তু উপায় কি? পিতৃদেবের একটি বিষয় গান প্রায়ই মনে জাগত :

জগৎ যা নিয়ে যায় একবার ফিরিয়ে দেয় না আর তায়।  
নিয়ে যায় সব ভেঙেচুরে, শুধু স্বাতিটুকু তার বেধে যায়।

তাই এই সময়ে ইন্দ্রিয়ার নানা অধ্যাত্ম উপলক্ষ—বিশেষ করে বারবার ঠাকুরের মহাপ্রসাদ লাভ—আমাকে ভরসা দিয়েছিল সবচেয়ে বেশি। তারপরে যে দু-চার-জন বন্ধুর সমর্থনে আমি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলাম তাদের পুরোধা ছিলেন শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, কালীদাস, কৃষ্ণপ্রেম ও শ্রীরামদাস।

এঁদের কথা আমি অন্তর লিপেছি। কিন্তু এঁদের কথা থেকে ঠিক কী পাথের পেয়েছি তার হয়ত হৃদিশ দিইনি স্পষ্ট করে। তাই বলি—শ্রীগোপীনাথের বাণী থেকে আমি পেতাম ভরসা, কৃষ্ণপ্রেমের বাণী থেকে—আশ্বাস, শ্রীরামদাসের কাহ থেকে আশীর্বাদ আর কালীদাস কাহ থেকে অনাবিল স্নেহের সমর্থন। এ-স্নেহ তিনি আমাকে অকুণ্ঠে দিতেন এই জন্যে যে, তিনি—বিশেষ করে ইন্দ্রিয়াকে চিনতে পেয়ে—আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি নিঃসংশয় হয়েছিলেন। কী ভাবে ছোটখাটো নিদর্শনে তিনি তাঁর স্নেহ বরাতেন একটা দৃষ্টান্ত দেই।

১৯৫৩ সালে চই জাহ্নগারী মধ্যরাতে আমরা জাপানযুগ্মী বিমানে আমেরিকা রওনা হই দিল্লী থেকে। কালীদাসকে জানিয়েছিলাম একথা। তিনি পৌজ নিয়ে জেনেছিলেন যে এ-বিমান দমদমের বিমান ঘাঁটিতে ১৪ তারিখে ভোর সাড়ে চারটেয় পৌছবে। দমদমে পৌছে বিমান থেকে নামতেই অবাচ্, গয়ং কালীদাস—সঙ্গে নালিনীদা (নালিনীকান্ত সরকার) ও শ্রীঅম্বীর সরকার (এম সি সরকার পার্লামেন্টের কর্মচার)। আমি নামতেই অভিনন্দন : “Bon voyage !” ( শুভযাত্রা ! )

ছোট ঘটনা, কিন্তু মস্ত মহিমা। ঐ শীতের রাতে দশ পনরো মাইল ডিঙিয়ে আমাদের বিমানের জন্তে অপেক্ষা করা—শুধু আমাদের অভিনন্দিত করতে—এ কেবল কালীদাস পক্ষেই সম্ভব। মনে আছে ইন্দ্রিয়া ও আমার উভয়ের চোখেই জল এসেছিল। আসবে না? কোথায় চলিছ অদূর আমেরিকায়—সাত সপ্তাহ তেহা নদীর পারে—সেখানে আমাদের কী গতি হবে কিছুই

হানি না। ভরসা কেবল কল্যাণশিখা ইন্দ্রার উজ্জল আত্মিক সমর্থন ও স্নেহনিলায় কালীদার মগ্ন গভীর আশীর্বাদ।

\* \* \* \*

বিধ ভ্রমণান্তে দেশে ফিরে কোথায় আমরা থাকব, কী করব, সবই অজানা। যেটা চোখে-দেখা-খায় সেটা শুধু এই যে, আমার সাধনা ঠাণ্ডা গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের পর বিবাদের আঁচন কুয়াশার দিকে ধাবমান—সে-কুয়াশার ওপারে কী আছে কে বলবে? এই সময়েই কালীদার ভরসা দিয়েছিলেন তাঁর শিষ্যমান্ন স্নেহময় আশ্রমে যে, আমি পাণ্ডুর ছেড়ে তুল করীন—আমার সাধনায় সাক্ষাৎ হবে অত পথে।

এর পরেই ঠাণ্ডা আঁচনকে হুঃ হুঃ দিলীপ আশ্রয় পেল ডানলাভল কুটিরে। হোক না সে-কুটির ভগ্নপ্রায়, মুষ্ণিক-অপুষ্ণাযত, বন্ধক না বধায় প্রীত পরে নিব্বন্ধধারা, দারিদ্র্য দেখাক না ভয়, আত্মবিশ্বাস উড়ক না থেকে থেকে টলমল করে—পাণ্ডুর ছেড়ে ঠিক করোঁছ না তুল করোঁছ ভেবে,—ইন্দ্রার মতন শিখা যখন মিলেছে ও ডানলাভল কুটিরে সামান্যক আশ্রয় যখন পেয়েছি তখন একান্তই হয়ে সাধনায় মন বসালে ঠিক “কল্যাণকৃত্য”—এর সত্য সত্যি জুগতি ক’তে পারে?—জপতাম আমি প্রাণপণে।

এই সময়েই এল আশ্রাস—না চাক্ষুঃকণ্ঠে গেল—এর নাম যাদু ককণা না হয় তবে ককণা কী বস্তু? আমার একটি গানে লিখেছিলাম :

“না চাক্ষুঃতে যে গো সকলি মালিন

অহেতুক প্রেমোদলে গহনে।”

কিন্তু যার অহেতুক প্রেমোদল ছিল আমার সাধনার দৃঢ় ভিত্তি সেই গুরুত্ব যে নেই আর—পায়ের নিচের মাটি উঠবে না কেপে? আমার মনে হয়—ইন্দ্রার মাধ্যমে ঠাকুর যে আমাদের বার বার মহাপ্রসাদ দিলেন, অষ্টটনের পর অষ্টটন ঘটিয়ে তাঁর ককণাকে প্রত্যক্ষ করালেন, নানা সাধুসন্ত মহাত্মার আশীর্বাদ বিতরণ করলেন—এ সবই শুধু আমার আত্ম-আবিশ্বাস সংশয়কে

দাবিয়ে প্রভাতের আলো জাগাতে—তা ছাড়া কী? শ্রীঅর্যবন্দ্য আমাকে উঠতে বসতে নানা যুক্তি ও নিকের অভিজ্ঞতার জজ্ঞার পেশ করতেনও ঠিক এই উদ্দেশ্যেই—ঠাকুরের ককণায় বিশ্বাসকে ষোলো আনা আঁকড়ে ধরতে। তাই বারবারই বলতেন আমাকে যে, যোগ আমার দধর্ম, ভগবান্ আমাকে সংসার থেকে ছিনিয়ে আনেন নৈ যোগ নামে এক মল্লভূমিতে অনাহারে শুকিয়ে মারতে।

কিন্তু যখন বিনামেঘে বজ্রধাতের মতন অকস্মাৎ তাঁর দেহান্ত হল তখন আমার বিশ্বাস কিছুতেই পুরাছিল না টাল সামলাতে। আমি কেনোদিন ভাবতে পারিনি যে, তাঁর পুণ্যযোগের আশ্রম সাক্ষর আগে তিনি এমন ঠাণ্ডা মহাপ্রয়াণ করবেন। এ-পূর্ণ সাক্ষর তিনি ননি দিতেন আত্মমানস (supramental) শাক্তর অবতরণ তথা এক নব মহাজাতির অদ্বাদয়—advent of the Superman। তাঁর ভাষায়, এ-অবতরণের ফল হবে (Savitri Book Xf) :

The man and superman shall be at one,

And all the earth become a single life.

মানব জাতিমানব সে-স্বলয়ে হবে একীভূত,

চলাচল হবে এক মহাজীবনের অদ্বাদয়।

আমার নিরাশা আস্তে জগতের গভীরায়মান দ্ব্যর্থোক্ত দেখে। আত্মমানব বা আতিমানস শাক্তর কোনো দেহাচল ও দেহতে পাওয়া যায় না—এই-ই কী শ্রীঅর্যবন্দ্যের চাক্ষুঃবংশের তপসসাক্ষর ফল? আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শ্রীঅর্যবন্দ্যের জীবনশান্তেই মানব ও আত্মমানবের রাশীবন্ধন হবে যার ফলে “দধর্ম নাঁময়া আসিবে মন্তো, দধর্ম উঠিবে ধরণী”। বহুমূল বিশ্বাসে খা খলে মাতৃষ কেমন যেন বিধ্বল হয়ে যায়। তাই আমার মনে থেকে থেকে ঘানিয়ে উঠত আত্ম-আবিশ্বাস ও সংশয় যার পরিণাম হতাশা।

এই সময়েই ইন্দ্রা এসে (কালীদার ভাষায়) আমার ভার নিল, সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে চাক্ষুঃ করলাম এক দিব্য জ্যোতি যার প্রত্যক্ষ ফলক্রান্তি তার নানা ভজন

ও বাণী—মীরার বাণী যা আমি পরে প্রকাশ করি প্রভাবশালীতে। এ-বইটি কেমন করে জানি না। রামকৃষ্ণ মিশনের মহাত্মা গামী মাধবানন্দের হাতে পড়েছিল। আমি যখন প্রথম বেলুড় মঠে যাই ইন্দিরাকে নিয়ে তখন গামীজীকে ইন্দিরার পরিচয় দিতেই তিনি বললেন: “জানি। আপনি ভাগ্যবান পুরুষ দিলীপবাবু, তাই শ্রীঅরবিন্দের মতন গুরু ও ইন্দিয়ার মতন শিষ্য পেয়েছেন।” আমি উৎকৃষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম: “ইন্দিরার সম্বন্ধে আপনি কি কিছু জানেন যে এর কথা বলছেন?” উত্তরে তিনি হেসে বললেন: “স্বপ্ন আমি নয়, আরো অনেকেই জানেন যে, ঐর মতো অসামান্য কর্মনিপুণ ও সাধনশীলার বিরল সমন্বয় হয়েছে।”

সে সময়ে তিনি বেলুড়ের অধ্যক্ষ। তাই তাঁকে বলেছিলাম আমি: “গামীজী, আপনার শ্রীমুখ থেকে এ কথা শুনে আমি গীতার ভাষায়—ঈশ্বরিম চ পুনঃ পুনঃ, ঈশ্বরিম চ মুহুর্তঃ—ডবল হর্থ।”

অতঃপর মন্দির গড়ার নানা আঁচস্তম্ভীয় যোগাযোগ হয়ে গেল—সে আর এক অঘটনের কাকিনী। তবে সে-কাকিনী বলবার এখনো সময় আসেনি। তাই শুধু বলি—১৯১৭ চমৎকার ভ্রমি পাওয়া গেল সম্ভ্রায়। এক মারাত্মক বজুর সভায়তায় মিলে গেল চমৎকার আর্কিটেক্ট ও কনট্রাক্টর।

কী আনন্দ! কী আনন্দ! মন্দির গড়া শুরু হ'ল। ডন ও রিচার্ডকে লিখে দিলাম, মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত হ'লেই তাদের ডাক দেব। তারা পরামানন্দ পরে এক বৎসর বাদে এসে কাজের হ'ল।

মন্দির গড়া শুরু হয়েছিল ১৯৫৮ সালে এপ্রিল মাসে, সমাপ্ত হ'ল ১৯৫৯ সালে জ্যৈষ্ঠার মাসে—ঠিক আমার জন্মদিনের তিনদিন আগে। গৃহপ্রবেশ করলাম ধুমধাম ক'রে ঠাকুরের বিগ্রহ পার্বতে বহন ক'রে সারা রাস্তা “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে” গাইতে গাইতে।

অতঃপর ইন্দিরার ফবমাল মত গড়া হ'ল মনোহর বেদী, মাঝখানে কৃষ্ণ, দুধারে শিব ও ভবানী।

এ-বিগ্রহ তিনটিই আমরা কাশীতে কিনেছিলাম। কিন্তু রাধারাণীর কোনো মূর্তির বিগ্রহ কোথাও পাইনি, শেষে তিনি ইন্দিরাকে দর্শন দিয়ে বললেন: “আমাকে পাবে জয়পুরে।”

কিছু জয়পুরে যাওয়া সহজ নয়—তবু না গিয়ে ক'র কী যখন রাধারাণী ডেকেছেন? প্রার্থনা করতে ব'সে গেলাম যেন জয়পুরে যেতে পারি আবলম্বে। প্রযোগও মিলল অভাবনীয় ভাবে: ১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করে। সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী থেকে পাণ্ডিত্যের ডাক এল টোলফোনে—বোডিঙতে দদেশী সঙ্গীত গাওয়াই চাই। পুনা বোডিঙতে পিতৃদেবের “ভারত আমার”, “বেদিন সুনীল জলাধি হইতে” ও “আমার জন্মভূমি” গাইলাম মূল বাংলায় ও ইন্দিরার হিন্দী অন্তর্বাদে। ইন্দিরার তিনটি দদেশী গানও গাইলাম হিন্দীতে: “১ম ভারতকেই রাখবোলে”, “নিশা উঠা কদম বটা” ও “জীবন কে পায়ী জিস লিয়ে”।

তারপর ১৯৬২ সালে সদলবলে ডন রিচার্ডকে সঙ্গে ক'রে গেলাম দিল্লী হয়ে জয়পুরে। সেখানে আমরা বারো জন অতিথি ছলাম তৎকালীন রাজাপাল শ্রীসম্পূর্ণানন্দের রাজত্ববনে। সেখানে গান গেয়ে সৈনিকদের জঙ্গে কিছু টাকা তুললাম—ইন্দিরা ডন ও রিচার্ডের সঙ্গে কোরাসে গেয়ে। প্রদেব চিন্মী ভজন ও সংস্কৃত স্তোত্র গাইতে শিখিয়েছিলাম।

কিছু সবচেয়ে বড় ভাগ্য—গান গাওয়া নয়—জয়পুরে রাধারাণীর একটি আঁত চমৎকার মমর স্মৃতি পাওয়া। রক্ষপ্রেমের কথা মনে পড়ে ব'সে: রাধারাণীকে সাতা ডাকলে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেন না।

আজও ভাবতে অবাক লাগে—কি ক'রে এ-অসম্ভব সম্ভব হ'ল—নিরাক্ষর বৈদেশিক মন্দির গ'ড়ে ওঠা, নিঃস্বের হওয়া রাজ-অতিথি! এরপরে কি সংশয় শোষণ করা চলে যে, ভাগবতী করুণা অঘটনঘটনপটীয়সী?—রটের ভাষায়:

“With men this is impossible; but with God all things are possible”—

মানুষ যা পারে না ভগবান্ পারেন ব'লেই না তিনি ভগবান্।

চৈর পরের কথা আগে ব'লে ফেললাম। স্মৃতি-চারণে এক-একটা স্মৃতির স্মৃতি আসে যেন রিলের পশমের মতন—একটু টানলে সবটুকু গুলে আসে—তখন সবটুকুর তদারক কর্তেই হয়। আমার মনে হয় এই উক্তিই সহজ—‘তো আপসে আয়। উস্কো আনে দেও’—যে নিজে খেঁচে আসছে তাকে আসতে দাঁও না। তবে এ-ভক্তিমার যেমন স্মৃতিধা আছে তেমনই মূল্যও আছে—নানা কথার পুনরাবৃত্তি হয় অজান্তে। সব সময়ে তো মনে থাকে না কখন কী বসেছি কোন্ কনটেক্টে? মরুক সে, এ-আপলাজ তো করোছ একাধিকবার—আর কেন এ-বড়বনা? ফিরে আসি ডানলাভন কটেজের প্রসঙ্গে।

১৯৫৭ সালে কেন্দ্রারি মাসের শেষ সপ্তাহে পরম ভাগবত শ্রীরামদাস তাঁর কল্যাণভা মাভাজী কক্ষাবাহকে নিয়ে আমাদের নন্দিরে ছিলেন তিন দিন। এ-তিনটি দিন যে কেমন ক'রে কেটে গেল আনন্দের বড়ে—মনে পড়ে প'ছদেবের কাঁবতা (আলেখ্য—বিগবা) :

মুখের বছর হয় যে গত একটি ছোট্ট শ্রমের মত,

হুগের বছর দুগের মত কাটে।

আবহমানকাল এইই মাত্রের আভিজাতা হয়ে এসেছে সব দেশেই। মনে হয়, জীবনদেবতার এই বাঁধর একটি উদ্দেশ্য—গভীর আনন্দকে বিবল ক'রে মহাখ করা। যা অলভ তার হুগ অভ্যাসবশে খিতিয়ে হয়ে দাঁড়ায় বড় জোর সোয়ান্ত। কিন্তু যে-আনন্দ বিবল সে খিতিয়ে কোনো স্পষ্ট ক্রীতপূরণ বহন ক'রে এনে দেয় না—মহানন্দের উপসংহার নীরসতায়, আক্ষেপে—কি পেয়েছিলেন কিন্তু হারিয়ে দেউলে হয়ে ব'সে আছি। শেলির খেদ কার না পুকের ভারে বেজে ওঠে : Rarely rarely, comest thou, spirit of delight !

শ্রীরামদাসের নন্দিত অভ্যাসের অন্তে আবার ছেয়ে এসেছিল নীরসতার ধূসর মেঘ, মনে হ'ত তখন শেলির এই চিরস্মরণীয় খেদ—বার আঁধার দেওয়া চলে :

দেখা দাও কয়বার আনন্দের হে প্রাণ-প্রতিমা !

আমাদের দৈনন্দিন নীরস অন্তরে

বহুদিন অন্তে কণতরে

বারিবে বিজলী সম বলকিয়া তোমার মহিমা

কোথায় লুকায় নাহি জানি :

পথ চেয়ে থাকি শুধু জাপ' সে-মগুর স্মৃতিখানি।

সত্যিই শ্রীরামদাস ও মাভাজী যে আবিভাব হ'তে পারে আমাদের অশ্রুভয় কুটিরে, আমরা গড়েও ভাবি নি। কিন্তু এরই তো নাম করণা—মগুর অতীত মগুর যে জাগরণে নামে এত অঘটন। হোক না সে কণতরে অসীম—আত্মিক দেখা দিয়েই মিলিয়ে যান শুধু তো অসীমারই কৃষ্ণা জাগতেই।

উচ্ছ্বাস? কিন্তু আশার অতীত করণা যখন মহাসাগর স্মৃতিতে বনকে ওঠে তখন সে-আনন্দকে উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কার মালা দিয়ে বরণ করব? ভাগবতের কাঁষও কি বলেন নি সোচ্ছ্বাসে যে, সাগরী আসেন ব'লেই তীর্থ গড়ে ওঠে? (১।১।১০)

শ্রীরামদাস সপ্তকে আমার উচ্ছ্বাসের মুখে আছে শুধু অদয়াবেগ নয়, রুতজ্ঞতা। তাঁর শুধু সায়ধ্যে নয়, তাঁর আশীর্বাদে আমার একাধিক পরম উল্লসিক হয়—তাঁর কদম্বতে সাতাই পেয়েছিলেন অধাবাদ—বিশেষ ক'রে পুণ্য। রুত কথাই যে তাঁর বলতেন অনঙ্গল—তাঁর দীক্ষার কথা, পারমার্থিক জীবনের কথা, নানা অঘটনের কথা, সপোপারি—চাঁরনামের মাভাখ্যোদ কথা। বহুবাহু তাঁর মুখে শুনোই যে, তিনি শুধু ‘শ্রীরাম জয় রাম জয় রাম’ এত গুরুমন্ত্র জপ ক'রেই পরমার্জিত লাভ ক'রে শেষে সবদেতে ঠাকুরকে দেখেছিলেন—শুধু কণতরে নয়, চিরতরে। ভাগবতে ও নানা ভাঙ্কশাস্ত্রে আশ্বাস পাও যে, কাদম্বগে শুধু চাঁরনামেই বহলাও হ'তে পারে : এ কথার মূর্ত প্রমাণ শ্রীরামদাস। এবার একটু পৌছিয়ে যেতে হবে—তাঁর আশ্রমে কি ভাবে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল বলতে।

তাঁর কয়েকটি বইয়ে তাঁর নানা দৈবী উপলব্ধির কথা প'ড়ে আমি প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে যাই তাঁর ‘আনন্দাশ্রমে’—কেবলে।

আশ্রমটির পরিবেশ অতি সুন্দর—সবুজের আশ্রন  
লেগে থাকে প্রায় সোমবৎসর—বর্ষায় তো কথাই নেই।  
আর্মি গিয়েছিলাম বর্ষার অন্তে শরৎকালে। দুটি  
পাকড়ের চূড়ার মধ্যে চাঁদ উঠল—যেন শৈলবালা  
কপালে সোনার টিপের মত—আজও হুলতে পারি নি  
সে-সৌন্দর্য। অদূরে নীল সমুদ্রের ক্ষীণ রেখা  
কালিদাসের অবিস্মরণীয় শ্লোক মনে করিয়ে দেয় :

“দূরাদয়চ্চক্রানন্তর তদ্রী তমাল-তালীবনমাজিনীলা”

দূর দিগন্তে তমালতালীর আনন্দ্য বনমাজি

তদ্রী মত শোভা পায় যেন সুনীল বসনে মাজি।

তাকে আর্মি বিজ্ঞাসা করেছিলাম প্রথমেই :

“ভগবান্কে পাওয়ায় উপায় কি?” তিনি তৎক্ষণাৎ  
উত্তর দিয়েছিলেন : “তঁার জন্মে পাগল হওয়া (to be  
Godmad)। কি বকব জানো? তুমি দুটেছ ট্রেন ধরতে  
—সময় কম; পথে একজন ডাকল—‘শোনো চো, কথা  
আছে!’ তুমি চোঁচয়ে বললে : ‘থাক, পরে হবে—  
এখন ট্রেন ধার তো আগে।’ যখন মনে হবে—আগে  
ভগবান্কে পাই তো—তারপর আর সব, অর্থাৎ তঁার  
স্থান সবার উপরে, তাকে পেলে তখনই আর সব পাওয়া  
সাপেক্ষ হবে,—তখনই তিনি বরা দেবেন।”

মনে পড়েছিল বৃষ্টিদেবের একটি অমূল্য বাণী :

“আগে ভগবানের রাজ্যে পৌছানো চাই তারপর  
আর সব কথা বস্ত্র মিলবে—পাবে ঠাই মর্ত্যলোকে।”

শ্রীরামদাস এক কথায় সম্রাসী হয়েছিলেন—  
ঠাকুরের সব শ্রুতি : “সব ছেড়ে এক কাপড়ে বোঁরয়ে  
পড়া।” গুরুময় জপ করে তাঁর মনে নেমেছিল

অক্ষুস্ত আনন্দনিবন্ধ। দিব্যোন্মাদ। ভয় কিসের?  
আমাকে বলেছিলেন তিনি দেয়াল-খাটা গীতার একটি  
বিখ্যাত শ্লোক দোঁখিয়ে : “এ যে শাক্ত্য রামের অঙ্গীকার  
—রামদাস অঙ্কুতিবার উপলব্ধি করেছে তার জীবনে।”  
(তিনি ‘আর্মি’ বলতেন না, প্রতি মানুষকে ডাকতেন  
‘রাম’, নিজেকে ‘রামদাস’) শ্লোকটি এই :

অনর্গাচ্চকৃত্যন্তো মাং যে জনা পশুপাসতে।

হেবাং নিত্য্যিভ্যুজানং যোগক্ষেমং বহামাহম্ ॥

অনন্ত মনে করে যে জীবনে আমার পান ধরায়,

চিরাদিন তার বাকি আমি তার ঠাই দিয়ে তারে পায়।

তাঁর আশ্রমে আর্মি সাত-আট দিন ছিলাম—যার  
বিবরণ অন্যত্র লিখেছি কলিয়েই। তাই এখানে শুধু  
উপক্রমণিকা হিসেবেই তাঁর উক্তরের চূষকটুকু পরিবেশণ  
করব।

ক্রমশঃ

১। “কম ভাবতে” ছাপা হয় পরে “সুখাঞ্জালি”-তে ;  
“নিশী উঠা” ও “জীবন চো পায়”—“সুখাঞ্জালি-  
প্রমোজালি”-তে। এ গান তিনটির অঙ্কবাদ ছাপা  
হয় “সুখাঞ্জালি”-তে ১৯১২ সালে।

২। ওরা দুজন প্রথম পুণায় চাঁদক্ক মন্দিরে  
এসেছিল—১৯০৮/০৯, নিউইয়র্কে ফিরে গিয়েছিল  
—২৯০৮/০৯। দ্বিতীয়বার এসেছিল ১৯১১/১২,  
ফিরে গিয়েছিল ১৯০৮/০৯। তৃতীয়বার এসে  
একবৎসরেরও বেশি ছিল ১৯০৮/০৯—থেকে  
১৯১৬/১৭।

৩। Seek ye first the kingdom of God  
and his righteousness ; and all these things  
shall be added unto you.....St. Matthew.



# মাতৃভাষায় অর্থশাস্ত্র

অবিমল সিংহ

“মানুষ শস্ত্রকার জীব (man is a tool making animal)”।

জৈব-বিবর্তন (biological evolution) এবং সমাজ বিবর্তন (social evolution)-এর পারিপ্ৰেক্ষিতে আমরা “শ্রম” (labour), মূলধন (capital), প্রকৃতিজ সম্পদ (যাহাকে অর্থশাস্ত্রে “land” আখ্যা দেওয়া হয়) ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রীয় সংজ্ঞার যথার্থ ভাষণ দিয়া, ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং বৈষায়িক সমাজ সংগঠনে ইহাদের ভূমিকা বুঝবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা দেখিয়াছি যে, হয়-সাত কোটি বৎসর পূর্বে প্রকৃতিশ্রী এক প্রেণীর চতুষ্পদ পানী ক্রমে দ্বি-বাহু শাখায়ুগে পরিণত হইয়া, পায় দুই কোটি বৎসর আগে ভূমিতে অবতরণ পূর্বক ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল হন। এবং ইহাদেরই একটি বিলম্বিত শাখা সম্ভবতঃ বিশলক্ষ বৎসর আগে পেছনের পা দুটিকে প্রধানতঃ দেহভার বহনে এবং সামনের হাত দুটিকে প্রধানতঃ আহরণ, শিকার, আহার্য্য ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত রাখেন। ক্রমে তাঁহারা ত্রুপ পদযয়ের উপর ভর করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে, হাঁটিতে এবং ক্রত দৌড়াইতেও সমর্থ হন। আর দেহভার বহনের দায়িত্ব মুক্ত বাহুদ্বয় কাঠখণ্ড প্রস্তরাদি দেহাতিরিজ প্রত্যঙ্গের (extra-corporeal limbs) ব্যবহারে উত্তরোত্তর দক্ষতা এবং ক্ষিপ্ৰতা অর্জন করে। ক্রমে প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে লভ্য কাঠখণ্ড প্রস্তরাদির স্থলে ঐগুলিকে সচেতন ভাবে প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত করিয়া কৃত্রিম অস্ত্র প্রস্তুত শুরু হইল। দলবদ্ধ ভাবে বাঁচিয়া থাকার সংগ্রামে পরস্পর ভাষাবিনিময়ের অপরিহার্য্য ভাষাগে বাঁচন শক্তিও ধ্বনিময় (articulate speech) ভাষাগও উদ্ভব হইল।

ইহা সহজেই অহুম্যেয় যে, সময়কে যেখানে লক্ষ

অথবা কোটি বৎসরের অল্প প্রকাশ করিতে হয় সেখানে কোন ঘটনার প্রকৃত আত্মীয় নিদারণ সহজ নহে, এবং সার্থকও নহে। কারণ আমাদের নিকট একলক্ষ অথবা দশলক্ষ বৎসর সমান কথাটি। যে প্রকৃতিশ্রী চতুষ্পদ প্রাণীর শাখা হইতে ক্রমে মানুষের উদ্ভব, সেই মূল শাখাটিকেই সম্ভবতঃ জীব-বিজ্ঞানীরা “প্রাইমেটস্” (Primates) সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। তার পরবর্ত্তী লম্বায়ুক্রমিক শাখাগুলিকে যথাক্রমে “দ্বিপদ প্রাণী” (Anthropoidea), “মনুষ্যরূপী প্রাণী” (Hominoidea), “দেহায়মান (অর্থাৎ দেহের মত ঝাড়ী) দ্বিপদ” (Homo erectus), “বুদ্ধিমান দ্বিপদ” (Homo sapiens), “যথার্থ বুদ্ধিমান মনুষ্য” (Homo sapiens sapiens) ইত্যাদি সংজ্ঞায় ভূষিত করা হয়। এই ক্রমবিকাশের ঠিক কোন পর্ষায়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা “মানুষ” পদবাচ্য হইতে পারেন, তাহা নিশ্চিত ভাবে নির্দেশ করা দুঃকর। তবে অস্বদেশ শাস্ত্রীর আবেশিকার পটনীতিজ্ঞ (diplomat), বিজ্ঞানী (scientist)-এর আবিষ্কার-এর সন্নিহিত যাহার নাম জড়িত, উদ্ভাবক (inventor), এবং চিন্তানায়ক বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন (Benjamin Franklin)-এর একটি আপ্রবাক্যকে কাল মার্গে মানুষের সংজ্ঞারূপে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহা এই যে “মানুষ শস্ত্রকার জীব” (man is a tool making animal)। অর্থাৎ ক্রমবিকাশের যে পর্ষায়ে আঁসিয়া আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে লভ্য কাঠখণ্ড প্রস্তরাদির পরিবর্তে ঐগুলিকে সচেতন ভাবে প্রয়োজনানুসারে রূপান্তরিত করিয়া কৃত্রিম অস্ত্র প্রস্তুত এবং ব্যবহার শুরু করিলেন ঠিক সেই পর্ষায়েই তাঁহারা “মনুষ্য” লাভ করিলেন। কিন্তু মুশকিল এই যে, ঐ বিশেষ পর্ষায়টীও সম্ভবতঃ লক্ষ লক্ষ বৎসরের ব্যাপার



কারণ, অস্ত্রাবধি পাঁচ অথবা দশ লক্ষাধিক বৎসর পূর্ন হইতেই মনুষ্যরূপী প্রাণীরা প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে লভ্য বস্তুকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন বলিয়া অনুমান করা হয়। এবং ইহারই কোন এক পর্যায়ে তাঁহারা সচেতন ভাবে ঐ বস্তুগুলিকে প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তিত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তৎপূর্বেই তাঁহারা শুধুমাত্র পদদ্বয়ের উপর ভর করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন একপ মনে করার কারণ নাই। অর্থাৎ অস্ত্র ব্যবহার, এমন কি অস্ত্র প্রস্তুত পক্ষও, “দণ্ডায়মান দ্বিপদ” (Homo erectus) অথবা “দণ্ড” পক্ষের আগে ঘটিয়া থাকিতে পারে। তবে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পর হইতেই মনুষ্যরূপী প্রাণীদের ক্রম মস্তিষ্কের প্রসার ঘটিতে থাকে এবং প্রস্তুত ব্যাপারে একটা সচেতন অভিজ্ঞতা লক্ষ্য ধারা প্রবর্তিত হয় এবং ক্রমে তাঁহারা “বুদ্ধিমান দ্বিপদ” (Homo sapiens) তথা “বুদ্ধিমান নর” (Homo sapiens sapiens)-এ পরিণত হন।

ন্যূনাবধি দেড়লক্ষ বৎসর পূর্বের কৃত্রিম অস্ত্র ব্যবহারকারী যে সব আদি মানুষের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদিগকে গুতায়-এর দলদারীর জন্ত অগুনী লুপ্ত-আঁস-দস্তী ব্যাঘ্র (sabre toothed tiger), চিতাবাঘ, হায়না (hyaena) ইত্যাদি হিংস্র স্বাপদ-এর সহিত সংগ্রাম করিতে হইত। তাঁহাদের অসুবিধিত হুয়ায় আভিশয় সাধারণ অথচ কৃত্রিম প্রস্তরাস্ত্রের সহিত কস্তী, অশ্ব, গজার, মাহিষ অথবা বাইসন (bison), উষ্ট্র, বরাহ, মেঘ, চারপাঁদীর যে সব অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা কোথাও বা অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ, কোথাও বা অগ্নিতে দগ্ধ। ইহা হইতে তাঁহাদের সমাজবদ্ধ শিকারী জীবন এবং অস্ত্রের ব্যবহারের প্রমাণ ত্রিমিলেই, অধিকন্তু তাঁহারা যে অগ্নির ব্যবহারও আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহা জানা যায়। এই অগ্নির আবিষ্কার শুধু যে অভ্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার তাহাই নহে, ইহাই আদিমানবের সপ্তপ্রথম যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। অগ্নিদগ্ধ মাংস সুস্বাদু এবং অসুপাচ্যও বটে। প্রজাতি

অগ্নির সাহায্যে একদিকে তীব্র শীত, অপর্দাদিকে উষ্ণ স্বাপদ, এই উভয়বিধ শত্রুর আক্রমণ হইতেই আত্মরক্ষা করা যায়। কল্পনা করা যায় যে, প্রথমে তাঁহারা খাণ্ডবদাহনরূপ নৈসর্গিক দাবামল হইতে পলায়মান গীত ব্রহ্ম স্বাপদাদি নিরীক্ষণ করিয়া, এবং দাবায়দগ্ধ পশুদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া, অগ্নির এই বিচিত্র গুণাবলী আবিষ্কার করেন। প্রথমে সম্ভবতঃ দাবানল হইতেই অগ্নি আহরণ পূরক প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডে তাহা জিয়াইয়া রাখিতেন। ইহাতে অস্ত্রের ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ “অস্ত্র পক্ষের” আগেই “অগ্নি পক্ষ” সম্ভব। পরে অবশুই অস্ত্রাদি প্রস্তুতকালে প্রস্তরের সাহিত প্রস্তরের আঘাতে উদ্ধৃত স্মৃলিপ্ত হইতে, এবং ক্রমে অগ্নি-প্রস্তর অথবা অগ্নি-কাষ্ঠ (অরাণ) হইতে অগ্নির উৎপাদন কৌশল আয়ত্ত হইয়া থাকিবে। এইরূপে “আগ্নেয়াস্ত্রে” বলীয়ান আদিমানব পরবর্তী একলক্ষ বৎসরে অতিক্রান্ত উন্নতি লাভ করেন। ইতিমধ্যে পৃথিবীর বুকে গত দশলক্ষ বৎসরে পর পর প্রাদুর্ভূত একাধিক ভূযায়গের (glacial age) সন্মিলন ভূযায় যুগটির আদিভাব ঘটে। অর্থাৎ মেরু অঞ্চলের এবং ভূযায়শীষ হিমালয়াদি পক্ষের ভূযায় ন্যাসিয়া আসিয়া পৃথিবীর বুকে বিস্তারিত অঞ্চল আবৃত করিয়া ফেলে। অগ্নির সাহায্যে নিরাবরণ আদিমানব সেই হিমশীতল ভূযায় যুগও অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর বুকে বিস্তারিত অঞ্চলে ছাড়াইয়া পড়েন। তারপর সেই সন্মিলন ভূযায় যুগের অপসৃতির শুরুতে অর্থাৎ প্রায় চার্লস হাকার বছর আগে আমাদের, অর্থাৎ বর্তমান মানুষের, নিকটতম পূরপূরক “বুদ্ধিমান নর” (Homo sapiens sapiens) এর আদিভাব ঘটে। ইহারা উত্তরোত্তর উন্নততর অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে শিখেন। অস্ত্রাদি এবং মার্কিত ধরণের প্রস্তরাস্ত্র ছাড়াও তাঁহারা অস্থি, যুগ-শূল, গজদন্ত ইত্যাদি নানাবিধ উপকরণে প্রস্তুত বশীকলক, বড়িশ (বড়শী), ধনুস, ভাঁম অথবা বৃহৎকায় মংগ্যাদি শিকারের রজ্জু সংলগ্ন বর্শা (harpoon), চর্ম্মানির্ঘত পরিধেয়, সেলাইয়ের সীবনী, এমন কি গজদন্তের

কার্যকার্যময় অজ্ঞাতবশও প্রস্তুত করিতেন। অপস্রম্যমান ভূমির যুগে প্রকৃতির বদান্যতায় সহজলভ্য শিকারের বিশেষ প্রাচুর্য্য ঘটে। ফলে আমাদের গুহাশ্রয়ী নিমাদ পূর্বপুরুষেরা “শুণ্ড প্রাণধারণের মান্ন” হইতে আংশিক মুক্তি লাভ করিয়া “লালিতকলা” চর্চা করিবারও অবকাশ পাইতেন। প্রায় বিংশ শতাব্দীর বংশের পক্ষে প্রস্তর গায়ে অথবা গুহাপ্রাচীরে আঁকিত বিষয়কর চিত্রাবলী আঁকিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তারপর অস্ত্রাধি পীচ হইতে দলশিকার বংশের পক্ষে আমাদের এইসব নিমাদ পূর্বপুরুষেরা ভূমিকষণ, বস্ত্রবয়ন, মৃৎপাত্র নিৰ্ম্মাণ শিল্প ইত্যাদি কৌশল আয়ত্ত করিয়া যাবাবর বাসগাওঁ পরিভাগ পুষক একত্ব স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, এবং জনপদ নগরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন করেন। ইহা আমাদের মতভারত অথবা রামায়ণ-এর যুগের অর্থাৎ দ্বাপর অথবা ত্রেতাযুগের বেশ কিছুকাল আগেকার কথা। অর্থাৎ সভ্যযুগের কথা।

এই প্রাগৈতিহাসিক সমাজ বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পক্ষে শ্রম (labour), মূলধন (capital), উৎপাদন (production) ইত্যাদি সংজ্ঞার প্রকৃঃ অর্থশাস্ত্রীয় ভাষণার্থে উপলব্ধি অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে। জীবজগতে প্রত্যেক প্রাণীকেই বাঁচিয়া থাকার জন্য আয়াস করিতে হয়। কারণ বাঁচিয়া থাকা তথা প্রজনন মাধ্যমে বংশপরম্পরায় জীবনের গতি অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা জীবনের ধর্ম্ম। বার্নাড শ-এর নিম্নলিখিত নাটক “অস্ত্র এবং মানুষ” (Arms and the Man)-এর মুদ্রক্রেত হইতে পলায়মান লায়ক বলিতেছেন, “মানুষের কর্তব্য যতদিন সম্ভব বাঁচিয়া থাকা” (It is our duty to live as long as we can)। এইরূপ সচেতন “কর্তব্য” বোধ বর্জিত হইলেও সচ্ছাত্ত প্রবণতা হইতেই প্রত্যেক প্রাণীকেই বাঁচিয়া থাকার প্রয়াস করিতে হয়। এবং সময় সময় এই প্রয়াস প্রাণান্তকরও হইয়া থাকে। প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে জাত ফলমূল্যাদি আহরণ, যুগ্মে পূরণ, গলাধঃকরণ, অন্ত্র জীবকে ভক্ষণার্থে তড়ন, অন্ত্র জীব দ্বারা ত্যাগিত হইয়া পলায়ন, এইসব প্রকৃতি

নির্দিষ্ট বাঁচিয়া থাকার স্বাভাবিক প্রয়াস অর্থশাস্ত্রীয় “শ্রম”-এর পর্য্যায়ে পড়িতে পারে না। তবে “মানুষ অস্ত্রকারক প্রাণী,” মানুষের এই সংজ্ঞাটি মানিয়া লইলে “শ্রম,” “মূলধন,” “উৎপাদন,” “প্রকৃতিজ সম্পদ (land)” ইত্যাদি অর্থশাস্ত্রীয় বস্তুনের মোটামুটিভাবে অনেকটা কিনারা করা যায়। যেমন ধরা যায় যে, প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে লভ্য কাষ্ঠখণ্ড প্রস্তরাদিকে অস্ত্ররূপে ব্যবহারের পূর্ববর্ত্তে ইন্ডলিকে সচেতন ভাবে প্রয়োজনানুসারে রূপান্তরিত অথবা বিকৃত করিয়া কৃত্রিম “অস্ত্র প্রস্তরের কাজকে আনিয়া “শ্রম” আখ্যা দিতে পারি। এখানে “সচেতন ভাবে” কথাগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কারণ প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে লভ্য বস্তুতে নিজের প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তন সাধনের কাজও সম্বন্ধেই শ্রম বলিয়া বিবোধিত হইতে পারে না। পাঁথরা প্রকৃতি হইতে বড়কুটা সংগ্রহ করিয়া বাসা বাঁধে। পিপীলিকা, ময়মাককা প্রকৃতি কাটিপতল বিষয়কর বাসগৃহাদি নিৰ্ম্মাণ করে। তবে এই সব কাজ “সচেতন” প্রয়াস নহে, ইহা সচ্ছাত্ত গতির তড়নায় যত্নবৎ সম্পাদিত। আবার “সচেতন প্রয়াস”ও সম্বন্ধেই শ্রম-পদবাচ্য হইবে না। প্রথমতঃ ইহা সখের কাজ (labour of love) হইলে চলিবে না। ইহা প্রয়োজন সাধক হওয়া চাই। এবং দ্বিতীয়তঃ ইহা “পুষকক্লান্ত” হওয়া চাই। মাকল বলেন যে বর্ত্তমানে আমরা শ্রমকে একটা সম্পূর্ণ মনুষ্যমূলভ ব্যাপার বলিয়া মনে করি। উর্গনাভের কাষ্যাবলী তত্ত্ববায়ের কাজের সমগোত্রীয় এবং মৌমাছির মণ্ডক নিৰ্ম্মাণ কৌশল অনেক বড় বড় স্থপতিকেও লক্ষ্য দেয়। তবুও শ্রেষ্ঠতম মাককা এবং নিকৃষ্টতম স্থপতির পার্থক্য এই যে, স্থপতি বাস্তব গৃহনিৰ্ম্মাণের পক্ষেই কল্পনায় তাকা নিৰ্ম্মাণ করিয়া ফেলেন। অতএব মাকল-এর মতে পুষকক্লান্ত ভাবে প্রয়োজনসাধক সচেতন প্রয়াসকেই “শ্রম” আখ্যা দেওয়া যায়।

অতএব দেখা যায় যে, এই “শ্রম” সম্পূর্ণভাবে মনুষ্যোত্তর প্রাণীর এলাকা বহির্ভূত; এবং মানুষের

ক্ষেত্রেও ইহা বিবর্তনের পথে বৃদ্ধির ক্রমবিকাশের একটা বিশেষ পরিণত অবস্থায়ই প্রযোজ্য। শুধু তাহাই নহে। এঙ্গেলস-এর মতে শ্রম হইতেই মানুষের উদ্ভব (labour created man himself)। অর্থাৎ জীবনধারণের অথবা উন্নততর জীবন সাপনের সচেতন প্রচেষ্টা হইতেই মানুষের দৈহিক, মানসিক, বুদ্ধিরাত্তিক যাবতীয় উন্নতি সাধিত হইয়া মানুষ অগাধ প্রাণী অপেক্ষা একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মার্কস এবং এঙ্গেলস-এর বস্তুবাদী (materialist) দৃষ্টিতে মানুষের মানসিক তথা বুদ্ধিরাত্তিক উন্নতির ভিত্তিই হইল মান্তকের অর্থাৎ মান্তকধারের অভ্যন্তরস্থ “মগজ” অথবা “মিথ্র” নামক বস্তুটির প্রসার। এবং মানুষের ক্ষেত্রে এই মান্তকের প্রসার নেহাৎই একটা “জৈব” বিবর্তনের ব্যাপার নহে। ইহা সম্পূর্ণভাবে “মানবীয়” বিবর্তন। অর্থাৎ ইহা অগাধ প্রাণীর মত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া বাঁচিয়া থাকার নেহাৎই সহজাত জৈব প্রবণতা সজাত একটা অন্ধ প্রচেষ্টার ফল নহে। ইহা জীবন-সংগ্রামে একটা সচেতন প্রচেষ্টা সজাত বুদ্ধি-বিকাশের অবশ্যস্বাবী পরিণতি। আবার ইহা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল নহে। সমাজবদ্ধ জীবনের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উত্তরোত্তর ধারাবাহিক অগ্রগতির সাক্ষ্যমান ফল। অতএব এঙ্গেলস মানুষের শ্রমকে সমাজ ভিত্তিক শ্রম (social labour) আখ্যা দিয়া থাকেন। কারণ, আমরা দাঁখিয়াছি যে শিকার এবং

আস্বরক্ষার প্রয়োজনে আদিমানবকে দলবদ্ধ ভাবে বাস করিতে হইত। এই অবস্থায় জীবনসংগ্রামের নবনব আবিষ্কৃত নিত্যনূতন কৌশল পরস্পরের নিকট শিক্ষণীয় এবং পুরুষ-পরস্পরায় স্থানীয় সচেতন ভাবে অতিশয় সরল অস্ত্রাদির ব্যবহার অথবা নিশ্চাপেও হস্ত-চক্ষু-মান্তকাদির সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। অতএব হস্ত কৌশলের উন্নতির সাহিত মান্তকের উন্নতিও ওতপ্রোত। আবার এই উন্নতি ধারাবাহিক এবং অব্যাহত রাখিতে পরস্পরের ভাব-বিনিময় প্রয়োজন। ফলে ভাষার উদ্ভব। আবার এই ভাষার সাহিত মান্তকের অর্থাৎ কল্পনাশক্তির সম্পর্কও আবিষ্কৃত। কারণ, ভাষার মাধ্যমে কোন বিষয় প্রকাশ করিতে হইলে ঐ বিষয়টির একটা চিত্র বস্তু এবং শ্রোতা-উভয়েরই কল্পনার চোখে উদ্ভিত হওয়া চাই। এবং এই কল্পনা-শক্তি অর্থাৎ চক্ষুর সম্মুখে অনুপস্থিত অত্যন্ত বর্তমান অথবা ভাবব্যয় বিষয়ের চিত্র মানসপটে আঁকিত করার শক্তি একমাত্র মানুষের মধ্যেই দেখা যায় এবং ইহাভেই মানুষ অগাধ প্রাণী অপেক্ষা স্বতন্ত্র। অতএব এঙ্গেলস বলেন যে, প্রথম শ্রম এবং তৎপরে শ্রমের সাহিত ঋতুত ধ্যানময় ভাষা,—এই দুইটিই মূল উদ্দীপক, যাহার প্রভাবে বিলাসুল শাখামূগের মান্তক মানুষের মান্তকে পরিণত হইয়াছে (first labour, after it, and then with it, articulate speech—these were the two most essential stimuli under the influence of which the brain of the ape gradually changed into that of man)।



## ২৫৬ পঠার পরবর্তী অংশ

সাধারণ প্রকৃতিটি কেমন ভাল রূপে তাঁর জানা ছিল। রচনাকে সুন্দর ও সুন্দর করতে হ'লে এটি জানা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর লেখার স্থানে স্থানে দ্ব্যর্থবোধকতা যে নেই তা নয়, তবে সে-সকল দ্ব্যর্থবোধকতা আলোচ্য বিষয়ের প্রকৃতির জন্যে। স্থানবিশেষে তিনি সংস্কৃত শব্দ ও সংস্কৃত বঙ্গশব্দ (idiom) ব্যবহার করেও রচনাকে একটি শব্দ করেছেন কিন্তু সংস্কৃত তাঁর জ্ঞানসাপেক্ষেই সঠিক। এর কোনকিছর ভুলে গিয়ে তিনি লিখেছেন :—

বেদান্তশাস্ত্রের ভাষ্যেই বিবরণ করিতে সংস্কৃতের শব্দ সকল স্থানে স্থানে দৃষ্ট্য গিয়াছে তাঁহার দোষ যাহার, তাহাঃ এবং সংস্কৃত ভাষ্যের নীতিও লক্ষ্যের নীতি কারণ বিচার যোগ্য বাক্য বিনা সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কেবল প্রদেশীয় ভাষাতেই বিবরণ করা যায় না। (জ ৭)

রামমোহনের রচনার স্থানে স্থানে কাঠিন্যতা থাকলেও তাঁর দ্বারা বাংলা সাহিত্যের উন্নতিসাধনের কাজ বাতিল হয়নি। রায় ও সমাজ সাধারণের যে প্রবল আন্দোলন তিনি দেশহিত্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর ফলে নব পদার্থ গল্প রচনা এক নতুন গীতবেগ পেয়েছিল এবং ভারত ফলে ঘটিল দেশীয় লোকদের দ্বারা সংবাদপত্র প্রকাশ। এর সংবাদপত্রও বাংলা গল্পকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করবার কম সাহায্য করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংবাদপত্রের জন্যে বাংলা সাহিত্যের দুর্দশা ঘটেছিল যথেষ্ট। এত শোচনীয় অবস্থার তাত্র থেকে যিনি বাংলা সাহিত্যকে রক্ষা করলেন তিনি রামমোহনের পরম অনুরাগী ও শিষ্যকল্প দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৬৩ সালে 'জগদ্বোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করে দেবেন্দ্রনাথ বাংলা গল্প সাহিত্যের দুনিয়ায় দৃঢ়তর ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কেবল ধর্মমতাদিতে নয়, রচনাপদ্ধতিতেও দেবেন্দ্রনাথের উপর রামমোহনের প্রভাব বিশেষ ভাবে বর্তমান। দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব তত্ত্ববোধিনীর প্রথম সম্পাদক (১৮৪০-১৮৪৪) অক্ষয়কুমার দত্তের উপর পড়েছিল আর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও এই প্রভাবের একান্ত বাইরে ছিলেন না। বর্তমান প্রবন্ধের সন্ন পরিসরে সে-সকলের আলোচনা সম্ভব নয়। বারাস্তরে সেটিকে দৃষ্টি দেওয়া বাবে কিন্তু তাঁর আগেই একথা বলা যেতে পারে যে, রামমোহনের প্রবর্তিত গল্পের ধারাকে আশ্রয় করেই আধুনিক বাংলার সমাজনবাবোধ্য গল্প রীতি গড়ে উঠেছে। \*

১। তিনবার তিন লেখকের দ্বারা অন্তর্বাদিত।

২। এটি গল্প সংস্কৃত 'শুকসমুদ্র' নামক গল্পগুচ্ছ থেকে সংকলিত।

৩। এ-রাজ্য রামমোহন রায়ের সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থাবলী, পাণ্ডিনী কায়ালায় (১৯১৭) প্রকাশিত।

৪। এটি গ্রন্থ রামমোহন রায়ের বেদান্ত প্রস্তাব উত্তরে লিখিত। ১৮৪৬-৪৭ সালে পাঁচটি দার্শনিক আলোচনায় বদলে লোকক তর্কযুক্তি দ্বারা একেশ্বরবাদ খণ্ডনের প্রয়াস এবং রামমোহন রায়ের প্রাক্ত বাক্য বহু ভ্রান্ত আছে।

৫। এটি গল্পও 'বেদান্তচালিকা'র অন্তর্গত উদ্দেশ্য এবং প্রণালীতে লিখিত।

৬। রচনাটির সম্পূর্ণ নাম 'পাদারি ও শিষ্য সংদর্শন'। এর প্রাতিষ্ঠান পাদারি ও তাঁহার তিনজন চীনদেশস্থ শিষ্য তাঁহারদের পরস্পর কথোপকথন।

৭। স্থানভায়ে এর রচনাটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা গেল না। আর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলে সমগ্র রচনার সম্বন্ধে যথার্থ ধারণার ব্যাঘাত হতে পারে ভেবে তাতেও নিন্দিত থাকতে চল।

৮। পরশ্রীকান্তরতা।

৯। 'বেদান্তচালিকা' এবং 'পাষওপাড়ন' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধারে শ্রীযুক্ত প্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৭১।

# যুগগুরু রামমোহন

স্বাধীভাষ্যমোহন সেন

বাল্যকালে দৌৰ্ভাগ্য কালীয়া সৰ্কাৰ গলিৰ মধ্য বন্ধ প্ৰাণ গলিৰ মুক্ত তীৰে আসিয়া মুক্তিৰ আনন্দ অহুতব কৰে। গল্প যে মুক্তিদায়িনী তাহা কালীয়া গলিতে বন্ধ প্ৰাণী অনায়াসেই অহুতব কৰে। সনাতন হিন্দু সমাজেৰ অগণিত বিধিব্যবহাৰ আচাৰে বিচাৰে নিৰ্যাসিত হৃদয় মন প্ৰাণ তেমান ভাৰতীয় সাধক ও ভক্তগণেৰ মুক্তিদায়িনী সাধনাধাৰাৰ ও সাধকবাণীৰ মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰে আসিয়া অসংখ্য বন্ধনেৰ মধ্য মুক্তিৰ অমৃতকে আশ্বাদন কৰে। হৃদয় মনেৰ এই মুক্তিগল্প যদি ভাৰতে প্ৰবহমানা না থাকিত তৰে ভাৰতেৰ চিত্ত এতাদৰে শুকাইয়া নাৱিয়া যাইত।

সৌভাগ্য ক্ৰমে ভাৰতেৰ মধ্যযুগেৰ সাধক ও ভক্তেৰা সবাই প্ৰেমেৰ ও মিলনেৰ মুক্তিবাণী বহন কৰিয়া আনিয়াছেন। আচাৰ-বিচাৰেৰ পৃথক্ৰেৰ জয়গান কেইকৈ কৰেন নাওঁ, কৰা সম্ভবও নয়। কাৰণ, ইহাদেৰ অনেকেই আত্ম নীচ, এমন কি অস্পৃশ্য অন্তাজ কুলে জন্মিয়াছেন, এবং দীন হীন মুসলমান বংশে জন্মগ্ৰহণ কৰিয়াছেন এমন ভক্তেৰ সংখ্যাও কম নহে। তাৰণেৰে ইহাদেৰ প্ৰায় সকলেই নিরক্ষৰ, কাজেই শাস্ত্ৰেৰ, বেদেৰ ও সনাতন আচাৰ নিয়মেৰ যশোপান কৰাৰ সম্ভাবনা ইহাদেৰ নাই।

অথচ ইহাদেৰ অধ্যাত্ম দৃষ্টি ও জ্ঞান যে কত গভীৰ ও মথুৰ তাহা শুধু কথাৰ দ্বাৰা বৰ্ণনা কৰিয়া বুজান যায় না। আকাশ হইতে যখন সৃষ্টি হয় তখন তাহাৰ অল্প অংশই ভূমিৰ উপৰিস্থিত নদী নালায় ধাৱাৰূপে বাহিয়া যায় বা হৃদয়গোবৰেৰ জলাশয়ে বন্ধ হইয়া থাকে। বৃষ্টিৰ অধিকাংশই ভূমিৰ নীচে অদৃশ্য গভীৰতাৰ মধ্য নামিয়া গিয়া গোপনে সঞ্চিত হইয়া থাকে। সেই জলেৰ জলই ভূমিত পানপ বনস্পতি তাহাদেৰ মূলকে

গভীৰে প্ৰেৰণ কৰে, সন্ধানী মানব কৃপাৰাল খুঁড়িয়া সেই জলেই তৃষ্ণা নিৰ্বাৰণ ও কৃত্তিকৰ্ম কৰে ও এই অদৃশ্য ধাৱাটো নিৰ্বাধেৰ হৃদনে নহনদীৰ ধাৱাকে কোনমতে জিয়াইয়া থাকে। ঠিক তেমান মানব সমাজে যে জ্ঞানেৰ ধাৱাৰ সৃষ্টি হয় তাহাৰ অল্প অংশই উচ্চতলেৰ মানবেৰ মধ্য দৃশ্যভাবে থাকে, তাহাই শাস্ত্ৰ বেদপুৰাণে ও দৰ্শনাদিৰ নানা বড় বড় শব্দাবলীৰ মধ্য আপনাকে নানাভাবে প্ৰকটিত কৰে। কিন্তু সেই জ্ঞানেৰ অধিকাংশই মানবেৰ ‘গভীৰ-চেতন’ লোকে (subconscious) নামিয়া যায় এবং সেখানে থাকিয়া মানব-সমাজেৰ প্ৰাণ নানা ভাবে রক্ষা কৰে। যদি কেই সন্ধান কৰিয়া সেই গভীৰতায় নামিত পাবে তৰে সেই জলেৰ মাথুৰ্য্যে ও প্ৰাণপ্ৰদ প্ৰাচুৰ্য্যে সে বিশ্বয়াপন্ন হইয়া পড়ে।

যখন আমাৰ বয়স আত্ম অল্প তখন একান্ত সৌভাগ্যবশে এবং দুই একটি ভক্তজনেৰ সঙ্গপুৰ্ণে আমি এই ভক্ত ও সাধকদেৰ বাণীৰ সঙ্গে পৰিচিত হইয়া বাচিয়া গিয়াছিলাম। ভাৰতেৰ মধ্যযুগকে অনেকে না জানিয়া একটি অন্ধযুগ বনে কৰেন। কিন্তু ভক্তসাধকদেৰ বাণীৰ সঙ্গে ইহাদেৰ পৰিচয় আছে তাহাৰা জামেন, এই যুগেৰ ঐশ্বৰ্য্য অপৰিমেয়। তখন উত্তৰ-ভাৰতে ৰামানন্দ ও তাঁৰ পৰবৰ্ত্তী সন্তগণ ভাৰতেৰ সাধনাৰ আকাশকে পূৰ্ণ কৰিয়া গাঁথিয়াছেন। এই সন্তদেৰ বাণী হইতেই আত্ম আমি কিছু আলোচনা কৰিব। তাহা ছাড়া পাঞ্জাবে, সিন্ধে তখন হিন্দু ও মুসলমান মুফীদেৰ সাধনায়, বাঙলাৰ বাউল ও বৈষ্ণবেৰ সাধনায়, দক্ষিণে শৈব ও বৈষ্ণব ও অসাম্প্ৰদায়িক নানা ভক্তজনেৰ সাধনায় ভাৰত সেই সময় ঐশ্বৰ্য্যময়।

বৌদ্ধ ও জৈন সাধনা যখন ভাৰতে হুঁপল হইয়া আসিয়াছে, যখন জীবন্ত ধৰ্ম কেবল দাৰ্শনিক চুলচেৰা

তর্কে বিতর্কে দাঁড়াইয়াছে, তখন ভারতের ক্ষমতায় ধর্মভ্রষ্টা মিটিয়াছে এই সব কুলমানহীন সাধকদের সাধনায় ও বাণীতে। পাপিত ও উচ্চ জেলার লোকেরা যে সব অসাধ্য সাধনা করিতে সাহসী, তন নাহি ইহারা তাহতে ভীত তন নাহি। তাই হিন্দু-মুসলমানের মিলন, সাধনার সঙ্গে সাধনার মিলন, সকল পন্থ ও ধর্মসাধনার মৈত্রীর চেষ্টা অসাধ্য সাধন তর্কালেও সে-সব কথা বালিতে ইহারা একটুও সম্বুচিত হন নাহি।

সাধকদের মধ্যে কাঁচক আছে যে, উত্তর-ভারতে মধ্যযুগে ভীষণভাবে নিষ্প্রভ হওয়া আসিতোঁছিল এমন সময় হবিড় দেশে উত্তর কর্ত্তে কোন কালে সমানীত ভক্তি প্রবল হওয়া উচিতোঁছিল। সেই ভীষণ রামানন্দ আবার উত্তরে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু তাকে সকলদিকে ছাড়িয়াছিলেন ভক্ত কবীর। ভক্তদের মধ্যে প্রাপ্ত সেই বাণীতে

‘ভীষণ হাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ,

প্রণতি কিয়ে কবীর নৈন সান্তলীল নোথত্বে।

কাশীর আচার-বিচার এবং প্রাচীন সাম্প্রদায়িকতাবদ্ধ জীবনে আমার পক্ষে এই ভক্ত-বাণীভীলটি ছিল যথার্থ মুক্তির ক্ষেত্র। বড় ভক্ত্যর পর যখন রাজা রামমোহন রায়ের নানা ক্ষেত্রের লেখার সঙ্গে পরিচিত হইলাম তখন তাকে ভিতরের ভাবটা আমার একান্ত পরিচিত মনে হইল। সেই সব সন্ত সাধকদের ভাবের সঙ্গে রাজার ভাবের কোন বিবর্তন দেখলাম না—মনে হইল রাজার মধ্যে তাঁর বহুমনে যুগের মনীষজনৌচু দৃষ্টির মধ্যে যেন ভারতের প্রাচীন মধ্যযুগের চমৎকার সুসঙ্গত সাধকতা (fulfilment)।

ভারতে যোগই হইল বড় কথা। পাণ্ডিত্য জানে নানাবিধ বস্তকে ও তাদের ভিন্নতাকে। তাহাকেই মধ্য যুগের কোন কোন ভক্ত ‘সংখ্যা’ বুলিয়াছেন। অনেক-বিধ ভবের অনেকটা সরুপলক্ষণ পরিচয়ই এই সংখ্যা বা সাংখ্য। সেই অনেককে একের মধ্যে সুসঙ্গত করিয়া দেখাই হইল যোগ। সংখ্যা হইতে যোগ ইহাদের মতে

অনেক গভীর কথা। তাই ভক্ত রজ্জব (আকবরের সমসাময়িক যজ্ঞপুজানার সাধক) বলেন—

সংখ্যা জানে সয়ান সো জানু।

জোগী জুক্তা শ্বর অধিক মানু ॥

ভেদ বিভেদ মিলে তত কোঙ্গি।

পরম পুণীত তাঁরখ তত তোঙ্গি ॥

যে সংখ্যা জানে তাহাকে সেখানে বালিয়া জানি। যে যোগে সব সন্ত বালিয়া জানে তাহাকে আরও বেশী মানি। ভেদাভেদে যেখানে মিলিতে পারিয়াছে সেখানেই তো পরম পবিত্র তথ্যভূমি।

এই দেশে নদীর সঙ্গে যেখানে নদীর মিলন সেখানে এক-একটি পবিত্র তথ্য। নদীর সঙ্গে যেখানে সাগরের মিলন সে সঙ্গম একটি মুক্তির তথ্য। শারা ভিন্ন ভিন্ন সাগরকে মেয়ে ও মিত্রীকে সুসঙ্গত করিতে পারিয়াছেন, ভারতে তাহারই মহাপুরুষ। মধ্যযুগের সাধকদের মধ্যেও এই সত্যটি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা যায়।

তখনকার দিনে ভারতে অনেক ছিল হিন্দু ও মুসলমানকে লইয়া। তাই তখন মহাপুরুষদের প্রধান সমস্যা ছিল কি করিয়া এই দুই সাধনাকে প্রেমে মৈত্রীতে সুসঙ্গত করা যায়। আজ হিন্দু-মুসলমানের মিলন বালিতে যতটা বুঝা যায় তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানের মিলন বালিতে ততটা বুঝা হইত না। আজ হিন্দু-মুসলমান উভয়ে এক টুপে এক হৃদয়কে পাই হুত। এখন রাজনৈতিক প্রয়োজনের কাগিদেও নিতান্ত সচেতন একথা বলা চলে। একথা এখন রাজনৈতিক নিতান্ত সাধারণ জরুরী (expediency) কথা মাত্র। আজ পশ্চাত্য সাধনাকে বা ইংরাজের সাধনাকে আমাদের সাধনার সঙ্গে সুসঙ্গত করিতে যে চায়, তার পক্ষে যেমন কঠিন প্রতি কুলতা, তখনকার দিনে এখন পরাজিত শাসক মুসলমানের সাধনাকে শাসিত হিন্দু সাধনার সঙ্গে মিলিত করিতে যাহারা চাহিয়াছেন তাহাদের বিরুদ্ধেও প্রতিকূলতা তেমনি কঠিন ছিল। তাই ভক্ত রজ্জব বালিয়াছেন—

হাথ জোড়ু গুরু সু হৌ মিলে হিন্দু মুসলমান।

সাধনা মৌ জৈ জোগ নহী ক্যা সাধনা পরমান॥

সেই প্রথম গুরুর কাছে হাতযোড় করিয়া বালভোঁছ হিন্দু-মুসলমান যেন সাধনায় মিলিতে পারে। সাধনাতে যদি যোগই না রহিল তবে সাধনার সত্যতার আর প্রমাণ কি রহিল ?

এ কাজ ত সহজ কাজ নহে। রামমোহন এই কঠিন কাজে যদি হাত না দিতেন, তবে তিনি ভারতের ক্ষুদ্র-দৃষ্টি জনসাধারণের কাছে একজন অতি বড় মহাপুরুষ অতি সহজেই চইতে পারিতেন। কিন্তু ভারতের প্রথম সৌভাগ্য যে তিনি সত্তা মহাপুরুষ এইবার সহজ পন্থা গণ্যেন নাই। আর এইজন্য তাঁর আপন বিশিষ্টতাটি এমন উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে।

তখনকার দিনে এই কাজে যাঁহারা হাত দিয়াছেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রতিকূলতা যে কত প্রবল তাহা এখন বুঝা কঠিন। তাঁরা উভয়দলেরই শত্রু। এই বিষয়ে কবীরের সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প আছে :

কবীর যখন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা বলিতে-  
ছিলেন তখন তাঁহার উপর মুসলমান মুন্সারা ও ব্রাহ্মণ  
পণ্ডিতেরা সমানভাবে ক্ষোঁপয়া উঠিলেন। মুন্সারা  
বলেন হিন্দুয়ানীর সঙ্গে মিলাইতে গিয়া কবীর মুসলমান  
ধর্মকে নারিল। হিন্দুরা বলেন যবনের মুখে সাধনার  
কথায় ভগবানের নামে হিন্দুধর্ম এসাতলে গেল। এমন  
সময় বাদশাহ সেকেন্দর শাহ লোদী কাশীর কাছে  
সফরে আসিলেন। মুন্সার ও পণ্ডিত উভয়ে বাদশাহের  
কাছে কবীরের বিরুদ্ধে ফারিয়াদ করিলেন। বাদশাহের  
লোক আসিয়া কবীরকে দরবারে লইয়া গেল। তখনকার  
দিনে অভিযুক্তদের একটি স্থান, অভিযোগকারীদের একটি  
খেরা স্থান নির্দিষ্ট থাকিত। একই খেরা জায়গায় মুন্সার ও  
পণ্ডিতদের একত্র অবস্থান দেখিয়া কবীর উচ্চৈঃস্বরে হাস্ত  
করিয়া উঠিলেন। বাদশাহ এরূপ অসঙ্গত ব্যবহারে  
একটু বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“এরূপ  
আচরণের অর্থ কি ?” কবীর বলিলেন—“আমাকে ক্ষমা  
করিবেন কিন্তু আজ আমার একটু ভরসা হইয়াছে।

আমি যাহা এককাল চাহিয়া আসিতোঁছ আজ তাহাই  
সিদ্ধ হইয়াছে দেখিলাম। ঐকানায় একটু ভুল  
হইয়াছে—

“ঐকানামে খোড়ী গলাত হো গড়।”

বাদশাহ বলিলেন—“কথাটা শুলিয়া বল।” কবীর  
কহিলেন—“আমি চাহিয়াছিলাম হিন্দু ও মুসলমানকে  
প্রেমে ও মৈত্রীতে ভগবানের চরণতলে মিলান যায় কি  
না। সকলেই বলিলেন তাহা অসম্ভব। আজ  
দেখিলাম তাহা সম্ভব হইয়াছে। অপ্রেমেই যদি তাহার  
আজ এখানে মিলিতে পারিয়া থাকে তবে প্রেমে  
মিলিতে পারা আরো সহজ। আর তোমার সিংহাসনের  
নীচেই যদি তাদের মিলন সম্ভব হয় তবে বিশ্বপতির  
সিংহাসনের নীচে কি আরও প্রশস্ত স্থান মিলিবে না ?  
আজ অসম্ভবকে সম্ভব দেখিয়া আমার ভরসা হইয়াছে,  
মনে মনে যাহা চাহিয়া আসিয়াছি তাহাই আজ  
প্রত্যক্ষ দেখিলাম। তবে তাঁর সিংহাসনতলে না  
হইয়া তোমার সিংহাসনের নীচে এত মিলন ঘটিয়াছে।  
তাই বলতোঁছিলাম—সবই ঠিক হইয়াছে কেবল ঐকানায়  
একটু ভুল হইয়া গিয়াছে।”

বাদশাহ কথাটা বুঝিতে পারিয়া লাজ্জিত হইয়া ঈষৎ  
হাস্ত করিয়া কবীরকে তৎক্ষণাৎ বিদায় দিলেন।

মধ্যযুগে নানাবিধ সাধনার অসঙ্গতিকে মনে প্রাণে  
কামনা করিয়াছেন এমন ছই শতের আধক মহাপুরুষ  
সাধকদের বাণী পাঠিয়াছি। সম্ভব হইলে, দেখাইতে  
পারিতাম; তাঁহাদের প্রত্যেকের অন্তরের সাধনাটি পরিপূর্ণ  
হইয়াছে রামমোহনের সাধনাতে। তেমন সময় ও  
সুযোগ এখন নাই। তাই প্রধানতঃ কবীরজী, দাদুজী ও  
রজ্জবজীর বাণী হইতেই আজ কিছু কিছু দেখাইতে চেষ্টা  
করিব। ভক্ত নানকজীর হিন্দু-মুসলমানকে মিলাইবার  
চেষ্টা সঙ্গর্জনাবাদিত—বিশেষতঃ যুরোপীয় পণ্ডিতরাও  
তাহা উত্তমরূপে লিখিয়াছেন।

কবীর বলিতেছেন—

কত বা পায়ে ধরিয়া বুঝাইলাম, কত বা কাঁদিয়া  
বুঝাইলাম, হিন্দু দেবদেবীই পূজে আর মুসলমানও  
কারও আপন হইতে চায় না।

কি তনো মনারো পাই পরি কি তনো মনারো রোর ।

হিন্দু পূজি দেবতা তুর্ক ন কাহু হোর ॥

খোদা যদি মসজিদেই বাস করেন তবে আর সব  
মলুক কাহার? তাঁর-মুর্শিতেই যদি রাম নিবাস করেন  
তবে বাহিরের জগৎকে দেখে কে?

জো খোদায় মসজিদ বসতু হৈ ঐর মলুক কোঁচি কেরা ।

‘তীরথ মুরত রাম নবাসী বাহর করে কো হেরা ॥

হিন্দুর হিন্দুয়ানী দেখিলাম, মুসলমানের মুসলমানী  
দেখিলাম, হার, ইহার কহই পথ পায় নাই ।

অরে ইনতুহু রাত ন পাঈ ।

হিন্দুহী হিন্দুবাঈ দোখি তুর্কন কী তুর্কাত ॥

সবাই বাঁধাব্যবস্থায় বেড়া (creed) রাঁচিয়া নিজ নিজ  
সম্প্রদায়কে নিরাপদ কাঁধতে চায়, শেষে সেই সঙ্কীর্ণ-  
তাতেই ধর্ম মারা যায় । তাই কবীর বলেন—

ক্ষেতে দিলাম বেড়া, শেষে দেখি বেড়াটিই ক্ষেতকে  
খায় । তিন লোক সংশয়ের মধ্যে রচিল পাড়িয়া, আমি  
কতাকে কি বুঝাইব ?

বেড়া দাঁহী খেত কো বেড়াই খেত খায় ।

তিনলোক সংশয় পড়ি যৈ কাঁচি কহো সমুঝায় ॥

এই প্রত্যেকটি কথা আমরা রামমোহনের মধ্যে পাই ।  
রামমোহনের মতই কবীর তাঁরই জীর্ণে গুরিয়া  
দেখিলেন; সত্যকে পাইলেন না । শাস্ত্রের জ্ঞান  
কবীরের ছিল না তবু শাস্ত্রের বন্ধনটা যে কত কঠিন তাহা  
বেশ বুঝিয়াছিলেন ।

তাঁই কবীর বলেন---

জীর্ণে তো কেবল জল, তাহাতে কিছুই হয় না, সে  
আমি আন করিয়া দেখিয়াছি । প্রাণনাশালি তো জড়,  
কোন কথাই বলে না, সে আমি ডাকিয়া দেখিয়াছি ।  
পুরাণ কুরান তো কেবল কথা, সে আমি ঘটের পদ্মা  
সরাইয়া দেখিয়াছি । কবীর কহে শুণু প্রতাক্ষ অন্তঃকরের  
কথা । আর সব যে মিথ্যা ও অন্তঃসারশূন্য তাহা বেশ  
দেখিয়াছি ।

জীর্ণে যৈ তো সব পানী হৈ হোবৈ নহী কহু

অহ্মায় দেখা ।

প্রতিমা সকল তো জড় হৈ বোলে নাই

বোলায় দেখা ॥

পুরাণ কুরান সব বাত হৈ যা ঘটকা পরদা

খোল দেখা ।

অন্তঃকর কী বাত কবীর কহৈ য়ে সব হৈ স্ত্রী

পোল দেখা ॥

বেদের পুত্রী আসিলেন স্মৃতি, তিনি বাঁধিলেন এমন  
বাধন যে কিছুতেই যায় না ছাড়ান ।

বেদকী পুত্রী স্মৃতি আঈ

বংশবত বংশ-হোড়ি ন জাঈ ॥

রামমোহন সংস্কৃত ছাড়িয়া বাংলাতেই তাঁর বক্তব্য  
বলিতে আরম্ভ করিলেন । এমন করিয়াই তিনি বাংলা  
গদ্যকে গাড়িয়া তুলিলেন । কবীর তো মাতৃভাষা ছাড়া  
আর কিছু জানিতেনই না । তবু সংস্কৃত ভাষাতে ভাষার  
শ্রেষ্ঠতা বহুদূর তাঁর বাংলা কি চমৎকার !

হে কবীর সংস্কৃত তইল কৃপ জল আর ভাষা তইল  
প্রবচমানা জলধারা । যখন চাপ তখন ডুব দাও ; শরীর  
জুড়াইয়া যাবে ।

সংস্কৃত পপজল কবীর ভাষা বহুতা নীর ।

জব চাইত কবীর দুর্বো শাস্ত হোর শরীর ॥

সংস্কৃত ভাষা পড়িলেই লোক মনে করে, আমি  
জ্ঞানী, আমাকে সবাই জ্ঞানী বলুক ।

সংস্কারিত ভাষা পার লীনতা জ্ঞানী লোক কহোয়ী ॥

কোনো বিশেষ জাতের, সম্প্রদায়ের বা দেশেরই যে  
কেবল সাধনার অধিকার আছে এতখানি কবীর মানিতেন  
না, তাই বাঁচিয়াছেন, সাধনের জাতি বৈজ্ঞান্যসা করা বুঝা ।  
সাধনাতে ছাঁজিল কোম (Nationality) আছে, তাই এই  
প্রশ্নটিই অস্বত । হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের  
লোকই সাধক হইয়াছেন, ইহার মধ্যে কি কিছু বিচার  
করা চলে ?

সন্তান জাত ন পুছো নিরপণিয়া ।

সাধন মী ছাঁজিয়া কোম হৈ টেটী তোর পূহনিয়া ।

হিন্দু তুর্ক হই দীন বনে হৈ কছু নহী পহচনিয়া ॥

অন্তর বাহির হইকে নিরন্তর করিয়া আছেন তিনি ।



চেতন-অচেতন দুই তাঁর পাদ-পীঠ। যদি বলি তিনি কেবল অন্তরে তবে বাহ্যিকগত লক্ষ্যায় মরে, যদি বলি তিনি বাহিরে তবে কথাটা ভয় মিথ্যা।

ভিতর কত তো জনময় লাজে বাহর কত তো

গুটা লো।

বাহর ভিতর সকল নিরন্তর চেত অচেত

দউপীঠা লো।

লোকেরা ভুল কারখানি সংসার ছাড়িয়া বনে যায়।

তাঁই কবীর বলেন—

শাস্তিকে যে খরে ফিরাইয়া আনে সেই তো আমার প্রিয়। ঘরেই যোগ, ঘরেই মুক্তি, যদি অলখ গুরু তাহা দেখাইয়া দেয়।

অবশ্য ভুলেকো খর লাগে সো জন হমকো ভাবে।

খরমে জুত মুক্ত ঘরোঁ মেঁ জো ভর অলখ লখাবে।

দেহ-ভাঙনকে বিবাস করতেন না বলিয়াই কবীর বালিলেন—

চক্ষুও প্রাণ নাই, কানও ক্রোধ নাই, কায়কূটও কারিব নাই, নয়ন স্থালিয়া হোসিতে হোসিতে আমি দ্বিধাব, সুলভের গুপাই সমস্ত দেখিব।

নাথ না মূদ কান না ক্রোধ কায় কষ্টন ধারোঁ।

স্থলে নয়ন মেঁ কস কস দেহু সুলভ রূপ নিচারাঁ।

কবীরের মত যে নীরস বৈরাগীর মত ছিল না, তাহা বুঝাই যায়, রামনোচনের সঙ্গে এসব বিষয়ে তাঁর চমৎকার একা।

দুকের মত তাঁরানও বালিয়াছেন। এই দেক একটি তত্ত্বোপাত্তের মত। ইতার তার তাঁনয়া খুঁটি মোচড়াইয়া প্রভুর রাগিণী বাহির হয়।

সাধো যত তন ধটি তং ঘরে কা।

এ চত তার মড়েরত খুঁটী নিকসত রাগ হজুরে কা।

প্রত্যেকের জীবনের সাধনায় প্রভুর সুরটি বাহির করতে পারিলে তবে তার জীবনের কাজ সিদ্ধ হইল। তারপর সকলের সাধনা, সকল মানবের সাধনা লইয়া নানাবিধ সুরের সমবায় এক সাধনসুরের মহাসঙ্গীত চালিয়াছে। প্রত্যেক পথের সাধনাই তার একটি একটি

প্রবাসী

সুর। এইজন্য কোন একটি সাধনাকে নাই করা অর্থহীন সেই মহা-সঙ্গীতকে ক্ষুণ্ণ করা। এই সুর অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করে।

পঞ্চবাণী সত রাগ উচাইর যো বেধত হিয়ে মঝাঝা হো।

কবীরের এইসব অনুভব তাঁর ব্যক্তিগত। অবশ্য তাঁর ধর্ম-বন্ধু-বান্ধবও অনেক ছিলেন। তখনকার অনেক ভক্ত সাধকজনের সঙ্গে তিনি মিশিতেন। কিন্তু সম্প্রদায় তখনো তাঁর ভয়ে একটি সাধকসমাজ গড়িয়া তোলেন নাই। তাঁর পুত্র কমালও সম্প্রদায় গড়িলেন না। তাঁর শিষ্য দাদু (কোনো কোনো মতে তাঁর পরস্পরক্রমে শিষ্য) অনুভব করিলেন যে, এমন একটি সাধকমণ্ডলী গড়িয়া তোলা দরকার যেখানে সমস্তের সাধনা সামঞ্জস্য পাঠতে পারে।

দাদুর সঙ্গে এসব বিষয়ে আকবরের চাঁদপাশ ইদন ব্যাপী আলাপ হয়। আকবরও দাদুর এই সাধকসমাজের অনেক আশ্বাদ কারয়াছিলেন। তাঁর মণ্ডলীর নাম প্রথম রাখেন “অলখ দরোহা” অর্থাৎ যেখানে ভগবানের অন্তর্ভবের বিনামত পরস্পরের মধ্যে চর্চা হতে পারে। তারপর নাম রাখিলেন “চৌগান” অর্থাৎ মুক্ত ময়দান যেখানে সকলেই পাতা ও শাঁড় লাভের জন্ম যায়। এই সাধন মণ্ডলীতেও সকলে যাঁহিবেন, নিজ নিজ সম্প্রদায়-বাদি ভাগ করিয়া নিজেদের অধ্যাত্ম দ্বাষ্টা ও শাঁড়ের জন্ম। জয়পুরের রাজা ভগবান দাস (নামসিংহের পিতা) দাদুকে এইরকম সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা কি জিজ্ঞাসা করলে দাদু বালিলেন,—

“সেহমরা নগরে কেন মাঝে মাঝে উল্ফান ও ময়দান রাখিয়াছ।” তারপর হুঁহা বা পরস্পরের উপাসক বালিয়া এই মণ্ডলীর নাম সকলে দিলেন “রক্ষসম্প্রদায়।” দাদুরাঙ্গের মধ্যে পুণ্ড্র একটি রক্ষসম্প্রদায় ছিল বালিয়া দাদু নামটি পারিবারিক করিয়া নাম দিলেন “পরব্রহ্ম সম্প্রদায়”। (এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যে আমায় লিখিত দাদুর রক্ষসম্প্রদায় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

দাদুর শিষ্য জয়গোপাল তাঁর “জীবনপরচী” গ্রন্থে লিখিয়াছেন—দাদু মুসলমান বংশোদ্ভূত সাম্প্রদায়িক

পদ্ধতি ছাড়িয়া দিলেন অথচ হিন্দুধর্মের সংকীর্ণ বিধি  
আচরণাদি হইতেও দূরে রহিলেন।

তুর্ককী রহ খোজ সব ছাড়ী

হিন্দুন কে করণীতে পুন জারী ॥

দাদু বড় দর্শনের পথ ছাড়িয়া ভগবদ্ভজ্ঞে নিশ্চিন্দন  
রাজিয়া রহিলেন। তিনি বাহ্য সাক্ষসম্মা ভেদ ও  
সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি না মানিয়া পূর্ণপ্রকৃতি সত্য বাণীয়া  
জানিলেন। দেবদেবী পূজা-পদ্ধতি ভীষণ ভ্রম সেবা  
জাতি কিছুই মানিলেন না।

যট দর্শন সে নারি সংগী।

বিশ দিন বটে রামকে বংগী ॥

বাংগ ভেদ পূহপংখ ন মানী।

পূরণ প্রকৃতি সত্যকার জানী ॥

দেবী দেব ন পূজা পাঠী।

ভীরথ ব্রত ন সেবা জাতি ॥

(জয়গোপালকৃত জীবনপরচী)

এহাতে বাহ্যপ্রতীক লিঙ্গসমূহ আদি পূজার স্থান নাই  
বাণীয়া এই সম্প্রদায়কে এক-সম্প্রদায় বালী ত (মুন্সেরাম  
১০ পৃষ্ঠা, পুরোহিত হারনারায়ণ কৃত)। এহাতে বিস্তর  
হিন্দু সাধক ছিলেন, মুসলমান সাধকদের সংখ্যাও কম  
নহে। কাজী কাদমজী, সেখ করিমজী, কাজী মহম্মদজী,  
সেখ বহাদুরজী, বখশাজী, রজবজী প্রভৃতি মুসলমান এই  
দলে ছিলেন।

ত্রিশ বৎসর বয়সে দাদু বিবাহিত হইয়া এই মণ্ডলী  
গঠনে হাত দেন। কবীরের মত ভ্রমও আদর্শ ছিল  
সাধকরা সব বিবাহিত গৃহী হইবেন। দাদুর দুই পুত্র  
গরীবদাস ও মসকীন দাস। তাঁর দুই কন্যা নানী বাজি  
ও মাতা বাজি। পারিবারিক জীবনেও দাদু খুব আধীনতা  
দেওয়া ভাল মনে করিতেন। দাদুর ইচ্ছা ছিল তাঁর  
কল্যায় বিবাহিত হইয়া ধর্ম সাধনা করেন। কল্যায়  
ব্রহ্মচারিনী থাকতে চাহিলেন। দাদু বুঝাইলেন,  
কিন্তু বাধা দিলেন না। এই দুইটি যুবতী কল্যাকে  
অবিবাহিত দেখিয়া রাজা ভগবান্দাস একই অসন্তোষ  
জানান, দাদু তাই জয়পুর রাজ্য ছাড়িয়া গেলেন।

দাদুর আকাঙ্ক্ষা ছিল—

ইহাতে জ্ঞানী অজ্ঞান উচ্চ নীচ সকলেরই অমূল্য  
ধর্মের একটি সরল ও মহৎ আদর্শ সকলেরই কাছে  
স্থাপিত হউক। ইহাতে উপাসনা-রীতি প্রবর্তিত  
হইল সরল ও উচ্চ ধরণের, যাহাতে অতি সহজেই মানুষ  
পরমানন্দ লাভ করিতে পারে। এই সাধনমণ্ডলে  
প্রত্যেক নরনারীর জ্ঞানে ও সাধনায় সমান অধিকার  
ছিল।

(চলিতপ্রসাদ ত্রিপাঠী কৃত

দাদুপন্থী সাহিত্য, ৪র্থ পৃষ্ঠা)

এই সাধনমণ্ডলী স্থাপনে সকল লোকই দাদুর উপর  
চটিয়া গেলেন। দাদু বাঁশাছেন—

আমি যখন হইতে সাম্প্রদায়িকতা ছাড়িয়া তখন  
হইতে সকল লোক চটিয়া গেলেন। তবে সদগুরু  
প্রসাদে আমার না আছে কোনো ভয়, না আছে কোনো  
শোক।

দাদু জবাইৎ ৯ম নিন্দা ৩য় সর্বে রিসানে লোক।

সন্ত গুরুকে পরসাদপথে মেরে করণ ন শোক ॥

বিশ্বাসে সীমা ও ভাবে গভীর সাধনার্থীর সবারই জন্ত  
এই মণ্ডলীর দ্বার মুক্ত রাখিল। উচ্চনীচ জাতি বাণীয়া  
কোন বাধা রাখিল না। পুরুষ ও নারী, ধনী ও  
দারিদ্রের কোন ভেদ ইহায়া মানিলেন না। ইহাদের  
মধ্যে কেহই ধন মান পদমর্যাদার জোরে নেত্র লাল  
করেন নাই। সন্তোষ, ভাবের ও সাধনার দাবীই ছিল  
সবচেয়ে বড় দাবী।

এই সাধনা ছিল সঙ্গমবাদের মধ্যে প্রেম ও যমতা  
প্রচার করিতে। এই ধর্ম কাহাকেও আঘাত করে না  
এবং মাতৃবৈর সঙ্গে মাতৃবৈর অপ্রেম ঘটিতে দেয় না।  
এ ধর্ম জগতের সকল মানবকে এক পরম পিতার সম্মান  
বাণীয়া জানে, কাহাকেও সকলকে এক পরিবার ভুক্ত মনে  
করিয়া সবত্র ভ্রাতৃত্ব ও ভগ্নীভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে  
চাহে। বিচ্ছিন্ন মানবজাতিতে পরস্পরের প্রেমে মিলিত  
করিয়া এই ধর্ম সকলকে নব উত্তম নব নব কল্যাণের  
নিমিত্ত অগ্রসর করিতে চায় (দাদুপন্থী সাহিত্য,  
৪র্থ পৃষ্ঠা)।

ইহাতে একমাত্র নির্মল ব্রহ্মের উপাসনাই মনুষ্যের কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট। নিরঞ্জন নিরাকার অঈশ্বর ব্রহ্মের প্রাপ্ত ভাজ্য, প্রেমের সাহিত্য ব্রহ্মের উপাসনা, ব্রহ্ম ধ্যান ও ব্রহ্ম সমাহিত হইয়া থাকাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। ইহারা জ্ঞাত পন্থার রীতি মানেন না। বাহ্যপূজার পদ্ধতিকে ইহারা সম্মান করেন না। অন্তরের মধ্যে পূজাতি মুখ্য ও শ্রেষ্ঠ পূজা, (এ, অর্থ পৃষ্ঠা)।

দাদুর শ্যাম সুন্দরদাস দাদুর পাঁচয়ে লিখিয়াছেন—  
যান জ্ঞাত, কল আর বর্ণাশ্রমকে মিথ্যা নাম  
বলিয়াছেন, সেই দাদু দয়াল আমার প্রসিদ্ধ সঙ্গুরু  
তাহাকে আমার প্রণাম।

জ্ঞান জ্ঞাত কল আর বর্ণাশ্রম কহে মিথ্যা নাম  
হে।

দাদু দয়াল প্রসিদ্ধ সঙ্গুরু তাঁহি মোর প্রণাম হে।

(সুন্দরদাস, গুরু-উপদেশ-মষ্টক :

সাধারণ লোকের বিরুদ্ধতার ভয়ে বীরের মত তাঁতান  
বর্ণাশ্রম প্রভৃতির উপর আঘাত করিতে ভীত হন নাহ

যখন হিন্দু-মুসলমান দুইপক্ষ ঝগড়া করিয়া  
মারিতোছিল তখন দাদু দয়ালের উপদেশ দশদিক  
উজ্জল করিয়া প্রকাশ হইল। সুন্দর বলেন, এই পন্থই  
পরমেশ্বরের সম্প্রদায় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

দাদু দয়াল দশদিক প্রকট ঝগড়া ঝগড়াই পথ থাক।  
কহি সুন্দর পন্থ প্রসিদ্ধ হৈ সম্প্রদায় পরমেশ্বরের। (এ)

দাদু গুরুয়া পারিতেন না, বিবৃতি লাগাইতেন না-  
তিলক মালা পরা করিতেন না। মুসলমানী পদ্ধতি  
ভাঙ্গা করিলেন। হিন্দুর সকাঁপিত হাথ করিতেন না।

ভগবতী ভাবে নাহি, বিবৃতি লগাইব নাহি নীকা  
মালা মানো নাহি।

তুরকো তো গোয়াদ গাড়ী হিন্দুনকো তদছাড়ী...  
(রক্তবজী কৃত দাদু দয়াল ভেটসবেয়া।)

ইহার একশত বৎসর পরে দাসজীকৃত পন্থপ্রণা  
প্রভেদে দ্বিধি এই মণ্ডলী খুব বিস্তৃত ছিল : আজও  
ইহাদের মধ্যে পৌত্তলিকতা পচলিত হইতে পারে নাই।  
ইহাদের উত্তরমৌ নামে শাখা অল্প কিছুদিন পূর্বে একটি

আধটু মূর্তিপূজা প্রবর্তিত করিতে চাহে, কিন্তু  
বিরক্ত, নাগা প্রভৃতি দলের বাধা পাওয়ায় তাহা ঘটয়া  
উঠিতে পারে নাই। এখনও রক্তবজীর শাখাতে হিন্দু-  
মুসলমান নির্বিশেষে যিনি সবচেয়ে বড় সাধক হন তিনি  
সকলের নেতৃপদে নির্বাচিত হন।

কবীরের ছিল যাহা আপন জীবনের সাধনা এবং  
যাহা কবীর কেবল বন্ধু-বান্ধব কয়েকজনকে লইয়া সাধনা  
করিতেন, দাদু তাহাই লইয়া একটি সাধনার মণ্ডলী তৈয়ার  
করিলেন এবং কয়টি শতাব্দী ধরিয়া সেই আদর্শ যে  
নির্মলভাবে আজও চালিয়া আসিতেছে সে-কথা  
রানমোহনের মণ্ডলীগত সাধনার শতবারিকীর দিনে  
স্মরণীয়। ইহারাও জ্ঞাত, পন্থ, দেবদেবী, বার্থ  
অচার নিয়ম, বাহ্য চিহ্ন-এত উপবাসাদি, পুরুষ ও  
নারীর অধিকার পার্থক্য, জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে বৈষম্য  
প্রদর্শিত মানিতেন না।

দাদুর শ্যাম রক্তবের সময় এই আদর্শটি আরও ভাব  
ও সাধনার গ্রন্থরো ভরিয়া উঠিল। রক্তব ছিলেন ভক্ত  
ও ভাবুক সাধক; কিন্তু বৈরাগ্য তাঁর পথ নয়। তত্টি  
দেহকে ত্যাগ বড় হৈছে দিয়া জীবনকে আর করিয়া যে  
সাধনা তাহা তিনি গ্রহণ করিতে পারিলেন না। রক্তব  
বলিলেন—

মনের মধ্যে রহিল অপরাধ, তাহার নাগাল না  
পাইয়া হাতের কাছে বেচারী দেহকে পাইয়া তাহার  
উপর ঝাল ঝাড় কেন? পঞ্জীয়তা পেরে সঙ্গে ঝগড়ায়  
হারিয়া নিজের অসহায় ছেলেকে ধরিয়া ঠেকায়। এও  
যেন তাহ। বেচারী কেবল মাহের যুগের দিকে চাহিয়া  
ভাবে হইল কি? গতের মধ্যে রাখল ভয়াল সাপ,  
তাঁর নাগাল না পাইয়া গতের উপরে কেবল আঘাত  
করিয়া লাভ কি? দেহকে কাসিয়া তৈরানি নির্মল  
সাধনা। হে রক্তব, কেন এমন কর? ভগবান অসহায়  
দেহধারীকে তোমার সাধনার সন্ধ্যা করিয়া যে তোমার  
হাতে দিয়াছেন তার উপর অকারণ উপদ্রব না  
করিয়া তাহাকে প্রেমের সাহিত্য প্রতিপালন কর।

কসি দেহে ন মারি সকে বাবা বীচ সর্প ভয়াল।

সো রক্তব কড় করিতো প্রাণক্ প্রেমপ্রতিপাল।

সাধনার জন্য পূর্ণভাবে আমাদের ভিতরকার সব শক্তি ও সব সম্ভাবনাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে ইহাই ছিল রজ্জবের মত। এক অংশের পোষণের নিমিত্ত অল্প অংশকে শুকাইয়া নষ্ট করা কখনো সাধনা নহে। তাই রজ্জব কহিলেন—

দয়া জিনিষটা ভাল তবু তাহা পোষণ করিতে গিয়া যদি কেহ পৌরুষকে বধ করিল, তাহাও ত দয়া হইল না, তাহা হত্যা করা হইল। ইহা কিছু বর্ষ নহে। এ যেন তাইকে মারিয়া তাইকে পোষণ করা, এই কথাটা বুঝিয়া দোঁপলে আমরা এরূপ করিতে অভ্যস্ত হইবোষণ করিতাম। বাদ বিড়ালাদি জন্তু দুই-একটি বাচ্চাকে শান্তশালী করিতে অথ বাচ্চাগুলিকে মারিয়া খাওয়ায়—এমনি জীবনের কতকগুলি ভাবে মারিয়া দুই-একটি বিশেষ ভাবে শান্তশালী করার যে সাধনা—বালহার যাই সেই সাধনাকে।

দয়া লাগি নরপণ বধে পাতক ধরম ন কোয়।

তাইক হাঁতি ভাঁকি গোণে সময়ে বহু হুণতোয় ॥

বচ্চ মাঝ বচ্চ খিলাইব জে সে বাখ বলাড়ী।

ভাব মারি ভাবকু সাধি সাধনকা বালহারী ॥

সাম্প্রদায়িক ভেদ বিবেদ ছাড়িয়া মেত্রীতে সব সাধনা সুসঙ্গত করিয়া বৈচিত্র্যের দ্বারা পারিপূর্ণতার সাধনায় গণবান্ধকে ভজন করিলে কি মন্দ হয় না হইত। কিন্তু এ যে দেশে যেখানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে হিন্দু খুসী, মুসলমানের মধ্যে মুসলমান খুসী, ওরো রজ্জব, সেহ প্রেমময় যে এক। তাঁর তো এ দুয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই নাই।

হিন্দুগতি হিন্দুখুসী তুরক তুরকী মাঠি।

রজ্জব আশিক এক তে তিনকে হুন্স নাঠি ॥

তখন রজ্জবকে সকলে জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি কি তবে সাধনার নানা ভাব নষ্ট করিয়া পৃথিবীতে কেবল একটিমাত্র পথ রাখিতে চাও?” রজ্জব কহিলেন—“তবে তো বাঘবিড়ালের পদ্ধতিই হইল। সব বাচ্চা মারিয়া একটি বাচ্চা পুঁথিলায় মাড়। পৃথিবীতে যত মানুষ তত ধর্ম। সকলের বিভিন্নতাকে মৈত্রী ও

হৃদয়গত দ্বারা এক করিয়া একটি পারিপূর্ণ সাধনার বিচিত্র সৌন্দর্যে মন্দ্র ঐক্যকে গাঁড়িয়া তোলা।

জগতে চৌরাশী লক্ষ লোক (জনগণ্যায় জ্ঞান তাঁর এইরকমই ছিল)—এই চৌরাশী লক্ষ সম্প্রদায় রচনা করিয়া সেই বিশ্বস্তর জগতে বৈচিত্র্য রচনা করিলেন। জনের জনের বিচিত্রতা দ্বারা নিখিল মানবের সাধনা বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হইল।

চৌরাশী লক্ষ সম্প্রদায় করি বিশ্বস্তর সোয়।

রজ্জব বৈচিত্র্য রাখিয়া জনজন বৈচিত্র্য কোয় ॥

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সকলের সব সাধনা লইয়া এই বিশ্বময় একটি মহাপ্রণীত এক রক্তের চরণেয় দিকে চলিয়াছে। নানা জনের সাধনার বিন্দু বিন্দু লইয়া সাধন রসে সঙ্গ হইয়াছে। এটি বিন্দুগুলি না মিলিলে প্রত্যেকে শুকাইয়া জগৎময় একটি বিরাট মরুভূমি হইত মাত।

এক বন্দগী বিশ্বমে এক একা মাল জায়।

বৃন্দ বৃন্দ মিলি রসে সঙ্গু তে শুদা জুদা মক ভায় ॥

কিন্তু চারিদিকে তখন খোর অজ্ঞান বিকলতা, তার মধ্যে এই সত্য কয়জন বুঝবে? তবু রজ্জবের ভয় নাই। তিনি বাললেন—যুগে যুগে বারবার সত্যই মিথ্যাকে আঘাত করিয়া জয়ী হইয়াছে। এ রজ্জব, এসে করণ না। এই মহাসত্যের ব্যতিক্রম কখনও হইবার নহে।

মাচ সত্য দে বহু ঠেক জুগ জুগ বারংবার।

রজ্জব জান ন কী জয়ে তামে ফের ন ফার ॥

সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গীর্ণ আশ্রয়ে না লুপ্তগয়া যাঁহারা সত্যের উন্মুক্ত সমরক্ষেত্রে নির্ভয়প্রাণে আসে তাঁহারাও বীর। এই জগৎ তাঁহাদের সাধনার সমরভূমি, এখানে প্রতিযুগেই তাঁহারা মনে করে যে প্রভুর জন্ত তাঁরা লড়িতেছে তাই সদাই প্রভুর সাথে সাথে আছে।

ভেখ পথ ভাবি নহী সত্য নিরস্তর প্রাণ।

রজ্জব রহে সনাতন শুরা জন্ত মৈদান।

এই বীরেবাই নূতন জগৎকে সৃষ্টি করিবে। বীর

বিনা এই সাধনার জগৎ রাঁচতে পারে না। হে রজ্জব কোটি কাপুরুষ মিলিলেও তাহারা তাহাদের সঙ্গীর্ণ গুণী ছাড়াইয়া এক পা বাহিরে যাঁতে সাঁকস করে না।

স্বরা বিনা সংসার নৃ বিবচ্যা কথী ন জায়।

রজ্জব কায়ব কোটি মালি বাহর ধরে ন পায় ॥

যে সত্যের জন্ম বীরেরা প্রাণ দিতে পারে সে সত্য কখনো ক্ষুদ্র হইলে চলে না। তাই রজ্জবের সত্যও ছিল বিশাল। “সব সত্যের সঙ্গে যদি মেলে তবেই তাহা সত্য, নাহিলে তাহা মিথ্যা। রজ্জব এই সত্য কথাটা বলিয়া দিল। এখন চাই তুই ০৩ চাই কুই হও।”

সব সাচ মিলে সো সাচ ০৮ না মিলে সো নুট।

জন রজ্জব সাচী কহী ভাইব রাঁধে ভাইব রুঠ ॥

কুরাণ পুত্রাণ বেদশাস্ত্র রজ্জব মানিতেন না, তিনি বলিলেন—

হে রজ্জব, বহুবার সব বেদ আর আখিল সৃষ্টিই কুরাণ—। পাণ্ডিত ও কাজীরা কতকগুলি কাগজপত্র দপ্তরকেই আখিল জগৎ মনে করিয়া বার্থ হইতেছেন। বিশ্বসৃষ্টিই হইল শাস্ত্র। ও বে রজ্জব, শুধু কাগজ কি পাড়াইব, সেখানে চাহিয়া দেখ নিত্যই তাজা জ্ঞান।

রজ্জব বহুধা বেদ সব কুল আলম কুরাণ।

পাণ্ডিত কাজী বৈথৈড়ি দফতর দুনিয়া জান ॥

সৃষ্টি শাস্ত্রের হে সচী বেত্ত করে বখান।

রজ্জব কাগজ ক্যা পটে নিতাই তাজা গ্যান ॥

সাধকের অন্তরের কাগজে প্রাণের অক্ষরে লেখা সে শাস্ত্র তাহা তো কেও পড়ে না। মরমের সঙ্গীত ইহারা শুনিতেই পায় না।

সাধন চায় কী অংগের কাগজ প্রাণ অক্ষর মারিঁ

যহ পুস্তক কেউ খেলা বাঁচে মর্ম শব্দ ন সুনাইঁ ॥

কোটি মানব মালিমা যে বিরাট মানব জগৎ (ব্রহ্মাণ্ড) তাহাতে বিরাট অনন্ত বেদ বলমূল করিতেছে। বাহিরের বাহু আলো নিভাইয়া দিলে মরমী তার মরম পায়।

প্রাণ কোটি ব্রহ্মাণ্ড যে বলকে অনন্ত বেদ।

বাহরা জোত বুঝায়কে ভেদী পাইব ভেদ ॥

হে বিন্দু, হে মুসলমান, সেই জীবন্ত শাস্ত্র পাড়িয়া দেখ। বিশ্বনিখলে এক মহাবিশ্বাই পাঠবে, পাড়িলেই জীবন্ত জ্ঞানে পাণ্ডিতপ্রাণ হইয়া উঠিবে। শুধু মৃত কাগজে মৃত অক্ষরে যে শাস্ত্র তাহার পাঠক মিলে অনেক। ঘটে ঘটে যে প্রাণময় বেদ, হে রজ্জব তাহা দেখ পাড়িয়া।

প্রাণ পুস্তক দেখছ বিন্দু মুসলমান।

সবমে বিশ্বা একই পটে অ পাণ্ডিতপ্রাণ ॥

কাগজ মৃত্যু অক্ষরই পাঠক মিলে অনেক।

বেদ ঘট ঘট প্রাণময়ী রজ্জব বাঁচকে দেখ ॥

এই মহাসত্য তাহাদের জন্মে আসিয়াছে তাহাদের সকলে যদি সাধনার শাস্ত্রে মিলিতে না পারেন তবে সকলেরই সাধনা ছুঁল হইয়া পড়ে। তাহা তাহারাও তখন নানা মতের নানা সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে এই এক ভাবের ভাবুকদের লইয়া একটি সত্যসাধনার মণ্ডলী রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন।

একেলা কাহারও জন্মে যদি এই প্রেম আসিয়া থাকে তবে তাহা শুধু বার্থ হইবে। কারণ প্রত্যেকটি বিন্দুর মধ্যে যে সিন্দুর ডাক আসিয়াছে। সেই বিন্দুই বিন্দুগুলি যদি একা একা সিন্দুর দিকে চলে, তবে ঐ কাহারও প্রত্যেকেই বার্থ হইবে না? তাই সিন্দুবিবর্তী একটি বিন্দু অপর সকল বিন্দুকে ডাকে, কারণ, সব বিন্দু একত্র হইতে পারিলেই সংযোগে একটি ধারায় গতি মিলিতে পারে। একেলা কোন বিন্দু পৌছিতেই পারে না, মাঝের ব্যবধান ও পথই তার সব শক্তি সব জীবনটুকু শুকাইয়া মারবে। আবার সব বিন্দু যদি একত্র হইতে পারে তবে সেও ব্যবধানকে, সেই পথকে নিজেকেই পরিপূর্ণতায় প্রাবৃত করিয়া দিতে পারে। হে প্রভু, তোমার দয়াতেই তোমার দরশ মেলে—বিন্দু বিন্দু সাধনা মিলিয়া আজ তাঁরসাগরে চাঁলিয়াছে। এই সাধনার জীবন্ত ধারাই তো জীবন্ত গঙ্গা। এই গঙ্গায় স্নান না করিয়া মৃত গঙ্গায় স্নান করিলে লাভ কি?

শ্রীতি অকেলী ব্যর্থ মহাসিংধাবরকী দিল হোর।

বুন্দ পুকাঠের বুন্দ কো গতি মিলে সংজোর ॥

অকেল বুন্দ পড়িচেন নহী অথৈ পংখ জিংজোর।

পংখ ভর ভরে এক হোয় দরস দয়া প্রে ভোর ॥

বুন্দ বুন্দ সাধন মিলে তার সাগর জাঁতি।

প্রাণ পংগী না পহুচা মুরদ গংগা সনাই ॥

এই যে সাধকদের সংসঙ্গ ইচ্ছা তো সত্য তীর্থ।

এখানে স্থান এবং কাল আতিক্রম করিয়া সব ধারা আসিয়া মিলিত হইতে পারে। সুগন্ধকের ধারা এখানে মিলিয়া অন্তরীণ পদে সচা বহিয়া চালায়াছে।

সত্য তীর্থস্থ সংসঙ্গ হৈ স্থান কাল লংঘ্য জায়।

জুগ জুগকে ধারা মিলে অতীতীন পদ ধায় ॥

তীর্থের সময়ে দেশদেশান্তরের সুগন্ধকান্তরের সব ধারা মাজ বরনার কথা ছিল। আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত পৃথিবীতে তাই সত্যে পরিণত হইয়াছে।

হিন্দুদের চিন্তার ধারা নানাগুণের মধ্য দিয়া তার বিশিষ্টতা লইয়া চলিয়া আসিতেছিল, শব্দ রূপ প্রভৃতি জাতি ভিন্ন ধারা আনিলেও তাঁহারা তেমন বিরুদ্ধভাব লইয়া আসে নাই, কাজেই হয় তারা চলিয়া গিয়াছে নয় তারা সম্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা যখন আসিল তখন হিন্দু তার জীবনী শক্তি হারাইয়াছে। তখন ভারতের ঋগ্ বেদ জাতি, ঋগ্ বেদ ধর্ম, ঋগ্ বেদ রাজ্যকে প্রায়োগে এক করবার শক্তি আর তার নাই, তখন তার সৃষ্টিশক্তি নাই, তখন সে কেবল আচার-বিচারের জঞ্জালকে নিত্য বাড়াইতেছে। এমন সময় বিরুদ্ধ শক্তি ও ভাষা লইয়া মুসলমান আসিল, স্বাভাবিক নিয়মে হিন্দু পরাভূত হইল। ভারতের এই নূতন জাতির সমাগম এখন আর কেবলমাত্র এমন একটি স্বতন্ত্র শক্তির সমাগম নয় যে কোনো রকমে ইতাকে পরিণাক করা চলিতে পারে। এ একেবারে বিরুদ্ধ শক্তির সমাগম। তাই উভয়দিকে অনেক দুঃখ চালিল। এই দুঃখে একদল প্রাকৃতিক নিয়মে অপরকে পরাভূত করিয়া নিজেদের আদর্শ আত্মশক্তিকে জয়ী করিতে চাহিল। মধ্যযুগে যেমন কবীর, নানক, দাদু, রজ্জব প্রভৃতি সাধকেরা যোগের কথা ভাবিতোছিলেন, তেমন

আবার স্বাভাবিক নিয়মবশেই হিন্দু-মুসলমান উভয়দলে কতক ধর্মপ্রাণ নিষ্ঠাবান লোকও অপর পক্ষকে পরাভূত করিয়া নিজেদের আদর্শকেই জয়ী করিতে চাহিয়াছেন। সমর্থ রামদাস দামী, ভূষণ কাঁব প্রভৃতি শিবাজী ছত্রশাল প্রভৃতিতে লইয়া হিন্দুদের দিক হইতে সে চেষ্টা করিয়াছেন। মুসলমানের দিক হইতেও সে চেষ্টা কিছু কম হয় নাই। আগরজের তাদের আদর্শ। কিন্তু একে মারিয়া অজেয় জয়ী হওয়া ভারতের পন্থা নহে— তাই উভয় শক্তির নিজেদের শক্তি ও সত্যতা বাহির হইতে আগত অপর এক শক্তির নিকট হারাইল। স্বভাবের নিয়মে যাহারা সে যুগে নিজেদের শক্তিকেই কেবল জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহারাও সামাজ্য শ্রেণীর লোকে নন। তাঁহারা সকলেই গভীর ভাবে নিজেদের সাধনাকে সত্য করবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের পন্থা হইল যোগের পন্থা। সে পথ তাঁহারা ছাড়িয়া দিয়া সত্যকে অগ্রসর করিতে পারিলেন না। যদিও তাঁহারা স্বাভাবিক মহত্ব স্বভাব নিয়োজিত হইয়াই এই পথ ধরিয়াছিলেন।

যাহারা আরও গভীর সাধক তাঁহারা নিজেদের দলের জয়ই বড় করিয়া না দেখিয়া উভয় সত্যকে যোগে বড় করিয়া দেখিতে চাছিলেন। তাঁহারাও ভারতের যোগদৃষ্টির মনোমী। সকল দলের একটু একটু বাহু চিহ্ন মাত্র লইয়া নানাদলের বাহু চিহ্নের একটা খুচুড়ী পাকান মাজ তাঁহারা করেন নাই। আকবরের ইচ্ছা ছিল অতি সং, অথচ কবীর প্রভৃতি সাধকদের মত গভীর দৃষ্টি তাঁহারা ছিল না। তাই তিনি দাদু প্রভৃতি সাধকদের সঙ্গে মিশিয়া ধ্যানকটা নানা সম্প্রদায়ের বাহু চিহ্ন ও পদ্ধতিকে জোড়াভাড়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

দারা শুকো আরও গভীর লোকে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের বাহু প্রতীকগুলি লইয়া যথেষ্ট একটা অর্থহীন কিন্তু তুচ্ছকাকার একাকার মাত্র তিনি করিতে যান নাই। তাঁহান সত্য সাহিত্য কাব্য ও ধর্মালোচনার সদাই ভরপূর খাণ্ডিত। একদিকে ভাবিনী-বিলাস রসগন্ধাধর প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের কাঁব জগন্নাথ

মিল্ল, অন্নাদিকে ভাষা কবি শঙ্কনাথ সিংহ, সরস্বতী শর্মা, বেদান্ত রায় প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল। তাঁহারই প্রভাবে আওরংজেবের সময়েও হিন্দী সাহিত্য একেবারে মরিয়া যায় নাই ও আওরংজেবের পুত্র আজম শাহ বিহারী কবির এক সংগ্রহ সম্পাদন করেন। তুলসী কবির সংগ্রহীত পঁচাত্তরটি কবির কাব্যসংগ্রহ “কবিমালা” তিনি যত্নপূর্বক আগাগোড়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীবিষয়ে দাদুপণ্ডী কবীরপণ্ডী সাধকদের সঙ্গে তাঁর গভীর আলাপ চালাত। ভক্ত বীর ভান, লাল দাস প্রভৃতি ধর্মসাধনায় দারার দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন।

পঞ্জাবের ভক্তসাধক বাবলাল সখদাই দারার সঙ্গে গম্ভীর আলোচনার জন্ত যাইতেন। হিন্দু-মুসলমান সাধনার যোগ সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত ও গভীর সব যত্ন ছিল। মৃত্যুতে সবই অর্পণ হইয়া গেল।

যে সব মনীষীরা তাঁহাদের সাধনালব্ধ গভীর দৃষ্টির দ্বারা ভারতের সত্য যোগের পন্থা বার্তার কারিতে চাটিয়াছেন তাঁহারা নিজ নিজ সম্প্রদায় হইতে আরও অনেক বড় এমন একটি মহান সত্যকে আদর্শ রূপে ধারণা করিয়াছেন যাহা সাধন কারিতে নিজেকে অনেক ক্ষুদ্র পরিচয় ছাড়িতে হয়। এইখানেই সমসাময়িক এমন অনেক ক্ষুদ্র লোকেব বিকলতা ও প্রতিকূলতা তাঁহারা পাইয়াছেন। তাঁহারা ভারতের যথার্থ সমস্তকে কিছুমাত্র প্রাণে পাবেন নাহি। তবু তাঁহারা এইসব ক্ষুদ্রত্বাদেশ কহে সন্তা মহাপুরুষ না হইয়াই যথার্থ সত্যপালনের কঠিন হৃদয় ভ্রত দিনরাত্রি ধারণ করিয়া নিন্দা বিকলতার শত শত আঘাতানিত্য সাহসে নিজেদের তপস্বীকে অগ্রসব করিয়া চলিয়াছেন। স্বাম্যোচনের তপস্যাও ছিল এই রকমের। তাই তাঁহার সমসাময়িক এমন কি তাঁহার কালের অনেক পরে আজও অনেকে তাঁহার যথার্থ মহত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই।

সমসাময়িক কালে বার বার অসম্মান অপমানের ভুগে ভুগিত হওয়াই মহাপুরুষের লক্ষণ। এই লক্ষণ সকল যুগের মহাপুরুষদের সম্বন্ধেই খাটে। মহাপুরুষের লক্ষণ বুঝাইতে গিয়া ভক্ত রজ্জবজী বলিয়াছেন—

মহাপুরুষেরা সকল বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া অন্ধকারকে আলোকময় করিয়া দেন। অমূল্য মানুষ্য-জন্মে তাঁহারা প্রেম ও বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহাদের সাধনায় সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়, দৈন্ত সংশয় দূরে পশ্চায়ন করে। প্রেমে ও ভাবে সকল চিন্তা ভরিয়া উঠে, হৃদয়ে পরমানন্দ জাগিয়া উঠে।

মহাপুরুষ নিঃবন্ধ করে ভীতির প্রকাশ।

অমোল মানুষ্যজন্মমৌ খাঁপে প্রেম বিশ্বাস ॥

মুক্ত হোয় বন্ধ সব দৈন্ত সংসে ভাগে।

প্রেম ভাব সব চিন্তা ভরে পরমানন্দ উর স্বাগে ॥

সকলের হৃদয়ের মধ্যে স্তম্ভ প্রেমকে মহাপুরুষেরা আপন হৃদয়ের প্রেম দিয়া জাগাইয়া তোলেন, জাগাইবার আর উপায় নাই।

প্রেম বিনা প্রেম জাগে না। আঁখিই আঁখিকে জাগাইতে পারে। বীরই বীরকে জাগায়, ত্যাগীই ত্যাগকে জাগায়। হৃদয় হইতে হৃদয়ের ভাব সর্বাঙ্গতঃ হয়। সাধনাই সাধনাকে জাগায়। সত্য ও যত্নকে দেখিয়াই প্রেম ও আরাধনা জাগিয়া উঠে।

প্রেম ন জাগে প্রেম বিনে আগ জগাটব আগ।

বীর বীরপন জগাটব ত্যাগী জগাটব ত্যাগ ॥

উরসে ভাব উর সংচরে সাধন জগাবে সাধ।

সত্য জতীকো দেখিকে জাগে প্রেম আরাগ ॥

মানবের সকল বন্ধন খুলিয়া সেই বন্ধন-পাশ জ্বলাইয়া (bonfire) মহাপুরুষেরা অঁখল ভরিয়া যে মহোৎসব করেন হুঁষ্ট ও নীচেরা তাহাতে দগ্ধ হইয়া মরে। এই সৌভাগ্য তাহারা যেন সঠিতেই পারে না।

মহোৎসব অঁখল ভর ভয়ো বন্ধ পাশ জ্বলাই।

হুঁষ্ট কমীনা দহি মরে সৌভাগ্য সহ্য ন জাই ॥

যুগে যুগে মহাপুরুষেরা এই হুঃখ পাইয়াছেন।

এই সব নীচ কুকুবেধা গোরখ, দাদু সকলের বিকল চাঁৎকার করিয়াছে। কুস্তার সব ভাবই এই। কবীর, রবীন্দ্র ও সকল সাধকের বিকলই এই চাঁৎকার চলিয়াছে। নীচের প্রাণই নীচ।

ভৌকিই গোরখ দাদুই কুন্তোকী য় বান ।

কবীর রৈদাদ ঔর সব সন্তুই ওহকা ওহ প্রাণ ॥

তবে এই চাঁৎকারে একটা লাভ আছে বটে । যখন সবাই নির্দ্রুত তখন কোনো মানুষ আসিলে লোকে টের পায় কুকুরের চাঁৎকার শুনিয়া । তেমন অন্ধকার নির্দ্রুত যুগে অনেক সময় মহাপুরুষদের আগমন লোকে টেরও পাইত না যদি এই-সব নীচরা বিরুদ্ধতার চাঁৎকার করিয়া সকলকে জাগাইয়া না দিত ।

কখন যে মহাপুরুষদের উদয় হয় অনেক সময় নিদ্রায় অন্ধ নয়ন তাণী দাঁখিতেই পায় না । নীচ এ অধমদের এই বিরুদ্ধতার চাঁৎকার শুনিয়াই অচেতন মানব সচেতন হইয়া মহামানবের আগমন অনুভব করে ।

মহাপুরুষ উদয় যদি অন্ধ নৈন নহি জোয় ।

নীচ ওহকা শোর স্থানি অচেত অচেত জোয় ॥

মহাপুরুষ সত্য কি না বুঝিতে হইলে রক্ষকের প্রথম প্রশ্নই হইল এই সমসাময়িক কুকুরেরা তাকার বিরুদ্ধে সমবেত চাঁৎকার করিয়াছিল কি না ।

কিন্তু এত বিরুদ্ধতাতেও মহাপুরুষদের অনন্ত মহা সত্য পরাভূত হয় না । তাঁহাদের সাধনার সত্য বিরুদ্ধতার বিপুল পরিমাণকে বিদ্যুৎমাত্র ভয় করে না ।

সমুদ্রের তলে সাগর প্রমাণ জলের সকল বিরুদ্ধতা জয় করিয়া বাড়বানল জলে । মহাগির্গির উচ্চ শিখরে নিয়গামী জল উঠিয়া সেখানে হইতে ঝরিয়া পড়ে । ভাব ও শ্রীতি কিছুতেই মরে না ।

সিদ্ধু বারি বড়বানল জলে বারি বিরোধ জাঁতি ।

মহাগির্গির শির নিব্বর ঝরে মরে ন ভাব শ্রীতি ॥

এই সবগুলি লক্ষণই রামমোহনের সম্বন্ধে খাটে ।

তাঁর সাধনা তাঁর সত্য ঘরবার নহে । বিরুদ্ধতা তিনি যথেষ্ট পাইয়াছেন এবং এই বিরুদ্ধতাই আমাদের অচেতন মনকে সচেতন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে যে, মহাপুরুষ আসিয়াছেন । আজও তাঁর সত্য তাঁর সাধনা কাজ করিয়া চলিয়াছে কারণ এখনো বিরুদ্ধতা চলিয়াছে ।

বিরুদ্ধতাকে তিনি ভয় করেন নাই তবু সাধনা

সাধনাকে ধোঁজে । সাধনা সর্দাই দৃঢ় ও গভীরভাবে কাজ করিবার জন্য সাধনাকে ধোঁজে ।

বারির সঙ্গে বারি মিলে বলিয়াই সাগরে সব নদী চলিয়াছে । হে রক্ষক পূর্ণ পূর্ণকে চায় । ভাব ভাবের অন্তসারী ।

নদী নাথ আরকি নদী বারি ভারি তই বারি

রক্ষক পূর্ণ পূর্ণই মিলে ভাব ভাব উনহারী ॥

সিদ্ধুর দিকে যেমন নদী চলে তেমন সাধক ও ভাবের ধারা চলিয়াছে । সকল বন্ধন ও মান ত্যাগ করিয়া সেখানে আপনাকে মিলিও । যুগযুগজয়ী সাধনা চলিয়াছে, লোকলোকের সাক্ষ্য চলিয়াছেন । ভাব ও ভক্তির এই বিশ্বধারা ধরিয়া ভগবানের সাক্ষ্য গিয়া মিলিত হও ।

সংস্র ভাবকী ধারা চলে সিংহ মে নদী সমান ।

ওই মিলাকে আপ কুঁ তাকি সব বন্ধন মান ॥

জুগ জুগজয়ী সাধন চলে লোক লোক কা সংস্র ।

ভাব ভক্তি ধারা ধরি জায় মিলা ভগবন্ত ॥

রামমোহনের বাস্তবিক ও সাধনার মণ্ডলে রক্ষকের মহাপুরুষ ও সাধনার মণ্ডলের পূর্ণ পরিচয়ই পাই ।

প্রত্যেক যুগেরই একটি বিশেষ দান আছে । সেই যুগ তখনকার দিনের সম্মানবের শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবক লইয়া এক দেশের ঘরে দাঁড়ায় । যথার্থ ভাবে এই দান গ্রহণ করার সার্বণ্য দ্বারা সেই সেই দেশ তাহার জীবনের সাংস্কৃতিক ও সাধনার পরিচয় দেয় । জড়প্রাণ তামাসিক মৃতপ্রায় দেশ এই দান গ্রহণ করিতে পারে না । কখনো ভুলে কখনো অভিমানে ক্ষুদ্রজন উপাসিত কোন মনোহর সর্গাণ্ডা বিশেষের নাম লইয়া যুগের এই মহাদান প্রত্যাখ্যান করিয়া বিধাতার অভিশপ্ত দেশ যুগধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হয় । কাজেই যে-সব মহাপুরুষ সমগ্র জাতির হইয়া এই মহাদান সত্য ভাবে গ্রহণ করিয়া যুগধর্মকে রক্ষা করেন তাঁহাদের কাজ যেমন মহৎ তেমন কঠিন । এমন মহাপুরুষ পাইবার দৌভাগ্য যে জাতির নাই তাহারা সেই মহাসম্পদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া দিন দিন



ভার্মাসিকতাগ্রস্ত হইয়া ধীরে ধীরে বৃত্ত্যবুধে অগ্রসর হইতে থাকে। দেশের সব ক্ষুদ্রাশয় অক্ললোকেবা এই বৃত্ত্যবুধে যাত্রাকেই জয়যাত্রা মনে করিয়া তাকে নানা উপচারে অলঙ্কৃত করিয়া নিজেদের আসন্ন বিনষ্টিকে সকলের চেতনার ও দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া রাখে।

মুসলমান যখন ভারতে আসিল সে তখন তার মরু ভূমিতে প্রাপ্তজন্ম ধর্মের মধ্যে ভারতের জন্ম কোন কোন মহাপ্রাণ আনিয়াছিল। তাহাদের কঠোর সরল একনিষ্ঠা, তাহাদের দৃঢ় বাহ্যল্যবর্জিত সাধনা তখনকার রসভারাক্রান্ত আচার-বিচার-বাংলা-ভারাক্রান্ত ভারতের পক্ষে অতি আবশ্যক ছিল। ভারত তখন তাহার জীবনের কেন্দ্র হারাইয়া, সৃষ্টিশক্তি হারাইয়া নিজেদের আচার-বিচারের জঞ্জালই দিন দিন বাড়াইয়া তুলিতেছিল। ভারত হয় তো এই মহৎ দান গ্রহণ কারিতেই পারিত না যদি ভারতের হইয়া কবীর, নানক প্রভৃতি উত্তর-ভারতের সাধকেরা, বাংলার বাউলেরা ও অক্সার প্রদেশের তৎকালিক গভীর সাধকেরা তাহা গ্রহণ করিতে না পারিতেন।

গঙ্গা যখন স্বর্ণ রঙে অবতরণ করিলেন তখন সাধকবর মহাদেব স্বীয় ভটাজালে সেই মন্দাকিনীধারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই যুগে যখন পশ্চিম তাহার বিস্তৃত ও বহুধাবিচিত্র সভ্যতার জানাবিজ্ঞানের ঐশ্বর্য লইয়া উপস্থিত হইল তখন ভাগ্যে ভারতের লক্ষ্য রক্ষা করবার জন্ম রামমোহন আপন সাধনার মধ্যে সেই দান গ্রহণ করিলেন। তখনকার দিনে কেমন করিয়া নিজের দেশের বিংশতিতম না হারাইয়া এমন প্রকার সাহিত্য সেই দান গ্রহণ করিলেন যে তাহা চিন্তা করিলেও মন প্রকায়ে নত না হইয়া যায় না। আজকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত কত বিজ্ঞানভিম্বানী সংস্কারমুক্ত হইয়া যে মহাদান প্রকার সাহিত্য গ্রহণ করিতে বা সেই গ্রহণের মাধ্যম বুঝিতে অক্ষম, রামমোহন সেই শিক্ষাবরল দিনে কেমন করিয়া সেই মহাদান প্রকায়ে অথচ এমন অভিজাত শালীনতার সাহিত্য যথার্থ বীর সাধকের মত গ্রহণ করিতে পারিলেন তাহা চিন্তা করিয়া বিশ্বযাবিষ্ট হইতে হয়।

এই সব অংশে ভারতের মধ্যযুগের এই সব সাধকদের সঙ্গে রামমোহনের মিল থাকিলেও অনেক দিকে প্রভেদও আছে। মধ্যযুগে সমস্তা ছিল প্রধানতঃ ধর্মগত ভেদকে মিলাইবার। তাই কবীর, নানক, দাদু, রামদাস প্রভৃতি সাধকেরা তাঁহাদের সকল শক্তি, সকল সাধনা চালিয়া দিয়াছেন ধর্মসাধনার উপরে। চরিত্র ধর্মভাবের গভীর-তায় ও ধর্মের ধ্যানে সাধনায় রামমোহন ইহাদের কাছে হার মানিতেও পারেন। কিন্তু তাঁহার সময় সমস্তা যে সবাদিক লইয়া। মধ্যযুগে এই সব সাধকেরা হিন্দু বা মুসলমান জ্ঞান ও শাস্ত্রাদি সামঞ্জস্য সাধনার চেষ্টা মাত্র করেন নাই। কারণ উভয় দলের জ্ঞানই তখন অনেক পরিমাণে নিজেদের দলের ক্ষুদ্র সত্যেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু যুরোপ যখন এই যুগের প্রারম্ভে ভৌগোলিক সব ব্যবধান ভাঙিয়া ভারতে উপস্থিত হইল তখন তাহারা যে জ্ঞান-বিজ্ঞান আনিল তাহা আর উপেক্ষণীয় নহে। তাহা পরাবিস্তার না হইতে পারে, কিন্তু অপরা হইলেও তাহা সত্যই বিজ্ঞা। এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিজ্ঞার মধ্যে যোগ স্থাপন করা, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এই বিরাট সংঘাতে গ্রহণীতিত সমাজনীতি শিক্ষানীতি ও উদ্ভাবনকের নানাবিধ বিশিষ্টতার সমন্বয় করা সেই যুগে রামমোহন চাড়া আর যে কেও এমন অসাধারণরূপে করিতে পারিতেন, তাহা ত বুঝি না। এই যুগের সেই উষায় যখন আমাদের দেশে পশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয় নাট বলিলেই হয়, সেই সময় তাঁহার মত এমন কে ছিলেন যিনি এমন গভীর ভারতীয় ও প্রাচ্য শিক্ষাদীক্ষার দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া পশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে এমনভাবে গ্রহণ করিয়া সেই কঠিন সমস্তা এমন করিয়া সমাধান করিতে পারিতেন। তিনি কোনমতেই সেই যুগের মাঝে ভৈরবী মাহু হইলেন না। আত্ম পর্যন্ত অনেকে তাঁহাকে যে চিনিতেন পাঠেন নাই তাহার অর্থ, তিনি অপ্রত্যাশিতরূপে তাঁহার কালের অনেক পূর্নেই জগিয়াছিলেন।

যে সব সমস্তা আজকার সাধকদের সমক্ষে উপস্থিত, যে সব আকাঙ্ক্ষার সব আকাঙ্ক্ষা এই সব সমস্তাকে লইয়া

এই যুগকে উদ্বোধন করিয়াছেন মহা সাধক মহাপুরুষ রামমোহন। এই সব আকাজক্ষা ও সমস্তা কতক পরিমাণে যদিও ভারতের মধ্যযুগের মহাপুরুষদের মনে আসিয়াছিল তবু তখন সমস্তা আঁজকার মত এত জটিল হয় নাই। অবশ্য তাঁহাদের চারিদিকে প্রতিকূলতাও ছিল অপরিমেয়। রামমোহনের জন্ম হইল এমন এক বৈজ্ঞানিক যুগের উষাকালে যখন দেশে বিদেশে ভৌগোলিক সব ব্যবধান দূর হইয়া গিয়াছে, যখন অগণিত জাতি সমুদায় তাহাদের বিচিত্র শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতা লইয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে, যখন হুল জাতিদের হুলতা প্রবল জাতিদের সর্বিধ ক্ষুধাকে জাগ্রত করিয়া ভুলিয়াছে, যখন শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতা উৎকর্ষের নানা বিচিত্র ধাতু-সংযাত প্রতিক্রিয়া চলিয়াছে। রামমোহনও যুগান্তরের এত বড় বিরাট রচনার যোগ্য মনুষ্য ও সাধনা লইয়া কেবল হিন্দু মুসলমান নচেৎ জগতের সকল সাধনার মিলনের মত উচ্চারণ করিলেন, নতন যুগের উদ্বোধন করিলেন। তখন রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সকল ক্ষেত্রে তাঁহাকে সমানভাবে বীরের মত আসিয়া নব নব সৃষ্টিতে হাত দিতে হইল

এবং সবই তিনি অসাধারণ-বীরদের সহিত সম্পন্ন করিলেন। কোনো মহাপুরুষকেই একসঙ্গে এতগুলি কাজে হস্তক্ষেপ করিতে হয় নাই। তাঁহার এক-একটি কাজে তাঁহার সমকক্ষ সাধক মিলিলেও মিলিতে পারে, কিন্তু জাতীয় জীবনের জাগরণের জন্ত একসঙ্গে এতগুলি কাজে হস্তক্ষেপ করার দৃষ্টান্ত হুলভ। তাঁর বহুযুগী সাধনার নানা অংশ নানাভাবে পূর্ণকালে সাধিত হইলেও কখনো একত্র সাধিত হয় নাই। তাই, তিনি এই মহাযুগের আদিলগ্নের স্তম্ভ মুহূর্তে জাতীয় জীবনকে উদ্বোধিত করিতে বিধাতার প্রেরিত মহাপুরুষ।

এক কথায় বলিতে হইত, রামমোহন ভারতে একটি আকাঙ্ক্ষক সাধনার উপদ্রব নছেন—তাঁহার পূর্বে যুগে যুগে যুগধর্মের মধ্যে দীক্ষিত মহাপুরুষরা ভারতের সাধনাক্ষেত্রে উদ্বীত হইয়াছেন। সন্দেহভাবে বিচিত্র এই মহাযুগের প্রারম্ভে এত বড় বিরাট ও সমস্তাবহুল যুগের উদ্বোধক প্রবর্তক ও যুগধর্ম সাধনার মহাপুরুষ রামমোহনের মধ্যে পূর্ণ যুগের সাধনাক্ষক সকল মহাপুরুষেরই সার্থকতা। তাঁহাতেই সকল পূর্ণ গুণের পারিপূর্ণতা।

শ্রবাসী, কান্তিক, ১৯৩৬।



# স্বৰ্গ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

স্বৰ্গ ? কোথা স্বৰ্গ ? তাহা আকাশে কি যুদ্ধের পরে  
নয়,

স্বৰ্গ ভক্তের স্বপ্ন নয়ক, স্বপ্ন নয়ক মস্তিষ্কে কাবির,  
স্বৰ্গ—সে পদার্থ নয়ক, ধারণা নয়। মহা সমাধির  
সাধনা সে ; নয় সে স্তব্ধের হানি।—বড় দুঃখময় !  
চলেছে যে মহাছন্দে চূর্ণজ্যোতি অশ্রান্ত, অধীর,  
কোটি কোটি মহাপুণ্যে, তাহাদেরও একটা স্বৰ্গ  
আছে।

কুদ্রুতম কাঁট যা মাটির মধ্যে থাকে—পাছে  
কারও পায়ের দলে যায়, তারও স্বৰ্গ আছে কেনো  
খুব।

স্বৰ্গ—সে সাধনা যাহার অন্ত নাইক ; স্বৰ্গ—মহা  
যোগ ;  
স্বৰ্গ—পরের জন্ত সত্য ; স্বৰ্গ—পরের জন্ত দুঃখভোগ।

এই যে স্রষ্টি—চলেছে সে একই মহা লক্ষ্য লক্ষ্য  
করে’—

কেহ হ’তে কেপে, শূন্য হতে বিধে, আত্ম হ’তে  
পরে।

সত্যতাও চলেছে সে একই দিকে—সেই স্বার্থ হ’তে  
পরার্থে, স্ব-বৃত্তি হতে প্রেম, নেওয়া হ’তে দেওয়ায়।  
পরের জন্ত স্বইচ্ছায় তাঁর আলা মাথা পেতে

নেওয়ায়

বেই দুঃখ—সেই স্বৰ্গ। সেই মহা দুঃখ-মহারত্নে  
এক খ্রীষ্ট খ্রীষ্টচৈতন্য পরোঁছিলেন ছিন্ন চীর-বেশ,  
সেই দুঃখের বহাছন্দে গেরোঁছিলেন মহাকাব্যচয়।

কেন প্রশ্নের নাইক সীমা ? কেন বিশ্বের দুঃখের  
নাইক শেষ ?

—পাছে এ ব্রহ্মাণ্ড হ’তে সেই স্বৰ্গ কড় লুপ্ত হয়।  
কি কাজ তবে কর্ণের মাগ্ধ ? সেদিন কাহার দুঃখ  
করে দূর  
বৃত্ত হবে ? কি দুঃখে গাঁড়বে কাব—তাহার বাঁধায়  
বাজাবে কি সুর ?

সেই-ই পরম সুখ—পরের দুঃখে কেন্দ্রে যে সুখ  
স্বমগ্ন।

সেই-ই গরীয়সী চিন্তা—পরের স্তব্ধের জন্ত চিন্তা  
করা।

সেই-ই পুণ্যকর্ম—পরের জন্ত সত্য, দুঃখ করা দূর।

সেই-ই শ্রেয় বশ্য—পরের প্রতি প্রীতি অকম্পাভরা।

সেই মহা দুঃখই স্বৰ্গ। সেই মহা দুঃখ—মহা সুখ।

সেই মহা স্তব্ধের কাছে স্বার্থের যা সন্তোষ—সে  
কতটুকু !

সেই মহা প্রীতির কাছে সূর্য্যোদয়ে শশধরের মত  
স্বার্থ পাণ্ডু হয়ে যায়—সে আলোকে বিধে সমুদ্র  
হেয়, কুর্বাণ অপরিত্র যা’—সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বলিত হয়।  
ক্রন্দন নির্বাক হয়ে যায়, ও স্বয়ং যুজ্য হয় সে  
পদানত।

প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪

# কলক

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বাতাবি কুঞ্জে সন্ধ্যার বায় পুষ্পপরাগ-চোর—

কলকী মন চেয়ে দেখে আজ সন্ধ্যা মিলেছে তোর।

দিবা অবসান, রাব হল রাঙা

পাশ্চিমাকাশে নটকনা-ভাঙা ;

সজ্জননের যাত্রা। কছু সাজ সাজ করোছ মোর,

কুঞ্জহয়ারে বসে আঁচ একা কুন্তলগন্ধে ভোর।

আধকুটিল বাতাবিকুন্তমে কানন ভারিমা আছে,

কি গোপন কথা গুজার আলি ফাঁরছে ফুলের কাছে :

‘ফুটনোখ ফুলদলভাল

পুলক-পরশে উঠে হুলি’ হুলি’

গন্ধাভরা সন্ধ্যার বায় ফুল-পারিমল যাচে—

সঙ্কোচে নভ পুষ্পবালিকা, আঁতরি কিবে বা পাচে !

বেলা বয়ে যায়, উন্মাদ বায় আলি’ কচো বার বার

সন্ধ্যা হয় যে, অন্ধ কুন্তল খোল অন্তর-ধার।

মুকুল-গন্ধ অন্ধ বাতায়

কুঁড়ির বন্ধ টুটিবারে চায়,

লুটাইতে চায় সন্ধ্যার গায় কন্ধ আবেগ ভার,

বিকারিতে চায় চরণের পরে কোমার স্নানুয়ার।

মগ্নর পক্ষে সন্ধ্যা নামিল কাজল ভোরের আঁকা,

হয়ারে আঁতরি, অন্তরে বাধা, সম্ভব সে কি থাক’ ?

গন্ধে পাগল অন্তর যার

আবরণ মাঝে থাকে সে কি আর,

খুলি দিল হার, পরাণ তাহার পরাগ শিশিরের মাথা,

কুঞ্জ ঘোরিয়া আধারে ছাইল স্বপ্ন-পাখীর পাখা।

বাতাবি-কুঞ্জে সন্ধ্যার বায় পুষ্পপরাগ-চোর,

হা রে কলকী হৃদয় আমার, সন্ধ্যা মিলেছে তোর।

দূর দিগন্তে রাব হল সারা

অন্ধর ভরি কুটে’ উঠে তারা,

নব কুটিল নেবুর গন্ধে আঁসিল তন্দ্রা-ঘোর ;—

কলকী মন, মুগ্ধ হৃদয়—এ কি পরিণাম তোর।

প্রবাসী, কার্তিক, ১৩১৭।

## কাল রাতে বৃষ্টি

হয়ে গেছে

মনোরমা সিন্ধুরায়

কাল রাতে রষ্টি হয়ে গেছে। উজ্জল নিমল ভোর

বিবর্ণিত স্বাধীন সত্তার। সচ্ছ সেই আবরণে

অনাগত দিনের কামনা বার বার দেখা যায়।

ভবু হৃদয় কাঁদে আর আসে একান্ত স্মরণে

যে দিন গিয়েছে চলে নিয়ে তার স্বর্গসত্তার।

অবাসিত মোহভার। ‘তবু সে তো আছে অমলিন।

যাও, ফিরে যাও ভ্রাম, কছু নেই আকাজকা আমার

কোরে, মুক্তা, চুনি, পারা,

শোনো ভ্রাম কে উজ্জল দিন।

একন ভেঁটে চলে যাও আলোকিত করে এ জীবন।

নীলাকাশে বিতত বাসনা

দূরে মুছে নিয়ে গেছে কাল

আজ্ঞার রাঁচত ধ্বংস হারিয়েছে কেনো সেই মন॥

আর আমি নবতরো কোনো ফুল

ফোটাতে পারি না।

সব ফুল ঝরে যায়, শ্রামলতা ক্রমে শেষ হয়।

এ বিষাদ অব্যাহত। ভবিষ্যৎ করছে নির্ণয়॥

# সবটুকু মোছে নাকি

ককণাশয় বস্তু

বিকেলের ষোড়টুকু মুছে গেলে মাঠে মাঠে

কুকুড়া বনে,

সবটুকু মোছে নাকি,

কিছু সপ্ন, কিছু রক্ত থাকে না কি বাকি,—

জ্যোৎস্না হয়ে শেষ রাতে আকাশের

পাগুর নয়নে,

সপ্ন হয়ে, গন্ধে হয়ে বনে বনে গোলাপের

উত্তর ঘোষনে।

জীবনের সব কিছু মুছে গেলে সব কিছু

মোছে নাকি,

কিছু স্মৃতি, কিছু অর থাকে না কি বাকি ?

যে স্মৃতি হাঁসের মতো সময়ের গুল শক্তভায়

লতাপাতা খুলে খুলে একে বাধে

আশ্রয় বাধায়।

যে অর বকুল গাছে জ্যোৎস্না আঁকা ঘুম ভাঙা

রাঙের বেলায়

ডেকে যায় চোখ গেল, চোখ গেল, পাখি হয়ে

ককণ গলায় :

ব্যথাটুকু তার

খণ্ডিত চেতনায় আদিগন্ত উদাস বিস্তার।

খুল ফোটা জীবনের প্রথম প্রহরে

যে সপ্ন যে রক্ত ছিল, স্মৃতি হয়ে, অর হয়ে

জীবনের বাকিটুকু অধা দেয় ভরে।

সেই স্মৃতি, সেই অর

বসন্ত এনেছে কাছে, অদূর শক্ততা এক

জীবনের আলগাল

পার হয়ে চলে গেল দূর অরণো দূর।

— — —



# সেনেদের মাতৃভাষা

ব্রেনের বাদ্যকর

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

বহুদিন আগের কথা। জার্মানি দেশে ব্রেনের নামক শহরের কিছু দূরে একটি গ্রামে একটা বুড়ো গাধা থাকত। একদিন সে হুপুর বেলায় আশ্চর্যবলে বসে বসে ঝিমছে এমন সময়ে দেওয়ালের ওঁদিক থেকে তার মালিকের গলার আওয়াজ শুনতে পেল। সে কাকে যেন বলছে, “গাধাটা বেজার বুড়ো হয়ে গেছে। কোনই কাজে আর আসে না, কেবল খায় আর ঘুময়। কালকেই ভাবছি ওটাকে বিদায় করব।”

গাধাটা ঠিক করল যে পরদিন ভোরে সে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাবে। তার মনে পড়ে গেল যে, কাজেই ব্রেনের শহরে বাদ্যকরের অভাব কাজেই সে ঠিক করল যে, ওইখানে গিয়ে গান গেয়ে পয়সা উপার্জন করবে। পরদিন ভোরবেলা সে ঘুম ভাঙা মাত্র শহরের দিকে রওনা হলো।

কিছুদূর গিয়ে একটা কুতুরের সঙ্গে তার দেখা হলো। সেটাও মাঝে মাঝে তাদের গ্রামে যাতায়াত করত। কুতুরটা বলো “ভাই গাধা, আমার হৃৎকের কথা আর কি বলব। আমার বয়স হয়েছে বলে আমি আর এখন

শিকার করতে পারি না, কাজেই মালিক ঠিক করেছে যে আমাকে মেরে ফেলবে। তাই বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছি কিন্তু এখন ভাবছি কোথায় যাওয়া যায়।”

গাধা বলো, “আমিও বাড়ী ছেড়ে পালিচ্ছি। ব্রেনের শহরে শুনিছি বাদ্যকরের অভাব তাই সেইখানে যাচ্ছি গান গেয়ে কিছু রোজগার করবার আশায়। ভূমিও চলনা সেখানে।” কুতুরটা ঠিক করল যে সেও গাধার সঙ্গে ব্রেনে যাবে।

যেতে যেতে তারা একটা রোগা ভিক্রে লোমওঠা বেড়ালকে দেখতে পেল। সে বলো—“আমার বয়স হয়েছে আর দাঁত ভেঙ্গে গেছে কাজেই ইঁহর মাঝে পারি না, তাই গিন্নী আমাকে বিদায় করে দিয়েছে। কোথায় যাব তাই শাবিহ।”

অল্প হুজন বলে উঠল, “আমাদের সঙ্গে চলো। ভূমিও ব্রেনে গান গেয়ে পয়সা রোজগার করতে পারবে।” এসব কথা শুনে বেড়ালটাও জুটে গেল।

তিনজনে মনের আনন্দে গান গেয়ে নাচতে নাচতে চলেছে এমন সময় একটা খড়ের গাধার উপর থেকে

একটা মোরগ খুব জোরে জোরে ডেকে উঠল। চমকে গিয়ে তিনজনই ভিজ্ঞাসা করল, “কি হে, অবেলায় চোঁচাচ্ছ কেন?”

সে বলো, “বাবা, আজকের মত চোঁচিয়ে নি, কাল সকালেই তো গিন্নী আমাকে হাঁড়িতে চড়াবে বলেছে।”

গাধা বলো—“কি সরনাশ! তুমিও বরং আমাদের সঙ্গে ব্রেনে চলো—আমরা সেখানে গান গেয়ে বা বাজনা বাজিয়ে পয়সা উপার্জন করব। তাছাড়া তোমার গলার তো বেশ জোর, কাজেই তুমি প্রধান গায়ক হবে।”

মোরগটা এরপর খুব খুঁসি হয়েই তাদের দলে জুটে গেল।

যেতে যেতে ক্রমে রাত্রি গভীর হতে লাগল। তখনও ব্রেনে শহর বহদুর কাজেই তারা ঠিক করল যে সে রাত্তিরটা কললেই কাটাবে। সামনেই একটা বট গাছ দেখে গাধা ও কুকুর তার নিচে শুয়ে পড়ল আর বেড়ালও মোরগটা গাছে চড়ে ডালে বসে ঘুমবার ব্যবস্থা করল। কিন্তু ঘুম আর আসে না—প্রচণ্ড ক্ষিদে, কেবল খাবারের কথা মনে আসছে তাদের, এমন সময় মোরগটা চারিদিকে দেখে উপর থেকে বলে উঠল—“বন্ধুগণ, কিছু দূরে একটা বাড়ী দেখা যাচ্ছে। ভেতরে মনে হচ্ছে যেন আলো জ্বলছে—চলো আমরা ওখানে যাই কিছু খাবার জুটতেও পারে।

চারজন জড়াজড়ি় নিচে নেমে এলো—আর সেই বাড়ীটার দিকে দৌড়ে দৌড়ে এগোতে লাগল। বাড়ীর কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল চারজন লম্বা-চওড়া লোক, একটা বড় টেবিলের চারদিকে বসে ভূঁরভোজন করছে। তাদের হাতের কাছে বড় বড় লাঠি, কোমরে ছুরি গৌজা, কাপড়-চোপড় অতি অপরিষ্কার আর জোর গলার পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করে চলেছে। টোঁবলতরা নানা রকম মুখবোচক খাবার, মাছ, মাংস, কেক, মিষ্টি, সরষণ তো দেখাই যাচ্ছে, তাছাড়া আরও কত কি আছে তার ঠিক নেই। চার বন্ধুর জিব দিয়ে টস্ টস্ করে লাল ঝরতে লাগল।

অন্ধকণ পর গাধাটা কুকুরকে বলো—“বলো তো ভাই, কি করে খাবারগুলি পাওয়া যায়?”

কুকুর বলো—“ওদের কোন রকমে তড়াতে পারলে পাওয়া যাবে খাবার। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়।”—

বেড়াল বলো “সে তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে।—ওদের হাতের কাছে ওই লাঠিগুলো দেখেছ? ভেবে-চিন্তে এগোতে হবে বাবা।”—

মোরগটা বলো—“ভূঁরগুলোও বিশেষ সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না—গলার ছোঁয়ালেই শেষ হয়ে যাব।”

অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত তারা ঠিক করল যে কিছু চালাক করে ডাকাতদের সরাবার চেষ্টা করতে হবে।—গাধা তার সামনের পা-দুটি জানালার আলোর উপর রাখল, কুকুরটা গাধার পিঠের উপর চড়ল, বেড়াল কুকুরের ঘাড়ের লাফ দিয়ে উঠল, আর মোরগটা উড়ে গিয়ে বেড়ালের মাথায় চেপে বসল। তারপর যে যেমন ভাবে পারে চোঁচাতে আরম্ভ করল আর অন্ধকণের মধ্যে গাধার ডাক, কুকুরের “ঘেউ ঘেউ”, বেড়ালের “মে’ও মে’ও” আর মোরগের “কা, কা” চারিদিক ভরে গেল।

এই প্রচণ্ড অস্বাভাবিক আগ্রাসকে ডাকাতগুলি চমকে উঠল।—সঙ্গে সঙ্গে চারটি জন্তু কাচের জানালা ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।—টোঁবলটা ঘরে তারা চিংকার করতে লাগল ও পরে ঘুরে ঘুরে আসবার পত্রগুলি ধাক্কাধাক্কি করে এঁদিক প্রাঁদিক করে দিল। এই সব দেখে ডাকাতগুলি হতভম্ব হয়ে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেল।

তখন আর চার বন্ধুকে পায় কে? তারা টোঁবলে রাখা সব খাবারগুলি নিমেষের মধ্যে শেষ করে ফেলো। তারপর যে যেখানে ঘুমতে ভালবাসে, সে সেখানে জায়গা খুঁজতে লাগল বিশ্রাম করবে বলে। বেড়ালটা আগুনের ধারে গরমে আরাম করে শুলো, কুকুরটা দরজার পিছনে, গাধাটা উননের খড়ের গাদায় আর মোরগটা ছাদে চড়ে বসল।—কিছুকণ পর সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

গভীর রাতে ডাকাতগুলো আস্তে আস্তে জঙ্গল ছেড়ে বাড়ী ফিরে আসবে ঠিক করল। শীতের চোটে তাদের হাত-পা জমে গেছে আর ফির্দেও পেয়েছে খুব। বাড়ী পৌঁছিয়ে প্রথমেই তারা আগুন পোয়াবে ঠিক করল। ঘরে ঢুকেই প্রথম ডাকাতটা অন্ধকারে বেড়ালের চক্চকে চোখ দেখেই তাকে আগুন বলে ভুল করল। কাঁক দিচ্ছে সেখান থেকে আগুন ধরাবে বলে যেই না বেড়ালের চোখে গোঁচা দেওয়া অর্মান বেড়ালটা দ্যাস করে লাক দিচ্ছে ডাকাতের চোখমুখ নখ দিয়ে আঁচড়ে দিল।

বাথায় চিৎকার করতে করতে ডাকাতটা পালাতে গিয়ে দরজার পিছনে কুকুরটার ঘাড়ে পড়ল : সেটা তৎক্ষণাৎ তার পা কামড়ে ধরল। ডাকাতটা এবার ভীষণ জোরে “বীচাও বাঁচাও” বলে চৈচাতে লাগল। তার বন্ধুগুলি এই চিৎকার শুনে উদর পাসে পালাল। হুঁটো গিয়ে ঘুমন্ত গাধার ঘাড়ে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুপ ঘুপ পড়ে গেল, আর গাধাটা অর্মান বেগে গিয়ে তাদের দমাদম লাঞ্ছিত মারতে লাগল।

“যেহে ফেল্লো রে।” বলে সেই না সে হুঁজন চৈচাতে শুরু করল, অর্মান চতুর্থ ডাকাত পালিয়ে গিয়ে দেওয়াল বেয়ে ছাদে উঠতে লাগল। মোরগটা এই আওয়াজ পেয়ে গলা কাটিয়ে ডাকতে লাগল আর ডাকাতটা চমকে গিয়ে পা পিছলে নিচে পড়ে গেল। বাকি তিনটে ততক্ষণে পালিয়ে গেছে জঙ্গলে, এটাও কাদতে কাদতে তাদের পিছন পিছন পালাল। চার বন্ধু আবার যথাস্থানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে তারা বাড়ীটা ভাল করে ঘুরে দেখল। অনেক ঝাবার দাবার, কাপড় পয়সা ইত্যাদি সেইখান থেকে পাওয়া গেল কাজেরীদের এরপর আর কোন অভাব রইল না। এই বাড়ীতেই তারা থাকত খেতো আর মনের অনন্দে মাঝে মাঝে গান বাজনা করত। মাঝে মাঝে ব্রেমেন শহরের তাদের ডাক পড়ত কিন্তু কোনদিন তারা এই ঘটনাটি ভুলতে পারেনি, বিশেষ করে তাদের চার বন্ধুর প্রথম গানের মজলিশের কথা।





# “বঙ্গভূমি” নাম হবে কেন ?

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

স্মারশাস্ত্রে “আপুবাধ্য” বা “authority”কেও অল্পতম “প্রমাণ” বলে গণ্য করা হয়। আইনজীবীরাও বিখ্যাত বিচারকগণের “রায়”কে “প্রমাণ” বা “নজীর” রূপে উত্থাপন করেন।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা বাঙ্গালীরা এবং ভারতীয়রাও কোনো কোনো বিষয়ে “authority” বলে মানতে পারি।

যে রবীন্দ্রনাথের রচিত দুটি গানকে আমরা ভারত ও বাংলাদেশের অধিবাসীরা জাতীয় সঙ্গীতরূপে স্বীকার করে নিয়েছি—সেই রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে (১৩০২ হতে ১৩২৯ বা ১৮৯৫ হতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত) তাঁর কাব্যে “বঙ্গ”কে “বঙ্গভূমি” নামেও চিহ্নিত করে গেছেন :—

(১) “বঙ্গভূমির প্রতি” (কাঁবড়া)

রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম, পৃ-২০৬।

(২) “আত্মান গীত”

“বিশ্বের মাঝারে টাই নাট বলে

কাঁদতেছে বঙ্গভূমি।” ঐ, ১ম, পৃ-২০৭-২১১।

(৩) “বঙ্গমাতা”

“পুণ্যে পাশে দুঃখে স্নেহে পতনে উপানে

মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে

হে স্নেহাঙ্ক বঙ্গভূমি—ঐ, ১ম, পৃ-৫৬১।

রচনাকাল, ১৩০২ বা ১৮৯৫।

(৪) “দুর্ভ বিধা জমি”

“নমোনমো নমঃ স্নানরী মম জননী বঙ্গভূমি।

গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।

ঐ, ১ম, পৃ-৬৭৮।

রচনাকাল, ১৩০২ বা ১৮৯৫।

(৫) “সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত”

“...কোঁকিলের কুহরবে শিখীর কেকায়

দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত ; কাননের পল্লবে কুহুমে

রেখে গেলে আনন্দের ঝিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে

যে তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধস্বার রাতি-অভিযানে—”

ঐ, ২য়, পৃ-৩২২

রচনাকাল, ১৩২৯ বা ১৯২২।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী। মাদুরের শ্রুতি। যারা তাঁকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানতেন, তাঁরা লক্ষ করেছেন—অতি স্নন্দর স্নন্দর নামের তিনি আবিষ্কারক। বালক বালিকা, তরুলতা, পুষ্প, পশুপক্ষী, বিজ্ঞানাম্বর, নানাজাতীয় প্রাণিষ্টান ও অহুষ্টান, পল্লী, সরণী, বাসগৃহ প্রভৃতিকে তিনি মনোহর, মধুর নামে অভিহিত করেছেন।

“বঙ্গভূমি” নামটি স্নন্দর মনে না হ’লে দীর্ঘ সাতাশ বছর ধরে তাকে তিনি তাঁর কাব্যে স্থান দিতেন না। প্রথমদিকে ব্যবহার করে কানে বাজলে পরে পরিত্যাগ করতেন।

তাঁর কান যে শব্দ-স্বাক্ষর বিচারে কেমন তীক্ষ্ণ ছিল, স্মৃতি ও উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের সুরভাল নির্ণয়ে কেমন সূক্ষ্মপূর্ণ ছিল, তা যারা তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন, তাঁরাই জানেন।

তাঁর সেই অসাধারণ কণ্ঠে দীর্ঘ সাতাশ বছর কাল, বা স্মৃতি ও স্মরণের লেগেছে, সেই “বঙ্গভূমি” নাম পশ্চিমবঙ্গের জন্তে আমরা নির্ভয়ে এবং নিঃসঙ্কোচে রাখতে পারি।

বাঙ্গালী এবং ভারতবাসীর কাছে আমরা এই নতুন নামের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথকেই প্রমাণ স্বরূপ খাড়া করতে পারি।

# আমেরিকার উপর ভারতের প্রভাব

( রামমোহন হুইতে রবীন্দ্রনাথ )

ভারত ও আমেরিকার মধ্যে ভাবের ও বাণিজ্যিক আদান প্রদান চলছে অদীর্ঘকাল ধরে। ১৭৮৭ সাল থেকেই তা শুরু হয়েছে। জর্জ নামে একটি মার্কিন পণ্য-বাণী জাহাজ ১৮১৫ থেকে ১৮০৭ সালের মধ্যে আমেরিকা ও কলকাতার মধ্যে একশবার যাতায়াত করেছে। ঐ সময়েই বস্টনে প্রকাশিত হয়েছে রামমোহন রায়ের “প্রিন্সিপাল অব জীসাস : এ গাইড টু পীস অ্যান্ড হ্যাপিনেস।” “ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রামমোহনের রচনা ও ভারত সম্পর্কে অন্তান্ত রচনার মাধ্যমে মার্কিন দার্শনিক এমাসন, ওয়েন, থোরো, কবির হুইটম্যান, কপকিনস ল্যানম্যান, সংস্কৃত পণ্ডিত হুইটনী ভারতীয় ভাবাদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর জীবনের এক সফটময় পর্ষায়ে থোরোর আইন অমান্ত শীর্ষক নিবন্ধ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। পারস্পরিক ভ্রমপ্রাকৃতিকতা ও ভাবের আদান প্রদানের ফলে দুই দেশের মধ্যে গড়ে উঠেছে সৌহার্দ্যের সেতু। প্রাচ্যবাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বহু মনীষী ভারত থেকে আমেরিকা সফরে এসেছেন। ১৮৮৩ সালে এসেছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার। আর তার দশ বছর পরে এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ঐরা দুজনেই শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে ভারতের বাণী প্রচার করে গিয়েছেন।

তারই প্রায় ২০ বছর পরে এলেন রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে। ভারতের উপনিষাদক আদর্শ প্রচার ও শান্তিনিকেতন এবং বিশ্বভারতীর জ্ঞান অর্থ সংগ্রহই ছিল তাঁর সফরের উদ্দেশ্য। তিনি মোট পাঁচবার আমেরিকা সফরে এসেছিলেন। প্রথম তিনি যখন সেদেশে যান তখন কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে পড়ে নি, পশ্চিমী হুনিয়ার তিনি প্রায়

অপরিচিত। আমেরিকার “পোয়েট্রি” নামে একটি কাব্য সাময়িকী কবিকে পশ্চিমী হুনিয়ার সামনে তুলে ধরে। ঐ পত্রিকার ১৯১২ সালের ডিসেম্বর মাসের সংখ্যায় গীতাঞ্জলির ছটি কাব্যভার প্রথম ইংরেজী অনূবাদ প্রকাশিত হয়। বিশ্বখ্যাত মার্কিন কবি এডরা পাউণ্ড এই সকল কাব্যতা পড়ে মন্তব্য করেন “এসকল কাব্যভার রয়েছে এক নিস্তরঙ্গ সূক্ষ্মতা, যেন সঙ্গী নবীন গ্রীসকে আবিষ্কার করলাম।” প্রথমবার আমেরিকায় এসে তিনি নিউইয়র্ক, রোচেস্টার, হার্ভার্ড ও শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন। এই সকল বক্তৃতা কবির সাধনা এত্রে সংকলিত হয়েছে।

১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, প্রায় এক বছর পরে কাব্য লন্ডন হয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। ফিরে আসার দুমাস পরেই পেলেন তাঁকে বিশ্ববিখ্যাত নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করার সংবাদ। এই আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করার পর কবি “পোয়েট্রি” পত্রিকার সম্পাদিকা হ্যারিয়েট মন্রোকে লিখলেন, “আমি এই সম্মানকে সর্গোরবে বচন করব, এই সত্যকে স্বরণ করে উল্লাসবোধ করব যে মানবজাতির রক্তমালায় প্রাচী ও প্রতীচী হল যুগল মাণর মতো। সারাক্ষণই পরস্পরকে স্পর্শ করেছে।”

পরের বছর বাধল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রক্তমালায় পড়ল দীর্ঘ অন্তর ছায়া। কবি তখন থেকেই দেশে দেশে প্রচার করেছেন, “প্রাচ্যকে গ্রহণ করতে হবে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, কারিগরি আর সাংগঠনিক দক্ষতা, পাশ্চাত্যের আত্মার পুনর্জাগরণের জ্ঞান প্রয়োজন প্রাচ্যদর্শনের আধ্যাত্মিক উৎস থেকে জীবনী গৃহণার।” আবার তিনি এলেন আমেরিকায় ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর

মাসে। ১৯১৭ সালের জাহুয়ারী মাস পর্যন্ত অর্থাৎ চারমাস রবীন্দ্রনাথ সেবার সে দেশে কাটিয়ে গেছেন। ঐ সময়ে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও প্রোভাদের তিনি সরাচিত কাবিতা ও গল্প পড়ে শুনিয়েছেন। নিউইয়র্কের কাণেগী হলে স্তাশনালিকম সম্পর্কে একটি ভাষণে কবি নেশন টেটের নিয়মানুগ ও বঙ্গ শোভকে ধিকার দিয়ে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন, নিন্দা করেছেন যান্ত্রিক যুগের শৃঙ্খল পরিণতির। দ্বিতীয় বারের সফরের সময়ে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এই সতর্কবাণী সম্পর্কে সকলেই যে তাঁর প্রতি প্রশংসায় মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল, তা নয়। বড় পত্রপত্রিকায় বিরূপ মন্তব্যও করা হয়েছিল। কবি সেবার শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমেরিকার একপ্রান্ত থেকে অল্পপ্রাপ্ত পয়স্ব বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছেন। দ্বিতীয় বারের সফর খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী গড়ে তোলার আত্মনিয়োগ করেন। বিশ্বভারতীর জন্ম অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম সফরে বেরিয়ে পড়লেন। ইংলও আর ফ্রান্সে কিছুকাল কাটিয়ে নভেম্বর মাসে এলেন আমেরিকায়। বিশ্বভারতীয় কলনী ও আদর্শ তখন সবারই ভাল লেগেছিল। নিউইয়র্কের মিসেস উইলার্ড স্ট্রেট বাৎসরিক ৫০০০০ টাকা দিতে রাজী হলেন। তাঁর এই অর্থ সাহায্যেই ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ব্রিনকেতন। কিন্তু মহাযুদ্ধের পর মার্কিন জনসাধারণের মনে তখন আবির্ভাস ও বিদ্বেষ, বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ে উঠেছে তারা। কবির আত্মানে তারা ভেমন সাড়া দেয়নি, মার্কিন সাহিত্যিক গোল্ডস্টীও কবি সম্পর্কে ভেমন উৎসাহ দেখাননি। এবারের সফর কবিকে হতাশ করেছিল অনেকখানি। তখন কবি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন “এ দেশে আমি সময় কাটাচ্ছি যেন এক বিষাক্ত রূপ দুর্গের কারাগারে বসে, মনের কোন খোঁষাক নেই আমার।” এ সময়ে ভারতে চলছে

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ অসহযোগ আন্দোলন। আর একটি চিঠিতে তিনি লিখলেন, “ভাগ্যের এমনই পরিহাস আমি যখন এপারে বসে প্রাচ্য আর পশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয়ের আবেদন জানাচ্ছি তখন সাগরের ওপারে বলছে অসহযোগিতার কথা।” ১৯২১ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি ইয়োরোপ হয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন এবং ইয়োরোপে পেলেন বিপুল সমর্থন।

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যে, “এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে বর্তমান যুগোপযোগী কর্মসাধনের জন্য বিশ্বদেবতা পশ্চাত্য বীরদেরই বেছে নিয়েছেন, তাদের কাছে তুলে দিয়েছেন অস্ত্র, দিয়েছেন ধর্ম। কিন্তু আদর্শের প্রতি যে ঐকান্তিক আস্থা থাকলে শয়তানের প্রলোভন ও উৎকোচকে জয় করা যায়, তা কি তাদের আছে? সমগ্র বিশ্বকে আজ তুলে দেওয়া হয়েছে পশ্চাত্যের কাছে। মাত্রের মহান সৃষ্টিকাজে যদি সে ব্যবহার না করে বিশ্বকে, তবে সে তার ধ্বংসকেই ডেকে আনবে।”

এর আট বছর পরে ১৯২৯ সালে কানাডার ভ্যানকুভারের স্তাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে তিনি আসেন আমেরিকায়। কিন্তু ১৯২৭-২৮ সালের প্রমণের তুলনায় তাঁর এবারের অভিজ্ঞতা তিক্ততর। লস এঞ্জেলসের বক্তৃতা শেষ করেই পরবর্তী প্রমণসূচী বাতিল করে দিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে এলেন।

১৯৩০ সালে শেষবারের মতো রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম যান। সে বছর তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায়ও গিয়েছিলেন, মস্কোতে দু সপ্তাহ ছিলেন তারপর ইয়োরোপ থেকে জাহাজযোগে পঞ্চম ও শেষবারের মতো যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করেন। ওয়াশিংটনে পৌছবার পরেই হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হভারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। নিউইয়র্কে গঠিত হয় রবীন্দ্র অভ্যর্থনা সমিতি। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কুলিজ ছিলেন সেই সমিতির সদস্য,

সভাপতি হেনরী মর্গেনথ। সমিতির পক্ষ থেকে কবির প্রতি সমর্থনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে যে ভোক্তাভার আয়োজন করা হয়েছিল নিউইয়র্কের গবর্নর ক্রাফলিন ডি ক্রজভেল্ট সহ তাতে পাঁচশরও বেশী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ভোক্তাপদ সাদৃশ্যের পর হেনরী মর্গেনথের ভাষণের উত্তরে কবি বলেছিলেন, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষের পক্ষে পরস্পরকে আরও ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার। ভারতবর্ষে যাবার পথ সন্ধান করতেই কলম্বাস একাদিন আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেছিলেন। পশ্চিমের পক্ষে ভারতযুগী সেই অসমাপ্ত অভিযানকে সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন।”

এর এক বছর পরে ১৯১১ সালে রবার্টনাথ আমেরিকা সম্পর্কে শান্তিনিকেতনে বলেছিলেন : “আমেরিকার ধনোৎপাদন শক্তি তার অন্তর্দৃষ্টিকে কোন রকম ব্যাহত না করে তার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। কৃষ্টিধর্মী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। এ গণতন্ত্র থেকে আসবে মানুষের আত্মার প্রকৃত স্বাধীনতা। মানবতার কল্যাণে সে কাজে লাগাবে তার পার্থিব সম্পদকে, বর্নাদিকে করবে জয়-বেঁচে থাকবার বৈজ্ঞানিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে সবাইকে এবং আমেরিকার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রচারিত হয়ে তার ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে একাদিন সকলের কল্যাণ সাধন করবে। আধুনিক বিশ্বে একমাত্র আমেরিকাই যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে চিন্তা করে আধ্যাত্মিক পরিণতির কথা। পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না এমনটা।”

### সর্বজনের কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান

১৮৯০ সালে আমেরিকায় প্রখ্যাত মার্সিপেজ হার্পাস মানবলী একটি প্রশ্ন করেছিল : এখন থেকে একশ বছর পরেও কি ওয়াল্ট হুইটম্যান পৃথিবীর অল্পতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় কবি বলে পরিগণিত হবেন, না বিশ্বাসিত অতল আধারে চিরকালের জন্য তলিয়ে যাবেন ?

পৃথিবীর বিখ্যাত সমাজে শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে হুইটম্যান তখন সর্বত্র সুপরিচিত। সেদিন ঐ প্রশ্নটি পড়ে যু

হাসিতে কবির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর দিনালিপিতে লিখেছিলেন, “এ একটি খাঁখাঁর মত প্রশ্ন, একশ বছর পরে কালের কটিপাথরে এই কবির যাচাই হবে।” এর দুবছর পরে ১৮৯২ সালে কবি পরলোক গমন করেন। শত বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। আমরা দেখেছি পৃথিবীর মানুষ কবিকে ভুলে যাওয়া তো দূরের কথা, তিনি তাদের কাছে ক্রমেই অধিকতর ভাব্য করে উঠেছেন, তাঁর খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়ছে দেশ হতে দেশান্তরে।

আমেরিকার প্রখ্যাত দার্শনিক র্যালফ ওয়ালডো এমার্সন হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ “লিভস অব এ্যাস” সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন “এ যেন গীতা ও নিউইয়র্ক তেরাল্ডের সম্মিলন।” আর তেনার ডেভিড বোরো বলেছিলেন যে এই কাব্যের সঙ্গে প্রাচ্যদেশীয় মনোভাবের অঙ্গুলীমল রয়েছে।

হুইটম্যান কাব্যে পৃথিবী সম্পর্কে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত হয়েছে তার সঙ্গে ভারতীয় বেদান্তিক চিন্তাধারার যুবলীমল দেখতে পাওয়া যায়। বেদান্তবাদীদের মত হুইটম্যান উপলব্ধি করেছিলেন যে, বোধিদেয় সত্যকে জানতে হয়, বোধিদেয় সত্যাত্মসন্ধানের পথ। তিনি বোধকে আত্মার দৃষ্টি বলে অভিহিত করেছেন। কিভাবে আমার আত্মার রসাতল ও নায়ার আবরণ উন্মোচন করে আত্মরূপকে উপলব্ধি করতে হয় তা তিনি জানতেন। জনৈক বিশিষ্ট মার্কিন দার্শনিক এপ্রসঙ্গে বলেছেন, “আমার মনে হয় একজাই তাঁর ভাব-ধারা তাঁর ভাষা হয়েছে ভারতীয়দের মনের মতো। তিনি যে এই দেশে এতখানি জনপ্রিয় তার মূলে তাঁর এই ভাবধারাও ভয়তো খাঁজিকটা রয়েছে।”

হুইটম্যান তাঁর কাব্যে গেয়েছেন মানুষের ও স্বাধীনতার জয়গান। প্রচণ্ড আশাবাদ, বিষাক্ত দৃষ্টি, মৈত্রীভাবনা, নানা দেশের ও সমাজের মেলবন্ধন ও ঐক্যবোধ। গণতান্ত্রিক আদর্শবোধই তাঁর কাব্যকে করেছে মহিমাযুক্ত, করেছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সব মানুষই

সমান এই কথাই তাঁর কাব্যে অন্তর্নিহিত। এইখানে তিনি পাঁচি আর্মোরকান।

১৮১১ সালের ৩১শে মে আমেরিকার লং অ্যায়ল্যান্ডের ওয়েস্টহিলসের একটি খামারে ওয়ালটার হুইটম্যান জন্মগ্রহণ করেন। তরুণ বয়সে তিনি ছাপাখানার মুদ্রাকর, সাংবাদিক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। ১৮৩১ থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত ককলীন এবং নিউইয়র্ক সিটিস্থিত বহু সংবাদপত্রে তিনি কাজ করেছেন। এই সময়ে তিনি খা কিছু লিখেছেন তার আশকাংশই ছিল গল্প রচনা। তখন মিতাচার সমর্থন করে তিনি “ক্রাকলিন ইভানস” নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, এটি প্রকাশিত হয় ১৮৪২ সালে।

১৮৪০ দশকের শেষের দিক থেকে ১৮৫০ দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত হুইটম্যানের জীবনেও তাঁর চিন্তা ও ভাবধারার আসে বিরাট পরিবর্তন। তাঁকে দেখা যায় সম্পূর্ণ এক নতুন মহানু কবিরূপে। তাঁর উল্লিখিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ “লিভস অব গ্র্যাস” প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালে। তখনই তিনি তাঁর নতুন নাম ওয়াল্ট হুইটম্যান গ্রহণ করেন।

মার্কিন দার্শনিক ও সাহিত্যিক এমাস’নই কবির জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। কবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “আমি তখন আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল ছিলাম, এমাস’নই আমাকে বাইরে টেনে আনলেন।” এমাস’ন ছাড়া তিনি তাঁর সাহিত্য রচনায় যে সকল সাহিত্যিকের রচনা থেকে সবচেয়ে প্রেরণালাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন থোরো, লোয়েল আর আছেন শেল্লিপয়ার। বাইবেলের প্রভাব ছিল তাঁর জীবনে। এই কাব্যগ্রন্থে কবি মানবিকতাবোধ, প্রেম, গণতান্ত্রিক আদর্শ ও মানুষের জয়গান গেয়েছেন, নিপীড়িত মানুষের মনে সঞ্চার করেছেন শান্তি, জ্বালায়েছেন আশার আলো। “প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া” শীর্ষক কাব্যে তিনি সমগ্র বিশ্বকে ডাক দিয়েছেন :

হে হৃদয় চলো ভারতে  
চলো সেই আদিম মননে  
শুধু দেশে দেশে কি সাগরে নয়  
সেই প্রথম দৃষ্টি সজীবতায়,  
জীবনবেদের সুকূল যেখানে জেগেছে  
সেইখানে প্রাণের তরুণ্যে  
উপলব্ধি খোঁজো এশিয়ার পুরণ কথার।

কেবল কাব্যজগতেই নয়, গল্পসাহিত্যেও চিরন্তন দাক্ষর্য্য রেখে গিয়েছেন হুইটম্যান। “স্পোর্সম্যান ডেক”, “ডাইরিজ এবাউট দি সিভিল ওয়ার” প্রভৃতি গ্রন্থ “লিভস অব গ্র্যাসের” ভূমিকা ইত্যাদি তাঁর রচিত উৎকৃষ্ট গল্পসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ১৮৬১-১৮৬৫ আমেরিকার যেরোয়া সংগ্রাম বা সিভিল ওয়ার কবিসত্তাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে এবং ১৮৬২ সাল থেকে কবি বিভিন্ন হাসপাতাল ও সৈন্য শিবিরে আহতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ঐ যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হয়, ঐ সকল কাব্য ঐ যুদ্ধের অভিজ্ঞতারই ফসল। ঐ সকল কবিতা প্রকাশিত হয় “ড্রাম ট্যাপ” নামক কাব্য গ্রন্থে। ১৮৬৪ সালে এই কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

ঐ সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন এব্রাহাম লিঙ্কন। কবির অসীম লক্ষ্য ছিল তাঁর উপরে। লিঙ্কন হত্যার পর কবি লিখেছিলেন, “যে স্বাধীনতা ও মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য লিঙ্কন জীবন বিসর্জন দিলেন তাঁর সেই আদর্শই একদিন দেশকালের সীমানা পৌরয়ে সমগ্রমানব জাতিকে একাবদ্ধ করবে।” এই মহানু যুক্তিদাতার প্রতি কবির অতুল্য “ও কাপটেন মাই কাপটেন” এবং “হুয়েন লিলাকস লাস্ট ইন দি ডোরহিয়াড রুমড” নামে দুটি আত্মস্মরণীয় কবিতায় নিবেদন করেন।

১৮৭৩ সালে ওয়াশিংটনে থাকার সময়ে তিনি পক্ষাঘাতে জন্ম হয়ে পড়েন এবং নিউজার্সির ক্যামডেনে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ১৮৯২ সালে ৭৩ বছর বয়সে তিনি সেখানেই পরলোকগমন করেন।

হুইটম্যান ছিলেন সর্বদেশের সর্বকালের কবি। জীবনের অপরাধে বিশ্বের সজ্জনকে তিনি এই বলে আশ্বাস করে গিয়েছেন :

“এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া  
মহাদেশবাসীরা যে যেখানে রয়েছ শোন  
আর শোন সমুদ্রের অসংখ্য দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের

মানুষেরা।

শোন অনাগত শতাব্দীর সকল মানুষ, তোমরা

প্রত্যেকে শোন,

তোমরা সবাই শোন। কাউকেই তোমাদের

আলাদা করে বলছি না, বলছি একসঙ্গে সবাইকে :

কামনা কর তোমাদের স্বাস্থ্য,

তোমাদের সুখের জন্য শুভেচ্ছা

আমার ও আমেরিকাবাসীদের পক্ষ থেকে।”

# রাজা রামমোহন রায়ের রচনার উদ্ধৃতি

ব্রজেননাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস  
সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত  
রামমোহন গ্রন্থাবলী ২২ইতে

রামমোহনের 'বেদান্তসার' প্রকাশিত হইবার  
কিছুদিন পরে—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে মুদ্রাজ্ঞয়  
বিদ্যালয়কার ইংরেজী অনবাদ সহ 'বেদান্তচন্দ্রিকা' প্রচার  
করেন। 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' রামমোহনের  
প্রতিবাদাত্মক যথেষ্ট প্রতিবাদ মুদ্রাজ্ঞয় এই গ্রন্থে করিয়া  
ছিলেন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ১ম পত্র—১২৮ পৃষ্ঠা ৪৪তে)

মুদ্রাজ্ঞয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চিত্ত বেদান্তচন্দ্রিকার গোড়ার  
কিয়দংশ

এক সময়ে বদিকান্ত সমায়াতে কলো যুগে।  
নারীতটন্তি কৌন্তেয় শিলোদরপরায়ণাঃ॥ ইত্যাদি  
শাস্ত্রের দৃষ্টান্তস্থলাভিষক্ত তত্ত্বজ্ঞানমানিরদের  
স্বপ্নোলকান্তি হুপ্রয়োজনাসমিক্তাৎপথ্যক বাক্যপ্রবল  
কল্পনার পুণ্ড্রার্থ ইহা লেখা যাইতেছে এমত কেহ মনে  
করও না। যেহেতুক বিশিষ্টাংশিষ্ট শিষ্টেরদের সে  
কথা লক্ষ্যই নহে তবে যে এ গ্রন্থ রচিত হইতেছে বিস্তর-  
মাতা-পিতৃক আবিগীত শিষ্টেরদের যদ্যাপ সমজ্ঞাত ও  
কুল ও আশ্রমবিধিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের কারণশত্বতেও অন্তথা  
কখন হইতে পারে না এ নিশ্চয়ই আছে তথাপি এতদেশে  
বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য প্রযুক্ত জনয়িত কুয়দনাশিঃ  
যুক্তবকো হি বালমৎজানান্ ত্রৈলোক্যার্থ গায় বকমুণ্ডেরদের  
বচনে পরমার্থপ্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্রে আনাহা না হয়  
কেবল এই তাৎপর্য্যেতে বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত  
সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে ॥

হে শিষ্টসম্মানেরা ইদানীন্তন রাগাক্ত তত্ত্বজ্ঞান  
মানিরদের উপদেশকে বৈদ্যপুত্রের নেত্রযোগীর প্রতি

উপদেশের গায় জানিও যেমন এক বৈদ্যকৃত ঔষধকটাক্ত  
নেত্রযোগীকে অর্ষাচিকৎসাপ্রকরণীয় নেত্রযোগে সমুৎপরে  
কর্ণে হিহ্বা শুদং দহেৎ। এই বচনের প্রকরণাদি  
জ্ঞানভাবপ্রযুক্ত তাৎপর্য্যপরিজ্ঞানে যথাক্রমার্থানুসারে  
নেত্রযোগীতোঁচিকৎসোপদেশ করিয়ানেত্র-জ্বালা নিবৃত্তি  
কি করিবে অধিক জ্বালায় যদি করিয়া উপহাসসম্পদ  
হইয়াছিল। অতএব প্রীতি স্থিতিতে কহিয়াছেন  
তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা ও শ্রোতা ও শুনিয়া বোদ্ধা এমন  
পুরুষ অতি দুর্লভ কিন্তু কাপটিক তত্ত্বজ্ঞানীঃ অনেক।  
তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীরদের হাটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান এই লৌকিক  
গাথার গায় যে অসহুপদেশ তাহাতে আত্মা করিয়া অন্ধ  
গোলাঙ্গুল ভায়ে নষ্ট হইয়া। যেমন পশুরগৃহে স্তম্ভপ্রাপ্যর্থে  
পশুরাগমনেচ্ছ কোন অন্ধ ব্যক্তি পশুর-গ্রামপ্রান্তে  
দৃষ্ট কোন গোলকে পশুরগৃহে জিজ্ঞাসা করিয়া  
জ্ঞান্য বাক্যে দৃঢ়তরাস্থিতে পশুরগৃহোপুচ্ছ  
দৃঢ়স্থিতিতে ধরিয়া পশুরগৃহে গন্তকাম হইয়া আকষণ ও  
পথগিত কটকশব্দবোধবোধ ও পাদপ্রহারেতে ছিন্নাভয়  
ভক্ত হইয়াও তৎস্বপ্নপ্রত্যাশাতে গোপোপদিষ্ট গোপুচ্ছ-  
ধারণ ভাগ না করিয়া রাজপ্রথমভাগে পশুরবিক্রীণীতে  
উপাশ্রুত হইয়া গোচোরজ্ঞানে পশুরশ্যালকাদি-  
কৃতক মুষ্টিঘাটপ্রকারে চূর্ণাক হইয়াছিল। হে শিষ্ট-  
সম্মানেরা তোমরাও তাদৃশোপদেশ গ্রহণে তাদৃশ দ্রবস্থা  
প্রাপ্ত হইও না সর্বপ্রথম পিতৃপিতামহক্ৰমাগত কুলমণ্ড্যাদি  
লজ্জান করিও না নৈসর্গিক প্রথমপ্রমাদকরণপাটি  
বাবিপ্লিষ্টাদোষভূত্যাংশিষ্ট পুরুষেরদের প্রীতিস্থিতি-  
বিকল স্বদুর্লভকল্পিত বাক্যে অন্যায় করিয়া তদোষ-  
চতুষ্টয়গন্ধমাত্রশূন্য পরমেশ্বরের বাক্যে ও বেদবাস  
মরাদির তত্ত্বলবাক্যে প্রজ্ঞা করিয়া তত্ত্বপাত্রব্যখ্যাভগবৎ  
শকরাচার্য্যাদিবচনানুসারে তত্ত্বশাস্ত্র তাৎপর্য্যার্থব-

ধারণ ও ভাবিতাহুষ্ঠান করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখ সম্পাদন করত পুরুষার্থচর্চায়ভাগী হইয়া লোকে সংপুরুষরূপে বিখ্যাত হও।

(রামমোহন প্রবাসী—১ম খণ্ড, ১:১ পৃঃ)

### মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত বেদান্তচন্দ্রিকার

#### শেষের কিয়দংশ

যদি বল আমি তাদৃশ অদ্বৈতজ্ঞানী হই এমন কিহও না তুমি তাদৃশ নও গীতাতে জীবমুক্তিববেকেতে তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীর লক্ষণ কিহিয়াছেন তাহার গল্পমাত্র স্পর্শ তোমাতে নাহি বরং বিরুদ্ধ অনেক সংপূর্ণ লক্ষণ আছে যেহেতুক তোমারদের লোকৈষণা ও বিস্ত্রেষণা ও পুত্রৈষণা ও শ্বশুরচন্দন-বর্নিতাদি ভোগবাসনা আছে এ সকলের মধ্যে একেকের থাকাতেও তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্কুরও হইতে পারে না যে বৃক্ষের কোটরে অগ্নি থাকে তাহার কি মঞ্জরী হইতে পারে সে যে আপন ভস্মীভূত না হয় সেই যথেষ্ট যদি বল আমার মনে কোনও বাসনা নাহি বটে তুমি এমন ভাল ভাল এমন পুরুষ পড় হুগ্গভ পাতঞ্জল দর্শনে নির্দিকল্প-সমাধির উত্তমাদিকারী এতাদৃশ পুরুষকেই কিহিয়াছে। তবে তোমারো নিম্নকল্প সমাধি বড় মূলভ। তাহা করিয়া দ্বৈতমাত্রজ্ঞানশূন্য হইয়া অদ্বৈতকরসঙ্গেরে মগ্ন হইয়া থাকি ভালমানুষেরদের সন্তানগুলি একটা পাউক অনাধিকারচচ্চা বা ভোমনা কেন করো॥ অনাধিকার-চচ্চা যে করিয়াছিলো ও তাহার যে প্রতিকল পাঠিয়াছিলো তাহা কি ভোমনা শুন নাই আপনার চক্ষুর চৌকি দৌধিতে পায় না পরের চক্ষুর ধূলি তুলিতে চায়। পরমহংস পরিব্রজকাচার্য্য হইতে মনে করে আর যদি বল সাধনদশাতেই বিহিতাহুষ্ঠানে থাকা সিদ্ধদশাতে নয় তবে তোমরা তত্ত্বজ্ঞানসম্প্রদায়েতে সিদ্ধিদশা যাহাকে বলে তাহাই কি আবিহিতাহুষ্ঠান করবার জলে চাও। দেহপাত হইলে সিদ্ধিশ্রী হইলেন ইহাই কথা সম্প্রদায়সিদ্ধ আছে দেহ বিদ্যমান জীবমুক্তিদশাকেও সিদ্ধিদশা কথা যায় জীবমুক্ত পুরুষ গীতোক্ত লক্ষণ দ্বারা জানা যায় এতদ্ব্যতিরিক্ত

যে যে দশা সে সকলিই সুমুখুর সাধনশা। অভাব সে সকল দশাতে নিষিদ্ধাচরণ পরিবর্জনপূর্বক বিহিতাচরণের আবশ্যক।

পরমার্থদর্শী ধার্মিক সংপুরুষেরদের নির্মলজলবদ-বুদ্ধিতে বেদান্তাসিদ্ধার্থ বিস্তারার্থে তৈলকণাৎ বেদান্ত-সিদ্ধান্তলেশমাত্র প্রক্ষেপ করা গেল আর যেমন যণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতিযত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমন শাস্ত্রাসিদ্ধান্ত নিত্যন্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ব বদরীফলবৎ বাক্যেতে বদ্ধ হইলেই থাকে। আরো যেমন রূপালকারবতী সাধন্য জ্বর হৃদয়ার্থবোদ্ধা অচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর সন্দর্শনে পরামুগ্ধ হন তেমনি সাধন্য শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষায় হৃদয়ার্থবোদ্ধা সংপুরুষেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খল লৌকিক ভাষা শ্রবণ-মাত্রেতেই পরামুগ্ধ হন।

(রামমোহন প্রবাসী—১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৭১)

—২৭—

### ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার (রামমোহনের প্রত্যুত্তর)

#### ভূমিকা

১৩৭১ সৎ। রামমোহনপাষ্য ভট্টাচার্য্যের বেদান্তচন্দ্রিকা লিখিবাত্তে এবং তাহার অন্তর্গতাদিগের ঐ প্রস্তাবিত কথাতে অন্তঃকরণে যথেষ্ট হর্ষ জাগিয়াছে যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অন্তর্শীলনের দ্বারা সকল শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ যে পথ তাহা সমসাধারণে প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং কোন পক্ষে নয় আর প্রতারণা ও স্বার্থপরতা আছে তাহাও বিদিত হইতে পারে এবং ইহাও একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টাচার্য্য একবার প্রবৃত্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত্ত হইবেন না অভাব দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার উদয়ের প্রতীক্ষাতে আমরা রহিলাম। কিন্তু তিন প্রকারে অন্তঃকরণে বেদ জন্মে প্রথম এই যে সংস্কৃত ভাগ্য করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করবার তাৎপর্য্য এই যে সমসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ় সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্বক দিয়া গ্রন্থকে হর্ষম করা কেবল লোকদে

তাহার অর্থ হইতে বকনা এবং তাৎপর্যের অন্বেষণ করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্তচাক্ষিকাকে প্রথম বেদান্তচাক্ষিক হইতে অগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য লিখেন যাগাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয় ॥ দ্বিতীয় বেদান্তচাক্ষিক সাভ্যটিপুষ্ঠ তাহাতে অভিপ্রায় করি যে বেদান্তের আট নয় সূত্রের অধিক নাই আর বেদের দুই তিন প্রমাণ লিখিয়া থাকিবেন অধিকন্তু ওই সকল সূত্র কোন অধ্যায়ের কোন পাদের হয় তাহা লিখেন না এবং বেদান্তচাক্ষিকার মঙ্গলাচরণীয় প্রকৃতি শ্লোকসকল কোন প্রস্তর হয় তাহা প্রায় লিখেন না অতএব নিবেদন দ্বিতীয় বেদান্তচাক্ষিকাতে যে সূত্র এবং শ্রুতি আর স্মৃতিাদির প্রমাণ ভট্টাচার্য্য লিখিবেন তাহার বিশেষরূপে নিদর্শন যেন লিখেন। তৃতীয় বেদান্ত চাক্ষিকার প্রথমে লিখেন যে এ প্রস্তর কাহার ভাষা বিবরণের উত্তর দিয়াছে তাহা লেখা যাইতেছে এবং নতঃ অর্থ প্রথম অর্থাৎ প্রাচীন বেদান্তের অগ্রাহ্যনামক অমুরেরা ইত্যাদি উক্তির বিবরণ লিখিয়াছেন আর হানে ইন্দোয়ানি আমরা কদাপি কোনো প্রে লিখি নাই এবং স্বীকার করি নাই তাহা আমাদের মত হয় এবং জানাইয়াছেন অতএব তৃতীয় প্রার্থনা এই যে শাস্ত্রার্থের অমূল্যলনে সত্যকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় বেদান্তচাক্ষিকাতে যদি আমাদের লিপিত মতকে ভট্টাচার্য্য দূষিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহার পুষ্ঠা এবং পংক্তির নিদেশপূরক লিখিয়া যেন দোষ ছেন তাহা হইলে বিজ্ঞলোক দোষাদোষ অনায়াসে দৃষ্টিতে পারিবেন। ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রলাপে হুঙ্কার না করেন এ প্রার্থনা রখা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্তরা প্রায় হয় না যদি ভট্টাচার্য্য কৃপাপূরক দ্বিতীয় বেদান্তচাক্ষিকাকে পূর্বের জায় হুঙ্কারো পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেষ্ট ল্লাখ্য করিয়া মানিব হইত।

(রামমোহন প্রেছাবলী—১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৫, ১৫৬)

### প্রত্যুত্তরের অংশবিশেষ

.....এখন ভট্টাচার্য্য বেদান্তচাক্ষিকাতে যে সকল যোগ্যযোগ্য প্রস্তর লিখিয়াছেন তাহার উত্তর একপ্রকার

দেয়া যাইতেছে। ১৭ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তিতে ভট্টাচার্য্য প্রস্তর করেন “যদি বল আমি তাদৃশ বটি, তবে ভূমি যার-দিগে স্বীয় আচরণ করণে প্রবর্তাইতেছ তাহারও সকলে কি রামদেব কপিলাদির জায় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াই ব্রহ্মসাক্ষ্যকারবান হইয়াছে” ইহার উত্তর পূর্ব পূর্ব যোগীদের ভুল্য হওয়া আমাদিগের দৃষ্টি থাকুক ভট্টাচার্য্য যেরূপ সংকল্প গণিত জাতিও আমরা নহি কেবল ব্রহ্মসাক্ষ্য তাহাতে যেরূপ কর্তব্য শাস্ত্রে লিখিয়াছেন তাহার অনুষ্ঠানেও অপত্তি আছি ইহা আমরা ইশোপনিষদের ভূমিকাতে ১৭ পৃষ্ঠের ২ পংক্তি অবধি অঙ্গীকার করিয়াছি অতএব অঙ্গীকার করিলে পরেও ভট্টাচার্য্য যে এরূপ শ্লোক করেন সে ভট্টাচার্য্যের মহত্ত্ব আর আমরা অঙ্গকে বিরুদ্ধ আচরণে প্রবর্ত করাইতেছি ইহা যে ভট্টাচার্য্য করেন সেও ভট্টাচার্য্যের সাধুতা। এ প্রমাণ বটে যে বেদান্তের ও ঈশাদি উপনিষদের বিবরণ সংক্ষেপে সাধানুসারে আমরা করিয়াছি তাহার দোষিবার ইচ্ছা থাকে তেঁও দেখেন আর তাহার শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আছে আছে তেঁও শ্রদ্ধা করেন আর তাহার অবোধ হয়েন তাহার ঈশ্বরের উপাসনা আর কেবল খেলা এ হুয়ের প্রভেদ অবগত করিয়া লয়েন আর ভূমিষ্ট হইবামান ঐ সকলের ব্রহ্মসাক্ষ্যকার হইয়াছে কি না এ প্রশ্ন করা ভট্টাচার্য্যকেই সম্ভব হয় যেহেতু ভট্টাচার্য্যেরা মন্ববলে কাঠ পাষাণ স্তম্ভাদিকে সজীব করিতেছেন অতএব মনুষ্যের বালককে ব্রহ্মসাক্ষ্যকারবান করা তাহাদের কোন আশ্চর্য্য কিছু আমরা সাধারণ মনুষ্য আমাদিগে এ প্রশ্ন আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়।

বেদান্তচাক্ষিকার ২৪ পৃষ্ঠ ৭ পংক্তি অবধি করিয়া লিখেন “তবে ঈশ্বরাদি শরীরের উদোধক প্রাতিমাদিতে তহুদেশে শাস্ত্রবিহিত পূজাদি ব্যাপার লৌকিক প্রীতাহেদন বাণ মারণাদির জায় কেন না হয় আশ্চর্য্য সেবা ইহা কি শুনো না যেমন গাফড়ী মন্ত্রশাস্তিতে একের উদ্দেশে অস্ত্রত্ব ক্রিয়া করিতে উদ্দেশ্যফলভাগী হয় তেমনি কি বৈদিক মন্ত্রশাস্তিতে হয় না উত্তর। এই যে দুই উদাহরণ ভট্টাচার্য্য দিয়াছেন যে বাণ মারণে প্রীতাহেদন



হয় আর সপাদিমন্ত অজ্ঞোদ্যে পড়িলে অল্প ব্যক্তি ভালো হয় ইহাতে যে সকল মনুষ্যের নিশ্চয় আছে তাঁহারা ইহুতরাং ভট্টাচার্য্যের বাক্যে বিশ্বাস করিবেন আর তাঁহাদের চিন্তাশ্রমের নিমিত্তে শাস্ত্রে নানাপ্রকার কাল্পনিক উপাসনা লিখিয়াছেন কিন্তু ঐহাদের জ্ঞান আছে তাঁহারা এই দুই উদাহরণেতে ভট্টাচার্য্যের সত্য মিথ্যা সকল জানিতেছেন আর এই সকল প্রপঞ্চ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত উপাধিবাশিষ্টের উপাসনা না করিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

২৬ পৃষ্ঠের ১৪ পংক্তি অবধি করিয়া লিখেন “যদি কহ শরীরের মিথ্যাও প্রতিপাদন শাস্ত্রে করিয়াছেন তবে আমি জিজ্ঞাসি সে কি কেবল দেববিগ্রহের হয় তোমাদের বিগ্রহের নয় যদি বল আমারদের বিগ্রহেরো বটে তবে আগে শরীরকে মিথ্যা করিয়া জ্ঞান মন হইতে তাহাকে দূর কর ও তদনুরূপ ক্রিয়াতে অস্ত্রের প্রামাণ্য জন্ম ও পরে দেবতাবিগ্রহকে মিথ্যা বলিও তদনুরূপ কথ্য ও করিও”। ইহার উত্তর ভট্টাচার্য্যের এ অনুমতির পূর্বেই আমরা আপনাদের শরীরকে ও দেবতাদের শরীরকে মিথ্যারূপে ভুল্য জানিয়া সেই জ্ঞানের দৃঢ়তার নিমিত্তে যত্ন আরম্ভ করিয়াছি অতএব আমাদের প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ প্রেরণার প্রয়োজন নাই কিন্তু ভট্টাচার্য্যের উচিত আপন প্রিয়পাত্র শিষ্টসন্তানের প্রতি এ প্রেরণা করেন যে তাঁহারা আপনার শরীরকে এবং দেবশরীরকে মিথ্যা যেন জানেন এবং তদনুরূপ কথ্য করেন।...

(রামমোহন গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৬৭-১৬৮)

### “কবিতাকারের সহিত বিচার”

#### পুস্তকের কিয়দংশ

...কবিতাকার প্রথম পৃষ্ঠের ১ পংক্তিতে লিখেন যে আমরা এই সকল পুস্তক প্রচার করিয়া দেশের ধর্ম্য নষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছি। কবিতাকারের এরূপ লিখাতে আশ্চর্য্য করি নাই যেহেতু ধর্ম্মকে অধর্ম্ম করিয়া ও অধর্ম্মকে ধর্ম্মরূপে ঐহাদের জ্ঞান তাঁহারা পরমেশ্বরের উপদেশকে ধর্ম্মনাশের কারণ করিয়া যে কহিবেন

তাহাতে আশ্চর্য্য কি আছে আমাদের সকল পুস্তকের তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বরের গ্রাহ্য যে নথর নামরূপ তাহাতে ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়া সর্বব্যাপি পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন করিয়া কৃতার্থ হওয়া উচিত হয় বর্ণাশ্রমাচার এরূপ সাধনের সহকারি বটে কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক নহে অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগে পুনঃ নিবেদন করিতেছি যে আমাদের প্রকাশিত তাৎপর্য্য পুস্তকের অবলোকন করিয়া যত্নাপি সকল হইতে এই অর্থ নিম্পন্ন হয় এমৎ দেখেন তবে কবিতাকারের প্রতি যাহা কহিতে উচিত জানেন তাহা যেন কহেন। ঐ প্রথম পৃষ্ঠার ১০ পংক্তিতে আর ২২ পৃষ্ঠে ১৩ পংক্তিতে কবিতাকার লিখেন যে এই সকল মতের প্রকাশ হইবাত্তে লোকের অমঙ্গল ও মারাত্মক ও মগস্তর হইতেছে। যত্নাপিও বিজ্ঞ লোক এ কথা শুনিয়া উপহাস করিবেন তথাপি এই বিষয়ে কিঞ্চৎ লিখিতেছি লোকের মঙ্গল কিছা হইয়া আপনঃ কাম্যধীন হয় ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া অথবা পুস্তালিকা সাক্ষ্য পুস্তকের সহিত সাক্ষ্য আর কোনো কার্য্যকারণ ভাব নাই আমাদের এই সকল পুস্তক প্রকাশের অনেক দিন পূর্বে কবিতাকারের রোগা-নির্ম্মণ্ড এবং মিথ্যা অপবাদ দ্বারা ধনের হানি ও মানহানি জন্মে তাহাতেও বুঝি কবিতাকার কহিতে পারেন যে তাঁহার সাক্ষ্যের ফল নহে কিন্তু অল্প কোনো ব্যক্তির গ্রন্থ করিবার দোষে ঐ সকল ব্যামোহ কবিতাকারের হইয়াছিল আপনাকে নির্দোষ জানাইবার উত্তম পথ কবিতাকার সৃষ্টি করিয়াছেন বস্তুত অনেকের মঙ্গল ও অনেকের অমঙ্গল পূর্বে হইয়াছিল এবং সম্ভ্রান্তিও হইতেছে সেইরূপ মগস্তর অথবা আহাঙ্গবোয় প্রচুর হওয়া ও মারাত্মক কিংবা সুখে কাল হরণ করা তাবদ্যে কালে লৌকিক কারণ সত্ত্বে হইয়াছে এবং হইবার সম্ভাবনা আছে বরঞ্চ আমরা এরূপ সাহস করিয়া কহিতে পারি যে পরমেশ্বরের সত্যোপাসনাতে ঐহারা প্ররম্ভ হইয়া থাকেন তাঁহারা ঐ সংকর্ষাত্মক দ্বারা সুখী ও নিরোগী আছেন এবং এই সত্যধর্ম্মের প্রচার হইলে দেশ সত্যকালের জায় হইবেক।...

(রামমোহন গ্রন্থাবলী—২য় খণ্ড, পৃ: ১১-১২)

“সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সন্মতি”

[শেষাংশ]

প্রবর্তক।—তুমি সহমরণ ও অন্তঃস্রবণের অস্তিত্ব বিষয়ে যে সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ দিলে যত্নপূর্ণ ও তাহার খণ্ডন কোনো রূপে হইতে পারে না কিন্তু আমরা ঐ তথ্যাদি স্মৃতির অনুসারে সহমরণ ও অন্তঃস্রবণের ব্যবহার করিয়া পরম্পরায় আসিতেছি।

নিবর্তক।—তুমি এখন যাহা কহিতেছ সে আত্ম অস্তিত্ব। ঐ সকল বাণিত বচনের দ্বারা এরূপ আশ্রয়ান্তে প্রবৃত্ত করান সম্ভব অযোগ্য হয় দ্বিতীয়ত ঐ সকল বচনেতে এবং ঐ বচনানুসারে ভোমাদেব রচিত সঙ্কলনবাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে পাতকী কলঙ্ক চিত্তান্তে প্রজ্ঞাপূর্বক আরোহণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিবেন কিন্তু তাহার বিপরীত মতে ভোমরা অর্থাৎ ঐ বিধবাকে পাতকীদেহের সহিত দূত বন্ধন কর পরে তাহার উপর এত দুঃখ দিয়া যে তাহা উঠিতে না পারে তাহার পর অর্থাৎ দেহের কালে দূত রহে নীল দিয়া ছাপিয়া রাখ। ঐ সকল বন্ধনাদি কথ্য কোন তথ্যাদির বচনে আছে যে ভদ্রসমূহের করিয়া থাকে অতএব এ কেবল জ্ঞানপূর্বক গ্রহীত্বা হয়।

প্রবর্তক।—যদিও এরূপ বন্ধনাদি করিয়া দাহ করা তথ্যাদি বচনের দ্বারা প্রাপ্ত নহে তথ্যাপ সঙ্কলনের পর সহমরণ না করিলে পাপ হয় এবং লোকের নিন্দা আছে এ নিমিত্ত আমরা করিয়া থাকি।

নিবর্তক।—পাপের ভয় যে কহিলে সে ভোমাদেব কথামাত্র যেহেতু ঐ স্মৃতিতেই কহিয়াছেন যে প্রাজাপত্য এতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে সে পাপের ক্ষয় হয়। যথা। চিত্তিভ্রষ্টা চ যা নারী মোহর্দগ্ধা চিত্তিতা তবৎ। প্রাজাপত্যেন শুদ্ধেতু তস্যার্ক পাপকর্মণঃ॥ প্রাজাপত্য এতে অসমর্থ হইলে এক যেতুম্বা তিন কাহণ কড়ি উৎসর্গ করিলেই সিক হয়। অতএব পাপের ভয় নাই তবে লোকানন্দাভয় যাহা কহিতেছ তাহাও অস্তিত্ব যেহেতু যে সকল লোক জ্ঞানপূর্বক গ্রহীত্বা না করিলে নিন্দা করে তাহাদের স্মৃতি নিন্দাকে সাধু ব্যক্তির গ্রহণ

করেন না আর ঈশ্বরের ভয় ও ধর্মভয় ও শাস্ত্রভয় এ সকলকে ত্যাগ করিয়া কেবল গ্রীষ্মবেষ্টি লোকের নিন্দাভয়ে গ্রীষ্ম করতে কিরূপ পাতক হয় তাহা কি আপনি বিবেচনা না করিতেছেন।

প্রবর্তক।—যত্নপূর্ণ এরূপ বন্ধনাদি করা শাস্ত্রপ্রাপ্ত নহে তথ্যাপ তাবৎ হিন্দুর দেশে এরূপ পরম্পরা হইয়া আসিতেছে এ প্রযুক্ত আমরা করি।

নিবর্তক।—তাবৎ হিন্দুর দেশে এরূপ বন্ধনাদি করিয়া প্রীতি দাওয়া পরম্পরা হইয়া আসিতেছে যাহা কহিলে তাহা কদাপি নহে যেহেতু হিন্দুর অগ্রদেহ যে এত বাক্সলা হইতেই বাক্স কাল অবধি পরম্পরায় এরূপ বন্ধন করিয়া গ্রীষ্ম করিয়া আসিতেছেন বিশেষত কোনো ব্যক্তি যাহা লোকভয় ও ধর্মভয় আছে সে এমত কহিবেন না যে পরম্পরা প্রাপ্ত হইলে গ্রীষ্ম মন্তব্য ও চৌযাদি কথ্য করিয়া মন্তব্য নিম্পাপে থাকিতে পারে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ পরম্পরাকে মান্য করিলে বনহ এবং পক্ষীয় লোক যাহার পরম্পরায় দ্বন্দ্বারিত করিয়া আসিতেছে তাহাদিগো নিন্দোষ করিয়া মানিতে হয় এবং এ সকল কথ্য হইতে তাহাদিগো নিবর্ত করণ প্রয়াস পাওয়া উচিত হয় না বস্তুত সম্ভাবনামূলকপণের উপায় শাস্ত্র এবং শাস্ত্রসংমত কহিয়াছেন সে শাস্ত্রের সমগ্রকারে অসম্মত এরূপ গ্রীষ্ম হয় এবং যুক্তিতেও অবলাকে স্বর্গাদি প্রলোভ দেখাইয়া বন্ধনপূর্বক বধ করা অত্যন্ত পাপের কারণ হয়।

প্রবর্তক।—এরূপ সহমরণে ও অন্তঃস্রবণে পাপই হইক কিম্বা যাহা হইক আমরা এ ব্যবহারকে নিবর্ত করিতে দিব না ইহার নিরাস্ত হইলে ঠাৎ লৌকিক এক আশঙ্কা আছে যে স্বামী যত্ন হইলে স্ত্রী সহগমন না করিয়া বিধবা অবস্থায় রাইলে তাহার ব্যাভিচার হইবার সম্ভবনা থাকে কিন্তু সহমরণ করিলে এ আশঙ্কা থাকে না জ্ঞানী হুঁইষ সকলেই নিঃশঙ্ক হইয়া থাকেন এবং পতিও যদি জীবৎকালে জানিতে পারে তবে তাহারো মনে গ্রীষ্মচিহ্ন কলঙ্কের কোনো চিন্তা হয় না ইতি।

নিবর্তক।—কেবল ভাবি আশঙ্কাকে দূর করিবার

নিমিত্তে এরূপ গ্রীবধে পাপ জানিয়াও নির্দয় হইয়া জ্ঞানপূর্বক প্রবর্ত হইতেছে তবে ইহাতে আমরা কি করিতে পারি? কিঞ্চিৎ ব্যাভিচারের আশঙ্কা পতি বর্তমান থাকিতেই বা কোন্‌ না আছে বিশেষত পতি দূরদেশে বহুকাল থাকিতে এ আশঙ্কার সম্ভাবনা কেন না থাকে অতএব সে আশঙ্কা নিরুত্তির উপায় কি করিয়াছ।

প্রবর্তক।—স্বামী বর্তমানে ও অবর্তমানে অনেক প্রভেদ আছে যেহেতু স্বামী বর্তমান থাকিলে নিকটেই থাকুন কিম্বা দূরদেশেই থাকুন গ্রী সর্বদা স্বামীর শাসনেই থাকে নিঃশঙ্ক হইতে পারে না স্বামীর মৃত্যু হইলে পর সেরূপ শাসন থাকে না সুতরাং নিঃশঙ্ক হয়।

নিবর্তক।—যে শাস্ত্রানুসারে পতি বর্তমানে পতির শাসনে গ্রীকে থাকিতে হয় সেই শাস্ত্রেই লিখেন পতি মারিলে পতিকূলে তাহার অভাবে পিতৃকূলে তাঁতাদের শাসনে বিধবা থাকিবেন এ ধর্ম বক্ষাতে দেশাধিপতিকে নিয়ন্তা করিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন তবে স্বামী বর্তমান থাকিলে কি তাহার অবর্তমানে স্বামী প্রভৃতির শাসন ভাগ ও ব্যাভিচারের সম্ভাবনা কদাপি নিরুত্তি হইতে পারে না যেহেতু অনেক অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ দোষিতেছে যে স্বামী বর্তমান থাকিতেও তাহার শাসনে গ্রী না থাকিয়া স্বতন্ত্রা হইতেছে। কায়মনবাক্যকণ্ঠ দক্ষ্য হইতে নিবর্ত করিবার কারণ শাসনমাত্র হইতে পারে না কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উপদেশ ঈশ্বরের ভয় দক্ষ্য হইতে কি গ্রীকে কি পুরুষকে নিবর্ত করায় হইল শাস্ত্রে ও প্রত্যক্ষে দোষিতোঁছ।

প্রবর্তক।—তুমি আমাদের পুনঃ কহিতেছ যে নির্দয়তা করিয়া আমরা গ্রীবধে প্রবর্ত হই এ আঁত অযোগ্য যেহেতু প্রতি স্থিতিতে সর্বদা কহিতেছেন যে দ্বন্দ্ব সকল যশের মূল হয় এবং অতিথিসেবা দি পরম্পরা ব্যবহারের দ্বারা আমাদের দয়াবত্তা সত্ত্ব প্রকাশ আছে।

নিবর্তক।—অন্তঃ বিষয়ে তোমাদের দয়ার বাহুল্য আছে এ যথার্থ বটে কিন্তু বালক কাল অবধি আপনঃ প্রাচীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও অন্তঃ ২ গ্রামস্থ লোকের দ্বারা জ্ঞানপূর্বক গ্রীদাহ পুনঃ দেখিবাতে এবং

দাহকালীন গ্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকিতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে এই নিমিত্ত কি গ্রীর পুরুষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাস্ত্রের বাল্যাবধি ছাগমহিষাদি হন পুনঃ দেখিবার দ্বারা ছাগমহিষাদির বধকালী কাতরতাতে দয়া জন্মে না কিঞ্চিৎ বৈকল্যবোধের অত্যন্ত দয় হয়।

প্রবর্তক।—তুমি যাহা কহিলে তাহা আমি বিশেষ মতে বিবেচনা করিব।

নিবর্তক।—এ অতি আশ্চর্যের বিষয় যে এখন গ্রী এ বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবর্ত হইলে পক্ষপাত পরিভ্রান্ত করিয়া শাস্ত্র বিবেচনা করিলে ষাটা শাস্ত্রাস হয় তাহার অবশ্য নিশ্চয় হইতে পারিবেন এবং এরূপ গ্রীবধজ্ঞ পাপ হইতে দেশের অনিষ্ট ও তির্যাক্ত আ হইবে না ইতি।

(রামমোহন প্রেসাবলী-৩য় খণ্ড পৃ. ১১২)

“প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় স্তম্ভ” (শেষাংশ)

২৪ পৃষ্ঠার শেষ অবধি লিখেন, দাহকেরা দেশাচার প্রযুক্ত বন্ধনাদি করে, সেও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে যেহেতু পুষ্পোক্ত হারীতিবচনে বর্ণিত হইতেছে, যাব পর্যন্ত গ্রী আশ্রয়শরীরের দাহ না করে, অর্থাৎ সম্বতোভাবে দাহ না করে, তাবৎ পর্যন্ত গ্রী শরীর হইতে মুক্ত হয় না, এই প্রযুক্ত গ্রীর মৃত শরীর যদি চিত হইতে যত্ন হইয়া ইতস্তত পড়ে, তবে গ্রীশরীরে প্রকৃষ্ট দাহ হয় না, এই জন্যে দাহকেরা বন্ধনাদি করে সেও শাস্ত্রের অন্তর্গত ব্যবহার এবং দাহকেরা বন্ধনাদি করে, তাহাতে তাহারদিগের পাপ নাই, পরন্তু পুণ্য হয় ও তাহার প্রমাণের নিমিত্তে আপত্ত্যের বচন লিখি যাহার তাৎপর্য এই, যে বৈধ কর্মের যে প্রবর্তক ও অনুমতিকর্তা ও কর্তা সকলে স্বর্গে যান, আর নিষিদ্ধ কর্মে প্রবর্তক ও অনুমতিকর্তা এবং কর্তা সকলে নরকে গমন করেন। উত্তর। আপনকার বক্তব্য এই হইয়াছে, চিতায় অগ্নি দিলে অগ্নির উত্তাপের ভয়ে কিম্বা অগ্নিশরীরে হইলে অসহিষ্ণুতা প্রযুক্ত কি জানি যদি বিধ

চিত্তা হইতে পলায় : সে আশঙ্কা দূর করবার নিমিত্ত দাতকেয়া চিত্তার উপর শ্রীর শরীরকে বন্ধন করেন না। কিন্তু শ্রীর মৃত শরীরের মতঃ দাতক্যালে চিত্তা হইতে কি জানি যদি উত্তপ্ত পড়ে, এ নিমিত্ত দাতকেয়া জীবদশাতেই চিত্তাতে বন্ধন করেন : অতএব জিজ্ঞাসা করি, যে লোভবীচলিত রক্ত, দিয়া একপ বিধবাকে বন্ধন করিয়া থাকেন : ঐক সামান্য পাসির রক্ত, দিয়া বন্ধন করেন ? করেন লোভ যথেষ্ট শরীরকে প্রাবল্য করিয়া দাত করিলে তাতার মতঃ উত্তপ্ত পাড়বার সম্ভাবনা থাকে না। অতঃপা সামান্য রক্ত, দিয়া যদি বন্ধন করেন, তবে সে রক্ত শরীর দাতের পক্ষে প্রাণভাঙ্গ সময়ে দগ্ন হয়। অতএব সে দগ্ন রক্ত দ্বারা শরীরের উত্তপ্ত পড়ি কোনে রূপে বারণ হইতে পারে না। অতঃপক্ষে সম্মুখের সংস্থাপন করিতে প্রৱত্ত হইলে পাড়িত লোকেরও এ পর্য্যন্ত অনবধান হইতঃ যে, হলন্ত আশ্রয় মনোঃ রক্ত থাকিয়া উদ্বৃত্ত হয় না। অতঃপক্ষে আশ্রয় হইতে উত্তপ্ত পড়নে নিবারণ করে, একপ বিধকা লোকের বিবাহের নিমিত্ত লিখেন, অতএব বিধকা লোকে বিবেচনা করিবেন যে, দাত দিয়া বন্ধন করবার চেঃ যতঃ আপান লিখিয়াছেন, যথার্থ বটে, ঐক নাঃ সংসারেও সকল লোক এককালে নৈততীন হয় নাঃ অতএব দাতক্যালে যাকিয়া দাতক্যালে বিধবার বন্ধনের যে কারণ আপান কহিয়াছেন তাঃ সম্ভা ঐক মিথ্যা হইয়া অনায়াসে জানিতে পারিবেনঃ আর আপনকার অল্পগত বিধবার দাতের মনোঃ যতঃ দাতক্যালে সম্ভা হইয়া আছে, তাঃ দাতা একপ চেঃ শ্রীমতঃ কিসপ শ্রীমতঃ হইবেন, তাঃ দাতা ঐক্যঃ বিবেচনা করিলে কেনি আপনকার বিবাহ না হইবেকঃ আপন্থের বচন যতঃ প্রমাণ নিমিত্ত আমায়দের লেখা টাচত ছিল, তাঃ আপান লিখিয়াছেন যে, কেঃ সে বচনের দ্বারা হইয়া সিদ্ধ হইতেছে যে, নিমিত্ত কয়ের প্রবলক ও অতঃমাতকতা এবং কতঃ নরকে যায়। ততঃ সমগ্রকারে অতঃব ও অতি নিমিত্তঃ জ্ঞানপূরক বন্ধন করিয়া যে শ্রীদাতঃ তাঃ প্রবলক ও অতঃমাতকতা ও কতঃ ঐ বচনের বিবয় অবশ্য হইলেন, দাতাচার হল হয় ঐক্য

বন্ধন করিলে শরীরের মতঃ উত্তপ্ত পাড়বেক না, একপ বিধাক্যালে পরলোক্যামন হইতে নিষ্কতি হইতে পারিবেন না।

আঃ ২৬ পৃষ্ঠা অবধি লিখেন, যে, অল্প হলন্ত চিত্তার দাতকেয়া ৩৭ কাষ্ঠাদি দ্বারা ঐ শ্রীর অতঃমাতক্যালে চিত্তাকে প্রজালিত করে, তাঃ দাতের পূণ্য কার্যের আত্মকলা যে করে, তাঃ আর অতঃমতঃ পূণ্য হয়, এবং মতঃ পূণ্যীয় দগ্নকারের তীতঃস লিখিয়াছেন, যে, পূণ্য কয়ের আত্মকলা দ্বারা অতঃমতঃ দগ্ন পাঠিয়াছে। ততঃ উদ্বৃত্তঃ এক প্রবলকঃ পূণ্যপারিচ্ছদে লেখা লিখিয়াছে, অতঃপাঃ যদি জ্ঞানপূরক বন্ধন করিয়া ৩০২ বাশ দিয়া চাপিয়া প্রবল করা পূণ্য কয় হইতঃ তবে আত্মকলা-কয়াদের পূণ্য হইবার সম্ভাবনা ছিল। ঐক্য হইয়া অতঃমতঃ নিমিত্ত দাতক্যালে পাঠক, অতএব ততঃ প্রযোজকেয়া শ্রীমতঃ প্রতিকল অবশ্য হইতে পারে। শ্রীমতঃ পারিচ্ছদে অতঃপাঃ শ্রীমতঃ প্রবলকঃ পদশন তিন বচনের দ্বারা দিয়াছেন : প্রথমতঃ এক কপোতিকা দাতার সহিত আশ্রয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, দ্বিতীয় কটিকাশ্রয় দ্বারা দাতার শরীর দাতক্যালে দাতার আশ্রয় প্রবেশ করিলেন আর বচনের বলরাম প্রভাঃদার শ্রী সকল দাতারদের শরীরের সাঃ অতঃ প্রবেশ করিলেনঃ এতঃ প্রবলকঃ দাতারের শ্রীমতঃ অতঃমতঃ পদশনঃ হইয়াছিল, অতএব অতঃপাঃ প্রদর্শন করবার নিমিত্তঃ অতঃ উদ্বৃত্তঃ আপনকে দেওয়া টাচত ছিল, সে দাতা হইতঃ, আপনকার বিবাহ অবশ্য থাকবেক, যে, পূণ্যকালে এ কালের মতঃ কতঃ লোক মোক্ষার্থী কতঃ দগ্নার্থী ছিলেন, এবং কতঃ পূণ্যার্থী কতঃ পাপার্থী কতঃ অতঃমতঃ নাঃ তাঃ ঐক্যঃ পূণ্য সাঃ কতঃ কতঃ অতঃমতঃ করিতেন তাঃ দাতার দগ্ন ভোগানন্তঃ পূণ্য পতন হইতঃ, ঐ সকল শাস্ত্রে তাঃ প্রমাণ আছে। মোক্ষাঃ বধায়ক শাস্ত্রে পূণ্যঃ কামনা পারজ্যাগের বিধি তাঃ দাতার পতি দিয়াছেন ঐ শাস্ত্রাঃসারে অগ্ন্যনীয় বিধবা সকল আদোপান্ত অবধি মোক্ষার্থী হইয়া বচন করিয়া কতঃ হইয়াছেন তাঃ প্রমাণ

মহাভারতাদি গ্রন্থে আছে, উদ্ভকে ক্রিয়মাণে তু বীরাণাং  
বীরগণ্যীভিঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গামী যে  
কুরুবীর সকল বাহারা সমুদায়কে উৎসাহপূর্বক প্রাণত্যাগ  
করিয়াছেন, তাঁহাদের পত্নী সকল যুত শরীরের সহিত  
সহমরণ না করিয়া তর্পণাদি ক্রিয়া করিলেন। কিন্তু  
আপনি বিবেচনা করুন যে তিন উদাহরণ আপনি  
দিয়াছেন তাহাতে তিন স্থানেই অগ্নিপ্রবেশ শব্দ পাষ্ট  
আছে, প্রবিবেশ ইত্যাদি, তর্পণনৈবেদ্যাদি, উপগৃহা  
গ্নিমর্গাণাম্। এবং ঐ তিন স্থানে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যে  
বিধবা প্রজ্বলিত যে অগ্নি ছিল তাহাতে প্রবেশ করিয়া-  
ছেন; অতএব উদ্যানীন্তন যে বিধবা প্রজ্বলিত অগ্নিতে  
প্রবেশ না করে কিন্তু অগ্নি বন্ধনপূর্বক তাহাকে দাঁত করে।  
আপনকার লিপিত সকারীর আদ্যোপান্ত ব্যবহারও  
তাহার সিদ্ধ হয় না, এবং সহমরণ জন্ত যে  
কিঞ্চিৎ কাল সর্গভোগ তাহাও সে বিধবার স্মরণ  
হইবেক না; এবং যাহারা তাহাকে বন্ধনপূর্বক রুদ্ধ বাঁধ  
দ্বারা ধূপিয়া বধ করেন তাহারা নিতান্ত গ্রীহত্যাগ  
পাতকী সমশাশ্রমসারে হইবেন। ইতি অষ্টম প্রকরণ  
ইতি।

প্রবর্তক।—ঐলোককে স্বামীর সহিত মরণে প্রস্তুত  
দিবার যথার্থ কারণ এবং এরূপ বন্ধন করিয়া দাঁত  
করিবার আশ্রয় কারণ ১৮ পৃষ্ঠার ১৮ পংক্তিতে প্রায়  
লিখিয়াছি যে ঐলোক সম্ভাবিত অন্নবৃদ্ধি, অস্থিরান্তঃ-  
করণ বিশ্বাসের অপাত্ত সান্তরণ ও ধর্মজ্ঞানশূন্য  
হয়। স্বামীর পরলোক হইলে পর শাস্ত্রানুসারে পুনরায়  
বিধবার বিবাহ হইতে পারে না, এককালে সমুদায়  
সাংসারিক সুখ হইতে নিরাশা হয়, অতএব এ প্রকার  
দুর্ভাগা যে বিধবা তাহার জীবন অপেক্ষা মরণ শ্রেষ্ঠ।  
যেহেতুক শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মচর্যের অন্ত্যস্তান পূর্বক শুদ্ধ  
ভাবে কাল যাপন করা অত্যন্ত দুর্ঘট স্মরণ্য সহমরণ না  
করিলে নানা দোষের সম্ভাবনা, যাহাতে কুলজয়ের কলঙ্ক  
জন্মে, এই নিমিত্ত বাল্যকাল অবধি ঐলোককে সন্ধদা  
উপদেশ দেওয়া যায় যে সহমরণ করিলে স্বামীর সহিত  
সর্গভোগ হয়, এবং তিন কুলের উদ্ধার হয়, ও লোকত

মহাযশ আছে যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া স্বামী মরিলে  
অনেকেই সহমরণ করিতে অভিপ্রায় করে, কিন্তু  
অগ্নির উত্তাপে চিতাভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা  
দূর করিবার নিমিত্ত বন্ধনাদি করিয়া দাঁত করা যায়।

নিবর্তক।—এই যে কারণ কাহেলা তাহা যথার্থ বটে;  
এবং আমারদিগের সুন্দররূপে বিদিত আছে, কিন্তু  
ঐলোককে যে পর্য্যন্ত দোষায়িত আপন করিলেন,  
তাহা সম্ভাব্যসিদ্ধ নহে। অতএব কেবল সন্দেহের  
নিমিত্তে বধ পর্য্যন্ত করা লোকের ধর্মত বিরুদ্ধ হয়, এবং  
ঐলোকের প্রতি এইরূপ নানাবিধ দোষোন্মেষ সন্দেহ  
করিয়া তাহারদিগকে সকলের নিকট অত্যন্ত হেয় এবং  
দুঃখদায়ক জানাইয়া থাকেন, যাহার দ্বারা তাহারা নিরন্তর  
ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, এ নিমিত্ত এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ নির্মাণতোহি।  
ঐলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় নূন  
হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারদিগকে আপন হইতে দূর  
জানিয়া যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা সম্ভাবিত  
যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উহারদিগকে পূর্ণাপর বাক্ত  
করিয়া আসিতেছেন। পরে কহেন, যে সম্ভাবিত তাহারা  
সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে, কিন্তু বিবেচনা করিলে  
তাহারদিগকে যেই দোষ আপনি দিলেন, তাহা সম্ভাব্য  
মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক।

প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, ঐলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা  
কেন কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহারদিগকে  
অন্নবৃদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা  
দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে,  
তখন তাহাকে অন্নবৃদ্ধি কহা সম্ভব হয়; আপনার বিদ্যা  
শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ ঐলোককে প্রায় দেন নাই, তবে  
তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ  
লীলাবর্তী, ভ্রামহতী, কণ্ঠি রাজার পত্নী কালিদাসের  
পত্নী প্রভৃতি যাহাকেই বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন,  
তাহারা সর্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাতা আছে,  
বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে,  
যে অত্যন্ত দূরত্ব ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন জ্ঞা

মৈত্র্যকে উপদেশ করিয়াছেন। মৈত্র্যীও গ্রহণ গ্রহণ পূর্বক কৃতার্থ হয়েন।

দ্বিতীয়ত ভাৱাদিগকে আস্থাস্বত্বকরণ কহিয়া থাকেন ইহাতে আশ্রয় জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ যুহাৰ নাম তাঁনলে যুতপ্রায় হয়, তথাকার গ্রীলোক অস্ত্রকরণের হৈষা দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথ্যচ কঠেন, যে ভাৱাদের অস্ত্রকরণের হৈষা নাহি।

তৃতীয়ত বিধাসম্বন্ধকার বিষয়। এদোষ পুরুষে অধিকারী গ্রীতে অধিক উভয়ের চাপিত দৃষ্টি করলে বিদিত হইবেক। প্রাতি নগরে প্রাতি আমে বিবেচনা কর, যে কত গ্রী পুরুষ হইতে প্রভাবিত হইয়াছে, আর কত পুরুষ গ্রী হইতে প্রভাবিত প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা অস্ত্রভব কার যে প্রভাবিত গ্রীর সংখ্যা দশভুগ অধিক হইবেক। তবে পুরুষেরা প্রায় লেগাপড়াতে পারগ এবং নানা রাতকর্মে অধিকার রাখেন, যাকার দ্বারা গ্রীলোকের কোন একপদ অধিকার হইয়াছে হইলে সমস্ত বিবাহিত অনায়মেই করেন, অথচ ক্রমে গ্রীলোককে প্রভাবিত করিলে তাহা দেবের মধ্যে গণনা করেন না। গ্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার কর, যে আপনাদের জ্ঞান অজ্ঞকে সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে তাহার দ্বারা অনেকেই প্রেরণ পায়। এ পদার্থ যেহেতু প্রভাবিত হইয়া অধিকতর দৃঢ় হয়।

চতুর্থ যে সম্ভাবনা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই বাস্তব আছে, অর্থাৎ এক পুরুষের প্রতি হই তিন দশ বরদ অধিক পত্নী দোষহেঁছ। আর গ্রীলোকের এক পাঁচ সে ব্যক্তি মারলে কেহ তাবৎ যুগ পাবিত্যগ করিয়া সঙ্গে মারিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতিকষ্টে যে ব্রহ্মচর্য ভাৱার অকৃত্যন করে।

পঞ্চম ভাৱাদের বশ্যভব অল্প, এ অতি অল্পের কথা, দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ, অপমান, ভিতরকার, যাতনা, ভাৱা কেবল বশ্যভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক তুলান ভ্রান্ত্য দ্বারা দশ পোনের বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ

হয় না, অথবা যাক্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত হই চারবার সাক্ষাৎ করেন, তথাপি এই সকল গ্রীলোকের মধ্যে অনেকেই বশ্যভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যক্তিরেকেও এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা পিতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সচ্ছন্দাপূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন বশ্য নিবাহ করেন। আর ব্রাহ্মণের অথবা অল্প বর্ণের মধ্যে যাক্জা আপন গ্রীকে লইয়া গৃহস্থ করেন তাহারদের বাটীতে প্রায় গ্রীলোক বি- হুগীত না পায়। বিবাহের সময় গ্রীকে অল্প যত্ন করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু বাহ্যিকের সময় পশু হইতে নীচ জ্ঞানিয়া বাহ্যিক করেন, যেহেতু স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাড়াইয়া করে, অর্থাৎ অতি প্রাতে কি নীতকালে কি বধাতে স্থান মার্জন, ভোজনাদি পাকি মার্জন। দুঃখ লেপনাদি তাবৎ কন্ম করিয়া থাকে, এবং স্পৃহাকারের কন্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রেতে করে, অর্থাৎ স্বামী যত্ন শাস্তি ও স্বামীর দাতব্য অমাত্যবর্ণ এ সকলের রক্ষণ পারিবেষাদি আপন নিয়মিতকালে করে, যেহেতু চন্দ্রবর্গের অল্প জাতি অপেক্ষা ভাঙ্গ সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন এই নান্যমত বিষয়মুক্তি প্রভাবেরোষ ভাৱাদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে; এ বন্ধনে ও পারিবেষণে যদি কোনো অংশে কষ্ট হয়; তবে তাহারদের দাম্য শাস্তি দেব প্রভৃতি কি তিরস্কার না করেন এ সকলকেই গ্রীলোকেরা বশ্যভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে বাস্তব উদ্বার পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চ অবাশ্চর্য থাকে। তাহা সম্ভাব্যপূর্বক তাহার করিয়া কাল যাপন করে; আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ তাহারদের ঘনবস্তা নাহি, তাহারদের গ্রীলোক সকল গোমেষবাদ কন্ম করেন, এবং পাকাদির নিষিদ্ধ গোমেষের ঘাস খুজতে দেন, বৈকালে পূজারী অথবা নদী হইতে জলাধরণ করেন, রাত্রে শয্যা দিয়া যাক্জ ভক্তের কন্ম তাহা করেন। মদ্যে কোনো কন্মে কিঞ্চিৎ কষ্ট হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যত্বেপ কদাচিৎ এ স্বামীর ঘনবস্তা

হইল, তবে ঐ শ্রীর সৰ্বপ্রকার জ্ঞানসাধনে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায় ব্যাভিচার দোষে মগ্ন হয় এবং মাস মধ্যে এক দিবসও তাহার সাহিত্য আলোচনা নাই। স্বামী দীর্ঘ যে পর্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্ৰেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানস হুঃখে কাতর হয়, এসকল হুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্মভয়েই তাহার সাতিশুভতা করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন শ্রীকে পাইয়া গাহিয়া করে। তাহার দিবা রাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্মভয়ে এসকল ক্রেশ সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয়, যে এক শ্রীর পক্ষ হইয়া অল্প শ্রীকে সম্বাদা ত্যাগ করে, এবং নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহার সৎসঙ্গ না পায়, তাহার আপন শ্রীকে কিঞ্চিৎ ক্রটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সম্বন্ধে তাহারদের প্রতি হইলে চোরের ত্যাগ তাহারদিগকে করে। অনেকেই ধর্মভয়ে লোকভয়ে ক্রমাগত থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যত্নপর অসাক্ষ্য হইয়া পতির সাহিত্য ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে তবে রাজস্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই পতিহস্তে আসিতে হয়। পতিও সেই পূজ্যতাক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্রেশ দেয়। কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে; এসকল প্রত্যাক্ষিক, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না। হুঃখ এই, যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা হুঃখে হুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনাবন্ধদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন পূরক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়। ইতি সমাপ্ত। ১৭৪১ শক ১৬ আশ্বিন।

(স্বামোচন প্রবাসী—৩য় খণ্ড, ৪২-৪৮ পৃঃ)

প্রার্থনাপত্র

পরমেশ্বরায় নমঃ

সবিনয় প্রার্থনা

যাহারা এই বেদবাক্যে বিশ্বাস রাখেন যে “এক-মেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম”; “নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্যুং শক্যো

চক্ষুযা। অন্তীত কবতোহজ্ঞান কথং তদুপলভ্যতে” অর্থাৎ “এক কেবল একই দ্বিতীয়রহিত হয়েন;” “সেই পরমাত্মাকে বাক্যের দ্বারা ও মনের দ্বারা অথবা চক্ষুর দ্বারা জানা যায় না তদ্রূপ জগতের মূল ও আশ্রয় আন্তরূপ তেঁও হয়েন এই প্রকারে তাঁহাকে জানিবেক; অতএব আন্তরূপ তাঁহাকে যে ব্যক্তি জানিতে না পারে তাহার জ্ঞানগোচর তেঁও কিরূপে হইবেন?”—এবং এই বাক্যানুসারে আচরণে যত্ন করেন “যথৈবাত্মা পরন্তুতং দৃষ্টব্যঃ স্তুতিমচ্ছতা। সুখহুঃখানি তুল্যানি যথাস্থানি তথা পরে ॥” অর্থাৎ “কল্যাণেচ্ছ ব্যক্তি যেমন আপনাকে সেইরূপ পরকেও দেখিবেন, সুখ ও হুঃখ যেমন আপনাতে হয় সেইরূপ পরেতেও হয় এমত জানিবেন,”—তাঁহাদের কর্তব্য। এই যে স্বদেশীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তিতে এই এই নিষ্ঠা ও আচরণ দেখেন তাঁহাদের সাহিত্য আভিলাষ প্রীতি করেন, যদ্যপিও তাঁহারা ঐ সকল প্রতির সাক্ষাৎ অধ্যয়ন না করিয়া তাহার তাৎপর্যার্থের দ্বারা পরমেশ্বরের তৎপর হইয়া থাকেন। দশনামা সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে, এবং শুক নানকের সম্প্রদায়, ও দাদুপুত্রী, ও কবীরপুত্রী, এবং সমস্ত ভারতীয় প্রভৃতি, এই ধর্মাক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের সাহিত্য প্রতিভাবে আচরণ করা আমাদের কর্তব্য হয়। ভাষা বাক্যই কেবল তাঁহাদের অনেকের উপদেশের দ্বারা এবং ভাষা গানাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে অতএব তাঁহাদের পরমার্থ সাধনে সন্দেহ আছে এমত আশঙ্কা করা উচিত নহে; যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য বেদগানে অসমর্থদের প্রতি কাহিয়াছেন যে “ঋগ্‌গাথা পার্ণিকা দক্ষা বিহিতা ব্রহ্মগীতিকা। গেয়মেতৎ তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মবিগচ্ছতি। বীণা-বাদনকৃত্যঃ ক্রীতজ্যোতির্বাশরদঃ। তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং নিযচ্ছতি ॥” অর্থাৎ “ঋকসংজ্ঞক গান ও গাথাসংজ্ঞক গান ও পার্ণিকা এবং দক্ষা বিহিত গান ব্রহ্মবিষয়ক এই চারি প্রকার গান অহুতৈর হয়, নোক্ষসাধন যে এই সকল গান ইহার অভ্যাস করিলে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। বীণাবাদনে নিপুণ ও সপ্ত স্বরের বাঁশ প্রকার ক্রীত ও আঠার প্রকার জ্যোতি ইহাতে প্রবীণ ও তালজ্ঞ

ইহারা অনায়াসে মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন।” আন্তর্গত শিবধর্মের বচন “সংস্কৃতে: প্রাকৃতৈবৈকার্ষ: শিষ্টমন্ত্রপত:। দেশভাষ্যাপায়ৈশ্ব বোধয়েৎ স গুরু: শ্রুত:।” অর্থাৎ “শিষ্টের বোধগম্যাত্মকস্বরে সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃত বাক্যের দ্বারা অথবা দেশভাষ্যাদি উপায়ের দ্বারা যিনি উপদেশ করেন তাঁতাকে গুরু কহা যায়।”

বিদেশীয়দের অন্তঃপাতি ইউরোপীয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরকে সম্যক এক জানেন ও মনের শুদ্ধভাবে কেবল তাঁহার উপাসনা করেন এবং দয়ার বিস্তারিততাকে পরমার্থমাধন জানেন তাঁহাদিগেও উপাস্তের একান্তরোধে অতিশয় প্রিয়পাত্র জ্ঞান করা কষ্টব্য হয়। তাঁহারা যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বরের প্রেরিত ও আপনাদের আচাষা কছেন উহাতে পরমার্থ বিষয়ে আত্মীয়তা কিরূপে হয় এমনত আশঙ্কা উচিত নহে; যেহেতু উপাস্তের একা ও অজ্ঞানের একা উপাসকদের আত্মীয়তার কারণ হইয়া থাকে।

আর ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিকে মনে করনা করেন এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, ও সন্তান ঈশ্বর কিন্তু এত তিনে এক ঈশ্বর করেন, ইহাতি স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিও বিবোধিতাব কষ্টব্য নহে; বরঞ্চ যেরূপে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা বাহেতে

প্রতিমা নিৰ্ম্মাণ না করিয়া মনেতে রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জ্ঞানিয়া তাঁহাদের ধ্যান ধারণা করেন এবং এই নানা অবতারের একাত্তা দর্শন, তাঁহাদের সাহিত যেরূপে অবিরোধিতাব রাখি, সেইরূপ এই ইউরোপীয়দের প্রতিও কর্তব্য হয়।

আর যে সকল ইউরোপীয় যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর জ্ঞানিয়া তাঁহার নানা প্রকার মূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করেন তাঁহাদের প্রতিও দেখভাব কষ্টব্য হয় না; বরঞ্চ আমাদের মধ্যে যাঁহারা রামাদি অবতারকে পরমেশ্বর জ্ঞানে তাঁহাদের মূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করেন তাঁহাদের সাহিত যেরূপ আচরণ করিয়া থাকে সেইরূপ এই ইউরোপীয়দের সজিত করাতে গানি নাই; যেহেতু এ দুই ইউরোপীয় সম্প্রদায় এবং এই দুই প্রকার পদেদশীয় তাঁহাদের উপাসনার দ্বলে একা আছে যদ্যপিও বর্ণের প্রভেদ দ্বারা পরস্পর ভিন্ন উপলব্ধ হয়েন। কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রকার ইউরোপীয়েরা যখন আপন মতে সইতে ও অদৈতবাদ হইতে বিমুক্ত করিতে আমাদের প্রতি যত করেন তখনও তাঁহাদিগেও দেখভাব না করিয়া বরঞ্চ তাঁহাদের গায় লোক জ্ঞানবার অজ্ঞানতা নিমিত্ত কেবল করুণা করা উচিত হয়; যেহেতু ইহারা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় যে যন ও আপকার হইলে আপনাতে অল্প কোন কটি আছে এমনত অন্ততব মন্ত্রের প্রায় হয় না হইত।

(রামমোহন প্রজাবলী—৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১-২৮)





# রামমোহন সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী লোকদের মত

রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কারণে, তিনি যদি আর কিছুই না করিতেন, তাহা হইলেও ব্রাহ্মেরা তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তিনি অসঙ্গত ভাবভিত্তিক এবং জগদ্ধিতকর কাজও করিয়াছিলেন। এইজন্য যাহারা ব্রাহ্ম নহেন এমন বহুসংখ্যক লোকও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন; ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তনের জন্য, যাহারা ব্রাহ্ম নহেন, এমন অনেক লোক তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি যদি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার লোক হয়ত আরও কিছু বেশী হইত, যাহার হৃদয়, তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া থাকিলেও ব্রাহ্মসমাজের বারিকবের এমন অনেক প্রসিদ্ধ লোক তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহাদের গুণগ্রাহিতা সাম্প্রদায়িক গুণী অতিক্রম করিতে সমর্থ। এইসব গুণগ্রাহী লোকদের মধ্যে দেশী-বিদেশী উভয় রকমের মানুষই আছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার সাহিত্য পরিচিতি ছিলেন। যেমন ফরাসী পর্যটক ও বৈজ্ঞানিক ভীজের বাক্‌মোঁ (Victor Jacquemont) তিনি তাঁহার Voyage dans l'Inde গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন :—

“Before Coming out to India I knew that he was an able orientalist, a subtle logician and an irresistible dialectician; but I had no idea that he was the best of men”. (English Translation from the original French.)  
তাৎপর্য।

“স্বাভাবিক আশ্রয় আগের আমি জানিতাম তিনি

একজন যোগী প্রাচ্যবিজ্ঞান, সুস্বাভাবিককারী নৈয়ায়িক এবং অজ্ঞেয় তাত্ত্বিক কিন্তু আমার ধারণাই ছিল না, যে, তিনি নরোত্তম।”

ইহার পর রামমোহনের ব্যক্তিগত বর্ণনা করিয়া বাক্‌মোঁ বলিতেছেন—

“He never expresses an opinion without taking precautions on all sides,.....”

“.....He has grown in a region of ideas and feelings which is higher than the world in which his countrymen live; he lives alone; and though, perhaps the consciousness of the good he is accomplishing affords him a perpetual source of satisfaction, sadness and melancholy mark his grave countenance.”

তাৎপর্য।

“সবাদকে সাবধানতা অবলম্বন না করিয়া (অর্থাৎ আটখাট না-বাঁধিয়া) তিনি কখনও কোন মত প্রকাশ করেন না।”

“যে সব চিন্তা ও ভাবের রাজ্যে তাঁহার বদেহবাসীরা বাস করেন, তদপেক্ষা উচ্চতর মনোলোকে তাঁহার ব্যোমরাজ্য হইয়াছে; তিনি একাকী থাকেন; এবং যদিও, হয়ত তিনি যে ইচ্ছাসাধন করিতেছেন, তাহার অন্তর্ভূতি তাঁহাকে সঙ্গদাই আনন্দপ্রসাদ দেয়, তথাপি তাঁহার গম্ভীর মুখমণ্ডলে বিষাদের চিহ্ন লাক্ত হয়।”

বিস্তর সমসাময়িক ইংরেজ ভদ্রলোক ও মহিলা রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহাদের উচ্চধারণা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি সব ছাপিবার স্থান হইবে না।

অল্প পাস্চাত্য কয়েকজন বিদেশীর এবং একজন ইংরেজের মত উদ্ধৃত করিব। রামমোহনের সমসাময়িক আমেরিকান চিকিৎসক ডাঃ বুট লিখিয়াছেন :—

“To me he stood alone in the single majesty of, I had almost said, perfect humanity. No one in past history, or in present time, ever came before my judgement clothed in such wisdom, grace and humility. I knew of no tendency even to error”.

তাৎপর্য্য,

“র্তান আমার চক্ষে, প্রায় বলিয়া কেলিয়াছিলাম, পূর্ণ মনুষ্যত্বের মণিময় একাকী দণ্ডায়মান। অতীত ইতিহাসে বা বর্তমান সময়ে আর কেহ আমার বিচারের সম্মুখে এরূপ প্রজ্ঞা-সৌম্যতা ও নম্রতায় মণ্ডিত হইয়া উপস্থিত হন নাই। আমি তাঁহাতে কোন নাস্তিপ্রবণতাও জানিতাম না।”

খ্রিস্টাব্দে সোসাইটির স্থাপয়ন্ত্রী ম্যাডাম রায়ভ্যাটস্কা লিখিয়াছেন, যে রামমোহন ছিলেন “One of the purest, most philanthropic, and enlightened men India ever produced.” “ভারতবর্ষে সকাপেক্ষা শুদ্ধচেতা, মানবপ্রোমিত ও জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল যে-সব মানুষকে জন্ম দিয়াছেন, রামমোহন তাঁহাদের মধ্যে অকৃত্য।” তাহার পর ম্যাডাম রায়ভ্যাটস্কা তাঁহার স্মরণে বুদ্ধিশক্তি, স্মার্মজ্ঞত শিষ্ট ব্যবহার, ভয়হীন নৈতিক সাহস, পূর্ণ নম্রতা, মানব-প্রেম-প্রবণতা, স্বদেশভক্তি এবং অলস ধর্মভাবের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,

“We have before us the picture of a man of the noblest type. Such a person was the ideal of a religious reformer.....one searches the record of his life and work in vain for any evidence of personal conceit, or a disposition to make himself figure as a heaven-sent messenger.”

তাৎপর্য্য।

“(এইসব গুণ লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারি, যে)

আমাদের সম্মুখে মহত্তম আদর্শের একটি মানুষের ছবি রহিয়াছে। এই রকম এই মানুষটি আদর্শ ধর্ম-সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার জীবন ও কর্মের রক্তাক্ত অন্বেষণ করিয়া কোথাও ব্যক্তিগত অহঙ্কারের কোন প্রমাণ কিম্বা নিজেকে বর্ণ হইতে প্রেরিত দূত বলিয়া খাড়া করিবার কোন প্রয়াসের প্রমাণ পাওয়া যায় না।”

এইরূপ আরও অনেক প্রশংসাসূচক কথা ম্যাডাম রায়ভ্যাটস্কা লিখিয়াছেন।

সুবিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিজ্ঞানিৎ অধ্যাপক সিলভান লেভী লিখিয়াছেন :—

Raja Rammohan Roy, father of modern India, was one of the most remarkable personalities of his age. While representing all that was best in the Indian tradition, he showed his special genius in a line where the Indians of today are the weakest—in translating into practice by the force of will the dictates of idealism.....He fought, with phenomenal heroism, against desperate odds, to realize his ideal. If India today wanted any model to shape her present destiny and future history, Rammohan should be the model. He was really the first to bring India abreast of universal history.”

তাৎপর্য্য,

“আধুনিক ভারতবর্ষের জনক রাজা রামমোহন রায় তাঁহার যুগের বিশেষ লক্ষ্য করিবার মত অকৃত্য পুরুষ ছিলেন। ভারতবর্ষে অভ্যুত্থানাগত শ্রেষ্ঠ বাহা তাহা তাঁহাতে ছিল, আবার অল্প এমন একদিকে তাঁহার বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচয় তঁান দিয়াছেন, যেদিকে তাঁহার দেশের আজ-কালকার লোকেরা দুর্বলতম—তঁান বাহা আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে তাহাকে নিজের আচরণে পরিণত করিতেন। যদি আজ ভারতবর্ষ নিজের বর্তমান ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ও ভবিষ্যৎ ইতিহাস গঠনের জন্ত কোন আদর্শ চান, তবে রামমোহন সেই আদর্শ। তিনিই বস্তুতঃ ভারতবর্ষকে

প্রথম বিবেচিতহাসে (অল্প সব জাতির সাহিত্য) প্রগতিশীলদের দলে আনিয়াছেন।”

সিলভা লোভ এইরূপ আরও অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। কাগরও সব কথা উদ্ধৃত করিতে পারিতেছি না। আর দু-জন বিদেশীয় কথা উদ্ধৃত করিয়া পরে আমাদের দেশের তিনজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মন্তব্য উদ্ধৃত করব। একজন রামমোহনের সমসাময়িক ভারত প্রবাসী ইংরেজ সম্পাদক মিঃ বার্কিংহাম, তিনি ১৮১৮ সালে ভারতবর্ষে আসেন এবং রামমোহনকে ভালভাবে জানিবার তাঁহার খুব সুযোগ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন—

“Rammohan Roy might have had abundant opportunities of receiving rewards from the Indian Government in the shape of offices and appointments, for his mere neutrality ; but being as remarkable for his integrity as he is for his attainments, he has pursued his arduous task of endeavouring to improve his countrymen, to beat down superstition, and to hasten as much as possible those reforms in the religion and Government of his native land of which both stand in equal need. He has done all this to the great detriment of his private fortune, being rewarded by the coldness and jealousy of all the great functionaries of Church and State in India, and supporting the Unitarian Chapel, the Unitarian Press and the expense of his own publications, besides other charitable acts, out of a private fortune, of which he devotes more than one-third to acts of the purest philanthropy and benevolence.”

ভাৎপয়া,

“রামমোহন যদি (গবর্নমেন্টের সমালোচনা না করিয়া) কেবল নিরপেক্ষ থাকিতেন, তবে পদ ও চাকরীর আকাংখে ভারতীয় গবর্নমেন্টের নিকট হইতে পুরস্কার পাঠবার প্রচুর সুযোগ তাঁহার হইত, কিন্তু

বিজ্ঞাবুদ্ধির জন্ত যেমন, সততার জন্তও তেমন তিনি লক্ষ্যভূত ছিলেন বালিয়া, তিনি স্বদেশবাসীদের উন্নতি সাধন, কুসংস্কার বিনাশ, এবং জন্মভূমির ধর্ম ও শাসন প্রণালীতে সমভাবে আবশ্যিক সংস্কার যথাসম্ভব সম্বল সাধনরূপ শ্রমসাধ্য কার্য করিয়া আসিতেছেন। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত দাণের প্রভূত ক্ষতি করিয়া এই সব করিয়াছেন। তাহাতে এত পুরস্কার পাইয়াছেন, যে, সরকারী বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিদের এবং স্থায়ী ইংলণ্ডীয় গির্জার বড় বড় পাদ্রীদের অমৈত্রী ও ঘৃণার পাত্র হইয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে তিনি একেশ্বরবাদী মন্দির ও ছাপাখানা চালান, নিজের কেতাব পত্র মুদ্রণ ও প্রকাশ করেন, এবং নানাবিধ মানবিকতার ও দয়াধর্মের কাজ করেন। তাহাতে তাঁহার আয়ের এক-তৃতীয়াংশেরও উপর ব্যয়িত হয়।”

রামমোহন সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের দীর্ঘ অভিভাষণের এক জায়গায় আছে :—

“The German name for prince is furst, in English first, he who is always to the fore, he who courts the place of danger, the first place in fight and the last in flight. Such a furst was Rammohan Roy, a true prince, a real Rajah, if Rajah also, like Rex, meant originally the steersman, the man at the helm.”

ভাৎপয়া,

“প্রজ্ঞের জাম্বিয়ান প্রতিশব্দ ফুরষ্ট, ইংরেজী ফার্স্ট। তিনি যিনি সমুদাই অগ্রণী, যিনি বিপদের জায়গাটি বাছিয়া লয়েন, যুদ্ধে প্রথম স্থান এবং পলায়নে শেষ জায়গা, রামমোহন রায় এইরূপ ফুরষ্ট ছিলেন, একজন সত্যিকার প্রজ্ঞ, বাস্তবিক রাজা—যাঁদ ল্যাটিন রোগ শব্দের মত রাজার মানে আদিতে ছিল কর্ণধার।

সুপ্রসন্নাত্ম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামমোহন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় বালিয়াছেন :—

“Sitting at the feet of Rammohan Roy, let us be imbued with his lofty spirit—his love of country, his devotion to truth, his enthusiasm for progress—let us be regenerated

by the touch of his example, and we shall then have acquired the impulse which will carry us on to and will help us to secure for ourselves a place among the progressive nations of the earth and to accomplish those high destinies which, I believe, are reserved for us in the decrees of Providence."

তাৎপর্য্য,

"রামমোহন রায়ের পদপ্রান্তে শিক্ষার্থীরূপে উপবিষ্ট হইয়া, আত্মন আমরা তাঁহার উচ্চাশয়তাতে অনুপ্রাণিত হই—তাঁহার পদশ্রীতিতে, তাঁহার সত্যপরায়ণতাহে ও প্রগতিব্রজ তাঁহার সোৎসাহ উদ্ভবে; আত্মন আমরা তাঁহার দৃষ্টান্তের সংস্পর্শে পুনর্জন্ম লাভ করি, তাহা হইলে আমরা পৃথিবীর প্রগতিশীল জাতিদের মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারিব, এবং বিশ্বতা তাঁহার বিধানে আমাদের জন্ত যে-সব উচ্চ সৌভাগ্য রাখিয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইব"।

পরলোকগত বিচারপতি শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন :—

"One thing, I believe, we all will be agreed upon—all sects, whether orthodox Hindus or progressive Brahmos, whether Mahomedans or Christians, that to Rammohun Roy is due the credit of forcibly pointing out to learned Hindus that religion does not require one to be a yogi, a suttee, or to go to the forest, but that home and society are the best surroundings of appropriate worship."

তাৎপর্য্য,

"আমরা গোড়া হিন্দু বা প্রগতিশীল ব্রাহ্ম, মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান, যাহাই হই, এট একটি বিষয়ে আমি বিশ্বাস করি আমরা সকলে একমত হইব, যে, বিদ্বান্-হিন্দুদিগকে ইহা প্রত্যয়জনক ভাবে জানাইয়া দিবার প্রশংসা রামমোহন রায়েরই প্রাপ্য, যে ধর্ম্মলাভের জন্ত কাহারও "যোগী" বা "সহস্রভা" বা অরণ্যগামী হইবার আবশ্যক

নাই, কিন্তু গৃহপরিবার ও জনসমাজই স্বাযোগ্য ভগবদ্বাদার পরিবেষ্টন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা।"

ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের সহিত হিমালয়ের পার্বত্য লোকালয় সমূহে ভ্রমণ কালে তাঁহার কথাবার্তার অঙ্কলিপ রাখিয়াছিলেন, তাহা Notes of some wanderings with the Swami Vivekananda নাম দিয়া স্বামী সারদানন্দ পুস্তকাকারে বাহির করেন। তাহার ১৯ পৃষ্ঠায় আছে :—

"It was here, too, that we heard a long talk on Rammohun Roy, in which he (Swami Vivekananda) pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message, his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussulman equally with the Hindu. In all these things, he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Rammohun Roy had mapped out."

তাৎপর্য্য,

এখানেই রামমোহন সঙ্ক্ষে স্বামীজীর দীর্ঘ ভাষণ শ্রবণে পাই, তাহাতে স্বামীজী বলেন, শিক্ষাদাতা রামমোহনের বাণীর তিনটি প্রধান সূত্র, বেদান্তকে সত্য বলিয়া গ্রহণ, পদশ্রীতি প্রচার, এবং সেই মৈত্রী যাহা হিন্দু ও মুসলমানকে সমভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিল, স্বামী বিবেকানন্দ দাবী করেন, যে, রামমোহনের উদ্যম ও ভবিষ্যৎনিষ্ঠতা যে কালের তালিকা ও পদ্ধতি নির্দেশ করিয়া গিয়াছে, তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) সেই কাজ করিতেছেন।"

ভারতবর্ষে গাহারা ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া লাভবান হইয়াছেন, গাহারা জ্ঞানী হইয়াছেন, দেশভক্ত হইয়াছেন, সংস্কার উন্নতি ও প্রগতি চাহিতেছেন, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ও পৃথিবীর নানা দেশের সহিত মানসিক আদান প্রদান করিতে পারিতেছেন, পৃথিবীর সমসাময়িক ইতিহাসে শ্রোতা দর্শক ও কর্মী হইতে

পারিতোছেন—উাহাদের একটি কথা স্মরণ করা ও মনে রাখা আবশ্যক। যখন ইংরেজ-রাজত্ব ভারতবর্ষে ক্রমশঃ শিক্ষা দেওয়া হইবে এই প্রশ্ন উঠে, তখন একদল লোক (ক্ষমতাশীল ইংরেজ রাজপুরুষেরা প্রায় সবাই এই দলে ছিলেন) কেবল সংস্কৃত আরবী পারসী ও কিছু দেশভাষা শিখাইবার পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু রামমোহন দয়্য প্রাচ্য বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও এবং সংস্কৃত শিখাইবার শিক্ষালয় স্থাপন করিয়াও ইংরাজী ভাষার সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি শিখাইবার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া লর্ড আমহার্‌স্টের নিকট একটি আবেদন পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তখন তখন সেই চিঠি ফলদায়ক হয় নাই। কিন্তু পরে যে ইংরাজী শিখাইবার পক্ষপাতী “ইংলিশ পার্টি” নামক দলের উদ্ভব হয়, তাহার প্রভাবে এবং লর্ড মেকলের মন্তব্য পড়িয়া বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্‌ক ইংরেজী শিক্ষা

চালাইবার দিকে মত দেন, এই “ইংলিশ পার্টি”র উদ্ভব কেবলকি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের বষ্ট খণ্ডে ১১০ পৃষ্ঠায় আছে :—

It is important to notice that the strongest influence in bringing this “English Party” into existence were the petition of Rammohun Roy and the practical experience of the Committee.

তাৎপর্য্য,

ইহা লক্ষ্য করা বিশেষ আবশ্যক, যে, ইংলিশ পার্টির উৎপত্তি যে প্রবলতম প্রভাবের ফলে হয় তাহা রামমোহন রায়ের আবেদন পত্র এবং কমিটির স্বীয় কার্য্যালয় অভিজ্ঞতা।

মেকলের মন্তব্যেও রামমোহন রায়ের চিঠির প্রতিফলন পাওয়া যায়।

প্রবাসী: কার্তিক, ১৩৪০।



# সংসার

## নির্বাচনে অত্যাশ্চর্য্য পথ অবলম্বন

কংগ্রেসদলের (নয়া কং) বিরুদ্ধদল বলিয়া থাকেন যে, বর্তমান নির্বাচনে তাঁহাদের বিজয় নানা প্রকার মিথ্যা ভোট দানের ফলে হইয়াছে। সায়সম্মতভাবে নির্বাচন হইলে নয়া কং দিগের বিজয় হইত না। একথাটা আন্তরজন-দোষ-হুটে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একথাও বিশ্বাস করা কঠিন যে, নির্বাচনে কোনও মিথ্যা ভোটদান হয় না। কারণ সকল নির্বাচনেই মিথ্যাভোটের ক্রীড়া চলিয়া থাকে এবং এইবারেও চলিয়াছে বলিয়াই জনসাধারণ মনে করেন। তবে নয়া কং শ্রীমতী ইন্দিরার যুদ্ধজয়ের ফলে সাধারণের চক্ষে একটা নূতন গৌরব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বিজয়, যেভাবেই নির্বাচন হইত না কেন, এক প্রকার স্থির নিশ্চয় ছিল। “যুগজ্যোতি” সামগ্রাহিকে এই বিষয়ের একটা বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—“রেড রাগ টু দি বুল (red rag to the bull)”—খাঁড়ের নিকট লাল কাপড়ের টুকরা। সম্ভ্রান্তি পশ্চিমবঙ্গের গত নিগাচন সম্পর্কীয় আলোচনা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের নিকট ঐ “লাল কাপড়ের টুকরা” হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ নিগাচন সম্পর্কে কোন আলোচনা করিতে গেলেই তাঁহারা গুরুত্বোজিত নয়, উন্নত হইয়া উঠিতেছেন।

গত ৪ঠা এপ্রিল নবনির্বাচিত বিধান সভায় আদি কংগ্রেস নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন রাজ্যপালের গৃহণের উপর বিতর্কে যোগ দিয়া নিগাচন সম্পর্কে স্তব্য করিলে কংগ্রেস সদস্যবৃন্দ বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। প্রফুল্ল সেন বলিয়াছিলেন, এইবার নির্বাচন সম্পর্কে তাঁহার নিকট যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে

দেখা যায় যে ৪০-৪৫ টি আসনে কারচুপি হইয়াছে। তিনি অভিযুক্ত প্রকাশ করেন যে, লোকের মনে যখন সন্দেহ দেখা দিয়াছে তখন একটি তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহার উত্তর দেন প্রথমে কংগ্রেসের বর্ধমানের নাদনঘাট হইতে নির্বাচিত পরেশ গোস্বামী, যিনি ১৯১১ সালের নিগাচনে সি পি এম প্রার্থীর নিকট প্রায় ১২ হাজার ভোটে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং ১৯১২ সালে যেখানে পুনবারের বিজয়ী সি পি এম প্রার্থী মাড় ২,৬৪১ টি ভোট পাঠয়াছেন, সেখানে ৬১,৬১৭টি ভোট পাইয়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীকে বিস্মিত ও হতচাকিত করিয়াছেন। তিনি প্রফুল্ল সেনকে ভীষের সহিত তুলনা করিয়া বলেন যে, পিতামহ ভীষ যেমন সর্বাঙ্গী জ্ঞানিয়া শুনিয়াও কোঁরব পক্ষ লইয়াছিলেন, প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ও তেমন সব জ্ঞানিয়া সি পি এমের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন ও কারচুপির কথা তুলিয়া জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে চাহিতেছেন, অথচ জনগণ যে সি পি এমের হিংসার পথ ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসকে গ্রহণ করিয়াছেন সে সম্পর্কে তিনি কোন কথাই বলেন নাই। বর্তমানের তরুণ রাজনৈতিক নেতারাও যে মহাভারত পাঠ করেন তাহা জ্ঞানিয়া বিস্মিত ও পূর্নাকিত হইলাম। তবে সম্ভবত সময়ভাবে শেষ পর্যন্ত পাড়য়া উঠিতে পারেন নাই। তাহা হইলে দেখিতেন যে, শরশয্যাশায়ী পিতামহ ভীষ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানের পর কোঁরবদের স্বপক্ষে কিছুই বলেন নাই। তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাষ্ট্রনীতি ও রাজ্যাশাসন সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিয়াছিলেন এবং রণজয়ী পাণ্ডবশ্রেষ্ঠও বিনীতভাবে ঐ উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রফুল্ল সেন যদি ভীষ হন, তাহা হইলে বর্তমানে তিনি যে শরশয্যাশায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরে শচল গোস্বামীর কথা বুঝি, কারণ প্রফুল্ল সেনের উক্তি তাঁহার গায়ে লাগিয়াছে। নাদনঘাটের নিন্দাচনের অত্যন্ত ফলাফল জনমনকে সন্দেহাকুল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তাঁহার নেতা মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের ‘মেজাজ চ্যুতি’র কারণ বোঝা কঠিন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাজাহান নাটকের ঠগংজীবের কথা মনে হইতেছে। দ্রাঘত্ব্য করিবার পর তিনি যেমন চতুর্দিকে “দ্বারার ছিন্নমুণ্ড” ও “মোরাদের কবন্ধ” দেখিতেছিলেন, রায় মহাশয়ও তেমন “প্রফুল্ল সেনের কর্ণে” ও জ্যোতি বসুর কথাই শুনিতেছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—“প্রফুল্লবাবু আজ জ্যোতি বসুর কথাই বলেছেন। গলাটা শ্রীপ্রফুল্ল সেনের কিন্তু কথাটা জ্যোতিবাবুর। জ্যোতিবাবুরা বাইরে যা বলে বেড়াচ্ছেন প্রফুল্লবাবু এখানে তারই প্রতিধ্বনি করলেন। শ্রীসেন বলেছেন ৪০।৪৫টি আসনে কারচুপি হয়েছে—আমরা বলছি হয়নি।” বাস! আবার কি! মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং যখন বলিয়াছেন যে “হয়নি”—তখন তার উপর আর কোন কথাই চলিতে পারে না। আমাদের পরলোকগত ডাঃ বিধান রায়ের কথা মনে পড়িতেছে। একদিন বিধান সভায় তাঁহাকে উত্তেজিত হইয়া চিৎকার করিতে শুনিয়াছিলাম—“আমি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী—আমিই পশ্চিমবঙ্গের জনগণের প্রতিনিধি। তাই আমি যা বলি তাই পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কথা।” ছোট রায় তখন বসিয়াই বড় রায়ের মেজাজ ও দান্তিকতাটা পুরাপুরিই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। তবে সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষের কর্মশক্তি, বিচক্ষণতা ও প্রশাসনিক ক্রমতার কতটা আয়ত্ত করিয়াছেন ভবিষ্যৎই তাহার পরিচয় দিবে।

ভিয়েৎনামের ও বাংলাদেশের যুদ্ধ এক জাতীয় কি না

“মুগ্ধবাণী” প্রতিকার মতে এই দুই যুদ্ধের মধ্যে একই স্বাধীনতা প্রাপ্তির আবেগ দেখা গিয়াছে। আমাদের মতে দুই দেশের যুদ্ধের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। বাংলা দেশ লাড়িয়াছে সহস্র মাইল দূরের বিভিন্ন জাতির

মানুষের সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন নীতি ভাঙিয়া দিবার জন্য। ভিয়েৎনামে লাড়াই হইতেছে এক জাতির দুই রাষ্ট্রমতাবলম্বী দলের মধ্যে; ক্রশ-চীন সমর্থিত কম্যুনিষ্ট দলের সহিত আমেরিকার সাহায্য প্রাপ্ত সাধারণতন্ত্রবাদী দলের। এখনকার যুদ্ধটা আরম্ভ হইয়াছে কম্যুনিষ্টদলের সাধারণতন্ত্র এলাকায় অতঃপ্রবেশের ফলে। বাংলাদেশে যুদ্ধ হইয়াছিল পঞ্চদশবৎসরাধিক কাল পশ্চিমপাকিস্তান কর্তৃক লুণ্ঠিত—উৎপীড়িত হওয়ার কারণে। একটা মতবাদ ঘটিত যুদ্ধ; অপরটি অতি বাস্তব লুণ্ঠন উৎপীড়ন ও শোষণ নিবারণ ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত। মুগ্ধবাণী বলিয়াছেন:

ভিয়েৎনামে আবার ভীমবেগে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এই যুদ্ধ মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত অধ্যায়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়া থেকে যাতে চিরতরে বিতাড়িত হয় এবারের যুদ্ধ সেই উদ্দেশ্যেই শুরু করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন পিকিংয়ে গিয়েছিলেন। ভিয়েৎনামের ব্যাপারে একটা আপস-মীমাংসার আয়োজন করতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গোপন আলোচনায় নিক্সন ও চৌ এন লাই একটা বোঝাপাড়া এসেও ছিলেন। নিক্সন তাইওয়ানের ওপর চীনের অধিকার স্বীকার করে নেন। প্রতিদানে চৌ এন লাই ভিয়েৎনামে যুদ্ধ বন্ধের আশ্বাস দেন এবং ধীরে ধীরে আমেরিকান সৈন্য প্রত্যাহারের স্বেচ্ছা দেওয়া হবে একথাও জানান। চৌ এন লাই আরও জানিয়েছিলেন যে এশিয়া থেকে সমস্ত মার্কিন সৈন্য ও মার্কিন সামরিক ঘাঁটি অপসারণের পক্ষপাতী তাঁরা নন। কারণ এশিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব ক্রমবর্ধমান। তাকে প্রতিহত করার সাধ্য চীনের নেই। এশিয়ায় চীনকে কোন দেশ বিশ্বাসও করে না। তাই রাশিয়ার প্রভাব যাতে একচ্ছত্র না হতে পারে সেজন্য এশিয়ায় মার্কিন উপস্থিতি চীনেরও কাম্য। ভিয়েৎনামের আশুনকে তাই ছাই চাপা দেবার গরজ নিক্সনের মতো চৌ এন লাইয়েরও ছিল।

কিন্তু ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা চীনের কথায় কর্ণপাত করেনি। তারা চীনকেই বিশ্বাস করে

না। তারা প্রকাশ্যে বলেছে যে অল্প রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া সমাধান তারা মেনে নেবে না। নিশ্চয় যখন পিকিংয়ে গিয়েছিলেন ভিয়েতনামীরা তখন রাশিয়ার কাছ থেকে বহু আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছে। তারা জানত সশস্ত্র সংগ্রাম ভিন্ন স্বাধীনতা আসবে না, দেশের ঐক্যও সাধিত হবে না। তারা তারই জ্ঞান প্রস্তুত হয়েছে। আমেরিকা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে সাহায্য ও সমর্থন দান করেছিল। সেখানে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে আজ আমেরিকা স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। আমেরিকার শক্তির পরিমাপ তাতেই হয়ে গিয়েছে। তাদের সাধ্যের সীমাও জানা গিয়েছে। ভিয়েতনামে তাই এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামের গাঁতকে তীব্রকর করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে ভিয়েতনাম থেকে একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে এসেছিল। তারা বাংলাদেশে একটি বিশেষ কথা বলে গিয়েছে। তারা বলেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে গোড়া থেকেই ভিয়েতনামবাসীরা সমর্থন করেছে, কারণ তারা জানে যে বাংলাদেশের ও ভিয়েতনামের সংগ্রাম একই মহাসংগ্রামের দুটি অংশ মাত্র। এশিয়া থেকে সকল সাম্রাজ্যবাদী দখল ও শোষণকে দূর করার লড়াই দশকের পর দশক ধরে চলেছে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, বার্মা, চীন সবাই স্বাধীনতার লড়াই করেছে—কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে এশিয়া পূর্ণ মুক্ত হয়নি। এইবার এশিয়ার মুক্তি সংগ্রামে পূর্ণ আত্মতা দেবার আয়োজন হয়েছে।

হুই যুদ্ধই এশিয়ার মুক্তি যুদ্ধ অথবা একটি মুক্তি যুদ্ধ ও অপরটি মতবাদ স্থাপন চেষ্টার সংগ্রাম তাহা বিচার্য।

### গ্রামের কথা

“যুগশক্তি” (করিমগঞ্জ) পত্রিকায় একজন গ্রামবাসী লিখিতেছেন :

স্বাধীনতা পাওয়ার পর হইতেই অনেক আশা ও আশ্বাসবাণী গ্রামবাসীরা শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু

হুজুরের বিষয় কার্যক্ষেত্রে গ্রামগুলির কোনও উন্নয়নই হয় নাই। সরকারী বেসরকারী সকল দ্বয়েই শহরের সমস্তাদির প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়ার মনোভাব ইদানিং আরো বাড়িয়াছে। অথচ দেশের অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বাস করে এবং তাহাদের প্রায় বাদ দিয়াই দেশ গঠনের যাবতীয় কাজ কর্ম করা হইয়া থাকে। আমাদের করিমগঞ্জ মহকুমার গ্রামগুলির অবস্থা সকল দিক দিয়াই শোচনীয় কিন্তু সেগুলির উন্নতির জন্য সচেতন হইতে কাঁচাকেও বড় দেখা যায় না। শহরের যে কোন সমস্তা সঙ্গে সঙ্গে শাসন কণ্ঠপক্ষের কাছে পেশ করা যায়, এবং প্রতিকারও পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রামের মানুষের নালিশ যথাগত পৌছানোই কঠিন ব্যাপার, তদুপরি ধরাধারির উপযুক্ত শক্ত লোককে বিষয়টি সমজাইয়া দিতে না পারিলে প্রতিকার কোনও সময়ই হয় না। সংবাদপত্রগুলিতেও গ্রামের সমস্তা খুব একটা মর্যাদা পায় না, রাজনৈতিক দলগুলিই শহরের মধ্যেই তাহাদের সমস্ত কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখেন, কারণ নেতারা সকলেই শহর হইতে নেতৃত্ব করেন, এমন কি গ্রাম্যকলের জনপ্রতিনিধিরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শহরবাসী, ভোটার প্রয়োজন ছাড়া গ্রামের খবর নেওয়ার দরকার তাহারা বোধ করেন না।

শহরের মানুষ যে সমস্ত সমস্তা লইয়া প্রথমে গুলুগুলু বাধাইয়া দেন, সেই সমস্ত সমস্তা গ্রাম্যকলে দিনের পর দিন বছরের পর বছর শিকড় গাড়িয়া বাসিয়া আছে, প্রতিকারের কথা কেহ চিন্তাও করে না। আপনাদের কাগজেই দোঁপ, একদিন হুজুরন কেবোর্সিন পাওয়া যায় না না পেলো বিজলী বাত শোভিত আপনাদের শহরে সোরগোল পাড়িয়া যায়। অথচ জায্য মূল্যে কেবোর্সিন না পাওয়া বা মধ্যে মধ্যে একেবারেই না পাওয়া আশাদের নিত্য দিনের সমস্তা। রেশনে চিনির বরাদ্দ একটু কম হইলে আপনারা তোলপাড় করেন, আমরা চিনির চেহারাি প্রায় ভুলিতে বাসিয়াছি। মাছের অধিমূল্য নিয়া গত সপ্তাহেও আপনারা লিখিয়াছেন, আমরা কোনও মূল্যেই মাছ পাই না। বেবীফুড গ্রামের



অধিকাংশ লোকই কিনিতে পারে না, অথচ গোহৃৎ ও গ্রামাঞ্চলে হুত্ৰাপ্য বস্ত্ৰ, শহরে প্রায় সবই চালান হয়। আমাদেব শিশুরা হৃৎদেব অভাবে ভাতের ফ্যান খাইয়া কপাল জোবের ভারতম্য অহুসারে বাঁচিয়া থাকে কিংবা মারা যায়। এক ডজন সরকারী ডাক্তার এবং শতাধিক প্র্যাকটিশনার লইয়া আপনারা চিকিৎসার অব্যবস্থা নিয়া প্রায়ই নালিশ জানান, আর আমরা এক ডজন গ্রামের জন্ত একজন মাত্র ডাক্তার পাইয়া ধন্ত হই। রিজ্ঞা চড়িতে না পাইয়া আপনারা গলদঘর্ম আর আমরা পায়ে চলা পথের একটা ব্যবস্থা করিতে পারিলে বর্ত্তাইয়া যাই। বানে কিংবা ধরায় যখন আমরা ফসল খোয়াইয়া সনহাস্ত হই, আপনাদের তখন কোনরূপ চিন্তাবৈকল্প দেখা যায় না, ককে মাস পর সেই কারণে যখন শহরের বাজারে চাউলের দাম বাড়িয়া যায়, তখন অবশ্ত আপনাদের সাময়িক উত্তেজনা দেখা দেয়, কিন্তু বেশনের বরাদ্দ একটু বাড়াইয়া দিলেই আবার শান্ত হইতেও সময় লাগে না।

সরকার অবশ্ত বলিবেন যে উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মাধ্যমে গ্রামগুলির উপকারের জন্ত তাঁহারা পয্যাপ্ত খরচ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ২৫ বৎসরের বন্ধনার ঠেলায় এইটুকু বুঝিয়াছি যে প্রক অফিসগুলি এক ধরনের

আড্ডাখানাও বটে। দেশবাসীর রক্ত জল করা ট্যাক্সের টাকা এখানে একদল অযোগ্য সন্ধানী লোকের মধ্যে বন্টিত হয়। প্রক সমূহের সাহেব, আধা সাহেব মায় কেরানী-পিয়ন পর্য্যন্ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের মত উন্নাসিক মনোভাব লইয়া গ্রামবাসীদের সহিত ব্যবহার করেন, গ্রামের প্রতি অহুমান্ত মমতা ইহাদের নাই। কিছুদিন আগে বেকারী দূর করার নামে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের যে টাকা প্রকগুলিতে আসিয়াছিল, তাহাতে কয়জন বেকার উপকৃত হইয়াছে, তাহার হিসাব লইলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। উন্নত সারের প্রয়োগ, শিক্ষার বিস্তার, স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবহার উন্নয়ন ইত্যাদি ব্যাপারে যে পারিসংখ্যান মাঝে মধ্যে প্রকাশিত হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাঁওতা মাত্র।

এইভাবে দেশের শতকরা নব্বই ভাগ লোকের সমস্ত্রাকে অবহেলা করিয়া দেশ গঠনের কাজ কিছুমাত্র অগ্রসর হইবে না এবং অদূর ভবিষ্যতে গ্রামগুলি নিান্ত্রত ধবংস হইবে। প্রশাসন ও সমাজের বাঁহারা চিন্তাশীল অংশ তাঁহারা আরো কার্যকরী ভাবে গ্রামীন সমস্ত্রা-গুলির সমাধানে অগ্রসর না হইলে গোটা দেশই তাহার বিষময় ফল ভোগ করিবে।



# দেশ-বিদেশের কথা

মহামতি লেনিনের অমর বাণী

কতটা সফল হইয়াছে ?

খালিস্থামেন্দোভ লিখিত, “প্রভুদায়” প্রকাশিত নিয়োকৃত প্রবন্ধটি (তর্জমা) হইতে দেখা যাইবে যে, কশরাই পরিচালনা কার্যে লেনিনের উপদেশ অনুসরণ করাই একান্তভাবে অনুষৃত পদ্ধতি। ইহার যাবার্থা লইয়া মতভেদ থাকিলেও প্রবন্ধটি জ্ঞানগর্ভ ও সুপাঠ্য। ইচ্ছা করা কম্যুনিষ্টদিগের রাষ্ট্রীয় আদর্শ কি তাহা বুঝা যায়। আদর্শ অনুসরণ হান-কাল-পাত্র-নির্দেশে যে কখনও একই পথেই চলে না, তাহা ইতিহাসের চর্চা করিলে পরিষ্কার বুঝা যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ান সমাজতন্ত্রের মূলতঃ সফল্যগুলির অন্ততঃ এই আশাদের দেশের সমস্ত জাতি ও অধিকাংশকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের পত্রাকাতলে সমবেত করা। আমরা চিরন্তরে শোষণ, নিপীড়ন, এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির উপর বলপ্রয়োগের অবসান ঘটিয়েছি। আমরা সমান অধিকারভোগী স্বাধীন জাতিসমূহের নতুন ধরণের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক ইউনিয়ন বা জাতিসংঘ গড়ে তুলেছি।

জাতিগত সম্পর্কের লেনিন-নীতির বিপুল সাফল্যতা সোভিয়েত রাষ্ট্রের সমগ্র ইতিহাস প্রমাণ করেছে। এই সব আন্তর্জাতিক নীতিকে ভিত্তি করে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির অটুট সংঘ ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে।

এই বছরের ৩০ শে ডিসেম্বর সোভিয়েত জনগণ এই জাতিসংঘের ৫০শ বার্ষিকী উদ্‌যাপন করবে।

॥ ১ ॥

পৃথিবীর বৈপ্লবিক নব রূপায়ণে জাতিসংক্রান্ত সমস্ত হান ও ভূমিকা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ব্যাখ্যা করেছে এবং দেখিয়েছে যে, এই সমস্তা শ্রেণীসংগ্রামের

স্বার্থের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। তত্ত্ব ও কর্ম প্রমাণ করেছে যে, পুঁজিবাদী দাপ্তরের বিরুদ্ধে এবং সামাজিক ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জন্য সংগ্রামে সকল জাতির শ্রমিকশ্রেণীর একেবারে একান্ত প্রয়োজন।

পার্টির জাতিসংক্রান্ত কর্মসূচীর সার-বিষয়টি বর্ণনা করে লেনিন তাঁর মৌল নীতিগুলি নিম্নলিখিতভাবে নির্ধারণ করেছেন — “জাতিসমূহের পরিপূর্ণ সাম্য; জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার; সমস্ত জাতির শ্রমিকদের মিলন।” লেনিন বলেছেন যে, সাধারণভাবে জাতিসমূহের সাম্য সম্পর্কে যামূল গুলি আউড়ে কান্ড হলে চলবে না, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করতে হবে। জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করে নিপীড়িত জাতির মার্কসবাদীদের জোর দিতে হবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতার উপর, আবার নিপীড়নকারী জাতির মার্কসবাদীদের জোর দিতে হবে জাতিসমূহের স্বতঃপ্রণোদিত একেবারে উপর। লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন যে, জাতিসমূহের সংসক্তি ও মিলনের দিকে, আন্তর্জাতিকতাবাদের দিকে এগুনোর আর কোন পথ নেই, থাকতে পারে না।

লেনিন একটি গ্রহণ বহুজাতিক রাষ্ট্র রূপে সমাজতান্ত্রিক রূপায়ণ করণা করেছিলেন। এই রাষ্ট্র কোন বিশেষ জাতিতে কোন বিশেষ সুবিধা দেবে না এবং জাতিসমূহের সাম্য ও সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে ভাষাসমূহের সাম্য অন্তর্ভুক্ত করবে। এই রাষ্ট্র সংখ্যালঘু জাতিগুলির অধিকার ও অবাধ বিকাশের গ্যারান্টি দেবে। অকটোবর বিপ্লবের স্বল্পকাল আগে লেনিন লেখেন: “আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থাৎ স্বাধীনতার অর্থাৎ নিপীড়িত জাতিগুলির বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতা দাবি করি। এর কারণ এই নয় যে, অর্থনৈতিক দিক

থেকে আমরা দেশকে টুকরো টুকরো করার অথবা ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আদর্শের স্বপ্ন দেখেছি। এর কারণ এই যে, আমরা চাই বৃহৎ রাষ্ট্র, স্বনিষ্ঠতর ঐক্য এবং এমন কি জাতিসমূহের মিলন, কিন্তু এসব আমরা চাই সাত্যাকারের গণতান্ত্রিক, সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার স্বাধীনতা ব্যতিরেকে অচিস্তনীয়।” (সংগৃহীত রচনাবলী, ইংরাজী সংস্করণ, ২১ শ খণ্ড, পৃ: ৪১৩-৪১৪)

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের দেশের সমস্ত জাতি ও অধিজাতিতে একটি দৃঢ়সংবদ্ধ আন্তর্জাতিকতাবাদী প্রত্যঙ্গের পরিণত করেছে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা ও তাদের পার্টিগুলি কোনঠাসা হয়েছে, জনগণের সমর্থন হারিয়েছে এবং বিপ্লব কড়ক পরাটুত হয়েছে। পার্টি অত্যন্ত লেনিনের জাতি সংক্রান্ত কর্মসূচী রুশিয়ার সমস্ত জাতি ও অধিজাতির জনগণের মনে পূর্ণ আস্থা জাগায় এবং সামাজিক ও জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামে বৈপ্লবিক উত্তম ও শক্তি জাগ্রত করে।

\* \* \* \*

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় এনে দেয় রুশিয়ার সমস্ত জাতির স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সাম্য। এই জয় তাদের সামাজিক ও জাতিগত নিপীড়ন থেকে মুক্তি দেয় এবং আমাদের দেশের জাতি ও অধিজাতিগুলির সংঘ গড়ে তোলা ও সংহত করার প্রয়োজনীয় সমস্ত অবস্থা সৃষ্টি করে। রুশিয়ার জাতিসমূহের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা, মেহনতী ও শোষিত জনগণের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা, রুশিয়া ও প্রাচ্যের সমস্ত মেহনতী মুসলিমদের প্রতি আবেদন, রুশ ফেডারেশনের প্রথম সংবিধান এবং সোভিয়েত সরকারের অন্তর্ভুক্ত দলিল জাতিগত এবং জাতিধর্মগত সমস্ত বিশেষ অধিকার ও বিবিনিবেধ লোপ করে এবং ছোটবড় সমস্ত জাতির সাম্য ও সাংগঠনিক এবং বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সহ তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা করে।

রাষ্ট্র সংগঠনের লেনিনবাদী নীতিসমূহের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার পরিকল্পনা রচনা করে। সমাজতান্ত্রিক ধরণের যুক্তরাষ্ট্র সমমর্যাদা-সম্পন্ন জাতিগুলিকে যেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহিত করে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এক জাতি কড়ক অপর জাতির উপর সশস্ত্র বলপ্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে, জাতিগত বিবাদ-বিসংবাদ নির্মূল করতে সাহায্য করে, জাতিসমূহের সৌভ্রাতৃপূর্ণ সহযোগিতা এবং শ্রমজীবী জনগণের অভূতপূর্ণ গণতন্ত্রের কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশক্তি গড়ে তোলার অবস্থা সৃষ্টি স্থানান্তর করে।

ঐতিহাসিক বিকাশের দ্বারা সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের সংঘ গড়ে তোলার তাগিদ দেয়। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের সংঘ ব্যতিরেকে সাম্রাজ্যবাদ কড়ক বিধ্বস্ত উৎপাদন-শক্তিগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, অর্থ ও পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলা ও খৃষ্টিসম্মত সামাজিক শ্রমবিভাগ প্রতিষ্ঠা করা ও প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা, শ্রমজীবী জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে যাওয়া এবং সমস্ত জাতি ও অধিজাতির সংস্কৃতির সশালীন বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটানো অসম্ভব ছিল। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রসমূহের সংঘ ব্যতিরেকে প্রজাতন্ত্রগুলির স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে তাদের বাঁচানো অসম্ভব।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির সংঘ গঠনের ৫০শ বার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি সংক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে জোর দিয়ে বলা হয়েছে: “রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ফলাফলের দিক থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের ইতিহাসে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির সংঘের প্রতিষ্ঠা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণার সংশ্লিষ্ট জয় এবং কমিউনিস্ট পার্টির জাতিসংক্রান্ত লেনিনবাদী কর্মনীতির সার্থক ফল।”

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতি জাতিসংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে দৃষ্টিপন্থী ও “বামপন্থী”

শোষণবাদী ধারণাগুলিকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করেছে। এট সব ধারণার ফল কি হয় চীন-নার দৃষ্টান্ত। জাতিসংক্রান্ত কর্মনীতির লেনিনবাদী নীতিগুলি বর্জন করে মার্সবাদীরা সংখ্যালঘু জাতিগুলিকে সাক্ষীকরণে বাধ্য করে এবং তাদের সম্পর্কে “চীনা করণের” কর্মনীতি অনুসরণ করে দেশে প্রবলভাবে চীন জাতাভিমানের অনুশীলন করেছে। গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধানে সকল জাতির সাম্যের কথা বলা হলেও অ-চীন জাতিগুলির লোকেরা (চীনে এঁদের সংখ্যা ৩৬ লাখ কোটির মত) চীন অবস্থায় আছেন, এঁরা এঁদের নিজস্ব জাতীয় রাষ্ট্রসত্তা প্রতিষ্ঠার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

জাতিসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে শোষণবাদী কর্মনীতির দরুণ দৃঢ়ভাবে উদ্ঘাটন করে এবং আবির্ভূতভাবে লেনিনবাদী কর্মনীতি অনুসরণ করে সোভিয়েতের পার্টি আমাদের দেশের ছোট-বড় জাতিগুলির সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা বাদের মত নীতিগুলি স্থাপন করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন রাষ্ট্রসমূহের একটা সীমিত মাত্র নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন হল সোভিয়েত জাতিসমূহের দেখ্ছায় স্থাপিত অষ্টটি সমাজতান্ত্রিক সংঘ। দশাশিত প্রজাতন্ত্র, দশাশিত অঞ্চল এবং জাতীয় এলাকাগুলি একাবক সোভিয়েত রাষ্ট্রের অচ্ছেদ্য অংশ। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের সংঘ আমাদের দেশে জাতি ও আধিজাতিগুলির একাবদ্ধতার মৌলিক রূপ এবং জাতি ও আধিজাতিসমূহের অগ্রগতি, স্বাধীনতা ও সাম্যোন্মেষের গ্যারান্টি।

|| ২ ||

সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহের যুক্ত প্রচেষ্টায় নির্মিত সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ ভাবে প্রমাণ করেছে যে, স্থিতি-ক্ষমবাসম্পন্ন জাতি এবং স্থিতিকার্যে “অসমর্থ” ও জীবনাত্মক দিক থেকে “অযোগ্য” হওয়ার ফলে আত্মক জীবনে স্বাভাবিক জাতিগুলি সম্পর্কে বুজোয়া তাত্ত্বিকদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা তত্ত্বগুলি অসার ও

অ-বৈজ্ঞানিক। আমাদের দেশে জাতিসংক্রান্ত সমস্যায় সমাধান অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণ করেছে যে, সক্রিয় ও স্বাধীন স্থিতির নীতিগত ক্ষমতা শুধু “বাহাই”-করা জাতিগুলির সম্পাদিত নয়, বরং এই ক্ষমতা সকল জাতিই পেতে পারে।

সহযোগিতা ও সৌহার্দপূর্ণ সাহায্য, বিশেষ করে, কৃষ জনগণের সাহায্যের ফলে আমাদের দেশের জাতি ও আধিজাতিগুলি এক পুরুষের মধ্যেই কয়েক শতাব্দী পথ অতিক্রম করেছে এবং কোন কোন জাতি পুঁজিবাদ এড়িয়ে সমাজতন্ত্রে উপনীত হয়েছে। নতুন ধরণের সমাজ গড়ে তোলার কালে তারা তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রসত্তা অর্জন করেছে, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা দূর করেছে এবং অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সর্বোচ্চ সমাজতান্ত্রিক রূপে উপনীত হয়েছে। লেনিনের পার্টি একমাত্র সঠিক ও ত্রাণাভিত্তিক জাতিসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম করেছে, আর তা হল শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতি, আমাদের মহান দেশের সমস্ত জাতির সাম্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা।

বুজোয়া ব্যবস্থা হল সামাজিক ও জাতিগত অসাম্য, নিপীড়ন ও হিংসা, তাঁর সংকট ও অবিরোধিতার ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। কয়েক বছর ধরে সাহসী ভিয়েতনামী জনগণের রক্তপাত ঘনিনোর জল, মধ্যপ্রাচ্যে স্বাধীনতা প্রিয় আরব জাতিগুলির ভূখণ্ড দখল করার ও লক্ষ লক্ষ আরবের পরণামে পরিণত হওয়ার জল, জাতীয় স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে উত্তর আয়ারল্যান্ডের জনগণের সংগ্রাম নিপুণভাবে দমন করার জল সাম্রাজ্যবাদী দায়ী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে জাতিবৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের জল এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও বোডোশায় জাতিঘেঁসী সম্রাসের জখল আভয়ান চালানোর জলও সাম্রাজ্যবাদী দায়ী।

সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিনের জাতিসংক্রান্ত কর্মনীতির বাস্তব রূপায়ণের প্রেরণা স্থিতিকারী আদর্শ এক মহৎ আদর্শ। সোভিয়েত ইউনিয়নে অতীতের

অন্যসর জাতি ও অধিজাতিগুলির ঐক্য ও অগ্রগতির বাস্তব অভিজ্ঞতা বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। পুঁজিবাদী ও উন্নয়নশীল দেশগুলির শ্রমজীবী জনগণের উপর। সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমতা ও ক্রমবর্ধমান আকর্ষণীয় শক্তির উৎসগুলি হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বান্বিত ভূমিকা, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষককূলের মৈত্রী এবং সোভিয়েত জাতিগুলির অটুট বন্ধুত্ব ও ঐক্য। দেশপ্রেমিক মহামুন্দের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই ঐক্য এখন শান্তিপূর্ণ সৃষ্টিশীল শ্রমে এবং কমিউনিস্ট নির্মাণকার্যের বিশাল কর্মসূচীর রূপায়ণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে অভিযুক্ত হচ্ছে।

ছোট বড় প্রত্যেকটি জাতি কমিউনিজমের বৈষায়িক ও কারিগরী ভিত্তি প্রাপ্ততার কাজে যথায়োগ্য সাহায্য করছে। সমগ্র দেশের ও প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক সাফল্যের মূলে আছে সমগ্র সোভিয়েত জাতির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও স্থায়ী পারস্পরিক সাহায্য। শুণ্য বিশেষ বিশেষ প্রজাতন্ত্র নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্নিত প্রজাতন্ত্রে জনগণের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার ফলেই এক একটি প্রজাতন্ত্র অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির উচ্চ শিখরে উপনীত হচ্ছে। দেশের সমস্ত ঐতিহাসিক জাতিগুলির নিঃস্বার্থ সাহায্য ব্যতিরেকে কাজাখস্তানের শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ অহল্যা ও পীড়িত জমি আবাদ করা এবং ভূমিকম্পের পর তালখন্দার জনগণের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি পুনর্নির্মাণ করা কেমন করে সম্ভব হত?

বিশ্ববস্তুর দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক ও আবারের দিক থেকে জাতীয় সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাফল্যগুলির ভিত্তিতে। যেখানে বিপ্লবের আগে কৃষিয়ার জাতিও অধিজাতিগুলির নিরক্ষর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একেবারে নিরক্ষর ছিল, এমন কি, কোন কোন অধিজাতির নিজস্ব অক্ষরও ছিল না, আজ সেখানে অতীতের এই ভয়ঙ্কর উত্তরাধিকারকে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭০

সালের আদম শুমারীতে দেখা যায় যে, ১ থেকে ৪০ বৎসর বয়স্ক নরনারীর ১৯.৭ শতাংশ সাক্ষর। অল্প-প্রজাতন্ত্র এবং স্বশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলিতে লক্ষ লক্ষ সাধারণ শিক্ষাদানের বিদ্যালয়, শত শত মাধ্যমিক শিক্ষালয় ও বৃত্তি শিক্ষালয়, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান আকাদেমি, সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির শাখাসমূহ স্থাপিত হয়েছে। আজ বহুজাতিক সোভিয়েত সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছে সোভিয়েতের বিভিন্ন জাতির ৮১টি ভাষায়, বই প্রকাশিত হচ্ছে ১৪৫টি ভাষায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিগুলির আর্থিক বিকাশ, তাদের সংস্কৃতি সমূহের পারস্পরিক প্রভাব ও পারস্পরিক সমৃদ্ধিসাধনের ক্ষেত্রে ক্রশভাষা এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ক্রশভাষা জাতিসমূহের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ক্রশ ভাষার জনপ্রিয়তা কোন ভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিগুলির জাতীয় ভাষাসমূহের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে না বা তাদের ক্ষয় করছে না।

নতুন সমাজ গড়ে তোলার কালে পার্টির মতাদর্শগত ও শিক্ষামূলক তৎপরতার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতি ও অধিজাতির শ্রমজীবী জনগণের চেতনার বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। তাদের আত্মসম্মতি রূপান্তর ঘটেছে, তারা নতুন, সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতির আর্থিক গুণাবলী অর্জন করেছে, সঙ্গে সঙ্গে তারা অতীতের অনিষ্টকর অভ্যাস ও রীতিনীতি থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে। তাদের নিরক্ষর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব, জাতিগত আঁধারতা, জাতিগত বিদ্বেষিতা ও সংকীর্ণতা এবং অগ্নিত জাতির প্রতি জাতিগত স্বপ্নার মত কুৎসিত জিনিসগুলি থেকে মুক্ত। তারা সমাজতান্ত্রিক দেশাত্মবোধের ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবোধের মনোভাব নিয়ে মাহু হইয়েছে। উৎপাদনের হাতিয়ারগুলির সামাজিক মালিকানা, অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ, শ্রমিকশ্রেণীর কমিউনিস্ট আদর্শ ও স্বার্থের ভিত্তিতে

জনগণের নতুন ঐতিহাসিক গোষ্ঠী—সোভিয়েত জনগণ গড়ে উঠেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহের শক্তিশালী ঐক্য, তাদের সত্যিকারের সংখ্যবদ্ধতা। যে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থগুলিকে ভাষা দেয় এবং লেনিনবাদী জাতিসংক্রান্ত কর্মনীতি অনুসরণ করে একমাত্র কমিউনিস্টদের সেই পার্টিই সমস্ত জাতি ও অধিজাতিতে একটি অখণ্ড আন্তর্জাতিকতাবাদী ভ্রাতৃত্বসংঘের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করতে, তাদের প্রচেষ্টাকে নতুন সমাজ গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত করতে সক্ষম। মতাদর্শ, সংগঠনের পরণ এবং কাজের প্রকৃতি অত্রসারে একান্তভাবে আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়ায় এবং তার কর্মীদের মধ্যে আমাদের দেশের শতাধিক জাতি ও অধিজাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের ঐক্যবদ্ধ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি সাকল্যের সঙ্গে বহুজাতিক সামাজ্যতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তার নেতৃত্বান্বিত ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের পার্টির সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্মনীতি সোভিয়েত সামাজ্যতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির সংঘকে দৃঢ়তর করা এবং কমিউনিজম গড়ে তোলার সংগ্রামে জাতিগুলির সংখ্যবদ্ধতাকে ব্যাপকতর ও গভীরতর করা স্থানচ্যয় করেছে।

॥ ৩ ॥

আমাদের দেশের সমস্ত জাতি ও অধিজাতির প্রচেষ্টায় গঠিত অগ্রগামী সামাজ্যতান্ত্রিক সমাজে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি প্রত্যেকটি জাতিপ্রাতিম সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের স্বাধীন উন্নতি সাধনের এবং জাতি ও অধিজাতিগুলিকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলার লক্ষ্যে অভিমুখী কর্মনীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে। পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে লিওনিদ ব্রেঝনেভ বলেন, “এই ঘনিষ্ঠ করে তোলার ব্যাপারটি ঘটছে এমন অবস্থায় যখন জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং সামাজ্যতান্ত্রিক জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীরতম মনোবোগ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে পার্টির কর্মনীতির সার কথা হল আমাদের সমগ্র সংঘের সাধারণ স্বার্থ এবং

তার প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্রের স্বার্থ সদাসর্বদা বিবেচনা করতে হবে।”

জাতিসমূহকে ও বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সম্পর্কে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সমস্তাগুলির উপর পার্টি সদা নজর রাখছে। এ ক্ষেত্রে পার্টি যে কর্মনীতি অনুসরণ করেছে তা কমিউনিজম গড়ে তোলার বর্তমান স্তরের জটিল কর্তব্যগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের অবস্থান থেকে জাতিগত সম্পর্কের প্রশ্নগুলির মোকাবিলা করতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি উপেক্ষা করে না, আবার সেগুলিকে ফুলিয়ে কাঁপিয়েও দেখে না। পার্টি জাতীয়তাবাদ ও শ্রেষ্ঠাধিকারের এবং জাতীয় সংকীর্ণতা ও অহঙ্কারের যে কোন আকারের অভিযান্ত্রিক প্রতি আপসহীন মনোভাব অবলম্বন করতেই সমস্ত শ্রমজীবী জনগণকে শিক্ষা দেয়। পার্টি শ্রমজীবী জনগণের মনে সমস্ত জাতি ও অধিজাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা মনোভাব জাগিয়ে তোলে। “ক্ষুদ্র জাতিগুলি সংকীর্ণ মনোভাব, সংগোপনে থাকা ও বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার” এবং “সমগ্র ও সাধারণকে বিবেচনা করার এবং বিশেষকে সাধারণ স্বার্থের নীচে স্থান দেওয়ার” প্রয়োজনীয়তার প্রতি লেনিন বার বার অজুলী নির্দেশ করেছেন।

( সংগৃহীত রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৭ )

লেনিনের নির্দেশ প্রকারে সঙ্গে পালন করতে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টি সোভিয়েত জনগণের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংখ্যবদ্ধতা আরও বাড়িয়ে চলার জন্য কাজ করে চলেছে। অর্থনৈতিক নির্মাণকার্যে অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রগুলির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অর্থনৈতিক অগ্রগতির আরও উচ্চস্তরে পৌঁছানোর, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান অগ্রগতি দ্রুততর করার ও তার ভিত্তিতে সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্রে সামাজিক উৎপাদনের কার্যকারিতা, শ্রমের উৎপাদন-শীলতা এবং শ্রমজীবী জনগণের কল্যাণ আরও রক্ষা

করার নির্ধারক উপাদান। সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির কেন্দ্রীভূত ও পরিচালিত পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা, বৃহদাকার শিল্পসংস্থাদি নির্মাণ, অর্থ বিনিয়োগ, শ্রমিক ও মজুরী সংক্রান্ত সংগঠনের ব্যাপারে অঙ্গ-প্রজাতন্ত্রগুলিকে ব্যাপক অধিকার দান অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করে তোলার ও বিশেষীকরণের অগ্রগতি এবং উৎপাদনের সময়সাপেক্ষ ও কেন্দ্রীভবনের পথ সুগম করেছে। এর ফলে শ্রম, মালমশলা ও অর্থসম্পদের আরও সুষ্ঠুসম্মত ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক যোগ, সৌভাগ্যপূর্ণ সহযোগিতা ও জাতি সমূহের পারস্পরিক সাহায্য সম্ভব হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রণ কার্যের আভিভূত প্রমাণ করেছে যে, সমাজতান্ত্রিক জাতিগুলির অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে সুসমঞ্জস যোগাযোগ ঘটতে হলে সশ্রমে প্রয়োজন সমগ্র দেশের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে অগ্রসর হওয়া। কারণ সমগ্র সোভিয়েত সমাজের কমিউনিস্টের বৈষয়িক ও কার্যগতী ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছে। অতীতকে এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে এবং সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের প্রসার ঘটতে হলে পার্টিকে প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রের ও প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক এলাকার স্বার্থগুলি বিবেচনা করতে হয়। এতে এমন সব অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে প্রজাতন্ত্রগুলি তাদের অধিকার ও সম্ভাবনাগুলি কাজে লাগিয়ে সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির স্বার্থগুলি মনে রেখে অগ্রসর হয়।

সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন বা সংঘ একটি বহুজাতিক রাষ্ট্রের সংগঠনের সম্প্রদায় ও নিগূহত রূপ। এতে সমগ্র সমাজের স্বার্থের সঙ্গে প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বার্থের সুসমঞ্জস মিলন ঘটেছে।

বর্তমান অবস্থায় জাতিগত সম্পর্কের উন্নতি ঘটানোর ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয়গুলির একটি হল এই যে, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির আবিষ্কার

অর্থনৈতিক অগ্রগতি তাদের অর্থনৈতিক জীবনের সহযোগিতা ঘনিষ্ঠতর হওয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পার্টি তার কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সংগঠনগুলির সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে বহুজাতিক রাষ্ট্রের পরাক্রম সংহত করার ব্যাপারটিকে সমগ্র রাষ্ট্রের দিক থেকে বিচার করে ও তার জ্ঞান আগ্রহ দেখায়। পার্টি আমাদের অর্থ ও জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত ষোগসূত্রে সমতানে ও আবিষ্কার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিজ্ঞার মধ্যে চালু রাখার চেষ্টা করে।

লোননবাদী পার্টি বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক নীতিগুলিকে দৃঢ়তর করার এবং কর্মউনিষ্ট সমাজের ভবিষ্যৎ অর্থ ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার উপর আঁচল দৃষ্টি রাখে। প্রত্যেকটি জাতি ও প্রত্যেকটি সংস্কৃতির অগ্রগতিশীল ঐতিহ্য ও সম্প্রদায় আভিভূতাকে সঞ্চার ও প্রচার করে আমাদের পার্টি নতুন নতুন ঐতিহ্য এবং সকল জাতির মধ্যেই কমিউনিস্টের নিয়ন্ত্রণের আভিভূত বৈশিষ্ট্যগুলি গড়ে তুলছে। জাতি ও আভিজাত্যগুলির মধ্যে আর্থিক মূল্যগুলির নিবিড় বিনিময়, পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রক্রিয়ার বৃদ্ধি এবং জাতীয় সংস্কৃতিগুলির মিলন ঘটছে উন্নত সমাজতন্ত্রের অবস্থায়। এর ফলে জাতীয় সংস্কৃতিগুলির সমাজতান্ত্রিক বিষয়বস্তু গভীরতর হচ্ছে এবং সোভিয়েত সমাজের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক একতা দৃঢ়তর হচ্ছে।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির সংঘ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, মার্কসবাদী-লোননবাদী মতাদর্শের আধিপত্য এবং জাতিসমূহের মৈত্রী, সৌভাগ্য এবং অর্থ ও একতা সোভিয়েত দেশের পরাক্রম আরও প্রবল হয়ে ওঠার এবং আমাদের দেশের জাতিসমূহের বহুজাতিক পরিবারের সমৃদ্ধি আরও বেড়ে যাওয়ার গ্যারান্টি।

# সাময়িকা

চীন রাষ্ট্রের সকল মানুষ একজাতির ও এক ভাষাভাষী নহে একথা সর্বজনবিদিত। কয়েক বৎসর পূর্বে চীন যখন ভিতর দখল করে তখন বহু লক্ষ ভিন্নভাষী ভাষা-ভাষী মহাযান বৌদ্ধকে জোর করিয়া চীনা করিয়া লওয়া হয়। যাহারা চীনা হইতে পলাতন হয় নাই তাহাদিগকে ইহলোক ত্যাগ করাইতে চীনা মাওবাদীগণ দ্বিধা করে নাই। চীন ভাষাতত্ত্বও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ দখল করিয়া লইয়াছে ও সেই সকল স্থানের বাসিন্দাগণ যদি জীবিত থাকেন তাহাহইলে তাহারাও চীনাভাষায় পরস্পরের সহিত বাকলাপ করেন বলিয়া আমরা মনে করি না। যে ভাষাকে চীনরাষ্ট্রে জাতীয়ভাষা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে সেই ভাষা লিখিতভাবে প্রায় ৬০ কোটি লোকের পক্ষে একই ভাষা বলিয়া ধরা হয়; কিন্তু কথিত ভাবে সেই লিখিত ভাষা এতই বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয় যে সেগুলি পূর্ণরূপেই ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিয়া ধরিতে হয়। সে সকল চীনা পিকিংবাসীদিগের সহিত একভাবে কথা বলে তাহারাই সংখ্যাধিক্য বলতঃ চীনদেশের গণ রাষ্ট্রের মালিক বলিলে ভুল হইবে না। আমরা শুনিয়াছি যে, উচ্চারণ-ঘটিত পার্থক্যের বিষয় না ধরিয়া যদি শুধু জাতি ও ভাষাগত বিভিন্নতা ধরা যায় তাহা হইলে চীনদেশে নানা ভাষাভাষীর সংখ্যা নিম্নলিখিত তালিকা অনুযায়ী থাকিতে দেখা যায়।

ম্যাণ্ডারীন (পিকিংএ কথিত) ৫৬.৭ কোটি ভাষাভাষী				
ক্যানটন	৪.৫	,	,	,
উ	৪.০	,	,	,
মিন	৩.৭	,	,	,
হাকা	২.০	,	,	,
তিব্বতী	অজ্ঞাত	,	,	,
অগ্রান্ত	অজ্ঞাত	,	,	,

ধরা যাউতে পারে যে ১৫ কোটি চীনদেশের গণ রাষ্ট্রের অধিবাসী ম্যান্ডারীন ভাষাভাষী নহেন। কম্যুনিষ্ট মতবাদ অনুসারে এই সকল সংখ্যালিখিত শ্রেণীর মানুষ সংক্ষেপে সমাধিকার উপভোগ করিতে পারিবেন ধরিতে হইবে। কিন্তু বস্তুতঃ সমাধিকার সত্তোগ সংখ্যালিখিত দিগের কখনও হয় বলিয়া মনে হয় না। রুশ রাষ্ট্রের রুশের এশিয়া-নিবৃত দেশগুলিতে লেনিনগ্রাদ বা মস্কোর বাসিন্দাদিগের সহিত সমান অধিকার আছে বলিয়া মনে হয়। রাষ্ট্রত্যাগ করিয়া পৃথক হইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে কি হয় তাহা বলা যায় না, তবে কম্যুনিষ্ট হাঙ্গেরী ও চেকোস্লোভাকিয়াতে পার্থক্য কামনা নিরোধার্থ রুশিয়ার ট্যাকের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। চীনদেশে পার্থক্য-প্রার্থী প্রায় ১১ লক্ষ ভিন্নভাষী যে পৃথক হইতে গিয়া প্রাণ দিয়াছে সেকথাও বিশ্ববাসীর অবিদিত নহে। সুতরাং রুশের বা চীনের সংবিধানে যাহাই থাকুক না কেন, বাস্তব কার্যক্ষেত্রে পৃথক হওয়া অথবা সাম্য আদায় করিয়া লওয়া অতি সুকঠিন কার্য।

শুধু কম্যুনিষ্টদিগের সম্বন্ধেই যে সমানঅধিকার প্রাপ্তির অসম্ভাব্যতার কথা উঠে এমন কথা বলা চলে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর সমান অধিকার আছে বলা চলে না। কারণ, প্রায় দুইকোটি কৃষ্ণকায় নিগ্রো মার্কিন দেশবাসী বহুক্ষেত্রে নানা প্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত আছেন। অনেক স্থানে বাসে ট্রেনে হোটলে কৃষ্ণকায়গণ শেতকায়দিগের সহিত একত্র চলিতে থাকিতে পারেন না। যদিও সম্মিলিত রাষ্ট্র-সংঘের নির্দেশ অনুসারে নিগ্রোদিগের সকল ক্ষেত্রে সমানাধিকার আছে। আমেরিকার সংবিধান অনুসারেও কৃষ্ণকায় আমেরিকানগণ কোনও প্রকার অধিকারই হারাইতে পারেন না। ভারতেও সেইরূপ তথাকথিত



অশ্রুশয্যা জাতির মানুষদিগকে এখনও নানা অপমান সহ্য করিতে হয়; বান্ধিও আইনভঃ তাঁহারা সব বিষয়েই অপর জাতির মানুষের সমতুল্য। নারীজাতির সাংবিধানিক সাম্যও সেইরূপ বহুস্থলে বাস্তব আকারে দৃষ্টিগোচর হয় না।

রুশিয়ার লোকেরা বলেন, চীনদেশে সামান্যীত সুপ্রতিষ্ঠিত নাই। চীনাগণ একথাটা অস্বীকার করেন এবং বলেন রুশ দেশের লোকেরাই লেনিন প্রতিষ্ঠিত নীতি অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পৃথিবীর সর্বত্রই শ্রেণী ও জাতি লইয়া অধিকারের ইতর-বিশেষ করা হইয়া থাকে। অতাবধি এই ব্যাধির সূচিকংসা সম্ভবপর হয় নাই।

মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০০।৮০০ ভারতীয় ছাত্র

ডেট্রয়েট সহরে মিসিগান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনেক-গুলি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। এইগুলিতে প্রায় ২০০০ বিদেশী ছাত্র পাঠ করেন ও তাহাদিগের মধ্যে সর্গাধিক সংখ্যা হইল ভারতীয় ছাত্রদিগের। সম্প্রতি মিসিগানের রাষ্ট্রীয় কতৃপক্ষ ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা অবসর সময়ে নানাহানে কাজ করিয়া নিজেদের খরচ চালায় তাহাদিগের কাজ করিয়া দিন গুজরান করিবার অনুর্নাত পত্র আছে কি না দেখিবার জন্ত বহু ছাত্রদিগের উপর অনুসন্ধান করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে অনেক-গুলি ভারতীয় ছাত্রের উপর দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার নির্দেশ জারি করা হয় যাহারা সপ্তাহে অনাধিক ২০ ঘণ্টা কাজ করিবার অনুর্নাত পাইয়া ঐ সময়ের অধিককাল কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদিগের উপরেও আইনভঙ্গের অভিযোগ আনয়ন করা হয়। ডেট্রয়েটের ভারতীয় বাসিন্দাগণ ছাত্রদিগের সাহায্যের জন্ত টাকা তুলিয়া প্রায় ২০০০০, হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই অর্থ প্রধানতঃ ছাত্রদিগের আদালতের খরচের জন্ত ব্যবহার করা হইয়াছিল। এক দিকে আমেরিকান রাষ্ট্রনেতাগণ আমেরিকার শিক্ষা-পদ্ধতির সুনাম বিস্তারের জন্ত বাহিরের ছাত্রদিগকে আমেরিকা যাইতে উৎসাহিত করিয়া থাকেন ও

অপরদিকে তাহারা আমেরিকার ব্যয়বহুল জীবনযাত্রার কারণে উপার্জন করিয়া খরচ মিটাইতে যাইলে তাহাদিগের উপর অভিযোগ আরোপ করিয়া তাহাদিগকে আমেরিকা হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করা হয়। এই অবস্থায় ভারতীয় ছাত্রদিগের পক্ষে আমেরিকা গমন না করাই শ্রেয় বলিয়া মনে হয়।

আয়রল্যান্ডের আত্মত্যাগী বীর জোসেফ ম্যাকক্যান

আয়রল্যান্ডে যে ইংরেজ আইরিশ যুদ্ধ চালিতেছে তাহাতে প্রায়ই গুলিচালনাও বোমা মারিবার ফলে উভয় পক্ষেই অনেক হতাহত হইয়া থাকে। এই সকল লড়াই প্রধানত পথে-ঘাটে আচমকা আক্রমণ করিয়া চালিত হয়। আয়রল্যান্ডের রিপাবলিকান সেনাবাহিনীর প্রথম ব্যাটালিয়নের সেনাপতি জোসেফ ম্যাকক্যান-এর কয়স হইয়াছিল মাত্র ২৫ বৎসর। তিনি তাঁহার দুঃসাহসিক কার্যকলাপের জন্ত বেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। লোকে বলে যে তিনি স্বয়ং লড়াই করিয়া ১৫জন রুশ সৈন্যকে নিহত করিয়াছিলেন ও রুশ সৈন্যগণ তাঁহাকে মারিবার জন্ত সশস্ত্র খুঁজিয়া ফিরিত; কিন্তু কোনও সময়েই তাঁহাকে পাইত না। তিনি যে সকল রুশ সৈন্যদিগকে মারিয়াছিলেন তাহারা সশস্ত্র ভাবে তাঁহার সাহিত যুদ্ধ করিয়া মারা গিয়াছিল। তিনি কোন বার্তাকে পিছন হইতে অথবা নিরস্ত্র অবস্থায় আক্রমণ করিয়া মারেন নাই। সম্প্রতি একদিন যখন তিনি একেলা নিরস্ত্রভাবে বেল-ফাস্টের একটি গলি দিয়া যাওঁতাইছিলেন তখন কয়েকজন সাধারণ বস্ত্র পরিহিত রুশ সৈন্য তাঁহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তাঁহার উপর গুলি চালায়। তিনি পায়ে গুলি লাগিয়া পাড়িয়া যান ও ঐ উদ্ভাবকী সৈন্য-গণ তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে পতিত অবস্থায় গুলির পর গুলি মারিয়া হত্যা করে। তিনি উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত পলাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু বহুশত্রু বেঁটিত নিরস্ত্র অবস্থায় কিছু করিতে পারেন নাই। এই হত্যাকাণ্ডের জন্ত আইরিশ-রুশি সশস্ত্র আরও খারাপ হইয়াছে। এক সপ্তাহে ২৫০ বার গুলি চলিয়াছে ও

অনেক জনের প্রাণ গিয়াছে। ম্যাকক্যানের বৃত্তদেহ কবর দিবার সময় সহস্র সহস্র আইরিশ নরনারী বোকার বেশ পরিহিতভাবে শবধারের অনুগমন করিয়াছিলেন।

### অ্যাপোলো ১৬ র চন্দ্রাভিযান

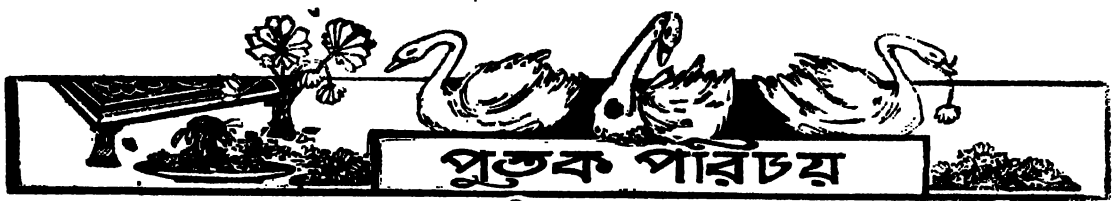
অ্যাপোলো ১৬ বিগত ১৬ ই এপ্রিল ১৯৭২ চন্দ্রাভিযানে যাত্রা করে। চন্দ্রে পৌঁছিয়া ২০ তারিখ এপ্রিল দুইজন অনন্তশক্তির নাবিক, ক্যাপটেন জন ডব্লু ইয়ঙ্গ ও লেঃ কলঃ চার্লস এম ডিউক (ছোট) চন্দ্রে অবতরণ করিয়া তাঁহাদের প্রথম অনুসন্ধান যাত্রা আরম্ভ করেন। এই কার্য্য তাঁহারা সাত ঘণ্টা কাল চালাইয়া চন্দ্রে-অবতরণ যান ওরায়নে ফিরিয়া যান। দ্বিতীয় বার অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হয় ২১ তারিখ এপ্রিল। এইবার তাঁহারা ২১০ মাইল দক্ষিণ দিকে গমন করেন ও নানা প্রকার নমুনা সংগ্রহ করিয়া পুনরায় ওরায়নে ফিরিয়া যান। শনিবার ২২শে এপ্রিল তাঁহারা শেষবার ভ্রমণে নির্গত হন ও উত্তর মৃত্তপঙ্কত পর্বত গমন করিয়া ওরায়নে ফিরিয়া যান। তাঁহারা অভ্যন্তর চন্দ্রে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন চন্দ্রদেশ হইতে ওরায়নকে শূন্যে উঠাইয়া চন্দ্র পরিবেষ্টন নিরত “ক্যাসবার” এ পৌঁছিয়া ঐ মহাকাশ যানের চালক লেঃ কমান্ডার টমাস কেনেথ ম্যাটিংলির সাহিত মিলিত হন। অভ্যন্তর তাঁহারা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন সঙ্ক্ষে সকল প্রস্তুতি যথাযথভাবে পরীক্ষা করিয়া লইয়া পৃথিবীর পথে যাত্রা করেন ও ২৮শে এপ্রিল প্রশান্ত মহাসাগরের ক্রীসমাস দ্বীপের নিকটে সমুদ্রবক্ষে অবতরণ করেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল ১১৫ পাউণ্ড নমুনা প্রস্তুতাদি সংগ্রহ করিয়া আনিবেন। যাহা আনিয়াছেন তাহা আশানুরূপ না হইলেও যথেষ্টই

হইয়াছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা প্রকার বাধা বিপত্তি উপস্থিত হইলেও এই চন্দ্র অভিযান এক প্রকার পরিচালনা অনুযায়ী ভাবেই সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধরা যায়।

### ইয়াসুনারি কাওয়াবাটা

ইয়াসুনারি কাওয়াবাটা জাপানের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার লিখিত উপন্যাসগুলি রস অভিযান্ত্রিকিতে সুন্দর অনুভূতিজাত ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ ছিল। তাঁহাকে ১৯৬৮ খৃঃঅধি সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। জাপানে এখনকার মত উপন্যাস লেখা আরম্ভ হয় উনিবিংশ শতাব্দীতে। ৭শুবিচ শোয়োর নাম এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার জন্ম হয় ১৮৫৯ এ এ এবং মৃত্যু হয় ১৯৩৮ খৃঃঅধি। ইয়াসুনারি কাওয়াবাটার জন্ম হয় ১৮৯৯ খৃঃঅধি। তাঁহার উপন্যাসগুলির প্রেরণা প্রধানত পুরাতন জাপানী সাহিত্য হইতে প্রাপ্ত; এবং তিনি রুশদেশের সাহিত্য দ্বারাও কিছুটা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। কাব্যে, সাহিত্যে, নাটো, নৃত্যে, চলচ্চিত্রে ও অন্যান্যক্ষে জাপানের স্থান অতি উচ্চে। জাতি হিসাবে জাপানীদিগের রসঅনুভূতি অতি আন্তরিক, নিগূঢ় ও দার্শনিক। জাপানী “নো” ও “কারুকি” নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে ক্রান্তিক্ষেত্রে একসময় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। ইয়াসুনারি কাওয়াবাটা জাপানের এই সুপ্রাচীন ক্রান্তির সকল বৈশিষ্ট্য আধুনিক ছাঁচে ঢালিয়া যুগোপযুক্ত করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে জাপানের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। বিশ্ববাসীও একজন উচ্চস্তরের সাহিত্যিককে হারাইলেন।





**স্মৃতিচারণ** (১ম ও ২য় খণ্ড) শ্রীদিলীপকুমার রায়, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। ১২ টাকা ও ৬.৫০ পয়সা।

এই স্মৃতিচারণ পাড়িয়া দিলীপকুমারকে নতুন করিয়া জানিবার সৌভাগ্য হইল। ইহাতে তাঁহার বাল্য কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাল্যকাল হইতেই তিনি ভগবৎ-প্রেমী ছিলেন। পরিবেশও পাইয়াছিলেন তিনি অসুস্থ। ইহা ভগবানেরই নিদেশ। তাঁহার বাল্য কৈশোর যৌবনের যে চিত্রগুলি পাই, তাহাতেও সেই একই আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভগবান যেন তাঁহাকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন। তাঁহার নির্মলতা একটি অপূর্ণ চরিত্র! মাটি দিয়া পুতুল গড়িবার কাজ তিনিই করিয়াছেন।

পরিবেশই মানুষের চারিদিক সৃষ্টি করে। অথবা চরিত্রাভ্যাসই পরিবেশ আঁসিয়া জোটে। দ্বিতীয়খণ্ডে দেখিতে পাই, যেসব যোগপুরুষের সঙ্গলাভ তিনি করিয়াছেন তাহা তাঁহারই কৃতিত্বের ফল। সাধনার ক্ষেত্রে এই ক্রম: তাঁহাকে ধীরে ধীরে আগাইয়া লইয়া গিয়াছে। তবে তাঁহার সাধনার পথকে স্তম্ভ করিয়াছে তাঁহার গান। তিনি নিজেকে স্তম্ভায়ক। সাধনার বিষয়ে যে-একাগ্রতার প্রয়োজন, যে-একাগ্রতা আনিতে যোগীরা যোগ-অভ্যাস করেন তিনি তাহা গানের মধ্য দিয়া সহজে পাইয়াছেন। গানের মত জগৎরতা আর কেহ আনিতে পারে না। ইহার মধ্য দিয়া ভগবদর্শন সহজে হয়।

এই খণ্ডে দেখিতে পাই তিনি অরবিন্দ সান্নিধ্যে আসিয়াছেন—প্রকৃত সাধনা তাঁহার এইখান হইতেই শুরু। সাধনার ক্রম ও তাহার বিস্তারিত বিবরণ তাঁহার পরবর্তী খণ্ডে হয়ত দেখিতে পাইব। আমরা সেই খণ্ডটি দেখিবার প্রত্যাশায় রহিলাম।

আসরের গল্প: দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দধারা প্রকাশন, ৭১১ বি. মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য বার টাকা।

আসরের গল্প অর্থাৎ সঙ্গীত-আসরের গল্প। গল্পাকারে লিখিত হইলেও ইহা কল্পিত গল্প নহে। এটি গল্পগুলি পূর্বে ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছে।

‘সঙ্গীতের আসর’ লিখিয়া দিলীপবাবু পূর্বেই সুনাম অর্জন করিয়াছেন। যেসব খাতনামা ওস্তাদের কথা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—তিনি না লিখিলে, কালে ইহাদের নাম পর্যন্ত লোপ পাইত। কিংবদন্তীর মত হয়ত কিছুদিন লোকের মুখে মুখে ধারিত, কিন্তু তাকা আর কয়দিন? বিশেষ করিয়া এইসব শিল্পীদের কথা কেহ কখনো লিখিবার প্রয়োজন বোধ করেন না—এমান অবজ্ঞাত ইহাদের জীবন। সেই কাজ তিনিই একমাত্র সমাধা করিলেন। এইসব তথ্য সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে বিপুল পরিশ্রম করিতে হইয়াছে ইহা সচেতন বোঝা যায়। তিনি নিজেকে সঙ্গীতজ্ঞ কি না জানি না, কিন্তু তিনি যাহা করিলেন তাহা ইতিহাস হইয়া রহবে, সেই সঙ্গে এইসব গুলী ব্যক্তিদের কথা লিখিয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া গেলেন। আমরা তাঁহার এই কার্যের জন্য কৃতজ্ঞ।



শ্রীমানন্দ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম : ৩০শে মে, ১৮৬৫

মৃত্যু : ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩



ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

# প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নারায়ণা বলহীনেন লভ্যঃ”

৭২তম ভাগ  
প্রথম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৭৯

৩য় সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

জাতীয় জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা

আসানসোল-হুগুঁপুঁর মহকুমার বাসিন্দাদিগের ১২ লক্ষ নরনারী শিশুর মধ্যে ১০৫২৪২, একলক্ষ পাঁচহাজার ছই শত বিয়ার্লিশ জন বাস্তবিত্তে বাস করেন। ইঁহাদিগের আট আটটি পরিবারের রক্ষণশালা একপ্রভাবে আছে; পৃথক্ রান্নাঘর নাই। শতকরা ৮১টি পরিবারের স্নানের ঘর নাই। শতকরা ৩৯টি পরিবার অপরের সহিত একই পাইখানা ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। শতকরা ৭৬ জনের ঘরে বিজলিবাতি নাই, বায়ু চলাচল কোনমতে হয় এবং অর্ধেকের গৃহের সহিত কোন বারান্দা নাই। আসানসোল উন্নয়ন সংস্থার ইচ্ছা যে এই সকল বাস্তবিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করা হয় তাহাতে তাহার বাসিন্দাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে তাহাতে বাস করিতে পারে। এইজন্য তাহাদের হিসাবে চার কোটি উনসত্তর লক্ষ টাকার প্রয়োজন। বাংলা সরকার ইহার অর্ধেক দিবেন পাঁচ বৎসরে। অর্থাৎ মোট বাস্তবাসীদিগের গৃহ নির্মাণের জন্য মাথা

পিছু প্রায় চারশত পঁচাত্তর টাকা ধার্য্য হইতেছে। একটি পরিবারে যদি নরনারী শিশুর সংখ্যা পাঁচ হয় তাহা হইলে সেই পরিবারের নিবাসের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হইবে দুইহাজার তিনশত পঁচাত্তর টাকা দিয়া। পাকাগৃহ নির্মাণ করিতে আজকাল বর্গফুটে ২০ হইতে ৩০ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ যে টাকা দেওয়া হইবে তাহাতে প্রায় ১০০ শত বর্গফুট নির্মাণ করা যাইতে পারে। একখানা ১০ ফুট x ১০ ফুট ঘর হইলেই টাকা শেষ হইয়া যাইবে। রান্না, স্নান ইত্যাদি কোথায় হইবে? খোলা বারান্দা যদি থাকে তাহার টাকা কে দিবে? এই সকল বাস্তবাসীদিগের পরিবার পিছু মাসিক আয় ২৪৯ টাকা। ইঁহারা যদি মাসিক ৫০।৬০ টাকা দিতে পারেন তাহা হইলে ইঁহাদিগকে ৫০০০।৬০০০ টাকা কর্জা দিলে তাহাতে যে গৃহ নির্মাণ করা সম্ভব হইবে সে গৃহে এক একটি পরিবার অন্নবিস্তর আরামেই বাস করিতে পারিবে। গৃহ বন্ধক থাকিবে এবং মাসিক ৫০।৬০ টাকা

দিলে গৃহের ঋণ ১০২০ বৎসরে সুদে আসলে শোধ হইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে। সুদটা আইন করিয়া শতকরা ৪৮০ টাকা রাখা আবশ্যক এবং সেই সুদে টাকা কিছু কিছু ঋণ দিতে কারখানার ও কয়লাখাদ্যের মালিকদিগকে এবং সরকার বাতাহুরকে উদ্ধৃত্ত করা প্রয়োজন। এই জাতীয় ব্যবস্থা না করিয়া যদি অল্প খরচে দায়সারাভাবে ব্যক্তি সংস্কার করা হয়, তাহা কখনও উচিত হইবে না। যদি টাকা চালিয়া উচিত ভাড়া আদায় চেষ্টা হয় তাহাও দারিদ্র্য শ্রমিকদিগের পক্ষে কষ্টকর হইবে। শুধু যদি গৃহগুলি ভাড়াদিগের নিজেদের হইয়া যায় তাহা হইলেই গরীবলোক প্রাপণ চেষ্টা করিয়া সেইরূপ ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া ক্রমে ক্রমে ঋণ শোধ করিয়া গৃহের মালিক হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে। আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলে জমির মূল্য কম। সুতরাং গৃহের সচিত্র সকলেই অল্প অল্প জমি রাখিতে পারিবে এবং শাক শাক্তি উৎপাদন কিম্বা হাঁস মুরগী পালন করিয়া জীবনযাত্রা আরও সুখময় করিতে পারিবে। তবে একথা বলিতেই হইবে যে এক পরিবারের পাঁচজন লোক একখানা ঘরে থাকিবে এইরূপ পরিকল্পনা সভ্যতার উন্নতিসাধনকর হইতে পারে না।

#### রুশিয়ায় কয়লা খাদ্যের কর্মীদের কথা

আসানসোল হইতে প্রকাশিত “কোল ফিল্ড ট্রিবিউন” পত্রিকায় প্রকাশ যে, মস্কো হইতে প্রফেসর আইএন পানিন খানবাগে আসিয়াছেন ও তাঁহার উদ্দেশ্য রুশিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খানব কার্য শিক্ষার ছাত্রদিগকে ভারতীয় কয়লা খাদ্যে পাঠাইয়া শিক্ষা দান ব্যবস্থা করা। তাঁহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম পাত্রিচে লুমুবা জন-বহুতা বিশ্ববিদ্যালয়, মস্কো। প্রফেসর পানিনকে সেক্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কয়েকটি কেন্দ্রে লইয়া যাওয়া হয় ও তিনি নানা স্থলের অবস্থা সাক্ষাৎভাবে পরিদর্শন করেন। সন্ধ্যাবেলায় তিনি একটি বিশেষজ্ঞদিগের সভায় সকলের সহিত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করেন। বিস্ফোরক বিষয়ে তিনি বলেন যে, ইউ-এস এস-আর এ চাপ দিয়া শতকরা কাগজের খাপে বিস্ফোরক রাখিয়া

ফাটাইলে তাহা বেশ সস্তা ও কার্যকর হয়। ইহাতে ৬ নং-এর পরিবর্তে ৮ নং ডিটোনেটর ব্যবহার করা হয়। ইহার কারণ এই যে স্ফারিক বিস্ফোরকের সহিত ৬ নং ডিটোনেটর কাজ করে না। এবং স্ফারিক বিস্ফোরক আজকাল সকল প্রকার খাদ্যে ও উদ্ভুক্ত কাটা খনিতে ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রফেসর পানিন বলেন যে রুশিয়ায় কয়লা খাদ্যে টেলিফোন ব্যবহার প্রায় সর্বত্রই হইয়া থাকে। রেডিও ব্যবহারও হয়। রুশিয়ার খাদ্যে যাহারা কাজ করে তাহারা মাসিক প্রায় ২৪০০ টাকা বেতন পায়। কেহ কেহ ৪০০০ টাকাও উপার্জন করে। এই টাকাতে অধ্যাপক নিয়োগ করাও সম্ভব হয়। খনিতে যাহারা কাজ করেন তাহারা অশুখ হইলে স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া অল্প খরচে থাকিতে পারেন। যাহা ব্যয় হয় তাহার শতকরা ৩০ টাকা কর্মীদের দিতে হয়। বার্ষিক ৭০ টাকা ট্রেড ইউনিয়ন হইতে দেওয়া হয়।

#### জীবনধারণে পারিপার্শ্বিকের আনুকূল্য

ডারউইনের মতে জীবজগতের বিভিন্ন জাতির প্রাণীদিগের কোনও একটা বিশেষ পারিপার্শ্বিক বিশেষ অবস্থায় বাঁচিয়া থাকবার ক্ষমতার উপরেই সেই সকল জাতির জীবগুলির অস্তিত্ব নির্ভর করিয়াছে। যেগুলি পারিপার্শ্বিকের সংঘাত সহ্য করিতে পারে নাই সেই সকল জাতীয় জীবজন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে অম্লহিত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাণী জগতে ক্রমবিকাশের ধারা পারিপার্শ্বিকের সহিত সংঘাতে চিকিৎসা থাকিবার উপরেই গঠিত ও নিৰ্ণীত হইয়াছে। বর্তমানে মানব জাতির জীবনধারণের সাহায্যের জন্য অল্পকূল পারিপার্শ্বিক স্বজন সম্বন্ধে যে নানা প্রকার আলোচনা চলিতেছে তাহা একটা কোন নতুন আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর গড়িয়া উঠে নাই। জীবজগতে পারিপার্শ্বিকের অল্পকূল অথবা প্রতিকূল ভাবের কথা ডারউইনের সময় হইতেই সর্বজন জ্ঞাত আছে। নতুন কথা হইতেছে এই যে, মানুষ এখন দোষভেদে যে তাহার নিজের জীবনযাত্রা পদ্ধতিই অনেক স্থলে তাহার জীবন রক্ষার প্রতিবন্ধক অবস্থার স্বজন করিতেছে। যথা, মানুষ

মাটির স্বাভাবিক গুণাগুণ, জলের পরিভ্রতা ও হাওয়ার পরিষ্কার অবস্থা নিজের কার্যের দ্বারাই নষ্ট করিতেছে ও তাহার ফলে বহু মানবের স্বাস্থ্যনাশ ঘটিতেছে, অনেকের মৃত্যু হইতেছে ও জীবনধারণ কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইতেছে। মাটিতে বিষাক্ত ঔষধাদি ছিটাইয়া কীট-পতঙ্গ বিনাশ করিতে গিয়া অথবা কৃত্রিম সার ঢালিয়া মানুষ মাটির স্বাভাবিক সরসতা নষ্ট করিয়া মাটির মানব-জীবনধারণের অগ্রদূত গুণগুলি নষ্ট করিতেছে। এইভাবে মানুষ জলে ময়লা ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি নর্দমা দিয়া ছাড়িয়া জলাশয়, নদী, হ্রদ, এমন কি সমুদ্রকেও কলুষিত করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্তই পরিষ্কার ও পরিভ্র জলের অভাব সৃষ্টি করিতেছে। হাওয়ার ধোঁয়া, বিষাক্ত ও কষ্টদায়ক বাষ্প এবং আজকাল পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে প্রসূত প্রাণনাশকারী তেজস্ক্রিয় রশ্মিও পরমাণু সম্বলিত করিয়া মানুষ বায়ুমণ্ডলকে ও পৃথিবীর বিভীষিকা ছিন্ন করিয়া তুলিয়াছে পূর্বকালে পারিপার্শ্বিক ছিল স্বভাবতঃ এখন তাহা হইয়াছে মানুষের কর্মসূচী ক্রমবর্ধনশীল ভাবে বিষাক্ত ও মানব জীবন ধারণের অগ্রদূত।

এই সকল কথায় আলোচনার জগৎ সুইডেনে একটা আন্তর্জাতিক বৈঠক বসিয়াছে ও তাহাতে সকল জাতির বিশেষজ্ঞদের সমাবেশ হইয়াছে। চেষ্টা হইতেছে যাহাতে সকল জাতিগুলি মিলিত প্রচেষ্টায় জগতের জলবায়ু, স্থিতি, পরিষ্কার ও জীবনধারণ-সহায়ক হইয়া থাকে। এই আলোচনা বৈঠকে কেহ কেহ বলেন যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করা একান্ত আবশ্যিক; যেহেতু ঐ বিস্ফোরণ জগতের বায়ুমণ্ডলকে এমন ভাবে বিষময় করিয়া তুলিতেছে যাহাতে ভবিষ্যতে ঐ রূপ বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীতে মানবজীবন রক্ষা অসম্ভব হইবে। প্রায় সকল জাতিই এই কথাটা মানেন, অন্ততঃ কথায়; শুধু চীন দেশ এই কথায় আপত্তি করেন। চীনাঙ্গের মতে হাওয়ায় জলে বিষাক্ত বস্তু নিক্ষেপ আপত্তিজনক হইলেও আকাশে প্রাণনাশকারী রশ্মি বিকিরণ কিছুতেই নিবারণ করা চলিবে না। কারণ তাহা হইলে চীনের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি আর

সেইরূপ সবল থাকিবে না। সে যাহাই হউক, তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ যেভাবে পারিপার্শ্বিকে মানব জীবন ধারণের প্রতিবন্ধক করে তাহার তুলনায় ধূম্র, ক্ষতিকর বাষ্প ইত্যাদি কিছুই নহে; এবং যদি তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও পারমাণবিক কণিকা থাকিলে তাহা চীনের প্রতিবেশী মানিয়া লইতে হয় তাহা হইলে অন্তর পারিপার্শ্বিক লইয়া মাথা ঘামাইবার কোনও আবশ্যক থাকে না।

সুইডেনে যাঁহারা এই সকল আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মতে দারিদ্র্যও একটা পারিপার্শ্বিকের অবস্থা বলিয়া ধর্তব্য হওয়া উচিত। ইহা যদি মানিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে দেখিতে হয়, অর্থাৎ কত অধিক হইলে তাহা মানুষের প্রাণধারণের পক্ষে হানিকর অবস্থার সৃজন করে। ইহার সহিত দেখিতে হয়, অন্তর কি কি অবস্থা আছে যাহা মানুষের দ্বারা সৃজিত, ও মানুষ যাহার পরিবর্তন করিতে সক্ষম, যাহাতে মানব জীবন রক্ষা কর্তন হয়। যথা, বলা যাইতে পারে যে, বহু স্থলেই খাদ্য, পানীয় জল, চিকিৎসা ব্যবস্থা, বাসস্থান প্রভৃতি এরূপ আছে যেখানে যাহা যাহাতে মানব জীবন রক্ষার ব্যাঘাত হয়। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে এই সকল কথার উপস্থাপনা প্রয়োজনীয়—অন্ততঃ ধূম্র লাগবের কথার তুলনায়। আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে সকলের মনে হইতে পারে। ১৯০১ খৃঃ অব্দের তুলনায়, সকল পারিপার্শ্বিকের (দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যভাব প্রভৃতি ধরিয়া) উপস্থিতি সত্ত্বেও, ১৯৭১ খৃঃ অব্দে ভারতের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক অপরিষ্কার ও জীবন ধারণের বিরোধী হইলেও যদি মানব জাতি ক্রমশঃ সংখ্যায় বাড়িয়াই চলে, তাহা হইলে ঐ সকল আলোচনার মূল্য কতটা ধরা যাইতে পারে? কারণ মানব জাতি শুধু যে প্রতিবন্ধ পারিপার্শ্বিক সৃজন করিয়াই ক্ষান্ত হয় এইরূপ কথা বলা চলে না। জীবন ধারণ সহজ, সরল করিতেও মানুষ কম করে না। শুধু বিশেষ শতাব্দীতেই যেসকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়াছে চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার ও ঔষধের ক্ষেত্রে,



তাহাতেই মানুষের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা বহুলাংশে অসম্ভব আবিষ্কারের ফলে কোটি কোটি মানুষের জীবন রক্ষা হইয়াছে। যথা, ডিপথেরিয়া, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া হইতেছে। ইহা ব্যতীত যে সকল অবস্থা মানুষের জীবন ধারণ কঠিন করে সেই সকল অবস্থাও ক্রমশঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেষ্টার ফলে উন্নততর রূপ ধারণ করিতেছে। এই সকল কথাও মনে রাখা কর্তব্য।

### সরকারী কারখানাতে লাভ লোকসান

ভারতবর্ষে যে-সকল সরকারী কারখানা ও কারবার চলিতেছে তাহার মধ্যে যেগুলিতে ১০ কোটির অধিক টাকা নিয়োগ করা হইয়াছে সেগুলির অনেক কারবারই লোকসানে চলে। যথা মূলধন ও লাভ লোকসান বিচারে নিম্নলিখিত রূপ পরিদৃষ্ট হইতে পারে।

১। হিন্দুস্থান স্টিল	১০৬২ কোটি টাকা মূলধন	১৯৬৯-৭০-র লোকসান ১১ কোটি
২। হিন্দুস্থান মেশিন টুল	২২০ " " "	৮৭ লক্ষ
৩। ভারত ইলেকট্রনিক	১১ " " "	লাভ ২.৬ কোটি
৪। হোভ ইলেকট্রিকাল (ইণ্ডিয়া)	১২৩ " " "	লোকসান ৭.৮ কোটি
৫। হোভ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পন	২৪৬ " " "	লোকসান ১৭.২ কোটি
৬। ভারত আর্থ মুভার	১৬.৬ " " "	লাভ ২ কোটি
৭। হিন্দুস্থান এরোনটিক্স	২১২ " " "	লাভ ৩.৩ কোটি
৮। ভারত হোভ ইলেকট্রিকালস	১৭৩ " " "	লোকসান ১.৪ কোটি
৯। মাইনিং এণ্ড এলায়েড মেশিনারি কর্পন	৫৬ " " "	লোকসান ৬.৪ কোটি
১০। এফ, এ, সি, টি,	৭০ " " "	লোকসান ১.৯ কোটি
১১। ক্রাশনাল নিউক্লিয়ার	১১ " " "	লোকসান ৮৮ লক্ষ
১২। হিন্দুস্থান ফোটো ফিল্ম	১৫.৮ " " "	লোকসান ২ কোটি
১৩। এফ, সি, আই,	২০৫ " " "	লাভ ২.২ কোটি
১৪। আই, ডি, পি, এল,	৭৫ " " "	লোকসান ৯.২ কোটি
১৫। এন, সি, ডি, সি,	১৮৪ " " "	লাভ ১.১ কোটি
১৬। নেভেলি লিগনাইট	১৭ " " "	লোকসান ৪.৪ কোটি
১৭। এন, এম, ডি, সি,	৫ " " "	লোকসান ২৭ লক্ষ
১৮। ও, এন, জি, সি,	২০৩ " " "	লাভ ১১.৯ কোটি
১৯। আই, ও, সি,	১৩১ " " "	লাভ ২.৪ কোটি
২০। কোচিন রিফাইনারীস	২১.৮ " " "	লাভ ২.৪ কোটি
২১। এস, টি, সি,	১৮.৪ " " "	লাভ ৪.৯ কোটি
২২। সূড কর্পন	২৯১ " " "	লাভ ১.১ কোটি
২৩। এয়ার ইণ্ডিয়া	৪৯ " " "	লাভ ২.৬ কোটি
২৪। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স	৪৭ " " "	লাভ ১.৩ কোটি
২৫। শিপিং কর্পন	৮১ " " "	লাভ ৫.৯ কোটি

যোট হিসাবে ক্ষতির পরিমাণই প্রায় টাকায় আট আনা অধিক

### হত্যা উদ্‌ঘাটনার অভিযুক্তি

কিছুকাল পূর্বে ইসরায়েলের বিমান বন্দর লিডডাতে আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ বিমানযাত্রী বলিয়া মনে হয় এইরূপ কয়েকজন ব্যক্তি একটি বিমান হইতে অবতরণ করে। তাহাদিগের জিনিসপত্র যখন মাণ্ডলের জন্ত পরীক্ষার কেন্দ্রে স্থাপিত হয় তখন তাহারা বাস্তব স্থলিয়া হঠাৎ যন্ত্র-বন্দুক, পিস্তল, বোমা প্রভৃতি বাহির করিয়া চারিদিকে একটা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের সূচনা করে। যে সকল যাত্রী ঐ আক্রমণে হতাহত হন তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন তীর্থযাত্রী। ইহাদিগের উপর যাহারা আক্রমণ চালায় তাহারা ছিল জাপানী। তিন জন জাপানী হত্যাকারী ২৪জন মানুষকে হনন করে ও তাহাদিগের মধ্যে ১৭জন ছিল পুয়েরটোরিকান তীর্থ-যাত্রী। যে তিনজন জাপানী এই বীভৎস নিশ্চয়মতঃর জন্ত দায়ী তাহারা হত্যাকর্মকে ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল ও নিজেদের মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়াই তাহারা ঐ বংশসভাতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, অর্থাৎ ঐ যাত্রীদিগকে একপ্রকার হত্যা উদ্‌ঘাটনা পাইয়া বসিয়াছিল ও তাহারা যেভাবে ঐ নিষ্ঠুরতা সম্পূর্ণ করে তাহাতে তাহাদিগকে উদ্‌ঘাট ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। দুই ব্যক্তি ঐ সময়েই প্রাণ হারায় এবং তৃতীয় ব্যক্তি কোকো ওকামোটো গুত হয়। এই ব্যক্তির পিতা পুত্রের কার্যের জন্ত তাহাকে যেন অনতিবিলম্বে প্রাণ দিতে দাঁড়াত করা হয় এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। জাপানী সরকার ১৫ লক্ষ ডলার ক্ষতি পূরণ স্বরূপ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ব্রতব্যক্তিগণের উত্তরাধিকারীগণের এক-একজনের জন্ত ১০,০০০ হাজার ডলার ও আহতদিগের অংশে মাথা পিছু ৫০০০ ডলার প্রাপ্য হইবে। জাপান সরকার জাতিগত ভাবে বহুভাবে লজ্জা প্রকাশ করিয়াছেন এবং এইরূপ ঘটনা যে ঘটিতে পারে ইহা দেখিয়া পৃথিবীর সকল বিমান বন্দরে বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কোন ব্যক্তি কোথাও বিমানে বাইতে চাহিলেই তাহাকে ও তাহার মালপত্রের তন্নতন

করিয়া তন্নাস হইতেছে। নবনারী নির্কিশেষে। সকল বিমান বন্দরে এখন বহু সংখ্যক অস্ত্রধারী শাস্ত্রী মোতায়েন করা হইতেছে।

### বাংলাদেশে পাকিস্তানী পঞ্চম বাহিনী

বাংলাদেশে পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশে অনেক মানুষ রহিয়াছে যাহারা পাকিস্তানকে অন্তরে অন্তরে ঐ দেশে শক্তিশালী করিতে চাহে এবং পাকিস্তানের শক্তিবৃদ্ধির জন্ত মিথ্যা প্রচার করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা অনুভব করে না। ঐ সকল পাকিস্তানভক্ত বাংলাদেশবাসীদিগের মধ্যে মোলানা ভাসানীর দলের চীনপন্থী কম্যুনিষ্ট জাতীয় অনেক বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আছে। ইহারা ভারতীয়-দিগের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে সতত নিযুক্ত এবং বাংলা দেশের হিন্দুদিগেরও (অকম্যুনিষ্ট) শত্রু। ইহারা কোথাও কোথাও বাংলাদেশের হিন্দুদিগের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে দেশত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সেই কথা ভারতবর্ষে রাষ্ট্র করিয়া ইহারা ভারত বাংলাদেশ যুদ্ধের বন্ধন টিলা করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের চীনপন্থী কম্যুনিষ্টগণ এই সকল অপপ্রচার ভারতবর্ষে চালাইবার প্রচুর চেষ্টা করিয়া থাকে। শেখ মুজিবুর রেহমান এই সকল কম্যুনিষ্টদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু সে কার্যে কতটা সক্ষম হইতেছেন তাহা বলা কঠিন। ভারতবর্ষে যাহারা কম্যুনিষ্ট প্রেরণা জাত প্রচার চালাইতেছেন তাহাদিগকে দমন করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ উভয় দেশেই জাপ্রত ভাবে দেখা প্রয়োজন যাহাতে মোলানা ভাসানীর অহুচরদিগের ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী বিনাশ চেষ্টা সফল না হয়। বাংলাদেশ সরকারের কর্তব্য যাহাতে ভারতের জন সাধারণ সহজে বাংলাদেশে গিয়া সকল বিষয়ের সাক্ষাৎ খবরাখবর পাইতে সক্ষম হ'ন, সে ব্যবস্থা করা।

### শ্রেণীসংগ্রামের সর্বপ্রাসী রূপ

মানুষ যেখানেই থাকে তাহাকে জীবনযাত্রা নির্বাহ

করিবার জন্ত নানা কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতে হয়। ইহা হইতেই প্রতিনিয়তা, কলহ ও অপর প্রকার সংঘাতের সৃষ্টি হয়। বাহার সহিত বাহারই সংঘাত যে কারণেই হয়, তাহার ফলে দেখা যায়, পরস্পরের সম্বন্ধে নিদারুণ নিন্দার উত্থাপনা। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা অর্থনৈতিক সম্বন্ধ থাকিলেই কেহ নিষেধতা কেহ নিষৃত্ত, কেহ দান করে কেহ গ্রহণ করে, কেহ শোষক কেহ শোষিত, কেহ উপরওয়াল কেহ তাঁবেদার, কাহারও হুকুমত কাহারও কার্য সেই হুকুম তামিল করা—সম্বন্ধের শেষ নাট এবং সকল সম্বন্ধই শেষ অবধি উল্টা-সোজা, সপক্ষ-বিপক্ষ অথবা ঐ জাতীয় দ্বিবিধ বৈপরীত্য জ্ঞাপক স্বরূপ অবলম্বন করে। সকল কিছুরই শেষ অবধি দুই শ্রেণীগত হইয়া দেখা দেয় ও দুই শ্রেণীর সময়ের কোনও সম্ভাবনা বদ্যাপি কোথাওই দেখা যায় না। শ্রেণীসংগ্রাম শুধু যে শোষক ও শোষিতের মধ্যেই চলিতেছে এমন নহে। যেখানেই দুইটি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মিলন একত্রে কার্য করিতেছে সেইখানেই তাহার দুই শ্রেণী হইয়া কাঁড়াইতেছে এবং তাহাদের পরস্পর-বিরোধিতা শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ ধারণ করিতেছে। এই ভাবে শ্রেণীসংগ্রাম সর্বব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। মালিক মজদুর হইতে আরম্ভ হইয়া এখন সে সংগ্রাম সর্বত্র ছড়িয়া পড়িয়াছে। ক্ষেত্রা বিজ্ঞতা, শাসক শাসিত, শিক্ষক ছাত্র, স্বর্ণদাতা কণগ্রাহক—যেদিকেই দেখা যাউক না কেন, দুই পক্ষ থাকিলেই শ্রেণীসংগ্রাম লাগিয়া যায়। পরস্পরের সহিত মিলিত থাকিয়া কার্যে সমবায়নীতি অনুসৃত কেন হয় না? হয় না সম্ভবত এই জন্য যে, সংগ্রামই অস্তিত্বের মূল নীতি। মিলিয়া মিশিয়া চলা আদর্শ হইতে পারে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আভাবিক নহে। যে সকল বৈপরীত্য বর্তমানে মনুষ্যজীবনকে বিবাক্ত করিয়া তুলিতেছে তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল,—সমাজে বক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী, রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যা-লঘিষ্ঠ, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক (পরিচালক) ও ছাত্র, গৃহে অভিভাবক ও প্রতিপালিত জন, হাসপাতালে চিকিৎসক

ও রোগী, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সকল শ্রেণীর মধ্যে সর্বক্ষেত্রেই একটি উত্তম অথবা উপরওয়াল ও অগাঠি অধম অথবা যাহাকে উপরওয়ালকে মানিয়া চলিতে হইবে। মতামতের ক্ষেত্রে যাহারা উপরওয়ালার তরফের তাহারাই হইল দক্ষিণ পন্থী এবং যাহারা নিম্নতরের সপক্ষে তাহারাই হইল বাম পন্থী। দক্ষিণ ও বামের যে শ্রেণীবিভাগ তাহা হইল যাহাদের সম্পদ আছে ও যাহাদের নাই এই দুই দলের পার্থক্যের উপর ভিত্তি। সম্পদ যদি আসিয়া যায় তাহা হইলে বাম দক্ষিণে চলিয়া যাইতে পারে। সেই ভাবে একশ্রেণী হইতে অগ্রেণীতে চলিয়া যাওয়া প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। কোন শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ ছিন্ন নিম্নতরভাবে নিজ শ্রেণীতে আবদ্ধ থাকেন না। সুবিধা হইলে শ্রেণী বদল অনায়াসেই হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে শ্রেণী-গুলি জীবজগতের বিভিন্ন জাতির জায় স্বভাবে আকারে ব্যবহারে অপরিবর্তনীয় নহে। যে অর্থ সে গাভী হইতে পারিবে না এমন কোন নিয়ম শ্রেণীর মানবগুলিকে বাঁধিয়া রাখে নাই। প্রয়োজন হইলে সিংহ ছাগশিশু হইতে পারে, মৎস্য জল ছাড়িয়া স্থলে বিচরণে সক্ষম হয় ও চতুষ্পদসকল আকাশপথে যাতায়াত আরম্ভ করে। শ্রেণী জাতির জায় নির্দিষ্ট ও নিম্নতর ভাবে কাহারও শরীর মন চরিত্রে স্থিতিশীল নহে। এই সকল কারণে শ্রেণীর সম্বন্ধে ভিতর জীবজগতের জাতিগুলির অস্তিত্বের সংগ্রামের আত্মমজ্জাগত প্রাকৃতিক রূপ লক্ষিত হয় না। শ্রেণীর গঠন নির্ভর করে শ্রেণীগত ব্যক্তিগণের দলবদ্ধ হইবার ক্রিয়ম ও সাময়িক সুবিধা-বোধ জাত কারণগুলির উপর। সেই সকল কারণ শ্রেণীর কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে হঠাৎ হঠাৎ আর সুবিধাজনক থাকে না ও তখন সেই সকল ব্যক্তি এক শ্রেণী ত্যাগ করিয়া অপর শ্রেণীতে যোগদান করা অধিক সুবিধাজনক মনে করিতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে একই ব্যক্তি নিজ জীবনে নানান সময়ে নানান শ্রেণীতে যুক্ত থাকিতে পারেন।

## রাষ্ট্র ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের বাহুল্য

রাষ্ট্র ক্ষেত্রে যে-জাতীয় কর্মক্ষমতা প্রয়োজন হয় বর্তমান কালে শিক্ষালাভ করিয়া সেইরূপ বহুখণী কার্য-শক্তি গঠিত হয় কি না তাহা ভাবিবার বিষয়। কারণ, বর্তমান যুগ হইল বিশেষজ্ঞদিগের যুগ এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যও হইয়া দাঁড়াইয়াছে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করা। আধুনিক বিশেষজ্ঞদিগের বিশেষজ্ঞ বিচার করিলে দেখা যায় যে তাঁহারা নিজ নিজ বিশেষ জ্ঞান বা কার্য-ক্ষেত্রের বিষয়ে যেকুল পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ক্ষুদ্রতম কর্তৃকারও সন্ধান রাখেন তেমনই তাঁহারা নিজ জ্ঞান বা শ্রুণের বাহিরের কোন কিছুই খোঁজ রাখেন না। অর্থাৎ তাঁহাদের কর্মক্ষমতা নিজ সীমার ভিতরে যেকুল অণু-পরমাণুর বিচার করিয়া ব্যস্ত হয়, সীমার বাহিরে তাহা তেমনই অক্ষমতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। রাষ্ট্র কার্য আত্মকাল প্রয়োজনীয় কার্য এবং দেশের মঙ্গল বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রকর্মীদিগের জ্ঞান ও বিচারশক্তির উপর নির্ভর করে। সুতরাং যদি রাষ্ট্র-ক্ষেত্রের পরিচালকগণ সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ চালাইতে না পারেন তাহা হইলে দেশের উন্নতি যথায় যথায় সাধিত হইতে পারে না। সকল দিকে দৃষ্টি রাখা সাধারণভাবে সকল বিষয় বুঝিতে পারার উপর নির্ভর করে। তাহা বুঝিতে হইলে নানা বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বাহ্যিক শুধু ক্রেমিয়াম স্টীল অথবা নাইলন ব্যতীত অপর কোনও বিষয়ের কোনো সন্ধান রাখেন না, তাঁহাদের দ্বারা দেশের যাহা যাহা খাদ্য-বাসস্থান-বেকার-সমস্যা অথবা স্বাস্থ্য বিষয়ের সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে মনে করা কিছুটা হ্রাসের কথা। কারণ তাঁহারা যে অতি ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে শুধু ক্রেমিয়াম স্টীল ও নাইলন দেখিতে শিখিয়াছেন সেই দৃষ্টি যে ব্যাপক ভাবে দেশের জনমঙ্গলের সকল সমস্যার পর্যালোচনা করিতে সক্ষম হইবে এইরূপ আশা করা যায় না। এই সকল কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ লাভ করিবার জন্য কিছু কিছু মানুষকে ধারণা ভাবে বহু বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষাদান ব্যবস্থা

জাতির মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে। রাষ্ট্রের ও বহু বহু কারবারের পরিচালনা করিতে হইলে ঐরূপ ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন প্রয়োজন হয়। বাহ্যিক কার্য দিগ্‌দর্শন, তিনি যদি দশ দিক বা অষ্টকোণের মধ্যে শুধু একটি মাত্র দিক বা কোণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হ'ন তাহা হইলে তিনি যেকুল দিগ্‌দর্শনে অক্ষম প্রমাণ হইবেন, রাষ্ট্রক্ষেত্রের কর্মীগণ যদি বস্ত্রবস্ত্র বা গণিতের কোন একটি শাখা ব্যতীত অন্য কোন বিষয় না বুঝেন তাহা হইলে সেইরূপ রাষ্ট্রকর্মীগণ দেশের কার্য পরিচালনাতে সক্ষম হইবেন না।

বদেশী আন্দোলনের সময়ে যে সকল ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই নানান বিষয়ে জ্ঞান ছিল। যথা, অতি উচ্চ স্তরের উদ্ভার কেহ কেহ ডাক্তারী ব্যতীত অপর বিষয়ে এম.এ. পাশ ছিলেন। ব্যাবিটারদিগের মধ্যে কেহ কেহ পদার্থ বিজ্ঞান অথবা ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। সে যুগের এঞ্জিনিয়ারদিগের মধ্যে বিচার অপরাধের শাস্তির অহুশীলনে কাহাকে কাহাকেও আত্মনিয়োগ করিতে দেখা যাইত। দার্শনিকগণ অনেক সময়ে বিজ্ঞান চর্চাও করিতেন। গণিত ও দর্শন, ঐতিহাস ও চিত্রকলা এইরূপ মিলিত ভাবের অহুসীলনেও লক্ষিত হইত। বর্তমান কালে প্রথমতঃ পূর্বকালের গ্রাম খ্যাতিমান বিদ্বান ব্যক্তিরা রাষ্ট্রকার্যে অবতীর্ণ হইতে চাহেন না এবং বাহ্যিক চাহেন তাঁহারাও অতি বিশেষজ্ঞ বলিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু বিষয়ের আলোচনা গবেষণাতে যোগদান করিতে পারেন না। এখন যখন দেখা যাইতেছে যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে অসংখ্য মানুষ নানাভাবে আসিয়া পড়িতেছেন এবং তাঁহারা বহু বিষয়ের আলোচনা ও বিচার করিতে বাধ্য হইতেছেন, সে অবস্থার সাধারণ জ্ঞানের প্রসাধন আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু শিক্ষার ব্যবস্থা তাহার অগ্রসর হইতেছে না।

## ফরাক

ফরাক বাধের পরিকল্পনার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভাগীরথীতে জলপ্রোত বৃদ্ধি করিয়া

কলিকাতা বন্দরের জাহাজ চলাচল সহজ করা ও অল্প উদ্দেশ্যটি ছিল গঙ্গার উপর দিয়া একটা রেল ও চক্রবান পথ নির্মাণ করা। কলিকাতার নদীতে জলপ্রোত বৃদ্ধির প্রয়োজনও দুই কারণে অতি আবশ্যক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। প্রথম প্রয়োজন হইল অধিক সংখ্যায় ও বৃহত্তর আকারের জাহাজ চলাচল ও দ্বিতীয় প্রয়োজন হইল ভাগীরথীর জলের লবণাক্ত ভাব কিছুটা কমাইয়া বৃহত্তর কলিকাতার বাসিন্দাদিগের নোনা জল পান বন্ধ করার ব্যবস্থা। কলিকাতা বন্দর গঠন করা উচিত হইয়াছিল কি না আলোচনা করার আবশ্যকতা এখন আর নাই। কারণ, দুই শতাধিক বৎসর ধরিয়া যাহা হইয়া আসিয়াছে ও যাহার ফলে ভাগীরথীর দুই তীরে শত শত পাট কল ও অন্যান্য কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে, শত শত কোটি টাকার চা, কয়লা, পাট ও যন্ত্রাদির রপ্তানি আমদানি হইয়া চলিয়াছে ও বৃহত্তর কলিকাতা ১০ লক্ষ নরনারী শিশুর বাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে; বহুগুণ গভ হইবার পবে সেইপ্রকার হওয়াটা ঠিক হয় নাই বলার কোন মূল্য থাকে না। তর্কের খাতিরে কোন শহর, কারখানা, বন্দর বা কোনও কিছুই না হইলেই ভাল হইত বলা যাইতে পারে কিন্তু সেইরূপ তর্কের কোন বিশেষ মূল্য আছে বলা যায় না। কলিকাতা বন্দর সমুদ্র হইতে ১২৫ মাইল দূরে নদীবক্ষে গড়িয়া উঠিয়াছে। নদীতে অনেক স্থলেই গভীরতার অভাব আছে এবং সেই কারণে বিশেষ সাবধানতার সহিতই জাহাজ প্রভৃতি নদীপথে লইয়া যাওয়া হয়। জলের তলায় অনেক স্থলেই বালির স্তূপ জমা হইয়া জলের গভীরতা হ্রাস করে ও জোয়ারের সময় ব্যতীত ঐ সকল বালির চাপি অতিক্রম করিয়া জাহাজ যাইতে পারে না। নদীবক্ষে জমা বালুকা স্তূপ ও কর্দম ইত্যাদি যত্র দিয়া কাটিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয় ড্রেজার জাহাজ দিয়া। ভাগীরথীর জলপথ গভীর রাখিবার জন্য বহুকাল হইতেই ঐ বালুকর্দম নিষ্কাশন করিবার ড্রেজার জাহাজ ব্যবহার করা হইয়া আসিতেছে। গঙ্গার জলপ্রোতের প্রবলতর অংশ পদ্মার পথে ক্রমশঃ

মেঘনার দিকে চলিয়া যাইতেছে ও ভাগীরথীর দিকে জলপ্রোত আর তেমন গতিবেগ ও পরিমাণ রক্ষা করিয়া চলিতেছে না। ফলে কলিকাতা বন্দরে জাহাজ চলাচল দুরূহ হওয়াতে মাল আনা পাঠানর পরিমাণ পূর্বে যাহা প্রায় এক কোটি টন হইত, এখন তাহা সম্ভব লক্ষ টনের অধিক হয় না।

এইরূপ অবস্থায় কলিকাতা বন্দরকে রক্ষা করিবার জন্য ফরাসী পরিচরনা আকার গ্রহণ করে। ফরাসীতে বাঁধ বাঁধিয়া গঙ্গার জল রোধ করিয়া একটি হ্রদ সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং ঐ জমান জল হইতে একটা বিরাট অংশ খাল কাটিয়া আনিয়া প্রয়োজন মত ভাগীরথীতে ছাড়িয়া দিয়া ঐ নদীর জলপ্রোত বৎসরের সকল সময় একটা নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণের কম হইতে না দিবার ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতার বন্দরে জাহাজ চলাচল সহজ করা হইবে স্থির হইয়াছে। ঐ সঙ্গে জলপ্রোত বৃদ্ধি করিয়া ভাগীরথীর জলের লবণাক্ত ভাব দমন করাও সম্ভব হইবে বলিয়া কর্মকুশল ব্যক্তিগণ নির্ধারণ করেন।

এই জলপ্রোত বৃদ্ধির পরিমাণ স্থির হয় ৪০০০ কিউসেক অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে চল্লিশ হাজার ঘন ফুট। কিন্তু নানা প্রকার অপরাপর জল-ধরচের নূতন নূতন কারণ সৃষ্টি করিয়া ঐ পরিমাণ জল ভাগীরথীতে ছাড়িবার সম্ভাবনা ক্রমশঃ ক্রীণ হইয়া আসিতেছে। ফরাসী পরিচরনা পূর্ক হইতে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রাহ্য করিয়া লওয়ার পরেও শতাধিক নবনব সেচন ব্যবস্থা করিয়া উত্তরপ্রদেশ ও বিহার গঙ্গার জলধারা ফরাসী পৌছাইবার পূর্বে অনেকাংশে পরিমাণে অল্প করিয়া আনিয়াছে। এই সকল সেচন ব্যবস্থা অপর উপায়েও হইতে পারিত কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদিগের গা ঢিলা দিয়া নিজ কর্তব্য না করার ফলে যে যেখানে যথা-ইচ্ছা গঙ্গার জল এভাবে ওভাবে ব্যবহার করিয়া ফরাসী কার্য প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। উত্তর প্রদেশ ও বিহারের সেচন কার্য ব্যতীতও অল্প উপায়ে গঙ্গার জল ব্যবহার করিয়া ফরাসী জলের পরিমাণ হ্রাস

# আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রামমোহন রায়

যোগানন্দ দাস

ভূমিকা

‘আধুনিক’ শব্দটা আপেক্ষিক। দেড়শো বছর আগে, তারো দেড়শো বছর আগেকার ভুলনায় যেটা ‘আধুনিক’ ছিল আজ আর তা’ আধুনিক নয়। আজকের দিনে অর্থাৎ ১৯৭২ সালে যেটা ‘আধুনিক’, দুশো বছর পরে সে-টা আর ‘আধুনিক’ থাকবে না হবে, ‘সেকেন্ড’।

বর্তমান প্রবন্ধে ‘আধুনিক’ কথাটা প্রচলিত ঐতিহাসিক ‘যুগ’ অর্থাৎ মধ্যযুগের পরবর্তী যে যুগ, সেই যুগেই ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষে আধুনিক যুগ বলতে সাধারণত ইংরেজ আমলকেই বোঝায়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলার নবজাগরণ বা রেনেসাঁসু দিয়ে যার শুরু।

বাংলার এই রেনেসাঁসু বা নবজাগরণ প্রত্যক্ষ কারণ ৩’ল দুই সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের সভ্যতা বা সংস্কৃতির সংঘাত, যে দু’টো সংস্কৃতি জাঁততে, ধমে, ধর্মীয়নীতিতে, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে, ভাষায় ও চিন্তায় আলাদা। ইংরেজ এদেশে (গোড়ায় বাংলাদেশে ও পরে গোটা ভারতবর্ষে) রাজ্য হয়ে বসবার দরুন পাশ্চাত্য সভ্য ও সংস্কৃতির একটা সংঘর্ষ হয়। তার ফলে, নবায়িত আধুনিক যুগের সব রকম চাঁহদা মেটাবার জন্য গোটা শাষেকণী বা মধ্যযুগীয় সভ্যতার একটা পরিবর্তন দরকার হয়ে পড়ে। যুগে যুগে এই পরিবর্তন হয়েছে।

॥ মুসলমান আমলে পরিবর্তন ॥

মধ্যযুগে, মুসলমান আমলে, ফার্সী ছিল সরকারী ভাষা, এবং হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে, শিক্ষিত ভদ্র বা

‘বায়’ সমাজের ইংরেজীতে যাদের ‘Elite’ বলা হয় তাদের ভাষা। কারণ তাকে সরকারী চাকার পাবার এবং আদালতের কাজের সুবিধা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরবী ও বিশেষভাবে ফার্সী ভাষার মাধ্যমে অনেক নতুন বিদেশী চিন্তাধারা এদেশে এসে পৌছয় এবং এদেশের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে।

মুসলমান শাসক সমাজের সঙ্গে দীর্ঘকাল একতরু থাকার দরুন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলার ও ভারতীয় সমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল—ধমে, সামাজিক আচার ব্যবহারে, স্থাপত্য, চিত্রকলায়, বিশেষভাবে সভ্যতায় ও সাহিত্যে যা ছাপ রেখে গিয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে এই সাংস্কৃতিক মিলনের নতুন সৃষ্টি নানক, কবীর, দাদু, চৈতন্য প্রভৃতি। ভাষার ক্ষেত্রে উর্দু ও হিন্দুস্থানী, এবং এই আরবী ও ফার্সী সৃষ্টিত বহু বাংলা শব্দ।

সুতরাং সে যুগেও দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাতের ও মিলনের জন্য নতুন পারিস্থিতিতে সমাজকে নতুন করে গড়তে হয়েছে।

\* বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশ কথাটা নতুন রাষ্ট্র ‘বাংলাদেশ’ (পূর্ববঙ্গ) অর্থে ব্যবহৃত হয় নি, ইংরেজ আমলের অবিভক্ত বেঙ্গল বা বাংলাদেশ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। রামমোহনের সময়ে বাংলাদেশ বা ‘বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী’ বিস্তৃত ছিল বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি নিয়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত সমস্ত ইংরেজ আধিকৃত অঞ্চলে।

## ॥ ইংরেজ আমলে পরিবর্তন ॥

ইংরেজ আমলেও তেমন সরকারী চাকরী আদালতের মামলা, ব্যবসায় লেন দেন প্রভৃতির জন্য ইংরেজী ভাষা সরকারী ভাষা হিসেবে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক' সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে পাশ্চাত্য ভাবধারা এদেশে প্রচুর পরিমাণে আসতে শুরু করে। সমাজের কাঠামো ও আদর্শের আবার একটা পরিবর্তন ঘটে।

কিন্তু মুসলমান আমলে সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে ইংরেজ আমলের ঐ পরিবর্তনের একটা মস্ত বড়ো পার্থক্য আছে। ইংরেজ আমলে ভারতে ও বাংলা দেশে যে পরিবর্তন আসে, তার সঙ্গে সমসাময়িক বিশ্বের ইতিহাসের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, যে-টা মুসলমান আমলে ছিল না বললেই হয়।

## ॥ বিশ্ববিপ্লব ও রামমোহন ॥

ইংরেজ আমলে, রামমোহনের জীবিতকালেই য়োরোপ-আমেরিকার রঙ্গক্ষেত্র একটা স্পষ্ট পরিবর্তন চলেছে, একটা মহাসুগ শেষ হয়ে আর-একটা মহাসুগের পত্তন ততে চলেছে। আনোরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, জাঙ্গে, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় রাজতন্ত্র ও ঐক্যবোধিক সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়ে জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, রিপাবলিক বা প্রজা গড়ে উঠছে। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব গোটা পাশ্চাত্য সমাজে একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেছে। সাহিত্যেও তার ছাপ পড়েছে।

এই সমস্তের সংঘাত এসে পৌঁছেছে বাংলাদেশে, প্রতিধ্বনি তুলছে এশিয়ার সপ্তপ্রথম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মাহুঁর বা বিশ্বমানব রামমোহন রায়ের চিত্তে।

বাংলার সমাজের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কি ধরনের পরিবর্তন এল এবং তার সঙ্গে রামমোহন রায়ের সম্পর্ক কোথায়, সে কথা বুঝতে গেলে এই পটভূমিকা মনে রাখা প্রয়োজন।

রামমোহনের সম্পর্কে যে কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার, সেটা হ'ল, রামমোহন রায় জন্মেছিলেন হানরাঙ্গোড়া একটা মহাসুগপরিবর্তনের সাক্ষরকণে, এবং

সেই বিশ্ববিপ্লবের স্তম্ভপানে রামমোহন পুটে। রামমোহনের সংগ্রাসী প্রতিভার বৈশিষ্ট্য হ'ল, ধর্ম থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত বিশ্ববিপ্লবের সেই সংতোমুখী ভাবধারাকে হজম করবার ক্ষমতায়। শুধু ভারতে নয়, সেইদিনকার সারা দুনিয়ায় রামমোহন ছাড়া যিভীয় কোনো ব্যক্তির সেই বিশ্বগ্রাসী হজম ক্ষমতা ছিল না। সেই জন্য তিনি শুধু বাংলা দেশের সংস্কৃতিকেই নুতন করে গড়েন নি, তাঁর প্রভাব বাংলার ও ভারতের চৌহদ্দী ছাড়িয়ে য়োরোপ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

সেই জন্যই ইংলণ্ডের বহু ভাষা ও শাস্ত্র-বেত্তা ডঃ জন বাউরিং রামমোহনকে একাধার সোক্রাটিস্, নিউটন্ ও মিল্টন্ বলেছেন। আমেরিকান জাবেজ টি গ্রাণ্ডারলাও তাঁকে বলেছেন, একাধারে মোজেক্স, গ্যারিবলডি ও ওয়াশিংটন্।

দীনবন্ধু এঞ্জল বলছেন,

"It was his supreme moral and spiritual genius that made Rammohun Roy one of the heroes of humanity, who more than any other living soul shaped the course of human history at the beginning of the nineteenth century. Indeed it may be said with truth that his character and personality changed the face of Asia and profoundly influenced Europe and European thought also."

তাৎপর্য। রামমোহন রায়ের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রতিভাই তাঁকে সমগ্র মানব জাতির অগ্নিতম মহাপুরুষ করে তুলেছিল। উনিশ শতকের গোড়ায় গোটা মানব সমাজের ইতিহাস যারা গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর (রামমোহনের) অবদানই সব চেয়ে বেশী। বস্তুত, সত্যই একথা বলা চলে যে, রামমোহনের চারিত্র ও ব্যক্তিত্ব সমগ্র এশিয়ার মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিল এবং য়োরোপ ও য়োরোপীয় চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগে রামমোহনের স্থান নির্ণয়ের সময়ে সমসাময়িক বিশ্বের ইতিহাস, রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভা ও তাঁর জগৎব্যাপী জ্ঞান ভাণ্ডার, এবং 'আধুনিক' বাংলা সাহিত্যের গঠনে সেই

সব বিশ্ব-চিন্তার প্রতিজ্ঞার কথা মনে রাখতে হবে, এবং স্থির করতে হবে, সেই যুগে রামমোহন ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি ছিলেন কি-না যিনি এই সর্বতোমুখী ‘আধুনিক’ যুগমানসের উপযুক্ত বাহন রূপে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে গড়ে তুলতে পারেন।

॥ আধুনিক বাংলা গঙ্গার জনক কে ? ॥

প্রশ্ন উঠেছে, ১৮১৫ সালে রামমোহন রায়ের ‘বেদান্তগ্রন্থ’ প্রকাশের আগে রামরাম বসু, যুত্মজয় বিদ্যালঙ্কার, উর্দাওয়াম কেরী প্রভৃতির গন্ত গ্রন্থ বাংলা হরফে বেরিয়েছিল, সুতরাং রামমোহন বাংলা গঙ্গার জনক কি না ?

সম্ভানের জন্ম না দিলে “জনক” হয় না। বাংলা সাহিত্যে রাম রাম বসু, যুত্মজয় বা কেরী ক’জন সম্ভানের জন্ম দিয়েছিলেন ?

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সুবিখ্যাত ও প্রামাণ্য ইতিহাসকার ডক্টর স্কুমার সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে রামমোহনের অবদান আলোচনার পর বলেছেন।

“When we consider all these achievements of Rammohun in the field of Bengali literature and language, the least we can say is, that without him Vidyasagar, Bankim Chandra and Rabindranath would not have been possible.”-

তৎপরে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামমোহনের এই সব কীর্তির কথা যখন বিবেচনা করি, তখন খুব কম করে এইটুকু বলতে পারি যে, তিনি (রামমোহন) না জন্মালে বিজ্ঞানাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্ভব হতেন না।

ডঃ সেন একথা বলেন নি যে, রামরাম, যুত্মজয় বা কেরী না জন্মালে বিজ্ঞানাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্ভব হতেন না। ডঃ স্কুমার সেনের নতে বিজ্ঞানাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ বাংলা গঙ্গে রামমোহনেরই বংশধর, রামরাম, যুত্মজয় বা কেরীর বংশধর ন’ন। “জনক” কে ?

যয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ও ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার বাঙ্গালা ভাষার উপর প্রবন্ধে বলেছেন যে, মহামহোপাধ্যায়রা উপস্থিত থাকতেও “উপপ্রবক্তা মহাত্মা” রামমোহন রায়ই বাঙ্গালা ভাষার জলাশয়ের বঙ্গমুখ খুলে দিলেন। রামমোহন যুত্মজয় বা কেরীর বিষয়ে সে-কথা বলেন নি।

তত্ত্ববোধিনী সভার ১৭৮৮ শকের (১৮৪৬-৪৭ খৃঃ) “সাংস্কৃতিক আয় ব্যয় নিরূপণ” পুস্তকের (বা ঐ সভার বার্ষিক রিপোর্টে) তৎকালীন সম্পাদক নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, “এই প্রসঙ্গে বঙ্গভাষায় গন্ত রচনার সৃষ্টি আদৌ এদেশে তাঁরা (রামমোহন রায়) হইতেই হইল।”

সেই সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভার বিশিষ্ট সভ্যদের মধ্যে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচাঁদ মিত্র, ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মহম্মদ দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন মোহন তর্কালঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক, কাব্য, পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যবেত্তা। তাঁরা সকলেই বাংলা গঙ্গে রামমোহনের জনকত্ব বিষয়ে সম্পাদকের উক্তি মেনে নিয়েছিলেন, একজনও আপত্তি জানান নি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম ও দ্বিতীয় ইতিহাসকার পাণ্ডিত্য রামগতি ত্রায়র ও রাজনারায়ণ বসু হ’জনেই রামমোহনের বাংলাগঙ্গার প্রশংসা করেছেন, রামরাম, যুত্মজয় বা কেরীর বিষয়ে করেন নি।

অথচ তাঁরা যে যুত্মজয় প্রভৃতির লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, তা নয়। অনেকেই তাঁদের উল্লেখ করেছেন, এবং উল্লেখ করেও বাংলা গঙ্গার জন্ম দাতা হিসেবে রামমোহনেরই নাম করেছেন।

উল্লিখিত প্রাথমিক সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বেত্তাদের, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর স্কুমার সেন প্রভৃতির সাহিত্যবোধের ও সাহিত্যবিচারের চেয়ে আজ বারা সম্মানসম্মতিদের সম্মান না রেখে শুধু



তারিখ ক'বে “জনক” নির্ধারণ করছেন, তাঁদের সাহিত্য-বোধের ও সাহিত্য-বিচারের দাম কি বেশী?

রামরাম বহু, মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতির বাংলা গল্প বাংলা হয়ে ছাশা বটে, গল্পও বটে, তবে “বাংলা” নয়। রামরামের গল্প বারো আনা ফাশী, মৃত্যুঞ্জয়ের দেড়গজী সমাসযুক্ত\* বাংলা হুবোধ্য ভাষা, না সংস্কৃত, না বাংলা। কেবীর বাংলা জ্ঞানের সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হ'ল, তাঁর বাইবেলের বাংলা অনুবাদ যখন অবোধ্য ও অপাংস্তেয় ব'লে পরিত্যক্ত হ'ল, তখন বাইবেলের “বাংলা” অনুবাদের জন্য ডাক পড়ল অ-প্ৰতীন রামমোহন রায়ের, ক্রিস্টিান পাট্রী উইলিয়ম কেবীরনয়, রামরাম বা মৃত্যুঞ্জয়েরও নয়।

রামমোহন রায় যে গল্পের সৃষ্টি করলেন সেটাই হ'ল সপ্ৰথম পাঁচটি “বাংলা”, ফাশীর বা সংস্কৃতের দ্বাসত্ব থেকে মুক্ত, স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ বাংলা, সংস্কৃতের বা ফাশীর বকলমে বাংলা নয়। ছোট ছোট, স্বয়ং সম্পূর্ণ বাংলা শব্দের দ্বারা তৈরী। সাধু বাংলা, কিন্তু পাঁচটি বাংলা, সংস্কৃতও নয়, ফাশীও নয়।

সেইকালেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উত্তরসাধকেরা রামমোহন রায়ের গল্পরীতির পথে চলছিলেন, রামরাম মৃত্যুঞ্জয়ের পথে নয়। এই থেকেই বোঝা যায়, বাংলা গল্পের “জনক” কে।

এখানে মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহনের “বাংলা”র কিছু নমুনা দিলাম (১) বর্ণনামূলক (২) শাস্ত্রবিচারে।

#### (১) বর্ণনামূলক

#### মৃত্যুঞ্জয়:

“স্নেহ প্রভৃতি কীট পশুস্ত্র জীবলোকের এবং জীবলোকেরদের তুলেঁকানি সতালোক পশুস্ত্র উৎকৃষ্টতন সন্তলোক অতলাদি পাতাল পশুস্ত্র অধস্তন সন্তলোকরূপ নিবাসস্থানের ও অমৃতযবপ্রীহিত্রণাদি ভাবজোগ্যবস্ত্র সকলের ও স্বয়ংকর্ম্মানুসারে স্বর্গন-রকবন্ধমোক্ষন ব্যবহার ও কল্পমগ্নস্তরমুগাদি রূপ কালবিভাগের কণ্ঠ্য পরমেশ্বরসকলের মঙ্গল করুন।” (‘রাজাবলি’, ১৮০৮ পৃঃ)।

#### রামমোহন:

“এক স্থানে এক মূর্তি স্থাপিত ছিল, সে স্থান চারিদিকে পথের সহিত সংলগ্ন। ঐ মূর্তির হস্তে একখানা ঢাল ছিল, তাহা সম্মুখে স্বর্ণময় এবং পশ্চাৎ রৌপ্যময়।

এক দিবস দৈবাৎ দুইজন ষোড়সোয়ার দুই দিক হইতে ঐ মূর্তির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহাদের মধ্যে কেহই পূর্বে ঐ মূর্তি দেখে নাই। কতক্ষণ অবলোকন করিতে করিতে এক ব্যক্তি কহিল যে, ঐ ঢাল স্বর্ণময়, দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্তর্দিকে দেখিতেছিল, সে তাহার কথা শুনিবামাত্র কহিল যে, এ কি স্বর্ণ ঢাল? যদি তোমার ঢকু থাকে, তবে এ ঢাল রৌপ্যময়।” (‘সংবাদকৌমুদী’, ১৮২৩ পৃঃ।)

#### (২) শাস্ত্রবিচারে

#### মৃত্যুঞ্জয়:

“এই বচনের প্রকরণাদি জ্ঞানাত্মকপ্রযুক্ত তাৎপৰ্য-পরিজ্ঞানে যথাক্রমার্থানুসারে নেত্রবোগীকে চাকিংসোপদেশ করিয়া নেত্রজালা নিঃসৃত্য করিবে অধিক জালাদ্বয় রক্ষি করিয়া উপহাসান্দদ হইয়াছিল। অতএব প্রতিস্থিতিতে কহিয়াছেন তত্ত্বজ্ঞানের উপদেষ্টা ও শ্রোতা ও শুনিয়া বোদ্ধা এমন পুরুষ অতি দুর্লভ কিন্তু কাপটী তত্ত্বজ্ঞানীই অনেক। তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানীদের হাটের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান এই লৌকিক গাথার ত্রায় যে অসম্পূর্ণদেশ তাহাতে আস্থা করিয়া অন্ধগোলাহুলত্নায় নষ্ট হইয় না। যেমন স্বত্তরগৃহে স্বত্বপ্রাপ্ত্যর্থ স্বত্তরাগারগমনেচ্ছ কোন অন্ধ ব্যক্তি স্বত্তরগ্রামপ্রান্তে দৃষ্ট কোন গোপকে স্বত্তরগৃহবিজ্ঞানী করিয়া তাহার বাক্যে দৃঢ়তাবাহাতে স্বত্তরগোপুচ্ছ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া স্বত্তরগৃহে গন্তকাম হইয়া আকর্ষণ ও কর্কটশকরাদিবেধ ও পাদপ্রহারেতে ছিন্নভিন্ন-ভঙ্গ হইয়াও তৎস্বত্বপ্রত্যাশাতে গোপোপদ্বিষ্ট গোপুচ্ছধারণ ত্যাগ না করিয়া রাত্রিপ্রথমভাগে

বস্তুবাহিনীটিতে উপস্থিত হইয়া গোচরজ্ঞানে বস্তুবিশ্লেষণাদিকর্তৃক সুঠিকপ্রকারে চূর্ণিত হইয়াছিল।” (‘বেদান্তচর্চিকা’, ১৮১৭ পৃঃ)।

**রামমোহন :**

“অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার জায় অগ্রগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অমুঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। শাস্ত্রদেব সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিংকিতো থাকিবে, আর কাহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প প্রমেলি ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অর্থাভিত্ত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন।” (‘বেদান্তগ্রন্থ’, ১৮১৫ পৃঃ: ১)

**॥ সমাজ ও সাহিত্য ॥**

“জনকহ” বিষয়ে তারিখের চেয়ে অনেক বড়ো কথা হ’ল সাহিত্যের স্বরূপ ও লক্ষণ বিচার।

ইংরেজী সাহিত্যের একজন প্রথিতযশা সমালোচক লাসেল্‌ অ্যাবারক্‌জোঁষ বলেছেন :

“The history of criticism has been very largely the history of attempts to formulate rules for criticism, chiefly by comparing the merits of several works of literature, and the means used to produce them. But rules derived from particular instances in one kind of literature do not give the security required. Over and over again such rules have been found wanting. When the number of instances has been enlarged, the rules have broken down.”<sup>১৪</sup>

তাৎপৰ্য্য। সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাস হ’ল প্রধানত বিভিন্ন সাহিত্যিক রচনার পরস্পর তুলনার দ্বারা তাদের (সাহিত্যিক) গুণ নির্ণয়

ক’রে এবং ঐ সব রচনার সৃষ্টিপদ্ধতির আলোচনা ক’রে সমালোচনার নিয়মকানুন তৈরীর চেষ্টার ইতিহাস। কিন্তু একই শ্রেণীর সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ রচনার (বিচারের) উপর প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলী প্রয়োজনীয় স্থায়িত্ব আনতে পারে না। বার বার দেখা গিয়েছে, ঐ সব (সাহিত্য সমালোচনার) নিয়মকানুন যথেষ্ট নয়। যখনই (তুলনার গুণ নমুনা স্বরূপ গ্রহীত) সাহিত্যিক রচনার সংখ্যা বাড়াইয়া দেয়া হয়, তখনই ঐ সব (সাহিত্য সমালোচনার পুরাণে) নিয়মকানুন ভেঙে পড়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, শুধু সাহিত্যের দ্বারা নয়, সাহিত্য সমালোচনার দ্বারাও যুগে যুগে বদলেছে, আজও বদলাচ্ছে। এক সময়ে “art for art’s sake” সাহিত্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি ছিল। আজ আর তা নেই।

বর্তমানে সাহিত্যবোধের মূলে সমাজবোধকে একটা বড়ো আসন দেওয়া হয়।

সাহিত্য-সৃষ্টির একটা ব্যক্তিগত অবস্থা আছে। সাহিত্য-স্রষ্টা যতক্ষণ সাহিত্য-সৃষ্টির কাজে ব্যাপৃত থাকেন, ততক্ষণ তিনি আর তাঁর সৃষ্টি ছাড়া দুনিয়ার সব কিছু তাঁর সামনে থেকে সামান্যতম ভাবে মুছে যায়।

কিন্তু স্রষ্টা নিজেকে কি? তিনি ভূ-ইকোড জন্মান নি, ত্রিশকুর মতো শুল্কে তুলছেন না। যিনি যত বড়ো স্রষ্টাই হোন, যত বড়ো কবি বা শিল্পীই হোন, তিনি তাঁর সমাজেরই একটা অঙ্গ। শৈশব থেকেই তিনি বাস্তব ক্ষেত্রে যে সামাজিক সমাজে মানুষ, অথবা মানস ক্ষেত্রে যে বৃহত্তর মানব সমাজের চিন্তাভাবনার পরিপুষ্ট, সেই সব সামাজিক চিন্তা, আদর্শ, ভাবধারা সারা জীবন ধরে তাঁর শিরায় শিরায়, মস্তিষ্কে মস্তিষ্কে ঢুকে যায়, সজ্ঞানে বা তাঁর মনোচেতনায় গিয়ে বাসা বাঁধে।

স্রষ্টার সেই সচেতন বা অসচেতন মনের উপর প্রতি কলিত সমাজ-জীবনের বিচিত্র চিত্র স্রষ্টার প্রতিভার

ভেঁশরা কাচের মধ্য দিয়ে অপূর্ণ রঙে ও বস্তুতে রূপান্তর গ্রহণ করে। কিন্তু কবির নূতন নূতন সৃষ্টির অন্তরালে সমাজের বাস্তব সত্তাকে অবহীকার করা আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার স্বীকৃত নয়।

সমাজের সঙ্গে শ্রুতির, কবির বা শিল্পীর যোগঅঙ্গাকর্ষী অবিলম্বে যোগ। শ্রুতি সৃষ্টি-ছাড়া ন'ন, সৃষ্টি স্বজন ক্ষেত্র বা সমাজ ছাড়া নয়।

সামাজিক মানুষ খণ্ডিত মানুষ নয়। একই মানুষ কারো ভাই, কারো ছেলে, কারো বা বাপ। আবার হয়তো সে একটা কারবারের মালিক কিংবা কলেজের অধ্যাপক, কোনও স্কটবল ক্লাবের সেক্রেটারী, আবার সেই মানুষটাই কোনও পলিটিক্যাল পার্টির চাঁই ও থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক অথবা কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের অমুরাগী ভক্ত। একই মানুষের মধ্যে এই বিচিত্র সাধনা এসে যুক্ত হয়ে তাকে একটা পূর্ণ মানুষ করে গড়ে তুলেছে। সেই সমগ্র মানুষটিকে বিচার করতে হ'লে এদের কোনো একটি দিক নিয়ে বাকী সবকটা দিক থেকে তাকে আলাদা করে দেখলে সে-দেখাটা এক পেশে দেখা হয়। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি এ মানুষটির জীবনের একটি দিক বাকী সবকটার সঙ্গে কোথাও না কোথাও সম্বন্ধযুক্ত।

তেমনি সমাজ বস্তুটিও একতারা যন্ত্র নয়। বাঁধার মত ভাঙে বহু তার, বিচিত্র বক্রায়। ধর্মচিন্তা, রাষ্ট্র-চিন্তা, অর্থচিন্তা প্রভৃতি সব বক্রমের চিন্তা ও আদর্শই একটা সামগ্রিক সমাজের চিন্তাধারার বিবিধ প্রকাশ। সাহিত্য ও আর্টও তাই।

বিশ্বব্যাপ্ত সাহিত্য সমালোচক ডেভিড্ ডেচিস্ সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ১৯০৮ সালে প্রকাশিত তাঁর Society and Literature গ্রন্থের গোড়াতেই বলেছেন,

“Indeed, the more we consider the nature and function of any product of the human mind, the more we are led to the belief that categories devoted by such terms as “aesthetic” or “ethical” cannot be dealt with in isolation ; at some point they overlap with other cate-

gories, and ultimately the complete study of one human activity necessitates the study of all other human activities.”

তাৎপর্য। বাস্তবিক পক্ষে, মানুষের মনের কোনো একটা (বিশেষ) সৃষ্টির প্রকৃতি ও কাজ বিষয়ে যতই চিন্তা করা যায়, ততই আমাদের এই বিশ্বাসই জন্মায় যে, সৌন্দর্য বোধ (aesthetics) বা নীতিবোধ (ethics) বলে যে সব ভাগ করা হয়েছে, সেগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করা যায় না, মানুষের কর্মধারার কোনো না কোনো জায়গায় গিয়ে (নিজেদের সীমা রেখা লঙ্ঘন করে) একটা বিষয়ের সঙ্গে অল্প বিষয় যুক্ত হ'য়ে পড়ে, এবং শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, মানুষের কার্যাবলীর একটা দিক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিবেচনা করতে গেলে অল্প সমস্ত দিকের বিবেচনা অবশ্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

সুতরাং কোনো যুগের ও কোনো দেশের সাহিত্য বিচার করতে গেলেও সেই যুগের ও সেই দেশের সমসাময়িক অজ্ঞাত বিষয়ের অর্থাৎ গোটা যুগমানসের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সাহিত্য-বিচার করা প্রয়োজন।

অতএব, “আধুনিক” বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি ও লক্ষণ বিচার করতে গেলে এবং সেই বিচারের কটিপাথরে “জনক” নির্ণয় করতে গেলে আগে দেখতে হবে (১) মধ্যযুগের বাংলার সমাজের প্রকৃতি কি ছিল, (২) তার সঙ্গে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক কি, (৩) “আধুনিক” সমাজের লক্ষণ কি, (৪) “আধুনিক” সমাজ-চিন্তার উপযুক্ত বাহন রূপে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে গ'ড়ে তোলার প্রাথমিক কাজ কার হাতে হয়েছিল।

বাংলা গল্পের জনক এবং “আধুনিক” বাংলা গল্পের জনক, দুটি পৃথক্ বিচার।

এখানে গল্পের ‘স্টাইল’ বা শৈলীর কথা উঠতে পারে। যেমন, গত শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে যে ‘রোমান্টিক’ স্টাইল দেখা দিয়েছিল, আদি গল্পকারদের

মধ্যে এই বিশেষ স্টাইলের আভাস কার মধ্যে প্রথম দেখা দিয়েছিল, তাই দিয়ে জনকবের একটা বিচার সম্ভব। এ বিষয়ে, ‘রোমান্টিক’ স্টাইলের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কি, সমাজ বিবর্তনের কোন স্তরে রোমান্টিক স্টাইল সম্ভব, ‘রোমান্টিক’ স্টাইলের মধ্যে যে “conflict” বা দ্বন্দ্বের নীতি আছে সেটা কিসের দ্বন্দ্ব, মধ্যযুগীয় চিন্তার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল আধুনিকতার বিরুদ্ধে, না আধুনিকতার বিরুদ্ধে মধ্যযুগীয় চিন্তার conflict বা বিরোধ, সে কথাও বিচার্য।

তার আগে বিচার্য, style কাকে বলে? সাহিত্যের যে প্রকাশ ভঙ্গী, শিল্পচাতুর্য বা আর্ট শুধু সেইটাই কি স্টাইলের একমাত্র বিচার্য? এ বিষয়ে আবাবরকোঁথর একটা কথা বিশেষ ভাবে প্রাধান্যযোগ্য। তিনি বলেছেন :

“Style in the broadest sense, which includes mood and spirit and the choice of matter as well as technique and language, is the subject of criticism proper.”<sup>৫</sup>

ভাৎপর্ষ। খুব ব্যাপকভাবে বলতে গেলে যে-‘স্টাইল’-এর মধ্যে সাহিত্যের শিল্পরীতি ও ভাষা ছাড়াও আছে (সাহিত্যের) মনের গতি বা মেজাজ ও ভাবধারা এবং বিষয়বস্তু নিপাচন সেই-‘স্টাইল’ই সাহিত্য সমালোচনার প্রকৃত বিষয়।

অতরাং ‘রোমান্টিক’ কি রোমান্টিক নয়, এইটিই “আধুনিক” সাহিত্যের একমাত্র মাপকাঠি নয়। সাহিত্যের “মুড্”, “স্পিরিট” এবং “চয়েস্ অফ ম্যাটার” এইগুলিও সমভাবে বিচার্য।

এই কথাগুলি, এবং সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ এবং অঙ্গাঙ্গী যোগের কথা মনে রেখে এইবারে আমরা মধ্যযুগের লক্ষণগুলি ও আধুনিক যুগের লক্ষণ, এবং এই সব লক্ষণ বিচারে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে বাংলা সাহিত্যের পরিবর্তন ও সেই পরিবর্তনে শ্রেষ্ঠ ভূমিকা কে নিয়েছিলেন সেই বিষয়ে আলোচনা করব।

আগামী সংখ্যার সমাপ্য

১। Lecture at Bangalore on September 27, 1998.

২। Sukumar Sen, “The Bengali Prose and Rammohun”, *The Father of Modern India*, commemoration volume of the Rammohun Roy centenary celebrations, Calcutta, 1933, Part II, p.338.

৩। ‘মুহুরজয় গ্রন্থাবলী’ বা হুপ্রাপ্য গ্রন্থমালায় ‘বেদান্তচিন্তিকা’ মুহুরজয়ের প্রকৃত রচনার নির্ভরযোগ্য নিদর্শন নয়। মুহুরজয়ের বাংলাকে সঙ্কলিত করার জন্য পুনর্মুদ্রণের সময়ে লম্বা সমাসযুক্ত বাক্যগুলি আগাগোড়া ভেঙে ভেঙে ছোট করা হয়েছে, এমন কি মূল বইয়ের ব্যাকরণের ভুল সংশোধন করে ছাপা হয়েছে অতরাং এইসব সংশোধিত পুনর্মুদ্রণের ভাষা দিয়ে মুহুরজয়ের আসল ভাষার বিচার হয় না।

৪। Lascelles Abercrombie, “Principles of Literary criticism”, *Outline of General Knowledge*, London, 1932, p.862.

৫। “Principles of literary criticism”, *op.cit.* p.862.

# জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

## [ নিগ্রো মনোমো ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ডারের জীবনালেখ্য ]

অমল সেন

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

দেশকে যা দুঃখজনক পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, জর্জ কার্ডারের বিশ্বয়কর আবিষ্কারের ফলে তা থেকে দেশ রক্ষা পেল। জর্জ কার্ডারের উদ্ভব সার্থক ও সাকল্যামিওত হল, তাঁর প্রতিভা জয়যুক্ত হল। তিনি এককালের অবহেলিত ও নগণ্য কলাই থেকে যতগুলি পদার্থ আবিষ্কার ও প্রস্তুত করলেন বাজারে তার প্রত্যেকটা জিনিষের বিপুল সমাদর হল, সেসব জিনিষে বিশ্বের বাত্মর ছেয়ে গেল এবং কোথাও একটি জিনিষও অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে রইল না।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সহায়তায় এবং ভিন্ন ভিন্ন তাপাঙ্ক ও চাপ সৃষ্টি করে কলাই থেকে বেসব জিনিষ আবিষ্কার করে তিনি জনসাধারণের হাতে ছুঁলে দিলেন তা এককাল লোকের কল্পনার অতীত ছিল এবং তা দিয়ে যে নতুন বাণিজ্য-জগৎ তৈরী হল সেখান থেকে দক্ষিণাফলের কৃষি-ব্যবসায়ীরা লক্ষ লক্ষ ডলার আয় করে রীতিমত ধনী হল।

নিরাশার জমাটবীধা কালো মেঘ কোথায় মিলিয়ে গেল, মেঘহুস্ত দীপ্ত সূর্যালোকে আকাশ ঝলমল করে উঠলো।

এবার জর্জ কার্ডার মিষ্টি আলু নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। আরো একটা নতুন শিল্পের গোড়াপত্তন হতে

চলল। আগে তিনি মিষ্টি আলু নিয়ে একবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন এবং ময়দা, গদের ঝাঠা ইত্যাদি কতগুলি জিনিষ মিষ্টি আলু থেকে তিনি প্রস্তুতও করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার মুখে তিনি মিষ্টি আলুর সাহায্যে ১১৮টি নতুন জিনিষ তৈরী করলেন। এই সময়ে তিনি মিষ্টি আলু থেকে এক রকমের পাউডার আবিষ্কার করলেন। সে পাউডার কোঁটায় ভরে অনেক দিন রেখে দিলে পরেও তা নষ্ট হয় না, জল মাখিয়ে তা দিয়ে কেক অথবা বিস্কুট অনায়াসে তৈরী করা চলে। জমাট করা খাদ্যবস্তুর মতোই মিষ্টি আলুর এই পাউডারও আজ খাদ্যশিল্প হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং প্রতি বছর এই পণ্য থেকে কোটি কোটি ডলার মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

কার্ডারের অনলস ও নিঃস্বাচ্ছন্দ উদ্ভব নিত্য নিত্য নব নব আবিষ্কারের পথ খুলে দিতে লাগল। কমলালেবুর রস থেকে তিনি একটা আরক বের করলেন—এই আরক গরুর গায়ের বা সারাবার ভালো ঔষধ রূপে স্বীকৃতি লাভ করল এবং বিশেষ করে মাংস-বিক্রেতাদের কাছে এই ঔষধের চাহিদা যথেষ্ট বেড়ে গেল।

সাধারণত মানুষ যেসব জিনিসকে একান্ত অকিঞ্চিৎকর ও মূল্যহীন বলে অবজ্ঞার চোখে দেখত জর্জ কার্ডার সেসব জিনিসকে একজন খাঁটি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তার মূল্য বিচার করতেন। সামান্য তৃণশুল্ক পর্যন্ত তাঁর কাছে সোনার মতো মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় ছিল, তার মধ্যেও তিনি বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেতেন এবং তা পূর্বে বের করার জন্য বিজ্ঞান-সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করতেন। তিনি সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে, সেই তৃণশুল্কসমূহ আপাতদৃষ্টিতে দুচ্ছ মনে হলেও তার মধ্যে ভগবানের কল্যাণকর প্রতিক্রিয়া লুকিয়ে রয়েছে। যেসব কীটায়ুধরা গাছগুলি নিয়ে গ্রামের কৃষকরা অনেক সময়ে কোঁচুক করত, হাসি-ঠাট্টা করত জর্জ কার্ডার সেই জাতের আড়াইশো বিভিন্ন রকমের গাছগাছড়া নিয়ে পরীক্ষা করতে লেগে গেলেন। সেগুলোর মধ্য থেকে তিনি মানুষের উপকারে লাগতে পারে এমন সব ভেষজ পদার্থের সন্ধান আবিষ্কার করলেন। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করলেন যে, সেই কীটগাছগুলিও ভেষজ পদার্থে অভ্যস্ত গাছের মতোই সমৃদ্ধ।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা যখন রসায়ন বিজ্ঞানীরা রেয়ন এবং রেয়ন জাতীয় আরো কয়েক রকমের কৃত্রিম বস্ত্র আবিষ্কার করলেন, দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিজীবীদের তখন পর্যন্তও তার খবর অজ্ঞাত ছিল, তারা তখনো মাক্কাতার আমলের তুলোর চাষ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। উৎপন্ন তুলোর শেষ গাঁইট পর্যন্ত বাজারে বিক্রী হয়ে গেলেই তারা যারপরনাই খুশী থাকতো এই ভেবে যে, এবার তাদের কাজ শেষ, এবার বিশ্রাম আর আনন্দ করার সময়। কিন্তু শেষের পরেও যে আরো কাজ বাকী থাকে এবং তাও আবার শেষ করে ফেলতে হয়, এ কথা কখনো তাদের মনে হয়নি। জর্জ কার্ডার সেই কথাটাই তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন।

তুলোর ব্যবহার মাক্কাতার আমল থেকে গতানুগতিক

ভাবে একই রকম ভাবে চলে এসেছে, এ বাবৎ তার কোন পরিবর্তন হয়নি। তুলো আরো নতুন কী কী ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে তারই তথ্যসন্ধানের আত্মনিয়োগ করলেন ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ডার।

[ ২১ ]

১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসের একটি গভীর রাত। কার্ডার তাঁর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তারপর এক সময়ে কাজ করতে করতে ক্লান্তি, অবসাদ ও যন্ত্রণার অহির হয়ে যে বেকিতে বসে কাজ করছিলেন সেই বেকির ওপরে দৌড়ে এলিয়ে দিলেন, কিন্তু তিনি যে এতটা ক্লান্ত ও অবসন্ন জর্জ কার্ডার তা নিজেও বুঝতে পারেন নি। তিনি শুধু জানতেন, ভগবানের নির্দেশ পেয়েছিলেন তাই তাঁর পক্ষে উৎপন্ন প্রতিটি কলাইয়ের দানা তাঁর গভীর অহুসান্ধা ও অদম্য উদ্ভবের ফলে কয়েক বছরের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন প্রায়শ্চিত্ত, সান বাঁধানোর জন্য তাঁর পাখরের কুঁচি, মোটরগাড়ীর টায়ার এবং জিমির সার ইত্যাদি এইসব জিনিস আবিষ্কারের ফলে তুলোর চাহিদা এমন অসম্ভব রকম বেড়ে গেল যে, তুলোর বাজার অল্পদিনের মধ্যেই রীতিমতো কৈপে উঠলো, কৃষিজীবীদের হৃদয় উপস্থিত হল।

ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ডারের অন্ততম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হচ্ছে সয়াবানের তেল। আজকাল মোটরগাড়ীতে স্প্রেইন্ট করার উপকরণ হিসাবে সয়াবান তেলের চাহিদা খুব বেশী, এই তেল দিয়ে রঙ তৈরি হয়।

ডাঃ কার্ডার তাঁর একক জীবনে যতগুলি জিনিস আবিষ্কার করেছেন তার যে কোন একটি মাত্র জিনিস আবিষ্কার করেই তিনি প্রভূত যশ এবং অভুল ঐশ্বর্ষের অধিকারী হতে পারতেন, কিন্তু তিনি ধনী হতে চাননি। ঐশ্বর্ষের প্রতি তাঁর কোন লোভ অথবা আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তাঁর সারা জীবন তিনি মানবের কল্যাণে ব্যয় করতে পেরেছেন। তিনগুণ কমল উৎপন্ন হলেও প্রতিটি

কৃষিকর্মীরা যাহা বাকারে বন্দের পেতে কোন অসুবিধা ভোগ করতে না হয় ডাঃ কার্ভার সৌদিকে লক্ষ্য হইয় বেধেই তাঁর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

বহুক্ষণ ধরে গবেষণার কাজে ডুব খাকার পর ডাঃ কার্ভার একদিন শীতজরুর প্রত্যবে অবসর দেহে ক্রান্তপদে রাস্তায় বের হলেন ভগবানের উদ্দেশে হৃদয়ের ভক্তি ভালোবাসা ও প্রকার অর্থ্য নিবেদন করার জন্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু আমেরিকার কলাই পণ্যশিল্পের শৈশব অবস্থা তখনো কাটল না,— প্রতি বছর এই পণ্যশিল্পের বিনিময়ে আয় ৪৩ মাত্র ৮০ মিলিয়ন ডলার। জর্জ কার্ভারের পরলোকগমনের পরে কলাই থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের যেসব পণ্যদ্রব্য বাজারে চালু ছিল তার সংখ্যা ছিল তিনশোরও বেশী এবং সেই অল্পপাতে আয়ের পরিমাণও বহু গুণ বেড়ে গিয়েছিল। এইসব জিনিষ তৈরি করার জন্য আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য কল-কারখানা গড়ে উঠেছিল। পনির, জেলি, ঝাল আচার, চুলে মাখবার শ্যাম্পু, শুভ্র ও শাদা করার জন্য একরকম রাসায়নিক পদার্থ, অ্যালুমিনিয়াম প্রিজ, লিনোলিয়াম বস্ত্র, ধাতব বস্ত্র পাঁচিশ করার জন্য মশলা, কাঠে খড় করার জন্য রজন, ঝাঠালো পদার্থ, এবং প্র্যাক্টিক ইত্যাদি যেসব জিনিষ জর্জ কার্ভার কলাইকে উপাদান রূপে ব্যবহার করে আবিষ্কার করেছিলেন, পর্যায়ক্রমে সেইসব জিনিষের ক্রমবিকাশ এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছাল যে মানুষের মনকে তা বিস্মিত, মুগ্ধ ও বিচলিত করল এবং অতিশয় মূল্যবান ফসল হিসাবে কলাইয়ের মূল্য অনেকগুণ বেড়ে গিয়ে এখন তা আমেরিকার উল্লেখযোগ্য কৃষিপণ্য রূপে স্বীকৃতি অধিকার করেছে।

২২

নিগ্রোজাতির কর্মস্বির বুকার টি ওয়াশিংটন ১৯১৫ সালের ১৪ই নভেম্বর পরলোকগমন করলেন। সমগ্র

দেশ তাঁর শোকে মুগ্ধমান হল, কিন্তু সৌদিন জর্জ কার্ভারের বুকে এ শোক যতখানি বেজেছিল তেমন বোধকার আর কান্নাই নয়। তাঁর কাছে বুকার টি ওয়াশিংটনকে হারাবার দুঃখ হয়েছিল অসহনীয়। একজন অতি নিকট এবং পরমাখ্যায়ের বিরোগব্যথার মানুষ যেমন করে কাঁদে জর্জ কার্ভারও সৌদিন তেমন অকোয়নয়নে কেঁদেছিলেন। বুকার টি ওয়াশিংটন ছিলেন একাধারে সখা, সুহৃদ এবং গুরু, জ্যেষ্ঠভাতার মতো কল্যাণকাজী। তাঁদের উভয়ের মধ্যে ভিল ভিল করে যে নিবিড় বন্ধুত্ব সুদীর্ঘ ২০ বছর কাল একসঙ্গে থেকে একই মনঃ আদর্শ বাস্তবে রূপায়ণের কাজে আত্মনিয়োগ করার ফলে গড়ে উঠেছিল, সেই বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তার বন্ধন মৃত্যুর একটি আঘাতে এক নিমেষে ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁর চিন্তা হল, এই শূন্যতা তিনি কী দিয়ে পূর্ণ করবেন; একমাত্র কর্ম দিয়ে ছাড়া এই শূন্যতা তো আর কিছু দিয়েই পূর্ণ করা সম্ভব নয়, তাই তিনি একজন যথার্থ কর্মযোগীর মতো কাজের মধ্যে ডুব দিলেন—সে কাজ দেশ ও জাতি গঠনের কাজ। বিজ্ঞানের সাহায্যে দারিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধনের কাজ।

বুকার টি ওয়াশিংটন এবং জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার উভয়েই জগৎগ্রহণ করেছেন দাসত্বের পরিবেশের মধ্যে, জগৎথেকে হুজনেই ক্রীতদাস। এঁরা হুজনেই লাঞ্ছিত নিপীড়িত ক্রীতদাসত্বের বেদনায় জর্জের নিগ্রোজাতির জীবনে বহন করে এনেছিলেন মুক্তির আলো এবং স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব। হুজনেই অজ্ঞানতা, অশিক্ষা ও হতাশামাখা দুঃখময় ও অন্ধকার জীবন থেকে নিগ্রোজাতিতে মুক্ত করে এনে সম্ভাবনাময় ও উজ্জ্বল মুক্তজীবনের সিংহদ্বারে পৌঁছে দেবার এক কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা টাকোগির নিভৃত প্রদেশে তাঁদের কর্মস্থান বেছে নিয়ে টাকোগিকে একটি মনোরম এবং দর্শনযোগ্য নগরীতে উন্নীত করেছিলেন। বুকার টি ওয়াশিংটন মৃত্যুর পরপারে চলে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর বিদেহী আত্মা টাকোগির

শিক্ষা ভবন ছেড়ে যাবনি, আজও তা নিঃশব্দ পদস্বরে সেই শিক্ষাভবনের কক্ষে কক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাতাসে কোন ঘরের দরজা কেঁপে উঠে হঠাৎ শিকল নড়ার শব্দ হলে ছাত্ররা বলে ওঠে, ডাঃ বুকার টি ওয়াশিংটন এসেছেন জর্জ কার্ভারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ করার জন্য এবং ডাঃ কার্ভার ডাঃ ওয়াশিংটনের পুণ্য স্মৃতির প্রভাব উপলব্ধি করে ভগবানের নির্দেশে গবেষণাগারে ধ্যানরত অবস্থায় বসে নানা রকম রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে আবিষ্কারের ইচ্ছাজাল রচনা করেন। তাঁর গবেষণা অবশেষে এক নতুন এবং উদ্দীপনাময় স্তরে এসে পৌঁছাল।

বছর পাঁচেক আগে টাক্সেগি বিজ্ঞানভবনের অধি-পর্ষদ ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের অধ্যক্ষতায় একটি কৃষিবিজ্ঞান গবেষণা বিভাগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করে তা অনুমোদন করেছিল। সেই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে জর্জ কার্ভার অনেকগুলি ক্লাসে পড়ানোর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলেন এবং স্বীয় স্বজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনে তৎপর হবার অবাধ সুযোগ পেয়ে গেলেন। তাঁর বিজ্ঞান সাধনা ও গবেষণা নিত্য নতুন ঋতে প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি কৃষি বিজ্ঞান, রাসায়ন বিজ্ঞান, ভেষজ বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, প্রজনন বিজ্ঞান, ছাত্রদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, জন্মরহস্য ও মানবদেহের পুষ্টি বিধান, উদ্ভিদ সৃষ্টি ও রোগনির্ণয় প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা করে সাফল্য অর্জন করতে লাগলেন এবং মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে নিত্য নতুন বিশ্বয়কর অবদান জুগিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বেশী উৎসাহ এবং আগ্রহ লক্ষ্য করা গেল কৃষিজাত ও শিল্পোৎপাদিত যেসব দ্রব্য লোকে ভুচ্ছ ও অনাবশ্যক বলে বিবেচনা করে, অনেক সময়ে অবহেলা করে ফেলেও দেয়, সেইসব অর্কিফংকর এবং ভুচ্ছাতিভুচ্ছ জিনিস থেকে মানুষের ব্যবহারোপযোগী এবং মূল্যবান নানারকমের সব সামগ্রী প্রস্তুত করার দিকে। তিনি সরাবীন থেকে তৈরি করলেন ময়দা, খেতসার, তেল, কাকি এবং

প্রাতিরাশের ঋতুদ্রব্যরূপে গ্রহণযোগ্য এক রকমের সুবাহু আহার্য। ময়দা এবং নোংরা একরাশ কবাজে চেরা কাঠের গুঁড়ো থেকে তৈরি করলেন শাদা ধবধবে ও মসৃন অবিকল একখানা খেতপাখরের টুকরো। কলাইয়ের খোসা তাঁর গবেষণার ফলে পরিণত হল ফিনিকিনে পাতলা একটুকরো কাগজে। তিনি একডাল কাঁদামাটিকে পরিণত করলেন চীনা মাটির পাত্রে এবং এক জাতীয় গাঢ় নীলরঙের মাটি থেকে তৈরি করলেন কাপড়কাচার নীল। পরে অবশ্য জানতে পারা গিয়েছে যে এও এক রকমের দূষপ্রাপ্য নীল, প্রাচীন মিশরবাসীরা এই নীলের ব্যবহার জানত। কিন্তু হাজার হাজার বছরের ব্যবধানের ফলে সভ্য জগৎ এ জিনিসটির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। শুধু আবিষ্কার নয়, জর্জ কার্ভার এই নীলের সাহায্যে রঙ তৈরি করে নিকটবর্তী এক গ্রামের একটা গির্জায় নীলরঙ করে দিয়েছিলেন।

সংসারে মানুষ প্রায়শই যেসব জিনিসের কোন মূল্য আছে বলে মনে ভাবে না, সেইসব মূল্যহীন, অনাবশ্যক ও ভুচ্ছ জিনিসকে কাজের উপযুক্ত করে, মূল্যবান করে তোলাই হচ্ছে সৃষ্টির ধর্ম। ব্যাপক গবেষণার ক্ষেত্রে এই সৃষ্টির ধর্মই আজ কাজ করে যাচ্ছে এবং বিজ্ঞান-সাধকদের মনে নিত্য নতুন সৃষ্টির প্রেরণা ও উৎসাহের সঞ্চার করছে—ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার তার জলন্ত উদাহরণ। তাঁর সর্গশ্রেষ্ঠ দান মানবজাতির উদ্দেশ্যে তাঁর সেই সৃষ্টির ধর্ম। ঋগ্বেদ-পর্যায় হাড়াও সংসারে মানুষের অনেক কাজ করার আছে এবং কৃষিজাত কোন একটি একান্ত ভুচ্ছ পদার্থকে সেই অনেক কাজের কোন-না-কোন একটিতে সার্থক রূপে ব্যবহার করা সম্ভব—এ কথাটি তিনিই সর্গপ্রথম ঘোষণা করেন। তাঁর আগে কোন বৈজ্ঞানিক অথবা আর কেউই কখনো একথা বলেননি। জানি না আর কারুর চিন্তায় কখনো তা ছিল কি না। পৃথিবীতে যা কিছু প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মাচ্ছে, যা কিছু উৎপন্ন হচ্ছে, তার সব রহস্য আমরা জানি না বটে, কিন্তু একটা কথা আজ আমাদের নিশ্চিতরূপে জানা হয়ে গিয়েছে যে, পৃথিবীর



তাৎক্ষণিক জিনিষের মধ্যে এমন এক-একটা রাসায়নিক দ্রব্যগুণ নিহিত আছে বা আবিষ্কার করে মানুষ কাজে লাগাতে পারে।

ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের কতগুলি চিন্তাভাবনাকে লোকে নিছক কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, কোন মতেই তাকে আমল দিতে চায়নি। কিন্তু দশ বছর পরে তাঁর অনেকগুলি ভবিষ্যৎবাণীই বাস্তবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি পাইন গাছের কাঠ থেকে কাগজ তৈরি করেছিলেন এবং যে পদ্ধতিতে সেদিন তিনি তা তৈরি করেছিলেন ২৫ বছর পরে তাঁর আবিষ্কৃত সেই পদ্ধতিই আমেরিকায় নতুন নতুন এবং বড় বড় কাগজ শিল্পের কারখানা খোলার পথ সুগম করে দিয়েছে। এখন একথা নির্দিষ্ট বলা যেতে পারে যে, এমন একটা সময় খুব শিগ্গীরই আসছে যখন মার্কিন দেশের মোটরগাড়ীর প্রস্তুতকারকগণ ইন্সপাতের পরিবর্তে সেলুলোজ দিয়ে মোটরগাড়ী প্রস্তুত করতে সক্ষম হবেন। তাঁরা প্রতিটি গাড়ী তৈরির জন্য ৩৫০ পাউণ্ড কৃষিজাত দ্রব্য ব্যবহার করবেন।

ডাঃ কার্ভার স্বীয় আবিষ্কৃত জিনিষগুলি পণ্যদ্রব্য রূপে যাতে বাজারে ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহার করার অহুম্যত দেন বহু খ্যাতিমান্য ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সেজন্য বহু লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে প্রতিনিধিত্ব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল এবং প্রচুর অর্থও তাঁকে দিতে চাইল, কিন্তু শত অগ্ররোধ কিংবা সহস্র প্রলোভন দেখিয়েও তারা তাঁকে বশ করতে অথবা তাঁর বলিষ্ঠ আদর্শ থেকে তাঁকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারল না। তাদের অহুরোধের জবাবে তিনি শুধু একটা কথাই বললেন, “আমি জন্ম থেকেই নিজেকে বিজ্ঞান সাধনায় উৎসর্গ করেছি, আমি আজন্ম বৈজ্ঞানিক। আমার বিজ্ঞান-সাধনাকে কোনক্রমেই আমি বাজারের পণ্যদ্রব্য হতে দেব না, কারণ আমি বণিক নই।” জীবনের শেষদিন পর্বন্ত জর্জ কার্ভার নিজেকে একজন জ্ঞানপিপাসু ছাত্র হিসেবে গণ্য

করেছেন এবং সকলের কাছে নিজেকে ছাত্র বলেই পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। তিনি সর্বদা বলতেন, “আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, জ্ঞানবৃক্ষের তলায় কলের অহুসন্ধান করে বেড়াচ্ছি।”

জর্জ কার্ভারের জীবনযাত্রা একেবারেই বাহুল্য বর্জিত, সরল এবং অনাড়ম্বর। তিনি বাস করেন অতি সাধারণ একখানি বাড়িতে, দুটি নাত্র কক্ষ তার। একখানা ঘরে তিনি পড়াশুনা করেন, সেখানা তাঁর অধ্যয়ন কক্ষ। বাকী আর একখানা ঘর তাঁর নানান জিনিষপত্র দিয়ে এমন বোঝাই যে সে ঘরের মধ্যে পা কেলবার উপায় নেই। ঘরের দেয়ালে ছবি টাঙানো—তাঁর নিজের হাতে আঁকা ছবি। তিন দিকে তিনটে বইয়ের তাক, মধ্যখানে মস্তবড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল; তার ওপরে অগোছালোভাবে গাদা করা বইয়ের পাহাড় ছাড়াও আছে বহু ষ্টালাগমাইট ও ষ্টালাকটাইটস, বিভিন্ন প্রকারের ধাতব পদার্থ এবং পাথরের টুকরো। ঘরের কোণে রয়েছে একটা উছুন, গাছের পাতা এবং বাকল। এই জিনিষগুলি দিয়ে ডাঃ কার্ভার ঔষধ প্রস্তুত করেন। এমনি বহু রকমের গ্রাহ ও লভ্যপাতার সব নমুনা সে ঘরের সবজায়গায় ছড়ানো।

জর্জ কার্ভারের শয়নকক্ষে পাতা রয়েছে একখানা বিহানা, তাঁর হারিয়ে যাওয়া মায়েস স্থিতিবিজ্ঞান একটা চরকা—এই চরকায় তিনি স্নুতো কাটেন। বিহানার পাশে রাখা একটা ক্ষুদ্র টেবিল—সুতে বাবার আগে জর্জ কার্ভার সেই টেবিলের ওপরে বই রেখে কিছুক্ষণ পড়াশুনা করেন, কখনো বা বাইবেল, কখনো বা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলনগ্রন্থ, আবার অল্প সময়ে বিশ্বের বিখ্যাত মনীষী ও শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের জীবনকাহনী।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের বেশভূষায়ও কোন আড়ম্বর বা বাহ্য ছিল না। এমন একটা কথা তাঁর সখস্বে প্রচলিত আছে যে তিনি ১৮৯৬ সালে যে বেশভূষা পরে টাক্সেগতে এসেছিলেন ১৯১৫ সালেও তাঁকে সেই একই পোশাক পরিধান করতে দেখা

গিয়েছে। নিজের পরিধের পোশাক তিনি নিজেরই প্রস্তুত করে নিতেন। কোটপ্যাঁট ছিঁড়ে গেলে জজ' কার্ভার নিজেরই ছেঁড়া জায়গাগুলিতে তালি দিয়ে ঠিক করে নিতেন। তিনি নিজের শার্ট' নিজের তৈরি করতেন, মোজা বুনতেন, এমন কি জুতো তৈরি করতে পর্যন্ত জানতেন এবং নিজের পরবার জুতো নিজেরই তৈরি করতেন। আমাদের দেশে যাকে বলে চণ্ডীপাঠ থেকে জুতো সেলাই, জজ' কার্ভারের ছিল তাই। তিনি লোকটা ছিলেন অভ্যস্ত স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভর। পরের উপর কোন কারণেই কখনো যাতে নির্ভর করতে না হয় তিনি সর্বপ্রযত্নে সর্বদা সেই চেষ্টাই করতেন। এ ছাড়া, তিনি কদাচিৎ কোন সভাসম্মান বা উৎসব আনন্দে যোগ দিতেন, কারণ তাঁর সময়ের যেমন অভ্যস্ত অভাব ছিল, তেমনই ছিল তাঁর এসব ব্যাপারে আগ্রহের অভাব। জনতার ভিড় এড়িয়ে চলা বা তা থেকে দূরে সরে থাকাই ছিল তাঁর স্বভাব। তাঁর এই ঘরকুনো স্বভাবের জন্য তাঁকে লোকে সমালোচনাও কম করত না। তিনি লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না, লোকজন ভালোবাসেন না, শুধু নিজেকে নিয়েই তিনি সবসময়ে ব্যস্ত থাকেন, এই ছিল তাঁর বিরুদ্ধে লোকের সবচেয়ে বড় অভিযোগ।

অভিযোগ যে সত্য নয় সেইটে প্রমাণ করার জন্য জজ' কার্ভার তাঁর নীতির পরিবর্তন করবেন ঠিক করলেন। মিসেস ব্রুকার টি ওয়াশিংটন শিক্ষকদের সম্বন্ধী জানাবার উদ্দেশ্যে একটা সভার আয়োজন করলেন এবং জজ' কার্ভারকেও সেই সম্বন্ধী সভায় যোগ দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন।

কিন্তু বিশ্বজ্ঞান ও প্রণাম্য ব্যক্তিদের সেই সভায় যোগদানের উপযুক্ত পোশাক জজ' কার্ভারের ছিল না, কাজেই তিনি অন্তের কাছ থেকে চেয়ে একটা পোশাক জোগাড় করলেন এবং সেই পোশাক পরে বুক পকেটে একটা টকটকে লাল গোলাপ ফুল গুঁজে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ম্যাডাম ব্রুকার টি ওয়াশিংটনের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। ফুল প্রাক্তন পার হয়ে যখন তিনি

সেই বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন, পথে ছাত্ররা তাঁকে দেখে মুচকি মুচকি হাসছিল আর নিজেকে মধ্য বলাবলি করছিল “লতাগুপ্তের অধ্যাপক” সাক্ষ্য পোশাক পরে পাটিতে যোগ দিতে চলেছেন।

ম্যাডাম ওয়াশিংটনের বাড়ীর দরজায় পৌঁছে কলিংবেল বাজাতেই একজন ছাত্রী পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিল। মেয়েটি জজ' কার্ভারকে দেখেই আনন্দের সঙ্গে বলে উঠল, “অধ্যাপক কার্ভার! আনুন, আনুন, সোজা ভিতরে চলে আনুন।”

“ধন্যবাদ, কিন্তু আমার নিমন্ত্রণে যোগ দেবার সময় নেই, একজ্ঞ আমি খুবই দ্রুত চলে যাব। এক্ষুণি গিয়ে গবেষণাগারে আমার একটা খুব জরুরী বিষয় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে বসতে হবে।” জজ' কার্ভার এই কথা বলে পকেট থেকে একখানা কার্ড বের করে মেয়েটির হাতে দিয়ে বললেন, “ম্যাডাম ওয়াশিংটনকে দয়া করে এই কার্ডখানা দিয়ে, আর বলো, তাঁর প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যই এসেছিলাম কিন্তু সময়ের অভাবের জন্য আমি সম্বন্ধী সভায় উপস্থিত থাকতে পারলাম না। তাই আমি চলে যাচ্ছি।”

বাড়ী ফিরে এসে কার্ভার তাঁর সাক্ষ্য নিমন্ত্রণের পোশাক বদলে ছেঁড়া তালি দেওয়া সেই পুরানো প্যাঁটকোট পরে আবার গিয়ে গবেষণাগারে ঢুকলেন।

বৈজ্ঞানিক জজ' ওয়াশিংটন কার্ভার সব সময় জগতের কোলাহল ও জনতার ভিড় থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইতেন, সন্ধ্যাকে এড়িয়ে আলপা হয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। কিন্তু হলে কি হয়, জগৎ তাঁকে ছাড়তে চাইত না। তাঁর দরজায় সব সময় মানুষের আনাগোনার আর বিবাহ ছিল না। বিশ্বজগৎ তাঁর মাথায় একটার পর আর একটা খ্যাতি এবং সম্মানের মুহূর্ত পরিচয় দেবার জন্য তাঁর দরজায় যেন ভিড় করে এসে দাঁড়ায়। ইংল্যান্ডের রয়াল সোসাইটির পরিচালকবৃন্দ তাঁর প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেবার উদ্দেশ্যে তাঁকে রয়াল সোসাইটির অন্ততম সদস্যরূপে

নির্বাচিত করলেন। ১৯১৬ সালে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য হবার পরব্রহ্মত্ব থেকেই যশস্বী বৈজ্ঞানিক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার নিম্নের নামের শেষে এক. আর. এস. অক্ষর করাট বসাবার অধিকার লাভ করলেন এবং বিশ্বের স্মরণীয়দের পাশে তাঁরও আসন স্থাপিত হল। একজন আমেরিকানের কাছে এ এক আকাঙ্ক্ষার বস্তু এবং দুর্লভ সম্মান। এ মহৎ সম্মান লাভের সৌভাগ্য কদাচিৎ কোন একজন আমেরিকাবাসী পেয়ে থাকেন। জর্জ কার্ভারের এক. আর. এস. হবার মূলে ঝাঁক উৎসাহ উদ্দীপনা সব চেয়ে বেশী ছিল তাঁর নাম স্ত্রীর স্থান এই জনসন—প্রখ্যাতনামা ব্রুটিশ প্রাণীতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিক। স্ত্রীর স্থান তাঁর জীবনস্মৃতি “আমার জীবন কাহিনী” নামক গ্রন্থে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখছেন—“টাক্সেগির অস্ত্রতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি হলেন অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার, ইনি জাতিতে তো বটেই, মনে প্রাণেও একজন পাঁচি নিগ্রো। অধ্যাপক কার্ভার এমন চমৎকার এবং নিখুঁত ইংরেজী বলেন যে, তখনলে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছাড়া অন্য কিছু মনে হওয়া সম্ভব নয়। মনে হয়, ইনি যেন বাল্যকাল থেকেই অক্সফোর্ডে থেকে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়েছেন। আধুনিক বিশ্বে আমি এমন আর একজন লোকেরও সাক্ষাৎ পাইনি, উত্তর আমেরিকার উদ্ভিদ জগৎ তথা গ্রাহাগাছালি সম্বন্ধে কার্ভারের মতো এমন বিশাল ও গভীর জ্ঞানভাণ্ডার যিনি আমার সামনে উন্মুক্ত করতে পেরেছেন।”

রয়্যাল সোসাইটির সদস্যপদ গ্রহণ করতে গিয়ে অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার তাঁর স্বাভাবিক বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন—“এই বিরাট সম্মান লাভ করার আমি উপযুক্ত নই।”

২৩

১৯১১ সালে আমেরিকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। যুদ্ধ মানেই নরহত্যা, আর জর্জ কার্ভার নরহত্যা সমর্থন তো করতেনই না, মনে প্রাণে

নরহত্যাকে বড় ঘৃণা করতেন। কিন্তু স্বাধীনতার যুদ্ধের ডাক যখন এল তখন মন থেকে সব ঘৃণা সংশয় ঝেড়ে কেলে দিয়ে জর্জ কার্ভার সেই যুদ্ধের একজন সৈনিক হলেন, ছাত্রদেরও স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে ছুটলেন। বললেন, “সমগ্র বিশ্ব যখন যুদ্ধ ও সঙ্কটের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে তখন কোন মানুষ পারে চূপ করে বসে থাকতে? কোনও জাতি পারে কি সেই সঙ্কটমোঁচনে সাহায্য করার দায়িত্ব থেকে দূরে সরে থাকতে? তেমন মানুষ অথবা তেমন জাতি যদি একটিও কোথাও থেকে থাকে তবে বিশ্বের শান্তির দিনেও তারা কোনও সাহায্য প্রত্যাশা করার অধিকারী নয়।”

জর্জ কার্ভারের এ উদাত্ত আহ্বানে উত্তর আমেরিকার সশস্ত্র উদ্বাদনাময় সাদা পড়ে গেল, গ্রাম ও শহর থেকে অসংখ্য নিগ্রো তরুণ ছুটে এল টাক্সেগিতে, সৈন্তদলে নাম লেখাবার জন্য সে কি তাদের উৎসাহ ও আগ্রহ! নিগ্রো সৈন্তবাহিনীর একটি কোম্পানীর পতাকায় বেশ স্পষ্ট এবং বড় বড় অক্ষরে লেখা হল—“আমরা সমস্ত জগতের সামনে প্রমাণ দিতে চলেছি যে কৃষ্ণকায় নিগ্রো জাতির লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে না।”

এই ঘটনার পরেও আমেরিকায় রাষ্ট্রবিপ্লব, অথবা অন্য কোন জাতীয় সঙ্কট, যখনই দেখা দিয়েছে নিগ্রোরাও অস্ত্রাস্ত্র সকলের মতো সেই সঙ্কটের আবর্তে বাঁপিয়ে পড়েছে, বিপদ থেকে দূরে সরে থাকেনি এবং সবচেয়ে বড় কথা, নিগ্রো সেনাবাহিনীর পতাকায় লেখা উপরোক্ত কথাগুলি রীতিমত একটা ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়াল। আমেরিকার রাষ্ট্রবিপ্লবে সর্গপ্রথম যে ব্যক্তি জীবন উৎসর্গ করেছিল সেও ছিল একজন নিগ্রো, তার নাম ছিল ক্রিসপাস অ্যাটাক এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রথম যে আমেরিকান সৈন্তটি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে পুরস্কার লাভ করেছিল সেও একজন নিগ্রো ছিল এবং তাঁর নাম ছিল হেনারি জনসন। .....আর প্রথম মহাযুদ্ধের দারুণ খাতসঙ্কটের সময়ে

উপবাসী দেশগুলিকে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে অন্নভাণ্ড থেকে রক্ষা করলেন যিনি তিনিও একজন কৃষকায় নিয়ো। নাম তাঁর জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার।

১১১৪ সালে জার্মানী যে যুদ্ধ শুরু করল পৃথিবীর আরও ২১ টি দেশ সেই যুদ্ধ জড়িয়ে পড়ল। যুদ্ধের পতাকাভালে সমবেত হবার জন্য দেশদেশান্তর থেকে অসংখ্য যুদ্ধপারগল মানুষ যখন ছুটে এল তখন দেখা গেল, কলে-কারখানার অথবা ক্ষেত্রে-খামারে কাজ করার মতো লোক বেশী অবশিষ্ট নেই, ফলে লোকজনের অভাবে অনেক কল-কারখানার চাকা আর ঘুরছে না, জমি অনাবাদী পড়ে রইল, বহু খামার জনশূন্য হল। অনেক দেশেই দুর্ভিক্ষকালীন অবস্থার সৃষ্টি হল। মানুষ খেতে পায় না হুবেলা পেট ভরে। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে লক্ষ লক্ষ নরনারী ঘর ছেড়ে পথে বের হয়েছে। জর্জ কার্ভার দেখলেন, মানবজাতি এক ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে পড়ে বাঁচার উপায় খুঁজছে। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে অসম সাহসে ভর দিয়ে এগিয়ে এলেন জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার। তাঁর সঙ্গে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে আরও অনেকে এসে মিলিত হলেন। জর্জ কার্ভারের সংগ্রহান কাজ হল দুর্ভিক্ষাশ্রিত মানুষগুলির মনোবল অক্ষুর রাখা, উপদেশ দিয়ে উৎসাহ দিয়ে তাদের চাক্ষু করে তোলা। এ কাজ তিনি খুব ভালোই পারেন। যত বেশী সংখ্যক লোককে সম্ভব উৎসাহ দিয়ে তিনি তাদের নিজেদের বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে এবং জনসাধারণের ব্যবহৃত পার্কে ফল ও শাকসব্জি উৎপাদনে উৎসাহ করে তুলতে লাগলেন। তিনি উদ্বাঙ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, “ক্ষুধার পীড়িত কোন জাতি স্বাধীনতার জয়পতাকা বেশীদিন উল্লেস-তুলে ধরে রাখতে পারে না।” শুধু তাই নয়, জর্জ কার্ভার এক-খানি খাদ্য-পতাকা তৈরি করে উল্লেস ওড়ালেন, পতাকার গায়ে খোদাই করা অক্ষরের মতো যে লেখাগুলি জলজল করতে লাগল তা তিনি তৈরি করলেন বাঁট ও শালগ্রাম দিয়ে, নক্ষত্রগুলি তৈরি হল আলুর।

এ সময় জিনিব ছাড়াও নিভৃত পল্লীগ্রামের অভ্যন্তরে যে যে জিনিব লোকচক্ষুর অন্তরালে অজ্ঞাত অনাদৃত অবস্থায় রয়েছে জর্জ কার্ভার সেই সব জিনিবের দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আগ্রহী জাতীয় অনেক শাকসব্জি আছে লোকের কাছে বেগুলির কদর নেই অথচ মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে খুবই উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ জাতে রয়েছে। তিনি গ্রামবাসী দরিদ্র নিয়োদের ডেকে বললেন, “কৃষিজাত শাকসব্জির চাইতে অমূল্যলিপিত বস্ত্র আগ্রহাগুলি দ্বাদে ও গুণে কোন অংশে কম নয় এবং জীবনশক্তি বৃদ্ধিতে তা যথেষ্ট সাহায্য করে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বা লক্ষ্য করে থাকবে, বাগানে ফোটা গোলাপ ফুলের গন্ধের চেয়ে বুনো গোলাপ ফুলের গন্ধ ঢের বেশী মিষ্টি।”

জর্জ কার্ভার শুধু অন্তরে উপদেশ দিয়েই কর্তব্য শেষ করলেন না। নিজেও নিজের জীবনে তা পালন করে যেতে লাগলেন। এমনিভাবে অনেক বছর যাবৎ একটু একটু অভ্যাস করার ফলে কতগুলি বুনো আগ্রহী তাঁর খাদ্যবস্তুতে পরিণত হল। সেগুলির মধ্যে আছে একজাতীয় ত্রিগুণ বিশিষ্ট গাছের পত্রব, বস্ত্র লেটুস ও গোলমারচের শাক ইত্যাদি।

তিনি বললেন, “মোরগ ফুল দিয়ে আমি চমৎকার স্ত্রালাড বানিয়েছি।”

এমনিভাবেই জর্জ কার্ভার বহু আগ্রহী ও বুনো শাকসব্জি থেকে স্নানাহ খাদ্যসামগ্রী তৈরি করে জনসাধারণকে খাইয়ে খাইয়ে তাদের খাওয়ার অভ্যাসই বদলে দিলেন, এবং তার ফলে নিদারুণ খাদ্য সঙ্কটের সময়েও তাদের মোটেই কষ্ট ভোগ করতে হয়নি।

জার্মানী তার ডুবো জাহাজ নিয়ে আক্রমণ শুরু করতেই মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে খাদ্যভাণ্ডারের আশঙ্কা প্রবল হয়ে দেখা দিল। আটলান্টিক মহাসাগরে বহু যুদ্ধ জাহাজ ঘারেল হল, অনেক গমবাহী জাহাজ ডুবি হল। মার্কিন সরকার তখন বিকল্প খাদ্য ব্যবস্থা গ্রহণের

উদ্দেশ্যে বার্লিন, বাদাম এবং চাউল থেকে বিভিন্ন বকমের ময়দা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়ে তা জনসাধারণের মধ্যে বন্টন করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তা এতই অশাস্ত হল যে, জনসাধারণ তা গ্রহণ করতে একেবারেই রাজি হল না। সৈনিকশিবিরগুলিতেও খাদ্যভাব প্রকট হয়ে উঠল, তার মধ্যে রুটির অভাবই প্রধান। যেসব সৈনিকদের বয়স নিতান্ত অল্প তাদের ক্ষুধার আবেগ অত্যন্ত বেশী, বিশ্বাসী ক্ষুধা নিয়ে তারা যা পায় তাই-ই গোত্রাসে খেয়ে ফেলে। ডজন ডজন রুটি তারা মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে ফেলে। তাদের চাহিদার সঙ্গে পাঞ্জা দেবার উদ্দেশ্যে নতুন ধরণের রুটি তৈরি করার জন্য জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের ডাক পড়ল ওয়াশিংটন থেকে।

এর কিছুদিন আগে থেকে জর্জ কার্ভার মিষ্টি আলু দিয়ে নতুন এক ধরণের রুটি তৈরি করার চেষ্টায় মন দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর গভীর অসুস্থতাস্থা এবং ক্ষুধা অন্তর্ভুক্তি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন, মিষ্টি আলু থেকে ভালো জাতের ময়দা তৈরি করা সম্ভব। গমের ময়দার তুলনায় তা কোন অংশেই নিকট নয় এবং গমের ময়দার বদলে ব্যবহার করা চলে। সৈনিকদের জন্য খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করার যাদের ওপরে ভার, অধ্যাপক কার্ভার তাদের ডেকে এনে মিষ্টি আলু থেকে উৎপন্ন ময়দা দিয়ে রুটি তৈরি করার প্রাণালী বিশদরূপে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু জর্জ কার্ভারের ব্যাখ্যা সত্ত্বেও তারা যে এ জিনিষ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে এমন মনে হল না। জর্জ কার্ভার সেটা বুঝতে পেরে তাদের সংশয় দূর করার উদ্দেশ্যে নিজেই উহুনের কাছে এগিয়ে গেলেন। রুটি তৈরি করে উহুনের মধ্যে দিলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই উহুনের ওপরকার ঢাকনা খুলে ফেলে তৈরি রুটি বের করে তাদের সামনে তুলে ধরলেন। এবার আর তাদের সংশয়ের কোন অবকাশ রইল না। কনিষ্ঠের চেয়ারম্যান বিশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, “বাঃ, গন্ধটা তো চমৎকার।” তারপরে তারা

সবাই যখন সেই রুটির স্বাদ গ্রহণ করল, তাদের মনে আর কোন সন্দেহই রইলো না, সবাই একধাক্কো প্রশংসা না করে পারল না—“সত্যিই অপূর্ব লাগছে খেতে।”

কার্ভারের নির্দেশ অনুযায়ী একটানা কিছুদিন পর্যন্ত শুধু কেবল মিষ্টি আলুর ময়দা দিয়ে রুটি তৈরি করাই চলল। তারপর যখন জার্মানদের ডুবো জাহাজের আক্রমণ বন্ধ হল তখন আবার সাবেক গমের ময়দার রুটি তৈরি শুরু হল।

সারা যুদ্ধকালীন সময়ে জর্জ কার্ভার চিঠির জবাব দেবার কাজ নিয়েই বেশী ব্যস্ত ছিলেন। দেশ-বিদেশ থেকে এত বেশী সংখ্যায় চিঠি তাঁর কাছে আসতে আরম্ভ করল, আর তাদের মধ্যে এমন বিচিত্র ধরণের প্রশ্ন সব থাকত যে, তাঁর দিকে চেয়ে এক এক সময়ে মনে হত, তিনি যেন চিঠির পাহাড়ের নীচে চাপা পড়েছেন, তাঁর আর উঠবার বা চলাফেরা করারও বুঝি শক্তি নেই। তাঁকে দেখে অনেক সময় বিশ্বাসের আর অবাধ থাকত না। এত অসীম বৈধি তিনি কোথায় পান! সবাই তাঁর উপদেশ এবং পরামর্শ চায়, তিনি চিঠি লিখে সকলের সব জিজ্ঞাসার উত্তর দেন। কারকে ফেরান না, নিকটসাহ বা বঞ্চিত কারকে করেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে বিশেষ করে ধনীদেহ মঙ্গল থেকে তাঁর কাছে লোভের ইশারাও আসে। তিনখানা খামে বন্ধ করা চিঠি পেলেন জর্জ কার্ভার। তাঁর কাজের জন্য তাঁকে পারিশ্রমিক দিতে চাওয়া হয়েছে সেই চিঠিতে, তিনখানা চেক পাঠিয়ে। টাকার অঙ্ক নেহাৎ তুচ্ছ করার মতো নয়, কিন্তু জর্জ কার্ভারকে টলানো গেল না। চেক তিনখানা তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পত্রলেখকদের কাছে ফেরত পাঠালেন। চিঠির উত্তরে তাদের জানিয়ে দিলেন—“টাকোগি শিকারতনে এইসব কাজ করার জন্যই আমাকে রাখা হয়েছে এবং তার জন্য আমি মাসে মাসে বেতন নিয়ে থাকি। আপনাদের সেবা করা এবং সাহায্য করাও আমার এই কাজের অঙ্গ। তার জন্য আমি অতিরিক্ত পারিশ্রমিক নিতে পারি না।”

অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার তাঁর অক্লান্ত সাধনা দ্বারা জীবনে বহুগুলি জিনিষ আবিষ্কার করেছেন অপর কোন বৈজ্ঞানিক যদি তাঁর একটি মাত্র জিনিষ শুধু আবিষ্কার করতেন তা হলেও তার নাম বৈজ্ঞানিক হিসাবে আবিষ্কারপণী হত এবং তিনি প্রভুত ধন সম্পদের অধিকারী হতে পারতেন আঁত অনায়াসে। জর্জ কার্ভারও আবিষ্কারের জগতে তাঁর বিরাট ও বহুমুখী অবদানের জন্য তথা বিপুল সাক্ষ্যের জন্য জগৎ জোড়া খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে কোটিপতি ধনী হতে পারতেন। প্রচুর আনন্দ, আরাম ও সুখ ভোগ করতে পারতেন। আরো সম্মান, আরো খ্যাতি লাভ করতে পারতেন। সমাজে ও রাষ্ট্রে বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পারতেন। কিন্তু এর কোনটাই জর্জ কার্ভারের কাম্য ছিল না। জর্জ কার্ভার যশ-সম্মান প্রভাব-প্রতিপত্তি চান নি। তাঁর জীবনের যে একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল তা হল মানুষের কল্যাণসাধন। এই লক্ষ্য সামনে রেখে সমগ্র জীবন তিনি সাধনা করেছেন। বিজ্ঞানের সাধনা করেছেন নতুনের সন্ধান আর নিত্য নব নব আবিষ্কারের জন্য এবং তাঁর জীবনের সেই সব আবিষ্কারের সাক্ষ্যকে সার্বিকভাবে মানুষের কল্যাণে রূপায়িত করেছেন।

কোটিপতি ধনী ব্যবসায়ীরা দলে দলে জর্জ কার্ভারের দরজায় এসে ভিড় করতে শুরু করলো তাঁর কাছ থেকে উপযুক্ত পরামর্শ ও উপদেশ লাভ করার আশায় এবং পরামর্শ ও উপদেশের বিনিময়ে প্রচুর অর্থ তাঁকে দিতে চাইল। যত টাকা তিনি চান তারা তা দিতে প্রস্তুত। গোছা গোছা ডলারের বাঁগল হাতে নিয়ে তারা তাঁর পিছনে ঘুরতে লাগল। কিন্তু জর্জ কার্ভার কিরেও তাকান না।

ক্রোয়িডা থেকে একদল কলাই উৎপাদনকারী হুইজীবী একশো ডলারের একখানা চেক এবং সেই সঙ্গে পোকার খেয়ে নষ্ট করা একবাঁজ কলাইয়ের দানা জর্জ কার্ভারের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে লিখল, জর্জ কার্ভার যদি তাদের ফসল যোগসুন্দ করে দিতে পারেন তবে তারা তাঁকে মাসিক বেতনে নিযুক্ত করতে

রাজি আছেন। জর্জ কার্ভার ফসলের যোগ নির্ণয় করে তাদের জানিয়ে দিলেন এবং লেই সঙ্গে তারা যে চেক পাঠিয়েছিল তাও তাদের কাছে ফেরত পাঠালেন। চিঠিতে লিখলেন, “ভগবান তোমাদের জন্য ক্ষেতে ফসল উৎপন্ন করেন, কিন্তু তার বিনিময়ে তিনি তোমাদের কাছ থেকে কোনরূপ প্রতিদান বা পারিশ্রমিক দাবী করেন না। তেমনি আমাকেও ভগবান তার দিয়েছেন ফসলের যোগ সারাবার। ভগবানের দেওয়া কর্তব্য আমি পালন করেছি মাত্র, তার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করার কোন অধিকার আমার আছে বলে আমি মনে করি না।”

রঙ তাঁরির কারখানার মালিকরা যেই গুনল অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার নিভুল ভাবে কয়েকটি বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ রঞ্জকদ্রব্য আবিষ্কার করেছেন অমনি তারা তাঁর কাছে একটা গবেষণাগার স্থাপনের প্রস্তাব করে পাঠাল এবং তার সঙ্গে পাঠাল একখানা সাদা চেক—টাকার ঘর শূন্য। তারা অনুরোধ জানাল, টাকার অঙ্কটা যেন জর্জ কার্ভার তাঁর নিজের ইচ্ছামুযায়ী বাসিয়ে নেন। কার্ভার তাঁর নিজের আবিষ্কৃত ৫০৬টি বিভিন্ন ধরনের রঞ্জক পদার্থের নমুনা, সঙ্গে সাদা চেক—খানাও ফেরত পাঠালেন। রঞ্জক পদার্থগুলি আবিষ্কারের সূত্র তারা জানতে চেয়েছিল, তিনি তাও তাদের জানালেন।

জর্জ কার্ভার কলাইয়ের খোসা থেকে যে কৃত্রিম বেত মর্মর-প্রস্তুত আবিষ্কার করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন, একটা নামজাদা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার ব্যবসা করে মোটা মুনাফা লুটবার ফন্দি করল। ইতিমধ্যেই তারা তার ব্যবসা শুরু করে দিয়েছিল। আসল অভিসন্ধি গোপন রেখে তারা জর্জ কার্ভারকে সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানালো। বেশ মোটা মাইনের চাকরি, কিন্তু কার্ভার সে আহ্বানও প্রত্যাখ্যান করলেন। সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকগোষ্ঠী তখন নিজেরাই তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হল, অর্থাৎ তাদের গোটা কারখানাটাই

তার। সব যন্ত্রপাতি সমেত টাক্ষেপিতে উঠিয়ে নিয়ে এল। বলা বহুল্য, জর্জ কার্ডারের মূল্যবান্ পরামর্শ ও উপদেশ লাভ করা থেকে তারা বঞ্চিত হল না, যদিও তার জন্য এক পরশাও তাদের খরচ করতে হয়নি।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ডার টাক্ষেপির শিক্ষায়তনে অধ্যাপকরূপে প্রথম যে বেতনে চূর্কেছিলেন এখনো তিনি সেই একই বেতন পান, বছরে মাত্র ১৫০০ ডলার। তাঁর বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব কয়েকবারই তাঁর কাছে করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তাতে রাজি হননি। বলেছেন, “আমার প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশী টাকা আমি বেতন পাচ্ছি, আরো বেশী টাকা দিয়ে আমার কী হবে?”

বেতন পেয়ে চেক নিয়ে এসে তিনি ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিতেন, কদাচিৎ তিনি তা ব্যাঞ্চে ভাঙতে দিতেন। অনেকদিন ধরে একটার পর একটা চেক জমা হয়ে ড্রয়ারের মধ্যে জুপাকার হল এবং অবশেষে পুরু হয়ে তাতে ধুলো জমল—কার্ডারের কাছে যেন তা মূল্যহীন অকিঞ্চিৎকর। অর্থের প্রয়োজন সবার আছে কিন্তু অর্থ সম্বন্ধে কার্ডার সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিরাসক্ত। তিনি মনে করেন, অর্থকে খুব উঁচুতে স্থান দেওয়া হয়েছে। এবং তাঁর মতে এইটাই মানুষের সব দুঃখ হ্রদশা ও ক্ষয়ক্ষতির মুখ্য কারণ।

ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ডারের অগ্যাণনার খ্যাতি ও তাঁর বিজ্ঞান প্রতিভার রশ্মি এমনভাবে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল যে, বহু লোকের দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হল। বহু বিখ্যাত কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক বেশী বেতনে তাঁকে অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত করার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখানো হল—এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক বেশী বেতনে তাঁকে অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত করার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখানো হল—এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সরকারী এবং বেসরকারী ছয়কমই ছিল, কিন্তু জর্জ কার্ডার ভালো চাকরির সব সুযোগ প্রত্যাখ্যানে করে টাক্ষেপিতেই রয়ে গেলেন। একদিন প্রখ্যাতনামা

বৈজ্ঞানিক টমাস অ্যাালভা এডিসনের কাছে থেকে একটি বিশেষ বার্তা নিয়ে তাঁর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ মিলার হাচিসন বিখ্যাত নিগ্রো বিজ্ঞানবিদ ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তিনি জর্জ কার্ডারকে সেই বিশেষ বার্তাটি জানিয়ে দিয়ে বললেন, “মিঃ এডিসন তাঁর নিউক্লি সিঙ্কাভবনে আপনি যাতে যোগদান করেন সেই উদ্দেশ্যে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আশা করি তাঁর এ অনুরোধ আপনি রক্ষা করবেন।”

“আমি ভেবে দেখব মিঃ হাচিসন।”

“হ্যাঁ, অধ্যাপক কার্ডার, আপনি ভালো করে ভেবে দেখুন।” অতঃপর মিঃ হাচিসন জর্জ কার্ডারকে বেতন হিসেবে যে অর্থ দিতে চেয়েছেন টমাস অ্যাালভা এডিসন তার পরিমানটাও ব্যক্ত করেন।

মিঃ হাচিসন টাক্ষেপি থেকে চলে যাবার পরদিনই জর্জ কার্ডার চিঠি লিখে মিঃ এডিসনকে স্বীয় সিদ্ধান্ত জানালেন, লিখলেন, “আপনার আন্তরিকতাপূর্ণ এই প্রস্তাবের জন্য আমি আপনার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, তথাপি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ এখানকার লোকেরা আমাকে চায়। তাদের ত্যাগ করে যেতে আমি কিছুতেই পারব না।”

টমাস অ্যাালভা এডিসন মিঃ জর্জ কার্ডারের এই চিঠি পেয়ে তাঁর ওপরে একটুও রাগ করলেন না বা অসন্তুষ্ট হলেন না। কার্ডারের বৃকের মধ্যে লুকানো এত বড় একটা মহৎ প্রাণের সন্ধান পেয়ে তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হলেন। জাতির স্বার্থে নিজের ভবিষ্যৎকে অকাতরে বিসর্জন দেওয়া যে কত বড় ত্যাগ তা তিনি তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলেন।

কিন্তু জর্জ কার্ডারের বন্ধু-বান্ধব এবং পরিচিতদের মধ্যে অনেকেই তাঁর এ মহৎ ত্যাগের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে না পেয়ে তাঁকে বোকা ঠাওরাল, সমালোচনা করল। কেউ কেউ সম্ভ্রম প্রকাশ করে টাকার অঙ্কটা জানতে চেয়েছিল কার্ডারের কাছে, প্রশ্ন করেছিল, “মিঃ

এডলন আপনাকে কত টাকা বেতন দিতে চেয়েছিলেন?”

কার্তার প্রথমটায় এই ধরনের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু যখন আর পারতেন না, বার বার এই একই প্রশ্নের সম্মুখীন হতেন তখন বিরক্ত হয়ে বলতেন, “হয় অঙ্কের টাকা।” জবাবটা তিনি যেন তাদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারতেন।

বহুরে এক লক্ষ ডলার বেতনের একটি প্রস্তাবও তিনি ঠিক এই ভাবেই প্রত্যাখ্যান করলেন।

জর্জ কার্তার এই ভেবে সবচেয়ে অশাক হতেন, ভগবানের কাছ থেকে যে দান তিনি আশীর্বাদস্বরূপ পেয়েছেন তা তিনি অর্থের লোভে বিক্রী করবেন লোকে তাঁকে এতটা নীচ ও অর্থলোভী কী করে ভাবে? একবার একজন লোক চ্যালেঞ্জের সুরে তাঁকে বলেছিল, আপনি এখন এভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা পাবার সম্ভাবনাকে হেলায় তুচ্ছ করে প্রত্যাখ্যান করেছেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে হয়তো একদিন এর জন্য আপনার অনুশোচনার অবশিষ্ট থাকবে না। তখন ভাববেন, সেই লক্ষ লক্ষ টাকা থাকলে আপনি কত লোকের উপকার করতে পারতেন।

জর্জ কার্তার উত্তরে বলেছিলেন, যে অর্থ আমার নিজের নয় তা আমি নিই কী করে? আর তাছাড়া সেই অর্থ যদি আজ আমার থাকত, আমি হয়তো আমার প্রিয় ভাইবোনদের কথা, জনসাধারণের কথা একবারে ভুলেই যেতাম।”

২৪

জর্জ ওয়াশিংটন কার্তারের অধ্যাপিত দেশ থেকে বশান্তরে ছাড়িয়ে পড়ল, সারা পৃথিবীর মানুষ তাঁর যি জানে, তাঁর উদ্দেশে প্রকার মাথা নত করে। দেশ-বদেশের নানা স্থান থেকে প্রত্যহ হাজার হাজার চিঠি আসে, সব চিঠিতেই একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত ঠিকানা লেখা থাকে—‘কলাইয়ের মানুষ ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্তার।’ ফেরিগর ডাকঘরটি খুঁই ছোট কিন্তু তার তুলনায় চিঠির

সংখ্যা যথেষ্ট বেশী, আর অধিকাংশ চিঠিই আসে জর্জ কার্তারের নামে। টেবিলের উপরে জুপাকার করে রাখা চিঠিগুলির প্রত্যেকখানি চিঠি যত্নের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে পড়েন তিনি, খুঁটিনাটি কথাও বাদ যায় না এবং সব চিঠির সব প্রশ্নের তিনি উত্তর দেন বিশদভাবে। এ ছাড়া প্রত্যহ তাঁর কাছে অগণিত লোক আসে দেখা করতে, তাদের সবারই পৃথক পৃথক প্রশ্ন, আলাদা আলাদা সমস্যা। সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড় প্রায় সব সময়ই দেখা যায়। তাঁর কাছে লোকজনের আসার আর বিরাম নেই, কত রকমের লোক, আর তাদের কত বিচিত্র ধরনের প্রশ্ন। আশ্চর্য্য মানুষ কার্তার, অপারিসমীম তাঁর বৈধর্ম্য। কেউ কখনো তাঁকে রাগতে বা তাঁর বৈধর্ম্যচ্যুতি ঘটতে দেখেনি। যে কোন লোকই তাঁর কাছে আসে তাকেই তিনি আদর করে কাছে বসিয়ে মন দিয়ে তার সব কথা শোনেন, সব সমস্যার সমাধান বাতলে দেন। কারকেই তিনি কখনো কেয়ান না বা অবহেলা করেন না, অসম্মান দেখান না। চারপাশে ছড়ানো নানান গ্রাম থেকে অজ্ঞ চাষাভুষারা আসে, ফসল ও শস্তবীজ সম্পর্কে কত কথা তাদের জানবার থাকে। শহরগুলি থেকে আসে বড় বড় বাগানের ধনী মালিকরা, কিভাবে বাগানের উন্নতিসাধন করা যায় তার নিয়ম কাহন তারা জানতে চায়। কার্তারের কাছ থেকে সবাই সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পায়, খুশি মনে চলে যায়।

জর্জ কার্তারের কাছে এ ছাড়াও আসে ছোট ছোট শিশুর দল—জগৎ পারাবারের তাঁরে শিশুরা করে খেলা। দরিদ্র শ্রমজীবীদের কুটির থেকে ছোট ছোট বালক-বালিকারা এসে ভিড় করে কার্তারের কাছে, তারা নাচে, গান করে, আনন্দ কলরবে ভরিয়ে তোলে কার্তারের গৃহ অঙ্গন। তারা তাঁর সামান্য কোন কাজে লাগতে পারলেও তাদের আর আনন্দের সীমা পরিসীমা থাকে না। কার্তার শিশুদের সবার প্রিয়, সবার আপনার জন, সবার বন্ধু। তিনি তাদের সকলের সঙ্গী। শিশুরা আকার জানায় তাদের সঙ্গে কার্তারকে তাদের বাড়ী যেতে হবে। তিনি তাই যান। খুশি



মনে শিশুদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে এক-একদিন এক-একজন শিশুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হন, তার বাপমার সঙ্গে বসে অন্তরঙ্গভাবে অনেকক্ষণ ধরে আলাপ করেন। শিশুদের সঙ্গে মিশে কার্ভারও একজন আপনভোলা শিশু হয়ে যান, তাদের সঙ্গে তাঁর বয়সেই বতই ব্যবধান থাক, মনের ব্যবধান বিন্দুমাত্রও থাকে না।

সমগ্র টাক্সেগি শিক্ষায়তনের অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের সম্মান ও খ্যাতির আসন সবার চাইতে উঁচুতে। পূতচরিত্র, নিষ্কলঙ্ক, নির্লোভ মানুষ হিসাবে তিনি সকলের বিশেষ প্রকার পাত্র। কিন্তু জর্জ কার্ভার নিজের সম্বন্ধে বড়ই উদাসীন। এমস শহরে বাস করার সময়ে, সেই চার্লিশ বছর আগে, তাঁর বন্ধুরা তাঁকে যে পোশাক কিনে এনে সাজিয়ে দিয়েছিল, এখনো সেই জীর্ণ পুরানো পোশাকটা মাঝে মাঝে পরে দেখেন, কেমন লাগে। কলাইয়ের খোসা থেকে তিনি যে গলাবন্ধনী তাঁঁর করেছিলেন নিজের হাতে, সেটা তাঁর এখনো আছে।

অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের সময়ের ওপরে চাপ ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে লাগল, কিন্তু তাতে তাঁর উৎসাহের ঘাটিত দেখা গেল না। জনকয়েক উৎসাহী ছাত্র নিয়ে তিনি চিত্রাঙ্কনের ক্লাস খুলে বসলেন একটা। কাঁদা ও পাক থেকে আশ্চর্য এক রকমের রঙ উদ্ভাবন করে তিনি তাঁর ছাত্রদেরও তা প্রস্তত করার প্রণালী শিখিয়ে দিলেন। কলাইয়ের খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে কি রকম করে সেন একখানা ছবি আঁকার উপযোগী ক্যানভাস তৈরি করলেন। প্রতিভাধর শিল্পীরূপে জর্জ কার্ভারের হীতপূর্গেই যথেষ্ট খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়েছিল। লুয়েমবুর্গ আর্ট গ্যালারিতে তাঁর আঁকা চিত্র ‘চারটি পিচফল’ প্রেত শিল্পকর্ম রূপে স্বীকৃতি এবং মর্যাদা লাভ করেছিল।

টাক্সেগি শিক্ষায়তনে কার্ভারের যোগদানের পর কয়েক বছরের মধ্যে ছাত্ররা একটা চমৎকার অভ্যাস আয়ত্ত করেছে। প্রতি রবিবার জর্জ কার্ভারের ঘরে একটা আলোচনা বৈঠক বসে, সেই বৈঠকে তিনি হয় বিজ্ঞান কিংবা ধর্মশাস্ত্র বাইবেল নিয়ে আলোচনা করেন

এবং ছাত্ররা গভীর মনোযোগের সঙ্গে জর্জ কার্ভারের সুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে সম্মোহিতের মতো তা শোনে। তাদের এখন এমন অভ্যাস হয়েছে যে, একটিও রবিবার তাদের কেউ এ আলোচনা বৈঠক বাদ দিতে পারে না। রবিবার এলেই তাদের অন্তরের অন্ততল থেকে সাড়া লাগে। শেষে ছাত্রদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা হল যে, কার্ভারের ঘরের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সকলের আর স্থান সঙ্কুলান হয় না। আলোচনা বৈঠক আগে দু-এক রবিবার বাদ দেওয়া গেলো এবং তার জন্য ধরাধরা কোন নিয়ম কাছন না থাকলেও, পরে তা দস্তুরমতো নিয়মিত একটা ক্লাসে পরিণত হল এবং এই ক্লাসে যোগদানে আগ্রহী ছাত্রের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করল। অবশেষে আলোচনা বৈঠক কার্ভারী প্রোগ্রামের বড় হলঘরটাতে স্থানান্তরিত করা হল। কার্ভারের বক্তৃতা শোনার জন্য লোকের ভিড় ক্রমশ বেড়ে বেড়ে এমন হল যে সেটা আর শেষ অবধি শুধু কেবল ছাত্রদেরই আলোচনা বৈঠক রইল না, বয়স্ক ব্যক্তিরাও সমান আগ্রহ নিয়ে তাতে এসে যোগ দিতেন। এরকম একটা সপ্তাহ খুব কমই দেখা যেত, যে-সপ্তাহে শ্রোতাদের সংখ্যা কিছু কম হত, বা তিনশোটি আসনের মধ্যে একটি আসনও খালি পড়ে থাকত না।

জর্জ কার্ভার যদি নিয়ে বসে থাকতেন, অপেক্ষা করতেন আলোচনা বৈঠকে যোগদানের শ্রোতাদের আগমন প্রত্যাশায়, তারপর যেই ঠিক ৬টা বাজত অর্মান তিনি আলোচনা শুরু করে দিতেন। সবাই যাতে সহজেই বুঝতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর কথাগুলি বলে যেতেন। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুগুলি সরস বর্ণনার মাধ্যমে এমন হৃদয় তাতে বুঝিয়ে বলতেন যে, ছাত্রদের তা বোঝার পক্ষে কিছুমাত্র অসুবিধা হত না। কোন সংশয় অথবা দ্বিধা তাদের মনে থাকত না। তারা অধ্যাপক কার্ভারের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ ও বিম্মিত হত। জর্জ কার্ভার তাঁর বক্তব্য বিষয় বোঝাতে গিয়ে অনেক সময় কৌতুক ও হাস্যরসের সৃষ্টি করতেন, অনেক সময় আবার ছাত্রদের তিনি চমক লাগাতেন এক-একটা কথা বলে।

# পিতা ও পুত্র

অধীশ্বনাথ ঠাকুর

১

রমাকান্তের অনেক গুণ ছিল, দোষের মধ্যে সে অভ্যস্ত বদমাগী,—যখন রাগিত দ্বিগ্নদিক্ জ্ঞান থাকিত না। কিন্তু এই রাগটা ঘরের মধ্যে যতটা প্রবলরূপে প্রকাশ পাইত, ঘরের বাহিরে ততটা নয়। এই কারণে রমাকান্তের বহুবাক্যের সংখ্যার অভাব ছিল না, সমাজেও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল, কেবল ঘরের মধ্যে তেমন প্রতিষ্ঠা ছিল না।

রমাকান্তের পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি ছিল, তত্পরি নানান্ বকমের কারখানারও যথেষ্ট আয় ছিল, সংসার অর্থে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। সংসারে থাকিবার মধ্যে রমাকান্ত নিজে, বুড়ি মা, আট বৎসরের একটি ছেলে ও বিধবা এক ভগ্নী। রমাকান্তের ভ্রী ছেলেটিকে পাঁচ বৎসরের রাখিয়া ভবলীলা সম্বরণ করেন।

রমাকান্ত ছেলেটিকে অতিশয় ভালবাসিত, কিন্তু বাহিরে ব্যবহারে সে ভালবাসা প্রকাশ পাইত না, বরং অনেক সময়ে তাহা রুচতারই আকার ধারণ করিত। ছেলেকে মাতুল করিয়া তুলিতে চিন্তের যে সরসতা, যে গাহকুতা আবশ্যক রমাকান্তের তাহা আদবেই ছিল না, অথচ অন্তের বহু চেষ্টাও তাহার কখন মনঃপুত হইত না ; —এই কারণে ছেলেকে লইয়া রমাকান্তের প্রায়ই মার গড়ে খিটনিটি বাধিত, যত কাল বেচারি মার উপরেই আসিয়া পড়িত। ছেলের অস্থখ করিল, সে দোষ দায়ের। মা বলিডেন, ‘বাহা, আমি কি আর সাধ

করে অস্থখ ডেকে এনেছি, অস্থখ করেছে আবার সেবে যাবে’। মাষ্টারের কাছে ছেলে পড়া পারিল না—সে দোষ দায়ের, মা তাকে আদর দিয়া খায়াপ করিতেছেন। যোদিন নিতান্ত থাকিতে পারিডেন না, মা রাগ করিয়া বলিডেন, ‘রমা, আমাকে আর জালাসনে, —তোমার ভয়ে আজ পর্য্যন্তও ওকে একটা ভাল দিনির হাতে করে তুলে দিতে পারলুম না তবুও বলিস্ কিনা আমি আদর দিই খায়াপ করছি।—আজ যদি ওর মা থাকত’—বলিতে বলিতে চোখ দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িত। এইরূপ সামান্য কারণে, সামান্য এদিক্ ওদিকে রমাকান্ত প্রায়ই বাড়ি মাথায় করিয়া তুলিত। রমাকান্ত যে সব সময়ে ইচ্ছা করিয়া এরূপ করিত তাহা নহে। সে সবই বুঝিত কিন্তু নিজেই সামলাইয়া উঠিতে পারিত না। ইহাকে স্নায়ুর দোষই বল, আর স্বভাবের দোষই বল,—রমাকান্তের ইহা মজাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মার হইতে ছেলের পড়াভনা কিছুই হইতেছিলনা। রমাকান্ত যে ইহা বুঝিডেন না তাহা নহে। কিন্তু প্রতিকারের অল্প কোন ভাল উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া কেবল মাষ্টারের উপর মাষ্টারই বদলাইতে লাগিলেন—অবশেষে কিছুতে না পারিয়া একশত টাকা বেতনে গবর্ণমেন্টের এক পেলন্ প্রাপ্ত হেডমাষ্টারকে ছেলের গার্ডিয়ান্ টিউটার স্বরূপ ঠিক করিয়া বাড়িতে রাখিয়া দিলেন।

লোকটি আঁতশয় প্রবীণ, আঁতরিত্ত বিবেচক ও বুদ্ধিমান এবং কঠোর নীতিপরায়ণ। নিস্তার ওজনে তিনি সব কাজ করিতেন—একটু এদিক্ ওদিক্ হইবার বো ছিল না। হুলে থাকিতে ছেলেরা “বাবা হেডমাষ্টার” তাঁহার নাম দিয়াছিল—ইহা হইতে তাঁহার শাসন-প্রণালী সৰ্ব্বদে সকলেই অবধারণ করিতে পারিবেন—অধিক লেখা মিশ্রয়োজন।

মাষ্টার মহাশয় প্রায়ই ছেলের নামে বাপের কাছে আসিয়া নালিশ করিলে, রমাকান্তও ছেলেকে ধমক ধাক্কা দিতেন। এইরূপে দিন যায়, একদিন মাষ্টার মহাশয় অরিশস্ত্রী বৃষ্টি ধারণ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রমাকান্তের কাছে আসিয়া বলিলেন, “আমি চলিলাম। আমি আর পড়াইতে পারিব না।” “কেন, কি হইয়াছে?” “নাঃ, আমি আর পড়াইব না। অল্প লোক দেখুন।” “কি হইয়াছে বলুন না।” —অনেক কষ্টে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে প্রকাশ পাইল যে, তিনি যিপ্রহরে আহ্বানের পর যখন একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন সেই অবসরে পুত্র তাঁহার চশমার খাপ হইতে চশমা বাহির করিয়া চোখে পরিতে গিয়া হইখানা কাঁচই ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ফেলিয়াছে।

রমাকান্ত আর একটিও কথা না বলিয়া পুত্রের নিকট গমন করিলেন। তাহার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া একটি ছোট অঙ্ককার ঘরের মধ্যে তাহাকে আনিয়া ফেলিলেন। সেখানে তাহার মাথার উপরে একটা প্রকাণ্ড ভারী বই চাপাইয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিলেন এবং নিজে ঘরের পার্শ্বে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ছেলে চীৎকার করিতে লাগিল, “ও বাবা আমি আর করব না, কণ্ঠখনো করব না বলচি, তোমার হুঁট পায়ে পড়ি, খুলে দাও, গেলুম।” —চীৎকারে বাড়ী কাটিতে লাগিল। পাঁচ মিনিট অনবরত চীৎকারের পর বালকের কণ্ঠস্থ ক্রমশঃ ক্রীণ হইয়া আসিতে লাগিল—অবশেষে এমন হইল যে, রমাকান্তও সে স্বর আর শুনিতে পাইলেন না। রমাকান্ত একবার ভাবিলেন, “খুলিয়া দিই,” আবার মনে হইল,

“না, বখেই শান্তি হয় নাই; এখনই আবার ফুলিয়া যাইবে,”—এমন সময় রমাকান্তের মা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া রমাকান্তকে ঠেলিয়া শিকল টানিয়া খুলিয়া অবসর মুছিতপ্রায় বালককে বুকে আগলাইয়া ধরিয়া “এমনও করতে হয়, ছেলেটাকে এমনও করতে হয়,” বলিতে বলিতে অন্তঃপুরে তাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। রমাকান্ত মাতালের ভায় টলিতে টলিতে নিজ কক্ষে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন—চোখ দিয়া বর্ষবর্ষ করিয়া জল পড়িতে লাগিল—বালকের ভায় ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

২

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রমাকান্ত কাল ছেলেকে হুলে ভর্তি করিবেন ঠিক করিয়াছেন—নতুন খাতাপত্র বই সব কিনিয়া দিয়াছেন। ছেলের আনন্দ উৎসাহ আর ধরে না। সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া রাতে রমাকান্ত শয়ন করিয়াছেন, তথাৎ তাঁহার একটু জ্বরের মত দেখা দিল—ক্রমশঃ সেই জ্বর বাড়িতে লাগিল। প্রাতে ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া ঔষধপত্র কিছুই দিলেন না, বলিলেন, তিন দিন না দেখিয়া তিনি কোনও ব্যবস্থা করিবেন না। তখন সহরে বসন্তের আঁতশয় প্রকোপ। হাজার হাজার লোক মরিতেছে। রমাকান্তের জন্ম সকলের ভয় হইল।

তৃতীয় দিনে রমাকান্তের সর্দাজ আচ্ছন্ন করিয়া বসন্ত গুটিকা দেখা দিল। অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার পর্য্যন্ত আর সে ঘরে ঢুকিতেন না, দূর হইতে রোগীকে দেখিয়া চলিয়া যাইতেন। ডাক্তার সকলকে রমাকান্তের ঘরের দিক্ একেবারে বাড়াইতে নিষেধ করিলেন, বিশেষতঃ সেই ছোট ছেলেটিকে যেন অন্তঃপুর হইতে কোনও মতে বাহিরে আসিতে না দেওয়া হয় এই কথা বারবার বলিয়া দিলেন।

রমাকান্তের মাতা কাহারও নিষেধ বার্তা না শুনিয়া দিবারাত্র প্রাণপণে পুত্রের সেবা করিতে লাগিলেন। ছেলেটি অন্তঃপুরে তাহার পিসিমার নিকটেই থাকিত।

সাতদিনের পর রমাকান্তের অবস্থা একটু ভাল বোধ হইতে লাগিল, ডাক্তার আশা দিল।

তখনও অল্প ভাল করিয়া সারে নাই। রমাকান্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়াছিল, পার্শ্বে মাতা বলিয়া ব্যজন করিতেছিলেন। শিশু যেমন মায়ের কোলে সর্কাজ এলাইয়া দিয়া আচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া থাকে, রমাকান্ত মায়ের কোলে একখানি হাত এলাইয়া দিয়া সেইরূপ ভাবে পড়িয়া ছিল। স্বপ্নও নহে, জাগরণও নহে,—রমাকান্তের মনে হইতেছিল কে যেন তাহাকে জীবনের এপার হইতে ওপারে সজোরে ধোল খাওয়াইতেছে,—তাহার সর্কাজ আড়ট হইয়া আসিতোছিল—হঠাৎ চমক ভাঙিয়া চোখ খুলিয়া রমাকান্ত দরজার কাছে কি একটা ছায়ার মত দেখিলেন। ক্রীণ দৃষ্টি প্রাপ্তপণে প্রসারিত করিয়া রমাকান্ত দেখিলেন, তাঁহারই পুত্র করুণ নয়নে একদৃষ্টে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। রমাকান্তের বুঝিতে বাকী রহিল না, নিবেশ সত্ত্বেও বালক লুকাইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে। প্রায় দুই মিনিট কাল এইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বালক আস্তে আস্তে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার দুই চোখ যে বেদনা জানাইয়া গেল রমাকান্ত তাহা আর ভুলিতে পারিলেন না—শয্যা পড়িয়া হট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “রমা, অমন কন্ট্রিস্ কেন বাবা?” রমাকান্ত কহিল, “না মা, কিছু না।

৩

অল্প হইতে উঠিয়া রমাকান্ত সংশোধিত বিতীয় সংস্করণের ভায় সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আকারে দেখা দিল। রমাকান্ত আর সে রমাকান্ত নাই,—সে রাগ নাই, ক্রুদ্ধ মেজাজ নাই। রমাকান্ত এক্ষণে নিভান্ত শান্ত নিরীহ ভালবাহুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুত্রকে রমাকান্ত জননীবাৎ মেহ করিতে লাগিলেন;—হুই হাত ভরিয়া তাহাকে

জিনিসপত্র কিনিয়া দিতে লাগিলেন,—পড়াশনার জন্তও তাহাকে আর পূর্ববৎ শাসন করিতেন না,—সকল বিষয়ে তাহাকে মিট কথার তুটী করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। হঠাৎ পিতার এই ভাবান্তর, মেহ প্রাবল্যের কারণ ঠিক করিতে না পারিয়া পুত্র যেন কিকিং অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

রমাকান্ত কোনমতেই শরীর শুধরাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। ডাক্তাররা তাঁহাকে একবৎসরকাল কোন শৈলনিবাসে গিয়া থাকিবার পরামর্শ দিলেন।

তাঁহার অন্তর্পাহাতিতে ছেলের পড়াশনার কি হইবে রমাকান্ত তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে ভাবিয়া স্থির করিলেন, বেনারস হিন্দুকলেজের বোর্ডিং এ ছেলেকে রাখিয়া তিনি বায়ু পরিবর্তনে গমন করিবেন।

কর্তৃপক্ষকে লিখিয়া রমাকান্ত শীঘ্রই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া কেলিলেন। ছেলের পকেট খরচার জন্ত মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া বোর্ডিং এ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

ভাল দিন দেখিয়া রমাকান্ত পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বাজা করিলেন। কলেজে পৌঁছিয়া রমাকান্ত পুত্রকে কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন এবং যাহাতে তাহার কোনরূপ কষ্ট না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্ত বারম্বার অহরোধ করিয়া সেই দিনই আবার সিমলা অভিমুখে রওনা হইলেন।

দেখিতে দেখিতে একপক্ষ কাটিয়া গেল। রমাকান্ত সেদিন বাংলার সম্মুখে একখানা ইঞ্জিনের টানিয়া অলসভাবে বসিয়াছিলেন। সম্মুখে বড় বড় কেলুগাঁহ মাথা উচু করিয়া সাঁর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে,—তাহাদের মাথার উপর একরাশ মেঘ কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে, দূরে বরাস্ গাছে আগুন লাগাইয়া শুবকে শুবকে লাল লাল ফুল ফুটিয়া আছে। আকাশ ঘোর নীলবর্ণ,—তাহার গায়ে ঠেস্ দিয়া সাদা মেঘে ঢাকা পাহাড়ের শ্রেণী স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে—দূরে হইতেছে যেন কে বস্তা বস্তা তুলা আনিয়া তাহাদের

সর্বদা বিহাইয়া দিরাছে। রমাকান্ত বসিয়া বসিয়া ঘেঁষিতে ছিলেন ও মাঝে মাঝে ছেলের ও বাড়ির কথা ভাবিতে ছিলেন, এমন সময়ে চাকর আসিয়া ভাঁহার হাতে একখানি টেলিগ্রাম দিল। টেলিগ্রামখানা ইংরাজিতে লেখা ঐরূপ :—

“আপনার পুত্র প্রেমে আক্রান্ত, বাঁচবার আর আশা নাই।” রমাকান্তের হাত হইতে টেলিগ্রামের কাগজ পড়িয়া গেল, ভাঁহার সর্বদা কাঁপিতে লাগিল। বেশ পরিবর্তন না করিয়া সঙ্গে কিছু না লইয়া রমাকান্ত একছুটে তখনই রওনা হইলেন।

বেনারস ষ্টেশনে পৌঁছিয়া রমাকান্ত একটা ঠিকাগাড়ি ভাড়া করিলেন,—গাড়োয়ানের হাতে চারিটি টাকা ভাঁজিয়া দিয়া বলিলেন, “হাঁকাও হাঁকাও, পাঁচ মিনিটে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে আরও বক্শিস্ মিলিবে।”

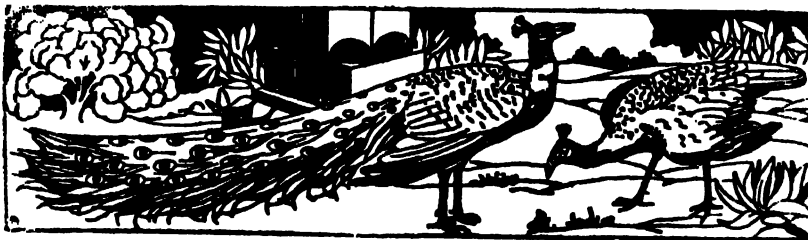
কলেজের ঘরে আসিয়া রমাকান্ত যখন পৌঁছিলেন

তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে—কাল রাত্রেই পুত্রের সংকার হইয়া গিয়াছে।

রমাকান্ত কানীতেই রহিয়া গেলেন, মাতা ও ভগ্নীকে নিকটে আনিলেন ;—বিবরসম্পত্তির প্রায় সমস্তই দানধ্যান দেবসেবার ব্যয় করিলেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে দেখা যাইত রমাকান্ত খালি পায়ে মলিনবেশে বিবেকবরের মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ঘোড়করে গলগলী-কৃতবাসে বলিতেছেন, “দয়া কর ঠাকুর, দয়া কর, তোমার সেই রূপ একবার দেখাও, যাহাতে আমি তোমার মধোই তাহাকে একবার দেখিতে পাই,—বড় অনাঙ্গরে সে চলিয়া গিয়াছে—তাহাকে একবার দেখাও ঠাকুর তাহাকে একবার দেখাও।” চোখ দিয়া অনবরত জল পড়িতে থাকিত।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬।



# আমার ইউরোপ ভ্রমণ

( ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী )

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

আমি জানি, আমি বিপজ্জনক মাটিতে পা দিয়াছি, কারণ অর্থশাস্ত্রের জটিলতায় প্রবেশ করি এমন সাধ; আমার নাই। কিন্তু একদেশদর্শী রূপে বিচার করিতে না পারা আমার দুর্ভাগ্য, স্বীকার করিতেছি। অল্প দিকটাও বিচার করা আমি অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করিতেছি। অতএব সেদিকটিতে আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা সবিনয়ে নিবেদন করি। আমার কাছে কোনও রেফারেন্স বই নাই, কিন্তু আমি স্মৃতি হইতে খালিতেছি, আমাদের দেশ হইতে সোনা এবং রূপা বাহিরে চলিয়া যাওয়া দূরে থাক, এবং প্রতিবৎসর আমরা প্রায় দশ কোটি টাকা মূল্যের সোনা ও রূপা এদেশে পাইয়া থাকি—এবং তাহা পুনরায় রপ্তানি করা হয় না। এই সোনা ও রূপা এদেশে মজুত করা হইয়া থাকে। আমি ভারতের যে অংশের বাসিন্দা, সেখানে ত্রিশ বৎসর পূর্বে সোনা দুর্লভ ছিল, এবং খ্রীলোকেরা শাখের, গালাব, পিতলের অথবা খুব বেশি হইলেও, রূপার অলঙ্কার পরিয়া খুলি থাকিত। কিন্তু এখন নিম্নস্তরের খ্রীলোকেরাও সোনার অলঙ্কার ব্যবহার করিতেছে। আমরা বৎসরে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ স্টার্লিং পাউণ্ড মূল্যের সোনা ও রূপা ক্রয় করিতেছি। অবশিষ্ট ৭ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে আমরা ৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের দ্রব্য বিদেশ হইতে কিনি। অবশিষ্ট থাকে ৪ কোটি ১ লক্ষ পাউণ্ড। ইহা হইতে ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের স্থতিবস্ত্র আমদানি করি, এবং সাধারণ কর

হইতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড মাস্তুল দিই। গত ছয় বৎসরের গড় মাস্তুলের পরিমাণ ৭২ কোটি টাকা, বাকিটা ধার করিয়া মিটাই। এই দুটি বিষয়ে আমাদের দেশের ক্ষতি। আমরা বিদেশে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ডের তুলা ও সূতা পাঠাই, এবং ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের কাপড় কিনি। তফাৎ ৭০ লক্ষের। ইহা হইতে উৎপাদন ব্যয়ের মূলধনের উপর সুদ কাটিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ আমরা ইংল্যান্ডকে আমাদের জন্য কাপড় তৈয়ারির মজুরি স্বরূপ বৎসরে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়া থাকি। আমরা নিজেরা যদি এখানে বস্ত্র উৎপাদন করিতে পারিতাম তাহা হইলে এই ৫০ লক্ষ পাউণ্ড আমাদের দেশেই থাকিয়া যাইত। “হোম চার্জ” রূপে ইংরেজরা আমাদের নিকট হইতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড আদায় করে ইহা ভিন্ন আরও অনেক বিষয়ে তাহাদিগকে খরচ জোগাইতে হয়, যথা, সিভিল মিলিটারি খরচ, ছুটির জন্য আলাউয়েল, পেনশন, ইংরেজ আর্কাশিয়ালগণ এদেশে যাহা জমায় তাহা, রেলপথ ও অন্যান্য জন-কল্যাণ মূলক কাজের জন্য যে টাকা উহার ধার দেয় তাহার সুদ দিতে হয়। এই সুদ অ্যামেরিকা ব্যতীত প্রায় সকল দেশই ইংরেজকে দিতে বাধ্য হয়। ইংরেজরা যদি রেল সংগ্রহ বিস্তারের জন্য শতকরা ৪ সুদে আরও টাকা ধার দিতে তাহা হইলে ভাল হইত মনে করি। সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, আমাদের স্বায়ত্ত শাসনের দেশ হইলে যে টাকাটা ইংরেজকে না দিয়া আমরা দেশেই রাখিতে

পারিতোষ, তাহার পরিমাণ বৎসরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড (২২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা) হইতে কিছু বেশি। ইহার উষ্টা দিকও আছে, যথা (১) ইংল্যাণ্ড চীনকে আফিং খাইতে বাধ্য করিয়া প্রায় ৮০ লক্ষ পাউণ্ড আয় করিয়াছে, যাহা আমাদের দ্বারা সম্ভব হইত না। (২) শান্তি স্থাপন, রেল বিস্তার ও ইংল্যাণ্ড এদেশের লোকদিগকে যে ব্যবসায়ের প্রেরণা দিয়াছে তাহাতে অনেক বেশি জমি চাষ হওয়াতে কাঁচা মালের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। (৩) ব্রিটিশ শক্তি আমাদের রক্ষকরূপে থাকিতে বিদেশীদের দ্বারা এদেশ আক্রমণের ভয় দূর হইয়াছে। এই সব বিবেচনা করিলে আমার মনে হয়, ইংল্যাণ্ডে এবং ভারতে অনেকে যেমন ভাবেন তেমন আর্থিক ক্ষতি আমাদের হয় নাই। আমি আমার এমত প্রকাশ করিতোঁহা কিছু সঙ্কোচের সঙ্গে, কারণ এবিষয়টি লইয়া আমি চর্চা করি নাই, তাই এ বিষয়ে আমার জ্ঞান অসম্পূর্ণ। তবু আমি মত প্রকাশ করিতোঁহি একজন যে ইংল্যাণ্ডের কোনও কৃতিত্ব আর কেহ স্বীকার করেন নাই।

আগের দিনে দেশের টাকা রুহং শহরে গিয়া জমা হইত, যেমন দিল্লী এবং লখনৌতে, এবং সবই সেই সব স্থানের রাজদরবারে আঁত জাঁকজমকের সঙ্গে খরচ করা হইত, লোকে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখিয়া অবাক হইত। সে এক আজব দৃষ্ট। মধ্য সিংহাসনে মোগল সম্রাটের সম্মুখে প্রধান মন্ত্রী সাতাঁজ প্রণত, চারিদিকে স্তম্ভ করে পাঁচদিক দণ্ডায়মান, জল্লাদ তাহার কুঠার লইয়া বাম পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছে। এই সব ঐশ্বর্য বিলাসের কথা বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু ইতিহাসে তাহাদের কথা নাই কেন যে, সব কোটি কোটি লোক জমি চাষ করিয়াছে ফসলের বীজ বুনিয়াছে, শস্য ঘরে ভুলিয়াছে, কিন্তু চিরকাল অনাহারে শীর্ণ হইয়াছে? ইংরেজরা এদেশে আসিবার পূর্বে এইসব কোটি কোটি নরনারী বেশি বস্ত্র পরিহিত কি না, গৃহপালিত পশু তাহাদের বেশি ছিল কি না, গায়ে বেশি সোনা পরিহিত কি না। আমরা শুধু অহুমান করিতে পারি যে, কৃষকের খামার বাড়িতে বেশি শস্য

থাকিত, কিন্তু তথাপি মুসলমান ঐতিহাসিকেরা, গত শতাব্দী হুভিক্কে মাহুঘের যে দুর্দশা হইয়াছিল এবং যে অবস্থায় তখন মৃত মাহুঘের মাংস খাইতে বাধ্য হইয়াছিল, তেমন বীভৎস হুভিক্কের কথা বার বার বলিয়াছেন কেন? গত শতাব্দীর প্রারম্ভীয় কৃষক জীবনের হল-ওয়েল, ভেরলেস্ট ও কড়ু'পক্কের বর্ণিত চিত্র যাহার উপর নির্ভর করিয়া বাকি বাংলার সুখী মাহুঘদের সম্পর্কে তাহার বিখ্যাত প্রশংসাপূর্ণ কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি দেখিয়াছি। এ সব পেটোরদের হাত ভাবাবেগে চালিত হইয়াছিল, এবং সেজন্য তাহাদের চিত্র অতিরিক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিলেও তাহারা মোটামুটি একটা সচ্ছলতা দেখিয়া থাকিবেন, যাহা তাহাদের দেশের সমগ্র দরিদ্রদের যে দুর্দশা দেখিয়াছেন, তাহার তুলনায় অনেক ভাল মনে হইয়াছে। তবু আমি বাংলাতে বাধ্য যে তাহাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে জ্ঞান অগভীর। অন্ততঃ সে জ্ঞান সমুদ্র উপকূলের ভূভাগেই সীমাবদ্ধ। এই সব অঞ্চলের ভূমির উন্নয়ন বেশি, চাষ কারবার লোকও বেশি। উচ্চ ভূভাগে কৃষিদের বস্ত্রশোষণকারীরা এখানে ততটা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু তথাপি একটি মাত্র ফসলের অজমায় ১৭১০ সনে যে হৃদয়-বিদারক হুভিক্ক ঘটয়া গেল তাহার একটি মাত্র মারাত্মক আঘাতে বাংলাদেশের সমস্ত জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশ ধ্বংস হইয়া গেল। এখনও প্রমাণিত হয় নাই যে, এখন অপেক্ষা আগের দিনে লোকে সুখে ছিল, এবং এখন তাহাদের শস্য-ক্রয় ক্ষমতা যত বাড়িয়াছে, তাহার চেয়ে শস্য পূরে বেশি ছিল। হুভাগ্যের বিষয় আগের দিন সম্পর্কে আমাদের নির্ভরযোগ্য কোনও লিখিত বিবরণ বা দলিল নাই। ইহাও হুভাগ্যের বিষয়, উপরের শ্রেণীর কয়েকজন ব্যক্তিই যে জাতি নহে এ শিক্ষা এখনও আমাদের হয় নাই। এবং আমরা ভাবিতে শিখি নাই যে, উচ্চ বা নিচ সকল স্তরের প্রত্যেকটি ব্যক্তি জাতির এক-একটি একক উপকরণ। জাতীয় সম্পদ এখন পূর্বাপেক্ষা বেশি সকলের ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্যই ইহা আমরা এখন দেখিতে পাই না। তবু অধিকাংশ

ইউরোপীয় জাতির তুলনায় আমরা এখনও অনেক বেশি দরিদ্র। এবং ইহার কারণ, যেমন বলা হইয়া থাকে ইংরেজ সরকার আমাদের সোনা রূপা দেশে লইয়া যাইতেছে বলিয়া, তাহা নহে। ইহার কারণ খুঁজিতে হইবে অধঃপতিত এবং হ্রাসপ্রাপ্ত জাতীয় চারিত্রের মধ্যে। যদি জনপ্রতি বাণিজ্যমূল্য ধার্য দ্বারা কোনও জাতির বস্তুসম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে অল্প জাতির তুলনায় তাহা বিস্ময়কর রূপে কম। ভারতীয় গড় বাণিজ্যমূল্য জনপ্রতি মাত্র ১২ শিলিং, ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের ৩০০ শিলিং, ফ্রান্সের ১৬৮ শিলিং, জার্মানির ১৪৫ শিলিং এবং ইউনাইটেড স্টেটসের ১০৫ শিলিং। বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের হিগাবটা আর্ম তুলিয়া গিয়াছি।

পরিমাণ বৃদ্ধির উপায় এখন আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত উৎপাদনের উৎকর্ষ এবং মূল্য। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে আমাদের দেশে যেটুকু উৎপন্ন হয়, তাহা অর্থদ্বিজাত অকৌশলী শ্রমের দ্বারা সাধিত হয়, এবং ইহার সাহায্যে জাতির উপার্জন বিচার করা হয়। আগে যাহা নিপুণ হাতের শ্রম ছিল, এখন তাহা অনিপুণ হাতের শ্রমে পরিণত হইয়াছে। সভ্য দেশসমূহে বিজ্ঞান, শিক্ষণ, এবং নিপুণ হাতের শ্রমকে পালন করিবার জন্য আইনের দ্বারা যে-সব পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, ভারতে এখনও তাহা প্রবেশ করে নাই। আমাদের দেশে গ্রামের কামার বা ছুতোর মিস্ত্রী এবং ক্ষেতের মজুরের মধ্যে বৈষয়িক অবস্থার কোনও পার্থক্য নাই। উভয় ক্ষেত্রেই এ কাজের জন্য যেটুকু শিক্ষা দরকার তাহা অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা মাত্র, এ কাজের জন্য বিশেষ বুদ্ধিরও দরকার নাই, অর্থব্যয়েরও দরকার নাই, এবং ইহা দ্বারা যাহা উপার্জন হয়, তাহা দৈহিক শ্রমের মূল্য মাত্র। আমরা যাহা চাই, তাহা হইতেছে—মজুরির যথার্থ মূল্য এবং বুদ্ধিকৌশল ও ব্যায়সাধ্য শিক্ষা দিবার আয়োজন এবং বিশেষ প্রয়োজন বোধ হইলে কাজ আরম্ভ করিবার জন্য কিছু মূলধন। দেহ ও মন ও তৎসহ কিছু মূলধন ব্যবহার করিয়া কিতাবে

অধিক উপার্জন করা যায় সেই শিক্ষা লাভ করা বর্তমানে আমাদের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আগে যে সব কৃত্রিম বাধা বুদ্ধি ও শিক্ষার দ্বারা লাভজনক কাজ করার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন তাহা কার্যতঃ দূর হইয়াছে। আগে প্রতিগত জাতিতে দ মাল্য করা হইত, এখন তাহা দ্বারা গৌরব বিচার করিবার প্রথা দূর হইবার মুখে। এখন বুদ্ধি যাহাই হউক, শিক্ষা ও ঐশ্বর্য দ্বারাই গৌরব অগৌরব বিচার হইতেছে। আমরা পরিবর্তন-বিরোধী জাতি হইলেও ক্ষমতা লাভ ও আরাম ভোগের ইচ্ছা সব সময়েই আমাদের মনে ছিল, যেমন পৃথিবীর অসংখ্য জাতির মনে আছে। এই ইচ্ছাই সামাজিক বিধিকে উল্টাইয়া দেয় যখনই সে মাহুষের প্ররাস্ত ও উচ্চকাজ্যের পথে বাধা স্থাপন করে। ঐশ্বর্য ও ক্ষমতাকে ঘৃণা করা শিক্ষা দেওয়া ধর্ম, পৃথিবীকে যেভাবে ভাঙ বানাইয়াছে এমন আর কিছুতে নহে। উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত মন আমার এষ্ট মন্তব্যে হাস্য করিবেন, কিন্তু আমি বাস্তব জগতের কথা বলিতেছি, আশ্চর্য উচ্চস্তরের মানস বিষয় নহে, কারণ বাস্তবের উপরে তাহার বাস। ব্রাহ্মণের অঙ্গধারণ নিষিদ্ধ, এবিষয়ে শাস্ত্রের আইন কঠোর, অথচ পরশুরাম তাঁহার কূঠারের সাহায্যে একশবার উচ্চত যোদ্ধা জাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন—প্রতিবাদকারী ত্রীলোক বাণেশ্ব কাহাকেও বাদ রাখেন নাই। অতঃপর দ্রোণের গায় এক শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ উত্তম অশ্ববস্ত্রের বিনিময়ে অস্ত্রায়ের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। প্রথম উল্লিখিত ব্যক্তিকে দেবতা পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, এবং শেষোক্ত ব্যক্তিকে তিন্দুজাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বাীরের সম্মান দেওয়া হইয়াছে। কেরানির কাজ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে হীন গ্রাস্তি, কিন্তু আজ হাজার হাজার ব্রাহ্মণকে কি করিতে দেখিতেছি? অসংখ্য অনেক নিষিদ্ধ গ্রাস্তির কথা আর তুলিয়া লাভ নাই। দেখা যাইতেছে গৌরব এখন তাহার উচ্চ আসন হইতে নিচে নামিয়া আসিয়াছে, এবং লাভজনক শ্রমের জন্য বুদ্ধি, শিক্ষা এবং মূলধন নিয়োগের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। ছুৎপের বিষয় এদিকে মনোযোগ এখনও অতি অল্পই দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে দেশে যে



সব আলোচনাই হইতেছে তাহার অধিকাংশই স্টেট উদ্দেশ্যবাহীন। ভারতীয় চিত্র যাহা অপ্রাপ্য, তাহাই পাইবার জন্য মার্টিয়ারা উঠিতে ভালবাসে। গাহারা বলেন পাশ্চাত্য চার্চিকের অগভীর আবরণের নিচে প্রাচ্য মনোভাবটিই আমাদের মধ্যে প্রবল ভাবে লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহারা কিছু অজায় বলেন না। আমাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য—অব্যবহিতের উদ্দেশ্য দৃষ্টিপাতের অক্ষমতা। এই অবস্থায় কোনও জীবন্ত দেহ বাঁচিতে পারে না।

আমরা লাইসিয়াম থিয়েটারে গেলাম। সেখানে তখন ‘ফাউস্ট’ অভিনীত হইতেছিল। মিষ্টার হেনার আরাভি নামক সুবিখ্যাত অভিনেতা মেফিস্টোফিলিসের ভূমিকায় এবং খ্যাতনামা অভিনেত্রী মিস্ এলেন টেরিয়ার গারগারেটের ভূমিকায় অভিনয় করিতেছিলেন। থিয়েটার গৃহটি অতি সুদৃশ্য, সমুদ্রের দিকে কোরিনথিয়ান ভাস্কর্য্য শ্রেণীর উপর গম্বুজ ও ছোট ছোট স্তম্ভ শ্রেণী। ভিতরটা সুন্দর ভাবে অলঙ্কৃত, পাকা শিল্পীর হাতের কাজ। এই গৃহে প্রায় পাঁচ হাজার লোক বসিতে পারে, এবং প্রতি রাত্তির অভিনয়েই পূর্ণ গৃহ, সেখানে তিল ধারণের স্থান থাকে না। রাত্তি ৮টায় অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রতি অভিনয়েই যে দরজা দিয়া পিটে পৌছাইতে হয় সে পথে ভিড়ের আতিশয্যে যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। এইভাবে সন্ধ্যা ৬টা হইতে দর্শকগণ সেখানে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করে। হেনার আরাভি ও এলেন টেরিয়ার—ও তৎসক মঞ্চে যে সব দৃশ্যাদি দেখান হয় তাহার মনোহারিত্ব প্রতি অভিনয়ে এত দর্শককে আকর্ষণ করে। দৃশ্যপটগুলি প্রকৃতই বিষ্ময়কর, বিজ্ঞান ও প্রয়োগ কৌশলের জয় সূচিত করে তাহা। আগে যাহা অলৌকিক শক্তি ভিন্ন সম্ভব মনে করা হইত

না, তাহা এখন লৌকিক শক্তিতে সম্ভব হইয়াছে। সহস্র শিখা আঙনের মাঝখানে মেফিস্টোফিলিস বসিয়া আছে এবং আঙনকে সে তাহার সর্গাপেক্ষা বহুভাবাপন্ন ভক্তের জায় আদর করিতেছে। শয়তানের রক্তনশালাগুলি দেখা যাইতেছে, যেখানে অভিশপ্ত কঙ্কাল প্রেতদেহগণ ঘুরা বস্ত্র সকল পাক করিতেছে। বন্দ যুদ্ধে শয়তানের তরবারিতে আঙন জ্বলিয়া উঠিতেছে। জীবন্ত অগ্নি-গিরি হইতে লাভা ও জ্বলন্ত জ্ববাগ্নি নির্গত হইতেছে। ডেভিল-মৃত্যু। অবশেষে স্বর্গ হইতে দেবকল্পাদের আবির্ভাব ও তাহাদের মৃত মার্গারেটের দেহের উপর হস্ত বিস্তার। সব চিত্তাকর্ষক। ডুরিলেন থিয়েটারে আমরা ‘ইউর্যান নেচার’ (মানবচরিত্র) অভিনীত হইতে দেখিলাম। ইহার দৃশ্য প্রাচ্যকালীন সূর্যোদয়, রাত্তিতে পূর্ণ চন্দ্র, মেঘচ্ছন্ন আকাশে বজ্রবিদ্যুৎ, সুধানের পদত, ট্র্যাফালগার দ্বয়ার খুব সুন্দর ভাবে দেখান হইল, খুব স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। শোনা গেল ‘ফাউস্ট’ অভিনয়ের জন্য মঞ্চে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে মিষ্টার আরাভি-এর ২০,০০০ পাউণ্ড (৩ লক্ষ টাকা) ব্যয় হইয়াছে। আলহামব্রা থিয়েটারে বহু নর্তকী একসঙ্গে নাচিতে দেখা গেল। মনে হয় সংখ্যায় তাহারা এক শতের আধক হইবে। প্রকৃত সংখ্যা ভুলিয়া গিয়াছি। এটি রূপকথার জগৎ, ভৌতিক এবং চোখ ঝলসান এ রকম আশি আর দেখি নাই। এই সময় শুভ্র থিয়েটারে ‘মিকাদো’ অভিনীত হইতেছিল। আমার মনে হয় এটি ভারতীয় থিয়েটারে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু ভারতীয় থিয়েটারে ইহার পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় নাই। এটি অল্পকোড়েও দেখিলাম। কিন্তু লণ্ডনের জায় চমৎকার হয় নাই।

ক্রমশঃ

# পুণা আশ্রমে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

( পুণপ্রকাশিতের পর )

শ্রীরামদাস গুরুমন্ত্র নেওয়ার পরে ভিক্ষু পরিব্রাজক  
ঠায়েছিলেন—কুমারিকা থেকে কাশ্মীরে সকলই  
পেয়েছিলেন “রাম”—এর করুণস্পর্শ। (রাম বলতেন তিনি  
কৃষ্ণকে, রাম ও কৃষ্ণ অভিন্ন এই উপলব্ধির অমুজ্জায়।)

দিনে দিনে কত বকমেদ অভিজ্ঞতা উপলব্ধিই যে  
তাঁর হ’ত—কত বকম দর্শন, জ্যোতি, ভাবসমাধি, পূর্ণ  
সমাধি—সর্বোপরি, মিত্যানন্দ! আমি একদিন তাঁকে  
জিজ্ঞাসা করেছিলাম : “আপনাকে ধর্ম উপাধি দিয়েও  
জিজ্ঞাসা করতে সাধ যায়—আপনার মনে সংশয় বা  
বিষাদ কখনো আসত না?” উত্তরে তিনি হেসে  
বলোছিলেন : “সংশয় আসবে কী ক’রে—রাম-এর  
করুণালাভের পরে? তবে কখনো কখনো নীরসতা  
আসত। তখন রামদাস সব ছেড়ে করত বিজন  
কোনো শৈলচূড়ায় বা গুহায়—সঙ্গে সঙ্গে অপ্রাপ্ত জপ।  
অর্থাৎ সে ফিরে পেত হারানিধিকে—যার নাম নামানন্দ।  
তখন রামদাস ফের ফিরত লোকালয়ে—এ-আনন্দ  
সবাইকে বিতরণ করতে—তার নামানন্দের ছোঁয়াতে  
তাদের মনেও প্রায়ই জেগে উঠত সে-আনন্দের  
রেশ। আর সে যে কী আনন্দ রাম, কী বলব?  
একটা অবটনের কথা বালি শোনো। একবার এক  
পাহাড়ে ব’সে নাম করতে করতে রামদাসের চোখের  
সামনে সূর্য ফেটে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল আনন্দ—  
তময় সমাধি। সমাধি ভাঙলে রামদাস দেখল—এক  
গোখরো সাপ তার পায়ের বুড়ো আঙুল চাটছে।

রামদাস তাকে বলল : “এ কী রাম? তোমার কিসের  
অভাব যে তোমার দাসের বুড়ো আঙুল চাটছে?”  
ধমক খেয়ে রামের সলজ্জ প্রস্থান—হা হা হা!”

সদানন্দ আত্মভোলা প্রেমিক পুরুষ তিনি। যেমন  
সবল তেমনই রসাল। কথায় কথায় হাসতেন, হাসাতেন।  
কেউ জেরা করতে এলে তাকে জখম করতেন রসিকতার  
তীরন্দাজিতে। শ্রীঅরাবিন্দ তাঁর সাবিত্রীতে লিখেছেন  
ভগবান্ সাবিত্রীকে বলেছেন :

“Those who have looked on me shall  
grieve no more.”

হৃৎখের পেয়েছে পার—পায় যারা দর্শন আমার।

শ্রীরামদাস ছিলেন একবার প্রমুত্ত প্রমাণ। হৃৎখ  
তাঁকে পেতে হয়েছে অর্জুন্নি বার কিস্ত তাঁর আনন্দকে  
আচ্ছন্ন করতে পারে নি। আমাকে বলোছিলেন  
(আমার ইংরেজীতে লেখা একটি স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃত  
করিছি—অমুবাদে) :

“রামদাস যখন ভারতে পরিব্রাজক হয়ে দেশে  
দেশে চলেছে যেন হাওয়ায় উড়ে—তখন একবার পায়ের  
কাটা ফুটে তার সমস্ত পা বিধিয়ে উঠল। দেহে অসহ  
যন্ত্রণা কিন্তু রামদাস সমান আনন্দে নাম জপ করে চলল।  
অনেকেই দেখতে এল এ আশ্চর্য্য দৃশ্য—পায়ে এত বড়  
কোড়া—প্রায় একটা আপেলের মত—ফুলে নীল হয়ে  
উঠেছে, অথচ এ অমৃত সাধু সারা রাত সুমোতে না  
পেরেও সানন্দে সমানে জপ ক’রে চলেছে ‘শ্রীরাম জয়  
রাম জয় জয় রাম!’

“অথ এলেন গ্রামবাসীদের এক নাপিত। তিনি রামদাসের কোড়া এক ঘা-য় কুর দিয়ে কেটে দিলেন। সবাই দেখে শিউরে উঠল—কিন্তু রামদাসের কোড়া কাটার বেদনা রাম-এর করুণার রূপান্তরিত হ’ল পরমানন্দে—শ্রীরাম জয় রাম জয় রাম।

“আর একবার রামদাস রাতে এক গাছভলায় শুয়ে ঘুম থেকে উঠে দেখে, এক কীটজর্জর লোমহীন কুকুর (mangy dog) তার নাকের কাছে লেজ পেতে বসে। রামদাস উঠে তার হৃগন্ধ পেল না—পাবে কেমন ক’রে? সে যে দেখতে পেল সেই ঘেরো কুকুরের মধ্যে সাক্ষাৎ রামকে।”

রামদাস আমাকে গভীর স্নেহ করতেন ব’লেই আমাদের দীন কুটিরে এসে তিনদিন ছিলেন ভিড়ের মধ্যে। সেসময়ে দেখতাম মাতাজি কৃষ্ণাবাই তাঁকে কী ভাবে চোখে চোখে রাখতেন। ইল্লিরাকে তিনি ভালোবেসেছিলেন প্রথম দিনট। এসতেন আমাদের সঙ্গে এক টেবিলে রামদাসকে আগে নিজে হাতে খাইয়ে। ঠিক যেন মা ও শিশু। রামদাস প্রশ্ন করার দিন বলেছিলেন কৃষ্ণাবাইকে দেখিয়ে : “Ramdas is merely a talker, Mataji is the doer।” শুনে কৃষ্ণাবাই হেসে হাত ধারিয়ে বলেছিলেন : “বা-হু!” কী মূল্য ও পবিত্র ছিল এ-গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ। ইল্লিরাকে শিখা পেয়ে আমি রামদাস ও মাতাজির সম্বন্ধের মাপুর্ষ যেন আরো গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলাম।

রামদাস ভালোবাসতেন হাসতে হাসতে কথা বলতে ও গান শুনতে। আমাদের ভজন গানে তাঁর চোখ চিক্ চিক্ ক’রে উঠত; ইল্লিরা মাতাজির গুণকীর্তনে একটি কবিতা লিখেছিল, প’ড়ে তিনি ইল্লিরাকে স্তম্ভিতকরি ব’লে স্নানান্ত করেছিলেন। তাঁর আশ্রমের Vision নামে মাসিক পত্রিকায় একটি নিবন্ধে রামদাসের ভাষা ছিল :

“Ramdas has met her (Indira) twice or thrice. She is an inspired poet. Here is her poem (on Mother Krishnabai) :

“Mother, I bow to you  
I do not know whether you are the Divine  
Mother :  
But that all orphaned hearts feel the love  
of a mother in you—I know.  
So, in that faith of a child, I bow to  
you.”...

পুরো কবিতাটি মাতাজির স্বর্ণগ্রন্থে সাদরে ছাপা হয়েছিল।

এর অনুবাদ—অমিত্রাক্ষর :

আমি মা, জানি না—তুমি জগন্মাতা কি না।  
জানি শুধু এইটুকু—যত মাতৃহারা  
শিশুরা তোমার স্নেহধারে নিত্য পায়  
জননীর স্নেহবাদ, তাই মা, শিশুর  
সবল বিশ্বাসে করি প্রণাম চরণে।

কিন্তু মাতাজি কখনো কোনো ভাষণ দিতেন না, ছায়ার মতন থাকতেন গুরুর পিছনে—অনন্তা সেবার্ণিনী, গুরুর চরণে শরণাগতা। রামদাস আমাদের কাছে একাধিকবার বলেছিলেন যে মাতাজি আত্মিক উপলব্ধিতে তাঁকে ছাড়িয়ে গেছেন। মাতাজি শুনে হেসে উড়িয়ে দিতেন, বলতেন : “শোনো কেন ওঁর কথা—যাট বছর আগেও যে-শিশু ছিলেন আজও সেই শিশুই আছেন।”

মন্দিরে সকালে সভা এসত ন’টায়—দশটা সাড়ে দশটায় ভাঙত। প্রথমে আমি গাইতাম, পরে রামদাস হয় নিজে থেকে কিছু ভাষণ দিতেন, নয় জিজ্ঞাসু ধর্মার্থীদের প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতেন সাবলীল ইংরেজীতে। বারবার একই প্রশ্নের একই উত্তর দিতে তাঁর ক্লান্তি আসতে কখনো দেখি নি কিন্তু মাতাজি সাড়ে দশটার তাঁকে নিরন্তর ক’রে টেনে নিয়ে যেতেন শয়নকক্ষে। তারপরে সন্ধ্যায়ও ঐ ব্যবস্থা—সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা আমি গাইতাম, তারপর প্রশ্নোত্তর পক্ষ। সব শেষে সবাই মিলে নাম গান, হয়—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ...না হয় শ্রীরাম জয় রাম জয় রাম। নামগানে যে এত আনন্দ করে কে জানত?

১লা মার্চ পূজ্য অতিথি বৃগলের প্রস্থানের দিন  
আমরা সবাই ত্রিসন্ধ্যায়। আমি গাইলাম সকালে  
ইন্দ্রবার সঙ্গে তাঁর বাঁধা রামদাস কৃষ্ণ বাই শুভ :

মনে পড়ে LIFE DIVINE-এ শ্রীঅরবিন্দের  
বাণী :

“For without experience of pain we would  
not get all the infinite value of the divine  
delight of which pain is in travail.”

ভাবার্থ : বেদনা কী বস্তু না জানলে গৈ-দিব।  
আনন্দের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'ত না যার  
প্রসূতি হুঃখ ব্যথা শোক তাপ।

উপনিষদে পাঠ : “নামসাত্বা বলহীনেন লভ্য :।”  
রামদাস পালোয়ান ছিলেন না। নানা অসুখেই কষ্ট  
পেয়েছেন। সমস্ত দাঁত তাঁকে তোলাতে হয়েছিল—  
দারুণ “পাইয়োরিয়া” অসুখে। নরম শাকসবজী কলা  
দুধ—বিশেষ ক'রে দুধ—ছিল তাঁর মুখ্য পথ্য। মাতাজি  
কৃষ্ণাবাই তাঁকে প্রতিপদে না আগলে রাখলে তাঁর  
অকালমৃত্যু হতেই হ'ত একথা রামদাস আমাদের  
একাধিকবার বলেছিলেন ভানলান্ডিন কটেজে। কি  
ভাবে মাতাজি তাঁকে রক্ষাকবচের মতনই রক্ষা করতেন  
তাঁর একটি দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছিলাম যখন পুণায় সাধু  
ভাসোয়ানির “মীরা সুল” থেকে এলেন দুই ভদ্রলোক :  
রামদাসকে যেতেই হবে সন্ধ্যায় সেখানে ভাষণ দিতে।  
শিশু-সরল রামদাস একগাল হেসে বললেন : “যাব  
বাঁক—” অমনি সভামাঝে (ঘর লোকে ভার্গি) কৃষ্ণাবাই  
উঠে বললেন : “অসম্ভব। তাঁর স্বভাবে শিশু—সব  
ঢাকেই সাড়া দেন। কিন্তু পুণার দারুণ শীতে সন্ধ্যায়  
বরুলে ওঁর অসুখ করবে। আপনারা ওঁকে নিয়ে  
যতে পারেন বিকেল চারটেয়। কিন্তু সন্ধ্যায় ওঁকে  
ঘামি বাইরে বেরুতে দিতে পারি না। হুঃখিত—কিন্তু  
নরুণায়।”

আরো অনেক কিছুই বলার আছে। কিন্তু তাহলে  
স্বাভিচারণ হয়ে দাঁড়াবে মহাভারত তাই এবার হারি  
ক মন্দিরের অধ্যাক্ষে ক্রিয়ে আসি।

বন্দনা লো রামদাস, বন্দনা লো মেরী।

বালরূপ হৈ অনুপ ক্রীত-রীত ভেরী।

নামরতন তরসে প্যাসে জগকো দেনে আরা :

“জয় শ্রীরাম জয় জয় রাম, জয় জয় রাম”—গায়।

পরে আমি এর অনুবাদও গাইতাম রামদাসের

দেহান্তের পরে :

কাঁর হৈ প্রণাম তোমায় রামদাস, ধন্যকলে।

ছিল যে সবল শিশু শ্রীরামের ধরাতলে।

জগতে নামরতন বিলাতে এসেছিলে :

“জয় রাম জয় জয় রাম”—ভূমি তাই গৈয়েছিলে।

কে রাজা, কে কিঙ্কর ? কোথা ভেদ আপনপরে ?

বন্ধু বৈরী সবার ডাকিলে প্রেমভরে।

প্রতি নামনিবাসে নেয় নিবাস রামনিবিলে :

“জয় রাম, জয় জয় রাম”—ভূমি তাই গৈয়েছিলে।

চরণের জোয়ায় তোমার ধন্য-এষণী !

ধন্য ভক্ত তোমার, কৃষ্ণাবাই জননী।

রামদাস হয়ে রামের লীলাদোল উচ্ছালিলে :

“জয় রাম, জয় জয় রাম”—ভূমি তাই গৈয়েছিলে।

শেষ আমি তাঁকে ধরলাম যাবার আগে, তাঁর  
শ্রীমুখে শুনেছি চাই তাঁর বিশ্বরূপ-দর্শন। (রামদাস  
সম্মুখেতে কৃষ্ণদর্শনকে বিশ্বরূপদর্শন নাম দিতেন।)

রামদাস তাঁর সাধনা ও সিদ্ধির কথা বলতেন সরল  
আনন্দেই—আর কিছু রেখে ঢেকে বলতেন না। তাই  
আমি জিজ্ঞাসা করবামাত্র বললেন হেসে : “তথ্যস্ত।  
শোনো।

“সে-সময়ে রামদাস অরুণাচল শৈলমূলে একটি  
শুধাতে অবিশ্রান্ত গুরুমন্ত্র জপ করত। সকালে কেবল  
একবার বোরিয়ে একমুঠা চাল সিদ্ধ করে কিছুটা খেয়ে  
বাঁকটা ছাড়িয়ে দিত বাইরে—কাঠিবিড়ালীরা এসে লুপে  
নিত পরমানন্দে।

“একদিন কে যেন বললে রামদাসকে রামন মহর্ষিকে  
প্রণাম ক'রে আসতে। রামদাস সানন্দে তৎক্ষণাৎ গিয়ে  
তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে বলল—সে শুধু তাঁর  
আশির্বাণী। মহর্ষির করুণভরা দৃষ্টিতে রামদাসের দেহ

আনন্দের রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল—মিলল মহর্ষির দৃষ্টি প্রসাদ, রোমাঞ্চ হবে না? তারপর ব্যস—সোজা গুহার সাধনপীঠে বসে কেবল নামজপ, অশ্রাস্ত নাম—ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কয়েকদিন বাদে হঠাৎ মুরলীধর কৃষ্ণের ঘুরে খুঁজে নাচ রামদাসের চারদিকে—বাঁশি বাজিয়ে। আহা, সে কী প্রাণকাড়া নৃত্য ও বাঁশি।”

একদিন জিজ্ঞাসা করল : “কৃষ্ণকে আপনি সমাধিহ অবস্থায় দেখলেন, না খোলা চোখে?”

“খোলা চোখে—যেমন রামদাস তোমাকে দেখছে এখন। কিন্তু এ-ক্ষণে রামদাসের মন ভুট্টে হবার নয়—সে নাচ খেমে গেলে রামদাস আবার যে-র্তিমিরে সে-র্তিমিরে। তাই রামদাস প্রার্থনা জানাল তঁাকে যে সে শুধু একটি বর চায়—সর্বদা প্রতিমুহূর্তে সনাত্তে কৃষ্ণ দর্শন। তিনি হেসেই হাওয়া।

“কিন্তু রামদাস কি ছাড়বার পাত্র?—ধরল ফের নামজপ। এইভাবে তিন সপ্তাহ কাটলে হঠাৎ হল তার বিস্ময়কর দর্শন : যেদিকে সে তাকায় রাম—শুধু রাম—গাছ পাতা তুলতাতা মাটি পাথর বন পাহাড় খুলো বালি... সর্বত্রই রাম, শুধু রাম—আর এমন রাম যে চিরদিনের সাধী, কণিকের আর্তিধি নয়।

সামনে এক গাছের গুঁড়ি—রামদাস জড়িয়ে ধরল। কিন্তু গুঁড়ি তো নয়—সাক্ষাৎ রাম। এক পাখি যাচ্ছে, রামদাস তাকে গিয়ে আলিঙ্গন করল ‘রাম রাম রাম’ বলে। সে তো প্রথমে ভয়েই সারা—কে পাগল? কারড়ে দেবে কি না কে জানে? কিন্তু পরে যখন দেখল পাগলের মুখে একটিও দাঁত নেই তখন নিশ্চিত—বলে রামদাসের সে কী শিশুসরল হাসি।”

আমরা একে একে গিয়ে তঁাকে প্রণাম করলাম চোখের জলে। আমি বললাম : “ঠাকুর! আপনি যে আমাদের ভাড়া ঘরে চাঁদের আলো হ’য়ে এসেছেন সে তো শুধু কপা করতে। নৈলে আমাদের কী আছে

বলুন যা দিয়ে আপনাকে বরণ করতে পারি? বিন্দু সিঁদুরকে কেমন ক’রে ডাকবে?

রামদাস আশীর্বাদ ক’রে হেসে বললেন ইংরেজীতে—আমি টুকে নিয়েছিলাম আমার ডাইরিতে :

“Not drops. You have dug a sweet lake of love’s pure cream here which is so inviting and cool that I have grown hoarse, don’t you see, dipping into it again and again.”

(টীকা : তাঁর স্বরভঙ্গ হয়েছিল ধর্মার্থীদের অশ্রাস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে। রামদাস কী মধুর চণ্ডে তাদের এ-অত্যাচারকে বরণ করে নিলেন মাখনের মধ্যে ডুব দেওয়ার উপমা প্রয়োগে।)

তঁাকে একবার বলেছিলাম : “আপনার চিরপলাতক রামকে একবার বলবেন—আমাকেও দেখা দিতে।”

রামদাস উত্তরে বলেছিলেন : “সাপের কাছে কি এ-নিবেদন করার দরকার হয়? রামদাস রামকে বলেছে আগেই।”

“কী বললেন তিনি?”

“বললেন—তিনি আসবেন আসবেন আসবেন গো।”

জীবনে শ্রেষ্ঠ সাধন কাকে বলে সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ বলেন কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ, কেউ জ্ঞানযোগ, কেউ ভক্তিযোগ। এ-যুগের একটি পরমা বাণী জীবসেবা। রবীন্দ্রনাথ আমাকে লিখেছিলেন। (তীর্থংকর দ্রষ্টব্য) : “আমার সব অহুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। বার বার ডেকেছি দেবতাকে, বার বার সাড়া দিয়েছে মানুষ, রূপে এবং অরূপে, ভোগে এবং ত্যাগে। সেই মানুষ ব্যক্তিতে, এবং সেই মানুষ অব্যক্তে।”

একদিনের কথা খুব স্পষ্ট মনে আছে। আমি তখন শান্তিনিকেতনে কবির আর্তিধি। কথায় কথায় কবি বললেন : “আজ নন্দলাল (চিত্রী) আমাকে জিজ্ঞাসা

করেছিল : “প্রতি যুগের এক একটি নিত্য আদর্শ থাকে বা গড়ে ওঠে। এ-যুগের আদর্শ কী মনে হয় আপনার ?” তাতে আমি উত্তর দিয়েছিলাম : “মাহুষ—যার মধ্যে ভগবান্ নেমেছেন। উপনিষদের ভাষায় : এষ দেব বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। অর্থাৎ দেবতা যে-মাটির মাহুষের মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন তাকে ভালোবাসতে পারলে তবেই পরমা সিদ্ধি।”

কালীদাস জীবনেও যে এ-বাণীর বক্তার বেঞ্জে উঠেছিল আমরা দেখেছি। রামদাসের জীবন একটু আলাদা। তিনি একদিকে মাটির মাহুষ অর্থাৎ চিত্তের কক্ষকে অর্থ দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের মধ্যেও পাই এই হুমুখী সাধনা : একদিকে দেবজ্ঞানে দাঁড়ানো নারায়ণ জীবসেবা :

বহুদিকে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?  
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

অর্থাৎ জীবন সংগ্রামে সব বাধা জয় করে বরণ করা যিনি প্রতি হৃদয়ে আসীন : শ্রামা, শ্রাম বা শিব। যথা,

পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় ভাঙা না  
ভরাক তোমা।

চূর্ণ হোক স্বার্থসাধ মান, হৃদয় শ্মশান নাচুক তাহাতে  
শ্রামা।

রামদাসের মধ্যেও দেখতে পাই এই হুমুখী সাধনা : পরাভক্তি লাভের ও জীবসেবার। তাই তাঁর কাছে আসত আত তথা জিজ্ঞাসু। (অর্থার্থীও আসত কিন্তু মার্জিত তাদের আমল দিতেন না। বলতেন যারা, “শুধু সাধারণ জীবনে দাঁড়ি আত্মকেন্দ্রিক জীবন বরণ করে হুখে গছন্দে থাকতে চেয়ে ভগবানকে ডাকে তাদের ভোগের বধের চাকায় তেল দিতে রামদাসের আনন্দাশ্রমে তাদের স্থান নেই।”

বলা বাহুল্য আমার ভালো লাগত রামদাসের এই মানবপ্রীতি। কিন্তু তাঁর স্নেহে আমরা সবাই স্থান করে ওঠে হলেও জানতাম তিনি চান এই আত্মত্যাগকে অর্থ করে আমরা নিবেদন করব রামকে। তাই মানবপ্রীতি

তাঁর কাছে মাত্র হ'লেও বরণ্য ছিল সব আগে ভগবৎ-প্রীতি, যার তিনি নাম দিতেন পরা ভক্তি।

কিন্তু তা বলে তিনি মাহুষের অপমান সইতেন না। ডানলাভিন কটেজে একদিন তিনি বলেছিলেন তাঁর জীবনের একটি কাহিনী—বলি।

রামদাস বলেছিলেন : “একদা এক শূদ্র রামদাস এক সাধুর পাশে বসে ধ্যান করছিল। সাধুজি পূজা করছিলেন সামনে রাখা একটি কুম্ভার্তর। হঠাৎ এক হরিজন এক বুড়ি ফলতুল নিয়ে এল শূদ্র। সাধু তো রেগে আগুন, বলল : ‘দূর হ অত্যাচারী। এখানে ঠাকুরের পূজা হচ্ছে জানিস না ?’ সে কেঁদে ফেলল। রামদাস উঠে কুম্ভার্তটিকে ছোঁ মেরে উঠিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে বলল সাধুকে : ‘ঠাকুর এসেছিলেন হরিজন রূপ ধরে। তাকে যখন ভাঙালে তখন ঠাকুরকেও ভাঙাও।’

তাঁর মধ্যে যে আচার্যপনার লেশও ছিল না, এই অসমসাহসিক দুঃস্বপ্ন তাঁর প্রমাণ। মন্তব্য অনাবশ্যক।

আমার তাঁর মন ভরে উঠত ভাবতে যে, কক্ষকে পূজা করে তিনি সত্যিই সন্মুখের কক্ষদর্শন করেছিলেন, নৈলে এ-হেন রোমহৃদয় অনাচার করতে সাহসী হতেন না কখনই। তাই তাঁর নানা ভাষণেই মেলে এই নিশ্চয়্যোক্ত যে, নির্বিকল্প সমাধিই মাহুষের সাধনার শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি নয়, সত্ব সমাধিই সিদ্ধির মুকুটমাণ, কেন না সত্ব সমাধির ভূমিতে যিনি পৌছেছেন তিনি নির্বিকল্প সমাধির অন্তর্ভুক্তিকে পান তাঁর জাগ্রত চেতনায়। তাঁর সন্মুখের কক্ষদর্শনের আমি অন্তত এই ভাষাই করেছিলাম—যদিও আমার আক্ষেপ ১৯৩৬ : “আহা, যদি তিনি কবি হতেন তাহলে এ-বর্ণনা আরো প্রাণম্পর্শী হত।” আমাদের মানসের তাঁর পদার্থের আগে ইন্দ্রিয় একটি গান বেঁধেছিল যেন আমার এই প্রতিপাদ্যটিকে প্রতিপন্ন করতেই। গানটি ইন্দ্রিয় ভাবমুখে আরাতি করেছিল সমাধিতে শোনার পর—ভুক্তপ্রয়াণ হচ্ছে (পঞ্চমাত্রিক)। তারিখ ১৩এ জুন ১৯৫৬—অর্থাৎ রামদাসের আসার ঠিক আট মাস আগে। গানটি ভাবজালিতে ছাপা হয়েছে বলে শুধু আটটি লাইন উদ্ধৃত করে আমার পুরো

অনুবাদটি পেশ করি। ইন্দিরা আনন্দ করেছিল :

জিহ্বার মৈনে দেখা তুঙ্গে নাথ পায়।

তু হব রক্ত হর রূপমে শ্রাম আরা ॥

তুঙ্গে দেখা আশা কি কলিরৌঁ মে খিলতে।

নিরাশাকে কাঁটো মে তুম হী হো মিলতে।

হরষমে অধর পর হো মুসকান বনতে।

তুঙ্গী বেদনাকে নিষ্ঠুর বাণ বলতে।

মিলা তেরা অর হী হৈ জো রাগ পায়।

তু হব রক্ত হর রূপমে শ্রাম আরা ॥.....

.....

যেখাই আমি তাকাই, দেখি তোমায় হুনয়নে।

প্রতিটি রঙ রূপেই ওঠো ঝলকি' এ-ভূষনে ॥

আশার কলি ফুটিলে আনে তোমারি তো আভাষ,

নিরাশাকালো কাঁটার বুকে তোমারি বিলাস।

অধরে ব্রহ্ম হাটিতে তুমি ওঠো মজারিয়া।

বেদনাবাণে রক্ত ঝরে তোমায় উছলিয়া।

প্রতি রাগিণী করে আলাপ তোমারি মুহঁনে।

প্রতিটি রঙ রূপেই ওঠো ঝলকি' এ-ভূষনে ॥

গগনে প্রতি তারার দীপ ধরে তোমারি বাতি,

ধরার সাথে চাঁদের যবে রাঙে মিলন রাতি।

স্নিগ্ধ সমীরণে তোমারি পাই যে পরশন।

ঘনালে ঘনঘটা সেখাও দাও গো দরশন।

বহু অরি মাঝে তোমারি উদয় ধনে ধনে।

প্রতিটি রঙ রূপেই ওঠো ঝলকি' এ-ভূষনে ॥

জানি গো তুমি নিখিলে রাজো প্রতিটি কণিকায়,

তবু আমার অন্তরে আনন্দছাঁই ভায় :

অঙ্গে পীত অধর শ্রীকণ্ঠে দোলে মালা,

চরণে বাজে নৃপুং, মরি মরি মুরলীওয়াল।

মীরার মন মজালে তুমি কান্ত হে কেমনে ?

যেখাই মাথা নোয়াই নিমি তোমারি শ্রীচরণে।

এরপর রামদাসের সঙ্গে হৃৎকট পত্র বিনিময়

হয়েছিল শুধু একটির কথা বলেই এ-পত্রের সমাপ্তি  
টানব।

আমাদের মন্দিরে একদিন কথার কথায় একজন  
তাকে জিজ্ঞাসা করে : “আপনি এবার বিশ্বভ্রমণে  
গুনোহি নানা ভ্রমার্তকেই বলেছেন যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ  
বাধবে না। শুদ্ধবটি কি সত্য ?”

রামদাস বলেছিলেন : “হ্যাঁ। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ  
বাধবে না।”

তিনি আনন্দাপ্রমে কিরে গেলে আমি তাঁকে একটি  
চিঠি লিখেছিলাম এসবক্ষে প্রশ্ন করে। উত্তরে তিনি  
আমাকে লিখেছিলেন : প্রিয় রাম, রামদাস ওদেশে  
সত্যিই বলেছিল সবাইকে যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবে  
না। একথা সে বলেছিল রামোর প্রেরণায়। তাই  
তুমি এ-বাণীকে ঐশী বাণী—revelation—বলে গ্রহণ  
করতে পারো।

“তুমি লিখেছ—আমাদের সাহচর্যে তোমরা আনন্দ  
পেয়েছিলে। আমরাও তোমার ও ইন্দিরা দেবীর  
সাহচর্যে বিপুল আনন্দ পেয়েছিলাম হরেকৃষ্ণ মন্দিরের  
পূণ্য আবহে শ্রবণ করে। সে স্মৃতি চিরদিনই জাগবে  
আমাদের মনে।

“রামদাসের জন্মদিন ? ১০ই এপ্রিল ১৮৮৪। সে  
সন্ন্যাস নেয় ২২ এ ডিসেম্বর ১৯২২ সালে।

“তোমাদের হৃদয় যেন কৃষ্ণভক্তিতে ভরপুর হয়ে  
ওঠে—যেন তাঁকে তোমরা দেখতে পাও সবখানেই।  
কোথায় তিনি নেই বলা—এ-আকর্ষ দেবতাটি ?

“আমাদের স্নেহাশিস নিও

একান্ত তোমাদেরই রামদাস।”

(এ পরম ভাগবতের তিরোধান ২৫ জুলাই ১৯৬৩)

\* তোমরা বন্ধু কে বলল ? তোমরা এখানে একটি  
নির্মল প্রেমবনীর সরোবর সৃষ্টি করেছ—এত লোভনীয়  
ও স্নিগ্ধ যে বার বার ডুব দিতে দিতে আমার স্বরভঙ্গ  
হয়ে গেছে, দেখছ না ?

\* রামদাস-এর আশ্রমের পত্রিক VISION,  
September 1971 থেকে “Papa Answers”—  
পারিশিটে উদ্ধৃতি উইব্য।

# ইসলামী বৈশিষ্ট্য ও বাঙালী মনীষা

ছোঁতাভর্যদী দেবী

লেখাটায় নামকরণ ও ভাবটা বিবেকানন্দের উক্তি (ইসলামী দেহ ও বেদান্তের মস্তিষ্ক) থেকে নেওয়া।

পূর্ণ বাঙালী স্বাধীন বাংলাদেশ গ্রুপে নবজন্ম লাভ করেছে।

আমরা পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষ অবাক হয়ে দেখছি। আর মনে মনে এবং প্রকাশ্যেও কথামালার সেই গল্পটার (সোনার কুটার) মত ওঁদের ক্রান্তি ও খ্যাতির অংশ নেবার কথা ভাবছি।

কিন্তু আজকের পশ্চিম বঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত চীন-রুশ-গান্ধী জমসজ্জ প্রমুখ নানা মতবাদী পরোক্ষে ক্ষমতা-ভোগ-লিপ্সু বাঙালীরা কি ঐ নব জাগ্রত ইসলামী দেহে নতুন “বাঙালী” মনীষা জাগ্রত ঐ নতুন বাঙালী জাতি? তাদের শতকরা ৯৫ জনই নিরক্ষর শোষণার্থীর খ্যাতিচীন অন্নভোজী ক্ষীণকায় শত্রুবিজ্ঞায়ণ শিক্ত নন, তাঁরা কান্ ঐক্যমন্ত্রের বলে কোন দেশমাতার আল্লানে সব ভুলে দ্বিজাতিতত্ত্ব ভেদ জ্ঞান ‘ইসলাম সভ্যতা ও ধর্ম প্রচার’ কথা বলে এমন এক হয়ে গেলেন। যাঁরা সত্য সত্য ‘ইসলামের মূলতত্ত্ব’ ‘ভেদাভেদহীন মানবতা’ ‘আমার কাছে সব মানুষ সমান’ ‘র্তান ইচ্ছা করলে সব মানুষকেই এক ধর্মীয় করতে পারেন, তা করেন নি’ কোরানের সত্য বাণীর সন্ধান

পেয়ে নতুন করে কোরানের মর্মকথা উপলব্ধি করে জগতে আবার নতুন করে একটি স্বাধীন মত ও আদর্শ ও স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করলেন। (কাজী আবদুল ওহুদ ‘কোরআন শরীফ’ থেকে।)

নিশ্চয়, “বাঙালী মনীষা আর ইসলামী মানবতাবাদই” এর মূলে আছে। কিন্তু শুণ ধর্ম নয়, শুণ মনীষা নয়, শুণ দেশপ্রেম নয়,—শুণ ভাষা-প্রেমও নয়—সব মিলিয়ে ঐ পূর্ণ বাঙালীর মানবতাবাদের মনে যেন আশ্চর্য্য ভাবে জেগে উঠছে—তাঁদের বাঙালী মানসে প্রতিভাত হচ্ছে সেই আজ থেকে দুশো বছর আগের এক আশ্চর্য্য বাঙালী মনীষার, রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। যার শেষ উত্তরাধিকারী ছিলেন সুভাষচন্দ্র। সেই জাগরণের, সেই আবির্ভাবের সময়ে বাঙালীর ইসলাম ধর্মী-সম্প্রদায়ের এগ “দেশ ভাষা-ধর্ম-জাতি মনীষা” এমন করে সেদিন সচেতন হয়ে উঠতে পারেন; আজ কিন্তু সেদিনের সেই বাঙালী ইসলামী বাঙালী সম্প্রদায়ই আমাদের আদর্শ প্রদে অত্র বাঙালী সম্প্রদায়ের সম্মুখে নতুন করে সেই প্রায় নির্যাপিত শিখাটা জ্বলে দিয়েছেন ‘ইসলামী দেহে বাঙালী মনীষার আলোকে। এবং তাই তাঁদের কাছে আজকের আমাদের চেতনা জাগানোর স্বপ্ন অপরিশোধ্য। তাই স্মরণীয়, আজ শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, “নেতাজী সুভাষচন্দ্র আমার অগ্রতম গুরু।”



# অন্তবিহীন পথ

(উপন্যাস)

বসুনা নাগ

(পূর্ণপ্রকাশিতের পর)

গ্লেন দিল্লীর এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছতেই জয়তী দেখতে পেল অবিনাশ দাঁড়িয়ে আছে।

‘মুকুট অসুস্থ নয় তো?’ জয়তী উদ্ভিন হয়ে প্রশ্ন করল।

‘একটু ক্লান্ত সে, তাই আমি তোমার ‘দিগন্তে’ পৌঁছে দিয়ে যাব, বলে এসেছি মুকুটকে।’ অবিনাশ উত্তর দিল।

বাড়ী ফিরে এসে মুকুটকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পেয়ে জয়তী সোয়ান্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

‘জয়পুরে কদিন খুবই হৈ চৈ হল’ মুকুট বলল।

‘প্রদর্শনীতে নানা দেশের শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় হল—বেশ আনন্দে কাটল কদিন। রাজস্থানের লোকেরা ফুঁটি করতে জানে, আশ্চর্য শিখতে হল। যোগ দিতে হল রীতিমত।’ মুকুটের কথাগুলি বলা শেষ হতেই দূর থেকে বহু লোকের মিলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—জয়তী বাস্তবগুলি খালি করতে করতেই দেখল অতিথিরা ঘরে ঢুকে আসছে। মুকুট তাদের দেখতে পেয়ে বলে উঠল—

‘জয়তী দেখো কারা এসেছেন।’ জয়তী কাপড় গুলি ফেলে রেখে বারান্দায় বেরিয়ে এল, তার ইচ্ছা করা হল চীৎকার করে বলে সে কাউকে এখন দেখতে

চায় না। জিনিষগুলি গোছাবার সময় আর হল না। কাপড় বদল করাও হল না।

‘আমুন মিসেস সিং’ বলে জয়তী শুক হাসি হেসে আপ্যায়িত করল।

‘মুকুটকে আপনি কত যত্ন করেছেন, উনি বলাহিলেন এইমাত্র। কদিন বেশ আনন্দে ছিলেন জয়পুরে।’

মিসেস সিং ক্রতগতিতে এগিয়ে এসে জয়তীর হাত ধরে সহানুভূতির সুরে বললেন—

‘তোমার বাবার কাছে কদিন ছিলে, বড় ভালো লাগল কেনে, এখন তিনি একটু সামলিয়েছেন বোধ হয়। বলহিলাম আমি কদিন এখানে থাকতে চাই, তোমাদেরই কাছে। খবর না দিয়ে চলে এলাম।’

মুকুট দূরে দাঁড়িয়ে ছিল—আনন্দ প্রকাশ করে বলল—‘নিশ্চয় নিশ্চয়’—জয়তীও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—‘হ্যাঁ—নিশ্চয় নিশ্চয়’। মিসেস সিং তাঁর দুটোকেস ও ব্যাগ নিয়ে আসতে বললেন। অবিনাশ জয়তীর অবস্থা দেখে একটু বিস্মিত হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল জয়তী যেন পালাতে পারলেই বাঁচে। তাকে কোণে ডোক নিয়ে বলল—

‘মুকুট এদের নিয়ে কি যে বাড়াবাড়ি করে। তুমি বাড়ী এসে পৌঁছতেই অতিথিসমাগম—এইকল্পই তো বলি ‘দিগন্তে’ থাকলে পাগল হয়ে যেতাম। মিসেস সিং মানুষটিও নিতান্ত স্বার্থপর।’ মুকুট ও মিসেস সিংএর

ব্যস্তবাগীশ ভাব দেখে অবিনাশ কি রকম একটু  
বিক্রপের হাসি হাসল, তারপর মিসেস সিং-এর কাছে  
গিরিয়ে গিয়ে বলল—

‘মিসেস সিং আমার ওখানে চলুন—কদিন হয়ত  
দল লাগবে না। আরাম কিছু পাবেন না তবে  
আমাদের দলের সঙ্গে থাকলে আমোদে দিন কাটবে  
—ওখানে জমিয়ে আড্ডা হয় বেশ।’ মুকুট অবিনাশের  
কথায় বাধা দিয়ে বলল—

‘অবিনাশের বাড়ীতে গিয়ে থাকার কথা করনাও  
করবেন না। ঐ বেচ্ছাচারী অলস দলটি পাগল করে  
দেবে আপনাকে। যা খুসী করে, যখন খুসী থায়—  
কাজ না করলেও চলে ওদের।’

‘কেন মুকুটবা? আপনার ধারণা ও রকম হয় কেন?  
জয়তী যখনই আমাদের কাছে যায়, মাথা ঠাণ্ডা করেই  
ফিরে আসে তো? আমার বন্ধুদের ও পছন্দ করে বলেই  
তো মনে হয়—আপনিও সময় পেলে নিশ্চয় আসবেন।’

‘তা হলে মানুষের দলকে জয়তীর ভাল লাগা আর  
আশ্চর্য কি? ওকে দোষ দিই না, কিন্তু এখানে ওর  
অনেক দায়িত্ব।’ মুকুট বেশ অল্প কথার মধ্যে অবিনাশকে  
বুঝিয়ে দিল যে খানিকক্ষণ আড্ডা দেওয়ায় ক্রান্ত নেই  
তবে ‘দ্বিগন্ত’ হ’ল জয়তীর প্রকৃত কর্মস্থল।

জয়তী মিসেস সিংকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেল।  
অতিথি যেন আরামে থাকতে পারেন সেদিকে জয়তী  
সতর্ক হল। পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে মিসেস  
সিং ও মুকুট কথা বলতে ব্যস্ত—জয়তী কফি ঢেলে দিয়ে  
ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল—

‘আপনারা কথাবার্তা বলুন, আমি যাই—কিছু  
জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসি—অনুগ্রহিত দিন।’  
তখন প্রায় ১টা বাজল। দোকান বাজার খুলতে আরম্ভ  
করেছে, প্রথমেই জয়তী অবিনাশের বাড়ী এসে থামল  
‘এক পেয়াদা কফি দাও অবিনাশ’ বলে সে চেয়ারে  
বসে পড়ল।

‘নিজের বাড়িতে তো এক দণ্ড শান্তিতে বসতে পাই  
না—সেখানে কফি খেতেও যেন ইচ্ছা করে না।  
সমস্তকণই অতিথি সমাগম, ক্লাস্ত হয়ে গেছি। আজ

সারাদিন এদিকেই থাকব বলে এসেছি। মুকুট আজ  
মিসেস সিংকে নিয়ে খুবই ব্যস্ত।’

অবিনাশ নিজের পকেটে একটা পরিষ্কার কমাল  
ভাঁজে নিয়ে বলল—

‘আমার কিন্তু দৈনন্দিন কটিন, ভূমি বা হয় কিছু  
রাখা করে খেও, আমি হয়ত হুপুরে খেতে আসব কিন্তু  
দেবী হতে পারে।’ সে ভাড়াভাড়ি নেমে যাচ্ছিল দেখে  
জয়তী বলে দিল সে পারলে যেন খেতে আসে। একটি  
চাকরের সাহায্যে দু-একটি পদ রাখা করে জয়তী মুকুটকে  
জানিয়ে দিল সে হুপুরে ফিরতে পারবে না—বিশেষ  
কাজ আছে দোকান বাজারে। মিসেস সিং ও মুকুট  
যেন অপেক্ষা না করেন। অবিনাশের মা খুব ছোটর  
মধ্যে গোছালো। টেবিলে হুজনের মত জায়গা লাগিয়ে  
জয়তী কয়েকটি বই নিয়ে নিচু চেয়ারে আরাম করে  
বসল। তখন প্রায় ১টা বাজে। কে যেন সিঁড়ি উঠে  
আসছে মনে হল, আওরাজ পেয়ে জয়তী বলল—

‘কতক্ষণ বসে থাকব অবিনাশ? এত দেবী  
করলে?’

‘আমি অবিনাশ নই—’নারীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।  
অনিতাকে উঠে আসতে দেখে জয়তীর যেন রাগে  
মাথা ঘুরে গেল। আবার সেই অনিতার সঙ্গে দেখা?  
‘অবিনাশ কোথায়?’ অমায়িকভাবে অনিতা প্রশ্ন  
করল।

‘ভূমি কি এখানে সারাদিন কাটাবে? আমিও  
তাই ভাবছিলাম।’ অনিতা দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ—অবিনাশের জন্তই প্রতীক্ষা করছি—সে  
বহুদিনের বন্ধু আমার জানেন তো?’ জয়তী উত্তর  
দিল।

‘পিকনিক হবে নাকি?’ অনিতা বিক্রপের স্বরে  
পুনরায় প্রশ্ন করল।

‘না, tete-a-tete। অবিনাশ আমাকে তার সঙ্গে  
খেতে বলেছে।’ জয়তী কথাগুলি একটুও নজর  
বলবার চেষ্টা করল না।

অনিতা তত্তপোশের ওপর গিয়ে বসল। একটি

কথাও আর বলল না। কতগুলি মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্র ছিল, সেগুলির প্রথম পাতা থেকে শেষ পর্যন্ত উল্টে গেল—কিন্তু সে উঠবে না বোঝা গেল। তখন দেড়টা বাজতে আর দেড়ী নেই। অবিনাশ সিঁড়ি উঠে এসে দেখে ছই নারী মৌন হয়ে একই ঘরে বসে আছে। তার আর বুঝতে বাকি রইল না ছুজনের মনের অবস্থা ঠিক কি রকম। তার কল্পনার অতীত এই দৃশ্য।

‘কিছু খেতে পাব তো?’ অবিনাশ মুহূর্তে হেসে প্রশ্ন করল, কেউ উত্তর দিল না। তিনজনে একত্রে বসে খেতে লাগল কিন্তু কারুর মুখ দিয়ে একটি কথা বেরুলো না। অনিতা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে স্থির করল। এদিকে অবিনাশকে কাজে ফিরে যেতে হল। জয়তী মনে করে এসেছিল আজ অবিনাশের সঙ্গে বসে মন খুলে গল্প করবে কিন্তু তার সে আশা খুলিসাং হ’ল। অবিনাশের ভাগ্যও সেদিন মন্দ—বন্ধুদের মধ্যে কলহ হয় তার ভাল লাগে না—বিশেষ করে জয়তীর সঙ্গে তার আবার মনোমালিন্য হবার আশঙ্কা দেখল। অনিতাও সরবে না, জয়তীও অবিনাশকে অনিতার সঙ্গে একা থাকবার স্ত্রযোগ দেবে না। অবিনাশ সেদিন শীঘ্র বাড়ী ফিরতে পারবে না আশঙ্ক করল। অনেক দেড়ী পর্যন্ত বসে বসে জয়তী অবশেষে জিনিস পত্র কিনতে বেরিয়ে গেল। রাস্তার আলোগুলি জলে উঠতে অবিনাশ বাড়ী ফিরল। ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি উঠছে বাড়ী চুপ চাপ দেখে নিশ্চিন্ত হল। দেখল কেউ নেই সেখানে। ধীরে ধীরে উঠে গেল এবং বসবার ঘরখানা নির্যাস অবস্থায় পেয়ে খুশী হ’ল। গলা থেকে ‘টাইট’ খুলে ফেলে জুতো জোড়া খুলতে শুরু করল। পায়ের আঙ্গুলগুলো বেশ কয়েকবার টানল। মোজা জোড়া দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—তক্তপোশের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে হাই তুলল। একেবারে একা স্বাধীনভাবে বিশ্রাম করতে পেয়ে বেন বেঁচে গেল। ক্রান্ত অবস্থাতে শুয়ে শুয়ে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল, কোথা থেকে জোলা হাওয়ার বেগ এসে সমস্ত

ঘরখানা ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল। ঘুমের ঘোরে অবিনাশ স্বপ্ন দেখছে, জয়তী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্রমাগত কি যেন বলছে—অনিতার প্রতি তীব্র ঈর্ষা সে তার দমন করে রাখতে পারছে না—অবিনাশ তাকে বলছে সে যেন ভুল না বোঝে—অনিতাও হুঃখ ভোলবার জন্যই আসে। অবিনাশ জয়তীর হাতখানা ধরে টানছে আর বার বার অন্তরোধ করছে ফিরে না যেতে। ঠিক এই সময় অবিনাশের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখে অনিতা একেবারে সামনেই দাঁড়িয়ে। হাত বাড়িয়ে তাকে টানছে আর বলছে—

‘ওঠ ওঠো অবিনাশ।

অবিনাশ এক লাফ দিয়ে উঠে বসল—‘স্বপ্ন এত বিপরীত হয়’—সে ভাবল। অনিতা কাছে এগিয়ে এসে অবিনাশকে বলল—

‘সোরাহীন এখানেই অপেক্ষা করছিলাম—জয়তী তো আমায় সহ্য করতে পারে না—সে চলে গেল তাই। আমি ভিতরের ঘরেই ছিলাম—সেখানে কেউ নেই দেখে ঘুমিয়ে ছিলাম। কিন্তু তুমি যে পাশের ঘরে এসেছ সে তো টের পায়নি? কখন এসেছ তুমি?’ অবিনাশ ভাবল খুব বেঁচে গিয়েছিল।

অনিতা অবিনাশের প্রেমের কাণ্ডাল। জয়তী উপস্থিত না থাকায় তার উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। অবিনাশের পাশে বসে তার হাত দুটি ধরল—‘নিতান্তই অসহায় করুণ মিনতি—অবিনাশ তাকে আর ফিরায়ে দিতে পারল না।

অবিনাশ আজ নিতান্তই বেকায়দায় পড়ল। অনিতার সমস্ত অনুরোধই সে মেনে নিতে বাধ্য হ’ল। তার স্বাভাবিক পৌরুষ নারীর মোহিনী মায়ায় সচেতন হয়ে ওঠা আর আশ্চর্য কি? অনিতা যেন তাকে মুহূর্তের জন্য হলেও আজ অতি খনিষ্ঠভাবে অতি নিকটে পেয়েছে, রাস্তায় অথবা তার বিজয়িনীর হাসি দেখা দিল—চোখ দুটি ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল—

‘জয়তী ফিরছে নাকি আবার?’

‘আশা করি সে আসতে পারবে। আমি অপেক্ষা

করাছি—।’ অবিবাহিত বেশ জোর গলায় উত্তর দিতে অনিতার মন ঈর্ষায় ভরে উঠল। জয়তী কেন অবিবাহিতের সঙ্গে চায় সে কিছুতেই বুঝতে পারল না— অবিবাহিতের দিকে ছলছল নয়নে তাকিয়ে বলল—

‘জয়তীর কিসের অভাব? সে কী চায় তোমার কাছে অবিবাহিত?’

অনিতা নিজের হৃদ্যাগোর কথাই বার বার অমুগ্ধ করে কিন্তু আর কারুর জীবনে যে কোন সমস্তা থাকতে পারে সে আর কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না।

মাহুকের মন এমনি অসুস্থ, অপরের দুঃখের কারণ খুঁজে দেখা তার পক্ষে নিতান্তই কঠিন। সাড়ে চটা বেজে গেল, চারিদিক অন্ধকার, অনিতা অবশেষে বিদায় নিল। অবিবাহিত আজ কিঞ্চিৎ শঙ্কিত। সে মহাসমস্তার মধ্যে পড়ল। অনিতার প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে পারল না—তার প্রেমকে উপেক্ষা করল না কিন্তু অবিবাহিত যা চায়নি তাই ঘটে গেল। সে নিজেকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করতে পারছিল না। স্থান করে কাপড় বদলে তৈরি হয়ে নিল—মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে চায়—বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে আহার করে তারপর বাড়ী আসবে এই স্থির করল। প্রায় মধ্য রাত্রে সে বাড়ী ফিরে গেল কিন্তু উপরে উঠতে তার তখনও যেন একটু ভয় করছিল। Bachelor-দের একা থাকাও নিরাপদ নয় এই ভাবছিল মনে মনে। অনিতাকে কিছুতেই এড়াতে পারে না।

সারারাত ছট-ফট করেছে বিছানায়। অবিবাহিতের মনের ভার নামেনি তখনও। সকাল হতেই জয়তীর আবেগ ভরা মুখখানা মনে পড়ল। টেলিফোনে গিয়ে তাকে ডাকতে জয়তী উত্তর দিল—

‘তোমার ওখানে আর যেতে ইচ্ছা করে না—আমি অনিতার সঙ্গে দেখা করতে চাই না।’

‘আমি কি করব?’ অবিবাহিত রাগ করে বলল।

‘যদি দেখা না করতে চাও সৎসাই তাকে এড়িয়ে চলতে পার’, বলল জয়তী। ‘তোমার না জানিয়ে সে যেন না আসে, এ কথা বলে দিলেই তো সব চুকে যায়।’

তার অল্প বন্ধুও তো আছে, সেখানেও তো মধ্যে মধ্যে যেতে পারে। ভুঁমি কি তার ভক্তবাহিকরত্নক?’ জয়তীর কথার মধ্যে আজ বিশেষ একটি অর্থ পাওয়া গেল—সে কিছু আর ঢেকে বলল না। নিজের সংসারে সে নানা বাধার মধ্যে নিতান্তই নীরস জীবন বাপন করে—অবিবাহিতকে সে খনিষ্ট বন্ধুর মতো আপন মনে করে কিন্তু তাই বলে সে অনিতাকে সহ্য করবে না। অবিবাহিত ও তার নিগূঢ় বন্ধুদের লীলাভূমিতে অনিতাকে সে প্রবেশ করতে দেবে না এ কথা অতি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল। অনিতার যে অবিবাহিতের উপর কোন দাবী থাকতে পারে না জয়তী ভাল করেছে ও অবিবাহিতকে জানতে দিল।

মুকুট মদের নেশা কিছুতেই ছাড়তে পারছে না— জয়তীর অমুরোধ, ৬৬’সনা, অভিমান, মনঃকষ্ট, কোনটাতেই যেন মুকুটের মন সাড়া দেয় না—সে অসুস্থ কণীর মত একটি বিশেষ বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়াল ডাক্তারের মানা সত্ত্বেও মুকুট কিছুতেই নেশা ত্যাগ করতে পারছে না। কাজে যখন মন দিতো মুকুট অতি নিখুঁতভাবেই কাজ করত—কিন্তু তার সাহ্য দিন দিনই ভেঙে যেতে লাগল। বন্ধুবান্ধব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, শিল্পীদের মধ্যে কানাদুখো চলতে লাগল— সন্ধ্যাবেলায় মুকুট মাহুকের মত থাকে না। প্রত্যহ সন্ধ্যায় একটি ঘরে তাকে প্রায় বন্ধ রাখতে হত। অতিথিরা যখন এসে কিছু প্রশ্ন করত জয়তীর মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠত চারিদিকে প্রচার করে দিতো হল মুকুটের পাকস্থলীতে বিশেষ রোগ হয়েছে, যন্ত্রণা ও ব্যাধার ভীতভায় সে শয়্যাগত। লোকের মুখে কৌতুকের হাসি দেখে, তাচ্ছিল্যের কথা শুনে জয়তীর সকল গর্ব যেন চূর্ণ হয়ে গেল। মুকুটের হাটের দুর্বলতা ক্রমশঃ উষ্ণের কারণ হয়ে দাঁড়াল। চায়ের পেয়ালা হাতে ধরে যখন কথা বলছে, হাত তার কাঁপছে, গলায় স্বরও অস্পষ্ট—

‘দেখো জয়তী, ঐ যে বিরাট প্রতিষ্ঠান নির্মাণ হচ্ছে, এই আমার স্বপ্ন রাস্তবে পরিণত হ’ল। কেবল একটা দুঃখ

রয়ে গেল—আমি এতদিনে লক্ষ্য করলাম তুমি এখনও সত্যানের মা হওনি।’ জয়তী বাধা দিয়ে বলল—

‘কেন তুমি হুংস করছ মুকুট? নিষেধাট না হয়ে কি হুজনে এত বড় কাজটা চালাতে পারতাম? কত দায়িত্ব নিয়ে এতদিন কাজ করেছ বল জো? আবার হেলেমেয়ের চিন্তা করতে হলে তোমার আর একটা রোগ হত।’

অনেক সংগ্রামের পর মুকুট ও জয়তী শিল্প-জগতে সাফল্য লাভ করেছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু বিবাহিত জীবনের সুখ তারা এক দণ্ডও উপভোগ করেনি। তাদের দাম্পত্য জীবনের বৈশিষ্ট্য কিছুই গড়ে ওঠে নি। গভীর শ্রুততার নীরব আত্ননাদ জয়তীর জীবনবীণায় একটা বেহুয়া রাগিণী হয়ে বেজেছিল—কোথায় যে সুর মিলাছিল না তাও সে খুঁজে পায়নি অথচ এই একটানা সুর সে আর যেন সহ করতে পারছিল না। কাজের নেশায় সে মেতে ছিল, কর্তব্যে ডুবে ছিল, কিন্তু বিবাহবন্ধনের নির্দিষ্ট প্রেমের প্রবাহ কোনদিন কি গুঁজে ছিল? সাফল্যই ছিল মুকুটের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এবং শিল্প জগতের রহস্য তার সব কিছুই জানা ছিল, তাই প্রতিযোগিতাকে সে কোনদিন ভয় করেনি। প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে রস গ্রহণ করা বা দৈনন্দিন জীবন থেকে সুখ সন্তুষ্টি খুঁজে দেখা মুকুটের অভ্যাস ছিল না—আত্মজ্ঞানহীন জীবন তার কাছে অর্থহীন ছিল বললেই হয়। মুকুট ছিল রঙ্গমঞ্চের পরিচালক, জয়তী বিধাপূর্ণ নায়িকা আর অবিনাশ প্রধান দর্শক। জয়তীর জীবনে দর্শকের প্রতাপই বিভিন্ন চিন্তার প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করেছে এবং তার মানসিক চেতনা নানাভাবে জাগিয়ে তুলেছিল। জয়তী না বুঝেই অগ্রপ্রাণিত হয়েছিল এবং কতটা যে অব্যাহত, তা সে নিজেই ঠিক অনুমান করতে পারে নি বলে মনে হয়।

দিল্লীর শুক দিনগুলি ক্রমশ খুঁরিয়ে আসছিল—খুলোর রুক খেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—দিল্লীবাসী বর্বার জল্প আকুল হয়ে আছে। কালবৈশাখীর কালে

মেঘ, আষাঢ়ের জলধারা, বাঙালীর মনে শত শত ভাবের ও উজ্জ্বল সৃষ্টি করে। অবশেষে এক পশলা রষ্টি পড়ে চারিদিক স্নিগ্ধ হল। দূর গ্রামের পাথে মধুর ও ময়ূরীরা নৃত্য করছে। পাখরের পাহাড়ের গা বেয়ে জল পড়ে যাচ্ছে—যেন জীর্ণ শীর্ণ বৃক্ষের করুণ অশ্রুধারা।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মুকুট বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়ল। বিকেল বেলা ‘দ্বিগন্তে’ আর আনন্দকোলাহল শোনা যায় না—সবই নিষ্পন্দ, প্রাণহীন। এই সুরাঙ্কত অঙ্গর গৃহে আজ জয়তী ও মুকুট একা হল। এখন আর মুকুটকে টেনে নিয়ে যাবার জর কেউ আসে না। এই বিষম আবহাওয়া কখনও কখনও জয়তীর অদৃষ্ট মনে হত। সুদীর্ঘ তিনমাস মুকুট শান্তিহীন অবস্থায় জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে তবু জয়তী অসীম ধৈর্য ও মানাসিক বলের পরিচয় দিল। সেবার তার আর কাউকে দিতে পারল না। মুকুটের বিরাট দেহ দিন দিন ক্ষীণ হয়ে পড়ছিল—বাকশান্তিহীন অবস্থায় সে পড়ে ছিল। জয়তীর মনে শত চিন্তা, সহস্র প্রশ্ন কন্টকের মত ব্যথা দাঁড়িয়ে—মুকুটকে সে এই রোগ থেকে রক্ষা করতে পারল না—শুণ্য মৃত্যুর নিরানন্দময় ছায়া যেন উভয়কে ঘিরে রেখেছিল।

পূজোর ছুটি শেষ হল। দেওয়ালির দিন এগিয়ে আসছে দীপাবলির শিখাগুলি যেদিন প্রাতবেশীদের গৃহ আলোকিত করল, জয়তী তখন মুকুটের পাঁড়িতে দেহের পাশে একাকী দাঁড়িয়ে। মুকুট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। রঙ্গমঞ্চের যবানিকা যেন অকস্মাৎ ভেঙে পড়ল। এতদিন সে জীবনের ক্ষয়লালা তিলে তিলে দেখেছে, রোগাক্রান্ত পুরুষের মনঃকষ্ট মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। সবদা সে মুকুটের কাছেই ছিল। আজ একেবারে একা—দ্বিগন্তের শেষ প্রান্তে কি?

দুঃসংবাদ পৌঁছতে দেবী হল না। বন্ধুমহলে সকলেই আশঙ্কা করেছিল মুকুট আর ভাষাবিক হয়ে কাজ করতে পারবে না—চারিদিকে আবার ভিড় জড়ো হল। গাড়ী লোক কথা সান্দ্রনাবাগী—এ যেন আর এক পর্ব যা জয়তী কোনদিন দেখতে চায় নি। নিঃশব্দে ঘরের ভিতরে

এক এক করে এসে সকলে দেখা করে গেল—জয়ন্তী নির্গাক কিন্তু নিঃসংশয়। মন তার যেন প্রস্তুত ছিল—এমনই একটা বিভীষিকা তার পিছনে পিছনে আসছিল—আজ সেই দৈত্য একেবারে সামনে এসে মুকুটকে তুলে নিয়ে গেল। এতদিন এরই প্রভাবে মুকুটের দিন কেটেছে কি ?

‘দিগন্তের’ সম্মুখে জনশ্রোত—জয়ন্তী নীরবে কৃতজ্ঞতা জানাল। সকলে সমবেত প্রার্থনা জানিয়ে যাচ্ছে। শীলা এসে পৌঁছল। সে নিমেষের মধ্যে সংযত হয়ে সমস্ত কণ্ঠব্যয় তার নিল। জয়ন্তী কদিন বিপ্রায় করতে বাধ্য হ’ল।

মিসেস সিং জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং অগ্রগোধ করলেন তাঁর সঙ্গে জয়পুরে যেতে।

‘আমায় কিছুদিন সব কাজ থেকে মুক্তি দিন তারপর দেশ গমনে যাব’ জয়ন্তী বলল। শিল্পজগতে জয়ন্তীর নাম হয়েছিল মুকুটেরই সাহায্যে—জয়ন্তীর সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা সে পূর্ণ করে দিয়ে গেছে। কিন্তু অতীত তার কাঁঁছিল বাইরের জগতের কাছে কিছুই কোনাঁদিন সে প্রকাশ করেনি। এক জেনোঁছিলেন রক্ত পিতা। তাঁর একমাত্র কন্যার জীবনের প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের কথা কেবল তিনিই বুঝেছিলেন শান্তা শুধু আনন্দের আভাস পেয়েছিল। মুকুটের মৃত্যুসংবাদ দেবানন্দের কাছে অপ্রত্যাশিত ভাবে আসেনি যদিও তবু প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল। নিঃস্বার্থ ভাবে জয়ন্তী তার সাধ্যমত সবই দিয়েছিল কিন্তু পেয়েছিল মর্মান্তিক শূন্যতা—নিত্য নতুন সংঘর্ষ।

\* \* \*

দেয়ালির উৎসবে দিল্লী শহর একটি বিশেষ রূপ ধারণ করে। এই মহোৎসব উপলক্ষে ধনী দরিদ্র উভয়েই আনন্দ করেছে দেখা যায়। চারিদিকে বাজী পোড়ানো

চলছে, সাহায্যে ভুবড়ীর আওয়াজে ঘুম হয় না—পানের দোকান, কুঁড়ে ঘর, রুগীর ঘর, বিরাট অট্টালিকা, সরকারী প্রাসাদ, সকল স্থানেই আলো জালিয়ে রাখা হয়, কোথাও রঙিন আলো, কোথাও লণ্ঠন, কোথাও প্রদীপ, কোথাও মোম বাতি। মিঠাইয়ের দোকানগুলি বরফি ও বাদামে ভরে ওঠে, কত রকমের চাঁচ, কত রকমের রং। দোকানগুলিতে রোড়ও এমনই উচ্চসুরে বাজতে থাকে যে কান প্রায় ফেটে যায়—কথা বলা বা শোনা কিছুই সম্ভব হয় না। পাড়াপড়শী অশ্রুত একবার দাঁড়িয়ে ঐ বিকটসুরের গীত ও বাদ্য শুনে যায়—সকলের মাঝখানে নিজের পরিচয় দিতে সৌন্দর্য ভালই লাগে—নিবিড় আলিঙ্গন, হাসি, ও কৌতুক। নতুন জামা কাপড়, জুতো, ট্রাপ পরে সকলে ঘুরে বেড়াচ্ছে; শিশু, কিশোর, যুবক, প্রবীণ, বৃদ্ধ, সকলেই ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে আলো দেখছে—সুসজ্জিত দোরান দেখছে। ফুলফুলিতে কাকর হাত জলে গেল—ভীষণ কান্না—আবার পট্কার আওয়াজে সকলে চমকিয়ে গেল—শিশু ও মুহুর্তের মধ্যে কান্না হলে গেল। প্রকাণ্ড পাগড়ী পরা মিঠাইওয়ালী তার গোসে চাড়া দিয়ে বলে উঠল ‘খুশ রহো বেটা।’

জয়ন্তীর গৃহে আজ নিবিড় অন্ধা। শীলা জয়ন্তীকে কলকাতা নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত—দেবানন্দ উদ্গ্রীব হয়ে আছে জয়ন্তীর জন্য কিন্তু দিগন্তের ঘরদোর না গাছয়ে জয়ন্তী দিল্লী ছাড়বে না। শীলা আঁবনাশকে অগ্রগোধ করল সে যেন জয়ন্তীকে সাহায্য করে এবং শীঘ্র কলকাতায় রওনা করিয়ে দেয়। হৃদয় পথ আঁবনাশকে প্রজ্ঞা যাতায়াত করতে হবে—তবু সে জয়ন্তীকে সাহায্য করবে কথা দিল।

ক্রমশঃ

# কংগ্রেস স্মৃতি

( সপ্তাব্দিংশ অধিবেশন—গয়া—১৯২২ )

## শ্রীগিরিজামোহন সাত্তাল

(১২)

৩০শে ডিসেম্বর বেলা ১টায় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট ছিল। সভাপতি মশায় সময়মত উপস্থিত না হওয়ায় পণ্ডিত যাঁতলাল নেহেরু সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, সভাপতি মশায় তাঁর অস্থূর্ণাহিততে তাঁকে (পণ্ডিতজিকে) কার্য পরিচালনার কথা বলেছেন।

এদিনকার দর্শকদের সংখ্যা অনেক কম ছিল। অধিবেশন দীর্ঘ হওয়ায় অনেক দর্শক ও কতক প্রতিনিধি গয়া ত্যাগ করে ঘেঁষে চলে গিয়েছিলেন।

সভার কার্য শুরু হওয়ার প্রাকালে কুমারী ভায়েবজী একটি সঙ্গীত গাইলেন। তারপর কয়েকজন বাঙালী বালক ও বালিকা শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণীর “মহাসভা উন্মাদিনী মম বাণী গাহ আজি হিন্দুস্থান” সমবেত কণ্ঠে গাইলেন। তারপর শ্রীমতী সরস্বতী দেবী একটি গান গাইলেন।

যখন কুমারী ভায়েবজী গান চলছিল তখন সভাপতি দেশবন্ধু দাশ সভাগৃহে প্রবেশ করে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

গান সমাপনান্তে সভার কার্য আরম্ভ হল।

প্রথমেই সভাপতির নির্দেশে দীপ নারায়ণ সিংহ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দুটি প্রস্তাব উপস্থিত করে বাঙলার জুয়োগ্য সম্ভান মতিলাল ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক) ও ফরিদপুরের প্রবীণ নেতা লক্ষ্মী কংগ্রেসের

ভূতপূর্ণ সভাপতি অম্বিকা চরণ মজুমদারের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করলেন।

প্রস্তাব দুটি সকলে দণ্ডায়মান হয়ে পাশ করলেন।

তারপর পূর্ণদিনে উপস্থিত রাজগোপালাচাৰ্যীর প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হল।

শ্রীনিবাস আয়েজার একটি সংশোধন প্রস্তাব পেশ করে বললেন যে তাঁর প্রস্তাবটি উভয়পক্ষের মধ্যে আপোষে সহায়তা করবে। তিনি সকলকে সান্নিধ্য অনুরোধ করলেন যে তাঁরা যেন তাঁর আপোষের প্রস্তাব গ্রহণ করে দলের ভাঙ্গন রোধ করেন।

সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে যেহেতু ১৯২০ সালের কাউন্সিল নিৰ্বাচনে সমগ্র দেশের অধিকাংশ লোক ভোট না দেওয়া সত্ত্বেও অনেক ভারতীয় নিকৃদের নিৰ্বাচিত হতে দিয়েছেন এবং নাগপুর কংগ্রেসের উপদেশ সত্ত্বেও তাঁদের পক্ষে ইচ্ছা দেন নি, যার ফলে যদিও নূতন কাউন্সিলগুলি দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে না তথাপি সেগুলিকে গভর্ণমেন্টের ক্ষমতা যা কংগ্রেস অবসান করতে সম্মত নিয়েছে, সেই ক্ষমতা দূরীভূত করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে অতএব এই কংগ্রেস ১৯২০ সালের অপেক্ষা কাউন্সিল বয়কট বেশী ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে সকল নির্বাচনকারীকে কংগ্রেসের সদস্যদের পক্ষে (যারা নির্বাচিত হলে কাউন্সিলে কোন অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন) ভোট দিতে আন্তরিক ভাবে উপদেশ দিচ্ছে।

পাঞ্জাবের কুমারী লক্ষাবতী হিন্দিতে এবং দীপ নারায়ণ সিংহ হিন্দি ও ইংরেজি উভয় ভাষাতে এই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

বিজয়রামবাচারী মশায় মূল প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব তুলনামূলক সমালোচনা করে মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

বিজয়রামবাচারী মশায় আসন গ্রহণ করার পর পঞ্জাবের আবদার রহমান গাজী রাজাগোপালাচারীর প্রস্তাবের আলোচনা মূলতঃই রাখার জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। ভোটদ্বারা মূলতঃই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

তারপর পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু আর একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

এই সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে যেহেতু কাউন্সিলের প্রথম বারের কার্য-কলাপ খিলাফত ও পাঞ্জাবের অভ্যুত্থানের প্রতিকারে এবং দ্রুত দরাজ অর্ডনের বাধা স্বরূপ হওয়া ছাড়াও দেশের জনগণের অতিশয় দুঃখ ও কষ্ট পটিয়েছে এবং যেহেতু অহিংস অসহযোগের নীতি অনুসারে অত্যাচারের পুনরারম্ভ অবসানের জন্য পক্ষা অবলম্বন বাহুল্যীয় অতএব এই কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যে, আইন অমান্ত ও দণ্ড কার্যকারিতার বিরোধিতার পারপ্রোক্টিতে পাঞ্জাব ও খিলাফতের অত্যাচার প্রতিকার এবং অবলম্বন দরাজ অর্ডনের প্রসঙ্গে অহিংস অসহযোগের নীতি অনুসারে কাউন্সিল নিষাচনে প্রাতিদ্বন্দ্বিতা করে তাতে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভের জন্য সদপ্রকার চেষ্টা করা হোক এবং এই কংগ্রেস আরও প্রস্তাব করছে যে, ১৯২৪ সালে জাভহারী মাসের প্রথম দিকে নতুন কাউন্সিলের আধিবেশন ৩ওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩০ সালের কংগ্রেসের আধিবেশন ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহের পরিবর্তে প্রথম সপ্তাহে করা হোক এবং অবস্থা বিবেচনায় এই বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত নির্দেশের জন্য কংগ্রেসের নিকট পুনরায় উপস্থিত করা হোক।

প্রস্তাব উপস্থিত করে পণ্ডিতজি বললেন যে তিনি অসহযোগে পূর্ণ বিশ্বাস বজায় রেখেছেন এবং শত্রু

নিকট মাথা নত না করে পরিচ্ছন্ন অন্ত্রদ্বারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি কাউন্সিলে প্রবেশের বিরোধী কিন্তু নিষাচনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলে কাউন্সিল বয়কট আধিক্যের সাফল্যমণ্ডিত হবে। তিনি আরও জানালেন যে তাঁর প্রস্তাব আয়েজার মশায়ের প্রস্তাব অপেক্ষা ভাল কারণ তাঁর প্রস্তাবে এক বৎসরের পরে তৎকালীন অবস্থার পারপ্রোক্টিতে কংগ্রেস প্রার্থী কোন কর্মসূচী গ্রহণ করবে তার ব্যবস্থা আছে। আয়েজার মশায়ের প্রস্তাবে পূর্ব থেকে নীতি হিংস করা হয়েছে।

ময়নাদাস মেহেতা পণ্ডিত নেহেরুর সংশোধনী প্রস্তাব ইংরেজিতে খুব জোড়ালো ভাষায় সমর্থন করলেন।

সি এস রঙ্গ আয়ার আয়েজার মশায়ের সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংশোধনী প্রস্তাবগুলির বিরোধিতা করে বললেন যে তিনি আপোসের প্রস্তাবের কোন উপকারিতা দেখেছেন না, তিনি বুঝতে পারেন না কাউন্সিলের সমস্ত আসনভাল দখল করলেও কি করে গভর্ণমেন্টকে পঙ্খ করা যায়।

শ্রীপ্রকাশ (কাশীর বাবু ভগবান দাসের পুত্র এবং পরবর্তীকালে গাধাম ভারতে নেহেরু গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী ও কয়েকটি রাজ্যের গভর্ণর) আয়েজার মশায়ের প্রস্তাব সমর্থন করে কংগ্রেসকে দলের মধ্যে ভাঙ্গন বন্ধ করতে মানস্ক আবেদন জানালেন।

পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়া তারপর দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বললেন যে অভ্যুত্থানের উদ্ভাদ গতি রোধ করা, মহাত্মা গান্ধী ও অত্যাচার নেতাদের কারাগার থেকে মুক্ত করা, গভর্ণমেন্টের কর্মচারী ছাঁটাই করে ব্যায় ভার লাঘব করা করদাতাগণের করের বোঝা কমানোর জন্য কাউন্সিলে প্রবেশ দেশের পক্ষে কল্যাণজনক হবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে কংগ্রেসের সদস্য কাউন্সিলে গরিষ্ঠতা লাভ করবে এবং গভর্ণমেন্টের কার্য নিয়ন্ত্রণ



করতে সমর্থ হবে। তিনটি প্রস্তাবের মধ্যে তিনি পণ্ডিত মতিলালের প্রস্তাব সুপারিশ করলেন।

বিতর্কের উত্তর দিতে উঠে রাজাগোপালাচারী মশায় বক্তৃতা মঞ্চের দিকে অগ্রসর হতেই সভার অধিকাংশ সদস্য মুহূর্তে ‘মহাত্মা গান্ধী কি জয়’ ধ্বনি দ্বারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। ‘সভাগৃহ নিস্তব্ধ হলে রাজাগোপালাচারী মশায় তাঁর স্বভাবাসিদ্ধ ধীরস্থির ভাবে বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তি খণ্ডন করে প্রতিনিধিদের তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য আহ্বান করলেন।

তাঁর বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর প্যাণ্ডেল থেকে প্রতিনিধি ব্যতীত অন্ত সকলকে বাইরে যেতে বলা হল, সভাগৃহে তখন মাত্র প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকলেন। ভোট গ্রহণের পর দেখা গেল যে আয়েজার ও পণ্ডিত নেহেরুর সংশোধনী প্রস্তাব-দুটি বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হল। রাজাগোপালাচারীর প্রস্তাব গৃহীত হল।

তারপর সোম্বিনের মত কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হল। স্থির হল যে পরদিন ৩১শে ডিসেম্বর বেলা ২টার সময় কংগ্রেসের শেষ দিনের অধিবেশন হবে।

( ১৩ )

৩১শে ডিসেম্বর বেলা ২টার কংগ্রেসের শেষ অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট ছিল। এদিনেও সভাপতি মশায় সময়মত না আসায় ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি বিজয়রামবাচারিয়া মশায় সভাপতির আসন গ্রহণ করে বললেন যে দাস মশায় এখনও আসেন নি কাজেই তিনি এখন সভার কাজ চালিয়ে যাবেন।

পূর্বদিনের মত এদিনও কুমারী ভায়েবজী তাঁর সঙ্গীত দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করলেন। তারপর একদল বাঙালী তরুণ তরুণী সমবেত করে একটি জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন। তারপর শ্রীমতী সরস্বতী দেবী ও নানাভাই উপাধ্যায় তাঁদের সঙ্গীত দ্বারা সকলকে আপ্যায়িত করলেন।

সঙ্গীতের পর বিজয় রামবাচারিয়া মশায় দীপনারায়ণ সিংহকে পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য আহ্বান করলেন।

দীপনারায়ণ সিংহ নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করলেন :—

যেহেতু কংগ্রেস মনে করে যে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি এবং তাদের স্বাধীনতার বৃদ্ধি এবং তাদের জাতীয় অধিকার আদায়ের জন্য—এবং ভারতীয় শ্রমিক ও ভারতীয় কামাচাল তাদের কাজে লাগানো (exploitation) বন্ধ করার জন্য ভারতীয় শ্রমিকদের সংগঠন করা কর্তব্য অতএব এই কংগ্রেস অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং অন্যান্য কিম্বা সভাগুলি দ্বারা ভারতীয় শ্রমিকদের সংযুক্ত করার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্য্য নির্বাহক কমিটিকে ভারতীয় শ্রমিক সংস্থা গঠনে সাহায্য করার জন্য ‘কোঅর্ডেট’ করার ক্ষমতা সহ নিম্নলিখিত সদস্যগণকে নিয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করছে :—

সি এফ এনড্রুস, যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত, হুরেন্দ্রনাথ হালদার, স্বামী দীনানন্দ, ডাঃ ডি ডি সাহে, শ্রদ্ধার ভেলু কেটিয়ার ও ই, এল, আয়াব।

কে ডি শাস্ত্রী ও বিহারের কে পি এন সিংহ এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

শ্রদ্ধার ভেলু কেটিয়ার নিজেকে কমিউনিষ্ট বলে পরিচয় দিয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণের জন্য সকলের নিকট আবেদন করলেন।

সবসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইল। উপরোক্ত প্রস্তাব আলোচনার সময় সভাপতি মশায় শোভাযাত্রা সহ প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে সভাপতির আসনে উপবেশন করলেন।

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, গভর্ণমেন্ট এবং গভর্ণমেন্টের শিক্ষায়তনগুলি বয়কট সম্বন্ধে কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে উক্ত বয়কট বজায় রাখতেই হবে এবং আরও প্রস্তাব করছে যে বর্তমান জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দৃষ্ট আর্থিক ভিত্তির উপর স্থাপন এবং সর্বপ্রকার উপায়ে

তাদের দক্ষতার উন্নতি করতে প্রত্যেক প্রদেশকে আহ্বান করছে।

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থাপক কে পি এন সিংহ।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস ঘোষণা করছে যে আইনজীবীগণ ও মামলার পক্ষগণ কর্তৃক আদালত বয়কট বজায় রাখতে হবে এবং আরও ঘোষণা করছে যে পক্ষায়েত স্থাপন এবং তার স্বপক্ষে জনমত গঠন করার জগৎ অধিকতর চেষ্টা করতে হবে।

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

এরপর বসন্তকুমার মজুমদার কংগ্রেসের মূলনীতি (ক্রীড) পরিবর্তনের জগৎ একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন। বসন্তবাবু বিষয় নির্বাচনী সমিতির সভায় এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছিলেন কিন্তু সেখানে তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়েছিল। তখন বসন্তবাবু নোটিশ দিয়েছিলেন যে তিনি প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রস্তাব উপস্থাপিত করবেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হচ্ছে সবপ্রকার সত্ত্ব ও উপযুক্ত উপায় দ্বারা ভারতের জনগণ কর্তৃক স্বরাজ অর্জন অর্থাৎ সর্বপ্রকার বৈদেশিক সম্পর্কহীন পূর্ণ-স্বরাজ অর্জন।

প্রস্তাব সমর্থন করলেন শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য।

রাজাগোপালাচাৰী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে উঠে বললেন যে বর্তমান ক্রীডে উভয় মতেরই স্থান আছে। এতে পূর্ণ স্বাধীনতা অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্বাধীনতা উভয়ই বোঝায়। পছন্দ স্বাক্ষর বললেন শান্তিপূর্ণ পথেই আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

পণ্ডিত সুরেন্দ্রলাল এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হিন্দীতে বললেন। তিনি জানালেন যে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে কিন্তু ক্রীড বদলের পূর্বে তাঁদের ক্ষমতা সন্নিবিষ্ট হতে হবে।

কজলুল রহমান প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

ভোট দেওয়া হলে “মহাত্মা গান্ধীজীক জয়” ধ্বনির মধ্যে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

পরবর্তী প্রস্তাব আনলেন রাধাকৃষ্ণ ভার্গব। তাঁর প্রস্তাবে কংগ্রেসের সংবিধানে ষ্টেমাসের ছুটি শব্দের পরিবর্তে “টেক্স গুপ্ত পক্ষ” গ্রহণ করার কথা ছিল।

স্বামী ভাস্করানন্দ প্রস্তাব সমর্থন করলেন এবং বিরোধিতা করলেন হরি সর্গোত্তম রাও ও পণ্ডিত নরসিংহ শর্মা।

ভোটে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

তারপর রাজাগোপালাচাৰী নিম্নলিখিত প্রস্তাব পেশ করলেন :—

যেহেতু অর্থোক্তিক সাময়িক ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয়-বাহন্য দ্বারা গভর্ণমেন্ট জাতীয় ঋণ পরিশোধ করার সীমা অতিক্রম করেছে এবং যেহেতু যে-সকল তথাকথিত নির্বাচিত বিধানসভা যা অধিকাংশ ভোটার অথবা তাদের বিশিষ্ট অংশের অসমর্থনে গঠিত আছে এবং এই সকল বিধান সভা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করছে না এ স্বাক্ষর স্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও গভর্ণমেন্ট গেই সকল বিধান সভাগুলির ক্ষমতার আড়ালে এরূপ নীতি এখনও অনুসরণ করছে এবং যেহেতু—গভর্ণমেন্টকে যদি এই নীতি চালিয়ে যেতে দেওয়া হয় তা হলে ভারতের জনগণের পক্ষে সম্মানে তাদের স্বত্ব ও স্বাধীন্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে কাজ চালানো অসম্ভব হবে এবং সেইহেতু এই প্রকার দায়িত্বহীনতার প্রতিরোধ করা প্রয়োজন অতএব এই কংগ্রেসে জাতীয় বয়কট সত্ত্বেও গভর্ণমেন্ট কর্তৃক যে সকল বিধানসভা গঠিত হয়েছে বা পরে হবে সেগুলির জাতীয় ঋণ গ্রহণ অথবা কোন দায় স্থিতি করার ক্ষমতা অস্বীকার করছে এবং পৃথিবীর সকলকে জানিয়ে দিচ্ছে স্বরাজ অর্জনের পর ভারতের জনগণ এখন পর্যন্ত যে সকল ঋণ বা দায় গভর্ণমেন্ট দ্বারা বা অন্যান্যভাবে গ্রহণ বা স্থিতি করেছে সেগুলির জন্ত দায়ী থাকবে কিন্তু এই তারিখের পর জাতীয় বয়কট সত্ত্বেও গঠিত তথাকথিত বিধান সভাগুলির ক্ষমতা বা অনুমোদনের বলে যে-সকল

রণ গ্রহণ বা স্থিতি করা হবে তা শোধ করতে বা দায়মুক্ত হতে বাধ্য থাকবে না।

পদ্মদাস জৈন এই প্রস্তাব হিন্দীতে সমর্থন করলেন।

লালা হুনীচাঁদ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দিলেন।

বিজয় রায়বাচারিয়া একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে বললেন যে রাজাগোপালাচারীর প্রস্তাব বিবেচনা করে আগামী কংগ্রেসের পূর্বে রিপোর্ট দাখিল করার জন্য অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির উপর ভার দেওয়া হোক।

বল্লভভাই প্যাটেল এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

রাজাগোপালাচারী এই সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে বললেন যে তিনি পরবর্তী কংগ্রেস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে প্রস্তুত আছেন।

তখন তাঁর সম্মতি ক্রমে মূল প্রস্তাব সংশোধিত হয়ে গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন অরুণ ভায়েবজী।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস পুনরায় অভিমত প্রকাশ করছে যে যখন স্বেচ্ছাচারী সৈরাচারী এবং মনুষ্যত্বহানিকর ক্ষমতা প্রয়োগের প্রতিরোধে সমস্ত উপায়ই ব্যর্থ হয়েছে তখন সশস্ত্র বিপ্লবে পরিবর্তে আইন অমান্য একমাত্র সুসভ্য ও ফলপ্রসূ পথ এবং অবিলম্বে স্বরাজের আবশ্যিকতা সন্থা জনগণের সন্থাপী জাগরণ ও জাতীয় লক্ষ্যে ক্রান্ত পৌছানোর জন্য আইন অমান্যের দাবি ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সদ প্রকার প্রয়োচনা সত্ত্বেও অহিংসার আবহাওয়া বজায় রাখার পরিপ্রেক্ষিতে এই কংগ্রেস কর্মীকে জাতীয় সংঘটনগুলি প্রসার ও শক্তিশালী করে—এবং গয়ায় অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দিনের মধ্যে তিলক স্বরাজ্যফাণ্ডের তহবিলে অন্ততঃ পক্ষে ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করে এবং আমেদাবাদের প্রাক্তজ্ঞাপত্রের শর্তানুসারে ৫০,০০০ স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত করে আইন অমান্যের প্রস্তুতি পূর্ণাঙ্গ করতে আহ্বান করছে। এবং এই প্রস্তাব কার্য-

কর করার জন্য অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস-কমিটিতে আবশ্যিকীয় নির্দেশ দিতে ক্ষমতা দিচ্ছে।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু একটি হুন্দর ভাষণ দ্বারা এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

বসন্তকুমার মজুমদার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নির্দেশানুসারে অবিলম্বে আইন অমান্য আন্দোলন করার জন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করেন।

ফজলুল রহমান একটি সংশোধনী প্রস্তাব দ্বারা ৩ মাসের মধ্যে আইন অমান্যের প্রস্তুতি সমাপ্ত করতে বললেন।

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

কে শাস্তানন্দ এবং দিল্লীর গুরুবক্স সিং হিন্দীতে মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

তারপর এটোয়ার বাবু রাম শর্মা একটি সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত করলেন।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস জোরের সঙ্গে অভিমত প্রকাশ করছে যে ব্রহ্ম আকারে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় উপস্থিত হয়েছে এবং যেহেতু যুক্ত প্রদেশ ও আসাম, সংশোধিত ফৌজদারি আইন যেখানে এখনও (Criminal Law Amendment Act) বলবৎ আছে, ব্রহ্ম আকারে অবিলম্বে বাস্তবগত আইন অমান্যের উপযুক্ত ক্ষেত্র অতএব এই-কংগ্রেস প্রস্তাব করছে যেন অবিলম্বে সমগ্র ভারত থেকে বিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে যুক্ত প্রদেশ ও আসামে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির নির্দেশানুসারে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করা হোক এবং প্রত্যেক প্রদেশ তার লোকসংখ্যার অনুপাতে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণা করুক।

আরও প্রস্তাব করা হচ্ছে উপরোক্ত বিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে মধ্যে চার হাজার আসামে এবং বোল হাজার যুক্ত প্রদেশে নিযুক্ত করা হোক।

শিবনারায়ণ উর্দুতে এই সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

কৃষ্ণকান্ত মালবায় এ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে উপদেশ দিলেন।

সিদ্ধ প্রদেশের কাজী আবদুর রহমান মূল প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

এরপর শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রস্তাবগুলির উপর ভোট নিতে অতি সুন্দর অভিজ্ঞতা দিলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি বললেন যে যদি আগামী কালই অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি নির্দেশ দেয় তা হলে সকলে আন্দোলনের সহিত আসাম ও যুক্ত প্রদেশে যাবেন এবং অবস্থা অসুস্থ হলে সকলেই এর জন্য প্রস্তুত আছেন।

প্রথমে তিনি বাবুরাম বর্মার সংশোধনী প্রস্তাবের উপর ভোট নিলেন। ভোটে বর্মার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

অনুরূপ ভাবে ফজলুল রহমান ও বসন্তকুমার মজুমদারের প্রস্তাব-হুঁটও অগ্রাহ্য হল।

ভারতের সবসম্মতিক্রমে মূল প্রস্তাব গৃহীত হল।

উপরোক্ত প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর শ্রীমতী নাইডু জানালেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী তামিল নাড়ুর সম্মানেরা আইন অমান্য আন্দোলন ফাণ্ডের জন্য ১১০ টাকার একশানি চেক পাঠিয়েছেন এবং ঐ ফাণ্ডে তায়েবজী সাহেব ১০০০ টাকা ও কুমারী তায়েবজী ৫০০ টাকা দান করেছেন। তায়েবজী সাহেব, ভিলক স্বাধীন ফাণ্ডেও ১৫০০ টাকা দান করেছেন। আরও অনেকে অনেক টাকা দিয়েছেন। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ১০০০ টাকা দিয়েছেন।

পরবর্তী প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন—রাজাগোপালাচারী।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে কংগ্রেসের কাজ করার সময় ছাড়া এবং যে ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে হিংস্রতার প্রকাশ হতে পারে সেইরূপ ক্ষেত্র ছাড়া অসহযোগীগণ আইনের সীমার মধ্যে আত্মরক্ষা করতে পারবেন।

প্রকাশ থাকে সদুদ্দেশ্যে যথা ধর্মের অবমাননা, স্বাধীনতার স্বাধীনতা হানি এবং বালক ও পুরুষের উপর অশ্লীল আক্রমণের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য বল প্রয়োগ করা কোন অবস্থাতেও নিষিদ্ধ নয়।

যথারীতি সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

এরপর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিয়মিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করলেন :—

নিকট প্রাচ্যে খিলাফতের এবং তুর্কী গভর্নমেন্টের ঐক্যের গুরুতর শঙ্কাজনক অবস্থার-পরিপ্রেক্ষিতে এবং এর প্রতিরোধের জন্য হিন্দু-মুসলমান ও অন্য সকলের দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিপ্রেক্ষিতে এই কংগ্রেস প্রস্তাব করেছে যে খিলাফৎ ওয়ার্কিং কমিটির সহিত পরামর্শ করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই রকম অন্যান্য কাজে ভারতকে ব্যবহারের পথে বাধা দেওয়ার জন্য এবং পার্শ্বাতি অসুযোগী কাজ করার জন্য হিন্দু-মুসলমান ও অন্য সকলকে সংযুক্ত হতে হবে।

বোম্বাইয়ের ক্ষেত্রী মশায় সমর্থন করার প্রস্তাব গৃহীত হল।

পরবর্তী প্রস্তাব পেশ করলেন রাজাগোপালাচারী মশায়।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এই কংগ্রেস প্রস্তাব করেছে যে নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস কমিটি কেপ টাউন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ভারবানের জয়েন্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে ১০ জন প্রতিনিধি পাঠানোর ক্ষমতা সহ কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। প্রতিনিধিদের সংখ্যা তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে এবং সে সম্বন্ধে অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির নিকট রিপোর্ট করবে।

এই কংগ্রেস আরও প্রস্তাব করেছে যে দুজন প্রতিনিধি পাঠানোর ক্ষমতাসহ কাবুল কংগ্রেস কমিটিকেও কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

যথারীতি সমর্থিত হয়ে প্রস্তাব গৃহীত হল।

এরপর একটি প্রস্তাব দ্বারা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, ডাঃ এম্ এ আনসারী ও সি রাজাগোপালাচারীর স্থলে আগামী বৎসরের জন্য মোজ্জাম আলী, বল্লভ ভাই প্যাটেল ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হল।

সভাপতি মশায় উঠে বিদায়ী সম্পাদকগণকে তাঁদের কার্যের জন্য কৃতজ্ঞতা পূর্ণ ধন্যবাদ দিলেন।

তারপর নাগেশ্বর রাও অন্ধপ্রদেশে আগামী কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন।

একটি প্রস্তাব দ্বারা আগামী অধিবেশন অন্ধপ্রদেশে হাওরা হির হল। অধিবেশনের স্থান পরে নির্দিষ্ট হবে।

সভার কার্য শেষ হওয়ার পর—অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে দাঁড়ালেন ভাগলপুরের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও সুবক্তা,—দীপ নারায়ণ সিংহ। তিনি অনবস্ত ভাষায়—সভাপতির নানাবিধ গুণকীর্তন করলেন। জাতির সম্মান বজায় রাখার জন্য এবং যোগ্যতা ও মর্যাদায় সাহিত সভার কার্য পরিচালনার জন্য সভাপতিকে আবেগপূর্ণ ভাষায় ধন্যবাদ দিয়ে বললেন দাশ সাহেব দেশের গৌরব বলে স্বীকৃত হবেন।

তারপর তিনি প্রতিনিধিগণকে—সেচ্ছাসেবক বাহিনীকে, গয়া মিউনিসিপালটি ও গয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে এই জাতীয় কাজে সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

দীপনারায়ণ সিংহ মশায় আসন গ্রহণ করার পর সভাপতি মশায় তাঁর বিদায়ী অভিভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। তিনি বক্তৃতা মঞ্চের দিকে অগ্রসর হতেই সববেত প্রতিনিধি ও দর্শকগণের প্রবল হর্ষধ্বনি ও “দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কি জয়” ধ্বনিদ্বারা সম্বর্জিত হলেন।

অভিভাষণ দেবার প্রাকালে তিনি বললেন যে তাঁর স্বরভঙ্গ হয়েছে অতরাং তাঁর নিকট থেকে শ্রোতারা বক্তৃতা আশা যেন না করেন।

তিনি বললেন যে কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তার জন্য নিজেকে ও প্রতিনিধিগণকে অভিনন্দন জানাতে পারলে তিনি সুখী হতেন। তারপর তিনি বললেন যে বিরাট মতভেদ সত্ত্বেও প্রতিনিধিগণ আশ্চর্য্য ভাবে ধৈর্য্যের সহিত সভার কার্য পরিচালনা করতে দিয়েছেন তার জন্য তিনি হৃদয়ের অন্ততল থেকে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। যদিও অধিকাংশ প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর মতের পার্থক্য রয়েছে তথাপি তিনি আশা ছাড়েননি। তিনি বললেন যে—এমন একদিন আসবে যেদিন তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন লাভ করতে পারবেন। তিনি বললেন যে পরস্পরের মতের প্রতি কি ভাবে অন্ধা প্রদর্শন করতে হয় তা তাঁরা শিখেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে আশান্ত দৃষ্টিতে তাঁদের মধ্যে বিরোধ দেখা গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা এক সঙ্গে আছেন। এক বিষয়ে তাঁরা সকলেই একমত যে ক্রম স্বরাজ অর্জনের জন্য কোন কার্যই তাঁদের বিচ্ছেদ করতে পারবে না এবং তাঁরা সকলেই অচিৎস অসহযোগ নীতিতে বিশ্বাস করেন।

পরিশেষে তিনি প্রতিনিধিদের ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মশায়কে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বিশেষ করে ধন্যবাদ দিলেন সেচ্ছাসেবকগণকে।

তারপর ‘বন্দে মাতরম্’ ও ‘জয় জয়’ ধ্বনির মধ্যে অধিবেশন সমাপ্ত করলেন।

ক্রমশঃ



# প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাধনা প্রসঙ্গে রামমোহন রায়

বিজ্ঞাননাথ ঠাকুর

...বুদ্ধদেব এবং তাঁহার পুণ্ড্র উপনিষদ্-প্রণেতা  
ঋষিগণ কৃত্রিম কৰ্মকাণ্ডের পেয়ণযন্ত্র হইতে লোকদিগকে  
উদ্ধার করিবার জন্য পরাকাষ্ঠা তপস্বী এবং ত্যাগস্বীকার  
করিয়াছিলেন। কিন্তু নব্য হিঁদুয়ানির আপনি-মণ্ডল  
মহোদয়েরা, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ পর্যাস্ত জানেন  
না, তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রকে দিব্য একটি সরস নারিকেল  
পাতিয়া—তাঁহার শাঁস কোন কাজের হইল না, জল কোন  
কাজের হইল না—তাঁহার গাজ হইতে রাশি রাশি  
ছোবড়া সংগ্রহ করিতেছেন, আর, তাহারই দাঁড়  
পাকাইয়া দেশের লোকের হাত-পা বাঁধিবার কঠিন বন্ধন  
প্রস্তুত করিতেছেন। এমনি আড়ম্বরের সহিত তাহা  
করিতেছেন যে, দেখিলে মনে হয়—কত না জ্ঞান  
দেশের উপকার সাধন হইতেছে। টিকিহীণ মস্তকে টিকি  
গজাইতেছে, কঁটাহীন লالاটে কঁটা আবির্ভূত  
হইতেছে, বিলাতফেড়ীয়া গোবর খাইয়া তাঁহার প্রথম  
অঙ্কুর দিয়া মুখ শোধন করিতেছেন—দেশের উপকার  
ইহা অপেক্ষা অধিক আর কী হইতে পারে? ইঁহারা  
এই এতগুলো ব্যক্তি, আর জন্মিয়াছিলেন রামমোহন রায়  
একাকী একজন—দোঁহার ইঁরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর কার্য  
তুলনা করিয়া দেখিলে কী মনে হয়? মনে হয় যে—  
অসংখ্য তপস্বীরা তুপাকারে সজ্জিত হইলেও তালগাছের  
মস্তক নাগাল পায় না। যে কারণে প্রাচীন ভারত  
বুদ্ধদেবকে চিনিলা না, ইহুদীরা ঈশাকে চিনিলা না,  
সেই কারণেই রামমোহন রায়ের স্বাতি তাঁহার প্রিয়  
কন্যাভূমিকে ছাড়িয়া ইউরোপ আমেরিকার হৃদয়ভ্যন্তরে  
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এরূপ হইবে তাহাতে আর

আশ্চর্য্য কী? তাঁহার বিশ্বব্যাপী মহান হৃদয়কে  
সদেশের বিস্তাদিগুণক পণ্ডিতেরা যখন সহস্র বাহ  
প্রসারণ করিয়াও আঁকাড়িয়া পাঠলেন না, তখন তাঁহারা  
আপনাদের অপদার্থতা চাকিবার জন্য স্বয়ংস্বীর্ণ  
কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলাবলি করিতে  
লাগিলেন, ‘ওটা বিধর্মী—ওকে দূর করিয়া দেও।’ এবং  
সুযোগ পাইলে আজিও আপনি-মণ্ডলের দল ঐ কথার  
পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনি করিতে ক্রটি করেন না।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অল্পবয়সী সোপানে  
তাঁহারা পশ্চাদ্ভাবী লোকদিগের নাগাল ছাড়াইয়া বেশী  
উচ্চ পংক্তিতে অবস্থান করেন, তাঁহারা সেই পশ্চাদ্ভাবী  
জ্ঞানদিগকে আপনাদের উচ্চ মঞ্চে উঠাইয়া লইবার জন্য  
নীচে হাত বাড়াইলে লাঞ্ছনা গল্পনার খুলা-কাঁদা ইঁট  
পাটকেল তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ হয়।...

.....ইউরোপীয়েরা দেশান্তরাগের উত্তেজনায়  
কেমন অভূতপূর্ব অশ্রুতপূর্ব মহৎ মহৎ কার্য সাধন করে  
এবং কেমন অবলীলাক্রমে তাহা করে, তাহা আমরা  
প্রত্যহই চক্ষের দমকে দেখিতেছি; কিন্তু কুলাঙ্গারদের  
উত্তেজনায় আমরা কি করি? করিবার মধ্যে কি  
কেবল—গাঁয়ে মানে না আপনি মণ্ডল হইয়া হিঁদুয়ানির  
প্রচার অথবা, যাহা একই কথা, হিঁদুয়ানির প্রাক।  
কখনও বা আমরা বন-গাঁয়ে শেয়াল রাজা হই, তখন  
আমাদের প্রতাপ দেখে কে?—এঁকে জাতে তুলিতেছি,  
ওঁকে জাত হইতে বাহিষ্কৃত করিয়া দিতেছি, এঁর নিমন্ত্রণ  
বন্ধ করিতেছি, ওঁকে সমাজে ঢালাইয়া লইতেছি—  
এইরূপ গুরুতর রাজকার্যের অহুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিয়া

(মহাবীর ডনুহইকসোট আমাদের কাছে কোথায় লাগে।) আমরা আপনাপনাকে সিংহ-শাদ্দুল অপেক্ষাও বড় মনে করিতেছি। কুলাঙ্গরগই হইতে আমাদের দেশে কার্য্য বড়জোর এই যা সম্ভব, এ ছাড়া আর কিছুই সম্ভবে না।

যদি বল ‘দেশান্তরাগ’! তবে তাহার এখনও চের বাকি, আমাদের দেশে তাহার গোড়াপত্তনও হয় নাই। দুঃখের কথা কি বলিব, আমাদের স্বদেশান্তরাগও আমাদের স্বদেশীয় সামগ্রী নহে। বিলাতি ধূতির জায় আমাদের বিলাতি স্বদেশান্তরাগ ইংরাজি দোকানে খুব সম্ভাদরে বিক্রীত হইতেছে—টাকাটা সিকেটা খরচ করিলেই তাহা পাওয়া যাইতে পারে; টাকাটা সিকেটা এখানে আর কিছু না—বামন কায়েতের কুলমর্যাদা, তাহার বিনিময়ে আমাদের দেশের আপামর সাধারণ যে সে লোকে মনে করিলেই ‘পেট্রিয়ট’ নাম ক্রয় করিতে পারে। এরূপ দেশান্তরাগ জিনিস খুব সম্ভা বটে, কিন্তু তাহার বিস্মোজায় গলদ্। বিদেশীয় চণ্ডের স্বদেশান্তরাগ, আর সোনার পাথর-বাটি—দুয়ের মধ্যে ভিলমাত্রও প্রভেদ নাই।

এই বিষয় সংকটে আমাদের উদ্ধারের পথ একটি কেবল আছে, সেটি আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না; সেটি পলিসীর পথ নহে, কিন্তু সত্যের পথ—ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যের পথ। এই স্থলে আমি বিনীত ভাবে শ্রোতবর্গের নিকট হইতে এই একটি অমুগ্রহ ভিক্ষা চাই—যেন ভগবদ্ভক্তি বাঁলতে তাঁহারি কেহ প্রতিমা পূজা অথবা মানুষ পূজা না বোঝেন, আর, বৈরাগ্য বলিতে বনে যাওয়া অথবা কাজের বার হইয়া যাওয়া না বোঝেন। উপনিষদের বিস্তৃত ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়া ভগবদ্গীতার প্রণেতা যেরূপ ভগবদ্ভক্তি উপদেশ করিয়াছেন তাহাকেই আমি এখানে বলিতেছি ভগবদ্ভক্তি; আর তিনি যেরূপ নিকাম কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন তাহাকেই এখানে আমি বলিতেছি বৈরাগ্য।

দেশান্তরাগের কথা ছাড়িয়া দেও, তাহা আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে জন্মবারই অবকাশ পায় নাই, এক্ষণে

আমাদের দেশে গৃহী ব্যক্তির যত কিছু সংসার-ধন্য কুলাঙ্গরগই তাহার সর্বপ্রধান প্রবর্তক, তা বই, বৈরাগ্য আমাদের দেশে নিকাম কর্ম্মের প্রবর্তক দাঁড়াইয়াছে। বৈরাগ্যের রাগ ফিরাইয়া তাহাকে নিকাম কর্ম্মের সাধনায় নিযুক্ত করা সকল কাজের সেবা কাজ—এই কাজটি এখনও আমাদের আপনাদের হাতে রহিয়াছে।

কুলাঙ্গরগ এ-পক্ষের নির্ভরহল, দেশান্তরাগ ও-পক্ষের নির্ভরহল, বৈরাগ্য অমুভয় পক্ষের নির্ভরহল। বৈরাগ্যের মুক্ত সমীরণ ক্ষণকালের জ্ঞাও যদি আমরা সেবন করি তবে আমরা বাহিরে পরাধীন হইলেও অন্তরে স্বাধীন হই; সেই সমীরণের প্রত্যেক হিল্লোলে আমাদের ধড়ে প্রাণ আসে—তাহা মৃতঙ্গজীবনী স্থা। সেই স্থাশিক্ষনে প্রাণ পাইলে মৃত্যু না কিংবতে পারে এমন অসাধ্য কাজই নাই। দেশান্তরাগী ব্যক্তি কামান-বন্দুক দিয়া বিদেশ জয় করে—এই পর্য্যন্ত; ঈশ্বরান্তরাগী ব্যক্তি হৃদয়ের অন্তরাগ দিয়া পৃথিবী জয় করেন। ঈশ্বরান্তরাগী ব্যক্তি মখন অমুভয় পক্ষের মুক্তসমীরণ হইতে উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে অবতীর্ণ হইয়া সকল পক্ষেরই মঙ্গল কামনা করিয়া নিকাম কর্ম্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তখন কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। এইরূপ উচ্চ অঙ্গের নিকাম সাধনা কাহাকে বলে তাহা যদি কার্য্যে সূক্ষ্মমান দেখিতে চাও, তবে রামমোহন রায়ের জীবন-রস্তান্ত পাঠ কর। উভয় পক্ষের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কেমন করিয়া বিধেবকে অন্তরাগ দ্বারা জয় করিতে হয়, অসত্যকে সত্য দ্বারা জয় করিতে হয়, পরকে আপনার করিতে হয়, স্বদেশীয় শূণের উদ্ধাস দ্বারা বিদেশকে বশীভূত করিতে হয়—তাঁহার জীবনচরিত্রের প্রত্যেক পত্র প্রত্যেক ছত্র তোমাকে তাহার সন্ধান বাৎলিয়া দিবে। ইংলণ্ডে তাঁহার সমাধিসম্বন্ধ দেখিয়া ভয় পাইও না; যতদিন সেখানে তিনি বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন তাঁহার গাজে স্বদেশীয় পরিচ্ছদ এবং কণ্ঠে উপবীত—দুয়ে মিলিয়া সাক্ষ্য দান করিয়াছে যে, তিনি স্বদেশকেও বিশ্বস্ত হন নাই। অথচ তিনি স্বদেশ বিদেশ সজ্ঞাতি বিজ্ঞাতি সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভগবদ্ভক্তি

এবং বৈয়াক্ষণিক কৈলাসশিখৰে দেবভাগ্যৰে সহিত  
একত্রে ব্ৰহ্মগান কৰিভেছিলেন; তাহাৰ সাক্ষী সমুদ্ৰে  
মাৰুখানে

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,  
তোমাৰি ৰচনা মध्ये তোমাৰে দোখিয়া থাকি;  
দেশভেদে কালভেদে ৰচনা অসীমা,  
প্ৰতিক্ষেপে সাক্ষ্য দেয় তোমাৰ মহিমা;  
তোমাৰ প্ৰভাব দোখি না থাকি একাকী।

এ গীত তাঁহাৰই হস্ত দিয়া এবং তাঁহাৰই কণ্ঠ দিয়া  
বাহিৰ হইয়াছিল। ব্ৰাহ্মণ জাতিৰ প্ৰধান ধৰ্ম্ম যে  
অধ্যয়ন অধ্যাপন দেৱাৰাধনা এবং পৰোপকাৰ তাহাই  
তাঁহাৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ ব্ৰত ছিল। তিনি এ দেশ এবং  
এ কালে দুৱৈৰ মধ্যস্থলে দাণ্ডায়মান হইয়া কেমন কৰিয়া  
যে চাকিত্তেৰ মध्ये হুই পক্ষৰ বিবাদ ভঞ্জন কৰিয়া  
দিলেন দোখিয়া মনে হয় ঐশ্বৰ্য্যকালিক ব্যাপাৰ; তাহা  
বালিয়া তাহা কৃত্ৰিম পলিসীৰ কোনো ধাৰ ধাৰে না;  
তাহা অকৃত্ৰিম অমুৰাগেৰ স্তম্ভবল্লভ কাৰ্য্যনৈপুণ্য।  
তাহা প্ৰতিভাৰ কলা—প্ৰভুত্বপন্নমতি। হুসুফি-কলা  
আত্মঘাতিনী পলিসী সেই স্বৰ্গীয় দেৱকল্যাণিৰ মতো  
সাজগোজ কৰিয়া অনাভিজ্ঞ লোকৰ চোখে ধূলা দিতে  
পারে, কিন্তু তাহাৰ মুখাবৰণেৰ ভিতৰে একটু উকি  
দিয়া দোখিলেই দোখিতে পাওয়া যাইবে যে, কৃত্ৰিম এবং  
অকৃত্ৰিম দুৱৈৰ মध्ये আকাশ পাতাল প্ৰভেদ। পলিসী-  
বেগুৱা সকলেই বুঝিতেছেন যে, হিন্দু-মুসলমানৰ মध्ये  
খোটা বান্ধালিৰ মध्ये এবং আৰ আৰ সহোদৰ জাতি-  
গণেৰ মध्ये হাকামা কোনমতে চুকিয়া যাইতে পাৰিলেই  
ভাৰতভূমিৰ হাড়ো খাতাস লাগে; কিন্তু কেমন কৰিয়া  
যে তাহা হইতে পারে তাহা কেহই বুঝিতেছেন না।  
একা কেবল ৰামমোহন ৰায়ই তাহা বুঝিয়াছিলেন,  
তাঁহাৰ দূৰদৰ্শী প্ৰজ্ঞানয়নে স্পষ্টাকারে দোখিতে  
পাইয়াছিলেন যে, একেশ্বৰবাদেৰ জয়ধ্বজাৰ অধীনেই  
হিন্দু-মুসলমান বান্ধালি খোটা শিথ প্ৰভাতি ভাৰতবৰ্ষেৰ  
বিভিন্ন জাতিৰা এক মা-বাপেৰ সন্তান হইয়া পুনৰ্জন্ম  
লাভ কৰিতে পারে, যাঁহা—ভাৰতভূমি। পিতা—স্বয়ম্ভু

ভগবান! ইউৰোপীয় জাতিদিগেৰ যতকিছু মহেশ্বৰ  
সাধনা সমস্তই প্ৰধানতঃ দেশামুৰাগেৰই উত্তেজনা;  
ৰামমোহন ৰায় দেশামুৰাগ হইতে আৰ এক ধাপ উচ্চে  
উঠিয়া বিপুল ভগবদ্ভক্তি ও নিষ্কাম সাধনাৰ পথ  
আমাদিগকে প্ৰদৰ্শন কৰিয়া চাকিত্তেৰ মध्ये অন্তৰ্ধান  
কৰিলেন। তাঁহাৰ কাজ ফুৰাইল—আৰ তাঁহাকে কে  
ধৰিয়া ৰাখিতে পারে? এমন একজন মহত্ম সোঁদন  
আমাদেৰ দেশে জন্মগ্ৰহণ কৰিলেন তবুও আমাৰ তাঁহাকে  
ধুণাকৰেও চিনিতে পাৰিলাম না। তাঁহাকে স্মৰণ  
কৰিয়া এক ফোটাও অক্ষ বৰ্ণন কৰিলাম না—অথচ  
আমাৰা ‘হায় সেকাল হায় সেকাল’ কৰিয়া বুক  
চাপড়াইয়া ৰাজ্যৰ মাৰুখানে নতন একতৰো হাসেন,  
হোসেনকে আসৰে নামাইতেছি।—ইহাতে হাসিব কি  
কাঁদিব ঠিক কৰিয়া ওঠা দায়। হাসেন হোসেনেৰ  
নাট্যাভিনয় যথেষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে সাধনায় প্ৰৱৃত্ত হও।  
ৰামমোহন ৰায় যে-পথে ‘নিশান ধৰিয়া সৰ্ব্বাণে  
দাঁড়াইয়া আছেন সেই পথেৰ অনুযায়ী হও। কালতো  
মায়া-কাৰা মায়া-ভক্তি মায়া-চাতুৰী ছাড়ো—পলিসী  
ছাড়ো। সাহসে ভৰ কৰিয়া এ-পক্ষ ও-পক্ষৰ মধ্যস্থলে,  
এ-দেশ এবং এ-কালেৰ মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হও; সেই  
বিবাদী ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া সত্য দ্বাৰা অসত্যকে  
জয় কৰ, অমুৰাগ দ্বাৰা বিৰোধকে জয় কৰ, মঙ্গল দ্বাৰা  
অমঙ্গলকে জয় কৰ; এইরূপ কৰ মে, দেশেৰ তাহাতে  
মঙ্গল হইবে, কুলেৰ তাহাতে মঙ্গল হইবে, পৃথিবীৰ  
তাহাতে মঙ্গল হইবে।

বঙ্গাব্দ ১৩২৭।

\*.....ৰামমোহন ৰায় অবশ্য এটা জানিভেন যে,  
উপবীত ৰাখিলেও স্বৰ্গলাভ হয় না, উপবীত কোঁলিয়া  
দিলেও জাত যায় না।... নীচেৰ পইটা ছাড়াইয়া  
উপৰেৰ পইটাৰ উঠিলে নীচেৰ পইটাৰ কতকগুলি  
অবয়বেৰ ছাপ তাহাৰ গায়ে লাগিয়া থাকে—যদিচ  
বৰ্ত্তমান পইটাৰ তাহা আদৰেই কোনো কাজে লাগে  
না।.....



# সাগর পারে

সীতা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এ বাড়ীটাতে গুহিয়ে বসতে একটু সময় লাগল। পারিবারিক বিপর্যয়ের ফলে কয়েক দিন নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়তে হয়েছিল, এখন আবার একত্রিত হলাম। দেশ থেকে আমার স্বপ্নের ও ছোট ননদ এলেন। বাড়ীটা দোতলা। একতলায় অল্প ভাড়াটে। হুতলার সিঁড়ির হুপাশে দুটি ফ্র্যাট। একটিতে গৃহ-স্বামী নিজে থাকেন সপরিবারে আর একদিকের ফ্র্যাটটি আমরা ভাড়া নিলাম। ঐ মহারাষ্ট্রীয় পরিবারটি আয়তনে নিতান্ত মন্দ ছিলেন না। কর্ত্তা, গিন্নি, গিন্নির একজন বিধবা বোন এবং হেলেমেয়ে হ'সাতটি। মেয়েগুলি মন্দ ছিল না। তাদের একটি জ্যাঠাভূতো বোনও তাদের সঙ্গে থাকত মনে হচ্ছে। ওরা সব ক'জনই অবিবাহিত, পনেরো থেকে পাঁচ-এর মধ্যে বয়স, তবে আমাদের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। কর্ত্তা অতি কর্মব্যস্ত তাঁর সঙ্গে কোনোদিন বাক্যলাপ হয়নি। গৃহিণীটি একটু রাশভারি তবে নাকতোলা type-এর নয়, কথাবার্তা বললে বেশ সহজ ভাবেই গল্প করতেন। তাঁর বিধবা ছোটবোন অত্যন্ত গভীর প্রকৃতির ছিলেন, কথাবার্তা প্রায় বলতেনই না। বোনটির দল তাঁকে ডাকত "ভিন্মি" বলে, সত্যিই তাঁর নাম "ভীমা" ছিল কি না জানি না, তবে চেহারা একবারেই ভীমা ছিলেন না, অতিশয় ধোঁগা সোঁগা মাহুষ।

দিন একরকম একঘেয়ে ভাবেই কেটে যেতে লাগল। নিজের পীড়িত মেয়ে নিয়ে আমি নিজের ঘরে বসে

থাকতাম, আর এক শূন্য ঘরে আমার বড় জা বসে থাকত। তবে দুই ঘরেই নতুন অতিথি আসবার সস্তাবনা ঘটেছিল। তাদের জন্ত প্রস্তুতি কিছু কিছু চালাতে হচ্ছিল। আত্মীয়-স্বজন কিছু এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। দুটি নতুন আয়ারও সন্ধান করা হচ্ছিল অনাগত শিশুদের জন্ত। বাড়ীতে কিছু জন-সমাগম ঘটেছিল, তা ছাড়া পাশের বাড়ীর মেয়েরা ছিল, গল্প করতে প্রায়ই দুটে যেত। এদের মধ্যে রমা বলে একটি মেয়ে গল্প করতে খুব ওস্তাদ ছিল বলে মনে পড়ে। আমি তাদের চেয়ে অনেক বড়, তা ছাড়া উচ্চশিক্ষিতা বলে একটা নামডাক ছিল, আমার সঙ্গে তার তত জমত না। বড় জা স্নহাসিনী বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট, কাজেই তার সঙ্গেই জমত বেশী।

এই পরিবারটি কতদিন আগে দেশ থেকে এসে ব্রহ্মদেশে বাসা বেঁধেছিলেন জানি না, তবে দেশের সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ ছিল খুব। প্রায়ই ভারতীয় অতিথি এসে দেখা দিতেন তাঁদের বাড়ী। মধ্যে মধ্যে আমার চেনা লোকও বেরিয়ে পড়ত তাদের মধ্যে। একদিন Bomanji বলে এক পার্শী ভদ্রলোক আমি পাশের বাড়ী থাকি শুনে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। গেলাম দেখা করতে। তিনি বোধহয় রেঙ্গুন কোর্টে ব্যারিষ্টার করতেন তখন। আবিষ্কার করলাম যে, আমার বাল্যকালে এলাহাবাদে থাকাকালীন তাঁকে দু'একবার আমাদের বাড়ী দেখেছি। আমার বাবার সঙ্গে দেখা

করতে আসতেন। ঐরই এক ভাই, আর এক বোমান্জি শান্তিনিকেতনে খুব যাওয়া-আসা করতেন, ওখানের সব কিছু সম্বন্ধে খুব interest দেখাতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উল্লেখ করতেন “বামনজী” বলে। সেটা কোঁতুকবশতঃ কি আর কোনো কারণে তা ঠিক জানি না।

আর একদিন সুনাম লালা লাক্ষপত রায় তাঁদের বাড়ীতে রাত্রে ডিনার খেতে আসছেন। ওঁকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করতাম, এলাহাবাদে তিনি আমাদের বাড়ী এসেওছিলেন। আমি গৃহস্থামিনীকে বলে পাঠালাম যে, আমি একটু ঐ সুনামধন্য আতিথির সঙ্গে দেখা করতে চাই, তিনি আমার বাবার বন্ধু। তিনিও তৎক্ষণাৎ রাজী, কর্তা আবার তহপার বলে পাঠালেন, আমি যেন রাতি বেলা তাঁদের ডিনারেও যোগদান করি। সেটা অবশ্য আমি সসন্মানে প্রত্যাখ্যান করলাম।

লাক্ষপত রায়ও এলেন। আমি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। দেখলাম আগের মত আর দেখতে নেই। অনেক রোগা আর বুড়ো হয়ে গিয়েছেন। আমার পরিচয় শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। বাবা জেনেভায় গিয়েছেন শুনে বললেন, “তোমার বাবা দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াতে গেলে আর কিছু চান না। আমি নিতান্ত বাধ্য না হলে কোথাও বেরই না।” অল্পকণ পরেই চলে এলাম।

এই বাড়ী আসার পর আমাদের একজন সহৃদয় বন্ধু জুটেছিলেন। ইনি সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। নাম শুনে বা কথাবার্তা শুনে বুঝবার উপায় ছিল না যে তিনি বাঙালী নয়। বাংলা ঠিক বাঙালীর মতই বলেন তবে তিনি আসাম প্রদেশের অধিবাসী। ব্রাহ্মসমাজের লোক, কাজেই আমাদের বাড়ী খুব শীঘ্রই এলেন। ইনি রেজুন মেল দৈনিকের সম্পাদক হয়ে এসেছিলেন, এবং আমরা যতদিন ব্রহ্মদেশে ছিলাম ততদিন ওখানেই ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন বেশীর ভাগ ভারতীয়েরা ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করেন তখন ইনিও চলে আসেন। এখানে থাকা কালীনই তিনি আমার একটি বাঙালী ছাত্রীকে বিবাহ করেন। হুঃখের বিষয় সে ভদ্রমহিলা

আর এখন জীবিত নেই। সুরেশবাবু ওখানে আসার কিছুদিন পরেই তাঁর এক বন্ধু মহেন্দ্রনাথ স্কনও ওখানে আসেন। তিনিও কাগজ সম্পাদনে সুরেশবাবুকে সাহায্য করতেন। ইনি খুব artistic temperament-এর মানুষ ছিলেন। নানা দিকে তাঁর interest ছিল, তার মধ্যে অভিনয় করা একটি।

আমরা যতদিন ওখানে ছিলাম, ততদিন সুরেশবাবু যখন যেমন দরকার হত, আমাদের সাহায্য করতেন। এটা শুণ্ড যে আমাদের বাড়ীতেই করতেন তা নয়, পরোপকারী বলেও খুব তাঁর নাম ঘটে গিয়েছিল। আর এক বাঙালী পরিবার একবার খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের বাড়ীর এক মহিলাকে বলতে শোনা গিয়েছিল, “আঃ কেউ আমাদের বাড়ী না আসুক, আমি জানি সুরেশবাবু নিশ্চয়ই আসবেন।”

সুরেশবাবু যখন প্রথম ওখানে যান, তখন কাগজের সম্পাদকরূপে প্রায়ই বড় বড় সিনেমা হাউসে complimentary টিকিট পেতেন। নিজের জন্ত ও বন্ধুদের জন্ত একটা গোটী boxই পেতেন প্রায়। তিনিও তখন অবিবাহিত মানুষ, অত টিকিট দিয়ে কি করবেন, ওগুলি আমাদের বড়ই কাজে লাগত। ভাল ভাল ছবি যে কত দেখেছি তার ঠিক নেই। তার ভিতর হুটির কথা মনে পড়ে Ten Commandments এবং Ben Hur। এক একটা ছবি একবারের বেশীও দেখেছি।

সব চেয়ে খুশি হয়েছিলাম Anna Pavlova'র নাচ দেখে। একে এর আগে আমি আর কখনও দেখিনি। যখন নাচ দেখতে গেলাম, মনে হল যেন magic দেখছি। মহিলার বয়স তখন ৪৪ বা ৪৫ হবে, অথচ মনে হচ্ছিল যেন ১৭ কি ১৮ বছর বয়সের তরুণী। দেহটা যেন রক্ত মাংস দিয়ে গড়া নয়, জ্যোতিষ্ময় অস্ত্র কোনো উপাদানেই গড়া। সঙ্গের নর্তক তাঁকে এমন অবলীলার ঘাড় মাথায় তুলেছিলেন যেন তিনি শোলা দিয়ে তৈরি। একটি জিপ্সীদের নাচ ও একটি রাধাকৃষ্ণের নাচ দেখলাম। শুনেছিলাম যে রাধাকৃষ্ণের নাচে, কৃষ্ণের ভূমিকায় নারী উদয় শঙ্কর কোথাও কোথাও অবতীর্ণ

হয়েছিলেন শুবে রেজুনের স্টেজে তিনিই ছিলেন কি না তা আমার মনে নেই।

এই অনন্তযৌবনা উর্ধ্বশীকে কলকাতায় ফিরে আসার পরে আর একবার দেখেছিলাম। তখনও সেই এক জ্যোতির্ময়ী নৃত্তি। বয়স যেন এক দিনও বাড়েনি, রূপ একতিলও ক্ষয় হয়নি। অথচ বয়স তখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। এরকম মানুষ কণকজয়া, শিক্কাই দীক্ষায় গড়ে পিটে এদের তৈরি করা যায় না। এঁর জায়গা বোধ হয় কোনোদিনই আর পূর্ণ হবে না।

আর একটি নাচের দলের কথা বেশ মনে পড়ে। এঁরা অবশ্য Anna Pavlovaও সমপর্যায়ের নয়, তবে ঐ সময় পাক্কা জগতে এঁরাও খুব কুশলী শিল্পী বলে যশস্বী হয়েছিলেন। এঁরা আমেরিকান ছিলেনই। নর্তকীর নাম Ruth Denis এবং নর্তকের নাম Ted Shawn. পুরুষটির Red Indian শিকারীর নৃত্য দর্শকস্বল্পকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। মহিলাটি দেখতে খুব সুন্দরী, নাচতেও পারতেন খুব ভাল। ইনি একটি মন্থরকণ্ঠী রংএর বুটি দেখুয়া বেনারসী পরে এমন সুন্দর নেচেছিলেন যে সে ছবিটি যেন এখনও চোখের সামনে দেখতে পাই। শাড়ী পরা ব্যাপারটাকেই যেন তিনি একটা নৃত্যনাট্যে পরিণত করেছিলেন।

এ ছাড়া আরো যে কত থিয়েটার আর ছবি দেখেছিলাম তার ত গোণাশাস্ত নেই। তখন বয়সটা ছিল অল্প, আমোদ-প্রমোদের দিকে একটা স্বাভাবিক টান ছিল। বাড়ীর আবহাওয়াটা প্রায়ই tragic থাকত, তবুও সেটা অতিক্রম করে মানুষের স্বভাব বৈচিত্র্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ত। এই সময়ই একটা ইংরেজি নাটকের অভিনয় দেখেছিলাম Journey's End বলে, সেটা খুব ভাল লেগেছিল। রেজুনে ছবি বা থিয়েটার ভাল যা কিছু আসত, বেশীর ভাগই পাক্কা, দেশী জিনিষের বেশী আদর ওখানে দেখতাম না। ভারতীয় ছবি মধ্যে মধ্যে আসত, ব্রহ্মদেশীয় ছবি কোনোদিনই দেখিনি, বোধহয় হতও না তখন। ওদেশের “পোয়ে” নাচের খুব নাও শুনতাম, তাও খুব বেশী কিছু

দেখিনি। যা ছিটে কোটা দেখেছি তা কিছু ভাল লাগেনি। ওদেশের লোকেরা খুবই আমোদপ্রিয়, নাচ গান হজোড় খুব ভালবাসে। তবে কোনো art-কেই তারা খুব উচ্চ স্তরে তুলতে পেরেছে বলে মনে হত না। Public Festival তেমন কিছু তাদের আমি দেখিনি। বর্ধা নামার আগে তারা এর ওর গায়ে জল ঢেলে দিয়ে একটা উৎসব করে। দলে দলে পায়ে হেঁটে, truckএ চড়ে, গাড়ীতে চড়ে ঘুরে বেড়ায় আর লোকের গায়ে জল দেয়। অনেকটা আমাদের হোলি খেলার মত। তবে শুধুই জল, তাতে রং বা অস্ত্র কিছু নোংরা কখনও মেশায় না। আর কেউ অপত্তি করলে কখনও তার গায়ে কিছু দেয় না। অল্পদেশীয় লোক তারা এখানে থাকেন, তাঁরা নিজেদের নিয়ম মত সব পালা পার্কেই করেন। দুর্গাবাড়ীতে ঘটা করে দুর্গা পূজা হয়। গ্রীষ্টানরা বাড়িদিন পালন করেন, ইষ্টার পালন করেন। ওখানে মাদ্রাজীদের মধ্যে অনেক রোমান ক্যাথলিক গ্রীষ্টান। তারা ত একমাস আগে থাকতে Christmas-এর জন্ত তৈরি হয়। যার যেমন সাধ্য নতুন পোশাক আশাক তৈরি করে। ছোট ছেলেরা রাঙে মিছিল করে Carol গেয়ে বেড়ায়। ২৫শে ডিসেম্বর সবাই সেজে গুজে গির্জায় যায় এবং ভাল করে খাওয়া দাওয়া করে। আমরাও ওখানে মাঘোৎসবের সময় ঘটা করেই উৎসব করতাম। ১১ই মাঘ গ্রীতি ভোজন হত, বালক-বালিকা-উৎসবও ঘটা করেই হত। ব্রাহ্ম তারা নন, তাঁরাও অরেকে খুব উৎসাহ সহকারে এ সবে যোগ দিতেন। বাঙালীদের এখানে অনেক আড্ডা Club ইত্যাদি ছিল। চট্টগ্রামবাসীদের আবার আলাদা Club ছিল। হানায় অনেক লোক চট্টগ্রামবাসীদের বাঙালী বলে স্বীকার করত না, এঁরা কর্খ্যতঃ যেন সেটা স্বীকারই করে নিয়েছিলেন।

আমার স্বামীর ছোট বেলার থেকেই অভিনয় করার নেশা ছিল। এখানে এসে তাঁর হৃদয় খুব উৎসাহী সহযোগী জুটেছিলেন। একজন Rangoon Mail-এর মহেন্দ্র ফুকন আর একজন কলকাতার সাহিত্যিক

সত্যোজ্জ্বল গুপ্ত। ইনি কি কার্য উপলক্ষে জানি না, বহর কয়েক তখন এখানে এসেছিলেন। এঁদের বেশ একটি দল গড়ে উঠেছিল। কয়েকটা অভিনয় তাঁরা এখানে করেছিলেন, সেগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এর মধ্যে গিরীশচন্দ্র ঘোষের “প্রজ্ঞা” ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের “চন্দ্রগুপ্ত” আমি দেখেছিলাম। সব জড়িয়ে অভিনয় ভালই হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র ও শিক্ষকদের অভিনয় ছাড়া আর কোনো অভিনয় আমি দেখিনি। পেশাদার বাঙালী থিয়েটার ত জীবনেই দেখিনি। তবে এঁদের অভিনয় ভালই লেগেছিল। একটা গুঁহ ছিল, সেটা সকালে অনিবার্য ছিল। ঐলোকের ভূমিকায় পুরুষরাই অভিনয় করেছিলেন, কারণ তখনকার দিনের বাঙালী ভদ্রমহিলারা কখনই ষ্টেজে উঠে পুরুষদের সঙ্গে অভিনয় করতে রাজী হতেন না। পুরুষরা করলেও একটা মেয়ের পাটি বেশ ভাল হয়েছিল বলে মনে পড়ে। প্রজ্ঞা নাটকে জগন্নাথ ভূমিকায় অশান্ত দত্ত বলে এক ভদ্রলোক অভিনয় করেছিলেন, সেটা খুবই realistic এবং কৌতুক উদ্দীপক হয়েছিল। “পাহারাওয়ালা মায়ী”র অপূর্ণ চেহারা আমার এখনও মনে পড়ে।

ওখানের বাঙালী স্কুল ‘বেঙ্গল অ্যাকাডেমী’র মেয়ে বিভাগের ছাত্রীরা একবার “লক্ষ্মীর পরীক্ষা” অভিনয় করেছিল, তা ভালই লেগেছিল।

ওখানে রানকুক সেবাপ্রদ দ্বারা চালিত একটি বড় হাসপাতাল আছে। ওখানকার যে স্বামীজি এসবের দেখাশুনা করতেন তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ী আসতেন। তাঁর নাম স্বামী শ্রীমানন্দ। তাঁর সঙ্গে একবার তাঁদের hospital দেখতে গিয়েছিলাম। খুব বিরাট প্রতিষ্ঠান, দারিদ্র রোগীরাই বেশী দেখলাম। এঁরাই চালান মনে হল, paying ward আছে বলে মনে হয় নি। অবশ্য আমার ভাল করে এখন কিছু মনে নেই।

ওখানেও একটি বড় চিড়িয়াখানা আছে শুনে একদিন দেখতে গিয়েছিলাম। তবে দেখে বিশেষ

কিছু খুশি হতে পারলাম না। জানোয়ার অনেকগুলি দেখলাম বটে, তবে তারা বেঁচে আছে কি মরে গেছে তা ঠিক বোধগম্য হল না। রেন্ডুনে Royal Lakes প্রতিষ্ঠিত আরো দু-একটা বেড়াবার জায়গা আছে, সেখানেও গিয়েছি দুচার দিন। দেশ থেকে ঋণবাদের আত্মীয়জন দুচারজন মধ্যে মধ্যে এসেছেন। আমার বাপের বাড়ীর দিক থেকে আমার দাদা একবার গিয়েছিলেন। আর একবার কয়েক বৎসর পরে বাবা কয়েকদিনের জন্য গিয়েছিলেন ইউরোপ থেকে ফিরবার পথেই বোধ হয়। আর কেউ কোনোদিন যান নি।

১৯২৫ এর শেষে November মাসেই সম্ভবতঃ আমাব ছোট ভাই অশোকের বিয়ে হয় শ্রীর নীলরতন সরকারের ছোট মেয়ে কমলার সঙ্গে। বিয়ে অনেকদিনই ঠিক ছিল, কমলাও আমাদের বাল্যকাল থেকেই সুপরিচিতা, তবু আমাদের বাড়ীর বউরূপে তাঁকে দেখবার বাসনাটা ছিল। তা ছাড়া অশোকের বিয়ে আমাদের বাড়ীর শেষ বিয়ে। কিন্তু বিয়েতে যেতে আমি পারলাম না। পূজোর সময় আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। এর আগে অনেকদিন আমি অসুস্থ ছিলাম এবং ছেলে হবার পর সারতেও আমার অনেকদিন লাগল। কাজেই সাগর পাড়ি দেবার সাধ্য আর আমার হল না। এরই মাস দেড়েকের মধ্যে আমার বড় ভা অংশাসিনীরও একটি কন্যা হল। কন্যার নাম হল শান্তি এবং ছেলের নাম হল অনিরুদ্ধ।

এই সময় দুটি নতুন আয়ার আবির্ভাব হল বাড়ীতে অংশাসিনীর কন্যার জন্য ষাঁচি এলেন তিনি ষোরতর কৃষ্ণবর্ণা, তবে অতি সুসজ্জিতা এবং খুব ক্রতবেগে ইংরেজি বলেন। নাম কিটি। দেশী নাম হয়ত কিছু ছিল, সেটা সে কখনও বলত না। মাস্তাকী রোম্যান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান। মেম-বাড়ীতে অনেক কাজ করেছেন সেটা তাঁর ইংরেজি বলা এবং নানারকম সং ও অসং অভ্যাসের দ্বারা প্রমাণ হত। যা হোক তিনি বেশীদিন রইলেন না, কাজেই তাঁর বিষয়ে আর বেশী কিছু লিখবার নেই।

আমার শিশু পুত্রের জন্ত যে আয়াটি এল, সেও মাজাজী খ্রীষ্টান, নাম উৎসর্গও মারী অনুল। আয়া হলে কি হবে, এর মত remarkable খ্রীলোক আমার জীবনে আমি কমই দেখেছি। এরা তিন পুরুষে খ্রীষ্টান কাজেই অনেকটা কার্যদ্রব্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিয়মধ্যবিন্ত ঘরের মেয়ে, আবার পরিবারের মধ্যে বেশ উচ্চ শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ লোকও ছিল। আয়ার একজন মাসভূতো তাই ব্যারিষ্টার ছিলেন। বড় রেল কর্মচারীও দু-একজন ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, এতে এদের সামাজিক ভাবে মেলামেশা করায় কিছুই এসে যেত না। সমানেই সকলের বাড়ী সকলে যাওয়া আসা করত। এইটা আমার বড় ভাল লাগত। বাঙালী হিন্দুঘরে হলে উচ্চ-পদস্থ আত্মীয়েরা এ-সব আয়া চাকর শ্রেণীর আত্মীয়দের চোখ চেয়ে দেখতেই পেত না। এদের ও-সব কোনো বালাই ছিল না। নিজের ভাষায় লেখাপড়া খানিক দূর সে শিখেছিল। ইংরেজি বলতে পারত, বুঝতেও পারত। হেলেণ্ড ভাষাও জানত। নিয়মধ্যবিন্ত ঘরেই চাকুরে স্বামীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, তবে বিবাহিত জীবনে সে সুখী হতে পারেনি। স্বামীর খড়ব চরিত্র-ভাল ছিল না। অল্পবয়সে পাঁচটি সন্তান নিয়ে সে বিধবা হয়। তখন থেকে সে খেটে খাচ্ছে, কোনো ধনী আত্মীয়ের দ্বারস্থ হয় নি।

মারার আকৃতির ঠাঁট সাঁট গড়নের স্ত্রামাজী মাহুয়। শরীরে সামর্থ্য যেমন, মনে সাহস তেমন। কখনও কোনো কাজে পেহত না। হুটো ছেলে, হুটো মেয়ে নিয়ে বস্তীতে বাস করত, এবং বস্তী জীবনের যত রকম হুর্ভোগ আছে, অনায়াসে তার মোকাবিলা করত। শক্ত পোক্ত পুরুষ মাহুয়রাও সব কাজে তার পরামর্শ নিত। মারামারি লাগলে নির্ভয়ে ডাঙা হাতে এগিয়ে যেত, এবং প্রতিপক্ষকে হঠিয়ে দিয়ে ছাড়ত।

এদিকে মনে তার দয়ামায়া খুব ছিল। অন্যায় দেখলে যেমন গর্জন করে লাঠি হাতে দাঁড়াতে, দুঃখীর দুঃখেও নিজের সীমিত সম্বল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। বস্তীবাসী কত মেয়েকে যে সে রোগে ও সন্তান-সন্ততি

হওয়ার পর খাবার জোগাত তার ঠিক নেই। আমি মধ্যে মধ্যে জানতে চাইতাম, ওরা তোমার কে হয়? বলত, কেউ হয় না, এক জায়গায় থাকি তাই। মাতাল, অকর্মণ্য বুড়ো পুরুষ মাহুয়কে যেমন বেগে গাল দিত, তেমন তাদের সাহায্য করতে, কাজ জুটিয়ে দিতে সব সময় তৎপর ছিল। তাদের সঙ্গে কি সম্পর্ক? না তারা এক জাতের। জাত বলতে সে বুঝত এক ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ তারাও রোমান ক্যাথলিক। এই ধর্ম সম্বন্ধে তার প্রগাঢ় আস্থা ছিল, এবং গৌরব বোধও ছিল অত্যন্ত। গির্জায় যাওয়া, এবং সব ক’টি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা এসে অবশ্যকর্তব্য বোধে করত। আমার বাড়ী যখন সে কাজ করতে আসে তখন তার হুটি ছেলে, হুটি মেয়ে। Anthony ও Xavier ওরকে দাস্ত, এই হুটি ছেলে বড় Ruth এবং Papa এই হুটি মেয়ে ছোট। এরা সারাদিনই আমার বাড়ী যাওয়া-আসা করত এবং শেষের বছর-দুই সকলে আমার বাড়ীতেই ছিল। বড়মেয়ে ক্রম দেখতে কালোর মধ্যে বেশ খ্রীমতী ছিল, পাপার ভাল নাম যে কি ছিল তা এখন আমি ভুলে গিয়েছি। সে চেহারায় এবং ধরণ-ধারণে খুব বেশী Uncle Tom’s Cabin এর টপসীর মত ছিল। সব ক’জন মিলে বাড়ী সরগরম করে রাখত। এরা সুলে যেত, এবং রোমান ক্যাথলিক বালক-বালিকার করণীয় সব রকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করত। প্রতি খ্রীষ্টোৎসবে তাদের জন্ত নতুন পোশাক করা হত, এবং সাধ্যমত সুখাশ্র প্রস্তুত করে আয়া তাদের খাওয়াত। তামিল কথা যেমন শুনে শুনে আমি খানিকটা শিখে গিয়েছিলাম, তামিল রাস্তাও চেখে দেখবার অনেক সুযোগ ঘটেছিল। তামিল জলখাবারও। এগুলির ভিতর দু-চারটে ভালই লাগত। তবে চালের গুঁড়োর আধিক্য ছিল বেশী, এবং মিষ্টির এরা বিশেষ ধার ধারত না। অজি ও চিনি দিয়ে হালুয়ার বদলে ওরা অজি, হুন, লঙ্কা দিয়ে হালুয়া বানাত। এর এক মাসভূতো বোন অভাবে পড়ে মাজাজী খাবার তৈরি করে বিক্রী করত। মাহুয়টি পরিবার পরিচ্ছন্ন, এবং জানাশোনা,

কাকেই তার কাছে মাজাজী “আপো” এবং “মোসে” আমি প্রায়ই কিনতাম। খাবারগুলি মন্দ নয়। আমার বিতীয়া কন্যা যখন কথা বলতে শিখেছিল, তখন এই মহিলাকে সে “আপোআয়া” বলে উল্লেখ করত।

আয়া শৈশব, বাল্য ও প্রথম যৌবন অপেক্ষাকৃত গচ্ছল অবস্থার মধ্যেই কাটিয়েছিল। এর কিছু কিছু প্রমাণ তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনাগাটির মধ্যে ছিল। সাধারণতঃ সাজগোজ বেশী কিছু করত না, তাদের জাতের সাদাসিধা রঙীন জামা কাপড়ই পরত। এ সব মেয়েরা শাদা শাড়ী কদাচিৎ পরত। তবে কোনো পর উপলক্ষে বা আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে কোনো উৎসব হলে তাকে শ্বেত দামী দক্ষিণী বেশমের শাড়ী এবং গলায় সুলভ কাককাখ্য করা সোনার কণ্ঠী পরতে দেখতাম। ঐ দু-তিনটি জিনিস তার পূর্ববর্তী সম্পন্ন জীবনের চিহ্ন ছিল, ছেলে-মেয়েদের জন্তে তুলে রেখে দিয়েছিল।

এই নতুন খোকা-খুকী দুজন এসে বাড়ী আবার খানিক জমজমাট হয়ে উঠল। আমার সন্তর এবং ছোট নন্দ এসে কিছুদিন থেকে গেলেন। আমার শরীর ব্রহ্মদেশে থাকাকালীন কোনো সময়েই ভাল থাকত না, ভাল মন্দ মিশিয়ে দিন কাটতে লাগল। পাড়ায় একজন চট্টগ্রামবাসিনী লেডী ডাক্তার ছিলেন, মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে গল্প করতে যেতাম। তিনি গ্রীষ্টান ছিলেন, পোশাক আশাকও মেমসাহেবের মত করতেন। নামটাও বিদেশী ছিল। তবে মনে প্রাণে বাড়ালী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে গল্পগাছা করতে কখনও কোনো বাধা অনুভব করিনি। তাঁর বাবা বোধহয় যৌবনকালে পূর্ববঙ্গের ডাওয়ালা রাজবংশে কাজ করতেন। ঐ রাজবাড়ীর কুমার রমেন্দ্র দারায়ণের পরিবারের লোকজনের অনেক গল্প করতেন। ইনি সর্বদাই সন্ধিবিষয়ে আমাকে সাহায্য করতেন; শুধু যে ডাক্তারির ক্ষেত্রেই তা নয়। যতদিন ওখানে ছিলাম, ততদিন তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। আমি কলকাতায় ফিরে আসার পরও ইনি যখনই কোনো কাজে কলকাতায় এসেছেন, আমার সঙ্গে দেখা করেছেন।

এক ভাবেই দিন কাটিছিল। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে এল। তারপরেই এল আমার ব্রহ্মদেশ বাসে সব চেয়ে মর্যাদাসিক দুঃখের দিন। আমার ছেলে এবং বড় কন্যা স্নায়ুসিকার মধ্যে প্রায় একই সঙ্গে দারুণ রক্ত আমাশা রোগে আক্রান্ত হল। চিকিৎসা বিভ্রাট খানিকটা হল। অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত হল। নিজের ইচ্ছামত ঠিক কিছু করতে পারব না বুঝতে পেরে আমি ক্রমশঃ শিশুপুত্র নিয়ে বাড়ী ছেড়ে যাওয়াই ঠিক করলাম। অতঃপর ভাড়াভাড়িতে কোথায় জায়গা পাওয়া যায়? সুরেশ ভট্টাচার্য্য তাঁর ছোট flat তখনই ছেড়ে দিলেন, বললেন, ওখানে গিয়ে উঠুন আপনারা, দুটো ছোট ঘর আছে আপনারদের চলে যাবে। আমি আফসোসে বাড়ীতে ঠিক থাকতে পারব। আমরা গিয়ে সেই flatএ উঠলাম। ক্রমশঃ বড় মেয়েকে এই দারুণ রোগের ছোঁয়াচের মধ্যে রাখার সাহস হল না। তাকে তার চাকরের সঙ্গে খ্রীষ্মন্ত জ্ঞানরঞ্জন চৌধুরীর বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী তাকে অতি স্নেহের সঙ্গেই গ্রহণ করলেন। বেশ কয়েকদিন তাকে সেখানে থাকতে হল।

খ্রীষ্মন্ত চৌধুরীর প্রসঙ্গে এর আগে লিখেছিলাম যে, শুনেছিলাম তিনি পরলোক গমন করেছেন। খবরটা যিনি আমার দিয়েছিলেন তিনি ভুল করেই দিয়েছিলেন বোধহয়েছে। এখন এক বছর চিঠিতে জানলাম যে, জ্ঞানরঞ্জন চৌধুরী মহাশয় জীবিত আছেন এবং কলকাতার উপকণ্ঠেই বাস করেন। এতে আনন্দিত ছিলাম, এবং নিজেকে ভাল তথ্য পরিবেশন করার জন্য লজ্জিত ছিলাম।

আমাদের আশ্রয় চেষ্টাতেও আমরা আমাদের শিশু পুত্রকে বাঁচাতে পারলাম না। প্রথমেই চিকিৎসায় মারাত্মক ভুল হয়ে গিয়েছিল। সেই চিকিৎসার বিতীয়া দিন রাতেই আমরা তাকে হারালাম।

তখনকার অবস্থা বর্ণনা করার মত ভাষা আমার নেই। জীবনে এই আমার প্রথম সন্তান শোক। নিজে তখন আবার হঠাৎ পীড়িত হয়ে চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লাম। বাধ্য হয়ে আরো দু-একদিন আমাকে ঐ বাড়ীতেই

আটকে থাকতে হল। কিন্তু ভদ্রলোককে কতদিন আর তাঁর বাড়ী থেকে বার করে দিয়ে রাখা যায়? আগের বাড়ীতে, ঐ যৌথ পরিবারের মধ্যে আর ফিরব না ঠিকই করেছিলাম। ঐ পাড়ার মধ্যেই তিনজন বাঙালী অধ্যাপক একটা ফ্ল্যাট নিয়ে মেস করে থাকতেন। সেই সময় কি কারণে জানি না তাঁরা তিনজনেই দেশে চলে গিয়েছিলেন। ফ্ল্যাটটি গার ভাড়াধানে ছিল তাঁর অনুমতি নিয়ে আমরা দিন দুই পরে সেখানে উঠে গেলাম। পূর্ণের বাসস্থান থেকে কিছু কিছু জিনিষপত্র আনিয়ে নিলাম। জ্ঞানরত্নবাবুদের বাড়ী থেকে বড় মেয়েটিকেও আনিয়ে নিলাম। শুনলাম, সুহাসিনীর মেয়ে ক্রমে ভাল হয়ে উঠছে।

ঐ পাড়াতেই Bigandet Streetএ একটা ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া গেল। সব জিনিষপত্র আনিয়ে নিয়ে ঐ বাড়ীতে এসে উঠলাম। পুরণো আয়াকে আনিয়ে নিলাম নতুন চাকর একটা রাখলাম। এ বাড়ীতে এসেই একজন পূর্ণপরিচিতি লোক পাওয়া গেল। ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা দুজনেই মরমনসিংহের লোক, কাজেই আমার স্বামীর সঙ্গে চেনাশোনা ছিল। আমার একটা সুবিধা হল যে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজটি খুবই কাছে ছিল। প্রবীণ ব্রাহ্ম কুলদা প্রসাদ নিম্নোঙ্গী এইখানেই বাস করতেন, তাঁর ছাী আশার খুব গৌজখবর নিতেন। আর একজন অনেক কাল প্রাক-প্রবাসী ব্রাহ্ম ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার এখানেই বাস করতেন। তাঁর সঙ্গে ও তাঁর ছাীর সঙ্গে পরিচয় হল। এঁরা আমাদের খুব সাহায্য করতেন দরকার হলেই। এঁদের বাড়ীরই একটা অংশে আর একজন ব্রাহ্ম ভাড়াটিয়া বাস করতেন, এঁদের গৃহিণীর দুই বোনকে এক সময় আমি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে পড়িয়েছিলাম। ভদ্রলোক ভারি সুকঠ ছিলেন, এত স্তম্ভর ব্রহ্মসঙ্গীত করতেন যে সেজন্তেই তাঁদের মনে আছে।

এই বাড়ীটাতে যতদিন ছিলাম, খানিকটা নিশ্চিন্ততার মধ্যে ছিলাম। বড় রকম দুর্ঘটনা কিছু ঘটে নি।

কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে একটু যাওয়া-আসাও হত। মাঝোৎসবাদিতেও যেতাম। এই বাড়ীতে আমার দ্বিতীয়া কন্যা স্মৃতিতা জন্মগ্রহণ করে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হয়েছিল যে এখানে থাকবার সময় রবীন্দ্রনাথ একবার রেক্সুন বেড়িয়ে যান। আমার বাবাও একবার ইউরোপ ঘুরে ঘুরে ফিরবার মুখে আমাকে দেখে যান।

পাড়াটা মন্দ ছিল না। এদিক ওদিক তাকিয়ে অনেক গল্প লেখার মাল মশলা পাওয়া যেত। গোটা দুই-তিন উপভাস এবং অসংখ্য ছোট গল্পের ধোরাক এইখান থেকে জোগাড় করা। মোটামুটি ভদ্রলোক এবং ব্যবসাদার লোকই এখানে থাকত। আমার উপর তলায় একজন Anglo Indian সাহেব থাকত, তার সঙ্গিনী মেমটি বেশ স্তম্ভরী। তবে রেক্সুনে সর্বদাই অজানা লোক সম্বন্ধে সাবধান হয়ে চলতে হত। কখন কার পেট থেকে কি বেরায় তার ঠিক নেই। আয়া সারাক্ষণ আমাকে সাবধান করত, “এ সব মেম সাহেবদের সঙ্গে বেশী কথা বোলো না আয়্যা, হুঁদিন পরেই টাকা ধার চাইবে এবং কোনো দিনও তা শোধ দেবে না।” বাস্তবিক হয়েও ছিল তাই।

পাশের বাড়ীটাতে এক সাহেবী পোশাক পরা মহিলা বাস করতেন, গায়ের রং কাল। সঙ্গে একটা অল্পবয়স্ক সাহেব থাকত। বোধ হয় গাঙ্কর বিবাহের পতি। মহিলার মেজাজ অতি রুক্ষ ছিল, ঝগড়াঝাঁটি তাদের প্রায় সারাক্ষণই লেগে থাকত। গালাগালির শব্দে কান পাতা যেত না। বেশী রেগে গেলেই মহিলা সাহেবকে ধরে বেদম প্রহার দিতেন। সাহেবকে একদিকে ভাল বলতে হবে, সে উটে মারত না, খালি আত্মরক্ষার চেষ্টা করত। কিন্তু মার ত আবার নানা রকমের আছে, কেউ হাতে মারে, কেউ ভাতে মারে। একদিন সকালে উঠে শুনি মতা কোলাহল। সাহেব রাগে মেমের আলমারির ভেঙ্গে তার সব অলঙ্কারপত্র নিয়ে চম্পট দিয়েছেন। মেম আমার আশ্রয় সঙ্গে আলোচনা করছেন যে কি করে!

তাকে ধরা যায়। বলা বাহুল্য, ধরতে, আর তিনি তাকে কোনোদিনই পারেন নি। এদের নিয়ে আনি সেকালে “উগ্রচণ্ডা”, বলে একটা গল্প লিখেছিলাম।

জন্মিভা হবার দিন আমার স্বামী আবার কোথায় থিয়েটারের রিহাসাল দিতে চলে গিয়েছিলেন। অনেক খোজাখুঁজির পর তাঁকে খবর দিয়ে আনা হল। মেয়ের আবির্ভাব যথাসময়ের কিছু আগেই হয়ে থাকবে। আমার পূর্বপরিচিন্তা লেডী ডাক্তারটিই আমার কাছে ছিলেন এবং আমার পুরণো আয়া মেরীই নার্সের কাজ করেছিল। সে এসব কাজ ও ভালই জানত। মেয়ের নাম রাখা হল জন্মিভা এবং চোখ দুটো তখন খুব ঘন নীল দেখাত বলে ডাক নাম তখন থেকে হয়ে গেল নীলি। এই মেয়ে ছোট বেলাতেই বড় বেশী ভাষা-সব্বটের মধ্যে পড়ে গেল।

সে মা ও বাবার কাছে শুনত পশ্চিম বাংলার ভাষা। তার বাবা নিজের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বলতেন পূর্ববঙ্গের ভাষা। বাড়ীর চাকর প্রভৃতি বেশীর ভাগ বলত তামিল ও হিন্দি। অতএব কোনো একটা ভাষাকে অবলম্বন না করে সে সব ক’টা ভাষা থেকে কিছু কিছু শব্দ আহরণ করে একটা নতুন ভাষা তৈরি করে নিয়েছিল। সেটা আমরা দুব্তান ও তার আয়া সপরিবারে বেশ বুঝতে পারত, অন্যদের ততটা বোধগম্য হত না। ১৯৩০-এ আমি যখন আবার কলকাতায় ফিরে এলাম, তখনও সে ঐ ভাষাতেই কথা বলত। তার কথা বুঝতে না পেয়ে তার মাসভূতো বোনেরা তার সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলতে আরম্ভ করল।

ক্রমশঃ

## অবনীন্দ্র-স্মৃতি রক্ষা প্রসঙ্গে

শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় ও ত্রিদিবরঞ্জন মিত্র

ভূতাত্ত্বিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, আজ যেখানে রসহীন, প্রাণহীন মরুভূমি, সেখানে এক কালে ছিল একাধিক স্রোতস্বিনী। ক্রমে ক্রমে স্রোতের বেগ এল কমে, কমে গেল কাদা আর পাক। এক পা এক পা করে এগিয়ে এল রসহীন মরু বালু; এাস করে নিল সব কিছুকে। সামান্য জল যা রইল, চলে গেল পৃথিবীর অন্তস্তলের গভীরে। গাছেরা বাঁচার তাগিদে বহুকাষ্টে অনেক গভীরে শিকড় চালিয়ে দিয়ে সামান্য রস আহরণ করতে লাগল। ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও এই সব্বা দেখা যায়। প্রাক্ হরপ্পার (কালিবঙ্গন প্রভৃতি

অঞ্চলে) যুগ থেকে দেখা যায় ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতিতে ছিল স্রোতের বেগ। তার চেউ এক কালে অল্প দেশের সংস্কৃতিতেও রসের যোগান দিয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার বেগেও ভাঁটা পড়ল এবং এক সময় সকলের অজ্ঞাতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে গেল; দেখা দিল ভারতের মানসিক মদীতে কুসংস্কার রূপী পাক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম নিলেন মহাত্মা রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও আরো অনেকে। ডঃ রমা চৌধুরীর ভাষায় বলা যায়, “বিশ্ববিধাতার মঙ্গল বিধান”ে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে অকস্মাৎ শত



সত সূর্য একত্রে উদ্ভিত হয়েছিল প্রোজলতম প্রভায়।”  
এসব সূর্যদের কিরণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তৎকালীন  
সদাশয় ইউরোপীয়রা। তাঁদের সকলের প্রচেষ্টায়  
ভারতবাসীর যুগ ভাঙা—বিশ্বকে নতুন ক’রে জানবার  
আশায় জেগে উঠল।

অবনীন্দ্রনাথ ঐ সূর্যদের কিরণে প্রস্ফুটিত একটি ফুল।  
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পরাবাদী ভারতবাসীরা যখন  
প্রাচ্যের সব কিছুতে খারাপ দেখেছিলেন ও পাশ্চাত্যের  
গাঢ়চিন্তা-পূর্ণ, স্বার্থক সত্যতার দিকে ছুটে যান্নিছিলেন  
তক সেই সময় অবনীন্দ্রনাথ, পাশ্চাত্য ভাবধারায়  
শিক্ষিত হয়েও, ভারতের প্রাচীন গৌরব অজ্ঞাত,  
ইলোরা প্রভৃতির চিত্রাবলী অঁকিতে ব্যস্ত ছিলেন।  
সেই সঙ্গে তাঁর চিত্রাবলীর মধ্যে হান পেয়েছিল  
গাঠনিক, বেতাল পঞ্চবিংশতি, কচ ও দেবযানী প্রভৃতি।  
শরচ্চাক্ষে তিনি নীচ ব্যবসায়িক-ভিত্তিক করতে পারেন  
নি। টলস্টয়ের মত তিনিও বিশ্বাস করতেন, “True  
science and true art are the products of  
sacrifice and not of certain material  
advantages।” বাস্তবধর্মীতার নামে শিল্পে আজ যে  
প্রহসন চলছে তাঁর দর্শনে তা হান পায়নি।  
অবনীন্দ্রনাথের দর্শন ছিল, রমারলীর ভাষায় প্রকাশ করা  
যায়, “Art is the supreme play of the spirit  
which liberating itself from the cruel laws of  
life, becomes by itself the creator of life and  
master of laws which govern the Universe  
modelled by the spirit in the image of reality।  
এই কারণেই বোধ হয় অবনীন্দ্রনাথের অঁকা ছবি বিশ্ব-  
সভায় হান পেয়েছিল। বহুকাল পরে ভারতের ঐতিহ্য-  
পূর্ণ শিল্প পৃথিবীর শিল্পীদের চোখের সামনে গিয়ে  
দাঁড়াল। বিশ্বশিল্পী সমাজ তাকে সম্মান জানাল।

অবনীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম দেখে তাঁর কাছে ছুটে  
এলেন মহামানবী ভাগিনী নিবেদিতা; আশা, ভারতের  
সেবা কার্যে নতুন প্রেরণা পাবার। সাহায্য ও প্রতিজ্ঞা  
দেই-ই তিনি পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

তু নিজেই নয়, অবনীন্দ্রনাথ ভারতসেবার কাজে  
শিষ্যদেরকেও উৎসাহিত করতেন। তবে তাই বলে  
বিশ্বাস করা উচিত হবে না যে, তিনি দেশের কাজে  
বিশ্বকে ভুলে গিয়েছিলেন। রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের  
মতো তাঁর মধ্যেও ছিল ক্রিশ্চিয়ানিটিজম ও ইন্টার-  
ক্রিশ্চিয়ানিটিজমের ছাপ।

১৯১১ সালের আগষ্ট মাস থেকে চলছে পশ্চিম  
বাংলার নানা অঞ্চলে অবনীন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী সভা।  
এই সকল সভায় নানা ব্যক্তি অবনীন্দ্রনাথের জীবনের  
নানা দিক নিয়ে আলোচনা করছেন বটে কিন্তু খুব কম  
সংখ্যক ব্যক্তি তাঁর স্মৃতিরক্ষা সম্পর্কে আলোচনা  
করেন। বর্তমান অবস্থায় সেই সম্পর্কে সামান্য  
আলোচনার প্রয়াস আছে।

মহামানবের স্মৃতি রক্ষা অর্থে সাধারণতঃ আমরা  
বুঝি তাঁর ব্যবহৃত কয়েকটি জিনিস, কিছু কীর্তি নিদর্শন  
ও পত্রাবলী সংরক্ষণ করা যুগ যুগ ধরে। প্রশ্ন জাগে,  
সকল মানুষই কি তাঁর পত্রাবলী, ব্যবহৃত জিনিসে রেখে  
যায় তার সত্তা? এটা ঠিক, কীর্তি মানুষের চিন্তার  
পরিবাহক। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, কয়েকটি  
সার্টিফিকেট সংরক্ষণ করলেই মহামানবের স্মৃতিরক্ষা  
করা যায় না। তাঁর জীবন-দর্শনকে রক্ষা করাই প্রকৃত  
স্মৃতিরক্ষা। কয়েক মাস আগে পশ্চিম বাংলায় যখন  
ভারতের কৃতীসন্তানদের স্মৃতি ভাঙ্গার জোয়ার বয়ে  
যান্নিছিল, সেই সময় কলকাতার কয়েকজন জানী ব্যক্তি  
বলেছিলেন, হঠকারীরা স্মৃতি ভেঙ্গে অপরাধ করেছে  
বলে চেঁচালেও আমরাই তাঁদের বেশি অপমান করেছি—  
যুগে মহামানবদের দর্শনকে আদর্শ বলে আওড়েছি বটে,  
কিন্তু নিজেদের বেলায় অল্প পথ ধরে সত্য সমাজে  
প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করেছি।

অতএব পরিষ্কার ভাবে বলা যায়, আজকের হুনিয়ার  
যেভাবে বক্তৃতা ও ছবিতে মালা দিয়ে মহামানবদের  
স্মৃতি রক্ষা করার চেষ্টা চলছে, ভাবগতের কাছে তার  
কোন দান নেই। অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য চাই  
সরকার ও বুদ্ধিজীবী সম্মদারের মুক্ত প্রয়াস। মন-প্রাণ

সঙ্গে দিয়ে কাজ করবার মত মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে, ভুলে যেতে হবে পদ ও ডিগ্রীর গরিমা। সকলকে সমান অধিকার ও সমান সম্মান দিলে তবেই অবনীন্দ্রনাথের শ্রুতি রক্ষার কাজ ভাল ভাবে এগুবে—নইলে ব্যর্থতার পর্যবসিত হবে।

শিল্পীদের সঙ্গাঙ্গে এগিয়ে আসা দরকার। কারণ তাঁরা ব্যতীত আর কারো পক্ষে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের শ্রুতিরক্ষার কাজ করা সম্ভব কি না সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তাঁদের উচিত হবে আচার্য দেবের হাতে অঁকা সবকিছু ছবি ও অঙ্ক কোন কারু শিল্প যদি থাকে তা সংগ্রহ করে এক জায়গায় রাখা এবং পরে ঐসব ছবির সৃষ্টির কালাহুয়ারি সাজান, যাতে যে কোন ব্যক্তি আচার্যদেবের প্রতিভার কর্মবিকাশের ঐতিহাস জানতে পারে। সরকারের উচিত হবে শিল্পীরা যাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে পারে তার জন্য আর্থিক সাহায্য, বেতার ও সংবাদপত্র মাধ্যমে জনসাধারণকে ঐ কাজে সাহায্য করতে উৎসাহিত করা এবং অবনীন্দ্রনাথের নামে একটি আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত সংগ্রহশালা তৈয়ারী করা। এছাড়াও প্রত্যেক সংগ্রহশালায় যাতে একটি করে অবনীন্দ্র গ্যালারি থাকে তারও ব্যবস্থা করা দরকার এবং ছবিগুলি পুনর্মুদ্রন করে সাধারণের মধ্যে সল্পমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, সাহিত্যিকদেরও উচিত হবে, কিভাবে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তি সংগ্রহ করা যায় তার পথ আবিষ্কার করা এবং সেইভাবে সরকারকে উপদেশ দেওয়া। স্মরণ্য বলা যায়, ব্রজ-

জীবীরাও সরকার যদি যুক্তভাবে কাজে হাত না দেন তবে অবনীন্দ্রনাথের শ্রুতিরক্ষা করা কখনোই সম্ভব নয়। সবার উপরে শিল্পীদের মনে রাখতে হবে যে, অবনীন্দ্রনাথ স্কন্দের পূজারী ছিলেন। তাঁর শিল্প-চেতনাকে হারবার্ট রীডের ভাষায় বলা যায়, “all that is beautiful is art or that all art is beautiful, that what is not beautiful is not art and that ugliness is the negation of art,” শিল্পীরা যদি গ্রহণ না করেন তবে সংগ্রহশালার কোম দাম থাকবে না। তাঁরা পারবেন না স্কন্দের ও মহান্ কিছু সৃষ্টি করতে। আধুনিক কালে শিল্পের নামে যে গ্রহসন চলছে, যার সম্বন্ধে গোর্গি কোপস্ বলেছেন, “most of the recent group of artists has returned from abstract images to concrete objects in their environment. They have become fascinated by vulgar features of everyday life, and they have chosen them as emblems. Seductive selling devices of the competitive society—advertising pictures, containers, packages, and the mass produced heroes of comic strips—are their preferred images.”\*\*\* Most of the mushroom art movements seem to have forgotten the essential role of artistic creation”, আরও জোরদার হয়ে উঠবে। অনেক দূরে সরে যাবেন অবনীন্দ্রনাথ, আর তাঁর বিখ্যাত শিল্পী কীর্তির নিদর্শনগুলি পড়ে থাকবে কর্মযোগীর প্রাণহীন দেহের মতো।

# অভয়

(উপভাস)

শ্রীশুধীরচন্দ্র রাহা

ভীর্ণপতি মাষ্টারের সেই কথা এখনও যেন অভয়  
মনতে পায়—এগিয়ে যেতে হবে, এগিয়ে চল। সেই  
থেকে অভয় এগিয়ে যাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু সঠিক  
পথের উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছে না। পথ খুব জটিল; খুবই  
ছুর আর কুটিল আর বড় যন্ত্রণাময় কণ্টকাকীর্ণ। রাত  
গড়তে থাকে। অভয় নিবিষ্ট মনে পড়ে চলতে থাকে  
গামীজীর গ্রন্থাবলী।

সকাল হতেই অভয় এই পত্র নিয়ে পড়াশোনার  
তাড়জোড় করে। দুঃখ-শোক-কষ্ট এসব নিয়েই তো  
জীবন। তা বলে হা-হতাশ করে এমন মানব জীবনকে  
সনষ্ট করতে পারে না। তার মাথার ওপর রয়েছে  
হর্ষব্য। মা যে স্বর্গে বসে সবই দেখছেন। তাঁর  
বাদরের খোকা—যে বড় হয়ে ছোট ভাইবোনদের  
মাহুষ করবে—তার বুদ্ধ পিতাকে দুঃখ দারিদ্র্য থেকে  
শাস্তি দেবে। এ যে, মা ওপরে বসে তাই ভাবছেন।  
ই নিয়ে বসতেই অবাক হয়ে গেল অভয়। এক হাতে  
গায়ের কাপ আর গ্রেটে ডিম সেদ্ধ ও বিস্কুট নিয়ে আচ্ছ  
মনাতি আসছে।

অবাক বিস্ময়ে অভয় বলল, এ কি, তুমি যে! কেন,  
মানাই গেল কোথায়?

—কে, কানাই? সে আর যাঁবে কোথায়? আজ  
মামাই নিয়ে এলাম। বাড়ী থেকে ফিরে যেন আরও  
ভীর্ণ হয়ে গেছে অভয়দা।

—একর আবার? সেদ্ধ ডিমটা দেখিয়ে অভয়  
বলল। মিনতি বলল, মায়ের ব্যবস্থা। তোমার চেহারা  
ই খারাপ হয়েছে, তাই রোজ সকালে সেদ্ধ ডিম দেবার  
রুখা মা বলেছেন। অভয় কিছু আশ্চর্য হয়ে যায়।  
নের মধ্যে এতদিন যে অতিমানটুকু ছিল, আজ তা

সবই মিলিয়ে উড়ে যায়। মাহুষকে যে আমরা কত  
ভাবে ভুল বুঝে থাকি, তা বলা যায় না।

চারে চুমুক দিয়ে অভয় বলে, কই, আর তো গান  
শুনিনে। তা এখন পড়াশোনা কেমন চলছে—

—ঐ এক রকম—মিনতি অভয়কে দেখতে থাকে।

—আমার গান কি ভাল লাগে অভয়দা—

—গান? ওঃ, খুব ভাল লাগে। অনেকদিন  
শুনিনি। ভোর বেলাকার গান শুনতে খুব ভাল লাগে—

মিনতির মুখ উজ্জল হয়ে ওঠে। দুই তরুণ মন।  
একজনের মনে শোকেই ছায়া। পিতা ও ভাইবোনের  
জঙ্গ দুঃসহ চিন্তা। আর একজনের মন শিশিরস্নাত  
ফুলের মত। দেখলে চোখ জুড়ায়, মন আনন্দে মেতে  
ওঠে। মিনতির এই সারিধ্য যে কোন তরুণেরই কাম্য  
মনে হয়। ওর আকর্ষণ যে কত দুনিবার, কত মোহময়  
তা বোধকার মিনতির নিজের কাছেই অজ্ঞাত। এর  
মধ্যে উমেশের সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা। অত্যন্ত ব্যস্ত  
হয়ে উমেশ বোঝায় যেন যাচ্ছিল।

সে-ই ডাকল, অভয় অভয়। অভয় ফিরে তাকিয়ে  
বেখল উমেশ। কাছে এসে বলল, কি, আজকাল আর  
যে দেখতেই পাইনে। কি, ব্যপার কি?

—ব্যাপার কিছু না। শরীর ভাল নয় আর মনটাও  
ভাল নয়।

—হঁ, কিন্তু সংসার তো এমানই। মাহুষ  
তো মরবেই। তাই এই মৃত্যু দেখে অত উত্তলা হলে  
চলবে না। বাবা, মা কাকর কি চিরকাল বেঁচে থাকে?  
কিন্তু যারা বেঁচে আছে তাদের জীবনযাত্রা যাতে  
শুশুর হয়, স্ত্রী হয় তার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে।  
দেশের অবস্থাটা দেখতে পাচ্ছ অভয়? উমেশ অনেক

কথা বলে যায়। অভয় কোন কথার উত্তর দেয় না। যে উৎসাহ যে উদ্দীপনা এর আগে ছিল, আজ তার বাষ্পটুকুও নেই। মায়ের মৃত্যু তার তরুণ হৃদয়কে ভেঙ্গেচুরে দিয়েছে। অতি অল্প বয়স থেকে ঋণ দারিদ্র্যের মুক্তি দেখেছে। অনশন অর্দ্ধাশন বহু অভাব কত দুঃখ কষ্ট তারা তিলে তিলে ভোগ করেছে। পিতা মাতার অসহায় অবস্থা দেখেছে, আর পাশাপাশি দেখেছে অবস্থাপন্ন লোকদের অবস্থা। তাদের প্রচুত প্রার্থনা, তাদের অহেতুক বিলাস-বাহুল্য। দেখেছে তাদের কত অহঙ্কার, কত অর্থ আর খাদ্যের অপচয়। কিন্তু তারা কিছু পায়নি। রোগে তারা ঐষ পণ্য পায়নি। ভগবানের অমুগ্ধে, বহুদিন ভুগে ভুগে কোন মতে সেরে উঠেছিল তারা। ঠিক কুকুর শেয়ালের মত জীবনযাপন করেছে, আর ভিক্ষুকের মত এর ওর কাছে হাত পেতেছে। কিন্তু কোথাও সহায়ভূতির কোন প্রকৃত স্বাদ পায়নি। সর্বত্র থেকেই বিভাড়িত হয়েছে। তাদের হৃৎখিনী মা, বহু কষ্টে মাতুষ করেছেন। লোকের বাড়ী দাসীস্বাস্তি, জল তুলে, মুড়ি ভেজে, বুটে বিক্রী করে এমন কত কাজ করে, তা জানেন ভগবান। অভয় দেখেছে তার বাবাকে। সেই চির দারিদ্র্য, ব্যাধিতে জর্জরিত, চিরহুঃখী, চিরঅভাবগ্ন, এক অতি নিরীহ ধর্মপ্রাণ মানুষকে। আশাহীন ভয়সাহীন করুণ মুখ অস্বাভাব্যে অতি শীর্ণ দেহ চিকিৎসার অভাবে দেহ ব্যাধিগ্ন। বাবার করুণ মুখ সব সময়, অভয়ের মনে, চিরকালের মত উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। অভয় ভাবে, কি হবে অপরের কথা ভেবে। অন্তে কি তাদের এই নিঃশব্দ আত্মত্যাগের কোন মূল্য দিয়েছে? তাদের মত অপরাপর লক্ষ লক্ষ হতভাগ্যের জীবনের মূল্য কি দেশবাসী দিয়েছে? না, দেয়নি। আর কোনদিন দেবেও না। অভয় ভাবে, অতীতে কত সর্বভ্যাগী, আপন ভোলা মানুষ নিজের সমস্ত মুখ শান্তি বিসর্জন দিয়ে, দেশের জন্ত, দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্ত নিজের সব কিছু বিসর্জন দিয়েছেন, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত

দিয়েছেন, কিন্তু দেশবাসী কি তাঁদের স্মরণ করে? তাঁদের কী কোন স্বীকৃতি আজ পর্যন্ত দেশবাসী দিয়েছে? অভয়ের মনে পড়ছে, তার মোনোদার কথা। দেশবাসী কি সেই মন্থর কোনও খোঁজ রাখে? তাকে জানবার কি কোনও চেষ্টা করেছে? এমন কত শত সহস্র মন্থর লোকচক্রুর অন্তরালে আজও বেঁচে রয়েছেন, কিন্তু তাঁরা চিরদিনই এমন অবজ্ঞাত থেকে লোকচক্রুর অন্তরালেই থেকে যাবেন। উমেশের কথায় অভয় জবাব দেয়, দোষ। মনটা বিশেষ ভাল নয়।

উমেশ বলে, অভয় তোমার যেন কিছু পরিবর্তন হয়েছে। এর আগে যে উৎসাহ দেখেছিলাম, এখন যেন তা দেখা যাচ্ছে না। ক্রমে তাই আমরা বলাবলি করি—

অভয় হেসে বলে, কথাটা সত্য। কিন্তু উমেশ প্রকৃতি জীবনে দেখ। তারা ভেতর সব সময় অদল বদল হচ্ছে। পরিবর্তন আর পরিবর্তন নিয়েই জগৎ চলছে। ভাঙ্গা-গড়া তো দিনরাতই হচ্ছে। সেখানে মানুষের মনের পরিবর্তন হলে, বা চিন্তার পরিবর্তন হলে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? আমার তো মনে হয়, সেটাই স্বাভাবিক। কোন কিছু একনিষ্ঠতা প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

—উমেশ ক্ষণেক ভেবে বলল, প্রকৃতির ভেতর যে পরিবর্তন হয় তার সঙ্গে এটার কি সম্বন্ধ আছে? এ জিনিস তো আলাদা—

—না, আলাদা নয়। সবই একই ব্যাপার। এক সময় যা খুব ভাল লাগত, কালক্রমে তার ওপর বিষাগণ আসে। আর সেটাই স্বাভাবিক। হঠাৎ গুড় গুড় করে মেঘ ডেকে উঠতেই উভয়েই সচকিত হয়ে উঠল। কখন যে মেঘ জমে উঠেছে, তা খোঁজ ছিল না। সৌ-সৌ। লক্ষ—আর চারিদিক অন্ধকার হওয়াতে উভয়েই সচকিত হয়ে দেখল, ভয়ানক ব্যাপার। তুমুল বর্ষণ আর ঝড় এগিয়ে আসছে। পথের লোক ছুটেছে—দোকানপাট বন্ধ হচ্ছে। অভয় আর দাঁড়াল না। একলাফে একটা দোকানের ভেতর আশ্রয় নিল।

এখন গুণু পড়া। টেট পরীক্ষার অভয় ভাল ফল

করেছে। শুভময় বলে, দেখ অভয়দা, তুমি কাঠে ভিত্তিগত নিশ্চয়ই পাশ করবে। চাই কি অঙ্কে লেটার পেতে পার। বাবাকে একখানা চিঠি লিখে অভয় পড়তে বসে। মাঝে মাত্র দুমাস সময়। মাঠে বার তারিখে পরীক্ষা, এখন আর সময় নেই। এখন শুধু পড়া। নাওয়া খাওয়ার সময় নেই অভয়ের। দিনরাত পড়ে যাচ্ছে। বিকেলে শুধু অল্প সময়ের জন্য, বাইরে ঘুরে আসে। তারপর পড়া চলে, অনেক রাত পর্যন্ত। এ যেন দুঃস্বপ্ন তপস্যা। বোধ করি এই রকম মনঃসংযোগ নিয়ে সাধনার নামই তপস্যা। এ হ'ল পাশের জন্ত তপস্যা—আর সে সাধনা, সে তপস্যা হ'ল, পরমজ্ঞান আর চরম সত্যকে উপলব্ধি করা। অভয় ভাবে, কঠিন সাধনা ছাড়া মনঃকিছু লাভ করা যায় না। এমন গভীর মনঃসংযোগ করে যে বিষয়ই ধরা যায় না কেন, বোধ করি তাকে জয় করা, কঠিন নয়। অভয়ের প্রতিজ্ঞা দৃঢ়। তাকে যে ম্যাট্রিক পাশ ভাল ভাবেই করতে হবে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে অভয় পড়ে। রাত একটা বেজে যায় আলো কামিয়ে দেয়। টেবিলের ওপর এক গ্রাস জল ঢাকা থাকে। সেই এক গ্রাস জল ঢুক ঢুক করে খেয়ে ফেলে। নিশ্চয় ঘরে স্তিমিত আলোয়, বিছানার ওপর চুপ করে বসে থাকে। চাকতে মনের আকাশে ভেসে ওঠে, তার দেশের ছবি, তার বাড়ীর ছবি। গাঁয়ের সেই রাস্তা ঘাট, পথের ধারে বহুদিনকার পুরাতন অতি বৃদ্ধ অর্থ গাছটি, বগীচালা, হালদার পুকুর আর পালের পুকুরের ছবি। বাড়ীর ছবিখানি চোখের ওপর আরো স্পষ্ট হুটে ওঠে। গীতা খোকন এমন ঘুঘুছে। গীতার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে, একটা পা তার পিঠের ওপর দিয়ে, খোকন ঘুঘুছে। বাবা ওদের পাশে শুয়ে আছেন। মাথার চুল পেকে গেছে, রুগ্ন-শীর্ণ শরীর। মুখে উষ্মের চিহ্ন। সব যেন দেখতে পায় অভয়। সেই পুরাতন ঘর, মেঝে এবড়ো খেঁচড়া। ছেঁড়া বাঁশ—ছেঁড়া পাটি—মলিন জীর্ণ ছবিখানি কাঁধ। ঘরের এককোণে সেই অতি পুরাতন লণ্ঠনটি রয়েছে। বাইরে উঠানের একপাশে গোয়ালঘর।

ওদিকে কুয়োভালা—তার পাশে পেরারা গাছ আর লাউ কুমড়োর মাচা। তার পাশে ছাইগাদার ওপর ঘুঘুছে কালু কুরটা। এক-একবার অক্ষুটভাবে খেউ খেউ করে, আবার ঘুমোয়। বাছুরটা বুঝি একবার ডাকল ওর মাও সাড়া দেয়। ঠিক ঠিক সব যেন দেখতে পায় অভয়। গরুর ডাকে, বাবার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আলোটা একটু উসকে দিয়ে বাইরে এলেন। চারদিকে একবার দেখে নিয়ে, দরজার সামনে আলো রেখে, জল খেয়ে তামাক শাকতে লাগলেন। বাবার এই অভ্যাস। দরজার সামনে আলো রেখে অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে তামাক খাওয়া—তারপর আর ঘুমোন না। সমস্ত রাত জেগেই কেটে যায়। গীতা খোকনকে ভালভাবে শুইয়ে দিয়ে, চুপচাপ হুকো টানতে থাকেন। আবার ভোর হয়ে আসতে থাকে। ঠাকুরবাড়ীর বুড়ো পুজারী, তারণ কাকার ভাঙ্গা গলার কীর্তন গান শোনা যায়।

রাতের অন্ধকার ধীরে ধীরে কটতে থাকে। ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়—একটা অক্ষুট আলো আকাশ বাতাসে ফুটে ওঠে। ঠাণ্ডা বাতাসের মাঝে তারণ কাকার ভাঙ্গা গলার কীর্তন গান ভেসে যায়—হররাম হররাম রাম-রাম হর-হর। অভয় যেন সব শুনতে পায়—সব দেখতে পায়। তার মা যেন ফিরে এসেছেন। ললে পেড়ে সাড়ী, হাতে শাঁখা, মাথায় সিন্ধুর। সরোজিনী যেন ডাকেন, খোকা, ও খোকা। ঘুমো বাবা আর রাত জাগিসনে। অভয় সব দেখতে পায়। সব স্পষ্ট—সব স্পষ্ট। ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে তার মা। সেই শীর্ণ চেহারা, শীর্ণ মুখ। চোখে শুধু অজস্র স্নেহ ভালবাসার অক্ষুরক্ত ভাণ্ডার। মা যেন বলছেন—রাত জেগে পড়িসনে বাবা। ঘুমো, এই তো আছি। তুই ঘুমো খোকা—আমি বাতাস করি। কে যেন এসেছে সত্যি। একি স্বপ্ন একি ঘুমের ঘোর। অভয় ডাকে—মা—মা—

কে যেন গায়ে হাত দিয়ে ডাকে—অভয়দা—অভয়দা—

অভয় উঠে বসে। ক্যাল ক্যাল করে তাকায়।

আবার ডাক ভেসে আসে—অভয়দা—অভয়দা—

দুই হাতে চোখ বগড়ে অভয় দেখে, সামনে দাঁড়িয়ে মিনতি। একহাতে চায়ের কাপ—

চোখে জল দাও অভয়দা। আমি অনেকক্ষণ ধরে ডাকছি। ঘুমের ঘোরে মা-মা বলে ডাকছিলে। অভয় মিনতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এখন দিনের আলো। রাতের সেই স্বপ্ন ঘেরা রক্ত মাথা আলো নেই। নেই—সেই অনন্ত প্রশান্তি আর শুকতা। তার হারানো মা আবার হারিয়ে গেছে দিনের আলোর মাঝে—

বাবাকে পত্র দেয় অভয়। পরীক্ষার আর দেবী নেই। পরীক্ষা শেষ হলোই সে বাড়ী যাবে। বড্ড মন কেমন করছে। গীতা খোকন কেমন? তাদের খুব সাবধানে রাখার জন্তে বার বার লিখেছে অভয়। তারিখের ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে অভয় দিন গুনতে থাকে। আর মাঝে মাত্র দশদিন। পরীক্ষায় কি যে হবে তাই ভাবে অভয়। ওর বুক টিপ্ টিপ্ করে। কোন রকমে এই দশটা দিন কেটে গেলে বাঁচে। পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই সেই দিনই বাড়ী যাবে। বাড়ীর জল মন অত্যন্ত উতলা হয়ে উঠেছে। শুভময় তাকে দেখা করবার জন্তে বলেছে, বিকেলের দিকে যাবে। অভয় আবার বইয়ের দিকে মন দেয়। খাড়ির কাটা ঘুরে যেতে থাকে। দরজার দিকে চোখ পড়তেই দেখে মিনতি দাঁড়িয়ে।

মিনতি বলে—দশটা যে বাজে। জল খাবার খেয়ে নাও অভয়দা। আমার স্কুলের সময় হয়ে গেছে। কিন্তু একটা কথা। এখন নিজের শরীরের দিকে খুব লক্ষ্য রাখ অভয়দা। সময় মত খাওয়া নাওয়া করা চাই।

—তা সত্যি কথা। কিন্তু এখন আর কোনদিকে চোখ দিতে পারিনে। এই পরীক্ষায় ওপরই আমার সব যে নির্ভর করছে—

মিনতি বলে—দেখো, ভূমি ঠিকই কাষ্ট ডিভিশনে পাশ করবে। অত ভাবনা করছ কেন? আসছে

বহর আমার পরীক্ষা। আমার গাবনা ওর হয়েছে এখন থেকেই।

অভয় হাসল। বলল, তোমার আবার ভাবনা। হু-হুটো প্রাইভেট মাষ্টার রয়েছে—

—তা রয়েছে। কিন্তু আমার যে কিছুই মনে থাকে না। কিছুক্ষণ পর মিনতি চলে যায়। কিন্তু আর পড়ায় মন বলে না, বাইরে ঘোড়ের ভেজ খুব। সদর রাস্তায় নানান লোকের নানা কোলাহল। স্কুল অফিসের আদালতের ছাত্ররা বাবুরা তাড়াতাড়ি ছুটছেন। ছাতা মাথায় দিয়ে লোকে হাঁটছে, কেউ কেউ সাইকেলে যাচ্ছে।

অভয় খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাতাসে বইয়ের পাতা ফ্ ফ্ করে উড়তে থাকে। টেবিলের ওপর থেকে খাতা পেনসিল বাতাসের বেগে পড়ে যায়। অভয়ের এখন কোনদিকে দেখবার অবসর নেই। রাতের সেই স্বপ্নটা যেন দেখতে পায়। মা এসেছিলেন। মায়ের সেই চির পরিচিত ডাক। সেই মধুর ডাক, কি ভোলবার? সেই ডাক যে অভয় এখনও গুনতে পাচ্ছে—খোকা ও খোকা। ঠিক যেন সব সেই দেশ—সেই দেশের ঘর বাড়ী। তার গী—ছায়া ঘেরা বন জঙ্গল ঘেরা তার আঁত পাঁচত গাঁয়ের বাড়ী। মা যেন গোয়ালঘর থেকে বোঁরিয়ে এসে ডাকছেন—খোকা ও খোকা—মায়ের সেই শীর্ণ চেহারা। পরণে লাল পেড়ে সাড়ী। হাতে শুধু একগাছি লোতা আর শাখা। অভয় পলকহীন চোখে, শূন্য দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়ে থাকে।

এই লোকজন কলকোলাহল, সব যেন তার চোখের সম্মুখ থেকে উধাও হয়ে গেছে। এই দৃশ্যমান জগৎ যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। শূন্য দৃষ্টিতে, অভয় বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কানে শুধু ভেসে আসে মায়ের সেই পরিচিত ডাক—খোকা—ও খোকা—

হুপুরে পড়ছিল অভয়। দরজায় একটু শব্দ হতেই অবাক হয়ে দেখল, মিনতি দাঁড়িয়ে—

—এ কি, স্কুলে যাওনি—

—না, বাই নি। খাওয়ার পর হঠাৎ শরীরটা ভাল লাগল না। এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলাম। আচ্ছা—অভয়দা, ম্যাস্ট্রিক পাশ করে কোথায় পড়বেন।

—কোথায় পড়ব? দাঁড়াও আগে পরীক্ষা হোক, পাশ করি, তারপর যে সব ভাবা হবে—

ঘাড় হুলিয়ে মিনাতি বলল—না—না। পাশ তো করবেনই। আমি বলছি দেখবেন। ফাষ্ট ডিভিশনে পাশ করবেন। ভাবা হচ্ছে কোথায় পড়বেন। এখানে তো কলেজ নেই—

—পড়া কি আর হবে? এখানে কলেজ থাকলে তুণ্ড পড়াটা হ'ত। পড়তে চলে হয় বরমপুর—না হয় কলকাতা। কিন্তু আমার খরচ কে দেবে?

—খরচ? তা বাবাকে না হয় বলবেন। মনে হয় আপান যদি বলেন, বাবা কক্ষনো অর্থীকার করবেন না। সত্যি অভয়দা, আপনাকে পড়তেই হবে।

হাসিয়া অভয় বলে—আচ্ছা পাগল তো। আমার তো পড়ার খুব সাধ। কিন্তু টাকা কোথায়? আমার বাবার অবস্থা জান। কোন রকমে দিন চলে যায়। বাবার কোন সাধ নেই যে আমার খরচ দেন।

মিনাতি বলল, বঠিয়ে পড়েছি, কত গরীব ছাত্র বড় কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছেন। সেই কথাটি বলছি অভয়দা। ম্যাস্ট্রিক পাশ করার পর, যেমন করে হোক কলেজে ভর্তি হয়ে যান। দু-একটা টিউশন হুটিয়ে কাকুর বাড়ীতে থেকে, কতজনাই এমান করে করে লেখা পড়া করে। শেষে জীবনে উন্নতি করেছে। তা তুমি কেন পারবে না?

অভয় অবাধ হয়ে যায়। মিনাতির মুখ আর কথাগুলো যেন কোন প্রতিজ্ঞায় মূগ্ধ। কিন্তু অভয় আশ্চর্য্য হয়। তার পড়ার জন্যে মিনাতির এত আগ্রহ কেন?

মিনাতির মুখের পানে চেয়ে অভয় বলল, তা, চেষ্টা করব। খুবই আমি চেষ্টা করব। সত্যি কতজন কষ্ট কষ্ট সহ করে লেখাপড়া শিখেছেন। দেশের আর

দেশের মধ্যে গণ্যমান্ত মানুষ হয়ে উঠেছেন। কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে খুবই উপকার করলে আমার। কিন্তু ও সব তো পরের কথা। এমন সামনের ভাবনা ভাবি—

মিনাতি বলল, সামনের ভাবনা কি আবার?

—অনেক অনেক ভাবনা। পরীক্ষা তো বটেই, এ ছাড়া কত যে ভাবনা চিন্তা, সে কি বলে শেষ করা যায়?

মিনাতির মুখের মুখে হাসি ফুটে উঠল। মিনাতি বলল, অভয়দা, তুমি নিজেকে একজন আন্তিকালের বাস্তবীড়ির মত কথা বলছ। যেন কতই না ব্যয়স হয়েছে তোমার। ঠিক বুড়ো লোকদের মত পাকা পাকা কথা বলতে শিখেছ।

অভয় হাসল। হেসে বলল, পাকা পাকা কথা শুধ মাথার ঢুল পাকলেই কি মুখ দিয়ে বেরোয়? অবস্থাগতিক, নানান আশ্রিত থেয়ে, অন্ন দয়সেই অনেক অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান জন্মে যায়। আমার অবস্থা তুমি এখন ঠিক বুঝতে পারবে না। তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আর আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেতর অনেক পার্থক্য।

মিনাতির মুখে হাসি ছায়া দেখা দিল। মিনাতি বলল, অভয়দা, তোমার কি এখানে অস্ত্রবিধে হচ্ছে?

—অস্ত্রবিধে? না—না—ওসব কিছু নয়। ওগু পাণ্ডা থাকা ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে তো? আমার অনেক ভাবনা। কি যে তা ভাবনা, তা আমি ঠিক করে তোমাকেও বোঝাতে পারব না।

মিনাতি অশ্রদ্ধা হয়ে বলল,—বা, নিজেকে ভাবছ, কি চিন্তা ভাবনা তা নিজেকে বলতে পার না?

অভয় কথা র জবাব দিল না—শুধু হাসল। খাড়িতে ঢং ঢং করে কটা যেন বাজল।

এক এর মধ্যে তিনটে বেজে গেল। যাঁই এখন—

সেই বড় প্রতীক্ষিত দিনটি এল।—এল খবর। স্কুলে পাশের খবর এসেছে। খবর নিয়ে এল, অভয়ের সহ-পাঠী রাখাল। রাখাল কতবেগে এসে ডাকল,—অভয়,

অভয়। দুপুরে অভয় কি একখানা বই পড়তে পড়তে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল, বাথালের চাঁৎকারে জেগে উঠল। কৌচাচর কাপড় গায়ে জড়িয়ে বাইরে এসে বলল, আরে বাথাল যে। কি ব্যাপার? হাসতে হাসতে বাথাল বলল, এখনও ঘুমুচ্ছে? এদিকে স্থলে রেজাল্ট এসেছে যে। ভূমি ফাট ডাঁভশনে পাশ করছে—

—সত্যি?

—হ্যাঁ। নাও, জামা গায়ে দিয়ে নাও। স্থলে চল। আমরা সবাই পাশ করছি। শুধু আবহুল আর পরেশ ফেল করেছে। নাও আর দেবরী নয়।

অভয় তাড়াতাড়ি জামা জুতো পরে নিল। খাচি পরীক্ষার পাশ ফেলের কথা। ছাত্র, অর্ধভাবক, সবাই শহরে শুধু স্থলের দিকে ছুটছে; বাল পরশু বেকবে, কাগজে কাগজে নামের তালিকা। তখনকার দিনে দাঁক খবরের কাগজে মার্চিক পাশের খবর ছাপা কত নাম আর ডাঁভশন মুখ। স্থলে অভয় যখন পৌঁছাল, তখন চারদিকে শুধু কে কে বাল। সবাই অর্ধভাবক জানাচ্ছে, সকলের মুখেই হাসি। কেউ কেউ খবর নিয়েছে, জেলা স্থলে কটা পাশ করল। বা কটা গেল কোন্ বিভাগে। কেউ বলছেন রতন চাট্টিয়া নিন্দয়ত স্তম্ভাংশ পাবে। এদিকে আচ আবার ডাঁভশন কাগজে খবরটার। শোজাল নাটক হবে। এখন থেকেই শুরু হয়েছে চিকিৎসা বিভাগ। স্থলে গেলো আজ আর কেউ বাল যাবে না। খাবারের দোকানে নিষ্টি বক্রীর গুম পড়ে গেছে। হেলেনা দল বেঁধে যাচ্ছে খাবারের দোকানে। এ চি করেন এ শুকে খাওয়াচ্ছে।

শুভময় একবার জোর করে শুভমকে নিয়ে চলল নিজের বাড়ীতে। আজ যে বড় মুখের দিন। কিও এই সমস্ত মুখ ও আনন্দকে ছাপিয়ে অভয়ের মার এক একটা ভীত বাথায় টনু টনু করে উঠছে। এমন আনন্দের দিনেও—তার চোখ দিয়ে এক সময় জল গড়িয়ে পড়ল। চোখ মুছবার আগেই দোখে ফেলল

শুভময়। শুভময় বলল, ও কি অভয়দা, তোমার চোখে জল কেন?

—না—না। ও কিছু নয়। বোধ করি চোখে কিছু পড়েছে। শুভময় বাড়ি নেড়ে বলল উহ—ও আমি বুঝিছি। ভূমি আমায় ফাকী দিতে পারবে না। মায়ের কল চোখে জল এসেছে। ঠিক কি না বল। অভয়ের চোখের ওপর ভেসে উঠল মায়ের সেই মুখখানা। মায়ের যে বড় সাধ ছিল তার খোকা পাশ করবে। পাশের খবর পেলে সত্যনারায়ণের সিন্দী দেবেন। গায়ের পাচজনকে ডেকে ঠাকুরের প্রসাদ দেবেন। মা বলবেন, তোমরা আশীর্বাদ কর। খোকা আমার পাশ করেছে। আতা মায়ের যে কত আশা ছিল। হায়, আজ সে পাশ করেছে, কিন্তু আজ কোথায় তার ছাঁখনী মা। অভয়ের মনে হল এত মুহূর্তে তার মা যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেই শীর্ণ মুখ আজ কানিতে পূর্ণ। হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন হেলের দিকে। যেন বলছেন—খোকা, ও খোকা। সত্য নারায়ণের পুজোটা দিস বাবা। ঠাকুরের কাছে মানস করো ছিলাম যে। চোখের ওপর ভেসে উঠল সেই গায়ের ছাঁখনী। ছায়া দেবী বনজঙ্গলে দেবী তাদের গাঁ পলালপুর। চব্বারে বন, কোথাও আমবাগান, বাগবন আর কলাবাগান। বড় বড় অশগ গাছ আর বটগাছে জড়াজড় করে রয়েছে। এ পাশে ও পাশে ছোট ছোট ডোবা—মজা পুকুর—গালবন আর বাপলা বন। গাঁয়ের বড়গালা, তারপর তার চিক পাশ দিয়ে পায়ে চলার সুরু পথ। চোখের ওপর এক মুহূর্ত সব ভেসে উঠল। একে একে চোখের ওপর জেগে উঠল, তার বাবা মা, গীতা আর খোকনের মুখ।

শুভময় বলে, অভয়দা, ও অভয়দা। অভয় যেন সাবংসীফের পেল। অবাক হয়ে তাকায়।

—কি ভাবছিলে অভয়দা। না—দেবী হয়ে যাচ্ছে চল চল। অভয়কে নিয়ে এল বাড়ীতে। ওপরের সেই পড়ার ঘর। চারদিকে কত আলমারী—কত বই। শুভময় বলল, বস অভয়দা। অভয় চারদিকে তাকিয়ে



তাকিয়ে দেখতে লাগল। কত চেয়ার, টেবিল, কত বই—

কিন্তু অভয়ের মন চলে গিয়েছে বাড়ীতে। কালই একখানা চিঠি দিতে হবে বাবাকে। খোকন গীতাকেও লিখতে হবে। কিন্তু এখন তার কি কর্তব্য। পড়া আর হবে কি না সন্দেহ। এখানে কলেজ নেই—যদি থাকত তবে নিশ্চয়ই একটা উপায় হ'ত কিন্তু জেঠাবাবু কি আর তাকে পড়াতে রাজী হবেন?

চাকরের হাতে একরাশ খাবার আর চা নিয়ে ঢুকল শুভময়।

আজ আমিরাও সঙ্গে এসেছে।

—এ কি, এত খাবার কে খাবে?

শুভময় বলল, কেন, আমরা। আমরা দুজন তো বটেই আর সুপরিও খাবে।

অমিয়া রেগে বলল, আবার আমার ঐ নামে ডাকছ। দাঁড়াও মাকে বলে দাঁচ্ছ। অভয় মুদ্র দৃষ্টিতে, এই ফুটফুটে স্নান ঘেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

—সত্যি তো। ওকে ওর ভাল নামেই ডাকা উচিত। তবে ডাকনামটা তো নেহাৎ খারাপ নয়। চেয়ারের পেছনে মুখ লুকাল অমিয়া। শুভময় বলল, বাঃ, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে কেন, এস আমরা একসঙ্গে খাই—

শুভময় বলল, ও খাবে না, লজ্জা হয়েছে। তা না থাক্, আমাদের কাপে চা চলে দে—

চা খাওয়া শেষ হলে, শুভময় বলল, চল অভয়দা, মার সঙ্গে দেখা করে আসবে। স্বভাবতঃই অভয় একটু লাজুক প্রকৃতির। তাই অভয় বেশ চিন্তিত হয়ে উঠল। এর আগে বহুবার সে এখানে এসেছে, কিন্তু এই লাইব্রেরী ঘর ছাড়া বাড়ীর ভেতরে কোনদিন যায়নি। সে শুভময়ের পেছনে, বারান্দা পার হয়ে, অল্প একটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে, আলাদা একটা বাড়ীর মধ্যে পৌঁছল। অভয় দেখল, মস্ত বাড়ী, এটা এদের অন্দর মহল। বিরাট লম্বা চওড়া বারান্দার একপাশে একখানি চেয়ারে বসে আছেন শুভময়ের মা। শুভময়ের মাকে

দেখে অভয় অবাক হয়ে গেল। মাহুৰ যে এত সুন্দর হতে পারে, এর আগে তা ভাবেনি। জ্যাঠাইমাও খুব বড় লোকের বউ, কিন্তু তিনিও এত সুন্দর নন।

শুভময় বলল, মা—এই অভয়। অভয় প্রণাম করতেই শুভময়ের মা বললেন, শুভর কাছে তোমার কথা প্রায়ই শুনতে পাই। তা এখন কলেজে পড়বে তো—

—দেখি কি হয়।

—না—না, পড়বে বৈকি। নিশ্চয়ই পড়বে। তবে যে কোন একটা লাইন ঘরে পড়াই ভাল। যেটা তোমার নিজের বেশ ইচ্ছে, ধর ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, এমনি একটা লাইন নিয়ে পড়াশোনা করা উচিত।

—বাড়ী নুইয়ে অভয় বলল, হঁ—তা বটে।

—আমি তো শুভকে ইঞ্জিনিয়ার করব। আমার তাই ইচ্ছে আর কর্তার ইচ্ছেও তাই। এরপর আর দু'একটি কথার পর অভয় ফিরে এল। অভয়ের এখন অনেক চিন্তা। শুভময় বলল, অভয়দা ঠিক আটটার মধ্যে চলে আসবেন কিন্তু। টিকিট কিনে আমি ওখানেই থাকব। আজ তো দারুণ ভীড় হবে—ঠিক নটার আরম্ভ হ'বে থিয়েটার।

বাড়ী ফিরতেই মিনতি বলল, এতক্ষণ কোথায় ছিলেন অভয়দা, বাবা বাড়ী এসে, ভোমায় ডাকছিলেন।

দোতালার ঘরে অনেকগুলো কাগজপত্র খুলে কি সব দেখাছিলেন, যোগেশ্বর দত্ত। ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে জেঠার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই যোগেশ্বর বললেন, খুব খুশী হয়েছি। কাল গোপেশ্বরকে পত্র দিয়ে পাশের খবরটা জানাবে। তা এখন কি করবে ঠিক করেছ?

ভয়ে ভয়ে অভয় বলল—আমার ইচ্ছে পড়ি—

—হঁ, কিন্তু কি পড়বে? আচ্ছা—আমি ভেবে চিন্তে দেখি, যা হয় একটা ব্যবস্থা হবেই। আমার মনে হয়, বহরমপুর কলেজ ভাল। তোমার সঙ্গে যারা যারা পাশ করেছে, তারা কে কোথায় পড়বে, সব খোঁজ নাও। তারপর ঠিক করা যাবে। আচ্ছা এস এখন।

অভয়ের আনন্দ আর বাধা মানে না। তার

জীবনের অপূর্ণ সাধ পূর্ণ হতে চলেছে। জেঠাবাবু যখন নিজস্ব বসে বসে, তখন আর কোন বাধা নেই। হাসিমুখে অভয় ফিরে এসে স্নানঘরটা জানাল মিনতিকে।

মিনতি বলল—আমি আগেই বলেছিলাম না? এখন মাকে প্রণাম করে এস অভয়দা।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। অভয়ের আজ যে বড় আনন্দের দিন। এই কয়মাস দিনরাত্রে মধ্য, মাত্র দু একঘণ্টা ছাড়া পাতা এক করেছিল। সমস্ত দিন রাতের মধ্যে একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল, পরীক্ষায় ভাল ভাবে পাশ করা। সেই অধ্যবসায়, সেই পরিশ্রম এখন সার্থক হয়েছে। তার সেই গ্রাম, এখন বহুদূর। সেই ছায়াঢাকা গ্রাম চাঁদকে শুধু আম কাঁঠাল বাগান আর বাঁশবন। এখানে ওখানে শুধু মজা পুকুর। সেখানকার বাসিন্দারা প্রায় সবাই চাষী আর মধ্যবিত্ত। বহু কষ্টে তারা সংসার চালায়। বহু পরিশ্রমে তারা ফসল তোলে। সেখানে না আছে খুল—না আছে কোন রাস্তাঘাট। তবুও সে ভালবাসে তার সেই অধ্যাত্ত অবজ্ঞিত গ্রামকে। বোধ করি, এমন সুন্দর মনুষ্যবিশিষ্ট দেশ আর কোথাও নেই। আম জাম তেঁতুল আর নানা ফলফুলের ছায়াচ্ছন্ন স্বন্দিতা, মাটির নমনীয়তা আর কোথায় আছে? কান পাতলেই শোনা যাবে নানান পাখীদের কলরব। সেই অনন্ত দিগন্তপ্রসারী মাঠ—রাস্তার ধারে ধারে বৃদ্ধ বটগাছ অশ্বগাছ, আকাশে মেঘের খেলা—শীর্ণ নদীটির ধারে, তরমুজ, ফুটি, পটলের ক্ষেত আর কাশবন। এসবের তুলনা কোথায়? এই দেশ কি ভুলে থাকা যায়? দূরে থাকলেও, সে কখনও তার জন্মভূমি গ্রামকে ভুলতে পারবে না। সেখানকার

প্রতি ধূলিকণা যে তার সর্বোচ্চ মাথা। অভয় চোখ বন্ধ করে, তার গায়ের ছবি দেখতে পায়।

খুলোভরা রাস্তা। রাস্তার পাশে পাশে দেবদারু, বাবলা, আম, কাঁঠাল গাছের ছাড়াছাড়ি ভিড়। পথের পাশে, নটুর মুদীখানা দোকান—তার পাশে সদা ময়রার খাবারের দোকান। সদানন্দ ঠিক নিজের জায়গায় বসে দাঁড়ীপালা হাতে করে, মুড়কী, জিলেপী, রসগোল্লা ওজন করছে। ছোটখাট মানুষটা। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা—আর সব চুলই পেকে সাদা। পরনে ছোট আটহাতি লাল পেড়ে শ্রুতি—কাঁধে সাদা গামছা। সদানন্দ নিজের তক্তাপোশটির ওপরে বসে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে কাল কুচকুচে ছোট্ট হুকোয় তামাক টানে। কখনও ক্যাচকোচ শব্দ ভুলে, গরুর গাড়ী চলে যায়। লাঙ্গল কাঁধে চাষীরা মাঠে যায়—রাখাল ছেলেরা তাল পাতার ছাতা—টোকা মাথায় দিয়ে পাল পাল গরু নিয়ে মাঠে যায়। আবার রাস্তা হয় নির্জন। দুপুরের নিস্তব্ধতা নেমে আসে সারা গায়ের ওপর। বোদের তেজ আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে। বাবলা বনের ওপার হতে ভেসে আসে ঘুঘুপাখীর ডাক। এ সমস্তই অভয় চোখ বুজলেই দেখতে পায়। তার সেই পলাশপুর গাঁ। পলাশপুরের নদীনালা রাস্তার খুলো মাটি কাঁদা,—বাতাস—কত ফুলের সুগন্ধ, পাখীদের ডাক, মধুর গান সব সে দেখতে পায় শুনতে পায়, সব সে সর্ব মনপ্রাণ শরীর দিয়ে অনুভব করে। পলাশপুর যেন তাকে ডাকে—অভয়—অভয়—। আর ভেসে আসে তার চিঃহঃখিনী মায়ের ডাক—খোকা—বাবা আমার—

ক্রমশঃ

# সঙ্গীত সঙ্কলন

রাজা রামমোহন রায়

আমায় কোথায় আনিলে ।

আনিয়ে সাগর-মাঝে তরী ডুবালে ।

নাতি দেখি পারাপার,

চারিদিক অন্ধকার,

প্রাণ বুঝি যায় এবার

ঘূর্ণিত জলে ।

কোথা রইল পিতামাতা,

কে করে স্নেহ মমতা,

প্রাণপ্রয়া রইল কোথা

বন্ধু সকলে ॥

(ইমন কল্যাণ, তেওট)

ভাব সেই একে,

জলে হলে শূন্যে যে সমানভাবে থাকে ।

যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার,

সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে ।

তমোহরানাং পরমং মহেশ্বরং,

তং দেবতাপাং পরমং দেবতং,

পাতং পতীনাং পরমং পরস্তাং-

। বদাম দেবং দিবনেশমীডাম্ ।

(সাহিনী, ধামার)

ভয় করিলে যারে না থাকে অস্তের ভয়,

বাহাতে কারিলে পীড়িত, জগতের প্রিয় হয় ।

জড় মাড়ী ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়,

সকল ইচ্ছায় দিল, তোমার সহায় ;

কিঞ্চ ভূমি ভোল তাঁরে, এ ত ভাল নয় ॥

(বাগেলী, আড়াঠেকা)

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,

তোমার রচনা-মধ্যে ভোমাকে দোখিয়া ডাকি ।

দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা,

প্রতিক্ষেপে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা ;

তোমার প্রভাব দোখি না থাকি একাকী ॥

(সুরট, কাওয়াল)

ভজ অকাল নির্ভয়ে,

পবন তপন শশী প্রমে যার ভয়ে ।

সকলকালে বিজ্ঞান,

সর্বভূতে যে সমান,

সেই সত্য, তাহে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে ॥

(রামকোল, আড়াঠেকা)

অনিভা বিষয় কর সন্ধান চিহ্নন ।

প্রমেও না ভাব, তবে নিশ্চয় মরণ ।

বিষয় ভাবিবে যত বাসনা বাড়িবে তত-

ক্ষেপে হস্ত, ক্ষেপে খেদ, তাঁই কাঁট প্রতিক্ষণ ।

অশ্রু পড়ে বাসনার, দস্ত করে হাতীকার,

মৃত্যুর অরণে কাপে কামক্রোধ রিপুগণ ।

অতএব চিন্তা শেষ, ভাব সত্য নির্বিশেষ,

মরণ সময়ে বন্ধু একমাত্র তিনি হন ॥

(রামকোল, আড়াঠেকা)

গ্রাস করে কাল পরমায়ু, প্রতিক্ষেপে ;

তর্কপি বিষয়ে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্কনে ।

গত হয় আয়ু যত,

স্নেহে কহ হ'ল এত,

বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বহুগুণে ।

এসব কথাই হলে  
কিবা ধনজন-বলে,  
তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে ।  
অতএব নিরন্তর  
চিন্তা সত্য-পরাংপর,  
বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে ।

(রামকোণ, আড়াঠেকা)

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ;  
অন্তে বাক্য কবে কিস্তি তুমি যবে নিরুত্তর ।  
যার প্রতি ষত মায়া,  
কিবা পুত্র, কিবা ক্রায়া,  
তার মুখ চেয়ে কত হইবে কাতর ।  
পুতে ছায় ছায় শব্দ,  
সম্মুখে গজন স্তব্দ,  
দৃষ্টিহীন, নাড়ী ক্ষীণ, ভীম কলেবর ।  
অতএব সাধনান,  
ত্যাগ দগ্ধ আভমান,  
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যোত্তে নিভর ।

(সিদ্ধ ভৈরবী, আড়াঠেকা)

মন, এাক দাঁত জোমার ।  
আবাহন বিসর্জন বল এর কার ।  
যে বিন্দু সমান থাকে,  
উছাগদ্ধ বল তাকে,  
তুমি কে বা খনি কাকে, এঁক চমৎকার ।

অনন্ত জগদাধারে,

আসন প্রদান করে,  
ইহ ভিত্তি বল তারে, এঁক আবিচার ।  
এঁক দোষ অসম্ভব,  
বিবিধ নৈবেদ্য সব  
তারে দিয়া কর শ্রব, এঁক বিশ্ব যাতার ।

(টোড়ি, আড়াঠেকা)

এত জাতি কেন মন, দেখ আপন অন্তরে ।  
যায অগ্রেণ কর সে নিবাসে সন্মান্তরে ।  
স্বর্ঘোত্তে প্রকাশ, তেজ রূপে করে হিতি,  
শরীতে শরীতলত। জগতে এঁক রীতি,  
তোমাতে যে আত্মরূপে প্রকাশ  
সেই ব্যাপ্ত চরাচরে ।

(বেলাগ, আড়াঠেকা)

অজ্ঞানে জ্ঞান চায়ায়ে করে এঁক অমৃতান ।  
পরাংপরে করি পর অপরে পরম জ্ঞান ।  
কল প্রমে মরীচিকা আশা মান সাধ,  
অলভা বাসিজ্য তাকে না দোষ অসার ।  
আববেকে ত্যজ তত্ত্ব অতত্ত্ব যথার্থ জ্ঞান ।

\* ১৮৩২, ২২এ সেপ্টেম্বর বিলম্বিত ৫৪তে রামমোহন  
ক্রোড় পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়কে এঁক গীতিটি পাঠাইয়া  
পনে লিখিয়াছিলেন :—  
“এঁক অবকাশে রক্ষসমাজের কাজের নিমন্ত এক গীতি  
পাঠাইভোঁচ, যত্নাপ প্রেমরা ও বিদ্যাবাগীশ উচিত  
মান, গুরুকদিগকে ‘দেবে।’”

# যোগেশচন্দ্র স্মরণে

কানাইলাল দত্ত

বিদগ্ধ সমাজে যোগেশচন্দ্রে বাগল একটি অতিপরিচিত নাম। গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ তিনি চারণের ভায়ে বাংলা ও বাঙালির কর্মকথা আমাদের স্মরণে আসছেন। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে শিক্ষা সাহিত্য ধর্ম-সমাজ সংস্কার কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিবিধ প্রয়াসের যে বিন্দুস্বয়কর বিকাশ বাঙালি জীবনে ঘটেছিল তারই তথ্যনির্ভর অথচ রোমাঞ্চকর ইতিহাসকার যোগেশচন্দ্র। বিদেশী শাসকের অনীহা ও উপেক্ষা এবং আমাদের অনাড়ম্বর এবং আত্ম-বিশ্বাসের অভিশাপে নিকট অতীতের অতি প্রয়োজনীয় সেই ইতিহাসের আকর অবলুপ্ত হতে বসেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম যত তীব্র আকার ধারণ করেছে আমাদের আত্মসচেতনতাও তত বেড়েছে। এই সচেতনতা আত্মাবস্থাসের দ্বারা স্থিতিশীল হয়। বাঙালির অভীত স্মৃতির কথা এ ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রহ্মপ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজ শুরু করেছিলেন। যোগেশচন্দ্র তাঁর সার্থক উত্তরসূরী।

যোগেশচন্দ্র সাংবাদিক রূপেই কর্মজীবনে অবতীর্ণ হন। মুখ্যতঃ প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ এবং অল্প পরিমাণে দেশ সাপ্তাহিকের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। সমসাময়িক খবরাখবরের মূলধারা ধরেই সাময়িক পত্র পত্রিকার চলতে হয়। প্রতিদিন শত শত সংবাদ তৈরি হচ্ছে। তার মধ্য থেকে সাময়িক পত্রিকার জন্য প্রয়োজনীয় গুটি কয়েক মাত্র খবর বেছে নিতে হয়। সংবাদ বাছাই কাজটির উপরই সাময়িক পত্রের উৎকর্ষ

বহুলাংশে নির্ভরশীল। সার্থক সাংবাদিক ভিন্ন সূচক রূপে এই কাজটি করা যায় না।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির মতামত ও পারবেশিত তথ্যাদির মূল দায়িত্ব লেখকের। তথাপি কাগজের আদর্শ রক্ষার্থে মতবাদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় এবং মর্যাদা ও সুনামের জন্য তথ্যাদির যথার্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়। দক্ষ সাংবাদিকের ভায়ে যোগেশচন্দ্র সূচকরূপে এই কাজটি দীর্ঘকাল ধরে করে এসেছেন। বিদগ্ধ সমাজে প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউতে প্রকাশিত তথ্যাদি সাধারণতঃ বিনা বিতর্কে গ্রহীত হতো। প্রবাসীর মতামতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। চলতি সমস্ত সম্পর্কে প্রবাসী কি বলেন তা জানবার জন্য বহুজনে সাপেক্ষে অপেক্ষা করতেন। প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা--সাংবাদিকপ্রবর শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব একান্ত নিশ্চয়ই সর্বাধিক। তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ কাজে যোগেশচন্দ্র সহ প্রবাসীর অন্যান্য সহকারীদের অবদান কম নয়। কিন্তু গবেষক যোগেশচন্দ্রের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং বিপুল খ্যাতির আড়ালে আজ সাংবাদিক যোগেশচন্দ্র অপেক্ষাকৃত স্নান ও বাহুলাংশে বিস্মৃত।

গবেষক যোগেশচন্দ্রকে যথার্থভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা আমার নেই। হু-চারটা প্রবন্ধের দ্বারা তা করা যায়ও না। বাঙালি ও বাঙালির কর্মকথাকে বাদ দিয়ে আমাদের লেখাপড়া জ্ঞানচর্চা কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাই বিস্তারী থেকে পণ্ডিতজন পর্যন্ত প্রায় সকলকে কোন না কোন সময়ে যোগেশচন্দ্রের

রচনাবলীর শরণ নিতে হয়। সুতরাং কালক্রমে স্রষ্টাজনেরা গবেষক যোগেশচন্দ্রের প্রকৃত মূল্যায়নে উদ্যোগী হবেন এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। আমি এখানে তাঁর গবেষণা পদ্ধতির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

যোগেশচন্দ্রের গবেষণার বিশিষ্ট পদ্ধতির প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী। আমাদের সমাজে যা কিছু ঘটে তার পেছনে ব্যক্তি মানুষের বিপুল ও বিস্ময়কর অবদানটি বর্তমান সময়ে তেমন গুরুত্বসহকারে আমরা দেখতে অভ্যস্ত নই। সাধারণতঃ ঘটনাবলীর ঐক্য বা প্রবণতা বিচার বিশ্লেষণ করে একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু যোগেশচন্দ্র বোধ হয় ব্যক্তি মানুষের কর্মকর্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। প্রতিভাবান ও কর্মদক্ষ মানুষের দ্বারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা সমস্যামায়ক ঘটনা প্রভাবিত হয়। সেগুলি নতুন আকার ধারণ করে এবং নতুনতর মূল্য লাভ করে। সেজন্যই যোগেশচন্দ্র এক-একজন মানুষের জীবন ও কর্মকথাকে কেন্দ্র করে সেযুগের নানা আন্দোলন ও বিবিধ অস্থিতির প্রতিষ্ঠানের কথা শুনিয়েছেন।

মানুষের ব্যক্তিসত্তার সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি খুবই অর্ধবাক্য। যোগেশচন্দ্র তাঁর শেষ জীবনের বাসস্থান নব বারাকপুর সমবায় পর্যায়ে সাহিত্যসেবা ও সাহিত্যাহরণী সঙ্ঘদেবীর নিয়ে একটি সাহিত্য চক্র গড়ে তোলেন। এটির নাম দেন তিনি সাহিত্যক। যোগেশচন্দ্রের পরলোক গমনের পর এর নাম হয়েছে যোগেশচন্দ্র স্থিতি সাহিত্য বাসর। এই সংস্থার কাজকর্ম উপলক্ষে বারংবার তাঁকে বলতে শুনিছি, আমরা জনতা চাই না, জন চাই। এটা জনতার যুগ। প্রতি পদক্ষেপে জনগণের দোহাই পাড়া তো ক্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হলো, এক দুই জন মানুষ দ্বারা নেতৃত্ব থাকেন তাঁদের সিদ্ধান্তই জনতার সিদ্ধান্ত বলে প্রচারিত হয়। বিশ্বের প্রতিটি ক্রান্তিকারী চিন্তা কোন না কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রথমে আসে। সেই চিন্তাকে কমে রূপান্তরিত

কর, পরিহীত ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা যিনি সৃষ্টি করেন এবং অনুগামী সংগ্রহ করেন তিনি নেতা। এদের দ্বারাই দেশ সমৃদ্ধ হয় জাতি বড় হয়। সুতরাং দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির হাতহাসে ব্যক্তির ভূমিকা সর্বাধিক। যোগেশচন্দ্র সেই ব্যক্তি মানুষকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর গবেষণায়। দ্বারা স্বীকার করেন ঘটনার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা মানুষ গড়ে ওঠে, তাঁরা একথায় স্ক্রু হবেন। কিন্তু তারা বিশ্বাস করেন মানুষ ঘটনা সৃষ্টি করে, তাঁরা এর দ্বারা আশ্রিত হবেন বলেই আশা করি।

যোগেশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসবার পূর্বে আমি খাতি মানুষ ও জ্ঞান-তাপস শব্দ-দ্বিটির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। কিন্তু তাঁর পাঠপ্রাপ্তে বসেই আমি এর প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে পেরেছি। যোগেশচন্দ্রের মধ্যে সত্যিকার একজন খাতি মানুষ ও জ্ঞানতাপস মূর্তি ছিল। গীতায় দৈবাত্মের সম্পদ বিভাগ যোগে দৈবী অবস্থালভের যোগ্য মানুষের গুণাবলীর উল্লেখ আছে। এই ২০টি গুণের অনেকগুলি আমি যোগেশচন্দ্রের প্রতিদিনের আচরণে দীর্ঘদিন ধরে নিতা প্রত্যক্ষ করেছি। কেবল আমি কেন? যারাই তাঁর নিকট সান্নিধ্যে এসেছেন তারা সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন বলেই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বগুণে স্বাধীনতা আন্দোলন কালে দেশবাসীর চরিত্র উন্নত হয়েছিল। গান্ধীজি নিদোশত একাদশ প্রতীকারী মানুষের সংখ্যা তখন অন্তর্নিত। অহিংসা, সত্য, অস্তিত্ব, ব্রহ্মচর্য, অসংগ্রহ, শরীরশ্রম, অস্বাদ, ভয়বর্জন, বদেহী, অস্পৃশ্যতা বর্জন ইত্যাদি এতপালনের দ্বারা সাধারণ মানুষের চরিত্র অসাধারণ হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবী বাংলার বীর্যময় প্রকাশের এই চরিত্রশাস্ত্র আরও দৃঢ় হয়েছিল। যোগেশচন্দ্র ও সমসাময়ের অনুরূপ মানুষের চরিত্র এর সাক্ষ্য বহন করছে। তখন বিত্ত-কৌলিন্তের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়নি; বোহিমিত্তান যৌবনের বিপদগামী হাওয়ার সুযোগও ছিল সীমাবদ্ধ। তাই সমাজে বিত্ত ও চরিত্রের সমাদর ছিল।

সর্বোপরি যোগেশচন্দ্রের আধারটি ছিল ঐতিহ্য। প্রজাবান্ লভতে জ্ঞানম্ কথাটা তো আর কথার কথা নয়? খবরের কাগজ, রেডিও, সিনেমার কল্যাণে আজকের সমাজে একপ্রকার অধর্শীকৃত মানসিকতার প্রাবল্য ঘটেছে। ফলে প্রজ্ঞা প্রায় অবলুপ্ত। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় ডাঙচুর, খুনজখম, চরিত্রসঙ্কট। এই রকম সমাজে যোগেশচন্দ্রের জ্ঞান আত্মসমাহিত প্রচারকূঠ পণ্ডিতের বথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে কি না তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সমাজকে তিনি যা দিয়েছেন তার বিনিময়ে সমাজ তাঁকে যথেষ্ট সমাদর করে নি, যথোপযুক্ত মর্যাদাও দেয় নি। তিনি অবশ্য তার জ্ঞান বিন্দুমাত্র কোভ কোনদিন প্রকাশ করেন নি। পরন্তু আমরা কেউ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তিনি অসন্তুষ্টই হতেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়। সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী ছিলেন আধ্যাপক কবীর সাহেব। তিনি, স্বর্গত তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ কয়েকজনের চেষ্টায় যোগেশচন্দ্র একযোগে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারের নিকট থেকে কীকিং সাহিত্যিক পেনশন পান। স্বাধীন দেশের জাতীয় সরকার শুধুমাত্র কয়েকটি টাকা পেনশন মঞ্জুর করলেই যোগেশ চন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা করা হলো এ আমরা মনে করতে পারি নি। সেজন্য আমাদের ক্রোধ ছিল। যোগেশচন্দ্র তা জানতেন। কিন্তু সরকারের এই সামান্য কাজটুকুর জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না। তিনি আত্মসন্তুষ্ট ছিলেন বলেই বোধ করি দুঃখ বা ক্রোধ প্রকাশ করতে তাঁকে দেখিনি কোনদিন।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন যোগেশচন্দ্রের শিক্ষাগুরু ছিলেন। প্রিয়রঞ্জন সক্রিয় ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে কারাভোগ করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রগতিশীল পণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। নির্দোষ ভ্যাগবতী এই মানুষটির নির্মল চরিত্রের আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। স্বাধীন ভারতের ভাগ্যবিধাতারা

অনেকেই তাঁর অমুরাগী বহু ছিলেন। তিনি ইচ্ছামাত্র প্রকাশ করলে একটা মন্ত্রী নেহাৎকল্পে একটা রাজ্যপাল বা অমুরাগ কিছু সহজেই হতে পারতেন। কিন্তু কেউ যদি তাঁকে বলতেন—দেশ আপনার যোগ্যতার সমাদর করল না, তিনি তাঁর স্বভাবমূলভ মুহূর্ত্ত সহকারে অমুরাগকে বলতেন—কেন এই তো বেশ আছি—দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করি, মাহনে পাই, অন্নবস্ত্রের কষ্ট নেই—আবার কি চাই। বেশ তো আছি। গল্পটা শুনেছিলাম যোগেশচন্দ্রেরই মুখে। আত্মসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে প্রিয়রঞ্জন ছিলেন যোগেশচন্দ্রের আদর্শ।

যোগেশচন্দ্র হাসপাতালের ক্রি বেডে ভর্তি হন। পশ্চিম বঙ্গ সরকার সরকারী ব্যয়ে কেবিনে রেখে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে স্বীকৃত হলে তিনি স্বাস্থ্য বোধ করেন কিন্তু প্রথমে কেবিনে গিয়ে সরকারের ব্যয় বাড়াতে রাজি হন নি। পরে অবশ্য আত্মীয় ও শুভামুখ্যায়ীদের অনুরোধে তিনি কেবিনে যান। যতটুকু না নিলে জীবন রক্ষা হয় না তার চেয়ে এক কপর্দকও বেশি তিনি সম্ভবতঃ কখন গ্রহণ করেন নি। এমন একজন মানুষ সম্পর্কে যত যত্ন করেই লিখি না কেন, সেই চরিত্র মহত্ত্ব ও মাধুর্য সুটিয়ে তুলবার সাধ্য আমার নেই। যোগেশচন্দ্রের পরলোক গমনের বহু পূর্বে লেখা সুধীজনের কয়েকখানা পত্রাংশ দিয়ে আমি আজ স্মৃতি ভরণ শেষ করব। এই সব চিঠিপত্রে যোগেশচন্দ্র চরিত্র কীকিং সত্য স্বরূপে প্রকটিত হবে। অপরে লেখা চিঠিপত্রই হলো জীবন চরিত্রের অন্ততম শ্রেষ্ঠ উপাদান বলে স্বীকৃত। যোগেশচন্দ্র এই সব চিঠিপত্র কখন রাখেন নি। অকস্মাৎ সামান্য কয়েকখানা চিঠি আমার হাতে আসে।

যোগেশচন্দ্র নানাবিধে নবীন গবেষকদের সাহায্য ও সহায়তা দান করতেন। বহুজনে দেশী বিদেশী গবেষকদের তাঁর নিকটে পাঠাতেন। এই সম্পর্কে আচার্য যত্নাধ সরকারের ২০।১।৫১ তারিখের একখানি চিঠিতে পাই :

“এইটি কালিকা কানুনগোর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভূপেন,

M. A. সে Lord Canning 1858-1862 (যুদ্ধ বাদ দিয়া) গবেষণা করিতেছে, Ph. D থিসিস লিখিবার জন্য। আমার বাগান থাকে এবং আমার প্রহাঙ্গার হইতে বই লইয়া নোট করে। বন্ধে নব জাগরণ সম্বন্ধে বই ও খবর আপনাদের হাতে আছে। ইহার সঙ্গে আলোচনা করিবেন ও সাহায্য দিবেন।”

এই পর্যায়ে আরও চিঠি আছে। আচার্য যদুনাথের বাড়িতে বসে যে ছাত্র কাজ করছেন তাঁকে তিনি নিজেই পাঠাচ্ছেন যোগেশচন্দ্রের নিকট—এটা জানবার পর আশা করা যায় এ পর্যায়ে আর কোন চিঠির আবশ্যকতা নেই।

যোগেশচন্দ্রের নিকট আচার্য যদুনাথ যে সব দা চিঠি লিখে গবেষক পাঠাতেন তা নয়। অনেক সময় মুখে মুখে নির্দেশ শুনে অনেকে যোগাযোগ করতেন। কলকাতার বাইরে থেকেও গবেষক আসতেন। এই রকম একটি পত্রের অংশ নিচে দিলাম। লিখছেন জনৈক J. R. Ahmed তাং ৬।১।৫৩।”

“I am a research scholar preparing my thesis for Ph D. degree from the Punjab University. The subject of my thesis is Genesis of Indian struggle for freedom in the days of the East India Co. from 1757 to 1857. I went to see Dr. Jadunath Sarkar, the well-known historian, to seek some aid and guidance. He directed me to contact you and he gave me your address.”

যোগেশচন্দ্রের অজিত তথ্যাদ তিনি অকপটে অপরকে ব্যবহার করতে দিতেন। এমন কি পুস্তক বা প্রবন্ধকারে প্রকাশিত হবার আগেই দিয়ে দিতেন অনেক ক্ষেত্রে। এজেন্সি নাথ শীলের নীতি শ্রীঅনল শীল কোম্পানির ট্রিনিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কিছু তথ্য তাঁর প্রয়োজন পড়ে। ১৯৬১ সনের ক্রেয়য়ারিতে তিনি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাক্রমে এ দেশে আসেন। তখন তিনি যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যাদির জন্য যোগাযোগ

করেন। যোগেশচন্দ্র বিলুপ্ত বিধা না করে সানন্দে অনিল শীল মশায়কে তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেন। শীল মশায় ধন্যবাদ দিয়ে লিখলেন; “I have received the manuscript—it will be returned on the 20th Feb. 1961” নির্মোহ জান-সাধক না হলে এমন করে পাণ্ডুলিপি কেউ অপরকে ব্যবহার করতে দিতে পারেন না।

কেবল সংগৃহীত তথ্যই যোগেশচন্দ্র যে দিতেন তা নয়। অপরের জন্য খুঁজে পেতে নানা সাল তারিখ ও তথ্য উদ্ধার করে দিয়েছেন এমন কথা আমার জানা আছে। এই পর্যায়ে রাজশেখর বসু মহাশয়ের একখানি চিঠি মাত্র উদ্ধৃত করব।

দশই জুন ১৯৫৫ তারিখে ৭২ নং বকুল বাগান রোড থেকে রাজশেখর বসু মহাশয় লিখছেন—  
“শ্রীতিভাজনেয়, বামমোহন রায় আদি ব্রাহ্ম সমাজের যে ট্রাস্ট ডাউড রচনা করছিলেন তাতে এক জায়গায় যেন আছে—ভাতিধর্ম নিশিষে সকলেই এখানে উপাসনায় যোগ দিতে পারেন, যদি তাঁদের বেশ পরিচ্ছন্ন হয়। আপনার যদি অসুবিধা না হয় তবে এই সম্বন্ধে তাঁর উক্তি আমাকে লিখে জানাতে পারেন কি? প্রবাসীর জন্য ‘আত্মারামিক সমাজ’ প্রবন্ধ লিখছি, তারই জন্যই দরকার।”

যোগেশচন্দ্র ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রেকর্ডস কমিশন ও ইন্ডিজেনাল রেকর্ড কমিশন পশ্চিম বঙ্গের সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনার তথ্য সংগ্রহের জন্য জাতীয় অধ্যাপক শ্রীব্রজ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে গঠিত কর্মসূচিতেও যোগেশচন্দ্র গৃহীত হন। এ সবই তাঁর ব্রাহ্মসমাজ বিজ্ঞানভার স্বীকৃতির পরিচায়ক। কিন্তু কোন রকম স্বীকৃতির প্রয়োজন না করেই কত মাত্রায় যে তিনি সাহায্য ও সহায়তা দান করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। এ বিষয়েও তিনখানা সামান্য সামান্য উদ্ধৃতি দেব। এর থেকেই আমরা ধারণা করতে পারি ঐতিহাসিক বিষয়ে যোগেশচন্দ্রের পাণ্ডিত্য অধীজন বিশেষ



প্রকার কুটিলে দেখতেন। অল্প আর একটি বিষয়ও এর মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। তা হলো—সমাজের সকল স্তরের মানুষকে তাদের দিন দিন প্রচেষ্টায় নীরবে যথাসাধ্য সাহায্য ও সহায়তা দান। এই ঔদার্য আজকের সমাজে হুলস্থল নয়।

বর্তমান সময়ের অন্ততম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ৩০শে এপ্রিল ১৯৫৩ তারিখে লিখেছিলেন :

“Dear Mr. Bagal,

Perhaps you know I am a member of the Editorial Board set up by the Govt. of India for writing a history of the Freedom Movement. I think you have already been in touch with Sri S. M. Ghosh, who is the Secretary of the Board. I will like to have a talk with you in this matter.....”

রাজ্য সীমানা পুনর্নির্ভাস কমিশনের নিকট পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি যে স্মারকলিপি পেশ করেন তার রচয়িতা ছিলেন স্বর্গত বিমলচন্দ্র সিংহ। এজন্য তিনি যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের নিকট থেকে নানা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য নিয়েছিলেন। কংগ্রেস ভবন থেকে ২৫শে মার্চ ১৯৫৪ তারিখে তিনি যোগেশচন্দ্রকে লিখছেন :

সাবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়াছি।

(১) অমৃতবাজারের কপি যে পাইতেছি না। তাহার পুরা textটা আপনার কাছে আছে কি? সেই editorial-এর textটা চাই, পাইলে quote করিয়া দিতাম। কোথায় পাইব?

(২) Govt Resolution 1905 দেখিয়াছি। তাহাতে Risleyর উল্লেখ আছে। সেইজন্য Risleyর letterএর textটা পড়িতে চাই। কোথায় পাইব?

(৩) দেখিতেছি Risleyর Proposalএর জবাবে মাদ্রাজ সরকার linguistic unityর কথা তুলিয়াছেন। বাংলা সরকার কি বলিয়াছিলেন? ছোট নাগপুরের বেলায় খালি commercial consideration-এর কথা

বলিয়াছিলেন? তাঁহার linguistic argument-এর কথা কি ভোলেন নাই? সেই জন্য সেই memorandum দেখিতে পারিলে ভাল হইত। কোথায় পাওয়া যাইবে?

(৪) Town Hall conference against partition 11. 1. 1905—তাহার proceedings পাইব কোথায়? আপনার কাছে extract টোকা আছে কি?

এই materialগুলি যদি আপনার নিকট থাকে তাহা হইলে বড় সুবিধা হইত। সোমবার তো দেখা হইতেছে॥”

প্রাচ্য বাণী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সংস্কৃতপ্রেমী শিক্ষাবিদ অধ্যাপক যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী চট্টগ্রামের বাসর। তাঁরা এক সময় ঠিক করেন চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করবেন। সেজন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। যতীন্দ্রবিমলের উপর ভাষাসংগ্রহের ভার পড়ে। এই কাজেও যোগেশচন্দ্র সহায় হতে পারেন এই ধারণায় ৩নং ফেডারেশন স্ট্রীট থেকে ১৯৫৩ সনের ২৮শে জুন তারিখে যতীন্দ্রবিমল যে চিঠি লিখেছিলেন তার মধ্যে আছে :

“আমার বিশ্বাস আপনি বিভিন্ন বিষয়ে এত সন্ধান করেন যে আপনার চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিষয়েও কিছু জানা থাকা সম্ভব বা কোন্ কোন্ পুস্তক বা পুঁথিতে এ বিষয়ে সংবাদ জানা যেতে পারে তাও আপনি বলতে পারবেন।”

যোগেশচন্দ্র বহুজনকে হাতে ধরে লেখা শিখিয়েছেন। ভূপূর্বেটক রামনাথ বিশ্বাস বরিশ। বাজারে যোগেশচন্দ্রের পাশেই থাকতেন। তার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেকগুলি বই আছে। এর গোড়ার দিকের প্রচুর লেখা যোগেশচন্দ্র আগাগোড়া সংশোধন করে দিতেন। অনেকদিন দেখা গেছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পুনর্লিখিত হয়েছে। পরের দিকে তাঁর লেখায় প্রভূত উন্নতি ঘটে। যোগেশচন্দ্রের নিরন্তর উৎসাহেই তিনি লিখতে প্রবৃত্ত হন এ কথা বহুজনেই জানেন। স্বর্গত যাদুকর পি সি সরকার

ঐ রকম আর একজন লোক। হৃদয় লগুন থেকে তিনি যোগেশচন্দ্রকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ২০শে আগষ্ট ১৯৫৩ তারিখে লিখছেন :

“জীবনে কোনদিনই আপনাদের কথা ভুলিবার নয়। আপনি আমার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত করিয়া এবং সংবাদ ছাপাইয়া আমাকে প্রথম জীবনে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন।...লগুন হইতে এই পত্র লেখার উদ্দেশ্য এই যে আমি আপনাদের কথা বিদেশে বসিয়াও প্রচার সঙ্গে স্মরণ করি।”

যোগেশচন্দ্রের বহুভাগ্য ছিল। নানা সুখে দুঃখে যারা তাঁর ধোঁজ খবর নিতেন, তাঁর সাহায্য কামনা করতেন এমন খ্যাতিমান লোকের সংখ্যাও বিস্তর। যোগেশচন্দ্রের নিকটে এলে বিদ্ধ-আর্ত-পীড়িত মানুষ শান্ত হয়ে ও শান্তি নিয়ে ফিরে যেতেন। সুখ দুঃখ বোধ তাঁকে পীড়িত করতে পারত না। তাঁর মনের জোর ছিল সীমাহীন। এমন কি শারীরিক অপটুতাকে পর্যন্ত এই জোরে তিনি মুহূর্তক্ষণ পর্যন্ত অস্বীকার করে চলেছেন।

বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত হাজিতকুমার মুখোপাধ্যায় খ্যাতিমান পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ২৪শে মে ১৯৫২ তারিখে যোগেশচন্দ্রকে লেখেন, “জীবনে বহুলাভ সংক্ষেপ হয় না। অথচ আপনার মত একজন বহুলাভ করে যদি আমি নিজ দোষে তা হারাই তবে তা সত্যই আমার পক্ষে দুর্ভাগ্য।”

যোগেশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অন্তরঙ্গ জনের মধ্যে বিচিত্র চরিত্রের লোক ছিলেন। আমরা দেখেছি, পরলোকগত সজনীকান্ত দাস ও রামপদ মুখোপাধ্যায়, খ্যাতিমান গান্ধীবাদী নেতা শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, পুলিশবিহারী সেন, নারায়ণ চৌধুরী,

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে যোগেশচন্দ্রের প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতা ছিল। বহু ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ মতের মানুষের মধ্যে ঈর্ষা স্বল্প ছিল। সে সব ঘটনার কেন্দ্রস্থলে থেকেও যোগেশচন্দ্র তাঁর চরিত্রের নির্মলতার জন্য সকলেরই প্রজ্ঞা প্রীতি লাভ করতেন। ঐ এক দুর্লভ চরিত্রগুণ।

ব্যক্তিগত দুঃখ শোক যোগেশচন্দ্রকে বিচলিত করতে পারত না এ কথা পূর্বে বলেছি। ১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যোগেশচন্দ্র পুত্রশোক পান। এই উপলক্ষে তারাশঙ্কর বল্লোপাধ্যায়ের একখানি চিঠি বিশেষ ঐর্ষ্যবহ।

প্রিয়বরেষু,

যোগেশবাবু, দুঃসংবাদ জানতাম না। আজ সকালে সজনীকান্তের নিকট জ্ঞাত হলাম। কাল টেলিফোনের সময় হয়তো আপনার অজ্ঞাত মনেও তুফা থেকে গেছে। বন্ধুর প্রীতি সাক্ষ্য এই বিরোগভাপ কাতরতার মধ্যে এক বিন্দু শীতলতা এনে দেয়।

সাক্ষ্য দেবার ভাষা নেই। অত্যন্ত মর্মান্বিত হয়েছি। ভগবান আপনাকে সাক্ষ্য দান।”

এই চিঠিতে যোগেশচন্দ্র কি সাক্ষ্য পেয়েছিলেন তা তিনিই জানেন। সাক্ষ্যের কোন প্রয়োজন তার ছিল না সে কথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। তারাশঙ্করের মর্মবেদনা প্রকাশের জন্য ঐ চিঠি লেখার প্রয়োজন ছিল। সজ্জন শুভাহুধ্যায়ী বন্ধু হিসাবে ওটা তাঁর কর্তব্য কর্মও বটে। আজ যোগেশচন্দ্রের পরলোকগমনের ফলে আমাদেরও কিংকিৎ মর্মপীড়া সৃষ্টি হয়েছে আর সে বেদনা থেকে আমরা আমাদের কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে যোগেশচন্দ্রের যথার্থ মূল্যায়নে যদি ব্রতী হই, তাঁর স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত আয়োজন করি তবেই তা সার্থক হবে।

# বিস্মৃতপ্রায় কবি

কবিক। কর

একদিন ঘরে ঘরে সরলমতি শিশুকণ্ঠে পদ্মমালায়  
সরল কবিতা শোনা যাইত। “রাতি পোহাইল, ওঠো  
প্রিয়ধন। কাক ডাকিতেছে করহ প্রবণ॥” “বেড়াতে  
বেড়াতে আলস্ত ঘুচিবে। পূর্ব দিকে সূর্য উঠেছে  
দেখিবে॥ সোনার বরণ সোনার কিরণ। হটা তার  
কর্ণতারের মতন। তা’ দেখে আনন্দ হইবে তোমার।  
তাই বলি বাহু ধুমায়ে না আর॥” “দুর্গন্ধ মিঠাই মোত্তা  
দিলেও তা’ নিও না। সহজে যা’ জীর্ণ হয়, তার বেশী  
খায় যে। পেটুক তাহারে বলে, শেষে কষ্ট পায় সে॥”  
“হড় হড় হড় হড় মেঘ ডাকিছে, পথঘাট হেড়ে লোক  
বাড়ী ফিরিছে। চিকমিকু বিদ্যুতের আলো  
হানিছে। শন্ শন্ শন্ রবে বায়ু বহিছে।” “ভুমিও  
তো ভাল হলে দেখে শিখে লও। ভালবাসা চাও যদি,  
নিজে ভাল হও॥” শিশুশিক্ষার মন্টেসরি কিতোর  
গার্টেন প্রণালী উদ্ভাবনের পূণের যুগে, শিশুদের কোমল  
অস্তরে স্বাভাবিক কথা, প্রকৃতির পারিচয়, নীতি উপদেশ  
প্রভৃতির প্রতি আশ্রয় উদ্ভিক্ত করিয়াছিলেন কবি  
মনোমোহন বসু এই সকল সহজ কথায়। কবির পিতৃ-  
ভূমি কলিকাতার অদূরে ছোট জাগুলিয়া গ্রামে।  
কালকাতায় হাতীবাগান অকলে তিনি বাস স্থাপন  
করেন। সেই পথ এখন তাঁহার নামাঙ্কিত। সমাজ-  
কল্যাণে লোকসঙ্গীত, যাত্রা, তরঙ্গা, হাফআখড়াই  
বাংলাতে প্রচলিত হয়, তাহার জন্ত তিনি সচেষ্ট ছিলেন।  
তাঁহার রচিত নাটক, উপজ্ঞানাদি সে-যুগের উপযোগী।  
যে হিন্দু মেলা সেযুগে দেশমধ্যে নবজাগরণের উষ্মের  
ঘটাইয়াছিল, কবি মনোমোহন তাহার সাহিত্যনিষ্ঠভাবে  
জড়িত ছিলেন।

মনীষী রাজনারায়ণ বসুর পারিকল্পনায়, ১৮৬৫ অব্দে,

স্বদেশিকদের সভাপতিত্ব হয়—তাঁহার সহযোগী, ছিলেন  
বিজ্ঞেননাথ, গণেননাথ, জ্যোতিরেননাথ ঠাকুর।  
হিন্দুমেলায় উৎপাদিত ইহা হইতেই। মেলায় কর্মকর্তারা  
প্রতি মাসে আলোচনা-চক্রে বসিতেন—মহর্ষি  
দেবেননাথ, শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ, কবি  
মনোমোহন, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি। মেলায় মুখ্য  
উদ্দেশ্য স্বাবলম্বন ও জাতীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা।  
১৮৬৭ হইতে ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত মোট চৌদ্দবার মেলা  
হইয়াছিল। প্রথম দিকে চৈত্রমেলা নামে চৈত্রসংক্রান্তিতে  
মেলা বসিত। পরমে অশ্ববিধা বলিয়া, পরে ফাল্গুনে,  
এবং শেষে মাঘমাসে হিন্দুমেলা নামে তাহার অধিবেশন  
চলিত। মেলায় নানা স্বদেশী পণ্যের সাহিত ব্যায়ম,  
অভিনয়াদি প্রদর্শনের আয়োজন ছিল। কিশোর  
কবি রবীন্দ্রনাথের “হিন্দুমেলায় উপহার” গণেননাথের,  
“লঙ্কায় ভারত-যশ গাহিব কি করে”, সত্যেন্দ্রনাথের  
“মিলি সব ভারতসন্তান, একতান একপ্রাণ,” বিজ্ঞেন  
নাথের “মিলন মুখচন্দ্রমা, ভারত ভোমারি, রাজাদব  
করিছে লোচনবারি॥” প্রভৃতি নব নব গীতিমালায়  
হিন্দুমেলায় গৌরব ঘোষিত হয়। সগজ জাতীয়তা  
জাগিয়া উঠে।)

মেলায় ষষ্ঠীয় অধিবেশনে, ১৮৬৮ অব্দে কবি  
মনোমোহনের ভাষণে “...সেই বীজ স্বদেশক্ষেত্রে  
রোপিত হইলেই...একটি মহৎ বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক।  
এত মনোহর হইবে যে যখন জাতি গৌরব রূপ তাহার  
নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ সৌভাগ্যপুষ্প বিকশিত  
হইবে, যে তাহার শোভা ও সৌরভে ভারতভূমি  
আমোদিত হইতে থাকিবে! তাহার ফলের নাম

করিতে একপে লাহস হয় না। অপর দেশের লোকেরা  
তাহাকে স্বাধীনতা নাম দিয়া, তাহার অবতারণা  
ভোগ করিতে থাকে। আমরা সে কল কখন  
দেখি নাই.....

“হে স্বদেশহু ভ্রাতৃগণ। আহুন, আমাদের পরম  
হিতের জন্ত, জননী জন্মভূমির জন্ত, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব কোষ্ঠ  
সংকৃত ভাষণ জন্ত, শারীরিক বলাধান জন্ত, মনের  
উৎকর্ষ জন্য, শিল্পবিজ্ঞানের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য,  
আহুন আমরা সকলে মিলিত হই।” ১৮৭০, ১১ই  
এপ্রিলে শারীরিক ব্যায়ামের জন্য বলেন—  
“বিভাগীকর সঙ্গে সঙ্গে শিখিলে ব্যায়াম। সুহ  
চিন্তে সুহু দেহে পাইবে অরাম।”

শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগের জন্য দিন  
দিন আমরা হীন হয়ে পড়িতেছি। ইংলণ্ডের উপর  
আমাদের নির্ভরতা দিনদিন বাড়িতেছে। কাপড়  
পারিতে হইবে, ইংলণ্ড হইতে কাপড় না আসিলে আমরা  
পারিতে পারি না।...এমন কি বিলাত হইতে লবণ না  
আসিলে আমরা আহা করিতে পাই না। দেশলাইটি  
পর্যন্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে আমরা  
আগুন জ্বালিতে পাই না। দেশ হহতে, কিছুই হইতেছে  
না।” ফলে বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়।  
কবির দুই পুত্রই—মতিলাল এবং প্রিয়নাথ প্রথম  
ভারতীয় সার্কাস গঠন করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন।

কবির পুণ্যস্থিতি স্বার্থে বঙ্গাব্দ ১৩২৫, ৫ আশ্বিন,  
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।  
চিত্রকর অবনীন্দ্রকৃষ্ণ কবিগুহ বংশধর। তুলিকার সহিত  
লেখনী ধারণ করিয়া চিত্রকর কবির জীবন আলেখ্য  
—“চিত্রকরের ভাবোচ্কাস” শীর্ষক গ্রন্থায় রচনা করিয়া  
সভায় দান করেন। এইটি কবিজীবনের এক প্রামাণিক  
সার সংক্ষেপ। পুরাবস্তুর পেটিকা থেকে তাহা উদ্ধৃত  
হইল :—

“কোথা দেব পিতামহ। কবির মহাপ্রাণ।—

কোন লোকে আহ এবে, গাঁহি হে কিবা গান ?

আজিকার হেন দিনে,

তব কথা পড়ে মনে,

জাগে হৃদে কণে কণে সে স্মৃতি স্মহান্।

ভেসে আসে সমীরণে, বীণার স্বর তার তান।

মনে পড়ে বাল্যকালে,

যাপিতাম কুহুহলে,

বাস তব পদতলে আনন্দ-পূর্তিপ্রায়,

আনন্দ রচিত যেন বিভাসিত সমুদায়।

মনে পড়ে সন্ধ্যাবেলা,

সান্ন হ'লে ধূলা-খেলা,

তব সাক্ষ্য-ছায়া-ঢালা সুদূর গগন গায়,—

দেখাইতে সন্ধ্যাতারা,—ছুটিতেহে কি বিভায়।

উপকথা হুণে সদা

শিখাইতে কত কথা,

মনে পড়ে সে বারতা, জীবন-উষায় মোর—

নব রাগে সুরাজত উজলিত দিগন্তর।

নাহি সে তপন আর,

চারিদিক অন্ধকার,

প্রভাতের সহচর নীরব বিহগবর,

হুটে না কুসুম আর—আজি মরুতু অন্তর।

আছিহু বালক তখন,—চিনি নাই তোমায়ে,

বুঝিনি কি রত্ন ভূমি, সাহিত্যের সংসারে ;

এবে যবে দিন গত,

পাড়ি তব প্রহ যত,

বুঝিতেছি কি অমৃত ছিল তব ভাণ্ডারে ;

কিবা সুধা যোগায়েছ উজালিয়া ভাষারে।

ছিল যবে আশ্চর্য বঙ্গনাট্য রচনার,

দেখাইলে দৃশ্যকাব্য—অপরূপ চমৎকার।

উদ্ভাটিলে কি বিচিত্র

প্রেম-ভাস্কি-প্রীতি-চিত্র।

দেশবাসী মুগ্ধনেত্র, তেজে তব প্রতিভার ;

অমর তোমার কীর্তি, বঙ্গকবি-নাট্যকার।

নাটকে তুলেছ তুমি অপরূপ করণ সুখ,

হাস্তের তরঙ্গে পুনঃ ভাষায়েছ হৃদিপুর ;

অল্লীলতা-বিবর্জিত,

ধর্ম-নীতি-বিমণ্ডিত,

নাটক-অভাব যত, তুমিই করেছ দূর,

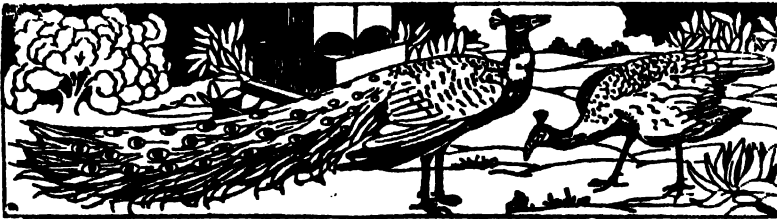
প্রথম হৃদিলে হাত, অনাবিল হুমধুর।  
 হিন্দুমেলো নামে সেই স্বদেশের অমুঠান,  
 কায়মনোবাক্যে তুমি দিলে তাহে যোগদান ;  
 দেশী শিল্প, দেশী কর্ম,  
 দেশী ভাব, দেশী মর্ম,  
 দেশীয় সমাজ ধর্ম—সকাল করিতে ত্রাণ,  
 উন্মাদিনী বক্তৃতায় মাতাইলে শত প্রশ্ন।’  
 স্বদেশীয় যে আন্দোলন উঠেছে এখন,  
 স্বদেশসেবার তরে এত যে ব্যাকুল মন,  
 কাহার জাতীয় গান,  
 তুলিয়া প্রথম তান,  
 অমুগ্ন স্বজাতি-প্রাণ করিল গো উদ্দীপন ?  
 সাধিয়া কাঁদিয়া কে গো জাগায়েছে ভ্রাতৃগণ !  
 যবে বঙ্গপারিত্য যত অভ্যন্তরগণ,  
 বিচূর্ণিতে আর্ষ-ধর্ম হুর্গ সনাতন ;  
 প্রাচীন সে হুর্গধারে,  
 লেখনী-কৃপাণ-করে  
 অটল সাহসভরে দাঁড়ালে, নির্ভীক মন।  
 বৃত্তি অন্তে ফিরাইলে, ধর্মদ্রোহী সুবর্ণ।  
 সমাজ নিবীৰ্য্য যবে খোর বিশৃঙ্খলতায়,  
 অত্যাচার প্রলীড়িত—নবযুগ সাধনায় ;  
 নবীন প্রবীণ মতে,  
 মিলাইতে সাধ্যমতে,  
 ত’লে ‘মধ্যস্থ’ রূপেতে তুমি সমাজে উদয়,  
 মূলমন্ত্র হ’লো তব করিবারে সমন্বয়।  
 কবিতা কাননে তুমি পঞ্চমে তুলিয়া তান,  
 কলকণ্ঠে গেয়েছিলে কত হুমধুর গান !  
 গাঁথিলে যে ‘পদ্মমালা’  
 শোভিল শিশুর গলা,  
 যেন শেফালিকামালা-কোমল বয়ান ;  
 খাটি বাংলা কবিতার অটুট রাখিল মান।  
 বিজয়ীবা-প্রণোদিত সঙ্গীত-সমর-ক্ষেত্রে,  
 দিগ্বিজয়ী বীর তুমি, যেন পার্থ কুরুক্ষেত্রে ;  
 বাঙ্গালার কবি-গুরু,

‘গুপ্ত-কবি’ তব গুরু—  
 হ’য়ে কবিকল্পতরু, হারিল তোমার অস্ত্রে ;  
 যথা দ্রোণ পরাজিত শিশু অর্জুনের হস্তে।  
 নাটো, গানে, বক্তৃতায়, কাব্যে, উপন্যাসে তুমি,  
 মাতায়েছ চিরদিন বঙ্গভরা বঙ্গভূমি ;  
 সপ্ন-রস-অবতার,  
 দীপ্ত মূর্তি প্রতিভার,  
 কবিবর বাঙ্গালার, স্বদেশ-কল্যাণ-কামী ;  
 ব্যর্থকাম গুণক্রাম বর্ণিতে আজি গো আমি।  
 সঙ্গীত উৎসব সব, তব সাথে হয়েছে নীরব,  
 বাণীর মন্দিরে তাই, রহিল আলেখ্য তব।  
 সমুগ্ন বাঙ্গালী সবে,  
 স্মরিতে সে উৎসবে,  
 নিতাস্ত ব্যাধিত হবে, ভাবি তবকীর্তি দেব।  
 আসিবে এ মন্দিরে ছুটে বুঢ়াতে অন্তর তাপ।’  
 রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার সাহিত্য-সুধাকর  
 রচিত এই গীতি সভায় হয় :—  
 ধন্ত তুমি, জন্মভূমি  
 অয়ি পুণ্যময় শ্রামাক্ষনে।  
 খার কীর্তি, নাট্য-গীতি,  
 পে’লে পুণ্যে সে মনোমোহনে।  
 মাতৃভক্ত পুণ্যপ্রাণ, রাখিতে মায়ের মান,  
 তুলেছ প্রথমতান,  
 প্রথমে সে দেশ-সম্ভাষণে।  
 দীঘল জীবন ধ’রে কায়-মনে সেবা ক’রে,  
 এনে ফুল থালি ভ’রে  
 দিত ডালি বাণীর চরণে—  
 শেত হেথা নাহি আর যেমে গেছে হেথাকার  
 বাণীর স্বকার-ভার,  
 শুধু স্মর জাগে মা স্মরণে।  
 শুধু স্মরে মনে হয়, এখনো জাগিয়ে রয়,  
 গান ভার বিশ্বময়  
 ক’রে বেশ গগনে পবনে—  
 গেছে সে, উপায় নাই, এখন মা এই চাই,

যেন একে রেখে যাই  
 কবি-স্বাভি জীবনে মরণে ॥”  
 ( ২ )  
 কে একেছে যে এ হবি  
 কি জানি কি তুলিকায়।  
 পলকে যে ছায়া লোকে  
 সাকারে প্রতিভা ভায় ॥  
 সেই মুখ চোখ সেই সৌম্যকায়,—  
 দীপ্ত রবিরাগে কবি-প্রতিভায়,  
 অঁকা ভাবটুকু নীরব ভাষায়  
 রস-গান্ধীরে মিলন ফুটায়  
 দেখে চিত্রপটে স্বতিনিদর্শনে  
 জাগে না কি মনে সভা জাগরণে  
 অঁকির ইঙ্গিতে মৌন সম্ভাষণে  
 প্রতিভার শত পথ সে দেখায়।  
 কবি-স্বাভি-চিত্র এ ত শুণু নয়,  
 কবি চিত্রকর দৃশ্যে উন্নয়  
 একাধারে চিত্র-পরিচিত রস  
 প্রতিভায় হুঁসে এক ত পর্যায়।

কবি পরলোকে, হেথা চিত্রকর,—  
 চিত্রে কীর্তিমান পৌত্র গুণধর,—  
 পেয়ে বহুদার আশীর্বাদ-বর  
 আলোখা-লেখায় আদর্শ জাগর—  
 বাণী বরপুত্র যে মনোমোহন,—  
 রেখে তার প্রীতি-স্বাভি-নিদর্শন  
 হলো ধন্য পুণ্য বাণী-নিকেতন,  
 “বঙ্গ-পরিষদ” গণ্য গরিমায় ॥

রবীন্দ্রনাথের উক্তি—“The unfortunate people who have lost the harvest of their past, have lost the harvest of their present age. They have missed their seed for cultivation ...The time has come for us to break open the treasure trove of our ancestors and use it for our commerce of life.” পুরা আলোচনা নিরর্থক রোমধন মাত্র নহে। অতীত ও বর্তমানের মাঝে ইহা যুগ্মমিলন সেতু। তাঁদের অরণ্য করিয়া ধন্য আমরা যতোবহু কৃতকৃত্যোৎসব।



# ভারতের বিপ্লব আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের ভূমিকা

সন্তোষকুমার অধিকারী

প্রথম মহাব্যুৎসব গান্ধীজী ও কংগ্রেসের উদ্বারপন্থী নেতৃত্বশীল ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ সমর্থন করে, গভর্ণমেন্টকে সর্বকিছু সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁদের আশা ছিল, যুদ্ধের শেষে ইংরাজ ভারতবাসীর হাতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন তুলে দেবে। ১৯১৭ সালে ভারতসচিব মন্টেগু ভারতবর্ষে আসেন এবং ভারতবাসীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে মন্টেগুর ভারতে-শাসন-সংস্কার সম্পর্কীয় রিপোর্ট তৈরী হবার আগেই লণ্ডনের কিংস বেঞ্চ ডিভিশনের জজ রাউলাটকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিশন গঠন করা হ'ল। উদ্দেশ্য হ'ল: দেশের যে কোন স্থানে যে কোন লোককে বিনা বিচারে আটক করে রাখবার ক্ষমতা গভর্ণমেন্টের হাতে তুলে দেওয়া। ১৯১৯ সালের ১৮ মার্চ তারিখে এই রাউলাট কমিটির সুপারিশ আইনে পরিণত হয়।

রাউলাট বিল আইনে পরিণত হওয়ায় গান্ধীজীর মোহমুক্তি ঘটল। তিনি সত্যগ্রহ আন্দোলনে দেশবাসীকে ডাক দিলেন এবং ৩-শে মার্চ তারিখে দেশব্যাপী হরতালের আহ্বান জানালেন।

এই বিলকে কেন্দ্র করেই ব্রিটিশ সরকারের নয় বারতা প্রকাশ হয়ে পড়ল। ১৯১৯ সালে অক্টোবরের জালিওয়ানওয়ালা বাগে একটি ছোট বাগানে নিরীহ জনসাধারণের একটি প্রতিবাদ সভার ওপরে হঠাৎ বিনা প্রয়োচনায় ও বিনা নোটিশে পাঞ্জাবের সামরিক শাসনকর্তা জেনারেল ডায়ার তাঁর সৈন্তদলকে গুলি বর্ষণের হুকুম দিলেন।

সে এক বাতিল নিষ্ঠুরতা। ব্লক নারী ও শিশুর ওপরে সৈন্তদের নির্দিষ্ট গুলি বর্ষণে যে হত্যাও

সাধিত হ'ল, কোন সভা জাতির ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না।

এই কুৎসিত ও পাশবিক বারতা সমস্ত ভারতবর্ষ ভিত্তি। চিত্তরঞ্জন দাশ নিজে এই ঘটনার তদন্তে ব্রতী হলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে তাঁর 'নাইট' উপাধি টুড়ে কেলে দিলেন। লর্ড চেম্‌সফোর্ডকে এক চিঠিতে তিনি লিখলেন—

“নিরস্ত্র ও নিঃসহায় জাতির উপর মনুষ্যবাহী অগ্রেশন বলায়ান শক্তি যে অত্যাচার করিল, তাহার তুলনা কোন সভ্য সরকারের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।.....

আমি দেখিতেছি যে, সম্মানের নিদর্শন আমার এই উপাধিটি পূর্ণোক্ত অপমান ও লজ্জাকে আরও প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। আজ আমি এই সম্মানের পদটির ভারমুক্ত হইয়া অপমানিত, লজ্জিত, মাহুষের প্রতি অযোগ্য ব্যবহার প্রসীড়িত দেশবাসীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে চাই।”

গান্ধীজী কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদকে সমর্থন করতে পারেন নি। কারণ, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবীর সামনে ইংরাজ শাসনের নগ্নতা প্রকাশ হয়ে পড়ল। গান্ধীজীর কথা—“I do not want to embarrass the Government now.” ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার তখনই তদন্তের জন্য একটি কমিশনের প্রহসন বসালেন। এবং তাড়াহড়ো করে মন্টেগুর শাসন-সংস্কার বিলটিকেও পাশ করালেন (২৪ ডিসেম্বর ১৯১৯)। অক্টোবরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল এই শাসন-সংস্কার আইনের সপক্ষে। কারণ গান্ধীজী সহযোগিতার পক্ষপাতি। কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীর বিপক্ষে

দাঁড়ালেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি প্রতিরোধমূলক নীতি গ্রহণের পক্ষে মত দিলেন।

আষাঢ়ের উদ্বারনৈতিক নরমপন্থী নেতাদের চেতনা রূঢ়ভাবে আহত হ'ল, যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হাউস অব লর্ডস্ জেনারেল ডায়ারের কাজের প্রশংসা করলেন এবং সাধারণ ইংরাজ সমাজ টাকার তোড়া ভুলে উপহার দিলেন ডায়ারকে। নৃশংস বণরতার জন্ত পৌর অভিনন্দনের এমন ঘটনাও বোধ হয় সভ্য জগতে আর ঘটেনি।

১৯২০ সালে কংগ্রেসের চিন্তাধারার কিছুটা পরিবর্তন ঘটল কারণ: চিত্তরঞ্জন, তিলক, লালু লাজপত রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি। সেন্টেম্বরের অধিবেশনে গান্ধীজী দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন।

ভারতের রাজনীতিক্রেত্রে এই সময় গান্ধীর প্রভাব অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। তিনি এক নতুন অস্ত্র হাতে নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন; সে অস্ত্র হল অহিংসামূলক অসহযোগ। কলকাতা ও নাগপুরের অধিবেশনে তিনি আন্দোলনের আশ্রয় দিলেন, আর এই আশ্রয়কে সমর্থন করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

১৯১৫ সালে যতীন মুখার্জীর মৃত্যুর সঙ্গে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটলেও, এবং যুদ্ধের মাঝখানে বিপ্লবীদের কর্মধারা কিছুটা শিথিল হয়ে এলেও স্তব্ধ হয়ে যায়নি। ১৯১৮ সালের জুন মাসে ঢাকার কলতাবাজারে পুলিশের সঙ্গে যুগ্মযুদ্ধী সংঘাতে প্রাণ দিলেন নালিনী বাগচী ও তারিণী মজুমদার। জালওয়ানওয়াল্লা বাগের হত্যাকাণ্ডে তাদের রক্তে রক্তে জালা ধরেছে। কিন্তু প্রতিরোধ আইনে আধিকাংশ নেতাই তখন জেলে। লর্ড চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার আইনের অহুত্বে সরকারের সাদিচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দিলেন।

বিপ্লবী দলের নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশের সাদিচ্ছায় যেমন বিশ্বাসী ছিল না, গান্ধীজীর অহিংসা-নীতিতেও ভেদানন্দ প্রকাশ্যে ছিল না। অথচ গান্ধীজী তাদের

সহযোগিতাও চাচ্ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ গান্ধী নীতিকে সমর্থন করার বিপ্লবীরা বিব্রত বোধ করল। অবশেষে চিত্তরঞ্জন দাশের গৃহে একটি আলোচনা সভা বসল। গান্ধীজী এই সভায় সম্মতিবাদ ও অহিংসামূলক বিপ্লবে বিশ্বাসী কামীদের কাছে অহরোধ জানালেন—  
“আমায় একবার সুযোগ দাও।”

অহিংস অসহযোগের কর্মতালিকা সামনে রেখে গান্ধীজী জাতীয় কংগ্রেসে প্রভাব বিস্তার করলেন। অহিংসার নীতিতে মোটেই বিশ্বাসী নন, এমন বিপ্লবী কমিরা—বিশেষ করে অতুলীন সমিতির সদস্যরা ‘ভারতসেবক সংঘ’ সংঘবদ্ধ হলেন। পরবর্তীকালে এই সংঘের নাম পরিবর্তিত হয় ‘সিটিজেন প্রোটেকশন লীগ’। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের চেউয়ে সমস্ত দেশ প্রাবিত হয়ে যায়। শুধু বাংলাদেশেই চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে প্রায় ষোল হাজার লোক কারাবরণ করে। দেশব্যাপী যখন তুফান উত্তোলনা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চরম বিব্রত তখন হঠাৎ গান্ধীজী চৌধীচৌর নামক স্থানে একটি অহিংসামূলক ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। এইভাবে আন্দোলনের শ্রোতকে রুদ্ধ করে দেওয়ায় অতি আশাবাদীরও আশা ভঙ্গ হ'ল। দেশবন্ধুও অভিভূত হুঁক হন। এক আবেগে তিনি ছটকট করতে লাগলেন। বিপ্লবের পক্ষপাতী অহিংসার বিশ্বাসী নেতারা বুঝলেন, গান্ধীজী নির্ভরযোগ্য নন। যারা এতদিন গান্ধীর দিকে চেয়ে অপেক্ষা করেছিলেন, তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, নতুন করে আন্দোলনের পথ নির্দেশ দেওয়ার সময় এসেছে।

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। ভারতবর্ষের বিপ্লবী যুবক সমাজ, যারা এতদিন অপেক্ষা করছিলেন গান্ধীজীর আন্দোলনের সুখ চেয়ে, তাঁরা হতাশ হ'লেন। ১৯২০ সালে শাসন-সংস্কার আইনের সাদিচ্ছারূপ বিপ্লবী নেতাদেরও মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা এবারে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। ঢাকা কলকাতা ও



উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে বিপ্লবাত্মক কার্যসূচী দানা বেঁধে উঠতে লাগল। ১৯২৩ সালে ‘রেড বেঙ্গল’ সংস্থার আবির্ভাব দেখা গেল। কলকাতায় সম্ভ্রামিত্রের নেতৃত্বে দুটি হুঃসাহাসিক ডাকাতি হয়ে গেল। অহুশীলন সমিতি এ সময়ে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী প্রভুল গাঙ্গুলি ও নরেন সেনের পরিচালনাধীন। চট্টগ্রামে শূর্য সেন সক্রিয় হয়ে উঠছেন। সমস্ত উত্তর প্রদেশে বিপ্লবাত্মক কার্যসূচী পরিচালনার নেতৃত্ব নিয়েছেন শচীন্দ্রনাথ সান্নাল।

রাসবিহারী বসু একদা সহকর্মী শচীন সান্নাল বিভিন্ন স্থানের বৈপ্লবিক সংস্থাগুলিকে একটি সর্গভারতীয় সংস্থার পরিচালনায় আনার জন্তে একটি পরিকল্পনা করলেন। এই পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টায় তিনি কলকাতায় এলেন এবং অহুশীলন সমিতির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

রাসবিহারী বসু ও যতীন মুখার্জীর পর শচীন সান্নালই এমন একটি ব্যাপক প্রচেষ্টায় মন দিয়েছিলেন। কাশীর বাঙালীটোলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র শচীন সান্নাল ১৯৮ সালে তাঁর সহপাঠীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন এবং নাম দিয়েছিলেন অহুশীলন সমিতি। পরে, পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্তে নাম বদলিয়ে রাখা হয় ‘যুবসম্ম’। শচীন সান্নালের এই সংগঠন বাংলাদেশের অহুশীলন সমিতির একটি শাখা ছিল। হুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করতেন শশাঙ্কমোহন (অমৃত) হালদার। যুবসম্ম (Youngmen's Association) সম্বন্ধে সিভিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে—“শচীন্দ্র নিঃসন্দেহে এই সম্মকে দেশে অপরাধমূলক কাজের প্রসারের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন।” শচীন্দ্র মাঝে মাঝে কলকাতা আসতেন এবং তাঁর সংগঠনের জন্তে অর্থ ও বোমা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতেন। তিনি স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ইত্তাহার বিলি করে উত্তেজনার সৃষ্টি করতেন। তাঁর কথা ছিল, ইউরোপীয়দের বিতাড়িত না করলে আমাদের অবস্থার উন্নতি হবে না। দ্বিতীয়

বড়বয়স্ক মামলার অন্ততম আসামী রাসবিহারী বসু ১৯১৪ সালের প্রথম দিকে কাশীতে এসে শচীন সান্নালের সঙ্গে মিলিত হন। সে সময়ে তাঁকে ধারিয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশ থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। তাঁর ফোটোও চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তা সত্ত্বেও শচীন্দ্র তাঁকে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। রাসবিহারী বসু শচীন সান্নালের সংগঠনকে শক্তিশালী করার চেষ্টায় মন দেন। রাতে তিনি দলের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতেন। ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসের ১৮ তারিখে রাসবিহারী বসু যখন বোমা ছুঁড়তে শেখাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ একটি বোমা ফেটে যাওয়ায় তিনি এবং শচীন্দ্র আহত হন।

শচীন্দ্র এর পরে তাঁর সঙ্গে এক মারাত্মক যুবকের আলাপ করিয়ে দেন। এই যুবক ‘গদর’ দলের একজন নেতা। এদেশে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সুযোগ গুঁজ-ছিলেন। নাম বিষ্ণু গণেশ পিংলে। পিংলে রাসবিহারী বসুকে জানালেন যে, আমেরিকা থেকে গদর দলের চার হাজার লোক ভারতে চলে আসছেন এবং তাঁরা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত।

রাসবিহারী বসু নিদে’শে শচীন্দ্র লাহোরে গিয়ে অগ্নাগ্নি বিপ্লবী গদর সভ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁদেরকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। শচীন্দ্র তাঁদের জানান যে, বোমা তৈরী করার কৌশল তাঁদের জানা আছে।

১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে শচীন্দ্র পিংলেকে সঙ্গে নিয়ে কাশীতে ফিরে এলেন। রাসবিহারী দলের একটি জরুরী সভা ডেকে ঘোষণা করলেন যে, সমস্ত দেশে এক সামরিক অভ্যুত্থান আসন্ন। তিনি বললেন যে, দেশের জন্তে প্রাণ দেওয়ার সময় এসেছে।

সেই সভায় ঠিক হয় যে এলাহাবাদ কেন্দ্রের ভার নেবেন শিক্ষক দামোদর স্বরূপ। রাসবিহারী নিজে পিংলে ও শচীনকে নিয়ে লাহোরে সংগঠনের মূল কেন্দ্রে উপস্থিত থাকেন। দুজন যুবকের ওপরে তার দেওয়া হল, তার বাংলা থেকে বোমা নিয়ে আসবে। বিনায়ক

কপিলের ওপর তার পড়ল সেই বোমা পাঞ্জাবে নিয়ে যাওয়ায়। বিভূতি ও প্রিয়নাথ—দুই যুবককে ধেওয়া হল বেনারসের সৈন্তবাহিনীকে সংগঠিত করার ভার। রাসবিহারী বসু ও শচীন্দ্র লাহোরের উদ্দেশে যাত্রা করলেন কিন্তু তারপরে শচীন ফিরে এলেন বেনারসের ভার নিতে। ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখে মণিলাল ও কপিল আঠারোটি বোমার একটি বাস নিয়ে লাহোর রওনা হলেন। মণিলাল লাহোরে পৌছালে রাসবিহারী তাঁকে জানান যে, ২১ তারিখে অভ্যর্থনায় দিন স্থির হয়েছে। মণিলাল শচীন্দ্রনাথকে দিনটি জানিয়ে দেন। কিন্তু পরে কর্মসূচীর পরিবর্তন করা হয়, অথচ শচীন্দ্রনাথ সে পরিবর্তন জানতে পারেননি।

রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী এই সশস্ত্র অভ্যর্থনায় পরিচালনা পুলিশ জানতে পারল শুণ্ডচর কৃপাল সিংহের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে তল্লাসী ও গ্রেপ্তার শুরু হয়ে গেল। রাসবিহারী বসু পিংলেকে সঙ্গে নিয়ে বারানসীতে পালিয়ে এলেন। পিংলে কয়েকদিন পরেই সেই বোমাগুলি সঙ্গে নিয়ে মীরাতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলেন। “...he was arrested on the 23rd march in the lines of the 12th Indian Cavalry with a box in his possession containing ten bombs sufficient to annihilate half a regiment.” লাহোর যড়যন্ত্র মামলায় পিংলের দাবী হয়।

রাসবিহারী জাপান চলে যান। তাঁর নির্দেশ ছিল উত্তর প্রদেশে সংগঠনের ভার থাকবে শচীন্দ্রনাথ ও গিরিজাবাবুর (নগেন্দ্রনাথ দত্ত) ওপরে। গিরিজাবাবুর সঙ্গে শচীন্দ্রনাথ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

১৯২০-তে শচীন্দ্রনাথ ছাড়া পান কিন্তু মুক্ত হয়েছে তিনি উত্তর প্রদেশের সংগঠনের জন্ত কাজ শুরু করেন। ১৯২২ সালে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে, বিপ্লবীরা তাঁদের সংগঠনকে দৃঢ়তর করে তোলবার সংকল্প নেন।

এই সময়ে শচীন্দ্রের সঙ্গে অমূল্যসিন সত্যবাদের বিশিষ্ট নেতাদের যোগাযোগ ঘটে। তিনি নরেন সেন, প্রভুল গাঙ্গুলী ও জৈলোক্য চক্রবর্তীর কাছে প্রস্তাব দেন যে উত্তর প্রদেশ পাঞ্জাব ও বাংলার বিপ্লবীদের একটি সর্বভারতীয় সংস্থার মধ্যে আনা দরকার। বেনারসে শচীন্দ্রনাথের সংগঠনে রাজেন লাহিড়ী ও শচীন্দ্রনাথ বকসীর যত ব্যস্তিরা ছিলেন। কুমিল্লা থেকে যোগেশ চ্যাটার্জী এসে যোগ দিলেন। ১৯২০ সালে বাংলাদেশে উত্তরপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে বিপ্লবাত্মক কার্যের তৎপরতা যেমন বাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ নির্বাহাতনও তেমন প্রচণ্ড হয়ে উঠল। ১৯২৪ সালে ‘বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স’ জারি করে বিপ্লবীদের যথেষ্ট গ্রেপ্তার করা হতে লাগল।

এই সময়ে চট্টগ্রামের একটি দুঃসাহসিক ডাক্তারি গভর্ণমেন্টকে বিচলিত করে তুলেছিল। ১৯২০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে প্রকান্ত রাজপথে রেল অফিসের ১১০০০ টাকা লুট করা হল। ধারা লুট করলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেবেন দে, অনন্ত সিংহ, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য ও রাজেন দাস।

চট্টগ্রামের পাকড়ায়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ ৩১ল। অত্যন্ত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন সুর্য সেন ও অমিকা চক্রবর্তী। কিন্তু জে এম সেনগুপ্তর চেষ্টায় দুজনেই ছাড়া পান।

১৯২৪ সালের শেষদিকে পুলিশ অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষকে গ্রেপ্তার করল। বর্ধমান জেলে অনন্ত সিংহ গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টর ময়ধ সেন-এর কাছে ৩, ১, ১৯২৫ ও ১৫, ১, ১৯২৫ তারিখে দুটি বিবৃতি দিয়ে ছিলেন কার্যকলাপ ও অস্ত্র কর্মীদের সম্বন্ধে। (Reference F 253/H/Poll-1925—Appendix IX.)

ইহার উপর নির্ভর করিয়া পুলিশ সুর্য সেন, নির্মল সেন ও চাক্রবিকশ দত্তের সম্মান করতে

লাগল। কিন্তু সূর্য্য সেন পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে সংগঠনের কাজ করে যেতে লাগলেন।

১৯২৪ সালে শচীন্দ্রনাথের চেটায় এবং ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সমর্থনে বিপ্লবীদের সর্বভারতীয় সংস্থা হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশনের সৃষ্টি। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হন শচীন্দ্রনাথ, পরিচালক সংসদে থাকেন সূর্য্য সেন, রাজেন লাহিড়ী, অনন্তহারি মিত্র, চাক্রবিকাশ দত্ত ও আরও অনেকে।

এই অ্যাসোসিয়েশন (এইচ আর এ) যে সব বৈপ্লবিক কার্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল তার মধ্যে কাকোরি ডাকাতি, দিল্লী অ্যাসেম্ব্লির ঘটনা, দক্ষিণেশ্বরের বোমার কারখানা, ভূসুওয়াল বোমার মামলা, লাহোর বড়মন্ত্র... প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইচ আর এ'র পরিকল্পনা অনুসারেই ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মত ঘটনা ঘটে।

এইচ আর এ'র সংগঠনের জ্ঞাত শচীন্দ্রনাথ কাশী থেকে কলকাতায় চলে আসেন। এখানে তিনি কয়েকটি শক্তিশালী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবককে সংগঠনের মধ্যে টেনে আনেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে দীপ্তিময় যার নাম, তিনি হলেন যতীন্দ্রনাথ দাস।

আমরা জানি, পরবর্তীকালে (১৯২৯-এর ১৩ই সেপ্টেম্বরে) এই দুর্দান্ত যুবক যতীন্দ্রনাথ লাহোর জেলে অনশনে ব্রহ্মবরণ করেন। ৬৩ দিন ধরে অনশনে তিলতিল করে যুজ্য পথে তিনি এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর এই ঐতিহাসিক যুজ্য ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে যেমন গৌরব এনে দিয়েছিল, তেমনি প্রতিষ্ঠিত করেছিল বাঙালী যুবকের দেশপ্রেম ও অদ্বৈত মনোবল।

১। Such members of the Jugantar or Western Bengal Party as reverted to Revolutionary conspiracy after the Royal amnesty, realised that it was impossible for them to make any headway against the popular sentiment of Nonviolence... Some of the leaders interviewed Mr. Gandhi but he begged them to give his programme a chance.

(File No. 61/Home/Poll-1924 P. 21.)

২। স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (গোবিন্দলাল সেন) পৃঃ ১৬।



# ক্রীড়া জগতে ভার প্রশিক্ষনের অবদান

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

বর্তমান জগতে ভার নিয়ে প্রশিক্ষণের প্রভূত\* প্রচলন হয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান জিজ্ঞাস্য—যে কোন ক্রীড়াতেই ক্রীড়ার উপযোগী শরীর গঠন করার জন্য ভার নিয়ে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি?

এক সময়ে আমাদের ধারণা ছিল, দৌড়, হাইজাম্প, বল্লিং, ফুটবল প্রভৃতি গতি-সকরণশীল ক্রীড়ার ভার নিয়ে প্রশিক্ষণে শরীরের মাংসপেশী সমূহের স্বাভাবিক নমনীয়তা দূরীভূত হয়ে তাহার অযথা শক্ত হয়ে ওঠে (steep muscle)। এই সকল শক্ত পেশী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গতিবেগের (speed) পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমানে কিন্তু এ চিন্তা ধারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যে কোন ক্রীড়াতেই শারীরিক শক্তি, সহনশক্তি, জীবনশক্তি ও লেগে থাকার শক্তির সমন্বয়ে সামগ্রিক শারীরিক উন্নতিই এক জন দক্ষ ক্রীড়াবিদ তৈয়ারী করিতে সমর্থ হয়। একটু ভাল ভাবে চিন্তা করলে আমরা লক্ষ্য করব যে গ্রীসের অলিম্পিক আদর্শের মধ্যেও ঐ রকম কয়টি কথার উল্লেখ আছে যথা—Strength, Stamina, Agility এবং Endurance।

আমাদের জানা প্রয়োজন, প্রতিটি ক্রীড়াতেই উপরোক্ত প্রতিটি গুণের প্রয়োজন। স্ততরাং শারীরিক শক্তি ব্যাতিরেকে অন্যান্য গুণের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা অনেক সময় সার্থক ক্রীড়াবিদ হয়ে উঠবার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বর্তমান সময়ে প্রতীচ্য Circuit Training নামে একটি কথার বিশেষ প্রচলন হয়েছে। ইংরাজীতে Circuit training কথটির সংজ্ঞাগত অর্থ হল—

—A series of graduated exercises that involve principle of progressive resistance or

as is now progressive loading and require both physical and mental controlled effort.

এ বিষয়ে বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান কোচ Percy Wells Cerruty বলেছেন ভার প্রশিক্ষণে সাধারণ অস্ট্রেলীয় ক্রীড়া মানবিক বিপর্যয়ের মানে পর্যবসিত হয়েছে।

Victorian Weight Lifting Association এবং Malabar Harris Club-এর প্রেসিডেন্টের অধীনে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনি বচন্যাতনামা ক্রীড়াবিদকে এ বিষয়ে শিক্ষাদান করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই এখানে ভার নিয়ে প্রশিক্ষণের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বিষয়বিখ্যাত দৌড়বার Herbert Elliot যখন ৪ মিনিট ২০ সেকেন্ডে মাইল দৌড়ান সেই সময় তিনি Cerruty's Camp-এ যোগদান করেন। এরপর প্রায় তিন মাসের মধ্যে তিনি ৪ মিনিট ১০ সেকেন্ডে উক্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে সমর্থ হন।

শোনা যায় তাঁর এই উন্নতির মূলে ছিল সপ্তাহে হাঁদিন হুগটা করে বারবেল নিয়ে ব্যায়াম। এর পর বৎসরই তিনি ৩ মিনিট ৫৪.৫ সেকেন্ডে মাইল দৌড়ে একটি বিশ্ব রেকর্ড করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বিষয়টির উল্লেখ করে Cerruty বলেছেন Herbert Elliot এই সময়ে যথেষ্ট পরিমাণ প্রয়োজনীয় বারবেল ব্যায়াম অহুশীলন করেছেন।

Herbert Elliot নিজেও বলেছেন Cerruty ক্যাম্পের বহু ক্রীড়াবিদের সঙ্গে তিনি নিজেও উক্ত পদ্ধতিতে তাঁর অহুশীলন চালিয়েছেন।

একটি আধুনিক পত্রিকার কোন এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে ক্যানাডিয়ান জাতীয় ক্রীড়ামূল্যে

\* Training—অহুশীলন।

প্রতিযোগীদের যোগ্যতা। সম্পন্ন করে তোলার জন্য ক্রিমজাটিক ও মেডিসিন বলের ব্যায়ামের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ ভার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

অতীত দিনের ৩০ মিটার থেকে ৪৪০ গজ পর্যন্ত কোড়ের বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী Miss Betty Cuthbert আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে বলে গিয়েছেন, ক্রীড়াপোষুক্ত শরীর গঠনের জন্য অট্রেলিয়ান মেয়েরাও তখন ডায়েল বারবেল ভারী বুট প্রভৃতি নিয়ে তাদের নিত্যকার ব্যায়াম পদ্ধতি অনুসরণ করতেন।

Betty Cuthbert বলেছেন, মেয়েদের পেটের প্রথ পেশীসমূহকে সশল করে তোলার জন্য শায়িত অবস্থায় পালা করে একের পর এক পা উত্তোলন করা একটি ভাল ব্যায়াম। ভার নিয়ে পেটের ব্যায়ামও পেটের পেশী সমূহকে শক্তিশালী করে তোলার উপযোগী একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি।

আজকের দিনে বিশ্বব্যাপী বিক্রম পরিবেশ ও বহু প্রতিদ্বন্দ্বতার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই বিশ্ব ক্রীড়ামানের ক্রমোন্নতি। আমরা দেখতে পাই বহু ষাণ্ড প্রতিঘাতের মধ্যেও বিশ্ব ক্রীড়ার ক্রমোন্নতি রেকর্ড ভাঙ্গার পালা কি বিপুল গতিতে আজ অগ্রসরমান। আমরা দেখতে পাই কয়েক মাস অন্তর অন্তর নিত্য নতুন প্রতিযোগীর নতুন বিশ্ব রেকর্ডের সমন্বয়ে বিশ্ব জগতে নব নব আবির্ভাব।

এই উন্নত ক্রীড়ামানের রহস্যটি কি? সেটা কি প্রতিযোগিতার উত্তেজনা? ভাল খাওয়া? ভাল প্রশিক্ষণ?

হ্যাঁ, এই উন্নত ক্রীড়ামানের জন্য এদের প্রত্যেকেরই অবদান আছে। কিন্তু এইখানেই এর শেষ নয়। আমাদের আরও উপলব্ধি করার আছে। একথা আমাদের জানা উচিত, বর্তমানের ক্রীড়াবিদদের তাদের পূর্বগামীদের অপেক্ষা সশল সক্ষম এবং অধিকতর কষ্ট-সহিষ্ণু

যখন ক্লান্তি কর্তরিত মাহুকের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্র, পেশীতন্ত্র এবং মনোবল প্রান্তিতে বিকল হয়ে যায় তখন এই শক্তি এবং সামর্থ্যই তার অভীষ্ট সিঁড়ির জন্য তাকে তার জয়লাভের পথের দিকে চালিত করে।

কষ্টসহিষ্ণুতাই ক্রীড়াবিদকে ক্রীড়ার পথে নিয়ে যায়। বর্তমান ক্রীড়াবিদদের অসীম জীবনী শক্তি সম্পন্ন শরীরের প্রতিটি তন্ত্রই যেন কষ্টসহিষ্ণুতার এক-একটি প্রতীক।

বর্তমানে তারা অধিক সময় ব্যাপিয়া অধিকতর কঠিন ভাবে পুনঃ পুনঃ প্রশিক্ষণের পক্ষপাতী। আজ তারা উপলব্ধি করেছেন একমাত্র এই উপায়েই উচ্চ প্রতিযোগিতা মান ও প্রবল প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হওয়া সম্ভবপর হয়। এই প্রতিযোগীদের অনেকেই এখন ক্রিমজাটিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এখানে তাঁরা কমবর্ধমান (against Progressive Resistance) বাধার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যায়ামের দ্বারা উচ্চ ক্রীড়ামানের জন্য উপযুক্ত শরীর গঠনের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন।

বর্তমান অলিম্পিকের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ব রেকর্ড সমূহের তুলনামূলক বিচার করলে আমরা প্রস্তুত পাব, সমস্ত বিষয়েই বিশ্ব ক্রীড়ামান দৃষ্টিগত বা ততোধিক পরিমাণ উন্নতি লাভ করেছে। এ বিষয়ে ক্রীড়া-বিশেষজ্ঞদের সূচিসূচিত অভিমত এই যে, এর একমাত্র কারণ ক্রীড়াবিদদের উপোষোক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ।

বহুরের পর বহুর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মান ক্রমেই উন্নততর হচ্ছে। ৭৫ বৎসর পূর্বে অলিম্পিকে যেটা হয়ত সর্বাধিক মান রূপে প্রমাণিত হয়েছে, বর্তমানে সেটাই হয়ত আবার অতি সাধারণ মান রূপে পরিগণিত হয়েছে। বিষয়টি সন্দেহে একটু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

১৮৯৬ সালের অলিম্পিকে যুক্তরাষ্ট্রের R. Gurel ১৬ পাউন্ডের বল ৩৬ ফুট ২ ইঞ্চি দূরে নিক্ষেপ করে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হন। বর্তমান পর্যায়ের G. Fuchus ১৯৫২ সালের অলিম্পিকে তাঁর আঘাত প্রাপ্ত পা নিয়ে ৫৫ ফুট এগার ইঞ্চি এবং এক ইঞ্চির আট ভাগের পাঁচ ভাগ দূরে বল নিক্ষেপ করে মাত্র তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে ক্রীড়ামান প্রায় দৃষ্টিগত পরিমাণ উন্নততর হয়েছে।

১৮৯৬ সালের অলিম্পিক হাইজাম্পের রেকর্ড ছিল ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি আর ১৯১২ সালের গ্রেট ব্রিটেনের Ron Porit ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি লাফিয়ে মাত্র পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। ১৯৬২ সালের অলিম্পিকে একাধিক প্রতিযোগী ৭ ফুট ব্যবধানের উচ্চতা পার হয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। এই প্রতিযোগিতায় Valery Brummel ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি অতিক্রম করে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৮৯৫ সালের পোল ভল্ট রেকর্ড ছিল ১০ ফুট পোনে দশ ইঞ্চি। বর্তমানে বিশ্বের একাধিক প্রতিযোগী ১৬ ফুট উচ্চতা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন। এখনকার অধিকাংশ প্রতিযোগীরই লক্ষ্য ১৮ ফুট উচ্চতা অতিক্রম। আজ মানুষ তার সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সমর্থ হয়েছে। মাত্র কয়েক দিন আগে সুইডেনের “ফেঙ্কেল ইসাকসন” ১৮ ফুট ১ ইঞ্চি লাফিয়ে একটি বিশ্ব রেকর্ড করেছেন।

বর্তমান জগতের সকল ক্রীড়াবিদই একবাক্যে স্বীকার করেন, তার নিয়ে প্রশিক্ষণেই এই উন্নত মান লাভ করা সম্ভবপর হয়েছে। তার নিয়ে প্রশিক্ষণই বর্তমান জগতে শক্ত স বল ও কর্মঠ ক্রীড়াবিদদের আবির্ভাব ঘটাতে সমর্থ হয়েছে।

ইংলিশ ফুটবল টিম একবার রাশিয়ান মস্কো ডায়নামো দলের নিকট নিকট ক্রীড়ামানের পরিচয় প্রদানে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়। এই সময়ে এ বিষয়ে একজন ইংরাজ শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে রাশিয়ান কোচ বলেছিলেন — “আপনাদের ক্রীড়াবিদেরা যথেষ্ট স বল নয় বলেই তারা আজ এই প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়েছেন।”

ফুটবলারের ‘Notre Dame’ সংস্থার নাম উল্লিখিত হলেই ফুটবলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এক ক্রাবের সভ্যগণও বহুদিন ধরেই নিজেদের প্রশিক্ষণের সঙ্গে তার নিয়ে অভ্যাস শুরু করেছেন। বাস্কেটবল খেলোয়াড় এবং অজ্ঞাত ক্রীড়াবিদেরাও এখনকার ইয়ুনিভার্সিটি ব্যায়াম কেন্দ্রে নিয়মিত বারবেল ব্যায়াম করেন।

লণ্ডন অলিম্পিক গেমসে ব্রিটেনের ডিস্কাস বিভাগের কোন প্রতিনিধি তৎকালীন ফটল্যান্ডের জাতীয় শিক্ষক Tony Chapman-কে প্রেরণ করেছিলেন, “বিদেশী খেলোয়াড়েরা কোন্ পদ্ধতি অবলম্বনের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে এত পারদর্শিতা প্রদর্শনে সক্ষম হচ্ছেন?”

উত্তরে Tony তাঁকে বলেছিলেন, “এর মধ্যে একটি মাত্র সত্যই নিহিত আছে, আর সেটি হচ্ছে তারা আমাদের জুলনার যিগুণ বলশালী, যিগুণ কষ্টসহিষ্ণু ও যিগুণ তৎপর।”

রাশিয়ান অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন Leonid Scherla-kaov ট্রিপল জাম্পে একটি বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন। শোনা যায় প্রশিক্ষণ কালে তিনি কোমরে তার বঁধে নিয়ে লাক দেওয়া অভ্যাস করতেন।

তিনি বলেছেন- তাঁর নিয়ন্ত্রিত অস্বাভাবিক স বল ও সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই রকম ক্রমবর্ধমান তার নিয়ে অভ্যাস করেছেন।

হেলসিঙ্কী অলিম্পিকের ম্যারাথন রেস চ্যাম্পিয়ন Emil Zatopek প্রমবহল প্রশিক্ষণের যেন এক নুর্ড প্রতীক। ক্রীড়ার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ কালীন তিনি বহুরে হাজার ঘণ্টারও অধিক সময় প্রশিক্ষণে অতিবাহিত করেছেন। এই সময়ে তিনি ভারী বাস্কেট বল, জুতা অথবা অল্প কোন রকম তার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে নিয়মিত অভ্যাস করেছেন। বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে তিনি অভ্যাস করেছেন বাতাসে প্রতিযোগিতার সময় তিনি মুক্তভাবে সহজ ভঙ্গীতে প্রতিযোগিতা করতে সমর্থ হন।

পূর্বতন দিনের বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গকারী স্বল্প পাজার দৌড়বার Knut Lindeberg তাঁর ক্রীড়া-জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে একজন ভারোত্তলনকারী ছিলেন। ক্রালের দূর পাজার দৌড়বার James Bunin তার প্রশিক্ষণের দ্বারা তাঁর শরীর এমন ভাবে তৈরী করেছিলেন যে সংবাদপত্রে তখন তাঁকে “দৌড়ের হারকিউলিস” বলে অভিহিত করা হত (Hercules of foot racing)।

জগৎবরণ্য দোড়বার Pavo Nurm মোট বোকাই  
ঠেলাগাড়ী ঠেলে দোড়ে তাঁর পা হটিকে সবল করে  
হুলেছিলেন।

ব্রিটিশ “ক্রশ কান্ট্রী ইউনিয়ন” সেক্রেটারীকে  
একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, “এতগুলি উচ্চ পর্যায়ের  
দোড়বার আপনি পেলেন কেমন করে?”

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “অতি সহজেই আমি  
তাদের তৈরী করে নিয়েছি। তাদের প্রতিজনই বিশ্বের  
যে কোন লোকের চেয়ে বেশী পরিশ্রম করে। অত্যাৎ  
আজ তারা বিশ্বের সগোস্তম।”

লণ্ডন অলিম্পিকে Wilbur Thompson ৫৬ ফুট  
২২ইঞ্চি দূরে বল নিক্ষেপ করে অলিম্পিক রেকর্ড করেন।  
এ বিষয়ে আশ্চর্য্য হয়ে একজন ব্রিটিশ প্রতিযোগী তাঁকে  
বলেছিলেন, “আমি তোমার মতনই শক্তিশালী কিন্তু  
আমি তো তোমার মতন এটা পারি না। তোমার পক্ষে  
এটা তবে কি করে সম্ভব হয়?”

উত্তরে Thompson বলেছিলেন, সেদিন ‘ভূমি তো  
আমার মতন শক্তিশালী কিন্তু ভূমি কি Horizontal  
Bar-এ ১০৫ বার chin up করতে পার? আমি প্রত্যেক  
দিনই সকাল বেলায় এটা অভ্যাস করি।”

১৬ পাউন্ড শটপুটের এক সময়কার বিশ্ব রেকর্ড  
অধিকারী James Fuchs-কে তাঁর সাকল্যের কারণ  
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, তার নিয়ে  
প্রশিক্ষণই তাঁর সাকল্যের একমাত্র কারণ।

শটপুট বিভাগে Parry O'brien একটি জনপ্রিয়  
নাম। তাঁর সম্বন্ধে এও জানা যায় যে তিনিও তার নিয়ে  
প্রভূত পরিমাণ প্রশিক্ষণ করতেন।

স্কটল্যান্ডের Manny Seaman জগতের একজন শ্রেষ্ঠ  
হুটিয়ুড শিক্ষক। প্রধানতঃ তাঁর প্রশিক্ষণই জো লুইকে  
বিশ্বশ্রেষ্ঠ হুটিয়োকা হওয়ার পথে পরিচালিত করেছিল।  
এই সময়ে একাধিক বিশ্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ের হুটিয়োকা তাঁর  
নিকট শিক্ষাধীন ছিলেন।

Seaman বলেছেন “যখনই আমি কোন হুটিয়োকার  
ছুঁসির জোর কম বোধ করি তখনই আমি ভাবেন  
ব্যায়ামের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি।”

Pat O'Halloran ছিলেন একজন খ্যাতিমান  
ভারোত্তলক। তিনি তাঁর শান্ত শিষ্ট সৌম্যদর্শন সাত  
টোন ওজনের ভাইকে তার প্রশিক্ষণের সঙ্গে হুটিয়ুডে  
নিয়োজিত করেন। এই বালকই পরবর্তীকালে  
উপহুঁপরি হুবার ইংলণ্ডের ইন্টার স্কুল চ্যাম্পিয়ন রূপে  
স্বীকৃতি লাভ করে। শোনা যায়, তার প্রবল হুটোবাতে  
সময় সময় প্রতিপক্ষ যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠত।

বর্তমানে পেশাদারী হুটিয়ুডে তার নিয়ে প্রশিক্ষণ  
একটি অসংবদ্ধ রীতিতে পরিণত হয়ে উঠেছে। প্রতিটি  
বিভাগের প্রতিটি চ্যাম্পিয়নই সম্ভবতঃ এখন তার  
প্রশিক্ষণে অভ্যস্ত।

অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন কুস্তীগির Paul Barlenbach-ই  
জগতের মধ্যে এমন একজন মানুষ যিনি পরবর্তীকালে  
হুটিয়ুডেও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। শোনা যায়  
Barlenbachও পর্যাপ্ত পরিমাণ তার উত্তোলন অভ্যাস  
করতেন।

আমাদের জানা প্রয়োজন যে বিদেশের প্রতিটি  
চ্যাম্পিয়ন মনযোগী নিয়মিত ভাবে ভারোত্তলন অভ্যাস  
করেন। ভাল কুস্তীগির হওয়ার জন্য প্রয়োজন প্রভূত  
শক্তি। আর এই জন্যই প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণ  
ভারোত্তলনকারী ব্যায়াম।

ক্যানাডীয়ান হেভীওয়েট ভারোত্তলন চ্যাম্পিয়ন  
Dave Bailie একাদিক্রমে প্রায় কুড়িটি বিভিন্ন ক্রীড়া  
বিভাগে অংশ গ্রহণ করে প্রতিটি বিষয়েই নিজেকে  
একজন কৃতী ক্রীড়াবিদ বলে প্রমাণিত করেছেন। তিনি  
ক্যানাডীয়ান ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২২টি বিভাগে  
প্রথম তিনটি বিভাগে দ্বিতীয় এবং চারটি বিভাগে  
তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

তিনি শটপুট বিভাগে রেকর্ড করার কৃতিত্ব প্রদর্শন  
করেন এবং ডিসকাসেও অসুস্থরূপ সাকল্য প্রদর্শনের  
অধিকারী ছিলেন।

বেলী সম্পর্কে ইহাও জানা যায় যে তিনি নিয়মিত  
তার প্রশিক্ষণের পক্ষপাতী ছিলেন।

বলিংএ অনভিজ্ঞ Harold Koch নামে কোন  
ভারোত্তলনকারী ব্যায়ামবিদ (Barbel man) “গোন্ডেন

গ্রাভস" সংস্থা পরিচালিত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে লাইট ওয়েট বিভাগে জয়লাভ করেন। অজ্ঞাত ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতেও হয়ত বা এটা সম্ভব হতে পারে।

এ কথা সত্য যে ভার নিয়ে প্রশিক্ষণই ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সব নয়। ক্রীড়াবিদেরা তাঁদের নিজ নিজ বিভাগের জ্ঞান অবশ্যই বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করবেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে দৌড়বার দৌড় অভ্যাস করবেন, কুস্তীগির কুস্তী লড়বেন, মুষ্টিক মুষ্টিবদ্ধ করবেন, কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে সবতোভাবে বিশেষ প্রয়োজন শরীরিক শক্তির। এই শারীরিক শক্তির সঙ্গে পূর্ণোন্নতিত অজ্ঞাত গুণের সমন্বয় ঘটলেই তবে একজন ক্রীড়াবিদের দ্বারা অবিবাক্য অসম্ভব অথবা অজ্ঞত-পূর্ব কোন কিছু করা সম্ভব হতে পারে। তার পূর্বে নয়।

মিষ্টার আমেরিকা উপাধিধারী Denis Tincerino নামে বিখ্যাত শরীর শিক্ষাবিদ তিন বৎসর ভার প্রশিক্ষণের পর ফেন্সিং (Fencing) বিষয়ে শিক্ষা আরম্ভ করে বহু প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে সমর্থ হন। ফেন্সিং-এর খোঁচা দেওয়া (Lunges) এবং কাটানো পদ্ধতি (Counter retreat) তিনি ভার নিয়ে অভ্যাস করতেন। পরবর্তীকালে Denis Tincerino টেট ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী সাব্যস্ত হন।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ভার প্রশিক্ষণে শিক্ষা প্রাপ্ত মানুষ সাধারণতঃ একাধিক ক্রীড়ায় পারদর্শিতা লাভ করে। এর একমাত্র কারণ ভার নিয়ে প্রশিক্ষণে শক্তি, সামর্থ্য, সহনশক্তি ও মানসিক শক্তির সমন্বয়ে গড়ে উঠা স্বাস্থ্য যে কোন ক্রীড়াতেই পারদর্শিতা অর্জনে সাহায্য করে।

বিখ্যাত যন্ত্রবীর হ্যাকেনসমিট্ (George Hackenschmidt) তাঁর অতীত জীবনে ছিলেন একজন ভারোত্তলনকারী। ইতিপূর্বে ভারোত্তলনে তাঁর অনেকগুলি বিশ্বরেকর্ডও ছিল। কিন্তু একথাটা খুব কম লোকই জানে যে তিনি রাশিয়ার একজন চ্যাম্পিয়ন সাইক্লিষ্টও ছিলেন।

লৌহবল নিক্ষেপকারী James Fuchus প্রথম জীবনে একজন ফুটবল খেলোয়াড় (American Football) হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর ফুট বলে বাধাদান (Blocking), কাটান (Tackling) এবং গতি (Speed) তখন সত্যসত্যই দর্শনীয় ছিল।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি ৯.৭ সেকেন্ডে ১০০ গজ দৌড়েছেন; হাইজাম্প করেছেন ৬ ফুট, লং জাম্প ২৩ ফুট ৬ ইঞ্চি। ঐ একই সময়ে তিনি ১৭২ ফুট পৌনে এগার ৪ ইঞ্চি দূরে লোহ বল নিক্ষেপ করে একটি বিশ্ব রেকর্ড করতে সমর্থ হয়েছেন।

আইরিশ চ্যাম্পিয়ন Davic Guiney (শটপুটে) Dick O'Raffetry (হাইজাম্প) এবং Ronney Taylor (ডিসকাস্) প্রভৃতি ক্রীড়াবিদেরা সকলেই ভার প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই তাঁদের যথোপযুক্ত শরীর গঠন করতে সমর্থ হয়েছেন।

বিশেষ বিভিন্ন দেশের এই তথ্যবহুল সংবাদ বিশ্বেরই উন্নতিকল্পে Michael Fallon বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন একাধিক। এ সবকিছু তিনি কোন তথ্যকথা আমাদের শোনাতে চাননি। তিনি শোনাতে চেয়েছেন যে কথা সত্য, সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত এবং কলপ্রস্থ। মনে হয় আমাদের দেশেও এ বিষয়ে অসুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।



# বন মন্দির

ডাঃ নন্দলাল পাল

বপু দেখাছিলাম।

ছোট বেলায় আমি খেতে বসেছি। বায়না ধরলাম, গল্প বল, নইলে খাব না। হঠাৎ কোন গল্প মনে পড়ছিল না দিদিভাই-এর। আমিও খাওয়া বন্ধ করে বসে রইলাম।

দিদিভাই বলল, শোনু রাখাল, আজ তোকে নাগাপাহাড়ের গল্প বলব।' দিদিভাই বলেছিল, কিন্তু আমার ভেতন ভাল লাগেনি। এতদিন দিদিভাই-এর মুখে শুনেছি, রাজা মানেই হল সাত মহলা বাড়ীর মালিক। তাঁর অনেক হাতি ঘোড়া, দাসদাসী, সিংহাসন, রাজদণ্ড, রাজকীয় পোশাকের বাহার। কিন্তু এ কেমন রাজা যে নিজে এবং যার প্রজারা নেংটির মত কাপড় পরে।

আচমকা দরজার হুম হুম করে বা পড়ল। ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ খুলে তাকালাম। কী আশ্চর্য, আমি যে নাগাপাহাড়েই আছি। ছোট বেলায় দিদিভাইএর মুখে শোনা গল্প কি তবে অবচেতন মন থেকে আজ নাগাপাহাড়েই বপু দেখা দিল?

শরীরটা ভেতন ভাল ছিল না। দু'দিন ধরে আমাশয়ের মত হয়েছিল। তাই হাসপাতাল থেকে এসেই সামান্ত খেয়ে দরজা বন্ধ করে লেপের নীচে চুকে পড়েছিলাম। হাতে ছিল C. V. Furer-Halmendorf সাহেবের লেখা 'দি নেকেড্ নাগাস্' (The Naked Nagas) বইখানা। কোন্ সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

এখানে এসেছি মাত্র দিন কয়েক আগে। চমৎকার বাংলা। তাই প্রথম দিকে রাজে পেট্রোমাক্স জ্বালাতাম। দু'তিন দিন পরে যখন মিলিটারী ক্যাম্পে বেড়াতে গেলাম তখন সুবেদার সাহেব একথা সেকথার পর

আমাকে বলেছিলেন, 'ডাক্তার সাহেব, আপনি ও নতুন লোক, এখনকার অবস্থা এখনও ভাল ভাবে জানেন না। যাহোক, রাজে এত উজ্জল বাতি জ্বালাবেন না।'

পরদিন সার্কেল অফিসার মিঃ ঘোসেফের বাসায় বেড়াতে গেলাম। তিনিও একই কথা বললেন। মিঃ ঘোসেফ আর একটু খোলাসা করেই বললেন, 'ডক্টর, উজ্জল আলো বৈরীদের পথের নিশানা দেয়। এ ছাড়া ওরা বুঝতে পারবে যে ডাক্তারের বাংলাও এখন খালি নেই। সুতরাং.....'

সুতরাং আর বেশী আমাকে বলার প্রয়োজন নেই। সেদিন থেকেই সন্ধ্যার আগে ভোজন পূর্ণ সমাধা করে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়তাম। ঘরে আলো জ্বালাবার প্রয়োজন হয়নি কোনদিন।

আবার দরজার হুম হুম শব্দ হচ্ছে। আমি চুপ করে বিহানায় শুয়ে আছি। একটা আকানা ভয় ও আশঙ্কায় মনটা কেঁপে উঠল। কান খাড়া করে রইলাম।

'ডাক্তার সাহেব উঠিবি, উঠিবি। জলদি উঠিবি।' সঙ্গে সঙ্গে দরজায় প্রচণ্ড হুমদাম শব্দ।

তবে কি সত্যি ওরা এল? কিপিরিতে ডঃ পালিত বলেছিলেন, 'একা কখনও ট্যারে যাবেন না, ডঃ চৌরালি। আমার কিন্তু এখানে তিন বছরের অভিজ্ঞতা। ওদের নাকি আবার ডাক্তার একজনের দরকার। অন্ততঃ আমার সেমা চাকরটা ত তাই বলে। কোন্ ডাক্তার কোথায় আছেন সব বৈরীদের নথ্যদর্শনে। ওরা নাকি হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন দেবে। তবে আপনাকেও ওদের সঙ্গে আত্মরক্ষাও হতে হবে।'

এই মুহূর্তে ডঃ পালিভের গলাটা যেন আমার কানে কাছে আবার বাজতে লাগল, 'ওদের নাকি আবার

ডাক্তার একজনের দরকার—।’ তবে কি আজই ওদের দরকার হল? এবং এখনই?

গা’টা হুম হুম করে উঠল। কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বাইরে জোৎস্না ঝিকমিক করছে। সেদিনের তিথিটা আজ আর ঠিক মনে নেই। তবে খুব সম্ভব পূর্ণিমার দু’একদিন আগে বা পরে হবে। কিন্তু এ কী, সে কি আমার মনের ভাবটা টের পেল? এবার যে সে এসে আমার বেডরুমের দরজায়ই যা দিল। মনে হল, সত্যি বিপদ ঘনিরে এসেছে। মনে মনে ইষ্ট নাম জপতে লাগলাম। এবার কিন্তু সে একেবারে আমার মাথার পাশের জানালায় যা দিল।

‘ডাক্তার সাব, উঠিনি উঠিনি।’

জানালায় দিকে তাকালাম। কিন্তু যা দেখলাম তা’তে হাত-পা অবশ হয়ে এল। আগন্তুক যেই হোক, তার দু’কাঁধে দুই প্রহরণ—এক কাঁধে স্তূর্ণীর্ণ বস্ত্র এবং অল্প কাঁধে প্রকাণ্ড নাগা দাঁ—জ্যোৎস্নার আলোকে ঝক ঝক করছে।

বুঝলাম বিপদে পড়েছি। কিন্তু এখন যদি নার্ভাস হই, তবে নির্ধাত হার্টফেল করবে। মনে পড়ল সেই মহাজন বাণী—‘তাবত্তয়ন্ত ভেত্তব্যং যাবত্তয়ম্ অনাগতম্।’ সাহস সঞ্চয় করে বললাম। ‘কে, কে তুমি?’

‘কে তুমি?’ আমার গলার স্বরটা নিজেই যেন চিনতে পারলাম না। আশ্চর্য, এত বড় বিপদে পড়েও নিজের গলাকে বেশ নিকরবেগ মনে হল। আমার গলার শব্দ বন্ধ দরজা জানালার গায়ে যা খেয়ে আবার আমার কাছেই কিয়ে এল।

চাঁদের আলোর এক ফালি জানালার পর্দার ওপর দিয়ে এসে ঘরে পড়েছে। হঠাৎ মনে হল, আমার বাংলোর পেছন দিকে কাদের কিসকিসানি শোনা যাচ্ছে। উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। ই্যা, কিসকিসানি নয়, একাধিক লোকের চাপা কথাবার্তা। নিখাস বন্ধ করে রইলাম, ঐ সব কথাবার্তার দু’একটা শব্দের অর্থও যদি বোঝা যায়।

নিখুম রাজি। নির্জন ঘর। হৃৎপিণ্ডের শব্দটাও যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। লাব্-ডাব্, লাব্-ডাব্। মনে পড়ল, ডাক্তারী পড়বার সময় তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে যখন রোগীদের দেখিয়ে প্রথম ডিমেনস্ট্রেশন শুরু হল, তখন আমার ক্ষত যে রোগীদের নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন রেজিষ্ট্রার ডঃ হরেন্দ্র ঘোষ, ঠাকৈ আমরা সবাই হরেন্দ্রা বলে ডাকতাম এবং এর থেকে যিনি পরবর্তী কালে সাবজনীন হরেন্দ্রা হয়ে উঠেছিলেন, তার প্রথম রোগীটাই ছিল হার্ট কেস—মাইট্রেল স্টেনোসিস (Mitral Stenosis)। মাইট্রেল এরিয়াতে ডায়েটলিক মারমার (Diastolic murmur)—বাংলা করলে দাঁড়ায় মর্মর ধ্বনি। সবে মাত্র খার্ড ইয়ারে উঠে মেডিক্যাল ওয়ার্ড করতে এসেছি, আর সেখানে প্রথম রোগীই কিনা মাইট্রেল স্টেনোসিস কেস।

হরেন্দ্রা রসিক পুরুষ। রসিকতা করে বললেন, ‘কাব্যে মর্মর ধ্বনি পড়েছ আর বসন্ত কালে বনের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে সে মর্মর ধ্বনি হয়ত উপলব্ধি করেছ। তবে সোনা আমার’ এবার তোমাকে হৃদয়ের মর্মর ধ্বনি অহুধাবন করতে হবে। আর তা যদি পার তবে জেনে রেখো, হার্ট কেসের অনেক কিছুই তোমার শেখা হয়ে গেল। তবে ঠ্যা, প্রথমেই একেবারে এ মর্মর ধ্বনি তোমার কর্ণে প্রবিষ্ট হবে না। তার ক্ষত চাই আগে নরম্যাল (normal) হার্ট সাউণ্ড আয়ত্ত করা।’ এই বলেই তিনি আমাকে অল্প এক রোগীর কাছে নিয়ে গেলেন যার অন্ততঃ হার্টের কোন অহুধ ছিল না। তার বুকের ওপর টেথোকোপ রেখে হরেন্দ্রা বললেন, ‘আগে শোন এবং বুঝতে চেষ্টা কর এ সাউণ্ড। বইয়ে পড়েছ, হার্টের প্রথম সাউণ্ড বা সিস্টোলিক সাউণ্ড এবং দ্বিতীয় সাউণ্ড বা ডায়েটলিক সাউণ্ড। এখানে ভাল করে শোন—প্রথম সাউণ্ডটা ‘লাব্’ এবং দ্বিতীয় সাউণ্ডটা ‘ডাব্’ এর মত হচ্ছে। এই ‘লাব্-ডাব্’ সাউণ্ড আগে বুঝবার চেষ্টা কর।’ এরপর তিনি অল্প ছাত্তের কাছে চলে গিয়েছিলেন। হরেন্দ্রা ত এত সহজে আমাকে ‘লাব্-ডাব্’ আয়ত্ত করতে বলে গেলেন, কিন্তু আমি

টেবোথোপ বসিয়ে যা গুনতে শেলাম, তার হয় সবটাই 'লাব্' না হয় সবটাই 'ডাব্' আর না হয় সবটাই কিছু নয়। অবশ্য পরবর্তী করেকদিনের অক্লান্ত চেষ্টায় সে 'লাব্ ডাব্' আয়ত্ত করেছিল। কিন্তু আজ নাগাপাহাড়ে বসে এই মুহুর্তে মনে হচ্ছিল, আমার হার্টের শব্দ আমার কাছে এতই স্পষ্ট যে তা বুঝবার জন্য টেবোথোপের দরকার নেই। খালি কানেই আমি তার 'লাব্ ডাব্' গুনতে পাচ্ছি।

কিন্তু না, বহু চেষ্টা করেও সে কথাবার্তার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। হৃগ্ণা নাগা ভাষায় সে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে।

বিহানার ওপর বসে মিলিটারী ক্যাম্পের দিকে তাকালাম। আমার বাংলা থেকে মিলিটারী ক্যাম্প প্রায় অর্ধমাইল দূরে। ক্যাম্পের চার কোণে চারটি বিবরে বসে সিপাইরা ক্যাম্প পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু হৃগ্ণা আমার, আমার বাংলার এদিকে কোন সাত্রী নেই। আমার বাংলা থেকে ফার্মিং-চারেকের ভেতরে জনমানবের কোন আশ্রয় নেই। যদি আমি সাহায্যের জন্য জোরে চেষ্টাই, তবে তা চারদিকের পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার কাছে ফিরে এসে আমাকেই বিক্রম করবে—অন্ত কা'রো কানে পৌঁছাবে না। সুতরাং সে চেষ্টা করে লাভ নেই। বরং তা'তে ফল আরো খারাপ হতে পারে।

আমার গলার দর বোধ হয় বন্ধ ঘরের দেওয়াল ভেদ করে আগন্তকের কানে পৌঁছায়নি। তাই সে আবার দরজায় যা মেরে বলল, “ডাক্তার সাহ, উঠিবি উঠিবি।

আমিও আবার বললাম, ‘কে তুমি?’

এবার বোধ হয় সে গুনল। যথাসম্ভব চোঁচিয়ে বলল, ‘মুই লেসামং।’

‘লেসামং, কোন্ লেসামং তুমি?’

‘মুই লেসামং, হুপিটাল কা লেসামং আহি।’

হুপিটাল কা লেসামং। তবে কি হাসপাতালের এ্যাটেনডেন্ট লেসামং? বিহানা থেকে নেমে পর্দার

উপর দিয়ে কাঁচের জানালার ওপাশে আগন্তককে দেখে নিলাম। কোন্ লেসামং চিনবার উপায় নেই। আপাদ-মস্তক এক ওভারকোট চাকা। মাথায় বানরমুখ টুপি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘লেসামং, তুমি এত রাতে কেন এসেছ, কি হয়েছে?’

প্রত্যুত্তরে লেসামং যা বলল তার বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় যে, আচুংবা দোভারীর জ্বর ছেলে হয়েছে বিকাল চারটার, কিন্তু এখনো ফুল (Placenta) বেরোয়নি। ওরা অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেছে, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। মেয়েটির ভীষণ রক্তশ্রাব হচ্ছে এবং অবস্থা খুবই খারাপ। সুতরাং আমি যদি একবার গিয়ে দেখি তবে খুবই ভাল হয়।

একটা কথা চকিতে আমার মনে এল। লেসামংকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘পেছন দিকে চাপা গলার কা'রা কথা বলছে?’

লেসামং বলল, তার সঙ্গে আরো কয়েকজন লোক এসেছে। তবে ওরা একসঙ্গে এসে আমাকে বিরক্ত করতে চায় না।

দরজা খুলে বাইরে এলাম। প্রায় গোল চাঁদটা তখন মাথার ওপর। মিলিটারী ক্যাম্পে ঢং করে রাত একটা বাজল।

মুহিমংকে ডেকে ডুললাম। বাংলার এক পাশে চাকরদের জন্য নির্দিষ্ট যে ঘর আছে সে ঘরে মুহিমং থাকে। মুহিমং নাগা ছেলে—জাতিতে ইমচুংগর।

মুহিমং-এর ঘরের দরজায় যা দিল লেসামং। একবার—হু'বার—তিনবার। কিন্তু মুহিমং-এর কোন সাড়াশব্দ নেই। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। সুতরাং মুহিমং ঘরেই আছে।

লেসামং বলল, ‘তার, আপনি একবার ওকে ডাকুন।’ আমি তা'ই করলাম। হু'তিন বার ডাকতেও উত্তর নেই। জবাব দিল মুহিমং, ‘তার, মুই এত্তা আহি।’ অর্থাৎ আমি এখানে আহি।

আমি বললাম, ‘দরজা খোল মুহিমং।’

মুহিমং দরজা খুলল। বললাম, ‘কেন এতক্ষণ তুমি জবাব দাওনি মুহিমং?’

মুহিমং হঠাৎ হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'ভ্রা, আমি ভয় পেয়েছিলাম বোধ হয় জংলী (বিদ্রোহী) লোকেরা এসে গেল। তাই খাটের নীচে ঢুকে পড়েছিলাম।'

বেচারা মুহিমং! বৈরী নাগাদের ভয় দেখাচ্ছ তারণ কম নয়।

মুহিমং বলল, 'সাহেব, আমিও আপনাব সঙ্গে যাব।'

বুর্লাম মুহিমং একা থাকতে ভয় পাচ্ছে। তাই সে-ও আমাদের সঙ্গে চলল।

বাংলার গেছন দিকে বাক ঘুরে যেতে হবে দোভাষী আচুংবার বাড়ীতে। প্রায় এক মাইল রাস্তা।

পথের দু'ধারে পাইন ও হুপগাছের সারি। বাতাসে পাতাগুলো যেন শিশু দিচ্ছে। মাঝে মাঝে তুলোর মত সাদা হু'এক খণ্ড মেঘ গগনচুম্বী পাছাড়গুলোর মাথায় বসে আছে। আকাশে চাঁদ—চারদিকে জ্যোৎস্নার ছড়াছড়ি। মনে হচ্ছিল যেন কোন এক স্বপ্নময় জগতের ভেতর দিয়ে চলছি। কিন্তু সে সৌন্দর্য উপভোগ করার অবকাশ কোথায় আমার? আজকে আমার দক্ষতার উপর অনেককিছু নির্ভর করছে। আচুংবা দোভাষীর স্ত্রীর ছেলে হয়েছে বিকাল চারটায়, তার খুল এখনো বেরোয়নি। এখন রাত একটা। নানা প্রাইগৈতিহাসিক চিকিৎসা হয়েছে এবং সে চিকিৎসা ব্যর্থ হওয়ার ডাক্তারের ডাক পড়েছে। এর আগে পুংরো এলাকার এমনটি আর হয়নি। মনে মনে আচুংবার স্ত্রীর অবস্থা কল্পনা করলাম এবং তার সঙ্গে কল্পনা করলাম আমার অবস্থাও। রিটেন্ড্‌প্লেসেন্টা কেস (Retained placenta case)। মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সময় এবং তারপর হাউস সার্জন হিসাবে কাজ করবার সময় এরূপ রোগী অনেক দেখেছি এবং চিকিৎসাও করেছি অনেক। রীতিমত ঘটায় ব্যাপার। কম করেও দু'জন ডাক্তারের দরকার। একজন রোগীকে অজ্ঞান করবে এবং অস্ত্রজন অপারেশন করবে। কিন্তু এখানে ডাক্তার বলতে সবেশন নীলমণি আমি। আমাকেই সবাকিছু করতে হবে। সহায় আছে একমাত্র কম্পাউণ্ডার জর্জ। কিন্তু সে-ও ট্রেন্ড কম্পাউণ্ডার নয়।

নেফার বাদিপর্কে যখন কেউ সেখানে যেতে ভয়লা পেত না, তখন কম্পাউণ্ডার জর্জ চুকেছিল নেফার চাকুরিতে। কেবলমাত্র কোন এক অধ্যাত প্রাণে বাড়ী তার। বাড়ী থেকে পালিয়ে জর্জ নিজের ভাগ্যের সন্ধানে এসেছিল আসামে। সেখানে এক চা-বাগানে কুলি সর্দারের কাজ করত জর্জ। অবসর সময়ে বাগানের হাসপাতালে গিয়ে কম্পাউণ্ডার, ড্রেসারদের সঙ্গে আড্ডা দিত সে। এখানেই হয় তার হাতে-খড়ি। কিছুদিন পর কুলি সর্দারীর কাজ জর্জের ভাল লাগল না। বাগানের হাসপাতালে কয়েক বছর কাজ করে মোটামুটি সব কাজই আয়ত্ত করল জর্জ। তারপর কিভাবে যেন কম্পাউণ্ডারের এক সার্টিফিকেট যোগাড় করে ১৯৫০ সালে নেফার চাকুরিতে কম্পাউণ্ডার হিসাবে ঢুকে পড়ে। জর্জের এ কাহিনী আমি ডঃ বিবেকদীপ মুখে শুনেছিলাম।

এই মুহুর্তে নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হল। কে বুঝবে এসব কথা? আচুংবা দোভাষীর স্ত্রীর ছেলে হয়েছে—ফুল বেরোয়নি। স্ততরাং যেমন করেই হোক ডাক্তারকে ডা'বের করে দিতে হবে। যদি না পার তবে তোমার ডাক্তারী বিজ্ঞা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী—এসবের এক পরসার দামও নেই আচুংবার কাছে।

যোলটা মুণ্ডলিকারী আচুংবার মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। এর চেয়ে বৈরীদের হাতে পড়াও বোধ হয় ভাল ছিল।

প্রথম যৌদিন এখানে এলাম, সেদিনই রাত্রে আচুংবা এসেছিল দেখা করতে। হেড দোভাষী—স্ততরাং দায়িত্ব তার কম নয়। কখন কখন অফিসার আসেন যান তার পৌজ-খবর তাকে রাখতে হয়। প্রথম দৃষ্টিতেই যেন মনে হয়েছিল আচুংবা তার চারপাশের অণু দশজনের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র। ইম্পাতের মত কঠিন শরীর। মাথার চুল গোল করে ছাটা। গোল গোল দুটি চোখ যেন শিকারী নেকড়ে মত সব সময় ঝকঝক করছে।

আচুংবা এসেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিল,

সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে ডঃ পালিভের কথাগুলি বেজে উঠল।

আসার পথে কিপিরিতে পরবর্তী কনভয়ের জন্ত হুঁপন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ডঃ পালিভ সেখানকার মেডিক্যাল অফিসার। তিনি প্রায় অস্বাচিন্ত ভাবেই বলেছিলেন, ‘ডঃ চৌরালি, নাগাহিলস্ ত এলেন। যদি সন্মানে এবং নির্ভয়ে চাকুরী করতে চান, তবে আচুংবা দোভাষীকে যে কোনও ভাবে যশে রাখবেন। যোলটা হেড্‌হাটীর সে। তার কথায় পুংরো এরিয়া ওঠে বসে। সে যদি প্রসন্ন থাকে, তবে সাম্রা-সিপাই কিছুই দরকার হবে না। আপনার এলাকায় আপনি নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারেন। কোন বৈষী নাগা আপনাকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু সে যদি বিগড়ায়, তবে সাম্রা সিপাই কিছুই আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না।’

এ হেন আচুংবা এসেছে আমার সঙ্গে দেখা করতে। স্তম্ভর্য আপ্যায়নের কিছুই বাকী রাখলাম না। কক্ষ ত খাওয়ারামই, সঙ্গে বিছুট ডালমুট যা ছিল সবই তাকে মুঠো মুঠো করে দিলাম। খুব খুসী হয়েছিল আচুংবা। যাবার সময় আমাকে তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিল। সানন্দে আমি তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে-ছিলাম।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা আচুংবার ভাই এসে আমাকে নিয়ে গেল তার বাসায়। আমার বাংলা থেকে যেখানে পুংরো টিলা বের হয়ে মুম্বিক নদীর দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে এবং যেখানে অজস্র ধূপগাহ সবুজ মেঘলার মত পুংরো টিলাকে জড়িয়ে ধরেছে এবং যেখান থেকে মুম্বিক নদীর হলহল শব্দ অস্পষ্ট কানে আসে, সেখানে আচুংবার ঘর। হেড দোভাষী। চমৎকার স্তম্ভর্য সরকারী বাসা তার আছে। কিন্তু সেখানে সে থাকে না। শহরের একপ্রান্তে নিজের হাতে নাগা কারবার তৈরী বাড়ীতে সে থাকে।

আচুংবার ঘরে পৌঁছে দেখি, আমার সন্মানে আচুংবা অনেক আয়োজন করেছে। ঘরের মাঝখানে হলুদ

অগ্নিকুণ্ডের পাশে মদের গেলাস হাতে আচুংবা বসে আছে। পাশে দুটো মদের বোতল। তার পাশে একটা কাঠের উঁচু পিঁড়ি। আমাকে দেখেই আচুংবা ও তার স্ত্রী দুটে এসে ‘জয় হিল্’ বলে অভ্যর্থনা করল। তারপর আচুংবা আমাকে সেই কাঠের পিঁড়িতে বসতে বলল। স্বামী স্ত্রী দু’জন বিচিত্র সাজে সেজেছিল। আচুংবার গায়ে স্তম্ভর্য একখানা নাগা চাদর। পরশে নাগা নেংটি। হুঁহাতে হাতের দাঁতের বলয়। গলার অসংখ্য লাল পাথরের মালা। আচুংবার স্ত্রীর পরশেও নাগা চাদর। গায়ে কামিজ এবং গলার অসংখ্য লাল পাথরের মালা।

আচুংবাকে অত্মসম্বরণ করে আমিও অগ্নিকুণ্ডের পাশে পিঁড়িতে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা গেলাস এনে দিল আচুংবার স্ত্রী। কোন ভূমিকা না করেই আচুংবা বোতল থেকে মদ ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে দিল। মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। আচুংবার স্ত্রীও আর-একটা গেলাসে মদ ঢেলে খেতে লাগল।

আমি ইতস্ততঃ করে বললাম, ‘দোভাষী আমি ত ও জিনিষ খাই না।’

আচুংবা বলল, ‘কেন?’

‘আমার পছন্দ হয় না।’

‘পছন্দ হয় না?’ আচুংবা যেন আকাশ থেকে পড়ল। হাকিস্য সাতাশ বছর বয়স কোন লোক কোনদিন মদ খায় নি—এ আবার কেমন কথা। আচুংবা বলল, ‘ম দেবতার গায়ে হাত দিয়ে হাত পোড়েনি, একথা যদি বলেন তবে বিশ্বাস করতে পারি, ডাক্তার সাহেব, কিন্তু আপনার বয়সের কোন লোক কোনদিন মদ খায়নি বললে বিশ্বাস করব না।’

আমি যতই এড়াতে চাই, আচুংবা যেন ততই জড়াতে চায়। আমাকে উদ্ধার করল আচুংবার স্ত্রী—। আমার গেলাসের মদ সে তার নিজের গেলাসে ঢেলে নিল এবং তারপর উঠে গিয়ে একটা কাঠের বেকাবী এনে পাশে রাখল।

বেকাবির দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠলাম। অস্তিত্বের হুই বড় বড় মাংসের টুকরো নৈবেদ্যের মত সাজানো। ওর মধ্যে আবার সেজ বড় বড় কী এক রকমের পাতা এবং অসংখ্য কাঁচা লবঙ্গ। এ পরিমাণ মাংসে আমার কমসে কম হুঁদিন খাবে।

আমার চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন লক্ষ্য করেই বোধ হয় আচুংবা বলল, ‘হরিণের মাংস, ডাক্তার সাহেব। আপনার বরাত বড় ভাল’ আপনার নাম করে আজ শিকারে বেরিয়েছিলাম।’

অবিশ্রাম মন্থ খেয়ে চলল আচুংবা ও তার স্ত্রী। আচুংবার মুখের তামাটে চামড়া যেন বেগুনী হতে লাগল। ছোট চোখ দুটো তার ক্রমশঃ আরো ছোট হয়ে আসতে লাগল। আচুংবা বলল, ‘আজ হরিণের মাংস খান ডাক্তার সাহেব, কাল অজগরের মাংস খাওয়াব।’ তারপর বলল, ‘আমি বোলটা হেডহাটার আচুংবা। নিজের হিম্মতকে বাড়িয়ে বলি না। কাল নিশ্চয়ই আপনাকে অজগরের মাংস খাওয়াব।’

হঠাৎ আচুংবা গা থেকে চাদরখানা খুলে ফেলে দিল। তারপর ‘এই দেখুন’ বলে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে তার বুকটা দেখিয়ে দিল। আমি সবিস্ময়ে শুনে শুনে দেখলাম, আচুংবার বুক উন্মুক্ত দিয়ে বোলটা মাংসের মাথা আঁকা।

আচুংবার চোখের দিকে তাকালাম। মদের নেশায় আর নিজের বীরত্বের ব্যাখ্যায় আচুংবার চোখ দুটো ঝাপড়ের চোখের মত জলছে। তবু তার চোখে চোখ রেখে চললাম, ‘বল না দোভাষী: তোমার সেই বোলটা হুও শিকারের কাহিনী।’

অতীত বীরত্বের কাহিনী মনে পড়ায় এবং আমার মত প্রোডা পেয়ে আচুংবা যেন উজ্জ্বলিত হয়ে উঠল।

‘সে অনেক দিন আগের কথা।’ মদের গেলাসে একটা দীর্ঘ চুপ দিয়ে আচুংবা বলল, ‘তখন আমি পুরোপুরি বুঝেছি।’ একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল, ‘মাত্র বাইশ বছর বয়স। মিনি বাঁততে গিয়েছিলাম মাটির হাঁড়ি আনতে। ঐ একটা মাত্র বাঁত যেখানে মাটির হাঁড়ি

উঠেছিল। চারপাশের বিশ-পঁচিশটা বাঁততে ওরাই মাটির হাঁড়ি যোগান দেয়। বর্ষা সীমায় সে বাঁত। এখান থেকে পুরো হুঁদিনের রাত্তা। অবশ্য সোজা মিনি বাঁত হয়ে একদিনে পৌঁছান যায়। কিন্তু মিনি বাঁতের সেমারা আনাড়ের জাতশত্রু। সেমা ও ইমচুংগরদের শত্রুতা চিরদিনের। আমাদের বাঁত আর মিনিবকের মধ্যে কতবার যে লড়াই হয়েছে তার বোধ হয় হিসাবও নেই। ফেরার পথে কেমন যেন খেয়াল হল মিনি বাঁত হয়ে একদিনে পৌঁছে যাই। মাথার বিষটি বোকা। তাই ভাবলাম, একদিনের রাত্তা যদি কমাতে পারি তবে মন্দ কি। মনে মনে ভাবলাম, মিনি বাঁতটা একটু এড়িয়ে গেলেই চলবে। কিন্তু এড়িয়ে যাওয়াই হল কাল।’

আচুংবা একবার আড় চোখে স্ত্রী ইয়াংলার দিকে চেয়ে হেসে মদের গেলাসে আর একটা চুপ দিল। সামনের আগুনটাকে একটু উসকে দিল। তারপর বলল, ‘ওই যে ইয়াংলা—আমার স্ত্রী—ওকেই এখন জিজ্ঞাস করুন, ডাক্তার সাহেব।’

ইয়াংলা নিজেকে দুর্গোধ্য ভাষায় আচুংবাকে কী বলে খিল খিল করে হেসে উঠল। সে হাসিতে যোগ দিল আচুংবাও। আমি সে কথা বা হাসি কোনটারই অর্থ বুঝতে না পেরে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, ‘দোভাষী, তারপর কি হল?’

ইয়াংলা আবার কি বলল। আচুংবা হঠাৎ যেন অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠল। বলল, ‘এ কি ডাক্তার সাহেব, মাংস ত ঠাণ্ডা হয়ে জল হয়ে গেল। আপনার জন্য ইয়াংলা নিজের হাতে মাংস রান্না করেছে। আপনি না খেলে আমি ভীষণ রাগ করব।’

আমিও যেন এককণ স্থান-কাল পার ভুলে আচুংবার রক্ত শুনিছিলাম। আচুংবার কথার আমারও যেন খেয়াল হল। সামনে বোলটা হুও শিকারী আচুংবা মর্যং তার অতীত বীরত্ব গীতা বলে চলেছে। তার বুক উন্মুক্ত

উঠল। এহেন আচুংবার স্বী ইয়াংলা আমার ভক্ত মাংস  
গায়্য করেছে। স্ততরাং সে মাংস না খেয়ে উপায় কি।

সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে আচুংবা ও ইয়াংলার চোখের দিকে  
ডাকলাম। মদের ঘোরে উভয়ের দৃষ্টি উদ্ভ্রান্ত।  
রেকাবী থেকে এক টুকরো মাংস ছুলে তাতে কামড়  
দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে রালে আমার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত  
জলে উঠল। হুকান দিয়ে বেন ধোঁয়া বেরুতে লাগল।  
আমি ধু ধু করে তা ফেলে দিলাম।

হো হো করে হেসে উঠল আচুংবা। বলল, 'এ কি  
ডাক্তার সাহেব, আপনি বাঙালী বলে ইয়াংলা একদম  
রাল ছাড়া রেখেছে। খুব কম করে মাংসে রাল  
দিতে আমিই তাকে বলছি।'।

মনে মনে ভাবলাম, 'হে ভগবান, এই যদি রাল ছাড়া  
রায়্য হয় তবে রাল কাকে বলে তা ত আমার এখনও  
জানতে বাকী। কিন্তু বুধে বললাম, 'না দোভাষী, রায়্য  
চমৎকার হয়েছে। রাল একদম কম। আমার জিহ্বার  
খানিকটা জ্বরগায় বা হয়েছে। তাই বোধ হয় এমনটা  
হয়েছে।'।

আচুংবাও বলল, 'তাই বোধ হয় হবে।'।

আমি গল্পে ছেদ পড়তে দিলাম না। বললাম, 'বল  
দোভাষী, তারপর কি হল।'।

আমার আগ্রহ দেখে আচুংবা খুশী হল। বলল,  
'ডাক্তার সাহেব, মিনিক বস্তি অতি সন্তর্পণে এড়িয়ে  
চলছি। যদি চিরশত্রু সেমাদের হাতে পড়ে বাই,  
সে আশঙ্কাও আছে। এড়াতে গিয়েও এড়াতে পারলাম  
না।'।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'তবে কি সেমারা  
ধরে কেলল?'

আচুংবা হেসে বলল, 'হ্যাঁ, ডাক্তার সাহেব, ধরে  
কেলল। তবে সে যে-সে ধরা নয়। একেবারে আটে  
পৃষ্ঠে।'। ইয়াংলার দিকে চেয়ে আবার হেসে উঠল  
আচুংবা। তারপর বলল, 'খামার থেকে কিয়ছিল  
ইয়াংলা। স্ততরাং ইয়াংলা। আমাকে দেখে জু হুঁচকে  
দাঁড়াল। কিন্তু সে চাহানিতেই খারেল করল আমাকে।

ভাবলাম, এই ত সেই মেয়ে বাকে আমি চাই। মরা  
বস্তির গাঁও-বুড়োর মেয়ের সঙ্গে আমার বাবা বিয়ে  
দিতে চাইছে। এরা এক পরস্পর কনে পণ নেবে না।  
বাবা তা'তেই খুশী। বাবা হিসেব করেছে, স্ততরাং বিয়ে  
হলে কম করেও একটা মিথুন, দু'টো শূকর, গোটা দশেক  
সুরগী, গোটা দশেক নাগা চাদর এবং গোটা দশেক নাগা  
দা ত কনে পণ হিসাবে না দিলেই নয়। অথচ মরার  
গাঁও বুড়ো চুয়াংগা আমার বাবার বন্ধু। তাই পণ না  
নিয়েই আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু  
কেবল আমার আপত্তিতে বিয়ে হচ্ছে না।

'ইয়াংলাকে দেখলাম, ডাক্তার সাহেব। ইয়াংলাও  
আমাকে দেখল এবং এই দেখা দেখির ভিতর দিয়ে  
একের মনের ভাষা অন্তে টের পেলাম।

'হঠাৎ চমক ভাবল ইয়াংলার কথায়। ইয়াংলা বলল,  
'বুঝতে পেরেছি তুমি ইমচুংগর। তাড়াতাড়ি পালাও।  
সামনে আমাদের বস্তির লোক আসছে ক্ষেতের কাজ  
করে। যদি তোমাকে দেখে তা হলে আর রক্ষা  
থাকবে না।'।

'আমি মরীয়া হয়ে বললাম, "কিন্তু তোমাকে না  
নিরে পালাই কী করে?"'

'ইয়াংলা বলল, সর্বনাশ, বলহ কি? তা'হলে আমার  
বাবা বজ্রমের মাথায় তোমার মাথাটি গর্বে বসিত্তে  
কিরবে।'।

আমি বললাম, সে-ও ভাল। কিন্তু এমনভাবে গেলে  
তুমিও আমার মনটি নিয়ে বসিত্তে কিরবে।'।

ওপাশ থেকে ইয়াংলা আবার হুর্ঘোষ্য জ্বায় কি  
একটা বলে হেসে উঠল। আচুংবাও সে হাসিতে যোগ  
দিল।

আমি বললাম, 'বল দোভাষী, আমার কিন্তু গল্পের  
এমন জ্বরগায় খামাটা একটুও সহ হচ্ছে না।'।

আচুংবা বলে চলল, 'ইয়াংলার বস্তির অনেক লোক  
ভখন এসে পড়েছে। ওরা সবাই আসছিল খামার থেকে।  
আমি পালাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না।  
ডাইনে হুকল, বায়ে গভীর খাদ। স্ততরাং ধরা পড়তে

হল। আমাকে ওরা ঘিরে কেঁদল। আমি মতুংরিব লোক জেনে ওদের আনন্দের সীমা রইল না। আমাকে ধরে নিয়ে মরাং-এ বন্দী করে রাখল।”

‘মুংসংবাদ হাওয়ার আগে ছোট্টে, আমি যে সেমাদের বস্ত্র মিনিকে বন্দী হয়ে আছি এ খবর কেমন করে জানি না, আমাদের বস্ত্রভে পৌঁছাল। সাজ সাজ রব পড়ে গেল মতুংরিভে। এদিকে সেমারাও বসে রইল না। আমাকে ধরে রাখার কল কি হবে তা ভাল করেছে ওরা জানত। বহুদিন পর আবার মতুংরি ও মিনিকের মাহুয়ের রক্তে জিয়াংগার আগুন জলে উঠল। সেমাদের রক্তে চিরদিনের হিংসা নিবৃত্ত করতে ছুটে আসছে ইমচুংগররা।

‘সেমাদের পাণ্ডা আক্রমণে ইমচুংগররা বেশ বেকায়দার পড়ল। আমি কিছুই হির করতে পারলাম না। রক্ত আমার টপটপ করে ফুটছে। এত বড় একটা লড়াই হচ্ছে, আর আমি তা’তে অংশ নিতে পারছি না। আমি তখন সেমাদের মরাং-এ বন্দী। হাত-পা, বুক-পিঠ সব বাঁধা—নড়বারও ক্ষমতা নেই। সেমারা ঠিক করেছিল আমাকে কেটে আমার মাথাটা উঁচু বাঁশের মাথায় টাঙিয়ে রাখবে, যা’তে আর কোনদিন কোন ইমচুংগর বুঝে কোন সেমা মেয়ের পানিপ্রার্থী না হয়। যেদিন রাত্রে আমাকে কাটবে বলে হির করেছিল সেদিন ভোরবেলাই মতুংরিব ইমচুংগররা সেমাদের আক্রমণ করল। বন্দী অবস্থায় শুয়ে শুয়ে মিনিক বস্ত্র হেলে-বুড়ো ও মেয়েদের উল্লাসে বুঝতে পারছিলাম ইমচুংগররা লড়াইয়ে হারছে। তার পরিণাম কি তা’ও বুঝতে পারছিলাম। আমার মুণ্ডের সঙ্গে আরো অনেক ইমচুংগরের মুণ্ডে হুঙমালা ভৈরী করে সেমারা ঝোলাবে। আমার অভয়াঙ্ক হাহাকার করে উঠল। স্বজাতির এমন হুঁত্বে আমি একটা শক্রও মাথা নিতে পারছি না। অথচ আমিই এর কারণ।

‘হঠাৎ ঘেঁষা পা টিপে টিপে ইয়াংলা মরাং-এ ঢুকল।

কিঞ্চি তাতে আমার বাঁধন কেটে দিয়ে বলল, “পালাও,

শীঘ্র পালাও। ইমচুংগররা লড়াইয়ে পরাজিত হয়েছে। ওরা পালাচ্ছে, আর সেমারা ওদের পেছনে ধাক্কা করেছে।”

‘ছাড়া পেয়ে আমি পাগলের মত ছুটলাম। মিনিক টিলার গা বেয়ে সেমারা ইমচুংগরদের তাড়া করতে করতে মিনিক নদীর দিকে নামছিল। পেছন থেকে আমি তাদের আক্রমণ করলাম। আমার বর্শা ও দা-এর যায়ে বারো জন সেমা কিছু বুঝবার আগেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমি চীৎকার করে ইমচুংগরদের বললাম, ‘আমি আছি, ভয় নেই। মতুংরিব মুখে কালি দিয়ে তোমরা পালিয়ে না।”

‘ইমচুংগররা আমার চিৎকারে ভরসা পেয়ে নদী থেকে চড়াই বেয়ে সেমাদের আবার আক্রমণ করল। সামনে ওরা, পেছনে আমি আর মাঝখানে সেমারা। দেখতে দেখতে সেমারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আমি একাই আরো চার জনকে শেষ করলাম। বিজয় উল্লাসে উদ্ভূত ইমচুংগররা মিনিক বস্ত্র হেলে বুড়ো মেয়েদেরও রেহাই দিল না। তাদের রক্তে ভেসে গেল বস্ত্র। দীর্ঘ-দিনের শক্ততার আগুন যে মেয়েকে কেন্দ্র করে জলে উঠেছিল, সেই ইয়াংলাকে নিয়ে এলাম মতুংরিভে। কেবল তাকেই বাঁচতে দিয়েছিলাম আমার।”

কাছিনী শেষ করে আচুংবা নিজেদের ভাষায় কি বলল। খিল খিল করে হেসে উঠল ইয়াংলা।

আমি যেন চেতনা কিরে পেলাম। আচুংবার গল্পের শেষ দিকে সবাকিছু ভুলে আমার যেন মনে হয়েছিল, সে লড়াই আমার চোখের সামনে হচ্ছে আর তার ভেতর থেকে রক্তস্রাব আচুংবা বেরিয়ে এসেছে। তার গলায় বোলটা হুড়ের মালা। সে হুঙগুলো ক্রমশঃ মিলিয়ে গিয়ে আচুংবার গলায় উঠি আঁকা হয়ে রইল।

... ..

আচুংবা দোতাবীর বয়ের সামনে এসে পৌঁছলাম।



আমার সামনে ও পেছনে ছিল নাগা-বাহিনী, বাবা আমার বাংলোর পেছনে বসে কিসকিস করছিল। মুহিম হাতে হারিকেন নিয়ে আমার পাশে পাশে রয়েছে সারাটা রাত। পথে কেউ একটিও কথা বলেনি। বলবেই বা কে ?

আচুংবা বেরিয়ে এল। রীতিমত উদ্ভ্রান্ত তার চোখের দৃষ্টি। আমাকে বলল, 'সাহেব, ইয়াংলাকে আমার বাঁচিয়ে দেন। সে যদি না বাঁচে, আমিও বাঁচব না। কত চেষ্টা করল সুসেলা, কিন্তু ভুতকে কিছুতেই তাড়াতে পারল না। আন্ত মিশুন দেব বললাম, তবু ব্যাটা ভুতের নড়বার নাম নেই।'

সুসেলা বুড়ীর দিকে তাকালাম। সুসেলার দুর্দান্ত প্রভাব এলাকাতে। সুসেলা শুধু দাই নয়—সে স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ এবং যোদ্ধা। বহুদূরের ব্যক্তি থেকেও তার ডাক আসে। সুসেলা নাকি ইচ্ছা করলে দেবদারু গাছের মাথাকে ময় পড়ে মাটিতে নামিয়ে দিতে পারে এবং যে পর্বত না সুসেলা হকুম দেবে, সে পর্বত দেবদারু গাছ সুখ খুবড়ে মাটিতে পড়ে থাকবে।

ঘরের একদিকে আচুংবা দোভাষীর স্ত্রী ইয়াংলা। সন্তান ছুমিঠ হয়েছিল বিকাল চারটায়। কিন্তু এখনও নাড়ী কাটা হয়নি। ওদের ধারণা, ফুল না বেরুলে নাড়ী কাটতে নেই। কাটলে প্রসূতি এবং গেরহ—উভয়ের অমঙ্গল। অবিশ্রাম রক্তস্রাবে ইয়াংলার পাছাড়া মজবুত শরীরটাও ক্যাকাসে হয়ে গেছে।

সীতার জন্ত লক্ষা হারখার হয়েছিল, হেলেনের জন্ত ট্রয় আর ইয়াংলার জন্ত মিনিক ব্যক্তি। এ হেন ইয়াংলাকে যদি না বাঁচাতে পারি, তবে রক্ষা নেই।

এখনেই আমি কাঁচি বের করে নাড়ীটা কেটে বেঁধে দিলাম। হা হা করে উঠল সুসেলা বুড়ী। তাকে বাধা দিল আচুংবা। আচুংবার ভাবখানা হল, দেখাই যাক না ডাক্তার শের-পর্বত কী করেন।

ঘরে একটি মাত্র কাঠের মাচান ছিল। তার ওপর ইয়াংলাকে ধরাধরি করে ছুললাম। নাড়ী পরীক্ষা করলাম। নাড়ীর অবস্থা ভাল নয়। মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করলাম।

একটা লিটে লিখে কমপাউণ্ডার জর্জকে পাঠালাম হাসপাতাল থেকে ঔষধ আনতে। তার সঙ্গে গেল এক নাগা বাহিনী।

আমি এদিকে শুরু করলাম ইয়াংলার চিকিৎসা। বিভিন্ন রকমের প্রয়োজনীয় কয়েকটা ইনজেকশন দিলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এল জর্জ। যে প্রচণ্ড রক্তস্রাব হয়েছে তা'তে যোগীকে রক্ত দেওয়া উচিত। কিন্তু এখানে কোথায় সে ব্যবস্থা। নাড়ীর ভেতরে স্ট্রাইন চালিয়ে দিলাম।

ঘণ্টাখানেক পর নাড়ীর অবস্থা একটু ভাল মনে হল। আমি একটু থুলাই হলাম।

বাইরে থেকে জরায়ুর চাপ দিয়ে (Credes method) ফুলটাকে বের করার সব রকম চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। হুশিভা আবার আমাকে চেপে ধরতে লাগল। একটি মাত্র রাত্তা খোলা—জরায়ুর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ফুলটাকে বের করা (Manual removal of placenta)।

কমপাউণ্ডার জর্জের দিকে তাকালাম। বললাম 'এনায়েসিয়া দিতে পারবে ?'

জিভ দিয়ে ঠোট ফুটোকে চেটে জর্জ বলল, 'না।' ঘরের ভেতরে অনেক লোক। আচুংবা ত আছেই, আরো আছে দোভাষী হেরাং ও মুহিমং। আরো আছে গাওবুড়োর দল। এরা সবাই কোঁহুলী—এরা সবাই দেখতে চার, কেমন করে নতুন জাতের আচুংবা দোভাষীর বউ-এর ফুল বের করে।

তাকালাম সুসেলার দিকে। কিন্তু বাঁধনীর মত সুসেলা হুঁসছে। তার চিকিৎসা, তার মানসবীরা,

প্রভাব প্রতিপত্তি—সব কিছুর প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে নতুন ডাক্তার। স্নেসেলাও দেখে নেরে। এক মাঘে শীত যায় না।

আমি ঈশ্বর ঢেলে ইয়াংলাকে অজ্ঞান করলাম। কম্পাউন্ডার জর্জকে বললাম, ‘ছুমি এই কানেলটা ধরে থাক এবং আমি যখন বলব তখন ফানেলের ওপর ঈশ্বর ঢালবে। পারবে তো?’

ইতস্ততঃ করে জর্জ বলল, ‘পারব।’

প্রায় তুড়ি মিনিট পরিশ্রম করে জরায়ুর ভেতর থেকে হাত দিয়ে বের করে নিয়ে এলাম ফুলটা। আনন্দে প্রায় চীৎকার করে উঠল আচুংবা।

এরপর প্রয়োজনীয় গোটা কয় ইনজেকশন দিলাম।

ইয়াংলার খুক, নাড়ী ইত্যাদি আবার পরীক্ষা করলাম। অবস্থা একটু ভালর দিকে মনে হল।

বাইরে এলাম। ঘাড়িতে তখন পাঁচটা বেজে তুড়ি মিনিট। চারদিক বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। গাছে গাছে পাখিদের কাকলী। শরমতী পাছাড়ের বরফ ঢাকা মাথাটা আবহা আবহা দেখা যাচ্ছে।

আচুংবা নীচু গলার ফিসফিস করে গাঁওবুড়োদের সঙ্গে কী আলোচনা করছিল। আলোচনাটি কী জানতে

উৎসুক হলাম। মুহিমংকে আড়ালে ডেকে ডিজেন্স করলাম। সে বলল, ‘আচুংবা ও গাঁওবুড়োর বল আমার ওপর খুব খুশী হয়েছে। ওরা বলছে, ডাক্তার সাহেব নিশ্চয়ই স্নেসেলার চেয়ে বড় গুণিন, নইলে এমনটা সম্ভব নয়।’

... ..

প্রায় এক মাস পরের কথা। হাসপাতালে যাবার জন্য ভেরী হয়ে মাত্র বাইরে পা দিয়েছি, এসে উপস্থিত হল আচুংবা, মুখটা তার খুশী খুশী। তার পেছনে প্রকাণ্ড তুড়ি মাথার আর একটি লোক। লোকটি তুড়িটাকে মাটিতে রাখল। এর ভেতর থেকে আচুংবা বের করল বিরাট মহিষের আন্ত একখানা ঠ্যাং, হুঁখানা শূকরের ঠ্যাং, চারটি মুরগী, সেং হুই চাল এবং হুঁবোতল মধু (ভেঁতো মদ)। তারপর বলল, ‘ডাক্তার সাহেব, গরীব বলে অবহেলা করলে চলবে না। এটুকু আপনাকে নিতেই হবে।’

আচুংবা চলে গেল।

ঘরে এসে মুহিমংকে বললাম, ‘আজ তোমার ছুটি। তুই আজ বস্তিতে যা এবং যাওয়ার সময় ঐ তুড়িটা নিতে তুলিসনি যেন।’



# ছেলেদের মাতৃভাড়া

## মেক্সিকোর রূপকথা

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

বহুদিন আগের কথা—মেক্সিকো দেশের একটি বড় গ্রামে এক বনী-চাষী বাস করত। তার বহু ভাই ও চাষবাস ছিল। যদিও তার অবস্থা খুবই সম্ভল ও নিজেদের বেশ কাজ করতে হতো না তবুও সে গম কাটার সময় ক্ষেতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বোদে দাঁড়িয়ে লোক-জনের তদারক করত।

নূতন গমের আটা দিয়ে নানা রকমের সুস্বাদু খাবার রান্না হয় মেক্সিকো দেশে। এই ক্ষুদ্র চাষী নিজে গম পিষার সময় যথাস্থানে দাঁড়িয়ে দেখত কতটা আটা জমা হচ্ছে। একদিন তার মনে হলো যে আটার পরিমাণ খুবই কম। নিশ্চয় ক্ষেতে চোর চুকেছে। এরপর থেকে জমশঃ গমের পরিমাণও কমতে শুরু করল। চাষী মহাভাবনার দিন কাটাতে লাগল। শেষে একদিন বাড়ী গিয়ে ছেলেদের ডেকে এই বিষয় পরামর্শ করতে বসল।

চাষীর তিন ছেলে। বড়টি অতি কুঁড়ে, মেঝোটির অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না, আর ছোটটি অতি ধীর শান্ত। চাষী তিনজনকে ডেকে বল্লো—দেখ, ক্ষেতে চোর চুকেছে; যোজ রাত্রে গম ও আটা চুরি হচ্ছে। তোমাদের মধ্যে যে চোর ধরতে পারবে তাকে আমার সব সম্পত্তি দান করব। বাপের কথা শুনে বড় ছেলে পরদিন চোর ধরতে যাবে ঠিক করল।

আরেকটা মাহু, সন্ধ্যার আগে তার ঘুম ভাঙে না কোন দিন। সেদিনও সেই সময় উঠে, কাঁধে বন্দুক তুলে, মাথায় টুপি পরে, মাংস পরটাগুলি একটি পাত্রে ভরে নিয়ে সে বাড়ী থেকে আস্তে আস্তে রওনা হলো। ঘুমে চোখ তার ভরা, হোঁচট খেতে খেতে সে ক্ষেতের দিকে এগোতে লাগল। প্রচণ্ড হাই তুলতে তুলতে যাচ্ছে এমন সময় সামনেই একটা কুয়ো দেখে সে ঠিক করল যে এইখানেই সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে। টুপিটা ভাল করে বুকের উপর চাপা দিয়ে সে কুয়োর পাড়ে হেলান দিয়ে বসে মাত্রই সেখানে ঘুমিয়ে পড়ল। নিশ্চয় রাত্রি তার নাসিকা-ধ্বনিতে চঞ্চল হয়ে উঠল।

হঠাৎ একটা কর্কশ ভালা গলার আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেল। চমকে উঠে চোখ খুলতেই সে দেখল যে, একটা কুৎসিত কোলা ব্যাঙ, পাশে বসে কথা বলে চলেছে।

ব্যাঙটা বলছে—শুধু হে, আমাকে ক্ষেতে নিয়ে চলো—আমি তোমার চোর ধরে দেবো।”

চাষীর ছেলে ছেলে বল্লো, আরে, তুমি আমাকে কি সাহায্য করবে? বাও, বাও কুয়োর ভিতর কিরে বাও। এই বলে সে ব্যাঙটাকে তুলে কুয়োর মধ্যে কেলে দিলো। আর কিছুদূর সে ক্ষেতের দিকে হেঁটে চল্লো

ও সেখানে পৌঁছবা মাত্র শুইয়ে বসে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুতেই আর সে জেগে থাকতে পারল না।

বোদের আলোর যখন তার আবার ঘুম ভাঙ্গল, তখন সে দেখল যে সমস্ত গমগুলি কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে। তারপর আর কি করে? বাড়ী কিরে তার বাপ ও ভাইদের বলতে হলো যে সে চোর ধরতে পারেনি।

এবার মেকো ছেলের চোর ধরবার পালা। পরদিন রাতে সে কাঁধে বন্দুক ফেলে হাতে ডবকারি পরটাগুলি বেঁধে নিয়ে চোর ধরতে বেরল। সঙ্গে তার জল খাবার একটি ভাঁড়। কুয়োর কাছে পৌঁছেই সে ভাঁড় ভরে জল খাবার ব্যবস্থা করল। কুয়োর থেকে জল তুলতে যাবে এমন সময় ব্যাঙটাকে দেখতে পেলো।

সেটা বল্লো—“আমাকে ক্ষেতে নিয়ে চল। আমি তোমার চোর ধরে দেব। এরপর সে ভাঙ্গা গলায় গান গাইতে শুরু করল। এই বিকট আওয়াজে মেক ছেলের হাত থেকে ভাঁড়টা কুয়োর ভিতর পড়ে গিয়ে ও সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল। হতভাগা, বেআকসে আপদ কোথাকার। গান করবার আর সময় পেলো না, একপাি চৈচামেচি থামাও বলছি,” বলে সে চিৎকার করে উঠল ও নিজের মনে বিড়ি বিড়ি করতে করতে ক্ষেতের দিকে এগিয়ে চল্লো।

ক্ষেতের কোণে লুকিয়ে বসে সে বন্দুক উঁচিয়ে চোর ধরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। হঠাৎ একটা মর্শ্বর ধনি শুনে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল যে একটি অপূর্ণ হুল্লরী পাখী উড়ে এসে ক্ষেতের দিকে নামছে। তার রংবেরংএর পালকগুলি আকাশের গায়ে যেন বলক দিচ্ছে। চাষীর ছেলে ভাবল—“এই নিশ্চয় চোর।” তাড়াতাড়ি বন্দুক তুলে সে পাখীটার গায়ে গুলি চালিয়ে দিল, কিন্তু গোটাকতক পালক মাত্র ঝরে পড়ল। পাখীটা ভীক হয়ে চিৎকার করে ডানা মেলে উড়ে গেল। চাষীর ছেলে বহুক্ষণ ক্ষেতে বসে রইল তার অপেক্ষায়, কিন্তু পাখীটা আর কিরে এলো না। তখন হতাশ হয়ে সেও বাড়ী কিরে গিয়ে বাপকে বল্লো যে সেও চোর ধরতে পারেনি।

ছোট ছেলের কথা সকলে তুলেই গিয়েছিল। যখন মেকোভাই বিকল হয়ে বাড়ী কিরে এলো তখন ছোট ভাই ঠিক করল যে পরদিন সে চোর ধরতে যাবে।

বড়ভাই তার এই কথা শুনে হাসতে লাগল; কিন্তু মেজটি রেগে বল্লো, তোমার তো কম আশঙ্কা নয়। আমি চোর ধরতে পারলাম না আর তুমি পারবে?”

চাষী এদের কথাবার্তা শুনে হেসে বল্লো—“ঠিক আছে—সবাই চেষ্টা করছে চোর ধরতে; তুমিও আজ রাতে চেষ্টা করো।”

তৃতীয় রাতে ছোট ছেলে বন্দুক হাতে বাড়ী থেকে বেরোল। তার হাতে একটি পাত্রে কতগুলি ওকনো কুটি। এইগুলি থাকে বলে সে কুয়োর ধারে এসে বসেছে এমন সময় একটা ব্যাঙ ডাকার আওয়াজ শুনে পেলো। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলো যে একটা মোটা কোলা ব্যাঙ সেখানে বসে আছে। নিচু হয়ে ব্যাঙটাকে হাতে তুলে নিয়ে সে বল্লো, “এই যে বন্ধু, তুমি কুটি থাকে? এই নাও, এগুলি বেশ সুচ সুচে।”

ব্যাঙটি ওর কুটিতে ভাগ্য বসাল। খাওয়া হয়ে যাবার পর সে বল্লো, “আমাকে ক্ষেতে নিয়ে চলো, আমি তোমাকে চোর ধরতে সাহায্য করব।”

“ভাই নাকি? তা হলে তোমাকে নিশ্চয় সঙ্গে নিয়ে যাব” বলে চাষীর ছেলে ব্যাঙটাকে হাতে তুলে নিল। ব্যাঙ তখন বল্লো, “তোমাকে একটা কাজ করতে হবে—ওই কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে পাখরগুলি জলের ভিতর ফেলতে থাক, তারপর মনে মনে বা চাও ভা বলতে থাকবে। এইগুলি তুমি নিশ্চয় পাবে।”

চাষীর ছেলে খুব উৎসুক হয়ে উঠল এইসব শুনে। ব্যাঙ বা বলেছে সে তাই করল। কুয়োর পাড়ে গিয়ে সে জলের ভিতর পাখরগুলি ছুঁড়ে ফেলতে লাগল আর বল্লো—“আমি যেন চোরটাকে আজ ধরতে পারি—আর আমার যেন খুব সুন্দর বউ আসে যবে আর যেন আমি বাপের বাড়ীর থেকেও ভাল বাড়ীতে থাকতে পাই।—”

কিছুক্ষণ পর ব্যাঙটাকে তুলে নিয়ে সে ক্ষেতের

দিকে রওনা হলো। ক্ষেতে পৌঁছে গমের গাঁহগুলির মধ্যে লুকিয়ে যেই বলেছে, অমনি উপর থেকে পাখী ওড়ার আওয়াজ তারা পেলো। উপরে ডাকিয়ে দেখল যে একটি অপূর্ণ হুন্দর পাখী গমের শীর্ষগুলি খাচ্ছে। পাখীটাকে ডাক করে যেই না চাষীর হেলে বন্দুক তুলে গুলি করতে গেছে অমনি ব্যাঙটা কর্কশ স্বরে চিৎকার করে উঠল, “মেরো না বন্ধু, ওকে মেরো না। ও তোমার আঁতি প্রিয়জন।”

চাষীর হেলে আকর্ষণ হয়ে যেই না বন্দুক নামিয়েছে অমনি পাখীটা উড়ে এসে তাদের কাছে বসল। এরপর আঁতি মধুর গান গেয়ে সে তাদের বুঝিয়ে দিল যে সে আসলে পাখী নয়। তাকে এক যাত্রীর পাখীর রূপে পরিবর্তিত করেছে—আসলে সে এক রাজকন্যা। যোজ রায়ে সেই গমের ক্ষেতে এসে গম খেয়েছে কারণ তার অন্ত খাবার আর কিছু জোটে নি।

ব্যাঙটা আর থাকতে না পেয়ে সেই কর্কশ স্বরে গান ধরল। বুক ফুলিয়ে বিকট আওয়াজ করে সে যেই না গান গাইতে শুরু করল সেই মুহূর্তে পাখীটার গায়ের পালকগুলি ঝরতে লাগল ও কিছুক্ষণ পরে সে একটি পরমা হুন্দরীর রূপ ধারণ করল।

ব্যাঙ তখন চাষীর হেলেকে বল্লো—“তুমি তো হুন্দরী বউ চেয়েছিল—এই হুন্দরী তোমার বউ হবে।”

হতভব হয়ে চাষীর হেলে তখন সেই মেয়েটির হাত ধরে বাড়ীর পথে রওনা হলো। কিন্তু পথে আরো একটি আকর্ষণ ব্যাপার হলো—বাড়ীর কাছে পৌঁছে সে দেখল যে তারে বাপের বাড়ীর নিকটে আর একটি চমৎকার বাড়ী কে যেন রাতারাতি তৈরি করে দিয়ে গেছে। ব্যাঙটা সেইটি দেখিয়ে বল্লো, “এই বাড়ীটি তোমার। এইখানে তোমরা বাস করবে।”

চাষীর হেলে দৌড় বাপের বাড়ীতে গিয়ে তাদের সকলকে নিয়ে এলো তার বউ দেখাতে ও সেই সময় তার বাপকে সব ঘটনাগুলি শোনাল।

বড় ভাই সব দেখে শুনে আপসোস করে বল্লো, “হার রে হায়। কি কৃষ্ণে ব্যাঙটাকে তখন ক্রোধে ফেলেছিলাম।”

নেজহেলে চিৎকার করে বল্লো, “হার রে হায়, কি কৃষ্ণে হতভাগ্য ব্যাঙটার গান তখন শুনি নি।”

কিন্তু চাষী ছোট হেলের সৌভাগ্য দেখে আঁতি আনন্দিত হলো, ও তাকেই কথামত নিজের সম্পত্তি সর্ব দান করে দিল। তারপর সেই হেলে, বউ ও ব্যাঙটা খুব সুখে নতুন বাড়ীতে বাস করতে লাগল।—



# সংসার

পাট বাঙালীর জীবনের অভিশাপ

“সুগবাকী” সাপ্তাহিক বলিতেছেন :

পশ্চিম বাংলা কেন্দ্রীয় সরকারের কলোনী একথা আমরা বলি না, কিন্তু পশ্চিম বাংলায় শোষণের মাত্রা যে দিনে দিনে গভীরতর হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকছেন একথা অস্বীকার করা চলে না। এই শোষণের অন্ততম শিকার পাটচাষীরা। পাট বাংলায় জন্মে, পাটকলগুলিও বাংলার, পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীর বড় বন্দর কলকাতা। সবাই জানে পাটজাত দ্রব্য থেকে ভারত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে। বাংলার পাট ভারতের কোষাগার সমৃদ্ধ করে, কিন্তু পাট থেকে বাঙালীর ক্ষতি হাড় লাভ নেই। পাটকলগুলির মালিকরা অবাঙালী, পাটকলের শ্রমিক ও কর্মচারীরা অবাঙালী; পাটদ্রব্য রপ্তানীজাত আয়ের কোন ভাগই বাঙালী পায় না। পাটের কারবারে একমাত্র যে বাঙালীরা জড়িত আছে তারা হল পাটচাষী। কিন্তু তারাই সবচেয়ে বঞ্চিত, শোষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত। তার কারণ পাট চাষের আয় লাভজনক নয়, লোকসানজনক। ধানের জমিতে ধান চাষের বদলে পাট চাষ করা হয়। সরকারের নির্দেশ ধানজমিকে পাটের জমিতে রূপান্তরিত করতে হবে। কারণ দেশ ভাগের আগে পাট চাষ হত পূর্ব বাংলায়। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে পাট চাষ না হলে পাটকলগুলি বন্ধ হয়ে যেত ও বিশ্বের বাজারে ভারতের এই পুরনো রপ্তানীদ্রব্য আর পাঠানো যেত না। তাতে ক্ষতি হত অবাঙালী পাটকল মালিক ও শ্রমিকদের এবং ভারত সরকারের তথা সারা দেশের। বাঙালীর কোন ক্ষতি হত না। বরং পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত ধানের জমিতে ধান কলাতে

পারলে এ রাজ্যে খাদ্যভাব দেখা দিত না। ভারত সরকারের নির্দেশেই দেশভাগের পর পশ্চিম বাংলায় পাট চাষ ব্যাপকভাবে শুরু করা হয়। খুবই দৃঃখের বিষয় বাঙালী চাষীর তাতে ক্ষতিই হয়ে আসছে। অমরাভাবে পাটচাষীরা জীর্ণ শীর্ণ হচ্ছে। সাধারণভাবে বাঙালীও খাদ্যভাবগ্রস্ত হচ্ছে—কারণ পাট জন্মাতো গিয়ে খাদ্য উৎপাদনে বাটতি পড়ছে।

পাটচাষীরা তাদের জমিতে ধান জন্মালে আজকাল বছরে দুটি তিনটি ফসল ফলাতে পারত। পাটচাষের জন্য জলা জমি চাই। সেই জমিতে বছরে দুই কিস্তি ধান অনায়াসে ফলানো যায়। তার ফলে চাষীদের সংসারের অন্ন বাঁধা থাকত এবং আজকাল খোলা বাজারে চালের মণ আশি টাকা হওয়ার তাদের ভালো আয়ও হত। সরকার যত চেষ্টাই করুন চালের বাজার দাম খুব বেণী কমবে না। সরকার নিজের রেশন দোকান মারফত অতি অখাদ্য পচা চাল ১০৪২ পরসী কে জি দরে বিক্রী করছেন। লোকে ঐ চাল পারলে হেড়েই দেয়। বাজারে তার চেয়ে ভালো সিদ্ধ চাল ১০৭৫ পরসায় পেলে লোকে খুশি মনে নেয়। ২ টাকা বা তদধিক দাম হলেও খোলা বাজারে চালের ক্ষেতাব অভাব হবে না। কান্দেই ধান চাষ আজকাল সত্যি লাভজনক। ধান চাষে ঘরের অন্ন সংস্থানের গ্যারান্টি থাকে ও ভালো দরে ধান চাল বিক্রয়ের বাজারের অভাব নেই। সে ক্ষেত্রে পাট চাষী পাচ্ছে কী ?...

পাট হয় মাস না বিক্রয় করে শুদামজাত রাখার সামর্থ্য তার নেই—কারণ হয় মাস পরিবারতক লোক না খেয়ে থাকতে পারে না। তাছাড়া আছে মহাজনের চাপ। চাষের

করতে বাধ্য পাটচাষী মহাজনের কাছে আরও ঋণগ্রস্ত হয়, সংসারে আরও অজাবত্যাগিত হয়, দারিদ্র্য তার বুকে আরও চেপে বসে। এই পাটচাষীটি কিন্তু বাঙালী। সে মরে। কিন্তু তার পরিশ্রমের ফসলে হুনাকার পাঁচাল জমায় বাজোরিয়ারদের মতো হাক-জুয়াচোর পাটকল মালিকরা ও তাদের এজেন্টরা। পাটকলের শ্রমিকরা সবাই অবাঙালী। তারা মাসে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা বাংলার বাইরে মণিঅর্জার করে পাঠায়। সেই টাকায় বিহারে, উত্তর প্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে তাদের পরিবার প্রতিপালিত হয়, সেখানে তারা জমি, গরু ইত্যাদি কেনে, তাদের ঘরে লক্ষ্মীর আসন পড়ে। ভারত সরকার পাট রপ্তানী থেকে বৈদেশিক মুদ্রা পেয়ে খুশি হন। সবাইই ঐক্যবদ্ধ ষটেছে—মরছে শুধু একজন, সে বাঙালী পাটচাষী।

পাট বাঙালীর জীবনে আজ অতিশাপ হয়ে আছে। শেষশ্বস্ত্র বাংলা গড়তে হলে পাটের দিকে গোড়াতেই আমাদের নজর দিতে হবে।

### চম্পে অভিযানের সার্থকতা

মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ বি কীটিং “আমেরিকান রিপোর্টারের” ১৭ইমে সংখ্যায় এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :

চাঁদে সার্বক অভিযান চালিয়ে অ্যাপোলো ১৬ ফিরে এসেছে আর সঙ্গে সঙ্গে এই প্রসঙ্গ উঠেছে : “মহাকাশ অভিযানের জন্য এই বিপুল অর্থব্যয় সার্থক কি ?”

এটা অবশ্যই সুতিসঙ্গত প্রশ্ন। আমি যখন যুক্ত রাষ্ট্রের সেনেটের সদস্য ছিলাম তখন এই প্রশ্নটি নিয়ে প্রতিদিনের বিচার বিবেচনা করছি এবং প্রতি বছর আমাদের মহাকাশ কর্মসূচীর ব্যয়বরাদ্দের বিষয়ে ভোটও দিতে হয়েছে।

আমি হির করি যে ওই কর্মসূচী সমর্থন করব, এবং নীতির বিচারেই তা করছি। তখন পৃথিবীতে এমন অনেক সমস্যা ছিল যা আমাদের সমাধান করতে হবে, এবং এখনও তা আছে।

কিন্তু যখনই বিষয়টি বিবেচনা করছি তখন

প্রতিবারই এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে মানুষকে চাঁদে অবতরণ করানোর এই কর্মসূচী আমাদের চালিয়ে যাওয়া উচিত।

এখানে চাঁদে উপনীত হবার ক্ষেত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নকে হারাবার প্রশ্ন ছিল না, আমার মূল্যবোধে বিষয়টি ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইচ্ছিত স্থিতির চাইতে অনেক বড় কিছু। প্রশ্নটি নেহাতই আমাদের সীমিত সম্পদকে ও পার্শ্ববর্তী প্রকল্পগুলিকে উপেক্ষা করে সারিয়ে নিয়ে মহাকাশ কর্মসূচীতে বরাদ্দ করার ছিল না।

মানুষকে শেষ পর্যন্ত চাঁদে পৌঁছে দেবার এই কর্মসূচীতে এক দশকে সাকুল্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৫০ কোটি ডলার (১৮, ২০০ কোটি টাকা)। বর্তমানে যুক্ত রাষ্ট্রের বার্ষিক সামগ্রিক জাতীয় আয় ১০০০০ কোটি ডলার (৭২৮,০০০ কোটি টাকা)। ওই বিচারে ওই অর্থের সামান্যই বলা চলে।

আজ আমি মনে করছি এই অর্থব্যয় শুধু সুতিসঙ্গত হয় নি, এতে যে পার্শ্ববর্তী কল্যাণ হয়েছে বা হবে তা মোট ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশি—কিন্তু সেদিন আমার মূল্যবোধে এই লাভ-খরচের হিসাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ওই সুতি ছিল আরও গভীরে নিহিত।

উদাহরণ স্বরূপ, এই মহাকাশ কর্মসূচীর ফলে ভারতে প্রত্যক্ষভাবে অনেক উপকার হবে। তিনটি ক্ষেত্রে বেসরকারি বড় রকমের উপকার হবে বলে আমার মনে আসছে।

### আবহাওয়ার পূর্ণাভাস

মার্কিন মহাকাশ কর্মসূচী আবহাওয়ার পূর্ণাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে। যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া উপগ্রহগুলি থেকে ভারত বোঝেই আলোকচিত্র পাচ্ছে, এবং ঐগুলি ভারতের আবহাওয়াবিদদের দৈনন্দিন পূর্ণাভাস দান ও আসন্ন ঝড় বিষয়ে সতর্কবাণী প্রচারে সর্বশেষ সহায়ক হচ্ছে।

### পৃথিবীর সম্পদ

যন্ত্রকালের মধ্যেই আর্থ রিসোর্সেস্ অবজারভেশন সিস্টেম (পৃথিবীর সম্পদ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা) নামে একটি কর্মসূচী চালু হবে। ভারত এবং অপর ২০টি রাষ্ট্রের

সহযোগিতাক্রমে কৃত্রিম উপগ্রহ ভিত্তিক এই কর্মসূচীর মাধ্যমে স্প্রিট রাষ্ট্রগুলির উন্নয়নের জন্য কি নৈদর্শিক সম্পদ এই সকল দেশে আছে সুনির্দিষ্ট ভাবে সেগুলির অবস্থান নির্ণয় করা হবে।

### শিক্ষামূলক টেলিভিশন

কয়েক বৎসরের মধ্যে শিক্ষামূলক টেলিভিশনের ক্ষেত্রে একটি বড় রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হবে ভারতে। একটি মার্কিন যোগাযোগ রক্ষাকারী উপগ্রহের মাধ্যমে ভারত দেশের উত্তরাঞ্চলে বিকল্প ৫,০০০ গ্রামে টেলিভিশন, অহুষ্ঠান প্রচার করবে। ভারত সরকার উপগ্রহটি নিয়ন্ত্রণ করবেন, টেলিভিশন সেট প্রভৃতি সরঞ্জাম নির্মাণ করবেন, এবং সম্প্রচারের জন্য টেলিভিশন অহুষ্ঠানগুলি তৈরি করবেন।

সুনির্দিষ্ট এই প্রকল্পগুলি ছাড়া যারা বিশ্বের পক্ষে কল্যাণকর হবে এরূপ বিষয়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে— মনে হচ্ছে যেন এই হিতকর বিষয়ের কোন ইয়ত্তা নেই।

মহাকাশ কর্মকাণ্ডের সূত্রে ভেষজ, শিক্ষা, যোগাযোগ, প্রযুক্তিবিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি নানাক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং উন্নতিও হয়েছে। সুতরাষ্ট্রে বর্তমানে একদল মহাকাশ বিজ্ঞানী শহর উন্নয়নের সমস্ত নিরসনের জন্য “সিটেম্‌স ইঞ্জিনিয়ারিং” নামক পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন। এই প্রকৃতি সর্গপ্রথম কাজে লাগান হয় চন্দ্র সম্পর্কিত কর্মসূচীতে।

মহাকাশ কর্মসূচীর শুরু থেকেই সুতরাষ্ট্র সরকারের নীতি হল মহাকাশে দূর থেকে দূরান্তরে যাত্রার পথে যে জ্ঞানলাভ হবে এবং তা থেকে বাস্তব যে কল্যাণ বর্তাবে সকল জাতিতে সে সবার অংশভাগী করা। এই নীতি থেকে আমরা বিচ্যুত হইনি।

তবে, জ্ঞান অর্জন ও বাস্তব কল্যাণ ছাড়াও আমার মহাকাশ কর্মসূচী সমর্থনের পিছনে একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল। একে বলা যায় বিশ্বাস—অসম্ভবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাকে জয় করার যে প্রয়োজন আছে মানুষের সেই প্রয়োজন সম্পর্কে বিশ্বাস। এই মনোভাবকে আমল না দিলে মানুষের মধ্যে একটা কিছু

মুহূর্ত ঘটবে। আর এ হল এমন একটা গুণ যার পরিমাপ ডলারে বা টাকায় করা যায় না।

মনে পড়ে, চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম পদার্পণকারী মানবসন্তান নীল আর্মস্ট্রং তাঁর ঐতিহাসিক অভিযানের কয়েকমাস পরে বোম্বাই এসেছিলেন। তিনি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডাঃ বিক্রম সরাসাই এবং টাটা মৌল গবেষণা কেন্দ্রে তাঁর অধীনস্থ বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন।

আশ্চর্যের বিষয়, ডাঃ সরাসাই আর্মস্ট্রং-এর অভিযানের প্রযুক্তিবিজ্ঞানগত সিন্ধুর চাইতে ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি মহাকাশচারী আর্মস্ট্রং-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে লক্ষ্য সিদ্ধির ব্যাপারে তাঁর কখনও সন্দেহ হয়েছিল কি না।

নীল বলেছিলেন যে তাঁর কখনও সন্দেহ হয়নি। ডাঃ সরাসাইকে তিনি বলেন, “একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল আমাদের এবং অ্যাপোলো কর্মসূচীর সকল কর্মীই জানতেন সে লক্ষ্য যথার্থই কি। লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় সম্পর্কে মাঝে মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে আমাদের, তবে লক্ষ্য থেকে কখনও বিচ্যুত হইনি আমরা।”

আমি মনে করি সমস্ত সমাধানের ক্ষেত্রে চন্দ্র অভিযানগুলি এক বিরাট পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং গুণগুলির সার্থকতা থেকে অপ্রত্যক্ষ অপর এক কল্যাণ হয়েছে আমাদের; সপ্রমাণ হয়েছে : সকলে একসঙ্গে কাজ করলে কোন লক্ষ্য সিদ্ধিই সাধ্যাতীত নয়।

আজ যখন আমি ৫০ ও ৬০ দশকে আমার সেনেটে ভোটদানের কথা মনে করি, তখন অতীত বিচার করে উপলব্ধি হয় যে ঠিকই করেছিলাম আমি এবং যথার্থ স্মৃতিসজ্জত কাজই করেছি।

### কাছাড় রেলওয়ের অবস্থা

করিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত “যুগশক্তি” পত্রিকাতে কাছাড় পাহাড়ী অঞ্চলের রেলওয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা হইতেছে :—

হিংল সেকশনে বা কাছাড় জেলায় বাহাদুর ট্রেনে



যাতায়াত করিতে হয়, তাঁহারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন যে গোটা দেশের রেলওয়ে ব্যবহার সাহিত সামঞ্জস্যহীন এক হুমহাড়া রাজস্বে তাঁহারা বাস করিতেছেন। অত্যন্ত অকল হইতে যে সমস্ত যাত্রীবাহী কামরা বাতিল করা হইয়াছে, তাহাই এখানে ব্যবহার করা হয়। জল কিংবা আলোর ব্যবস্থা কামরাগুলিতে প্রায়শই থাকে না, এমন কি অভ্যুযোগ করা হইলে রেলের কারিগররা পর্য্যন্ত ঐ ব্যবস্থাগুলি চালু করিতে পারে না কারণ হুইচ, বাথ বা টেপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নষ্ট থাকে। হিল সেকশনে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা অতীব নিকট, যদিও উহার দাম একেবারে আকাশস্পর্শী। সবকিছু দেখিলে মনে হয়, রেল কর্তৃপক্ষ এই লাইনের যাত্রীসাধারণকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন, নিজেদের হাতে অণুমান দায় দায়িত্বের বামেলা রাখেন নাই।

কারিমগঞ্জের যাত্রীদের অবস্থা শোচনীয়। ভেলার বাইরে যাওয়ার কার্য্যভঃ একটি মাত্র ট্রেন তাহাদের জন্য আছে, কারণ শিলচর হইতে সকালে যে ট্রেনখানা তাহা ধরিতে হইলে বদরপুরে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হয়। ঐ একমোবাযিতীয় ট্রেনখানা ধর্ম্মনগর হইতেই যাত্রী বোঝাই হইয়া আসে, কারিমগঞ্জে আসিলে পর আর তিলধারণের জায়গা থাকে না। আগে একখানা কামরা সরাসরি কারিমগঞ্জ হইতে বলাইগাঁও অবধি যাইত, এখন কোন অজ্ঞাত কারণে তাহাও তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সীটিং কিংবা স্লিপিং রিকার্ভেশনের ভেতন কোন ব্যবস্থা নাই, কারিমগঞ্জ হইতে বাঁহারা কালিকাতা যাইবেন, তাঁহাদের জন্য একটি মাত্র আসন বরাদ্দ আছে। সবচাইতে বড় কথা, কারিমগঞ্জ, বদরপুর বা শিলচর হইতে রিকার্ভেশন বা দূরপাল্লার সময় তালিকা সম্পর্কে কোনও সংবাদ সংগ্রহ করা বাঁতমত হুঃসাধ্য ব্যাপার।

কাছাড়ের এম. পি. বা কেউ কেউ রেলওয়ের বিভিন্ন কমিটিতে আছেন, অন্যান্য প্রতিনিধিও হুই-একজন আছেন, তাঁহারা সন্মিলিতভাবে চেষ্টা করিয়া যদি কাছাড়ের রেলযাত্রীদের এই সমস্ত দুর্ভোগের কিছুটা অন্ততঃ অবসান ঘটাইতে পারেন, তবে জনসাধারণ কৃতজ্ঞ বোধ করিবে।

### বুটেনের বাসস্থান-ব্যবস্থা

বুটেনে এক কোটি বিরানন্দই লক্ষ গৃহ আছে। ঐ দেশের জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। অর্থাৎ বুটেনে প্রতি তিনজন মানুষের বাসের জন্য একটা করিয়া গৃহ আছে। উপরোক্ত এক কোটি বিরানন্দই লক্ষ গৃহের মধ্যে অর্ধেক-গুলিতেই গৃহের মালিক বাস করেন। শতকরা ৩০টি গৃহ স্থানীয় কোন জনসাধারণের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি ও তাহাদের নিকট হইতে ভাড়ার লওয়া হইয়াছে। বুটেনে এই জাতীয় গৃহ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ১৬০০। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে নির্মিত গৃহও অনেক আছে। ১১৭০ গৃহঅঙ্কে ৪৬২০০০ নুতন গৃহ নির্মিত হয় এবং এইগুলির মধ্যে অর্ধেকের অধিক গৃহ নির্মাণ করা হইয়াছিল গৃহ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সমূহ। বাঁহারা নির্মিত গৃহ ক্রয় করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই গৃহের মূল্য দিবার জন্য ত্রিশ বৎসরাধিক কাল সময় গ্রহণ করেন।

ইহাঙ্গিরের মধ্যে অনেকে পেনশন ভোগী। গৃহ-মূল্য বুটেনে ভারতের সহরের তুলনায় খুব অধিক বলিয়া মনে হয় না। প্রায় এক হাজার বর্গ ফুট মাপের সুগঠিত, জল, নালা, বিদ্যুৎ প্রভৃতির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গৃহের জন্য খরচ হয় ৩৩৮৪ পাউণ্ড, অর্থাৎ ৬০১১২ টাকা। এইরূপ গৃহ নির্মাণ করিয়া নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলি ভাড়া দেন মাসিক প্রায় ১৮০ টাকাত (ইংলণ্ডে)। এই ভাড়া স্কটল্যাণ্ডে হয় মাত্র ১০০ টাকা মাসিক। বাড়ীগুলিতে মাঝারি আকারের পরিবার, ৫১৬ জন মানুষ, আরামে বাস করিতে পারেন। যে সকল অর্থসাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান কিস্তিতে বাড়ী কেনার সাহায্য করেন তাঁহারা সচরাচর পূর্ণ মূল্যের শতকরা ৮০ হইতে ১০ ভাগ টাকা ঋণ হিসাবে দিয়া থাকেন। এই ঋণ ৩০১০১ বৎসর পর্য্যন্ত রাখা চলে এবং শোধের ব্যবস্থা এইরূপ করা হয় যাহাতে কোন ঋণগ্রাহককেই নিজ মাসিক আয়ের এক-চতুর্থাংশের অধিক শোধের কিস্তি হিসাবে কখনও দিতে হয় না। অর্থাৎ ৬০০০০ হাজার টাকা মূল্যের গৃহ ক্রয় করিলে ক্রেতাকে ৬০০০০১২০০০ টাকা মাত্র দিয়া গৃহ লইতে হয়। তৎপরে ঋণের টাকা শোধ করিবার জন্য ঋণ ও আসলের জন্য মোট মাসিক ৫০০ শত টাকা অবধি দিতে হইতে পারে। বুটেনের রাজস্বের পরিমাণ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই মাসিক ২০০০ হাজার টাকার অধিক। সুতরাং ঋণ কিস্তি দিতে তদ্বদেশের মানুষ সহজেই পারে বলিয়া মনে হয়।

# সাময়িকী

## আমেরিকার নূতন ভোটদাতা

জুলাই ১৯১১ খ্রঃ অব্দ হইতে আমেরিকার ভোটদাতা দিগের বয়স আইন ১৮ বৎসর করা হইয়াছে। ইহার ফলে আগামী নভেম্বর মাসে যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হইবে তাহাতে এক কোটি এক লক্ষের অধিক নূতন ভোটদাতা ভোট দিতে সক্ষম হইবেন। এই সকল নূতন ভোটদাতাদিগের মধ্যে অনেকেই এখন কলেজে পাঠ করিতেছেন। যদিও বয়স বিচারে মনে করা হইতে পারে যে ইহারা অপরিণত-বুদ্ধি; কিন্তু জ্ঞান ও শিক্ষার হিসাবে এই সকল নব্য ভোটদাতাগণ পরিণত বয়স্ক আমেরিকানদিগের তুলনায় কিছুমাত্র ওজন করিয়া ও বুঝিয়া ভোট দিতে অপারগ নহেন।

## রেলগাড়ীতে যাত্রীদিগের জন্ত খাওয়ার ব্যবস্থা

ইংরেজদিগের শাসন কালে বহু ইংরেজ ব্যবসাদারও রাজকর্মচারী রেলগাড়ীতে যাতায়াত করিতেন বলিয়াই হটক অথবা অন্ত কারণেই হটক, রেলগাড়ীতে যাত্রীদিগের খাওয়ার ব্যবস্থা উদ্ভব হইল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সরেশ মাল মশলা ব্যবহার, রন্ধনবিদ্যা প্রভৃতি সকল দিক দিয়াই যাত্রীদিগের আহারের ব্যবস্থা সর্বোৎকৃষ্ট হইল বলিয়াই সকলে মনে করেন। ইংরেজ রাজত্বের অবসান হইলে পরে রেলপথের পরিচালনা পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় হইয়া যায় ও পুরাতন খাতিসরবরাহ ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া নূতন নূতন লোকের উপর ঐ কার্যভার অর্পণ করা হয়। এই ব্যক্তিগণ ভাল ভাবেই কাজ চালাইত; যদিও ঠিক পূর্বের মত হইত না। এই সকল খাতিসরবরাহকারীদিগের

এই কার্যে যথেষ্ট লাভ হইত ও তাহা দেখিয়া রাষ্ট্র-ক্ষেত্রের বহু নায়কের প্রাণে বেদনার সঞ্চার হয়। কারণ, কাহারও যদি লাভ হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রনেতাদিগের মতে শুধু এই কথাই প্রমাণ হয় যে, জনসাধারণকে শোষণ করা হইতেছে। শুধু রাষ্ট্রনেতাদিগের জীবনযাত্রা যদি ব্যয়-বহুলভাবে আরামদায়ক করা হয় তাহাতে সেকথা উঠে না। তাঁহারা বাড়ী, গাড়ী, বিহুয়া, টেলিফোন, ভ্রমণসুবিধা ইত্যাদি পাইলে তৎক্ষণাৎ যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা সাধারণের নিকট হইতে আদায় করা হইলেও শোষণ নহে, কারণ রাষ্ট্রনেতাগণ সাধারণের সেবাসেই সঙ্গা নিযুক্ত, নিজ লাভের জন্ত তাঁহারা কোন চেষ্টাই করেন না। তাঁহাদের আত্মীয়কুটুম্বগণ যদি লাভের কার্যে লাগিয়া যান তাহা হইলে তাঁহারা নিজস্বগণেই সেই লাভ করিয়া থাকেন; রাষ্ট্রনেতাদিগের কোনও পক্ষপাত জনিত চেষ্টার ফলে নহে। যাহাই হউক, রাষ্ট্রনেতাগণ রেলপথে খাতিসরবরাহ কার্যে এতই খরচ করিলেন যে তাঁহাদের হুঁসি হইয়া গেল। খাতিসের অবস্থাও বিশেষ নিকটরূপ ধারণ করিল। সুতরাং বর্তমান রেল-মন্ত্রী শ্রীহরমজীইয়া পুনর্বার ঠিকাদার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিলেন ও হুঁসিয়া চবিয়া এমন সকল ঠিকাদার আবিষ্কার করিলেন, যাহার কোনও তুলনা হয় না। এখন রেলপথে যাহারা খাতিসরবরাহ করিতেছে তাহারা সকল দিক দিয়াই অযোগ্য ও কার্য-ক্ষমতাহীন। যেমন অপরিষ্কার ও অখাদ্য বস্তু সরবরাহ করা হয় তেমনি কর্মীদিগের চালচলন বস্ত্র ও ব্যবহার। মূল্য বিচার করিলে মনে হয় যে এক টাকার খাতিস চার টাকার বিক্রয় করিবার এ ব্যবস্থা যদি শোষণ না হয়

তাহা হইলে শ্রীহুমতাইরা শোষণ বলিতে কি বুঝেন? এবং তিনি যেহেতু সর্ববিভাবিশারদ সেহলে তিনি খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কেন? মোট-বাহক কুলি ও খাদ্য পরিবেশক ভৃত্যের পার্শ্বক্য কি তিনি বুঝেন না? কর্তৃমাস্ত বাসন ও আলকাতরা-বর্ণের চা যে খাতের টেবিলের অঙ্গুপবৃত্ত তাহা কি তাঁহাকে শিখাইতে হইবে? উত্তর ভারতের মাহুর যে লক্ষা ও লাউ একত্রে সিদ্ধ করিলে তাহা খাইয়া তৃপ্তলাভ করে না, তিনি কি তাহা জানেন না? দক্ষিণ ভারতের রন্ধন ব্যবস্থা অল্প প্রকার হইলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আদর্শে সেদেশে আমরা কোনও পার্শ্বক্য কখন লক্ষ্য করি নাই। আর একটা কথা হইল সময়ের কথা। যথাক্রমে-ভোজন ব্যবস্থা যদি ৩টার সময় হয় এবং রাত্রেই আহার গাড়ী কাটিবার অজুহাতে যদি ৬। টার সময় পরিবেশন করা হয় তাহাও অব্যবহার্য কথা। গাড়ী যদি সঙ্গে সঙ্গে যাইতে পারে তাহা হইলে সেই গাড়ী হইতে খাদ্য দিবার ব্যবস্থাও যথাযথরূপ হওয়া উচিত। করিডর নাই। মাঝখানে মালবাহী গাড়ী আছে ইত্যাদি বলিলে তাহাতে শুধু রেল-কর্মচারীদের অক্ষমতাই প্রমাণ হয়। সকল ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, দক্ষিণ ভারতের কর্মশক্তি ও প্রতিভা আমরা যতটা অসীম ও সর্বব্যাপ্ত মনে করিতে ইচ্ছা করি কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাহা ততটা সর্বদোষবৃত্ত নহে। শ্রীহুমতাইরা অন্ততঃ দক্ষিণ ভারতের কর্ম পরিচালনা প্রেরণার প্রভীক নহেন। তিনি যদি অপরের ধোম খুঁজিয়া না বেড়াইয়া নিজের কর্মসাকল্যে অধিকতবে আত্মনিয়োগ করিতেন তাহা হইলে হয়ত তাহাযারা দেশের কার্য আরও উত্তমরূপে হইতে পারিত।

তদা যার শ্রীহুমতাইরা ফরাক বাঁধের কার্যেও পূর্বে-কার কর্মচারী ও ঠিকাদারদিগকে অনেক হলে অপহৃত করিয়া নিজের অহুস্ত ব্যক্তিদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন ও তাহার ফলেই এখনও ফরাক হইতে কোনও জল ভাগাধাখীতে আসিতেছে না। এইসকল কর্মচারী ও ঠিকাদার কে এবং কি দেখিয়া শ্রীহুমতাইরা তাহা-

দিগকে ফরাকার পাঠাইয়াছিলেন। তাহা লোকসভার সভ্যদিগের দেখা কর্তব্য। ইহার মধ্যে যদি কোনও ভোষণ বা পোষণের কথা থাকে তাহা হইলে সে কথাও পূর্ণ আলোচনা প্রয়োজন। কারণ, শোষণ নিবারণ-রূপ আবশ্যক, অযোগ্য ব্যক্তির ছুটি অথবা পুষ্টি সাধনে বাধা দেওয়া তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজন।

ভ্রমণকারীদের ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধা

ভারতবর্ষে যাহারা বিদেশ হইতে ভ্রমণ করিতে আইসেন তাঁহাদিগের যাতায়াত, হোটেলের বাসের ব্যবস্থা প্রভৃতি যদি আরও অনেক সহজ ও সস্তা না করা হয় তাহা হইলে ভ্রমণকারীদের সংখ্যা হ্রাস হইবে বলিয়া মনে হয় না। দিল্লীতে বর্তমানে কোনও ভ্রমণকারীই দৈনিক দেড়শত টাকা ব্যয় না করিলে থাকিতে খাইতে সক্ষম হ'ন না। যাতায়াতের রেল-ভাড়াও অত্যধিক এবং যেদিন টিকিট চাওয়া হয় তাহার তিনদিন পরে টিকিট পাইলে তাহা পরম সৌভাগ্যের কথা বলিয়া মনে করা হয়। সাধারণ ট্যাক্সীতে ভ্রমণ করিলে ৫০।১০০ টাকা খরচ হয়। সুতরাং কেহ যদি দিল্লীতে তিনচার দিন ভ্রমণ করিতে থাকিয়া যান তাহা হইলে তাঁহার মোট ব্যয় দৈনিক ২০০।২৫০ টাকা হয়। তৎপরে যদি কেহ নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ৫০০০ হাজার মাইল রেলপথে গমনাগমন করেন তাহাতেও রেলভাড়া প্রভৃতি ১৫০০।২০০০ টাকা হয়। অর্থাৎ কেহ যদি শত দিবস ভারতভ্রমণ করেন তাঁহার ব্যয় হইবে ২০০০ হাজার টাকা। ইহার উপর শ্রীহুমতাইয়ার অক্ষমতার জন্ত রেলপথে যাহা তাহা খাইয়া যদি কাহারও অস্থখ হইয়া যায় তাহার জন্তও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। রেলগাড়ীতে হানাতাব হইয়া কোথাও কোথাও বসিয়া থাকিয়া ব্যয়বৃদ্ধির সভাবনাও থাকিবে বলিয়া ধরিতে হইবে। ভ্রমণকারীদের সুযোগ-সুবিধা যথাযথরূপ না করিলে তাঁহারা বহুসংখ্যক ভারতভ্রমণে আসিবেন বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ ব্যবহার জন্ত প্রয়োজন দৈনিক অনধিক ৭৫ টাকার সর্বজন পুরা থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা; ট্যাক্সীভাড়ার দৈনিক হার অনধিক ৫০ টাকা বাঁধিয়া

দেওয়া এবং রেলপথে ঠাণ্ডা গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও ভাড়া কম করা। এইরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাহাতে এখনকার হিসাবে অর্ধেক খরচে সকলে ভারতভ্রমণ করিতে পারেন। রেলপথে খাদ্য সরবরাহ পরিষ্কার ও সুবাহু করা আবশ্যিক। ইহার জন্য যে সকল ঠিকাদার নিযুক্ত করা হইবে তাহাদিগের নিকট অভিযোগ-পুস্তক থাকিবে এবং সকল যাত্রীদিগের মতামত সেই পুস্তকে লিখিবার ব্যবস্থা যাহাতে করা হয় তাহা দেখিতে হইবে। আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। পূর্বে রেলপথে সর্বত্রই ঠাণ্ডা সোডা লেমনেড প্রভৃতি পাওয়া যাইত। সম্ভ্রান্তি দেখা গিয়াছে যে, রেলপথে শুণ্য কোকা কোলা ব্যতীত অপর কোন পানীয় বিক্রয় করা হয় না। কোকা কোলা বহুলোকই পান করেন না। কর্তৃপক্ষ কি কারণে কোকা কোলা বিক্রয়ার্থে যাত্রীদিগের অসুবিধা সৃষ্টি করিতেছেন তাহা জানিতে পারিলে রেলের মালিক-দিগের সম্বন্ধে যাত্রীদিগের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে পারে। ইহার মধ্যে যদি কোন পক্ষপাতের কথা থাকে তাহার উচ্ছেদ আবশ্যিক।

### কালাপাহাড়ী বর্ষরতা

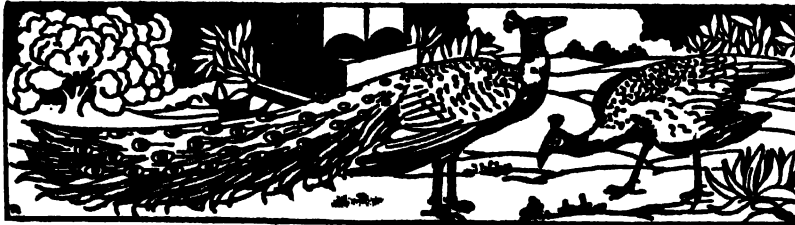
ভারতবর্ষের ইতিহাসে ধর্ম ও কৃষ্টি-বিধ্বংসী বর্ষরতার জন্য যে সকল মানুষ অখ্যাতি ও অশেষের নিয়তম স্তরে স্থাপিত হইয়াছেন, কালাপাহাড়ের নাম তাঁহাদিগের সকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষে উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণগণ্ডান ছিলেন এবং ধর্ম পরিবর্তন করিয়া মুসলমান হইয়া ইনি সকল ভাবে হিন্দুধর্মের সর্বনাশ সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মুসলমান রণাতিথিগের দ্বারা ইনি সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হন ও পরে ইনি শত শত মন্দির ও দেবমূর্তি ভাঙ্গিয়া নিজের হিন্দুধর্ম-বিষয়ে একটভাবে ব্যক্ত করেন। কালাপাহাড় নামটাই পরে সামাজিক সংস্কার ও বিশ্বাস-বিক্রমতার সহিত সমার্থক বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। বাহা কিছু সর্বজনস্বীকৃত ও জনমানসে সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে তাহাকে মূখ্য ও বর্জনীয় প্রমাণ। চেষ্টাকে কালাপাহাড়ী বর্ষরতার পরিচায়ক বলিয়া বলা হইয়া থাকে। কাল-

পাহাড় সংস্কার বিচার অথবা সমালোচনার বিষয় করিতে নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল শাবল, গাঁইখি ও হাতুড়ির উপর। তর্ক বা আলোচনার দ্বারা পরিবর্তন সাধন করিবার অধিকার সকলেরই আছে; কিন্তু যাহাদের আস্থা ভ্রাবিচারের উপর ভিত্তি নহে ও যাহারা পাশব শক্তি ব্যবহারের উপরেই নির্ভরশীল, তাহাদের পক্ষে কালাপাহাড়ের পথে চলাই সহজ ও সরল। মতানৈক্য সকল যুগেই থাকিয়াছে, বর্তমান কালেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। সভ্যতার পরিবর্তিত হইতে নানান মত থাকিলে হাতুড়ির ব্যবহারে সকল মতকে এক করিবার চেষ্টা করা হয় না; যেখানে সেইরূপ চেষ্টা হয় সেখানে সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত নাই বলিয়াই ধরা হয়। বর্তমান কালে নানা দেশে মতবিরোধের কারণে নানা প্রকার বন্দ হইতে দেখা যাইতেছে এবং সকল ক্ষেত্রেই যে সেই বন্দ অহিংস নীতি অনুসরণে চালিত হইতেছে এমন কথা বলা যায় না। বহু ক্ষেত্রেই হাতাহাতি, গুলি বন্দুক ও রক্তপাত হইতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু সকল যোদ্ধাদিগের মতেই তাঁহাদের যুদ্ধ সভ্যতার ও মানবীয় আদর্শবাদের সংস্কার ও প্রসারের জন্যই হইতেছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। যদিও যেহলে শান্তভাবে তর্ক আলোচনা না করিয়া শুধু লুণ্ঠন ব্যবহারেই নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে সেক্ষেত্রেও সভ্যতার গতি ও হ্রাস সুরক্ষিত থাকিতেছে এমন কথা মানিয়া লওয়া কঠিন ও কষ্টকর। সকলের মতেই অপর পক্ষ 'মুখ' এবং সেই কারণে 'মুখ' ল্যাঠোঁষম্ নীতি অনুসরণে পরস্পরকে শারোজ্য করিবার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা সর্বত্র লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ এই মূল্যায়ন কিছু ভুল নহে যদিও ঐক্যে বিশেষ কাজ হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।

রাষ্ট্রক্ষেত্রের মতবাদ পুরাকালের ধর্মমতবাদের সহিত তুলনীয় হইলেও ঠিক একভাবে রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীগুলিকে অহুপ্রেরণা দান করে না। কারণ, রাষ্ট্রীয় মতবাদ বর্তমানে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন অনুসারে অর্থ পরিবর্তন করিয়া থাকে। সেই হিসাবে প্রাচীন ধর্মমতের কঠিন অপরিবর্তনীয় কাঠামো আজকালকার রাষ্ট্রীয় মতবাদের

তিনতবে লক্ষিত হয় না। রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীগুলি মতবাদ অপেক্ষা নেতৃত্ববাহকেই অধিক নির্ভরশীল। নেতাদিগের সুবিধা, প্রয়োজন ও অবস্থা বুঝিয়া মতবাদের অর্থ-পরিবর্তন ঘটয়া থাকে এবং সেই কারণে রাষ্ট্রীয় দলগুলির মত মতবাদের খাতিরে হইতেছে বলা হইলেও বস্তুতঃ তাহা ব্যক্তিগত বিরোধের তাগিদেই চালিত হয়। স্মৃত-রাজ বহিও পরস্পরের মতামতের অসারতা প্রমাণ করিবার জন্য জাতির মানস ক্ষেত্রে বড় বহাইবার অভিনয় প্রায়ই করা হইয়া থাকে তথাপি বাস্তব নির্ণয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন মতবাদের কোনও বোধগম্য মূল্যায়ন প্রায় কখনই করিবার চেষ্টা হয় না। মনে হয় যেন চারিদিকে বিশ্বাস-বিশ্বাসী আক্রমণের ফলে প্রগাঢ় বিশ্বাসের অসংখ্য প্রকার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ও সেইসকল ধ্বংস হ্রুপের উপর নব নব মতবাদের বৃহৎ বৃহৎ দুর্গ নির্মিত হইতেছে, কিন্তু সত্যই কি সেইরূপ কিছু হইতেছে? কোনও মতবাদই কি মানব মনে সত্য সত্যই গভীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ও মতবাদ বিনাশ কার্যের তিতর কি আমরা প্রাচীন কালের মন্দির ভাঙ্গিবার মত কোন সতেজ আক্রমণ-শক্তি অথবা উৎকট আগ্রহ দেখিতে পাই? রাষ্ট্রক্ষেত্রে বহুব্যবহৃত “পালিসি” কথাটির কোন গভীর বিশ্বাসের ভিত্তি নাই। আছে শুধু ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত সুবিধার কথা, এইজন্য রাষ্ট্রক্ষেত্রে সকল

আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ ও অপপ্রচার প্রায় সর্বদাই পালিসির কারণে চালিত হয়, বিশ্বাস বা মানসিক নির্ভরের কথা লড়াই স্বগড়ার মূল অঙ্গসম্বন্ধে প্রয়োজন হয় না। আমেরিকার সহিত রুশিয়ার অথবা চীনের সহিত পার্শ্ববাসীদের মৈত্রী কিংবা ঐ-সকল জাতির অপর কোন শক্ততার মূলে যদিও রাষ্ট্রীয় আদর্শ বা মতবাদের কথা তোলা হয়, তাহা হইলেও বিষয়টা সত্য সত্যই মতলবের দাঁড়িপাল্লার ওজন করিয়া অস্বস্ত্য হয়। এক কথায় অন্তরের একান্ত বিশ্বাস অথবা কোন আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বর্তমানে রাষ্ট্রক্ষেত্রে মানসিক অবস্থার পরিচায়ক নহে। মতলব সিদ্ধি রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বড় কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মতবাদ বিনাশ, নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুরকালের ভাঙ্গন গঠনের কথা আজকাল আর চলে না। ধর্ম্মাঙ্কতা নাই কিন্তু জনসাধারণকে উন্মাদিয়া লড়াইবার জন্য একটা সাময়িক উত্তেজনায় সৃষ্টি করা এখনকার রাষ্ট্রীয় পালিসি বা মতলব সিদ্ধির পন্থা। আমরা মনে করিতে পারি যে রুশ, চীনা বা আমেরিকান কোনও কালাপাহাড় এমন একটা আলোড়নের সৃষ্টি করিবেন যে তাহার ফলে কোন কোন মতবাদ পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া নূতন আদর্শের স্থাপনা স্ফুট করিবে; কিন্তু তাহা হইতে পারিবে না এই কারণে যে, আদর্শ বা মতবাদ মতলব ও পালিসির নিকট সম্পূর্ণরূপে শক্তিশালী।



## দেশ-বিদেশের কথা

### রুশ আমেরিকার চূড়ান্ত বোঝাপড়া

আজকাল রাষ্ট্রক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মীমাংসামূলক কথাই প্রায় সহজ সরল আলোচনা বা সম্বন্ধ নির্ণয় বলিয়া প্রচারিত হয় না। সকল কথাই চরম, চূড়ান্ত বা শেষ কথা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে; কারণ এই যে সহজ সরল আলোচনা অথবা সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের আজকাল আর কোনও দাম নাই। সুতরাং আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিকসন যখন নানা দেশের সহিত আমেরিকার রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ পরিষ্কার করিয়া লইয়া অবশেষে মস্কোতে অবতরণ করিলেন তখন সকলেই মনে করিল যে এইবার চূড়ান্তের চূড়ান্ত ও চরমের চরম ঘটবেই ঘটবে। যাহা ঘটিল তাহাতে রুশিয়া, আমেরিকা অথবা বিশ্বের অগ্রগত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, অবস্থিতি বা পরিবর্তনের বিশেষ কোনও পরিবর্তন হইল বলিয়া মনে হয় না। রাষ্ট্রীয় ভিত্তির অদৃঢ়তা আরও জোরাল হইল অথবা শত্রুতা কিম্বা মিত্রতা নূতন উপায়ে সূচিকাক্ষা অথবা পুষ্টিলাভ করিয়া নব কলেবর প্রাপ্ত হইল এইরূপ কিছু হইবার লক্ষণ কেহ দেখিল বলিয়া মনে হয় না। ব্যাপারটা অনেকটা নির্বাচন কালের প্রতিক্রমণের মতই মনে হইয়াছিল, অর্থাৎ তাহার ভিত্তরে এমন কোনও সম্ভবস্তরূপ গ্রহণ করে নাই বাহা দ্বারা রাষ্ট্রক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নির্ণয়ন নূতন পথে চলিবে বলিয়া মনে হইবার কোন নূতন কারণ সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া বিচার করা যায়।

রুশ-আমেরিকা অথবা বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ন ক্ষেত্রে এই জাতীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্বগণের মেলামেশা ও আলাপ আলোচনা বহুবার হইয়াছে ও নানা প্রকার রীতিনীতির পুনর্নির্ধারণ চেষ্টাও বাড়ে বাড়ে করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে যে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নূতন পথে চলিয়াছে এমন মনে

করিবার কোনও নূতন লক্ষণ দেখা যায় নাই। এখন যাহা ঘটিল তাহার ফল হইে মহাজাতি নিজেদের সম্বন্ধ বিবরণের মূলনীতি দ্বাদশ শত্রে ব্যক্ত করিলেন। ঐ দ্বাদশ-শত্রে বিচার করিলে মনে হইতে পারে যে, সেইগুলির কোন কোনটি মূলনীতি বলিয়া বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থিত করার বিশেষ কোন কারণ ছিল না, কিন্তু বিশ্ববাসী নিক্সন বা ব্রেজ্নেভ যাহা বলিবেন তাহাই বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য এই ধারণাই এখন ছাপার অক্ষরে প্রবল শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যে দ্বাদশ শত্রে অল্পসংখ্যক এমন রুশ-আমেরিকান রাষ্ট্র-সম্বন্ধ পরিচালিত হইবে বলা হইয়াছে সেইগুলি হইল নিম্নলিখিতরূপ। (১) পরস্পরের অস্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। (২) সামরিক ভাবে পরস্পরের সহিত মোকাবিলা চেষ্টা অথবা পারমাণবিক যুদ্ধে কোনও মতেই প্রবৃত্ত না হওয়া। (৩) সর্বত্র এইরূপ অবস্থা সৃজন চেষ্টা যাহাতে সকল জাতি শান্তিতে ও নির্ভীকভাবে নিজ অধিকার বজায় রাখিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। (৪) সত্যতার সহিত সকল সন্ধির সকল সর্ব মানি রাখা। তাহা হইে জাতির ভিতর হউক বা বহু জাতির সম্বন্ধ লইয়াই হউক। (৫) পরস্পরের সম্বন্ধ লইয়া মধ্যে মধ্যে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার। (৬) সামরিক অস্ত্রশস্ত্র লাঘব ব্যবস্থা বিজাতীয় ভাবে করিবার ব্যবস্থা করা। (৭) অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক সম্বন্ধ দৃঢ়তর রূপে গঠন চেষ্টা এবং সামুদ্রিক ও আকাশ পথে বাতায়ানের উন্নততর ব্যবহার আয়োজন করা। (৮) বিজ্ঞান ও কার্যকর কলাকৌশল ব্যবহার ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত সহায়তা সংযোগ স্থাপন চেষ্টা। (৯) কৃষ্টির ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ গভীরতর ভাবে গঠন চেষ্টা ও পরস্পরের কৃষ্টির মূল্যায়নে ঘনিষ্ঠ উপলব্ধির আয়োজন করা। (১০) যুদ্ধ ভাবে এরূপ ব্যবস্থা করা যাহাতে উপরোক্ত সকল ক্ষেত্রের সকল ব্যবস্থা দীর্ঘ-

দ্বারা ও কার্যকর নিয়মানুবর্তিতাবে চলিতে পারে। (১১) বিশ্বরাষ্ট্র ক্ষেত্রে কাহারও কোনও বিশেষ দাবী বা অধিকার মানা হইবে না ও সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার অধিকার মানিয়া লইতে হইবে। এবং (১২) এই সকল ব্যবস্থা সম্বন্ধে পুরাতন সন্ধি ও অপরাপর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দায়িত্বসকল সংরক্ষিত থাকিবে ও তৎকাল দাবিদারগণের কোন পরিবর্তন হইবে না।

হুই জাতির পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার বিষয়ে এই নবরচিত দ্বাদশ শ্লোকের প্রভাব কতটা সক্রিয় হইবে তাহার আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সে প্রভাব বর্তমান অবস্থার কোন পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইবে না। কারণ যেসকল পুরাতন গোষ্ঠীগত দায়িত্ব স্বীকার করিয়া এখন আমেরিকান ও কম্যুনিষ্ট দলগুলি নানা ক্ষেত্রে সামরিক সাহায্য দানে নিযুক্ত আছে, বর্তমান দ্বাদশ শ্লোক তাহাতে কোনও পরিবর্তন আনয়ন করিতে পারিবে না। অর্থাৎ ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার বোমা বর্ষণ অথবা কশিয়ার বিমান ও কামান সরবরাহ এই দুইজন পরিবর্তিত হইতে কিছু যাত্র কম বেশী হইবে না। যেমন চলিতেছিল কম্যুনিষ্ট-অকম্যুনিষ্ট যুদ্ধ সেই ভাবেই রুশ-চীন ও আমেরিকান সমর্থিত ভাবে চলিতে থাকিবে। বিশ্ব মহাযুদ্ধ অথবা পারমাণবিক সংগ্রাম সভ্যতা এই দুইজন দ্বাদশ শ্লোক নীতির আবির্ভাবে কোনও ভাবে হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং রাষ্ট্রগতি নিকসনের কম্যুনিষ্ট ভ্রমণের ফলে বিশ্বশান্তি কিভাবে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে সে কথা উত্তরে বলিতেই হইবে যে বিশ্বশান্তি যেখানে ছিল সেইখানেই রহিয়াছে। নারায়ণী কাটাকাটি যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে থাকিবে এবং দলদলির প্রেরণা কোনভাবেই বিশ্ব মৈত্রীর হাওয়ার উড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ দেখা যাইতেছে না।

অবশ্য অনেকে মনে করেন যে, বাহিরের বাহা বলা হইতেছে আসলে ভিতরে ভিতরে কশিরা, চীন ও আমেরিকা তাহার উপরেও অস্ত্র কিছু গুপ্ত সর্ভে আবদ্ধ

হইয়াছে এবং সেই সর্ভগুলিই হইল আগল কথা। কিন্তু সেগুলি যতকাল অজানা থাকিবে ততদিন তাহার আলোচনা অর্থহীন।

### তুর্কীদিগের স্বাধীন রাষ্ট্র

১৯১২-২২ খৃঃ অব্দ তুরস্ক দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়। যেরাচাষী তুর্কী মুসলমানদিগের রাজশক্তির উচ্ছেদ করিয়া ঐ সময় মুতাকা কেমাল পাশা তুরস্কে স্বাধীন রাষ্ট্রের সংস্থাপন করেন। কেমাল পাশাকে ঐ ক্ষুদ্র আত্মতুর্ক নাম দেওয়া হইয়াছিল। তিনি যে শুধু মুসলমানদিগের রাজত্ব ভাঙ্গিয়া দিয়া আধুনিক কৈতোর সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার মহিমার একমাত্র পরিচয় নহে। তিনি ঐ সঙ্গে তুরস্কের জনসাধারণকে প্রাচীনতার গভীর অন্ধকার হইতে তুলিয়া আধুনিকতার আলোকময় শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। পুরাতন ধর্মাত্মতার অবসান করিয়া শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আগিল। প্রাচীন লাল টুপি উঠিয়া গিয়া তুর্কীদিগের মস্তকে যুরোপীয় হ্যাট শোভমান হইল। মুসলমান দরবেশ জাতীর মোজা-দিগকে বিতাড়িত করিয়া তুর্কীদিগকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও মুক্তি দেওয়া হইল। আইন পরিবর্তন করিয়া নানা বিষয়ে পুরাতন বর্ষরতার শেষ হইল; যথা বহু-বিবাহ নিবারণ। তুর্কী ভাষা পূর্বে আরবী অক্ষরে লিখিত হইত। তাহা বদলাইয়া এখন ল্যাটিন অক্ষর ব্যবহার আরম্ভ হইল। পুরাতন আভিজাত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট খেতাব প্রভৃতি তুলিয়া দেওয়া হইল এবং পুরাতন দোকান আলখান্না জাতীয় পোশাক ব্যবহার অচল করা হইল। ধর্মভিত্তিক আদালত ও বিচারব্যবস্থা রদ হইল ও ইসলাম আর অতঃপর রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইল না। শ্রীলোকদিগের অবরোধ প্রথা উঠাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে পুরুষের সহিত সমান অধিকার দান করিয়া নারী জাগরণের নুতন ব্যবস্থা করা হইল।

নুতন তুরস্ক মুতাকা কেমাল পাশার আদর্শে জাতীয় উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়া সে

প্রতিবেশ রক্ষা করিতে পারে নাই। কেমাল পাশার মৃত্যুর পর নানাক্ষেত্রে কিছু কিছু অধোগমন লক্ষিত হয়। জাতির একতা অরক্ষিত হইতেহেনা দেখিয়া নানা প্রকার চেষ্টা হয় যাহাতে জাতীয়তা বোধ কোনও ভাবে নষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকেই বাইতে থাকে। ২৭ মে ১৯৬০ খৃঃ অব্দে তুর্কী সেনা বাহিনী জেনারেল সেমাল গ্যুরসেলের অধিনায়কত্বে তুরস্কের ডিমক্রাটিক দল চালিত শাসনব্যবহার উচ্ছেদ করিয়া জাতীয় একতা সংঘের নির্দেশে শাসনভার সেনা বাহিনীর হস্তে তুলিয়া ল'ন। নাগরিকদিগের প্রতি-নিষিদ্ধ শাসন কার্য্য হইতে অপসৃত হ'ন ও তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন দলগুলি রাষ্ট্র কার্য্য হইতে সরিয়া যান। রাষ্ট্রীয় দলগুলি পুনর্বার নিজেদের কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন ১৯৬১ খৃঃ অব্দে। ১৯৬২ এ যে নির্বাচন হয় তাহাতে Justice Party ৭৫ জন সভ্যের মধ্যে ২৫৯টি আসন দখল করেন। Republican Peoples Party পান ১৪৪টি আসন। অপর ছয়টি দল মিলিতভাবে ৫০টি আসনও পান নাই। ১৯৬১ খৃঃ অব্দে তুরস্ক পুনর্বার শাসন ক্ষমতা সাময়িক হস্তে চলিয়া যায়। সেনাপতিগণ বলেন, রাষ্ট্রনেতাগণ শুধু বিভেদ সৃষ্টি করিতেই পারেন; এবং পারেন অরাজকতার বড় বহাইতে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রনেতা-দিগের দ্বারা কোনও উন্নতিকর কিছুই ঘটে না। সাময়িক নেতাগণ কিন্তু নিজেদের হস্তে শক্তি হ্রাস চেষ্টা করেন না। যথালীল সম্ভব তাঁহারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নাগরিক-দিগের হস্তে ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রনেতা-গণ অনেক সময় সেনাপতিদিগের সহায়তা বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে চাহেন না। ইহার জন্য সেনাপতিগণ বিশেষ দায়ী নহেন। তুরস্কের সেনাবাহিনীর রাজত্ব

চালাইবার ইচ্ছা বিশেষ নাই। তাহারা শুধু নিজ কার্য্য করিতেই ইচ্ছুক। অপরের বোকা ভুলে উঠাইতে বিশেষ আগ্রহ তাঁহাদিগের নাই।

#### চীনদেশে নেতৃত্ব-প্রতিদ্বন্দ্বিতা

নিক্সনের সহিত মূল্যাকাত হইবার পরে মাওসেতুসকে আর কোথাও কেহ দেখিতে পায় নাই বলিয়া একটা ওজবের সৃষ্টি হইয়াছে যে, চেয়ারম্যান মাও সম্ভবতঃ কোন কঠিন রোগের আক্রমণে অচল অবস্থায় আছেন কিবা তাঁহার মৃত্যুও হইয়া থাকিতে পারে। কথটা চাপা দিয়া রাখার কারণ চীন দেশে নেতৃত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রাবল্য। পূর্বকার দেশরক্ষা মন্ত্রী লিন পিয়াও কোথায় আছেন কেহ জানে না। তিনি হয়ত বাঁচিয়া নাই। হয়ত বা বন্দী হইয়া কোথাও আটক আছেন। অথবা লুকাইয়া কোথাও সুযোগের আপেক্ষাতেও গা ঢাকা দিয়া থাকিতে পারেন। যাহাই হউক, নেতৃত্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতার খেলার তাঁহারও অংশ গ্রহণের সম্ভাবনা আছে, একথা ভুলিলে চলে না। চু এন লাই, বয়স ৭৪ বৎসর ও মাওসেতুস-এর বর্তমানে দক্ষিণ হস্ত, তিনি নেতৃত্বভার লইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ও মাওসেতুসের উপস্থিতির অভাবে তাঁহাকেই অনেকে চেয়ারম্যানের আসনে বসাইবার চেষ্টা করিবে। আবার নানা স্থানে মাও বিরোধী চু এন লাই-এর অপসারণ-কামী ছোট বড় গণ্ডিও এখন বর্তমান আছে। এই সকল দলের মাহুস চু এন লাইকে উচ্চাসনে উঠিতে দিবে না বলিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। বিষয়টা সুভাষা খুব সহজ থাকিবে না—মাও যদি নিজ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত না থাকেন। নেতৃত্বের কলহ অবশ্যই আরম্ভ হইবে এবং হইলে তাহা প্রায় একটা মহা বিপ্লবের আকার গ্রহণ করিবে বলিয়াই বিশেষজ্ঞদিগের বিশ্বাস।



## ৩৬৮ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

করিবার আরোজন চলিতেছে। যথা, কাবেরীতে গঙ্গার জল ব্যবহার উঠাইয়া পাঠাইবার চেষ্টা। এই কাবেরী পরিকল্পনার জন্ত দায়ী কেন্দ্রের মন্ত্রী কে. এল. রাও। তিনি কোন্ অধিকারে গঙ্গার জল কাবেরীতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। গঙ্গার জল গঙ্গার প্রয়োজনে ব্যবহার করাই সর্বোপযোগী প্রয়োজন। যেখানে গঙ্গাভেদী (ভাগীরথী ও গঙ্গারই নাম) জলাভাব ও সেই জলাভাবহেতু গঙ্গাতীরনিবাসী মানুষের সর্বনাশ হইতে বাসিয়াছে, সেখানে গঙ্গার জল কোন্ নীতি অনুসরণে কাবেরীতে ঢালিবার আরোজন হইতেছে? এইরূপ ব্যবস্থা করিলে দক্ষিণ ভারতের মানুষের লাভ হইতে পারে কিম্বা দক্ষিণ ভারতের নষ্ট নহে। গঙ্গার উপকূলস্থ মানুষের দাবী আগে দেখিয়া পরে গঙ্গার জল অস্ত্র কাহারও ব্যবহারে লাগান যাইতে পারে। আরও দেখিতে হইবে, গঙ্গার জল ব্যবহারে কোথায় কতজন মানুষের কষ্টটা স্মরণ হইতেছে। সংখ্যার অধিক বাহারা তাহাদিগের দাবী অপরের অগ্রে মানিতে হইবে। কলিকাতা বন্দর ঠিকভাবে না চলিলে প্রায় এক কোটি মানুষের হৃদয়শির অস্ত্র থাকিবে না। উত্তর প্রদেশ ও বিহারে জল সেচন করিয়া হয়ত দুই দশ লক্ষ মানুষের কিছু কিছু চাষের সুবিধা হইবে। সুতরাং ঐ সেচন কার্য বন্ধ করিয়া ফরাকা হইতে নতুন খাল দিয়া ৪০০০০ কিউসেক জল ভাগীরথীতে ছাড়া সর্বোপযোগী কর্তব্য। ইহা কোন প্রাদেশিক দাবীদাওয়ার কথা নহে। ন্যায়ের কথা। সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক উপকার বাহাতে হয় তাহাই হইল মানবীয় ন্যায়ের সার কথা।

কে এল. রাও আর ৪০০০০ হাজার কিউসেক কথাটাই উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না। প্রথমে ২০০০০ কিউসেক বলিডেন এখন ১৫০০০ বলিতেছেন। এই ব্যক্তির নীতিজ্ঞান বা ন্যায়বোধ ত নাইই, এমন কি ফরাকা সম্বন্ধে কথা বলিতে গিয়া ইনি ফরাকার উদ্দেশ্য কি তাহাও ভুলিয়া বাসিয়া থাকেন। ভাগীরথীর জল-প্রোত অম্বতঃ ৪০০০০ কিউসেক না বাড়াইলে কলিকাতা বন্দর রক্ষা সম্ভব হইবে না। সে অবস্থায় ৪০০০০কে কাটিয়া প্রথমে অর্ধেক ও পরে অর্ধেকেরও কম করিবার কোন সার্বিকতা থাকে না। কারণ ১৫০০০ কিউসেক জলবৃদ্ধি হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না এবং তাহা করা না করা সমান। উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও কাবেরীতটের বাসিন্দাদিগকে তাহাদিগের যে জলের প্রয়োজন তাহার ৩ এর ৮ অংশ মাত্র দিবার ব্যবস্থা করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে ৪০০০০ হলে ১৫০০০ কিলসেক জল বহাইলে কলিকাতা বন্দরের জাহাজ চলাচল হইবে কি না।

আর একটা কথাও বুঝিবার প্রয়োজন আছে। তাহা হইল প্রাদেশিক দাবী দায়িত্বের কথা। ফরাকা যদি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা না হইয়া প্রাদেশিক হইত তাহা হইলে কার্যে বিলম্ব অথবা নানা প্রকার অর্থহীন প্রসঙ্গের উত্থাপনা ঐ ক্ষেত্রে কখনও হইত না। কে এল. রাও বা হুমমতাইয়ার বাণীও আমাদের গুণিতে হইত না। আমাদের কর্তব্য ফরাকা পরিকল্পনার কার্যভার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদেগের হাত হইতে সরাইয়া লইয়া উঠা। পশ্চিম বঙ্গ সরকারের করায়ত্ত করিবার ব্যবস্থা করা। তাহার পরে দেখিতে হইবে, কি উপায়ে ও কোথায় চাপ দিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে।







অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ  
( ২৯ জুন, ১৮৯০—২৮ জুন, ১৯৭২ )

ঃঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

# প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নারমাস্তা বলহীনেন লভ্যঃ”

৭২তম ভাগ  
প্রথম খণ্ড -

}

শ্রাবণ, ১৩৭৯

}

৪র্থ সংখ্যা



বিবি

প্রসঙ্গ



প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

(১৮৯০ খৃঃ অব্দের ২১শে জুন কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সর্বজন-পরিচিত নেতা গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র প্রবোধচন্দ্রের প্রথম সম্ভান প্রশান্তচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার মাতা নীরদবাসিনী ছিলেন ডাঃ নীলরতন সরকারের কনিষ্ঠা ভগিনী। ক্যেটভাত অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র মহলানবিশ সে-যুগের ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। প্রবোধচন্দ্র বিবাহ করেন নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা মণিকা দেবীকে। গুরুচরণ মহলানবিশের গৃহে সর্বদাই দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণীজনের সমাগম হইত ও প্রশান্তচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই বিদ্যানুপ্রাণিত ও প্রতিভাবানু ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। বাল্যকাল হইতেই বাহাদুরিগের সাহিত্য পাঠ্যে প্রশান্তচন্দ্রের মনের বিকাশ সূক্ষ্ম

হইয়াছিল তাঁহাদিগের মধ্যে ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেননাথ শীল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত শীতানাথ তত্ত্ববোধ ও অন্যান্য অনেকে। সে-যুগ ছিল স্বদেশী আন্দোলন, স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার যুগ। দেশের আকাশ তখন মানবীয় প্রতিভার উজ্জল আলোকে শুভ্রাভ এবং দেশাত্মবোধজাত বলিষ্ঠ ভাব-অভিব্যক্তি তখন ছিল সকল আসরেরই একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রবোধচন্দ্র বাল্যেই সাধারণ, অরবিন্দ ঘোষ, অখিনীকুমার দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতির বাণী তখন সকলের মুখে এবং বাংলার বাহিরেরও মহানুভব যথা গোখলে, রানাদে, লাল্লপত রায় প্রভৃতি মহামানবগণও এদেশ-বাসীর আপনায় জন রূপে আদৃত হইতেছিলেন।

প্রশান্তচন্দ্র বাল্যকালে পাঠের জন্য ব্রাহ্মবালক বিদ্যালয়ে প্রেরিত হ'ন এবং সেই বিদ্যালয় হইতেই

প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। ঐ সময়ে বাহাদিগের সহিত তাঁহার বন্ধু হয় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে পরে জীবনক্ষেত্রে উচ্চস্থান অধিকার করেন ও প্রশাস্ত্র আত্মজীবন পুরানো বন্ধুদিগের সহিত বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। এই সময় প্রশাস্ত্র-চক্রের সহিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইতে আরম্ভ হয়। পরে বি এসসি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার পরে যখন প্রশাস্ত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য গমন করেন তখন রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে গমন করিলে এই দেশের ছাত্রদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় গভীরতর হয়। প্রশাস্ত্র তখন কেন্দ্রীয় হইতে লণ্ডনে আসিয়া কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।)

(কেন্দ্রীয় প্রশাস্ত্র কিংস কলেজে যোগদান করিয়া গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রথমে গণিতে ও পরে পদার্থবিজ্ঞানে ট্রাইপোস পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি অর্জন করেন।) কিন্তু ১৯১৫ খ্রঃ অব্দে তিনি কিছুদিনের জন্য দেশে আগমন করেন ও এদেশে ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে একটা অধ্যাপকের কার্য্য পাইয়া যাওয়াতে কেন্দ্রীয়ে কিরিয়া না গিয়া অস্থায়ীল কার্য্য এই দেশেই করিবার উদ্যোগ করেন। পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনাই তাঁহার কার্য্য হইলেও তিনি গণিতে অধিক অগ্রগামী ছিলেন ও অঙ্কশাস্ত্রীয় সমস্যার বিশ্লেষণ ও বাস্তব পরিমাণ বিচার করিতেই তাঁহাকে বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করিতে দেখা যাইত। প্রথমতঃ জীববিজ্ঞান অন্তর্গত বিভিন্ন পরিণতির সম্ভাবনা সংক্রান্ত গণনাতেই তিনি নিমুক্ত থাকিতেন; কিন্তু পরে অন্তান্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁহার অস্থায়ীল কার্য্য প্রসারিত হইতে লাগিল। আদ্যমুখ্যার সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিসংখ্যান লইয়া তাঁহার কার্য্য তাঁহাকে শীঘ্রই পরিসংখ্যানবিদ হিসাবে পণ্ডিতজন সমাজে খ্যাতিমান বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিল ও কিছুদিন পরেই তিনি তাঁহার কার্য্যের জন্য এক আর এল

(ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটির সভ্য) উপাধি লাভ করিলেন।

এই সময়ের তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহিত পূর্ণ পরিচয়ের বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া বিশেষ ঘনিষ্ঠতার সূত্রে আবদ্ধ হইল ও প্রায় দশ বৎসর কাল বিশ্ব ভারতীয় কর্ম-সচিবের কার্য্য করেন। বিশ্বের নানান দেশে তাঁহার যাতায়াত এখন হইতে প্রয়োজন হইতে আরম্ভ করে ও তিনি যে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিলেন সেইখানে নানান দেশের বিদ্বৎজন সমাগম হইল।) ভারত স্বাধীন হইবার পরে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আরম্ভ হইল। পরে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু প্রশাস্ত্র মহলানবিশকে পরিকল্পনার আকার প্রকার নির্ণয় কার্য্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করেন ও তিনি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাক্ষেত্রে ভারতের প্রধান বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে বিদেশী পণ্ডিত ও অপরাপর ক্ষেত্রের বিশিষ্ট নেতাদিগের আগমন একটা দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বহু জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের সকলের নাম এই স্থলে দেওয়া অসম্ভব। বিজ্ঞানের বাহিরের বাহারা বিশ্বের খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁহাদিগেরও অনেক এই শিক্ষাক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সনামমন্ত বাহারা তাঁহাদিগের মধ্যে আমরা এইখানে চীনের প্রধান মন্ত্রী চু এন লাই ও উত্তর ভিয়েতনামের ডাঃ হো চি মিনহুকে বর্ণিতরাছি। নেপালের রাজা মহেন্দ্র ও রাণী রত্নাও এখানে আসিয়াছেন। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে বাহারা ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে আসিয়াছেন তাঁহাদিগের সংখ্যা অনেক। বাহারা নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত তাঁহাদিগের মধ্যে মনে পড়ে অধ্যাপক প্রুনেবার্গ, অধ্যাপক নীল বোর্হ, ও অধ্যাপক সীন্জ্‌এর নাম। অধ্যাপক জে বি এস হলডেন এই শিক্ষাক্ষেত্রে আসিয়া কাজ করিয়াছিলেন। ডব্লিও রোনাল্ড্, ফিশারও এইখানে বহুবার আসিয়া

বাঁকিয়া গিয়াছেন। জগতের আরও বহু গণ্যমান্য মানুষ এখানে বারবার আসিয়াছেন। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুও অনেকবার এই ইন্সটিটিউটে আসিয়াছিলেন।

এই সকল আনানগোনার মূলে ছিলেন প্রশান্তজ মহালানবিশ। তাঁহার পৃথিবীব্যাপী ব্যক্তিগত বহুদূর বন্ধনমুক্ত দূর-দূরান্তের কত গুণীজনকে যে বহুদূর টানে ভারতের নিকট আনিয়াছিল তাহার হিসাব করা সহজ নহে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রশান্তজ জগতের উচ্চ শিক্ষিত সমাজে ভারতের জাতীয় প্রতিনিধি ছিলেন বলিলে অত্যাতি হইবে না। আজ তাঁহার অবর্তমানে বিশ্বের বহু জ্ঞানীজন আর ভারতে আসিবার কোন আকর্ষণ অনুভব করিবেন না। তর্ক-বিচার ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় প্রশান্তজ সর্বশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি বাক্যালাপেও সূচক ছিলেন ও সকল স্তরের ও সকল বয়সের মানুষকেই তিনি কথায় মুগ্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম ছিলেন। এই সকল কারণে তিনি স্বদেশে ও বিদেশে বহু পরিবারেই আপনার জন বলিয়া গণ্য হইতেন।

বহু দেশের অসংখ্য বহু বান্ধবই আজ তাঁহার মৃত্যুতে শোচকাতর। রবীন্দ্রমুগের যে মানসিক আগ্রহ তাহা দর্শন বিজ্ঞান শিল্পকলা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অমৃত হইয়াছিল। বহু নবীন চিন্তাশীল তখন বাঙালা দেশে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন এখন বাঁহারা ক্রমে ক্রমে জীবন-ক্ষেত্র হইতে চলিয়া যাইতেছেন। এই সকল ব্যক্তির প্রতিভা সাহিত্যে কাব্যে দর্শনে বিজ্ঞানে ও নানা শিল্পকলায় প্রতিভা হইয়াছিল। গণিত ও ফলিত বিজ্ঞানের ব্যাপক অজ্ঞানে দেখা গিয়াছিল প্রশান্তজের জ্ঞানমার্গের কর্যনিষ্ঠা। গভীর চিন্তা, বিশ্লেষণ ও অংশীলনের শানিত অস্ত্রে তিনি অজ্ঞানার অন্ধকার বিদারণ করিয়া বহুক্ষেত্রে মানসিক তাম্রা অপসারণ সহজ ও হ্রিনিকর করিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক।

### অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি

নীতি কথাটার সকল সময় কোন নৈতিক অর্থ থাকে না। অর্থাৎ নীতির সহিত ধর্মাদর্শ বোধ বা শুভ-অশুভ

ঘটনার যে সম্বন্ধ তাহা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সকল সময় রক্ষিত হয় না। ভায় বাহা শুধু তাহাই যদি নীতির অন্তর্ভুক্ত হইত তাহা হইলে অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির অজ্ঞেদের প্রয়োজন ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিত। বর্তমানে আমরা নীতি বলিতে কোন কার্য বা বিষয়ের যে প্রেরণা বা পরিচালনার বিধি তাহার মূল বা সারাংশটুকু কথাই মনে করি। অর্থাৎ অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি বা কূটনীতির মধ্যে যে সকল জনহিতবিরুদ্ধ অভ্যাসের বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায় সেই সকল অশুভ উপস্থিতিগুলিকেও ধরিয়া লওয়া হয়। অর্থনীতি অনেক মূলে যাহা আবশ্যক ও উচিত বলিয়া নির্দেশ করে রাষ্ট্রনীতি অপর দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণে সেই সকল প্রয়োজনকে অস্বীকার করিয়া অর্থনীতিকে ভিন্ন পথে চালাইবার ব্যবস্থা চেষ্টা করে। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রনীতির মূলনীতিতে অর্থনীতির সর্বনাশ সাধন প্রায়শই হইয়া থাকে এবং এইরূপ ব্যবস্থা পশ্চিম বঙ্গের আগে বহুবারই আঘাত করিয়াছে। কলিকাতা বন্দরের জলাভাব ও নানা উপায়ে এই বন্দর হইতে মাল রপ্তানী আমদানী না করিয়া সেই ব্যবসায় অল্প পথে চালাইবার চেষ্টা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির একটা স্বাভাবিক অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জলাভাব হ্রাস চেষ্টার যে কোন ব্যবস্থাই করা হয়, রাষ্ট্রনীতিবিদগণ তাহা নাকচ করিয়া ঐ অবস্থা চিরস্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যোরাফেরা করেন। ফরাকা বাঁধের পরিকল্পনা বহুপুর্নাতন ও ভারতীয় আর্থিক পরিকল্পনার একটি সর্ববিশেষজ্ঞ-স্বীকৃত আভি আবশ্যকীয় অঙ্গ। কিন্তু বহু কোটি টাকা ব্যয় করিবার পরেও ফরাকা লইয়া ছিন্মিন্মিন খেলা এখনও স্থগিত হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের করণ কি প্রতিভার আধার কেন্দ্রীয় বাঙালী-বিরোধী নেতাদিগের গুপ্ত নির্দেশ নিক্ষেপক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদিগের এখন একমাত্র চেষ্টা কি করিয়া কলিকাতা তথা বাঙালা দেশের সর্বনাশ সাধন সম্পূর্ণ করা যায়। বাঙালা দেশে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় প্রেরণা উদ্ভূত রাষ্ট্রনীতি এই সকল বাঙালা-বিরোধসী প্রচেষ্টার বিপরীত কোনও আন্দোলন অথবা বিধিব্যবস্থা করিতে অপারগ ও অসমর্থ। সুতরাং এই ক্ষেত্রে

রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতিকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া সর্বসাধারণের গভীরে নিক্ষেপ করিতে অনায়াসেই সক্ষম হইতেছে। এই যে রাষ্ট্রনীতি তাহা রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য, জাতীয় উন্নতির প্রকৃষ্ট পন্থা অথবা সর্বসাধারণের মঙ্গল, কোন কিছুই মানিয়া চলে না। কূটনীতি কথাটা আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেই সচরাচর ব্যবহৃত হয়; কিন্তু বর্তমানে ভারতের প্রদেশগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে একটা দেশের আভ্যন্তরিক কূটনীতির জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার মূলে আছে অত্যধিক সংখ্যায় রাষ্ট্র নেতা সৃষ্টি। সত্যকার দেশাত্মবোধ ও নেতৃগুণ না থাকিলে মানুষ নানা প্রকার দুর্কর্মে লিপ্ত হইয়া দল পাকাইতে থাকে এবং ভারতে বহু সংখ্যায় প্রদেশ স্বজন করিয়া এইরূপ একটা অবস্থানীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে সন্দেহ করেন যে, তথাকথিত রাষ্ট্রনেতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কোথাও কোথাও সমাজবিরুদ্ধতা-দোষহুত অপরাধাদিগের সহিতও সংশ্লিষ্ট আছেন। সুতরাং রাষ্ট্রনীতি যে এই অবস্থায় কাল-কূটনীতির বিবেচ্যকরিত হইয়া পড়িবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

মানবীয় কর্মপ্রচেষ্টার অঙ্গনে তাহা হইলে অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতিও কূটনীতি কোনভাবেই জনমঙ্গল বা দেশাহিত আকাজকার প্রেরণা পরিচালিত নহে; শুধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত লাভলোকসান, শক্তিবৃদ্ধি ও প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে দাবাইয়া রাখিয়া আন্তঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা লইয়াই ঐ সকল নীতি গঠিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জেরোম বেনথাম বর্ণিত “সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তির সর্বাধিক সুখ স্বাক্ষর্য্য” লইয়া মানুষের অর্থকরী চেষ্টা পরিচালিত হয় না। রাষ্ট্রের কর্তব্যাদিগের সমাজতরণীর গতিনির্দেশও এভাহাম লিনকনের ভাষায় “সমাজ-শাসন সমাজের লোকের দ্বারা ও সমাজের মঙ্গলার্থেই” হইতে দেখা যায় না। কূটনীতির মধ্যে কূটভাব ক্রমবর্ধনশীল ও বর্তমানে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার পক্ষে পূর্ণ নিমজ্জিত। প্রথমে মনে হইয়াছিল যে অর্থনীতি বহু অধিক রাষ্ট্রশাসন কার্যের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইবে ততই তাহা দূর হইবার শোষণ ও

প্রবলের ধনভাণ্ডার পূরণ ব্যবস্থা দ্রুত হইবে। কিন্তু কার্য্যত তাহা হয় নাই। যে পাপ পূর্বে ছিল তাহা হ্রাসবেশ ধারণ করিয়া বহিরা গিয়াছে ও তত্পরি কিছু নূতন নূতন রাষ্ট্রক্ষেত্রের পাপও আর্থিক প্রচেষ্টাকে বিবাক্ত করিয়া ছুলিয়াছে। কূটনীতি এখন ভগ্ন জাতিসভার আসর হইতে উঠিয়া আসিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল গণি, গোষ্ঠী ও দলের প্রাণশক্তির রূপ ধারণ করিয়াছে।

### গৃহ-সম্পদের উর্ধ্বতম সীমা নির্দেশ

সম্প্রতি বিহার প্রদেশে হিব করা হইয়াছে যে কোন সহরে কেহ দুই লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের ঘরবাড়ী রাখিতে পারিবে না। যদি কাহারও দুই লক্ষাধিক মূল্যের গৃহ-সম্পদ থাকে তাহা হইলে তাহাকে হয় কোন বিশেষ রাজকর দিতে হইবে নয়ত বাধ্যতামূলকভাবে আইনপ্রাণ্য সীমার অতিরিক্ত অংশ সরকারকে “বিক্রয়” করিয়া দিতে হইবে। “বিক্রয়” অর্থে বুঝিতে হইবে নির্দিষ্ট মূল্যের একটা অংশমাত্র (তাহাও কিস্তিতে) দিয়া সরকার সম্পত্তি গ্রাস করিতে পারিবেন। কোন সহরে অধিক মূল্যের ঘরবাড়ী রাখা তাহা হইলে একটা অতি মহাপাপ বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার কারণ কি? বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা কি ভাড়াটিয়াদিগের সুখ-সুবিধার কোনও বিশেষ অন্তরায় স্বজন করে? আমার ত জানি যে দাঁরদ্র যাহারা তাহারা বৃহৎ বৃহৎ ইমারতে বাস করে না। তাহারা বাস করে বস্তিতে এবং বিভিন্ন মালিকগণ সচরাচর ৫-৬ টাকা মাসিক ভাড়া দিয়া জমি লইয়া তাহাতে কাঁচা ঘর বানাইয়া শতকরা বার্ষিক চল্লিশ টাকা লাভে সেই সকল মানুষের বাসের অযোগ্য ঘরগুলি ভাড়া দিয়া গরীবের হৃদশা আরও গভীর করিয়া ছুলিয়া থাকেন। পাকবাড়ী বাঁহারা ভাড়া দেন তাহারা ভাড়াটিয়ার সকল বায়না দা সামলাইয়া শেষ অবধি খাটান টাকার উপর বাৎসরিক শতকরা পাঁচ টাকাও পান কি না তাহাতে সন্দেহ। সুতরাং বস্তি উঠাইয়া দিয়া অল্প ভাড়ায় মহত্ববাসের উপযুক্ত গৃহাদি নির্মাণ ব্যবস্থা না করিয়া তথাকথিত সোসিয়ালিজম-এর ক্রীড়াক্ষেত্রে

লোক দেখাইবার জন্য একটা অর্থহীন গৃহ-সম্পদের উচ্চ সীমা নির্দেশ করিয়া বিহার সরকার কোনও জনহিতকর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন বলা যায় না। গৃহ সম্পদ প্রথমতঃ এক প্রকারের সম্পদ, ব্যতীত অপর কোনও ভাবে কোনও মানবীয়তা-বিরুদ্ধ বিষয়ের প্রতিষ্ঠান নহে। যদি কোনও ব্যক্তি একশতটি বাস বা লগী রাখিয়া ব্যবসা করিতে পারে অথবা এক কোটি টাকার হীরা-জহরত দিয়া দোকান সাজাইয়া বসিতে পারে, অথবা পাঁচ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি বসাইয়া একটি কারখানা চালাইতে পারে; তাহা হইলে সুনীতি অথবা জনমঙ্গল প্রতিষ্ঠার কোন আদর্শ বিনষ্ট হইতেছে বলিয়া এই গৃহ সম্পদের উচ্চতম সীমা নির্দেশ করা হইতেছে কেন? আমরা এই প্রশ্ন করিতেছি এইজন্য যে এই সীমা-নির্দেশের কথা বিহার ব্যতীত অপরাপর প্রদেশেও উত্থাপিত হইয়াছে। শুনা গিয়াছে পশ্চিম বঙ্গেও এই ব্যবস্থা করিয়া বৃহৎ গ্রহাদি বাজেয়াপ্ত করিবার চেষ্টা হইবে। আজকাল কলকাতায় গৃহ-নির্মাণের খরচ হয় জমির মূল্য না ধরিয়া বর্গ ফুট প্রতি ৫০।৭৫ টাকা। স্বাস্থ্যের নিয়ম অনুসারে একজন মানুষের ঘুমাইবার স্থান অন্তত ১০০০ ঘনফুট হওয়া উচিত। ইহা ব্যতীত খাইবার, লেখাপড়া ও অন্যান্য কার্য্য করিবার জন্যও মাথাপিছু ১০০০ ঘনফুট স্থান প্রয়োজন হইতে পারে। বারান্দা, সিঁড়ি, স্নানাগার, রন্ধনশালা প্রভৃতিরও আবশ্যক থাকে। অর্থাৎ মাথাপিছু ৩০০০।৪০০০ ঘনফুট বাসস্থান থাকা অন্ত্যরত নহেই, তাহা থাকা উচিত। ৬০ টাকা বর্গফুট হিসাবে ৩০০।৪০০ বর্গফুটের মূল্য দাঁড়ায় (জমি বাদে) ১৮০০০ হইতে ২৪০০০ টাকা। আমাদের দেশে কোন কোন পরিবারে অনেক সময় ২০-২৫জন মানুষের আবির্ভাব দেখা যায়। পরিবারে পিতামাতা, বৃদ্ধা পিতামহী, বিধবা ভগিনীও তাহাদের সন্তানাদি এবং সাত পুত্র ও পাঁচকন্যা থাকা এখনও আইন-বিরুদ্ধ করা হয় নাই। পুত্রবধু ও জামাতা থাকাও বাঁতি বা নীতি বিরোধের উদাহরণ বলিয়া প্রচারিত হইতেছে না। সুতরাং ৫।৭ লক্ষ টাকার গৃহ থাকিলে তাহা সমাজ-

বিরোধিতার নিদর্শন বলা চলে না। বিশেষ করিয়া বলা হলে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ৪০০।৫০০ বস্তিবাসীকে ভিলে ভিলে প্রাণে মারিবার ব্যবস্থা আইন-বিরুদ্ধ নহে।

গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহাতে ভাড়াটিয়া রাখা ক্রিশয়া ও চীন দেশে রাষ্ট্রনীতি-বিরুদ্ধ কিন্তু ঐ সকল দেশে ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে কারখানা, বাস, ট্যাক্সি, গহনার দোকান প্রভৃতি রাখাও কাহারও পক্ষে চলে না। এই দেশের সমাজবাদ কন্মুনিকম নহে। আমাদের দেশে সোশিয়ালিজম রাষ্ট্রনেতা তথা উচ্চপদস্থ আমলাদিগের ইচ্ছা ও সুবিধা বুঝিয়া চলিয়া থাকে। বৃহৎ বৃহৎ গৃহ প্রভৃতির কিছু কিছু যদি উক্ত সম্পদের অধিকারীদিগকে আইন দেখাইয়া হিনাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ঐ সকল গৃহসম্পদের মালিকগণ। রাষ্ট্রনেতা ও আমলাগণ নানা ভাবে সুবিধা লাভ করিবে। গৃহ-সম্পদের মূল্য নির্ধারণ, পুরাতন ভাড়াটিয়াদিগকে ছুলিয়া দিয়া অথবা তাহাদিগের ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণ, ক্ষতিপূরণের অর্থ-সরকারী উদ্বিল হইতে উঠাইয়া বাহার প্রাপ্য তাহাকে দেওয়া প্রভৃতি বহু কার্য্যে আমলাগণ নিজেদের সুবিধা করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন। গৃহগুলি অপর বাসিন্দাদিগকে দেওয়াও একটা নূতন কার্য্য হইবে। সরকারী বিভাগের সংখ্যা বাড়িবে। আমলাদিগের সংখ্যাও ক্রমবর্দ্ধনশীল হইবে নিশ্চয়ই। সমাজবাদ কতটা সার্থকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে সে-কথার আলোচনা করাও নিম্নপ্রয়োজন, কারণ আমরা, সকলেই জানি রাষ্ট্রীয়দলের নেতৃত্ব ও আমলাদিগের মিথালি হইতে জনসাধারণ কতটা লাভবান হয়।

### সমাজবাদের নকশা

সমাজবাদের মূল কথা হইল মানব জীবনকে সমাজ অবলম্বন করিয়া অস্তিত্ব, নানা পথে গতিতরকা ও পূর্ণতা লাভ করিতে শিক্ষা দেওয়া। ব্যক্তি যদি সকলক্ষেত্রে শুধু নিজের অস্তিত্ব ও সুবিধার কথাই ভাবিয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিয়া চলিতে চায়, শুধু যদি নিজের কমতার উপরেই তাহাকে নির্ভর করিতে হয়, সমাজের সহিত তাহার দেনা-পাওনার কথা যদি শুধু ব্যক্তিগত



সুখ-সুবিধার ওজন বুঝিয়াই স্থিরীকৃত হয়; তাহা হইলে মানব জীবন ব্যক্তিকেই কেন্দ্র করিয়া গতিশীল হয়। সমাজবাদ ইহার পরিবর্তে চায় মানুষকে ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার কথা পিছনে রাখিয়া সকল মানবের সমবেত আন্তরিকেই সম্মুখে স্থাপন করিয়া চলিতে শিখাইতে। মানুষ তাহার নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার কথা ভুলিয়া যদি সমাজের সকল ব্যক্তির ভালমন্দ বিচার করিয়াই চলিতে শিখে তাহা হইলেই সমাজবাদের আদর্শ যথার্থ ভাবে মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

কিন্তু মানব জীবন বলিতে আমরা যে প্রাণশক্তির মানবদেহে অবস্থিতের কথা বুঝি, সেই দেহ, সেই প্রাণ ও তাহাদের মুখ্য অবস্থিত শুধু ব্যক্তির মধ্যেই থাকিতে পারে। ব্যক্তি ব্যতীত সমাজ বলিয়া কোনও দানবীয় মহাদেহ নাই। বহু ব্যক্তির বহু দেহের সমবেত অবস্থিত হইতেই সমাজের উৎপত্তি হয় এবং সকল ব্যক্তির প্রাণ-শক্তির মিলিত বিকাশ হইতেই সমাজ-প্রাণ বিকাশিত হয়। কিন্তু সমাজের কোন নিজস্ব বিরাট ও সর্বব্যাপ্ত অভাব বোধ অথবা তাহার নিবৃত্তির কথা বাস্তবে উঠিতে পারে না। কারণ ভোগ্য যাহা তাহার ভোগ্যী হইল ব্যক্তি ও ব্যক্তির ভোগের মাধ্যমেই সমাজের খাদ বস্ত্র বাসস্থান আসবাব চিকিৎসা শিক্ষা প্রভৃতির অভাব দূর হইয়া থাকে।

এরূপ অবস্থায় বহু ব্যক্তি যদি নানা প্রকার অভাবে জর্জরিত হইয়া শারীরিক ও মানসিক দুর্দশার চরমে অবস্থিত থাকে তাহা হইলে সমাজবাদের নাম করিয়া তাহাদিগের ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ উপেক্ষা করিয়া চলা একটা অতিবড় সামাজিক অপরাধ হইয়া দাঁড়ায়। স্বাভাবিক বলেন, সমাজের খাতিরে ব্যক্তিকে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-খ্যাচ্ছন্দ্য অবহেলা করিয়া সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য ত্যাগস্বীকার করিয়া চলিতে হইবে, তাহার। যেন একথা ভুলিয়া না যান যে সর্বসাধারণও বহু ব্যক্তির সমাবেশ মাত্র এবং সর্বজনের অধিকাংশ অথবা একটা বৃহৎ অংশ যদি অভাব ক্রিষ্টভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে সমাজকেও নিজ সমষ্টিগত সুখ-

সুবিধা (অর্থাৎ সমাজ-পরিচালকদিগকে) ভুলিয়া সমাজ অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের কথা লইয়া মাথা ঘামাইতে হইবে। ইহা যদি না করা হয় তাহা হইলে ব্যক্তি যেভাবে সমাজকে রূপদান করিয়া সকল ব্যক্তির উপরে হান দিয়াছে, সেই ভাবেই আবার সমাজকে (অর্থাৎ সমাজ-পরিচালকদিগকে) নিজ উচ্চ আসন হইতে অপসৃত করিয়া অপর কোন সংস্থা স্বজনে আত্মনিরোগ করিতে বাধ্য হইবে।

অর্থাৎ সমাজবাদ যদি জাগ্রত জীবন্তভাবে মানব-গোষ্ঠীতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে চায় তাহা হইলে সমাজের সকল ব্যক্তির সুখ-সুবিধার দায়িত্ব সমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি বহুব্যক্তি সমাজের উৎপন্ন ভোগ্য বস্তুর কোন অংশ আহরণে অক্ষম হয় তাহা হইলে সেইরূপ সামাজিক অর্থনীতির কোন মানবীয় সার্বিকতা থাকে না। এবং তাহাই হয়, যদি অসংখ্য ব্যক্তি কোনও ভাবেই সেই অর্থনীতিতে সাক্ষাৎ ও উপার্জনশীল অংশীদার হইতে না পারে। বেকার মানুষ যদি কোনও কাজ না করিয়া উপার্জনহীন জীবনযাত্রা নিক্ষেপ করে এবং সমাজ যদি তাহাকে কোনও বেকার-ভাতা না দিয়া শুধু সমাজবাদের তত্ত্বকথা শুনাইয়া পথে পথে পতাকা হাতে মিছিল বাহির করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেয়, তাহা হইলে সেই সমাজবাদ নিঃসন্দেহ অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে একটা অতিবড় প্রবন্ধনার সূচনা করে। আমাদের দেশে যে সোশিয়ালিস্ট নকশা অল্পসংখ্যে রচিত (socialist pattern) সমাজবাদ তাহা পণ্ডিত নেহেরুর প্রাণে শাস্তি জাগ্রত করিয়াছিল কিন্তু লক্ষ লক্ষ বেকার ব্যক্তির ক্ষুরিগুণ্ডি করিতে পারে নাই। ক্ষুরিগুণ্ডি অপেক্ষা বড় কথা হইল আত্মসম্মানবোধের কথা। পরিণত কর্শশক্তি ও শিক্ষা থাকিতেও যদি মানুষ কাজ করবার সুযোগ না পায় তাহা হইলে তাহার আত্মমর্যাদা যেভাবে আহত হয় তাহার প্রতিকার কোন নকশা দেখাইয়া করা যাইতে পারে না।

এখন কথা হইল ঐ লক্ষ লক্ষ বেকারদিগের কার্য ব্যবস্থা কি ভাবে করা সম্ভব? আমরা পূর্বেও বলিয়াছি

এখনও বলিতেছি যে, এই সমস্ত সমাধান গোল ঘরের ঠাণ্ডা হাওয়ার বসিয়া জন্না-কল্পনা দ্বারা সম্ভব হইবে না। ইহার জন্য প্রয়োজন, কৰ্মশক্তি কোথায় কি ভাবে কতটা অব্যবহৃত রহিয়াছে তাহার হিসাব বাস্তব অনুসন্ধান করিয়া নির্ধারণ করা। সমাজের সকল ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ভোগ্য বস্তু কি কি পরিমাণে প্রয়োজন হইতে পারে তাহারও একটা হিসাব করা আবশ্যিক বিশেষজ্ঞদিগের সহায়তায়। তৎপরে কৰ্মশক্তি ব্যবহারে প্রয়োজনীয় বস্তু সকল উৎপাদন ব্যবস্থা করিয়া এবং সৰ্বসাধারণকে জীবন নির্বাহে উন্নততর মান অবলম্বন করিয়া নব উৎপাদিত বস্তু সকল ক্রয় করিতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রচার ও উদাহরণ দেখাইয়া করিতে উদ্ধৃক করিয়া জাতীয় কৰ্মশক্তির পূর্ণ ও সফল ব্যবহার সম্পূর্ণ করিতে হইবে। যতদূর অল্প অল্প চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া এবং কিছু কিছু বাছাই করা বেকারদিগকে চাকুরীতে বহাল করিয়া এই বিরাট সমস্ত সমাধান সম্ভব হইতে পারে না। কারণ চাকুরী সৃষ্টির ঐতিহ্য চর্চা করিলে দেখা যায় যে, নব সৃষ্ট চাকুরী বধন আমলাদিগের পরিকল্পনাজাত হয় তখন তাহা শুধু মাহিনা দেওয়ারই ব্যবস্থা হইয়া থাকে। সেই চাকুরী কোন অর্থনীতি-সমর্থিত উৎপাদন কার্যের সূচনা করে না। বেকারগণ যদি মাহিনা লইয়া বাস্তব উৎপাদন ক্ষেত্রে নিৰ্দ্ধৰ্মই থাকিয়া যান তাহা হইলে সেইরূপ ব্যবস্থা হইতে কোনও অর্থ নৈতিক সমস্তার সমাধান হয় না।

এমন কাজ করিতে হইবে যাহাতে মানুষ বস্তু তৈয়ার করা অথবা জনগণের একপ সেবা করিতে নিযুক্ত হইবে, যাহার মানবীর অর্থনীতিতে কোন মূল্য থাকে। যথা কলিকাতায় ও পশ্চিম বাংলার অন্যান্য সহরে যে সহস্র সহস্র রিকশা চলে সেগুলি উঠাইয়া দিয়া যদি মোটর সাইকেল রিকশার প্রবর্তন করা যায় তাহাতে মানুষের জমলাঘবও হয় এবং আরোহিগণেরও সময়ের অপচয় ততটা হয় না। শুধু যদি ২০০০।২৫০০০ মোটর সাইকেল রিকশা পশ্চিম বাংলা সরকার চালিত করিতে পারেন তাহাতে লক্ষাধিক যুবকের মাসিক ২০০।৩০০ টাকা উপার্জন হইতে পারে।

বাহার এখন রিকশা টানিয়া প্রাণপাত করিতেছে তাহার। যাহা বোজগার করে তাহার জন্য কোনও মানুষের প্রাণ দিবার কোন আবশ্যিক দেখা যায় না। তাহার। এনে ফিরিয়া গিয়া ক্ষেত বা মাঝে কাজ করিলে খাদ উৎপাদন যুক্ত হইতে পারে। কলিকাতায় ও অন্যান্য সহরে সহস্র সহস্র মানুষ খুঁজে লইয়া বা পথের ধূলার মালপত্র সাজাইয়া দোকানদারী করিয়া থাকে। এই সকল ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা সভ্যজগতের রীতিবিরুদ্ধ। এইগুলিকে উঠাইয়া দিয়া সৰ্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোঁটার উপর স্থাপিত “কিয়ৎ” জাতীয় দোকান-ঘর নির্মান করিলে এরূপ “কিয়ৎ”গুলিতেও বহুলক মানুষ নিযুক্ত হইতে পারে। এই সকল “কিয়ৎ” হইতে যদি শীতল ও উষ্ণ পানীয় ও নানা প্রকার খাদ্য-বস্তু বিক্রয় করা হয় তাহা হইলে সাধারণের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইতে পারে। এই সকল পানীয় ও খাদ্য প্রস্তুত ও সরবরাহের কার্যেও বহনবাহারী নিযুক্ত হইতে পারেন। কাগজের বাগে ভাত, খিচুড়ী, মাছ, মাংস, কুটি ইত্যাদি সকল খাদ্যই বিক্রয় করা যাইতে পারে এবং যদি সরকারী সাহায্যে এই সকল খাদ্য অল্প লাভে বিক্রয় ব্যবস্থা করা যায় তাহাতে বাহার। দূর হইতে কৰ্মক্ষেত্রে আগমন করেন তাহাদের আর কষ্ট করিয়া আনা ঠাণ্ডা খাবার খাইতে হয় না। এই “কিয়ৎ” পশ্চিম বঙ্গের সহরগুলিতে ৫০০০ বগান সম্ভব এবং তাহাতে ৪।৫ লক্ষ লোকের সংস্থান সম্ভব হইতে পারে।

### বিদ্যুৎ সরবরাহে বাধা-বিপত্তি

কলিকাতা ও কলিকাতার নিকটবর্তী বহু স্থলে বৎসরাধিক কাল হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাইতেছে। ইহার ফলে জনসাধারণের শুধু যে মহা অসুবিধা হইতেছে তাহাই নহে; ইহার ফলে কারখানা বন্ধ রাখিতে হইতেছে, উচ্চ উচ্চ নিবাস স্থল ও দ্রুতগতির উঠিবার নাগিবার “লিফ্ট্” বন্ধ হইয়া কার্য ও জীবনযাত্রা অসম্ভব হইতেছে। কখন কখন “লিফ্ট্”-মধ্যপথে আটকাইয়া থাকিয়া মানুষের জীবন

বিপন্ন হইতেছে। হাসপাতালে রুগীদিগের এমন কি অসুস্থতাকেন্দ্রে শায়িত রুগীদিগেরও হঠাৎ আলো বন্ধ হওয়ার বিপদজনক পরিস্থিতিতে থাকিতে হইতেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার খাদ্য ঔষধ প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যাদি, যাহা সর্বদাই শীতল কক্ষে অথবা আলমারিতে রাখা হয়, বৈদ্যুতিক বস্তু অচল হইয়া যাওয়ার গরম হইয়া গিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। দোকানপাট, ভোজন করিবার রেস্তোরাঁ প্রভৃতির বহু লোকসান হইতেছে। এক কথায় যে অসুবিধা ও ক্ষতি বিদ্যুৎ সরবরাহ থামিয়া যাওয়ার হইতেছে তাহার মূল্য বিচার করিলে পশ্চিম বঙ্গের দৈনিক এক লক্ষ টাকা ক্ষতি হইতেছে বলা অসুযুক্তি হইবে না। অর্থাৎ বাৎসরিক প্রায় চার কোটি টাকা। বস্তুতঃ ক্ষতি ইহার বিগুণ চতুঃগুণ হইতেছে যদি বলা যায় তাহাও ভুল না হইতে পারে। এই ক্ষতি হইতে বাঁচার ব্যবস্থা করা যদি দশ-বিংশ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে সে ব্যবস্থা অবিলম্বে করা উচিত এবং এই ক্ষতি যদি সরকারকে টাকা ধার করিতেও হয় তাহাও করা উচিত। যদি কোন ব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে, যেহেতু বিদ্যুৎ সরবরাহ যথাযথভাবে করা হইতেছে না সেই কারণে, বিদ্যুৎ সরবরাহের যে একাধিপত্যের অধিকার তাহা উঠাইয়া দিয়া সাধারণকে নিজের বিদ্যুৎ নিজে উৎপাদন করিয়া সমবায় রীতিতে বন্টন করিয়া লইতে দেওয়া উচিত হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিতে দিলে সর্বত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা স্থাপিত হইবে ও জনসাধারণের কোনও অভিযোগ করিবার কারণ থাকিবে না। যদি বলা হয়, বর্তমানে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে তাহা কি হইবে, তাহার উত্তরে বলা যাইবে যে ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত কেন্দ্রগুলি কিছু কিছু বৈদ্যুতিক শক্তি ক্রয় করিবার ব্যবস্থা রাখিলে যেটুকু বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে তাহা ব্যবহার হইয়া যাইবে। ইহা ছাড়া অন্য আর দশ-সহস্রাধিক গ্রামে নুতন করিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ করার আবশ্যক আছে। তাহা যদি হয় তাহা হইলে সরকারী ভাবেও কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ কারবারের দ্বারা যে

বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাহা গ্রামে গ্রামে পাঠান যাইতে পারে। গ্রামে বিদ্যুৎ যদি না যায় তাহাতে ততটা ক্ষতি হইবে না যতটা সহরে ও কারখানার না যাইলে হইয়া থাকে।

কলিকাতার রাজভবন এলাকার বৈদ্যুতিক আলোকের ঘটা দেখিলে অবশ্য মনে হয় না যে এই নগরীতে কোনও বিদ্যুতের অভাব আছে। অনেক সময় দিবাভাগেও এই অঞ্চলে শতাধিক আঁত উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতে থাকিতে দেখা যায়। তাহাতে মনে হয় যে বিদ্যুতের অভাবটা রাজভবন অঞ্চলে ততটা নাই যতটা সাধারণ মানুষদিগের নিবাস অঞ্চলে আছে। প্রায় প্রত্যহই কলিকাতা ও সহরতলিতে কোথাও না কোথাও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা হয়। ইহা যে কর্মচারীগণ করেন তাঁহাদিগের কার্যে কোনও পক্ষপাতিত্ব হইতেছে কি না দেখিবার জন্য সাধারণের তরফ হইতে বিশেষ পর্যবেক্ষক নিযুক্ত হওয়া আবশ্যিক। ভি আই পি দিগের অসুবিধা বুঝিয়া যদি এই ব্যবস্থা চালিত হইতে থাকে তাহা হইলে কোনওদিনই বিদ্যুৎ সরবরাহের কার্য উপযুক্ত ভাবে সাধিত হইবে না। রাষ্ট্র-কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ-দিগকে অল্পকালে বসিয়া গরমে বসন্তকাল হইতে হইলে সমস্তর সমাধান শীঘ্র শীঘ্র হইবে মনে হয়।

ধাপা অঞ্চলে খেলার মাঠ ও স্টেডিয়াম

প্রথমে সরকারী গণ্যমান্তগণ স্থির করেন যে ইডেন গার্ডেনে যেখানে ক্রিকেট খেলার মাঠ ও স্টেডিয়াম আছে সেইখানেই আকাশ বৃষ্টি ও সন্ধ্যার করিয়া এমন একটা খেলার মাঠ ও দর্শক বসিবার স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হইবে যেখানে ফুটবল ক্রিকেট হকি ত খেলা হইবেই, এমন কি সকল প্রতিযোগিতার খেলাই হইতে পারিবে। টেনিস, সস্তরণ, প্রভৃতি ঐখানেই চলিতে পারিবে। মহামান্য মাতঙ্গরদিগের কথায় বাহাদুর সর্দারাই “ইয়া” বলিয়া থাকেন তাঁহারা ঘন ঘন শিরঃসঞ্চালন করিয়া স্টেডিয়াম নির্মাণ ঠিক করিয়া দিলেও ক্রমে ক্রমে ক্রিকেটের অভিজ্ঞ সমর্থকগণ বলিতে আরম্ভ করিলেন

শেবাংশ ৫৭৫ পৃষ্ঠায়

# ভারতীয় দর্শনে বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

সলিল বিশ্বাস

মানব সভ্যতার প্রাতিষ্ঠিত মুহূর্ত থেকে আর্য-ভূমি ভারতবর্ষে যে জ্ঞান সাধনার সূত্র দিয়েছিল—তার বিস্তৃতি এবং সার্থক উত্তরণ বিশ্বসুখকর। প্রাচীন ভারতের মনীষা পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞানকে পেছনে ফেলে পারমার্থিক এবং আত্মজ্ঞানকেই প্রেরণের বলে আভিহিত করেছিল। ভারত-মনীষার এই চারিত্র্য ধর্ম থেকে দার্ভাবিক ভাবে মনে চোঁতে পারের যে অমীমাংসাবাদের লীলা-নিরঞ্জন ভারতভূমিতে মোক্ষ কামনার অনিবার্য আকুলতায় পরাজ্ঞান সাধনা ছাড়া অজায়ত জ্ঞান-চরা হ্রদই নি।—কিন্তু ভারতীয় মনীষার চারিত্র্য ধর্মের বাথার্থ্য ভাবলে বিস্মিত চোঁতে চয়।

বিচিত্র মত, প্রজ্ঞান, ধর্ম ও যাত্যোর অপূর সমন্বয়ে ভারতীয় মনীষা গড়ে উঠে। সনাতন ভূমি ভারত-বর্ষে পরাজ্ঞান, অপরাজ্ঞান পার্থিব-অপার্থিক, অসাম্যবাদ ও জড়বাদের বৈজ্ঞানিক প্রোঁতসাহা চিরন্তন ঐক্যত্বের অবিচ্ছিন্ন গতিতে রয়ে চলেছে। এখানে এত মতা মনেবের সাগরতীরেই দোণ দর্শন ও বিজ্ঞানের অপূর সমন্বয়।

ভারতীয় দর্শনের পারমার্থিক জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের পার্থক্য হচ্ছে যে, দর্শনের আভিজ্ঞা অজিত সভ্যতা আপ্রানিক বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা নির্ভর নয়। কিন্তু তবুও, সাক্ষিক বিশ্বাস, তীব্র যুক্ত ও তীক্ষ্ণ বিচারের নানে প্রত্যক্ষ তথ্যের অভিজ্ঞতার নিরূপণ এবং বৌদ্ধিক ধ্যান সজ্ঞাত প্রজ্ঞানকেই দর্শনের উৎস-ভূমি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। ভারতীয় আর্য ঋষি

বিজ্ঞানকেও বিশেষ 'দর্শন' হিসেবেই দিয়েছেন। ঋষি দৃষ্টিতে দর্শন-বিজ্ঞানের অবশ্য কর্তব্য হলো—মানবিক জীবনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা এবং সমস্যার সমাধান করে মতোর পাসতী শিখা জালিয়ে দেওয়া। এখানেই দর্শন ও বিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্নতা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এই প্রোঁকিতেই, ভারতীয় দর্শন এবং আপ্রানিক বিজ্ঞানের একটি পভাবজ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পারম্পরিক আলোচনায় বাধ্যবৈধ বিষয়টি সজ্ঞ হয়ে ওঠে।

## ॥ আকাশ জিজ্ঞাসা ॥

আপ্রানিক বিজ্ঞানকের কাছে আকাশ-রহস্য এক বিস্মিতাজিজ্ঞাসা। আকাশের অন্তর্লীন গুহতা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের ছেদচীন অন্বেষণ এখনও নিশ্চিত যাবাথ্যের প্রামাণ্য আশ্রম অর্জন করতে পারেনি। অতীত ভারতীয় দার্শনিক মনীষাত আকাশ-রহস্য সম্পর্কে নিরাক ছিল না। ভারতীয় দর্শনের আকাশ-রহস্য অন্বেষণ এবং উত্তরণ এক অপূর বিশেষ্য এবং মৌলিক বচন করে আনে।

ভারতীয় দর্শনে জড় ও শক্তির অবিচ্ছিন্ন মেলবন্ধন এবং পারম্পরিক রূপান্তর বাগিত্বের দীক্ষিত আলোচনা দেখা যায়। ভারতীয় দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব জিজ্ঞাসার সমাধান অল্পমারে বাস্তব সংগঠনের বহির্বিদিত পাঁচটি মৌলিক উপাদান 'স্বপ্ন' ও 'স্থূল'-ভূতের পর্যায় বিস্তৃত। 'স্বপ্ন' ও 'স্থূল' ভূতকে 'তন্মাত্র' এবং 'মহাভূত' নামে নিরূপিত করে 'তন্মাত্র'-কে মহাভূতের স্বজক নামে আভিহিত করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে 'ভূত'—শব্দটি জড় বা জীব এবং যে কোন পদার্থের

সংজ্ঞা পরিচায়ক শব্দ—অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে জড় ও শক্তির অবিচ্ছিন্ন মেলবন্ধন স্বীকার করে আকাশকে জড়ের পর্যায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এই পর্যায়িক তাৎপর্য গভীরভাবে অনুশীলন করা প্রয়োজন।

আকাশকে 'তন্মাত্র' রূপে শক্তি হিসাবে এবং পুনর্বার 'মহাভূত' রূপে পদার্থ হিসাবে অভিহিত করে ভারতের দার্শনিক মনীষা এক গভীর মনন ব্যঞ্জনার পরিচয় দিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণায় এ সত্য সফল প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বিশেষ অবস্থায় আলোক শক্তি জড় কণিকার অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ রূপে চলার শক্তি অর্জন করতে পারে।

সাংখ্য এবং পাণ্ডুল্ল দর্শন অনুসারে 'তন্মাত্র আকাশ' সমগ্র তন্মাত্রের আদিরূপ ও স্বজক শক্তি এবং অল্প কোটিতে সমগ্র মহাভূত পরমাণু আকাশ-মহাভূত পরমাণু থেকেই আবির্ভূত হয়। বিজ্ঞান ভিক্টর যোগবাস্তিক আকাশকে 'সর্বব্যাপী জড় স্বর্গহীন সত্তা'—এবং 'তন্মাত্রিক আদি বড় কণিকা'র দুটি বিচ্ছিন্ন বিস্তার আবয়বিক অস্তিত্ব রূপে অভিহিত করেছে। বিজ্ঞান ভিক্টর-প্রজ্ঞান অনুসারে আদিম ও অভিব্যক্তিক দু-টি ক্রমিক পরিণামের ভেতর দিয়েই আকাশ অস্তিত্বের পরিচয় প্রকাশিত হয়। আদিম আকাশকে সূক্ষ্ম এবং স্থলভূতের সম-মাত্রিক সমস্থান আধিকারিক অভিহিত করে, সর্বব্যাপী, অবয়বহীন এবং নির্গিশের সত্তা রূপে স্বীকার করা হয়েছে। বিজ্ঞানভিক্টর 'দেব' এবং 'আদিম আকাশ' ধারণার মধ্যে কোন বিচ্ছিন্নতাকে মেনে নেন নি, তাই তিনি আকাশকে 'সমান-দেশকম্ আকাশ স্বরূপম্'—বলেছেন।

ভারতীয় দর্শনের অনন্ত অভিজ্ঞান বেদান্ত ও আকাশের 'আদিম এবং 'তন্মাত্র বা পরিণত' রূপের দু-টি বিভক্ত সত্তাকে 'পুরাণং ধম্' এবং 'বায়ুরং ধম্'—বলে অভিহিত করেছে। বেদান্তের 'আদিম' এবং 'তন্মাত্র' বা পরিণত আকাশকেই বিজ্ঞানভিক্টর 'কারণাকাশ' এবং 'কার্বাকাশ' নামে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আদিম

আকাশের পরিবর্তিত পরিণত অবস্থাই হচ্ছে তন্মাত্রিক আকাশ এবং এই প্রজ্ঞান থেকেই জড়স্বার্থ বিচ্যুত আদিম আকাশ থেকেই যে জড়স্বার্থী আকাশ তন্মাত্রের উৎপত্তি—এই স্বার্থার্থ্য উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, আধুনিক বিজ্ঞান মনীষা যেমনি আকাশ ভিজ্ঞাসায় স্বপ্নহীন মতৈক্যের অভিজ্ঞান অর্জন করতে পারে নি, তেমনি, ভারতীয় দর্শন মনীষার সামগ্রিক অনুশীলনও সাংখ্য পাণ্ডুল্ল এবং যোগবাস্তিকের আনুপাতিক নয়। বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা কণাদ আকাশের পরমাণু অস্তিত্বকে স্বীকার করেন নি। তিনি আকাশকে ক্রিয়াহীন (inert), অবয়বহীন (Non-atomic) সর্বব্যাপী আকাশরূপী শব্দবাহী মাধ্যম হিসাবে অভিহিত করেছেন। জায় এবং বৌদ্ধ দার্শনিকও আকাশ প্রসঙ্গে কণাদ অভিজ্ঞানেরই কম-বেশ পুনরুচ্চারণ করেছেন এবং তাঁরা আকাশকে 'ভূত' অর্থে স্বীকার করেন নি। এমন কি, ভারতীয় জড়বাদী দার্শনিক চাণক্যও আকাশকে 'তন্মাত্র' ও 'মহাভূতের' স্বজক শক্তি হিসাবে ধারণা অর্জনের নিহিত তাৎপর্য ধরে নিতে পারেননি। জায়, বৈশেষিক বৌদ্ধ এবং চাণক্য প্রজ্ঞান অনুসৃত তাই সাংখ্য, পাণ্ডুল্ল-যোগবাস্তিক বিচ্ছিন্ন হয়েই গড়ে উঠেছে।

ভারতীয় দর্শনের আকাশ ভিজ্ঞাসায় এই চিহ্নিত প্রেক্ষিতে আধুনিক বিজ্ঞানের আকাশ গবেষণার আলোচনায় ভারতীয় দর্শনের বিশেষত্ব ও মৌলিকত্বের অনন্ততার পরিচয় মিলবে।

ভারতীয় দর্শনে আকাশকে প্রথমে 'তন্মাত্র' রূপে শক্তি হিসাবে এবং পুনর্বার মহাভূত রূপে পদার্থ হিসাবে অভিহিত করার ভেতর দিয়েই আকাশ ভিজ্ঞাসায় আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা-অর্জিত সত্যই বিকাশ লাভ করছে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, বিশেষ অবস্থায় আলোকশক্তি জড়কণিকার (কোটন) তরঙ্গরূপ। উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিকরা আলোক শক্তির তরঙ্গরূপে চলাচল প্রসঙ্গে ভারতীয়, মিতামিত্ত-অস্তিত্ব সর্বব্যাপী 'Ether'—এর কল্পনা করেছিলেন,

কিন্তু উনিশ শতকেরই আট দশক পেরিয়ে (১৮৮৭) মর্লি (Morley) ও মিকেলসন (Michelson) বিজ্ঞান গবেষণায় 'Ether'-এর অস্তিত্বের প্রমাণ পান নি বলেই 'Ether' কল্পনা বিজ্ঞান জগতে বর্জিত হয়ে ওঠে। 'Ether' অভিজ্ঞান বর্জিত হবার ফলে সন্ধানী বিজ্ঞান-মানস অধিকতর সমস্তা জটিল মুহুর্তে উপনীত হলো এবং সেই জটিলতর সমস্তার সন্নিপাতে বিজ্ঞান মনীষী আইনস্টাইন নতুন এক সমাধান নিয়ে এলেন। আইনস্টাইন' অভিমত থেকে উৎস্রুত অহুস্মিতমন জন জানতে পারল যে, কথিত 'দেশ' বা 'শূন্য প্রদেশ'—কেবল মাত্র পদার্থশূন্য এবং তাতে কোন শক্তির অস্তিত্বই নেই তাই নয়,—উদ্ভাতে তড়িৎ-চুম্বক ক্ষেত্রের (Electromagnetic field) ধর্মও নেই। শক্তিকণা বা ফোটনরূপে আলোকরশ্মি প্রতিষ্ঠা না হ'লে উদ্ভাতে অভিহিত ক্ষেত্রের ধর্ম অচলুত হয় না। শূন্যপ্রদেশ সম্পর্কে অর্জিত এই অভিজ্ঞান বিজ্ঞানসার সমাধান আনতে পারল না; পারল না বৈজ্ঞানিক ডিরাকের 'Anti-matter'-এর ধারণাও।

অক শাস্ত্রের জটিল সমীকরণ সমাধান থেকে বৈজ্ঞানিক ডিরাক তাঁর বিপরীত জড়ধর্মী সত্তার (Anti-matter) সিদ্ধান্ত অর্জন করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, আকাশ তো শূন্য নয়—ই দৃশ্যত মহাশূন্য এক প্রকার বিপরীত জড়ধর্মী সত্তার আকর বিশেষ এবং এটি 'সত্তার' ধর্ম হচ্ছে জড়ো স্বাভাবিক ধর্মের প্রতিফল-মুখীন। কিন্তু ডিরাকের এই 'Anti-matter'-এর ধারণা বিজ্ঞান মনীষার মনন-গ্রাস্ত নয়।—বায়ুশূন্য আকাশে কোন জড়বস্ত অনিবার্য ধর্মে মাটির দিকে নেমে এলেও সম-প্রোক্ষিতে কোন 'Anti-matter' উর্ধ্বমুখীন হ'য়ে ছুটেবে। শক্তি প্রয়োগের ফলে শক্তিশীল কোন জড়বস্ত শক্তির অভিমুখেই গতিচ্ছন্দী হয়ে ওঠে; কিন্তু ডিরাক তাঁর অহুসারে কোন 'Anti-matter' শক্তি প্রয়োগের প্রতিফল অভিমুখেই চলবে। ডিরাকের সিদ্ধান্ত অহুসারে মহাশূন্তের বিশাল ব্যাপ্তিতে অবিচ্ছিন্ন গতিতে এই 'Anti-matter' থেকেই 'Matter'-এর অবিরাম স্রষ্টি

হচ্ছে। দুর্কোষ বলেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক ডিরাকের এই 'Anti-matter' তত্ত্বকে উনিশ শতকের 'Ether' কল্পনার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

পদার্থ বিজ্ঞানীর জটিল বিজ্ঞানসার মুহুর্তে জ্যোতি-বিজ্ঞানী নূতনতর তাত্ত্বিক সমীক্ষা অর্জিত 'সত্তত সঙ্গ্রসারণশীল বিশ্বের' (Expanding Universe) সিদ্ধান্ত নিয়ে এলেন। মহাশূন্তে ছড়ান নীহারিকা পুঞ্জের বর্ণালী—অহুশীলন এই সত্য প্রকাশ করল যে, নীহারিকা পুঞ্জ অবিরাম অনির্গদ গতিতে মাহুশের দৃষ্টি সীমা পেরিয়ে ছুটে চলছে এবং এই প্রতিক্রিয়ার ফলেই বিশ্ব জগতের অবয়ব অবিচ্ছিন্ন বর্জিত হয়ে চলছে। এই 'প্রক্রিয়ার' স্রুত হিসাবে জ্যোতি-বিজ্ঞানী আবিষ্কার করলেন যে, নীহারিকা এবং নক্ষত্রবিজির অদৃশ্য অন্তরে প্রোটন এবং ইলেকট্রনে গঠিত আদিম জড়কণিকা হাইড্রোজেন পরমাণুর অবিরাম স্রষ্টি হচ্ছে। এই অভিজ্ঞানে এ কথাই প্রমাণিত হলো যে, হাইড্রোজেন, প্রোটন ও ইলেকট্রন শক্তিকণিকা ফোটনের প্রাথমিক মুহুর্ত শূন্য আকাশেই খনিয়ে আসছে, স্রুতরাং 'শূন্য আকাশ'কে আর শুণ্য মাত্র 'অনন্ত শূন্য' বলে মেনে নেওয়া যায় না, তাকে শক্তি ও জড়কণিকা স্রষ্টির উৎসসার হিসাবে স্বীকার করতেই হয়। মহাশূন্তের এই 'উৎসসার' থেকে উৎপন্ন অহুস্রুত শক্তি ও জড়কণিকার চাপ সঙ্গ্রসারের কারণেই শূন্যের নীহারিকা পুঞ্জ অবিরাম সীমানা পেরিয়ে ছুটে চলেছে। আকাশ-বিজ্ঞানসার ভারতীয় দার্শনিক মনীষার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান মননার এখানেই মিল খুঁজে পাই।

খৃষ্টপূর্ব ৫ম—৮ম শতাব্দীতে ভারতীয় দার্শনিক মনীষা 'তন্মাত্র' রূপে স্রুজভাবে এবং মহাভূত হিসাবে স্থূলভাবে ও অন্যান্য তন্মাত্র মহাভূত সমূহের উৎস-কারণ রূপে আকাশকে অভিহিত করে একটি অপূর্ণ বিজ্ঞান নির্ভর প্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে। উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিকের 'Ether' পরিকল্পনা, বৈজ্ঞানিক মর্লি ও মিকেলসনের গবেষণা-লব্ধ সিদ্ধান্ত এবং নতুন প্রোক্ষিতে আইনস্টাইনের অর্জিত অভিজ্ঞানের ভেতর দিয়ে

বৈশেষিক প্রণেতা কশ্যপ, স্মার ও বৌদ্ধ দর্শনের সত্যই প্রমাণিত হলো; অন্য প্রেক্ষিতে, আধুনিক জ্যোতির্-বিজ্ঞানীর গবেষণায় সাংখ্য ও পাণ্ডুল্ল-দর্শন অভিমতই প্রতিষ্ঠিত হলো। বৈদ্যাস্ত এবং যোগবাবাউকের সিদ্ধান্ত ইয়েই যেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক ডিগ্রাক বলছেন যে, বিপরীত জড়ধর্মী সত্য (Anti-matter) পূর্ণ 'শূন্যতা' (Space) থেকেই আবিষ্কার গতিতে জড়ধর্মী কণিকার সৃষ্টি হচ্ছে।

॥ শক্তি-উৎস : দর্শনে এবং বিজ্ঞানে ॥

ভারতীয় দর্শনে জড় ও শক্তির আবিষ্কার মেল-বন্ধন এবং পারস্পারিক, রূপান্তরণ আলোচনা দেখতে পাই। ভারতীয় বৈদিক সাহিত্য এবং দর্শনে সৃষ্টিতত্ত্বের অপূর্ণ ব্যাখ্যায় এই সত্যের নিদর্শন মিলবে। ভারতীয় দার্শনিক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ক্রিতি, অপ তেজ, যক্ষ্ম এবং যোম—এই পাঁচটি উপাদানের সামগ্রিক আন্তর রচনার ফলেই দৃশ্যমান বস্তু বিশ্বের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। প্রাচ্য-দার্শনিক মনীষা-ভাবিত এই 'পঞ্চভূত' তাত্ত্বিক প্রজ্ঞান অমুসারে 'ভূত' সমূহকে 'সূক্ষ্ম' ও 'স্থূল' বিভাগে করনা করে উভয়কেই 'তন্মাত্র' ও 'মহাভূত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্য এবং দর্শনে 'ভূত' শব্দকে জড় বা জীব অথবা যে কোন পদার্থের সংজ্ঞা নিরূপণ-মানীয় শব্দ রূপেই নির্ণীত করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে 'তন্মাত্র'কে মহাভূতের স্বত্বক শক্তি রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

আসন্ন আলোচনার প্রেক্ষিতে এখন প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক সাময়িক প্রেক্ষাপট দেখে নিতে হবে। ভারতীয় সাহিত্য দর্শনে 'বেদ'-কেই প্রাচীনতম রচনা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। এই 'প্রাচীনতা' কেবল প্রাচ্য ক্ষেত্রেই সমীহ অর্জন করে নি, বিশ্ব মনীষার কাছ থেকেও শ্রদ্ধা স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বেদ সমূহে 'ঋক'-বেদই প্রাচীনতম কালে গ্রন্থিত; স্মৃত্যং ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির আগরণ তারও পূর্ণ কাল থেকে। ভিজাসার এই প্রেক্ষণ থেকেই ঐতিহাসিকেরা 'বেদ'

রচনা কাল নির্ণয় করতে প্রচেষ্টা নিয়েছেন। মনীষী ভারততত্ত্ববিদ ম্যাকসম্যুলায় 'ঋক' বেদের কাল ষ্টুপূর্ব দশ থেকে বারো শতাব্দী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু, নিছক অমুমানের ওপর নির্ভর করেই ম্যাকসম্যুলায় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা উন্নত আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার বর্জিত হয়েছে। কিন্তু, ম্যাকসম্যুলায়ের এই অভিমত 'সংস্কারের' মত কিছু পাশ্চাত্য মননাকে সংক্রামিত করেছে বলেই তাঁরা ঋক-বেদকে অধিকতর প্রাচীন কালের বলে আর মেনে নিতে পারছেন না। শ্রদ্ধেয় জর্মান মনীষী ভিনটারনিটস্ ষ্টুপূর্ব তিন হাজার বছর থেকে শুরু করে ষ্টুপূর্ব আট শতক অবধি বৈদিক যুগের সীমা রেখা টেনেছেন। কিন্তু তাঁর এই কাল নির্ণয়ও কোন নিশ্চিত প্রমাণ নির্ভর নয়। প্রাচ্য মনীষী তিলক তাঁর 'গীতা রহস্তের' প্রসঙ্গিত আলোচনায়, বিস্তৃত প্রেক্ষিতে, চার হাজার পাঁচ শত বছরের কম নয় বলেই ঋক বেদের কালের স্বীকৃতি দিয়েছেন। সমীকরণ ফলশ্রুতির মতন যদিও এই কাল-সীমা বিদ্বৎজনের মতৈক্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তবুও, মনীষী তিলকের এই অভিমতকেই অধিকতর ক্ষেত্রেই মেনে নেওয়া হয় এবং এই অমুসারে বেদ, ব্রহ্মণ, সংহিতা, আরণ্যক এবং উপনিষদের রচনা কাল ষ্টুপূর্ব ষোল শতক অবধি সীমিত হয়। ভাবতে বিন্ময় লাগে, এই সুপ্রাচীন আরণ্যক এবং উপনিষদের যুগেই যুগপ্রায়ী মনীষা এই 'পঞ্চভূততত্ত্ব' অর্জন করেছিল।

এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে, উপনিষদেই ভারতীয় দর্শন মননার পরম প্রকাশ ব্যঞ্জিত হয়েছে। ঐতিহাসিক প্রহ্ননায় একশো আট খানা উপনিষদের কথা জানতে পারলেও এগার খানা উপনিষদই বহুশ্রুত, এবং সমালোচকরা বলেন যে, নারায়াদী দার্শনিক শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্র এবং গীতাভাষ্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে পরিমার্জিত রূপে এই এগার খানি উপনিষদও 'লিখিত' ছিলেন। এই উপনিষদ তালিকার 'দশম' তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'পঞ্চভূততত্ত্বের' বিরোধিতা আলোচনা দেখতে পাই। একটি বার্ষিক উদাহরণ তুলে নিলে আমাদের আলোচনা আরও পরিষ্কার হবে:

১. তত্ত্বাধা এতদ্বাদান আকাশ: সত্ত্বত:।

আকাশাধাযু:। বায়োরগি:। আরেরাপ:।

অভ্য: পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়:। ওষধী-

ভোয়ম্। অন্নং পুরুষ:।

আত্মা থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ুর মত, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী এবং পৃথিবী থেকে ওষধির উৎপত্তি হয়েছে।—এই ওষধি থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়ে পুরুষের সৃষ্টি করেছে।

মৈত্রী এবং পৈঙ্গল উপনিষদও ‘পঞ্চভূততত্ত্বের’ আলোচনা করেছে। আমরা একটি উদাহরণ হুলে নিতে পারি:

১. অথ পঞ্চমহাভূতানি ভূতশব্দেনোচ্যতে; পঞ্চত-  
গ্নাত্মা ভূতশব্দেনোচ্যতে।

পাঁচটি ভূত মহাভূত শব্দের দ্বারা নির্দেশিত হয়;—  
এবং,

পাঁচটি তত্ত্বাত্মা ভূত শব্দের দ্বারা নির্দেশিত হয়।

উপনিষদ-উত্তর দিনে সাংখ্য দর্শনও এই তত্ত্বের  
অনুসারে আলোচনা করেছে। এই প্রসঙ্গে সে আলোচনা  
অনিবার্য স্বরণ-সাপেক্ষ বলে মনে করি।

কপিল প্রণীত সাংখ্য দর্শনের রচনা কাল সম্পর্কে  
কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছন যায় নি। বিজ্ঞানভিক্ষুর  
‘সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য’ এবং মধ্যচার্য কৃত ‘সংদর্শন সংগ্রহে’  
সাংখ্যের উল্লেখ থেকে এ কথা অনুমান করা যায় যে,  
চৌদ্দ শতকের পরে কিছুতেই ‘সাংখ্য’ বিচিহ্ন হ’তে পারে  
না। আচার্য শংকরও সাংখ্য-মত খণ্ডন করেছিলেন,  
সুতরাং, সাংখ্যের কালপ্রাচীনত্ব কোন সংশয় উচ্চারণ  
করা যায় না।

সাংখ্য অনুসারে—সত্ত্ব, রজ: এবং তম:—তিনের  
সামন্বয়িক সাম্য থেকেই প্রকৃতির আবির্ভাব ঘটে। এই  
প্রকৃতি দু’ভাবে রূপান্তরিত হবার ফলে প্রথম পর্যায়ে  
‘মহৎ’ বা ‘মনীষা’ (intelligence) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে  
‘অহংকারের’ সৃষ্টি করে। এই ‘অহংকার’ থেকেই পাঁচটি  
জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচ ‘তত্ত্বাত্মা’-র সৃষ্টি,  
—এবং এই পাঁচ ‘তত্ত্বাত্মা’ থেকেই মহাভূতের বা

বস্তুবিশ্বের সৃষ্টি হয়। এসব—স্বার্থক উদাহরণ হুলে  
নিচি:—

১. সত্ত্বরজতমসাম্ সাম্যাবস্থায় প্রকৃতিঃ;  
প্রকৃতের্মহান্; মহতোহহংকারোহহংকারায় পঞ্চতত্ত্বাত্মাত্ম-  
ভয়মিদ্ভিঃ—তত্ত্বাত্মাত্মাং স্থলভূতানি—, ইত্যাদি।

ভারতীয় দর্শন যেমন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দ-  
‘তত্ত্বাত্মা’-কে পাঁচটি সূক্ষ্ণভূত নামে অভিহিত করেছে,  
তেমনি, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীকে পাঁচটি  
মহাভূত রূপে চিহ্নিত করেছে। ভারতীয় দর্শন মনীষা  
স্থলভূতকে জড় পরমাণুর সাম্য-প্রকৃতি হিসেবে মেনে  
নিয়ে সূক্ষ্ণভূতকে তাদের অন্তর্নিহিত গুণাত্মিক শক্তি রূপে  
অভিহিত করেছে। অতএব, ‘তত্ত্বাত্মা’ হ’তে মহাভূতের  
উৎসারণ ঘটছে—এই উচ্চারণ নিহিত স্বচ্ছ অর্থ হচ্ছে  
যে, শক্তি থেকেই জড়ের উৎপত্তি অনিবার্য হয়ে উঠছে।  
ভারতীয় দর্শন এই প্রজ্ঞান অনুসারেই জড় ও শক্তির  
আবিষ্কার মেলবন্ধন রচনা করেছে।

কিন্তু আরণ্যক থেকে সাংখ্য অব্যবহিত এই  
‘পঞ্চভূততত্ত্ববাদ’ উত্তর দিনে বৈশেষিক, জায়, চার্বাক  
এবং বৌদ্ধ দর্শনে এক নতুন বাঁক নিয়েছে। কণাদ,  
গৌতম, চার্বাক এবং বৌদ্ধদার্শনিক আকাশকে ‘ভূত’  
বিশেষ রূপে গণনা করেন নি। তাঁরা ‘ব্যোম্য’ বস্তু  
ক্ষিত, অপ, তেজ এবং মক্খং এই চারটি মহাভূত থেকে  
দৃষ্টমান বস্তু বিশ্বের আবির্ভাব কল্পনা করেছেন। তাঁদের  
প্রবর্তিত এই নতুন ভাবনাকে ‘চতুর্ভূততত্ত্ব’ নামে অভিহিত  
করা যায়। ভারতীয় দার্শনিকদের এই ‘চতুর্ভূততত্ত্ব’  
প্রসঙ্গে গুপ্তপূর্ণ পাঁচ শতকের গ্রীস-মনীষী ‘এম্পিডো-  
ক্লিসের’ কথাও চলে আসে, সমকালীন গ্রীসে তিনিও  
‘চতুর্ভূততত্ত্বের’ প্রবর্তন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে  
এখানে একটি প্রশ্নের উত্তর রেখে যাওয়া বাঞ্ছিত বলে  
মনে করছি।

আধুনিক ঐতিহাসিক অনুশীলনে ভারতীয় বৈদিক  
সাহিত্য দর্শনের প্রাচীনত্ব ম্যাক্সম্যুলার-নির্ণয় কালকে  
পেরিয়ে গেলেও যেমন কিছু পশ্চিম দেশের পণ্ডিত-  
সমালোচকেরা সংস্কার বশত: তাকে মানতে পারছেন না



ভেদে অনেক পণ্ডিতও খ্রীস্ট-মনীষী 'এম্পিরিওলজিস'-কে সামনে রেখে বলছেন যে, ভারতীয় দার্শনিক মনীষার এই মহাভূতভঙ্ক খ্রীস্ট থেকেই সমাহৃত। কিন্তু, এই বিশ্বাস এবং মন্তব্যের মধ্যে অন্ধ আবেগ এবং অকারণ মানসিক অন্ধমতা ছাড়া কোন ঐতিহাসিক ভাষ্যের সত্য নিহিত নেই। প্রকৃত মনীষী এম্পিরিওলজিস্ট গৃহপূর্ণ পাঁচ শতকে তাঁর অহুশীলন অর্জিত মতবাদ প্রবর্তন করেন; কিন্তু ভারতীয় দার্শনিক মনীষা গৃহপূর্ণ ষোল শতকের পরেই 'মহাভূতভঙ্ক' ঘোষণা করেন। সাংখ্য-উত্তর দিনের দার্শনিক কণাদ, গৌতম, চার্বাক এবং বৌদ্ধ দার্শনিক 'তন্মাত্র-আকাশ'-কে তন্মাত্র ও মহাভূতের স্বক স্বাক্ষর হিসাবে কল্পনা করার প্রজ্ঞান-গভীরতাকে ছুঁয়ে যেতে পারেন নি; এমন কি সমকালীন খ্রীস্ট-দার্শনিকও নয়; কিন্তু চৈনিক দার্শনিক সু-চিং হু' হাজার হু'শ বছর আগেই এই 'পঞ্চভূত-ভঙ্ক' মৌলিক বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর রচনায় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলছে। মনে হয় চার হাজার পাঁচ শ' বছর আগে উত্তর দার্শনিক মনীষার প্রতিকলন থেকে চীন-মনীষীও দূরত্ব হতে পারেন না।

ভারতীয় দর্শনের জড় ও শক্তির অবিচ্ছিন্ন মেলবন্ধন কল্পনার বৈজ্ঞানিক অহুশীলন অর্জিত সমর্থন নিয়ে প্রথম বিজ্ঞানী আইনস্টাইন এগিয়ে এলেন। আধুনিক বিজ্ঞান জগতে তিনিই প্রথম জড় ও শক্তির অবিচ্ছিন্নতা এবং ভাদের পারস্পরিক রূপান্তরনের তত্ত্ব প্রচার করেন। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণায় জানতে পারা গেল যে, বিশেষ অবস্থায় তরঙ্গধর্মী শক্তি কণিকাধর্মী জড়ের মত এবং কণিকাধর্মী জড় তরঙ্গধর্মী শক্তির সদৃশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। অহুশীলনের ভেতর দিয়ে এই সত্য অর্জিত হ'লো যে, জড়ের বিনশনের ফলেই শক্তি উৎপত্তির উৎস গুলে যায়। গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকরা সাক্ষরভাবে শক্তি কণিকা বা গামাশক্তি থেকে (X-rays) ইলেকট্রন ও পজিট্রন মুখ্য জড়কণিকা সৃষ্টির সকল দৃশ্যতা অর্জন করলেন। আইনস্টাইন প্রবর্তিত মতবাদ অনুসারে, জড় ও শক্তির পারস্পরিক রূপান্তরের

সমীকরণ এই সত্যই প্রকাশ করে যে, ন্যূনতম ক্ষুদ্র অসুখিত জড়কণিকা বিপুল শক্তি রাশির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত ও সক্রিয় হতে পারে। পারমাণবিক এবং হাইড্রোজেন মাধ্যম আবিষ্কারের ভেতর দিয়ে এই সমীকরণ অর্জিত সত্যের নিদর্শন মিলল। কিন্তু, জড় কণিকা থেকে বিপুল শক্তির রাশির উৎপন্ন-কৌশল বিজ্ঞানীদের করায়ত্ত হ'লেও শক্তি থেকে বিপুল পারমাণবিক জড়সৃষ্টির সভাব্য তোরণ এখনও আধুনিক বিজ্ঞান মনীষার সীমারত হ'য়ে ওঠেনি।

॥ পদার্থের মৌলিকত্ব জিজ্ঞাসা : দর্শনে ও বিজ্ঞানে ॥

ভারতীয় দর্শন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রান্ত থেকে পদার্থের মৌলিকত্ব জিজ্ঞাসা এসে পড়ছে এবং এই জগতেই এসে পড়ছে যে, অনেক অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রামাণিক সত্যের পাথেয় নিয়ে ভারতীয় দর্শন মনীষাকে সমালোচনার উপাদান হিসাবে নির্ণয় করা হ'চ্ছে। পদার্থের যৌগিক ও মৌলিক স্বরূপ-নির্ণীত হবার পর এ প্রশ্ন আরও অগ্নি হতে আসে।

মানুষ ইতিহাসের আদিম উষ্মা মুহূর্ত থেকে দৃশ্যমান জগতের বস্তুরাশির মধ্যে একটি ক্রমিক শৃঙ্খলা-আবিষ্কারের চেষ্টা করে আসছে। সেই পুরোনো জিজ্ঞাসা আর উত্তর সন্ধানের অনিবার্য প্রয়াস আর উত্তরণকে পাথেয় করেছে আধুনিক বিজ্ঞান সুসম-পরিণীত অর্জন করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের এই উজ্জল মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা সভ্যতার ইতিহাসের আদিম মুহূর্তের ভারতীয় দার্শনিকদের বিশিষ্ট বিজ্ঞান প্রতিভার উত্তরণ দেখে বিস্মিত হই।

ভারতীয় দার্শনিক বিজ্ঞান মানস পাঁচটি বিশিষ্ট উপাদানে দৃশ্যমান বস্তু জগৎ নির্ণীত হয়েছে বলে বর্ণনা করলেও 'মাটি, জল ও বাতাস'-কেই বস্তু-বিষয়ের 'মূল' উপাদান-পদার্থ রূপে গণ্য করে আসছে; কিন্তু কখনও তাদের 'মৌলিক' পদার্থ রূপে অভিহিত করে নি। কারণ জল, মাটি এবং বাতাস এই বস্তু-জগতের উপাদান জেনেই তাঁরা জানার অবসান মেনে নেন নি। তাই, বিশ্ব নির্মিতের গভীরতর সত্য সন্ধান এবং দৃষ্ট পদার্থের

প্রভাৱে নিহিত মৌল শক্তি-অভিবেশ অহুশীলন করেই ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক কণাদ তাঁর পরমাণু 'তত্ত্বের' রচনা করেছিলেন। কণাদের পরমাণুতত্ত্বের প্রসঙ্গেই গ্রীক-মননীর ডিমোক্ৰিটাসের পদার্থের মৌলিক মৌলিক কণা পরমাণুর কল্পনা'র কথা মনে আসে।

ভারতীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিকরা তাঁদের নির্বাচিত বিশ্ব-নির্মিত্যের উপাদানগুলিকে 'মূল' বলে গণ্য করলেও 'মৌলিক' বলে অভিহিত করেন নি। এদিক থেকে তাঁদের বিজ্ঞান-গবেষণার আদর্শ মৌলিকতা অহুমান করা যায়। বৈশেষিক দার্শনিক কণাদের কথামুখ্যত্বতে আমরা 'মূল' পদার্থকে কোন 'গঠিত পদার্থের-উপাদান-কারণ' বলতে পারি, কিন্তু 'মৌলিক' পদার্থকে কখন-ই 'উপাদান কারণ' বলতে পারি নে। 'মৌলিক' পদার্থ স্ব-স্বভাবে অবিচ্ছিন্ন এবং অবিভাজ্য। 'পানীয় চা এবং সোডা ওয়াটারের' 'মূল' উপাদান 'গুঁড়ো চা এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস'; কিন্তু, সোনা, ব্রোমিন এবং নাইট্রোজেন স্ব-স্বভাবে অবিচ্ছিন্ন-অবিভাজ্য 'মৌলিক'-পদার্থ। 'মূল'-পদার্থ কখনও কখনও আনুমানিক উপাদান সহযোগে নতুন পদার্থের সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু, 'মৌলিক' পদার্থ সম্পূর্ণ বিসৃষ্ট অথচ একটি মাত্র উপাদানে গঠিত এবং যা থেকে আর কোন উপায়েই দ্বিতীয় ধর্ম বিশিষ্ট কোন উপাদান-ই বের করা যায় না। আধুনিক বিজ্ঞান, তাই পদার্থ শ্রেণীকে শুধু মাত্র 'পদার্থ' বা 'Matter' বলে মেনে নিতে পারে নি, পদার্থ শ্রেণীকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। বিসৃষ্ট পদার্থকে মৌলিক পদার্থ বা 'Element' বলা হয়েছে এবং অ-বিসৃষ্ট পদার্থকে যৌগিক পদার্থ বা 'Matter' বলা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, যৌগিক পদার্থকে আবার পরীক্ষা করে 'রাসায়নিক যৌগ' এবং 'যান্ত্রিক মিশ্রণ' তথা 'কেমিক্যাল কম্পাউন্ড (Chemical Compound) এবং 'মেকানিক্যাল মিক্সচার' (Mechanical Mixture) বলা হয়েছে। ভারতীয় দার্শনিক বৈজ্ঞানিকেরা 'মূল' এবং 'মৌলিক' শব্দ দু'টির এবং প্রয়োগিক, ব্যবহারিক এবং শাস্ত্রাধিক আকাশ-মাটি ব্যবধান বিস্মৃত হন নি; তাঁদের

এই অ-বিসৃষ্টি আদ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সত্যের পরিণতি অজ্ঞান করেছে।

ষ্টপূর্বাব্দের ভারতীয় দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকের এই 'পদার্থবিশ্বাস' কিন্তু ষ্টপূর্ব-উত্তর পশ্চিমী বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বাস করেন নি। আঠার শতকের শেষার্ধ্বে অবধি তাঁরা এই পদার্থগুলিকে মৌলিক-পদার্থের মর্যাদার অভিহিত করে এসেছেন। কিন্তু, ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কনাসী বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়সিয়ের এবং ক্যাভোণ্ডিশের এবং উত্তর দিনে ল্যাভয়সিয়েরের একক সার্বিক আবিষ্কারের ফলে জল ও বাতাসের যৌগিক স্ব প্রমাণিত হ'লে অহুমানের মোহ মুক্তি ঘটে। জল ও বাতাসের সত্য আবিষ্কারের পরে 'মাটি'-রহস্তও আর অজ্ঞাত থাকে নি, রহস্তের অন্তরাল থেকে 'সিলিকন' ও 'গ্র্যানুলামিনয়মের' স্বরূপ-সত্য আবিষ্কৃত হ'য়েছে।

সভ্যতার আদিম উষা মুহূর্ত থেকে পৃথিবীর মানুষ গঠিত পৃথিবীর উপাদানকে জানার অন্তহীন জিজ্ঞাসা নিয়ে আসছে। গত দু'শতকেরও বেশি সময়ের বিজ্ঞান সাধনায় জানা গিয়েছিল যে, অতীত ষ্টপূর্ব পাঁচটি মূল উপাদানে নয়, বিরানব্বইটি মৌলিক উপাদান-ই এই বস্তুরাশির বিচিত্র সমাজ গড়ে তুলেছে। কিন্তু বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেল যে, অজস্র বস্তুরাশির এই পৃথিবী মাত্র দ্বি-বিধ প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক পদার্থে গঠিত হয়েছে।—এর পরেও বৈজ্ঞানিক অহুসন্ধান পদার্থের স্বরূপ অন্বেষণে ছেদ টানে নি। অহুসন্ধান প্রমাণিত হ'লো যে, পদার্থের অন্তিম প্রকৃতি ও পরিচয় মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সীমানার ধরে নেওয়া যায় না। এই নূতনতর অভিজ্ঞাত পরিচয় বৈজ্ঞানিকের কাছে কোন নতুন দিগন্ত রহস্ত বহন করে আনবে বিজ্ঞান তা' জানে না।

॥ দেশকালের অহুমতি : সাময়িক অহুশীলন ॥

প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক সত্যে এ কথা অনিবার্য স্বীকার্য যে, দেশকালের প্রকৃত অস্তিত্ব মেনে নিয়েই বিজ্ঞান সারকেরা জড় বিজ্ঞানের বিপুল বিচিত্র সৌধ নির্মাণ করে তুলেছেন। কিন্তু সত্যি সত্যিই দেশকালের

কোন বাস্তব সত্তা নেই; এই সত্তা ‘অস্তিত্বের’ প্রজ্ঞান বৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধি ব্যঞ্জিত, আনুভূতিক বা নির্ণিকর প্রজ্ঞা (Intuitionality) উৎসারিত। এই প্রজ্ঞান অনুপস্থিত বিজ্ঞান অনুশীলনের উত্তরণ বস্তাব্য ছিল না। বিজ্ঞান সাধকেরা তাঁদের ইন্দ্রিয় অনুভূতি অর্জিত তথ্য ও অভিজ্ঞতাকে দেশ-কালের পটভূমিতে সাজিয়ে এই বৈতথ্যোক্তার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করেন। এই পারস্পরিক সম্পর্ক নির্মিতের ফলে এই একটি বৈজ্ঞানিক সত্তার আবির্ভাব সম্ভব হয়ে ওঠে। সুতরাং দেশ-কালের ‘অনুভূতি’ ‘প্রজ্ঞান’ বিজ্ঞান সাধনায় অপরিহার্য। ভারতীয় দর্শন ও আধুনিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান সাধনায় এই অপরিহার্য প্রজ্ঞানকেই অঙ্গীকার করেই গড়ে উঠেছে।

‘ভারতীয় দর্শন বর্ণিত ‘তত্ত্বাত্ত্ব’ বা আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকৃত ‘অবপরমাণু’ (infraatomic particle) যদি দেশ-কাল ও কার্যকারণ সূত্রের প্রেক্ষিতে স্থাপিত না হয় তা’ হ’লে এই ‘তত্ত্বাত্ত্ব’ বা ‘অবপরমাণু’ আমাদের বুদ্ধিগ্রাস্য হবে না—পাতঞ্জল ব্যাসভাষ্যের এই উচ্চারণ মুহূর্তেই বুঝে নিতে পারি যে, দেশ-কাল ও কার্যকারণের সীমার মধ্যে ধরতে না পারলে কোন জড়কণিকার ধারণাই আমরা অর্জন করতে পারব না! এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতার প্রক্ষেপে একটি সার্থক উদাহরণ হুলে নিতে পারি :—

১. জড় ভূতস্থলস্থ অতিব্যাক্ত বস্তুকে দেশকাল-নিমিত্তভাবাবিচ্ছিন্নে—

‘দেশ’ অব্যবহৃত (Position in space), ‘কাল’ অব্যবহৃত (Position in the time series) এবং ‘নিমিত্ত’ অব্যবহৃত (Position in the causal series) অবস্থায় মুহূর্ত্ত কণিকার আভ্যন্তরীণ ব্যঞ্জিত হয়।

‘দেশ-কাল’ সম্পর্কে এই অনিব্যাহৃত উচ্চারণ সত্ত্বপে পাতঞ্জল দর্শন তার কোন সত্ত্ব বাস্তব সত্তা স্বীকার করে নি—তাকে ‘সাম্যবোধে নির্বিকল্প প্রজ্ঞা’ (Empirical intuitionality) রূপে অভিহিত করেছে। সাম্যবোধ দর্শনেও পাতঞ্জল অনুশীলনেরই অনুপ্রাণন শুনে পাই।

কিন্তু জ্ঞান, বৈশেষিক এবং চরক সংহিতায় এই মতানুসৃতের প্রতিফল প্রতিভাস দেখতে পাই। জ্ঞান এবং বৈশেষিক—‘দেশকালের’ সত্ত্ব বাস্তব সত্তা স্বীকার করেছে এবং চরক সংহিতা তাকে দ্রব্যপঞ্জাবাচক অর্থে অভিহিত করেছে। চরকভাষ্যে—

১. স্বাদীভাষ্য মনঃ কালোদিশশ্চ জ্বা সংগ্রহঃ।’  
—পাঁচটি মহাবৃত্ত, আত্মা এবং মন, দেশ-কাল—সবই জ্ববোর সদর্থ বাচক।

আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসেও দেশ-কাল সম্পর্কে পারস্পরিক বিরোধী আলোচনাও দেখতে পাই যদিও বিজ্ঞানেয় সত্যসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, ‘দেশ-কাল’ বিজ্ঞান সাধকের বুদ্ধি ব্যঞ্জিত আনুভূতিক সত্তা—তবুও বৈজ্ঞানিক ডিগ্রাক বলেছেন যে, দেশ (space) হচ্ছে এক বিপরীত জড়ধর্মী সত্তায় পরিপূর্ণ এবং তা থেকেই অবিরাম আব্যবহৃত গতিতে জড়ধর্মী কণিকাপুঞ্জের সৃষ্টি হচ্ছে। ডিগ্রাকের এই ‘Anti-matter’ ভিত্তি বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধিগ্রাস্য নয়।

‘ভারতীয় দর্শনে ‘দেশ’-এর দু’টি অস্বীকার্য অঙ্গ—‘ব্যাপ্ত’ ও ‘দিকের’ পর্যালোচনাও হয়েছে। নিরব্যবহৃত সর্বব্যাপ্ত মতানুসৃতের মধ্যে উদাহরণ নিম্নবর্ণিত আকারের পদার্থ সংগ্রহের পারস্পরিক যোগ থেকেই ‘দিকধর্মী’ দেশের ধারণার উৎসারণ ঘটেছে। যদিও ‘দিক’ হিসাবে দেশের কোন ব্যবহারিক একক নেই, তবুও ‘ব্যাপ্ত’ হিসাবে তার এককের ব্যবহার করা যায়। সংঘটন পরস্পরায় শৃঙ্খলা বোধ সত্ত্বাত্ত্ব ‘ক্ষণ’ বা ‘মুহূর্ত্ত’-কে কাল পারমাপক ‘একক’ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

॥ কার্যকারণবাদ : প্রেক্ষিতের দর্শন ও বিজ্ঞান ॥

সাহিত্যে-দর্শনে রাজনীতি-সমাজনীতি, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, নীতি বিজ্ঞান, শিল্প এবং সঙ্গীতে আমরা সৃষ্টির এক অন্তর্ধান হুসম প্রবাহের ছন্দ শুনে চলি। আমাদের কাল-ক্রমিক মুহূর্ত্ত মননার এবং জীবনার বিচিত্র আনুভূতিক ব্যঞ্জনাই সক্রিয় অস্তিত্বের উপলব্ধি বহন

করে আনছে এবং এই সক্রিয় আন্তঃকরণ প্রবণতাই জীবন হ্রস্ব প্রবাহের অন্তর্হীনতা প্রদর্শন করে তুলছে। ভারতীয় জীবন বেদের অর্থও বিশ্বাস, সক্রিয় আন্তঃকরণ এই অন্তর্হীন প্রবাহমানতা প্রাণী জগতের সীমানা পেরিয়েও সক্রিয় গতিশীল রয়েছে এবং তাই-ই সৃষ্টির আন্তঃকরণ অন্তর্হীন। চিরন্তন শক্তি। জীবন সত্যের এই প্রত্যক্ষ বিবাস থেকেই দার্শনিক 'কার্যকারণবাদ' অর্জন করেছেন।

যে উপাদান কিছু সৃষ্টি করে তাই-ই সৃষ্টি বিষয়ের 'কারণ' এবং এই অর্থে 'কারণ-ই' সকল কাজ এবং সৃষ্টি-প্রবাহের মৌলিক উপাদান। কাজ উৎপন্ন হবার পূর্বে 'সং', 'কারণ'কে আশ্রয় করেই তাকে 'সং'এর আন্তঃকরণ অর্জন করে নিতে হয়।

এই মুহূর্তে যা' ঘটছে তার 'কারণ' হ'লো সংঘটিত ঘটনার প্রাক মুহূর্তিক ঘটনা এবং বর্তমান ঘটনাই তার অব্যাহিত পরবর্তী 'কারণ', এই তত্ত্বকেই, দর্শনে এবং বিজ্ঞানে, 'কার্যকারণবাদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই নিয়মকেই, কোথাও কোথাও 'হেতুবাদ' নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

নিরীক্ষণবাদী সাংখ্য দার্শনিক কপিল 'কার্যকারণ-বাদ' বা 'হেতুবাদ'কে স্বীকার করে নিয়েছেন। সাংখ্য দার্শনিক সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অন্তর্লীন আলোচনা করতে গিয়ে শক্তির সংরক্ষণ এবং রূপান্তর নিয়ম (Law of Conservation and transformation of energy) প্রসঙ্গে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রসঙ্গিত আলোচনার অন্তিম অভিমত এই যে, বিশ্ব জগতের ক্রমায়ত অভিব্যক্তি মুহূর্ত মাত্রও থেমে যেতে পারে না, কারণ, তার অর্থ হ'লো হ্রাসিত জীবন ও গতির নিঃশেষ বিনশন। দর্শনের এই জটিল তাত্ত্বিক আলোচনা কেবল দার্শনিকের বিচিত্র সৃষ্টির উপাদানই হয়ে ওঠে নি, রবীন্দ্রনাথের জীবন বাণীর অন্তর্লীন হ্রস্ব-স্রবেরও রচনা করেছে। কিন্তু সৃষ্টির এই ক্রমাব্যক্তি মুহূর্ত মাত্র না ধামলেও এই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার উৎস শক্তির পরিমাণ অব্যাহত থাকে বলেই কার্য সমষ্টির শক্তি

কারণ সমূহের মধ্যে নিহিত থাকে। বিজ্ঞানভিত্তিক সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য এবং ব্যাসভাষ্য এ প্রসঙ্গে স্বচ্ছ আলোচনা করেছে।

সাংখ্য এবং পাতঞ্জল দর্শনে মৌলিক পার্থক্য বেশি নেই, যেমন নেই ভায় এবং বৈশেষিক দর্শনেও। সৃষ্টিতত্ত্ব এবং বিশ্ববীক্ষণের প্রেক্ষিতে সাংখ্য পাতঞ্জলের সাদৃশ্যতাই সহজ দৃষ্ট, কিন্তু ভায় বৈশেষিকের সঙ্গে তেমন কোন মিলে খুঁজে পাওয়া যায় না। সাংখ্য ভাষ্যের হেতু বা কার্যকারণবাদ তাই প্রায় বৈশেষিকে ভিন্নায়ত আলোচনার প্রেক্ষিতে গৃহীত হয়েছে। ভায় বৈশেষিক 'কার্য' ও 'কারণের' বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র সত্তা কল্পনা করেছে।

যদিও কণাদ এবং গৌতম 'তিন' কারণের উল্লেখ এবং আলোচনা করেছেন, তবুও ভারতীয় দর্শনে উপাদান বা সমবায়ী (Material Causes) এবং নিমিত্ত কারণ (Efficient Causes)—এই দুই কারণেরই সাধারণ স্বীকৃত আলোচনাই দেখতে পাই। উৎপন্ন-পূর্ব কার্য উপাদান বা সমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণের সক্রিয় সমন্বয়ের ভেতর দিয়েই দৃষ্ট আন্তঃকরণ রূপান্তর অর্জন করে। কলে এবং কারখানায় অবিরাম স্রুতো থেকে কাপড় এবং তিল থেকে তেল উৎপাদিত হচ্ছে। এখানে, স্রুতো এবং তিল উপাদান বা সমবায়ী কারণ,—(Material Causes) তিল কাপড় এবং যে সাহায্যকারী শক্তির সাহচর্যে স্রুতো এবং তেলে রূপান্তর লাভ করল—সেই সহকারী শক্তি-ই নিমিত্তকারণ (Efficient Causes) নামে অভিহিত। উপাদান কারণকে কার্যে সক্রিয় করে তোলাবার ক্ষেত্রে নিমিত্ত কারণের অনিবার্য প্রয়োজন, নিমিত্ত কারণ বিচ্যুত উপাদান কারণ কখনই কার্যের উৎপত্তি আনতে পারে না। 'কারণ' প্রসঙ্গিত আলোচনার পাতঞ্জল একটি অপূর্ণ উদাহরণের বোঝনা এনেছে।

এ বিষয়ে নির্ভর নির্ভর উক্তি করা যায় যে, প্রাকৃতিক জগতের স্রবম নিয়মের আন্তঃকরণ (Law of uniformity of Nature) প্রত্যয় থেকেই এই কার্য-

কারণবাদ উঠে এসেছে। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন এই প্রত্যয়ের গভীরে নিহিত রয়েছে। এই ভাষের অস্বীকৃতি কেবল দর্শনের জগতেই অচলতা বহন করে আনবে না,—বিজ্ঞানকেও স্থবির (stagnant) করে তুলবে। এই অস্বীকার্য প্রজ্ঞান থেকেই বিজ্ঞানও ‘কার্য-কারণতত্ত্ব’ বা হেতুবাদকে স্বীকার করে নিয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ধারণার মৌলিক ও যৌগিক বস্তুপুঞ্জ গঠিত দৃশ্যমান এই বিশাল পৃথিবী একটি যন্ত্রের রূপ অর্জন করেছে এবং যার শরীর ঘিরে চাকা, দণ্ড, কাঁটা ও তারের রচিত একটি জটিল জাল জড়িয়ে রয়েছে। এই উপাদানগুলোর প্রত্যেকটি উপাদানের গতি অল্প-টিতে সঞ্চালিত হয়ে তাকে গতিশীল করে যে চিরন্তন সম-ক্রমিক ছেদহীন গতিশীলতা বা গতি-সম্প্রতি (Continuity of motion) সৃষ্টি করেছে—তার ফলেই বিশাল বিশ্বযন্ত্রটি অবিরাম চলছে হ’য়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের একটি সনাতন প্রত্যয় রূপে গতি-সম্প্রতির ধারণা অভিহিত হয়েছে। এই ধারণা অমুসারেই আমরা বুঝতে পারি যে, গতিশীল জড়বস্তু ছেদহীন গতিপথে অবিরাম ছুটে চলে, কোথাও যতি মাত্র চিহ্নও রেখে যায় না। কালের গতিধারাও এই নিরবচ্ছিন্নতার অন্তিমই বহন করে আনে।

মানবিক মননা, দর্শন ও বিজ্ঞানের শীলিত প্রজ্ঞান থেকে এই বিশাল অর্জন করেছে যে, এ মুহূর্তে যা ঘটছে তা’ পূর্বভীরই ফল এবং বর্তমান সংঘটনই অব্যবহিত পরবর্তীর প্রতিফলন সৃষ্টি করবে। বিজ্ঞানের এই অজিত প্রত্যয়ই বৈজ্ঞানিক কার্যকারণবাদ বা হেতুবাদ এবং এই ‘বাদ’-(Isam) নির্ভর করেই বিজ্ঞানের অগ্রগতি সমানে চলছে। কার্যকারণের নিয়মের প্রেক্ষিতে জড় ও শক্তি থেকে বিজ্ঞান সাধকেরা এই বিশ্ব জগতের উদাহরণ রচনা করেছেন; স্তব্ধতা, ঘটনার অজীভ, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই কার্যকারণের নিয়মের বাঁধনে বাঁধা, তার ব্যতিক্রমের কোন পথই আর খোলা নেই। কার্যকারণ নীতির এই অনতিক্রম্য শাস্ত্র ধারণা থেকেই বিজ্ঞানের নৈশ্চিন্ত্যবাদ (Determinism) অজিত

হয়েছে। দেখেছি, কিছু সমালোচক এই সাধনা এবং অদৃষ্টবাদকে অবিস্মরণ সত্তার মর্ষাদায় অভিহিত করেছেন; কিন্তু তা যেমন অর্থোত্তিক তেমনি অবাঞ্ছিত।

কিছু সাম্প্রতিক দিনে কিছু বৈজ্ঞানিকের ধারণা হচ্ছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান অমুশীলনের ফলে ক্ষেত্র বিশেষে কার্যকারণবাদের বন্ধন খানিকটা শ্লথ হতে এসেছে। এই ধারণার পরিণাম থেকেই একটি নতুন আলোচনা উঠে আসছে।

॥ শঙ্কর এবং হাইসেনবার্গ : নতুন দিগন্ত ॥

দর্শন ও বিজ্ঞানের ইতিহাস আচার্য শঙ্কর এবং হাইসেনবার্গ—দুটি স্বর্ণ স্বাক্ষর নাম। মনোবী আচা এবং বৈজ্ঞানিক হাইসেনবার্গ পূর্বাভাসিত দর্শন বিজ্ঞানকে এক নতুনতর প্রত্যয়ের অভিধার কালান্তকার করে তুলেছেন। দার্শনিক মননার আচার্য শঙ্করে ‘মায়াবাদ’ এবং বিজ্ঞান সাধনায় বৈজ্ঞানিক হাইসেনবার্গের ‘অনৈশ্চিন্ত্যবাদ (Principle of Uncertainty)-দর্শন এবং বিজ্ঞানকে এক নতুনতর বাক-ক্রম এবং প্রত্যয় প্রজ্ঞানে উপনীত করেছে। আমরা এই প্রসঙ্গে একটি ক্রমিক আলোচনা আনতে পারি।

সম্ভাব্য প্রসঙ্গটিকে মেনে নিয়েই বলছি, যদিও আচার্য শঙ্কর মায়াবাদের প্রথম স্রোষ্ঠী পুরুষ নন, তবুও, তিনি এই মতবাদের সার্থকতম রূপকার। ‘অক’—মুহূর্ত থেকে ‘মায়াদ’ ভাবনা এবং মননার সংক্রমণ দেখা যায় এবং উপনিষদ ও বৌদ্ধ দার্শনিকতায় এর অমুসৃষ্টি চলে এসেছে। উত্তর দিনে আচার্য শঙ্করই তাকে পরিমার্জন ও সুমিত—শৃঙ্খলার প্রেমানয় এনেছেন এবং সব দর্শন মতবাদের শীর্ষ চিহ্নিত এবং প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ‘অক’ মুহূর্ত থেকেই মায়াবাদের অমুসৃষ্টি এবং ভাবনা অমুসৃষ্টি ছিল বলে মায়াবাদের অন্ত না ‘বিবর্তনবাদ’ ও।

প্রায় চার হাজার পাঁচ শ’ বছর পূর্বদিনে, ভারতের আর্ষ ঋষিদের বিশ্ব সৃষ্টি-তত্ত্ব এবং প্রকৃতির গভীর বর্ণিত প্রেমানয় আমাদের ইন্দ্রিয় অমুসৃষ্টি প্রাচীন দৃশ্যমান বিশ্ব

জগৎ মায়ায়ৰ ৰূপে প্ৰতিভাভ হৈছিল। তাঁৰ। বশেছিলেন, দৃশ্যমান বিশ্ব চৰাচৰেৰ প্ৰকৃত স্বৰূপেৰ একট 'ত্ৰাণ্ডিমূলক' উপলব্ধি-ই আমাৰা অৰ্জন কৰতে পাৰি, 'স্বৰূপ'কে ধৰে এবং বুঝে নিতে পাৰিনে। বেদান্ত দৰ্শন 'মায়া'-কেই দৃশ্যত 'বিশ্ব'ৰ সৃষ্টি-উৎপ বা উপাদান কাৰণ নামে অভিহিত কৰেহে। 'মায়া' শক্তিৰ প্ৰভাৰেই অনিত্য, বিকৃতি এবং অবাস্তবতা, নিত্য অ-বিকৃতি এবং বাস্তব সত্যেৰ ৰূপ ও মৰ্যাদা অৰ্জন কৰে। উপনিষদ সচ্চিদানন্দময় ব্ৰহ্ম ও আত্মাৰ অবিচ্ছিন্নতা স্বীকাৰ কৰেহে। আচাৰ্য শঙ্কৰেৰ অভিমতে, জগৎ ব্ৰহ্ম বা আত্মাৰ বিকাশ নয়—বিবৰ্ত। ব্ৰহ্ম বা আত্মাৰ একট 'অংশ' বিবৰ্ত কলঙ্কিততেই মায়ায়ৰ আত্মিক আন্তৰ্ক অৰ্জিত কৰে এবং এই 'মায়া'ই জগতেৰ সৃষ্টি বহন কৰে আনে। স্তত্ৰাং জগৎ যে 'ব্ৰহ্ম'ই—এই প্ৰজ্ঞান অৰ্জন না কৰা অবাধি—মাহুৰ 'জগৎ'-কেই সত্য ভেবে নেয়। ব্ৰহ্মজ্ঞান অৰ্জিত হলেই এই মিথ্যাৰ মুক্তি অনিবাৰ্য হৈয়ে ওঠে।

বেদান্তেৰ 'মায়া' দৰ্শন প্ৰসঙ্গে সাংখ্যেৰ প্ৰকৃতি বাদেৰ কথা উঠে আসে। সাংখ্য 'প্ৰকৃতি'-কে বিশ্ব বিধায়নাৰ 'কাৰণ' ৰূপে অভিহিত কৰেহে, যেমন বেদান্ত কৰেহে—'মায়া'কে। এই প্ৰাক্তন-উৎস থেকেই বিশ্বসৃষ্টি বিবৰ্তেৰ অপূৰ্ণ ব্যঞ্জনা এসেহে।

ব্ৰহ্ম বা আত্মাৰ সত্তা বিবৰ্তেৰ কলে সৃষ্টি 'মায়া' থেকেই সৰ্গায়ত ক্ৰিয়াহীন অ-সীম অ-ভাৰ আকাশ 'তথ্যাত্ৰে'ৰ উৎসাৰণ ঘটে এবং তাৰই বৰ্দ্ধিত জটিলতাৰ অভায়ত মহাভূত পৰমাণুৰ সৃষ্টি বহন কৰে আনে। স্তত্ৰাং, এই কাৰণেই—'মায়া'বৃত্তেৰ 'ক্ষুটিত প্ৰস্থ'ন এ জগৎ অনিত্য মায়ায়ৰ।

কিন্তু 'মায়া' এবং 'জগৎ' উভয়েই পৰম সত্য স্বৰূপ 'সদব্ৰহ্ম' থেকেই উৎপন্ন হ'ছে ; স্তত্ৰাং যদিও 'জগৎ' অসত্য এবং মায়ায়ৰ, তবুও তা' সদব্ৰহ্মেৰই ছায়াৰূপ ; এ অৰ্থে, 'জগৎ'-ও মুখ্যভাবে 'সৎ' এবং 'অসৎ' প্ৰভাৰেই পালিত। এই প্ৰসঙ্গেই নিম্ণে ব্ৰহ্মেৰ সপ্ত প্ৰকাশ ভজনা কৰা হৈয়েহে। সসীম ও ৰূপময় জগতেৰ পাৰ্শ্ব

অন্তৰ্বেই অসীম ও অৰূপ সত্য স্বৰূপ ব্ৰহ্মেৰ আত্মপ্ৰকাশ হৈয়েহে। বেদান্ত দাৰ্শনিক এই সিদ্ধান্তই প্ৰকাশ কৰেহেন। বেদান্তেৰ এই প্ৰজ্ঞানেই বলা যেতে পাৰে ব্ৰহ্ম এবং জগতেৰ অবিচ্ছিন্নতাৰ অৰ্থই হলো অৰূপ-ৰূপেৰ নিম্ণে-গুণেৰ এবং ঐক্য-বৈচিত্ৰ্যেৰ সুসাময়িক মেলবন্ধন এবং এখানেই প্ৰাচীন ভাৰতীয় দৰ্শন এবং আধুনিক বিজ্ঞানেৰ মিল খুঁজে পাই।—অভিমতটি আলোচনা নিৰ্ভৰ।

বিংশতি পূৰ্ণ বিজ্ঞান জগতে ব্যাক্তিক বিশ্বধাৰণা বৈজ্ঞানিক হেতুবাদ (Doctrine of Causation) নৈশ্চিন্ত্য বাদ (Doctrine of Determinism) প্ৰাকৃতিক নিয়মাত্ম-বৰ্দ্ধিতাৰ সিদ্ধান্ত (Law of Uniformity of Nature) এবং গতি-সম্পত্তিবাদ (Law of Continuity of Motion) সমূহ অপৰিহৃত প্ৰতিষ্ঠা এবং মৰ্যাদা অৰ্জন কৰেছিল ; বস্তুত এই ধাৰণাগুলেৰ ওপৰ নিৰ্ভৰ কৰেই বিজ্ঞান প্ৰগতিৰ সোধ মিনাৰ গড়ে উঠেহে। কিন্তু বিংশতিৰ প্ৰাৰম্ভিক পাদ থেকে বিজ্ঞান জগতে নতুন নতুন যুগান্তক আবিষ্কাৰ মুহূৰ্ত থেকে এই ধাৰণা-সমূহেৰ প্ৰত্যয় বাধন শিথিল হৈয়ে এলো। বিজ্ঞান এক নতুন যুগেৰ সূৰ্য তোৰণে উপনীত হলো। ৰেডিঅাম এবং পলোনিয়াম প্ৰভৃতি তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থ এবং ইউৰেনিয়াম পৰমাণুৰ তেজস্ক্ৰিয় ধৰ্মেৰ আবিষ্কাৰ মুহূৰ্ত থেকে এই নতুনেৰ অভিযান স্ত্ৰ হ'লো।

এই আবিষ্কাৰেৰ সাৰ্থক ফল স্বৰূপ বৈজ্ঞানিকতা প্ৰত্যক্ষ কৰলেন যে, এই তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থ সমূহেৰ পৰমাণু গুলি অবিচ্ছিন্ন ভাবে সকল অবস্থায় এক অ-ব্যতিক্ৰম্য নিদৃষ্ট হাৰে ভেঙে ভেঙে অন্ত পৰমাণুৰ ৰূপান্তৰ অৰ্জন কৰেহে। বৈজ্ঞানিকতা আৰও একট বিবৰ লক্ষ্য কৰলেন যে, পদাৰ্থ বিশেষে এই ভাঙনেৰ পৰিমাণিত অনেক অনেক বোশ থেকে আশ্চৰ্য মাত্ৰায় কমও হ'তে পাৰে। এই নিয়ম অনুসাৰে বিশেষ বিশেষ পদাৰ্থ 'লক্ষ লক্ষ বছৰ' স্থায়ী হ'তে পাৰে, আৰ কোন কোন পদাৰ্থ বা বিস্ময়কৰ ৰূপ মুহূৰ্ত স্থায়ী হৈয়ে ওঠে। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই দীৰ্ঘ-কণহাৰি তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থেৰ ভিন্ন ভিন্ন পৰমাণুৰ অস্তিত্ব

কালের কোন নির্দিষ্ট সময়-সীমা মুহূর্ত নির্ণয় করা সম্ভব হলো না ; ঠিক এমনি ভাবেই 'সমষ্টিগত ভাবে' কোন বিশেষ পদার্থের পরমাণুর ভাঙনের হার ক্রমিক নির্ধারিত হ'লেও 'ব্যোটিগতভাবে' সেই পদার্থের প্রত্যেক পরমাণুর পরিণতির মুহূর্ত বৈজ্ঞানিকের অজ্ঞাতই রইলো। পারমাণবিক গবেষণার এই নতুন অর্জিত অভিজ্ঞতা বিজ্ঞানের পূর্বানুসৃত হেতুবাদ (Doctrine of Causation) এবং নৈশ্চৈতন্যবাদের (Doctrine of Determinism) প্রত্যয় বাঁধন শিথিল করে দিয়ে নতুন প্রজ্ঞান-প্রত্যয় অর্জিত 'গড় নিয়ম' (Statistical laws) বহন করে আনল ; বৈজ্ঞানিক এই নতুন নিয়মকে স্বীকার করলেন।

কেবল 'গড় নিয়ম'(Statistical laws) নয়, পূর্বানুসৃত গতি-সঙ্গতিবাদের (Law of Continuity of Motion) পরিবর্তে পরমাণুর কোয়ান্টামবাদ ও এলো। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় নিরীক্ষিত হ'লো যে, আদিম জড়কণিকা প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন-ই পরমাণুর শরীর গঠন করেছে, কোন পরমাণুই মৌলিক অবিভাজ্য নয়। প্রোটন এবং নিউট্রনের সমবায়ে নির্মিত পরমাণু কেন্দ্রের চারিদিকে ইলেকট্রনের কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে স্তরীত গতিতে ছুটে বেড়ানোর ফলেই আলোক রশ্মির বিকিরণ ঘটে। এই বিকীর্ণ আলোক রশ্মির বর্ণালী অস্থগুণীন করে বৈজ্ঞানিক এই সত্য অর্জন করেছেন যে, ইলেকট্রন অবিচ্ছিন্ন গতিতে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ছুটে চলে না,—লাফিয়ে চলার নীতি-ই অস্থসরণ করে। এই অর্জিত প্রজ্ঞান থেকেই পরমাণুর 'কোয়ান্টামবাদের উৎসারণ এবং এই মতবাদের সঙ্গে আইনস্টাইন ও প্লাঙ্ক প্রবর্তিত ভেজরশ্মি কণিকাবাদের নিকট মিল দেখা যায়।

আদিম জড়কণিকা, অণুপরমাণু এবং আলোক রশ্মির অবস্থা বিশেষে কণিকা ধর্ম-তরঙ্গ ধর্ম প্রকাশের যে নতুন-প্রমাণ পাওয়া গেল তার ফলে আর কোন ক্ষেত্রে,—নৈশ্চৈতন্যবাদ (Doctrine of Determinism) অস্থসরণ করা গেল না ; দেখা দিল 'সম্ভাবনাবাদ' (Theory of Probability)। কিন্তু তবুও প্রায় থেকে গেল, অস্থপরমাণু

সম্পর্কে প্রাকৃতিক নিয়মের একাত্মবর্তিতাই (Law of Uniformity of Nature) কি বার্থ? এই কালান্তর পরিবর্তন মুহূর্তেও ? বিংশতীর বিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তর দিল। বৈজ্ঞানিক হাইসেনবার্গ তাঁর 'অনৈশ্চৈতন্যবাদ'—(Law of Indeterminism) নিয়ে এগিয়ে এলেন। একাত্মবর্তিতার অবসানে বিজ্ঞান জগতে এক নতুন রূপান্তর ঘটে গেল।

পুরাতন-নতনের এবং বিরোজন-নিরোজনের সামগ্রিকতার সত্য এই যে, আদিম জড় কণিকা সমূহ এবং অণুপরমাণুর সূক্ষ্মতম অস্তিত্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকের অর্জিত ধারণা বিশ্ব জগতের বার্থ 'স্বরূপ' সম্পর্কে যে অভিজ্ঞান অর্জন করেছে তার সঙ্গে দৃষ্টমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের কোন মিল নেই। বিংশতীর বৈজ্ঞানিকেরা শক্তিকে কণিকারূপ কোটন হিসাবে মেনে নিয়ে বলছেন যে, দৃষ্টমান বিশ্বজগতের অনির্মাণ্য মহাশূন্তের, গ্রহকূল, নক্ষত্ররাজি, নীহারিকাপুঞ্জ এবং জীব, জড় ও উদ্ভিদের সামগ্রিক বিস্তৃতিতে অগণিত আদিম জড়কণিকা, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, এবং ফোটনের দল অবিরাম অবিচ্ছিন্ন হ্রস্ব গতিতে ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এই 'ছুটন্ত' কণিকার পরিমাণ সঞ্জ্ঞ সমান নয়। কোথাও বা ভারী, কোথাও বা কম এবং 'পরিমাণ' সঙ্গুতার-ই যেন কোথাও বা তড়িৎ গতি আবার কোথাও বা সামান্য কম-বেশি হয়ে উঠছে।

আদিম জড়কণিকা পুঞ্জ এবং অণুপরমাণু অবিচ্ছিন্ন ছুটে চলার গতি পথে মাহুকের ইন্দ্রিয় অস্থভূতির কেন্দ্র-মূলে অবিরাম আঘাত হানছে। মানব শরীরের দ্বাঙ্গু সূত্র এই আঘাত মস্তিষ্ক কোষে বহন করে নিয়ে যায় এবং এরই প্রতিক্রিয়ার ফলে বর্ণ-বসের এক রসন্ত-হানিত বিচিত্র জগৎ মাহুকের মানস-লোকে ছুটে উঠে। কিন্তু, মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় কোষে এই প্রতিক্রিয়ার 'সংঘটন স্বরূপ' টিকে বৈজ্ঞানিকেরা ধরে নিতে পারেন নি। মাহুকের ইন্দ্রিয় অস্থভূতির কেন্দ্র-মূলে আগত বে বাহুর্গণিতক আদিম শক্তি কণিকার নাচের হলের আঘাত লাগে তাই-ই প্রস্থ চেষ্টনার গহনে বিচিত্র

অহুত্বিত জাগিয়ে তোলে। বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্তই আমাদের দর্শন জগতে আহ্বান জানায়, বাউলের এক-তারার সুর জাগিয়ে তোলে,—‘হুনিয়া মনেরই কারসাজি তাই, মনেরই কারসাজি।’—এ অভিজ্ঞান মানতেই হয়।

বিংশতীর বিজ্ঞান এ জগতের সত্য-রূপ সম্পর্কে সনাতন দর্শনের বাণীই উচ্চারণ করছে:—‘অরুণ-রসমগন্ধম্পর্শমশব্দম্।’—যে জগৎকে আমরা ইন্দ্রিয় অহুত্বিতে ধরে নি, আমাদের সেই ‘কান্না হাসির দোল দোলানো পৌর ফাঙনের পালা’-র জগৎ আমাদেরই ‘আপন মনের মাসুরী মিশায়’ আমরাই রচনা করেছি। বিজ্ঞানের এই বিচিত্র পরীক্ষিত সত্যর উপলব্ধি ‘বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ’-ই; বেদান্ত ভাস্কর সঙ্গে এর পার্থক্য খুবই কম।

বেদান্ত বলছে, দেশ, কাল ও কার্যকারণ পারম্পরিক-তার মেলবন্ধন থেকেই ‘মায়’-র আবির্ভাব ঘটে; কারণ ব্রহ্মের স্বরূপ হ’লো—অসীম, অনাদি, অনন্ত এবং অশেষত—অর্থাৎ দেশ-কাল অতীত এবং কার্যকারণ নিয়ম-বিচ্যুত। বিজ্ঞানও বলেছে দেশ, কাল ও কার্যকারণের অবসান বিচিত্র দৃশ্যমান জগতের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শারীর মাহুকের আন্তঃস্থ অবলুপ্তি বহন করে আনবে। এই অভিজ্ঞানেই, বৈজ্ঞানিক ভাঙে চুষক ক্ষেত্রের (Electromagnetic field) সঙ্গে বেদান্তের ‘মায়’ ও সাংখ্যের ‘প্রকৃতির’ তুলনা করতে পারি এবং আকাশ ‘তন্মাত্র’-কে—‘দেশের’ সমান ধর্ম মানেরও বলা যেতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান দেশ-কাল-কার্যকারণের সীমানা হুত্ব রাজ্যের ক্রীণ প্রাতিধ্বনি অহুত্ব করছে। এই ‘অহুত্বিত’ হয়ত এক নতুন বিশ্বর বহন করে আনবে।

কিন্তু মানব মন, দেশ-কাল ও কার্যকারণের পারম্পরিকতা বিষুস্ত হয়ে কোন পদার্থ বা বিষয়ের ধারণা করতেই পারে না। বেদান্ত তাই পরমসত্যরূপ এককে—‘অবাঙ্‌মানসো গোচরঃ’—বলে অভিহিত করেছে।

॥ পরমাণুতত্ত্ব : প্রবীন ও নবীন ॥

মানব সভ্যতার প্রাচীন মুহূর্ত থেকে পরমাণুতত্ত্ব চলে আসছে। কাল ক্রমিকতার বিচিত্র বিবর্তন পেরিয়ে এই পারমাণবিকতত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞান সত্যের রূপান্তর লাভ করেছে। পরমাণুতত্ত্বের সেই ক্রমিক আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের প্রচেষ্টা নয়।

আর্য্য ভারতের দার্শনিক বিজ্ঞানী কণাধের ‘পরমাণুবাদ’ বহুখ্যাত—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। কণাদ বলছেন যে, যদিও কোন পরমাণু স্বেচ্ছায় অবস্থান করতে পারে না, তবুও তারা অস্থায়ী বা বিনশন ধর্মী নয় এবং পরমাণু অনৌপাদানিক ও অবিভাজ্য। তিনি পরমাণুকে গোলাকার কল্পনা করে ওয় ওজন, প্রতিবেগ, স্থিতিস্থাপ্যতা এবং চাকল্য ইত্যাদি করেকটি বিশিষ্ট ধর্মের স্বীকার করেছেন। নানা বর্ণ, গন্ধ এবং বিচিত্র রূপে মানবিক জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের অহুত্বিত বৃত্তিও পরমাণুর বিশিষ্ট অবিচ্ছিন্ন ধর্ম। ভার্য্য দার্শনিক গোতম পারমাণবিক দৃষ্টিভঙ্গির কণাধেরই দ্বিতীয় উচ্চারণ করেছেন।

কণাধের পরমাণু পরিবর্তনায়, এক জাতীয় ‘ভূতের’ একাধিক বা বহু পরমাণু মিলিত হয়ে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের এবং বিভাজ্য ‘ভূতের’ পরমাণু থেকে বিবদ ভৌতিক অণু বা যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। ‘অণু’-র গভীরে পরমাণু বিভাসের ভিন্ন বিশিষ্টতা থেকে বিচিত্র অণু বা পদার্থের সৃষ্টির সম্ভাবনার প্রত্যয়ই হ’লো কনাদের রাসায়নিক সংযোগ বাদের বৈশিষ্ট্য। এক ঘন সমহরতলকের আকারে ( Cubical arrangement ) পরমাণুর এই বিভাস ঘটে। চারিদিকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে হ’লি পরমাণুকে ঘিরে অল্প হ’লি পরমাণু অবস্থান করে। কণাধের এই পরমাণুবাদের সঙ্গে খৃষ্ট-পূর্ব ৪৭০-৩৬০ শতকের গ্রীস-দার্শনিক ডোমাক্রিটাস এবং ১৮০৮ শতকের মনীষী ডালটনের পরমাণুবাদের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

সাংখ্য ও পাণ্ডুল, ঔপাদানিক তন্মাত্রের পরিমাণ ও বিভাসের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুর



সৃষ্টির পরিচয়না করেছে। সাংখ্য এবং পাণ্ডুল্ল মতে হুই বা বহু পরমাণুর মিলনের ফলে 'অণু'র অস্তিত্বের সৃষ্টি হয়।

অণু-পরমাণুতত্ত্ব জিজ্ঞাসায় বেদান্ত দর্শন অনেকাংশে সাংখ্য-পাণ্ডুল্ল ছুঁয়ে গেছে। বেদান্ত দর্শনের অভিজ্ঞান অহুসারে 'সুদৃঢ়ত'ই দৃঢ়ভূত বা 'মহাভূত'—পরমাণু—সৃষ্টির অনিবার্য উৎস।

এই প্রসঙ্গে ষষ্ঠীয় প্রথম শতকে জৈন দার্শনিক উমাস্বাতীর পরমাণু ভাবনার কথাও উঠে আসে। আরণ্যক, উপনিষদ, সাংখ্য, পাণ্ডুল্ল, ভ্রায় এবং বৈশেষিকের মত 'জৈন-দর্শন'ও জীব, জড় বা কোন পদার্থের সংজ্ঞা হিসেবে বহু ব্যবহৃত 'ভূত' শব্দটি নির্বাচন করে নি। পদার্থের সংজ্ঞা অর্থে 'পুদ্গল' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। জৈন পরমাণুতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য আণবিক আকর্ষণ এবং সংযোজন ক্রিয়া সম্পর্কিত ভাবনার ওপর নির্ভর করেছে। এই সিদ্ধান্ত অহুসারে, স্বকীয় ধর্মের বৈষম্য থেকেই 'পুদ্গল-পরমাণুকে' হু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বৈষম্য ধর্মের প্রাবল্যের ফলেই বিপরীতধর্মী দুটি 'পুদ্গল' পরমাণু পারস্পরিক আকর্ষণে রাসায়নিক মেলবন্ধনে (Atomic linking) মিলিত হয়। এমন কি, গুণগত বিপুল পার্থক্যের ফলে সমধর্মী হুই 'পুদ্গল' পরমাণুর মধ্যে রাসায়নিক মিলনও রচিত হ'তে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ দুটি সমধর্মী আত্মীয় পরমাণু উভয়ে উভয়কেই আরও দূরেই সরিয়ে দেয়।

উপরন্তু, জৈন-দার্শনিক 'অণু' এবং 'পরমাণু'র মধ্যে অহুসৃত স্বীকৃত ব্যবধানও রাখেন নি। তিনি পরমাণুকেই 'অণু' এবং পরমাণু পুঞ্জকে 'স্কন্ধ'-নামে অভিহিত করেছেন। পরমাণুতত্ত্ব ভাবনার জৈন-দার্শনিক কণাধর্মের অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়ছেন—অর্থাৎ তিনি পরমাণুর বিনশন স্বীকার করেন নি এবং তাকে অস্তিম ও আদি-মধ্যে অন্তর্হীন জড়কণিকা রূপে কল্পনা করেছেন। জৈন দার্শনিক 'স্কন্ধের'ও বিভাজন নিরূপণ করেছেন।

বিশ্বয়কর ভাবে লক্ষ্য করতে হয় যে, জৈন-দর্শনে 'অনন্তন্যক' স্বল্পের বিবরণ আছে। আধুনিক বিজ্ঞান বর্ণিত 'বিশালকার অণুকে' (High Polymer) এই পর্ষায় নির্বাচন করা যায়।

আধুনিক বিজ্ঞান পর্যালোচনা প্রসঙ্গে উমাস্বাতীর কথা অনিবার্য হয়ে পড়ে এই জন্তেই যে, উনিশ শতকের প্রথম পাদে প্রখ্যাত হুইডিস্ মনীরী বিজ্ঞান-রাসায়নিক বাক্সিলিয়াস বিজ্ঞান জগতে যে বৈত-প্রকল্পের (Dualistic hypothesis) প্রবর্তন করেন, তার সঙ্গে জৈন-দার্শনিকের বিজ্ঞান ভাবনার আত্মীয়তা অহুস্তব করা যায়।

কেবল পরমাণু পরিচয়ন নয়, আর্থ-ভূমির বৈজ্ঞানিক দার্শনিকরা অণু-পরমাণুর গতিতত্ত্ব সম্পর্কেও নীরব ছিলেন না। তাঁরা অহুধাবন করছিলেন যে, অণু-পরমাণুর গতিস্পন্দই তরঙ্গ গতি, শ্রোতগতি এবং পরিবহন প্রবাহকে গতিশীল রাখছে। ভ্রায় ও বৈশেষিক দার্শনিক সমগ্র ভূত কণিকার অবিরাম অবিক্ষয় গতিস্পন্দনকে একটি বিশিষ্ট ধর্ম রূপে অভিহিত করেছেন। বেদান্ত ও সাংখ্য দার্শনিক অণু-পরমাণুর অবিক্ষয় গতিস্পন্দনকেই (Vibratory motion) দৃশ্যমান জাগতিক প্রক্রিয়া-সক্রিয়তার মৌলিক শক্তি রূপে অভিহিত করেছেন। অণু-পরমাণুর এই আবর্তিত চক্রাকার গতি এবং কম্পনকে ভারতীয় বিজ্ঞান-মানস দার্শনিকেরা 'পরিম্পন্দ' তত্ত্ব নামে অভিহিত করেছেন। ভারতীয় দর্শনের এই 'পরিম্পন্দ' তত্ত্ব থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের আভাস ব্যঞ্জিত হয়ে উঠছে।

সুতরাং, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে ভারতীয় দার্শনিকদের বিজ্ঞান মননার কথা তাবলে সত্যিই বিস্মিত হ'তে হয়। যে বিষয়টি আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি, কোন একটি নীতিদীর্ঘ প্রবন্ধে তার সামগ্রিক আলোচনা স্বচ্ছ-সহজ করে তোলা সম্ভব নয় এবং নিঃসন্দেহে, এ আলোচনা কোন যোগ্য-ব্যক্তিত্বের ওপর অধিকতর নির্ভরশীল। হয়ত বা আসছে দিনের অহুসন্ধিৎসু মন এ বিষয়ে সার্থক সম্বন্ধ সচেতন হয়ে উঠবে।

# আমার ইউরোপ ভ্রমণ

( ১৮৮১ খ্রষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী )

জৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

প্রদর্শনীতে উপস্থিত ঔপনিবেশিক ও ভারতীয়দের জন্য ডিউক অভ বেডফোর্ড অফগ্রহ পূর্ণক পল্লী-অঞ্চলের কৃষি-সম্পর্কিত যাবতীয় দর্শনীয় দেখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ক্রলি খামার ও উওবার্শ-এর গবেষণা-ক্ষেত্র দেখিবার নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। ইংল্যান্ডের রয়্যাল অ্যাগ্রিকালচারাল সোসাইটির অধীনে এইখানে বহুজাতীয় পরীক্ষার কাজ চলে। আমাদের এই ভ্রমণ-তালিকায় ডিউকের নিজস্ব খামার অ্যাগি, এবং উওবার্শে অবস্থিত তাঁহার পার্ক ও উতান-সমূহ স্থান পাইয়াছিল। ২০শে জুন (১৮৮৬) বুধবার ডিউকের অতিথিগণ সহ একখানি স্পেশাল ট্রেন ইউস্টন স্টেশন হইতে ছাড়িয়া রিজমন্ট অভিমুখে চলিল। সুদৃশ্য পল্লীনিসর্গ অতিক্রম করিয়া চলিলাম আমরা। হৃদয়ে ঐয়কালীন সবুজ শস্যের সূর্যের স্বর্ণরোদ্ভুত স্তম্ভ হইয়া রহিয়াছে। সে বেন বার্লি, স্ট্রবেরি, রাস্পবেরি, আপেল ও পিয়ারের স্বপ্নে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। স্বপ্ন দেখিতেছে কবে ইহারা পাকিবে। কি সরল! তাপমূহা কাহাকে বলে জানে না, মরোকো হইতে আরব পর্যন্ত যে তপ্ত হাওয়া মরু বালুকার পাহাড় উড়াইয়া প্রবাহিত হয়, যাহার হাত হইতে রক্তা পাইবার জন্য ক্যারাতানের উটেরা মাটিতে বসিয়া পড়ে, সেই 'সিহুম' কাহাকে বলে তাহাও জানে না। ভারতের সমস্তল জমিতে যে অগ্নিতপ্ত প্রচণ্ড বায়ু-প্রবাহ রহিয়া চলিতে চলিতে জমির বাস এবং গাছের পাতা পুড়াইয়া দেয়, তাহাও জানে না। আর জানে না দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কথা যাহার ফলে হৃদয় উগ্ৰীভূত হয় এবং

লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দেশটাকে মরুভূমি করিয়া তোলে।

ডিউক তাঁহার অতিথিদের সম্মানে তাঁহার অধীন কর্মরত লোকদের সেদিনের মত কর্মবিবর্তিত ঘোষণা করিয়াছিলেন। আমাদের গমন-পথে বিপুল হর্ষধ্বনি। আমরা যত আমাদের গন্তব্যের কাছে আসিতে লাগিলাম, জনতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং হর্ষধ্বনি আরও প্রবল এবং উল্লাসপূর্ণ হইতে লাগিল। আমাদের জন্য গাড়ি প্রস্তুত ছিল। আমরা ক্রলি খামারে গিয়া পৌঁছিলাম, এবং সেখানে হইতে গবেষণা-ক্ষেত্রে। কৃষি রসায়নে বিশেষ খ্যাতি রয়্যাল অ্যাগ্রিকালচারাল সোসাইটির সেক্রেটারি, সেখানে গন্ত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে-সব পরীক্ষা চলিতেছে, যে-সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হইতেছে এবং সে-সবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আমাদেরকে বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর আমরা পার্কের ভিতর দিয়া পার্ক ক্রিকেরে আসিলাম। এখানে বহু জাতীয় গোমেষ ইত্যাদি পশু দেখিলাম, তাহারা দেখিতে খুব চমৎকার। আমরা ইতিমধ্যে সূর্যাস্ত হইয়া পড়িয়াছি অতএব উওবার্শ অ্যাগির পশ্চিম দিকে আমাদের নামিতে বলা হইল, এইখানে খুব উৎকৃষ্ট ভোজনের আয়োজন করা হইল। ডিউক নিজে এই অফিসটানের পুরোধা হইলেন এবং যথারীতি ভাষণও দেওয়া হইল। লাকের পরে মারকুইস অভ চ্যাউন্সটক(ডিউকের পুত্র) আমাদেরকে সব দেখাইলেন, অ্যাগিতে পারিবারিক অনেকের প্রতিকৃতি টাঙান আছে। কয়েকজন বিখ্যাত পেট্রারক

হাতের প্রতিফলিতও আছে। আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত উজানে ভ্রমণ করিলাম, এবং ফ্রিটউইকে স্পেশাল ট্রেনে উঠিয়া সাড়ে ছয়টার সময় লওনের সেন্ট প্যামিক্রিস্টিয়ান স্টেশনের দিকে যাত্রা করিলাম। উওবার্ণে যেভাবে গবেষণাদি চালান হইতেছে তাহা দেখিয়া আমি কিছু নিরাশ হইয়াছি। নির্ণীত পদ্ধতি ইংল্যান্ডেই দেখিতে আশা করি। সেখানে মানুষের বুদ্ধি উত্তম অভিজ্ঞতা সমস্তই প্রয়োগ করা হয়, এবং সর্বদা উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। কৃষিতেও তাহাই। তথাপি উওবার্ণে যে-সব বর্ণনা আমি নীরবে শুনিলাম তাহাতে বোধ হইল গোড়াতেই গুরুতর ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। কৃষি কার্বে গবেষণা বা নানা জাতীয় পরীক্ষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, আবিষ্কার উদ্ভোগ এবং ধৈর্য দরকার হয়, ইহা এই গবেষণার হুঁচকিই বলা চলে। কারণ এতমাত্র এইসব গুণের বিচার-বিবেচনা প্রস্তুত প্রযুক্তি দ্বারা ইতিমধ্যে প্রস্তুত করা যাইতে পারে, বাহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া তবে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্য কার্যকর ফলান সম্ভব হয়। কিন্তু কার্যতঃ পূর্বগঠিত মতকে প্রমাণ করিবার জন্য সব সময়ই তাড়াহুড়া করিয়া পরীক্ষা চালান হয়। প্রথমেই যে একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি গড়িয়া লইতে হয়, সে কথাটা ইহারা ভুলিয়া যান। ইহাতে ফললাভ মনোমত হয় না, শেষে যত দোষ পড়ে আবহাওয়ার ঘাড়ে। কৃষি বিষয়ে ভুলনামূলক পরীক্ষা করিতে হইলে সব একসঙ্গে ভালগোল না পাকাইয়া আমার মতে দুইটি স্পষ্ট এবং পৃথক কর্ণধারী অঙ্গসংগ্রহ করা উচিত। প্রাথমিক কর্ণধা, যাহাকে আমি মূল ভিত্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছি, তাহা হইতেছে যে-সব ক্ষেত্রে নানাতাবে পরীক্ষা চালান হইবে সে-গুলিকে আগাগোড়া একই রকম করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। জমিতে জমিতে কোনও দিক দিয়া কোনও পার্থক্য যেন না থাকে। যদি দুই একর জমিতে সার দিতে হয়, একটিতে গোবর সার, অন্যটিতে খৈলের সার, বাহা দ্বারা দুইটি ক্ষেত্রেই গম বুনিয়া দুইটি সারের পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে,

তাহা হইলে এই দুই সারের পার্থক্য ব্যতীত ঐ দুইটি ক্ষেত্রে যেন অন্য কোনও দিক দিয়া অবস্থার কোনও পার্থক্য না থাকে। জমি ও পারিপার্শ্বিকের দিক দিয়া যেন দুইটি ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ এক অবস্থার থাকে। অর্থাৎ দুই জাতীয় সারের জিয়ার যে পার্থক্য দেখা যাইবে, সেই পার্থক্য সৃষ্টির মূলে যেন অন্য কোনও কারণ বিস্তারিত না থাকে। তাহা হইলে সারের উৎকর্ষ বিচার সম্ভব। পরীক্ষাকারীদের এ বিষয়ে খুল ধারণা কিছু আছে, কিন্তু জমিতে কোনও পার্থক্য ছিল না, তাহা প্রমাণ করিবার মত ধৈর্য তাঁহাদের নাই।

আমাদের সাধারণ বিচারে জমি ও অন্যান্য অবস্থা সম্পূর্ণ এক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের হিসাবের বাহিরে থাকিয়া ধীর, বাহা প্রমাণ ব্যতিরেকে বুঝা যায় না, এবং তাহা আবিষ্কার করিয়া নানাতাবে পরীক্ষা করিয়া তবে তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আমি এ বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত যে, দুইটি জমি সম্পূর্ণ এক হইলেও বিনা সারে তাহাতে শস্ত ফলাইলে তথাপি দুই ফসলের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকিবে। দুই রকম সারের ভুলনামূলক গুণ বুঝিতে হইলে সার দিবার পূর্বে ঐ দুই জমির উৎপাদনে যে পার্থক্য দেখা দিবে তাহা সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া তবে সারের পরীক্ষা করিতে হইবে। এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া, আবহাওয়ার নানা প্রভাব হইতে জমিকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে হইবে। জমিতে শস্ত কিছুদূর পর্যন্ত বাড়িবার এক সপ্তাহ আগে বা পরে এক পশলা বৃষ্টি হইলে ফসলের পরিমাণে অনেক পার্থক্য ঘটে। ইংল্যান্ডের লোকদের পক্ষে বিজ্ঞানের পূর্ণ সাহায্য পাওয়া সম্ভব, সেখানে তাহাদের হাতে অনেক উপায় আছে, ইচ্ছা আছে, সেখানে তাহারা কাঁচ-ঘরে অ্যারিকা পাম জগাইতে পারে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে সেখানে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া পরীক্ষার জমিতে একই উদ্ভাপ ও আর্দ্রতা বজায় রাখা অসম্ভব নহে। এ সব বিষয়ে ইহারা আমার অপেক্ষা অনেক বেশি জানী তাঁহাদের কাজের সমালোচনা করা আমার পক্ষে অবশ্যই দুঃসাহস,

সন্দেহ নাই। কিন্তু উত্তরাংশের পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, পরীক্ষার প্রাথমিক শর্ত পালন করা হয় নাই। খোঁসাহাড়ানো কটন-কেক ও মেইজ-মীলের সারের তুলনামূলক পরীক্ষা সেজন্য ঠিকমত হয় নাই। অজ্ঞ চাষীরা জানে, মেইজ-মীলের সারের অপেক্ষা কটন-কেকের সার অনেক উৎকৃষ্ট। প্রথমটির দাম প্রতি টন পাউণ্ড ১-৫-১, দ্বিতীয়টির দাম প্রতি টন পাউণ্ড ৫-১০-০। অতএব যে দুটি ক্ষেত্রে দুই রকম সার ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার ফলে কটন-কেক ব্যবহৃত ক্ষেত্রে অনেক ভাল ফসল উৎপন্ন হওয়া উচিত ছিল। পরীক্ষা ১ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে—১৮৭৭ হইতে ১৮৮৫ সন পর্যন্ত। উদ্দেশ্য ছিল কটন-কেকের উৎকর্ষ প্রমাণ করা। কিন্তু এত দিন পরীক্ষা চালাইয়াও তাহা প্রমাণ করা সম্ভব হয় নাই। পরীক্ষাকারীগণ ইহাতে বিস্মিত। ইহার পর তাঁহারা ইহার কারণ জানিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা বলেন, “এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণ খুঁজিতে গিয়া অসুমান করা হইল, এবং অসুমান করিবার যথেষ্ট প্রমাণও মিলিল যে, জমিতে সারের পরিমাণ অতিরিক্ত হওয়াতে এবং ইহার ফলে নাইট্রোজেন অধিক কমিয়া বাওয়াতে সর্বোচ্চ পরিমাণ যে ফসল পাওয়া গিয়াছে তা মেইজ-মীলের সারের দরুন অথবা কৃত্রিম বিকল্প সারের দরুন, অতএব অধিক শক্তিসম্পন্ন কটন-কেকের সার তাহার শ্রেষ্ঠতা দেখাইতে পারে নাই।” অতএব দেখা যাইতেছে দুই জাতীয় সারের তুলনামূলক বিচার হইতে ইহাদের কার কি মূল্য তা যদি ঠিকমত জানা না হয়, তাহা হইলে উত্তরাংশ খামারের গবেষণা হইতে কি সিদ্ধান্ত করা যাইবে? এই অস্বাভাবিক এবং কৃত্রিম সিদ্ধান্ত যে, মেইজ-মীল সার কোনো মতেই কটন-কেক সার হইতে হীন নহে, যদি নয় বৎসরের পরীক্ষার পরে করা হয় এবং তাহা ইংল্যান্ডের রয়্যাল অ্যাপ্রিকালচারাল সোসাইটির অধীন পরিচালিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে গ্রহণ করা চলে না। আবার, সার দেওয়া হয় নাই এমন জমিতে বৎসরের পর বৎসর চাষ করিয়া যে গম

পাওয়া গেল, তাহা হইতেও প্রমাণ করা যায় যে আবহাওয়ার বদল নিয়ন্ত্রণ না করিলে বিভ্রান্তসমস্ত নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। দেখা যাইতেছে, এক একর বিনা সারী জমিতে ১৮৭৭ হইতে ১৮৮৫ পর্যন্ত এইরূপ ফসল ফলিয়াছিল : ১৮৭৭—২২.৫ বুশেল। ১৮৭৮—১৫.৮ বুশেল। ১৮৭৯—১০.১ বুশেল। ১৮৮০—১.৬ বুশেল। ১৮৮১—২৫.৭ বুশেল। ১৮৮২—১২ বুশেল। ১৮৮৩—১৬ বুশেল। ১৮৮৪—২৩ বুশেল। ১৮৮৫—২১.২ বুশেল। ১৮৭৭ হইতে ১৮৮০ পর্যন্ত পরিমাণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কারণ, বুঝা যাইতেছে জমির উৎপাদন ক্ষমতা অবিরাম চাষে ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার পর ফসলের পরিমাণ একলাকে হঠাৎ বাড়িয়া গেল, এবং তাহার পর হ্রাসবৃত্তি অনিয়মিত। শক্তও ক্রমে পরিপুষ্ট হারাইয়াছে। প্রথম বৎসরে বুশেল প্রতি ৬১.৮ পাউণ্ড দানা পাওয়া গিয়াছে। এবং যদিও এই পরিমাণ পরে খুব কমিয়াছে বা বাড়িয়াছে, কিন্তু কখনও প্রথম বৎসরের পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছায় নাই। ১৮৮৫ সনে ইহার পরিমাণ ছিল ৫২.২ পাউণ্ড। এই হ্রাসবৃত্তি কি আবহাওয়ার পরিবর্তনে ঘটিয়াছে? তাহা হইলে ইহাই বালি যে, ফলন যদি অল্প শক্তিশালী অথচ নিয়ন্ত্রণের বাহিরের কারণের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহা নিয়ন্ত্রণাধীন তাহার উৎকর্ষ প্রমাণ করা যাইবে কিরূপে? আমার পক্ষে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ হাতের গবেষণা বিষয়ে এরূপ সমালোচনা করিতে আমি বেদনাবোধ করিতেছি, বিশেষ করিয়া আমি যখন ইহাদের নিমন্ত্রিত আতিথি। আমাদের দেশেও কৃষি গবেষণা হইয়া থাকে, এবং আশা করি তাহা শিক্ষা ও সুরোগ বৃদ্ধির সঙ্গে আরও ব্যাপকভাবে করা হইবে, এবং ইহার মূল্যও সবাই ক্রমে অধিক উপলব্ধি করিবেন। অতএব ঐ গবেষণায় যে-সব অসঙ্গতি ঘটিয়াছে তাহা দেখাইয়া দেওয়া আমি কর্তব্য মনে করিতেছি। যাহা হউক, বহু ক্রটি সত্ত্বেও উত্তরাংশ ক্ষেত্রের গবেষণা হইতে অনেক কিছু জানিতে পারা গিয়াছে। অজ্ঞানত বিবয়ের মধ্যে কৃত্রিম সার সম্পর্কে

মূল্যবান অনেক তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। বিশেষ করিয়া অ্যান্থোনিয়াম সল্টগুলি বিষয়ে। ডিউক অফ বেডফোর্ড এইসব পরীক্ষার জন্য রয়্যাল অ্যান্থ্রাকসাল সোসাইটির হাতে ১২৭ একর জমি হাড়িয়া দিয়াছেন। আমি এই পরীক্ষার ক্রটি উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইংল্যান্ডের অনেক সুবিধা আছে। যে পরীক্ষা যেখানে আরম্ভ হয়, পরবর্তী পুরুষও তাহার ধরাবাহিকতা রক্ষা করিয়া চলে, কারণ প্রকৃতি তাহার যে-সব তথ্য গোপন রাখিয়াছে তাহা উদ্ঘাটন করা একটি জীবনে সম্ভব হইতে পারে না। এই রকম একজন উত্তর পুরুষ সার জন বেনেট লইস। তিনি কৃষি গবেষণার জনক। তাঁহার রটহামস্টেডের পরীক্ষা-ক্ষেত্র আমি দেখি নাই। ‘মার্কলেন এক্সপ্রেস’-এর মিস্টার কোড্ একবার আমাকে সেখানে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই।

বহু বিজ্ঞান-সেবীর নিকট কৃষির উন্নতি একটি ‘হবি’ বা শৌখিন পেশা। সাধারণ মানুষ ইহা হান্তকর মনে করিতে পারে, কিন্তু হবি সাধারণ মানুষের জন্য নহে। সাধারণ লোকের কোনও বিষয়ে চান বা আকর্ষণ থাকে, পছন্দ থাকে। ইউরোপ ও অ্যামেরিকা হবি হইতে মহাবিদ্য সব আবিষ্কার করিয়াছে। ইহাকে কেউ ইচ্ছা করিলে বিশেষ বৃত্তি বলিতে পারেন কিন্তু হবি ইহা হইতে পৃথক, এবং বড় জিনিস। ইহা কোনও বিষয়ে আভ্যন্তরিক এবং অক্লান্ত নিষ্ঠা, এবং সেই বিষয়ে অতীতকর আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা, এবং ইহা এমন একটি অল্পভূতি বাহ্য মাতৃক-বিকারেয় সীমা স্পর্শ করিয়া চলে, এবং ইহা হইতেই এমন সব আশ্চর্য আবিষ্কার হইয়াছে আধুনিক অগ্রগতি বাহার কাছে বিশেষ ভাবে ধনী। আমাদের দেশে এমন হবি কোথাও দেখা যায় না। এবং তাহার প্রধান কারণ আমরা আপাততঃ মাঝারি শ্রেণীর মানুষ। আমাদের কোনও আবিষ্কার নাই, কোনও উদ্ভাবন নাই, পৃথিবী জোড়া কোনও ব্যাতি নাই। আমাদের হবি—ধর্ম। কখনও বা ইহা হবির চেয়েও অধিক, ইহা মাতৃক-বিকার। স্রবের বিষয় সমাজ ধর্মীয়

উদ্ভাবনকে পূজা করে। আমরা দুর্বলজাতি বলিয়াই কি ধর্ম আমাদের হবি? কারণ, দেখা যায় প্রত্যেকটি দেশেই জীজাতি, কন্ন, এবং পজু, ইহারা সর্বদাই ধর্মীয় ভাবাপন্ন। প্রকৃতির এই ধারা অনুসরণ করিয়া, প্রত্যেক দেশের এবং কালের শক্তিশালী ব্যক্তিগণ ধর্মীয় ভাবাপন্ন হইবার জন্য নিজদিককে কৃত্রিম উপায়ে—অনশনে, অহুশোচনায়, দুর্বল করিয়া লইয়াছে। দৈহিক দুর্বলতা এবং মানসিক দুর্বলতা, দুইই ধর্মীয় ভাব লালনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। স্বজনহারা ব্যক্তি, হতাশ ব্যক্তি, অত্যাচারিত ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম একটি সাস্থ্যদানকারী আশ্রয়। বন্দী মতি ক্রিস্টোর ক্ষত-হৃদয়ে ইহা সম্ভাপ-নিবারণী প্রলেপের কাজ করিয়াছে সন্দেহ নাই, অথবা ভেনিসে ডোজদের (ডোজ=প্রধান বিচারক) প্রাসাদের ভূনিয়ন্ত্রক কক্ষগুলির ভিতর দিয়া লইয়া যাইবার সময় গাইড বে হুর্মু অহুতপ হতভাগ্যের কাহিনী ওনাহিতে—ছিল তাহার পক্ষে ধর্ম সাস্থ্যের কারণ। আমাদের দেশের বহু ব্যক্তি এই রূপ বেহমেন ক্রীণ করিয়া মনে ধর্মের প্রলেপ পুষ্টি উপভোগের জন্য প্রস্তুত হয়। ইহাই তাহাদের হবি, ইহা ভিন্ন অন্য হবি তাহাদের নাই। অধিকাংশই সংসারের চাপে আঁহর অন্তর ইহা ভিন্ন অন্য হবির কথা তাহাদের পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব। ঈশ্বরের দিকে মন দেওয়া ভাল কাজ। কিন্তু ধর্ম বিকৃত রহস্যবাদের দিক হইতেই হউক অথবা উদ্ভাস উদ্ভাবনার দিক হইতেই হউক—উভয় দিক হইতেই ধর্ম মাতৃক-বিকারে পরিণত হয়। এই দুই জাতীয় মাতৃক-বিকারেয় মধ্যে শেষেরটি আমার পছন্দ।

কাউন্টেন্স অফ রোজবেরি, করেন অক্সফোর্ড নিকটস্থ তাঁহার লণ্ডনস্থ গৃহে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অন্তান্ত নিমন্ত্রণকারী—ডাচেস অফ ওয়েস্টমিনস্টার তাঁহার হাইড পার্ক সন্নিহিত গৃহে। মার্জ্জিইস অফ হাটিকল্ড, ও ডিউক অফ নর্দামবারল্যাণ্ড—সাইরন হাউসে, গার্ডেন পার্টিতে। ১৮৭৪ সন পর্যন্ত ডিউকের লণ্ডন বাস ছিল স্ট্রাও, নর্দামবারল্যাণ্ড হাউসে। পঞ্চ নূতন ভাবে প্রভুত্বের জন্য ঐ গৃহটি ভাঙিয়া দেওয়া

হয়। অতঃপর তিনি সাইয়ন হাউসে বাস করিতে থাকেন। এটি কিউ প্রাডেনস-এর কাছে লণ্ডনের সাবার্বে, কয়েক মাইল পশ্চিমে। নর্দামবারল্যাও হাউসের মাথার একটি প্রস্তর-নির্মিত সিংহ ছিল, তাহা এক্ষণে সাইয়ন হাউসের মাথার আনিয়া বসান হইয়াছে। এই সিংহ সম্পর্কে একটি অদ্ভুত কাহিনী আছে, ইহা হইতে বুঝা যায় অন্ধবিধ্বাসী মানুষ পৃথিবীর সব স্থানেই আছে। একদা একটি লোক প্রচার করিয়াছিল, সে এই সিংহের ল্যাজ নড়িতে দেখিয়াছে। শুনিবামাত্র সিংহের চতুর্দিকে বিরাট ভিড় হইল, সিংহ কখন আবার ল্যাজ নাড়িবে তাহা দেখিবে। দূর-দূরান্তর হইতে লোক আসিয়াছিল। সমস্ত দিন ধরিয়া রাত্তর এমন ভিড় জমিয়া ছিল যে বানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঐ গঠিত ভিড়টি সকলকেই সোদন নিরাশ করিল। এমন কি বহু অপেরা গ্লাস এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রভাবেও সে ল্যাজ একচুল নড়িল না। সাইয়ন হাউসের একটি ইতিহাস আছে। পূর্বে এটি পঞ্চম হেনারি প্রতিষ্ঠিত একটি মঠ ছিল—ইহা সাইয়নের সেন্ট সোভিয়র ও সেন্ট ব্রিজিটের নামে উৎসর্গীকৃত ছিল। অষ্টম হেনারি এই সম্পত্তির অভিভাবকত্ব সমারসেটকে দান করেন, এবং তিনি ইহাকে প্রাদায়ে পরিণত করেন। পরে এটি ডিউক অভ নর্দামবারল্যাওয়ের অধীনে আসে। যষ্ঠ এডওয়ার্ডের মৃত্যু হইলে এই স্থান হইতে লোড জেন প্রে টাওয়ার অভ লণ্ডনে গিয়া ইংল্যান্ডের সিংহাসনে তাঁহার দাবি পেশ করেন। এবং এইস্থান হইতেই, চার্লস-১ এর শিরশ্ছেদের পূর্বে তাঁহার সন্তানদের সেন্ট জেমস প্যালেসে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইবার জন্ত লইয়া যাওয়া হয়।

এক বছর বিশেষ অহুরোধে আমি বিশ্ব-বিভাগের একটি অস্থান দেখিতে ক্যামব্রিজে গিয়াছিলাম। অস্থানটি সার জর্জ বার্ডউড, সার এডওয়ার্ড বাক ও নরসিংগের মহারাজাকে এল্‌এল্‌ডি উপাধিদান উপলক্ষে। রাজার জন্ত স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেখানে পৌঁছানর পর অভ্যর্থনা সমিতি

আমাদের ভোজ্যবাহনের ভার লইলেন। এই সমিতি টাউন কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিভাগের কর্তৃপক্ষ দ্বারা যুগ্মভাবে গঠিত হইয়াছিল। নানা দর্শনীয় দেখিবার পর আমরা ক্লান্ত বোধ করিলে আমাদেরকে গিল্ডহলে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে আমাদের সম্মানার্থে খুব চমৎকার ভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল। বিশ্ববিভাগের অস্থান সেনেট হাউসে অপরাহ্নে আরম্ভ হইল। হাউসটি দেখিতে খুব সুন্দর, কার্নিভিয়ান ষ্টাইলে নির্মিত স্তম্ভগুলির শীর্ষ বা ক্যাপিট্যাল রোমের ছুপিটার মন্দিরের স্তম্ভশীর্ষের অনুরূপে নির্মিত। গীলিং খুব উচ্চাঙ্গের অলঙ্করণে সজ্জিত এবং মেঝে কালো ও শাদা মার্বেলে নির্মিত। মঞ্চে ভাইস চ্যান্সেলর ও বিশ্ববিভাগের অস্ত্রান্ত সভ্যগণ উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা এই মঞ্চের পাশে আসন দখল করিলাম। আগার গ্র্যাঞ্জুয়েটদের সংখ্যা কয়েক শত হইবে, তাহার উপরের গ্যালারিতে বসিয়াছিল। এবং সেই উচ্চ স্থান হইতে তাহার মঞ্চে উপবিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অধ্যাপক মণ্ডলীর উদ্দেশে নানা বকম বসিকতা নিক্ষেপ করিতেছিল। এ সবই স্ক্রুটি ও কোছুকের পরিচায়ক। উদ্দিষ্ট সকলেই ইহা সম কোছুকের সঙ্গেই গ্রহণ করিলেন। আমরা অস্থানের অস্ত্রান্ত অংশ অপেক্ষা এইটিই বেশি উপভোগ করিয়াছিলাম। প্রথমে ভাইস চ্যান্সেলরের ভাষণ দ্বারা অস্থান আরম্ভ হইল। তাহার পর বাঁহারা ডিগ্রী গ্রহণ করিবেন তাঁহারা একে একে মঞ্চে আনীত হইলেন। একজন প্রোফেসর ল্যাটিন ভাষায় একটি বক্তৃতা দিলেন। ছাত্ররা মাঝেমাঝে নানা মন্তব্য করিয়া বাধা সৃষ্টি করিতেছিল, প্রোফেসরটিও হাসিমুখে তাহার জবাব দিতেছিলেন। বক্তৃতা দিতে দিতেই কোশলে মুখ ফিরাইয়া জবাব দিতেছিলেন। বাহা তিনলাম তাহার সব কথাই অর্থ বুঝিতে পারি নাই, মোটামুটি ভাবার্থটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বক্তৃতা শেষ হইলে সম্মানসূচক আচ্ছাদনে নূতন ডিগ্রীপ্রাপ্ত ডক্টরকে সজ্জিত করা হইল। অতঃপর তাঁহার স্থান বিতীর্ণ জন গ্রহণ করিলেন। তারপর তৃতীয় জন।

এইভাবে অসুস্থান শেষ হইল। কিন্তু হাজরা এখনও তৃপ্ত নহে, তাহাদের ইচ্ছা আরও বড়তা চলুক, কিন্তু সে ইচ্ছা তাহাদের পূরণ হইল না।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এছাপার ঘোঁষিতে গেলাম।

এখানে ৪,৬০০০০ এর উপর গ্রন্থ আছে, উপরন্তু বহু পাণ্ডুলিপিও সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহার পর কিংস কলেজে গেলাম। ১৪৪১ সনে বঠ হেনারি কর্তৃক এই কলেজটি স্থাপিত হয়। এখান হইতে আমরা একটি স্কলার চ্যাপেলে গেলাম, তাহার সকল অংশের সকল বৈশিষ্ট্যগুলি শ্রদ্ধের গাইডগণ আমাদের দেখাইলেন। আমার সর্গাপেক্ষা ভাল লাগিল রঙীন কাঁচের জানালা-গুলি, এগুলির উপর বাইবেলের কাহিনী চিত্রিত ছিল। এই চিত্রগুলি ১৫১৫ হইতে ১৫৩১ সনের মধ্যে নির্মিত। কিংস কলেজ ঘোঁষিবার পর আমরা আরও দুইটি কলেজ পরিদর্শন করিলাম। ইহাদের একটির অঙ্গনের একটি গাছের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল। শুনিলাম ইহা মিলটন কর্তৃক রোপিত হইয়াছিল। এই গাছ হইতে একটি পাতা ছিড়িয়া লইলাম।

মেলস' র্যান্সম্‌স সিম্‌স অ্যাণ্ড জেক্স আমাদিগকে ইপসউইচে অবস্থিত অরওয়েল কারখানা ঘোঁষিতে নিয়ন্ত্রণ জানাইলেন। এইখানে প্রতি বৎসর বহু ক্রি-বজ্রাদি নির্মিত হয়, এবং এখান হইতে পৃথিবীর নানা স্থানে রপ্তানি করা হয়। এট ইষ্টার্ন রেলওয়ে আমাদের জন্য একখানা স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এই ট্রেনে আমরা ইপসউইচের বিপরীত দিকে জাঁপিং নদীর তীরে অবস্থিত একটি স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অরওয়েল ওয়ার্কস-এর একটি স্টীমারে আমরা নদী পার হইলাম। স্টীমারের ডেকে দাঁড়াইয়া আমরা ইপসউইচের অদূরে জার্মান সমুদ্র ঘোঁষিতে পাঠিত্তেছিলাম, সেখান হইতে সমুদ্র ১২ মাইল দূরে। এখানে নানা দর্শনীয় স্থান দেখিলাম, ইপসউইচের এই সব বৈশিষ্ট্য বিষয়ে শহরের লোকদের খুব গর্ব। এট ব্রিটেনের যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই স্থানীয় লোকদের নিজ নিজ শহর বিষয়ে গর্বিত হইতে দেখিয়াছি। আমাদের কাছে তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছে “শহরটি কেমন লাগিল?” ইহাতে অজ্ঞার কিছু নাই, কারণ নিজ নিজ স্থানের উন্নতির জন্য সে-সব স্থানের অধিবাসীরা নিজেদের ব্যক্তিগত কলহ থাকিলেও তাহা ভুলিয়া এক বোঁগে কাজ করে। টাউন হল, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম এবং অস্ত্রাস্ত্র হারী সর্বজনীন ব্যবহার্য প্রতিষ্ঠান গাঁড়িয়া

ভুলিবার জন্য মোটা অর্থ দান করে। এমন কি ইপসউইচের জায় ছোট শহরেও বেনেসাঁস ভবিত্তে নির্মিত একটি টাউন হল আছে, একটি মিউজিয়াম আছে। বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিল্প শিক্ষার বিদ্যালয় আছে, একটি কর্প হল আছে, পাবলিক হল আছে। আর্ট গ্যালারি আছে, গবেষণার জন্য বুকোস্তান আছে, বাজীরের জন্য ইনসটিটিউট আছে, কর্তৃত্ব লোকদের জন্য কলেজ আছে। অস্ত্রাস্ত্র দর্শনীর মধ্যে Sparrowe's House নামক একটি প্রাচীন স্থাপত্য ভবির অট্টালিকা দেখিলাম। উস্টারের বুকোর পর চার্লস-২ এইখানে লুকাইয়া ছিলেন এবং এখানকার পাবলিক হাউস (মদের দোকান) ডিকেন্স-এর সৃষ্ট বিখ্যাত চরিত্র মিস্টার পিকউইকের নৈশ অভিবাসনের স্থান রূপে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে। অতঃপর আমরা অরওয়েল কারখানা ঘোঁষিতে চলিলাম। অরওয়েল নদীর নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এখানে একটি ফাউন্ড্রি বা ঢালাইয়ের কারখানা আছে। এই কারখানাটি ওয়েশের সর্ববৃহৎ আলো হাওয়ার ব্যবস্থাসুত কারখানা। এখানে অবিরাম গলিত ধাতু পাশে বাহিত হইয়া ছাঁচে ঢালাই হইতেছে। প্রতি বৎসর এখানে লক্ষ লক্ষ লাঙলের কলা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফাউন্ড্রি হইতে আমরা কামারের কারখানায় গেলাম। এখানে বহুসংখ্যক চুল্লি আছে, সেখানে সোঁহ দণ্ড উত্তপ্ত করিয়া তাহা হইতে নানা হাতিয়ার নির্মিত হইতেছে। বাস্প পরিচালিত শস্ত মাড়াইয়ের যন্ত্র দেখিলাম, ইহা প্রায়-এখান দেশের পক্ষে খুব উপযোগী। কারখানার প্রতিনিধিগণ আমাদের জন্য উত্তম লাকের আয়োজন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহারা কে আমাদের বেশি খাতির করিবেন তাহা লইয়া প্রতিযোগিতা করিতেছিলেন। মিস্টার জেক্স, তাহার স্ত্রী ও সন্তান-গণ বিশেষ ভাবে আমাদিগকে যত্ন করিতেছিলেন। কামারী রাজ্যের একজন বড় অফিসার তাহাদের সঙ্গে বাস করিতেন, তাহার নাম মিস্টার আর. বি. মুখার্জি। কামারীর মহারাজা তাহাকে ওখানে পাঠাইয়াছিলেন ক্রী ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার উদ্দেশ্যে। সবাই তাহার খুবই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এবং জেক্স দম্পতি ও সন্তানগণ মিস্টার মুখার্জিকে তাহাদের শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য আমাকে অহ্বোধ করিলেন। আমি তাহাদের ছোট্ট ঘেরটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কথা তাহাকে কি জানাইব? সে বলিল, “Give my love to Mr. Mukharji.”

# শ্রীঅরবিন্দের ‘দিব্য-জীবন’-এর আলোয়

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

বহুপূর্বের ওপায় থেকে আমাদের কানে আজও ভেসে আসছে ভগবানের কর্ণনিঃসৃত দিব্যবাণী : অনিত্য-স্থব্ধ লোকমিমং প্রাপ্য ভজয় মাং। “যে পৃথিবীতে এসেছো ছুমি, তা অনিত্য এবং স্থব্ধময়; হুতরাং ভালোবাসো আমাকে, আরাধনা করো আমার।” যুগে যুগে কত বাণী কত কর্ণে উচ্চারিত হোলো। তাদের বেশীর ভাগই কালের বুকে কর্ণিকের তরঙ্গ ভুলে আবার মিলিয়ে গেছে কাল-সমুদ্রের বকে। কিন্তু গীতার দিব্যসঙ্গীতের ঐ ধ্রুবাটীর মধ্যে চিরন্তনের এমনই একটি স্পর্শ আছে যা আমাদের অন্তরের সকল জালা ছুড়িয়ে দেয়, হৃদয়ের পুঞ্জীভূত নৈরাশ্রের সমস্ত তমসাকে অপসারিত করে একটি অপরাজয়ের আশার সোনার কাঠির ছোঁয়ায়।

“আমাকে ভালোবাসো, আমার আরাধনা করো।” কেন ভগবানকে ভালোবাসবো? কেন তাঁর ভজনা করবো? কারণ তাঁর মধ্যেই যে আমার জীবনের সমস্ত আনন্দ রয়েছে। তিনি যে সচ্চিদানন্দ। তিনি যে শুধু সৎ অর্থাৎ আছেন, তা নয়; তিনি যে শুধু চিদ্ব্যন, তাও নয়; তিনি পরমানন্দধর্মসূর্তি অনন্ত বাহুদেবও বটে। তিনি আনন্দরূপ। তাঁর নিজের মধ্যে তরঙ্গিত হচ্ছে একটি কলশ্রুত আনন্দের সমুদ্র। ঝাঁকে আমরা ভগবান বলি তিনি সৎ অর্থাৎ সত্য অর্থাৎ ঝাঁক কখনো কোন পরিণাম নেই, সর্বদেশে যিনি বিরাজমান এবং যিনি সবই হয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, Sachchidananda of the Vedanta is one existence without a second; all that is, is He. আনন্দকে সৎ থেকে

কোনকালেই বিচ্ছিন্ন ক’রে দেখবার উপায় নেই। নাম-রূপের এই যে বৈচিত্র্যময় জগৎ—এই জগৎ তো তাঁরই লীলা যিনি আছেন ব’লেই সব আছে, পরমচৈতন্যরূপ ঝাঁক চিহ্নান্তির নিয়ত প্রকাশ সৃষ্টির এই অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে, আর বিচিত্রকে এই যে তিনি অনবরত প্রকাশ ক’রে চলেছেন রূপের অন্তহীন লীলার মধ্যে—এই নিত্য নব সৃষ্টির বিচিত্রতা একটা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের আরাধন থেকে। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, That play is the universe and that delight is the sole cause, motive and object of cosmic existence. এই বিশ্বজগৎ তো সেই ভুবনেশ্বরের খেলারই অঙ্গ আর এই খেলা চলতেই পারতো না যদি না খেলার মধ্যে থাকতো সেই লীলাময়ের আনন্দ। এ খেলার উৎপত্তি একমাত্র আনন্দ থেকেই, এ খেলার পিছনে রয়েছে শুধু আনন্দেরই প্রেরণা, এ খেলার লক্ষ্যও আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ঝাঁক বলছেন, আনন্দাত্মেব ঐশ্বর্যমাসি তুতানি জায়তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযত্যাভিসংবিশন্তি। আনন্দ থেকেই এই সমস্ত জীবের উৎপত্তি, আনন্দকে আশ্রয় ক’রেই এরা বেঁচে আছে এবং আনন্দের মধ্যেই এরা মিলিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ব জুড়ে এই যে লীলার একটা অসুস্থ প্রোভ রয়ে যাচ্ছে—এই লীলার কারণ অসুস্থমান করতে গিয়ে আনন্দ ছাড়া আর কোন হেতুর সন্ধান পাইনে আমরা। ঝাঁকে বন্ধ বলা হয় তিনি তো পূর্ণ, অনন্ত, কোনোই অভাব নেই তাঁর, কোন কিছুই কামনা করেন না তিনি। তবে কোন্ প্রয়োজনের তাগিদে বন্ধ চিহ্নান্তিকে আশ্রয় করে



নামরূপের এই সংখ্যাহীন জগৎ সৃষ্টি করতে গেলেন ? খুবই বিস্মুটে এই প্রশ্ন। যার কোন অভাব নেই, কোন বাসনা নেই জগৎ সৃষ্টির জন্য—কেন তাঁর এই মাথা ব্যথা ? চির-মুক্ত তিনি। তিনি সক্রিয় হ'য়ে রূপের লীলার নিজেকে প্রকটিত করবেন অথবা নিষ্ক্রিয় হ'য়ে নিজের মধ্যে সৃষ্টিহীন-প্রলয়ের শক্তিকে গুটিয়ে রাখবেন—সবই একান্ত ভাবে নির্ভর করে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপরে। তিনি তো কারও অধীন নন। তবুও তিনি যখন ঘোড়াপ্রণোদিত হ'য়ে সৃষ্টির বন্ধনকে স্বীকার ক'রে নেন, অসীম হ'য়েও সীমার মধ্যে আপন স্রষ্টাকে বাজাতে থাকেন, অরূপ হ'য়েও রূপের লীলার নিজেকে ছুঁবিয়ে দেন তখন ব্রহ্মের এই লীলারনের পিছনে একটি মাত্র কারণই আমরা আবিষ্কার করতে পারি এবং এই কারণটি হোলো আনন্দ। আনন্দ ॥ আনন্দ ॥ From Delight all these beings are born, by Delight they exist and grow, to Delight they return. তৈত্তিরীয় উপনিষদ—ইংরেজী অনুবাদ—শ্রীঅরবিন্দ।

কিন্তু অখণ্ড সাক্ষিদানন্দই যদি সমস্ত কিছু হ'য়ে থাকেন, এই বিশ্বভূবন যদি সেই পরিপূর্ণ পরমসত্তার লীলার আনন্দের জন্যই তৈরি হ'য়ে থাকে তবে জগতে হুঃখ কেন ? কারণ যিনি সং অর্থাৎ আছেন, ছিলেন এবং অনন্তকাল ধরে থাকবেন, দেশ-কাল-বস্তুর দ্বারা সীমিত নন যিনি, তাঁর অস্তিত্বের পরিপূর্ণতার মধ্যে যেমন শূন্য (nothingness) বলে কিছু থাকতেই পারে না, তেমনি হুঃখ ব'লেও কিছু থাকতে পারে না। অসীমের মধ্যে আনন্দ নেই, এমন কথা আমরা ভাবতেই পারিনে। কেন ভাবতে পারিনে ? কারণ শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় “All illimitableness, all infinity, all absoluteness is pure delight.” সমস্ত নিঃসীমতা, সমস্ত অন্তহীনতা, সমস্ত পরিপূর্ণতা একটি বিস্তুত আনন্দ। চিৎসন পরমসত্তার পূর্ণতার মধ্যে অসীম আনন্দেরই হড়াছাড়। সত্য আর আনন্দ—এ দুটো শব্দ পৃথক হ'লেও একটা থেকে আর একটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার উপায় নেই। আমাদের জীবনের অতিভক্তা আমাদেরিগকে বলে, যেখানে সীমা

সেখানেই অর্ডাণ্ড। হুঃখের মূল কারণ অহংসজ্ঞান করলে আমরা দেখবো, যেখানেই পরিণামশীল কোন বস্তুতে বা ব্যক্তিতে আমাদের হৃদয় আমরা ভ্রান্তির রশে অর্পণ করি সেখানেই জীবনে হুঃখকেই আমরা ডেকে আনি। গভীরতরে সীমার বন্ধনকে অতিক্রম ক'রে যেখানে আমাদের সমস্ত সত্তা দিক থেকে দিগন্তরে বহুজনের মধ্যে বিকীর্ণ হ'য়ে যায় সেখানেই চৈতন্তের সেই মহাবিকিরণ আনন্দের একটি অনির্কচনীয়তায় আমাদের হৃদয়কে কানায় কানায় ভরিয়ে তোলে। যা সীমিত, যার পরিণাম আছে—তা সে বস্তুই হোক অথবা ব্যক্তিই হোক—তাকে ভালোবাসলে হুঃখ পেতেই হবে। মনে পড়ছে স্বামীজীর কঠিনঃস্বত বাণী : “ভ্রান্তিবশতঃ কোন পরিণামশীল বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি হৃদয় অর্পণ করিও না। কারণ তাহা হইতে হুঃখের উদ্ভব। তুমি বহু বিশেষকে ঐরূপ হৃদয় অর্পণ করিতে পারো, কিন্তু কাল সে তোমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তুমি স্রষ্টাকে হৃদয় অর্পণ করিতে পারো, কিন্তু সে হয়ত কাল বাদে পরন্তু মরিয়া যাইবে। এই রূপেই জগৎ চালিতেছে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ গীতার বলিতেছেন, সেই প্রহু ভগবানই একমাত্র অপরিণামী। তাঁহার ভালোবাসার কখনো অভাব হয় না।” ব্যক্তিকে বা বস্তুকে ভালোবেশে হুঃখ কেন ? কারণ যাকে চোলে দিচ্ছ হৃদয়ের ভালোবাসা সে তো তোমার ভালোবাসার বন্ধনের মধ্যে থাকতে রাজী নয়। আত্মুলের কঁক দিগে যেমন জল গলে যায় তেমনি যাকেই তুমি হৃদয় অর্পণ করছো সে-ই তোমার আলিঙ্গন-পাশ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে কোন্ স্রুদূরে স'রে যাচ্ছে। যে যাহুবটাকে আজ তুমি ভালোবাসছো একবছর পরে দেখবে সেই যাহুবটী আর সে-মাহুস নেই। সে একদম বদলে গেছে। তোমাকে সে যেন বুঝতেই পারছে না। তার হৃদয়ের মধ্যে তোমার জন্ত যদি বা একটু জায়গা অবশিষ্ট থাকে সেই প্রেমের স্বল্পতা তোমাকে নিরাশ করবে। আর অল্পে তো যাহুবের স্রুপ নাই। যাহুবের আনন্দ ভূমার। তাই তো এমন কাউকে আমরা ভালোবাসতে চাই যার প্রেমের মধ্যে উদ্ভব পুরুষের একবচনের নাম-গন্ধ নেই, যিনি

প্রতিদানের কোন অপেক্ষা না রেখে ভালোবাসার জন্তই ভালোবাসবেন আমাকে, ঐরুদ্রকে অধিকার করে থাকবো শুধু আমি। তাই আনন্দের জন্তই আমরা আমাদের রুদ্রের সমস্ত ভালোবাসা নিবেদন করে দেবো তাঁকেই ঐরুদ্র কখনো কোনো পরিণাম নেই, ঐরুদ্র ভালোবাসার কখনো অভাব হয় না। আর একমাত্র অপরিণামী তো ভগবানই। তিনি সৎ। তাই তাঁর মধ্যেই আমাদের যথার্থ আনন্দ। স্বামীজীর ভাষায়, ‘রুদ্রের ভালোবাসায় কেবল একজনের মাত্র অধিকার। কাহার অধিকার? তাঁহারই অধিকার, ঐরুদ্র কখনো কোনো পরিণাম নাই। কে তিনি? ঐশ্বর।’

সুতরাং এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে : যা কিছু নিঃসীম, যা কিছু শাশ্বত তার অন্তহীনতা, তার পরিপূর্ণতা একটি বিশুদ্ধ আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সত্য যিনি, অনন্ত চৈতন্যরূপ যিনি, ঠাকুরের ভাষায় ‘অখণ্ড সচ্চিদানন্দ’ যিনি তাঁকে খণ্ডিত করে দেখার কোনো মানে হয় না। যিনি সৎ, তিনিই আবার আনন্দ। তবুও যখন আমরা বলি, ব্রহ্মের অসীম সত্তার আনন্দ-অংশ থেকে এই সকল ভূতের উৎপত্তি হয়েছে তখন এমন ধারণা আমরা যেন না করে বসি যে ব্রহ্মের এই আনন্দ (self-delight of Brahma) কোথাও গিয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছে। এই আনন্দ নিজেকে অব্যাহিত করে চলেছে সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় অনন্ত প্রবাহের মধ্যে। ব্রহ্মের এই যে সৃষ্টির খেলা চলেছে সংখ্যাহীন সৌরভগুণে জুড়ে—এই তো শক্তিরই খেলা। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম আপন পরমাশক্তিকে আশ্রয় করে সৃষ্টির অন্তহীন প্রবাহের বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন। এই প্রকাশ কোনো বাধ্য-বাধকতা থেকে আদৌ নয়। যে-ব্রহ্মের চিন্ময় অনন্ত সত্তার মধ্যে রয়েছে একটি পরিপূর্ণতা তিনি যে সর্বভোক্তাভাবে স্বাধীন, তিনি যে তাঁর কর্তব্য অধীন নন, এটি আমাদের ধরে নিতেই হবে। কারণ, ব্রহ্ম যদি প্রকৃতিই ইচ্ছায় পরিচালিত হন তবে তিনি চিদ্বশ সর্ব-শক্তিমান ব্রহ্ম নন। তিনি অনন্ত হতে পারেন কিন্তু সেই অনন্ত জড়েরই পর্যায়ভুক্ত। তিনি শক্তির চৈতন্য

অধিকারী হ’তে পারেন—কিন্তু সেই শক্তির সর্বময় কর্তা তিনি নন, কারণ তাঁর শক্তিই প্রভু হয়ে তাঁকে চালাচ্ছে। শ্রী অরবিন্দ বলেছেন, A Brahma compelled by Prakriti is not Brahma, but an inert Infinite. সুতরাং ব্রহ্মের শক্তির স্বকনাম্বক এই খেলা যখন বাধ্যতা-মূলক নয় তখন ধরে নিতে হবে, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম সৃষ্টিবিহিত-বিধায়িনী প্রলয়করী শক্তির মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত করতেনও পারেন, না-ও করতে পারেন। গতির যে একটি শক্তি, একটি বেগ বা প্রেরিত রয়েছে তাঁর মধ্যে সেই শক্তিকে প্রকটিত করার অথবা না করার অন্তর্নিহিত অধিকার তারই।

তাঁর যদি হয় তবে স্বীকার করতেই হয়, নিজের আনন্দকে আশ্রয়ন করার জন্তই লীলার এই অক্ষয় প্রোত ব’য়ে চলেছে জগৎ জুড়ে। এই অনন্ত গতিশীলতার ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ব্রহ্মের স্বতঃস্ফূর্তিত আনন্দেরই প্রকাশ, প্রেমেরও প্রকাশ কারণ ভগবান প্রেমস্বরূপ এবং আনন্দ-স্বরূপ; God is Love and Delight. যাকে আমরা বিশ্বসত্তা বা World existence বলি—সে তো শিবের আনন্দময় নৃত্য। সেই নটরাজ আনন্দে পাগল হ’য়ে নাচছেন আর সেই নাচের ঘূর্ণীপাক ভাগবানের দেহকে কতরূপেই না আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রকটিত করছে। কিন্তু এই চঞ্চল নৃত্যের মধ্যে মহাদেবের শুভ্র সত্তার প্রশান্ত হৈর্য রয়েছে অটুট, অতুলস্পর্শী। নৃত্যের চাকল্য সেই হৈর্য এবং প্রশান্তিকে আদৌ স্পর্শ করছে না। ভগবান যা ছিলেন, অনন্ত কাল ধরে যা আছেন এবং অনন্ত কাল ধরে যা থাকবেন তাতে কোনোকালে কোনো পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগবে না। সমস্ত পরিবর্তনকে অতিক্রম করে আছে সেই পরমসত্তা। নাচের আনন্দই হচ্ছে নটরাজের নৃত্যের একমাত্র লক্ষ্য। কী অপূর্ণ ভাষায় শিবনৃত্যের ব্যাখ্যা এসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : World-existence is the ecstasitic dance of Shiva which multiplies the body of the God numberlessly to the view ;

it leaves that white existence precisely where and what it was, ever is and ever will be ; its sole absolute object is the joy of the dancing. এই বিশ্বস্তা, World-existence যদি শিবের আনন্দময় বৃত্ত্য না হতো, এই বৃত্ত্যের মধ্যে যদি সচ্চিদানন্দের আনন্দরূপের একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ না থাকতো তবে কোথায় থাকতো সৃষ্টির মধ্যে রূপের এই অন্তহীন বৈচিত্র্য ?

“মরি মরি সে আনন্দ খেমে যেত যদি

এই নদী

হারাত তরঙ্গবেগ,

এই মেঘ

মুছিয়া কলিত তার সোনার লিখন ।

তোমার চিকন

চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হ’তে যদি মিলাইত

তবে

একদিন কবে

চকল পবনে লীলারিড

মর্মর-মুখর ছায়া মাধবী-বনের

হ’ত স্বপনের।” (বলাকা-ববীপ্রনাথ)

ব্রহ্মের তো কোনো অভাব নেই, কোনো কামনা নেই। তিনি তো পূর্ণ।

“নিত্য তোমার পায়ের কাছে

তোমার বিশ্ব তোমার আছে

কোনোখানে অভাব কিছু নাই।” (বলাকা)

পূর্ণ যিনি, সমস্ত অভাবের উৎসে যিনি, জগৎসৃষ্টির জন্ত তাঁর এমন কি দার ছিল ? সবই তাঁর ছিল, হিসেটা না শুধু ধন-দানের পরিপূর্ণতার মধ্যে ব্রহ্মের আনন্দ।

“পূর্ণ তুমি, তাই

তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে।

তাই তো একে একে

যা-কিছু ধন তোমার আছে আমার ক’রে লবে।”

(বলাকা)

এই আনন্দের জন্তই, যে পূর্ণ ব্রহ্ম, তুমি

“এমনি ক’রেই দিনে দিনে

আমার চোখে লও যে কিনে

তোমার সুর্য্যোদয়।

এমনি ক’রেই দিনে দিনে

আপন প্রেমের পরশমাণি আগনি যে লও চিনে

আমার পরাণ করি হিরণ্ময়।” (বলাকা)

কিন্তু যিনি সৎ অর্থাৎ যিনি আছেন, ছিলেন এবং চিরকাল ধরে থাকবেন তিনি যদি অনন্ত আনন্দই হন, আনন্দই যদি তাঁর স্বরূপ হয় তবে জগৎজুড়ে এত দুঃখ, এত কষ্ট কেন ? কারণ বাইরে থেকে দেখলে আমরা দেখতে পাই পৃথিবী দুঃখে ভরে রয়েছে। বেদনা ভরা সংসারে সুখ যেন আগন্তুক পাখী ;—কিছুক্ষণের জন্ত শাখায় বসে তাকে ছোলা দিয়ে ফুৎকা’রে উড়ে যায়। শ্রীঅরবিন্দ The Life Divine-এ এই প্রসঙ্গে যা বলেছেন তার মধ্যে রয়েছে একটা নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গিমা। তিনি বলেছেন, জীবনে আনন্দের পরিমাণ দুঃখের পরিমাণের অল্পপাতে অনেক বেশী। The sum of the pleasure of existence far exceeds the sum of the pain of existence. অভ্যর্থনের মধ্যে যে একটা আনন্দ আছে সেই আনন্দই হচ্ছে প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থা, আমাদের একেবারে ঠাটি ঘরের জিনিস। দুঃখ স্বাভাবিক নয়। ওটা কর্তব্যকালের জন্ত এসে আমাদের স্বাভাবিক অবস্থাকে আচ্ছন্ন ক’রে কেলে। আনন্দ আমাদের সহজ স্বাভাবিক সম্পদ বলেই তার সম্পর্কে আমরা তেমন সচেতন নই। আমাদের চেতনার সে থেকেও নেই। চোখ আমাদের এত বড়ো সম্পদতার সম্পর্কেও একই কারণে আমাদের চেতনার অভাব। আনন্দ যখন স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সুখের অল্পভূতির তরঙ্গচূড়ার পৌঁছায় তখনই তার তীব্রতার মধ্য দিয়ে আনন্দের স্পর্শ আমরা অনুভব করি। সুখের এই তীব্রতাই আমাদের কাছে আনন্দ রূপে প্রতিভাত হয়। এই আনন্দকেই আমরা ঝুঁজে ঝুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু প্রতিদিনের জীবনযাত্রার ঝুঁটিনাটির মধ্যে বেঁচে থাকার যে একটা সহজ আনন্দ আছে তা আমাদের কাছে কেমন যে

পানসে। তা হুংখও নয়, হুংখও নয়। তবু জীবনের মধ্যে আনন্দ তো রয়েছেই, যাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন a great practical fact. কারণ, আনন্দের জন্য যদি একটা সর্গজনীন এবং সর্গপ্রাপ্ত প্রবণতা না থাকতো তবে জীবনকে আঁকড়ে থাকবার একটা জোরালো প্রবৃত্তি এমন ক'রে আমাদের রক্তের মধ্যে শিকড় গাড়ে পায়তো না। এই self preservation-এর প্রবণতা এলো কোথা থেকে? নিশ্চয়ই বেঁচে থাকার মধ্যে একটা স্বাভাবিক আনন্দ আছে বলেই জীবনকে আমরা ভালোবাসি। জীবন কণিকের তা জানি। কবির ভাষায়

“তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।

মোর বাণী

একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না,

মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,

মোর হিয়া ফুটিবে না।

অক্লণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে;

মোর কানে কানে

রজনী কবে না তার রহস্তবারতা,

শেষ ক'রে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।

(বলাকা)

কিন্তু জগৎকে, জীবনকে ‘এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া’ই কবির কাছে সত্যের চূড়ান্ত নয়। সত্যের হারায় আমরা বাস করছি ঠিকই, কিন্তু কী গভীর ক'রে জীবনকে আমরা চাইছি। জগৎকে কী গভীর করে আমরা ভালোবাসছি। এই একান্ত করে চাওয়ার মধ্যে কি কোন সত্যই নেই? এই ‘লক্ষ রূপের সঙ্গীতে মাথা’ হৃদয়ের ভুবনে আমরা কি কেউ সাধ ক'রে মরতে চাই? মানুষের মধ্যে আমরা কি বেঁচে থাকতে চাই নে? জানি তো এই পৃথিবীর পাঁচশালার দ্বিগুণগুণ থেকে সমাপ্ত আমরা বাজীরা এক রাজ্যের জন্য মিলিত হয়েছি। রাজ্যের অবলানে চলে যাবো একা একা অজানার মধ্যে। সঙ্গে কেউ থাকবে না। তবুও পাঁচশালার আগুনের ধারে

কণিকের এই কলরবরুধর আড্ডা আমাদের হুলাফিরদের কাছে কতই না প্রিয়।

‘আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতের;

পাকে পাকে ফেরে ফেরে

আমার জীবন দিয়ে জড়িয়েছি এরে;

প্রভাত-সন্ধ্যার

আলো-অন্ধকার

মোর চেতনায় গেছে ভেসে;

অবশেষে

এক হ'য়ে গেছে আজ আমার জীবন

আর আমার ভুবন।

ভালোবাসিগাহি এই জগতের আলো

জীবনের তাই বাসি ভালো।” (বলাকা)

হুংখকে এড়িয়ে যাবার দিকে একটা প্রবণতা সর্গজনীন। ‘কেবা সে পামর হুংখে যার ভালোবাসা?’ জীবনের পানপাত্র যদি বেদনার ভিত্তরসে কানায় কানায় ভরা থাকতো তবে জীবনকে কেউ আমরা ভালোবাসতাম না। ‘মরণ হ'লে বাঁচতাম’—ওটা আমাদের শুধু একটা সুখের কথা। তবুও বেঁচে থাকার আনন্দের দিকটাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে হুংখে যে আমরা এত বিচলিত হয়ে পড়ি তার কারণ শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়: “It is abnormal to our being, contrary to our natural tendency and is experienced as an outrage on our existence, an offence and external attack on what we are and what we seek to be.” “হুংখ জিনিষটা আমাদের সত্তার পক্ষে আদৌ স্বাভাবিক নয়; আমাদের সহজ প্রবণতা হুংখে আমল না দেওয়ার দিকেই, হুংখের অভিজ্ঞতাকে আমাদের অস্তিত্বের উপরে একটা হামলা ব'লেই আমরা মনে করি, আমরা মূলতঃ বা এবং বা আমরা হ'তে চাই, হুংখ তার উপরে একটা বহিরাক্রমণেরই সাক্ষি, হুংখ তার বিরুদ্ধে একটা অপরাধ।”

ঔপনিষদিক তত্ত্বের আলোয় এটা পরিষ্কার ক'রে বোঝা গেল, আনন্দের জন্য মানুষের মধ্যে রয়েছে একটা

অপরাধের প্রবণতা। আনন্দকে অগ্রসর করার দিকে  
জীবনের এই যে বোঁক রয়েছে, এর শিকড় আমাদের  
একেবারে মর্শের মজ্জার মধ্যে। বলতঃ আমাদের বেঁচে  
থাকার সমস্ত ব্যাপারটাই আনন্দ পাওয়ার জড়ই। এই  
আনন্দের অগ্রসরণকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন :  
the fundamental impulse and sense of Life.  
আগামীকালের আনন্দের উজ্জ্বল সম্ভাবনাই তো মানুষকে  
দিচ্ছে বেঁচে থাকার প্রেরণা। তার চারদিকে যাকিকছু,  
সবই তো জলবুদ্বুদের মতো ফুটেই মিলিয়ে যাচ্ছে, যেন  
বাজকরের ভোজবাজি। এই আছে, এই নেই। কাল-  
প্রোতে ভেসে চলেছে জীবন-বোঁবন-ধন সমস্ত কিছুই।

“অস্থির সত্তার রূপ ফুটে আর টুটে ;

‘নয় নয়’ এই বাণী ফেনাইয়া মুখারিয়া উঠে

মহাকাল-সমুদ্রের পরে।

সেই ঘরে

কত্থের ডমকুধনি বাজে

অসীম অশ্বর-মাঝে

নয় নয় নয়।” (পরিশেষ—রবীন্দ্রনাথ)

এই প্রলয়ের তীরে, মৃত্যুর এই ছায়ায় মানুষের কিন্তু  
বেঁচে থাকার আশ্রয় কী প্রবল। স্বামীজীর ভাষায়,

“সুখ তরে সবাই কাতর, কেবা সে পামর হুঃখের যার  
ভালোবাসা।

সুখে হুঃখ, অন্তরে গরল, কঠে হলহল, তবু নাহি  
ছাড়ে আশা।”

প্রলয়ের মধ্যে সৃষ্টির ধারা যখন কণে কণে বিলুপ্ত হ’য়ে  
যাচ্ছে তখনও মানুষ কিসের আশায় জীবনের প্রেমে  
মাতোয়ারা হ’য়ে আছে? নিশ্চয়ই আনন্দের আশায়।  
শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন—The unconquerable  
impulse of man towards God, Light, Bliss,  
Freedom, Immortality অর্থাৎ ভগবান, আলো,  
আনন্দ, স্বাধীনতা, অমরতা—এদের জড় মানুষের  
অপরাধের যে একটা প্রবণতা—এই প্রবণতাই বিশ্বব্যাপী  
বিনাশের অকরণ খেলার মধ্যেও আমাদেরকে বেঁচে  
থাকার প্রেরণা দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অনন্ত-  
করণীয় ভাষায়,

“যাবে সব যাবে চলে, তবু ভালোবাসি,—

চমকে বিনাশ-মাঝে অভিবের হাসি

আনন্দের বেগে।

মরণের বাঁধাতারে উঠে জেগে

জীবনের গান।”

তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, ভগবান যখন সচিদানন্দ এবং  
এই সমস্ত কিছুই যখন সচিদানন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়,  
তখন হুঃখ-ব্যথার অভিন্ন আদৌ কেমন ক’রে সম্ভব?  
সচিদানন্দ তো প্রকৃতির ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত কোন জড়  
সত্তা নয়। তিনি চিদ্মন, পরম চৈতন্যরূপ। সেই  
শান্তম্, শিবম্ অশেষতম্-এর আনন্দময় নৃত্যই হচ্ছে এই  
জগৎ। এই নৃত্যলীলায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, সেই  
মুগ্ধের “পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের  
আন্দোলন।” তাই যদি হয়, ভগবান যদি চিদ্মনই হন  
এবং সৃষ্টি যদি হয় ভগবানের চিত্ত-শক্তির “নিঃশেষ  
আনন্দেরই আন্দোলন” তবে সেই আনন্দধন চিহ্নের পরম  
দেবতা তাঁর সৃষ্ট জগতের জীবগণকে এত হুঃখের আশুনে  
পোড়ানো কেন? পৃথিবীতে অন্তঃশক্তির এত  
প্রাহুর্ভাব কেন? আমরা যদি বলি হুঃখ হচ্ছে  
একটা অগ্নি-পরীক্ষা, যে আশুনে পুড়িয়ে তিনি  
আমাদেরকে গুহ্য করেন তা হলেও এই জবাবের মধ্যে  
নৈতিক সমস্যার সমাধান নেই। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়  
না ঈশ্বর প্রেমরূপ বজ্ররূপ। প্রমাণিত হয়  
ঈশ্বর প্রতাপশালী বাঁর নিয়মের কাছে নতিস্বীকার না  
ক’রে উপায় নেই, বড়ো জোর বাঁর খেয়ালকে  
তুষ্ট করার আশা আমরা পোষণ করতে  
পারি। কারণ, যিনি নির্ধ্যাতন আবিষ্কার করেন  
আমাদের বাচাই করার একটা উপায় হিসাবে, যত্নপা  
দিয়ে যিনি আমাদের পরীক্ষা ক’রে দেখেন আমরা ঋণি  
না ভেজাল, তিনি হয় যেচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতার অপরাধী,  
নয় তো নৈতিক কোনো চেতনা নেই তাঁর মধ্যে। এই  
নৈতিক সমস্যার জটিলতাকে এড়ানোর জন্য যদি আমরা  
বলি, নৈতিক কোন পাপ করলে—তা একঘেয়েই হোক  
অথবা পূর্ণ জঘেই হোক—তার ফল ভগ্নতাই  
হবে এবং পাপের সেই অনিবার্য ফল হচ্ছে হুঃখ,

যান্ত্রিক পরিণাম হচ্ছে শান্তি তা হলেও কিন্তু মূল নৈতিক সমস্তার গিঁট আমরা খুলতে পারছি নে। শেষ প্রশ্ন থেকেই যায় : কে যাহুয়ের মধ্যে তৈরী করলো অন্তত প্রবৃত্তি? পাপ করার প্রবণতা এলো কোথা থেকে? নৈতিক পাপ তো আসলে মানসিক ব্যাধি অথবা অবিজ্ঞা। মানসিক ব্যাধি থেকে বা অবিজ্ঞা থেকে নৈতিক অপকর্ষ যদি আমরা ক'রেই ফেলি তবে তার জগৎ এত সাংঘাতিক শান্তি পেতে হবে কেন? শ্রীঅরবিন্দ বলছেন : “The inexorable law of Karma is irreconcilable with a supreme moral and personal Deity, and therefore the clear logic of Buddha denied the existence of any free and all-governing personal God; all personality he declared to be a creation of ignorance and subject to Karma.” অর্থাৎ যেমন কর্ম তেমনি ফল এই নিশ্চয় নিয়ম এবং করুণা-ঘন এক পরম দেবতার অস্তিত্ব—এ দুয়ের মধ্যে মিল কোথায়? এবং এই কারণেই বুকের পরিচ্ছন্ন বিচারবুদ্ধি অস্বীকার করেছিলো সর্বনিয়ন্তা স্বাধীন কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বকে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন সমস্ত ব্যক্তিসত্তাই অবিজ্ঞার সৃষ্টি, কর্মের অধীন।”

কিন্তু সচ্চিদানন্দই যখন জগতের স্রষ্টা এবং তিনিই যখন সবই,—তখন হুঃখ ব্যাধার অস্তিত্ব কেন—এ সমস্যা তো উঠবার নয়। তবুও এই সমস্যা নিদারুণ হ'য়ে আমাদের মনকে আন্দোলিত করবে যদি আমরা ধরে নিই—ঈশ্বর বিশ্বজগতের বাইরে রয়েছেন কোথাও এই জীব-জগৎ তিনি নন, ভালো-মন্দ, হুঃখ-ব্যথা তিনি তাঁর জীব-সকলের জন্ত সৃষ্টি করেছেন কিন্তু নিজে আছেন সমস্ত ভালো-মন্দের ও হুঃখ-ব্যথার উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য লোক থেকে তিনি দেখছেন সবই, জগৎ শাসন করছেনও তিনিই, হুঃখময় পৃথিবীতে তাঁরই ইচ্ছাকে পূর্ণ করছেন তিনি। তবে তাঁকে কোন মতেই মজলময় এবং প্রেমময় বলা যেতে পারে না। যদি তিনি অপরিবর্তনীয় কোন নিয়মের দ্বারা জগৎকে পরিচালিত হ'তে দেন, তাঁর

সাহায্য থেকে যদি জগৎ বঞ্চিতও থাকে অথবা সেই সাহায্য যদি আংশিক হয় তা হলেও তাঁকে সর্বশক্তিমান, মজল ও প্রেমধরূপ বলার কোন মানে হয় না।

শ্রীঅরবিন্দ তাই বলছেন, On no theory of extra-cosmic moral God, can evil and suffering be explained. অর্থাৎ ভগবান জগৎ-ছাড়া-এরকম কোনো মতবাদ দিয়ে অমজল আর হুঃখের আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো না। যদি করতে বাই সেটা হবে আসল প্রশ্নকে এড়ানোর জন্ত বুদ্ধির নামে একটা প্যাঁচালো কৌশলের আশ্রয় নেওয়া। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মতে বেদান্তের সচ্চিদানন্দ extra-cosmic বা জগৎ-ছাড়া নন। তিনি বলছেন : Sachchidananda of the Vedanta is one existence without a second : all that is, is He. বেদান্তের সচ্চিদানন্দ এক এবং অবিভীড়। যা কিছু আছে, সবই তিনি। তা হলে অন্তত এবং হুঃখ যদি থাকে তবে তিনিই তো সেই হুঃখ বেদনা ভোগ করছেন জীবের মধ্যে। জীব তো তাঁরই মূর্তিবিগ্রহ। এই বৈদান্তিক পরমভবের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত সমস্যাটিকে দেখলে সমস্যার চেহারা ই পালটে যায়। ভগবান কেমন করে তাঁর জীবসকলের জন্ত এমন হুঃখ সৃষ্টি করলেন যার থেকে তিনি নিজে মুক্ত?—এই প্রশ্নের বে উত্তর পেলাম শ্রীঅরবিন্দের The Life Divine-এ, সেই উত্তরই পাই রবীন্দ্রনাথের হৃদ্যাবদ্ধ ভাষার ‘মিলন’ কবিতাটির মধ্যে :

“তোমাতে দিব না দোষ। জানি মোর ভাগ্যের ক্রকুটি,  
কুহু এই সংসারের যত ক্রত, যত তার ক্রটি,  
যত ব্যথা আঘাত করিছে তব পরম সত্তারে  
অহরহ। জানি যে ছুমি তো নাই ছাড়ারে আমারে  
নির্গিপু হৃদয় বর্ণে। আমি মোর তোমাতে বিরাজে।  
দেওয়া-নেওয়া নিরন্তর প্রবাহিত ছুমি-আমি মাঝে  
হৃদয় বাধারে অভিক্রম। আমার সকল ভার  
যাতিদিন রয়েছে তোমারি 'পরে, আমার সংসার  
সে শুধু আমারি নহে।” (পরিশেষ—রবীন্দ্রনাথ)

ঐশ্বরবিশ্বের জীবন-দর্শন ঔপনিষদিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। The Life Divine-এ মূলতঃ বেদান্তেরই অপূর্ণ ব্যাখ্যা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার মূলেও প্রাণরস ঢেলে দিয়েছে উপনিষদেরই ব্রহ্মহীন বাণী, তপোবনের ব্রহ্মজয় পরম ঘোষণাগুলি। ঐশ্বরবিশ্ব মূলতঃ দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। রবীন্দ্রকাব্যেও দার্শনিকের চিন্তাশীলতার স্বাক্ষর প্রচুর। কিন্তু ঐ কাব্যের মৌলিক আবেদন আমাদের হৃদয়াবেগের কাছে। The Life Divine-এ যে সত্যকে আমরা বুঝির বহু আলোর জ্বলি, রবীন্দ্রকাব্যে সেই একই ঔপনিষদিক সত্যকে মর্শ্বের মধ্যে আমরা গভীর করে অনুভব করি। কবির কাব্যের মধ্যে জ্বলিত এমন একটি অনির্লুপ্তচরিত্র বাহু থাকে যা আমাদের হৃদয়ের বীণাজ্যোতিতে বিশেষ একটা সুরকে জাগিয়ে তোলে। ঐ সুর জাগানো লজিকের নিয়মে সাজানো গন্তের পক্ষে সম্ভব নয়। আর যত্নে প্রাণ না হুললে কোনো বড়ো কাজের মধ্যে আমরা ঝাঁপ দিতে পারি নে। এইখানেই কাব্যের পরম অবদানের মহিমা ব্যবহারিক দিক থেকে।

কিন্তু বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে যাই। প্রবন্ধের কলেবর আর বাড়িয়ে লাভ নেই। যিনি “নাই ছাড়িয়ে আমারে নির্গুণ সূর্য স্বর্গে”, আমার মধ্যে থেকে যিনি অহরহ আমার হৃৎকের ভাগ নিচ্ছেন, যাকে extra cosmic বলার কোনো মানে হয় না, তাঁকে হৃদয়হীনতার অপরাধে অপরাধী করা চলে না। কিন্তু আরও একটা প্রশ্ন থেকে যায় যার একটা সহজত্তর পাওয়া দরকার। প্রশ্নটি হোলো, যিনি সচ্চিদানন্দ, এক এবং অবিভী

এবং অনন্ত, তিনি নিজের মধ্যে এমন কিছুকে স্বীকৃতি দিলেন কেন যা আনন্দ নয়, যা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় আনন্দের সম্পূর্ণ বিপরীত বলে।

অবশ্যই এই মোক্ষম প্রশ্নের জবাব আমরা The Life Divine-এর মধ্যেই পাবো। কারণ, জীবনের গভীর সত্যগুলি আপাতদৃষ্টিতে যতই paradox বলে মনেহোক না কেন, তাদের মধ্যে কোনখানে একটা মিল আছেই আর এই মিলকে যতক্ষণ আমরা প্রজ্ঞার আলোর আবিষ্কার করতে না পারিহি ততক্ষণ আমাদের মধ্যে একটা দারুণ অভ্যুত্থিত থেকেই যাচ্ছে। For all problems of existence are essentially problems of harmony. জীবনের সমস্ত সমস্যাই তো আসলে একটা সম্বন্ধেরই সমস্যা। বাদের মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাচ্ছি নে আমরা তাদের ভিতরকার অসঙ্গতির মধ্যে কোন সম্বন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টা না করে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে কারা? বাদের মনটা ঘুমিয়ে আছে, আচ্ছন্ন হয়ে আছে, একধা তামাসিকতার মধ্যে। বাদের মন জাগ্রত তারা অজানাকে জানবার জন্য নিজেদের মধ্যে একটা দুর্বীর কোঁতুল অনুভব করবেই। উপনিষদের ঋষিদের মধ্যে অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার, অধরাকে ধরবার, মহাতমসার পারে জ্যোতিতে পৌঁছাবার একটা গভীর পিপাসা ছিল। আর তাঁদের চিন্তের মহাজিজ্ঞাসাগুলির উত্তরও তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। সচ্চিদানন্দের মধ্যে হৃৎকের অস্তিত্ব কেমন করে সম্ভব এ প্রশ্নের উত্তরও খুঁজে পেরেছিলেন তাঁরা। The Life Divine-এ হৃৎকের সমস্ত ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু আজ এই পর্য্যন্ত।

# জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

## [ নিগ্রো মনোবী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের জীবনামল্য ]

অমল সেন

জর্জ কার্ভার জীবনে কখনো ধূমপান করেননি। ধূমপান সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—“ভগবান মানুষকে নাক দিয়েছেন সুগন্ধ গ্রহণ এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য, মানুষ তার নাককে ধূম উৎসর্গের চিমনি হিসেবে ব্যবহার করবে ভগবানের যদি তাই-ই অভিপ্রায় হত তবে নাক না বানিয়ে অন্যরাসে তিনি আমাদের নাকগুলোকে উদ্ধবুখী সূর্য চিমনি, তৈরি করতে পারতেন। তা যখন তিনি করেন নি, তখন বুঝতে হবে ধূমপান করে মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করছে।

বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে জর্জ কার্ভার একবার বলেছিলেন, “আমি বিশ্বপ্রকৃতিকে একটা বড় রকমের যেতার বার্তার সীমাহীন ব্যবস্থা বলে মনে করি। প্রতি ঘটায়, প্রতি গল অল্পপলে এই ব্যবহার মাধ্যমে তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। আমরা যদি যথাস্থানে ঠিক সুরটি ধরতে পারি তবেই তাঁর অসুত বাণী আমাদের কর্ণকূহরে প্রবেশ করবে, তাঁর অসুচারিত বাণী আমাদের বোধগম্য হবে।”

বুড়্যকে জর্জ কার্ভার তাঁর পরম নির্ভর এবং একমাত্র আশ্রয় বলে একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি কখনো বুড়্যভয়ে ভীত বা সন্ত্রস্ত হননি। প্রায় সময়েই তিনি বলতেন, “অনেক জিনিসের মতো বুড়্যও আমাকে সাহায্য করেছে। বুড়্য এত বেশী সাহায্য আমাকে করেছে যা আমি আর কারুর কাছ থেকে কখনো পাইনি, তাই আমি বুড়্যের কাছে গুণী। আমি কবে মারা যাবো সেটা বড় কথা নয়। আমি বর্তমান বাঁচবো আমার সেই জীবনকালের মধ্যে কী এবং কতখানি বেশী জিনিস আমি দিয়ে যেতে পারবো, কোন্ মহত্তর কর্তব্য

আমার দ্বারা সাধিত হবে এবং তা জগতের কল্যাণের কাজে লাগবে কি না সেইটেই হল সবচেয়ে বড় কথা।”

অধ্যাপক কার্ভার ছাত্রদের কাছে ছিলেন সেরা শিক্ষক, সবচেয়ে প্রিয় মাস্টারমশাই। তাঁর ওপরে ছাত্রদের প্রগাঢ় ভক্তি ও অবিচল আস্থা। শিক্ষকের ওপরে ছাত্রদের এরকম গভীর প্রীতি ও পরিপূর্ণ নির্ভরতা খুবই কম দেখা যায়। যখনই বা যে কারণেই হোক কার্ভারের ছাত্ররা জাতিবিষেব বা নিষ্ঠুর বর্ণ-বৈষম্যের শীকার হয়েছে তখনই তারা তাদের গুরু, বন্ধু ও নেতা জর্জ কার্ভারের শরণাগত হয়েছিল, পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহারে যখনই তাদের অন্তর বেদনার রক্তাক্ত হয়েছে তারা সাহসনা পাবার আশায় ও প্রতিকারের উপায় জানবার জন্য তাঁর কাছে ছুটে এসেছে, আর কার্ভার তাদের সব কথা শ্রবণ ও সহানুভূতির সঙ্গে শুনেছেন, তিনি তাদের অপমানে বিচলিত বা বৈধ্বংস্য না হবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন, উপদেশ দিয়েছেন নিশ্চিন্দা-প্রশংসা, দান-অপমান সব সমান ভাবে তুচ্ছ করে অবিচলিত চিন্তে দৃঢ় পদক্ষেপে কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আপনার লক্ষ্যপথে এগিয়ে যেতে। তিনি ছাত্রদের একটা কথা বেশ জোরের সঙ্গে প্রায়ই বলতেন, “বর্ণবিষেবী যেতাজরা নিজেদের স্বপ্নের আশুনে নিজেরাই একদিন পুড়ে মরবে। কোন ক্ষতি তারা তোমাদের করতে পারবে না। পৃথিবীতে এমন এক দিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন কৃষ্ণাজরা আর এভাবে পায়ের তলায় পড়ে থেকে যেতাজদের দ্বারা পদদলিত হবে না, যেতাজদের চাবুকের দ্বারা আর তাদের দেহ রক্তাক্ত কর্তব্যকৃত হবে না, যেতাজদের সাহসনা ও নিশীড়ন আর তারা সহ্য করবে না। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের



মার ষাণ্ডার দিন শেষ হবে। নিম্নোক্ত সোদিন পরি-  
পূর্ণ মানবাধিকার আদার করার জন্য সকলে সংযত হইবে  
এক সঙ্গে উঠে দাঁড়াবে।” “ওরা যদি দিতে না চায়।”  
—একজন ছাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। উত্তরে জর্জ কার্ভার  
বলেছিলেন, “ওরা তো দিতে চাইবেই না। যতকাল  
পারে ওরা ওদের জুলুম আর অত্যাচারের রথ চালিয়ে  
যাবে আমাদের পিঠে মারবার জন্য, কিন্তু আমরা  
কৃষ্ণাঙ্গরা কিছুতেই তা হতে দেবো না। এই  
অসাম্য, এই অবিচার দূর করতেই হবে। আমি অহুত্ব  
করিছি, আমাদের সেই বন্ধন-মুক্তি ও নব-জাগরণের  
নতুন যুগ শুরু হয়েছে, কিন্তু হয়তো বেঁচে থেকে সে  
জাগরণের পূর্ণ রূপ দেখে যেতে পারবো না। তোমরা  
যারা তখন থাকবে তারা যেন দেখতে পায়। তার জন্য  
হয়তো তোমাদের সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে ধৈর্য  
ও তীক্ষ্ণতার সঙ্গে। অজ্ঞানের অন্ধকারে আমাদের  
যে সব ভাইবোনরা এখন ডুবে আছে সোদিন তারা  
জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল হইবে, সত্যের সুখো-  
মুখি দাঁড়িয়ে সোদিন তারা স্পষ্ট উপলব্ধি করবে  
বন্ধনমুক্ত স্বাধীন জীবনকে, এই পৃথিবীর বুকে তারা  
স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বিচরণ  
করবে। তোমরা সবাই এ যুগের সুজ্ঞাত, সেই অনাগত  
যুগের বাণী তোমরা নিজদের মধ্যে বহন করে  
চলেছো। আজ থেকে যদি তোমরা তার জন্য তৈরি  
থাকো তা হলে তখন তোমরা অহুত্ব করতে পারবে,  
তোমরা কারুর চাইতে হীন নও। পৃথিবীর সব মানুষের  
সঙ্গে তোমাদের আসন, সুখ-সম্পদ সকলের সঙ্গে সমান  
ভাবে ভোগ করার যে অধিকার বিধাতা তোমাদের  
দিয়েছেন কেউ চিরকাল তা থেকে তোমাদের বঞ্চিত  
ক’রে রাখতে পারবে না।”

জর্জ কার্ভার একদিন ক্লাসে পড়বার সময় আলোচনা  
এসঙ্গে ছাত্রদের বললেন, “তোমাদের হয়তো কখনো  
এমন আয়গার যাবার প্রয়োজন হতে পারে যেখানে  
আছে চূড়ান্ত বর্ণবৈষম্য, হয়তো পথে যেতে যেতে চোখে  
পড়বে বড় বড় এবং স্পষ্টাক্ষরে লেখা সাইনবোর্ড  
‘নিম্নোক্তের চাই না’। কিন্তু মনে রেখো এটা একেবারে

নতুন নয়, কিংবা প্রথমও নয়। এর আগে এরকম  
অনেক হয়েছে। এমনি অপমান, এমনি ঘৃণা ঈশ্বরের  
পুত্র প্রভু যীশুখ্রীষ্টকেও সহ করতে হয়েছিল তিনি যখন  
গ্যালিলিতে ছিলেন।”

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের বহু লাভের আগ্রহে  
অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে  
বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রনায়ক ও রাষ্ট্রপতিও  
কয়েকজন ছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছরে  
অনেক দূর দেশ থেকে দীর্ঘ পথ ভ্রমণের কষ্ট স্বীকার  
করেও অনেক দেশের রাজা এবং রাজপুত্র তাঁর সঙ্গে  
সাক্ষাৎ করার ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার আকাঙ্ক্ষা  
নিয়ে ছুটে এসেছিলেন। সুইডেনের সুবরাজ জর্জ  
কার্ভারের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে থেকে, কলম কেটে  
নেবার পরে ক্ষেতে পড়ে থাকা শস্তের দানান্তাল কুড়িয়ে  
নিয়ে আবার কাজে লাগাবার পদ্ধতি শিক্ষা করেছিলেন  
এবং এই কাজ শিখবার জন্য তিনি প্রায় তিন সপ্তাহ  
টান্সিগিতে ছিলেন।

ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নেতা  
মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের  
বহুদিন ধরে অব্যাহত ভাবে চিঠিপত্র লেখালেখি  
চলেছিল। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অহিংস স্বাধীনতা  
সংগ্রাম এবং সত্যপ্রহ আন্দোলনের পরিণতি কী  
দাঁড়ায়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটলো কি না  
ভারতে, বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন।  
গান্ধীজীর কাছ থেকেই তিনি অহিংস সংগ্রামের আদর্শ  
প্রথম লাভ করেন যখন গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায়  
কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শ্রেষ্ঠাঙ্গদের বর্ণবৈষম্য ও অত্যাচারের  
বিরুদ্ধে নিরস্ত্র সংগ্রাম করে বিশ্বের চমক সৃষ্টি  
করেছিলেন। জর্জ কার্ভার গান্ধীজীকে কলম্বু ও  
শাকসজি ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ পরামর্শ দিয়ে একখানি  
চিঠি লিখেছিলেন এবং যে-সমস্ত কলম্বু ও শাকসজিতে  
খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ খুব বেশী আছে মহাত্মা গান্ধীর  
পরামর্শ ও দীর্ঘ জমজুম ভাষ্যের উত্তর ও সরল  
স্বস্তিকার অঙ্গারালে তা উৎপন্ন করা সম্ভব হতে পারে,

ভারতের দরিদ্র কৃষকরাও এর দ্বারা অপারিসীম উপকৃত হবে। ডাঃ কার্ভার এইসব ফলমূল ও শাকসব্জির একটি বিস্তৃত তালিকা মহাশয় গান্ধীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আমেরিকার ক্রোড়পতি ও পৃথিবীবিশ্বব্যাপ্তি ঘনী হেনারি ফোর্ড ছিলেন বৈজ্ঞানিক ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে প্রথম পরিচয় হয় ১৯০৭ সালে। এই পরিচয়ই পরে অগভীর বন্ধুত্ব পরিণত হয়। তারপরে অবস্থা এমন হল যে, দীর্ঘদিন একজন আর একজনকে না দেখে থাকতে পারতেন না। বছরে অন্তত একবার হৃদয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ না হলে হৃদয়ের মনে হত, কী যেন বড় জিনিষ একটা তাঁরা হারালেন, সে ক্ষতি কোনক্রমেই আর পূরণ হবার নয়। একান্ত যেমন করেই হোক বছরে অন্তত একবার হৃদয়ে এক জায়গার মিলিত হতেন এবং করেকটা দিন গল্প-গুজবে ও আনন্দে কাটাতেন। এই সুনিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক কার্ভারের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এই বন্ধুত্ব স্থাপিত হবার প্রথম পর্যায়ে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার যেতেন হেনারি ফোর্ডের মিশিগানের বাড়ীতে অথবা জর্জিয়ায় বাগানবাড়ীতে। পরে যখন কার্ভারের স্বাস্থ্য ভাঙতে আরম্ভ করলো, তিনি আর আগের মতো বেশী চলাফেরা বা পরিভ্রমের কাজ করতে পারতেন না, তখন হেনারি ফোর্ডই যেতেন টাক্সেগিতে জর্জ কার্ভারের সঙ্গে করেক দিন কাটিয়ে আসার জন্য।

হেনারি ফোর্ডের এইভাবে টাক্সেগিতে যাওয়া-আসা করার ফল হল অদূরপ্রসারী। জর্জ কার্ভারের বিজ্ঞান গবেষণা ভবন এবং সংরক্ষিত উদ্যানটি পরিদর্শনের জন্য প্রতিদিন যে শত শত কোতুলী খেতাজ দর্শক টাক্সেগিতে আসতে শুরু করলো তার মূলে প্রধানত ছিল জর্জ কার্ভারের সঙ্গে হেনারি ফোর্ডের গভীর বন্ধুত্বের প্রভাব, না হলে তখনকার দিনে কোন খেতাজ যতঃ প্রস্তুত হয়ে কৃষক নিগ্রোদের জন্য তাঁঁর বিভাগের দরজার পা দিচ্ছেন কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আরো কিছুকাল পরে খেতাজ সমাজ এই বিভাগটির প্রতি এমন

গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিকল্পে প্রচুর অর্থ দান করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হননি।

ফোর্ড এবং কার্ভারের মিলনের ফলে যে বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সূচনা হল তারই ফল মাহুকের জন্য এক অমূল্য সম্পদ আবিষ্কৃত হল—কৃত্রিম রবার। জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান এই কৃত্রিম রবার।

হেনারি ফোর্ডের জর্জিয়ায় বাগানে প্রায় সব জায়গা জুড়ে সোনালী রঙের এক জাতীয় দীর্ঘ লম্বা ঝুঁশাখা-বিশিষ্ট গাছ জন্মাতো, অন্যদিকে অবহেলায় উৎপন্ন এই গাছ যে কাম্বিন্‌কালেও মাহুকের কোন কাজে আসতে পারে এটা কেউ কল্পনাও করেনি। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জর্জ কার্ভারের দৃষ্টি এই অল্পসম্প্রসৃত গাছগুলির দিকে গুপ্ত যে আকৃষ্ট হল তাই-ই নয়, বিজ্ঞানের প্রসুতিবিভার এক নতুন সম্ভাবনাময় জগতের সম্মান পেলেন তিনি তার মধ্যে। এই গাছের ত্বক থেকে খেতাজ নির্বাস আহরণ করে জর্জ কার্ভার গবেষণা শুরু করলেন, আবিষ্কার করলেন রবারের সমজাতীয় গুণবিশিষ্ট একটা পদার্থ। রবারের পরিবর্তে তারই সমপ্রোজীয় একটা কৃত্রিম বিকল্প পদার্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে গিয়েই জর্জ কার্ভার এইভাবে কৃত্রিম রবার আবিষ্কার করলেন। এ জিনিষটি আজ এই বিশ্বে শতাব্দীর সম্ভাব্যতার শ্রেষ্ঠ উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাহুকের দৈনন্দিন গৃহস্থালীর কাজ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনযাত্রার নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে মাহুকের কাজে এমনভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যে রবারকে অপরিহার্য বললেও কিছু বেশী বলা হয় না।

প্রথম মহামুখ শেষ হবার পরে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের কলাইউৎপাদক কৃষিকারীরা তাদের কসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে একটা সমিতিতে সম্মেলন হল। তাদের প্রথম কাজ হল, কলাইয়ের প্রকৃতি ও উৎপাদন সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা।

তা যে আসলে মাটির বুকে লতানো শুষ্ক জন্মের এ ভাষাটা অনেকেরই জানা ছিল না। কলাইয়ের লতানো গাঁহ মাটি থেকে বড় জোর দ্রুত পর্বত উঁচু হয় এবং কলাইয়ের শুঁটির ভাবে গাঁহের মাথা যত ভারী হয় ততই সেটা একটু একটু করে মাটিতে হুয়ে পড়ে। সত্যি কথা বলতে কি, কলাইগাঁহ না বলে কলাই, লতা বলাই সম্ভব।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার যে বৃগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে বৃগে মার্কিন দেশের জনসাধারণ কলাই উৎপাদন করতেই যে শুধু জানতো না, তাই নয়, কলাইয়ের দোষগুণ সম্বন্ধেও তারা অজ্ঞ। কেউ কেউ আবার এ জিনিষটাকে ভয়ের চেখেও দেখতো, কারণ তখন অনেকেরই বকসল ধারণা ছিল, কলাই খেলে প্রেগ হয়, কলাইয়ের দানার মধ্যে প্রেগের জীবাণু বাসা বেঁধে আছে। অনেকে ভাবতো কলাই শ্রেণি গুয়ারের খাদ। কলাই মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহার করা যায় এ সংবাদ বেশী লোকের জানা ছিল না। তাই এটা বধন তারা প্রথম শুনলো তারা, দস্তরমতো চমকে উঠলো। কাজেই কলাইয়ের প্রকৃত কি গুণ আছে সে সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলাই হল সমিতির প্রধান কাজ এবং এই কাজের জন্য তাদের একজন প্রথম প্রণয়ী বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন হয়ে পড়লো।

সমিতির প্রথম যৌদন বৈঠক বসলো সেদিনই সমস্তরা এমনি একজন বিশেষজ্ঞ কিভাবে কোথায় পাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করলেন। একজন সমস্ত এমনি এক বিশেষজ্ঞের বিষয় উল্লেখ করলেন আলোচনা এসঙ্গে, নাম তাঁর জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার।

একজন সমস্ত জিজ্ঞাসা করলেন, “তিনি কি বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা রাখেন?”

“না, তিনি একজন শিক্ষক।”

“সামান্য একজন শিক্ষক ব্যবসা সম্পর্কে কী বোঝেন?”

“তিনি ব্যবসা সম্পর্কে কিছু বোঝেন না বটে, কিন্তু কলাই সম্বন্ধে তিনি সর্বাঙ্গ জানেন।”

“তিনি কোথায় থাকেন? কোন্ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন?”

“টাক্সিগেডে থাকেন। সেখানকার স্থানীয় শিক্ষারতনের শিক্ষক।”

“কিন্তু সে তো নিগ্রোদের কলেজ।”

“হ্যাঁ ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারও একজন নিগ্রো।”

নিগ্রো কথাটা শুনে সমস্তদের মধ্যে অনেকেরই নাসিকা কুঞ্চিত হল, সাহাব্যের জন্ম একজন নিগ্রোর শরণাপন্ন হতে বিশেষ করে খেতাজ সমস্তদেরই বেশী আপত্তি কিন্তু যিনি জর্জ কার্ভারের নাম উল্লেখ করেছিলেন তিনি সকলের সমস্ত আপত্তির বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি দিয়ে বললেন, “আমি ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের গবেষণাগার নিয়ে দেখে এসেছি। সেই গবেষণাগারের মধ্যে আমি আমার জীবনের মূল্যবান বেশ কয়েক বছর সময় অতিবাহিত করেছি। কলাই থেকে উৎপন্ন তাঁর বিষয়কর আবিষ্কারের কতগুলি নমুনা তিনি আমার দেখিয়েছেন, সেগুলিকে অমূল্য সম্পদও বলা যায়। তাঁর প্রতিভায় আমি বিস্মিত এবং মুগ্ধ হয়েছি। ডাঃ জর্জ কার্ভার একজন বিক্রেতা নন বটে, একজন প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক রূপে তিনি যা করতে পারেন তা আর কেউই পারে না। তিনি কলাইয়ের উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ অজ্ঞ কৃষককে বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা যেমন স্পষ্টভাবে বোঝাতে পারেন, খুঁটিনাটি জিনিষ বলে দিতে পারেন, এমন খুব কম লোকই পারে।”

তথাপি আপত্তির হ্রস্ব ওঠে—“কিন্তু একজন নিগ্রোকে...”

“কিন্তু, নিগ্রো বলেই সে অচ্ছুৎ হয়ে গেল? তার গুণ আমরা দেখবো না? সেই মানুষটির কালো চামড়ার নীচে ঢাকা আছে যে প্রেরণ প্রতিভাদীপ্ত মন, আমাদের জন্মসাধারণের শুভ কল্যাণের জন্য আমরা তাঁর সেই মূল্যবান মনকে কেন কাজে লাগাবো না, বলতে পারেন?”

বৈঠকে জোর তর্কাতর্কি আর প্রথম প্রথম কথার ফোয়ারা ছুটলো, পরে সমিতির সভাপতি অনেক চেষ্টায় সবাইকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললেন, “আমি বলি কি, এ বিষয়ে আমাদের মধ্য থেকেই কেউ একটা প্রস্তাব উত্থাপন করুক।”

জর্জ কার্ভারের পক্ষ নিয়ে যিনি এতক্ষণ কথা বলছিলেন সুহৃদের মধ্যে তিনিই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, প্রস্তাব উত্থাপনের ভঙ্গীতে বললেন, “আমি এই সভায় প্রস্তাব করছি, টাক্সিগেড কলেজের অধ্যাপক ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারকে এই দায়িত্ব প্রেরণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হোক, তিনি এসে নিজেই বলবেন কলাই সম্বন্ধে তাঁর কতখানি কী জানা আছে।”

সভার মধ্য থেকে দাঁড়িয়ে উঠে আর একজন চীৎকার করে বলে উঠলেন, “আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি।”

ক্রমশঃ

# মাতৃভাষায় অর্থশাস্ত্র

অবিমল সিংহ

(৮)

“মানুষ, শত্রু-কার জীব (man is a tool-making animal)” — বৈজ্ঞানিক ক্রাফ্টলিন কথিত এবং কার্ল মার্কস সমর্থিত “মানুষ”-এর এই সংজ্ঞাটির অনুসরণে আমরা “শ্রম” শব্দটির একটা অর্থশাস্ত্রীয় সংজ্ঞা পাইয়াছি। তাহা এই যে, জীবন ধারণার্থে অথবা উন্নততর জীবন যাপনার্থে পূর্নকল্পিত সচেতন এবং সার্থক প্রয়াসকেই শ্রম আখ্যা দেওয়া যায়। বাঁচিয়া থাকার জন্য অস্তিত্ব প্রাণীর লব্ধাত্ত্ব গুণ্ডি (instinct) স্নলভ অকপ্রয়াস হইতে মানুষের শ্রমের বিশেষণার্থে “উন্নততর জীবন যাপন” “সচেতন” “পূর্নকল্পিত” “সার্থক” (অর্থাৎ “প্রয়োজন সাধক”) এই শব্দগুলির প্রয়োগ।

“শ্রম” যদি “সচেতন” এবং “পূর্নকল্পিত” প্রয়াস হয় তবে ইহার সহিত “চেতনা” এবং “কল্পনা”ও ওতপ্রোত। অর্থাৎ “শ্রম” নেহাতই একটা “দৈহিক” প্রয়াস নয়। ইহার সহিত মানসিক অথবা বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াসও জড়িত। অতএব শ্রম সম্পূর্ণরূপেই একটা মনুষ্য-স্নলভ ব্যাপার। এবং ক্রমবিকাশের যে পর্যায়ে আসিয়া মনুষ্যরূপী প্রাণীরা (Hominids) চেতনা এবং কল্পনা শক্তির অধিকারী হইয়া বুদ্ধিমান হি-পদ (Homo Sapiens)-এ পরিণত হইলেন, সেই স্তরেই শ্রমেরও আবির্ভাব ঘটিল। অথবা বলা যায় যে “শ্রম”-এর আবির্ভাব-এর সঙ্গে সঙ্গেই “মানুষ”-এরও উদ্ভব হইল।

তবে শ্রম হইতেই মানুষের উদ্ভব (labour created man himself) — এঙ্গেলস-এর এই উক্তি অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। এবং ইহার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করিতে হইলে অথবা ইহার কতটুকু অঙ্গীকার্য আর কতটুকু বা অঙ্গীকার্য, তাহা সম্যক বুঝিতে হইলে “শ্রম”কে আরেকটু ব্যাপক অর্থে দেখিতে হয়। অর্থাৎ

মনুষ্যরূপী প্রাণীদের (hominids) বুদ্ধিমান হি-পদে (Homo Sapiens) পরিণতির পূর্বে এবং পরে, এই উভয় স্তরেই তাঁহাদের জীবন ধারণার্থে অথবা উন্নততর জীবন যাপনার্থে “অচেতন”, স্বল্প-“চেতন” অথবা “সচেতন” সঞ্চাবিত্ত প্রয়াসেরই পর্য্যালোচন করিতে হয়।

মনুষ্যরূপী প্রাণীদের ক্রম-বিকাশে সঞ্চাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য যে দুইটা ঘটনা ভগ্নব্যে একটা হইল শুধুমাত্র পেছনের দুইটা পায়ের উপর ভর করিয়া সোজাভাবে দাঁড়ানো অর্থাৎ “দণ্ডায়মান হি-পদ (homoerectus)”-এ পরিণতি। অপরটা হইল কাঁঠাও প্রত্যঙ্গি দেহাতিরিক্ত প্রত্যঙ্গের (extra corporeal limbs) ব্যবহার। এই দুইটা ঘটনার কোনটা আগে কোনটা পরে ঘটয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃস্ব। তবে মনে করা যায় — এবং সঙ্গত ভাবেই — যে এই উভয়ই একে-অন্বয়ের সহায়ক অথবা পরিপূরক স্বরূপ বৃক্ষপং ঘটয়া থাকিবে। কারণ জীবনসংগ্রামে হাত দুইটিকে দেহভার বহনের দায়িত্ব-মুক্ত করিয়া কেবল মাত্র আহাৰ্য্যগ্রহণ, শত্রুহনন, আশ্রয়স্থানাদির কাজে ব্যাপৃত রাখিতে হইলেই শুধুমাত্র পদব্রম-এর উপর ভর করিয়া দাঁড়ানোর এবং চলার প্রয়োজন আসে। আবার পা দুইটির উপর দেহভার বহনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপাইয়া দিতে পারিলেই হস্তব্রম সেই দায়িত্ব মুক্ত হইয়া জীবনসংগ্রামে অধিকতর সহায়ক হইতে পারে। অতএব হস্তব্রম এবং পদব্রমের ব্যবহারের বিশেষায়ন অথবা স্বাতন্ত্র্যায়ন (specialization অথবা differentiation of function) পরস্পরের উপর নির্ভর-শীল এবং পরস্পরের অঙ্গপূরক।

কিন্তু হস্ত এবং পদের ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্যায়নের সহিত অন্বয়ের ব্যবহার-এর সম্পর্ক থাকিতেও পারে আবার

নাও থাকিতে পারে। অর্থাৎ জীবনসংগ্রামে আহাৰ্য্যাহরণ, শিক হনন, আশ্রয়লাভ ইত্যাদি কার্য্যে বাহ্য ব্যবহার সমগ্র হইতে পারে, নিরস্ত্রও হইতে পারে, যদি নিরস্ত্রই তাহা হইলে অস্ত্রের ব্যবহার-এর ব্যতিরেকেই অথবা পূর্বেই “দণ্ডায়মান বিপদে” পরিণতি সম্ভব। অর্থাৎ মনে করা যায় যে প্রাক্‌মাহুয-পর্যায়ে অস্ত্র সকল প্রাণীর মত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেদের মানাইয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকার সহজাত বৃত্তি (instinct) সুলভ প্রয়াস হইতেই শুধুমাত্র পদযন্ত্রের উপর ভর করিয়া দাঁড়ানোর ক্ষমতা অর্জিত হইতে পারে। ইহা শুধু যে সম্ভব তাহাই নয়, জীবজগতে এইরূপ অস্ত্রপ্রত্যঙ্গাদির বিশেষায়ন, রূপান্তর, অথবা উদ্ভব লৈব বিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়ম। যেমন আফ্রিকার তৃণ-ভূমি-বিচারাী জিরাফ দিগন্ত-বিষুত শাখল প্রান্তরের স্থানে স্থানে ইতস্ততঃ বিচরণে অপেক্ষাকৃত উচ্চ রক্তের পত্রাদি ভক্ষণের প্রয়াস এবং অভ্যাস হইতে সুদীর্ঘ প্রাণী লাভ করিয়াছে। কারণ তাহাদের একমিকে তৃণও চাই, অপরিমিত বৃক্ষপত্রও চাই। ডেমন মনে করা যায় যে, যে নিরক্ষীয় (equatorial) অঞ্চলে প্রথম “দণ্ডায়মান বি-পদ”এর অবির্ভাব ঘটে তথাকার স্বভাবজ, অনাবোহ অথচ কেবল মাত্র দণ্ডায়মান অবস্থায়ই প্রসারিত বাহ্যাবস্থা অধিগম্য, অসুচ বৃক্ষ গুল্মাদির (যথা, কদলী) ফল পত্রাদি আহরণের অভ্যাস হইতেই ক্রমে অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বৎসরে তাহারা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে শিখেন। আবার কাহারও কাহারও মতে বৃক্ষপ্রায় শাখাযুগের পর্য্যায়ের একটি আনুভূমিক (horizontal) শাখার পদযন্ত্র স্থাপন করিয়া উর্ধ্বতম শাখাপ্রাণাদি হস্তদ্বারা ধারণ পূর্বক গোজা হইয়া চলাচলের অভ্যাস-এর মধ্যেই “দণ্ডায়মান বিপদ”-এর আদি কারণ নিহিত ছিল। এইরূপ চলাচলকে cruriation আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

তবে আমরা দেখিয়াছি যে বৃক্ষপ্রায় শাখাযুগের পর্য্যায়ের বৃক্ষশাখা ধারণ পূর্বক চলাফেরা অথবা অবলম্বিত থাকার অভ্যাসের ফলে অস্থূলভাল দীর্ঘ হইয়া হস্তযন্ত্র গৃহীতকম (prehensile) হয়। কোটি কোটি

বৎসর পূর্বে অর্জিত এই গৃহীতকম হস্তের শক্তি আজও মানব শিশুর মধ্যে নিজেকে ধারণ করিবার আর কোন শক্তি না থাকিলেও কোনও বয়স্ক লোকের অস্থূল অথবা অস্থূল একটা সুরু কাঠি হুষ্টিমধ্যে অবলম্বন করিয়া বেশ কয়েক সেকেণ্ড স্থলিয়া থাকার শক্তি দেখা যায়। অথচ সোজা হইয়া দাঁড়াইতে তাহার বৎসরাবিক সময় লাগে এবং হাঁটিতে শিখিবার পথে প্রথমে বেশ কিছুদিন cruriation সঙ্গ চলচল অভ্যাস করিতে হয়।

যাহাই হোক, আমরা দেখিয়াছি যে, এইরূপ গৃহীতকম হস্ত দ্বারা বৃক্ষপ্রায়ী অবস্থার আহাৰ্য্যাদি আহরণ করিয়া মুখে পুরিবার অভ্যাস হয়। পরবর্তী পর্য্যায়ের অর্থাৎ বৃক্ষপ্রায় হইতে অবতরণের পর ভূচর অবস্থায়ও সেই অভ্যাস অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। অধিকন্তু সেই ভূচর অবস্থার কোন এক সময়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুভূম্য অথবা কঠোরতর জীবনসংগ্রামের চাপে কাঠ-খণ্ড প্রভৃতি অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া সেই গৃহীতকম হস্তের অধিকতর সযাবহারের সম্ভাবনাও বাস্তবে রূপান্তরিত হইয়া থাকিবে এবং একবার অস্ত্র ব্যবহারের সার্বকতা অথবা সাকল্য প্রত্যক্ষীভূত হইলে উত্তরোত্তর ইহার ব্যবহার বাড়িতেই থাকিবে।

অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, গৃহীতকম হস্ত এবং উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেই অস্ত্রের ব্যবহার অসম্ভব নহে। গৃহীতকম হস্তকে অস্ত্র ব্যবহারে নিয়োজিত করিতে হইলে অন্ততঃ অস্থূল একটা ন্যূনতম পর্য্যায়ের বৃদ্ধি বিকাশেরও প্রয়োজন। কারণ, দেখা যায় যে একমাত্র মাহুয অথবা মনুষ্যরূপী প্রাণীরাই গৃহীতকম হস্তের অধিকারী নহেন। মাহুয অথবা মনুষ্যরূপী প্রাণীদের ক্ষেত্রে শুধু সামনের হৃদী পাই বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থে হস্তে রূপান্তরিত হইয়াছে। হস্তীর ক্ষেত্রে পদ-চতুষ্টয় স্বাধীনভাবে থাকিয়াই নাসিকাপ্রাণী প্রসারিত হইয়া গৃহীতকম হস্তে (ওড়ে) পরিণত হইয়াছে। এবং “হস্ত” অথবা “কর”এর অধিকারী বলিয়াই এই বৃহৎকার প্রাণীটি “হস্তী” অথবা “করী” আখ্যায় ভূষিতও হইয়াছে। কিন্তু মাহুযের সহিত হস্তীর তফাৎ এই যে, হস্তীর দেহের

অণুপাতে মস্তিষ্কের পরিমাণ বর্তমান মানুষের তুলনায় প্রায় পনের ভাগের এক ভাগ। প্রাক-মানুষের তুলনায়ও সম্ভবত: অত্যন্ত: পাঁচভাগের এক ভাগ হইবে। অতএব ধরিয়া লইতে হইবে যে, যে মনুষ্যরূপী প্রাণীরা সর্বপ্রথম অল্প ব্যবহারের সূচনা করেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত: তিনটা বিবরের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। প্রথমত: পূর্ববর্তী স্তর হইতে ক্রমবিকাশের পথে লব্ধ গতিক্ষম হস্ত এবং জীবনসংগ্রামে তাহার (নিরস্ত) ব্যবহারের অভ্যাস। দ্বিতীয়ত: অল্প ব্যবহারের উপযোগী বুদ্ধির বিকাশ। তৃতীয়ত: উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপ।

এখানে আরও স্মরণীয় যে, বৃক্ষাশ্রয়ী শাখামুগের ক্ষেত্রে শুধু হস্তদ্বয়ই গতিক্ষম নহে। তাঁহাদের হস্ত এবং পদ উভয়ই দীর্ঘাঙ্গুল এবং গতিক্ষম অর্থাৎ বলা যায় যে, তাঁহারা চতুষ্পদ (Quadruped) হইতে “চতুর্ভুজ”-এ (Quadrumanons অথবা Quadrumanal) রূপান্তরিত হইয়াছেন। অধিকন্তু অনেকের গতিক্ষম একটা লাঙ্গুলও আছে। এই সমস্তই গাছের ডালগালাদি আঁকড়াইয়া ধরিয়া চলাফেরা অথবা ভারসাম্য রক্ষার তাগিদ হইতে। কিন্তু সমুখস্থ পদদ্বয় অথবা প্রত্যঙ্গদ্বয় (fore limbs) বুকের সম্মিহিত থাকারদরূপে স্বাভাবিক ইহারা আহাৰ্য্যাদি আহরণ, মুখে পূরণ ইত্যাদি কার্যে নিয়োজিত হইয়া ইহাদের স্বাতন্ত্র্যায়ন ((differentiation) ঘটিয়া ইহারা “হস্ত” আখ্যায় অধিকারী হইয়াছে।

মনুষ্যরূপী প্রাণীদের “দণ্ডায়মান বিশপদ”এ পরিণতির শুক্ল সম্পর্কে আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, শুধু অঙ্গাদি ব্যবহারের জন্যই যে ইহা আবশ্যিক ছিল তাহাই নয়, বুদ্ধি বিকাশের জন্যও ইহার প্রয়োজন ছিল। আমরা দেখিয়াছি যে, বুদ্ধির বিকাশের সহিত মস্তিষ্কের প্রসারও জড়িত। কিন্তু পদদ্বয়ের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায়, ভূপৃষ্ঠের উপর লম্ব (vertical) অথবা খাড়া ভাবে অবস্থিত মেরুদণ্ডের উপর স্থাপিত মস্তকটা ধারণ করা যে রূপ সহজ, চতুষ্পদ প্রাণীর মত আনুভূমিক (horizontal) মেরুদণ্ড সংলগ্ন মস্তকটা ধারণ তত সহজ নহে। প্রাক-মানুষ পর্যায় হইতে মানুষ পর্যায় অবধি মনুষ্যরূপী প্রাণীদের

মস্তিষ্কের প্রসার হইয়াছে প্রায় তিনগুণ। অতএব মনুষ্যরূপী প্রাণীদের প্রথমে “দণ্ডায়মান বিশপদ” পরিণত না হইয়া “বুদ্ধিমান বিশপদ” (homosapiens) অথবা “বসার্থ বুদ্ধিমান নর” (homo sapiens sapiens)এ পরিণতি সম্ভব ছিল না। বৃক্ষাশ্রয়ী শাখামুগদের ক্ষেত্রেও বৃক্ষে উপবিষ্ট অবস্থায়ও খাড়াভাবে অবস্থিত মেরুদণ্ডের উপর অপেক্ষাকৃত ভারী মস্তক ধারণ সহজ। এবং মনে করা যায় যে অনেকটাসেই কারণেই তাহাদের মস্তিষ্কেরও কতকটা প্রসার আগেই ঘটিয়া থাকিবে। বাহারা বৃক্ষাশ্রয় ছাড়িয়া ভূমিতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই হয়ত বৃক্ষশাখাদি প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে লভ্য বস্তুকে অল্পরূপে ব্যবহারের উপযোগী ন্যূনতম বুদ্ধি ছিল। কিন্তু উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার যোগাযোগ না ঘটায় হয়ত সকলে তাহা করেন নাই। বাহারা করিয়াছিলেন তাঁহারা বর্তীয়া গেলেন, এবং বিশেষ মর্যাদার সহিতই। অস্তেরা হয়ত ভূপৃষ্ঠের উপর ভয়ে ভয়ে চলিতেন। তাড়া খাইলেই গিয়া গাছে চড়িতেন। অথবা হয়ত তাঁহাদের সীমিত প্রয়োজন সহজেই মিটিয়া যাইত। পক্ষান্তরে আদি অস্তধারীরা হয়ত কঠোরতর প্রাকৃতিক অবস্থায় পড়িয়া মরিয়া হইয়াই ঐ পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা আকস্মিক অথবা accidental হইতে পারে কি না, জীব-মনোবিজ্ঞানীরাই বলিতে পারেন। কিন্তু জীব দ্বারা জড়িত হইয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া হয়ত একটা পাথর ছুঁড়িয়া মারিলেন। তার পর ইহার চমৎকার ফল প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাতেই অভ্যস্ত হইলেন। ক্রমে এই অস্ত্রের ব্যবহারই আদিতে বৃক্ষাশ্রয়ী মূল “প্রাইমেটস্” (Primates) শ্রেণীর প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত একটি মনুষ্যরূপী প্রাণীকে অল্প সমস্ত প্রাণীর উপর একহাত লগায়ার সুযোগ দিল।

আরেক দিক দিয়া দেখিতে গেলে আদি প্রাথমিক স্তরে সহজাত বুদ্ধি এবং সচেতন বুদ্ধির পার্থক্য খুবই কীণ এবং নিরস্ত জীবনসংগ্রাম হইতে সশস্ত্র জীবনসংগ্রামে উত্তরণ খুব একটা নাটকীয় ব্যাপার নয়। এমন কি

আদিতে নিরস্ত্র জীবনসংগ্রামের সহিত, সশস্ত্র জীবন-সংগ্রাম অপেক্ষা, জটিলতর বুদ্ধির বিকাশ জড়িত থাকিতে পারে। যেমন ধরা যায় যে, শ্রুতিক্রম হস্তদ্বারা আহৃত পক এবং অপক উভয়বিধ ফল সুখে ভুলিয়া দত্ত দ্বারা দংশন এবং চক্ষু দ্বারা নিরীক্ষণ পূর্বক ইহাদের বর্ণ এবং আবাদন-এর মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন, এবং ইহাদের পার্থক্য বিধান, একটা অতি প্রাথমিক পর্য্যায়ের কাজ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইহার সহিত অস্ত্রাদিরও কোন সম্পর্ক নাই। তবুও ইহাতে চক্ষু জিহ্বাদি “জ্ঞানেন্দ্রিয়”, বাকু-পাণি-আদি “কর্মেন্দ্রিয়”, মস্তিস্করূপ বিচার-বিশ্লেষক “অন্তরেন্দ্রিয়”, অসংখ্য স্নায়ু এবং জটিল স্নায়ুতন্ত্র, ইত্যাদির সমন্বিত প্রয়াস জড়িত। পক্ষান্তরে, যদি লক্ষ্য করা যায় যে একটি অনারোহ বৃক্ষশাখায়ে অবলম্বিত পক ফল, শাখাটিকে আন্দোলিত করিলেই ভূপাতিত হয়, তাহা হইলে সেই পক্ষা অবলম্বন করিতে বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। সম্ভবতঃ এতগুলি ইন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্র-মস্তিষ্কাদির এত ষাটুনিও হয় না। তবে যিনি বা বাঁহারা বৃক্ষোপরি থাকিয়া শাখাটিকে আন্দোলিত করিবেন এবং যিনি বা বাঁহারা বৃক্ষতলে থাকিয়া ফল কুড়াইবেন তাঁহাদের মধ্যে একটা সহযোগিতা অথবা বৃক্ষোপড়া থাকা দরকার (যাহাকে “সমাজবাদী” অর্থশাস্ত্রে সম্ভবতঃ বলা হয় “উৎপাদনমূলক সম্পর্ক”—Production relation)। যাই হোক, “বুদ্ধির ঘোড়” আরেক পা গেলেই “আবিষ্কার” করা যাইবে যে, একটা বিচ্ছিন্ন বৃক্ষশাখা হস্তে ধারণ পূর্বক তাহা দ্বারা আঘাত করিলেও হস্তদ্বারা অনাধিগম্য ঐ ফলগুলিও সহজেই হস্তগত করা

যায়। এই বিচ্ছিন্ন বৃক্ষশাখাটাই আদি মানবের প্রথম হাতিয়ার। তার পরই বিচার করিতে হইবে, হাতিয়ারটা উপযুক্ত রকমের দীর্ঘ কি না, অর্থাৎ আসিবে হৃদ-দীর্ঘের পার্থক্যের বিচার। কিন্তু এই হৃদ-দীর্ঘের বিচারও ঋণের পার্থক্যের সহিত আবাদন-এর সম্পর্ক স্থাপন পূর্বক পক-অপকের পার্থক্যের বিচার অপেক্ষা সম্ভবতঃ সহজসাধ্য ব্যাপার। এইরূপে ক্রমে আসিবে কোন বস্তুর আকৃতি অথবা ওজনের লঘু-গুরুত্বের বিচার, আকৃতির লঘু-গুরুত্বের সহিত ওজনের লঘু-গুরুত্বের সম্পর্ক স্থাপন, আকৃতি অথবা ওজনের লঘু-গুরুত্বের সহিত সেই বস্তু দ্বারা আঘাতের লঘু-গুরুত্বের সম্পর্ক স্থাপন, ইত্যাদি ব্যাপার। ফলে অস্ত্রাদির ব্যবহার ক্রমে অধিকতর সচেতন বিচার-ভিত্তিক হইবে, ইহাদের ব্যবহারের জটিলতা বাড়িবে, ব্যবহারের জটিলতা বুদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়াদির অল্পভূতিশক্তি এবং মস্তিষ্কের বিচারশক্তি, স্নায়ু তন্ত্র অর্থাৎ মাংস-পেশী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তন অথবা ক্রমবিকাশ ঘটিবে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, জীবন সংগ্রামে শ্রুতিক্রম হস্তের ব্যবহার, বাহা আদিতে সহজাত বুদ্ধি-মূলভ ছিল, তাহা ক্রমে সরল হইতে জটিল, জটিল হইতে জটিলতর, অচেতন হইতে অর্ধচেতন, অর্ধচেতন হইতে সচেতন হইয়াছে, এবং প্রয়োজনানুসারে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিস্তার সহ বুদ্ধি এবং বিচার-শক্তির ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে।

এই ধারণার ভিত্তিতেই আমরা এঙ্গেলস-এর “শ্রম হইতেই মানুষের উদ্ভব (labour created man himself)”, এই উক্তির তাৎপর্য্য বিচার করিতে পারি।

# অভয়

( উপভাস )

ঐশ্বরীচন্দ্র রাই

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

সকাল হতেই, অথবরটা শোনাতে যায় শুভমরকে ।  
আজ আর বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না অভয় । দরজার  
শুভমরদের দোতলা বৈঠকখানায় উঠে যায় । দরজা  
ভেজান । একটু ঠেলেতেই দরজা খুলে যায় ।

—কে ? অভয় তাকিয়ে দেখল, মস্ত বড় সোকার  
ওপর আধশোয়া অবস্থায় গুয়ে, কি একটা বই পড়ছে,  
হুপরি—বা অমিয়া । অমিয়া ধড়মড় করে উঠে  
বসল ।

—ওউ কোথায় ? অভয় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে  
ধাকে । কি অদ্ভুত স্তম্ভর চেহারা । ধপ্পে ফরসা  
হং—গোলাপ ফুলের মত আভা সারা গায়ে । মুখখানি  
যেন ফুটন্ত পল্লফুল । সেই মুখ পনের চার পাশে কালো  
কুচকুচে কৌকড়ান চুলের রাশি । অভয় মুখ চোখে  
তাকিয়ে থাকে । চোখ নামিয়ে নেয় অমিয়া । বৃহৎ  
বলে, বহন । দাদাকে ডেকে দিচ্ছি । আর একবার  
অভয়ের দিকে তাকিয়ে, অমিয়া দরজা ঠেলে চলে যায় ।  
একটা অতি মিষ্টি স্তম্ভ—,সারা ঘরে ছাড়িয়ে পড়ে ।  
অভয়ের মনে হয়, ঘরে এতক্ষণ একটা আলো ছিল,  
সে আলো যেন নিভে গেল । পাশাপাশি আর একটা  
মুখ, মনের মাঝে জেগে উঠল । সে মুখ মিনতির ।  
কিন্তু মিনতির ভাষা সে যেন বুঝতে পারে না । মিনতির  
রূপ আছে । কিন্তু সে রূপ বড় প্রথম । সূর্যের আলোর  
মত দীপ্তভাব কিন্তু যেন স্নিগ্ধ নয় ।

শুভমর আসে । গানে গানে বেলা বাড়তে থাকে ।

অভয় বারবার দরজার দিকে তাকায় । কিন্তু কী  
অশ্রু, অমিয়াকে আর দেখা যায় না । আর একবার  
দেখবার জন্য মন উন্মুখ হয়ে ওঠে । কিন্তু না—আর  
অমিয়া আসে না । কিন্তু অভয়ের যেন মনে হয়  
অমিয়া ধারে কাছেই কোথায় আছে । নিজের মনের  
মাঝে বার বার এই কথাটাই যেন উঠতে লাগল ।  
অমিয়া লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখছে । কামনা-কলুষহীন  
মনের এই ইচ্ছার ভেতর অস্ত্র কোন কালিমা ছিল না ।  
আমরা ফুল দেখতে ভালবাসি—স্তম্ভর জিনিষ দেখলে  
মন অনাক্ষিত হয় । একটা অপূর্ণ পুলকে, সমস্ত মন যেন  
প্রাণিত হয়ে যায় । তার ভেতর অস্ত্র কোন কুংসিত  
লোভের ছায়া দেখতে পাওয়া যায় না । অভয়ের  
এই ইচ্ছাটা ঠিক তাই । দেখবার এই আকর্ষণ—এ  
কামনাহীন কলুষহীন আকাঙ্ক্ষা । অভয়ের বরল  
অস্ত্র, সংসারের অতিজ্ঞতা নেই, বিচিত্র মাহুষের  
বিচিত্র ইচ্ছা, চরিত্র সম্বন্ধে তার কোনও জ্ঞানই  
নেই । এই জগতে কত সহস্র সহস্র বিচিত্র মাহুষ আছে ।  
তাদের নিষ্ঠুর কর্মপ্রণালী, মনের নীচগতি, নীচ কর্ম,  
নীচ চিন্তাধারা কি আশ্চর্য্য ভাবে, অতি গোপনে, সমাজ  
সংসারের ভেতর দিয়ে, ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে, এ  
সম্বন্ধে অভয়ের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই । আমাদের  
সব ইচ্ছাই যে পূরণ হয় না সেখানে বহু বাধা, বহু  
বিষয় বিপদ আছে—সে সম্বন্ধে অভয়ের কোন জ্ঞান বা  
অভিজ্ঞতা নেই মিলল মনের মাঝে একটি স্তম্ভর কিন্তু



দেখে নৌলব্যাগীত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সম্ভবতঃ কিছু অভিজ্ঞতা থাকলে অভয় সংঘত হত।

কারণ, অসম্ভব কোন বস্তুকে না পাবার যে দুঃখ, হতাশা, সেই দুঃখ বেদনাকে অকাংক্ষণ বরণ করতে নিশ্চয়ই অভয় রাজী হ'ত না। কিন্তু অল্প বয়সের অনাভিজ্ঞতার এই এক যন্ত্রণা। কিন্তু অভয়ের পিপাসিভ চোখ আজ নতুন করে অমিরাকে আবিষ্কার করেছে। হঠাৎ অভয় সচাকিত হয়ে উঠল—উঃ, এখন যে বেলা বারটা। অভয় দাঁড়িয়ে পড়ে।

শুভময় বলে, পড়ার কি হ'ল তা জানিও, অভয়দা। বলছিল যে বাড়ী যাবে একবার, তা কবে যাবে—

—কোথি আজ ঘেঁঠাবাবু কি বলেন। ঘেঁঠাবাবুর কথা শুনে তবে বাড়ী যাব। আজ তো নয়ই, সম্ভবতঃ কাল যাব—

শহরের দোকানপাট তখন বন্ধ হয়নি। বেলা একটা নাগাদ সব দোকান বন্ধ হবে—আবার খুলবে তিনটেয়। স্নরকীর রাত্তা তেতে উঠেছে—আর গরমও মন্দ নয়। অভয় হঠাৎ অবাক হয়ে যায়। রাত্তার হুধারের কুক-চুড়ার গাছগুলিতে ফুল ফুটেছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, রাত্তার মাধার ওপর একখানা সুদৃশ্য লাল রংএর বিরাট গালচে কে যেন বিহিয়ে রেখেছে। কি আশ্চর্য্যই না লাগছে। রাত্তার ওপাশে খেলার মাঠ—তারপরে বাঁধের রাত্তা। সমস্ত পথ এখন নির্জন—হুধারে কুকচুড়ার গাছ সমস্ত রাত্তার ওপর কুকচুড়ার ফুল ছাড়িয়ে পড়ে রয়েছে। রাশি রাশি ফুল—ফুলের কুঁড়ি সমস্তই রাত্তার ছড়াছড়ি। ছোট ছোট পাখী, মৌমাছি, প্রজাপতি, ভিড় করেছে, এই ফুলের মেলায়। অবাক হয়ে, অভয় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। বাঃ, কী সুন্দর—

অভয়ের মনে পড়ে যায় তার গাঁয়ের কথা। সেই পলাশপুর গাঁ। গাঁয়ের লোক চাষবাস করেই থাকে। মাটির মর্যাদা তারা বোঝে—তাই আজও গ্রাম ছেড়ে যায় নি। শহরের আধুনিক সভ্যতা তাদের ভোলাতে পারেনি। তাদের গাঁয়ের রাত্তার কাটা হয়, বর্ষার অপে

চারদিক ভরে যায়। তবুও সেই ভাল। সেখানকার লোকজন, লঠন হাতে করে, কাঁধে গামছা নিয়ে, লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে পথ চলে। দৈবাৎ যদি রাত্তার সাপ থাকে, তারা মাড়রের পায়ের শব্দে সরে যায়।

বনে বনে শেরাল ডাকে, কাঁচৎ বাঘের ডাকও শোনা যায়। গভীর বনে একটানা ভাবে ঝাঁঝি পোকা, ঝাঁঝি করে ডেকে যায়—কুক কুক করে পের্চায় গলায় আওয়াজ ভেসে আসে। নিশাচর পাখী, চাম্‌চিকে, বাহুড়, পের্চারা দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে আতা গাছে, শেরারা গাছে। বড় বড় গাছের মাধার বাঁক বাঁক জ্যোৎস্নাপোকা ঠিক হীরে মাণিকের মত এলতে থাকে। নিস্তন্ধ গ্রামে নেমে আসে রাত্রির অন্ধকার। রাত গভীর হতে, গভীরতর হয়। মাঝে মাঝে সাঁ সাঁ শব্দে বাতাস বয়ে যায়।

এ রূপের তুলনা কোথায়? মাঠে-মাঠে কাঁচ ধান গাছে বাতাস দোলা দিয়ে যায়। ক্ষেতে কুমড়ো, লাউ, শশা—নানা তরীতরকারী ওঠে। বাড়ীর আনাচে কানাচে মাচার-মাচার-ঝিল্লি, উচ্ছে, লাউ হুলতে থাকে। টগর, গন্ধরাজ, বেল, মালতী ফুলের সুগন্ধে সমস্ত ঘর বাড়ী মৌ-মৌ করতে থাকে। অভয় যেন ফিরে যায় তার গাঁয়ে।

পলাশপুরের নদী বন মাঠ সব যেন তাকে ডাকতে থাকে। অভয় ভাবে, কী হবে বেশী আশা করে। সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার তো একদিন শেষ হবেই। তবু কামনা বাসনা কি তাতে মিটবে? চাই, চাই—আরও চাই। এই চাওয়ার কি কোন শেষ আছে? তাতে কি জীবনে শান্তি আসে? না তাতে আসে সুখ? তার চেয়ে নিভৃত পল্লীর মেঠো ঘরে, ক্ষেতে ধান্যে পরিচর্য করে, উদারায় ছুটিয়ে যে শান্তি পাওয়া যাবে তার তুলনা কোথায়? অভয়কে সহস্র টানে টানতে থাকে তার গাঁ। অভয়ের মনে হয়, সে যেন বন্দী। অভয় ভাবে, কবে সে এই শহরের বাঁচা থেকে মুক্তি পাবে। অভয় যেন শুনতে পায়, তার মা ডাকছেন—খোকা—ও খোকা। কিন্তু কোথায় তার মা? তার

চিরহুঃখিনী মায়ের শেষ শয্যা পাতা হয়েছে সেই গাঁয়ের শেষ প্রান্তে—নদীর ধারে বালুর চড়ায়—আঙনের শয্যায়। সেই জলন্ত অগ্নিশয্যায় তার মা চিরকালের মত বিলীন হয়ে গেছেন। আঃ সেই হান যে তার চির তীর্থস্থান। তার মা যে সেই বালুর শয্যায় চির বিশ্রাম নিতে নিতে, মাঝে মাঝে যেন ব্যাকুল হয়ে ডাকছেন—খোকা—ও খোকা—

অনেক রাতে হঠাৎ অভয়ের ঘুম ভেঙে যায়। কে যেন ব্যাকুলভাবে ডাকছে—অভয়দা—ও অভয়দা। অতঃ চোখ কচলে তাকিয়ে দেখে মিনতি—

মিনতি বলল, শিগ্রী এসো অভয়দা। বাবা—বাবা—

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে অভয় বলে—কি হয়েছে—

—বাবা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। শিগ্রী ডাকার ডেকে আনো অভয়দা। যাও, দেবী কহো না। বাড়ীতে তখন কলরব উঠেছে। চারদিকে আলো, চাকর-বাকররা ছটোছুটি করছে। প্রতিবেশী গগন মোক্তার, ললিত উকীল যিহেন পেশকার অচুল কবরেক সব চলে এসেছেন। নানাজনে নানা কথা বলছে। কে যেন কাঁদছে। বোধ করি মিনতির বা প্রশতির গলা। বাকুর কারাও শোনা যাচ্ছে। ডাকারবাবুর সঙ্গেই এসেছে অভয়। খাটের ওপর শোয়ান হয়েছে যোগেশ্বরবাবুকে। কিন্তু জ্ঞান নেই। গলার ভেতর থেকে মাঝেমাঝে গোঁ গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে। মাথার বরফ দেওয়া হয়েছে, ঔষধও চলছে। কিন্তু ডাক্তারের মুখ গভীর। সকলেই ব্যাকুল নয়নে তাকিয়ে আছে, রুগীর মুখের দিকে। আশালতা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন স্বামীর মুখের দিকে। মুখ নির্জিকার যেন পাথরপ্রতিমা। অভয় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে জেঠাবাবুর মুখ। সে এর আগেও হু-চারটে ব্রহ্ম দেখেছে। তার মনে হয়, আর নিষ্ফল নেই। কদিন থেকে কাকের ডাক বড় বেশী শুনতে পেয়েছে। অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলে কাল পের্চার কুক কুক অলঙ্ঘনে ডাক শুনতে পেয়েছে। একটা যেন মত

অমলস এ বাড়ীতে হবে, কদিন থেকে তার মনে হচ্ছিল। কিন্তু এরা তো বিশ্বাস করেন না—বরং হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলতেন, ওসব বাজে কুসংস্কার। কিন্তু আজ এই কাল রাতে, ব্রহ্মদূতের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে তার মনে হয়, ব্রহ্মদূতের বিদ্রী কালো ছায়া পে যেন দেখতে পাচ্ছে। কোন এক অজানা রহস্যময় পাৎ থেকে নেমে এসেছে, সেই ব্রহ্মদূত। এই পৃথিবীর সুখ-দুঃখ ঘেরা, নানা স্থিতি বিজড়িত, স্নেহভালবাগা শতক মায়ায় বন্ধন থেকে, এক নিমিষে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে সে। এই সংসার, যশ মান সম্পদ সব হবে মিথ্যা। অভয় যেন দুর্ভতে পারে, আর বেশী দেবী নেই। কিন্তু এসব কথা কে শোনে। কাকেই বা বলবে এসব কথা।

ভোর বেলার যোগেশ্বর দত্ত চলে গেলেন। একটা আর্ড চীৎকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। যোগেশ্বর দত্ত সমস্ত বন্ধন আজ ছিন্ন হ'ল। তাঁর বান্ধব আজ খুলল। সূর্য্যের প্রসন্ন আলোকের সঙ্গে গিঞ্জরে আবক প্রাণপক্ষী বান্ধবের শৃঙ্খল মোচন করে ছাড়া করল সেই অনির্কণ অসুরস্র আলোকের দিকে। এতদিনে যোগেশ্বর দত্ত ছুটি পেলেন। তাই এই প্রসন্ন প্রভাতের সূর্যের উক আলোর মাঝে বেজে উঠল সেই ছুটির ঘণ্টা—ঢং—ঢং—ং—।

মহা সমারোহে যোগেশ্বর দত্তর শ্রাদ্ধ শান্তি হয়ে গেল। এখন ওখান হতে শ্রাদ্ধে বহু লোকজন এসে। আশালতা প্রচুর পরসাদ খরচ করলেন, স্বামীর শেষ কাজে। যোগেশ্বর দত্তর দুই শ্রালক, স্বস্তর স্বাত্তী সকলেই এসেছিলেন। গোপেশ্বর এসেছিলেন, কিন্তু হৃদয়ের বেশী থাকতে পারেন নি। এই হুঃসহ শোকের মাঝে, আশালতার সঙ্গে কোন কথাবার্তাই হয়নি। গোপেশ্বর দ্বিতীয় কিন্তু তাঁর দাদা যোগেশ্বর ছিলেন অর্থবান্ এবং বহু সম্পত্তির মালিক। এক্ষণে আশালতার বাবা, মা, দুই, তাই এখন অভিভাবক। সেখানে গোপেশ্বরের সঙ্গে আর কি কথা হতে পারে? গোপেশ্বরের একমাত্র চিন্তা এখন অভয়ের জন্ত। যোগেশ্বর বীর বেঁচে থাকতেন তবে অভয়ের কলেজে পড়ার সন্ধান ছিল। কিন্তু বর্তমানে আর কোনও আশা নেই। অভয় তাই বলল

শুভময়কে, —বুঝলে শুভ, আমাদের কী অদ্ভুত অদ্ভুত। বাক্য বলে, অভাঙ্গা বোধকে চার সাগর শুকায়ে যায়। আমাদের সেই অবস্থা। বোধ করি ভগবানের ইচ্ছা নয়, লেখাপড়া শিখি। জন্মকাল থেকে বড় কষ্টে মানুষ হয়েছি। খাওয়া পরা সব ব্যাপারেই কী যে নিদারুণ অভাবের ভেতর দিয়ে আমরা চলেছি, তা ছুঁমি ভাবতেও পারবে না। বোধ করি, এই রকম অদ্ভুত নিয়েই আমরা জন্মেছি। তাই, অদ্ভুতের নিয়ম লঙ্ঘন করা অসাধ্য।

তাই এক এক সময় তাই, আমরা কত অপরাধই না করেছিলাম, তাই এই শাস্তি। শুভময় চুপ করে থাকে। অভয় বলে, বাবা চলে গেছেন। আমাকেও এবার এখান থেকে পাতভাড়ি গোটাতে হবে। যদি জেঠাবাবু বেঁচে থাকতেন তবে আশা ছিল। কিন্তু এখন আর কোনও আশা ভরসা নেই। জেঠাইমা এখন তাই বললেন।

শুভময় বলল, ছুঁমি চলে যাবে অভয়দা। আর বোধ হয় দেখা সাক্ষাৎ হবে না।

—দেখা হওয়া? বৃহৎ হেসে বলল অভয়—না বোধ হয় আর কেন আশাই নেই। এখানে থাকব কোন ভরসায়, বা কিসের জোরে। এক জ্যাঠাবাবুর জোরেই এখানে ছিলাম। কিন্তু সৌদিক থেকে, ভগবান তাও ছুঁচিয়ে দিলেন। ওঁদের সঙ্গে আর আমার লব্ধ কি? আমরা গরীব। গরীব আত্মীয়কে কি বড়লোক আত্মীয় ভালবাসে না শ্রদ্ধা করে। ওঁরা বরং আমাদের ভয় পান, পাছে আমরা ওঁদের ঘাড়ের বোঝা হয়ে দাঁড়াই।

চাকরে চা আর খাবার দিয়ে গেল। অভয় একবার দরজার দিকে তাকাইল। কিন্তু আল আর হুপুঁরিকে

কোথাও দেখা গেল না।

অভয়ের বুক হতে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। চারে চুপক দিয়ে অভয় ভাল, তার কি আশ্চর্য লক্ষ্য। দেখতে ভাল লাগে। ওর সংস্পর্শ, কথা, সবই ভাল, লাগে। কিন্তু এই ভাল লাগার পরিণাম কি? সে কে? সে তো সামান্য—অতি নগণ্য একটি ছেলে। কোথায় আকাশের চাঁদ, আর কোথায় এক হীন মাটির প্রতীপ। এঁকি অদ্ভুত দুরাশা তার।

শুভময় বলল, অভয়দা, যেখানে থাক না, কেন, চিঠি দিলে যেন উত্তর পাই। তোমার বাড়ীর ঠিকানায় পত্র দেব। যদি কোথাও যাও তবে জানাবে।

—হাঁ, উত্তর ঠিক দেব। কিন্তু শুভ, এই চিঠির আদান প্রদান কতদিন থাকবে জানিনে। আমি তো দেখছি, সময় আর মানুষের অবস্থা সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। তবুও আমি তোমার ভুলব না। তবে, শেষ পর্যন্ত এই শপথ হয়ত আর থাকবে না।

—না, থাকবে। ছুঁমি দেখো অভয়দা। শুভময় জোর দিয়ে এই কথা কটি বলল।

বোধ করি এই রকমই হয়। হুঁটি সংসার-অনভিজ্ঞ বালক, আসন্ন বিদায়ের ব্যথার কত রকম শপথই না করে দেখা যায়, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে, কত শত শপথ, কত ব্যথা বেদনা, ভালবাসা, স্নেহ, সব এক নিমেষে মুছে গেছে। মহাকাল ভেঙ্গে চূরে মানুষকে বারবার নুতন করে গড়ে দিচ্ছেন। তবুও বোধ করি, স্নেহ, মায়ী ভালবাসা মিথ্যা নয়। এই কণভঙ্গুর জগতে এটাই অতি সত্য। একদিন এরাও উত্তর উত্তরকে ভুলে যাবে, তখন কোথায় থাকবে অভয়, আর কোথায় থাকবে শুভময়।

# ভোট

শ্রীভগবত দাস বস্ট

আচমকা কেঁদে উঠল মেয়েরা। আর সেই কান্নার শব্দে পাড়ার অন্তঃস্থ ঘরের মধ্যে পুরুষ দুটে গিরে ওদের দরজার জড় হল। আমি গেলাম না। পাড়ার ঘরে টেবিলের সামনে বসে বুঝতে পারলাম, নিতু বাগ্‌দী মারা গেল। কিন্তু মুখ ফুটে কথাটা প্রকাশ করতে দাহস হল না। ঝিঝের অবস্থাসী হলাম।

অপ্রিয় কথা। স্ততরাং ভাল ভাবে না কেনে শুনে ঘোষণা করা অন্তঃস্থ। তবে এ কথা সত্য যে নিতু বাগ্‌দী মরণাপন্ন অবস্থায় রাত কাটাচ্ছে। আজ না হলেও দিন করেকের মধ্যেই ওর স্বাস্থ্য কার্য চিরতরে তরু হবে। ওকে আর সুহাবহার যোত্রাঘুরি করতে দেখা যাবে না। পাড়ার মোড়লি করার দিন ওর অন্তঃস্থ। তা হলেও এখনই এই মুহূর্তে ওর মুখ্য হোক তা যেমন কেউ চায় না, তেমনি আমিও চাই না। কারণ সে আমাকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। আমাকে ধনী নামে জাহির করেছে। যার ফলে আমার ঘরে চোর-ডাকাডাকের উপদ্রব না বাড়লেও মানুষের অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে অহরহ।

পাশের বাড়ীর বাসিন্দা নিতু বাগ্‌দী। সংসারে পাঁচজন পোস্তের মধ্যে চারজন কর্মকর্ম—রোজগারী। তবু মাটির ঘরে আঁত হীন ভাবে দিন কাটার। ঘরটিও জীর্ণ। যেন বাতাসে ভাসছে। বলে, ওর এই হীনাবস্থার মূলে ধনীদেব শোষণ। অথচ কোনদিন দেখলাম না কোন ধনী ওর রোজগারের অর্থ হিঁনিয়ে নিচ্ছে। বরং ওকে অনেকে সামলে চলতে উপদেশ দেয়। কিন্তু সে কথা সে কানে নেয় না। হুঁলি আঁটা কলুর বলদ যেমন একই পথে পরিভ্রমণ করে, তেমনি সেও ওর বতাবের দাস। জন্মগত অভ্যাস ধমনির রক্তপ্রোতে যেন মিশে আছে।

আগে সে কাজ করত। কিন্তু এখন বোগে পড়ার ওর কাজ বন্ধ। ওর ছেলে, বোঁ আর মেয়ে কাজ করে। যা আনে তাতে গুলার আগেও যেমন চলছিল এখনও তেমনি চলে। তবে এখন খরচা একটু বেড়েছে।

নিতু ওরুধ-পথে যে খরচা হচ্ছে তাতে কিছু খণ ধারণ হচ্ছে। কিন্তু তবু ওর বাড়ীর লোকজনরা আমার মতই চায় না যে নিতু মারা যাক। সকলের ইচ্ছা বেঁচে উঠুক। যতকণ স্বাস, ততকণ আশ। তাহলেও সবায় মনে ঐ এক প্রশ্ন,—আর সে সেবে উঠবে কি?

কি যে বোগ তা জানি না। ওর আত্মীয় স্বজন হয়ত জানে, কিন্তু প্রকাশ করে না। বলে, ছবার কুহুরে কামড়েছিল। তাই বাঁচতে চেয়ে আর মরা হয়ে পড়েছে। পেটের নাড়িমুণ্ডের চার ধারে বারটা ইনজেকশন নিয়ে ওর জীবনেরও বারটা বেঁকে গেছে। আবার কখনও বলে বিভ্রাল আর ইঁহুরের ঘন ঘন কামড়ের ফলে ওর জীবনের এই দুঃসহ। যাক, এত সব জন্ত জানোয়ারের কামড় সহ্য করে যে বেঁচে আছে এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। আরও আশ্চর্য যে আমি ওর বিচারে ধনী না হলেও ধনী। অথচ পৃথিবীতে এমন কোন লোক নেই যে আমাকে ধনী বলে স্বীকার করবে। পাড়ার বাইরে অনেকেই আমাকে মান্ত করে তা বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু ধনী পদবীতে আজও আমি কারো কাছে আখ্যায়িত হইনি। তবু ওর কাছে আমি যেন পড়াশুনা না করেই এম-এ ডিগ্রি পেয়ে গেছি।

নিতু বাড়ির কারখানায় কাজ করত। ওর ছেলেরও ঐ কাজ। ওর স্ত্রী ও মেয়ে করে কোন এক ধনী পরিবারে ঝি-এর কাজ। স্ততরাং ধনীদেব পোষকতার ওরাও পোষিত। কিন্তু ওর মতে ধনীরাই ওদের পেষণ করছে। ধনী শ্রেণীর উপর ওর জন্মগত বিদ্বেষ। কতকগুলো মুখস্থ করা বুলি মনে রেখেছে। সেগুলো আঙাড়িয়ে সে পাড়ার সর্দার। নামের পুরোভাগে রায়বাহাদুর লেখার মত সেও কমরেড লিখতে শুরু করেছে।

হঠাৎ কান্নার বোল বন্ধ হল। যে সব মেয়ে পুরুষ ওদের দরজার সামনে ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তারা একে একে সরে পড়ল। কে একজন জোর গলায় বলে উঠল, আর ঘরবে না। একটু আঙন জেলে সেক তাপ

দে তা হলেই সেরে উঠবে।

কথাটা শুনে কোতুলী হলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে ওদের বাড়ীর দোরগোড়ায় হাজির হলাম।

শীতের সকাল। তার উপর আজ হুঁশনি বাদলা। ঠাণ্ডার প্রকোপ তাই খুব বেশী। আর এই ঠাণ্ডার প্রকোপে ওর হাত-পা ঠাণ্ডা ঘেরে গেল। ক্লান্ত শরীর। ঘরে শীতবস্ত্রেরও অভাব। ঠাণ্ডা ঘোড়ের কোন ব্যবস্থা না থাকায় হাত-পায়ে শীতলতা ও চোখ মুখে কেমন যেন এক বিকৃত ভাব ফুটে উঠেছিল। যাতে বাড়ীর লোক-জন ভেবেছিল, এখনই বুঝি মাথা ঘাবে। কিন্তু মরল না। একটু সামলে নিয়েছে। যাক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

এই তো মাত্র হুঁশনি লম্বাশায়ী। এর মধ্যেই শেষ হবে? তা হতে পারে না। তাহলে যে ঈশ্বরের মান সম্মান ধরবে। যে নাকি যমেরও অর্কাচি। যম যাকে নিতে এসেও নিল না,—কি জানি যমালয়ে গিয়ে পাছে পাটি পলিটিলের বুলি আওড়ায়। তাহলে তো বিব্রত হতে হবে। স্তম্ভাৎ নিছর মেয়াদ যে এখন শেষ হবার নয়,—তা স্পষ্ট বুঝা গেল। তাই হোক;—মরার চেয়ে বেঁচে থেকেই শান্তি বেশী। কঁাসির চেয়ে জেল খাটায় অশান্তি অনেক।

মা চকলা যে আমার ভাগ্যে কোন দিন অচকল নয়, তা আমি জানি। ভুলেও তিনি আমার উপর কৃপা বৃষ্টি করেন নি। বিশেষ করে শৈশব থেকে বাগ্‌দেবীর শরণাপন্ন হওয়ার তিনি যেন আরও কষ্ট। পরে বিভাগ্যচর্চার বিরত হয়েও তাঁকে ছুট করতে পারি নি। শোনা যায় লক্ষীর সঙ্গে সরস্বতীর সাপ নেউলের সম্বন্ধ। সে কারণে মা কমলার আমার উপর শ্রদ্ধা। তাহলেও কোন প্রকারে একটু লেখাপড়া শিখোঁহলাম বলে খেটে খুটে খেতে পারছি। আটপৌরে একটা চাকরি জুটিয়ে মাসে কিছু আয় করছি। কিন্তু এতেই আমি নিছর বিচারে বড়লোক। আর আমার উপর ওর বিশ্বাসও কম নয়। যেহেতু আমি ওর নাগালের মধ্যে রয়েছি এবং আমি হুঁশল প্রকৃতির মানুষ, সেই হেতু ওর দলের সকলেরই আমার উপর প্রবল আক্রমণ। নানা পূজা আচার মোটা টাকা চাঁদা দাবী, উৎসব ও পার্বণ

উপলক্ষে এটা-সেটা আদায় উল্লস;—এ যেন নিত্য লেগেই আছে। ভিক্ষা বা সাহায্য নয়,—দ্বিতেই হবে,—এই রকম জোর দাবী।

তাই ভাবি, ওদের কথা বলার কথা ছুরিয়ে গেলে বলি,—একটু দূরে কত ধনী লোক রয়েছে;—কেউ মিল মালিক,—কেউ আড়ৎদার,—কই তাদের কাছে গিয়ে তো কিছু চাও না? আর যত চাপ আমার উপর।

জবানে নিছর দলের লোকেরা বলে,—তারা কেন দেবে মশায়,—তারা তো ভিন্ পাড়ায় বাস করে। আপনি যখন পাড়ায় আছেন, তখন আপনার উপরই তো আমাদের জোর। আপনার আছে বলেই তো চাটছি। মনে মনে বলি,—ওদের কাছে চাইতে গেলে তো পাবে না। উণ্টা ওদের কোপে তোমাদের বাড়ি গর্দান কাটা যাবে।

অবসরে ওদের বিষয় চিন্তা করে আমার মনে এই সিদ্ধান্ত বলবৎ যে ওরা কমিউনিজম যে কি, তাই বুঝে না। যা করে বা বলে তা ঈর্ষা-প্ররোচিত। আমি ওদের মত হুঁড়ে ঘরে বাস করলেও হুঁড়ে নই। ওরা যেমন একদিন কাজ করে বেশী কিছু টাকা কামালে হুঁএকদিন কাজে যায় না,—আমি কিন্তু তেমন নই। শুধু এই কারণে ওদের আমার উপর ঈর্ষা নয়। আমার একার বোজগারে যে আমার সংসার সচ্ছল, অথচ ওদের প্রত্যেকের বাড়ীর প্রতিজনই বোজগার করে সচ্ছল অবস্থার দিন কাটাতে পারছে না,—তাতেই হিংসা।

আমার ঘরের পাশে এক কালি জমি, যেটুকু এমনি কঁাকা পড়ে ছিল, সেটা ওরা সবাই মিলে ঘিটে বেড়ে ঘেরাও করে দখল করল। বাধা দিতেও সাহস পেলাম না। কারণ আমি একা, আর ওরা অনেক। ওদের দলে হুঁএকজন রাজনৈতিক নেতাও আছে। ওরাই ওদের সাহস জোগাচ্ছে। তারা ভোট পেয়ে গদী কায়দা করার স্বার্থে ওদের হাতে হাত মিলিয়েছে। স্তম্ভাৎ সবাই মিলে এখন বা বলবে তাই ওরা মানতে বাধ্য। জল চিরকাল নিয়মুখী। কিন্তু সবাই যদি এক জোটে বলে, জলের গতি উল্লংঘ্য, তা হলে তাই সত্য। তাই ভাবি, এই দল নেতারা বেশ সেবার এগিয়ে এলেও কোন

দিনই ওদের কাছ থেকে মুকল আশা করা যাবে না।  
মন যে ওদের স্বার্থপ্রণোদিত। স্বীয় বিবেকবুদ্ধিকেও  
ওরা ওদের কাছে বিক্রি করে ফেলেছে। তাই তো ওদের  
আফালন। ঐ নিছু ঞার নিছুর দলভুক্ত যত সব ছোট  
লোক, ওরাই এখন তাক বুকে নেতাদের মাথায় চড়ে  
বসেছে।

ঐ পাড়ার সবাই শ্রমিক। রোজগার ওদের কম  
নয়। ঘরের প্রতিজনই কর্মী। মেয়েরাও বাবু বাড়ীতে  
কি-এর কাজ করে। কেউ বা রাজমিস্ত্রীর সহকর্মী।  
কিন্তু রোজগার বেশী হলেও নানা বদ্‌ দোষ ওদের।  
মদ খায়, জুয়া খেলে আবার কখনও বা যেখানে সেখানে  
গিৰ্জাপয়সা খুঁয়ে ঘরে ঢুকে। কিন্তু তাতেও ওদের কদর  
কমে নি। বেহেতু ওরা নিজেদের কমরেড বলে জাহির  
করে। আর কমিউনিজম অর্থে ওরা বুকে, লুপ্টপাট  
ও দাঙ্গাবাজী।

ওদের দলপতি মুহাস সরকার বেশ মোলায়েম ভাবে  
জানাল,—ওরা আপনার জায়গায় একটা প্রাতিমারী স্থল  
করতে চায়। সাধারণের মঙ্গলের জন্যই ওদের এই  
প্রচেষ্টা। আশা করি পাড়ার মানুষ হয়ে আপনি  
ওদের সঙ্গে সহযোগিতাই করবেন।

—কিন্তু আমি যে টাকা দিয়ে জায়গা কিনেছি।  
তিনশ' টাকা দিয়ে জায়গা কিনলাম, ঘরের অকুলান  
হওয়ার আর ছোটো ক্রম বাড়াব বলে; - সেই জায়গাটা  
কি আমার এমনি ভাবে নষ্ট হবে?—মহা স্বার্থপরের  
মত আমি প্রশ্ন করলাম।

নষ্ট হবে কেন, জায়গায় তো সঙ্গতি হচ্ছে। কুট  
ভাবে মুহাস সরকার উত্তর দিল।

—তা'হলে আমার তিন শ' টাকা আপনি দিয়ে  
দিন।

—আমি কেন দিব। আপনি ভেবে নিন, ঐ জায়গাটা  
আপনি দান করলেন।

এই কথায় কি জবাব দিব, তাই ভাবি। নিচ্চুপে  
দাঁড়িয়ে রইলাম। মুহাস বলে,—আমাদের রাশিয়ার  
অনুক মনীষী বলেন,—Wealth should be looked  
upon as a possession of the community to be  
cultivated and safeguarded.

—কি কথাটার মানে বুঝলেন? বললাম,—না।

একটু হুটকি হেসে মুহাস জানাল, লেখা পড়া যখন  
শিখেছেন, তখন বই-টাই পড়ুন। মনটা উদার করুন,  
—কেমন। কথা বলেই সে চলে গেল।

যাক্, মনকেই প্রবোধ দিলাম। লোকে কত বেশী  
টাকা জুয়া খেলায় হেরে যায়, জানব ভেমনি সখ করে  
একদিন জুয়া খেলে তিন শ' টাকা হেরেছি। সেই  
সব্বয় একথা মনে হল না যে, বিভালয় প্রতিষ্ঠা করে  
আমি ঐ এক কালি জমি দান করলাম। কারণ, আমার  
কাছে ওরা ভিধারীরও অধম।

যথাকালে মুহাস বিভাগীঠা প্রতিষ্ঠিত হল। ছোট  
খাটো একটা কাঁচা মাটির ঘর তৈরী হল মুহাস  
সরকারের খরচায়। মাটারও হু'জন নিযুক্ত হল। কিন্তু  
ইস্কুল চলল না। প্রথম কথা, কম মাইনায় কে কান্দিন  
পড়াবে? আর দ্বিতীয় কথা, শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা  
শেখার আদ্রহ মোটেই নেই। ওরা তো সব ঐ  
বুব্বুক্কেরই কল। স্ট্রেট পেনসিল আর বই খাতা নিয়ে  
পড়তে এসে মাটারের সামনে খেয়াল খুসী মত বিড়ি  
টানতে শুরু করল।

যাক্, ইস্কুল উঠে গেলেও ঘরটা তো রইল। সেই  
ঘরে তখন সকাল সন্ধ্যা জুয়ার আড্ডা বসতে লাগল।

শীতের সকাল। রোদে পিঠ পেতে ঘরের বাইরে  
নিছু বসে ছিল। জীর্ণ, ককালসার বেহ। রোগে ভুগে  
ভুগে আরও বেশী শীর্ণ হয়েছে। বললাম,—কেমন  
আছ?

—আর বাবু, এবার মরে গেলে বাঁচি।

—সে কি, মরবে কেন? হাসপাতালে ভর্তি হও  
গে।

—সিট পাব না যে। সখেদে একটা নিশ্বাস ছেড়ে  
উত্তর দিল নিছু।

বললাম,—কেন, তোমাদের দলের নেতাদের ঘর।  
ওদের রেকমেণ্ডে সীটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—ঠেক, তাঁরা তো অসেন না।

কিছু বললাম না। নিচ্চুপ রইলাম। নিছুও  
কিছুক্ষণ ভব থেকে জানাল,—উনার আসবেন। খবর  
দিয়েছি। আমার অবদানও তো কম নয়। আঁঠার

বহুৰেৰ অবদান। বহুৱাৰ পিকেটিং কৰেহি। পুলিচৰ হাতে ধৰা পড়ে জখমও হৱেহি। বাস আলিয়েহি। সরকারী অপিসেৰ খাভাপত্ৰ তছনহ কৰেহি। আমাকে বখন উনাৱা নিলেন জানেন, তখন আসবেনই, আজ না হলেও কাল আসবেন।

বলোহিলাম, আসবে না। আৰ হলও ঠিক তাই। মুহাস সরকার আসে নি। কিন্তু এসেছিল অভজন। জনসেবক দলের নেতা বিজয় দাস। নিজের দলটা একটু পুৰু করতে এগিয়ে এল। নিতু বাগদীর তদবির তদায়ক হুৰু হল।

বিজয় দাস শুধু রাজনৈতিক কৰ্মী নয়, এম বি, বি এস ডাক্তার এবং মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান। বেশ পরলা ওৱালা লোক। নিতুর চিকিৎসা স্বয়ং কৰল না। ৱেকমেণ্ডে সে হাসপাতালে সীট পেল।

পাড়াটার ওপর নজর পড়ল বিজয় ডাক্তারের। ৱাতা ঘাট পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হল। পাড়ার কয়েকজন গরীবদের মিলিক দেওয়ার ব্যবস্থা হল। ভাবল, আগামী জেনারেল ইলেকশনে সে সব ভোটই কয়েম কৰবে। স্কুলটা আবার চালু হল। আৰ দিন পনের বাদে আৰ সারা অবস্থায় হাসপাতাল হতে কিৰে এল নিতু বাগদী। ওকে দেখে মনে হল, শ্রোতের জলে ভেসে আসা একটা আৰ পোড়া কাঠ।

দশটা পাঁচটা যথারীতি স্কুল চলতে লাগল। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিয়ম মাসিক উপাহৃতিতে মনে হল আৰ বুঝি স্কুল বন্ধ হবে না। মুহাসের তৈরী বাড়ী। বোধ হয় সেই কারণে মুহাসের নাম বজায় রেখে বিভাগলের নতুন নামকরণ হল, মুহাস বিজয় বিভাগীঠ। পাড়াটা আগের চেয়ে অনেক উন্নত হল। অল্প কয় দিনেই অনেক রকম বদল ও রূপান্তর ঘটে গেল। কিন্তু নিতু আৰ সম্পূর্ণ সেরে উঠল না। কিন্তু বিজয়ের সেদিকে হ'ল নেই। আসল জেনারেল ইলেকশনে সে কমপিট কৰবে। আৰ নির্বাচন পৰ্ক্ষও আগন্তপ্রায়। ভোট পেয়ে ওকে এম-এল-এ হভেই হবে। প্রভৃতি অনেক আগের থেকে শুরু কৰেহে, এখন প্রভৃতি হয়ে অপেক্ষার আছে, বাতে সব ভোটগুলো ওয়ই কয়েম হয়।

মুহাস সরকার দাঁড়িয়েছে। তারও লক্ষ্য পাড়াটার উপর। একদিন সে এই পাড়ার খুলো বাড়ায় নি, এখন আপন গরজে হাজির। ঘরে ঘরে সবার খোজ খবর নেয়। নিতুর কাছেও গিয়ে দাঁড়ায়। নিতু বলে,—আমি তো অক্ষম, খাটাখুটি মোটেই করতে পারব না। তবে ভোটের দিন ঠিকই যাব ভোট দিতে। ভোট নষ্ট তো করতে পারি না।

মুহাস খুসী হল। বলল,—ঠিক আছে। তোমাকে তো জানি। তুমি পার্টিকে খুব ভালবাস। নাও, কিছু রাখো,—দেখবে এতজ্ঞাটের ভোট যেন নষ্ট না হয়। এই বলে সে হুশ টাকা ওর হাতে শুঁকে দিল। আৰ নিতুও তা নির্দ্বিধায়ে গ্রহণ কৰল।

এদিকে সে বিজয় ডাক্তারের কাছে থেকেও মোটা টাকা নিয়ে রেখেছে। ওকেও আশ্বাস দিয়েছে, ওদের দলের সব ভোটই ওর কেনা হল। কিন্তু সে কাকে ভোট দেবে তা তো মোটেই ভাবল না।

ভোটের দিন সকালেই নিতু ভোট দিয়ে বাড়ী কিৰল। হেঁটে যাওয়ার শক্তি ছিল না, রিকশায় গেছল। এবং রিকশায় কিৰেহিল। কিন্তু কাকে সে ভোট দিল তা অনেকে অহুমান জানলেও আমি কিন্তু অহুমান করতে পারি নি। কারণ হুপফেরই সে টাকা নিয়ে আশ্বাস্য কৰেহে। কেউ তা জানে না, কিন্তু আমি দেখেহি। হুপফকেই সন্তুষ্ট কৰেহে। আরো যদি কেউ আসত, তাহলে তার কাছেও টাকা নিত। কিন্তু ভোট নষ্ট না কৰে সে একজনকেই দিয়েছে। সেদিকে সে মহা দুষু।

ভোট কাউন্টিং-এর পর কলাকল জানা গেল। কিন্তু দেখলাম, আমরা ভোট দিয়ে সমালয় থেকে নিতুকে কিৰিয়ে আমলাম। অথচ সে ভোট দিয়ে ওর প্রিয়জনকে জিতাতে পারে নি। কারণ নির্দলীয় প্রার্থী মুকুন্দ ঘোষ সেবার অধিক ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ কৰল। নিতু এখন ভাবছে, মুহাস বাবুর দেওয়া হুশ টাকা আশ্বাস্য কৰে সে ভীষণ ভুল কৰেহে। বিলিয়ে দিলে পারত।

# কংগ্রেস স্মৃতি

(সপ্তাব্দিংশ অধিবেশন—গয়া—১৯২২)

## ঐগিরিজামোহন সাহা

গয়া কংগ্রেস অধিবেশনের একটি ঘটনা চাকল্যের সৃষ্টি করেছিল। বিনী টিকিটে কাউকে প্যাণ্ডেলের ভিতর প্রবেশের অনুমতি না দেওয়ার জন্য খেচ্ছাসেবকদের প্রতি বর্জ্যপক্ষের নির্দেশ ছিল। আমরা যখন প্যাণ্ডেলের ভিতর যাওয়ার জন্য একটি গেটের সম্মুখীন হলাম তখন দেখলাম যে, দীনবন্ধু এনড্রুস সাহেব ধুতি পাঞ্জাবী ও গলায় পাটকরা চাদর জড়িয়ে প্যাণ্ডেলের ভিতর প্রবেশের জন্য উত্তর হতেই গেটের প্রহরারত খেচ্ছাসেবক টিকিট দেখতে চাইলেন। সাহেবের সঙ্গে প্রতিনিধির কার্ড ছিল না বোধ হয় তিনি তা সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার আবশ্যকতাও মনে করেন নি, তাঁর নিকট কার্ড ছিল না। তিনি সেই কথা জানিয়ে খেচ্ছাসেবকের বাধা অগ্রাহ্য করে প্যাণ্ডেলের দিকে পা বাড়াতেই কর্তব্যপরায়ণ খেচ্ছাসেবক এনড্রুস সাহেবের গলায় চাদর হাতে ধরে তাঁকে টেনে রাখলেন। এরকম অভাবনীয় ব্যাপারে সকলে অভিভূত হয়ে গেল, ভীষণ হৈ চৈ পড়ে গেল। খেচ্ছাসেবককে যৎপরোনাস্তি ভৎসনা করা হল, অভ্যর্থনা সমিতির কয়েকজন সদস্য সংবাদ পেয়ে দৌড়ে এসে সাহেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সম্মানে তাঁকে ভিতরে নিয়ে ডায়ালে বসালেন। এই ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী।\*

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হওয়ার পরই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সহযোগিতায় স্বরাজ্য পাটী স্থাপন করলেন। এই পাটী গঠনের কার্যে লওনের প্রিন্স কাউন্সিলের খ্যাতিমান ব্যারিষ্টার অতি হৃদয়বান দীন হুবে বিশিষ্ট অংগ গ্রহণ করেছিলেন।

অধিবেশনের পর গয়ার ঝটব্য হান ডালি ও বৌদ্ধ

গয়া দর্শন করে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান রজনী মোহন সান্যাল ও শ্রীমান্ প্রভাতচন্দ্র মৈত্রের সঙ্গে পাটনা বেড়াতে গিয়ে আমার সহপাঠী বন্ধু পাটনা হাইকোর্টের বিশিষ্ট এডভোকেট নিবন্তনারায়ণ সিংহের আতিথ্যেরতা গ্রহণ করলাম। নিরন্তর পরবর্তী কালে পাটনা বিধান সভায় স্পীকার নির্বাচিত হয়েছিলেন। নিরন্তর আতি আশ্রয়ের সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা করল। যে কয়দিন পাটনায় ছিলাম, তার আতিথ্যেরতা যুগ্ম হয়েছিল।

একদিন পাটনা হাইকোর্টে গিয়ে আমার কয়েকজন বন্ধু ও সহপাঠী এডভোকেটের সঙ্গে দেখা হল। আমরা নিরন্তর বাড়ীতে উঠেছি শুনে তাঁরা একবাক্যে বললেন, আমরা থাকতে দাঁড় টানার বাড়ীতে উঠতে গেলে কেন? নিরন্তর অপরাধ তার পৈতৃক ব্যবসা ছিল পাটনা থেকে আরম্ভ করে ময়মনসিংহ পর্যন্ত কোঁর ঘাটের ইজারদারি। রাজসাহীতে তাদের ইজারদারি ছিল। রাজসাহীর বাসা থেকেই নিরন্তর গড়াগুনা করে রাজসাহী কলেজ থেকে এফ.এ পাশ করে, তার পর কলকাতার পড়বার সময়ও আমরা এক মেসে ছিলাম।

আমার বাঙালী উকিল বন্ধুরা বিহারীদের সম্বন্ধে অনেক কটাক্ষপাত করলেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ একদিনও আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন না।

পাটনা সহর পরিদর্শন করে আমরা কলকাতা ফিরে এলাম। আমার বাসায় কয়দিন থাকার পর রজনীরা দেশে ফিরে গেল।

বিশেষ অধিবেশন—দিল্লী-১৯২৩

(১)

গয়া কংগ্রেস অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই ১৯২৩



গালের ১৫ জাহ্নরাধী চৌরী চৌরী মাঝলার রায় বেকুল।  
তাতে জানা গেল যে, ২২৮ জন বিচারাধীন আসামীর  
মধ্যে ৬ জন জেলে বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেছে।  
একজনকে গুরুতর অস্ত্রের জন্তু হেড়ে দেওয়া হয়েছে।  
বাকী আসামীদের মধ্যে ৪৭ জন নিরপরাধী সাব্যস্ত  
হয়ে মুক্তি লাভ করেছে। দুজনকে দু'বৎসরের জন্তু সশ্রম  
কাষাদও দেওয়া হয়েছে। বাকী ১৭০ জন আসামীর  
প্রতি হত্যা, অগ্নিসংযোগ এবং ডাকাতির অভিযোগে  
প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই ভীষণ সংবাদে  
সমস্ত দেশ ভিত্তিত হয়ে গেল।

গয়া কংগ্রেসের পর কংগ্রেসের উত্তর দলের  
কর্মচাকল্য দেখা দিল। নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জারের দল  
তাদের নিজ নিজ মত প্রচারে লেগে গেল। ১০ই  
জাহ্নরাধী তামিল নাড়ু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির  
এক সভার কংগ্রেসের কর্মসূচী সম্বন্ধে বলতে উঠে মিঃ  
রাজাগোপালাচারী মন্তব্য করলেন যে নেতারা তাঁদের  
(নো-চেঞ্জারদের) পরিভ্যাগ করেছেন, একটি মাত্র  
বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে মাত্র এই কারণে।  
অবশ্য তাঁরা (নো-চেঞ্জাররা) কোন ঝগড়া করেন নি বা  
তাঁদের (প্রো চেঞ্জারদের) কাজে বাধা দেওয়ার ইচ্ছাও,  
প্রকাশ করেন নি। নেতাদের স্নেহ ফিরে পাওয়ার  
একমাত্র উপায় কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মসূচী-সাকল্য-  
সিদ্ধি করে তোলা।

অপর দিকে স্বরাজ্য দলের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন  
দাশ স্বরাজ্য পার্টির কর্মসূচী প্রচারের জন্তু দেশময় ঘুরে  
বেড়াতে লাগলেন। 'নেশন' পত্রিকার এক সাফাৎকারে  
তিনি জানালেন যে স্বরাজ্য দলের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর  
গয়া কংগ্রেসের সভাপতির অধিভাষণে উল্লিখিত মত  
গ্রহণ করা। তিনি দৃঢ়নিশ্চয় ভাবে মনে করেন যে গয়া  
কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তার ব্যর্থতা বুঝতে  
মাত্র মাস কয়েক সময় লাগবে। তিনি আইন অমান্ত  
প্রস্তাব কার্যকর মনে করেন না এবং যেভাবে আইন  
অমান্ত করা হবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে সেভাবে  
আইন অমান্ত করা সম্ভব হবে না। জাতীয়তার

জন্তু আবশ্যক বিবেচিত না হলে তিনি এর বিশেষ কোন  
গুণও দেখেন না। তাঁর বক্তব্য এই বলে তিনি শেষ  
করলেন যে নূতন দল ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল (নোচেঞ্জার)  
পুনরায় মিলিত হবে এবং এর জন্তু কংগ্রেসের একটি  
বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হবে।

১৬ই জাহ্নরাধী পুণার শিবাজী মন্দিরে এক জন-  
সভার নরসিংহ চিত্তামন কেলকার ঘোষণা করলেন যে  
যতদিন নূতন দলের সংখ্যা-সিদ্ধি তা সংখ্যা-  
গরিষ্ঠতার পরিণত না হয় ততদিন তিনি আন্দোলন  
চালিয়ে যেতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন।

ইতিমধ্যে কাঁকিনাড়া (কোকিনদ) কংগ্রেসের  
অধিবেশনের জন্তু নিমন্ত্রণ জানাল। ২০শে জাহ্নরাধী  
অস্ত্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে  
আগামী কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান কাঁকিনাড়া স্থির  
করল।

এই সময়ে উত্তর দলের মধ্যে একটা আপোষের চেষ্টা  
চলতে লাগল। এই উদ্দেশ্যে এলাহাবাদে ২৭শে  
জাহ্নরাধী অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির একটি  
অধিবেশন আহ্বান করা হল। উক্ত সভার নেতৃত্ব  
করলেন দেশবন্ধু দাশ।

উত্তর পক্ষের বহু তর্ক বিতর্ক আলোচনার পর  
নিম্নলিখিত আপোষের প্রস্তাব গৃহীত হল :—

(১) ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত উত্তর পক্ষকে কাউন্সিলে  
প্রবেশ সম্বন্ধে প্রচার কার্য বন্ধ রাখতে হবে।

(২) পরস্পরের কাজে বাধা না দিয়ে কর্মসূচীর  
অস্তিত্ত বিবয়ে কাজ করার স্বাধীনতা সকলের থাকবে।

(৩) অর্থ ও খেজাসেবক সম্বন্ধে প্রয়াতে গৃহীত  
কর্মসূচী প্রচার করার স্বাধীনতা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের  
থাকবে।

(৪) অর্থসংগ্রহ এবং তার জন্তু আবেদন করা এবং  
প্রয়োজনানুসারে গঠন মূলক কর্মসূচীর জন্তু খেজাসেবক  
লিটুত করা এবং গঠনমূলক কর্মসূচী ও অস্তিত্ত 'কমন'  
বিষয়ে সংখ্যাসিদ্ধি দল সংখ্যাগরিষ্ঠদলের সাহিত  
সহযোগিতা করবে।

(৫) ৩০শে এপ্রিলের পর প্রত্যেক দল যে পছন্দ উপযুক্ত বিবেচনা করবে তা গ্রহণ করতে পারবে।

(৬) উপরোক্ত ব্যবস্থা করা হলে এই সর্ভাধীনে যে, কোন প্রদেশে বর্তমান কাউন্সিলগুলি সময়ের পূর্বে ভেঙে যাবে না।

প্রস্তাব সি রাজাগোপালাচরী কর্তৃক উপস্থাপিত ও পাণ্ডিত্যমণ্ডল নেহেরু কর্তৃক সমর্থিত হয়ে গৃহীত হল।

১৮ই মার্চ তারিখে মহাত্মা গান্ধীর কারাবরণের বার্ষিকী পালনের জন্য সমগ্র দেশে হরতাল পালিত হল।

৩১শে মার্চ শ্রামশ্রমের চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সঙ্গীলনীর অধিবেশন যশোহরে আরম্ভ হয়। এই কনফারেন্সে ২৯ই এপ্রিল তারিখে অধিকাংশ প্রতিনিধিদের ভোটে আইন অমান্ত সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি নিয়ে দেওয়া গেল :—

যেহেতু বর্তমান সময়ে কংগ্রেস ও খিলাফত কর্মী এবং জনসাধারণ নীরব এবং কাজ সম্বন্ধে তাদের উদ্দীপনা কমে গিয়েছে এবং এই পরিস্থিতির সুযোগে দেশের শত্রুরা নানা উপায়ে আন্দোলন ধ্বংস করতে চেষ্টা করছে এবং নতুন নতুন কর ধার্য্য করে জনসাধারণকে উত্থাপিত করছে এবং যেহেতু বঙ্গীয় প্রাদেশিক সঙ্গীলনী মনে করে যে, আইন অমান্ত এবং অস্ত্র উপায় অবলম্বন দ্বারা দেশে পুনরায় উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা উচিত, অতএব এই কনফারেন্স সাব্যস্ত করছে যে এর জন্য আইন অমান্তই শ্রেষ্ঠ উপায়, অতএব এই সঙ্গীলনী প্রস্তাব করছে যে এর জন্য লবণের উপর ধার্য্য নতুন কর দিতে অস্বীকার করা তাদের উচিত এবং এই কনফারেন্স—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর ব্যাপক আইন অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ করার ক্ষমতা দিতে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিকে অনুরোধ করছে।

এই রকম সময়ে পাঞ্জাবে এবং উত্তর ভারতের হানে হানে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য বা মহাত্মা গান্ধী বহু

চেষ্টার স্থাপন করছিলেন তা ভীষণ ভাবে বিঘ্নিত হল।

স্বামী প্রদানন্দ অহরত ও অশ্রুত হিন্দু সমাজের উন্নতির জন্য গুটি আন্দোলন আরম্ভ করলেন। এতে গোঁড়া মুসলমানরা ক্ষেপে গেল। ২১শে এপ্রিল এক বিঘ্নিতত্রে স্বামীজি এই আন্দোলনের যে কারণ দেখিয়েছেন তা নিয়ে দেওয়া গেল।

ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুগণকে গুটি করে পুনরায় হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে আনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এই আন্দোলন (গুটি) শান্তিপূর্ণ ভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। উল্লেখ্য যে তাঁদের বক্তৃতা দ্বারা এবং অর্থ ও বেচ্ছাসেবকের জন্য আবেদন দ্বারা এই আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দিয়েছেন। জমিয়েত উল উল্লেখ্য প্রচারণার সমর্থনে উল্লেখ্যমতাই গুটি জাহাঙ্গীরী ও ফকিরদারী মাসে হিন্দুদের ব্যাপকভাবে ধর্ম্মান্তরিত করার সংযত্ন হয়ে চেষ্টা করছে। এই ঘটনার পর যখন হিন্দুরা দেখল যে তাদের ধর্ম্ম বিপর্য্য তখন তারা ভারতী গুটি সভা প্রতিরোধক-প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠন করল। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটিও দায়ী।

স্বামীজি আরও জানালেন যে কিছুদিন পূর্বে তিনি কংগ্রেসের ও তার কাজের সহিত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছেন এবং গুটি আন্দোলনের জন্য তিনি কংগ্রেসের কোন সাহায্য কখনও চান নি। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চান যে এই আন্দোলনে তাঁর রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য নেই। তিনি সমগ্র হিন্দু সমাজকে একটি মাত্র সম্মুখদিকপথে সংগঠন করতে চান এবং তাদের ভিতর থেকে সবুজ বৈষম্যকে দূরীভূত করতে চান। তিনি জানালেন যে, তাঁর একটি বক্তৃতা দ্বারা তিনি বলেছিলেন যে, ৭ কোটি অশ্রুত হিন্দুসমাজভুক্ত না করা পর্যন্ত তিনি বিশ্রাম নেবেন না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কেউ কেউ এই উক্তি মুসলমানদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয়েছে বলে মনে করেছেন। মুসলমানরা তা অশ্রুত নন। তিনি স্পষ্ট ভাবে জানালেন যে এটা তাঁর ধারণার বাইরে।

মার্চ ও এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবে ব্যাপক ভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ আরম্ভ হল। সেখানকার উদ্যোগ

অবস্থা পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য দেশবহু দাশ, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, হাকিম আজমল খাঁ এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে সদস্য করে একটি কংগ্রেসে ডেপুটেশন পাঞ্জাবে প্রেরিত হল।

ডেপুটেশনের সদস্যগণ পাঞ্জাবে গিয়ে দেখলেন যে সাম্প্রদায়িক পরিহ্রাসিত আতি গুরুতর আকার ধারণ করেছে। হিন্দু ও মুসলমান সম্পূর্ণ ভাবে হুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছে, মালাবার ও মুলতানের স্থিতি একদিকে ও তুর্কি ও হিন্দু সংগঠন অতীতকালে পরস্পরের মনে বিদ্বেষের ভাব ধরে দিয়েছে। পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ ডেপুটেশনকে জানাল যে মুসলমানরা বিধান পরিষদে, মিউনিসিপালিটি, জেলা বোর্ড, বিধানসভা ও সরকারী অফিসে তাদের সংখ্যায় অল্পশায়ে আসন সংরক্ষণের দাবি করছে। হিন্দু ও শিখেরা এই রকম সাম্প্রদায়িক দাবির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। ডেপুটেশনের পক্ষে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হল না। পাঞ্জাবের অবস্থা অপরিবর্তিত রইল।

(২)

কংগ্রেসের হুই দলের মধ্যে যে আগোস হয়েছিল তার সর্বাপেক্ষা ৩০শে এপ্রিল তারিখ শেষ হওয়ার পর রাজাগোপালাচাৰী ঐরা যে তারিখে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বললেন যে ৩০শে এপ্রিল তারিখ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাহাবাদে উত্তর দলের মধ্যে যে সাক্ষি হয়েছিল তার সমাপ্তি ঘটেছে। স্বরাজ্য পার্টি আগামী কাউন্সিলের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে এবং অন্ত্যস্ত দলের প্রার্থীদের পরিবর্তে তাদের নির্বাচিত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন করার ইচ্ছা ঘোষণা করেছে। অতএব আমাদের নো-চেয়ারম্যানের গয়া কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে কাউন্সিল বয়কট সাকল্যাগীত করা কর্তব্য। আমরা আশা করি পারস্পরিক সহিষ্ণুতা এবং বিনা বাধার আমাদের কর্তব্য পালন করতে পারব।

আবার উত্তর পক্ষ দেশময় নিজ নিজ মত প্রচারে

লেগে গেলেন।

এই রকম পরিহ্রাসিত বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ১২ই মে তারিখে আরম্ভ হয়। উক্ত কমিটির সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেদিন অন্ত্যস্ত প্রস্তাবের মধ্যে জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপালিটিগুলি দখল ও ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পরদিন চিত্তরঞ্জন দাশ গয়া কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব হৃগিত রাখা বাহুনিয় সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সভাপতি আউট অব অর্ডার ক্রলিং দিখে প্রস্তাবটি নাকচ করে দিলেন। ঐ ক্রলিং-এর বিরুদ্ধে দাশ মশায় বিস্তারিত আলোচনা করে বললেন যে সভাপতি মশায়ের আইনজ্ঞানের একান্ত অভাব। সভাপতি মশায় তাঁর ক্রলিং বদলালেন না।

অনুরূপ অন্ত্যস্ত প্রস্তাবও ঐ একই কারণে সভাপতি মশায় নাকচ করলেন। তখন মুসলিম ঔপত্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য প্রকাশ করলেন যে, সভায় কার্য গ্রহসনে পরিণত হয়েছে। এই উত্তির দরুন সভাপতি মশায় শরৎবাবুকে সভা হতে বোরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং দাশ মশায়কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, শরৎবাবুর মন্তব্য সভাপতির আপমান জনক কি না। দাশ মশায় স্বীকার করলেন, এরূপ মন্তব্য করা শরৎবাবুর পক্ষে উচিত হয় নি। বহু সদস্য শরৎবাবুর ক্ষমা প্রার্থনার দাবি জানালেন। শরৎবাবু ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তার পর দাশ মশায় তাঁর দলবল সহ সভা-গৃহ ত্যাগ করলেন।

১১শে ও ২০শে মে তারিখের বেজুগড়া (বিজয়গুড়া) সহরে অত্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনটি প্রকাশনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রস্তাব দ্বারা উত্তর পক্ষের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করার সুপারিশ করা হয়েছিল, অবশ্য যদি উত্তর পক্ষ বিশেষ অধিবেশনের

সিদ্ধান্ত দেনে সিতে স্বীকার করেন এই সর্তে।

এ সভা কাউন্সিল বরকট প্রস্তাব স্থগিত রাখার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে।

এই বকব সময়ে করিমপুর জেলায় মুসলমান ও নমঃ-মুসলমানের মধ্যে প্রচণ্ড হাঙ্গামা হাঙ্গামা বেধে যায়।

২০শে মে তারিখে দেশবন্ধু দাসের সভাপতিত্বে বোম্বাই সহরে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির একটি অধিবেশন হয় এবং পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের উত্তর দলের মধ্যে আপোষ মূলক প্রস্তাব অধিকাংশের ভোটে গৃহীত হয়। (প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন ১১৬, বিপক্ষে ছিলেন ১১১)।

প্রস্তাবটি নিম্নলিখিত মত ছিল :-

বেহেতু কাউন্সিল প্রবেশের স্বপক্ষে কংগ্রেসে একটি প্রবল মত আছে এবং বেহেতু কংগ্রেস সদস্যদের বর্তমান বিভেদের ফলে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি ইতিমধ্যেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে অতএব—কংগ্রেস সদস্যদের দলদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করে সংযুক্ত ভাবে দাঁড়ানো একান্ত আবশ্যিক এবং উচ্ছ্রস্ত গয়া কংগ্রেসের প্রস্তাবের সাক্ষ্যের ক্ষমতা ভোটারদের মধ্যে প্রচার কার্য চালানো বন্ধ করা হোক।

এই প্রস্তাব নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক ও বাগান্বাদ হয়। অল্প ভোটের ব্যবধানে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর একটি বিবৃতি নিয়ে সি বাজাপোপালাচারী ও রাজেন্দ্র প্রসাদ (সেক্রেটারী) বরদালাল বাজাজ (কোষাধ্যক্ষ), বরদা ভাই প্যাটেল, ব্রজকিশোর, মোরান্দাম আলী এবং দেশপাণ্ডে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য পদ ইত্যাদি দেন। দেশবন্ধু দাস ও উক্ত কমিটির সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। তাঁর ফলে ডাঃ আনসারী সভাপতি নির্বাচিত হন। পাণ্ডিত্য বড়হরলাল নেহেরু, টি. প্রকাশনু এবং ডঃ বাবুদ সাধারণ সম্পাদক—এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, সর্দার ডেব সিং, ঘোষালা আবুল কালাম আজাদ, অরুণে নাথায় সিং, ডঃ ভরদয়াজল নাইডু ও কাজি আবদুল বাজিদ ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন।

উত্তর দলের মধ্যে একই স্থাপন না হওয়ার ফলে উত্তর পক্ষের নেতৃগণ দেশময় পরিভ্রমণ করে নিজ নিজ পক্ষের মতের জন্য জোর প্রচার কার্য চালানিতে লাগলেন।

এমন সময় ভারতের ভাঙ্গাফাশে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষের কালো মেঘ আবার দেখা দিল। কোম্বাটে ভীষণ দাঙ্গার ফলে তৎকালীন মুম্বইয়ের হিন্দু অধিবাসীদের অধিকাংশই বাড়কের থানাঘাটে প্রাণত্যাগ করল এবং তাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হল।

১৩ই জুন নেলোরে টি প্রকাশনের সভাপতিত্বে অল্প প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে নো-চেয়ারম্যান একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাতে বলা হয় যে বোম্বাইয়ের অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব কালুর উপর বাধ্যতামূলক নয় ঘোষণা করা হোক এবং গয়া কংগ্রেস কাউন্সিল বরকটের যে কার্যক্রম সুপারিস করেছে তা কার্যকর করা হোক।

এই প্রস্তাব নিয়ে প্রচুর বাকবিতণ্ডা চলে। ৫ খণ্ডী আলোচনা ও তর্কাতর্কির পর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। তার পরিবর্তে এক প্রস্তাব দ্বারা সুন্দর জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলিকে কাউন্সিল বরকট প্রচার কার্য থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই সভার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ হয়। তাতে বলা যে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অহেতুক বিরোধ এড়ানোর জন্য কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিকে অহরোধ করা হোক।

বরিশাল জেলা কংগ্রেস কমিটিও ১৮ই জুন তারিখে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের জন্য একটি প্রস্তাব পাশ করে। তাতে বলা হয়েছে, বোম্বাইতে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব পাশ করেছে তা গয়া কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবের পরিপন্থী হওয়ার দ্বারা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে

বলা হোক বাড়ে তারা এই প্রণের বিমাংসার জন্য অল-ইতিয়া কংগ্রেস কমিটিকে অহুবাধ করেন।

ইতিমধ্যে কাকিনাড়া : কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের তেড়ত্বেড় আরত হল।

অত্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ১৫ই জুন তারিখে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি পদের জন্য মোলানা মহম্মদ আলীর নাম সুপারিশ করে।

তারপর কেবল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ২২শে জুন, সিদ্ধ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ২৭শে জুন, মুক্ত প্রদেশ ৩০শে জুন, এবং পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ৩রা জুলাই তারিখে একমাত্র মোলানা মহম্মদ আলীর নাম সুপারিশ করে।

দব নির্বাচিত ওয়ার্কিং কমিটিতে যে সকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি অল-ইতিয়া কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনের প্রভাব অগ্রাহ করেহে তাদের বিচার দ্বিধে একটি প্রভাব উত্থাপন করা হয় কিন্তু ঐ প্রভাব অগ্রাহ হয়। এর ফলে কয়েকজন সদস্য পরত্যাগ করেন।

এই বকম পরিবর্তিততে নাগপুর অল-ইতিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আহুত হল। দেশবদ্ধ দ্বাপ সভাপতি নির্বাচিত হন। এই অধিবেশনে বোম্বাইতে গৃহীত প্রভাবই পুনরায় পাশ হল। রাজাগোপালাচাৰী প্রবলভাবে এই প্রভাবের বিরোধিতা করেন কিন্তু ভোটেইর সময় তিনি ও তাঁর অহুগামীগণ ভোট দিতে বিরত থাকেন।

এই অধিবেশনে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা সাব্যস্ত হল।

পুনরায় নতুন করে ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হল। সভাপতি হলেন অত্রের জনপ্রিয় নেতা কোতা ভেঙ্কটাপ্পায়া, সেক্রেটারী হলেন, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, গোপাল কৃষ্ণ আয়ার এবং সদস্য নির্বাচিত হলেন তসদক শেরওয়ানী। কোরাধ্যক্ষ হলেন বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট জগদীশ্বর এবং গজাধর রাও দেশপাণ্ডে, বরত কাই প্যাটেল, রাজাগোপালাচাৰী, জর্জ বোসেক,

মহম্মদ সকা ও ডঃ ভবকারাকান্দু।

২২শে জুলাই কাকিনাড়া কংগ্রেসের অত্যাধনা সভায় দেশভক্ত কোতা ভেঙ্কটাপ্পায়া সভাপতি : টি প্রকাশন ও কে নাগেশ্বর রাও সহ ১৫ জন সহ সভাপতি এবং বুল্লু শান্তমূর্তি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তারতবর্বে তিনিই প্রথম জাতীয় পতাকা বক্ষা করতে গিয়ে এক বৎসর কারাবরণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি মাত্রাজ বিধান সভার স্পীকার হন।

৩রা আগষ্ট তারিখে কোতা ভেঙ্কটাপ্পায়া সভাপতিতে বিশাখাপত্তনমে (ভিজাপট্টম) অল-ইতিয়া কংগ্রেস কমিটির একটি অধিবেশন হয়। অধিবেশনে রাজাগোপালাচাৰী, তসদক শেরওয়ানী, গৌরীশঙ্কর মিশ্র, দেশপাণ্ডে, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, অত্রের গোপাল কৃষ্ণ, টি প্রকাশন, নাগেশ্বর রাও প্রভৃতি ৪৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

রাজাগোপালাচাৰী একটি প্রভাব দ্বারা নাগপুরে গৃহীত প্রভাবাহুসারে সেক্টেবর মাসে বড় শীত্র সম্ভব বোম্বাইতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন করার লক্ষ্য বললেন। যদি অধিবেশনের স্থান সম্বন্ধে কোন অহুবিধা হয় তা হলে অত্র কোন স্থানে অধিবেশনের ব্যবস্থা করতে সভাপতির উপর ভার অর্পিত হল।

\* অহুরূপ আর একটি ঘটনা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। দেশবদ্ধ মহাপ্রহানের পর মহাত্মা গান্ধী যখন বাংলার মকঃম্বে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের লক্ষ অর্ধসংগ্রহে বৌরয়ে-হিলেন তখন রাজসাহী জেলা ভ্রমণে আমি তাঁর এসকট হিলাম। ঐ সময় নভগাঁতে থিরেটার হলে একটি মচিলা সভা অহ্বান করা হয়। সভায় মহাত্মা গান্ধীর অতি-ভাবনের ব্যবস্থা ছিল। অদহবোগ আন্দোলনের প্রথম দিকে হাও দেশের মহিলাগণ প্রাক্ত সভায় বোগ দিতে আরত করেহিলেন তবে এখনকার মত অচটা দ্বাধীনতা লাভ করেননি। তা হাড়া নওগাঁর বড় ক্ষুত্র সহরে কেবলমাত্র মহিলাদের লক্ষই ওই সভা অহ্বান করা হয়েছিল।

মহাত্মাজি বাইরে বসজা দিয়ে রক্তমকে প্রবেশ করার পর তাঁর সঙ্গী যদি প্রতিষ্ঠানের বিখ্যাত কর্মী সত্যীশ চন্দ্র দাস ও গুপ্ত মশায়ও মহাত্মার পেছনে রক্তমকে প্রবেশ করতে উদ্ভত হইতই যেচ্ছাসেবকগণ তাঁকে সর্বিনয়ে জানালেন যে, এই সত্যী মহাত্মা ছাড়া আর কোন পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। একমাত্র ব্যতিক্রম হানীর ব্যক্তি হিসাবে আমি মহাত্মার সঙ্গে থাকব। সত্যীশ বাবু বললেন যে মহাত্মা হিন্দীতে বক্তৃতা করবেন, তিনি তা বাংলাতে অনুবাদ করে শোনাবেন। উত্তরে তাঁকে জানানো হলো যে, হানীর জনৈক মীরাট প্রবাসিনী

ভরুণী উপস্থিত আছেন, তিনিই হিন্দী অনুবাদ করে শোনাবেন। সত্যীশবাবু সে কথা শুনলেন না। তারপর সর্বপ্রকার অনুন্নয় বিনয় উপেক্ষা করে সিঁড়ির ধাপে পা দিতেই আমার সহপাঠী বহু নগরীর উকিল প্রাণেশচন্দ্র বাগচী সজোর সত্যীশবাবুর গলার চাবির হুই হাতে ধরে তাঁকে টেনে নামালেন।

\* 'কাকিনাড়া' শব্দের ইংরেজি রূপ কেওরা হয়েছিল "Cocanada"; তা থেকে বাংলায় আমরা করেছিলাম "কোকনদ"। বর্তমানে ইংরেজি বানান "Kankinada" করা হয়েছে। ক্রমশঃ

## অন্তবিহীন পথ

(উপভাস)

যমুনা নাগ

সপ্তম অধ্যায়

'দীপগত'র ঐ অনেকদিনই রান হয়েছিল। দীর্ঘদিন জরতী কোন দিকে দৃষ্টি ঘেরান—রাতদিন হুকুটকে শুধু আগলে রেখেছিল। বিবামবিপ্রামহীন দিনগুলি, নির্ধাক্ পাঁড়িতের তদ্বাবধান, জরতী ক্লান্ত হয়েছিল কিন্তু সৌদিকে তার কোন নজরই ছিল না। এতদিন সে একা থাকবার সুযোগ পায়নি বলে হঃখ করেছে, সে নিজেকেই শুধু খুঁজে পেতে চাইছিল, অদৃষ্ট তাই বিক্রপের হাসি হাসল, অবশেষে একা হল সে। গর্গ করে বাবাকে বলোঁছিল তার বয়স সকল হয়েছে।

কিন্তু হায় এ যেন ভীষণ হঃখ, কোন এক উন্নাদ রক্তের আলোড়ন, দেহমনকে হিম্রাভিত করে দিয়ে গেল। সূহ্মায় মধ্যে শান্তির লেশমাত্র সে খুঁজে পেল না। শিল্পীগোষ্ঠী ও বহুবর্গ যারা জরতী ও হুকুটের জীবন ধরে রেখেছিল, জরতীকে অতি ভাগ্যবতী ছাড়া এতদিন আর কিছুই ভাবেনি তারা। তার অন্তরের অতৃপ্তির ও বিবাদের কালিমা সর্বত্র অলক্ষ্য রয়ে গেছে। এই জনকোলাহলের কাছ থেকে সে যে দূরে সরে যেতে চাইছিল—সুগভীর নীরবতার অভলম্পর্শ বুঁজোঁছিল, একমাত্র দেবাশিস অনুমান করেছিল তা।

হাঁস, রঙ, ভুলি বই, খাতা, কাগজ, কাড' স্টেচ, শির  
জগতের শত সহস্র অবলম্বন চতুর্দিকে ছাড়িয়ে পড়েছিল  
—জয়ন্তী যেন সেদিকে আর তাকাতে চাইল না।  
অপ্রয়োজনীয় সব কিছু ছিঁড়ে ফেলে দিল—জানালা  
গুলি ভাল করে খুলে দিয়ে বাইরের শুষ্ক বাতাস ঢুকতে  
দিল। জনশ্রোত, সঙ্গী বন্ধু আমোদ আনন্দ, মান,  
যশ, কী না চায় মানুষ? এ সকল বস্তুবই কান্দাল সে,  
কিন্তু চতুর্দিক থেকে যখন প্রবল বেগে বাহ্যিক  
কামনাগুলি মানুষকে চেপে ধরে, তার শাস্তি কেড়ে নেয়,  
সে তখন বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, সংসার থেকে  
নির্গম্য হতে চায়। তার বাসনা সুপ অকস্মাৎ লুপ্ত হয়ে  
যায়—অজানা পথে পথভ্রান্ত পথিকের মত সে ঘুরে  
বেড়ায়। এতদিনের জীবননাট্য থেকে জয়ন্তী মুক্ত  
হবার উপায় খুঁজেছিল—অতি গোপন অনন্ত অহম  
কোথায় দূরে ফেলে রেখেছিল সে তাই ভাবছিল। সত্য  
যতই ভয়ঙ্কর হোক তবু তাকে সে খুঁজেবেই। নিজেকে  
সে খুঁজে বার করবেই যতদিন লাগুক।

পশ্চিমের রক্তিম আকাশ একটি বিশাল চিত্রপটের  
মতন দেখাচ্ছিল, জয়ন্তীর দৃষ্টি পড়ল সেইদিকেই,  
জানালায় অতি নিকটে গিয়ে সে দাঁড়ালে। শৈশবে  
সে মার হাত ধরে সূর্যাস্তের রক্তিম খেলা দেখতো,  
অস্তাচলের রমণীয় দৃশ্য দেখে মনে হল যেন একটি শিশু  
তার বাজের সব রঙগুলি দিয়ে অজস্র রেখা টেনেছে—  
তারপর সব রকম রঙ একত্র করে মিলিয়ে দিয়েছে।  
গগনজনে নিত্য যে রঙের বৈচিত্র্য দেখা যায়  
মহাশিল্পীরই সৃষ্টির খেলা অতি অপূর্ণ অতুলনীয় রূপের  
লীলা। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণের বাতাস বইতে  
লাগল, চতুর্দিক স্নিগ্ধ ও শান্ত হল। জয়ন্তী গেট খুলে  
বেরিয়ে গেল—সুদীর্ঘ পথ সম্মুখে। বেশ কয়েক মাইল  
একা হেঁটে আসবে এই ইচ্ছা। অনেক দূর পর্যন্ত  
এইভাবে ক্রান্ত গতিতে সে হাঁটলো, পথের শেষে একটি  
গুদোয়ারের কাছে এসে থেমে গেল। কি যেন একটা  
গভীর স্মরণ কানে ভেসে আসছিল, 'কাজল ঘন মাঝে,  
নিশি অঁধার মাঝে'। ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরে এল।

একটি বাগান্দার কোণে ইঁজি চেয়ারখানা টেনে নিয়ে  
নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। বই খুলে পড়তে লাগল কিন্তু  
এতখানি পথ হাঁটার ক্লান্তিতে সে মুহূর্তের মধ্যে ঘুমিয়ে  
পড়ল। অবিনাশ আসবে বলে গেছে কিন্তু সে তখনও  
আসে নি—। আবার হাতে বই নিয়ে জয়ন্তী পড়তে  
চেষ্টা করল—কিন্তু চোখের পাতা আর খুলে রাখতে  
পারল না।

নিশাঙ্কে গেট খুলে অবিনাশ কখন বাগানে ঢুকে  
এসেছে, বাগান্দার এসে দাঁড়িয়েছে জয়ন্তী কিছুই টের  
পায় নি। অবিনাশ গেট থেকে দেখেছে জয়ন্তী ঘুমিয়ে  
তাই সে নিশাঙ্কে পাশে এসে বসল। চারিদিক ঘিরে  
অন্ধকার, জনমানব নেই। কি নির্ভর নিবাসভ্য ভাবে  
জয়ন্তী ঘুমিয়েছিল—অবিনাশ এসে তার কপালে হাত  
দিল।

'দেবী হয়ে গেল আসতে, ভূমি এতক্ষণ একা ছিলে  
—কিছু মনে কোরো না।' অবিনাশ বলল। জয়ন্তী  
সোজা হয়ে বসল—

'বেড় ভাল লাগল একা থাকতে—অনেক পথ হেঁটে  
এসেছি—ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—কিন্তু নিরাকুল  
সফ্যায় এই নির্জন কোণটি সত্যিই ভাল লাগল।'   
অবিনাশ পাশের একটি চেয়ারে বসে পড়ল—

'কবে কলকাতায় যাবে বল? সহর থেকে আসতে  
আমার দেবী হয় খুব, রোজই এ রকম হবে—ভূমি  
কলকাতায় তাড়াতাড়ি গেলেই ভাল, এখানে ভূমি  
সারাদিন একা থাকবে কেন? কিছুদিন ঘুরে এসো।'

'আমি আগামী সপ্তাহে যাব, ততদিনে কাগজপত্র-  
গুলি দেখা হয়ে যাবে। তোমার ফিরতে রাত হয় সেও  
ভাবি।'

'খুব পারিশ্রম পেছে কিছুদিন তোমার জয়ন্তী, একটা  
লম্বা ছুটিতে কোথাও বোড়িয়ে এসো।'

পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করে।'   
জয়ন্তী বলল।

'আমি তো তোমার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে পুরণো  
আবার সবচেয়ে।' অবিনাশ হাসল।

‘তোমার বিবাহিত জীবন যেন কোন বিশাল কাহিনীর একটি খণ্ড। কত রকমের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধুত্ব জটিল বন্ধ। কি হাজার হাজার জীবন—সে ভুলনায় আমার অলস হৃদয় স্বীকার করছি।’ জরতী বাধা দিয়ে বলল—

‘দোর দিতে পার আমার কিছ সত্যি কথা বলতে আমি চিরদিনই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, স্বাধীনতার জন্য আমি উদ্গীৰ্ণ হিলাম—মুকুট শিল্প জগতে আমার খুবই এগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এতটা কোলাহলের জীবনের মধ্যে যে এসে ঠেকতে হবে তা ভাবিনি—ঐ বাসনা চক্রের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে প্রবেশ করতে আকর্ষণ আর নেই অবিনাশ। শিল্পী নির্জনতা চায় নইলে তার সাধনাও নষ্ট হয়—অস্বস্তি ব্যবসার মত হয়ে ওঠে।’

অবিনাশ সমর্থন করার জন্য উৎসাহিত হয়ে উঠল—

‘এ কথা আমি খুবই বিশ্বাস করি, তোমার মনের অবস্থা আমি বেশ বুঝতে পারছি। একটা স্বাভাবিক জীবনের মধ্যেই বিবেক ঠিক থাকে। কিন্তু জরতী, তুমি বিলাসের মধ্যে থেকে অভ্যস্ত, মুকুটকে বিয়ে করেছিলে বলে সে সবও পেয়েছিলে ভুলে যেও না। সে গরীব শিল্পী ছিল না কোনদিন।’

‘হ্যাঁ—শিল্পের জন্যই এতটা সহ্য করেছি, মুকুট ছাড়া কেউ এ বিষয় এতটা সাহায্য করতে পারতো না। মা বাবার মনে আমি আশ্বাস দিয়েছি, তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে বিয়ে করিনি। শিল্প জগতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব বলে বড়ই সাধ ছিল, মুকুটকে তাই বিয়ে করেছিলাম। বিয়ের পর কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে মানুষ জীবনে আরও অনেক কিছু চায়। অবিনাশ, আজ আর সেকথা স্বীকার করতে বিধা করি না।’

‘যা ভাল লাগে যন খুলে আমার বলতে পার—আমি বোঝেছি তোমাকে যতটা চিনি তুমি নিজেকেও এতটা ভাল করে বোঝে কি না সন্দেহ।’

অবিনাশ অভিভাবকের মত জরতীর কাছে নিজের মতব্য প্রকাশ করল—জরতী আজ বিনা ভরসে সব মেনে

নিল। এতদিন কেবল উপদেশ দিয়ে এসেছে অবিনাশকে, আজ কিছু বলবার পেল না।

‘কিন্তু অবিনাশ একটুও আভাস দাওনি তো যে অনিত্যের মত মেয়েকে তুমি এতটা প্রেম দিয়েছ?’

‘প্রেম মানে? ক্রমাগত হৃৎকের কাহিনী শুনিয়েছে—না শুনে পারি? তোমার ভাঙে আপত্তি কি? আমি কি তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি? তুমিও তো আভাস দাওনি যে শুধু শিল্প জগতে লুপ্তাতি লাভ করার আশায় মুকুটকে বিয়ে করবে? মুকুটের কাছে প্রেমের ভাঙের বিশেষ মূল্য ছিল বলে তো আমার মনে হয় না।’

‘তা হয়তো সত্যি। স্বীকার করছি না, কিন্তু এক মানুষের কাছে সব তো আশা করা যায় না।’ অবিনাশ ধীরে ধীরে বলল—

‘তাহলে আজ সত্যি কথা স্পষ্ট করেই বলতে দাও। তুমি আর আমি মুকুটের কাছে কাজ শিখতাম, তোমার আর আমার মধ্যে যদিও বন্ধুত্ব ছিল তবু তোমাকে কোনদিন ঠিক বুঝতে পারিনি, তবে এ কথা জানতাম তুমি মুকুটের প্রেমে পড়নি কোনদিন।’

‘তুমি তো ছেলেমানুষ ছিলে তখন অবিনাশ—তোমার ওপর ভরসা ছিল না কিছু—হিরতা ছিল না কোন বিষয়ে তোমার।’

‘আমার মত লোকের ওপর তোমার আস্থা ছিল না হতে পারে কিন্তু মুকুটকে কতটুকু তুমি জানতে? জিদ ছিল তার কতগুলো বিষয়, তার প্রকৃতির বিশেষত্বই ছিল তাই তাকে আমিও ভালবাসতাম। অসাধারণ কমতায় ছিল কাজের, শিল্পদক্ষতা ছিল প্রচুর কিন্তু আমি ভাবতেই পারিনি সে কোনদিন বিয়ে করবে।’

‘অবিনাশ, বিয়ের সন্ধানে তোমার কোন মতামতই ছিল না—তুমি আজও সেই একদল সখাসখী নিয়ে দিন যাপন করে, বিশেষ করে সখী-পরিবৃত্ত হয়ে—’

‘আমি কি তাদের প্রেমে মত্ত মনে কর? তবে চিরকুমার হয়ে যাব এও ভাবি না। শিল্প চক্রের সভাপতি না হতে পারলেও চিরকুমার সভার সভাপতি হবার সখ আমার নেই।’



হই বন্ধুর আলোচনার মধ্যে মান অভিমানের মাত্রা বাড়তে বাড়তে শেষে অভিযোগ ও মনোমালিন্তে পরিণত হবার আশঙ্কা দেখা দিল। ‘অন্য একদিন এ বিষয়ে কথাবার্তা হবে’ এই বলে হৃদয়ে চূপ করে গেল। হৃদনের মধ্যেই জয়তী কলকাতায় যাবে বলে ঠিক করে ফেলল। রওনা দেবার পূর্বদিন সন্ধ্যাবেলা পড়বার ঘরে বসে অবিনাশ ও জয়তী কতগুলি দলিলপত্র দেখা দিল। টেবিলের ওপর একটি ছোট আলো জ্বলছে। আলো ও অশ্রুধারের আলিঙ্গনটা ছায়া জয়তীর মুখের ওপর পড়েছে। হাতের ওপর মাথা রেখে সে বিশ্রাম করছিল। মুখখানা নিভান্তই বিষম। অবিনাশ সিগারেট ধরালো, ধোঁয়াটা ওপরের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলল—

‘তোমায় তো আজ থেকে জানি না, এক রকমই রয়ে গেলে তুমি জয়তী, আর আমার চিন্তাও কমলো না।’ সিগারেটটা মুহূর্তের মধ্যে নিবিয়ে ফেলে দিল। অবিনাশ খানিকটা অস্থির বোধ করছিল, মনটা কেমন যেন করছিল তার।

জয়তীর মুখে আজ কোন আশা, আকাঙ্ক্ষা বা উৎসাহের দীপ্তি নেই।

‘অন্ত নৈরাস্ত আমার ভাল লাগে না—মন শক্ত কর, আবার কাজে মন দাও’—অবিনাশ বলল।

‘তুমি আমায় সাহায্য করবে তো?’ জয়তী প্রশ্ন করল।

‘আমি আহমেদাবাদ ফিরে যাব, শীঘ্র যেতে হবে—তুমি কলকাতা থেকে ফেরার আগেই হয়তো যাব।’

জয়তীর মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেল—‘এতদিন তো বলছিলে আমার জন্য তোমার ভাবনা হয়, কাছাকাছি থাকবার তো তোমার কোন উৎসাহ আছে বলে মনে হয় না।’ যেন আহত হরিণীর মত সে একবার অবিনাশের দিকে চাইল। চুলগুলি আলুখালু গুঁতীর মুখ। অবিনাশ তাকে উপহাস করছিল কি না সন্দেহ হল। বিস্মিত হয়ে তাকাল একবার, তারপর মাথাটা নিচু করেই রইল। অবিনাশ বলল—

‘আহমেদাবাদে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে। আমার মার ইচ্ছায় মত দেবো হয়তো। মেয়েটিকে চিনিও না ভাল করে, যেটুকু পরিচয় ছিল তাতে বেশ ঘরোয়া বলে মনে হয়। আমাদের ঘরে মানাবে। আমার পিতৃবিয়োগের পর আহমেদাবাদের বাড়ীর সম্পূর্ণ ভার আমাকেই নিতে হয়েছে—তাই শীঘ্র ফিরে যেতে হবে।’

জয়তী যেন আকাশ পাতাল কিছুই বুঝতে পারল না। অবিনাশ তার বিবাহের বিষয় বলে আলোচনা করছে জয়তী বিশ্বাসই করতে পারল না। এতদিন জয়তীকে সে কতভাবে জানিয়েছে সে নিভান্তই তার প্রতি আকৃষ্ট, অসুগত, কিন্তু অবিনাশ কি হলনা করেছিল এতদিন? অপরের সমস্তা সম্বন্ধে জয়তী চিরদিনই উদাসীন, আজও তাই অবিনাশের বিবাহ সম্বন্ধে সে বিরুদ্ধ হয়ে উঠল—অবিনাশকে সে অস্ত্র কোর্সকে দৃষ্টি দিতে দেখে না—তুণ্য বন্ধুত্বের রজ্জু দিয়ে বেঁধে রেখে দেবে এই কি সে চায়?

অবিনাশ জয়তীর প্রতি অসুগত, কিন্তু সে তার নিজের মতামত জলাঞ্জলি দিয়ে জয়তীকে সন্তুষ্ট করতে রাজী নয়। সে চোখে আঁচল দিয়ে জয়তীকে দেখাতে চায় সংশয় সন্দেহ, বিরোধ, বিষম, এ সব মাহুষের স্বাভাবিক হৃদয়তা, মাহুষকে সে তাই বলে স্বপ্না করতে পারে না। জয়তী হার মানল। এতদিন অবিনাশকে ভাল করে জানতে চায়নি সে—এখন তাই মহা সমস্যার মধ্যে পড়ল। আজ কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করতে অবিনাশ এগিয়ে চলেছে? সে স্বপ্নেও ভাবতে পারল না। পূর্বে অনিবার্য প্রতি তার সহায়ত্বভূতি দেখে জয়তী অতি মনঃপূর্ণ হয়েছিল, এখন অবিনাশ বিয়ে করতে যাবে? একটা বিকট রকমের স্বার্থপরতা তার মনকে উদ্ভাস্ত করে দিল, অবিনাশের সঙ্গে খোলাখুলিতাবে কথা বলার পর সে যেন আর দিল্লীতে একদণ্ডও থাকতে পারাছিল না। ঘরে বাইরে কোন স্থানেই তার আকর্ষণ রইল না—দিগন্তের ঘরে ঘরে চাঁচি পড়ল, একটি বিবাসী লোকের হাতে বাড়ী রেখে জয়তী কলকাতা রওনা হ’ল।

### অষ্টম অধ্যায়

গেন কলকাতা পৌহতে দেৱী হল না। দেবাশিস ব্যাকুল হয়েই অপেক্ষা করছিল। জয়তী খানিকক্ষণ হিৰ মূৰ্ত্তিৰ মত দাঁড়িয়েছিল, তারপর ধীরে ধীরে বাবার ঘরে গিয়ে বসল। শীলা দুজনকে একত্রে বসবার সুযোগ করে দিয়ে নিজে অন্য ঘরে চলে গেল। জয়তীর চোখে জল নেই, তার দৃষ্টির মধ্যে আবেগ নেই—মুখে কেমন যেন একটা বিষাদপূর্ণ গাখীৰ চাপা আঙনের মত ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। আহাৰ সেৱে এসে জয়তী দেবাশিসের পাঠাগারে গিয়ে বসল। একটিও কথা যেন সে বলতে পারল না। সাধা-কালো পোষা বেড়ালটির মাথায় হাত বুলাতে লাগল। মাথা নিচু করেই বসেছিল জয়তী—দেবাশিস তার সামনে একটি চেয়াৰে এসে বসল। জয়তীর মনের কোণে কেমন যেন বিদ্বেষ—উন্মত্ত অপরিভাষিত ম্লানছায়া—বহাদিনের অব্যক্ত অধিমান, লৈলান্ধ ও ক্লান্তি। কস্তাৰ গভীৰ অন্তৰে যে অশান্তিৰ বহিঃকলন্ত রয়েছে তা পিতাৰ অনুমান করতে দেৱী হল না। দেবাশিস বলল—কিছুই করা গেল না তাহ'লে?

‘মুঠুট অতিৰিক্ত পৰিশ্ৰম কৰিছিল, তাৰ উচ্চাভিলাষৰ তাড়নায়—সে যেন মনৰ হিৰতা হাৰিয়ে কেলিছিল, বিপদেৰ আশঙ্কা আমাৰ মনে বহাদিন থেকে উঠি দিয়েছে।’ জয়তী আপনা হতেই কথাগুলি বলল।

‘চিকিৎসকৰে জীৱনে হিৰতা প্ৰায়ই থাকে না—তাৰ যত্ন ব্যত্বে পৰিণত কৰবাৰ জন্তই এত খেটেছিল সে অন্তৰ্ভুক্ত একটা শিক্ষা কেন্দ্ৰ দাঁড় কৰাতে গৈলে দৃঢ়তাৰ প্ৰয়োজন। সাংসাৰিক বা পাৰিবাৰিক শান্তি বা সুখৰ দিকে সে উদ্ভাসীন ছিল তা আৰ আশ্চৰ্য কি? সে সংসাৰী ছিল না বলেই মনে হয়।’ দেবাশিস হিৰ হয়েই উত্তৰ দিল। আতি ধীৰ প্ৰশান্ত মূৰ্ত্তি কিন্তু দৃঢ়তাৰ অভাব ছিল না তাৰ বক্তাবে। মাহুৰেৰ চাৰিত্ৰেৰ দুৰ্বলতা তাৰ কাহে সহজেই ধরা পড়ত।

জয়তী যে বিবাহিত জীৱনে নিভাতই অস্থি হয়েছিল সে কথা দেবাশিস ভালমতেই বুঝেছিল—কিন্তু জয়তীৰ নিজের মুখ থেকেই সব কথা শুনে চাব সে। কস্তা যে তার কঠিন সংগ্ৰামের কথা এতদিন গোপন রেখেছিল, পিতা সেবিষয় অবগত ছিলেন। তাই চেয়েছিলেন কস্তাকে প্ৰেছ দিয়ে ঘিৰে রেখে তাকে শাস্ত করতে। কস্তাৰ যে সকল বিশেষ গুণ তাৰ চাৰিত্ৰেৰ ঐশ্বৰ্য—দেবাশিস সেগুলি একা কৰাৰ জন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। জয়তীকে আতি নিকটেই কিছুদিন রেখে দেবে তাই ইচ্ছা ছিল। কলমে কালি ভৰতে ভৰতে সে বলল—

‘তুমাকে ভুলে যাওনি তো? সে আমে থাকে এখন, তাকে চিঠি দিও। এই ধৰণানায় ভূমি বসে বসে ছাঁৰ আকতে, এইখানেই স্টুডিও কৰ। আবার ভাল কৰে ছাঁৰ আকো, আমাৰ মনে ৩য় বহাদিন তাদিকে মন দিতে পাবনি ভূমি।’

দেবাশিসের বুকের মধ্যে—আজ গভীৰ বেদনা গুমৰে গুমৰে উঠছে, জয়তীকে কিভাবে সে আবার সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলবে তাই ভাবছে।

‘বাবা, আমি তো খুবই মন দিয়েছিলাম কাজে—তোমায় তো লিখেছিলাম সব বিবৃতিভাবে প্ৰদৰ্শনীয় বিষয়ও। মুঠুট ক্ৰমশঃ বাড়ীটাকে প্ৰায় পাৰ্ট গ্যালেৰী কৰে তুলল—বাইৰেৰ জগতে সুখ্যাতি লাভেৰ জন্ত, ছাঁৰ বিক্ৰীৰ জন্ত অনেক প্ৰয়োজনীয় অৰ্থাৰ্থনীয় জিনিস জীৱনে ডেকে আনল। নিৰাৱিৰাল বসে ছাঁৰ আকাৰ সুযোগ আমাৰ ক্ৰমশঃ কমতে লাগল, বাধা বাড়তে লাগল। মুঠুট এৰই মধ্যে তাৰ বড় বড় অৰ্জাৰগুলি তৈৰি কৰতো, কিন্তু আমি আৰ মন বসাতে পাৰতাম না। অতবড় সংসাৰেৰ হান্ধামা—সামাজিক-তাৰ কঠিন শাসন, আমাৰ আৰ ভাল লাগত না—ভিড়ের মধ্যে থাকতে থাকতে মনটা কেমন যেন বিকল হয়ে উঠেছিল। অবিলাশ অনেকদিনেৰ বহু, তাৰ কাহে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম। মুঠুট একাই সব কৰবাৰ জন্ত ব্যস্ত, সে কোন কথায় মধ্যেই আমাৰ ডাকতো না—

অনেক অল্পবয়সেই তার দায়িত্ব ভাগ করে দেবার অধিকার দিতে। কিন্তু মুকুট কিছুতেই আমার সে সুযোগ দিল না। বড় ছুর মনে দিন কাটিয়েছি বাবা। ছকনের মধ্যে এত বড় একটা সেছু বাধা উঠছিল কিছুতেই সে মুকুলো না। মতামত বা মন্তব্য শোনবার তার মুহূর্ত রাজও সময় ছিল না সে রকম ধৈর্যও ছিল না। আমি নিঃসন্তান ছিলাম বলে নিঃসন্ত ছিলাম কিন্তু মুকুট ছিল উদাসীন। তার মত শক্তিশালী পুরুষের এভাবে আমার স্বাভাবিক পরিবর্তন হয়েছিল। কাজে প্রেরণা দিয়েছিল সে স্বীকার করি, শিল্পকলার বিষয় আমার নতুন করে শিক্ষা মুকুটের হাতেই হয়েছিল। কিন্তু বিবাহিত জীবন বা সাংসারিক সমস্যা তার কাছে নিতান্তই দুচ্ছন্ন বস্তু ছিল—স্বামীর দায়িত্ব সে নিজে পারে নি—আমার তার কর্মক্ষেত্রে একটুও হান দিতে চায় নি। সম্পূর্ণ নিজের এলাকায় সে যেন তার কাজ নিয়ে নিমগ্ন থাকতো, আমার সেখানে অধিকার বা দাবী কিছুই ছিল না। বিশেষভাবে যখন পরাজয় মেনে নিলাম তখন ইচ্ছামতই সে চলতে পেরেছে। তারপর আবার নেশা ধরল। কোন রকম মতামতই সে শুনে রাজী হয়নি—আঘাতের পর আঘাত সহ করতে করতে যেন নিজের কাছে হেরে গেছে মনে হ’ত। জীবন তখন নিতান্তই শুষ্ক ও অর্থহীন হয়ে উঠল। বাবা, তোমার আজ সত্য কথা বলি—আর ঢেকে কি হবে?—তিলে তিলে নিজের সত্তাকে চূর্ণ করেছি—বাইরের শাস্তি রক্ষা করেছি এটুকুই গর্ব ছিল।’

দেবশিশু সহানুভূতির সাহিত্য জয়ন্তীর কথাগুলি শুনিছিল, তার স্টেবানিতাকে প্রভাও করছিল মনে মনে—

‘কিন্তু জয়মা, তুমি যদি শিল্প জগতের উন্নতির পথে না পৌঁছতে পারতে তাহলে কি সুখী হতে? মুকুটকে বিয়ে করা তোমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, সেই তো বিশেষ সাহায্য করেছে তোমার, তুমি তো সময় নষ্ট করনি, কত জিনিস শেখবার সময় পেয়েছ, তবে শিল্প জগতের দায়িত্ব থেকে তোমার ওভাবে সরিয়ে দেওয়া আমিও সমর্থন করি না।’

‘হ্যাঁ বাবা, সময় অনেক নষ্ট হয়েছ—গত কয়েক বছর শুধু কলের পুতুলের মতই উঠেছি বসেছি, মানুষের মত হাসতে কাঁদতে পারিনি। শুধু সমাধির কাছে স্তন্য রক্ষা করবার জন্য নিজের শিক্ষা শক্তি মতামত সব জলাঞ্জলি দিয়েছি তাও স্বীকার করছি—’

‘তাই-কি সব সত্য? অত বড় বাড়ীখানা স্থল্য করে রেখেছিলে, সাজিয়েছিলে, কত রকম মানুষকে জেনেছ, দেখেছ, কত গুণী শিল্পীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে এভাবে। যে সব ঘনাত্য ব্যক্তি চিত্রকরকে সাহায্য করতে পারে, ব্যবসায়ী সন্মুখিশালী পদস্থ ব্যক্তি সকলেই তো বছর মত মিশেছে, তাদের উৎসাহ ছাড়া চিত্রজগতে উন্নতি কমই হয়। মুখোস পরতে হয় অনেকবার, হাসি না পেলেও হাসতে হয়, আনন্দ না পেলেও কুণ্ঠিত দেখাতে হয়। কিন্তু আজকালকার শিল্প জগতের অনেকখানিই তো এই বাইরের আদান প্রদানের ওপর নির্ভর। স্বাধীনতা কতখানি থাকে মানুষের? শুধু ছাঁচ নিয়ে পড়ে থাকতে পারে কজন? দর্শকের মন্তব্য, লোকের প্রশংসা, ভাল খরিদার এসবই তো ক্রমশঃ সংগ্রহ করতে হয়, নইলে কাজ এগোয় না। প্রাচীন কালে শিল্পী শুধু সাধনার জন্য সংগ্রাম করেছে, দায়িত্বকে ভয় করেনি যশের জন্য মোহ ছিল না তার, এখন তো সে সব আদর্শ অনেকখানি লুপ্ত হয়েছে দেখি।

‘আনন্দ কিছুই পাইনি মনে হয় এক-একবার। ঐ লোকের মেলা যেন আমার কেমন পাগল করে দিয়েছিল—মুকুট ঐভিডেরই একটি অঙ্গ মাত্র—তাকে আলাদা করে চিনতে পারিনি কোনদিন।’

‘আপনজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা রক্ষার জন্য যে সময় ও সুযোগের প্রয়োজন শিল্পীর জীবনে তা দুর্লভ। কোন চিত্রকর বা শিল্পী পৃষ্ঠপোষকের সাহায্য ছাড়া অগ্রসর হতে পারে না। রাজনৈতিক ও গায়ক সঙ্গীতজ্ঞর উৎসাহ ছাড়া খ্যাতি অর্জন করতে পারে না। রাজনৈতিক দলকে সঙ্গে নিয়েই নেতারা দেশসেবার কাজে অগ্রসর হয়, পরস্পরের সাহায্য ছাড়া কোন বড় কাজ চালানো সম্ভব হয় না—পরস্পরের মধ্যে গভীর হৃদয়-সম্পর্ক

নাও থাকতে পারে তবু সস্তায় রাখা বাঞ্ছনীয়। পরন্তু-  
কাতরতা দাঁড়কতা পরস্পরকে অশান্তির প্রাবনে ভাসিয়ে  
নিয়ে যায়—কিন্তু তবু কেউ কাউকে ছাড়তে পারে না।  
তুমি যদি নিরিবিলিভাবে গৃহস্থ জীবন যাপন করতে  
চাও তাহলে এই বিশাল শিল্প গোলক দাঁটার মধ্যে  
প্রবেশ করতে না। বিদেশে সুদীর্ঘ দিন কাটিয়ে যে  
শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করো তাতে সবই থাকা হোক  
যদি সাধীন চিত্তের না হতে পারবে। এটি বিরাট কর্ম  
জগতে স্থান খুঁজে নিতে পারবে না। লেখক, শিল্পী  
বা চিত্রকর সকলকেই এই এক পড়া অবলম্বন করতে হয়,  
নানান ভাষাভাষার মধ্যে দিয়ে, বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে  
দিয়ে সৎকণি পথ হাতিয়াতে হাতিয়াতে চলা—অংশেমে  
আত্মপ্রকাশের পূর্ণ পরিণতি। উল্লেখ্য একই জল  
ছক্কনের কিন্তু আদর্শ এক রাখতে পারেন চক্করে পারি।  
কিন্তু তাই বলে সব ধ্বংস হয়ে গেছে বলে এবারও  
ভাববে না। তুমিও বিশ্বাস রাখো নিজের শক্তি ও পথ।  
মুহুর্ত অকালে প্রাণ হারিয়েছে, তাকে কেউ বদলাতে  
পারতো না। তুমি আজ নিজের ওপর নিভর করতে  
পারবে আমি জানি। তোমার নিজস্ব শক্তি একটুও  
হারাত্ত নি এই মনে রাখবে। কিছুদিন বিদেশে কোথাও  
বেড়িয়ে এলে আবার দেখমনে শক্তি দিয়ে পাবে—  
কাজে উৎসাহ পাবে—ভেবে দেখ কিভাবে আবার  
কাজে মন দিতে পার।’

দেবাশিস করুণা বা সন্তানভূতির আবেগ প্রকাশ  
করল না—জয়তীকে পুরাতন বিভীষিকা থেকে মুক্ত  
করে নেবার জন্য সহজ পথ দাঁখিয়ে দিল। সে জয়তীর  
মনে কর্তব্যবুদ্ধি জাগিয়ে তুলল—তার নতুন করে  
ইচ্ছাশক্তি জেগে উঠুক তাই দেবাশিসের একমাত্র  
কামনা।

‘বাবা, আমি দিগন্তে এখনই ফিরে যেতে পারব না  
—আমার এখনও ঐ ভিড়ের হৃৎস্পন্দ কাটেনি। কিছুদিন

ঘুরে আসি, বন্ধুদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে আসতে  
চাই। মনুয়া ও যোসেফ বখেতে আছে, তাদের  
দেখতে ইচ্ছা করে। তাদের বিয়ের পর বখেতে কাজ  
করছে দুজনে।’

‘বন্ধুরা তো শীলার কাছে থাবর নিয়ে যায়—তাদের  
আসতে বল, ভালই লাগবে দেখা হলো।’

‘আমি কিছুদিনের জন্য আবার বিদেশে যাব ভাবছি,  
দোখ নৌদি কি পরামশ দেয়।’

‘অলোক সন্তোষে আছে জান বোধ্য—তোমার  
মার মুহুর পর চিঠি দিয়েছিল। শীলাকে লিখেছে  
বাদলকে তার কাছে রেখে পড়াতে পারে—তিনি বছর  
ত্রিদিবেই আছে সে। অলোক এখনও একা—সে বিয়ে  
করেনি তাই বাদলকে তার কাছে রাখতে চায়—একটা  
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সে ভর্তি হয়েছে—শীলাকে  
বলাচলাম নিজে গিয়ে বাদলকে ভর্তি করে আসতে।  
চুটিতে বাদল অলোকের কাছে যাবে আসবে। শীলা  
আমায় একা রেখে যেতে চায় না।’

‘বাবা, আমি তোমার কাছে থাকবো’—জয়তী  
ব্যস্ত হয়ে উঠল।

‘জয়মা না, তোমায় আটকে রাখব না, বাদল, তেমন  
এরাও ঠোঁট আছে আমার সঙ্গেই। নুনো ছেলে তেমন  
আমার কাজ নিয়েই থাকে—খাবার টেবিলে কেবল  
দেখা হয়। একটা কলের মতই সে কাজ করে।’

হেমনেনের নাম করতে দেবাশিসের মুখে মুহূ  
হাসি দেখা গেল, মেহে পরিপূর্ণ জন্ম তার। জয়তীর  
ও শীলার বিষয় তার বিশেষ চিন্তা—তাদের জন্য কিছু  
করতে পারলেই সে যেন সন্তুষ্ট।

‘এবার বাড়ীর মেয়েরা বেড়িয়ে আসবে—ঠিক করে  
ফেলো’ দেবাশিস বলল—

জয়তী কিছুদিনের জন্য দেশ ভ্রমণে যাবে ইচ্ছা  
প্রকাশ করল।

ক্রমশঃ

# প্রকল্প-রূপায়ণে বিভক্ত বাংলার বর্তমান চিত্র

চিন্তারঞ্জন দাস

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী মণ্ডলী ও সামরিক বাহিনী প্রধানদের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য

রাষ্ট্রপতি—আবু সয়ীদ চৌধুরী

ময়মনসিংহ জেলার সুপরিচিত এক জমিদার বংশে ১৯২১ সালের ৩১শে জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভার স্পীকার শ্রীআবদুল হামিদ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র। শিক্ষালাভ করেন কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম্ এ, বি এল পাশ করে আইনে উচ্চ শিক্ষা লাভের নিমিত্ত ইংলণ্ডে যান এবং লিনকনস্ ইন্ (Lincoln's Inn) থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে, ১৯৪৭ সালে ইংলিশ বারে যোগদান করেন।

তিনি প্রায় ১৪ বৎসর ঢাকা হাইকোর্টে কেওয়ারী, ফৌজদারী এবং বিশেষ করে সাংবিধানিক ও বাণিজ্যিক সংক্রান্ত আইন ব্যবসাতে লিপ্ত থাকেন। তিনি সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র এ্যাডভোকেটও ছিলেন। ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে তিনি ভূতপূর্ব পূর্বপাকিস্তানের এ্যাডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন এবং প্রাদেশিক গভর্ণরের প্রধান আইন উপদেষ্টা হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

ভূতপূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত সংবিধান কমিশনের সদস্যরূপে দেশের সংবিধান প্রণয়ণে তিনি সাহায্য করেন। প্রাদেশিক বার কাউন্সিল সৃষ্টির পর থেকে তিনি তার সদস্য ছিলেন এবং এ্যাডভোকেট জেনারেলের পদাধিকার বলে তার সভাপতি ছিলেন। ১৯৬১ সালের ৭ই জুলাই তিনি ঢাকা হাইকোর্টের অল্পতম বিচারপতি নিযুক্ত হন। তিনি একজন বিশিষ্ট রোটারিয়ান ছিলেন এবং একবারের জন্য ঢাকা রোটারি ক্লাবের সভাপতিও হন।

ছাত্র জীবন থেকে তিনি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৬ সালে সংস্কারভিত্তিক মুসলিম চাত্র ফেডারেশনের এটিশ শাখার সভাপতি ছিলেন। জাতি সংঘের সাধারণ সভার (ইউনাইটেড নেশনস্ জেনারেল এ্যাসেম্ব্লি) চতুর্থ অধিবেশনে তদানীন্তন পাকিস্তান প্রতিনিধিদেব তিনি অল্পতম সদস্য ছিলেন এবং সেখানে আইন সংক্রান্ত কর্মসূচিতে তিনি তাঁর দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। মঃ সয়ীদ ১৯৫৯ সালে মঃ আই আই কাসীমের সভানেতৃত্বে গঠিত কোম্পানী আইন কমিশনের একজন সদস্য ছিলেন।

তিনি ভূতপূর্ব পূর্বপাকিস্তান যক্ষা সমিতি এবং পাকিস্তান জাতীয় যক্ষা সমিতির সভাপতি ছিলেন। প্রদেশের লক্ষ-প্রতিষ্ঠ শিক্ষাব্রতীদের দ্বারা বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে গঠিত কেন্দ্রীয় বোর্ডের দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্ব-জঙ্ঘা সম্মেলনে এবং আইনের মাধ্যমে বিশ্ব-শান্তি সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে তিনি ব্যাংককে প্রেরিত হয়েছিলেন। এই সালেরই নভেম্বর মাসে তিনি চার বৎসরের জন্য ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে প্রাক্তন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন।

পাকিস্তানী দখলদার সৈন্যদের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেন। লগুনে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান এবং জাতি সংঘে বাংলাদেশ সরকারের

বিশেষ দৃষ্ট দ্রুপ, বহির্বিষে তিনি প্রাধান্য প্রবর্তা ছিলেন।

বর্তমানে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি।

প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান

১৯১৯ সালে ১৭ই মার্চ ফরিদপুর জেলায় টাঙ্গুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে তিনি বি এ পাশ করেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং সফল ভাষা আন্দোলনের অগ্রভূমি নেতা বলে পরিচিত হন—যে ভাষা আন্দোলনের ফলে “বাংলা ভাষা” পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় ভাষার অগ্রভূমি ভাষারূপে স্বীকৃত হয়।

১৯৪৯ সালে গঢ়িঃ আওয়ামী লীগের তিনি অগ্রভূমি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি উক্ত পার্টির সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৫৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি মুক্তফন্ট মন্ত্রীসভার সদস্যনিষ্ঠ মন্ত্রী হন। মুক্তফন্ট মন্ত্রীসভা দ্বৈচ্ছাচারিতা দ্বারা ভেঙ্গে দেওয়ার পর, তাঁকে কিছুকালের জন্য গ্রেপ্তার করে রাখা হয়। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খাঁ যখন বে-আইনীভাবে ক্ষমতা দখল করে, তখন শেখ মুজিবুর রহমানকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে তিন বৎসর জেলে আবদ্ধ রাখা হয়।

১৯৬৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং পূর্ব বাংলার স্বাধীন শাসনের নিমিত্ত তাঁর ছয় দফা দাবীর কর্মসূচী প্রস্তুত করেন। অবিলম্বে তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় এবং হাস্যকর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী সাব্যস্ত করা হয়। ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণ-অধ্যক্ষানের ফলে মুজিবের মুক্তিলাভ এবং আয়ুব খাঁর পতন হয়। ইয়াহিয়া খাঁ তখন নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা দখল করে।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান দুটি নির্বাচনে কেন্দ্রে জয়লাভ করেন। একটি কেন্দ্রে ছিলেন তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং অপরটিতে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ভোটের ব্যবধান ছিল ১২২, ৪৩০।

(Reproduced from “Bangladesh” Bulletin

Vol. 1 No. 3 of July 14, 1971)

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর—মন্ত্রীসভা বিষয়ক, প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও বেতার।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি—সৈয়দ নজরুল ইসলাম

ময়মনসিংহ জেলায় যশোদল নামক ক্ষুদ্র একটি গ্রামে ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জেলা সহরে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং ১৯৪৫ সালে এম এ উপাধি লাভ করেন।

উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেই তিনি বাস্তব রাজনীতির প্রাথমিক শিক্ষণ প্রাপ্ত হন। স্বযোগ্য নেতা হিসাবেই তিনি সালিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাড়া ইউনিয়নের সহকারী সভাপতি মনোনীত হন এবং সমাজলীয়া কার্যকরী সমিতির অগ্রভূমি সদস্যরূপে ভাষা আন্দোলনকে সফল করার জন্য তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন।

উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর পুত্র সৈয়দ নজরুল ইসলামের পক্ষে পিতার পদাধি অরুসরণ করাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু নিয়তি তাঁর জ্ঞান পুণ্যেই হ্রাস করে রেখেছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক স্থান। যদিও তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ শ্রেণীর চাকুরীতে যোগদান করে কর দায়্য বিভাগে মাত্র এক বৎসর কাজ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উক্ত সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করে তিনি ময়মনসিংহে আনন্দ মোহন কলেজের লেকচারারের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি ময়মনসিংহ দ্বারা যোগদান করেন এবং তদবধি তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে আসছেন। তাঁর অবিচলিত সত্যতা, বিশ্বাসের সাহসিকতা এবং উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা অতি শীঘ্রই তাঁকে স্বদেশীয় লোকদের নিকট অতীব প্রিয় ও অপরিহার্য করে তুলেছিল। ১৯৫৭ সালে তিনি ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন, এবং সেই বৎসরেই তিনি প্রাদেশিক আওয়ামী লীগেরও সহকারী সভাপতি হন। উক্তপদে তিনি এখনও প্রতিষ্ঠিত আছেন।

১৯৬২ সালে আয়ুল শাহী স্বৈর-শাসনের বিরুদ্ধে জন-গণ-সংগ্রামের তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রধান ভোতা। ১৯৬৬ সালে শাসক গোষ্ঠী ছয় দফা কর্মসূচীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে, আওয়ামী লীগের উপর অমাত্রাধিক অত্যাচার শুরু করে দিল। শেখ মুজিবুর রহমান সহ শত শত আওয়ামীলীগ নেতা ও কর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হ'ল। এই সময়ে সড়ক থেকে মুক্ত হতে তিনি সঠিকভাবে পাটী পরিচালনা করে বিশেষ যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন। অতঃপর ১৯৬৯ সালে তৎকালীন আগরতলা যুদ্ধের মামলার ব্যাপারে যখন শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অন্তরণ করে রাখা হয়েছিল, তখন পুনরায় সৈয়দ নজরুল পাটীকে নিভুল পথে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি গণতান্ত্রিক গ্র্যাকুশন কমিটি সংগঠন করেছিলেন যার কর্মসূচী ও কার্যাবলীর দ্বারা ১৯৭১ সালের গণজাগরণ সফল হ'য়েছিল এবং আগরতলা যুদ্ধের মামলা তুলে নিতে হ'য়েছিল। সেই বৎসরেই শেষের সঙ্গে তিনি রাওলপাণ্ডিতে গোলটোবিল কনফারেন্সে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তার আলোচনায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি জাশনাল এসেমব্লীর সদস্য নির্বাচিত হন এবং তারপর জাশনাল এসেমব্লীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পাটীর ডেপুটী লীডারও নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি মুজিব নন্দীসভার শির ও বানিজ্য মন্ত্রী।

### অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী—শ্রীতাজউদ্দীন আমেদ

ঢাকার একটি ক্ষুদ্রগ্রামে ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়ায় তিনি একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অর্থশাস্ত্রে অনাস সহ বিএ পাশ করেন এবং কয়েক বৎসর পরে রাজনৈতিক বলী অবস্থায় কারাভ্যন্তরে আইনের ডিগ্রী পদীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯৩৭ সালে স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিনি তাঁর প্রামের নিকটবর্তী স্থানে কতিপয় অন্তরণ রাজবন্দীর সংসর্গে

আসেন এবং ১৯৪০ সালের কাছাকাছি শ্রী আবুল হাসিমের প্রভাবে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। প্রকৃত পক্ষে তিনি ১৯৪৪ সালে মুসলিম লীগের বঙ্গীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে যখন তিনি দেখলেন যে, মুসলিম লীগ সাধারণ মাত্রার সংসর্গ ত্যাগ করে জনবিরোধী চক্রান্তের সামিল হয়েছে, তখন তিনি মুসলিম লীগের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করলেন। কিন্তু তার অর্থ এইনয় যে, তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে থেকে উপিত প্রত্যেকটি রাজনৈতিক আন্দোলনের পাঁচালনার ভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ কয়ে ভাষা আন্দোলনে তাঁর হৃদয় ভূমিকা গ্রহণও দেশ-বাসী কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করেন।

১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা কালে শ্রীতাজউদ্দীন উহার অত্যন্ত প্রধান সংগঠনকারী ও অদৃষ্ট স্তম্ভ ছিলেন। পাটীর লক্ষ্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং কঠিন পরিশ্রমের জন্ত তিনি ক্রমশঃ পাটীর নেতৃত্বের শীর্ষস্থান অধিকার করতে পেরেছিলেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি পাটীর সাংগঠনিক সম্পাদক হন এবং ১৯৬৪ সাল থেকে সাধারণ সম্পাদক রূপে কাজ করছেন। ১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনের সময় তিনি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সম্পাদক স্বরূপ কাজ করেন।

নির্বাচন ক্ষেত্রে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল অতুল্য। ১৯৫৪ সালে তিনি আইনের ছাত্রাবস্থায় পূর্ববঙ্গ বিধান সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়েও তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে জাশনাল এসেমব্লীতে নির্বাচিত হন।

শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় কলিকাতায় ১৯৪৫ সালে এবং তদবধি উভয়ের মধ্যে গভীরভাবে রাজনৈতিক সম্মোহতা এবং মৈত্রিক্য চলে

আসছে। রাজনৈতিক জীবন ছাড়াও আমেদ সাহেব বিভিন্ন সামাজিক কর্মসংস্থার সাহিত্য সংগঠিত আছেন। তিনি প্রচুর পড়াশুনা করেন। তাঁর পাঠ্য তালিকার ক্ষেত্রে যেমন বিরাট তেমনই বিচিত্র। তিনি বিদেশের বহু স্থান ভ্রমণ করেছেন। বর্তমানে তিনি মুজিব মন্ত্রী সভার অর্থমন্ত্রী। ভূমিরাজস্ব ও পরিকল্পনার দায়িত্বও তাঁরই উপর স্তম্ভ।

#### অস্থায়ী অর্থমন্ত্রী - ক্যাপ্টেন মনসুর আলি

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অস্থায়ী কৃষি-পাড়া গ্রামে ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সিরাজগঞ্জের বি এল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপ সহ প্রবোধিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কালকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে স্নাতক হন। অতঃপর তিনি ১৯৪৫ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ এবং প্রথম শ্রেণীতে এল এল বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দশ বৎসরই তিনি পাবনা জেলা কোর্টের এ্যাডভোকেট হন, এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ভাল পশার জাময়ে ফেলেন ও প্রচুর অর্থ উপাধন করেন।

১৯৫১ সালে তিনি পাবনা জেলা আওয়ামী লীগ সংগঠন করেন এবং তিনি তার সম্পাদক হন। ১৯৫২ সালে তিনি রুস্তামী আন্দোলনে যোগদান করে কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৪ সালে তিনি পার্কেস্থানের প্রাক্তন হাই কমিশনার মিঃ আবদুল্লা-অল-মামুদকে পরাজিত করে পূর্ববাংলা বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে কৃষি আইন প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তিনি মন্ত্রীপদে বহাল ছিলেন।

আয়বসাহীর দমন নীতির বিরুদ্ধে পাবনা জেলায় আন্দোলনে নেতৃত্ব করার অপরাধে পূর্বপাকিস্তান গণ নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে তাঁকে ১৯৬৪ সালে গ্রেপ্তার করে ৬ মাসের উপর কারাগারে আটক রাখা হয়।

পুনঃবার ১৯৬৭ সালে বিখ্যাত ভূট্টো বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের বলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং প্রায় এক বৎসর কারাবন্দী করে রাখা হয়। পরবর্তী বৎসর সরকার কর্তৃক ভূট্টোর বিরুদ্ধে বাণী বিতরণের ব্যাপারে বার এ্যাসোসিয়েশনের একটি সভায় পৌরোচিত্য করার অপরাধে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনানুসারে আরও এক বৎসরের জন্য কারাবাসের শাস্তি তাঁকে দেওয়া হয়। পরে আপীলে হাইকোর্ট কর্তৃক এই শাস্তি নাকচ হয়।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেট ওয়্যার দফা তিনি পরপর পাঁচবার পাবনা জেলা বার এসোসিয়েশনের নেতা ও সভাপতি ছিলেন। নব প্রতিষ্ঠিত পাবনা ল' কলেজের তিনি প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন পুরাতন ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী আলি সাহেব বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের সহকারী সভাপতি। ১৯৭০ সালে তিনি প্রাদেশিক এ্যাসেম্বলিতে সদস্য এবং বাংলাদেশ পানামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বর্তমানে তিনি মুজিব মন্ত্রিসভার যোগাযোগ মন্ত্রী।

#### খোন্দকার মোস্তাক আমেদ

পাচ হুট চার তালি দীঘ, শার্ণিকায়, মুহুতাবী-৫৩ বৎসর বয়স খোন্দকার আমেদ একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বলে সুপরিচিত। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এবং অতি সাধারণ জীবন যাপন করেন।

সক্রিয় রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি প্রবেশ করেন ১৯৪২ সালে এবং তদবধি উল্লেখযোগ্য সমুদয় রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে আসছেন এবং বিভিন্ন সময়ে প্রায় সাত বৎসর কাল কারাবাস করেন।

কুমিল্লা জেলার দাসপাড়া দাউদকান্দি গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত ধার্মিক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য জীবনে প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন কলিকাতার খিদিরপুর একাডেমিতে। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল এল বি উপাধি গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে



## সোহরাব হুসেন

যশোহর জেলার মাগুরায় ১৯২৬ সালের মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র শ্রীহসেন ১৯৪৬ সালে ডিটিংসন সহ বিজ্ঞানে স্নাতক হন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পরীক্ষায় উপাধি লাভ করে এই বছরই মাগুরা বারে যোগ দেন।

১৯৫২ সালে আওয়ামী লীগে যোগদান করে মাগুরা মহকুমা আওয়ামী লীগের সম্পাদক পদে যুক্ত ছিলেন ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত। ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কৃষি সম্পাদকের পদাধিকারী ছিলেন।

১৯৬২ সালের নির্বাচনে তৎকালীন জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসাবে তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। তিনিই পূর্ণপাকিস্তানের আওয়ামী লীগ নির্বাচিত প্রথম সদস্য যিনি ১৯৬৩ সালে জাতীয় পরিষদের রাওয়ালপিণ্ডি অধিবেশনে ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি পূর্ব-পাক অধিবাসীদের অসন্তোষসমূহের প্রতিকার করা না হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা বাধ্য হবেন পঃ পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেঁদে দেওয়া।

মিঃ সোহরাব হুসেন বিশ্বের বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছেন, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯৬৪ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ডেনমার্ক এবং ইউরোপের আরও বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন, তন্মধ্যে তিনি সৌদি আরব সহ মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রেও ভ্রমণ করে এসেছেন।

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসাবে সাধারণ নির্বাচনে তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ বাংলা দেশে পাক-বাহিনীর বর্বরোচিত অভিযান শুরু হবার পর তিনি মুক্তিব নগরে চলে আসেন এবং মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। মুক্তিবনগরে থাকা কালীন তিনি কেন্দ্রীয় জাণ ও পুনর্গঠন কমিটির

সদস্য ছিলেন এবং মুক্তি বাহিনীর হিসেপশন ক্যাম্পের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

মিঃ হুসেন মাগুরা ডিগ্রী কলেজের একজন পঠিপোষক এবং অন্তর্জ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জালিরও অন্তর্ভুক্ত সদস্য।

বর্তমানে তিনি মুক্তিব মন্ত্রীসভার বন, মৎস্য ও পশু-পালন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

## জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী

শ্রীলঙ্কা জেলার সুনামগঞ্জে ১৯১৮ সালে জেঃ ওসমানী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদর্শ পূর্ণপুরুষ প্রখ্যাত কক্সবত শাহ নিজামুদ্দীন ওসমানী পরম শ্রদ্ধাভাজন ধর্মপ্রাণ হজরত শাহ জালালের অন্ততম সঙ্গী ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে শ্রীহটে আসেন। জেনারেল ওসমানীর পিতা পরলোকগত খান বাহাদুর মফিজুর রহমান বেঙ্গল (পরে আসাম) সিভিল সার্ভিসের সদস্য ছিলেন এবং ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

তাঁর পিতব্য পরলোকগত গজনফর আলি খান, সি এস্ আই; সি আই টি; ও বি জি; আই সি এস্, ১৮৯৭ সালে আই সি এস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। জেঃ ওসমানী শিক্ষালাভ করেন কটন স্কুলে এবং পরে শ্রীহটে সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে মাট্রিকুলেশন পাশ করে, ১৯৩৮ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন ইউ টি সি এর বিভিন্ন উচ্চ পদে নির্বাচিত ও নিযুক্ত হয়ে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং এম্ এ পরীক্ষায় প্রাক্-কালে তিনি ভারতীয় সৈন্ত বাহিনীতে ক্যাডেট স্বরূপ যোগদান করেন। দেহাফনে ভারতীয় সামরিক শিক্ষায়তন থেকে শিক্ষাজ্ঞান তিনি ১৯৪০ সালে ভারতীয় সৈন্তবাহিনীতে কমিশন প্রাপ্ত হন।

অন্তঃপর ক্রতগতিতে তাঁর পদোন্নতি হয়। তিনি ১৯৪১ সালে ক্যাপ্টেন এবং ৪২ সালে মেজর হয়ে একটি রেকর্ড সৃষ্টি করেন। ২৩ বৎসর বয়স্ক যুবক ওসমানী ছিলেন তদানীন্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বকনিষ্ঠ মেজর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন ব্রহ্মদেশের

রণাজনে মেজর বা তদুর্ধ্ব ব্যাকের মুষ্টিমেয় এসিয়ার  
অফিসারদের অন্ততন।

ভিন আই সি এম্ পরীক্ষোত্তীর্ণ থাকার দরুণ, মুক্কাশ্বে  
তাকে ভারতীয় রাজনৈতিক সার্ভিসের জন্ত মনোনীত  
করা হয়, কিন্তু ভিন সৈন্যবাহিনী ত্যাগ করতে অস্বীকার  
করেন। ভিন সিনয়ার অফিসারের কোম্পানী সমাপ্ত  
করবার পর, ব্রিটিশ আমলে তাকে লেঃ কর্ণেলের পদে  
প্রমোশন দেওয়ার বিষয়ও বিবেচিত হ'য়েছিল। ১৯৪৭  
সালের গোড়ার দিকে তৎকালীন অন্তর্বর্তীকালের ভারত  
সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পণ্ডিত জগদ্বলাল নেকের  
তাকে ভারতীয় কূটনৈতিক বিষয়ে যোগদানের অনুরোধ  
আহ্বান করেন, কিন্তু পুনরায় ভিন সেনা বিভাগে  
থাকারই পছন্দ করেছিলেন।

ব্রিটিশ ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে  
প্রতিযোগিতা করে এবং প্রথম সুকেন্দ্রের স্টাফ কলেজের  
প্রবেশিকা পরীক্ষার উচ্চস্থান দখল করে, ভিন স্টাফ  
কলেজের একটি শুল্ক পদে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন। ১৯৪৭  
সালে ভিন লেঃ কর্ণেল পদে প্রমোশন পান এবং  
কোয়েটার স্টাফ কলেজ থেকে পি এম্ সি ডিগ্রী লাভ  
করেন।

জেনারেল ওসমানী স্টাফ এবং কমান্ডে উন্নত হলেই  
বহু গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ছিলেন। যথা:—১ নং  
ওয়েডের জেনারেল স্টাফ অফিসার এবং সহকারী এ্যাড-  
জুটেন্ট জেনারেল, সমগ্র পরিবহন ভারপ্রাপ্ত স্টাফ  
অফিসার এবং কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল শাখার  
অফিসার। ১৯১৪ নং পাজার রোজমেন্টের কমান্ডার,  
ইষ্ট বেঙ্গল রোজমেন্টের প্রথম ব্যাটেলিয়নের কমান্ডার

এবং পরে কেন্দ্রীয় কমান্ডার। ই পি আর-এর  
এডিটর কমান্ডার ইত্যাদি।

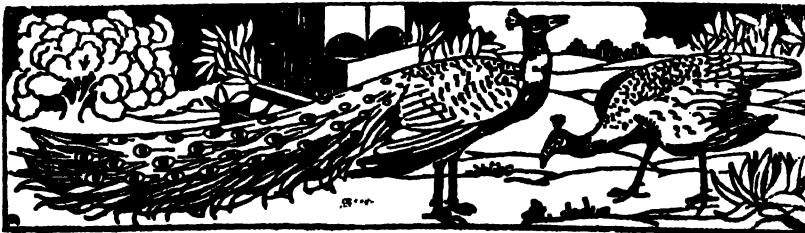
১৯৫৬ সালে ভিন কর্ণেল পদে প্রমোশন পান এবং  
সৈন্য পরিচালনার ডেপুটি ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। উক্ত  
পদে ভিন পরোপরি ১০ বৎসর ছিলেন। সেন্টো এবং  
সিয়েটোর বিভিন্ন পরিবহন প্রতিষ্ঠানে ভিন পারিকৃত্তাম  
সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং পারিকৃত্তানের  
বিমান প্রতিরক্ষা কমিটির সদস্য ছিলেন।

ভিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রধান এবং প্রতিনিধি  
ছিলেন। দশ বৎসর কর্ণেল স্বরূপ এবং কয়েক মাস  
অস্থায়ী সিনিয়র ডায়রেক্টর কায়া করে ১৯৬৭ সালের  
মোজারী মাসে ভিন অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৭০ সালে ভিন রাজনীতিতে যোগদান করেন  
এবং সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসের সাধারণ নির্বাচনে  
আওয়ামী লীগের প্রার্থীরূপে তার ছয়জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে  
তৎকালীন পারিকৃত্তানের সর্বগ্রহণ নির্বাচন কেড়ে বহু  
ভোটার বাবদানে পরাজিত করেন। ১৯৭১ সালের ১৭ই  
এপ্রিল যখন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হল তখন  
ভিন কারাবন্দনের অগ্রতম মন্ত্রীর মর্যাদা সহ  
মুক্তবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্ণেল এম্ এ জি  
ওসমানী পি এম্ সি এম্ সি এ কে ১৯৭১ সালের  
১৯ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ শুল্ক বাহিনীর সর্বাধি-  
নায়করূপে জেনারেলের পদে প্রমোশন দিলেন। ১৯৭২  
সালের ৯ই এপ্রিল জেনারেল ওসমানী বাংলাদেশ শুল্ক  
বাহিনীর পদ ত্যাগ করেন।

বর্তমানে ভিন মুজিব মন্ত্রণালয়ের নৌ ও বিমান  
পরিবহন মন্ত্রী।



# পুণা আশ্রমে

শ্রীমলীপকুমার রায়

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

আট

শ্রীরামদাসের অভ্যাগমের কিছুদিন পরেই আমাদের অতিথি হয়ে এলেন স্ত্র পল ভিউক্স কে. বি. ই. Knight Commander of the British Empire)। আমার স্মৃতিচারণের দ্বিতীয় ভাগে এর নাম আছে। এঁকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম কালীদাস কাছে কলকাতার হিমাদ্রি আফিসে। কালীদাস তাঁর স্বকীয় চড়াও (aggressive) চেষ্টে প্রথম দিকে স্ত্র পলকে আক্রমণ করেছিলেন—স্ত্র পল যা-ই বলেন কালীদাস প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেন। কালীদাস প্রায়ই নানা আগন্তুককে এভাবে পরীক্ষা করতেন। সে সময়ে আমি একদিকে যেমন উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম, পাছে একটা “সীন” হয় ভেবে, অন্যদিকে স্ত্র পলের শাস্ত অথচ দৃঢ় তর্কভিত্তিতে আশ্বস্ত হয়ে মনে মনে তারিফ করেছিলাম তাঁর দৃঢ় অথচ নিরুপগ্ৰাণ প্রতিবাদের চেষ্টা—‘রটিশ ডগেডনেস।’ পরে কালীদাস তাঁকে সাদরেই বরণ করেছিলেন বহু ব’লে—ষষ্ঠিও প্রথম দিকে বেধেছিল ‘কুরুক্ষেত্র’—‘ধর্মক্ষেত্র’ পৌছানোর প্রাক্কালে। কিন্তু আগে বলি আমাদের মন্দিরে স্ত্র পলের আত্মদয়ের কাহিনী।

স্ত্র পল কুরুক্ষেত্রের একটি চিঠি নিয়ে এসেছিল—যাকে বলে ‘লেটার অব ইনট্রডাকশন।’ তাতে কুরুক্ষেত্র লিখেছিল, স্ত্র পল মিস্টিকদের সঙ্গোড়—ভারতীয় যোগেরও অনেক কিছু খবর রাখেন। মাস দুই পরে তাকে আমি লিখি ধন্যবাদ স্মৃতিয়ে, এমন অপক্লান্ত দরদী অতিথিকে আমাদের মন্দিরে পরিবেষণ করার জন্তে। কুরুক্ষেত্র লিখেছিল আলমোরা থেকে (২২এ আগষ্ট ১৯৫৭) :

“I am glad you liked Sir Paul. We found him a nice and very sincere man, otherwise I would not have given him your address. But now-a-days there are so many humbugs in Ashrams (and elsewhere !) that I did want him to come in touch with at least some genuine people...Moreover, it is not only his charm : he is also a man of great courage as you must have seen for yourself.” \*

আমার জীবনে বহুবিধ চরিত্রের মানুষ এসেছেন ষাঁদের ভালোবেসে নিজেকে চরিতার্থ মনে করেছি। এঁদের মধ্যে স্ত্র পল একজন বিশিষ্ট মনীষী—পুরুষসিংহ—মানুষের মতন মানুষ—যাকে সাহেবি ভাষায় বলে worth his salt ; তাঁর সব গুণগণনার কথা বলতে গেলে এ-স্মৃতিচারণের বহর অত্যধিক বেড়ে যাবে, তাই শুধু তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেই ক্ষান্ত হব।

প্রথম কথা, তিনি বুদ্ধিমান হয়েও বুদ্ধিবাদী ছিলেন না। যাকে বলে মিস্টিক, ঠিক তাদের দলে না হ’লেও উদাসী তথা বৈরাগী। ৬৬ বৎসর বয়সে যে-মানুষ দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় বেপরোয়া হ’য়ে—কখনো কোনো সরাইখানায় কখনো বা গাছতলায় শুয়ে কাটায়

\* খুশী হয়েছি শুনে যে স্ত্র পলকে তোমাদের ভালো লেগেছিল। তিনি সত্যিই চমৎকার আর খুব আন্তরিক। কিন্তু আজকাল নানা আশ্রমে এত ভণ্ড আসীন (শুধু আশ্রমেই নয়—সর্বত্রই) যে আমি চেরেছিলাম তিনি কয়েকটি ঋণী কুলীনের সংস্পর্শে আসেন। আর শুধু তাঁর চরিত্রের স্মরণের জন্তেই নয়—ভ্রাম নিশ্চয়ই টের পেয়েছে তিনি একজন অসমসাহসিক পুরুষ।

কাল কী হবে না ভেবে—একটা গান মনে প'ড়ে গেল,  
ছেলেবেলায় শোনা :

“আমি সদাই হেসে হেসে বেড়াই ভেসে ভেসে, এ  
ভব সাগরে করে ডরি না”—স্তব পলকে দেখলে মনে  
হ'ত যেন এ-গানটি হুবহু তাঁর মনের প্রতিচ্ছবি।  
ইন্দিরার একটি মীরাভজন আরো সুপ্রযুক্ত (গানটি সুদীর্ঘ,  
তাই মাত্র প্রথম কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করেই থামব) :

অব দী হৈ য় নৈয়া নদীয়ে বহা,

জা লগী জিস কিনারে চলে জায়জে।

অব তো করুণাকি জব ভী উঠেগী হবা

হম উসীকে সহারে চলে জায়জে।

আমরা অকূলের ডাকে ভাসারোঁছি আজ তরী,

যাব চ'লে যে-কূলেই পারী-সে খেয়া ভিড়ায়।

তার করুণায় হাওয়া ওঠে যদি মর্মরি',

আমরা পাল ভুলে যাব—যেথা-ই সে নিয়ে যায়।

আমরা চলেছি উষাও কেটে তটবন্ধন,

দ্বিধে বিদায় সঙ্গী সাথী প্রিয়পরিজন,

আমরা গাহিব গীতালি কৃষ্ণ মেঘের সাথে,

আমরা সাধিব মিতালি অচিন পথের সাথে,

আমরা করিয়া বরণ করকা তুফান সাথে

যাব ভেসে এ জগত ভুলে নীল মোহানায়।

প্রতি সাধকের কমেই এক বাউল গায় এ-ঘর ছাড়া  
উদাস গান—যার বাদী সুর (স্ববীজনাথের ভাষায়) :  
‘হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনোখানে।’ গায়—কিন্তু  
সবাই সে-সুরে কান পাভতে পারে না—ভয় পায়—পারে  
কেবল সে-ই যে (কৃষ্ণপ্রেমের ভাষায়) স্বভাবে অসম-  
সাহসিক ও স্বধর্মে পরিব্রাজক। স্তব পল এ-সুরে কান  
পেতে অনিকেত (homeless) জীবন বরণ ক'রে  
নিয়েছিলেন—নিপ্সরোয়া হ'য়ে দেশদেশান্তরে ভেসে  
ভেসে পৌঁছতে কোনো বাঞ্ছিত নীলমোহানায়। জীবনে  
তিনি অনেক ঘা খেয়েছিলেন আরো এই জন্মে যে তিনি  
ছিলেন স্বভাব কোমল, স্পর্শকাতর। কিন্তু এসব আঘাত  
স'য়ে তিনি শুক কঠোর ‘সিনিক’ হন নি, হয়েছিলেন  
নরম দরদী প্রেমিক, ক্রিটিক নয়—বোদ্ধা, বিরক্ত বৈরাগী

নয়—মধুর বিরাগী, সর্গোপরি সঙ্কয়ী নয়—  
দিলদারিয়া—যার কলে তাঁকে প্রায় দেউলে হতে,  
হয়েছিল। গভ যুদ্ধের সময় তিনি রুস দেশে  
গিয়েছিলেন সমসে'টি মম-এর মতন ওদের সামরিক  
খবরা-খবর নিতে। তাঁর এ-হরন্তু দুঃসাহসের  
কাহিনী তিনি পরে ফিরে এসে প্রকাশ করেন তাঁর  
রোমাঞ্চকর স্মৃতিচারণে—Secret Agent, S.T. 25।  
বইটি ইন্দিরা পুণার এত পুরানো এছাড়াও থেকে কিনে  
আনে। পড়তে পড়তে গা'য় কাঁটা দেয়। কতবার যে  
তিনি “অন্ধকারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী” থেকে  
ফিরে এসেছিলেন—যাকে বলে touch and go—ভাবতে  
অবাক লাগে। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার যার রক্তে মরণকে  
সে ডরাবে কেমন ক'রে? ফিনল্যান্ড থেকে সীমাস্ত  
পেরিয়ে রুস দেশে পৌঁছনো—যখন আশে পাশে রুস  
পন্থাতিক সীমাস্তরক্ষী পাহারা দিচ্ছে—সে এক রোমাঞ্চ  
—পড়তে পড়তে মনে হয় “Truth is stranger than  
fiction” প্রবচনটি কবিকল্পনা নয়। তারপর রুসদেশে  
লুকিয়ে লুকিয়ে থাকা—অভাবনীয় ভাবে এখানে ওখানে  
অ্যাক্সর পাওয়া কোন সদর বন্ধু বা বান্ধবীর নিভতকক্ষে।  
শেষে ধরা প'ড়ে সাইবিরিয়ার কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে  
বাস ও শেষে প্রিন্স ক্রপটকিনের মতন সেখান থেকে  
ফিরে বহু বিপদ ডিভিডে ইংলণ্ডে ফিরে K.B.E. উপাধি  
পাওয়া—এসব গু'র মুখে শুনে শুনে মনে হত—  
অ ঘটনই গু'র এ-বিচিত্র জীবনযোদ্ধার মুখ্য উপজীব্য।  
বলতে ভালোই—ইনি একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতকার—  
Conductor—এমন কি রুসদেশেও একসময়ে অপেরায়  
কণ্ঠকটর হ'য়ে নাম কিনেছিলেন বিশ্বযুদ্ধের আগে।  
বোধহয় সেই সময়েই রুসভাষা শিখেছিলেন—নৈলে  
বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় রুসদেশে যেতে পারতেন না।

স্তব পল যখন সাইবিরিয়ায় কয়েদী ছিলেন সে  
সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তখন তাঁর পরিচর্য হয় এক  
শিখ যোগবিশ্ব-এর সঙ্গে—যে তাঁকে হঠাৎযোগের আসন ও  
রাজযোগের প্রাণায়ামে দীক্ষা দেয়। এ-যোগসাধনার  
কলে তিনি যে শুধু নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছিলেন তাই

নয়, সন্ধান পেয়েছিলেন এক নতুন জগতের যার খবর মেলে না বুকের পরীক্ষাগারে কি সঙ্গীতের কুঞ্জকাননে। তাঁর YOGA FOR THE WESTERN WORLD-এ স্তর পল তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ডমকননে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন : “Yoga is a process of death and birth : death to the old life, birth to a new one : অর্থাৎ যোগসাধনার ফলে মায়িক জীবনের মরণ সেধে জন্মলাভ করি আমরা এক নবজীবনে।

শেষ অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠায় স্তর পল আরো বিশদ করে লিখেছেন যে, যোগ কোনো হুণ্ডাধ্য নেপথ্যতত্ত্বের প্রহেলিকা নয়—জীবনের প্রতিপদে কী ভাবে পা ফেললে চলা সহজ ও প্রাণসাধনা সফল হবে তারই নির্দেশিকা—যার পথ কাটা হয় আত্মবোধের আঁচন লোকের গ্রামছাড়া বনহুলীর মধ্যে দিয়ে, এমন অনেক ঘুমন্ত নিয়ন্ত্রী শক্তিকে জাগিয়ে তুলে—বুকের রাজপথে যাদের কোনো হৃদিশ মেলে না। এসব শক্তি (লিখেছেন স্তর পল) চায় ধাপে ধাপে আমাদের অন্তরাত্মকে জাগতিক আলোমুখারী অভ্যন্তরলোক থেকে উত্তীর্ণ করবে এক নিত্যানন্দ দিব্য চেতনায় যার প্রসাদ বিনা মাত্র জীবন্ত হতে পারে না।

স্তর পল আরো তিনটি বই লিখেছেন : AN EPIC OF THE GESTAPPO—অর্থাৎ, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ সালে যে হুদাস্ত পুলিশবাহিনী গুড়ে তোলেন তাঁর বিরুদ্ধে ; COME HAMMER, COME SICKLE ও THE UNENDING QUEST বলা বাহুল্য আমি এই শেষের বইটির জগেই উৎসুক হিলাম। কিন্তু স্তর পল বইটি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন কথা দিয়ে ফিরাত পথে অস্ট্রেলিয়ায় মারা যান। পরে লওনে পৌঁছ করে ক’রেও এ বইটি পাই নি।

তিনি আমাদের আর্জি হ’য়ে তাঁর জীবনের ও সাধনার সম্বন্ধে কত কথাই যে বলতেন শুনে সত্যিই অবাঞ্ছিত লাগত ইংরাজ অভিজ্ঞাতের মধ্যে এমন সহজ আত্মউদ্ঘাটনের প্রবণতা দেখে। কিন্তু তিনি আরো বেশি চাইতেন আমাদের সাধনার খবর

নিতে। ইন্দিরার কাছে মীরার আবির্ভাবের সংবাদে তিনি শুধু যে হুটে হয়েছিলেন তাই নয়, পুলকিত হ’য়ে আমাদের দাদা ও দাদি ডেকে বৈধোছিলেন তাঁর সরল স্নেহভায়ে। শুধু তাই নয়, আমার ভাগবতের অনুবাদ Immortals of the Bhagavat-এ তিনি এক সুদীর্ঘ প্রাক্কথন (Foreword) লিখে আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন—যে-Forewordটি পরিশিষ্টে দিয়েছি—স্তর পল ও আমার দুটি ইংরাজী চিঠির সঙ্গে। প্রথমে ভেবেছিলাম ইংরাজী রচনা পরিশিষ্টে না-দেওয়াই ভালো। কিন্তু পরে মনে হ’ল আমার একটি উদ্দেশ্য যখন স্মৃতিচরী ভাঙ্গিতে বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধবীর ছাঁচ আঁকা তখন এ-চিঠি ও প্রাক্কথন অপ্রাসঙ্গিক হবে না—এদের মধ্যে দিয়ে চিত্রিত বন্ধুর মনের ছাঁচটি আরো উজ্জল হ’য়ে ফুটে উঠবে ব’লে। পরিশেষে স্তর পল সম্বন্ধে আরো কিছু বলতে চাই।

তিনি আমাদের আর্জি হ’য়ে এসে এখানে দু’তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন—আমাদের আশ্রমেও একটি। বক্তৃতা দুটির বিষয়বস্তু ছিল আসন। কত রকম দ্রুত আসনে যে তিনি সিদ্ধ হয়েছিলেন দেখে সবাই আশ্চর্য হ’ত। আরো নানা শহরে তিনি বক্তৃতা দিতেন আসন দোখিয়ে। একদিন বলেছিলেন যে, আসনের ঠোঁটতো আকৃষ্ট হ’য়ে যারা আসে তাদের তিনি শুধু আসন দোখিয়েই ফাস্ত হন না, সেই সঙ্গে বলেন আমাদের মহান যোগের সম্বন্ধে নানা কথা—যার অন্তিম লক্ষ্য আত্মবোধ ওরফে বস্তুলাভ। ইন্দিরার মধ্যে দিয়ে সাক্ষর নরলীলার আনন্দ বিষয় ফিলিয়ে তুলেছেন, আমার এ প্রাতিপাত্তি স্তর পল অকুণ্ঠে গ্রহণ করেছিলেন কালীদাস ও রামদাসের মতনই। বলতে কি, কথা ব’লে এমন আনন্দ আমি খুব কমই পেয়েছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাকেই ব’লে যেতে হয় আমাদের কথা। শোভার বড় একটি কিছু বলেন না—বড় জোর হুচারটি মন্তব্য করেন। কিন্তু কথালোপে উদ্দীপনা লাগে যখন দুই পক্ষই আলাপের রসদ জোগায়—যখন এ-পক্ষ যা বলে ও-পক্ষ শুধু সেটুকু গ্রহণ করেই থামে না, বলে এ-সম্পর্কে

ভার যা যা বলবার আছে। স্তর পল প্রতিপদেই এই রসদ জোগাতেন তাঁর অসামান্য বুদ্ধির আলোকপাত করে। এরই অঙ্গ নাম দরদী তথা উদ্দীপক। মনে আছে একবার বসেতে এক বিখ্যাত চিত্রতারকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল যাকে লগুনে আমি স্নেহপাত্রী বলে বরণ করেছিলাম—তখন সে ছিল দশবয়ীয়া বালিকা। বসেতে তার সঙ্গে দেখা বিশ পঁচিশ বৎসর পরে। সে জিজ্ঞাসা করেছিল : “দিলীপকা, পণ্ডিতোঁরতে তোমরা কী করে?” বলা বড়ল্য এ-শ্রেণীর প্রষ্টাকে নাচকেতার সমানধর্মণী নাম দেওয়া যায় না।

স্তর পল যে এত সহজে আমাদের সাধনার নানা অঘটন নিজে চাক্ষুষ না করেও বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন তার কারণ শুধু এ নয় যে, আত্মিক জগতের ছন্দ সুরের প্রতি তাঁর নিটোল শ্রদ্ধা ছিল, এ-ও বটে যে তিনি এ-ছন্দ সুরের কিছুটা নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর জীবনসাধনায়। এ-সাধনায় যে তিনি ভারতবর্ষের সনাতন প্রজার কাছ থেকে অনেক কিছু পেয়েছিলেন একথা তিনি একাধিকবার আমাদের কাছে প্রায়ঃ বলতেন সন্তুভজে। তাই হয়ত আমাদের এ-সনাতন জ্ঞানমণী ভক্তিযোগের পথে চলতে দেখে তিনি আমাদের সাগ্রহে বরণ করতে পেরেছিলেন সন্মানী বলে। প্রতিদানে আমরাও তাঁকে বরণ করেছিলাম সমানধর্মী বলে, যাদের পথ ভিন্ন হলেও লক্ষ্য এক। অঙ্গ ভাষায় স্তর পলকে আমরা আরো কাছে পেয়েছিলাম তিনি স্বভাবে ভক্তিপূরী ছিলেন বলে তাই তিনি Yoga for the Western World এ প্রথম অধ্যায়েই উদ্ধৃত করেছেন বিখ্যাত প্রেমিক লেট কালিস অব আর্সিসর একটি অল্পম প্রার্থনা :

“Lord, make me an instrument of Thy peace. Where there is hatred let me sow love ; where there is doubt—faith ; where there is despair—hope ; where there is darkness—light. Grant that I may seek to console rather than be consoled, to understand rather than be understood, and to love rather than

be loved ; for it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life.”

এবার স্তর পলের অধ্যায় শেষ করি আমার একটি চিঠির অহুবাদ দিয়ে :

হরিকৃষ্ণ মন্দির                      এই অক্টোবর, ১৯৫৭  
পূনা—১৬

( ভাবাহুবাধ )

স্তর পল ডিউক্স্

বঙ্গবরেন্দ্

যদি এখন তুমি দিল্লিতে নাও থাকো তাহলেও আশা করি এ-পত্র তোমার হাতে পৌঁছবে যথাকালে।

আজ সকালে আমার মন আনন্দে ভরপুর হয়ে আছে। থাকবে না? কাল কী কাণ্ডই হয়ে গেল। শোনোই না।

আমি কাল নীবারাই সন্ধ্যা লেখা আমার নাটক BEGGAR PRINCESS পড়ে শোনাচ্ছিলাম পঞ্চম অঙ্ক প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে—ভক্তসংসদে। সবাই মুগ্ধ হয়েছেন নীবার ভিখারিণী হয়ে ওঠাবনে গাছতলায় ঘুমোবার কাঁছন। এমন সময়ে ইন্দিরার হঠাৎ সমাধি—নিশ্চল নিখর মার্ভ, শুধু দুই গাল বেয়ে দুটি রূপালি ধারা নামছে ধীরে ধীরে। পড়ার শেষে ভজন। তারপর সবাই ইন্দিরাকে প্রণাম করল একে একে। ওদের মধ্যে ছিল ইন্দিরার দশবৎসরের ছেলে প্রেমল। সে-ই আমার কাছে প্রথম এসে বলে—ইন্দিরার হাতে পায়ে চন্দনগন্ধের কথা। আমি জানতাম ইন্দিরা কদাচ এসেঙ্গ ব্যবহার করেন না। তাই চমকে উঠেছিলাম বৈকি। তাড়াতাড়ি ইন্দিরার কাছে যেতেই আমিও পেলাম তার হাতে ও পায়ে চন্দনগন্ধ। আরো কয়েকজন ভক্ত ও ভক্তিমতীকে ডাক দিলাম, তারাও দ্রুত নিয়ে আস্তর্য হয়ে ফিশ ফিশ করে বলাবালি করতে থাকে—চন্দনের গন্ধই তো! পরে এ-গন্ধ আরো গঢ় হয়ে প্রায় সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়ল।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করি। আমার এক গুরুভাই বিমল মৈত্র এখন উত্তরকানীতে একলা সাধনা

করে। কিছুদিন আগে সেখান থেকে একটি পত্রে সে আমাকে লিখেছিল যে, স্বনামধন্য নগ্ন যোগী স্বামী কৃষ্ণাশ্রম সম্প্রতি উত্তরকানীতে এসেছিলেন—তার কাছে গিয়ে বসতেই সে তাঁর অন্তসোরণে চম্কে উঠেছিল। স্বামী কৃষ্ণাশ্রম বোর ছুয়ারপাতের সময়েও নগ্ন দেহে থাকেন প্রায় সর্বদাই সমাধিস্থ। এহেন মহাযোগীর পক্ষে কী না সম্ভব? কিন্তু ইন্দিরা যোগে দীক্ষা নিয়েছে তো মাত্র সোঁদিন—১৯৪৯ সালে। ইতিমধ্যে—মাত্র আট বৎসরে—কেমন করে তার মধ্যে এহেন যোগ-বিভূতির আবির্ভাব হ'ল? পরে ওকে জিজ্ঞাসা করতে ও বলল যে, ধ্যানে যখনই ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে তখনই ওর গায়ে চন্দন বা কতুরী গন্ধের আবির্ভাব হয়। আমি বললাম, “কিন্তু কই, আমাকে তো এর আগে কোনোদিন বলো নি?” ও হেসে বলল, “বললেই যে তুমি সবাইকে বলে ফেল।” আমি বললাম: “বলে কি অজ্ঞায় করি বলতে চাও? আমরা দিনের পর দিন আলোচনা করি এ-ও-তা নিয়ে—কোথায় কে কাকে ঠাকুরেছে, কার হাতে কে খুন হয়েছে, কোন্ গুণ্ডা কোন্ ব্যাক লুট করল, কে কোথায় পারমাণবিক বোমা ফাটিয়ে আকাশ বাতাস বিঁচিয়ে তুলল—এই সব। আমি ও-পথে পা না বাড়িয়ে না হয় দুটো সংকথাই বললাম—সমাধির কথা, চন্দনগন্ধের কথা, ঠাকুরের কথা।” কিন্তু মুশকিল এই যে, ইন্দিরা ওর নানা যোগবিভূতির কথা কাউকেই বলতে চায় না—আমি ওর গুরু বলেই ও স'য়ে থাকে যখন আমি ক'শ ক'রে দেই ওর মধ্যে যা যা দেখেছি।

জানি অবশ্য—ঠেকেও শিখেছি তো—যে, অনেকেই এসব অঘটনের কথা শুনে “the old old story” বলে হাসেন। হাঙ্গন না মনের সাথে—যখন জানি, শেষ হাসিতে তাঁরা জিতবেন না। বলছি তো ঠাকুরেরই কথা। তাছাড়া কার না বলতে সাধ হয় যখন কানে-শোনা দৈবী লীলা চোখে-দেখার (খুঁড়ি, জাণে পাওয়ার) কোঠায় এসে হাজির দেয়?

তুমি জানো—আমি স্বভাবে বিশ্বাসীও বটে সংশয়ীও

বটে। আমার মধ্যে সংশয়ী যে দিলীপ, সে বিশ্বাসী দিলীপকে ধমকার বাড়ি বাড়ি, বলে: “সাবধান, অকাট্য এজাহার না পেলে বিশ্বাস করে বোসো না—পত্তাবে। লোকে বিশ্বাস করবে না দেখো।”

ইন্দিরা শুনে হাসে, বলে: “দাদা, তুমি কেন যাও লোককে বিশ্বাস করতে? না-ই করল ওরা বিশ্বাস? প্রত্যক্ষ অহভবে সত্য বলে জেনেছি, আমার রক্তে যার দোলা লেগেছে তাকে সমস্ত জগৎ নামঞ্জুর করলেও কি আমার নিজের কাছে তা নামঞ্জুর হ'তে পারে? সত্যবাদীকে কেউ মিথ্যুক ভাবলে ক্রটি হয় কার? সত্যনিষ্ঠের, না সেই অবিশ্বাসীর, যে সত্যকে মিথ্যা ভেবে তুল করল?” এই ধরণের বারিগতগুণের মাঝে থাকে আমাদের হৃদয়ের—অবশ্য স্নেহের তর্কাতর্কি—“বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি”—র বিতণ্ডা নয়।

যাই হোক, কালই রাতে আমার ঈপ্সিত প্রমাণ হাজিরীদল। বাল সংক্ষেপে।

কাল রাতে, এগারোটায়, আমি ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে বসেছি এমন সময় হঠাৎ ইন্দিরা পাশে এসে বসল। আমি বললাম: “দেখি তো এখনো তোমার হাতে পায়ে গন্ধচন্দন আছে কি না।” পরীক্ষা ক'রে দেখলাম পায়ের স্পর্শক রয়েছে কিন্তু হাতের সৌরভ মিলিয়ে গেছে। চুলে বা দেহে স্পর্শকের লেশও নেই।

মিনিট পাঁচেক বাদে দেখি—তখনও সমাধিস্থ—চোখের কোণে সেই প্রেমাক্ষ। সমাধি ভাঙার পরে কথা বলতে পারে না, কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ ওর হাতে ফের সেই স্পর্শক। ও গদগদ কণ্ঠে শুধু বলে “ঠাকুর। ঠাকুর।” বুঝলাম, ও ঠাকুরের চরণ ছুঁয়েছে। এমন সময়ে ও হঠাৎ আমার হাত ধরল—সঙ্গে সঙ্গে দেখি আমার হাতেও স্পর্শক। তখন আমাদের পাশের ঘরে থাকত যোগেশ্বর ওরকে যোহাঙ্গ। বকের এক নিখুঁতপাতির পুত্র—ভীষ্মমান, উচ্চশিক্ষিত, একদা শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে যাওয়া-আসা করত। তাকে ডাকতেই সে ছুটে এল। ইন্দিরা তাকে ছুঁতেই তার গায়েও স্পর্শক ছেয়ে গেল।

পরদিন সকালে বারান্দায় ফের ওর দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়েই সমাধি, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভ!  
প্রতিবেশী শ্রম চুনিলালকে ডেকে পাঠাতেই তিনি  
কম্বল হ'য়ে ছুটে এসেন। আমি ইন্দ্রাকে বললাম  
তাকে ছুঁতে। চৌওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সার চুনিলাল স্তম্ভ  
হ'য়ে উঠলেন। সামনের আটচালায় থাকতেন যে-  
পাঞ্জাবী পরিবার—স্বামী গী ও দুই মেয়ে—তাদেরও  
ডেকে পাঠিয়ে ইন্দ্রাকে বললাম প্রত্যেককে ছুঁতে।  
ও ছুঁতেই কেব সেই চন্দনগন্ধ! তাঁরা তো আপ্লাদে  
আটখানা!

কখনো কখনো সমাধির উচ্চভূমি থেকে একটু নিচে  
নেমে এলে ইন্দ্রা গান শোনে মীরার। কত সময়ে—  
আমরা সবাই দেখেছি—ওর বিষম নিশ্বাসের কষ্ট—  
(ক্রমিক হাঁপানি তো!) এমন সময়ে কঠাৎ সমাধি—  
সঙ্গে সঙ্গে মুখে অপরূপ হাসি—অথচ বেদনাও ওকে  
ছাড়ান দিচ্ছে না, হাঁপাচ্ছে। ও তখন “দাদা! গান  
শুনোছি।” বলে মুঁকতে মুঁকতে আরম্ভ করে যায়  
ধানশ্রুত গান—আমি টুকে নিই—আটাশ বাঁজন ছাঁজন  
—এমন কি দুয়াল্লিশ লাইনের গানও এই ভাবেও কখনো  
কখনো হাঁপাতে হাঁপাতে আরম্ভ করেছে। এত দীর্ঘ  
গানের সব পদ ওর অস্থির অবস্থায়ও মনে থাকে কী ক'রে  
—ভেবে পাই না! আমি নিজেকে মনে করি—এ-  
অঘটনের জুড়ি নেই। অথচ লোকে প্রায়ই বলে বিজ্ঞ  
হেসে—অঘটনের যুগ গত! আমার একটি জনপ্রিয়  
গানের আখর অনেকের মনে দাগ কেটেছে: “ওরা জানে  
না তাই মানে না—আমি জানি তাই মানি—আমি  
অন্তরে তোমার বাঁশরী শুনোছি ‘তাই নাথ আমি জানি।’  
হাঁত দাদা।”

\* \* \*

এ-চিঠিটি স্যর পলকে লেখা চিঠির মূল্যবান অহবাদ  
নয়। কিছু বাদ দিয়ে কিছু জুড়ে এ-চিঠিটি যেন এক  
পুরোনো রচনার নবসংস্করণ দাঁড়িয়ে গেছে। তাই স্যর  
পলকে লেখা মূল চিঠিটি পরিশেষে জুড়ে দিলাম—আরো  
এই জন্তে যে, তার শেষে আছে শ্রীঅরবিন্দের মূল্যবান  
মন্তব্য অঘটন সম্বন্ধে।

নয়

মাত্রের মন বিচিত্র। স্যর চুনিলাল ডানলাভিন  
কটেজের সংস্কার সাধনের জন্ত এক পরসাদ গরত করতে  
চান নি ইন্দ্রাকে গভীর ভক্তি করা সত্ত্বেও। শেষে  
একদিন শ্রীবিগ্ভূষণ মল্লিক তাঁকে বলেন যে ইন্দ্রার  
শয়নকক্ষে জলে পড়ে জলপ্রপাতের মতন, তাঁর কর্তব্য  
এ-বিষয়ে অবাহিত হওয়া। তখন স্যর চুনিলাল অল্প  
থল খেরামতি করলেন, যাকে বলে tinkering—কিছু  
কটেজটির নানা দেয়াল ধ'সে পড়াছিল, তাদেরও তো  
সংস্কার চাই। তাছাড়া রান্নাঘর বাইরে, সেখান থেকে  
একদিন আমাদের বাসন কোশন সব দূর হ'য়ে গেল।  
কিছু স্যর চুনিলাল এসব প্রসঙ্গ ভুলতেই দিতেন না।  
তিনি এসময়ে আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু  
বুঝেও বুঝতে চাইতেন না যে, আমরা চিরদিন এভাবে  
তাঁর রূপাশ্রিত হ'য়ে থাকতে চাই না, চাই যে-কোনো  
উপায়ে হোক নিজের পায়ে দাঁড়াতে। তাই আমরা  
পৌজাখুঁজি শুরু ক'রে দিলাম একটি হুঁল্ড বাংলোর,  
যার আছে অন্ততঃ তিনটি শয়নকক্ষ ও একটি ‘হল’ ঘর।  
‘হল’ না হ'লেই নয়, কেননা আমাদের সাধনার ভিত্তি-ই  
ছিল ভজন। দিনের পর দিন আমি বই প্রবন্ধ কবিতা  
লিখতাম বটে, কিন্তু আমাদের ভজনে দিনে দিনে  
ভজনার্থীদের সংখ্যা জোয়ারের জলের মতনই  
বেড়ে উঠেছিল যে। স্যর চুনিলাল জানতেন আমাদের  
অস্বাস্থ্য কথা, কিন্তু যেন দেখেও দেখতে চাইতেন না।  
তাঁর সাক্ষাৎ ছিল এই যে, এ-ধরণের তুচ্ছ অসুবিধা প্রায়  
সবাইকেই সহ্যে হয়, আমরা প্রখ্যাত সাধক-সাধিকা,  
আমাদের কাছে অগছ হবে কেন? আমরা বুঝতাম তাঁর  
মনোভাব, কিন্তু তিনি যেন বুঝেও বুঝতে চাইতেন না যে,  
আমরা ঠিক মনুলিপসহী সাধক-সাধিকা নই। দেশকাল  
পাজভেদে ধর্মার্থীদের সাধনারও বং চং বদলে যেতে  
বাধ্য। তাছাড়া তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি যে,  
আমরা বিদেশে বিদূষে এসে একটি হলঘর-ওয়াল বড়  
মন্দির গড়তে পারব চারপাঁচটি শয়নকক্ষ সমেত।

এই সময়েই বটেছিল অঘটন। আর্কিটেক্ট



কন্ট্রাক্টারও মিলে গেল, জামিও পেয়ে গেলাম সত্তায়—  
চমৎকার পরিবেশ। সবাই মানল—এ অঘটন।

অথ আমরা হির করলাম—সাতটি শয়নকক্ষ চাইই  
চাই—শ্রীকান্ত, একাধ, প্রশান্ত ও মোহান্ত থাকবে, ছটি  
অতিথিদের জন্যে, একটি ভজনকক্ষ যেখানে ঠাকুরের  
বেদী বসানো হবে। একটি বাগানও বসানো হবে—  
শ্রীকান্ত ও হিন্দুরা ভার নিল। বাগানের জন্যে চাই  
অনেক জল—নানা আম গাছ, লেগু গাছ, কদম গাছ,  
আরো কত গাছ...কিঞ্চ কোথায় জল? এক সদয় বন্ধু  
খুঁড়ে দিলেন টিউবওয়েল—সমস্তার আশু সমাধান হয়ে  
গেল। শ্রীকান্ত এক প্রবীণ মালীকে নিয়োগ করে কী  
খাটুনিই যে খাটত—সে একটা দেখবার জিনিষ।

কিঞ্চ মুশকিল হ'ল স্থপতির একটি বিধান নিয়ে। সে  
ছয়টি শয়নকক্ষের ছক কাটল বটে—স্নানাগার সমেত,  
কিঞ্চ ভজনকক্ষের পাশেই রান্নাঘর। হিন্দুরা বৈধে বসল,  
এ হতেই পারে না। বলেও শেষটায় হঠাৎ—এক দিব্য  
প্রেরণায়ই বলব—একটি মনোহর নতুন ছক কাটল  
ভজনকক্ষের পাশে খোলা প্রাক্ষণ - Patio—তার পরে  
রান্নাঘর। কন্ট্রাক্টর মুখ ভার করলেন, “এ অসম্ভব—  
আনুপ্রাকটিক্যাল।” আমি তখনকেসে বললাম: “বন্ধুবর,  
আমাদের একটি বাংলা প্রবচনে আছে—আমার হাগল  
যদি লেজের দিকে কাটি—কার কী বলার থাকতে  
পারে?” অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিতে তিনি বিবস  
মুখেও সরস হাসি না হেসে পারলেন না। জয়, হাসির  
জয়।

পরে দেখা গেল—হিন্দুরা ছক অতি শোভন ও

নিখুঁত। ভজনকক্ষে ভিড় বেশ হ'লে প্রাক্ষণেও লোকে  
বসতে পারে যত্নে। আমাদের আলাদা বৈঠকখানাও  
ছিল না, পরে প্রাক্ষণটির শীর্ষে ছাতা বসানো হ'লে সেটিও  
এ-ওঘর হ'য়ে দাঁড়াল। আনুপ্রাকটিক্যাল হয়ে দাঁড়াল  
চমৎকার। এক অঘটন ইট কাঠ চুন স্রবির স্তরে।  
অঘটনের কোথায় “প্রবেশ নিষেধ?”

জামিয়ার মাসের প্রথম সপ্তাহে মন্দির গড়া সম্পূর্ণ  
হল। আমরা ডানলাভিন কটেজ থেকে ঠাকুরকে  
পারিতো চাড়িয়ে পাঁচ মাধায় ক'রে নগর সঙ্কীর্ণন করতে  
করতে এলাম ডানলাভিন কটেজ থেকে সোজা হরিহর  
মন্দিরে—হিন্দুরা-নিলয়ে। সে কী আনন্দ। আমরাও  
চলেছি—ঠাকুরও চলেছেন সঙ্গে সঙ্গে চিরসার্থী, নিত্য  
বন্ধু। রাস্তায় হিন্দুরা দুহাত ভূলে সে কী মনোহর নাচ।  
ভিড় জ'মে গেল দুধারে—কত লোক ছুটে এসে ওর  
পায়ের মুলো নেয়। থেকে থেকে ভাব সমাধি হয় ওর।  
ভাবগর সমাধি ভাঙলে ফের যাত্রা শুরু। আপ্তবাক্যে  
পাই—ঠাকুর “মুকং করোতি বাচালং পশুং লক্ষ্যতে  
গিরিম্”—আমি বাংলায় আখর জুড়লাম :

মুক হয় সদালাপী, পশু গিরিচূড়ে ধায়,

বিদেশও স্বদেশ হয় ঠাকুরের করুণায়।

ডন ও রিচার্ডকে লিখে দিলাম সবিস্তারে। ওরা  
মহানন্দে উড়ে এল শ্রীঅরবিন্দের জন্মোৎসবের ঠিক দুদিন  
আগে—১৩ ই আগষ্ট, ১৯৫৯। তারপরেই জন্মষ্টমী।

জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয়।

জয় হরি, জয় হরি, নাই নাই ভয়।

( প্রাক্ষমন্দির পূর্ণ সমাপ্ত )



# বঞ্চিতা

( গল্প )

আরতি বসু

এই এক বিধী ব্যাণার। প্রতিরাতে প্রায় একই সময়ে একটা হৃৎস্পন্দ দেখে আমার ঘুমের ভীষণ ব্যাঘাত হয়। ঘুমের মধ্যে অশ্রুভর করি কে যেন কাঁদছে। বালাশ অঁকড়ে ধরে, হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে। একটা চাপা আর্তনাদ কিংবা অস্বস্তিতে সমস্ত ঘরটা ভরে যায়। আমি বন্ধ দরজার দিকে রাখি। খুট্ করে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ হয়। শ্রীতা চমকে বলে—এই। আরও একটু ধেনে বলে, কোথায় যাচ্ছে? আমি কি অশ্রুভর হই? কি জানি! তাড়াতাড়ি মিথ্যা ভাষণ করি—বাথরুমে। ও বলে—ও দিকে কেন? বাথরুমের দরজা ভেদে এদিকে। আমি যেন বাস্তবে ফিরে আসি। ও তাই তো, ঘুমের ঘোরে ঠিক বুঝতে পারিনি। অনর্থক মিনিট পাঁচেক সময় বাথরুমে কাটিয়ে আমার আমবা রাত্রে শয্যায় আছড়ে পড়ি। আমার ঘরের হুপাশে দুটো দরজা। একটা দ্বিবে বাথরুমে যাওয়া যায়। আরেকটা দ্বিবে বাগানে। দোতলার সিঁড়িটা নেমে গিয়ে একেবারে যেখানে মিশেছে সেটাই আমার বাগান। কতকগুলো নামী আর অনামী ফুল আর তার সঙ্গে কিছু সবজির সারি। তার পাশেই ছোট্ট একটা ঘর। সেই ঘরেই...

সারাটা দিন আমি খুবই ব্যস্ত থাকি। একটা বেসরকারী অফিসে চাকরি করছি প্রায় বছর দশেক। অফিস যাওয়ার আগে আর অফিস থেকে এসে পর্যন্ত সমানে লিখে চলি। এতটুকু বিরাম নেই, এতটুকু বিশ্রাম। মাঝে মাঝে শ্রীতা এসে পাশে দাঁড়ায়। অল্পবোগ করে, অভিমান করে। বলে—কি এত লেখ, ছাইপাশ কিছুই বুঝনে। কিন্তু আমি জানি আমার প্রতিটি পত্রের প্রত্যেকটি চরিত্র ওর মুখ। সমস্ত হৃদয় ধরে শ্রীতা ওদের কথা ভাবে, ওদের

নিম্নে মনে মনে সমালোচনা করে, তাপর আমি কিবলে আমাকে এমন সব জটিল প্রশ্ন করে যে আমি বীভতমত ধতমত ধৈয়ে যাই। ভাবি, কে বলবে শ্রীতা একটা সমান্ত্র জ্বলে পড়া ধৈয়ে। বিস্তে যার প্রবেশিকার দরজা পর্যন্তও এগোয়নি। শ্রীতা আমারই লেখা থেকে মাঝে মাঝে আমাকেই উদ্ধৃতি করে শোনার—আচ্ছা, তুমি নিজের কাছ থেকে কেন একটু ছুটি নাও না বল তো? আমি সিগারেট পুড়িয়ে চলি, নিঃশব্দ প্রহর পার হয়ে যাই। কেন নিই না, সে কি নিজেকে জ্বলে থাকব বলে?

সত্যিই আমি বুঝনা কেন আমার জীবনে নিঃশব্দ ফেলবার পর্যন্ত এতটুকু সময় নেই। কোথাও কোন মুহূর্তকে আমি আমার জন্ত জ্বলে রাখিনি। সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরেও বাড়ী এসে আমি থাবার সময় পাই না। তাড়াতাড়ি কলমটাকে টেনে নিই। শ্রীতা হাত থেকে ওটা কেড়ে নেয়। বলে, দেখ তো হাতের শিরাগুলো কেমন জ্বলে উঠেছে। একটু পরেই না হয় লিখনা গো। থালায় সে যত রাজ্যের ভাল ভাল থাবার জড়ো করে রেখেছে। তারই একটা জ্বলে দিতে থাকে আমার মুখে। আর তখনই আমি এলিয়ে পড়ি। যে মনটার সঙ্গে এতকণ বৃদ্ধ করছিলাম সেটা হঠাৎ যেন বড় বেশী অবশ হয়ে পড়ে। আসলে ভেতরে ভেতরে আমি যে ভীষণ ক্লান্ত সেটাকে আর অস্বীকার করতে পারি না। শ্রীতার কোলে মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়ি। যখন ঘুম তাজে, দেখি ও আমার মাথার গায়ে পরম আবেগে হাত বুলায়ে দিচ্ছে।

এই শ্রীতা। আমার সমস্ত জীবনকে সমস্ত বস্তুকে পরম যত্নে ভরিয়ে রেখেছে। আমি নিজেকে একেবারে

হারিয়ে ফেলেছি। আমি কি চাই, কি না চাই কিছুই আজকাল আর বুঝতে পারি না। শ্রীতা যা দেয়, মনে হয় সেটাই চাইছিলাম এতক্ষণ; যা দেয় না, তাবি ওটার বোধ হয় দরকার নেই আমার জীবনে।

সত্যি বলতে কি জীবনে আমি শ্রীতার কোন তুলনা পাই না। শুধু আমার জন্তই নয়, সংসারের অন্ত মাছুষের জন্তও শ্রীতা ঠিক এমনি করেই ভাবে। এমনি করেই কাঁদে। সমস্ত দিন আমার কথা ভেবে ভেবে সারা হয়। রাজ্বেই কি ঘুমোতে পারে? পারে না। তখন ওর চিন্তা মালতীকে নিয়ে। বলে, লক্ষ্মীটি তুমি একটা ভাল ছেলে দেখনা গো। মেয়েটার সমস্ত জীবনটাই যে পড়ে আছে। আমি উত্তর করি না। পাশ ফিরে শুই। অন্ধকারে আমার মুখটাকে শ্রীতা দেখতে পার না। ভাবে স্তনতে পাইনি ওর কথা। তখন বাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর। আমাকে এপাশে ফিরায়। গলা জড়িয়ে বলে—আচ্ছা, ওয় কি সংসার করতে ইচ্ছে হয় না? ওর কি ভাল লাগা নালাগা বলে কিছুই নেই? বোঝ না কেন বল তো? আমি ন্নান হাসি। বলি, কি মুশকিল। আমি কি তাই বলেছি কোনদিন? আর তা ছাড়া...। শ্রীতাকে আরেকটু কাছে টেনে নিই, তারপর ওর কপালের চুলগুলো সারিয়ে দিতে দিতে বলি—তাহাড়া ও তো বেশ ভাল করেই সংসার করছে শ্রীতা। বাঁধছে বাড়ছে, ঘর দোর পরিষ্কার করছে, ঠাকুরঘর করছে, তুমি তো সংসারের চাবি ওর হাতেই তুলে দিয়েছ। তবে আবার নতুন করে সংসার কি করবে?

আমার অনভিজ্ঞতাকে ও যেন পরম ভূপ্তিতে উপভোগ করে। তারপর মন্তব্য করে, আচ্ছা কি বুঝি রে আমার—পরের সংসার বয়ে বেড়াবার জন্ত তো ঘুম নেই মেয়েদের! জান, তুমি মিথ্যেই বই লেখ। আসলে মেয়েদের মনকে তুমি কিছু বোঝানি, কিছু না।

আমি আর কথা বাড়াই না। যেন শ্রীতার কাছে হেরে যেতেই চাই। বলি—তা হবে। মনে মনে শুধু উচ্চারণ করি পরের? মালতী কি পরের সংসার করছে?

এইভাবে কথা বলতে বলতে কখন আমরা দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ি। অনেক রাত্তিরে ঠঠাৎ একবার ঘুম ভেঙ্গে যায়। মনে হয় কে যেন কাঁদছে। চুপি চুপি, খুব চাপা স্বরে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরোতে যায, শ্রীতা আমার হাতটা টেনে ধরে—এই, কোথায় যাচ্ছ এত রাত্তিরে? শ্রীতাকে আমি মনে মনে উত্তর দিই,—কোথাও আমি যাই না শ্রীতা, কোথাও যেতে আমার ইচ্ছাও হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝে.....মাঝে মাঝে সব যেন আমার কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

এই নিয়েই আমি বেঁচে আছি। আমার বেদনা, যন্ত্রণা, আমার ভালয় মন্দ মিলে মিশে। সংসারে হুটি প্রাণী। আমি আর শ্রীতা। আমাদের এখনও কোন সন্ধান হয়নি। অবশ্য ঠিক হুটি প্রাণী বলা যায় না। আরও একজন আছে। সে ঐ মালতী। ওকে কেন্দ্র করেই শ্রীতার যতকিছু ভাবনা। ও বছর দুয়েক হ'ল আমাদের সংসারে এসেছে। একা একা সমস্ত কাজ করতে শ্রীতার খুবই কষ্ট হািজল। মালতী আসার পর এখন একটু হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। শ্রীতা অবশ্য প্রথম প্রথম এমন কিছু কাজ ওকে দিত না। কিন্তু ও-ই আস্তে আস্তে সমস্ত সংসারের দায় দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিল। ও বোধহয় শ্রীতার চেয়ে দু-এক বছরের ছোটই হবে।

ইদানীং ওর বিয়ের জন্তে শ্রীতা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমি অকিস যাওয়ার সময় আমাকে জ্বালাতন করে মারে। আমি যেন সারাদিনে একটি ভালছেলের সন্ধান করে রাখি। এবং বাড়ী ফিরেই যেন মালতীকে সেই দুখবরটা দিতে পারি।

আমি হাসতে থাকি—আচ্ছা, অকিসে কি ঘটক মশাইদের মেলা বসেছে যে সেখান থেকে একটা খবর আনলেই হোল। কিন্তু কোন কথায় শ্রীতা স্তনবে না। বলে, এত বন্ধুবান্ধব, কেউ কি দিতে পারে না একটি ভাল সম্বন্ধ?

—পারবে না কেন? কিন্তু তোমার মালতী যে বিয়ে করতে রাজী হবে এমন কথা জানলে কি করে? শ্রীতা

ধমক দিয়ে ওঠে।—খাম। তোমাকে আর সন্ধানি করতে হবে না। মালতী কি চায় না-চায় আমি তোমার চেয়ে ভালরকমই জানি। এখন তোমার যা বলছি তাই কর। আমি আর বাঁকতাবাদ করি না। মুখে বলি—আচ্ছা। বলেই তাড়াতাড়ি পথে বার হই। বাড়ি তো আর আমার জন্মে বসে থাকবে না।

বলা বাহুল্য সারাদিন অফিসে আমি একটি ছেলেরও সন্ধান করি না। কারণ, শ্রীতা না জানলেও আমি জানি যে মালতী বিয়ে করবে না, করতে চায় না, করতে পারে না—

অফিসের অনেকগুলো কাজ পড়ে আছে। আমি খুব তাড়াতাড়ি টাইপ করে চলি। একটার পর একটা কাগজ সরে যায়। নতুন কাগজ আসে। কাগজ নয়, সরতে থাকে আমার অতীত দিনের ছবিগুলো। ঠিক ছায়াছবির মত ভেসে উঠতে চায় চোখের সামনে। আমার বাড়ী, সেখানকার গ্রাম, সকাল, সন্ধ্যা, রাঙির আর, আর হুটি ছেলেমেয়ের নিশাপ হুটি মুখ—মানস আর মালতীলতা।

মালতীলতা! নামটা বারবার মনে মনে উচ্চারণ করি। ভূপ্তি পাঠ, আনন্দ হয় প্রাণে। অনেকদিন ঐ নামটা উচ্চারণ করিনি যে। প্রায় দু-বছর। যেদিন থেকে মালতী এ বাড়ীতে এসেছে। আমার কাছে। ভাল বলছি, কাছে নয়, সংসারে। কারণ, এখানে আসার পর থেকে ও বরং দূরেই সরেছে বেশী। এমনকি অনেকদিন হুজনের দেখা সাক্ষাৎ-ও হয় না। ওর সেই সকাল থেকে কাজ। এটা করা, ওটা করা, যেন কুতোতেই চায় না, আর আমারও তাড়া—অফিসের তাড়া, জীবনের তাড়া। তাড়াতাড়িই এই জীবনটাকে বুঝি শেষ করতে চাই। তাই বিশ্রাম নিই না এতটুকু, কোনরকমে নাকেমুখে গুঁজে বোরিয়ে পড়ি। ফিরি সেই সন্ধ্যাবেলা। এসেই কলমটাকে ডুলে ধরি।

অবশ্য ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্ত আমি ব্যস্ত ও হই না, কারণ, মনের মধ্যকার সেই তারিগটুকুকে সেই

হুবহু আগেই বিসর্জন দিয়েছি যে। ওর কাছে প্রতিশ্রুতি হয়েছি, সারাদিন ওর সঙ্গে কথা বলবনা, ওর দিকে তাকাব না। ওকে যে একদিন চিন্তাম এ কথা ভুলে থাকতে হবে আমাকে প্রতিমুহুর্তে। আমি এতদূর প্রতিজ্ঞা করতে রাজী হইনি, কারণ, জানি একই ছাদের তলায় থেকে এতটা উদাসীনতা সম্ভব নয়। আর তাছাড়া তাতে শ্রীতার মনেও কোন বেথাপাত করতে পারে। তার চেয়ে এই-ই ভাল। অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া হুজনে মুখোমুখি হব না। আর ঠিক এই কারণেই বোধহয় আমি অফিসে ছুটে আসি এত তাড়াতাড়ি। আসলে ওর সামনে থেকে সরতে পারলেই আমি ওর মুখোমুখি বেশী করে হতে পারি। ও তখন আমার সঙ্গে কত কথা করি। আমি উত্তর দিই খুব আন্তে আন্তে। পাছে শ্রীতা শুনতে পায়। মালতী জিজ্ঞেস করে, আমাকে ভুলে থাকতে কি তোমার কষ্ট হচ্ছে? আমি বলি—কষ্ট হচ্ছে কি? কই না তো। আসলে তুমি বোধহয় পুরুষ মানুষকে ঠিক চেন না মালতী। ওরা সব পারে। সব, সব। তাই একটা মেরেকে ভুলে যাওয়া ওদের পক্ষে এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। তারপর নিজের মনেই ধিকার আসে। দূর, কোথায় শ্রীতা। আর শ্রীতা কি এসব নিয়ে মাথা খামায়? অমন সরল স্তম্ভর মেয়ের তুলনা আমি তো আর কোথাও দোঁধানি। তা না হলে সেবারে যখন ওর ছোট ভাইয়ের টাইকয়েড হয়েছিল তখন ও প্রায়ই সকালের দিকে মালতীর হাতে আমার সব দায়িত্ব ভুলে দিয়ে বাপের বাড়ী চলে যেত। ও তো আমাদের সঙ্গেই করতেও পারত। কিন্তু করে নি। ওর আচরণে আমি বারবার সেই সরলতার প্রকাশ লক্ষ্য করেছি। অথচ আমি? প্রতিদিন অভিনয় করে চলছি সরল সাজার। একবার শ্রীতাকে ভুলে থাকছি, আর একবার মালতীকে।

মালতী শ্রীতার বিশ্বাসের মর্যাদা সত্যিই রেখেছিল। কিন্তু আমি কি পেরেছিলাম? শ্রীতার রাঙির ফেরার সুযোগটুকু নেব বলে সে ক'দিন হুপুরেই ফিরে আসতাম। অসময়ে আমাকে আসতে দেখে মালতী অবাক হতো,

ভয় পেতো। জিজ্ঞেস করত—এখন? অসময়ে যে। আমি বলতাম—এমনই। মালতী খুঁড়ায় খুঁড়টা ফিরিয়ে নিত। বলত, হিঃ। কাজকে কীকি দিয়ে এমন প্রগতিকে প্রশংসা দেওয়া কি ভাল? আমি বলতাম—কিন্তু...। আমার বক্তব্যকে মালতী মাঝপথে ধামিয়ে দিয়ে বলত—কোন কিন্তু নয়। কাল থেকে এমন কাজ আর কোরনা। তারপর ধীরে ধীরে চলে যেত আমার সামনে থেকে। আমি বিছানায় এলিয়ে পড়তাম। একটু পরে কিছু খাবার আমার টেবিলের ওপরে রেখে যেত। জলটা সমস্ত চাপা দিয়ে রাখত। আমি দুহাত দিয়ে কপালটাকে চেপে ধরতাম। উঃ, কি অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। সমস্ত শরীর যেন অপমানে পুড়ে যাচ্ছে। একবার আর্তনাদ করে উঠতাম—মালতী! মাথাটা একটু টিপে দেবে? বিশ্বাস কর, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার। আশ্চর্য্য কঠিন দেখাত মালতীকে। বলত, মাথার যন্ত্রণাটা এ সময়ে অফিসেই হবার কথা। আর তখন নিশ্চয়ই টিপে দেবার কোন লোক পাওয়া যেত না। সেই রাত্তির পর্যন্ত মাথাকে অপেক্ষা করতেই হতো। আজও তাই হোক—বতকণ না বোঁদি কিরে আসে।

আমি অবাক বিস্ময়ে শুক হয়ে যেতাম। এই কি সেই মালতীলতা! যে আমার জন্ম তার সমস্ত জীবনটুকু দিতে রাজ্য ছিল? না, না, ছিল নয়, এখনও আছে। কিন্তু শ্রীতার সামনে, আড়ালে নয়। শ্রীতার বিশ্বাসকে ও ঠকতে দেবে না এই-ই ওর জীবনজোড়া পণ। আমাকে তাই আমার প্রতিজ্ঞার কথাটাকেই মালতী বারবার মনে করিয়ে দেয়। ও আর আগের মালতীলতা থাকবে না, ও হবে আমার আশ্রিতা মালতী। কিন্তু আশ্চর্য্য, ওর এত কঠোরতাও আমাকে হুমতে পারেনি, আমি আবার পরদিনও তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলাম। আর ওর চোখের দিকে তাকিয়েই নিশাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমি জানতাম, আমার বাড়ী বলেই মালতী আমাকে চুকতে দিতে বাধ্য, তা না হলে ও সেই মুহূর্ত্তেই আমার মুখের ওপরে দরজা দিয়ে দিত। সেদিন মালতী কোন কথা না বলে সরে দাঁড়িয়েছিল। আমি বলেছিলাম,

আজকে একজন অফিসের স্টাক মারা যাওয়াতে... ও গভীর হয়ে বলল, আমি তো কৈফিয়ৎ চাইনি। শুধু পায়ে ধরে তোমার কাছে একটা অনুরোধ করছি, ভূমি এমন কিছু কোর না যাতে তোমার ওপর আমি শ্রদ্ধা হারাতে পারি। তোমার ওপর আজীবন শ্রদ্ধা নিয়েই আমার পৃথিবী থেকে চলে যেতে দাও।

এর পরের দিন আমার সত্যিই তাড়াতাড়ি ছুটি হবার কথা। সেদিন শনিবার। কিন্তু আমার বাড়ী যাবার নিজস্ব অধিকারকে তবু বিসর্জন দিতে হ'ল। এর পরেও কি হ্যাংলার্মি সাজে? তাই বতকণ না শ্রীতা ফেরে আমাকে বাইরেই কাটাতে হ'ল।

সেদিন রাত্তিরে আমি শ্রীতাকে অনুরোধ করলাম যে, যদি তাই ভাল থাকে তাহলে আর পরদিন যেন ও না যায়। আসলে পরদিন ছিল রবিবার। তাই সারাদিনের সেই ভয়াবহতার কথা ভেবেই আমাকে সাবধান হতে হ'ল। বলা বাহুল্য, দ্বীপ প্রাতি এই আকর্ষণ শ্রীতাকে গণিতই করল। পরম নিশ্চিন্তে ও ঘুমোতে পারল। অথচ আমাকে ভেগে থাকতে হ'ল সারারাত। আমার ওপর মালতী যতই শ্রদ্ধা হারাচ্ছে নিজের ওপর বিশ্বাস যেন ওর ততই বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ তো হতে পারে না। মালতীকে আমি কিছুই দিতে পারিনি। শুধু ঐ শ্রদ্ধাটুকুকে সঞ্চল করেই ও এ বাড়ীতে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে। তা ঐ শেষ সঞ্চলটুকুও যদি কেড়ে নিই তাহলে আমি বাঁচব কি করে? মালতীর কাছে যে আমার আর কোন মূল্যই থাকবেনা।

আবার ভাবি, মালতী কি আমাকে সিংহাসনে বসিয়ে তার এই শ্রদ্ধাটুকুকে সত্যিই নিবেদন করতে চায়, না কি আমার প্রগতিকে পথের ধূলোয় নামিয়ে শ্রীতার গায়ে সেই প্রতিশোধের ধূলো মাখিয়ে দিতে চায়? হয়তো এতসব কিছুই চায় না। মালতী চায় শুধু আমার অত্যাশ্রয়ই প্রতিদান দিতে। তাকে রাজার মত বা দিতে পারিনি, ভিখিরি হয়ে সেটুকু চেয়ে নিতে সে স্বপ্নাবোধ করে!

একদিন খেলাডলে যে সিঁহর তার সিঁথিতে ঐকে

দিরেছিলাম তাকেই মালতী জীবনের সর্ব্ব বলে ধরে নিয়েছিল। অথচ আমার কাছে তা ছিল নিতান্তই অভিনয়।

তাই কবেকার সেই মালতীলতার কাছে শপথ করা হৃদয়টা বোবনের দরজায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। মালতী অভিনয়-জড়িত কর্তে ছোট্ট একটা কৈফিয়ৎ চাইল। তার সঙ্গে এমন হলনা কেন করলাম। আমি অবাক হলাম। হলনা তো নয়। সেদিনের সেই ঘটনা, সে তো একটা অভিনয় মাত্র। অভিনয়? মালতী যেন পাষণ্ড হয়ে গেল।

মামারবাড়ীর সেই গ্রামে হুজনে ছেলেবেলায় কত খেলা করেছি। পাড়ার যখন খিয়েটার হতো, মালতী আর আমি সামী-স্ত্রীর পাট নিয়েছি। কত ফাগ পরিষে দিইয়েছি ওর সিঁথিতে। এমন করেই কবে হুজনার হৃদয় হুজনার কাছে বাঁধা পড়ে গেছে! তারপর একদিন সত্যি সত্যি খানিকটা সিঁহুর নিয়ে ওর মাথায় দিয়ে দিইয়েছিলাম। মালতী অক্ষুটে আর্তনাদ করেছিল—তুমি এ কি করলে মানস। এ তো ফাগ নয়, এ যে সিঁহুর। আমি বললাম—তোতে কি হল? এ তো তোমায় কত পরিষেছি, তখন তো আপ্যন্ত করনি? ও খুঁপিয়ে কৈছেছে, বলেছে—তুমি কিছু বোঝ না মানস, কিছুই বুঝতে চাও না। তোমাকে আমি কেমন করে বোঝাই মেয়েদের হুবার সিঁহুর পরতে নেই। আমি তখন কেমন যেন হয়ে গেলাম। মুখে বললেও মনে মনে জেনেছিলাম, আমার সেদিনকার সেই আচরণটাতিক অভিনয় ছিল না। আমি বুঝি সত্যি সত্যিই সে রকম কিছু একটা চাইছিলাম। না হলে আঠারো বছরের একটা তরুণ কি সিঁহুর আর ফাগে পার্থক্য সত্যিই বুঝতে পারে না।

হঠাৎ জান যেন হারিয়ে গেল। মালতীকে আকর্ষণ করলাম সজোরে। বললাম—মালতী, তোমার ভয় নেই, তোমার মানস কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করবেনা। মনে যেন, আমি চিরকাল তোমারই থাকব। আজ বেশ বুঝতে পারি, মালতী সেদিন আমার কথা এতটুকুও বিশ্বাস করে নি। মুখে বলেছিল—কিন্তু আমার কি

হবে মানস? আজকের এই স্বীকৃতি আমি কেমন করে পাব? কে আমার এই পবিত্র ঘটনার সাক্ষী থাকবে?

আমি বলেছিলাম কেউ নয় মালতী, কেউ নয়। তার দরকারও নেই। হুটো হৃদয়ের স্বাক্ষরই যে সবচেয়ে বড় কথা।

তারপর কালের হাওয়ায় সেই স্বাক্ষর কবে মুছে গেল। আমি লেখাপড়া শিখে চাকরী নিয়ে কলকাতা চলে এলাম। মামার বাড়ী, সেই গ্রাম, সেখানকার মালতীলতা আন্তে আন্তে আমার জীবন থেকে সরে দাঁড়াল।

মালতী ছিল আমার দ্বিদিমার আশ্রিতা। গঙ্গাসাগর মেলা দেখতে গিয়ে দ্বিদিমা এই মেয়েকে খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই মেলায় বাবা-মাকে হারিয়ে অঝোরে কাঁদাছিল মালতী। দ্বিদিমা দেখতে পেয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। তারপর অনেক চেষ্টা করেও মালতীর বাবা-মার খোঁজ-খবর দ্বিদিমা পাননি। পাঁচ বছরের মেয়েও একদিন পরিবেশের চাপে পড়ে বাপমাকে ভুলে গেল। সেদিন থেকে আমার দ্বিদিমাই হলেন একাধারে ওর মা বাবা। অজ্ঞাতকুলশীলার্তার আশ্রয়েই লালিতা হতে লাগল।

খুব ছেলেবেলার মালতীকে আমার ঠিক মনে পড়ে না। এগারো বছরের কিশোরী শরীরটাই আমার মনে বেশী প্রভাব ফেলেছিলো। তখন আমি প্রায়ই মামাবাড়ী গিয়ে থাকতাম। ওকে দেখতাম; ওর সঙ্গে খেলা করতাম, পাড়ার স্বাভাবিক হুজনে যোগ দিতাম। ও আমার চেয়ে বছর চারেকের ছোট্টাছিল বোধহয়। সমস্ত হুপুর্টা হুজনে মিলে পরের বাগানের কল চুরি করে খেতাম। কাঁচা আম পেড়ে ওকে দিতাম, মালতী দ্বিদিমার রান্নাবর থেকে কাঁচালুকা, হুন, তেল সব নিয়ে আসত। সবকিছু মিশিয়ে পরম তৃপ্তিতে হুজনে আচার খেতাম। আমার মায়েরা এক ভাই, এক বোন। মামার বদলীর চাকরী। তিনি কোন সময়েই বাড়ীতে থাকতেন না। বিয়েও করেননি। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালবাসতেন।

সেইসব ছেলেবেলায় দিনগুলো একসময় আঙে আঙে ঝিমিয়ে এসেছিল। চাকরী পাবার পরে মামাবাড়ী যাওয়া আর খুব বেশী হয়ে উঠত না বছরে একবার যেতে পারতাম তি না সন্দেহ। যখন যেতাম, মালতীর সে এক অল্প মৃতি। একটাও কথা বলত না। সমস্তদিন রাজ্যঘরে থাকত। পরিবেশন করার সময় মাত্র একবার দেখা পেতাম। আমার অন্তরের ভিতরকার বিবাসঘাতক শয়তানটাকে যেন ও দেখতে পেত। আশ্চর্য্য কোনরকম কৈফিয়ৎ দাবী করত না আমার কাছে। আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারতাম না দ্বিদিমা কেন ওর বিয়ের চেষ্টা করেন না। অজ্ঞাতকুলশীলা বলে কি কেউ রাজী হত না, নাকি ওই দ্বিদিমাকে বারণ করেছিল? তারপর একদিন আমাকে সেই ভয়ঙ্কর প্রেমের সম্মুখীন হতে হল। থবর এল দ্বিদিমার খুব অস্থখ। বাঁচবার আশা নেই। মাকে নিয়ে সেই রাতেই চলে গেলাম। তিনদিন যমে মাহুবে টানাটানি, তারপর সব শেষ। মা ভো কেঁদে কেঁদে প্রায় অচৈতন্য। মালতী কিন্তু পাষাণ প্রতিমা। আমি তো জানি মালতীও দ্বিদিমার আরেকমেয়ে। কিন্তু জীবনে বিচলত হওয়া ওর যেন বারণ ছিল। শ্রাদ্ধশাস্তি চুকে গেলে একদিন দুজনে বুঝোবুঝি হলাম। স্বান সেরে পুকুরঘাট থেকে উঠে আসছিল। আমি বাগানে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছিলাম। গেই অবস্থায় মালতী একটু এগিয়ে এল। আমার চোখে হির দৃষ্টি তুলে ধরলে। বললে, এতদিন পরে একটা কথা যদি বলি বোধহয় আমার অন্তর কিছু হবে না। মালতীর হৃ চোখের ওপর দৃষ্টি রেখেই বললাম—বল। মালতী একটু ভাবল, তারপর খুব ধীরে ধীরে বলল, এখন আমি কোথায় বাব? শুনেছি বিয়ে করেছ কিছুদিন হল। স্বীর সম্মান আমার প্রাপ্য নয়। কিন্তু বাড়ীতে দাসী রাখারও প্রয়োজন হয়।

আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল। আমি আতঁনাদ করলাম—মালতী!

মালতীকে তখন খুব পরিচয় আর স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিল। আমি যেন ওর কপালে আর সিঁধিতে কেমন একটা

লালচে আভা দেখলাম। সেটা কি আমারই দেওয়া সেই স্বীকৃতি? মনে মনে কবেকার সেই কথাটা উচ্চারণ করলাম। মনে যেন তোমার মানস কোনদিন তোমার সঙ্গে বিবাসঘাতকতা করবে না। আমাকে আকাশ পাতাল চিন্তা করতে দেখে মালতী জিজ্ঞেস করলে—তোমাকে বিপদে ফেললাম? বুঝেছি, বৌদির কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার কথা ভাবছ; বেশ তো, তাঁকে বোলো, দ্বিদিমার বাড়ীতে যে কাজ করত সে আমাদের বাড়ী কাজ করতে চায়।

আমি হির, নিম্পন্দ, নিশ্শব্দ। অতি কাশ্মিত কণ্ঠস্বরে শুধু উচ্চারণ করলাম—মালতী, আমাকে তুমি আর কত ছোট করে দিতে পার, বলবে?

মালতী আর দাঁড়াল না। যেতে যেতে বলে গেল—কাউকে ছোট করে আমার স্মৃতি নেই, কিন্তু আমি জানি এর চেয়ে বেশী সম্মান আমার প্রাপ্য নয়।

মনে আছে মালতীকে কয়েক দিন পরে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলাম। তার জন্ত শ্রীতাকে কি কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল আজ আর স্মরণে নেই। শুধু এটুকু জানি, মালতী নিজেকে দাসী মনে করে এ বাড়ীর সমস্ত কাজ মাথায় তুলে নিয়েছে, অন্তর্দিকে সংসারের চাঁচকাঠি তার হাতে তুলে দিয়ে মালতীকে পরম সম্মানে সম্মানিত করতে শ্রীতা এতটুকু বিধা করেন।

এই মালতী। একেই আমি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে নতুন করে আবিষ্কার করেছি। যত দেখেছি ততই বিস্মিত হয়েছি। বুঝেছি প্রতি, পলে পলে এই একটা মেয়ের কাছে আমি কি অস্বাভাবিক অপমানিত হয়ে চলেছি। শ্রীতা তার স্বামীকে যেমন শ্রদ্ধার আসনে বাসিয়ে রেখেছে, এই মেয়ে তেমন ভাবেই সেই আসনটাকে ধুলোয় ঠেলে নামিয়ে আনছে। সিংহাসন আর পথের ধুলো—এ হুটোর টানা পোড়েনে আমি শুধুই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ছি।

অজান্তে যদি মালতীর ঘরে চুকে পড়েছি, আমাকে যেন চোর হতে হয়েছে। আমার সঙ্গে কথা বলেনি ও। হৃদয় মনে করে স্থগার প্রাণ সরিয়ে নিয়েছে।

আশ্চর্য্য। আমি কিছুতেই এতদিন জানতে পারিনি যে, যুগে কোন কথা না বলেও নীরবে এতটা প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হতে পারে।

আমি এখন শ্রীতার পাশে শুয়ে আছি। শ্রীতার ভালবাসায়, শ্রীতার দরদে, শ্রীতার আবেগের আলিঙ্গনে আমি আবদ্ধ। কিন্তু কি ভীষণ খারাপ আমার লাগছে আমি বলে বোঝাতে পারব না। কেন আমি আমার শ্রীর সঙ্গে প্রতিরাতে এই মিথ্যাভাষণ করছি? আমি চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে বাগানে ঘাবার দয়াকর হাত রাখব অথচ শ্রীতা ভাববে ঘুমের ঘোরে আমি খুব বাথরুম চিনতে ভুল করছি। নিজের সঙ্গে এই মিথ্যা-চোরের যে কি প্রয়োজন তাও আমি বুঝতে পারি না। শুধু মালতীকে আমার বলতে ইচ্ছে করে, তুমি অত রাতে কেন অমন করে কাঁদ মালতী? সুপিয়ে সুপিয়ে, চাপা ঘরে? বোঝনা কি আমি শ্রীতাকে জড়িয়ে ধেকেও তখন কোন মতে, কিছুতেই ঘুমোতে পারি না? আকাশ-কাঁপা তোমার আর্তনাদে আমার সমস্ত সাধের সংসারটা যে ছারখার হয়ে যায়।

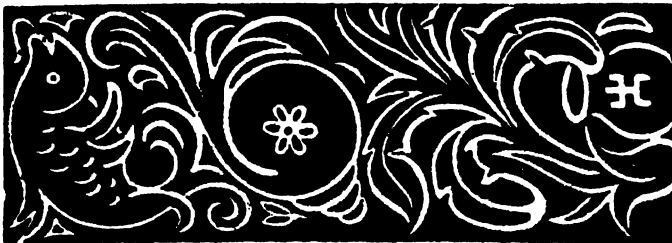
আমি ঘুমোতে চেষ্টা করি। মনকে বোঝাই মালতী কাঁদে না। কাঁদতে পারে না। কেবলই তার মানসকে কাঁদিয়ে নিয়ে স্থখ পায়।

কাল সকালে ভাবছি শ্রীতা ওঠার আগেই অফিস চলে যাব, তা না হলেই আবার সেই এক কথা গুনতে হবে।—ঘেরেটার জন্য কিছু ঠিক করলে? আচ্ছা, তুমি এত পাষণ কেন বল ত? ও যে কেমন হয়ে যাচ্ছে দিনদিন। ওর কি সংসার করতে ইচ্ছে হয় না? মালতী

কি বাকিতা হয়েছে থাকবে সারা জীবন? বিশ্বাস কর, বাড়ির তোমার কাছে শুতে আসতে আমার ভীষণ খারাপ লাগে; মনে হয়, ও যে একলা ঘরে একলা আছে গো।

আমি তখন কি করবো? সব কথা কি শ্রীতাকে খুঁসিয়ে বলতে পারব? পারব না। কারণ, সে সাহস আমার নেই। গোপনে শুধু উচ্চারিত হবে কণ্ঠি কথা। এ সংসারে কে বাকিতা শ্রীতা। তুমি না মালতী? মালতী-ই যদি হয় তবে আমি কেন সারাকণ, সারাবেলা শুধু ঐ ঘেরেটাকেই চিন্তা করে চলেছি? যে স্বামীকে পেয়ে তোমার জীবনের সকল পাওয়া পূর্ণ হয়ে গেছে, যার পাশে শুতে আসতে তুমি ওরই জন্যে লজ্জা পাও, জান না তোমার সেই স্বামী মালতীরই পাশে শুয়ে আছে।

তুমি ভাবছ, মালতী জীবনে কিছু পেলেন না, তাই ওর জন্যে এত চিন্তা করে মরছ। মালতীও হয়ত তাই জানে। শুধু আমারই জানা নেই তোমাদের ভেতরে আসলে বাকিতা কে। যাকে পুরোপুরি পেলেন তোমরা দুজনেই বন্ধনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যেতে, সেই মানুসখটাই যে তোমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু। তবু বলব, তোমার জন্যেই আমার বেশী দুঃখ হয় শ্রীতা, তুমি তো জান না যে এ সংসারে আশ্রয় দিয়ে তুমি যাকে করুণা করে চলেছ, এর চেয়ে অনেক বড় আশ্রয়ের মালিক সে আগে থেকেই হয়ে আছে। তবে জ্ঞাত্য এই, সে কিন্তু তোমাকে করুণা করতে সাহস করে না। কারণ, এই সত্যটুকু তার নিজেরই জানা নেই।





# ৰাজমাতা\*

( ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ বে, জ্যৈষ্ঠ ১২৬৬ )

জ্যোতিৰ্ময়ী দেবী

জ্যোত্ৰেৰ উজ্জল দিন। তাৰা তৰা নিৰ্মল আকাশ।

বনে বনে শুকু ৰাত। গাহে গাহে পাতার পাতার হিৰ হয়ে  
বয়েছে বাতাস।

প্ৰাক্তন প্ৰত্যন্ত ভাগে ক্ষুদ্ৰ গৃহে একখানি,

ৰাজী কোলে সুপ শিশু পাশে মাতা ফুলঠাকুৰাণী।

সহসা ছুয়াৰ প্ৰান্তে ডাকে পৰিজন

‘আজ যট দিবসেৰ ৰাত—

এখানে পিঁড়ার পৰে বাখিলায় ভাল পাতা মসী ও লেখনী।

ওৰে ৰাজী, আগিবেন ৰাতা—তোৰ কোলে এবে শিশু। লেখা হবে  
ভাগ্যলিপি।

আজ মেবেনা মঙ্গলদীপ যেন। বুঝায়ো না ৰাজী ও জননী।’

কোলে শিশু। নিছাড়ৰ-নেত্র ৰাজী। পাশে মাতা শয্যাপৰে।

ভৈল পূৰ্ণ মঙ্গল প্ৰদীপ জ্বলিতেছে কাণিতেছে কড় থৰ থৰে।

প্ৰাক্তনে প্ৰহর গৌনে নিছাহীন ৰাত।

অকস্মাৎ ছায়াময় কে আসে পুৰুষ।

নিল কি লেখনী হাতে—

কি লেখে? কোথায় লেখে? ভাল কিংবা ভালপত্ৰে,—

—“মোচন কৰিও বৎস, ধৰ্ম আৰু সমাজেৰ বৃদ্ধ আচাৰ কলুষ”—

‘জালিয়ো জ্ঞানেৰ দিব্য আলো’ দেশে।

অৰ্দ্ধ সুপ মাতা। শিয়ৰে দাঁড়ান বুৰি ৰাতা।

কহিলা, ‘পুত্ৰ তোৰ ৰাজা হবে। ভূমি ৰাজমাতা।’

ৰাতাসে কাণিল দীপ থৰ থৰ।

নিছা টুটে মার।

কাৰ ৰাজ্য। কোথা ৰাজ্য! কোথা ৰাজা প্ৰজা। ক্ষুদ্ৰ প্ৰায় থৰ।  
দেখেছে স্বপন।

কোথা লেখা? হাসিল জননী।—ৰাজী কোলে হাসে সুপ শিশু?

ৰাজমাতা? ৰাজশিশু?

ওৰে এই মোৰ মহাৰাজ্য ধন। কোলে লয়ে মাতা ভায়ে কৰিল চুবন।

\* ৰাজা ৰামমোহনেৰ জননীৰ নাম ছিল তামিৰণী দেবী। কিন্তু তিনি ফুলঠাকুৰাণী নামে খ্যাত ছিলেন। দেশীয় সংস্কাৰ আছে শিশুকন্যেৰ হৃদিনে যেটোৰ পূজা হয় ও বিধাতা পুৰুষ নব জাতকেৰ ভাগ্যলিপি লিখেতে আসেন।

# রামমোহন বিদ্যেশ্বর মূল অনুসন্ধান

অ. চ.

রাজা রামমোহন রায় যুগ-পরিবর্তক মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি ভারতের নব জাগরণের আকাশে উদীয়মান সূর্য্যের মতই আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার আলোকে জাতীয় চরিত্রের বহু অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে সূচিকার বিকাশ সতেজ ও সহজ হইয়াছিল। ভারতীয় হিন্দু জাতির জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে যে নূতন প্রেরণার উত্থান তাঁহার মূলে রহিয়াছে রাজা রামমোহনের সমাজ ধর্ম ও রাষ্ট্রীয়-সংস্কারের বহু ধারাবাহিত বিবর্তক ও প্রচেষ্টা। হিন্দুধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থাদি বাংলায় প্রকাশ করিয়া তিনি নিজ জাতির সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে ভারতের প্রাচীন গৌরব ও ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে শিখাইয়াছিলেন। প্রাচীন, মুসলমান এবং বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান প্রগাঢ় ছিল এবং ভারতের যে সকল ব্যক্তি হিন্দু ছিলেন না তাঁহারাও রাজা রামমোহন রায়ের জাতীয় জীবন ক্ষেত্রের অন্তর্গত। দ্বারা সকল বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের পথে চলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বর্তমান বৎসরে রাজা রামমোহনের বিশতবার্ষিকী জ্যোৎসব অতুলিত হইতেছে এবং সর্বত্রই ভারতের সকল দেশ ও জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সেই অতুলন যাহাতে যথার্থ ভাবে সম্পন্ন হয় সেই চেষ্টা করিতেছেন। শুধু পশ্চিম বঙ্গের অগ্রসংখ্যক কয়েকজন ব্যক্তি এই প্রদেশের রামমোহন-বিষয়বাদের মুখপাত্র হইয়া রামমোহন-বিরুদ্ধতা প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালা দেশে বহুকাল ধরিয়া বাহারা রামমোহনের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করিয়া নিজ নিজ জীবনে সেই আদর্শ উপলব্ধি চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা সংখ্যায় অগণিত। জাতীয় কৃষ্টি, জ্ঞান ও কর্মক্ষেত্রে বাহারাই ব্যাতি অর্জন করিয়াছেন প্রায় সকলেই রামমোহনের প্রতি অপেক্ষ

ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। একথা বলিতে কোনও বাধা থাকিতে পারে না যে, রাজা রামমোহন রায় যদি এই দেশে না জন্মাইতেন তাহা হইলে জাতীয় নব জাগরণ বহুকাল অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বাদশী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি বহু মহামানবই রামমোহন রায়ের প্রভুপ্রেরণায় নিজ নিজ পথ গুঁজিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অপর যে সকল খ্যাতিনামা ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পথ অনুসরণে অগ্রসর হইয়া জাতীয় জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের নাম কদা এই স্থলে সম্ভব নহে। তবে শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার, বহুনাথ সরকার, ব্রজেননাথ শীল, অধিনীকুমার দত্ত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ও আরও বহু সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, বিপ্লবী ও সমাজ সংস্কারক বিগত এক শত বৎসরের মধ্যে জাতীয় জীবন ক্ষেত্রে গঠনমূলক কার্যের জন্ত চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন ও তাঁহাদিগের নাম রামমোহন-ভক্তদিগের মধ্যে উল্লেখ করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

রামমোহন-বিষয়বাদের মূল কারণ হইল, কোন কোন ব্যক্তির উপকার প্রাপ্তি স্বীকার না করিবার মিলনীয় আবেগ। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন যে, নিম্নকরণ প্রায় সর্বত্রই বাহাদের দ্বারা উপকৃত হয় তাহাদেরই মিন্দা করিয়া নিজেদের আত্মসন্ধান বোধ অকুর ধারণার চেষ্টা করে। আমাদের দেশেও অকৃতজ্ঞতাপূষ্ট কিছু কিছু মানুষ দেখা যায়। তবে তাঁহাদের সংখ্যা অল্প।

রামমোহনের কীর্তি, মতামত, জন্মের তারিখ প্রভৃতি লইয়া তাঁহারা যে আলোচনার উত্থাপনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা তাঁহাদের স্বভাবজাত উপকার-স্বীকৃতির অনিচ্ছা উদ্ভূত। এই অকৃতজ্ঞতার বিব এতই প্রকটভাবে প্রদর্শিত হইতেছে যে, তাহাতে দেশবাসীর মধ্যে রামমোহন সম্বন্ধে উচ্চ ধারণার কোন লাভ নাই হইয়া ঐ সকল নিম্নকৃৎসিতের প্রতিই স্থণার ভাব প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

রাজা রামমোহন রায়ের ঠিকট আমরা শুধু সমাজ সংস্কার ও ভারতের প্রাচীন জ্ঞান ও কৃষ্টির পুনরুদ্ধারের জন্যই স্বীকৃত নহি; আমরা তাঁহার অনুপ্রেরণাতেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জীবনযাত্রা নির্বাহ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অবলম্বন করিতে শিখিয়াছি। তিনি একাধারে প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলিকে শুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়া আমাদের নিজ ঐতিহ্য সম্বন্ধে জাগ্রতদৃষ্টি হইতে শিখাইয়াছিলেন এবং সেই একই সময়ে পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতি বর্জন করিয়া নূতনের সন্ধানে ইয়োরোপীয় আদর্শের ক্ষেত্রে প্রেরণা অনুসন্ধানে যাইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি রাষ্ট্র ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, স্বাভাবিক ও আত্মপ্রতিষ্ঠাকে জাতীয়তার সারবস্তু বলিয়া প্রচার করিয়া সর্বপ্রথমে আধুনিককালে দেশাস্ববোধকে ভারতের মানুষের নিকট উচ্চ আদর্শের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইয়োরোপে একটা সময় গিরিয়াছিল যখন শিক্ষিত মানুষ ল্যাটিন ব্যতীত অন্যভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিত না। মাতৃভাষা শুধু অশিক্ষিতজনের দৈনিক জীবনযাত্রার বিষয়ে অতি সাধারণ কথাই ব্যবহৃত হইত। পরে দীর্ঘকাল বহু চেষ্টার ফলে ইয়োরোপের কথিত ভাষাগুলি প্রকৃষ্টরূপে গঠিত হইয়া উচ্চাঙ্গের আলোচনার ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করে। রামমোহনের সময়ে এদেশে বাঙ্গালা ভাষা কেহ স্বাধা

ভাবে ব্যবহার করিতে সক্ষম ছিলেন না। আইন আদালত অথবা অন্য উচ্চস্তরের আসরে কেহ বাঙ্গালা ব্যবহার করিত না। পণ্ডিতজনের মধ্যে সংস্কৃত এবং দরবার বা আদালতে ফারসী প্রচলিত ছিল। ইংরেজী ব্যবহার প্রায় হইতই না কেননা ইংরেজী শিক্ষা তখনও ঠিকমত আরম্ভ হয় নাই। বাঙ্গালা পণ্ড চলিত কিন্তু গম্ভ আড়ম্বভাবে সংস্কৃতের অনুকরণে লেখা হইত। এই কারণে রামমোহন যখন পুস্তিকা প্রণয়নে নিযুক্ত হইলেন তখন তাঁহাকে উপযুক্ত গম্ভ ভাষা সৃষ্টি করিয়া লইতে হইল। তাঁহার গম্ভ রচনা পণ্ডিতদিগের বাঙ্গালা গম্ভ অপেক্ষা অনেক সহজ সরল ভাবে বোধগম্য ছিল এবং এই কারণে তাঁহাকে বাঙ্গালা গম্ভের জগদ্ব্যভাতা বলা হইয়া থাকে। রাজা রামমোহন রায় নিজ জীবনকালের মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষাকে তর্ক, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যম করিয়া তুলিলেন ও সেই যুগ হইতেই বাঙ্গালা আধুনিক ভাষার রূপ ধারণ করিল। বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিজ রূপ ধারণের ফলেও ছিলেন রাজা রামমোহন। এবং তিনি প্রথম উচ্চ জাতীয় হিন্দু যিনি সরুদ পার হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়া তদ্বৈদ্য গুণীজনদিগকে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির সহিত পরিচিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার কার্যাবলী আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় সংযোগ সম্বন্ধের ক্ষেত্রে নূতন পদক্ষেপের সূচনা বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে। তিনিই মানব সমাজে মানবীর অধিকার নির্দেশ কার্যে সর্বপ্রথম। সকল দিক দিয়া দেখিলে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠা হিরানন্দ্র ও অবশ্যস্বীকার্য। বাহ্যিক মহাপুরুষদিগের অপবাদ করিয়া ধ্যান্ডিত অর্জন চেষ্টা করেন তাঁহাদিগের মূল্যায়ন অথবা মিথ্যা প্রচার মহাপুরুষদিগকে স্পর্শও করিতে পারেন না।

## ৪২২ পুটার পরবর্তী অংশ

যে ফুটবল খেলার মাঠে কখনও ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা হইতে পারে না। যে পূর্ণ সমতল ভাব ও ঠাসা ঘাস না থাকিলে ক্রিকেট খেলার বাধা সৃষ্টি হয়, ফুটবল ব্লট পরিয়া দাপাদাপি করিলে জমির সে অবস্থা কখনও রক্ষা করা সম্ভব হয় না। তাহাড়া দৌড়ের অজার রচিত পথ, সমুদ্রপের জলপথ প্রভৃতির সহিত টেনিসের সমগ্র আরোহি অসম্ভব। ফুটবল খেলুড়ে ও ব্যবহাপকগণ বলিলেন, স্টেডিয়াম দীর্ঘ ও খেলার মাঠ তাহার এক পার্শ্বে হইলে দর্শকগণ নামিয়া আসিয়া খেলার মাঠের নিকটে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিবার চেষ্টা করিবে। ফলে সেই খেলা জায়গাইকুতে যদি ক্রিকেটের “পিচ” নির্মাণ করা ইচ্ছা থাকে ত জমিতে লোক চলিয়া তাহার আর কোনও বস্তু থাকিবে না। সুতরাং সংযুক্ত স্টেডিয়াম ধামা চাপা পড়িল। নূতন হাওড়া ব্রীজ পরিকল্পনার থাকায় এলেনবরা কোর্সের ফুটবল স্টেডিয়ামও হইতে বাধা পড়িল। সকল বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন নূতন কোন উপায় সন্ধান, যাহাতে কলিকাতা-বাসীর ফুটবল খেলা দেখিতে সুবিধার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। সম্ভ্রান্তি শুনা গিয়াছে সন্ট-লেক এরিয়া অথবা ধাপার নোনা জলের এলাকায়, যেখানে সরকারী ব্যবস্থায় বাড়ীঘর রাস্তা বাগান ইত্যাদি নির্মিত হইতেছে, সেইখানে একটা বিরাট স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হইবে। এ বিষয়ে গাঁহার সরকারী গণনার আভি বিচক্ষণ ও জানুনেওয়ালা তাঁহার এবারও শিরঃসঞ্চালন করিয়া বিষয়টাকে সমর্থন করিয়াছেন ও গণ্যমান্য উপর-ওয়ালাগণ বলিয়াছেন, এই স্টেডিয়াম হইবেই হইবে, হইতেই হইবে, না হওয়া কোনও মতেই চলিবে না। কেহ কেহ ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যাহুবে অত দূরে যাইবে কেমন করিয়া? উত্তর হইল, বাসে চাড়িয়া। বাস কোথা হইতে আসিবে কিবা অপরদিকের বাস বড় খেলার দিন ধাপার চালাইয়া দিলে সেই সময় জনসাধারণ বাহুড় বলিয়া যাতায়াতের জন্য নিজ নিজ অকলে বাস পাইবে কি করিয়া ইত্যাদি কথা কেহ আর ভরে উঠায় নাই।

আকিস হইতে দৌড়িয়া গিয়া দলে দলে কেরানীরা যে খেলা দেখেন তাহা সাত মাইল দূরে যাইতে হইলে কেমন করিয়া হইবে? কলিকাতা ময়দান, ভবানীপুর টালিগঞ্জ চেতলা অথবা হাওড়া শ্রামবাজার বেলগাঁহিয়া হইতে সমগ্রবর্তী। হাওড়া হইতে ধাপা প্রায় এগার মাইল হইবে, টালিগঞ্জ হইতেও প্রায় ঐরূপ। ধাপার স্টেডিয়াম হইলে হাওড়া টালিগঞ্জ হইতে কেহ খেলা দেখিতে যাইতে পারিবে বলিয়া সন্দেহ। মনে হয় যে ধাপার স্টেডিয়াম নির্মিত হইতে তাহা বিশেষ জনপ্রিয় হইবে না। ময়দানে যেমন করিয়া এখন খেলা হয় তাহাই চলিতে থাকিবে। ক্রিকেট খেলাও ইডেন উদ্যানে পূর্বের মতই চলিবে বলিয়া মনে হয়। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া ধাপার ক্রীড়া-ক্ষেত্র নির্মাণ করিয়া একটা খুব লাভ হইবে না। স্টেডিয়ামের নিচে যে সকল দোকান, অকিস, ভোজনালয় প্রভৃতি হইতে পারে তাহাও ধাপার চলিবে কি না সন্দেহের বিষয়।

## ওকিনাওয়া হইতে হানরে বোমা বর্ষণ

আমেরিকান বোমারু বিমানের কিছু কিছু জাপান রাষ্ট্রের ওকিনাওয়া দ্বীপ হইতে উত্তর ভিয়েতনামের হানয় সহরে বোমা ফেলিতে যায় ও বোমা ফেলিয়া আসিয়া ঐ দ্বীপেই বিলুপ্ত করে। ওকিনাওয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে অনেক কাল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দখলে ছিল কিন্তু কিছু পূর্বে দ্বীপটি পুনরায় জাপানকে ফিরাইয়া দিয়া আমেরিকা জাপানের সহিত বন্ধুত্ব গাঢ়তর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখন ঐ দ্বীপকে বোমারু বিমান কেন্দ্র করিবার কোনও ভাব্য আধিকার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের থাকিতে পারে না, এবং বর্তমানের বিমান পরিচালনার জন্য জাপান আমেরিকার তীব্র সমালোচনা করিয়া ওয়াশিংটনকে অভিযোগ জানাইয়াছেন। আমেরিকা বলিয়াছেন যে, আবহাওয়ার কারণে ঐরূপ করিতে হইয়াছে; কিন্তু এই কথায় জাপান সন্তুষ্ট হ'ন নাই এবং বলিয়াছেন যে ঐরূপ কার্য করা বন্ধ করিতে হইবে।

আমেরিকা বহুকাল পূর্বে পাকিস্তান হইতে বিমান পাঠাইয়া অপরাণর দেশের সামরিক রক্ষণ ব্যবহার আশোক-চিত্র গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিত। তখন ঐ কার্যের বহু নিষা জগৎ জাতি-মণ্ডলীতে উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু আমেরিকা ধরা পড়িয়া বিশেষ লক্ষ্য অহুত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এখন অপরের বিমান-বন্দর ব্যবহার করিয়া নিজের অন্তর বিমান আক্রমণ চালনা করিয়াও আমেরিকা পঙ্কিত হইতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে না। সামরিক শক্তি ও অর্থ অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে সম্ভবত লক্ষ্য হওয়ার আর সম্ভাবনা বা প্রয়োজন থাকে না।

### ব্যাঙ্কের টাকা চুরি

বড় বড় অনেকগুলি ব্যাঙ্কে জাতীয় করিয়া লইবার পরে ব্যাঙ্কের টাকা জুরাচুরি করিয়া অপহরণ করা খুবই বাড়িয়াছে। ইহার একটা কারণ জাতীয় করাইবার ফলে ব্যাঙ্কের অনেক অনেক শাখা খোলা হইয়াছে ও পূর্ণ-প্রতিষ্ঠিত শাখাগুলির অভিজ্ঞ কর্মচারীদের হুতন শাখায় পাঠাইয়া দিয়া তাহাদিগের কার্যে নবনিযুক্ত অনভিজ্ঞ কর্মচারীদেরকে রাখা হইতেছে। অপর একটি কারণ এই যে, যাহারা এই সকল জুরাচুরির সহিত জড়িত তাহারা ব্যাঙ্কের কর্মচারীদেরকে কোনও না কোন উপায়ে নিজেদের টাকা অতি শীঘ্র দিয়া দিবার জন্ত রাজী করার ও তাহার ফলে তাহাদের টাকা দিবার পূর্বে চেক ইত্যাদি ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়াই টাকা দিয়া দেওয়া হইয়া যায়। চেকে অদল বদল করা হইয়াছে কি না, তাহািলে টাকা সত্য সত্যই আছে কি না এ সকল পুরাপুরি অঙ্গসন্ধান না করিয়াই ইহাদের কাজ শীঘ্র শীঘ্র করা হইয়া যায়। এমনিতে ব্যাঙ্কের একটা

টাকা বাহির করিতে অনেক সময় লাগে; একথা সর্বজন-বিদিত। কিন্তু কখন কখন কাহারও কাহারও কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন হইয়া যায়। এইরূপ যখনই হয় তখনই উক্ত কর্মচারীদের সন্দেহ করিবার প্রয়োজন হয়। তাহারা বাহাতে সকল সময় যথাযথ পরীক্ষা (বৈজ্ঞানিক উপায়েও) করিয়া তবে মোটা টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন ইহা একটা অপরিবর্তনীয় রীতি বলিয়া গ্রহণ করা আবশ্যিক।

### গরীবের নিকট রাজস্ব আদায়

উচ্চহারে খাজনা মাগুল ও রাজস্ব আদায় যদি শুধু এমন ভাবেই করা সম্ভব হইত যাহাতে দরিদ্রদিগের উপর তাহার চাপ না পড়িয়া শুধু যাহারা দিতে পারে তাহারা ই তাহা দিত, তাহা হইলে সামাজিক অবস্থাটা অনেকটা ভ্রাসঙ্গত হইতে পারিত। কিন্তু আমাদের দেশে, যাহার আর অভয় ও যাহার ঘরে শিশুরা হৃষ পায় না ও রুগীদের ঔষধ জুটে না, তাহারাও খাজনা মাগুল দিয়া অর্দ্ধাহারে কাতর হইয়া দেশনেতাদিগের দেশ সেবার প্রহসন দেখিতে থাকেন। দেশনেতাগণ কোন রাজস্ব না দিয়া দেশবাসীর খরচে ভ্রমণ, আরামে বাস করা প্রভৃতি করিয়া থাকেন, কিন্তু গরীব যে সে অর্দ্ধগজ কাপড় ক্রয় করিলে অথবা চায়ে এক চামচ চিনি দিয়া চা পান করিলেও, তাহাকে রাজস্ব দিতে হয়। দেশে সহস্র সহস্র বাসস্থান নির্মাণ করা হইয়াছে যাহাতে রাষ্ট্রকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ সুবিধামত উপায়ে বৃহৎ বৃহৎ সহরে নিবাস করিতে পারেন; কিন্তু পাঁচলক্ষ গ্রামের মানুষ বৃক্ষহারার থাকে, না কি করে, তাহা কেহ দেখিতেও চাহেন না। গরীবদিগের সাহায্যের ব্যবস্থা ত নাই এদেশে পরন্তু অসহায়কে আরও নিঃশেষ করিয়া দিবার আয়োজন আছে অসংখ্য রকমের।

# রামমোহন জিজ্ঞাসার পথিকৃৎ রাখালদাস হালদার

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাখালদাস হালদার (১৮৩১-১৮৮৭) তাঁর নামের ইংরেজী আত্মাকর দিয়ে পরিচিত হতে পছন্দ করতেন। সম্ভবত তাঁর দেশী-বিদেশী অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তাঁকে ডাকতেন R.D.H. বলে। এই নিবন্ধে আমরাও তাঁকে সেই নামেই উল্লেখ করব।

রামমোহন-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্যে R.D.H. যে একজন বিশিষ্ট পথিকৃৎ ছিলেন, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ঘটনার সূত্রে সেই তথ্যটুকু তুলে ধরার জন্য এই নিবন্ধের অবতারণা। প্রসঙ্গে আসবার আগে R.D.H.-এর নিজস্ব রক্তস্রোত সামান্য কিছু জানা দরকার, অন্তত তাঁর প্রথম জীবনের। \* ১

Rev. C. H. A. Dall \* ২ হাওড়ায় Calcutta to London by the Suez Canal শীর্ষক একটি বক্তৃতায় (১৮৬১) বলেছিলেন, গোরা বলেন বাঙালীকে বিলাত পাঠালে সে বিগড়ে যায় আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। সে দেশে গিয়ে রামমোহনের চরিত্রে আবুল পরিবর্তন ঘটেছিল এমন কথা কেউ বলবেন না। ষাটেক্ষণ্যে ঐশ্বর্যবান বণিকপ্রবর হারকানাথ ঠাকুরও লগুনে যাবার কলে নৈতিক দিক থেকে অধঃপাতিত হয়েছিলেন—এমন কথা কুজাপি শুনিব। আবার একজন বাঙালী যিনি এ রাজ্যের আমার সহযাত্রী ছিলেন (R.D.H.) এবং যিনি এক বৎসর কাল লগুন স্থানভাগিটির ছাত্র ও শিক্ষকরূপে ইংলণ্ডের জীবনযাত্রা সম্যকরূপে অভ্যাস করেন, মাটি'নো, টেইলর, ম্যাক্সমুলার, ট্রেভলিন ও উড্-এর মতো বিদ্বৎ ব্যক্তিদের নিকট-সংস্পর্শে এসেছেন—বিলাত যাবার কলে তাঁর যে কোনো দিক থেকেই আধোগ্রাস্ত হয়নি—এ আমি জোর করে বলতে পারি।'

Rev. Dall যে রামমোহন ও R.D.H.-এর নাম একই সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন—সম্ভবত তাঁর অন্ততম কারণ এই যে, ধর্ম-জিজ্ঞাসার উভয়ে ছিলেন প্রায় একই পথের পথিক।

জগদল-হর্গলির হালদারেরা ছিলেন পীরালি ব্রাহ্মণ। এঁরা ছিলেন নিষ্ঠাবান বেকব—খড়্গহের গোঁসাইরা ছিলেন এঁদের গুরু। বাড়িতে নিয়মিত বিগ্রহ সেবার ব্যবস্থা ছিল। R.D.H.-এর পিতা বেচারাম হালদার (১৭৮৪-১৮৬১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে বাংলা ও ওড়িশা অঞ্চলে পূর্বাধিকার লাভ করতেন। শিশু অবস্থায় R.D.H.-এর মা মারা যান, তাঁকে মানুষ করেন জেঠাইমা দেবতী দেবী। R.D.H. এর হাতেখড়ি হয় পাঁচ বছর বয়সে। বেচারাম বালাসোরে যখন ছিলেন, R.D.H. ইংরেজী ও ওড়িয়া শিখতে শুরু করেন, তখন তাঁর দশ বছর বয়স (১৮৪২)। সে-সময় কয়েকজন আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে বালক R.D.H. পুরীর জগন্নাথদর্শনে যান। জনৈক সহযাত্রীর মুখে তিনি শুনেছিলেন যে শ্রীক্ষেত্রের এমনই মহিমা যে মন্দিরের অভ্যন্তরে নাকি ছায়া পড়ে না। R.D.H. মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকে প্রমাণ করেছিলেন যে সেখানকার বিগ্রহেরও ছায়া পড়ে। ১৮৪৪-৪৫ অব্দে তিনি চুচুড়া ও হর্গলিতে স্কুলে ভর্তি হয়ে নিয়মিত পাঠাভ্যাস করেন। সংস্কৃতে অল্প বয়সেই তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হয়েছিল। ধর্মজিজ্ঞাসার সুযোগ নিয়ে কুলপুত্রোচিত R.D.H.কে কালীসান্নাথের দীক্ষা দেন—যখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো বছর। হুটি বছর পূর্ব অধিবতার মধ্যে তাঁর দিন কাটে। অতঃপর ১৮৪৭ অব্দে খড়্গহের ললিত গোঁসাই তাঁকে

বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দেন। কিন্তু তাতেও তাঁর ধর্মশিপাসার নিবৃত্তি ঘটেনি। এই ঘটনার বৎসর কাল পরেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত হবার ফলে অল্প খাতে তাঁর জীবনের ধারা বইতে শুরু করে। ১৮৯৮ অব্দে তাঁর বয়স ১৬, কিন্তু ওই বয়সেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সামুদ্রজন' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। 'প্রভাকরে'ও তাঁর রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হত। সাহিত্য রচনার সূত্রে তিনি বিভাসাগর, রাধাকান্ত দেব, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, শঙ্কুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে আসেন। আরও যে-হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা হয় তাঁরা হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও অনঙ্গমোহন মিত্র। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সূত্রে তাঁর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গভীরত গুরু হয় এবং তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে একেশ্বরবাদের কথায় গভীর ভাবে আকৃষ্ট বোধ করেন। এই সময়ে একেশ্বরবাদী কোন কোন ইংরেজ লেখকের বই তিনি গভীর মনোযোগে পাঠ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন থিয়োডোর পার্কার, চ্যানিং, এডওয়ার্ড জেনিস প্রমুখ মনীষী। এঁদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত গল্পব্যবহারও ছিল। আর তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিলেন রামমোহন রায়। মনে হয় এই বকম সময়েই R.D.H. রামমোহনের Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness বাংলায় অনুবাদ করতে শুরু করেন। ১৮৫১ অব্দ এই অনুবাদ 'স্বপ্ন শাস্তির উপায় স্বরূপ যিশু প্রণীত হিতোপদেশ' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়।

এবার (১৮৫১) তিনি মনে মনে স্থির করলেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করবেন। সেইসঙ্গে তাঁর ধারণা হল বৈষ্ণব শাস্ত্রদের মতো ব্রাহ্মের যদি কেবল হিন্দুধর্মের অন্তর্গত সূত্রধার-বিশেষ হন তাহলে ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে প্রগতি আনা সম্ভবপর হবে না। অনঙ্গমোহন মিত্রকে সঙ্গী করে ছুটলেন দেবেন্দ্রনাথের কাছে এই কথা বলতে। দেবেন্দ্রনাথ সব কথা মন দিয়ে শুনে বললেন—স্বাসাধি বিপ্লব ঘোষণা না করে আপাতত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের

নির্দেশ অনুসারে ধর্মীয় জীবন বাপন করাই যথেষ্ট; তবে কেউ যদি ব্রাহ্মধর্মের নিয়ম মেনে চলতে চান তবে তাঁর পক্ষে সমাজভুক্ত হওয়াই ভালো। কথাটা R.D.H.-এর বেশ মনে ধরল। সেই বছরেই ২৪ পরগনার বাঁধ সংরক্ষণের কাজে ব্যাপৃত থাকা কালে আকস্মিক হৃৎকটনায় আহত হয়ে বেচারাম কোম্পানীর কাজ থেকে অসর নিলেন। কোম্পানী তাঁর জন্য বিশেষ পেনশনের ব্যবস্থা করল, ছেলে R.D.H.কে বাপের আকসেই কেরাণীর কাজে বহাল করল। বেচারাম চলে গেলেন জগদলে, ছেলে খিদিরপুরে বাসা ভাড়া করে চাকরী করতে লাগলেন।

পরের বছর (১৮৫২) R. D. H. দেবেন্দ্রনাথের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। কিন্তু এতেই তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসার নিরসন হল না। অক্ষয়কুমার দত্ত ও অনঙ্গমোহন মিত্রকে সঙ্গী করে, দেবেন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমে জোড়াসাঁকো বাড়িতেই রামমোহনের দৃষ্টান্ত অনুসরণে তাঁরা এক 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করলেন। সভার আধিবেশন হত প্রতি বুধবার সন্ধ্যায়। সূচনার সমাজ-সংস্কার বিষয়েই আলাপ আলোচনা হত, ক্রমশ আলোচনার পরিধি বিস্তৃত হয়ে ব্রাহ্মধর্মের মূলতত্ত্ব নিয়েও বিতর্কের সূত্রপাত হল। R. D. H. বললেন, উপাসনা কালে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার আকর্ষণিকর, বাংলাতেই সংক্ষেপে পরমেশ্বরের উপাসনা করার পর দেড়-দুই ঘণ্টা কাল ধর্মীয় ও সামাজিক প্রসঙ্গ অবতারণা বিধেয়। বলা বাহুল্য দেবেন্দ্রনাথ নব্যব্রাহ্মদের এই সব নুতন মত স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারেন নি। R. D. H. আপন উদ্যোগে খিদিরপুরে যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, সেখানে তাঁর প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। শঙ্কুনাথ গণ্ডিত, কাশীধর মিত্র, প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ভবানীপুরে যে জ্ঞানপ্রকাশিকা সভা গঠন করেন (তত্ত্ববোধিনী সভার অনুকরণে) সেখানেও এই বিংশতি বর্ষীয় তরুণটি অল্প বয়সেই প্রগতি-মূলক আলাপ আলোচনার একটি ক্ষেত্র রচনা করে নেন।

এ বিষয়ে একটি কোচুকোদীপক কাহিনী R. D. H. তাঁর ডায়েরিতে বিবৃত করেছেন।

১৮৫০ অব্দের ২১ মার্চ তারিখে সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য দেবেজনাথ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, কলকাতার কতিপয় ব্রাহ্ম শিষ্যও এসেছেন তাঁর সঙ্গে। উপাসনার পর প্রস্তাব হল সভার নিজস্ব ভবনের ট্রাস্ট ডীড নিয়ে আলোচনা হবে। R. D. H. সরাসরি প্রস্তাব করলেন, সভার লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রেখে নতুন নামকরণ হোক ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ। ভবানীপুরের মুখপাত্রে বাধিতা করে বললেন, সভার আদি নামই বহাল থাক। দেবেজনাথ দোটানায় পড়ে আড়ালে R. D. H.কে পরামর্শ দিলেন, নামকরণের ব্যাপারটা যদি অগ্রিম বিজ্ঞাপিত যোগে সভার কার্যসূচির অন্তর্গত না হয়ে থাকে, তাহলে প্রস্তাবটা মূলত বাধা যায়। পরের অধিবেশনের আগেই যদি কলকাতার কিছু ব্রাহ্ম সম্মেলন আহ্বিত হতে পারেন তা-হলে R. D. H.-এর প্রস্তাবিত নামান্তরের সপক্ষে দল তৈরি করা যায়। R. D. H. বিপক্ষদলকে আপন প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে দু-চারটি কথা নিবেদন করার জন্য সভাপতিত্ব অহুমতি চেয়ে নিলেন। অতঃপর বাড়ী গিয়ে মিনিট ধরে এমন সব মুক্তিভরকের অবতারণা করলেন যে ভোট গ্রহণের সময় দেখা গেল, বিপক্ষে যত ভোট সপক্ষেও তত। তখন সভাপরিচালনার রেওয়াজ অনুসারে সভাপতি ব্রাহ্মসমাজ নামের সপক্ষে মত দেওয়ার হিব হয়, ট্রাস্ট ডীডে ওই নামই রাখা হবে। অল্প বয়সেই R. D. H. উত্তম বাগ্মী ছিলেন, মুক্তি প্রয়োগেও তিনি ছিলেন সিদ্ধান্ত।

পূর্বের বছর (১৮৫২) জুলাই মাসে জগদলের নিজ বাড়িতেও R. D. H. ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন, বেচারামের সুস্থ আপত্তি সত্ত্বেও। ৩১ অক্টোবর তাঁর আমন্ত্রণক্রমে দেবেজনাথ নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজ-ভবনে উপনিষদের ধর্ম বিষয়ে মৌলিক ভাষণ দিয়েছিলেন।

জোড়াসাঁকো বাড়িতে আত্মীয়সভা স্থাপনের ব্যাপার থেকে অহুমান হয় R. D. H. হয়তো ভেবেছিলেন

রামমোহনকে যথাযথভাবে অনুগরণ করতে হলে ভুক্তিবাদের উচ্চাস পরিহার করে মুক্তিবাদের শক্ত বুনিয়ে দাঁড়াতে হবে। ১৮৫৪ অব্দের ১ জানুয়ারি পলতার বাগানের ঘটনা ৩০ অনুধাবন করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে দেবেজনাথের সাবধানী রক্ষণশীলতাকে খারাপা নাড়া দিতে চেয়েছিলেন তাঁদের অগ্রণী ছিলেন অক্ষয়কুমার ও R. D. H.। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেজনাথের পত্র থেকে স্পষ্টই দেখা যায়, ব্রাহ্মদের একত্র ভোজন, পরস্পরের মধ্যে কঠোর বৈবাহিক আদান-প্রদান, উপবীত বর্জন—প্রভৃতি প্রগতিশীল সমাজব্যবহার প্রস্তাব মুখ্যত আসত R. D. H.-এর কাছ থেকে। কেবল প্রস্তাব করে তিনি ক্ষান্ত হবার পাত্র ছিলেন না। প্রস্তাব কার্যে পরিণত করতে চাইতেন। পলতার বাগানের ঘটনার পর তিনি জগদল গিয়ে উপবীত ছাড়ার পিতা বেচারাম আপন বক্ষে ছুরি মারতে উত্তেজিত হয়েছিলেন একথা মহর্ষি তাঁর ‘আত্মজীবনী’তে লিখে গেছেন।

নব্য ব্রাহ্মদের আচরণে এরকম আতিশয্য যখন দেখা যেত, দেবেজনাথ পরোক্ষ ভাবে তাঁর আপত্তি প্রকট করার জন্য হিমালয়ে চলে যেতেন—দীর্ঘ কালের জন্য।

অহুমতি R. D. H. তাঁর প্রস্তাবিত বিপ্লব কার্যকর করার পথে বহু বিঘ্ন দেখে কিন্তু দমলেন না। ১৮৫৫ অব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখের দিনলিপি থেকে দেখা যায় একই দিনে তিনি মধ্যাহ্নভোজনে মিলিত হচ্চেন অনঙ্গমোহনের সঙ্গে। তত্ত্বোধিনী দপ্তরে গিয়ে অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন। তার পরেই চলে যাচ্ছেন সংযুক্ত কলেজে বিজ্ঞানাগরের সঙ্গে বিধবা-বিবাহ বিষয়ে কথা বলতে।

সেই সঙ্গে চলেছে তাঁর সেই রামমোহনের ইংরেজী গ্রন্থ অহুমানের কাজ, ‘স্বপ্ন শাস্তির উপায় স্বরূপ বিত্ত প্রণীত হিতোপদেশ’। আমেরিকান মিশনারি সাহেব Dall-এর সঙ্গে এই বইয়ের বিষয়ে তাঁর অনেক কথাবার্তা হয়। রামমোহনের বহু জীটান বন্ধুদের মতো এই আমেরিকান পাণ্ডীও নিশ্চয় R. D. H.কে বুঝিয়ে



দিতে চেয়ে থাকবেন যে এক নামে ছাড়া রামমোহন অন্তরে অন্তরে ছিলেন খ্রীষ্টান। হয়তো বলে থাকবেন যে তাঁর বিলাতের বন্ধুরা (যারা রামমোহনের বিলাত প্রবাস কালে তাঁর অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন) তাঁকে সেই মর্মে পুস্তক পত্রিকা চিঠিপত্রও পাঠিয়েছেন। অত্যন্ত একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টান পাদরিদের মতো Dall নিষ্ঠুর ভেবে থাকবেন হিন্দু সমাজের আওতা থেকে ব্রাহ্ম একেশ্বরবাদীদের যদি বিচ্যুত করা যায়, বিচ্যায় বুদ্ধিতে নেতৃস্থানীয় ভারতীয়েরা যদি যিশুর ধর্ম গ্রহণ করেন— তাহলে ক্রমে দেশের অত্যন্ত জনসাধারণও ধর্মান্তরিত হতে আশঙ্কিত করবে না।

অপর পক্ষে হিন্দুসমাজের পক্ষপটে থেকে ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিস্তর সম্ভাবনা সুদূর জ্ঞান করে অসহিষ্ণু হতাশার রামমোহনের মতো R. D. H.ও একসময় হয়তো ভেবে থাকবেন, একেশ্বরবাদই মুখ্য—কোন ধর্মের কি নাম গোঁপ। ধর্মান্তরের ফলে সমাজে সাংগিক উন্নতি সাধন সম্ভবপর যদি হয়, নামে কি আসে যায়। এই নিহক অহুমানের ভিত্তিতে হয়তো কিছুটা বুঝতে পারা যায়, পাদরি Dallএর প্রয়োচনা ও অর্থাহুঙ্কল্য কেন R. D. H. তাঁর সঙ্গে বিলাত যাত্রার সম্মত হয়েছিলেন।

বিলাতে গিয়ে R. D. H.এর মোহভঙ্গ হতে যে বিলম্ব হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ডায়েরিতেই। Dallএর দেওয়া শেষ পাইটুকু শোধ দিয়ে তিনি প্রারম্ভিত করেছিলেন। ১৮৬১ অব্দের ২ জুন তারিখে লণ্ডন থেকে তিনি বহু যত্নাধা মুখোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন, ‘কপালে যাঁহা থাকুক, আমি খ্রীষ্টান ধর্মের নিমিত্ত এখানে আসি নাই। সাংসারিক বিষয় শিথিরা দেশে কিরিয়া যাইব এই অভিপ্রায়ে আসিয়াছি।’ সে যাই হোক, আমাদের এই নিবন্ধের দিক থেকে এই প্রসঙ্গ অবাস্তব বলে আমরা ডায়েরির রামমোহন-জিজ্ঞাসা অংশগুলির প্রতিই দৃষ্টি দিতে চাই। ডায়েরির পাঠে দেখা যায়, R. D. H.এর মুখ্য আগ্রহ ছিল বিলাতের একেশ্বরবাদী ও মনীষীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও রামমোহনের বিষয়ে সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা।

১৮৬১ অব্দের ১১ এপ্রিল তারিখে ‘নেমোসিস্’ স্টিমার থেকে R. D. H. সুরেজের পথে বিলাত যান। তাঁকে বিদায় দিতে যারা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন যত্নাধা মুখোপাধ্যায়। ইনিই সম্ভবত পরবর্তী কালে দেবেন্দ্রনাথের কত্তা শরৎকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। ১৪ বিলাত যাবার পথে এবং বিলাতে থাকতে এই যত্নাধাের সঙ্গে R. D. H.এর নিয়মিত পত্রব্যবহার ছিল। সিংহল থেকে ১৮ এপ্রিল তারিখের চিঠিতে লিখলেন:—‘পিতাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইবে ও তাঁহাকে বলিবে পরমেশ্বর আমার রক্ষক ও সহায়ক রূপে সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন: আনন্দং ব্রহ্মণো বিজান্ন ন বিভেতি কুতশ্চন কদাচন। পরমেশ্বর তাঁহাকেও নিয়ত রক্ষা করুন।’

১৮৬১ অব্দের ২১ মে তারিখে তিনি বিলাতে পান দেন। অব্যবহিত পরেই যে সব ইংরেজ মনীষীদের সঙ্গে তাঁর পূর্ণ থেকে পত্রব্যবহার ছিল (যথা চ্যানিং, টেইলর, মাটিনো) তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরের দিন আইলিংটন স্কুলঘরে তিনি হিন্দু শাস্ত্রে একেশ্বরবাদ ও রামমোহন রায় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

২৮ মে তারিখে এসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জানেন্দ্রমোহন\* ও তাঁর স্ত্রীর (যেতা: কুমারমোহন রম্ভোপাধ্যায়ের কত্তা) সঙ্গে তাঁদের কেনসিংটনস্থিত বাড়িতে R. D. H. দেখা করেন। সে সময় জানেন্দ্রমোহন লণ্ডন য়নিভার্সিটি কলেজে বাংলাভাষা ও হিন্দু আইনের অধ্যাপক।

১২ জুন তারিখে R. D. H. অক্সফোর্ডে ম্যাক্সমুলরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৬

১৬ জুন তারিখে লণ্ডন থেকে রেলযোগে R. D. H. ব্রিস্টল গেলেন। এই ব্রিস্টল যাত্রা অংশের অল্পবাদ দেওয়া হল:

১৬ জুন। সকাল আটটার রেলযোগে ব্রিস্টলের পথে যওনা হওয়া গেল। আজ আমি তীর্থযাত্রী—চলোঁহ রামমোহনের সমাধি দেখতে। পথে যেতে সুন্দর গ্রামাঞ্চল চোখে পড়ল—একবারে বোন মন্দির উপত্যকার মতো দেখতে। ট্রেন থেকে পলকের

জন্ম বাণ্ শহরটা নজরে এল—বোঝা গেল কেন এই শহরকে অনেকে স্মরণ স্মৃতিম প্রেক্ষাগৃহের সঙ্গে তুলনা করেন। ব্রিস্টল পৌরহালায় বিকেল ছটোয়—লণ্ডন থেকে দূরত্ব ১১৮ ১/২ মাইল। ঘোড়াগাড়ি চেপে মিসেস চাম্পিয়নের বাড়ি। শোনা যায় কবি জেমস মন্টগোমেরি এবং আরো বহুখ্যাতিমান ব্যক্তি এঁর বহুহিনীয়। এলিজা জেন ও সারা নামধের পরিচারিকাসুগল বাড়ির গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে বিদেশী অতিথিকে স্বাগত করার জন্য ঐহুকো অধীর। গেটের কাছে গাড়ি থামতেই তারা দ্রুত পায়ে আমার কাছে চলে এল। আমার পূর্বে আরো যে একজন ভারতীয়—জগৎচন্দ্র গাঙ্গুলি—এখানিতে উঠেছিলেন, তাঁর কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করল একজন, একজন আমার পোটমেন্টোটি বহন করে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বাড়ির ভিতর। বেশ ঘরোয়া পরিবেশ। রেভাঃ জেনস আমায় সাদরে অভ্যর্থনা করে আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানি দেখিয়ে দিলেন। হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে তাঁর সঙ্গে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসলাম। হুগল হাটের জন্য মিসেস চাম্পিয়ন নেমে আসতে পারেন নি। তাঁর সঙ্গে দেখা হল একেবারে ডিনার টেবিলে। মাতৃসমা মহিলা, আমায় এমন ভাবে স্বাগত করলেন যেন আমি তাঁর নিজের সন্তান। এরকম আন্তরিকতা কদাচিত দেখা যায়। এখানে দিন বেশ লম্বা, সূর্যাস্ত হয় ন’টার পরে। তাই ডিনার সেবে আমি পায়ে হেঁটে শহরের দিকে রওনা দিলাম—মজুরদের এক সভার বক্তৃতা দেখার কথা ছিল। বক্তৃতার পর মিস কার্পেন্টারের ৯৭ ‘রেড লজ’ বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। খুব আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি আমায় স্বাগত করলেন। রামমোহনের ও তাঁর নিজের কোটাগ্রাক উপহার দিলেন আর দিলেন কিছু বই। সন্ধ্যায় ক্লিক্টন ফিরে গিয়ে মিঃ ব্রাউনের বিরাট বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সন্ধ্যাটা ভালোই কাটল—তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী ও শিশুদ্বয়।

### স্টেপলটন প্রোভ

রামমোহন বাবের সমাধি

১৭ জুন। প্রাতঃরাশের পর মিসেস ব্রাউন ও তাঁর মা তাঁদের ফীটন যোগে এসে পড়লেন। রেভাঃ মিঃ জেমস ও আমি সেই ফীটনে চেপে মিস এস্টলিনের আবাস-অভিযুগে রওনা হলাম। রামমোহনের শেষ অন্ত্যেষ্টের সময় যে ডাক্তার এস্টলিন তাঁর দেখাশোনা করেছিলেন ইনি তাঁরই মেয়ে। অপর যে চিকিৎসক ছিলেন শেষ সময়ে, Physical History of Mankind গ্রন্থের লেখক ডঃ প্রিচার্ড, এঁদের আত্মীয়। শুক্রবার ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ অব্দে যুক্তার অব্যবহিত পরে রামমোহনের মৃত্যুগুণের একটি খেঁচা নেওয়া হয়েছিল সেটি মিস এস্টলিন আমায় দেখালেন। আর দেখালেন রাজার মাথার শাল-পাগড়ি। মিসেস ব্রাউন সেটি আমার মাথায় পরিয়ে দিলেন। লাল রঙের শাল আলোয়ান ও হাসিয়া দিয়ে মোড়া প্রকাণ্ড পাগড়ি, ওজনও বেশ ভারি। ভিতর দিকের বেটনী দেখে মনে হল, রাজার মাথার তেলে তৈলাক্ত। মাথার পরিধি নিশ্চয় আমার মাথার পরিধি থেকে ইকিধানেক বড় ছিল। অথচ আমার মাথার বেড় কিছু কম নয়, টুপিও দোকানে সচরাচর আমার মাথার মাংসে টুপি সহজে পাওয়া যায় না, প্রায়ই মাংসে ছোট হয়। ১৮ অতঃপর আমরা গাড়ি চেপে স্টেপলটন প্রোভে গেলাম। মিস ফালেলের অতিথি হয়ে ১৮৩০ অব্দের শরৎকালে রামমোহন এই বাড়িতেই কাটিয়েছিলেন। অতি রমণীয় জায়গা এই স্টেপলটন প্রোভ—দেখে মনে হল স্বর্গীয় পরিবেশের মধ্যে রাজা স্বর্গারোহণ করেছেন। যে ঘরে আমার প্রখ্যাত স্বদেশবাসী তাঁর শেষনিবাস ত্যাগ করেছেন সেই ঘরটিতে প্রবেশ করলাম। জানালায় বাইরে মনোমুগ্ধকর নিসর্গ শোভা। অন্তিম সময়ে ঝাঝ উপস্থিত ছিলেন এবং আকো ঝাঝ জীবিত রয়েছেন তাঁদের দুগে শোনা বর্ণনার ভিত্তিতে আমি মনশ্চক্রে দেখতে পেলাম: ২৭ সেপ্টেম্বরে তাঁদের আলোর উদ্ভাসিত শান্ত রাত্রি, আবাল্য যে দেশে প্রতিপালিত দে-দেশ থেকে বহু দূরে তিনি শেষ শয্যায়

শয়ান, মুহুর্ত-শয্যায় আশে পাশে রয়েছেন যারা—কেউ তাঁর আত্মীয়পরিজন নন, ডঃ প্রিচার্ডের মতো বিচক্ষণ চিকিৎসকেরাও তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করেছেন, (আমাদের অতি-পরিচিত ডেভিডের ভগ্নী অথবা ভাই-বিক) মিস্ হেয়ার<sup>১১</sup> মুম্বইর শয্যাপার্শ্বে বসে কুঁপিয়ে কুঁপিয়ে কাঁদছেন; রামমোহনের পালিত পুত্র রাজারাম একপ্রকার হতচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন...। এই সব ক্লান্ত ছবি মানসপটে ভেসে উঠতেই চোখ আমার জলে ভরে এল। অতঃপর<sup>১২</sup> মরদেহ সমাধিহীন হবার স্থানটি দেখতে গেলাম। ডঃ লাট কারপেন্টারের কথায় এ-স্থানটি তৃণাচ্ছাদিত উদ্ভানের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি এলুম গাহের ছায়ার নিচে অবস্থিত একটি বিজান। সেই সঙ্গেই মিস্ অকল্যাণ্ড লিখিত কবিতার নিম্নলিখিত ছন্দ-গুলি আমার স্মরণে এল:—এই সেই ঠাই, এখানে পাথর গুদে স্মারক লেখার প্রয়োজন নেই। এক-মেধাশিতায় এই নির্জন সমাধির উপর কোনো স্তম্ভ রচিত হয়নি। কেবল ছায়াঘন এলুম গাহের বিনম্র শাখা পবিত্র অঙ্ককারে আচ্ছাদন করে রেখেছে রাজার শীতল মরদেহ। যেদিন তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পিতৃভূমির আকাশে পুণ্যের সূর্য উদিত হবে, সকল দূরিত দূর করবে অরুণ কিরণ, যেদিন ভারত-সম্মানেরা রাজার মধ্যাহ্নদীপ্ত পূর্ণ প্রাণের পরিচয় লাভ করবে, একান্ত্রভূতির একসূত্রে পরম্পরের সঙ্গে মিলিত হবে,—সেদিন হয়তো সেই সম্মানেরা এই স্থানে আসবে তীর্থযাত্রীর মতো, ভক্তি ও শ্রদ্ধায় উদ্দীপ্ত হয়ে সন্ধান করে নেবে এই পবিত্র ঠাই, এই মাটি সিক্ত করবে তাদের আনন্দ বিষাদের শিশিরাঙ্ক দিয়ে, কারণ, এ সেই ঠাই যেখানে তাদের দেশ ও জাতির পরম মিত্র ও প্রবক্তা তাঁর শেষ শয্যায় শয়ান রয়েছেন।

২৭ জুন ১৮৬১ তারিখে লণ্ডনে ফিরে এসে R.D.H. মিঃ ম্যাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শুনেছিলেন ঐর একেশ্বরবাদী মন্দিরে রামমোহন নিয়মিত তর্গবৎ উপাসনার যোগ দিতেন।

ওই বছরেই ৬ আগষ্ট তারিখে বেতাং উইলিয়ম এডামের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। কলকাতার থাকতে এডামের সঙ্গে রামমোহনের গভীর বন্ধুতা হয়েছিল। এককালে ঐর আশা ছিল রাজাকে ইনি ধর্মাস্তর গ্রহণে সম্মত করাতে পারবেন। সাইবেলের অপরোক্ষেষণ নিয়ে মতভেদ হওয়ায় সম্বন্ধে চিড় দেখা দেয়, কিন্তু এডাম আজীবন রামমোহনের গুণগ্রাহী অমুরাগী ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর ইনি আমেরিকার বস্টন শহরে ১৮৪৫ অব্দে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল Life and Labours of Rammohun Roy। দেশে ফিরে আসার পর R. D. H. নিজের সম্পাদনায়, নিজের গরচে এই বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন ১৮৭১ অব্দে। ১৮৮১ অব্দে এডামের মৃত্যু হয়। তাঁর ভাইবিক মিদ হেলেন এডামের (পরে মিসেস উইলস) সঙ্গে R.D.H.এর হস্ততা বজায় ছিল আজীবন। সোফিয়া কলেট, ১৮৮২ অব্দে R.D.H.কে যে চিঠি লেখেন তা থেকে জানা যায়, রাজার জীবনীর জন্ত তথ্য সংকলনে হেলেন তাঁকে বিস্তর সাহায্য করেছিলেন।

৬ অক্টোবর ১৮৬১ তারিখে এইচ সি ববিনসনের বাড়িতে R. D. H.-এর সঙ্গে ডঃ বুট্, ও প্রফেসর বাসিলির পরিচয় হয়। বাসিলি ছিলেন লণ্ডন যুনিভার্সিটি কলেজের প্রফেসর ও ‘পবিত্রবিষ্টি রিভিউ’ কাগজের সম্পাদক। ডঃ বুট্ রাজাকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন বলে তাঁর বিষয়ে অনেক কথা বলেন। বুট্ বরাবরই রাজাকে ঈশ্বরবিশ্বাসী রূপে দেখেছেন। ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বিধান মেনে চলতেন, স্বদেশীয়দের ধর্মবিশ্বাস অথবা সংস্কারে আঘাত দিতে চান নি বলে জ্ঞাত তিনি অমান্য করেননি, উপবীতও ত্যাগ করেন নি—যদিচ নিষেক সংস্কার ছাড়া এ সবের অল্প উপযোগিতা তিনি স্বীকার করতেন না। তাঁর আচারবিচার নিয়ে যাতে নিন্দাকুৎসার রচনা না হয় সেই উদ্দেশ্যে সঙ্গে দু-জন হিন্দু অম্বচর এনেছিলেন<sup>১৩</sup>। একবার তিনি নাকি লণ্ডনের বিশপকে বলেছিলেন যে খ্রীষ্টধর্মের বিষয়ে শুনেতে জানতে শিখতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত কিন্তু যত দিন না প্রমাণ হয় তাঁর নিজের ধর্মবিশ্বাসে ত্রুটিবদ্ধ হবে

গেছে, ততদিন তিনি তাঁর সহজ সরল বেদান্তপ্রতিপাদ একেশ্বরবাদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন। স্বচ্ছ মিশনারীদের কেউ কেউ সভ্যদাহ নিবারণে রাজার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। কিন্তু এঁদেরই একজন যখন রাজাকে ডিনারে আমন্ত্রণ করেন, বুটের বাড়ি না গিয়ে তিনি সেই স্বচ্ছ প্রতিপক্ষের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। বুটকে তখন বলোছিলেন, মিষ্টের শিষ্টাচারকে যতটা মূল্য তিনি দেন তার অধিক মূল্য দেন শত্রুপক্ষের শিষ্টাচারকে। ডিম খেতে তিনি খুবই ভালবাসতেন, কিন্তু একই পাত্র থেকে পর পর দুটি ডিম খেতে তিনি চাইতেন না—উজ্জ্বল দোষের ভয়ে। একটা সময় ভারতের রায়ত-সাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য পার্লামেন্টে তাঁর ডাক পড়েছিল। নিছক সরকারী এতেলার জোরে পার্লামেন্টে হাজিরা দেওয়া তাঁর মনঃপূত হয়নি। বলোছিলেন, এ নিয়ে যদি জোর-জবাবদাতি করা হয়, তিনি ক্রাশে চলে যাবেন বলে কৃতসংকল্প। অবশেষে পার্লামেন্টের কতিপয় সদস্য তাঁর বাড়ি এসে তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে, সে-বছর (১৮৩১), কোম্পানী শাসনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে কি না বিবেচনার জন্য যে সিলেকট কমিটি গঠিত হয়েছে তাঁরা সেই কমিটিরই সদস্য। সুতরাং রামমোহন যদি তাঁর সাক্ষ্য প্রকৃত তথ্যাবলী উপস্থিত করেন, কমিটি তদনুসারে পার্লামেন্টের কাছে তাঁদের বক্তব্য ও সুপারিশ পেশ করবেন। রাজা তখন বাংলার রায়তদের হ্রবস্থা নিয়ে একটি পুস্তিকা লেখেন, উপরন্তু একাধিক পত্রে সিলেকট কমিটির সদস্যদের অবগতির জন্য বহু তথ্য সরবরাহ করেন। সেগুলি তখন পার্লামেন্টের রু-বুকে ছাপা হয়; পরে সমস্ত লেখা একত্র করে রামমোহন একটি পুস্তক প্রকাশ করেন, নাম দেন *Exposition of the Practical Operations of the Judicial and Revenue Systems of India*। ডঃ বুট্‌আরো বলেন, ইংলণ্ডের রিকর্ড বিল পাশ হয় কি না হয় তা নিয়ে রামমোহনের আগ্রহ ও উৎকর্ষীয় অবাধ ছিল না। তিনি বলতেন ইংরেজরা যদি নিজদের দেশে শাসনের ব্যবস্থা করতে না পারেন, ভারতের লোককে শাসনে রাখবেন কী উপায়ে? রিকর্ড বিল কী ভাবে

কতখানি এগোচ্ছে সেবিষয়ে নিরন্তর খোঁজখবর নেবার জন্য সকল ব্যবস্থা সারা হলেও তিনি তাঁর ফটলও যাত্রা হগিত রেখেছিলেন। প্রথম দিকে রামমোহন থাকতেন রিকর্ডে পার্কের সন্নিহিত অভিজাত পল্লীতে একটি সুরম্য অট্টালিকায়, পরে তিনি উঠে যান বেভকোর্ড কোয়ার্টারে তাঁর নিকট বহু ডেভিডের ভাই জন্ হেয়ারের বাসভবনে। পরিশেষে বুট বলেন, সব কিছু জড়িয়ে যদি বিচার করতে হয় তাহলে তিনি বলবেন তাঁর দেখা সকল মাস্তবের মধ্যে রাজা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

পরের বছর (১৮৩২) ২২ এপ্রিলে R. D. H. গেলেন তাঁর সতীর্থ (তিনি তখন লণ্ডনের যুনিভার্সিটি কলেজে আইন পড়েন এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত ও বাংলা পড়ান) এডওয়ার্ড এস. হাউজের আমন্ত্রণক্রমে তাঁদের রাঁডিং শহরের বাড়িতে ইষ্টারের ছুটি বাপন করতে। হাউজ পরবর্তী জীবনে পাদরি হয়েছিলেন। তাঁদের বাড়িতে নানা দেশের ধর্ম বিষয়ক বিস্তার গ্রন্থের একটি লাইব্রেরি ছিল। এই লাইব্রেরিতে R. D. H. রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। ডায়েরিতে লেখেন, দেশের মহৎ জীবন কিংবা মহৎ ঘটনা সম্পর্কে দেশের লোকের নিকরুসাহ ওদাসীন্য বড়ই শোচনীয় ও মানিকর। বলেন, ভারত কিংবা ভারতীয়দের বিষয়ে বহু তথ্য ভারতে বসে পাওয়া যায় না, বিলাতে এসে সন্ধান করে নিতে হয়—এটা খুবই দুঃখের কথা।

২ মে তারিখে লণ্ডন ফিরে R. D. H. খবর পেলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মনোমোহন ঘোষ বিলাতে এসে পড়েছেন। দু’দিন পরে তাঁদের বাসস্থানে গিয়ে অভ্যাগতদের তিনি স্বাগত জানিয়ে এলেন।

২৫ মে তারিখে এডামের বাড়ি গিয়ে তাঁর মুখেই রামমোহনের উপর লিখিত বক্তৃতা শুনে এলেন ও বক্তৃতার পাণ্ডুলিপি সঙ্গে নিয়ে এলেন এদেশে প্রকাশের জন্য। ইতিপূর্বে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে অন্তর্ভুক্ত।

সারা জুন মাসটা কাটল দেশে কেবল ভোড়জোড় করতে। ১৮৬২ অক্টোবর ১৯ জুন তারিখে যত্নাথকে

লিথলেন, ঢাক ঢোল না পিটিয়ে-চুপি চুপি তিনি দেশে ফিরতে চান। ঠাট্টা করে বললেন তাঁর প্রত্যাবর্তনটা হবে রামমোহনের এংলো-হিন্দি স্কুলের সেই 'ভালো ছেলেটির' মতো—যে নাকি স্কলকর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে এক মাগাড়ে তিনটি বছর বাড়িতে ছুটি কাটিয়ে, একদিন তার আগের ক্লাসের অভ্যন্তরীণ জায়গার অন্নান বদলে ফিরে এসে বসেছিল—ভাবনা এমন যেন কিছুই হয়নি।

২১ জুন কোলোশিয়াম্ গিয়ে R. D. H. দ্বারকানাথ চাকুরের আবক্ষ মূর্তি দেখে এলেন।

২৬ জুন তারিখে উইলিয়াম্ রস্কোর বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে R.D.H. সাক্ষাৎ করেন। বিলাতে পা দেবার পর সর্বপ্রথম যে বিশিষ্ট ইংরেজের সঙ্গে রাজার দেখা হয় তিনি ছিলেন পক্ষাঘাতে পড়ু ও যুত্ৰাপথযাত্রী রস্কো।

৩০ জুন এডামের সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা।

২ জুলাই তারিখে সত্যেন্দ্রনাথ ও মনোমোহনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং ৪ জুলাই সাধামতনে জাহাজ ধরলেন ভারতের পথে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেন ১৮৬২ অব্দের ২ই আগষ্ট তারিখে। বুদ্ধ বেচারাম ভান করলেন যেন ছেলের প্রত্যাগমন তিনি দেখেও দেখেন নি।

দেশে ফেরার পরেও R.D.H.-এর রামমোহন জিজ্ঞাসা অব্যাহত ছিল। ১৮৬৩ অব্দের জাহ্নসারী মাসে রামমোহনের সাক্ষাৎ শিশু চন্দ্রশেখর দেবের\*১২ সঙ্গে সাক্ষাৎক্রমে রাজার বিষয়ে অনেক তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, তার কিছুটা ছিল সত্য ঘটনা, কিছু কিংবদন্তী। ১৮৬৭ অব্দের জাহ্নসারী মাসে বর্ধমানে গিয়ে রাজার খাস চাকর রামহরি দাসের সঙ্গে আলাপ ক্রমে R.D.H. রাজার দিনচর্য্যার একটি কিরীতি সংগ্রহ করেছিলেন। অকিঞ্চিৎকর হলেও সে-হাঁচ হয়তো অনেকের আগ্রহ উদ্বেক করবে :

ভোর চারটায় শয্যা ত্যাগ করে রাজা কাকি পান করতেন। অতঃপর কতিপয় অনুচর সহ প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেন। সূর্যোদয়ের পূর্বেই বাড়ী ফিরে এসে পৌচাঁদি কর্ষ সারতেন। সেই সময় গোলক দাস নাগিড তাঁকে সেই দিনের খবর কাগজ পড়ে

শোনাত। অতঃপর প্রাতঃরাশ সেবে তিনি ব্যায়ামাদি করতেন। ব্যায়ামের পর কিকিৎ বিশ্রাম করে চিঠিপত্র নিয়ে বসতেন। তারপর স্নানের পালা। ভাত খেতেন দশটায়—সে সময়েও আরেক দফা তাঁকে খবর কাগজ পড়িয়ে শোনানো হত। আহাের পর খালি তক্তপোশের উপর বসে থাকেন নিদ্রা যেতেন। দুম থেকে উঠে হয় গল্পগুজব করতেন, নয় তো বহুবাক্যবের বাড়ি বেড়াতে যেতেন। বিকেল তিনটায় সময় জলখাবার, পাঁচটায় মনঃসমী ফল ও মেওয়া খেয়ে সাক্ষাৎক্রমে বেরোতেন। নৈশ ভোজন হত রাত দশটায়। তারপর রাত হুপুর অবধি বহুবাক্যবদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলত। শুতে যাবার আগে জল খাবারের সময় যে-কেকু খেতেন তারই কয়েক টুকরো মুখে দিতেন। এই কেকু ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়, তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'হালিলা'। লিখতে যখন বসতেন, ধারে কাছে কেউ যেতে পেত না—সুতরাং কখন যে তিনি লিখতেন কেউ তা জানত না।\* ১৩

R.D.H. দুই দেশ থেকেই প্রচুর প্রামাণ্য তথ্য ও দলিল সংগ্রহ করেছিলেন। রামমোহনের জীবনীকার সোফিয়া কলেট্কে কিছু কিছু তথ্য সরবরাহও করেছিলেন। বাসনা ছিল, তিনি স্বয়ং রামমোহনের জীবনী লিখবেন। দেশে ফেরার পর সরকারের অধীনে গুরুদায়িত্বপূর্ণ চাকুরীতে নিয়ত ব্যস্ত থাকার এবং ১৮৮৭ অব্দে তাঁর অকাল বিয়োগের কলে, সে ইচ্ছা আর কার্যে পরিণত করে যেতে পারেন নি। রামমোহন-জিজ্ঞাসাধিক থেকে এই বৃত্তা প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত কারণ হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তদপেক্ষা শোচনীয় এই যে, গীতার বৃত্তার পর পুত্র সুরুমারের সংগ্রহ থেকে এইসব সবর-রক্ষিত মহামূল্য সামগ্রী ১৮৯৬ অব্দে চুরি হয়ে যায়। সে-সময় সুরুমার হালদার বর্ধমানে সরকারী চাকুরীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কুড়িয়ে বাড়িয়ে অবশিষ্ট যা-কিছু পেয়েছিলেন তার বেশির ভাগ তিনি সাহিত্য পরিষদে দান করেছিলেন, কিছু হয় তো ছিল রাঁচি-সামলং কার্ণে হালদার

বাড়ির রাখালদাস মেমোরিয়েল লাইব্রেরিতে। অকুমার হালদার আর ইহুজগতে নেই, তাঁর পুত্র অসিতকুমারও পরলোকে। জানা যায় না মেমোরিয়েল লাইব্রেরির অমূল্য সংগ্রহের এখন কি অবস্থা।

পরবর্তী জীবনে ছোটনাগপুর অঞ্চলে মিশনারিদের কাণ্ডকারখানা দেখে R.D.H. খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠান বিষয়ে সন্দেহ হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। ব্রাহ্মদের বিষয়েও বিতর্ক করে একদা তিনি কর্তৃত্বজ্ঞা সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। কিন্তু রামমোহন বিষয়ে তাঁর প্রজ্ঞা ও আগ্রহ কোনো কালে হ্রাস পেয়েছিল বলে শোনা যায় না।

১ R. D. H.-এর The English Diary of an Indian Student: 1861-62 (প্রকাশ ১৯০০) পুস্তকের ভূমিকায় হরিনাথ দে একটি চমৎকার চরিত্রচিত্র তুলে ধরেছেন।

২ Reverend C. H. A. Dall ছিলেন একজন আমেরিকান মিশনারি। খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ প্রচার করার জন্য ইনি কলকাতায় এসেছিলেন। ঐর সঙ্গে R. D. H.-এর পরিচয় হয় ১৮৫৫ অব্দে। সম্প্রতি রামমোহনের জন্মতারিখ এসঙ্গে Rev. Dall-এর কথা বিশেষভাবে শোনা গেছে। ১৮৮০ অব্দে তিনি খবর কাগজে একটি বিবৃতিস্বত্বে জানান যে, ১৮৫৮ অব্দে রামপ্রসাদ রায়ের বাড়িতে উপস্থিত থাকা কালে, তিনি রামমোহনের এই কনিষ্ঠপুত্রের মুখে শুনেছিলেন যে তাঁর পিতা কলকাতার সন্নিকটে রাখানগরে ১৭৭২ অব্দের মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

৩ দ্রষ্টব্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী পরিশিষ্টাংশ।

৪ আমাদের এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে যখনাথের কন্যা অপ্রভার সঙ্গে R.D.H.-এর ষোড়শপুত্র অকুমার হালদারের বিবাহ হয়েছিল। অসিতকুমার হালদার ঐদের পুত্র।

৫ মিস কলেট-এর রামমোহন জীবনীর জন্য ইনি রামমোহনের দিনচর্যা বিষয়ে একটি বিশদ বিবরণ দিয়েছিলেন, পিতার কাছ থেকে শোনা গল্পের ভিত্তিতে।

৬ তাঁর Biographical Essays (1884) গ্রন্থে ম্যাক্সমুলার রামমোহন এসঙ্গে অবতারণা করেছেন।

৭ Last Days in England of Raja Rammohun Roy গ্রন্থের লেখিকা, Mary Carpenter ঐর

পিতা Lant Carpenter ও ইনি বৃহদাকালে রামমোহনের পরিচর্যা করেছিলেন। পরে ইনি ভারতে আসেন। ঐর বইয়ে R.D.H.-এর উল্লেখ আছে।

৮ R.D.H.-এর পুত্র অকুমার হালদার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাঁর পিতার সংগৃহীত রামমোহন স্মরণিক সভার দান করেছিলেন বলে শোনা যায়। সম্ভবত সেই সব সামগ্রীর অন্ততম হবে রাজার মাথার এক গুচ্ছ চুল। মাথার যত্নগার রাজা যখন কাতর, তখন তাঁর বাবার চুলের কিছুটা ছোঁতে বেখে দেওয়া হয়। তা থেকে একটি গুচ্ছ মিস এস্টলিন R.D.H.-কে দিয়েছিলেন।

৯ দেশ থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাবার পর রামমোহন হেয়ার পারিবারের হেফাজতে থাকতেন তাঁদের লণ্ডনস্থিত বেডফোর্ড স্কোয়ার বাড়িতে। বিলাতে রাজার সমস্ত কাগজপত্র এই বাড়িতেই থাকার সম্ভাবনা হেতু R.D.H. হয়তো ঐদের বাড়ি থেকে রামমোহন স্মরণ সভার কিছু সংগ্রহ করে থাকতে পারেন। অন্তত এই অনুমানের পরবর্তী হয়ে সোফিয়া কলেট, R. D. H.-কে ১৮৮২ অব্দে একটি চিঠি লিখে সেই সব সামগ্রী কিংবা তৎসংক্রান্ত সংবাদ ভিক্ষা করে একটি চিঠি দেন। মূল চিঠি সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহে আছে।

১০ রাজার মৃত্যুর পর ইনি একটি বই লেখেন, A Review of the Labours, Opinions and Character of Raja Rammohun Roy in a discourse on Occasion of Death, Delivered in Lemin's Mead Chapel, Bristol; A Series of Illustrative Extracts from His Writings; And a Biographical Memoir to which is subjoined an Examination of some derogatory statements in the Asiatic Journal, 1833.

১১ এই অনুচরবরের নাম সম্ভবত রামমোহন মুখোপাধ্যায় ও রামহরি দাস।

১২ চন্দ্রশেখর দেবই সংগ্রহণ একেশ্বরবাদীদের উপাসনার জন্য মন্দির স্থাপনের কথা বলেন। তৎ-বোধিনী পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৭৯৪ সালে) দেবের লিখিত ইংরেজি প্রবন্ধ Reminiscences of Rammohun Roy প্রকাশিত হয়।

১৩ রামহরি দাসের কথা বলতে গিয়ে R. D. H. লিখেছেন, রাজার নাম শুনেই এই প্রভুভক্ত ভক্ত্যের চোখে জল আসত।

# আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রামমোহন রায়

যোগানন্দ দাস

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

## মধ্যযুগীয় সমাজ ও সাহিত্য

মধ্যযুগীয় বাংলা দেশে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যনৈতিক চেতনা বা জাতীয়তাবোধ ছিল না। কারণ, সে-যুগটা ছিল সামন্ততান্ত্রিক যুগ, রাজার রাজার লড়াইয়ের যুগ, প্রজার কোনো স্বাধীন গতা বা মত নেই। সে-সময়ে কাঙালী হিন্দু সমাজের (যাদের মাতৃভাষা বাংলা) প্রধান নিয়ামক ছিল ধর্মের শাসন। সেই জন্য, সে-যুগের বাংলা সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে প্রধানত ধর্মীয় ভাবধারাকে আশ্রয় করে।

সুতরাং সেই যুগের বাংলা সাহিত্যকে বুঝতে গেলে আগে চেনা দরকার সে-যুগের ধর্মীয় মানসকে।

মধ্যযুগের দুটি প্রধান ধর্ম-ধারা ছিল হিন্দু ও মুসলমান। মুসলমান সমাজ বা ধর্মের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের তখন পর্যন্ত কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠেনি। সুতরাং মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে এখানে মধ্যযুগের হিন্দু ধর্ম ও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনাই প্রাসঙ্গিক।

সে-যুগের ধর্ম বলতে প্রধানত বোঝায় (১) বৈষ্ণব ধর্ম, (২) প্রচলিত পৌরাণিক ধর্ম। যেমন শৈব ও শাক্ত, মনসা সম্পর্কিত প্রভৃতি, (৩) মরমিয়া বা 'মিস্টিক' ধর্ম এবং (৪) সন্ন্যাসীর ধর্ম।

সন্ন্যাসীর ধর্ম বা উদাসীর ধর্ম মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে কোনো উল্লেখযোগ্য ছাপ রেখে যায় নি, এক দেহত্যাগের গান ছাড়া।

শৈব ধর্ম বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে শিবের গাজন। বাংলা সাহিত্যে শাক্ত ধর্মের দান রামপ্রসাদী। রামপ্রসাদী ভ্রামসঙ্গীতে প্রচলিত শাক্ত বামাচার

পঞ্চমকারের কাণালিক বা অবোরণহী ছাপ নেই। আছে গোড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার বাৎসল্য ভাবের প্রভাব, যা-কে নিয়ে ছেলের মান অভিমান আদার।

সহজিয়া প্রভৃতি মরমিয়া বা মিস্টিক সাহিত্য ছিল গুহ্য ও সঙ্কেতময়। সাধকরাই কেবল তার মানে বুঝতেন। জনসাধারণের মধ্যে সে-সাহিত্যের কোনো প্রচার ছিল না।

এ ছাড়া ছিল মঙ্গলকাব্য, যেমন মনসামঙ্গল প্রভৃতি; লোকসাহিত্য, যেমন বাউল, ভাটিয়াল, সারিগান, ময়নামতী, পাঁচালী, ভরজা বা কবির লড়াই।

সে যুগের প্রধানতম ধর্ম হ'ল ভক্তিধর্ম। ভক্তিধর্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে। মধ্যযুগের বাংলাদেশে রেনেসাঁস্ বা নবজন্ম এনেছিল গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, কারণ ঐ ধর্মের মধ্যেই নিহিত ছিল হিন্দু-মুসলমানেব মিলন-বাণী মানবধর্মের অঙ্কুর ('তুহ মাছুষ ভাই, সবার উপরে মাছুষ সত্য তাহার উপরে নাই')। গুহ মরমিয়া ধর্মেও তার আভাস ছিল।

বাংলা সাহিত্যে গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দান শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি, এবং বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি, বৈষ্ণব পদাবলী।

এই বৈষ্ণবধর্মের বা ভক্তিধর্মের লক্ষণ কি? কারণ, ঐ সব লক্ষণই বৈষ্ণব সাহিত্যে সফারিত হয়েছে।

ভক্তিধর্মের লক্ষণ মানে, ভক্তির লক্ষণ। ভক্তি কাকে বলে বুঝলেই ভক্তিধর্মের স্বরূপ বোঝা যাবে এবং তা থেকে সে যুগের প্রধানতম সাহিত্যের বা বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রকৃতি নির্ণয় করা সহজ হবে।

## ভক্তি কাকে বলে ?

হয় জন প্রধান বৈষ্ণবাচার্যের মধ্যে হুঁজন হলেন রূপগোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী। ভক্তিধর্মে এই হুঁজন আচার্যের প্রামাণ্যই সকলের চেয়ে বড়ো।

শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর “শ্রীশ্রীভক্তিরসামুত্‌সিদ্ধিঃ” গ্রন্থে বলেছেন :

“অভ্যভিলাষিতশূন্যং জ্ঞানকল্পাভিমাত্রতম্ ।

আত্মকল্যেণ কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিকৃত্যম ॥” (১।১।১১)\*

অর্থাৎ, উদ্ভব ভক্তি হ’ল ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন বা কৃষ্ণ-সাধনা। কিতাবে এই কৃষ্ণের অনুশীলন করতে হবে?—(১) অস্ত্র কোনো অভিলাস থাকবে না, (২) জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা অনারুত হতে হবে অর্থাৎ, জ্ঞান ও কর্মকে বর্জন করতে হবে, \* এবং (৩) অস্ত্রকূল পরিবেশ (অর্থাৎ যেখানে কৃষ্ণ কীর্তন বা কৃষ্ণপ্রসঙ্গ হয় বা মন যেখানে কৃষ্ণের অনুকূল হয়), অস্ত্রকূল সাহচর্যে (অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তদের সংসঙ্গে) ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন বা সাধনা করতে হবে।

আজকের আপোষের যুগে যেমন স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গে পৌরাণিক প্রতিমা পূজার একটা আপোষ চলেছে, তেমন চলেছে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম “সম্বন্ধ” একটা অর্থহীন আপোষ। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির “সম্বন্ধ” সম্ভব নয় কারণ হুঁয়ের সম্পর্ক হ’ল সাপে-নেউলের সম্বন্ধ। ঠাটি ভক্তি জ্ঞান-বজ্রিত।

\* শ্রীশ্রী-রূপগোস্বামী-প্রভুপাদ-প্রণীতঃ শ্রীশ্রীভক্তিরসামুত্‌সিদ্ধিঃ, শ্রীহরিনাস দাসেন সম্পাদিতঃ, শ্রীমুকুন্দদাস দাসেন প্রকাশিতঃ, শ্রীধাম নবদ্বীপাৎ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৪৬২ শ্রীগৌরাঙ্গাঙ্গ, পৃঃ ১০।

\* এখানে ‘জ্ঞান’ বলতে শাস্ত্র বা ‘বিধি’ সম্বন্ধ ব্রহ্মজ্ঞান চৈতন্যচরিতামৃত (ঐষ্টব্য), এবং কর্ম বলতে যাগ-যজ্ঞাদি দান-প্রতিগ্রহ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বা ‘বৈধ’ কর্ম। শাস্ত্রবিধির উপর প্রতিষ্ঠিত ভক্তি হল ‘বৈধীভক্তি’। বৈধী ভক্তি অধমভক্তি, জ্ঞান-কর্ম-বিবজ্রিত ভক্তিই উত্তম ভক্তি।

“শ্রদ্ধয়া লভতে জ্ঞানম্” শাস্ত্রবাক্য। জ্ঞান লাভ করতে গেলে মনে শ্রদ্ধার ভাব থাকা দরকার। কিন্তু ‘ভক্ত্যা লভতে জ্ঞানম্’ অর্থাৎ ভক্তির সাহায্যে জ্ঞানলাভ হয়, একথা কোথাও কোনো শাস্ত্রে নেই। শ্রদ্ধা ও ভক্তি এক কথা নয়। জ্ঞান লাভ করতে গেলে ভক্তিকে বাদ দিতে হবে, নয়তো ভক্তিসাধন করতে গেলে জ্ঞানকে বাদ দিতে হয়। সোনার বাটি হয়, পাথর বাটি হয় কিন্তু সোনার পাথর বাটি হয় না।

ভক্তিশাস্ত্র মতে ভক্তি অর্থে জ্ঞানহীন বিচারহীন অন্ধ বিশ্বাস। সেইজন্য মধ্যযুগের ধর্মীয় লক্ষণ হল “বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।”

মধ্যযুগে যোরোপের ক্যাথলিক ধর্মেরও লক্ষণ ছিল অন্ধ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে তর্ক বা যুক্তি তুলেছে, সে হয়েছে হেরেটিক বা বিধর্মী। তাকে আগুন পুড়িয়ে মারা হয়েছে।

মধ্যযুগীয় ধর্ম ও সমাজের প্রথম লক্ষণ জ্ঞানবিরোধী, বিচার-বিহীন অন্ধ বিশ্বাস। সাহিত্যেও তার ছাপ পড়েছে।

## পঞ্চভাবের সাধনা

মধ্যযুগীয় সাহিত্যের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ বিচার করতে গেলে ঐ যুগে ধর্মীয় সাধনার কথা আলোচনা করা দরকার, যা পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত হয়েছে সেই যুগের সাহিত্যে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা পঞ্চভাবের সাধনা। কৃষ্ণের অনুশীলন করতে গেলে পাঁচ ভাবে সেটা সম্ভব,—শাস্ত্র, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা কান্ত। এর মধ্যে প্রথম চারটি “এহ বাহু”, অর্থাৎ বাইরের জিনিষ। প্রেষ্ঠ বা অন্তরঙ্গ সাধনা হ’ল, মধুর বা কান্তভাবের সাধনা,—রাধা-কৃষ্ণের ভাব-সাধনা বা, আসলে, রাধাভাবের সাধনা।

শ্রীচৈতন্য অবতার। কিসের অবতার?—রাধাভাবের অবতার। রাধাভাবে কৃষ্ণপ্রেম আরাধনের জন্য তিনি শচীশর্মে অবতীর্ণ হয়েছিলেন (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, আদিলীলা)।



রাধাভাবের সাধনা হ'ল নারীভাবের সাধনা। একা কুক পুরুষ, আর সাতকোটি বাঙালী রাধা বা গোপিনী।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের এই গুণভাব বৈষ্ণব সাহিত্যে পঙ্করস হয়ে দেখা দিয়েছে। কৃষ্ণসখা স্ত্রীদাম স্ত্রীদাম বহুদামের সখাভাবই এবং রাধার সখীদের সখীভাবই সাহিত্যে সখ্যরস রূপে প্রকট হয়েছে। নন্দগোপাল ও বশোদ্ধার যে বাৎসল্যভাব তাই সাহিত্যে বাৎসল্য রসরূপে প্রকাশ পেয়েছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম—বিরহ মিলন প্রভৃতি বিচিত্রভাবে মধুর বা কান্ডরসের অপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়েছে।

কিন্তু মধ্যযুগের এই সব কটি ভাব বা রসই পেলব। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-নাটকের যে নব রস, তার মধ্যে কৃত্তরস, বীররস প্রভৃতির দেখা মধ্যযুগীয় সাহিত্যে পাওয়া যায় না। উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক সাধনা এর মধ্যে থাকতে পারে, কিন্তু সবটাই রাধাভাবের বা নারীভাবের সাধনা ও সাহিত্য।

পুরুষকার মধ্যযুগের সাহিত্যে কোথাও নেই। একমাত্র মঙ্গলকাব্যে চাঁদ সদাগরের কাহিনীতে কিছু আভাস আছে। কিন্তু সেখানেও সেই সাহিত্যরস কি ভাবে ফুটেছে?

আগাগোড়া শিবভক্ত চাঁদ সদাগরের সঙ্গে মনসা দেবীর লড়াইয়ের কাহিনী। চাঁদ সদাগরকে মনসাপূজা করতেই হবে, চাঁদ সদাগর কিছুতেই তা' করবে না। শেষ পর্যন্ত মনসাপূজা করতে হ'ল।

অর্থাৎ মধ্যযুগীয় চাঁদ সদাগরের কাহিনী হ'ল দৈবশক্তির কাছে পুরুষকারের পরাজয়ের কাহিনী।

সে যুগের সীতারাম প্রভৃতি বারোভূঞা জমিদারের শৌর্ধবীরের কাহিনীর কোনো প্রতিফলন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নেই।

মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের লক্ষণ হ'ল, ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দেওয়া 'ব্যবস্থা' অগ্রসারে অন্ধভাবে আচার পালন।

হুতরাং মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজ ও ধর্মের লক্ষণ হ'ল (১) ভক্তিধর্মের বৃত্তি ও বিচারহীন, জ্ঞানবর্জিত ভক্তি সাধন বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের ঐভাবে আচার পালন, (২) নারী ভাবের ও দ্বন্দ্বভাবের সাধনা এবং (৩) পুরুষকারের পরাজয় (বাষ্ট্রে মুসলমানের কাছে হিন্দুর দাসত্ব)।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও সমাজ ও ধর্মের এই 'মুড়ু' বা 'স্পিরিট' প্রতিফলিত হয়েছে।

এই যুগের সাহিত্যের 'চরম্ অফ্ ম্যাটার' বা বিষয়-বস্তু নির্বাচন হ'ল : শিবের গাজনে শিব, মনসামঙ্গলে মনসা, চণ্ডীকাব্যে চণ্ডী, শান্ত সাহিত্যে (রামপ্রসাদ) তারা, বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধা ও কৃষ্ণ। পাঁচালী, যাত্রা, কথকতার বিষয়বস্তু পৌরাণিক। তরঙ্গা বা কবির লড়াই অশ্লীলতা ভরা। মূল বিষয়বস্তু, ধর্ম ও দেবদেবী।

এইবার আমরা আধুনিক সমাজ ও সাহিত্যের লক্ষণ বিচারে প্রবৃত্ত হব।

ক্রমশঃ



# ছেলেদের মাতৃত্বাভি

## দান প্রতিদান

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

এক চাষীর ভিন ছেলে ছিল। বড়টির নাম লোহারাম, মেকোর নাম উলটারাম, ও ছোটর নাম বুড়ুরাম। বুড়ুকে নিয়ে সকলে হাসিঠাট্টা করত ও বাড়ীর লোকেরা সকলেই তাকে ভাঙ্ছিলোর চোখে দেখত।—একদিন বাড়ীতে কাঠ ফুরিয়ে গেছে শুনে বড় ছেলে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাবে ঠিক করল।—চাষীবউ তার সঙ্গে পরটা ভরকারি তৈরী করে দিল ও কিছু ঠাণ্ডা মিষ্টি সরবৎও দিয়ে দিল।

জঙ্গলে পৌঁছবামাত্র লোহারামের একটি থুড়থুড়ে বুড়োর সঙ্গে দেখা হলো। বুড়ো বল্লো “ওহে চাষী ভাই, আমাকে কিছু খেতে দাও না। ভেটায় মরে যাচ্ছি—ক্ষীবেও বেজার পেয়েছে।”

লোহারাম বল্লো, “দুর্ দুর্। তোকে আমার খাবারের তাগ দেব কেন? যাঃ, যাঃ। বিদায় হ।” লোকটাকে ভাড়িয়ে দিয়ে সে নিজে খেতে বসে গেল।—খাওয়া দাওয়া শেষ করে ফুড়ুল খানি ছলে যেই সে এক কোপ বলাতে গেছে একটা গাছের গুড়িতে অমনি ফুড়ুলটা তার হাতের থেকে খসে গিয়ে তার গায়ের উপর পড়ল। তখন সেই রক্তাক্ত অবস্থায়, সে বাড়ী ফিরে যেতে বাধ্য হলো।

বেলো ছেলে উলটারাম তার পরদিন কাঠ কাটতে বেরল। তার মা তাকেও খাবার দাবার গুঁহিয়ে

দিল। জঙ্গলে গিয়ে কিছুদূর এগিয়ে তারও সেই বুড়োটীর সঙ্গে দেখা হলো। বুড়ো তারও কাছে খাবার চাইল কিন্তু সেও বিরক্ত হয়ে “বল্লো, আমি কি নিজে না খেয়ে তোমাকে খাওয়াব? যাও যাও, বিদায় হও।” খাওয়া দাওয়া শেষে সে কাঠ কাটতে যেই গিয়েছে অমনি ফুড়ুলটা হাতের থেকে ফসকে গিয়ে তার গায়ের ওপর পড়ে পা কেটে গেল। তখন অল্প কাঠেরেরা তাকে কাঁখে করে বাড়ী পৌঁছে দিল।

এবার একমাত্র বুড়ুরাম বাকি রইল।—সে তার পরদিন সকালে তার বাবাকে বল্লো, “এবার আমাকে কাঠ কাটতে যেতে দাও জঙ্গলে। ‘তার বাপ বল্লো, ‘দেখো বাবা, তোমার ভাইদের কি অবস্থা হয়েছে। তাহাড়া জানই তো তোমার বুদ্ধি কম। তোমাকে কোন সাহসে জঙ্গলে পাঠাই বল ত?”

বুড়ু কিন্তু কিছুতেই কথা শুনলো না। শেষে চাষী অনিচ্ছাসহেও তাকে কাঠ কাটতে পাঠাতে রাজী হলো। তার মা রাগ করে তাকে কিছু বাসী খাবার ও টুক্ সরবৎ সঙ্গে দিয়ে দিল। বুড়ু এই নিয়েই খুঁস হয়ে জঙ্গলের গবে রওনা হলো।—কিছু দূর যেতেই সেই বেঁটে বুড়োটা তার পথ আগলে দাঁড়াল। তারপর তার খাবারের দিকে তাকিয়ে বল্লো, “আমার কিদে পেয়েছে—কিছু খেতে দেবে?”

বুদ্ধরাম বলো, “এখানে এসে বসো। আমার সঙ্গে কিছু বাসী খাবার আছে, তার ভাগ চাও তো নিশ্চয় দেব।—আর সববৎটাও টুকু, তাও দিতে পারি।” হু’জনে রাতার ধারে গাঁহের ছায়ায় বসে খাবারগুলি বার করল। কি আশ্চর্য্য, কোথায় সেই বাসী খাবার-গুলি গেল? তার বদলে চমৎকার খাদ্য কচুরি আর তরকারি কলাপাতার মোড়া আছে। এমন কি সববৎটাও তাণ্ডা ও মিষ্টি হয়ে গেছে।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে বুড়োটা বলো—“তোমার কাছে আমি এত উপকার পেলাম যে এর বদলে আমিও তোমাকে কিছু দিতে চাই। ওই যে ঘরে ওই পুরনো গাছটা দেখছ, ওটাকে কেটে ফেল। ওর গুঁড়ির ভিতরে কিছু গুপ্ত ধন পাবে।”—

বুদ্ধ কোঁড়ে গিয়ে সেই গাছটার কুড়ুলটা বসাতেই একটা সোনার হাঁস গাছের গুঁড়ির ভিতর থেকে উড়ে বেরিয়ে এলো।—বুদ্ধ সেটাকে তুলে নিয়ে কাছেই একটি ছোট সরাইখানায় গিয়ে উঠল ও সেখানেই হাত কাটাতে ঠিক করল।—সরাইখানার মালিকের তিনটি মেয়ে—এরা সোনার হাঁসটি দেখে তার পালকগুলি নেবার লোভে বুদ্ধর ঘরের সামনে ও আশেপাশে ঘোরা-ঘুরি করতে লাগল।—

বড় মেয়েটি ভাবল—“লোকটা দেখছি ঘরের বাইরে গেছে—এইবার ক’টা পালক নিয়ে আসা যাবে।” ভিতরে গিয়ে যেই না সে হাঁসের ডানা ধরেছে অমনি তার হাত সেখানে আটকে গেল। কিছুতেই সে হাত ছাড়তে পারল না।

অল্পকণ পর মেঝো বোন ঘরে ঢুকল। দাঁড়ির অবস্থা দেখে সে তাকে ছাড়তে গেল কিন্তু গায়ে হাত দেওয়া মাত্র সেও দাঁড়ির পিছনে আটকে গেল ও কিছুতেই হাত ছাড়তে পারল না।

আধঘন্টা পর ছোট বোন পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল পালক সরাতে।—বাকি দুই বোন চিংকার করে উঠল—“আগিস্ না এখানে—সাবধান। পালা পালা।” কিন্তু সে ভাবল, “বা রে বা, এরা নিশ্চয় আমাকে পালকের

ভাগ দিতে চায় না বলে এরকম করছে।” এই না তেবে সে আরও আগ্রহ করে এগিয়ে এসে তাদের গায়ের উপর হুমাড় খেয়ে পড়ল। এরপর তিনজনই হাঁসের গায়ে আটকে রইল সারা রাত।

পরদিন ভোরে বুদ্ধরাম ঘরে ঢুকেই কোনা দিকে না তাকিয়ে হাঁসটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।—তিনটি মেয়ে হাঁসের সঙ্গে চলেছে সে বিবর তার কোন খোঁজ নেই। তারা ওর সঙ্গে সঙ্গে ডাইনে বাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলো। যেতে যেতে একটা ধান ক্ষেতের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছেছে এমন সময় গায়ের বড় মোড়ল তাদের এইভাবে যেতে দেখে চিংকার করতে আরম্ভ করল—

“বালি তোমরা কি সব লজ্জার মাথা খেয়েছ? তিনজনে মিলে একটা ছেলের পিছনে দৌড়ছে। কেন? থামো থামো।”—বলতে বলতে সে ছোট মেয়েটার হাত ধরে টানতে শুরু করল। কিন্তু তাকে তো ছাড়তে পারলই না বরং উলটে সেও গেল মেয়েগুলির সঙ্গে আটকে ও তাদের সঙ্গে কোঁড়ে কোঁড়ে চলতে লাগল।

একটু এগিয়ে গিয়েই তাদের ছোট মোড়লের সঙ্গে দেখা হলো।—সে বড় মোড়লের খোঁজে চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বুদ্ধরামের পিছনে এতগুলি লোক দেখে সে চোঁচাতে শুরু করল, ও বড় মোড়ল দশাই। বালি কোথায় যাওয়া হচ্ছে তুমি? এদিকে মোড়ল গিরি তোমার খোঁজে আমাকে চারদিকে ঘোঁড়োঘোড়ি করাচ্ছে আর তুমি কি না তিনটে মেয়ের আঁচল ধরে ছুটোছুটি করছ। হিঃ হিঃ।’ এতেও বখন মোড়ল মুখ ফিঁসিয়ে দেখল না তখন সে কোঁড়ে গিয়ে মোড়লের কাপড় ধরে টানড়ে শুরু করল। এরপর সেও গেল ঐ দলের সঙ্গে আটকে।—

এইভাবে যেতে যেতে তাদের হুঁটো চারদিক সজে দেখা হলো। দুই মোড়লে চিংকার করে তাদের ডাকতে লাগল, “বাঁচাও, বাঁচাও, শিগগির এসে আমাদের বাঁচাও এই রাহুকরের দলের হাত থেকে।” কিন্তু হার, তারা যেই না মোড়লদের গায়ে হাত দিয়েছে অমনি

তারাত গেল আটকে আর এরপর সাতজন লোক বুকুয়াম ও তার হাঁসের সঙ্গে চলতে লাগল।

বেশ কিছুদূর গিয়ে তারা একটা শহরে এসে পৌঁছল। সেখানে রাজকন্যা জয় অবধি কখনও হালে নি। সেই কন্যারাজ্যমশাই জাহির করাইলেন যে, রাজকন্যাকে যে হাসাতে পারবে, তার সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন। বুকুয়াম শহরে ঢুকেই এই কথা শুনে তার দলবল নিয়ে রাজকন্যার সমুখে উপস্থিত হলো।—রাজকন্যা এই সাতজন লোকের অবস্থা দেখে এত জোরে হাসতে শুরু করল যে কেউ তাকে থামাতে পারল না।

কিন্তু রাজ্যমশাই কথা রাখতে রাজি হলেন না। বুকুয়ামের মত বোকা ছেলেকে তিনি জামাই করতে চাইলেন না। কাজেই প্রথমে নানা প্রকার আপত্তি করে তারপর বলেন—

“বেশ তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবো রাজকন্যার যদি ছুঁমি বা তোমার কোন বন্ধু দশ হাজার পিপে সরবৎ খেতে পার।”

বুকুয়াম মাথায় বাজ পড়ল। এ কি সম্ভব কোন মানুষের পক্ষে? মনের হুঁশে সে আবার জললে কিরে গেল।—যে গাছের থেকে সোনার হাঁস বেরিয়েছিল সেইখানে যেতেই দেখল যে সেই বৃড়োটা গাছের নিচে বৃখ কাঁচুমাচু করে বসে আছে।—তার কি হয়েছে জিজ্ঞেস করার পে বুকুকে বললো, “আমার অসম্ভব ভেট্টা পেয়েছে। কিছুতেই এ ভেট্টা মিটছে না। ঠাণ্ডা জলও আমার সহ হয় না। একটা পিপে ভরা সরবৎ খেয়েও এ ভেট্টা মিটল না।—কি করি বল ত?”

বুকুয়াম বললো, “আমার সঙ্গে চলো। তোমাকে যেখানে নিয়ে যাবি সেখানে কিছুক্ষণ থাকলেই তোমার ভেট্টা মিটতে বাধ্য হবে।—” রাজবাড়ীতে গিয়েই সেই সরবতের পিপেগুলি দেখেই বৃড়োটা সরবৎ খেতে শুরু করে দিল। এক একটা পিপে শেষ করে সেগুলিকে বাইরে কেলতে লাগল। বুকুয়াম হতভম্ব হয়ে দেখতে লাগল। সারাদিন এইভাবে সরবৎ খেয়ে সন্ধ্যাবেলায় সব পিপে সে খালি করে দিল।

বুকুয়াম নাচতে নাচতে রাজ্যর কাছে গেল বিয়ের কথা জিজ্ঞাসে। কিন্তু রাজ্যমশাই তখনও মত দিলেন না। তিনি এবার বলেন, “তোমার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে

দেব যদি ছুঁমি এমন কোন লোক আনতে পার যে ওই জুপাকৃত রুটিগুলি সব একদিনে খেতে পারে।”

বেচারী বুকু আবার জললে গিয়ে সেই গাহতলায় হতাশ হয়ে বসে রইল। কিছু দূরে দেখল, একটা লোক হাত-পা বুড়ে বসে আছে, তার শরীর মোটা মোটা দাঁড়ি জড়িয়ে বাঁধা। বুকুকে সে বললো, আমার নাম আটেপুটে, ওই হোকানের বত পাউরুটি ছিল সব খেয়েছি কিন্তু আমার এই প্রচণ্ড ক্ষিদে কিছুতেই মিটছে না। আপাতত পেট বেঁধে বসে যাতে আমি ক্ষিদেের যন্ত্রণা কিছুটা কমে।

বুকু ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললো—

“ওঠো হে ওঠো। আমি তোমাকে এমন জায়গার নিয়ে যাব যে সেখানে তোমার মত ইচ্ছে ছুঁমি তত খেতে পারবে।”

রাজবাড়ীতে গিয়ে সেই জুপাকৃত রুটিগুলি দেখেই লোকটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এত তাড়াহাড়া সে রুটিগুলো খেলো যে সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগেই সমস্ত রুটিগুলি তার খাওয়া শেষ হয়ে গেল। বুকু আবার রাজ্যর কাছে বিয়ের কথা জিজ্ঞাসে। কিন্তু রাজ্যমশাই এবারেও তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হলেন না। তিনি বলেন—“আরো একটি কথা যদি আমার রাখতে পার তো তোমার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেব। একটা জাহাজ নিয়ে এসো, যেটা ডাকার চলে ও জলেও ভাসে।—”

বুকু এবার দৌর না করে দৌড়ে জললে কিরে গেল। সেই গাহতলায় দেখল যে সেই বৃড়ো বসে আছে। বৃড়ো তাকে দেখেই বললো—“আমিই তোমাকে সাহায্য করার জন্য সরবৎ ও রুটি খেয়েছি—এবারেও একটি জাহাজের ব্যবস্থা করছি। ছুঁমি আমার উপকার করেছিল বলে আমিও তোমাকে সাহায্য করছি। ওই দেখো ওই জাহাজটা—এটা ডাকার চলে আবার জলেও ভাসে।”

বুকু জাহাজটিতে উঠে তখনই রাজ্যর সামনে গিয়ে হাজির হলো। রাজ্যমশাই এবার আর আপত্তি করতে পারলেন না, কাজেই পরদিন রাজকন্যার সঙ্গে বুকুয়ামের বিয়ে হয়ে গেল। তারপর অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা নিয়ে বুকুয়াম মনের আনন্দে বিন কাটাতে লাগল।

# সংসার

## করাক

পশ্চিম বাংলার অর্থনীতি ও বাঙালীর জাতীয় জীবনের সংরক্ষণ ও অগ্রগমনের জন্য ভাগীরথীর জল-প্রোত বৃদ্ধি একান্তভাবে প্রয়োজন। এই বিষয়ে পূর্ণ অহুসঙ্কান, আলোচনা ও বিচার করিবার পরে করাক পরিচালনা কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পরে অজ্ঞাত প্রদেশের অপেক্ষাকৃত অনাবশ্যক সুবিধা সৃষ্টির জন্য গঙ্গার জল নানাভাবে করাকাতে পৌঁছাইবার পূর্বেই এদিকে ওদিকে চালাইয়া দিয়া করাক পরিচালনাকে বানচাল করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয় ও সেই অপকর্ম অনেকাংশে করিয়াও ফেলা হইয়াছে। এই বিষয়ে “সুগ্রহাণী” সাপ্তাহিকে বলা হইয়াছে—

কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী কে এল রাও কলকাতায় এসে বাঙালী জাতির উদ্দেশ্যে চরম পত্র দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হুগলী নদীতে সব সময় ৪০ হাজার কুশেক জল দেওয়া সম্ভব হবে না, ২০ হাজার কুশেক বা তার কম জল নিয়েই বাঙালীকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং হুগলী নদীতে জল প্রবাহ ত্বরিত করার ফলে যদি কলকাতা বন্দর ও নগর ধ্বংসও হয়ে যায় তাহলেও সারা ভারতের স্বার্থে বাঙালীকে তা মেনে নিতে হবে। সারা ভারতের স্বার্থে বাঙালীকেই শুধু চিরকাল স্বার্থ ত্যাগ করতে হয় একথা আমরা জানি। বাঙালীর জন্য ভারতের আর কেউ স্বার্থ ত্যাগ অবশ্যই করবে না—করতে কেউ কখনো বলেও নি। কিন্তু কে, এল, রাও বা বলেছেন তার অর্থ হল বাঙালীকে এবার আত্মহত্যা বরণ করতে হবে। স্বার্থ বলেতে তিনি বুঝিয়েছেন উত্তরপ্রদেশে গঙ্গা থেকে খাল কেটে

জল বের করে নিয়ে সেখানকার সেচ ব্যবস্থা বাড়ানো এবং গঙ্গা থেকে কাবেরী নদী পর্যন্ত খাল কেটে গঙ্গার জল দাক্ষিণাত্যে নিয়ে যাওয়া। গঙ্গার জল থেকে বাংলাকে বঞ্চিত করাই এইসব পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য। বাংলার গঙ্গার অবস্থা কি হয়েছে তা কলকাতার অদূরে চন্দননগরে গেলেই বোঝা যায়—মুর্শিদাবাদে গঙ্গা হেঁটে পার হওয়া যায়। করাক প্রকল্প করা হয়েছিল গঙ্গার জলপ্রবাহ বাড়াতে ও কলকাতার বন্দরের স্বার্থে হুগলী নদীর নাব্যতা বাড়াতে। কে, এল, রাও করাক প্রকল্পকে বানচাল করতে চান। যখন হুগলী নদীতে এখনই জল বাড়ানোর আশায় সবাই উৎসুক হয়ে আছে তখন কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী বলেছেন যে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের আগে ফাঁড়ার ক্যানাল খনন করা হবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এই অজ্ঞার আচরণের প্রতিবাদে করাক সম্পর্কে সকল তথ্য একত্রিত করে একটি বৈতপত্র প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। সেচমন্ত্রী কে, এল, রাও অতি ক্ষুণ্ণ ভাবায় রাজ্য সরকারকে সেজন্য নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, বৈতপত্র বের করলে সারা ভারত বাঙালীর ওপর ক্রুদ্ধ হবে। কেন? তথ্য প্রকাশ করতে গেলেই বাঙালীর মহা অপরাধ হবে কোন্ কারণে? এ থেকে একটা কথাই বোঝা যায়। কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী বলতে চান যে বাঙালীকে সারা ভারতের স্বার্থে জবাই করা হবে, কিন্তু বাঙালী প্রতিবাদে সামান্য শব্দও করতে পারবে না। এই কি নব্য ভারতের নব্য বিধান? কে, এল, রাও আশে বলেছেন যে সুখ্যমন্ত্রী সিকান্দার খান হুজুমান

ব্যক্তি ও তিনি যাও সাহেবের সব কথাই মেনে নিরেছেন। সিদ্ধার্থস্বরূপ এ কথার সত্যতা অস্বীকার করেন নি। তাহলে কি তিনি বাঙালীর আত্মহত্যার দাবী মেনে নিলেন? এমন কি খেতপত্র প্রকাশের কথাও আর শোনা যাচ্ছে না। বাঙালী জাতির উৎসাদনের নতুন বড়বড় সাফল্যসম্পন্ন করতে বাংলার সরকারই কি শেষ পর্যন্ত সাহায্য করবেন?

কংগ্রেসী সরকার অন্তত কি করিতেছেন

সকল রাষ্ট্রীয় দলই নির্বাচনের সময় প্রয়োজনের আতিরিক্ত কথা বলিয়া থাকেন। কার্যতঃ বাহা করা অসম্ভব এবং দলপতিদের বাহা করিবার কোনও ইচ্ছা নাই সেই সকল প্রতিশ্রুতিও দরাজ হস্তে বিতরণ করিয়া নির্বাচনে জয়লাভ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল প্রতিশ্রুতি যখন দেওয়া হয় তখন ঐ সকল ব্যক্তির মন্ত্রী বা বিধান সভার সভ্য হইবার পূর্বের দায়িত্বহীন অবস্থা। সেইজন্য তাঁহাদের প্রতিশ্রুতির কোন দায়িত্বগত মূল্য থাকে না। কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভ করিবার পরে মন্ত্রীরা কিছু বলিলে তাহার একটা দায়িত্বের দিক থাকে। অনেক প্রদেশেই কিছু মন্ত্রীগণ প্রতিজ্ঞা পালনে তৎপরতা প্রদর্শন করিতে অক্ষম হইতেছেন দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের সমালোচনাও হইতেছে প্রচুর। “জিপুরা” সাপ্তাহিকে সম্পাদকীয়ভাবে বলা হইয়াছে :—

তিন বছরের মধ্যেই জিপুরার সমস্ত সমস্তার সমাধান হইবে। বিগত পঁচিশ বছরে বাহা সম্ভব হয় নাই, তাহা আগামী তিন বছরেই সম্ভব হইবে বলিয়া জিপুরার সুখ্যমন্ত্রী শ্রীমধুসেন সেনগুপ্ত সোদিন দশ হাজার ক্রয়কের মহতী জমায়েতে ডেকোদণ্ড ভাষণ প্রদান করিয়াছেন। চমৎকার ভাষণ। সকলকেই চমৎকৃত করিতে সফলকাম হইয়াছে। চমৎকারিতার হইটি দিক ছিল। একটা কালো অন্ধকার দিক অল্পটা কুরাশাহর প্রভাতের রক্তিম সূর্য্যোদয়। কালো দিকটা হইল অতীত কাল আর ভবিষ্যতটাই হইল প্রভাত-সূর্য্য। বিগত পঁচিশ বছর কংগ্রেসী পালন দেশকে উন্নত বা সমৃদ্ধ করিয়া নবসাধারণের অভাব আতিবোধ বিদূরিত করিয়া দ্রুত

ভারত গড়িয়া তুলিতে কেন সক্ষম হয় নাই—শ্রীমেনগুপ্ত উহা অতি মূল্যবান ভাবে তত্ত্ব ও তথ্যাদি সহ পরিবেশন করিয়াছেন। কংগ্রেসের আদর্শ এবং নীতির কোন দোষ নাই; উহা পূর্বে বাহা ছিল আজও তাহাই আছে, ভবিষ্যতেও উহার কোন হেরকের হইবে না। অতীতের কংগ্রেসীরাই যত নষ্টের মূল। অতীতের কংগ্রেসীরা নীতি ও আদর্শ মার্কিক কাজ না করিয়া মুনাফাশিকারী, স্বার্থায়েবী, পুঁজিপতিদের জীড়নক হইয়া দেশে কারেন্দী স্বার্থের পাইকারী করিবার খুলিয়া দিয়াছিল এবং নিজেরা ঐ কারেন্দী স্বার্থকে মদৎ দিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে একটা বাকসংঘ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছিল। তাই অতীতের কংগ্রেস কেবল কথা দিয়াছে তথা কথা-মালায় গোটা ভারতকে স্বর্গ বা স্বর্ণরাজ্যে পরিণত করিবার রত্নীন চিত্র আঁকিত করিয়া জাতিকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেই সচেষ্ট ছিল। বন্ধনার ব্যাপারে মোহিনী শক্তিরও একটা সীমা থাকে। দেশ বা জাতিকে বেশীদিন ঐ মোহ রোগ কানু করিয়া রাখিতে পারে নাই। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনেই দেশবাসী কংগ্রেসকে তাহার অপদার্বিতার জন্য সমুচিত জবাব দিল। এই জবাবের পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের পুনর্বিভাগ তথা নবকংগ্রেসের অভ্যুত্থান। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, শ্রীমধুসেন সেনগুপ্ত একজন বন্ধনশীল কংগ্রেসী; অতীতে ছিলেন এবং বর্তমানেও হইয়াছেন। মাঝখানে ১৯৬০ সালে বাকসংঘ কংগ্রেসকে কর্মময় জগতে টানিয়া নিবার আশ্রয় চেষ্টা করিয়াও যখন সফলকাম হইলেন না, তখন প্রথমে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ পরে কংগ্রেস হইতেও নিজেকে অপসারিত করিয়া কংগ্রেসের নীতি আঁকড়াইয়া রাজনৈতিক দল গঠন করেন। আজ কার্য কারণেই তিনি আবার কংগ্রেসী হইয়াছেন এবং যোগ্যতার জন্যই সুখ্যমন্ত্রিত্ব তথা কংগ্রেস দলনেতা হইয়াছেন। অতএব তিনি বীরদর্পেই ঘোষণা দিয়াছেন সোদিন—“আমি কথার কথা বলিব না, কানের কথাই বলিব—কাজ করিব।” আজ কংগ্রেস বাহা বলিতেছে,

কাজেও তাহাই করিতেছে। শ্রীসেনগুপ্তের মতে যথাযথ কাজ করিতে পারিলে জিপুয়ার সমস্ত সমাধানে তিন বৎসর কালই যথেষ্ট।

মহতী কৃষক জমারেতের প্রোত্মমণী তাহাদের দেতার বক্তৃতা শুনিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় নাই। হইলেও তাহা ধোবের হইত না। কারণ সকলেরই আজ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, ইন্দিয়াজাতীয় কংগ্রেস কথার ও কাজে এক। চমৎকারিতার এখানেই শেষ নহে। শ্রীসেনগুপ্ত কবুল করিয়াছেন, এক মাসের মধ্যে (কেহ কেহ বলে দুই মাসের মধ্যে) দুই হাজার বেকারের চাকুরী দেওয়া হইবে এবং মন্ত্রিপরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক সরকারী কর্মচারীদের মেজাজ সারিকের নির্মিত অতি সম্মত রাজ্য পর্যায়ে পে-কমিশন প্রদান করিবেন। ক্রাস্। কৃষক, বেকার ও সরকারী কর্মচারী—একে একে সকলেরই হ্যাঁ করা যুগ তিনি বুক করিয়া দিয়াছেন। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শ্রীসেনগুপ্ত দীর্ঘ আড়াই মাস ঘোঁরা ছিলেন; কিন্তু অলস ছিলেন না। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণকেও ঘরে বসাইয়া রাখেন নাই। তিনি যত্ন করে কবার দিল্লী হিল্লী করিয়াছেন আর মন্ত্রী উপমন্ত্রীদের দ্বারা সমগ্র জিপুয়া চাষিয়া বেড়াইবার কাজ করাইয়াছেন। দীর্ঘ আড়াই মাস প্রজ্ঞাতি চলার পর কর্মকাণ্ড ঘোষিত হইয়াছে। কর্মকাণ্ড ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রী ধারিয়ার আসিয়া হাজির হইয়াছেন জিপুয়াতে। তাঁহারও লক্ষ্য কৃষি ও কৃষকের কল্যাণ। জিপুয়ার সমস্যা সমাধানে তথা উন্নতি বিধানে কেন্দ্রীয় সরকারও নাকি রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে বিশেষ আগ্রহী তাহা শ্রী ধারিয়ার সাংবাদিক বৈঠকে কবুল করিয়া গিয়াছেন।

তবে কিনা উভয়ের করার মধ্যে কীকিং কাক হইয়াছে। যে কাক ভবিষ্যতে কীকিতে পরিণত হইবার অবকাশ আছে। প্রথমে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রী মোহন ধারিয়ার কথায় ধরা যাক। তিনি বলিয়াছেন জিপুয়ার সমস্যা সমূহ যেমন জটিল তেমন বহু বস্তুর বিভিন্ন একটি একাও কর্মকাণ্ড।

জিপুয়ার আর্থিক সমস্যা এই কর্মকাণ্ডের নিকট সমুদ্রে বাঁরিবিন্দুৎ। অভাব ইহার সার্বিক রূপধারণ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ সক্রিয় সাহায্য ব্যতিরেকে হইতে পারে না। এই প্রকল্পকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। রাজ্য সরকার যদি কেবলমাত্র নিকট পুরাপুরি ভাবে আত্ম সমর্পণ করেন তবেই উহা সম্ভব হইতে পারে। অর্থাৎ জিপুয়ার উন্নয়নের চাবিকাঠি একটি একটি করিয়া আলাদা ভাবে চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে কোন সার্বিকতা নাই; সামগ্রিকভাবে গোটা চাবি-গুচ্ছটি এক সঙ্গে (বেল দাও, রাত্তা দাও, বিহুয়া দাও অর্থ দাও,—সর্বশেষ পর্য্যায়ের দাও শিল্প) পাইতে হইবে। শ্রী ধারিয়ার মতে এই জন্ত রাজ্যসরকারের শক্তিশালী টায় প্রদান করা আবশ্যিক এবং তৎসঙ্গে রাজ্যবাসীকে বৃত্ত করিয়া কেবলমাত্র নিকট দাবী পেশ করা উচিত। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখময় সেনগুপ্তের সর্বটা ছলনার কম শক্ত নহে। তিনি বলিয়াছেন যথাযথ কাজ করিতে পারিলে জিপুয়ার সমস্ত সমস্যা সমাধানে তিন বছর সময়ই যথেষ্ট। এই “যথাযথ” শব্দের অর্থ হইল, তাঁহাকে তিন বছর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাজ করিবার গ্যারান্টি দিতে হইবে এবং এই সময়ে কোন প্রকার উৎপাত-উপদ্রব সৃষ্টির করা (ধর্মঘট, বিক্ষোভ ইত্যাদি) চলিবে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার রাজ্যবাসী সর্বসাধারণের পক্ষে এই ধরনের সর্ব মানিয়া নেওয়া বোধহয় অসম্ভব কিছু নহে; কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি এবং আমলাতন্ত্র এই—গণতান্ত্রিক সত্ত্বাধীনে বাইবে কি? বাইতে পারে কি? না; বাইতে পারে না। কথা দিতে পারে, সাধীও হইতে পারে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজেদের আত্ম বিলুপ্তির আশঙ্কার সেবোটেজ ও (Sabotage) করিতে পারে। তবেই দেখা যায় জিপুয়ার উন্নয়ন “সাধারণ নাচনের” পাজার পড়িয়াছে।

### জর্জী ডিমিট্র

বুলগেরিয়ার জননেতা ও স্বাধীন বুলগেরিয়ার প্রথম প্রধান মন্ত্রী জর্জী ডিমিট্র ১৮ই জুন ১৮৮২ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সাধারণ গ্রহণ পার্থক্যেই

জন্মগ্রহণ করেন। ১২ বৎসর বয়সে তাঁহাকে স্কুল ছাড়িয়া কর্কস্কেনে জীবিকা অর্জনে নিযুক্ত হইতে হয়। তিনি প্রথমে ছাপা খানায় হরক বসাইয়া মুদ্রণ কার্যের শিক্ষা-লাভ হ'ন। সেইখান হইতেই তিনি শ্রমিকদিগের সংঘবদ্ধতার জন্য কার্য আরম্ভ করেন ও শীঘ্রই একজন জনপ্রিয় ও শক্তিশালী শ্রমিক নেতা হইয়া দেশবাসীর নিকট দেখা দেন। ডিমিত্রি বিপ্লববাদী ছিলেন। তাঁহার সকল বক্তৃতাতেই তিনি জনগণের অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে কথা বলিতেন এবং শ্রমিকদিগের অন্যান্যগুলির প্রতিবাদও তিনি জোরাল ভাবেই করিতেন। প্রথম মহা যুদ্ধে তিনি সর্বত্র পুরিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের হইয়া যুদ্ধ করিবার বিরুদ্ধে প্রচার চালাইতেন এবং অনাহারবিক্ষেপে জনসাধারণের জন্য খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতি আদায় করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সকল যুদ্ধ বিরোধী কার্যের জন্য তাঁহাকে কারাবদ্ধ করা হয়। যুদ্ধ শেষ হইলে জর্জী পুনরায় জন নেতার পদে

অধিষ্ঠিত হইলেন। দায়িত্ব, ত্রব্যাদির, সূচ্য কৃষি ইত্যাদির বিরুদ্ধে যখন তিনি প্রবল আন্দোলন চালাইতেছেন সেই সময়েই প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিগণ সাময়িক নেতাদিগের সাহিত মিলিত হইয়া (জুন ১৯২০) শাসনশক্তি কাড়িয়া লইয়া ক্যান্টো বরণের রাষ্ট্র গঠন করেন। ডিমিত্রি অতঃপর তাঁহার আন্দোলন চালাইলেন বৈরাচারী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে। এই সময় যে বিপ্লব চেষ্টা হয় তাহা সফল না হওয়ার ডিমিত্রি ও অপর অনেকে দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিতে বাধ্য হ'ন। ডিমিত্রি প্রায় ২২ বৎসর দেশ হইতে বাহিরে থাকিতেন। তিনি সর্বদাই দেশের কথা লইয়া নানা দেশে আন্দোলন চালাইতেন। ১৯৪৫ হইতে ১৯৪৯ (তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯৪৮) পর্যন্ত তিনি দেশের রাষ্ট্র কার্য প্রাপ্যতা করিয়া চালাইয়াছিলেন। বুলগেরিয়ার বর্তমান উন্নতি ও গঠনশীলতার মূলে প্রধান কণ্ঠী ছিলেন ডিমিত্রি। (নিউজ ক্রম বুলগেরিয়া)

## সাময়িকী

### পশ্চিম বঙ্গের বাজেট

হাকিমশে জুন ১৯৭২, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার চলিত বছরের বাজেট পেশ করা হয়েছেন। এই বাজেটের সর্বপ্রধান লক্ষ্য বা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে এর স্থাবর ও স্থাবর। এই বাজেটে আছে বাধ্যকোর ও নির্জবতার ছাপ। বাজেটের প্রস্তাবগুলোর উপর চোখ বোলালেই মনে হয় এর মূলে রয়েছে পক্ষপাত প্রবীণের পরিণত ও স্যাবধানী বুদ্ধি, বা সময়ে পরিহার করে গেছে সেই সব বিষয় যেখানে উঠতে পারে বিতর্কের স্বচ্ছ, যেখানে আদ্যন্ত লাগতে পারে কারেনী ব্যর্থে বা

পরিবর্তন আনতে পারে অভ্যন্ত চিন্তাধারার জগতে যেখানে তাক্রণ্যের প্রাণ-চকলতা আনতে পারে অনেক ঢেকে রাখা জটিলতা। কি শিক্ষা বাবদে, বা স্বাস্থ্য বাবদে বা কৃষি বাবদে বেশী টাকা বরাদ্দ করলেই সেই বাজেট বিজয়ী সভাব লাভ করে না; তার কারণ এই বরাদ্দ অর্থ যে একটি স্বার্থায়েবী ক্ষুদ্র গোষ্ঠীরই ধান 'কীত না করে যে বৃহৎ জনসাধারণের জীবনকে উন্নত, সুস্থ ও সবুজ করে তুলবে তার কোনো অঙ্গীকার এর মধ্যে নেই। যে আপোষহীন, সতর্ক, নিরলস ও সংগ্রামী চেতনা এই বাঙালী জনসাধারণের জীবনে এই



বিপ্লব আনতে পারে তার কোনো পরিচয় এই বাজেট বহন করে না। মনে হয় এই বছরের বাজেটও অত্যন্ত বছরের বাজেটের মায়ুলি পথ ধরবে। বাঙালী জনসাধারণ যে বিরাট আশা নিয়ে বর্তমান সরকারকে সমর্থন জানিয়েছে বিগত নির্বাচনে, সেই আশা কি রূপ নিতে পেরেছে এই বাজেটে? এই বাজেটে নেই নতুন পথ কেটে চলার গতিবেগ, নেই তাক্রণ্যের সৃষ্টির কল্পনা, নেই আভিমানিক হুঃসাহসিকতা।

দেখা যাক এই বাজেটের গোড়ার কথা কি? এই বাজেটের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যা ঘাটতি হচ্ছে, তার ভিতর থেকে দশ কোটি টাকা পূরণ করা। যে ব্যয়-বাহুল্যের জন্তে এই ঘাটতি হচ্ছে তার মোটা অংশই কি গঠন মূলক কাজে লাগানো হবে—না টাকাটাই খরচ হবে, গড়ে উঠবে না কিছুই। কেবল টাকা খরচ করলেই শুভ ফল পাওয়া যায় না—যদি অপচয় ঘটান না যায়, যদি অসঙ্গতকে প্রসার না দেওয়া হয়, যদি অসং ও অসাব্যু আচরণকে কঠোরভাবে দমন না করা যায়, যদি কপটের চাফুড়োর কাছে প্রশাসনের বুদ্ধিমত্তা পরাজিত হয় তবে অর্থই ব্যয় হবে, তা দিয়ে বাঙালী মাহুষও হবে না বাঙালীর হুঃখও দূর হবে না। বাঙালীর হুঃখিত মোচন করার মত বরাদ্দ এই বাজেটে আছে কি? সকলের সমবেত চেষ্টা করা উচিত বাজেটের হাড়িড়ি পিটিয়ে সেই হাতিয়ার তৈরী করতে যা দিয়ে অঙ্গের হবার পথের বাধা বিচূর্ণ হবে।

এবার সামান্য বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে, ব্যয়-বাহুল্যের জন্তে যে ঘাটতি হচ্ছে, তার কিয়দংশ মেটাবার জন্ত কয় বসিয়ে বাড়তি দশ কোটি টাকা জোতার জন্তে কি পথ এই বাজেটে অন্বেষিত হয়েছে।

কয় বাড়ানো হচ্ছে সিনেমা টিকিটের উপর। এর দুটো বিতর্ক দিক আছে। একদিকে যদি ইংরাজী ও হিন্দি ছাঁবর উপর কয় বাড়ানো হয় তাকলে ক্ষতিগ্রস্ত আশঙ্কা নেই। কিন্তু বাঙলা ছাঁবর মুহূর্ত অবস্থা। তার উপর যদি টিকিটের দাম বাড়ি তা হলে তার প্রতিফল কি হবে সেটা অল্পমান করা শক্ত নয়। বাঙলা

ছাঁবর দর্শক কেবল বাঙালীরা—বেশী ভাগ অবাঙালী গোটা কর্মজীবন বাঙলার কাটিয়েও বাঙলা বলতে, পড়তে, লিখতে পারে না। বাঙালীর গড়পড়তা আয়, ইংরাজী ও হিন্দি ছাঁবর দামে দেখে তাদের আয়ের চেয়ে কম। দুতরাং পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে সিনেমা টিকিটের দাম বাড়ানোর আশাতটা দারাব্যক ভাবে পড়বে বাঙালীদের উপরেই। এর একমাত্র প্রতিফল যে, বাঙলা ভাষার যে ছাঁব দেখানো হবে তার টিকিটের দাম বাড়ানো হবে না, বাড়ানো হবে বাঙলা ভাষা ছাড়া আর যে কোনো ভাষায় তোলা সিনেমার টিকিটের দাম। কি উপায়ে এই ধরণের আইন বলবৎ হতে পারে তার সুচিত্ত ব্যবস্থা বিধান সভায় নেওয়া উচিত। একে যদি অপবাদ দিয়ে বলা হয় এটা বাঙালীর প্রাদেশিক মনোভাব তবে পশ্চিম বঙ্গের বুকের উপর বসে অল্পদের বীজত্ব প্রাদেশিকতার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বিবদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়। যদি পশ্চিম বঙ্গের বাঙালীকে আশ্বর্য্যকর জন্ত কোনো বিশেষ পথ নিতে হয়, তাকে প্রাদেশিকতা আখ্যা কিছুতেই দেওয়া যায় না।

বিত্তীয় প্রত্যাব কথা হয়েছে, পণ্যবাহী ও মজুতবাহী যানের ভাড়া বাড়ানোর। এটা শুনতে সহজ, কাজেও সোজা, কিন্তু এর কলাফল দুদুরপ্রসারী। এই বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে রেলপথের ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। তার কলে যে-সব কাঁচা মাল বা বাস্তব্য অল্প প্রদেশ থেকে আমদানী হচ্ছে, বাঙালীকে বেশী দাম দিয়ে তা কিনতে হচ্ছে। বাঙলার শিল্পজাত লোহা ইন্সপাতের পণ্য বা তুলাজাত পণ্য, যা বাঙলার বাইরে রপ্তানী হতে পারে, তারও দর এত বেশী পড়ছে যে বাঙলার উৎপন্ন বস্ত দরের প্রতিযোগিতার পিছু হটেছে। এর মূলে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল মন্ত্রণালয়ের বিপরীত ধর্মী নীতি। এর উপর পঃ বাঙলা সরকারও যদি কয়েক বোকা চাপান তবে এর অপরিহার্য্য কল হবে অতিরিক্ত দ্রব্য মূল্যবৃদ্ধি—যার কলে হবে উৎপাদন হ্রাস ও সমস্ত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার অপমুহূর্ত। এই মূল্য বৃদ্ধি বোঝ করার মত সংগঠন ক্ষমতা কি সরকারের আছে? এই

মূল্যবান আশাও এসে পড়বে বেশী করে আপামর সাধারণ বাঙালীদেরই উপর। কারণ অধিকাংশ বাঙালীই খুচরো ক্রেতা। যে-সব বাঙালী ব্যবসা করেন তাঁরাও গোড়াতে ক্রেতা, পরে খুচরো বিক্রেতা। পাইকারী বিক্রেতা বা কাঁচামাল বিক্রেতা যেমন অবলীলাক্রমে অতিরিক্ত দ্রব্যমূল্য ছোট ক্রেতার ক্ষেপে চাপিয়ে দিতে পারে, ছোট বিক্রেতার ক্ষমতা সেই ভুলনার অনেক কম। দ্রব্যমূল্যের ক্ষীণত যে সরকার বন্ধ করতে উত্তরাণী সেই সরকারের পক্ষে এই প্রকার কয়মর্দন কি সম্ভব?

এই প্রশ্নে আর একটা কথা এসে পড়ে। যেমনি জিনিসের দাম বাড়বে তেমনি সরকারী কর্মচারীদের দাবী সোচ্চার হবে যে তাঁদের মাহার্ব ভাতা বাড়াতে হবে। আর সেই দাবী মেটানোর জন্য বহুস্তর জনসাধারণকে শোষণ করে আবার অতিরিক্ত কর ধার্য করতে হবে। অতিরিক্ত দ্রব্যমূল্য ক্ষীণত ও অতিরিক্ত মাহার্ব ভাতার ঋণীকড়ে সমগ্র উন্নয়ন ব্যবস্থাই বানচাল হবে—এবারও যা হয়ে এসেছে। এই যে ক্রমোচ্চ প্রতিক্রিয়া এর মধ্যে কোন সামাজিক নীতি বা জারীবিচার রয়েছে, বা কি প্রশাসনিক দক্ষতা আছে? এটা কি দেউলে নীতি বা নীতির দেউলে অবস্থা নয়?

তারপর মূল্যবান পাথর—স্বাভাবিক বা রাসায়নিক, কৃত্রিম বা বিশেষ প্রণালীতে প্রস্তুত মুক্তা, সোনা বা রূপা দিয়ে গড়া ঝালরের কাজ করা জিনিসের উপর অতিরিক্ত কর বসানোর প্রস্তাব আছে। এটার বিশেষ কোনো গুরুত্ব আছে না, এটা হেলেভুলানো হড়ার অহুবাদ মাত্র। এর থেকে তহবিলে কতখানি মোটা টাকার অভ আসবে তার কোনো হিসাব দেওয়া হয়নি। এর বিরুদ্ধে বলার কিছু নেই; শুধু এই খাতে যা অর্থ সংগৃহীত হবে সেটা পরিহাসের পর্যায়ে না গিয়ে পড়লেই খুলীর কারণ হবে।

বাজেটের যে দৈন্ত মনকে পীড়িত করে সেটা হচ্ছে বাঙালীর বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কি অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে বা করতে হবে তার অস্পষ্টতা। আশাঙ্কর এই মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

বাঙালীদের জন্যেই, তাদের বিশেষ অবস্থা ভেবেই তৈরী করা উচিত। তাদের সকল কিছু গুরুতর সমস্যা দূর করার জন্য যে স্থিতিস্থিত ও স্থানীয়কৃত কর্মসূচী—আন্ত প্রতিকারের পন্থা ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা—দৃঢ়ভাবে অগ্রসরণের একান্ত আবশ্যিক তার আভাস এই বাজেটে ঋণিক দিয়ে উঠেছে না। কালো মেঘের চারিপাশে কোনো রূপোলি রেখার চিহ্ন নেই। উচ্চ সোপানের মন্ত্রী মহাশয়েরা বক্তৃতায় ও বাক্যে বেকারত্ব প্রতিরোধের যে জোরালো আশাস দেন, এই বাজেটের, মধ্য দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি বলিষ্ঠভাবে কি কর্মপদ্ধতি দিয়ে কিভাবে রূপায়িত হবে তার কোনো ইঙ্গিত নেই। এইটেই প্রতীয়মান হয় যে মন্ত্রীমণ্ডলী মনে মনে যা ভাবেন বা ইচ্ছা পোষণ করেন, বাস্তব বাজেটের মধ্য দিয়ে তাকে ফলবানু করার জন্য কি পথ প্রকৃষ্ট সে বিষয়ে হয় তাঁদের যথেষ্ট স্পষ্ট ধারণা নেই নয় তাঁরা সম্পূর্ণভাবে কাজে গাঁপিয়ে পড়ার সাহস সংগ্রহ করতে পারছেন না।

বর্তমান বিধানসভায় অনেক তরুণ সদস্য আছেন,— এই বিষয়ে তাঁদের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী। দেশের বেকার বাঙালী যুবকরা আশা করেন বিধানসভার এই সব তরুণ সভ্যেরা অকাট্য যুক্তিমালা প্রয়োগ করে দৃঢ় মনোভাব নিয়ে, পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই সব সমস্যার মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসবেন এবং এই দুঃস্থ কাজে পদে পদে যে সব বাধা আসবে তারা যেন সে সকলকে জয় করার অনমনীয় সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এই পণ গ্রহণ করতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গে যেন বাঙালীর শির, বাঙালীর প্রম, বাঙালীর বিত্তা, বাঙালীর বুদ্ধি, বাঙালীর কর্মসংস্থান সর্বাধিকার লাভ করে—এর জন্য যদি কেউ মনে করেন যে পশ্চিমবঙ্গ প্রতিযোগিতার জন্য প্রদেশের কাছে পিছু হটবে—তবে তাই যদি সত্য হয়, তবে পিছুই হটুক পশ্চিমবঙ্গ। তবে একথা সত্য নয়, যারা এ কথা বলে তারা ঈর্ষার বশীভূত হয়েই একথা বলে, বাঙালী নেতৃত্বকে বিভ্রান্ত করবার জন্য। পশ্চিমবঙ্গে আজ বাঙালী গোঁণ হান অধিকার করে

আছে, সে নিজ জন্মভূমিতে আজ পরবাসী,- এখানে যদি বাঙালীকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তবে বাঙালী পিছু হটবে না, এগিয়েই যাবে—এইটাই অস্ত্রদের ভয়ের কারণ। পশ্চিমবঙ্গে বাঙালীর দাবী সবচেয়ে বড় এবং যে প্রাপ্য থেকে সে বঞ্চিত সেই অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে, এই মনোভাবকে যদি প্রাদেশিকতা বলা হয় তবে পশ্চিমবঙ্গের অরজল সেবনে পরিপুষ্ট অস্ত্র অস্ত্র প্রদেশের লোকদের, বাঙালীকে অবহেলা করে, স্বজনপোষণ কি নির্লজ্জ প্রাদেশিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত নয়। পশ্চিমবঙ্গের বাজারে যেন বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা পূর্ণতা লাভ করবার পথে অগ্রসর হতে পারে।

“মুসলিম”

#### ভারত-পাকিস্থান চুক্তির ফল

অনেকের মতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সিমলার বৈঠকে পাকিস্থানের সহিত যে বিলি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা উভয় দেশের পক্ষেই বিশেষ লাভজনক হইবে। কাহারও কাহারও মতে শ্রীমতী ইন্দিরার দখল করা জমি ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। এই সমালোচক-দিগের মতে পাকিস্থান কান্দীর লইয়া গান্ধামাও ইউ এম এর দরবার চালাইয়া চলিবে। সুতরাং প্রথমতঃ শ্রীমতী ইন্দিরার বাংলা দেশে যুদ্ধজয়ের পরেই যুদ্ধবিবর্তিত না

করিয়া সমগ্র কান্দীর অন্ততঃ দখল করিয়া লওয়া উচিত ছিল এবং, দ্বিতীয়তঃ সিমলার বৈঠকে পাকিস্থানের সহিত কোনও ব্যবস্থা না করাই বাঞ্ছনীয় হইত। “বুগবাণী” পত্রিকা বলেন :—

ভারতীয় সামরিক বাহিনী প্রায়…… হাজার সৈন্তের প্রাণ ঝাল দিয়ে যে বিপুল বিজয় লাভ করেছিল সিমলার আলোচনার টেবিলে শ্রীমতী গান্ধী তাকে পরাজয়ে পরিণত করে ছেড়েছেন। কারণ তিনি রাজি হয়েছেন জম্মু ও কান্দীর ছাড়া সমস্ত সীমান্ত থেকে ভারতীয় সৈন্তদের সরিয়ে আনতে, যাকে পাকিস্থানের যে সাড়ে পাঁচ হাজার বর্গমাইল এলাকা আমরা দখল করেছিলাম তা ফিরিয়ে দিতে এবং যুদ্ধবন্দীদেরও ফেরৎ দিতে। ‘ভুট্টো হুটি লক্ষ্য’ নিয়ে ভারতে এসেছিলেন— ভারত কর্তৃক অধিকৃত পাক অকলজাল ফেরৎ পাওয়া এবং যুদ্ধবন্দীদের ফেরৎ পাওয়া। তিনি হুটি বিষয়েই সাক্ষ্য অর্জন করেছেন। কিন্তু পরিবর্তে ভারত কী পেল? কান্দীর প্রশ্নটি এখনো খোলাই রইল, কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল না। কান্দীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও একটি রাজ্যমাত্র একথাও আর বলা উচিত নয়, —কেননা কান্দীর ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে একটা আলোচনামোক্ষ ও মীমাংসামোক্ষ প্রশ্নরূপে সিমলা চুক্তিতেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।



# দেশ-বিদেশের কথা

## জাতীয়ভাবে কয়লাধনি পরিচালনা

কোয়িং কয়লার ২১৪টি খনি জনসাধারণের হাত হইতে আইন করিয়া লইয়াই সরকারী প্রতিষ্ঠান ভারত কোয়িং কোল লিঃ কোয়িং কয়লার দাম টন পিছু তিন টাকা বাড়াইয়াছেন। মূল্য বৃদ্ধির কারণ খরচ বৃদ্ধি। প্রধানতঃ খরচ বাড়িয়াছে মালকাটাদিগের বেতন ও ভারত টাকা অধিক নির্দিষ্ট হওয়ার ফলে। অল্প খরচ বৃদ্ধির কারণ হইল, ভারত কোয়িং কোল, খোলা বাজারে উচ্চ মূল্য যে নরম ও শক্ত কোক বিক্রয় হইত, সেই বিক্রয়ের পরিমাণ বন্ধা করিয়া ব্যবসায় চালাইতে পারেন নাই। এই বিক্রয় না হওয়ার কারণ উৎপাদন কম হওয়া এবং ওয়ারেন না পাওয়া। ইহা ব্যতীত কান্দীর সংখ্যাও ভারত কোয়িং কোলের অপেক্ষাকৃত অধিক। লোক মাধিয়াও বেশী উৎপাদন সেরূপ হয় না। জাতীয় করিয়া লইলেই যদি সকল কার্যেই লোকসান হইতে আরম্ভ হয় তাহা হইলে সমষ্টিবাদী অর্থনীতি গঠন কঠিন হইবে। বাংলার একটা প্রবাদ আছে—“ভাগের মা পকা পায় না।” কারবার কারখানাগুলি যদি সমগ্র জাতির হইয়া যায় অর্থাৎ যদি সকল কারবারেই জাতির সকল ব্যক্তির ভাগ থাকে তাহা হইলে সকল কর্মক্ষেত্রেই ভাগের মা হইয়া দাঁড়ায়।

## সিমলার শীর্ষ বৈঠক

ইংলণ্ডের “নিউ স্টেটসম্যান” সাপ্তাহিকে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে সিমলার ভারত-পাকিস্তান শীর্ষ বৈঠক একটা বিশেষ সকলভাব আবহাওয়া সৃজন করিয়াছে। ইহাযারা দুই জাতি আর

একটা দুর্লভ প্রাচীরের দুই দিকে বসিয়া পরস্পরকে শত্রু চিন্তা করিয়া হাতিয়ার শানাইতে ব্যস্ত থাকিবে না। প্রাচীরের গায়ে প্রবেশ পথ উন্মুক্ত হইয়াছে, বাক্যালাপ হইতেছে এবং যাইবার সময় উভয় পক্ষ ভবিষ্যতে আবার মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া হাসি মুখে বিদায় লইয়া গিয়াছেন। যেখানে প্রায় কুড়ি বৎসরের অধিককাল যুদ্ধ দেখাদেখি বন্ধ ছিল, শত্রুতা ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ ছিল না সেখানেই, যুদ্ধ বিরতিতে যেখানে কেহ গায়ের জোরে বদলাইবার চেষ্টা করিবে না এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া একটা মহা পরিবর্তন স্বীকার করিতেই হইবে। ভারতের আকাশ পথে পাকিস্তানের বিমান চলিবে, পাকিস্তানের উপর দিয়াও ভারতীয় বিমান যাতায়াত করিবে ইহাও কম কথা নহে। একথা ঠিক যে কান্দীর সমস্তার সমাধান হয় নাই, ১৩০০০ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য এখনও বন্ধই রহিয়াছে কিন্তু ঐ সকল কথা লইয়া সিমলার কোনও প্রকার কলহের সূচনা হয় নাই। এই যে কোনও প্রকার বিবাদ না করিয়া কয়েক দিন সকলে কথাবার্তা চালাইয়াছেন ইহা কম কথা নহে। নূতন করিয়া যখন আবার বৈঠক বাসবে তখন বহু কথাই পূর্ণ আলোচিত হইয়া ভ্রাতৃত্ব নিষ্পত্তির পথে অগ্রসর হইবে। পাকিস্তানের নেতৃগণ এই শীর্ষ বৈঠকে নূতন মনোভাব লইয়া আসিয়াছিলেন এবং মনে হয় এই বৈঠক হওয়ার পরে অদূর ভবিষ্যতে ভারত-পাকিস্তান সম্বন্ধ একটা নূতন ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। এই শীর্ষ বৈঠক নিশ্চয়ই বহু রক্ত হ্রাস খুলিবার পূর্বাভাস এবং সেই কারণে বাহারা শান্তি ও উন্নতি চাহেন তাঁহারা ইহার মধ্যে এক নূতন বছরের আশ্বাস ভনিতে পাইয়াছেন।

### পশ্চিম বাংলাতে বাঙ্গালীর স্থান

“মুগ্ধবাণী” পত্রিকা নিম্নলিখিত হিসাবটি প্রকাশ করিয়াছেন :—

কলকাতায় যারা উপার্জনশীল তাদের শতকরা ৭৪ জনই অবাঙালী। পশ্চিম বাংলার চটকলগুলিতে অবাঙালী কর্মীর হার শতকরা ৭১ জন

কাপড়ের কলে     ”     ”     ”     ”     ৬৪ ”

ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে     ”     ”     ”     ”     ৬০ ”

কাগজ কলে     ”     ”     ”     ”     ৭০ ”

পশ্চিম বাংলার সব

কলকারখানাগুলিতে     ”     ”     ”     ”     ৬১ জন

প্রতি বছর অবাঙালীরা বাংলা থেকে দেশে টাকা পাঠায় ২৮০ কোটি টাকা।

### রুশ ইরাক চুক্তি

১৯৭২ সালের ১ই এপ্রিল বাগদাদে স্বাক্ষরিত সৌভিয়েত-ইরাক মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তিটি সর্বোচ্চ সৌভিয়েতের উভয় সত্তার পররাষ্ট্রীয় বিষয় সংক্রান্ত কমিশন দ্বারা অনুমোদিত হয়ে সৌভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সৌভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীয় হুকুমদ্বারা বলে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে।

গত ১৩ই জুন ক্রেমলিনে সর্বোচ্চ সৌভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীয় সভাপতি এন ভি পোদগোরিনের সভাপতিত্বে সভাপতিমণ্ডলীয় এক বৈঠক বসে।

সভাপতিমণ্ডলীয় সৌভিয়েত-ইরাক মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তিটি পাকাপাকিভাবে অনুমোদন করার বিষয়টি বিবেচনা করেন।

এই সম্পর্কে সৌভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভি ভি বুজনেভসোভ বলেন যে, সৌভিয়েত-ইরাক মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তিটি ইরাক এবং সমগ্র আরব হুনিয়ার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি বলেন যে, এই চুক্তির প্রধান তাৎপর্য হল এই যে, আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক রূপে লিপিবদ্ধ এই

চুক্তিতে সৌভিয়েত ইউনিয়ন ও ইরাক অটুট বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে তাদের সম্পর্ক গড়ে তোলার ও উভয় রাষ্ট্রের বার্ষিক সর্গাঙ্গীন সহযোগিতার প্রসার ঘটানোর জন্য এবং বিশ্বশান্তিকে দৃঢ়তর করা, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এবং জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য সংগ্রামে তাদের প্রচেষ্টাকে একীভূত করার উদ্দেশ্যে উভয় রাষ্ট্র পবিত্র বাধ্যবাধকতা মেনে নিয়েছে।

সৌভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে লিওনিদ ব্রেজনেভ উল্লিখিত কর্মসূচী উপস্থাপিত করেছিলেন। বুজনেভসোভ বলেন যে, উভয় দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সকল বিকাশই সৌভিয়েত-ইরাক চুক্তির পথ প্রস্তুত করেছিল। সম্ভ্রুতি ইরাক ও সৌভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার সম্পর্ক গভীরতর অর্থবহ হয়েছে ও বৈচিত্র্য লাভ করেছে। উভয় দেশের সম্পর্কের আওতায় এসেছে বিপাকিক সম্পর্ক তথা জরুরী আন্তর্জাতিক সমতা সংক্রান্ত বহুবিধ প্রশ্ন।

অর্থনৈতিক ও কারিগরী সহযোগিতার চুক্তিগুলি অনুসারে সৌভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে ইরাকে প্রায় ৭০টি নানা ধরণের প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে যেনে আমরা খুলী।

বৈঠকে পররাষ্ট্র বিষয় সংক্রান্ত কমিশনের পক্ষ থেকে উক্ত কমিশনের সহকারী সভাপতি এবং লিথুয়ানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক এ ভে স্নেকাস, কাজাখস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ও সৌভিয়েত ইউনিয়নের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য ভি এ জুনারেভ, ইরখুতস্ক অঞ্চলের তাইশেভ জেলার একটি ঘোঁষ খামারের সভাপতি জি এস অরনোভা, আজারবাইজানের সর্বোচ্চ সৌভিয়েতের সভাপতি মণ্ডলীয় সভাপতি কে এ খালিলোভ এবং পার্টির মকো অঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক ভি আই কুনোতোপ ভাষণ দেন। সকলেই চুক্তি পাকাপাকিভাবে অনুমোদনের পক্ষে হার দেন।

এন এচ পোদগোরান বলেন, “প্রায় এক বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী সোভিয়েত-মিশর মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি অনুমোদন করেছিল। আর এখন আমরা সোভিয়েত-ইরাক মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি পাকাপাকিভাবে অনুমোদনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি।”

পোদগোরান বলেন, “গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করা উচিত যে, সোভিয়েত-ইরাকী চুক্তি তৃতীয় দেশগুলির বিরুদ্ধে উদ্ভূত নয়, তাদের জায়সত্ত্ব অধিকার ও স্বার্থের পক্ষে এই চুক্তি ক্ষতিকর নয়। বরং চুক্তিতে এমন সব সংস্থান আছে যেগুলি অজান্তে দেশ ও জাতির একান্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের অনুকূল। বিশ্বশান্তি রক্ষা ও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন, সামূহিক ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য উভয়পক্ষ চেটে চালায়ে যাবে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র ইহুদী স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদ, জাতিঘেঁষ ও অ-খেতাজদের এক-ঘরে করে রাখার ব্যবহার নিঃশর্ত ও চূড়ান্ত অবলুপ্তির জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালায়ে যাবে বলে উভয় পক্ষ যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেগুলি উল্লিখিত সংস্থানগুলির অন্তর্ভুক্ত। সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য জাতিসমূহের সংগ্রামে সমর্থন জানানোর ব্যাপারে উভয়পক্ষ পরস্পরের সঙ্গে ও অজান্তে শান্তি-প্রিয় জাতিগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

“এবিষয়ে আরো কোন সন্দেহ নেই যে সোভিয়েত-ইরাকী চুক্তি আরব প্রাচ্যের জাতিগুলির মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে এবং ঐ অঞ্চলের অগ্রগতিশীল রাষ্ট্রগুলির পক্ষে হিতকর। এই চুক্তি তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ঐক্যকে সংহত করার পথ মুগ্ধম করবে। এইরূপ ঐক্য যে একটা কার্যকর শক্তি, এই ঐক্য যে কার্যকর বল দিতে পারে এই সত্য ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী নামক একটি বিদেশী একচেটিয়া তৈল সংস্থার সম্পত্তি জাতীয়করণের ইরাকী সরকারের জায়সত্ত্ব সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। ইরাকী সরকারের এই সুবিদিত পদক্ষেপ বহু আরব রাষ্ট্রের সরকারের অনুমোদন ও কার্যকর সমর্থন লাভ করেছে। এতে সাম্রাজ্যবাদী মহলগুলির শত্রুতাপূর্ণ চক্রান্তের বিরোধিতা করার ব্যাপারে সংহতি ও পারস্পরিক সহায়তা অভিভ্যস্ত হয়েছে।”

ইরাকী প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী নেতৃত্বের জাতীয় পরিষদ এই চুক্তি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেছেন বলে জানা গেছে।

সোভিয়েত-ইরাক মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি পাকাপাকিভাবে অনুমোদন করে একটি হুকুমনামা সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নিকোলাই পোদগোরান হুকুমনামা এবং অনুমোদন সংক্রান্ত দলিলপত্র স্বাক্ষর করেন।



# পুস্তক পরিচয়

পঞ্চদশী—শ্রীশ্রী দেবী, গল্পসংগ্রহ, প্রকাশক মিত্র ও বোম, ১০ নং ভ্রামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, মূল্য—পাঁচ টাকা ।

পনেরটি গল্পসংগ্রহে স্নানমধু প্রবীন লেখিকা জীবনের নানা দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। অতি বিদ্বদী, সেকালের কলেজী শিক্ষার চিহ্নিতা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা। ইত্যাদি ঐতিহ্যে তিনি সে-যুগের একজন প্রেট লেখিকা। প্রবাসীর তৎকালীন কয়েকটি লেখক-লেখিকা বাংলা সাহিত্যের নানা নূতন দিক উন্মোচনে অগ্রণী ছিলেন। শান্তাদেবী ও কনিষ্ঠা ভগ্নী সীতাদেবীর অবদান অপারিসীম সে-ক্ষেত্রে।

আধুনিক কলেজী শিক্ষার শিক্ষিতা মেয়েরা এবার সাহিত্যে নিজেকে খুঁজে পেয়ে ভুগ্ন হল। শান্তাদেবীর রচনার বিশ্লেষণ অপেক্ষা তাবের প্রাধান্ত অধিক, বিশেষতঃ তাঁর উপজ্ঞাসম্ভলিতে। প্রথম একক উপজ্ঞাস চিরন্তনী থেকে শেষ উপজ্ঞাস অলম্বোরা পর্যন্ত এক পেলব মাদুর্য ও ভাবাকুল জগতের অহুভূতি পাওয়া যায়।

পঞ্চদশীর ‘সুনন্দা’ গল্পে এ ধরনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই। ‘সুনন্দা’ লেখিকার প্রথম গল্প, লেখিকার মতে ‘কাঁচা’। সাধারণ একটি গল্পের কাঠামোতে অসাধারণ লিপিতাত্ত্ব্য। বাস্তবধর্মী নয়, লিরিক ধর্মী। বর্ণনার বিভ্রান্তিতে রঙে আঁকা ছবি কখনও কখনও ফুটে উঠেছিল তরুণী লেখিকার হাতে, যদিও আখ্যান-সংস্থানের পশ্চাত্তাপের বৃত্তি দুর্বল।

বইখানিতে প্রায়ই বকনার চিত্র। ‘ব্রজরাজ’, ‘শিক্ষার পরীক্ষা’, ‘হুইবোন’, ‘গৃহত্যাগী’, ‘ক্লকগৃহ’, ইত্যাদি গল্পে বিভিন্ন চিত্র। ‘ছুটি’ গল্পের নায়িকা গৌরীও একদিনের ছুটি থেকে বাকিত, ‘সন্ধান’ গল্পে বাৎসল্যময়ী মুকুল স্নহ সন্ধানলাভে বাকিত। ‘জীবন দয়া’র চিত্র বোমা-ভয়ে পলাতক বাঙালী পরিবার বিতুতিভূষণের অহুর্ভবনকে মনে পড়ায়। সেখানেও বাড়ীওয়ালার কাছে পলাতক বিপদ। ‘গৃহসংস্কার’ের বৃদ্ধা পরিজন-অহু-বাকিত। ভিলোডমার কিশোর হিমের বোমাল ও বিকোভের বিকলগী প্রতিক্রিয়া। ‘পাখিহারা’ সর্ব-

বাকিতা বিধবা হিন্দুনারীর মর্শবেদনা, অসহায়তা ও অভ্যমে প্রকৃত প্রেমের সন্ধানলাভ বিশদ ও বিতুত ভাবে পরিষ্কৃত। ‘মরণকরী’ গল্পে লেখিকা রাজনীতির একটি দিক দেখিয়েছেন।

‘শিক্ষার পরীক্ষা’ গল্প শান্তাদেবীর অনেক গল্পের মত ইংরেজী ও ফরাসী ভাষার অহুবাদ হয়েছিল। এই-সুত্রে বিদেশী সাময়িকী ‘Nation and the Athenaeum’ এর সমালোচনা উদ্ধৃত করি :—

‘Tara Sundari might have sat for Chaucer or Katherine Mansfield, an ancient universal type yet convincingly individual.’

‘দেয়ালের আড়ালে’ এক ভাগ্যহীন যুবকের অ্যাকসিডেন্টে পা কোয়ানোর করুণ কাহিনী হাসপাতালের পরিবেশে। কিন্তু হৃৎধের কালমেঘে রূপালী পাড় পাশের ক্যাবিনের রোগীর বোন অপূর্ণ শেষ কথাটি—“দাদা, দাও না তোমার কাড়টা অনাদিহাবুকে। ওতে বাড়ীর ঠিকানা লেখা আছে।”

সর্বহারার বকনার মধ্যে স্নহের সন্ধানের একটি সার্থক গল্প ‘ফুটকী’। কৈশোর প্রেম ও এক অপরাধ পরিণতির চিত্রায়ণে উজ্জল মধুর হয়ে উঠেছে গল্পটি।

‘ক্লকগৃহে’ যে কাব্যধর্মী লিপিবিত্তাস রূপকথার রাজ্যের ছায়ামাথা; ‘পখিহারা’র যে হতান-পূর্ণ-প্রেম সন্ধান; ‘সুনন্দা’র যে অনন্ত বিরহ—সব উত্তরণ করে বাস্তব রূপায়ণে প্রেম স্নহুভি ভিত্তি পেয়েছে ‘ফুটকী’ গল্পে। এখানে ভাবালুতার, উজ্জ্বলের প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল, কিন্তু স্নহুভা লেখিকার পরিমিত জ্ঞান অতি প্রশংসনীয়। মার্শিক...“তারপরে একদিন আমি ভাল মাসা কিনে আনব। আখার ঘরে বিয়ে হবে না, অনেক আলো জেলে ভাল করে বিয়ে হবে।”

শান্তা দেবীর লিপিতাত্ত্ব্যতা, শিল্পজ্ঞান, চরিত্র চিত্রণের শক্তি, রচনার মাদুর্য ও নির্ভুল পর্যবেক্ষণ এতদিন পরে নূতন করে বলায় গুটীত আশায় নেই। তিনি বাংলার অস্ততমা প্রেট লেখিকা, ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস তাঁর নাম চিহ্নিত বলা করবে।

বেদান্ত প্রচারক রূপে স্বামী বিবেকানন্দের বর্ণনা  
উত্তর সাধক হিসেবে স্বামী বিশ্বরূপানন্দ যে মহৎ ব্রত  
উদ্‌ঘাটন করেছেন, তার কোন ছলনা নেই। হৃদ্ধ,  
আপাতদৃষ্টিতে চিত্ত বিকর্ষক, নীরস শাস্ত্রভাষ্যের মূল,  
বিগুহ নির্ভুল বঙ্গানুবাদ, বৈজ্ঞানিক শ্রীর মালা, তানত্রিক  
বঙ্গানুবাদ, ভাবদীপিকা ব্যাখ্যা ও চতুঃস্থলী পর্যন্ত  
শাস্ত্ররত্নপ্রভা টীকা প্রদান করে তিনি বেদান্তে অনাভিজ্ঞ  
পাঠককে বেদান্তবিষয়ক পূর্ণ গুহ জ্ঞান লাভের সুযোগ  
করে দিয়েছেন। যেমন একদিকে তিনি অসাধারণ  
শ্রম স্বীকার করেছেন, অন্য দিকে তাঁর ব্যাখ্যায়ও তেমন  
উৎকর্ষের কোন ছলনা নেই। তাঁর ব্যাখ্যা পড়লে  
সকলেই বুঝতে পারবেন যে, যেমন ব্রহ্ম সকল রসের  
উৎস, শুদ্ধ স্বরূপ নন, বার ভাঙে ব্রহ্মাবাদকে সকল



সাহায্যের প্রেত বলে স্বীকার করে কাব্যরসিক আলমদার, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন যে, কাব্যরস “ব্রহ্মবাদ সহোদর,” ডেমনি বেদান্ত বেত্ত শাস্ত্রালোচনা স্ত্রা নয়; বয়ং সকল রসের উৎস কোথায়, তার অতি চিত্তাকর্ষক মানচিত্র স্বরূপ। এ এসঙ্গে প্রকৃতির স্বামী বীরেশ্বরানন্দ যা বলেছেন, তার প্রতি সকলের মনোযোগ দেওয়া উচিত :—“বেদান্তসূত্রের উপর বহু ভাষ্য রচিত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্ত বলিতে সাধারণ লোকে আচার্য শব্দের অর্থবাদই বুঝিয়া থাকে। আশা করি এই গ্রন্থপাঠে বহু ব্যক্তি শঙ্করবেদান্তের স্বার্থ মর্ম গ্রহণে সক্ষম হইবেন। বেদান্ত-তত্ত্ব ধারণা করিতে সাধারণ লোকেরও কোন অসুবিধা হইবে না।”

বর্তমান সমালোচক একজন অধীক্ষিত অশিক্ষিত বেদান্তরসিক পাঠক মাত্র, সুতরাং সাধারণ লোকের কাছে এই বই কতটা সাহায্য করতে পারবে, তা বলার অধিকার তার আছে। কোন পূর্ণ সংস্কার, ধারণা ও অভিজ্ঞতা না থাকলেও খোলা মন নিয়ে পড়তে বসলে যে কোন বাঙালি পাঠক দুই সংস্করণে চার-চারটি খণ্ডে সম্পাদিত এই মহাগ্রন্থ অবলম্বনে শঙ্করচার্য (১৮৮-৮২০) প্রচারিত বৈদান্তিক জীবন দর্শন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারবেন। বিশ্বরূপানন্দের বিশ বৎসরের কঠোর পরিশ্রম সার্থক হয়েছে, এর চেয়ে বড় প্রশংসার কথা আর কিছু হতে পারে না।

বুদ্ধাবনদাস, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন গোঁড়া ধর্মিক বৈকবেরা অন্যায়ভক্ত ও অপ্রাসঙ্গিকভাবে চৈতন্য মহিমা বর্ণনা এসঙ্গে আচার্য শঙ্করের কুৎসা করেছেন। কিন্তু এঁরা ভুলে যান যে, অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে উপযুক্ত সময়ে যদি এঁর আবির্ভাব না ঘটত, তাহলে সারা ভারতে প্রথমে পুরো বৌদ্ধধর্ম এবং অনিবার্যভাবে অব্যবহিত পরে পুরো ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয় ঘটত, ভারতীয় আর্থ মনীষার সকল দান নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যেত। শঙ্করকে কটুক্তি করার সুযোগ পাবার জন্য কোন বৈতবাদী ভক্তই তখন সাহায্য করার সুযোগ পেতেন না। পরবর্তী সব বৈতবাদী-অবৈতবাদী দর্শনই শঙ্কর ভাস্করকে কেন্দ্র করে গঠিত, এমন কি শ্রীঅরবিন্দের The life divineও। সুতরাং মহাত্মা গান্ধী ধীরে ধীরে বলেছেন, “পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মন্দির,” তাঁকে আমাদের সম্রাটভাবে বুঝতে হবে। এ বিষয়ে দিলীপকুমারের একটি রচনাংশ এসম্বন্ধে স্বরূপী :—“মহাবাদীদের বিদ্যুৎবিসর্গও তোমরা জানলে না, বুঝলে না, এমন-কি বৌদ্ধ পর্যন্ত করলে না, অথচ বলে বসলে মহাবাদীরা নির্বদ—স্বেচ্ছ-বিরাগী—নীতি। শঙ্করকে বুঝে পড়লে না একটিবারও অথচ তাঁকে

পুলিপোলাও চালান দিলে এই চাচ্ছে যে, এ-জগৎকে তিনি অসিদ্ধ ধরে মানুষকে বরখাস্ত করেছেন তাঁর অবৈতবাদ থেকে। বললে—তিনি বে-দরদী। প্রেমাবিশুধ, শুদ্ধ, কঠোর। কিন্তু বলতে চাও কি মানুষকে যে ভালোবাসেন, কখনো সে বলতে পারে ভুলেও :— জীবমুক্ততা দেহধারণ লোকভোগকার্যব... জীবমুক্ততা দেহধারণ করেন লোকের উপকারের জন্যই—তাঁদের অশন বসন চলন বলন এমন-কি নিজের শরীর পর্যন্ত উপভোগের জন্য নয়।” (হাসিবাঁশি, ১০ পৃষ্ঠা।)

স্বামী বিশ্বরূপানন্দকে আরো বেশি করে প্রশংসা জানাতে মন চায় এই জন্যে যে, তিনি ভারতের তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক-ব্যাখ্যাতা শঙ্করকে আমাদের কাছে সুবোধ্য করে উপস্থাপিত করেছেন। শঙ্কর সম্বন্ধে দিলীপকুমারের ১৯৪২ সালে লেখা একটি মন্তব্য পড়লে বিশ্বরূপানন্দের মহান করণীর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হবে :—

“এ-যুগ শঙ্কর-বিশুধ তো বটেই—যেহেতু বৈরাগ্য-বিশুধ। শঙ্করের তেজো দীপ্ত তব বা সূত্রগুলি স্বাক্ষরিত হয়ে উঠত—সম্মত জাগৃত সেই চিরকুমারের প্রতি যিনি প্রেমের নাম না করেও বহু মানুষকে দিয়ে গেছেন প্রেমের দীক্ষা, নৈষ্কর্ষ্যতন্ত্রী হয়েও জীবনে কিনেছেন অদ্বৈতকর্মী নাম, অবাঙ-মনসোগোচরমের উপাসক হয়েও আশ্রয় তার ভরকে যুক্তির ওকালতিই করে গেছেন—কায়মনোবাক্যে।” (এ, ১০-১১ পৃষ্ঠা।)

বিশ্বরূপানন্দের ভাবার এসাদৃশ্য ও প্রাঞ্জলতার একটু নিদর্শন দিয়ে এই অধীক্ষিতকর আলোচনা শেষ করা হল। আশা করি, প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালির পাঠাগারে বইটি মধ্যমাজনক স্থান পাবে :—

“এই মারা সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের শক্তি। ইহা ব্যতিরেকে পরমেশ্বরের জগৎপ্রভু সন্দেহ হয় না। যুক্তিদৃষ্টিতে ইহার স্বরূপ অনির্বচনীয়। এই হেতু মারা ও তাহার কার্য জগৎকে এই মতবাদে মিম্যা বলা হয়। এই মিম্যা শব্দের অর্থ—ব্যক্তাপুত্রের ভায় অলীক নহে, পরন্তু অনির্বচনীয়। এই ‘মিম্যা’ শব্দ এই অর্থে এই শাস্ত্রে পরিভাষিক। এই মারারূপ উপাধি এবং তৎস্বত্ব নামরূপাদি উপাধিযোগেই শুদ্ধ নিগুণ ব্রহ্ম ‘ঈশ্বর’ নামে অভিহিত হন এবং তিনিই বিভিন্নরূপধারী নটের ভায় জগতের বাবভার্য কার্যরূপে ব্রহ্মবিদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হন।”

অভিজ্ঞ পাঠক যাজ্ঞেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এই এই অভিমতই শান্ত গীতিকা, বৈকব পদ, কবির, নামক, মারা প্রভৃতির ভক্তাবলী—সর্বজ্ঞ অদ্বৈত ও ব্যাখ্যাত।

অধ্যাপক ডঃ ত্রািলকুমার চট্টোপাধ্যায়

## মজল পাণ্ডিত নেহেৰুৰ কথা



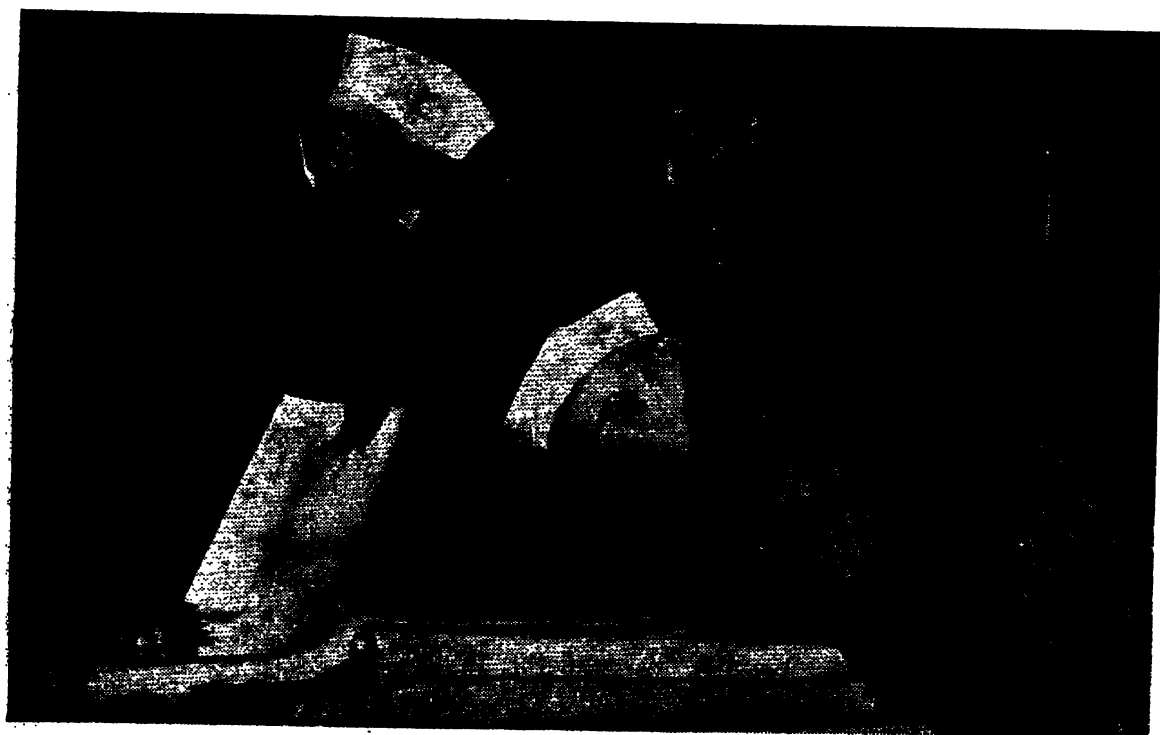
পত্নী কমলা ও কন্যা জ্যোতিকাৰ সৈতে



নেতাজী সুভাষেৰ সৈতে



ঐতিহাসিক ঘটনা—ব্রিটেনের বিকট হইতে রাজ্য প্রাপ্তি



সংবিধান সাফল

: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত :

# প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

নাগমায়া বলহীনেন লভ্যঃ”

৭২তম ভাগ

প্রথম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৭৯

৫ম সংখ্যা



বিবি

প্রসঙ্গ



সমাজবাদ কাকে বলে ?

যে রাষ্ট্রে সকল ব্যক্তির সমান অর্থ সুবিধা অর্জনের উপায় পূর্ণরূপে বর্তমান থাকে ; অর্থাৎ কোন বিশেষ গণি বা গোষ্ঠীর মানুষের অপর সকল ব্যক্তির তুলনায় অধিক অর্থ সুবিধা প্রাপ্তির পৃথক ব্যবস্থা বা সুযোগ সৃজন করা হয় না এবং সকল মানুষই নিজ নিজ প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী ভাবে যথাসম্ভব উন্নতির পথে স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হইয়া যাইতে কোনও বাধা প্রাপ্ত হ'ন না ; সেইরূপ রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক বা সমাজবাদী রাষ্ট্র বলা যাইতে পারে। মানুষের উন্নতির যে সকল উপায় সমাজ-পরিচালকদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হইয়া থাকে, যথা শিক্ষার ব্যবস্থা, গমনাগমনের সুবিধা, চিকিৎসার আয়োজন অথবা শ্রমশক্তি যথাযথ ভাবে নিয়োগ করিয়া উপার্জন করিবার সহজলভ্য বন্দোবস্ত প্রভৃতি ; সেই সকল আয়োজন যদি কোথাও

থাকে এবং রাষ্ট্রান্তর্গত কোন কোন স্থানে না থাকে, তখন চাইলে বলিতে হয় যে সেই রাষ্ট্রে নানান লোকের দ্বন্দ্ব নানান ব্যবস্থা থাকায় সকল মানুষের সমান সুযোগ সুবিধা নাই, অতরাং সেই রাষ্ট্রে সমাজবাদ সক্রিয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নাই। শিক্ষা, সুচিকিৎসা বা উপার্জনের সুযোগ কেহ পায় এবং অপর কেহ পায় না ; এরূপ অবস্থাকে সমাজবাদী পরিহীত বলা চলে না। কাটারও গৃহে যাইবার পথ স্বপ্নম ও যন্ত্রযান যোগে যাতায়াত ব্যবস্থা সমগ্রিত, আবার অপর কাহারও গৃহ কর্মমাত্ত হুগম ও সংকীর্ণ শত্রুক্ষেত্রের পথে অবস্থিত। কোথাও দ্রব্য কৃত্রিম ব্যবস্থা লব্ধ জল সেচন সাহায্যে সহজেই উত্তম ফসল পায়, কোথাও বা তাহাকে সত্তাই আকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চাষের আয়োজন করিতে হয়। ইহা ব্যতীত অপরাপর নানা প্রকার ব্যবস্থা ও অবস্থার কারণে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল নিবাসী

ব্যক্তিদিগের বাৎসরিক মাথা পিছু উপার্জন কোথাও ১০০।৮০০ টাকা কোথাও বা ২০০ টাকা বা তাহা অপেক্ষাও অল্প। এরূপ পরিস্থিতিতে উক্ত রাষ্ট্রে সমাজবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত এখন কথা কেহ বলিতে পারে না। দেশে ব্যক্তিগত অধিকারে গঠিত বৃহৎ বৃহৎ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যদি রাষ্ট্র-অধিকারে আনয়ন করা হয় তাহা হইলেও যতদিন নানান ব্যক্তির জীবন-যাত্রা ও উপার্জন ব্যবস্থা নানান প্রকার থাকে ও কেহ অনেক সুখ-সুবিধা লাভ করে ও কেহ করে না, ততদিন সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা চলে না। ব্যক্তিগত সম্পদ রাষ্ট্রকরায়ত্ত করিয়া আমলাদিগের হস্তে তুলিয়া দেওয়ার অর্থ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে যদি সকল মানবের মধ্যে সুযোগ সুবিধার সাম্য সৃষ্টি না হয় তাহা হইলে তাহাকে সমাজবাদ নামে আখ্যায়িত করা যায় না। যদি কোন রাষ্ট্রে সকল কারখানা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ অন্তর্গত করিয়া লওয়া হয় এবং সকল বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও কৃষিক্ষেত্রও ব্যক্তিগত অধিকার হইতে রাষ্ট্রীয় অধিকারগত করা হয়, তাহা হইলেও, দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি গোষ্ঠীর মধ্যে উপার্জন, সম্পদ ও জীবনযাত্রার সুখ-সুবিধার পার্থক্য একটভাবে বর্তমান থাকে তাহা হইলে দেশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা চলে না।

প্রথমত দেখিতে হইবে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি ও রাজকর্মচারীদিগের বেতন ও কর্মসূত্রে প্রাপ্ত গৃহ, যানবাহন, টেলিকোন, ভূত্ব, আসবাব প্রভৃতি কতটা কাহাকে দেওয়া হয়। যদি মাসিক ৫০০ শত হইতে পঞ্চ সহস্র টাকা অনেকে রাষ্ট্রীয় কার্যসূত্রে প্রাপ্ত হ'ন তাহা হইলে যদি দেশের অপর সকল বাসিন্দা উহা অপেক্ষা অনেক অল্প উপার্জনে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হ'ন সে ক্ষেত্রে কেহ বলিবেন না যে ঐ রাষ্ট্রে সমাজবাদ প্রবল গতিতে প্রবাহিত আছে। যদি শত শত গৃহ নির্মাণ করিয়া সেইগুলিতে রাজকর্মচারী ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদিগকে বিনা ভাড়ার অথবা অতি অল্প ভাড়ার থাকিতে দেওয়া

হয়, এবং দেশের সাধারণ মানুষ যদি অতি নিকট কুঁড়ে ঘরে, বাঁশিতে বা বাসিন্দাবহুল ক্রাফ্ট গৃহে থাকিতে বাধ্য হয় তাহা হইলেও সেইরূপ পরিস্থিতি সমাজবাদের অতিশয় পরিচায়ক নহে। সরকারী চাকুরীগণ যদি “বাতাসুহুল” ট্রেনগাড়ীতে যাতায়াত করেন ও সাধারণ মানুষ যদি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী বহল কামরাতে মানুষের চাপে অর্ধমৃত ভাবে গমন করিতে বাধ্য হ'ন তাহাও সমাজবাদের অতিশয় প্রমাণ করে না। সাধারণ মানুষ যদি স্ট্রাম ও বাসে বাহুড়ঝোলা ভাবে যাইতে বাধ্য হ'ন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বিশেষ সুবিধা উপভোগী কর্মীগণ যদি সরকারী যন্ত্রবানে আরামে ভ্রমণ করিতে পারেন তাহা হইলে সাম্য নীতির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কেহ বলিবে না।

পদাধিকারজাত বিশেষ সুযোগ সুবিধা উপভোগ যে রাষ্ট্রে প্রচলিত সে রাষ্ট্রে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শিক্ষার ব্যবস্থা যদি এরূপ হয় যাহাতে বহু শিক্ষা প্রাপ্ত ইচ্ছুক গল্পবয়স্ক নরনারী শিক্ষা না পাইয়া নিরক্ষর থাকিয়া যান এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবে বহু নরনারী রোগ ভোগ করিয়া মরা কটে দিন কাটান কিম্বা ব্রুছানুখে পতিত হ'ন তাহা হইলেও ঐ অবস্থা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করে না। ইহা ব্যতীত আরও অনেক কথা থাকিতে পারে যাহাতে সাম্যের আদর্শ বিনষ্ট হয়। জাতির কথা, ভাবার কথা, ধর্মের কথা ও দরবারের সহিত সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ বিনিষ্ঠতার কথা। সাম্য যেখানে একটভাবে অবর্তমান সেখানে নানাপ্রকার লোক দেখান সাম্য অথবা সমাজবাদের লক্ষণ শুধু সাধারণের মন তুলান ভাবে সৃষ্টি করিলেও তাহারারা মানুষের মূল মানবীয় অধিকারগুলি জয়লাভ করে না এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের বহু আবহাবিকের অভাবও দূর হয় না। অর্থাৎ জাতীয় জীবনের অনন্ত-বিদ্যুত ক্ষেত্রের যথাযথ হইতে দু-চারিটি প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় করিয়া লইলেই সাম্য বা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হয় না। সাম্যনীতির প্রতিষ্ঠা তখনই হয় যখন সকল মানুষ সমানভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে, চিকিৎসার

সমান সুযোগ পায়, কর্মশক্তির উপযুক্ত ও পূর্ণ ব্যবহার করিয়া যথার্থিত উপাধ্বন করিতে সক্ষম হয় এবং সমাজে মাথা উঠু করিয়া অপর সকলের সহিত সমানে ও সমানভাবে চলিতে পারিতে পারে। যদি সেইরূপ না হইয়া মানুষকে সর্বদাই সকল কার্যে ও সকল প্রচেষ্টার আমলাদিগকে তৈল মর্দন করিয়া অথবা উৎকোচ প্রদান করিয়া কার্য সিদ্ধি করিতে হয়, কোন কিছুই “লাইসেন্স”, “পারমিট” বা “কনট্রাক্ট” পাইতে হইলেই রাজদরবারে ছুটাছুটি করিয়া ঘিরিতে হয়, মুক্কাফি না থাকিলে সকল বিষয়েই অসফলতা ভীতভাবে কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রায়শঃ করে; তাহা হইলে রাষ্ট্রে মানব স্বাধীনতা অথবা সাম্য ও সুনীতির কোন মূল্যই থাকে না। কোন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্র করায়ত্ত করিয়া লইলেই তাহাতে সর্বসাধারণের কোন লাভ হইবে এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। ইহাতে সাধারণের কোন কোন ব্যক্তির ক্ষতিই হইতে পারে এবং হয়। লাভ কাহারও হয় না বলিলেই ঠিক হয়—শুধু আমলাদিগের শক্তিগৃহীত হয়। বলা যাইতে পারে যে পুঁজিপতিদিগের লাভের পথ বন্ধ করার ইহা একটা উপায়; কিন্তু পুঁজিপতিদিগের লাভ কমাইবার জন্ত বহু মধ্যবিত্ত ব্যক্তির কষ্টসঞ্চিত সম্পদ কাড়িয়া লওয়ার কোন সাধকতা দেখা যায় না। এবং এইভাবে ব্যক্তিগত উপাধ্বন, সম্পদ আহরণ ও সঞ্চয়ের অধিকার খণ্ড করিলে তাহার দ্বারা সর্বসাধারণের লাভ হইতেছে প্রমাণ করিতে না পারিলে ঐরূপ ভাবে ব্যক্তিগত সম্পদ কাড়িয়া লওয়া সাধারণের উপর অকারণ অত্যাচার বলিয়া ধার্য হইবে ও তাহার নিবারণ ব্যবস্থা জনমঙ্গলকর বলিয়া ধরিতে হইবে। অর্থাৎ পুঁজিপতিদিগের লাভ বন্ধ করিতে গিয়া যদি হুলনামূলকভাবে অনেক অধিক পরিমাণে মধ্যবিত্ত ও গরীবদিগের ক্ষতি করা হয়; এবং আমলাদিগের শক্তিগৃহীত করিয়া অর্থনৈতিক দূর্নীতির প্রচুর লাভ ব্যবস্থা বিস্তৃত হইতে সুযোগ পায় তাহা হইলে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রীকরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধি কখনও হওয়া সম্ভব হইবে না।

সুতরাং সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা চেষ্টা প্রথমতঃ সেই সকল উপায় অবলম্বনে করা উচিত যাহাতে সমাজের সকল মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও উপাধ্বন করিবার সুযোগ পাইতে সক্ষম হ'ন। যখন সকলেই জাতীয় মোট উৎপাদন কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন তখনই কথা উঠিতে পারিবে যে জাতির আর্থিক উন্নতি কোন্ পথে অগ্রসর হইলে জাতির অধিক মঙ্গল হইতে পারিবে। যদি আর্থিক প্রচেষ্টার প্রসার ব্যক্তিগত অধিকারের পথেই চলিলে অধিক হইবে মনে হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রীকরণের উপর জোর না দেওয়াই উচিত হইবে। যদি মনে হয় যে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদই অধিক লাভজনক হইবে তাহা হইলে সেই পথ অগ্রসরণই কাম্য হইবে। তবে এখন অবাধি বাহা দেখা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় না যে রাষ্ট্রীয় কর্মীগণ জাতীয় অর্থনীতি পরিচালনা ক্ষেত্রে বিশেষ সফলকাম হইতে পারিবেন।

#### বিজ্ঞান সরবরাহে সরকারী অসামর্থ্য

লেনিন কৃষিকারকে কৃষিকারবাসীদিগের নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া সর্বপ্রথমে চেষ্টা করিয়াছিলেন বৈজ্ঞানিক শক্তির অবাধ উৎপাদন ও তৎস্বারা কৃষিকার সর্বত্র আধুনিক যুগের উপযুক্ত মানব জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নতির সর্বব্যাপ্ত ব্যবস্থা করিবার। আমাদিগের রাষ্ট্রে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত রাষ্ট্র-নেতৃবৃন্দ আমলাতন্ত্রের নিকট আত্মবলিদান দিয়া যাহা কিছু করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা দ্বারা সমাজের মানুষ পূর্ণাঙ্গপেক্ষা অনেক অধিক সুবিধা ত উপভোগ করিতেছেনই না, বরঞ্চ উর্দ্বাদিগের অবস্থা ক্রমশঃ আরই অভাবান্বিত হইয়া পড়িতেছে। ব্যাঙগুলিকে রাষ্ট্র-করায়ত্ত করিয়া দেশবাসীর মূলধনের অভাব দূর করা হইবে কল্পিত হইয়াছিল। দেশের সকল মানুষের মূলধনের অভাব দূর করিতে হইলে প্রায় দুইলক্ষ কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে। ব্যাঙগুলি খাল খাল করিয়া সকল অর্থ প্রায়-বাসীদিগকে বিতরণ করিয়া দিলেও মাত্র ১০০০/২০০০ কোটি টাকা মুক্কাফিদিগের সহায়তার কোন কোন হাতে

যাহা গ্রামবাসীর নিকট আসিতে পারে। ফলে দেশের যে সকল মানুষের মূলধন প্রয়োজন তাহাদিগের মধ্যে শতকরা এক হই জনের কিছু কিছু মূলধন প্রাপ্তি ঘটিবে; বাকি সকলে, যাহারা কিছু পাইয়াছে তাহাদিগের সম্বন্ধে ঈর্ষাকাতর মনোভাব পোষণ করিয়া সমাজবাদী নেতৃবৃন্দের সম্বন্ধে প্রতিভুলতার প্রবৃত্তি হইবে। যাহা করিলে গ্রামবাসীদিগের সত্যই উপকার হইত সে চেষ্টা কেহ করিল না। যথা, যে সকল গ্রামের কোন মানবাহন চলিবার উপযুক্ত রাজপথ নাই সেইগুলিকে যদি রাজপথ নির্মাণ করিয়া ভারতের সকল এলাকার সহিত সংযুক্ত করা যাইত তাহা হইলে অন্ততঃ সকল গ্রামের আর্থিক উন্নতির পথ খুলিয়া যাইত। ইহা না হইলে ভারতবর্ষের একটা বিরাট অংশ সমগ্র দেশের প্রায় বাহিরে থাকিয়া যায় ও অর্থ-নৈতিক গঠনকার্য্য সকল দিকে পৌছাইতে পারে না। কয়লার খনি, ইম্পাত ও তাম্র প্রভৃতির ব্যক্তিগত অধিকারে প্রতিষ্ঠিত কারবার রাষ্ট্র-করায়ত্ত করিয়া জনসাধারণের কিভাবে কোন উন্নতি হইবে তাহা কাহারও বোধগম্য হয় নাই।

কোন নতুন কার্য্যভার গ্রহণ করিলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমলাদিগের পরিচালনা প্রচেষ্টা বিফল হইতে দেখা যায়। ইহার ফলে স্বদেশ ও বিদেশে বহু সহস্র কোটি টাকা খণ করিয়া ভারতের অর্থ-নৈতিক অবস্থা এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। ব্যক্তিগত অধিকারে যাহা গঠিত হইয়াছে তাহা অনেকাংশে অধিক ফলপ্রসূ হইয়াছে। কিন্তু ইহা দেখিয়া ব্যক্তিগত অধিকারের কারবারগুলিকে আরও বাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া তাহার অনেকগুলি রাষ্ট্র-করায়ত্ত করিবারই ব্যবস্থা হইয়াছে। ফলে ভারতবর্ষের মানুষ আর সঞ্চয় ও আর্থিক গঠনের দিকে যাইতে ইচ্ছুক থাকিতেছে না। অর্থ নানাভাবে ব্যয় করিয়া ভোগে লাগাইবার আগ্রহই ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে ও সরকারী ব্যয় বাহ্যল্যের জন্য মুদ্রাস্ফীতি ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিতেছে ও তাহার ক্রয়শক্তি হ্রাস হইয়া সকল দ্রব্যের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে। এই মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্য-

বৃদ্ধি ক্রমঃ বর্দ্ধনশীল ও ইহার ফলে বেতনভোগী মানুষের যতই বেতনবৃদ্ধি হয় মূল্যবৃদ্ধি হইয়া তাহার বেতনবৃদ্ধির কোন ফল ফলে না। মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব ইহাতে অধুনা আকার গ্রহণ করে ও দেশের অর্থনীতি অচল হইয়া দাঁড়ায়। আর একটা কথাও সকলকে সমাজবাদ সম্বন্ধে আভ্যন্তরীণ করিয়া রাখা। ইহা হইল সঞ্চয় করিয়া ঘরবাড়ী জমিজমা ক্রয় করিয়া মুখে দিন কাটানর পথ বন্ধের আশঙ্কা। কেহ নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক দামের গৃহ অথবা নির্দেশ-অতিরিক্ত জমি রাখিতে পারিবে না, ইত্যাদি ব্যবস্থা সাধারণের স্বাধীনতা হরণ চেষ্টা। পরে এই নীতি অনুসরণে মানুষকে রাষ্ট্রের দাসত্বে বন্ধন করা হইবে বলিয়া মনে হয়।

আমলাভ্রমের অকস্মাতা বিশেষভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে লক্ষিত হইতেছে। কলিকাতা মহানগরীতে ক্রমাগতই বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় এখানে নয় সেখানে বন্ধ করা হইতেছে। ফলে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারে যে সকল কার্য্য করা হয় তাহা প্রায় অচল হইয়া দাঁড়াইতেছে। গৃহস্থের ও দোকানদারের খাজ বস্তু, ঔষধ প্রভৃতি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসার অসুবিধা হইতেছে এবং কল কারখানা থাকিয়া থাকিয়া বন্ধ হইয়া যাইতেছে। এইরূপ হইতেছে অনেককাল ধরিয়া ও আমলাদিগের কর্তৃশক্তি নাই বলিয়াই ইহার কোনও প্রতিকার হইতেছে না। যাহারা কোটি কোটি টাকা খণ করিয়া অপব্যয় করিতে পারেন তাহারা যে ব্যবস্থা করিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন অধিক করিয়া করাইতে পারেন না একথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। সাধারণ এই সরকারী দীর্ঘ-মুজিতার ফলে শত শত কোটি টাকার লোকসান, বহু অসুবিধা ও স্বাস্থ্যহানি সহ করিয়া চলিয়াছেন। বিশেষ কোনও চেষ্টাও সরকারী তরফে কেহ করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। লেনিনের সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্বন্ধে উপদেশ; তাহারও কোন মূল্যবোধ কাহারও মনে জাগ্রত হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। কি কর্তব্য তাহা যে বুঝিতে চাহে না,

গুৰু হতে ব্যক্তিৰ অধিকাৰ বিনষ্ট কৰিতেই ব্যত থাকে, তাহাৰ দ্বাৰা সমাজবাদ অথবা অপৰ কোন আদৰ্শৰ প্ৰতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। সে গুৰু নিজ শক্তিবুদ্ধি কৰিতে চাহে; অৰ্থাৎ অপৰেৰ শক্তি ও অধিকাৰ বিনাশ কৰিয়া। আমলাদিগেৰ বা রাষ্ট্ৰ-নেতাদিগেৰ একাধিপত্য প্ৰবলভাবে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলে তাহা জনমঙ্গলকৰ হইবে এইৰূপ ধাৰণাৰ মূলে কোনও সত্য আছে কি না তাহা বিশেষ অহুসন্ধান ও বিচাৰেৰ কথা।

চিনি লইয়া কি হইতেছে ?

সংবাদপত্ৰে প্ৰকাশ যে চিনিৰ মূল্য কিলো পিছু ১৬ পয়সা হ্রাস কৰা হইবে। বাজাৰে কিছু কেহ চিনি ক্ৰয় কৰিতে যাইলে দোকানদাৰ পূৰ্বাপেক্ষা অনেক অধিক মূল্য চাহিতেছে এবং অনেক স্থলে চিনি নাই বলিতেছে। শুনা যায় যে নতুন মূল্য স্থিৰ হইয়াছে এক টাকা নিৰানব্বই পয়সা কিলোতে এবং বাহিৰে খোলা বাজাৰে তিন টাকা, চাৰ টাকা কিলো হাৰে চিনি বিক্ৰয় হইতেছে। মূল্য হ্রাস হইলে জনসাধাৰণ মনে কবেন যে দ্ৰব্যেৰ উৎপাদন অনেক অধিক হইয়াছে কিন্তু চিনিৰ উৎপাদন শুনা যাইতেছে বৰ্ত্তমানে অনেক কম হইয়াছে। যদি এই কথা সত্য হয় তাহা হইলে মূল্য হ্রাস হইতেছে কেমন কৰিয়া ? হুঁখ লোকে বলিবে যে উৎপাদন ঠিকই হইয়াছে গুৰু উৎপন্ন বস্ত্ৰৰ অনেকাংশ কালো বাজাৰে চলিয়া যাইতেছে এবং সেই পৰিস্থিতিতে উৎপাদক কাৰখানাগুলি অল্প মূল্যে কিছু চিনি সরকারী দোকানগুলিকে দিবাৰ ব্যবহা কৰিয়া কালো বাজাৰ হইতে লাভেৰ ব্যবহা কৰিতেছেন। অনেকে বলিতেছেন চিনি উৎপাদন সত্য সত্যই অল্প হইয়াছে এবং তাহাৰ কাৰণ আখের চাষ উপযুক্ত পৰিমাণে কৰা হইতেছে না, মূল্য কম স্থিৰ কৰাৰ লজ্জা। যাহাই হউক বুঝা যাইতেছে যে ইহা সুব্যবহাৰ অভাবেৰ আৰেকটা উদাহৰণ। অৰ্থনীতি ক্ষেত্ৰে সরকারী হস্তমণ্ড চালাবে অথচ সেই হস্তমণ্ড কাৰ্যকৰ হইবে না, উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি কৰিবে, এই নীতি চলিতে পারে না।

### শ্ৰীঅৰবিন্দ জন্ম শতবাৰ্ষিকী

বৰ্ত্তমান যুগে যে সকল মহামানব ভাৰতবৰ্ষে জন্মগ্ৰহণ কৰিয়াছেন শ্ৰীঅৰবিন্দ তাঁহাদিগেৰ মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একাধাৰে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ভাৰতীয় জ্ঞানেৰ আধাৰ ছিলেন। প্ৰথম জীবনে তিনি ইংলেণ্ডেই বাস কৰিয়া শিক্ষালাভ করেন ও পূৰ্বে ভাৰতবৰ্ষে আসিয়া তিনি ইংলণ্ডীয় শাসকদিগেৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিয়া মহাবিপ্লবীৰ আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া-ছিলেন। ইহাৰ পৰে তিনি বিপ্লবেৰ পথ ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক অহুসন্ধিস্থায় আত্মনিয়োগ করেন ও যোগ-সাধনা কৰিয়া ভক্তি ও জ্ঞান অহুসরণে পৰম সত্য উপ-লব্ধি কৰিয়া স্বৰ্গ আসনে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ন। শ্ৰীঅৰবিন্দ ১৮৭২ খৃঃ অব্দেৰ ১৫ই আগষ্ট জন্ম গ্ৰহণ করেন এবং এখন হইতে এক বৰ্ষকাল তাঁহাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী পালিত হইবে। তাঁহাৰ ভক্তাদিগেৰ মধ্যে অধিক সংখ্যক ব্যক্তিই ভক্তি মাৰ্গেৰ পথিক; কিন্তু অনেকে আছেন যাহাৰা শ্ৰীঅৰবিন্দকে ভাৰতীয় বিপ্লববাদেৰ প্ৰবৰ্ত্তক বলিয়া বিশেষ সংবধনাৰ অধিকাৰী বলিয়া বিশ্বাস করেন। একথা ঠিক যে শ্ৰীঅৰবিন্দ পণ্ডিতোৰ যাইবাৰ পূৰ্বে স্বাধীনতা লাভেৰ শ্ৰেষ্ঠ পন্থা বলিয়া বিপ্লবেই বিশ্বাস কৰিতেন। তাঁহাৰ সহিত সৰ্বভাৰতীয় বিপ্লবীদিগেৰ সংযোগ ছিল এবং তিনি বাংলাৰ বাহিৰে মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজপুতানা প্ৰভৃতি দেশেৰ ব্ৰিটিশ বিৰোধী বিদ্ৰোহাকাজী বহু লোকেৰ সহিত সঘন যত্ন কৰিয়া চলিতেন। তাঁহাকে যখন ব্ৰিটিশ শাসকগণ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিয়া ৰাজশক্তিৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিবাৰ অভিযোগে অভিযুক্ত কৰে তখন তিনি দৰ্শন ও যোগ-সাধনাৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰিতেন না। ঐ সকল অভিযোগ কাটাইয়া তিনি যখন ফৰাসী অধিকৃত পণ্ডিতোৰতে অবস্থান কৰাই স্থিৰ কৰিলেন তখন হইতেই তাঁহাৰ বিপ্লবী জীবনেৰ অবসান হইয়া আধ্যাত্মিক জীবনেৰ যুগান্ত হইল।

তিনি দীৰ্ঘ জিহ্ন বৎসৰ প্ৰতিদিন বহু সময় ধ্যানে অভিযাহিত কৰিয়া যে সত্য উপলব্ধি কৰিয়াছিলেন



তাহা তাঁহার শিষ্যদিগের সম্মুখে যোগের একটি নতুন অর্থ উদ্ঘাটিত করিয়াছিল। মানব জীবন যে এক উন্নততর জীবনেরই অংশ এবং সৃষ্টির সকল সত্তাই যোগসূত্রে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এই শিক্ষাই শ্রীঅরবিন্দ ভগবাসীকে দিয়া গিয়াছেন। বিশেষণ অস্ত্রে সকল বৈপরীত্য উন্মোচিত করিয়া ভিতরের ঐক্যাত্ম্য প্রদর্শন দর্শন ক্ষেত্রে সহজসাধ্য নহে; কিন্তু তাহা অসম্ভব নহে। জবাহরলাল নেহেরু শ্রীঅরবিন্দের দেহান্তের পরে বলিয়াছিলেন যে তিনি ভারতের পূর্বাঙ্গের ঋষিদিগের শেষ প্রতিনিধি। তাঁহাকে জানিলে ও বুঝিলে ভারতের প্রাচীন গৌরবের সহিত ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠা সম্ভব হয়।

#### ফরক।

ফরাকতে যে ঠিক কি হইবে তাহা শুণু অহুমানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ এই যে প্রথমতঃ যে সকল অবস্থাগত সত্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ফরক। বাঁধ ও ভাগীরথীর জলস্রোত রক্ষার জন্য আভিযুক্ত জল আনিবার খালের পরিকল্পনা হির নির্দিষ্ট হইয়াছিল, শেষ অবধি দক্ষিণ ভারতীয় মন্ত্রীদিগের কূটতর্কের অভ্যয় অবতারণার ফলে সেই সকল ধারণাই বর্জন করিয়া নূতন পথে চিন্তা করিবার প্রয়োজনের সূচনা হয়। কে এল রাও-এর মতে সর্বসময়েই যে ৪০০০০ কিউসেক জলের আবশ্রুকতা সকল বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছিল তাহা ২০০০০ কিউসেক পরিণত হয় এবং তিনি আরও বলেন যে গঙ্গার উপরদিগের জলস্রোত যথেষ্ট ব্যবহার করিবার অধিকার অপরাপর প্রদেশেরই পশ্চিম বাংলা অপেক্ষা অধিক আছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এই জাতীয় কথাই অর্থ ইহাই দাঁড়ায় যে কেন্দ্রীয় সরকার শত শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া যে সকল পরিকল্পনাকে বাস্তব আকার দান করেন সে সকল অর্থব্যয় অপর প্রদেশের মন্ত্রীদিগের ইচ্ছামত যখন তখন নাকচ করিয়া খরচের খাতার লেখার ব্যবস্থা হইতে পারে। অর্থাৎ সকল প্রদেশেরই ভিতর দিয়া যে সকল নদী, খাল,

রাজপথ বা রেলপথ গিয়াছে সেইগুলির ব্যবহার প্রাদেশিক শাসকদিগের ইচ্ছায় চলিবে; কেন্দ্রের নিখিল ভারতীয় বিলব্যবস্থাকে গ্রাহ্য করিতে প্রদেশ বাধ্য নহে। ইহা দ্বারা মনে হইতে পারে যে এ্যাণ্ড ট্রান্স রোড অথবা ইন্টার্ন রেলওয়েকে বিহার প্রদেশের মালিকগণ দেওয়ায় তুলিয়া বন্ধ করিয়া দিতে পারেন কিম্বা যথেষ্ট ভিন্ন পথে চালাইয়া দিতেও পারেন। কিন্তু ঐ প্রকার অধিকার বিহার বা উত্তর প্রদেশের থাকিতে পারে না এবং থাকা উচিতও নহে। স্তত্রাং গঙ্গার জলস্রোত যত্রতত্র বহাইয়া চালাইবার অধিকারও তাঁহাদের থাকা উচিত নহে এবং সেইরূপ অধিকার আছে ধরিয়া লইয়া তাঁহারা যদি গঙ্গার জলস্রোত খাল কাটিয়া অর্জাব্দকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করেন, তাহাও আইনতঃ তাঁহাদিগকে করিতে দেওয়া উচিত হইবে না। কারণ সমগ্র ভারতের স্বার্থ প্রথমে রক্ষণীয় ও প্রাদেশিক স্বার্থরক্ষার কথা তাহার পরে আসে। পশ্চিম বঙ্গ যদি রাজপথ ও রেললাইন কাটিয়া দিয়া বিহার ও উত্তর প্রদেশের গমনাগমন ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া দেয় তাহা প্রায় খাল কাটিয়া গঙ্গার জলস্রোতের ভিন্ন পথে চালানারই সহিত তুলনীয় হইবে। এবং পশ্চিম বঙ্গ হইতে সকল বিহায় ও উত্তর প্রদেশ বাসীকে নিজ দেশে কিরিয়া যাইতে বাধ্য করাও ঐ জাতীয় উৎকট প্রাদেশিক অধিকার জাহির করার একটা পছা হইতে পারে।

আমরা জানি না শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় কি উপায় উদ্ভাবনা করিয়া ফরক। সমস্তার সমাধান ব্যবস্থা করিয়াছেন। যদি বিহার ও উত্তর প্রদেশের খালগুলির জল লইবার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রয়োজন মত ভাগীরথীতে ফরক। হইতে ৪০০০০ কিউসেক জল আনিবার সুযোগ সৃষ্টি করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মূখ্য মন্ত্রীর “সাদা কাগজ” সাদা থাকিবে। যদি তাহা না হইয়া কে এল রাওয়ের কারসাজিতে সিদ্ধার্থশঙ্কর পশ্চিম বঙ্গের স্বার্থহানিকর কোন ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া থাকেন তাহা হইলে সাদা কাগজের বর্ণ মসলিগু হইয়া দেখা দিবে।

কলিকাতার ভবিষ্যৎ ফরকার জলস্রোত নিয়ন্ত্রণের

উপৰ নিৰ্ভৰ কৰিতেছে। কলিকাতাৰ যদি জলাভাৰে বন্দৰ হিচাবে আঁতৰ না থাকে তাহা হইলে বাল্লালী জাতিৰ একটা চৰম দ্ৰবহা উপস্থিত হইবে। লক্ষলক্ষ মানুহৰ অন্নবস্ত্ৰৰ সংস্থান থাকিব নোওঁ বহু সহস্ৰ কোটি টাকায় নিৰ্ম্মিত এই বিৰাট সৰু ক্ৰমশঃ ধ্বংসস্থাপে পৰিণত হইবে।

### দিল্লী বিমান বন্দৰে বিমান ধ্বংস

কয়েক দিন পূৰ্বে ইণ্ডিয়ান এয়াৰ লাইনস-এৰ একটা ককাৰ ক্ৰেণ্ডিশপ বিমান বোম্বাই হঠাতে দিল্লী আসিছিল। দিল্লীৰ বিমান বন্দৰে অবতৰণ কৰিবৰ সময় প্ৰথম চেষ্টাতে বিমানটি নামিবৰ পথ ছাড়িয়া বাহিৰে চলিয়া যাওয়াতে বিমান চালক পুনৰ্বাৰ বিমান বন্দৰ প্ৰদক্ষিণ কৰিয়া আসিয়া অবতৰণ কৰিবেন স্থিৰ কৰিয়া আকাশ পথে পুনঃ পৰিক্ৰমণ আৰম্ভ করেন। কিন্তু গভীৰ হুঃখৰ বিষয় যে তিনি ঐভাবে আকাশে উড়িয়া চলিবৰ সময় কিছু দূৰেৰে মাসাদপুৰ আমেৰ নিকটস্থ একটা ক্ষুদ্ৰ পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া ভূপতিত হ'ন ও সকল যাত্ৰী ও বিমানকৰ্মী সৰ্ব নিহত হ'ন। বিমানটিতে ১৪ জন যাত্ৰী ও ৪ জন কৰ্মী ছিলেন। ইহাদিগেৰে মধ্যে একজন পাৰ্লামেন্টেৰ সভ্যও ছিলেন; আৰু ছিলেন একজন অষ্ট্ৰেলিয়ান, একজন ক্ৰিশিয়ান ও একজন আমেৰিকান। বিমানটি খণ্ডবিখণ্ড হইয়া দুই বৰ্গ কিলোমিটাৰ জুড়িয়া পাড়িয়া থাকিতে দেখা যায় ও ব্লত ব্যক্তিদিগেৰে চেহায়া দেখিয়া সনাত কৰা প্ৰায় অসম্ভব হয়। ভাৰতীয় বিমানগুলিৰ নিৰাপদ গমনাগমনেৰে একটা ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এইৰূপ দুৰ্ঘটনা ঘাৰা সেই স্তন্য নষ্ট হয় ও সেইজন্য সৰ্ব-সাধাৰণেৰে মনে এই বিমান ধ্বংসেৰে কথাটি একটা গভীৰ কতীচক্ৰেৰ সৃষ্টি কৰিয়াছে। সকলেই জানিতে চাহিতেছেন যে এৰূপ দুৰ্ঘটনা কেমন কৰিয়া সম্ভব হইল। বলা হইয়াছে ঐ সময় বড় বৃষ্টিৰ কোন প্ৰবল প্ৰাৰ্হাৰ ছিল না; কিন্তু সত্যই কি ছিল না? মাসাদপুৰ আমেৰ নিকটস্থ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ পাহাড়গুলি কি বিমান বন্দৰেৰে আঁত নিকটে? যদি তাহা হয় তাহা

হইলে সেইগুলিৰ সৰ্ব্বদে বিমান চালকদিগকে সতৰ্ক কৰিবৰ কি ব্যৱস্থা কৰা হইয়াছে? ককাৰ ক্ৰেণ্ডিশপ বিমানগুলি কত পুৰাতন ও সেগুলি ঠিকভাবে চলে কি না ইত্যাদি নানা প্ৰশ্নই সকলেৰে মনে আঁতৰ হইতেছে। একটা তদন্ত হইবে নিঃসন্দেহ এবং তাহা হইলে পৰে হয়ত জানা যাইবে ঐ দুৰ্ঘটনা কি কাৰণে সম্ভব হইয়াছিল। এৰূপ বাহাতে আৰু কখনও না হয় সে ব্যৱস্থা কৰাৰ চেষ্টা অবশ্যই হইবে।

### মানব জীৱন ধাৰণেৰে বিপৰীত অবস্থা

মানুষ দেখানে ও যেভাবে জীৱনযাত্ৰা নিৰ্ব্বাহ কৰে সেই পৰিপাৰ্শ্বিক কোথাও কোন সময় জীৱন নিৰ্ব্বাহেৰে সহায়ক হয় এবং অপৰ কোথাও অল্প সময়ে অবস্থান্তৰে জীৱন ধাৰণেৰে পক্ষে বিৰুদ্ধ ও প্ৰতিকূল হয়। এই বিষয়টি বৰ্ত্তমানে মানব মনকে বিশেষভাবে আলোড়িত কৰিতেছে; কাৰণ বহুস্থলে মানুহ নিজেই নিজ জীৱন ধাৰণ অসম্ভব কৰিয়া ছুটিতেছে এবং বিশেষজ্ঞদিগেৰে মতে মানুহ নিজ কৰ্মধাৰা সংশোধন কৰিয়া জীৱন ধাৰণ সহজ ও সম্ভব কৰিবৰ চেষ্টা না কৰিলে আৰু এক শত বৎসৰেৰে মধ্যেই এই পৃথিৱী মনুষ্যবাসেৰে অযোগ্য হইয়া যাইবে ও মানুহ অগণিত সংখ্যায় অকাল মৃত্যু বৰণ কৰিয়া মনুষ্যজাতিৰ ধৰা পৃষ্ঠ হইতে অন্তৰ্ধান হৈ চুচনা সম্পাদনে নিযুক্ত হইবে। এই যে পৰিপাৰ্শ্বিককে জীৱন ধাৰণেৰে অযোগ্য ও বিপৰীত কৰিয়া তোলা ইহা বাস্তবে নানাতাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে। পৃথিৱীৰ বায়ু মনুষ্য চালিত কল কৰ্ম্মা চুল্লি প্ৰভৃতি হইতে উৎপন্ন শূন্য ও বিষাক্ত বাষ্পে ক্ৰমশঃ এমনভাবে শ্বাস প্ৰশ্বাসেৰে অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে যে সৰ্ব্বত্রই মানুহ কি কৰিয়া শূন্য ইত্যাদি বুদ্ধি না পায় সেই চেষ্টা কৰিতে আৰম্ভ কৰিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ব্যাটাৰী চালিত মোটাৰ গাড়ী ও চুল্লিৰ পৰিবৰ্ত্তে বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কি কৰিয়া সৰ্ব্বক্ষেত্ৰে হইতে পাৰে তাহাৰ লক্ষ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হইবে বলা যাইতেছে। সহৰেৰে ও কাৰখানাৰ নালাৰ জল এখন অৰাধি যথেষ্ট নিকটস্থ নদী বা সমুদ্ৰে কেলা হইয়া থাকে। ইহাৰ ফলে বিপুল পানীৰ জলেৰে অভাৱ

ঘটিতে আরম্ভ করিরাছে, মাহও আর পূর্বের মত নয়। হলে যে সকল কীট বিনাশক ঔষধ ব্যবহার করা হইয়া থাকে তাহার বিবেচনা বড় উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি হইতেছে। ইহা ব্যতীত পারমাণবিক বিস্ফোরণজাত তেজস্ক্রিয় রশ্মির উদ্ভবও কখন কখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করিতেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও যন্ত্র বাহুল্যের ফলে আকাশে বাতাসে এমন মারাত্মক শব্দ উৎপন্ন হইতেছে যে মানুষ পথে সেই দুঃসহ শব্দভরমাত্রের বিনাশের কারণ হইয়া দেখা দিতেছে। মানুষও যন্ত্রজাত শব্দের প্রাচল্যের সহিত নিজ কণ্ঠ বা হস্তচালিত বাস্তব ইত্যাদি প্রসূত শব্দ ছাড়িয়া কোলাহল শতগুণ করিয়া তুলিতেছে। মিছিল, সভা, কীর্তন, একতান বাস্তব, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি নানা উৎকট শব্দ উৎপাদনের উৎস ভারতবর্ষে মানবকণ বিদ্যারণ করিয়া তাহাকে শারীরিক বিনাশের আরও নিকটে লইয়া যায়। শব্দ যে পরিপার্শ্বিককে মানব জীবন ধারণের অযোগ্য করিয়া তোলে একথা সর্বজন-বিদিত কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষ অকারণে প্রবল শব্দ-ভরমের সৃষ্টি করিয়া নিজ জীবন বিপন্ন করিতে বিধা করে না।

মানুষ নিজ কর্ম পদ্ধতি দ্বারা এই কথাই প্রমাণ করে যে তাহার বিশ্বাস মনুষ্যজীবন কিছুতেই কোন চরম পরিণতিতে পৌঁছাইয়া বিলোপের আবেশে পড়িয়া শেষ হইয়া যাইবে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে ভোগসাধন প্রীতি উৎপাদন বৃদ্ধি সমানে চলিবে ও তাহার কোন শেষ হইবে না। কিন্তু বস্তুতঃ কোন কিছুই অসীম বৃদ্ধির পথ অবলম্বনে চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বৃদ্ধি সর্ব সময়েই বর্ধনশীল, যাহা তাহাকে নিজ ভাবেই বিনষ্ট করিয়া থাকে। অতিরিক্ত উৎপাদন ব্যবহাও নিজ আকার বৃদ্ধির ফলে ভাঙিয়া পড়ে।

### স্বাধীনতার রক্তত জয়ন্তী

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইল। ঐশ্বর্য্যবোধে বলা হয় পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে তাহার নাম “সিলভার জুবিলি” অথবা রক্ত জয়ন্তী।

স্বাধীনতার রক্তত জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হইলে পরে মানুষের স্বভাবভেদেই মনে হয় পঁচিশ বৎসর স্বাধীন থাকিয়া কি লাভ হইল, কোন্ কোন্ উচ্চ আদর্শ জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইল, জাতি কি কি মহৎ কার্য্য করিল? ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহা হইরাছে তাহার মধ্যে গৌরবের কথা নাই এমন নহে; আবার যে অগৌরবও নাই তাহাও বলা চলে না। খুব বড় কথা হইল এই যে আমরা সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করিয়াছিলাম ও অন্ত অনেক রাষ্ট্র স্বাধীন হইবার পরে একনায়কত্বের স্বৈরাচারে নিমজ্জিত হইয়া গিয়া থাকিলেও আমরা পঁচিশ বৎসর কাল নিজ নিজ রক্ষা করিয়া সাধারণ-তন্ত্রেই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে সক্ষম হইয়াছি। আমরা পৃথিবীর বৃহত্তম সাধারণতন্ত্র অম্মগামী রাষ্ট্র ও আমরা পাঁচবার সাধারণ নির্বাচন কার্য ২০ কোটি ভোট দাতার দ্বারা শাস্তিপূর্ণ মুশৃঙ্খলার সহিত সাধিত করিতে পারিয়াছি। ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমাদের সংবিধান প্রণয়ন যেভাবে করা হইয়াছিল ও সেই সংবিধান যেক্রমে নানান শাখা প্রশাখার ভারসাম্য রক্ষা করিয়া গঠিত হইয়াছিল তাহাও কম প্রশংসনীয় নহে। জগতের ইতিহাসে যেসকল রাষ্ট্রীয় সংবিধান রচনার কথা বিশেষ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তারতীয় সংবিধানের রচনা কাহিনীও সেই সকলের মধ্যে স্থান লাভ করিবে। ভারত শাসন ক্ষেত্রে অনেক স্থলে দুর্নীতির পক্ষে নিমজ্জিত হইয়া গিয়া থাকিলেও অপর বহু বিষয়ে উচ্চ আদর্শ অবলম্বন করিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহা একটি নব গঠিত দরিদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে গৌরবের কথা, স্বীকার করিতেই হইবে। ভারত যদি বিদেশীদিগের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিয়া বৈদেশিক প্রেরণার কারখানা-বাড়ি প্রতিষ্ঠা চেষ্টা না করিত তাহা হইলে ভারতের আদর্শচ্যুতির সম্ভাবনা ততটা প্রকট ভাবে রূপায়িত হইত না। বিগত পঁচিশ বৎসরে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কারণে ভারত কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই; এবং সকল সময়েই

পরবর্তী অংশ ১১১ পৃষ্ঠার ত্রুটি

# আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবণতা

অধ্যাপক শ্রীমল কুমার চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবণতা প্রধানত বহির্মুখী। দেহ ও প্রাণচেতনার রাজ্য অতিক্রম করে এলেও এখন পর্যন্ত এই সাহিত্যে বিচার-বিশ্লেষণ-প্রধান মনোজিজ্ঞাসাও ভালো করে ফোটে নি। তিন-চার জন যাঁদের বেশি বয়স্ক অতি-প্রবীণ সাহিত্যিকের রচনায় এই প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ-পটুতা দেখা গেছে : দিলীপ-কুমার, মণীন্দ্রলাল, বলাইচাঁদ, অন্নদাশঙ্কর ও বুদ্ধদেব ; এঁদের মধ্যে মণীন্দ্রলাল, প্রায় অবসৃত। অন্তরাকৃতির কোন চিহ্ন এ-সাহিত্যে আর দেখা যায় না। বিভূতি-ভূষণের পরলোকগমনের পর এবং দিলীপকুমার “অঘটন” নিয়ে মেরে ওঠার ফলে, যে মনোবিশ্লেষণ এযাবৎকাল আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত হয়েছে, তাতে ঝাঙাল কথাসাহিত্যিকদের বীভৎস বরাবর লক্ষ্য করা গেছে। একেত্রে যথোচিত বিকাশের আগেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পঞ্চাষতিতম উদ্বেগজনক অবস্থার বিষয়।

মনোজিজ্ঞাসাকেও অতিক্রম করে মানবের অন্তলোকে সন্ধানী দৃষ্টি প্রেরণের উৎসুক প্রয়াস সাম্প্রতিক পশ্চাত্য সাহিত্যে বারবার দেখা গেছে যা প্রকৃত পক্ষে মনোজিজ্ঞাসার স্বাভাবিক পরিণতি। চিন্তাশীল মানুষ জীবনের সমস্ত স্বরূপ বিশ্লেষণ করবে, অথচ তার সমাধান কোথায়, তা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে না, এমন হতে পারে না। সমাধান অন্বেষণে লেখকের অক্ষমতা তার সৃষ্টিকর্মের অসম্পূর্ণতাকেই প্রতিপন্ন করে। সাহিত্য সৃষ্টি করে যে মানস-চেতনা, সে দেহ ও প্রাণের রাজ্যে, ঘটনাবলী, পরিবেশ-রচনা ও চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে তার অসুস্থান প্রায় শেষ করে মানসিক বিচার ও ব্যবচ্ছেদপ্রবণ বিশ্লেষণ নিয়ে ব্যস্ত

হয়ে পড়েছিল বহুকাল থেকে। দ্বিতীয় মানুষের আগে থেকে মনেরও উদ্ভললোকের কোন চেতনার আলোয় সমগ্র বিশ্বসমস্তাকে নতুনভাবে নিরীক্ষণ করতে পশ্চাত্য শিল্পীরা আশ্রয়ী হয়ে উঠলেন। সেই অভীক্ষা আধুনিক পশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষত ইংরেজি ভাষার রচিত সাহিত্যে ক্রমেই পরিষ্কৃত হল সমাসেট মম, অলডাস হাক্সলি প্রভৃতির রচনায়। ইংরেজি সাহিত্যের এই উদ্ভাসিতসারে সহায়তা করেছেন ইংরেজ ব্যতীত আইরিশ, আমেরিকান ও ভারতীয় সাহিত্যিকসকলও। জার্মান ও অন্যান্য ইউরোপীয় মহাদেশীয় ভাষার সাহিত্যেও এই ধারার ক্ষুরণ দেখা গেল হের্মান হেসে, লুইজ পিরান্দেল্লো প্রভৃতির রচনায় কিন্তু বিশ্বের বিষয় এই যে, বহুমুখ ও বহীক্ষনাধের আবির্ভাব সত্ত্বেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যথাসময়ে এই উদ্ভাসপ্রয়াণের চিহ্ন একেবারে দেখা গেল না বললেই হয়। বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিলীপকুমার রায়ের রচনায় চকিতে দেখা দিয়ে এই অলঙ্ঘ্য জগতের পরম আলোক আমাদের জীবনভরা বেদনা নাশের কোন ব্যবহা না করে যেন চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

১৯৫০ সালে বিভূতিভূষণের অকালমৃত্যুর পর আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্য বিশেষভাবে পরবর্ত্ত-ভারশঙ্কর-বলাইচাঁদ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিদের দ্বারা অসুস্থ বিশেষ এক ধরনের কাহিনী ও চরিত্র প্রধান সাহিত্য সৃষ্টির দিকে মোড় ফির্ন। বোমালই হোক বা নভেলই হোক, ছোট গল্প হোক বা দীর্ঘায়ত উপন্যাস হোক, সব রচনাতেই অগভীর চেতনার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশ্ববনের সর্গাশেকা প্রগতিশীল আভিযাত্রির দিকে থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে

নিতান্ত পশ্চাৎপদ তার অসংশয় পরিচয় বহন করবে গত ত্রিশ বছরের কবিতা-নাটক-গল্প-উপন্যাস। অবশ্য স্বাক্ষরিত মতবাদ রূপায়ণের কাজে কিম্বা পারিপার্শ্বিকের একান্ত অধীন যে জনতা তার অন্ধ আবেগ প্রমুখ্ত করার সাধনায় বাঙালি সাহিত্যিকেরা যে মোটামুটি রুশ-চৈনিক-মার্কিন ধারা বরাবর এগিয়ে চলেছেন, সে-সত্য অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। কিন্তু অল্পদীপ্ত স্থূল খোঁজ আবেগ রূপায়িত করার মার্কিন পদ্ধতি বা বড় জোর আলবের্তো মোরাভিয়ার বস্তুনিষ্ঠ সমাজ দর্শনের অনুসরণ, কৃষক-দরদী চীনা বা শ্রমিক-সেবক রুশ সাহিত্যশিল্পীর অত্যন্ত গভীরগভিক মামুলি জীবনীচক্র-অনুসরণ—এ-সবের দ্বারা আধুনিক বাঙালি সাহিত্যিকদের কোন রসসিকি বা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা নেই। যে-ঐক্যল্যাবোধ বরিস পাস্তেরনাকের মতো মহান শিল্পীকেও অভিভূত করেছে, তাঁর চেয়ে অনেক নিম্ন স্তরের হয়েও বাঙালি সাহিত্যিকেরা যদি তাঁরই ধারা অনুসরণ করেন তা হলে তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যর্থতার গ্লানি তাঁদের বিধিলাপি।

প্রবন্ধ চেতনার দ্বারা জাগতিক সমস্তাগুলির বিচার করার, নতুন সংশ্লেষণী মনোবৃত্তি নিয়ে অভাবিতপূর্ণ সমাধান অনুসন্ধানের কোন প্রচেষ্টা আজ কোথাও দেখা যায় না। বাঙালি সাহিত্যিকরা কেউ কেউ অবচেতনার দ্বারা উদ্ঘাটন করে পাতালপুরীর রহস্যময় গর্ভেরে সঞ্চারী রশ্মির আলোক সম্পাত করলেও উদ্ভব-চেতনার তোরণদ্বার অতিক্রম করার সাধনায় তাঁদের তামসিক উদাসীনতা দেশের কল্যাণকামী-মাত্রকে ব্যাধিত করবে।

১৯৪১-৭১ সালের মধ্যে লিখিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সামান্য চিন্তাশক্তি শক্তি ব্যতীত স্থায়ী কোন সাহিত্যসম্পদ প্রায় কোন রচনাতে দেখা যায় না। মননশক্তির যে-গভীরতার সঙ্গে অন্তরলোকের স্বত উজ্জ্বলিত রসপ্রবাহ সংযুক্ত হলে তবে যথার্থ সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়, যা একাধিকবার পাঠে প্রাণহীন বলে প্রতীয়মান হয় না এবং যা সমসাময়িকতার একান্ত বশব্দ

নয়, সে-গভীরতার ক্রীণতম আভাসও দেখা যায় না পূর্ণোক্ত চার-পাঁচ জনের কোন কোন রচনায় ছাড়া। বস্তুত যে-মহৎ মানসের অভিভ্যক্তিতে বাংলা সাহিত্য উনিশ শতকের দ্বিতীয়াধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম চারটি দশকে প্রথম উদাসনগমে রঞ্জিত পূর্বশির মতো নবোন্মেষরাগরাস্তিম হয়ে উঠেছিল, তা যেন বড় বেশি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়েছে। আমাদের জন্তে পড়ে আছে বিকৃত কামপ্রবৃত্তি আর দলীয় রাজনীতির চর্চা।

১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ এবং ৭ই ডিসেম্বর জাপানের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণাঙ্গনে প্রবেশের ফলে দ্রুত আবির্ভূত রাষ্ট্রনৈতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় পরস্পরের প্রভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শোচনীয় অপকর্ষ সাধিত হয়েছে। কোন জাতির সর্গাঙ্গীন অবক্ষয়ের যুগে তার সাহিত্য সম্পূর্ণ অক্ষত থাকা অসম্ভব। অবশ্য এর জন্তে “অবস্থার দাস” বাঙালি নিজেই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। সমগ্রভাবে বিচার করলে বাঙালি আজ যে সাংস্কৃতিক অধোগতির সম্মুখীন হয়েছে, সেই ধ্বংসোন্মুখ অপকর্ষের প্রভাব পড়েছে তার সাহিত্যেও। মুসলিম আমল বা নবাব-বাদশাহি রাজত্বের অবসানে এবং ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে এই বাংলা দেশেই একদা যে নিয়ন্ত্রিত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, ইংরেজ রাজত্বের অবসানে এবং হিন্দুস্থানি প্রভু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সূচনায় তারই কদর্যতর পুনরাবির্ভাব দেখা যাচ্ছে।

বাংলা সাহিত্যের তথা সংস্কৃতির অন্তান্য অঙ্গের বিশেষত সঙ্গীতের সাম্প্রতিক অধোগতির কারণের মূলে যে হিন্দুস্থানি অর্থাৎ হিন্দি-উর্দু ভাষাসাম্রাজ্যবাদের প্রচ্ছন্ন প্রভাব সক্রিয়, তার প্রমাণ স্বরূপ ১৩৭১ সালের কাস্তিক সংখ্যা “প্রবাসী” পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ও সুনীতিকুমারের হুঁচি মূল্যবান্ অভিমত উল্লেখ করা হল। ১৯২৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্তনে স্বীকৃত ভাষণদান কালে আচার্য সুনীতিকুমার বলেছিলেন, “আমাদের স্থূল এবং কলেজগুলিতে পাঠ্যতত্ত্ব অহিন্দুভাবী বালক-বাণিকদের জন্য

আবশ্যিক হিন্দীর আমি ভীর বিরোধী।” তারপর রবীন্দ্রনাথের একটি রচনাংশ তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন:—

“বাঙালি বাংলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের যদি উন্নতি করে তবেই হিন্দীভাষীদের সঙ্গে তাহার বড় রকমের মিল হইবে, সে যদি হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে সন্তোষ ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দীর ছাঁচে বাংলা লিখিতে থাকে, তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে এবং কোনো হিন্দুস্থানি তাহার দিকে দৃকপাতও করিবে না। আমার বেশ মনে আছে, অনেকদিন পূর্বে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘বাংলা সাহিত্য যতই উন্নতি লাভ করিতেছে ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। কাব্য, এ-সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে, তবে ইহা মরিতে চাহিবে না এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষা মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার একসাধনের পক্ষে সনাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলা ভাষা, অতএব বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।’ সকল প্রকার ভেদকে চোঁকিতে কুঁদিয়া একটা পিণ্ডাকার পদার্থ গড়িয়া তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকল লোকের মনে জাগিতোছিল। কিন্তু আসল কথা—বিশেষত্ব বিসর্জন করিয়া যে-সুবিধা তাহা দু দিনের ফাঁকি—বিশেষত্বকেই মহত্ব লইয়া গিয়া যে-সুবিধা, তাহাই সত্য।” (“হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়”, ১০৮, রবীন্দ্রচিন্তাবলী, পশ্চিম বঙ্গ সরকার, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ১৮১-৮২।)

এর পর সুনীতিবাবু নিজেই বলছেন:—

“এই জাতীয় অভিমত আমি নাগাঁর অক্ষরে হিন্দীর মাধ্যমে ভারতীয় ঐক্যের জন্য গাহারা উদ্বিগ্ন, সেই সকল ব্যক্তি, গাহাদের অধিকাংশই হিন্দীভাষী, তাহাদের স্রষ্টা অথবা প্রচ্ছন্নভাবে বলিতে গুনিয়াছি।... হিন্দীর গর্ভে নিমজ্জিত করার পথ প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে কেহ কেহ বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলির

‘হিন্দীকরণ’ করিতে চাহেন। অভিপ্রেত না হইলেও কার্যক্ষেত্রে ভাষানীতির রূপায়ণ এই পথেই যাইতেছে।” (প্রবাসী, কান্তিক, ১০৭৫, পৃষ্ঠা ২১-২২)।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গুন ক’রে বলেছিলেন, বাঙালি গানের রাজা। সেই গণোক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ক’রে সরকারি প্ররোচনায় মাইক সহযোগে মস্তানদের দ্বারা ব্যাপক ভাবে কুশ্রাব্য হিন্দুস্থানি গানের প্রচার চলতে দেওয়া হচ্ছে এই আশায় যে এর ফলে হিন্দী গানের জনপ্রিয়তা তথা হিন্দী ভাষার প্রগতি বৃদ্ধি পাবে।

বাংলা সাহিত্যের সাক্ষিপূর্বে ১৭৬০-১৮৩১ সালে যেমন রাশি রাশি কবি-গান ও খেউড়-শ্রেণীর গীতিকার লেখা হয়েছিল, তেমনই বর্তমান কালে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অজস্র গল্প, উপন্যাস ও গল্পকাব্য রচিত হচ্ছে বেঙালির অন্তঃসারশূন্যতা সমাধিক পরিণতি। যথেষ্ট পরিমাণে বিজ্ঞেয়গীতি, কাম্পনকাব্যলী, নবকলগীতি, ‘অতুলপ্রসাদী’ এমন কি রবীন্দ্রসঙ্গীতও প্রায়শঃই একে একে রেকর্ড করা বা বেতার-কেব্র থেকে প্রচার করা হয় না। অথচ অতি অল্প আনাড়ি কবিদের রচনা জনপ্রিয়তার দোহাই দিয়ে প্রচার ক’রে বাংলা গানের মান ও আদর্শ নামিয়ে এনে হিন্দী গানের পর্যায়ে ফেলার চেষ্টা চলেছে।

এই অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিশ্বের মনোভূমিতে যেখানে আগাহার ফসল ফলেছে সর্গাধিক, সেই দলীয় রাজনীতির মহা-অরণ্যে বাঙালি আজ পথহারা। বাঙালি সাহিত্যিকের স্বপ্ন প্রায় বিস্মৃত হয়েছেন। বাঙালির মন আজ রসোপলব্ধির মূল উৎসের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ব’সে আছে। যেখানে বিশ্বমন উদ্দেশ্যী হয়ে মহত্তর সার্থকতার নক্ষত্র-

লোকে আরোহণের জন্তে তার বহুদিনের স্বপ্নকুসুমগুলি একে একে চরন ক’রে সংস্কে লবীন অর্থ্য প্রস্তুত করছে বিশ্বদেবতার চরণে অঞ্জলি প্রদানের অভ্যাসে, সেই সমৃদ্ধ মানসের স্বপ্নবীণে কাননভূমিতে পুষ্পচরনব্রতী কোন বাঙালি সাহিত্যিককে আজ আর দেখা সহজ নয়।

সাহিত্য যেখানে রাজনৈতিক দলীয় প্রচারধর্মী, সাহিত্যে যেখানে গোষ্ঠীচেতনার প্রকাশ, সেখানে আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গগামী। কিন্তু যেখানে সাহিত্যে বৃহত্তর সম্ভারিত চেতনা নিয়ে জীবনের সমস্তাসমূহের সমাধান খোঁজার প্রয়াস পাওয়া হয়, সেখানে বাঙালি সাহিত্যিক পক্ষাৎপদ।

সাধারণ গড়পড়তা মনের কাজই হচ্ছে, যে কোন জিনিসকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা, অংশকে সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা। মহতী বুদ্ধি বা বোধের কাজ বস্তুকে সমগ্ররূপে দেখা, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার সম্বন্ধ বিচার করে দেখা। আধুনিক বাঙালি লেখকের রচনায় এই সমগ্র দৃষ্টির একান্ত অভাব। রবীন্দ্রনাথের রচিত সমসাময়িক জীবনসমগ্রাবিষয়ক প্রবন্ধগুলির সঙ্গে এখনকার মনষীদের লেখা প্রবন্ধগুলির তুলনা ও আলোচনা করলে তা বোঝা যাবে।

রবীন্দ্রনাথের কালান্তর বা স্বদেশ শীর্ষক প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নিবন্ধসমূহ আলোচনা করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীর হৃৎ-দারিদ্র্য, কুসংস্কার, শিক্ষার অভাব প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করার সময়ে বিতর্পী ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমির ওপরে স্থাপিত সমস্তাগুলিকে মুক্তদৃষ্টিতে দেখে তাদের প্রতিকার নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি সাজ অক্ষর প্রশান্তির সঙ্গে ধীরভাবে সমস্তাগুলির সব দিক বিশ্লেষণ করে একটি সজননহিতকর সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রয়াস করেছেন। এখনকার প্রবন্ধলেখকরা সমস্তার আলোচনার সময়ে সেই অটল মানসস্বৈর্য ও চিন্তাপ্রসার একেবারেই দেখাতে পারেন না। সেই জন্তে প্রধানত সমস্তাজড়িত সাহিত্য-সৃষ্টি করলেও এ-যুগের সাহিত্যিক কোন স্পষ্ট বা বলিষ্ঠ সমাধান দিতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্র, বিজ্ঞানলাল এমন কি শরৎচন্দ্রের মধ্যেও এ-যুগের লেখকদের মতো বিধা ও সংশয় ছিল না।

বাংলা সাহিত্য এখন বস্তুগুলি পূর্ণনির্দিষ্ট গতিচক্রের মধ্যে বারবার আবর্তিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত লেখকদের রচনায় পূর্ণনির্দিষ্ট পছা অঙ্গসরণ

ক'রে গতানুগতিক বিষয় নিয়ে বৈচিত্র্যহীন ভঙ্গিতে রসসৃষ্টির ব্যর্থ প্রয়াস সবত্র পরিদৃশ্যমান। মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ ও মহাভারতের পাঁচালি রচনার সময় থেকে বাঙালি লেখকের যে-স্বভাব—একজনের পরিকল্পিত অভিনব কোন রচনার অঙ্গকরণে অনেকগুলি বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি-সৃষ্টি—তা আজও প্রবলভাবে বর্তমান। আমাদের এখন কিছুদিন অঙ্গমুখী হয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে আত্মাহুসস্থান ও আত্মবিচারণা প্রয়োজন। অজ্ঞাত্য আমরা হারিয়ে-ফেলা অন্তঃপ্রেরণার চির-প্রবহমান উৎসধারা খুঁজে পাব না, অন্যমনস্ক বহিমুখী প্রাণাবেগ ও মানসিক বিক্ষোভের মরুভালুতে আমাদের আত্মচেতনার স্ফুটনালিলা নদীটি হয় তো চিরদিনের জন্তে শুকিয়ে যাবে।

এই আশঙ্কার সঙ্গত কারণ আছে যখন ভৌগোলিক বাংলাদেশে বাঙালি জাতি সম্ভার্যনির্দেশে বিশেষ ভাবে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, উচ্ছাস্ত এবং চমৎকারা অপ্রচিন্তায় প্রপীড়িত। বাঙালির বাসভূমি রাষ্ট্রীয় দিক থেকে বহু খণ্ডে বিভক্ত; সে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অপমুহুর্যর সম্মুখীন। জীববিশেষের পক্ষে যেমন অন্ত জীবের উদরে প্রবেশ করে তার দেহগুটি ঘটিয়ে তার অঙ্গলীন হয়ে তার পরিচয়ে পরিচিতরূপে জীবিত থাকে বাীজৎস মূহুর্যর নামান্তর মাত্র, সেই রকম পাকিস্তান বা হিন্দুস্থানের অঙ্গীভূত হয়ে বাঙালির পক্ষে স্বারাজ্য-সিদ্ধি কখনও সম্ভবপর নয়। এই রাষ্ট্রচেতনাপ্রধান যুগে রাষ্ট্রনৈতিক স্বকীয়তা লুপ্ত হলে সাংস্কৃতিক লুপ্তও ক্রমশ অবশ্যস্তাবী। এ-ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানরা অনেকটা সচেতন হলেও পূর্ব বঙ্গের হিন্দু, পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান এবং বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা একেবারে বোধশূন্য।

নিজের দোষে নানা কদাচার ও কুৎসিত মতবাদের দাসত্ব করে পারিপার্শ্বিককে প্রবলভাবে প্রতিদ্বন্দ্ব ক'রে তুলে বাঙালি সেই অঙ্গরক্ত প্রাণশক্তির উদ্ধার প্রবাহ হারিয়ে ফেলেছে যার বেগে সে অতীত জীবনের অজ্ঞাত ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যসাধনাতেও পূর্ণ সাক্ষ্য আয়ত্ত করেছিল।

নিজৰ দোষে নানা কদাচাৰে ও কুৎসিত মতবাদেৰ দাসত্ব ক'ৰে পাৰিপাৰ্শ্বিকক প্ৰবলভাবে প্ৰতিকূল ক'ৰে হুলে বাঙালি সেই অক্লান্ত প্ৰাণশক্তিৰ উদ্দাম প্ৰবাহ হাৰিয়ে ফেলেছে যাৰ বেগ সেই অতীত জীৱনৰ অজ্ঞাত ক্ষেত্ৰেৰ মতো সাহিত্যসাধনাতেও পূৰ্ণ সাফল্য আৱণ্ট কৰিছিল।

সাম্প্ৰতিক গল্প কবিতাঙালি পাঠ কৰে ঐ প্ৰাণশক্তিৰ অভাব আৰু বোশ ক'ৰে বুৰে হতাশ হয়ে পড়তে হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন জীৱন ধাৰণেৰ সমস্তা এত প্ৰবল ছিল না, পূৰ্ববৰ্ত্তী মোগল আমলেৰ তুলনায় অনেক বোশ প্ৰগতিশীল, গণতান্ত্ৰিক ও মানবতাবোধ সম্পন্ন ইংৰেজ শাসন ব্যবস্থাৰ কল্যাণে বাঙালিৰা বিশেষত বাঙালি হিন্দুৰা উদাৰ মুক্তিৰ আলোকে বহিৰ্বিশ্বকে দেখাৰ, জানাৰ ও বিচাৰ কৰাৰ সুযোগ পেয়েছে, তখনও বাঙালিকে নিজৰ অধিকাৰে সচেতন প্ৰতিষ্ঠাৰ সুযোগ অৰ্জনেৰ জন্ত হেমচন্দ্ৰ, রবীন্দ্ৰনাথ, দ্বিজেন্দ্ৰলাল প্ৰভৃতি কবিৰা অজস্ৰ উদ্দীপনাময়ী কবিতায় সাহিত্যক্ষেত্ৰ সমৃদ্ধ কৰেহেঁ। আৰ এখন তমসাৰ অন্ধকাৰে চাৰিদিগ যতই ঢেকে আসছে, নিন্তেজ গল্প কবিতাৰ কটকটগ্ৰে ততই বাংলাৰ কাব্যজগৎলৈ পৰিণত হতে চলল। ভাৰত-চন্দ্ৰেৰ আমলে কৃষ্ণনাগৰিক বঙ্গীয় কাব্যে যেমন আলংকাৰিক কৌশল দেখানোই সৰ্বসংগী ছিল, এখনও তেমনি কলিকাতা মহানগৰীৰ কবিতুল কয়েকটি বুলি ও মুছাদোষেৰ বিৰুদ্ধিতকৰ পুনঃ প্ৰদৰ্শন সম্বল ক'ৰে বিভিন্ন পত্ৰ-পত্ৰিকাৰ আসৰ দখল ক'ৰে অসাৰ কাব্য সৃষ্টি কৰেহেঁ। এই শ্ৰেণীৰ কবিতাঙালিৰ লক্ষ্য রসালিপা নয় দেশসেবা বা জনসেবা নয়, মহৎ আদৰ্শেৰ বিবৰণ নয়, কেবল একটি কসৰৎ ধোঁথয়ে আঁত নিন্দনীয় পলায়নী ও প্ৰবীৰিত মনোবৃত্তিৰ নমুনা ৰেখে-বাওয়া। এই সব কবিতাৰ আবেদন শিক্ষিত জনসাধাৰণেৰ কাহেঁ নয়, আঁজিকে রসজ্ঞ সুক্ৰমাৰমতিদেৰ কাহেঁও নয়, একটা বিশেষ রসপ্ৰহৰে অভ্যস্ত একটি গোষ্ঠীৰ কাহেঁ। এৰ চেয়ে কবিগোলাদেৰ গানও যে অনেক ভালো ছিল। সে-সব তো তবু বোকা যেত! অৰ্থশূন্য প্ৰলাপেৰ কোন

প্ৰয়োজন আছে আনন্দলিপ্সু বা দিশাসন্ধানীৰ কাহেঁ? যে-রচনা মনে আনন্দেৰ উদ্দীপনা আনে না, কৰ্তব্য বোধেৰ প্ৰেৰণায় সজীৱিত কৰে না, তাৰ কোন দয়কাৰ নেই। এই সব কবিতা প্ৰায়ই কবি নিজে এবং তাঁৰ দলেৰ দুচাৰ জন লোক ছাড়া অন্য কোন পাঠক একেবাৰে বুৰতে পাৰেন না, এটা বহুপৰীক্ষিত সত্য। রবীন্দ্ৰনাথ স্বয়ং গল্প কবিতা লিখেও এ অবস্থাৰ অজ্ঞাৰা সাধন কৰতে পাৰেন নি। তাঁৰ মৃত্যুৰ পৰা ত্ৰিশ বছৰ পাৰ হয়ে গেলেও গল্প কবিতাৰ এ-ব্যাপাৰে কিছু মাত্ৰ উৎকৰ্ষ লাভ হয় নি। সুতৰাং কাঁদেৰ জন্ত এবং কেন ওঙালি লেখা হয় সে প্ৰশ্ন কৰা প্ৰয়োজন। সাহিত্যজগৎ থেকে এই লিখনশৈলীটি একেবাৰে লুপ্ত হয়ে গেলে শোকাপ্ৰপাতের কোন কাৰণ থাকবে না। কাৰণ অন্নদাশঙ্কৰ ৰায় মহাশয়েৰ একখাটি অপ্ৰতিবাস্ত যে, গল্পে কবিত্ব হলেও কবিতা হয় না। কবিতাৰ জন্তে ছন্দেৰ সহযোগিতা অপৰিহাৰ্য। শিক্ষিত কল্যাণসক বাঙালি সমাজ আজ ধ্বংসোন্মুখ না হলে এইসব অপকৃষ্ট আবৰ্জনা কবিতা বলে গণ্য হত না।

আজ বাঙালি বিপ্লবেৰ মধ্য দিয়ে চলেছে। এমন সঙ্কট জাতিৰ জীৱনে কদাচিৎ আসে। এক লক্ষ বৰ্গ মাইল পৰিমাণত ভূখণ্ডে প্ৰায় বারো কোটি বাঙালি এক জাতীয়তাৰ বন্ধনে বাঁধবদ্ধ হয়ে পূৰ্ণ স্বাধীনতা লাভেৰ আগে এ-সঙ্কটেৰ অবসান হতে পাৰে না। কিন্তু কবি তাঁৰ কৰ্তব্য এই সময় কিভাবে পালন কৰেহেঁ? কিছুই কৰেহেঁ না তিন এবং কৰাৰ মতো প্ৰাণশক্তিও তাঁৰ নেই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যেৰ দুৰ্দ্ধল অসহায় কামাত্মরতা আৰ অহুপযোগী বিদেশাগত ৰাজনৈতিক মতবাদেৰ চৰ্চিত-চৰ্চন দেখতে দেখতে চোখেৰ সামনে একটা ছবি ভেসে ওঠে।

অষ্টাদশ শতাব্দীৰ কাল। ফৰাণি বিপ্লবেৰ সময়। চাৰিদিগে মাংসভয়। অন্তৰ্গত্ৰবে দুৰ্দ্ধল খণ্ডবিখণ্ড কাল। লোভী ইউৰোপীয় ৰাজত্ববৰ্গ সুযোগ বুৰে নবীন গণতন্ত্ৰেৰ এলাকা খণ্ডে খণ্ডে ভাগ ক'ৰে নেবাৰ জন্ত এগিয়ে আসছে। বিভিন্ন বংসৰ বয়স্ক যুবক ফৰাসি



কর্মচারি ক্লাজে দ'লিস্ জাসবুর্গ শহরে ব'সে জার্মান মেয়রের প্রদত্ত ভোজসভার লক্ষ্য করলেন, ক্লাজের দিকে এগিয়ে চলেছে অবশিষ্ট ইউরোপের লোক বাহ। রাজ্যে বাড়ি ফিরে তিনি লিখলেন এক অমর কবিতা। সুসহযোগে গীতিকারূপে। তারপর দীর্ঘকায় বলিষ্টদেহ এই যুবককে চারণ কবিগায়কের মতো দেশের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে প্রতি কূটরে প্রতি প্রাসাদে গিয়ে গাইতে শোনা গেল :

“স্বদেশজননীর সন্তানগণ! এসো যাত্রা শুরু করি, গৌরবের দিন সমাগত। আমাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার তার রক্তপাতকা উত্তোলন করেছে। আমাদের মাতৃভূমিতে হিংস সৈনিকদের গর্জন শুনে পাও কি? তারা বরাবর তোমাদের কাছে আসছে তোমাদের পত্নী ও সন্তানদের হত্যা করতে। অগ্র নাও, নাগরিকগণ। সেনাবাহিনী গঠন কর। অভিযান চালাও, যাতে অপবিত্র শত্রুশোণিতে আমাদের চাষের জমিতে সেচের কাজ করা হয়।”

এই হল বিখ্যাত লা মার্সেইএজ (La Marseillaise) গীতিকার মর্মার্থ। এই উদ্দীপনার চিহ্নমাত্র বাংলা সাহিত্যে নেই। বাঙালি সাহিত্যিক দেশের দুর্দিনে প্রেরণাসূচকের কৌশল হলে গেছেন বহুদিন। অধ্যাত্ম চেতনাবিজ্ঞিত, দেশপ্রেমবিবাহিত, রসোপলব্ধি বিধিত শিল্পসৃষ্টিসামর্থ্যবিহীন এই লেখকগোষ্ঠীকে বাতিল

ক'রে নবীন সাহিত্য রচনার কাজে অগ্রণী হতে আগামী ভাবী ভরুণদলকে আহ্বান জানাই।

Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrive !

স্বদেশভূমির সন্তান সবে আর রে আর রে আর।

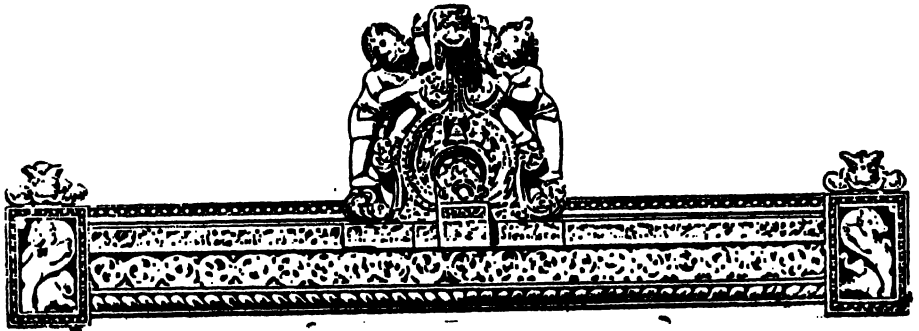
কীর্তলাভের শুভ অবসর যায় রে বাঁহা যায়।

( অমুবাদ—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত । )

শেষ কথা হল এই যে, ত্রিশ বছরের “প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা” কি বলছেন, কি লিখছেন, তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এঁদের আর কিছু দেবার নেই। কতগুলি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার আর সাম্প্রদায়িক ডক্টরেট এঁদের ভাগ্যে জুটল, তার বিচার নিরর্থক। ব্যক্তি মানবকে ভরবান ও মুক্তির দিকে, দেশবাসীকে স্বাধীনতা ও সশস্ত্রির দিকে এগিয়ে দেবার জন্তে এঁরা কিছুই লেখেন নি, লিখবার ক্ষমতাও এঁদের নেই। এঁদের শিক্ষাদীক্ষা নিম্নস্তরের, বাহিজগতিক জ্ঞান ও অন্তর্জগতিক সূক্ষ্মভাব, কিছুই এঁদের নেই। অতএব, এঁদের বাতিল ক'রে স্মরণ করা যাক শ্রীঅরবিন্দের সেই দীপ্ত উক্তি :

We do not belong to the past dawns but to the noons of the future.

আমরা অতীতের উষার আবদ্ধ নই, বরং ভবিষ্যতের মধ্যাহ্নবর্তী।



# জোনাকি থেকে জ্যোতিষ্ক

## [ নিগ্রো মনোমী ডাঃ জর্জ ওয়াশিংটন কার্ডারের জীবনালেখ্য ]

অমল সেন

( পূর্ণপ্রকাশিতের পর )

২৬

১৯২০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ডার আমেরিকার ইউনাইটেড পিনাট্‌স্‌ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার জন্য আলাবামার মন্টগোমারিতে গেলেন। সেখানেই সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এক্সচেঞ্জ হোটেলে অধিবেশন বসেছে, প্রতিনিধিদের সব আসনগুলিই ভর্তি, প্রতিনিধিরা সবাই উপস্থিত। এই ঐতিহাসিক এক্সচেঞ্জ হোটেল থেকেই কনফেডারেট কংগ্রেস আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে সামটার দুর্গ আক্রমণের আদেশ ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই-ই হল আমেরিকার গৃহযুদ্ধের প্রথম সূচনা। এবং আজ, সেই ঘটনার ৫৯ বছর পরে সেই গৃহযুদ্ধের ফলে দাসত্বশ্রম থেকে মুক্ত একজন নিগ্রো প্রাক্তন প্রভুদের সভায় বক্তৃতা করতে এসেছেন।

সেদিন ছিল অসহ্য গরম, প্রতিনিধিরা সবাই জামার আঁতিন গুটিয়ে নিয়ে বসেছিলেন। কতগুলি ক্ষুদ্র বোতলের মধ্যে কলাইয়ের নির্ধাস থেকে প্রস্তুত নানা রকম জিনিষের নমুনা ভরে নিয়ে তা একটা স্টকেসে বোঝাই করে জর্জ কার্ডার সেই বেজায় ভারী স্টকেসটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এক্সচেঞ্জ হোটেলের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর ললাট খামে ভেজা, দর দর ধারে ঘাম ঝরে পড়ছিল সর্গজ দিয়ে কিন্তু ক্রমাল বের করে যে ঘাম মুছে ফেলবেন তিনি, তারও উপায় নেই। তাঁর হাতই জোড়া।

হোটেলের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়ে জর্জ কার্ডার প্রথমেই বাধা পেলেন হোটেলের দারোয়ানের কাছে, সে তাঁকে কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে দিল না। মাঝ পথে কার্ডারকে খামিয়ে দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, “কী চাই তোমার এখানে?”

কার্ডার বললেন, “আমি পি-নাট্‌স্‌ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনের সভাপতির সঙ্গে দেখা করবার জন্য এসেছি।”

“এখানে নিগ্রোদের প্রবেশাধিকার নেই।” বলেই কার্ডারকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল দারোয়ান।

জর্জ কার্ডার এবার একটু জোর দিয়েই বললেন, “কিন্তু আমি এখানে নিজের গরজে আঁসিনি, আমাকে নিমন্ত্রণ করে ডেকে পাঠানো হয়েছে।”

দারোয়ান বেজায় একপুঁয়ে, কিছুতেই সে জর্জ কার্ডারকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেবে না। তিনি কী আর করবেন, ফিরে যাবেন কি না ভাবলেন একবার, তারপর ডায়েরীর একটা পাতা হিঁড়ে নিয়ে তাতে কি যেন লিখলেন, দারোয়ানের হাতে সেটা দিয়ে বললেন, “দয়া করে এটা কাগজটা সভাপতির কাছে একটু পৌঁছে দেবে কি?”

দারোয়ান তাতেও রাজি হল না।

ঠিক তখনই দরজার কাছে কথা কাটাকাটির শব্দ পেয়ে একজন লোক বাইরে বেরিয়ে এল। কার্ডারের হাত থেকে সেই লেখা চিরকুটখানা নিয়ে সে ভিতরে গেল। কয়েক মিনিট পরে একজন বার্তাবাহক উপর থেকে নেমে এসে জর্জ কার্ডারকে সসন্মানে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল, বলল, “আমার সঙ্গে আসুন দয়া করে।”

পিছনের ঘোঁড়াকে লিক্টে করে মাল ওঠানো নামানো হয় লোকটি সেই দিকের পথ দিয়ে অধ্যাপক কার্ভারকে নিয়ে এগিয়ে চলল। অবশেষে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার সম্মেলনের অধিবেশন কক্ষে পৌঁছালেন। গভীর পরিশ্রমে তাঁর দেহ যথেষ্ট ক্লান্ত, কিন্তু প্রবীণ বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস নিয়ে সময় নষ্ট করলেন না। সেই মুহূর্তেই বক্তৃতা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তিনি তাঁর স্লটকেসটা খুলে সামনে রেখে দিলেন। তারপর ধীর অথচ গভীর কণ্ঠে জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার ভাষণ দিতে শুরু করলেন।

প্রথমে তিনি বললেন, “আপনাদের বিরাট কর্মসূত্রে আমার কৃতজ্ঞ দান নিয়ে আমাকে এসে যোগদান করার জন্য যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেজন্য আমি আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আপনাদের সাকল্য কামনা করি।”

তারপর, অল্প সময়ের মধ্যেই জর্জ কার্ভার সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের এমনভাবে মন কেড়ে নিলেন যে, শেষ পর্যন্ত কার্ভার আর মনেই রইল না জর্জ কার্ভার নামে একজন নিগ্রো অধ্যাপক বেতারদেবের সম্মেলনে আজ প্রধান বক্তা। আগে যদিও অনেকের মনেই বিধায় ও সংশয়ে দোহুল্যমান ছিল যে, একজন নিগ্রো অধ্যাপককে এভাবে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করে করে আনা উচিত হয়েছে কি না, কিন্তু কার্ভারের বক্তৃতা শুনতে শুনতে তারা সবাই ভুলে গেল।

যখন অধ্যাপক কার্ভার তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন তখন শ্রোতারা একথা মনে ভাবতেই ভুলে গেল যে, বক্তা ভিন্ন জাতের লোক, সে কালো আদমি, সে নিগ্রো। তারা উল্লাসে ও আনন্দে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল জর্জ কার্ভারকে। এটা অপ্রত্যাশিত হলেও একেবারে অস্বাভাবিক নয়।

জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের আজকের এই জয় আগামী দিনের বিরাট জয়ের একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা মাত্র।

পরের মাসে...পত্রিকার জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভারের বক্তৃতার খবর বেশ বড় বড় অক্ষরে ছাপা হল এবং তার

উপরে মন্তব্য ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। সারা আমেরিকায় রীতিমত একটা আলোড়ন সৃষ্টি হল।

শুধু মুখে বক্তৃতা দিয়েই নয়, কার্ভার শ্রোতাদের সামনে তাঁর আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাথির করে দেখালেন। স্লটকেসের ভিতর থেকে কলাইয়ের উপাদানে প্রস্তুত বিবিধ সামগ্রীর নমুনা তুলে তিনি দেখাতে লাগলেন দর্শকদের। দর্শকরা এক-একটি জিনিস দেখে বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, মুখে তাদের আর কথা বেরোয় না।

চার মাস পরে অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে একটি তারবার্তা পেলেন ...“২০শে জানুয়ারী প্রভাতে ওয়াশিংটনে আমরা আপনার সাক্ষাৎ কামনা করি। কলাইয়ের বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত সেদিন আপনাকে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে তুলে ধরতে হবে।”

শুধু সম্পর্কে আলোচনার জন্য কংগ্রেসনাল কমিটির অধিবেশন আহ্বান করা হয়েছে এবং আমেরিকার কলাই উৎপাদক কৃষিজীবীদের দ্বারা তার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। এক কথায় বলা চলে, আমেরিকার কলাইয়ের বাণিজ্য শিল্পকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এটা হচ্ছে এক রকম বাণিজ্যিক গুরু। মনে করুন, একজোড়া জুতো আমেরিকার তুলনায় ইউরোপে কম খরচে তৈরি করা সম্ভব হয়, তার প্রধান কারণ ইউরোপের লোকেরা অল্প মূল্যের জিনিস ব্যবহার করতে অভ্যস্ত এবং শ্রমিকদের মজুরির হারও আমেরিকার তুলনায় যথেষ্ট কম। আমেরিকার শ্রমিকদের কম মজুরি দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে কি হল? ইউরোপে তৈরি সম্ভা দামের জুতোর আমেরিকার বাজার ছেয়ে গেল এবং আমেরিকার পাছকা শিল্প বিষয় মার খেল, জুতো তৈরির কারখানাগুলি কাজের অভাবে অচল অবস্থায় পৌঁছল, মুচিরা কর্মহীন বেকার হয়ে পড়ল। এই বিপর্ষয় বোধ করার উদ্দেশ্যে গুরু প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হল যাতে আমেরিকার

ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে পিছু হটতে না হয়, ইউরোপ থেকে আমদানী করা জিনিষপত্র মার্কিন দেশে তৈরি জিনিষপত্রের চেয়ে বেশী দামের না হয়।

অবিকল একই রকমের আর একটা সমস্যা আমেরিকার কলাই-উৎপাদক কৃষিজীবীদের সামনে এসে হাজির হল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদার অধেক পরিমাণ কলাই প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানী করা হত—এই রীতিই বহুদিন ধরে চলে আসছিল। কলাই আমদানী করার যে ব্যয় হত তার পরিমাণও বেশী ছিল না। কারণ প্রাচ্য ভূখণ্ডের চীন প্রভৃতি কতগুলি দেশে শ্রমিকদের উদ্যোগ যে রকম পরিণাম করতে হত, সেই হাড়ভাঙ্গা ঋতুনির তুলনায় মজুরি পেত যৎসামান্য। তাছাড়া শুনের হারও ছিল নামমাত্র—প্রতি পাউণ্ডের জন্য আশে সেন্ট। কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কলাই উৎপন্ন করার চাইতে প্রাচ্য দেশ-গুলি থেকে তা আমদানী করতে ব্যয় অনেক কম হত এবং শুধু এই কারণেই মার্কিন কলাই শিল্প ধ্বংস হবার উপক্রম হয়েছিল। কলাই উৎপাদনকারী কৃষিজীবীরা দাবী করে বসল, আমাদের শিল্পকে বাঁচাবার জন্য দূরপ্রাচ্যের দেশগুলি থেকে আমদানী করা প্রতি পাউণ্ড কলাইর উপরে অন্ততঃপক্ষে চার সেন্ট ট্যাক্সিক কর বসাতে হবে। তারা আরও বলল, কলাইয়ের ওপরে এরকম একটা শুদ্ধ দাবী করলে প্রাচ্যদেশীয় উৎপাদকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আমরা জোরের সঙ্গে চালিয়ে যেতে পারব কিছুতেই আমরা আর মার খাব না।

কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের কলাই উৎপাদনকারী কৃষিজীবীদের মনে সন্দেহই এরকম একটা সংশয় ছিল যে, মার্কিন সরকার তাদের দাবীতে সাড়া দেবেন না। মার্কিন কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই কলাই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবর রাখত না, দেশের আর দশজন সাধারণ লোকের মতোই কলাইয়ের শিল্প হিসাবে ভবিষ্যৎ কতটা উজ্জ্বল সে সম্বন্ধেও তাদের কোন ধারণা ছিল না। সমগ্র আমেরিকার তখন একটি মাত্র মানুষ ছিলেন যিনি

এরদ্বারা আলোকপাত করতে পারতেন—তিনি হলেন জর্জ ওয়াশিংটন কার্ডার।

শুধু এই কারণেই ওয়াশিংটন থেকে জর্জ কার্ডারের ডাক পড়ল। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি একটি ভারবাহী পেলেন।

ওয়াশিংটনে জর্জ কার্ডার যখন গিয়ে পৌঁছোলেন তখন কিন্তু শুনের ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা কৌতুহল ছিল না। তিনি মনেই করতেন ও কাজটা আসলে হচ্ছে অর্থনীতিবদ্ পাণ্ডতদের কাজ, রসায়ন বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের ও বিষয়ে কিছু করার নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের দরিদ্র কৃষিজীবীদের মর্মস্বত্ব দারিদ্র্য ও হুঃখ-দুঃখ তাঁকে এমন বিচলিত করে তুলেছিল যে, এই ডাক পেয়ে প্রথমে তাদের কথাই তাঁর মনে পড়েছিল। তাদের অপরিণীত হুঃখ দুঃখের কথা তিনি যুহুর্ন্তের জন্তও ভুলে থাকতে পারেন না। তাদের কপ্যাণচিন্তাই তাঁর দিনরাত্রির ধ্যানজ্ঞান। তিনিই তাদের অনেককে কলাইচাষে উৎসাহিত করে তুলেছিলেন এবং বিবেকের কাছে এখন তাঁর এ জন্য জবাবদিহি করার সময় এসেছে। এখন এটা তাঁর কর্তব্য তাদের এই শিল্প-বিপর্যয়ে তাদের রক্ষা করা।

ওয়াশিংটনে পৌঁছোবার পরের শনিবার জর্জ কার্ডার কংগ্রেসনাল কমিটির অধিবেশনে যোগ দিলেন। সময় তখন বিকেল চারটে। তিনদিন ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা চালিয়েও কমিটির সদস্যরা শুনের ব্যাপারে কোন মীমাংসায় পৌঁছাতে সক্ষম হলেন না। অবশেষে ক্লাস্ত ও অনেড়টা যেন বিরক্ত হয়ে তাঁরা অধিবেশন মূলতঃই রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এখন একজন মাত্র লোকের উপর তাঁদের শেষ ভরসা, তিনি যদি কোন মীমাংসা করে দিতে পারেন তবেই এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার সম্ভাবনা আছে, নচেৎ যে কী হবে তা কেউ জানে না। তাদের শেষ ভরসাহল হলেন জর্জ ওয়াশিংটন কার্ডার।

কমিটির অধিবেশনে যিনি সভাপতিত্ব করছিলেন তিনি সভাকক্ষের চারদিকে দৃষ্টিপাত করে বলে উঠলেন, অধ্যাপক জর্জ ওয়াশিংটন কার্ডার আছেন নাকি এখানে? এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই ক্লাস্ত, অবসর, শ্রান্তদেহ একজন নিগ্রোর উপর তাঁদের সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল, হাতে তাঁর ভারী ব্যাগ ঝোলানো, সেটা নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে সভাকক্ষের দিকে এগিয়েছেন। সভায় তৎক্ষণাৎ একটা কলরব উঠল একজন লোক জর্জ কার্ডারের ব্যাগটার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, “আপনার ও ব্যাগটার মধ্যে কী আছে? তরমুজ খুঁজ? আপনার নৈশভোজের খাবার?”

অধ্যাপক কার্ডার লোকটার কথার কোন জবাব দিলেন না, তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। কারণ এরকম অভদ্র ব্যবহার তিনি খেতাজদের কাছ থেকে বহুবার বহু জায়গায় পেয়েছেন। এদের তিনি ভালোভাবেই চেনেন।

অপর এক ব্যক্তি আবার ঠাট্টার স্বরে জিজ্ঞাসা করল, “আপনি ট্যারিক সম্বন্ধে নিশ্চয় একজন বিশেষজ্ঞ, কি বলেন? আচ্ছা, আপনার কি নাম আংকেল?”

এবার কার্ডার সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে বললেন, “আমি বিশেষজ্ঞ নই, সত্যি কথা বলতে কি ট্যারিক সম্পর্কে আমি আদৌ কিছু জানি না। আশা করি আপনি জানেন।”

খেতাজরা কিছুক্ষণ ধরে এমনিভাবে জর্জ কার্ডারকে বিজ্ঞপের হল কোটাতে থাকল। তারপর সেটা যখন একটু কমল তখন অধ্যাপক কার্ডার বললেন, “আমি এখানে ট্যারিক সম্বন্ধে বলতে আসিনি, আমার বক্তব্য বিবরণ হচ্ছে কলাই।”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা বুঝতে পেরেছি,” কমিটির সভাপতি মিঃ জোসেফ ডরু কোউনি বললেন। তিনি ভদ্র হলেও যেন কিছুটা অধৈর্য। “অধ্যাপক কার্ডার, আপনার বক্তব্য বিবরণ সভায় উপস্থাপিত করার জন্য আমরা কিন্তু আপনাকে দশ মিনিটের বেশী সময় দিতে পারছি না।”

“ধন্যবাদ,” অধ্যাপক কার্ডার বললেন, “আপনাদের আন্তরিকতা উপলব্ধি করছি।”

জর্জ কার্ডার তাঁর ভাষণ শুরু করার আগে সভায় উপস্থিত শ্রোতাদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, দেখলেন, সবাই খেতাজ, একজনও কৃষ্ণাঙ্গ কিংবা অন্ত জাতের লোক নেই। তাঁর বুক যে একটুও কাঁপল না, একথা ঠিক নয়, তবু তিনি বাইরে যথেষ্ট সাহস দেখালেন। ভিতরে ভিতরে যদিও ভয়ে ভাবনায় তাঁর বুক কাঁপছিল, গলা শুকিয়ে আসছিল, কারণ তাঁর ব্যাগ খুলে জিনিষপত্রগুলি বের করতেই হয়তো দশ মিনিট সময় লাগবে, কোন কথা বলারই সুযোগ হয়তো তিনি পাবেন না। এইসব ভাবতে ভাবতে তিনি তাঁর ব্যাগ খুলে ফেললেন। যে স্বল্প মুহূর্ত তাঁকে দেওয়া হয়েছে তারই মধ্যে তিনি দ্রুত কথার পাঠ্য বলবেন স্থির করলেন।

জর্জ কার্ডার সরল গভীর কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন, যেমন ভাবে একজন শিক্ষক বলেন তাঁর ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে—“আমি অ্যালাবামা, টাক্সেগি থেকে আপনাদের কাছে কলাই সম্বন্ধে দ্রুত কথার বলবার জন্য এখানে এসেছি। টাক্সেগি শিক্ষান্তবনে আমি কৃষি নিয়ে গবেষণা করি। সেখানে আমি কলাইয়ের বিভিন্ন রকম ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে ফল লাভ করেছি তাই আমি প্রমাণ সহযোগে আপনাদের দেখাতে চাই। আপনাদের চমৎকৃত করা মোটেই আমার উদ্দেশ্য নয় কিন্তু বা মাহুয়ের অনেক উপকারে লাগতে পারে তার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলে তা অবহেলিত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। গবেষণা করে আমি যতটুকু বা কেনেছি কলাই সম্বন্ধে তা আপনাদের দেখাবো।” এই বলে কার্ডার ব্যাগের ওপরকার ডালা ছুলে ধরতেই কয়েকজন সদস্য কোঁতুহলী দৃষ্টি নিয়ে ঝুঁকি দেখতে গেল নিগ্রো বৈজ্ঞানিকের ব্যাগের ভিতরে আরব্য রজনীর কী গুপ্তধন লুকায়িত রয়েছে।

জর্জ কার্ডার ব্যাগের মধ্য থেকে ছোট্ট একটা শিশি হাতে ছুলে নিয়ে বললেন, “এই ছোট্ট শিশিটার মধ্যে

যে সাধা তবল পদাৰ্থ আপনাতা দেখতে পাচ্ছেন সেই তবল পদাৰ্থ হল হুধ।”

“কলাই থেকে তৈরি হুধ না কি?” মিঃ ফোউনি জিজ্ঞাসা করলেন।

“আজ্ঞে হ্যাঁ, এ হচ্ছে কলাই থেকে নিষ্কাশিত নিৰ্বাসের হুধ। এবং এ হচ্ছে আইসক্রিম। এও কলাই থেকে তৈরি,” বলে জৰ্জ কাৰ্ডাৰ অল্প একটা শিশি শ্রোতাদের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলেন।

“ও আইসক্রিম সোডাৰ ব্যবহার করা যাবে?” জিজ্ঞাসা করলেন একজন সদস্য।

“এ রকম সুস্বাদু আইসক্রিম আপনি গুব কমই খেয়েছেন, একথা আমি সাহস করে বলতে পারি। আপনি একটা আইসক্রিম খেয়ে পরীক্ষা করে দেখতে চান? দেব তৈরি করে?”

সেই লোকটি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, “না, না, তার কিছু দরকার নেই। আর, তা ছাড়া আপনার সময়ও তো খুব কম।”

“আর এই দেখুন, আর একটা জিনিস ভদ্রমহোদয়গণ।” ব্যাগের মধ্য থেকে একটা নল বের করে তা হাতে নিয়ে জৰ্জ কাৰ্ডাৰ বললেন, “এটা হল এক রকমের প্রাভাশ্যের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য, এটা আমি তৈরি করেছি কলাই ও মিষ্টি আলুর সংমিশ্রণে।”

“আপনি কি মিষ্টি আলু নিয়েও গবেষণা করেন নাকি অধ্যাপক কাৰ্ডাৰ?” জিজ্ঞাসা করলেন কমিটির অন্ততম বিশিষ্ট সদস্য মিঃ জন, এল, গান্ধী। ইনি পরে আমেরিকা মুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট নিৰ্বাচিত হয়েছিলেন।

জৰ্জ কাৰ্ডাৰ সৰিনয়ে উত্তর দিলেন, “এ যাবৎ আমি একমাত্র মিষ্টি আলু থেকেই ১০৭টি বিভিন্ন পদাৰ্থ আবিষ্কার করেছি।”

“আপনার মুখে যা শুনেছি এ কি সত্য?” মিঃ গান্ধীর স্বীকৃতিমত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

“সত্যি বৈকি মিঃ গান্ধী। ১০৭টা জিনিসের সবগুলিই নতুন। এখন অবশ্য আমি আপনাদের দেখাতে

পারব না, কিন্তু আমি মিথ্যে বলিনি। তারপর অধ্যাপক কাৰ্ডাৰ তাঁর ব্যাগ খুলে একটার পর একটা আবিষ্কৃত জিনিসের নমুনা শুধু কেবল বেরই করতে লাগলেন, আর অল্প দিকে শ্রোতারাও এমনভাবে এগ্ন করতে লাগল যেন একটার পর একটা এগ্ন তাঁরের ফলার মতো এসে জৰ্জ কাৰ্ডাৰকে বিধতে লাগল। অশুন্যিত, অসংখ্য এগ্ন।

মিঃ ফোউনি এই সময়ে বলে উঠলেন “আপনার দশ মিনিট সময়ের তিন মিনিট কিন্তু চলে গেল মিঃ কাৰ্ডাৰ।”

জৰ্জ কাৰ্ডাৰ কমিটির সদস্যদের দিকে ফিরে একটুখানি ব্রহ্ম হেসে বললেন, “ভদ্রমহোদয়গণ। এই তিন মিনিট সময়ের বেশীৰ ভাগই তো আপনারা নিয়ে নিলেন। মনে করা যাক সেই তিন মিনিট সময় আপনারা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তা কি হতে পারে না বলুন?”

“নিশ্চয়, আপনাদেরই জিত হল,” মিঃ ফোউনি বললেন সহাস্যে, “এবার চালিয়ে যান।”

“ভদ্রমহোদয়গণ, যে কথাটা এতক্ষণ আমি আপনাদের বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছিলাম সেই কথাটা হচ্ছে এই যে, কলাই আর মিষ্টি আলুর সংমিশ্রণে একটা চমৎকার প্রাভাশ্যের খাবার বানানো যায়। পৃথিবীতে এর জুড়ি আর একটি খাবারও নেই। মিষ্টি আলু আর কলাই মিশিয়ে যে খাদ্য তৈরি হবে তাতে আমাদের দেহের পুষ্টির জন্য যত রকম পুষ্টিকর পদাৰ্থের প্রয়োজন তার সব উপাদানই পাওয়া যাবে।”

এই সময়ে মিঃ গান্ধীর কথা বলে উঠলেন। তিনি বললেন, “ভদ্রমহোদয়গণ আমি দেখতে পাচ্ছি এই আলোচনাটা বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে, সবারই মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তাই আমি প্রস্তাব করছি মিঃ কাৰ্ডাৰের বক্তৃতার সময় আরো কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হোক।”

অন্তান্ত সদস্যরাও মিঃ গান্ধীর প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তখন অধ্যাপক কাৰ্ডাৰ আবার বলতে শুরু

করলেন। তিনি ওয়ারসেটসারার আচারের একটা শিশি, একটা চাটনির বৈয়ম, কয়েকটা প্রসাধন সামগ্রীর নল এবং কুইনিন মেশানো একটা ওষুধের ফাইল সবার সামনে উঁচু করে ভুলে ধরে বললেন, “কড়াই গুটি থেকে গৃহীত উপাদানে প্রস্তুত বহু সামগ্রীর মধ্যে মাত্র কয়েকটি দ্রব্যের নমুনা এখানে আপনাদের দেখাচ্ছি। কিন্তু বক্তৃতা করার জন্য যে সময় আমাকে আপনারা দিয়েছিলেন সে সময় বোধহয় ছুরিয়ে এসেছে।”

“না, না, আপনি চালিয়ে যান”, সদস্তরা সবাই ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন।

জর্জ কার্ভারের বক্তৃতায় বাধা পাবার আর কোন ভয় রইল না। তিনি পুনরায় বলতে আরম্ভ করলেন, “ভদ্রমহোদয়গণ, অল্প প্রসঙ্গ অবতারণার আগে একটা কথা আমি আপনাদের বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কথাটা হ’ল এই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কড়াইগুটি উৎপাদনকারীদের আজ বড় দুর্দিন, তাই তাদের বাঁচানো আজ সবচেয়ে বেশী দরকার।”

“আপনি তা হ’লে ট্যারিফ গুলু সম্বন্ধে কিছু বলবেন ব’লে মনে হচ্ছে”, কমিটির সভাপতি মন্তব্য করলেন “অথচ আপনিই গোড়ায় বলেছিলেন ট্যারিফ সম্বন্ধে আপনার কোন জ্ঞান নেই।”

“ও হ্যাঁ, ট্যারিফ গুলুর কথা বলছেন তো?” জর্জ কার্ভার ফিরে আবার বললেন কথাটা। তাঁর চোখের দুই তারা তখন যেন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। “ভদ্রমহোদয়গণ, ট্যারিফ গুলু সম্বন্ধে আমি যতটুকু যা জানি তা হ’ল, অব্যাহত লোকদের এই ব্যবসা থেকে হটিয়ে দেওয়া।” তাঁর এই মজার কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। মিঃ কোউনি তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অধ্যাপকের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন “চালিয়ে যান ভাই।” তারপর আরো জোরগলার চেষ্টায়ে ব’লে উঠলেন, “আপনার সময় অধূন্য।”

অধ্যাপক জর্জ কার্ভার একটুখানি মুহূর্তে হেসে আবার বক্তৃতা শুরু করলেন। বক্তৃতা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমনভাবে তাঁর স্রষ্টাকেশের ভিতর থেকে কৃত্রিম বিদ্যুৎ,

মাংসের টুকরো, স্যালাড, ভিনেগার, চবি, ছাপার কালি, সাবান, শ্যাম্পু এবং এমনি ধরণের তিনশোটি উৎপন্ন দ্রব্য বের করলেন, দেখে মনে হ’ল একজন যাত্ৰিকরের খেলের মধ্য থেকে বিচিত্র এই জিনিষগুলি যেন অবিকল ম্যাজিকের মতো বেরিয়ে এল, সবগুলি জিনিষই কিন্তু এক কড়াইগুটি থেকে উৎপন্ন। জর্জ কার্ভার হু’বটারও বেশী সময় ধরে অনর্গল বক্তৃতা করলেন। তাঁর বলা যখন শেষ হ’ল তখন সারা সভাগ্রহ মুহূর্তে করতালি ধ্বনিতে কম্পিত হ’তে লাগল, সকলে তাঁর উজ্জ্বলিত প্রশংসা করলেন, বিপুল অভিনন্দন জানালেন।

জর্জ কার্ভার এবার ফিরে যাবেন ব’লে তৈরি হলেন, মিঃ ফোউনি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন, বললেন, “অধ্যাপক কার্ভার, কমিটির পক্ষ থেকে আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যেসব অত্যাশ্চর্য জিনিষ আপনি আজ আমাদের দেখালেন, ইতিপূর্বে সে-রকম জিনিষ দেখবার সৌভাগ্য আর কখনো আমাদের হয়নি।”

ডাঃ জর্জ কার্ভারের এই প্রদর্শনীর অমূল্যমানের কলে সেই কমিটি কড়াইগুটিকেও ১৯২১ সালের রক্ষামূলক ট্যারিফ বিলের অন্তর্ভুক্ত ক’রে মিল। কড়াই গুটি শিল্পের একজন বড় মালিক এবং নতুনানীয় ব্যক্তি মিঃ টম হাটেন অধ্যাপক কার্ভারকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কোন শ্রেষ্ঠ উপহার পেলে আপনি সবচেয়ে খুশি হবেন বলুন তো?”

জর্জ কার্ভার মুহূর্তে উত্তর দিলেন, “শুধু একখানা হীরা।”

এর কিছুদিন পরে মিঃ হাটেন একটি হীরাখচিত প্রাটিনামের আঙুটি কিনে জর্জ কার্ভারকে পাঠিয়ে দিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে মিঃ হাটেন অধ্যাপক কার্ভারের দেখা করতে গেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি যে উপহার পাঠিয়েছিলাম তা আপনার পছন্দ হয়েছে তো?”

জর্জ কার্ভার উজ্জ্বলিত আনন্দের সঙ্গে ব’লে উঠলেন, “আপনার দেওয়া উপহার পেয়ে আমি তারি খুশি হয়েছি।”

“কিন্তু আপনাকে তো কই সেটা আঙুলে গরতে দেখছি না।”

“আপনার উপহার আমি বিশেষ যত্নের সঙ্গে একটা ভালো জায়গায় রেখে দিয়েছি, দেখবেন চলুন”, বলে মিঃ হাট্টেনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন জর্জ কার্ভার।

কার্ভার তাঁর আতিথিকে নিয়ে গেলেন নিজের গবেষণাগারে, একটা প্রকাণ্ড বাস্তবের ডালা খুলে তাঁকে দেখালেন অস্ফাট আরো বহু মূল্যবান ভূতাত্ত্বিক নমুনার সঙ্গে সাকানো সেই উজ্জল হীরের আঙটি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কড়াইঙটি উৎপাদনকারীরা এইসব জিনিষ তাঁর কাজের পুরস্কার হিসেবে তাঁকে দিয়েছে।

২৭

ষিরাট সাকল্য এবং বিপুল খ্যাতি সত্ত্বেও জর্জ ওয়াশিংটন কার্ভার খেতাজ সমাজের কাছে যে অপাংক্তেয় সেই অপাংক্তেয়ই রয়ে গিয়েছেন, এগনো তাঁকে ভ্রমণ করতে হয় জিম্-ক্রো গাড়ীতে চড়ে—রেলগাড়ীর এই কামরা কেবলমাত্র কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের জন্যই নির্দিষ্ট করা ছিল বলে দক্ষিণাফলে ঘুরে বেড়াবার সময়ে সন্দাই তাঁকে বাধ্যতামূলকভাবে নিগ্রোদের জন্য তাঁর আইন অফরে অফরে মেনে চলতে হ’ত। অনেকবার এমন হয়েছে যে শহরে তিনি বক্তৃতা করার জন্য নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছেন সেই শহরের সব লোকই ভয়ংকর নিগ্রোবিষেবী, তারা কার্ভারকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে। তিনি সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। জর্জ কার্ভার যখনই দক্ষিণাফলে কার্ভোপলকে গিয়েছেন তখন সন্দাই আহা ও বাসস্থানের সমস্তা নিয়ে তাঁকে ভীষণ বিরত থাকতে হয়েছে। ডুকা পেলে সংসাধারণের জলের কল থেকে জল পান করতে পারতেন না। তাঁকে অঙ্গাল পেতে স্বর্ণণার জল পান করতে হয়েছে যেখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা থাকত “কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের

জন্য”। অথবা অনেক সময় ভাড়া পাখুরে সিঁড়ি বেয়ে তাঁর নদীর ঘাটে নেমে জল খেতে হ’ত।

একবার হ’য়েছে কি, মটগোমারি শহরের কাছাকাছি একটা ক্ষুদ্র শহরের স্থলে তিনি বক্তৃতা করতে গিয়েছেন। ট্রেন থেকে টেনে নামতেই এক রেভারেন্ডি ফটোগ্রাফারের সঙ্গে তাঁর দেখা হ’ল। মহিলাটি দক্ষিণাফলের সাধারণ নাগরিকদের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে কতগুলি প্রামাণ্য তথ্যচিত্র তুলবার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। কার্ভারকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে একজন শিক্ষক এসেছিলেন এবং তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য এঁরা বোড়ার গাড়ীও ঠিক করা ছিল। জর্জ কার্ভার মহিলা ফটোগ্রাফারকে একই বোড়ার গাড়ীতে সঙ্গী হবার জন্য অনুরোধ জানালেন এবং তিনি আনন্দে রাজি হলেন। এতে যে দোষের কিছু আছে এটা কিন্তু কার্ভার কিংবা সেই মহিলা কারুরই একবারও মনে হ’ল না। দু’জনে শিক্ষাসমগ্রার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে করতে পথ আত্মরম্য করলেন। হোটেলের দরজায় পৌঁছে গাড়ী থেকে নেমে যাবার সময় মহিলাটি জর্জ কার্ভারকে ধন্যবাদ জানালেন।

মধ্যরাত্রে একটা বিল্লী বন্ বন্ আওয়াজ আর কতগুলি লোকের কণ্ঠের গালাগাল ও চীৎকার শুনে হঠাৎ জর্জ কার্ভারের ঘুম ভেঙে গেল। খোলা জানালার মধ্য দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যেও তিনি দেখতে পেলেন, মাথায় টুপি পরা অগারোহী এক দল, সবার হাতে বন্দুক। জর্জ কার্ভার প্রথমটায় বুঝতেই পারেননি যে, তিনি নিজেকে তাদের শিকারের লক্ষ্য, লোকগুলি তাঁকেই খুঁজে বের করার জন্য এসেছে। কিন্তু যখন তিনি ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকা একটা লোককে চীৎকার করে বলতে শুনলেন, “সেই বদ্মায়েস নিগারটা কোথায় গেল একজন ভদ্র রেভারেন্ডি মহিলার সঙ্গে এক গাড়ীতে চড়ার যে সাহস করে?” তখন আর তাঁর বুঝতে বাকী রইল না লোকগুলির আক্রমণের লক্ষ্য তিনি নিজে।



একটা অজ্ঞাত অস্বাভাবিক ভাবে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল, সর্বাঙ্গ দিয়ে দব দব ধারে ঘাম বরষতে শুরু করল। কিন্তু আর এক মুহূর্ত দেরি করলে বৃহৎ অনিবার্য। বুকে সাহস সঞ্চার করে জর্জ কার্ভার ডাড়াডাড়া ক'রে পোশাক প'রে নিলেন এবং বাড়ীর পিছন দিককার দরজা খুলে অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। বাইরে তখন প্রচণ্ড শীত। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। শীতে আর ঠাণ্ডায় জর্জ কার্ভারের সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসতে লাগল। এই শহরে

জর্জ কার্ভার নতুন আগন্তুক। পঞ্চাশটি সবই সম্পূর্ণ অজানা, শুধু রেলস্টেশনের পথটা অল্পটো ভাবে তাঁর মনে পড়ে। যারমুখী জনতার ভিড় বহু পিছনে রেখে কার্ভার নীরব অন্ধকারের মধ্যে নিঃশেষে মিলিয়ে গেলেন এবং প্রভীর খাদকাটা একটা নালায় মধ্যে নেমে আত্মগোপন ক'রে রইলেন। লোকগুলি চীৎকার করতে করতে কাছে এসে পড়ল। কিন্তু কার্ভারকে দেখতে পেল না।

ক্রমশঃ

## রামায়ণে আর্য সমাজ

রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী

বিশ্বসাহিত্যে রামায়ণ একটি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। বিদগ্ধ সমালোচক Barriedale Keith-এর মতে, রামায়ণের রচনাকাল মহাভারত রচনার বহুকাল পূর্বে। Keith-এর লিখিত বিবরণ অনুযায়ী বাণ্মীক ভারতের আদি কবি। Keith-এর বিশ্বাস, রামায়ণের কাব্যোৎকর্ষে প্রভাবিত হয়েই উত্তর কালে মহাভারত মহাকাব্যরূপে স্বীকৃত হয়েছিল।

মহাভারত মূলতঃ ইতিহাসাশ্রিত কাব্য। ইতিহাসের ভাষা-চিত্রের মধ্যে বিগত হয়েছে তৎকালীন মানুষের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবন-পরিচয়। অতএব কাব্যে মহাভারতের মুখ্য পরিচয় নয়। জীবন রস ক্ষুধণ ও ঐতিহাসিক শিল্পকলার মধ্যে কাব্যে ফুটে

উঠেছে মাজ। এই জন্ত অনেক রামায়ণকে ভারতের আদি কাব্য এবং মহর্ষি বাণ্মীককে আদি-কবি বলে অধ্যায়িত করে থাকেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকগণের অভিমত, রামায়ণ ত্রেতাযুগের রচনা এবং বেদব্যাস রচিত 'মহাভারত' রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীনতর। কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোনটি পূর্ববর্তী বা পরবর্তী রচনা, এ সম্পর্কে কোনরূপ প্রামাণিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ঐতিহাসিক ও ধর্ম্মীয় উপাদান বিচারে উক্ত গ্রন্থের সম্পর্কে মোটামুটি একটা কালের আভাস পাওয়া গেলেও, তা নিছক অসুমান-নির্ভর।

রামায়ণিক যুগ বলতে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়

কালকে ইঙ্গিত করে না; কারণ কাব্যের সকল কাল নির্দিষ্ট কালে আরম্ভ হয়ে শেষ হয়ে যায়নি। আরম্ভ থেকে সমাপ্তির সকলকাল একটি অসীম কালের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এই অসীম কালই প্রকৃত রামায়ণের কাল। এই সময় কালের মধ্যে আৰ্য্য ব্রহ্মপুত্রগণের বীর মহিমা ও কীর্তি গাথাসমূহ রামায়ণের কথাবস্তু। মহর্ষি বাণ্মীক, একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাদের জীবন-কথাকে রূপকের সংক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে এবং ইতিহাসের বৈচিত্র্যহীন দৃশ্যপরম্পরা থেকে উদ্ধার করে তার মধ্যে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছেন। ফলে, বিভিন্ন চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। চরিত্র চিত্রণের ঠাঁকে ঠাঁকে তৎকালীন সমাজের বহু প্রয়োজনীয় তথ্য অবিসংবাদিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অনেকে 'রামায়ণ'কে ঐতিহাসিক গ্রন্থ রূপে মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। তাঁদের অভিমত, রামায়ণের ঘটনাবলী কল্পনা প্রসূত। রাম-রাবণের যুদ্ধ কোনরূপ ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। অতএব কেবল কাব্য হিসেবেই রামায়ণের স্বীকৃতি। ঐতিহাসিক উপাদান বিচারে এর মূল্য নেই বললেই চলে। অবশ্য এমন একটি অভিমতকে যথার্থ বলে গ্রহণ করা যায় না; কারণ রামায়ণ রচনার পূর্বে রামায়ণ গান সমাজে কাহিনী আকারে প্রচলিত ছিল। ইতস্তত-বিকল্প এই কাহিনী-গুলি তদানীন্তন কালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আনুমানিক সহস্রাব্দী: পূর্বে হতে রামায়ণ কাহিনীর সংকলন কার্য আরম্ভ হয়। বাণ্মীকির মত ঐতিহাসিক কবি এই সময় কালে আবির্ভূত হয়ে বিকল্প কাহিনীগুলিকে বিগুঢ় কাব্য মন্ত্রে পরিগুঢ় করে শিল্পরূপ দান করেন। বলাবাহুল্য, কাহিনী, উপকাহিনী ও কল্পদস্তুর মধ্যেও ইতিহাস রচনার বহু উপাদান নিহিত রয়েছে। এই উপাদান গুলি থেকে বহু ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। রামায়ণ কাব্যে যে সকল কাহিনী ও উপকাহিনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে সেগুলি কল্পনা প্রসূত নয়, বরং অল্পবিস্তর ঐতিহাসিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। রামায়ণে বর্ণিত নগর, নদী ও পর্বতসমূহ সকলই

ঐতিহাসিক। ভারতের বহু ভীষণহানগুলির সঙ্গে রামায়ণ কাব্যস্থিত ছোট খাটো ঘটনা বিবরণের আবিষ্কার সংযোগ রয়েছে। তাছাড়া যুগ প্রচলিত লৌকিক কল্পদস্তুর সঙ্গেও রামায়ণে বর্ণিত তথ্য ও তথ্যের প্রত্যক্ষ সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। তথ্য ও তথ্যের মাঝে মাঝে যে সকল অলৌকিক ও অবিবাক্য কাহিনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তা থেকে প্রমাণ হয় না যে রামায়ণের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। সংশ্লিষ্ট কাহিনী বা ঘটনা বিবরণের মধ্যে যতদূর অলৌকিকতা ও অবিবাক্যতা পরিদৃষ্ট তা কবির স্বেচ্ছাকৃত পরিকল্পনা মাত্র। এ প্রসঙ্গে আচার্য্য মাধনলাল রায়চৌধুরীর একটি মন্তব্য বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা' গ্রন্থে লেখক বলেছেন, 'বাণ্মীক' ত নির্দোষ ছিলেন না। তিনি কেন এই সমস্ত আপাত দৃষ্টিতে অবিবাক্য কাহিনীর সমাবেশ করিয়াছেন? বোধহয় এই কাহিনীগুলি ইচ্ছাকৃত রচনা, কারণ সমস্ত তথ্যের লোকের দৃষ্টিতে রামায়ণ পারিকল্পিত। সরল বিশ্বাসী এবং জ্ঞানী, পুরুষ এবং নারী, শিশু এবং বৃদ্ধ সকলের উপযোগী ও উপভোগ্য সামগ্রী রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব সংযোজিত ঘটনা বিবরণগুলিকে বিনা বিচারে অমূলক বলা যায় না।

রামায়ণ কাহিনীকে অনেকে রূপক বর্ণী বলে আখ্যায়িত করেন; কারণ তাদের মতে, রামায়ণ আখ্যায়ণের কবি জীবনের প্রতীক রূপ। ঐতিহাসিক সমালোচক Weber মনে করেন, সীতা মূলত: আখ্যায়ণের কবিভিত্তিক জীবনের রূপক এবং রামচন্দ্র আখ্যায়ণ সভ্যতার প্রতীক। সীতা শব্দটি রূপকের আধারে ব্যাখ্যাত। শব্দটির অর্থ হলভূত, অর্থাৎ যিনি হল বহন করেন। রামচন্দ্র অরণ্য-সংকুল দক্ষিণ ভূমিকে কবি-কার্যের উপযোগী করে আখ্যায়ণ সভ্যতার প্রভাব বিস্তারে অগ্রণী হয়েছিলেন। ঐ উদ্দেশ্যে তিনি দক্ষিণ ভূমির বিস্তৃত অঞ্চল কবি-কর্মের অন্তর্ভুক্ত করে তোলেন; কিন্তু আখ্যায়ণ সংস্কৃতি বিরোধী রাজা রাবণ রামচন্দ্রের সকল সাধনের মূলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন। রাম-কায়ী সীতাকে

অপহরণ করে এবং দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি সম্পদকে বিনষ্ট করে তিনি আৰ্য্য সভ্যতার প্রতিপদ রুদ্ধ করেছিলেন। পরে কিঙ্কিণ্যানিবাসী বানরদের সহায়তায় রাবণকে নিহত করে রামচন্দ্র দক্ষিণ ভারতে আৰ্য্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করেন। তাই রাবণের বিরুদ্ধে রামের অভিযান অনেকের মতে, দাক্ষিণাত্যে আৰ্য্য সভ্যতার রূপক বলে অভিহিত।

রামচন্দ্রের রূপ বর্ণনায় নব হুর্দাদল শ্রাম কথাটি সর্বাধিক ব্যবহৃত। একেত্রে অনেকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে রামায়ণ কাব্য সম্পূর্ণরূপে রূপক ধর্মী। অবশ্য এমন সুক্তির প্রামাণিকতা সন্দেহ যথেষ্ট বিধা রয়েছে। সমালোচক জ্যাকবি বলেছেন, বিষয়টি প্রাচীন ভারতের একটি পুরাত্ত্ব মাত্র। ‘রামায়ণ’ কাব্যে, দক্ষিণ ভারতে আৰ্য্য সভ্যতার বিস্তারের কথা প্রচ্ছন্নভাবে বিবৃত হলেও, কাব্যটিকে পুরোপুরিভাবে রূপক ধর্মী বলে গ্রহণ করা যায় না। কেননা রামায়ণিক লোকসমাজের রসিকজনের কান এবং মন তখনো রূপকবাক্য হয়নি। কাব্যের প্রধান আবেদন, গল্পরস, প্রাণময় জীবনানুভব এবং চারিত্রিক আদর্শ। কবির রচনা রীতি তাঁর পরিচ্ছন্ন রস সচেতনতার স্পর্শে বলিষ্ঠ ও গতিশীল হয়ে উঠেছে। এখানেই রামায়ণের বাহিরজের যথার্থ সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেয়েছে সমকালীন জীবন বেদনার স্বতঃস্ফূর্ত অহুর্বর্তনের ফলে। কবি সমকালীন ভারত সমাজের গাঙ্ঘ্য জীবনাদর্শকে এক প্রাণময় রূপ দান করেছেন। এই উচ্ছ্বাসিত প্রাণময়তা রামায়ণ কাব্যকে ভারতীয় জীবন যন্ত্রে সন্নিবিষ্ট করেছে। এখানেই কবির যথার্থ শিল্প সফলতা। জীবন বেদনের স্মিত রূপই রামায়ণের প্রকৃত সৌন্দর্য্য। কাব্য গাঙ্ঘ্য তত্ত্ব আরোপিত হলেও, তা কোথাও উপজীব্যরূপে প্রতিষ্ঠা পায়নি। সমসাময়িক জীবনের বিভিন্নমুখী অনাচারের বিরুদ্ধে বাণীকর মোহমুক্ত শিল্প দৃষ্টি কোন কোন স্থানে উজ্জ্বলিত হয়েছে উঠলেও, প্রাণময় জীবনানুভবই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। তাই তত্ত্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা রামায়ণ কাব্যকে বিচার করলে নানা জাতির মধ্যে পড়তে হয়।

রামায়ণিক সভ্যতার বিভিন্ন জাতির সমন্বয় ঘটছে। তার মধ্যে নর, বানর এবং রাক্ষসেরাই প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। দেবতারা রয়েছেন নেপথ্যে। রামায়ণের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির সঙ্গে দেবতাদের কোন সংযোগ নেই। বস্তুতঃ রামায়ণিক সভ্যতার ঐক্য মূলে রয়েছে নর, বানর ও রাক্ষস জাতির ধর্ম, সমাজ ও চরিত্রগত আদর্শের একটা নিবিড় সম্পর্ক। ঐ ত্রিবিধ জাতির জীবন ও প্রাণরসের সঙ্গে যেন রামায়ণিক সভ্যতা ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

রামায়ণ যুগের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা ক্ষেত্র বিশেষে নীতি হুই বলে মনে হলেও তা বিশেষ কোন একটি জাতির সভ্যতাকে ইঙ্গিতায়িত করে না; বরং বিভিন্ন জাতির যে সমন্বিত ইতিবৃত্ত, চরিত্রনীতি ও গাঙ্ঘ্য জীবনাদর্শ লুকিয়ে রয়েছে তারই অনীতি ও অসঙ্গতি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য্য যে এই সভ্যতার বিভিন্ন জাতির সমন্বয় ঘটলেও তাদের আচার আচরণ, নীতিজ্ঞান ও সমাজবোধ ভিন্নধর্মী। তাদের কারণ ও কার্য্য বিপরীত। সভ্যতার মান নির্ণয় ব্যাপারে ঐ জাতিগত বৈসাদৃশ্যগুলি নিঃসন্দেহে সমীকার বস্তু। রামায়ণিক যুগ সভ্যতা বা সামাজিকতাকে দ্বারা নীতিহুই বলে প্রচার করে থাকেন, তাঁদের এরূপ অভিমতের বিরোধিতা সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি বিশেষ যুগের সভ্যতাকে বিচার করতে হলে সেই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত জাতির সামাজিক প্রকৃতি, সমাজের বিভিন্ন স্তরগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, জীবন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়গুলি সর্বপ্রথমে ঐতিহাসিক বীক্ষণের দ্বারা পর্যালোচনা করতে হয়। এরূপ পর্যালোচনার ফলে, সভ্যতা তার বিকাশের পথে যে যে সামাজিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে, তার সবিশেষ চিত্র পর্যালোচকদের মানসপটে ভেসে ওঠে তখন সভ্যতা সম্পর্কে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অসম্ভব হয় না। উপরন্তু সামাজিক পরিবেশ ও সভ্যতার বিকাশ যে সূত্রটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেই সূত্রটিকেও আবিষ্কার করা সহজ হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, ঐ



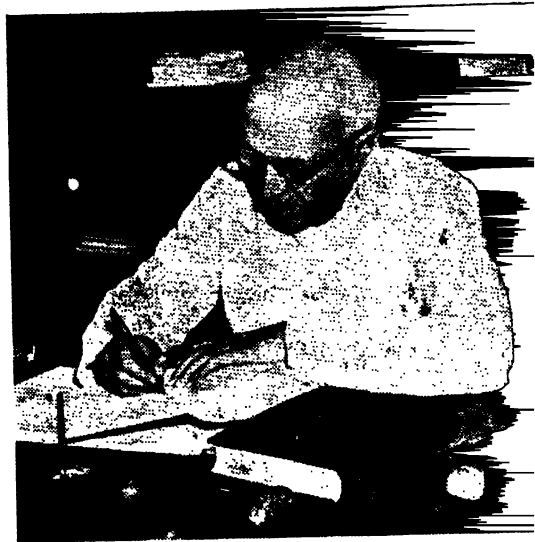
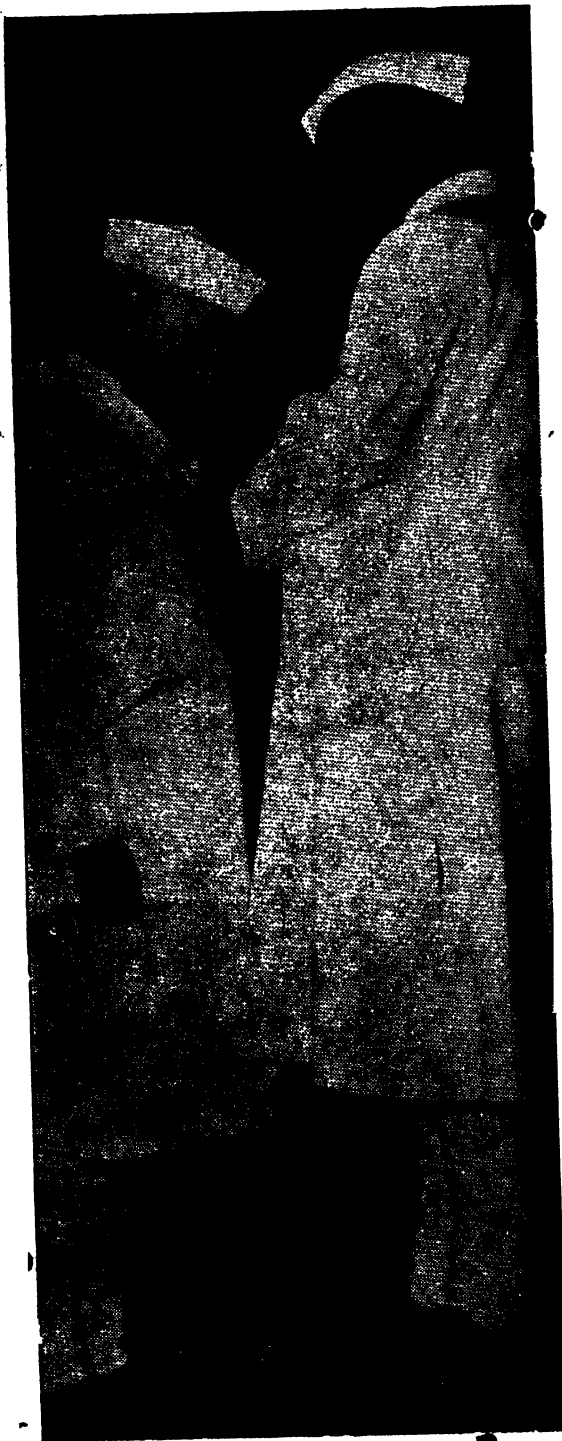
প্রধান কারাবরণ



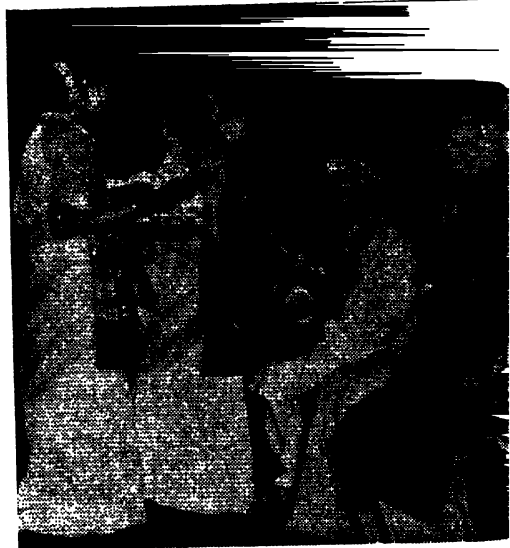
ভারতীয় জাতীয় সৈন্য বাহিনীর জল আদালতে গমন

কাঁবর সাহিত শান্তিনিকেতনে





দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনা সাক্ষর



বিশ্বভারতীর বার্ষিক উপাধি দান  
অমৃতান উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে

সুত্রটিই সভ্যতার প্রকৃতি এবং চরিত্র নিরূপণের নির্ভর যোগ্য মাপ-কাঠি। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে সামাজিক পরিবেশ, সভ্যতা বিকাশের মূল নিয়ামক নয়। সামাজিক পরিবেশের দোহাই দিয়ে ধারা কোন একটা যুগের সভ্যতাকে বিচার করতে চেয়েছেন, তাঁরা কেবলই জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন। ফলে, তাঁদের বিচার বিশ্লেষণ পরিপূর্ণ সার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। এই বিচারণায় তাঁরা কেবল সমাজকে যত্নরূপে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। উপযোগী পদ্ধতি অগ্রসন্ধান না করে তাঁরা কেবল সামাজিক পরিবেশ এবং ঘটনা সমূহকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর পরিণাম হয়েছে বিভ্রান্তকর। তত্ত্ব হয়ে উঠেছে বিপথগামী। একথা সর্বথা স্বীকার্য্য যে, সভ্যতা জাতির জীবনী। সভ্যতার ইতিহাস জাতিরই ইতিহাস। জাতির সভ্যতাকে জানতে হলে তাদের দৈহিক ও মানসিক গঠনের তুলনামূলক যে পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে তার দ্বারা জানতে হয়। তাহাড়া কোন সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত জাতিসমূহের মানসিক প্রতিবর্তী আবিষ্কার নয়। সেই হেতু তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণিতন্যীত সমাজবোধ ইত্যাদি বিষয়ভালও একই ভাব ধারায় বিচার্য্য হতে পারে না। তাই একটি থেকে অপরটিকে বর্জ্য্য করে পৃথক ভাবে একের পর এক তাদের বিবেচনা করতে হয়। অসুস্পষ্টভাবে এই বিষয়ভালও অন্তর্ভুক্ত সমীক্ষার বস্তু।

রামায়ণে নর, বানর, রাক্ষস একই পিতার ঔরসজাত সম্ভান হলেও তারা ভিন্ন জাতি। তাদের সমাজ এবং জাতিগত ভাবধারাও ভিন্ন ধর্ম্মী। রাক্ষসদের জাতি কুল বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলেও তারা জাতি কুল বিবজিত নয়। অনার্য্য জাতি রূপে তাদের পরিচয়। রামায়ণে অনার্য্য শব্দটির ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম্মে 'অসুয়' শব্দটির অর্থ অনার্য্য। রাক্ষসেবাই যে অসুয় বা অনার্য্য জাতি, বৈদিক যুগে তার সমর্থন আছে। আবার যেহেতু তারা অনার্য্য, আৰ্য্য ধর্ম্মের প্রতি তাদের বিষয় চিরাগত।

রামায়ণে আৰ্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার সংঘাত ঘটেছে। এই দু'য়ের মধ্যে পরিশেষে আৰ্য্য সভ্যতারই বিজয় ঘোষিত হয়েছে। নরোত্তম রামচন্দ্র আৰ্য্য সভ্যতার প্রজন্ম প্রতীক। অনার্য্য সভ্যতার প্রতীক বিজ্রবা মূনির পুত্র রাক্ষস রাজ রাবণ। বাণ্যীকির ভাষায় রামচন্দ্র প্রিয়দর্শণ, আৰ্য্য পৌরুষের ভাবগত মহিমা এবং অপরাপর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। বাণ্যীকির পরিকল্পনায় রামচরিত্র এক মহিমায়িত জীবন রহস্ত। পঞ্চাস্তরে, রাবণের রূপাদর্শ অনার্য্য সদৃশ। অরণ্যকাণ্ডে রাবণের রূপ বর্ণনার উল্লেখ আছে। বাণ্যীকির রাবণের রূপচিত্র স্বল্পতম রেখাচিত্রের সাহায্যে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর ভাষায় রাবণ, 'পাপরাশি সদৃশ কৃষ্ণ বর্ণ সেই রাক্ষস পতি'।

রামায়ণে, আৰ্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের অন্তরালে নিশ্চয় কোন ঐতিহাসিক সভ্য বা জাতিগত বিরোধের সন্মিলিত ইতিবৃত্ত লুকিয়ে আছে। এই ইতিবৃত্তই আৰ্য্য ধর্ম্মাদর্শের চরিত্রকথা — 'আৰ্য্য জীবনের গুচিসিদ্ধ চরিত্রনীতি'। রামায়ণ তাই বৃহদ্ জীবনের মহাকাব্য। বেদ এবং অত্রাগ দর্শনশাস্ত্রে যাত্রাবের জীবন জিজ্ঞাসা ও জীবন উপলব্ধি বিষয়ে সম্ভাব্য প্রশ্নগুলির যে সকল স্তর সমূহ প্রদত্ত হয়েছে রামায়ণে ও মহাভারতে সেই একই উত্তর কাহিনীর মাধ্যমে উচ্চারিত হয়েছে। তাই রামায়ণ ও মহাভারত আজও লোকসমাজে পঞ্চম বেদ রূপে পরিচিত। রামায়ণে যদি কোন বাণী থাকে, তবে তা হচ্ছে মহত্বের মহত্তর আদর্শের বাণী, আর সেই মহত্তম আদর্শের প্রতিভূ, রামচন্দ্র। শুধু এক যুগেই নয়। এই নরোত্তম সর্বযুগের সর্বদেশের আরাধ্য পুরুষ। বহু-শতাব্দী পরেও ভারতচিন্তে তাঁর জীবনাদর্শ আজও অগ্নান হয়ে রয়েছে।

রামায়ণ আৰ্য্যদের গৌরব কীর্জন। আৰ্য্যদের চরিত্র চিত্রনের কাকে কাকে মহর্ষি বাণ্যীকি তদানীন্তন কালের আৰ্য্য সভ্যতার স্বরূপ চিত্রটি তুলে ধরেছেন।

রামায়ণ কাব্যে আৰ্য্যদের মহিমায়িত জীবন রহস্য অতি সুলভ ভাবে চিত্রিত হয়েছে। রামের মত প্রেমময় প্রাণময় এবং চন্দন চর্চিত চরিত্র; ভরতের মত নীতিনিষ্ঠ ও ধর্ম-শীলভ্রাতা, লক্ষ্মণের মত প্রকাবনত দেবর, সীতার মত শুচিস্বভা কল্যাণীবধু, আৰ্য্য সমাজের মহিমায়িত জীবনাদর্শের প্রতীক স্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণে একটি বিশেষ যুগের ভারত জীবনাদর্শ বাণ্যীকর চিত্রে সঞ্চারিত হয়েছিল; আর তারই ফলস্বরূপ রামায়ণ কাব্যের সৃষ্টি।

মহামতি বাকুল সাহেব সভ্যতার ইতিহাস প্রত্নতাত্ত্বিক মন্তব্য করেছেন,—মানবিক উন্নতিই সভ্যতার প্রাচীন লক্ষণ। এই উন্নতি প্রধানতঃ দুই প্রকারের—নৈতিক ও বৌদ্ধিক। প্রথমটি কর্তব্য বিষয়ক, দ্বিতীয়টি জ্ঞান বিষয়ক। সভা হতে সভ্যতা শব্দের উৎপত্তি; স্তম্ভরাজ সভ্যতা শব্দের মৌল অর্থ,—সামাজিকতা।

রামায়ণে, নর, বানর ও রাক্ষস, এতদ্বিজ্ঞানীয় সভ্যতার পরিচয় বিবৃত হয়েছে। তার মধ্যে মানব সভ্যতাই অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। রামায়ণের আৰ্য্য সভ্যতাই বিশ্ব সভ্যতার আদিকরূপ এবং ভারতবর্ষ বিশ্ব সভ্যতার আদি ভূমি।

মহর্ষি বাণ্যীক আৰ্য্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে পাশাপাশি আরও দুটি বিশদীভাচারী জাতির জীবন ধারাকে ছলে ধরেছেন এবং নানা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানব জাতির মানব প্রমাণ করেছেন। মহৎ চরিত্রের মূল্য এবং মর্যাদাকে উপলব্ধি করতে হলে তার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজন হয়। আৰ্য্য চরিত্র চিত্রনে মহাকাবি ভাই অনাৰ্য্য জাতি সম্বৃত আরও দুটি জাতির জীবন ধারাকে পরিপ্রেক্ষণের কাজে লাগিয়েছেন। ফলস্বরূপ মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, গতিবেগ এবং হৃদয়ের ঔদার্য ইত্যাদি অবিসংবাদিত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাণ্যীকর মানব চরিত্র ক্ষেত্র বিশেষে বাস্তবতা থেকে সরে গেলেও কোন চিত্র প্রাণহীন হয়ে পড়েনি। মহাকাবির বর্ণনায় সঞ্চিত মানবাত্মার বলিষ্ঠ রূপই আত্মপ্রকাশ করেছে।

— — —

#### উল্লেখ্য পঞ্জী

- (১) রামায়ণে রাক্ষস সভ্যতা : মাধন লাল রায় চৌধুরী।
- (২) রামায়ণ ও ধর্মাত্মতা : সুরেন্দ্র মোহন তৌমিক
- (৩) ইতিহাসের দর্শন : মনোরঞ্জন রায়।



# আমার ইউরোপ ভ্রমণ

( ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী )

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

( পূর্ণপ্রকাশিতের পর )

একটি ব্রিটেনের সকল বড় শহরই আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া কে কত বেশি আতিথেয়তা দেখাইতে পারে তাহার জন্য প্রতিযোগিতা চালাইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে ম্যানচেস্টারের আয়োজনকে অস্বতম সংগোপন করিয়া জাঁকজমকপূর্ণ এবং সুন্দর বলা চলে। এই নানা জাতীয় লক্ষ কর্মীর ভিড়ওয়ালা শহরের উৎসব বস্ত্রপুথিবীর নানা দেশে ব্যবহৃত হয়। অত্যাচারিত নাপিত রিচার্ড আর্করাইট (পরে সার রিচার্ড আর্করাইট) কিংবা ঘড়িনির্মাণী জন কে, কিংবা তত্ত্বাবধায় জেমস হারগ্রোভস কি কখনও ভাবিয়াছিলেন যে ওয়াটার ক্রেম অথবা স্পিনিং জেনি একদিন পৃথিবীর তত্ত্বাবধায় বিপ্লব আনিবে? এবং তাহার সাহায্যে ইংল্যান্ড অপরিমিত উপার্জন করিবে, এবং পৃথিবীর অনেক অংশে ইহা যুদ্ধের, সম্পত্তি লাভের এবং ট্যাক্সের গোণ কারণ হইবে? অথবা তাঁহারা কি ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাদের ঐ সব আবিষ্কার, যাহা প্রথমে হুল বোঝার ফলে লোকের নিকট আমল পায় নাই, তাহা হঠাৎ পরে আনুমানিক অনেক বড় বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে, বিরাট বিরাট এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, যন্ত্রের কারখানা, বিদ্যুত রীতিং প্রতিষ্ঠান এবং আরও কত অসংখ্য শিল্প উৎপাদন এঞ্জেলি গড়িয়া উঠিবে? অথচ এ সমস্তই সম্ভব হইয়াছে। আমি ত কখনও রিচার্ড আর্করাইট, অথবা জন কে, অথবা জেমস হারগ্রোভস-এর মত ব্যক্তি দ্বিতীয় আর দেখি নাই। কিংবা তাঁহাদেরই মত অত্যাচারিত তাঁহাদের একই পথের পথিক পূর্ববর্তীগণ—

জন ওয়াইয়াট, লুই পল এবং টমাস হাইজ-এর মত ব্যক্তিও আর দেখি নাই। ইহাদের পরবর্তী শব্দহীন স্মৃতিচিহ্ন যন্ত্রের উদ্ভাবক ক্রম্পটন, কাভিং মেনীনের উদ্ভাবক—ডায়ার, বাষ্পচালিত তাঁতের উদ্ভাবক ও উন্নত সংস্করণের প্রবর্তক—কার্টরাইট, শার্প রবার্টস এবং হরক্স, ড্রেসিং মেশীনের উদ্ভাবক জনসন ও গ্যাডক্লিফ, অথবা কুইং মেশীনের উদ্ভাবক জোসুয়া হাটলম্যান—ইহাদের সম্পর্কেও সেই একই কথা। আমাদের ম্যানচেস্টারের নিমন্ত্রণকারী আমাদিগকে সংগোপন হোটেলের রাজকীয় সম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন এবং কাপড়ের কলের সমস্ত বিভাগ দেখাইয়া আমাদের ঘানাসিক আনন্দ দান করিলেন।

এই ভাবে একশত কুড়ি বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ ভূমিতে যে বীজ বপন করা হইয়াছিল তাহা ভিতরের দিকে ফল ফল চালাইয়া করিয়া বৃক্ষের পুষ্টি ও ফল ফলাইবার কাজ সম্পন্ন করিয়াছে। ইহাতে ম্যানচেস্টার, ল্যাঙ্কাশায়ার এবং সমগ্র ব্রিটেনের পরম উপকার হইয়াছে, এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে পৃথিবীরও উপকার হইয়াছে। এই একই জাতি ঐ একই বীজ ভারতের জমিতেও বপন করিয়াছে, কিন্তু স্ট্রবেরির বীজ সাহায্য মরুতে বপন করিলে যাহা হয়, ভারতেও তাহাই হইয়াছে। কেননা দুই দেশের জাতীয় চরিত্রে পার্থক্য রহিয়াছে। দশহাজার স্পিঙ্ক বা টাকু যুক্ত কাপড়ের কল ও প্রায় তাঁতে যে পার্থক্য, প্রায় সেই পার্থক্য। রেলওয়ে ট্রেন ও গোরুর গাড়ীতে যে পার্থক্য। ইহা



অতিশয়োক্তি হইতে পারে, তবু ইহা হইতে ব্রিটিশ ও ভারতীয় জাতীর চরিত্রের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা মোটের উপর বুঝা যাইবে। স্বীকার করা আমার পক্ষে নির্দ্বিধিতার কাজ হইবে তবু বলি, আজ যদি জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা চালিত সরকার গঠিত হয় তাহা ব্রিটিশ জাতির সরকারের ত্রায় সফল হইবে ইহাতে আমার যের সন্দেহ আছে। নির্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলে কি ধরনের লোককে তাহারা নির্বাচিত করিবে তাহাই ভাবি। যাহাই হউক, দেশের যে অবস্থা চলিতেছে, তাহা হইতে আমি অল্পমান করি, বর্তমানে দেশের লোকের যে চরিত্র বা মনোভাব তাহাতে এই লোকদের ভিতর হইতে যাহাদিগকে ছাঁকিয়া আনিয়া নির্বাচিত করা হইবে, তাহারা ক্ষমতা হাতে পাইবামাত্র প্রথমেই গোহত্যা সমস্তা বিষয়ে প্রশ্ন তুলিবে।

গোহত্যা নিবারণ খুবই উত্তম কাজ সন্দেহ নাই, এবং ইহার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলবারও নাই। পক্ষান্তরে একজন হিন্দুরূপে এবং ব্রাহ্মণরূপে, এবং বিশেষভাবে আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষের মনোভাবের প্রতি সন্মানবশতঃ, গোহত্যা নিবারণিত হইলে আমি আনন্দিতই হইব, আরও আনন্দিত হইব, যদি মানুষের দ্বারা বা অল্প প্রাণী দ্বারা সকল প্রাণীহত্যা নিবারণিত হয়, এবং সমস্ত বিশ্ব, শান্তি, শ্রীতি, এবং শুভ ইচ্ছার পূর্ণ হইয়া উঠে—কোথাও ভীষা, যুদ্ধ, বেদনা, ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকে। কিন্তু ইহা ত জগৎকে আমার মনের মত করিয়া গড়িয়া লইবার ইচ্ছা। বিচিত্র স্বার্থক, প্রশ্নের অতীত, সমালোচনার অতীত করিয়া মিলাইয়া দিবার উপযুক্ত কোনও কাটাছাঁটা পরিকল্পনা আমার নাই। সেজন্য আমি বিনীতভাবে চিন্তা করিতেছি—এই গোরক্ষা আন্দোলনমাত্র আংশিকভাবে সফল হইতে পারে একমাত্র নীলগিরির সংখ্যালঘু টোডাদের মধ্যে। নীলগিরির টোডাদের প্রতি গোষ্ঠীপাত্তর দৃষ্টান্তে তাহার বিদ্যারী আশ্চর্য সঙ্গে তাহার বহুসংখ্যক মহিষ হত্যা করিয়া থাকে এই প্রথার

বিরুদ্ধে নীলগিরির কলেকটর ব্যবস্থা অবলম্বন করাতে উহার কিছু সংঘত হইয়াছে, বলি দিবার জন্ত মহিষের সংখ্যা কমাইয়াছে। অথবা যে জাতির মধ্যে এত চারণ ভূমি আছে যে গোরুর সংখ্যা সীমাহীন বৃদ্ধি পাইলেও কোন অসুবিধা হইবে না, তাহাদের মধ্যে গোরক্ষা আন্দোলন সফল হইতে পারে। বুদ্ধ জগৎ হিন্দুজাতি চাঁদ ধরিবার জন্ত হাত বাড়াইতেছে। এই হিন্দুজাতি তিন সহস্র বৎসর পূর্বের শৈশবে যাহা পাইবার জন্ত কাদিত, সেই জাতি বুদ্ধ হইয়াও সেই সব ভুল খেলনার জন্ত কাদিতেছে, এ দৃশ্য কৌতুককর। কিন্তু তরুণ ভারতের পক্ষে সমকালের উপযুক্ত জিনিষ চাওয়াই শক্তিসঙ্গত। বর্তমান অবস্থায় আরও একটি জিনিষ প্রয়োজন। অর্থাৎ সমস্ত দাবি এমন খোলাখুলি এক প্রকাশ্য ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে সন্দেহচিন্তা ব্যক্তিও বৃষ্টিতে পারে যে, ইহার মধ্যে কোনও বিচারণ অথবা অসামুত্তা প্রচ্ছন্ন নাই। গোরক্ষা আন্দোলন যে অর্থনৈতিক আবরণে ঢাকা হইয়াছে, যাহার স্তূভার দৈর্ঘ্য অনেক কিন্তু বয়ন ও বিভাস দৃঢ়তাহীন। গোরক্ষা প্রশ্নের গোড়াতেই একথা অল্পমান করা অসম্ভব যে, সীমাহীন সংখ্যক গোরুর জন্ত সীমাহীন পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা চলিবে। পশুখাত্তের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া, যে হারে উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা না ভাবিয়া এবং যে হারে চাষের জমি কমিয়া যাইতেছে সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া অরণ্য-সম্পদ রক্ষার জন্ত যেরূপ কঠোরতা অবলম্বন করা হইতেছে তাহা বিবেচনা না করিয়াও একথা ভাবা যায় না যে যত গোক, তত খাদ্য মিলিবে। ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত মানুষকে বিদায় করিয়া সমস্ত মহাদেশটিকে শুধুমাত্র গোকতে পূর্ণ করিয়া তুলিলেও যত গোক, তত খাদ্য মিলিবে করনা করা অসম্ভব। সম্ভবতঃ এ অসুবিধা দূর করা সম্ভব হইবে এই অল্পমান করা হইয়াছে, কারণ দিনে দিনে অজাহারের দক্ষণ করক পুরুষের মধ্যেই, জাপানীদের খেলনা-উদ্যানের গাছের

মত গোক্ৰ হাগলের চেহারা পাইবে এবং ছোটনাগপুরের উচ্চভূমিতে পাথরের মধ্যে খাদ্য সন্ধানরত বামনাকার পশুর ভায় ছোট হইয়া যাইবে। এই জাতীয় মোক্ষম যুক্তির সাহায্যে পশুখাদ্যের সামান্য অর্থাবধার মীমাংসা করা হইয়া থাকিবে, কিন্তু বর্তমান অবস্থা আরও ভুচ্ছ কয়েকটি বিবেচনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এগুলি ঐ যুক্তির সাহায্যে দূর করা যাইতেছে না। যথা—গোরক্ষকদের যুক্তি অহুসারে অর্থনৈতিক দিক হইতে হৃথের জন্ত গোক্ৰ পালন করা অনেক বেশি লাভজনক, এবং ইংা তাঁহারা অল্প করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যে ব্যক্তি কশাইধানায় গোক্ৰ বিক্রির জন্ত লোকেদের উপর চাপ দেয়, তাহাকে কোন্ আইনে নিরস্ত করা যাইবে, সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। যদি বেশি লাভের জন্ত হৃথের গোক্ৰ রাখিতে হয়, তাহা হইলে যাহারা কম লাভে গোক্ৰ কশাইদের কাছে বিক্রি করে, তাহারা অবশ্যই তাহা কাহারও চাপে পড়িয়া করে। নানা কারণে আগের অপেক্ষা গোক্ৰর চাহিদা কমিয়া গিয়াছে, তাহার স্থলে মহিষের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু গোহত্যা আন্দোলন নিষক ধর্মীয় আন্দোলন, এবং ইহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। যে সব গ্রহে আমাদের পূর্বপুরুষদের গোহত্যা এবং গোমাংস ভক্ষণের কথা আছে, সেই গ্রহের সেই অংশ বাদ দিতে হইবে, ব্যাখ্যার ভোড়ে ভাসাইয়া দিতে হইবে, অথবা মিথ্যা অর্থ আরোপ করিতে হইবে, তাহার পর আমাদের গোমাংস বর্জিত ধর্মে, পৃথিবীর ১৩০ কোটি মানুষ—যাহারা এই মাংসকে বিধিসঙ্গতরূপে খাদ্য বলিয়া জানে তাহাদিগকে দীক্ষা দিতে হইবে। যে আইনের পিছনে আশিহাজার ব্রিটিশ বেরনেটের সমর্থন বহিয়াছে, ধর্মের নামে একটি খাদ্যাভ্যাসকে নিষিদ্ধ করিবার জন্ত সেই আইনের সাহায্য প্রার্থনা করা বিপজ্জনক। ভিন্ন ধর্মীয় কোটি কোটি মানুষের কাছে গোমাংস অত্যাধিকার নহে। তাহাদেরও অনেক বিষয়ে দৃঢ় মত আছে। আমাদিগকে বাহারা শাসন করিতেছেন, তাঁহারা নৃতপজাকে পাপ বলিয়া গণ্য করেন। এক ধর্মের

মতে আত্মিক জগতের অতি প্রায় ৭৩শে প্রবেশ করিবার হাড়পত্র ধূমপান। আবার এক ধর্মের মতে ভেল চকচকে হুইপুই ব্রান্ডনের হাতে একটি টাকা ডাঁড়িয়া দিলে স্বর্গে বাইবার পরিচয় পত্র মিলে। যদি অস্ত্রের আচারিত প্রথা তোমার নিকট পাপ বলিয়া গণ্য হয় তবে তাহা আইনের সাহায্যে জোর করিয়া বন্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত কর, তাহা হইলে তোমার কোন আচারিত প্রথাকে তাহাদের কাছে পাপ মনে হইলে তাহারা যদি তাহা বন্ধ করিতে চাহে, তাহা হইলে ভূমি আপত্তি করিবে কি? এই গোরক্ষা আন্দোলন বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই গত শতাব্দীতে দিল্লীর সাম্রাজ্য যখন ভিত্তিসমেত কাঁপিতোছিল, ভাঙিয়া পড়িবার দেরি নাই, তখনও সম্রাট বাহাদুর শাহ উদয়পুরের রাণা অভিজিত সিংহের বিরুদ্ধে যে সব কারণে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এই গোহত্যার বিষয় তাহার অন্ততম।

জাতীয় মন কোন্ দিকে বাহিতেছে সেই দিকটি দেখাইবার জন্তই এই সব প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম। আমাদের দেশের লোকদের যদি নিন্দেদের পরিচালচাধীম ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে চীনারা তাহাদের রেলওয়ে লইয়া যাহা করিয়াছিল, তাহারাও যদি তাহাই করে তবে আমি বিস্মিত হইব না। আমাদের শিক্ষিত দেশপ্রেমীরা আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, “রেলওয়ে টেলিগ্রাফ না থাকিলেও আমাদের পূর্বপুরুষেরা কি স্তখে ছিলেন না?” আসল কথা আমরা অতীত সখন্দে অজ্ঞ, অথবা অতীতকে ভুলিয়া গিয়াছি, বর্তমান সন্ধে অসভর্ক এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞ। কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিবেন কি যে, আমরা যে মাটির উপর বাস করিতেছি, যে বাতাস নাকে টানিতেছি, যে জিহবার আমরা গ্রহণ করিতেছি, যে জল আমরা পান করিতেছি, তাহার প্রত্যেকটিতে কি পরিমাণ মরিকিয়া মিশান আছে? কারণ আমরা যে এই পৃথিবীকে একটি স্বপ্ন জগৎ করিয়া লইয়া তাহাতে হারানুর্ভিত মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। মানুষের

অগ্রগতির গ্রহে আমরা যদি আয়ুর্নিকের হান লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে প্রথমেই আমাদের জাতীয় চরিত্র বদলাইতে হইবে। ইহার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। তাহা যদি না করিতে পারি, তবে একটি গভর্মেন্ট—এবং যে গভর্মেন্ট আমাদের জাতি অপেক্ষা অল্পতঃ এক শত বৎসর অগ্রসর হইয়া আছে, তাহার সংস্কার সাধনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। তাই আমি আশা করিতেছি আমাদের জাতীয় কংগ্রেস, আমাদের জাতিকে অজ্ঞতা, হীনতা, কুসংস্কার ও অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রথাগুলি হইতে উদ্ধার করিবার কাজে গভর্মেন্টকে সাহায্য করিবে। ব্রিটিশ জাতির সম্পর্কে আসিবার ভাগ্য আমাদের দৈবাৎ ঘটিয়াছে। আমরা ইতিপূর্বে জাতিভেদ প্রথার জঘন্যতম রূপটি দেখিয়াছি। যদি অতীত ইতিহাসের উপর আরও স্পষ্ট আলো নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, বাহিরের একটার পর একটা আক্রমণের ফলে বংশের পর বংশ হীনচরিত্র হইয়া পড়িয়াছে। পরস্পর বিদ্বেষ কোটি কোটি মানুষকে কয়েকজন মাত্র উন্নত জাতির মানুষ শাসন করিতেছে, উন্নত উপায়ে, জায়ের দ্বারা, বলপ্রয়োগের দ্বারা নহে, ইহা সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম, এবং ইহা ব্রিটিশগণ ভারতে সম্ভব করিয়াছে। এই উদ্ধার নীতি হইতেই কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছে, এবং স্বাভাবিক কারণেই। এবং সময় যখন আসিয়াছে, তখন ইহা “জাশজাল কংগ্রেস” বা অজ্ঞ নামে টিকিয়া থাকিবে। ব্রিটিশ জাতির মধ্যে অবশ্য একটি সম্প্রদায় আছে, সে সম্প্রদায়ের লোকেরা ইংল্যান্ডকে স্পেন যেমন ছিল তেমন দেখিতে চাহেন। তাহারা ভারতকে ব্রিটিশের পদানত দেখিতে চাহেন। ইহার ক্ষতির দিকটি সম্পর্কে তাহারা অন্ধ। কিন্তু তাহাদের ইচ্ছা পূরণ হইবে না।

মানচেষ্টার হইতে আমরা লিভারপুলে গেলাম। বাণিজ্যিক দিক হইতে লিভারপুল ব্রিটেনের সর্গাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শহর। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, যখন উত্তর-পূর্ব দক্ষিণ ভারতে মারাঠাদের সঙ্গে সর্গাশা

যুদ্ধে রত, সে সময় লিভারপুল মাত্র একটি ফেলোদের গ্রাম ছিল। এখন সেখান হইতে বৎসরে কুড়িহাজার জাহাজ ছাড়িয়া পৃথিবীর নানা স্থানে যায়। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আটলান্টিক পাড়ি দিয়া যেসব বাষ্পীয় পোত অ্যামেরিকায় যায়। এই জাহাজগুলির মালিক প্রধানতঃ ‘কুনার্ড’, ‘ইনম্যান’ ‘হোয়াইটস্টার’, ‘জাশজাল’, ‘গিয়ার্ন’, ‘অ্যান্ডার’, এবং ‘অ্যালান’ পরিবহন প্রতিষ্ঠান। যেসব স্থান আমরা পরিদর্শন করিলাম তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কোরিনথিয়ান হাণ্ডল স্টাইলের সেন্ট জর্জেস হল, ইহার কক্ষগুলি সুন্দর ভাবে অ্যানিট, পোরফির এবং অজ্ঞাত দামী প্রস্তরে অলঙ্কৃত। ইহার গ্র্যান্ড হল—এ ২৫০০ লোকের বাসবার স্থান আছে, একটি বৃহৎ অরগ্যান আছে তাহার পাইপের সংখ্যা ৮০০। আমরা টাউন হল এবং এরলচেল বিলডিং—এও গিয়াছিলাম। লিভারপুলে একটি বড় লাইব্রেরি আছে, বিনা মাসুলে সকলেই এখানকার গ্রন্থ পাঠ করিতে পারে। একটি মিউজিয়াম আছে, ব্যতিক্রম দানে এটি গড়িয়া উঠিয়াছে। লাইব্রেরিতে ১০০,০০০-এর বেশি বই আছে।

লিভারপুল হইতে আমরা বার্কেনহেডে উপস্থিত হইলাম। এই শহরটি মারসি নদীর অপর পারে। এই শতাব্দীর আরম্ভে এটি ১০০ জন অধিবাসীর একটি গ্রাম মাত্র ছিল, এখন এটি মস্ত বড় এক শহর। এখানে এখন বিস্তৃত ডকইয়ার্ড সমূহ নির্মিত হইয়াছে, বড় বড় জাহাজ প্রস্তুত হয় এখানে। ইহার বর্তমান লোকসংখ্যা ৭০,০০০। শহরে এখন একটি মার্কেট হল, একটি মিউজিক হল, একটি ক্রী লাইব্রেরি, একটি আর্ট স্কুল এবং একটি বড় পার্ক বহিয়াছে। লিভারপুল ও বার্কেনহেডের মধ্যে অবিরাম ফেরি স্ট্রীমার যাতায়াত করে। আমরা অবশ্য সাম্প্রতিক নদীর নিম্নভাগ দিয়া নির্মিত টানেল পথে রেলগাড়িতে গিয়াছিলাম। আমার স্বদেশবাসী অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি টেমস নদীর সুবর্ণ পথ দেখিয়াছি কি না। পূর্বের দিনে ইহা লণ্ডনের অবশ্যই একটি দর্শনীয় জিনিস ছিল, কিন্তু এখন আর

তাহা নাই, কাৰণ এখন ইহা অপেক্ষা অনেক বড় টানেল অধিকতৰ এঞ্জিনিয়াৰিং নৈপুণ্যে গঠিত হৈয়াছে। মার্সি নদীৰ টানেল কত দীৰ্ঘ তাহা ঠিক বলিতে পাৰিব না, কিন্তু পাৰ হইতে বতৰা সময় লাগিয়াছিল তাহাতে মনে হয় এটি তিন হইতে চাৰি মাইল দীৰ্ঘ। নদীটি এইখানে খুব গভীৰ বলিয়া বোধ হয়, কাৰণ যেখানে বেল পাভা হৈয়াছে, সেই স্তৰে পৌছিতে আমাদেৱ লিকটা কয়েক শত ফুট নিচে নামিয়াছিল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্ৰান্সেৰ মध्ये যদি টানেল নিৰ্মাণেৰ অধিকাৰ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে শেটি অল্প সব টানেলেৰ গোঁৱৰ মান কৰিতে পাৰিত। এখন হইতে পুনৰায় লিভাৰপুলে, তাহাৰ পৰ চেষ্টাৰ, সেখানে ডিউক অভ ওয়েস্টমিনষ্টাৰেৰ নিমন্ত্ৰণ গ্ৰহণ।

আমাদেৱ শেষ দৰ্শনীয় স্থান—ব্ৰিস্টল, বাথ এবং ওয়েল্‌স। ব্ৰিস্টল লণ্ডন হইতে ১১৮ মাইল দূৰে এবং ৱেলপথে মাত্ৰ তিন ঘণ্টায় পৌছান যায়। আমাৰা ১৮৮৬ সনেৰ ২ই জুন ব্ৰিস্টলে আসিলাম। মেয়াৰ এবং হানীৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আমাদিগকে অভ্যর্থনা কৰিলেন। অপৰাহ্নে মাৰ্চ্যান্টস হল-এ লাঞ্চ। নিমন্ত্ৰণকাৰী—মাৰ্চ্যান্ট ভেনচাৰাৰ্‌স। এই সমিতি মধ্যযুগেৰ বণিক সমিতিগুলিৰ অন্তৰ্ভূত। এগুলি এককালে ব্ৰিস্টলে স্থাপিত হৈয়াছিল। কখন হৈয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় না, কিন্তু যে সব ২৫৬ আছে তাহা হইতে দেখা যায় ১৪৬৭ সনে এই সমিতিটি পূৰ্ণ প্রতিষ্ঠিত এবং ১৫০০ সনে ইহাৰ কাৰ্য্যধাৰা ও পৰিচালনা বিধি ৰচিত হৈয়াছিল। ব্ৰিটিশ ধনসম্পদ বৃদ্ধিৰ মূলে এই সব সমিতি। কাৰণ ইহাৰাই সব কিছু হাৰাইবাৰ বঁকি লইয়া বিদেশে বণ্টানি বাণিজ্য চলাইয়াছিল। এবং সেই জন্তই ইহাৰা “ভেনচাৰাৰ্‌স”। আমাদেৱ দেশেৰ সন্দেশ ইহাদেৱ পৰিচয় আছে, কাৰণ তাহাৰা পূৰ্ব দেশে বাণিজ্য বিস্তাৰেৰ জন্ত আসিয়াছিল। ব্ৰিস্টলেৰ “মাৰ্চ্যান্ট ভেনচাৰাৰ্‌স”ও নিষ্ক্ৰিয় ছিল না। গিল হইতে জানা যায়, ইহাৰা অবিৰাম বাণিজ্য ক্ষেত্ৰে বিদেশ ৰাজ্য কৰিয়াছে। ইহাৰা গাৰ্ভিনা এক নিউ ইংল্যাণ্ডে উপনিবেশ গাঁড়িয়াছে।

এই সমিতিই উত্তৰ পশ্চিম পথে ভারতে আসিবাৰ চেষ্টা কৰিয়াছিল। ব্ৰিস্টলেৰ বন্দৰগুলি ইহাৰাই স্থাপন কৰিয়াছিল। ইহাৰা বহু লোকহিতকৰ প্ৰতিষ্ঠানেৰ জনক। অভিধিদেৰ আপ্যায়ন কৰা হইল ম্যানসন হল-এ। ব্ৰিস্টলেৰ মেয়াৰ-পত্নী ক্লিফটনেৰ “শিকটোৱা ক্ৰম্‌স”-এ বল-নাচেৰ আয়োজন কৰিয়াছিলেন। ম্যাড্ৰিগ্যাল কনসার্টেই আমাৰা খুব বেশি আনন্দ পাইয়াছিলাম। ইহা ব্ৰিস্টল ম্যাড্ৰিগ্যাল সোসাইটি কতৃক ব্ৰিস্টলে অৰ্হুষ্ঠিত হৈয়াছিল। ম্যাড্ৰিগ্যালৰ অৰ্থ প্ৰেমসঙ্গীত। ইংল্যাণ্ডেৰ সৰ্বত্র ইহাৰ খ্যাতি আছে। লণ্ডন ম্যাড্ৰিগ্যাল সোসাইটিৰ প্ৰেসিডেণ্ট ১৮৪৩ সনে বলিয়াছিলেন, “If you want to know what a madrigal is, go to Bristol.” ইহাৰ পৰ নানা স্থান পৰিদৰ্শন কৰিলাম, তন্মধ্যে উইলিস কম্পানিৰ তামাকেৰ কাৰখানা উল্লেখযোগ্য। সবই কলে হইতেছে তামাক কাটা সিগাৰেট তৈয়াৰি—সব। পৃথিবীৰ নানা স্থান হইতে পাভা আনিয়া ইহাৰা নিজেদেৰ প্ৰয়োজন অহুযাৰী প্ৰস্তুত কৰিয়া লয়। দেখিয়া হুঃখ হইল যে ইহাৰা ভাৰতবৰ্ষ হইতে কোনো তামাক পাভা লয় না।

প্ৰত্যেক ভাৰতীয়েৰ পক্ষে ৰাজা ৰামমোহন ৰায়েৰ সমাধিকে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা একটি ধৰ্মীয় কৰ্তব্য। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, ঠুড়ি ঠুড়ি বৃষ্টি পড়িভোঁছিল। সেদিন সেই ১৮৮৬ সনেৰ ৭ই সেপ্টেম্বৰ, আমি সেই সমাধিৰ পাৰ্শ্বদেশে জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া প্ৰাৰ্থনা জানাইলাম—ঈশ্বৰ আমাদিগকে সত্যেৰ পথ দেখাও, এবং আমি বাঁহাৰ সমাধিক্ষেত্ৰে বসিয়া আছি, তিনি জীবনে বেৰণ কৰিয়াছেন, তেমনি আমাদিগকে শান্তি দাও, মনেৰ বল দাও যাহাতে তাঁহাৰ স্তায় সমস্ত জীবন সত্য পথে চলিতে পাৰি।” আমি ব্যাকুল হৃদয়ে প্ৰাৰ্থনা জানাইলাম, “যেন আমি কখনও ভীক না হই।” আৰও আমাৰ মনে তখন যে-সব ভাবেৰ উদয় হৈয়াছিল তাহা আমি প্ৰকাশ কৰিতে পাৰিব না, আমাৰ ব্ৰহ্মবাসীগণ তাহা অহুমান কৰিয়া লইবেন। আমি যখন এই ভাবে চিন্তামগ্ন ছিলাম। সেই সময় আমাৰ নিকট এক ভদ্ৰলোক গাৰ্ভিনা বলিলেন, তিনি

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষভাবে আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছেন—রামমোহন রায়ের মৃত্যু বিষয়ে যাবতীয় দলিল তিনি আমাকে দেখাইবেন। বর্তমান সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার দেহ লইয়া আসিবার বিবরণও তাৎক্ষণিক দেখা যাইবে। আমি সে সব দেখিলাম। কিন্তু সেগুলির বিবরণ দেওয়া এখানে অনাবশ্যক, কারণ তাহা বাংলা বা ইংরেজী অনেক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি ঐ স্থান ত্যাগ করিলাম; শুধু বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলাম, রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর আমরা আমাদের সমাজের বহু আবর্জনা দূর করিতে কতটুকু চেষ্টা করিয়াছি।

ট্রিস্টলে দুইজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল—তাঁহাদের নাম মিস্টার আর সি দত্ত এবং মিস্টার বি এল গুপ্ত। তাঁহারা সম্প্রতি নরওয়ে ভ্রমণ শেষ করিয়া ইংল্যাণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ঐখানে মাঝামাঝি সময়ে তাঁহারা নরওয়েতে ছিলেন, স্তত্রয়াং তাঁহারা সেখানে দীর্ঘকাল অন্তরীণ সূর্য দেখিয়াছেন। স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার কৃষক সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে আপ্যায়ন করিয়াছেন; আতিথেয়তা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ সে কথা সপ্রশংস ভাষায় বর্ণনা করিলেন।

একমাত্র ট্রিস্টলের অভ্যর্থনাতেই আমরা বাঙালী দেখিতে পাইলাম, অন্তর্য দেখি নাই। সরকারী গন্ধ যাহাতে আছে, অথবা রক্ষণশীলতার স্পর্শ আছে এমন অস্থানাদি হইতে তাঁহারা দূরে থাকেন। নরওয়ে ইণ্ডিয়ান ক্লাবেও তাঁহাদের ভিড় করিতে দেখি নাই। অথচ ইহা ইংল্যাণ্ডে প্রবাসী ভারতীয় এবং বাহারা পূর্বে ভারতে বাস করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য স্থাপিত। ইংল্যাণ্ডের বাঙালীরা উদারপন্থীদের ক্লাবে যোগ দিয়া থাকেন। ইহারা উদারপন্থীদের দিকে ঝুঁকিয়াছেন কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। বাঙালী পান্ডিত্য জীবনধারা ও নীতি মোটামুটি আশ্চর্য

করিয়াছে, সেজন্য শ্রেণী-স্বাতন্ত্র্য তাহার কাছে অকর্টিকর; অতএব বাহারা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হইয়া তাহার সুবিধা-গুলি ভোগ করিতে চাহে, তাহাদের সে এড়াইয়া চলে। পান্ডিত্য শিক্ষার ফলে, স্বরূপাতীত কাল হইতে হিন্দু সমাজের যে উচ্চ বর্ণকে সে পূজা করিয়াছে, তাহাকে সে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে, তাহার স্থলে অল্প পূজনীয়কে বসাইবার গরজও তাহার নাই। তাহার জিজ্ঞাসা “ভারতীয়রা ব্রিটিশ প্রজাক্রমে জন্ম-স্বাধীন কি না? ব্রিটিশ নাগরিকের জায় তাহাদের সমস্ত বিষয়ে অধিকার আছে কি না?” এ প্রশ্ন তাৎক্ষণিক কেহ পছন্দ করে না। তাহাকে নিম্না করা হয় এ কারণে যে, সে তাহার স্বাধীনতা ও মাসিক ৮ টাকা উপার্জনের বিনিময়ে কেন মাসিক ৭ টাকা বেতনে বাহিরে যুদ্ধ করিবার জন্য সেনা হইতে চাহে না? আরও অনেক সত্য মিথ্যা এবং অধিকাংশই মিথ্যা কারণে সে নিম্নিত হয়, ইহাতে ব্রিটিশদের সন্মান আমাদের দেশে নষ্ট হইয়া থাকে। তাহার অনেক দোষ আছে সন্দেহ নাই, এবং সে দোষ ভারতীয় চরিত্রের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে; এবং এ দোষ অল্প নানা কারণে এবং পরিবেশের জন্য সমূল দূর করা সম্ভব নহে। তথাপি বাঙালীকে ভারতের স্বতঃসম্মান বলা হইয়া থাকে। ইহা যারা তাহাকে প্রশংসাই করা হয়। এ বিশেষণ তাহার নহে, কারণ স্বতঃসম্মান বাহা করিবে ভাবে, তাহা সে করে। বাঙালী তাহার মত বিশ্ববুদ্ধি এবং সকল কাজে দৃঢ়সঙ্কল্প নহে। স্বতঃসম্মান চিন্তার গুরুত্ব অর্পণ করে, কাজে গুরুত্ব অর্পণ করে। বাঙালী অনেক সময়েই গুরু চিন্তা করে, কিন্তু কাজ করে লম্বু ভাবে। সে আবেগ-সর্বস্ব এবং ধৈর্যহীন। সে ভারতের শিশু ক্রোধময়। সে সতর্ক নহে, বিচক্ষণ নহে। কিন্তু সমস্ত দোষ সত্ত্বেও, ভারতে, উদার নীতি ও বাঙালীর সমর্থক হইয়া দাঁড়াইতেছে। সে ইংল্যাণ্ডে যায় এই উদ্দেশ্যে যে, সেখানে তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সমর্থক পাইবে। সেইজন্য ইংল্যাণ্ডে গিয়া এক দলের সঙ্গে মিশে, অল্প দলকে খুশি রাখিবার চেষ্টা করে না।

# বৃত্ত

অর্ধেক চক্রবর্তী

বাস্ থেকে নামতেই চারপাশ থেকে ছোপ্ ছোপ্, বৃষ্টিতে অন্ধকার অমলকে আঠেপুঠে ঘিরে ধরে। কোলকাতা শহরে এমন অন্ধকার কেন ভাবাই যায় না। ছোট্ট টর্চের ক্ষীণ আলোটুকু অন্ধকারে ভীক মনে হয়।

মনটা ঝিঁচিয়ে ওঠে অমলের। যত সব..... কেন রে বাপু যুদ্ধ? যুদ্ধ-টুকু মানেই ব্ল্যাকআউট আর শয়রানির একশেষ। কারও পৌষমাস কারও সর্দানাশ। যুদ্ধ না করলে কারও রাতে ঘুম হয় না। আর যুদ্ধের তাগুবে অমলের মতন ছাপোষা মানুষের মরণ আর কি? বেবিবুড্, রাতারাতি উধাও। বাগ্‌ডি মার্কেটে লাইন দিয়ে কিনতে গেলে অফিস কামাই হয়। তবু ভাগ্যিস টাটা আগে কেনা ছিল। নইলে এই ব্ল্যাক-আউটের বাজারে সেলামি দিয়ে হয়তো ডবল দামে কিনতে হ'তো। এই তো খবরের কাগজের ওপর সারচাফ বসেছে। পোস্টাল-ইয়াম্পে বাড়তি পয়সা গুনতে হচ্ছে। গু...আমাদের কথা কেউ ভাবে না।

ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢুকে বাইরের অন্ধকারটা গা থেকে কেচে ফেলে অমল। ঘরে ঢুকেই মনটা দ্বিগুণ ঝিঁচিয়ে ওঠে বিহানায় চোখ যেতে। টুকলু শুয়ে। ওপালে ওর ভিজ জ্বাড়া। পাখা হাতে মাথার কাছে বসে গোপালের মা।

—টুকলু কি জ্বর হয়েছে? অমল জিগোস করে।

—ই.....হুপরে ভাত খাওয়ার পর গা গরম হ'য়ে—

—ই—বুকেছি। ডাক্তারকে খবর দিয়েছিলাম?

—আমি একলা কি ক'রে যাই বলো দিকিনি?

গোপালের মা'র কথাটা যেন চাবুক মারতে থাকে অমলকে। ইচ্ছে হয় ঠাসু ক'রে এক চড়ু কবিয়ে দেয় ওর গালে। তোমার টাকা দেওয়া হয় কি মুখ দেখতে?

টাকা তো গাছের গোটা নয়। বোজগার করতে মেহনত লাগে। একলা জেনেই তো কাজ ক'রতে এসেচো। মাস গেলে গোটা কয়েক কড়কড়ে নোটও পাচ্ছে।

কিন্তু না, নিজেকে সামলে নেয় অমল। কিছু বলে না গোপালের মাকে। সত্যিই তো, ওরই বা দোষ কি? টাকার বিনিময়ে ও তো খুবই ক'রছে। ওর কাছে এর বেশী আশা করাও অস্বাভাবিক। বেশি টাকা নিয়েও আর কেউ তো রাজি হয়নি টুকলুকে সারাদিন রাখতে। আর স্থলতা.....? স্থলতা তো টুকলুর মা। স্থলতা কতটুকু ক'রছে নিজের ছেলের জন্তে? ই্যা—টাকা পয়সা বোজগার ক'রছে স্থলতা। ভালো জামা-কাপড় আর খাবার দাবার যোগাচ্ছে ছেলের জন্তে। কিন্তু মায়ের কাছে শিশু-সন্তানের এইই কি সব? মনটা বিষয়ে ওঠে অমলের স্থলতার ওপর। অফিস থেকে এখনি ফেরিনি স্থলতা। কখন কিভাবে কে জানে।

বিশেষ ক'রে টুকলু হবার পর স্থলতাকে কতবার বলেছে অমল, এবার না হয় চাকরিটা ছেড়েই দাও। অন্ততঃ টুকলুর দিকে চেয়ে।

স্থলতা রাজি হয়নি।

বলেছে, সে তোমার ভাবতে হবে না। সারাদিনের একটা লোক রেখে নেবো। আর.....একটু বড় হ'লে ওকে কন্ডেক্টে দ্বিগুণ দেবো।

বিড়বিড় ক'রে নিজের মনে বলতে থাকে অমল, নাও লোক রাখো এবার। কন্ডেক্টে দ্বিগুণ দাও। যত্ন তো সব.....।

গোপালের মাকে বললো, তুমি বাড়ি যাও গোপালের মা।

গোপালের মা চলে যায়। সার্সির ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকায় অমল। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা আর কেবল গুটিপাকানো অন্ধকার। কোনও ফাঁক-দুকের দিয়ে এক বলক আলোও বাইরে আসছে না কোথাও। কৃষ্ণ পক্ষের কালো আকাশে কেবল অসংখ্য তারা মিট-মিট করে হাসছে। ওঃ...বুদ্ধ...রয়াক্-আউট...কৃষ্ণপক্ষ সবই যেন সময় বুকে এসেছে।

অমলের কাছাকাছি কোনও ডাক্তার নেই। দূরের ডাক্তারকে কল দিলেও এখন আসবে না। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে এদিকে রিক্শাও বেয়োর না। ওরাও তো মাহুয? অথচ রিক্শা ছাড়া টুকলুকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। টুকলুর কপালে হাত রাখে অমল। কপালটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। বগলে থার্মোমিটার লাগায় অমল।

হুলতা ঘরে ঢোকে।

হুলতাই জিগোস করে, কি হলো? টুকলুর কি মর হ'য়েছে?

—হ'.....।

—কখন হ'লো?

—দুপুরে খাওয়ার পর।

—ডাক্তার দেখিয়েছে?

—না।

—সে কি! গোপালের মা কই?

—চলে গেছে। আমি যেতে বলাছি।

—আতর্ষ.....! আচ্ছা, বলতে পারো ওকে এক-কাড়ি টাকা দিয়ে রেখেছি কি ভুলে?

—জানি। কিন্তু... ..ও-ই বা একলা কি করবে?

—মানে?

—মানে টাকার বিনিময়ে ও তো খুবই করছে।

—খুব না ছাই। ও না পারে ছেড়ে দিক। আমি কালই অল্প লোক ঠিক করবো। খই হিটোলে আবার কাকের অভাব।

—জানি অনেক সময় কাকের অভাব হয় না। কিন্তু গত এক বছরে কটা লোক এলো আর গেলো তার হিসেব করছো কি? যাকে যে ক'মাস লোক ছিল না

তখন তো টুকলুকে দেখার জন্যে বাড়িতে থেকে তোমার আমার ছুটিও প্রায় শেব হ'য়েছে।

অমলের কথার কোন উত্তর দেয় না হুলতা।

অমলই বলে আবার, ভুলে যেয়ো না হুলতা টাকায় হুনিয়ার সবকিছু পাওয়া যায় না। তাছাড়া টুকলু তোমার ছেলে, আগার ছেলে।

হুলতার মেজাজটা তিরক্খি হ'য়ে ওঠে অমলের কথায়।

হুলতাই বলে, অমল.....লেবু বেশ ৮টকালে টক হয়। তোমার ওই খোঁচা আমার ভাল লাগে না। আমার চাকরিটাই কি তোমার চক্ষুশূল—

ভূমি ভুল করেছা হুলতা। চাকরির প্রশ্নটা এখানে বড় নয়।

—না অমল, ভুল আমি কোনদিন করিনি। আজও নয়। যখন আমরা আলাদা হ'য়ে এখানে চলে এলাম তখন তেন এসব তালিয়ে ভাবোনি?

—ভেবেছিলাম। বলতে পারি বেশ ভালো মনেই ভেবেছিলাম। আর এও ভেবেছিলাম যে হুলতার ব্যক্তিগত জীবনটাটুকু নষ্ট করা আমার উচিত নয়।

—তবে আজ হঠাৎ এমন খড়্গ্হস্ত হ'য়ে উঠেছো কেন? যোগ কি মাহুযের হয় না?

—হ্যাঁ স্বীকার করি। শরীর থাকলে যোগ আসবেই। কিন্তু...ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে একেবারে যে জানো না তা তো নয়। বাবা-মা চাকরি করার ফলে ওরা কারও ক্রোজ্-এ্যাকেশন তেমন পায় না। তাই ওদের জীবনে আগে হতাশা। বিশেষ করে আমেরিকানদের মধ্যে, যার পরিণতি চরম উচ্ছ্বলতা।

—এও তোমার আগেই ভাবা উচিত ছিল অমল। আমি চাকরি পাবার পর একদিনও তো তোমায় এসব বলতে গিনিনি? সেদিন টাকার অভাব আর সম্বলতাকেই বড় করে দেখেছিলে?

—কি বলছ ভূমি, হুলতা? রাগলে তোমার মুখে কিছু আটকায় না।

—আমি ঠিকই বলাছি। রাগটা পুরুষের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। তবু সেটা যদি অজায় না হ'তো। ভূমি যদি—

—থাক। তোমার সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছে বা সাহস আমার নেই। তবে একটা জিনিস সব সময় মনে রেখো সুলতা, টাকা দিয়ে মানুষের স্নেহ কেনা যায় না।

—জানি। চাকরি ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—আর কোনদিন আমি তোমায় চাকরি ছাড়তে বলবো না সুলতা। সত্যিই তো আজকের দিনে একটা চাকরি লটারির সামিল, সেখানে ভূমি কেন আমার কথায় তা ছেড়ে দেবে?

খুব সাদাসিধে গলায় বললো অমল। কিন্তু বুঝলোনা ওর কথাগুলো সুলতা শুনলে কি না। কারণ সুলতা হাতের ব্যাগটাকে ড্রসিং-টোবিলে ছুঁড়ে সবগে বাধক্ৰমে ঢুকে পড়েছে। খটাসু ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়। এমনিতেই মেয়েদের বাধক্ৰমে সময় লাগে বেশি। সুলতার তো আরও বেশি। আজ আবার কতক্ষণ লাগবে জানে না অমল।

দেওয়ালে সুলতা-অমলের বিয়ের ছবিটার দিকে চেয়েই সুলতার কথা ভাবে অমল। আর সুলতাকে বিয়ে নিজের অতীতটা। হ'তে পারে সুলতা নিজের ঐ, কিন্তু একেক সময় সত্যিই ভেবে পায় না অমনি মেয়েদের মনটা কি দিয়ে তৈরী। কবির মেয়েদের সর্গসহা বলে যত উপমাই দিক না কেন, অমল ভেবে পায় না অন্ততঃ সুলতার মতন শিক্ষিতা মেয়েরাও কেন যুহুর্ভের মধ্যে স্নেহের পাঁচল ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিতে পারে। অল্প মেয়ের সম্পর্কে ধারণা নেই অমলের। কেননা মেয়েদের সঙ্গটা বরাবর বাঁচিয়ে চলেছে অমল। তাই সুলতাকে দিয়েই আর পাঁচটা মেয়ের বিচার করতে চায়। এও অমল অনেকদিন ভেবেছে যদি মন নামক জিনিসটা অ্যাবস্ট্রাক্ট না হ'তো তবে হয়তো ও নিজেই একদিন গবেষণা করতো, বিশ্লেষণ করে দেখতো।

ওদের বিয়ের দু'বছর পর টুকলুর জর। টুকলু হবার পরেই গোলমালের শুরু। এদিকে সুলতার চাকরি.....আরেকদিকে টুকলুর দেখাশোনা কেমন যেন ভালগোল পাকাতো থাকে। বাড়িতে বৌদিদের প্রত্যেকের কোলে একজন বা দুজন। একমালা লোক কাকে কখন রাখে। মা তো ঠাকুর ঘর নিজেই ব্যস্ত। অমলের হাত পড়ার আগেই ভান্ডনের ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়ে গেছে তখন।

সেদিন রাতে বালিশ আঁকড়ে ধরে সুলতা বললো, টুকলুকে দেখাশোনা করার জন্যে একজন লোক ঠিক ক'রতে হবে।

একটু আশ্চর্য হয় অমল।

—ভূমি কি ঠাট্টা করছো সুলতা?

—না না না। ঠাট্টার বয়েস আমার নেই। যা বলাছি তাই করো। আমি তো কারো কথা শুনতে বাজি নই।

—ভূমি কি বলতে চাইছো আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না সুলতা।

এক ঝটকায় বালিশটা ঠেলে দিয়ে বিব্রত সুলতা কুপিতা গর্গিনীর মতন অমলের মুখের কাছে মুখ এনে এনে বলে, তা বুঝবে কেন? তাকা পুরুষ আমার। ভূমি যে বধির, তোমার চোখ যে অন্ধ। তাই কিছু শুনতে পাও না, দেখেও দেখতে পাও না।

বালিশে মুখ গুঁজে কোঁপাতে থাকে সুলতা। অমল ভাবতে থাকে সুলতার কথা। এক সময় সবই জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যায় অমলের কাছে।

অমলই বলে, আমি বধির নই, কানা নই সুলতা। সবই বুঝি কিন্তু.....একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতে গেলে এক আধটু কথা শুনতে হয় বৈকি। সেজন্য কিছু মনে করলে তো চলে না। সুলতা ভেমনিই কোঁপাতে থাকে।

অমলই বলে আবার, এমনি করেই মানুষ হয়েছি সুলতা, কোলে আমাদের নেবার কেউ ছিল না।



তাহাড়া বেশি যত্নে শিশুদের ভাচারাল প্রোধ্ নষ্ট হয়ে যায়।

হুলতা ফৌস করে বলে ওঠে, তোমার ইচ্ছে হয় এখানে থাকো, আমি তো কারও অধীন নই। আমি টুকলুকে নিয়ে অস্ত্র কোথাও—

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল হুলতা।

হিটারে চায়ের কেটলি চাপাল। অমল নীরবে হুলতাকে দেখে। হৃদিস্তার রেখামাত্র নেই হুলতার মুখে অথচ এখনই টুকলুকে নিয়ে ডাক্তারখানায় যাওয়া দরকার। হুলতাকে কিছু বলতে সাহস হয় না অমলের। হুলতাও সারাদিন খেটেখুটে ফিরেছে, কিছু বলতে গেলে আবার হয়তো পাঁচকথা শুনিবে দেবে। অমলের নিজেরও আজ খুব খাটুনি গেছে। হোক না ছোট কোম্পানী। কিন্তু বহরের শেষে ডিসেম্বর মাসে জন্ম হিসেব-নিকসের পাহাড় দেখলে গায়ে জ্বর আসে। বেশির ভাগই দেখতে হয় অমলকে কিনা? আজও সারাদিন দম ফেলার ফুরসৎ পায়নি। শরীর ক্লান্ত। মাথাটাও ভার হ'য়ে রয়েছে। এখন একটু বিশ্রাম দরকার।

কিন্তু না। উঠে পড়ে অমল। বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে ঠাণ্ডা জল ঠাসে। বেরিয়ে এসে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। চিরুনি বুলিয়ে এলোমেলো চুলগুলো ভদ্রস্থ করে। ব্যাগ থেকে কয়েকটা টাকা বের করে পকেটে পোরে।

হুলতা এতক্ষণ চুপচাপ অমলকে লক্ষ্য করছিল।

একবার জিগ্যেস করলো, চললে কোথায়?

—কোথায় আবার? ডাক্তারখানায়।

—চায়ের জল চাপিয়েছি দেখতে পাওনি?

অমলের নিজেরও চায়ের নেশায় মনটা উসখুস করছিল। তবু নিজেকে চেপে বললো, ই...পেয়েছি। কিন্তু চায়ের চাইতে টুকলুর মেডিসিনের ইম্পরট্যান্স এখন অনেক বেশি।

দগ্ করে অলে ওঠে হুলতা।

—বলতে পারো তুমি পুরুষ হয়ে জন্মেছিলে কেন?

আশ্চর্য...আজকের দিনে এমন ভীড় আর নার্ভাস পুরুষ আমি দেখিনি।

অমল কথা বলে না। অমলের নীরবতা হুলতাকে আরও খিঁচিয়ে তোলে।

—একেক সময় মনে হয় তোমার সঙ্গে আমার বিয়েটাই জীবনের একটা বিরাট ভুল।

হুলতার কথায় বোমার মতন ফেটে পড়ে অমল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ...আমারও তাই মনে হয়। কেন, পথ তো খোলাই রয়েছে। ভুলটা যদি ভাঙতে পারো—

—মা, একটু জল...?

টুকলু জল চায়। হুলতার মনের আগুনটা যেন হঠাৎ নিবে যায় টুকলুর কথায়।

টুকলুকে জল দিতে দিতে অমলকে বলে হুলতা, মিনিট দশেকের মধ্যেই চা হয়ে যাবে। খেয়েই যাওয়া যাবে। দশ মিনিটে এমন কি আর হবে?

হুলতার কথায় আগের সেই ঝাঁকুনেই। তবু অমল কোনও কথা বলে না। সার্গির ভেতর দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখে। সূচিভেদ্য অন্ধকার বাইরে। প্রাণের স্পন্দনও যেন স্তব্ধ। অন্ধকার আকাশে কেবল মিটমিটে তারাগুলো যেন অমলকে ব্যঙ্গ করছে।

চা খাওয়া হ'লো। ইচ্ছে না থাকলেও অমলকে খেতে হ'লো। চা তো নয়। যেন হুলতার বিষ মেশানো গরম কথাগুলো অমলকে পুড়িয়ে দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

টুকলুকে ভুলতে যাচ্ছিল অমল।

হুলতা বললে, ওকে আমার কাছে দাও। ভালো করে গরম কাপড় জড়িয়ে দাও। যা শীত পড়েছে। অমল বললো, দুজন গিয়ে লাভ কি হুলতা? তুমি না হয় বাড়িতেই থাকো। আমি ওকে নিয়ে গিয়ে...

হুলতার মুখের দিকে চেয়ে অমল কথা শেষ করার সাহস পায় না। হুলতার মুখটা পাথরের মতন শক্ত। চোখহুটো থেকে যেন আগুনের ফুলকি ঠিকুরে বেরিয়ে আসছে। টুকলুকে হুলতার কোলে তুলে দেয় অমল। টচটা নিয়ে হুলতার পেছন পেছন বেরিয়ে আসে।

বাইরে বেরুতেই ঘুটঘুটে অন্ধকার বহুতে ওদেরকে গিলে  
নেয়।

গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পা দিতেই কেঁপে কেঁপে  
সাইরেন বেজে ওঠে। থমকে দাঁড়ায় ওরা। সাইরেনের  
আওয়াজে গলা মিলিয়ে আলি গলি থেকে গোটাকয়েক  
কুকুরও চোঁচিয়ে চলেছে।

—প্রেন্-এ্যাটাকিং সিগ্ণ্যাল।

অনুটে বললো হুলতা।

—হঁ...।

মেজাজটা অমলের আবার তিরিকুঁথি হ'য়ে ওঠে।  
প্রেন্-এ্যাটাকও খুব সময় বুঝেই এসেছে। বিপদ যখন  
আসে চারদিক থেকেই যেন আটপেট্টে ঘিরে ধরে।  
ওঃ...এও যেন অমলের জীবনের এক চরম পরীক্ষা।

—কি করবো, কিরে যাবো কি?

হুলতা জিগ্যেস করলো।

—না। বেরিয়ে যখন পড়েছি, যাবোই। কপালে  
মরণ থাকলে হবে।

পা বাড়ায় অমল। পেছন পেছন ছেলে কোলে  
হুলতা।

টরের আলোটা নিচের দিকে ফেলছে অমল।  
ছোট টরের কীণ গোলাকার আলোটুকু চারপাশের  
সংগ্রাসী অন্ধকারে ভিত্তিমিত বলয় তৈরী করছে। অমল  
দেখতে পাচ্ছে ওই বলয়ের মধ্যে একটা কচি মুখ ডাগর  
হুটি চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে গভীর প্রত্যাশা নিয়ে।  
আর বলয়ের পরিধি খিরে ঘুরপাক খাচ্ছে হুলতা আর  
অমল।

## কংগ্রেস স্মৃতি

(সপ্তদ্বিংশ অধিবেশন—গয়া—১৯২২)

শ্রীগিরিজামোহন সাত্তাল

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী  
শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বোম্বাইতে বিশেষ অধিবেশন  
করার অক্ষমতা জানালেন। তখন তৎকালক শেরওয়ানী  
দিল্লী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আসফ  
আলীর পক্ষ থেকে দিল্লীতে বিশেষ অধিবেশনের জন্য  
কংগ্রেসকে আহ্বান করলেন।

এই সময় নাগপুরে জাতীয় পতাকা আন্দোলন খুব  
ঝোরে চলছিল।

এই সময়েই আবার উত্তর ভারতের নানা স্থানে  
বিশেষতঃ মিরাত, সাহাবানপুর, আজমীড়ে হিন্দু-  
মুসলমানের দাঙ্গা বেধে গেল।

ইতিমধ্যে নাগপুর পতাকা আন্দোলন দমন করতে  
গভর্ণমেন্টের দণ্ডনীতির উৎকর্ষ প্রকাশে যে গুরুতর  
পরিণতি উপস্থিত হল—তা আলোচনার জন্য নাগপুরে  
জরুরি অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের জন্য  
বল্লভভাই প্যাটেল ৬ই আগষ্ট অধিবেশনের দিন স্থির  
করে জানালে বিশাখাপত্তনম থেকে দেশভক্ত বেকটাগারা,  
রাজাগোপালাচারী ও দেশপাণ্ডে নাগপুর যেতে ৪ঠা  
তারিখে কলিকাতা রওনা হলেন।

৬ই আগষ্ট নাগপুরে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি  
সভাপ্রবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করে যথোচিত উপায়  
অবলম্বন করল।

অন্তর্ভুক্ত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের জন্ত ১ই আগষ্ট তারিখে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হল এবং তার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন যথাক্রমে ডাঃ আনসারী ও আসফ আলী।

দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে স্বরাজ্য পার্টি ও নো-চেঞ্জারদের ভাগ্য পরীক্ষা হবে সুতরাং উভয় পক্ষই কংগ্রেসে তাদের পক্ষের প্রতিনিধি পাঠানোর জন্ত উঠে পড়ে লেগে গেল।

স্বরাজ্য পার্টির সভাপতি যদিও দেশবন্ধু দাশ কিন্তু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি তখন নো-চেঞ্জারদের কজায়, উক্ত কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে ছিলেন শ্রামসুন্দর চক্রবর্তী ও ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। সুতরাং প্রাদেশিক কমিটি তাঁদের হাত থেকে কেড়ে নিতে না পারলে বাংলা থেকে স্বরাজ্য পার্টির পক্ষে অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠানোর সম্ভাবনা নেই, অতএব নো-চেঞ্জারদের অপসারিত করে নিজদিগের লোকদ্বারা বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি গঠন করার উদ্দেশ্যে স্বরাজ্য পার্টির কয়েকজন সদস্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির বিশেষ সভা আহ্বান করার জন্ত সেক্রেটারী ডঃ ঘোষের নিকট একটি রিকুইজিশন পাঠালেন, ঐ রিকুইজিশন ডঃ ঘোষের নিকট ১৬ই জুলাই তারিখে পৌঁছায়, কমিটির বিধানানুসারে ৩০শে আগষ্ট তারিখে সভা আহ্বান করার কথা এবং তার ৭ দিন পূর্বে অর্থাৎ ২৩শে আগষ্ট সভার নোটিস দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ডঃ ঘোষ তা না করে ৩১শে জুলাই তারিখে নোটিস দিয়ে ১৫ই আগষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে বেলা ৩টার সময় সভা আহ্বান করলেন।

আইনানুসারে সময় মত সভা আহ্বান না করার রিকুইজিশন-কারীদের উপর সভা আহ্বানের অধিকার বর্তমান। তারা এ সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করে ভারত সভা হলে কমিটির সভা আহ্বান করার জন্ত নোটিস দিল এবং ১১ই আগষ্ট সভার তারিখ ঠিক করল। নির্দিষ্ট তারিখে অখিলচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশন হল। সভায় অত্র

প্রস্তাবের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকের পদ শূন্য বলে গণ্য করা হল এবং তৎস্থলে মোলানা আকাম খাঁ ও ভূপতি মজুমদারকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত করা হল। আর একটি প্রস্তাব দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন সম্বন্ধে, কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচন সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে এবং অর্ডার জারি করা হয়েছে সেগুলি সংশোধন করার ক্ষমতা কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতিতে দেওয়া হল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচন বা তা রদ করা অথবা স্থগিত রাখার ক্ষমতাও একুজিকিউটিভ কাউন্সিলকে দেওয়া হল। সময়ের অল্পতা হেতু কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্ত নির্বাচন সম্বন্ধীয় আইন স্থগিত রেখে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতাও উক্ত কাউন্সিলকে দেওয়া হল।

এর পর ভূপতি মজুমদার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসাবে ১৫ই আগষ্ট বেলা ৩টার সময় ভারতসভা গৃহে কমিটির সভা আহ্বান করলেন। প্রকাশ থাকে যে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষও ঠিক ঐ তারিখে ও ঐ সময় উক্ত গৃহে রিকুইজিশন সভা আহ্বান করেছেন।

১৫ই আগষ্ট নির্দিষ্ট সময় ৩টার বহু পূর্বেই উভয় দলের সদস্য দ্বারা ভারত সভা গৃহ পূর্ণ হয়ে গেল। হলের মধ্যস্থলে একটি টেবিলে মোলানা আকাম খাঁ ভূপতি মজুমদারকে পাশে রেখে বসলেন। তার নিকটেই আর একটি টেবিলে শ্রামসুন্দর চক্রবর্তী ডঃ ঘোষের সঙ্গে আসন গ্রহণ করলেন।

৩টা বাজা মাত্র শ্রামসুন্দর চক্রবর্তীর নির্দেশে গত ৩০শে জুন তারিখের কমিটির মিটিংয়ের মিনিট ডঃ ঘোষ পড়তে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মোলানা সাহেবের নির্দেশে ভূপতি মজুমদার ১১ই আগষ্ট তারিখের সভার মিনিট পড়তে আরম্ভ করলেন। তখন প্রচণ্ড হৈ চৈ ও গুণগোল আরম্ভ হয়ে গেল। কোলাহলের মধ্যে কারো কথাই শোনা গেল না। উভয় দলের সভ্যদের মধ্যে বচসা ও ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হল। নো-চেঞ্জারদের

দলের মাধনলাল সেনকে আমি একটা কথা বলতে উদ্যত হতেই তিনি সজোরে আমাকে থাকা মেরে সরিয়ে দিলেন। গুণগোলের মধ্যে ১১ই আগস্টের সভা বৈধ বলে গণ্য করা হল এবং কাঁকিনাড়া কংগ্রেসের জন্ত মোলানা মহম্মদ আলীর নাম সুপারিস করা হল। অত্যন্ত বিরাগের সঙ্গে শ্রাবশ্বরের চক্রবর্তী, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, হরদয়াল নাগ, শরৎ কুমার ঘোষ, মুজিবর রহমান প্রভৃতি নো-চেয়ার নেতাগণ সভা পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। সভার স্বরাজ্য দলের সভ্যপ্রচন্দ্র মিত্র, পুরুষোত্তম রায় ও আমেদ আলী সভায় অংশ গ্রহণ করে খুব টৈ টৈ করেছিলেন।

তার পরদিনই ১২নং এন্টনাবাগান লেনে শ্রীমতী মোহিনী দেবীর বাড়ীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক সমিতির (একজিকিউটিভ কাউন্সিল) অধিবেশন হয়। সভায় সাতকাড়পাতি রায়, মহম্মদ আবদুল করিম, যুগলকান্ত ঘোষ, গিরিজামোহন সান্নাল, কিরণশঙ্কর রায় এবং পদাধিকার বলে সভাপতি মোলানা আক্রাম খাঁ ও সম্পাদক ভূপতি মজুমদারকে নিয়ে একটি নির্দ্বন্দ্বিতা কমিটি গঠিত হয় এবং কমিটির আত্মায়ক নির্বাচিত করা হয় গিরিজামোহন সান্নালকে। এই কমিটির উপর দিল্লী কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচনের ভার অর্পিত হল।

১৫ই আগস্টের হাঁওরান এলোপিসিয়েশন হলের সভার পর বাংলা দেশে ছুটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি দেখা দিল। উভয় কমিটীই নিজেকে বৈধ কমিটী বলে প্রচার করতে লাগল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হুই কমিটির সম্পাদকের নামে সভাসমিতি আহ্বান ও অজ্ঞাত আহ্বায়িক ব্যাপারে নোটীস যেতে লাগল।

বাংলার উভয় কংগ্রেস কমিটির মধ্যে একটা আপোষ করার জন্ত অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী সচেষ্ট হল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী কমিটির বৈধতার প্রশ্ন বিচার করার জন্ত পণ্ডিত বদনমোহন মালবীর উপর ভারার্পণ করা হল। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র হাইকোটের উকিল আখতারুজ্জামান ঘোষ সহ নো-চেয়ারদের পক্ষে এবং দেশবন্ধু দাশ স্বরাজ্যপাটীর পক্ষে মালবাজীর সম্মুখে তাঁদের পক্ষ সমর্থনের জন্ত

উপস্থিত হলেন। উভয় পক্ষের মতামত শুনে মালবীরজী রিকুইজিশনকারীদের সভা বৈধ সাব্যস্ত করলেন কিন্তু তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে একটি আপোষের উপর জোর দিলেন। আশোষ না হলে এক পক্ষের দিল্লী কংগ্রেসের জন্ত নির্বাচিত ১৮৬ জন প্রতিনিধি অবৈধ বলে গণ্য হবে।

এই রকম সময়ে সালা লাজপত রায়, ডঃ মইনুদ্দিন কিলচলু, মোলানা হসরত মোহানী ও মোলানা মহম্মদ আলী কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন।

আগষ্ট মাসের শেষের দিকে সাহাবানপুরে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা আরম্ভ হল।

স্বরাজ্যপাটীর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির অফিস তখন বোম্বাইয়ের স্ট্রীট (বর্তমানে বিপিন বিহারী গান্ধী স্ট্রীট) ও কলেজ স্ট্রীটের সংযোগ হলে পূর্ব দাক্ষিণ কোণের গৃহের দোতলায় অবস্থিত ছিল। সেখানে দেশবন্ধু দাশ, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অভ্যাসচন্দ্র বসু, ভূপতি মজুমদার, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি কংগ্রেস নেতাগণ প্রায় সব সময়েই থাকতেন। আমিও সেখানে প্রাতিদিন যেতাম। আমাদের দলের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে, এমন সময় একদিন সন্ধ্যার দিকে দেশবন্ধু বললেন যে আমাকে পরদিনই ঐ তালিকা নিয়ে দিল্লী রওনা হতে হবে। নির্দিষ্ট ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে প্রতিনিধিদের তালিকা দিল্লী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকট না পৌঁছলে সেই তালিকা কোন মতেই গ্রহণ করা হবে না এই মর্মে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক আসফ আলী নোটীস দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন। ডাকে পাঠালে তালিকা সময়মত না পৌঁছতে পারে। পৌঁছালেও যে প্রাপ্তিস্বীকার পাওয়া যাবে তারও নিশ্চয়তা নেই। এই সকল কারণে আমাকে দিল্লী গিয়ে আলফ আলীর হাতে তালিকা দেওয়ার নির্দেশ দেশবন্ধু আমাকে দিলেন। তাছাড়া পূর্বে গিয়ে আমাদের দলের প্রতিনিধিদের থাকবার ব্যবস্থা করার ভারও আমার উপর অর্পিত হল। আমার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় দিল্লীর পরলোকগত ডাক্তার হেমচন্দ্র সান্নালের একমাত্র পুত্র তখন

কলকাতাতেই ছিলেন। দিল্লীর তাঁর বিরাট বাসভবন খালি পড়ে ছিল, সেই বাড়ী প্রতিনিধিদের জন্য ছেড়ে দিতে তাঁকে অনুরোধ করা যাত্র তিনি সম্মত হয়ে দিল্লীর ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামে এক পত্র দিলেন।

দিল্লীতে পৌঁছে চাঁদনী চক কোয়ারার সন্নিকটে পরলোকগত প্রসিদ্ধ ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনের পুত্র রাসবিহারী সেনের গৃহে আতিথ্য হল। রাসবিহারী আতিথ্যের লোক। দিল্লীতে তিনি আহুবাণু নামে পরিচিত ছিলেন। যেদিন দিল্লী পৌঁছলাম সেই দিনই সন্ধ্যার সময় অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে গিয়ে আসফ আলীর হাতে প্রতিনিধির তালিকা দিলাম।

(৩)

পরদিন প্রাতঃকালে অভ্যর্থনা সমিতি বাংলার প্রতিনিধিদের থাকবার জন্য একটি কলেজগৃহ ঠিক করে রেখেছিলেন তা দেখতে গেলাম এবং রেল লাইনের উত্তরে অবস্থিত স্বর্গীয় হেমচন্দ্র সান্নালের গৃহে উপস্থিত হয়ে বাড়ীর ভ্রাতৃবন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে ঐ বাড়ীতেও প্রতিনিধিদের থাকার বন্দোবস্ত করে এলাম। তারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ আনসারীর সঙ্গে দেখা করে জানলাম যে তাঁর বাসভবনের সামনে দরিয়াগঞ্জের একটি বিড়ল গৃহে দেশবন্ধু, পাণ্ডিত্য মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি নেতৃগণের থাকবার স্থান ঠিক করা হয়েছে।

এরপর আমার কাজ হল দৈনিক ট্রেনে উপস্থিত হয়ে বাংলার প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করে তাঁদের বাসায় পৌঁছে দেওয়া। এবারে সকলে একসঙ্গে এলেন না। কংগ্রেস অধিবেশনের দিন স্থির হয়েছিল ২১শে সেপ্টেম্বর। ১২ই, ১৩ই তারিখ থেকেই প্রতিনিধিরা আসতে লাগলেন।

দেশবন্ধু দশ তাঁর ভ্রাতৃসহ পৌঁছলে তাঁকে দরিয়াগঞ্জের বাসায় নিয়ে গেলাম।

একদিন সংবাদ পেলাম রাজের ট্রেনে কথাশিল্পী শরৎ চট্টোপাধ্যায় আসবেন। তাঁর জন্য আমার সঙ্গে আহুবাণুর বাড়ীতে থাকার বন্দোবস্ত করলাম। দিল্লী ট্রেনে

ট্রেন প্রায় রাত ১১টার সময় পৌঁছলো। ট্রেন থেকে শরৎবাবু দেশবন্ধুর ভগ্নী উর্মিলা দেবী সহ নামলেন। একজন খেজাসেবককে দেশবন্ধুর বাসস্থানে উর্মিলা দেবীকে পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিয়ে আমি শরৎবাবুকে নিয়ে একটি টাক্সি আহুবাণুর বাড়ীতে পৌঁছলাম। তখন রাত অনেক হয়েছে। সমস্ত সন্ধ্যা অস্থিরমগ্ন। আমরা যখন আহুবাণুর বাড়ীর নিকট পৌঁছলাম তখন দেখি যে গেট বন্ধ। শরৎবাবু বাড়ীতে বসে থাকলেন। আমি নেমে গেটের দরজার কড়া নাড়লাম। কেউ দরজা খুলল না। তখন আমি জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলাম। তবুও কোন সাড়া নেই। টাক্সি উপর শরৎবাবু অধৈর্য হয়ে পড়লেন এবং বললেন, “গিগিরিজা, আমাকে কেমন স্থানে ভূমি নিয়ে এসেছ। চলো, চলো, কোন একটা হোটেল নিয়ে চলো।” শরৎবাবু অত্যন্ত স্পর্শকাতর ছিলেন। তাঁর মত লোক যে গৃহে আতিথ্য হতে যাচ্ছেন সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য কেউ জেগে নেই এতে তাঁর ক্ষুব্ধ হওয়ারই কথা। যাইহোক এত রাতে হোটেল খোঁজা পাওয়া সম্ভব নয়, জানিয়ে বললাম যে, বাড়ীর মালিক আতিথ্য সজ্জন, খুব ভাল লোক। সাবান দিন তিনি কংগ্রেসের কাজে খেটে পারিশ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছেন। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর বাড়ীর ভ্রাতৃ গেট খুলে দিল। তাকে জিনিষপত্র উপরে তোলার নির্দেশ দিয়ে, টাক্সিওয়ালাকে বিদায় দিয়ে, শরৎবাবুকে নিয়ে দোতলায় আমার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করলাম।

তখন বাড়ীর ঠাকুর চাকর সবাই উঠেছে। ঠাকুর শরৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করল তিনি লুচি খাবেন, না ভাত খাবেন। ছুঁ রকম বন্দোবস্তই করা আছে। শরৎবাবু লুচি খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে ঘরের মেঝের খেতে বসলেন। ঐ ঘরের সম্মুখে একটি বারান্দা ছিল। শরৎবাবু সব খাওয়া খারজ করেছেন এমন সময় সম্মুখবর্তী বারান্দায় একটি শীর্ণকায় লোমহীন কুকুরের দর্শন পাওয়া গেল। শরৎবাবু ঐ কুকুরকে দেখে আমাকে বললেন, “ভূমি না ভক্তলোককে খুব ভাল লোক

বলেছিলে? দেখ কেমন ভাল লোক। কুকুৰটাকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলাৰ উপক্ৰম কৰেহে।” এই বলে তিনি তাঁৰ থালা খেকে একখানা লুচি ভুলে কুকুৰেৰ দিকে ছুঁড়ে দিলেন। কুকুৰ সেই লুচি লুফে নিয়ে খেয়ে ফেলল। তাৰপৰি তিনি পৰপৰি আৰও কয়েকখানা লুচি কুকুৰকে খেতে দিলেন। আমি বললাম, কুকুৰেৰ ত লোম নেই। যে কটা আছে তাও এই লুচি খেয়ে উঠে যাবে। খাওয়া দাওয়ার পৰ আমৰা সে প্ৰান্তৰ মত শয়্যাৰ আশ্ৰয় নিলাম। এই বাড়ীতে শবৎবাবু দিন তিনিও দিলেন। পৰে উত্তৰ পাশ্চিম ৱেলৰ কোয়াৰ্টীয়েৰে তাঁৰ এক ভাইপোৰ বাসায় উঠে গেলেন। যে কয়দিন আমাৰ সঙ্গে ছিলেন তাঁকে ঘন ঘন তামাক ও চা খেতে দেখোঁছি এবং প্ৰতাহ ৰাৱ-দুয়েক আফিম খেতে দেখোঁছি।

এৰপৰি একদিন সন্ধ্যাৰ পৰি সূভাষচন্দ্ৰ বহুকে অভিযন্তা কৰতে টেশনে উপস্থিত হলাম। সূভাষবাবু যখন ট্ৰেন খেকে নামলেন তখন ৱাক্সি চটা চাটা হৰে। সূভাষ বাবুকে একটা টাকায় বাসিয়ে দেশবন্ধুৰ বাসগৃহে নিয়ে গেলাম। আমৰা যখন দোহলায় পৌছিলাম তখন দেখলাম যে দেশবন্ধু দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেৰু এবং বিঠলভাই প্যাটেল ডিনাৰ খেতে বসেছেন। পণ্ডিতজী সূভাষবাবুকে বললেন, সূভাষ, তুমিও খেতে বসে যাও। তাঁৰ কথামত সূভাষবাবু টেবিলে বসলেন। দেশবন্ধুৰ প্ৰিয় ভাত্য (নামটি এখন মনে পড়েছে না) খাবাৰ সাজিয়ে টেবিলে দিয়ে গেল। তাৰপৰি খাওঁৱৰ একটা বিশেষ পদ সূভাষবাবুকে দেওয়ার কৃত্ত পণ্ডিতজী চাকৰকে ডাকলেন। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। হয়ত বিশেষ খাদ্যবস্তুটিৰ অভাব হৰ্মোঁছিল, যাই হোক, প্ৰথম দুবাৰেৰ ডাকে ভাত্যটি এল না, তাৰপৰি আসতেই পণ্ডিতজী ক্ৰোধে জলে উঠলেন এবং কড়া সুরে চাকৰকে ঘমকে দিয়ে বললেন—বেয়াদৰ, তোম কাঁহে নেছি আয়া? তোমহাৰ শিয় জুতিসেচুৰ চুৰ কৰ ডালেঙ্গে। ভাত্যটি কোন জবাব না দিয়ে তৎক্ষণাত্ সে স্থান পৰিত্যাগ কৰে চলে গেল। তাৰপৰি পণ্ডিতজীৰ ক্ৰোধ গিয়ে পড়ল দেশবন্ধু চিত্তৰঞ্জন দাশেৰ উপৰ। তাঁকেও একহাত নিলেন, বললেন, এককম বেয়াদৰ চাকৰ কেন

ৱেখেছ? দেশবন্ধু নীৰবে নতশিৰে বসে থাকলেন। একটা কথাও বললেন না।

দিব্লীতে আমাৰ উপস্থিতিৰ স্ত্ৰযোগে আমাৰ মা বিধবা সেজীদিদি ও মেক ভয়ীপতি সহ উত্তৰ ভাৰতেৰ তীৰ্থ পৰিদৰ্শন মানসে দিব্লী এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদেৰ থাকবাৰ ব্যবস্থা ডাঃ হেমচন্দ্ৰ সাজ্জালেৰ বাড়ীৰ দোতলায় কৰলাম এবং আমিও আহুৰাবুৰ বাড়ী ছেড়ে তাঁদেৰ সঙ্গে মিলিত হলাম।

একদিন সন্ধ্যাৰ পৰি দেশবন্ধু দাশ আমাকে তাঁৰ দৰিয়াগঞ্জৰ বাসগৃহে ডেকে পাঠালেন। আমি যখন গেলাম তখন তিনি শয়্যাৰ বিশ্ৰাম কৰছেন। আলীগড়ৰ কংগ্ৰেছেৰ অন্ততম নেতা ব্যাৰিষ্টাৰ তসদ্দক শেৰওয়ানীৰ সঙ্গে দেখা কৰে যুত্ৰ প্ৰদেশ খেকে স্বৰাজ্য দলেৰ বহু সংখ্যক প্ৰতিনিধি যাতে দিব্লীৰ কংগ্ৰেছে উপস্থিত হয় তাৰ ব্যবস্থা কৰাৰ জন্য অহুৰোধ কৰতে আমাকে অবিলম্বে আলীগড় যেতে বললেন। আমি তাৰপৰি দিনই প্ৰাতেঃকালেৰ এক ট্ৰেনে আলীগড় বওনা হলাম। আমি মধ্যম শ্ৰেণীতে যে কামৰাৰ উঠেছিলাম সেই কামৰাৰ একজন কোট-প্যাটলুন-খাৰী বাদ্গালী ভদ্ৰলোকও আলীগড় যাচ্ছিলেন। তিনিও শেৰওয়ানী সাহেবেৰ বাড়ী যাবেন বজেন। এতে আমাৰ বেশ সুবিধাই হোল। পৰিচয়ে জানলাম যে তাঁৰ নাম ডাক্তাৰ সুরেশচন্দ্ৰ ৱায়। বংপুৰে তাঁৰ নিবাসি ছিল। তখন তিনি গাজিয়াবাদে বাগা কৰে সপৰিবাৰে বাস কৰছেন এবং দিব্লীতে জুয়া মসজিদেৰ নিকটে একটা ডিসপেনসাৰী খুলে ডাক্তাৰি কৰছেন। অন্তান্ত ব্যবসায়ের সঙ্গেও তিনি জড়িত। তসদ্দক শেৰওয়ানীৰ একজন কনিষ্ঠ ভ্ৰাতাৰ সহিত একটা ব্যবসাতে লিপ্ত ছিলেন। সেই সূত্ৰেই তিনি আলীগড় যাচ্ছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আলাপ জমে উঠল। পৰে আৰও ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁৰ সঙ্গে পৰিচিত হৱে উঠেছিলাম। আলীগড়ে ১০টা নাগাদ আমৰা পৌছিলাম এবং একটা টাক্সি কৰে শেৰওয়ানী সাহেবেৰ গৃহে উপস্থিত হলাম।

শেৰওয়ানী সাহেব অতি সমাদৰে আমাদেৰ গ্ৰহণ কৰলেন। আমৰা দ্বিপ্ৰহাৰিক আহাৰেৰ পৰে পৌৰ্ণমাসিক

সুতরাং তিনি আমাদের আহ্বানের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি সন্নিহিত জানালাম যে আমার জন্ম কোন ব্যবস্থা করতে হবে না, আমি বাজার থেকে কিছু মিষ্টি কিনে খেয়ে নেব। তিনি জানালেন যে, তাঁদের বাড়ীতে গত ৩০ বৎসর যাবৎ গোমাংস ব্যবহার হয়নি। তিনি ভেবেছিলেন যে এই জন্মই বোধ হয় আমার খেতে আপত্তি। তাতেও আমি সম্মত না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হলেন এবং বললেন যে তিনি মনে করেছিলেন যে, বাংলা দেশ থেকে এটি উঠে গেছে (This thing has disappeared from Bengal)। সেই সময় তাঁর মাতুল উপস্থিত ছিলেন, তিনি তখন আলীগড়ে জিমিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া নামক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন। গৌরবর্ণ বুদ্ধের অতি সৌম্য চেহারা। তাঁর গায়ের রং গোলাপ ফুলের মত। তিনি মন্তব্য করলেন যে, কিছু দিন এখানে বাস করলে বাজারের নিকট খাবারের ফলে আমাকে তাঁদের সঙ্গে খেতে বাধ্য হতে হত। তিনি জানালেন যে একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক সেখানকার বাজারের খাবারে আতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে মাংস পর্যন্ত খেয়েছেন। যাই হোক, আমার জন্ম বাজার থেকে খাবার আনানো হল।

ডিনারের সময় শেরওয়ানী ত্রাত্বয়ের সঙ্গে সুরেশ বাবু টেবিলে খেতে বসলেন। আমি একই দূরে একটি চেয়ারে বসে কথাবার্তা চালাচ্ছিলাম। দেখলাম টেবিলে একটি প্রকাণ্ড জামবাটীতে মাংস রাখা হল এবং প্রত্যেকের সম্মুখে পৃথক পৃথক খালায় কুটী দেওয়া হল। প্রত্যেকেই কুটী নিয়ে সেই মাংসের বাটীতে চুবিয়ে থাকছেন। এতে আমার গা ঘিন ঘিন করতে লাগল। ভাবলাম যে, এভাবে আমি কোনমতেই খেতে পারতাম না।

শেরওয়ানী সাহেব বেশী সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠানোর জন্ত বিশেষ চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আহ্বানাদির পর শেরওয়ানী সাহেবের কনিষ্ঠ এক ভ্রাতার সহিত আলীগড়ের প্রসিদ্ধ কলেজ দেখতে

গেলাম। ছাত্রদের থাকার বোর্ডিংগুলি অতি সুন্দর। যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের ধনী মুসলমান পরিবারের সন্তানরাই বেশীর ভাগ এখান থেকে পড়াশোনা করে। এতোক ছাত্রের জন্ত একটি বসবার ঘর এবং তৎসংলগ্ন একটি শোবার ঘর। ঘরগুলি মহার্ঘ আসবাবপত্র সজ্জিত ও মেজে পুরু গালিচার আবৃত। ঘরের বাসিন্দারাও অতি সুশৃঙ্খল। গায়ের রং উজ্জল গৌরবর্ণ। ঘুরে ঘুরে একটি বাঙালী ছাত্র দেখতে না পেয়ে একজন বোর্ডারকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কোন বাঙালী ছাত্র আছে কি না। সে অবজ্ঞাভরে উত্তর দিল যে তারা কাচ্চী ঘরমে ছায়। দরিদ্র বাঙালী মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে এত বিলাসিতার খরচ জোগান সম্ভব নয়, সুতরাং তাদের কাচ্চী ঘর ছাড়া উপায় কি? ঐ কাচ্চী ঘরগুলি প্রধান বোর্ডিং ঘরগুলি থেকে দূরে থাকায় এবং দিল্লী কেরার জন্ত ট্রেনের সময় হওয়ায় আর বাঙালী ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। আলীগড় শহরও দেখা হল না। ডঃ রায়ের সঙ্গে দিল্লী ফিরে গেলাম। তারপর ডঃ রায় আমার মাধ্যমে সুরেশচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে পরিচিত হলেন। সুরেশবাবু একদিন নিমন্ত্রণ করে সুরাষ বাবু কিরণশঙ্কর রায় ও আমাকে সন্ধ্যায় তাঁর বাসায় ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করলেন। গাজিয়াবাদের বাসায় তখন তাঁর আতিথি ছিলেন আমার বন্ধু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। আহ্বানের সময় কথা প্রসঙ্গে অখিনীকুমার ঘোষের কথা উঠল। অখিনী ঘোষ তখন মডার্ন রিভিউ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। কিরণশঙ্করবাবু কেদারবাবুকে অখিনী বাবুকে মডার্ন রিভিউর সহকারী সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া যাবে কি না জিজ্ঞাসা করলেন। অখিনী বাবুর অপরাধ তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নো-চেয়ারম্যানের পক্ষে ওকালতি করতে পিণ্ডিত মদন মোহন মালবীর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিরণ-বাবুর এই রকম মনোভাব দেখে বিস্মিত হলাম।

ক্রমশঃ

# শ্রীরবীন্দ্রনাথ ১৩৭৯ জন্ম স্মরণে

সংগ্রাম সিংহ তালুকদার

ঋষি আত্মা, সর্ব-বহা অর্থাৎ তাঁরা সব কিছু সৃষ্টি করে সর্বস্বত্বের প্রবাহিত থাকেন। তাঁরা আপামর সকলের। সকলের আপন ও সকলে তাঁকে আপন ভাবে। কেমন করে তিনি সকলের আপন হন? যে আত্মা ব্রহ্মস্বত্বের সর্বদা বাস করেন তাঁর নিত্য প্রবাহিত জীবন সর্ব মানবাত্মার সঙ্গে নিত্য যুক্ত থাকেন। আমরা এমন একটি আত্মার পরিচয় পাই বর্তমান কালে। যিনি সকলের। কেউ তাঁকে দূরে ঠেলে রাখতে পারে না—কারণ তিনি যে সকলের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে নিজের চিন্তা ভাবনা এক ক'রে নিজেকে সর্বস্বত্বের বিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি রবীন্দ্র আত্মা। ভাস্কর যেমন তার প্রভাব প্রকৃতির উপর প্রতিফলিত ক'রে আপনার অনন্ত-সাধারণ প্রতিষ্ঠার পরিচয় রেখে যায়—রবীন্দ্র আত্মা তেমনি মানুষ জাতির প্রাণস্পন্দনকে নিত্য নব ভাবে, নব মাস্তুলে ও নবীন প্রেরণায় জাগ্রত করে রেখেছেন। মনে হয় মানব ইতিহাসে এ একটি বিষয়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সকলের। কবি ত অনেক জগৎগ্রহণ করেছেন। বিশ্বকবিও আমরা পেয়েছি পূর্বে। কিন্তু এমন আপন জন কি আমরা এর আগে দেখেছি? আমার জীবনের সকল সুখে, দুঃখে তাঁর আগমন। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন এমন এক অনির্বচনীয় দরদরিদ্রা দারিত্রের কাছে যেখানে আমার সকল অভাব ও সকল দুঃখের চির শান্তি, সকল সমস্তার সমাধান। যুক্ত করে যে প্রার্থনা তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্গত হ'য়েছে সে যে আমারই জন্ম তার প্রাণের আকৃতি—বিশ্বের দেবতার কাছে। এমন যুক্ত মন না হ'লে কি এমন মুক্তির আশ্বাস দিতে পারে সকল মানবকে।

Professor Young এক জায়গায় বলেছেন “There is no morality without freedom” স্বাধীনতা বা প্রকৃত মুক্তি ছাড়া ধর্মবোধ থাকেনা। পরা শান্তি। আমরা এমন একটি জীবনের সাক্ষাৎ পাই যে জীবন প্রবাহিত হ'য়েছে অনন্ত মুক্তির প্রোজল আলোকের প্রাণের রস ধারায়। যিনি রস স্বরূপ হ'য়ে পরম রসস্বরূপকে—হুঃখ, দৈন্তে ভরা মানব জীবনের প্রতি রক্তে, রক্তে ভ'য়ে দিয়েছেন সে অবদান যে বিশ্বয়কর। আজ প্রাচ্য তার জীবনের অপূর্ণ্যাপ্ত প্রাচুর্য লাভ করেই প্রকৃত সুখ বা শান্তি বাক্য বলে সেটার জন্ম উদ্ভাবিত হ'য়েছে। আমার মনে হয় রবীন্দ্র-রস-দর্শনই একমাত্র অবলম্বন যার দ্বারা তাঁরা প্রকৃত শান্তি জীবনে লাভ করতে পারবেন। আমরা প্রার্থনা করছি :—

“সংগেহুঃখং মুখিনঃ সন্ত,

সংগে সন্ত নিরাময়াঃ।

সংগে ভক্তানি পশুন্ত,

মা কশ্চিদ্ হুঃখং.....।”

“সকলেই মুখী হোক। সকলেই দ্বাহাবান হোক। সকলের ভগবৎ দর্শন লাভ হোক। কেহ যেন হুঃখ কষ্ট ভোগ না করে।”

এই প্রার্থনাই রবীন্দ্র জীবনের পরম আদর্শ। তিনি হুঃখ পেয়েছেন। কিন্তু হুঃখহারাঁকে সকলের চিন্তা বিনোদনের জন্ম প্রার্থনা করেছেন। হুঃখ আছে, বিরহ আছে, শোক আছে কিন্তু তার মধ্যে পরা শান্তি বিদ্যমান করছে, যা মানব জীবনের পরম-শ্রেয়। এই শ্রেয়কেই তিনি জীবনে সর্ব অবস্থায় চেয়েছেন ও সকলকে সেই প্রেম সিদ্ধ সুখের কণা বিলিয়ে দিয়েছেন।



# অভয়

(উপভাস)

ঐন্দ্রধীরচন্দ্র রাহা

সেই পলাশপুর তাকে ডাকছে। অভয় কি আর ছিন্ন থাকতে পারে? ছোট্ট একটা বিছানা নিয়ে, অভয় যখন নিজেকে রেল ট্রেনে নামল, তখন বেলা বারটা। পূর্বে কোনও থবর দিতে পারেনি, মন চকল হয়ে উঠছিল। মালদহের সঙ্গে সমস্ত যোগসূত্র কেটে অভয় বেরিয়ে পড়ল। যাবার আগে জেঠাইমাকে প্রণাম করতে গেল অভয়। আশালতা শুয়েছিলেন, উঠে বসে বললেন, কি করব বল বাবা। উনি থাকলে তোমার এতটা উপায় হ'ত অবিশ্য। কিন্তু বর্তমানে তার উপায় নেই। যাক, পৌছে একটা চিঠি দিও।

—হাঁ দেব। আশালতা বললেন, একটু দাঁড়াও অভয়। ট্রেন কটায়, সেই তিনটেয় তো। তা কি বলিলাম—দাঁড়াও। আশালতা উঠে বিছানার তলা থেকে, একটা দশটাকার নোট এনে হাতে দিলেন।

আশালতা বললেন, মুটে ঠিক হয়েছে তো। তা ওদের সঙ্গে ত তোমার দেখা হ'ল না, ওরা সব এখন স্থলে—

অভয় আর একবার প্রণাম করে চলে এল। আশালতা আর কিছু বললেন না—আর বলার আছেই বা কি? অন্তরে যেখানে বন্ধন নেই, সেখানে স্নেহ, দয়া, মায়া থাকার তো কথাই নেই।

আসন্ন বিদায় মুহূর্তে, অভয় ফিরে ফিরে নিজের ঘরটির দিকে ফিরে চাইল। এই ঘরটিতে অনেকদিন কাটিয়েছে, একটা মায়া জন্মে গিয়েছে। অভয় আবার নুতন করে শোক পেল। এই ঘরটি তাকে বার বার যেন

শত সহস্র বাহু দিয়ে টানতে থাকে। কি আশ্চর্য ব্যাপার। একটা অব্যক্ত ব্যথায় অভয়ের তরুণ মন কেন্দ্রে উঠল। তার ওই কয় বৎসরের জীবনের সঙ্গে এই ঘরটির বহু স্মৃতি যে জড়িত। কতদিন ঘুম ভাঙা রাতে এই ঘরটির স্বপ্নালোকিত শয্যায় শুয়ে শুয়ে কত কি সে ভেবেছে। স্নেহময়ী মায়ের মত এই ঘরটির নির্ঝাঁক কণ্ঠ যেন মুখর হয়ে উঠেছে—যেন বলেছে ভয় কি? সে ভালবেসে ফেলোছিল, এই ক্ষুদ্র আশ্রয়স্থলকে। মৃত্যু মায়ের জন্ম ছোট ভাইবোনের জন্ম কতদিন এক! এক! হ হ করে কেন্দেছে—তা কেউ দেখেনি। শুধু সাক্ষী থেকেছে এই ঘরটি। জেঠাইমার অনাদর উপেক্ষায় যখন সে ভেঙ্গে পড়েছে, চোখ দিয়ে হ হ করে জল পড়েছে তখন সকলের অলক্ষ্যে নিজের মুখ লুকিয়েছে এই ঘরটিতে। এই ঘরের অন্ধকার দেহের মাঝে আশ্রয় নিয়ে সে পেয়েছে সান্ত্বনা, সে পেয়েছে আনন্দ আর শান্তি। এই ঘরটির শীতল কোলে শুয়ে তার দুই চোখে নেমে এসেছে শ্রান্তিহরা, দুঃখহরা গভীর ঘুম।

আর একজনের কথা মনে পড়ল সে মিনতি। যাবার আগে একবার দেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তা হবার নয়। মিনতি স্থল থেকে ফিরে শুনবে সে চলে গেছে। হয়তো সাময়িক ভাবে একটু দুঃখ পাবে। কিন্তু সে সাময়িক। হয়তো সামান্ত আশ্চর্য হবে। আজ যে সে যাবে, একথা কাউকে বলেনি অভয়। বলে লাভ কি? একটা অকৃত বিতৃষ্ণায় ওর সারা মন ভরে গেছে। এ যে কি—বা কেন এমন হল, এ প্রশ্নের উত্তর সে নিজেও

দিতে পারবে না। মনে হয়, একটা বিরাট শূন্যতায় তার সমস্ত জীবন ভরে গেছে। আশীষিত জীবনের চারদিকে যেন বিরাট শূন্যতা, কোথাও কোনও আশা নেই, বা নেই উজ্জ্বল জীবনের চিহ্ন।

টেশনে লোকজনের ওঠানামা শেষ হতেই গাড়ী চলতে লাগল। প্রাটফর্মের যাত্রীরা নিজনিজ যাত্রাপথে চলে গেল। দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত বাতাস, সৌ সৌ করে বয়ে যাচ্ছে। ধীরে কাছে কোন লোক নেই। টেশন মাঠের এবার দরজায় ভালো দিয়ে নিজ নিজ কোয়টারের উদ্দেশ্যে চলে গেছেন। অভয় দেখল, কোন লোক নেই, একটা কুলীও নেই। অগত্যা বিছানাটা বগলদাবা করে, টিনের স্টুটকেসটা হাতে করে চলতে লাগল। যেতে হবে অনেকটা। লাইনের পাশ দিয়ে সরু একাচলতে রাস্তা ধরে, অন্ততঃ দেড় মাইল চলে, শেষে মাঠের রাস্তা ধরে তাকে হাঁটতে হবে। একটা লোক হলে খুব ভাল হ'ত। কারণ, মালপত্র যতই কম হোক তবুও, এই দুপুরের বোদ আর গরমে, এই যৎ-সামান্ত জিনিষগুলিই অতিশয় ভারী হয়ে উঠবে। কিন্তু উপায় কি? অভয় হাঁটা শুরু করল। অনেকদিন পরে দেশে ফিরেছে। একটা অ-কেতুক আনন্দে মন ভরে উঠেছে। তবুও সবচেয়ে মনে পড়ে যায়, মা নেই। সেই আনন্দের ঘর আজ নিরানন্দে ভরে আছে। দ্বি-প্রহরের এই চম্চমে বোদের মাঝে চলতে চলতে অভয়ের বার বার মনে হতে লাগল, তার মায়ের কথা। অভয়ের মনে হ'ল, দ্বিপ্রহরের এই রৌদ্রতপ্ত নীলাকাশের অনন্ত বিস্তৃতির মাঝে, কোথাও যেন, তার মা অলক্ষ্যে তার গতিবিধি লক্ষ্য করেছেন। নীলাকাশের মাঝে মাঝে সাদা সাদা মেঘ, পেঁজা ভুলোর মত ইতস্ততঃ ভেলে বেড়াচ্ছে, দিনকর মধ্যগর্গনে-বসে, তপ্ত কিরণে সারা বিশ্ব চরাচরকে প্রাবিত করে দিচ্ছেন। নীচে এই পৃথিবী, গাছ পালা ক্ষেত ধামার ঘর বাড়ী, কত প্রাণী, কত ফল ফুল, আর এরই মাঝে, কত আশা নিরাশা সুখ দুঃখ বেদনা বস্ত্রপার মাঝে, তারই মত কত শত লোক কণে কণে দোল খাচ্ছে। নিকরুণ উদাস

প্রকৃতি আপন মনে আপন হৃদয়ে অনন্তকাল হতে বয়ে যাচ্ছে।

অভয় হাত বদল করে। কখনও বিছানাটা নেয় ডান হাতে, কখনও স্টুটকেস নেয় বাঁ হাতে। এখনও অনেকদূর। এই মাঠ পেরিয়ে, বাঁ-হাতি ভালগাছের সাঁর পার হয়ে, তারপর বাবলা বন, তারপর আবার মাঠ। ওদিকে গুরু হয়েচে গ্রাম। নরপুর, হুদয়পুর, সিনেপলশা, কুড়ুবপুর, একডালা এমনি আরও গ্রাম। কিন্তু তার পথ এদিকে নয়। ওই গাঙলোকে পিছনে ফেলে, তাকে আরও এগিয়ে যেতে হবে পূর্ব মুখো। ক্ষেতের আলো আলো তাঁকে হাঁটতে হবে। অভয় হাঁটে। মাঝে মাঝে, একটা বাবলা গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ায় অভয়। দূরে দু-একটা মাঠে চাষীরা মাথায় টোকা দিয়ে চাষ করছে, কোথাও গরুর পাল চরছে, কোথাও বা রাখাল ছেলেরা তৃণ শয্যার বসে ঘুমুচ্ছে। অভয়ের হঠাৎ চমক ভেঙ্গে যায়। স্টুটকেস আর বিছানা ভুলে নিয়ে হাঁটতে থাকে। তার মনে হয়, নীল আকাশের এক প্রান্ত থেকে কে যেন ডাকছে—থোকা, ও থোকা—। না কেউ কোথাও নেই।—একি ভুল। তার শোনার ভুল। দূরের ভালগাছের পাতা-গুলো, তপ্ত বাতাসে শুধু শব্দ করছে সাই-সাই। কিন্তু অভয়ের মনে হয়, না এ ভুল নয়। এ সত্যিই। অভয় এদিক ওদিকে তাকায়। বিহ্ব বিহ্ব দেখা যায় না। শুধু তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চ দিয়ে ওঠে। তার মনে হয়, ঠিক মেঘের ঐ প্রান্ত সীমায়, পেঁজা ভুলোর মত, সাদা মেঘখানির পাশে, তার মায়ের সেই মুখখানি। ভেমনি শীর্ণ ভেমনি স্নেহ স্রবমা মাথা, আর দুটি চোখ যেন উবেগ ব্যাকুল। মুখের দুইপাশে ঈষৎ লালচে লালচে তৈলহীন রক্ত চুল উড়ছে। আর মাথার ওপর দিয়ে রয়েছে, সেই লালপেড়ে সাদার ঈষৎ ঘোমটা। অভয় তাকিয়ে থাকে। কিন্তু না—কোথাও কেউ নেই। নির্জন রৌদ্রতপ্ত মাঠে দূরে দূরে খেজুর, বাবলা, ভালগাছের সারি। মাঠের এক প্রান্ত হতে মাঝে মাঝে তপ্ত বাতাস বয়ে আসছে। একটানা সাই সাই শব্দ।

ভবুও অভয়ের মনে হয়, যা যেন তাকে দেখছেন ওই মহা শূন্য থেকে। অভয় দুই হাত জোড় করে মাকে প্রণাম করে। মনে মনে বলে, মা, তোমায় চোখে দেখতে না পেলেও মন দিয়ে বুঝছি, তুমি আহ আর আমার তুমি দেখছ। তুমি তোমার অভয়কে ভুলতে পারনি মা। আজ আমি ফিরে এলাম মা। আমি আবার তোমার কাছে ফিরে এলাম মা। তোমার সেই দেহ নেই জানি ভবুও বিশ্বাস করি, তোমার অস্তিত্ব মুছে যায় নি। এই আকাশ বাতাস, এই মর্ত্য জগতের মাঝে তুমি ছাড়িয়ে রয়েছ। তোমায় কি ভুলতে পারি মা। অভয় হাঁটতে থাকে। তার মনে হয়, কোন্‌ সে নাস্তিক প্রচার করেছে যে, মৃত্যুর পরই সমস্তই শেষ। এই দেহ ধ্বংস হলেই এর আর কোন অস্তিত্বই থাকে না। চোখে যা দেখা যায় না তাই বলে কি তার কোন অস্তিত্বই নেই? না তার প্রাণ নেই? চোখে তো আমরা বহু জিনিষ দেখতে পাই না। এক বিন্দু জলের মাঝে, কত যে জীবন্ত প্রাণী রয়েছে, তাই কি আমরা জানি, না দেখছি। তা বলে কি তারা নেই? চোখ দিয়েই কি সব জিনিষ দেখা যায়? কান দিয়েই কি সব জিনিষ শোনা যায়? ইট, কাঠ, পাথর এরা তো সাদা চোখে প্রাণহীন। কিন্তু এদের ভেতর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুকণাগুলির বিদ্যুৎসম প্রাণচাক্ষুস্য রয়েছে, তা কি মিথ্যা? এই দৃশ্যমান জগতের পারে, স্তরে স্তরে যে অদৃশ্য জগৎ নিত্য বিরাজমান, সেই অদৃশ্য জগতের প্রাণচাক্ষুস্য, তার অস্তিত্ব বোঝা তো আমাদের এই চক্ষুর্কর্ণের ক্ষমতার অতীত।

আর বেশী পথ নেই। মাঠ ছাড়িয়ে, হাবুল বোয়ের আমবাগানের পাশ দিয়ে, অভয় সদর রাস্তায় পড়ল। একটু বাঁহাতি বেঁকে, ঝোপঝাড়, লেবু বাগান ছাড়িয়ে, এসে পড়ল সেই চেনা রাস্তায়। ঐ দেখা যাচ্ছে সেই অশ্বপ গাছটি। কোন্‌ যুগ থেকে ও দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত জিনিষই না দেখছে। কত অশ্ব হুঃধ কত মর্মান্তিক যন্ত্রণার কত আনন্দের ঘটনার ঐ একমাত্র সুপ্রাচীন সাক্ষী। নব বধু নিয়ে

বর যখন কত অশ্ব ভরা মনে, কত আনন্দে গ্রামে ঢোকে, তখন ওরই তলায় বরকনের পাকী নামিয়ে, ওরই সুশীতল ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার চলে যায়। নীরব বৃক অশ্বপ গাছ তার সাক্ষী থাকে। আবার ওরই তলায় এসে নামার কোন যত্নদেহ। কোন গৃহ সংসারকে অন্ধকার করে, কোন সতীলক্ষ্মী পরপারে যখন যায়, তখনও সাক্ষী থাকে ওই বৃক অশ্বপ গাছ। ও দেখেছে, সন্ত পতিহারী রমণীর করুণ কাহ্না। পিতৃহীন অনাথ বালকদের বৃক ভাঙ্গা করুণ বিলাপ। সে সব দেখেছে। সে দেখেছে আর নীরবে চোখের জল কেলেকে। আবার আনন্দের দিনে ও সকলের সঙ্গে হেসেছে। কিন্তু তাও কেউ দেখেনি। অভয় এসে খমকে দাঁড়াল গাছের ছায়ায়, তার মনে হ'ল, বৃক পিতামহ অশ্বপ গাছটি যেন তাকে বলছে, কি রে অভয়, এলি? বেশ ভাল তো—ভাল আছি সু তো? শীতল ঝরঝরে বাতাস সর্দারকে শীতল করে দিল। অভয় আবার চলতে লাগল। রাস্তার আশে পাশের বাড়ীঘরের দরজা বন্ধ। রাস্তার ওপর গরু আর কুকুর শুয়ে রয়েছে। মন্ডি গোয়ালিনী ঠিক আগের মতই ভাঙা ঝুড়ি হাতে পথে পথে গোবর কুড়ুচ্ছে, আর আপন মনে বোধ করি সয়ং ঈশ্বরকেই গাল পাড়ছে। অভয় এবার রাস্তার বাঁক ঘুরতেই দেখতে পেল, তাদের বাড়ীর সদর দরজা। সেই অতি পরিচিত দরজা। চারিদিকে বেড়া দেওয়া, এখানে ওখানে জবা আর টগর ফুলের গাছ। সব একই আছে। বাবার ছোট্ট দোকান ঘরটির এখন ঝাঁপ বন্ধ। দোকানের সম্মুখে লোকজনের বসার জন্ত বাঁশের তৈরী বসবার আসন এখন শূন্য। বৈকাল থেকে রাত নটা পর্যন্ত ঐ জায়গা পূর্ণ হয়ে যাবে। লোকে চাষ আবাদেয় গরু করবে :কউত তামাক খাবে। খন্দের হু চার পরসার জিনিষ কিনবে—গরু করবে—

এখন ভেতর থেকে বাঁশের ঝাঁপ বন্ধ।

দাঁড়র গিট খুলে অভয় আস্তে আস্তে ঢুকল। বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তেই ভেতর হতে শব্দ এল—কে? কে রে?

—বাবা। আমি অভয়—

—অভয়? বড়মড় করে উঠে পড়লেন গোপেশ্বর। ভাড়াভাড়ি দরজা খুলে দিয়ে হাঁকলেন—ওরে জীতু, খোকন আর। তোদের দাদা এসেছে—। বোধ করি ওরা এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিল। চোখ মুছতে মুছতে হাজির।

—দাদা—। দুই-জনকে কাছে টানতেই ব্যস্ত হয়ে গোপেশ্বর বললেন, এই বোদের মধ্যে যেমে নেয়ে উঠেছি বাবা। একটা পত্ৰ দিতে হয়। যা গীতু দাদাকে পাখা দে। খোকা একটু বাতাস করুক। তারপর ঠাণ্ডা হলে চান করে ফেল বাবা। গীতা যা— উম্মনে আগুন দিয়ে দুটো ভাত চাড়িয়ে দে না। এখন সরোজিনী নেই। এখন সংসারের যাবতীয় কাজ করতে হয় গীতা খোকনকে।

গোপেশ্বর বললেন, বেলা তো আর নেই। যা হোক; ভাতের মধ্যে আলু, পটল কেনে দাও। ঘরে হুই আছে—বিগু আছে। গোপেশ্বর হাঁকো টানতে লাগলেন।

বাড়ীর পোষা কুকুরটি লেজ নাড়তে নাড়তে আসতেই খোকন বলল, দাদা, এর নাম রেখেছি টিম। কেমন নাম বলত? ভাল নয় কি?

অভয় হেসে বলল—খুব ভাল নাম। হঠাৎ এই নামটা কি করে তোর মাথায় এল।

গীতা ভাতের হাড়ীতে চাল দিয়ে বলল, ওদের ফুলের একটা ছেলে, সেই নামটা দিয়েছে। দাদা, এবার চানু করে এস। দেখতে দেখতে ভাত হয়ে যাবে।

উঠানের পেয়ারাগাছটি তেমন আছে। সারা গাছে অজস্র ফল ধরেছে। এটা তার মায়ের হাতে এসান। যতবড় উঠানের একপাশে সেই তুলসীমঞ্চ আর ছোট্ট ফুলের বাগান। তার মায়ের ছিল ফুলের ভীষণ শখ। তা ছাড়া সরোজিনী বলতেন, গেরস্থর বাড়ী, পুজো আচ্ছা আছে, কার দুয়োরে দুটো ফুলের জল, তুলসী পাতার জলে ঝাঝ। তাই সরোজিনী নানা রকম ফুলের গাছ বসিয়েছিলেন। শুধু কি কেবল ফুলের গাছ? কত শাক সবজী, ফলের গাছও

বসিয়েছিলেন সরোজিনী। এখনও রয়েছে, মায়ের হাতে লাগান লাউ মাচা, আর বেগুনের গাছ। ওদিকে রয়েছে কুমড়োর মাচা আর উল্লেহ মাচা। সবই আগের মতনই রয়েছে। বাগানে একটি ঘাসও রাখতেন না। সব সময় ছোট নিড়ানিটা দিয়ে গাছের গোড়া পরিষ্কার করতেন। হুহাত দিয়ে যাবতীয় ঘাস উপড়ে ফেলে দিতেন। অভয় তাকিয়ে তাকিয়ে সমস্তই দেখে। তার মায়ের হাতের কাজ চারদিকে। সেই কল্যাণময়ীর হাতের স্পর্শ আজও অগ্নান। চিরকাল ছেঁড়া সেলাই করে, জোড়াতালি দিয়ে যেমন কাপড় পরেছেন, তেমন বুক দিয়ে রেখেছিলেন এই দরিদ্র সংসারকে।

কত আচার, বাড়ি করতেন। আমের সময়, আমেরই কত আচার কত আমসত্ত্ব করতেন। কুলের সময় কুলের, পাকা তেঁতুলের আচার, নেবুর আচার, এমন কত কি। কোন জিনিষই তিনি ফেলতেন না, সে বস্তু যতই অকিঞ্চিৎকর হোক। একটু ছেঁড়া কাগজ এক টুকরো দাড়ি। ভাঙ্গা কাঁচ, পেরেক, কাঠি, এ সমস্তই সঞ্চয় করে রেখে দিতেন। বলতেন—ওরে এখন তো সংসার করিসনে। বড় হলে বুঝাবে, সব জিনিষই কাজে লাগে। যা রাখবে, তাই কাজে লাগবে—

অভয়ের বুকের ভেতরটা একটা বেদনায় টন্ টন্ করে ওঠে। একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। দুই চক্ষু নিজের অজান্তেই কোন সময় সজল হয়ে ওঠে।

গীতা বলে, দাদা, যাও, চানু করে নাও। গোপেশ্বর এসে বললেন, ওরে গীতু, দাদাকে খেতে দে। শুড়, হুই দিবি। আর দেখ, কলা তো বেশ পেকেছে। আজই খোকন বলছিল, বাবা, কত কলা পেকেছে। শুধু দাদা খেতে পেল না। বজা ভাখ্। আজই খোকন বলছিল—

গোপেশ্বর বললেন—গোবালঘর পরিষ্কারই আছে। আমি দোকানঘর খুলছি। ঘর বাঁট দিয়ে, জিনিষপত্র গোছগাছ করিগে। কাপ হাটবার তো। জাপলা গরু বাছুর চরাতে নিয়ে গেছে, ও এলে গরু বাছুর বাঁধবে। খড়, খোল, ফ্যানু দেবে—। খোকন এখন

যেন খেলা করতে বেরিও না। দাদার কাছে থাক।  
দাদা খেয়ে একটু বিশ্রাম করে নিক—

রান্নাঘরে অভয় খেতে বসে। গীতা পাখা দিয়ে  
বাতাস করতে থাকে। খোকন একটা পিঁড়ি পেতে  
বসে। অভয়ের মনে পড়ে, মায়ের কথা। মা বসন্তে  
ওই জ্বরগায়। মায়ের সেই খুরো উঁচু পিঁড়ে রয়েছে।  
মায়ের হাতে টাঙ্গান সেই রঙিন শিকে, সেই সবই  
রয়েছে, শুধু নেই সেই মাহুত।

অনেকক্ষণ ঘুমোবার পর, অভয় যখন জাগল তখন  
সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গ্রামের ঘরে ঘরে জলে উঠেছে  
সন্ধ্যা প্রদীপ। ভেসে আসছে শুভ শাঁখের শব্দ।  
অভয় মুখ চোখ ধুয়ে, উঠোনে এসে দাঁড়াল।  
পাতলা জ্যোৎস্নায় সারা উঠান ভরে গেছে। তুলসী  
তলায় মাটির প্রদীপ তার ভীক আলোড়িত্ব নিয়ে টিপ-  
টিপ করে জলছে। অভয় তাকিয়ে দেখে রান্নাঘরেও  
আলো জলছে। গীতা আর খোকন তুলসী তলায়  
প্রণাম করে ধূণো দেণাল। এবার ওবরে ধূণো  
দেখিয়ে আবার ধূণুচ এনে রাখল তুলসী তলায়। গীতা  
বলল, দাদা চায়ের জল চাপাব। ভূমি এইখানে বস।  
মাহুত পেতে দিই—এখানে খোকন বসে পড়া করুক।

মাপলা একজন গোলমালঘরের কাজ শেষ করে এসে  
এক পাশে দাঁড়াল।

—কতাবাবু বললেন, দাদাবাবু এসেছে। একটা  
পাশ দিয়েছ না দাদাবাবু—

অভয় বলল—বসবে ব। তা তোঁর নাম কি?

—মাপলা। হই হিহু বাউড়ীর ছেলে আমি গো।  
বাবা যে গাঁয়ের চৌকিদার হয়েছে। আন্তর কালে  
লঠন হাতে করে, লাঠি নিয়ে পাহারায় বেরোয়।  
কিছুক্ষণ গল্প করার পর মাপলা চলে গেল। গোপেশ্বর  
এখন দোকানে। গায়ের লোক সন্ধ্যাবেলায় আসে।  
সামনের বাঁশের ধরাটে বসে সবাই গল্প করে। তাদের  
বেশীর ভাগ গল্প চাষ আবাদ আর বৃষ্টি নিয়ে।

বৃষ্টি না হলে সকলের মুখে খুটে ওঠে ভয়ের কালো  
ছায়া।

ধীরে ধীরে রাত বাড়তে থাকে। লোকজন ক্রমশঃ  
চলে যায়।

গোপেশ্বরও দোকানের দরজা বন্ধ করেন।

ক্রমশঃ





শিওদের সহিত জম্মাদিন অলুটানের আনন্দোৎসব



প্রতিরক্ষার জন্ত অলংকার প্রাপ্তি—হিমাচল প্রদেশ হইতে পাওয়া



মাউন্টব্যাটেন ব্যবহার আলোচনা-  
দক্ষিণে দ্বিতীয় ব্যক্তি জিন্না

রমা রচনায় পৌরাণিক উপাখ্যান—

## অবীক্ষিত ও বৈশালিনী

ঐদিলীপ মুখোপাধ্যায়

বার্ষিকপ্রদীপিতা স্মৃতি ও স্মরণতা বীরা স্বয়ম্বরেই পারগ্রহ করেছিলেন মহারাজ করকমকে। তাঁদেরই সকল করনাকে দোহন করে মর্ত্যের যুক্তিকা স্পর্শ করেছিলেন অবীক্ষিত। তাঁর জন্মকালে তাঁর ভাগ্যে বারংবার বিভিন্ন গ্রহমাঙ্গল্যের অবৈক্ষিতমুচক সৌভাগ্য-লিপি পাঠ করেছিলেন অনেকানেক রাজদৈবজ্ঞ, তাই হর্ষাতিশয্যে তাঁর ঐ নামকরণই করেছিলেন স্বয়ং করকম। দেবজ্ঞরা নাকি জানিয়েছিলেন, দেবগুরু ব্রহ্মপতি ও দৈত্যচার্য শুক্র উভয়েই সপ্তম স্থান অধিকার করে বিবাহিত ছিলেন এই নবজাতকের জাতপত্রিকায়। চতুর্থ স্থান অধিকারে ছিলেন নাকি সোম, আর তাঁর উপাঙ্গে ছিলেন নাকি স্বয়ং বৃষ। সবচেয়ে মঙ্গলের কথা, তিনি নাকি সূর্য, ভোম ও শনৈশ্চরের কু-দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এক ভাগ্যকে সঙ্গী করেই দর্শন করেছিলেন জাগতিক আলোক। স্মরণ্য কোন ভাবেই সমাবিধ কল্যাণসমৃদ্ধিলাভে বিন্দুমাত্রও অসামর্থতা দেখা দিতে পারে না এই সৌভাগ্যবান নবজাতকের জীবনে।

বেদবেদাদ্বে পারদর্শী হয়ে কণ্ডনয়ের শত্রুশিষ্ণুরূপে বহুগ্যাতি লাভ করেছিলেন প্রাপ্তযৌবন অবীক্ষিত। তিনি রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, বুদ্ধিতে বাচস্পতিকে, কাঙ্ক্ষিতে চন্দ্রকে, ভেঙ্গে সূর্যকে, ধৈর্যে সাগরকে এবং শাহসুতার পৃথিবীকে অতিক্রম করে অর্যাতিক্রমের সকল বার্ষিকে পরিহৃত করেছিলেন আপন আজাহুলশিভ বহুগুণের সহায়তায়। স্বয়ম্বরে আমোদিনী হয়ে তাঁকে জীবনদায়িত্বরূপে অভিনন্দিত করতে দুর্য্যভলাবতী হয়েছিলেন হেমবর্মাঋজা বরা, সুদেবতনয়া গৌরী,

বলিগুজী স্তম্ভা, বারম্বতা লীলাবতী, বীরভদ্রহিঙা নিভা, ভীমাশ্বরা মালবতী এবং দম্বকতা কুমুদতী প্রমুখ। অনেকানেক রাজকুলোদ্ভবা রূপ-গুণোদ্ভবা। কিন্তু বিবাহিত-জীবনের অন্তর্বেগ অলস কালক্ষেপণের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য খুঁজে পেতেন না অবীক্ষিত। তাই বারংবার তাঁর সকল চেষ্টা শুধু বৈরিকুলের নিরাকরণেই কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকত সর্বক্ষণ। কখনও কোন পরাজয়ের মানিকে বরণ করতে হয়নি তাঁকে।

বর্ণভূমে তাঁর গুণগ্লাবা না করে পারতেন না নিখিল বীরপুল। ভায়ধুকে শত্রুযোধ-সংহারক সর্গাধিক বলে বলীয়ান থাকতেন তিনি সর্বক্ষণ।

কিন্তু বিশ্বরুদ্ধাত্তের সকল অসীমভারও যেমন অন্ত থাকে, তেমনই রাজকুঞ্জর অবীক্ষিতেরও হৃদহীন বিজয় গৌরব একদিন ম্লান হলো আচিষিতে।

বিপুল বার্ষবতার সে এক বিরাট বিপর্যয়।

দূতমুখেই শুধু শোনেনি, আমন্ত্রিতও হয়েছিলেন তিনি বৈদিশাধিপতি বিশালের আত্মজা সুদতী বৈশালিনীর স্বয়ম্বর সভায়। কিন্তু আপন দুর্গম ইচ্ছার বশীভূত হয়েই সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানও করেছিলেন তিনি। কিন্তু তখনও জানতেন না অবীক্ষিত, কী বিভীষণ ধ্বংসের পরিণতি সূচিত হচ্ছিল তাঁর অজ্ঞাতে।

অবীক্ষিতের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানকে তাঁর দুর্গলভা-রূপে প্রচার করেছিলেন তাঁর অর্যাতিবর্গ! আর, তাতেই বায়ুসহযোগে অগ্নিও দতোই কদ্রামর্ধে আপূরিত হয়ে উঠেছিল অবীক্ষিতের চিত্ত। বলগণে পরাভিত,



করকমতনয় সমগ্র রাজমণ্ডলীর কাছে তাঁর আপন বল-  
বলের পরীক্ষা দিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন অকস্মাৎ।  
তাঁর সেই রণালীপু আবির্ভাবে চমকিত হয়ে উঠেছিলেন  
স্বয়ম্বর-সভাগত যত নরপতি।

অফুটপ্রায় হয়ে পতিস্বর্য নায়িকায় কর্ণে আগন্তক  
রাজকুমারের পরিচয় জ্ঞাপন করছিলেন বাকপট্টিয়সী  
পরিচয়-সঞ্চারিকা। বায়ুবশে সঞ্চালিত তরঙ্গমালায়  
প্রভাসিত মানসসরসীবাঁসিনী রাজহংসীর স্তব্ধময় পদ্ম  
হৃতে পদ্মাস্তরে বিচরণের মতো এক নৃপতির সমুখ হতে  
অপরের দিকে মরালহন্দে অপ্রবর্তিনী হচ্ছিলেন  
রক্তাধিকা বৈশালিনী। অমানিশায় সঞ্চারিণী দীপশিখা  
যেমন পক্ষাতে এক তিমিরজাল বিরচিত ক'রে উত্ত-  
রোত্তরে আলোকরেশ সঞ্চারিত ক'রে যায়, তেমনই  
স্বয়ম্বর্য নৃপনন্দিনীর এই গতিতে একদিকে অভাবিত  
বিষাদের অগিত আবরণে যেমন আচ্ছাদিত হচ্ছিল  
অতিক্রান্ত ভূপতির মুখমণ্ডল, তেমনই অমুবাগ-সভা-  
তিশয়ে সমুজ্জল হয়ে উঠছিল পুরোবতী রাজস্তের বদনশ্রী,  
তিনি যেন রঘুনন্দনের বরণাধেয়ণে স্বয়ম্বর-সমাগতা স্বয়ং  
ভোজরাজকা ইন্দুমতী।

এমনই ভাবে ভাবিবিলাসময়ীরূপে এক পরম আশ্র-  
প্রেরণাবশে চলতে চলতেই সহসা স্বহস্ত-বিরচিত পুণ-  
মালিকা হাতে নিয়েই নিম্নাক বিশ্বয়ে চিত্রাপিতার  
মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন অহুমাৰী বিশালাক্ষজা।  
আপন চিত্তের প্রমোদনে এইরকমই এক উৎসবময় মুহূর্তে  
বাক্যে বরণ ক'রে নিতে প্রীতিজ্ঞত হয়েছিলেন তিনি,  
তাঁরই এ অভাবিত আবির্ভাবে কিছুটা যেন বিহ্বলই  
হয়ে পড়েছিলেন তিনি। প্রমোদাতিশয্যে ভুবুরিত  
হুই ভ্রমহু যেন তাঁর গতিভঙ্গের সঙ্গেই স্থিরবদ্ধ হলো  
একটি লক্ষ্যে।

বহুকাল আগে থেকেই, কিশোরীমনের সেই ধূসর  
মানসপটে আশ্রুতপ্তর সপ্তবর্ণ বিবর্ণিত হবার মুহূর্ত  
থেকেই, মহাহুলপ্রদীপ এই দীপ্তানলহুলা-তেজস্বী করকম-  
তনয়েরই বীরত্বের ব্যাতিতে বিমূৰ্হ হতো তাঁর চিত্ত।  
বোঁবনারতের সেই পঞ্চরত্নের আঁহর মুহূর্তগুলিকে এই  
বিষাভ-গোন্ধর অদৃষ্টপূর্ণ স্তব্ধত্বের কল্পনা দিয়েই

সাম্বনা দিতেন ভামিনী। একে পাবারই আতুলতা  
ছিল তাঁর অসংখ্য উন্নয়নজনীর প্রলেপাধার চিত্তা,  
এঁরই বামাকরূপীকরণে নিজেকে কল্পনাই ছিল তাঁর  
বিগত প্রতিটি মুহূর্তের একমাত্র পানযোগ্য মদিরা।  
জানতেন বিশালনন্দিনী, এই দেবোপম অপূর্ণদর্শন  
অধিতীয়কে মনে মনে এমনভাবে সব কিছু সমর্পণ  
করেছিলেন তিনি, বাক্যে বাস্তবজীবনে সঙ্গীরূপে না  
পেলে শুধু রিক্তই থেকে যাবে না তাঁর এই ক্ষুদ্র জীবনে  
অন্ত দেবার্চনার অর্থ, পরন্তু নিজেরই কাছে নিজস্বহীন  
অস্তিত্বে অবশিষ্ট জীবনব্যাপী এক রূপাঞ্জীবা রমণীর  
পরিচিতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তাঁকে।

স্বয়ম্বরসভায় তাঁর পারিজাতপল্লবসদৃশ পাণিপীড়নের  
প্রাণিধি নিয়ে তাঁরই পরিণয়মালিকা গ্রহণের আশায়  
এতদিন একেই অপেক্ষমান হয়ে থাকতে দেখার আকা-  
ঙ্কাই পোষণ ক'রে এসেছিলেন নৃপাঙ্কজা। কিন্তু যে  
মুহূর্তে গুনেছিলেন, তাঁর পিতার আত্মান প্রত্যাখ্যান  
ক'রে তাঁর নারীত্বের সকল আকাঙ্কাকে চরম নির্বাহিত  
করেছেন সেই নিষ্ঠুর, সেইদিনই আপন মুহূর্তকে আত্মান  
করেছিলেন তিনি; আজকের এই স্বয়ম্বরসভায় তাই যে  
কোন রাজতনয়ের কণ্ঠে নিবিচারে বরণমালিকা পরিণয়ে  
দিয়ে জীবনের সেই মুহূর্তকেই বরণ করতে প্রীতিজ্ঞত  
ছিল তাঁর নৈরাশ্রপীড়িত হৃদয়।

এইতো প্রত্যাখ্যানের প্রত্যাখ্যাতের লয়! কিন্তু তবু  
যেন কোম এক অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে বিবশ হয়ে  
যাচ্ছিল তাঁর চেতনা। তিমিরবন্ধে কণ্ঠধাপনকারিণী  
মহোৎপলার জীবনে দিবস্পতির আবির্ভাবজাত আশ্র-  
বিহ্বলতার মতো আশ্রসংঘমে অধীরা হয়ে উঠতে চাই-  
ছিলেন রাজনন্দিনী। চরম সুযোগ পেয়েও নিজেরই  
জীবনের পরম প্রতিশোধম্পূহাকে আর জাগিয়ে তুলতে  
সক্ষম হলেন না তিনি একটুও। নিজেরই ওপরে  
প্রতিশোধ নেওয়া কী এতই অনায়াসসাধ্য।

বরং কর্ণশেখরের নীলপদ্মসদৃশ হুই নয়নে এক  
অভিভূত দৃষ্টির দর্শন নিয়ে যেন সেই আপন আকাঙ্কারই  
একাগ্র পূজনে রতা হয়ে রইলেন রাজকন্তা। ললাটের

রক্তহলে অলসলীলার লাভ নত'কীর মতোই বুভূক্ষণ হয়ে ওঠে বাকিম জ্বলতা। কটকিত হয়ে উঠতে থাকে বস্তকপোলের রেখা। প্রণয় ও লজ্জা, সমর্পণ ও সংবরণ, প্রার্থনা ও গ্রহণভীতির অন্তরালপথে বিচরণ করতে করতে কখন যে আপনাই আনন্ডিত অক্ৰম্যায় আত্ম হয়ে গেল স্তনভটের চন্দন, টেরও পেলেন না রাজকতা।

একসময়ে সমবেত রাজমণ্ডলীর উদ্দেশে ধ্বনিত হয়ে ওঠা অবীক্ষিতের বজ্রনির্ঘোষে চমকিত হয়ে উঠলেন বিমুখা রাজদ্বিজিতাও।

—বীর্যব্রত! এই বৈশালিনীকে আপন ভুজবল-গৌরবেই গ্রহণ করলাম আমি, করকমাত্মজ অবীক্ষিত। যদি সমশক্তির গবে' গর্বাগ্নিত হয়ে থাক তোমরা কেউ, সূক্ষ্ম দান করো। এই নারীতে আসক্ত নই আমি, তবু আপন হৃৎপলতার কলক মোচনের অভিলাষেই তোমাদের ঐ ক্রিয়গৌরবে অগ্নিত মুখমণ্ডলেই পরাজয়ের কালিমা লেপন ক'রে আমি নিয়ে যাচ্ছি একে।

আচাষিতে তার মুকোমল মণিবন্ধে সেই বহু-প্রার্থিত কঠিন প্রতলের স্পর্শভুজবে পুলকোদগমে আপূরিত হয়ে গেল সেই বরতনু। অনাস্বাদিতপূর্ব' এক প্রশ্রয়ের প্রস্নাতীত মোহাচ্ছন্নতার আত্মহারিণী সেই কুমারীমনের নিভৃতাক্ষল যেন জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসবের কোলাহলে মুগ্ধ হয়ে উঠল।

কঠে নয়, আপন বিবরণতার বশে অবীক্ষিতের সেই স্নকঠিন রক্তদেশেই আপন বরমাল্যের বরণ-সীকৃতি জড়িয়ে দিলেন নৃপাশ্রজা।

তারপর বিশ্বয়বিমুক্ত ক্রিয়গুণের সমুখ দিয়েই সেই হস্তাকর্ষণের আবেগের চেয়েও আপন আত্মবেগে তাঁরই সাথে পিতৃপুত্রী পরিত্যাগ ক'রে গেলেন ছটমনা বিশালানন্দিনী।

তাঁদের হৃজনকে বহন ক'রে তাঁরবেগে সকলের দৃষ্টিসীমা অতিক্রম ক'রে গেল অবীক্ষিতের অশ্লিষ্ট হৃজম।

রাজকুলভিলক অনেকানেক শোঁর্ষবানের অমর্ষনিঃ-খাসের দোলায় প্রেচ্ছালিত হয়ে উঠল বিশালরাজ-হিহিতার স্বরস্বরসভা। সহসা যেন জলদমত্রে আপূরিত

হয়ে গেল ক্রান্তবর্ষণ গগন সদৃশ সেই বিশাল কক্ষের বক।

বলগর্বে গর্বাগ্নিত অবীক্ষিতের কাছে বারংবার নিরাকৃত হয়ে নিবৈদগ্ধ হৃদয়ে এতকণ শুধু অবহানই করছিলেন পরিভূত রাজমণ্ডলী। এবার আকুল হৃদয়ে প্রত্যেকেই প্রবৃত্ত হলেন সরব আত্মাধিকারে :

—ধিক্ আমাদের রাজজন্মে। ধিক্ আমাদের আত্মগর্বে। ধিক্ আমাদের শত্রুগণিতে। ধিক্ আমাদের শৌর্ষের পরিচিতি। যেখানে একাকী এক রাজধুরন্ধর আমাদের সহস্র চকুর সমুখ দ্বিগে অনারাসে এক অপরিগৃহীতা ললনাকে গ্রহণ ক'রে অর্গৌরবের কালিমা লেপন ক'রে দিয়ে গেল আমাদের ক্রিয়রসে, সেখানে আর কোন্ মর্যাদার দাবী নিয়ে বাঁচব আমরা আর? আমরা কি মেদমাংসশোণিতে বিগঠিতদেহী এই মর্ত্যের মানব, অথবা শুধু বিরাজনের অস্তিত্ব নিয়ে চলৎশক্তিহীন কোন বিরাটকায় মহীকহের রাশি? অস্ত্র দ্বিগন্তের বুধাই সমুদ্রযোষিত আমাদের রাজ-শব্দের লাক্ষিত অহঙ্কার। ধিক্, ধিক্, ধিক্।

ধীরে ধীরে আপনাপন অন্তর্কোষের সাময়িক বিহ্বলতা অপসারিত ক'রে করকমতনয়ের প্রতি অতিমাত্র বিস্ফারিত অমর্ষে পরিপূরিত হয়ে উঠলেন সকল নরাধিপ। যেন হৃদম শোণিতপিপাসায় সত্ত জাগরিত হয়ে উঠল প্রমুগ্ন শাহ'লদল।

কেউ স্পর্শ করলেন আপন কটিবন্ধগত শেষবন্ধ রত্ন-সকর সৃষ্টি। কেউ টকার দিলেন আপন কোদণ্ডে। কেউ বা তুলে নিলেন আপন ভিন্দিপাল। আবার কেউ বা আপন পরিষাতনে দেহভার অগ্নিত রেখেই উঠে দাঁড়ালেন সহসা। তারপর শবব্যবন্ধভেদপ্রয়াসী বেগোন্মত্ত আঙগের মতোই সভামণ্ডপ পরিত্যাগ ক'রে অবীক্ষিতের অধকুরোৎকিণ্ড খুলিজালের মধ্যেই একে একে অদৃশ হয়ে যেতে লাগলেন তাঁরা তখনই।

দিকে দিকে বাড়িত হলো ভেরী ও বৃদ্ধ, পণব ও ঢকা, এবং গোরুখ। যেন মুহূর্ত মধ্যে আত্যাভিক প্রলয়ের সমুখীনা হলেন গিরিগহনবতী বহুমতী।

হুই কবিবার কেন্দ্রবিভাগে উপবেশিত। সেই প্রারম্ভ-  
 বোবনা রূপমাধুর্যময়ী, যার সৌকুমার্যের কাছে লজ্জায়  
 অবনত। হয়ে আসে নবমালিকার মঞ্জরী,—তাকে নিয়ে  
 আত্মশ্রুতি বেগেই অতি বিধম আটব-বটপাকীর্ণ অরণ্য-  
 পথ উল্লঙ্ঘন করে আপন তুরঙ্গমকে ছুটিয়ে চলেন  
 অবাঞ্ছিত। মাঝে মাঝে ধরে ধরে তাঁর বক্ষস্পর্শ  
 করাহিল সমুদ্রাশ্রিত। সেই রাজহুহিতার আলোল অলকের  
 কুটিল নীলিমা, কিন্তু তবু রোমাঞ্চকর্কশ কোন অহু-  
 ভূতিতে চঞ্চল হচ্ছিলেন না রাজতনয়। পথপার্শ্ব  
 অটবীর বীথিতে বীথিতে শালফুলের খেতমঞ্জরী, অথবা  
 রাশি রাশি রক্তিম পলাশের সর্ববর্ণানকারী বিরাজন,  
 —বকোলগা সিঁতবেশা অথবা রক্তমাখরা, সুবর্ণসদৃশ  
 সমুদ্রলগ্না কীবা নবোদিত সূর্যসদৃশ রক্তিম দেহপ্রভা-  
 শালিনী স্বয়ম্বরা,—কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না  
 অবাঞ্ছিত। কত বৈদিকের আকরা সেই বহরহাবিভূষিতা  
 প্রমদোত্তমা, তার অহুমান অহুমানের সক্ষম হচ্ছিলেন না  
 রত্নোদাসীন রাজতনয়। হুল'ভা রাজকন্তাকে নয়,  
 তাঁরই হাতের ঐ বরমাণ্যের যে স্বদ্বন্দ্বিতা তিনি দিয়ে  
 এসেছেন সকল যুদ্ধাতিথি ভূ-বল্লভের সম্মুখে, তিনি  
 জানেন তার দায়িত্ব কতখানি; জানেন, সাম্রাজ্যের রাজ-  
 শক্তির আহতা আক্ষর্যণ কী বিভীষণী! যুদ্ধে ভীত  
 নন অত্যন্তদীপ্তবীর্য করকমতনয়, শুধু যুদ্ধের অবস্থার  
 অসতর্কতায় হস্তগত বরমালিকার চ্যুতিতেই তাঁর সকল  
 আশঙ্কা,—তাঁর সকল অহকারের পরাভব। তাই  
 সমুদ্রাশ্রিতা রূপোত্তমাকে কিংবা পারিপার্শ্বিক চলমান  
 দৃষ্টান্তকে দেখবার অবসর পাননি অবাঞ্ছিত; তাঁর  
 প্রয়োজনও ছিল না কিছু। জানেন শুধু তিনি, ভূজপরা-  
 ক্রমে হুল'ভ নেই কিছু ধরণীতে; যে কোন পরিবেশে যে  
 কোন আকাঙ্ক্ষাকে সার্থকরূপে রূপায়িত করা যায় শুধু  
 আপনারই বীর্যবতায়। জানেন অবাঞ্ছিত, যে ভূজ-  
 পরিষে অগণিত বীরপুঞ্জ শাসিত হয় একটি মুহূর্তে, তার  
 প্রদানশক্তির অসীমতা বলে নেই কিছু আর। জানেন  
 অবাঞ্ছিত, বীরভোগ্য বহুধার মতোই জগতের সকল  
 নারীই বীর্যগুণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অবশেষে গহনারণ্যে পুষ্পশ্রীবেষ্টিত এক সুরম্য  
 প্রদেশে এসে অধগতি রুদ্ধ করেন অবাঞ্ছিত। নিরাপদে  
 সেই ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ বিশ্রামের অভিলাষেই অধগতি  
 থেকে বৈশালিনীকেও নামিয়ে এনে ধাতুচিহ্নিত এক  
 কমলীয় শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট হলেন হুঁজনার।

তাঁদের আশে-পাশে বিচরিত হলো সারিকা ও  
 ময়ূর, চকোর ও মস্তোৎকট, শুক ও ভক্তরাজ, এবং  
 অনেকানেক নয়নরম্য বিহঙ্গম। জীবজীবক ও হেমক,  
 মন্তকোকিল ও বস্ত্র, স্ত্রীবি ও কাঞ্চন, এবং কলবিড়ের  
 কলকাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠল সর্গহান। ঐত হলো  
 মস্তোৎকট মধুকরকুলের মধুর বন্ধার, যেন বহুদ্রবীহারী  
 মদালসগতি অসংখ্য কিন্নরকণ্ঠেই উপগীত সেই বনভূমি।

এবার মন্দমারুতে আন্দোলিত, সতত পুষ্পবর্ণগরত ও  
 চারুপল্লবে স্ত্রীশোভিত তরুণচয়ের দিকে তাকালেন  
 অবাঞ্ছিত। দেখলেন, কোন্‌ সে পরমানন্দের প্রতীক-  
 রূপে বায়ুহিল্লোলে সততই স্ফুটল হয়ে উঠেছে তাদের  
 আত্মা কিশলয়, মঞ্জরীপুঞ্জ ও পুষ্পস্তবক। তাকালেন  
 প্রস্ফুটিত কমল, তরুণতপনসমিধ পুণ্ডরীক ও মহাপত্র-  
 শালী উৎপলে স্ত্রীশোভিত সুরস ও স্ত্রীমল তোমারয়ের  
 দিকে।

আর, এইভাবে কখন যে তাঁর সেই আত্মবিমুগ্ধ  
 দৃষ্টির দর্শন পার্শ্বাভিনী এক ত্রিভুবনপ্ৰলম্ব রম্যরূপময়ীর  
 আবেগাপ্ত মুখশ্রীতে বিলয় হয়ে গেছে, তা জানতেও  
 পারেননি করকমতনয়।

যা কখনও ভাবতে পারেন নি অবাঞ্ছিত, এবার  
 তা-ই ভাবতে শুরু করেন। যেন তাঁর সকল দর্শনা-  
 ভিলাষকেও অতিপ্রাপ্তির বিহ্বলতায় আকুল করে দিয়ে  
 তাঁর পার্শ্ব-ই সম্ভাবিত হয়েছে সেই রূপাতিশালিনীর  
 অসম্ভাব্য বিরাজন; তাই, যেন যা কখনও দেখেননি  
 অবাঞ্ছিত, এবার সেই দিকেই ফিরিয়েছেন তাঁর আকর্ণ-  
 বিশ্রান্ত হুই নয়নের নিরীক্ষণ।

মনে হলো অবাঞ্ছিতের, যেন তাঁর চিরবন্ধনহীন  
 মনঃস্বপ্ন সেই অপরূপ রূপের আনায়ে বন্দী হলো মুহূর্তে।  
 যেন তাঁর চিত্তশালায় বৈধরূপ সংযমিত বারণ সেই

অপরাধবোধই মন্থবলতরাজিত কটাক্ষশ্রেণী ক্রিপ্ত হয়ে দণ্ডের শিকল ছিন্ন করতে উদ্ভত হলো মুহূর্তে। বুঝি মুহূর্তে এক অনীতাত্রয়েই জীবনের শ্রেষ্ঠ নীতিকে ধ্বংস করতে হবে তাঁকে।

কত যে সম্মোহিত মুহূর্ত সেই সুখ-শীতল পরিবেশে ধল হয়েছিল, তা বুঝতেও পারেন নি তাঁরা।

সহসা ক্রমধাবমান বহু অস্বপ্নরথনিতে যেন বিভক্ত হয়ে গেল নিভৃত বনকূলে সেই সজ্জাশূন্য স্বপ্নাবেশ। এক অভাবিত উপচকে মুহূর্তে বৈশালিনীর ক্ষতিকর ছবাবল্লরীর বন্ধন হ'তে মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন অবীক্ষিত। তারপর চকিতে আপন ভূপাতিত কামুকটিকে তুলে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর আসন্ন অজ্ঞাত আপদের নিষ্পত্তিসাধন মানসে।

ততক্ষণে অনাতদূরবর্তী সরোবরের অপর প্রান্তে সারি সারি দাঁড়িয়ে গেছেন যুদ্ধদ্বন্দ্ব অর্গণিত রাজপুরুষ। তাঁদের বোধকরায়ত দৃষ্টিতে যেন শত অবীক্ষিতের নিঃশেষ দণ্ডের ইঙ্গিত।

মুহূর্তে শুরু হয়ে যায় সে এক মহাপ্রলয়কর দুর্ঘটনা, —কৃত্য ও বলপ্রেষ্ট একাকী অবীক্ষিতের সাথে অর্গণিত যুদ্ধদ্বন্দ্ব রাজপুরুষের নিদাক্ষণ সংগ্রাম। শত শত প্রচণ্ড শরধীরে ধীরে বিদ্ধ হ'তে লাগলেন ক্ষত্রিয়দল, সুশর্গণিত শরানির প্রহারে বিদীর্ণ হ'তে লাগলেন অবীক্ষিতও।

ক্রমে ক্রমে যুদ্ধদ্বন্দ্ব এক বিভীষণ মূর্তিতে রূপান্তরিত হ'তে লাগলেন অবীক্ষিত। দেখতে দেখতে দ্বিগুণিতক জ্ঞানশূন্য হয়ে এক সঙ্গরপ্রয়াসী উন্মাদনায় উন্মাদ হয়ে উঠলেন তিনি। যেন ক্ষত্রিয়কুলধরুণ খণ্ডবদহনে আবিস্কৃত স্বয়ং অবীক্ষিতরূপী তাঁরই উত্তরযুগল গাণ্ডীবধরা মহেন্দ্রাজ্ঞ। তাঁর ক্রোধবিস্তৃত মুহূর্তে অট্টহাসে যেন চমকিত হয়ে ওঠে স্বাবর-জগম। তাঁর স্বেদবিশ্মূ-নিচিহ্ন হৃদয়ধ্বজিত দুই নয়নে যেন ত্রিলোক-দক্ষোত্তর করাল ক্রশমুর তেজোদীপ্ত।

অবীক্ষিতের ঠিক পার্শ্বেই দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দিক হ'তে তাঁর প্রতি প্রতিটি আক্রমণে তাঁকে অবহিত করতে লাগলেন বিশালহুহিতা স্তম্ভতী বৈশালিনী।

অবীক্ষিতের নিশিত শরপুঞ্জ ছোঁত হলো কারো বা শিরোধরা; বিদ্ধ হলো কারো বা হৃদয়, আঘাতে বিভগ্ন হলো কারো বা বক্ষঃস্থল। অনেকের হস্তীকর ও অশ্বশির ছেদন ক'রে, অনেকের রথাস্থকে কিংবা সারথিকে সংহার করে সম্মুখ সমাগত সকল শরকেই শরপরম্পরার সাহায্যে অর্ধপথেই বিখণ্ডিত ক'রে যেন আপন হস্তলাঘবপ্রদর্শনের জগুই কারো বা ধনু এবং কারো বা খড়্গও ছেদন ক'রে দিতে লাগলেন অবীক্ষিত। তাঁর শরে ছোঁতবর্ম হয়ে বিনষ্টপ্রাপ্ত যেন অনেকানেক নৃপনন্দন; যুগ্মে-সময়ে যুগ্মযুগ্ম হতো রণ-পরিভ্রাণে পলায়নতৎপরও হলেন বহু পদাতি।

আকুলীকৃত ও নির্জিত প্রতিযোগীদের পশ্চাতে রক্তলোভাঙ্গর জিহ্বাস্রু কেশরীর মতো প্রধাবিত হ'তে লাগলেন অবীক্ষিত। বৈশালিনীর পার্শ্বস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তিনি বুঝতে পারলেন না, কী প্রচণ্ড পরিণতিকে পশ্চাতে রেখে এইভাবে অগ্রসর হলেন তিনি এইবার।

সহসা রীতিহীন পন্থায় তাঁকে সর্গ দিক থেকে বলয়িত ক'রে ফেললেন পাদপাশ্চরালপ্রায় সপ্তশত বীর, যারা আপনাপন কোলিজ, বয়স ও শৌর্ধের বিচারে জিয়মান হয়ে চরম সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন এতক্ষণ। এঁরা লক্ষ্যভরে মুহূর্তেও উপেক্ষা ক'রে অবাহতি করছিলেন, কিন্তু এবার সকল লক্ষ্য পরিভ্রাণ ক'রে অরাজধানিকরূপেই রাজদণ্ডের প্রতিশোধম্পৃহাকে চরিতার্থ করলেন।

সর্গদিকে বৈরবেষ্টিত অবীক্ষিত এ যেন অস্বাধিকার পরিহিতের সম্মুখে কখনও পড়েন নি আর। দক্ষিণে দৃষ্টিক্ষেপ করতে গিয়ে আক্রান্ত হন বামপার্শ্বে। পশ্চাতে দৃষ্টি ফেরাতে গিয়ে শরাস্রোতে ভাঙিত হয় পৃষ্ঠদেশ। এই মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্রের পাওয়া বৈশালিনীর সান্নিধ্যভাব এক আশ্রয় উপলব্ধিতেই বুঝতে পারলেন অবীক্ষিত। জীবনের এই মুহূর্তপ্রয়াসী মুহূর্তে তাঁরই মতো এক আপনাত্মক সহায়তার আত্যন্তিক প্রয়োজনকে

অস্বীকার করতে পারেন না তিনি কিছুতেই। কিন্তু কোথায় বৈশালিনী?

তথাপি আপন হৃদয় রণদক্ষতার বেষ্টনকারী মহাবল নবোদ্বতনরত্নের অস্ত্র-কবচাদি বিচ্ছিন্ন করতে লাগলেন অবীক্ষিত। কিন্তু এক সময় এক পার্শ্বের অতীক্ষিত আক্রমণে ছিন্ন হয়ে গেল তাঁরই কামুক।

সরোষে আপন অসিচর্ম গ্রহণ করেই অগ্রসর হলেন হিমধরা অবীক্ষিত। কিন্তু তা-ও ছিন্ন হয়ে গেল বৃহত্তে।

জালাবৃত যুগেন্দ্রের মতো আপন পরিণতিতে প্রমাদ গনলেন চিরাপ্রমাদিত করকমতনয়। বাধ্য হয়ে পদপ্রান্তে লুপ্তিত অপর কোন ধীরের গদা সংগ্রহীত করলেন গদাযুদ্ধকুশল অবীক্ষিত। কিন্তু বৃহত্তে মধ্যে লঘুতত্ত একাধিক বীর-বীরের ক্ষুরপ্র বাণবাণিতে ছেদিত হয়ে গেল তা-ও।

প্রবল প্রভঞ্নের দ্বন্দ্ব তাওবের মাঝে দাণ্ডায়মান হিরমুত্য় নিক্রপায় বনস্পতির মতো ধর্মযুদ্ধ-পরাস্থখ অগণিত রাজমণ্ডলীর যুগপৎ আক্রমণের মাঝখানে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে পড়েন উপায়বিমুঢ় অবীক্ষিত।

আর অবধারিত পরিণতিতে সার্থক করেই কয়েক বৃহত্তের মধ্যেই মাতঙ্গাক্রান্ত বেদনার্ড কেশরীর মতো ভূতলে লুটিয়ে পড়লেন শরকতসর্বাঙ্গ করকমতনয়।

মহোদ্রাসে ত্র্যম্বকসিহ তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে এলেন রাজন্তবর্গ। কিন্তু সহসা চমকিত বিন্ময়ে হির হয়ে দাঁড়ালেন তাঁরা।

তাঁদের সকলের দৃষ্টির অন্তরালপথেই কখন অবীক্ষিতের পার্শ্বে এসে আহত আবেগে লুটিয়ে পড়েছেন তাঁতেই অভিসংশ্রিতা রাজনন্দিনী বৈশালিনী, —যেন মূলোৎপাটিত মহীকহের পার্শ্বে কম্পিতকারী এক এক বাতসফালিতা কুমুদিতা মাধবীর লতিকা।

মুহূর্ত্ত তরঙ্গবিবম তাঁর সেই সমাব্যক্ত ক্রন্দন-রেশ শুনতে পাচ্ছিলেন পরব্রহ্মপ্রভা রাজন্তবর্গ। মাঝে একবার তাঁদের দিকে যেন সন্ধ্য অহঙ্কারে তাকিয়ে-ছিলেন রাজনন্দিনী, এবং তাতেই বৃহত্তের ভ্রম আপনাপন

রীতিহীন যুদ্ধনীতিকে ধিকার দিতে উদ্ভত হয়েও পারলেন তাঁরা। কারণ বক্রনালযুক্ত বর্ষাজালিক্রম তড়াগস্থিত পল্লের মতো সেই শ্লাঘ্যযৌবনার সমগ্র মুখমণ্ডলে যে কী দ্রবস্ত অভিশাপের ছায়া দেখেছিলেন তাঁরা, সেই বৃহত্তে তা বিচারণার অবসরও ছিল না তাঁদের একটুও।

দৃষ্টিপরায়াণের চিরাচরিত চিন্তধর্মের বিকারে অগ্নিত তখন তাঁদের মন। একটি অন্যায়কে আবরণ প্রয়াসী আর এক অন্যায়ের অবতারণা। অপরাধের ক্ষীণতম অংশটুকুকেও অপরাধ দিয়েই পূরণকল আত্মহননের উদ্যোগ।

বৃহত্তের মধ্যে অশ্রবজ্জু উদ্বোধিত করে তাই দিয়ে একই সঙ্গে অচেতন অবীক্ষিতকে ও বৈদিশপুরদ্বিহিতা বৈশালিনীকে বন্ধন করে ছুটে ও আল্লাদিত অন্তরে রাজন্যসম্মম বিশালের রাজধানীর দিকে প্রত্যাভর্তন করলেন তাঁরা।

প্রথম আবির্ভাবে অবীক্ষিতকে চিনতে পারেননি বিশাল, কিন্তু এখন পারলেন। বুঝলেন, রণদ্বন্দ্ব করকমের ক্রমরোধ হ'তে মুক্তির উপায় নেই তাঁরও। বুঝলেন, স্নয়ধর-ন্যাত্তা কন্যা থেকে মুক্তানুখে ন্যস্ত হয়েছেন তিনি নিজেও।

তবু, তাঁরও প্রত্যাভর্তনের উপায় ছিল না আর। অবীক্ষিতকে বন্ধনযুক্ত করে শুক্রযাগারে প্রেরণ করে সমবেত রাজগণমধ্যে আপন অভিলাবাহুযায়ী যে কোন একজনকে অচিরে পতিরূপে বরণ করবার আদেশ দিলেন তিনি অজ্ঞাতপরিণয়া আপন কন্যাকে। কিন্তু পিতৃ আজ্ঞা লম্বন করে বনযুগীর মতোই ক্রতপদসফারে রাজান্তঃপুরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বৈশালিনী।

নিক্রপায় বিশাল এবার আহ্বান করলেন বিদিতাখিলবিজ্ঞান সকল দৈবজকে।

রাজাজ্ঞায় বিচিতিভাচিত্ত দৈবজ্ঞবর্গ বৃহত্তে বিজ্ঞাত-বৃত্তান্ত হয়ে হুঃখাগ্নিত অন্তরে মহীপতির সমীপে বিদ্রোহপাদক এই যুদ্ধ সংঘটের দিবসটিকে পরিহার করে অপর কোন প্রশস্ত লগ্নযুক্ত শুভ দিবসের প্রতীকার

থাকবার নিৰ্দেশ জ্ঞাপন কৰলেন শুধু। অগত্যা তাতেই সম্মত হলেন হুঁচুতাপীড়িত বিশাল।

দুৰ্গাৰ্জী বাতাসেৰে চেয়েও গতিময়,—বিশেষতঃ জমক-জননীৰ কৰ্ণকূহৰে অপত্যেৰ সৰ্বস্ব-সমাচাৰ। ক্ৰান্তিৰঞ্জে সে হুঃসংবাদ আসাৰ আগেই হৃদয়কে ধৰে অম্লভূত হয় অকল্যাণী সন্মাস। দেহজাতোৰ চিৰাবাহিত প্ৰটো-প্ৰটীৰ অন্তৰলোকে।

অজ্ঞাত-কাৰণে উদ্বিগ্নচিন্তে ৰাজকাৰ্য্যে ব্যাপ্ত থাকতে চেষ্টিত ছিলেন সিংহাসনাসীন সিংহাবক্রম খনিনেত্ৰাত্মক কৰক্ৰম। তাঁৰ পাৰ্শ্বে যেন জলদাবলী-সমাচ্ছন্ন চান্দকাৰ মতো অবেন্ত-শোকে ত্ৰিয়মাণা হয়ে উপবিষ্টা ছিলেন শুভব্ৰতা বীৰ্যচন্দ্ৰহঁতা।

মহা বৈবধিক্যেৰে যুগেই সেই অৰ্বেষ সমাচাৰ বিঘোষিত হলো সভাহলে। আচৰিতে অবীকৃতোৰ বন্ধন-বিসংবাদে লম্পাশ্পুষ্টেৰ মতো যুহুৰ্তেৰ জল একবাৰ চমকিত হয়ে উঠলেন ৰাজা ও ৰাজমহিষী। অবিলম্বে ৰাজতনয়েৰ এ হেন বিপৰ্য্যয়েৰ প্ৰতিশোধ-স্পৃহায় আসন ত্যাগ কৰে উঠে দাঁড়ালেন কৰক্ৰম-সভাহঁত সকল সামন্ত-ভূপতি।

যুহুৰ্তেৰ মধোই আত্মহ হ'লেন অভাবিত ধৈৰ্য্যধৰ ৰাজৰ্ষি কৰক্ৰম। বীৰপত্নী বীৰপ্ৰসূ বীৰ্য্যৰ দুটি চক্ৰে যেন দেৱাৱিধিধ্বংসিনী চণ্ডিকাৰ চণ্ডদৃষ্টিৰ জ্বালা, তগু অটল হৈছে আপন আসনেই উপবিষ্টা তিনি।

ৰাজাজায় আপনাপন আসনে পুনৰায় উপবিষ্ট হলেন কোধোম্মত সামন্তৰাজেৰ দল। তাৰপৰ শুক হলো আশু কৰ্তব্যেৰ আলোচনা।

কেউ বললেন :

—যাৱা বহজন-সমবেত হয়ে একমাত্ৰ বীৰকে অধৰ্ম্ম সময়ে বন্ধ কৰেছে, তাৱা সকলেই বধ্য। আদেশ কৰুন ভূজনাধিপ্ কৰক্ৰম, তাৰেৰ স্কন্ধচূত যুগুণ্ডল আপনাৰ বিটকবোদিকাৰ নিয়ে উপহাৰ দিয়ে ধন্ত হই আমবা আচৰে।

কেউ জানালেন :

—নিশ্চিন্তে চিন্তাৰ অবসৰ নেই, মহাৰাজ আদেশ কৰুন, যেন সেই অম্লব্ৰশ্মণী দুৰাত্মাবৰ্গেৰ কাঁধৰ ধয়নে

আচৰে তপ্ত কৰতে পাৰি ধৰণীৰ পাপৰত্নপিয়াস চিন্তদেশ।

ৰাজৰোষে ক্ৰমাগ্ৰাৰ্থী হয়ে নিবেদন কৰলেন কোল বা নীতিশাস্ত্ৰজ্ঞ পুৰোহিত :

কিঞ্চ ৰাজকুলভিলক অবীকৃতই কী অনভিলাষিণী কন্তাকে অজ্ঞায়ক্ৰমে আপন বলগৰ্বে গণ্যকৃত হয়েই গ্ৰহণ কৰেননি ? যয়ধৰ-সভাহু অগণিত ক্ৰিয়বন্ধে বৈৰত্যাৰ অগ্নি প্ৰজ্বলিত ক'ৰে তিনি নিজেই কি এই পৰিণতিৰ আশ্ৰয় কৰেননি ?

মহা বিগ্ৰহ বনভূমে ধুমায়িত অগ্নিৰ আচৰিতে সহংশিনায় পৰিৱৰ্ত্তাপুৰ মতো মগন উগ্ৰতায় উঠে দাঁড়ালেন মহাৰাজা বীৰা :

—হে পাৰ্থিবশ্ৰেষ্ঠ ক্ৰিয়বন্ধ ! সমগ্ৰ মহাপীতিকে প্ৰজ্বলিত ক'ৰে আমাৰ কল্যাণাশ্পদ পুণ্ড্ৰে বলপ্ৰয়োগে কন্তাকে গ্ৰহণ কৰেছে, তা তাৰ সপোত্তম বীৰ্য্যবন্তাকেই সূচিত কৰে। আৰ, সেই কাৰণেই আপনাপন বীৰধৰ্ম্মকে লাঞ্ছিত ক'ৰে অস্বপ্নপৰবশচিত্ত জ্ঞায়ক্ৰমে বিক্ৰবচেতা অবিবেকী নৰাধম নৰাধিপবৃন্দ একাকী সেই মহাবীৰ বীৰতনয়েৰ সাধে অধৰ্ম্মধূকে লিপ্ত হয়েছে ; পাদপাত্তৰালে আপনাপন কলুষিত তহুকে লুকায়িত ৰেখে আত্মৰক্ষাৰ কোন স্নযোগ না দিয়েই ক্লৰপ্ৰবাণে তাকে গ্ৰহণ কৰেছে ; সপোপাৰি, অশেষ অপৌৰুষে অধৰজ্জু উন্মোচিত ক'ৰে তাৰ অচৈতন্ত দেহকে বন্ধন কৰেছে। তথাপি আমি আমাৰ পুত্ৰেৰ হানিকাৰক কিছুই দেখি না। শৌণ্ডীৱবৃন্দ ! জিহ্বাংগ কেশৱীৰ মতো নীতিজ্ঞান-হীনতাৰ দৈন্তে আপীড়িত পাপীয়াস্ন সেই ক্ৰিয়কুলজাৱবৰ্গেৰ দুৰ্গাৰ্জীকে যেনে না নিয়ে অচেতন-দেহে আমাৰ পুত্ৰেৰ সেই বন্ধন, তাৰ অপৰিসীম পুৰুষকাৰেৰই নিদৰ্শন। কোন্ যুক্তিবলে তাৰ সেই যয়ধৰ-কন্তা কন্তা গ্ৰহণেৰ কৃতিত্বকে নিন্দা কৰা যায় ? ক্ৰিয়কুলজাত কোন্ মহাবীৰ আপন বীৰধৰ্ম্মকে লাঞ্ছিত ক'ৰে হীনজনসেবিত যাচুণ্ডাৰ মধো ব্যৰ্থ হয়ে যেতে চায় ? অতএব বলিজন-সমকে শৌণ্ডীৱপ্ৰকাশ পূৰ্ণক পৰিহুমা আপন আকাজিকাৰ পাণিগ্ৰহণ ক'ৰে

যে কাঙ্ক্ষাকুলোচিত কর্মই সাধন করেছে অবীক্ষিত, সে বিষয়ে দৌর্দমন্য অবলম্বনের কিছুই থাকতে পারে না। আর অবীক্ষিতের বন্ধন যেমন শ্রাব্য বিষয় তেমনই শ্রাব্যনীয় আপনাদের মস্তকে অস্ত্রাঘাত। অত্যাং হে মহুকুল-হিতকামী বান্ধববৃন্দ, বিবসানের দিগন্তব্যাপ্ত তমোরাশি বিনাশনের মতোই ভুবনব্যাপী অবীক্ষিতের বৈরিকুল বিধ্বংসে সম্ভ্রান্ত হন আপনারা। আর, আপনাদের অসীম শৌর্যবস্তার পশ্চাতে অথও শক্তির ষোণান হয়ে ধাবিত হবে তার মাচ্ছ-অস্তরের পুতানীস।

পুনরায় রণলিপ্সু প্রচণ্ডতার আগন পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন উদীর্ণমনা সমুত্তোজিত প্রহর্তাবৃন্দ। যেম অবর্তাবিক্ষোভিত মীনাক্ষিতরহিত মরোবররূপ সেই রাজসভার বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষত্রিয়ের তেলোগ্রুণী মদোন্মত্ত বারণ। সকল-কণ্ঠ-বধিরকারী জ্বালোড়নের মতো নিরন্তর নিরন্তে মুহূর্তে আপূরিত হয়ে গেল সভাগৃহ।

বীরাবাক্যে উত্তোজিত হয়ে উঠেছিলেন ভ্রূবীর্ষগণে চিরোদ্ধত করকমণ্ড। পুত্রসকলের বিনাশের কামনায় সৈন্তসম্মার অহুজা বিঘোষিত করলেন তিনি তখনই।

অচিরেই বিশালনগরীর দিকে এগিয়ে চললেন বারবাণ পরিহিত অনেকানেক পণ্ডিতসংহতি, অগ্নয়েয় আয়ুধিক, সংখ্যাত্তিত কৃতপুন্ড্র, অদ্র শক্তিহেতিক, পরোলক্ষ নৈজ্জিংশিক, এবং অত্যাগত প্রাসিকবাহিনী। বৃহতে ও অখল্লোভ্য, পটতে ও বিক্ষারে, অসির্ভকার ও ঘোষসংরাবে সুধর সেই সর্গাভিসার-বাহিনীর প্রচণ্ডে যেন বিদীর্ণ হয়ে যায় দীনা পৃথিবীর বক্ষ। হুন্ডুভি ও ভেরী, কণ্ঠ ও দামামার নাদে প্রতিশ্রুণ্ডর হয়ে যায় সুদূর অঘরের নিস্তক গভীরতা। তিনটি অভিশপ্ত দিবস ও যামিনীব্যাপী সেই নিদারুণ শোণিতক্ষরী প্রবিদারণে যেন আপন বক্ষে শূন্যভতার জাণবলীলা প্রত্যক্ষ করলেন অধীরা ধরনী।

পুত্রস্নেহাত্মা জননীকণ্ঠের উত্তেজে তেলোময়ী করকমণ্ডের সেই অনেকানীকিনী অচিরেই বীরাশংসনে

পরিণত করে ফেললেন সেই রণভূমি। ব্যূহের চতুর্দিকে শুধু বিতায়িত হয়ে থাকে বিশালরাজ্যভূগামী পরঃসহস্র ভূপমণ্ডলীর শব আর শব।

অদূরে রাজকীয় স্কন্ধাবারে অবরুদ্ধ নিখাসে যুদ্ধ-পরিহৃতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন করকম। লক্ষ করছিলেন অচিরে স্বভূজবিজিতপ্রায় অদূরবর্তী, বিশাল-নগরীর দিকেও।

সহসা শত শত খেতকেতন উড্ডীন করে এক রাজকীয় বাহিনী সন্ধির প্রার্থনা নিয়ে এগিয়ে আসতে থাকেন তাঁর স্কন্ধাবারের দিকে। বাহিনীর পুরোভাগে করকমের উপাসনার্থে অর্ধ্যাহুত সয়ঃ বিশাল। তাঁর এক পার্শ্বে নতশির অবীক্ষিত, অপরপার্শ্বে গুণম কাঞ্চনবল্লীসদৃশা অজাতপরিণয়া রাজহাঁহতা।

বিশালের অর্চনায় ভুঙ হলেন করকম। বিগ্রহও যানের সাথে, আসন ও ঘেষের সাথে আশ্রয় ও সন্ধিতেও আপন গুণ-প্রেষ্ট প্রতাপ করলেন তিনি। পুত্রের বন্ধন মোচনারসানের সাথে সাথেই ক্ষমা করলেন তিনি বিশালকে।

বিশাল সাগ্রহেই বিজয়ী করকমতনয়ের হাতে কস্তাকে সমর্পণ করার প্রস্তাব নিবোধিত করলেন করকমের সকাশে।

যেন বিশালের প্রস্তাবের প্রাত্যহায়েই কিছু বলতে উত্তম হলেন অবীক্ষিত। কিন্তু মহাবীর্ষ করকমের সর্ষ উচ্চহাসের কাছে অক্ষুট রয়ে গেল তাঁর প্রতিবাদ।

বিশাল বা অপর রূপাভবর্গেরও দৃষ্টিকে আতিক্রম করে গেল বাকেছু অবীক্ষিতের ব্যাকুলতা।

লক্ষ্য করেছিলেন শুধু বিশালহাঁহতা বৈশালিনী। কিন্তু কি যে বলতে চেয়েছিলেন অবীক্ষিত, তা-ও বোঝা হলো না তাঁর।

পরদিন প্রভাতেই উষাহের সূপ্রশস্ত লগ বিচার করলেন এহবেত্তা রাজ-পুরোহিতবৃন্দ। মহানন্দেই সম্মতিজ্ঞাপন করলেন দুই আও-বৈবাহিক।

এক অনিবার অন্তর্ঘর্ষে দ্বন্দ্বায়িত হয়ে উঠেছিল অবীক্ষিতের চিত্তবেশ। যেন সর্বলোকোচ্ছল্য পরিয়ান-

প্রয়াসী এক হৃদেস্ত ভমিয়ার আবির্ভাব হয়ে গিয়েছিল তাঁর বিগতকালের সালোকিত বিবেক-পট।

কোথায় যেন অবলুপ্তি ঘটেছিল তাঁর সেই মহীয়সী ধীশক্তি। কোথায় যেন তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর অবিচালিত উৎসাহ। সেই স্থিরতম অধ্যবসায়ের আচাষিত অস্ত্রধানে কোন কিছুই আর নতুন ক'রে মেনে নেবার আগ্রহকে হারিয়ে ফেলেছিলেন অবীক্ষিত।

যে দুর্জয় রিপুবর্গকে একদিন আত্মবশে রাখতেন অবীক্ষিত, তারাই বা গিয়েছিলেন কোথায়? কোথায়ই বা গিয়েছিলেন তাঁর সেই কিছুতেই বাসনা না হবার অঙ্কার?

জীবনে প্রথম এই অভাবিত রণপরাজয়ে প্রকৃতই যে কি অনিশ্চয়্য এক রূপান্তর ঘটেছিল অবীক্ষিতের মনে, তা একমাত্র অবীক্ষিতই অনুভব করতে পারছিলেন।

বস্তুতঃ, তাঁর আপন আন্তঃকৈ তিনি আবাসী হয়ে উঠেছিলেন। অতীতের সকল অস্থাপোক্রমের গৌরবের পারবর্তে চরম প্রানিতেই পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তাঁর নিকংসাহিত সত্তা। দু'বল শুধু চিন্তাই নয়, যেন তাঁর অঙ্গের প্রাণটি অংশে অংশে কেজীভূত হয়ে গিয়েছিল শক্তিহীনতার অগুরাশি। যেন বীরধীশ কোন পুরুষ নন তিনি,—যেন পুরুষদেহে এক অবলা হাঁহতা।

চিন্তাভাবে আত্মহারা হয়ে যাননি অবীক্ষিত; শুধু নিজেরই পরাহত অস্তিকে আরও বোঁশ ক'রে আত্মসচেতনায় সযুক্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি নতুন ক'রে।

মহাত্মীতিতে আগ্রুত অন্তরে পরপ্রভাতের অপেক্ষায় বিশালপুরীতেই একটি রজনী অতিবাহিত করলেন রাজর্ষি করকম।

পরদিন প্রভাতেই আপন কজাকে অবীক্ষিতের হাতে সমর্পণ করতে সমুপস্থিত হলেন বিশাল। মাতালক মস্ত্রে ও সহর্ষ মস্ত্রে পরিপূর্ণ তখন বিশালপুরীর প্রতিটি চহর।

ইন্দ্রনীলবন্ধ প্রাসাদতলে মেঘোদয়ভ্রমে সানন্দে বৃত্যপরায়ণ হলো ময়ূর। প্রবাল মাণিক্যময় ভবনোঁখত

মরীচানিচয় স্তম্ভর চূতাহ্বর শঙ্কায় ভোগরত হলো যত ভব্যবাহী বিহঙ্গম। ক্ষটিকগৃহোঁখিত আজকের সানন্দ প্রভাপুঞ্জ মিশ্রিত হয়ে মন্ডরোদভ্রান্ত সন্দেশ অর্পণের মতো প্রতিভাত হ'তে লাগল বিশালপুরী। পূর্ণসাক্ষ্য-চন্দ্রাননা যত অন্তরবাসিতা আজকের বিভাত আনন্দালোকের অবস্থান নিয়েই বিবাহবাসরে এসে সমুপস্থিতা হলেন একে একে। রাজপুরীর বাতায়নপথ হতে ধূপ-ধুমপুঞ্জের নির্গমনে বিশালাকাশমণ্ডলে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমশোভার বিস্তৃতি ঘটল ক্রমে ক্রমে। ক্রমে ক্রমে সেই উৎসবাসরের চতুর্মণ্ডল হ'তে বিনির্গত প্রভাপটলে সমস্ত রঙোমণ্ডল যেন ইন্দ্রাশ্বমেধে পরিকর্ষ হয়ে উন্নত স্বর্ণমেঘবৎ প্রতিভাত হ'তে থাকে।

পুত্র অবীক্ষিতের বাহ ধারণ ক'রে লাজকস্তম্ভর অবনতশির বিশালাশ্রমার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছিলেন প্রার্থনিতাস্তর পিতা করকম।

সহসা বাক্‌স্ফুট হলো দীর্ঘমোনী অবীক্ষিতের। যেন তখনও অপনোদিত হয়নি তাঁর দীর্ঘকালপূবে পাওয়া শরাঘাতের যন্ত্রণা। এক অব্যক্ত অস্ত্রাংলাই ব্যক্ত হয়ে ওঠে তাঁর করুণ অথচ প্রাণজ্ঞাদুগ্ধ কণ্ঠস্বরে :

—শিতা, যে কজার সমক্ষে শত্রুকর্তৃক পরাজিত হয়েছি আমি, তাকে কখনই জীবনদায়িত্বরূপে গ্রহণ ক'রে এক হীনবীর্য পুরুষসজিনীষের আভিশাপ দিতে পারিনি আর। শত্রুর কাছে চিরাপরাজয়ের চিরমাত্র কোন অধঃগত-যশোবীর্য ব্যক্তিতেই যেন সম্প্রদত্তা হয় এই কজা, আপনি সেইমতো নির্দেশই দান করুন এখানে। বিশালাধিপ বিশাল, কাতরা ও হতধীবিভা অবলার মতো শক্রানজিত এই অবীক্ষিতে ও পরাধীন এই কজাকার যে পার্থক্য নেই কিছুই, তা কি আপনি বুঝে অপারগ? আপনার যে কজার সমুখে পুরুষের চিরায়ত্ত স্বাধীনতা হারিয়েছি আমি শত্রুর কাছে, কোন্ নির্লজ্জ দুঃসাহসে তার কাছে আমার এই পূর্ণদৃষ্ট বদন প্রদর্শন করব আমি আর?

নির্গাৎ হয়ে রইলেন করকম। শক্রবিজয়ী এক পিতা শত্রুবিজিত আপন পুত্রের এ হেন বীরব্যঞ্জক



প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে বাকশক্তিহারা। কখনও পরাভূত না হলেও অভিশবের অনপনোদিত গ্রানিকে অমুভব করতে পারেন তিনি আপন অঞ্চল শূরসভায়।

বিশালের সমীপে আপন নিকরপায় বিবেকের বার্তা কোনমতে বিজ্ঞাপিত করলেন করকম :

—বান্ধব বিশাল, অভিনব হলেও পুত্রের অকাষ্ঠ্য যুক্তির বিরোধিতা করতে অপায়গ আমি আজ। আপন বয়ঃ অজ্ঞ আপনার কন্টার বিবাহের উদ্ভোগ করুন।

নিকরপায় বিশালও। বারংবার কন্টার বিবাহ বিভ্রাটে মর্মান্তিক বেদনাভারে জর্জরিতচিত্তে অপহৃষ্টবেদনে অনিলবিকম্পিত কল্পক্রমের মতো কম্পিতকায়ে অপেক্ষা করছিলেন তিনি করকমেরই অমুজ্ঞার। অতঃপর কন্টার উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন তিনি :

—কল্যাণি! মণ্ডকুলতিলক মহাত্মা রাজনন্দনের বজ্রাধিপ মুকঠোর প্রতিজ্ঞাবাণী কি শ্রবণ করেছে তুমি? যদি ইচ্ছা হয়, তবে স্বয়ং অজ্ঞ কাকেও পতিত্ব বরণ করো, অথবা তোমার প্রতি অপারিসীম স্নেহবশতঃ আমাদেরই নিষ্পাচিত একজনের পত্নীত্ব গ্রহণের স্বীকৃতি দান করো।

পিতৃআজ্ঞায় এবার আর অসৌজন্ত প্রকাশ করে সভাকক্ষ পরিভ্রাণ করে গেলেন না মুগ্ধপ্রেক্ষণী বৈশালিনী। ধীরে ধীরে তাঁর বোদনারাক্তিম পলাশ নয়নদুটি বিস্ফারিত করে ঝঙ্কু ভাবেই তাকাইলেন তিনি পিতার মুখাবয়বে। তারপর বীণাতন্ত্রে বেন ঝঙ্কুত হলো তাঁর স্বর ঝঙ্কার :

—হে পাণ্ডিবেশ্রেষ্ঠ! রাজতনয় ধর্মমার্গামুসরী হয়ে অর্গণিত অভায়বোধী পাণ্ডাঙ্গার সাথে সংগ্রামরত থেকেও জ্ঞাতসারে যশোবীর্যহানিকারক সেই পরাজয়কে বরণ করেননি একটুও। ইনি জ্ঞানমতে অবাহিত থেকে নিখিল নৃপতিমণ্ডলীকেই পরাজিত করেছেন বারংবার। শৌর্য ও বিক্রমের সার্বিক-প্রতীক ধর্মযুদ্ধপারঙ্গম এই কুমারকে অধম ব্যবহারে বন্দী করে বহুসংখ্যক নৃপতিবৃন্দই লজ্জাম্পক হয়েছেন। হে পিতঃ! আপনার

হৃহিতা কেবলমাত্র ঐর অপরূপ রূপের জন্তই যে ঐতে অভিল্যামণী, তা নয়; প্রভূত তাঁর শৌর্য, বিক্রম ও ধৈর্যই হরণ করেছে তার মন। শুধু তাই নয়, জ্ঞানাদীশরূপে যে রাজদণ্ড আপনারা গ্রহণ করেছেন, একবার পাণ্ডিগৃহীতা কন্টাকে পুনরায় অস্ত্রের হাতে সমর্পণ করবার বিধানকে যেনে নিয়ে, তারই স্বমহাননা করবেন না কি আপনারা? বরং মহামুগ্ধব রাজনন্দনকেই অমুরোধ করুন, তিনি একবার যে অমুর্ষাহিতা কন্টার পাণ্ডিগ্রহণ করে তাকে জীবনদায়িত্বরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন, পুনরায় তাকে অগ্রহণের কপোলকল্পনাগ্রস্ত প্রতিজ্ঞায় সঙ্গার্মবিভ্রষ্টের কলুষে যেন আগ্রস্ত না হন কখনও।

নিম্নুপ সভামণ্ডলে নৃষ্টিক্ষেপ করে নিঃশেষিত-বায়ু আপন বক্ষে পুনরায় আবেগ সঞ্চারিত করে পিত্রোদ্দেশে নিবেদিত হয় তাঁর মুখারবিম্ববিগলিত সুখাদ্ বাগধারা। অর্থাণ্ডত যুক্তিনিপুণা রম্যভাষাভিজ্ঞার মতো শোনাল তাঁর সেই বাণী :

—পরম তপোয়স্বরূপ হে জনক! আপনার এ দ্ৰাহতার দেহমন একবার নিবেদিত হয়েছে যখন, পুনরায় নিবেদনের অবশিষ্ট নেই আর কিছুই। নতুন করে বিবাহ-মাজল্যের প্রয়োজনীয়তাই বা আর কোথায়, এই কুমারের অনাহত অবস্থায় যখন তার সাথেই বিবাহিতা আমি?

স্বন্দারিতচিত্তে কন্টার বাণী বিচার করে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রাজসন্তম বিশাল। কোন যুক্তিতেই তার এই আত্মক আকৃতিকে খণ্ডিত করতে পারলেন না তিনি। অগত্যা রাজনন্দন অবাকিতের উদ্দেশ্যেই ঘরায়িত হয়ে উঠল তাঁর অমুরোধ :

—অপ্রতিহত-শৌর্য হে প্রভূত পরাক্রমি! আমার এ কন্টা একবার আপনারই পাণ্ডিগৃহীতা। একে চিরসঙ্গিনীরূপে স্বীকৃতি দিয়ে আমার কুলপবিত্রতাকে অক্ষয় অমুগ্রহে আশিত করুন।

নতমুখে প্রভূতর জানালেন করকমডনয় :

—গ্রীময়াহিতান্তর আমি আপনার কন্টা বা অপর

কোন কামিনীকেই স্বীকৃতি বরণ করতে অপারগ। হে মনুজেশ্বর। নারী কখনও নারীর ভর্তা হ'তে পারে না। আপনি এমন এক ছরদুই হ'তে আমাকে রক্ষা করুন।

আকুলান্তরা বৈশালিনীর আকৃতিতে ব্যাকুলীকৃত হয়ে উঠেছিল করকমেরও অন্তর। পুত্রের উদ্দেশ্যে তিনিও অমুরাধ বাণী উচ্চারিত না ক'রে পারেন না :

—পুত্র অবীকৃত! এই স্ত্রী বিশালাত্মকা তোমাতে প্রগাঢ় অমুরাগবতী। স্তম্ভরাং একে পরিভ্যাগে দূষিত হবে না কি তোমার মা'মা? একে 'হুমি প্রণ করলে স্তম্ভী হবে আমার অন্তর।

পিতৃ অমুরোধেও আপন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়ে থাকেন অবীকৃত। যেন আপন বক্ষাগীরিত বাস্প-রাশিকে বহু আয়োগে সংযমিত রেখে ব'লে ওঠেন তিনি :

—হে প্রভো! হীতপূর্বে কখনই আপনার আজ্ঞাকে অপালিত রাখিনি আমি। এখনও আমার আপনি তেমনই আদেশ দান করুন, যা প্রতিপালনে সমর্থ হবো আমি। আর, একান্তই যদি আমাতে পরিগৃহীতা হতে

হয় এই বরবারিনীকে, তবে তাঁকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, যেন কোনদিন কোন মুহূর্তে কোন আসক্তির আবেগে আমাকে বভসসঙ্গীরূপে পাবার আগ্রহে অধিত না হন তিনি। এক নারীর লীলাসহচরীরূপেই নিয়োজিত হবে আমার পুরুষহীন সত্তা, তাতে আসক্তির লেশমাত্র সংযোগ থাকবে না কিছুতেই।

—আর্থ রূপাত্মক!

যেন অভ্রহীন গগন হ'তে বিচ্যুত এক আচম্বিত কুলিশ পতনের অনিগাঢ় অচেতনতায় আচ্ছন্ন হয়ে যাবার আগে একবার নিদারুণ আত্মস্বর উৎসারিত ক'রে উঠলেন স্তম্ভতী বিশালাত্মকা।

তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসারিণী হয়ে এসে পিতা বিশাল ও রাজধি করকমের চরণে প্রণামার্থ্য নিবেদিত ক'বে জলকণালিপ্ত হিরনাল কমলের মতো অক্ষসিত হুই নয়নের আচ্ছন্নপ্রায় দুটি নিয়ে সভাকক হ'তে বিনিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন তিনি।

নতমস্তকে একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন অবীকৃত।



# জৈব

শ্রীমতীহার বঙ্গন সেনগুপ্ত

দিন পনেরো বাদে মুন্সিপাল ইলেকশান্, যশোদাহুলালবাবু যেন ফেপে উঠলেন নিজের নাম ও কাজ চাকে চোলে প্রচারে।

বরাবরের মত এবারও তিনি দাঁড়াচ্ছেন কাউন্সিলর পদের জন্য।

প্রতিবারই তিনি কোন পার্টি বা দলের পক্ষপুটে থেকেছেন। এবার আর কোন দল নয়, —ইণ্ডিপেন্ডেন্ট। হাঁ স্বাধীনভাবে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা আছে তাঁর। নিজেকে তিনি ধান ও পাটের ব্যবসায়ী, কিছু পিতৃদত্ত ধনও রয়েছে তার উপর। এই পৈতৃক বসতবাটির মূল্যই ত এখন মফঃসল শহরে হুঁলাধের চেয়ে বেশী।

যশোদাহুলালবাবু বিপত্নীক।

প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে একটি কন্যা প্রসব করার বছর ঋনেকের মধ্যে টাইফয়েড মারা যান ঘরের লক্ষ্মীস্বরূপা পত্নী এজবালা।

তারপর আর বিয়ে করেন নি। আর সময়ও যটেনি।

নিজের ব্যবসা আর পৈতৃকধনের সিন্ধুক সাম্ব্লাতে তাঁকে বিরত থাকতে হয়েছে সর্গক্ষণ। নিজের বিধবা মা অবশ্র দার পরিগ্রহের জন্যে পুনঃপুনঃ তাঁর কানের কাছে অহোব্রাজ আবেদন নিবেদন করেছেন এমনকি কাশীবাসী হবার ভয়ও দেখিয়েছেন, উত্তরে যশোদাহুলালবাবু ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে শুধু বলেছেন : দাঁড়াও মা, একটু দাঁড়াও। পাটের কাজ কারবার বেশ মন্দা যাচ্ছে, মোড় খুবলৈ ব্যস্, তোমার কথা রক্ষা করুবো। কোন চিন্তা করে না।

মা ও তৎক্ষণাৎ বলেছেন : ‘তাহলে ভালবংশের মেয়ে আগে থেকে দেখেগুনে রাখি, কি বলিস্। ছেলের জবাব : ভুমিও যেমন মা,...বাংলাদেশে কি ভালবংশের মেয়ের অভাব ? একদিনেই হাজার মেয়ে ছোটে।...তা নয় মা, আমি ঠিক সময়েই তোমাকে জানাবো—’

এই জানাবো জানাবো বলে আর ঠিক সময়ে মাকে জানানো আর ঘটলো না যশোদাহুলালবাবুর। ব্যবসা আর পৈতৃকধন সামলানো ছাড়াও প্রতিবছরই কোন-না-কোন একটা ইলেকশানের খেলা নিয়ে মেতে থাকতেন তিনি।

এই সময় রাতের কয়েকঘণ্টা ঘুম আর বিশ্রাম ছাড়া সময়ই থাকতো না হাতে।

সহরের কয়েকটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন নানাভাবে। দ্বুতরাং ইচ্ছা থাকলেও যশোদাহুলালবাবু সাঁতে-পাঁকে আর বাধ্তে পারুলেন না নিজেকে।

মা বাদে এ'ব্যাপারে অজস্র বন্ধুবান্ধবরাও কম বিরক্ত করেন তাকে।

তাদের দৃষ্টি অবশ্র ছিল বিশেষ কোন বিরাট ভোজ ও ফলাবের দিকে,...যশোদাহুলালবাবু নিজে বুঝতেন কিন্তু সম্ভ্য তাঁর সময় কোথায়?...

এমনি করেই বছর গাড়িয়ে কখন তিনি চান্নিশের থাকায় পৌঁছে গেলেন।

কোলের একমাত্র শিশু মেয়েটির বয়সও পনেরো পেরিয়ে যোলেয় দাঁড়ালো।

যশোদাহুলালবাবু স্থপাজ দেখে বটা করে তার বিয়ে

দিলেন। বছর খুঁতে তার একটি বাচ্চাও হলো।  
বাচ্চাটি কিছু বড় হ'তে যশোদাছালবাবু তাকে নিজের  
কাছে এনে রাখলেন।

নিজের যখন বিয়ে করে পোস্ত বাড়তে পারলেন না,  
—বিরাট বাড়ীর বিরাট শ্রুততা পূরণ করতে পারলেন  
না,—সেই হেতু, একমাত্র মেয়ে ঘর ছেড়ে চলে যেতে,  
তারই পরিপূরক হিসেবে নাতীটিকে নিয়ে এসে ঘরের  
বিরাট শ্রুততা আংশিক পূরণ করলেন মাত্র।

বিবধা মায়ের এখন খাট পেরিয়ে গেছে।

ছেলের আবার বিয়ে নিয়ে তিনি এখন আর আগের  
মত বায়না কা করেন না,—ছেলের কাজকর্ম দেখে নিজেরও  
কিছু বুঝতে পারেন এখন। এখন শুধু একমাত্র নাতনীর  
ছেলেটিকে বুকে তুলে নিয়ে সান্দ্রনা খোঁজেন।...

এবারকার ম্যানিসিপাল-ইলেকশানে কাজের কিছু  
কটিন বেঁধে নিয়েছিলেন যশোদাছালবাবু। একটু  
বেলা করেই সচরাচর ওঠেন তিনি।

উঠেই প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে 'ব্রেকফাস্ট' খেয়ে নিজে-  
নতে সাড়ে আট-নটা বেজে যায়। তারপর দোতালার  
চলে কোঠায় গিয়ে আধঘণ্টা বসেন।

এখানে তিনটি ছেলে বসে পোস্তার লেখে। 'ভোট'  
'দন,' 'ভোট দিন,' আপনাদের শ্রীচরণের দাস,...  
অথবা বছরছরের অভিজ্ঞ সমাজকল্যাণসেবক, কিম্বা  
আপনাদের প্রিয়জন বন্ধু বা জনসমাজের উৎসর্গাত  
প্রাণ...যশোদাছালবাবু সংস্কারের পক্ষে ভোট দিয়া দেশ  
তথা জাতির সেবার সর্বতোভাবে সমর্থন জানান।'

প্রায় দিন পনরো ঘণ্টা ছেলে তিনটি এসব লিখে  
গেলেছে।

মাথাপিছু দুটাকা দিন। তাবাদের চা-জলখাবার  
কি'। ঐ পোস্তারগুলো দেয়ালে-দেয়ালে বা কোথাও  
হুসিয়ে দেবার জন্তে আলাদা লোক আছে। তাদেরও  
থেকে কিছু গুঁজে দিতে হয়।

পোস্তার লেখা 'চেক' করে তিনি রাত্তার গাড়ী নিয়ে  
ঘরিয়ে পড়েন,—সঙ্গে থাকে জনচারেক মো-সাহেব  
যারা প্রায় সবসময়ই যশোদাছালবাবুর বাইরে বৈঠক-

খানায় আস্তানা গেড়ে নানাভাবে প্রচারকার্যে সহায়তা  
করে চলেছেন।

রাত্তার ঘুরে-ঘুরে খুঁটে-খুঁটে দেখেন পোস্তারগুলো  
ঠিকমত লাগানো হয়েছে কিনা।

কোথাও গোলমাল বোধ হলে পকেট-ডায়েরীতে  
চট্ করে টুকে নেন।...পোস্তার চেকিংয়ের শেষে  
ভোটারদের ঘরে ঘরে গিয়ে পদখুলি দেবার পালা।

ইলেকশানে নাম্বার কয়েকদিন আগে থেকেই  
এ'কাজ আরম্ভ করেছেন তিনি। অবশ্য তার সীমিত  
এলাকার মধ্যেই তার যাতায়াত। দিনে ছ'টি বাড়ীর  
বেশী তিনি যেতে পারেন না।

হৃদয় বলে বাড়ীর কর্তাগোছের ব্যক্তিদের সঙ্গে  
হেসে আলাপ করেন, তাদের সুখসুবিধার কথা জিজ্ঞেস  
করেন অথবা গুনে থাকেন। বাড়ীর কর্তা খুসী হন,  
যশোদাছালবাবুর মনও ভরে যায়।

বেলা একটার মধ্যে ঘরে ফেরেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর গায়ে খাটি সরষের তেল  
মাখেন প্রায় একছটাকের মত। চাকর বনমালীই এ'কাজ  
করে থাকে। প্রায় আধঘণ্টা ঘরে সর্বাঙ্গে দলাই  
মলাই।

তারপর স্নান।

বাড়ীর পূর্বভাগে পৈতৃকআমলের একমালী একটি  
পুকুর,—পরিষ্কার কাকচকুর মত টলটলে জল, সেখানে  
আধঘণ্টা ঘরে অবগাহন স্নান করেন। মাঝে মাঝে  
দেয়ীও হয়। ঘাটে যদি কোন মেয়েরা থাকেন,  
যশোদাছালবাবু সহসা সেখানে যেতে পারেন না।  
কেমন সংকোচ বোধ হয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন।  
মেয়েরা চলে গেলে, তবে তিনটি গিয়ে ঘাটে নামেন।

স্নান সেরে খেতে যখন বসেন, দুটো বেজে যায়।

খাবার সময় প্রায়ই মা সাম্নে এসে বসেন।

যশোদাছালবাবু ভোজনবিলাসী। রাহ মাংসটা  
খেতে খুবই ভালবাসেন। আর খেয়েও থাকেন প্রতি-  
দিন। ...তাতে বৃদ্ধা মায়ের আবিদার ও জেদ। স্ত্রতবাং  
প্রায়ই গুরুভোজন হ'য়ে পড়ে।

বাগ্ম্যর পর সাধারণতঃ কিছুক্ষণ বিশ্রামে যশোদা-  
হুলালবাবু অভ্যস্ত, কিন্তু ভোটেরদের ব্যাপার আরম্ভ  
হওয়া পৰ্যন্ত এটি আর হ'চ্ছে না বলা চলে। বাইরের  
ঘরে সাধারণ অধিষ্ঠানরত মোসাহেবদের কাছে এসে  
বসতে হয়। তাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষটির আলোচনা  
করতে হয় বিতৃপ্তভাবে।

এমনি আলোচনা কালে হু'তিনবার চা' এসে যায়  
বনমালীর হাতে।

...বিকেল পাঁচটা বেজে যায়।

যোগেশ্বর সপারিসদ যশোদাহুলালবাবু বোরবে  
পড়েন আবার। কিছুক্ষণ আড়তে গিয়ে বলেন। আয়-  
ব্যয়ের হিসেব নিকেশ করেন।

মানেকার তথা হিসেব রক্ষক গনেশহালদার মশাই-  
এর বাঁধানো খেরো খাতায় সহি দিতে হয়। তাকে  
অযাচিত কিছু উপদেশ দিয়ে উঠে পড়েন আবার  
যশোদাহুলালবাবু।

এমনি করে সন্ধ্যা বয়ে যায়।...

ঘরে-বাইরে ম্যুনিসিপাল তথা ইলেকট্রিক  
কোম্পানীর হল্‌দে আলো জলে উঠে।

মাঠবহল অরণ্য গাছের ডালে পাতায় ঘরে ফেরা  
গোকপাকালীর অবিভ্রান্ত কলকাকলিতে ভরে যায়।  
বাজারের একধারে অবস্থিত বারোয়ারী গোপীনাথের  
মাল্লর থেকে সন্ধ্যারতির কাঁশি বঁটান্বিন জ্বল আকাশকে  
মুখা রত করে মুহূর্তে।

যশোদাহুলালবাবু সদলে গোপীনাথের মন্দিরে গিয়ে  
এই সময় সভ্যক্তি প্রণাম নিবেদন করে আসেন। পূজারী  
রাখালঠাকুর স-পুঙ্গ বিবরণ আশীর্বাদ করেন যশোদা-  
হুলালবাবুর মাথায়। প্রতিদিনের মত আট আনা  
পরয়া রাখালঠাকুরের পায়ে প্রণামী রেখে উঠে পড়েন  
যশোদাহুলালবাবু।

তারপর এখান থেকেই সোজা চলে যান কোন ক্লাব  
বা সমিতিতে।

কোন মিটিং থাকলে মিটিঙে বলেন, নয়তো  
মাগাজিন পড়েন। বাংলা-ইংরাজী-হিন্দি যা পান,  
পড়ে সংবাদ সংগ্রহ করেন।

মোসাহেবরা তখনো তাকে ছাড়ে না, তাদের সঙ্গে  
অধীত সংবাদ বিচিত্র। নিয়ে তর্ক বা আলোচনা করেন।  
কোন-কোন রাজনৈতিক দল বা পার্টির সুওপাত করেন  
এই সময়। সুবিধা এই যে, বর্তমানে তিনি কোন  
দলভুক্ত নন।

রাত সাড়ে-নটা-দশটার মধ্যেই ঘরে ফিরে আসেন  
তিনি।

কিন্তু ক্লাব বা সমিতি-ফেরত হু'একটি অন্তরঙ্গের  
বাড়ী না যেয়ে পারেন না।

এক অললিত হাজরা, অপর কাহ্নপ্রিয় চৌধুরী।

এরা কেউ অবস্থাপন্ন নয়। জনশ্রুতি, গোপনে এদের  
নাকি যশোদাহুলালবাবু আর্থিক সাহায্য করে থাকেন।

এমনি সাহায্য নাকি বয়োবৃদ্ধ অললিত হাজরা বা  
প্রোঢ় কাহ্নপ্রিয় চৌধুরীর মুখ দেখে নয়,—নিম্নকেরা  
বলে, সেটা নাকি হাজরার বিধবা স্ত্রীর কল্যাণ তথা  
বর্তমানে ম্যুনিসিপাল স্কুলের মিস্ট্রেস্‌ শ্রীমতা মালবিকা  
অপর কাহ্নপ্রিয় চৌধুরীর বিশ বছরের শিক্ষিতা শ্রালিকা  
কুমারী নন্দিতার রূপসৌবনের প্রবল আকর্ষণেই।

আরো জোর গুজব, এদের কোন একজনকেই নাকি  
যশোদাহুলালবাবু বিয়ে করবেন একদিন।

সবই যশোদাহুলালবাবুর কানে পৌছেছে কিন্তু তিনি  
হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন।

লোকে কি-না ভাবে, কি-না বলে? আবার বিয়ে  
করবেন তিনি এই বয়সে? তার দরকারই বা কি?  
...একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, তারও ছেলে  
হয়েছে; আর সেই ছেলেকে কাছে রেখেই ত এখন  
নিজের হৃদয়ের শূন্যতাকে পূরণ করে চলেছেন তিনি।  
আবার বিয়ে করে নুতন করে ঝগড়া বাড়িয়ে কি লাভ  
হবে?...

ঘরে ফিরে সোজা নান্দিটির খোঁজ করেন। নাম  
বেধেছেন 'দীপালোক'। সংক্ষেপে আহ্বাদ করে  
ডাকেন, 'দীপু'।

কোনদিন দেখেন দীপু আজিমার কোলে অকাতরে  
সুস্থচ্ছে,...নয়তো কোনদিন বনমালী তাকে খেলা দিচ্ছে  
নানাভাবে।

দেখে যশোদাহুলালবাবু খুঁসি হন। নাতিকে কাছে টানাত চোঁটী কৰেন। কিছু খেলনা, নয়তো কিছু পয়সা হাতে গুঁজে দেন। খুলোখুলো গালে ছোট কয়েকটি চুৰু এঁকে দেন সশব্দে।

সাড়ে দশটায় খেতে বসেন তিনি।

এবার গুৰুপাকৈৰ কিছু নয়। শুধু মাহেৰ বোলভাত আৰু দুধ। ভাজাভাজি-ও কিছু নয়।...

হাতযুথ ধুৱে এবাৰ নিজের শোবাৰ ঘৰে প্ৰবেশ কৰেন যশোদাহুলালবাবু।

তাৰ ঘৰে সচৰাচৰ কাৰো প্ৰবেশ নিষেধ। কুলুপ লাগানো থাকে সৰ্গক্ষণ। বিশেষ প্ৰয়োজনীয় তিনিৰ থাকে বলেট।

ঘৰেৰ তাল খুলে একশো পাওয়াৰ আলোটি জালিয়ে দেন।

চৌকিতে গিয়ে বসুৰ আগে জানুৱা হুটে খুলে দেন- ফুৰফুৰে দক্ষিণেৰ হাওয়া ঘৰে ঢুকতে থাকে।

দুধেৰ মত সাদা ধবধবে বিহানা পাতাই থাকে পৰিপাটি।

দৰজা বন্ধ কৰেন না কিছুক্ষণ। কাৰণ, এই সময় বনমালা এসে এক গ্লাস খাবাৰ জল ৰেখে যায়। সে চলে যেতে, দৰজায় হড়কা এঁটে দেন যশোদাহুলালবাবু।

তাৰপৰ সোজা গুৱে পড়েন বিহানায়। ৰাত তখন এগাঁৱো। দূৰেৰে খানাত খড়িতে সময় সংকেত কৰে। শোবাৰ পৰেই প্ৰকৃতই ক্লান্তিবোধ কৰেন তিনি। দেহেৰ ক্লান্তি, মনেৰ ক্লান্তি।...কিন্তু তিনি এই নিৰ্জৰন

একক ঘৰে থাকে বলে স্বাধীন...ইন্টিপেনডেণ্ট। বা খুঁসি তাই কৰ্ত্তে পাবেন।

সুতৰাং এই ক্লান্তি পৰিহাৰেৰ জন্তে যদি তিনি ইংগে পান্ কৰেন, তাতে কেউ বলারও নেই, প্ৰত্যক্ষ কৰাৰও নেই। ব্যাপাৰটি ঠিক ওষুধ খাবাৰ মতই।

কাজেই, যশোদাহুলালবাবু উঠে আলমারীৰ গুপ্তস্থান থেকে দুটো বোতল বের কৰেন। একটিতে খাঁটি 'ক্কচ্', অপৰটিতে সোডাৰ জল। স্তম্ভৰ কাঁচের গ্লাসে বস্তটিকে পৰিমাণ মত কৰে ঢালেন, তাৰপৰ নিঃশব্দ চুৰুকে সবটাই একেবাৰে শেষ কৰেন। মুহূৰ্ত পৰেই তিনি ৰেণ স্তম্ভ বোধ কৰেন,...মৰে যাওয়া স্বাস্থ্যতত্ত্ব ধীৰে ধীৰে স্বস্তি-সঞ্চাৰ হ'তে থাকে।

তাৰপৰ শ' পাওয়াৰেৰ আলো নিৰিয়ে দিহে মাথাৰ পাশে ছোট টিপয়ে ৰক্ষিত টেবিল ল্যাম্পটি জালিয়ে দেন,—মুহূৰ্তে নীলালোক বিচ্ছুরিত হতে থাকে। আগামী দিনেৰ কৰ্মজগতে প্ৰবেশেৰ মুখে অদ্ভুত কোন শক্তি বা এনাৰ্জি সঞ্চয় কৰা তিনি বিশেষ বিবেচনা বোধ কৰেন। আৰু তাই কৰতে যদি তাৰই কোন ফটো-গ্ৰাফাৰ বছুৰ ছেওয়া কয়েকটি ছবি তিনি গোপনে দেখে থাকেন, তবে কি অস্তায় হ'তে পাৰে?

যশোদাহুলালবাবু তাই কৰেন।

স্বচপানে উত্তেজিত স্বাস্থ্য আৰো একধাপ উত্তেজিত হবাৰ মুখেই আলোটি নিৰিয়ে দেন যশোদাহুলালবাবু দপ্ কৰে।

তাৰপৰ নিৰ্জীৱ অন্ধকাৰ শূন্ততাৰ মাৰ্কে ডুবে যান অবলীলায়।



# সেকাল আর একাল কলিযুগ—সত্যযুগ

ষষ্ঠীন্দ্র মোহন গাঙ্গুলী

( ছইবার কৈলাশ দর্শন ও অন্তান্ত পুস্তক প্রণেতা )

“এখন যোর কলি, আর ত সত্যযুগ নেই, এ রকম ত হবেই।”

জিজ্ঞাসা করলাম “কেন, কি হল।”

“এই দেখছেন না চারিদিকে অজ্ঞায়, অধর্ম, পাপাচার।”

ভুল্লোকটি নতুন কিছু বললেন না, সকলেই এ রকম বলেন ঠাঁহারা দেখেন বা শোনেন এমন কিছু যাঁহা তাঁহারা পছন্দ করেন না, সমর্থন করেন না, বা যাঁহা তাঁহাদের ইচ্ছার, উদ্দেশ্যের বা স্বার্থের বিপরীত বা বিরুদ্ধ হয়।

তঁাকে বললাম “কিন্তু এই সব যা বলছেন তা কি আগে যাকে সত্যযুগ বলে শুনেছেন, তখন ছিল না? তখনও এ রকম হত, বরং হয়ত আরও বেশীই হত। এখন সামাজিক নিয়ম, কানুন, আচরণ আগের চেয়ে ভালই হয়েছে যাঁহা দরুণ লোকের আচরণ কিছু সংযত হয়েছে। অবশ্য মানুষের প্রকৃতি যে বদলেছে তা বলা যায় না, কোন জীবের প্রকৃতিই বদলায় না, তবে সমাজ ও আইন শাসনে কতকটা অন্ততঃ আগের চেয়ে আটকের মধ্যে এসেছে।”

আমার কথা শুনে তিনি কেবল অবাঞ্ছনীয় যেন কিছু বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন। বিরক্ত ও উত্তেজিত হবারই কথা, কারণ এ রকম কথা কখন নিশ্চয় শোনেন নি। শুনে এসেছেন এবং অল্প ধর্মসংকায়ে বিশ্বাস করে এসেছেন যে সত্যযুগে ধর্ম ছিল

চার পাশে অধিষ্ঠিত। সে যুগে অজ্ঞায়, অধর্ম বলে কিছু ছিল না। এ রকম অল্প বিশ্বাস সংস্কার এমনি সর্বব্যাপী এবং এমনি সকলকে অভিভূত করে রেখেছে যে ও বিষয় কোনরূপ প্রশ্ন, সন্দেহ লোকের মনে ওঠে না। কিন্তু ভেবে দেখলে দেখা যায় যে সন্দেহ, প্রশ্নের অনেক অবকাশ আছে। সত্য যুগেরই যে-সব কাহিনী আছে তাতে এমন এমন অজ্ঞায় অধর্মের উল্লেখ আছে যাঁহা এ যুগে আমরা নিম্ননীয় মনে করি। এখানে আর একটা কথা বলা যায় এই যে আজকাল যাঁহারা অজ্ঞায় অধর্ম করে তাঁহারা লোকের নিকট, সমাজের নিকট, নিম্ননীয়, কিন্তু সেকালে যাঁহারা প্রবঞ্চনা, অজ্ঞায়, অধর্ম করেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই কেবল প্রজ্ঞা ও মর্যাদাই দেওয়া হয়নি, তাঁহারা ঋষি, দেবতা ও এমনকি অবতার বলিয়াও গণ্য হইয়াছেন।

যদি রাজাকে রাজ্য ও ক্ষমতা হৃত করিতে বামদেব অবতার এলেন ও চাটুর্ঘ্য প্রবঞ্চনার দ্বারা তাঁহা সব নিয়ে নেবার পর তাঁহাকে পাড়ালে আটক করিয়া রাখিলেন। কলিযুগে এ রকম প্রতারণা লোকে সমর্থন করে না, তাঁর নিন্দা করে, কিন্তু সত্যযুগে যিনি এরকম করিলেন তাঁহাকে অবতার বলা হল।

শুধু অল্প মিলে সন্তুষ্ট মন করলেন, অন্তান্ত দ্রব্যের সহিত অমৃতও বাহির হল। দেবতাও কিছু চাইলেন যে অমৃত সব তাঁহা হাই আশ্বাস করেন, অমৃতদেব

বঞ্চিত করে। অমৃত খেয়ে অমৃতরস বলবান হবে, দেবতারা যদি তাদের প্রাতিযোগিতায়, যুদ্ধে না পারেন সেই ভয়ে তাঁহারা বিজুকে স্মরণ করিলেন। বিজু এলেন, কিন্তু দেবতাদের বললেন না যে এ কি কথা, তোমরা হৃৎক মিলে সমুদ্র মছন করে অমৃত পেলে, কিন্তু এখন অমৃতদের না দিয়ে অমৃত সবটা তোমরাই নেবে? এ রকম বলা কেবল উচিত নয়, যাহার একটু বিবেকযুক্তি আছে সেই এ রকম বলিবে। কিন্তু দেবতাদের বেলা ও রকম বিচার করা চলে না। তাঁহাদের বিবেক, তাঁহাদের জ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান ছিল elastic, ইচ্ছামত, সুবিধামত তাহা তাঁহারা বৈকালে মোচড়াতে পারতেন। তাতে কোন দোষ ছিল না, কারণ তাঁহারা ছিলেন দেবতা, সত্যযুগের মহামানব।

বিজু বলিলেন—বেশ, তোমরা স্তব অমৃত দুই সারিতে বোস। বলে তিনি মনযুক্তকারী মোহিনীরূপ নিলেন ও অমৃত ভাও নিয়ে পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। অবশ্য পরিবেশন আরম্ভ হল দেবতাদের দিক থেকে। দেবতাদের পরিবেশনের পর যাহা বাকি রহিল এক চুপে তাহা তিনি খেয়ে ফেললেন। এক অমৃত দেবতাদের মধ্যে বসে গিয়েছিল। বিজুর ও দেবতাদের চোখে পড়েনি, এখন পড়িল। অমনি বিজু নিজের চক্র দিয়ে সে বেচারাকে বিধিগত করিলেন।

কলিযুগে এ রকম কাণ্ড কোন সমাজেই সমর্থিত হয় না। কিন্তু সত্যযুগে যাহারা এ রকম অজ্ঞান করিলেন তাঁহারা হলেন পূজনীয় দেবতা এবং তাঁহাদের প্রধান যিনি মোহিনীরূপ ধরে এই উপায় দেবতাদের দেখাইলেন তিনি হলেন দেবতাদের শ্রদ্ধেয় বিজু।

এই রকম কত কাহিনী নিয়ে সত্যযুগের ইতিহাস। আর সে ইতিহাসে আছে কেবল রাজ্য নিয়ে মারামারি কাটাকাটি। যে রাজা শক্তিশালী হলেন তিনি আরম্ভ করলেন অধমেধ যজ্ঞ, যে যজ্ঞ করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। যজ্ঞটা আর কিছু নয়, একটা ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া, আর ঘোড়ার পিছনে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে পুণ্যাকাজী রাজার পদম এই ঘোষণা করিতে করিতে যে যদি

কাহারও ক্ষমতা ও সাহস থাকে ত অধমেধ ধর নচেৎ বশ্যতা স্বীকার কর ও কর দাও। যাহারা অবতার বলে পূজিত তাঁহারাও এই যজ্ঞ করে পুণ্যলাভ করেছেন। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও এই অধমেধ করে পুণ্য অর্জন করেন।

যে অভীত যুগের আমরা বাখান করি ও যাহার উদ্বেগ সর্গোরূপে করি সে যুগের মানুষের চরিত্র, আচরণ দোঁধিলে সে যুগকে গৌরবময় ধর্মযুগ বলা যায় না। সে যুগের সাধনা, ধ্যান, তপস্তার কথাও আমরা বলে থাকি, কিন্তু ভেবে এ বিচার করে দেখি না যে এই সব সাধনা তপস্তা কি নিয়ে হয়েছে এবং তার ফল কি হয়েছে। তপস্তার উদ্দেশ্য সাধারণতঃ ছিল কোন আকাঙ্ক্ষা, উচ্চাশা, লোভ, কাহনা চরিতার্থ করা। অথচ কামনা, বাসনা, উচ্চাশা জয় করাই ধর্মের উপদেশ। কোন তপস্বী চেয়েছেন ধর্ম হতে, কেহ চেয়েছেন ত্রিভুবন জয় করার ক্ষমতা, কেহ চেয়েছেন যার মস্তকে তিনি হাত রাখবেন সে যেন ভঙ্গ হয়ে যায়, কেহ চেয়েছেন অর্থ, কেহ চেয়েছেন পুত্র, কেহ চেয়েছেন ধন-সম্পত্তি, কেহ চেয়েছেন শত্রুর বিনাশ, কেহ চেয়েছেন যোগসিদ্ধি ইত্যাদি।

এই রকম উদ্দেশ্য নিয়ে যে তপস্তা সে তপস্তা, আর সে তপস্বীকে ভাল বলা যায় কি? কিন্তু এই তপস্তা আর তপস্বীকে আমরা বড় শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত দেখি। যাই হোক, তপস্তার লক্ষ্য ভাল না হইলেও সংযমের সহিত একাগ্র, একনিষ্ঠ হয়ে বেশ কিছুদিন একান্তে থাকিলে মন থেকে মন্দ আকাঙ্ক্ষা সরে যাওয়া উচিত যদি তপস্তার সংযমের কিছু গুণ থাকে, কিন্তু তাহা কোথাও দেখা যায় না। তপস্তাস্তে বর পাইলে পূর্বের মন্দ অভ্যাস আরও উত্তেজিত হইয়াছে। তপস্বী তপস্তা ছেড়ে উগ্র হইয়া বাসনা চরিতার্থ করতে ছুটেছেন। যিনি বর পাইলেন যে আত্মা তিনি যার মাথায় হাত ছোঁয়াবেন সে তখন ভঙ্গ হয়ে যাবে তিনি বর পেয়েই প্রথমে চাইলেন বরদাতা শিবের মাথায় হাত রাখতে।

এই রকম প্রায় সব বরপ্রাপ্তরাই করেছেন। যে সব হুনিধাষিয়া যাগযজ্ঞ ও তপস্তা করেছেন তাঁদের



আচরণ, ব্যবহার, অসংযম দেখিলেও মনে প্রশ্ন ওঠে তপস্তা করিলে কি কিছু হয়? তপস্তা করিয়া উঁহাদের রিপু দমন হয় নি। বড় বড় নামকরা ঋষিদের চারিত্রিক অসংযম বিষয়কর। দ্বীলোক দেখিলে তাঁহারা কিরূপ উগ্র হইয়াছেন, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছেন, পরাশর, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি নানা মুনির আচরণে তাহা লক্ষিত হয়। কোথেকে তাঁহারা আত্মহারা হয়েছেন। কথায় কথায় লোকেদের ভয় করেছেন।

গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির আশ্রম। একদিন মুনি ধ্যানস্থ আছেন এমন সময় সগর রাজার পুত্রেরা তাদের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের সন্ধানে আসে এবং অশ্বকে মুনির আশ্রমে দেখতে পায়। সে কারণে তাহারা তাহাদের যৌবনমূল্য উত্তেজনায় মুনির প্রতি কিছু অস্বীচিত ব্যবহার করে। মুনি কোথেকে তাহাদের সকলকে ভয় করিলেন। ঋষিদের এ রকম আচরণকে নিচর খুব ভাল বলা যায় না, আর তাঁহার রিপুদমনের প্রমাণও ইহাতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সে বিচার করে কে? মুনিঋষিরা বাহ্য করেছেন তাহাই মহৎ, এই সংস্কারে,

বিশ্বাসে আমরা জড়িত। তাই যেখানে এইরূপ ক্রোধের তাণ্ডব লীলা হল সেই গঙ্গাসাগর হয়ে গেল মহা তীর্থস্থান, যেখানে চারিত্রিক হতে বৎসরে লাখে লাখে পুণ্যাকাঙ্ক্ষী যাত্রী আসে।

অতীত হইতে ভাল মন্দ অনেক রকম শিক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের অতীতে সব ভাল ছিল, সে এক মহা ধর্মযুগ ছিল, তখন সত্য ছাড়া কিছুই ছিল না, তখনকার ব্যক্তি অতি মহৎ, সর্বজ্ঞানী ছিলেন, সর্ব মহৎগুণের অধিকারী ছিলেন, পাপ, অজ্ঞান, অধর্ম, তাঁহাদের স্পর্শ করিত না—এইরকম বিশ্বাসে অতীতকে পূজা করার লাভ ত হয়ই না, বরং ঐ দিকে চোখ ফিরিয়ে বসে থাকায় আর এই বলে গৌরব করার যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অতি মহৎ ছিলেন; অবনতিই হয়, সামনের আলো চোখে পড়ে না, অগ্রগতি বন্ধ হয়, যেমনটি হয়েছে। হিন্দু বৌদ্ধ অন্ধ সংস্কারের আর অন্ধ বিশ্বাসের পক্ষে পড়ে গিয়েছে যেখান থেকে সে বের হতে পাচ্ছে না। আর বের হবার আশা সত্তাবনাও দেখা যাচ্ছে না।



# অন্তবিহীন পথ

(উপভাস)

মহুনা নাগ

নবম অধ্যায়

জয়ন্তী বোম্বে পৌঁছতে যোসেফ ও মহুয়া এয়ারপোর্ট থেকে তাকে বাসায় নিয়ে এল। মহুয়ার মিষ্টভাবী শিশুপুত্র ও কত্তা দৌড়ে এসে জয়ন্তীকে আলিঙ্গন করল। মহুয়া গৃহস্থালীর কাজে লিপ্ত থাকার সঙ্গেও চিত্রকরের জগৎ থেকে বিশেষ দূরে সরে যায় নি। যদিও তার বাড়ীতে অতিথি সমাগমের কোলাহল বিশেষ নেই—তবু বহুর অভাবও ছিল না। হেলেমেয়ের সঙ্গে মহুয়া গল্প করে খেলা করে, তাদের স্বভাবও অতি সুন্দর। যোসেফ একটি বড় আর্ট স্কুলের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত থাকতে নানান দায়িত্ব নিতে হয় তার। মহুয়ার ছাত্রছাত্রীরা তার বাড়ীতেই ছবি আঁকা শিখতে আসে। যোসেফ ও মহুয়ার জীবনে শৃঙ্খলতার ও আনন্দের প্রাচুর্য অতি সহজেই লক্ষিত হয়। জয়ন্তী মহুয়ার বাড়ীতে এসে বেশ শান্তি পেলো।

মহুয়া একদিন বলল—

‘এতো অল্প বয়সে তোমার স্বামী এভাবে চলে গেলেন, তাঁর স্মৃতিতে সর্বত্র ছড়িয়েছিল। যে বিরাট শিক্ষারতন করে গেলেন, সে বিষয় বিত্বতভাবে সব জানলাম—ইচ্ছা আছে একদিন দেখতে যাব। প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা করা এখন তোমার সবচেয়ে বড় কর্তব্য। ঐ শিক্ষাকেন্দ্রের উন্নতি তোমারই ওপর নির্ভর করছে। কোথায় আলাপ হ’ল তোমার সঙ্গে মুকুটের? তোমার বিষের খবর কিছুই পাইনি, তুমি কি আমাদেরও ডুবে গিয়েছিলে?’

‘মহুয়া, বিষে হবার পর কোন দিকেই মন দিতে পারতাম না। মুকুটের এত রকমের লোক নিয়ে কারবার ছিল আর এত দায়িত্ব একার ওপর নিয়োহিল সে, আমি যেন তার সঙ্গে ভাল রেখে চলতেই পারতাম না। শুধু চিত্রকলার জন্তই যেন আমাদের সংসার পাতা। হ’বছর শিল্প জগতের সঙ্গে যুক্ত করেছি, দেখছো তো একটি সন্তানও হয় নি আমার—সময় ছিল না সে কথা ভাববার।’

মনের ভিতরকার আলা যেন কিছুতেই সে নেবাতে পারছিল না—বাবার কাছে যদি সব কথা খুলে না বলতো তাহলে বহুদের কাছে কত যে অপ্রিয় কথা বলে ফেলতো কে জানে। সর্বদাই যেন একটা পীড়িত মনের সঙ্গে সে যুঝে চলেছে—তার নিজস্ব শক্তির পরাজয় যেন তাকে কেমন অস্বাভাবিক করে ফেলেছিল। জয়ন্তী মহুয়ার হাত ধুখানা ধরে বলল—

‘মহুয়া, মুকুটের কাছে সব শিক্ষাই পেয়েছিলাম, তার কাছে আমি সত্যিই ঋণী। তোমরা যদি ‘দিগন্তে’ আসতে বড় খুশী হতাম। দুজনে একসঙ্গে কত কাজ যে করেছি—নইলে অতবড় দায়িত্ব নেবার সাধ্য আমার হ’ত না।’

কিন্তু সে যে ঐ আবেষ্টন থেকে পালাতে পারলেই বাঁচে এ কথা জয়ন্তী প্রকাশ করতে পারল না। অপরের কাছে সে অন্তরের বিভীষিকার কথা জানাতে চায় কিন্তু পারে না—মুকুটও তাদের কাছে অপরিচিত। কী কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যে সে জীবন কাটিয়েছে কেউ

বা কেনেছে? সে যে নবজন্মের জন্ত অন্ধরে কেঁদে মরছে, আশার বাণী সে এক বাবার কাছেই শুনেছে— সত্য ঘটনাগুলি আর কাউকে বলবার তার প্রবৃত্তি নেই, অধিকারও নেই। শত সহস্র ভুল বোঝার মধ্যে তার যে দিন কেটেছে এত কথা সে আর বলতে চায় না। অথচ সেই চিন্তাগুলি তাকে পাগলের মত ঘুরিয়ে মারছে। রাতের পর রাত সে ঘুসুতে পারে না।

তবু কিছুতেই যেন সে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছিল না। বোঝে আসতেই শীলার চিঠি পেলো। বাদলকে নিয়ে শীলা বিলেত যাবে হির করেছে—জয়তীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়—অলোকের সাহায্যে সকলে কঠিনেটে ঘুরতে পারবে।

যোসেফ ও অম্মরাকে পরামর্শ করতে ওরা দুজনেই খুব উৎসাহ দিল। বহু বছর জয়তী দেশের বাইরে যায় নি। ওদিকে অলোক প্রায় প্রবাসীর মতই হয়ে গেছে। ছোটদার বিয়েতে সে আসেনি—অনেকদিনের কথা মনে পড়ল। বিলেত থেকে ফিরে এসে সে আর অলোককে দেখেনি—কত বাল্যস্মৃতি তার মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়, সে নানা কথা ভাবে কিন্তু বলে না।

শীলা, বাদল ও জয়তী বোঝে থেকেই লগুন রওনা দেবে হির করল। জয়তীর অতি পুরাতন বন্ধু 'ভীরা' লগুনে তার কাছে থাকতে অস্বাভাব্য করেছিল। বাদল ও শীলা অলোকের কাছেই গিয়ে উঠবে।

অলোক টেলিগ্রাফ পেয়ে মহাখুশী। জয়তীর বিবর অলোক কিছু উল্লেখ করল না চিঠিতে, সে অতীত প্রেমের কাহিনী সম্পূর্ণ ভুলে যেতেই চেরেছিল। এখন সে বেশ শান্তিতে আছে। এয়ারপোর্টে সে ঠিক সময়ই উপস্থিত ছিল শীলা ও বাদলকে নিজের ক্লাটে নিয়ে যাবে, ভীরা জয়তীকে তার বাসায় নিয়ে ওঠালো। অলোকের আনন্দের সীমা নেই। বাদল আর শীলাকে বহু বছর পরে কাছে পেয়ে সে রীতিমত ছোট্ট ছোট্ট করে দিল—। তাদের ঘরখানা দেখিয়ে বিপ্রাম করতে হল। পাশের বাড়ীর ছাতি ছেলে বাদলকে বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়—ভীরা অলোকের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ

হয়ে গেছে। চা খাওয়া হলে তিনজনে মিলে বেরিয়ে পড়ল। বাদল সঙ্গী পেয়ে খুব খুশী।

শীলা অলোকের দিকে তাকিয়ে বলল—এ কি অলোক? তোমার মাথায় পাকা চুল? তুমি তো সংসারী হওনি, তোমার এত চিন্তা কিসের? যেমন এখনও এভাবেই কলের মত কাজ করেন—আমি আমার স্বামীকে কোনমতেই আর বদলাতে পারলাম না। তবে পরিশ্রম করতে ওঁর আপত্তিও নেই আর একেবারেই জীবন তাঁর মল্লও লাগে না।

অলোক যৌবনের গাঁড়ি অনেকদিনই পেরিয়েছে—দেহের কৃশকায় গড়ন ভারী হয়ে গেছে—মাথায় কাঁচাপাকা চুল। সৌম্য মুখশ্রী তার, কোথাও চাকল্য বা উদ্বেজনায় ছাপ নেই। পড়ার ঘরখানি সে সমস্তে সাজিয়েছে, বিভিন্ন ধরনের রাশীকৃত পুস্তক আলমারিতে ও তাকে। অলোকের ক্রটিই প্রশংসা না করে পারা যায় না।

শীলা কুসানের ওপর ভর দিয়ে বসেছে—দরজার কে নাড়া দিল, আওরাজ গুনতে পেয়ে সে পিছন ফিরে তাকালো। দেখল দরজা খুলে জয়তী ঘরে ঢুকছে—অলোক উঠে দাঁড়ালো। জয়তীর মুখখানা আজ নিতান্তই স্নান—ও দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু তার কৃশ মুখশ্রী লাবণ্যে পরিপূর্ণ। অলোক, জয়তী ও শীলা কলকাতার বাড়ীর নানান ঘটনা আলোচনা করছিল, জয়তীর বাল্যকালের হরতপনার গল্প শুনে তিনজনেই হেসে উঠল। উগোলাভিয়ার যাবার একান্তই ইচ্ছা তার—অলোক বিশেষ উৎসাহ দিতে বিধা করল না। জয়তীর বিবাহিত জীবনের সম্বন্ধে অলোক কিছুই জানতো না, দীর্ঘকাল জয়তীর সঙ্গে তার দেখা হয়নি, সে খানিক উদাসীন হয়ে গেছে। জয়তী আশা করেছিল অলোক কোতুল তরে অনেক কিছু প্রশ্ন করবে—সে যেন একটু ক্ষুধা হ'ল—অলোক একেবারেই কিছু বলল না এ বিবর।

'কালই হির করে কেলব উরোগোলাভিয়ারেতে যেতেই হবে। কড়িয়! কত অসুখবোধ করেছে—তার

কাছেই যাব। লগনে থাকবার আকর্ষণ কিছু নেই—  
বছরা কেউ নেই দেখছি এখানে। ভীরা খুব ভাল  
মামুষ।’ কথাগুলি জয়তী এক নিঃশ্বাসে বলে শেষ  
করল।

অলোক জয়তীর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে দেখল,  
সে আগের মত আর সজীব নেই, নিরানন্দময় একটা ভাব  
তার সমস্ত মুখখানা যেন ঢেকে দিয়েছে—অন্তরে একটা  
অস্বাভাবিক অধীরতা তাকে পীড়ন করছে। অলোক  
ভাল করে কিছুই বুঝল না। জয়তী একটু পরেই  
উঠে পড়ল। বাদল তার বছরের সঙ্গে কিছুদূর ঘুরে  
আসতে চাইতে অবশেষে শীলা অলোকের সঙ্গে একা  
কথা বলার সুযোগ পেল।

‘দেখ অলোক, জয়তী এখনও সুস্থ ও স্বাভাবিক  
হয় নি, তার কাছে সে ফিরে যেতে পারছে না—বড়ই  
উদ্ভ্রান্ত মনের অবস্থা ওয়, তুমি যে ওকে কেন বিয়ে  
করলে না—এ বিষয় তোমার জোর করা উচিত ছিল।  
এখন একমাত্র বাবার কাছেই সে নিঃসঙ্কোচ হতে পারে।  
জয়তী মুকুটকে বিয়ে করে অবধি নানান পরীক্ষার মধ্যে  
দিন কাটিয়েছে।’

‘শীলা।’—অলোক যেন চোঁচিয়ে উঠল—‘ঐ’ এক  
কথা ছাড়া তুমি আমার সঙ্গে অন্য কোন বিষয় কি কথা  
বলতে পার না? জয়তীর সঙ্গে কবেকার কোন সম্পর্ক  
ছিল আমার, বার বার সেই কথা টেনে আনো কেন?  
জয়তী কোন কারণে বিশেষ মনঃকষ্ট পেয়েছে—মনে  
হয়, তার মুখে বিশেষ গানির ছাপ দেখতে পাই—খুব  
হুঃখ হয়, কিন্তু আমি কি করব? কেন আমার অপ্রস্তুত  
কর তুমি ঐ কথা তুলে? এ বাড়ীতে আর এ বিষয় কথা  
তুলো না শীলা।’ অলোক আজ বিব্রত হয়ে কথাগুলি  
না বলে পারল না।

পরদিন সকালে জয়তী উগোল্লাভিয়ার রওনা দিল।  
কেন জানি গেনে সমস্তক্ষণ অলোকের গলার ঘর তার  
কানে আসতে লাগল।

‘আমি তোমার জন্য নিশ্চয় অপেক্ষা করব’—সে  
বলোছিল কি? কই সে তো আর বিয়ে করল না—কিন্তু  
আমার সঙ্গে ভাল করে তো কথাই বলল না।

অলোকের বিষয় তার কেমন জানি কোঁতুল হ’ল।  
এতদিন কোন সম্পর্ক ছিল না কিন্তু জয়তীর মনে আজ  
পুরাতন ঘটনাগুলি যেন নিতান্তই স্পষ্ট হয়ে ফুটে  
উঠলো। অলোক যে তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এ  
কথা সে মেনে নিতে চাইছে না—শীলার প্রতি  
অলোকের অনুরাগ দেখেও তা সত্যি বলে বিশ্বাস  
করতে পারছে না। শীলা তার নিজের জীবনে কোথায়  
যে ভাল মেলাতে পারেনি আর কখন যে অলোক তাকে  
স্নেহের বন্ধনে বেঁধে ফেলেছিল—জয়তী কিছুই জানে  
না।

কড়িয়া জয়তীকে কাছে পেয়ে রীতিমত উৎফুল্ল।  
সে বিয়ে করেনি কিন্তু সে তার ভাবী বরের প্রেমে  
নিতান্তই বিভোর। প্রত্যহ দুজনে একত্রে গান করে—  
বেড়ায়, এই রোমাঞ্চকর দিনগুলি তার জীবনে অতি  
মূল্যবান। কড়িয়ার চিত্রকর ভাই-এর সঙ্গে জয়তীর  
আলাপ হ’ল। মুকুটের মৃত্যুর সংবাদ সকলেই  
জেনেছিল এবং তারা আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ  
করল। দেশে ফিরে আসবার জন্য তার ব্যগ্রতা কিছু  
জয়তী ‘দিগন্তে’ ফিরতে চায় না। নিজেই সে থিকার  
দিল বহবার, কিন্তু কেন যে সে উপস্থিত সমস্তার সম্মুখীন  
হতে পারাছিল না তাই ভাবাছিল। বড় অসহায় অবস্থা  
—আত্মগোপনে জর্জরিত। দিগন্তর তাল পাশে আবার  
ঘরগুলিকে সজীব করতে হবে? যে জন-কোলাহল  
আর সম্বন্ধ করতে পারাছিল না—তাই আবার আহ্বান  
করতে হবে?—সামাজিক লীলাধেলার নিতানুতন  
মুখোশ পরা অভিনেত্রী ও নায়কদের অভ্যর্থনা করতে  
হবে? জয়তী যেন নিজেকেই বলে উঠল—

‘আমি পারব না—না কিছুতেই না?’ সার্কাসের  
কণিষ রজ্জুর উপর অভিনেত্রীকে স্তম্ভপর্ণে হাঁটতে হয়।  
আশঙ্কার বহি তাকে কখনও কখনও গ্রাস করে ফেলে,  
দর্শক তার মনোভাব কিছুই জানতে পারে না।  
জয়তীকে কি সেই ভীতি ও সন্ত্রাস গ্রাস করতে চায়?  
শির জগতে সকলতার কথা স্মরণ করে জয়তী বিশ্বাস  
করতে চেষ্টা করল সে শিল্পীদের মাঝখানে স্নান

করেছিল, আড়ম্বর করে সংসার করেছিল—সামাজিক আনন্দ লহরীতে সেও ভেসেছিল—সে তো বেশী দিন নয়। আর তাবতে পারলো না। কাগজ ও কলম হাতে নিয়ে বসল। বাবাকে সে আবার এক কথাই লিখতে চায় সে, দিগন্তে ফিরতে পারছে না। কুহেলিকা আবৃত পর্বতমালার মনোরম দৃশ্য দেখে জয়তীর যেন মনটা উদ্বাস হয়ে গেল। কাগজ আর কলম উঠিয়ে নিল আবার, কিন্তু কিছু লেখার আগেই কর্ডিয়া ঘরে ঢুকে এল। হাতে একখানা চিঠি। জয়তীকে উদ্দেশ্য করে বলল—

‘তোমার বাবা বড়ই একা পড়েছেন—তোমায় যোজাই মনে করছেন বোধ হয়। কেমন আছেন? চিঠি পড়ে আমার বলো পরে।’ চিঠি হাতে দিয়ে কর্ডিয়া ঘরের বাইরে চলে গেল।

‘হ্যাঁ? বাবার চিঠি?’ জয়তী চিঠিখানা পড়তে শুরু করে দিল।

আহমেদাবাদ

প্রিয় জয়তী,

তোমার উপস্থিত ঠিকানা তোমার বাবার কাছ থেকে জানিয়েছি, আশা করি রওনা দেবার পূর্বেই এ চিঠি পাবে। অল্পদিন হ’ল আমার মা স্বর্গারোহণ করেছেন, আমি তাই দিল্লী ছেড়ে চলে এসেছি, ঠিকানা দেখে বুঝবে আমি আহমেদাবাদে। আমার ছোট বোন তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানেই আছে। আমি এ বাড়ীর একমাত্র ছেলে কাজেই পারিবারিক দায়িত্ব এড়ানো আর সম্ভব নয়। আমার বোনের সাহায্য নিয়ে এই বাড়ীখানা ভাল করে গুছিয়ে নিয়েছি। আহমেদাবাদ সহরটি সব দিক দিয়ে এখন সম্ভব হয়ে উঠেছে। কাজে মন দিয়েছি এবং অল্পদিনের মধ্যে আমার বেশ কয়েকটি স্মৃতি করে দিতে হ’ল। ছাত্রাবস্থায় এই সহরে ছিলাম এক সময় মনে পড়ে? একটি খবর দিই। যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চলছিল তার কয়েকমাস আগে একটি সংপাত্রেব সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। মনে হয় আমার মত অলস পাত্রের হাতে কন্যাকে দান করতে

গিতামাতার সাহস হয়নি। আমি কিন্তু নিশ্চিত। ভাবী বৌকে কিছুই জানতাম না, তার বিয়ে হয়ে গেছে জেনে সুখীই ছিলাম। আমার মা শেষ কয়েকদিন বিশেষ অসুস্থ ছিলেন, আমার সাক্ষনা এই যে শেষ ক’দিন তাঁর কাছেই ছিলাম। এ চিঠিতে তোমায় নিমন্ত্রণ করছি। কিরতি পথে তুমি আমাদের কাছে কদিন থেকে যাবে অনুরোধ করছি। বাড়ীখানা বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে—আমার বোনই এখন গৃহিণী, সেই তোমায় দেখানো করবে। এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে অবস্থাপন্ন লোকের অভাব নেই, তারা শিল্পীদের উৎসাহ দেয় কাজেই শিল্পীদের কাজের অভাব নেই। অনিন্দা ‘এয়ার ট্র্যাভেল’এ কাজ করছে—আমার সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ নেই। ভয় পেয়ো না—সে এখানে আসবে না। তুমি যদি আসতে পার খুশী হব।

অবিনাশ

মহা রঙা ও প্রাচীন ধারার পর যেন সূর্যের আলো দেখা দিল। জয়তী উগোল্লাভিত্যে গিয়েও শান্তি পাচ্ছিল না। ভবিষ্যতের হুঁশ্কারা একটি ভূতের বোকার মত হয়ে উঠেছিল, সেই ভাব বহন করতে করতে তার দেহমন যেন অবশ হয়ে পড়েছিল। অবিনাশের সহজ সরল চিঠিখানা পড়ে জয়তীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। প্রতীতির উপলব্ধি তাকে স্পর্শ করল, মনে হল আজ যেন সে মনের একটি শিকল ছিঁড়তে পেরেছে।

‘কর্ডিয়া—ওনে যাও’ জয়তী উচ্চস্বরে ডাকল।

‘চিঠিখানা বাবার কাছ থেকে আসেনি—একটি বিনীত বন্ধু আহমেদাবাদ থেকে লিখেছে সেখানে কদিনের জন্য যেতে। একত্রে সুকুটের কাছে কাজ করোঁহ আমরা। এই বন্ধুটি যেমন সুদক্ষ তাকর, তেমনি রসিক। তোমার সঙ্গে মিলিত কোনা’দিন এর আলাপ হবে। সে দিল্লী ছেড়ে চলে গেছে এই আমার হুঁশ্কার। আমি একবার আহমেদাবাদ যাব তা’বাহ—নেমন্তর করেছি চিঠিতে।’

কর্ডিয়া বিস্মিত হয়ে জয়তীর দিকে তাকালো—জয়তীর মুখের ভাব দেখে মনে হ’ল সে যেন একটা

শুধুই পেয়েছে। এতদিনের বিষয়তা কণেকের জন্ত দূর হ'ল। কে সে বন্ধু?

জয়তীকে সঙ্গে নিয়ে কড়িয়া অদীর্ঘ পথ হাঁটতে বেরুলো। হুজনে বেশ করে কচা ভাতা ভাবে গল্প করছিল। তাই কড়িয়া ভাবল—কই এতটা উৎসুক হয়ে তো জয়তী একদিনও কথা বলেনি। কড়িয়া কথা দিল সে নিশ্চয় ভারতবর্ষে আসবে এবং জয়তীর কাছে থাকবে। হুজনে যখন বাড়ী ফিরে এলো তখন জয়তী চিঠিখানা দ্বিতীয় বার পড়বার জন্য হট্‌কট্‌ করতে লাগল।

‘আজ আমি তাড়াতাড়ি যদি গুতে চলে চাই তুমি কিছু মনে করবে না তো কড়িয়া?’ জয়তী প্রশ্ন করল।

‘চিঠি লিখবে?’ কড়িয়া হাসল—গালে চুষন দিয়ে ঘর থেকে সরে পড়ল। ‘আজ ভাল করে ঘুমবে তো?’

বিহানায় বসে জয়তী লিখতে শুরু করল—

প্রিয় অবিনাশ,

উগোল্লাভিয়া

গত কয়েক মাস যেন বিভীষিকার মধ্যে বাস করছিলাম। ‘দিগন্ত’ ফিরে যেতে পারছি না কিছুতেই। ঐ বাড়ীর কথা ভাবলেই আবার নানান স্থিতির কথা মনে এসে যায়, হুঃখের দিনের কথা আর আর ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছা করে না। তুমি জান নিশ্চয় কাকুর কাছে আমি নিজের কথা কখনও বলিনি। আমার হুঃখপ কেটে যাবে এই আশায় প্রায় হুবহু কেবল ঘুরছি। যাকে ‘দিগন্ত’র তার দিয়ে এসেছিলাম সে ছ মাসের মধ্যে ছুটি চায়—সে এত বড় দায়িত্ব নিয়ে আর থাকতে রাজী নয়। এখানে কড়িয়া ও তার আত্মীয়স্বজন সকলেই বড় সরল প্রীতির বন্ধনে আমার জড়িয়েছে তবু আমি আমার বিবাদপূর্ণ বৈতাপুরী থেকে যেন মুক্ত হতে পারছি না। এমন হাকা লাড়া মেঘ আকাশের গায়ে, নিচে সুনীল সাগর, অদূরে অপূর্ব গিরিমালা নিত্য নতুন পটে যেন কেউ বিভিন্ন ধরণের ছবি একে দিয়ে যাচ্ছে আর বলছে—শুধু দেখো, উপভোগ কর। এত হাতকোঁকড়তা লাড়া মন এদের। আমি শুধু তাদের

সবষ্ট রাখবার জন্য আনন্দে যোগ দিচ্ছি। অন্তরের বোধ শক্তি যেন লোপ পেয়েছে—নিজেকে যেন হারিয়ে কেলোছি। তোমার আত্মরিক নিমন্ত্রণ সব চেয়ে বড় উপহার—তোমাকে দেখবার জন্য আমিও উৎসুক হয়ে আছি। আমার লগনে থাকতে ইচ্ছা করল না—তাই শীঘ্রই ফিরে যাচ্ছি। আহমেদাবাদের দিকে রওনা দিচ্ছি—অল্পদিনের মধ্যেই যাব। আমার আত্মরিক শুভেচ্ছা নিও।

জয়তী—

কড়িয়া আভাস পেলো জয়তী শীঘ্র ফিরে যাবে—অবিনাশের সঙ্গে দেখা করার তার প্রবল আগ্রহ। শীলাকে জয়তী ভরখনি লিখল সে অবিদ্যার চিঠি পেয়েছে এবং তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আহমেদাবাদ হয়ে কলকাতা ফিরবে। লগনে সে আর ফিরবে না। এদিকে শীলা প্রায় ছ মাস ধরে বাদল ও অলোকের সঙ্গে নানা স্থান ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক ঘেঁষে জীবনের পর নতুন আবেষ্টনে আসতে পেরে সে অশেষ তৃপ্ত লাভ করল। বাদল কলেজে ভর্তি হ'ল। শীলাকে এইবার ফিরতে হবে।

‘এই ক’দিনের আনন্দের স্থিতি চিরদিন মনে থাকবে’—শীলা অলোককে উদ্দেশ্য করেই বলল।

‘বাদলের জন্য তুমি হুঃখিতা করবে না মনে রেখো।’ অলোক উত্তর দিল।

শীলা আবার নতুন বস্ত্রের মধ্যে পড়ল—কিন্তু সে দুঃ-প্রতিভ হয়েই এসেছিল সে অলোককে হুঃখিতা হতে দেবে না। হেমেনের প্রত্যাখ্যান তাকে আর হুঃখ দেয় না—অলোকও তার জীবন থেকে বহু দূরে সরে এসেছে। এখন সে কোন দিক থেকেই কিছু আশা করে না। জয়তীর জীবনের ব্যর্থতা, ও মানসিক উদ্বিগ্নতা শীলাকে পীড়া দেয়, সে চায় জয়তীকে সাহায্য দিতে। বাদলকে ছেড়ে যেতে শীলার বুক ভেঙে বাচ্ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ সংযত হয়েই সে বিদায় নেবে সেটুকু মনের প্রতীতি ছিল তার। অলোক বাদলকে দেখাশোনা করবে কেনে অনেকখানি ভয়সা পেলো—একই লগন থেকে রওনা হল।

দেশে ফিরে শীলা আবার সংসারের ভার নিতেই দেখল দেবাশিস জয়তীর অস্ত্র খানিক চিন্তিত হয়ে উঠেছে।

‘জয়তী জানিয়েছিল তো যে আহমেদাবাদে অবিনাশ ও তার বোনের কাছে কদিন থেকে আসবে?’ শীলার প্রশ্ন শুনে দেবাশিস বলল—

‘জয়তী ওদের কাছে গেলে হয়তো একটু প্রফুল্ল হয়ে ফিরে আসবে—অবিনাশকে আমিই জয়তীর ঠিকানা দিয়েছিলাম—আমার লিখেছিল সে। ভালই হয় যদি কদিন ঘুরে আসে।’ দেবাশিস অবিনাশকে বহুদিন দেখেনি, ছাড়াবহার আসতে দেখেছে কেবল।

মাদল তার মাকে কাছে পেয়ে বড় খুশী। দাদার কথা জানবার অস্ত্র সে উৎসুক হয়েছিল। শীলার সঙ্গে দেখা হতেই হেমন বলল—

‘তুমি ফেরার অস্ত্র এত ব্যস্ত হচ্ছিলে কেন? এখানে আমরা ভালই ছিলাম তবে মাদল রোজ একটি করে চিঠি লিখে রাখছিল। চিঠিগুলি সব ডাকে দেওয়া

হরনি, জমিয়ে রেখেছি, এই নাও।’ কথাগুলি বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে চেয়ারের দিকে যাচ্ছিল, শীলা ধীরে ধীরে তার পেছনে হাঁটতে শুরু করল।

‘তুমি যখন একটু সময় পাবে তখন আমাদের বিশেষ ভ্রমণের গল্প শুনো।’ শীলার অবশ্র সঙ্গের ছিল হেমন কোনদিন সময় পাবে না।

‘নিশ্চয় নিশ্চয়’, বলে হেমন চেয়ারটা টেনে নিয়ে বই খুলে বসল। শীলা ফিরে যাচ্ছিল—আবার খেমে গিয়ে দরজার ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, হেমনের দিকে চেয়ে বলল—

‘বাদলের কলেজের কথা জানতেও কি তোমার সময় নেই?’

‘আছে বৈকি!’ হেমন উত্তর দিল। চোখও বই থেকে ভাল করে তুলল না—শীলা দাঁড়িয়ে রইল। হেমন তার দিকে তাকাতে বাধ্য হ’ল কিন্তু শীলার মনে হ’ল সে যেন হেমনের অতিরিক্ত সময় নষ্ট করেছে, সে দ্রুতবেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

ক্রমশঃ





জাভিকে তাঁহার শেষ দান—চিত্তাভ্যাস

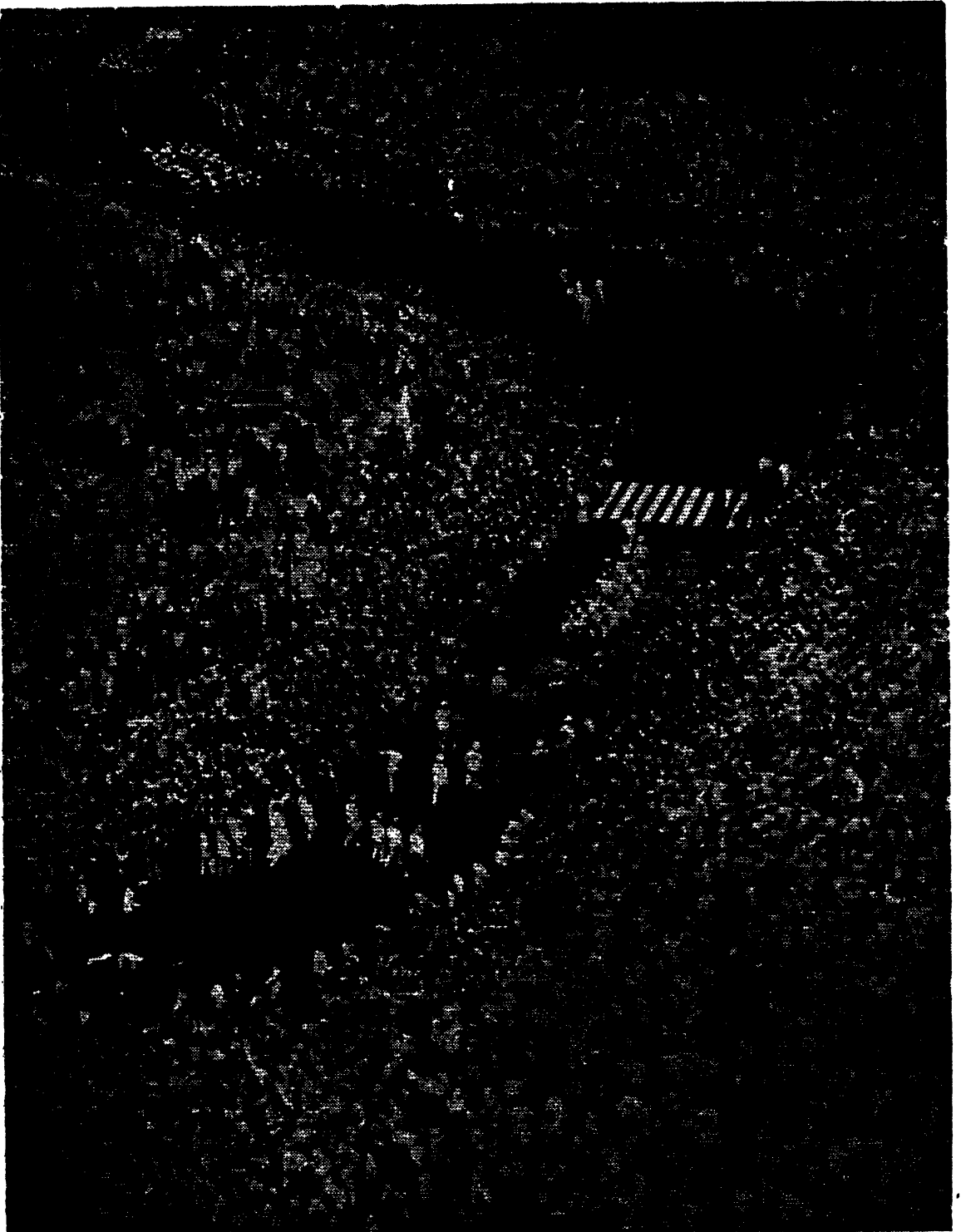


দুইজন মহান নেতা  
আমেরিকার শহিদ রাষ্ট্রপতি কেনেডি ও পাণ্ডিত নেহেরু



বুলগারি়ান ও খুস্কাভেভের সহিত ভাঙত-কল  
মৈত্রী বন্ধন জোড়ালো করা হইতেছে





শেখ হাসিনা—শান্তিঘাটের পথে

# পণ

ঐবিমলজ্যোতি দাস

১

কোট থেকে ফিরে তপনকুমার প্রাত্যহিক নিয়মমত উপরে উঠে যাচ্ছিল। হঠাৎ সিঁড়ির পাশে অবস্থিত এক তলার বৈঠকখানার ভিতর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ কানে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কণ্ঠস্বর তার পিতা কালিদাসবাবুর। তিনি কিঞ্চিৎ পরম্বকণ্ঠে বলছিলেন—না, আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। ‘আজ নয় কাল’ করে আপনি হ’মাস কাটিয়ে দিলেন। বিয়ের রাজ্বেই আপনার টাকা দেবার কথা। তা যখন দিলেন না, তখনই আমি বিয়ে বন্ধ করে দিতে পারতাম। কেবল একটা গুণগোল হৈ চৈ হবে বলেই দিলাম না। এখন দেখছি তাই করাই উচিত ছিল। নেহাৎ আপনি একঘরে হয়ে পড়বেন বলেই আমি বিয়েটা হতে দিলাম। ভেবেছিলাম আপনি টাকাটা শীঘ্রই শোধ করে দেবেন। তা আপনার ত দেবার কোন গা-ই দেখছি না। কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেন না, আপনার লজ্জা করে না?

মিনিট দুই সব নিস্তব্ধ। তারপর ক্রীণকণ্ঠে উত্তর এল—আর কিছুদিন দয়া করে সব্বর করুন বেহাই বশাই। টাকা আপনার আমি যেমন করে পারি শোধ দেব। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি বখালাঘ্য চেষ্টা করছি। যদি অল্প সব চেষ্টা বিফল হয়, ত শেষে বাড়ি-খানা বাঁধা বেখেই টাকার বোগাড় করব।

কণ্ঠ তপনের স্বস্তর উন্মেষবাবুর। শেষের দিকে তাঁর গলাটা ঘন হুঃখে ও হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কালিদাসের তীব্র স্বর তপনের কানে এল—এখন বাড়ি বাঁধা-টাঁধা এসব কথা বললে চলবে কেন? সে

সব বিয়ের আগে ভেবে দেখা উচিত ছিল। যদি পারবেনই না, তবে এখানে সত্বক করতে এসেছিলেন কেন? তবু আমি অনেক ষাতির করে মাত্র চার হাজার টাকা নগদে রাছি হয়েছিলাম। নইলে আমার ছেলের লজ্জা বারো চোদ্দ হাজার টাকা দেবার মত লোক ছিল।

দীনভাবে উন্মেষ উত্তর দিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, সে ত নিশ্চয়ই। তবে কি না বিয়ের সময় গহনার চার হাজার টাকার বেশী আর যোগাড় করে উঠতে পারলাম না। তবে আমি চেষ্টার জট করছি না। যদি আর কিছু দিন দয়া করে—

কালিদাস রেঁকে উঠলেন—আর কিছু দিন, আর কিছু দিন ত করছেন। বলি, কতদিন সব্বর করতে হবে? দশ বছর, না বিশ বছর? তারি চার হাজার টাকার গহনা দিয়েছেন, তা আবার শোনান হচ্ছে। জানেন, উত্তর পাড়ার রেবতীবাবু হাজার টাকা নগদ আর হাজার টাকার গহনা দিতে চেয়েছিল? আমারই ভুল হয়েছিল আপনার ওখানে সত্বক করতে যাওয়া। তার ফল আজ ভোগ করছি।

কিন্তু ভুল তাঁর হয়নি। তিনি অবহাপর এবং তাঁর একমাত্র পুত্র তপন শিক্ষিত, চরিত্রবান্ ও অশ্রুক্ষম বলে অনেকগুলি কস্তার পিতা তাঁর ঘরস্থ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু দরিদ্র উন্মেষবাবুর কলা অপরাধিতা তাদের মধ্যে সর্গাপেক্ষা অক্ষরী বলে কালিদাস তাকেই বধূরূপে নির্বাচন করলেন। কিন্তু তাই বলে অপরাধিতার রূপের জ্যোতি তাঁর বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন দৃষ্টিকে ষাতিধরে দিতে পারেনি। সেইজন্য তিনি অনেক কথা মাকার

পর চার হাজার টাকা আর অলঙ্কার এবং চার হাজার টাকা নগদ, সব শাকুল্যে এই আট হাজার টাকার বিনিময়ে উমেশকে কস্তাঘাটের বৈতরণী পার করতে রাজি হয়েছিলেন।

কস্তা আত্মবিন হুখে থাকবে এই আশায় উমেশ সাধার আতিথিত ব্যয়ে তপনের সঙ্গে সখ্য হাপন করতে যখন মনস্থ করলেন, তখন তাঁর পত্নী দেববালা আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন—হ্যাঁ গা, এখানে যে সখ্য করছ, হেলে ভাল এবং পর বড় বুঝলুম, কিন্তু আট হাজার টাকা ছুটি ঘোড়াড় করবে কি করে?

উত্তরে উমেশ বলেছিলেন—সে ছুটি ভেবো না। গহনার চার হাজার টাকা আমার ঘোড়াড় আছে, নগদ চার হাজার বিয়ের পর আঙে আঙে দেওয়া যাবে।

দেববালা কিন্তু একথা আরও হতে পারেন নি। ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানতেন, বহু ক্ষেত্রে এই পণের টাকা নিয়ে হুই বৈবাহিকের মধ্যেকার মধুর সম্পর্ক ক্রম তিক্ততায় পর্যবসিত হয়েছে, এবং পিতার আর্থিক অক্ষমতার কুসংস্কারা রাহর মত কস্তার জীবনের সুধংশী গ্রাস করে ফেলেছে। তাই তিনি বারংবার স্বামীকে অস্বস্তি করেছিলেন, এর চেয়ে আর খরচে তাঁর ক্ষমতার মধ্যে একটি চলনসই পাত্র ঘোড়াড় করতে। কিন্তু অদূরদর্শী উমেশ তা করেন নি। তিনি শেষ পর্যন্ত এই বিবাহই ঘটালেন। তপনের জীবন-সর্বোত্তম অপরাধিতা নলিনীর মত ফুটে উঠল।

কিন্তু বিবাহ চুকে যাবার পর থেকেই পত্নীর পরামর্শের সারবত্তা উমেশ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে লাগলেন। স্বামীপরি অর্থগুরু কালিদাসের ব্যবহার থেকে সৌজন্য বলে জানিবাটা কর্পূরের মত উবে গেল এবং তাঁর কঠোর ভাষা ও তীক্ষ্ণ পত্র তাঁর মত উমেশের হৃদয়ে এসে বিধতে লাগল। অবশেষে তিনি স্থির করলেন যে বলতবাটি বিক্রয় করে অথবা বন্ধক রেখে চার হাজার টাকা সংগ্রহ করে কালিদাসের ঋণ শোধ করবেন। সেই বিষয়ে কথাবার্তা ঠিক করে আজ তিনি বৈবাহিকের গৃহে এসেছেন কস্তাকে এই সংবাদ দেবার জন্য। বৃদ্ধ-পরিবেশে কুহকের মত যে গৃহে একদিন অপরাধিতার জন্ম

হয়েছিল, সেই গৃহ যে আজ তারই অর্থ-পিণ্ডাচ বস্তুর জবরদস্তিতে হস্তান্তরিত হতে চলেছে, এই কথাটা আগে মেরেকে জানিয়ে তবে উমেশ বন্ধক-নামার স্বাক্ষর করবেন।

কিন্তু এসে অবধি সঙ্কোচবশতঃ মেরের সঙ্গে সাক্ষাতের কথাটা তিনি উত্থাপন করতে পারেন নি। এদিকে কালিদাসের উদ্ভূত বাক্যের তাপে ঘরের আবাহাওয়া ক্রমশঃ এত গরম হয়ে উঠেছে যে, আর বলে থাকা অস্বস্তিত ভেবে উমেশ মুহূর্তে বললেন—আচ্ছা, তাহলে আমি উঠি বেবাই মশাই। যাবার আগে মাকে একবার দয়া করে ডেকে দিও, একটা কথা বলে যাই।

তখন কালিদাস সপ্তমহুরে জবাব দিলেন—আর কথা টাখার দরকার নেই, আবার কথা কিসের? বৌমা এখন ব্যস্ত আছে, এখন দেখা টেখা হবে না।

ব্যথা ও নৈরাস্ত জড়িত ঘরে উমেশ বললেন—হবে না? আচ্ছা তাহলে আমি চলি। নমস্কার। ভগবান!—বলে ক্ষুদ্রচিত্তে জীর্ণ চটিজোড়া পায়ে দিয়ে ধীরে ধীরে নিজস্ব হয়ে গেলেন। তিনি বোরিয়ে আসবেন বুঝতে পেরে তপন লঘু ক্রতপদে সিঁড়ির মোড় ঘুরে দাঁড়াল, যাতে উমেশ তাকে দেখতে না পান। তিনি সদর দরজা দিয়ে বোরিয়ে গেলে সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল, এবং একটু পরে কালিদাসও উপরে নিজের ঘরে চলে গেলেন। তিনি বা উমেশ কেউই জানতে পারলেন না যে, তপন নেপথ্যে দাঁড়িয়ে উত্তর বৈবাহিকের মধ্যে এই ক্ষুদ্র কল্প-রসাত্মক খণ্ড-নাট্যের নীরব প্রোতা হয়ে রইল।

( ২ )

উমেশের প্রতি কালিদাসের আজকের ব্যবহারে তপন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। পিতার চরিত্রে কোনও বিশেষ উদারতার পরিচয় সে পূর্বে কোনও দিন পায়নি বটে, কিন্তু তিনি যে এত সঙ্গীচৈতন্য এটা সে ভাবতে পারেনি। যে লোভ এতদিন তাঁর হৃদয়-বিবরে লুক্কায়িত ছিল, তা আজ অকস্মাৎ বিবধর ভূজের মত বোরিয়ে এসে এমন গরল ঢেলে দিল যে, তপনের

সর্বদা আলা দ্বারায় দিল। বিবাহের রাতে উমেশ বাবু পণের টাকা দিতে না পারায় একটা গুণ্ডগোল উঠেছিল বটে, কিন্তু তা মিটমাট হয়ে বিয়ে যখন হয়ে গেল, তখন তখন ভেবেছিল ব্যাপারটা বোধ হয় চুকে গেছে। কালিদাস যে গোপনে উমেশকে ভাগাদারপ অল্পশের আশাত করছেন তা সে জানত না। তাই আজ অর্থ-সামর্থ্যহীন নিরুপায় রুগ উমেশের প্রতি নিজের পিতার নির্মম কটুভিত্তিক তার মনকে বিধিয়ে তুলল। আজ একটা ভাল সংবাদ পিতাকে দেবার ছিল। বিবাহের কিছুদিন পূর্বে সে ওকালতি পাশ করে কোর্টে যাত্রারাত শুরু করেছিল। এতদিন আয়ের পরিমাণ আশাতরূপ হয় নি। সম্ভ্রতি সে একটা বড় কেসে সহকারী উকিল নিযুক্ত হয়েছিল। বারোদিন ধরে মোকদ্দমার শুনানী হয়ে আজ শেষ হয়েছে। তার পক্ষের প্রধান উকিল প্রথম শুনানীর দিনই হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার সংবাদ পাঠিয়ে অল্পশিত ছিলেন এবং আজ পর্যন্ত কাজে আসেন নি। কাজেই বাধ্য হয়ে তপনকে এতবড় মামলা একাকী পরিচালনা করতে হয়েছে, এবং অদৃষ্টের জোরে সে আশাতীত ভালভাবে তা করেছে। আজ হাকিমের রায়ে তার পক্ষের জয় ঘোষিত হয়েছে। এতে সে সকলের কাছে প্রচুর অভিনন্দন এবং তাঁর মকেলের কাছ থেকে মোটা পারিশ্রমিক লাভ করেছে। সকলেই বলেছে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল—এই মামলার ফতকার্যতা তার উত্তর জীবনের সোভাগ্যের অরুণোদয়।

এই সংবাদ পিতাকে দেবার জন্য আগ্রহভরে বাড়ি এসে সে এইমাত্র যা শুনল তাতে পিতার কাছে এ কথা গোপন রাখল এবং মনে মনে সঙ্কল্প করল তারই হস্তে কস্তাদান করে বিপদের সম্মুখীন স্বস্তর মহাশয়কে সে সর্বপ্রথমে সাহায্য করবে। একটা পরিকল্পনাও সে চটপট স্থির করে ফেলল এবং পত্নীর কাছে সকল কথা ব্যক্ত করল। পণের টাকা শোধ করতে পিতার অক্ষমতার দরুণ একটা নিদারুণ লজ্জা অপরাধিতা রূপ শিশুর মত নিজ বন্ধের নিতুতে ঢেকে রেখেছে, এটা সে জানত। তাই ত্রীকে সকল কথা খুলে বলে বাড়ির

কারও কাছে তা প্রকাশ করতে নিবেদন করল, এবং পত্নীর রবিবার কালিদাসের কাছে 'কলকাতার কাজ আছে' বলে বোঝাতে এতবারে উমেশবাবুর হৃদে এসে উপস্থিত হল।

বিস্মিত উমেশকে হু কথায় আশ্বস্ত করে তপন একেবারে কাজের কথা পাড়ল। বলল—বাবা, আপনাকে একটা কথা বলব বলে এসেছি। পণের চার হাজার টাকা আমি আপনাকে গোপনে দিয়ে বাব, আপনি নিয়ে গিয়ে আমার বাবাকে দেবেন। টাকাটা আমি আমার নিজের উপার্জন থেকে দেব, কাজেই এ সম্বন্ধে কারও কিছু বলবার নেই। আমার হাতে এখন হু হাজার টাকা আছে, এবং আমি সেটা নিয়েই এসেছি। আপনি এটা নিন, এবং দু-তিন দিনের মধ্যে গিয়ে আমার বাবাকে দিয়ে আসুন। আমার টাকা আমারই থাকবে, অথচ আপনি ঋণমুক্ত হবেন।—বলে পকেট থেকে টাকা বার করে উমেশের সামনে রাখল।

জামাতার মহাশয়বতায় উমেশের চোখ হলহল করে উঠল। কিন্তু প্রথমেই তিনি টাকা নিলেন না। ইতস্ততঃ করে বললেন—আশীর্বাদ করছি তুমি চিরজীবী হও, বাবা। তোমার মত এমন মহত্ব কজন দেখাতে পারে? কিন্তু এ টাকা আমি কেমন করে নেব বাবা? তাতে কি প্রতারণা করা হবে না?

—আজ্ঞে না। কেন প্রতারণা করা হবে? আমার টাকা আমি যেচ্ছার সহদেপ্ত্রে আপনাকে দিচ্ছি। আপনি ত চান নি। তাই প্রতারণার প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমার বাবা এর বিনু বিসর্গও জানতে পারবেন না। টাকা আমার একাউন্টে ব্যাঙ্কে জমা ছিল, বাবা এর বিষয় জানেন না। আপনি রাজি হোন, বাবা। আপনার হৃদিত্তা আর অপমান আমি সহ করতে পারি না। আপনি আমাকে চার হাজার টাকা দিলে আমি যত খুশি হতাম, আপনাকে ঋণমুক্ত ও প্রসন্ন দেখলে তার থেকে ঢের ঢের বেশি খুশি হব।—বলে ব্যগ্রভাবে স্বস্তরের হাত দুটি চেপে ধরল।

আনন্দে ও হৃদয়তার বৃদ্ধ উমেশ কেঁদে

কেনলেন। জামাতাকে বকে ধারণ করে বললেন—  
জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন বাবা। তোমার মত  
এমন দেবতুল্য জামাই পেরেছি, এ আমার পরম ভাগ্য।

এই ব্যবহাস্যত কাজ হল। তপনের বদান্ততার  
উমেশের পৈতৃক ভিত্তিখানি আসন্ন বন্ধকের প্রলয়প্রাস  
থেকে অব্যাহতি পেল। হু দিন পরে উমেশ কালিদাসের  
বাড়ি গিয়ে হু হাজার টাকা দিলেন। কালিদাস  
জিজ্ঞাসা করলেন—বাড়ি বন্ধক দিয়েছেন?

উত্তরে উমেশ একটু সলজ্জ হেসে বললেন—আজ্ঞে  
না, আপাততঃ দিতে হল না। পাঁচ বারগার চেঁচা  
করতে করতে যোগাড় হয়ে গেল আপনার আশীর্বাদে।  
—কালিদাস আর বিতীয় প্রশ্ন না করে টাকাকালি শুনে  
পকেটস্থ করলেন। তিনি টাকাই চান। কি করে  
যোগাড় হল তা জানবার আগ্রহ তাঁর নেই। উমেশ  
বিদ্যার নেবার সময় তাঁকে বাকী হু হাজার শীত্র সংগ্রহ  
করবার তাগিদ দিতে কালিদাস ছাড়লেন না। ‘যে  
আজ্ঞে’ বলে উমেশ বোরিয়ে গেলেন।

এর মাস তিনেক পরে একদিন সন্ধ্যায় অবশিষ্ট হু  
হাজার টাকা নিয়ে উমেশ কালিদাসের বৈঠকখানায়  
পদার্পণ করলেন। টাকা সম্পূর্ণ শোধ হওয়াতে  
কালিদাসের লুপ্ত সৌজন্য কঠাং কিয়ে এল। এই প্রথম  
তিনি দ্বিরুক্ত উমেশকে ‘বৈবাহিক’ বলে সম্বোধন করলেন  
এবং মিষ্ট কথা বললেন—তারপর বেহাই মশাই, বাড়ির  
ধর-টর সব ভাল ত? বেরান ঠাকরুণ ভাল আছেন?

উমেশ পূর্বের মতই নম্রভাবে জবাব দিলেন—আজ্ঞে  
হ্যাঁ। আমি তাহলে এবার উঠি?

ব্যস্তভাবে কালিদাস বললেন—সে কি, এখুনি  
যাবেন। বৌমাকে ডেকে দি, বৌমার সঙ্গে হুটো কথা  
করে যান।

বিনীতকণ্ঠে উমেশ বললেন—আজ্ঞে, আজ আর  
হয়ে উঠবে না। আজ অল্প জায়গার একটা জরুরি কাজ  
আছে।

কালিদাস—ওঃ, আজ্ঞা তবে আজ থাক। শিগগিরই  
আর এক দিন এসে দেখে যাবেন কিন্তু।

—বে আজ্ঞে।—বলে উমেশ ধীরপদে নিক্রান্ত  
হলেন।

উমেশ যে আজ আসবেন, এ কথা আগে থেকেই  
তপনের জানা ছিল। তিনি উপস্থিত হবার মিনিট  
পাঁচেক পরে সে-ও এসে প্রথম দিনের মত সিঁড়ির বাঁকে  
দাঁড়িয়ে তাঁদের কথাবার্তা শুনাছিল। উমেশ বিদ্যার  
নেবার পর আপনমনে খুব একটোটা হেসে তপন সিঁড়ি  
দিয়ে উঠে নিজের ঘরে গেল এবং স্ত্রীকে হুই হাতে  
জড়িয়ে ধরে বলল—জানো অপরাধিতা, আজ তোমার  
টাকা সম্পূর্ণ শোধ হল।

একটু পরে তাকে ছেড়ে দিতেই দেখল, অপরাধিতার  
হুই চক্কু থেকে হুই বিন্দু অজ্ঞাত গুপ্ত কপালের উপর  
গড়িয়ে পড়েছে। কোমল কণ্ঠে বলল—এ কি, তুমি  
কাদছ?

নত হয়ে স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করে অপরাধিতা  
বলল—তুমি দেবতা, আশীর্বাদ কর যেন তোমার যোগ্য  
হতে পারি।

পত্নীর চিবুকে তর্জনী স্পর্শ করে তপন বলল—  
নিশ্চয়। প্রথমে মনে করেছিলাম তোমার বাবার  
প্রতিশ্রুতি তাঁর দায়িত্বের কাছে নুঁচি বা পরাজিত হয়।  
তারপর দেখি, কার সাধ্য তাঁকে পরাজিত করে? কেন  
না, তাঁর কল্পা তুমি যে অপরাধিতা। তাই শেষ  
পর্যন্ত তোমাদের জয় হল।

# প্রকল্প-রূপায়ণে বিভক্ত বাংলার বর্তমান চিত্র

চিন্তামণি দাস  
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ডাক, তার ও টেলিফোন বিভাগীয় মন্ত্রী  
মোস্তা জালালুদ্দীন আহমেদ

ফরিদপুর জেলায় গোপালগঞ্জের অন্তর্গত বরফা গ্রামে ১৯২৬ সালে মোস্তা জালালুদ্দীন আহমেদ সাহেবের জন্ম। তাঁর স্বর্গত পিতা হাতেম মোস্তা সাহেব ছিলেন স্থানীয় জননেতা এবং সুদীর্ঘ বিশ বছরের—ও অধিককাল তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও উদার মনোভাবাপন্ন হিসাবে তাঁর ছিল যথেষ্ট খ্যাতি। পিতৃচরিত্রাদর্শে অনুপ্রাণিত জালাল সাহেব জনসেবা-মূলক রাজনীতি জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করেছেন।

গোপালগঞ্জ এম্. এন্. ইন্সটিটিউশন থেকে ১৯৪১ সালে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৪৩ সালে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে এম. এ. এবং আইন পরীক্ষায় উপাধি প্রাপ্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অতঃপর তিনি ঢাকা হাইকোর্ট বারে যোগ দেন।

বাল্য জীবনে প্রিয় সঙ্গীরূপে পেয়েছিলেন তিনি আজকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি ছিলেন জালাল সাহেবের বন্ধু, উপদেষ্টা ও পথনির্দেশক। ১৯৪১ সালে মিঃ আমেদ সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং এই বছরই তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমা ছাত্র লীগের সভাপতি ও ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের সংগঠন সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হন। Post-partition ছাত্র লীগের তিনি ছিলেন অল্পতম প্রতিষ্ঠাতা। উক্ত সংস্থার আহ্বায়ক ছিলেন স্বর্গত নাইমুদ্দীন আমেদ এবং মিঃ জালালুদ্দীন ছিলেন অফিস সেক্রেটারী। ১৯৪৯ সালে

তিনি এই সংস্থার প্রথম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন এবং পরে অস্থায়ী সভাপতির পদ লাভ করেন।

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অল্পতম এবং শুরু থেকেই তিনি কার্যকরী সমিতির একজন সদস্য।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পার্লামেন্টার মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ও আব্দুর মতীসভার প্রাক্তন বাণিজ্য মন্ত্রী মিঃ ওয়াহিদ-উজ্জামানকে পরাজিত করে জালাল সাহেব জাতীয় পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন গোপালগঞ্জ-কোটালিপাড়া NE—99 কেন্দ্র থেকে।

কুখ্যাত পাক সরকার কর্তৃক পার্শ্বিক পীড়ন তাঁকে যথেষ্ট ভোগ করতে হয়েছে এবং রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে তাঁকে বহুবার কারারুদ্ধ করা হয়েছে। এতসব করেও সন্তুষ্ট হতে না পারায় পাক-সরকার ১৯৪৮ সালে তাঁর এম. এ. ডিগ্রী বাতিল করে দেয়। ১৯৫২ সালে আওয়ামী লীগের প্রবল আন্দোলনকালে মিঃ আমেদ লীগের অল্পতম আহ্বায়ক হিসাবে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণের অপরাধে রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে তাঁর আঠারো মাস কারাদণ্ড হয়। কারাবৃত্তির পর জালাল সাহেব ১৯৬১ সালে আব্দুর সরকারের পতন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারাবৃত্তি সংক্রান্ত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তৎকালীন কুখ্যাত আগরতলা বড়ঘর মামলায় মিঃ জালালুদ্দীন আমেদ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে অনারারী কাউন্সেল হিসেবে দাঁড়ান।

১৯৬১ সালে রাওয়ালপিণ্ডি গোল টেবিল বৈঠকে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং অতি স্বল্পসংখ্যক উক্ত বৈঠকের ক্ষয় মূল্যবান প্রতিবেদন রচনা করেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তিনি বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ দূত হিসাবে আরব রাষ্ট্রসমূহে সফর করেন। কার্যসম্পাদনে অস্বস্তিত এ্যাক্রো-এশিয় সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে যোগদান করে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।

একজন চৌকশ ক্রীড়াবিদ জালাল সাহেব ছিলেন তাঁর কলেজের ক্রীড়া সম্পাদক।

মমতাময়ী স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্রকে নিয়ে জালাল সাহেবের অধের সংসার।

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

দপ্তরের মন্ত্রী মি: আব্দুল মালেক উকীল

১৯২৪ সালের ১লা অক্টোবর নোয়াখালি জেলার রাজপুরে আব্দুল মালেক উকীলের জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হবার পর ১৯৫০ সালে এম. এ. পাঠক্রম শেষ করেন। পরের বছর ১৯৫১ সালে আইনের স্নাতক হয়ে ১৯৫২ সালে নোয়াখালি বার-এ যোগদেন এবং ১৯৬৪ সালে ঢাকা হাইকোর্টে এ্যাডভোকেট তালিকাভুক্ত হন।

পাক-ভারত স্বাধীনতা আন্দোলন, খ্রীষ্ট গণভোট, ভাষা আন্দোলন প্রভৃতি কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার অপরাধে প্রথমবার তিনি কারাবরণ করেন ১৯৪৬ সালের ১৮ই মার্চ। ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী বিতায়বার তিনি কারাবরণ করেন এবং ঐ ছুন মাসে তাঁকে “পূর্ববঙ্গ জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স” বলে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। একটি ডিগ্রী কলেজ সহ কতিপয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা।

মি: আব্দুল মালেক উকীল শেখ মুজিবুর রহমানের অনিষ্ট সহযোগিতারূপে বাংলাদেশের সব বকম প্রগতিশীল আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং ১৯৬১ সালে অনুষ্ঠিত গোল টেবিলে বৈঠকেও তিনি যোগদান করেছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি মহকুমা আওয়ামী-লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৬০ সালে

নির্বাচিত হন...নোয়াখালি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আওয়ামীলীগ কার্যকরী কমিটির সদস্য, যে পক্ষে তিনি অস্বাধি অধিষ্ঠিত। ১৯৬১ সালে নয়জন সদস্য বিশিষ্ট আওয়ামী লীগপরিষদীয় বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন মি: উকীল। ১৯৬৬ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত ‘সারা পাকিস্তান বৈঠকে’ তাঁরই সভাপতিত্বে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ছয় দফা কর্মসূচী ঘোষিত হয়।

নোয়াখালি জেলা মুক্ত-ক্রেট আফিসের প্রধানরূপে তিনি ১৯৫৪ সালে নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা করেন। মি: মালেক ১৯৬৪ সালে সর্বসম্মতিক্রমে নোয়াখালি জেলা সংযুক্ত বিরোধী দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। ঐ সময়েই তিনি আব্দুর খানের বিরুদ্ধে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানে মিস কতিমা জিন্নাহর পক্ষে নোয়াখালি জেলার রেকর্ড সংখ্যক ভোট সংগ্রহ করেন। কিছু কালের জন্য তিনি ত্রিশ জন সদস্য বিশিষ্ট খসড়া সংবিধান কমিটির “সদস্য” ছিলেন এবং ১৯৭১ সালে নোয়াখালির পাঁচজন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জেলা সংগ্রাম কমিটির তিনি ছিলেন সভাপতি। তৎপূর্বে ১৯৬৮ সালে আব্দুর বিরোধী গণ আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠিত জেলা গণতান্ত্রিক কর্মসমিতির সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসাবে বিধান সভার সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে পুনরায় তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ঐ বছরই তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বিধান সভার সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামীলীগ সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালেও পূর্বোক্ত ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হয় এবং ঐ বছর সংযুক্ত বিরোধী মোর্চার নেতা ছিলেন তিনিই।

বিগত সাধারণ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসাবে ‘জাতীয় পরিষদে’ সদস্য নির্বাচিত হন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে তিনি ১৯৬৫-৬৬ সাল-এর জন্য কমন্ওয়েলথ পার্লিয়ারমেন্টারী এ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৬-৬৭

সাল পর্যন্ত তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বার  
হাউজিলের সদস্য ছিলেন।

বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম কালে তিনি জনমত সংগঠন  
মানসে আওয়ামীলীগ পালিয়ামেন্টারী প্রতিনিধিত্বের  
নেতা হিসাবে নেপাল পরিভ্রমণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ  
চলাকালীন তিনি আগরতলা ও অজান্ত হানে মুক্তি  
বাহিনীর প্রশিক্ষণ, অভ্যর্থনা শিবির, যুব শিবির, সেনা  
নিবাস প্রভৃতি সংগঠন করেন। বঙ্গবন্ধুর ক্যাবিনেট  
মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে তিনি নোয়াখালি জেলা জাণ  
ও পুনর্গমন সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে কর্মরত  
ছিলেন।

বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞাত, প্রাকৃতিক সম্পদ,  
বিজ্ঞান ও প্রায়োগিক গবেষণা দপ্তরের  
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ মফিজ চৌধুরী

১৯১৯ সালের আগষ্ট মাসে বগুড়া জেলার জয়পুরহাট  
থানার অন্তর্গত মঙ্গলবাড়ী গ্রামে ডঃ চৌধুরীর জন্ম।  
১৯৭২ সালের ১২ই এপ্রিল তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী  
বাংলাদেশ সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে শপথ  
গ্রহণ করেন।

মেধাবী ছাত্র ডঃ চৌধুরী বগুড়া জিলা স্কুল থেকে  
স্টার মার্ক পেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে,  
কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এস.সি.  
পাশ করেন। ১৯৩৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে  
বসায়নে এম.এস.সি. ডিগ্রি প্রাপ্ত হন এবং আমেরিকা  
যুক্তরাষ্ট্রের লেহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌলিক গবেষণা  
কার্যের জন্য ১৯৪৯ সালে পি.এইচ.ডি. উপাধি অর্জন  
করেন।

সর্বোচ্চ গবেষণা কার্যের জন্য সর্গভারতীর ভিত্তিক  
১৯৪০ সালের 'কুপার' স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন ডঃ চৌধুরী  
রাশারনিক ইনস্টিটিউট কলকাতা এবং পরে তিনি লন্ডনের  
রয়্যাল গ্র্যাকডেমীর সদস্যপদে নির্বাচিত হন। ১৯৪৯  
সালে ব্রিটিশ মার্কিন সংস্থা "Sigma" তাঁকে সভ্যপদ  
প্রদান করে। ১৯৪১ থেকে ৫০ সাল পর্যন্ত ডঃ চৌধুরী  
বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫০

সালে সরকারী পদ পরিত্যাগ করে শিল্প ব্যবসায় উদ্যোগ  
কার্যে ব্রতী হন এবং ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলা-  
দেশের সর্বপ্রথম ও বৃহৎ "Gest Engineering  
Factory."

১৯৫৬ সালে ব্যাককে অস্থিতিত সিয়াটো অর্থ-নৈতিক  
বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব  
করেন ডঃ চৌধুরী এবং ১৯৬০ সালে সিওলে অস্থিতিত  
অধিবেশনে এসিয়ান প্রোডাক্টিভিটি সংহার অন্ততম  
প্রতিনিধিত্ব ছিলেন তিনি।

ডাঃ মফিজ চৌধুরী তৎকালীন "PITAC" শিল্প  
উপদেষ্টা পরিষদ, মানক সংস্থা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়  
কোর্টের সদস্য ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি  
ছিলেন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। সারা বাংলা মুসলিম  
ছাত্র সংঘের প্রথম কার্য্যকরী সমিতির সভাপতির মধ্যে  
তিনি অন্ততম। প্রখ্যাত ছাত্র নেতা বর্গত আব্দুল  
ওয়াক্ক-এর নেতৃত্বে "হলুওয়েল্ মুখিত্তত" অপসারণ  
আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এই  
সময়েই তিনি "শের-এ-বেঙ্গল" মিঃ এ. কে. ফজলুল হক  
এর সংস্পর্শে আসেন।

বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে তিনি সক্রিয়  
ভূমিকায় ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ কলকাতা ১৯৭১  
সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিচারণািত আব্দুল সৈয়দ চৌধুরীর  
নেতৃত্বে রাষ্ট্রসংঘে যে প্রতিনিধিত্ব প্রেরণ করা হয়েছিল,  
ডাঃ চৌধুরী সেই দলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।  
তিনি সাহিত্যরসমাণ্ডিত বেশ কয়েকখানি গ্রন্থের  
প্রণেতা। তাঁর গ্রন্থাদির মধ্যে কোরিয়ার কবিতা,  
বাত্যালয়, বড় ও সোনালী পাহাড় উল্লেখযোগ্য।  
সাহিত্য পত্রিকা 'স্বদেশ'-এর প্রথম সম্পাদক ও প্রকাশক  
ছিলেন ডঃ মফিজ চৌধুরী।

মিঃ আব্দুর রব সান্নায়াবত  
ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার (ভূমি-রাজস্ব সমন্বিত)  
দপ্তরের মন্ত্রী

বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত মহাইল  
গ্রামে বাংলা ১৩২৭ সালে মিঃ আব্দুর রব জন্মগ্রহণ



করেন। স্থানীয় গৈলা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে ১৯৪১ সালে স্নাতক হন। কলিকাতার রিপন কলেজে আইন পড়া শুরু করেন এবং ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পরীক্ষার উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৫০ সালে তিনি বরিশাল বাবে যোগদান করেন।

১৯৫৭ সালে মিঃ আব্দুল রব ছিলেন ‘ভাপ’-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা ‘গণতন্ত্রী দলের’ সাধারণ সম্পাদক। সর্ববিধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন সক্রিয় সহযোগী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁকে আত্মগোপন করতে হয়েছে। ১৯৬২ সালে তিনি ছিলেন অন্তরীণ।

হয় দফা কর্মসূচীর অন্ততম প্রবক্তা মিঃ আব্দুল রব ১৯৬৮-৬৯ সালে আব্দুল-বিবোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছিল তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা।

মিঃ সান্নেয়াবত বরাবরই সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত এবং বরিশাল জেলা জার্নালিস্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের তিনি সভাপতি। ভক্তির বহু সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন।

১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের টিকিটে তিনি বরিশালের গৌরনদী কেন্দ্র থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী

মিঃ মিজানুর রহমান চৌধুরী

১৯৩১ সালে মিঃ এম্. আর. চৌধুরীর জন্ম। ইন্টার-মিডিয়েট পর্যন্ত পড়েছেন চাঁদপুরে এবং ১৯৫২ সালে কেন্দ্রী কলেজ থেকে স্নাতক হন। কেন্দ্রী কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর সাহেব পরে গণস্বাক্ষরকারীপে পরিচিতি পান।

১৯৫৯ সালে তিনি চাঁদপুর পৌর সংস্থার উপ-পৌর প্রধান নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ সদস্য হিসাবে তিনি জাতীয় পরিষদে আসন লাভ করেন ১৯৬২ সালে।

১৯৬৪ সালে ‘জন নিরাপত্তা আইন’ বলে কারাকুদ্ধ থাকাকালীন পুনরায় তিনি জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে জয়ী হন।

১৯৬৬ সালে তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক এবং লীগের অন্ততম নেতা হিসাবে ঐতিহাসিক “হয় দফা দাবী” আন্দোলন পরিচালনা করার অপরাধে, জুন মাসে তাঁকে কারাকুদ্ধ করা হয়। ১৯৬৭ সালে সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা অনুসারে তিনি কারাবুক্ত হন। সংযুক্ত বিবোধী দলের আত্মায়ক নির্বাচিত হন তিনি ১৯৪৮ সালে।

১৯৬৪ সাল থেকে আওয়ামী লীগের সংগঠন সম্পাদক মিজানুর সাহেব বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের অন্ততম সংগঠক হিসাবে সীমান্তের অপর পার থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন।

কর্ণেল কে. এম্. সফিউল্লা, পি. এম্. সি

বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী সৈন্যধ্যক্ষ

ঢাকা জেলার রূপগঞ্জ গ্রামের স্বর্গত কাজী আব্দুল হামিদের দ্বিতীয় পুত্র কর্নেল সফিউল্লা জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৫ সালে। ১৯৫৩ সালের প্রথম দিকে তিনি পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেন, ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান মিলিটারী এ্যাকাডেমী থেকে কমিশন প্রাপ্ত হন। সেনাবাহিনীতে থাকা কালীন প্রথম দু বছর তিনি ছিলেন ১৫নং পাজাব রেজিমেন্টে এবং পরে তাঁকে বদলী করা হয় পূর্ববঙ্গ রেজিমেন্টে।

১৯৫৭ সাল থেকে তিনি পূর্ববঙ্গ রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নে সৈন্য ও স্টাক্ কম্যান্ডাররূপে বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদের কার্যভার পরিচালনা করেন। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত মিলিটারী সেক্রেটারিয়েট অফিসে রাওয়ালপিণ্ডি জেনারেল হেড কোয়ার্টারে স্টাক্ অফিসার হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৬৫ সালে কোরেটার কম্যান্ড এ্যাক্ট স্টাক্ কলেজের স্নাতক উপাধি প্রাপ্তির পর, সুল অব্ ইনক্যান্টুটী এণ্ড ট্যাকটিকস্-এর ট্যাকটিক্যাল উইংএর উপদেষ্টা নিযুক্ত হন।

ক্যাডেট জীবনে কর্ণেল সফিউল্লার প্রিয় খেলা মুষ্টিযুদ্ধ ও বন্দুক চালনা। তৎকালীন একাডেমীর তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম মুষ্টিক এবং পারিক্তান আর্মি রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনেও তাঁর ছিল দক্ষ বন্দুকবাজের স্বীকৃতি। যখন বর্ষের পাক-বাহিনী ঢাকার নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর বৃশস অত্যাচার চালিয়েছে, তিনি ছিলেন তখন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ব্যাটেলিয়ানের বিত্তীয় কম্যান্ডার। ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে উক্ত ব্যাটালিয়ান ঢাকার জয়দেবপুরে মোতায়েন ছিল এবং ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর ৭১ পর্যন্ত কর্ণেল সফিউল্লা লড়াই করেছেন পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে এবং ঢাকা, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি বিভিন্ন খণ্ডে মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। মুষ্টিযুদ্ধ চলাকালীন অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে তিনি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী নো সৈন্যাধক্ষ মিঃ

মুরুল হক

ঢাকা শহরে স্বর্গত আব্দুল খালেকের কনিষ্ঠ পুত্র মুরুল হক সাহেবের জন্ম ১৯০৬ সালের জাহুয়ারী মাসে। ১৯২৯ সালে তিনি ঢাকা আম'নীটোলা গভর্নমেন্ট হাই-স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, আই, এন্স. সি. পাশ করেন ঢাকা কলেজ থেকে ১৯২২ সালে। তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময়ে তিনি পারিক্তান নো-বাহিনীতে ভর্তি হয়ে ১৯২৩ সালের মে মাসে কোয়েটার জয়েন্ট সার্ভিসেস্ প্রিক্যাডেট ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান করেন।

কোয়েটা এবং করাচির পাক নো-প্রশিক্ষণ বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হবার পর ১৯২৪ সালের আগস্ট মাসে মুক্ত-রাজ্যের ডারটমাউথস্থ ব্রিটেনিয়া রয়্যাল নেভী কলেজে যোগদান করেন। ব্রিটিশ নো-বাহিনীতে সফল প্রশিক্ষণের পর ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে “মিডলিশ্‌ম্যান”এর পদে উন্নীত করা হয়। বিমানবাহী রণপোত সীগ্ল এ “মিডলিশ্‌ম্যান” হিসেবে প্রশিক্ষণের পর, ১৯২৮ সালে প্রাইমাউথের রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে স্নাতক হন।

১৯২৪ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯২৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি রয়্যাল নেভীর পক্ষে যুদ্ধ ছিলেন প্রাথমিক প্রশিক্ষণ, যন্ত্রবিদ্যা, স্নাতক প্রশিক্ষণ ও সামুদ্রিক যন্ত্রবিদ্যা, বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ প্রভৃতি কার্যে। প্রাক্তন পাক-নো-বহরের একজন সেক্রেটারি হিসাবে জল ও হল উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর উপর প্রভূত দায়িত্বভার স্তম্ভ ছিল। কম্যান্ডার মুরুল হক ছিলেন পাক-নো-বহরের ডেপুটি “সাক্সাহান” ও ডক ইয়ার্ডের ইঞ্জিনিয়ার অফিসার এবং নেভী ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স-এর উপদেষ্টা। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রামে বেস্ ইঞ্জিনিয়ার অফিসার এবং টেলদারী নো-বহরেরও কোয়ার্টার ইঞ্জিনিয়ার-এর দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৭ সালে তাঁকে নোবহরের একজন “কুয়ার” পি. এন্স. এস. “বাবর”-এর সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার অফিসার এবং পরে করাচীর স্টেভেল হেডকোয়ার্টারে স্টাক অফিসার পদে নিয়োগ করা হয়। প্রচুর বিপদের মুকি নিয়ে তিনি একখানি ক্ষুদ্র মৎস্ত-ধরা নৌকায় সপরিবারে সমুদ্রপথে পারস্য উপসাগরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে পাড়ি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিমানাধ্যক্ষ মিঃ আব্দুল করিম খোন্দকার

বাংলাদেশে যুদ্ধরত বাহিনীর অতিজ্ঞতম অফিসার খোন্দকার সাহেব জন্মগ্রহণ করেন বংপুরে ১৯০৫ সালে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রাবস্থায় ১৯২১ সালে তিনি পারিক্তান বিমান বাহিনীতে যোগদান করেন।

পাক বিমান বহরের সবকটি উড্ডয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনি উপদেষ্টা হিসাবে কার্যপরিচালনা করেছেন এবং সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল পাক-বিমান বহরের বৃহত্তম “কেট ফাইটার ট্রেনিং কোয়ার্টার” কম্যান্ডার-এর পদাধিকারী ছিলেন। প্রতিষ্ঠা আবাহাওয়ার কেট বিমান উড্ডয়নকালে পাইলটদের কম্যান্ড পরীক্ষকও ছিলেন তিনি।

পারিক্তান স্টাফ কলেজের স্নাতক কমোডোর খোন্দকার ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পাক-বিমান বহরের প্রানিং বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত ছিলেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তান হিত পাক-বিমান বহরের তিনি ছিলেন বিতীয় কমান্ডার। মুজিবনগর হিত বাংলাদেশ বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে “আক্রমণ ও প্রশিক্ষণ” কার্যের দায়িত্ব ছিল তাঁর। এতদ্ব্যতীত মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীও গঠন করেন তিনি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কল্যাণ ট্রাস্ট

এসোসিয়েশনের স্পীকার—মিঃ মহম্মদ উল্লাহ

নোয়াখালী জেলার রায়পুর থানার অন্তর্গত সুইচা গ্রামে ১৯২১ সালে জন্ম। এই জেলার লক্ষ্মীপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে ১৯৩৮ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স সহ তিনি স্নাতক হন ১৯৪৩ সালে তিনি আইনের উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯৫১ সালে তিনি আওয়ামী লীগ-এ যোগ দেন এবং ১৯৫২ সাল থেকে ভূতপূর্ব পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদকের পদাধিকারী ছিলেন। ১৯৫০ সালের জাহাঙ্গীর মাসে তিনি ঢাকা জেলা বাহা যোগদান করেন এবং হাইকোর্টে

যোগ দেন ১৯৬০ সালে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নোয়াখালীর রায়পুর-লক্ষ্মীপুর কেন্দ্রে থেকে তিনি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী দলের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৬৬ সালে তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে মুক্তি যুদ্ধ শুরু হতে তিনি উহাভে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং মে মাসের প্রথমদিকে তিনি কামরাপুর এবং যশোরের মধ্য দিয়ে মুজিব নগরে আসতে সক্ষম হন। সেখানে তিনি তৎকালীন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের পরামর্শদাতা এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদকের কঠিন দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন।

বাংলাদেশের বিবিধ মিশন সদস্যস্বরূপ মিঃ মহম্মদ উল্লাহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সফর করেন এবং পাক জঙ্গী শাহীর গভনের পর ১৯৭১ সালের ২২শে ডিসেম্বর তিনি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।

তিনি পুত্র ও দুই কন্যার জনক মহম্মদ উল্লাহ সাহেবের অবসর বিনোদনের প্রিয় পছন্দ কবিতা বা নজরুলের কবিতা আবৃত্তি অথবা দাবা খেলা।



# মাতৃভাষায় অর্থশাস্ত্র

অবিমল সিং

(১)

“মানুষ শস্ত্র-কার জীব (Man is a tool-making animal)” — বের্গামিন ক্রাকলিন।

মানুষের ক্রম-বিকাশে “শ্রম”এর ভূমিকা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে “শ্রম হইতে মানুষের উদ্ভব (Labour created man himself),” এঙ্গেলস-এর এই উক্তি প্রকৃত তাৎপর্য অহুতাবন করিতে হইলে “শ্রম” শব্দটিকে আমাদের গ্রহীত অর্থশাস্ত্রীয় সংজ্ঞা অপেক্ষা একটু ব্যাপকতর অর্থে দেখিতে হইবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে “শ্রম”-এর অর্থকে “জীবন ধারণার্থে অথবা উন্নততর জীবন ধারণার্থে পূর্বকল্পিত সচেতন এবং সার্থক প্রয়াস” এর মধ্যে সীমিত রাখিলে চলিবে না। “চেতনা” এবং “কল্পনা” শক্তির বিকাশের পুরাবৃত্তায় অর্ধচেতন অথবা অব-চেতন, এমন কি সহজাত রীতি এবং অতি প্রাথমিক পর্যায়ের সচেতন বুদ্ধির মাঝখানে ভেদ-রেখা টানা প্রায় অসম্ভব।

আবার “শ্রম”কে বেশী ব্যাপক অর্থে দেখিলেও চলিবে না। কারণ “শ্রম” অর্থে যদি আমরা শুধু বাঁচিয়া থাকার প্রয়াস মাত্র ধরিয়া লই, তাহা হইলে শ্রম হইতে একমাত্র মানুষেরই নয়, সমস্ত প্রাণীরই উদ্ভব। কারণ, আমরা জানি যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেদের মানাইয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকার সহজাত রীতি মূলতঃ প্রয়াস হইতেই বিভিন্ন প্রাণীর উদ্ভব, অর্থাৎ আদিতে একই প্রাণীর বিভিন্ন প্রাণীতে রূপান্তর।

তেমনি এক্ষেত্রে “মানুষ” কথাটিকেও আমাদের গ্রহীত সংজ্ঞাহুয়ারী “শস্ত্রকার জীব (tool-making animal)”, এই অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলে চলিবে না একটু ব্যাপক অর্থে দেখিতে হইবে।

আদি মানুষের অস্ত্র বলিতে আমরা সাধারণতঃ “প্রস্তরস্ত্র”ই বুঝিয়া থাকি। এবং ব্র-তাত্ত্বিকেরাও মানুষের ক্রম-বিকাশের গবেষণায় বিশেষভাবে প্রস্তরস্ত্রের উপরই নির্ভর করিতে বাধ্য হ’ন। কারণ, আদিমানুষের অস্ত্রাদির মধ্যে একমাত্র প্রস্তরস্ত্রই কালজয়ী সাক্ষ্যরূপে যুক ভাষায় মানুষের অতীত ইতিহাস একটু আঁচটু বলিতে চেষ্টা করে। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত, বিভিন্ন কালে ব্যবহৃত, প্রস্তরস্ত্রের নির্মাণ কৌশল-এর ক্রমবিকাশ অহুযায়ী মানুষের লক্ষ লক্ষ বৎসরের অতীতকে আদি-প্রস্তর (Palaeo-lithic), মধ্য-প্রস্তর (Meso-lithic), নব্য-প্রস্তর (Neo-lithic) ইত্যাদি যুগে ভাগ করা হইয়া থাকে। আবার প্রস্তরস্ত্র নির্মাণের বিভিন্ন আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা হইতে বিভিন্ন কৃষ্টি (culture), তাহাদের প্রকার, অথবা সময়, এবং ক্রম-বিকাশও লক্ষ্য করা যায়। অতএব ব্র-বিজ্ঞানীরা অতি আদিম স্তরের মহত্ত্ব-রূপী প্রাণীদের ভূগর্ভে প্রোথিত জীবাশ্মের (fossil) সন্নিধ্যে কোন তীক্ষ্ণরিত প্রস্তরের সন্ধান পাইলে, তাহা কৃত্রিম ভাবে অস্ত্ররূপে প্রস্তুত হইয়াছিল, অথবা কোন নৈসর্গিক কারণেই তীক্ষ্ণরিত হইয়াছিল, এই প্রশ্নের মীমাংসার গলদঘর হইয়া থাকেন। কারণ এই মীমাংসার উপরই ঐ সব প্রাণীকে “শস্ত্রকার জীব”-এর পর্যায়ভুক্ত করা যায় কি না তাহা নির্ভর করে।

কিন্তু প্রস্তরস্ত্রের পাশাপাশি, কিবা অনেক পূর্বাবধি, মহত্ত্বরূপী প্রাণীরা বৃক্ষশাখাদি প্রকৃতিতে

সহজলভ্য বিচিত্র ধরণের নবর বস্তুকে অন্তরূপে সমাধিক ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন এরূপ অসুমান অবশ্যই অসঙ্গত নহে। যদিও ঐ সব অনিন্দ্য বস্তু কালের চক্রতলে নিপীড়িত হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে। যেমন দেখিয়াছি যে অতি প্রাথমিক স্তরের বুদ্ধি বিকাশ ঘটিলেই একটি বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিশাখার আঘাতে হস্তের অনাধিগম্য ফলও হস্তগত করা যায়। আমরা অসুমান করিতে পারি যে এই বুদ্ধিশাখাটিই আদি মানুষের প্রথম অস্ত্র। কারণ আদিতে মনুষ্য-রূপী প্রাণীর ফল-মূলহারী ছিলেন এবং বৃক্ষই তাঁহাদের প্রধান আশ্রয় ছিল। একটি বুদ্ধিশাখাকে আন্দোলিত করিলে যেমন লক্ষ্য করা যায় যে উৎসংশ্লিষ্ট স্থপক ফল ভূর্ণিত হইতেছে, তেমনি বুদ্ধিক্রম হস্ত দ্বারা একটি বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিশাখা ক্রীড়াহলে ইতস্ততঃ সঞ্চালনের ফলে দৈবাৎ আহত হস্তভাগ্য অপরিণত ফলের ভূ-লুপ্তনও লক্ষ্য করা যায়। একেত্রে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিশাখারূপ বস্তুই সঞ্চালনের ফলে অপরিণত ফলের উপর ইহার আঘাত, এবং সেই আঘাতের ফলে বুদ্ধিশাখারূপ অবলম্বন হইতে ইহার বিচ্যুতি, এই কার্য-কারণ সম্বন্ধ স্থাপনের উপযোগী ন্যূনতম বুদ্ধির বিকাশ না ঘটিলে কোনরূপ কৃত্রিম অস্ত্র ব্যবহারই সম্ভব নয়।

একণে প্রশ্ন হইতে পারে এই বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিশাখাটিকে “কৃত্রিম” অস্ত্র বলা যায় কি না। কারণ ইহা ত প্রকৃতিতে সহজলভ্য। এই প্রশ্নে যতাবতঃই মহাভারতের ভীম-সেনের কথা মনে পড়ে। তিনি বড় একটা অস্ত্রাদির ভোয়াকা করিতেন না। প্রহরণের প্রয়োজন হইলে এবং গত্যন্তর না দেখিলে একটা শালবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিয়া ইহাকেই অন্তরূপে ব্যবহার করিতেন। সুস্থ ভাবে বিচার করিলে ভীমসেনের অথও শালবৃক্ষ অথবা তাঁহার অপেক্ষাকৃত কমজোর প্রপিতামহদের বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিশাখা কোনটাই অকৃত্রিম নহে। অন্তরূপে ব্যবহার্য শালবৃক্ষকে ছুঁই হইতে উৎপাটিত করিতে হয়, বুদ্ধিশাখাকে বৃক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। ইহা সর্বশাস্ত্রের সংজ্ঞাহুসারে “উৎপাদন”-এর পর্যায়ে পড়ে।

প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে লভ্য বস্তুকে মানুষের প্রয়োজনানুরূপ রূপান্তরিত অথবা বিকৃত অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত করাকে অর্থাশাস্ত্রে “উৎপাদন” আখ্যা দেওয়া হয়। তবে ঝড়-ঝড়াদি নৈসর্গিক উৎপাদে, মস্ত হস্তীর “হস্তে”, অথবা সুখ্যমান মহিষ-গণ্ডারাদি বৃহৎকার প্রাণীর সংঘাতে বৃক্ষাদি সমূলে উৎপাটিত হইতে পারে, বুদ্ধিশাখা ভাঙিতে পারে, এবং অতঃপর ইহারা সেইরূপ “বিকৃত” অবস্থায় মানুষের অন্তরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে ইহাদিগকে প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে প্রাপ্ত অর্থাৎ “অকৃত্রিম”ই বলা যায়।

অতঃপর আদিতে যেমন সহজাত বুদ্ধি এবং অতি প্রাথমিক স্তরের সচেতন বুদ্ধির, অথবা নিরস্ত্র জীবন সংগ্রাম এবং সশস্ত্র জীবন সংগ্রামের, পার্থক্য অতি ক্ষীণ, তেমনি প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে লভ্য বস্তুকে অন্তরূপে ব্যবহার এবং ঐ সব বস্তুকে সচেতন ভাবে প্রয়োজনানুরূপ রূপান্তরিত অথবা বিকৃত করিয়া অন্তরূপে ব্যবহার, এই দুই-এর পার্থক্যও অতীব ক্ষীণ। সর্কাপেক্ষা কোঁচুকপ্রম ব্যাপার এই যে অস্ত্রাস্ত্র প্রাণী অস্ত্রের নির্মাণ কৌশল না জানিলেও তাঁহাদের অনেকেরই অস্ত্রের ব্যবহার কৌশল জানেন। অর্থাৎ মানুষকে “অস্ত্রকার” জীব না বলিয়া যদি “অস্ত্র-ব্যবহর্তা” জীব বলিতে যাই তবে তদ্বারা অস্ত্রাস্ত্র প্রাণী হইতে মানুষকে বিশেষায়িত করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে অস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে অস্ত্রাস্ত্র অনেক প্রাণীই মানুষকে অনেকদূর অতিক্রম করিয়া যান। এবং প্রকৃতিতে সহজলভ্য বস্তুকে অন্তরূপে ব্যবহারের প্রশ্ন হইলে তাঁহাদের কথাই সর্বাগ্রে বলিতে হয়। কারণ তাঁহাদের অস্ত্রাবলীকে “সহজলভ্য” বলিলে কিছুই বলা হয় না। ইহারা একেবারে আক্ষরিক অর্থেই “সহজ” অর্থাৎ সহজাত, অথবা প্রকৃতিদত্ত। সিংহ-ব্যাঘ্রাদির তীক্ষ্ণ নখ-দন্ত, হস্তী-বরাহাদির দীর্ঘ বৃগল দন্ত, মেঘ বুঝ-মহিষ গণ্ডারাদি জন্তুর অথবা কোন কোন মৎস্তের (যথা “শৃঙ্গী” গুরুকে “শিঙ্গী” মাছ-এর) শৃঙ্গ, পক্ষীর চকু এবং নখর, নর্পের বিববন্ত, মধুমাকিকার ফল, মশক মৎসুগাদি বিচিত্র কীটপতঙ্গের বিচিত্র ধরণের দশনাদি

অথবা বেধনান্ধ, ইত্যাদি দেখিলে মনে হয় প্রকৃতি যেন গোটা প্রাণী জগৎটাকেই বৰণসাজে সজ্জিত কৰিয়া দিয়াছেন। এমন কি উভিদেহও কটকাদি বিভিন্ন বকমেৰে “অস্ত্ৰ” দেখা যায়, যদিও ইহাৰা আক্ৰমণাত্মক (offensive) নহে, আত্মৰক্ষাত্মক (defensive)। এবং তাহা অক্ষয়িক অৰ্থেই; শান্তিপূৰ্ণ সহাবস্থানে বিধাসী আধুনিক মানব গোষ্ঠীৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ যে অৰ্থে আত্মৰক্ষাত্মক, সেই অৰ্থে নহে।

আদিতে প্রকৃতিতে সহজলভ্য বস্তুকে অস্ত্ৰৰূপে ব্যৱহাৰ এবং কৃত্ৰিম অস্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ, এই দুই-এৰ পাৰ্থক্য যদি এত ক্ষীণ হয় এবং স্বাভাৱিক অস্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰেৰে কেন্দ্ৰে মানুহৰ অপেক্ষা অস্ত্ৰাস্ত্ৰ প্রাণী যদি শ্ৰেষ্ঠই হয়, তবে তাহাদেৰ উপৰ মানুহেৰে আধিপত্যেৰ মূল কোথায়? মানুহেৰে প্রাধান্তেৰ মূল এই যে অস্ত্ৰাস্ত্ৰ প্রাণীৰ অস্ত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপেই অস্ত্ৰাধিকাৰীৰ অঙ্গীভূত প্রত্যক্ষমাত্ৰ, মানুহেৰে অস্ত্ৰ তাহাৰ অঙ্গ-বহিৰ্ভূত “প্রত্যক্ষ”, অৰ্থাৎ উপকৰণ। অস্ত্ৰেৰ বহিৰ্ভূত বস্তুকে সচেতন ভাবে অস্ত্ৰৰূপে ব্যৱহাৰেৰে এই শক্তিতেই মানুহৰ অন্যান্য প্রাণীকে অনেক পক্ষান্তে কেলিয়া দিয়াছে। অঙ্গীভূত অস্ত্ৰ এবং অঙ্গ-বহিৰ্ভূত অস্ত্ৰ এই দুই-এৰ পাৰ্থক্য কতকটা প্রতীয়মান হইতে পারে যদি আমৰা ৰামায়ণে বৰ্ণিত শ্ৰেনৰাজ জটায়ুৰ সহিত সীতাপহাৰী ৰাবণেৰ সংঘৰ্ষেৰ কথা শৱণ কৰি। পক্ষ-চক্ষু-নখৰাৰাতে চূৰ্ণিতৱথ কৰ্ত্তিত-মাংস ক্ষত-বিক্ষত বিধ্বস্ত-প্রায় বিংশ-বাহু দশানন অবশেষে কোনকমে একটি হস্তে গুত অসিৰ দ্বাৰা শ্ৰেনৰাজেৰ পক্ষ এবং নখৰ ছেদন পূৰ্বক সে যাত্ৰা ৰক্ষা পান। এই অসিটি না থাকিলে ৰামায়ণেৰ ব্যাপাৰটা সম্ভবতঃ বেশীদূৰ গড়াইত না। কিন্তু অসি তথা ধাতব অস্ত্ৰেৰ অবিৰ্ভাব মাত্ৰ সেদিনকাৰ ঘটনা; বড়জোৰ তিন চাৰ হাজাৰ বৎসৰ আগেকাৰ হইবে। আমাদেৰ আলোচ্য বিষয় তিন চাৰ লক্ষ বৎসৰ অথবা ততোধিক আগেকাৰও হইতে পারে।

দেহান্তৰ্গত অস্ত্ৰেৰ (corporeal weapons) এবং দেহ-বহিৰ্ভূত অস্ত্ৰেৰ (extra-corporeal weapons)

মৌলিক পাৰ্থক্য এই যে প্রথমোক্তটি অস্ত্ৰাধিকাৰীৰ দেহেৰ সহিত অবিচ্ছেদ্য বিধায় ইহাৰ প্রয়োগেৰ কেন্দ্ৰও সম্পূৰ্ণ ভাবে সীমাবদ্ধ, অপৰটিৰ তাহা নহে। দেহান্তৰ্গত অস্ত্ৰ অপরিবৰ্ত্তনীয় বলিয়া পাৰিপাৰ্শ্বিক অবস্থায় সহিত ইহাৰ অভিযোজন (adaptation) অসম্ভব। পক্ষান্তে দেহাতিৰিক্ত অস্ত্ৰ বহুৰূপী, অৰ্থাৎ অবস্থান্তেৰে যে কোন ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিতে পারে। আদি মানুহ প্রকৃতিতে সহজলভ্য বিভিন্ন বস্তুকে স্বাভাৱিক অবস্থায়, অথবা তাঁহাদেৰ প্রয়োজনানুৰূপ এবং সাধ্যানুৰূপ ৰূপান্তৰিত অথবা বিকৃত কৰিয়া অস্ত্ৰৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিতে ত পারিতেনই; উপৰন্ত মৃত-সিংহ ব্যাঘ্ৰাদিৰ তীক্ষ্ণ নখ-দন্ত, পক্ষীৰ চকু অথবা নখৰ, হস্তী-বৰাহাদিৰ দীৰ্ঘ দন্ত, মেঘ বৃষ-মহিষাদিৰ শৃঙ্গ ইত্যাদি প্রাণী জগতেৰ যাবতীৰ প্রকৃতিদত্ত আৱুধও ইচ্ছামত পৰিগ্ৰহ কৰিতে পারিতেন।

আমৰা “tool making” কথাটিকে “শস্ত্ৰকাৰ” বলিয়াহি, “শস্ত্ৰকাৰ” বলি নাই। কাৰণ আদি মানুহেৰ জীৱনে দেহ বহিৰ্ভূত “অস্ত্ৰ” এবং “যন্ত্ৰেৰ” পাৰ্থক্য বিধান হুৱহ। বৃক্ষ-শাখাৰূপ যষ্টি দ্বাৰা কল পাড়িলে তাহা “যন্ত্ৰ”, সাপ মাৰিলে তাহা “অস্ত্ৰ”। আবার প্রাণী জগতেও যেমন সহজাত অথবা প্রকৃতিজ “অস্ত্ৰ” আছে, তেমনই “যন্ত্ৰ”ও আছে। অনেক কেন্দ্ৰে একই প্রত্যক্ষ দ্ব্যৰ্থ-সাধক, অৰ্থাৎ অস্ত্ৰ এবং যন্ত্ৰ এই উভয়েৰ উদ্দেশ্যই সাধন কৰে। পণ্ড পক্ষীৰ দন্ত নখৰ চকু ইত্যাদি প্রত্যক্ষ কখনও বা অস্ত্ৰবৎ কখনও বা যন্ত্ৰবৎ হনন বেধন ছেদন কৰ্ত্তন চৰ্ৰণ ইত্যাদি বিভিন্ন কাৰ্য্য সম্পাদন কৰে। মশকেৰ অতি সূক্ষ্ম সূচি-সদৃশ শোণিত-শোষক বেধনিকাটি শল্য-চিৰিৎসকেৰ (Surgeon), “সীৰিঞ্জ” (Syringe) তুল্য একটি সূক্ষ্ম যন্ত্ৰ-বিশেষ। আনাদেৰ প্রাতিবেশী মূৰিকেৰ দন্তেৰ মতই মেক্ৰবৃত্ত সমীপস্থ হিন অকল নিবাসী বাঁধ এবং বিবৰাবাস নিৰ্মাণ-কুশল মহা-মূল্য-পশম-কক্কৰ বাঁধৰ (beaver) নামা উভয়েৰ প্রাণীটিৰ দন্তও একটি কোদালীৰং ধননাত্ৰ বিশেষ। তেমন পক্ষীৰ পক্ষ, মীনৰ পৃষ্ঠ, বৃগাদিৰ চৰণ প্রকৃতপক্ষে

উদ্ভূত সত্ত্ব ধাবন, অর্থাৎ বোম্ব হুল অথবা হুল পথে “পারিবহন” যন্ত্র বিশেষ। জীবজগতের এইসব দেহান্তর্গত প্রত্যয়ের কৃত্রিম বিন্দুরকর হইলেও ইহারা আসলে সমগ্র বহুবর্ষ-সাধক (multipurpose) দেহ-যন্ত্রটির অন্তর্ভুক্ত বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধক যন্ত্রাংশ মাত্র। পক্ষান্তরে মাহুষের দেহ-বাহির্ভূত প্রত্যয়গুলি (extra-corporeal implements) স্বাভাবিক জৈব প্রয়োজনের অতিরিক্ত বহির্বিষ উদ্দেশ্য সাধনেও সমর্থ।

অস্ত্রাস্ত্র প্রাণীর দেহান্তর্গত সহজাত অথবা প্রকৃতিজ, আদি মাহুষের দেহ-বাহির্ভূত স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম, এমন কি স্বজাতির উপর প্রয়োজ্য মারণাস্ত্র বাদ দিলে আধুনিক মাহুষেরও যাবতীয় উন্নত এবং কৃত্রিম, “অস্ত্র” এবং “যন্ত্রের” মৌলিক কোন পার্থক্য নাই। ইহাদের মূল উদ্দেশ্য একই। তাহা হইল জীবন ধারণে অথবা উন্নততর জীবন যাপনে সহায়তা। অস্ত্রাস্ত্র প্রাণীর অস্ত্র অথবা যন্ত্র তাহাদের প্রত্যঙ্গীভূত বলিয়া, এবং ফলে ইহাদের প্রয়োগের কেন্দ্র সীমিত বলিয়া, ইহারা বড় জোর জীবন ধারণেরই সহায়ক। এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত অভিযোজিত (adapted) না হইলে সেই সহায়তাও অপ্রভু। কিন্তু মাহুষের দেহাতিরিক্ত “অস্ত্র” অথবা “যন্ত্র” শুধু জীবন ধারণেরই, অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইতেই, সহায়ক নহে। সেই প্রয়োজন মিটাইয়া উন্নততর জীবন যাপনেও সহায়ক।

আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে “অস্ত্র” এবং “যন্ত্র” সমার্থবোধক হইলেও একথা উল্লেখ্য যে ইংরাজী “tool” অথবা “implement” শব্দের প্রকৃত অভিধেয় “অস্ত্র”ও নহে, “যন্ত্র”ও নহে, “হাতিয়ার” হইলেও হইতে পারে। হস্তে ধৃত যে বস্তু দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করা হয় তাহাকেই “tool”, “implement”, অথবা “হাতিয়ার” বলা যায়। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন “tool” শব্দ দ্বারা এবং পরবর্তী কালে কাল মার্কস “শ্রমসাধক যন্ত্রাদি (instruments of labour)” দ্বারা এই “হাতিয়ার” অথবা “যন্ত্রপাতি”ই বুঝাইয়াছেন। হাতিয়ার-এর মর্ম এই যে ইহা হাতের জোরকে অনেকখানি বাড়াইয়া দেয়। প্রসঙ্গতঃ শিশুপাঠ্য পুস্তকের “যাঁতা (যন্ত্র) ধোরে হাতের জোরে” এই ছড়াটি এবং তৎসংলগ্ন চিত্রটি স্মরণীয়। ইহাতে হাতের জোর এবং হাতিয়ার এই দুই-এর সম্পর্ক স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। হাতের জোর ব্যতীত হাতিয়ার অচল, হাতিয়ার-বিহীন হাতের জোর অপ্রভু। কাল মার্কস-এর মতে হাতের জোর এবং হাতিয়ার এই দুই এর মালিকানা যখন বিশিষ্ট হইয়া পড়ে তখনই সমাজে শ্রম-সর্গ (proletariat) “শ্রমিক” এবং ধন-সর্গ (capitalist) “মালিক” এই দুইটি প্রতিপক্ষ শ্রেণীর উদ্ভব হয়। কিন্তু সে অনেক পরবর্তী কালের ঘটনা। আপাততঃ আমরা আদি মাহুষের কথা ভাবিতেছি।



# ৰামমোহন ( দ্বি-শতবাৰ্ষিকী শ্রদ্ধাৰ্থ্য )

শান্তশীল দাশ

সে দিন কী অন্ধকাৰ এ প্ৰাচীৰ বুকৈ ;  
নানা কুসংস্কাৰে ঘেৰা হুবিৰ জীবন ;  
চলে না, আবদ্ধ সদা কুপেৰ ভিতৰ;  
গতিহীন সে-জীবন যেন কাৰাগাৰ ।

সেই অন্ধ কাৰাগাৰ ভেঙে দিহে তুমি  
নিহে এলে কী আলোক । হে ৰামমোহন,  
( সৰ্ব সংস্কাৰ মুক্ত প্ৰগল উদ্ধাৰ )  
ও বিদ্ৰোহী কৰ্ম্মপাৰ্শে হল অপগত  
অদ্বীৰ্ঘ দিনেৰ যত গ্ৰানিৰ কালিমা ;  
নিমেঘে নিঃশেষ হল আবৰ্জনা ৰাশি ।

পঙ্কিল পথল মাৰে নবজীবনেৰ  
শ্ৰোতোধাৰা এনে দিলে—সে কথা স্মৰণ  
কৰে জাগে কী বিশ্বয় । মহাশক্তিমান  
মুগ্ধকৰ হে মানব, তোমাৰ প্ৰণাম ।

## সনেট

ঐআন্তোৰ সান্যাল

যদোকত মধুৰত্ব সাধে নহে তুলনা তোমাৰ ।  
ভৰু হয় অৰ্ধপথে ফাল্গুনেৰ ফুলেৰ জোৱাৰ—  
সহস্ৰ কুহ্মশোভা সৰ্ব অঙ্গে নিহে আসো ছুমি  
যবে ঘোঁৰ পাশে । বস্তুকুৰুক তব পদ চুমি'  
পৰিহরি' ৰূপগৰ্ব নভাশিৰে মাগে পৰাজয় ;  
প্ৰগলভ প্ৰলাপ ভ্যাজি' গোলাপ কাতৰে কেঁদে কয়  
“ধন্ত তুমি ।” স্ফুটাবুক শৰভেৰ স্বৰ্ণাভ জুহমা,—  
ভাৱো সাধে মাৰাবিনী, নহে কভু তোমাৰ উপমা ।

লাভময়ী বৰবাৰ মজো অগ্নি নৰ্ম্মবৃত্তাপৰা,  
তুমি চিৰহান্তময়ী ললিত উত্তল কলঘৰা  
ফেলিকলাবিলাসিনী । লীলায়িত পুলক-প্ৰবাহ,  
তাই দিহে সহনীয় কৰিয়াহ অস্তিত্বের দাহ  
হুবিৰহ । অশীতল ধাৰা-দীৰে পৰিসিক্ত কৰি',  
হুলিয়াহ উজ্জীবিৰা জিৱমাণ এ চিত্ত-বল্লৰী ।



# ডাক ও সাড়া

ঐন্দ্রিলীপকুমার রায়

তোমাকে জানি না, ঘোঁষিনি নয়নে,

তবুও চেয়েছি শরণ চরণে ।

বেয়েছি তরণী বরিয়া অঁধারে

তোমারি তারকা অকুল পাখারে ।

উঠেছি চমকি' নিশীথে বেদনে—

গাঁহিলে প্রভাতী সুধলী ঘননে :

“কাঁহিলি কেমনে : তোমাকে জানি নি ?—

গানে যে গেয়েছে আমারি রাগিণী ।

ভালো যে বেলেছে সোনালি হরষে

পুলকে উহসে আমার পরশে ।

আমারি প্রসাদে প্রণয়-চুম্বনে

অধরা-হরাশা জাগে যে চেতনে ।

“আমারি লালিমা অরুণে উহলে,

আমারি স্নেহমা বিহালো কমলে ।

ধরণী শিহরে আমারি মলয়ে,

নীলিমা উজলে আমারি অভয়ে ।

আমারি করুণা—জাগরে স্বপনে,

বিবহে মিলনে জীবনে মরণে ।”

## অকাল ফাঙ্কন

ঐধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দোল এলো, আমাদের অকাল ফাঙ্কন,

রাঙিল না কুণ্ডলন দাড়িয়ে পলাশে,

হালিল না এ হৃদয়, বসন্ত-বাতাসে,

শুভ হরে গেছে আজ অনন্তের তৃণ ।

দূর হতে তবু শুনি কোকিলের গান,

কি যেন হারিয়ে গেছে কিরবে না আশ,

ফুলগন্ধ ভেসে আসে, আনে স্মৃতিভার,

—কত হাসি, কত অশ্রু, মান অস্তিত্বমান ।

প্রাণ ভরে কে ছড়াবে আবার কুহুম,

রক্তে রক্তে কোথা সেই পুলক-উজ্জ্বল ?

বিবশ, বিবর্ণ মন বিবর উদাস,

চোখে নাই সেই নেশা, গুঁঠে নাই চুম্ব ।

অঁধি-আগে নাই ভাসে নিত্যস্বপন,

দেখোঁছ একদিন অলীক স্বপন ।

# একুশ শতকের পৃথিবী

শ্রীসত্যোব কুমার দে

জগৎ নিত্য পরিবর্তনশীল। যুগে যুগে কত পরিবর্তন আসছে, পুরাতনের স্থান নতুন অধিকার করছে। অনাগত দিনে যে পরিবর্তন আসবে সে কি-রূপ নিয়ে আসবে, তা আমরা সাধারণ মানুষ জানতে পারি নে; কারণ জানবার মত মনীষা ও দিব্য দৃষ্টি আমাদের নেই। ২০ শতকে যে সব অত্যাশ্চর্য ও চমকপ্রদ আবিষ্কার হয়েছে, যে সব যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে, যে সব অজানাকে জানা গেছে, যে সব অধরা ধরা দিয়েছে; ১৯ শতকের লোক তার করুণাও করতে পারেন নি, বা করুণা করবার চেষ্টাও করে নি। কিন্তু আজ ২০ শতকের লোক আগামী ২১ শতকে যে সব ঘটনা ঘটতে পারে, যেসব নতুন আবিষ্কার মানুষকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে, তার করুণা করবার, হৃদয় পাবার চেষ্টা করছেন। তাঁদের এইসব ভবিষ্যদ্বাণী বোল আনা সফল হয়ত নাও হতে পারে, তবু তার একটা রূপরেখা তাঁরা হিঁচ করেছেন। একুশ শতকে, অর্থাৎ ২০০০ থেকে ২০২২ সালে পৃথিবীর অবস্থা কিরকম হবে, মানুষের সুখ-দুঃখ, আশ্রম ঐশ্বর্য কতটা বাড়বে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ কতটা ভেদিক দেখাবে, এখন থেকেই বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, অর্থনীতি-ও রাজনীতিবিদ এবং সমাজ-তাত্ত্বিকেরা তার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন। তাঁরা যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তার কিছুটা আভাস এখানে দেওয়া হচ্ছে। এইসব ভবিষ্যদ্বাণী তাঁরা আমাদের দেশের দৈবজ্ঞের মত ভণ্ড-সংহিতার সঙ্গে মিলিয়ে বা এহনকজ বিচার করে করেন নি। এই শতকের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা কোন পথে চলেছে, তার পরিণতি কি হতে পারে, তাই বিবেচনা করে, বিচার বুদ্ধি খাটিয়ে করেছেন; অর্থাৎ এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো হল তথ্য-ভিত্তিক।

তাঁরা একুশ শতকে ঘটবে বলে যতগুলো ভবিষ্যদ্বাণী ১৯৬৫ সালে করেছিলেন, তার মধ্যে কতগুলো এই শতকেই ঘটে গিয়েছে। এ-গুলির ইঙ্গিত তাঁরা কিছু কিছু পেয়েছিলেন; কিন্তু এত শীর্গগির যে এগুলো সাফল্যমণ্ডিত হবে তা ভাবতে পারেন নি। দু'একটির নাম এখানে করা যেতে পারে।

(১) তাঁরা বলেছিলেন কৃত্রিম প্রোটিন-যুক্ত খাদ্য একুশ শতকে ব্যবহৃত হবে। এরকম খাদ্য ইতিমধ্যেই কয়েকটা বেরিয়ে গিয়েছে। যেমন “কাকা”—পায়রা মটরে প্রোটিনযুক্ত করে এই খাদ্যটি তৈরি হয়েছে। এটি ইথিওপিয়ায় প্রচুর বিক্রি হয়; “আরলক”—আর একটি কৃত্রিম প্রোটিনযুক্ত খাদ্য। বাদাম ও সরতোলা হুখে ৪২% প্রোটিন যোগ করে এই খাদ্যটি তৈরি হয়েছে। এটি নাইজেরিয়ায় প্রচুর বিক্রি হয়; ‘L-Aubina’ এই রকম আরও একটি কৃত্রিম প্রোটিনযুক্ত খাদ্য। সমুদ্রের শেওলা থেকে কৃত্রিম উপায় হুখ তৈরি হচ্ছে, সয়াবিন থেকেও হুখ তৈরি হচ্ছে। আমাদের দেশে যে শুঁড়ো হুখ আমেরিকা থেকে আসছে সে সবই সমুদ্র শৈবালজাত কৃত্রিম হুখ। পেট্রলের মত অখাদ্য থেকে এখনও খাদ্য তৈরি হয় নি, তবে চেষ্টা চলছে।

(২) বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন একুশ শতকে মানুষ মঙ্গলে অবতরণ করবে। এটি এখনও সম্ভব হয়নি বটে; তবে এ বিষয়ে মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা বেশ খানিকটা সাক্ষ্য জমা করেছেন। মঙ্গলে মহাকাশবিহীন মহাকাশ-যান করেবার গিয়েছে এবং সেখান থেকে বায়বীয় পদ্ধতিতে আলোকচিত্র ও বহু অজানা তথ্য পৃথিবীতে এসে পৌঁছিয়েছে। শীর্গগির সেখানে লুনা গোধের মত বয়বান অবতরণ করে আরও নিহুঁপ তথ্য পৃথিবীকে

উপহার দেবে। আর মানুষের স-শরীরে মঙ্গলে অবতরণ এই শতাব্দীতেই সকল হবে বলে মনে হয়।

(৩) পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরে মহুতহীন গবেষণাগার স্থাপন হবে বলেছিলেন একুশ শতকে। এই বছরেই যে মাসে পৃথিবীর কক্ষপথে কসমোড্রোম বা মহাকাশ ভবন নামে এক সোভিয়েট বিজ্ঞান-গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। এই গবেষণাগারটিকে পৃথিবীর অভিকর্ষ থেকে বার করে ইচ্ছামত ওঠা-নামা করানোর এবং সেখান থেকে মানুষের গ্রহে গ্রহে ঘুরে বেড়ানোর ব্যবস্থাও সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের কায়দা। একদিকটি ভবিষ্যৎবাণী এ যুগেই ঘটে গিয়েছে।

একদল বিজ্ঞানী বলেছেন, একুশ শতকের মানুষ হবে বোলখানা বয়-নির্ভরশীল; ক্রেশ স্বীকার করতে তারা চাইবে না, স্বীকার করতেও হবে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞা এক মনোরম স্বপ্ন জগতের সৃষ্টি করবে। মানুষ পাবে অক্লান্ত অবকাশ, আরাম, বিলাস-দামগ্রী আর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য। জীবন উপভোগের চরম পর্যায়ে পৌঁছাবে। সারা বিশ্বে থাকবে না একজনও অক্ষর-পরিচয়হীন, অতৃপ্ত ও আশ্রয়হীন। জগৎটা হবে বোতাম-টেপা জগৎ; বোতাম টিপলেই সব পাওয়া যাবে হাতের কাছে। অর্থাৎ একুশ শতকের পৃথিবী হবে ডিজনিফিকড এক স্বপ্নজগৎ (Disney Land)।

আর একদল বিজ্ঞানী বলেছেন, ই)১, জগৎটা বোতাম টেপা জগৎ হবে বটে তবে সে-জগতের হুপ্রান্তে হুজনে বোতামে হাত দিয়ে বসে থাকবেন, যে কোন মুহূর্তে বোতাম টিপে ছুটি মহাদেশকে পঞ্চমাপু বোমার আঘাতে নিমেষে নিঃশেষ করে দিতে পারবেন। আর সেটা যদি নাই হয়, তাহলে আর একজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীর মতে পৃথিবীর জল ও বাতাস প্রতিদিন বেরকম বিপজ্জনক ভাবে হুমিত হয়ে উঠছে, তাতে একুশ শতকের শেষের দিকেই (যদি উপযুক্ত প্রতিবেদক ব্যবস্থা ইতিমধ্যে গ্রহণ করা না হয়) মানব জাতির বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা ৫০% কমে যাবে। একথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট নিকসনের বিষয়কর্ষের পরামর্শদাতা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী দানিয়েল জি মনিহাম। আর একজন

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বলেছেন বায়ুমণ্ডল যেভাবে হুমিত হচ্ছে তাতে মনে হয়, বাইশ শতকের পরে পৃথিবী দৃষ্ট মহাকাগতিক অজার-ভয়ের গোলকে পরিণত হয়ে নিম্প্রাণভাবে আপন অক্ষে আবর্তিত হতে থাকবে; অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীকে হত্যা করে (cosmicide) নিজেকে নিহত হবে। হয়ত এটা একটা নিছক আভিসংযোজিত, তাহলেও সত্য এর মধ্যে কিছুটা আছে অবশ্য।

এই দুই চরম মতের মাঝামাঝি আর একটা রূপ বিজ্ঞানীরা মানস চক্ষে দেখতে পেয়েছেন। সেই রূপটি এখানে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করছি। একথা সত্য যে, আগামী একশত বছরে জ্ঞানবিজ্ঞানে, বিশেষ করে প্রযুক্তি বিজ্ঞা, চিকিৎসাবিজ্ঞা, জীবনবিজ্ঞান, রসায়ন ও শারীরবৃত্তে পৃথিবী অদ্বুতপূর্ব উন্নতি করবে। কত অজানাকে জানবে আর তার ফলে মানুষের হৃৎকষ্ট অনেকটা প্রশমিত হবে। মানুষ দেবতা বা অদৃষ্টকে ভৎসনা না করে আপন ভাগ্যজয় করবার অধিকার পাবে। “বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার, সৃষ্টি তাহার খেলা” হবে।

মানুষ এখন যে-কাজ স্বয়ং সাহায্যে ৪১৫ ঘণ্টার করছে। একুশ শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞার অদ্বুতপূর্ব উন্নতির ফলে সেই কাজ এক ঘণ্টা বা তারও কমে করতে পারবে। ফলে শ্রমিকদের কলকারখানার ষাট্টিনির সময় অনেক কমে যাবে; অথচ পারিশ্রমিক কমবে না। বছরে ১৬০০-১৭০০ ঘণ্টার বেশী কাজ আর কাউকেই করতে হবে না; অর্থাৎ সপ্তাহে ৪ ঘণ্টা করে ৫ দিন কাজ করবে কিংবা ৬ ঘণ্টা করে ৩ দিন কাজ করবে—আর ছুটি পাবে সপ্তাহে ৪ দিন। এ ভবিষ্যৎবাণী করেছেন হাড্‌সন ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা পদার্থবিদ ডাঃ হারমান কন। অবশ্য পৃথিবীর সর্বত্রই এরকম অবস্থা হবে না। রাশিয়া, আমেরিকা ও যুরোপের অনেক দেশে এবং এশিয়ার জাপানে, যেখানে বিজ্ঞান সাধনার মানুষ সিজিলাভ করবে সবচেয়ে বেশী, সেইসব দেশেই এইরকম অবস্থা হবে। আমেরিকা ভারতের

মত দুটি-পাগল দেশ; হয়ত বা তাই এই প্রচুর অবসর সেখানে প্রচুর অশান্তি ডেকে আনবে।

ডাঃ কান একুশ শতকের আমেরিকার এক মনোরম চিত্র এঁকেছেন। বলেছেন, এই শতকে আমেরিকার বেশীর ভাগ লোক ১০ কামরাঙ্ক বাড়িতে বাস করবে। তাদের গ্যারেজে থাকবে তিনটা মোটর আর উঠানে থাকবে একটা হেলিকপটার। পাঁচ থেকে দশ শতাংশ লোকের আরকর বাদে বার্ষিক আয় হবে ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার ডলারের মধ্যে। কিন্তু এ লুখ সৌভাগ্য থেকে দেশের ২০%-২৫% লোক বঞ্চিত হওয়ার, তাদের মধ্যে জাগবে প্রবল অসন্তোষ। তা ছাড়া প্রচুর অবসর শ্রমিকদের জীবনে আনবে এক অবসাদ। তখন অপৰ্য্যাপ্ত অবসর কিভাবে কাটানো যাবে তাই নিয়ে হবে ভাবনা। গুণ হয়ে দোষ হবে বিজ্ঞার বিজ্ঞার। এই অপরিমেয় অবসর শ্রমিকরা কাটাবে কি করে? এর জন্তে নতুন নতুন বড় বড় কমপোজিট টেডিয়ম গড়ে উঠবে খেলা দেখার জন্তে, সিনেমা, থিয়েটার সঙ্গীতগৃহ, গল্ফ ও বেসবল খেলার মাঠও তৈরি হবে অনেক; কিন্তু সবাই ত একটা সীমা আছে। সীমা ছাড়িয়ে গেলে আর নতুন করে খেলার মাঠ, টেডিয়ম, প্রভৃতি তৈরি হবে না। তখন শ্রমিকরা অবসর বিনোদনের জন্তে প্রচুর পটরমাণে মের্ফাডিন, মারিজুয়ানা, হেরোরিন, এল. এস. ডি. (Lysergic acid diathalomide) প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে ত্রুয়ানন্দ উপভোগ করবে; অনেকে আবার বিটনিক, হিপি, মড ও রকরদের দলে ভিড়বে। শ্রমিক ভুলে যাবে, “বিশ্রাম কাজেরই অঙ্গ, এক সাথে গাঁথা, নয়নের অঙ্গ যেন নয়নের পাতা।”

এই শতাব্দীতে মানুষের দৈহিক ও ঐহিক লুপ্ত ও শ্রাম অনেক বেড়ে যাবে আর তার জন্তে মানুষকে কষ্ট স্বীকার হুর অন্নই করতে হবে। হাতের কাছে বোতাম টিপলেই অনেক আরামের ব্যবস্থা আপনা থেকেই হবে। এই বোতাম-টেপা আরাম অবস্তা যুরোপ আমেরিকার এখনি অনেকটা দেখা দিয়েছে। সেখানে

কোকের পরসা ফেললেই গরম চা, কফি এবং অত্যন্ত পানীয় আপনি এসে পড়ে, পছন্দমত ব্রেকফাস্ট, ডিনারও ফোকের পরসা ফেললেই হাতের কাছে পাওয়া যায়। বর্তমানের এই ব্যবহার আরও উন্নতি হবে। রান্নার ঘরে বোতাম টিপলেই ঠাণ্ডা বা গরম জলের স্প্রে সর্বাঙ্গ ঘুরে দেবে, টেলিফোন শাওয়ার ঘুসালে সাবানের স্প্রে সর্বাঙ্গ পরিষ্কার করে দেবে, ঘরাঘরি আর করতে হবে না। তারপর কষ্ট করে তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে হবে না, গরম বাতাস এসে গা ও মাথার চুল পরিপাটি করে শুকিয়ে দেবে এবং স্নানকার হলে পাউডার ও সেন্টও মাখিয়ে দেবে।

এই শতাব্দীতে লোকের আর্থিক সচ্ছলতা অনেক বেড়ে যাবে, তার সঙ্গে সংগতি রেখে পারিশ্রমিকের হারও বাড়বে; ফলে শ্রি, চাকর, বেয়্যারাকে মাইনে দিয়ে পুষবার ক্ষমতা বেশীর ভাগ লোকেরই থাকবে না। ভারতবর্ষ সমেত সমস্ত উন্নতিশীল দেশেও উচ্চ-মধ্যবিত্ত লোকদের চাকর, চাকরাণী রাখা সম্ভব হবে না। তা বলে গৃহস্থালীর কাজ ত উঠে যাবে না? তাই ঘরের গৃহিণীকে কাজকর্মে সাহায্য করবে কলের শ্রি (Robot maid)। এই কলের চাকরাণীর চেহারা হবে একটা বাজের মত; তার ওপর দিকে থাকবে একটা চোখ, (ম্যাজিক আই) আর চার পাশে থাকবে অনেক-গুলো হাত। সেই হাতগুলো দিয়ে কলের শ্রি ঘর ছয়োর পরিষ্কার করবে, বাসন মাজা, ঝাড়া-পোছা সব কাজ করবে।

আর্থিক সচ্ছলতা বাড়ার ফলে মেয়েরা হয়ে পড়বে অত্যন্ত বিলাসী ও সৌধিন। নিতানতুন বসনভূষণ ও সাজসজ্জা নিয়ে তারা মেতে থাকবে। ক্যাশিনহুস্ত মেয়েরা জ্যাক্ত জোনাকী পোকা দিয়ে খোঁপা সাজাবে। এক বিশেষ ধরণের ভেল দিয়ে খোঁপা বাঁধবে, আর তার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে জোনাকীগুলো খোঁপায় আশ্রয় নিয়ে জলতে নিভতে থাকবে। এ হবে এক সহজ দৃষ্টি-আকর্ষক ক্যাশন।

এরূপে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গ্রাণ-রসায়ন বিজ্ঞানের

(বারোকেনিটি) প্রভূত উন্নতি হবে। তার কলে শরীরের নানা ঝুঁত সারিয়ে নেওয়া যাবে। বয়সের প্রভাবে যুথের চামড়া কুঁচকে গেলে, কপালে রেখা পড়লে, বাচ্চাদের রং ময়লা হলে ডাক্তারখানার বেলেই, ডাক্তারবাবু যুথের চামড়া চীনচীন করে দেবেন, খাঁজ-গুলো সিলিকন-অনু দিয়ে ভরাট করে দেবেন, কালোকে কসাঁ করে দেবেন; তা ছাড়া খাঁদা নাককে টিকলো, কুলোর মত কানকে কেটে ছোটো, আর চোখ ছোটোকে একটু চানচান আঁর ভাসাভাসা করে দিতেও পারবেন। শরীরের অনাবশ্যক বেদ কমিয়ে স্লিম কিপার করা, সে আর এমন কি শক্ত কাজ।

বারোলজিক্যাল ইন্জিনিয়ারিং শাস্ত্রের অসাধারণ উন্নতি হবে। কলে তখন কারও ছুৎপিণ্ড, কুসকুস, বহুৎ, প্রীহা, পিত্তকোষ, বৃশ্চাশর প্রভৃতি দেহের অতি প্রয়োজনীয় কোন প্রত্যঙ্গ যোগদুট বা জীর্ণ হলে, প্রাসটিকের এই সব দেহযন্ত্র লাগিয়ে দিয়ে যদি মেয়ামত করার মত মানুষকে ত্রুহ ও সবল করে তোলা যাবে।

নির্ভুত ক্রিয়ম Enzyme (বিভিন্ন জীবধর্মী হজ্বাকের দেহকোষ থেকে নিঃসৃত জৈব পদার্থ বিশেষ) বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি করতে পারবেন। দেহকোষে এই ক্রিয়ম এনজাইম প্রবেশ করিয়ে মানুষ বাতে চট করে করার হাতে ধরা না পড়ে অর্থাৎ বাধঁক্য বিলম্বিত করে বুড়োদের যৌবন কিরিয়ে আনার ব্যবহা পাকা হয়ে যাবে। বাধঁক্যে কর্মকমতা কমে যায় কিন্তু একেবারে নষ্ট হয় না। এই করিহু কমতাকে বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করা হবে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহ ক্রমশ ছোট হতে আরম্ভ করে—জীবকোষের সংখ্যা কমতে থাকে। মস্তিষ্কের আকার ও ওজনও কমতে থাকে। ৭৫ বছর বয়সে আদিম মস্তিষ্কের ওজন শতকরা ৫৬ ভাগ অবশিষ্ট থাকে। মানুষ হ তাহে বৃদ্ধ হয়। প্রাইমারি এজিং (বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে বাধঁক্য আসে) এবং সেকেন্ডারি এজিং (অল্প-বিস্ত্রের কলে যে অকাল বাধঁক্য এসে উপািস্ত হয়)। প্রাইমারি এজিং একুশ শতকে বহল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হবে। আর সেকেন্ডারি এজিং কুড়ি শতকের শেষেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে।

হাতের কি পায়ের হু-একটা আঙুল যদি কেটে যায় বা না জন্মায়, কান যদি ছোটো বদলে একটা হয়, দাঁত পড়ে গেলে, কর্পটাহ কেটে গেলে এই প্রত্যঙ্গগুলো নতুন করে জন্মানোর ব্যবহা করা হবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটা ২০০৭ সালেই সম্ভব হবে। ২০১২ সালের মধ্যে মানুষের বুদ্ধিশক্তি বাড়ানোর ওষুধ আবিষ্কৃত হবে। ২০২০ সালে মানুষের মস্তিষ্কে কমপিউটার সংযুক্ত করে বুদ্ধিশক্তি আরও বাড়ানোর ব্যবহা হবে।

শত শত বৎসরে মানুষের প্রজনন পরিবর্তন অতি অল্প মাত্রায় দেখা দেয়, কাজেই এরকম কোন পরিবর্তন একুশ শতকে ত দেখা যাবেই না, তার পরেও কয়েক শতাব্দীতে বোধ হয় দেখা যাবে না। (James F. Crow—Mechanism and Trends in Human Evolution দ্রষ্টব্য।)

একুশ শতক D N A যুগে রূপান্তরিত হবে। ভারত-গৌরব ডাঃ হরগোবিন্দ খোঁসানা হলেন এই বিশ্লেষণমূলক নব জীববিজ্ঞানের উদ্গাতা। বংশধারার মূল উৎপাদন জীন (Gene) ডি. এন. এ. (ডি-অজি-র-ইন-উট্রিক এসিড) ও আর. এন. এ. (রিবো-ইন-উট্রিক এসিড) এই দুই অণুর সমন্বয়। ডি. এন. এ.-র মধ্যে থাকে দেহ গঠনের সংকেত এবং আর. এন. এ. যোগসূত্র হিগেবে কাজ করে। ডাঃ খোঁসানার নেতৃত্বে উইসকিনসন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা সাধারণ রাগারানিক পদার্থের পরমাণু থেকে ক্রিয়ম উপায়ে জীন সৃষ্টি করেছেন। এই যুগান্তকারী সৃষ্টির কলে, মানুষের জৈবিক গঠনের পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। জন্ম সংকেতের (জেনেটিক কোড) সঠিক পাঠোদ্ধার হবে; ইপানি, ক্ষয়রোগ, বর্ণান্ধতা, মাথার টাঁক প্রভৃতি বংশগত ব্যাধি, প্রজননগত ত্রু বা বিকলাঙ্গতা দূর করা সম্ভব হবে এবং জন্মসূত্রও নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হবে। গবেষণাগারে মানবীয় জীন এখনও তৈরি করা যায় নি—একুশ শতকে তা সম্ভব হবে।

ডি.এ. ও ডি.এ. নিয়ে বিজ্ঞানীরা টেস্টটিউবে তাদের ঐলন সাধন করতে পেরেছেন, কিন্তু এখনও নির্দিষ্ট

(fertilize) কৰতে পাৰিহেন না—একুশ শতকে তা সম্ভব হ'বে এবং তাৰ কলে সত্যিকাকৈ টেস্টিটলিৰ বোবি তৈৰি হ'বে; তৰে কৃত্ৰিম ডিম্ব ও শুক্ৰ তৈৰি কৰা সম্ভব হ'বে কি না তা এখনও জানা যাচ্ছে না।

একুশ শতকৰ পৃথিবীতে অনেক সামাজিক পৰিবৰ্তন দেখা দেবে। য়ুৰোপ আমেৰিকায় মধ্য-যুগৰ ভাৱতবৰ্ণেৰ মত বালাবিবাহ প্ৰচলিত হ'বে। আমেৰিকায় এখন আমাদেৱ দেশেৰ চেয়ে কম বয়সে হেলেমেয়েদেৱ বিবাহ আৰম্ভ হৈছে। সব দেশেই বিবাহ বিলম্বিত হয় দাৰিদ্ৰ্যৰ জন্তে। দেশে আৰ্থিক সমৃদ্ধতা এলে বিবাহ ডাঙাডাঙি হয়। ঘৰ-গৃহস্থালীৰ কাজে আগামী যুগে য়ুৰোপ আমেৰিকায় স্বামীৰ স্ত্ৰীদেৱ অধিকতৰভাবে সাহায্য কৰবে। শিশুকে খাওৱানো, ধোৱানো ও তাদেৱ দেখাশুনাৰ ভাৱ স্বামীৰা বোচ্ছাৱ নিজেদেৱ হাতে তুলে নেবে।

মানুহেৰ মন অধিকতৰ যুক্তিবাদী হৈ উঠবে। তাই আগামী শতকে আমাদেৱ দেশে ও ঠিকুজি-কুঠিৰ বদলে পাত্ৰ-পাত্ৰীৰ ৰক্ত, শৰীৰাণু (ক্ৰোমোসোম) পৰীক্ষা কৰে অভিভাবকেৰা বিয়েৰ বাবস্থা কৰবেন। তৰে ব্যতিক্ৰম যে থাকবে না, তা নয়। প্ৰেমেৰ দুপাৰ শক্তিৰ কাছে মাথা নিচু কৰে, বাধা নিবেধ না মেনে যাৰা বিবাহ কৰে সম্ভান-স্বৰ্ণে বঞ্চিত হ'বে তাদেৱ জন্তে এ-যুগেৰ ব্ৰাড ব্যাংকেৰ মত শুক্ৰ ও ডিম্বৰ ব্যাংক (স্পাৰ্ম এণ্ড এগ্ ব্যাংক) স্থাপিত হ'বে। সেখান থেকে সম্ভানকামীৰা শুক্ৰ বা ডিম্ব কিলে এনে সম্ভানেৰ যুগ দেখবেন।

বিবাহে জাতি-ধৰ্ম ও বৰ্ণ-বৈষম্য লোপ পাবে। আমাদেৱ দেশেও অসবৰ্ণ বিবাহটাই হ'বে নিয়ম, সবৰ্ণ বিবাহ ব্যতিক্ৰম। আন্তঃ-প্ৰাদেশিক বিবাহেৰ সংখ্যা বেড়ে যাবে।

নব জাতকেৰ জন্মেৰ সঙ্গে সঙ্গে জননীৰ বৃত্ত্য হলে তাকে শুভদানে লালন কৰা খুব কষ্টকৰ হৈ ওঠে, তাই তাৰ জন্তে শুভদায়িনী ধাত্ৰী (ওয়েট নাস') রাখতে হয়। একুশ শতকে এ অল্পবিধে দূৰ হ'বে। কৃত্ৰিম শুভদান পদ্ধতি আবিষ্কৃত হ'বে।

ধনী ও স্তম্ভনী গৃহীণীৰা নিজেৰা গৰ্ভধাৰণেৰ স্বামেলা না নিয়ে গৰ্ভস্থ জ্ঞপকে পৰিচাৰিকায় গৰ্ভে স্থানান্তৰিত কৰে সম্ভানেৰ মা হবেন; অৰ্থাৎ বিজ্ঞানী J. B. S. Haldane যে Ectogenetic child-এৰ কল্পনা কৰিছিলে, তা সফল হ'বে। এটাই এ যুগেৰ ট্যাটাল সিঞ্চল হৈ উঠবে।

ইচ্ছামত পুত্ৰ বা কন্তা সম্ভান প্ৰজননেৰ প্ৰচেষ্টা সফল হ'বে। সম্ভ্ৰতি জানা গিয়েছে যে, Y-chromosome (শৰীৰাণু) নিষিক্ত ডিম্বকে (ovum) পুত্ৰ সম্ভানে পৰিণত কৰে, আৰ এৰ অভাব হলে (অৰ্থাৎ X-chromosome থাকলে) কন্তা সম্ভান হয়। এ-যুগে মানুহ ইচ্ছামত X-বা Y-ক্ৰোমোসোম নিষিক্ত ডিম্বৰ সঙ্গে মিলন ঘটাই ইচ্ছামত পুত্ৰ বা কন্তা সম্ভান লাভ কৰবে। যদি Y-ক্ৰোমোসোমেৰ নিতান্তই অভাব হয়, তা হলে গৰ্ভবতী স্ত্ৰীলোককে “androgen” ইনজেকশন কৰে কন্তা সম্ভানেকে পুত্ৰ সম্ভানে পৰিবাৰিত কৰবাৰ চেষ্টা হ'বে। এই এণ্ড্ৰজেন পুত্ৰবেৰ অণুকোষ থেকে নিৰ্গত হৈ জ্ঞপেৰ অন্তঃ-পুত্ৰবাক বিকাশে সহায়তা কৰে এবং পৰে বাহিঃ-পুত্ৰবাককে পূৰ্ণ প্ৰকাশ কৰে। এ প্ৰচেষ্টা primates অৰ্থাৎ বানৰ, লেমুৰ প্ৰভৃতি প্ৰাণীৰ ওপৰ পৰীক্ষা কৰে খানিকটা সফল হওয়া গেলেও, মানুহেৰ বেলায় এখনও পৰ্বত সফল হওয়া সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানীৰা আশা কৰেৰ একুশ শতকে এটা সম্ভব হ'বে। (Hormones in the Development of Sex Differences by William Young, Robert Goy and Charles Phoenix in Science, 143 (1964), 212-218 দ্ৰষ্টব্য।)

হৰেক বকমেৰ ফলপ্ৰসু গৰ্ভনিৰোধক বটিকা আবিষ্কৃত হ'বে এবং তাৰ ব্যবহাৰও হ'বে ব্যাপকভাবে। কুমাৰীৰা চায়েৰ সঙ্গে নিৰ্মমিত হ'বেলা এই বটিকা সেবন কৰে অবাঞ্ছিত মাতৃভেৰ হাত থেকে ৰক্ষা পাবে—আৰ তাদেৰ গাইতে হ'বে না, “তোমাৰ আকাশে এসোঁহু হায় আমি কলঙ্কী চাঁদ।”

জীৱবিজ্ঞানেৰ ক্ষেত্ৰে নতুন ও বিস্ময়কৰ পদক্ষেপ

দেখা দেবে এ সুপে। ডাঃ জ্যানিয়েরী বলেছেন: দরজার দোকানে ইচ্ছামত মাণ ও আকৃতির পোশাক তৈরির মত একুশ শতকে মানুষ নির্দিষ্ট নকশা অনুযায়ী সজ্জাপারী জীবন সৃষ্টি করতে পারবে।

মানুষের আয়ু এখন থেকেই বাড়তে আরম্ভ করেছে। আমেরিকায় ১৮৪০ সালে মানুষের গড়পড়তা আয়ু ছিল ৪০ বছর; ১৯০০ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৪৭ বছর। তারপর ১৯৩০ সালে হঠাৎ একেবারে হল ৬০ বছর; ১৯৫০ সালে আরও বেড়ে গিয়ে হল ৬৮ বছর। ১৯৭০ সালে মনে হয় আরও কিছু বেড়েছে। ১৯৫০ সালে আমেরিকার ৬৫ বছরের বৃদ্ধের সংখ্যা ছিল এক কোটি; আর ১৯৬০ সালে ৭৫ বছরের বৃদ্ধের সংখ্যা ছিল ৯০ লক্ষ। মানুষের আয়ুর ক্রমবর্ধমান উৎসর্গিত দেখে মনে হয়, আগামী শতকে গড়পড়তা আয়ু আরও বেড়ে যাবে; কাজেই তখন বৃদ্ধের সংখ্যা হবে অনেক বেশী। এই বৃদ্ধোদের নিয়ে তখন হবে সমস্ত। তাদের কাজ করবার সামর্থ্য নেই, কৃষিরোজ্জগার নেই; কিন্তু মাথা ঠুঁকবার ঠাই, আর পেট চালানোর ভাবনা থেকেই যাবে। যারা পেনশন পায়, বা কিছু জমাতে পেরেছে তাদের জন্য যুরোপ-আমেরিকায় আছে ওল্ড-এজ হাউস এবং গোলডেন এজ ক্লাব। বৃদ্ধারা ওদেশে-অবহেলিত। ওল্ড-এজ হাউসে তারা আত্মীয় স্বজন পরিত্যক্ত অবস্থায় নিরাসক্ত জীবন যাপন করে, নিম্প্রভ চোখে চেয়ে থাকে নাতি-নাতনীদেব আগমনের প্রতীক্ষায়। ন্যমাসে হ'মাসে হরত হেলে নাতি-নাতনীরা একবার খোঁজ নিতে আসে। হরত আসে না; কাজেই অতীত দিনের স্মৃতির রোমন্থন করে দিন কাটাতে হয়। অনেকে তাই বন্ধুদের প্রয়োজনে বৃদ্ধো বয়সে নতুন করে বিয়ে করে। আধুনিক আপানেও বৃদ্ধ জনক-জননীরা আর বড় পাতা পান না। আমাদের দেশেও একুশ শতকে এইরকম অবস্থা হবে। বোধ পরিবার এদেশে অনেক কাল আগেই ভেঙ্গে গিয়েছে; কিন্তু এখনও হেলেরা বাপ-মা নিয়ে একত্রে বাস করছে। আগামী শতকে অবস্থা আর এমনটি থাকবে না। তখন ব্যক্তি-ব্যক্ত্য বেড়ে যাবে অনেক, হেলেনেদের

ওপর বাপ-মার কোন কর্তৃত্বই থাকবে না। হেলেরা রোজগার করতে শিখলেই আলাদা হয়ে যাবে, আর বাপ-মা চলে যাবে ওল্ড-এজ হাউসে। যে বাপ-মায়ের হাউসের খরচ যোগাড় করা সম্ভব হবে না, তাদের নির্ভর করতে হবে সাধারণের দয়ার ওপর। আমাদের সুপে তরুণদের নিয়ে যেমন সমস্তা হয়েছে, আগামী সুপে তেমন হবে বৃদ্ধোদের নিয়ে।

একুশ শতকের পৃথিবীতে রাজনৈতিক রূপেরও অনেক পরিবর্তন হবে। আজ যাঁরা মহাশক্তিধর দেশ, আগামী শতকে তাঁরা সকলেই সেরকম নাও থাকতে পারেন এবং তাঁদের শত্রুহান আজকের দিনের অনেক নগণ্য শক্তি পূর্ণ করতে পারেন।

বিশ শতকে দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই আমেরিকা, যুরোপের বিভিন্ন দেশ, যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, স্পেন, ইটালি প্রভৃতি দেশের প্রভাব ক্ষয় করে পৃথিবীর সর্গাণেকা শক্তিশালী দেশ (সুপার পাওয়ার) হয়ে উঠেছে—সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, ললিত কলায়, ব্যবসায় বাণিজ্যে সর্ব বিধে সে অগ্রণী। প্রাচীন এথেন্সের মত “উর্ধ্ব” ছিল বৈজয়ন্তী উন্নত রাশি শির” কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মধ্যমাণ হয়েছিল আমেরিকা। তাই তখন পৃথিবীর মেধাবী ছাত্রেরা, গুণী ও জ্ঞানীজনরা সেখানে গিয়ে সমবেত হচ্ছেন। যে সুযোগ, সুবিধে ও সম্মান তাঁরা পাচ্ছেন, তা ছেড়ে তাঁদের আর স্বদেশে কিরে আসা সম্ভব হচ্ছে না। আমেরিকায় এই প্রভাব ও প্রতিপত্তি একুশ শতকে আর থাকবে বলে মনে হয় না। তার এই স্থান এশিয়ার চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকায় ব্রাজিল আর পূর্ব-যুরোপের সোভিয়েট রাশিয়া অধিকার করে বসবে। অল্প সময়ের মধ্যে মহাচীন যে অর্থ-নৈতিক শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত করেছে তা শুধু পারি-সংখ্যানের দিক দিয়ে বিশ্বরকর নয়, কৃতিত্বের দিক থেকেও অভাবনীয়। (Samuel P. Huntington—Changing Patterns of Military Politics দ্রষ্টব্য।।)

চীন ও আমেরিকার মধ্যে সম্বন্ধ তীব্র বিরোধ অথবা মিথিড় বন্ধুত্ব পরিণত হতে পারে। শেবোক্ত পক্ষ-

গতিটাই বেশী সম্ভব বলে মনে হয়। চতুৰ চীন মনে হয়, ভবিষ্যতে তাৰ অগণিত নৱনাৱীৰ বৃদ্ধি নিৰসনেৰ জন্তে আমেৰিকাৰ কাহে খাতিৰ ও আৰ্থিক সাহায্যেৰ আশাৰ আপন উগ্র মতবাদ ও জেহাদি জিগৰকে কিছুটা প্রশমিত কৰবে। আৰ একটা কাৰণ হল, প্ৰতিবেশী মহাশক্তিধৰ সোভিয়েট ৰাশিয়াৰ হাতৰে তাকে আত্মৰক্ষা কৰতে হ'বে; তাই আমেৰিকাৰ দিকে চলে পড়া ছাড়া উপায় নেই। আমেৰিকাৰ কাহে শক্তিশালী ৰাশিয়াৰ চেয়ে শক্তিশালী চীন কম ভয়ের কাৰণ। চীন শক্তিশালী হলে সারা এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তাৰ কৰতে পাৰে; কিন্তু ৰাশিয়াৰ শক্তিবৃদ্ধি হলে, তাৰ প্ৰভাৱ সমস্ত যুৰোপেৰ ওপৰ এসে পড়তে বাধ্য—ফলে শক্তিসাম্য নষ্ট হয়ে আমেৰিকাৰ প্ৰভাৱ যাবে কমে।

একুশ শতকেৰ গোড়ালি দিকে বিশাল চীন ভূখণ্ডেৰ একাংশে দীৰ্ঘকাল ব্যাপী ছুৰ্ভিক চলতে থাকবে। তাৰ ফলে দেশে অশান্তি, অসন্তোষ, বিক্ষোভ দেখা দিতে পাৰে, কিছু কিছু হিংসাশ্ৰয়ী ঘটনা ঘটবে ও অৰাজকতা দেখা দেবে। সেই স্তৰোণে সোভিয়েট ৰাশিয়া চীন সীমান্তেৰ কিছু অংশ, বিশেষ কৰে মাঞ্চুৰিয়া প্ৰদেশ অধিকাৰ কৰে নেবে; কিন্তু তা বেশী দিন দখলে ৰাখা সম্ভব হ'বে না। মাঞ্চুৰিয়াৰ ওপৰ ৰাশিয়াৰ বহুখুটি কিছুটা শিথিল হয়ে পড়বে; কিন্তু চীনেৰও এই প্ৰদেশ পুৰোপুৰি পুনৰুদ্ধাৰ কৰা সম্ভব হ'বে না; ফলে মাঞ্চুৰিয়া এক আধা-স্বাধীন প্ৰদেশ বলে গণ্য হ'বে এবং চীন ও ৰাশিয়া উভয়েই এৰ ওপৰ খানিকটা কৰ্তৃত্ব কৰবে।

ব্ৰেজিল ও মেক্সিকো প্ৰভাৱশালী ৰাষ্ট্ৰ হয়ে উঠবে এবং হয় ব্ৰেজিল নয় মেক্সিকো ল্যাটিন আমেৰিকাৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰবে। এই শতকে যুক্তৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকাৰ ইটি নতুন অঙ্গ-ৰাজ্য সংযুক্ত হ'বে। ১১তম ৰাষ্ট্ৰটি হ'বে পিউৰ্তোৰিকো, আৰ ১২তম অঙ্গ-ৰাজ্যটি হ'বে প্ৰশান্ত সাগৰেৰ কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে।

সমাজে শ্ৰমিক-কৃষক, সৈন্তদল ও মধ্যবিত্ত সম্ভ্ৰমণেৰ মধ্যে এক ত্ৰিৰূপী বিবাদ প্ৰায় সব সময় চলতে দেখা

যায়। শ্ৰমিক ও কৃষকেৰ ভোট আছে, সৈন্তদলেৰ অস্ত্ৰ আছে আৰ মধ্যবিত্তেৰ আছে বুদ্ধি। এদেৰ মধ্যে যে কোন দুয়েৰ সঙ্গে মিতাৰি কৰে দেশেৰ সরকার কিছু দিনেৰ জন্তে চালানো যায়; কিন্তু চিৰদিনেৰ সরকার চালাতে হলে, শ্ৰমিক ও কৃষকেৰ সঙ্গে আপোষ কৰতেই হ'বে। তাই মনে হয় একুশ শতকে এবং তাৰ পৰেও পৃথিৱীৰ সৰ্বত্র শ্ৰমিক-ৰাজ প্ৰতিষ্ঠিত হ'বে। ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্ৰিক ৰাজতন্ত্ৰ আৰ থাকবে না, পূৰ্ণ-গণতন্ত্ৰ স্থাপিত হ'বে। যুৰোপ ও এশিয়াতেও কোথাও আৰ ৰাজতন্ত্ৰ দেখা যাবে না।

সামাজিক ও ৰাজনৈতিক পৰিবৰ্তনেৰ সঙ্গে সঙ্গে আসবে কিছু কিছু অৰ্থ-নৈতিক পৰিবৰ্তন। পাৰিশ্ৰমিকেৰ হাৰ অত্যন্ত বেড়ে যাবে; ফলে মধ্যবিত্ত লোকেৰ পক্ষে বাড়িঘৰ মেৰামত কৰে ওঠা সম্ভব হ'বে না—নতুন কৰে বাড়িঘৰ তৈৰী কৰা ত দূৰহান। শ্ৰমিক-দেৰ অৰ্থ-নৈতিক অবস্থাৰ অনেক উন্নতি হ'বে; কিন্তু তবু তাৰা সম্ভষ্ট থাকবে না, আৰও পাৰিশ্ৰমিক বাড়ানোৰ জন্তে আন্দোলন কৰতে থাকবে। ষ্ট্ৰাইক, বন্ধ, খেৰাও, ধৰণা, নিয়ম মাফিক কাজ, প্ৰতিবাদ, আভয়ান, মহতী-সভা ঐক্যলোৰ কোনটাই কমবে না, বৰং বেড়ে যাবে। ধনী ও দৰিদ্ৰদেৰ মধ্যে পাৰ্থক্য এখনকাৰ মতই বাড়ন্তে থাকবে; অৰ্থাৎ ধনী আৰও ধনী হ'বে, তবে দৰিদ্ৰেৰ অবস্থাৰ অনেক উন্নতি হ'লেও, ধনীৰ অনেক পিছনেই তাকে থাকতে হ'বে।

আৰ্থিক দিক দিহে একুশ শতকেৰ পৃথিৱীৰ চেহাৰা হ'বে যেন এক বৃহৎ সম্ভলতা ও সমৃদ্ধিৰ দ্বীপ, আৰ তাকে ঘিৰে থাকবে অভাৱ, অনটন ও দাৰিদ্ৰ্য। তবু সামাজিকভাবে বিশ শতকেৰ দৰিদ্ৰ দেশগুলোৰ চেয়ে একুশ শতকেৰ দৰিদ্ৰ দেশগুলোৰ জীৱনযাত্ৰাৰ মান হ'বে অনেকটা উন্নত ধৰণেৰ; অনেক সুখ, সুবিধে ও স্বাচ্ছন্দ্য তাৰা ভোগ কৰবে বা বিশ শতকেৰ দৰিদ্ৰেৰা কল্পনাও কৰতে পাৰবে না।

সম্পত্তি কৰ ও বৃত্ত্য কৰ ৮০%—৯০% হ'বে যাৰ ফলে বেয় কৰ বাদ দিহে উত্তৰাধিকাৰীদেৰ হাতে পুৰ বেশী



টাকা আসবে না। করের বোঝা বড়লোকেরই ওপর বেশী চাপবে।

জনসাধারণ এক জায়গার স্থায়ীভাবে বাস করতে চাইবে না; কলিকাতাগীরের ভুলে তাদের শহর থেকে শহরান্তরে হোটেলটি করতে হবে। ৮০%-১০% গ্রাম ও শহরতলীর লোকদের শহরে এসে বাস করবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে দেখা দেবে; যদিও সে-সুগে শহরতলী ও গ্রামে পৌর ব্যবস্থা অনেক ভাল হবে, আরাম ও সুখ স্বাস্থ্যের বিশেষ অভাব হবে না, তবু জনাকীর্ণ শহরে ঠাসাঠাসি করে থাকতে অর্থাৎ শহরে হওয়ার ইচ্ছেটা মানুষের খুব বেড়ে যাবে। তাই ইচ্ছে পূরণের জন্য একুশ শতকের গোড়ার দিকেই আমেরিকায় তিনটি বিপুলায়তন মহানগরী স্থাপিত হবে।

প্রথম মহানগরীটি বর্তমানের ওয়াশিংটন থেকে বোষ্টন পর্যন্ত বিস্তারিত হবে এবং সেখানে বাস করবে ৮ কোটি লোক। দ্বিতীয় শহরটি বর্তমানের শিকাগো থেকে পিটসবার্গ পর্যন্ত প্রসারিত হবে, পরে এই শহরটি আরও বিস্তৃতিলাভ করবে। তৃত্যে যাওয়া লেক মাইর ও আবর্জনাপূর্ণ লেক মিশিগান ও লেক অনটারিও ভরাট করে শহরটি কানাডা পর্যন্ত প্রসারিত হবে। এখানকার লোকসংখ্যা হবে ৪ কোটি। আর তৃতীয় শহরটি হবে অপেক্ষাকৃত ছোট। এটি সাত্তা বারবারাস থেকে লানডিগো পর্যন্ত প্রসারিত হবে। এখানকার লোকসংখ্যা হবে ২ কোটি। এই সব বিপুলায়তন শহরগুলোতে বিদ্যুৎ, জলসরবরাহ, স্বাস্থ্য ও পৌর সুখ সুবিধা বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। শহরে বাস করার প্রয়াসটো বেড়ে যাওয়ার ফলে, কম খরচার এবং জাড়াভাড়া ভৈরি করা যায় এমন বাড়ির (Pre-fabricated) সংখ্যা বেড়ে যাবে, আর বাড়িবে বহুতল বিশিষ্ট বাড়ি। উলগওয়ার্থ, এমপায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর মতন অট্টালিকার রূপে আমেরিকা ছেয়ে যাবে (The Next Thirty Years: A Framework for Speculation ট্রটব্য!)

বিশ শতকে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বেরকম বিস্তৃতি লাভ করেছে, বিগত তিন চার হাজার বছরের কোন

শতকে তেমনটি দেখা যায় নি। এই শতকে মানুষ মনে করেছিল, আকাশে ও ভূতলে বা কিছু অজানা ছিল, সব জেনে ফেলেছে, আর কিছু জানবার নেই; কিন্তু না, বিজ্ঞানীরা বলছেন, একুশ শতকে তাঁরা আরও নতুন নতুন আবিষ্কারের পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলবেন। তাঁরা বলছেন, কম পক্ষে একশটি চমকপ্রদ নতুন আবিষ্কারের কথা পৃথিবীর লোক জানতে পারবে। এই একশটি নতুন আবিষ্কারের মধ্যে থেকে বেছে বেছে গুটি কতক নতুন আবিষ্কারের কথা এখানে বলা হচ্ছে।

১) এ-সুগের টেরিসলিনের মত একুশ শতকে কার্গন্ডের জামা কাপড়ের বিশেষ প্রচলন হবে।

২) পরিবহন রকেটের সাহায্যে পৃথিবীর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মানুষ ও মালপত্র পাঠাবার ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ নিরাপদ করে ফেলা হবে। আটলান্টিক পারাপারে এখন শব্দের চেয়ে ক্ষতগামী আকাশযানে সময় লাগে ২।৩ ঘণ্টা; তখন লাগবে ২০।৩০ মিনিট। বৃহদাকারের তেলিকপটার এক এক বারে একশ' থেকে দেড়শ' হাজী নিয়ে যেতে পারবে; আর হাজার থেকে হু হাজার যাত্রীবাহী জেট বিমানও ভৈরি হবে।

৩) জ্বালানীর সুখা ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার ফলে উন্নত দেশগুলিতে করলা ও তেলের পরিবর্তে পরমানবিক জ্বালানী প্রবর্তিত হবে; আর তার ফলে বাতাসে কার্বন ডায়অক্সাইডের পরিমাণ কিছুটা কমবে।

৪) এখনকার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভরশীল এবং অনেক দিন আগে থেকে (হু মাস) আব-হাওয়ার পূর্বাভাস নির্ভুলভাবে দেওয়া সম্ভব হবে।

৫) সাময়িক সুবিধের লগ্নে কৃত্রিম বড়, ঝড় ও বৃষ্টিপাত করা সম্ভব হবে।

৬) আকাশ, বাতাস ও পৃথিবীর জলাধারগুলির মালিন্য মুক্ত করবার ও খোয়াসা দূর করবার প্রয়াস অনেকটা সফল্য মণ্ডিত হবে। আঞ্চলিক আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতকটা সফল হবে।

৭) ক্রান্তি, অবসাদ, ক্ষোভ, শোক ও হুঃখ দূর করবার মত কার্যকারী ওষুধ আবিষ্কৃত হবে। প্রায় লাখবের লগ্নে নানা রকম আবিষ্কৃত হবে।

৮) মানুষের নিজা কাজের চাপে, উদ্বেগ ও উৎকর্ষের ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে, অথচ নিজের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তাই নিজাকর্ষণের জন্তে নির্দোষ ওষু ও বিহুত চালিত শয্যা তৈরি হবে। শয্যার বৃহৎ কম্পনে চোখে “আরেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দ্বিরে” যাবে। তা ছাড়াও সাপ ও বেঙের মত দয়কার হলে মানুষ যাতে অনেক দিন যুগ্ম অবস্থায় (হিবারনেশন) থাকতে পারে তার উপায় বার হবে। বিশেষ বিশেষ যোগে এর প্রয়োজন আছে।

৯) বিবাক্ত জীবাবুঝিত ও স্পর্শক্রমিক অনেক রোগের অব্যর্থ প্রতিসেধক বার হবে—যার ফলে এই সব রোগবিস্তার প্রতিরুদ্ধ হবে। মানুষের স্বাস্থ্য এ-যুগে মোটামুটি ভাল থাকবে।

১০) ক্ষুধা-তৃষ্ণা সংবরণ করার ওষুধও বার হবে। এই ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণী বটিকা সেবনে মানুষ অনেক দিন পর্যন্ত বাহাল ভাব্যতে বেঁচে থাকতে পারবে। যুদ্ধ ও হুঁতিক্ষের সময় এই সব ওষুধের চাহিদা খুব বেড়ে যাবে।

১১) চক্ষুগ্রহকে সমস্ত রকমে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তুলে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করা হবে। ঘর-বাড়ি বানিয়ে অনেকে সেখানে বাস করবে। মহাকাশযানে হাজারে হাজারে মানুষ পাঠানো সম্ভব নয়। তাই অভিজ্ঞ জীববিজ্ঞানীর সঙ্গে মানুষ ও গরু, ভেড়া, বোড়া, হাঁস, মুরগী প্রভৃতির নিষিক্ত, অপরিপক্ক জ্ঞান পাঠিয়ে দ্বিরে কম খরচে এবং অল্প সময়ে অসংখ্য মানুষ ও পশুপক্ষীর প্রজনন সম্ভব হবে। এতে মহাকাশযানে হান ও ভাবের সান্ত্রয় হবে। (১৯৬৫ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর “লাইক” পত্রিকার প্রকাশিত Control of Life নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

১২) কৃত্রিম কার্গোহাইড্রেট ও ফ্যাট তৈরির চেষ্টা সাফল্যশীল হতে পারে। প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রলিয়াম, এমন কি পানুয়ে করলা থেকে একে-কোষী জৈব পদার্থ (yeast) চাষ করে, তা থেকে জৈব প্রোটিন আবিষ্কারের চেষ্টা হবে। এ-চেষ্টা সকল হলে খাবারের অনেকটা স্বাধা হবে; কারণ পেট্রল, গ্যাস এবং করলা আগামী কয়েক শত বছর অপরিপাণ্ড হারে পাওয়া যাবে।

১৩) মানুষের এই হতে প্রহাঙ্করে পরিভ্রমণ ব্যবস্থা সুগম ও নিরাপদ হবে কাজেই তখন বড়লোকেরা বড় দিন কি পূজার ছুটিতে চাঁদে গিয়ে দিন কতক কাটিয়ে আসতে পারবেন—দার্জিলিং, সিমলা, উটি তখন আর তাঁদের মনে ধরবে না।

১৪) কম খরচার ব্যাটারিচালিত টেলিভিশন সেট তৈরি হবে; এখনই এ-প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আজকাল যেমন ঘরে ঘরে, ক্ষেতে খামারে, বোকার, হাট, ট্রামে, বাসে সর্বত্র ট্রানজিস্টার রেডিওর চলন হয়েছে, তেমনি এ যুগে ট্রানজিস্টার টেলিভিশনের চলন হবে।

১৫) মহাকাশ গবেষণার যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে একুশ শতকে তা পূর্ণতা লাভ করবে। দূরদূরান্তের এই থেকে আবাহাওয়া সংক্রান্ত নানা সংবাদ আসতে থাকবে, বড়-বজা ও বৃষ্টিপাতের অনেক সংকেত অনেক আগে থেকেই পাওয়া যাবে।

১৬) নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডনে যেতে এক ঘণ্টারও কম সময় লাগবে, কাজেই তখন অনেক ছাত্র ও শিক্ষক প্রতিদিন লণ্ডন থেকে নিউইয়র্ক বা নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডনে পড়াশুনা করতে বা কাজকর্ম করতে ডেলি প্যাসেঞ্জারী আরম্ভ করবেন।

১৭) ট্রান্সক টেলিফোনের খরচ কমে যাবে। যুরোপ থেকে এশিয়ার যে কোন স্থানে টেলিফোন করতে হলে এক থেকে দুইপারের বেশী খরচা পড়বে না। উপগ্রহ ব্যবহৃত সোলারজি বার্ডা পাঠানো এখনই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

১৮) বড় বড় শহরে অন্ধকার দূর করার জন্তে কৃত্রিম চাঁদের সৃষ্টি হবে। সম্প্রতি Laser নামে এক অতি শক্তিশালী আলোক রশ্মি আবিষ্কৃত হয়েছে। একশ কোটি সূর্য রশ্মির চেয়ে (সূর্যের সমগ্র রশ্মির অতি ক্ষুদ্রতম অংশ পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়) এর আলো উজ্জল। এই লেজার আলোর বহু হ-এক হাজার হুট উচুতে স্থলিমে দিলে, বেশ একটা ছোট চাঁদের মত এক কিরাট এলাকা আলোকিত করবে।

১৯) একুশ শতকে মহাকাশের যত সমুদ্রও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা সমুদ্রকে কিতাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা যায়, তার বিরাট ব্যবহা করবেন। সমুদ্র থেকে খনিজ বস্তু আহরণ করা ছাড়াও তাকে চাষের কাজে লাগাবার ব্যবহাও হবে। সমুদ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ শক্তি আহরণ করা হবে; তাছাড়া সমুদ্রতলে গৃহ নির্মাণ, সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে ওষুধ ও নানান রকমের প্রোটিনবৃদ্ধ খাদ্য তৈরিও চেষ্টা হবে। সমুদ্রতলে শক্ত-সংরক্ষণাগার এবং তৈলাধার প্রভৃতির ব্যবহাও হবে। সমুদ্রতলে তৈল রাখার সুবিধা ও নিরাপত্তা হইবে। এ ছাড়াও সমুদ্রতলে তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির চেষ্টাও হবে। একুশ শতকে আবহাওয়া দ্বিভিত হওয়ার ফলে মনুষ্যের জলের অভাব দেখা দিতে পারে; সেই ক্ষেত্রে সমুদ্র জলকে লবণমুক্ত করে পানের ও চাষের উপযোগী করার চেষ্টা সার্থক হবে। পারমাণবিক জ্বালানী শক্তি চালিত প্রকল্পের (নিউক্লিয়ার ফুরেল্ড পাওয়ার প্লান্ট) সাহায্যে এ কাজ সহজ ও অল্প ব্যয়সাধ্য হবে।

আমাদের দেশে সমুদ্রকে বলা হয় রসাকর—অশেষ রসের আকর যে সমুদ্র তা বোধ হয় প্রাচীনকালে সব জাতিরই জানা ছিল। বাইবেলে Isaiah 60 : 5 উল্লেখ আছে, “The abundance of the sea shall be converted unto thee”। সমুদ্রে যে কি পরিমাণে রসের আকর The Dow Chemical Company তার একটি কারিগরি দিয়েছেন :—

১) এক ঘন মাইল সমুদ্রজলে আছে ১১৫ মিলিয়ন-টন গলিত রাসায়নিক পদার্থ, যার মূল্য কম করে ধরলেও হবে ৫০০ কোটি ডলার।

২) প্রতি ঘন মাইল সমুদ্রজলে আছে ২০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনা আর সাড়ে আট মিলিয়ন ডলার মূল্যের রূপা।

৩) প্রতি ঘন মাইলে পাওয়া যাবে ৭ টন ইউরেনিয়াম।

৪) পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রে বেলন মূল্যবান পদার্থ

আছে তার আনুমানিক মূল্য হবে এক কুইন্টিলিয়ন পাঁচশ কোয়ান্টিলিয়ন ডলার। (এক কোয়ান্টিলিয়ন ডলার মানে এক হাজার ট্রিলিয়ন ডলার, ট্রিলিয়ন হল আবার এক হাজার বিলিয়ন—বিলিয়ন হল এক হাজার মিলিয়ন, আর মিলিয়ন হল দশ লক্ষ। তাহলে এক কুইন্টিলিয়ন হল—এক হাজার কোয়ান্টিলিয়ন। তাহলেও মাথা ঘুরতে থাকে।)

এসব তথ্য অবশ্য এই শতকের বিজ্ঞানীরা সকলেই জানেন। তাঁরা চেষ্টাও কিছু কিছু করেছেন; কিন্তু রসাকরের গর্ভ থেকে রস আহরণ করতে যে পরিমাণ অর্থ ও সময় ব্যয় হয়, তাতে খরচা পোষায় না বলেই এদিকে চেষ্টা করা ছেড়ে দিয়েছেন। আগামী শতকে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের অপরিমেয় উন্নতি, আর তার ফলে এই প্রচেষ্টা হবে সাফল্যমণ্ডিত।

২০) মোটরগাড়ি প্রস্তুতকারকেরা বিদ্যুৎ চালিত বা পেট্রোল-ও-বিদ্যুৎ সাহায্যে চালিত মোটর ইনজিন তৈরি করবেন। ধুমহীন বিস্ফোরক—নাইট্রো-গ্লিসারিনের সাহায্যে ট্রেন চালানোর ব্যবহা হবে।

২১) পরমাণবিক জ্বালানী চালিত হাওয়াই জাহাজ তৈরি হবে।

২২) মঙ্গলগ্রহে অভয়ান বিশ শতকেই সাফল্য-মণ্ডিত হবে। আগামী দশ পনের বছরের মধ্যেই মানুষ সশরীরে মঙ্গলে গিয়ে উপস্থিত হবে। সূর্যকে কেন্দ্র করে যে নটি গ্রহ আপন কক্ষ সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে তার মধ্যে বৃহৎ প্রভৃতি কয়েকটি গ্রহে একুশ শতকে মানুষের পৌছাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। মনে হয় মহাকাশের সমস্ত জঞ্জের রহস্য মানুষের কাছে উন্মোচিত হবে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন,—

“খোলো খোলো হে আকাশ, তব তব নীল  
স্বনিকা।

খুঁজিব তারার মাঝে চকলের মালার মণিকা।

খুঁজিব সেবার আনি বেধা হতে আদে কণতরে  
আখিনে গোখুলি-আলো, বেধা হতে নামে পৃথ্বী-

পরে

### আবহাওয়ার সারাক্ষর বৃদ্ধি।—

যেখা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের কণদীপ্ত টিকা ॥”

২০) কোবান্ট বোমা আবিষ্কৃত হবে এ যুগে। এই বোমা হবে হাইড্রোজেন বোমার চেয়ে বেশী বিধ্বংসী; কিন্তু সে প্রাণের স্পন্দন শুরু করে দেওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি করবে না। ঘরবাড়ি, কল কারখানা, যানবাহন সবই অক্ষত থাকবে—থাকবে না শুধু জীবন্ত প্রাণী। এর প্রচণ্ড আঘাতে জীবন্ত প্রাণী সমেত সমস্ত গাছপালা ধ্বংস হয়ে যাবে—মাটির এক ফুট নিচেও কঁচো, পিঁপড়ে, সাপ, বেঙে কেউ জীবন্ত থাকবে না। একটি ফুৎকারে প্রাণের প্রদীপ যাবে নিভে—নেমে আসবে আদিম পৃথিবীর নিস্তরতা।

২৪) ধর, গোবি, সাহারা প্রভৃতি মরুভূমিতে প্রথমে মনসা জাতীয় বৃষ্টি বোপণ করে খানিকটা চাষের যোগ্য করে তুলবার চেষ্টা হবে। ইজরাইল এ-বিষয়ে খানিকটা অগ্রসর হয়েছে। মরুভূমিতে চাষের সবচেয়ে বড় অসুবিধে হল রুটির অভাব। অনেক মরুভূমিতে, যেমন সাহারায়, সারা বছরে এক ইঞ্চির কম রুটিপাত হয়; আবার অনেক মরুভূমিতে সারা বছরে দশ ইঞ্চি পর্যন্ত রুটিপাত হয়। এসব জায়গায় চাষ আবাদ করা অত্যন্ত দুঃসহ। পূর্ণ মরুভূমি ছাড়াও পৃথিবীতে অর্ধ-মরুভূমি আছে এবং তাদের পরিমাণ নিত্য ক্রমে কম নয়—ভূপৃষ্ঠের ৭৪ শতাংশ এতরকম অর্ধ-মরুভূমি এবং সেখানে সারা বছরে ১০-২০ ইঞ্চি পরিমাণ রুটি হয়। এইসব জায়গায় চাষ আবাদ খানিকটা সফল হবে। আর সে চেষ্টা সফল করতে হলে পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন করতে হবে। আবহাওয়া পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে সব পরিকল্পনার কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন, সেগুলো আমাদের কাছে আজগুবি বলে মনে হয়। একটা পরিকল্পনার কথা ধরা যাক। তাঁরা বলছেন, স্ত্রমের রঙে পাঁচ মাইল-পুরু বরফের মেঘ সৃষ্টি করতে পারলে পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তন করা সম্ভব। এই রকম মেঘ সৃষ্টি করতে হলে স্ত্রমের সাগরে জলের তলে দশটি বড় আকারের হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ

করলে, যে উচ্চ মেঘ আকাশে জন্মে, তাই কিয়দল পরে ঠাণ্ডা হয়ে নিচে নেমে এসে স্ত্রমের সাগরের চারদিকে রুটিপাত ঘটাবে এবং তারই কলে আরো মরুভূমি অঞ্চল চাষের উপযোগী হয়ে উঠবে। আর এটা উপায় স্থির করেছেন। সেটি হল Sierra Nevada পর্বতমালার মধ্যে বড় আকারের স্ত্রম পথ কাটতে পারলে, ঐ স্ত্রম পথ দিয়ে আর্দ্র প্রশান্ত সাগরের আবহাওয়া এসে অস্থির নেভাদা মরুভূমিকে শান্তামল করে তুলতে পারবে।

এই পরিকল্পনাগুলি সার্বক্ষণিকভাবে রূপায়িত হলে, বিশ শতকে যেখানে ছিল শুষ্ক ধূ ধূ শুষ্ক বালুবাশি, একুশ শতকে সেখানে খানিকটা সবুজের ছোঁয়া লাগবে।

### গোপনীয়তা

একুশ শতকে বিজ্ঞানের বিশ্বয়কর উন্নতির ফলে ব্যক্তিগত জীবনে তথা রাষ্ট্র জীবনে গোপন বলে বড় কিছু থাকবে না—কোন কিছু লুকিয়ে রাখা হবে শক্ত। আড়িপেতে শোনা ও পরের গোপন তথ্য উদ্ধার করার নতুন নতুন উপায় আবিষ্কৃত হবে। এখনই ‘মাইক্লেসারের’ আলোক বিশ্বের সাহায্যে বহু দূর থেকে আলোক চিত্র নিতে পারে, টাই-পিন বা সিগারেট লাইটারের মধ্যে মাইক্রোকোন লুকিয়ে রাখতে পারে, closed-circuit television সাহায্যে লুকানো জিনিস ঠিক ঠিক দেখতে পায়, টেলিফোন লাইন ট্যাপ করে অপরের গোপন কথাবার্তা সহজেই শুনতে পারে, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পাণের ঘরের গোপন মন্ত্রণারত লোকের সমস্ত কথা শুনতে পেতে পারে, খাম না খুলেই ভিতরের চিঠির মর্মার্থ জানতে পারে। এ ছাড়া আছে স্পাইন্ডাটেলাইট, তার সাহায্যে গোপন তথ্য আলোক চিত্রের সাহায্যে সংগ্রহ করা যায়। এই ভাবে গোপন তথ্য উদ্ধার করার নানা নতুন নতুন উপায় এ-যুগেই বার হয়েছে। এইসব উপায় আগামী যুগে আরও নিখুঁত ও উন্নত ধরনের হবে এবং সেগুলো বেশ ভালভাবেই কাজ করবে। মালিক, শ্রমিকরা কাজের

সময় ঠিকভাবে কাজ করছে, না কাজে কীকি দিচ্ছে জানতে পারবেন; ব্যবসায় সংক্রান্ত গোপন তথ্য, গোপন আদান-প্রদান, উৎকোচ প্রদান, জীবনবিমার পর বিমাকারীর আঘাত, দৈহিক ক্রটি ইচ্ছাকৃত না সত্যসত্যই আকস্মিক, বিবাহ-বিচ্ছেদকারী ছানী বা ছানী গোপনে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্তে ব্যবস্থা করছেন কি না ইত্যাদি বহু বিষয় জানবার জন্তে নতুন নতুন উপায় আবিষ্কৃত হবে। ফলে মানুষের জীবনে গোপনীয় বলে কিছুই থাকবে না। ইচ্ছে করলেই একে অপরের গোপন কথা জানতে পারবে।

অনেক নতুন নতুন সংস্থা গড়ে উঠবে, যেমন বানবাহন জটলা নিবারণী সংস্থা, আকাশ-বাতাস বিতরণ রক্ষণী সমিতি। এদের কাজ হবে, রাস্তার যাতে বানবাহন জটলা পার্কিয়ে অবরোধ সৃষ্টি না করে তা দেখা, আকাশ-বাতাস যাতে দূষিত না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখা এবং দূষিতকারীদের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা।

লোকসংখ্যা সীমিত রাখবার বড় চেষ্টাই হোক, আর গর্ভনিরোধের যতই নতুন নতুন ওষুধ বার হোক না কেন, “মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের প্রবাহ।” একুশ শতকে লোকসংখ্যা যে সাংখ্যাতিক ভাবে বেড়ে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু কত বাড়বে সে নিয়ে আছে মত-বিবোধ। ড্যানিয়েল বেল বলেছেন একুশ শতকের শেষ দশকে সারা বিশ্বে লোকসংখ্যা হবে ৫০১ কোটি; অর্থাৎ ১৯৬০ সালের চেয়ে ৬৫% বেশী। আবার কেও কেও বলেছেন ৮০০ কোটি। আর একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অনেক হিসেব করে বলেছেন, সঠিক সংখ্যা হবে ১০২ কোটি। সঠিক সংখ্যা যাই হোক সেটা জন-বিস্কোরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রেসিডেন্ট মিল্লন বলেন, ২০০১ সালে শুধু চীনের লোক সংখ্যা হবে একুশ কোটি। শহরে পার্ক, খেলাধুলা করবার মত খোলামেলা জায়গা আর থাকবে না। মোটরের সংখ্যা এত বেড়ে যাবে যে রাস্তার হাই-ওয়ে করেও কুল কিনারা মিলবে না। গাড়ার জ্যাম-লেগেই থাকবে। শুধু রাস্তা কেন আকাশেও ঐ একই অবস্থার সৃষ্টি হবে।

আমেরিকার নিম্নোক্তের সংখ্যা বর্তমানে ১০% আগামী শতকে তাদের সংখ্যা হবে ১১%-১২%, ফলে আমেরিকার বর্ণ-বিষেব ও জাতি-বিষেব বেড়ে যাবে মাঝে মাঝে সাদার কালোর মারামারি, হানাহানি প্রবল হয়ে দেখা দেবে। দেশের শান্তি বিঘ্নিত হবে। পূর্ব-বঙ্গে যেমন সংখ্যালঘু নিধন যজ্ঞ চলছে, ওদেশেও সেই রকম কাল। আদমি নিধনে খেতকাররা মেতে উঠলে আশ্চর্য হবার কিছুই থাকবে না।

আমাদের পশ্চিম বঙ্গেও মুসলমানের সংখ্যা হবে ৫১% আর হিন্দুর সংখ্যা ৪৯%, ফলে এখানেও সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দিতে পারে। আর পশ্চিমবঙ্গে অশান্তি দেখা দিলে, তার ছায়া পড়বে ভারতের সর্বত্র—ফলে এই উপ-মহাদেশের উন্নতি ব্যাহত হতে পারে।

যাই হোক বিপুল, সংখ্যক মানুষ থাকবে কোথায় সেই নিয়ে হবে একুশ শতকে সকলের মত বড় মাথা ব্যথা। দু-পৃষ্ঠে মাত্র ১৫% জমি মানুষের বাসোপযোগী সীমিত পৃথিবীতে বহুগুলি বাসিষ্ট বাড়ি করেও তাদের মাথা গুঁজবার ঠাই দেওয়া হবে শক্ত। বিল-বাদাড় ভরি করে খরবাড়ি করেও কলিকাতার পাওয়া যাবে না তখন মানুষকে সমুদ্রের তলে এবং মাটির নিচে বাড়ি করে ইঁহরের মত বিবরের বসবাসী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। জাপান ত ইতিমধ্যেই মাটির নিচে খরবাড়ি তৈরি করতে আরম্ভ করেছে। জনাকীর্ণ টোকিও শহরের ৭৪৮ বর্গ মাইলের মধ্যে ৬ শতাংশ স্থানে মাটির নিচে বাড়ি তৈরী হয়েছে; কোন কোন বাড়ি তিন থেকে চার তলা পর্যন্ত হয়েছে। বৃহদারতন বিদ্যুৎ চালিত পাখা চালিয়ে ভেতরের আবহাওয়াকে ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। মাটির নিচের দূষিত বায়ু টেনে বার করবার জন্তে বড় বড় ventilator flue আছে।

হুই মেক প্রদেশও মানুষের বসবাসের উপযোগী করে ভোলবার চেষ্টা হবে এবং কিছুটা সাকল্য দেখা দেবে।

ধাককার ব্যবস্থা যদি বা কোন রকমে হয়, পাওয়ার ব্যবস্থা কি করে হবে? পৃথিবীতে ১৪% হল বরফাচ্ছিন্ন

আৰ এক ১৪% অৰ্ধ মৰুভূমি, মাত্ৰ ১০% জমি হল আবাসযোগ্য। যতই নিবিড় চাৰ ও উন্নত ধৰণেৰ বীজ বপন কৰা হোক না কেন, এতগুলো মুখকে খাওয়ানোৱা পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। তাই জমিতে যেমন চাষবাস হয় সমুদ্রেও তেমনভাবে চাষবাসেৰ ব্যবস্থা করতে হবে। অৰ্থাৎ সমুদ্রে মাছ, হালধি, কুমীৰ, শুকক প্রভৃতি যত প্ৰাণী আছে সবই মানুহকে খেতে হবে। তাতেও কুলোবে না; তাই সমুদ্রেৰ (শেওলা সমুদ্রেৰ শেওলা থেকে এখনই কৃত্ৰিম ঝাঁড়ো দুধ তৈৰি হচ্ছে এবং আমেৰিকা থেকে হৃৰ্ভিকাৰ্ণীভূত দেশে তা চালান যাচ্ছে) ও সমুদ্রতলেৰ নানা উদ্ভিদ থেকে খাদ্য তৈৰি হবে। কিন্তু তাতেও হয়ত সকলেৰ খাদ্য চুটবে না; তখন সমদৰ্শী প্ৰকৃতি নিৰ্মম হাতে তাৰ প্ৰতিবিধান কৰবেন।

তাই এই শতকে বিশ্বযুদ্ধ অনিবাৰ্য। আৰ এই মহাযুদ্ধ হবে পাৰমাণৱিক যুদ্ধ; ফলে ২০১২৫ কোটি লোক হবে নিহত; আৰ যুদ্ধ শেষে হৃৰ্ভিক ও মহামাৰীতে আৰও ১০০-১৫ কোটি লোক হবে নিঃশেষ। এইভাবে বিৰাট প্ৰাণবন্ত্যৰ খানিকটা ভীটা পড়বে, প্ৰকৃতি ভাৱসাম্য ৰক্ষা কৰবেন। তাৰপৰ পৃথিৱীতে আৰাৰ আসবে শান্তি। (American Academy's Commission on the year 2000 দ্ৰষ্টব্য।)

যুৰোপ-আমেৰিকায়, বিশেষ কৰে আমেৰিকায় যে হাৰে বিদ্যা শক্তি ব্যবহাৰ হচ্ছে তাতে বিজ্ঞানীৰা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আজকাল আমেৰিকানৰা ৰাৱা থেকে দাঁত মাজা, চুল আঁচড়ান, সব কাজ বিদ্যা চালিত যন্ত্ৰেৰ সাহায্যে কৰছেন; ফলে শুধু ভীৰাই বছৰে ১৮ ট্ৰিলিয়ন কিলওয়াট ঘটা (১৮,০০০,০০০,০০০,০০০) বিদ্যা শক্তি ব্যবহাৰ কৰছেন। এছাড়া আছে সান্না হুনিয়া। সান্না বিশ্বৰ এই অন্তহীন বিদ্যা কুখা যেটাতে হয় কয়লা, প্ৰাকৃতিক গ্যাস এবং খনিজ তেল জালিয়ে। যদিও পৃথিৱীতে যে পরিমাণ কয়লা আছে তা আগামী ১০০ বছৰ অনাৱাসে চলে যাবে; আৰ তেল এবং প্ৰাকৃতিক গ্যাস, তাৰ পরিমাণ অপৰিসৰে; তবু আমেৰিকাৰ বিদ্যা উৎপাদনে যে

বিৰাট পরিমাণ কয়লা (বছৰে একশ বিলিয়ন টন) খৰা হচ্ছে, তাতে বিজ্ঞানীদেৰ খুব আপত্তি। তাৰ কাৰ্য কয়লাৰ ধোঁৱা অকাশ বাতাস ভয়ঙ্করভাবে কলুষিত হয়ে পড়েছে। এৰ থেকে পরিজাণ পাওয়া যায় পৰমাণৱিক শক্তি ব্যবহাৰে; কিন্তু তাৰও পরিণাম ভয়াবহ। কাভেই বিজ্ঞানীৰা পড়েছেন মহা সমতাৰ। ভীৰা বলছেন, এ হল সম্যতাৰ সঙ্কট—মানুহ আজ নিছ হাতে গড়া ৰিপদেৰ মাৰ্গে আটকে পড়েছে। এৰ থেকে মুক্তি মেলা শত (Next Hundred Years, by Harrison Brown, James Bonner and John Weir দ্ৰষ্টব্য।)

একুশ শতকে শিল্পোন্নত দেশে কলকাৰখানা থেকে ক্ৰমাগত ধোঁৱা বাৰ হওয়ায় এবং সেখানকাৰ দূষিত পদাৰ্থ সব শোধন না কৰে নদী বা সমুদ্রে হেড়ে দেওয়াৰ ফলে আকাশ, বাতাস ও জল অত্যন্ত দূষিত হয়ে পড়বে। বিষাক্ত বায়ু আৰ নিৰ্মল জল হয়ে উঠবে প্ৰায় হুস্তাপ্য এবং তা পেতে হলে মানুহকে বেশ উচ্চ মূল্য দিতে হবে। আকাশ বাতাস নিৰ্মল ৰাখাৰ জন্তে ছোট ছোট কোম্পানি গড়ে উঠবে। বাতাসে কাৰ্বন-ডাইঅক্সাইডেৰ পরিমাণ একুশ শতকেৰ প্ৰথম দিকেই প্ৰায় পঁচিশ শতাংশ বেড়ে যাবে। লোকে কনুজাংকি-ভাইটিস, অপথেলিমিয়া, মকোমা ট্ৰ্যাকোমা, হীপাৰি, ব্ৰংকাইটিস, হুসহুসে ক্যানসাৰ প্ৰভৃতি হাস-প্ৰশাস ঘটত নানা ৰোগে এবং অবসাদ, নৈৰাশ ও নানা মানসিক ৰোগে ভুগতে থাকবে। এ ছাড়াও ৪%-৫% নবজাতক ৰোবা, কালা বা জন্মাক্ত হবে; অনেক শিশু বিকৃত অঙ্গ-প্ৰত্যঙ্গ এবং ক্যানসাৰ ৰোগ নিয়েই জন্মাবে। মাতৃস্তনে সীসক বিষ দেখা দেবে। তখন মানুষ-সন্তেৰ হয়ত বলতে থাকবেন,—“হে মহাভুখ, হে ক্ৰত, হে ভয়ঙ্কর, ওহে শঙ্কর, হে প্ৰলয়ঙ্কর। হোক জটানিঃকৃত অগ্নিভুজঙ্গম-দংশন-জৰ্জৰ হাবৰ জঙ্গম।”

সমাজ এত জটিল এবং কৰ্মজগৎ এত বিশাল ও বহুৰূপী হয়ে পড়বে যে তখন কমপিউটাৰ ছাড়া মানুহেৰ গত্যন্তৰ থাকবে না। এখন কমপিউটাৰেৰ ওপৰে

বিবাহ ও বিতৃষ্ণা দেখা যাচ্ছে সেটা দূর হয়ে গিয়ে একুশ শতকে মানুষ হয়ে পড়বে কমপিউটার-নির্ভরশীল। হাজারে পরীক্ষার খাতাগুলি দেখে মান নির্ণীত হবে কমপিউটার যন্ত্রের সাহায্যে। স্কুল কলেজে কমপিউটার ও টেলিভিশনের সাহায্যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ব্যাপক হারে বেড়ে যাবে। হাজারহাজারের স্কুল রেকর্ড রাখা হবে এই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। গৃহশিক্ষকের কাছে হাজারহাজার যেমন ব্যক্তিগত মনোযোগ পায়, কমপিউটারও তেমনি ব্যক্তিগত মনোযোগের সঙ্গে শিক্ষা দিতে ও তাদের দ্রুত সমস্যাগুলোর সমাধানে রত থাকবে।

সমস্ত দেশে প্রতিটি ছেলেমেয়ে শিক্ষার সুযোগ পাবে। উন্নত দেশগুলোতে, বিশেষ করে যুরোপ-আমেরিকার স্নাতক শ্রেণীর শিক্ষা আর উন্নতশীল দেশগুলোতে স্নাতক-পূর্ণ শিক্ষা হবে শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদার সর্বনিম্ন মান। শিক্ষাব্যবস্থায় জীবিকা অর্জনের উপায় শিক্ষা দেওয়া হবে কিন্তু জীবনচর্যা শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা থাকবে না। মানুষ হয়ে উঠবে আরও ভোগস্বচ্ছ-ও ইচ্ছা-পরায়ণ।

সমস্ত উন্নত দেশে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে যাবে। আমেরিকার এতদিন প্রতি তিনটে বিবাহের মধ্যে একটি বিবাহ বিচ্ছেদে পরিণত হয়। অর্ধেক সম্ভানেত সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যাবে। আমেরিকার প্রতি বছর তিন লক্ষের অধিক (গর্ভনিরোধ ও অস্ত্রোপচারের সবরকম ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও) অর্ধেক সম্ভান জন্মাচ্ছে। এই সংখ্যা হল পরিসংখ্যান তথ্য অনুযায়ী—পরিসংখ্যান বহির্ভূত কত অর্ধেক সম্ভান জন্মায়, তা কেও বলতে পারে না। জাপানেও ঐ একই রকম অবস্থা হবে। এই সব অর্ধেক সম্ভান সমাজে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে। সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হবে।

### অস্ত্রাণ্য আবিষ্কার

আগামী শতাব্দীতে যুরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন যোগ (ভৌগোলিক ভিত্তিক) মহামারী আকারে দেখা

দেবে। এখনই আমেরিকার এই যোগের সংখ্যা হল প্রতিদিন ১,৫০০ অর্থাৎ প্রতি ১৬ সেকেন্ডে একটি। যে পেনিসিলিন এতদিন কার্যকর হচ্ছিল তাতে এখন আর বিশেষ কল পাওয়া যাচ্ছে না। নতুন শতাব্দীতে এই যোগের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হবে।

আগেই বলা হয়েছে যুরোপ আমেরিকার বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। তাই দেখে সমাজবিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, একুশ শতকে সাময়িক বিবাহ (marriage of convenience) প্রচলিত হবে। চিরায়ত বিবাহরীতি চিরজীবন-ব্যাপী ভালবাসার লোক ক্রমশঃ অসমর্থ হয়ে আসবে। তাই আশুচ্য বিবাহবন্ধনের পরিবর্তে জনসাধারণ ক্রমশঃ সাময়িক বিবাহের দিকে ঝুঁকবেন। প্রথম থেকেই একথা ভেনেই প্রেমিক প্রেমিকা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। যতদিন অসুবিধে না হবে, এ বন্ধন মেনে নেবেন। তারপর আবার মুক্ত—আবার মুক্ত। আবার ..... অর্থাৎ মানুষ যত্নে যেতে চাইবে মানব সভ্যতার সেই উদয় বৃহত্তে—যখন সভ্যতারের সামাজিক বন্ধন, দায়দায়িত্ব ছিল না (Brown, Harrison—The Challenge of Man's Future উইব্য) এর প্রভাব আমাদের দেশেও ধানিকটা এসে পড়বে—এটা স্থানান্তরিত।

এই শতকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা দেখে সমাজের বেশীর ভাগ লোক জড়বাদী ও ভোগস্বচ্ছবাদী হয়ে উঠবে। ভাগ্য ও ভগবানে আস্থা হারিয়ে মানুষ যোর নাস্তিক হয়ে পড়বে। চার্চ, মন্দির, মসজিদ, মঠ লোক আর ভিড় করবে না, অধিকাংশ স্থানে এগুলোতে কাপড়খালা খুলিয়ে দিতে হবে, নয়ত সেগুলো মিউজিয়াম, পুস্তকালয় বা ছাত্রনিবাসে পরিণত হবে। পাদ্রির, পুরোহিত, মোজা লামাদের দাপট সমাজ থেকে একেবারে ধুয়ে মুছে যাবে।

একুশ শতকে জন্মনিরোধ বটিকার পরিবর্তে জন্মনিরোধক ঋতু আবিষ্কৃত হবে বলে কেও কেও বলছেন। ভারত পারমাণবিক কমিশনের অধিকর্তা

ডাঃ হোমি ভাবা জন্মনিরোধক গুণধর ষাণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করবার সুপারিশ করেছিলেন। সেই মত নতুন শতাব্দীতে জন্মনিরোধক গুণধর মিশ্রিত লবণ, শর্করা, চাউন, ক্রটি এবং কিছু কিছু পানীয় বিশেষ বিশেষ দোকানে বিক্রির ব্যবস্থা হবে। এইসব ষাণ্ডের একটা গুণ হবে যে, বর্তমান কালের এই জাতীয় বটিকা সেবনে যে-সব কুফল দেখা যায়, এইসব ষাণ্ডে সে-সব কুফল দেখা দেবে না।

আগে যে বলা হয়েছিল মানুষের নাক, কান কি আঙ্গুল কেটে গেলে, সে সব আবার গজাবার জন্তে গুণধর আবিষ্কৃত হবে, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা আরও বিশদ ব্যাখ্যা করে বলছেন যে, চিংড়ি মাছের দাঁড়া ভেঙ্গে গেলে আবার গজায়, টিকটিকির লেজ কেটে দিলে নতুন লেজ, গোধিকার চোখ ও অপটিক নার্ভ নষ্ট হয়ে গেলে দেহগুলো আবার গজায়; এসব তাঁরা চিংড়ি, টিকটিকি, গোধিকা প্রভৃতির জন্মরস (embryonic fluid), তাদের দেহস্থ ফলার (টিগু) সার বা হরমোনের সাহায্যে গুণধর তৈরি করে এই সব বাহিরজ ও উপজাগুলো আবার গজিয়ে তুলবার ব্যবস্থা করবেন। এটা সকল হলে কৃত্রিম হাত-পা, দাঁত আর ব্যবহার করতে হবে না। অনেক বিজ্ঞানী এ বিষয়ে এখন থেকেই গবেষণার রত হয়েছেন। তাঁদের এ চেষ্টা সকল হলে, যুদ্ধে আহত সৈনিকদের এবং কল-কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের অশেষ কল্যাণ সাধন হবে।

পৃথিবীতে আজকাল যেসব শিশু জন্ম গ্রহণ করছে তাদের মধ্যে ৪% শতাংশ জন্মগত (জেনেটিক ডিফেক্ট) কোন না কোনো রোগে ভুগছে। আজকাল নিশ্চিতভাবে জানা গেছে; Mongolism, Phenyl Ketonuria (P K U), Schizophrenia, Hemophilia প্রভৃতি কয়েকটি রোগ জন্মগত এবং শরীরগত ক্রটি বিচ্যুতির ফলে ঘটে থাকে। জিনের (gene) মধ্যস্থ শরীরগত বাহিত এইসব রোগের জীবাণু লেগার আলোক রশ্মি ও রোডএশনের সাহায্যে বাইকোসার্জারি করে শিশুকে সশূল, সুস্থ ও নিরোগ করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

এ ছাড়াও ইচ্ছামত Y-chromosome-এর সম্মিলন ছাড়াই (বা অভ্যস্ত দ্রুত) দম্পতি যাতে ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা লাভ করতে পারে, তার পরীক্ষা নিরীক্ষা ১৯৭০ সালেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এটা আরও জোরদার হবে আগামী শতকে। এখনই জগের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের আলোক সম্পাত করে হাঁস-মুরগীর গর্ভে স্ত্রী শাবককে পুং শাবকে পরিণত করা আংশিকভাবে সফল হয়েছে। উচ্চতর জন্তুপায়ী জীবের ওপর এ-পরীক্ষা এখনও করা হয় নি। একুশ শতকে এই পরীক্ষা মানুষের ওপর করা সম্ভব হবে এবং এই লিঙ্গ পরিবর্তনে মানুষের শারীরিক ও মানসিক গুণের কোন পরিবর্তন হয় কি না, অর্থাৎ পরিবর্তিত পুরুষ সন্তানটি মেয়েলী ভাবাপন্ন আর কতটা সন্তানটি পুরুষালী ভাব পায় কি না সেটা ভালভাবে পরীক্ষা করা হবে।

Dr. Augustus B. Kinzel বলেছেন, “মানুষের বার্ষিক্যকে এমন আঘাত আঘাত হানব যে দুর্ঘটনা ছাড়া মানুষের বৃত্ত্য সাধারণত হবে না।” (The Second Genesis পৃঃ ৩৪ দ্রষ্টব্য।) হাড় ভেঙ্গে গেলে খাড় নির্মিত হাড়, ডেরুনের তৈরি ধমনী, ইলেকট্রনিক পেশীও তৈরি করা হবে। এর ফলে মানুষের ২০০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। (Gordon Taylor—The Biological Time Bomb দ্রষ্টব্য)

বিজ্ঞানীরা ১৯৬৫ সালে বলেছিলেন, একুশ শতকের আগে টেটটিউবে বোঁব তৈরি করা সম্ভব হবে না। এটা কিন্তু মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৭০ সালে ইটালির এক বিজ্ঞানী, Donicle Petrucci একটি স্ত্রী-ভিষ এমোনাইট দ্রাবকে চুষিয়ে সোধন করে নিয়ে একটি গুজকীটের সঙ্গে মিলন সাধন করে একটি জগের সৃষ্টি করেন। জগটি ২০ দিন পর্যন্ত জীবিত ছিল। একুশ শতকে এই পদ্ধতির আরও উন্নতি হবে। তখন নারীদের আর গর্ভব্রণা, শারীরিক অসোয়াস্তি সহ করতে হবে না, অথচ প্রয়োজনমত সন্তান পাবেন (Wolstenholme Gordon—Man and his Future দ্রষ্টব্য) এই প্রসঙ্গে একজন লেখক যে ব্যঙ্গোক্তি



করেছেন, সেটাও এখানে উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছে না। তিনি বলেছেন, তা হলে ত একশ শতকে পুত্র কন্যা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বড় বড় কারখানা বানাতে হবে, আর তাঁদের উৎপন্ন দ্রব্য দোকানে থাকে থাকে সাজানো থাকবে। নিঃসন্তান দম্পতিরা সেখানে গিয়ে পুতুল কেনার মত পছন্দমত নানা ধরণের নবজাতক কিনতে পারবেন। আর কারখানা থাকলেই ধর্মঘট লক আউট প্রকৃতি হয়ে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে ধর্মঘট হলে মালিক ও প্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন—জনসাধারণ নয়।

কর্ণওয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ক্রেডারিক স্টিউয়ার্ড পরাগের সাহায্যে ছাড়াই গাঞ্জর ও ডামাক গাছ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তাঁর প্রকৃতিটি হল এই রকম : একটা পূর্ববর্ত গাছ থেকে একটা কোষ (cell) নিয়ে বাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধিত করে তা থেকে গোটা ডামাক বা গাঞ্জর গাছ তৈরী করেছেন। এই গাছে বীজ কলানো সম্ভব হয়েছে এবং সেই বীজ থেকে আবার নতুন গাছও জন্মানো সম্ভব হয়েছে। এই রকম পরাগ ও গর্ভকেশরের আশ্রয় না নিয়ে নতুন গাছের স্বজন পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় cloning বলা হয়।

পূর্ববর্ত জীবজন্তুর প্রতি কোষের কেশ্রীন (নিউক্লিয়াস) ও পরীরাগুর (কোমোসোম) মধ্যে জীবের ক্রমোতিব্যক্তির সমস্ত সংবাদ মেলে। তাই জানতে পেরে অল্পকোড' বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জে. বি. গর্ডন মাইক্রো-পিপেটের সাহায্যে আক্রিডা দেশীয় একটি বেঙের একটি অ-নিষিক্ত (un-fertilized) ডিম্ব বার করে নিয়ে বিকরণের (রোডারগন) সাহায্যে তার কেশ্রীনটি নষ্ট করে ফেলেন। তারপর অপর একটি বেঙের দেহকোষ নিয়ে তার কেশ্রীনটাও ছোট্ট একটি যন্ত্রের সাহায্যে বার করেনিয়ে সেটি পুথোক্ত ডিম্বকোষে বোপণ করেন। তার ফলে যে নতুন কোষ সন্ধিস্থানের (cell combination) সৃষ্টি হল, সেটি স্বাভাবিক দেহ-কোষের মতই বীজ পেয়ে বিকশিত হতে লাগল এবং তার ফলে বেঙাচির সৃষ্টি হল। এই প্রক্রিয়ার ঘোম সংসর্গ ছাড়াই অসংখ্য

একই রকমের বেঙ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এই প্রক্রিয়া উচ্চ শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীব নিয়ে এখনও পরীক্ষা করা হয় নি। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ২০১০ সালে হাঁস-মুরগী, শূকর ও গবাদি পশুর উপর এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে চেষ্টা করা হবে এবং সে চেষ্টা সার্থক হলে, অসংখ্য হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু অল্প সময়ে সৃষ্টি করা সম্ভব হবে আর তার ফলে মাংস, ডিম ও ছত্থের পরিমাণ ৫০%—১০০% শতাংশ বেড়ে যাবে।

মাহুয নিয়ে কি এই পরীক্ষা চলবে? ই্যা, ক্রোনিং পদ্ধতিতে মাহুয সৃষ্টি করবার চেষ্টা হতে পারে। ইলিনইস বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়লজির অধ্যাপক কিম্বেল এটউড এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডাঃ গুয়রা লেডারবার্গ বলেছেন, ২০২০ সালে মাহুয মানব-দেহ-কোষের কেশ্রীন থেকে অযৌনসম্ভব (asexual) অসংখ্য মানব-মানবী সৃষ্টি করতে পারবে এবং সেগুলো কার্গন কপিরা মত বেধতে একই রকমের হবে মনে হবে যেন সবাই যমজ সন্তান। কাজটা অবশ্য প্রত্যন্ত কঠিন বলে তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন (Rosenfield—The Second Genesis, পৃঃ-১৩৮ দ্রষ্টব্য) তবে যে-হারে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে এর আর প্রয়োজন হবে না; শুধু বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ঘোষণার জন্তেই এবং মাহুয যে সৃষ্টিকর্তার চেয়ে কিছু কম নয়, শুধু সেটাই প্রমাণের জন্তে বিজ্ঞানীরা এর পরীক্ষা চালাবেন। আলবার্ট' রোজেনফিল্ড এই প্রসঙ্গে বলেছেন, “When this kind of biological sophistication has been attained, when man can write out detailed genetic messages of his own, his powers become truly godlike.” (The Second Genesis—পৃঃ ১৪০ দ্রষ্টব্য।) এক কথায় মাহুয ভগবান ভগবান খেলা আরম্ভ করে দেবে।

এই প্রক্রিয়ার একটা অস্ববিধা হল, এর ফলে এক সঙ্গে শত শত চোঁকচোঁক খাঁ, নাদির শাহ, ইয়াহিয়া খান সৃষ্টি হতে পারে, আবার শত শত আইনটাইন, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধ, চৈতন্যদেবও সৃষ্টি হতে পারে।

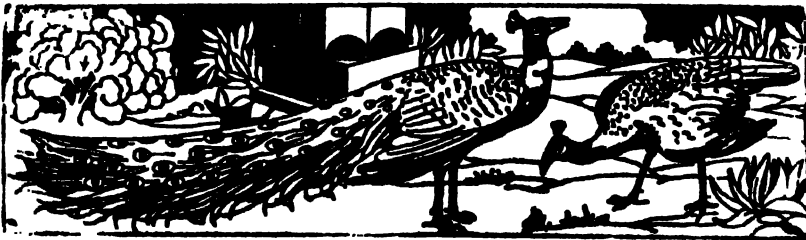
আজ যে মানুহ “ভাগ্যেৰ পায়ে হুৰ’ল প্ৰাণে” ভিক্ষা না চোৱে আপন হাতে আপন ভাগ্য ৰচনা কৰতে চলেহে, তাতে অনেক নীতিবাগীশ আতঙ্কিত হৈ পড়েছেন। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ Dr. Leroy G. Augenstein প্ৰশ্ন তুলেছেন, “বিজ্ঞান ভয়ৰ কৃত-গতিতে এগিৰে চলেহে কিন্তু বিজ্ঞানেৰ দান, সেই নব-লব্ধ শক্তিকে আমাৰা অনেক সময় ঠিকমত ব্যৱহাৰ কৰতে পাৰিছ নে। বিজ্ঞান ও প্ৰযুক্তি বিস্তাৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰতিদিনে বে বকম অসম্ভৱ উন্নতি হৈছে তাতে অনেক সময় নীতি ও ধৰ্মবিবৰক সৰুট দেখা দিছে—যে সৰুটোৰ দমাধান শুধুই বাস্তবতা দিয়ে কৰা যায় না।

একুশ শতকৰ পৃথিবীতে বিজ্ঞানেৰ এই অবিখ্যাত জয়যাত্ৰা, এই হুগাৰ গতিৰ কথা বা আজকেৰ দিনেৰ বিজ্ঞানীৰা ভাৱধৰে ঘোষণা কৰেহে, তাই শুনে অনেক অবিখ্যাসী হয়ত বলবেন, এ ত বিজ্ঞানেৰ কথা নয়, এ হল কল্প-বিজ্ঞানেৰ (সায়েন্স ফিক্শনেৰ) কথা। একথা বলবাৰ আগে আমাদেৰ মনে ৰাখতে হবে, জুল ভাৰ্ণ, হাৰ্ভাল, ওয়েল্‌স্, আৰ্থাৰ ক্লক প্ৰভৃতি যেসব মনীষী কল্প-বিজ্ঞান বিষয়ে লিখেহে, সেগুলো সবই আজকেৰ

দিনেৰ বিজ্ঞানেৰ অগ্ৰদূত, একথা বললে বোধ হয় তুল বলা হবে না। আজ বা কল্প-বিজ্ঞান, আগামী যুগে সেটাই হৈবে সত্যিকাবেৰ বিজ্ঞান।

ৰবীন্দ্ৰনাথ একবাৰ বলেছিলেন, “মানুহেৰ শ্ৰেষ্ঠ পৰিচয় হৈছে মানুহ সৃষ্টিকৰ্তা.....মানুহ নিৰ্মাণ কৰে ব্যৱসায়েৰ প্ৰয়োজনে, সৃষ্টি কৰে আত্মাৰ প্ৰেৰণায়।” ৰবীন্দ্ৰনাথৰ এই উক্তিকে ব্যাঞ্জে পৰিণত কৰে মানুহ সৃষ্টি কৰে চলবে অনন্ত কাল ধৰে। সে কোনদিনই বলবে না, “আমাৰ কাজ হয়েহে সাৱা/এখন প্ৰাণে বাঁশী বাজাৰ সক্ষা। তাৱা।/ দেবাৰ মত বা ছিল মোৰ নাই কিছু আৰ হাতে।”

উপসংহাৰে বাল, একুশ শতকৰ পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্ৰযুক্তিবিস্তাৰ অভাবনীয় উন্নতি হৈবে, অনেক অসম্ভৱ সম্ভৱ হৈবে; তবে মানব চৰিত্ৰেৰ কোন মৌল পৰিবৰ্তন হৈবে না। এখনকাৰই মত হুখ হুখ হুটি তাই আগামী শতকেও হাত ধৰাধাৰ কৰে চলতে থাকবে। আলো-ছায়াৰ সন্মিলিত অভিব্যক্তিই জীৱনেৰ পথেৰ ৰূপ বিচিত্ৰ কৰে তুলবে, হাসি-কাহা হাঁহে-পাৱা এখনকাৰই মত জীৱনকে ৰহস্যময় কৰবে।



# সাবিত্রীর ঋষি কবি শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

(বিজ্ঞানজালেকের “বঙ্গ আমার” স্তরে গের)

পায় না আভাস মন যে-জ্যোতির সে ছিল তোমার চরণধাস,  
এসেছিলে তুমি সে-অমিতাভার করিতে গহনে সুপ্রকাশ ।  
নীরদ নীলীন যে-মণিমৌলি অসীন ছিলে সে-ধ্যানচূড়ায়,  
তাই আনন্দে ল, শ্রীঅরবিন্দ, আমরা প্রণাম করি তোমায় ।

গেরেছিলে তুমি : “পথহারা নিশা জাগিবে তারকাকীর্তনে,  
প্রতিদিন হবে তীর্থলক্ষ্য, ধন্ত, নীলিমা বন্দনে ।

“স্বপ্নর দেহে শিব চিত্রর বিগ্রহ তাঁর উজ্জ্বল’  
আগেন বেদনা-অশ্রু মুছাতে কোমল করুণা উজ্জ্বল’ ।

জীব অমৃতের সন্তান, তাই শিবসালোক্য চাহিবে সে  
অশ্রাদ্ধিকার করি’ দাবি মাতৃ ময় মহিমা গাহিবে সে ।”  
গেরেছিলে তুমি : “পথহারা নিশা জাগিবে তারকাকীর্তনে,  
প্রতিদিন হবে তীর্থলক্ষ্য, ধন্ত, নীলিমা বন্দনে ।”

“তাঁর নিখাসে উল্লাসে প্রাণী নিখাস লয় আলোছারায়,  
তাঁর সৃষ্টির বরে দেখে শোনে তাঁর বাঁশি মধুমুহুনায ।  
ভগবানে চায় যে হয় বন্দী শরণানন্দ-নিগড়ে তাঁর,  
প্রেমের পতাকাবাহী তবে তাঁর জ্ঞান মন্দির খোলে হুয়ার ।”  
গেরেছিলে তুমি : “পথহারা নিশা জাগিবে তারকাকীর্তনে,  
প্রতিদিন হবে তীর্থলক্ষ্য, ধন্ত, নীলিমা বন্দনে ।

“জড়বিজ্ঞানকীর্তিসোধে মিলে না সুত্ৰিদিশা ধরায়,  
অপারে পারানি পায় জীব শুধু পারীর মহিমাময়ী রূপায় ।  
মানব জীবন নয় শুধু এক ক্ষণরাঙা অধকেনমাতন,  
পৃথিবী ঝুলনা বালগোপালের—বীরবৃন্দের রণাঙ্গন ।”

গেরেছিলে তুমি : “পথহারা নিশা জাগিবে তারকাকীর্তনে,  
প্রতিদিন হবে তীর্থলক্ষ্য, ধন্ত, নীলিমা বন্দনে ।

“অধসকট পাণপুষ্পের সোপানবাহিনী হু টিউর,  
দৈবী অমবা-বিকাশের পথে সাধনার চিরহুহুতিসার ।  
প্রতি তবু অহু মঞ্জরে এক অমরাশক্তি বরে মহানু,  
চিন্তামণির চিন্তাপুলক-অভিধান ক্রম, নিরবসান ।”

গেরেছিলে তুমি : “পথহারা নিশা জাগিবে তারকাকীর্তনে,  
প্রতিদিন হবে তীর্থলক্ষ্য, ধন্ত, নীলিমা বন্দনে ।”

## ৩৭২ পৃষ্ঠাৰ পৰ্যবৰ্তী অংশ

যথাশীঘ্ৰ সম্ভব বুদ্ধ নিবৃত্তি চেষ্টা কৰিয়া এই ৰাষ্ট্ৰ নিজ শান্তিপ্রিয়তা প্ৰমাণ কৰিয়াছে। একথা যদিও সৰ্বজন-বিদিত যে ভাৰতে এখনও শতকৰা ৫০ জন বালক বালিকা শিক্ষালাভ না কৰিয়াই দিন কাটাইতেছে, তাহা হইলেও সেই শিক্ষাৰ অভাব যে-সকল কাৰণে উপস্থিত হইয়াছে তাহাৰ মূলে সৰ্ব্ব ক্ষেত্ৰেই যে শাসকবিগ্নের অবহেলা বৰ্ত্তমান আছে তাহা বলা যায় না। সকল ব্যবস্থা ও চেষ্টা থাকিলেও অনেক মূলে বালক-বালিকাগণ শিক্ষা লাভ কৰিতে ব্যৰ্থ না! ইহাৰ জন্ত তাহাবিগ্নের পিতামাতাৰাই অধিক ভাবে দায়ী। দূৰ দূৰ গ্ৰামাঞ্চলে শিক্ষক না থাকায় শিক্ষাকেন্দ্ৰ স্থাপনও অনেক ক্ষেত্ৰে সম্ভব হয় নাই। বাঁধান ৰাস্তা নিৰ্ম্মাণ সম্পূৰ্ণ হইয়া যাইলে ও শিক্ষকের সংযোগ্য হইলে পৰে শিক্ষাৰ ব্যবস্থা শীঘ্ৰ শীঘ্ৰ প্ৰসাৰ লাভ কৰিবে বলিয়া মনে হয়। কাৰখানা-বাদ প্ৰতিষ্ঠা চেষ্টা কৰিয়া সহস্ৰ সহস্ৰ কোটি টকা ব্যয় হইয়াছে। ইহাতে দেশের দায়িত্ব ও অজ্ঞতা দূৰ হয় নাই। ব্যক্তিগত অধিকাৰ ধৰ্ম কৰিয়া সেই অধিকাৰ ৰাষ্ট্ৰকবলিত কৰিয়াও ৫৫ কোটি মাহুঘের দায়িত্ব দূৰ কৰা সম্ভব হয় নাই। হইতেও পাৰে না। এই সকল সত্য বিলম্বে উপলব্ধি কৰিলেও জাতীয় অৰ্থনীতি ও শাসনৰীতি ঐ উপলব্ধিৰ ফলে কোন না কোন সময় সফলতাৰ পথে চলিতে আৰম্ভ কৰিবে বলিয়াই আমাৰা বিশ্বাস কৰি।

বাধীনতা লাভের সময় আমাৰা ভাবিয়াছিলাম যে অতঃপৰ জাতিৰ চৰিত্ৰ ক্ৰমশঃ আৰও উন্নত হইবে। কিন্তু ঐশ্বৰ্য্য আহরণের আশ্ৰয়ে জাতিৰ বহু ব্যক্তি হুঁনীতিৰ পথে চলিতে আৰম্ভ কৰিয়াছেন। শাসক গোষ্ঠীকেও বলা যায় যে তাঁহাৰা যে জুয়া খেলা (লটারি), মত্তপান প্ৰভৃতিৰ প্ৰলয় দিয়া ৰাজস্ব বৃদ্ধিৰ চেষ্টা করেন

তাহা প্ৰশংসনীয় নহে এবং তাঁহাদের উচিত ঐ পথ হাড়িয়া উন্নততৰ আদৰ্শের পথেই সুপ্ৰতিষ্ঠিত থাকিবাব চেষ্টা কৰা। কাৰণ আমাৰা যদি জাতিগত ভাবে হুনীতি ও ধৰ্ম্মের পথেই থাকি তাহা হইলে আমাৰেৰ কাৰখানা-বাদ ও সাময়িক শক্তি আহরণের দিকে ততটা কুঁকিবাব প্ৰয়োজন থাকিবে না। অথবা যদি আমাৰা পাশ্চাত্য আদৰ্শেই চলিতে চাহি তাহা হইলে আমাৰেৰ উচিত হইবে সাময়িক শক্তি বৃদ্ধিৰ দিকে সকল দিক হইতে অগ্ৰসৰ হওয়া ও অহিংসনীতি সম্বন্ধে কোন গভীৰ আশ্ৰয় পোষণ না কৰা। পৰম্পৰ-বিৰোধী আদৰ্শের সংমিশ্ৰণ কোন সময়েই ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নতিৰ পন্থা হইতে পাৰে না। বৰ্জিত জয়ন্তী উপলক্ষে আমাৰেৰ এই সত্য ঐকান্তিক ভাবে উপলব্ধি কৰিবাব চেষ্টা কৰা প্ৰয়োজন।

## ফরকা (২)

বুদ্বনকাৰ্য্য শেষ হইবাব পূৰ্বে জানা গেল যে ফরকা সম্বন্ধে ঐগিৰ্দ্ধাৰ্ধ্য শব্দৰ ৰায় দিল্লীতে কেন্দ্ৰীয় শাসক-বিগ্নের সহিত যে ব্যবস্থা কৰিয়াছেন তাহাতে ফরকা হইতে যে খাল দিয়া ভাগীৰথীতে জলশোত বৃদ্ধি কৰা হইবে সেই পথে খাল কাটা শেষ হইলে পৰে প্ৰথম পাঁচ বৎসৰ প্ৰয়োজন মত ৪০০০০ কিউসেক জল আনিবাব আয়োজন কৰা হইবে। পৰে দুই বৎসৰ জলশোত প্ৰয়োজন মত বাড়ান কমান চলিবে এবং সেই প্ৰয়োজন বৈজ্ঞানিক অম্লসন্ধানের দ্বাৰা নিৰ্দ্ধাৰিত হইবে। অম্লসন্ধান চলিবে যে পাঁচ বৎসৰ ৪০০০০ কিউসেক জল ছাড়া হইবে সেই পাঁচ বৎসৰ ধৰিয়া। উপস্থিত কালে যে বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল মনে হয় তাহাৰ একটা নিৰ্দ্ধাৰিত সম্ভবনা দেখা যাইতেছে এবং কয়েক বৎসৰ সময় পাইলে অপৰাপৰ উপায় সৃষ্টি হইবে যাহা দ্বাৰা কলিকাতা বন্দরের পৰমায় বৃদ্ধি যথাযথভাবে সম্পন্ন হইতে পাৰিবে। সিদ্ধাৰ্থ হ'ল সক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰিয়া সুনাম অৰ্জন কৰিয়াছেন।

# জেনারেল মাতঙ্গাডি

লক্ষী চট্টোপাধ্যায়

ভাস্কর কাহিনী

বহাদুর আগের কথা—তখন প্রত্যেক রাজার সভায় একটি করে নবরত্ন মণ্ডল দেখা যেত, এমন কি নবাবজাদাদের মহলেও এরকম মণ্ডল প্রায়ই দেখা যেত। কান্দাহারের নবাবজাদা আমাছুজা খাঁয়ের দরবারে বহু বিজ্ঞ ও অদ্ভুত লোক দেখা যেত এবং খাঁ সাহেব নিজেও খুবই সৌখিন ছিলেন। তাঁর সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও আদরকারদার সকলেই মুগ্ধ হতো। তবে তাঁর সভায় আর কারো সৌখিনতার বা বিজ্ঞতার তারিফ তিনি করতে দিড়েন না, বরং তাঁকেই সব বিষয় সকলকে তারিফ করতে হতো। নিজ গুণ নিয়ে তিনি খুবই তদয় থাকতেন কারণ তিনি মনে করতেন যে ধনে-মানে-বশে ও খ্যাতিতে হুনিয়ার তাঁর তুল্য কেউ ছিল না। —কিন্তু এমন দিন শেষে এলো যখন খাঁ সাহেবকে অস্ত্র লোকের কাছে হার মানতে হলো, আর সেও কি না এক বিদেশীর কাছে।—

একদিন দরবারে সব বিখ্যাত বোকারা একসঙ্গে বলে থাকেন এমন সময় বাইরের দরজার দ্বাা সোরগোল শোনা গেল ও অল্পক্ষণ পরে সকলে দেখলেন যে একটি আগন্তুক কাল বোড়ার চড়ে দরজার কাছে উপস্থিত হয়েছেন। খাঁ সাহেব তাঁকে অতি ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করে নিজের পাশে বসালেন ও তাঁর নাম পরিচয় জানতে চাইলেন।

আগন্তুক বলেন, “আমার নাম ভাস্কর খাঁ। আপনার দেশের বহু আশ্চর্য কথা শুনে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছি।—কে না জানে আমাছুজা খাঁ সাহেবের নাম? আমার দেশ হিন্দুস্থান—সেখানের লোকেরাও আপনার কথা শুনেছে।”

এই সব শুনে খাঁ সাহেব খুব খুশী হলেন। অতিথিকে নানা ভাবে যত্ন করতে লাগলেন। সকলে মিলে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আরাম করে গল্প করতে বসলেন। রাজি গভীর হতে লাগল, সকলের মেজাজও সেই সঙ্গে খুশী হতে লাগল, আর গল্পার শব্দের মাজাও চড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পরে খাঁ সাহেবের গল্পার স্বরই আর সকলের উপরে শোনা যেতে লাগল। কেবল আগন্তুক চুপ করে এদের সব কথা শুনে লাগলেন। দেখা গেল যে এদের গল্পের লে আছে কিছু না কিছু সম্পত্তি নিয়ে গর্ভ করা, আর খাঁ সাহেব সকলের চোরে বেশি এই রকম গল্প বলে চলেছেন।

তোমার কাছে সভা ভাঙ্গবার মুখে খাঁ সাহেব বিদেশীকে বলেন, “কি হে আগন্তুক, তোমার গল্পার আওরাজ তো শুনেতে পেলাম না একবারও। তোমার কি কিছুই বলবার নেই? তুমি কি এতই গর্বী যে কোন সম্পত্তি, উল্লেখ করে গর্ভ করতেও পার না?”

তাজব খাঁ দীর্ঘকাল ফেলে বল্লো, “খাঁ সাহেব, ভাবিছলাম। আপনারা এত ছোট জিনিস নিয়ে এত বড় গল্প ক’দিয়েন যে আপনাদের সামনে আমার মুখ খুলতে লজ্জা করছে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমার বহু সম্পত্তি, আপনার থেকে হাজার গুণ বেশি। এই ধরন, আপনার বেগম সাহেবা আমার মায়ের ঝিদের মত পোশাক পরেছেন। আর ওই গহনাগুলি কোন আমিরের ঘরের মেরেদের উপযুক্ত নয় আমাদের দেশে। এই সব কারণে আমি চূপ করে আছি।”

তাজব খাঁর কথা শুনে খাঁ সাহেবের মেজাজ ধারাপ হয়ে গেল। বাকি সকলে লাফিয়ে উঠে চিৎকার করতে আরম্ভ করল। কেউ বল্লো, “এ কি রকমের আদব-কায়দা? বেগম সাহেবকে অপমান করছে।” অস্তর বল্লো, “খাঁ সাহেবকে নিচু নজরে দেখছে।”

তাজব খাঁ বল্লো, “বন্ধুগণ, রাগ করছ কেন? আমি তো সত্যি কথাই বলছি। তোমাদের এই শুকনো পাহাড়ে দেশ আর আমাদের হিন্দুস্থানের অনেক তফাৎ। আমাদের কুঁড়েঘরগুলিরও এখানের বাড়ীর থেকে শ্রী আছে বেশি। এখানের রাস্তা পাথর ভর্তি, বোড়া ঠিক মতন চলতে পারে না। আর আমাদের রাস্তার হলুদ রংএর বালুর উপর সমানভাবে পশমের গলিচা দিয়ে ঢাকা। এখানের খাবার পুষ্টিকর, কিন্তু আমাদের খাবারের মত সুস্বাদু নয়, এখানের সাজ-পোশাকে শীত আটকায় বটে কিন্তু আমাদের পোশাকের মত সেগুলির চটক ও জাঁকজমক নেই। এখানের ধনী লোকেরা আমাদের তুলনার গরিব, এমন কি আমার একটি সিন্দুকে যা ধনরত্ন আছে তা ভাল করে হিসেব করলে আপনার এই কান্দাহারকে কিনে নেওয়া যায়।”

এত বড় কথা শুনে সকলে বাক্যহীন হলো। খাঁ সাহেব তারপর বলেন, “বটে, এত বড় সম্পদ তোমার যে আমার সঙ্গে ভূমি টেকা দিতে চাও? বেশ, এই ৫০,০০০ মোহর বাজি রাখা যাক। ভূমি এক বছর বাস করবে এই কান্দাহারে আর প্রত্যেক দিন আমরা হুঁকনে নুতন সাজপোশাক পরে রাস্তার জনসাধারণের

সামনে ঘুরব। তারা আর দেখে কে বেশি ধনী হ সৌধিন। এক বছর শেষ হলে, যে জিতবে সে মোহরগুলি পাবে।”

বাকি লোকেরা সকলেই এতে রাজি হলো। বিদেশী তখন একটি চিঠি লিখে তার কাল বোড়াটির লাগামে সেটি বেঁধে তাকে—“কাল, ছুটো। মার কাছে গিয়ে আমার সব পোশাক নিয়ে এসো।” বোড়া তাঁর বেগে ছুটে চল্লো এবার আর অন্নকণের মধ্যেই তার বাড়ী পৌঁছে গেল।

তাজব খাঁর মা বিখ্যাত যাহুকর। তিনি হেলেকে কিছু কিছু বিজ্ঞা শিখিয়েছিলেন। হেলের চিঠি পেয়ে ঘরের ভিতর থেকে হুঁটি ছোট তোরঙ্গ বার করে বোড়ার পিঠে সেগুলি ঝাটলেন। তারপর বোড়াকে বলেন, “কাল, এতে তিন শ নুতন পোশাক আর অনেক হীরা জহরৎ আছে। আমার হেলের কাছে এগুলি পৌঁছে দাও।” বোড়া সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে তাঁর বেগে কান্দাহারের রাস্তায় এগিয়ে চল্লো ও অন্নকণের মধ্যে খাঁ সাহেবের রাজ্যে এসে পৌঁছল।

রাজবাড়ীর সামনে আমাতুল্লা খাঁ তাঁর সঙ্গীসাথী নিয়ে অপেক্ষা করছেন তাজব খাঁর দেশের জীবনপত্তর দেখবার জন্য। বোড়ার পিঠে হুঁটি ছোট তোরঙ্গ দেখে সকলে গাড়িয়ে গাড়িয়ে হাসতে লাগল। হা, হা, হা, তাজব সাহেব, এই বাক্সে এক বছরের পোশাক আছে তোমার? আর কোথায় তোমার সেই ধনরত্ন যা দিয়ে ভূমি কান্দাহার কিনছিলে?” মোহরগুলি বোধ হয় কান্দাহারেই রইল।

কিন্তু পরদিন সকালে যখন খাঁ সাহেব নুতন পোশাক পরে বোড়ার চেপে এসে দাঁড়ালেন তখন দেখা গেল যে তাজবও চমৎকার পোশাক পরে কাল বোড়ার পিঠে চলেছে। উপরন্তু কালর গলায় খাঁ সাহেবের বেগমের মত গহনা ঝুলছে। ওই ছোট তোরঙ্গ থেকে সকলের চোখের সামনে হুঁশ মিহানকুই নুতন পোশাক তাজব খাঁ বের করে পরল। হুঁজদের সাজ পোশাক দেখে জনসাধারণ হতভম্ব—হার জিৎ কি হবে এঁকথা নিয়ে সকলেই আলোচনা শুরু করেছে।

শেষের দিন সহরের লোক সকলেই এই রাত্তর হু ধার ছুড়ে দাঁড়িয়ে গেল। প্রথমে আশাহুলা খাঁ এলেন। তাঁর গায়ে সোনালি রংয়ের কিংখাবের পোশাক আর এতোকটি বোতাম ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নৃত্তির মত খোঁদাই করা। বুঝকদল বাঁশ বাঁজাছে আর বুঝতীরা সববৎ খাচ্ছে ও মাঝে মাঝে ঘুরে ঘুরে নাচছে। খাঁ সাহেবের পায়ে সবুজ জুতো জরিব কাছে ভরা, জহরৎ বসান টুপি ও গায়ে অবল্য শাল-দোশালা জড়ান। যেই না খাঁ সাহেব বোতামগুলি ছুঁয়েছেন অমনি বুঝকদল বাঁশ বাঁজাতে শুরু করল ও মেয়েরা ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। সত্যর সকলে “সাবাস সাবাস” বলে চিৎকার আরম্ভ করল।

কিন্তু পরব্রহ্মে তারা তাকব খাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়ে চুপ করে গেল। তার পরণেও কিংখাবের পোশাক, পায়ে জরিব নাগরাই জুতো, মাথায় মণিযুক্ত বসান টুপি ও একটি সোনার পাতের তৈরি আলোয়ান সর্বাঙ্গে জড়ান।

তার বোতামগুলি ছোট ছোট পাখি ও সাপের মত খোঁদাই করা। যে ব্রহ্মে সে বোতামগুলিতে হাত

দিল তখনই পাখিগুলি উড়ে ঘুরতে লাগল। তাদের হুমিটে গানে সত্য ভরপুর। সাপগুলি কণা ধরে কৌস কৌস করে ছলতে লাগল। হঠাৎ তারা মাথা বাড়িয়ে এগিয়ে এসে খাঁ সাহেবের বোতামগুলিকে সব গিলে ফেলো।

সকলে ভিত্তিত হয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগল। তখন খাঁ সাহেব নিজের এগিয়ে এসে তাকবখাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেন, “সাবাস—আপনারই জিত হলো। চলুন, মোহরগুলি আপনারা দি।”

কিন্তু তাকব খাঁ বলো: “খাঁ সাহেব, এ কয়টি মোহর আমার কাছে কিছুই নয়। বাজিতে জিত হয়েছি তাই যথেষ্ট।” এই বলে জনসাধারণকে মোহরগুলি সব দান করে দিল। বিস্মিত সভ্যমণ্ডলী এই দৃশ্য দেখতে লাগল। এমন সময় একটা ঘোর ধূলার ঝড় উঠল। সকলে চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ তারপর হাওয়ার বেগ কেটে যেতে চোখ খুলল। চেয়ে দেখল তারা যে, বহুদূরে সেই ঝড়ের মধ্যে তাকব খাঁ কাল ঘোড়াটির পিঠে চড়ে ক্ষতবেগে উধাও হয়ে গেল।



# সাময়িকা

## রামমোহন

“Rammohan stands in history as the living bridge over which India marches from her unmeasured past to her incalculable future.”

এত অল্প কথায় এত বেশী করে রামমোহনের পরিচয় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। নিরবধিক আচার অনুষ্ঠানের বাহ্যিকতার ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মের আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে নির্দোষ করে দিয়েছিল, রামমোহন সেই অসারতা, সেই আবর্জনা থেকে প্রাচীন ধর্মকে পরিষ্কৃত করে তাকে, প্রাচীন কাল থেকে নবীন কালের মধ্য দিয়ে যে চিরন্তনের ধারা চলছে তার সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। যে গতিবেগের মধ্য দিয়ে প্রাচীনতা নিরন্তর নবীনতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে, সেই গতিবেগ দেশের জীবনে তিনি সঞ্চারিত করে দিলেন। আজ হুশো বছর পরেও আমরা দেখি, সেই যে প্রেরণায় দেশকে উদ্ধৃত্ত করেছিলেন, প্রতিবাদের মধ্যে, বিচ্ছিন্নতার মধ্যে তার স্রোত বিচিত্রভাবে, সংঘাতের আবর্তে প্রবল ভাবে আজো বহে চলেছে। আমি এক ব্যক্তিকে, যিনি কোনো বিশেষ ডিগ্রীতে, বা খেতাবে বা পদমর্যাদায় চিহ্নিত নন, যিনি জনসাধারণেরই একজন, তাঁকে তিন-চার দিন আগে প্রশ্ন করেছিলাম—এই যে থাকা রামমোহনের কথা আজকাল শুনে পাচ্ছি, তিনি কে? উত্তর পেলাম, আগনি বা আমি আজ যা হয়েছি, তা তিনি ছিলেন বলেই হয়েছি। এত তাৎপর্যপূর্ণ কথা আমি খুব কমই পড়েছি বা শুনেছি।

রামমোহন তাঁর জীবিত কালে দুটি জিনিষের সমাপ্তি দেখে যেতে পেরেছেন—এদেশে সতীদাহ প্রথা রোধ ও ইংল্যান্ডে Reform Bill পাস হওয়া। এই বিতীর্ণ বিষয়ে রামমোহনের যে কতখানি আগ্রহ ছিল ও

প্রথমটির জন্য তিনি কি ভাবে যুঝেছিলেন সে বিষয়ে অনেক বক্তব্য আছে এবং আমি আশা করি অন্য অনেকেই এসকল কথা বিশদভাবে আলোচনা করবেন। কিন্তু এই দুটি কাজ ছাড়াও আরও বহুদিকে তাঁর কর্মতৎপরতা বিস্তৃত ছিল; তার অনেক কাজ তাঁর জীবদ্দশায় সম্পূর্ণতা লাভ করেনি। কিন্তু তার মধ্যে এমন প্রাণাবেগ তিনি সংক্রামিত করে দিয়েছিলেন যে তাঁর জীবনাবসানের পরেও সেই সব কর্মের গতিবেগ জ্বলিত ভ হয়েই নি, নানাদিক থেকে শক্তি সংগৃহীত হয়েছিল ও তারা পূর্ণ পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছিল। শুধু তাই নয়, তারা নানা দিকে শাখায়িত হয়ে রূপায়িত হয়েছে ও হচ্ছে বহুবিধ পরিকল্পনার মধ্যে। কেবল ভাড়া বা রক্তপাত বিপ্লব নয়—একটা উচ্চতর বৃহত্তর আদর্শকে স্থাপিত করার জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিকূলতার মধ্যে যে পরিবর্তন আনতে হয় সেটাই বিপ্লব। মানসিক বিপ্লব আগে আগে। তাকে অহসরণ করে বিপ্লবের অন্ত যা কিছু আহবানিক। আধুনিক যুগে, আমাদের দেশে এই বিপ্লবের আশ্রয় উজ্জ্বল উৎসারিত করেছেন রামমোহন সর্বপ্রথমে। বাংলাদেশে, ভারতবর্ষে প্রকৃত (সাক্ষাৎ) বিপ্লবীদের তিনি প্রধান পুরোধা। একাকী রামমোহন বা গুরু করে গিয়েছিলেন, যে যে পথের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন—ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, রাজনীতিতে, মানসিক ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার সাধনায়, দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায়, বারত ও জমিদারের সম্বন্ধ সম্পর্কে (যাকে আজ আমরা প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্ট বলে অভিহিত করি)—আজ হুশো বছর পরেও সেই



সব কাজের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন ভাবে বয়ে চলেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে, একজন মানুষের জীবনের ইতিহাসে এই দ্বারাবাহিকতা এক অভ্যাসার্ধ্য ঘটনা। আমি এইদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম মাত্র।

আরেকটা জিনিষ আমাকে আশ্চর্য্যায়িত করে, সেটা হচ্ছে তাঁর একান্ত নিঃস্বের জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্যের বা উপাদানের স্বল্পতা। জনসাধারণের ভক্ত তাঁর প্রচেষ্টা, তাঁর ক্রিয়াকলাপের সাময়িক বহু সাক্ষ্য রয়ে গেছে; রয়েছে তাঁর বই, ফার্সীতে, ইংরেজীতে, বাংলায়; রয়েছে তাঁর চিঠিপত্র বিশেষ করে ইংরেজীতে, রয়েছে তাঁর সংবাদপত্রসমূহ, রয়েছে তাঁর শাস্ত্র সম্বন্ধীয় তর্ক, হিন্দু পণ্ডিতদের ও ক্রিস্চান মিশনারীদের সঙ্গে, রয়েছে তাঁর প্রবন্ধ, ব্যাকরণ, রয়েছে তাঁর স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার ও অপরের প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজে সাহায্যের কথা, রয়েছে লেখা মারকত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের Select Committeeর কাছে তিনি যে সব মতামত পেশ করেছিলেন। এই সব কর্মের বর্ণনা, তাঁর এই সব কীর্ত্তি প্রোথিত রয়েছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পথে পথে, এরা তার স্বাভি-সৌন্দর্য্যে গুণু হাবসর ভাবে পড়ে আছে তাই নয়, এদের মর্যবাপী আজো ধ্বনিত হচ্ছে অনেক স্থরে অনেক স্থলে, বুকি পেয়েছে তারা, পরিণতির পথে প্রসারিত হয়েছে।

কিন্তু নেই সমসাময়িক কালে দেশী ভাষার দেশবাসীর দ্বারা রচিত তাঁর জীবনী। এটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য্যের বিষয় বলে মনে হয়। অতীতকে তাঁর কীর্ত্তির যদি কোনো দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত বাস্তব প্রমাণ না থাকত তবে কোনো আঁতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি এতদিনে আভিস্মর্য্য স্বীকৃতি প্রয়োগ করে প্রমাণ করে দিতে পারতেন যে রামমোহন বলে কোনো ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলেন না। সমস্ত ব্যাপারটাই এক পক্ষপাতহ্রষ্ট সম্ভ্রমারের, দেশী ও বিদেশীদের করুণাপ্রসূত রূপকথা, অলীক কাহিনী। এমন কি তাঁর জন্মকাল সম্বন্ধেও মতভেদ আছে।

এদেশের তখনকার কালের প্রচলিত ভাষায়,

সংস্কৃতে, ফার্সীতে, আরবীতে, হিন্দুস্থানীতে বা বাংলায় সমসাময়িক কালে লেখা তাঁর কোনো জীবনী নেই। কারণ আর যাই হোক—উপাদানের অভাব নয়। একটা কারণ হতে পারে—তিনি একাকী অমিতব্যয়ী সংগ্রাম করে গেছেন, তাঁর ধ্যানধারণা সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গীকে অতিক্রম করে দূর ভবিষ্যের দিকে এত ছাড়িয়ে পড়েছিল, যে এদেশে তখন এমন কোনো লোক বা দল ছিল না, যিনি বা দ্বারা তাঁর সার্বভৌমিক ও সর্গাজীপ ভাবধারার সম্ভাবনা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন।

রামমোহনের সমসাময়িক কালে জীবনী লেখার ক্ষমতা আমরা বিশেষভাবে খণী হুজন ইংরেজ মহিলায় কাছে। তাঁদের নাম, মিস্ সোফিয়া ডেব্‌সন কলেট ও মিস্ মেরী কার্পেন্টার।

রামমোহন নিজের কোনো আত্মজীবনী লিখে যান নি। Athenaeum পত্রিকায় ৫ই অক্টোবর ১৮৩৩ এর সংখ্যায়, তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রামমোহনের লেখা একটি পত্র ছাপা হয়, যাকে আমরা Autobiographical sketch বলে অভিহিত করতে পারি। এটা খুবই ছোট চিঠি, কিন্তু দলিল হিসাবে এর মূল্য খুবই বেশী। কিছুদিন আগে (শনিবার ২০শে মে, ১৯৭২) একটি বিদগ্ধ সভায় রামমোহনের বিষয় আলোচনা হচ্ছিল—আমি প্রোতা হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সেই সভায় কয়েকজন বললেন, যে রামমোহন যে তির্য্যকত গিয়েছিলেন এই প্রচলিত ধারণাটা খুব সম্ভবত ভ্রান্ত। তার কোনো প্রমাণ নেই। তবে যখন তিনি East India Company-তে চাকরী করতেন তখন তিনি ভূটান ভ্রমণ করেছিলেন তার প্রমাণ আছে।

এই বিষয়ে আমি একটা প্রশ্ন তুলতে চাই। যে biographical sketch-এর কথা আমি আগেই বলেছি, সেখানে রামমোহন স্বয়ং লিখেছেন—“When about the age of sixteen...I proceeded on my travels, and passed through different countries,

chiefly within but some beyond the bounds of Hindusthan...

ভারতবর্ষের বাইরে কিছু কিছু জায়গায় ভ্রমণের এই যে উদ্দেশ্য রয়েছে সেটা কি হতে পারে? সেটা যে তির্যক হতে পারে, এই ধারণা কি কেবল অদূরপরাহত কল্পনা?

ডঃ ল্যাটিক কার্পেন্টার, ১৮৩৩ সালেই লিখছেন রামমোহন প্রসঙ্গে—“and he at last determined, at the early age of fifteen, to leave the paternal home and sojourn for a time in the Thibet, that he might see another form of religious faith.”

ডঃ কার্পেন্টার বলেন, রামমোহন যখন লওনে ছিলেন তখন তাঁর কাছ থেকেই শুনেছেন। এখানেও আমরা তাঁর তির্যক ভ্রমণের উদ্দেশ্য পাই। সাক্ষ্য হিসাবে এটা কি অগ্রাহ্য?

যিনি আরবী ফার্সীতে কোরাণ পড়েছেন, সংস্কৃতে বেদ উপনিষদ পড়েছেন, ও পরবর্তীকালে Hebrew ভাষার Bible পড়েছেন, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞান আহরণ করবার জন্য তির্যক যাত্রার সজ্জাবনাটাই যেন বেশী করে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে।

আর একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। চারিত্রিক সামঞ্জস্যের কথাই উদ্দেশ্য আমি করছি। তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি ছিল যা থেকে তিনি এমন অমিত শক্তি লাভ করেছিলেন যা তাঁর প্রতিভাকে অতীত কাল থেকে অদূর ভাবীকাল পর্যন্ত বেদীপাশমান করে রেখেছে?

তিনি মানুষ ছিলেন, বিষয়-সম্পত্তির পরিচালনাতেও তিনি বিশেষ দক্ষতা ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁর যত্নসহকারে তিনি কোনোদিন অধীকার করেন নি, কোনোদিন কোনো অলৌকিক ঘটনার আশ্রয় নেন নি, কোনোদিন তিনি নিজেকে দেবতার পদে বসান নি, বা বসাতে দেন নি, নিজেকে ভগবানের অংশ বলে প্রচার করেন নি বা করান নি। তবু যে তেজস্বিতা, যে মনীষিতা, যে স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি, যে শাস্ত মানসিকতা, যে

উদার ভগবদ্ প্রত্যয় তাঁর চরিত্রকে হৃদয়ময় করেছিল এবং আজো যে দীপ্তিচ্ছটা অমান অক্ষুর রয়েছে, তার উৎপত্তি কোথায়?

তাঁর কর্মের বৈচিত্র্য, প্রাচুর্য ও বহুমুখীনতাকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। নানাধিকৈ তাঁর কর্মধারা বিস্তারিত। নিজ নিজ ক্ষেত্রে এদের দূরবিসর্পী তাৎপর্য যথার্থভাবে বুঝতে গেলে প্রত্যেক বিষয়টিতে আলাদা আলাদা ভাবে অন্বেষণ চালাতে হবে। আগেই বলেছি, অনেক ক্ষেত্রেই যে যে কাজ তিনি শুরু করেছিলেন, তা পরিণতি পেয়েছে তাঁর মৃত্যুর পরে—অনেক জটিলতা অতিক্রম করে। আবার এমনও আছে যার ইঙ্গিত চকিত বিদ্যুতের মত জলে উঠেছিল তাঁর মানসসম্ভার—যা রূপ গ্রহণ করেছে পরবর্তী শতাব্দীতে বহু মনীষীর বহু প্রয়াসের ফলে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি:

১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে ফরাসীদেশের বাহির্বিসয়ক মন্ত্রীকে তিনি যে চিঠি দেন তার মধ্যে নিহিত রয়েছে সেই সজ্জাবনার ইঙ্গিত যা কলেবর গ্রহণ করেছিল League of Nations-এ United Nations এ, এবং পূর্ণভাবে কবে সেই আদর্শ কার্যকর হবে তার আশার প্রতীক্ষা করে রয়েছে সমগ্র মানব সমাজ। তিনি লিখেছেন—

“By such a Congress, all matters of difference, whether political or commercial affecting the natives of any two civilized countries... might be settled amicably and justly to the satisfaction of both and profound peace and friendly feelings might be preserved between them from generation to generation.”

এই চিঠির আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—

“It is now generally admitted that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches. Hence enlightened men in all

countries feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race."

এই যে সমগ্র-মানব সমাজ-বোধ—বিশ্বমানবতা—মানবের ঐক্যত্বে এই বিশ্বাস, এটা তিনি পেয়েছিলেন কোথা থেকে? সেই যুগে, উনবিংশ শতকের প্রথম পঞ্চকে, কি দেশে, কি বিদেশে, কোথাও আমরা এই ধারণার বিকাশ ত দেখতেই পাই না, কোথাও তার কোনে স্মরণও দেখতে পাই না। এই ভাবধারার, যে ভাবধারা রামমোহনকে এক অভিনব মহিমায় মণ্ডিত করেছে, সেই ভাবধারার উৎসের সন্ধান যদি আমরা করি তবেই আমরা তাঁর জীবনের মূল মর্ম বুঝতে পারব।

কোন কৈশোরে কোথা থেকে এই বীজ তাঁর চিত্তে উড়ে এসে পড়েছিল, তার সন্ধান আমরা জানি না, এই বীজই অঙ্কুরিত হয়েছিল Tuhfat-ul-Muwahhidin-এ ১৮০৩ সালে বোধকরি, এবং শাখারিত হয়েছিল ১১ই মার্চ ১৮৪০ সালে Trust Deed রচনায়। সেই শাখার তাঁর জীবদ্দশায় ফুল কোটেনি, ফল ধরেনি :

এই Trust Deed-এর একটু অংশ আমি উদ্ধৃত করছি—

"Shall at all times permit the said building...to be used...as and for a place of Public Meeting of all sorts and descriptions of people without distinction for the worship and adoration of the Eternal, Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe but not under or by any other name designation or title...And that no sermon preaching discourse, prayer or hymn be delivered in such worship but such as have a tendency to the promotion

of the contemplation of the Author and Preserver of the Universe or to the promotion of charity morality...and the strengthening of the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds."

এই যে অবিভীষিত দেবতা,—রামমোহন সেই এককে, সেই অবিভীষিত বিশ্ববিধাতাকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সমস্ত আবরণ মোচন করে সেই একমেবাদ্বিতীয়তাকে তিনি নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ই তাঁর চিত্তকে মুক্ত করেছিল বিশ্বসত্যের সঙ্গে, তাঁর চিত্তকে অমুপ্রাণিত করেছিলো সমগ্র মানবের ঐক্যবোধে, শ্রী পুরুষ নিঃশেষে সমগ্র মানবের কল্যাণে। এই পটভূমিকাতে যখনই আমরা রামমোহনকে দেখি, তখনই তাঁর চরিত্রের, সাধনার, কর্মের পূর্ণ রূপ সমুজ্জ্বল ভাবে ফুটে ওঠে। Botanyর মধ্যে যেমন ফুলের সৌন্দর্য ধরা দেয় না, তেমনি dialectics-এর মধ্যেও রামমোহনের স্বরূপ খুঁজে পাব না।

আমি শেষ করছি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় (দুটি কথাই সমরোপযোগী পরিবর্তন করে) :—

“তাঁর জন্মের (ব্রহ্মার) আজ দুইশত (একশত) বৎসর অতীত হল। সেদিনকার অনেক কিছুই আজ পুরাতন হয়ে গেছে; কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতনের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতই আধুনিক কেননা তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীত কালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই—তার অস্পষ্টত চলে গিয়েছে ভারতের সূর্য্য ভাবীকালের অভিমুখে। তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত।...রামমোহন যে কালে বিরাজ করেন, যে কাল...অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারি নি।”

—শুশাঙ্ক

# সংসার

## মোটর-সাইক্ল রিকশ

মোটর-সাইক্ল রিকশ চালাইতে দিলে প্রথমত চালকদিগকে কঠিন পরিশ্রম না করিয়া অর্থোপার্জন সক্ষম হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় ও দ্বিতীয়ত শিক্ষিত বেকার যুবকগণ ঐ অটোরিকশ চালাইয়া সুখে দিন গুজরান করিতে পারেন। আমরা এই জাতীয় যন্ত্র রিকশ প্রবর্তন করিলে কলিকাতা ও অল্পাল্প বঙ্গদেশীয় সহরে অনেক যুবকের বেকারত্ব দূর হইতে পারে মনে করি ও কতৃপক্ষকে ঐ ধরণের রিকশ চালাইবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছি। কাছাড়ের সম্মতি এই ব্যবস্থা করার আয়োজন সম্বন্ধে “সুগমশক্তি” পত্রিকায় প্রকাশ :—

কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার জেলার শিক্ষিত বেকার তরুণদের জন্য ৫৫টি নতুন অটোরিক্সার পারমিট দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই ৫৫টি অটোর মধ্যে ২০টি আসবে করিমগঞ্জে, ২৪টি যাবে শিলচরে এবং ১০টি যাবে হাইলাকান্দিতে। করিমগঞ্জে খুব শিগগিরই অটো প্রচলন করার জন্য শিক্ষিত বেকার সংস্থা চেষ্টা করছেন।

## ত্রিপুরা রাজ্যে অনাবুজি

“ত্রিপুরা” সাপ্তাহিকে উক্ত রাজ্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী অনাবুজির যে বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় ঐ অঞ্চলের মানুষের কি প্রকার ক্ষতি হইয়াছে। আমরা ঐ বর্ণনা অংশতঃ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

১১ই জুলাই শাসকদলের জনৈক সদস্য (খুব সম্ভব অসহ প্রমথকে পুঁজি করিয়া) খরা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিরোধী পক্ষও ইহাতে সায় দেন। কিন্তু কোন সদস্যই তাঁহার স্বীয় এলাকা সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য পরিবেশন করিতে পারেন নাই। প্রত্যেকের

মুখেই এক কথা, খরার দরুণ জুম, বোরো, আউস ও পাট জমি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সেনগুপ্ত খরার তথ্যাদি বিধান সভায় পরিবেশন করিতে না পারিয়া পর পর দুইটি সাংবাদিক বৈঠক ডাকিয়াছিলেন। প্রথম বৈঠক ১৪ই এবং দ্বিতীয় বৈঠক ১৭ই জুলাই। তথ্যের মধ্যে আছে, মোট ৮ লক্ষ ৬২ হাজার লোক খরার কবলে পড়িয়াছে উহার মধ্যে জমিয়ার সংখ্যাই অধিক; ২ লক্ষ ২০ হাজার। জমির ফসল নষ্ট হইয়াছে, বোরো প্রায় তের হাজার একর; আউস ১ লক্ষ ৫০ হাজার এবং জুম ২৭ হাজার একর। সমগ্র মোট ক্ষয় ও ক্ষতির পরিমাণ ধার্য হইয়াছে ৭ কোটি টাকা। কেন্দ্রের নিকট আপাততঃ ত্রাণ কার্য চালাইবার জন্য ৩ কোটি টাকা সাহায্য চাওয়া হইয়াছে।

## বাঙালীর সর্বনাশ—যড়মন্ত্রের কথা

যুগবাণী সাপ্তাহিকে প্রকাশ :—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্বার্থ দেখবে এটাই আমরা আশা করি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যেমন তার কর্তব্য নয় সারা ভারতের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বাঙালীর উপকার করতে বসবে সিদ্ধার্থস্বরূপ রায়েব সরকার, এ রকম আশাও আমরা পোষণ করি না। যুক্তফ্রন্ট সরকারের মতো অহিনিস কেন্দ্রবিরোধী জিগীর ভুলুক পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার এ কামনাও আমাদের নাই। কিন্তু বাঙালীকে পিট করে, বাঙালীকে রিক্ত, বাকিত, সর্বনাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের রথের চাকা যদি এগিয়ে যেতে চায় তবে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করার দায়িত্ব বাঙালীর সরকারকেই নিতে হবে। গত সপ্তাহে বিধান সভায় দুটি ঘটনার আমরা এ সম্পর্কে বিস্মিত ও হর্ষমত হইয়াছি। পশ্চিম বাংলার বর্তমান সরকার

বাঙালীর স্বার্থকে, বাঙালীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের, বিশেষ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বাহবা পাবার জন্য লালায়িত বলে এখন প্রতীত হচ্ছে।

বার্ষপুত্রের ইকো কারখানার ম্যানেজমেন্ট কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন, সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিধান সভার প্রস্তাব এনে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। দুর্গাপুরে ইম্পাত কারখানা পরিচালনার সরকার যে অব্যোধ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, কয়েক শত কোটি টাকা যেভাবে খোলামুচির মতো নষ্ট করেছেন, তারপর ইণ্ডিয়ান আয়রণ অ্যান্ড স্টীল কোম্পানী ভালো চলছে না বলে পরিচালনাভার নিজের হাতে নিয়ে নেবার মতো মুক্তি থাকতে পারে না। বাঙালী পরিচালিত এটি ছিল বৃহত্তম শিল্প কারখানা; বামপন্থী জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়নের উচ্ছৃঙ্খলতার নীতির ফলে ইতিপূর্বেই এই কারখানাটি অচল হয়ে এসেছিল, এখন কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে কারখানাটি নিয়ে নিলেন। বাঙালী পরিচালনা শিল্পক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় এটা প্রমাণিত করার ভযোগ কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়েননি;—কিন্তু যদি তা প্রমাণিত হতোও থাকে তবে তাতে আমাদের হৃৎ-বোধ করাই উচিত, আনন্দ ও গর্ব নয়। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আনন্দ ও গর্ব সামলাতে না পেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রস্তাবই এনে ফেলেছেন বিধান সভায়। অথচ পশ্চিমবঙ্গ থেকে টাকা লুটে নিয়ে দাবীদুওয়াল হরিয়ানার একটি ব্যক্তিগত মালিকানায় ইম্পাত কারখানা খুলেছেন, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ তো সেখানে দেখা যায় না?

শিল্পক্ষেত্রে বাঙালীর এই পরাজয়ের পর গত সপ্তাহে বিধানসভার ক্রিয়মন্ত্রী আবদুল সাভার, কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালী চাবীকে সর্বস্বান্ত করার চক্রান্ত সম্পর্কে অতি ক্রীণ কর্তে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার একটি পাট কর্পোরেশন গঠন করেছেন, অতি সময়ে যা থেকে বাঙালীকে বর্জন করা হয়েছে, যদিও পাট প্রধানত বাংলার সম্পদ। পাট কর্পোরেশনে কোন চেয়ারম্যান নিযুক্ত না হওয়ার কেন্দ্রীয় সরকার খুশিমতো কাঁচা পাটের সর্বনিম্ন দাম বেধে দিয়েছেন কুইটাল প্রতি ১১৫

টাকা। পাটশিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করার দাবী বহুদিন আগেই উঠেছে। আমরা সে দাবী সমর্থন করি। আমরা ব্যবহার একথাও প্রমাণ করেছি যে পাটকল মালিকরা কোটি কোটি টাকা কালো টাকা উপার্জন করছে, রাষ্ট্রকে তার প্রাপ্য কর কীকি দিয়েছে এবং পাটশিল্পকেও ধ্বংস করে আনছে। যে কেন্দ্রীয় সরকার ইকোকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করতে পারল, সে সরকার বাজোরিয়া প্রমুখদের পাটকল-গুলির দিকে ফিরেও তাকায় না—অথচ শিল্পপতি হিসাবে তার বীরেন মুখার্জির চেয়ে বাজোরিয়ারা সৎ ও দক্ষ একথা কেউ বলবে কি?

রাজ্য ক্রিয়মন্ত্রী বলেছেন, এক কুইটাল পাটচাষের খরচ ১২৭ টাকা; তাই এক কুইটাল কাঁচা পাটের বিক্রয় মূল্য ন্যূনপক্ষে ১৫০ টাকা হওয়া উচিত। ক্রিয়মন্ত্রী পাটচাষের খরচ কমিয়ে বলেছেন, তিনি চাষীর নিজের ও তার পরিবারের লোকদের শ্রমকে অবৈতনিক ধরে নিয়েছেন। বস্তুত একমণ পাটের দাম কমপক্ষে ৮০ টাকা হওয়া উচিত—যদিও ১০০ টাকা হলেই জায়সজ্জত দাম হয়। সেই হিসাবে এক কুইটাল কাঁচা পাটের দাম হওয়া উচিত কমপক্ষে ২০০ টাকা; ২৫০ টাকা হওয়াই অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

বাংলার চাষীকে তার জ্বাভ্য প্রাপ্য না মিটিয়ে পাট চাষ করতে বলার অধিকার কারও নেই। জ্বাভ্য দাম না পেলে সে পাট চাষ ছেড়ে ধান চাষ করবে। ১৯৬৮-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১১ লক্ষ ২৭ হাজার বেল (প্রতি বেল ২০০ কোজ ওজনের—হুই কুইটালের সমান) পাট উৎপন্ন হয়েছিল। সেবার পাটের দাম ছিল মণপ্রতি ৮০ টাকা। পরের বছর চাষী উৎসাহিত হয়ে বেশী জমিতে পাটচাষ করে—ফলে এই রাজ্যে উৎপন্ন হয়েছিল ৩০ লক্ষ ৫২ হাজার বেল। কিন্তু সে বছর পাটের দাম কমে যায়। ফলে ১৯৭০-৭১ সালে চাষী কম জমিতে পাট চাষ করে ও উৎপাদন নেমে যায় ২৪ লক্ষ ১৫ হাজার বেল। কেন্দ্রীয় সরকার এখন পাটের যে সর্বনিম্ন দাম হির করেছেন তার ফলে বাংলার চাষী আর পাট চাষে প্রবৃত্ত হবে না। এর চেয়ে তার জমিতে ধান চাষ করলে সে লাভবান হবে, পশ্চিমবঙ্গেরও খাভাভাব যুটবে।

## দেশ-বিদেশের কথা

### লিন পিয়াওএর আসনচ্যুতি

শেষ পর্যন্ত পিকিং মার্নিতে বাধ্য হইলেন যে মাওসেতুজের পরে যিনি চীনের চেয়ারম্যানের পদে অভিষিক্ত হইবেন বলিয়া স্থির ছিল সেই শক্তিমান নেতা লিন পিয়াও আজ নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত নাই। তিনি বিমান যোগে মঙ্গোলীয়া যাত্রাকালে বিমান বিনষ্ট হওয়ায় প্রাণ হারাইয়াছেন। তিনি মঙ্গোলীয়া যাইতেছিলেন এই কারণে যে তাঁহার যে আকস্মিক আক্রমণ করিয়া রাজশক্তি হস্তগত করার চেষ্টা তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। যে সকল গুপ্ত দলিল পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রমাণ হয় যে লিন নানান বড়বড়ের কার্যে লিপ্ত ছিলেন। ইহার কলে পিকিংএ যে সকল কথার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে চীনের রাজনীতি নেতাদিগের পরস্পর বিরোধী গুপ্ত অভিসন্ধি রুদ্ধ নহে; এবং রাশিয়ার দ্বারা নিযুক্ত গুপ্তচরদিগের কার্য কলাপ ও চীনের বিরুদ্ধে সজোরে চালিত হইতেছে। ১৯৪৯ খৃঃ অব্দে চীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে অন্ততঃ চারবার রাজশক্তি আহরণ চেষ্টার বন্দ সক্রিয় হইয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। এই সকল উপলক্ষে মাওসেতুজ স্বধন শত্রুদমন হেতু নানান নেতাকে অপহৃত করিয়াছিলেন সেই সকল নেতার অনেকেই কোন না কোন সময় মক্কোর সহিত জড়িত ছিলেন বলিয়া দেখা যায়। লিন পিয়াও স্বয়ং ক্রিশিয়াতে ১৯৩৯ হইতে ১৯৪২ পর্য্যন্ত ছিলেন এবং স্টালিনগ্রাদের দিকে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। লিন চেয়ারম্যান মাওকে

শত্রু নিপাতে সাহায্য করিয়া একটা কথা বুঝিয়া-হিলেন যে নানান ব্যক্তিকে যেমন করিয়া সরান হইয়াছে তাঁহাকে নিজেকেও সেই ভাবেই অপহৃত করা হইতে পারে। তাঁহার স্থিতি কিছুমাত্র সুর্য্যপ্রতিষ্ঠিত নহে এবং তিনি যে চেয়ারম্যান মাওকে বি-৫২ বোম্বার্ক বিমানের নামে আখ্যাত করিতেন তাহার মূলে কিছু সত্যও ছিল। এই জাতীয় একটি বর্ণনায় দেখা যায় লিন পিয়াও বলিতেছেন :—

“বি-৫২ কোন সময়েই সকলকে পরস্পরের সহিত লড়াইতে চেষ্টার ক্রটি করেন না। আজ তিনি যাহার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ ব্যবহা করেন কাল আবার তাহারই সমর্থনে অন্য কাহারও ধর্ষণে আত্মনিয়োগ করেন। আজ তাঁহার কথায় মধু বরিতে দেখা যাইলেও কাল তিনি .য তোমাকে কত্যা করিবার ব্যবহা করিবেন না, ইহার কোন নিশ্চয়তা লক্ষিত হয় না। অতীতে কত কেহই যে তাঁহার হস্তে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরে আবার তাঁহার হস্তেই নিপাত গিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা অগণিত। কোন রাষ্ট্রীয় শক্তিই তাঁহার সহিত একত্র প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে নাই। তাঁহার সহকর্মী ছিলেন ষাঁহারা তাঁহার প্রায় সকলেই আজ নিহত, নরত কারাক্ষক। তাঁহার নিজের পুত্রও তাঁহার উৎসাহিতনে অর্ধউগ্ৰস্ত। তিনি একটি সন্দেহ-পাগল রক্তলোপন বিরক্ত-মনোভাব-পুষ্ট অস্বাভাবিক চরিত্র ব্যক্তি।”

কাহারও কাহারও মতে ১৯৭০ হইতেই মাওসেতুজ লিন পিয়াওকে আর নিজ উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করিতেন না। অন্ত মতে তিনি ১৯৬৯ হইতেই এই

বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই উসুহির নদীর আশেপাশে ক্রিশিয়া-চীনের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। ইহা হয় মার্চ মাসে এবং ইহার পরে জুন জুলাই মাসে আরও ঘোরতর যুদ্ধের সূচনা হয়। পিকিং বিমান বন্দরে চু-এন-লাই ও কসিগিনের বন্দও ঐ বৎসরের ঘটনা। কিন্তু সেপ্টেম্বরে চীনাদিগের কসিগিনের সহিত সাক্ষাৎ আলোচনা ইহার পরেও হইতে বাধিল না ও তাহার কারণ অসুসন্ধান এখনও অসুমানের ক্ষেত্রেই রহিয়া গিয়াছে। যে সকল কথা চিন্তা করা হয় তাহার মূলে আছে মাওৎসেতুঙ্গের লিন প্রীতির অবসানের কথা। সীমান্তের যুদ্ধ সাজাইয়া দেখাইয়া চেয়ারম্যান মাও ক্রিশিয়ার সহিত লিনের সংযোগ ও চীনের অভ্যন্তরে দলগত বড়বড়ের প্রাচুর্ভাব যুদ্ধ প্রাক্কনে আনিয়া প্রকাশ্যে দেখাইবার চেষ্টা করেন। ক্রিশিয়াও মাও এর সহিত বন্ধুত্বের সম্বন্ধ রক্ষা ও লিনের বড়বড়ের সাক্ষ্য এই দুই সম্ভাবনার মধ্যে প্রথমটিকেই অবলম্বন করা বুঝির কার্য্য মনে করিয়া চীনের সহিত বিবাদ বৃদ্ধি না করাই স্থির করেন।

মক্কা যে লিনকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেন তাহার মূলে ছিল লিনের মাওকে শক্তিশীল করিবার প্রতিজ্ঞায় ক্রিশিয়ার বিশ্বাস না থাকিলেও সেইরূপ হইলে ক্রিশিয়ার সুবিধার সম্ভাবনা। এই কারণে ক্রিশিয়ার নেতৃগণ জানিতেন যে মাও যদি অপসৃত হ'ন তাহা হইলে ক্রিশিয়ার নানাদিক হইতে লাভ হইবে। ইহা ব্যতীত চীন-আমেরিকার নবজাত বন্ধুত্বও এইরূপ ঘটিলে আর সুগঠিত হইতে পারিবে না। কিন্তু ক্রিশিয়ান নেতৃগণ খোলাখুলি ভাবে লিনকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না কারণ তাহাতে লিনের কোন সুবিধা হইত না। গুপ্তভাবে সাহায্য প্রাপ্তিই স্থির হইল এবং পিকিং-এর সহিত সংখ্যর পঞ্চও খোলা রহিল।

মক্কা রেডিও ২৭ এপ্রিল ১৯৬১ একটি সংবাদ প্রস্তুত করেন যাহাতে বলা হয় যে লিন পিয়াও-এর উদ্ভাষাধিকার সম্বন্ধে কথা স্থির হইবার পরেই দুই সপ্তাহের মধ্যেই লিন পিয়াও এর নানা প্রকার বিপদের আরম্ভ

হয়। আরও বলা হয় যে মাওৎসেতুঙ্গ যখনই দেখেন যে সামরিক বাহিনীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে জনসাধারণ অসন্তুষ্ট ভিনি তখনই সকল দোষ সৈন্যদিগের উপরেই চাপাইবার চেষ্টা করেন। যদিও দোষটা অনেক সময়েই বিপ্লবী সংঘগুলিরই একান্তভাবে নিজস্ব দেখা যায়। এই সকল কথাই সর্বজনদীকৃত। সেপ্টেম্বর ১৯৬১-এর শেষের দিকে মক্কা হইতে একটা মাও বিরুদ্ধ পুস্তিকা বাহির হয় যাহার ভাষা ও মত প্রকাশের ভঙ্গীতে অনেকটা লিন-এর প্রচারের সহিত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এ সময় চাউ-কিসিগিন দেখাশোনাও হইয়া যায়। সেই কারণে পুস্তিকাটি বাজার হইতে টানিয়া লওয়া হয়। ১৪ই অক্টোবর ১৯৬১ হইতে ২০শে মে ১৯৭০ অবধি মাও কোন প্রকাশ্য মূলে দেখা দেন নাই। তিনি এই সময় সম্ভবতঃ তাঁহার ভক্তদিগকে শিক্ষা দিয়া বিরুদ্ধবাদীদিগকে হটাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। তিনি জানিতেন যে সোভিয়েট শক্তি লিন পিয়াও-এর সমর্থনে ততটা জোরালভাবে আসিবে না। কিন্তু তিনি নিজের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতেও পারেন নাই। বিরুদ্ধ দলকে দাবাইতে তাঁহার পূর্ণ এক বৎসর লাগিয়াছিল।

লিন পিয়াও যখন ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১এ মঙ্গোলীয়া যাত্রা করিলেন তখন তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন যে ক্রিশিয়ানরা তাঁহাকে খুবই বন্ধুভাবে সমর্থন দান করিবে। লিন যদিও মাও-এর হস্তে পরাজিত তথাপি তাঁহার সহায়তা ক্রিশিয়াকে শক্তি দান করিবে। তিনি যদি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা ক্রিশিয়ার মাও-বিরোধের কার্য্য নানা ভাবে শক্তিশালী করিত। লিনের মৃত্যু ক্রিশিয়ার পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিকর হইয়াছে। অতঃপর মাও কাহার উপর তলোয়ার টানিয়া অগ্রসর হইবেন? সম্ভবতঃ চাউ-এন-লাই-এর উপরেই ইহা হইবে। কিম্বা ইহাও হইতে পারে যে চাউ-এন-লাই মাওৎসেতুঙ্গকে তাঁহারই শিক্ষিত বিভা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়া চীনের ইতিহাসকে আর এক নতুন ধারায় প্রবাহিত করাইবেন।

বন্দর উন্নয়নে চতুর্থ পরিকল্পনার ব্যয় হইবে  
যুগবাণীতে প্রকাশ ভারত সরকার বন্দর উন্নয়নের জন্য  
নিম্নলিখিতরূপ ব্যয় ধার্য্য করিয়াছেন :

বম্বে বন্দরের জন্য—	৪৮.১৪ কোটি টাকা
বিশাখাপত্তনমের জন্য—	৫১.৪৫ „ „
মাদ্রাজের জন্য—	২০.৮৪ „ „
কোচিন বন্দরের জন্য—	১৭.৮৯ „ „
পারাষীপ বন্দরের জন্য—	১৫.০০ „ „
কলিকাতার জন্য—	৫.৮৬ „ „

### খাদ্যবস্তু উৎপাদনে ঘাটতি

সবুজ বিপ্লব (Green Revolution) কথাটি ব্যবহার  
করা হয় চাষের ফসল উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি  
পাওয়াতে। কিন্তু ভারতের অপরাপর বিপ্লবের মতই

এই সবুজ বিপ্লবও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না বলিয়া মনে  
হইতেছে। কারণ ছুন ১৯৭২এ যে বারমাস শেষ হইল  
তাঁহাতে খাদ্যবস্তু উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়া নাই পরন্তু  
উৎপাদন হ্রাস হইয়াছে বলিয়াই অনুমান করা যাইতেছে।  
দেখা যাইতেছে যে খাদ্যবস্তু উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে  
মোট উৎপাদন ১১৯।১১০ নিম্নত টন না হইয়া দাঁড়াইয়াছে  
১০৬ নিম্নত টনে। অথচ এই সময়ে বৃষ্টিপাতও  
স্বাভাবিকই হইয়াছিল। তাহা হইলে ফসল পরিকল্পনা-  
অনুযায়ী হইল না কেন? বাঁহারা ফসল উৎপাদনের  
হিসাব করেন তাঁহায়াই বা হিসাবে ভুল করিলেন কি  
করিয়া? উৎপাদন বৃদ্ধিই বা হইল না কেন? সেচ,  
সার, বীজ বা অপর কোন কিছু লইয়া কি গোলমাল  
হইল? নয়ত উৎপাদন পরিকল্পনা-অনুযায়ী হইল  
না কেন?







কবি অরবিন্দ —( ড: ) প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ,  
সম্বিতা প্রকাশন। ২৪ এ, ব্রহ্ম কলে, নিউ আলিপুর  
কলিকাতা-৫৩। মূল্য-৫.০০।

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের লেখা “কবি অরবিন্দ”  
শ্রীঅরবিন্দের জীবন কথা। প্রকার সঙ্গ লেখা এই  
বইখানি পড়তে আরম্ভ করলেই বা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা  
হচ্ছে ডাঃ ঘোষের সংযত ভাষা ও সদা জাগ্রত বিচার-  
বুদ্ধি। উচ্চাসের আধিক্যে কোথাও আঁতরণজন হয়নি,  
ভাষাও কেনিল হয়নি।

চারটি অধ্যায়ে ডাঃ ঘোষ এই মহাজীবন পরিচয়  
শেষ করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে জন্ম, বংশ, বাল্য ও  
ছাত্রজীবনের কথা লিখেছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে  
গাড়ের ভেতর বহর বরোদাবাসের ও চার বছর বাংলাবাসের  
কথা লিখেছেন। এই সাড়ে সত্তরো বছরকে ডাঃ ঘোষ  
অরবিন্দ জীবনের পরিবর্তনের যুগ বলে অভিহিত  
করেছেন এবং তার ক্রমিক ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে  
লিখেছেন। পড়লেই বোঝা যায় তথ্যবহুল অধ্যায় দুটি  
ডাঃ ঘোষের গভীর মনন ও পরিচয়ের কল। শেষের  
অধ্যায়ে আছে পণ্ডিতের জীবনের কথা, অর্থাৎ  
শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক জীবনের কথা। শ্রীঅরবিন্দের  
সাধনা ও তাঁর প্রচারিত বিশেষ তত্ত্ব অনেকেই বুঝতে  
পারে না, কারণ শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি প্রবন্ধাবলী ও

তাদের বঙ্গানুবাদ সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নয়।  
ডাঃ ঘোষ এই বাধা দূর করে সংস্কৃতের পাঠকের  
উপযোগী করে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ও তত্ত্ব সহজ ভাষায়  
লিপিবদ্ধ করেছেন।

বইখানির আরো একটি বৈশিষ্ট্য আছে। অনেকেই  
শ্রীঅরবিন্দের বাংলা লেখার সঙ্গে পরিচিত নন।  
বইটিতে ডাঃ ঘোষ শ্রীঅরবিন্দের বাংলা লেখা কিছু কিছু  
উদ্ধৃত করেছেন। পাঠক তা পড়ে আনন্দ পাবেন।

সবশেষে রবীন্দ্রনাথের “চারিত্রপূজা” থেকে কতিপয়  
পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করছি —“পুস্তক কতই প্রকাশিত হইতেছে,  
কিন্তু যদি অবিচারে সন্দেহ করিবার প্রযুক্তি না থাকে,  
যদি মনে করি কেবল যে বইগুলি যথার্থই আমার প্রিয়,  
যাহা আমার পক্ষে চিরদিন পড়িবার যোগ্য সেইগুলিই  
রক্ষা করিব, তবে শতবৎসর পরমায়ু হইলেও আমার  
পাঠ্যগ্রন্থ আমার পক্ষে হৃদয় হইয়া উঠে না।” কবি  
অরবিন্দ “চিরদিন পড়িবার যোগ্য” বই এবং তা সন্দেহ  
করলে কোন্‌দিনই হৃদয় হয়ে উঠবে না। বইখানির  
বহুল প্রচার কামনা করি।



ঐঅরবিন্দ



# প্রবাসী

“সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”

“নারায়ণা বলহীনেন লভ্যঃ”

৭২তম ভাগ  
প্রথম খণ্ড

আশ্বিন, ১৩৭৯

৬ষ্ঠ সংখ্যা

## বিবিধ প্রসঙ্গ

### অলিম্পিকে নির্মম হত্যাকাণ্ড

এই বৎসর মিউনিখে যে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা একটা বিশেষ অরণীয় ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইত এই কারণে যে ঐ প্রতিযোগিতাকালে নানান ক্রীড়ায় বিশ্বের পূর্বের শ্রেষ্ঠমান যাহা ছিল তাহা তাজিয়া নতুন উন্নততর মান স্বজন করা হইয়াছিল। কিন্তু মানুষ সে কথা মনে রাখিবার, বিচার করিবার পূর্বেই মিউনিখে এমন একটা শব্দ অমাত্রিক পাশব বর্বরতার অভিব্যক্তি হইল য তাহার পাকলতা ও স্থপিত জবজবতার আবেগে অল্প কল প্রসঙ্গ এক চরম বিতর্কিত অন্ধকারে নির্মম হইয়া মানব মন হইতে লয় প্রাপ্ত হইল। মিউনিখে অলিম্পিক গ্রামে বিশ্বক্রীড়া প্রতিযোগিতার ভক্ত প্রায় ১,০০০ খেলোয়াড়, বিচারক, শিক্ষক, সংবাদদাতা ও ভক্ত লোক একত্র হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে যে খন কোন ছদ্মবেশে অনেকগুলি আরবদেশীয় গুপ্ত তক অলিম্পিক গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল সে কথা ভতঃ পশ্চিম জার্মানীর নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষক হিনীর কর্তব্যকর্তৃগণ বুঝিতে পারেন নাই। মজলবাব

এই সেপ্টেম্বর ভোরবেলা ঐ আরব গুপ্তবাতক দল যন্ত্রবন্ধুক, হাতবোমা প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া ইসরায়েলের খেলোয়াড় ও তাহাদের সঙ্গে লোকদের বাসগৃহে প্রবেশ করে। তখন ভোর চারটা ২০ মিনিট। টেলিফোন মেয়ামতকারী দুই ব্যক্তি দেখে যে ৩১১ ফুট তার টপকাইয়া কিছু লোক একটি বাসগৃহে প্রবেশ করিতেছে; কিন্তু তাহারা ধরিয়া লয় যে ঐ সকল ব্যক্তি স্বাভাবিক উল্লাস করিয়া লুকাইয়া ঘরে ফিরিতেছিল। এইরূপ ভাবে স্বাভাবিক খাপন করিয়া অনেক সময়েই খেলোয়াড়গণ তার টপকাইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত। তাহা নতুন কিছু ছিল না। অতঃপর ঐ আরববাহিনীর লোকেরা ঘুমে কালি লাগাইয়া আত্মগোপন ব্যবস্থা করিয়া এবং অস্ত্রশস্ত্র বাহির করিয়া লইয়া ইসরায়েলের খেলোয়াড়গণের নিবাস গৃহে প্রবেশ করে। কোন ঘরে ইসরায়েলীগণ আছে না জানায় আরবগণ একটা ঘরের দরজায় থাকা দেয় ও জার্মান ভাষায় জিজ্ঞাসা করে, “এইখানে কি ইসরায়েলের খেলার দল আছে?” কুতি শিক্ষক মোসে তাইনবার্গ দরজা খুলিয়া ঐ সকল শস্ত্র মাহুদ দেখিয়া

দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঘরের অভ্যন্তর লোকদের চিৎকার করিয়া পলাইতে বলেন। দরজা ভেদ করিয়া এক ঝাপটা যন্ত্রবন্ধকের গুলি বৃষ্টি হইলে ভাইনবার্গ তাহার ফলে চরমভাবে আহত হইলেন। মুষ্টিযোদ্ধা গাড জাভারি একটি জানলা ভাঙ্গিয়া গৃহের বাহিরে পলাইলেন। তাহার পিছনেও গুলি বর্ষণ প্রবল বেগে চলিল কিন্তু তিনি আহত হইলেন না। অল্প আর একটি ঘরেও ঐভাবে আরবগণ গিয়া আক্রমণ করে ও কৃতিগীর ইয়োসেফ রোমানো কিছুকাল তাহাদের ঠেকাইয়া রাখেন। তিনিও শীঘ্রই এমনভাবে গুলি খাইলেন যে তাহার তাহাতেই মৃত্যু হয়। আর একজন হুজির বিচারক, ৬ফুট ১ইঞ্চি, ২৪০ পাউণ্ড ইয়োসেফ গটক্রয়েও দরজা চাপিয়া রাখিয়া অপর লোকদের পলাইতে স্বেয়োগ দিয়াছিলেন, কিন্তু নিজে অকাল মৃত্যু বরণ করেন। সর্বসমেত ইসরায়েলের জনা ১৮ খেলোয়াড় ও তাহাদের সহায়ক কর্মীগণ গুলিযাতকদিগের হাত হইতে প্রাণ বাঁচাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন; হুইজন প্রথম আক্রমণেই মারা যান ও নরজনকে আরবগণ ধরিয়া বাঁধিয়া রাখে, তাহাদের মুক্তির সর্ভ করিয়া ইসরায়েল সরকারকে ২০০ আরব কয়েদীকে খালাস করিতে বাধ্য করবার জন্ত। এই দর করার অবশ্য কোনও ফল হয় নাই এবং আরব যাতকগণ এখন যেক্ষণ ভয় দেখাইয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল ও তাহা মূলতঃ এইরূপই হইল যে এতটা সময় অতিক্রান্ত হইলেও যদি আরবদিগের দাবী অপূর্ণ থাকিয়া যায় তাহা হইলে এক এক করিয়া সকল বন্দী ইসরায়েলীকে হত্যা করা হইবে। ১৮ খণ্ডা ধরিয়া কথাই চলিতে লাগিল ও শেষ পর্যন্ত আরবদিগকে বোঝান হইল যে তাহারা নিজেদের বন্দীদিগকে লইয়া কোন আরব রাষ্ট্রে গিয়া দর কষাকষি চালাইতে পারে।

৫ তারিখ সেপ্টেম্বর রাত্রে ১০ টার সময় একটি জার্মান সামরিক যাত্রী যানে আরবগণ তাহাদের বন্দীদিগকে হাত পা বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া অলিম্পিক

গ্রামের গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রথমে গিয়া দুইটি হেলিকপ্টারে উঠিল ও পরে হেলিকপ্টার যোগে ১৬ মাইল দূরবর্তী হ্যারটেনকেম্পকক বিমান বন্দরে গমন করিল। সেইখানে তাহারা দেখিল একটি বৃহৎ বিমান তাহাদিগের জন্য উপস্থিত রাখিয়াছে। কিন্তু তাহারা সাবধানী ছিল ও কোন সময়েই নিজেদের একত্রে পৃথকভাবে কোথাও মুহূর্তের জন্যও দাঁড়াইতে বা চলিতে দেয় নাই। জার্মান পুলিশের যে সকল সূক্ষ্ম বন্দুক চালক বিমান বন্দর ঘুরিয়া উপস্থিত ছিল তাহারা কোনভাবেই সকল আরবদিগকে দূর হইতে গুলি করিয়া মারিতে পারিত না।

ইহার পরে কে কাহাকে কখন গুলি চালাইয়া প্রথমে মারিবার চেষ্টা করিল তাহা অনুমানের বিষয়। সন্দেহঃ কোন জার্মানই গুলি চালনা আরম্ভ করে ও আরবগণ প্রত্যন্তরে গুলি ও বোমা বর্ষণ আরম্ভ করে। ফলে ইসরায়েলী বন্দীদিগের নয় ব্যক্তিই গুলির আঘাতে বা বোমা বিস্ফোরণের ফলে প্রাণ হারান। আরব যাতকগণেরও পঁচজন নিহত ও তিনজন বন্দী হয়।

বিশ্ব মৈত্রীর কেন্দ্রস্থল অলিম্পিকের ক্রীড়াভূমি এইভাবে নির্দোষ খেলোয়াড়দিগের মধ্যে লিঙ্কিত হওয়াতে বিশ্বের সকল মানুষেরই মন হৃৎ-ধে-শোকে আচ্ছন্ন হইল। ভারতের মন্ত্রীসভা হইতে এই নির্মম হত্যালীলার তীব্র সমালোচনা করা হইল। এমন কি মিশরও ইহার নিন্দা করিলেন। যাহার সহিত যাহারই শত্রুতা থাকুক না কেন; নির্দোষ তৃতীয় পক্ষকে হত্যা করিয়া যুদ্ধ চালনার সমর্থন কেহ করিতে পারে না। গুলিহত্যা কখনই রাষ্ট্রক্ষেত্রে উত্তম পন্থা নহে। যেখানে সেই গুলি হত্যা নির্দোষ অল্পবয়স্ক খেলোয়াড়দিগের উপর গিয়া পড়ে সেখানে বিষয়টা আরও দৃশ্য ও কাপুরুষতাব্রিষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। জার্মান পুলিশের দোষে ইসরায়েলীগণ মারা গিয়াছে বলিয়া গিরিয়া ও লেবানন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ৫ তারিখে ভোরবেলা যখন ভাইনবার্গ ও গটক্রয়েওকে গুলি করিয়া মারা হয় তখন জার্মান পুলিশ কোথায় ছিল? সুতরাং আরব যাতকদিগের

বোম্বকালীন চেষ্টার কোনও অর্থ হয় না। আরবদিগের মধ্যে বিমান বন্দরে পাঁচজন নিহত হইয়াছিল ও তিনজন আত্মসমর্পণ করে। এইসকল ব্যক্তি ও তাহাদের প্রয়োচকদিগের নাম মানব-কলঙ্কের ইতিহাসে মহাপাপী ও অপরাধীদের তালিকাভুক্ত হইবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

### ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান একশত দশ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়া অমরধামে গমন করিয়াছেন। তিনি যে সকল মহাসঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শুভো বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। তিনি নিজের চেষ্টা, প্রেরণা, প্রতিভা ও সাধনা দ্বারা আলাউদ্দিন ঘরাণা সৃজন করিয়া গিয়াছেন ও শব্দ ও সেতার বাজে তাঁহার প্রেরণা শত শত সাধকের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইতেছে ও বহুকালাবধি হইতে থাকিবে। তিনি বাল্যকালে ও যৌবনে কোন ঘরাণার সাহায্যে নিজপথ বাহিয়া লইতে পারেন নাই। নিজ চেষ্টা ও সাধনাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছিল। মাইহার রাজ্য তাঁহার সমর্থক ও সহায়ক ছিলেন নিঃসন্দেহে; কিন্তু তাহা যথার্থভাবে তাঁহার জীবনে কার্যকর হইবার পূর্বেই তিনি বহু ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হইয়া নানাভাবে আঘাত সহ করিয়া অটুট সাহসে পদে পদে অগ্রগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি শব্দ ও সেতার বাজে নব নব সুর, তান ও চাল সৃজন করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি যদিও সুদীর্ঘকাল আমাদের সঙ্গীত-সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন তাহা হইলেও তাঁহার অভাব কোনও মতে কেহ দূর করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গরত্ন আলাউদ্দিন বাংলা মায়ের অসুস্কাম ছিলেন ও তাঁহার মৃত্যু বহু বঙ্গবাসীকে গভীর শোকাচ্ছন্ন করিয়াছে।

### দিল্লীতে হরিজন বালিকার মৃত্যু

নূতন দিল্লীর কস্তুরবা বালিকা বিদ্যালয়ে সম্মতি জন্মাইয়া অস্থান হয় ও ইহার দুই-তিন দিনের মধ্যে ঐ

বিদ্যালয়ের একটি কুপে একটি বালিকার মৃতদেহ পাওয়া যায়। বালিকাটির নাম প্রেমলতা ও সে জাতিতে হরিজন শ্রেণীর ছিল। তাহার পরিবারের লোকেরা অভিযোগ করেন যে প্রেমলতা ও আরও কোন কোন বালিকা জন্মাইয়া অস্থানের পরে ভোগ বিতরণ করেন ও তাহা লইয়া ঐ প্রতিষ্ঠানের উচ্চজাতির কোন কোন নারী বিশেষ বিকোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করেন। কারণ হরিজন বালিকার স্পর্শ হুঁট খাটবস্ত্র উচ্চজাতির মহিলা-দিগকে কেন দেওয়া হইয়াছে। অভিযোগে আরও বলা হয় যে প্রেমলতাকে প্রথমতঃ দুইদিন একটা ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখা হয় ও তাহাকে কোন কিছু খাইতে দেওয়া হয় নাই। দুইদিন অনাহারে রাখিয়া উচ্চজাতির ব্যক্তির প্রেমলতাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করেন ও ফলে প্রেমলতার মৃত্যু হয়। তখন তাহার মৃতদেহ লইয়া গিয়া নিকটস্থ ঐ কুপে নিক্ষেপ করা হয়। অভিযোক্তাগণ এই হত্যাকাণ্ডের সহিত কস্তুরবা বালিকা স্কুলের প্রধান শিক্ষায়ত্নীর সংযোগ ছিল বলেন, ও ঐ শিক্ষায়ত্নীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ও পরে জামিনে ছাড়িয়া দেয়। দিল্লীর জনসাধারণের মধ্যে এই ঘটনা লইয়া বিশেষ উত্তেজনার স্রষ্টি হইয়াছে ও পুলিশের সহিত সংঘর্ষণ হইয়াছে কয়েকবার। ইহাতে মনে হয় যে প্রেমলতাকে যদি সত্যসত্যই না খাইতে দিয়া ঘরে বদ্ধ করিয়া প্রহার করিয়া হত্যা করা হইয়া থাকে তাহা হইলে অপরাধী বা অপরাধীদিগের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হইবে। বর্তমানকালে যে এইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে ইহা আমাদের গভীর ধারণার বাহিরে। তাহাও আবার ঘটিয়াছে ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে এবং কস্তুরবার নামে প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে।

### বেকার সমস্যার সমাধান

পশ্চিম বাংলার নূতন কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হইবার পর হইতেই একটা কথা জোর গলায় অনেকেই বলিতেছেন, তাহা হইল বেকার সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি। কিছুদিন পূর্বে শ্রীসিদ্ধার্থ রায় বলেন যে শুধু হলদিয়াতেই তিনি এক লক্ষ ব্যক্তিকে চাকুরী দিবার

ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং শ্রীদেবী চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় হইতে আসিয়া বলেন যে স্বাস্থ্য বিভাগেই আশি হাজার মানুষ কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিবে। শুনা যায় পশ্চিম বাংলার বেকারদিগের সংখ্যা বহু লক্ষ এবং যদি হলদিয়া ও স্বাস্থ্য বিভাগে এক লক্ষ আশি হাজার বেকারের সংস্থান হয় তাহা হইলেও অনেক লক্ষ বেকার কাজ না পাইয়া বসিয়াই থাকিবে। সুতরাং হলদিয়াতে লক্ষ লোকের চাকুরীর ব্যবস্থা করিবার পরেও শ্রীসিদ্ধার্থ রায় আরও বহুস্থানে চাকুরী সৃষ্টি করিতে পারিলে তবেই সমস্তটার আংশিক সমাধান সম্ভব হইবে। শ্রীদেবী চট্টোপাধ্যায় সরকারী বিভাগে আর কতই চাকুরী সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবেন? খুব অধিক নিশ্চয়ই নহে। সুতরাং তাহার প্রতিজ্ঞাতি দ্বারা অধিক লোকের সাহায্য হইবে না। আমরা পূর্বেও বলিষ্ঠাহি এখনও বলিতেছি যে মাত্ৰবের প্রশমতি সাক্ষাৎভাবে ভোগ্য বস্তু উৎপাদনে নিয়োগ করিতে পারিলে তবেই বেকার সমস্তার সমাধান সরল পথে সম্ভব হইতে পারে। সরকারী বিভাগে চাকুরী সৃষ্টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ট্যান্ড বুদ্ধির ব্যবস্থা মাত্র। ইহাতে মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে না; হইবে শুধু রাজকরের পরিমাণ বৃদ্ধি। জর্জ বার্নার্ড শ তামাসা করিয়া লিখিয়াছিলেন একটি দেশের কথা যে দেশের মানুষ শুধু পরস্পরের কাপড় ঘুরিয়া দিন গুজরান করে। আমরাও যদি পরস্পরকে চাকুরীতে নিয়োগ করি এবং উৎপাদনহীন কার্যের জন্য, তাহা হইলে ফল অনেকটা একই প্রকারের হইবে। কারণ বহু দ্রব্যের বহুল পরিমাণে উৎপাদন না করিলে বহু ব্যক্তির সকল কার্যে নিয়োগ সম্ভব হইতে পারে না এবং সেইরূপ ব্যবস্থা না হইলে কোন জাতীয় অর্থনীতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীসিদ্ধার্থ রায় অথবা শ্রীদেবী চট্টোপাধ্যায় যদি উৎপাদনকার্যহীন চাকুরী সৃষ্টি করিয়া বেকার সমস্তা সমাধান চেষ্টা করেন তাহাতে বাহারা উৎপাদন করে তাহাদের দেশরাজ্য বৃদ্ধি হইবে যাহাদের

সম্পত্তি অর্থ আছে তাহাদের অর্থ নানাতাবে সরকারী তহবিলে বাইবে ও ব্যয় হইয়া কোন না কোন সময় শেষ হইয়া যাইবে। এবং জাতীয় অর্থনীতি পলু অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমবর্দ্ধনশীলভাবে অচল হইয়া দাঁড়াইবে। শ্রীসিদ্ধার্থ রায় প্রায়ই বলেন যে তিনি শ্রমিকদিগের জীবনযাত্রা আরও স্বচ্ছন্দ্য ও আনন্দদায়ক করিয়া গঠন করিবার ব্যবস্থা করিবেন। অর্থাৎ তাহার মতে বাহারা বেকার নহে এবং বেতন উপার্জন করিতেছে তাহারাও যথেষ্ট অর্থ পাইতেছে না। যাহারা নানান কারখানার কাজ করে তাহারা অনার্সাসেই মাসে ১০ শত হইতে ৫ শত টাকা বেতন পায়। অর্থাৎ এক পরিবারে একজন উপার্জনক ও তাহার পত্নী ও দুইটি শিশুকে ঐ বেতনগারে প্রতিপালিত ধরিলে দেখা যায় যে ৪ জনের খোরপোষ চলে ৩০০০।৬০০০ টাকা বাৎসরিক উপার্জনের উপর। তাহা এখা পিছু ভাগ করিলে দাঁড়ায় বাৎসরিক ৭৫০ শত হইতে ১৫০০ শত টাকা। ভারতবর্ষের মাথা পিছু আয় হইল বাৎসরিক ৩০০ শত টাকা। তাহা হইলে কারখানার নিয়তম বেতনগারও জাতীয় মোট হিসাবের তুলনায় বিগুণ হয় দেখা যায়। ঐ হারে সকল মানুষ যদি উপার্জন সক্ষম হয় তাহা হইলে জাতীয় মোট আয় ও উৎপাদনও মোটামুটি বিগুণ করিতে হইবে। তাহার চেটা না করিয়া খুচরা ভাবে এখানে কয়েকটি ও সেখানে কয়েকটি চাকুরীর ব্যবস্থা করিলে জাতীয় জীবন যাত্রার মান উন্নত হইবে না। শ্রমিকদিগকে দুটির সময় স্বাস্থ্যকর স্থানে বেড়াইতে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেও কোন দ্রবীণ হইবে না। প্রয়োজন, সকল মানুষের একটা আঁত আবশ্যক জীবনযাত্রার মান নির্ণয় করার এবং সেই মান অসুসরণ করিলে সকলের যত পরিমাণ যে ভোগ্য বস্তু, শিক্ষা চিকিৎসা প্রভৃতি সেবার আবশ্যক তাহার উৎপাদন ব্যবস্থা। জাতীয় জীবনকে সুস্থ সবল ও সুগঠিত করিতে হইলে যতদূর বস্তুত দিয়া লোকের মনে আশার সঞ্চার করিলে অথবা অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে গোঁজামিল দিয়া দুই চারিটি চাকুরীর সৃষ্টি দ্বারা যে কার্য সাধিত

হইতে পারে না। প্রতিষ্ঠিত হইতে মাছুবের পেট ভরে না। উৎপাদনী কার্য্য করিয়াই তাহা সম্ভব হয়। অল্প উপায় কোনও নাই।

### পশ্চিমবঙ্গ হইতে কারবার অপসারণ

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলিয়াছেন তিনি ধনিক গোষ্ঠীকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে কোন কারখানা ছুলিয়া দিয়া তাহা ভারতবর্ষের অল্প কোন প্রদেশে লইয়া যাইতে দিবেন না। ইহা দ্বারা তিনি পশ্চিমবঙ্গের মাছুবের বেকার সমস্যা যাহাতে আরও প্রকট না হইয়া উঠে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবেন। কিন্তু শুধু কারখানা সরাইয়াই যে বেকারী বৃদ্ধি হয় এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। রেলওয়ে অথবা পোর্ট-টেলিগ্রামের আঞ্চলিক কর্ম্ম কেন্দ্রগুলি যদি পশ্চিমবঙ্গ হইতে উঠিয়া লইয়া কটক, নাগপুর অথবা গোরক্ষপুরে লইয়া যাওয়া হয় তাহাতেও বেকার সমস্যা আরও জটিলরূপ ধারণ করে। এইরূপ ব্যবস্থা ধনিক গোষ্ঠীর উপর নির্ভর করে না, করে সরকার বাহাদুরের উপর এবং শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এরূপ কিছু বলিলে কি করিবেন তাহা বলিলে এই দেশের জনসাধারণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। বেকারী বৃদ্ধির আর একটা কারণ হইল গভর্ণমেণ্টের কারখানা স্থাপনের অসুস্থতি দান ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের ভাগে যথেষ্ট অসুস্থতি পত্র না বাহির হওয়া। সরকারী ও ব্যক্তিগত উভয় প্রকার কারখানা স্থাপনই অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাইসেন্স পারমিটের উপর নির্ভর করে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার ঐ ভাগবাটের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা আমলাদিগের অভিমত স্বীকার করিয়া লইয়া পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করিয়া অপর প্রদেশগুলিকে অধিক করিয়া হুতন হুতন কারখানা স্থাপনের অসুস্থতি পত্র দিয়া কেনেন তাহা হইলে শাক্য ও পরোক্ষভাবে উহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদনী শক্তি অব্যবহৃত থাকিয়া যায়—অর্থাৎ বেকারী বৃদ্ধি হয়। আমাদের বক্তা জানা আছে তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার যে বিশেষ দরজা হস্তে পশ্চিমবঙ্গকে অসুস্থতি পত্র দিয়া থাকেন এ বিষয় সন্দেহ নহে। কিছুকাল পূর্বেই সংবাদপত্রে

প্রকাশ হয় যে দুর্গাপুরের অ্যালুমিনিয়াম কারখানা শ্রীমোহনকুমার মল্লিক দক্ষিণ ভারতে সালেমে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। দুইটি স্টীল কারখানার পারিপার্শ্বিক হইতে উঠাইয়া এই কারখানাটি দক্ষিণ ভারত লইয়া যাইবার এমন কি প্রয়োজন ঘটিতে পারে যাহার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইতেছে? আরও শুনা গিয়াছে যে দুর্গাপুরের আর একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান নিজেদের বয়লার নির্মাণ কারখানা উত্তর প্রদেশে খুলিবার আয়োজন করিতেছেন। এই অবস্থায় শুধু কোনও একটি ধনিক গোষ্ঠীকে হম্বাকি দিলেই পশ্চিমবঙ্গ বেকারীর হাত হইতে বাঁচিয়া যাইবে এরূপ আশা করা যায় না। ইহা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যে বোঝেন না তাহা মনে হয় না।

### গঙ্গা-কাবেরী খাল

ডাঃ কে. এল. রাও কিছুদিন চূপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় গঙ্গাকাবেরী খালের কথা উঠাইয়াছেন। ঐতিপূর্বে তিনি ফরাকী হইতে ৪০০০০ কিউসেক জল ভাগীরথী হংগল জলপথে ছাড়া সম্ভব (প্রয়োজন) হইবে না এই আলোচনাতে তাত্ত্বানিয়োগ করিয়াছিলেন, কেন না তিনি উত্তর প্রদেশ ও বিহারে দুই শতটি খাল গঙ্গা হইতে কাটিয়া ক্ষেত্রে জল সেচনের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ইহার মধ্যেই তিনি গঙ্গা কাবেরী খাল কাটার ব্যবস্থাও করিতেছিলেন কেন না দক্ষিণা-পথে জলাভার হইতেছে ও গঙ্গা হতে জল না লইলে ঐ অঞ্চলে জল সরবরাহের অল্প সহজ উপায় না কি নাই। নদীর জল অপেক্ষা ভূগর্ভস্থিত জল চাষের পক্ষে অধিক উপকারী, ইহা সকলেই জানেন। নদীর জল ব্যবহার না করিয়া কৃপ খনন করিয়া জল লইলে তাহাতে জমির ফসল উৎপাদন উৎকৃষ্টতর হয় এবং সেই জন্য কৃপ খননই উত্তম পন্থা। আর একটা কথাও আছে, তাহা হইল ভূগর্ভের জল কাটিয়া বাহির করিয়া লইলে তাহার একটা ব্যবহার হয়। পানের জলও ইহাতে ভালভাবেই পাওয়া যায়। খালের জল পান সকল সময় নিরাপদ নহে। সুতরাং ডাঃ কে. এল. রাও খাল



কাটাইয়া জল দিবার ব্যবস্থা করিয়া কাহারও উপকার করিতেছিলেন না। ক্ষতি করিতেছিলেন কলিকাতা বন্দরের। এখন যদিও তিনি মানিয়া লইয়াছেন যে কলিকাতা বন্দরের ক্ষতি ৪০০০০ কিউসেক জল ফরাকা হইতে দেওয়া হইবে তথাপি তিনি নানান্তাবে এই সম্বন্ধে তাঁহার বৈপরীত্য জ্ঞাপন করিতে বিধা করিতেছেন না। গঙ্গা-কাবেরী খালের পরিকল্পনা এই মনোভাবের অপর অভিযুক্ত। খালের জল চাষের পক্ষে ততটা ভাল নহে যেমন ভাল কৃষকের জল। সুতরাং কৃষকের ব্যবস্থা না করিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গঙ্গার জল কাবেরীতে লইয়া যাওয়ার কোনও অর্থ হয় না। ইহাতে গঙ্গার জল উত্তর প্রদেশ ও বিহারে প্রবাহিত হইবে এবং ঐ দুই প্রদেশে ২০০ শত সেচন খালে জল দিয়া তৎপরে গঙ্গার কতটা জল ফরাকায় পৌঁছাইবে তাহা সঠিক বলা এখন সম্ভব নহে। গঙ্গা-কাবেরী খাল এই কারণে এখন না কাটিয়া পাঁচ বৎসর পরে অবস্থা বুঝিয়া কাটিবার কথা বিচার করা কর্তব্য।

সুতন কংগ্রেস সরকারের শাসন কার্যে সক্ষমতা।

শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় তাঁহার পরিচালিত শাসক সংঘের কর্মক্ষমতার কোনও সমালোচনা হইলে তাহাতে ঐত হ'ন না এবং ধরিয়া ল'ন যে সকল সমালোচনাই কংগ্রেস বিরুদ্ধতাজাত। এই জাতীয় মনোভাব রাজকার্যে সক্ষমতা আনয়ন করে না। সমালোচনা সংস্কার সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। সমালোচনা বন্ধ করিয়া দেওয়া ঘৈয়াচার ও 'জোর যার মূলুক তার' নীতি প্রতিষ্ঠার প্রধান অস্ত্র। এবং শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় নিশ্চয়ই গায়ের জোরে রাজ্য শাসনে বিশ্বাস করেন না। তাঁহার শাসন-কালে দেশের অবস্থা পূর্নাপেক্ষা আরও অবনতির পথে বাইতেছে একথা কেহ বলিতেছেন না। ইহার কারণ পূর্বের অবস্থা আরও খারাপ ছিল। আরও অধিক মারপিট, খুন খারাপি, অত্যাচার উৎপাদন তখন চলিত। কিন্তু বর্তমানে অবস্থা নিশ্চয় উন্নত হইয়া থাকিলেই প্রমাণ হয় না যে সিদ্ধার্থ-সরকার সর্বদোষ মুক্ত। প্রথমতঃ কোনও শাসন পদ্ধতিই কখন সর্বদোষ

মুক্ত হয় না এবং এই কারণেই সকল সাধারণভাবে বিরোধের-দল থাকে ও থাকা আবশ্যিক। যাহারাই প্রতিষ্ঠিত শাসকদের সমালোচনা করিবে তাহাদেরই যদি জোর করিয়া ঐরূপ সমালোচনা করা হইতে নিষৃত্ত করা হয় তাহা হইলে সাধারণতর এবং জনসাধীনতা বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। এই সকল কারণে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সমালোচকদিগকে দেশ শত্রু বিবেচনা না করিয়া রাজনীতির একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া বিচার করিলে সুবিধার পরিচয় দিতেন। যাহারা সকল শাসন পদ্ধতিকেই উল্টাইয়া বিদেশীদিগের সাহায্যে ভারতবর্ষে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজনে নিযুক্ত তাহাদিগকে অবশ্য এই সমালোচক-দিগের মধ্যে গণনা করা হইবে না। কিন্তু বাজারে মূল্য বৃদ্ধি ও অজ্ঞাত বিষয় লইয়া যাহারা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সমালোচনা করিতেছে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই কৃষিয়া বা চীনের সহিত মানাসকভাবে জড়িত নয়।

ক্রীড়া বিশ্বপ্রতিযোগিতার কেন্দ্র

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মিউনিখে ভারতীয় খেলোয়াড়-দিগের প্রায় সকল খেলাতেই হারিয়া যাওয়াতে বলিয়াছেন যে ঐরূপ অক্ষমতা বড়ই লজ্জার বিষয়। ভারতবর্ষ শুধু একটা "ব্রজ" পদক পাইয়া পদক অর্জনের তালিকার শেষের দিকে নামটা চুকাইতে পারিয়াছে মাত্র। ইহা যে বৃহৎ দেশের পক্ষে লজ্জার কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর মনে রাখা উচিত যে ক্রীড়া আজকাল একটা বিশ্ব-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ও বিশ্বের সকল রাষ্ট্রই নানান্তাবে চেষ্টা করেন যাহাতে তাঁহাদের খেলোয়াড়গণ ক্রীড়াক্ষেত্রের প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইতে পারেন। খেলার মাঠ, শিক্ষার আয়োজন, খাওয়া, থাকিবার ব্যবস্থা, আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়ে বহু রাষ্ট্রই অল্প-পণ হতে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। অর্থব্যয় বৈ ভারতীয় সরকার করেন না ক্রীড়ার জন্য এমন কথা বলা যায় না ;

কিন্তু সেই অর্থ ব্যয় করা হয় এমনভাবে যাহাতে সকলেরই খেলার আয়োজন করা সম্ভবে উৎসাহ চলিয়া যায়। ইহাও আবার করা হয় শুধু বড় বড় প্রতিযোগিতার জন্য। ক্রীড়াবিদগণের জন্য যেন খুল-পাঠশালার ও গ্রামের খেলার মাঠে, সরকারী অর্থসাহায্য সেখানে পৌঁছায় না। ইহা ব্যতীত দেখা যায় যে অন্তর্ভুক্তগণকে খেলা শিখাইবার কোনও যথাযথ ব্যবস্থাই প্রায় ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র সহরে কোথাও নাই। গ্রামের কথা ছাড়িয়া দিলেই হয়। এই দেশের শতকরা ১০ জনের অধিক লোক গ্রামে বাস করেন। তাঁহারা “স্পোর্টস্” ও “গেম্‌স্” কাছাকাঁবে বলে তাহা প্রায় জানেনই না। কেহ কেহ হয়ত আনাড়ীভাবে ফুটবলে লাথি লাগাইয়াছেন কিন্তু তাহাকে খেলা শিক্ষা বলা যায় না। লক্ষ লক্ষ গ্রামে খেলার মাঠই নাই এবং অধিকাংশ সহরেও দৌড়, উল্লম্বন, হকি খেলা, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি কেহই প্রায় অভ্যাস করেন না। দুই-একটি অতি বৃহৎ সহরে সম্ভবতঃ প্রতিযোগিতার উপযুক্ত সম্ভরণ-কেন্দ্র আছে। অপর সকল স্থানেই পুরাতন পন্থায় সীতার কাটা হইয়া থাকে কিন্তু আধুনিক প্রতিযোগিতার স্বাভাবিক নীতি সে সকল স্থানে অজ্ঞাত। ভারতবর্ষের খেলার ক্ষেত্রে অনগ্রসর অবস্থার জন্য দায়ী প্রধানতঃ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি। সকল স্থলে যদি ব্যবস্থা করিয়া জিম্‌নাস্টিক্, দৌড়, উল্লম্বন, দীর্ঘলম্বন, ডিসকাস ছোঁড়া, লোহগোলক নিক্ষেপ, বর্ষা চালনা, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি শিখান হইত তাহা হইলে আমাদের উপযুক্ত বিশ্ব-প্রতিযোগিতায় নামিবার মত খেলোয়াড়ের অভাব হইত না। আমাদের দেশে প্রথমতঃ শিক্ষার ব্যবস্থাই যথোপযুক্ত নহে। তাহার উপর ক্রীড়া শিক্ষার ব্যবস্থা আরই সুবিধাজনক নহে। শ্রীমতী গান্ধী অলিম্পিকে ভারতের কোন কিছুতেই জয়লাভ করিতে না পারাকে লজ্জাকর বলিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ “গুড়ু দিলেই মিটি হয়” এই প্রবাদ বাঁকাটি শুনে নাই। তাঁহাকে বলা আবশ্যক যে তাঁহার শাসক মহলের পরিচালকগণ যথেষ্ট খেলার মাঠ, খেলা শিক্ষক, খেলার সরঞ্জাম প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলে অদূর

ভবিষ্যতে তাহার স্কল অবশ্যই কলিবে। শুধু শীর্ষস্থে একটা জাতীয় ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান বসাইয়া দিলেই জাতীয় বালক-বালিকারা খেলা-ধুলার খ্যাতি অর্জন করিতে আরম্ভ করিবে এই ধারণা একেবারেই ভুল। প্রদেশে প্রদেশে ঐরূপ এক-একটি স্পোর্টস্ কাউন্সিল গঠন করিলেও কিছু হইবে না যদি না এমন অর্থের ব্যবস্থা করা হয় যাহাতে ক্রীড়ার আগ্রহ সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে পারে। সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইলে এই উদ্দেশ্যে অন্ততঃ কয়েক কোটি মুদ্রা বাৎসরিক খরচ হওয়া প্রয়োজন। ইহা কি করা হইবে? শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ভারতের সর্বত্র ক্রীড়া ব্যবস্থা যথোপযুক্তরূপে করা সম্ভব হইতে পারে। তাহার ফল নিশ্চয়ই ১৯৭৬ গ্রীষ্মকালের অলিম্পিকে পাওয়া যাইবে। সে ব্যবস্থা করিতে হইলে যে টাকা লাগিবে তাহাও হিসাব করিয়া সহজেই জানা যাইতে পারে।

#### ঠাকুরবাড়ীর চার শিল্পীর চিত্রকলা

প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের চারজন খ্যাতনামা শিল্পীর চিত্রকলা সম্মতি বিড়লা মিউজিয়মে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই চারজন চিত্রকর হইলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতীয় চিত্রকলার সহিত পাহাড়ের পরিচয় আছে তাঁহাদের প্রায় সকলেই অবনীন্দ্রনাথ, গগণেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্র দেখিয়াছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুরের চিত্রের সহিত অনেকেরই পরিচয় নাই। তাঁহারা এই প্রদর্শনীতে জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুরের রেখাচিত্রগুলি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের “মেঘদূত” জ্যোতির্বিজ্ঞান ঠাকুর সাহিত্যে প্রেরণা ও অনন্তসাধারণ প্রতিভার আধার ছিলেন ইহা বাংলার বিদ্বৎজনের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু তিনি যে চিত্রাঙ্কনেও সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাহা অনেকেই জানেন না। এই প্রদর্শনীতে তাহারা গিয়াছেন তাঁহাদের মনে জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রতিভার স্বরূপ আরও স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রগুলির মধ্যে দেখা যায় এক অপূর্ণ অপারিখ

অন্তর্ভুক্ত অঙ্গভূতির প্রকাশ। তাঁহার মনে যে ভাব বর্ণে ও বৈখ্য রূপ গ্রহণ করিয়া বিকশিত হইয়াছিল তিনি তাহাই নিজের কোশলে বাস্তবে প্রতিবিম্বিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিত্র কোন রীতি বা পদ্ধতি অনুসরণে অঙ্কিত নহে। কলা-কোশল ও প্রেরণার আন্তর্য্যাত্তি তাঁহার নিজ অন্তরের নির্দেশ অনুসারী; পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কোনও আদর্শ অনুসরণে রচিত নহে। গগণেন্দ্রনাথ প্রথমে ব্যক্তিচিত্র অঙ্কনে যশ অর্জন করেন। সামাজিক রীতি-নীতি সুসংস্কারাদি লইয়া বিজ্ঞপাতক চিত্রাঙ্কণে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত 'কার্টুন' চিত্রগুলি পরিহাসের রঙে রঙীন হইলেও সেগুলির ভিতরে সমালোচনার শাণিত তীক্ষ্ণতার সহজেই বোধগম্য হয়। পরে তিনি ব্যঙ্গরসের আসর ছাড়িয়া জ্ঞানবোধের পূজারী হইয়া বর্ণে ও বৈখ্য মনের গভীরের অনুপ্রলোকের প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজি বহির্জগতে প্রকাশিত করিয়া ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন। অপরের পক্ষে তাঁহার অনুকরণ সহজ হয় নাই। তিনি যে পথে চলিয়াছিলেন সে পথে অন্তে চলবার চেষ্টা করিলে সহজেই পথভ্রষ্ট হইয়া নিকরদেশের অন্ধকারে গিয়া পড়িতেন। গগণেন্দ্রনাথের প্রেরণার বিকাশ পূর্তনভাবে তাঁহার পরবর্তী চিত্রশিল্পীদিগের মধ্যে ক্রমবর্ধিত রূপ ধারণ করে নাই বলিয়াই তিনি ভারতীয় চিত্র কলাক্ষেত্রে এক অনন্ত-সাধারণ কলাকোশলের অধিকারী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে যে সকল রীতি পদ্ধতি ও ভাবের বিকাশ দেখা যায় তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল অজ্ঞাতা গুহার চিত্রাবলীর অঙ্কনপদ্ধতি বা রচনাশৈলী। তৎপরে যাহার ইতিহাসিক মূল্য বিশেষরূপে দিয়া থাকেন তাহা হইল মোগল রাজপুত ধর্ম্মের চিত্রাঙ্কণ প্রথা। ইহার মধ্যে পারস্ত-দেশের চিত্রাঙ্কন প্রেরণা বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং প্রথমদিকের মোগল চিত্রের অনেকগুলিই পারস্য দেশীয় চিত্রকরদিগের দ্বারা অঙ্কিত। ভারতের প্রাচীন চিত্রকলার সহিত অঙ্কন পদ্ধতি ও ভাবধারার সমস্ত রক্ষা করিয়া চিত্রাঙ্কনক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অবনীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের ও শশিভদ্র অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় চিত্রকলা ক্ষেত্রে যাহা করিয়াছেন তাহা কৃষ্টির ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বলভাবে বর্তমান থাকিবে। তিনি যে শুধু কোন একটা চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি বা প্রথাকে পুনর্জীবন দান করিয়া গিয়াছেন একথা বলা ঠিক হয় না। তিনি মোগল, রাজপুত ও অজ্ঞাতার প্রেরণাকে পুনর্জাগ্রত করিয়া নব-বিকশিত করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গেই নিজ অভাবনীয় স্বকন-শক্তির ব্যবহারে চীন, জাপান ও অপরাপর ক্ষেত্রের শিল্প-রচনাকোশল সমন্বিত করিয়া নূতনভাবে সৌন্দর্য্যের আলোক বিকিরণ চেষ্টাও করিয়া গিয়াছেন। চিত্রকলা ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ অমর হইয়া থাকিবেন ও তাঁহার প্রেরণা বারবার নবরূপ ধারণ করিয়া ভারতীয় কৃষ্টির মালকে ফুটিয়া উঠিবে।

### ঢালানো ভক্তি

ভারতবর্ষে ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার সময় একটা বড় কথা হইয়াছিল বিদেশী বস্ত্র ও অপরাপর পণ্য ভারতবর্ষে বিক্রয় ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইয়োরোপীয়গণ নানান চেষ্টা করিয়া ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্প ও অন্যান্য কাজ কারবারের সর্বনাশ সাধন করে ও অনেক কাল অবধি ভারতীয় কর্ম্মীগণ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা হারািয়া সর্বস্ব হারান দলে যোগদান করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। পরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে এবং অর্থ-নৈতিক কর্ম্ম প্রচেষ্টার আওতে ভারতের কর্ম্মীগণ পুনরায় নিজেদের শিল্পগুলিকে হুতনভাবে পড়িয়া ছলিয়া বিদেশীদিগকে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার কার্য্যে একাধিপত্যের স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করে। কিন্তু দুই শত বৎসরের শোষণের ফলে আমরা যে দারিদ্র্যের কবলে পড়িয়া চরম নিগ্রহে লুপ্ত করিয়া অসীম কষ্টে অর্থনীতির পূর্ণগঠন ক্ষেত্রে পুনর্বার আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিলাম সেই কষ্টভোগের মূল ছিল বিদেশীর সাম্রাজ্য গঠন চেষ্টা। এই কারণে আমরা জাতীয়ভাবে সকল ক্ষেত্রেই বিদেশীর অগ্রবেশ পরবর্তী অংশ ৮২২ পৃষ্ঠায়

# বাংলায় বিপ্লব সংগঠন ও যতীন্দ্রনাথ দাস

সম্ভাবনার অধিকারী

বাংলাদেশেই ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের ভারত-জয়ের প্রথম ঘাটি, বাঙালীই ইংরাজ শাসন বাবুয়া, ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী ভাবাদর্শের সঙ্গে প্রথম পরিচয় লাভ করে। আর এই বাংলাদেশেই (অবিভক্ত বঙ্গ) স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি সুবন্ধ ও সুস্পষ্ট সংগঠনের ধারা লক্ষ্য করা গেল। মহারাষ্ট্রে লোকমাত্র তিলকের বাণী সাধারণ মানুষকে ব্রিটিশশাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু বিপ্লবকে একটি আদর্শবাদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করার কাজ প্রথম বাঙালীই করেছে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আন্দোলনমুঠ ও ঋষির উচ্চারিত ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি সমগ্র জাতির কাছে দেশাত্মবোধের সজীবনী মন্ত্র। স্বামী বিবেকানন্দ সম্রাসী হ’য়েও দেশের শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়কে ডাক দিলেন দেশের জন্যে আত্মনিবেদন ও আত্মত্যাগের ব্রতী হতে। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের উদ্বুদ্ধ আহ্বানকে জাগ্রত প্রাণে পৌঁছিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী গানগুলিতে। শ্রীঅরবিন্দ আরও সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করলেন এই আদর্শের রূপকে। বললেন, দেশমাতৃকা আজ বলি চায়; ‘Suffer so that she may rejoice.’

বিপ্লবসংগঠনের কাজে ধারা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যেও মতান্তর ছিল বৈকি; কিন্তু মতের পার্থক্য বৈরিতার সৃষ্টি করেনি। তাঁদের লক্ষ্য একই—দেশ-জননীর শৃঙ্খল মোচন; যদিও পথের বিভিন্নতা অর্থ্যাৎ পার্থক্য means সন্ধে তাঁরা বিধাবিভক্ত ছিলেন। দেশ-জননীর রূপ তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বলেই মতান্তর কোনওদিন মনান্তরে পৌঁছায়নি। আদর্শ তাঁদের স্বদেশের মুক্তিকে থেকে গ্রহণ করা। রাজনীতির

জন্ত লক্ষ্য থেকে সরে আসা শুধু অচিন্তনীয় নয়, অমার্জনীয় অপরাধ ছিল। দেশের জন্যে সমস্ত মতবিরোধ বিসর্জন দিয়ে আপন জীবনকে ফুলের মত অর্থ দিতে তাঁরা মিলিত হ’তে পেরেছিলেন।

সেদিনের বিপ্লবসংগঠন গড়ে উঠেছিল শিক্ষিত ও সংঘবদ্ধ মধ্যবিত্ত যুবকদের হাতে। শিক্ষা তাঁদের সচেতন করেছিল দেশাত্মবোধে, আদর্শের অমূল্য তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল আত্মত্যাগে। তাই ১৯০৮ থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় ও উল্লেখযোগ্য অধ্যায়টুকু বঙ্গভঙ্গ আত্মদানের ধারাপ্রায়ে মাত্র। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়েই যুবক বিপ্লবী নিজেকে ফুলের মত নিবেদন করেছে মুক্ত্যঙ্গণা মাতার পায়ে।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ বিপ্লবোত্তীর্ণতার এই আট বছর এইচ আর এ-র কর্মধারায় বিপ্লব। শচীন্দ্রনাথ সান্নাল আদর্শ নায়কের মত উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি দলের জন্যে খেতপত্র রচনা করে দলের আদর্শ, নিয়মকানূনের বিস্তৃত খসড়া তৈরী করেন। এইচ আর এ-র সভাপনই সেদিন ইংরাজ সরকারকে ব্যস্ত করে তুলেছিল। দেশের জন্যে অগ্নি ফুলের মত তাজা যুবকপ্রাণ উৎসর্গ করতে ধারা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রামপ্রসাদ বিসমিল রোশন সিং, আসফাকউল্লাহ, শচীন বস্তু, রাজেন লাহিড়ী, এবং চন্দ্রশেখর আজাদ-এর নাম বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব। এইচ আর এ তার দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম বদলিয়ে হয় এইচ এস আর এ বা হিন্দুহান সোভ্যালিষ্ট রিপাবলিক্যান আর্মি। ১৯২৮-৩০ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচীকে রূপায়িত করতে গিয়ে ধারা আত্মদান করেন তাঁদের মধ্যে চট্টোপাধ্যায়

অম্মাণার লুণ্ঠনের সূর্য সেন এবং লাহোর বড়বয়স নামলার ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আত্মা, ভগবতী চরণ ভোরা ও বাংলার দ্বিচী বতীজনাথ দাস বিপ্লবের ইতিহাসকে মন্থন করে গড়ে দিয়ে গেছেন।

কাকোরি বড়বয়স নামলার হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান এসোসিয়েশন-এর উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী সম্বলিত একটি ছাপা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকার এইচ আর এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে—

“এই সংঘের উদ্দেশ্য হবে সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ভারতবাস্তবের স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

এই প্রজাতন্ত্রের দ্বারা কনস্টিটিউশন সৃষ্টি করবে সাধারণ মানুষের নির্গাচিত প্রতিনিধিত্ব; অবশ্য যখন তাদের মতামতকে হুগল করে বলবার সময় আসবে।

“এই প্রজাতন্ত্রের মূল নীতি হবে সকলের ভোটাধিকার সৃষ্টি করা এবং মানুষের শোষণমূলক সকল কাজের অবসান ঘটানো।”

সংঘের কর্মসূচীর মধ্যে মজুর ও কৃষক সংগঠনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রদেশে প্রদেশে সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করে স্বাধীন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের আদর্শকে প্রচার করার কথা বলা হয়। পুস্তিকা ও ইত্যাহার ছাপিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে আধুনিক চিন্তাধারার প্রসার করার কথাও বলা হয়। এ ছাড়া দেশের সর্বত্র সংঘের শাখা সৃষ্টি করা, অর্থ সংগ্রহ করা এবং সাময়িক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার জন্য বিদেশে কর্মী পাঠানো; বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করার ব্যবস্থা ও অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করার চেষ্টা করাও কর্মসূচিতে প্রাধান্য পায়।

এইচ আর এর সংগঠনের জন্য শচীন্দ্রনাথ সাত্তাল দক্ষিণ কলিকাতায় একটি ঘর ভাড়া নিলেন। কান্নি থেকে কলকাতার চলে আসার আর একটি কারণ ছিল। কান্নিতে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ’ত না। দক্ষিণ কলকাতায় থাকার সময়ই তিনি কয়েকটি শক্তিশালী তরুণকে বিপ্লবের দ্বন্দ্বী দীক্ষা দিলেন। বতীজনাথ তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে

উল্লেখযোগ্য। “Jatin Das was the most remarkable among them.”

(Joges Chatterjee in “In Search of Freedom”, pp. 211)

শচীন্দ্রনাথের দ্বী শ্রীমতী প্রতিভা সাত্তাল যতীন দাস এসঙ্গে লিখেছেন—“গোরাই যতীনকে আমার স্বামীর কাছে প্রথম নিয়ে আসে। গোরাই আসল নাম বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়; বাড়ী দক্ষিণ কলকাতার হরিণ মুখার্জি বোড়ে। যতীন তখন রবীন নামেই পরিচিত। তাকে প্রথম দেখে আমি মোটেই আশ্চর্য হইনি। মনে হয়েছিল নেহাতই ছেলেমানুষ। স্বামীর কাছে আমার সঙ্গেই জানালে তিনি বলেছিলেন, সময় এলেই দেখা যাবে ও’র মধ্যে কি ষাছু রয়েছে। তিনি আরও বললেন যে, রবীন তার শক্তির পরিচয় এর মধ্যেই দিয়েছে। ও’র নিঃস্বার্থ মনের পরিচয়ও একদিন সকলে পাবে। আমার স্বামী উত্তর ভারতের বৈপ্লবিক সংহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উত্তর প্রদেশ থেকে পালিয়ে এসে আমরা কলকাতায় লুকোতে বাধ্য হয়েছিলাম। বাংলার বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে—নরেন সেন, প্রভুল গাঙ্গুলী ও ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে—আলোচনার পর স্থির হয় যে কলকাতাকে কেন্দ্র করে হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের এই গোপন জীবনযাত্রা প্রথম দিকে অভ্যস্ত কঠোর ছিল। আমাদের না ছিল টাকাকড়ি, না কোন আশ্রয়। এই সময় এল রবীন সে শুধু যে বৈপ্লবিক সংহার প্রাণধারণ হয়ে উঠল তাই নয়, আমাদের কাছেও অপরিহার্য হ’য়ে দেখা দিল। সে নিরাপদ ও গোপন আশ্রয়ে আমার স্বামীকে রাখল; যেখান থেকে তিনি দলের কাজ নিশ্চিন্ত হয়ে দেখা শোনা করতে পারতেন। আন্তে আন্তে কলকাতার কেন্দ্রী অভ্যস্ত শক্তিশালী হয়ে উঠল, আর বেশীর ভাগ দায়িত্বই এসে পড়ল রবীনের ঘাড়ে। রবীন তার হ-চাষটি বজুর সঙ্গে দলের অন্ত্রে গোপন প্রচারপত্র ও ইত্যাহার রচনা করে ‘আনন্দ প্রেস’ থেকে গোপনে

ছাপাও। এইভাবেই সে আমার স্বামীর লেখা “দেশবাসীর প্রতি নিবেদন” এবং “বিপ্লবী” (The Revolutionary) ইত্যাদি ইত্তাহারগুলি ছাপায়। স্বামীর কাজ নিষ্ঠুর ছিল। সে এই ইত্তাহার ও পুস্তিকাগুলি গোটে রেল পার্সেলে বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। এবান হুঃসাহসী ছিল, তাকে দেখে মনে হত বিপদের পথে পা বাড়াতে সন্দেহই প্রস্তুত।”

১৯০৪ সালের ২৭ শে অক্টোবর তারিখে শিকদার-বাগানে এক-এর বিপ্লবের মিত্র লেনে আমার বাড়ীতে যতীন্দ্রনাথের জন্ম। বাবার নাম বঙ্কিমবিহারী দাস, মা স্নেহাসিনী দেবী। পিতামহ মহেন্দ্রনাথ দাস কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম এ্যাটর্নি; মামা সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকও বিখ্যাত লোক। তিনি তাঁর সম্পত্তি জনহিতকর কার্যে দান করেছিলেন। দাদামশায় পরেশনাথ ঘোষের আত্মরে নাতি ছিল যতীন। শিশুবয়স থেকেই সে পেটুক। খেতে ভীষণ ভালবাসত। পেটুক স্বভাবের জেজো আমার বাড়ীতে সবাই ক্যাংলা বলে ডাকত যতীনকে। সেদিন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে ওই ক্যাংলা ছেলেই একদিন সুভাষকের অমর মন্ত্র জীবনকে নিবেদন করবে।

যতীনের বয়স যখন চার তখন কিশোর সুদীর্ঘাম কাসিকাঠে আত্মদান করে শহীদ হলেন। সমস্ত বাংলাদেশের পথে পথে গেয়ে বেড়াল বাউল—“একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি।” ১৯০৫ থেকে ১৯১৫ অর্থাৎ তার সমস্ত শৈশব জুড়ে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক রক্তাক্ত বিপ্লবের দামামা, কিশোর যতীন্দ্রনাথ নিশ্চরই শুনেছিল বারান, উল্লাসের ও হেমচন্দ্র দাসের বোমা তৈরী করার কাহিনী। ১৯২০তে দিল্লীর প্রকাশিত রাজপথে বড়লাটের ওপর বোমা ফেলে যে কাহিনী রচনা করেছিলেন বসন্ত বিদ্যাস, তার বোমাকণ্ড সেদিনের বালকজীবনে কম নয়। ১৯১৩ তে রাজাবাজারে বোমার কারখানা আবিষ্কার করল পুলিশ। এই

কারখানা থেকে অন্ততলাল ওরফে শশাঙ্ক হাজরা বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের নানা স্থানে বোমা পাঠাতেন। শশাঙ্ক হাজরাকে আসামী করে রাজাবাজার বোমার মামলা চারিদিকে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলল। এই কারখানার তৈরী বোমার সম্বন্ধে সিডিশন কমিটির মন্তব্য—“The trial showed the manner in which the revolutionaries were secretly manufacturing bombs of a very dangerous type...”

১৯১৫ সালে উড়িষ্কার বুড়িবালাঘের তীরে যতীন মুখার্জী তাঁর চারজন সহকর্মীকে নিয়ে দেড়হাজার শশাঙ্ক পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করে যে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, তার উল্লেখে কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টও লন্ডা নিবেদন করেছেন। এগারো বছরের বালক যতীন দাস যতীন মুখার্জীর এই নিষ্ঠুর আত্মদানে যে প্রেরণা লাভ করেছিলেন পরবর্তীকালে সেই প্রেরণাই তাঁকে সুভাষকের মন্ত্র শিখিয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সমস্ত ভারতের যুবমানস যে প্রবল স্ফূর্ণা অশ্রুভব করেছিল, তার কারণ গদর বিপ্লবের নায়কদের নির্বিচারে হত্যা এবং ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। যুবসমাজের শরিক হিসেবে দেই নির্বিড়িত স্ফূর্ণা যতীন দাসের রক্তে সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু সেই ব্রহ্মুর্ভেই ভারতের রাজনীতিতে আবির্ভাব হয়েছে এক অদ্বুতপূর্ব ব্যক্তিত্বের। ১৯২১ সালে ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ’য়ে বোল বছরের কিশোর যতীন যোদিন রাজপথের ওপরে এসে দাঁড়াল, সেদিন সারা ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠেছে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে। কিশোর যতীন বড়বাজারে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে কারাকন্ড হ’লেন। ছাড়া গেলেন অন্নদিনের মধ্যাহ্ন।

পিতা বঙ্কিমবিহারী তখন ভবানীপুরে গিরিশ মুখার্জী বোডের একটি বাড়ীতে বাস করেন। কাছেই চক্রবেড়ে রোডে থাকতেন দেবেন বোস, দাঁর বাড়ীতে

অনেক বিশিষ্ট লোকের যাওয়া-আসা ছিল। কিছু বিপ্লবী নেতাও যেনে বোসের বাড়ীতে আসতেন। যতীন ও তার ছোট ভাই কিরণও এ বাড়ীতে আড্ডা জমাতেন। সম্ভবতঃ এই বাড়ীতেই তিনি পরিচিত হন বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে।

বেল থেকে ছাড়া পেয়ে যতীন কিন্তু কাজ থেকে সরে গেল না। দেশবন্ধুর প্রভাবে সে কংগ্রেসের কাজে যোগ দিল। বোল বহরের ছেলে কলেজ ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে যোগ দেবে এটা পিতা বঙ্কিম বিহারী সহ করতে পারছিলেন না। ছেলেকে তিনি তিরস্কার করে পড়াশোনার মন দিতে বললেন। কিন্তু দেশের সমস্ত ছেলের কানে তখন ধ্বনিত হ'চ্ছে গান্ধীজীর বাণী "Education can wait, but swaraj cannot." সেই গান্ধীজীই যখন পরের বছর হঠাৎ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন, তখন সকলের মত যতীনও প্রচণ্ড আশ্বাত পেল মনে।

বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে যতীন বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আবার কিরে এল। ১৯২২ সালে সে দক্ষিণ কলিকাতা কলেজে (বর্তমান আশুতোষ কলেজ) আই এ ক্লাসে ভর্তি হ'ল।

এই সময় সে ইউনিভার্সিটি টেব্রিটোরিয়াল কোরেও যোগ দিল। এই কলেজ থেকে আই এ পাশ করে বিভাগাগর কলেজে এসে বি এ ক্লাসে ভর্তি হ'ল।

১৯২৩ সালে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্নাতকোত্তর বোর্ডযোগে ঘটে। দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলের পক্ষে নির্বাচনে কাজ করতে গিয়ে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্নাতকোত্তর পরিচয়। পরবর্তীকালে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতার পরিণত হয়েছিল। এবং স্নাতকোত্তর যতীন্দ্রনাথের কর্মশীততে যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর আন্দোলনের মহনীয়তার তেমন অতিভূত হয়েছিলেন।

বিভাগাগর কলেজের ছাত্র যতীন্দ্রনাথ নিয়মিত ছুটির আড্ডায় ও ব্যায়ামাগারে যেতেন। তখন অহুশীলন সমিতির সভ্যরা সমস্ত দেশেই ব্যায়ামাগারের প্রতিষ্ঠা করছে। অহুশীলনের সভাপতি ব্যারিষ্টার পি বিজয় মজুমদার শরীর চর্চা, লাঠি, ছুরি ও তরোয়াল খেলা

স্বকর্মের একান্ত কর্তব্য। শরীর চর্চা করার প্রেরণা বাঙালী স্বকর্মের মধ্যে যিনি এনে দিয়েছিলেন তিনি হলেন যামী বিবেকানন্দ। যামীজীর ভাষায়—“প্রথম কাজ প্রথম করিতে হইবে। শরীর গঠন ও হুঃসাহসিক কার্যে বাঁপাইয়া পড়াই তরুণ বাঙালীর প্রাথমিক কর্তব্য। শরীর সাধনা এমন কি ভগ্নবদগীতা পাঠ করা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ।” যে নির্ভীক আত্মদানের পথে বাঙালী স্বকর্মের সোঁদীন অগ্রসর হয়েছিল তার মূলে ছিল বিবেকানন্দের বঙ্গগভীর বাণী :—“হায় ভারত। তুমি কি কেবল এই পাথের সঞ্চল করিয়াই সভ্যতা ও মহত্বের উচ্চারণের আয়োজন করিতে চাও? যে স্বাধীনতা কেবল সাহসী ও বীরেরাই আয়ত্ত করিতে পারে সেই স্বাধীনতা কি তুমি তোমার লজ্জাকর ভীকৃত্য দ্বারা লাভ করিতে পারিবে?”

বিবেকানন্দের বাণী যতীন্দ্রনাথকে যে উদ্দীপ্ত করেছিল তার প্রমাণ তাঁর নির্ভয় প্রাণোৎসর্গ।

১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশ্য রাজপথে এক তরুণ যুবক আর্পেট ডে নামের এক ইংরাজ ডায়ালোককে গুলি করে হত্যা করলেন। ধরা পড়ার পর এই তরুণ যুবক আদালতে বিব্রাতি দিয়ে বললেন যে, তিনি চার্লস টেগার্টকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। টেগার্ট তাঁর হাতে নিহত হ'লেন না এ জন্য তিনি হুঃখিত। তাঁর এই ডলের জন্তে (টেগার্ট ভ্রমে অন্ত অন্ত একজনকে হত্যা করার জন্তে) তিনি হুঃখিত। কিন্তু তাঁর আশা, আর একজন দেশপ্রেমিক যুবক দেশের শত্রু টেগার্টকে নিচরই হত্যা করবে।

এই নির্ভীক যুবকের নাম গোপীনাথ সাহা। তাঁকে যখন স্নাতকোত্তর দেওয়া হ'ল, তিনি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন—আমার রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে বিপ্লবের বীজ ভাঙতবর্বের যবে যবে ছিড়তে পড়বে।

হাসিমুখে কানিসকাঠের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন গোপীনাথ। স্নাতকোত্তর যেন 'অনুত সমান' মনে ক'রে আলিঙ্গন করলেন। সেদিনও সারা বাংলাদেশে এক অদ্বুত বেদনাধীপ্ত উদ্দীপনা। স্নাতকোত্তর নিজেকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কেলের গেটে। স্নাতকোত্তর ও দেশবন্ধু

গোপীনাথ সাহাৰ কাৰকে সমৰ্থন না কৰেও তাঁৰ চৰিত্ৰৰ দৃঢ়তা ও স্বদেশপ্ৰেমৰ গভীৰতাৰ প্ৰশংসা কৰে প্ৰস্তাব গ্ৰহণ কৰেন। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ফাৰদপুৰ অধিবেশনে সেই প্ৰশংসামূলক প্ৰস্তাব গৃহীত হ'তে পাৰে নি। কাৰণ বিৰোধিতা কৰিছিলেন গান্ধীজী।

১৯২৪ সালে যতীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থান ৰিপাবলিক্যান এ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিয়ে বিপ্লবৰ পথে পুৰোপরি পা বাঢ়িয়ে দিলেন। বিপ্লবী দলে যতীন্দ্রনাথৰ নাম হল ৰবীন। শ্ৰীমতী প্ৰতিভা সান্নাল লিখেছেন :

“With the set up of a strong unit of the party in Bengal more responsibilities were shouldered by Jatin.”

যতীন প্ৰথমতঃ ভাৰ নিয়োজিলেন দলেৰ প্ৰয়োজনে অৰ্থ সংগ্ৰহৰ, দ্বিতীয়তঃ অস্ত্ৰ সংগ্ৰহ কৰে দলেৰ সভ্যদেৰ কাছে পৌছে দেওৱাৰ। অস্ত্ৰ অৰ্থে বোকাৰ পিস্তল এবং বোমা। পিস্তলৰ গুলুৰ অপৰিসীম। যে কোন মূল্যে পাওৱা চাই। তাৰ জন্মে যতীন খিদিৰপুৰেৰ ডকে খালাসী ও নাৰিকদেৰ সঙ্গে আলাপ জমালেন। বন্ধুদেৰ নিয়ে ডক এলাকাৰ কাহাকাছি চায়েৰ দোকানও খুললেন। উদ্দেশ্য, নাৰিকদেৰ সঙ্গে যোগাযোগ ৰাখা। একবাৰ সন্ধান এল দুটি ৰিভলবাৰ পাওৱা গেছে কিন্তু দাম দিতে হবে প্ৰায় হশো টাকাৰ মত। টাকা কোথায় পাওৱা যাবে ?

অৰ্থসংগ্ৰহেৰ জন্ত বিপ্লবীৰা ডাকাতিৰ পথ বেছে নিতে বাধ্য হৈছিল। আগেই বলেছি, ময়ঃ অৰবিন্দও সমৰ্থন কৰিছিলেন এ'পথ। যতীন ও তাৰ বন্ধু প্ৰেমৰঞ্জন সেন, ওৱফে কাপ্তেন, ডাকাতি কৰেই টাকাটা সংগ্ৰহ কৰবাৰ ভাৱ নিল। (১)

কেওড়াভালা থেকে টালিগঞ্জ ৰোড ধৰে দক্ষিণে কিছুটা এগিয়ে গেলে ইন্দো বাৰ্মা পেট্ৰলিয়ামেৰ পেট্ৰল ষ্টেশন। শনি ৰাতি ও সোম তিনিদিনেৰ ক্যাপ সোমবাৰ সকাল এগাৰোটাৰ জমা দিতে বাবে দাৰোয়ান। থবৰ দিল পেট্ৰল ষ্টেশনেৰ কেৱালী কঙ্গীনাথ।

তখন ৰাত্ৰা জুড়ে লোক গিজগিজ কৰছে। একটা

বাগেৰ মধ্যে টাকা নিয়ে দাৰোয়ান চলেছে। সৰ্কে লোকটাৰ হাতে পাকা বাঁশেৰ লাঠি। এ গাভাৰ ভয়ে কোন কাৰণই নেই।

দুটি অৱসৰসেৰ হেলে তাৰ একটু আগেই সাইকেলে এসে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। হজনেৰই পাকামা পাঞ্জাবী গায়ে, মাথায় কুমাল বাধা। ঠোট পানেৰ ছোপে লাল। সাইকেল দুটো একটা বাড়ীৰ বেণ্ডালে হেলান দিয়ে তাৰা বিড়ি ধৰাছিল। ঠিক সেই সময়েই লাঠি ঠকঠক কৰতে কৰাত সেই পশ্চিমা দাৰোয়ান দুটি টাকাৰ ব্যাগ হাতে নিয়ে হাজিৰ হল।

হাতেৰ বিড়ি ফেলে দিয়ে হেলে দুটি পলকে এগিয়ে গেল। কেউ কিছু ভাববাৰ আগেই তাৰেৰ একজন (যতীন) একমুঠো শুকনো লকাৰ গুড়ো ছিটিয়ে দিল দাৰোয়ানেৰ চোখেৰ ওপৰ। দুই পশ্চিমা পুজব 'ময় গিয়া' ডাক ছেড়ে চোখ চেপে ধৰলো। যুহুৰ্তেৰ মধ্যে একটা হ্যাচকা টানে যতীন ছিনিয়ে নিল টাকাৰ ব্যাগ।

সকলী প্ৰেমৰঞ্জন তাৰ পিস্তল বাৰ কৰে দুটো ব্ৰাফ ফায়াৰ কৰল। ভয়ে ৰাত্ৰাৰ লোক পেহিয়ে গেল। যতীন ও প্ৰেমৰঞ্জন সেই অবসৰে সাইকেলে উঠে পালেশ গলি দিয়ে রসা। ৰোডেৰ দিকে ছুটল।

এ গলি থেকে সে গলি। ভুবানীপুৰ থেকে পাৰ্ক সার্কাস। তাৰপৰ ইউৰোপীয়ান এ্যাসাইলাম লেন। সেখানে তাৰা বদলে নিল কাপড় জামা। হাতেৰ অস্ত্ৰগুলো জমা ৰাখল এক বন্ধুৰ বাড়ী। টাকা জমা হ'ল কলেজ ষ্ট্ৰীটেৰ একটা দোকানে তাৰপৰ দুই বন্ধু যথাবিধি কলেজে।

কিন্তু শুধু পিস্তল বা ৰিভলবাৰ যথেষ্ট নয়। চাই বোমা। বোমাৰ উপযোগিতা সন্দেহাতীত। একটা বোমা ফাটালে শব্দে লোকে ভয় পেয়ে পালায়। ধোঁয়াৰ আড়াল দিয়ে বিপ্লবীৰাও আত্মগোশন কৰতে পাৰে। বিপ্লবীৰা তাই শিখতে চেৰিছিলেন বোমা তৈৰী কৰাৰ কোশল।

সৰ্বম বিক্ৰী কৰে তৰুণ বিপ্লবী হেমচন্দ্ৰ দাস প্যাৰিসে গিৰিছিলেন সে কোশলকে আয়ত্ত কৰতে। হেমচন্দ্ৰ দাস, বি এম বাপাত ও মিক্স আকাস্ ৱাশিয়ান



নিহালিষ্টদের কাছে তালিম নিলেন। তাঁদের এ ব্যাপারে যিনি সাহায্য করেছিলেন, সেই মহীয়সী মহিলার নাম মাদাম ভিকোজী কামা।

রাজাবাজারে শশাঙ্কশেখর হাজরা যে বোমা তৈরী করেছিলেন তার উৎকর্ষ সরকার পক্ষকে বিস্মিত ও উদ্ভীষ্ট করেছিল। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (মাঠারমশাই) তাঁর দলের মধ্যেও বোমা তৈরীর কাজকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মাঠার মশাইয়ের দলের হরিনারায়ণ চন্দ্র এ ব্যাপারে দক্ষ ছিলেন। শচীন্দ্রনাথ সান্তালের অনুরোধে তিনি রাজী হলেন এইচ আর এ-র সভ্যদেরকে বোমা তৈরীর কৌশল শেখাতে। হরিনারায়ণ চন্দ্রের সঙ্গে দেওঘরে বোমা তৈরী শিখতে গেলেন বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেশ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও যতীন্দ্রনাথ দাস। এঁদের মধ্যে যতীনই (ওরফে রবীন) বোমা তৈরীর প্রণালী সঠিক আয়ত্ত করেন। প্রতিভা সান্তাল লিখেছেন—“Though Rabin had acted as a guard he was intelligent enough to learn the art.”(২)

শচীন সান্তালের নেতৃত্বে সারাদ্বারতে বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্যে যতীন কাজ করছিলেন। তাঁর সহযোগী বহু বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (ওরফে গোরা) যতীন সম্পর্কে বলেন—“যতীন বড় বেপরোয়া ছিল কিন্তু তার কাজ নিখুঁত ছিল। যতীন খেতে বড় ভালবাসত। অনেক সময় কাজে বেরিয়েও সে রেটুরেটে চুকে পড়তো। যতীনকে সামলাবার তার আমাকেই নিতে হ’ত।”(৩)

পরবর্তীকালে কাকোরি মামলায় পুলিশের গোপন রিপোর্ট—“Sachin has two lieutenants in Bengal, by name Rabin and Gora. It was known that after Sachin’s arrest his lieutenants communicated two addresses at Calcutta to Sachin’s brother Jiten for receiving letters from U. P and the Punjab.....Rabin has been traced as Jatindranath Das.”

আগেই বলা হয়েছে যে যতীন্দ্রনাথ দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ঘটেছে। ১৯২৩ সালে নির্বাচনে দেশবন্ধু স্বরাজ্য পার্টির সমর্থনে কাজ করার সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যে তিনি বসিষ্ঠ ভাবে আসেন। ১৯২৪ সালে তিনি দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে কানপুরে হিন্দুহান রিপাবলিক্যান এ্যাসোসিয়েশনের কর্মীদের একটি গোপন সভা ডাকা হ’ল। এই সভায় বিপ্লবীরা সারাদ্বারতে বিপ্লব আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে কাজে নামার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ্যাকসন কমিটির অধিনায়ক হ’লেন সাহজাহানপুরের রামপ্রসাদ বিসমিল।

২৫শে অক্টোবর তারিখে সুভাষচন্দ্র বহুকে আটক করা হ’লো তিনি আইনের ধারায়।

এই সময় শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতের রাজনীতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নিরঙ্কুশ আধিপত্য। চিত্তরঞ্জন রাজনীতিক্ষেত্রে শুধু প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ মাত্র নন; তাঁর দূরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, ও সংগঠনশীলতা তাঁকে সর্বভারতীয় নেতার পদে বৃত্ত করেছিল। উপরন্তু বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি সহায়ত্বভূতির দৃষ্টি তাঁকে ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভয়াবহ করে তুলেছিল।

বাংলাদেশে বিপ্লব আন্দোলনের ধারাকে নষ্ট করে দেবার উদ্দেশ্যে ১৯২৪ সালের ২৪শে অক্টোবর মধ্যরাত্রে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। এবং এই অর্ডিন্যান্স-এর ধারায় সকল জায়গাতেই নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা শুরু হয়। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই অর্ডিন্যান্সটিকে আইনের রূপ দেওয়ার জন্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দি বেঙ্গল জিওরিনাল ল অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল (১৯২৫) উপস্থাপিত করা হয়। দেশবন্ধু তখন অত্যন্ত অসুস্থ। তাঁকে ঘরকিরা ইন্সপেকশন দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থাতেও বিলটির প্রতিবোধ করার জন্য তিনি ষ্ট্রোকে গুয়ে ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হলেন। তাঁর উপস্থিতিতে বেন বাহুমন্ডের মত কাজ হ’ল। সরকার পক্ষ প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে বিল

পাশ করাতে পারলেন না। শেষে গভর্নর তাঁর বিশেষ ক্রমতাবলে বিলটিকে আইনে পরিণত করেন।

বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স-এর দ্বারা বিপ্লবী যোগেশ চ্যাটার্জীকে ধরা হয় এবং পুলিশ তাঁর কাছ থেকে এইচ আর এ'র ছুটি ইত্তাহার উদ্ধার করে। এই ইত্তাহার দুটির শিরোনামা 'বিপ্লবী' ও 'দেশবাসীর প্রতি নিবেদন।' হোম মেম্বার হিউ স্টিভেনসন এই ইত্তাহারের লেখক হিসেবে শচীন সান্নালের নামের উল্লেখ করেন এবং 'বিপ্লবী'র অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে বলেন—“এই দল সশস্ত্র অধ্যয়নের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা আনার প্রয়াসী।”

১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে শচীন সান্নালকে গ্রেপ্তার করে দু বছরের জল কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

এদিকে উত্তরপ্রদেশে রামপ্রসাদ বিসমিলের নেতৃত্বে এইচ আর এ তখন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ১৯২৪-এর ডিসেম্বরে পিলভিত জেলার তারা প্রথম একটি ডাকাতির অভিযানে নামে। বৈপ্লবিক সংগঠনের জল্প অর্থসংগ্রহে বিসমিল আরও কয়েকটি ডাকাতির চেষ্টা করেন। সংগঠনের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে টাকার প্রয়োজন রত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে এ'ছাড়া আর উপায় ছিল না। দলের অনেকে, বিশেষ করে আসকাক উল্লা ডাকাতি করে টাকা তোলার বিশেষ ছিলেন। কিন্তু অধিনায়ক রামপ্রসাদের সামনে এই একটাই মাত্র পথ খোলা ছিল।

দলের হুঃসাহসিক অভিযান হল কাকোরি ষ্টেশনের কাছে ট্রেন ডাকাতি।

১৯২৫ সালের ১ই আগস্ট। একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন (৮নং ডাউন) উত্তরপ্রদেশের সাহারাণপুর থেকে লক্‌নৌর দিকে এগিয়ে চলেছে। সন্ধ্যার সামান্য পরে ট্রেনটি কাকোরি ষ্টেশন ছাড়ল। পরের ষ্টেশন সালমনগর। কিন্তু প্রটিকরম পার হয়ে একটু এগোতে না এগোতে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়লো। কে যেন এ্যালার্ম চেন টেনেছে।

গার্ড তাঁর কাষরা থেকে বোঁরয়ে আসতে গিয়ে দেখেন সামনে কয়েকজন সুবক রিভলভার হাতে

দাঁড়িয়ে। তারা হাতের রিভলভার থেকে কয়েকটি কাকা আওরাজ করে হতচকিত করে দিল সকলকে। সুবকদের নির্দেশে গার্ড এবং ড্রাইভার সুখ নিচু করে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। যাত্রীদের তারা নিবেদন করল গাড়ীর বাইরে আসতে বা সুখ বাড়িয়ে তাকাতে। তা সত্ত্বেও একজন নেমে এসেছিল নিচে। সুবকদের গুলিতে সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এবার সুবকের দল এগিয়ে গেল ব্রেকভ্যানের দিকে। তাদের লক্ষ্য ব্রেকভ্যানের লোহার সিন্দুকটি। ঐ সিন্দুকে বিভিন্ন ষ্টেশন থেকে সংগ্রহ করা টিকিট বিক্রীর টাকা। তারা সিন্দুকটি ভেঙ্গে প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকার মত অর্থ ব্যাগে নিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ল।

ঠিক ওই সময়ে উলটো দিক থেকে ছুন এক্সপ্রেস এসে বোঁরয়ে গেল। ট্রেনের সমস্ত যাত্রী ভয়ে বিবুত হয়ে বসে রইল। কেউ অহুমান করতেও পারলনা, কি ঘটে গেল।

দলটিতে মোট দশজন সুবক ছিলেন। রামপ্রসাদ বিসমিল ও রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী দলটিকে পরিচালনা করার ভার নিয়েছিলেন। যে রকম শৃঙ্খলার সঙ্গে অথচ নিঃশব্দে কাজ সেবে তাঁরা সরে পড়েছিলেন, তাতে পুলিশ বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। কাকোরি ট্রেন ডাকাতির মূল নায়ক রামপ্রসাদ ও রাজেন্দ্র লাহিড়ী হ'লেও যতীন দাসও যুক্ত ছিলেন এর সঙ্গে। এই সময়ে তাঁর ইন্দ্র নাম ছিল কালীবাবু। বস্তুতঃ যতীন দাসই কলকাতার খিদিরপুর ডক থেকে সংগ্রহ করা রিভলভার নিয়ে এলাহাবাদে ও লক্‌নৌতে দলের লোকের হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

কাকোরি ডাকাতি ভারত সরকারকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল। মিঃ হটন নামের এক উচ্চপদস্থ পোরেলা-অফিসারের হাতে তার দেওয়া হল তদন্তের। আর হটন আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে আবিষ্কার করল এইচ আর এ'র পুরো দলের ইতিহাস ও রামপ্রসাদ বিসমিলের ভূমিকা।

পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিসমিল ছিলেন সাহারাণপুরের

এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। উনিশবছর বয়সে (১৯১৬ সালে) তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। মৈনপুরী ডাকাতের মামলার দ্বারা পড়ে জেলে গেলেও ১৯২০ সালে শাসনসংস্কার আইন প্রয়োগের সময় অস্ত্রাভ্যুদয়ের সঙ্গে তাঁকেও মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯২৩ সালে শচীন সান্নাল তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত করেন। রামপ্রসাদ বিসমিল একজন মূলেখক ছিলেন এবং অনেকগুলি ভাষা জানতেন।

সাজাহানপুরে পুলিশ হঠাৎ তিনখানি কারেক্সি নোট পেল, যেগুলি ট্রেন থেকে স্টুট করা টাকার অংশ। হটন তখনই সাজাহানপুরের দিকে গুটি কেয়ালো এবং সন্দেহজনক লোকগুলি সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে লাগলেন। হটন জানতে পারলেন যে ২ই ও ১০ই আগস্ট তারিখে রামপ্রসাদ বিসমিল শহরে ছিলেন না। খুঁজতে খুঁজতে একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক খাঁলাবেব হাইলস আহমেদ-এর কাছে জানতে পারলেন হটন যে, স্কুলেরই একটি ছাত্র ইন্সপেক্টর মিজের সঙ্গে রামপ্রসাদের বনিষ্ট যোগাযোগ রয়েছে এবং ইন্সপেক্টর নামে বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক অনেক চিঠিপত্র আসে। এই স্কুল ধরে' এবং প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রটির চিঠিগুলি গোপনে পরীক্ষা করে হটন দলের অন্তর্ভুক্ত ও বিবরণ জেনে ফেললেন।

রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন লাহিড়ী বা বিপ্লবীদের অস্ত্র কেউই এই গোপন পুলিশী তৎপরতার খবর পান নি। তাই হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি (১৯২৫) সেপ্টেম্বর ১৩ ও ১৪ তারিখে যখন কানপুরের গোপন সভায় মিলিত হলেন, তখনও তাঁরা ভাবতে পারেনি যে পুলিশ এই সভার খবর জেনেছে এবং গোপনে নজর রাখছে। এই কানপুরের সভাতেই যতীন্দ্রনাথ দাস আসেন এবং রামপ্রসাদের সঙ্গে বোমা তৈরীর ব্যাপার নিয়ে গোপন আলোচনা করেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে উত্তরপ্রদেশের সর্বত্র হঠাৎ ভয়াবহ চালিয়ে পুলিশ বহু লোককে গ্রেপ্তার

করল। সাজাহানপুরের সেই ছাত্রটি—যার নাম ইন্সপেক্টর মিজ—তার কাছ থেকেই পুলিশ অনেকগুলি টিকানা পেয়েছিল। তারা কাশীতে হিন্দু ইউনিভার্সিটির ছাত্র রাজকুমারকে গ্রেপ্তার করল এবং তার ঘর থেকে রাইফেল সমেত অনেক কাগজপত্র উদ্ধার করল। এই সময়ে 'দি রেভোলিউশনারি' পুস্তিকার কতকগুলি পার্শ্বলিও তারা হাতে পেল।

পুলিশ প্রায় সবমুহুরে চরিশজন লোককে গ্রেপ্তার করল, তার মধ্যে ছিলেন রামপ্রসাদ বিসমিল, রোশন সিং, হরগোবিন্দ, বানারসীলাল, বনওয়ারিলাল, মগধনাথ গুপ্ত প্রমুখ। ইন্সপেক্টর মিজ ও বানারসীলালই রাজসাক্ষী হয়ে গেল এবং এইচ আর এ ও কাকোরি ডাকাতের সমস্ত খবর পুলিশকে জানিয়ে দিল।

কাকোরির অন্ততম নারক রাজেন লাহিড়ী তখন কলকাতায়। ১৯২৪ সালের অক্টোবরে কানপুরের সভায় বোমা তৈরী করার প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। রামপ্রসাদ বিসমিল নিজেকে শিখতে চান এবং তাঁর অহুরোধে রাজেন লাহিড়ী যতীন দাসকে ব্যবস্থা করার জন্তে অহুরোধ জানান। এই সময়েই দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতিপাড়ার একটা ভাঙ্গা বাড়ীর মধ্যে বোমা তৈরীর কারখানা। এই কারখানা থেকে বোমা তৈরী হয়ে যাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে। বোমা তৈরীর প্রণালী শেখাচ্ছেন হরিনারায়ণ চন্দ্র। অস্ত্রাভ্যুদয় হারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ক্রমেশ চট্টোপাধ্যায়, অনন্তহারি মিত্র, প্রফুল্ল বসু, যতীন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ বিসমিল শেষ পর্যন্ত আসতে না পারায় রাজেন লাহিড়ী নিজেকে এসেছিলেন বোমা তৈরী শিখতে। যতীন্দ্রনাথ দাস তাঁকে বাচস্পতিপাড়ার সেই ভাঙ্গা বাড়ীতেই রাখেন।

হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বনিষ্ট যোগাযোগ ছিল চট্টগ্রাম বিপ্লবের মহানায়ক সূর্য সেনের। সূর্য সেন-এর আত্মনা তখন শোভাবাজারের ৪নং বাড়ীতে। শোভাবাজার চিৎপুরের নোড়ে একদিন চপ্পুরে পুলিশের এক টিকটিকি বেধল, অনন্তহারি মিত্র

আর হুজুন বুঝকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর দিকে একটা ট্যান্ডি করে চলে গেল। গোরেন্‌গাটি অনন্তহারিকে চিনতে পেরেছিল। সে ওই ট্যান্ডির নম্বর দেখে পরে খোঁজ করে কবে বাচস্পতিপাড়ার আড়ার খোঁজ পায়।

১০ই নভেম্বর (১৯২৫) জোর রাতে পুলিশ দক্ষিণেশ্বর বাচস্পতিপাড়ার সেই বাড়ীটি ঘিরে ফেলল। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেন রাজেন লাহিড়ী, ক্রবেশ চট্টোপাধ্যায়, অনন্তহারি মিত্র, হরিনারায়ণ চন্দ্র ও আরও অনেকে। যতীন দাস দৈবক্রমে রক্ষা পেলেন। কারণ সেই রাতে তিনি এক আত্মীয়ের বাড়ীতে চলে গিয়েছিলেন।

পুলিশ সেইদিনই হানা দিল শোভাবাজারের বাড়ীতে। ধরা পড়লেন প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ও অনন্ত কুমার চক্রবর্তী। কিন্তু পুলিশের ব্যর্থ ভেদ করে পালিয়ে গেলেন সূর্য সেন।

১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার অন্ততম আসামী রাজেন লাহিড়ীকে দেওয়া হল দশ বছর কারাদণ্ড। কিন্তু জেলে না পাঠিয়ে তাঁকে পাঠানো হ'ল লক্ষ্মীতে—কারণ কাকোরি ঘটনায় মামলারও তিনি প্রধান আসামী।

এই রাজেন লাহিড়ী ছিলেন পাবনা জেলার বিখ্যাত জনসেবক ক্ষিতিমোহন লাহিড়ীর পুত্র। কালীতে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির যখন ছাত্র তখনই তিনি বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্ত্বালের সম্পর্কে আসেন। শচীন্দ্রনাথই তাঁকে এইচ আর এ-র সদস্য করেন এবং কালীতে দলের কাজ দেখায় তার দেন।

পুলিশী তদন্তে প্রমাণিত হয় যে শচীন্দ্রনাথ সান্ত্বালই এইচ আর এ-র কর্ণধার। এইচ আর এ-র সংগঠনের নিয়মাবলী ও অন্ত্যস্ত কার্যকপত্রও পুলিশ হাতে পায়। শচীন্দ্রনাথকেও তারা কলকাতা থেকে লক্ষ্মীতে নিয়ে আসে।

কাকোরি ডাকাতি সম্পর্কিত মামলার পুলিশ বিপ্লবীদের সংগঠন সম্পর্কে যে মোট দেয়, তাতে বলা হয়—

“বাংলাদেশে শচীনের হুজুন সহযোগিতা রয়েছে—

তাদের নাম রবীন ও গৌরা। জানা গেছে যে শচীন ধরা পড়ার পর তার সহকর্মীরা শচীনের ভাই দ্বিতেনকে (সান্ত্বাল) চিঠিপত্রের জন্ত হুট তিকানা দেয়। এর মধ্যে একটি ভবানীপুরে ৪৮ নম্বর শীখারীপাড়া রোডের কে. সি. গুহর তিকানা। এই তিকানার কতকগুলি চিঠিতে গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে যে, রবীন হচ্ছে আসলে যতীন্দ্রনাথ দাস।”

ঐ একই নোটে বলা হয়—“দক্ষিণেশ্বর বোমার কারখানা ধরা পড়ার পরই যতীন দাস আত্মগোপন করে। সেপ্টেম্বর মাসে মীরোটের এক গোপন সভায় সে হাজির ছিল। এই সভাতে রামপ্রসাদ বিসমিলও ছিল। উপরে উল্লিখিত চিঠিগুলিতে এক কালীঝারু নাম আছে যাকে শাড়ি ও বইপত্র নিয়ে আসতে বলা হয়েছে।

“প্রতি সেপ্টেম্বর মাসে রবীন (ওরফে যতীন দাস) ইউরোপীয় পোশাকে অস্ত্র নিয়ে আসে এবং সেই অস্ত্রই কাকোরি ডাকাতিতে ব্যবহার করা হয়। সংগঠনের কাজের জন্ত রামপ্রসাদ রবীনকে পাঁচশো টাকা দেয়।”

কাকোরি ডাকাতির মামলার মূল আসামীদের—রামপ্রসাদ বিসমিল, রোশন সিং, আসফাকউল্লাহ রাজেন লাহিড়ী,—কালী দেওয়া হয়। শচীন্দ্রনাথ সান্ত্বাল, যোগেশ চ্যাটার্জী, শচীন্দ্রনাথ বস্তু, গোবিন্দচরণ কর প্রমুখের হয় যাবজ্জীবন বীপাত্তর। চন্দ্রশেখর আজাদকে পুলিশ ধরতে পারেনি। আর যতীন্দ্রনাথ দাসের বিরুদ্ধে উপহৃত সাক্ষী ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে না পারার তাঁকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের ধারায় বন্দী করা হয়।

১। এই ঘটনার বিবরণ আর্মি প্রিপ্রেশরজন সেনের মুখেই শুনা গেল।

২। অবিস্মরণীয়—পৃঃ ৭৮ (গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র)

৩। প্রবন্ধ লেখকের কাছে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য।

৪। যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী (এম.পি.) তাঁর বইয়ে (“In Search of Freedom”, পৃঃ ৩৬৭) লিখেছেন, কালীঝারু আসলে যতীন দাসেরই আর একটি ছদ্মনাম।

# রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে তাঁর (সোনার বাংলার কথা)

গৌরীদাস মল্লিক

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহুখণী প্রতিভার জন্ম বিবের  
সুধীকনের কাছে বিশেষ সম্মানিত ও সমাদৃত  
হয়েছিলেন। তাঁর নানা বিষয়ে জ্ঞানগুরু তাত্ত্বিক  
আলোচনা, তাঁর ভাবগম্বুজ কাব্যসজীত প্রভৃতি রচনা,  
তাঁর মানবতার মহৎ আদর্শ তাঁদের অন্তরকে মুগ্ধ  
করেছে। তাঁর এইসব কীর্তির মাঝেও ছিল তাঁর এক  
আবেগময় কর্মময় জীবন, যে জীবনে তিনি কায়মনো-  
বাক্যে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর  
স্বদেশপ্রেম তাঁর স্বদেশবাসীকে যেমন মুগ্ধ করেছিল  
তেমনি তাদের তা স্বদেশ সাধনায় উদ্বোধিতও করে  
ছিল। তাঁর অস্তিত্ব চিন্তার মধ্যেও তাঁর স্বদেশচিন্তা  
অব্যাহত ছিল, স্বদেশপ্রেম ও বাংলাদেশপ্রীতি তাঁর  
অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল। (স্বদেশপ্রেমের আবেগে তিনি  
তাঁর স্বদেশকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'ভারতভার্য', যার  
গৌরবময় অবস্থানের পরিচয় দিয়েছিলেন—'মহামানবের  
সাগরভার্য'। আর তাঁর জন্মভূমি বঙ্গভূমিকে আখ্যা  
দিয়েছিলেন—'সোনার বাংলা', বাক্যে তিনি আদর করে  
সম্বোধন করে বলেছিলেন—'আমার সোনার বাংলা,  
আমি তোমার ভালবাসি।' তিনি 'ভারতভার্য'-কে ত্রেয়  
মানবতার পূজারী হয়ে কখনও থাকতেন বিধিচিন্তার মগ্ন,  
কখনও স্বদেশভক্ত হয়ে স্বদেশ-সাধনায় ব্রতী। আবার,  
ঐ 'ভারতভার্য'-কে ত্রেয় পূর্বাকলে তাঁর জন্মভূমি যে  
'সোনার বাংলা', সেখানে তিনি বাংলাদেশপ্রেমী  
বাঙালী, দেশাত্মবোধক বাণীর প্রচারক হিসাবে চারণ-  
কবি এবং বাংলার কল্যাণকামী কর্তব্যোগী।

বাংলাদেশকে রবীন্দ্রনাথ একান্ত ভালবেসেছিলেন  
সমগ্রভাবে। তাঁর আকাশ, তাঁর বাতাস, হায়াভরা তাঁর  
পল্লীর নদীতট, তাঁর ধানভরা কেতের শ্রামিলমা—এ  
সবই যেন তাঁর চোখে এক যারার অঙ্গন পরিচয়  
দিয়েছিল, বঙ্গজননীর স্নেহকে মল স্পর্শ তিনি যেন তাঁর

অন্তরে অনুভব করেছিলেন। তাই বাংলাদেশের প্রতি  
তাঁর গভীর অহুবাগ, তাই তাঁর প্রতি তাঁর আত্ম-  
নিবেদনের প্রকাশ—'সোনার বাংলা'।

“আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।  
চিরদিন তোমার আকাশ. তোমার বাতাস,  
আমার প্রাণে বাজার বাঁশী।

— — — — —  
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো,  
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে,  
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুখের মতো,  
মরি হায়, হায় যে—  
মা তোর বদনখানি মলিন হলে,

ও মা, আমি নয়নকলে ভাসি।”

এইরূপে তিনি মাতৃজ্ঞানে বাংলাদেশের স্তুতিগান  
করলেন। এইসঙ্গে তাঁর 'সোনার বাংলা'র পল্লীপ্রকৃতির  
প্রতি তিনি যেমন তাঁর গভীর অহুবাগ ও মমত্ববোধ  
প্রকাশ করলেন, তেমনি বাংলামায়ের প্রকৃতির কোলে  
যেসব রাখাল-চাষী, যাদের 'খেজু-চরা' মাঠে, 'পারে  
যাবার ধোয়াবাটে', 'ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাটে' আর 'ধান  
ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে'—সেইসব  
পল্লীবাসীদেরও তিনি তাঁর ভালবাসা জানালেন এই  
বলে—“ও মা, আমার যে তাই তারা সবাই, ও মা,  
তোমার রাখাল তোমার চাষী।” তাঁর এই সঙ্গীতে  
হয়তো কবিস্বলভ ভাবানুভব প্রকাশ আছে। কিন্তু  
তাঁরই সব নয়, এই সঙ্গীতের মর্মে তাঁর আন্তরিকতার  
পরিচয়ও আছে।

বাংলার পল্লীপ্রকৃতি, তাঁর আকাশ, তাঁর বাতাস-  
স্বস্তিক্য-জল-বন-শতকেজ প্রভৃতি যেসব উপকরণ নিয়ে  
অগিষ্ঠিত, সেইসব উপকরণগুলিকে নিছক প্রাকৃতিক  
বস্তুবিশেষজ্ঞানে উপেক্ষা না করে তিনি সেইসব

উপকরণগুলিকে কল্যাণকর ও প্রীতিপদ সত্য পদার্থের মতোই বিবেচনা করতেন। একথা তাঁর এক ভাষণের মধ্যে প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন “এই যে বাংলাদেশ ইহার সুভিকা, ইহার জল, ইহার বায়ু, ইহার আকাশ, ইহার বন, ইহার শস্যক্ষেত্র লইয়া আমাদের সর্বতোভাবে বেঁটন করিয়া আছে,—যাহা আমাদের পিতৃপিতামহগণকে বহু যুগ হইতে লালন করিয়া আসিয়াছে, যাহা আমাদের অনাগত সম্ভাবিতগণকে বঞ্চে ধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে,.....।”

বাংলাদেশের প্রকৃতির সর্গদিকে, সংস্থানে যেন তিনি অহুভব করেছিলেন বাংলামায়ের স্নেহাকলের মাতৃস্পর্শ। তাই তাঁর কাছে বাংলাদেশ সোনার বাংলা, তাই সেই সোনার বাংলাকে মাতৃজ্ঞানে নিবেদন করলেন তাঁর অন্তরের ভালবাসা। এই ভালবাসা জানানো শুধু সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে নয়, ভাবরস-সজ্জাগের মধ্যেও তা নিবদ্ধ নয়, তা যে ছিল কত আত্মিক, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর উপরোক্ত ভাষণের পরবর্তী অংশের এই কথায়— ‘.....যে কল্যাণী আমাদের পিতৃগণের অমর কীর্তি অন্ততবাণী আমাদের জন্য বহন করিয়া চলিয়াছে আমরা তাহাকে যেন সত্য পদার্থের মতোই সর্বতোভাবে ভালবাসিতে পারি—কেবলমাত্র ভাবরসসজ্জাগের মধ্যে আমাদের সমস্ত প্রীতিকো নিঃশেষ করিয়া না দি।’

বাংলাদেশকে কেমন করে যে সর্বতোভাবে ভালবাসা জানাতে হয়, তারও একটি সুপরিপক্ক গঠনমূলক কার্যাবলীর নির্দেশ দিয়ে তিনি বলে গেলেন—“আমরা যেন ভালবাসিয়া তাহার সুভিকাকে উন্নয়ন করি, তাহার জলকে নির্মল করি, তাহার বায়ুকে নিরাময় করি, তাহার বনজলীকে ফল-পুষ্পবতী করিয়া তুলি, তাহার নরনারীকে মহত্ত্বলাভে সাহায্য করি। যাহাকে এমনি নতরূপে জানি ও সত্যরূপে ভালবাসি তাহাকে আমরা সকল দিক্ দিয়া এমনি করিয়া লাগাই, সকল দিক্ হইতে এমনি করিয়া সেবা করি, এবং সেই আমাদের সেবার প্রাণী প্রাণের ধনের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই না।”

বাংলাদেশকে সর্বতোভাবে ভালবাসার অর্থ যে এত গভীর, এত ব্যাপক, তা শুধু বাংলার কল্যাণকামী

রবীন্দ্রনাথের চিন্তার আশা সম্ভব। তিনি যেন বাংলাদেশের বুকের দিলেন যে, বাংলাদেশকে ভালবাসা নিহক ভাবরসসজ্জাগ নয়, তা শুধু বাংলাদেশকে নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে সীমিত নয়, তা আরও গভীরে, তা আরও ব্যাপক। বাংলার জল বাংলার বায়ুকে নির্মল ও রোগজীবাণুমুক্ত করে, তার মাটিকে উন্নয়ন করে তাকে সুকলা-সুকলা শস্য-শ্রামলা করে তাকে সুসজ্জিত করে তোলা, আর বাংলার নরনারীদের শিক্ষায় দীক্ষায় প্রকৃত মানুষ করে তোলাই হলো, রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলাদেশকে ভালবাসা। দেশকে সর্বতোভাবে গড়ে তোলাই হলো দেশকে ভালবাসার সার্থকতা, যেমন সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলাই হলো বাপ-মায়ের সন্তানবাৎসল্যের সার্থকতা, এই ভাব নিয়ে তিনি বঙ্গজননীকে ভালবাসা জানিয়ে বললেন, “আমার সোনার বাংলা, আমি তোমার ভালবাসি”, তেমনি আবার বাংলার সর্গবিধ সংগঠনমূলক কার্যের শিক্ষার জন্যও ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন,

“বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার

ফল—

পুষ্য হউক, পুষ্য হউক, পুষ্য হউক হে ভগবান ॥

বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ —  
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান ॥”

রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশপ্রেমী, আবার কবিও বটে। তাঁর ব্যক্তিত্বের এই দুইটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে তিনি বাংলার প্রকৃতিজগৎকে নিরীক্ষণ করেছেন, মুগ্ধ হয়েছেন তা দেখে, ফলে তার প্রতি তাঁর অন্তরে যে প্রীতিভাবের সঞ্চার হয়েছিল, তা তিনি হৃদয়িত কবিতায় ও সঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। আবার, যতাবশেষে তাঁর অন্তর অধ্যাত্মচেতনার ছিল সদা প্রোথিত। সেই অধ্যাত্মচেতনার প্রভাবে তিনি বাংলার অন্তরাত্ম্য মধ্যে গুনতে পেয়েছিলেন দেশমাতৃকা বঙ্গজননীর পদধ্বনি। বাংলার প্রতি তাঁর প্রীতি-অনুরাগ-মমতাবোধ—এইসব যেন ভক্তি-প্রেমের অর্ধরূপে তিনি বঙ্গজননীর উদ্দেশে নিবেদন

করেছেন। ভাবাবেশে একদিন তিনি করলেন তাঁর বন্দনা—

“তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে,  
তব আজবনে যেরা সহস্র ফুটিয়ে,  
দোহনরুখের গোটে, ছায়াবটমূলে,  
গজার পাখানঘাটে ঘাঘন দেউলে,  
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষী, হে বঙ্গজননী  
আপন অক্স কান্ন করিছ আশনি  
অহর্নিশ হান্তমুখে।.....”

তিনি এখানে তাঁর ভাবজগতের বঙ্গজননীকে দেখে  
অধিষ্ঠিত রেখে নিছক দেবীরূপে তাঁকে বন্দনা করেছেন  
না। তিনি তাঁর মধ্যে দেখেছেন সংসারের সর্বা কর্মব্যস্ত  
জননীর সত্তাকে। তাই, তিনি তাঁর বন্দনায় আরও  
জানালেন—

“নিত্যকর্মে রত শুধু, অয়ি মাতৃভূমি,  
প্রত্যয়ে পূজার ফুল ফুটায়েছ তুমি,  
মধ্যাহ্নে পল্লবাকুল প্রসারিয়া ধরি  
রৌদ্র নিবারণ,.....”

বঙ্গজননীর পূজারী তিনি। বাংলার প্রকৃতিজগতের  
পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গজননীও যেন তাঁর ভাব-  
জগতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবমূর্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হন।

শরৎকালের এক প্রভাতে বাংলার পল্লীর প্রাকৃতিক  
সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ কবিমনে উদয় হয়েছিল এক ভাবাবেশ।  
সেই ভাবাবেশে তিনি দেখলেন—সেই মনোমুগ্ধকর  
শারদ প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক উপকরণে সজ্জিত হয়ে  
প্রকৃতিসত্যের অপরূপ বেশে দণ্ডায়মানা বঙ্গমাতা। এই  
স্থূলের পরিবেশে কবি বঙ্গমাতাকে জানালেন তাঁর  
হৃদয়োচ্ছ্বাস—

“আজি কি তোমার মধুর স্মৃতি  
হেরিছ শারদ প্রভাতে।  
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্রামল অঙ্গ  
ঝলিছে অমল শোভাতে।

... ..  
মাতার কণ্ঠে শেকালিমাল্য  
গন্ধে ভরিছে অবনী।  
জলধারা যেব আঁচলে খচিত  
স্তম্ভ যেন সে নবনী।

বাংলামায়ের শুভ কবি এইভাবে তাঁর ভাবরাজ্যে  
দেখলেন তাঁর সৌন্দর্যময়ী বঙ্গজননীকে, যিনি দাঁড়িয়ে  
আছেন ‘কুহুমভূষণজড়িতচরণে’ এক মনোমুগ্ধকর  
প্রাকৃতিক পরিবেশে, যে পরিবেশে (কবির বর্ণনায়)—

“পারে না বহিতে নদী জলধার,  
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর—  
ডাকিছে দারেল গাহিছে কোয়েল

তোমার কানন-সভাতে  
মাঝখানে ছুঁমি দাঁড়িয়ে জননী,  
শরৎকালের প্রভাতে।”

কবি দেখছেন, তাঁর ধানের এই সৌন্দর্যময়ী  
বঙ্গজননী শুধু নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেননি, তিনি  
কর্মব্যস্ত হয়ে আছেন। কারণ তাঁর “মাঠে মাঠে ধান  
ধরে নাকো আর”। আর তাঁর ধান-ভাঙারে “আঁটি  
আঁটি ধান চলে তারে তার।” এই ধান্যভাঙারের  
পূর্ণাঙ্গ পরিমাণ ধান যোগান দিতে হবে দেশ-বিদেশে,  
তা জানিয়ে দিতে হবে সর্গজ। তাই বঙ্গজননীকে কবি  
বলছেন—

“জননী, তোমার শুভ আহ্বান  
গিয়াছে নির্খলভুবনে—

নূতন ধাত্তে হবে নবান্ন  
তোমার ভবনে ভবনে।”

তাই কবি জানাচ্ছেন—“অবলর আর নাহিক  
ভোমার—”। কবিও যেন বাংলাদেশের ধানের প্রাচুর্যে  
উৎফুল্ল হয়ে দেশের সকলকে আহ্বান জানিয়ে বললেনঃ

“আর আর আয়, আয় যে যেবার  
আর তোরা সব ছুটিয়া—  
ভাঙার দার খুলেছে জননী  
অন্ন যেতেছে লুটিয়া।”

সর্বস্তরের দেশবাসীকে আহ্বান করে তিনি বলে  
চলেছেন—“ওপার হইতে আর খেরা ধিরে,/ওপাড়া  
হইতে আর মারে ধিরে—।” শুধু ধনী-মধ্যবিত্তদের  
তিনি বঙ্গজননীর অন্ন-ভাঙারের ভাগ নিতে আহ্বান  
জানান নি, যে-সব দরিদ্র অন্নভাবে ক্ষুধার্ত, তাদের

তিনি ডাক দিলেন—“কে কাঁদে জুয়ার জননী  
ওয়ার/আর তোরা নবে জুটিয়া।”

বঙ্গপ্রেমী কবি বাংলার শারদ-সৌন্দর্য বর্ণনাচ্ছে  
বঙ্গজননীকে প্রকৃতির মনোহর উপকরণে সাজিয়ে ঐ  
প্রকৃতিরই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দৃশ্যপটে স্নানরূপে সজ্জা করে  
চললেন। শুধু তাই নয়, সেই জননীকে অন্নদালা  
অন্নপূর্ণারূপে ঘোষণাও করলেন। যে প্রিয় তাকে কল্পিত  
শঙ্কার মনোমত করে সাজানো ও তার উজ্জ্বলিত গুণ-  
গানে তাকে মহিমায়িত করে তোলা তার প্রতি প্রগাঢ়  
ভালবাসার পরিচায়ক। অবশ্য বাস্তবের দিক দিয়ে  
দেখলে এর মধ্যে হয়তো দেখতে পাওয়া যেতে পারে  
তাবাবেগজনিত কিছু অতিশয়োক্তি। যাই হোক,  
উপরোক্ত কবিতায় এমন করেই বঙ্গপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ  
কাব্যের ভাব-ভাষা-হৃদয়ের মাধ্যমে বঙ্গজননীকে  
ভালবাসা জানিয়েছেন। আরও, তিনি তাঁকে আদর্শ  
মাতা বলে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে সাধরে জানিয়েছিলেন :

“হে নিত্য-কল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গজননী,

আপন অজস্র কাজ করিহ আপনি

অহর্নিশ হস্তমুখে।”

তাই, তিনি তাঁর সেই আদর্শ দেশজননীর চরণে  
আত্মনিবেদন করে গেয়েছেন—

“ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে,

দে গো তোর পায়ের ধূলো, সে যে আমার মাথার  
মানিক হবে।

ও মা গরীবের ধন বা আছে তাই দিব চরণতলে,

মরি হার, হার যে—

আমি পরের ঘরে কিনব না আর ভূষণ

ব’লে গলার কাঁচি।”

উপরোক্ত সংগীতাংশে শুধু বাংলামায়ের প্রতি  
আত্মনিবেদনের কথা নেই, এর সঙ্গে পরোক্ষভাবে  
আরও জড়িয়ে আছে এই সংগীত রচনাকালীন বিলাতী  
দ্রব্য বর্জনের সংকল্পের কথাও।

উক্ত সংগীতাংশটি রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক  
‘সোনার বাংলা’ সঙ্গীতের শেষ অংশ। তিনি এই  
সঙ্গীত রচনা করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে

যখন বাঙালী দমনের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসকের নির্দেশে  
বাংলাদেশকে দুই অংশে বিভাজন করার প্রতিবাদে  
বাঙালীরা ‘বঙ্গভঙ্গ’-আন্দোলনে তথা স্বদেশী  
আন্দোলনে সারা বাংলাদেশকে আলোড়িত করে  
চলেছিল। এই আন্দোলনের অন্ততম বিশিষ্ট কার্যসূচী  
ছিল ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটানো। বাঙালী  
দমনে ব্রিটিশের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ নীতিতে রবীন্দ্রনাথও  
তখন বিলাতি বর্জনের সংকল্প করেছিলেন, তা বোঝা  
যায় তাঁর এই কথায় ‘পরের ঘরে কিনব না আর  
ভূষণ ব’লে গলার কাঁচি।’

বাংলাদেশের হৃদয় হতে অমন যে স্বতঃস্ফূর্ত স্বদেশী  
আন্দোলন প্রকাশ পেয়েছিল, সেই আন্দোলনে বঙ্গ-  
ব্যবচ্ছেদে বিমূঢ় বাঙালীদের মনে ব্রিটিশ শাসকের  
প্রতি বৈরপ্য ও জন্মভূমি বাংলাদেশের প্রতি প্রীতি  
জাগানোর উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করেছিলেন পূর্বোক্ত  
‘সোনার বাংলা’ গানের সঙ্গে আরও অনেক দেশাত্মবোধক  
গান, যে গান গেয়ে গেয়ে তখনকার ও পরবর্তীকালেও  
বাংলাদেশের স্বদেশভক্ত সোচ্ছাসেবকরা বাংলার  
আকাশ-বাতাস সুধারিত করে স্বদেশপ্রীতির এক  
আবেগময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ চেতনার উদ্বোধন করার উদ্দেশ্যে  
শুধু দেশাত্মবোধক গান-কবিতা রচনা করে বাংলা  
প্রীতির পরিচয় দেন নি, তিনি কায়মনোবাক্যে  
বাংলাদেশের উন্নতি ও বাংলার স্বাধীনস্বরক্ষণের  
ব্যাপারেও সচেষ্ট ছিলেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বাংলাদেশের  
স্বার্থের অন্তরায়, কারণ বাংলাদেশকে দুই অংশে বিভাজন  
করে বাঙালীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের হৃৎস্পন্দ  
করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। তাই, রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ  
সরকারের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ প্রচেষ্টাকে বিচার দিয়ে-  
ছিলেন। আর ঐ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবার উদ্দেশ্যে  
বাংলাদেশের সুবর্ণাভূমিকে সংহত করে সুবন্ধের মনে  
আত্মশক্তি, ঐক্যবোধ ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার  
এবং বাংলাদেশের স্বার্থে আত্মনিয়োগ করার কাজে  
তাদের প্রেরণা দেবার প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বত্ব  
করেছিলেন। তাই, সেই সময়ে একদিন তিনি বাংলার



সুবক্শের আস্থান করে তাদের উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন,—“হে বলের নবীন সুবক্শ,.....বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শৃঙ্খলা আনিয়ন করা, জড়ত্বের মধ্যে জীবন সঞ্চার করা, সংকীর্ণতার মধ্যে উদার মনুষ্কতাকে আস্থান করা— এই মহৎ সৃষ্টি কার্য তোমার সম্মুখে পড়িয়া আছে..... নিজের শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন করো, নিজের দেশের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করো এবং ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়ো না। আজ আমাদের কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মানচিত্রের মাঝখানে একটা রেখা টানিয়া দিতে উদ্ভত হইয়াছেন।.....য্যাপে দাগ টানিয়া মাত্র বাংলাদেশকে হুই টুকরা করিতে গর্বমেন্টে পাবেন ?.....আমরা সমস্ত বাঙালী তাদের ঐক্যপুত্রকে অবিচ্ছিন্ন রাখিতে পারি না ?.....আমাদের কয়েকজনকে চেঁচাতেই সেই বৃহৎ ঐক্য মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে, এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিতে হইবে।”

রবীন্দ্রনাথের এই মর্মগ্রাহী কথার বোঝা যায় যে, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে বিমুগ্ধ হলেও তিনি বঙ্গ-ভক্তকারী ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে ক্রোধ প্রকাশ না করে বিচ্ছিন্ন বাঙালীদের মধ্যে ঐক্যশক্তি জাগ্রত করার উপরই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন। কারণ, তিনি তখন বুঝেছিলেন যে, বাংলার জনসাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যবোধ জাগানো ব্যাপারে তৎকালীন রাজনীতির নেতারা কিছুই করে নি। তাদের অবজ্ঞা করে স্বদেশী কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে কেবলমাত্র ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের অস্ত্রাশ্রয় পাশদর্শি সমালোচনা করে ও কিছু কিছু স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা লাভের জন্তে আবেদন-নিবেদন করে (তীর কথার) “ইংরেজী ভাষার শুটিকের শিকড় লোকে মিলিয়া রেজোল্যুশন পাশ” করলেই যে “জন-সাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কর্তব্যবোধের উদ্রেক” হবে তা তিনি মোটেই বিশ্বাস করেন নি। তাই, তিনি বাঙালীদের মধ্যে ঐক্যশক্তি জাগানোর সংকল্প নিয়ে তাদের উদ্দেশে বলেছিলেন—“বাংলার মাঝখানে যে রাজ্য বহুগুলি রেখাই টানিয়া দিচ্, তোমাদিগকে এক

থাকিতে হইবে,—আবেদন-নিবেদনের জোরে নয়, নিজের শক্তিতে এক থাকিতে হইবে, নিজের প্রেমে এক থাকিতে হইবে।”

বাঙালী যদি প্রেমে ও মনের জোরে ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে বাঙালীদের এই ঐক্যশক্তি রাজ্যের আইনগত বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে পারবে— এই ছিল তীর বিশ্বাস। বাংলাদেশ পূর্ব ও পশ্চিম—এই দুই অংশে খণ্ডিত হয়ে যাবার কথাও তিনি ভাবতে পারেন নি। তিনি সমগ্র বাংলার কল্যাণ-কামী। তাই বাংলার অখণ্ডতা সম্বন্ধে তীর গভীর আবেগে ভরা এবং নিজস্ব মতবাদ ছিল। তা ব্যক্ত করে তিনি একদিন বলেছিলেন—“বাংলার পূর্ব পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন; একই পূর্ব-পশ্চিম হ্রৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের জায়, একই পুরাতন রক্তপ্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের সমস্ত শিরা-উপশিরার প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে; এই পূর্ব-পশ্চিম জননীর বাম-দক্ষিণ স্তনের জায় চিরদিন বাঙালীর সন্তানকে পালন করিয়াছে।”

এইরূপ যে তীর ধ্যানের স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশমাতৃকা বাংলাদেশ, তাকে বিখণ্ডিত করবার প্রচেষ্টাকে পর্দ্বদন্ত করবার জন্ত তখনকার স্বদেশী আন্দোলনে বিলাতী জিনিস বর্জন করবার যে সংকল্প সারা দেশ গ্রহণ করেছিল, রবীন্দ্রনাথও সে সংকল্পকে স্বাগত জানিয়ে-ছিলেন। কিন্তু তীর সেই সংকল্প কণিক আন্দোলনের উদ্ভেজনাভিনিত নয়। তাহা যে এক আবেগময় আত্মীয় স্বদেশীয়তাবোধিত, তা বেশ বোঝা যায় তীর এই উক্তিতে—“আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতি জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া দেশী জিনিস তিনিবার জন্ত যে সংকল্প করিয়াছি, সেই সংকল্পটিকে তত্ত্বভাবে গভীরভাবে হারী মঙ্গলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে।.....ইহা দেশের পূজা, ইহা একটি মহান সংকল্পের নিকট আত্মনিবেদন।”

সেই সময়ে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে যে স্বদেশী

আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা তার পূর্বকালীন রাজ-  
নৈতিক আন্দোলনের মতো শুধু 'গুটিকরেক শিক্ষিত  
লোকের' মধ্যে সীমিত ছিল না ও শুধু ব্রিটিশ সরকারের  
নিকট 'আবেদন-নিবেদন'-সর্বস্ব ছিল না, তা ছিল  
জন-জাগরণের স্বতঃকূর্ত প্রকাশ, তা ছিল রাজার বিরুদ্ধে  
জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। সোদান শিক্ষিত-অশিক্ষিত  
নির্বিশেষে সমগ্র বাংলার দেশপ্রেমী জনসাধারণ ঐক্য-  
বদ্ধ হয়ে রাজশক্তির নানারূপ অভ্যয়ের বিরুদ্ধে ক্রমে  
দাঁড়াবার জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেছিল, যার  
ফলে তারা বহু ভাগ স্বীকার করে, বহু হুঃখকষ্ট ভোগ  
করে তাদের স্বদেশী-আন্দোলনকে তীব্রতর করে তুলে  
সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল।  
সোদানকার বাঙালীদের এরূপ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের  
উত্তমকৈ বাঙালীর অভূতপূর্ব সংগ্রাম-শক্তির পরিচায়ক  
হিসাবে গণ্য করে তিনি তাঁর বৃত্তার প্রায় দুই বৎসর  
পূর্বে এক প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রশংসার ছলে  
বলেছিলেন—“বাংলাদেশের ইচ্ছার মূর্তি একদিন  
প্রত্যক্ষ করছি বঙ্গভঙ্গ বোধের আন্দোলনে। বঙ্গ  
কলেশ্বর বিধিগুণিত করবার জন্যে সমুদ্রত ধড়াকে প্রতিহত  
করেছিল এই ইচ্ছা। যে বহুবলশালী শক্তির প্রতি-  
পক্ষে বাঙালী সোদান ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, সেই রাজশক্তির  
অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত করা সম্ভবপর কি-না এ নিয়ে সে  
বিজয়ের মতো তর্ক করে নি, বিচার করে নি, কেবলই  
সে সমস্ত মন দিয়ে ইচ্ছা করেছিল।”

রাজশক্তির বাংলাদেশকে বিধিগুণিত করবার  
অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত করবার উদ্দেশ্যে বাঙালীরা তখন  
যে মনোবল দেখিয়েছিলেন, তার প্রশংসা করে এইভাবে  
রবীন্দ্রনাথ তার জীবনসারাকে সেই সব বাঙালীদের  
মর্যাদা দিলেন।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে বাংলার জনসাধারণের  
মধ্যে কেমন করে যে সম্ভব হলো স্বদেশ চেতনার  
উদ্বোধন, বাংলাদেশের অখণ্ডতা অক্ষুর রাখার প্রবল  
ইচ্ছার উদ্বেগ, আর সেই উদ্বেগে ঐক্যবদ্ধ বাঙালীদের  
রাজশক্তির বিরুদ্ধে সেই জাগ্রত ইচ্ছার প্রবল শক্তির

প্রয়োগ—তা তখনকার রাজশক্তির কাছে আবেদন-  
নিবেদন-সর্বস্ব রাজনৈতিক আন্দোলনের মূর্গে ছিল  
বিস্ময়ের বিষয়। রবীন্দ্রনাথও এই প্রসঙ্গে বিস্ময়  
প্রকাশ করে তখন বলেছিলেন—“বাংলাকে যেমনি  
হুইখানা করিবার হুকুম হইল অমনি পূর্ব হইতে পাঁচমে  
একটিমাত্র ধনি জাগিয়া উঠিল—আমরা যে বাঙালী,  
আমরা যে এক। বাঙালী কখন যে বাঙালীর এত কাছে  
আসিয়া পড়িয়াছে, যত্নের নাড়ি কখন বাংলার সকল  
অঙ্গে এমন করিয়া এক চেতনার বন্ধনে  
বাঁধিয়া ছুলিয়াছে, তাহা ত পূর্বে আমরা এমন শ্রুতি  
করিয়া বুঝিতে পারি নাই।”

কিন্তু বাঙালীদের অন্তরে কেমন করে সম্ভবপর  
হলো এইরূপ ঐক্য চেতনার জাগরণ, কেমন করে  
সম্ভবপর হলো বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে  
ইচ্ছামূর্তির প্রকাশ—তার একটা ভাবমর্যাদা তৎপত্ত কারণও  
বুঝিয়ে বলেছেন বঙ্গজননীর পূজারী রবীন্দ্রনাথ তাঁর  
এক অভিভাষণে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—“বঙ্গ  
ব্যবচ্ছেদ একটি উপলক্ষ স্বরূপ হইয়া সমস্ত বাঙালীর  
হৃদয়ে এক আঘাত লগার করিতেই অমনি আমাদের  
যেন একটা তম্বা ছুটিয়া পেল, অমনি আমরা দুহুর্ডের  
মধ্যেই চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম বহু কোটি  
সন্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি  
বিরাজ করিতেছে।.....সেই জগ্গই আমাদের সমস্তো-  
জাগ্রত চক্ষুর উপরে জননীর মাতৃমূর্তি পাত হইবামাত্রই  
এমন অনায়াসেই বাঙালী বাঙালীর এত কাছে আসিয়া  
পড়িল—আমাদের হৃৎ-হুঃখ, বিপদ-সম্পদ, মান-অপমান  
যে সেই এক মাতার চিহ্নেই আঘাত করিতেছে, একথা  
বুঝিতে আমাদের আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।”

বাংলাদেশের প্রতি তাঁর গভীর অহুসারজনিত তাঁর  
কবিত্বের এইরূপ আধ্যাত্মিক উপলক্ষের কথা  
তিনি শোনালেন। তাঁর বিশ্বাস-দেশাত্মবোধহীন  
বাঙালীদের হৃদয়ে স্বদেশচেতনা ও বিবেক জাগ্রত  
হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গব্যবচ্ছেদরূপ কণাঘাতে,  
যার ফলে তারা অন্তরে অহুতব করেছিল বাংলাদেশের

অন্তরাঙ্গা যে দেশবাহুকা তাঁর আবির্ভাব, আর ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজশক্তির বঙ্গব্যবচ্ছেদ-অভিপ্রায়কে প্রতিহত করার জন্য তাঁর অহুপ্রেরণা।

অধ্যাক্ষচেষ্টনার সদা জাগ্রত ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্তর তাই, বাংলাদেশের ঐরূপ জনজাগরণের মূলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ঐশী শক্তির প্রভাব। তিনি বিশ্বের মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন যেমন বিশ্বনিরঙ্ক বিশ্বদেবতাকে, নিজের জীবনের অন্তরালে যেমন উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর জীবনের সকল কাজের পরিচালক তাঁর জীবনদেবতাকে, তেমনি তিনি বাংলাদেশের অন্তরাঙ্গার উপলব্ধি করেছিলেন স্বদেশের অন্তর্ভাবী দেবতাকে। তাঁর এইরূপ স্বদেশ-দেবতার উপলব্ধির কথা তিনি ঐ একই সময়ে জানিয়েছিলেন—  
“যিনি আমাদের দেশের দেবতা... যিনি জাতিনির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টানকে এক মহাযজ্ঞে আহ্বান করিয়া পাশে পাশে বসাইয়া সকলেরই অঙ্গের থালায় স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া আসিতেছেন, দেশের সেই অন্তর্ভাবী সেই দেবতাকে আমাদের সেই চিরন্তন অধিপত্যকে এখনো আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই।... আজ এই একটি আকস্মিক ঘটনার সমস্ত বাঙালিকে একই বেদনার আঘাত করাতে আমরা যেন ক্ষণকালের ক্ষণে আমাদের এই স্বদেশের অন্তর্ভাবী দেবতার আভাস পাইয়াছি।”

এই স্বদেশের অন্তর্ভাবী দেবতাকেই তিনি অল্প বঙ্গজননী বলে সম্বোধন করেছেন। বাংলাদেশের সংকটময় সেই রাজনৈতিক মুগ্ধসজ্জিকণে একদিন তিনি ভাবাবেশে দেখতে পেলেন স্বদেশের সেই অন্তর্ভাবী দেবতা অপরূপ রূপ ধারণ করে মহীমসী স্বদেশ-জননীরূপে তাঁর মানসগটে আবির্ভূত। বাংলাদেশ-প্রেমী বঙ্গজননীর পূজারী কবি তখন গাইলেন তাঁর ভবগান—

“আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি  
ছুঁবি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।  
ওগো মা, তোমার দেখে বেঁচে আঁখি না কিরে।  
তোমার হৃদয় আঁখি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।”

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বহুরূপে বহুভাবে বঙ্গজননীর আভিষেক অল্পভব করেছেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাবের পরিবেশে বঙ্গজননীর ভাবমূর্তিও ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে তাঁর কল্পনাপ্রবণ চিত্তে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর প্রিয় ‘সোনার বাংলা’র প্রাণ-কুড়ানো আকাশ-বাতাস প্রভৃতি প্রকৃতির শোভার অন্তরালে তিনি দেখেছেন—বাংলা দেশের স্নেহ-মমতা-ভরা হাতময়ী সৌন্দর্যশালিনী মাড়রূপ, অজ্ঞানে তাঁর ওরা ক্ষেতে তিনি দেখেছেন তাঁর অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা-মাতার রূপ, আর দেখেছেন বাংলার মাঠের মাঝে, নদীতীরে, সহস্র কুটিরে, গোষ্ঠে, ঘাটশ দেউলে সর্বত্র অজস্র কার্বেষত ‘নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী’ রূপাণী বঙ্গজননীকে। রবীন্দ্রকল্পনার দেবালয়তুল্য বাংলার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপরোক্ত ভাবমূর্তি উদয় হয়েছিল স্রষ্টার দিনে। কিন্তু বঙ্গব্যবচ্ছেদরূপ সংকটের দিনে তাঁর মনে বাংলার যে কিরূপ ভাবমূর্তি উদয় হয়েছিল, তা উল্লেখ করা যাক তাঁরই কথায়—“আজ হৃৎপিণ্ডের রাজ্যে যে বিহ্যতের আলোক চাকিত হইতেছে সেই আলোকে—আমাদের দেবালয়ের দেবতাকে, আমাদের ঐক্যাধিষ্ঠাত্রী অভয়াকে দেখিতেছি—সেই ভক্তই আজ আমাদের উৎসাহ এমন সজীব হইয়া উঠিল। সম্পদের দিনে নহে, সংকটের দিনেই বাংলাদেশ আপন হৃদয়ের মধ্যে এই প্রাণ লাভ করিল।...ইহাতেই বুঝিতে হইবে, হৃৎপিণ্ডের বল আছে, দায়িত্বেরও সম্পদ আছে।”

কবির চিত্তে উদ্ভাসিত বঙ্গজননীর এই ভাবমূর্তি এখন প্রকৃতির মকে ‘কুসুমভূষণ অঙ্কিত চরণে’ আর দাঁড়িয়ে নয়, তার দৃষ্টিভঙ্গিমায় এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না—‘নিম্ন অধিধ্বন ধৈর্যশাত দৃষ্টিপাতে চহুর্দিকময়’। এখন সেই ভাবমূর্তি বাঙালির ভাললোকে প্রতিষ্ঠিত স্রষ্টাভাব মন্দিরে ঐক্যাধিষ্ঠাত্রী অভয়রূপে বিরাজিত। বাংলার সংকটের দিনে যেন তাঁর এই অপরূপ রূপ। তাঁর সাজসজ্জায় ও দৃষ্টিভঙ্গিমায় এখন একদিকে দেখা যায় কুশাসনে পীড়িত বঙ্গসন্তানদের প্রতি তার অন্তরবাহীর ইঙ্গিত, আর একদিকে বোকা বায় কুশাসনের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম করার ইচ্ছা

কবি তাঁর ভাষায় লিখলেন এই ভাবমূর্তির বর্ণনা—

“ভান হাতে তোর খড়া অলে, বাঁ হাত করে শকাহরণ,  
হুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।

ও গো বা,

তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে।

তোমার আজি ছয়ার খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥”

রবীন্দ্রনাথের ধ্যানলোকের এই ঐক্যাবিষ্টাঙ্গী অভয়রাগিণী বঙ্গজননী যেন বঙ্গব্যবচ্ছেদকে প্রতিহত করবার জন্তে অহুপ্রেরণা দিয়ে বাঙালিদের অন্তরে ঐক্যচেতনা জাগিয়েছেন এবং উৎসাহ উদ্দীপনা ও কর্মতৎপরতার উদ্রেক করেছিলেন—এই ছিল তাঁর উপলব্ধ অভিজ্ঞতা। তাই, একদিন ঐ প্রসঙ্গেই তিনি বলেছিলেন,—“.....অমনি আমরা যুদ্ধের মধ্যেই চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম—বহুতোটি বাঙালির সান্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি বিরাজ করিতেছে।...আমাদের সন্তোজাগ্রত চক্ষুর উপরে জননীর মাতৃদুটিপাত হইবামাত্রই এমন অনায়াসেই বাঙালি বাঙালির এত কাছে আসিয়া পড়িল।”

বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন-যুগেই দেখা গেছে, বাংলাদেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রেম-প্রীতি-অনুরাগ করে পড়েছে তাঁর চিন্তা, কল্পনা ও কর্মধারার মধ্য দিয়ে। আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বাংলাদেশকে ভক্তিরূপে দেখেছেন শক্তিময়ীদেবী-জননীরূপে আর করেছেন তাঁর স্তবগান; কাব্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবমূর্তি দিয়ে তিনি তাকে স্তব ও মহৎ করে রূপায়িত করেছেন অন্নদাজীরূপে, নিত্য-কল্যাণিলক্ষীরূপে; আর বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কায়মনোবাক্যে কামনা করেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা-বাহ্যবিধানের উন্নতি ও জনসাধারণ বাঙালিদের ঐক্য, বর্ধা ও সুখসম্পদ।

বাংলাদেশকে ‘সোনার বাংলা’ বলে তিনি প্রীতি-ভালবাসা জানিয়েছেন কবিতা, সংগীত ও ভাবধারার মধ্য দিয়ে—একথা আগেই আলোচিত হয়েছে। তেমনি বাংলার সন্তান যে বাঙালি তাদেরও তিনি বঙ্গলাভাকীরূপে আশীর্বাদ জানিয়েছেন ও বদেশ

সেবার কাছে উৎসাহ দিয়েছেন। আজও যেন পকেট সেই বদেশী যুগে তিনি এক আভিভাষণে বাঙালিদের কল্যাণ কামনা করে বলেছিলেন—“তোমাদের সান্মিলিত হৃদয়ের ‘বঙ্গমাতার’-পীতবর্ণিনী একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাক—একবার করছোত করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো—

.....  
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ,  
বাঙালির ভাবা,  
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান ॥  
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত  
তাই-বোন,  
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান ॥”

তিনি ছিলেন বাঙালির কল্যাণকামী। তাই, প্রাক-বদেশী-আন্দোলনযুগে যেমন তিনি বাঙালিদের গৃহসুখবিলাসিতা দেখতে পেলেন, তখন তিনি যে কিরূপ উষ্ম হয়ে পড়েছিলেন, তা ভ্রূষপটাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সেই কালে রচিত ‘বঙ্গমাতা’-কবিতায়। এখানকার বাঙালিদের ঐরূপ দুর্গলতার জন্তে বঙ্গ-বঙ্গমাতাকেই দায়ী করে তিনি তাঁকে জানালেন—

“সাতকোটি সন্তানের, হে মুখ জননী,  
বেধেছ বাঙালি করে মানুষ কর নি।”

তাঁর বিবেচনায় যে পথে বাঙালিদের প্রকৃত মানুষ করে তোলা যায়, সেই পথের নির্দেশ উল্লেখ করে তিনি ‘বঙ্গমাতা’কে করলেন আবেদন—

“পুণ্যে পাণে হুংখে লুখে পতনে উঝানে,  
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।  
হে স্নেহাৰ্ত্ত বঙ্গভূমি, তব গৃহকোড়ে  
চিরশিশু করে আর রাখিয়ো না ধরে।  
প্রাণ দিয়ে হুংখ সয়ে, আপনার হাতে  
সংগ্রাম করিতে দাও ভালমন্স সাধে ॥”

সৌভাগ্যের কথা, এর ঠিক পরবর্তীকালেই বঙ্গভঙ্গ-রোধ-আন্দোলনযুগে ও অগ্নিযুগে বদেশ সাধনার সত্যই প্রাণ দিয়ে হুংখ সয়ে, আপনার হাতে সংগ্রাম করবার প্রবল ইচ্ছা বাঙালিদের অন্তরে যতঃকূর্ত হয়ে উঠেছিল। বঙ্গমাতা যেন কবির ঐ আবেদনে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশে নানাভাবেই রাজনৈতিক পরিবেশ

কিটি করে বাঙালিদের সংগ্রামশীল করে তুলতে পারলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রাকালে ‘শীর্ষ, শান্ত সাধু’ বাঙালিদের ‘চিরশিশু’-স্বভাবের জন্মে রবীন্দ্রনাথের মনে যে হতাশার সঞ্চার হয়েছিল, তা যেন পরবর্তীকালে ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়ে আসছিল—একথা বেশ বোঝা যায় তাঁর এই স্বীকৃতিসূচক বাক্যে—“বাংলাদেশের ইচ্ছার দৃষ্টি একদিন প্রত্যক্ষ করোঁহি বঙ্গভঙ্গরোধের আন্দোলনে। বঙ্গদেশের বিধিগুণিত করবার জন্মে নবুত্তম পঞ্চকে প্রতিহত করিহল এই ইচ্ছা।।..... বহু বংশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙালি সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল...।” এই একই প্রসঙ্গে এর পরবর্তী কালে অগ্নিব্রণের বাংলার তরুণদের বীররূপের মহিমা কীর্তন করতে করতে তিনি বলে চললেন—“তার পরবর্তী কালের প্রজন্মে (generation) ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখোঁহি বাংলাদেশের তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা স্বীপ আলাবার জন্মে আলো নিয়েই জন্মোঁহিল...তাদের সেই জ্যোতের পর জ্যোত, সেই হৃৎধের পর হৃৎধ, সেই তাদের প্রাণ নিবেদন আও নিঃশ্বাসের তন্ত্রসাং হয়েছে, কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চিরদিনের মতো। এমণ করে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে।”

তারপর তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে বললেন বাঙালি স্বভাবের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গুণাবলীর কথা—“বাঙালির স্বভাবের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরসতা, তার করুণাবৃত্তি, নতুনকে চিনে নেবার উজ্জল দৃষ্টি, রূপস্বষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি.....।” বাঙালির এই সব মনোবৃত্তির গুণের কথা উল্লেখ করে তিনি তা কর্ণে প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন—“এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাঙ্ক্ষের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে।”

কিন্তু বাঙালিদের যে কত জটিল-বিহ্বলিত আছে, তা বলা বাহুল্য। ঐ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তার কিছু কিছু উল্লেখ করতে তুললেন না। এ সম্বন্ধে তিনি একটা কথা জ্ঞাপলেন—“বাঙালি নৈরাসিক—বাঙালি অতি ক্ষুদ্র-দৃষ্টিতে বিভর্ত্ত করে, কর্ত্ত উত্তোষের আশ্রয় থেকে

শেষ পর্যন্ত বিপরীত পক্ষ নিয়ে বক্ষা-বৃদ্ধির পর্বে প্রতি-বাদ করতে তার অদ্বুত আনন্দ, সমগ্র দৃষ্টির চেয়ে বহু সন্ধানের ভাঙন-লাগানো দৃষ্টিতে তার ঔৎসুক্য।” তাঁর এই মন্তব্য যে অতি সত্য তা বলা বাহুল্য।

তিনি বাঙালিদের এইরূপ নিকর্মী বুদ্ধি ও নিষ্ফল শৌখিন তাত্ত্বিকতাকে ভাল চোখে দেখেন নি। বাংলা দেশের তৎকালীন নানাবিধ সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন—“আজ প্রয়োজন হয়েছে তর্কের নয়, স্বতঃউদ্ভূত ইচ্ছার।” বাংলার কল্যাণের জন্যই তাঁকে এইভাবে সমালোচনা করতে হয়েছে।

১৯০৯ সালে, তার মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পূর্বে সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়ক রূপে শান্তিনিকেতনে অভ্যর্থনা জানাবার সময় তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা থেকেই উদ্ধৃত করা হয়েছে বাঙালিদের সম্বন্ধে উপরোক্ত তাঁর কথাগুলি। এই উপলক্ষে তিনি সুভাষচন্দ্রকে বলে-ছিলেন—“বাঙালি অদৃষ্ট কর্ত্তক অপমানিত হয়ে মরবে না—এই আশাকে সমস্ত দেশে ছুঁটি জাগিয়ে তোলো।”

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সোনার বাংলাকে ভালবেসেছেন আবেগভরে, আন্তরিকভাবে, আর সেই বাংলার গম্বী-সহর নির্বিশেষে সকল স্থানের বাঙালিকেও দেখেছেন মর্মান্বয় সঙ্গে প্রীতির চোখে। তিনি পূর্বোক্ত ভাষণের মধ্যে বাঙালি-প্রীতির পরিচয় দিয়ে এই কামনা জানিয়েছিলেন—“বাঙালির পরস্পর বিরোধের সমাধান হোক..., আত্মসংশয়ের নিরসন হোক..., হীনতা লীক্ষিত ও দীনতা বিকৃত হোক ..।” আর এই সঙ্গে অদৃষ্ট কর্ত্তক অপমানিত বাঙালিদের মনে আশা জাগাবার জন্য তিনি দৃষ্টকণ্ঠে বলেছিলেন—“সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙালি মারের উপরে মাথা তুলবে।” ধর্ম্ম কর্ত্তে চারিজে বাঙালির উন্নত হোক—এই ছিল তাঁর আহ্বিত। জীবনসারাক্কেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন (রবীন্দ্রনাথের উক্তি) “সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সন্নিবেশ যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ বলপ্রসূ হয়, যাতে সে বিস্তারিত হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে।” বাঙালিকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন মর্মান্বয়-সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের উন্নত স্বভাববিশিষ্ট কর্মীরূপে যাতে যে

সর্বভারতীয় কর্মক্ষেত্রে কর্মের দ্বারা, আচরণের দ্বারা, প্রতিভার দ্বারা বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করতে পারে। যুদ্ধের দুই বৎসর পূর্বে মহাকাণ্ডিত সদনে তিনি বাঙালিদের অন্তরে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবোধের আগরণের কামনা করে বলেছিলেন—“বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক, বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তি সাধনায় বাঙালি স্বেচ্ছাক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে।”

এই বাণী দিয়ে তিনি এই শিক্ষা দিলেন যে, বাংলা ভারতেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাঙালির শাস্তি-সাধনা, কৃষ্টি-সাধনা বাংলাকে যেমন গৌরবান্বিত করবে ভারতকেও তেমন বলশালী ও প্রতিভাশালী করবে।

রবীন্দ্রনাথ সহর নগর অপেক্ষা গ্রামবাংলার পল্লীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। পল্লীবাসীদের সম্বন্ধে তিনি গভীর ও আন্তরিকভাবে চিন্তা করেছেন। সহস্র-ভূতির দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি তাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছেন, তাদের অভাব অভিযোগ সবিস্তারে জেনে নিয়েছেন, তাদের আত্মশক্তির অভাব অল্পভব করে তা উষোদিত করার জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভে জমিদারির কাজে তাঁর জীবনের অনেকদিন নগরের বাইরে পল্লীগ্রামের অন্ধ দুঃখের ভেতর দিয়ে কেটেছে। সেই সময়ে পল্লীর দুঃখবহা সম্বন্ধে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা ব্যক্ত করে তিনি এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন—“তখন পল্লীগ্রামের মানুষের জীবনের যে পরিচয় পেয়েছিলাম তাতে এই অল্পভব করেছিলাম যে, আমাদের দেশের যা, দেশের ধাত্রী, পল্লীজননীর স্তন্যময় গুণিয়ে গিয়েছে। গ্রামের লোকদের খাদ নেই, স্বাস্থ্য নেই, তারা শুধু একান্ত অসহায়ভাবে করুণ নয়নে চেয়ে থাকে।”

একদিন পল্লীগ্রামে নৌকা-ভ্রমণকালে পল্লীর অভাব অভিযোগের নানারূপ করুণ চিত্র তাঁর চিত্তকে যে কিরূপ বিচুত করে ছুলেছিল তার কিছু আভাস পাওয়া যায় তাঁর এই বর্ণনায়—“নদীর তীরে সেই পল্লীবাসীর সময়ে

নৌকা যখন ভেসে চলে তখন দুধারে দেখতাম পল্লীগ্রামের লোকের কত যে অভাব অভিযোগ। সে তখন অল্পভব করেছি এবং বেদনার চিত্ত ব্যথিত হয়েছিল।”

তিনি পল্লীর প্রতি সহস্রভূতিশীল। পল্লীর ঐক্যপূর্ণ মর্মান্তিক ‘অভাব অভিযোগের করুণ চিত্রের’ উদ্ধারের দর্শকের ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেন নি, বা তা নিয়ে রাষ্ট্রমঞ্চে দাঁড়িয়ে আবেগপূর্ণ বাক্যবিভ্রাস দ্বারা বক্তৃতা করে তাঁর সেই বেদনার ব্যথিত চিত্তের উদ্ধার প্রকাশ করবার জন্য আশ্রয়ও দেখান নি। তার পরিবর্তে, সেই ঘটনাকালেই তাঁর বিচুত মনে জেগে উঠেছিল এক সংকল্পের কথা। তিনি সেই কথা প্রকাশ করে বলেন, “সে সময়ে দিনরাত স্বপ্নের মতো এই অভাব অভিযোগ দূর করবার জন্য আশ্রয় ও উত্তেজনা আমার চিত্তকে অধিকার করেছিল; যত বড় দায়িত্ব হোক না কেন, তাই গ্রহণ করব—এই আনন্দেই বিভোর হয়েছিলাম...”।

তিনি শুধু চিন্তার মধ্যে সেই দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করে রাখেন নি, কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি তা পালনও করেছেন যথাসাধ্য। কত অগণিত অরহীন স্বাস্থ্যহীন অশিক্ষিত অসহায় অবহেলিত গ্রামবাসীর অভাব অভিযোগ নিয়ে দুঃখে দিন কাটাচ্ছে! এই সব দেখে তাদের অভাব অভিযোগ যাতে নিবারণিত হয় তার জন্য তিনিও যেমন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পরিকল্পনা করলেন, তেমন দেশের সুবকসের পল্লীবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা-অজানতার প্রতি অবহিত হতে বলে তাদেরও পরামর্শও দিলেন—“যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বাসিয়া বাহাকে কেহ কখনো ডাকিয়া কথা কহে নাই, তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎ-সংসারে অবজার অধিকারী নহে।...তাহাকে জ্ঞান হইতে, অজ্ঞানতার হইতে রক্ষা করো।”

এ কথা তিনি বলেছিলেন ১৯০৭ সালে। সে সময়ে কোনো রাষ্ট্রনেতাই পল্লী-উন্নয়নকর্মকে দেশের কাজ বলে গণ্য করেন নি, রবীন্দ্রনাথের এই ধারণার প্রস্তাবকে আমলই দেন নি। এর কয়েক বৎসর পরে তিনি ঐ

উদ্দেশ্যে কর্তৃকল্পে অবতীর্ণ হয়ে শ্রীনিকেতনে পল্লী উন্নয়ন মহাব্রতের অনুষ্ঠান করলেন। তাঁর সখল, ক্রমতা ছিল সীমিত। তাই, ঐ অনুষ্ঠানকে সাকল্যের পথে পরিচালিত করতে তাঁকে যে কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল তা তিনি শ্রীনিকেতনের এক সাহিত্যিকদের সভায় প্রকাশ করে বলেছিলেন, “আমি ধনী নই, আমার সাধ্য ছিল, আমার যে সম্পত্তি ছিল, যে সামান্য সখল ছিল, আমি এই অপমানিতের ক্ষত্রে তা দিয়েছি।... একদিন সেই নদীপথে যেতে যেতে অসহায় প্রামবাসী-দের যে চেহারা দেখেছি তা আমি ভুলতে পারি নি, তাই আজ এখানে এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করেছি।”

তাঁর ঐ মহাব্রতের অনুষ্ঠানটি হলো শ্রীনিকেতনের পল্লীউন্নয়ন বিভাগ।

বাংলাদেশপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশকে দেখেন নাই তার পল্লীকে বাদ দিয়ে, বাংলাদেশকে ভালবাসেন নি হতভাগ্য পল্লীর রাখাল-চাষীদের না ভালবেসে। পল্লীর দরদী তিনি। তাই তিনি সহানুভূতি দেখিয়ে গেরেছিলেন—“ও-মা, আমার যে তাই তারা সবাই, তোমার রাখাল তোমার চাষী।” আর তাঁর মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বেও বীকুড়ার এক জনসভায় তাঁর অভিভাষণে পল্লীর প্রতি তাঁর দরদের কথাও ব্যক্ত করেছিলেন—

“আমার যে নিরন্তর ভালবাসার দৃষ্টি দিয়ে আমি পল্লীগ্রামকে দেখেছি তাতেই তার কদরের দার খুলে গিয়েছে। আজ (১৯০৯ মার্চ) বললে অহংকারের মতো শোনাবে, তবু বলব আমাদের দেশের খুব অল্প লেখকই এই রসবোধের চোখে বাংলাদেশকে দেখেছেন...সেই পল্লীর প্রতি যে একটা আনন্দময় আকর্ষণ আমার যৌবনের মূখে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল আজও তা বার নি।”

যে রসবোধের চোখে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশকে দেখেছেন, ঠিক সেই রসবোধ নিয়ে আর কেউ বাংলাদেশকে দেখেন নি। তিনি এইরূপ রসবোধের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলাদেশকে সমগ্রভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, পর্যালোচনা করেছেন। কলে, তাঁর হয়েছে

নানা ভাবগত উপলব্ধি, নানা সমভাগত অভিজ্ঞতা। আর তাঁর এই সব উপলব্ধি-অভিজ্ঞতার কথা নানাভাবে নানা উদ্দেশ্যে তিনি উল্লেখ করে গেছেন হৃদয়গত কবিতায়, ভাবরসে সমৃদ্ধ সমুদ্র সংগীতে, মর্মস্পর্শী ভাষণে, আর তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধে। তাঁর এই সব কথার মূলে রয়ে গেছে—সমগ্রভাবে বাংলাদেশের প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা, যে ভালবাসার আবেগ একদিন তাঁর কণ্ঠ দিয়ে বহির্গত হয়েছিল সংগীতের মূলে—‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।’

কিন্তু হৃদয়গত কথা, মহাকালের আবর্তনে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক খড়্গের আঘাতে তাঁর মৃত্যুর প্রায় ছয় বৎসর পরে তাঁর সোনার বাংলা দুই অংশে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এতে পরলোকে তাঁর আত্মার শান্তি নিশ্চিত বিয়ত হয়েছে। তবে, সৌভাগ্যের কথা—তাঁর সোনার বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন প্রবাকুলের যে বাংলাদেশ সেখানে তিনি আজ সম্মানে স্মৃতিভাজ হতে আছেন। ঐ অকলের বাঙালিরা তাঁকে তো উপেক্ষা করেই নি, বরং তাঁর ‘সোনার বাংলা’-গানকে তাদের জাতীয় সংগীতরূপে স্বীকৃতি দিয়ে, তাঁর দেশাত্মবোধক গান-গুলিকে মর্যাদা দিয়ে তারা তাঁকে গরীয়ান করে রেখেছে। আরও মূখের বিষয়, এ-পার বাংলা আর ও-পার বাংলা মিলে যে তাঁর সোনার বাংলা, এখনও তা এক হয়ে আছে এক বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাংলার সংস্কৃতির বন্ধনে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-সাম্রাজ্যে একদিন এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন—“আজ (১৯০৪ ফেব্রুয়ারী) বাঙালি বহুদূরে যেখানেই থাক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে।”)

তাঁর এই বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ে বহি উত্তর বাংলার বাঙালিরা একই বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্যের বন্ধনে এ-পার বাংলা আর ও-পার বাংলার সঙ্গে চিরকাল যুক্ত থাকে, তবে বাংলাদেশ-প্রেমী ও সমগ্র বাঙালির কল্যাণ-কামী রবীন্দ্রনাথের আত্মবিক বাংলা-প্রীতিকে মর্যাদা দেওয়া হবে ও তাঁকে মর্যাদা দেওয়া হবে।

# অভয়

( উপভাস )

ঐশ্বরীচন্দ্র রাহা

আজ গীতা চা তৈরী করে, দাদাকে চা দিবে  
বাবাকে চা দিবে এল। সদর দরজা বন্ধ আছে কি'না  
দেখে, গোরালঘরটা দেখল। গরুগুলো গুয়ে গুয়ে  
জাবর কাটছে। বাছুর ক'টি একপাশে এর ওর পায়ে  
জড়াজড়ি করে গুয়ে রয়েছে। কুতুরটা গুয়ে আছে  
পেরারা গাছটার তলায়। আকাশ নির্মল, অনন্ত  
আকাশে অজস্র নক্ষত্ররাশি বিকস্মিক করছে। গাছ-  
পালার ওপর জ্যোৎস্নার আলো এগে পড়ে, সব বস্তু  
করছে। মাঝে মাঝে একটু ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে  
আসছে। দূরে কারা যেন খেল করতাল বাজিয়ে  
কীৰ্ত্তন গান করছে। তারই বেশ ভেসে আসছে  
বাতাসে। কোথায় যেন একটা ফুল ফুটেছে। বেড়ার  
পায়ে হাসরু-হানা ফুলের মিষ্টি গন্ধ সারা বাড়ীকে  
সুস্বাদু করে তুলেছে। অভয়ের বেশ ভাল লাগে।  
অভয় ছোট বোনের দিকে তাকিয়ে দেখে আর ভাবে।  
মায়ের শূভস্থান এখন গীতাই নিয়েছে। রান্নাবান্না  
করা, ঘরসংসার দেখা,—এই সবই কেমন সুন্দর ভাবেই  
না করছে। অথচ কতই আর বয়স। বোধ করি তের  
বছরেরও কম। খোকন এক পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে।  
এই তো কিছু আগে, আপনমনে কত কথাই না বলছিল।  
একহাতে পেন্সিলটা ধরা আছে, বইখানা আছে বুকের  
ওপর। অভয় স্নেহভরে খোকনকে সতর্পণে কাৎ করে  
গুইয়ে দিল।

গীতা বলল, ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি। অভয়  
আমায় কাছে, রান্না ঘরে বসে পড়ে। কিন্তু পড়তে চায়  
না—খালি খেলে বেড়াবে—

অভয় হেসে, স্নেহভরে তাইয়ের কপালে হাত  
বুলোয়, মাথার চুলগুলো সারিয়ে দেয়।

ছদ্দিন কেটে গেল। অভয় ঘুরে ঘুরে সারা গ্রাম  
দেখে। এর মধ্যে হু-একজন মরে গেছে, কেউ বা  
বিদেশে চলে গেছে। মোনাদার বাবা যুগল কাকাত  
বঁচে নেই। আর ময়ূধর খবর কেউ ঠিক ঠিক দিতে  
পায়ল না। তারা বলল, ওর জেল হয়েছিল মদের  
দোকানে আর বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং  
করে। তারপর কি হ'ল আর কেউ জানে না। ওদের  
বাড়ী এখন তালি বন্ধ। অভয় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে,  
সেই দোকান ঘর আজ ভগ্ন—মাটির সঙ্গে মিশে গেছে  
সব।

গাঁয়ের লোক চাষ আবাদ করে, অর্ধেকদিন  
ম্যালেরিয়া রোগে ভোগে,—কেউ বা অর গায়ে দূরের  
ডাক্তারবাড়ী থেকে একশিশি কুইনিন্ মিক্সচার নিয়ে  
আসে। এখানে রাডাঘাট নেই, খবরের কাগজ বা ফুল,  
পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। এরা শুধু মাত্র  
অদৃষ্ট আর ভগবানের ওপর নির্ভর করে বঁচে থাকে।  
আনন্দ-হীন জীবন—পেটপুরে একবেলাও সব খেতে পায়  
না। যদি ঝুটি হয়, তবেই যৎসামান্ত ধান ঘরে  
আসে। কিন্তু মহাজন আর জমিদারবাবুর অত্যাচারে  
জীবনে শান্তি অথ নেই। এরা যেন ক্রীতদাস। অভয়  
ভাবে—এই পরিবেশের মধ্যে সে, কতদিন থাকতে  
পারবে। এখন সেটাই প্রশ্ন। এই ভাবে তো ভাইবোন-  
ছোটো মাত্র হবে না—কিন্তু অস্ত্র উপায়ই বা কি? অভয়  
ষাড় হেঁট করে চলতে থাকে। একটা এমন কোন লোক  
নেই যে, তার সঙ্গে হুঁ হুঁ কথা বলে। একদিন মোনাদা  
ছিল। নিজের সকল সুখসুখের কথা, অভাব-  
অভিযোগের কথা, একমাত্র মোনাদাই ভাল বুঝত। অভয়  
ভাবে—বোধ হয় আর কোনদিনই মোনাদার সঙ্গে দেখা



হুইবে না। একে একে বহু কথা মনে হয়। তার সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে হার্পিরে, বার বার মনে হয়, বাবার এই সামান্ত দোকান, আর যৎসামান্ত বিষে কর জমিতে এই সংসার তো চলতে পারে না। এখন সমস্ত কিছু নির্ভর করছে—তার ওপর। একটা জগদল পাথর যেন তার বুকের ওপর চেপে বসে আছে। নৈরাশ্রের কালো ছায়া তাকে ঘিরে ধরে।

গোপেশ্বর বলেন, তাই তো বাবা, এমন আমাদের অদেউ যে দাদাও মারা গেলেন। দাদা যদি থাকতেন, তবে তোর যাহোক একটা ব্যবস্থা করতেন। ভেবেছিলাম দোকানটা বড় করব। গীতা খোকনের পড়াশোনার ব্যবস্থা করব। কিন্তু ভগবান সব দিক দিয়েই বাদ সাধলেন। নিমন্ত্রণ করে গোপেশ্বর আস্তে আস্তে তামাক টানেন। গীতা, খোকন ওরা বুনুচ্ছে—বাইয়েও কোনও শব্দ নেই—সমস্ত শ্রোম এখন নিত্রায়ম।

সাদা জোৎস্নার চরাচর ভাসছে। উঠানের পেয়ারা গাছের পাতা থেকে টুপ্ টাপ্ করে শিশির করে পড়ছে, —এক-একবার হু-একটা বাহুড় এসে খুপ্ করে ডালে বসে পাকা পেয়ারার ধৌক করছে।

অভয় বলল, বাবা, একটা কিছু আমার করতেই হবে। এইভাবে, এখানে বসে থাকলে, কোন কিছুই হবে না। কিন্তু কি করব—কোথায় যে যাব তাই ভাবছি।

হঠাৎ গোপেশ্বর বলেন, হী রে, তোর জেঠাইমাকে এক খানা পত্তর লিখোঁহু তো। হী, পৌছান সংবাদ দিয়ে একখানা চিঠি দিও। একেবারে সশব্দ চুকিয়ে দিলে তো চলবে না বাবা। ওঁরা বড়লোক, গরীবদের সঙ্গে ওঁদের তকাৎ অনেক। তবে দাদা বেঁচে থাকলে, সে ছিল আলাদা কথা। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

অভয় দেখে, তার বাবা যেন আরও বুড়ো হয়েছেন, অর্ধ এই বয়সের লোক, কেমন হুহ, সবল—কেমন হুহর বাহ্য তাদের। অভয়ের মনে হয়, তার বাবার দেহের ভেতর একটা হুঁচকার পোকা, যেন অহর্নিশ ঠেকে

কুরে কুরে খেয়ে সমস্ত দেহ কাঁপা ও কাঁকরা করে দিচ্ছে। নিদারুণ দারিদ্র্য, অর্ধাভাব—হুঁচকা, আর সর্বোপরি এই হুই শিশু পুরুষতার জন্ত তার বাবার মন আঁত মাত্রায় ব্যাকুল। অভয় সব বোঝে—গীতা, খোকনের সকল দার দারিদ্র এখন তার ওপর। তার মনে হয় অলঙ্কে থেকে মা যেন আঁত আগ্রহে পুত্রের দিকে তাকিয়ে আছেন। তার মা যেন বলছেন—ওরে খোকা, ও হুটোকে দেখিসু বাবা। ওরা যে নেহাৎ ছেলেমানুষ। আমি যে দিনরাত—তোর মূখের দিকে তাকিয়ে আছি বাবা—

অভয় আর থাকতে পারে না। অশ্রুট কঠে বলে, মা—মা—। গোপেশ্বরের চমক ভেঙ্গে যায়, তিনি বলেন, কিছু বলিহু বাবা—

—না—কই—না তো।

ছেলের দিকে তাকিয়ে, গোপেশ্বর বলেন, বাবা অত ভাবিসুনে। ভগবান আছেন মাথার ওপর। যা হোক একটা ব্যবস্থা—তিনি করবেনই। এ বিশ্বাস আমার আছে বাবা। মনে প্রাণে ডাকলে, তিনি অবশ্যই সাড়া দেবেন।

অভয়ের মনে পড়ে গেল, একটা কবিতার কথা। স্থলপাঠ্য বইয়ে একটা কবিতা পড়েছিল—নদী ও সময়। সমস্ত কবিতাই এখনও বেশ মনে আছে।

সত্যি তাই। নদীর স্রোত আর সময়, এদের তো কেউ ধরে বেঁধে রাখতে পারে না। এরা তো বয়ে যাবেই—এদের গতি বন্ধ হবে না। কিন্তু সময়ের সদ-ব্যবহার করলে, সময়কে ধরে রাখা যায়। অভয় মনে মনে ভাবে, সে সত্যি কিছু চেটা করেছে কি? সময়কে ধরে রাখতে—সময়কে বাঁধতে, সে কতখানি পরিশ্রম করেছে—কতখানি উত্তম দেখিয়েছে? নিজে কে প্রশ্ন করে অভয়। না—কিছুই কয়নি। শুধু গভীর-গভীর ভাবে, সেও অভয় মত সময়ের স্রোতে গাঁ ঢেলে দিয়েছে, আর অদৃষ্টকে শুধু ধিকার দিয়েছে বসে বসে।

কানে ভেসে আসে মাটার মশাই, তীর্থপতিবাহুর কথা—এঁগরে যেতে হবে—শুধু এঁগরে যেতে হবে—।

বহুদিন আগে শোনা, তীর্থপাতি বাটারের কথা আজ বুঝতে পারে অভয়। সেদিন তাঁর কথার গুঢ় অর্থ বুঝতে পারেনি। কিন্তু এখন পারছে। হঠাৎ অভয়ের মনে হয়, আচ্ছা, তীর্থপাতিবাবু এখন কোথায়? না—তাঁর কোন চিহ্নই নেই। বহুকাল আগে তিনি গুড হয়েছেন। কিন্তু তিনি বৃত্ত হলেও, তাঁর সেই প্রদীপ্ত কঠোর ছব্ব কানে এখনও ঠিক নৃতনের মত বাজছে—এগিরে যাও—এগিরে যাও সব—। শুধুমাত্র অদৃষ্টের ওপর—নির্ভর করে চুপচাপ বসে থাকলে কোনদিন উন্নতি তো দূরের কথা, হুটো ভাতও ছুটবে না। শুধুমাত্র অদৃষ্ট আর কপালের ওপর নির্ভর করে আর নিজের কপালকে ধিকার দিয়ে লাভ কি? তবে—হাত, পা, চোখ, কান এই সবের কোনও দরকারই ছিল না। ঈশ্বর তবে, মাত্র একটা মাংসপিণ্ড করে সৃষ্টি করলেই তো পারতেন। অভয় মনোহর করে ফেলে। তার মনে হয়, কে বেন তাকে ডাকছে। বার বার হাতছানি দিয়ে বলছে—ওরে, আর, আর। তাকে এগিরে যেতে হবে। পথের হুংকটের কথা ভাবলে চলবে না। পথে নানা কষ্ট আছে—নানা হুংক আছে। আছে হুংকোং নানা বিপদ-অনটন-অভাব। সেই সবকে জয় করে, তাকে এগিরে যেতে হবে। আর, আর, আর দেবী করিস নে। অভয় যেন শুনতে পায়, তার অন্তঃকরণে যে দেবতা রয়েছেন, তিনিই গুডীর কঠোর আদেশ দিচ্ছেন, সব কিছু ঝেড়ে কেলে বেরিয়ে পড়। আমার ওপর ভরসা করে, শুধু বেরিয়ে পড় একবার। তারপর পথ আপনিই দেখতে পাবি। একদিকে এই বিরাট প্রকৃতি, অল্পদিকে সেই মহাকাল। এই হুই মিলিয়ে মিশিয়ে এই সংসার। এই হুই মিলিয়ে জীবন, এই হুই মিলিয়ে ছুটে চলছে জগৎ সংসার—সৃষ্টি-হিঁত-লয়-প্রলয়। বা, এগিরে বা। অভয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে।

সকাল বেলায় অভয় বলে, বাবা কাল আমি বাইরে যাবি—

ভিত্তি চোখে গোপেশ্বর তাকিয়ে থাকেন।

আশ্চর্য হয়ে বলেন—কোথায় বাবী বলছিস বাবা? কোথায়—

“ঠিক নেই বাবা। হয়ত কলকাতা যাব। কিন্তু কোথায় বাব আর কোথায় উঠব, কিছু ঠিক নেই। কিন্তু আমার যেতেই হবে—

—যেতেই হবে। হাঁ রে খোকা, কোথায় বাবী, কোথায় থাকবি, টাকা পরসা কোথায় পাবি?

অভয় বলে—বাবা, আমি একবার চেষ্টা করব। এমনি করে, এখানে বসে থাকতে পারব না। গীতা খোকন ওদের ভবিষ্যৎ ভাবছি। শুধু ছুঁমি ওদের দেখবে। আমার জন্তে ভেবো না বাবা। আমি ঠিক সময়েই খবর দেব। শুধু ওদের আগলে থেকো।

গোপেশ্বর বলেন—খোকা, আমি এই বয়সে তোকে ছেড়ে থাকব কি করে বাবা। আমার কিছু দরকার নেই, শুধু ছুঁমি এ বাড়ীতে থাক। ভগবান চালিয়ে দেবেন—

অভয় হাসে—না, তা হয় না বাবা। ভগবান চালাবেন কোন হুংকে। তাঁর কাছে, কোন হুংকে দাবী করব, কোন হুংকে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাব বাবা—। হুঁহ, সবল দেহ নিয়ে, তাঁর কাছে ভীষণির মত দাঁড়িয়ে কি ভিক্ষা করব। তিনি তো সবই দিয়েছেন। হাত, পা, চোখ, বুদ্ধি, বিবেচনা—এ সবই তো দিয়েছেন। এ সব থেকেও, কোন লক্ষ্যে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাব। বিনা পরিশ্রমে, কোন হুংকে বলব, আমার দয়া কর, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর। আমি অত কিছু জানিনে বাবা। কিন্তু আমি ভাবছি, এ সংসার যে বড় কঠিন। বিনা পরসায় তো কেউ খেতে দেয় না।

কলকাতায় কোথায় থাকবি কোথায় উঠবি? আর কখনো তো ছুঁমি কলকাতা আসনি। তাই পথঘাটই বা চিনাবি কি করে। আমি যে ঘরে শুয়ে বিন্দুমাত্র শান্তি পাব না। হুংকে যে ভাত উঠবে না। বৃদ্ধ গোপেশ্বরের চোখ জলে ভরে যায়।

অভয় বলে, কিছু ভেবো না বাবা। তার একটা ব্যবস্থা করবই। ছুঁমি বিন্দুমাত্র ভেবো না বাবা। শুধু গীতা-খোকনকে দেখো—।

নিঃস্বাস ফেলে গোপেশ্বর বলেন, বা ভাল মনে করিস তাই কর। জোর না যে সেই মরণকালে খাব

বার শুধু তোকে ডেকেছে। এমনি কপাল, শেষ দেখাও হ'ল না। একি কম হুংখের কথা বাবা। তাঁর যখন সব শেষ হয়ে আসছে, নিঃশেষ বহু হয়-হয়, তবুও ওঁইয়ে ওঁইয়ে শুধু বলেছে—আমার খোকা, আমার অভয়—।

অভয় শূন্য ঘরনে তাকিয়ে থাকে। ওর হুই চোখ জলে ভরে যায়। তার মা। তার অভাগিনী জননী, সারা জীবন কত কষ্ট পেয়েই না মারা গেছেন। অভয় বার বার চারদিকে তাকিয়ে দেখে। ঘরসংসারে চারদিকেই মায়ের হাতের চিহ্ন। সেই শিউল ফুলের গাছ। তাঁর হাতের পোতা পেয়ারা আর আম কাঁঠাল গাছ। এই সংসারে সর্বত্র মায়ের স্মৃতিচিহ্ন জল জল ক'রছে। শুধু নেই সেই মাল্লিখটি। মহাকালের বুকে কোথায় যে হারিয়ে গেছেন, তা কে জানে। কোথাও সেই দেহের আর চিহ্ন নেই। তবুও তার মনে হয়, এই মাত্র তার মা যেন, হুই স্নিগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন বলছেন, খোকা ও খোকা। বাবা—অভয়, ভয় কি? এই যে, এই যে আমি বাবা—

### শেষ কথা

জীবনের কি শেষ আছে? ঘটনারও শেষ নেই। মহাকালের বুকে, জীবনধারা বয়ে চলছে ঠিক নদীর মত। কোথাও সোজা কোথাও এঁকে বেঁকে বন, পাহাড় ডিঙিয়ে ছুটেছে। কোথাও সে ক্ষীণ প্রাণ বা ক্ষীণকার। আবার কোথাও তার গতি প্রেত প্রাণবানু। তার শেষ নেই বিজ্ঞান নেই। জীবনও তাই। জীবনের প্রেত গতিবেগ, মত্ততা, এ সবেরও বিজ্ঞান নেই, এরও শেষ নেই। এই জীবন এক আধার থেকে অল্প আধারে ভিন্নরূপে প্রবাহিত।

এই পৃথিবীর বুকে একদিন আমরা অকস্মাৎ যেমন কয়প্রহণ করেছিলাম, ঠিক তেমন আবার এমনি অকস্মাৎই আমাদের বিদায় নিতে হবে। জীবনের সমস্ত হুংখকট স্নেহ আনন্দ, অজস্র রোমাঞ্চকর উদ্ভাসনা আর কত সুখস্বপ্নভূতির একদিন চির অবসান ঘটবে। শুধুমাত্র আশ্রিত থাকবে, নিদ্রা নিদ্রা প্রিয়জনদের অভয়ে

এক স্নেহস্মৃতি। কিন্তু কালপ্রবাহে, সেই স্মৃতিও রান হয়ে যাবে, অবশেষে সব মুছে যাবে।

দৃষ্টির অভাবশে বোধ করি সবই লুপ্ত হয়ে যায়। বুঝি সবই নিঃশেষ হয়ে যায়, আর কেহই স্মরণ করে না। মহাকালের বুকে ছারখার চিহ্নই বা কয়জন দেখে যায়? চির উজ্জল, চির স্নেহ, চির জাগরক স্মৃতি কয়জনের ভাগ্যে জোটে? না—জোটে না।

বাঁদের ভাগ্যে সেই গৌরবটুকু দেখা যায়, তাঁরা মহা-মনসি, মহা-জিহা। জানে প্রজ্ঞার তাঁরা এই বিশেষ চির স্মরণীয় হয়ে থাকেন। কিন্তু জনতার এই বিচিত্র বিপুল শ্রোতের মাঝে, বিপুল প্রাণের এই সমারোহ এদের মূল্য কতটুকু? অপরের আঁত পরিচিত পদ-চিহ্নের সঙ্গে—অপরের হায়াতে ছারা মিশিয়ে, আমাদের স্বতন্ত্র আন্তরিকতার পরিচয় কোথায়?

না—না—কিছু নেই।

অভয়ের জীবন, বা জীবনের ঘটনাপ্রবাহ কোথায়, কোনদিকে গেছে—তার খোঁজ নেবার প্রয়োজন কি?

মহাকালের নির্ভর খেলায়—দয়াময়ী মায়াময়ী, জীবনযন্ত্রণার মাঝে, এমন শত শত অভয় নিশ্চিহ্ন হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। তাদের সন্ধান কে রাখে? তাই অভয়ের খোঁজ রাখার কোনও অর্থ হয় না। তার আনন্দ, শান্তি, হুংখ বেদনা, ছোট খাট ঘটনা নিয়ে, সে নিজেকে নিয়ে থাকুক—বা নিজেকে গড়ে নিকু। তার ইতিহাস জানা, বা তার ভাগ্যের পরিণতি কোথায়, কোন পথ ধরল। তা জানা অসম্ভব। যদি সে শান্তি বা আনন্দ পায়, তবে আমরা সুখী। হুংখ যদি পায়,—মাল্লিখের কাছে যদি আঘাত পায়,—মাল্লিখের বন্ধনার যদি তার বুকে আঘাত লাগে, তবে সে হুংখে আমিও অংশীদার হব। তার সমস্ত হুংখ, স্নেহ, আনন্দকে, নিরাসক্ত মনে মনে নেব। বোধ করি এই ভাল। মাল্লিখকে আমি মাল্লিখই দেখি। দেবতা বলে পূজা করতে চাইনে—আর পণ্ড বলে স্তুতিও করতে চাইনে। অভয়ের জীবন-ইতিহাস লেখা আগার কান্ধ্য নয়। কারণ শেষ করার পরও কিছু অবশিষ্ট সব সময় থেকে যায়। কথার কথনও শেষ হয় না—আর ঘটনাও তাই।

# গল্প বলছি

(গল্প)

দুর্গাপদ দাস

অসীমবাবু অনেক দিন ছুটি দিদির বাড়ী আস নি। তোমাকে কয়েকটা কথা বলবার দরকার ছিল। ঠিকানা জানলে আগেই লিখতাম। তোমার দিদির কাছে ঠিকানা চাওয়ার সাহস হয়নি। তাতে ঠিকানার বদলে বরাতে ছুটত এক কিস্তি দাঁতের মার, অর্থাৎ গালমন্দ। তাঁর অজান্তে তোমার ভারীকে কিছুটা আচার ঘুঘু দিয়ে ঠিকানা যোগাড় করে লিখতে বসেছি।

হাতে সময় খুব বেশী নেই। হয়ত দু'তিন ঘণ্টা। এর মাঝেই বা বলবার বলে বিদায় নিচ্ছি। তোমাকে ছাড়া ব্যর্থ জীবনের কথা আর কাকেই বা লিখব? ছুটি হয়ত আমার বেদনা বুঝবে। আর, না বুঝলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবার অনেক, অনেক আগেই সংসারের সকল ভালো মন্দ, সাদা কালোর সীমানা পেরিয়ে আমি চলে যাব।

আমাকে গড়বার বেলা বিধাতা ভীষণ ড়ল করেছিলেন নিক্করই। প্রথাবধি তাই আমি নিঃসঙ্গ একা ঘরে এবং বাহিরে। সকলের মাঝে থেকেও একঘরে। মা বাপের বোকা এবং হান্ধতা। বিধাতা আমাকে রূপ দেন নি।

শৈশবে আমার খেলার সাথী কেউ ছিল না। সবাই এঁড়িয়ে চলত আমাকে। দেখলেই দূর থেকে চিৎকার করত, ঐ বে কালো পেয়ী, ঝাণ্ডা গাঁহ, ইত্যাদি। নিজের গাইবোনেরাও যে আমাকে হনকরে দেখত, এমন নয়। কথার বার্তার আকারে ইদিকে তাদের মনোভাব প্রকাশ পেত। কোনও

আত্মীয় বাড়ীতে বা গ্রামের মেলায় তারা কেউ আমাকে সঙ্গে নিত না। কারণ, আমার চেহারা দুন্দর নয়।

ষতদিন ছোট ছিলাম, এসবের কিছুই বুঝতাম না। বুঝবার বয়স যখন হলো তখন একা একা কাঁদতাম। কাঁদতাম অঝোর ধারায়, একা থাকলেই কান্না নামত, সে কী কান্না। যদি জমিয়ে রাখার মতন হত, তাহলে হয়ত আমার চোখের জলে একটা সাগরই তরে যেত। নিজেকে ড়ালিয়ে রাখার চেষ্টা করতাম। নানা অছিলায়, নানান কাজের মাঝে। তবুও কান্না থামাতে পারতাম না।

মা অবশ্র মেয়ের মনের ব্যথা বুঝতেন। কিন্তু তিনিও নিতান্ত নিরুপায়। কুশ্রী মেয়ের করুণ ভাবিস্বভাবের এত ছবি সব সময়ই তাঁর চোখের উপরে। সাত্বনা দেবার ভাষা ছিল না তাঁর। বুকের জ্বালায় নিজেকে জলে পুড়ে থাকা হতেন। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন, কি রে এমন করে কাঁদাছিস যে? জবাব দিতাম, কিছু না।

এ যেন কোনও মহাসাগরের বুকে পরম্পরের নিকটের দুটি বীপ, নিকটে থেকেও দূরে। ছুঁই ছুঁই করেও যারা কেউ কাউকে ছুঁতে পারে না। শুধু নীরবে একে অন্তের দুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বলা অথবা না বলা। ঘরেও বাইরের একটান। এই হিং হিংর ভিত্তর দিয়েই লালিত হয়েচে আমার কৃষ্ণ বৎসরের জীবন।

কেন জানি না, দিদির বাড়ী এলে ছুটি যেচে আমার সঙ্গে কথা বলতে, এঁড়িয়ে থাকার সুযোগ দিতে

না, আমাকে এটা ওটা নিয়ে খুল্লিটো চালাতে। সেই শিশু মনেই ভাবতাম, আমি একেবারে একা নই। এমন মানুষও সংসারে আছে, আমার সঙ্গে কথা বলতে তার বাধে না। আমার ভূমি কবে আসবে তার দিন গুনতাম।

শৈশবের সেই না-বুঝা দিনগুলি কেটে গেল। মনে জাগল নতুন চেতনা, নতুন অহুভূতি, বুঝতে শিখলাম ক'মণ ধানে ক'মণ চাল ফুটে। বিবাতা আমাকে রূপ না দিলেও ভড় করেন নি। আর পাচ-জনের মতন আমাকেও আনন্দ বেদনার অহুভূতিতে সাজিয়ে দিতে তাঁর কার্পণ্য ছিল না কদাপি। শৈশবের উদ্বেবেই বুঝতে পারি জগতে আমি অবাঞ্ছিত, যা বাপের গলার কাঁটা।

এ সময়ে একাদিন ভূমি আমাদের বাড়ীতে এলে। বাল্যের ঠাট্টা-তামাসার দিন উৎরে গেছে। তোমার সেদিনের পরিহাস ছিল যৌবনের পরশে রাক্ষ। একথা সেকথার পর বেশ রসিয়ে বললে, এবার আমার বিয়ের আয়োজনের সময় এসেছে।

কুঞ্জী বিজীকে ঠাই দেবার মতন উদার কেউ নেই, বলেছিলাম আমি।

আমাকে রবীন্দ্রনাথের কক্কালি কাঁবতা শুনিয়েছিলে।

ভূমি কলেজে পড়। মন তোমার আকাশে উড়ে বেড়ায়, আর আমি; আমি ধূসর পৃথিবীর কঠোর হাতের মার খাওয়া। নিজের সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন।

বলেছিলাম, কবিতা আর সংসার এক নয়। যতদিন ছোট ছিলাম, আমাদের মেলামেশাতে তোমার দ্বিধারও আপত্তি ছিল না। তিনি আমাকে বেশ মাস্টাই করতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিধার আচরণেও বদল হতে থাকে। ভূমি এলে যখন তাঁর বাড়ী যেতাম, বুঝতাম, তোমাকে দ্বিধি সব সময়ই চোখে চোখে রাখেন। আমাদের বাড়ী আসতে তোমাকে তিনি নিষেধ করেছিলেন, এমন কথাও রটেছিল। দ্বিধার হরত ভর ছিল, তাঁর সোনার চাঁদ তাই আমার থলুরে পড়ে যাবে।

দ্বিধিকে দোর দেই না। মেরেলোক একে অভের ঈর্ষা-কাড়র। যা, মেরে, শাওড়ী, বউ ও বোনেদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন তফাৎ নেই। এ জায়গায় তারা সবাই এক।

তবুও শেষ সময়ে তোমাকে নিজের কথাটি বলে খাওয়া ভালো। দ্বিধার ভয়ের কোনও কারণ ছিল না। নিজের সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। পুরুষকে কাছে টানবার মতন কোনও যোগ্যতা আমার নেই।

তোমার কাছে কেন যেতাম? যেতাম কিছুটা কথাবার্তা বলে মনের একাকিত্ব থেকে সাময়িক রেহাই পাবার আশায়। এর পেছনে আর কোনও বাসনা ছিল না। আশায় সোঁতাগা, কোনদিন রিস্ত হতে কেরত আসি নি। বুঝেই হটক অথবা না বুঝেই হটক, আমার সমস্ত রিস্ততা, নিঃস্বতা, শূন্যতা, ভূমি কানায় কানায় ভরে দিতে। ভিক্ষুকের মতন, কাঙালের মতন হু হাতের অঞ্জাল ভরে ঘরে ফিরতাম, ঘরে বেড়াতাম। মূল্যহীনারে সোনা কয়বার অহুত কমতা রাখ ভূমি। তোমার চোখের মায়ার কাকলি বুইয়ে বুইয়ে আমার সমস্ত দৈন্ত দূর করে দিত।

ঘর-সংসার যে আমার কপালে নেই একথা শুধু যে আমিই জানতাম এমন নয়, যা বাবার অজানা ছিল না। তবুও গুরু হয় সবকিছু খোঁজা। কারণ শাস্ত্র নাকি বলে যে, সব জানের শ্রেষ্ঠ দান কষ্টা দান। এ না হলে পিতার হাত শুকু হয় না। এবং অপরের মেরে ঘরে আনার ঝগড় শোষ হয় না। এছাড়া, আমার বেলা আরো একটা বড়ো কারণও ছিল। যেভামেই হোক না কেন, অপরের হাতে গিহিয়ে দিয়ে গলার কাঁটা দূর করা, দায়বৃত্ত হওয়া। যদিও সবাই জানতেন, নিফল প্রয়াস।

বিয়ের আলাপের প্রথম ও প্রধান শর্ত তখন দেখা বা বাচাই করা। সে পর্যায়ও গুরু হয় বখারীতি। প্রথম দিকে এতে যে নিজের মনেও অজানার সাজা জাগত না এমন নয়। কিছুটা যত্নও দেখতাম নিশ্চয়ই,

কিন্তু বিধি বাম। দৈত্যে হাঙ্গির আড়ালে নিজেদের মনোভাব প্রকরে সবাই বিদায় নেন, 'পরে জানাব' বলে। অর্থাৎ, এমেরে বাজারে অচল, অপ্রিয় সত্য সামনা-সামনি বলতে সৌজন্মে বাধে। তাই এ অহিলা। সে খবর কখনো আসে না।

ধীরে ধীরে নিজের কাছেও এর মাধুর্য্য, অভিনব লোপ পায়। মনে হয়, সব কিছুই যেন এক রকমের অভিনয় ছাড়া আর কিছুই নয়। একের পর এক ব্যর্থতার পরেও আবার যাচাই করার পালা আসে। কলের পুতুলের মতনই সাক্ষাৎকারে হাজিরা দেই। আর হুয়াশা হলোও প্রতিবারেই মনে আশা জাগে, এভাবে হয়ত কোন সদাশয়ের করুণা লাভ করব কিন্তু প্রতি-বারেই সেই একঘেরোম। গতানুগতিকতার জাবর কাটা, পাশের নখর আর মেলে না।

ফিসফিসানি চলে কখনো বা আড়ালে আবডালে, কখনো সামনে। মায়ের চোখে মুখে ক্রান্তির বেধা ভাসে হৃদয়ভারও।

মরণ কামনা করি। নিজের জন্তই শুধু নয়। মা বাবার যন্ত্রণার অবসানের জন্তও।

এমনি করেই পাশের নখর ছাড়া লাভবার গেল। এবারে অষ্টম বারের প্রদর্শনী এবং আমার বিদ্যায়ের লানাই।

আগের ক'বারের 'পরে জানাব' বলাতে তবুও সৌজন্মের প্রলেপ ছিল। এবারে তার লেশমাত্র নাই। বরের বাবা কিছু না বলেই গভীর মুখে বিদায় নেন। তাঁর চোখ মুখের কুঞ্জেই আভাস দেয় শূন্য কলের।

আমার অহুমানই সত্য হয়। কদিন পর এক মলিন সন্ধ্যায় বাবা বাড়ি এসে মাকে ডাকেন। এত জোরে মাকে ডাকতে তাঁকে কখনো শুনিনি। বাবার চেহারা বড়ো করুণ, বড়ো কাতর। বলেন, আমারই করুণ দৃশ্য। এবারেও নিফল যাত্রা। তাঁকে যেন হিষ্টিরিয়া চেপেছে। হাত পা নেড়ে বলে চলেন। আগের স্তলোর তবু ভয়ঙ্কর খালাই ছিল। এ ব্যাটা হৃদ পাঙ্গী, চোখের চশম নেই; ঘেঁষে নেওয়া না-নেওয়া তোর

ইচ্ছা। তাই বলে এভাবে চিঠি লিখে অপমান করা। এ কি কোন ভদ্রলোকে করে? এমনি অনেক কিছু।

মা ধামাড়ে যান। বলেন, ঘেঁষে যে পাশের ঘরে। কী মনে করবে? মা'র কথাতেও উপচে পড়া কান্নার স্রব। যেন এ অবস্থার জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী। কেননা তিনি জননী।

এই গ্রামি, এই লাহুনা হুঃসহ। আর চলতে দেওয়া যায় না। অনেক স্নেহলভার গল্প শুনেছি। গায়ে কেরোসিন তেলে অগ্নিস্রোতে যারা পিতার দ্বার মোচন করেছে।

এবারে নিজের পথের ডাক পেলাম। তাই বলেছিলাম, অষ্টম বারের কনে দেখা আমার বিদায় বেলার সানাই।

সামনে আমার ভুক্তি। মরণ-মম্বুর ভুক্তি। ভুক্তি শুধু আমারই নয়, মা বাবারও নয়।

বাদের উপেক্ষা বিজ্ঞপ আমাকে তিলে তিলে ক্ষয় করেছে, তাড়েরও।

একটা কর্তব্য বাকী ছিল, তোমাকে খবর দেওয়া। পাঠশালার ডাকবারে এই চিঠিটা দ্বিগুণে দিলেই এ কর্তব্যও হয়ে যাবে।

যারা বারে বারে আমার ভাগ্যের হুয়ারে পরিহাসের দূত হয়ে এল আর গেল। খেলার পুতুলের মতন, দোকানের পশরার মতন নানানভাবে নেড়ে চেড়ে পরখ করল, যাচাই করল আমাকে এবং জানিয়ে দিতে কলুষ করল না আমি পছন্দসই নই, আমি বাজারে অচল। তারা ত আমার বাইরেটাই দেখল শুধু। বুঝতে চাইল না আমার অন্তর, যে অন্তঃপুরে আমি নারী, আমি মহীয়সী। দেখতে পেল না যে, আমারও মন বলে একটা অস্তিত্ব থাকতে পারে। যেখানে প্রমত্ত নারী জীবনের মহা অভীশা। স্বামী সন্তান বরসংসারের বন্দ। তাদের নির্ভর প্রত্যাখ্যান আমাকে জানিয়ে ছিল, সংসারে আমি নিভান্ত অপ্রয়োজনীয়, অসহ্য, অতিরিক্ত ছাড়া আর কিছু নই। একথাটুকু তারা অস্বীকার করল যে, বিধাতার রূপের ভাঙে আমার কোন অধিকার না

বাঁকলেও তাঁর বর্ণবন্ধন সংসারের জীবনের পাশে ত  
সম্পূর্ণ অধিকার ছিল আমার।

অজানার কূলে পাড়ি দেওয়ার মুহুর্তে তোমাকে  
প্রণাম জানাই, অসীমবারু আমার শেষ প্রণাম।  
তোমার দৃষ্টিপ্রদীপের আলোর কুরপা হয়েছিলাম  
অপরাধী। কুদর্শনা হয়েছিলাম সুদর্শনা। কণিকের  
জন্ত হলেও কালো পেদী ভাঙড়া গাছকে ছুঁমি কাছে  
টেনে নিয়েছিলাম, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলাম।  
হাসি মশকরাতেও তোমার বাধেনি। হয়ত এটা  
তোমার খেয়ালই ছিল, মনের কোনও বোগ ছিল না  
এতে। তবুও ছুঁমিই আমার জীবনের একতম পুরুষ  
যে এই ব্যর্থ, বঞ্চিত নারীজগৎকে ধস্ত করেছে।

পূর্ববর্তে তার কানে গেরেহে তোমার আগরণী। ইহাই  
আমার চাওয়া ও পাওয়ার পরম, ইহকাল ও পরকালের  
শান্তি ও সাধনা। তোমাকে শতকোটি প্রণাম।  
ইতি, অনিলা।

দেহের খোঁকা। ঘোষেদের মেয়ে অনিলা আজ  
তিন দিন হয় ভূবে আত্মহত্যা করেছে। সত্তবতঃ  
আগের রাতে পুত্রে ডুবোঁছিল। কদিন ধরে তোর  
কথা খুব বলত। তোর আসার খবর নিত। আমরা  
খুব একটা আমল দিতাম না।

জীবনে ত হতভাগিনীর শান্তি মেলেনি। মরণে  
যেন সে শান্তি পায়। সামনের ছুটিতে আমাদের দেখে  
গেলে সুখী হব।

ইতি আশী : দ্বিধা

## সংগ্রামী যোগেশদা : একটি শ্রদ্ধাজলি

বিশ্বপ্রাণ শুণ

যোগেশচন্দ্র বাগল আজ আর আমাদের মধ্যে নেই।  
কিছু সময় জীবন ব্যাপী তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল  
—বাঁদলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের এক বিরাট ভাণ্ডার তিনি  
আমাদের জন্ত রেখে গেছেন। যোগেশচন্দ্র বাগলের  
জীবন যেন এক চ্যালেঞ্জ। হুঃধ দারিদ্র্য ও ব্যাধির  
বিক্রমে, সমস্ত জীবন ব্যাপী তাঁর সংগ্রাম, এবং এ  
সংগ্রামের তিনি অক্লান্ত নৈনিক। অপরাধের।

ইতিহাস ও সাহিত্যের অক্লান্ত পাঠক, প্রবন্ধকার,  
রাশতাবী এই বিবন্ধ সুপণ্ডিত মানুষটির সংস্পর্শে  
এসেছিলাম, সেই ১৯৫৫ সালে। আমি তখন পশ্চিমবঙ্গ  
সরকারের অধীনে, ব্যারাকপুরের 'উদাত্ত প্রাণ ও  
পুনর্জন্ম' বিভাগে চাকরী করি। সারা সপ্তাহ চাকরীর  
পর, প্রতি শনিবার, অফিস ছুটির পর 'শনিবারের

চিঠির' অফিসে যেতাম। সেখানে প্রফের দারিদ্র্য  
চৌধুরীর ও অন্তর্ভুক্ত সুখীজনের সঙ্গে নানা বিষয়ে  
আলোচনা হ'ত, চা' পান হ'ত আর হ'ত সাহিত্যের  
আড্ডা। কোন কোন দিন পরম প্রফের সজনীকান্ত  
দাসও আসতেন। কুশলাদি প্রশ্ন করতেন, লেখার  
উৎসাহ দিতেন, তারপর কাজের কথাগুলি সেরে আবার  
ওপরে চলে যেতেন। 'শনিবারের চিঠি'তে ঐ সময়  
কিছু কিছু লিখেছিলাম। এবং এখানেই পরিচয়  
হয়েছিল পরম প্রফের যোগেশচন্দ্র বাগলের সঙ্গে।  
আমার নাম শুনে, এক মিনিট চুপ করে কি যেন  
ভাবলেন, তাপর বললেন, ছুঁমি কি বর্ণিত ঐতিহাসিক  
রামপ্রাণ শুণের কেউ হও?

—আজ্ঞে তিনি আমার পিতামহ।

—সেই কথা বল।

আরও বিস্তারিত পারিবারিক পরিচয় কেনে নিয়ে আমার কর্মজীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। ‘উষান্ত জ্ঞান ও পুনর্জন্ম’ বিভাগে ‘জুনিয়ার অফিসারের’ চাকরী করি শুনে বললেন, কাজ কেমন লাগছে?

বললাম, অনেকটা মিশনারী কাজের মত। তবে মাঝে মাঝে মাহুঘের কাজ আর দায়িত্ব বেধে ক্লান্ত লাগে।

—যত পারো ওদের জন্তে করবে। ওরা আমাদের স্বাধীনতার বলি। কথাটা বলে বোগেশচন্দ্র বাগল কেমন উদ্বাসীন হয়ে গেলেন। এক মিনিট পর বললেন, তা শনিবারের চিঠিতে এসেছ, নারায়ণবাবুর কাছে বসে আছ, লেখা টেবিলে অড্যান্স আছে না-কি?

—আজ সামান্য লিখি।

—কি লেখ?

—কিছু গল্প, কিছু প্রবন্ধ, বা ‘কিচ্চার’।

—তা ভাল। তোমার রক্তে ত’ সাহিত্য সেবার নেশা থাকবেই। ভাল করে লেখ। এই উষান্তদের নিয়ে লেখ। ওদের নিয়ে তেমন কিছু এখনও লেখা হয় নি। অথচ আমাদের স্বাধীনতার জন্ত ওদের সব কিছু হারানো, তার কথা লিখতেই হবে। তা প্রবাসীতে যেও। লেখা নিয়ে যেও। আমি নলিনীবাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। বোগেশচন্দ্র বাগল উঠে গেলেন। আমি সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিইে আবার ফিরে এলাম। আমার বুকের ভেতর হৃদয় বাজতে লাগল।

এই মাহুঘটি, যার বই, বাজলার বিপ্লব প্রচেষ্টা, উনিবংশ শতাব্দীর বাজালী ও বাংলার বেপেনসাঁস সংক্রান্ত অসংখ্য বই ও লেখা, হুল-কলেজ জীবনে পড়ে যোমায়িত হয়ে উঠেছি, আজ আমার সামনে বসে আমাকে উৎসাহিত করে গেলেন। আমি খুব অপ্রাণিত বোধ করেছিলাম। এবং উষান্ত জীবনের প্রতি তাঁর অপারিসীম সমর্থন বোধ আমাকে আকর্ষণ করেছিল।

পরের সপ্তাহে ‘শনিবারের চিঠি’তে যাইনি—

গিরোহিলাম প্রবাসী অফিসে। আমি সোজা বোগেশ-বাবুর ঘরে চুকে পরিচয় দিলাম। নাম শুনেই বললেন, ব’স লেখা এনেছ?

লেখা একটা নিয়ে গিরোহিলাম। উনি জা প্রবন্ধ করে বললেন, ভাল হলে ছাপব। আমি দম্বত হলাম।

মাস খানেক পর চিঠি পেলাম, গল্পটি মনোনীত হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যায় পত্র হব। এই প্রবাসীতেই, আমার ‘গিনকল’, ‘সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা’ ও অন্তান্ত ভাল গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়েই বোগেশদার সঙ্গে আমার পরিচয় বিনিমিত হয়, এবং কবে কখন কোন কীকে ‘বোগেশদা’ ডেকে কেলোছি তা আর আজ মনে নেই। আমার মত কত তরুণ লেখককেই ত’ তিনি প্রেরণা জুগিয়েছেন—বাজলা সাহিত্যে তার হিসাব কোথায়?

প্রকের পৌত্তম সেনের সঙ্গেও পরিচয় হয় এই সময়েই। বোগেশদা, বলেছিলেন, ‘পৌত্তমবাবু কথা সাহিত্য ভাল বোঝেন—ছুমি ওঁর সঙ্গে লেখা নিয়ে আলোচনা কর’। আরেকদিন বোগেশদা বলেছিলেন, অনেকেই তোমার লেখার প্রশংসা করছে, কীকি দিযো না। পরিচয় করে লেখ। পড়াওনা বাড়াও।

বহর খানেক পর বজীর সাহিত্য পরিষদের কোন এক সভা শেষে (সেই সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম) বোগেশদা আমাকে বললেন, আমাকে প্রবাসী পর্যন্ত পৌঁছে দাও। চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। রাত্তার কোথায় পড়ে যাব। আমি রিকসা বা ট্যাক্সিতে বাড়ার প্রস্তাব করলেই বললেন, না না, হেঁটে যাব। এবং সাহিত্য পরিষদ অফিস থেকে প্রবাসী অফিস পর্যন্ত আমার হাত ধরে হেঁটে এসেছিলেন। এই সময় তাঁর দুটিতে হানি পড়েছিল। কষ্ট পাচ্ছিলেন, কিন্তু সাহিত্য চর্চা বন্ধ করেন নি। শুধু তখন কেন, সারা জীবন ধরেই ত’ হুঃখ আর দায়িত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তিনি সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। চোখের হানি পরবর্তীকালে অপারেশন করিয়েছিলেন।



১৯৫৭/৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরণ স্থিতি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমাকে ঐ সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। আমিও অকিস থেকে হু দিন ছুটি নিয়ে ঐ সভায় উপস্থিত হয়েছিলাম। প্রতিদিনই বক্তৃতার ষ্টি-নাটি নিয়ে প্রসন্ন করতেন। আমি আগ্রহ নিয়ে শুনেছি দেখে মুগ্ধী হতেন।

ইতিমধ্যে যোগেশদা নবব্যারাকপুরে বাড়ী করেছিলেন। আমাকে বলেছিলেন, তুমি 'উষান্ত জ্ঞান ও পুনর্বাসন' বিভাগে চাকরী করে অনেক কলোনীতে ঘুরেছ, অনেক বাড়ী দেখেছ। আমার বাড়ীটাও দেখে এসো। একদিন যেও।

কিন্তু আমার আর যাওয়া হয় নি। কারণ এরপর, ১৯৬১ সালে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরী ছেড়ে চলে আসি দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানায়। সাতাষিক ভাবেই কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ক্রীণ হয়ে এসেছিল ক্রমে ক্রমে।

ইম্পাত কারখানার বিচিত্র জীবন, এবং সংসারের নানা সমস্যার ক্রান্ত দিনের কীকে কীকে, যোগেশদার সান্নিধ্যের সেই সব দিনগুলি, আজও স্মৃতি-তে উজ্জল হয়ে আছে। আমার উদ্দীপ্ত তারুণ্যের সেই সব দিনে, যোগেশদার উপদেশ। এবং উৎসাহে সাহিত্যের জন্ত নতুন করে প্রেরণা পাই। নতুন করে পড়া, নতুন করে ভাবা এবং নতুন করে লেখার এক-একটি উদ্দামনা ভরা দিন।

তিনিটি সংক্ষিপ্ত বুদ্ধ কটীকিত একটি দশক ইতি-মধ্যেই অতিক্রান্ত আজ ১৯৭২-এর জানুয়ারী। এ উপমহাদেশের জন-জীবনে নতুন দিগন্ত বিকশিত। শান্তি, স্বাধীনতা, প্রগতি ও গণতন্ত্রের জন্ত আজ আমরা লড়াই করছি। ওপার বাংলার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে এপার বাংলার মানুষ যখন মগ্ন হয়ে আছে, ঠিক তখন, হঠাৎ কাগজে দেখলাম, যোগেশদা অসুস্থ এবং নীলবস্ত্র সরকার হাসপাতালে হানাতারিত। কাগজে আরও দেখলাম, রাজ্যপাল এই সংগ্রামী সাহিত্যিকের জন্ত সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বাড়াতে চেয়েছেন। শুনে মুগ্ধী হয়েছি। কারণ যোগেশদার এই বয়সে এবং অসুস্থ অবস্থায় আর্থিক সচ্ছলতা প্রয়োজন। কয়েকদিন পর বজ্রাঘাত। যোগেশদা আর নেই। বুকের ভেতর হাহাকার করে উঠেছে। যোগেশদা নেই—তাকে আর কোনদিন দেখব না।

কলকাতা থেকে দূরে বসে সেই সব স্মৃতিই আজ মনে পড়ছে। সেই পরম জ্ঞানী, তপস্বী ও সংগ্রামী যোগেশদা, যিনি সারা জীবন ধরে উনিবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর জাগরণ, রেনেসাঁস নিয়ে ধ্যান করেছেন, রূপ দিয়েছেন অসংখ্য লেখার, তিনি এই উপমহাদেশে নতুন এক বাঙালী রাষ্ট্রের জন্মলগ্নের ইতিহাস লিখবার আর সময় পেলেন না—যে ইতিহাস বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর শৌর্ষ, বীর্য, পৌরুষ আর সংগ্রামের এক নতুন অব্যায় হিসাবে সংযোজিত হত, এই উপমহাদেশের নতুন ইতিহাসে।



# আদর্শবাদ ও ধর্মমত

## আদর্শবাদ ও ধর্মমত

পৃথিবীর মানুষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই ধর্মমত ও আদর্শবাদ লইয়া জীবনের দ্বারা নির্ণয় করিয়া আসিয়াছে। ধর্মমত অথবা আদর্শবাদ কাহাকে বলে তাহা লইয়া দার্শনিক মহলে বহু তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন ধর্মমত, অর্থে বুঝিতে হইবে কোন না কোন ভগবানে কিবা দেবতা-গোষ্ঠীতে বিশ্বাস। কিন্তু যখন দেখা যায় যে বৌদ্ধ জৈন অথবা কম্বুজিয়ান ধর্মমতে ভগবানে বা দেবতায় বিশ্বাস প্রয়োজন হয় নাই তখন ধর্মমতের ঐ অর্থ মানিয়া লওয়া চলিতে পারে না। অপর দার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে, ধর্মমত স্তনীতি ও মানব মঙ্গলের আদর্শের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, ধর্মমত অবলম্বনে নরবলি, সতীদাহ, গলায় কাঁস লাগাইয়া নরহত্যা শিক্তিদিগকে নদীর জলে নিক্ষেপ করা ও অন্ত্যস্ত বহু অমঙ্গল-সূচক বর্ধরতা সমর্থিত হইয়াছে, তখন ধর্মমতের বিতীয় অর্থও গ্রাহ্য হইতে পারে নাই। আরো অপর দার্শনিক ও তাত্ত্বিকগণ বলিয়াছেন যে, ধর্মমত ও আদর্শবাদ সর্বদাই মানবাহিতের কোন না কোন চেষ্টার সহিত জড়িত থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, ধর্ম ও আদর্শের নামে বহু বুদ্ধ, পরদেশ দখল ও লুণ্ঠন, মানুষকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা, নির্দাসন, কারাগারে নিক্ষেপ করা, পুড়াইয়া মারা কিবা হিংস্রজন্তুর দ্বারা ভক্ষণ করান হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে ধর্মমত অথবা আদর্শবাদ প্রভীর ও ঘনিষ্ঠভাবে মানবাহিতের সহিত জড়িত নহে; পরন্তু বহুহলেই ধর্ম ও আদর্শ অহুসরণ মানুষের যৌন অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে।

তাহা হইলে ধর্মমত ও আদর্শবাদ কাহাকে বলে ইহার সঠিক অর্থ নির্ধারণ সম্ভব নহে। এই পর্য্যন্ত বলা

যায় যে, ধর্ম ও আদর্শ মানুষের বিশ্বাসের কথা। অনেক লোক যদি এক প্রকার কোন কিছুতে বিশ্বাস করে তাহা হইলে সেই বিশ্বাসকে ধর্মমত বা আদর্শবাদ বলা যাইতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস করিলেই তাহা বিশ্বাসীয় মঙ্গলকর হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা থাকে না। বরঞ্চ মানবমন সর্বদাই স্বার্থবোধের দ্বারা অহুপ্রাণিত বলিয়া ধর্মমত ও আদর্শবাদও কোন সময়েই বিশ্বমানবের হিত ও উন্নতি বিচার করিয়া গঠিত হয় না। কোন ব্যক্তি গোষ্ঠী অথবা জাতি বা সম্প্রদায়ের সুবিধা ও লাভের কথা দিয়াই ধর্মমত ও আদর্শবাদ গড়িয়া উঠে। যদি বা কখনও সর্বমানবের কথা ধর্ম ও আদর্শ গঠনে সংযুক্ত হয়, তাহা অধিক কাল সেইভাবে থাকে না। অতি শীঘ্রই ঐ ধর্ম বা আদর্শ সাক্ষাৎ ভাবে স্বার্থবোধের আশ্রয়ে গড়িয়া উঠে তাহাদেবই সীমিত স্বার্থের দ্বারা পরিবর্তিত আকার ধারণ করে। পরিবর্তন ধর্ম ও আদর্শের এক প্রকার স্বভাবজাত এবং পরিবর্তন ঘটিলে তাহা কলহ-বিবাদের কারণ হইলেও সর্বদাই ঘটতে থাকে। ব্যবসা যেরূপ শুধু ব্যবসা বিশেষের আগ্রহ মাত্র এবং কোন ব্যবসা শুধু সেই ব্যবসার লাভ ও উন্নতিই চেষ্টা করে, বিশ্বের সকল অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার লাভ ও উন্নতির কথা তাহা না; ধর্মমত ও আদর্শবাদও তেমনি নিজ নিজ বিশ্বাসী ভক্তদিগের সুবিধা বিচার করিয়াই চলে; তদপেক্ষা ব্যাপক কোন উদ্দেশ্য তাহার থাকে না।

ধর্ম ও আদর্শ তাহা হইলে মতের ক্ষেত্রে তাহাই বাহা অবলম্বন করিয়া কোন এক বা একাধিক মানব-গোষ্ঠী নিজেদের ঐ আদর্শে বা ধর্মে বিশ্বাসী বলিয়া প্রচার করে। ধর্ম বা আদর্শ বিশেষের কোন ঐতিহাসিক নীতি বা জীবনযাত্রা পদ্ধতি থাকিলে মানব-গোষ্ঠী-গুলি নিজ নিজ ধর্ম বা আদর্শ অনুযায়ী নীতিমূলক

বা পদ্ধতি অনুসরণে জীবনযাত্রা নির্ধারণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। এইভাবে কোন মানব সম্ভাব্য কোন এক প্রকার খাতি বর্জন করিয়া চলে অথবা কোন বিশেষ প্রকারের বস্ত্র পরিধান করে। কেশবিভাজ চন্দন বা সিন্দুর লেপন, নদী বা সমুদ্র বিশেষে অবগাহন, তীর্থ, স্থান বিশেষের পরিভ্রমণের বিশ্বাস, ইত্যাদি নানা কথা ধর্ম সম্পর্কে মানুষের জীবনে উদ্ভূত হয়। আদর্শের ক্ষেত্রে মত, পুস্তক, গুরুবাদ, সামাজিক স্বাধীন ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মূল্য বিচার, প্রভৃতি কথা লইয়া বাকবিতণ্ডা প্রচারের উদ্ভব দেখা যায়। একটা জীবন সর্বত্র ও সর্ববুগ্গে দেখা যায়। তাহা হইল ধর্মমত ও আদর্শবাদের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা। কোথাও কোন এক মত বা এক আদর্শ থাকিলেও তাহা শীতাই নানা রূপ ধারণ করে ও ধর্মমতবাদ ও আদর্শবাদ সহজেই ধর্ম-মতবিবাদ ও আদর্শবিবাদে পর্যাবসিত হয়।

মানুষ যেরূপ সম্পত্তি লইয়া মারামারি কাটাকাটি করিয়া থাকে, মত ও বিশ্বাস লইয়াও সেইরূপ কলহবিবাদ হইয়া থাকে। হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, ধন, সম্পত্তি লইয়া পৃথিবীতে যত ঝগড়া হইয়াছে ধর্ম ও আদর্শ লইয়া তাহা হইতে কম হয় নাই। ধর্ম ও মতবাদ হইতে তাহা হইলে মানব জাতির উন্নতি ও লাভ কতটা হইয়াছে এবং অবনতি বা ক্ষতি কতটা হইয়াছে তাহার হিসাব সুদীর্ঘ হইবে। শেষ অবধি লাভ লোকসানের হিসাব কি দাঁড়াইবে তাহা স্থির ভাবে বলা যায় না, তবে বিশ্বমানবের মিলন ও শান্তিপূর্ণভাবে জীবনমিষ্টাই যদি মানব জীবনের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, ধর্ম ও মত-বিভেদ হইতে সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় নাই। একথা অবশ্য মানিতেই হইবে যে, ধর্ম ও আদর্শ এমনও আছে যাহা মানুষকে বিবাদ-কলহের পথ ছাড়িয়া

মানবাহিতভাবে আত্মনিয়োগ করিতে শিক্ষা দেয়। বর্তমান যুগে টলটল বা স্বাধীনতার আদর্শবাদ বিশ্ব-মানবীয় বলিয়া সর্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ লইয়া অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে দলাদলির সম্ভাবনা ঘটিয়াছে দেখা যায়, যদিও মূলতঃ তাঁহার মতবাদ টলটল ও স্বাধীনতার অনুসৃত পথেই অবহিত বলা যায়। ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে যদি স্বাধীন বা অর্থ-নৈতিক কথা আঁসিয়া পড়ে তাহা হইলে কলহের সম্ভাবনা বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এই কারণে উক্ত আদর্শ বা নীতির কথা সহিত স্বাধীনতার অথবা আর্থিক কথা সংযুক্ত হইতে দেওয়া কখনও উচিত নহে।

কোন অধিকার লইয়া যদি মানুষ কলহ ও দুর্ভাবগ্রহ করিতে সন্মত পায় তাহা হইলে সেই কলহ যুগান্তব্যাপী হইতে বাধ্য, সুতরাং মানুষকে সকল অবস্থায় সকল বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ বর্জন করিয়া চলিতে বাধ্য না করিলে বিশ্বমানবের হিত কখনও হইতে পারে না। ইতিহাস চর্চা করিলে দেখা যায় যে মানব জাতির সর্বাপেক্ষা অধিক অমঙ্গল হইয়াছে ধর্ম ও আদর্শ অথবা স্বাধীনতার সম্পর্কিত কলহ-বিবাদ হইতে। এই কারণে যে সকল ধর্ম বা আদর্শ মানুষকে সাময়িক শান্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করে সেই সকল ধর্ম ও আদর্শ মানবাহিত-বিরুদ্ধ। সুতরাং সুস্থিত সুবিবেচনা ও শান্তিপূর্ণ ভাবে বিচারই হইল সমস্যার স্রেষ্ঠ অস্ত্র। এই অস্ত্র ব্যবহারে কোন লোকসানের অমঙ্গলের সূচনার সম্ভাবনা থাকে না। সাময়িক শান্তি ব্যবহার—বা যে কোনও ভাবে গায়ের জোরে ও বলপূর্বক কার্যসিদ্ধি চেষ্টা করিলে তাহার ভিতর বিরাট অমঙ্গলের বীজ নিহিত থাকে। ঐ অমঙ্গলের বীজকে অসুস্থিত হইতে দিলেই অমঙ্গল অজন্ম নাশা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া উঠে ও মানব-হিতের সকল আশা বিনষ্ট হয়।

# ভালো জাত

মিত্যানন্দ

আমাদের একটি কুকুর আছে। সকলেই জানেন যে কুকুরদের মধ্যে যে রকম জাতিভেদ আছে সে রকম জাতি নিয়ে ইতরবিশেষ করা মানব সমাজে কোথাও দেখা যায় না। আকারে, বর্ণে, দৈর্ঘ্যে, স্থূলভায় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তুলনা মূলক পার্থক্যে; সব কিছুতেই কুকুরদের জাতি, বংশগোঁরব, কোলীনা, আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মাহুকের জাতি বিচার করবার বহু ব্যাঘ্রা পৃথিবীর সব দেশেই আছে। কেহ জাতি কিছা শ্রেণীর পার্থক্য ও মূল্য স্বীকার করে, কেহ বা করে না কিন্তু আসলে মেনে চলে। কুল, পরিচয় নিয়ে লম্বা লম্বা আলোচনা শুধু ভারতবর্ষেই হয় না। ইরোয়োপেও কার রক্ত কতটা ‘নীল’ তাই নিয়ে ডেব্রেট ও আলমানাক ছ গোটা জাতীয় বড় বড় বই নিয়মিত প্রকাশিত হ’তো। কে কার থেকে উঁচু জাতের, বড় ঘর, ছোট ঘর, সাধা, কালো, পাটকিলে, হলদে গরের রংএর সেমোটিক, ছামেটিক, নর্ডিক বা অ্যালপাইন, ল্যাটিন কিছা মোডিটেরেনিয়ান; তাতার, বারবারি, নিগ্রো কিছা পলিনেসিয়ান—কত রকম জাতই যে আছে। ভারতবর্ষে জাত মেলান চিরকালই একটা বড় ব্যবসা বলে চলে এসেছে।

কিন্তু কুকুরের জগতেও অসংখ্য জাত আছে। প্রায় ৩০ জাতের কুকুর পৃথিবীতে নিজের বংশ আর জাত দেখিয়ে সমস্তকার লোকদের বাড়ীতে পোষ হিসেবে আয়গা পেয়েছে। এর মধ্যে ১০০০ বংশী জাত কেনেল ক্লাব প্রাঙ্ক এবং তাদের কুলপীলের বিচার নিয়ে বছরে বছরে বহু সহস্র বহু দেশে কুকুর দেখানর মেলা হয়ে

থাকে। সে সব মেলাতে যে কুকুরগুলি জয়লাভ করে তাদের বাচ্চা উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়ে থাকে। কুকুরের জাত বিচার কুকুরের কেনা-বেচার একটা বিশেষ অঙ্গ আর তাই নিয়ে বারা দেশে দেশে নাম করেছেন তাঁরা কুকুরের ব্যবসাতে বেশ পরগা বোজগার করে থাকেন বলে শোনা যায়।

কুকুরের আভিজাত্য এরকম একটা বৃহৎ ব্যাপার হলেও যে সব কুকুর মহা সমাদরে ঘরে ঘরে বিবাজ করে তাদের মধ্যে উচ্চ আর মিশালহীন বংশ পরিচয় বেশীর ভাগেরই নেই। অনেক সময়ই দেখা যায় দোআঁশলা কুকুর মহাহুখে বড় পোকের বাড়ীতে রাজসম্মানে বিবাজ করছে। দোআঁশলা কথাটা শূধু কথার কথা। আসলে কোন্ কুকুর কয় আঁশলা তার হিসাব করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব।

আমাদের প্রথম প্রিয় সারমেরটি, তিনি খোস-মেজাজে ও বহাল ভবিষ্যতে সব জাতি আর শ্রেণীর বিচার উড়িয়ে দিয়ে আরামে পোষ অধিকার ভোগ দখলে বিশেষ করে কায়ম হয়েছেন; তাঁর জগ্ন ও জাতি বৃত্তান্ত হিসাব করলে দেখা যায় যে তিনি জাতিতে লীগ অফ নেশনস্। কুকুর জগতে এমন রক্ত নাই যা তাঁর দেহে কিছুটা অন্তঃ পাওয়া যাবে না। কিন্তু ভারত স্বাধীন হবার পরে জগ্ন হওয়ার ফলে কেউ বলতে সাহস পায়নি যে কুকুরটি বেশী। সবাই বলত ওর গোকের রং দেখলে মনে হয় যে ওর কোন পূর্ব পুরুষ অতীতকালে আরবল্যাও

শেখার ডাড়িয়ে বেড়াত। পুচ্ছের উদ্দেশ্যেই বক্তৃতাকে এ্যাণ্ড ইক মোডের কুতুব জাতির বৈশিষ্ট্যই দেখা যেত, সেই লাজুল-ভঙ্গীকে বিদেশের আমদানী দেহলক্ষণ বলে কেউই বলতে পারত না। কানের দৈর্ঘ্যে স্পার্মিয়েলের আর শরীরের উচ্চতার ডাকসুহৃদের সঙ্গে বনিষ্ঠতা মনে করিয়ে দিত। আর বর্ণ একেবারেই থাকি অর্থাৎ স্বদেশী কুকুরের একচেটিয়া রং। আমরা অনেক সময়েই আমাদের কুকুরটির সম্মান রক্ষার জন্যে নানা লোককে অগ্নির কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। কারণ, সব ক্ষেত্রেই স্বদেশীর ইচ্ছত সবাই মানে; শূণ্য কুকুরের বেলাই যত গোলমাল, বিদেশী দোআশলা, দশআশলা হ'লেও যার আসে না কিন্তু স্বদেশের অমিশ্রিত পবিত্র রক্তধারা ধমনীতে বহমান থাকলে দিশী কুকুরের তাতে কোন মান সম্মত বৃদ্ধি হয় না। নিজেদের যত রকম মুখ'তা, অগভ্যতা-ভব্যতাবিকল্পতা স্বদেশী ভাব বলে চলে যায়; শূণ্য কুকুরের স্বদেশী চাল-চলন দেখলেই অস্থবিধা। “এক দেশী ছায়” বলে দ্বিভাষ্য হস্ত করে যখন হিন্দুহানী ভৃত্যরাও কুকুরকে অসম্মান দেখায় তখন তা সহ করা শক্ত হয়ে ওঠে। বলতে বাধ্য হ'তে হয় যে ঐ ভৃত্যের সকল পুরুষের সকল ব্যক্তিই “দেশী ছায়”। এবং তাহাড়া তার দেশনেতারা, দেশের মন্ত্রীরা সকলেই দেশী, কেউই বিলাহিত নয়।

জাতে দিশী হলেও জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে আমাদের হালু একেবারেই সাহেব। ইংরেজী ছাড়া কথা বোঝে না। গোত ছাড়া আর কিছু খায় না। নীতকালে গায়ে বিলাহিত কোট পরে; গলায় সব সময়েই বিলিতি কলার। তা ছাড়া আছে কনিডশন ট্যাংলেট বা পাউডার, জেটের গুলি আর নানা রকম ভিটামিন। গায়ে পাউডার লাগিয়ে বৃক্ষণ করা, বিশেষ কুকুরের গায়ে মাখবার সাবান দিয়ে স্নান, ক্রাপ দিয়ে নখ কাটা ও কখন কখন চুল ছাঁটা। একেবারেই সাহেবিমানার চূড়ান্ত। গায়ে রং বা ল্যাক্সের ভঙ্গী যেমনই হোক না কেন।

হালুর সাহেবী ধরণধারণের নজির আমাদের দেশে

কালো সাহেবদের মধ্যে প্রায় ছই শ বৎসর ধরে গড়ে উঠেছে। তার পূর্বে আরও অনেক শ বছর আমরা আধ্যাত্মিক জাতের আরব অথবা অন্ত ধরণের বিদেশী মানুষ এ দেশের মাটিতে গাঁজিয়েছি আর তারা পুরুষাঙ্ক-ক্রমিকভাবে নিজেদের বিদেশীকে সবলে প্রতিষ্ঠিত রেখেই চলতে পেরেছিল। তাই হালু যখন মানসিক ভাবে আইরিশ হয়ে চলতে লাগল আমরা তার সে গৌরব প্রতিষ্ঠিত রাখতে কোন কার্পণ্য করতে চেষ্টা করতাম না। একবার ভেবেছিলাম ওর নামটা বদলে যোভার কিম্বা টোবি দেওয়া হ'লে বিলিতি রূপটা আরও ফুটে ওঠে কিন্তু হালুকে বদলে অন্ত নাম দেওয়া সম্ভব হ'ল না। বাৎসরিক কর্পোরেশনী লাইসেন্সে লিখিয়ে নেওয়া হ'ল ও জাতে আইরিশ টেরিয়র; কিন্তু তাতেও ওর দেশীক ঘুচল না। সবাই বলত বউবাজারের আইরিশম্যান। প্রথমকালে সেবার ওকে চেঞ্জ পাঠাবার কথা উঠল। সাহেবরা প্রথম সহ করতে পারে না সবাই জানে; তাই হালুকেও দার্জিলিং পাঠাবার ব্যবস্থা হতে লাগল। একটা প্রথম কোট তৈরী হয়ে এল আর আমাদের জানাশোনা একজনরা দার্জিলিং-এর চাঁদমারি পাড়ার থাকেন, তাঁদের ওখানেই একজন চাকর ওকে নিয়ে গিয়ে একমাস থাকবে সেই ব্যবস্থা করা হ'ল। ভৃত্য কুকুরের ধৌলতে পাহাড়ে বেড়িয়ে আসবে জেনে খুশীই হয়েছিল। হালুর বিহানা, বিশেষ খাদ্য, ওষুধ ইত্যাদি নিয়ে সে কিছুদিন পরে একদল জানা লোকের সঙ্গে দার্জিলিং চলে গেল। আমরা ভাবলাম যে এর পরে হালু ঠিক সেট বারণার্ড, আকগান হাউও কিম্বা নিউ কাউন্ট্যাণ্ড জাতের কুকুরের সমান সমান সম্মানার্থ হয়ে যাবে। তার ক্ষেত্রে তাই আরও চার বায় ডগ বিস্কুট পাঠান হ'ল। ঐ জিনিসটি হাড়ের ভাঁড়া, মাংসের ছিবড়ে ইত্যাদি দিয়ে তৈরী হয় এবং খুবই শক্ত বলে ঐ বিস্কুট চিবিয়ে খেলে কুকুরের দাঁত ঠিক থাকে। ভৃত্যকে চিঠি লিখে লাভ নেই জেনে আমরা গৃহস্থানীকে একটা চিঠি লিখলাম। তিনি ছিলেন, আমার এক বাসহুত বোনের সম্পর্কে ভাস্কর। কয়েক দিন পরে উত্তর এল,

“বাড়ীর ছেলেমেয়েরা আপনার পাঠান বিস্কুটগুলি পেয়ে খুব খুশী হয়েছে। একটু শক্ত হলেও তারা খেতে পেরেছে। শুধু বড় বোর্দি খেতে পারেন নি। আমিও খেয়ে দেখেছি। বেশ উপদেষ্টা লেগেছে। আপনার হালু এখানে এসে খুব ভাল ভাত মাহ চচ্চড়ি ইত্যাদি খাচ্ছে। আপনারা চাকর ওকে যতই মাংস খাওয়াবার চেষ্টা করে ও ততই নিরামিষ খাবার জন্মে এগিয়ে চলে। হু একখানা লুচি পেলে আর কিছুই চায় না। বেগুন ভাজা কি পোড়া আর ঝিঙ্গে পস্ত খুঁই পছন্দ। মাছের ঝোল ভাত মহা ভূঁপ্তি করে যায়.....”

চিঠিখানা পড়ে আমাদের চকুহির। সাহেব কুকুরের এ কি হুর্দ্বিতি। এতকাল ধরে এত কষ্টে আর খরচা করে যাকে বিলিতি ধরণে হাঁটা চলা ডাকা শেখান হ’ল সে শেষকালে ডাঁটা চচ্চড়ি খেতে আরম্ভ করল। আমার এক দিদি বলেন, “জাত ভুললে চলবে কি করে? ওর চোদ্দ পুরুষ লাউচিৎড়ি খেয়ে দিন কাটিয়েছে আর তোমরা ওকে দার্জিলিং পাঠিয়ে ভাবলে ওর খাস বিলিতি খানদান হয়ে যাবে? হায় কপাল।” আর এক বন্ধু সব ঘটনা শুনে বলেন, “ও ত দিশী তা দিশীই থেকে গেল। আর ওদিকে যে একদল ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা কুকুরের বিস্কুট খেয়ে দাঁত

শক্ত করেছে, তার কি হবে? এমন কি এক হুর্দ্বিতি চেষ্টা করে দেখেছেন খাওয়া যায় কি না। এ রকম ব্যাপার আর দেখা যায় না।”

আমি বললাম, “দেখ, মাছের বিস্কুট যদি কুকুরে খেতে পারে ত মাছের কুকুরের বিস্কুট খেতে পারবে না কেন? আর ওতে ত আর বিষ নেই? খেতে পারলে বেশ হজম হয়ে যাবে। এখন মানে মানে ঐ হালুটাকে কলকাতায় কিরিয়ে আনতে পারলে বাঁচা যায়। ও যদি জানতে পারে যে আইরিশরা আলু খেয়ে দিন গুজরান করে তাহলে আর রক্ষা নেই। ও তাহলে শুধু আলুই খাওয়া শুরু করে দেবে।”

আমার ছোট মেয়ে বললে, “আমি একদিন দেখেছি হালু বাসন মাজার জায়গায় তেল আর লকা বাটা পড়ে ছিল তাই চেষ্টা খেয়ে নিচ্ছিল। তাহাড়া ও কাঁচা লকা পেলেও খেয়ে নেয়।”

এই সব কথা শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। আমি তাই বিষয় পরিবর্তন করার জন্তে বললাম, “ও দার্জিলিং থেকে ফিরে আমুক, ওকে ভাল করে ডাক্তার দিয়ে দেখিয়ে নিতে হবে যে কোন অসুখ আছে কি না। ভালো জাতের কুকুর কখনও ত ঐ রকম হয় না।”

দিদি বলেন, “ভালো জাত।”



# আমার ইউরোপ ভ্রমণ

( ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ : পরিমল গোস্বামী )

জৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

ব্রিটল হইতে আমরা বাথ নামক শহরে পৌঁছিলাম। খুব প্রাচীন ঐতিহ্য ও কাহিনী রচিত হইয়াছে ইহাকে ঘিরিয়া। অবশ্য ইহার প্রতিষ্ঠাতার নামের সঙ্গে কোনও দেবতার নাম যুক্ত হয় নাই, এবং স্বর্গের কোনও স্থপতিও আসিয়া নির্মাণ করিয়া যায় নাই, কারণ স্বর্গের স্থপতি বিশেষ অমরোত্তমজনের প্রতি কৃপাবশতঃ পৃথিবীতেও অনেক নগর নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। একটি রাজপুত্র— নাম তাহার রেডাড—কুষ্ঠাক্রান্ত হইয়া হুঃখে হতাশায় নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে এইখানে আসিয়া পড়ে, এবং স্থানীয় এক কৃষকবীর শূকর পালনের কাজে নিযুক্ত হয়। শূকরদলও রাজপুত্রের নিকট হইতে এই মারাত্মক ব্যাধির স্পর্শ পায় এবং কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া পড়ে। মালিকের ক্রোধের ভয়ে রাজপুত্র শূকরপালকে একটি স্তম্ভের উপত্যকার চরাইতে লইয়া যায়। এখানে বহু উচ্চ প্রস্তর একটা বিস্তীর্ণ জলাভূমির স্রষ্টি করিয়াছিল। এই জলাভূমি দেখিয়া শূকরপাল তাহার ঐকান্তিক জলে গিয়া গড়াইতে লাগিল। এবং রাজপুত্র সন্নিহনে দেখিল—শূকরের কুষ্ঠ অঙ্গদ্বিনের মধ্যেই মিলাইয়া গিয়াছে। রাজপুত্র আবেল শহরে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল, অতএব তাহার মন ছিল বৃত্তিপ্রিয়। সে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিল, এই উচ্চ প্রস্তরের জল যদি শূকরের পক্ষে উপকারী হয়, তবে তাহা মানুষের পক্ষেও উপকারী হইবে। তাহার ভুল হয় নাই, কারণ সেও ইহাতে আরোগ্য লাভ করিল, এবং ঘেমে কিরিয়া গেল। বসাময়রে সে তাহার পিতার

সিংহাসন লাভ করিল। পিতা ছিলেন ব্রিটেনের বৃশ্টিত। রাজা হইয়া সে ঐ স্থানের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ সেইখানে একটি নগর নির্মাণ করিল। এই স্থানের অনেকগুলি বাথ বা স্নানাগারের মধ্যে কিংস বাথ কিং রেডাড নির্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজার একটি মৃতিও সেখানে আছে, তাহার সঙ্গে একটি লিপি খোদিত আছে—ভাষাতে খ্রীষ্টপূর্ব ৮৬০ বৎসর পূর্বে এই সকল স্নানাগার ঐ রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল রোমানগণ ও এই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অনেকগুলি মূল্যবান বাথ নির্মাণ করিয়াছিল। আমাদের এখানে যাইবার কিছু পূর্বে ৫৬ ফুট × ৫৫ ফুট আকারের একটি বাথ সমেত বৃহৎ হল খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছিল। গত শতাব্দীতে বাথ একটি বাস্তবিকরূপে পরিচিত ছিল। এখন ধনীসম্প্রদায় ইউরোপের মিনারাল ওয়াটার খনিজ লবণ পূর্ণ জলের প্রতি অধিক আকৃষ্ট। বাথের উচ্চ প্রস্তর বর্তমানে টাউন কর্পোরেশনের সম্পত্তি, এই কর্পোরেশন একটি “গ্রেণ্ড পাম্প কম” নির্মাণ করিয়াছে, ধরচ হইয়াছে ১০,০০০ পাউণ্ড। এখানকার প্রস্তরগুলি দৈনিক ৩৮৫০০ গ্যালন জল দিয়া থাকে তাপমাত্রা ১১.১° হইতে ১২.০° কারেনহাইট। এই জল গাউট রিউম্যাটিজম সায়টিকা, নিউর্যালজিয়া, প্যারালিসিস, স্নায়ুদ্রবলতা ও চর্মরোগের পক্ষে উপকারী। এই জল বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় ১১,০০০,০০ ভাগে ক্যালসিয়াম ৩৭৭, ম্যাগনেসিয়াম ৪৭.৪, পটাশিয়াম ৩২.৫, সোডিয়াম ১২২, লিথিয়াম নামমাত্র, আর্সে ৫.১ সালফিউরিক অ্যাসিড

৮৬১, কারবানিক অ্যাসিড (যুক্ত ভাবে) ৮৬, ক্লোরিন ২৮০, সিলিকা ৩০, ট্রানশিয়াম নামমাত্র, অ্যালকালাইন সালফাইডস নামমাত্র, কারবানিক অ্যাসিড গ্যাস স্বাভাবিক তাপ ও চাপে—(প্রতি লিটারে ক্রিটিকাল সেক্টিমিটার) ৬৫.০। মোট কঠিন পদার্থ একলক্ষে ১৮৬৪ ভাগ। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ১.০০১৫। আমি এতটা বিস্তারিত ভাবে বলিতেছি এই উদ্দেশ্যে যে, যদি আমাদের দেশের কেহ ভারতীয় উচ্চ প্রস্রবণগুলিকে জনপ্রিয় স্বাস্থ্যনিবাসের স্থানরূপে গড়িয়া তুলিতে চাহেন, তাহা হইলে এই তথ্যগুলি তাঁহার কাজে লাগিতে পারে। কারণ বাথের প্রস্রবণে প্রতি আনের ক্ষুদ্র ৩ পেনি হইতে ৩ শিলিং পর্যন্ত মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে। পানীয় রূপে এই জল প্রতি সপ্তাহে জনপ্রতি ১ শিলিং ৬ পেনি বিক্রয় করা হয়।

১৮৮৬ সনের আগষ্ট মাসে আমি স্কটল্যান্ডে গিয়াছিলাম। গিয়াছিলাম সমুদ্রপথে, ফিরিলাম রেলপথে। লন্ডন হইতে এডিনবরা ৩১৭ মাইল দূরে অবস্থিত, রেলপথে নয় ঘণ্টা সময় লাগে। ২৫শে আগষ্ট সেক্ট ক্যাথারিন নামক জাহাজঘাট হইতে ‘পেংগুইন’ জাহাজ ছাড়িয়া টেমস নদীর ঘোলা জল হইতে নর্থ সাইর নীল জলে গা ভাসাইল। সেখান হইতে সোজা লীথ অভিমুখে চলিল। বহুক্ষণ ধরিয়া আমরা হলভাগ দেখিতে দেখিতে চলিলাম। শাদা রঙের খাড়া পাহাড়গুলি ঢেউ-এর আবেশিত আঘাতে আঘাতে ভাঙিয়া গিয়াছে, কোথাও মন্ডন হইয়াছে, কোথাও দূর হইতে সবুজ ক্ষেত নামিয়া সমুদ্রের নীল জলের সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে, গ্রাম ও শহর তাহাদের বাড়িঘরের উপরিভাগ ও শীর্ষের চূড়াগুলি সমেত ছাব্বি মত দেখাইতেছে। তরঙ্গিত ক্ষেতের ঠিকভূমি সমূহে যেত বিলুপ্ত গবাদি পশু চরিতেছে। সূর্যালোক উজ্জল থাকিতে এসব দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। এই বোজ ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা করিতেছিল ও জাহাজের চালকঘরে অবস্থান শীঘ্র উৎকীর্ণ হইতেছিল, তাহার উপর বোজালোক পড়িয়া রামধনুর পর রামধনু গড়িয়া

চলিতেছিল। চত্বালোক শোভিত রাতি পার হইয়া পরদিন বিপ্রহরে আমরা কার্ণ অন্ড কোর্ন অর্বাং কোর্ন নদীর মুখে গিয়া পৌঁছিলাম। নর্থ বেচউইকের কয়েকটি পাহাড়ী বীপ অতিক্রম করিয়া গেলাম। একটি বীপে পূর্বে এক সন্ন্যাসীর বাস ছিল। সে মুগে স্কটল্যান্ডে সন্ন্যাসীদের দেখা মিলিত। বীপটির সবখানিই পাথর। এখানে শত জন্মাইবার উপায় নাই, তাই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সন্ন্যাসীর আহার কি ছিল? একটি অবশ্যই অবাস্তব, কারণ ধর্মীয় লোকেরা কি না করিতে পারে। ভারতীয় সন্ন্যাসীরা পাতা খাইয়া এবং গায়ে ভস্ম মাখিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন, শরশয্যার আরামে নিস্ত্রা যান। সম্ভবতঃ স্কটল্যান্ডের এই সন্ন্যাসীটি সঙ্গে এক-জোড়া ছাগল আনিয়াছিলেন। লীথে যখন পৌঁছিলাম তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। স্থানটি এডিনবরা হইতে দুই মাইল দূরে। লীথ এডিনবরার নন্দন, একপে শহরের অংশ।

স্কটল্যান্ডবাসীদের পক্ষে এডিনবরা শহর বিষয়ে গবিত হওয়া স্বাভাবিক। অনেকগুলি শিলাময় পাহাড়ের সম্মুখ দিয়া আরম্ভ—

“Whose ridgy back heaves to the sky  
Piled deep and massy, close and high”—

ক্রমে ঢালু হইতে হইতে উত্তম্পূর্ণ প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়া কোর্ন নদীর মুখে নীল জলের সঙ্গে মিলিয়াছে, ইহাতে এডিনবরা শহরটি মাছের হাতে গড়া শ্রেষ্ঠ চিত্রবৎ গহরগুলির অন্ততম হইয়াছে সন্দেহ নাই। কাসল পাহাড় অথবা সলিসবোরর খাড়া পাহাড় অথবা কাল’টন পাহাড়—যেখান হইতে দেখা যাউক না কেন, ইহার এমন একটি মোহময় সৌন্দর্য চোখে পড়িবে যা জীবনে তুলিবার নহে। এডিনবরার অধিকাংশ ঐতিহ্য স্থান আমি দেখিলাম। প্রিন্সেস স্ট্রীটের আগারোড়া স্থিরলাম, প্রিন্সেস স্ট্রীট গার্ডেনস্-এর চারিপাশেও স্থিরলাম। কাসল-এ ফিরিবার পথে সেক্ট আইল্‌জের গভিক ক্যাথিড্রালটি দেখিলাম।



নিকটেই কাউন্টি হবার, সেখানে পেভমেন্টের উপর পাথর বসাইয়া একটি চিত্রের রূপাংগুর চেহারা দেওয়া হইয়াছে, সেজন্য ইহার নাম হইয়াছে ‘হাট অফ মিডলোখিয়ান’। কাস্‌ল-এর ভিতরে আমাকে কুইন মেরির কক্ষ দেখান হইল, সেখানে জেম্‌স-৪ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং এইখান হইতে শিশু পুত্রটিকে ব্রুডিতে করিয়া খাড়া নিচে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল স্টার্লিং-এ পৌছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে। ক্রাউন রুমের রাজচিহ্ন সমূহ রক্ষিত আছে। একটি প্রাচীন কামান আছে কাস্‌ল-এ, উহার নাম মনু মের, ৪৮৬ সনে ঢালাই করা। এইখান হইতে হাই স্ট্রীটের পথে হোলিরুডে আসিয়া পৌঁছিয়াম।

রাজা ডেভিড-১ কর্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হোলিরুড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভাগ্যহীন কুইন মেরির জীবনের ঘটনার সঙ্গে ইহা সম্পর্কিত বলিয়া ইহার পৃথক একটি মূল্য আছে। ১৫৬১ সনে ক্রাল হইতে ফিরিয়া তিনি এখানে বাস করিয়াছিলেন। লর্ড ডার্লিগের সঙ্গে এইখানে তাঁহার বিবাহ হয়। এইখানে ইটালীর রিৎসিও আত্মকার জন্ত তাঁহার গাউন চাপিয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। কুখ্যাত বথওয়েলের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের পর এখানে উৎসব পালিত হয়। এবং এইখানে তিনি তাঁহার নিজের প্রজাপণ কর্তৃক লকলেডেন কাস্‌ল-এ নীত হইবার পূর্বে বন্দী হন। সেই সব কক্ষ দেখিলাম যেখানে ডার্লিগ কুইন মেরিকে কাঁদাইয়াছিলেন, যেখানে রুথডেন রিৎসিওকে ছোঁয়া মারিয়াছিলেন, এবং গাইড আমাকে এই স্থানে রক্তের চিহ্ন আছে তাহা দেখিতে বলিলেন। আমার দৃষ্টিশক্তি অবশ্য অতটা তীক্ষ্ণ ছিল না, তাই তিনশত বৎসর পূর্বকার রক্তচিহ্ন আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। ঐ সব রক্তাক্ত দিনের কথা শুনিতে শুনিতে মন অস্থির হইয়া পড়ে। আমার স্বদেশবাসীগণ ইউরোপীয়দের পাশবিকতা ও রক্তক্ষুরাঘাত নিন্দা করে। সন্দেহ নাই জার বিবরে বোধ ভারতীয়দের মনে বেশি আছে। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার, বিজয়ক্ষুরা যে জাতির আছে, তাহাদের রক্তক্ষুরাও আছে। আমাদের মনের এই

প্রোভ প্রশংসনীর হইত যদি তাহার সঙ্গে আমাদের চীৎকারের অন্ত দিকের মারাত্মক হীনতা না থাকিত। আমাদের মনের জার্মানিটা প্রভূতি আমাদের দৈহিক দুর্বলতা প্রসূত। এবং মনের উচ্চ ভাবের জন্য দৈহিক দুর্বলতা ঘটে নাই। পূর্ণাঙ্গ মানুষের দেহ ও মন একই সঙ্গে পূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহা তাহার নিয়ন্ত্রানধীন থাকে। তাহার হিংস্র বা অত্যাচারী হইবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তাহার আত্মরক্ষার ক্ষমতা থাকা চাই। এবং অন্যকে রক্ষা করারও ক্ষমতা থাকা চাই। পৃথিবীতে সকলেই সৎ নহে। একজন বড় মানবতার শিক্ষক পৃথিবীকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, বক্ষিপ গল্পদেশে কেহ আঘাত করিলে তাহার দিকে বাম গুণদেশটি ফিরাইবে। আমাদের শাস্ত্রও ক্রমা সকল ধর্মে সার বলিয়াছেন। এ সব উক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তবু সুবিনয়ে আমার স্বদেশবাসীকে, বিশেষ করিয়া নিয়বর্ণের হিন্দুদিগকে বলি, যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাহাদের মনের সকল স্বাধীনতা চূর্ণ করিয়াছে, তাহাদের পৌরুষ চূর্ণ করিয়াছে, সমস্ত আত্মসম্মান বোধ চূর্ণ করিয়াছে, তাহাদিগের নিকট হইতে প্রত্যেকটি আঘাত যেন প্রত্যাঘাতের সাহায্যে তাহাদিগকে দেয়, উচ্চবর্ণের হাতের কোনও আঘাত যেন তাহারা নীরবে সহ্য না করে। এবং সে প্রত্যাঘাত দুর্বল হইলেও যেন দেওয়া হয়, তাহার পরিণাম গুরুতর হইলেও যেন দেওয়া হয়। বর্তমান পৃথিবীর যে অবস্থা তাহাতে পূর্ণ ক্ষমার নীতি অচল। ইহা পাপ, বিশেষ করিয়া ইহা যখন অন্যায়কারীর লোভ আরও বাড়াইয়া দেয়, এবং তাহাতে সমস্ত মানবতার ক্রান্তি হয়। অতএব যাহাকে ইউরোপের পত্তনশক্তি বলা হয়, তাহা পৃথিবীর অশাসনের জন্য যে গুণ আবশ্যক তাহারই একটি উন্নত বিক্ষোভ মাত্র। এই উন্নত বিক্ষোভ যখনই এবং যেখানেই ঘটুক তাহা হুঃখজনক, কিন্তু ইহার মূলে যে গুণ নিহিত আছে তাহা হুঃখজনক নহে।

হোলিরুডে মেরি কুইন অফ স্কটস এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যবহার্য দর্শনীয় ভিউস ও কক্ষ সমূহ

দেখিলাম। এডিনবরাতে যে সব জিনিস দেখিলাম তাহার মধ্যে সার ওয়ালটার স্কটের সন্ধান নিমিত্ত মন্থমেটেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এডিনবরা হইতে আমি পার্থ-এ পৌঁছিলাম। রেলস্টেশনে ডক্টর ওয়াটের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, সঙ্গে আরও দুইজন স্থানীয় ভ্রমলোক ছিলেন—মিস্টার ডান্সমোর ও মিস্টার হানি। মিস্টার ডান্সমোরের অতিথি হইয়া থাকিব এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। খুব খাতির বয়স পাইলাম, ডান্সমোরের মাতা অন্য বাড়িতে থাকেন, তিনি আমাকে পৃথকভাবে আপ্যায়িত করিলেন। তিনি আগে কখনও ভারতীয় দেখেন নাই। আমাদের মতই ব্যবহার, কারণ তাঁহার ওখানে কিছু না খাইয়া তিনি আমাকে আসিতে দিলেন না। স্কটেরা বেশ মিতুল, সহজে অপরকে আশ্বাস করিয়া লইতে পারে।

পরদিন পূর্বে উল্লেখিত তিনজন ভ্রমলোক আমাকে লফ লেভেনে লইয়া গেলেন। পার্থ হইতে কয়েক মাইল দূরে স্থানটি। সেখানে যাইবার উদ্দেশ্যে মাহ ধরা, ট্রাউট মাহ। পরে মিস্টার ডান্সমোর নানা রকমের ছোট ছোট ঘটনার কথা শুনাইলেন। একটি উচ্চ ভূমির শীর্ষ দেশের দিকে দেখাইয়া বলিলেন, যখন তিনি আট দশ বৎসরের বালক, ঐ পাহাড়ের মাথায় একজন বিরাট পুরুষ বাস করিতেন, তাঁহার মাথায় একাণ্ড পাগড়ি, পাঞ্জাব বৃদ্ধের একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার তিনি। ঐ উচ্চস্থানে তিনি তাঁহার ঘর বাঁধিয়াছিলেন। সেটি একটি প্রশস্ত বাংলো। চারি পাশের পাহাড় ও ছোট নদীসমূহের তিনিই মালিক বলিয়া দাবি করিতেন। একদিন মিস্টার ডান্সমোর এবং এক বন্ধু,—বন্ধুটি তাঁহার সমবয়সী,—সেই পাঞ্জাবের অফিসারের দাবি করা স্থানের একটি ছোট নদীতে স্নান মাহ ধরবার জন্য গিয়াছিলেন। মাহ ধরার মন দিয়াছেন এমন সময় বঙ্গভীর কঠে জ্বলিত হইল, “পাণ্ডি ছোকরারা, এইবার তোমাদের ধরিয়াছি, এবারে তোমাদের পুলিশের হাতে সমর্পণ করিব।” তিনি এই

ধ্বনি শুনিয়া পিছনে চাহিয়া দেখেন আল্প পর্বত এলাকার যেমন বিরাট ভূবার ভূপ ধসিয়া পড়ে, তেমনি প্রবল বেগে এক একাণ্ড পাগড়ি পরা দৈত্য ছুটিয়া আসিতেছে। তিনি ইহা দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলেন, এবং কি করিবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার বন্ধু কিছু দূরে বাসিয়াছিলেন, তিনি চাকিতে সব বুঝিতে পারিয়া হিপ কেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, “কি ব্যাপার, বব? লোকটি তোমাকে কি বলে?” বলিতে বলিতে আরও কাছে আসিয়া কোট খুলিয়া কেলিল এবং আত্মন গুটাইয়া বিশাল লোকটিকে লড়াই করিবার জন্য আহ্বান জানাইল। প্রবীণ ভ্রমলোক ইহাতে খুব কোঁচুক অনুভব করিলেন, এবং অটহাতে কাটিয়া পড়িলেন। তাহার পর ছুটি লালপুশিয়ানকে বলিলেন, তোমাদের বীরকে মুক্ত হইয়াছি, তোমরা এখন যাইতে পার। আমরা আমাদের দেশে এমন দুটামি করি না, কারণ আমরা স্বেচ্ছা বালক। প্যারীচরণ সরকার, তাঁহার একখানি ছোটদের জন্য লেখা বইতে (Second Book of Reading) বলিয়াছেন, “A good boy never fights,”—ভাল ছেলে কখনও লড়াই করে না। তাহার সঙ্গে আমি কি এই কথাটি যোগ করিতে পারি—“but sneaks away when a bad boy beats him?”—এবং মন্দ ছেলে এহার করিলে কাপুরুষের মত পলাইয়া যায়।”

এই ভাবে আমরা স্কুলের ছেলের মত চলিতে লাগিলাম। প্রশস্ত পথ, আমরা, একখানি বোট লইয়া পাহাড় ডিঙাইয়া হ্রদের ধারে গিয়া পৌঁছিলাম। এইখানে আমরা একখানি বোট লইয়া হ্রদের এক ধার হইতে আর এক ধার পর্বত ট্রাউট মাহের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। লম্বা সূতার হিপ ধরিয়া থাকা খুব সহজ ছিল না। মাহ ধরবার অনেকগুলি কোণল আছে, তাহা জানা ছিল না, অতএব আমি শান্তভাবে নৌকার বলিয়া সঙ্গী মাহ ধরা দেখিতে লাগিলাম। এবং ঐ সঙ্গে চপল লহরীর খেলা। ছোট ছোট তরঙ্গের প্রত্যেকটিতে ছোট ছোট একটি করিয়া

সূর্য প্রতিবিম্বিত। নীল জলের বুকে সে দৃষ্ট অপূর্ব সুন্দর। আমরা অবশেষে করেকটি ট্রাউট লইয়া কিরলাম। কুইন মেরি বে ঘাঁপে বন্দী ছিলেন, তাহাও দৃষ্টগোচর হইল।

পর্যটন সমাপ্ত। মিটার ডান্সমোর আমাকে একা কোলরা না রাখিয়া আমাকে তাহার সঙ্গে গীর্জার লইয়া গেলেন। পথে একটি ছোট প্রাচীন অটালিকা দেখাইয়া তিনি বলিলেন, এখানে “কেয়ার মেইড অন্ড পার্শ্ব” বাস করিত। চার্চ হইতে কিরবার পথে আমরা কিন্নরোল পাহাড়ের গেলাম এবং যাইবার পথে ব্র্যাকবোর পাড়িতে পাড়িতে গেলাম। ‘উইক্স অন্ড বেইগলি’ নামক একটি স্থান হইতে পার্শ্ব সুন্দর দেখায়। একটি লোক-প্রবাদ—পার্শ্ব শহর দুই ইঞ্চির মাঝখানে অবস্থিত। ইহার অর্থ—টে নদীর সংলগ্ন পার্শ্বের দুটি ধারে নর্থ ইঞ্চ ও সাউথ ইঞ্চ নামক দুইটি ছোট উপত্যাকার স্থান আছে। নর্থ ইঞ্চ নামক স্থানটিই কটের ‘কেয়ার মেইড অন্ড পার্শ্ব’ নামক উপন্যাসে বর্ণিত বিখ্যাত বৃক্ষের স্থান।

পার্শ্ব হইতে পিটলহকিতে পৌঁছলাম, হাইল্যাণ্ড রেলওয়ের একটি ছোট স্টেশন। এখান হইতে বিখ্যাত কিল-ক্র্যাংকি নামক গিরিগণ অতিক্রম করিয়া রেয়ার অ্যাঠোল-এ গেলাম পদব্রজে, পর পর বহু বহু সর্পি উপত্যকা, অরণ্য, গভীর গিরিখাত, নদী পার হইয়া বাইতে হইল। পর্বত-দুস্তকে এই সব জিনিস এক অপূর্ব বৈচিত্র্য দান করিয়াছে।

রেয়ার অ্যাঠোলে তিনজন ভ্রমলোক গ্লেন টিল্টের পারে পদব্রজে ভ্রমারে লইয়া যাইবেন অসুযোগ জানাইলেন। আমি তাহাদের এই অসুযোগ ধন্যবাদের সহিত পালন করিলাম। কয়েক মাইল পথ পাড়ি চলার উপরন্তু, আমরা এ পথের সুযোগ গ্রহণ করিলাম। পথের মাঝখানে দুইদিকে দুই পর্বতশ্রেণী, তাহার সম্মুখভাগে একটি সর্পি উপত্যকার টিল্ট নদী। ও দেশে এটিকে ‘গ্লেন’ বলা হয়। নদীর পাশ বরাবর একটি পারে চলার পথ আছে। পথের এই অংশটি প্রায় ১৬ মাইল দীর্ঘ, আমরা পারে হাঁটিয়া অতিক্রম করিলাম।

আবহাওয়া অস্বস্তিকর ছিল আমি বর্তমান ঘটন্যাতে হিলাম, আকাশ মেঘহীন ছিল। মাত্র এই দিনটিতে মেঘ ছিল, বাকিও বৃষ্টি হয় নাই। আমরা কুর্জির সঙ্গে পথ চলিতেছিলাম। পর্বত-পায়ে ভারতীয় কারপেটের মতো বৃহৎ বর্ণে বিহান গুম্বাজ হইতে স্নগদ উদ্ভূত হইয়া আমাদের আনন্দ আরও বাড়িয়া দিতেছিল। আর তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিল টিল্ট নদীর মর্মর ধ্বনি। মাঝে মাঝে প্রস্তরখণ্ডের ধাক্কা খাইয়া শ্রোত র্জন করিয়া উঠিতেছিল। ক্রান্ত বোধ করিলে আমরা কোনও একটা পাথরের উপর বসিয়া সঙ্গে আনাত আহারের সব্যবহার করিতেছিলাম। টিল্ট নদীর নির্মল শীতল জল পান করিয়া বড়ই তৃপ্ত বোধ করিয়াছিলাম। যে অঞ্চল দিয়া চলিতেছিলাম, তাহা প্রায় বসতিহীন। পূর্বে যে হাইল্যাণ্ডবাসীরা ছিল তাহারা সবাই অভয় জীবিকার সন্ধানে চলিয়া গিয়াছে। দুর্দান্ত সাহসী সম্রাট ছিল ইহার। কটল্যাণ্ডের ওয়ালটার কট ইহাদের বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পাহাড়ের গভীর খাদ-প্রবাহিত ডী নদীর স্রোতের ধ্বনি আমরা শুনিতে পাইলাম। ডীর সেতুর উপর দাঁড়াইবার সময় গোমূল ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া দিক দিগন্ত আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। এইখানে দাঁড়াইয়া অবাধ হইয়া দেখিতে লাগিলাম, কেমন করিয়া দুই পাশের পাহাড়ের পাথর নদীটিকে দুই পাশ হইতে চাপিয়া ধরিয়াছে, এবং তাহারা পরস্পর এত কাছ আসিয়া পড়িয়াছে যে একটি ছোট ছেলেও একলাকে তাহা পার হইয়া বাইতে পারে। অবশেষে প্রস্তরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিয়ে পাথরের খোলা বৃক্ষের উপর আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, এবং যেন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্যই সেখানে এমন একটি গভীর গহ্বর খুঁটি করিয়াছে যাহা পাঠাল পথের অন্ধকারের মতই কালো। এইখানে কবি বারংবার প্রায় দ্বারা বাইতে বসিয়াছিলেন। তাহার জীবনীতে স্মরণ বলিয়াছেন—‘চালু পথে তিনি (বারংবার) কোন রকমে নিচের দিকে নামিতোছিলেন, এমন সময় হঠাৎ গুম্বাজী

হীকারে তাঁহার খোঁড়া পা আটকাইয়া যায়, এবং তিনি সেই চাপু পাহাড়ের গায়ে গড়াইতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার সঙ্গী তাঁহাকে বশাসময়ে ধরিয়া কেলিয়া তাঁহাকে যুদ্ধের হাত হইতে বাঁচাইয়া দেন। এইখানে আমাদের দল গাড়ি অপেক্ষা করিতেছিল, সেই গাড়িতে আমরা ত্রিমারে গিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে হোটেলের আমাদের জায়গা হইল না, সব হোটেলেরই স্থানভাব আমাদের চাইজনকে হাইল্যাণ্ড কুটিরে আশ্রয় লইতে হইল। পরদিন সকালে আমি যখন কুটিরের বাইরে পাহাড়ের ধারে, একটি ছোট ছেলে সেখানে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি কে। বলিলাম, আমি ইণ্ডিয়ান হইতে আসিয়াছি। সে বলিল, “আমার বাবাও ইণ্ডিয়ান।” “তোমার বাবার নাম কি?”—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল “স্মিটন।” “তাঁহার নাম কি ডক্টর ডী. স্মিটন? এবং তিনি কি বয়স আছেন?” এ কথায় সে দোঁড়াইয়া বাড়ি চলিয়া গেল, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমার অহুমান ঠিক। তাহা হইলে এই বালক আরবার সত্যই ভারতীয়। ইউরোপে থাকিতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যাত্রাকেই ভারতীয় মনে হইত। ছেলেটি আমার পাশে খেলিয়া বেড়াইল, এবং চলিয়া আসিবার সময় তাহার নিকট হইতে দ্রুতপূর্ণ বিদায় গ্রহণ করিলাম। ত্রিমারে স্থানীয় প্রধানগণ, আর্ল অভ ফাইক এবং কর্ণেল কার্কুহারসন প্রাতি বৎসর তাঁহাদের প্রজাবর্গকে লইয়া একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এটি হয় সম্পূর্ণ হাইল্যাণ্ড ভিত্তিতে। এক-একটি গোষ্ঠী তাহাদের মোড়লকে পুরোভাগে রাখিয়া মার্চ করিতে থাকে। পরিধানে হাইল্যাণ্ডারদের বিশেষ পোষাক, হাতে ক্রেমোর তরবারি অথবা লুক্ এবার কুঠার,—হুইই তাহাদের নিজস্ব অস্ত্র,

তৎসহ পতাকা ও ব্যাগ পাইপ। সম্রাজ্ঞী ও প্রিন্স অ্যান্ড গ্রেসেস এই হাইল্যাণ্ড গোষ্ঠীর সম্মেলনে যোগ দিয়া থাকেন। কিন্তু গেলিক ভাষা ও হাইল্যাণ্ড কিল্ট ক্রমে অদৃশ্য হইয়া বাইতেছে।

ত্রিমারে আমার বন্ধুদের রাখিয়া আমি এক ব্যালাটার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদের কোচ প্রায় দুই মাইল বাইবার পর এক সহযাত্রী আমাকে বিশেষ করেকটি স্থান চিনাইয়া দিতে লাগিলেন। এখানে সম্রাজ্ঞীর হাইল্যাণ্ড নিবাস ব্যালমোরাল দেখিলাম তাহার পর কার্কুহারসনের পারিবারিক বাসস্থান ইলভারকল্ড দেখিলাম। তাহার পর প্রিন্স অভ ওয়েলস এর অ্যাবারগেলিড এস্টেট দেখিলাম। তাহার পর ব্যারন কত্‌ক খ্যাতি প্রাপ্ত ডুয়ারাবুত লকনেগারের চূড় দেখিলাম। আমার নতুন বন্ধু মিস্টার নিউল্যাণ্ড আমাকে ব্যালাটার ছাড়িবার আগে আশে পাশের পাহাড়গুলি না দেখাইয়া ছাড়িবেন না। তিনি একটি সমিতি কত্‌ক নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ঐশ্বর্য্যকালে হাইল্যাণ্ডে যে-সব যাত্রী পারে চলা পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই সব পথ জমির মালিকেরা যাহাতে বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দখল করিয়া না লইতে পারে তাহা পূর্ববেক্ষণ করা। এইসব পথ কোথায় কি পরিমাণ আছে তাহার হিসাব লইবার জন্য মিস্টার নিউল্যাণ্ড প্রেরিত হইয়াছিলেন। পূর্বে এই জাতীয় খেঁসব পথ বন্ধ করা হইয়াছিল তাহা পুনরায় ছাড়িয়া দিবে জমিদারদিগকে বাধ্য করা হইয়াছে। পঞ্জীর সবার ব্যবহার হান বা পথ যদি জমিদার দখল করিয়া লয় তাহা হইলে সে জমিদার যত কমতালশী হউক না কেন সবাই মিলিয়া টাকা তুলিয়া তাহার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া বন্ধ নিষ্পত্তি করা হয়।]

ক্রমশঃ

# বাংলা দেশের যুদ্ধের তিন রূপ

শ্রীমশেচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশের যুদ্ধ তিনটি রূপে প্রতিভাত। প্রথম দুইটি অতি স্পষ্ট ও সমাপ্ত; তৃতীয়টি ভিন্নরূপে ও অসমাপ্ত।

আমরা সবাই জানি পাকিস্তান ও বাংলা দেশের মধ্যে তখনই যুদ্ধ লাগিয়া গেল যখন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া ভোটে বিজয়ী মুজিবরের হাতে শাসনভার হস্তান্তরিত করিতে অনিচ্ছুক হইল। বাংলাদেশের বুকে বর্বর সেনাবাহিনী নিয়োগ ও গণহত্যা, ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিয়া নারীনির্ধ্যাতনের সন্ত্রাস সৃষ্টি করার ভিতরে যে মানসিকতার পরিচয় পরিব্যাপ্ত তাহা উপরিউক্ত মনোভাবেরই বহিঃস্মরণ। বাংলাদেশের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা, সমধর্মিতা বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কিছুই ইয়াহিয়ার চোখে পড়িল না। তার দৃষ্টিতে একটি মাত্র লক্ষ্যই ছিল এবং তাহা হইল, সে একমাত্র বলপ্রয়োগেই বাংলাদেশকে পদানত রাখিবে।

বাংলাদেশের সহায়হীন অবস্থাও ইয়াহিয়াকে এই সংকল্পে প্ররোচিত করিয়াছিল। বাংলাদেশ হুঁসল, অস্ত্রহীন। পার্শ্ববর্তী ভারতবর্ষ তার সাহায্যে আসিবার কথা নয়; করণ পক্ষাশের হিন্দু-বিভাড়নে ভারতবর্ষ কোন উচ্চবাচ্য করে নাই; পাকিস্তানের উপদ্রব নীরবে মানিয়াই নিয়াছিল। কান্দীর সীমান্তের উপদ্রবেও ভারত নীরবতা অবলম্বন করিয়াছে। আজাদ কান্দীর লব্ধে মুখে দাবি করিলেও যুদ্ধের সাহায্য লইয়া আক্রমণ করিতে ইচ্ছুক নয়। সর্বাঙ্গীণ ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক মুসলমান থাকিতে তাদের বিরাগভাজন হইয়া বাংলা-দেশের সাহায্যে আগাইয়া আসিবার কথা নয়।

ভারতবর্ষকে আরও বিব্রত ও বিপর্যয় করিবার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান বাংলাদেশের যুদ্ধের প্রথম ক্রিান্তেই এক কোটি লোককে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিল। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই জনশ্রোতকে পাকিস্তান বাধা দেয় নাই। বরং বর্ডার অরক্ষিত রাখিয়া রেজিমেদের ভারতে প্রবেশের পথ সুগম করিয়াই রাখিয়াছিল। ফলে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দিকে দিকে প্রেরিত হইল, বিশ্বের দরবারে তারা বুধাই ধর্ণা দিল, কোন রাষ্ট্রই ভারতের পক্ষে দাঁড়াইল না। এদিকে আর্থনীতিক চাপে ভারত উদ্ভ্রান্ত, কি-করি কি-করি ভাব চোখে মুখে। হয়ত বিব্রতা শ্রীমতী গান্ধী দেয়ালে টাঙানো রাষ্ট্রপিতা গান্ধি ও রাষ্ট্রপতি পিতার দিকে তাকাইয়া হুহু'হু গভীর নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ভাবিতেন, লোক-বিনিময় না করিয়া কি বিপদেই না আমাকে ফেলিয়া গিয়াছ। ভারতবর্ষ যখন নানা চিন্তায় বিব্রত ও বিষয় তখন পাকিস্তানী বর্বর সৈন্যদল মহা উজ্জ্বলে বাংলাদেশে গণহত্যা, নারীনির্ধ্যাতন ঘরবাড়ী গ্রাম পোড়াইয়া এক বীভৎস উন্মাদনায় উন্মত্ত। বাংলাদেশে তৎকালীন অবস্থা অবর্ণনীয়। দেশের নেতা শত্রুহস্তে বলী, যুবক সম্প্রদায় বিভ্রান্ত, বিবৃট; রক্ষীবাহিনী প্রায় নিমূল। এমন যখন দেশের অবস্থা তখন পড়িয়া পড়িয়া মার ধাইবারই কথা; কিন্তু এক অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইল। যুবক সম্প্রদায় যুত্থ্য নিশ্চয় জানিয়াও এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হইল। তাদের অস্ত্র নাই, বস্ত্র নাই, শস্ত্র নাই, ভবু তারা কণিষা দাঁড়াইল পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে। হাতের কাছে যাহা পাইল,—দাঁ

হুড়াল খড়া, তাহা লইয়াই শত্রুর সম্মুখীন হইল। তাদের যে এক মহানু অস্ত্র সম্বল ছিল তাহা হইল হুঁকার মনোবল ও হুর্দম দেশপ্রেম। তার সাহায্যেই তারা বিভাঙ্কিত করিতে লাগিল শত্রুসৈন্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, থানা থেকে অস্ত্র থানায়। কলে সহরের দূরস্থিত অঞ্চল গ্রাম ও থানা তাদের হাতে আসিতে লাগিল। সংবাদ-পত্রে সেই সব খবর প্রকাশিত হইতে লাগিল; কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না।

এর পর মুক্তিবাহিনীর উদ্ভব। এ এক অলৌকিক ব্যাপার। শূন্য থেকে অন্ধ পৌছানোর ইতিবৃত্ত। অশিক্ষিত লোক যে অবস্থার চাপে অশিক্ষিত দক্ষ সৈনিক হিসাবে রূপান্তরিত হইতে সক্ষম, সেই অসম্ভাব্য অভিনব ইতিহাস। ভগবান যেন অত্যাচার ও বর্বরতা থেকে রক্ষা করিবার জন্যই মানুষের মস্তিষ্কে বুদ্ধি দিয়াছেন। সেই মূলধনকে স্তূপে আসলে ষাটাইয়া অত্যাচারিত মানুষ লত্যাচারী মানুষের সম্মুখীন হইবার কৌশল আয়ত্ত্ব করে। সৃষ্টির আদিকাল হইতেই ইহার ক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে। ষাটের উৎপাদন' আবরণের উদ্ভাবন ও আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রের আবিষ্কারে মানুষের মস্তিষ্ক সর্বক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। সেই একই ক্রিয়া মুক্তিবাহিনী সংগঠনে পরিব্যক্ত।

'টাইগার' সিদ্ধিকির মত বহু দক্ষ সৈনিকের উদ্ভবেই এই সত্য প্রতিভাত ও স্বীকৃত। ইহার পর মুক্তিবাহিনী ক্রমশঃ শক্তিবৃদ্ধি করিয়াই চলিয়াছে, নিহত ও আহত শত্রুর কবল হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া, থানা লুণ্ঠ করিয়া এবং অস্ত্র উপাড়ে। বাংলাদেশের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর পরম অবদান হইল পাকিস্তানী সৈন্তের প্রতিপক্ষ হিসাবে আবির্ভাব। তাদের দুর্জয় সাহসিকতা ও রণ-কৌশল হতচেতন জাতির প্রাণে ক্রীণ হইলেও আশার আলোক সঞ্চারিত করিল। এইখানেই বাংলাদেশের যুদ্ধের প্রথম পর্ব সমাপ্ত।

এই সময় গভীর চিন্তিত প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর পক্ষান্তে দত্তারমান পকাশ কোটি ভারতবর্ষের মানুষ। মুসলমানদের আশ্রয় ইচ্ছা করিয়াই বাহু দিলাম। বাংলা-

দেশের যুদ্ধে এদেশীয় মুসলমানদের কোন ভূমিকাই নাই। তারা খেলার মাঠে দর্শকদের মত তাকাশাই দেখিয়াছে। তাদের কোন সাহায্যকারী সংঘ গড়িয়া উঠে নাই, সাহায্য ত্যাগও। তাদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে প্রেরিত হয় নাট, এমনকি একটা মিটিং করিয়াও কেহ পাকিস্তানী বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নাই। আল-আসকা মসজিদ ব্যাপারেও মুসলমানদের মধ্যে একটা উত্তেজনা দেখিয়াছি; কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে তারা ছিল প্রথমাবধি নীরব ও নিষ্কূপ। পৃথিবীর মুসলমান রাষ্ট্রগুলিও ছিল সমান নীরব ও নিষ্কূপ। মুসলমান শাস্ত্র আমার অপঠিত কিন্তু তাহাতে কি নির্ব্যাতিত, নিপাতিত মানুষের প্রতি সমবেদনা দেখাইবার কোন নির্দেশই নাই? পাকিস্তানী কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া শেখ মুজিবুর বিবেচনায় যে-সব রাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন তার মধ্যে মুসলমানদের নামগন্ধও নাই। বস্তুত বাংলাদেশের যুদ্ধে অবাঙালী মুসলমানের আচরণ দুঃ, হুঁ ও হুঁত।

সবাই যখন নীরব ও নিষ্ক্রিয় তখন কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দু আত্মাহুতির থাকিতে পারিতেছিল না। জনগণের একমাত্র বুলি ধ্বনিত হইল—আর বিধা করিও না, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দাও, তাদের যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকায় নামিয়া পড়। এমন যে কমিউনিস্ট বলিয়া বিখ্যাত 'জনসংঘ' সেও বাংলাদেশের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ব্যাপারে সোচ্চার হইল।

বাংলাদেশের যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পক্ষে দুইটি কারণও ছিল অতি প্রবল—মানবিকতার প্রশ্ন ও শরণার্থীর প্রশ্ন। সাংবাদিক 'নারার' Statesman-এ অঙ্ক করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন, যুদ্ধে লিপ্ত হইবার স্ব-পক্ষে সুরধার বৃত্তি।

কিন্তু যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পক্ষে প্রবল মুক্তি থাকিলেও যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া যায় না। কারণ ভারত non-alignment নীতি প্রহণের কলে বিবেচনায় বন্ধুহীন, বান্ধবহীন। পাকিস্তানকে শায়েস্তা করিবার পক্ষে ভারত একক হিসাবেও সক্ষম ছিল। কিন্তু পাকিস্তান তো নিঃসঙ্গ নয়, তার পক্ষে আছে আমেরিকা ও চীন। তাই

ভারতকে ছুটিতে হইল মতো। এবং একদিন হঠাৎ আকস্মিক ভাবে ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে সমগ্র বিশ্ব বিস্মিত ও হতচকিত। ইংলও ক্ষুব্ধ হইল সভ্য কিন্তু কাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল আমেরিকার।

বাংলাদেশের মুক্তের প্রথম হইতেই ভারতে প্রতিটি মানুষ প্রধানমন্ত্রীর পাশে একাধিকভাবে দণ্ডারমান। ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি সাক্ষরিত হইবার কালে পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবার ব্যাপারে নিঃসন্দেহভাৱে প্রশ্ন বিদ্যমান হইল।

নিকসন ভারত-সোভিয়েট চুক্তির ক্ষুব্ধ মনে মনে ক্রিপ্ত হইলেও যুদ্ধে তার কোন কথা বাহির হইল না, সে নীরবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণার ছয় দিন পূর্বেও করাচীতে বিপুল রণ-সজ্জার আমেরিকা পাঠাইল। ইহার পরেই নিশ্চিত উৎসাহ ইয়াহিয়া খুর্শে হুকার ধ্বনিত হইল—In case of war Pakistan will not fight alone। অর্থাৎ two (America and China) are more than one (Russia)—এই কথাটাই ঘুরাইয়া প্রচারের সাহায্যে ভারতের কানে পৌছাইয়া গেল। এবং উল্লাসের উদ্ভাসভাৱে ভারতের কতকগুলি বিমান ক্ষেত্রে এরা ডিগেবরে বোমা নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বলিল।

পরবর্তী ঘটনা সংক্ষিপ্ত। পরদিনই ভারত সৈন্যে বাংলাদেশ আক্রমণ করিল এবং অবিস্মৃত অল্প সময়ের মধ্যে (মাত্র ১৪ দিনের মধ্যে) বাংলাদেশের পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য করিল। এইভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমাপ্ত হইল এবং বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত হইবার পথে অগ্রবাহ্য করিল। বাংলাদেশের মুক্তের দ্বিতীয় পর্ব ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এইভাবে পরিসমাপ্ত হইল।

পরিণেবে আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে দুর্ভাব

বিরোধিতার কথা বলিলেই আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত হয়।

বাংলাদেশের মুক্তের প্রথম হইতেই আমেরিকা ভারত-বিরোধী মনোভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিল। মনে হয় আমেরিকার প্রয়োচনাতেই এই যুদ্ধ পরিচালিত হইয়াছে। ইয়াহিয়া খাণের পুত্রুলের মত নিকসনের নির্দেশ পালন করিয়াছে মাত্র। ইয়াহিয়ার নিশ্চিততা ও কর্মতৎপরতার অভাবই আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে আসিতে বাধ্য করিয়াছে। যে সৈন্তদল বাংলাদেশে প্রেরিত হইয়াছিল তারা নারীধ্বংসে মতটা তৎপর ও দক্ষ, যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া সংগ্রাম করিতে ততটা উৎসাহক ছিল না। বিমান বাহিনীর শক্তিও নগণ্য ছিল। তাই যদি বলি, এই যুদ্ধে ইয়াহিয়ার বিশেষ সঙ্গতি ছিল না তবে কথাটা অবিস্মৃত হইবে কি? এবং যুদ্ধটা নিকসনের অহুরোধেই চালিত হইয়াছিল এইরূপ ধারণা করা অস্বাভাবিক হইবে না। হয় নিকসন বলিয়াছিল, এই যুদ্ধ জিতিলেও জিৎ, হারিলেও জিৎ, কারণ তোমার বিপক্ষে আমি cease fire প্রস্তাব আনিয়া তোমাকে বন্ধা করিব।

উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপোষণে কতকগুলি আচরণের উল্লেখ করিতে চাই। বাংলাদেশের যুদ্ধে পাকিস্তানী বর্বরতার বিরুদ্ধে আমেরিকা একটি কথাও বলে নাই। এক কোটি শরণার্থী সম্বন্ধেও সমান নীরবতা অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছে। এগুলি হইল আমেরিকার নিষ্ক্রিয় ভূমিকা। আমেরিকা সক্রিয় হইতেও পারে। আমেরিকা সক্রিয় হইল তখনই যখন ঢাকার বার-বার অবস্থা। তখন সাত ডাড়াডাড়ি বাংলাদেশের যুদ্ধে ভারতকে আক্রমণকারী আখ্যায় অভিহিত করিয়া ইউ এম ও-তে cease fire প্রস্তাব আনিল, অর্থাৎ চেষ্টা হইল ঢাকার পতন হইবার পূর্বে একটা লোড়াতালি দিয়া যুদ্ধটাকে থামাইয়া দেওয়া। কিন্তু নিকসনের অপচেষ্টা ব্যর্থ হইল রাশিয়ার ভিটোর কলে। আমেরিকার হুমকিসমূহ যে রাশিয়ার পূর্ণ অধিগম্য তাহা তার উত্তরে প্রমাণিত—The time for cease fire is not yet come.

নিকসন পাকিস্তানী বিপর্যয়ের কারণ যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। শক্তিমানু আমেরিকা ও চীন যে পাকিস্তানের পক্ষে এবং সীমাতীত বণসত্তার যে পাকিস্তানে মজুত, সেই পাকিস্তানের বিপর্যয় সত্যই কল্পনাতীত। এক লক্ষ সৈন্ত মজুত থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ ব্যাপার সত্যই অবিখ্যাত। তেমনি সমান অবিখ্যাত ও কল্পনাতীত যশোর ক্যান্টন-মেন্টের বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ। সেখানে অন্তত পক্ষে ২৫ হাজার সৈন্ত থাকিবার কথা—কিন্তু দেখা গেল সব ভেঁী ভেঁী—একজন সৈন্তও সেখানে পাওয়া যায় নাই। সৈন্তগুলি গেল কোথায়? তবে সবই কি কচুকাটা হইয়াছে? এবং তাদের সবংশে নিষন ব্যাপারই কি ঢাকার আত্মসমর্পণের সংকল্পে ভিন্নত্ব? এই প্রশ্নের সহজব হৃদয় কোনদিনই মিলবে না। পাকিস্তান অভিমানের খাতিরে কোনদিনই এই প্রশ্নের উল্লেখ

করিবে না। আর ভারত কোন বিষয়েই কথা বলে কহি, এই বিষয়ে সে নীরবই থাকিবে।

নবাব মিরজাকরের শাসনের শেষ অধ্যায়ের পরিচয় দিতে গিয়া বকিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন—বুক আকিং খায় ও ঝিমায়; আর ইংরাজ ডেসপ্যাচ লেখে। বাংলা দেশের শেষ অধ্যায়ে ইয়াহিয়া আকিং খাইত বালিয়া মনে হয় না; তবে চিরদিনের জন্তে নীরব ও নিশ্চুপ হইয়া গেল। হয়ত ‘এলাই’ আমেরিকা ও চীনের নিক্রিয়তা ইয়াহিয়াকে ভুত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রদূত কিটিং-এর সব ডেসপ্যাচই ব্যর্থ হইয়া গেল, তার একটি সতর্কবাণীও প্রেসিডেন্ট নিকসন কানে তোলে নাই। কিটিং-এর সতর্ক বাণী কিন্তু অকরে অকরে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে—Pakistan is probably finished.

ভারত-আমেরিকার বন্ধের অধ্যায়টি এখনও অসমাপ্ত। এই বন্ধের অবসান ঘটিতে আরও কিছু সময় লাগিবে মনে হয়।

## মাছ কুটলে মুড়ো দোব

জ্যোতির্ময়ী দেবী

গুণগ্রাম। চাষী মজুরের আর সামান্য, সাক্ষর উচ্চবর্ণ পুরুষ, প্রায় নিরক্ষর হুংখী দীন নরনারী। পাঠশালা আছে, স্কুল নেই। কিন্তু রোডও আছে। মহাপ্রচার যন্ত্র। রাতে লকালে চাষীভাইদের ডেকে বিলিভী ওবুধের সাবের বিদেশী নামে সার ও পরিমাপ বলা হয়। তারা নাম মুখুহ করে। দাম মুখুহ করে। ‘একরের’ অল্পবাদ করে মনে মনে বিচার কাঠার।

প্রায় হুপুর। বড় বেক হোট চাষী মজুরের দল মাঠে মাঠে আগেরভাগে পাটের ধানের বীজ বপন ঘোণনের ব্যাবহা করেছে। এবারে অবসর।

কবে কোন এক ঋণ পুণ্যশীলা নারী রায়গুণীহণী একটা অশ্বখ গাছ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অনেক দূর অবধি তার ছায়াময় স্মৃতি নেমেছে।

তারা সেখানে এসে বসল। তার কাছাকাছি রয়েছে এক প্রকাণ্ড দ্বীপ। সেটাও ঐ পুণ্যশীলার নির্বোধ দিদিশাওড়ী প্রতিষ্ঠা করেন স্বামীর নামে। রায়পুত্র বা রায়দ্বীপ নাম। প্রোমের জলাভাব ঘোচানোর জন্ত।

তা’ জল আছে। মাছও আছে। তারা সেখানে হাতে পায়ে মুখে জল দিল, মুখ মুখে গামছা দিয়ে বাতাস খেতে লাগল। চকচকে বেহ একদল চেলা ছনো



সরলপুটি ঘাটের ধারে খেলা করছে দেখতে পেল। তাদের ভাতের পাতের মাছের কথাও ভাবল একবার বোধহয়।

এবারে মায়েরা স্নান করার কান্না করে গমিছা ঢাকা ভাত নিয়ে আসবে। মাছ? ডাল? তরকারী? সে আমরা জানি না কি কি।

মোড়ল-হামীর এক বৃদ্ধ বসে। আশে পাশে ছোট বড় চাষীর দল। হঠাৎ এক চাষা জিজ্ঞাসা করলে, তাই, এবারে ভোটে কারা জিতল?

২য়। গাইবান্ধুর?

৩য়। কান্তে হাতুড়ী?

প্রথম জন। গাইবান্ধুর জিতেছে এবার।

সন্ধ্যাবেলা। মোড়লের বাড়ী রেডিও খুলেছে। অনেকেই জড় হয়েছে। পৈতৃক চট্টাঠা এনামেলের গ্লাসে ভাঙা কাপে চা নিয়ে, কোঁচড়ে কাছের ছুঁঠো হুড়িও আছে,—খবর শোনার দল সব।

মজার ভাষণ। মোড়লের ব্যাখ্যা।

“এই ১৯৮০ সালে চালের আর অভাব থাকবে না দেশে। সৰু মোটা সিন্ধু চাল পাওয়া যাবে। কাকর ধান ক্ষুদ্র থাকবে না তাতে। ১৯৮৫ সালে দেশের শক্তকরা ৫০ জন লেখাপড়া লিখবে। আর চাকরী পাবে সবাই। বেকার আর থাকবে না। ততদিনে আমরা চাঁদে উঠতে পারব। পরমাণু বোমা তৈরী করতে পারব।...”

জনতা খুসী। মোড়লের ব্যাখ্যাও চলে। শুধু মোড়ল জানে, ততদিনে ধরা—এই মন্ত্র আর থাকবে না। হুতরাং এ প্রতিশ্রুতিও ‘অচল টাকা’ হয়ে যাবে।

তবু প্রশ্ন করে একজন,—তা’ সে ক’ কুড়ি বছর হবে দাদা—বাহ ধান চাল সস্তা হতে? চালের খড় সস্তা হবে? গরুর খড়?

—তা হবে দেড় কুড়ি। এক কুড়ি। সস্তার কথাই জবাব এলো না।

রেডিওতে লোক সঙ্গীত শুরু। “পান খাইয়া যাও রে বন্ধু। পান খাইয়া যাও।” সকলেই সহাত বদন। বন্ধুর আস্থানে।

ওপাশে আঙিনায় মোড়লকত্তা ছেলেকে খুম পাড়ান্নে।

‘চাঁদের কপালে চাঁদ’কে—লোভ দেখিবে ডেকে।

‘এই মাহ কুটলে মুড়ো দোব—’

(আর)—ধান ভানলে কুঁড়ো দোব।

‘কুঁড়ো’? মোড়ল ভাবে।

(বলদ)—গরুর দুধ দোব। কত্তার মুখে কোঁচকের হাসি। এবারে মোড়ল ভাবে, ‘বলদ’ গাইয়ের দুধ?

খুম পাড়ানো ছড়া? শেষ হল? সবাই শুনেছে।

‘মুড়ো’? তার সঙ্গে মিশিয়ে ‘কুঁড়ো’? আর ‘বলদ’ গাইয়ের দুধ?

এবারে মোড়ল হাসে, ও। সবটাই ইয়ারকি?



# পুণা আশ্রমে

শ্রীদীনীপকুমার রায়  
(উপসংহার)

অঘটনের কথা যখন ভুলেইছি তখন আর একটু বললামই বা। অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাস করবেন—অবধারিত। তবে ক্রান্তিপূর্ণ মিলবে বিশ্বাসীদের বরণ-মালায়—যারা বিশ্বাস করেন বাইবেলের নিশ্চয়্যোক্তি—“We walk by faith, not by sight.” ইন্দ্রিয়ার যে কতরকম দর্শন হ’ত—আমরা যতই দেখতাম ততই বায়ুচ হয়ে চেয়ে থাকতাম। (আমার এক কন্সট্যান্ট বন্ধু ৩৭নং রায় অবিশ্বাসী হ’য়েও এসব বিশ্বাস করত ও সব শুনে ওকে হেসে ডাকত ভীষণা দেবী বলে।) ধ্যানে দেখত সে কতরকম যোগী সাধক মহাপুরুষ। দিকপেশ্বরে দেখেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে। একবার দেখেছিল রামান মহর্ষিকে—একা আছেন এক পাহাড়ে—পনেরো বোলো বৎসরের ছেলে। একদা—৮. ৭. ১৯৫৮—দেখেছিল ঠাকুর নাচছেন ঘুরে ফিরে। ও তাঁর পা ছুঁতেই ওর দেহে অগ্নিক ধ্বংসে উঠল। এ-অঘটন বহু-বারই ঘটেছে ও বহুলোক ওর হাতে পায় চন্দনগন্ধ পেয়েছে। এ অগ্নিকৃত চুনীলাল ও আমাদের প্রতিবেশী খাঙ্গার পরিবারের সবাই (স্বামী স্ত্রী ও ছুই ময়ে) পেয়ে-ছিল। কলকাতার আমাদের বন্ধু মিলন সেনের ১/এ, এলগিন রোডের বাড়িতেও একাধিকবার এ অঘটন ঘটেছে—সময়ে সময়ে এ-দর্শন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়ার ভাবমুখে বৃত্ত্য করত। হু-একবার স্ত্রী চুনীলালের হাত ধরে তাঁকেও নাচিয়ে তবে ছেড়েছিল। তিনি হু হু হু হু হু ওর ভাবাবহাির বৃত্ত্যে। ওর এই ভাবমুখে বৃত্ত্যের কয়েকটি ফটো আমাদের অ্যালবামে আছে। ওর সে নাচের সৌন্দর্য্য ভুলবার নয়—বহু বর্ষাবধি সে আনন্দের স্রিক হ’ত। আমেরিকার ওর এ-ভাবমুখে

বৃত্ত্য দেখেছিল আমাদের ছুটি প্রিয় বন্ধু—ডেভিড হাক্টার ও মড ওক্স (Oaks) যাদের ‘কথা দেশে দেশে চলি উড়ে’-তে লিখেছি। তাদের একদা লিখে-ছিলাম অভিনন্দনে :

Whose hearts, with ours in unison,  
Acclaim what few regard as true :  
That the deep is born in the droplet wan  
And clouds storm but to flaunt the blue.

ওর হাঁপানি ক্রমশ ওর বৃত্ত্যকে নিরস্ত করলেও যারা ওর ভাবমুখে বৃত্ত্য দেখেছে তারা ভুলতে পারবে না, আরো এইজন্তে যে, ও স্বভাবে উজ্জ্বলিনী ছিল না বলে নাচতে চাইত না যার তার সামনে। কিন্তু ঠাকুর যাকে নাচান তার না নেচে উপায় কী ?

ওর আর একরকম দর্শন হ’ত যাকে বলে দূরদর্শন—clairvoyance। শুধু যে যোগবিশুদ্ধিত প্রসাদেই এ-দর্শন হয় তা নয়, অনেকের মধ্যে এ-শক্তি যোগ না ক’রেও জেগে ওঠে। ওর যখন তখন এ-দূরদর্শন হ’ত—পরে খোজ নিতাম, মিলে যেত। বলেছি আমার NO REASON CAN EXPLAIN পাণ্ডুলিপিতে আমি প্রথম প্রথম ওর দূরদর্শন-দূরজ্ঞান-বর্গীর নানা অঘটন গুলিয়ে লিখে রাখতাম পণ্ডিতের তেই। তার-পরে এরকম অঘটন এত ঘন ঘন ঘটতে লাগল যে বেকর্ড রাখা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাই এখানে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিই কান্ড হব।

১) আমাদের প্রিয় বন্ধু শেঠ রণজিৎ সিং-এর কথা লিখেছি। পণ্ডিতেরীতে ১৬. ১০. ৫১ তারিখে ইন্দ্রিয়ার দেখল—তিনি পায় পটি বেঁধে শয্যাশায়ী। তাঁকে

টোলিগ্রাম করব করব ভেবেও গাঁড়মসি করার কলে  
বৌর হয়ে গেল। ৬. ১০. ৫১ তারিখে তাঁর চিঠি  
পেলায় : তিনি তিন সপ্তাহ শয্যা নিয়েছিলেন পারের  
একটি হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার দরুণ।

২) সুরেন্দ্র লালের কথা একটু আগে লিখোঁহি।  
১৮. ৯. ৫১ তারিখে ইন্দিরা তার ডায়েরিতে লিখল :  
ধ্যানে লালের দেখা। সে গোর্কির সঙ্গে আলোচনা  
করছে—আমাকে অস্বস্তি করবে কি না ডক্টর  
ভ্রামাশ্রমাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে তার নামে একটি  
পরিচয় পত্র দিতে। ২০-এ সেপ্টেম্বর আমি লালের  
কাছ থেকে এক দীর্ঘ পত্র পেলোম। তার শেষে ছিল :  
“ডক্টর ভ্রামাশ্রমাদ মুখার্জি এই কমিটির সভ্য। আপনি  
যদি আমাকে তাঁর কাছে একটি পরিচয় পত্র দেন তবে  
আমি বাধিত হব...” ইত্যাদি।

৩) ইন্দিরা কোনো খাম ছুঁয়ে ব’লে দিতে পারত  
চিঠিতে কী লেখা আছে। ২৪. ১২. ৫১ তারিখে আমি  
একটি চিঠি পাই, পোস্টমার্ক—বীডেন স্ট্রিট, কলিকাতা।  
ইন্দিরা চিঠিটি আশ্রম থেকে এনেছিল। বলল :  
“খামটি হাতে নিতেই দেখলাম তোমার এক ডাক্তার বন্ধু  
লিখছেন নলিনীদার (নলিনীকান্ত সরকার) ডান চোখে  
হানি পড়েছে কিন্তু এখনো পাকে নি—তাই হমাস  
অপেক্ষা করা বাহনীয়...” ইত্যাদি। খামটির মধ্যে  
চিঠিটিতে ঠিক এইসব কথাই লেখা ছিল।

৪) ২. ৮. ৫১ তারিখে আমি এক মোটা খাম  
পেলোম। ইন্দিরা সকালে আশ্রমে গিয়ে আমার  
চিঠিপত্র নিয়ে আসত। আমার হাতে স্পষ্ট খামটি দিয়ে  
বলল : “এটি লালের কাছ থেকে এসেছে—ঠিকানা তার  
হাতের লেখা। কিন্তু বোলো, খুলো না।” ব’লে  
তার ডায়েরি এনে দেখালো : “ধ্যানে দেখলাম লাল  
দাদাকে চিঠি লিখছে এমন সময় বিজি (লালের মা)  
তার হাতে একটি ছোট্ট ফুলের মালা দিয়ে বলল মালাটি  
দাদাকে পাঠাতে।”

খামটি খুলে আমি তো অবাক। মত খাম, ভিতরে  
একটি অস্বস্তি বহুল ফুলের মালা—মালা না ব’লে হাতের

মালা বলাই ভালো। লাল লিখছে : “মালাটি না  
গেঁথেছেন দাদার জন্তে।” এ-ছোট মালাটি আমি সবচেয়ে  
বেধে দিয়েছি।

৫) ১৯৫০ সালে নলিনীদা (নলিনীকান্ত সরকার)  
বসেতে শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য মহাশয়ের অতিথি হয়ে-  
ছিলেন। ১৯৫১ সালে ডিসেম্বরে আমাদের বসে যাওয়া  
হির—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের জন্তে গান গেয়ে কিছু টাকা  
তুলব—ইন্দিরার নাচও প্রোগ্রামে দিল। নলিনীদা  
যাবেন তবলা সজ্জা করতে। তাই সে নভেম্বরের মাঝ  
বরাবর নির্মলবাবুকে লেখে প্রোগ্রাম জানিয়ে। উত্তর  
আসে সেই বাড়ীর আর এক বাসিন্দা শ্রীস্ববোধ  
সরকারের কাছ থেকে। তিনি লিখোঁছিলেন, নির্মলবাবু  
অসুস্থ, তাই নলিনীদা তাঁর (স্ববোধবাবুর) আতিথ্য  
স্বীকার করেন যেন। বোধিন এ চিঠিটি এল ইন্দিরা  
ধ্যানে দেখল—নির্মলবাবু করেদিন আগে ট্রেনে ঠোঁড়  
ধরাতে গিয়ে অসাবধানে পা পুড়িয়ে ফেলেছেন।  
নলিনীদা স্ববোধবাবুকে ফের চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা  
করতে তিনি লিখলেন যে, ইন্দিরা দেবীর ধ্যান দর্শন  
সভ্য—ট্রেনে ঠোঁড় ধরাতে গিয়ে নির্মলবাবুর কাপড়ে  
আগুন লেগে যায়—কলে ছুটি পা-ই জখম হয়েছে।

৬) পুণ্যর একদিন ইন্দিরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমাকে  
বলল : “দেখলাম বসেতে তর চুনীলাল শয্যাশায়ী—  
কবজিতে পটি, খোঁজ নাও তার ক’রে।” কিন্তু তার  
করার আগেই তর চুনীলালের চিঠি এল : তিনি রিজ  
রোডে পদব্রজে যাচ্ছিলেন Hanging Garden-এ  
বেড়াতে—এমন সময়ে এক মোটরের আঘাতে প’ড়ে  
গিয়ে কবজির হাড় ভেঙে গেছে।

ইন্দিরার আর একটি দর্শন হ’ত বাকে বলা বেতে  
পারে অতীত-চারণ। কাউকে কাউকে কখনো কখনো  
দেখবামাত্র ওর চোখের সামনে ছবি তেনে উঠত কবে  
কোথায় সে কীভাবে ছিল। আমার ক্ষেত্রেও দেখতে  
পেত—“অনুক দিনে অনুক ঘোঁটরে অনুক জায়গার  
যাচ্ছিলে ছুঁমি।”

একবার দেখেছিল—এক বছর আত্মহত্যার পর—

তঁার কোনো নিকটাত্মীয় তাকে কী বলাতে তঁার মন ভেঙে যায়। খবর নিয়ে পরে জেনেছিলাম দর্শন হবহ সত্য।

বিদেহী নানা আশ্রয় দর্শনও পেত ইন্দিরা নানা সময়ে। কিন্তু সে সব কাহিনী আমি নাম বদলে আমার নানা রম্যভাবে লিখেছি। তাই কেবল তিনটি দৃষ্টান্ত দেব।

১) নরসিংহ দাস সানির কথা বলেছি। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যাবার পর তঁার আর কোনো খোঁজ পাই নি। একদিন তঁার বিদেহী রূপ ওর স্বপ্নে মূর্তি ধরে ওর কাছে এল লোকান্তর থেকে। খবর নিয়ে জানলাম—তার দেহান্ত হয়েছিল কয়েক মাস আগে।

২) আমাদের এক প্রিয় বন্ধু যশোদা নারায়ণ ঘোষ একদা ধনী ছিলেন। অতি সজ্জন, সুসুনার ও বদান্ত। ক্রান্তান্তে তঁার রম্যনিপুণে আমি ইন্দিরাকে নিয়ে উঠেছিলাম ১৯৪১ সালে কেক্রয়ারী মাসে যখন সে জব্বলপুর থেকে এসে প্রথম পাণ্ডুচেরী যায়। যশোদার ওখানে পরে কৃষ্ণপ্রেমও ছিল। সবাই তাকে ভালোবাসত তার মধুর স্বভাব ও শুদ্ধার্থের জন্যে। একদা সে ধনী ছিল কিন্তু সহজেই সবাইকে বিশ্বাস করত বলে বার বার যা খেত। শুধু বা খাওয়া নয়—ঠকতও বার বার, যার ফলে সে ক্রমশ প্রায় দেউলে হবার কোঠায় পৌঁছেছিল। এই সময়ে সে একটি ব্যবসা করতে যা কিছু মূলধন অবশিষ্ট ছিল খাটায়। কিন্তু ব্যবসার অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে দ্রুতিভায়ে তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। আমাকে লেখে সব জানিয়ে। আমি তাকে পর পর তিনবার কিছু সাহায্য করি। ফলে ব্যবসার সঙ্কট কাটে কতকটা। কিন্তু বিপদ যখন আসে একা আসে না—এক মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ওকে ছমাস শয্যা নিতে হয়। আমি কলকাতায় লিখি আমার এক ডাক্তার মামাতো ভাইকে। সে পরীক্ষা করে পায়—ভলপেটে কর্কটরোগ—

১৯৭১.৭.৬৭ তারিখে তঁার শ্রদ্ধা বৎসরের জন্যে আমি একটি তর্পণ লিখিছিলাম কবিতায়, আমার “বনু হুরলী”—১৭২ পৃষ্ঠার ছাপা হয়েছে।

ক্যান্সার। আমার অজ্ঞবোধে সে যশোদাকে চিকিৎসক হাসপাতালে অপারেশনের জন্যে পাঠায়। ১৯৬৬ সালে তার অপারেশন হওয়ার পরে যশোদা আমাকে তার করে: “Operation successful but extremely weak.” (শল্য চিকিৎসা সফল, কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল) তারপরে ব্যস—আর কোনো খবর নেই। চিঠি লিখি ওর স্বামীকে—জবাব নেই। তাবাহি কী করা যায় এমন সময় একদিন—১৯এ জুলাই—ইন্দিরা হঠাৎ আমার কাছে এসে বলল স্নানাগারে চুকতেই সামনের দেওয়ালের কাছে যশোদা নমস্কার করল—সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার পিছনের দেয়ালে একটি ক্যালেন্ডারে শুধু ১৭ তারিখ জ্বলে উঠল। তারপরেই যশোদার ভৌতিক মূর্তির অন্তর্ধান। আমি তৎক্ষণাৎ, ১৯এ জুলাই, আমাদের প্রিয় শিশু শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার করলাম যশোদার খবর নিতে। পরদিন শঙ্করের তার এলো—যশোদা ১৭ই জুলাই মারা গেছে।

এ-শোকাবহ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানি পরের বৎসর ওর বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরের জন্য লেখা একটি কাবিতা (তর্পণ) উদ্ধৃত করে;

ছিল ধন, তবু ছিল না তোমাঃ ধনে আসক্তি তবে।

জনে জনে দিতে দান—না জানিয়া ফল হবে কি

না হবে ?

অকুপণ মন বন্ধু, তোমার চাহিত না। বর্জ্যকানি, যেথা যেতে তহি অহুদেরে ভাই, নিতে সহজেই চিনি। নীতিবাদী ছুঁমি ছিলে না ভো, তাই অকুঠে দিতে মান। সমাজে যাদের নাই ঠাই—ছিল সরল তোমার প্রাণ। তাই ছুঁমি ভায় শ্রীঅরাবিন্দে হৃদয়ের গুরু মানি' দীক্ষা তঁাকার পেয়েছিলে—তঁারের পারাপারে পারী জানি'।

গুরুভাই-বোলে কী আনন্দেই করিতে বরণ স্নেহে। যারাই আসিত—দিতে আতিথ্য উদার তোমার গেহে। যোগী জানী মুনি শিল্পী গুণীয়ে দিতে মালা আলো

হেসে :

সবারেই ভালোবাসতে—তাদের কাছে ডেকে

ভালোবেলে।

নিষ্ঠা বরিষা সঙ্গীর্ণতা করেছিলে বর্জন।  
 গুরুবন্দনা তোমার তাই তো হয় নাই বর্জন।  
 বাহারা তোমার বাহিরের ক্রটি দেখেছে কেবল চাহি—  
 জানে না—ঠাকুর নন বিচারক, তিনি যে ভাবগ্রাহী।  
 দ্বিধা কান্ডি তবে কলে আকো কত মনোবর্ণপে।  
 স্মৃতি তর্পণে গাই আজ তাই জননীর আবাহনে :

(স্তবগান—লঘুগুরু হাদ, স্তবরা)

এসো প্রেমপ্রসাদে, উছালি—হররমা। অন্তরে  
 দ্বীপ্তিবাণী।  
 আলো আলো বিবাদে, বিদালি' যন অমা, প্রাণদা  
 শান্তিবাণী।  
 এসো তারা। কটাক্ষে বলকি' চিরদিশা ক্রান্তিভা  
 সাক্ষ্যহারার।  
 সিংহাসীনা। স্রষ্টাত্রে উজল কর' নিশা, নলিতা।  
 বলি মা পার।

৩) ইস্রাণির বয়স তখন বোধহয় ৫৫।৫৬—যখন  
 সে আমাদের কাছে প্রথম আসে। সে ইন্দ্রবার  
 “ঐক্যজালি”-র মীরভজন পড়ে লিখেছিল যে, সে  
 অবলা মীরার ভক্ত, মীরা তাকে প্রত্যাশে দিচ্ছেন  
 ইন্দ্রবার কাছে আসতে। প্রত্যাশের কথা শুনে  
 আমি চমকে উঠেছিলাম, বলাই বাহুল্য। সে প্রথমে  
 ৪০।৫০ কপি “ঐক্যজালি” কিনে উপহার দেয় বন্ধু-  
 বান্ধবকে। পরে ৪০।৫০ কপি প্রেমাজলি ও স্রষ্টাজলিও  
 কিনে বিল করে ঐ একই উদ্দেশ্যে—মীরার প্রচার।

এহেন দরদীকে আমরা সানলেই নিগন্ত  
 করেছিলাম, বলাই বাহুল্য। সে একাধিকবার এসে  
 আমাদের কাছে ছিল আমাদের মন্দির পড়ে ওঠার  
 পরে। এমন শিশুর মত সরল মানুষ সংসারে বেশি  
 দেখা যায় না। মীরার সে দর্শন পেয়েছিল হয়ত  
 এই সরল বিশ্বাসের বলেই। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল  
 যে মীরাই ইন্দ্রবার alter ego—গুঢ় আত্ম। তাকে  
 নিয়ে সবাই হাসাহাসি করত—বিশেষ করে তার  
 অকৃত ইংরাজি উচ্চারণ শুনে। যথা, pauper তার  
 মুখে উচ্চারিত হয়েছিল পাপার—সবাই হেসে তাকে  
 ভাকত—পাঁপার। শুনে সে-ও হাসত সমানে।

এহেন ইস্রাণি তার ভোশক বালিশ বেখে “কিবে  
 আসছি” বলে চলে গেল দ্বিগ্ন। তারপর অনেকদিন  
 তার কোনো খবর নেই। হঠাৎ একদিন ইন্দ্রবা  
 ধ্যানে তার ছায়ামূর্তি দেখল। সে বলল সে লোকান্তরে।  
 তার গ্রী-পুত্র থাকত কানপুরে। উষ্ম হয়ে সেখানে  
 লিখতে উত্তর এল—ইস্রাণি হঠাৎ হার্টফেল ক'রে  
 মারা গেছে। তার হার্টের কোনো অস্থি ছিল কি না  
 জানি না। জানি শুধু এইটুকু যে, সে ইন্দ্রবাকে  
 মীরার মূর্তি প্রতিমা মনে করত।

নানা বইয়েই পড়েছিলাম ভবিষ্যৎ-দর্শনের  
 (prophetic vision বা precognition) কথা; অর্থাৎ  
 ভবিষ্যতে কী হবে জানতে পারা। যথা, শ্রীমতী জীন  
 ডিক্সনের বিখ্যাত বই A Gift of Prophecy : শ্রীমতীর  
 নানা দর্শন হ'ত খ্যাতিনামা মনীষীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।  
 এসব বই চমকপ্রদ হ'লেও কেমন যেন একটা ষট্কা  
 মন থেকেই যায়। কিন্তু ইন্দ্রবার নানা ভাবগুরু-দর্শন  
 এমন হুবহু মিলত (যার অনেক সাক্ষী আছে) যে, সংশয়ী  
 হওয়া সম্ভব হয় নি আমাদের—যারা কাছ থেকে তাকে  
 দেখেছি, জেনেছি। এখানে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেব।

পুণ্য আমাদের প্রতিবেশী শ্রীমেলারাম ধার্মার  
 হোটোমেয়ে চিত্রা ওরফে মন্দিরার বিবাহের কথা হচ্ছিল।  
 এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের বড়ছেলের সঙ্গে। যুবকটি  
 ছিল বৈমানিক। ইন্দ্রবা হঠাৎ দেখল ধ্যানে যে সে  
 আকাশে বিমান থেকে পড়ছে। ধার্মা পরিবার  
 ইন্দ্রবাকে গভীর ভক্তি করত, তাই এ সম্বন্ধে ভেঙে গেল।  
 পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি রাগ করেছিলেন, বলাই বাহুল্য—  
 কারণ এর পরে তাঁরা আর আমাদের ছায়াও মাড়াতে  
 না। ইন্দ্রবা হঠাৎ হ'ল বৈকি তাঁদের বিবাহের কথা  
 ভেবে, কিন্তু কতিপূরণ মিলল—মন্দিরার কাঁড়া কেটে  
 গেল বলে। বিবাহ দিলে তো সে বিবাহ হ'ত।

কিছুদিন বাদে পাঞ্জাবী ভদ্রলোকটি বেলগাঁও  
 থেকে ছুটে এলেন। বললেন চোখের জলে যে, তাঁর

হেসেটি যারা গেছে বিমান থেকে পড়ে, তাঁর স্ত্রী শোকে পাগলের মতন কারাকাটি করছেন—আমরা যদি বাই তাঁকে সাধনা দিতে তবে তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন... ইত্যাদি। আমরা গেলাম বেলগাঁও।

অতঃপর কিছুদিন বাদে যুবকটির বিদেহী আত্মা ইন্দ্রিয়ার ধ্যানে এসে বলল, “আমার বড় ভাবনা হয়েছে আমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে।”

সে-ও বিমান চালায়। আমরা পাঞ্জাবী দম্পতিকে জানালাম একথা। কিন্তু তাঁরা কোন্ মুখে ছোট হেসে চাকরি ছেড়ে আসতে বলেন? “After all a vision is only a vision”—এই ভাব আর কি।

কিছুদিন বাদে সে বিমান চালাতে গিয়ে বিমান শুধু পড়ে যায় সমুদ্রে। তিন-চারটি পাঞ্জব ভেঙে যায়, কিন্তু এক জেলে ডিঙি তাকে তুলে নিয়ে ভীরে আনে।

অতঃপর চার-পাঁচমাস নাসিং হোম-এ কাটিয়ে সেরে উঠে সে আমাদের প্রণাম করতে এসেছিল—কিন্তু কোন্ তারিখে এনে নাই।

আরো তিন-চারটি বিদেহী আত্মার আবির্ভাব হয়েছিল ইন্দ্রিয়ার ধ্যানে। কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে—খামি এবার, “enough is enough” বলে।

বিদেহী আত্মা নানা লোককে দেখা দেয় এ-রটনা নিরাক জনপ্রীতি নয়, বা যুগোপের সাহিত্যিক রিসার্চ সোসাইটির নানা সাক্ষীর এজাহারই এ-রটনার একমাত্র ভিত্তি নয়—নানা মনীষীর জীবনী ও রচনারই এ-সত্যের স্বাক্ষর মেলে। মহামনীষী স্বামী অভেদানন্দ তাঁর প্রখ্যাত LIFE BEYOND DEATH-এর চতুর্থ অধ্যায়ে বিশদ বর্ণনা করেছেন নিউ ইয়র্কের একটি ভূত-চক্রে শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত বলরাম বহুর অপ্রত্যাশিত অভ্যুদয়ের কথা। স্বামীজী লিখেছেন: “My eyes were dazzled to look at his brilliant figure with flowing beard.....He put his right hand on my head and silently blessed me.” এ-রকম বিদেহী অভ্যুদয় কখনো কখনো স্বপ্নও হয় কখনো

বা খোলা চোখের সামনে হাবির মতন, যেমন বর্তোহিল ইন্দ্রিয়ার ক্ষেত্রে। আমার নিজের মনে হয়—বশোদা ইন্দ্রিয়ার কাছে এসেছিল শুধু ক্যালেন্ডারের অকৃত্ত বিজ্ঞাপ্তি পেশ করতেই নয়, এজন্মেও বটে যে সে জানাতে চেয়েছিল তার আত্মার কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া আরো পাঁচ-ছয়টি ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ার কাছে এমনই অপ্রত্যাশিত ভাবে বানা লোকাভিরিত আত্মা অভ্যুদিত হয়েছিল যার বাহ্য সমর্থন (verification) পরে মিলেছিল অভাবনীয় রূপে—হয়ত আমার সদাসংশয়ী মনের সংশয়কে নিরস্ত করতেই। তাই আরো কয়েকটি উদাহরণ দিলামই বা—যদিও জানি, এ-ধরণের অঘটন অনেকেই বিশ্বাস করতে না পেরে মাথা নাড়বেন—এমন কি যারা আমাকে সত্যনিষ্ঠ বলে চিনেছেন তাঁদের মধ্যেও হয়ত কান্নার মনে থাকা থেকে বাবেই শেষ পর্যন্ত—বলবেন তাঁরা: “এজাহারগুলি চমকপ্রদ বটে, কিন্তু ঋতিয়ে inconclusive”—অর্থাৎ হ’তেও পারে, না হ’তেও পারে। কিন্তু এ হ’ল তাঁদের (জজসাহেবের) তরফের কথা, আমার (সাক্ষীর বা পরিবেষকের) তরফের কথা হচ্ছে: “যে দেখেছে, জেনেছে, চেখেছে তার কাছে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই চরম প্রমাণ, তাই সে সংশয়ীর অবিশ্বাস বা হাসিঠাট্টাকেও গায়ে না মেখে পাণ্টা হেসে উড়িয়ে দিতে পারে, এবং দিয়েও থাকে এই বলে যে, সত্য নির্ণয়ের দাঁড়িপাল্লায় দেখার এজাহারের ওজন না-দেখার ওজনের চেয়ে বেশি ভারি।” যে-দৃষ্টান্তগুলি দিতে যাচ্ছি তারাই এ-উক্তি়র প্রেরণা, তাই ওকালতি ছেড়ে জবানবন্দীর মতই কাঠগড়ায় দাঁটি।

অনেকদিন আগেকার একটি বিখ্যাত দৃষ্টান্ত দিই—দৃষ্টান্তটি আমার তরুণ মনে দাগ কেটেছিল বলে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস যৌবন দার্জিলিং-এ যারা বান সেদিন পাটনার তাঁর ভাই খ্যাতনামা ব্যারিস্টার পি আর দাস দাদার বিদেহী আত্মা দেখে মুহূর্ত গিরেছিলেন—এ-সত্য (fact) অবিসংবাদিত। জর্মানিতে আমি যে-বিহুসী মহিলায় কাছে জর্ন ও

ইতালিয়ান ভাষায় ডালিম বিভাগ—বীর কথা অন্তত লিখেছি—তিনিও আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর এক মেয়ে প্যারিসে (না কোথায়) বোদন মারা বান সেদিন যাতে তিনি তাঁর দর্শন পেরেছিলেন খোলা চোখে বার্লিনে। সাইকিক রিচার্চ সোসাইটিতে এ-শ্রেণীর বিদেহী অভ্যুদয়ের বহু দৃষ্টান্ত নানা সাক্ষীসাবুদ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে।

কিন্তু আমার এ-বিষয়ে কোনো গভীর ঔৎসুক্য ছিল না ইন্দ্রিয়ার পিণ্ডিটার আসবার আগে। আমার মন সার দ্বিত পৰমহংসদেবের কথায় যে, জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হ'ল ভগবানের খবর পাওয়া—বাকি সব খবর হ'ল এহ বাছ—অর্থাৎ পাও বা না পাও প্রায় সমান কথা। তাই যখন খ্যাতনামা লেখক বিভূতিভূষণ বল্যোপাধ্যায় আমাকে কলকাতায় সোৎসাহে বলতেন যে, বিদেহী আত্মার দর্শন পাওয়া যায় একথা অকাট্য সত্য, তিনি প্রমাণ পেয়েছেন, তখন আমি তাঁর উৎসাহে মন ধুলে সার দ্বিতে পারিনি। আমার মনে জাগত কেবলই ছামলেটের কথা: "The undiscovered country from whose bourn no traveller returns:

চির-অনাবিষ্কৃত সে-মহাদেশ যার কোল হ'তে আসে না কখনো কিরে কোনো পায় আমাদের দেশে।

"ঠিক কথা," বলত আমার মন, "কাজেই কী হবে এ ধরনের ভৌতিক খবরে? আমার সব শক্তি নিয়োগ করা চাই ভগবানের চরণে আত্মনিবেদনের সাধনায়—যাতে ক'রে আমি তাঁর সঙ্গে পরমমিলনে বস্তু হ'য়ে তার পরে (যদি তিনি চান) তাঁর হাতের বস্তু হ'য়ে তাঁর কর্তৃক করতে পারি তাঁর 'সৎকর্মপরমোত্তম' আদেশ মেনে। সব অধ্যাত্মসাধনার শেষ কথা যে এই—এ-বিষয়ে আমার মনে সংশয় ছিল না কোনোদিনই—আজ তো নেই-ই।

কিন্তু মাহুকের মনের নানা মেজাজ। তাই আমার লক্ষ্য ভগবান একথা মেনেও পরলোকের সম্বন্ধে যে গ্রহন মনে আনো কোনো কোঁতুল ছিল না একথা বললে সত্যের

মর্যাদা রাখা হবে না। যখন বুকের বীণার তার নিচু হয়ে বীণা হ'ত (সব সময়েই তো উঁচু হয়ে বীণা যায় না) তখন মনে হ'ত: "মন্দ কি—এসব টুকটাকি খবর পাওয়ারও কিছুটা সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে, নৈলে দেশে দেশে আবহমান কাল মাহুকের কেন পরলোকের খবর পেতে আগ্রাণ চেষ্টা করেছে?—কেন নাচকেতার মতন অসামান্য 'প্রভা'-র যমকে বলেছিলেন, তিনি পারলৌকিক খবর চান সব আগে—কী হবে ইহলৌকিক ভোগবাদে যে-ভোগ ভল্লু, অক্রব, অতৃপ্তসম্বল?" তাহাড়া বকমারি ভৌতিক আবির্ভাব যখন যুগে যুগে মাহুকের কাছে না-চাইতেও ধরা দিয়েছে, তখন এ-সিদ্ধান্ত করা অর্থোত্তিক নয় যে, এসব খবর পেয়ে আমরা কিছুটা অন্তত: লাভবান হ'তে পারি। শ্রী অরবিন্দ তাঁর "দ্বিবাজীবন"—এ লিখেছেন "There are four main lines which Nature has followed in her attempt to open up the inner being: religion, occultism, spiritual thought and an inner spiritual realisation and experience: the three first are approaches, the last is the decisive avenue of entry." Chapter 24, Life Divine.

মাহুকের জীবন পূর্ণ কৃতকৃত্য হয় চারটি বিভাগসার সমন্বয়ে: ধর্ম, নেপথ্যতত্ত্ব, অধ্যাত্মচিন্তা ওরফে ফিলসফি ও আত্মর অভিজ্ঞতা ওরফে আত্মবোধ। এদের মধ্যে—লিখেছেন শ্রী অরবিন্দ—প্রথম তিনটি আমাদের এগিয়ে দেয়, শেষেরটিই আমাদের পৌঁছে দেয় বোধিলোকে। তাই যদিও আমি শেষেরটির উপরে জোর দিয়ে ছল কারিনি (শ্রী রামকৃষ্ণও এই নির্দেশই দিয়েছিলেন) তবু আমাদের এই-বে নেপথ্য লোকের খবর নিতে চাওয়া, এ-ও তত্ত্ববিজ্ঞানসার কোঠায়ই পড়ে। তাই হয়ত ঠাকুর ইন্দ্রিয়ার মাধ্যমে আমাকে এই খবর দিতে চেয়েছিলেন—কোঁতুলী নেপথ্যতত্ত্বাবৎ বলতে নয়, তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করতে। তাই আর আগুপাছু না ক'রে বলেই কোল এই নেপথ্য তত্ত্বের কিয়

ধবর কীভাবে প্রথম আসে বিবেচী আত্মার আবর্তাবে।

ঐঅরবিন্দের প্রিয়বন্ধু মনসী শ্রীচাক্রচন্দ্র দত্তই সব প্রথম বুদ্ধির পরে ইন্দ্রিয়কে সত্যাপন করেন “অনাবিকৃত দেশ থেকে। তাঁর কথা বলবার মত—আরো এই জন্মে যে, তিনি শুধু বুদ্ধিমান ছিলেন না, কথালোপেও ছিলেন প্রতিভাবান। তাঁর “পুরোনো কথা” স্মৃতিচারণ সে-সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। তিনি নাম কিনিছিলেন “কথক”।

চাক্রাব্যু বিলেত থেকে আই সি এস পাশ করে এসে পাণ্ডুচৌরিতে সঙ্গীক কার্যে মন একটি বাড়ি কিনে। তিনি প্রায়ই আমার ওখানে আসতেন আসর জমাতে। সবার সঙ্গেই তিনি মিথালি করতেন তেমনি সহজে, যেমন সহজে ফুল মিথালি করে পাতার সঙ্গে। এমন রসিক খুব কমই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর “পরিণেবে”-তে চাক্রাব্যুকে তারিফ করে লিখেছিলেন একটি সুদীর্ঘ কবিতা, তার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করি :  
প্রিয়বরেষু,

তুমি গল্প জমাতে পার।  
বোস তোমার কেদারায়,  
উইলে ওঠে আলাপ তোমার ভিতর থেকে...  
গল্প করতে গিয়ে মাস্টারি কর না,  
এই তোমার বাহাদুরি।  
তুমি মানুষকে জান, মানুষকে জানও,  
জীবলীলার মানুষকে।  
একে নাম দিতে পারি সাহিত্য,  
সব কিছুই কাছে থাকা।

“কথক” উপাধিটি চাক্রাব্যুর কপালে যেন তিলকের মতই জলজল করত। এত রকমের গল্প তিনি পরিবেশন করতেন তাঁর অট্টহাস্তের মশলা মিশিয়ে যে, শ্রোতাদের মধ্যে দেখতে দেখতে তাঁর হাসির ছোঁয়াচ লেগে যেত—এমনি ছিল তাঁর রসিকতার বাহার। তাঁর রসিকতার একটি নমুনা দেই। তাঁর জবানবন্টেই বলি, তাতে জ্বল ফলবে বেশ।

চাক্রাব্যু বললেন : “কলকাতার এক মস্ত ব্যারিস্টার একদা আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করেন—অনুক আমাকে এসে বলল চাক্র, যে তার ভাইবোনেরা তাদের বিবর-

আশর সব ঐঅরবিন্দ আশ্রমে দিয়ে দিয়েছে। এই ব্যাপার কে? আরো অনেকে শুনি পাণ্ডুচৌরির গিটে এইভাবে কবির হয়েছে। তাই তোমাকে জিজ্ঞাস করতে এসেছি—পাণ্ডুচৌরির গিটে কি মানুষের মাথা ধারণ হয়ে যায়?” উত্তরে আমি হেসে বললাম : “না, তাই, সত্যি হ’ল এর উল্টোটা—converse proposition : অর্থাৎ, যাদের মাথা ধারণ হয়েছে তারাই পাণ্ডুচৌরির যায়—হা-হা-হা।”

চাক্রাব্যুর আর একটি দৌরবময় পরিচয়—তিনি বিপ্লবী ঐঅরবিন্দের সহকারী ছিলেন, গোপনে নানা বিপ্লবীকে পরামর্শ দিতেন, অর্থসাহায্যও করতেন। ঐঅরবিন্দের সম্বন্ধে নানা কথাই বলতেন গভীর ভক্ত-ভরে। একদা আমি চাক্রাব্যুর কাছে ঐঅরবিন্দের বিষয়ে যা শুনেছিলাম লিখে গুরুদেবকে পাঠিয়েছিলাম। উত্তরে গুরুদেব আমাকে লিখেছিলেন :

“Yes. I saw little of him, for physically our way lay far apart, but that little was very intimate, one of the kind of man whom I used most to appreciate and felt as if they had been my friends and comrades and fellow-warriors in the battle of the ages and would be for ages more. But, curiously enough, my physical contact with men of his type—there were two or three others—was always brief, because I had something else to do this time.....Sri Aurobindo 28/9/36.”

(ভাবার্থ : চাক্রাব্যুর সঙ্গে ঐঅরবিন্দের দেখা সাক্ষাৎ খুব কম হ’লেও তাঁরা ছিলেন যুগে যুগে পরস্পরের আত্মার আত্মীয়—ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বহু সতীর্থ তথা সহযোগী।)

আমরা অনেকেই তাঁর কাছে গিয়ে বসতাম তাঁর জীবনস্মৃতি শুনতে, বিশেষ করে বিপ্লবী যুগে তিনি (ও খ্যাতনামা ব্যারিস্টার পি. মিত্র) কীভাবে বিপ্লবীদের গোপনে সাহায্য করতেন ও কীভাবে কয়েকবার ধরা পড়তে পড়তে বরণ খেঁসে বেঁচে গিয়েছিলেন শুনে শুনে আমাদের সত্যিই যোমাক হ’ত। এছাড়া তাঁর আর একটি গুণ ছিল—তিনি ছিলেন, সঙ্গীতবেত্তা না হোক, সঙ্গীতরসিক—যার কাছে গান গেয়ে আমি গভীর ছুঁপ পেতাম।



ইন্দিরা পণ্ডিচেরিতে প্রথম আসে ২০-এ কেকরবারি, ১৯৪১—প্রস্থান করে ১৫ই মার্চ। দ্বিতীয়বার আসে ২০ জুলাই, প্রস্থান—১৬ই আগস্ট। তৃতীয় বার আসে ১০ই মার্চ, ১৯৫০, প্রস্থান—১লা জুলাই। তার পরে আসে এই ডিসেম্বর শুকদেবের মহাপ্রয়াণের দিনে। অতঃপর আমরা উভয়ে বসে যাই ৪টা ডিসেম্বর ১৯৫১, পণ্ডিচেরিতে কিরি ২০-এ ডিসেম্বর ১৯৫১ ও ইন্দিরা পণ্ডিচেরিতে আমার কাছেই থাকে একাদিক্রমে প্রায় ন'মাস। এ-অঘটনটি ঘটে আমার জন্মদিনে ১৯৫২ সালে ২২-শে জানুয়ারী রাতে।

যা ঘটছিল, পরদিনই লিখে রেখেছিলাম আমার NO REASON CAN EXPLAIN-এ টাইপ করে। এখানে তার অনুবাদ দেই :

ভূমিকায় ব'লে রাখা ভালো যে ইন্দিরা এ-সময়ে প্রায় সর্গদ্বীপে অন্তর্ভুক্ত থাকত—এমন কি গানের সময়ও একটু গুনতে না গুনতে সমাধি, পরে সমাধি থেকে ব্যস্তিত হ'য়ে আক্কেপ করত গান শোনা হ'ল না ব'লে। তাই তার চাপতে অনেক সময়েই নিজের মাথায় চাপড় মিত। (এখনো দেয় মাঝে মাঝে।)

“রাত এগারোটা। ইন্দিরা ঘ্যানে বসতে না বসতে রিচল সমাধি। সমাধি ভাঙার পর আমাকে কিছুই বলে নি। পরদিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে বসল : ‘কাল রাতে যখন ঘ্যানে বসেছিলাম না ?—তখন দেখি তোমার প্রিয় বন্ধু চাকরবাবু! আমাকে বললেন—তিনি দেখুত হ'য়েছেন।’

“আমি চমকে উঠে বললাম : ‘চাকরবাবু? মারা গেছেন! কখন?’

“ইন্দিরা বলল : ‘আমি জিজ্ঞাসা করার বলাহলেন—রাত ন-টার।’

“আমি তৎক্ষণাৎ চা খাওয়া রেখে ইন্দিরাকে নিয়ে গেলাম সোজা চাকরবাবুর আনন্দানলয়ে। কাছেই, ভিন-চার মিনিটের পথ।

“চাকরবাবুর বৃদ্ধা স্ত্রী আমাকে দেখে চোখে জাঁচল দিলেন : ‘আর কী বাবা। সব শেষ। চ'লে গেলেন—কথাং।’

‘কথাং? কী ব্যাপার, মাসিমা?’

‘কী জানি বাবা। সন্ধ্যাবেলা তো বেশ সুস্থই ছিলেন—রোজকার মতই হাসিগল্পে মগন। সবাই

চ'লে গেলে পর বললেন—বুকে অসুস্থ ব্যাধা। বলতে বলতে নেতিয়ে পড়লেন। দশ মিনিটে সব স্থির হয়ে গেল।’ ব'লে কের চোখ মুছলেন।

আমি : ঠিক কটা তখন?

মাসিমা : রাত ন-টা।

আমার NO REASON CAN EXPLAIN

থেকে ইন্দিরার যোগাবিভূতি-দর্শনাদি আরো কয়েকটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত দেই :—

“২৯ এপ্রিল (১৯৫১) তারিখে এক মূলকার সাধক চাকর ভট্টাচার্য আমার ক্লাটে এসে এক মূলমমানের পাসপোর্ট দেখালো তার কটো শুকু। চাকর বলল ‘এ-লোকটি বলছে কাল রাতে তার যথাসময় চোরে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে—সে একেবারে নিঃশব্দ, কিছু টাকা চায়। বলছে অবিশ্বাস্য যে শোধ দেবে অবিলম্বে।’ ইন্দিরা কটোটি দেখেই বলল ‘দুর্ভাগ্য, ওর কথা সব মিথ্যা।’ চাকর চ'লে গেলে ইন্দিরা আমাকে বলল : ‘আমার মনে উঠল—স্বাগলায়।’ খানিক পরে চাকর ফিরে এসে নিজের কটে বলল : ‘কী সর্গদ্বীপ। এখানকার একটি লজ, যিনি আমাকে সকালবেলা দেখেছিলেন পথে এর সঙ্গে—বললেন আমাকে : খুব সাবধান, এ-স্বাগলায়টিকে মাসকয়েক আগে তিনি জেলে দিয়েছিলেন—সবে জেল থেকে বেরিয়েছে। উঃ, দিলীপদা, বড় রগ ঘেঁষে বেঁচে গেছে!’

সময়ে সময়ে বিদেশের নানা ঘটনাও ইন্দিরা দেখতে পেত দূর দর্শনে। একবার ওর এক জর্মন বন্ধুর সন্ধ্যা দেখেছিল (ওর ডায়েরিতে লিখে রেখেছিল) : “দেখলাম—Franz রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে ভূমারাবৃত মাঠে। কিন্তু কোথায় জানি না।” [Franz অস্ট্রিয়াবাসী—ইন্দিরার মহাভক্ত হয়ে উঠেছিল যখন ইন্দিরা সাভয় হোটেলে থাকত ওর পিতৃদেবের কাছে। ইন্দিরা আমাকে বলেছিল, Franz নাম করেছিল মনোবিকলন গবেষণার (psychiatrist)]

এক বৎসর পরে বসেতে ইন্দিরার কাছে এসেছিলেন Franz-এর এক বোন—আমিও হিলাম সেসময়ে বসেতে। মহিলাটি বলেছিলেন আমাদের যে, একলা ওয়া সবাই শীতে বরফের উপর দিয়ে skiing অভ্যাসে বেরিয়েছিলেন। Franz হ হ করে এগিয়ে অশুভ হ'য়ে যায়—অনেক খোঁজাখুঁজির পরে তার মৃত্যুদেহ আবিষ্কার করা গেল এক ভূমারাবৃত প্রান্তরে।

# অগ্নিগর্ভ পশ্চিমবঙ্গ(?)

শ্রীমতীতল দত্ত

ভিলে ভিলে যুত্মার যাতনা দিয়ে আজকের জীবন-  
ধরণী প্রতিষ্ঠিত এই সমাজে। বিবাক্ত মানুষের মন  
নৈরাশ্যে নিকবকাল অন্ধকার জনজীবনের সমুদ্রের বাকী  
পথ জুড়ে শান্তিলোভী মানুষের মন আজ নিরালস্য।  
প্রতিকারহীন দুর্নীতির রক্তচক্ষু আফালনে পুরাতন  
সমাজ-ব্যবস্থা সব ভেঙ্গে পড়ার মুখে। অবলুপ্ত হয়ে  
যাচ্ছে পুরাতনকে স্বীকার করার মূল্যবোধ—দয়া, মমতা,  
মহুয়াহ; বিবেক আজ বুঝি শরতানের শাসনপাশে  
আবদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গবাসীকে আজ তাই দেখতে পাচ্ছি  
জীবনের সর্বক্ষেত্রে রিক্ত—অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে সর্বহারা,  
রাজনৈতিক রাজ্যে দেউলিয়া। সমাজের বা কিছু সভ্য-  
সুন্দর-শিব সবই আজ ভেসে যাচ্ছে নৈরাজ্যের ধর-  
প্রোতে কোন এক ভয়ঙ্কর পরিণামবাহী অস্তহীন অন্ধ-  
কারে। ক্ষয়িষ্ণু সমাজ আজ যুত্মার প্রহর গনণার রত।  
দিকে দিকে অবক্ষয়ের ছড়াছড়ি, এইটাই হয়তো অলভ্য  
বিধাতার বিধানে অলিখিত স্বাভাবিক পরিণতি।

বিভিন্ন রাজ্যীয় সভাদর্শে বিভক্ত রাজনৈতিক জগৎ  
আজ উচ্চকণ্ঠ। প্রত্যেকেই অতি সচেতন আপন আপন  
'পার্শ্ব' আর অধিকারের লোভে। সমাজের কাছে তাঁদের  
পারি অনন্ত, অপরিমিত। কিন্তু দিতে পারেন না তাঁরা  
কছুই সমাজকে, অন্ততঃ দিতে পারেনি আজ পর্যন্ত—  
চাঁরা চান জনজীবনও গণদেবতাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত  
টুক 'সমাজতত্ত্ব'। কিন্তু তাঁদের বোধহয় জানবার  
প্রয়োজন নেই কোন সমাজতত্ত্বকে, বোঝবার প্রয়োজন  
নই গণদেবতার মন। তাইতো দেশবাসী আজ দেখতে  
পাচ্ছে নৈরাজ্যের অভলে ভুবে চলেছে মানব গোষ্ঠী,  
বশেষ করে বহুজাতি। আর ঠিক সেই কারণে দিক-

ভ্রান্ত (!) তাকুণ্য সবকিছুকেই গুঁড়িয়ে জালিয়ে ধ্বং-  
করবার জন্য কালাপাহাড়ীভ্রত ধারণ করে সমাজের অগ্নে  
প্রত্যক্ষে, শিরায়-উপশিরায় জাগিয়ে তুলেছে ভীতি-  
প্রাণন। অপর্যাপ্ত-প্রবণতা হিংসা-হত্যার ভয়ঙ্কর টল  
টলায়মান সমাজ অর্পণপোত। অথচ মিহিল চলেয়ে  
প্রোগান ধর্মী রাজনীতির (নিতিকর্ম বিপরীতমুখী), জন-  
জীবনের জন্য স্বতঃ উচ্চারিত হচ্ছে গালভরা প্রতিজ্ঞা  
উচ্চ কণ্ঠে, আর যবনিকার অন্তরাল থেকে চলেছে এবে  
অন্তের প্রতি কলঙ্ক লেপনের প্রতিযোগিতা আর কুৎসিৎ  
মন্তব্য হয়তো এই রাজ্যলোভী কিস্তমাতের একমাত্র  
পথ দেখেছেন এঁরা নইলে নেতাদের প্রতি আজ তেম-  
আর জনসাধারণের আস্থা নেই কেন দেখতে পাওয়া  
যায়। কারণ জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে তাদের  
কল্যাণের নামে এঁরা সবাই আজ মুখের কিছু আদর্শ-  
বাদের কচ্-কচানিতে আর নিজ নিজ দলের শান্তি  
বুদ্ধিতেই এঁরা সবাই ব্যস্ত—দেশ-জনজীবন উপলব্ধ  
যাত্র।

\* এই প্রবন্ধ লেখা শেষ হয়ে যাওয়ার পর বলিষ্ঠ  
রাজনৈতিক দূরদর্শিতা নির্মল চিন্তা ও অনন্ত নেতৃত্বে।  
অধিকারিনী ভারতের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা  
প্রাসাদী বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপে বাংলাদেশের দেশস্বাধীনতা ও  
মরণঞ্জয়ী সংকল্পের সঙ্গে ভারতীয় জোয়ানদের পৌর্য  
বীর্ণ একত্র হয়ে পীড়িত মানবের উদ্ধারের কাজ শে-  
করেছে—গড়ে উঠেছে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র  
বাংলাদেশ আর এর কলে এই কোটি মানুষের স্বদেশ-  
প্রত্যাশার্তন ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়েছে। এ অম-  
বটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠার তার ভুলনা নেই। এর জ-  
আজ আমরা খুশী, আমরা আনন্দিত, আমরা গর্বিত।

জনসাধারণ বলতে তাঁরা বুঝেছেন শুধু বোধহয় সরকারী কর্মচারী, শিল্প-শ্রমিক; আর বাকী দেশের বৃহত্তম জনসংখ্যা সাধারণ মানুষ বোঝা। এই গোষ্ঠীভুক্ত নন তাঁদের কথা হয়তো ভাবা অজ্ঞায়। নইলে আজ শুধু সরকারী কর্মচারী শ্রমিকদেরই রাজনৈতিক মিছিল দেখতে পাই শহরের রাজপথ জুড়ে। হয়তো তাঁদের অভাব আছে, সমস্ত আছে; বাকী বৃহত্তম জনসাধারণের জীবন বুঝি গড়লিকা। এটা তো স্বতঃই স্পষ্ট জনজীবনও বুঝেছেন তাঁরাও সচক্ষে দেখেছেন—স্বদেশ আর সমাজের কোন গঠনমূলক ভাল কাজ কিছুই তাঁরা করে উঠতে পারছেন না আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সর্বসাধারণের জন্তে। আর হয়তো পারবার দিনও তাঁদের অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এক কথার কার্যভ্যস্ত সবার চোখে এই সব রাজ-নৈতিক নেতারা বর্তমান সমাজের যে কোন সমস্ত সমাধানে অসমর্থ—মোকা কথা ব্যর্থ।

ব্যর্থ কিন্তু দেশের এবং দেশের এই অবস্থার জন্ত দায়ী কে এবং কারা? আজকের এই অশান্তির জন্ত দায়ী কি শুধু তরুণরাই?—না। রাজনৈতিক দলনেতারা বোঝা রাজনীতির বাতাবরণে জনগণকল্যাণের নামে জনসাধারণকে নিয়ে যাচ্ছেন এক অভল অধোগতি দিকে। এতদূর সফটময় বুদ্ধিতে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থার জন্ত দায়ী কার্য ও কারণগুলির আজ বিশ্লেষণ করা এবং প্রতিকারের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ এই কারণের বিভ্রান্ত চিন্তা এবং প্রচেষ্টার অভাবে তো নেমে এসেছে বঙ্গ-বিভাগের অভিশপ্ত পরিণাম।

অন্ত কোন সমাধানে ব্যর্থ হয়ে ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়েছিল একদিন—১৯৪৭ইং আগস্ট মাসে। তৎকালীন পারিহিতিতে সেটাই নাকি ছিল তখনকার নেতাদের কাছে একমাত্র বাস্তব সমাধান। (১) অথচ ঐতিহাসিক টরেন্সন বলেছিলেন—“এ অবাস্তব ব্যবস্থা টিকতে পারে না, আগামী বিশ কি বাইশ বৎসরের মধ্যেই এর অবলুপ্তি ঘটতে বাধ্য।” ঠিক এমনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন ভারত-আত্মা শ্রীঅরবিন্দ। এই মন্ত্রী ঐতিহাসিক আর সত্যজিটা বিপ্লবী মহা/সাধকের ভবিষ্যৎ বাণী আজ

অকস্মে অকস্মে সত্য বলে প্রমাণিত হতে চলেছে, তারই তো প্রমাণ স্বরূপ দেখছি সীমান্তের অপর পারে চলমান জীবনকরী অনির্দিষ্টকালের সংগ্রাম অর্থাৎ যাকে নাম দেওয়া হয়েছে “বুদ্ধিবুদ্ধি”। সেখানে আজ বাঙালী জাতীয়তাবাদ তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে মুক্ত করে শোষণহীন রসপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার জীবন আহ্বিত বিচ্ছেদ কাতারে কাতারে.....মরছে হাজারে হাজারে তরুণ, শত্রুর বিরুদ্ধে ব্রহ্মপণ লড়াই করে। অসহায় নিরস্ত্র বাঙালী মরছে পাকিস্তানী বর্ষার কসাইদের হাতে নিরর্থক এবং করুণভাবে। বুদ্ধিজীবীদের পাক পিশাচেরা হত্যা করছে ঠাণ্ডা মেজাজে আর বিশেষ স্বার্থে প্ররোচিত বিবেকহীন (১) কয়েকটি রাষ্ট্র এদের ইচ্ছন জোগাচ্ছেন প্রকান্তে বা গোপনে অস্ত্রে আর অর্থে; অথচ স্বাধীনতার জন্তে মানবতাবাদের জন্ত শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্তে দিব্যাজ্ঞা এদের কতই না কুন্ডলীকৃতপাত....।

আজ পর্যন্ত যে খবর এসে পৌঁছেছে তাতে দেখা যায় প্রায় দশ লক্ষ নিরস্ত্র বাঙালীকে হত্যা করা হয়েছে মাত্র সাড়ে তিন মাসের মধ্যে। বঙ্গবিভাগের পর থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু আপন আপন সম্পদ ও সম্পত্তির আশা পূচ্ছাতে কেলে এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের আশায়, আজকের বাংলাদেশ থেকে ইতিমধ্যেই এখানে পৌঁছেছেন নব্বই লক্ষের উপরে বৃদ্ধ, শিশু, নারীর দলদল। ১৯৪৭-এর দেশভাগের কারণ ছিল বুঝতে পারি উগ্র সূত্রী রাজনীতি পরিচালিত সাম্প্রদায়িকতা আর আজ দেশভাগ হচ্ছে কেন? কারণ স্বর্গীয় শত্রু সৈন্তের অমানুষিক অত্যাচার ও অকারণ গণহত্যার খেলা। ওদেরই হিসাবমত নিহত হয়েছে দেখি দশ লক্ষেরও বেশী, আরও হরত হবেন কতো—তার মধ্যে হিন্দু কত সে হিসাব অবশ্য আজ আর করতে বসব না। কিন্তু ক্রয় হয়েছে সমগ্র বাঙালী জাতিরই। আজ সীমান্ত পার হয়ে এসেছেন প্রাণের ভয়ে বহুসংখ্যক বাঙালী বোঝা ধর্মের মুসলমান—এঁরা বিভাড়িত না উভাঙ সে বিচারের সময় বেই, কিন্তু

ভীরা এসেছেন এটাই সত্য এবং এদের অপরাধ এবং নিরস্ত্র অসহায় দরিদ্র শোষিত এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের সমর্থক। এই প্রবন্ধ প্রকাশের সময় এই বিভাজিত সর্বহারা ভাগ্যহীন মানুষের সংখ্যা হয়তো এক কোটিকে ছাড়িয়ে যাবে।

.....এদের কতজন কিরে যাবেন স্বাধীন বাংলার বুকে তা আজ বলা খুবই শক্ত কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে তাদের সুখহঃখের অংশীদার করে অতিথি ভগবানের সন্ধান দিয়ে তাদের পূর্ণকৃতিরে আশ্রয় দিয়ে রাখতে হবে। আজ এঁরা আছেন ক্যাম্পে দয়ার অরে পেট অর্ধপূর্ণ করে—কারণ পশ্চিমবঙ্গ নিজেই অর্ধহারা।

অতিরিক্ত এক কোটি মানুষের জীবনযাত্রার ভারে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষের আর্থিক আর সামাজিক কাঠামোর ভীষণ চাপ পড়েছে—আর এর প্রতিক্রিয়া এবং পরিণাম ঘোরতর হতে বাধ্য। কিন্তু বড়ই লজ্জার এবং পরিতাপের কথা, এই মানবিক হৃদয়গর্ভপূর্ণ সমস্যার কোন সঠিক সমাধানের পথ আজ পর্যন্ত দেখা গেল না।

কেন্দ্রীয় রাজপুরুষেরা আজ রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলছেন বটে কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক, এটা অনেকটা হচ্ছে ভাবের ঘরে চুরি করতে বলা আর কি। অর্থাৎ চোরকে চুরি করতে বলে গৃহস্থকে সজাগ থাকার উপদেশ দেওয়া। কিন্তু এই হুঁশুখো নীতি কোনদিনই কোন গুড পরিণতির ফল প্রসব করেনি, তাই আজ তাঁদের কর্তব্য, সত্যই যদি তাঁরা দেশের দরদী এবং জনসাধারণের একনিষ্ঠ সেবক হন, তবে আজ এই কঠিন সত্যের সম্মুখীন হয়ে প্রজা আর সাহসের সঙ্গে বুক বেঁধে এই অবস্থার সুখোমুখি দাঁড়াতে পারেন তবেই দেশের সজাতি ও সুস্থির জীবন প্রতিষ্ঠার আশা দেখি, নইলে জাতীয় অস্তিত্ব অচিরে বিপদাপন্ন হয়ে হয়তো বিরাটভাবে আঘাত হানবে সর্বভারতীয় জন সমাজে এবং নমোমানসে। তখন কেন্দ্রীয় রাজপুরুষেরা, নেতারা কোন মায়ের আঁচলের নীচে আশ্রয় নিবেন?

ইংরাজী ১৯৪৭এর পর পশ্চিমবঙ্গে সরকারী

হিসাবেই এসেছেন ৪২ লক্ষ উদ্বাস্ত কিন্তু বেসরকারী হিসাবে তার দ্বিগুণ। এসব চিরমূল বাস্তব্যাগীদের বেশীর ভাগই হিন্দু এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু গিয়েছেন আসামে আর কিছু উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, আন্ধ্রপ্রদেশ আর দণ্ডকারণ্যে। এদের পুনর্বাসন হয়েছে সত্য কিন্তু এঁরা ক্রমে ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছেন বাঙালী সমাজের কাছে যোগসূত্রের ব্যবস্থা না থাকায়। তাই বাঙালীর মরুভূমি হয়তো ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। কিন্তু সাধক-বিগ্রহী-জ্ঞানভগবতী-দার্শনিকের এসবভূমি বাংলা আপন ভেঙ্গে তেজীয়ান আপন মস্ত্রে দীক্ষিত মহাপরাক্রমশালী দিক্‌দর্শক নেতা—তার ভেঙ্গে পড়লে চলবে কি করে? তাকে উন্নত মস্তকে প্রতিষ্ঠাবান রাখবে এই আগন্তুক বাংলার আগন্তুক যুবশক্তি.....একথা আমরা কখনও কি তুলিয়ে দেখেছি—আমরা মানে চিন্তাশীল অভিভাবকরা, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা নেতা যে পশ্চিমবঙ্গে যারা বসবাস করতে রয়ে গেছেন এদের পুনর্বাসনের সঠিক চোরাপথানাই একবার চোখ বোলাবার দরকার।

উদ্বাস্ত উপনগরী সব গড়ে উঠেছে অসংখ্য। ক্ষুদ্র-পরিসর ভূমিতে ঘর বেঁধেছে তাঁরা, সহরতলীর অনাবাদী ভূমি দখল করে পরিকল্পনাহীন ভাবে সব ঘর বাঁধা, অনেকে আবার আরো সংকীর্ণ পরিসরে খোলার ঘরে সহরের বতীতে বাস করছেন, সংসার পেতেছেন কড়ই না আশায় বুক বেঁধে—ঠাঁই নেই পাঁচ জনের কিন্তু আসর কাটাতে হয়—রাত কাটাতে হয় সেই পরিমাণ জায়গায় পনের জনের। কি অসহায়কর ক্লেদাত্ত পরিবেশ—বেশীর ভাগ মানুষই অপ্রতিষ্ঠিত-প্রতারণিত-শোষিত-বঞ্চিত। এছেন পটভূমিকার ক্ষুদ্রাতন পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সমাজজীবন আজ অশান্ত। স্বাভাবিক জীবন আজ মানুষের কাছে একেবারেই অলীক করুনা, এমনি করেই সামাজিক বিগ্রহের সুপ্রশস্ত কেন্দ্র আজ প্রস্তুত। জনসাধারণ এই বিভীষিকাময় ঘর্ণ থেকে এই সমাজ ব্যবহার বকনা থেকে প্রত্যাবর্তন থেকে, শোষণ থেকে উদ্ধার পেতে চায়, কিন্তু সেই উন্নত সুস্থ সুখী জীবনের প্রকৃত সন্ধান কি দিতে পারছেন বা

পারবেন আমাদের জনগণমন-পূজ্য দেশপ্রাণ জননেতারা ?

সমস্তর অষ্টোপাদে আঠে-পৃষ্ঠে আবদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের বেকার তরুণ সমাজ। তারুণ্যের হচ্ছে ক্রমাধীন-সীমাহীন অপচয়; কিন্তু কেন ? কি ভাবে—এর পিছনেও হয়তো বড়বড় আবিষ্কার করা বাবে ভালভাবে অবধারণ করলে।

বাণীনতা লাভের পর থেকে কলকাতার প্রাধান্ত কমে গেছে আর বাচ্ছে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে বেকারীর সংখ্যা চক্রবৃদ্ধিমান গতিতে বেড়ে চলেছে, কর্মসংস্থানের পারিকল্পনাও রূপায়ণ একসঙ্গে তাল ফেলে চলতে পারছে না। কারণ কর্ম-বিনিয়োগ ব্যবস্থা কোন অলক্ষ্য কারণে হয়েছে সঙ্কীর্ণত এবং ব্যক্তি-নির্দিষ্ট। তাই বাঙালী তরুণরা আজ কর্মক্ষেত্রে নিতান্তই অবাঞ্ছিত—এ এক মর্মান্তিক অবস্থা। এই অশালীন পরিবেশে কর্মহীন তারুণ্য যখনই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে তখনই তার চোখে একটি শুষ্ক ও অন্ধকারের কালো যবনিকা ছাড়া কিছুই ভেসে উঠছে না। কর্মের প্রেরণা-শক্তি যে বয়সে সর্বাধিক সেই বয়সেই এঁরা কর্মহীন, প্রাণশক্তি করেও কর্মসংস্থান করতে পারছেন না, তাই এঁরা হয়ে উঠেছে অস্থির, দামাল, বনজালী এক-একটি সংহারশক্তি; আর এঁরা সমাজ ব্যবস্থার উপর হয়ে পড়েছেন আত্মহীন, বতপুহ। এই অবস্থাই ক্রমে ক্রমে করে দিয়েছে উদ্দাম-উদ্ভট। এই পরিবেশ এই গতি থেকে এঁরা আজ বেরিয়ে আসতে চান—এঁরা আজ নুতন সমাজ ব্যবস্থার প্রত্যাশী, তাই এঁরা বর্তমান সমাজকে মানতে চাইছেন না। এঁহেন অবস্থার নিত্যন্ত নিরুপায় হয়ে ওঁরা বাঁচার জন্য হয়ে উঠেছেন সমাজভ্রাস, প্রচলিত নিয়মকানুন বা সামাজিক ব্যবস্থা এঁদের কাছে আজ অর্থহীন প্রলাপ, তাই ধ্বংসের নেশায় মত্ত ভ্রাতৃরক্ত শোতে করছেন এঁরা রক্ত-তর্পন। অস্থির নেতৃত্ব আর স্ফূর্তি চিন্তার অভাবে এঁরা দিক্ভ্রান্ত আর লক্ষ্যভ্রষ্ট।

যে সমাজের তারুণ্যশক্তি বিস্ত্রোহ ঘোষণা করছেন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সেই সমাজের সব ব্যবস্থাই কি তুল-কটী, বিচ্যুতি হুত ? না। যথেষ্টই গলদ রয়েছে

যা কোনমতেই অস্বীকার করার কোন পথ নেই। যত তাড়াতাড়ি এর সংশোধন সম্ভব হয় ততই মঙ্গল। বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে ঠিকভাবে এগিয়ে চলাই হচ্ছে যুগোপযোগী প্রগতিশীল কাজ এবং একমাত্র পথ।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বিপর্যয় এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে—দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আজ নাগালের বাইরে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে অপ্রাপ্তবয়স্কগণও বেড়ে চলেছে ভোগ্য এবং ভোগ্য দ্রব্যের মূল্য। মসোহারা, মাছিকা, পারিশ্রমিক বাড়ি নেতাদের কল্যাণে বুটিমের সরকারী কর্মচারী, শ্রমিক কর্মচারী, প্রমিক শিল্পের কিছু অংশের মূল্য দিতে হয় অস্বস্তি সাধারণ জনসাধারণের। দৈনন্দিন জীবন যাপন আজ এক বিষময় যন্ত্রণা। দেখে মনে হয় সরকার নেই প্রশাসন নেই, কিন্তু সবই আছেন জনসাধারণকে শোষণ এবং পেষণ করার জন্যে, নইলে প্রশাসনকে কেন দেখতে পাই নীরব দর্শকের ভূমিকায় ? তারা কি অসহায় ? না তাও তো নয়, যখন দেখি সিংহের মত তাদের কণ্ঠে গর্জন, কিন্তু শক্ত হাতে লাগাম ধরার শক্তি কই ? অসাধু ব্যবসায়ীরা নিজেদের লোভ-লিপ্সা বাড়িয়ে চলেছেন সমাজের রক্ত শুষে নিচ্ছেন নিশ্চিন্ত মনে। কেতা সাধারণ বাধা দিচ্ছেন না অসহায়-সাহস নেই বলে, প্রশাসন এখানে বৃত্ত সোনকের ভূমিকা গ্রহণ করে সমাজের শোভা বর্ধন করছেন। সাধারণ মানুষ হয়ে গেছেন সরকারের প্রতি প্রত্যাশী, বিশ্বাসহীন।

অতীতকে রাজনৈতিক দলনেতারা দলবাজী করে সমাজজীবনকে এই হৃদশায় এনে ফেলেছেন, নই হয়েছে স্বাভাবিক জীবন, পক্ষ হয়েছি আজ শিক্ষা-ব্যবস্থা, সভ্যতা, শালীনতা বোধ আর সংস্কৃতির হচ্ছে অবক্ষয়। তাই এই নেতাদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আজ। কারণ এঁরা সমাজকে করেছেন রাজনীতি সর্বস্ব। দলে দলে বিভক্ত সমাজ বিচ্ছিন্ন মতবাদের ছিন্ন জালে, এঁদের কর্ম করেছি ব্যক্তি সর্বস্ব পারস্পরিক আত্মহীন শৃঙ্খলাহীন রেবারি।

উন্নত জানা-হানি, খুনো-খুনী, প্রমত্ত হিংসার শিকার কিন্তু এরা শেখাননি কোন শৃঙ্খলতাবোধ, করেননি চরিত্র গঠনে কোন সাহায্য, জাগাননি সমাজ চেতনা বোধ, করেননি গুরুত্বের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ।

অতীতকে ব্যর্থ প্রশাসনের উপর ভরসা করে মানুষ অতীতের বিরুদ্ধে লড়াইতে পারছেন না বলেই মানুষের জীবন পর্যাস্ত আজ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। হিংসার বিরুদ্ধে মানুষ কণ্ঠে দাঁড়াতে পারছেন না—স্বাধিচারের আশা নেই বলে, তাই সদা আতঙ্কগ্রস্ত—সদা সন্ত্রস্ত সমাজ জীবন। পৌরুষ হয়েছে অবলুপ্ত, সমাজের অবক্ষয় শুরু হয়েছে অনেকদিন আগে থেকেই কিন্তু এই সাংঘাতিক অধোগতি চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গেছে গত তিন সাড়ে তিন বছরের মধ্যে। অসমর্থ নেতৃত্ব ও ব্যর্থ প্রশাসনের জন্য মানুষের এই অবস্থা, সমাজের এই দুর্দশা, শিক্ষা আর সংস্কৃতির এই অধোগতি। মোক্ষা কথা হলো পশ্চিমবঙ্গে আজ আর সমাজ নেই—আইনের শাসন নেই। সর্বত্র এক প্রাণান্তকর অব্যবস্থা বিরাজ করছে। আশাহত সমাজ স্ত্রী নেতৃত্বের অভাবে হয়েছে বিপথগামী হিংসার রাজনীতিতে রয়েছে প্রমত্ত আর বিপ্লবের বিপথগামী তরী যাত্রা শুরু করেছে অশান্ত সাগরে, যে তরীর তীরে পৌঁছবার আগেই হবে ভরাডুবি। সমাজ পরিবর্তন সেখানে সমবেত চেষ্টায় করা ছিল সহজ যেখানে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বহুমতবাদে আর বিচিত্র চিন্তায় কখনো যে শুণ্য বিায়িত ও ব্যাহত হচ্ছে তাই নয়, সব কিছুই যেন আজ জগদল পাথরের নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে। বুদ্ধির হয়েছে কঠিন বন্ধন, চিন্তা হয়েছে জরাগ্রস্ত, ধ্বংস হচ্ছে সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা আর সংস্কৃতি।

এই অবস্থার জন্য কে বা কারা দায়ী সে বিচারের সময় আর নেই—আগুন লেগেছে সমাজে, এ আগুন নেভাতে হবে, দেশকে বাঁচাবার পথ বাঁচার পথ খুঁজে বের করতে হবেই আজ। আর এর জন্য চাই স্ত্রী পরিবেশ সৃষ্টির সমবেত এবং সর্বাঙ্গীন প্রচেষ্টা।

আমাদের মতে পশ্চিমবঙ্গে এখনই জরুরী ব্যবস্থা

বোষণা করে সাময়িক শাসনের মত এমন কো-প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যা গণতন্ত্রবিরোধী নয় এই সঙ্গে সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার আদল পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বর্তমান ব্যবস্থার বহুবিধ গলত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থারই ফল। কর্মচারীমুখে মধ্যে কিছু দলগতভাবে পৃথক সত্তায় বিভক্ত। কেহ কেহ সরকারী কাজকে ফাঁকি দিয়ে দলীয় রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত। পরিকল্পনার কাজে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এঁরা বিলম্ব করেন, পাকিয়ে তুলেন হুজুট। ভিন্ন কাজে সময়ের করেন অপব্যবহার। সর্বস্তরের কথা না বলাই ভাল। এই সমস্ত কাজের ফলে মানুষের মনে আসে সংশয়, অবিশ্বাস। তাই মানুষ আজ সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। কারণ মানুষ দেখছে সর্বস্তরের এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খলতা।

এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে চাই কর্তৃপক্ষ নিষ্ঠা, চিন্তায় সমাজ-চেতনাবোধ আচরণে সততা আর ক্রিয়ার ক্ষিপ্ৰতা। বিকৃত আর বিভাঙিত মানুষের প্রতি সামাজিক বিচারের গাটকে ত্বরান্বিত করতে হবে স্ত্রীর জীবন লাভের জন্য। তবেই মানুষের মনে আস্থার ভাব ফিরে আসবে। এই আস্থাহীনতা প্রজাধীনতার ভয়াবহ অবস্থার হাত থেকে মানুষকে পুনরুদ্বাসিত করে স্ত্রী জীবন-বোধের অঙ্গপ্রেরণা জাগাতে হবে।

সমাজিকরী ক্রমবর্ধমান বেকারীর বিরুদ্ধে করতে হবে জরুরী সংগ্রাম। কারণ বহু লক্ষের উপর শিক্ষিত বেকার জীবন সমাজের একটি বিরাট আভ্যন্তরীণ ক্ষয়রোগ বিশেষ। এর শীঘ্র প্রতিকার না হলে—এদের কর্তব্য সংস্থান না করতে পারলে এঃ বিপদ থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকবে না। এর সমাধানের কাজে ফাঁকি ও ফাঁকি দিয়ে চলবে না—এর কোন সহজ পথ নেই। শুধু দক্ষতার দক্ষতার পরিকল্পনা করে ঢাক বাজালেই চলবে না। কাজে কলমে তো পরিকল্পনা হয়েছে অনেক, এতে হয়েছে জনসাধারণের অর্থের অপচয়—কর্তব্য তরাডুবি, খুব-মনে নৈরাশ্য। তাই এখন চাই হাতে কলমে কাজ শুরু হোক। এখনই বিপদ এড়াতে হলে খুব সমাজকে হতাশার হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

কল কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে বহু শতের উপর, তার মধ্যে ছোট-বড়-মাঝারি সবই আছে। বন্ধ হয়ে আছে নতুন শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস। অর্থ লগ্নীর ক্ষেত্র হয়েছে সঙ্কুচিত—সীমিত। এছাড়া আবার সরকারী টাকাত পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে কমই জোটে। তারও নাকি সঠিক লগ্নী হয় না। বেসরকারী লগ্নীর টাকা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চলে গেছে আর যাচ্ছে। এ শুধু অবাকালীর নয়, বাঙ্গালীরও। আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৭১টি কারখানার পশ্চিমবঙ্গের বাইরে স্থানান্তরের জন্য আবেদন পড়েছে। তার মধ্যে ইত্যবসরে ৪০টি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিয়েছেন। বাকীরা আছেন পাবার আশায় অর্থাৎ Waiting list এ। এ কাজগুলি কি ধরণের? বাঙ্গালীর অর্থ-নৈতিক পুনরাসনের সুস্থ জীবন প্রতিষ্ঠার কি এই নয়না? তা হলে দিনরাত এই কুস্তীয়াশ্রম বর্ষণের প্রয়োজনই বা কি, আর কেন? একদল লোক বলেছে—শ্রমিক আন্দোলনের ফলেই কল-কারখানা বন্ধ হয়েছে। আর একদল লোক বলেছেন—ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অসামর্থ্য লোভ শ্রমিকদের প্রাপ্য থেকে বাঞ্ছিত করছে—জায়সজ্জ দাবী মানছে না বলেই এই অশাস্ত। আপাত দৃষ্টিতে উভয় পক্ষের বক্তব্যই ঠিক। তাহলে সমাধানের উপায় কি? এর পিছনে যে আরো গভীর ও মৌল কারণ আছে আমরা তা অনুধাবন করি না বা করতে চাই না। দেশ বিভাগের পর সমগ্র দেশে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত পরিকল্পনা হয়েছে তা নিতান্ত কম নয়—কয়েকটি প্রতিষ্ঠান শিল্প স্থাপনের অনুমতি নিয়েও পরে অল্প কোন কারণে কারখানা স্থাপন করেন নি। এঁদের মধ্যে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সকলেই আছেন। দেশ বিভাগের পূর্বে কলিকাতা তথা বঙ্গদেশের স্থান শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্যে সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে প্রধান ছিল এবং সঙ্গ-ভারতের এক-তৃতীয়াংশ ব্যবসা এখানেই ছিল। দেশ বিভাগের ফলে বাজার বিশেষভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কলিকাতার প্রাধান্য কমে যাওয়ার দিকে মোড় ফিরেছে। হুগাঁপুর ইম্পাত নগরী একটি বৃহৎ শিল্প নগরীতে পরিণত

হয়ে কর্মসংস্থানের পরিসরকে বড় করেছে। কল্যাণী, বাবড়া, শক্তিগড়, সর্বোপরি হলদিয়া প্রভৃতি নতুন নতুন শিল্পনগর গড়ে উঠেছে—ভরুণদের কাজের সুযোগ হয়েছে—সুযোগ বাড়বে আরো শিল্প সম্মুখাধিত হলে, এবং হবে। কিছু বাঙ্গালী যুবক কাজ পেয়েছেন, আরো পাবেন আশা করি—না, আশা নয়, দাবী করছি। কিন্তু তবু—দেখছি বাঙ্গালী ছেলেরা সঙ্কল্প সুযোগ পায় না এই বাংলাদেশেই। আমাদের মতে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শিল্পসংস্থায়, সমস্ত কর্মে শুধুমাত্র বাঙ্গালী ছেলেদেরই কাজ পাওয়া দরকার আগামী কয়েক বৎসর ধরে। এটা হওয়া দরকার শুধু পশ্চিম-বঙ্গের জন্য নয়—প্রয়োজন সমস্ত ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য।

নগর পারিকল্পনা ও শিল্প প্রতিষ্ঠার পারিকল্পনাকেই যোজনা প্রণয়নকারী সার্বিক পরিকল্পনা বলে গ্রহণ করেছেন প্রচার করেছেন—অথচ কৃষি-প্রধান দেশের কৃষিকে করেছেন অবহেলা—নদীমাতৃক দেশের নদীকে করেছেন অবহেলা, পারণামে শাস্ত ব্যাপারে ঘটেছে মর্যাদাসিক অভাব। ওরা গ্রামজীবনকে করেছেন অবজ্ঞা, এর ফলে গ্রামের ছেলেরা শহরে এসে উপািস্ত হয়েছে কাজের সন্ধানে। গ্রাম হয়েছে অবহেলিত কৃষিপণ্যের হয়েছে প্রাণান্তকর অভাব। দারিদ্র—বেকারী—ব্যাগ্রাম হয়েছে লোকের নিত্য সহচর। জীবন হয়েছে বাঞ্ছিত। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের ভুল বা ত্রুটি বার বার দেখা গেছে—এঁরা পণ্ডিত ব্যক্তি বলেই এঁদের ডেকে নেওয়া হয়েছে। তাহলে এই ভুল-ত্রুটিগুলি কি বেজ্ঞাঙ্কিত বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত? হবেও বা। আমাদের ধারণা দেশাশ্রবোধ ও সমাজচেতনার অভাবে পরিকল্পনা রূপায়ণের কর্তব্যক্তিদের সততা ও কর্মনিষ্ঠার অভাব দেখা দিয়েছে। তার ফলে কোথাও পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হয়ে ওঠেনি। সকলে মিলে মিশেই যেন সরকারী অর্থ—জনসাধারণের স্বার্থ নষ্ট করছেন বছরের পর বছর। আর ঐ সার্বিক ক্ষতি পরিশেষে দেশের সম্পদের উপর কঠোর আঘাত হানে আর হানছে।

পরিণামে মানুষের আশাভঙ্গ হয়। মনে নৈরাশ্য আসে। তাই মানুষের আহ্বার ভাবকে কিরিয়ে আনার জন্ত চাই মুঠু পরিকল্পনা বাস্তবায়ন রূপায়ন মিতব্যয়িতা আর নিষ্ঠা সর্বোপরি সমাজ কল্যাণ বোধ। সুদ্রামূল্য হ্রাস করার কলেই জাতীয় আর্থিক অবস্থা আজ এইত ভয়াবহ।

এই নিদারুণ অবস্থার হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে এলোপাতাড়ি ভাবে বন্ধ কল-কারখানা খুললেই চলবে না। এতে আশাততঃ বেকার লোকদের বা কর্মচ্যুত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান হবে বটে কিন্তু পারিশেষে দেখা যাবে বহুক্ষেত্রেই হয়েছে অর্থের অপচয়। কারণ ঐ সমস্ত কল-কারখানার বেশীর ভাগই অতি পুরাতন যন্ত্রপাতি দিয়ে গড়া—উৎপাদনের মাম বহুনিম্নে—অনেকদিন যাবৎ লোকসানেই চলছে। কোথায়ও অসাম্য পরিচালনা—কোথায়ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পশ্চাদ্বেশসারণ। কাজেই ঐগুলি খোলার আরোজন করার আগে, অর্থদাননের পূর্বে পূর্ত্যাপর সমস্ত অবস্থা ভালভাবে বিচার করে দেখতে হবে এবং সেখানে অর্থলগ্নি হলে বাজালী ছেলেদের চাকুরী হবে আর উৎপাদন ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় ও উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষে দাঁড়াতে পারবে শুধুমাত্র সে সমস্ত জায়গাতেই অর্থ বিনিয়োগ করা বিধেয়।

এই বেকার সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্ত একটি সুবিজ্ঞ পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। প্রথম নিবিড় নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত সমস্তোমুখী প্রচেষ্টা শুরু করা প্রয়োজন। এই সর্বনাশের হাত থেকে মুক্তির জন্ত কিছু কিছু স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা এখনই হাতে নিতে পারলে কিছু তরুণ কাজ পেতে পারেন। পাঁচমবদে হাজা-মজা বিল, জলাশয়, নদী-নালা ও পুকুরগুলির সংস্কার সাধন করে মাছের নিবিড় চাষ করা যেতে পারে এবং তাকে ঘিরে Poultry ইত্যাদি অল্পস্বল্প সহযোগী আরো কুটিরশিল্প সৃষ্টি হতে পারে ও কয়েক লক্ষ বেকার বিশেষতঃ গ্রাম্য বেকারের স্থায়ী কর্মলাভ হতে পারে ও দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতি লাভ করা যেতে পারে। কিন্তু এসমস্ত কাজে বুদ্ধি ও নিষ্ঠার প্রয়োজন সর্বাধিক।

বাঁকড়া, পুকুরিয়া, হুন্দরবন প্রভৃতি স্থানের অল্পকর্ম জমিতে গভীর নলকূপ বসিয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করলে হ্রিকপীড়িত ঐ এলাকাগুলির লোকদের কাজের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে ও খাদ্য উৎপাদনের অবস্থা বেশ কিছু উন্নত হতে পারে। এমনি করে বহু জায়গাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের ব্যবস্থা করে উপযুক্ত জলসেচের জলের জোগান দিয়ে কৃষিপণ্যের ফলন ও জোগান বাড়ানো যাবে। ইয়া—কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্ত সরকার অনেক অনেক কিছু করেছেন, কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন, কিন্তু চাষীর চাহিদা মেটাতে পারেননি—পারেননি মূল্যায়নিক বোধ করতে, উৎপাদন বাড়াতে। আবাদযোগ্য জমির অভাব, লোকসংখ্যার চাপে ও নূতন কল-কারখানার প্রয়োজনে জমি আরো কমেছে। যেটুকু আছে তার বেশীর ভাগই নষ্ট হয় খরায় বা বজায়। কিন্তু সরকার নদী শাসনের ব্যবস্থা করেন নি। বীধ যা বেঁধেছেন তাও নাকি কোন এক অজ্ঞাত কারণে লোকের ছুর্গাত বাড়িচ্ছে। অথচ এসব ব্যবস্থাই তো হয়েছে জনসাধারণের সুবিধার জন্ত? লোক সরকারকে অভিযোগ দিচ্ছে যন্ত্রস্ত এই বস্তার জন্ত। কি লজ্জার কথা, পরিতাপের কথা।

দ্বিতীয় কথা হলো—শিল্প ও ব্যবসা ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপন ও মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থা স্থাপনের পারিশেষ সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের দায়িত্ব কিছুমাত্র কম নয়। কারণ আমাদের ধারণা-অশান্তির মূলে এদের বিপথগামী ও উদ্বেগপ্রণোদিত কার্যাবলী। কারণ এরা রাজ-নৈতিক-সর্বস্ব-লোক-দলের সক্রিয় নেতা। আমাদের মতে Trade Union আন্দোলনে কোন রাজনৈতিক দলের অল্পপ্রবেশ একেবারে বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ এরা শ্রমিক আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেন আর শ্রমিকেরা মূল স্বার্থকে বাদ দিয়ে কোন দলস্বার্থে নিজেদের সম্মুখভিত্তিক করে। আর শ্রমিক স্বার্থকে করে ব্যর্থ। তার প্রতিকার হিসাবে আমরা চাই কারখানা-ভিত্তিক শ্রমিক ইউনিয়ন আর শিল্পভিত্তিক



কেন্দ্রের ইউনিয়ন। শ্রমিকদের মধ্য থেকেই ইউনিয়নের কর্মকর্তা নিয়োগ প্রয়োজন এবং এঁরা যাতে কোন রাজ-নৈতিক দলের খস্মের না পড়ে তার জন্য সদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কিন্তু এই মানসিকতা সৃষ্টির জন্য চাই শ্রমিকদের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা।

আরেকটি কথা পরে বললেও জেনে রাখা ভাল যে, মালিকপক্ষের মানসিকতার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—তার দিনও সমাপ্ত। এঁরা যদি সমাজ প্রয়োজনে দৃষ্টি দিতে প্রস্তুত হন এবং যুক্তিনিষ্ঠ ও ইতিহাস-সচেতন হয়ে নিজেদের মানসিকতা গঠন করে শিল্প তথা বিনিয়োগ ও উৎপাদন খাতে এঁদের অভিজ্ঞতা ব্যয় করতে প্রস্তুত হন তবে শিল্পে শান্তি ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি বন্ধ হতে সহায়তা করবে। জনসাধারণের হতাশা আর অসন্তোষ ক্রমে ক্রমে দূর হবে। নিজেদের লাভ লিপ্সাকে সীমিত করে উৎপাদনভিত্তিক একটা জট স্তর ও স্তরভিত্তিক বটনের জন্য প্রস্তুত হবে। আমাদের শিল্প ক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে অসন্তোষ চলছে আর দিন দিন বাড়ছে তার জন্য সরকারী শিল্প-আইন ও তার আইন প্রয়োগকারী কর্মচারীরাও দায়ী। আইনে যেটুকু বিধান আছে তাও যথাযথভাবে পালিত হয় না। তাঁর ফলে শ্রমিকেরা মনে করেন যে, আইন মালিকের পক্ষে, আর সরকারও মালিকের পক্ষে। এরকম ধারণার অবসান হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আসল কথা সর্বসময়েই উৎপাদনবৃদ্ধির সমবেত প্রচেষ্টা থাকা উচিত। তাই একটা স্তর পরিবেশ হাপনের জন্য শ্রমিক-নেতা—মালিকপক্ষ ও সরকারকে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। উৎপাদন-সীমা-সাপেক্ষ শ্রম আইনকে প্রয়োজনভিত্তিক ও যুগোপযোগী করে প্রণয়ন করতে হবে। আইন প্রয়োগকালে সং ও সতর্ক থাকতে হবে। সরকারকে হতে হবে স্তরনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ। শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষকে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, বিবর্তমান অবস্থায় উৎপাদন ব্যাহত করে জনসাধারণের দুর্ভোগ বাড়ে ও দেশের অর্থকোষে

অনটন ঘটে। শ্রমিক আর মালিক দুইয়েরই ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। মালিক পক্ষ যদি মনে করেন যে তাঁদের লগ্নীর জন্যই শ্রমিকেরা মজুরী রোজগার করছে আর শ্রমিকেরা যদি ভাবেন যে শুধু এদের শ্রমের জন্যই মালিক লাভ করছে তাহলে এদের উভয়েই ভ্রান্ত। একথা উভয়েরই উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, উৎপাদনে তিনটি শক্তি—অর্থ, প্রায়োগিক জ্ঞান ও শ্রম একত্রে ও এক তারে বাঁধা স্তরের মত কাজ করে। প্রকৃতি ও পুরুষের সন্নিতিতে ও সহযোগিতার ফলে যেমন সৃষ্টি হয় মানুষের, তেমনি আবার একে অপরের সহযোগিতা ও অসমর্থ ও নিরুৎসাহক হলে সমাজের আজ কি অবস্থা হতো? তেমনি করে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে একটা সহজ সম্বন্ধবোধ, মানসিক সাম্য ও সমঝোতার ভাব গড়ে উঠলে উৎপাদন বাড়বে—জনসাধারণের স্বর্ণগার লাভ হবে। এখানে আরেকটি কথা বললে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আজকাল ঘন ঘন হরতাল ও বন্ধ জন-সাধারণের কাছে বিবর্তন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ হরতালে দিন-মজুরের দুর্গতির উপশম হয় না বরং জন-সাধারণের দুর্গতি বাড়ে। নেতারা হয়তো নিজেদের প্রভাব দেখাবার জন্য হরতাল ডাকেন—এতে এদের রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য কতটা সফল হয় জানি না তবে দৈনন্দিন কেনা কাটার ব্যাপারে ও আহ্বারে জনসাধারণের যে অশেষ অসুবিধা ও কষ্ট হয় তা আমরা বুঝি। এখানে সংযমবোধের প্রয়োজন। এতাল ভাববার কথা। একদিনের বন্ধে বা হরতালে প্রায় দশ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। আর ক্ষতির অংশীদার দেশের শোষিত জনসাধারণ। যে জনসাধারণের কল্যাণের নামে আমাদের নেতাদের বুক ফাটে। তখন দিনমজুর ও সাধারণ মানুষ অনশন, অর্ধ-অনশন বা সধবার একাদশী করে দিন কাটান—অসহ্য ব্যবসারীরা এই সুযোগে দ্রব্য-মূল্য বাড়িয়ে ক্ষেতা-সাধারণের পকেট থেকে টাকা নিয়ে নিজেদের পকেট ভর্তি করে—তখন লাভ হয় কার? একথা আমরা ভাব কি?

আজ শিক্ষাক্ষেত্রে একটা অচিন্তনীয় সফট চলছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় কোন ক্ষেত্রেই শান্তি নেই।

পড়াশুনা বন্ধ, উড়ন্ত মেঝে ভর করে চলেছে হেলেরা, উন্নতপ্রায় এদের মানসিকতা। স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী পুড়ছে, মূল্যবান ল্যাবোরেটরী ভাঙছে, স্বচ্ছ হাওয়া জ্ঞানী মনীষীদের মাথা। পরীক্ষা বন্ধ, পড়াশুনা উঠেছে শিকের—এর নাম নাকি সাংস্কৃতিক বিপ্লব। কিন্তু একাজের সঙ্গী কি সমগ্র ছাত্রসমাজ?—নিশ্চয়ই নয়। তবে এগুলি বন্ধ হয় না কেন? আগামী দিনের দুইটা যুগ নষ্ট হয়ে গেছে। এই নষ্ট হওয়া—শক্তির অপচয় আর মানবিকতার অপব্যবহার ভবিষ্যৎ সমাজের কোন ইঙ্গিত বহন করছে? একথা ভাবছেন কি সমাজ-কর্মী নেতারা? আমাদের ধারণা পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ ছাত্র এসব কাজের সমর্থক নন। এঁরা নিকরপার দর্শক হয়ে নিজেকে ভবিষ্যতের দিনগুলি গুনছেন। যুব সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশ, এঁরা এসেছে স্কুল, কলেজ থেকে এসেছে বস্ত্রী ভাবন থেকে। আজ এরা সমাজ বিদ্রোহী হয়ে গেছে—নৈতিক চরিত্রের হয়েছো বিপ্লবগতি। শিক্ষক ও অভিভাবকেরা আজকের শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজ-কতার নীরব দর্শক। আজকের ছাত্র কালকের সমাজ-নেতা, এমনি করেই ভবিষ্যৎ হারিয়ে বসেছেন। এ কি এক মর্শাস্ত্রিক মনোবেদনা, দারুণ যন্ত্রণা—চুক্তভোগীরা এটা ভাল করেই উপলব্ধি করছেন।

আজকের এই ছাত্র-অসন্তোষ থেকে বাঁচতে হলে দেশের চিন্তাবিদদের ভাবতে হবে, রাস্তা খুঁজে সমাধানের পথ দেখাতে হবে। প্রকৃতির নিয়মে সমাজ বদলায়—বদলার মাস্তবের মন, মেজাজ, তার ধ্যান ধারণা। তবে সে পরিবর্তনের উচ্ছ্বল গতিতে সঠিক পথে চালনা করে নেবার দায়িত্ব চিন্তাবিদ সমাজ-নেতাদের। সভ্যতার ও সংস্কৃতির পথ সরল নয়—সপিল, তবু কিছু ধ্যান ধারণার মুহূর্ত হয় না। ধ্যান ধারণা সীমিত হয়ে থাকে বিশ্বজনীন সচেতনতার মধ্যে, মূল্যবোধ বদলে যায় ধারণা অহুসারে।

আজ সব চাইতে বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আমাদের জাতীয় চরিত্রের পুনর্গঠন। তারজন্ত চাই শিক্ষা—দেশের সর্বস্তরে, দরিদ্রের পর্বতটীর থেকে ধনী সংস্কার পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে জ্ঞানের আলোক।

“Without knowledge the workers are defenceless, with knowledge they are a force”—বলেছেন মহামতি লেনিন, সর্বস্বায় সমাজতন্ত্রের পরমপুরুষ।

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা—করার বিশেষ প্রয়োজন পাঠ্য ও পরীক্ষার নিয়মে। পাঠ্যক্রম যুগ-প্রয়োজনভিত্তিক হওয়া চাই—যা ছেলেদের জীবনে কাজে লাগবে। যে শিক্ষা দেবে ছেলেদের জীবন-পথের সঠিক ইশারা। শিক্ষা হবে জীবনভিত্তিক, কিন্তু রাজনীতি-নিরপেক্ষ অথচ দেশপ্রীতি আর সমাজ-চেতনায় ভরপুর।

কিন্তু শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্বিভাগের আগে কয়েকটি কথা ভাববার আছে। কিছু ছেলে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে, অপরের পড়ায়, পরীক্ষায় বাধা দিচ্ছে। কারণ ওরা বলছে এ বুজ্জিয়া শিক্ষায় কিছু হবে না। কাজেই এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরমাচ করে দেও, বুছে ফেল সভ্যতা আর সংস্কৃতির সব কিছু চিহ্ন। এঁরা ভেবে দেখেছেন কি যে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার পড়াশুনা করেই উনিবিংশ শতাব্দীর মনীষীরা দেশকে সমৃদ্ধ করেছিলেন উন্নত আর গৌরবান্বিত শিক্ষায়, বিজ্ঞানে, অর্থ ও ধর্মে। করেছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের বাকি প্রজ্জ্বলিত জনমানসের মনে—আর উচ্চারণিত হয়েছিল “বন্দে মাতরম্”—এর মহামন্ত্র ডেপুটি বাকিমের কণ্ঠে। পড়াশুনা না করলে জ্ঞানার্জন না হলে অজ্ঞতা দূর না হলে নিজেকে সমাজকে দেশকে না চিনলে অশিক্ষা, দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনা থেকে সমাজকে এঁরা বাঁচাবেন কি করে? দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় গভীর করে দিতে হবে। যে যোগসূত্র আজ এঁরা হারিয়ে ফেলেছে—এদের সামনে ধরে রাখতে হবে দেশাত্ম-বোধের প্রেরণা, শিক্ষার মাধ্যমে দিতে হবে সমাজ-চেতনাবোধ। শিক্ষার নীতি নির্ধারণ করবেন শিক্ষা-বিদরা, রাজনৈতিক দলের নেতারা নন। অবশ্য দেশকে সমাজকে জানবার যে প্রেরণা তা আসবে বড়দের কাছ থেকে—অভিভাবকদের কাছ থেকে—আদর্শ শিক্ষকের

কাহ থেকে; আদর্শ সাহিত্যিক, কবি, দেশনেতাদের কাহ থেকে। আজ দেখতে হবে কী কী কোথায়—শিক্ষায়? মানসিকতায়? সমাজব্যবস্থায়? নেতাদের কর্মে? না কি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়? তখন ছিল তরুণদের মধ্যে আদর্শের প্রেরণা, দৃঢ় প্রত্যয়বোধ, সমাজ-চেতনা আর জাতীয় চরিত্র। আজ আমরা বড়ো হারিয়ে বসে আছি সেই চরিত্র, প্রজ্ঞা আর সেই প্রত্যয়বোধ, আর ছাত্রের তরুণরা করেছে আমাদের সেই বিপণ্যগামিতার অনুসরণ।

আজ আমার সেই বিপ্লব পথের সাজী ছাত্রবহুরা সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সব কিছুকে ধূয়ে বুছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে সে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা পত্তনের মরণপণ লড়াই—এ নেমেছেন, তাঁদের আমন্ত্রণ করছি—আমুন, এ ব্যাপারে মহাবিপ্লবী মার্কসীয় দর্শনের মহাসাধক এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্বন্ধে কি বলেছেন একবার দেখি—লেনিন বলেছেন,—

“You can become a communist only when you enrich your mind with a knowledge of all Treasures Created by mankind. Culture is not clutched out of thin air, it is not an invention of those who call themselves experts in Proletarian Culture. That is all nonsense. Proletarian Culture must be the logical developement of the store of knowledge mankind has accumulated under the yoke of Capitalism, Landowners and Bureaucratic Society”.—

একথা স্মরণ রেখে আমুন ছাত্রবহুরা, করুন আত্মহননের, হিংসা-বিষেবের পথ ছেড়ে আত্ম-বিসর্জনের মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে পারম্পরিক প্রজ্ঞা ও পরমদক্ষতার মাধ্যমে সুগোপযোগী গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, প্রতিষ্ঠিত করুন শোষণহীন স্বসম্পূর্ণ সমাজ—সকলকে প্রতিষ্ঠিত করুন মানবিক অধিকারে। সে সংগ্রামের সাথে আমরাও আছি।

দারিদ্র, বেকারী, অজ্ঞান, অবিচার আর শোষণের

বিরুদ্ধে লড়াইর শক্তি জাগাতে হবে বাঙ্গালীর জীবনে তরুণ সমাজকে জানাতে হবে জাতীয়তাবাদ এবং উনিবিংশ শতাব্দীর গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের কথা, শেষাতে হবে ইতিহাস। কারণ যে জাতির অতীত নেই তার বর্তমানও নেই আর ভবিষ্যতের কথা তো কোন দূর অস্ত।

আমাদের দৃঢ় ধারণা, আমাদের বড়দের দল যদি সমাজ-চেতনার উৎসূদ্ধ হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কর্মে শক্তি নিয়োগ করি; আচরণে, বাক্যে, আর কর্মে যদি সব হতে পারি তা হলে আমাদের তরুণরাও আমাদের অনুসরণ করবে।

সংপ্রশাসনের যেমন প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন সং সমাজের সং ও সূহ সমাজবোধ গণতন্ত্রের মূলভিত্তি। গণতন্ত্রের সূহ পরিচালনার জন্ত চাই একটি স্বাধীন, শিক্ষিত, নিরপেক্ষ ও ধীসম্পন্ন সমাজ। যে সমাজ গঠনের দায়িত্ব আজ সুবঙ্গমাজের। এত দায়িত্ব, অত্যাচার ও অজ্ঞানে পিটে হয়েও বাঙ্গালার প্রাণ সত্তার অবপ্তি ঘটেনি। সীমান্তের ওপারে তারই আজ প্রতিধ্বনি শুনি সত্য, নির্ভীক স্পন্দনের।

তাই আশা করছি—রাজা রামমোহন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র, ারামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রমুখগণ, জগদীশচন্দ্র, আন্ততোর সুখোপধ্যায়, রামেন্দু সন্দর্ভ বিবেদী, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তব্রজ, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সর্বশেষ শেখ মুজিবুর রহমান যে দেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই দেশের তাকণ্য শক্তি সমাজের সব অন্ধকার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে সর্ব শক্তি দিয়ে। আমরা বিশ্বাস করি এই তাকণ্যের মধ্যে থেকেই দেশাত্মবোধে প্রোজ্জ্বল, আত্মপ্রত্যয়ে উজ্জল, নিঃস্বার্থ, নির্দোষ, সমাজ-চেতনার উৎসূদ্ধ তাকণ্যের প্রাণশক্তির অধিকারী এমন এক স্বজনশীল নেতৃত্ব গড়ে উঠবে, যে নেতৃত্ব শৈবশক্তির আলোকে সমগ্র দেশকে তথা সমাজকে এই চরম অবক্ষরের হাত থেকে উন্নত করবে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি করবে। সেই অদ্বাগত নেতৃত্বকে প্রশংসা করে তার আগমন প্রতীক্ষার আজ বসে আছি।

# কংগ্রেস স্মৃতি

( সপ্তাভিংশ অধিবেশন—গয়া—১৯২২ )

## শ্রীগিরিজামোহন সাত্তাল

( পূর্বপ্রকাশিতের পর )

এবারকার কংগ্রেসে হুনীতির যে প্রপ্রয় দেওয়া হয় তার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছে। কলিকাতা থেকে প্রায় এক হাজার প্রতিনিধিকে দিল্লী নিয়ে যাওয়ার খরচ প্রচুর। এই খরচ লাঘবের জন্য দশ মণায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতাগণ দিল্লীর সন্নিকটবর্তী দহরগুলি থেকে আবাসী বাঙালী সংগ্রহ করে তাদের দরাজ্য পার্টির দলভুক্ত বঙ্গদেশের প্রতিনিধি বলে গিলিয়ে দেওয়া সাব্যস্ত করলেন। প্রতিনিধি সংগ্রহের জন্য পারিতোষিক দিয়ে কয়েকজন দালাল নিয়ুক্ত করা হল।

একদিন সন্ধ্যার পর ডাঃ হেমচন্দ্র সাত্তালের গৃহে দেখি, কাশী থেকে কতকগুলি শুভ্রা শ্রেণীর যুবককে বিকল্প প্রতিনিধি হিসাবে আনা হয়েছে এবং তাদের স্থান দেওয়া হয়েছে এই গৃহের নিম্নতলায়। প্রাতঃকালে উঠে দেখা গেল বাড়ীর ছাদ মলমুত্রে পরিপূর্ণ। তখন-কথিত প্রতিনিধিরা এই চূক্ষার্য করেছে, এ সম্বন্ধে অভিযোগ করতেই তারা সময়ের বলে উঠল যে, এই যক্ষ্মা রীতিতে তারা শুনে এসেছে স্তম্ভরাং অলস্য কিছু করা হয় নি। যাই হোক, পরসে খরচ করে বাড়িদার আনিতে সমস্ত পরিকার করা হল।

একদিন কলিকাতা থেকে প্রতিনিধিদের একটি বড় দল এল, তাঁদের বাসস্থান দেওয়া হল পুণোজ্জ্বিত কলেজ হোটেলে। মুসলমান প্রতিনিধিরা কেউ সেখানে গেলেন না, তাঁরা বললেন সেখানে তাঁদের যাওয়া দাওয়া এবং কথাবার্তা বলার খুব অস্বাভাবিক হবে।

এই কলেজে প্রতিনিধিদের সুখস্বাহল্য দেখার জন্য

যে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বাঙালী যুবক জনৈক মুখাঙ্গিও ছিলেন। অতি উৎসাহী যুবক, চোস্ত উর্দু বলতে পারতেন। একদিন সৈয়দ জালালুদ্দিন কাসেমী ও শাহজাদিন আমেদ তাঁকে বললেন—কারা উর্দুমে বাড়িচিত করেজা, তারপর উর্দুতে কথাবার্তা চলতে লাগল। মুখাঙ্গির চোস্ত অনর্গল উর্দুর সঙ্গে আমাদের বাঙালী মুসলমান ভাইরা আর পেরে উঠলেন না। অগত্যা আবার বাংলাতেই কথাবার্তা করতে লাগল।

কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ণদিন কলেজের উঠানে বসে স্তম্ভরাজে বহু ও কীরণশব্দর স্বায় প্রতিনিধির তালিকাভিনয়ীক সব আলোচনা করছিলেন। আমি কাছে যেতেই স্তম্ভরাজ বললেন—আপনি এখানে আসবেন না। You are too good for such things.

নির্বাচিত সভাপাত মোলানা আবুল কালাম আজাদ, স্বতন্ত্র মনে পড়ে, ১০ই তারিখে সন্ধ্যার সময় দিল্লী পৌছান। কারাকরু মধ্যা গাকীর কংগ্রেসে অনুপস্থিতির জন্য সভাপাতর শোভাযাত্রা বাতিল করে দেওয়া হয়। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে তাঁকে যথোচিত সম্বর্ধনা করে বিনা আড়ম্বরে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়।

এ দিনই প্রাতঃকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, কোস্তা ভেকাটান্সা, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু দিল্লীতে পৌছান।

কংগ্রেস অধিবেশনের প্রাকালে উত্তর ভারতের

নানাহামে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বেধে উভয় সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত করে তুলেছিল। সুতরাং কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাবের অপেক্ষা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রস্তাব অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছিল। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত ১১ই তারিখে নেতারা এক সভায় মিলিত হলেন। এই সভায় রাজনৈতিক নেতারা বিবেচ্য অংশ গ্রহণ করলেন না, প্রধানতঃ উলেখ্যদের ও হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরাই স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অভিযোগ উপস্থাপন করলেন। মোলানা মহম্মদ আলী বললেন যে, সকল প্রস্তাবের বড় প্রভু অথবা বর্তমান সময়ের একমাত্র প্রভুই হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থাপনের উপায় বের করা। এর জন্ত চাই চিত্তশুদ্ধি, কোন প্রকার চুক্তিপত্র নয়।

তারপর উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা পৃথক পৃথকভাবে মিলিত হলেন। মোলানা কফিউজ্জার গুঠে উলেখ্যদের সভা হল। মোলানা আবুল কালাম আজাদ ঐ সভায় যোগ দিলেন। স্বামী প্রদানন্দ সহ হিন্দু মহাসভার সদস্যগণ মিলিত হলেন লাল শিবনারায়ণের বাংলোয়।

লাল শিবনারায়ণের বাংলোয় একটি ঘরোয়া বৈঠকে লালাজীর সঙ্গে দেশবন্ধু দাশ সহ বাংলার কয়েকজন প্রতিনিধি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। আমিও উপস্থিত ছিলাম। আলোচনা এসঙ্গে লালাজী বললেন যে, হাকিম আজমল খাঁ বা ডাঃ আনসারী কেউই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব থেকে মুক্ত নন। তিনি বললেন মিরাত দিল্লী থেকে মাত্র এক ঘণ্টার পথ, সাহারাণপুর মাত্র তিন ঘণ্টার পথ। এঁরা সেখানে গিয়ে অনায়াসে দাঙ্গা থামাতে পারতেন তা না করে তাঁরা উভয়েই দিল্লীর বাইরে বিভিন্ন স্থান থেকে চিকিৎসার জন্য 'কল' আসার ওজুহাতে দিল্লীর বাইরে চলে গেলেন।

যাই হোক ১১ই তারিখে অপরাহ্নে একটি কনফারেন্সে সকল দেশের প্রতিনিধিগণ মিলিত হলেন। সভায় উলেখ্য কনফারেন্সের সেক্রেটারী মোলানা আমেদ সৈয়দ স্বামী

প্রদানন্দের স্তব্ধ আলোচনায় সবচেয়ে কতকগুলি অভিযোগ উপস্থিত করলেন। স্বামীজী এর প্রত্যুত্তরে তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন।

পরদিন ১২ই তারিখে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য কনফারেন্সের অধিবেশন হল। এদিনকার সভায় পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়া চোদ্দ উদ্ভূতে দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। মালবীয়াজীর হিন্দী ও ইংরাজী বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছি। এবার তাঁর উদ্ভূ বক্তৃতার মনোহারিত্য উপলব্ধি করলাম।

১০ই তারিখে অপরাহ্নে ৩ টার অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের সময় ধার্য হল। এটি কমিটির সভায় আলোচ্য বিষয় বাংলা দেশের প্রতিনিধিদের বৈষম্য সম্বন্ধে আলোচনা। সুতরাং প্রত্যেকটি ভোট মূল্যবান। শরৎচন্দ্রও এই কমিটির একজন সদস্য সুতরাং তাঁর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। তাঁকে ধরে না আনলে নিজ থেকে তিনি আসবেন না। অতএব তাঁকে সভায় গাজির করতে দেশবন্ধু আমাকে নির্দেশ দিলেন। আমি একটি টাক্সি করে রেলের কলোনীতে শরৎবাণুর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি তখন আরাম করে তামাক খাচ্ছিলেন। তাঁকে নড়ানো দুইহু ব্যাপার। সভায় সময় আর বেশী নেই, কাজেই বাধ্য হয়ে আমি তাঁকে তাগিদ দিতে লাগলাম। তিনি বললেন, অতো ব্যস্ত কেন? চা খাও, তারপর যাওয়া যাবে। অপর্যায় চা পানের পর বহু খোসাফেন্দ করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সভায় উপস্থিত ছিলাম।

তিন টার সময় সভা আরম্ভ হলে বাংলার নো-চেয়ার-দের পক্ষ থেকে প্রসিদ্ধ বাঙালী অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ার প্রস্তাব অবৈধ বলে বাতিল করার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ ঐ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন পণ্ডিত যতীন্দ্রলাল নেহেরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। দীর্ঘকাল আলোচনার পর সভা মোলানা মহম্মদ আলী, কোথা ভেঁকাটামায়া, ডাঃ আনসারী ও হাকিম আজমল খাঁকে নিয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করে তার উপর এই বিষয়ে

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার পরদিন অর্থাৎ ১৪ই তারিখে বেলা ১০ টার সময় রিপোর্ট দাখিল করার দায়িত্ব দেওয়া হল।

এদিকে একটা ঘরোয়া বৈঠকে নো-চেঞ্জারদের বিশিষ্ট নেতারা মিলিত হয়ে কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন মোলানা মহম্মদ আলী, বল্লভভাই প্যাটেল। ডঃ সন্তোষীন্দ্র কিশোর, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং কোণ্ডা ভেঙ্কাটাপ্পায়া। বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে পণ্ডিত জগদ্বলাল নেওক ও তসদিক শেরওয়ানী উপস্থিত ছিলেন। দু'ঘণ্টা আলোচনার পর তাঁরা কাউন্সিলে প্রবেশ সম্বন্ধে তাঁদের বিরুদ্ধ মতে অচল রইলেন। পণ্ডিত জগদ্বলাল নেওক ও শেরওয়ানী সাহেব আপোষের কথা তুলেছিলেন তা গ্রাহ্য হল না।

ওদিকে স্বরাজ্য দলের নেতারাও নিশ্চিন্তে বসে ছিলেন না। তাঁরা এক পৃথক সভায় মিলিত হলেন এবং নো-চেঞ্জাররা আপোষের প্রস্তাবে রাজি হন নি জেনে তাঁরাও তাঁদের মতে দৃঢ় রইলেন।

নির্ধারিত ১৪ই তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বৈধতা সম্বন্ধে অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত সাব-কমিটি স্বরাজ্য দলের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বৈধ সাব্যস্ত করে নো-চেঞ্জারদের কমিটি বাতিল করে দিল। ফলে নো-চেঞ্জারদের নিষিদ্ধতা, প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি, যারা দিল্লীতে কংগ্রেসে যোগ দিতে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা কংগ্রেসে যোগদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন।

৪

২১শে সেপ্টেম্বর বেলা ৩টার সময় কংগ্রেসের প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হল।

দিল্লীর প্রসিদ্ধ জুয়া মসজিদের সম্মুখস্থ মাঠে কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান নির্বাচিত করা হয়েছিল। সাধারণ অধিবেশনের জন্য যে বকম বৃহৎ প্যাণ্ডেল নির্মিত হয় এবারকার প্যাণ্ডেল তদপেক্ষা অনেক ছোট ছিল।

প্রতিনিধি ও দর্শকের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অনেক কম ছিল। প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল দু'হাজারের কিছু উপর। দর্শকের সংখ্যাও তিন হাজারের বেশী নয়।

প্যাণ্ডেলের শোভাবর্ণনের জন্য এবার কোন নেতার প্রতিষ্ঠিত সভামণ্ডপে রাখা হয় নি। কতকগুলি পোঁতার টাঙ্গানো ছিল তাতে এই সকল “মটো” লাগিত ছিল, “স্বাধীনতা”, “মহাত্মা গান্ধীর কারা মোচন—তোমাদের কতব্য”, “আত্মোৎসর্গই স্বরাজ্যের মূল্য।”

নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সভামণ্ডপ পূর্ণ হয়েছিল কিন্তু বাংলার প্রতিনিধিদের বৈধতা সম্বন্ধে কমিটির রায় তখন পর্যন্ত প্রকাশিত না হওয়ায় সভার কাজ আরম্ভ হতে দেয়া হল। ১-৩০টা পর্যন্ত বাংলার প্রতিনিধিদের প্রকৃৎখানি পড়ে ছিল। অল-ইণ্ডিয়া কর্তৃক নির্ধারিত কমিটি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যয়ের রায় সমর্থন করার পর স্বরাজ্য পার্টির নিষিদ্ধতা প্রতিনিধিগণ প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন। বিফলমনোবধ প্রায় এক হাজার নো-চেঞ্জারদের প্রতিনিধি, প্যাণ্ডেলের বাইরেই থেকে গেলেন।

অধিবেশনে যোগ দিতে যাওয়ার পথে প্যাণ্ডেলের বাইরে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। ডঃ কেমচন্দ্র সাক্সালের গৃহে কাশীর যে সকল বিকল্প প্রতিনিধিদের স্থান দেওয়া হয়েছিল তাদের সংগ্রহকারক একজন দালালকে ঘিরে তারা বাদান্তবাদ করছে। কোকিলের বনবর্তী হয়ে ব্যাপারটা কি জানতে তাদের নিকটে গিয়ে শুনলাম যে, দালাল মশায় কাশীর সুবকদের বোকাছেন যে, প্যাণ্ডেলের ভিতরে গিয়ে দেখবার বিশেষ কিছু নেই। তিনি মাত্র ২৩ খানা টিকিট কিনেছিলেন। তিনি বললেন যে, তোমারা কয়জন ভিতরে গিয়ে দেখে এস। পরে ঐ টিকিটের বলে ক্রমে ক্রমে তোমারা সকলেই কংগ্রেস দেখতে পারবে। স্বরাজ্য দলের স্বপক্ষে রায় প্রকাশ হওয়ায় আর ভোটাভুটির বেশী গুরুত্ব নেই ভেবে এই স্লোগানে

দালাল মশায় প্রতিনিধিদের কি ব্যবস্থা কিছু টাকা হজম করার চেষ্টার ছিলেন।

২-৩০টার সময় নির্গাচিত সভাপতি মশায় শোভা-যাত্রা সহ প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ডায়াসে তাঁর আসনে উপবেশন করলেন। ডাঃ আনসারী, মোলানা মহম্মদ আলী, শ্রীমতী কস্তুরীবাই গান্ধী প্রবেশকালে বিপুল হর্ষধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থিত হলেন।

সেই যমুনালাল বাজাজ ও বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে একদল নাগপুর সভাপ্রার্থী জাতীয় পতাকা সহ জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে যখন প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করল তখন সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকমণ্ডলী তাদের বিপুল হর্ষধ্বনি দ্বারা অভ্যর্থনা করল। কিছু দেরিতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের প্রবেশ করলে তাঁকেও অহুস্রপভাবে অভ্যর্থনা করা হল।

এবারকার কংগ্রেসে অহুস্রপাতকারীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গয়া কংগ্রেসের একচ্ছত্র নায়ক মিঃ রাজাগোপালাচাৰী এবং প্রবীণ দেশপ্রেমিক নাগপুর কংগ্রেসের সভাপতি বিজয়রামবাচারিয়া।

যথারীতি জাতীয় সঙ্গীতের পর সভার কার্য আরম্ভ হল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ আনসারী উদ্ভূত তাঁর অভিভাষণ পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর ভাষণে এতই আরবী ও পারসী শব্দ ছিল যে অধিকাংশ প্রতিনিধি তার এক বর্ণও বুঝতে পারেন নি। অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ করার পরেই মাস্তাজ, উৎকল, বার্মা (তখন পর্যন্ত বঙ্গদেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল) প্রভৃতি ব্লক থেকে “ইংলিশ”, “ইংলিশ” ধ্বনি উঠতে লাগল। তা ছাড়া ডাঃ আনসারীর কণ্ঠস্বরও দুর্গল। দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল না।

ডাঃ আনসারী তাঁর অভিভাষণে প্রথমে সভাপতি মশায়ের গুণাবলী কীর্তন করে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং নাগপুর সভাপ্রার্থীদের প্রতি তাঁর প্রকার্য দিলেন। তারপর তিনি অস্তিত্ব কথার পর বললেন যে খিলাফতের দাবি আংশিক ভাবে পূরণ করা হয়েছে

এবং মুসলিম চুক্তিপত্রে এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট কিন্তু এখনও কাজিবাড়-উল-আর: বিদেশীর অধীনে আছে। এই সকল অস্তিত্ব প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে স্বরাজ অর্জন।

অতঃপর তিনি হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ, তর্ক ও সংগঠন আন্দোলন, মালাবার ও মোপলাদের কার্যাবলি এবং দেশের ঐক্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচন করলেন।

তারপর তিনি কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্নে কংগ্রেসে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে তার উল্লেখ করে বললেন যে বিবাদমান উভয় পক্ষের মধ্যে মিলনের জন্য একটু সমাধান করতেই হবে। তিনি আশা প্রকাশ করলেন যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক বিরোধ দিল্লীর এই কংগ্রেসে কবর দেওয়া হবে।

পাঁচশেষে তিনি কেনিয়ায় ভারতবাসীদের সমস্ত উল্লেখ করে মন্তব্য করলেন যে, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী কেনিয়ায় ভারতবাসীদের হৃদশা দেখে মর্মান্বিত হয়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন যে ভারতের হৃদশার প্রতিকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দ্বারা হবে না।

ডাঃ আনসারী আসন গ্রহণ করার পর, সভাপতি মোলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর ভাষণ দিয়ে উঠলেন। ঐর ভাষণে ডাঃ আনসারীর ভাষণ অপেক্ষাও হৃৎকোষী। তিনি এত বেশী আরবী ও পারসী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন যে তা অধিকাংশ প্রতিনিধির পক্ষে বোঝা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন কি, বিহার মুক্ত প্রদেশ ও হিন্দীভাষী মধ্য প্রদেশের প্রতিনিধিরাও সভাপতি মশায়ের বক্তৃতা বুঝতে পারলেন না। অস্তিত্ব প্রদেশের প্রতিনিধিদের ত কথাই নেই।

যাই হোক, অস্তিত্ব কথার পর সভাপতি মশায় বললেন যে, তিন বৎসর সংশোধিত নতুন কাউন্সিলে কাজ করার পরও লবণের উপর ট্যাক্স রদ না করার এবং সিভিল সাভিসে ভারতীয়দের নিয়োগের প্রতিশ্রুতি পালন না করার এবং সর্বশেষে কেনিয়া সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তে মজারিটগণ মোহরুস্ত হয়েছেন এতে তিনি আনন্দিত।

সভাপতি মশায় তারপর তুরস্কের সামরিক ও রাজনৈতিক সাফল্যের উল্লেখ করলেন। তিনি জানালেন, ভারতের সাহায্যের জন্য কার্যে ও ইচ্ছায় (কনট্যাক্টিনোপোল) মহাত্মা গান্ধীর নাম সাংকেতিক চিহ্ন (watch word) হিসাবে গণ্য হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে খিলাফত আন্দোলনে সাহায্য মহাত্মা গান্ধীর ভারতে সব চেয়ে বড় কাজ এবং তুরস্কের বাইরে তুরস্ককে সাহায্য করার জন্য যদি কেউ ধন্তবাদের পাত্র বলে গণ্য হন তা হলে তিনি নিঃসন্দেহে মহাত্মা গান্ধী।

সভাপতি মশায় তারপর পৃথিবীর নানা স্থানের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তারিত বললেন।

তারপর তিনি জাতীয় সংগ্রামের অগ্র হিসাবে অসহযোগ আন্দোলনের গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

সভাপতি মশায় এরপর কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্নে মতবৈধের বিস্তারিত আলোচনা করলেন। তিনি ২২খ প্রকাশ করে বললেন যে, কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্নে এত শক্তি নষ্ট হয়েছে, যেন এর উপরেই জাতীয় সংগ্রামের অন্তিম নির্ভর করছে। তিনি আভ্যন্তরীণ প্রকাশ করলেও যে, যদি গণ্য কংগ্রেসের পর তাঁরা একতাবদ্ধ থাকতেন এবং বর্তমান বংসর কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্নে নষ্ট না করতেন তা হলে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে ফাটল দেখা দিত না।

এরপর তিনি আইন অমান্ত সম্বন্ধে বললেন যে, মহাত্মা গান্ধী ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা দিয়েছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, ভারতের মুক্তি ও স্বাধীনতা একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বেই অর্জন করা যাবে। আইন অমান্ত একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ব্যাপার। যদিও আপাততঃ তাঁরা আইন অমান্ত না করেন, তাঁদের আত্মরক্ষার্থে আইন অমান্তের উপর বিশ্বাস রাখা কর্তব্য এবং সময় উপস্থিত হলে ঐ আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যিক।

তিনি কাউন্সিলে প্রবেশ সম্বন্ধে বললেন যে, যদি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধে হয় তা হলে তা বিনা প্রস্নে মেনে নিতে হবে, কারণ প্রস্নটা এমন প্রণীত নয় যার জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করাও সম্ভব হবে।

উল্লেখ্য যে সম্বন্ধে তিনি আশ্বাস দিলেন যে, যদি

কংগ্রেস কোন সভ্যব্রহ্মনক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা হলে তাদের কোন আপত্তির কারণ থাকবে না।

সভাপতি মশায় তারপর হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করলেন যে, যখন ঐক্যের একান্ত প্রয়োজন, যখন সমস্ত জগৎ তাঁদের স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষা শোনার জন্য উদ্বেগিত হয়েছে, ভারত এখন দাসমনোভাব জনিত নির্লক্ষ্যতা এবং দাস্যের কাঙ্ক্ষা রচনা করছে। স্বরাজ ও খিলাফতের পরিবর্তে এক এক জগীর শোনা যাচ্ছে—“মুসলমানের হাত থেকে হিন্দুকে বাঁচাও” এবং “হিন্দুদের হাত থেকে মুসলমানকে বাঁচাও।” তিনি সকলের নিকট ভগবানের নামে প্রার্থনা করলেন যাতে তাঁরা এখন এখানেই স্থির করেন,—ভারত তাঁর স্বাধীনতার আশা আকাঙ্ক্ষা রক্ষা করবে, না সেট আকাঙ্ক্ষাকে সাহায্যানুর আশ্রয় স্বত্বাধীন মুক্তিকার ব্যবস্থা করবে।

তিনি বর্তমান সময়ে হিন্দু সংগঠন ও শুদ্ধ আন্দোলনের বিষয়বিত্তা করেন।

সভাপতি মশায় তারপর মূলতানে মুসলমানদের অমাত্রায়িক কর্তব্যের তীব্র নিন্দা করলেন এবং অবিলম্বে জাতীয় কল্যাণ এবং উভয় সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি জ্ঞানমূলক প্যাঙ্ক (জাতীয় চুক্তি) করতে বললেন। তিনি আরও বললেন যে, উভয় সম্প্রদায় থেকে সদস্য নির্বাচন করে আগামী কংগ্রেসে দাখিল করার জন্য একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করতে একটি সিলেক্ট কমিটি নির্বাচন করা কর্তব্য।

পাশেই তিনি উভয় সম্প্রদায়ের নিকট একযোগে কাজ করার জন্য আবেদন জানিয়ে তাঁর অভিভাষণ সমাপ্ত করলেন।

তারপর সভাপতির নির্দেশে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক গোপালকৃষ্ণ বাবা কংগ্রেসে যোগ দিতে অসমর্থ হলে শুভেচ্ছামূলক বাতা প্রেরণ করেছেন তাঁদের নাম পড়ে শোনালেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—বিজয়রামবাচারিয়ার, শেখাতি আরার, শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ট, রাইট অনারেবল শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, শ্রী শঙ্কর নাথার, জি এম, ভূরগুণি, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও শেঠ চোটারী।

একটি জাতীয় সঙ্গীতের পর সোভিনের মত অধিবেশনের কার্য শেষ হল।



# নাট্যরীতি

ধীরেন্দ্রনাথ বসু

সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, রূপসজ্জা, ইন্দ্রজাল, আলো, কৃত্রিম শব্দ, বস্তৃত্ব, এই সমস্ত কলা-কৌশল মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ মঞ্চাভিনয়। একত্রে এত কলার সমন্বয় আছে বলেই মঞ্চাভিনয় চিত্তাকর্ষক। স্থির সীমায় পূর্ণ একটি ঘটনা দেখাতে হয়, অথচ দর্শককে বোঝাতে হয় সীমাহীন স্থান ও কাল। তাঁদের মোট আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা অব্যাহত এই ধাঁধায় অভিভূত করে রাখতে হয়। ঘটনাটিকে এমন ভাবে পরিবেশন করতে হয়, যেন তা বাস্তব সঙ্গীতিক দ্বিধা।

অভিনয়ের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে লোকশিক্ষা। কি জাতীয়তাবোধে—কি সমাজ চরিত্রগঠনে। মানবচরিত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলিকে—পরোপাচিকারী, পরার্থে আত্মত্যাগ, সত্যাহ্বার, সত্যী ধর্ম, সৌহার্দ্য, পিতৃভক্তি, ভগবৎভক্তি, অভিনয়ের ভিত্তি দিয়ে গণমনে সংক্রামিত করাতে হয়। আবার এগাও দেখা যায় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক অভিনয়ের দ্বারা বর্ণজ্ঞান না থাকলেও গণমনে ধর্ম ও ঐতিহাসিক জ্ঞান সহজেই সঞ্চার করা সম্ভব। সেই হেতু অভিনয়ের বহিতে যে কোন দিক দিয়ে অন্ততঃ একটা আদর্শ থাকতেই হবে। অবশ্য বই-এর বিষয়বস্তু নির্গাচন করেতে হবে দর্শকের ক্রটি প্রাতি লক্ষ্য রেখে। দর্শকের ক্রটি যেমন অতি নিয়ন্ত্রণের অভিনয়ের বই দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণী হতে উৎসাহিত করা সমীচীন নয়—তেমনি সমীচীন নয় ভাষী বা অতি উচ্চস্তরের অভিনয়ের বই দেখিয়ে ক্রটিকে জোর করে উৎসাহিত করাবার প্রচেষ্টা।

যুগোপযোগী অভিনয়ের বই পৃথিবীর সর্বত্রই অভিনীত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হবেও।

নামকরা পুরোনো লেখকের লেখা অভিনয়ের বই এমন অনেক আছে যেগুলি বর্তমানে অচল আবার এমন পুরোনো লেখকের লেখা বইও আছে যেটা সঙ্গ কালের। পাস্তাভা ভাষায় যেমন—সেন্সপারার, মেটার-লিক, গেটে, চেকভ, পুশ্চকিন, গোর্কী; বাংলা ভাষায় তেমনি—মাইকেল, গিরীশচন্দ্র, কীরোরপ্রসাদ, বিজ্ঞান-লাল রায়ু ও রবীন্দ্রনাথ সঙ্গকালের।

অতীতে বাংলাদেশের প্রাতিটি রঙ্গমঞ্চে দক্ষ অভিনেতার ও অভিনেত্রীর প্রাচুর্য ছিল। অধিকাংশ অভিনয়ের বই ঐ সমস্ত দক্ষ অভিনেতার প্রাতি দৃষ্টি রেখে লেখা হ'ত, তাঁরা নিজেরাই নিজের দক্ষতায় অভিনয়কে সাকল্যমণ্ডিত করে তুলতেন। আবহ সঙ্গীত, প্রতীক শব্দ, স্থূলিত স্বর, আলো, ইন্দ্রজাল, দৃশ্যসজ্জা ইত্যাদির প্রাচুর্যকে মনে করতেন অপ্রয়োজনীয়। ঐ সবে প্রাচুর্যে দর্শক কি করে তাঁর দৃষ্টি অভিনেতার ওপর স্থির রাখবেন? এইটিই বোধহয় কারণ ছিল ও সবে রঙ্গ ব্যবহারের।

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে যে সমস্ত যুগোপযোগী অভিনয়ের বই লেখা হচ্ছে তার বেশীর ভাগের ভিতর দেখা যায়, সবার পূর্ণ সহযোগিতা না পেলে অভিনয় সঙ্গীত হ্রাস হয় না। অভিনয় আর অতীতের মত শুধু গুটি তিন-চার দক্ষ অভিনেতার ওপর নির্ভর করে না। এই সহযোগিতা কেবলমাত্র অভিনয়ের ক্ষেত্রেই নয়, সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়, সবার সহযোগিতা ছাড়া

কোন কার্যই সুসমাধা হয় না। এইটিই গুণধর্ম। আজকালকার অভিনয়ে শুধু অভিনয়ের বই, অভিনেতা, দৃশ্যসজ্জা, কণ্ঠসঙ্গীত এবং স্থির আলো দিয়ে চলে না। অভিনয়ের সাথে আবহ সঙ্গীত, শ্রীতক শব্দ, স্থূলিত বঙ্কার, আলোর খেলা, ইন্দ্রজাল ইত্যাদিরও প্রয়োজন। সব কিছু মিলে সৃষ্টি করতে হয় সাম্প্রতিক কালের একটি পূর্ণাঙ্গ মঞ্চাভিনয়।

আবার পাশ্চাত্যদেশে আজকাল বহুস্থানে চেষ্টা চলেছে অভিনয়ের বাহ্যিক আড়ম্বর কমিয়ে আনবার। তাঁরা অভিনয়ের বই এবং অভিনেতার ওপর প্রাধান্য দিতে চাচ্ছেন বেশী। এর পেছনেও একটা যুক্তি আছে। এছাড়া আমাদের দেশেও সপ্তের অভিনেতাদের প্রায়ই দেখা যায়, স্থানীয় লেখকের লেখা অভিনয়ের বইয়ের প্রতি অজুরাগ।

ইদানীংকালে পৃথিবী জুড়ে প্রচেষ্টা চলেছে অভিনয়কে আকর্ষণীয় করে তোলবার এই ধরনের নানা পরীক্ষা আর নিরীক্ষা। চলেছে অভিনয়েতে বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন, পরিবর্জন বা সংযোজন। আমাদের বাংলাদেশও সে সবে পিছিয়ে নেই। কেউ চাচ্ছেন অভিনয়ে আজকের প্রাচুর্য্য, কেউ বা চাচ্ছেন তার সবটুকুরই বিলুপ্তি। আবার বইএর অভাবই আকর্ষণ না হবার মূল কারণ মনে করে হ'চ্ছে বিদেশী নাটকের অহুবাধ ও অজুরাগ, সৃষ্টি হ'চ্ছে ভাবপ্রধান নাটকের, পরীক্ষামূলক নাটকের আর রহস্যভিনয়ের। কিন্তু দক্ষ অভিনেতা ছাড়া কোন পরীক্ষাতেই কি সফল হওয়া সম্ভব? আজ বাজলার রঙ্গমঞ্চে এঁদের অভাবটাই যেন হ'য়ে উঠেছে একট। কাজেই সবার প্রথমে সু-অভিনেতা সৃষ্টি করার পরীক্ষাতে প্রয়াসী হওয়াই উচিত।

অভিনেতাদের সম্বন্ধে অনেককিছুই বলবার বা ভাববার আছে। অপেশাদারদের থেকে পেশাদার তাঁরা তাঁদের কাছে থেকেই অভিনয় ভাল ভাবে দেখবার আশা সবাই করে থাকেন। কারণ তাঁরা ভাল অভিনয় করার চেষ্টা করে থাকেন, যেহেতু বিনিময়ে তাঁরা অর্থ পান এবং এইটিই তাঁদের পেশা। অপেশা-

দারের কাছে যেটা মার্জ্জনীয়, পেশাদারের কাছে সেটা অমার্জ্জনীয়। কিন্তু পেশাদার ও অপেশাদার উভয়েরই অভিনয়কে চিত্তাকর্ষক করে তুলবার পদ্ধতিগুলিতে সম্যক অভিজ্ঞতা থাকাটাও প্রয়োজন।

মঞ্চাভিনয়কে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে কেবল অভিনয়ের বই, দৃশ্যপট, কেন্দ্রীভূত আলোকবিন্যাস, স্থূলিতবঙ্কার ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে সু-অভিনয়ের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি বজা করা আবশ্যিক। সু-অভিনয় সৃষ্টি করতে সু-অভিনেতার প্রয়োজন। সু-অভিনেতা হ'তে গেলে অনেক কিছুই জানবার আছে, যেমন,

- (১) শৃঙ্খলা।
- (২) অভিনয়ের বই ও চরিত্র জ্ঞান।
- (৩) মহড়া।
- (৪) কণ্ঠস্বর।
- (৫) ভাব।
- (৬) প্রথম অভিনয় রঙ্গনী।
- (৭) অভিনয়ের আইন।

নব্য অভিনেতাদের এগুলিকে মনে চলেতেই হ'বে, তাছাড়া আরও কিছু জানবার আছে। প্রথমেই অভিনেতা সাজতে যাওয়া সমীচীন নয়। ঘাপে ঘাপে শিক্ষা করে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে হয়। নানা রকমের অভিনয় ও অভিনয় সম্বন্ধীয় দেশী বিদেশী বই পড়তে হয়। এই অভ্যাস জীবনে কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়। তারপর নানা রকম কবিতার আবৃত্তি অভ্যাস করতে হবে। এতে—ভাল, মন্দ, গুলার কাজ শিক্ষা হবে। দর্শকের ক্রটি এবং নিজেদের দক্ষতা বুঝে, ভাল বই অভিনয় করার জন্য বেছে নিতে হবে। সবাই সুনাম চায়। বিশেষ করে শখের নব্য অভিনেতারা। শখের অভিনেতাদের সেইজন্য সে রকমের বই, যার ভাষা ও সংলাপ কাঁচা, ঘটনার বাঁধন নেই, কোন কিছু দেখাবার বা শিখাবার নেই, সেই বই অভিনয় করতে গেলে ব্যর্থ হওয়া স্বাভাবিক।

অভিনয় শুরু করতে নব্য অভিনেতাদের কর্তব্য

এখানে গীতিনাট্য। পরে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক অভিনয়। তারপর গ্রহসন ও রহস্যভিনয়। সামাজিক সবার শেষে শিখতে হয়। আবার সামাজিক ভালমত রপ্ত হয়ে গেলে সাক্ষর করে ধরতে হতে বিশেষ চরিত্রকে নিয়ে লেখা অভিনয়। যেমন সেকালের বা একালের কোন দেশনেতার (সমাজসেবী, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা শিক্ষাবিদেব) চরিত্র নিয়ে লেখা বই। নিজের চরিত্রের প্রতি কেবল দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে, অভিনয়ের ও মঞ্চের প্রতিটি বিষয়ের এবং কার্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে—বুঝতে হবে, সবার সাথে আলোচনা করতে হবে। মোট কথা মঞ্চে যেতে দেবার বাসনা যেন মনে কখনই না জাগে।

দুচারটি অভিনয় ক'রে পরিচালক হ'তে যাওয়া খুব ভাল। কারণ পরিচালক তিনিই হবেন যার অভিনয় মঞ্চে সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়েছিল। দৃশ্যসজ্জা, রূপ-সজ্জা, আলো, সঙ্গীত, কৃত্রিম শব্দ, অভিনয়, অভিনয়ের আইন ইত্যাদি বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান যার আছে তিনিই পরিচালনা করার সাহস ক'রতে পারেন, অপরে নন।

## “অভিনয়ের আইন ও মঞ্চের ভৌগোলিক পরিচিতি”

অভিনয়ের আইন:—

প্রতিটি কার্যেরই এক-একটি বিশেষ ধরণের প্রয়োগ পরীক্ষিত বা আইন থাকে। আইনটা কি? অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা পরীক্ষানিরীক্ষা এবং বিচার-বিবেচনা ক'রে যে কার্যপদ্ধতি প্রায়ঃ ব'লে নিরূপিত হ'য়েছে, যেগুলিকে সবাই অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা ব'লে বিনা প্রশ্নে মেনে চলেন, সেইগুলিকেই সবাই ধ'রে নেন আইন বা নিয়ম ব'লে। দেখা গেছে মানলে অফল, না মানলে কুফল। প্রশ্ন না ক'রে সেই ভাবে চলতে শিখলে বোঝা যাবে এর কার্যকারিতা। যে স্থানের নিয়ম বা আইন নিয়ে প্রশ্ন, সেই স্থানের—ভৌগোলিক পরিচিতি,

আচার ব্যবহার, সবকিছু না জানা থাকলে নিজে সেখানে ঝাপ ঝাওয়াতে পারা যাবে না। অভিনয়ে স্থান, অভিনয়ের মঞ্চ। সেই মঞ্চের ভূগোল ও মানচিত্র পূর্বেই জেনে রাখতে হয়। কোন্ স্থানের কি নাম—কি জন্তু বিখ্যাত—রাস্তা কোথা দিয়ে কোথায় গে—কি ভাবে হাঁটতে হবে, ব'লতে হবে ইত্যাদি পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা দেখেছি এ সমস্তই লেখ থাকে। কিন্তু মঞ্চে এগুলি কিছুই লেখা থাকে না—অথচ আছে সবই। কাল্পনিক এই সমস্ত রাস্তা ও স্থান মঞ্চে ভাল জ্ঞান না থাকলে, আইন বা নিয়ম মেনে চলা অসম্ভব হ'য়ে পড়বে। মহড়াকক্ষের মেঝেতে এ মানচিত্র রং দিয়ে অঙ্কন ক'রে নিলে খুব ভাল হয়।

মহড়াকক্ষের মেঝেতে আঁকা মঞ্চে কাল্পনিক রাস্তাঘাট, স্থান, সবকিছু দেখে মনে গেঁথে রাখবার সুবিধা হয়। পরে কক্ষের মেঝেতে দাঁড়িয়ে মঞ্চের কাল্পনিক রাস্তা, স্থান, কোনটি কোথায় সবকিছু দেখে এবং মনে মনে চিন্তা ক'রে চলবার অভ্যাস হ'য়ে যায়। তারপর মঞ্চে দাঁড়িয়ে মেঝে দেখতে হ'য়ে না, কল্পনাতেই কাল্পনিক রাস্তাঘাট ও দাঁড়বার কক্ষ এবং কেন্দ্র বুঝে চলতে পারা যাবে। দেখা যাবে মহড়াকক্ষের মেঝেতে যে ভাবে চলাফেরা ক'রেছেন, ঠিক সেইরকম ভাবেই চলছেন সবাই, কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

অন্ধকার ঘরে, ঘরের সবকিছু যে জানে সে স্বাভাবিক ভাবেই চলে—ভুল হয় না। কিন্তু যে জানে না কিছুই ঘরের আগে থেকে, তার চলা স্বাভাবিক হ'তে পারে না কেবল ভুল আর ভুল। কেবল চেয়ার টেবিলের সাথে আঘাত লাগছে, দয়জা জানালা ঠিক পাচ্ছে না কোথায় তাই সে চলছে ধীরে ধীরে, অস্বাভাবিক ভাবে হাতড়াতে হাতড়াতে। বোঝা যাবে এ কক্ষে তার এ প্রথম প্রবেশ।

কতকগুলি বিষয়ের প্রতি অভিনেতার বিশেষ দৃষ্টি রাখা ক'রে চলতে হয়, মঞ্চের ও অভিনয়ের নিয়ম বা আইন মেনে চলতে। যেমন:—

(ক) মঞ্চের ভৌগোলিক পরিচিতি। Geography of stage.

(খ) ৪৫ অক্ষ। (45 Axis.)

(গ) প্রবেশ ও প্রস্থান। (Entrance and Exit.)

(ঘ) বিরাম। (Pause.)

(ঙ) দৃষ্টির ব্যাখ্যাত। (উপেক্ষা-Covering.)

(চ) বিজ্ঞাপন। (Grouping) ও সমন্বয়। (Adjustment.)

(ছ) চলন বা গতিভঙ্গি। (Movement.)

(জ) গতির দৈর্ঘ্য। (Length of movement.)  
এবং কাটা ঘাতি। (Cross.)

(ঝ) পদক্ষেপন। (Foot work) ও আবর্তন। (Turning.)

(ঞ) অঙ্গভঙ্গি। (Gesture.)

(ট) অভিনেতার সাধারণ জ্ঞান। (Common knowledge of an actor.)

(ঠ) মঞ্চের ভৌগোলিক পরিচিতি :-

অভিনয়ের মঞ্চ সাধারণতঃ তিন প্রকার :- পৃষ্ঠ, পক্ষ ও ঘূর্ণায়মান। মঞ্চের মেঝেতে কঠোর তক্তা পাতা। হুপাশে হুটের দেয়াল দেওয়া। দেয়াল থেকে তক্তা পর্যন্ত স্থানকে বলে—মঞ্চের “পক্ষ” (wing)। কারণ মঞ্চে বাবতারোপযোগী সব কিছু দ্বাই এই স্থানে ঢেকে রাখতে হয় প্রয়োজনীয় দৃশ্যপট দ্বারা। সামনে দর্শক ও মঞ্চের মধ্যে খোলা। হুপাশ, ওপরে ও নীচে, হুটের দেয়াল বা অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ঢেকে দেওয়া। হুটিকে দুই সাজাঙ্গা—প্রক্ষাগার ও রঙ্গমঞ্চ। শুধুমাত্র দৃষ্টিবিনময় চলে এপারে ওপারে—পায়ে চলাচল আইনতঃ নিষিদ্ধ। একে বলে মঞ্চের সীমান্ত (Proscenium)। পেছনে হুটের দেয়াল। এরা তত্ত্বের দিকটা খুঁস ও নীল রং করা। ইচ্ছা করলে আকাশ রূপে ব্যবহার করা যায় বলে। সীমান্তের পরে আছে পর্দা। তার পেছনে হুপাশে হুটী কাঠামো—মোটী কাপড় দিয়ে ঢাকা এবং রং করা। যাতে ভিতরের আলো বাইরে যেতে না পারে। মেঝের সাথে

আটকান এই কাঠামোকে বলে “পীড়ক কাঠামো” (Tormentor)। দর্শকের চোখে দৃশ্য দেখবার ব্যাখ্যাত ও বিবর্তিতকর বলে—“পীড়ক”। এর সাথে ভিতরের দিকে কজা দিয়ে আটকান আরেকটি পীড়ক কাঠামো আছে। এটি স্থান থেকে দৃশ্যসজ্জা গুরু করতে হয়। এর ওপর দিকটাতে আবার একটি মোটা কাপড়ের ঢাকা রং করা কাঠামো ঝোলানো আছে—দৃশ্যপটের মাথা ঢাকবার জজ। প্রাক্ত দৃশ্যে এটিকে ওঠানো নামানো করা চলে। দর্শকের একে বলে মঞ্চের “শীর্ষ প্তন” (Feaser)।

দর্শকের নিকটের দিকের মঞ্চের অংশকে “নীচমঞ্চ” (Down stage) এবং দূরের দিকের অংশকে “উপমঞ্চ” (Up stage) বলে। কোন বস্তু বা অভিনেতার সামনে কেউ দাঁড়ালে, তাকে “সহ বস্তুর বা চারত্বের “নীচে” (Below) এবং পেছনে থাকলে বলে “উপরে” (Above)। বাস্তবের দিকে থাকলে বলে—“বাহির মঞ্চ”। অভিনেতার বা দিকের মঞ্চকে—“বাম মঞ্চ” এবং ডানদিকের মঞ্চকে—“দক্ষিণ মঞ্চ” বলে।

এক পীড়ক কাঠামো থেকে ওপর পীড়ক কাঠামো পর্যন্ত সরলরেখাকে বলে “পীড়নরেখা” (Tormentor-line)। “পীড়নরেখা” এর জায়গা বা বাইরে পর্দা এর স্থান দিয়ে চলে দর্শকের মনকে এবং দৃষ্টিকে পীড়িত দেয় বলে। পীড়নরেখার সমান্তরালে সীমান্ত বরাবর মঞ্চের সামনের রেখাকে বলে—“পাদপ্রদীপ”। সারিবদ্ধ আলো এটি রেখার ওপর দিতে থাকে বলে—“পাদ-প্রদীপ”। মঞ্চের পশ্চাত্তরেখা ও পীড়নরেখার সমান্তরালে। পীড়নরেখার মধ্যবিন্দু থেকে পশ্চাত্তরেখার ওপর খাড়া লম্বকে বলে—“মধ্যরেখা”। মঞ্চের মধ্যস্থানকে বলে—“মঞ্চের ওপর” (On stage)। পীড়নরেখা থেকে পশ্চাত্তরেখা পর্যন্ত মঞ্চের অংশ—অভিনেতার ডান ও বাঁকে মঞ্চের ডান ও বাম ধরা হয়েছে। লেখাও সেভাবে। মঞ্চের কাল্পনিক রেখাগুলিকে (Axes) “অক্ষ” বলে। পীড়ন রেখা, মধ্যরেখা, পূর্বেই জেনেছি। পশ্চাত্তরেখা, পশ্চাত্তরেখার বা

দৃশ্যপটের হ'তে পারে। যাকে পীড়নরেখার ওপর তিনটি চিহ্ন ক'রে রাখা ভাল। অভিনেতা বুঝতে পারেন, কোথায় মধ্যরেখা, কোথা দিয়ে খাড়া অক্ষ চলে গিয়েছে।

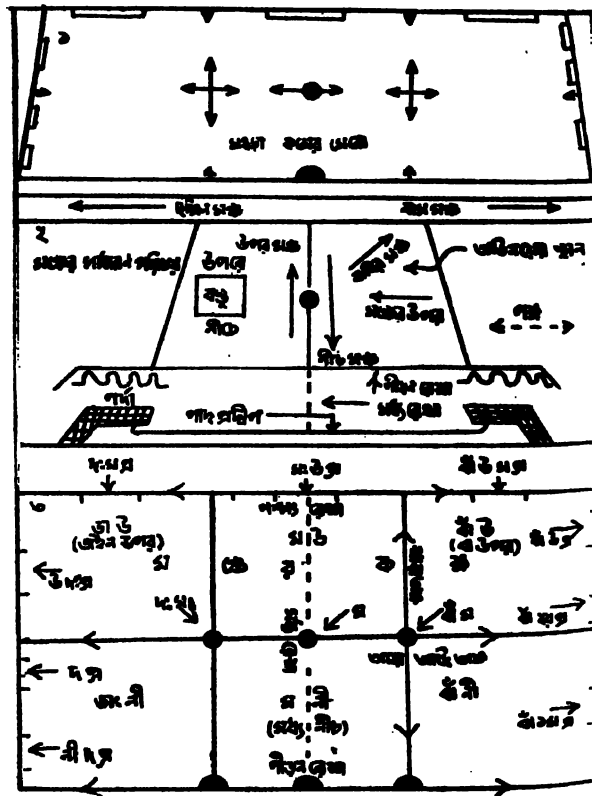
কতকগুলি কার্যনিক রেখা দিয়ে মঞ্চকে ছয়টি কক্ষে বিভক্ত করা হয়েছে। পীড়ন রেখার উত্তরপার্শ্ব থেকে পীড়নরেখার মধ্যবিন্দু পর্যন্ত রেখাকে আবার সম দুইভাগে বিভক্ত ক'রে মধ্যরেখার সমান্তরালে কতকগুলি রেখা দৃশ্যপটের বা পশ্চাৎ দেয়ালের পশ্চাৎ রেখার ওপর টেনে দেওয়া আছে। এগুলিকে বলে—“খাড়া অক্ষ” (Direct Axes)। প্রধান দুটি খাড়া অক্ষ কিন্তু সৃষ্টি ক'রেছে পীড়নরেখার উত্তরপার্শ্ব থেকে খাড়া অক্ষ এবং এক খাড়া অক্ষ থেকে অপর খাড়া অক্ষ সম ভাগ। মধ্যরেখার মধ্যবিন্দুতে মঞ্চের আড়াআড়িতে পীড়নরেখার সমান্তরালে একটি রেখা আছে। একে বলে—“আড়াআড়ি অক্ষ” (Transverse Axis)। এইরূপ অনেকগুলি আড়াআড়ি অক্ষ এবং খাড়া অক্ষ সমস্ত মঞ্চের ওপর আছে। প্রধানতঃ দেখা যাচ্ছে দুটি খাড়া অক্ষ, একটি আড়া অক্ষ, এবং পীড়নরেখা ও পশ্চাৎরেখা মিলে মঞ্চকে ছয়টি কক্ষে (খোপে) বিভক্ত ক'রেছে। মনে রাখতে হবে পশ্চাৎ রেখা শুধু পশ্চাৎ দেয়ালেরই নয়, দৃশ্যসজ্জারও পশ্চাৎরেখা বোঝায়। সেই সজ্জা খোপাগুলি দৃশ্যসজ্জাতে ছোটবড় হ'তে পারে।

প্রধান আড়া অক্ষ মধ্যরেখার যে বিন্দুতে ছেদ ক'রেছে তাকে বলে—মধ্যবিন্দু বা “ম” এবং প্রধান দুই খাড়া অক্ষকে যে বিন্দু হুটিতে ছেদ ক'রেছে, সেই বিন্দু দুটির মধ্যে ডাইনেব টিকে—“দক্ষিণ মধ্যবিন্দু” এবং বাঁদিকেরটিকে “বাম মধ্যবিন্দু” বলে। যাকে এই আড়া অক্ষের দুই প্রান্তে পক্ষের ভিতর দিকে মেঝের ওপর দুটি নীল আলো রাখলে অভিনেতা বুঝতে পারেন কোথায় আড়া অক্ষ। একে বলে—“মেঝে প্রদীপ” (Floor Lamp)।

এই সমস্ত স্থানের বিশেষত্ব খুব ভাল ক'রে মনে

রাখতে হবে। অভিনয়কে বাস্তব ও প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে এগুলি জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। অভিনেতার চরিত্র অনুসারে এবং ঘটনার তাৎপর্য অনুসারে এই সমস্ত স্থান নির্ধারিত ক'রতে যেন কখনই ভুল না হয়। পূর্বেই জেনেছি মঞ্চের কক্ষগুলির (খোপ) সৃষ্টি হ'য়েছে দুটি খাড়া অক্ষ, একটি আড়াআড়ি অক্ষ এবং পীড়নরেখা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছয়টি খোপ হ'য়েছে। অভিনেতার ডান ও বাঁকে ধ'রে খোপের নাম। মোটামুটি খোপগুলির অবস্থান ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা গেল :—

মঞ্চের কক্ষ ও বিভিন্ন স্থানের সংক্ষেপ নাম খুব ভাল ক'রে অভিনেতার মনে রাখতে হবে। কারণ এগুলি অভিনেতার ভূমিকাপত্রে লেখবার যেমন সুবিধা তেমনই সুবিধা পরিচালকেরও, অল্প কথায় বোঝাতে।



বাম উপৰ মঞ্চ।—এই স্থান দৰ্শকৰ পৰা দূৰে। কোমল  
(বী, উ) কিন্তু দুৰ্জল। সাধাৰণতঃ কম উল্লেখ-  
যোগ্য দৃশ্য এই স্থানে হয়। কোন  
ভয়াবহ, ঐশ্বৰিক, অপাৰ্থিব ভাব  
প্ৰকাশৰ স্থান।

ডাইন উপৰ মঞ্চ।—প্ৰায় বী, উৰ মত। তবে শক্তিশালী  
(ডা, উ) স্থান। কিন্তু বী, উৰ মত ভয়াবহ  
বা ভৌতিক নয়। সাধাৰণ দৃশ্য  
এখানে চলে।

ডাইন নীচ মঞ্চ।—উদ্ভেকক, শক্তিশালী এবং চট্ ক'ৰে  
(ডা, নী) দৃষ্টি পড়িব মত স্থান। গভীৰ প্ৰেম,  
মহাশয় ও দৰদ পূৰ্ণ ভাব প্ৰকাশৰ  
উপযুক্ত স্থান।

বাম নীচ মঞ্চ।—ডা, নীৰ মতই, তবে দুৰ্জল ও নরম  
(বী, নী) বেশী। সাধাৰণ প্ৰেমৰ স্থান। কিন্তু  
বিশেষ ক'ৰে এই স্থানে চলে—অপ  
প্ৰচাৰ, পৰিনিমিত্তা, হিংসা ও বড়বড়।

মধ্য উপৰ মঞ্চ।—দূৰে, কোমল, কিন্তু শক্তিশালী।  
(য, উ) যে দৃশ্য শেষ হ'বে দৰ্শকৰ সামনে তাৰ  
শুক এই স্থানৰ পৰা ক'ৰতে হয়।

মধ্য নীচ মঞ্চ।—শক্তিশালী, কোমল, উলঙ্গ (উদ্দেশ্য  
(য, নী) পূৰ্ণ বাক্য বা ঘটনায়)। যে দৃশ্য  
ঘটনাৰ বাত-প্ৰতিবাত চৰমসীমাৰ,  
কেবলমাত্ৰ সেই চৰম সীমাৰ বুদ্ধিৰ  
জন্ত এই স্থান একান্ত ভাবে সংৰক্ষিত।  
তাৰ অভিনেতাৰ। অনেক সময়ই  
এই স্থান ব্যৱহাৰ ক'ৰতে চান—খুব  
ভুল সেট। সেই দৃশ্যই ঐ স্থান  
পৰা পৰে এসে পুনৰায় অভিনয়ৰ  
সাথে সম্বন্ধ স্থাপন ক'ৰতে যাওৱাও  
হ'ব, আবার সৰে যেতেই উপৰ মঞ্চ  
আবৰ্ত্তন নিতে হয়। তখনই পূৰ্বে  
ঐ স্থানে যাৱাৰ উদ্দেশ্য ব্যৰ্থ হ'য়ে  
যায়।

আমরা লেখাপড়া কৰি বাদিকৰ পৰা ডান দিকে।  
মন ও চোখ সেইভাবে বুজতে ও দেখতে শিখেছে।  
তাই দৰ্শকৰ বাঁ দিকটো যত ভাল ক'ৰে মন দিয়ে  
দেখেন, ডান দিকটো তত নয়। মোটামুটি ধোপাগুলি  
সম্বন্ধে এইটুকু জেনে রাখা ভাল যে—অভিনেতাৰ ডান  
এবং দৰ্শকৰ বাঁ, অভিনেতাৰ বাঁ এবং দৰ্শকৰ  
ডান দিকৰ পৰা অনেক বেশী শক্তিশালী।



# রজনীকান্তের কল্যাণী

শেলেনকুমার দত্ত

রজনীকান্ত সেন ( ১৮৬৫-১৯১০ ) বাংলা সাহিত্যে একটি বিশ্বস্ত-প্রায় নাম। তাঁর মোট আটখানি কাব্য-গ্রন্থের অল্প কবিতা এবং গানের মধ্যে মাত্র দু'তিনটি গান—‘তুমি নির্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মুচায়ে’, ‘সেখা আমি কি গাহিব গান ?’, বিখ্যাত স্বদেশী সঙ্গীত ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়’ প্রভৃতি এবং কয়েকটি নীতিকবিতা ‘সার্থকতা’ ( মহাবীর নিখ এক পথ বাহ’ যায় ), ‘স্বাধর্প’ ( নর কহে খুলকণা, তোর জন্ম মিছে ) ও ‘স্বাধীনতার অর্থ’ ( বাবুই পাখিরে ডাক বলিছে চড়াই )—এই কটি রচনা ছাড়া অল্পাঙ্গ সমস্ত নীতি ও গীতি কবিতাই প্রায় বিশ্বস্তির অতলে। অথচ রজনীকান্ত একজন সার্থক গীতিকবি ছিলেন। তাঁর গান এক সময়ে বাঙালীর বিশেষ প্রিয় ছিল। জন্মশত-বার্ষিকীর দোতাই দিয়ে গত কয়েক বছরে তাঁর কাব্য-গ্রন্থের কিছু বিক্রি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সাহিত্য আলোচনা এবং কাব্য মূল্যায়নে কোন হের-ফের হয়নি।

রজনীকান্ত আজ তাঁর বখোঁচিত সমাদর থেকে বঞ্চিত হলেও তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ ‘বাণী’ ( ১৯০২ ) ও ‘কল্যাণী’ ( ১৯০৫ ) একসময়ে বখেট সমাদর পেয়েছে। বাণী গ্রন্থের গীতি কবিতাগুলি তাঁকে যেমন পরিচিতি দিয়েছে, কল্যাণী গ্রন্থের কবিতাগুলি তেমন তাঁকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এক সময়ে বাণী-কল্যাণী উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘটা রজনীকান্তের নামও প্রাসঙ্গিকভাবে এসে পড়ত।

কাব্যমূল্যের বিচারে বাণী উৎকৃষ্ট হলেও ‘কল্যাণী’ রজনীকান্তের অপেক্ষাকৃত পরিণত সৃষ্টি। সে কারণে কল্যাণীর গীতগুলি ভগবৎ-প্রেমের আত্মসমর্পণ চিন্তার হিমান্ঠ। প্রায় প্রৌঢ় বয়সের একটা মান খুসর আত্ম-চিন্তা কবিকে যেন নির্বড় ঐশ্বরিক প্রেমে বেঁধে রেখেছে।

কাব্য হিসেবে রজনীকান্তের দুটি পৃথক সত্তা ছিল—একটি প্রেমিকের, অপরাটি রাসিকের। আর অনিবার্য-ভাবে প্রেমিক সত্তায় যেমন রবীন্দ্রনাথের ছাপ দেখা যায়, রাসিক সত্তায় তেমন ছাপ দেখা যায় দ্বিজেন্দ্রলালের। কিন্তু সমসাময়িক দুই কবির প্রভাব থাকলেও রজনীকান্তের কাব্যাবলীর স্বকীয়তা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

কল্যাণী কাব্যের কবিতাগুলি ভক্তি ও রক্তরসে সিক্ত হলেও এ কাব্যের প্রতিটি গীতই কবির আত্ম-অনুভূতি এবং অমর পদ-ব্যঞ্জনার উৎকৃষ্ট হয়ে উঠেছে।

কল্যাণী কাব্যের ভক্তিরসের প্রতিটি গীত ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের আর্তিতে বেদনামধুর এই মরজগতের বহু উর্ধ্বে যিনি এই বিশ্বচরাচরকে চালন করছেন, যিনি অর্থ-হঃখ, উদান-পতন, বেদন-অখারভূতির সত্যিকারের নিরস্তা—সেই ঈশ্বরকেই তে তিনি প্রার্থনা করেছেন। তাঁর কাছেই তো কবি আত্মনিবেদন। তিনি যে সর্বব্যাপী, তাই তাঁর প্রেম কবি সর্বব্যাপ্ত দেখতে পেয়েছেন। তিনি যে বিচলরপ

সর্বত্রবিরাজী সেটি উপলব্ধি করতে পেরে কবি  
বলেছেন—

কত ভাবে বিরাজিছে বিশ্ব-মাঝারে।

মত্ত এ চিত্ত তবু, তর্ক বিচারে।

নিত্য নিয়তি বলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে,

তাম-বিটপী দলে, সুরসাল ফুল ফলে।

( অস্তি )

তিনি সর্বত্রবিরাজী বলেই তো তিনি বিচিত্ররূপী,  
বিভিন্ন স্থানে তিনি বিভিন্ন রূপ নেন; অথচ সব রূপের  
ওপরে তাঁর সেই প্রেমময় রূপই উজ্জ্বলিত—

শাশুর চিত্তে তুমি আনন্দরূপে রাজ,

প্রীতিরূপে জাগ পাতকীর প্রাণে;

প্রেমরূপে জাগ সত্যীর চিরামাবে,

স্নেহরূপে জাগ জননী-নয়ানে।

প্রীতিরূপে থাক প্রেমিক-প্রাণে সখা,

যোগি-চিন্তে চির উজল-আলোক;

অহুতপ্ত প্রাণে ভরসারূপে জাগ,

সাম্বন্ধরূপে এস যথা দুঃখশোক।

( তুল )

এই প্রেমময় যুটিই হল কবির আরাধ্য দেবতা।  
পদ্মে-পুষ্পে, রুদ্রে-অহুতুতিতে তিনি একাকার হয়ে  
আছেন। অথচ তিনি অসীম, অনন্ত, বিরাট। তাঁর  
স্বরূপ নেই বলেই তো তিনি অগুরুপ, আর এঁর আপামর  
জগৎই হল তাঁর বিশ্বরূপের প্রকাশ—

বিশ্ব-বিপদ-ভঞ্জন, মনোরঞ্জন, দুঃখহারী;

চিত্ত-নন্দন, জগৎবন্দন, ভব-বন্ধন-বারি;

সদয়ুয্যিত আকৃতিহীন, পঞ্চভূত-প্রকৃতি-লীন;

দীন-হীন-বহু, করুণা-সিদ্ধ, চিত্তবিহারী।

( আমার দেবতা )

এই চিত্ত-বিহারীই হলেন কবির উপাস্য দেবতা।

তাঁর এই বিরাট কবি যেমন দেখতে পেয়েছেন—

তুমি অজ্ঞান, বিরাট এ নির্ঝলব্যাপী

অহুত-অক্ষর।

( তুমি ও আমি )

ভেমনি অনুভব করতে পেরেছেন তুলনামূলকভাবে  
নিজের ক্ষুদ্রত্ব। তাই উপাসনা করতে গিয়ে, স্বয়ং  
সঙ্গীত নিবেদনের চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁর সংশয়  
জেরেছে—

কত দূরে আছি, প্রেমে, প্রেম-পারাবার?

তিনিতে কি পাবে বৃহৎ বিলাপ আমার?

( ভক্তিদ্বারা )

কিছু পরমুহূর্তে তাঁর মন কাঁঠন হয়েছে। তিনি  
তো চিত্ত-বিহারী, তবে কেন কবির এ ডাক? নি  
শুনতে পাবেন না। নিশ্চয়ই পাবেন। কবির অন্ত  
তাই বিশ্বাস জেরেছে—

আমি জানি তুমি আমারি দেবতা,

তাই আমি কাছে বারি হে;

তাই বলে ডাকি, প্রাণ বাহা চায়,

ডাকিতে ডাকিতে রুদ্র জুড়ায়;

যখন যে রূপে প্রাণ ভরে যায়,

তাই দোষ প্রাণ ভরি' হে।

( বিশ্বাস )

রুদ্রায়ুত্বভীতির বিচিত্র চিন্তায় সঙ্গীতভাণি একটি মধুর  
গীতি-কবিতার ব্যঞ্জনা যুগ্ম হয়ে উঠেছে। কল্যাণী  
কাব্যে কবি যেন নিজেকে সেই বিশ্বরূপের পদতলে  
নিবেদন করে অনুভব করতে পেরেছেন যে, পরম শান্তি  
এই আশ্রয়-নিবেদনই। কেন না তাঁর প্রেমরসেই তো  
এ মরজপং সঞ্চরণশীল; কবি তাই স্পষ্ট অনুভব করতে  
পেরেছেন—

নিজ বলে বলা করা, বিকল কেবলি,

ভব বলে বলী হলে তবে বলি বলী;

আমি ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখে, ফিরেছি তোমারি

দিকে,

( ঘোরে ) কাঁদাইয়া, বুয়ে লহ নয়ন-জলে।

( পরগণিত )

বাংলা গীতি-কবিতার ভাঙারে রজনীকান্তের এসব  
হ্রস্বগুলি অমূল্য সম্পদ। একটি নিটোল অপ্রবিশ্ল  
মত জঘাট হয়ে আছে। কল্যাণী কাব্যের কবিতাগুলি



সৌন্দর্য থেকে যেমন বর্ণস্পর্শী, তেমনি সাবলীল ব্যঙ্গনার  
সমধুর।

ভাস্কর্য গানে রজনীকান্তের সমধিক প্রসিদ্ধি  
হলেও, প্রথম জীবনেই তিনি হস্তরসাত্মক রচনার  
দক্ষতা দেখিয়েছেন। যিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘আমরা ও  
তোমরা’ হস্তরসাত্মক কবিতার প্রভাবে রজনীকান্ত  
প্রথম যে হস্তরসাত্মক কবিতা রচনা করেন, সেটি হল  
‘তোমরা ও আমরা’। যিজেন্দ্রলালের প্রভাব  
রজনীকান্তকে কিরণ প্রভাবিত করে, তা তাঁর এই  
পর্বায়ের কবিতাগুলি পড়লে বোঝা যায়। যিজেন্দ্র-  
লালের বিখ্যাত কবিতা ‘বিলেত ফের্তা ক’ ভাই’  
রজনীকান্তকে এত প্রভাবিত করে যে, কান্তকবি এই  
একটি কবিতার অনুসরণে হুঁটি কবিতা রচনা করেন।  
তার মধ্যে চারটি কবিতা কল্যাণী কাব্যের অন্তর্গত।  
হৃদয় এবং বাহ্যিক প্রকাশভঙ্গীতে যিজেন্দ্রলালের প্রভাব  
শাকলেও চিন্তাধারা এবং সূত্র বর্ণনায় যে এই কবিতাগুলি  
যত্ন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

রজনীকান্তের এই হস্তরসাত্মক কবিতাগুলিতে  
কোথাও কোন বিষয় বা আক্রমণ নেই। নির্মল হস্ত-  
রসের কবিতা এগুলি। হস্তরসাত্মক কবিতা রচনার যে  
বিংশতি প্রকাশভঙ্গী—সেটি কান্তকবির আয়ত্তে ছিল।  
হুঁ-একটি হুঁ তুলে ধরা যেতে পারে—

এক ভূতগর্বাঁ বিগত-যৌবন পুরুষ সখকে তিনি  
বলেছেন—

ছিল, দেহের বাহ্যিক কি।

সোনার কার্তিক, নখর গঠন, রসের আহারটি;

এখন, হাড়ের উপর চামড়া আছে, মাংস গেছে উড়ে।

(অসমর)

অন্তরুও যিজেন্দ্রলালের অনুসরণে রচিত চরিত্রচিত্র-  
গুলি যেমন নিখুঁত, স্বাভাবিক, তেমনি হস্তরসাত্মক।  
উদাহরণ স্বরূপ—

(ক) আমাদের কলি, এ পৈতে পুগাছি,

যোজ, যজ্ঞ সাবানে কাচি,

আয়, ভালভলা চটি পেন্দুন দিয়ে,

ঠনঠনে নিয়ে আছি।

(পুরুষোচিত)

(খ) আমাদের, মানা কারো সনে মিশতে,  
আমরা, দক্ষ কলম পিষতে  
ঐ এগারটা থেকে হুঁটা ব’সে লিখি,  
কাগজ দিতে দিতে।

(দেওয়ানী হাকিম)

(গ) আর ঐ মফঃসলে গেলে,  
বেশ বড় বড় ডালা মেলে,  
আরে, প্রীতিদান সেটা, ভবু লোকে কর  
ডেপুটিটা ঘুর খেলে।

(ডেপুটি)

(ঘ) আমরা, বাদীকেও বলি “ছালা,  
তোমার, মামলা তো অতি ভালো।”  
আবার প্রতিবাদী এলে বলি “জিতে যেনো,  
কত টাকা দেবে, ক্যালো।”

(উকিল)

রজনীকান্তের হস্তরসাত্মক রচনার যিজেন্দ্রলাল  
প্রভাব বিস্তার করেছেন শুধু বাহ্যিক প্রকাশভঙ্গীতে;  
বস্ত-চিন্তায় রজনীকান্ত স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন সর্বত্র।

রঙ্গরসে রজনীকান্ত যে রসিক ছিলেন তার প্রমাণ  
কল্যাণী কাব্যে বেশ কয়েকটি কাহিনী-আশ্রিত কবিতায়  
লক্ষ্য করা যায়। ‘বিনা মেঘে বজ্রাঘাত’ কবিতায়  
স্বামী ও দ্বিতীয়া পক্ষীর কথোপকথন, ‘বুড়ো বাঙ্গাল’  
কবিতায় দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রতি উক্তি, ‘বিয়ে  
পাগলা বুড়ো ও তাহার বাঙ্গাল চাকর’ কবিতায় উভয়ের  
কথাবার্তা বিস্তৃত হস্তরসের দৃষ্টান্ত। এ-ছাড়া তাঁর  
বাঙ্গাল পর্বায়ের কবিতাগুলি (বাঙ্গালের শ্রামা-সঙ্গীত,  
বাঙ্গালের বৈরাগ্য) ‘ঔদয়িক’, ‘শিচুড়ী’ প্রভৃতি  
কবিতাও বিস্তৃত হস্তরসাত্মক এবং রসোত্তীর্ণ।

কান্তকবির হস্তরসাস্রিত কবিতাগুলির মধ্যে যে  
বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে উদ্বোধনীয়, সেটি হল নিখুঁত চিত্রণ।  
কাজ নেই অথচ সময় কাটানো চাই—কিন্তু কি করে সময়

কাটানো যায়। কবি একটা পথ বাতলেছেন। সময় কাটানো আর বিভাগও একই সঙ্গে সম্ভব। তাই মস্তককে ব্যস্ত করা চাই—

আকবর সাহা কাহা দিত কিনা,  
মুহুজাহানের কটা ছিল বাণী,  
মহুয়া ছিলেন কীণা কিংবা পীনা,

(পুরাতত্ত্ববিৎ)

এই সমস্ত প্রশ্নের চিন্তায়।

কবি তাঁর চিন্তাবিনোদনের স্বাভাবিক রাস্তাটি বড় চমৎকার বলেছেন 'ভামাক' কবিতায়। ভামাকে যখন কবির মন মজে তখন 'ভুবন হয় সুধাময়'। তাঁর সার্বিক বর্ণনায় বিস্তৃত হস্তরসের নকীর আছে—

বুদ্ধির গোড়ায়, ভোমার ধোয়া না পৌঁছিলে,  
বেবোয় নাক' মুসোবিদী, কি মুন্সিল এ।

Idiom না আগে, কীকা কীকা লাগে,

হৈয়ালী Problem-এর উদ্ধার শক্ত হয়।

(ভামাক)

সামাজিক অব্যবস্থা এবং চারিত্রিক ভীকৃত্য দ্বিজেন্দ্র-লালের জায় কান্তকবিকেও ব্যথা দিয়েছিল। কারণে

বুদ্ধের সংবাদ-পাঠে ভীত পুরুষের ছবি আঁকতে বিন্দু তিনি যেন কিছুটা বেদনার অশ্রুপাতও করেছেন—

বুত্তর, শালী, শালা, শান্তড়ী, মাগ, হেলে,  
বহত মিলে যাবে, প্রাণটা বেঁচে গেলে।

(বুয়ার বুদ্ধ)

কিংবা নব্য বাঙালী তরুণের বাহ্যিক আড়ম্বরে আভিয্যে তিনি যেন ক্রন্দন করেছেন—

এমন, বেয়াড়া মৌতাতের মাতা চাকিরে দিলে কে ?  
এখন দশ বছরের ডে'পো ছেলে চস্মা ধরেছে ;

আর, টে'র নইলে চুলের গোড়ায়

যায় না মলয় হাওয়া

আর, রমজান চাচার হোটেল ভিন্ন

হয় না বাতুর ঝাওয়া।

(মৌতাত)

এ বর্ণনায় কোথাও বিষেষ বা আক্কেশ নেই, আছে অনাবিল হস্তরসের মোড়কে বেদনার অশ্রুধারা।

ভক্তি এবং রঙ্গরসের এমন আশ্চর্য-সার্থক কবি হয়েও রজনীকান্ত আজ বিস্মৃত-প্রায়। এটা যে আমাদেরই অবহেলার ফল—অগ্রিয় হলোও, সত্যভাষনের দোহাই দিয়েই সে-কথা বলতে হয়।



# অন্তর্বিহীন পথ

( উপভাস )

যমুনা নাগ

( পূর্ণপ্রকাশিতের পর )

জয়তী দেশে ফেরবার জন্য ব্যস্ত ।

আহ্মেদাবাদে পৌছতেই সে নোটবুক থেকে অবিবাহের বাড়ীর ঠিকানা দেখে নিলো । কোন সঠিক খবর না দিয়েই সে এসেছে,—ঘুরতে ঘুরতে ঠিক রাস্তাতেই এসে দাঁড়ালো । রাস্তার শেষ প্রান্তে আঁত মনোরম একটি সাদা দোতলা বাড়ী দেখতে পেলো । ছোট, কিন্তু ভারী সুন্দর । বাগানের ভিতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে দেখল বাড়ীখানা সবমাত্র রঙ করা হয়েছে । পর্দাগুলিও একেবারে নতুন । একটি অল্প বয়স্ক মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সম্ভাষণ জানালো ।

‘তুমি নিশ্চয় জয়তী ? এসো ।’

‘বাড়ী খুঁজে নিলাম—কোন অসুবিধা হয়নি ।  
তুমিই তো অবিবাহের ছোট বোন ?’

‘হ্যাঁ আমার নাম আশা । তোমার জন্য কদিন ধরেই অপেক্ষা করছি ।’ ঐতিহ্যের সহিত জয়তীর হাত ধরে আশা তাকে উপরে নিয়ে গেল । বাড়ীখানা ছোটর মধ্যে আঁত ঐক্য ও সুন্দর । দু’টি তিনটি শিশু এদিক ওদিক থেকে উঁকি দিচ্ছিল—আশা জয়তীকে দোতলার নিন্দে গিরে ঘরে বসাল । জানালা খুলে দিতেই সবরমতী নদী দেখা যায় । চেউগুলি যেন ভাল বেধে রেখে আসছে আর যাচ্ছে, জয়তীর এ দৃষ্ট বড় ভাল লাগল । মনে পড়ে গেল বহুদিন আগে শীলা গান গাইত—

‘মুখ অলসে গপি একা বসে

পলাতকা বত চেষ্টে

যারা চলে যায় ফেরে না তো হায়

পিছু পানে আর কেউ ।

মনে জানি কারও নাগাল পাব না

তবু যদি মোর উদাসী ভাবনা...’

জয়তীর পীড়িত মনের আজ অক্লান্ত পরিবর্তন হ’ল—  
কী এক অপূর্ণ স্থিতি তার বুক চিরে বেরিয়ে এল—ছোটবেলার কথা মনে পড়তে লাগল কেবল । আহা এতদিন যদি এই মন নিয়ে ঘুরতে পারতো । বিশাল পাথরের বোঝা এতদিন কেন এইভাবে নেমে যায় নি ? কোন্ দুরন্ত পিশাচের অত্যাচারে তার হৃদয় মন তিক্ত হয়েছিল ? আরোগ্য লাভ করবে কি সে ? ঐতিহ্য ভালবাসার প্রতিমূর্তি সে ছিল না কি কোনদিন ? তার শৈশব ও যৌবনের উজ্জ্বল ও আবেগের মধ্যে যে মধুর স্বাদ সে পেরেছিল তা এমন বিবাক্ত হয়ে উঠেছিল কেমন করে ? ঐ ভাবনা নির্ভর শব্দকে সে চিনতে পেরেছে, তাকে সে আজ বিনাশ করতে পারবে । নিজের মনের মধ্যেই সে কারাগারের সৃষ্টি করেছিল, করেছিল, শুধু বিবেক, দর্প, অবসাদ পূর্বে পূর্বে রেখেছিল—যেন এক একটি হিংস্র পশু । কারাগারের দরজা আজ ভেঙে গেছে—এখন শুধু ভয়কে ভাঙতে হবে । বাস্তবকে লাভ করতে হলে অগতের সত্য মিথ্যা উভয়কেই জয়

করতে হয়—সেই বিশ্বাস আজ সত্য হল কি? কত কালের দুখের দুটিভাঙ্গি এক এক করে সমুখে এসে পড়ল—নদীর ঢেউ—এর যুহু গতিয় দিকে চেয়ে এক মনে জয়তী বসে ছিল। প্রায় বেলা ১২টার আশা উপরে উঠে এল। জয়তীর সঙ্গে বসে সে নানান গল্প করে—হেলেমেয়েরা খাওয়া দাওয়া সেবে ঘুরতে গেল—আশা অবসর পায়।

অবিনাশ পেট খুলে বাগানে ঢুকছে। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতাই দামনে কাউকেই দেখতে পেলো না—অজ্ঞান আশা নিচেই থাকে। ভীত্ব ঘরে ডেকে উঠল—

‘বাড়ীতে কেউ নেই নাকি?’ হুপুর বোদে মেজাজ তার চড়ে গিয়েছে। ক্লান্ত অবস্থায় অবিনাশ সিঁড়ি উঠে আসতেই আশার গলার ঘর স্তনতে পেলো। কোণার ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার বলল—

‘এত নিরবিলাচ চারিদিক, ব্যাপার কি?’ কয়েক পা যেতেই দেখলো কোণার ঘরের দরজা খোলা—জয়তী ও আশা বসে আছে।

‘না জানিয়েই এসেছি দেখো, ভেবেছিলাম একটু চমকে দেব।’ বলে জয়তী এগিয়ে এল।

আশার হেলে নিচের ঘরে ভীষণ কান্না জুড়ে দিতে আশার আর কিছু বলা হ’ল না—সে ছুটে ছুটে নিচে নেমে গেল। অবিনাশ দুহুর্ডের জঙ্গ সবই ভুলে গিয়ে জয়তীকে ধরে বসল। জয়তী নিজেকে মুক্ত করে নিতে অবিনাশ বলল—

‘জয়তী, সত্যি এলে তাহলে? আজ তোমার একটা কথা বলতে দাও—এই বাড়ীতে তোমায় দেখতে চেরেছিলাম—এই ভাবেই, হঠাৎই।’

অবিনাশের মুখে জয়তী কদাচিত্ত আবেগের ভাষা শুনেছে—সে কি রকম যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল—কিন্তু বিশ্বাস করল, সে গভীর আবেগের বশেই কথাগুলি বলছে।

‘আমি তোমায় দেখবার জন্য আকুল হয়েছিলাম অবিনাশ।’ জয়তীর চোখে জল এলো। এগিয়ে

গিয়ে অবিনাশের হাতে নিজের হাতটি রাখল। অবিনাশ বলল—

‘জয়তী, আজ স্পষ্ট করে বলতে চাই, তোমায় চিরদিনের জন্যই চাই—তুমি কি বুঝতে পারনি এত দুঃপথে নিয়ে এসেছি কেন তোমায়? তোমায় চিরদিন ভালবেসেছি—কিন্তু তোমায় এইভাবে কখনও পাইনি। বোস খানিকক্ষণ, কিসের বাধা তোমার?’ অবিনাশ এখন আর দায়িত্বহীন সুবক নয়, সে স্বাভাবিক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ। অবিনাশের পরিবর্তন লক্ষ্য করল জয়তী। চেয়ারের একটি কোণে জয়তী নির্গত আসামীর মত বসে বসে রইল—যেন আর একটুও নড়তে পারল না। অবিনাশের হাতে আপসের চামড়ার ব্যাগ ছিল, সে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জয়তীকে আরও কাছে বসাল। জয়তীর দুই চোখ বেয়ে অবিরল অশ্রুধারা বয়ে চলল। অনেক কথা সে বলতে চেয়েছিল কিন্তু একটিও কথা বলা হ’ল না।

‘এত চোখের জল কেন জয়তী? এখন আমারই যেন ভয় করছে।’ অবিনাশের মনে বিধা হ’ল।

‘না, না, কিছু নয়—তুমি আমায় এমনভাবে চেরেছ আমি ভাবতেই পারিনি’—জয়তী উত্তর দিল।

‘জয়তী, কোনদিন তুমিও আমার বলনি তো কিছু?’  
‘আমি কি বলব বল? নিজেকে কি চিনতে পেরেছিলাম কোনদিন?’

‘বল বাড়ীটা কেমন লাগছে? আশা কত হাকাতা করে প্রত্যেকটি ঘর সাজিয়েছে হুজনে মিলে যা পেরেছি তা করেছে।’

‘আশা—আশা’ অবিনাশ ডাক দিল।

‘এই যে দাদা—বাক্সা এতক্ষণে ঘুরতে গেল—খেতে এসো।’ আশা উপরে উঠে গেল। সিঁড়ি নামতে নামতে আশা জয়তীকে বলল—

‘মা মারা যাবার পর দাদা এই বাড়ীর সবই বদলিয়েছে। আবার নতুন করে সব রঙ করা, পর্দা লাগানো, ইত্যাদি...আমি এসে ঘোঁষা বিশেষ কিছু কাজ বাকি নেই।’ জয়তী হাসল—

‘আবিনাশ আমার বলল, আশা সব সাজিয়েছে—  
তাই বোন হুজনেই হুজফ শিল্পী দেখছি।’ আশা হেসে  
উঠল—

‘দাদার কথা বিশ্বাস করলে ছুমি? গভ কয়েক  
সপ্তাহ ধরে সারাদিন সে এই বাড়ীর পেছনে লেগেছিল।  
আওয়ারের চোটে তো আমরা অন্ধ। এখন বুঝতে  
পারছি, তোমার কাছে অধ্যাতিক পাবার জন্যই এত কাণ্ড।  
আমরা হুজনেই কিন্তু তোমার প্রতীক্ষার হিলাম।’

আশা হু-একদিনের মধ্যেই জরতীর প্রতি আকৃষ্ট  
হয়ে পড়ল—ছোট বোন অবিনাশের বিশেষ প্রিয়—  
অবিনাশের বন্ধু আসছে শুনেই সে খুশী। দাদার জন্য  
সে সব করতে পারে। আহাবের পর সকলে জরতীর  
ঘরে গিয়ে বসল। হেলেমেয়েরা ঘুম থেকে উঠে পড়তে  
আশা আবার তাদের কাছে কিংবে যেতে বাধ্য হ’ল।

অবিনাশ বলল—‘তোমার বাবার কাছে যাব।  
বলতে চাই তোমায় বিয়ে করবো।’

‘কি যে বল? আমি কি কোনদিন মা-বাবার কথা  
ওর্নোছি?’

‘শোনা উচিত ছিল’—অবিনাশ গভীর গলায় উত্তর  
দিল।

‘আমি তাঁকে বলতে চাই, তোমায় বিয়ে করবার  
অনুমতি চাইছি।’

‘কি যে বলছো? আমার একই ভাবতে দাও—  
কাউকে কিছু ব’লো না অবিনাশ। আমার ভাবা এখনও  
শেষ হয়নি।’

‘না, সময় নষ্ট করবার কোন প্রয়োজন নেই, আজই  
হুপুরের মধ্যে আমি তোমার কাছ থেকে কথা চাই।’  
অবিনাশ কেমন অস্ত্র মাহুর হয়ে গেছে—তার কথার  
মধ্যে এমন দৃঢ়তার সুর ছিল না তো কোনদিন? জরতী  
আশ্চর্য হয়ে গেল—আকৃষ্টও যে হ’ল না তা নয়।  
অবিনাশকে জরতী কতবার ভিরঙ্কার করেছে, উপদেশ  
দিয়েছে, এখন কি অবিনাশেরই মতে তাকে মত দিতে  
হবে? জরতী আপত্তি করতে পারল না কিন্তু কি  
বলবে তাও বুঝতে পারলো না।

‘কি তোমার ভাবনা?’ অবিনাশ দৃঢ় গলায় প্রশ্ন  
করলো।

‘না কিছু না—এখন কিছু বলতে পারছি না।  
আমার ভাবতে সময় দাও।’ জরতী অহুর্বোধ করলো।

‘ছুমি কি আমার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত না তোমার  
পরিচয়ের জন্য লাজ্জিত? সত্যি কথা বল তো জরতী?  
আমি তোমার সঙ্গে নিয়ে দিল্লী যেতে পারি, ‘দিগন্ত’র  
একটা সুব্যবস্থা করে তারপর তোমায় এখানে নিয়ে  
আসবো।’

জরতীর মনে এখনও বিধা। অবিনাশ অধৈর্য হয়ে  
বলল—

‘তোমায় মত দিতেই হবে। তোমায় যে ভালবাসি  
এ কথা তোমার বাবাকে বলতে পারবো না? তিনি  
আমায় ভাল বুঝবেন না—তোমার চেয়ে তিনি আমার  
ভাল বুঝবেন।’

না, অবিনাশ, আমি একা যাই আগে। ঝাঁর কাছে  
সব খুলে বলি, তাই ভাল।’

‘ছুমি তৈরি হও, আমি নিচে যাই’, বলে অবিনাশ  
নেমে গেল।

অবিনাশ আশাকে ডেকে বলল তার হেলেমেয়েদের  
ওর ঘরে পাঠিয়ে দিতে। হেলের বয়স পাঁচ, আর  
যমজ মেয়ে দুটি আরও ছোট। তারা অবিনাশের ঘরে  
এলে দৌরাড়ি খুঁবই করে, নিমোমিত জিনিসপত্র উল্টে  
পাল্টে ভেঙে দিয়ে ঘরে। বালিশ ছুঁড়ে ভীষণ খেলা  
তারপর কুণ্ঠিত। মামার পেটের উপর বসে উদ্ভাস  
বৃত্ত। অবিনাশ এমনই মেতে ছেনেটির সঙ্গে কুণ্ঠিত  
করতে লাগল—কলে নিজের চপমা জোড়া মেঝেতে  
পড়ে গেল। জামার শাটের বোতামগুলি একটি বাদে  
সবই ছিঁড়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে প্যাঁচ অনেক নিচে নেমে  
গেল। আশার মেয়ে দুটি বিস্ফোরিত নেত্র মারামারি  
দেখাছিল—অবিনাশ হঠাৎ বিহানা ছেড়ে লাফ দিয়ে  
উঠে তাদের গাল টিপে দিতে ওরা বেন একই সাহস  
পেলো। তারপর তিনটিকে একত্র করে চাকরের সঙ্গে  
যেভাবে পাঠিয়ে নিশ্চিত। বাড়ী নিরুত্তর হতে জরতী

সিঁট নেমে এসে চারের টেবিলে বসল। আশা তার স্বামী বিজয়ের চিঠি খুলে পড়ছে—শীতাই তাকে কিরে যেতে হবে। বিজয় চিঠি পেলেই রওনা দেবে। অবিনাশ বলল—

‘জয়ন্তী, তোমার সংস্কার একটু দাঁথিয়ে নিয়ে আসি চল। আমার স্টুডিও ভাল করে দেখবে তো? নিজেকেই করেছি। বাড়ীর পিছনে একটি আধ ঢাকা বারান্দার খোদাই করা মূর্তিগুলি রাখা আছে—কতগুলি একত্রে সাজানো। কিছু ব্রজের, কিছু প্রস্তরের ও কিছু টেরাকোট। কোন কোনটি রীতিমত বড়। ছোটছোট স্নায়ু কাজও আছে কিছু। ভাস্কর্যের দক্ষতা বিশেষ লক্ষ্য হবে কি না জানি না।’

জয়ন্তী লক্ষ্য করল অবিনাশ নতুন ধরণের কাজও কিছু করেছে, খুব উৎসাহের সাহিত্য সে কাজ করেছে অস্বাভাবিক করা গেল। আশা প্রতিবেশীর বাড়ী খবর দিতে গেল সে শীত খবরবাড়ী কিরে যাবে। ইতিমধ্যে মশগুল হয়ে গল্প ছুড়ে দিতে তার কিরতে ঘেরা হ’ল। অবিনাশের দিকে তাকিয়ে জয়ন্তী বলল—

‘আমায় নতুন সমস্তার মধ্যে কেলেছ তুমি, আমার মনে হয় আমি বোধ হয় সংসার করবার উপযুক্ত নই। অবিনাশ, তোমার স্বপ্ন তোমার আকাঙ্ক্ষা সবই তির—তোমার নতুন জীবন পথে আমি কি সঙ্গী হবার উপযুক্ত?’

‘তর্ক রাখো জয়ন্তী—তোমার সমস্তার সমাধান আমিই করব—তুমি শুধু মত দাঁও—রাজী হও।’

‘আমি তো বললাম তোমায়, আমি কোনদিন স্বাভাবিক হতে পারব না—এইভাবেই জীবন কেটে যাবে। হয়তো প্রচণ্ড কাজের চাপে পড়লে কোনদিন মনকে ঠিক করতে পারব।’

‘কোনদিন তুমি স্বাভাবিক হিলে কি জয়ন্তী? তুমি জিন্দু করছো কেবল, তুমি অলোককেও বলোছলে যে তুমি বিবাহ সবচেয়ে উদ্বাসীন, বিবাহিত জীবন তোমার স্বাধীনতা কেড়ে নেবে ইত্যাদি। সেই সব

আবার চাও তো? বেচারাকে তো দেশছাড়ী করে দিলে। তোমার একগুঁয়েমি আমার ভাল লাগে না—আমায় কি চিনলে না এখনও? তোমায় পরাধীন করে রাখব বলে কি এত ভয় তোমায়? কী স্বাধীনতা চাও তুমি?’

‘না, না, শুধুই স্বাধীনতা চাই না অর্থাৎ একেবারে একা হতে চাই না—তাতে সুখ নেই অবিনাশ।’

‘বিবাহিত জীবনের কতগুলি সমস্যা তো থাকবেই, আমি তোমায় সুখী করবার আশ্রয় চেষ্টা করবো জয়ন্তী, এখন আমার নিজের ওপর সে বিশ্বাস আছে।’

জয়ন্তীর মুখ নিমেষের মধ্যে আবার গভীর হয়ে গেল—চুপ করে বসে কী যেন ভাবছিল।

‘ভাবতে দাঁও অবিনাশ, আমি যেন নিজের ওপর সব বিশ্বাস হারিয়েছি, জীবনের অগ্রিম অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছি না—ভুল ভুল যেন আমার সত্যের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে—আমার সবচেয়েই শুধু বিশ্বাস।’

‘কাল তুমি কলকাতায় কিরে যাচ্ছে জয়ন্তী, আজ তুমি আমায় কথা দাঁও। যদি তুমি দিল্লী কিরে গিয়ে একা জীবন যাপন করতে চাও তবু তোমার মজল কামনাই করবো।’

‘আমি দিল্লী এখনই যাচ্ছি না অবিনাশ—যদি বাই, তুমি কি যাবে সঙ্গে?’

‘যদি কথা দাঁও এ বিষয়ে তুমি রাজী আছ তবেই। আমি অলোক নই। চিরকুমার সত্য সত্যপতি হ’ব না এ কথা স্পষ্ট জেনো।’ অবিনাশ তার ঘরে চলে গেল।

জয়ন্তী ভাবিত হয়ে গেল। অবিনাশ তার জন্ত প্রতীক্ষা করবে না?—সে নিশ্চয় বিবাহ করবে এবং অন্ত মেয়েকে সুখী করবে। ঈর্ষার আগ্রহ তার অন্তর যেন বিদীর্ণ করে দিল—তার মনের প্রসন্নতা, আনন্দ সব মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উঠাও হয়ে গেল। নিজের ঘরে বসে সে জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। একটি সন্ধ্যা হয়ে গেছে, অবিনাশ কথা চায়। কিসের পশ্চাত্তাপ সে ছুটছে? স্বাধীন জীবন? শিল্প জগতের সুখ্যাতি

সেখানেও সে একা। বাবার কাছে গিয়ে থাকবে? তিনি তো অমর নন। ভবিষ্যতের উন্নতি? কাকে নিয়ে ভবিষ্যৎ? প্রশ্নগুলি একের পর এক এসে পড়ল, 'উত্তর দাও' বলছে চতুর্দিকে যেন কোলাহল করে তাগাদা দিচ্ছে 'উত্তর দাও'।

জয়ন্তী একদণ্ড হির হতে পারল না। সমস্ত জিনিস গুহিধে নিয়ে একত্র করে রেখে, তারপর বিছানার বসে কি যেন ভাবতে লাগল। ঘুম আর আসে না—ক্রমাগত জ্বাল, হুঁতাবনা, সংশয়।

একতলার ঘরে অবিনাশ হট্‌কট্‌ করছে, তার মনেও আজ শান্তি নেই।

‘জয়ন্তীকে বিয়ের কথা বললে সে ভীত হয়ে ওঠে, সে কি বোঝে না একার জীবন কত হুঃখের? শিল্পীর জীবনেও সঙ্গীর প্রয়োজন, ভবঘুরে হয়ে সারা জীবন কেই বা থাকতে পারে?’

ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে বালিশের ওপর ভর দিয়ে অবিনাশ শুয়ে পড়ল—চোখে তারও ঘুম নেই। জয়ন্তীর মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করল। পরদিন ভোরে জয়ন্তী রওনা হবে—তার মতামত জানতে না পারার অবিনাশ অধীর হয়ে উঠল।

‘জয়ন্তীর কাছ থেকে কথা চাই’—মনে মনে অবিনাশ কথাগুলি জপতে লাগল। আর ধৈর্য রাখতে পারল না। উঠে দরজার কাছে গিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে এক নিখাসে—বাবা! থেকে দেখতে পেলো জয়ন্তীর ঘরে। তখনও আলো জ্বলছে—দরজাও খোলা রয়েছে। সে টেবিলের কাছে বসে চিঠি লিখছিল, টেবিল ল্যাম্পের আলোর তার চিত্তিত মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

‘কাকে চিঠি লিখছে? ছুটিও ঘুমোও নি জয়ন্তী?’

‘এলো অবিনাশ—বিবাস কর এই দেখো তোমার চিঠি দিয়ে যাচ্ছিলাম কাল তোরেই তো বেতে হবে তাই। চিঠি রেখে যাব তাবিহলাম।’

চিঠিতে যা লিখেছি তাই এখন বল।’ অবিনাশের মনে কেমন যেন সন্দেহ হ’ল।

‘তেবোহিলাম লিখতে পারব ভাল করে, বলতে পারব না। দেখা হয়ে গেল এখন সবই খুলে বলতে পারি।’ কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তীর মুখে একটা সরল স্তম্ভর হাসি ছুটে উঠল—অবিনাশ আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। আজ জয়ন্তী তার সব তার যেন অবিনাশের হাতে ছুলে দিতে পারে—আশঙ্কা তার কিছু নেই, ভাবনাও কেটে গেছে। বহুদিনের আবেগ ও উজ্জ্বল উন্মুক্ত হয়ে মায়া-মুগ্ধ জয়ন্তীতে এসে ধামল। হৃদয় তরঙ্গের মধু গুঞ্জন শুধু হৃদনেই গুনতে পেলো। জয়ন্তীর বিদীর্ণ হৃদয়ের দৈন্য জালা ও ব্যর্থতা ক্রমশঃ লুপ্ত হ’ল। অবিনাশ তার বাহ্য আবেষ্টনে জয়ন্তীকে বন্দিনী করে রেখেছিল কিন্তু জয়ন্তী এইভাবে হার মানতেই চাইল।

‘স্বীকার কর তোমার মনে কোনো রকম বিধা, ভয়, শ্রানি নেই?’ অবিনাশ প্রশ্ন করল।

‘আমার কোন হুঃখ নেই অবিনাশ ছুটি বা চাও তাই দেব, এতদিন দিতেও জানতাম না, নিতেও জানতাম না। কলকাতায় চল, সেখানে আমাদের বিয়ে হবে। আর আমার ভয় নেই অবিনাশ।’

জয়ন্তীর কাছে কথা নিয়ে অবিনাশ নিশ্চিন্ত মনে নিজের ঘরে নেমে চলে গেল। সোঁদন রাতে অবিনাশ এক ঘুমে রাত কাটাল। ভোরের আলো উঁকি দিতেই চকল পাখীগুলো কেবল জানালার কাঁচে চোঁকা ঘেরে গেল। অবিনাশ উঠে আশার কাছে গেল।

‘আশা জয়ন্তী আজ কলকাতা বাবে না—এখন যা ঠিক হয়েছে তোমার সব বল, এখানে বোস।’ আশাকে হাত ধরে কাছে বসিয়ে অবিনাশ বলল—

‘আমি জয়ন্তীকে নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছি আশা, সে আমার বিয়ে করতে রাজী হয়েছে—ছুটিও সঙ্গে চল।’

‘আমার ভো তাই বলবার ইচ্ছা খুবই ছিল—জয়ন্তীর সঙ্গে তোমার বিয়ে আগে হয়নি কেন তাই তাবিহলাম—এখনদিন থেকেই তো জয়ন্তীকে আপন করে নিতে পেরেছি।’

জয়ন্তী নিশুণভাবে চুল বেঁধে একখানা বাসন্তী

হুতের লাড়ী পরে নেবে এল—তার মুখে হুনির্মল  
হীপের আভা। আশা পরে কলকাতার যাবে ঠিক  
হ'ল। অবিনাশ ও জয়তী কলকাতার গেনে উঠল।  
সারাপথ গেনে কতভাবে উঠল, নামল, বৈকল্যে,  
অবিনাশ ও জয়তী কিছুই লক্ষ্য করল না। উভার  
কিরণে চারিদিক উজ্জ্বলিত। অবিনাশের নিটোল  
মুখের ওপর সোনালি আলোর আভা পড়তে তার  
শান্ত মুখমণ্ডল অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল।

জয়তী চোখ খুলতেই দেখল গেনে কলকাতার  
এসে পৌঁচেছে। মাদল ও শীলা জয়তীকে বাড়ী নিয়ে  
গেল। অবিনাশ তার একটি বছর বাড়ী গিয়ে উঠল।  
জিনিসপত্র সেখানে রেখে সে দেবশিবের সঙ্গে দেখা  
করতে যাবে।

শীলা জয়তীকে জড়িয়ে ধরে বলল—অবিনাশের  
চেহারায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে—তাকে একা দেখলে  
চিনতে পারতাম না হরতো। তোমার 'তার' পরে  
আমার সঙ্গে হইছিল হরতো অবিনাশও সঙ্গে  
আসছে। ভাড়াভাড়ি বাবার কাছে যাও।'

দেবশিব তার ঘরে গিয়ে বসতে জয়তীও গিয়ে  
বসল।

'বাবা অবিনাশের বিষয় বিস্তৃতভাবে কিছু জানাবার  
সুযোগ পাইনি, সে তোমার বা বলতে চাইছিল, আমিই  
তোমার বলব তাকে বলছি।''

শান্তর অবর্তমানে দেবশিব একাধারে মা ও বাবার  
কৰ্ভব্য করে চলছে। জয়তীর জীবনে বহু বাসনাই যে  
অপূর্ণ রয়ে গেছে এ কথা সে ভাল করেই জানতো।  
জয়তী কিছুদিন স্বাধীনভাবে শির চর্চা করেছিল এবং  
তাতে ধানিক ভূঁপ্ত পেয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবনে  
অনেক কিছুই সে পায়নি। কস্তার মাথার হাত রেখে  
দেবশিব বলল—

'অবিনাশের সঙ্গে বহুদিনের বোঝাবোঝা তোমার—  
তাকে ছুঁমি ভাল করেই জানো, সুখী করতে পারবে  
তো? আমার তো বড় ভাল লেগেছে ওকে।'

'বাবা আমি তাকে বলছি ভাল করে ভেবে

দেখতে। আমার মতরত সে প্রমাণ করবে বলে মনে  
হয়, তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি। অতি  
স্নেহপূরণ মন—কোমল মতাব তার, আর কী চাইব  
বাবা? দাবী আমার আর কিছু নেই। উজ্জ্বলতা, বনস্পৃহা,  
মশোলিঙ্গা ও তীব্র বাসনার তড়নায়  
মাহুরকে যে কি উজ্জ্বল অবস্থায় দিন কাটাতে হয় সে  
আমার জানা আছে, আমি সে সব কিছু চাই না—তবে  
কোলাহলহীন শান্তিপূর্ণ জীবনের আকাঙ্ক্ষা এখনও  
আমার মেটেনি—ছুঁমি আশীর্বাদ কর বাবা যেন এটুকু  
পাই। এই আমার ঐশ্বর্য হোক।'

'আমিও চাই জীবনের অবলানে তোমার সুখী  
দেখে যাই। আমি তো চিরকাল তোমার সঙ্গে সঙ্গে  
ধাকবো না মা, অবিনাশকে বিয়ে করে ছুঁমি সুখী হও।'

'বাবা, আড়ম্বর কিছু ক'রো না, শুধু বাড়ীর কজন  
উপস্থিত থাকলেই ভাল। বিয়ে এ বাড়ীতে তোমার  
কাছে হবে।' জয়তীর কথার বিশেষ অভিভূত হ'ল  
দেবশিব, তার সিন্ত চোখ দুটো মুছে নিল গোপনে—  
সামান্য কথাই বলতে পারল।

'সোমেন আর মালা এসে পড়লেই হয়—তারাও এই  
অমুঠানে যোগ দিতে পারবে। নিতান্ত যমোর  
ব্যাপারই হবে কথা দিচ্ছি তোমার।'

দেবশিব ও অবিনাশ গল্প গুজবে সারাদিন ব্যস্ত  
ছিল। কদাচিত্ত হেমনের সঙ্গ পায়—সোমেনও  
বহুদিন বাড়ীর বাইরে। অবিনাশকে নিকটে পেয়ে  
সে বড় আনন্দ পেলো, একটি পুরুষের সঙ্গে মন খুলে  
কথা বলে তার ধানিক আশ্রয় হ'ল। অবিনাশের  
মতাবের বিশেষ গুণগুলি সকলেরই চোখে পড়ে। সে  
নানা প্রকৃতির মাহুরের সঙ্গে কথা বলতে পারে,  
স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারে—সহজেই সকলের  
আগন হয়ে যায়। দেবশিবের আহম্বদাবাদের  
সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল, অবিনাশ অনেক ধবর দিল।

'আমার বোন আশা, তার স্বামী পুত্র পানবার সহ  
বিয়েতে আসবে, আমার একটিই ঘোন—অবিনাশ  
বলল।



দেবাশিশ টেবিলের ওপর এক বাক্সো সিগারেট ও একটি দেশলায়ের বাক্সো রাখল—অবিশ্বাসকে ইঙ্গিত করল নিতে। তারপর একটু হেসে বলল—

‘অল্প বয়সে আমার সিগারেটের যেমন নেশা ছিল, তেমনি চুরুটেরও। শান্তার খুব ভাবনা ছিল এত ধোঁওয়া টানলে আয়ুষ্কর্য হবে। কিন্তু দেখছি সেই আগে চলে গেল। তার স্মৃতি এই বাড়ীতে আমার জাগিয়ে রাখে—তাই ঘুরে ঘুরে যেন তার কাজগুলি করছি বলে মনে হয়। হুঃখ হয় সে আজ উপস্থিত নেই—ভোমায় চিনলো না ভাল করে। জরতী আমার বড় আদরের মেয়ে জানো তো অবিশ্বাস?’

পরদিন সকালে সোমেন ও মালা হেলেমেয়েদের নিয়ে উপস্থিত হল। মালার হেলেমেয়েরা যেমন হুটপুট তেমনি ছুঁড়ল। মালা এত কাজের মধ্যেও অতি প্রফুল্ল ও সরস রয়ে গেছে, তার মুখে হাসি লেগেই আছে। হেলেমেয়েগুলি একবার খেতে খেতে আর একবারের

খাওয়ার তালিকা দিতে থাকে, শীলা ও মালা আহ্বয় হয়ে পড়ল।

জরতীর সঙ্গে মালার বহু বছর পর দেখা। হেমেন একবার হুঁ মিনিটের জল্প সকলের কাছে মুখ দেখিয়ে আবার অন্তর্ধান হয়ে গেল। সে যেন সর্বদাই সতর্ক থাকে কোন আলোচনা বা তর্কের মধ্যে যেন না জড়িয়ে পড়ে, তার মতামত দিতেও উৎসাহ নেই, জানতেও কোতুল নেই। নিতান্ত নিলিপ্ত হয়ে চিরকাল থেকেছে। দ্রুতাবটি সে এরকম নিয়ে জন্মোচ্ছল, না এইভাবে চলা অভ্যাস করেছে বলা শক্ত। আবেগ বা আন্তরিকতা তার ছিলই কি না কোনদিন কেউ বুঝলো না। তার মাথায় অল্প টাক পড়েছে। সোমেনের বেশ একটু ওজন বেড়েছে। বহুকাল পর পরিবারের সকলে আবার একত্র হল। পারিবারিক আবেষ্টনের মাধুর্য আজ জরতীর বড়ই মধুর লাগল—তার ভাবতে অবাক লাগল যে এক সময় সে এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাবার জন্তে ব্যস্ত হয়েছিল।

ক্রমশঃ



# রামমোহন ও নবজাগরণ

তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় শ্রীরাধাগোবিন্দ কর  
লিখিয়াছেন :—

সময়-সাধনাদর্শকে কেন্দ্র করেই রামমোহন ভারতে জাগরণের আলোক প্রজ্জ্বলিত করলেন। এই নবজাগরণে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নূতন মূল্যায়নের চেষ্টা যেমন ছিল, তেমনি ছিল তার মধ্যে বিশ্ববোধ জাগানোর চেষ্টা। এতে নূতন নূতন সৃষ্টির প্রেরণা যেমন ছিল, আর ছিল সব ব্যাপারে—ব্যবহারিক জীবনে, চিন্তা-জগতে, আচার-বিচারে ও ধর্মে—প্রতি পদক্ষেপে এক পরিপূর্ণ সংহতি স্থাপনের অদম্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা। বিশ্বপ্রেম, বিশ্বমানবিকতা বা মানবধর্মিতা—এই উন্মেষের মূলসূত্ররূপে অলঙ্কা-বহুমুখী চৈতন্যর সঙ্গে প্রথিত হয়েছিল। তারই বন্ধার বেড়ে উঠেছে প্রতিটি পদক্ষেপে, নানা চেষ্টায়, কর্মে ও গানে। ভারতীয় সাধনা আর সংকীর্ণ নাগপাশে আটপেটে আবদ্ধ রইলনা, মুক্ত হল বিশ্বসাধনার সঙ্গে। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সাধনা মুক্তপাখায় বিচরণ করার সুযোগ পেয়ে হয়ে উঠল বিশ্বমুখীন। ফলে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের মিলন পথ হয়ে উঠেছে সহজ ও সাবলীল। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনসেতু এইখানেই নূতন করে রচনা হল। পৃথিবীর মানুষ হয়ে উঠেছে একপরিবারভুক্ত অভিন্ন মানবজাতি।

ইউরোপীয় নবজাগরণের দুটি পর্যায় আছে। অটোমান তুর্কীদের-কনস্ট্যান্টিনোপল অভিযান ও বিজয় নবজাগরণের আদিভাগ কারণ, কিন্তু ইতালি-জার্মানিতে তার প্রথম স্পষ্টরূপ প্রত্যক্ষীভূত হল, সেই হিসাবে বলা হয় ইতালি এবং জার্মানিতেই নবজাগরণের সূচনা। তেমনি বাংলার নবজাগরণের প্রথম হেতু হিসাবে ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারক ও বণিকদের ভারতে আগমনকেই ধরা উচিত। কেননা তারই ফলে আদর্শের

সংঘাত, সামাজিক ও ধর্ম-বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রভূতি, রাজনৈতিক বিপর্যয় ইত্যাদির মাধ্যমে তারই প্রভূতি চলাছিল। আর রাজা রামমোহন রায়ের হাতে বাংলা-দেশে কলকাতায় তার প্রথম ফল দেখা গেল। তাই বাংলাদেশের বেণেমাঁসে রামমোহন রায়কেই প্রথম সূচনা বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাস্তবিক এই দুই সূচনাতে কোন পারস্পরিক সংঘাত নেই, বরং এরা পরস্পরের পরিপূরক। আমরা তাই ইউরোপীয় আগমন থেকেই শুরু করছি। এ দেশেই ইউরোপীয় ষাঠি ও মুসলমান শাসকদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল সাধারণ লোকচক্ষুর অন্তরালে কিন্তু তা যখন ক্রমে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠার স্বার্থঘর্ষের আলোড়নে স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন কেউ ভাবেনি তার ফল এমন বৈপ্লবিক হয়ে উঠবে। সে অষ্টাদশ শতকের কথা। এর ফল যখন ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাংলা-দেশের মানুষের জীবনে ও চিন্তায় প্রত্যক্ষীভূত হল তখন এক শতাব্দী পার হয়ে গেছে।

এরূপ পরিস্থিতিতে দেশের সংস্কৃত-পণ্ডিতগণ বিভ্রত হলেও নিবাক ও নিরুৎসাহ রইলেন। খ্রীষ্টধর্মমত শুনন করে নিজমত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হিন্দুশাস্ত্রে ও অজ্ঞাত শাস্ত্রে বিশেষতঃ খ্রীষ্টধর্মশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য কিন্তু এ কাজ সহজ নয়। ধর্ম ও সমাজ যে দুটি পৃথক সংস্থা এবং তারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয়েও যে আলাদা তা ভাল করে এবার হিন্দুদের বোঝানো দরকার। হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব ও তার সংজ্ঞানীন ভাব আবিষ্কার করে পৃথিবীর অজ্ঞাত ধর্মের সঙ্গে একটি নির্বিবোধ সময়ক্ষেত্র তৈরী করার দায়িত্ব কে নেবেন? কিন্তু সেদিনের নিশ্চিন্ত ও বিপন্ন বাংলার যিনি জাগরণের প্রদীপ জেলে আন্দোলনের দায়িত্ব নিরেয়েছিলেন, তিনি হলেন

দেশবরেণ্য ও বিশ্বপথিক রামমোহন। আর এই আন্দোলনে সহযোগিতা করে তাকে সার্থকতার দিকে আগিয়ে নিয়ে গেলেন সে যুগের কয়েকজন প্রগতিবাদী সংস্কারপন্থী মনীষী।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ফল হল ‘রিফরমেশন’ বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন। বাংলাদেশে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ সূত্র হয় ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভিঘাতে ধর্মকে কেন্দ্র করে এবং তা আস্তে আস্তে ব্যাপ্ত হয়ে যায় জীবনের সনক্ষেত্রে। তাই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আগে এল রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে ‘রিফরমেশন মুভমেন্ট’ বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন এবং এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেখা দিল রেনেসাঁসের প্রকৃতরূপ। এর ব্যাপক বিরাট রূপ দেখা যায় ধর্ম-সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতির সংস্কার, স্বজন ও উৎকর্ষের অভিযুগে এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় সমাজে মানবধর্মী চিন্তাধারার বিকাশে ও মানবসেবার ক্ষেত্রে ‘লোকশ্রেয়’ প্রভৃতি আদর্শ রূপায়ণের মাধ্যমে। জাগরণের ফল জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রকর্ষ। বুদ্ধি ও বিচারশক্তি বহু সনের লালিত সংকীর্ণতা ও দীনতা পারিত্যাগ করে দীপ্ত সাহস ও শক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এক কথায়—বুদ্ধির যুগ হল; আর সেই যুগটুকি দেখিয়ে দিল ভারতীয়দের সর্বাঙ্গীণ যুক্তির আলোক-উৎস ও পথ। এখন থেকে সংস্কারকর্মের প্রধানতম অস্ত্র যুক্তিবাদ। বিজ্ঞান সম্মত যুক্তির আঘাতে দেশের পুরোনো ধর্ম-ব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থা, দর্শন ও শিল্প-সাহিত্যবোধ ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে গড়ে তুলতে হলো। নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনযাত্রার প্রতি ক্ষেত্র আলোকদীপ্ত হয়ে উঠল; আর আধারে হাত বাড়িয়ে নেবার কিছুই রইল না। অথন্ত-মহুশ্ব সাধনার যে বাঁজ রোপন করা হল, তা কালে কালে সিঁকিত হয়ে ফুলে ফলে পল্লবিত হওয়াতে বাঙ্গালী মনীষী ও প্রাতিভার এক আশ্চর্য উদ্ভাস দেখা দিল উনিবিংশ শতাব্দীতে। তাকে তাঁরা সার্থক করে তুললেন তাঁদের জীবন-সাধনা দিলে, নিজেদের উৎসর্গ করলেন প্রাচীনের উৎকর্ষ

সাধনে ও নতুন সৃষ্টির আনন্দে। আর বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নবযুগের ধারাকে বহন করে নিয়ে চললেন সমুখের দিকে প্রগতির অভিযুগে।

ভারতে নবযুগের মণাবাণী এত মানবতা এবং মিলনের অগ্রদূত রামমোহন বললেন পৃথিবীর সব মানুষই একই জাতি। সাদা চামড়া আর কালো চামড়ার কোন ভেদ নাই। যে ভেদ আপাতঃদৃষ্টিতে দেখা যায় তা কৃত্রিম ও বানানো। যদি নবযুগকে আত্মজানতে হয়, তবে দেশী বা বিদেশী, ধর্মী বা বিধর্মী কাউকে উপেক্ষাভরে সরিয়ে দিলে চলবে কেন? মঙ্গলখট ভরবার জন্তে, তাকে পবিত্র করে তোলার জন্তে সবার স্পর্শ যে একান্ত দরকার! আর সেই সঙ্গে দরকার আমাদের মনগুলিকে স্তম্ভিত করে সবার হাত ধরার, সবার হাতে হাত মেলাবার। কিন্তু ইউরোপীয়দের অনেকেই ধারণা ছিল প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন অসম্ভব কিন্তু নবযুগের ভারতীয় মনীষীরা ভাবছিলেন এর ঠিক উলটো। ইউরোপ যখন মিলনের ভার বহনে ও দায়িত্ব পালনে অক্ষম ও নারাজ, তখন ভারত কিন্তু রূপ করে বসে রইল না। নবযুগের অগ্রদূত ও পথিকৃত রামমোহন তাই অল্পসংখ্যক আগে ইংরেজদেরও আত্মজানিয়ে ছিলেন কিন্তু তাদের সৈরাচারিতা বা মেচ্ছাচারিতাকে আত্মজানান নি। এই মিলন-বাণীই ভারতপথ, শক্তের কাছে হুৎতলের নাচ নয়, বঙ্গুর সংগে বঙ্গুর মিলন, —এই পথই নির্দেশ করেছেন ভারতের প্রাচীন মনীষীরা, রামমোহন সেই পথেরই প্রধান পথিক। এই ভাবেই তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছেও প্রাতিভাত হয়েছেন।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙ্গালী মনীষীরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন দাঁড়িত্ব দেখিয়ে বহন করে নিয়ে চললেন। তাঁরা ডাক দিলেন সারা ভারতকে। ভারত যখন সে ডাকে সাড়া দিল তখন দেশের আনাচে-কানাচে নবযুগের আলোক করেছে স্পর্শ, সে আলো গাঢ় রঙের তুলি বুলিয়ে চলেছে মনের সুন্দর তরীতে তরীতে। দেশ আপন আপনার দিকে বিক্ষারিতনেত্র রইল তাকিয়ে, মুগ্ধ হয়ে গেল সে তার আপন স্রষ্টাশক্তি

বিকার্শে, এবং নমস্কার জানাল আত্মশক্তিকে। স্বভাব হল দেশ, পুণ্য হল গৃহ-পরিবার।

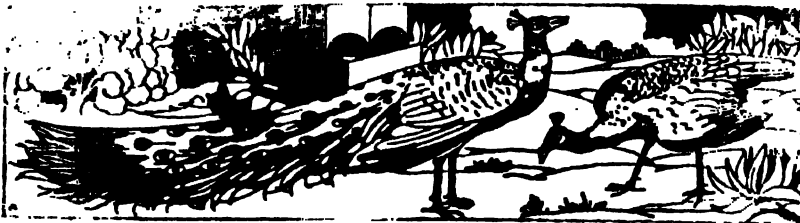
ভারতীয় ব্রহ্মসাধনা ও ঐতিহ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হল যুগধুরকর রামমোহনের যাত্ৰাঙ্গণে, যুক্ত হলো বিশ্বসাধনার সংগে। রামমোহন প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র সত্য ও ঐতিহ্যের নির্ধারিতকূ প্রহণ করলেন, তার সংগে মিশিয়ে দিলেন বিশ্বের বিভিন্ন সাধনার মূল তত্ত্বগুলি। প্রাচীনের নির্দিষ্টতার প্রতিষ্ঠা নয়—বিদেশের অন্ধ অনুকরণ নয়—রেনেসাঁস মানেই ঐতিহ্যের সংগে দেশবিদেশের প্রাণ-প্রবাহের সংযোজন। ভারতবর্ষে এটিই রামমোহনের দান।

রামমোহনের নূতন সাধনায় মিশল নৃক্ষির সংগে শক্তি, প্রেমের সংগে যুক্তি ও জ্ঞান, নীরস আধ্যাত্মিকতার সংগে যুক্ত হলো মানবধর্মিতা ও লোকপ্রেম। রামমোহনের ‘হিউম্যানিজম’ আধ্যাত্মিকতাসূক্ত। সমগ্র মানবাত্মার মুক্তি কামনায় নিজেকে নিয়োজিত করেও মাতুল তার নিজ ব্যক্তিত্বকে অব্যাহত রাখার উপায় খুঁজে পেল। রামমোহনের সাধনা ভারতীয় শাস্ত্র সত্যের ও ঐতিহ্যের উপরে তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও জীবনবোধ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস নিশ্চয়ই। আর এইটি করে তিনি ঠিকই করেছেন। তিনি জানতেন ভারতীয় শাস্ত্র সত্যকে বাদ দিয়ে এদেশে অল্প কোন সাধনা সফল হতে পারে না। ভারতের ঋষি-বাণীর মধ্যেই বিশ্বমিলন-সাধনার মন্ত্র তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। সেজন্তে তিনি

সহজে হতে পেরেছিলেন বিদেশীদের কাছেও নিকট আত্মীয়।

আগেই বলা হয়েছে বাংলাদেশের নবজাগরণের অগ্রনায়ক ছিলেন রামমোহন। তাঁর এমন একদেশবাসী বৃগাভিত্তিক আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল, যেহেতু সমসাময়িক সমাজের প্রধান ও প্রতিপত্তিশালী মনীষীদের সহায়তা ও সমর্থন তাঁর পিছনে ছিল।

রামমোহন তাঁর মুক্তচিন্তা, ধর্ম ও সমাজসংস্কারের আন্দোলনে সহযোগীরূপে আত্মীয়সভার বন্ধুদের পেয়ে রীতিমত বিব্রতকর করে দিলেন। এঁরা রামমোহনের ধর্মমত,—‘ব্রহ্মবাদ’, নিরাকার উপাসনা ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রাতি যথেষ্ট প্রকাশশীল ছিলেন এবং সমাজসংস্কার আন্দোলনে বিশেষভাবে তাঁর সহায়তা করেন। অবশ্য এঁরা দেশে স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজ নিজ স্বাধীন বিচার নৃক্ষি ও উদার চিন্তার অনেক পরিচয় রেখে গেলেও, বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন রামমোহনের সঙ্গে এবং সমসাময়িক লোকপ্রেম বা জমাততকর কাজে। রামমোহন যে যুগোপযোগী কম্পনতা গ্রহণ করলেন তাকে তাঁর বন্ধুরা অভিনন্দন জানালেন। এ ব্যাপারে সকলেই অবশ্য সমান উৎসাহী ছিলেন এমন নয়—তবে তাঁর ডাকে শরণ প্রথম সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কালীনাথ মুন্সী ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীরা অগ্রগণ্য, এঁরা রামমোহনের মৃত্যুর পরেও তাঁর আদর্শ আঁকড়ে ধরে নিজেদের কর্তব্য সাধন করে গেছেন।



## ১০২ পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ

ভীতির চক্ষে দেখিয়া থাকি; কারণ বিদেশী কখনই ভারতবাসীর অধিকার জ্ঞান কোনও কিছু করে না, করিবেও না। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের রাজসভায় যখন প্রথমে বিদেশীগণ আসিয়া দেখা দেয় তখন তাহারা আমাদের সহিত ব্যবসায় করিবে বলিয়াই বাদশাহের দরবারকে বুঝাইয়াছিল। কিন্তু সেই ব্যবসায় হইতে অল্প দিনই আমাদের কোনও লাভ হইয়াছিল। পরে সেই ব্যবসায় ক্রমশঃ শেষের পথে চালিত হইয়া অবশেষে বয়ন শিল্পীর অশ্রুত ছেদন, নীলকরের অভ্যাস ও বিদেশীর গরীব কণ্ঠীকে দুই পয়সা বেতন দিয়া নিজের তরফে দুই টাকা লাভের ব্যবস্থায় পর্য্যবসি- হয়। এই সকল কথা অবতারণা প্রয়োজন হইতেছে জাতীয় নিগ্রাপত্তা, জাতীয় আত্মসম্মানবোধ সংরক্ষণ ও জাতীয়তার দগুপ নিজ গৌরবে অক্ষুণ্ণ রাখিবার আবশ্যিকতার দীর্ঘকাল বিম্বয়ে জনসাধারণকে সজাগ করিবার জন্য। কারণ আমরা দাখীনতা লাভের পরে বিশ্বের সমস্তই সকল বিষয়ে জাতীয়ভাবে আত্ম-জাহির করিতে অশেষ তৎপরতাপ্রদর্শন করিয়াছি। ফলে আমরা সহজেই অপরাপর জাতির সহিত নানান সম্বন্ধে, বিশেষ করিয়া অর্থ-নৈতিক সম্বন্ধে, জড়িত হইয়া পড়ি। আমাদের বিভিন্ন অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনামূল্যের ক্ষেত্রে আমরা যে সংশ্লিষ্ট সহস্র কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছি তাহার ফলেও আমরা অপর অনেক বিদেশী জাতির নিকট অধর্মপূর্ণ উপস্থিত হইয়া থাকি ও তাহাতে আত্মজর্জরিতক আসরে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠা মহা-সম্মানের হইতে পারে নাই। ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে অধিক করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে। ইহার ফলে ঐ রাষ্ট্র আমাদের শুধু যে অসম্মানের চক্ষে দেখে তাহা নহে; তাহারা আত্মজর্জরিতক সম্বন্ধ ক্ষেত্রে আমাদের বিরুদ্ধতা করিয়া এবং আমাদের শত্রুপক্ষকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য করিয়াও কোনও লজ্জা অনুভব করে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নানান ক্ষেত্রে ভারতে লোক পাঠাইয়া অনুপ্রবেশ চেষ্টা করিয়া থাকে

ও প্রথমে তাহারা স্বেচ্ছপ ভেদই দেখাক না কেন, পরে যে তাহারা ভারত বিরুদ্ধতা করিয়া ভারতে আমেরিকার প্রভুত্ব স্থাপন চেষ্টা করিবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং সম্ভ্রান্তি যে ভারতে বহু সংখ্যক মুণ্ডিত মস্তক শিখাধারী কৃষ্ণভক্ত শেখার আমেরিকানের আবির্ভাব হইতেছে তাহাও আমরা সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকি। যদিও ভারতের মাভূমির অনেকে দুইশত বৎসরের যেতাজ পূজার ফলে আমেরিকানদিগের কৃষ্ণভক্ত দেখিয়া মুগ্ধ ও বিবশ আবেগে তাহাদিগের পক্ষাভিতে দোড়াইতে শুরু করিয়াছেন। হারজনদিগকে সাধারণ চরম অত্যাচার চক্ষে দেখিয়া থাকেন ও কখন কখন চরম নির্যাতনও করিতে দেখা করেন না, তাহাও যাদু আবার যেতাজ। সকল জাতি বাহঁরুত “স্নেহ”দিগকে ভক্তির আসনে উচ্চাসনে বসাইয়া আনন্দ বোধ করেন, তাহা হইলে অনেক দাখীনতা কামী, স্ভ্রান্তি গৌরবের সংরক্ষণ-কাজী ভারতবাসী সেই দৃষ্ট দেখিয়া স্বভাবতই বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। বিদেশীর পক্ষে নিজ আচার ব্যবহার পরিধান বদ্রাশি ত্যাগ করিয়া ভারতীয় রূপ পরিগ্রহণ খুবই অসম্ভাবিক। বলা যাইতে পারে ইহা একপ্রকার ছদ্মবেশ ধারণ। অন্তরে ভক্তি জাগ্রত হইলে কোনও কোনও মানুষ ঐরূপভাবে নিজ বেশ ও আকৃতি ছাড়িয়া অন্তভাবে ঘুরতে ফিরিতে পারে। কিন্তু যেখানে একটা বিদেশী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে শিখাইয়া পড়াইয়া ভক্তির ক্ষেত্রে আমেরিকান চালানী মনোভাব এই দেশের বক্ষে প্রোথিত করিয়া তাহাতে ফল ফলাইবার চেষ্টা করা হয়, সেইরূপ প্রচেষ্টা সততই সন্দেহের সৃষ্টি করিবে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আক্ষেপের বিষয় যে আমাদের সাংবাদিকগণও এই সকল চালানী ভক্তির ব্যাপারদিগকে আত্ম প্রচারের সুযোগ দান করিয়া জনসাধারণকে ভ্রান্ত ধারণার পথে চালাইতে সাহায্য করিতেছেন।

শেখ আবদুল্লাহ পুনরাবির্ভাব

শেখ আবদুল্লাহ কান্দীয়ে আবার জনসমক্ষে উপস্থিত

হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা সম্ভবতঃ ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়া ফাল হইয়া বাহির হইবার। সেই জন্য তিনি গিউ-নিসগ্যালিটির পথে জনসাধারণের সম্মুখে আসিয়াছেন ও সকলকে জানাইতেছেন যে তাঁহার কোন রাষ্ট্রীয় মতলব নাই। অনাহতভাবেই বলিতেছেন। তাঁহার সংক্ষেপে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

ইউ. এন.কে দিয়া গঙ্গা-কাবেরী খালের সাক্ষী  
গাওয়ানে:

ডাঃ কে. এল. রাও খুবই মুক্খমান ব্যক্তি। তিনি গঙ্গার জল নানাভাবে ব্যবহার করিয়া যাচাতে আর ফরাকী বাধের (ও কালিকাতার) জলাকটুমারও অবশেষে না থাকে তাহার ব্যবস্থা বিশেষ তৎপরতার সাক্ষী। কাজে চলিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বাংলাদেশের বহুটা জল দেওয়া আবশ্যিক তাহা লইয়া গভীর চিন্তায় গাঢ় হইলেন। উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক সংস্কার করা উঠাইয়া কালিকাতা বন্দরের জলের ব্যবস্থা দৃঢ় করা। পরে তিনি উত্তর প্রদেশ ও বিহারের চারবেই ব্যবহার ক্ষেত্র ২০০ শতাধিক খাল কাটিয়া সেচ ব্যবস্থা করিতে মনোনিবেশ করেন। এই সংক্ষেপে আসে গঙ্গা-কাবেরী জল লইয়া কাবেরীর জলপ্রোতের সংকট সমাধানের দাঁকণ ভারতের জলকষ্ট দূর করার পাবকল্পনা। এত অত্যন্তব্য কার্যের যাচাতে কোন ভাণ্ড সমালোচনা না হয় সেইজন্য ডাঃ রাও গঙ্গা-কাবেরী পাবকল্পনাটি সম্মিলিত জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের নিকট পেশ করান। ডাঃ রাও কিন্তু কালিকাতা বন্দরের জল গ্রাঁকর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। গঙ্গা-কাবেরীর কথা আবার

তাঁহার মনে বিদেশীজ্ঞদের মতে বিশ্বাস জারাইয়া তুলিল। ডাঃ রাও এই ইউ. এন.-এর বিশেষজ্ঞদের পরামর্শদাতা হিসাবেও একজনে কার্য্য করিবেন। সমস্ত ব্যাপারটা হইল একটা সাজা-গাফিলিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিবার মতো চাতুর্য্যপূর্ণ ব্যবস্থা। ইউ. এন. কইতে যাহারা আসিলেন তাঁহারা বলিয়াছেন যে ২০০০ খৃঃ অব্দে ভারতের এত জলাভাব কইবে যে ভারতকে একটা আন্তঃরূপ জলের আদৃত খাদ্য করিতে কইবে। অতীতনে ভূমধ্যস্র জল যে অগ্রাধ পরিমাণে উপরে তুলিয়া ব্যবহার করা কইবে এবং সমুদ্রের লবণাক্ত জল লবণরুদ্ধ করিয়া ব্যবহারের আয়োজনও কইবে সে কথা ডাঃ রাও ও ইউ. এন.-এর মতাবধারণ বলিতে তুলিয়া গিয়াছিলেন কেন? গঙ্গা-কাবেরী খাল এখনও কতটা উচিত কইবে না। ডাঃ কে. এল. রাও-এর পদত্যাগও প্রার্থনীয়। গঙ্গা-কাবেরী এক রাজ্যের মাহলেও দূরে অবস্থিত। মনো আঁচে বহু বৃহৎ বৃহৎ নদী ও উচ্চ পান্যত্ব অঞ্চলের বাধা। গঙ্গার জল তুলিয়া পাতাচ পার করিয়া দাঁকণাপথে বহাইবার পরি-কল্পনা কষ্টকল্পিত ও বহু ব্যয়সাধ্য। এইরূপ জটিল উপায়ে একটা সমস্ত কার্য্যাসাক্ষর চেষ্টাকে চাঁপত ভাষায় নামানো দেখেন বলা কইয়া থাকে। এইরূপ কার্য্যে ডাঃ রাও আত্মানয়োগ করিয়া গবেষণা-বিদেশে অগতন ঘটাইবার জন্য খ্যাতি অর্জন করিতে পারেন। কিন্তু ইতোতে জাতির জনসাধারণকে জড়াইয়া ফোলিয়া ট্যাঙ্কের দায়ে বাসনাবিক্রয় করিতে বাধ্য করার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। এই সকল কারণেই আমরা মনে করি যে ডাঃ কে. এল. রাও মন্ত্রী হিসাবে নিজ কর্তব্য যথাযথভাবে করিতে সক্ষমতা দেখাইতেছেন না।



# শ্রীঅরবিন্দ : শতাব্দী অর্থ্য

শান্তনীল দাশ

মহতী তপত্ৰা এক তোমার জীবন।  
মানব মজল তত, চিত্ত উদ্ভবস্থী,  
দেবত্বের উত্তরণ চাই ধরণীতে।  
এক পৃথিবীর বুকে একই সে-মাহুয  
ধাকবে সহজ হুখে, সর্গমানহীন  
জীবনের মহৈশ্বর্য্য ভোগ করে—সেই  
তপত্ৰা তোমার পুত্ৰ সারাটি জীবন।  
আপন কঙ্কের মাঝে দীর্ঘ রাত্রিদিন  
লোকচক্ষু অন্তরালে নিঃশব্দে একাকী  
কাটালে হুস্তর সেই মহাসাধনার।  
তারপর সিদ্ধকাম, দিব্য জীবনের  
বাণী দিলে বিশ্বজননে। বিবুধ জগৎ  
তোমার চরণপ্রান্তে রাখে নতনত  
প্রণামের অর্থ্যখানি প্রফায় গৌরবে।

## একত্বমনুপশ্যতঃ

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সকলেই স্থখী হোক, হোক নিরাময় ;  
কেহ যেন হুঃখ নাহি পায় এ সংসারে।  
কার নিন্দা করো ভূমি ? জলিছে অক্ষয়  
বিশুদ্ধ আত্মার শিখা আধারে, আধারে।  
উলঙ্গ আত্মার কাছে কোথা দেশ, কাল ?  
বাধিবারে চাও তারে বন্ধনে সীমায় ?  
লজ্জিয়া পঙ্কজমালা, সমুদ্র বিশাল  
শাস্ত, চূড়ান্ত সত্যোপলব্ধি আত্মার  
সর্বমানবের চিত্ত দিব্য চেতনার  
উদ্ভাসিয়া তোলে নিত্য। জ্যোতির নিৰ্ভর  
নিরে আসে অজ্ঞানের মহাত্মসার।  
নর আত্মা—বিশেষ তার কোথা নাই ঘর ?  
ঐক্যের এ অমুভূতি সম্পদ বাহার—  
কোথাশোক ? কোথা মোহ ? কোথা হুঃখ তার ?

# হেলেনের মাতৃভাড়া

কুঞ্জোর কাহিনী

লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়

হারু মাঝি, তার বউ পার্শ্বতী আর তাদের তিনটি ছেলে, বাঙ্গালাড়া গ্রামে বাস করত। হারু অতি গরীব, নিজের ক'টি ষটি-বাটি ছাড়া আর কিছুই তার ছিল না। জমিদারের ক্ষেতগুলি চাষ করে বছরের ধানটা কোনমতে জোঁতাঁত আর এই জমিটুকু ও কুঁড়ে ঘরটির জঙ্গ ও তাকে খাজনা দিতে হোত। প্রথম কয়েক বছর হারুর অবস্থা বেশ ভালই ছিল। তারপর তার দুর্দিন আরম্ভ হোল— একে একে তার হাঁস-পায়রাগুলি সব রোগের থাকায় শেষ হলো; তারপর ক্ষেতের ধানগুলিও জলের অভাবে শুকিয়ে গেল। শেষে মাত্র একটি গাই তার বাকি রইল। তিনটে ছেলে আধপেটা খেয়ে আছে আর জমিদারের খাজনাও বাকি, কাজেই হারু মহা ভাবনার পড়ল।

“এখন আমরা কি করি বল ত?” সে পার্শ্বতীকে বোঝ জিজ্ঞেস করতে লাগল।

তার বউ বললো, “তুই এক কাজ কর—কালকেই গরুটাকে হাটে বেচে দে, তারপর যাহোক করে খাজনাটা দিয়ে দে।”

পাশের গ্রামের হাটে পরদিন গরুটা বেচা হবে ঠিক করে তারা শুতে গেল।

ভোরবেলা হারু গরুটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গরুর পেছন পেছন হেঁটে চলেছে হারু মাঝি, গরমে ক্রমে গা দ্বিগুণ দরদর করে ঘাম ঝরতে লাগল। কোথাও একটি পুকুরও দেখা যায় না। কাজেই অতি

কটে শুকনো গলায় সে হেঁটে চলতে লাগল। হুপুরবেলা একটি বড় আমবাগানের পাশে এসে পৌছল। চারিদিকে বড় বড় গাছ, তাতে আম ফলে রয়েছে আর মাঝখানে একটি স্থলর পুকুর। হারুর এসব দেখে চোখ জুড়াল। সে গরুটাকে একটা গাছে বেঁধে সোজা পুকুরে নেমে মনের আনন্দে হাতে-মুখে জল দিল ও খেল। এরপর গাছতলায় বিশ্রাম করবে বলে স্থায় পড়ল। কিছুক্ষণ পর তার নাসিকাস্থানি চারিদিক মাতিয়ে তুলল।

হঠাৎ কানের কাছে তাঁত্‌কণ্ঠে কে যেন চিৎকার করে উঠল, “হারু, ও হারু, ওঠো ওঠো—” হারু চমকে গিয়ে চট্ করে উঠে বসে দেখল যে, তার পাশে একটি ছোট বামন বেঁটে লোক, দাঁড়িয়ে আছে। তার পরশে পায়জামা, কামিজ গায়ে, পায়ে নাগরবাই জুতো ও মাথায় একটি ছোট জরির কাজ করা টুপি।

হারু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কি মিঞা তুমি কি আমার ডাকছিলে?”

মিঞা বললো, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ছাড়া এখানে আর কে আছে তোমাকে ডাকবার? তা তুমি গরুটা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ বল ত?”

হারু বললো, “এটাকে পাশের গ্রামের হাটে বিক্রি করতে যাচ্ছি।”

“—তা অতদূর না গিয়ে ওটাকে আমাকে বিক্রি করে দাও না।”



হাক্ক বললো, “তুমি কত দেবে?”

লোকটা হাতের নিচের থেকে একটি ছোট মোরাদা-বাঁদি কাজ করা পিতলের কুঁজো বার করে বললো, “আমি তোমাকে এই কুঁজোটা দেব।”

হাক্ক সেটা দেখে ‘হাহা’ করে হাসতে শুরু করল। “থাবে মিঞা, আমি কি এতই বোকা যে একটা পিতলের কুঁজো নিয়ে তোমাকে এত দামী গরুটা দেব?”

লোকটা ভীষণ বেগে, চোঁচিয়ে উঠে বললো, “নাও বলাহ, ভাল হবে না আমার কথা না শুনলে। বাড়ি গিয়ে যেবেতে একটা সাদা কাপড় পেতে তার উপর কুঁজোটা রাখবে। তারপর বলবে ‘কুঁজো তোমার কাজ করো’—তখন দেখবে কিরকম জিনিস তোমাকে দিচ্ছি।”

হাক্ক হাঁ করে জিজ্ঞেস করল, “তবে এটা কি যাছ-খেলা দেখাবে?”

মিঞা বললো, “হ্যাঁ, তাই একরকম বলতে পার। নিয়েই যাও না বাড়ি, তোমার খদি কোন লাভ না হয় তো আমাকে এটা এখানেই ফিরিয়ে দিয়ে যেও।”

হাক্ক তখন গরুটা তাকে দিয়ে কুঁজোটা তুলে নিয়ে বাড়ি চলে গেল। ভয়ে ভয়ে বাড়িতে ঢুকবে এমন সময় পার্শ্বভী কোথা থেকে এসে হাজির হোল। “কি গো, গরুটা বেচে কত পেলে? ঐ কুঁজোটাই বা কে দিল?”

হাক্ক চোক গিলে বললো, “আরে ওটা দিয়েই তো মিঞা আমাদের গরুটা কিনল।”

তার বউ হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল; পরে দৌড়ে গিয়ে বাঁটাটা তুলে এনে তাকে বেশ কয়েক খা লাগিয়ে দিলো—“হতভাগা আপদ কোথাকার। এত দামী গরুটা দিয়ে এই বাজে কুঁজোটা নিলে? এখন আমরা খাজনা দেব কি করে? আর ছেলোপিলের মুখেই বা কি দেব?”

হাক্ক বললো, “আরে বাবা, অত রাগ করছ কেন? দেখিই না এটাতে বাহু আছে কি না, তারপর চোঁচও।”

আর কিছুক্ষণ চোঁচোমোঁচ করে পার্শ্বভী কিছুটা শান্ত হলো। কুঁজোটা এরপর বার করে হাক্ক যেবেতে চাদর পেতে তার উপর রাখল। কি আশ্চর্য, “কুঁজো কাজ দেখাও” বলতে না বলতে ছুটি ছোট্ট মাছ তার থেকে বেরিয়ে এলো। নিমেষের মধ্যে তাদের কুঁড়ে ঘরটি নানা রকমের দামী জিনিসে ভরে গেল; সোনা-রূপার রেকাব ও খালার উপর মূল্যবান পোশাক, মুখরোচক খাবার, মোহর ও গরনা চারিদিকে ছড়িয়ে দিল। লোকটি এরপর কুঁজোর ভিতর ঢুকে পড়ল।

হাক্ক ও তার বউ হাঁ করে এইসব ব্যাপার দেখতে লাগল। তারপর ছেলোপিলে নিয়ে মহা আনন্দে তারা হাপুস-হপুস করে সেইসব খাবার খেতে লাগল। এরপর হাক্কর কপাল ফিরল। এক-একটি খালা বিক্রি করে তারা মাস-ছয়েক করে আরামে খাওয়া-দাওয়া করল, লোকজন রেখে চাষ-বাস ঠিক হলো, ও শেষে জমিদারকে তার খাজনা যা পাওনা ছিল সব শোধ করে দিল। গ্রামের সকলে বললো, “হাক্ক যাক্কর কপাল ফিরেছে।”

জমিদারবাবুর কিন্তু কৌতূহলে মন ভরা, “হাক্ক বেটা রাতারাতি কি করে বড়লোক হলো?” সে রোজ হাক্কর বাড়ি যাওয়া-আসা করতে লাগল আর তাকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগল। শেষে একদিন হাক্ক কুঁজোর কথাটা তাকে বলেই ফেললো। জমিদারের মন হিংসায় ও লোভে ভরে উঠল; শেষকালে কিনা বেটা হাক্কর কাছে এই অমূল্য ধন রইল? জমিদার ঠিক করল, যেমন করেই হোক এই কুঁজোটা তাকে পেতেই হবে।

ছলে-বলে-কৌশলে তখন সে কুঁজোটা নেবার চেষ্টা করতে লাগল। এইভাবে রোজ জমিদারবাবু হাক্কর বাড়ি গিয়ে গিয়ে তাকে কুঁজোটা বিক্রি করতে রাজি করাল। হাক্ক বললো, “বাবু, আমাকে পাঁচশ টাকা যদি দাও তো কুঁজোটা দি।”

জমিদারবাবু সঙ্গে সঙ্গে টাকা বার করে হাক্ককে দিলেন ও কুঁজোটা নিয়ে মহা আনন্দে বাড়ি ফিরে গেলেন। হাক্কও খুব খুশি হয়ে টাকাগুলো পার্শ্বভীকে

দিয়ে বললো—“আমাদের আর জীবনভোর কোনও অভাব থাকবে না, বুঝলি পাক্তী—এটাকার বেশি তো আর গরুটা বেচে পেতাম না। তা এখন ঘরে সোনাকরপোও এসেছে, আর এই টাকটাও পাওয়া গেল।”

কিন্তু কিছুদিন পরেই হারুর অবস্থা আবার যেমন ছিল তেমনই হোল। বেশি রুটি হওয়াতে ক্ষেতের ফসল সব ভেসে গেল, বাড়ি-ঘরের ছাদ ঝড়ে উড়িয়ে দিল, আর শেষ পর্যন্ত আবার হারুরকে খাচ্চা দিতে হবে বলে নতুন গরুটা বেচবার ব্যবস্থা করতে হোল। আবার সেই পথ দিয়ে চলেছে হারু মাঝি, গরুটাকে ঠেলতে ঠেলতে। মনটা তার খুবই খারাপ, ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সে খাচ্ছে এমন সময় সেই ছোট্ট মিঞা সামনে এসে দাঁড়াল।

“কি হারু, আবার গরু নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?”

“আর কি বলব মিঞা, আবার আমার সদয় গেছে। সোনাদানগুলো তো চোরে নিল আর ঝড়জলে বাড়ি-ঘর চায়-বাস সব গেল। এই দেখ না, আবার গরুটা বেচতে যাচ্ছি হাটে।”

“কেন, কুজোটা তোমার কি হোল?” মিঞা বললো।

হারু বললো, “আর বল কেন মিঞা, নিজের দোষেই মেটাও গেল। জমিদারবাবু পাঁচশ টাকা দিয়ে সেটা কিনে নিলে।”

মিঞা বললো, “হারু, সত্যি তুই বড় বোকা। যা হয়েছে তা নিয়ে আর মন খারাপ করিস না, এই নে আর একটা কুজো—এটা ওই প্রথমটার মত ব্যবহার করবি বাড়ি গিয়ে।”

হারু কুজোটা নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরল। “পাক্তী, ও পাক্তী, শোন শোন—আমাদের আবার কপাল ফিরেছে।”

পাক্তী দৌড়ে এসে দেখে হারুর হাতে আর একটা কুজো। হুজনে মনের আনন্দে মেঝেতে চাদের পেতে কুজোটা তার উপর রেখে বললো, “কুজো, তোমার কাজ করো।”

মিমেষের মধ্যে হুটো ছোট্ট লোক বেরিয়ে এলো কুজোর ভেতর থেকে। তাদের পরশে কোপনি, হাতে গদা, আর বেহোবামাএ দমাদম করে গদা চালিয়ে তারা হারুরকে পিটতে শুরু করল।

“বাবা রে—মা রে,—গেলুম—গেলুম” বলতে বলতে হারু পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু লোকদুটো বেশ কিছু প্রহার দেবার পর নিজেরাই কুজোর ভেতর ঢুকে গেল। হারু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, তারপর বললো, “পাক্তী, এ তো আরো বিপদ হলো দেখছি—এখন কি করা যাবে?”

পাক্তী বললো, “দূর বোকা, এই কুজোটাও বাবুর বাড়ি নিয়ে যা। তারপর যতক্ষণ না আমাদের সেই ভাল কুজোটা ফেরত দেয় ততক্ষণ এরা বাবুরকে মারতে থাকবে। যা, শীগগির যা এটা নিয়ে।”

হারু কুজোটা নিয়ে দৌড়ে বাবুর বাড়ি গেল। সেটা দেখেই জমিদার ভাবলেন “ভাড়া তো, হুটো কুজো পাওয়া গেলে দ্বিগুণ বড়লোক হওয়া যাবে।” হারুরকে তাই ভাড়াভাড়ি আরো পাঁচশ টাকা বার করে দিয়ে কুজোটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন, “কুজো, তোমার কাজ করো।” সঙ্গে সঙ্গে সেই হুটো লোক গদা হাতে লাফিয়ে বেরুল, আর জমিদারবাবুও ধরে এত জোরে মারতে লাগল যে সে “বাঁচাও, বাঁচাও” বলে চিৎকার শুরু করল।

হারু তখন বললো, “বাবু, আগে আমাকে সেই কুজোটা ফেরত দাও তারপর এদের খামতে বলব।”

বাবু বললেন, “শীগগির তোর হুটো কুজো নিয়ে এখান থেকে দূর হ।”

হারু ভাড়াভাড়ি আগের কুজোটা তাকের উপর থেকে তুলে নিলে—পরে অল্পটার ভিতর পালোয়ান হুটো ঢুকে পড়বার পর, সেটাকেও নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

তারপর হারু মাঝির অনেক ধন-সম্পদ হলো আর তাদের পরিবারের সকলের ব্যবহারের মত কোনও অভাব রইল না।

# দীন দরদি গীতিকার অতুলপ্রসাদ

শ্রীভাগবতদাস বরাট

বঙ্গবানীর সাহিত্য ও সঙ্গীত ভাণ্ডারে যে সব ানী-গুণীর দান অবিস্মরণীয়, অতুলপ্রসাদ তাঁদের অন্ততম। তাই বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদ একটি স্মরণীয় নাম। সঙ্গীতপিপাসু জনগণের মানস পটেও তিনি সন্মানীয়। বিশেষ করে বর্তমান বৎসর তাঁর জন্ম শতবর্ষ পূর্তির কাল। দিকে দিকে স্মরণ সত্তার আয়োজন। এবং আলোচনার মাধ্যমে তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। এই আলোচনার উদ্দেশ্যও ঠিক তাই।

ধাঁকে চোখে দেখি নি, নাম শুনে বীর ধামের ঠিকানা খুঁজে বেড়াছি, যে মহাপুরুষ সিংহের সঙ্গীত শ্রোতে বাংলার আকাশ বাতাস আজও সুধারিত,— তাঁর বিষয়ে কিছু বলা আমার মত সাধারণ মানুষের পক্ষে দৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু আমি তো আলোচনার প্ররক্ত হইনি, সে রক্ষা দুঃসাহস আমার নেই। আমি তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রকাজলি জ্ঞাপন করছি। এবং তা দোষাবহ নয়। যদি এই লেখায় কোন স্মরের স্রষ্টি হয়, তা হলে সেই স্মরের বেশটুকুই গীতিকার ও স্মরকার অতুলপ্রসাদের চরণ স্পর্শ করবে বলে আমার বিশ্বাস। এ যেন তুলসী পাতার তুলসীর পূজা।

অতুল প্রসাদের সাহিত্য বলতে তাঁর সঙ্গীতকেই বুঝায়। কারণ তিনি তাঁর অনবদ্য সঙ্গীত লহরীর মধ্যে স্মরণীয় আছেন। উপজাস নয়, গল্প নয়, কাব্য নাটক, এমন কি প্রবন্ধ পর্যন্ত নয়,—শুধু মাত্র গান লিখে অর্থাৎ গানের কথারূপ রচনা করে স্বদেশবাসীর স্বাভিলোকে একটি অতুলনীয় নামরূপে যিনি আজও

জাগরুক তিনিই অতুলপ্রসাদ। সার্থক কবি রাম-প্রসাদ ছাড়া এমন সিন্ধি লাভ আর কার ভাগ্যে ঘটেছে?

নদীর শ্রোতের মতই কালের গতি। প্রভাব অপ্রতিহত। কাল শ্রোতের ঢেউ-এর হিসাব রাখার প্রয়োজন বোধ ইতিহাস করে। শ্রোতের জলে ভেসে আসে নানা ঝড় কুটো ও আবর্জনা সেই সঙ্গে কিছু ফুলও ভেসে আসে। অতুলপ্রসাদ তেমন শ্রোতের জলে ভেসে আসা একটি সুবাসিত ফুল। যে কালে সেই ফুলটি ভেসে এসেছিল সেই কাল গত হয়েও জাগরুক। দেশবাসী শতবর্ষ পরেও তাঁকে স্মরণ করছে। কাল তাই কাল প্রসাবিনী। ফুলটি আজ কালের আর এক ঠেলায় ভেসে গেছে। কিন্তু তার সুবাস আজও বাংলার বাতাসে ছড়িয়ে আছে। আর থাকবেও চিরকাল।

অতুল প্রসাদ প্রায় আড়াই শ'র মত গান লিখেছেন। সেই সব গান তাঁর গীতিগুণ, কাকালি এবং কয়েকটি নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ। কিছু সংখ্যক গানের স্বরলিপি তাঁর কাকালি গ্রন্থে সন্নিবেশিত। তবে তাঁর গান শুধুমাত্র স্বরলিপির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। স্বরলিপির বাইরেও সেই সব গানের অনেকখানি কলাকৌশল রয়েছে। আর সেই সব কলাকৌশল প্রয়োগ করা সব শিল্পীদের দ্বারা সম্ভবও নয়। হিন্দুহানী ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অস্থূললনে যে সব শিল্পীদের প্রতিভার ক্ষুরণ ঘটেছে, শুধুমাত্র তাঁরাই পারবেন তাঁর গানে কলাকৌশল প্রয়োগ করতে। কারণ, অতুলপ্রসাদের স্মরণ স্রষ্টিতে রয়েছে হিন্দুহানী সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ প্রভাব।

স্বরের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে অতুল প্রসাদের সমগ্র গীতি সত্তার মুখ্যতঃ দুটি ধারায় প্রবাহিত। প্রথম ধারাটি হল বাউল সঙ্গীতের ধারা এবং দ্বিতীয় ধারাটি হিন্দুস্থানী সুরের ঢঙ বাংলা গানে অনুপ্রবেশ। এই দুই ধারাতেই অতুলপ্রসাদের অতুলনীয় সিন্ধিলভ। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন বাংলার মানুষ। ঢাকার তাঁর জন্ম। কিন্তু কর্মজীবন ও সাধন জীবনের সেরা সময় কেটেছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অগ্রতম পীঠস্থান লখনউ শহরে। লখনউতে থাকাকালীন তিনি সেখানকার হিন্দুস্থানী ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সংস্পর্শে আসেন। বড় বড় ওস্তাদ ও বাঈজীরা তখন লক্ষ্যে আসতেন। বড় বড় জলসা হত। অতুল প্রসাদ সেই সব সঙ্গীতাহুষ্ঠানে প্রায় যোগ দিতেন এবং আকর্ষিত সঙ্গীত শ্রদ্ধা পান করতেন। এই ভাবে তাঁর মধ্যে দানা বাঁধে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বানিয়াদ। তাঁর সাধন জীবনের নেপথ্যে জন্মগত পরিবেশ ও কর্মজীবন গত পরিবেশ—উভয় পরিবেশের প্রভাব ক্রিয়শীল ছিল। কিন্তু সুরের দিক থেকে যাই হোক, তাঁর গানের মূল ভাব হচ্ছে ‘প্রেম’ এবং ‘ভাগবত প্রেম’। যে প্রেম কখনো দেবতা, কখনো প্রকৃতি, কখনো স্বদেশ, কখনো মানব এবং কখনো বা বিবিধ বিষয়কে আশ্রয় করে গুঞ্জরিত হয়েছে।

কিন্তু সঙ্গীত সাগরে নিমজ্জিত হয়েও অতুলপ্রসাদ তাঁর মনকে বেঁধে রাখতে পারেন নি। তাঁর মন সব সময় আর্দ্র ও হৃৎ জনগণের ব্যথায় কাদত। এবং তাদের হৃৎ হৃদিশা দূর করতে উদ্যতচেতা অতুল-প্রসাদ অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্য করতেন না। তাঁর কাছে গিয়ে কেউ শূন্য হাতে কোন দিনই ফিরে আসেনি। তাঁর কাছে যেমন প্রার্থীর শেষ ছিল না, তেমন লক্ষ্যে এমন কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না যা তাঁর দানে পুষ্ট না হয়েছে। তাঁর স্ত্রী হেমকুমারী দানশীলা ছিলেন। স্থানীয় এমন কোন মহিলা সংস্থা ছিল না যা তাঁর দানে উপকৃত হয় নি। লক্ষ্যে ব্যারিষ্টারী করে তিনি যেমন প্রচুত অর্থ উপার্জন করেছেন, তেমন

তাঁর সদ্য ব্যবহারও করেছেন দীন হৃৎখীদের সাহায্য করে। বাংলা সঙ্গীত ও সাহিত্যের জগৎ তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করে গেলেন। লাহোরে থাকা কালীন তিনি প্রতিদিন একটি কেসের জন্য হাজার টাকা ফি নিতেন। কিন্তু সেই টাকায় পাঁচ শ’ টাকার কামা, কাপড়, চাদর ও কঞ্চল কিনে তিনি দরিদ্রদের বিলিয়ে দিতেন। কেউ এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করে বিরত হতে উপদেশ দিলে তিনি বলতেন,—“যে দেশে থেকে আমি হুজাতে অর্থ উপার্জন করছি, সে দেশের লোকদের জন্য কিছু ব্যয় না করলে কি হয়?” যে কয়দিন তিনি লাহোরে ছিলেন সেই কয়দিন এইরূপ বিতরণ পক্ষ চলছিল। নালিনী হালদারকে তিনি প্রায়ই কথায় কথায় বলতেন,—“নালিনী বাবু, তগবান কখন আমি যেন এই ভাবে দিতে দিতেই যাই।”

অতুলপ্রসাদের বিরাট সংখ্যক কৃপা প্রার্থীদের মধ্যে যেমন অসংখ্য বিধবা রমণী ছিলেন, তেমনই ছিল বহু সংখ্যক দুঃস্থ ছাত্র। প্রায় পঞ্চাশ জন দুঃস্থ ও দরিদ্র ছাত্রকে নিজের খরচায় লেখাপড়ার সব ব্যবস্থাই তিনি করে দিয়ে ছিলেন। কিন্তু দান করেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না বা কড়ব্য শেষ হল ভাবতেন না। তিনি চেষ্টা করতেন কিভাবে প্রার্থীদের সাবলম্বী করা যায়। এই উদ্দেশ্যে তৎকালে গড়ে ওঠে “গোথলে ট্রুডেন্ট সোসাইটি”। প্রফেসর উপেন্দ্রনাথ বলের, চেষ্টায় ক্যানিং কলেজের বোর্ডারদের নিয়ে ঐ সংস্থা গড়ে ওঠে। সংস্থার জন্মকাল ১৯১৩-১৪ সালে। অতুল-বাবু এই সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সত্যদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত রাজনারায়ণ শুক্লা, পণ্ডিত নারায়ণ মিশ্র, সুরেন্দ্র বিক্রম সিং, কৃপাশঙ্কর নিগম, এস এন রায়, হরগোবিন্দ দয়াল, শ্রীবাস্তব, বসন্তকুমার খোয়াল প্রভৃতি। সংস্থার প্রধান কাজ ছিল নিরক্ষর-দের নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং গরীব দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্য দিয়ে পড়ানো। অতুলবাবুর প্রেরণায় ছাত্রদের মধ্যে এতখানি উৎসাহ দেখা গিয়েছিল যে তাঁরা তাঁদের চাকর-ঠাকুরদের জোর পূর্বক ধরে নিয়ে

গিরে পড়াতে। প্রতিদিন সন্ধ্যার কুইল ফুলে  
নিরক্ষরদের পড়ানো হত।

মাথা ফুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছোট চারা-  
গাছ দেখে আকাশের পরিধি সংকীর্ণ। কিন্তু বড়  
হয়ে সেই চারাগাছ শাখা-প্রশাখায় যখন আকাশ দেখে  
তখন তার কাছে আকাশের অসীমতা ধরা পড়ে।  
আমিও তেমনি ছাত্রাবস্থায় পাঠ্যপুস্তকে অভুলপ্রলাদের  
কবিতা পড়ে এবং অৰ্ধপুস্তকে তাঁর জীবনী পাঠে  
বিশেষ কিছু জানতাম না। পরে নানা জনের নানা  
কথামালায় ও আলোচনাদিতে আর একটু যেন  
বেশী জানলাম। তাই ভাবি হুঁ একটা টাকা পকেট  
থেকে পড়ে গেলে কিছা কেউ হিনিয়ে নিলে মনে  
কাঁটা ফুটে। কেউ কাজ পেতে চেয়েও কিছু পায়

না। কারণ মোহবদ্ধ চোখ আমাদের। টাকাকে  
মাটির মত ভুচ্ছ ভাবতে পারি নি। অথচ উঁহারা  
স্বামী জী উভয়েই টাকার মোহে আবদ্ধ হন নি।  
জনমানবকে ভাল বেসেছেন বলেই প্রাণ কেঁদেছে।  
এই সব চিন্তা করলে তাঁরা যে কত উদার ও নির্লিপ্ত  
তা সহজেই বোঝা যায়।

সঙ্গীতের 'স' জানি না। 'গা' নিয়েও সাদাসাধি  
করি নি। ওর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্যও লাভ করি  
নি। তাই অপরের ভুলা ফুল চেয়ে নিয়ে প্রজ্ঞালী  
জ্ঞাপন করলাম। বাহাবা লাভের আকাঙ্ক্ষায় নয়,  
মনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে। জানি না আমার এই  
পুস্পাঞ্জলী তাঁর চরণ স্পর্শ করবে কি না। তাঁর  
ভাষাতেই বলি—“আর কেহ যদি না পারে সাঁহতে  
ভূমি তো বহু গহিবে।”

## দেশ-বিদেশের কথা

### ইউগ্যান্ডার কাণ্ডকারখানা-১

ইউগ্যান্ডার বর্তমান রাষ্ট্রপতি ইদী আমিন প্রথম  
জীবনে ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীতে যোদ্ধা ছিলেন ও সেই  
সময় ব্রহ্মদেশে জাপানীদের ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের  
ভারতীয় জাতীয় সৈন্তদলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া  
লড়াই করিয়াছিলেন। ইদী আমিন ইহার পরে স্বদেশে  
প্রত্যাবর্তন করেন ও ব্রিটিশ সামরিক শক্তি যখন মাউ মাউ  
বিপ্লবীদিগের দমন চেষ্টায় বিশেষভাবে নিযুক্ত হইত তখন  
ব্রিটিশদিগের সহায়তায় পূর্ণ উদ্ভমে আত্মনিয়োগ করেন।  
মাউ মাউ দমন কার্যে তিনি এতই সক্ষমতা প্রদর্শন  
করেন যে তাঁহার ব্রিটিশ উপরওয়ালারা তাঁহাকে সামরিক  
কর্মচারীর পদে উন্নত করিয়া দেন। ইউগ্যান্ডা তখনও

স্বাধীন হয় নাই। অতঃপর যখন ইউগ্যান্ডা স্বাধীন  
হইল ও ইদী আমিন সেদেশে একজন কেওকেটা হইয়া  
দাঁড়াইলেন তখন প্রারম্ভকালে ব্রিটিশ শক্তিকে নিজেদের  
পূর্বসূর্যের সহায়কের সমর্থনে নিযুক্ত হইতে দেখা  
যাইত। কিন্তু পরে ব্রিটিশদিগের এই বহুভাব আর  
থাকিল না; কারণ ইদী আমিন আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ  
চেষ্টায় অনেক সময় ব্রিটিশ বিরোধীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা  
করিতে দ্বিধা করিতেন না। আমিন স্বাধীন ইউগ্যান্ডার  
প্রথম প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার রাষ্ট্র-  
ক্ষেত্রে নানা প্রকার অধ্যাত্তিও হইয়াছিল। যথা  
শকলে বলিত যে কঙ্গোর স্বাধীনতা আন্দোলনের জর  
সংগৃহীত যে অর্থ জমা হইয়াছিল, ইদী আমিন সেই অর্থ

নিজ কার্যে খরচ করিয়াছিলেন এবং ওবোট্টে তাঁহার এই হৃদ্যার্থের কথা লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিবেন আশঙ্কায় ইদি আমিন ওবোট্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে রাষ্ট্র ক্ষেত্র হইতে অপসৃত করিবার আয়োজন করেন। এই ষড়যন্ত্রে তিনি সক্ষমও হইয়াছিলেন।

এ হেন যে ইদি আমিন ইহার নিকট হইতে কোন অনুমতি কেহ আশা করিতে পারে না। ইউগ্যান্ডাতে ১০০০ ইয়োরোপীয় নরনারী বাস করেন এবং ৮৮০০০ এশিয়াবাসীরও ঐদেশে নিবাস। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে ডাক্তার, যন্ত্রাবদ, হিসাব লেখনে বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি বহুলোক আছেন এবং তদপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আছেন ব্যবসাদার। ইদি আমিন, যে কোন কারণেই হউক, ঐ সকল এশিয়াবাসীদিগকে ইউগ্যান্ডা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন ও তাঁহারা সেই আদেশ অনুসারে নানা দেশে চলিয়া যাইতেছেন। এশিয়াবাসী লোকেদের মধ্যে ব্রিটিশ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত আন্তর্জাতিক যাতায়াতের অনুমতি পত্র (পাসপোর্ট) আছে প্রায় ৬০০০০ এর অধিক ব্যক্তির। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই ইউগ্যান্ডা ছাড়িয়া বুটেনে যাইতে মনস্থ করিয়াছেন। বুটেনে কিন্তু এই পরিণতি সুবিধাজনক মনে করিতেছেন না। কারণ বুটেনে বহু রাষ্ট্রনেতা আছেন যাহারা কৃষ্ণাঙ্গদিগের বুটেনে আগমন পছন্দ করেন না। তাঁহারা বুটেনকে স্বৈরাচারদিগের নিবাস ভূমি হিসাবেই রাখিতে চাহেন। এই সকল নেতাদিগের মধ্যে প্রধান ইনথ পাওয়েল। তিনি স্বৈত-বুটেনে আদর্শের জন্য যথাসাধ্য কৃষ্ণাঙ্গ বিরুদ্ধ প্রচার করিয়া থাকেন। বর্তমান ক্ষেত্রে ইউগ্যান্ডা হইতে যাহারা বুটেনে আসিতে চাহিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন ২০০ শত ডাক্তার, ৩০০ যন্ত্র-বিশারদ, ১০ ইঞ্জিনিয়ার, ১০০ হিসাবকার্য বিশেষজ্ঞ, ২০ অস্ত্র চিকিৎসক ও ৪০০০ ব্যবসায়ী। অনেকের মতে ইহারা বুটেনে আসিলে ব্রিটিশ জাতির লাভই হইবে, কিন্তু কোনও আশঙ্কা নাই। ক্যানাডা বলিয়াছেন তাঁহারা ৮০০০/১০০০০ ইউগ্যান্ডাশাসী এশীয়

নরনারীকে ক্যানাডায় আসিয়া থাকিতে দিতে প্রস্তুত আছেন। অষ্ট্রেলিয়াও কিছু কিছু লোক লইবার জন্য প্রস্তুত। কিছু কিছু লোক ভাংতেও চলিয়া আসিতে চাহেন। শেষ অবধি ঐ সকল মানুষ নানা দেশে ছড়াইয়া পড়িবেন বলিয়াই মনে হয়।

বুটেনে ইদি আমিনের কার্যে সন্তুষ্ট নহেন এবং ইউগ্যান্ডাকে বুটেনে যে এক কোটি পাউণ্ড অর্থ সাহায্য করিতেছিলেন সেই সাহায্য এখন দেওয়া হইবে না, জানান হইয়াছে। ইহা ব্যতীত যে সকল ব্রিটিশ কর্ম-কৌশলী ব্যক্তি ইউগ্যান্ডাতে আছেন তাঁহারা ঐ দেশ হইতে চলিয়া আসিবেন বলা হইয়াছে। অস্ত্রাবধি বুটেনে ইউগ্যান্ডাকে চার কোটি পাউণ্ড অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং ঐ সাহায্য বন্ধ হইলে ইউগ্যান্ডা বিশেষ অন্ত্রাবধায় পড়িবেন বলিয়া মনে হয়। ইদি আমিন কিন্তু জোর গলায় “ইহাকে ভাড়াইব”, “উহার সম্পত্তি কাড়িয়া লইব” ইত্যাদি বলিয়া চলিয়াছেন। ইয়োরোপীয়দিগের যাত্রা ব্যবসা বাণিজ্য আছে তাহা কাড়িয়া লওয়া হইবে বলা হইয়াছে। বুটেনে উউ, এন, কাউনাসলে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছেন কিন্তু তাহার কি ফল হইবে তাহা এখনও জানা যায় না।

ইদি আমিন কথায় যাহা বলুন, কার্যতঃ তিনি স্বৈরাচারদিগকে ততটা স্বাধীনতা দেন না। যথা বিদেশীদের সম্পত্তি কাটার কি আছে বলিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, শুধু উউরোপীয়দিগকে সেই নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। আমিন বলিয়াছেন বুটেনে অর্থ সাহায্য না দিলেও আরও একশত দেশ আছে যাহারা অর্থ দিবার জন্য প্রস্তুত আছে। কিন্তু বিশ্ববাসী মনে করেন না যে ইদি আমিনের মত মাত্ৰ রাষ্ট্র আধিনায়ক থাকিলে কেহ অকাতরে টাকা দিবার জন্য ইউগ্যান্ডার দিকে হস্ত প্রসারিত করিবেন।

### ভারত-পাকিস্তান হকি খেলা

হকি খেলাতে ভারত বহুকাল পৃথিবীতে উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন, কিন্তু কিছু কাল হইল ভারতের সেই প্রেষ্ঠ আর নাই। অনেকে মনে

করিতেছেন যে, ভারত পূর্বে যে সকল দেশের সহিত হকি প্রতিযোগিতা করিতেন, বর্তমানে সেই সকল দেশ খেলায় এত উন্নতি করিয়াছে যে ভারত আর সেই সেই দেশের খেলোয়াড়দিগকে পরাজিত করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু বস্তুতঃ সেই হইয়াছে কি? ভারত কি পূর্বের জায় হকি খেলায় সক্ষমতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছেন? যদি পারিতেন তাহা হইলে সম্ভ্রান্তি যে পাকিস্তান ভারতকে পরাজিত করিল সেই খেলাতে পাকিস্তান প্রথম ১৬ মিনিটে ভারতকে দুই গোল দেওয়ার পরে ভারত এক ঘণ্টার অধিককাল পাকিস্তানের গোলের নিকটে মহাতেজে ছোট্টাছুটি ও ঘোরাকেরা করিয়াও কোনমতে একটাও গোল দিতে পারিলেন না কেন? বহুবার ভারত পাকিস্তানের গোলের সম্মুখে গিয়া লক্সাট্ট হইয়া বলটিকে যত্নতর মারিয়া পাঠাইয়া গোল দেওয়াতে অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পূনরুৎসে ভারতের খেলোয়াড়গণ খোলা গোল পাঁছিয়াও গোল দিতে পারিলেন না এরূপ অবস্থায় প্রায় কখনও পাড়তেন না। দুই-একবার এইরূপ হইলে তাহাকে অবস্থা-বিশেষ বলা যাইতে পারে। কিন্তু দশ-বিশবার এরূপ ঘটিলে তখন বলিতেই হয় যে বিষয়টা খেলোয়াড়দিগের অক্ষমতা প্রমাণ করিতেছে। সুতরাং ভারতকে হকি খেলার দিকে নজর দিয়া উৎকৃষ্টতর খেলোয়াড় ভোগাড় করিতে হইবে। শিক্ষা, সাধনা, পরিশ্রম, প্রতিপক্ষের পরিবর্তন, সকল দিকেই দেখিতে হইবে কি করিয়া হকি ক্ষেত্রে ভারতের হারান মৌরব পুনরাবিষ্কৃত হইতে পারে। পাকিস্তানের খেলোয়াড়গণ ভারতীয়দিগের সমজাতীয় বলিলে কোনও 'ভুল' হয় না; কারণ পাকিস্তান বিগত পঁচিশ বৎসর হাড়িয়া দিলে সর্বদাই ভারতের অজ হিল। ক্রীড়া ক্ষেত্রের ঐতিহ্য বহুভাবেই এই রাষ্ট্রের একই। পাকিস্তান অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতকে পরাজিত করিলেও পরে পশ্চিম জার্মানীর নিকট হার মানিতে বাধ্য হ'ন। হারিয়া তাঁহারা যতটা অধ্যাত্ত অজ্ঞান করেন, ক্রীড়া ক্ষেত্রে অসভ্যতা করিয়া তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক

বহনামের ভাগী হইয়াছেন। পাকিস্তানের পরাজয়ও তাঁহাদের হকি খেলার পারদর্শিতা হানি হইতেই উদ্ধৃত। বিশ্ব হকি ক্ষেত্রে এই প্রথম ভারত ও পাকিস্তান পরাজিত হইয়া ইয়োরোপের হস্তে ঐ ক্রীড়ার শ্রেষ্ঠত্ব ভুলিয়া দিলেন। ইহার কারণ কিছুটা ইয়োরোপীয় হকি খেলোয়াড়দিগের হকিতে উন্নতি করার মধ্যে নিহিত; কিন্তু অধিকতঃ ইহার জন্ম দায়ী ভারত ও পাকিস্তানের হকি খেলায় অবনতি। পাকিস্তান ইহার জন্ম কি ব্যবস্থা করিবে তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু ভারতকে হকি ক্ষেত্রে উন্নততর শিক্ষা ও অভ্যাসের আয়োজন করিতে হইবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাউতে পারে। ভারতীয় হকিদল বাছাই করার কাজ যাহারা করিতেন, তাহারা সেই কাজ এখন অধিক কার্যক্ষম ব্যক্তিদিগের সাহায্যে করাইবার জন্ম নিজেরা ঐ কার্যে ইন্তকা দিয়া সরিয়া যাইতেছেন। কিন্তু শুণু তাহা করিলেই চলবে না। ভারতের সর্বজন খেলার মাঠের সংখ্যা বৃদ্ধি ও স্কুল-কলেজে খেলা বাধ্যতামূলক করা অবিলম্বে আবশ্যিক। ক্রীড়া বিশেষজ্ঞগণ সমস্ত খুঁরয়া ঘুরিয়া সকল ক্রীড়ার উন্নতি সাধন চেষ্টা করিবেন; সে ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের জাতিসংঘে প্রবেশে চীনের ভিত্তি

পাকিস্তান হইতে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হইলে পরে পৃথিবীর প্রায় একশতটি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। অতঃপর বাংলাদেশ পৃথকভাবে বিশ্ব জাতিসংঘের সদস্য হইবার জন্য উক্ত সংঘের নিকট নিজ আবেদন পেশ করেন। কিন্তু ২৫শে আগষ্ট ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে পরে চীন দেশ তাহাতে নিজ ভিত্তি বা আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া বাংলাদেশের জাতিসংঘে প্রবেশ নাকচ করিয়া দেন। চীনের এই আপত্তির মূলে আছে পাকিস্তানের প্রেরণা। পাকিস্তান এখনও মনে আশা পোষণ করেন যে বাংলাদেশ আবার পাকিস্তানে ফিরিয়া যাইবে। এবং চীনকে সেইরূপ বুঝাইয়া পাকিস্তান তাহাকে দিয়া ভিত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু একথা সর্বজনস্বীকৃত যে

বাংলাদেশ আর কখনও পাকিস্থানে কিরিয় যাইবে না এবং তাহার জাতীয়তা পৃথক ও নিজস্ব। সুতরাং চীনের ভিত্তি দ্বিবার কোন সার্থকতা নাই। ইহাতে বিষয়টা বিলম্বে স্থির হইবে এবং সেই বিলম্ব কোন ভাবেই পাকিস্থানের কোন লাভের কারণ হইবে না। পাকিস্থান যখন বাংলাদেশ ধ্বংসে মতিয়া ছিল, চীন তখন পাকিস্থানকে নানাভাবে তাহার পাপকার্যে সাহায্য করিয়াছে। এক সময় লোক পাঠাইয়া সাক্ষাৎভাবে সেই ব্রশংস হত্যাকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করিতেও চীন দ্বিধা করে নাই। কিন্তু কোন কিছুতেই বাংলাদেশ আর পাকিস্থানে সংযুক্ত থাকে নাই। তেমনি চীন যতই ভিত্তি দিক না কেন, বাংলাদেশের তাহাতে কিছু মাত্র পরিবর্তন হইবে না একথা একান্তভাবে সত্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য।

### বাক্সালীর অবস্থা

ব্রিটিশ আমলে বাক্সালীরা ব্রিটিশের চাকুরী ও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া দিন কাটাইত। সেই কারণে ব্রিটিশ শাসকগণ একাধারে বাক্সালীদিগের সহায়তা লাভ ও দমন চেষ্টা করিয়া, এক ভাইকে বেতন দিয়া নিজকার্যে নিয়োগ আর এক ভাইকে হাতকড়া দিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিত।

আজ বাক্সালী স্বাধীন দেশের অংশীদার স্বাধীন নাগরিক। কিন্তু তাহার অবস্থা ব্রিটিশ যুগ হইতে মূলতঃ কোনভাবে উন্নত বা স্বাধীনতার আলোক উদ্ভাসিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ব্যবসা ক্ষেত্রে পূর্বে যেখানে ব্রিটিশ জাতীয় ব্যবসাদারগণ তাহার উপর প্রভু করিত এখন সেই স্থলে অপর কোন অবাক্সালী হকুম চালাইয়া থাকে। খাজ তাহার পূর্ণাপেক্ষা নিকট; কারণ তাহার প্রধান খাজবস্ত্তাল অল্প প্রদেশ হইতে আনা হয় বলিয়া তাহা আর পূর্বের মত উৎকৃষ্ট নাই। বস্ত্র ও তাহার অল্প প্রদেশের কাপড়ানায় প্রস্তুত ও গুণবাদেরও সেই অবস্থা। বাক্সালী পূর্বে যেমন একটি কক্ষে তিন জন বাস করিত এখনও তাহার সেই অবস্থা। এবং বাড়ীর মালিক অনেক স্থলেই অবাক্সালী। বাক্সালীর নির্ভর চাকুরীর উপর কিন্তু চাকুরী নাই অথবা অবাক্সালীর প্রতিযোগিতায় পরহস্তগত। এই অবস্থার স্বাধীন বঙ্গদেশের জনসাধারণ যতাদেব নেতৃস্থানীয় বলিয়া অনুসরণ করিতেছে তাহার। অবাক্সালীর দ্বারা প্ররোচিত, প্ররোচিত ও শাসিত। ফলে এই দেশের মানুষের কোনও সভ্যকার স্বাধীনতা নাই। সে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে অপরের প্রভুত্বব্রিটি ও অপরের দ্বারা শোষিত।

## সাময়িকী

### মৎস্যের অভাবে ভেঁক

বাক্সালী জাতিতে অনেকে ভারতবর্ষের ফরাসী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহার কারণ, বাক্সালী জাতি ঠিক ফরাসীদিগের মতই রসপিপাসু ও ভোজনবিলাসী। ফরাসীদিগের যেরূপ সাহিত্য, সঙ্গীত, অভিনয়, ও “আড্ডা”তে পরম আগ্রহ; বাক্সালীরাও ঠিক তেমনিই কুটিলকল্পের বিভিন্ন রসের সম্বন্ধকার। ফরাসীদিগের সহিত বাক্সালীদিগের

পার্থক্যও ছিল অনেক। যথা ফরাসীগণ মহাযোদ্ধা জাতি, বাক্সালীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেরণায় প্রেম-ধর্ম অনুগামী। বিগত ৫০-৬০ বৎসর কিছু বঙ্গবাসী খোল করতাল ছাড়িয়া বোমা ও বন্দুক ধারণ করিবার চেষ্টা করিলেও সেট পরিবর্তন ঠিক জাতিগত হইয়া দাঁড়ায় নাই। তাহা হইলেও একটা আশা দেখা দিয়াছে যে, প্রয়োজনের তাড়নায় বাক্সালী অস্ত্রধারণ করিয়া সমরাজনে অবতীর্ণ হইতে দ্বিধা করিবে না।



ফরাসীদিগের মত-প্রভুত কার্যে খ্যাতিও পৃথিবীতে অতুলনীয়। বাঙ্গালী মত-প্রভুত কার্য জানেনা কিন্তু তাহার রসগোষ্ঠা ও সন্দেশ বিবধিখ্যাতে। ফরাসীদিগের রন্ধনে মৎস্তের ব্যবহার নাই বলিলে চলে। বিভিন্ন চতুষ্পদ ও পক্ষী মাংসই অধিক ব্যবহৃত। বাঙ্গালীর মৎস্ত রন্ধন পৃথিবীর কোন দেশের তুলনায়ই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে না। ফরাসীদিগের আর-একটা খ্যাতির ক্ষেত্র হইল মহিলাদিগের সাজ-পোশাকে। পারীর ফ্যাশন হুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালীর রেশম ও তুলার সূতায় বোনা শাড়ী সর্বত্র আদৃত। বাঁকুড়া বীরভূমের ভসর গরদ প্রভৃতির বিদেশেও প্রচুর চাহিদা। একটা বিষয়ে ফরাসীরা জগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। তাহা হইল ডেক-মাংস ভক্ষণে। ইয়োরোপীয় অপরাপর মাংসভক্ষীদিগের মধ্যে ডেক-মাংসের প্রচলন নাই। শুধু ফরাসীদিগের মধ্যেই উহা চলে। বাঙ্গালীরাও ডেক-মাংস কোথাও কোথাও ভোজন করিত বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু তাহার ব্যাপক ব্যবহার ছিল না। সম্ভ্রান্ত শুনা যাইতেছে মৎস্তের অভাবে বাজারে ডেক বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে এবং বাঙ্গালীরা ক্রমশঃ অধিক করিয়া ডেক-মাংস ভক্ষণ করিতেছে। ইহা হইলে বাঙ্গালীর ও ফরাসীর কৃষ্টি ও জীবনযাত্রা-পদ্ধতির সাদৃশ্য আরও বর্ধিত হইবে।

#### সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদপত্র ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়, ১৭৮০ খৃঃ অব্দে। তাহার নাম ছিল “বেঙ্গল গেজেট”। প্রকাশক জেমস অগাষ্টাস হিকি। রাজা রামমোহন রায় ১৮২১ খৃঃ অব্দে “সংবাদ কোমুদী” প্রকাশ করেন ও ঐ পত্রিকাকে প্রথম ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র ধরিলে আমাদের সংবাদপত্র প্রকাশের ইতিহাসের বয়স ১৫১ বৎসর হয়। কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ইতিহাস এই দেশে ইংরেজী সাবাদপত্রগুলির সহিত জড়িত থাকায় সংবাদ কোমুদী প্রকাশের পূর্বে হইতেই শাসক-গোষ্ঠীর দ্বারা সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। “বেঙ্গল গেজেট” প্রকাশের পরে ইংরেজদিগের দ্বারা

প্রকাশিত “ইণ্ডিয়া গেজেট”, “ক্যালকাটা গেজেট” ও “বেঙ্গল হরকরা” ভারতবর্ষের সংবাদপত্র জগতে দেখা দেয়। ইহা হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ কুড়ি বৎসরে। ঐ সময় ইয়োরোপে বিপ্লবের আবহাওয়া প্রবলভাবে বহমান ছিল। ফরাসী বিপ্লব তখন বিশ্বের জনমনে এমন একটা অস্থিরতা জাগ্রত করিয়াছিল যে, তাহার ফলে কোনও কিছুই নিশ্চয়তা কেহ বিশ্বাস করিতে পারিতোঁছিল না। ঐ দেশে পরে নেপোলিয়নের রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে যে প্রতিজ্ঞা দেখা যায় তাহাতে বিপ্লবী চিন্তাধারার নানাভাবে বাধা দিবার চেষ্টা পাশ্চাত্যের সকল দেশেই আরম্ভ হয়। এই প্রতিজ্ঞার চেষ্টে ভারতবর্ষ অবাধ আসিয়া যায় এবং লর্ড ওয়েলেসলির শাসন যুগে সংবাদপত্রগুলিতে বাহাতে শাসকদিগের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব জাগাইবার চেষ্টা না হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উইলিয়াম ডুয়েন ছিলেন “ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড” পত্রিকার সম্পাদক। তাঁহাকে ঐ সময় প্রেষণার করিয়া ইংলণ্ডে চালান করিয়া দেওয়া হয়। লর্ড ওয়েলেসলি নিজের চীফ সেক্রেটারীর মারফত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ ও দমন কার্যে চালাইতেন। তাহার বিধি নিয়ম-আইনের রূপ গ্রহণ করে ১৭৯৮ খৃঃ অব্দে। এই আইন অনুসারে সকল সংবাদপত্রকে যাহা ছাপিবে তাহা চীফ সেক্রেটারীকে দেখাইয়া লইতে বাধ্য করা হইল। সংবাদপত্রগুলিকে লাইসেন্স লইতে হইল এবং তাহার শাসকদিগকে খুশী রাখিতে না পারিলে তাহাদের লাইসেন্স খারিজ করার ব্যবস্থা হইল। এই সকল নিয়ম প্রায় কুড়ি বৎসর মোতাদেন ছিল। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে এই সকল নিয়মের কড়া কাড়ি ছাড়া হইলে সিদ্ধ বার্কিংহামের “ক্যালকাটা জার্নাল” ও ও রামমোহন রায়ের “সংবাদ কোমুদী” এবং “ইমরাৎ-উল-আখবার” প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। কিন্তু জন্ম অ্যাডাম যখন অল্পদিনের জন্য বডলাট হইলেন তখন তিনি সিদ্ধ বার্কিংহামকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়া নিজের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধবাদের অভিযুক্তি আরম্ভ করিলেন। “ক্যালকাটা জার্নালের” সহঃ সম্পাদক ত্রাণকোডকেও প্রেষণার করিয়া যদেপে

পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পরে ডাক্তার আর্পট রাজা রামমোহন রায়ের সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। ১৮২৩ হইতে লাইসেন্স বিধি আবার জারি করা হইল। এই নিয়মের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর সুপ্রীম কোর্টে একটি স্মারকপত্র দাখিল করেন। তাহাতে যাহা লেখা হয় তাহা অংশত উদ্ধৃত করা হইল :

Every good ruler, who is convinced of the imperfection of human nature and reverences the Eternal Governor of the world, must be conscious of the great liability to error in managing the affairs of a vast empire ; and therefore he will be anxious to afford to every individual the readiest means of bringing to his notice whatever may require his interference. To secure this important object, the unrestrained liberty of publication is the only effectual means that can be employed.

অর্থাৎ, যে সকল শাসক বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করেন, তাঁহারা যদি মানবচারিত্রের দোষ ও অক্ষমতা স্বীকার করেন ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তাহা হইলে বাহাতে সকল ব্যক্তি সহজে তাঁহাদিগের নিকট শাসন-পদ্ধতির দোষ ও অভাবের কথা উপস্থাপিত করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা অটুট রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন। এই ব্যবস্থার অতি সহজ ও সরল উপায় হইল সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা।

সুপ্রীম কোর্ট এই স্মারকপত্র অগ্রাহ্য করেন। রাজা রামমোহন রায় ইহার প্রতিবাদে “মিরাৎ-উল-আখবার” প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আন্দোলন তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, প্রায় ১৫০ বৎসর কাল এই দেশে প্রয়োজন হইলেই চালিত হইয়াছে। ইহার সহিত বিদেশীর সাম্রাজ্যবাদের একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ লক্ষিত হয়, কারণ স্বাধীন দেশে সচরাচর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ অথবা দমন চেষ্টা শুধু তখনই হয় যখন শাসক-গোষ্ঠী দৈর্ঘ্যচায়ে প্রমত্ত হইয়া

মানব স্বাধীনতার আদর্শগুলি ভুলিয়া ক্ষুদ্র গণ্ডির অভ্যন্তর শক্তি প্রতিষ্ঠার দিকেই আত্মনিয়োগ করেন। এই কার্য যে শুধু আটন করিয়াই করা হয় এমন কোনও কথা নাই। অনেক সময় অল্প উপায়েও সংবাদপত্র-গুলির স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করা হয়। সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া না দেওয়া একটা বড় উপায় বলিয়া ব্যবহার করা হয় স্তন্য যায়। বাহারা নিজেদের সংবাদপত্রে শাসকদিগকে সমর্থন করিয়া অথবা তাঁহাদের দোষ না দেখাইয়া সংবাদাদি প্রকাশ করেন, তাঁহারা যথেষ্ট সরকারী বিজ্ঞাপন পাইয়া থাকেন। বাহারা সমালোচক তাঁহারা সেই আর্থিক সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। তৎপরে আছে শাসক-সমর্থক শক্তিশালী ব্যক্তিদিগের দ্বারা চালিত উৎপীড়নের কথা। যথা, অনেক সময় যদি কেনে সংবাদপত্র শাসকদিগের কঠিন সমালোচনা করেন, তাহার বিক্রয় ও প্রচারে শক্তি প্রয়োগে বাধা দিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। সেইরূপ হইলে স্বাধীনতা-প্রয়াসী সকল ব্যক্তিই তাহাতে মনঃক্লম হইতে পারেন ও হুওয়া উচিত। মত-বিরোধ থাকিলেই জোর করিয়া মত প্রকাশে বাধা দেওয়া হইবে, এই স্বাভাবিক সমর্থন করা যায় না।

### বহুরূপী কালোবাজার

কালোবাজার ও সাদা বাজার বলিয়া দুইটি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দ্রব্য কেনাবেচার প্রতিষ্ঠান নাই। যেখানে আইনতঃ পাওয়া দ্রব্যাদি আইন অনুযায়ীভাবে বিক্রয় করা হয়, সেখানেই অনেক সময় বেআইনীভাবে পাওয়া বস্তানিয় বেআইনীভাবে বিক্রয় করা হয়। আইন প্রাচ্য উপায়ে সংগৃহীত দ্রব্যাদিও অনেক সময় বেআইনী ভাবে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। ইহার উদ্দেশ্য, রাজকর কাঁকি দেওয়া ; অর্থাৎ ব্যবসায় লাভ পুরাণির না দেখাইয়া রাজকরের পরিমাণ হ্রাস চেষ্টা করা। ইহা ঠিক কালো বাজারের ব্যবসায় নয়, রাজকর কাঁকি দিবার ব্যবস্থা মাত্র। ইহা ব্যতীত অনেক সময় ভ্রাতৃত্ব-বে-সকল মাল দোকানদারের হস্তে আসিয়া থাকে তাহাও অংশতঃ ভ্রাতৃত্ব মূল্যে বাহাদিগের প্রাপ্য তাহারা না

নইলে, অধিক মূল্যে বাহাদিগের প্রাণ্য নহে তাহাদিগকে বিক্রয় করা হয়। ইহা এক প্রকার অর্ধ-কালো বাজার বলিলে অত্যাশ্চর্য হয় না। পুরাপুরি কালো বাজার হইল, যে বাজারে বেআইনীভাবে লব্ধ বস্তু বেআইনীভাবে অধিক মূল্যে বিক্রয় করা হয়। এই সকল বিক্রয় সামগ্রী নানা পথে দোকানদারের নিকটে আসিয়া থাকে। চোরাই মাল, মাগুল কাঁচ দিয়া আমদানি করা বিদেশী মাল, আবগারী শুল্ক না দিয়া উৎপন্ন বস্তু গোপনে আনিয়া বিক্রয়ের মাল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই বাজারের দ্রব্য সরবরাহ হয় বহু পথে। খাণ্ডবস্ত্র সরকারী আড়তে না দিয়া গোপনে বিক্রয় এই বাজারের বৃহত্তম ব্যবসায়। পাঁচ কিলো দশ কিলো হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্র সহস্র কুইন্টাল পর্যন্ত এইভাবে বিক্রয় হয়। গ্রামের দরিদ্র গ্রীলোকগণও এই ব্যবসায় করে ও তৎসঙ্গে এই কার্য করে বহু ক্রোরপতি বিরাট বিরাট আড়তের মালিকগণ।

কর্মীদিগকে বোনাস বা অতিরিক্ত অর্থ দিবার ব্যবস্থা

পূজা-পার্বণের সময় বহুকাল হইতেই একটা রীতি প্রচলিত আছে যে, যাহারা কাজকর্ম করে তাহাদিগকে জামা কাপড় মিষ্টান্নাদি বিতরণ একটা কর্তব্য কার্য। এই দিবার ব্যবস্থায় যে অর্থব্যয় করা হয়, তাহার সীমিত, যাহারা পায় তাহাদিগের বেতনের কোন তুলনা করিয়া কেহ কখনও শতকরা কত অংশ তাহা হিসাব করে নাই। তবে বলা যায় যে, অবস্থা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি ভৃত্যদিগকে বৎসরে কাপড় জামা মিষ্টান্নাদি যাহা দিয়া থাকেন তাহার মূল্য অর্ধ হইতে এক মাসের বেতনের সমান নিশ্চয়ই হয়। এই রীতি কতকালের পুরাতন রীতি তাহা আমরা জানি না; কিন্তু ইহা যে বহু শতাব্দী হইতেই চলিয়া আসিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কারখানা ও বৃহৎ আকারের কারবার স্থাপন হইবার পূর্বে যে সকল কর্মী নিয়োগ-কারী মালিকগণ ছিলেন তাহারাও মনে হয় নিজেদের

নিযুক্ত কর্মীদিগকে পূজা-পার্বণের সময় এই প্রকার দান করিতেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, পূজা-পার্বণের সময় কিছু পাইবার আশা যাহারা শ্রমজীবী তাহারা করিয়াই থাকে এবং ঐরূপ আশা করার একটা সামাজিক ঐতিহ্যও আছে। কারখানা কারবার স্থাপিত হইবার পরে পূজার সময় অথবা বৎসরে এক বার কিছু বেতনতিরিক্ত অর্থ লাভ চেষ্টা কর্মীগণ করিয়াই থাকে এবং ঐরূপ অর্থ দেওয়ারও একটা রীতির প্রচলনও হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আইন করিয়া কারখানার শ্রমিকদিগকে বাৎসরিক বেতনের শতকরা ৪ ভাগ বোনাস হিসাবে দেওয়ার রীতিও কয়েক বৎসর পূর্বে করা হইয়াছিল। এখন ঐ ৪ ভাগকে বাড়াইয়া ৮-১০ ভাগ করার চেষ্টা চলিতেছে, অর্থাৎ বাৎসরিক এক মাসের বেতন অতিরিক্ত যাহাতে শ্রমিকগণ পায় সেইরূপ ব্যবস্থা। ইহাতে অনেকে বলিতেছেন যে, বহু ব্যবসায়ে কোনও লাভ হয় না এবং সেই সকল ব্যবসায় ১২ মাসে ১০ মাসের মাহিনা দিতে সক্ষম নাও হইতে পারে। শ্রমিকগণ বলিতেছেন, লাভ হউক বা নাই হউক ঐ বোনাস সকলকেই দিতে হইবে নিয়ম করা হউক। কেহ কেহ বলিতেছেন লাভ হইলে দিতে হইবে এবং না হইলে দিবার কোনও বাধ্যবাধকতা থাকিবে না, এই রীতিই জায়সঙ্গত। একটা কথা সহজবোধ্য। তাহা হইল এই যে, শ্রমিক মালিক সম্বন্ধ বিচারে তাহাই জায্য যাহা উভয় পক্ষ মানিয়া লয়। জীবনযাত্রা-পদ্ধতির ব্যয়ের হিসাব করিয়া অথবা ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান দেখিয়া বেতনাদি নির্ধারণ কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না যদি না উভয় পক্ষ একমত হইয়া সেই বেতন বোনাস বা অন্যান্য সুখ-সুবিধার ব্যয়ই মানিয়া লইতে প্রস্তুত থাকেন। সুতরাং বর্তমান বোনাসের হার নির্ধারণের বিষয়েও ঐ নিয়মই প্রয়োগ করা কার্যকর হইবে। অঙ্ক করিয়া বিশেষ কিছু হইবে বলিয়া মনে হয় না।

ত্রিপুরায় স্বাধীনতার রক্তত জয়ন্তী

ত্রিপুরা সাপ্তাহিকে প্রকাশ :

১৪ই আগষ্টের অন্তিম মুহূর্ত। ১৫ই আগষ্টের অভ্যুদয় লগ্ন। আমাদের তখন মবাররাত্রি। সাধারণতঃ যে সময়টায় নগর বিশ্রাম গ্রহণ করে, পুরবাসীরা আশ্রয় নেয় সুশুপ্তির কোলে, কর্মচঞ্চল নাগরিক জীবনে বিরাজ করে স্তব্ধতা—এই দিন সেই সময়টায় রাজধানী আগরতলার বিয়াম ছিল না; কর্মচঞ্চলতা যেন বাড়িয়াই গিয়াছিল। চোখে ঘুম আসিবে কি! আলো বলমল প্রাসাদ মালা। প্রাকারে প্রাকারে বর্ণিচা দাঁপাবলী দেওয়ালী উৎসবের অভিনব সংস্করণ। গাওয়ার গাড়ীর অবিরাম ভৌৎ ভাৎ হর্ণ আর চাকার ঘড়ঘড়ানি আর ছুৎ ছাৎ ধ্বনি নৈশ স্তব্ধতাকে নিব্বাসনে পাঠাইয়া উৎসবমত্ততার আগমনী বার্তা ঘোষণা করিতেছিল।

আবাহনী যন্ত্র সংগীত বাজিতেছিল ত্রিপুরা বিধান সভার অলিন্দে। প্রবেশদ্বারে প্রহরার পরিবর্তে অভ্যর্থনার সমারোহ। বিধানসভা কক্ষ জগজমাট। অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, বিধান সভার সদস্যগণ প্রায় সকলেই স্ব স্ব আসনে সমাসীন। প্রেস গ্যালারীতে স্থানাভাব। দর্শকের গ্যালারীতে অর্দ্ধশতাধিক দ্বাধীনতা সংগ্রামীগণ একদিকে, অন্তর্দিকে সব পদস্থ আমলাবর্গ। বিচিত্র সভা। মন্ত্রী অধিবেশন-আয়োজন বিরোধী সদস্যগণের (হুইজন সি, পি, এম সমর্থক নির্দল সদস্য সহ সি, পি, এম, এর ১৭ জন সদস্যের) অনুপস্থিতিতে কলঙ্কিত পূর্ণচন্দ্রের জায় শোভা পাইতেছিল। রাাত্রি ১১টা ৫৫ মিনিটে ঐতিহাসিক স্বাধীনতা-স্মারক-অধিবেশনের শুভ সূচনা করিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখময় সেনগুপ্ত। প্রথমে প্রণতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন অমর শহীদ-গণের উদ্দেশে; সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইলেন সমাগত মুক্তি সংগ্রামীদের। সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিলেন স্বাধীনতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংকল্পের ক্রম-

বিবর্তনী ধারা। অতীতকে অবলম্বন করিয়াই মাঝি-ভূঁত হয় বর্তমান এবং এই বর্তমানই উৎস বা ভিত্তি হয় ভবিষ্যতের। স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পূর্তি দিবসে অতীতের সাক্ষ্য ও বার্থতার গ্রানটাকেই বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন এবং ঐ গ্রানি মুছবার সংকল্পই ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহার ভাষণে। স্বর্ষকাল ব্যাপী স্বাধীনতা রক্তত জয়ন্তী উৎসব পালনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিব্রেশন করিয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনগুপ্ত বলেন যে, “উৎসবের মাধ্যমে আমরা মতী কল্যাণবত সাধনের সংকল্প গ্রহণ করিতেছি; এই রক্ত উৎসাপনে যেহেতু গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণের সমান অধিকার সেই হেতু সম-দায়িত্ব পালনেও জনগণকে আগতিয়া আসার জন্ত অনুরোধ জানাইতেছি।”

“এ উৎসব আন্তর্জাতিক উৎসব নহে, বরঞ্চ ব্যাপী কল্যাণ রক্ত মতী উৎসব হইবে।” বিধান সভার বিশেষ স্মারক অধিবেশনে ভাষণ দান প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি দ্বাধীনতা সংগ্রামের দ্বিমুখী আভ্যাসনের (অ্যাসং ও স্যাসং) ক্রম-বিকাশের ধারা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন এবং শহীদ-গণের প্রতি নিবেদন করেন গভীর শ্রদ্ধা। শ্রীভৌমিক তাঁহার ভাষণে ভারতের এবং বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা-গণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

রাাত্রি ১১টা ৫৮ মিনিটে ভাষণ সমাপ্ত। অধ্যক্ষের প্রস্তাবানুসারে সমাগতগণ শহীদগণের স্মৃতি পূজায় দুই মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকেন। ঘাড়ের কাঁটা তখন বারোটায়, জাতীয় সঙ্গীতের সুর-সঙ্গীত ধারা রাজ্য বিধানসভার বিশেষ এই দ্বাধীনতা স্মারক অধিবেশনের সমাপ্ত।

অধিবেশনের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃত হয় উৎসব আরম্ভের তুর্ঘ্যানাদ। পরপর পঁচিশটি ভোপ নিনাদে আগমন বার্তা ঘোষণা করা হয় ১৯৭২ সালের ১৫ই

অত্যাচারের নামান্তর বলে গণ্য হবে। টেলিফোন এহীতাদের এখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় উপক্রম হয়েছে।

গণতন্ত্রে দায়িত্ব নিতে হয়, কৈফিয়ৎ দিতে হয়। পরস্পর খরচ করে ফোন রাখা, অথচ wrong call বা wrong connection-এর জন্য অযথা পরস্পর দিতে হবে; ১১১ নং-এ ডায়াল করে উত্তর পাওয়া যাবে না; খেয়ালখুশি মতো বিল আসবে; অথচ পত্র দিলে তার জবাব মিলবে না; খোঁজ নিতে গেলে অত্যাচার করা হবে—এই পরিস্থিতিটা সহ্য করা সম্ভব নয়। জেনারেল ম্যানেজার সহ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও হুঃসাধ্য। কোনো ব্যাপারেই কোনো প্রতিকার পাওয়া যায় না।

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় যদি এই অবস্থার প্রতি-বিধান করতে পারেন তবে এই সিদ্ধান্তে আসা ভিন্ন উপায় থাকবে না যে, এ রোগের বড় অপারেশন প্রয়োজন। টেলিফোনের ব্যবসায় সরকারী মনোপলি খুচিয়ে দিতে হবে।

### রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কাজ বন্ধ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কাজ বন্ধ হওয়ার ফলে পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণের বিশেষ ক্ষতি, কষ্টভোগ ও অসুবিধা হইয়াছিল ও তাহার জের এখন অবধি চলিতেছে। আগষ্ট মাসের শেষার্ধ্বে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে যে সকল চেক জমা দেওয়া হইয়াছে তাহা সেপ্টেম্বরের ১১১ তারিখ অবধি আদায় হয় নাই ও বাঁহাদগের টাকা তাঁহারা শূন্য হস্তে জন-বিক্রোডের অতিবিক্রোড কাহিনী গুনয়াই নিজেদের অর্থকষ্ট সহ করিয়া চলিতে বাধ্য হইতেছেন। এই বিষয়ে “যুগবাণী” বলিয়াছেন :

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এক পক্ষেরও বেশি কাল যাবৎ কাজকর্ম বন্ধ হয়ে আছে। ঐ ব্যাঙ্কের একটি বিভাগে একটি রেকর্ড সাপ্লায়ের পদের আর কোনো প্রয়োজন না থাকায় ঐ পদটির বিলোপ ঘটতে চাওয়া হয়েছে। ঐ চতুর্থ শ্রেণীর পদটিতে যে নিযুক্ত আছে তার চাকরি বাবায় কোনো সম্ভাবনা নেই, তার বেতন হ্রাসও ঘটবে না, এমনকি তাকে আর একটি বিভাগে রেকর্ড সাপ্লায়ের

পদে যোগ দিতে বলাও হয়েছে। অথচ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ইউনিয়ন এই সামান্য অঙ্গল বদল ঘটাবার প্রস্তাবে এতদূর ক্ষুব্ধ হয়েছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম তারা অচল করে দিয়েছে। তাদের দাবী স্বেচ্ছাসংগত নয়—কার্য প্রতিষ্ঠানের দার্থে নতুন পদ সৃষ্টি করা বা একটি বর্তমান পদের বিলোপ ঘটানোর অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে;—পদাধিকারীর কোনো বৈষয়িক ক্ষতি করা নাহলে এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টির অজুহাত থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত যদি কর্তৃপক্ষের আচরণ অসঙ্গত ও অসঙ্গতও হয় সেক্ষেত্রে আইনগতভাবে প্রতিবাদ ও দাবী জানানোর বহু উপায় আছে, আদালতেও বিচার প্রার্থনা করা চলে। কিন্তু সেসব কোনো পক্ষেই না গিয়ে, বৈধ সমস্ত পক্ষে চেষ্টা না করেই, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম বন্ধ করে দেবার একান্ত অসঙ্গত ও জুলুমবাজির পথ ইউনিয়ন বেছে নিয়েছে। ঐ ইউনিয়নের পিছনে যে পাট্টাই মদত থাকুক না কেন, কোনোমতেই আমরা এই তাণ্ডব সৃষ্টিকে সমর্থন করতে পারি না। শ্রমিক শ্রেণীর দার্থের নামে কিংবা বিপ্লবের নামেও এই দায়িত্ববোধহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন উচ্ছৃঙ্খল আচরণকে সমর্থন করা চলে না।

মাত্র একজন চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীর ব্যক্তিগত অভিমানকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে গোটা পূর্ব ভারতের অর্থ-নৈতিক জীবনকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকলে অর্থ-নৈতিক লেনদেন বন্ধ হয়ে যায়। গত পনেরো দিনে শতাধিক কোটি টাকার লেনদেন বন্ধ হয়ে রয়েছে। সরকারী কাজকর্ম চালানোও স্থগিল হয়ে পড়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষ করে ক্ষুদ্র শিল্প ও ছোট ব্যবসায়ের চরম অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের অর্থ-নৈতিক কাঠামোর স্তম্ভপিত স্বরূপ। ঐখান অর্থ-নৈতিক ধমনীগুলি এসে সঞ্চিত হয়েছে; ঐখানে থেকে রক্ত সঞ্চালিত হয় দেশের অর্থ-নৈতিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। একটি মাত্র ব্যক্তির হীনকো মর্বাদায় ঐহুৎ আঘাত লেগেছে বলে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সর্বভারতের, অর্থনীতিতে রক্তপ্রবাহ ত্ত্ব করে দেওয়া

হয়েছে। একটি লোকের একই বিভিন্নয়ে এক বিভাগ থেকে আর এক বিভাগে বদলি হবার আদেশের ফলে জাতির জীবনে দু'বিপাক ডেকে আনা হয়েছে।

এই ঐক্যত্ব, এই দুঃসাহস এই ব্যক্তিটি কিংবা তার ইউনিয়ন কোথা থেকে পায়? কংগ্রেস নেতারা, মন্ত্রীরা, বিশেষত যুব নেতারা বারবার বলছেন যে তাঁরা চান উৎপাদন বাড়ুক, বিশৃঙ্খলা বন্ধ হোক, ট্রেড ইউনিয়ন দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করুক, অর্থনীতিকে ধ্বংস করার পথ থেকে সরে দাঁড়াক। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে তাগু ব চলছে তাতে কি কংগ্রেস নেতাদের কামনা দক্ষল হবে? তবে তাঁরা আজ নীরব কেন? কেন রাজ্য সরকার অভ্যন্তরীণ মিষ্ট দু'লির আশ্রয় নিয়েছেন? রিজার্ভ ব্যাঙ্কে দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতাকে কে বা কারা আশ্রয় দিচ্ছে?

যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের কর্মীরা সরকারী অফিসে অফিসে চেয়ার দখলের আন্দোলন করেছিলেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা দিনের পর দিন অস্ত্রায় ও গহিত খাচরণ করে চললেও তার পাল্টা আন্দোলন করার কথা কি একবারও মনে পড়ছে না যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের নেতাদের? তাঁদের কাছে আমাদের আবেদন, যুক্তকণ্ঠ সরকারের আমলে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্কু করে দেবার যে প্রয়াস হয়েছিল ভিন্ন রূপে, ভিন্ন পন্থায় সেই একই প্রয়াস আবারও যেন না চলে। অতুর্বেই সর্বনাশের সম্ভাবনা নষ্ট করে ফেলা ভালো। কয়েকটি সম্ভবত্ব লোকের হৃদয়ের কাছে দেশের সর্বসাধারণের স্বার্থকে জলাঞ্জাল দিতে যেন না দেওয়া হয়।

### জ্যোতি বহুর বিদেশ ভ্রমণ

জ্যোতি বহুর লণ্ডন গমন লইয়া নানা প্রকার অপপ্রচার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এই বিষয়ে “যুগজ্যোতি” পত্রিকা বলেন :

গি পি এম্ নেতা জ্যোতি বহু কিছুদিন পূর্বে লণ্ডনে গিয়াছেন এবং দেখানে কয়েকটি জনসভায় বক্তৃতাও করিয়াছেন। তিনি কি বলিয়াছেন তাহার কোন

রিপোর্ট ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে বাহির হয় নাই। তবে যতদূর লোকপরিচায় শোনা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় পশ্চিম বঙ্গের “আধা-ক্যাপিট বিভীষিকা, নিগাচনী জালিয়াতি ও নিগাচনোত্তর পরিহীতি” প্রভৃতিই ছিল তাঁহার ভাষণের মুখ্য বিষয়বস্তু। এই ভাষণের ফলে লণ্ডনে ভারতীয়দের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হইয়াছে ঠিক জানি না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী মহলে যে ঝড় উঠিয়াছে তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কংগ্রেসী সদস্যরা প্রবল বজা বহাইয়া দিয়াছেন। প্রবল উঠিয়াছে—জ্যোতি বহুকে কেন লণ্ডনে যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল, কেন তাঁহার বিদেশ যাত্রার পাশপোর্ট মঞ্জুর করা হইল, কে তাঁহাকে টাকা দিল, পাকিস্তানের কোন হোটেলের মালিক তাঁহাকে টাকা দিয়াছে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

জ্যোতি বহু স্বাধীন ভারতের একজন নাগরিক। তিনি একটি সগভীরতর রাজনৈতিক দলের নেতা এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী। তাঁহাকে বিদেশ যাইবার অনুমতি না দিবার কোন কারণই নাই এবং এ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠা বিশেষ ভাবেই আশ্চর্যজনক। গণ্ডায় গণ্ডায় সংসদ সদস্য ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধান সভার সদস্যরা যখন তখন বিদেশ সফরে যাইতেছেন কে তাঁহাদের বেলায় অনুমতি না দিবার প্রশ্ন তো কোন দিনই ওঠে না।

জ্যোতি বহু এট রুটেনে ভারতীয়দের সংগঠিত বৃহৎ সংগঠন “ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ গ্রেট ব্রিটেন” (Indian Workers, Association of Great Britain) নামক সংস্থার আমন্ত্রণে লণ্ডনে গিয়াছেন। তাই তাঁহার পাশপোর্ট মঞ্জুর না করিবার কোন অজুহাতই থাকিতে পারে না। টাকাকে দিয়াছে অবশ্য জানি না, তবে যাহারা আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছে তাহাদেরই এই অর্থ যোগান স্বাভাবিক। পাকিস্তানের একটি হোটেলের মালিকের অর্থ দিবার যে কথা উঠিয়াছে তাহা অনর্থক জল বোলা করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ ভারতীয় সূত্রায় এই ভ্রমণের

ব্যয় নির্বাহের কোন সভাবনাই নাই, তাহার জন্য প্রয়োজন বৈদেশিক মুদ্রার। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অতি অবশ্যই এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছে, তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একথা সঠিক ভাবে না জানা থাকিবার কথা নয়। রাষ্ট্রমন্ত্রী সুরত মুখোপাধ্যায়ের ‘জনস্বার্থ’ এর কথা বার বার বলিয়া অনর্থক ধূম্রজাল সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না, খবরটি সত্য না মিথ্যা তাহা পরিষ্কার ভাবে বলিয়া দিলেই হইত। আর যদি কেহ কাহাকেও টাকা দিয়াই থাকে, তাহাই বা গোপন করিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? বন্ধুবান্ধব বা শ্রদ্ধেয় নেতাদের ব্যক্তিগত ভাবে ষোপাক্রিত অর্থদান করায় কোন বাধা নাই এবং ইহা অপরাধও নয়। শুধুমাত্র যদি ইহা ‘গিফট ট্যাক্স’-এর আওতায় আসে, তাহা হইলে ঐ ট্যাক্স দিতে হয়। অবশ্য এই পার্ক-স্ট্রীটের হোটেলটির কথা তুলিবার পক্ষান্তে কংগ্রেস দলের গৃহ উদ্দেশ্য আছে। দীর্ঘদিন ধরিয়াই প্রচার চালান হইতেছে যে জ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থাকিবার কালে অর্থাৎ ভাবে ঐ হোটেলটি খুলিবার অসুখিত দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহার বিনিময়ে তিনি ও তাঁহার দল প্রচুর লাভবান হইয়াছিলেন। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠিতেছে যে যদি সত্যই মন্ত্রী থাকা কালীন জ্যোতি বসু অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন তো বর্তমান মন্ত্রিসভা তাহা তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন গঠন করিতেছে না কেন। অল্প কয়েকটি রাত্রে প্রাপ্তন মন্ত্রীদের অবৈধ আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা হইয়াছে এবং ঐ কমিশনের রিপোর্টও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তবে জ্যোতি বসুর ব্যাপারেই বা তদন্ত করিতে বাধা কি ছিল? কোন নেতা অজ্ঞান বা অবৈধ কাজ করিয়া থাকিলে বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে সমর্থন করিবেন না কিন্তু প্রকাশ্যে অভিযোগ না তুলিয়া কানাকানি ও ইসারা ইত্যাদিতে পরোক্ষ ভাবে কোন নেতার চরিত্র হননের চেষ্টা শুধুমাত্র অজ্ঞান নয়, হীন মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত বিধান

ভারত ও বাংলাদেশের নাগরিকগণ ঐ দুই দেশে যাতায়াত করিতে হইলে বৈধ অসুখিত-পত্র ব্যবহার

করিবেন তাহার বর্ণনা ‘ত্রিপুরা’ সাপ্তাহিক হইতে উদ্ধৃত করা হইতেছে :

আগরতলা, ২৬শে আগষ্ট। ভারত ও বাংলাদেশ সরকার উভয় দেশের মধ্যে যাতায়াত নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৭২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হতে পাশপোর্ট ভিসা পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে সম্মত হয়েছে। এ পদ্ধতি চালু হওয়ার পর ভারতীয় নাগরিকদের বাংলাদেশ ভ্রমণের জন্য পারমিট প্রদান পদ্ধতি উঠে যাবে। ত্রিপুরার ভারত বাংলাদেশ পাশপোর্ট পলিটিকেল ডিপার্টমেন্টের আওতাধীন সেক্রেটারী ইন্সপেক্টর করবেন। উপরোক্ত কর্তৃপক্ষ ভারত বাংলাদেশ পাশপোর্ট রিনিউও করবেন। কোন ব্যক্তি একাধিক ভারতীয় পাশপোর্ট রাখতে পারবেন না, যথা বাংলাদেশ পাশপোর্ট, ভারত আন্তর্জাতিক পাশপোর্ট অথবা ভারত সিংহল পাশপোর্ট প্রভৃতি।

ভারত বাংলাদেশ পাশপোর্ট করতে খরচ পড়বে দশ টাকা। তিন বছর পর্যন্ত এ পাশপোর্টটি বৈধ থাকবে। এ ‘পাশপোর্ট’ পুনরায় তিন বছরের জন্য বলবৎ করা যায় এবং সেজন্য খরচ পড়বে পাঁচ টাকা (অথবা প্রতি বছর বা তার কোন সময়ের জন্য দুই টাকা)।

ভারতীয় নাগরিকগণ নির্ধারিত ফরমে দশ টাকার চালান এবং নাগরিকদের সাটিফিকেটের অ্যাটেস্টেড কপি সহ জমা দিতে হবে। পাশপোর্ট পেতে ইচ্ছুক সরকারী কর্মচারীদেরকে নির্ধারিত ফর্মের সাথে স্ব স্ব বিভাগের প্রধানদের নিকট হতে আপত্তি নাই এমন একটি সাটিফিকেট প্রদান করতে হবে। জেলাশাসকের অফিসে এবং পলিটিকেল ডিপার্টমেন্টে দরখাস্ত ফরম পাওয়া যাবে।

১৫ বছরের কম বয়সের ছেলেমেয়েদের পিতামাতা যে কোন জনের পাশপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যে সমস্ত ছেলে-মেয়ের বয়স ১৫ বছরের বেশী এবং যারা মাতাপিতার সাথে ভ্রমণ করবে না তাদেরকে পৃথক পাশপোর্ট করতে হবে। ১৯৭২

সালের ১লা আগষ্টের পর ভারত বাংলাদেশের যে সব নাগরিক অপরাধে ভ্রমণ করতে যাবেন তাঁদেরকে ভিসা করতে হবে। বাংলাদেশের যে সব নাগরিক ১৯৭২ সালের ১লা সেপ্টেম্বরে ভারতে থাকবেন এবং ৩০শে সেপ্টেম্বরের পরও ভারত থাকতে ইচ্ছুক তাঁদেরকে “ভারতীয় মিশন এণ্ড পোস্ট এবং রাজ্যসরকার ভিসা প্রদান করবেন। বাংলাদেশের নাগরিকদের জরুরি ভিসা বিনা খরচায় দেওয়া হবে। বাংলাদেশের নাগরিকদিগকে প্রদত্ত সকল শ্রেণীর ভিসা সংরক্ষিত সীমাবদ্ধ এবং নিষিদ্ধ এলাকা ছাড়া ভারতের কে কোন অংশে ভ্রমণ এবং অবস্থান সম্পর্কে বৈধ থাকবে। বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক বৈধ ভিসায় ভারতে আসবেন এবং একাধারে ছয় মাসের বেশী ভারতে অবস্থান করতে ইচ্ছুক তাঁদেরকে” ফরেনাস’ রোজট্রেশন অফিস/পুলিশকর্তৃপক্ষের নিকট নামেরোজিত্রী করতে হবে এবং রেসিডেনশিয়াল পারামিট নিতে হবে।

### পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী নিগ্রহ

নিজ্বাসভূমে পরবাসী হ’লে কবিতায় বলা হইয়াছে বহুগুণ পূর্বে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঐ কথাই অভিব্যক্তি শুনা যায় ২৫ বৎসর কাল হইতে বৃদ্ধ হইয়াছে। অথচ ভারতবর্ষে বহুস্থলে সংখ্যা লঘিষ্ঠাদিগের উপর যেরূপ উৎপীড়ন সজোরে পরিচালিত আছে দেখা যায় তাহাতে মনে হয় যে স্বাধীন মানুষের মানবীয় অধিকার প্রাপ্তি ভারতের বহু মানবের এখনও পূর্ণরূপে হয় নাই এবং কখন হইবে তাহাও অসুমান করা এখনও সম্ভব হইতেছে না। বিহার প্রদেশের সহিত যে সকল বাঙ্গালী ভাষাভাষীদিগের ভিটামাটি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, যথা মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা বা পূর্ণিয়া ব্রহ্মাট অঞ্চল, সেই সকল স্থানের বাঙ্গালী দিগকে জার করিয়া হিন্দী ভাষা শিক্ষা ও ব্যবহার করিতে পাধ্য করিবার চেষ্টার কথা আমরা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি। তাহাতে কোনও বিশেষ লাভ হয় নাই গরম হিন্দী রাষ্ট্রভাষা করিবার অর্থ ইহাই হইয়া গড়াইয়াছে যে হিন্দীভাষাভাষী প্রদেশগুলিতে যে

সকল অ-হিন্দী-ভাষাভাষী সংখ্যা লঘিষ্ঠ ব্যক্তিরা বাস করেন তাহাদের নিজ মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া হিন্দীকে মাতৃভাষা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

সে যাহাই হউক, এখন সংবাদপত্রে যাহা পাঠ করা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে, কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠেও বাঙ্গালী-দিগের নিজস্ব কোনও অধিকার থাকা সম্ভব হইতেছে না। ব্যারাকপুরের নিকটেও হিন্দী ভাষাভাষীগণ দল গঠন করিয়া বলিতেছে যে চাকুরীর অধিকার বাঙ্গালীর থাকিবে না, শুধু হিন্দী ভাষাভাষী গণই চাকুরী ক্ষেত্রে একাধিপত্য লাভ করিবে। টিটাগড়ের “মণাবীর ক্লাব” অবাঙ্গালীদিগের আখড়া ও ঐ ক্লাবের দলপাত শ্রীকৃষ্ণ স্ক্রু। তিনি নাকি বাঙ্গালীদিগকে কোণঠাসা করিয়া রাখিয়া ঐ অঞ্চলের সকল কারখানা যাহাতে শুণু অবাঙ্গালীদিগকে কর্মে নিযুক্ত করেন সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহার কোনও প্রতিকার ব্যবস্থা কেহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন না বলিয়া এই সকল ব্যক্তির বাঙ্গালী-নিগ্রহ চেষ্টা কোনও বাধা পাইতেছে না।

### ভোগ্য বস্তুর মূল্য বৃদ্ধি

“লিংক” পত্রিকা বলিতেছেন যে, বিগত দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে ভারত সরকারের খাদ্য সংক্রান্ত কথাবার্তাতে সুর বদলাইবার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পূর্বে যেরূপ “খাদ্যবস্তু যথেষ্ট আছে, সকল প্রদেশের চাহিদা মিটান হইবে” ইত্যাদি কথা বিশেষ আশ্বস্তাত্মকের সুরে বলা হইত; সম্মুখিত তাহা পরিবর্তিত হইয়া একটা সন্দেহ ও অবস্থা তেমন সুবিধার নহে ভাব সরকারী বিবৃতিতে দেখা যাইতেছে। এখন বলা হইতেছে, “সকল প্রদেশের চাহিদা যথা-সম্ভব মিটান হইবে—অবশ্য অপর সকল প্রদেশের চাহিদা বিচার করিয়া।” এখন মনে হইতেছে যে নব্বই লক্ষ টন খাদ্যবস্তু জমা করা হইলেই তাহাতে খাদ্যবস্থা ঠিক করা হইয়া যাইবে না। পাইকারী দর বাড়িয়াই চলিতেছে। সরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে কোনও পূর্ণ উদ্ভম লক্ষিত হইতেছে না। খাদ্য সরবরাহ যথাযথভাবে চলিবে বলিয়া মনে হয় না।





আলোছান্না জানালায়—বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।  
মডেল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১২/দাম পাঁচ  
টাকা।

কবি হিসাবেই বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত।  
আমরা ইতিপূর্বে তাঁর কবিতা পাঠ করে যেমন ভীর্ণ  
পেয়েছি, তেমনই আনন্দ পেয়েছি 'বীরবাহু' ছদ্মনামে  
লেখা নিবন্ধগুলি পড়ে। রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর  
আলোচনা গ্রন্থটিও অধীমহলে সমাদৃত। সম্প্রতি  
তাঁর উনিশটি ছোটগল্পের একটি সংকলন প্রকাশ  
করেছেন মডেল পাবলিশিং হাউস।

গল্পগুলির মধ্যে বীরেন্দ্র বাবুর কবিচিন্তার অমূর্ত  
একটি নিবিড় সূক্ষ্মতায় প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে  
তাঁর প্রেমিক হৃদয়ের সহজাত বেদনাবোধ সরল ও  
সচ্ছ প্রকাশগুলির মাধ্যমে উদ্ভাসিত, অন্যদিকে তাঁর  
সরল কৌতুকবোধ জীবনের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গনায় উচ্ছাসিত।  
জীবনকে তিনি বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে দেখেছেন তাঁর  
রসোপলব্ধির গভীরতায়। এবং তাঁর সেই উপলব্ধির  
রসকে প্রতিভাত করেছেন পাঠকের সামনে। 'বালিনী'  
'স্মিতার জন্ত' 'শিবহৃদয়' 'এই আবরণ' 'তমুনীড়ের  
ডায়েরী' প্রভৃতি গল্পে লেখকের সহজ কুশলতার প্রকাশ।

'আলোছান্না জানালায়' একটি সার্থক গল্পগ্রন্থ; পাঠক  
সমাজে সমাদর পাবে বলেই আশা করি।

—সন্তোষ কুমার অধিকারী

নির্ণয়—১ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ। সম্পাদক : জয়ন্ত  
চৌধুরী। ১৮৩২বি বালীগঞ্জ প্রেস প্রিন্ট হইতে শ্রীমতী  
শেকালী বসু কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য একটাকা মাত্র।

আলোচ্য পত্রিকাটি দ্বিভাষিক এবং দ্বিমাসিক।  
এই ধরনের দ্বিভাষিক পত্র পত্রিকা অধুনাকালে প্রকাশিত

হচ্ছে, এটা খুবই আশার কথা। দুটি ভাষায় যে  
পাঠক-সমাজের কাছে পৌছানো যায় তা নিশ্চয়ই  
একটি ভাষার মাধ্যমে পাওয়া পাঠক-সমাজের থেকে  
বিস্তৃততর, এর মানে পত্রিকার বক্তব্য, তার আবেদন  
বৃহত্তর পাঠকসমাজকে প্রভাবিত করে। পত্রিকার  
বক্তব্য স্বাস্থ্যকর হলে তা সমাজের অবশ্যই কল্যাণ  
করবে। 'নির্ণয়' পত্রিকাটিতে একটি সহজ গাহোয়,  
মানসিক স্বাস্থ্যের পরিবেশ লক্ষ্য করে উৎসাহবোধ  
করেছি। বাংলা ভাষায় লেখা কবিতাগুলির মধ্যে  
ভাল লেগেছে শ্রীজ্ঞানেন্দ্র হাজরা, কমল গুপ্ত, দীপক  
চক্রবর্তী, ভবানী দত্ত, নির্মল ভৌমিক ও ফিলিপ  
পারিকানের কবিতা। শ্রীবিজয় দেবের অনূদিত  
লিওপোল্ড লেজের লেখা 'আফ্রিকান কাব্যগুণ'  
একটি সুখপাঠ্য ভাব্যবহুল প্রবন্ধ। শ্রীনির্মল ভৌমিকের  
ইংরেজী ভাষায় লেখা 'A Note on Samar Sen' প্রবন্ধটি  
মৌলিক মূল্যায়নের দাবী রাখে। নির্মল বাবু সমর  
সেনের তিনটি কবিতারও অনুবাদ করেছেন। তবে  
বাঁরা মূল কবিতাগুলি পড়েছেন তাঁরা এই অনুবাদ  
তিনটি পড়ে খুব খুশী হতে পারবেন না বলেই মনে  
হয়। ইংরেজী ভাষায় দখল বেশ পাকা করে প্রতিষ্ঠা  
করতে না পারলে বোশ হয় এই ধরনের অনুবাদ করি  
হাত না দেওয়াই ভালো। 'Red oleanders  
palpitate' 'hazy looming evening' 'impalpable  
wailing in the wind' প্রমুখ শব্দাবিজ্ঞাস জানি না  
পাঠকের মনে কী ধরনের চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম  
হয়? আদৌ কোন কিছু ব্যঞ্জিত হয় কী না সে  
সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

—ডক্টর সুধীর নন্দী









